

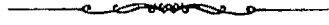
756-3
৯৪

CUK-4851-8-P30087

(প্রবাসী)

সচিত্র মাসিক পত্র।

756-3
৯৪



শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত



(অষ্টম ভাগ।) (দ্বিতীয় খণ্ড)

(১৩১৫)

কলিকাতা।

মূল্য তিন টাকা ছয় আনা।

P30087

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
কার—শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৩২	কবি রামকুমার নন্দী—শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা ...	২০৬
পদ্ম)—শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী ...	৩২৮	কবি-সম্ভাবণ (কবিতা)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার,	
—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল, ...	১৭৬	বি-এল, ...	৫৬
ার-সাধন—শ্রীশীতলচন্দ্র চন্দ্রবর্তী, এম-এ, ...	৪৪২	কাগজ—শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা ...	৫৭৫
র আবির্ভাব—শ্রীকালীশঙ্কর সেন ...	৪৪৬	কাব্যে বঙ্গদেশের বিশেষত্ব—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার,	
আশাসন পরে রাজ্যশাসন—শ্রীরজনীকান্ত		বি-এল, ...	৩০৩
এ, ও শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৭১	কুকি ও মিকির ...	৩৪
ফুলচন্দ্র রায় মহাশয়ের গবেষণা—		কেদার রায় (পদ্ম)—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী ...	৫৮৫
নন্দ রায় ...	৩৩৩	কৃষ্ণধর্ম—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪২৪
শ্রীমুখোজনাথ ঠাকুর ...	৭০৪	কঃ পদ্ম—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চন্দ্র ...	৫২৪
—পারব্রাজক শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী ...	৫৭২	খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর—শ্রীমুহনাথ সরকার, এম-এ, ...	৩২০
গ্রামে উন্নতির পরাকাষ্ঠা—সন্তুনিহাল		গণেশ ও বেদব্যাস (চিত্রপরিচয়)—শ্রীচারুচন্দ্র	
... ..	৬০১	বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ...	৬৪৫
র বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বরাষ্ট্রিক সমিতি—		গোয়ালপুরে অমী ও গ্রাম—শ্রীকালীপদ বসু ...	৪২
হনাথ গাঙ্গুলী ...	২৭৭	গোরা (উপভাস)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
এ)—শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী ...	৫৮৬	১, ৫৭, ১১৩, ১৬২, ২৩৩, ২২৭, ৩৫৩, ৪১৩, ৪৭৭,	
পদ্ম)—শ্রীমুখোজনাথ ঠাকুর, বি-এ, ...	৫৮৬	৫৬৩, ৫৯৩, ৬৪৫	
তার ভারতভ্রমণ—শ্রীমহাশয় হাকিমজল		চন্দ্র পদার্থটা কি ?—শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৬, ২৪০
... ..	৫০৫, ৫৫৬	চিত্র পরিচয়—সম্পাদক প্রভৃতি ...	৫৪
পুরাতত্ত্বসংগ্রহ—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,		১০৫, ১৬৮, ৩৫২, ৪১২, ৪৭৫, ৫৩১, ৫৮৮, ৬৪৩, ৬৪৫	
... ..	৩৮৪	অয়স্কিয়া ও খাসিয়া ...	১৪৭
ইতিহাস-সম্মিলন—শ্রীব্রজসুন্দর সাম্যাল ...	৬৭২	আগরণ (পদ্ম)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, ...	৪০২
শক্তি—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ...	৫১২	আপানে ভারতীয় ছাত্রের কত ব্যয় হয়? (প্রতিবাদ)	
উপদেশ (সমালোচনা)—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ	৪৬২	—শ্রীভারতীয় ছাত্র ...	৫৩২
পদ্ম)—শ্রীলজ্জাবতী বসু ...	৬৪৩	আপানে ভারতীয় ছাত্রের কত ব্যয় হয়—শ্রীঅন্যুৎপন্ন	
রনক ব্যবসায়—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ...	২৮০	সরকার ...	৭০২
র্গ—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি-এল, ...	৪৪১	তত্ত্ব প্রতিবাদ ...	৭১০
প্রব্র—শ্রীসখারাম গণেশ দেউকর ...	৫৪২	আপানে জ্ঞানিকা—শ্রীব্রজসুন্দর সাম্যাল ...	৪৩৫
র্গ—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ...	৬৪৩	আপানের নারীসমাজ—শ্রীব্রজসুন্দর সাম্যাল ...	৩১৫
হিত্যে নবরীতি—শ্রীইন্দুপ্রকাশবন্দ্যো-		জ্যোৎস্না (পদ্ম)—শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী ...	
... ..	৫১৫	ঠাকুর রুল—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম-এ, ...	১৬৩
—শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, ...	৩৮২	দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসী ...	৪৭৩
াল—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, ...	৩৯৮, ৪৬৬, ৫০১	ছৎপ (পদ্ম)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল, ...	২৮৩
চন্দ্র সেন—শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী ...	৬৩৮	মেথিরা শিখর কি ঠেকিয়া শিখর ?—শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ	
		ঠাকুর ...	১২০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
দেবদত্ত (পঞ্চ নাটক)—শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী	১০০, ১৪৫, ২১৮	বিদেশী বাঙালী ছাত্র	...
ধর্ম—শ্রীমদ্বীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ, ...	৪৫৩	বিবাহ বৈচিত্র্য—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল,	...
ধর্মসাধন বা চরিত্রের উন্নতি-সম্পাদন—শ্রীরজনীকান্ত	...	বিবিধ প্রসঙ্গ	৫৪, ২১৮
শুভ, এম এ, ...	১৩	বুদ্ধ সমাজ-সংস্কারক না মুক্তি প্রচারক—শ্রীজ্যোতি-	...
ধর্মের বলবত্তা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৫৭	রিন্দ্র নাথ ঠাকুর	...
ধূপ (পত্র)—শ্রীকুমুদবজ্রন মল্লিক, বি-এ,	১৬৭	বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ—শ্রীজগদানন্দ রায়	১৪৯, ৫
নবযুগের উৎসব—শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬১৪	বৈদিক ধর্ম—শ্রীজ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
নিরাপত্ত কায়োপোয়ে—শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	২৬৫	বৈদিক পারদোৎসব—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী	৪
নির্দোষ (পত্র)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল,	৩৪৭	বৌদ্ধধর্ম—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
স্বয়ংসাহান (সমালোচনা)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	...	বৌদ্ধধর্মের বিশ্বপ্রেম—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য	...
বি-এল,	২৭২	শাস্ত্রী	৫২৮, ৫
নেপালে বৌদ্ধধর্ম—শ্রীহেমলতা সরকার	১৩৯	বৌদ্ধযুগ ও ভাস্কর্য্য—শ্রীসখারাম গণেশ দেউ	৬
গাট বা নালিতা—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত	৬৬৪	ব্রাইটন—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি	...
পাণ্ডুরার কীর্তিচিহ্ন—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি-এল,	২০	ব্যারিষ্টার	৫
পারস্ত-প্রস্থন (পত্র)—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৪৭৬, ৫৩০	ব্রাহ্মণ্য ধর্ম—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
পূণা—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৯৫	ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও মিশরের পুস্তক—শ্রীইন্দুনাথ	...
পূর্ব ও পশ্চিম—শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৮৮	মল্লিক, এম-এ, বি-এল, এম-ডি	...
পেন্সিলভেনিয়া-প্রবাসীর পত্র—শ্রীপ্রেমানন্দ দাস	৬২০	ভক্ত ও কবি—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত	...
প্রতিবাদ—শ্রীআনন্দের আলী	৩৪৮	ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গ—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	...
প্রবাসী বাঙালীর কথা—	...	ভারতীয় ব্রহ্মবাদ—শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ	...
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-	...	ভারতে বৌদ্ধ প্রভাবের শক্তি—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ	...
মোহন দাস	৪৬	ঠাকুর	...
স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন—শ্রীঅম-	...	ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ	৮
লেনু গুপ্ত	৪৭	ঠাকুর	১২৮, ৫
মদ্রাশনাথ ভট্টাচার্য—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ,	৫৮৩	ভারতের সারকথা—শ্রীহেমলতা দেবী	৬
প্রবাসীর পত্র—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৩৮১	ভূত নামানো—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ	...	ভূগোলশিক্ষা—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...
ঠাকুর	২৪৭	ভেরা সেজোনোভা—শ্রীনঃ	...
প্রার্থনা (পত্র)—হিন্দু বিধবা	১৬৬	মহুয়াফষ্টি—শ্রীজগদানন্দ রায়	...
প্রার্থনা (পত্র)—শ্রীসরলা দত্ত	৫৩১	মরণঞ্জয়ী প্রেম (গল্প)—শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী	...
প্রীতি (পত্র)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল,	১৫২	মা (গল্প)—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ,	...
প্রেম (পত্র)—শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী	৪৭৬	মার্কিনরা ধর্মের দ্বারা স্বরাজ্য লাভ কবিরাছিল	...
ফলসংক্রান্ত—শ্রীঅনাথবন্ধু সরকার	৬০৬	না—শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম-এ,	...
বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান—ডাক্তার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বার,	...	স্বরোপীয় রাজার অত্যাচার—	...
ডি-এস্-সি,	৭২৪	স্বরোপে পদার্পণ—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপা-	...
বৈদ্য মূলসমানদিগের মাতৃভাবা কি ?—অধ্যাপক	...	বি-এ, ব্যারিষ্টার...	...
মোলবী আবদুল ময়দী খাঁ	৬৯৭	রাজনগর—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...
বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী—শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত	৫১৭, ৫৩৬	রাজা দেবী সিংহ	...
বিদেশী চিন্তির সহিত প্রতিযোগিতা—	...	লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈ	...
শ্রীকালিপ্রদ দাস	১৪৩	বি-এল,	...
শ্রীকুমারনাথ দাস	৪৪০	লবকোট ও কুশাবতী—শ্রীললিতামোহন মুখোপা-	...

সূচীপত্র ।

১০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পঞ্চ) — শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ...	১০৪	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—	
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ...	৩৪৪	মুজারাক্স ...	৫১, ১১০, ১৬৭, ২৭৬, ৩৪৮, ৪১১, ৪৭৬, ৫৩২, ৫৮৬, ৬৪৮, ৭১০
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২১	স্বপ্নরাজ্যের গান (কবিতা) — শ্রীচাক্রক্স বন্দ্যো-	
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬৬	পাধ্যাধ্যায়, বি-এ, ...	২৮০
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৫৬	স্বপ্নবহ যন্ত্র — শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ...	৬৯০
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৮৮	হত্যাপ্রবৃত্তি ...	৪৭৪
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৬৩	হাতে হাতে ফল — শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,	
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪৪৮	বি-এ, (ব্যারিষ্টার) ...	১৮১
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৩৭	হাবামণির অন্বেষণ (সমালোচনা) — শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ	২৫৭
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৩৭	হুঁকার জন্ম — শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৭

চিত্র সূচী ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৩২	খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর ...	৩২৪
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৪	গলায় রবাব দেওয়া কলবন্ধাব বোতল ...	৬৪৯
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৬৯	গোল্ড্‌ স্মিথের কবর — মিডল্‌ টেম্পল ...	৯৪
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪৭৫	জাপানী নারীগণের তরবারী ক্রীড়া শিক্ষা ...	৩১৭
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৭৮	জাপানী নারীগণকে চা প্রস্তুত ও পরিবেশন করিবার	
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৮৭, ৩৮৮	প্রণালী শিক্ষাদান ...	৩১৭
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪১২	জাপানে প্রথম নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা	
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৬১	জিন্জো নাকসে ...	৩১৭
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩১৬	জিগন ফারা চাউণ্ড — একটি ব্রহ্মদেশীয় মন্দির ...	২৬৯
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২৯	ধীবসের একটি কবরের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র ...	২২৯
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২৯	দেওয়ান বাহাদুর কে, কৃষ্ণস্বামী রাও ...	৫৩১
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২০৯	দ্বিতীয় বামসেসের পিতা ...	২২৮
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৫৩	নবীনচন্দ্র সেন ...	৬২১
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪৭৬	পত্রপৃষ্ঠে বহিঃকোষ ইত্যাদি ...	৫১৪
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৩৩	শাশী কুমারমল্লী, এম্-সি, আঞ্জলিয়া, দাউদ মাহমুদ ...	৪৭৫
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৬	পুরীর মন্দির ...	৪১২
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৬	পেন্সিলভেনিয়ার হুইট চিত্র ...	৬২০, ৬২২, ৬২৩
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৬	প্রাচীন ধীবসনগরস্থ একটি চিত্র ...	২২৯
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬০২	ফলবন্ধার 'ইকনমি' বোতল ...	৬১৩
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬০৩	ফলবন্ধার 'লাইটনিং' বোতল ...	৬১১
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬০৪	ফাণ্ডা সন্ কলেজ, পুণা ...	৯৫
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬০৫	বজ্রধর বুদ্ধ ...	১৮
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২৮	বিচাপতি শঙ্কর কায়ার ...	৬২১
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২৮	বুদ্ধদেবের সংসার ত্যাগ — যোশিও কাৎসুতা ...	১১৩
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২৮	বেলজিয়ম রাজ্যের নরমাংসভোজী সাক্ষীগণের ভূক্তা-	
শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২৮	শিষ্ট পঞ্চম বর্ষীয় কস্তার দেহাবশেষ ...	৪০৯

বিবরণ।	পৃষ্ঠা।	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
ব্রহ্মদেশীয়া নারী—মন্দির পথে ...	২৬৮	শ্রী জে, সি, দাস ...	...
ব্রাইটন—		শ্রীপুলিনবিহারী দাস ...	...
সমুদ্র ভট, রয়্যাল ল্যাভোরিয়ন, ওল্ড ষ্টাইন		শ্রীবারীকুমার ঘোষ ...	...
উত্তান ...	৪৮৮	শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ...	...
কড়ের সময় সমুদ্র তীরস্থ রেলওয়ে, পিয়ার,	৪৮৯	শ্রীযত্ননাথ সরকার ...	...
ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির ...	১৬০	শ্রীযুক্ত আব্দুল হালিম গজ্জনবী ...	...
ভুবনেশ্বরে বিন্দু সাগর ...	১৬১	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ...	...
ভুবনেশ্বরে বৈতাল দেউল ...	১৬০	শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ...	...
ভোক্তরাজা ও পুস্তালিকা—শ্রীমুরেরেনাথ গাঙ্গুলী	৪১৩	শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলক ...	...
মহাভাবত লিখন—ব্যাস বক্তা, গণেশ লেখক—		শ্রীশচাঁদ্র প্রসাদ বসু ...	...
শ্রীমুরেরেনাথ গাঙ্গুলী ...	৫৯৩	শ্রীশান্তিপদ গুপ্ত ...	...
মিডল্ টেম্পল গলি ...	৯৪	শ্রীমুরবোধচন্দ্র মল্লিক ...	...
মিডল্ টেম্পল—ফোর্টেন্ কোর্ট ...	৯৪	সতী—শ্রীন্দ্রলাল বসু ...	...
যাজপুরে বরাহাবতার ...	১৬০	সত্যেন্দ্রনাথ বসু ...	...
যাজপুরের সপ্তমাতৃকা মন্দির ...	৪১২	সাধু কবির ...	...
যাজপুরের সভাস্থল ...	৪১২	সি, কে, খাশি নায়ুহ ...	...
যথেষ্ট রবার না আনার ক্ষত হাত কাটা ও পা কাটা		সিদ্ধ করিবার আগে বোতলে ফল রাখা	...
• কয়েক জনের ছবি ...	৪০৮, ৪০৯	সোরাবজী সাপুর্জী ...	...
রাও বাহাদুর আবু এন, মুখোলকার ...	৫৩১	ফিংস এবং মিসরের একটি পিরামিড ...	...
রাজনগরের একুশ রত্ন মঠ ...	২৭৯	স্বর্গীয় অনারেল গুরুপ্রসাদ সেন ...	...
রাজা রামমোহন রায় ...	২৯৭	স্বর্গীয় ময়ধনাথ ভট্টাচার্য ...	...
রাম মুক্তি নারায়ণ ...	৬২১	স্বর্গীয় শশধর হালদার ...	...
রামমোহন সেনের পলায়ন কলঙ্ক ...	৫৩৪	হার্ভার্ট স্পেন্সারের হস্তলিপি ...	...
লঙ্কনে ২য় রামসেনের মুক্তি ...	২২৮	হিন্দু বিধবা আশ্রম, পুণা ...	...
শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী—শ্রীমহাদেব বিশ্বনাথ		গাঙ্গারী—শ্রীন্দ্রলাল বসু ...	...
ধুরন্ধর ...	৫৭	নাড়িকায়ত্র ...	...
শিক্ষিতা জাপানী মহিলাদের আধুনিক পরিচ্ছদ ...	৩১৬	জলখড়ী ...	...
শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ ...	৪৭৪	স্বয়ংবহু ঘটীচক্র ...	...
শ্রীঅবিন্দ ঘোষ ...	১০৮	স্বয়ংবহু নরযন্ত্র ...	...
শ্রীঅধিনীকুমার দত্ত ...	৫৮৮	স্বয়ংবহু জলখড়ী ...	...
শ্রীআব্দুল্লাহ্-অল্-মামুন স্ফাহওয়ারী ...	১০৯	স্বয়ংবহু ...	৬৯৫, ৬
শ্রীধুরাম বসু ...	২৩২	আবর্তচক্র ...	...

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনার বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি, এল,
উত্তর বঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ
একডালা তুর্গ
পাণ্ডুর কীর্তি চিহ্ন
লঙ্কনসেনের পলায়ন কলঙ্ক
পরিব্রাজক শ্রীঅচ্যুতানন্দ সবস্বতী
আভির্ভাষ

অধ্যাপক মোলবী আবদুল মরীদ খাঁ
বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা কি ?
শ্রীঅনাথবন্ধু সরকার
জাপানে ভারতীয় ছাত্রের কত ব্যয় হয় ?
ফল রক্ষণ
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস
অদ্বৈত শক্তি

সূচীপত্র ।

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত
প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা
(স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

ভক্ত ও কবি

মাসিক শ্রীআনন্দের আলী

গ—শ্রী প্রতিবাদ

মক ৩ শ্রীহনুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব-উল ঔপন্যাসিক সাহিত্যে নবরীতি

জ-সম সিরাজ সমাধি (পদ্ম)

রি শব্দ শ্রীহনুনাথ বসু, এম, এ, বি, এল, এম, ডি,

পদ্ম (১) ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও মিশরের পুরাতত্ত্ব

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুণা

ভূগোল শিক্ষা

শ্রীকালিদাস দাস

বিশেষী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা

পুরিক শ্রীকালিদাস বসু

মতান্তর গোয়ালিয়রে জরী ও গ্রাম

শ্রীকালীশঙ্কর সেন

অশ্রীরীর আবির্ভাব

শ্রীকুমুদনাথ নাহিড়ী

মরণজরী-গ্রন্থ (গল্প)

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক, বি-এ,

ধূপ (কবিতা)

শ্রীকেদার নাথ দাস

বিশেষী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা

শ্রীকীরোরোদচন্দ্র চন্দ্র

ক: পদ্ম:

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,

উদ্ভিদের দৃষ্টিশক্তি

ওস্তাদ: রামমুর্তি

গণেশ ও বেদব্যাস (চিত্র-পরিচয়)

মা (গল্প)

স্বপ্নরাজ্যের গান (কবিতা)

ইত্যাদি

শ্রীজগদানন্দ রায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পবেষণা

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ

মহুয়া স্মৃতি

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

পারস্য প্রব্রু (পদ্ম)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

একটা লাভজনক ব্যবসায়

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দ

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা

(শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৃষ্ণ ধর্ম

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

বুদ্ধ সমাজসংস্কারক না মুক্তিপ্রচারক ?

বৈদিক ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্ম

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম

ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা

সমসাময়িক ভারত

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

অতুল (পদ্ম)

আলো (পদ্ম)

জ্যোৎস্না

দেবদূত (পদ্ম-নাটক)

প্রেম (পদ্ম)

শ্রীবিজয়দাস দত্ত

পাট বা নালিতা

শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অজ্ঞতা স্বীকার

আগে আত্মশাসন পরে রাজ্যশাসন

চক্ষু পদার্থটা কি ?

দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব ?

ধর্মের বলবত্তা

ভারতে বৌদ্ধপ্রভাবের শক্তি

শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়, এম, এ,

কবি (কবিতা)

স্বর্ঘ্যাস্ত (কবিতা)

শ্রীনগিনীকান্ত ভট্টশালী

কেশার রায় (পদ্ম)

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা

কাগজ

শ্রীগঙ্গনাথ দেবশর্মা

কবি রামকুমার নন্দী

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এস, সি,

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি, এ, বারিষ্টার

ট্রাইটন

ইরোপে পদার্পণ

হাতে হাতে ফল (গল্প)

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস

পেনসিলভেনিয়া প্রবাসীর পত্র

- শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি, এল
কবি বিশ্বজ্ঞানলাল
কবি-সম্ভাষণ (পদ্ম)
কাব্যে বঙ্গদেশের বিশেষত্ব
জাগরণ (পদ্ম)
দুঃখ (পদ্ম)
নির্দোষ (পদ্ম)
মুরজাহান (সমালোচনা)
প্রীতি (পদ্ম)
বিবাহ বৈচিত্র্য
- শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী
বৈদিক শারদোৎসব
বৌদ্ধধর্মের বিশ্বপ্রেম
শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
নিরাশ্রুতে কারাগারে
শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী
কবির নবীনচন্দ্র সেন
শ্রীব্রজমুন্ডর সায়্যাল:
উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলন
জাপানে জীর্ণিকা
জাপানের নারী সমাজ
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ভূত নামাঙ্কো
ছকার জন্মকথা
- শ্রীমহাম্মদ হাকিমুল হোসেন
ইবনে বতুতার ভারত ভ্রমণ
শ্রীমহেশচন্দ্র বোহর
উপনিষদের উপদেশ
ভারতীয় ব্রহ্মবাদ
হারামণির অবেষণ
মুদ্রারাক্ষস
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ইত্যাদি
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রাথমিক শিক্ষা
শ্রীযতীনাথ সরকার, এম, এ,
খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর
সিয়ার-উল-মুতাখ্ খরীদ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
রাজনগর
শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত
বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম, এ,
ঠাকুরমার ঝুলি (সমালোচনা)
সুপরি শব্দ দেশজ কি না
স্বয়ংবহ যজ্ঞ

- শ্রীরজনীকান্ত গুহ, এম, এ
আগে আত্মশাসন পরে রাজ্যশাসন
ধর্মসাধন বা চরিত্রের উন্নতি-সম্পাদন
মার্কিনরা ধর্মের দ্বারা স্বরাজ্য লাভ করিয়াছিল কি না
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গোরা (উপভাস)
নবযুগের উৎসব
পূর্ণ ও পশ্চিম
সহপায়
সমস্তা
- শ্রীরমণীমোহন বোষ বি, এল,
শিবাজী ও সুন্দরী
শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত
ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গ
শ্রীলজ্জাবতী বসু
উপেক্ষিত
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
লবকোট ও কুশাবতী
শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, এম, এ,
অমৃত শরীর সাধন
শ্রীসখারাম গণেশ দেউড়ার
ঐতিহাসিক প্রঙ্গ.
বৌদ্ধযুগ ও ভাস্করাচার্য্য
সন্ত নিহাল সিংহ
আমেরিকার গ্রামে উন্নতির পবাকার্তা
সম্পাদক
চিত্রপরিচয়
বিবিধ প্রসঙ্গ
সাময়িক প্রসঙ্গ ইত্যাদি
শ্রীসরলাদাস
প্রার্থনা (কবিতা)
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ,
আনন্দ
আহ্বান (পদ্ম)
ধর্ম
শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
প্রবাসীর পত্র
শ্রীহেমলতা সরকার
নেপালে বৌদ্ধ ধর্ম
শ্রীহেমলতা দেবী
ভারতের সার কথ
শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ বোষ, বি, এ.
প্রবাসী বাঙালীর কথা
(মম্বতনাথ ভট্টাচার্য্য)

২১

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।”

৮ম ভাগ।

বৈশাখ, ১৩১৫।

১ম সংখ্যা।

গোরা।

২১

মহিম সেদিন গোরাকে কিছু না বলিয়া তাহার পরের দিন তাহার ঘরে গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন গোরাকে পুনর্বার রাজি করাইতে বিস্তর লড়াই করিতে হইবে। কিন্তু তিনি যেই আসিয়া বলিলেন যে বিনয় কাল বিকালে আসিয়া বিবাহ সম্বন্ধে পাকা কথা দিয়া গেছে ও পানপত্র সম্বন্ধে গোয়ার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছে, গোরা তখনি নিজের সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল—“বেশত। পানপত্র হয়ে যাক্ না।”

মহিম আশ্চর্য হইয়া কহিলেন—“এখন ত বলচ বৈশত। এর পরে আবার বাগড়া দেবে না ত।”

গোরা কহিল, “আমি ত বাধা দিয়ে বাগড়া দিইনি, অমরোদ্ধ করেই বাগড়া দিয়েছি।”

মহিম। অতএব তোমার কাছে আমার মিনতি এই যে তুমি বাধাও দিয়ো না অমরোদ্ধও করো না। কুস্ত পক্ষে নান্দ্যরঙ্গী সেনাতেও আমার কাজ নেই আর পাণ্ডব পক্ষে নান্দ্যরঙ্গীও আমার দরকার দেখিলে। আমি একলা যা পারি সেই ভাল—ভুল করেছিলুম—তোমার সহায়তাও যে

এমন বিপরীত তা আমি পূর্বে জানতুম না। যা হোক্ কাজটা হয় এটাতে তোমার ইচ্ছা আছে ত ?

গোরা। হ্যাঁ, ইচ্ছা আছে।

মহিম। তা হলে ইচ্ছাই থাক-কিন্তু চেষ্টায় কাজ নেই।

গোরা রাগ করে বটে এবং রাগের মুখে সবই করিতে পারে সেটাও সত্য—কিন্তু সেই রাগকে পোষণ কুরিয়া নিজের সম্বল নষ্ট করা তাহার স্বভাব নহে। বিনয়কে যেমন করিয়া হোক্ সে বাধিতে চায়, এখন অভিমানের সময় নহে। গত কল্যাকার ঝগড়ার প্রতিক্রিয়া দ্বারাতেই যে বিবাহের কথাটা পাকা হইল, বিনয়ের বিদ্রোহই যে বিনয়ের বন্ধনকে দৃঢ় করিল সে কথা মনে করিয়া গোরা কালিকার ঘটনায় মনে মনে খুসি হইল। বিনয়ের সঙ্গে তাহাদের চিরন্তন স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গোরা কিছু-মাত্র বিলম্ব করিল না। কিন্তু তবু এবার দুজনকার মাঝখানে তাহাদের একান্ত সহজ ভাবের একটুখানি ব্যতিক্রম ঘটিল।

গোবা এবার বুঝিয়াছে দুঃ হইতে বিনয়কে টানিয়া রাখা শক্ত হইবে—বিপদের ক্ষেত্র যেখানে সেইখানেই পাহারা দেওয়া চাই। গোরা মনে ভাবিল আমি যদি পরেশ বাবুদের বাড়িতে সর্বদা যাতায়াত রাখি তাহা হইলে বিনয়কে ঠিক গাঙীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিব।

সেই দিনই অর্থাৎ বগড়ার পরদিনই অপরাহ্নে গোরা বিনয়ের বাঁশায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজই গোবা আসিবে বিনয় কোনো মতেই এমন আশা করে নাই। সেই ক্ষণ সে মনে মনে যেমন খুসি তেমনি আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল।

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় গোরা পরেশবাবুদের মেয়েদের কথাই পাড়িল অথচ তাহার মধ্যে কিছুমাত্র বিরূপতা ছিলনা। এই আলোচনায় বিনয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে বেশী চেষ্টার প্রয়োজন করে না।

সুচরিতার সঙ্গে বিনয় যে সকল কথাই আলোচনা করিয়াছে তাহা আজ সে বিস্তারিত করিয়া গোরাকে বলিতে লাগিল। সুচরিতা যে বিশেষ আগ্রহের সহিত এ সকল প্রশ্ন আপনি উত্থাপিত কবে এবং যতই তর্ক করুক না কেন মনের অলক্ষ্য দেশে সে যে ক্রমশই অল্প অল্প করিয়া সায় দিতেছে এ কথা জানাইয়া গোরাকে বিনয় উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিল।

বিনয় গল্প করিতে-করিতে কহিল—“নন্দর মা ভূতের গুণা এনে নন্দকে কি করে মেরে ফেলেছে এবং তাই নিয়ে তোমার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল তাই যখন বলছিলুম তখন তিনি বলেন—‘আপনারা মনে করেন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে মেয়েদের রাখতে বাড়িতে আর ঘর নিকোতে দিলেই তাদের সমস্ত কর্তব্য হয়ে গেল। একদিকে এমনি করে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমস্ত খাটো করে রেখে দেবেন তার পরে যখন তারা-ভূতের গুণা ডাকে তখনো আপনাবা রাগ করতে ছাড়বেন না, যাদের পক্ষে ছুটি একটি পরিবাবের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বজগৎ তাবা কখনই সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে না—এবং তারা মানুষ না হলেই পুরুষের সমস্ত বড় কাজকে নষ্ট করে অসম্পূর্ণ করে পুরুষকে তারা নীচের দিকে ভারাক্রান্ত করে নিজেদের জুর্গতির শোধ তুলবেই। নন্দর মাকে আপনাবা এমন করে গড়েচেন এবং এমন জায়গায় ঘিবে রেখেছেন—যে আজ প্রাণের মায়েও আপনাবা যদি তাকে সুবুদ্ধি দিতে চান ত সেখানে গিয়ে পৌছবেই না।’—আমি এ নিয়ে তর্ক করবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সত্য বলচি গোরা মনে মনে তাঁর সঙ্গে মতের মিল হওয়াতে আমি জোরের সঙ্গে তর্ক করত পারিনি। তাঁর সঙ্গে তবু তর্ক চলে কিন্তু লজিতার সঙ্গে তর্ক করতে আমার সাহস হয় না। লজিতা

যখন জা তুলে বলেন ‘আপনারা মনে করেন, জগতের কাজ আপনারা করবেন, আর আপনাদের কাজ আমরা করব। সেটি হবার জো নেই! জগতের কাজ, হয় আমরাও চালাব নয় আমরা বোঝা হয়ে থাকব; আমরা যদি বোঝা হই তখন রাগ কবে বলবেন পথে নারী বিবর্জিত।—কিন্তু নারীকেও যদি চলতে দেন তাহলে পথেই হোক ঘরেই হোক নারীকে বিবর্জন করবার দরকার হয় না।’ তখন আমি আর কোনো উত্তর না করে চুপ করে বইলুম। লজিতা সহজে কথা কন না, কিন্তু যখন কন তখন খুব সাবধানে উত্তর দিতে হয়। যাই বল গোরা আমাবো মনে খুব বিশ্বাস হয়েছে যে আমাদের মেয়েরা যদি চীন-রমণীদের পায়ের মত সজ্জ্বিত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কোনো কাজই এগোবে না।”

গোরা। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হবে না এমন কথা আমি ত কোনো দিন বলি নে।

বিনয়। চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ পড়ালেই বুদ্ধি শিক্ষা দেওয়া হয়।

গোরা। আচ্ছা, এবার থেকে বিনয়বোধ প্রথম ভাগ ধবানো যাবে।

সৈদিন দুই বন্ধুতে ঘুরিয়া ফিবিয়া কেবলি পরেশ বাবু মেয়েদের কথা হইতে হইতে বাত হইয়া গেল।

গোরা একলা বাড়ি ফিবিবার পথে ঐ সকল কথাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া কবিতো লাগিল এবং ঘবে আসিয়া বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ ঘুম না আসিল পরেশ বাবুর মেয়েদের কথা মন হইতে তাড়াইতে পাড়িল না। গোবাব জীবনে এ উপসর্গ কোনো কালেই ছিল না, মেয়েদের কথা সে কোনোদিন চিন্তা মাত্রই করে নাই। জগদ্ব্যাপারে এটাও যে একটা কথার মধ্যে এবার বিনয় তাহা প্রমাণ করিয়া দিল। ইহাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না, ইহার সঙ্গে হয় আপোষ নয় লড়াই কবিতো হইবে।

পবদিন বিনয় যখন গোবাকে কহিল—“পরেশ বাবু বাড়িতে একবার চলই না—অনেক দিন যাওনি,—তিনি তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন—” তখন গোরা বিনা আপত্তিতে রাজি হইল। শুধু বাজি হওয়া নহে, তাহার মনের মধ্যে পূর্বের মত নিরুৎসাহ ভাব ছিল না। প্রথমে

সুচরিতা ও পরেশ বাবুর কল্পারদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গোরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, তাহাব পরে মধ্যে অবজ্ঞাপূর্ণ বিরুদ্ধ ভাব তাহার মনে জন্মিয়াছিল, এখন তাহার মনে একটা কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছে। বিনয়ের চিত্তকে কিসে যে এত করিয়া আকর্ষণ করিতেছে তাহা জানিবার জন্য তাহার মনে একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে।

উভয়ে যখন পরেশবাবুর বাড়ি গিয়া পৌছিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দোণ্ডলার ধরে একটা জেলের সেজ জ্বালাইয়া হারান তাঁহার একটা ইংরেজি লেখা পরেশবাবুকে শুনাইতে-ছিলেন। এ স্থলে পরেশবাবু বস্ত্রত উপলক্ষ্য মাত্র ছিলেন—সুচরিতাকে শোনানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুচরিতা টেবিলের দূরপ্রান্তে চোখের উপর হইতে আলো আড়াল করিবার জন্য মুখের সামনে একটা তালপাতার পাখা তুলিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে আপন স্বাভাবিক বাধ্যতাবশত প্রবন্ধটি শুনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার মন কেবলি অন্য দিকে যাইতে-ছিল।

এমন সময় চাকর আসিয়া যখন গোরা ও বিনয়ের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল, তখন সুচরিতা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। সে চৌকি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই পরেশবাবু কহিলেন—“রাধে, যাচ্চ কোথায়? আব কেউ নয় আমাদের বিনয় আর গোর এসেচে।”

সুচরিতা সঙ্কুচিত হইয়া আবার বসিল। হারানের সুদীর্ঘ ইংবেজি রচনা পাঠে ভক্ত ঘটাতে তাহার আরাম বোধ হইল; গোরা আসিয়াছে শুনিয়া তাহার মনে যে একটা উত্তেজনা হয় নাই তাহাও নহে কিন্তু হারানবাবুর সম্মুখে গোরার আগমনে তাহার মনের মধ্যে ভাষি একটা অস্বস্তি এবং সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। জ্বলনে পাছে বিরোধ বাধে এই মনে করিয়া অথবা কি যে তাহার কারণ তাহা বলা শক্ত।

গোরের নাম শুনিয়াই হারানবাবুর মনের ভিতরটা একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল। গোরের নমস্কারে কোনো-মতে প্রতিনিমস্কার করিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। হারানকে দেখিবা মাত্র গোরার সংগ্রাম করিবার প্রবৃত্তি সশব্দে উদ্ভূত হইয়া উঠিল।

বরদাসুন্দরী তাঁহার তিন মেয়েকে লইয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; কথা ছিল সন্ধ্যার সময় পরেশবাবু গিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন। পরেশবাবুর যাইবার সময় হইয়াছে। এমন সময় গোরা ও বিনয় আসিয়া পড়াতে তাঁহার বাধা পড়িল। কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না জানিয়া তিনি হারান ও সুচরিতাকে কানে কানে বলিয়া গেলেন “তোমরা এঁদের নিয়ে একটু বোস, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসছি।”

দেখিতে দেখিতে গোরা এবং হারানবাবুর মধ্যে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। যে প্রশঙ্গ লইয়া তর্ক তাহা এই:—কলিকাতার অনতিদূরবর্তী কোন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাউন্লো সাহেবের সহিত ঢাকায় থাকিতে পরেশবাবুদের আলাপ হইয়াছিল। পরেশবাবুর জী কল্পার অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেন বলিয়া সাহেব এবং তাঁহার জী ইহাদিগকে বিশেষ খাতির করিতেন। সাহেব তাঁহার জন্মদিনে প্রতিবৎসরে কৃষিপ্রদর্শনী মেলা করিয়া থাকেন। এবারে বরদাসুন্দরী ব্রাউন্লো সাহেবের জীর সহিত দেখা করিবার সময় ইংরেজি কাব্য সাহিত্য প্রভৃতিতে নিজের কল্পারদের বিশেষ পারদর্শিতার কথা উত্থাপন করাতে মেম সাহেব সহসা কহিলেন, এবার মেলায় লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর সঙ্গীক আসিবেন। আপনার মেয়েরা যদি তাঁহাদের সম্মুখে একটা ছোট খাট ইংরেজি কাব্য নাট্য অভিনয় করেন ত বড় ভাল হয়।—এই প্রস্তাবে বরদাসুন্দরী অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। আজ তিনি মেয়েদের রিহার্সাল দেওয়াইবার জন্যই কোনো বন্ধুর বাড়িতে লইয়া গিয়াছেন! এই মেলায় গোরার উপস্থিত থাকা সম্ভবপর হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় গোরা কিছু অনাবশ্যক উগ্রতার সহিত বলিয়াছিল—“না।” এই প্রশঙ্গে এ দেশে ইংরেজ বাঙালীর সম্বন্ধ ও পরস্পর সামাজিক সম্মিলনের বাধা লইয়া দুই তরফে রীতিমত বিতণ্ডা উপস্থিত হইল।

হারান কহিলেন—“বাঙালীরই দোষ। আমাদের এত কুসংস্কার ও কুপ্রথা, যে, আমরা ইংরেজের সঙ্গে মেলবার যোগ্যই নই।”

গোরা কহিল, “যদি তাই সত্য হয় তবে সেই অযোগ্যতা সম্বন্ধে ইংবেজের সঙ্গে মেলবার জন্যে লালায়িত হইয়া বেড়ানো আমাদের পক্ষে লজ্জাকর।”

হারান কহিলেন—“কিন্তু বাবা যোগ্য হয়েচেন তাঁরা ইংরেজের কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়ে থাকেন—যেমন এঁরা সকলে।”

গোবা। একজনের সমাদরের দ্বারা অন্য সকলের অনাদরটা যেখানে বেশি করে ফুটে ওঠে সেখানে এরকম সমাদরকে আমি অপমান বলে গণ্য করি।

দেখিতে দেখিতে হারান বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং গোরা তাঁহাকে রহিয়া রহিয়া বাক্যশেলবিদ্ধ করিতে লাগিল।

হুই পক্ষে এইরূপে যখন তর্ক চলিতেছে সূচরিতা টেবিলের প্রান্তে বসিয়া পাখার আড়াল হইতে গোরাকে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। কি কথা হইতেছে তাহা তাহার কানে আসিতেছিল বটে কিন্তু তাহাতে তাহার মন ছিল না। সূচরিতা যে গোরাকে অনিমেষনেদ্রে দেখিতেছে সে সম্বন্ধে তাহার নিজের যদি চেতনা থাকিত তবে সে লজ্জিত হইত কিন্তু সে যেন আশ্ববিস্মৃত হইয়াই গোরাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। গোরা তাহার বলিষ্ঠ দুই বাহু টেবিলের উপরে রাখিয়া সম্মুখে বুকিয়া বসিয়াছিল; তাহার প্রশস্ত শুভ্র ললাটের উপর বাতির আলো পড়িয়াছে; তাহার মুখে কখনো অবজ্ঞার হাস্য কখনো বা ঘৃণার ক্রকট তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে; তাহার মুখের প্রত্যেক ভাব লীলায় একটা আশ্চর্য্যাদার গৌরব লক্ষিত হইতেছে; সে যাহা বলিতেছে তাহা যে কেবলমাত্র সাময়িক বিতর্ক বা আক্ষেপের কথা নহে, প্রত্যেক কথা যে তাহার অনেক দিনের চিন্তা এবং ব্যবহারের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাব মধ্যে যে কোনো প্রকার দ্বিধা দুর্বলতা বা আকস্মিকতা নাই তাহা কেবল তাহার কণ্ঠস্বরে নহে, তাহার মুখে এবং তাহার সমস্ত শরীরেই যেন সূদৃঢ় ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সূচরিতা তাহাকে বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল। সূচরিতা তাহাব জীবনে এতদিন পরে এই প্রথম একজনকে একটি বিশেষ মানুষ একটি বিশেষ পুরুষ বলিয়া যেন দেখিতে পাইল। তাহাকে আর দশজনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারিল না। এই গোবার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া হারান বাবু অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরের এবং মুখের আকৃতি, তাঁহার হাব ভাব ভঙ্গী, এমন

কি, তাঁহার জামা এবং তাঁহার চাদরখানা পর্য্যন্ত যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। এতদিন বারম্বার বিনয়ের সঙ্গে গোরার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সূচরিতা গোবাকে একটা বিশেষ দলের একটা বিশেষ মতেব অসামান্য লোক বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহার দ্বারা দেশের একটা কোনো বিশেষ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে এইমাত্র সে কল্পনা করিয়াছিল—আজ সূচরিতা তাহার মুখের দিকে একমনে চাহিতে চাহিতে সমস্ত দল, সমস্ত মত, সমস্ত উদ্দেশ্য হইতে পৃথক্ করিয়া গোবাকে কেবল গোরা বলিয়াই যেন দেখিতে লাগিল। চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সূচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কি, মানুষের আত্মা কি, সূচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব্ব অল্পভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।

হারান বাবু সূচরিতার এই তদ্রূপ ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার তর্কের যুক্তিগুলি জোর পাইতেছিল না। অবশেষে একসময় নিতান্ত অধীৰ হইয়া তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং সূচরিতাকে নিতান্ত আত্মীয়ের মত ডাকিয়া কহিলেন—“সূচরিতা, একবার এঘরে এস, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।”

সূচরিতা একেবারে চমকিয়া উঠিল। তাহাকে কে যেন মারিল। হারান বাবুর সহিত তাহার ঘেরাপ সম্বন্ধ তাহাতে তিনি যে কখনো তাহাকে একপা আত্মীয় কবিতো পারেন না তাহা নহে, অন্য সময় হইলে সে কিছু মনেই করিত না কিন্তু আজ গোরাও বিনয়ের সম্মুখে সে নিজেকে অপমানিত বোধ করিল। বিশেষতঃ গোরা তাহার মুখের দিকে এমন একরকম করিয়া চাহিল যে সে হারান বাবুকে ক্ষমা করিতে পারিল না। প্রথমটা, সে যেন কিছুই শুনিতো পায় নাই অমনিভাবে চুপ কবিয়া বসিয়া বহিল। হারান বাবু তখন কণ্ঠস্বরে একটু বিবক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন—“শুন সূচরিতা, আমার একটা কথা আছে, একবার এঘরে আসতে হবে!”

সুচরিতা তাঁহার মুখেব দিকে না তাকাইয়াই কহিল—
“এখন থাক—বাবা আসুন, তার পরে হবে।”

বিনয় উঠিয়া কহিল—“আমরা না হয় যাচ্ছি।”

সুচরিতা তাড়াতাড়ি কহিল—“না বিনয় বাবু, উঠবেন না। বাবা আপনাদেব থাকতে বলছেন। তিনি এলেন বলে!”—তাহার কর্ণস্বরে একটা ব্যাকুল অশ্রুনের ভাব প্রকাশ পাইল। হরিণীকে যেন ব্যাধের হাতে ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

“আমি আব থাকতে পারচিনে, আমি তবে চলুম” বলিয়া হারান বাবু দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। রাগের মাথায় বাহির হইয়া আসিয়া পরক্ষণেই তাঁহার অম্মতাপ হইতে লাগিল কিন্তু তখন কিরিবার আর কোনো উপলক্ষ্য খুঁজিয়া পাইলেন না।

হারান বাবু চলিয়া গেলে সুচরিতা একটা কোন্ সুগভীর লজ্জায় মুখ যখন বস্ত্রিম ও নত করিয়া বসিয়াছিল, কি করিবে কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না—সেই সময়ে গোরা তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া লইবার অবকাশ পাইয়াছিল। গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে উদ্ধৃত্য যে প্রগলভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল সুচরিতার মুখদ্বীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়? তাহাব মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জলতা নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছিল। কিন্তু নব্রতা ও লজ্জাব দ্বারা তাহা কি স্তম্ভর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে! মুখেব ডোলটি কি স্নকুমার! ক্রয়গুলের উপরে ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মত নির্মল ও স্বচ্ছ। ঠোঁট ছুঁ চুপ করিয়া আছে কিন্তু অমুচ্চারিত কথার মাধুর্য্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মত রহিয়াছে! নবীনা বমণীর বেশভূষায প্রতি গোরা পূর্বে কোনো দিন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই এবং না দেখিয়াই সে-সমস্তের প্রতি তাহার একটা বিস্মার ভাব ছিল—আজ সুচরিতার দেহে তাহাব নূতন ধরণের শাড়ি পরার ভঙ্গী তাহার একটু বিশেষভাবে ভাল লাগিল;—সুচরিতার একটি হাত টেবিলের উপরে ছিল—তাহাব জামাব আস্তিনের কুঞ্চিত প্রান্ত হইতে সেই হাতখানি আজ গোরা চোখে কোমল স্তম্ভের একটা কল্যাণপূর্ণ বাণীব মন্ত বোধ হইল। দীপালোকিত শাস্ত সন্ধ্যার সুচরিতাকে

বেষ্টন কবিতা সমস্ত ঘবটি তাহার আলো, তাহার দেয়ালের ছবি, তাহার গৃহলজ্জা, তাহাব পরিপাট্য লইয়া একটি যেন বিশেষ অখণ্ড রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিল। তাহা যে গৃহ, তাহা যে সেবাকুশলা নারীব ঘড়ে মেহে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত, তাহা যে দেয়াল ও কড়ি ববগা ছাদের চেয়ে অনেক বেশি—ইহা আজ গোরাব কাছে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। গোরা আপনাব চতুর্দিকের আকাশেব মধ্যে একটা সজীব সত্তা অনুভব কবিল—তাহার হৃদয়কে চারিদিক হইতেই একটা হৃদয়ের হিল্লোল আসিয়া আবাত কবিতো লাগিল; একটা কিসের নিবিড়তা তাহাকে যেন বেষ্টন করিয়া ধবিল। এরূপ অপূর্ব উপগন্ধ তাহার জীবনে কোনো দিন ঘটে নাই। দেখিতে দেখিতে ক্রমশই সুচরিতার কপালের ব্রষ্ট কেশ হইতে তাহার পায়ের কাছে শাড়ির পাড়টুকু পর্যন্ত অত্যন্ত সত্য এবং অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল। একইকালে সমগ্রভাবে সুচরিতা, এবং সুচরিতার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্রভাবে গোরাব দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কেহ কোনো কথা কহিতে না পারিয়া সকলেই একপ্রকার কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তখন বিনয় সুচরিতাব দিকে চাহিয়া কহিল—“সোদিন আমাদের কথা হচ্ছিল” বলিয়া একটা বথা উত্থাপন করিয়া দিল।

সে কহিল—“আপনাকে ত বলেইছি আমার এমন একদিন ছিল যখন আমাব মনে বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশেব জন্তে সমাজের জন্তে আমাদের কিছুই আশা করবার নেই—চিরদিনই আমবা নাবালাকের মত কাটািব এবং ইংরেজ আমাদের অছি নিযুক্ত হয়ে থাকবে—যেখানে যা যেমন আছে সেই রকমই থেকে যাবে—ইংরেজের প্রবল শক্তি এবং সমাজের প্রবল জড়তার বিরুদ্ধে আমাদের কোথাও কোনো উপায়মাত্র নেই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই এই রকম মনের ভাব। এমন অবস্থায় মানব, হয় নিজের স্বার্থ নিয়েই থাকে, নয় উদাসীনভাবে কাটািয়। আমাদের দেশের মধ্যবিস্ত লোকেরা এই কারণেই চাকরির উন্নতি ছাড়া আর কোনো কথা ভাবে না, ধনী-লোকেরা গবর্নমেন্টের খেতাব পেলেই জীবন-সার্থক বোধ করে—আমাদের জীবনেব যাত্রাপথটা অল্প একটু দূরে

গিয়েই বাস্‌ থেকে যায়—সুতরাং সুদূর উদ্দেশ্যের কল্পনাও আমাদের মাথায় আসে না, আর তার পাশ্বে সংগ্রহও অনাবশ্যক বলে মনে করি। আমিও এক সময়ে ঠিক করেছিলাম গোরার বাবাকে মুরুবি ধরে একটা চাকরির জোগাড় করে নেব। এমন সময় গোরা আমাকে বললে—না গবর্মেণ্টের চাকরি তুমি কোনো মতেই করতে পারবে না।”

গোরা এই কথায় সূচরিতার মুখে একটুখানি বিষ্ময়ের আভাস দেখিয়া কহিল, “আপনি মনে করবেন না গবর্মেণ্টের উপর রাগ করে আমি এমন কথা বলছি। গবর্মেণ্টের কাজ যারা করে তারা গবর্মেণ্টের শক্তিকে নিজের শক্তি বলে একটা গর্ব বোধ করে এবং দেশের লোকের থেকে একটা ভিন্ন শ্রেণীর হয়ে ওঠে—যত দিন যাচ্ছে আমাদের এই ভাবটা ততই বেড়ে উঠছে। আমি জানি আমার একটি আত্মীয় সাবেক কালের ডেপুটি ছিলেন—এখন তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। তাঁকে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাবু তোমার বিচারে এত বেশি লোক খালাস পায় কেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, সাহেব তার একটি কারণ আছে; তুমি যাদের জেলে দাও তারা তোমার পক্ষে কুকুর বিড়াল মাত্র আর আমি যাদের জেলে দিই তারা যে আমার ভাই হয়।—এতবড় কথা বলতে পারে এমন ডেপুটি তখনো ছিল এবং স্তন্যে পারে এমন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটেরও অভাব ছিল না। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে চাকরির দড়াদড়ি অঙ্গের ভূষণ হয় উঠছে এবং এখনকার ডেপুটির কাছে তাঁর দেশের লোক ক্রমেই কুকুর বিড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে; এবং এমন করে পদের উন্নতি হতে হতে তাঁদের যে কেরলি অধোগতি হচ্ছে একথার অল্পভূতি পর্য্যন্ত তাঁদের চলে যাচ্ছে। পরের কাঁধে ভর দিয়ে নিজের লোকদের নীচু করে দেখে এবং নীচু করে দেখে মাত্রই তাদের প্রতি অবিচার করতে বাধ্য হব, এতে কোনো মঙ্গল হতে পারে না।” বলিয়া গোরা টেবিলে একটা মুষ্টি আঘাত করিল; তেলের সেজটা কাঁপিয়া উঠিল।

বিনয় কহিল “গোরা, এ টেবিলটা গবর্মেণ্টের নয়, আর এই সেজটা পত্বেশবাবুদের।”

সুনিষ্ঠা গোরা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার

হাস্তের প্রবল ধ্বনিতে সমস্ত বাড়িটা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঠাট্টা শুনিয়া গোরা যে ছেলেমানুষের মত এমন প্রচুরভাবে হাসিয়া উঠিতে পারে ইহাতে সূচরিতা আশ্চর্য বোধ করিল এবং তাহার মনের মধ্যে ভাবি একটা আনন্দ হইল। যাহারা বড় কথার চিন্তা করে তাহারা যে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে একথা তাহার জানা ছিল না।

গোরা সেদিন অনেক কথাই বলিল। সূচরিতা যদিও চুপ করিয়াছিল কিন্তু তাহার মুখের ভাবে গোরা এমন একটা সায় পাইল যে উৎসাহে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। শেষকালে সূচরিতাকেই যেন বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া কহিল—“দেখুন একটি কথা মনে রাখবেন;—যদি এমন ভুল সংস্কার আমাদের হয় যে, ইংরেজেরা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন আমারও ঠিক ইংরেজি না হলে কোনো মতে প্রবল হতে পারব না তা হলে সে অসম্ভব কোনো দিন সম্ভব হবে না এবং কেবলি নকল করতে করতে আমরা ছয়েরবার হয়ে যাব। একথা নিশ্চয় জানবেন ভারতের একটা বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি, বিশেষ সূত্রে আছে সেইটের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই ভারত সার্থক হবে—ভারত রক্ষা পাবে। ইংরেজের ইতিহাস পড়ে এইটে যদি আমরা না শিখে থাকি তবে সমস্তই ভুল শিখেছি। আপনার প্রতি আমার এই অল্পরোধ, আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এব সমস্ত ভাল মনের মাঝখানেই নেবে দাঁড়ান,—যদি বিকৃতি থাকে, তবে ভিতর থেকে সংশোধন করে তুলুন, কিন্তু একে দেখুন, বুঝুন, ভাবুন, এর দিকে মুখ ফেরান, এর সঙ্গে এক হোন, এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে, খুষ্টানী সংস্কারে বালাকাল থেকে অস্থি মজ্জায় দীক্ষিত হয়ে একে আপনি বুঝতেই পারবেন না, একে কেবলি আঘাত করতেই থাকবেন, এর কোনো কাজেই লাগবেন না।”

গোরা বলিল বটে—“আমার অল্পরোধ”—কিন্তু এ ত অল্পবোধ নয়, এ বেন আদেশ। কথার মধ্যে এমন একটা প্রচণ্ড জোর যে, তাহা অস্ত্রের সম্মতির অপেক্ষাই করে না। সূচরিতা মুখ নত করিয়াই সমস্ত শুনিল। এমন একটা প্রবল আগ্রহের সঙ্গে গোরা যে তাহাকেই বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া এই কথা কয়টি কহিল তাহাতে সূচরিতার

মনের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া দিল। সে আন্দোলন যে কিসের তখন তাহা ভাবিবার সময় ছিল না। ভারতবর্ষ বলিয়া যে একটা বৃহৎ প্রাচীন সভ্য আছে সূচরিতা সেকথা কোনো দিন এক মুহূর্তের জন্যও ভাবে নাই। এই সভ্য যে দূর অতীত ও সুদূর ভবিষ্যৎকে অধিকার পূর্বক নিভৃত খাকিয়া মানবের বিরাট ভাগ্যজালে একটা বিশেষ রঙের সূতা একটা বিশেষভাবে বুনিয়া চলিয়াছে; সেই সূতা যে কত স্থল, কত বিচিত্র এবং কত সুদূর সার্থকতার সহিত তাহার কত নিগূঢ় সম্বন্ধ—সূচরিতা আজ তাহা গোরা প্রবল কণ্ঠের কথা শুনিয়া যেন হঠাৎ এক রকম করিয়া উপলব্ধি করিল। প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবন যে এত বড় একটা সভ্য দ্বারা বেষ্টিত অধিকৃত তাহা সচেতনভাবে অনুভব না করিলে আমরা যে কতই ছোট হইয়া এবং চারিদিক্ সম্বন্ধে কতই অন্ধ হইয়া কাজ করিয়া যাই নিমেষের মধ্যেই তাহা যেন সূচরিতার কাছে প্রকাশ পাইল। সেই অকস্মাৎ চিন্তাশূন্যতার আবেগে সূচরিতা তাহার সমস্ত সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়া অত্যন্ত সহজ বিনয়ের সহিত কহিল—“আমি দেশের কথা কখনো এমন করে বড় করে সভ্য করে ভাবিনি। কিন্তু একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি—ধর্মের সঙ্গে দেশের যোগ কি? ধর্ম কি দেশের অতীত নয়?”

গোরার কাছে সূচরিতার মূঢ় কণ্ঠের এই প্রশ্ন বড় মধুর লাগিল। সূচরিতার বড় বড় দুইটি চোখের মধ্যে এই প্রশ্নটি আরো মধুর করিয়া দেখা দিল। গোরা কহিল—“দেশের অতীত যা, দেশের চেয়ে যা’ অনেক বড় তাই দেশের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। ধর্ম এমনি করিয়া বিচিত্র ভাবে আপনার অনন্ত স্বরূপকেই ব্যক্ত করছেন। ধারা বলেন সভ্য এক, অতএব কেবলি একটি ধর্মই সভ্য, ধর্মের একটিমাত্র রূপই সভ্য—তঁারা, সভ্য যে এক, কেবল এই সভ্যটিই মানেন, আর সভ্য যে অন্তহীন সে সভ্যটা মানতে চান না। অন্তহীন এক অন্তহীন অনেকে আপনাকে প্রকাশ কবেন—জগতে সেই লীলাই ত দেখ্‌চি। সেই জগতেই ধর্মমত বিচিত্র হয়ে সেই ধর্মরাজকে নানা দিক্ দিয়ে উপলব্ধি করাচ্ছে। আমি আপনাকে নিশ্চয় বলছি ভাবতবর্ষের খোলা জালনা দিয়ে আপনি সূর্য্যকে দেখতে পাবেন—

সে জগতে সমুদ্রপারে গিয়ে খুঁটান গির্জার জালনায় বসবার কোনো দরকার হবে না।”

সূচরিতা কহিল—“আপনি বলতে চান ভাবতবর্ষের ধর্মতন্ত্র একটি বিশেষ পথ দিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। সেই বিশেষত্বটি কি?”

গোরা কহিল—“কথাটা খুব মস্ত—ক্রমে ক্রমে আমি আপনাকে বলবার চেষ্টা করব। সংক্ষেপে বলতে গেলে সেটা হচ্ছে এই, ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়ে এবং ঐক্যের দিক্ দিয়ে দুই দিক্ থেকেই ঈশ্বরকে দেখবার চেষ্টা কবেচে। ঋগ্বেদের কাল থেকেই সেইটে চলে আসচে—ঋগ্বেদে ঋষিরা অগ্নি বায়ু বরুণ ইন্দ্র নামে জগতের বিচিত্র প্রকাশকে যখন বিচিত্র দেবতা রূপে স্তব করতেন তখন সেই একই কালে এই বছর মধ্যে এককেও তাঁদের চিন্তা উপলব্ধি করছিল। ঈশ্বরকে প্রকাশের দিকে বছরূপে দেখেচেন এবং প্রকাশকে কারণের দিকে একরূপেই জেনেচেন। এই বছর এবং একই নানা স্থল এবং স্থলভাবে ভারতবর্ষের ধর্মতন্ত্রে প্রকাশলাভ করবার চেষ্টা করতে বলেই ভারতবর্ষের ধর্মতন্ত্র এত বৃহৎ।”

সূচরিতা কহিল—“তবে আপনি কি বলেন ভারতবর্ষে আমরা প্রচলিত ধর্মের যে নানা আকার দেখতে পাই তা সমস্তই ভাল এবং সভ্য?”

গোরা কহিল—“পৃথিবীতে এমন কোনো দেশই নেই যেখানে প্রচলিত ধর্ম সর্বত্রই ভালো এবং সভ্য। আপনি ত ইতিহাস পড়েচেন আপনি ত জানেন খৃষ্টধর্মের নামে পৃথিবীতে যত নিদারুণ উৎপীড়ন অত্যাচার হয়েছে এমন কোনো ধর্মের নামে হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাই বলে খৃষ্টধর্মের আসল কথাটা অসত্য এবং অমঙ্গল তা আমি বলতে পারিনে। খৃষ্টধর্মের সেই আসল কথাটা ক্রমশই তার বাধা তার মগ্নি আবরণ পরিত্যাগ কবে শিক্ষিত ভক্তমণ্ডলীর কাছে উজ্জল হয়ে উঠবে। ভারতবর্ষের ধর্মের মধ্যেও আবর্জনার অভাব নেই কিন্তু আমরা যদি অগ্নিশূলিকটির প্রতি শ্রদ্ধা রাখা করে তাকে পোষণ করে তুলি তা হলে আগুনই এই আবর্জনাকে পোড়াতে থাকে।”

সূচরিতা কহিল—“সেই আগুনটি কি আমি এখনো ভাল করে বুঝতে পারিনি।”

গোরা কহিল—“সেটা হচ্ছে এই যে, ব্রহ্ম, যিনি নির্বিশেষ, তিনি বিশেষের মধ্যেই ব্যক্ত। কিন্তু তাঁর বিশেষের শেষ নেই। জল তাঁর বিশেষ, স্থল তাঁর বিশেষ, বায়ু তাঁর বিশেষ, অগ্নি তাঁর বিশেষ, প্রাণ তাঁর বিশেষ, বুদ্ধি, প্রেম, সমস্তই তাঁর বিশেষ—গণনা করে কোথাও তাঁর অন্ত পাওয়া যায় না—বিজ্ঞান তাই নিয়ে মাথা ঘুরিয়ে মরচে। যিনি নিরাকার তাঁর আকাশের অন্ত নেই—হুয় দীর্ঘ স্থল হুয়ের অনন্ত প্রবাহই তাঁর।—যিনি অনন্ত বিশেষ তিনিই নির্বিশেষ, যিনি অনন্তরূপ তিনিই অরূপ। অজ্ঞাত দেশে ঈশ্বরকে ন্যূনাত্মক পরিমাণে কোনো একটি মাত্র বিশেষের মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করেছে—ভাবতবর্ষেও ঈশ্বরকে বিশেষের মধ্যে দেখবার চেষ্টা আছে বটে কিন্তু সেই বিশেষকেই ভারতবর্ষ একমাত্র ও চূড়ান্ত বলে গণ্য কবে না। ঈশ্বর যে সেই বিশেষকেও অনন্তগুণে অতিক্রম করে আছেন একথা ভারতবর্ষের কোনো ভক্ত কোনোদিন অস্বীকার করেন না।”

সুচরিতা কহিল—“জানী করেন না কিন্তু অজ্ঞানী?”

গোরা কহিল “আমি ত পূর্বেই বলেছি অজ্ঞানী সকল দেশেই সকল সত্যকেই বিকৃত করবে।”

সুচরিতা কহিল—“কিন্তু আমাদের দেশে সেই বিকার কি বেশী দূর পর্য্যন্ত পৌছয়নি?”

গোরা কহিল—“তা হতে পারে। কিন্তু তার কাবণ, ধর্মের স্থল ও স্থল, অন্তর ও বাহির, শরীর ও আত্মা এই হুটো অঙ্গকেই ভাবতবর্ষ পূর্ণভাবে স্বীকার করতে চায় বলেই যারা হুয়কে গ্রহণ করতে পারে না তারা স্থলটাকেই নেয় এবং অজ্ঞানের দ্বারা সেই স্থলের মধ্যে নানা অদ্ভুত বিকার ঘটতে থাকে। কিন্তু যিনি রূপেও সত্য অরূপেও সত্য, স্থলেও সত্য, হুয়েও সত্য, ধ্যানেও সত্য, প্রত্যক্ষেও সত্য, তাঁকে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে দেখে মনে কর্ষে উপলব্ধি করবার যে আশ্চর্য্য, বিচিত্র ও প্রকাশ্য চেষ্টা করেছে তাকে আমরা-মুঢ়ের মত অশ্রদ্ধা করে ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর নাস্তিকতায় আন্তিকতার মিশ্রিত একটা সঙ্কীর্ণ ঐবস অঙ্গহীন ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলে গ্রহণ করব এতেই পারে না। আমি যা বলছি তা আপনাদের আশ্চর্য্যের হেঁসার বশত ভাল কবে বুঝতেই পারেন না, মনে করবেন

এলোকটার ইংরেজি শিখেও শিক্ষার কোনো ফল হয়নি; কিন্তু ভারতবর্ষের সত্য-প্রকৃতি ও সত্য-সাধনার প্রতি যদি আপনার কোনো দিন শ্রদ্ধা জন্মে, যদি ভাবতবর্ষ নিজেকে সহস্র বাধা ও বিকৃতির ভিতর দিয়েও যে রকম করে প্রকাশ করতে সেই প্রকাশের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পাবেন তাহলে—তাহলে, কি আর বলব, আপনার ভারত-বর্ষীয় স্বভাবকে শক্তিকে ফিরে পেয়ে আপনি মুক্তিলাভ করবেন।”

সুচরিতা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া গোরা কহিল—“আমাকে আপনি একটা গোঁড়া ব্যক্তি বলে মনে করবেন না। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়া লোকেরা, বিশেষতঃ যারা হঠাৎ নতুন গোঁড়া হয়ে উঠেছে তারা যে ভাবে কথা কয় আমার কথা সে ভাবে গ্রহণ করবেন না। ভারতবর্ষের নানা প্রকার প্রকাশে, এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই আমি আমার এই ভাবতবর্ষের জন্তে প্রাণ দেব বলে ঠিক কবেছি। সেই ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে এক দলে মিশে ধূলোয় গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না। ভারতবর্ষের এই বাণী কেউবা বোঝে কেউবা বোঝে না—তা নাই হল—আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক—তারা আমার সকলেই আপন—তাদের সকলের মধ্যেই চিরন্তন ভারতবর্ষের নিগূঢ় আবির্ভাব নিয়ত কাজ করচে সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই।”

গোরার প্রবলকণ্ঠের এই কথাগুলি ঘরের দেয়ালে ঠেলে, সমস্ত আসবাব পত্রেও যেন কাঁপিতে লাগিল।

এ সমস্ত কথা সুচরিতার গঞ্জে খুঁষ স্পষ্ট বুঝিবার কথা নহে—কিন্তু অল্পভূতির প্রথম অস্পষ্ট সন্ধানেরও বেগ অভ্যন্ত প্রবল। জীবনটা যে নিতাস্তই চারটে দেয়ালের মধ্যে বা একটা দলের মধ্যে বদ্ধ নহে এই উপলব্ধিটা সুচরিতাকে যেন পীড়া দিতে লাগিল।

এমন সময় সিঁড়ির কাছ হইতে মেয়েদের উচ্চহাস্য-মিশ্রিত ক্রুত পদশব্দ শুনা গেল। পরেশ বাবু, বরদাহুন্দরী ও মেয়েদের লইয়া ফিরিয়াছেন। সুধার সিঁড়ি দিয়া উঠিবার

সময় মেয়েদের উপর কি একটা উৎপাত করিতেছে, তাহাই লইয়া এই হাস্তধ্বনির সৃষ্টি ।

লাবণ্য, ললিতা ও সতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই গোরাকে দেখিয়া সংযত হইয়া দাঁড়াইল । লাবণ্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—সতীশ বিনয়ের চৌকির পাশে দাঁড়াইয়া কানে কানে তাহার সহিত বিশ্রুতলাপ সুরু করিয়া দিল । ললিতা সূচরিতার পশ্চাতে চৌকি টানিয়া তাহার আড়ালে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া বসিল ।

পরেশ আসিয়া কহিলেন—“আমার কিরতে বড় দেরি হয়ে গেল । পাশু বাবু বৃষ্টি চলে গেছেন ?”

সূচরিতা তাহার কোনো উত্তর দিল না—বিনয় কহিল—“হাঁ, তিনি থাকতে পারলেন না ।”

গোরা উঠিয়া কহিল—“আজ আমরাও আসি” বলিয়া পরেশ বাবুকে নত হইয়া নমস্কার করিল ।

পরেশ বাবু কহিল—“আজ আর তোমাদের সঙ্গে আলাপ করবার সময় পেলুম না । বাবা, যখন তোমার অবকাশ হবে মাঝে মাঝে এস ।”

গোরা ও বিনয় ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া পড়িলেন । উভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিল । তিনি কহিলেন “আপনারা এখনি যাচ্ছেন না কি ?”

গোরা কহিল “হাঁ ।”

বরদাসুন্দরী বিনয়কে কহিলেন—“কিন্তু বিনয় বাবু আপলি যেতে পারচেন না—আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে । আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে ।”

সতীশ লাফাইয়া উঠিয়া বিনয়ের হাত ধরিল এবং কহিল—“হাঁ, মা, বিনয় বাবুকে যেতে দিয়ো না, উনি আজ স্বাক্ষরে আমার সঙ্গে থাকবেন ।”

বিনয় কিছু কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর দিতে পারিতেছিল না দেখিয়া বরদাসুন্দরী গোরাকে কহিলেন—“বিনয় বাবুকে কি আপনি নিয়ে যেতে চান ? শুক্রে আপনার দরকার আছে ?”

গোরা কহিল “কিছু না । বিনয় তুমি থাক না—আমি আসছি ।” বলিয়া গোরা দ্রুতপদে চলিয়া গেল ।

বিনয়ের থাকা সম্বন্ধে বরদাসুন্দরী যখন গোরার সম্বন্ধে

লইলেন সেই মুহূর্ত্তেই বিনয় ললিতার মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না । ললিতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল ।

ললিতার এই ছোট খাট হাসি বিজ্রপের সঙ্গে বিনয় ঝগড়া করিতেও পারে না—অথচ ইহা তাহাকে কাঁটার মত বেঁধে । বিনয় ঘরে আসিয়া বসিতেই ললিতা কহিল—“বিনয় বাবু, আজ আপনি পালালেই ভাল করতেন ।”

বিনয় কহিল—“কেন ?”

ললিতা । মা আপনাকে বিপদে ফেলবার মতলব করচেন । ম্যাজিষ্ট্রেটের মেলায় যে অভিনয় হবে তাতে একজন লোক কম পড়চে—মা আপনাকে ঠিক করেচেন ।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল—“কি সর্বনাশ ! একাজ আমার দ্বারা হবে না ।”

ললিতা হাসিয়া কহিল—“সে আমি মাকে আগেই বলেছি । এ অভিনয়ে আপনার বন্ধু কখনই আপনাকে যোগ দিতে দেবেন না ।”

বিনয় খোঁচা খাইয়া কহিল—“বন্ধুর কথা রেখে দিন । আমি সাত জন্মে কখনো অভিনয় করিনি—আমাকে কেন ?”

ললিতা কহিল—“আমরাই বৃষ্টি জন্মজন্মান্তর অভিনয় করে আসছি ?”

এই সময় বরদাসুন্দরী ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন । ললিতা কহিল—“মা, তুমি অভিনয়ে বিনয় বাবুকে মিথ্যা ডাক্চ । আগে শুঁর বন্ধুকে যদি রাজি করাতে পার তাহলে—”

বিনয় কাতর হইয়া কহিল—“বন্ধুর রাজি হওয়া নিয়ে কথাই হচ্ছে না । অভিনয় ত করলেই হয় না—আমার যে ক্ষমতাই নেই ।”

বরদাসুন্দরী কহিলেন—“সে জল্পে ভাববেন না—আমরা আপনাকে শিখিয়ে ঠিক করে নিতে পারব । ছোট ছোট মেয়েরা পারবে আর আপনি পারবেন না ?”

বিনয়ের উদ্ভারের কোনো উপায় রহিল না ।

ক্রমশঃ ।

ভূগোল শিক্ষা।

ভারতবর্ষে অধুনা রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস চর্চার বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা স্বলক্ষণ বটে। কিন্তু সম্যকরূপে ইতিহাসচর্চা করিতে হইলে ভূগোল পরিচয়ের বিশেষ আবশ্যক। যদিচ প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস জাতির বা লোক-সমষ্টির, তথাপি জাতির বা লোকসমষ্টির সহিত তাহাদের বাসস্থান বা দেশের এত নিকট সম্বন্ধ যে চলিত কথায় অমুক জাতির ইতিহাস না বলিয়া অমুক দেশের (যথা ভারতবর্ষের বা আপানের) ইতিহাস বলিয়া থাকি। ফলতঃ জাতির নাম দেশের নাম হইতে সাধারণতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই নিকট সম্বন্ধ চলিত কথায় স্বীকৃত হইলেও কার্যতঃ শিক্ষাকালে আমরা তত লক্ষ্য রাখি না। ইতিহাস চর্চার সময় দেশ, কাল ও পাত্র এই তিনের সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে ইতিহাস চর্চার প্রকৃষ্ট ফল বা শিক্ষা লাভ হয় না। প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারা মানুষের দৈনিক কার্যকলাপ অনেকটা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। অবস্থার তারতম্যে দৈনিক কার্যকলাপের তারতম্য এবং সেই সঙ্গে মানসিক ধর্মেরও প্রভেদ হইয়া থাকে। ইংলণ্ড ও ক্রিয়াসার প্রাকৃতিক বৃত্তান্ত জানিলে তদেন্নীয়দিগের নৌবল এবং অন্তান্ত বিষয়ে প্রভেদ ধাকার কার্যাকারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্যের যথার্থ জ্ঞান হওয়া সম্ভব।

কেবল ইতিহাস চর্চার জন্ত নহে, উদ্ভিদবিজ্ঞা, প্রাণি-বিজ্ঞা প্রভৃতি নানারূপ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চার পক্ষেও ভূবৃত্তান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভূগোলের বিষয় এই যে এইরূপ প্রয়োজনীয় বিজ্ঞা, বাঙ্গালার এবং হিন্দুস্থানের অন্তান্ত স্থানের বিভীলয় সমূহে, ঘেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা অতিশয় নীরস ও নিষ্ফল। পাঠ্যপুস্তক হইতে দেশ, নদী, পাহাড়, অধিত্যকা, উপত্যকা, প্রভৃতি নানা পদার্থের নাম কণ্ঠস্থ করান হয়। সেই সকল পদার্থের জ্ঞান জন্মাইবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না। ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে জ্ঞান লাভ করা দূরে থাকুক ইহার উপর এরূপ বিতৃষ্ণা জন্মায় যে ভবিষ্যতে জ্ঞান লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা পর্যন্তও উন্মূলিত হয়। ভূগোল পাঠ শিক্ষা-প্রণালীর গুণে যে ভালকদিগের পক্ষে বিশেষ চিন্তাকর্ষক এবং চিত্তোৎকর্ষক

করা যাইতে পারে তাহা প্রমাণের চেষ্টা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে জর্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বিদ্যালয়ে কিরূপ ভাবে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার আভাস দেওয়া যাইতেছে।

জর্মানি দেশের পাঠশালায় ভূগোল শিক্ষার জন্ত মানচিত্র ব্যতিরেকে অপর কোনও পাঠ্য পুস্তক ব্যবহৃত হয় না। তদদেশের রাজধানী বার্লিন মহানগরীর পাঠশালায় প্রচলিত প্রথম শিক্ষার্থীর মানচিত্রের নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে বুঝিতে পুরা যাইবে যে কিরূপ পর্যায়ক্রমে শিক্ষা বিধান হয়।

মানচিত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় দৃশ্য এবং নকসা (views এবং map-plans) লইয়া ছয় খানি চিত্র আছে। প্রথম চিত্র পাঠ্যগৃহের (class room) দৃশ্য বা perspective view। ইহার পাশ্বেই দ্বিতীয় চিত্রে ঐ গৃহের নকসা বা map-plan (মান বা scale ১: ১০০)। তৃতীয় এবং চতুর্থ চিত্রে সমুদায় বিজ্ঞানমন্দিরের দৃশ্য এবং নকসা (মান ১: ৩০০)। ৫ম ও ৬ষ্ঠ চিত্রে বিজ্ঞানমন্দির এবং তল্লিকটবর্তী কতকগুলি গৃহ প্রভৃতি লইয়া বার্লিন সহরের একাংশের দৃশ্য এবং নকসা (মান ১: ১৫০০)।

২য় পৃষ্ঠায় তদ্ব্যপেক্ষা বৃহৎ স্থানের দৃশ্য এবং নকসা আছে। ইহাতে বিজ্ঞানমন্দিরটিও দৃষ্ট হয়। ৩য় পৃষ্ঠায় বৃহত্তর স্থানের দৃশ্য এবং নকসা। ৪র্থ পৃষ্ঠায় সমুদায় বার্লিন সহরের নকসা (মান ১: ৩৬০০০)। ৫ম পৃষ্ঠায় বার্লিন নগরী ও নিকটবর্তী চারিদিকের কতকগুলি স্থানের নকসা (scale ১: ১০০০০০)। ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় সমস্ত জার্মানি জেলায় মানচিত্র বা নকসা (মান ১: ১০০০০০০)।

৭ম পৃষ্ঠায় সমুদায় প্রদেশের প্রাকৃতিক ভূ-চিত্র। এই চিত্রে বার্লিন সহরে যতগুলি রেলের রাস্তা গিয়াছে তৎসমুদায় অঙ্কিত আছে। (মান ১: ১,২৬০,০০০)। ৮ম পৃষ্ঠায় ঐ প্রদেশের শাসনবিভাগসমূহ প্রদর্শিত আছে।

৯ম পৃষ্ঠায় জর্মানি দেশের প্রাকৃতিক চিত্র। ১০ম পৃষ্ঠায় ঐ দেশের শাসনবিভাগের চিত্র।

১১শ পৃষ্ঠা—ইউরোপ মহাদেশের প্রাকৃতিক চিত্র (physical map)। ১২শ পৃষ্ঠা ইউরোপ মহাদেশের রাজ্য বিভাগ।

১৩শ পৃষ্ঠা—আসিয়া মহাদেশের চিত্র (মান ১: ৫০,০০০,০০০)।

১৪শ পৃষ্ঠা—আফ্রিকার মানচিত্র।

১৫শ „ — উত্তর আমেরিকার মানচিত্র।

১৬শ „ — দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র।

১৭শ „ — অষ্ট্রেলিয়া, ওশ্ট্রালিয়া ও ভিক্টোরিয়া-
ল্যান্ডের আংশিক চিত্র। ইহাতে Coral reef বা প্রবাল
শৈলমালার উৎপত্তির দৃষ্টান্ত আছে।

১৮শ পৃষ্ঠা—প্যাগোষ্টাইনের মানচিত্র। ইহার সাহায্যে
খৃষ্টীয় ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৯শ পৃষ্ঠা—পূর্ব ভূগোলার্দ্ধ।

২০শ „ — পশ্চিম ভূগোলার্দ্ধ।

২১শ „ — প্রধান নক্ষত্র মণ্ডলী সম্বলিত উত্তর দিকের
আকাশের চিত্র।

২২শ পৃষ্ঠা—সূর্য্য-গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ, পৃথিবীর বার্ষিক
গতি, সৌর জগৎ, চন্দ্রের কলা প্রভৃতি চিত্রের দ্বারা প্রদর্শিত
আছে।

এইরূপ মানচিত্রে অনেক শুভ উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

১ম—প্রাকৃতিক দৃশ্যমান পদার্থ চিত্রে প্রতিকলিত করিবার
প্রণালী এবং ভূগোল ও মানচিত্রের পরস্পর সম্বন্ধ
শিশুদিগের লীলা ও সম্যক প্রকারে বোধগম্য হয়। ২য়—
সাধারণ মানচিত্রে সমুদ্র, পর্বত, নদী, রাজধানী, নগর
প্রভৃতি বহুবিধ জাত ও অজাত পদার্থের বিষয় একত্র
ধাকাতে শিশুদিগের শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোনিবেশের বাধা হয়;
এবং যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাও পরিষ্কৃতভাবে আয়ত্ত
করা আরও দুঃস্বপ্ন হইয়া পড়ে। ৩য়—আমাদের পাঠশালার
ভূগোল শিক্ষার আরম্ভে অপরিচিত পদার্থের সংজ্ঞা, তৎপরে
অপরিচিত স্থান, পর্বত, নদী প্রভৃতির নাম কণ্ঠস্থ করান
হয়। ভাগ্যক্রমে যদি কোন বালক কোন রাজধানীতে
বা প্রধান নগরে বা বৃহৎ নদীর তীরে বাস করে তবে
তাহাদের নাম পুস্তকে দেখিতে পায়। নূতন প্রণালীতে
ইহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদিগকে
পরিচিত পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অপরিচিত
পদার্থের শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয়
ধুমাকৃত না হইয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ৪র্থ—নূতন
প্রণালীর দ্বারা এক বিশেষকর উদ্দেশ্য না করিলে ইহার গুণ
ভাল বুঝিতে পারা যাইবে না। মুদ্রিত মানচিত্রের উপর

(পাঠ্য পুস্তকের মত) সম্পূর্ণ নির্ভর করা হয় না, কেবল
ইহার সাহায্য লওয়া হয়। শিক্ষার প্রধান অঙ্গ কালী কাঠফলক
(Black board)। বিভাগমন্দির, নিকটবর্তী ঘর, বাড়ী,
রাস্তা, বাগান, বিল, প্রভৃতি আঁকিয়া লওয়া হয়। বিভাগলয়
গৃহ এবং বাগান আঁকিবার কালে শিশুরা কিতা ধরিয়া মাপ
জোপ করিয়া Scale বা মান তৈয়ার করিয়া লয়। এই
উপায়ে শিক্ষণীয় বিষয় বালকের মনে গভীর এবং স্থায়ী
ভাবে খোদিত হইয়া যায়, এবং মানচিত্র অঙ্কনের শিক্ষার
ভিত্তিও স্থাপিত হয়। নিম্নে কয়েকটি পাঠের সংক্ষিপ্ত
উদাহরণ দেওয়া গেল।

প্রথমে শিক্ষক মহাশয় উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম
এই চারিদিকের বিষয় বালকদিগকে বলিয়া দিবেন।
তৎপরে একটি বালককে কাঠফলকের (কাঠফলক ধানি
পাঠ্যগৃহের উত্তর দিকে বা দক্ষিণাভিমুখে থাকা উচিত)
মধ্যস্থলে (বা শিক্ষক মহাশয়ের উদ্দেশ্যানুসারে অঙ্গ কোন
স্থলে) বিভাগলয় গৃহ সম্মিবেশিত করিতে বলিবেন। শিক্ষক
মহাশয় ক্রমে ক্রমে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রশ্ন করিবেন।
বিভাগলয়ের দক্ষিণ দিকে কি আছে? বাঃ—প্যারীচরণ
সরকারের ষ্ট্রীট। (যেমন যেমন উত্তর পাওয়া যাইবে
তেমনি কাঠফলকে সম্মিবেশিত করিতে হইবে)। শিঃ—
তাহার দক্ষিণে কি? বাঃ—মুনিভার্সিটি হল। শিঃ—কলেজ
ষ্ট্রীট বিভাগলয়ের কোন দিকে? বাঃ—পূর্ব দিকে। শিঃ—
গোলদিঘির হেয়ার স্কুল ও মুনিভার্সিটি হলের কোন দিকে?
গোলদিঘির দক্ষিণের রাস্তা যথা স্থানে সম্মিবেশিত কর।
বিভাগলয়ের উত্তর দিকে কি? সিয়ালদহ ষ্টেশন বিভাগলয়ের
কোন দিকে? সিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে বিভাগলয়ের উত্তর
দিক পর্যন্ত হ্যারিসন্ রোড সম্মিবেশিত কর। এইরূপে
বিভাগলয়ের চতুর্দিকের প্রধান প্রধান রাস্তা, বাড়ী, দিঘি,
প্রভৃতির সম্বন্ধে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিবেন এবং প্রশ্নের
উত্তর কাঠফলকের যথাস্থানে সম্মিবেশিত করিতে বলিবেন।
একজন বালক কাঠফলকের উপর এবং অপর সকলে
সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ প্রস্তরফলকের (প্লেটের) উপর ঐ
রূপ আঁকিবে।

এইরূপ নকসা হইয়া গেলে শিক্ষক মহাশয় সহজ সহজ
“ঐতিহাসিক” প্রশ্ন করিবেন। যথা—(১) হেয়ার স্কুল

কাহার ? (২) হেয়ার স্কুল নাম করণ হইল কেন ? (৩) হিন্দু স্কুল ক্ষাহাদেব দ্বারা স্থাপিত ? (৪) কলিকাতা যুনিভার্সিটি কত দিন পূর্বে স্থাপিত ? (৫) যুনিভার্সিটি হল কাহার ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

অপেক্ষাকৃত উন্নত ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। হুগলী নগর হইতে সাগর পর্যন্ত গঙ্গা নদী কাঁঠ ফলকের উপর সম্মিবেশিত কর। কলিকাতা ও পর পারে হাবড়া শিবপুর যথা স্থানে দেখাও। বালী, বারাকপুর, ইচ্ছাপুর, ত্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, চন্দননগর, হুগলী, ভাটপাড়া, মুলাজোড় প্রভৃতি সম্মিবেশিত কর। মহারাষ্ট্রা খাল ও আদিগঙ্গা যথা স্থানে আঁক।

এইরূপে শিক্ষক মহাশয় ভূগোল্যের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে সম্মিবেশিত করিতে প্রয়াস পাইবেন। উপরি উক্ত পাঠগুলি কলিকাতাস্থিত বালকদিগের বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এই প্রণালীতে যে কোন স্থানের বালককে নিজ গ্রাম বা সহরের ও তল্লিকটবর্তী স্থান সমূহের বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

পর্বত, নদী, হ্রদ, দ্বীপ, উপদ্বীপ, যোজক, প্রভৃতি ভূবৃত্তান্তের অন্তর্গত বিষয়ের প্রতিক্রম বালী অথবা কাগজের মণ্ড (কাগজ কুটিয়া তাহাতে সামান্য জল দিয়া মণ্ড তৈয়ার করা যাইতে পারে) দিয়া গড়িয়া বালকদিগকে দেখান যাইতে পারে। এইরূপ ভাবে শিক্ষা অতিশয় চিত্তাকর্ষক। সংজ্ঞা কণ্ঠস্থ না করাইয়া নানা বিষয় ও তাহাদের নাম বালকদিগকে সহজে ও পরিষ্কৃত ভাবে হৃদয়দয় করান যায়। পাঠকদিগেব কৌতূহল নিবারণের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিতেছি। ঘরের মেজে কিবা অপর কোন সমতল স্থানে চতুষ্কোণ করিয়া কাগজের মধ্যে আল দেওয়া হউক। ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিয়া ঐ আলের মধ্যে মণ্ডের ভারতবর্ষ গড়ুক। তাহার পরে প্রধান প্রধান পর্বতের স্থানে উচ্চ করিয়া পর্বতের মত করা হউক। অঙ্গুলি দ্বারা-চাপিয়া প্রধান প্রধান নদী উৎপত্তি হইতে সাগর সমুদ্র পর্যন্ত দেখান হউক। এইরূপ হ্রদ দ্বীপ প্রভৃতির প্রতিক্রম করা যাইতে পারে। ঐ গঠন একদিন শুকাইয়া পরদিন নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে একটু একটু জল ঢালিয়া নদীর স্রোত দেখান যাইতে পারে। সমুদ্র ও হ্রদের স্থানে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া দেওয়া হউক।

এই সমস্ত গড়ন বালকেরা নিজে নিজে যতটা পারে মানচিত্র দেখিয়া করিবে, শিক্ষক মহাশয় আবশ্যক মত সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক বালক স্বতন্ত্র ভাবে, অথবা এক শ্রেণীতে অনেক বালক থাকিলে দুই তিন জন মিলিয়া এক এক দল, এইরূপ গড়িতে চেষ্টা করিলে প্রত্যেক বালক বা প্রত্যেক দল নিজ নিজ গঠন অপরাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এইরূপে অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

ভূগোল শিক্ষায় কি উপায়ে বিভ্রাটদিগকে কার্যকারণ সম্বন্ধের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তাহা যুরোপীয় কোন বিভাগ্যের একটি পার্ঠের (ক্রম সাহেব কৃত) বিবরণ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। যাহাদিগকে পাঠ দেওয়া হইতেছিল তাহাদিগের বয়স ১৩, ১৪ বৎসর মাত্র। শিক্ষক মহাশয় একটি বড় গোলক আনিলেন, এবং প্রথমই বলিলেন যে তাপ বিষুবরেখা (heat Equator) প্রাক্ক ৫ বিষুবরেখা (mathematical equator) হইতে ভিন্ন, ইহা একটি বক্র রেখা, প্রাক্কৃত বিষুবরেখার সাধারণতঃ দশ অংশ উত্তরে স্থিত। শিক্ষক মহাশয় বালকদিগকে ইহার কারণ নির্দেশ করিতে বলিলেন। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ উভয়দিকে সূর্য্যরশ্মি কি এক পরিমাণে পতিত হয় না? বৃহৎ গোলকের সাহায্যে বালকেরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে উত্তর গোলাক্কে অপেক্ষা দক্ষিণ গোলাক্কে অধিক পরিমাণে জল দ্বারা আবৃত, অতএব অধিক পরিমাণে জল ধুমে পরিণত হয়। পদার্থ বিজ্ঞানে তাহার শিথিয়াছিল যে ধুমে পরিণত হইবার কালে তাপেব শোষণ (absorption of heat) হইয়া থাকে। এবং ভূমি যে তাপ গ্রহণ করে তাহা বিকিরণ (radiation) করার দরুন তল্লিকটবর্তী বায়ুকে অধিক উত্তপ্ত রাখে। এখন প্রমাণ স্থল অন্বেষণ করিতে করিতে বালকগণ শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে গোবী এবং সাহারা (Gobi and Sahara) মরুভূমি বৃহৎ ভূমিখণ্ডের উপর সূর্য্যরশ্মিপাতের পরিণাম। যুরোপের সমুদ্রতীর বক্র থাকিতে ঐ খণ্ডে নাতিশীতোষ্ণ বায়ুর প্রভাব ও মরুভূমির অভাবের কারণ প্রতিপন্ন হইল। তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিখণ্ডের জলবায়ুর বিষয় বাতালুপ্ত করিয়া স্থির হইল যে (ক) বৃহৎ ভূমিখণ্ডের উপর শীত ও তাপ উভয়ই অধিক প্রবল হয়—যথা, উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থল, আসিয়ায় মধ্য, অষ্ট্রেলিয়ায়

মধ্য, এমন কি যুরোপের কৃষিরা পর্য্যন্ত । (খ) জলের অধিক প্রাচুর্য্যাবে গ্রীষ্ম ও শীত উভয়ই মৃদু হয়—যথা পশ্চিম যুরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আসিয়ার দ্বীপপুঞ্জ ও উপদ্বীপ সমূহ। জানা আছে যে সাধারণতঃ অক্ষাংশ (latitude) অনুসারে শীত তাপের প্রভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতা এবং অবস্থান অনুসারেও শীতোর্ত্তার কতক পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এক অক্ষে স্থিত অধিত্যকা নিম্ন সমতল ভূমি অপেক্ষা অধিক শীতল হয়। ইকোয়েডর অঞ্চলে কুইটো এবং ব্রাজিলে পারা উভয় স্থানেই-যদিচ বিষুবরেখার নিকট অবস্থিত, কিন্তু একটি সমুদ্রতলের ১০,০০০ ফুট উচ্চে এবং অপরটি প্রায় সমুদ্রতলের সমান থাকায় উষ্ণতা ও শীত সম্বন্ধে বিশেষ ভিন্ন। বায়ু ও মেঘের স্রোত বাধা পায় বলিয়া উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতমালা নিকটস্থ দেশের জলবায়ু বার্ত্তম্য সাধন করিয়া পাকে। আণ্ডিজের উর্ব্বর পূর্ব্বধার ও বৃষ্টিহীন পশ্চিম ধার এবং রকিজের ছইধারের দৃষ্টান্তে ইহা প্রমাণ করা হইল। কিন্তু কেবল শীতোর্ত্তার মৃদুতা কোন দেশকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করে না। ইহাকে উর্ব্বর করিবার জন্য অশ্রান্ত বিষয়ের আবশ্যক; নচেৎ অষ্ট্রেলিয়া জীবের পরিপূর্ণ হইত কিন্তু এখানে মানুষের বাস অতি অল্প। জলসরবরাহ অত্যন্ত আবশ্যক। যেমন পশ্চিম এবং মধ্য যুরোপ, যুক্তরাজ্য সমূহ;—এই সকল প্রদেশে জল আগমন ও নির্গমনের উত্তম পথ আছে। যুক্ত সাম্রাজ্যের মিসিসিপি উপত্যাকাতে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জলসরবরাহ হইয়া থাকে বলিয়া ইহা সর্ব্বোপেক্ষা উর্ব্বর। উত্তম জলসরবরাহই ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালী, তুর্কিস্থান এবং স্পেনের উর্ব্বরতার কারণ। মাটিও উত্তম না হইলে উপযুক্ত জলবায়ু এবং উচ্চতা জীবন ধারণের পক্ষে যে বধেষ্ঠ নহে, শেষোক্ত প্রদেশই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। স্পেনের অরণ্য সমূহ নির্মূল করাতে পর্ব্বতপৃষ্ঠ সকল অনাবৃত হইয়াছে এবং অনাবৃত পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে উর্ব্বর মাটি বৃষ্টির জলে ধুইয়া গিয়াছে। সেই জন্য নদী সকল গ্রীষ্মের সময় শুকাইয়া যায় এবং বসন্তকালে তুষার গলিয়া নদীর গর্ভ পূর্ণ করে ও জলপ্রাবনে জীব ও দেশ ধ্বংস করিতে উদ্ভূত হয়। অতএব উপযুক্ত ভূমি জীবরক্ষার পক্ষে আবশ্যক। এক্ষণে বুঝা গেল যে জলবায়ু দেশের অক্ষ, আকৃতি এবং উচ্চতা

অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উপযুক্ত জলবায়ু, জলসরবরাহ ও উত্তম ভূমি অধিক শস্য উৎপাদনের কারণ। শস্য জীব জগতের একান্ত আবশ্যকীয় বটে; কিন্তু যেমন জীবপালন শস্যের উপর নির্ভর করে, সেই রূপ আবার উদ্ভিদ জীব-পদার্থ (animal matter) হইতে নিজ পোষণের সামগ্রী আহরণ কবে। এই ধানে পুনরায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখিতে পাইলাম। দৃষ্টান্ত একদিকে যুক্তরাজ্য এবং অপর দিকে কানাডা ও মেক্সিকো।

ক্রেম সাহেব বলেন এই পাঠের সময় ছাত্রগণ একাগ্রচিত্ত ছিল, এবং জিজ্ঞাসিত হইলে প্রমাণস্বয় উদ্ধৃত করিতেছিল। এই পাঠটি পূর্ব্বপাঠের পুনরালোচনা (review lesson)। পাঠ সমাপ্ত হইলে ছাত্রদিগকে আগামী পাঠের দিনে “অন্ত যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হইল তাহার প্রমাণ” লিখিয়া আনিতে বলা হইল। ছাত্রগণ নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবে কি না জিজ্ঞাসিত হইলে শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—“আমার বিশ্বাস যে তাহার পারিবে। যতক্ষণ না প্রমাণ পায় ততক্ষণ তাহাদের পিতা, মাতা, পিতৃব্য প্রভৃতিকে প্রমাণের জন্য ত্যক্ত করে; পুস্তকাগার এবং অন্যান্য স্থান অনুসন্ধান করে। অন্তকার মত উপায়ে লব্ধ সত্য ছাত্রদিগের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি উত্তেজিত এবং প্রবল করে। এবং এই সকল প্রমাণ পুনরাবৃত্তি করা নিশ্চয়োজন হয়। কারণ স্বকীয় চিন্তা প্রস্তরের উপর ইস্পাত দ্বারা খোদিত করার ত্রায় হয়, এবং পরকীয় বা ঋণকৃত চিন্তা (যাহা মুদ্রিত পুস্তক হইতে পাওয়া যায়) শুষ্ক বালির উপর দাগের ত্রায় কেবল বৃষ্টিপতন বা পদসঞ্চালন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।”

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

ধর্ম-সাধন বা চরিত্রের উন্নতি-সম্পাদন ।

ধর্মশব্দের বিবিধ অর্থ ।

ধর্ম শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। কয়েকটা অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২শ সূক্তের ঋষি মেধাতিথি বলিতেছেন:—

ত্রীণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।

বিষ্ণু রক্ষক, কেহ তাঁহাকে আঘাত করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্ম-সমূহ ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।

এস্থলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, ঋষি ধর্ম্মশব্দ দ্বারা বিশ্বের সনাতন নিয়মসমূহ (the eternal laws of the universe) ব্যক্ত করিতেছেন।

(২) জৈমিনি বলেন, চোদনালক্ষণার্থে ধর্ম্মঃ। অর্থাৎ আচার্য্যপ্রেরিত হইয়া যাগাদির অনুষ্ঠান করাই ধর্ম্ম। এখানে ধর্ম্ম বলিতে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড বুঝাইতেছে।

(৩) মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের প্রারম্ভে ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই—

বতোহভ্যদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।

এই সূত্র দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(ক) যাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যুক্তিলাভের হেতু, তাহাই ধর্ম্ম। অথবা (খ) যাহা সুখ ও মোক্ষের সাধন, তাহাই ধর্ম্ম। এই শেবোক্ত ব্যাখ্যায় সুখ শব্দ লৌকিক অর্থে গ্রহণ না করিয়া উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দের অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উভয় ব্যাখ্যা হইতেই দেখা যাইতেছে, এখানে ধর্ম্ম বলিতে এমন কিছু বুঝাইতেছে যাহা কর্ম্মকাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র।

(৪) গীতার তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিত্তগঃ পরধর্ম্মাৎ স্বহৃষ্টিতাৎ। [স্বহৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অজ্ঞানি সহ অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ]। এখানে ‘ধর্ম্ম’ শব্দ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অহিংসাদি, ইত্যাদি।

(৫) বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহেও ধর্ম্মশব্দের ভুরি ভুরি প্রয়োগ দেখা যায়। যথা, ধর্ম্মপদের প্রথম শ্লোকেই বুদ্ধদেব বলিতেছেন।

মনোপুস্পদমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া।

(ধর্ম্মসমূহ মন হইতে উৎপন্ন, মনই শ্রেষ্ঠ, তাহার মনোময়)।* কিন্তু বৌদ্ধ লেখকগণ ধর্ম্মশব্দ কোন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের ল্যাটিন অনুবাদে Fausbol ধর্ম্ম শব্দের অর্থ করিয়াছেন, nature, স্বভাব বা প্রকৃতি। Max Mullerএর মতে উহার অর্থ “আমরা যাহা” (All that we are). Rhys Davids (Buddhist India, p. 292) বলেন, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের পক্ষে যাহা করণীয়, তাহাই ধর্ম্ম (What it behoves a man of right feeling to do;—or on the other hand, what a man of sense will naturally hold)। পালিভাষাবিৎ কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ধর্ম্ম বলিতে বিধি বা নিয়ম (Laws) বুঝায়।

(৬) ধর্ম্ম শব্দের কতকগুলি লৌকিক ব্যবহার আছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য। যথা, কর্তব্য (পুত্রধর্ম্ম), গুণ (জলধর্ম্ম), মনোবৃত্তি (দয়াধর্ম্ম), আচার (বিধর্ম্ম = অনাচারী বা শাস্ত্রবিহিত আচার বর্জিত) ইত্যাদি।

(৭) মহু ধর্ম্মের দশ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

ধৃতিঃক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিচ্ছ্রিয়নিগ্রহঃ।

বীবিভ্রাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥ ৬। ৯২।

সন্তোষ, ক্ষমা, মনঃসংযম (অথবা মনের অবিক্রিয়তা), অচোরা, শুদ্ধতা, ইচ্ছ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্য এবং অক্রোধ—ধর্ম্মের এই দশ লক্ষণ বা স্বরূপ।*

অর্থাৎ মহু মতে ধার্ম্মিক কে?—যাঁহার চিত্তে সর্ব্বদা সন্তোষ বিরাজমান; অপরে অপকার করিলেও যিনি প্রত্যপকার করেন না; বিকারহেতু বিষয় নিকটে বর্ত্তমান থাকিলেও যাঁহার মনোবিকার উপস্থিত হয় না; যিনি অজ্ঞান পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ করেন না; যাঁহার দেহ শুদ্ধ; যিনি ইচ্ছামাত্র বিষয়সমূহ হইতে ইচ্ছ্রিয়নিগ্রহ প্রত্যাহার করিতে পারেন; যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যাবাদী ও

* সন্তোষো ধৃতিঃ। পরোপকারেকৃত্যে তস্ত প্রত্যপকারানচরণং ক্ষমা। বিকারহেতুবিষয়সম্মিশ্রিতান্যেপ্যবিক্রিয়ত্বং মনসো দমঃ। মনসো দমনং দম ইতি সনন্দবচনাৎ। শীতাতপাবিবস্বসহিষ্ণুতা ইতি গোবিন্দ-রাজঃ। (দমঃ অনৌদ্ধাত্যং বিদ্যাংদামিত্যাগঃ—মেধাতিথিঃ)। অজ্ঞানেন পরধনাদি গ্রহণং শ্রেয়ং তত্ত্বজ্ঞানেন্দেয়ং। যথাশাস্ত্রং মুক্তলাভায়াং দেহ-শোধনং শৌচম্ (আহারাদিশুদ্ধিঃ—মেধাতিথিঃ)। বিষয়েভ্যস্তদুদ্বাদি-বারশমিচ্ছ্রিয়নিগ্রহঃ। (অপ্রতিবিদ্ধেবপি বিষয়েবপ্রসঙ্গঃ—মেধাতিথিঃ)। শাস্ত্রানিতবজ্ঞান যীঃ আত্মজ্ঞানং বিদ্যা। (কর্ম্মাধ্যাক্সজ্ঞানভেদেন ধীবিদ্যারোভেদঃ—মেধাতিথিঃ)। যুগ্মার্থাভিধানং সত্যম্। জ্ঞোবহেতো সত্যাপি জ্ঞোবাভুৎপত্তির্যদাধঃ। এতদ্বশবিধং ধর্ম্মস্বরূপম্।—হুম্ কঃ।

ক্রোধশূন্য—তিনিই ধার্মিক। পক্ষান্তরে এবিধ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা “চরিত্রবান” বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকি। সুতরাং মনুষ্য ধর্ম সাধন, এবং চরিত্রের উন্নতি সম্পাদনে প্রথম একই কথা। অথবা প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, যিনি সর্বদাসুন্দর, সমঞ্জসীভূত চরিত্র-লাভের প্রয়াসী তাঁহাকে মনুষ্য প্রদর্শিত গুণ সকলের অধিকারী হইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। উপরে উল্লিখিত দশটা গুণের হই একটি পরিত্যক্ত বা তাহাদের সহিত নূতন হই একটি সংযোজিত হইতে পারে, কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে, মনুষ্যবর্ণিত ধর্মের সাধন, এবং চরিত্রের উন্নতির জন্য অধ্যবসায়, এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। অতএব দেখা যাক, চরিত্রের ভিত্তি কি।

চরিত্রের ভিত্তি—(ক) দৈহিক সংগঠন

(Physical organization)

দেহ ও আত্মা শইয়া মানব। প্রাণহীন দেহ বা বিদেহী আত্মাকে আমরা মানুষ্য বলি না। আত্মা স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ত্রয়ের স্ফুলিঙ্গ বা প্রকাশ। কিন্তু তাঁহাকে দেহের সাহায্যে ধরাতে যাবতীয় ব্যাপার নির্বাহ করিতে হয়। এজন্য তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইলেও তাঁহাকে পদে পদে দেহের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। মূল কথা এই। এখন, ইহার ব্যাখ্যা পূর্বে ও পশ্চিমে ভূখণ্ডে অবশ্য এক নহে। আমরা প্রথমে পাশ্চাত্য মত আলোচনা করিয়া পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব, ঐশ্বরীয় মতের সহিত তাহার বিশেষ অনৈক্য নাই।

—দৈহিক অবস্থার উপর নানা প্রকার সদৃশ গুণ নির্ভর করে। মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, পাকস্থলী, রক্ত, শ্বাস, মাংসপেশী প্রভৃতির ক্রিয়ার তারতম্যানুসারে বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন চরিত্র ব্যক্ত হয়। সুস্থ, স্বাভাবিক দেহধারী ব্যক্তির চরিত্র, অসুস্থ স্বাভাবিক (abnormal) দেহবিশিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র হইতে পৃথক হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি? কিন্তু সচরাচর ইহারা সুস্থ বা অসুস্থ বলিয়া গণ্য, তাঁহাদের একের চরিত্র দৈহিকসংগঠনানুসারে অপরের চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র, ইহা অনেকে স্বীকার করিতে চাহেন না। এজন্য এ বিষয়টা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

যিনি সুস্থ—অর্থাৎ স্বাস্থ্য শোণিত বিস্তৃত, পরিপাক শক্তি প্রবল, মস্তিষ্ক দীপ্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া অব্যাহত,

তিনি স্বভাবতঃই প্রকৃষ্ট, উৎসাহী, আশাশীল, অনলস, পরোপকারী, এবং ক্রোধশূন্য। পক্ষান্তরে, স্বাস্থ্য পাকস্থলী দুর্বল, যকৃৎের ক্রিয়া নিস্তেজ, তাঁহার শোণিত দূষিত, মস্তিষ্ক উত্তপ্ত, সুতরাং, তিনি সূনিদ্রায় বঞ্চিত, এবং এজন্য ক্লান্ত স্বভাব। এরূপ ব্যক্তি হয়ত অন্তর্নিহিত রোগমন্ত্রণায় নিয়ত ক্লেশ পাইতেছেন, সুতরাং তাঁহার স্বভাবতঃই শরীর সঞ্চালনে অকচিৎ জন্মিয়াছে। হয়ত এইরূপে ক্রমে তিনি অপরের অপেক্ষা নিজের কথা ভাবিতেই অধিক অভ্যস্ত হইয়াছেন। অথচ আমরা ইহার কিছুই না জানিয়া বা জানিয়াও ভুলিয়া যাইয়া এরূপ ব্যক্তিকে অনলস, অমুৎসাহী, স্বার্থপর বলিয়া তিরস্কার করিয়া থাকি। চরিত্রের উপর দেহের প্রভাব এত অধিক যে হই সহোদর একই মাতৃস্তন্যে লালিত পালিত হইয়াও ক্রমে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির হইয়া দাঁড়ায়। আমরা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু উভয়ের দেহ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলে এই বিষয় অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইতে পারে।

কতকগুলি গুণ বা দোষ বালাকাল হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ তাহার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে দৈহিক সংগঠন তাহার অন্যতম কারণ। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

ইং ১৮৮৬ সনে বার্লিনে মেরী শ্নাইডার (Mari Schneider) নামী দ্বাদশ বর্ষীয়া একটা ছাত্রীর বিচার হয়। তাহার আকৃতিতে অস্বাভাবিক কিছুই দেখা যায় নাই এবং সে দেখিতে সুন্দরী না হইলেও কুৎসিৎ ছিলনা। তাহাকে বিচারক যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করেন, সে ধীর, প্রশান্ত, অবিচলিত ভাবে সে সমস্তের উত্তর দেয়। তাহার কাহিনী এই—“আমার নাম মেরী শ্নাইডার। ১৮৭৪ সনের ১লা মে বার্লিনে আমার জন্ম হয়। আমার পিতার কথা আমার কিছুই মনে নাই, অনেক দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার একটা ছোট ভাই আছে। গত বৎসর আমার ছোট বোনের মৃত্যু হইয়াছে। আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম না, কারণ মা তাহাকে আমার চেয়ে বেশী আদর করিতেন। তিনি আমাকে দুর্ভাবহারে বহু অন্তর্য্য বার চাবুক মারিয়াছেন—আমি তাহা চুরী করিয়া ও তাঁহাকে

প্রহার করিয়া কিছুই অজ্ঞায় করি নাই। আমি ছয় বৎসর বয়স হইতে রিডালয়ে পড়িতেছি। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ছই বৎসর আছি। আমি লিখন, পঠন, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল এবং ধর্ম শিক্ষা করিয়াছি। আমি দশাঙ্গা জানি, বষ্ট আঙ্গাও জানি—‘কাহাকেও হত্যা করিও না’। আমার ক্রীড়া-সঙ্গী আছে। আমি যে গৃহে বাস করি সেই গৃহেই বিংশতি বর্ষিয়া একটি যুবতী আছে [—তাহার চরিত্র সন্দেহজনক] আমি তাহার নিকটে অনেক সময়ে যাই। আমি কিছু দিন হইল ক্রীড়াচ্ছলে একজন বালকের চক্ষু এমন জোরে টিপিয়া ধরিয়াছিলাম যে সে যাতনায় চীৎকার করিয়াছিল এবং তাহার চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে সে যাতনা পাইতেছে, কিন্তু যতক্ষণ না জোর করিয়া আমার হাত টানিয়া লওয়া হইয়াছিল ততক্ষণ আমি ছাড়ি নাই। আমি যে ইহাতে বেশী আনন্দ পাইয়াছিলাম তাহা নহে—কিন্তু হুঃখিতও হই নাই। আমি বাল্যকালে ধরগোসের চোখে কাঁটা ফুটাইতাম ও তাহাদের পেট চিরিয়া দিতাম—না এইরূপ বলেন, আমার তাহা মনে নাই। কনবান্ড নামক একজন তাহার স্ত্রী ও সন্তান দিগকে খুন করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, আমি তাহা জানি। আমি মিষ্ট দ্রব্য খাইতে ভালবাসি, সেজন্য অনেক বার মিথ্যাকথা বলিয়া পয়সা সংগ্রহ করিয়াছি। যে কাহাকেও হত্যা করে সে খুনী—আমি খুনী (murderess)। প্রাণ দণ্ড তাহার শাস্তি। আমার প্রাণদণ্ড হইবে না, কারণ আমার বয়স অল্প। ৭ই জুলাই মা আমাকে কোনও কাজে পাঠান। পথে মার্গারেট ডিএট্রিকের (Margarete Dietrich) সহিত দেখা হয়—তাহার বয়স সাড়ে তিন বৎসর। মার্চ মাস হইতে আমি তাহাকে চিনিতাম। আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, আমার সঙ্গে চল। আমি তাহার ইয়ারিং লইবার খানসী করিয়াছিলাম—বিক্রয় করিয়া পিষ্টক খাইবার জন্য আমি তাহাকে সিড়ির উপর বসাইয়া রাখিয়া মার নিকট হইতে পয়সা ও চাবী লইয়া কাজে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সে সেখানেই বসিয়া আছে। আমি আঙ্গিনা হইতে দেখিলাম তেতালার ঘরে জানালা একটু খোলা গাছে। তাহার কাণ হইতে ইয়ারিং খুলিয়া লইয়া তাহাকে গানাল হইতে ফেলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে লইয়া

উপরে গেলাম। আমি তাহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম, নতুবা সে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিত। সে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না, কিন্তু আমাকে দেখাইয়া দিতে পারিত। তাহা হইলেই মা আমাকে মারিতেন। আমি উপরে যাইয়া জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া তাহাকে সেখানে বসাইলাম। এমন সময়ে পদশব্দে বুঝিলাম, কেহ আসিতেছে। আমি মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ নীচে নামাইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। লোকটি আমাদিগকে না দেখিয়া চলিয়া গেল। আমি আবার জানালা খুলিয়া আমার দিকে পিঠ করিয়া মেয়েটিকে জানালার বসাইলাম, তাহার পা বুজিতে লাগিল। এরূপ করিয়া বসাইলাম এই জন্য যে আমি তাহার মুখ দেখিতে পাইব না, এবং সহজে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিব। আমি ইয়ারিং টানিয়া লইলাম। সে ব্যথা পাইয়া কাদিতে লাগিল। আমি ধমক দিয়া বলিলাম, কাদিলে নীচে ফেলিয়া দিব। সে চুপ করিল। আমি ইয়ারিং পকেটে রাখিলাম। তখন আমি তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলাম, শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, সে প্রথমে আলোকস্তম্ভের উপর ও তৎপর পাকা আঙ্গিনার উপর পড়িল। আমি তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া মার কাজে চলিয়া গেলাম। আমি জানিতাম যে আমি মেয়েটিকে হত্যা করিতে যাইতেছি। তাহার পিতা মাতা যে শোকাক্ত হইবেন, সে চিন্তা আমার মনে উদয় হয় নাই। আমি একজন হুঃখিত বা ক্লিষ্ট হই নাই। আমি জেলে আছি বলিয়া মুহূর্তের তরেও হুঃখিত হই নাই। আমি প্রথমে পুলিশের নিকট সমস্ত অস্বীকার করিয়াছিলাম ও ইয়ারিং ফেলিয়া দিয়াছিলাম। পবে পুলিশের লোক আমাকে প্রহারের ভয় দেখাইলে সমস্ত স্বীকার করি। আমি বালিকাটির মৃতদেহ দেখিয়া একটুকুও হুঃখ বোধ করি নাই। আমি জেলে চারিজন স্ত্রীলোকের সহিত ছিলাম—ভাষাদিগকে সব বলিয়াছি। তাহাদের অন্তত প্রদ্বা শুনিয়া আমি আমার কাহিনী বলিবার সময় না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই। আমি মাকে কিছু পয়সা পাঠাইতে লিখিয়াছি, কারণ জেলে শুষ্ক রুটী খাইতে দেখ—তাহা ভিজাইবার জন্য একটা কিছু চাই।* এই বালিকার পূর্ক-

* The Criminal (The Contemporary Science Series), pp. 7-11.

পুরুষ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। ইহার অন্তরে ধর্মার্থ-বোধ মোটেই ছিল না। কেন ছিল না, তাহার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। আমাদের মনে হয়, ইহার রক্ত-মাংসের মধ্যে এমন কিছু ছিল—অর্থাৎ ইহার দৈহিক সংগঠন এমন বিচিত্র ছিল, যাহাতে ইহার প্রাণে ধর্মার্থবোধরূপ বীজ উদ্ভূত হইয়াও অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই।

(খ) বংশ (Heredit)

চরিত্রের দ্বিতীয় ভিত্তি বংশ। সন্তান পিতামাতার দোষগুণের অধিকারী হয়, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু চরিত্রের উপর বংশের বা পূর্বপুরুষগণের প্রভাব কত প্রবল, বিস্তৃত ও গভীর, সে সমস্তা সহজ নহে। অনেকে মনে করেন, কাহারও চরিত্রের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ পিতামাতা বা পিতামহ মাতামহের মধ্যে দৃষ্ট না হইলেই বংশপ্রভাবের নিয়ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু যাহারা এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অন্বেষণ ও অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এক একটা গুণ বা দোষের মূল অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়া শাখা প্রশাখা ক্রমে অনেক দূরে বাহিতে হয়। এমন কি, হয় তো উচ্চতন চতুর্দশ পুরুষে উপস্থিত হইলে তবে একটা সমস্তার মোমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোনও পরিবারে বা গোত্রে বংশপ্রভাবের আশ্চর্য্য প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যেমন আমেরিকার জুক বংশ (The Jukes)। এই বংশের ৭০৯ জন লোকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কুড়িজনও নিপুণ শ্রমজীবী নাই—যে কয়জন আছে তাহাদের মধ্যে দশজন কারাগারে কর্ম শিক্ষা করিয়াছে। ১৮০ জন সরকারী দাতব্যদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। সকলের দাতব্য প্রাপ্তিকালের সমষ্টি ২৩০০ বৎসর, ৭৬ জন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী। এই বংশে অভিচারিণী রমণীর সংখ্যা শতকরা ৫২র উপর। সাধারণতঃ এরূপ রমণীর সংখ্যা শতকরা মোটে ১.৬৬। *

অপরাধী (the criminal) শ্রেণীর সম্বন্ধে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অবসর হইলে এবিষয়ে ভবিষ্যতে কিছু বলা যাইবে। আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম, তাহার ধর্ম এই যে সাধারণ অবস্থাতেও

চরিত্রের গুণাগুণ দৈহিক সংগঠন ও বংশ প্রভাবদ্বারা নিয়মিত হয়। এক্ষণে দেখিতে হইবে ধর্মসাধনের সহিত এই দুইটির কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা।

ধর্মসাধনের সহিত দৈহিকসংগঠন ও বংশ প্রভাবের সম্বন্ধ।

ধর্মসাধনের উদ্দেশ্য বোগক্ষেপ—অর্থাৎ যে গুণ নাই তাহা লাভ ও যে গুণ আছে তাহার উৎকর্ষ সাধন। মনুষ্যের যে দশটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পরিষ্কৃত ভাবে বা অঙ্কুরাকারে রহিয়াছে। এই গুণ বা লক্ষণগুলি কাহার মধ্যে কি আকারে আছে তাহা যেমন দৈহিকসংগঠন ও বংশপ্রভাব দ্বারা নিয়মিত হইয়াছে, তেমনি ইহাদিগের উৎকর্ষ সাধনে কৃতকার্য্যতাও এই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছে। যেমন ধৃতি বা সন্তোষ। কেহ কেহ অম্মাবধিই সন্তুষ্টচিত্ত। তাঁহারা এমন দেহ লাভ করিয়াছেন বা পিতামাতার নিকট হইতে এমন প্রকৃতি পাইয়াছেন যে অসন্তোষ, নিরাশা তাঁহাদের ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। পক্ষান্তরে যে বাগ্যাবধি রোগগ্রিষ্ট, যাহার রক্তমাংসের ক্রিয়া (animal spirits) দুর্বল, যে স্নিজা কাহাকে বলে জীবনে জানে না, তাহার চিন্তে সহজেই অসন্তোষ প্রবল হয়। তৎপর, অক্রোধ। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, ক্ষুধিতব্যক্তি ক্রোধী (A hungry man is an angry man)। কথাটা অতি ঠিক। যে ক্ষুধাতুর তাহার যেমন সহজেই ক্রোধের উদ্বেক হয়, তেমনি অজীর্ণরোগগ্রিষ্ট ব্যক্তিও সহজে ক্রোধ জন্ম করিতে পারে না। দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমা করা সহজ। শক্তিশালী পুরুষের পক্ষে অপরাধ মার্জনা করিতে একটু সময় লাগে। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা ক্ষমানীল বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। ইহা আমাদের দৈহিক দুর্বলতার না ধর্মসাধনের ফল, বলা কঠিন। তারপর, অন্তরও বহিরিস্থিত হৃদয়ের কথা ধরা যাক। কেনা জানে, সকলের সকল ইন্দ্রিয় সমান প্রবল থাকে না; দৈহিকসংগঠন ও বংশানুসারে এবিষয়ে গুরুতর তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে দেহ ও বংশের প্রভাব এত প্রবল যে অনেক ব্যাকুলচিত্ত, ভগবদ্ভক্ত সাধককেও এত

* The Criminal, pp. 101--2

রক্তাক্তকলেবর হইতে হয়। অপরাধীদের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাদিগের সংশোধনের জন্ত ধর্মোপদেশ প্রায়ই নিষ্ফল—শরীরের উন্নতি ও পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না। এই দেহ ও বংশের প্রভাবকেই খৃষ্টীয় শাস্ত্রে ‘আদিম পাপ’ (the original sin) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই প্রভাবের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াই ধর্মবীর সেন্ট পল অতি দুঃখে বলিয়াছেন—For the good that I would I do not; but the evil which I would not, that I do...O wretched man that I am! Who shall deliver me from this body of death?”

সেন্ট পল যেন এদেশীয় সাধকের ভাষায় বলিতেছেন—“জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। জানাম্যধর্ম ন চ মে নিবৃত্তিঃ।—ধর্ম জানিয়াও তাহার অনুসরণ করি না, অধর্ম জানিয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হই না—হায়! কে এই হতভাগ্য আমাকে যুত্ময় দেহ হইতে উদ্ধার করিবে?”

ধী এবং বিভ্রা—শাস্ত্রজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ঐ কথা। উহারা যে পরিমাণে পুরুষকারের উপর নির্ভর করে, ঠিক সেই পরিমাণে দেহ ও বংশের শক্তি দ্বারা নিয়মিত হয়। এ কথা বলিবার অপেক্ষা করে না যে, মেধা, বুদ্ধি ও স্মরণ শক্তির সাহায্য ভিন্ন কেহ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। এই সকল শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে দৃষ্ট হয়, ইহা অতি পুরাতন কথা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেও শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া সকলে এক ফল পাইতে পারেন না। কারণ কাহারও কাহারও এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ শক্তি ও সুবিধা থাকে। যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্ঞান, সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তি হিমাশ্রয় শিখরে শুভ্রতুষাররাশির মধ্যে বিচরণ করিয়া যে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন, চিরকুম্ভ বা ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি কখনও সে সৌভাগ্যের আশা করিতে পারেন না। যিনি পাঁচ মিনিট কাল শরীর উন্নত করিয়া বসিতে পারেন না, তিনি তাঁহার জ্ঞান সমস্ত রজনী ধ্যানে অতিবাহিত করিবেন, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়? আর যে ব্যক্তি এমন চঞ্চল দেহ মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে মুহূর্তকাল

সুস্থির থাকিতে পারে না, সেই বা কিরূপে যোগৈশ্বর্য লাভ করিবে?

বাকি রহিল, সত্যপ্রিয়তা। সত্যের সহিত দেহের সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ আছে। দুর্বলকায় ব্যক্তি অনেক সময়ে ভয়ে মিথ্যা কথা বলে। এ জন্তই দেখা যায়, স্বাধীন দেশের সুস্থ সবল, উন্নতকায় ব্যক্তির পরাধীন দেশের ধর্ম, দুর্বল রূপদেহ লোকদিগের অপেক্ষা সচরাচর অধিক স্পষ্টবাদী। এরূপও দেখা গিয়াছে, কোনও কোনও পরিবারের বালক-বালিকারা শৈশবকাল হইতেই মিথ্যা কথা বলিতে আরম্ভ করে।

গীতার মত ।

পশ্চিমদেশীয় সুধীগণ যাহাকে দেহসংগঠন ও বংশের ফল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, গীতার মতে তাহার নাম প্রকৃতি অথবা বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত পূর্বজন্মার্জিত-ধর্মাদি সংস্কার। গীতার তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—

সদৃশং চেষ্টতে স্বভাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥

জ্ঞানবান ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম-চেষ্টা করিয়া থাকে। ভূতমাত্রই প্রকৃতির অধীন, (সুতরাং) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে কি হইবে?

পুনশ্চ অষ্টাদশাধ্যায়ে—

যদহঙ্কারমশ্রিত্য ন যোংস্ত ইতি মন্তসো ।

মিথ্যৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্বাং নিয়োকীযতি ॥

হে অর্জুন, যদি অহঙ্কারের অধীন হইয়া তুমি নিশ্চয় কর, ‘আমি যুদ্ধ করিব না,’ তবে তোমার সংকল্প মিথ্যা হইবে, (কারণ) প্রকৃতিই তোমাকে (যুদ্ধে) নিয়োগ করিবে।

প্রথমোক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর প্রকৃতির অর্থ করিয়াছেন, বর্তমানজন্মাবস্থায় অভিব্যক্ত পূর্বজন্ম ধর্মাদি সংস্কার।* অথবা শ্রীধর স্বামীর ভাষায়, প্রাচীন কর্মসংস্কারাধীনস্বভাব। কিন্তু শেবোক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন, প্রকৃতিব অর্থ ক্ষত্রস্বভাব। যাহারা

* প্রকৃতির্নাম পূর্বজন্মধর্মাদিসংস্কারো বর্তমানজন্মাবস্থায়।

প্রাক্তনজন্মসংস্কার মানেন না, তাঁহারা বলিবেন, এই দ্বিতীয় অর্থের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত প্রায় এক। কারণ, শঙ্কর যাহাকে ক্ষত্রস্বভাব বলিতেছেন, তাঁহাদিগের মতে উহা দৈহিক-সংগঠন ও বংশপ্রভাবের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। গীতার সতের অধ্যায় জুড়িয়া যোগভক্তিকর্ম-জ্ঞানের এত অমূল্য উপদেশ দিবার পরেও যদি শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে হয়, “হে অর্জুন, তুমি যুদ্ধ করিতে চাও বা না চাও, তোমার প্রকৃতি বা ক্ষত্রস্বভাব তোমাকে ঘাড়ে ধরিয়া যুদ্ধ করাইবে, সুতরাং নিম্ন হইতে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ;” তবে নব্যতন্ত্রিগণ অনায়াসেই বলিতে পারেন, এ স্থলে শাস্ত্রকার নিজস্ব বংশ বা heredityর অনতিক্রমণীয় প্রভাব স্বীকার করিতেছেন।

ধর্মসাধন দ্বারা দেহ ও বংশের প্রভাব

অতিক্রম করা যায় কি না।

তবে কি দেহ ও বংশের প্রভাব সত্য সত্যই অনতিক্রমণীয়? এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। অথবা ইহার উত্তরে বলিতে হয়, অনতিক্রমণীয় না হইলেও ত্বরিতক্রমণীয় বটে। যখন পুরাণে পাঠ করি, এক এক জন তপোনিষ্ঠ সাধক আজীবন কঠোর তপস্বী করিয়াও হঠাৎ এক দিন রিপূর চরণে আপনাকে আহুতি দিয়াছেন,—যখন দেখিতে পাই, কত সরলপ্রাণ, ব্যাকুলচিত্ত, জৈশ্বরবিশ্বাসী সাধক সহস্রবার কৃতাপরাধের জন্ত অমৃতপুত্র ও গলদক্ষলোচন হইয়াও একটা দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই, তখন যথার্থই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, আজন্ম সাধনভজন আর ক্রমে দ্ব্যুতাহতি বৃদ্ধি একই কথা। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম-সাধন নিরর্থক বলা যায় না। লক্ষ লক্ষ সাধনশীল লোকের জীবন সাক্ষ্য দিতেছে, একাধি অধ্যবসায় কখনও সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয় না। দেহ ও বংশের প্রভাব সাধন বলে নির্মূল না হউক, অন্ততঃ নিম্নোক্তঃ ও নির্বীণ্য হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে কথা এই, সাধন এমন হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে দেহ ও আত্মা উভয়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে। কারণ, ধর্ম-সাধন দৈহিক-সংগঠন ও বংশপ্রভাবের অমূল্য না হইলে বার্থ হইতে পারে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ধর্মসাধনের উদ্দেশ্য যোগক্ষেম বা চরিত্রে যে সদগুণ আছে তাহাকে বিকশিত করা এবং-যে সদগুণ নাই তাহা লাভ করা। কাহাব মধ্যে কি শক্তি আছে, সাধন বা চর্চা ভিন্ন তাহা ধরিবার উপায় নাই। ধর্ম ইমার্সন একস্থলে বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিশেষত্ব আছে, ঐ বিশেষত্ব ধরিতে পারিলেই সে কীর্ত্তিমান হইতে পারে। এই ধরার কাজটা অবশ্য অত্যন্ত কঠিন। কঠিন বলিয়া একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেই বা চলিবে কেন? আজন্মসিদ্ধ কিংবা আজন্মপাপিষ্ঠ ব্যক্তির কথা না তুলিয়া সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে, চরিত্রের উন্নতি-সাধন অথবা ধর্মজীবন লাভের জন্য সীতিমত সাধন আবশ্যক। সে সাধন নিশ্চয়ই দেহ ও বংশপ্রভাবের অমূল্য হইবে, ও তদমুখায়ী ফল প্রসব করিবে, কিন্তু তাহা সর্বথা নিষ্ফল হইবে না।

ধর্মসমাজের একটা গুরুতর ভুল, সকলকে এক ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা। যেখানে যেখানে সমাজগঠনে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দেহ ও বংশপ্রভাব অস্বীকৃত হইয়াছে, সেখানেই মহানর্থ সংঘটিত হইয়াছে। তিনিই যথার্থ নেতা, গুরু বা চালক, যিনি বিভিন্ন প্রকৃতি অমুগারে বিভিন্ন সাধন পন্থা নির্দেশ করিতে পারেন। একরূপ গুরু দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু জগতের ইতিহাসে এমন কাহাকেও দেখা যায় নাই, ইহা স্বীকার করি না। দেশ ও বুদ্ধদেবের সঙ্ক্ষে যে সকল আধ্যাত্মিক প্রচলিত আছে, তাহার কোন কোনটা হইতে বৃদ্ধিতে পারা যায়, তাহাদের নিকট এই তত্ত্বটি অপরিচিত ছিল না।

শ্রোতাস্থিনী আপনার শক্তিতেই নিজের পথ করিয়া লয়, কিন্তু ভূমির প্রকৃতি দ্বারা তাহার গতি নির্দিষ্ট হয়। সেইরূপ, ধর্মার্থী, পুরুষকার ও ব্রহ্মকৃপার সাহায্যে চরিত্রের উন্নতি সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু তাহার সাধন স্বীয় দৈহিক-সংগঠন ও বংশপ্রভাব দ্বারা নিয়মিত এবং অমূল্য হয়। *

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

* এই প্রবন্ধে দৈহিকসংগঠন ও বংশ চরিত্রের ভিত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই দুইটা ছাড়া চরিত্র-বৈচিত্র্যের আরও অনেক কারণ আছে; যেমন, আবেষ্টন (environment), রাজনৈতিক অবস্থা, ইত্যাদি। সে সকলের আলোচনা উপস্থিত করিলে প্রবন্ধ অমূল্য হইয়া পড়াইত।

পাণ্ডুর কীর্তিচিহ্ন।

আদিনার গঠন-সৌন্দর্য্যে পাণ্ডুর অত্যন্ত কীর্তিচিহ্ন নিশ্চয় হইয়া বহিয়াছে। আদিনা না থাকিলে, সে সকল কীর্তিচিহ্ন সমধিক গৌরব লাভ করিতে পারিত। যে সকল হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির বিলুপ্ত করিয়া শেকন্দরশাহ আদিনা রচনার ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহা অক্ষতশরীরে বর্তমান থাকিলে, আদিনা নিশ্চয় হইয়া পড়িত কি না, তাহা কে বলিতে পারে? আদিনার অস্তিত্বই পাণ্ডুর দেবমন্দিরশুল্ক হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা গণেশের শাসন-সময়ে পাণ্ডুর আবাব দেবমন্দিরে অলংকৃত হইয়া উঠিতেছিল।

গণেশের শাসন সময়ের দুই শ্রেণীর ইতিহাস প্রচলিত আছে। এক শ্রেণীর ইতিহাসে—গণেশ হিন্দু মুসলমানের প্রিয়পাত্র,—পরম জ্ঞানপরায়ণ—প্রজাপালক পুণ্যলোক নরপতি বলিয়া প্রশংসিত। আর এক শ্রেণীর ইতিহাসে—গণেশ মুসলমানবিদ্বেষী—অত্যাচারপরায়ণ—প্রজাপীড়ক রাজ্যাপহাবক বলিয়া নিন্দিত। কিন্তু উভয় শ্রেণীর ইতিহাসেই—গণেশ হিন্দুধর্ম্মামুরক্ত—দেবমন্দির নির্মাণকারক বলিয়া পরিকীর্তিত। সে সকল দেবমন্দির দীর্ঘকাল আশ্রয়দান করিতে পারে নাই বলিয়া, তাহার চিহ্ন মাত্রও বর্তমান নাই। গণেশের পর তাহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সুলতান জালালুদ্দীন নামে সিংহাসন আরোহণ করায়, মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদরচনার পুরাতন প্রবৃত্তি পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতেই গণেশ-নির্ম্মিত দেবমন্দির বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গোড়ীয়াসাম্রাজ্যে যে সকল হিন্দু এবং বৌদ্ধ নরপতি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা সকলেই শাসনশর্ত্তে লিখিয়া দিতেন

“নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাস্যে।”

পরকীর্ত্তি বিনষ্ট করা মহাপাপ বলিয়া লোক সমাজেও সুপরিচিত ছিল। মুসলমান-শাসন সময়ে এই নীতি মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। তাহাতেই পরকীর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়া, বাকশাহগণ আত্মকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। রাজা গণেশ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মুসলমান নীতির অনুসরণ করিলে, আদিনা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে বিলম্ব ঘটত না। তিনি পরকীর্ত্তি বিলুপ্ত না করিয়া, হিন্দুনীতিরই মর্যাদা রক্ষা

করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র মুসলমানধর্ম্মের সঙ্গে মুসলমাননীতি গ্রহণ করায়, পুনরায় পরকীর্ত্তিলোপের আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। একটি মন্দিরে তাহার পরিচয় অত্যাধি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাহা একটি সমাধি-মন্দির বলিয়া পরিচিত। গোলাম হোসেন লিখিয়া গিয়াছেন,—তাহাতে সুলতান জালালুদ্দীনের, তাঁহার স্ত্রীর এবং পুত্রের মৃতদেহ সমাধিনিহিত হইয়াছিল।* অত্যাধি সে তিনটি সমাধি বর্তমান আছে। মন্দির অরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল,—গম্বুজের উপর অশ্বখবৃক্ষ সমুদ্ভূত হইয়া তাহাকে নিরতিশয় বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল;—এখন তাহা সমুদ্রে উৎপাটিত হইয়াছে, যথা যোগ্য জীর্ণসংস্কারও সাধিত হইতেছে। এই সমাধিমন্দিরের ইষ্টক প্রস্তরের সহিত বাঙ্গালার পুরাকাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ইহার নাম

একলক্ষি।

এরূপ নাম প্রচলিত হইল কেন, কেহ তাহার রহস্তোন্মোচন করিতে পারেন নাই। এই নাম কি পুরাকালপ্রচলিত প্রকৃত পরিচয় বিজ্ঞাপক নাম? গোলাম হোসেনের সময়ে এই নাম প্রচলিত থাকিলে, তিনি ইহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন কেন? ইলাহিবক্সের হস্তলিখিত ইতিহাসে এই নাম উল্লিখিত আছে। তবে কি এই নাম গোলাম হোসেনের পরে এবং ইলাহিবক্সের পূর্বে কোনও সময়ে সহসা প্রচলিত হইয়াছে? মুসলমান-সমাধিমন্দিরের হিন্দু নাম স্বতই এই সকল কোতূহলের উদ্রেক করিয়া থাকে। কুতবশাহী মসজিদের উত্তর পূর্বে—প্রচলিত রাজপুত্রের অনতিদূরে—একলক্ষি অবস্থিত। রাভেনশা ইহাকে ৮০ ফিট আয়তনের সমচতুর্ভুজ মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইলাহিবক্সের হস্তলিখিত ইতিহাসে একলক্ষি ৫০ হাত দীর্ঘ, ৪৬ হাত প্রস্থ, ২৭ হাত উচ্চ বলিয়া বর্ণিত। তাহার বর্ণনা প্রকৃত তাহা পর্য্যটক মাত্রই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।†

* To this day a large tower exists over his mausoleum at Panduah. The graves of his wife and son lie by the side of his mausoleum.—Riaz-us Salateen, p. 118.

† রাভেনশাহ প্রমুখ একলক্ষির চিত্র আছে, তাহাতে ইলাহিবক্সের বর্ণনাই প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে।

এত বড় সমাধিমন্দিরের উপর একটি মাত্র গম্বুজ । তাহাই একলক্ষির গঠন কৌশলের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় । এই মন্দিরের আর একটি বিশেষত্ব আছে । ইহাতে কোন ফলকলিপি দেখিতে পাওয়া যায় না,—কখন কোন ফলকলিপি সংযুক্ত হইয়াছিল বলিয়াও বোধ হয় না । অনাবৃত্ত হস্তান্তরে যে তিনটি সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও কোন ফলকলিপি সংযুক্ত হয় নাই । একটি সমাধি সর্কাপেক্ষা উচ্চ,—তাহা সকলের পশ্চিমে অবস্থিত । ইলাহিবক্স লিখিয়া গিয়াছেন,—“পশ্চিমপার্শ্বের সমাধি সুলতান জালালুদ্দীনের, পূর্বপার্শ্বের সমাধি তাহার পুত্র সুলতান আহম্মদশাহের এবং মধ্যস্থলের সমাধি তাহার স্ত্রীর বলিয়া অনুমিত হয় ।” * এক্ষণে অনুমানের কারণ কি, ইলাহিবক্স তদ্বিষয়ে আর কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই ।

একলক্ষি দেবমন্দির না সমাধিমন্দির, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবার কারণ পরম্পরার অভাব নাই । গম্বুজ না থাকিলে, ইহার অজ্ঞাত গঠন কৌশল দেখিয়া, ইহাকে সমাধি-মন্দির বলিতে সাহস হইত না । চারিদিকে চারিটি প্রবেশ দ্বার,—অট্টালিকার অল্পপাতে সকল দ্বারই নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন । যে দ্বারটি দক্ষিণদিকে অবস্থিত, তাহাই প্রধান দ্বার । তাহা প্রস্তরময় । উপরের চৌকাঠের মধ্যস্থলে এক দেবমূর্তি ! তাহার নাক মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ইলাহিবক্স লিখিয়া গিয়াছেন—“এই দ্বার কোনও দেবমন্দির হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে ।” † কেন্দ্র দ্বার কেন,—একলক্ষির সর্কাপেক্ষেই দেবমন্দিরের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় । কি অবস্থান, কি গঠন-পারিপাট্য, সর্কাপেক্ষেই একলক্ষি দেবমন্দিরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । রাভেনশা তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া-
ছিলেন ।‡ কিন্তু তিনি ইহাকে ষিয়াসুদ্দীনের সমাধিমন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । কাহার নিকট এক্ষণে কথা

জ্ঞাত হইয়াছিলেন, রাভেনশা তাহার উল্লেখ করেন নাই । অন্তের কথা দূরে থাকুক, তাহার টীকাकारও ইহাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই ।*

একলক্ষি বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার যোগ্য । কিন্তু আদিনা দর্শনের ঔৎসুক্যে পর্যটকগণ আশ্চর্য্য হইয়া, দূর হইতে একলক্ষির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন । জেনারেল কনিংহাম ইহাকে “বাঙ্গালী পাঠান-স্থাপত্যের” উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ।† গম্বুজের সম্বন্ধে সে কথা সর্কাপেক্ষে স্পষ্টতঃ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় । অজ্ঞাত অংশের সম্বন্ধে সে কথা স্বীকার করিতে সাহস হয় না । একলক্ষি ইষ্টকগঠিত, মধ্যে মধ্যে প্রস্তরের সমাবেশ । ইষ্টক গুলি কাককাব্যধচিত । তাহাতে দেবমন্দিরের উপযোগী রচনা-কৌশল অভিব্যক্ত । যে সময়ে এই মন্দির রচিত হয়, তখন হিন্দু মুসলমান মিলিয়া বাঙ্গালী জাতিতে পরিণত হইতেছিল । তখনকার শিক্ষা ও শিল্প উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত প্রতিভায় উজ্জল হইয়া উঠিতেছিল । সুতরাং একলক্ষিকে “বাঙ্গালী পাঠান-স্থাপত্যের” দৃষ্টান্ত না বলিয়া, “বাঙ্গালীর স্থাপত্য-প্রতিভার” দৃষ্টান্ত বলিলেই সঙ্গত হয় । কারণ, এই বিচিত্র মন্দিরে হিন্দু মুসলমানের স্থাপত্যপ্রতিভা সমভাবে দেদীপ্যমান । এখানে যাহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন,—তাহাদের অবস্থাও সেইরূপ,—জাতিতে হিন্দু, ধর্মে মুসলমান ।

P30087

সাতাইশ ঘরা ।

আদিনার পূর্বাংশে বহুদূর পর্যন্ত রাজনগর প্রতিষ্ঠিত ছিল । তথায় এখনও অনেক স্মৃৎসরোবর দেখিতে

Ghyasuddin, his wife, and his daughter-in-law. This tomb is a remarkable instance of the use of Hindu materials in the erection of a Muhammedan Mausoleum, for both door posts and lintels are covered with Hindu carvings.—*Ravenshaw's Gour*, p. 58.

* This can hardly be other than the “domed tomb” referred to in the Riaz-us-Salateen as that of Jalaluddin Abul Muzaffar Muhammad Shah. See Blochmann's contributions. J. A. S. B. Vol. XLII. Part I. p. 267.

† General Cunningham cites this tomb as “one of the finest specimens of the Bengali Pathan tomb.”—*Archeological Survey Report*, Vol. III. p. 11.

* I imagine that the western tomb, which is the highest, is that of Sultan Jalaluddin, that the one to the East is that of his son Sultan Ahmed Shah, and that the middle one is the tomb of his wife.—*Khuahid-jahannamah*.

† It appears from this that the lintel must have belonged to some idol-temple.—*Ibid*.

‡ It is beleived to contain the remains of Sultan

245, 283

পাওয়া যায়। আদিনার অর্ধক্রোশ পূর্বে নিবিড় বনেব অস্তরালে একটি সরোবর এবং তাহার তীরে দুর্গাকার স্থানে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান এখন “সাতাইশ ঘরা” নামে পরিচিত। সামসুদ্দীন ইলিয়াস পাণ্ডুয়ার রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া, এই স্থানেই বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত রহিয়াছে। এখানে ব্যাভীতি এরূপ প্রবল ছিল যে, অধিকাংশ পর্যটক এখানে পদার্পণ করিতেন না। রাভেনশা এখানে পদার্পণ করিয়া-ছিলেন কিনা, তাহাতে সন্দেহ হয়। তাঁহার গ্রন্থে “সাতাইশ ঘরার” কোন চিত্র মুদ্রিত নাই। যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও জনশ্রুতি মূলক। সরোবরটি উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘ। রাভেনশা লিখিয়া গিয়াছেন,—“তাহা মধ্যম পাণ্ডবের কীর্তিচিহ্ন বলিয়া পরিচিত।” * সে যাহা হউক, সরোবরটি হিন্দুকীর্তি। তাহার পার্শ্বে যে রাজদুর্গ বর্তমান ছিল; তাহা প্রায় চিহ্নহীন হইয়া উঠিয়াছে। কোন পরিখা নাই,—প্রাচীরের আভাস মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই যে পুরাতন রাজপ্রাসাদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে একটি স্নানাগার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও ধ্বংসদশায় নিপতিত হইয়াছে। ইলাহিবক্স লিখিয়া গিয়াছেন,—এই স্নানাগার সামসুদ্দীন ইলিয়াসের কীর্তি চিহ্ন। দিল্লীর ইতিহাসবিখ্যাত “সামসী” স্নানাগারের আদর্শে সামসুদ্দীন ইলিয়াস পাণ্ডুয়ার স্নানাগার নির্মাণ করায়, দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ ক্রোধাক্ত হইয়া পাণ্ডুয়া অবরোধ করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।† সাতাইশ ঘরার স্নানাগারের কথা এইরূপে ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। গোলাম হোসেনের কথা সত্য হইলে, একটি স্নানাগারের অল্প কি অনর্থই না উৎপন্ন

হইয়াছিল! ফিরোজ শাহ দুই লক্ষ পদাতিক, বষ্টিসহস্র অশ্বরোহী হইয়া সহস্র পোতারোহণে পাণ্ডুয়া উপনীত হইয়া নগর অবরোধ করিয়াছিলেন। একদিনের যুদ্ধে একলক্ষ সেনা কালকবলে পতিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে সাতাইশঘরার স্মৃতি নরশোণিত শ্রোতে নিমগ্ন হইয়া বহিয়াছে। যাহারা পাণ্ডুয়ার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই এই পুরাতন রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। নিকটে বা দূরে অল্প কোনও রাজপ্রাসাদ থাকিলে, তাহার জনশ্রুতি বর্তমান থাকিত। “সাতাইশ ঘরা” এখন ধীরে ধীরে লোকলোচনের অন্তর্হিত হইতেছে,—যাহা আছে, তাহারও জীর্ণসংস্কারের চেষ্টা হইতেছে না। গোড়ের ছায় পাণ্ডুয়া ইংরাজরাজের কুপা-কটাক্ষে স্তব্ধ হইতেছে। কিন্তু কি গোড়ে, কি পাণ্ডুয়ার,—কোন স্থলেই—রাজপ্রাসাদের জীর্ণসংস্কারের আরোজন দেখিতেছি না! ইতিহাসের নিকট মসজিদ অপেক্ষা রাজপ্রাসাদের মূল্য অধিক। তাহার সহিত পুরাকাহিনীর প্রধান সংশ্রব। তাহা ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, ইতিহাস সংকলন করা কঠিন হইয়া উঠিবে।

স্নানাগারটি সরোবরের পার্শ্বদেশেই অবস্থিত ছিল। এখন তাহার পূর্বাবস্থা বর্তমান নাই। ইলাহিবক্স লিখিয়া গিয়াছেন,—“এই সরোবর নাসির শাহের সরোবর বলিয়া পরিচিত।” * উত্তরকালে গণেশের পুত্র পোত্রের প্রভাবে ইলিয়াস বংশীয় নাসিরুদ্দীন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিবার কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাসে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়,—নাসিরুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, রাজধানী গোড়নগরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়ার নাসিরুদ্দীনের কীর্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার সিংহাসনারোহণের পূর্বে হইতে সরোবর না থাকিলে, তাহার পার্শ্বে তাঁহার পূর্বপুরুষের স্নানাগার নির্মিত হইত না। সরোবরের আকার ও স্নানাগারের সামিধ্য ইহাকে পুরাতন সরোবর বলিয়াই বোধিত করিতেছে। নাসিরুদ্দীনের নামে তাহা কথিত

* The tank has its greatest length north and south, and tradition declares it to have been the work of Arjun of the race of Pandu.—*Ravenshaw's Gouy*, p. 67.

† It is said that at that time Sultan Shamsuddin built a bath, similar to the Shamsi-bath of Delhi. Sultan Firuz Shah, who was furious with anger, against Shamsuddin in the year 754 A. H., set out for Lakhnau, and after forced marches, reached close to the city of Panduah, which was then the metropolis of Bengal.—*Riaz-us-Salateen*, p. 100.

* Ilahibux notices the beautiful tank of Satais-ghara, and says, it is known by the name of Nasir Shah's tank.—*H. Beveridge*,

হইয়া থাকিলেও, তাহা যে নাসিরুদ্দীনের কীর্তি, এরূপ অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়।*

পাণ্ডুর আর একটি সুপরিচিত দৃষ্টের নাম “সোনা মসজিদ।” কিন্তু পাণ্ডুর সোনা মসজিদ গঠন-গৌরবে গোড়ের সোনা মসজিদের সমকক্ষ বলিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করিতে পারে না। তথাপি তাহা পাণ্ডুর একটি উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাহা আস্তনে ক্ষুদ্র হইলেও, গঠনপরিপাট্যে সুন্দর বলিয়া কথিত হইবার যোগ্য।

এক সময়ে প্রস্তরগঠিত অট্টালিকার প্রাধান্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর প্রস্তরের সঙ্গে ইষ্টক সংযোগে অট্টালিকা নির্মিত হইতে আরম্ভ করে। গোড় এবং পাণ্ডুর অধিকাংশ অট্টালিকায় তাহারই নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ে পাণ্ডুর সোনা মসজিদ অনন্তসাধারণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। ইহার আশস্ত প্রস্তরগঠিত।†

কুতবশাহী অট্টালিকার উত্তরে এই ক্ষুদ্র মসজিদ অবস্থিত। ইহার পূর্বদিকে একটি প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পূর্বে একটি সুদৃঢ় তোরণদ্বার। তাহা অত্যাশ্চর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় উপাসনাবেন্দী বর্তমান আছে। প্রস্তরকলকে লিখিত আছে,—“হিজরী ৯৯০ সালে মহম্মদ আল্ খলিদির পুত্র মক্হুম শেখ নামক সাধুপুরুষ কর্তৃক এই কুতবশাহী মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।”‡ হিজরী ৯৯৩ সালে (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) তোরণ দ্বার নির্মিত হইবার কথা আর একখানি প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে। মেজর ফ্রাঙ্কলিন হিজরী ৮৮৫ সালে এই মসজিদ সুলতান বার্কক

* If it was he, who made the tank, then the probability is increased that the baths were made by his ancestor, for he would naturally revert to the palace of his forefathers. বিভারিঙ্গ সাহেবের এই উক্তি অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। কারণ,—নাসিরুদ্দীন পাণ্ডুর রাজপ্রাসাদে বাস করেন নাই, এবং প্রথমে মনাপার পরে সরোবর—ইহাও অসঙ্গত কথা।

† North of Qutabs' house stands a small but beautiful Mosque, called the Sona Musjid, or Golden Mosque, built throughout of horneblende.—Ravenshaw's Gour, p. 56.

‡ The foundation of this mosque was laid by the Honourable and Venerable Mukhdum Shaikh, son of Mahammad Al-Khalidi, honoured in all places, pole-star of the pole-stars, and source of rectitude. May

শাহের পুত্র সুলতান ইউসুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত হইবার কথা একখানি প্রস্তরফলকে পাঠ করিয়া গিয়াছিলেন। সে ফলক দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমান ফলকে ইহা “কুতবশাহী” বলিয়া উল্লিখিত আছে; তোরণ দ্বারের ফলকলিপিতে মক্হুম শেখ আপনাকে কুতব শাহার দাসামুদাস বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয়,—এই মসজিদ প্রাচীন; মক্হুম শাহ তাহা পুনর্গঠিত করিয়া, তোরণদ্বার নির্মিত করিয়া থাকিবেন।

মক্হুম শেখের নাম মালদহ অঞ্চলে “রাজা বিয়াবাণী” নামে পরিচিত। ইলাহিবক্স তাঁহার সুপরিচিত নামেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সাধুপুরুষ “অরণ্যের সম্রাট” বলিয়া কথিত হইতেন। জনসমাজে তাঁহার সম্মান প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। দিল্লীখ্বর ফিরোজ শাহ যখন পাণ্ডুর অবরোধ করেন, সেই সময়ে (১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে) এই সাধুপুরুষের দেহান্তর সংঘটিত হয়। গোড়েশ্বর তখন শত্রুবেষ্টিত একডালা হুর্গে পিঞ্জরাবদ্ধ বর্ণশার্দিুলের স্থায় গতিহীন। তাঁহার ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মক্হুম শেখের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিবার কথা গোলাম হোসেনের ইতিহাসে লিখিত আছে। কোথায় এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধিত হইয়াছিল,—কোথায় এই সাধুপুরুষের মৃতদেহ সমাধিনিহিত হইয়াছিল,—তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি জ্ঞাতব্য কথা। এই সময়ে গোড়েশ্বর একডালা হুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন। তিনি তথা হইতেই গোপনে ছদ্মবেশে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন, এবং দিল্লীখ্বর সংবাদ পাইবার পূর্বেই ছদ্মবেশে হুর্গমধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কাহিনী পাঠ করিলে, একডালা হুর্গকে পাণ্ডুর নিকটবর্তী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু একডালার হুর্গ কোথায় ছিল, তাহা লইয়া তর্ক বিতর্কের সূত্রপাত হইয়াছে। কেহ তাহাকে দিনাজপুরে, কেহ বা সুবর্ণগ্রামের নিকটে আবিষ্কৃত করিয়াছেন বলিয়া কোলাহল করিতেছেন! ইলাহিবক্সের হস্তলিখিত ইতিহাসে ইহার রহস্য উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা

God extend the shadow of his property. This mosque is the Qutabshahi and its date is “Mukhdum Ubed Raji, A.H. 990.”—ফলকলিপির অনুবাদ।

ছিল। কিন্তু তিনি লিখিবেন বলিয়া লিখিয়া যাইতে পারেন নাই,—তাহার জন্ত গ্রন্থমধ্যে অলিখিত পৃষ্ঠা পড়িয়া রহিয়াছে! তিনি কেবল এই পর্য্যন্তই লিখিয়া গিয়াছেন,—“যেখানে মক্কা শেখের সমাধি, তাহা সাধুপুরুষদিগের সাধারণ সমাধি স্থান বলিয়া পৃথক্ ভাবে নির্দিষ্ট ছিল। সে মহম্মার মাম—দেবটোলা।” এই স্থান কোথায় ছিল, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। যেখানেই হউক, তাহা যে পাণ্ডুর নিকটবর্তী, ইলাহিবজের লিখনভঙ্গী তাহা সুব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে ধর্মবিস্তার করা মুসলমানদিগের প্রচলিত রীতি বলিয়া সুপরিচিত। তজ্জন্ত প্রাচীন দেব-মন্দিরের সান্নিধ্যে মসজিদ বা সমাধিমন্দির রচনা করাও সেকালে একটি প্রচলিত রীতি হইয়া উঠিয়াছিল। দেবটোলার সাধুপুরুষদিগের সমাধিস্থান নির্দিষ্ট থাকিবার কথা পাঠ করিলে, তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণ্ডুর নিকটবর্তী স্থান সমূহের পুরাতন নাম কিরূপ ছিল, কেহ তাহার তথ্যাবিধারে কৃতকার্য হইলে, দৃশ্যমান অট্টালিকাদির ইষ্টকপ্রস্তর মুখরিত হইয়া উঠিবে—তাহারা বিবিধ বিলুপ্ত কাহিনীর সন্ধান প্রদান করিবে,—যাহা নাই, তাহার কথা, যাহা আছে, তাহাকে হয় ত নিস্ত্রস্ত করিয়া ফেলিবে! ভবিষ্যতের পর্য্যটকগণ কেবল কোতূহল চরিতার্থের জন্ত শ্রম স্বীকার না করিয়া, এই সকল বিষয়ের তথ্যাসন্ধান প্রবৃত্ত হইলে, প্রবন্ধরচনার সকল প্রয়াস চরিতার্থ হইবে। ইতি।

শ্রীঅক্ষরকুমার মৈত্রেয়।

ভেরা সেজোনোভা।

মার্কিন দেশের একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক—মিঃ লিরয় স্কট রুস সাত্রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাইবার জন্ত বহুকাল সেখানে বাস করিয়াছিলেন; এবং রুসিয়ার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি রুস সাত্রাজ্যের বৈপ্লবিক দল ভুক্তা এক বীররমণীর শিষ্যমুখ হইতে তাহার ক্ষুদ্র জীবনটীর যে ইতিহাস জ্ঞাত

হইতে পারিয়াছিলেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম তাহার প্রবন্ধ হইতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পাঠকের কাছে উপস্থিত করিব। এই তেজস্বিনী রমণীর ভেরা সেজোনোভা (Vera Sagonova)। এই অষ্টাদশ বয়ী বালিকার জীবনের একমাত্র ব্রত—তাঁহার নিপীড়িত অসহায় স্বদেশবাসীর অশেষ দুঃখ মোচন।

একদা রাজিকালে ভেরার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে আমরা উভয়ে এবং তাঁহার একমাত্র সঙ্গিনী বাসিয়াছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে ভেরা তাঁহার জীবনের অপূর্ণ কাহিনী শাস্ত্র মূহুরে, প্রকাশ করিলেন।

আমি একজন ইহুদী বালিকা, আমার পিতা কোনো এক সুবৃহৎ প্রাদেশিক নগরীতে সৈনিক বিভাগের নিম্ন পদস্থ চিকিৎসক। তাহার মত কর্ম্মঠ, বিচক্ষণ চিকিৎসক অতি বিরল। তুরস্ক সমরে চিকিৎসা নৈপুণ্যের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার বক্ষ আজও পদক মালো সুশোভিত; কিন্তু তবুও আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনো পদোন্নতি হইল না। এদিকে অজ্ঞাতশত্রু, নিকোথ, অলস, চরিত্রহীন কত যুবক উচ্চপদে উন্নীত হইতেছে কিন্তু পলিতকেশ, জ্ঞানী, পারদর্শী পিতৃদেবকে আজও সামান্ত ‘ছোকরা’ কর্ম্মচারীদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিতে হইতেছে। শৈশবে আমি অনেক সময় ইহার কারণ কি জানিবার জন্ত উৎসুক হইতাম কিন্তু ঠিক হেতুটা খুঁজিয়া পাইতাম না।

দশ বৎসর বয়সে আমি স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কালেজে (Gymnasium) প্রবেশ করিবার জন্ত চেষ্টা করি। যদিও আমি স্কুলের পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলাম, তথাপি কালেজের কর্তৃপক্ষ, যথেষ্ট অপূর্ণ স্থান থাকা স্বত্বেও আমাকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন না। এখন আমি পিতার অহুন্নতির কারণ বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। আমাদের উভয়েরই এই প্রকারে বঞ্চিত হইবার হেতু আমাদের ইহুদি জাতীয়তা।

যাহা হউক, তিন মাস অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া কালেজের কর্তৃপক্ষকে ঘুঁস দিয়া ও নানা উপায়ে অবশেষে পিতা আমাকে কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিছু দিন পরে আমার ধনসম্পত্তিশালিনী মুসলিমাতা-ঠাকুরাণী তাঁহার সঙ্গে বাস করার জন্ত আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে

লাগিলেন এবং অল্পমতির জন্ত আমার পিতামাতাকে নিতান্ত ধরিয়া পড়িলেন। এই পতিহীনা, নিঃসন্তান, মাসিমাতার অতুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিনী আমি! আমি ষোল বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াছিলাম।

সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে তাঁহার বহুসংখ্যক বন্ধু ছিল ইহাদিগকে আপ্যায়িত রাখিবার মতলবে মাঝে মাঝে অত্যন্ত সমারোহে পান-ভোজনাদির ব্যবস্থা করা হইত। এই সকল কারণে রাজকর্মচারীর অল্পগ্রহ প্রাপ্ত ধনীর ছায় আমিও এতদিন সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক অত্যাচার, অবিচার হইতে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত ছিলাম। সেই-হেতু রুসিয়ার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমার ধারণা একজন বিদেশীর অপেক্ষা কিছুমাত্র বেশী ছিল না। “সম্রাট সর্কে-সর্কা—তাঁহার আদেশ ভ্রমপ্রমাদের অতীত, তাঁহার বিধানই ঈশ্বরের বিধান” বাল্যকাল হইতে ইহাই আমাকে শেখান হইয়াছিল এবং এই বিশ্বাস প্রজাপুঞ্জের মনে বদ্ধমূল করিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্রের সর্বত্রই গভর্মেন্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানার্জনের স্পৃহা আমার বলবতী ছিল। ষোল বৎসর বয়সে নিয়শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া St. Petersburg বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলাম।

এখানে আমি আমার মাসিমার বিশেষ বন্ধু—একজন সেনাপতির সহধর্মিণীর সঙ্গে থাকিতাম। এখানেও মাঝে মাঝে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদিগকে লইয়া পান, ভোজন, নৃত্যগীতাদির বিরাট আয়োজন হইত। আমি অল্প বয়স্ক-বালিকা হইলেও মাসিমাতার অমুরোধে বাধ্য হইয়া আমাকে এই উচ্চ জ্ঞাত কর্মচারীদিগের সংসর্গে মিশিতে হইত।

সেনাপতির গৃহে নানাপ্রকার উৎসবদিগের আয়োজন প্রভৃতির অমুঠানে আমার অবসরটুকু এমন করিয়াই গ্রাস করিয়াছিল যে ছুঁতিন মাস পর্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম-পাঠিনীদের সঙ্গে একটু মিশিবার ও পরিচিত হইবারও কোনো অবকাশ পাই নাই। একদিন কালেজে যাইবার পথে, নেভা নদী পার হইবার গন্তব্য এক অপূর্ণ-দৃশ্য আমার হৃদয় মনকে আকৃষ্ট করিল। আমি দেখিলাম ইউনিভার্সিটির

বহুসংখ্যক যুবক যুবতী হস্তে রক্তবর্ণ পতাকা ধারণ করিয়া সঙ্গীত করিতে করিতে নানাতীরাত্মিতে আসিতেছেন—কালেজের প্রাঙ্গণ হইতে নান্দা নদীতীর পর্যন্ত এমন এক বিরাট জনপ্রয়াণের কোনো অর্থ আমি ভাবিয়া পাইলাম না, কারণ সৈনিকদল ব্যতীত কোনো জনতার সৃষ্টি করা রুসিয়ার আইনের বিরুদ্ধ কার্য। আমি নির্বাক নিশ্চল হইয়া এই অভিনব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম; ক্রমে জন-প্রয়াণের নেতাগণ আমাব কাছ দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল উৎসাহের পবিত্র দীপ্তিতে উজ্জ্বল, এবং তাঁহাদের উচ্চ কণ্ঠ হইতে মাতৃভূমির বন্দনাগীতি আকাশকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। জনতার ভিতরে আমি আমার এক পরিচিতা সহপাঠিনীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। ইনিই আমার সঙ্গিনী সোনিয়া, সেই অবধি আমরা উভয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বহুত্রে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। আমি উচ্চস্বরে সোনিয়াকে এই উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন “তুমি তা জান না?”

এ যে demonstration অর্থাৎ উদ্দেবারণ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম demonstrationএর অর্থ কি? সোনিয়া বলিলেন “ইহা গভর্মেন্টের যথেষ্টাচারের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত তীব্র প্রতি-বাদের একটা উপায়। “আমরা এই সমবেত ছাত্রমণ্ডলী বিশ্বাস করি, তোমরা রুসিয়ার নিরস্ত্র অসহায় প্রজাবৃন্দের হুগতিসাধন করিতেছ। এই ত আমরা নিরস্ত্র তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান তোমরা অনায়াসে আমাদের বিনাশ করিয়া ফেলিতে পার কিন্তু আমাদের দৃঢ় মত ও বিশ্বাসকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিবে না।” এই বৃহৎ জনসংখ্যক রুসিয়ার গভর্মেন্টকে ইহাই বলিতেছে।

চতুর্দিকের এই গভীর উত্তেজনা ও ভাবশ্রোত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিল—আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া প্রিয়তমা সোনিয়ার পথ অনুসরণ করিলাম।

ক্রমে এই বিপুল জনসংখ্যক নেতানদী উত্তীর্ণ হইয়া সম্রাটের রক্তবর্ণ শ্রীতনিবাস প্রাসাদের নিকট দিয়া একটা বিস্তীর্ণ খোলা ময়দানের সম্মুখে উপনীত হইল। কিছু দিন পরে এই স্থলে Father Gapon কর্তৃক পরিচালিত সহস্র

সহস্র শ্রমজীবীকে অকারণে হত্যা করা হইয়াছিল। বিপুল জনসমাগম ধীরে ধীরে সেন্টপিটার্সবার্গের প্রধান প্রধান রাজপথ বাহিয়া চলিতে লাগিল।

অকস্মাৎ একদল অশ্বারোহী কশাক্ সৈন্য ভীষণ চাবুক ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং অজস্র গালিবর্ষণ ও চীৎকার করিতে করিতে আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল এবং সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে যেখানে যাহাকে পাইল নৃশংসরূপে কশাবাত করিতে লাগিল। আমাদের হত্যা করিবার নিমিত্ত ইহারা বন্দুক, পিস্তল, তরবারী ইত্যাদিতে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছে। তপ্ত-গোহশলাকার স্তায় তীব্র কশাবাত মুহূর্মুহু আমাদের সর্বদিকে পড়িতে লাগিল; হুর্কৃত কশাক্ সৈন্যগণের অশ্রাব্য গালিবর্ষণ, রক্তকলেবর ছাত্র ছাত্রীগণের আকুল ক্রন্দন, ও চাবুকের তীব্র ঘন ঘন শব্দ চতুর্দিক পরিপূর্ণ করিয়া এমন এক ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল যে আমি তাহা আজ মনে করিতেও শিহরিয়া উঠিতেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে মেডিক্যাল কলেজের একজন যুবতীর চিবুক দারুণ কশাবাতে একেবারে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আমার অতি নিকট হইতে একজন কশাক্ এই রক্তাক্তকলেবরা যুবতীর মস্তকোপরি এমন দারুণ আঘাত করিল যে যুবতী তৎক্ষণাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। যুবতীর প্রেমাস্পদ একজন সঙ্গী যুবক তৎক্ষণাৎ কশাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলে কশাক্ ভূমিতে পড়িয়া গেল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই অপর এক কশাকের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্ত যুবককে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল কিন্তু হায়, অতি অল্প কাল মধ্যে যুবকও তাহার প্রেমসী মৃতা বাণিকার পার্শ্বে শায়িত হইলেন।

বৃহৎ জনশ্রোতের সর্বত্রই এইরূপ হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। নিরস্ত্র, অসহায়, আমরা—অসুধারী দুর্দান্ত কশাকের সম্মুখে কি করিয়া তিষ্ঠিতে পারিব? কাজেই আমাদের পলায়ন করিতে হইল। একজন কশাক সেনাপতি আমাদের লক্ষ্য করিয়া চাবুক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের তেমন বিশেষ আঘাত করিতে পারে নাই। কশাকদের ভিতর হইতে কোনোমতে উদ্ধার পাইয়া আমি একটা গলির ভিতর লুকাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেখানেও আমাদের হত্যা করিবার জন্ত একদল House

Porter অর্থাৎ দ্বারবান রাখা হইয়াছিল। আপনি বোধ হয় জানেন গভর্ণমেন্ট এই দ্বারবানদিগকে জোর করিয়া এই প্রকার কার্যে বাধ্য করিয়াছে এবং কশাকদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত ইহারা স্থানে স্থানে রক্ষিত হইতেছে। আমার বিশেষ ভাবে স্মরণ হইতেছে—এক দীর্ঘকায় কৃষ্ণ-শ্রম ভীষণ মূর্ত্তি পোর্টার আমাদের তাড়া করিয়া আসিয়াছিল। আমি প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম কিন্তু ইহার হাত এড়াইতে পারিলাম না। তাহার লাঠি আমার মস্তকের উপর পড়িল—আমি অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলাম। তারপর কি হইল, আমার আর স্মরণ নাই।

সেই দিন হইতেই আমি উৎসাহী আন্দোলনকারী ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত। একটু সুস্থ হইলেই আমি সেনা-পতির গৃহ ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গিনী সোনিয়ার সঙ্গে একটা ঘর ভাড়া করিলাম এবং সেই অবধি আমরা উভয়ে একত্রে বাস করিতেছি।

সেনাপতির গৃহ ত্যাগ করিয়া আমি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এতদিন আমি ছাত্রদের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে পারিনাই। এখন ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন এক নবজন্মলাভ করিলাম। নবজীবনের আশ্বাদনে আমার হৃদয় মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; কোনো প্রকার স্বার্থচিন্তা, মৃত্যু-ভয়, হুঃখশোক, আমার হৃদয়কে স্পর্শও করিতে পারিল না।

আমি আমার কর্তব্য পথ স্থির করিয়া লইলাম। নির-ক্ষর হতভাগ্য প্রজাদিগকে শিক্ষিত করিবার ও তাহাদের কাছে স্বদেশহিতের মঙ্গলমন্ত্র প্রচার করিবার সংকল্প লইয়া আমি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। কিন্তু আমাদের আরো কিছু অধ্যয়ন ও প্রচারকার্য শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিভিন্ন দেশের অবস্থা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ করিতে লাগিলাম।

সেন্ট-পিটার্সবার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য ৩০,০০০ হাজার ছাত্রছাত্রী আছেন অত্যন্ত সহরের বিখ্যাতশুল্কিত ও ছাত্রসংখ্যা ইহাপেক্ষা ন্যূন নহে। এই শিক্ষার্থী যুবক যুবতীর অধিকাংশই নিজের সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া থাকেন। এই আত্মনির্ভরশীল শিক্ষার্থীদের কথা স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দে, আশায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অর্ধেক

ছাত্র একেবারেই নিঃশব্দ; অন্ধভুক্ত থাকিয়া জীবন বাপন করিতেছে কেহ বা পথের ভিখারী বা ভিখারিণী !

বিপৎপাতের সম্ভাবনার প্রতি অক্ষিপ মাত্র না করিয়া ইহার কল্প নির্ভয়ে, প্রফুল্লচিত্তে রাজিকালে গোপনে বহুসংখ্যক গুপ্তচরের দৃষ্টি এড়াইয়া শ্রমজীবী ও নবাগত সৈনিকদিগের নিকট দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা প্রচার করেন তা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বৎসরের শেষভাগে আমি বাড়ীতে আসিয়া আমাদের আন্দোলনের বিষয় আমার মা ও মাসিকাকে বলিতেই তাঁহারা ভয়াকুল কর্তে চিৎকার করিয়া উঠিলেন “কি ? তুই তবে ভীষণ বৈপ্লবিকদিগের দলভুক্ত হয়েছিস্ ! তুই ত আমাদের বিনাশ করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিস্ !”

আমি বলিলাম—“তোমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্ত নহে। এই রুসিয়ার হতভাগ্য প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্তই আমাদের চেষ্টা”।

আমার মাসিমা তীব্র স্বরে বলিতে লাগিলেন “রুসিয়ার হতভাগ্যদের হৃৎক্ষেত্রে তোর কি আসে যায়। তোর ত যথেষ্ট স্বপ্ন, সচ্ছন্দতা, মান, সম্মান, ধনজন রহিয়াছে—এতেই দিব্য স্বপ্নে, আশ্রমে, আনন্দে থাকিতে পারিবি।”

আমি তর্ক করিয়া দেশের শোচনীয় অবস্থা ও আমাদের কর্তব্য কি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম—কিন্তু ইহার আমার কথা কানেও নিলেন না। আমার পুজনীয় পিতৃদেব আমাকে কিছুই বলিলেন না—সুধু তাঁহার শাস্ত সুনীল ছটি চক্ষু একদৃষ্টে আমার মুখ পানে চাহিয়া যেন তাহার হৃদয়ের নীরব সহানুভূতি জানাইতে লাগিল।

অবশেষে আমার মাসিমাতা অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে ভয় দেখাইলেন যে যদি আমি বিপদজনক সংসর্গ ত্যাগ না করি, তবে তিনি যে আমাকে প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া যাইবেন এই মনস্থ করিয়াছিলেন। তাহার এক কপর্দকও আমি পাইব না; সুধু তাহাই নয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমার শিক্ষার ব্যয়ভারও তিনি আর বহন করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি কিছুতেই দমিলাম না। মাসিমা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন অতএব সেই সাত্রেই আমাকে মাসিমার গৃহ ত্যাগ করিতে হইল।

* * সমস্ত গ্রীষ্মাবকাশটা পিতা মাতার কাছে

কাটিইলাম। সর্বদাই আমার মা আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন ও আমি কুপথে চলিয়াছি বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু পিতৃদেব কি করিতেন! মাঝে মাঝে শ্রমজীবীদের আড্ডায় প্রচার কার্যে অথবা সমব্রতীদিগের সভায় উপস্থিত থাকার দরুণ আমাকে অনেক রাজি পুৰ্য্যস্ত বাহিরে থাকিতে হইত, এবং যখন আমি গৃহে ফিরিতাম তখন সমস্ত গৃহ অন্ধকারে পরিপূর্ণ, সকলেই নিদ্রিত, কিন্তু আমার পিতা জাগিয়া থাকিতেন। যতই দেয়ী করিয়া আসিতাম না কেন পিতা একখানি প্রদীপ হস্তে আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেন। আলো জালিয়া আমাকে আমার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটীতে পৌছাইয়া দিয়া লগাটে চুম্বন করিয়া আস্তে আস্তে নিজের শয়নগারে যাইতেন। কোনো দিন আমাকে একটা প্রশ্ন করেন নাই; কোনো দিন তিরস্কার করেন নাই। পিতার কোমল হৃদয় আমার কর্মে, ও উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণই সায় দিত, তাঁহার নীরব সহানুভূতি আমার হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ, আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিত।

মাসিমা আমার খরচ বন্ধ করিলেন। বাবা তাঁহার স্বপ্ন কায় হইতে সংসারের সমস্ত খরচ পত্র চালাইয়া আমাকে কিছু দিতে পারিতেন না। তবু আমি সেন্টপিটার্সবার্গে ফিরিয়া আসিয়া সোনিয়ার সঙ্গে একখানি ছোট ঘর ভাড়া করিলাম। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীগণ যখন আপন আপন ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে তখন আমি কেন তাহা পারিব না? আমি একটা ছাত্রীকে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করিয়া ক্রেঞ্চ শিখাইবার ভার লইলাম; ইহার জন্ত ছাত্রীটি আমাকে মাসিক ১৫ রুবল করিয়া (অর্থাৎ ২৫ টাকা) দিতেন। এখনও আমাকে একটা ছাত্রী পড়াইতে হয় তিনিও আমাকে মাসিক ১৫ রুবল দিতেছেন। ইহাতে আমার সমস্ত খরচ পত্র বিনা কষ্টে চলিয়া যায়; এবং ইহা হইতে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে আমি কিছু অর্থ সাহায্য করি। আমাদের দলস্থ প্রত্যেক সভ্যকেই ইহার জন্ত টাকা দিতে হয়।

সমস্ত শীতকালটা আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। আমার ছাত্রীটি সহরের এক সুদূরপ্রান্তে থাকিতেন; কাজেই আমাকে প্রতিদিন এই সুদীর্ঘ পথ হাঁটিয়া যাওয়া

আসা করিতে হইত। আমার কালেক্টরের পড়ারও তখন যথেষ্ট চাপ ছিল; তা ছাড়া আমি বাহিরের অনেক বই পাঠ করিতে চেষ্টা করিতাম এবং আমার অত্যন্ত বন্ধুদের জায় আমি ক্ষুদ্র একটা শ্রমজীবীদের মণ্ডলীর শিক্ষার ভার লইয়াছিলাম। কাজেই রাত্রি চুই ঘটিকার পূর্বে আমি বিশ্রাম পাইতাম না।

শীতের শেষভাগে এক হত্যাকাণ্ড গভর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রমাণ করিয়া যেনুতন এক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমি তাহা পাঠ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলাম অবশ্য এই সকল গ্রন্থ বেআইনী (illegal) বলিয়া খ্যাত। একদিন অপরাহ্নে এই গ্রন্থখানি ক্রয় করিবার জন্য সহরের এক বৃহৎ পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলাম। এই দোকানে আইন বিরুদ্ধ গ্রন্থাদির গোপনে বিক্রয় হইত। দোকানে বহুসংখ্যক ক্রেতার মধ্যে তিনটা যুবতীও অপেক্ষা করিতেছিলেন; আমিও চুকিয়া অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ একদল কোতোয়াল (Gendarmes—the Political Police) দোকানে প্রবেশ করিল এবং একজন রাজকর্মচারী ঘোষণা করিলেন যে গভর্ণমেন্টের হুকুম অনুসারে এই দোকানখানি বাজেয়াপ্ত এবং দোকানস্থ ক্রেতাগণকেও ধৃত করা হইতেছে। ক্রেতা-বিক্রেতাগণ, কেরাণী ও ম্যানেজার প্রভৃতি সকলেই কারাগারে নীত হইলেন। আমরা চারিটা যুবতী একটা বৃহৎ কক্ষে আবদ্ধ হইলাম; সেখানে আরও দশটা যুবতী ছিলেন। সর্বশুদ্ধ আমরা এই ১৪টা প্রাণী এই একটা কক্ষের ভিতর বাস করিতে লাগিলাম। আপনাদের বোধ হয় অবিস্মৃত নাই যে কলিকাতার কারাগারগুলি রাজদ্রোহাভিযুক্ত আসামীতে একেবারে পরিপূর্ণ। আসামীদের একটু বিশ্রাম করিবার কি শয়ন করিবার একটু স্থান পর্য্যন্ত নাই। এমন কি রাজনৈতিক আন্দোলনকারী আসামীদের জন্য স্থান করিবার নিমিত্ত চোর, ডাকাত প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে।

চৌদ্দটা যুবতীর মধ্যে একটা ব্যতীত আমরা সকলেই বৈশ্বাসিক দলভুক্ত।

আমরা কি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছি তাহা আমাদের জানান হইল না এবং কোনো প্রকার বিচারও করা হইল না। ইতিমধ্যে দোকানের স্বত্বাধিকারী তাহার দুইজন

সহকারী কর্মচারীসহ সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত হইলেন; কিছুদিন পরেই আমাদের মধ্যে হইতে পাঁচটা যুবতীকেও সাইবিরিয়ায় প্রেরণ করা হইল।

আমার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করিয়া কিছুই পাওয়া গেলনা, অতএব জুন মাসের প্রথমভাগে আমি কারাগার হইতে অব্যাহতি পাইলাম। বহুসংখ্যক নরনারীব জায় আমিও এই গ্রীষ্মকালটা নিরক্ষর কৃষকদিগকে শিক্ষিত করার ও তাহাদের নিকট দেশের দুর্গতি জানাইয়া উদ্বোধিত করিবার কর্তব্য গ্রহণ করিলাম। আপনি জানেন আমাদের বহু কোটা কৃষক এক সহস্র হইতে পাঁচ সহস্র পর্য্যন্ত এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে।

গ্রামগুলির দৃশ্য দেখিলেই ইহাদের দারিদ্র্য কিছু অল্পভব করা যায়; ইহারা অরণ্য হইতে সংগৃহীত কাষ্ঠ দ্বারা কুটীরের দেয়াল প্রস্তুত করিয়া ও তৃণাদি দ্বারা চাল নির্মাণ করিয়া কোনো প্রকারে মাথা রাখিবার একটা আশ্রয় রচনা করে। অধিকাংশ গ্রাম নিকটবর্তি বেলের রাস্তা হইতে ২৫, ৫০, ১০০ মাইল, এমন কি ৫০০ মাইল দূরে; কোনো প্রকার যাতায়াতের সুবিধা নাই। সমস্ত পৃথিবীর সহিত যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া এই হতভাগ্য কৃষকদের এই গ্রামগুলিতেই বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

কৃষকদের কাছে পৌছিতে ও তাহাদিগকে লইয়া কোনো কাজ করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে; কারণ গভর্ণমেন্ট লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া নগরের উদ্ভেজনা যাহাতে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া না পড়ে তৎক্ষণাৎ যথেষ্ট সার্বধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। একবার কোনো প্রকারে ধৃত হইলেই তৎক্ষণাৎ সাইবিরিয়ায় প্রাপ্তে নির্বাসিত হইতে হইবে। আমার আর একটা বিপদের সম্ভাবনা ছিল—কলিকাতার ধর্মসম্প্রদায়গুলি ইহুদীদিগকে ঘৃণা করিতে আমাদের কৃষকদিগকে বরাবর শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন; অনেক উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক মুক্তকণ্ঠে সর্বসাধারণ সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন যে ইহুদী-হত্যা খুব পবিত্র কর্ম উহাতে কোনোই পাপ হয় না বরং ঈশ্বর ইহাতে প্রীত হন। আমার বন্ধুগণ আমাকে বলিলেন “ভেয়া, যদি কৃষকেরা ঘৃণাভাজন ও জানিতে পারে যে তুমি ইহুদীবৎসী, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে হত্যা করিয়া

ফেলিতেও পারে। অতএব তোমার একখানি ক্রশ ধারণ করা কর্তব্য।” কিন্তু ক্রশ ধারণ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব—কারণ ইহা দ্বারা সত্যের অপলাপ করা হইবে, আমি তাহা কিছুতেই পারিব না।

যাহা হউক, আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া বাহির হইলাম।

সহর হইতে বহুদূরস্থ কোলাহলশূন্য জীর্ণ একখানি গ্রামে উপনীত হইলাম। আমি প্রথমে অবশ্য একটু ভীত হইয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমশঃ আমাকে যেন সন্নিহিত বাস্তবায়িকা পরম আরাধ্যা দেবীর স্তায় গ্রহণ করিতে লাগিল। আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়া কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেই রৌদ্র-তাপিত, মলিন বহুসংখ্যক রুস স্ত্রীপুরুষ তাহাদের শিশুসন্তান লইয়া অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন, জীর্ণ কুটারের প্রান্তে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। কখনও রাস্তার পার্শ্বে বা কুটারের সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দে উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের কাছে বক্তৃতা করিতাম। তাহারা নিব্বিষ্ট-চিত্তে আগ্রহসহকারে আমার কথা শুনিত। যে সকল বিষয় যথার্থ তাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহাই কেবল আমি সহজ সরলভাবে একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। আমি তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিতাম যে যতদিন তাহারা নীরব, নিস্তেজ, হইয়া রহিবে, ততদিন তাহাদের দারিদ্র্য, মূর্থতা, ও দুর্বলতা কিছুতেই ঘূচিবে না।

সমাগত জনতার মধ্যে কখন কখন ছোট্টা নিম্নপদস্থ সর্কারী কর্মচারীও উপস্থিত থাকিত এবং তাহারা আমার বক্তৃতা আরম্ভের পূর্বেই বারম্বার “এই মহিলা সম্রাটের বিরুদ্ধ পক্ষ—উহার কথা কেহ শুনিও না—উহাকে গ্রেপ্তার কর” ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিত। আমি বিনীতভাবে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সর্বপ্রথমে আমার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তৎপরে বিচার করিতে অনুরোধ করিতাম। শ্রোতৃ-বর্গ সর্বদাই আগ্রহসহকারে আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন এবং আমার পক্ষই সমর্থন করিতেন।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলে বহুসংখ্যক পুরুষ আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া বহুবিধ প্রশ্নপরিজ্ঞাসা করিত এবং আমাকে কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাহাদের বাহা উৎকৃষ্ট খাদ্য—কালো রুটি ও কফির সুপ (soup)—আমার

সম্মুখে আনিয়া দিত। মাসেব পর মাস, বছরের পর বছর ক্রমশঃ এই সামান্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে; আলু তাহাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বিলাস খাদ্য; অতি কষ্টে আমার জন্য তাহারা কোনো কোনো দিন আলু সংগ্রহ করিয়া আনিত। মাংস খাইতে পারিতাম না—কারণ ক্রমশঃ নিজেরাই কখনও মাংস আশ্বাদন করে নাই। ইহাদের অপরিমিত দারিদ্র্য স্বচক্ষে না দেখিলে অনুভব করা যায় না। অনেক গ্রামে ভ্রমণ করিতে করিতে কত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হতভাগ্যদের আকুল ক্রন্দনধ্বনি আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহা আজ স্মরণ করিতেও হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে। কত নিরাশ্রয় হুঃখিনী জননীকে ঈশ্বরের কাছে বাস্পাবরুদ্ধ কর্তে তাহাদের ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানের মৃত্যুভিক্ষা করিতে শুনিয়াছি, কত ক্ষুধিত বালক বালিকাকে হা-অন্ন, হা-অন্ন, করিয়া পথে পথে আর্জুনাদ করিতে শুনিয়াছি। দুর্ভিক্ষের এমন ভয়াবহ দৃশ্য আমি কল্পনাও করিতে পারিতাম না।

রাজিকালে তাহারা আমাকে একটা ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটারে লইয়া যাইত। অতি সংকীর্ণ রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ জন লোক বাস করে। এবাধিধ একটা কুটারে আমার মেঘ চর্মের overcoatটা কর্ম্মামুক্ত মেজের উপর বিছাইয়া কোনো প্রকারে নিদ্রিত হইতাম।

এক একটা গ্রামে আমার কাজ সমাপ্ত হইলে আমি অন্য গ্রামে যাইতাম; কোন কোন উৎসাহী ক্রমশঃ তাহাদের ক্ষুদ্র জীর্ণ অশ্ব বাহিত শব্দে আমাকে পরবর্তী গ্রামে লইয়া যাইত। অশ্বগুলিও যথেষ্ট আহাৰ না পাইয়া নিতান্ত হীনশ্রী দুর্বল ও ক্রমশঃ হইয়াছে। একদিন একখানি গ্রামে পৌঁছিতেই দেখিলাম অনেকগুলি কুটার অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছে এবং বহু সংখ্যক কসাক সৈন্য নির্দয়রূপে নিরস্ত্র গ্রামবাসীদিগকে গীড়িত করিতেছে। অল্পসন্ধান লইয়া জানিলাম বহুকাল অবধি নিকটবর্তী এক জ্ঞান সামান্য তালুকদার রুসিয়ার প্রবল পরাক্রান্ত ভূস্বামীদের অত্যাচারে এই গ্রাম-বাসীদের প্রতি অশেষ উৎপীড়ন করিতেছিল; অবশেষে কিছুদিন হইল কতিপয় অধিবাসী ইহার গৃহ দগ্ধ করিয়া দিয়াছে। আজ তাহারই দগ্ধ স্বরূপ কসাকগণ দোষী নির্দোষী নির্কিচারে গ্রামবাসীদের জীর্ণ গৃহগুলি ভস্মীভূত করিবার ও তাহাদের

নৃশংসরূপে বেত্রাঘাত করিবার অভিপ্রায়ে অকস্মাৎ এই গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে ।

আমি এই কাসাকদের কর্তৃক ধৃত হইলে ইহারা যে সহজেই আমার পরিচয় পাইবে এবং আমাকে এখানেই যে হত্যা করিবে, আমার সঙ্গী বৃদ্ধ কৃষকটাও তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কিন্তু ফিরিয়া যাইবার ত আর সময় নাই । কৃষক সূচতুর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল “সজ্ঞাস্ত মহিলা, আপনি শুইয়া পড়িয়া আপনার শাল খানিতে মুণ্ড ঢাকিয়া রাখুন কোনো শঙ্ক করিবেন না ।” কৃষক আস্তে আস্তে গ্রামে উপনীত হইলে একজন কসাক তাহাকে অশ্রাব্য গালি দিয়া গাড়ী থমাইতে বলিল ও তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল । আমি শুনিলাম কসাক বলিতেছে “কিরে আয় গাড়ীর ভিতর থেকে বাহিরে আয় ; তুই এমন করে পালাতে চেষ্টা করেছিস্ বলে তোকে সবচেয়ে বেশী বেত্রাঘাত কর্ত্তে হবে । বের হ । মজা দেখবি নিঃসহায় বৃদ্ধ কৃষক ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বলিতে লাগিল “প্রভু, আমি অন্ত গ্রাম হইতে আসিতেছি ; আমি আমার মেয়েকে ডাক্তারের কাছে লইয়া চলিতেছি । ধর্ম্মাবতার, সে বড় রুখ তাহার ছরস্ত বসন্ত রোগ হইয়াছে ।” কসাক তত্ক্ষণে গালি দিতে দিতে বলিতে লাগিল “রে গর্দভ, মূর্থ, তবে গাড়ী থামিয়েছিস্ কেন ? বা, শিগগির এ গ্রাম থেকে বের হ” এই বলিয়া নিরীহ অশ্বটীর উপর এক কশাঘাত করিল । অশ্ব বেদনা পাইয়া তীরবেগে ছুটিতে ছুটিতে গ্রাম পার হইয়া আসিল । গ্রামের মধ্য দিয়া আসিবার সময় উৎপীড়িত নরনারীর আকুল ক্রন্দনধ্বনি আমার হৃদয়কে

স্পর্শ করিল আমি তাহাদের জন্ত কিছু করিতে পারিলাম না—শুধু সেই সর্বগ্রাসী বক্ষিপ্ৰধূমিত, অশানে পরিণত গ্রামটীর ছরবস্থা দেখিয়া ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিলাম ।

এই ভাবে সমস্ত গ্রীষ্মকালটা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচার কার্যে ব্যাপৃত ছিলাম । সর্বশুদ্ধ গ্রাম দেড় শত গ্রাম পরিদর্শন করিতে পারিয়াছিলাম, আমার নিরঙ্কর কৃষক ভ্রাতা ভগিনীদের কাছে যথাসাধ্য দেশের ছরবস্থা ও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি । বর্ষের অশিক্ষিত কৃষকদের কাছে আমি যেমন সরল, উদার ব্যবহার পাইয়াছি, আমার জীবনে তাহা কোনোদিন সন্তোষ

করি নাই, ইহা যে কেবল আমিই অনুভব করিয়াছি, এমত নহে, যে সকল যুবক যুবতী এই কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহারা সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন ।

শরৎ কালের প্রথম ভাগে আমাদের কালেজ খুলিলে আমি দ্বিগুণতর উৎসাহের সঙ্গে সৈনিকদিগের মধ্যে প্রচার কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম ।

সৈনিকগণ প্রচারিকাদের কত ভক্তি করে, তাহাদের সমস্ত প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কত চেষ্টা করে, আমি তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি । কিছু দিন পূর্বে আমার দুইটা বন্ধু ব্যারাকে এক সভার আয়োজন করিলে আমি সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম । সেখানে বহু সৈন্য মিলিত হইয়াছিলেন তাহারা আমাকে ভোজনাগারের প্রশস্ত গৃহে এক টেবিলের উপর দাঁড় করাইয়া আমার চতুর্দিক বিরিয়া দাঁড়াইলেন । উৎসাহী স্বদেশানুরাগী শতধিক সৈনিকের সম্মুখে আমি প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিলাম ; আমার বক্তৃতায় চতুর্দিকে যখন গভীর উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে, এমন সময় অকস্মাৎ গৃহ প্রবেশ দ্বার হইতে হুকুম আসিল “উহাকে গ্রেপ্তার কর ।” আমরা চমকিয়া উঠিলাম । আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম দরজার পাশে আমার পরিচিত একজন যুবা রাজকর্ম্মচারী প্রিন্স ম—দণ্ডায়মান ।—তিনি ভ্রমবশতঃ কতগুলি সংকারী কাগজ-পত্র ব্যারাকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে রাত্রিকালে পুনরায় আফিসে আসিতে হইয়াছে ; এবং সেখান হইতে ভোজনাগারে এক অপরিচিত নারী-কণ্ঠ শুনিতে পাইয়া একবার পীরদর্শন করিতে আসিয়াছেন ।

আমি দোড়াইয়া পলাইবার উদ্দেশ্যে টেবিল হইতে তাড়া তাড়ি লাফাইয়া পড়িলাম ; কিন্তু সে চেষ্টা নিতান্তই বৃথা । আমি নীচে নামিতেই দুইজন সৈনিক আমার দুই হাত ধরিয়া ফেলিল এবং আমি বুঝিতে পারিলাম আমার শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে ; এমনি সময় কে যেন আমার কানের কাছে আস্তে আস্তে বলিয়া গেলেন “আপনি পলাইবার কোনো চেষ্টা করিবেন না—কোনো কথাবার্ত্তাও বলিবেন না” আমি ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম যে আমার বন্ধু দুইটাই আমাকে ধরিয়াছিলেন । আমরা প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইলে কর্ম্মচারী আমাকে কারাগারে (Barrack

prison) লইয়া যাইবার হুকুম দিলেন। আমাকে যাহাতে প্রিন্স ম—চিনিতে না পাবে সেই জন্ত আমি আমার মুখ ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম আমি ও আমার বন্ধু দুইটা ববফাছাদিত অন্ধকার রজনীর ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে কাবাগারাভিমুখে চলিতেছি;—কিছু দূর আসিতেই তাহারা আমার হাত যুক্ত করিয়া বলিলেন “পালাও”। আমি তীরবেগে ছুটিয়া রাজ পথে আসিয়া পৌছিলাম। কিছুক্ষণ দিশা-হারা হইয়া রাজ পথে ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে বাড়ী পৌছিলাম।

অতি অল্প কাল মধ্যেই আমাব গৃহদ্বারে লোকের সাড়া পাইলাম। দ্বার খুলিয়া দেখি আমার সৈনিক-বন্ধুরদের আত্মীয় একজন সৈনিক আমাকে অভিবাদন করিয়া জানাইলেন যে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়ার অপবাধে তাহাব বন্ধু দুইটা ধৃত হইয়াছেন এবং তাঁহাবাই ইহাকে আমাব কাছে পাঠাইয়া এই সংবাদ জানাইতে ও কিছুতেই আমাব নাম পরিচয় প্রকাশ পাইবে না এই কথা জানাইয়া আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়াছেন। আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “তবে উহাদের সম্পর্কে গুরুতব কিছু ঘটবার সম্ভাবনা আছে নাকি?” সৈনিক উত্তর কবিল “হাঁ, তাহা দেব গুলি কবা হইবে।” আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িলাম। সৈনিকটা চলিয়া গেলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া নানা প্রকার চিন্তা আমার হৃদয় মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি ভাবিলাম আমাব সামান্য একটা জীবনকে বাঁচাইবাব জন্ত আমি কখনও এই দুইটা সাহসী স্বদেশ-প্রেমিক, সৈনিককে প্রাণ বিসর্জন করিতে দিব না। ইহাদিগকে বক্ষা করিতে আমি সেই মুহূর্ত্তেই ছুটিলাম।

সমস্ত প্রকার সন্দেহের হাত হইতে এড়াইবাব নিমিত্ত মাসিমাতার উপহাব সর্বোৎকৃষ্ট বহুমূল্য গোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আমি প্রিন্স ম—এব কাছে যাইবাব জন্ত প্রস্তুত হইলাম। তুষাবাবৃত রাজপথ বাহিয়া রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় প্রাসাদে উপনীত হইলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম প্রথমে ভৃত্যদের আগাইয়া পৰ্ব তাহাদের সাহায্যে প্রিন্সের কাছে পৌছিতে হইবে; কিন্তু ভৃত্যগণ নিদ্রিত ছিল না; আমি পৌছিতেই তাহারা আমাকে একটা

উজ্জ্বললোক মণ্ডিত সুসজ্জিত ভোজনাগারে লইয়া গেল। আমি দেখিলাম বিস্তীর্ণ টেবিলের এক পার্শ্বে প্রিন্স ও অন্ত তিনটা যুবা রাজকর্মচারী উপবিষ্ট। এতদ্ব্যতীত চারিজন স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন; ইহাবা কোন শ্রেণীর মহিলা তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিলাম।

সে যাহা হউক, আমি গৃহে প্রবেশ করিতেই একজন সুরাপান বিভোর রাজকর্মচারী টলিতে টলিতে আমাব কাছে আসিয়া কুৎসিৎ আশাপ আবস্ত করিয়া দিল। প্রিন্স ম—আমাকে চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন এবং অফিসাবকে তিরস্কার কবিয়া সুরিয়া যাইতে বলিলেন যথারীতি অভিবাদন করিয়া প্রিন্স ম—আমাকে পার্শ্ব একটা প্রকোষ্ঠে লইয়া চলিলেন; সেখানে আমি উপবিষ্ট হইলাম প্রিন্স দ্বাব রুদ্ধ কবিয়া এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া আমাব বক্তব্য শুনিতে চাহিলেন। প্রিন্স ম—অতি স্ত্রী যুবা পুরুষ। তাহার উন্নত দেহ, গাঢ় কৃষ্ণ গুহ উজ্জল মুখশ্রী, বাজোচিত গাঙ্গীর্ষ্য সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু হায়! সুরাপানে তাহাব মুখশ্রী লাবণ্য-হীন হইয়াছে; কিন্তু অন্তঃ কর্মচারীদের স্তায় উন্নত হইয়া ওঠেন নাই। তাঁহাকেই একটু শাস্ত, সংযত, ও প্রকৃতিস্থ দেখিলাম।

আমাবা উভয়ে উপবিষ্ট হইলে আমি আর ক্লিষ্ট না কবিয়া আমার আসিবার উদ্দেশ্যটা বলিতে আরম্ভ কবিলাম। বলিলাম “আজ রাত্রে একজন যুবতীকে ব্যাবাক্ হইতে পলাইয়া যাইতে সাহায্য কবাব অপরাধে আপনি, দুই জন সৈনিককে ধৃত করিয়াছেন।” ইহা বলিতেই তাঁহাব নেশা যেন ছুটিয়া গেল। তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন “হাঁ, কিন্তু তুমি—তুমি কি করিয়া জানিলে?” আমি ইহার কোনো উত্তর না করিয়া বলিলাম “তাহাদের নাকি গুলি করা হইবে।” প্রিন্স—“হাঁ নিশ্চয়ই তাহাদের সমুচিত শাস্তি হইবে।”

আমি—“প্রিন্স, ঐ সৈনিকেরা আমাব বন্ধু উহাদের গুলি কবা হয়, ইহা কিছুতেই আমার সম্মত হইবে না।”

প্রিন্স—“আচ্ছা, তবে না হয় তাহাদের শাস্তিটা একটু লঘু করিয়া দেওয়া হইবে।”

আমি—“প্রিন্স ম—আমি সেই অপরাধিনী বন্দী,

আপনার কাছে ধরা দিতে আসিয়াছি আপনি নিরপরাধ সৈনিক দুইটাকে বিনাশ করিবেন না।”

এতক্ষণে প্রিন্স আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিয়া সচকিত নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন তুমি, ভেরা সেজোনোভা—অবশেষে বিপ্লবকারীদের দলভুক্ত হইয়াছে।

আমি উত্তর করিলাম—হাঁ, আমিই সেই যুবতী।

প্রিন্স—তুমি কি তবে তাহাদিগকে মুক্তিদানের জন্য মৃত্যুকে বরণ করিবে?

আমি কহিলাম “হাঁ।” প্রিন্স নীরব হইলেন; বহুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অবশেষে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

“না, ভেরা, কেনইবা তুমি এমন করিবে ঐ দুইটা সৈনিক ত সামান্য কৃষকের বাচ্চা; ওদের থাকা না থাকায় কিছুই আসে যায় না। ওদের জীবনের কি কিছু মূল্য আছে?”

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বুঝাইয়া দিলাম যে ঐ নির্দোষী সৈনিক বন্ধু দুইটির পরিবর্তে আমি মৃত্যুদণ্ড বরণ করিয়া গৃহবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি। প্রিন্স পুনরায় বহুক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন “ভেরা, আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না; সৈনিকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া খুব সহজ নহে; আমাদের একটা কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে। তবে ঐ সৈনিক দুইটাই যে তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, আমি তাহার কোনো বিশিষ্ট প্রমাণ পাই নাই; কারণ গৃহে তেমন বেশী আলো ছিল না।”

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম—“আপনি তবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিবেন?”

প্রিন্স উত্তর করিলেন “আমি বলিতেছিলাম যে হয়ত কাল প্রাতে ধৃত সৈনিক দুইটাকে যথার্থ অপরাধী বলিয়া নাও চিনিতে পারি।”

আমি—তবে তাহারা মুক্তি পাইবে।

প্রিন্স—হাঁ।

আমি গুরুত্বপূর্ণরূপে তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম। প্রিন্স আমাদের বাড়ী পৌছাইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি

অস্বীকার করিলাম; কারণ আমার বাসস্থান তাহার জানা থাকা আমার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। বিদায় হইবার কালে তিনি আমাকে বিপ্লবকারীদের উদ্দেশ্য, কার্য প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো সময় তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে অনুরোধ করিলেন।

আমি সম্মত হইয়া একদিন কোন স্থানে মিলিত হইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে গৃহবার পর্যন্ত আসিলেন; আমি অভিবাধন করিয়া পুনরায় মহা নিস্তক্ক, নিরানন্দ, তুবারাবৃত রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে প্রায় একঘণ্টা পর গৃহে উপনীত হইলাম।

পাঠক! ভেরার কাহিনী এখানেই শেষ হইল না। মিঃ গিরয়-স্কট কিছু দিন হইল সেট পিটার্সবার্গ হইতে কোনো বন্ধুর চিঠিতে অবগত হইয়াছেন যে ভেরা সেজোনোভা ক্রনষ্টাড্ট (Kronstadt) সহরের সৈনিকাবাসে ধৃত হইয়াছিলেন এবং পরদিনই তাহাকে গুলিকরা হইয়াছে।

শ্রীঃ।

[প্রকাশ্যদেয় গ্রন্থিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই প্রবন্ধের বাহুল্য অংশ বাদ দিয়া ইহা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

“এই প্রবন্ধের নায়িকার স্বদেশপ্রেমে আত্মোৎসর্গের আশ্চর্য্য বিবরণটি আমাদের নিষ্ঠা উদ্বেকের পক্ষে উপযোগী বলিয়াই এটিকে আপনার নিকট পাঠাইতেছি। * * *

“রুসিয়ার যে পদ্ধতিতে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের দেশে তাহারই অধিকাংশ নকল করিবার চেষ্টা যদি কাহারো মাথায় আসে সেটা আমি কল্যাণকর মনে করি না। আমাদের দেশে সম্প্রতি যে সামাজিক পুনর্গঠন আবশ্যক হইয়াছে তাহা উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লবের মধ্যে হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। * * * নিজেদের মধ্যে বন্ধনকে পরস্পরের সেবা দ্বারা, সাধারণ হিতবুদ্ধির নিয়ত চর্চা দ্বারা, দৃঢ় করিয়া তুলিবার জন্যই আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে—পরের প্রতি বিরোধ উদ্বেক করিয়া সে শক্তির অপব্যয় কবা ক্ষতিকর।

“আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান কালে বাংলাদেশে রাজ-শাসন এমন আকাব ধারণ করিয়াছে যে তদ্বারা দেশের লোকের হিংস্র প্রবৃত্তি গোপনে ও প্রকাশ্যে উত্তেজিত হইয়া

উঠিতেছে। উপায়হীন দুর্বলের প্রতি প্রবল পক্ষ যখন
 বিভীষিকা বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হন তখন দুর্বলেরা চিত্ত-
 জ্বালায় কুটিল পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে
 প্রবলের অধর্ম দুর্বলকে দুর্নীতির দিকে টানিয়া লয়। এইরূপ
 অবস্থায় দুর্বলপক্ষ ত্রাসজড়িত অথবা গুপ্তক্রুরতা এই দুই
 প্রকার বিপদের সঙ্কটে পড়ে। এই উভয় অবস্থাই পৌরুষের
 বিকার জনক। ভারতশাসনকাণ্ডে আমরা নৈতিক অধোগতি
 স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি—এই দুর্গতির কালে আমরা যদি
 চারিত্র্যনীতির বল দেখাইতে পারি তবেই আমরা যথার্থ জয়
 লাভ করিব। কষ্ট পাওয়াটাই পরাভব নহে কষ্টের তড়ানায়
 ধর্মব্রত হওয়াই পরাভব। রাজনীতির মধ্যে আমরা ছলনা
 দেখিতে পাইতেছি—তাহার একটা দৃষ্টান্ত পুনিতিত পুলিশের
 উৎপাত। যে সকল গ্রামে কোনো প্রকার অসামান্য উৎপাত
 এমন কিছুই ঘটে নাই যাহাতে সাধারণ শাসনবিধি পরাস্ত
 হয় সেই স্থানে দোরাণ্ডাশাসনের উপলক্ষ্য করিয়া কোনো
 প্রকার বিচারের বিড়ম্বনা মাত্র ও না রাখিয়া বিশেষ বিশেষ
 লোকদের প্রতি বিশেষ ব্যয় ভার চাপাইয়া নির্দয়তা করার
 মধ্যে সত্যও নাই পৌরুষও নাই—অথচ ইহার লজ্জাকরতা
 আমাদের শাসনকর্তারা অনুভব মাত্র করিতেছেন না। এই-
 রূপ ঘটনার ছলনার বিরুদ্ধে আমাদের চরিত্রেও যদি ছলনা
 ও ক্রুরতা জন্মে তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আমাদের পক্ষে আর
 কিছুই হইতে পারে না। আশুপ্রয়োজনসাধনের প্রলোভনে
 ধর্মব্রত হওয়াই দুর্বলের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় বিপদ।
 ‘অয়কট’ উদ্ভোগের ব্যাপারে আমরা তাহার পরিচয় দিয়াছি।
 বিদেশী সামগ্রী বিক্রয় যাহাদের উপজীবিকা এবং বিদেশী
 সামগ্রী ক্রয়ে যাহাদের প্রয়োজন বা অভিরুচি তাহাদের প্রতি
 অস্ত্রায় জবরদস্তি করা হইয়াছে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।
 প্রয়োজন ঘটিলে অস্ত্রায় করা যাইতে পারে আমরা তাহার
 নজীর স্বরূপে বলিয়া থাকি ইংলণ্ডেও এক সময়ে ভারতীয়
 পণ্য বন্ধ করিবার অস্ত্র জবরদস্তি করা হইয়াছিল। আমরা
 সেরূপ আইন করিয়া অত্যাচার করিতে পারি না কাজেই
 আইন লঙ্ঘন করিয়া অত্যাচার করিতে হয়। জগতে
 অধর্মের নজির খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না। কিন্তু নজি-
 রের জোরে অস্ত্রায় কখনই ধর্ম হইয়া উঠিতে পারে না।
 আমরা স্বদেশহিতের দোহাই দিয়া লোকের স্বাধীন অধিকারে

যখনই হস্তক্ষেপ করিয়াছি তখন সেই স্বদেশহিতের মূলেই
 কুঠারাঘাত করিয়াছি। ধর্মের নাম দিয়া বা ক্রমের নাম
 দিয়া যে কোনো উপলক্ষ্যেই স্বাধীনতাকে অপমান করিবার
 অভিযাস আমাদেরকে স্বাধীনতালাভে অনধিকারী করিয়া
 তুলে। আমরা লবণ ব্যবসায়ীর লবণ যদি জোর করিয়া
 অস্ত্রায় করিয়া জলে ফেলিয়া দিই তবে কেবল যে লবণ
 ফেলিয়া দিই তাহা নহে সেই সঙ্গে স্বাধীন মনুষ্যজাতির
 অধিকারকেও জলাঞ্জলি দিই। সম্ভাব্যে এই উপায়ে এমন
 বিকৃত করিয়া তুলি যে মতের অনৈক্য বা ব্যবহারের
 অনৈক্যকে আমরা সহ্য করিতেই পারি না—সমস্তই গায়ের
 জোরে উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের জোরে একাকার করিয়া দিতে
 চাই। যাহারা এইরূপ অসংযত উপদ্রবকে মঙ্গলসাধনের
 উপায় বলিয়া জানে, যাহারা নিজের মতরক্ষা ও প্রয়োজন
 সাধনের বেলাতেই আইন স্বীকার করে তাহার অস্ত্রাধা
 হইলেই আইন ঠেলিয়া ফেলিতে বিলম্ব করে না, তাহার
 ইংরেজই হউক আর বাঙ্গালীই হউক, রাজাই হউক আর
 প্রজাই হউক, যে ডালে বসিয়া আছে সেই ডালে তাহার
 কুঠার মারে—তাহাদিগকে মাটিতে পড়িতেই হইবে। আমরা
 অধীন জাতি, এবং আমাদের রাজা আমাদের শক্তিসাধনের
 প্রতিকূল বলিয়াই আমাদের স্বদেশহিতের চরম সাধনার
 অধর্মই আমাদের সহায় এই কথা যদি বলি তবে এই বলা
 হয় যে ধর্ম স্বদেশহিত নহে, স্বদেশহিত পাপেরই পুরস্কার।
 দুর্বলের বল ধর্ম নহে এই ভয়ঙ্কর দুর্বুদ্ধি হইতে ঈশ্বর
 আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমরা কোনো মতেই সত্য
 হইতে ভ্রাস হইতে যেন ব্রত না হই—আমরা বড় ছুংখের
 সময়েও যেন কাপুরুষের ভ্রাস কোনো প্রকার গোপন
 উৎপাতের পছা অবলম্বন না করি। রাজনীতি যখন
 কলুষিত হয় তখন প্রজা যেন ধর্মের দ্বারা সেই কলুষের উপরে
 জয়ী হইতে পারে;—এইরূপ ধর্মবলের শ্রেষ্ঠতা লাভকে অর্ন্তক
 অদূরদর্শী আপাত পরাজয় বলিয়া মনে করিতে পারে কিন্তু
 এই শ্রেষ্ঠতা দ্বারাই আমরা আমাদের সকল ছুংখ অপমানের
 উর্দ্ধে মস্তক তুলিতে পারিব। ছুংখের বিষয়, শ্রিগণের নিলা-
 রুণতা সম্বন্ধে যুরোপের দৃষ্টান্তকেই আমরা একমাত্র দৃষ্টান্ত
 বলিয়া গণ্য করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু যে খুষ্টান সাধুগণ রোম
 সম্রাটের উৎপীড়ন ধর্মবলে সহ্য করিয়াছেন তাহার মৃত্যুদ্বারা

সত্রাটিকে পরাভূত করিয়াছেন। সেই জন্যই বারবার আমা-
দিগকে একথা বলিতে হইবে দর্শন প্রবলতার দ্বারা আমরা
যদি দলিত বিদলিত হইতে থাকি তথাপি ধর্ম আমাদের সমস্ত অব-
মাননার ভার অপমানকারীকেই অবনত কবিতা দিবে। সেই
জন্যই মনু বলিয়াছেন—

‘স্বধং স্বমতঃ শেতে স্বধং প্রতিবুধ্যতে—

স্বধং চরতি লোকেহস্মিন্ অবমস্তা বিনশতি।’

ইহার অর্থ এই, যে, হীনচরিত্রের জড়ত্ব দ্বারা নহে কিন্তু
ধর্মশক্তির প্রবল মাহাত্ম্য দ্বারা আমরা সমস্ত অপমানকে
আনন্দে অস্বীকার করিতে পারি কিন্তু যে অবমস্তা সেই
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ, তাহার অন্যায় অবমাননা অন্যকে
বাহিবে আঘাত করে কিন্তু তাহার নিজেকে অন্তরে আক্রমণ
করিয়া থাকে।”

৩০.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূর্যাস্ত।

সূর্য অস্ত গেল। দিবার শুভ্র আলোক অন্ধকারে লেগে’
ভেঙে’ গেছে। চূর্ণ হ’য়ে, ক্ষিপ্ত হ’য়ে যেন একটা ঝড়ে
সু’য়ে আছে বর্ণগুলি চারি ধাবে আকাশে ও মেঘে!—
যেন একটা বর্ণ-সৈন্ত মরে’ আছে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পড়ে’;
যেমন একটা মহানদী বহে’ গিয়ে—পূর্ণ, ধরবেগে,
শেষে, শাখা উপশাখায় ছড়িয়ে পড়ে মন্দীভূত তেজে;
যেমন একটা মহাগীতি মহাতানে মহাছন্দে জেগে’
ঘুমিয়ে পড়ে বিকল্পিত শত ভগ্ন মুছনাতে বেজে’;
যেন শিশুর হৃৎ হৃৎ; প্রতিভার স্বগভীর প্রলাপবাণী;
মাতার চিন্তা; কবির বিলাপ; প্রণয়ীর বিরহ-স্বপ্নখানি!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

কুকি ও মিকির।

আসামের নাগা ও আবার্কাণের মগদিগের প্রতিবেশী কুকি
দিগের অধ্যুষিত দেশ কোলাডাইন অধিত্যকা হইতে উত্তর
কাছাড় ও মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৭৯৯ সালে আসিয়াটিক
রিসার্চেস (Asiatic Researches, Vol. vii) নামক

পত্রিকায় ইহাদের নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।
ইহারা শিকারী ও ঘোড়ার জাতি। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে
বিভক্ত; প্রত্যেক দল বিশেষ পরিবার হইতে নির্বাচিত
দলপতি বা রাজার অধীন। ইহারা মগবংশসম্বৃত এইরূপ
ঐতিহ্য। দুর্গম পাহাড়ের উপর ইহারা খুয়া; অর্থাৎ গ্রাম
নির্মাণ করিয়া বাস করে। প্রতিগ্রামে ৫০০ হইতে ২০০০
অধিবাসী থাকে। ইহাদের গৃহের পোতা ৪ হাত উচ্চ,
পোতার মধ্যে গৃহপালিত পশুসকল রাখা হয়। যখন ইহারা
যুদ্ধ যাত্রা করে তখন পথে গাছের উপর বোলা টাঙাইয়া
তাহাতে বাজি বাস করে। ইহারা ইহাদের প্রতিবেশী
বাজুগীদিগের চিরশত্রু ছিল; সুবিধা মত আক্রমণ করিতে
পারিলে শিশু ভিন্ন ইহাদের হস্তে কেহই অব্যাহতি পাইত
না; শিশুদিগকে ধরিয়া আনিয়া আপনাদের পরিবারভুক্ত
করিয়া লইত। চৌর্য্যে দক্ষতা ইহাদের শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া
গণ্য হইত। চুরি করিতে গিয়া যে ধরা পড়ে তাহার মত
হেয় আর কেহ নহে। তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ চলে না,
কিন্তু পত্নী থাকা সত্ত্বেও উপপত্নী রাখা চলে। ইহারা
পবিত্র বিশ্বাস করে; ইহাদের বিশ্বাস যে যত হত্যা করিতে
পারে পরজন্মে সে তত সুখে থাকে। পরমেশ্বরের নাম
‘খোগেন পুটিয়াং’ ইহারা ‘শেম/শ্রাক’ নামক আর এক
দেবতার পূজা করে; এই দেবতার নরাকার দারুমূর্তির
সম্মুখে হত শত্রুর মস্তক প্রদান করে।

চট্টগ্রামের জঙ্গলে কুকিদিগের মধ্যেই বিভিন্ন শাখায়
আকারগত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বোরতর জঙ্গল
হইতে নোংরা যুরোপীয়ের মত শ্বেতাঙ্গ কুকি দেখা গিয়াছে।
আকার সাদৃশ্যে কেহবা মণিপুরীয় মত কেহবা খাসিয়াদের
মত মোঙ্গোলীয় ছাঁচের—চোপা মুখ, পুরু ঠোঁট।

৫০৬০ বৎসর পূর্বে কাছাড়ের দক্ষিণ পার্বত্য প্রদেশে
কুকির সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় উপস্থিত হয়। স্থানীয়
শাসনকর্তাদিগের প্ররোচনায় এখন কাপড় পবিত্রে শিখিয়াছে
এবং কুকি ও মিকির উত্তর কাছাড়ের সর্বোত্তম প্রজা বলিয়া
গণ্য হইয়াছে। (কেন ? নিরীহ অজ্ঞানদিগের নিকট
হইতে ধনাপহরণ অক্লেশ বলিয়া কি ?) সম্প্রতি কুকিদিগের
চারিটি বৃহৎ শাখা—খদন, শিসুন, চংসেন ও লুহুগুম—
লুশাই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাছাড়ে পলাইয়া আসে;

তাহাদিগকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কাছাড়ে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং ইহাদিগের মধ্য হইতে বাছা বাছা ২০০ লোক লইয়া তাহাদেরই দলপতির অধীনে সশস্ত্র ও সুশিক্ষিত সীমান্ত সৈন্য সংগঠিত হইয়াছে ।

প্রত্যেক দলের এক একজন রাজা আছে; তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করা ইহারা গৌরব ও কর্তব্য বিচেনা করে। সকল রাজাই এক দেবোৎসবসম্বৃত বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। একজন রাজার পবিত্র বলিয়া গণ্য হন, এবং সকলে তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় ভক্তি করে। বৎসরে এক বুদ্ধি চাল প্রায় দুই মণ, প্রত্যেক বারের শূকর বা মুরগীর ছানার মধ্য হইতে একটি করিয়া ছানা, শিকারে হত জন্তুর চতুর্থাংশ ও চারিদিনের বেগার খাটুনি রাজার প্রাপ্য। রাজা ধূসপে বা মস্ত্রীসভাব সাহায্যে বিচার করেন। ইহাদের আইনে রাজদ্রোহীই কেবল প্রাণদণ্ডার্থ। সাধাৰণ নরহত্যা সপরিবারে রাজার দাস্তে নিযুক্ত হয়। চোর শুধু আপনিই বন্দী দাস হয়। ব্যভিচার বা কুলত্যাগে স্বামী বা পিতা আপন অভিপ্রায় ও শক্তি অনুসারে দোষীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকে। ব্যভিচার সামাজিক দোষ বলিয়া গণ্য হইলেও কি বিবাহিতা কি কুমারী সকল মরণীই রাজার ঈচ্ছাভোগ্য।

কুকিরা সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে; তাঁহাকে ইহারা ‘পুথেন’ বলে। পুথেন দয়াময় সর্বময় কর্তা এবং ইহপরত্রে তিনি সকলের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পত্নীর নাম ‘নঙ্গজর’; তিনি ব্যাধি দূর করিতে ও প্রদান করিতে সক্ষম বলিয়া এবং পুথেনের কাছে দোষীর দণ্ড হ্রাসের জন্য ওকালতি করিতে পারেন বলিয়া, নঙ্গজর পূজাপ্রাপ্ত হন। ইহাদের পুত্র ‘খিলা’ অতি কঠিন প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবতা; তাঁহার পত্নী ‘মুমো’ যেন রায়বাধিনী। পুথেন-পুত্র খিলার উপপত্নী পুত্র ‘মুমৈলী’ অন্তঃসমূহের দেবতা; তাঁহার ক্রী ‘খুচোয়ান’ স্বামীর মতই অন্তত সংঘটনপটীয়সী; ইহাদের নিকট কখন কিছু প্রার্থনা করা হয় না; কিন্তু ইহাদের কোপ শাস্তির জন্য বলি প্রদত্ত হয়। ইহাদের কন্যা ‘হিলো’ জনক জননীর মতই মন্দকারিণী; ইনি বাহার উপর কুপিত হন তাহার পাপ্ত অস্বাস্থ্যকর ক্রিয়া দেন। কুকিদের গৃহদেবতার নাম ‘খোমোঙ্গনো’। এতস্তি বন, নদী, পর্বত

ও প্রত্যেক ধাতুর এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন।

প্রায় সকল অসভ্যজাতির মত কুকিদেরও বিশ্বাস যে দেবতার কুপ্রভাবেই বোগের উৎপত্তি হয়; এবং বলিদান করিয়া তাহাদের তুষ্টিসাধন করিতে পারিলেই বোগের উপশম হয়। কোনো কোনো রোগ নির্দিষ্ট দেবতার কুদৃষ্টি বলিয়াই জানা আছে; যেমন পেটে বেদনা জন্মানো হিলোর কর্ম্ম। কিন্তু অনির্দিষ্ট দেবতার বোগে ‘খিম্পু’ নামক ওয়ার শরণাপন্ন হইতে হয়। এই ওয়াগিরি কর্ম্ম কাঠিন্ত কিছু না থাকিলেও বিশেষ লাভজনক নহে বলিয়া কেহ এই ব্যবসায় করিতে চাহে না; একজন রাজাকে মধ্যে মধ্যে জোর জবরদস্তি করিয়া ইহাদিগকে আপন ব্যবসায়ে লিপ্ত রাখিতে হয়। খিম্পু আহৃত হইয়া আসিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা কবে, মহাবিজ্ঞের মত গোটাকয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং তাহার উত্তর হইতে স্থির করে কোন দেবতাকে কি প্রকারে তুষ্ট করিতে হইবে। যদি একটা মুরগী বলিই যথেষ্ট বিবেচিত হয়, তবে খিম্পু তাহা মারিয়া পুড়াইয়া যে স্থানে প্রথম রোগী অন্তস্থ হয় সেই স্থানে বলিয়া ধান এবং ঘাহা খাইতে পারে না তাহা বলিরূপে জঙ্গলে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়; শূকর বা কুকুর বলি হইলে খিম্পু একাকী খাইতে অশক্ত বলিয়া আবে দুই চারি জনকে নিমন্ত্রণ করে; এবং মহিষ বলি হইলে মহাভোজের অনুষ্ঠান হয়।

কুকিদিগের স্বর্গ কোনো উত্তর প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত; সেখানে ধাতাদি শস্ত আপনা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং সেখানে পর্যাপ্ত শিকার পাওয়া যায়। হত শত্রুগণ সেখানে অন্তর্গত দাস হইয়া সেবা করিবে, এবং যে সকল পশু তাহার এ জীবনে আহাৰ করিবে, তাহারাই পরজীবনে গৃহপালিতরূপে উপস্থিত থাকিবে। এই জন্য ইহারা খুব অতিথি বৎসল হয়।

কুকিরা বাযাবর অথচ সামাজিক জাতি; কোনো স্থানে তিন বৎসরের বেশি থাকে না, অথচ ইহাদের নিত্য নূতন গ্রামেও হাজার ঘর বসতির কম থাকে না। কোনো গ্রাম পরিবর্তনের আবশ্যক হইলে রাজা একটি নূতন স্থান মনোনীত করেন এবং সেখানে প্রথমে তাঁহারই বাসগৃহ নির্মিত হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে একটা পথ রাখিয়া তাহারই ছবারি সারি সারি গৃহ নির্মিত হয়। বাড়ীর পোতা উচু হয় এবং

বাড়ীর আকার পরিবারস্থ পরিজন সংখ্যার উপর নির্ভর করে। রাজ্যীয় বাড়ী নিম্ন বহির্ভূত; কখনো কখনো ১৫০ ফুট লম্বা ও ৫০ ফুট চৌড়া হয়। যখন সকলের বাসগৃহ নির্মিত হইয়া যায় তখন রাজবাড়ী কাঠের বেড়া দিয়া সুরক্ষিত করা হয়, তাহার পর সকল গ্রামপথে আগড় দিয়া সমগ্র গ্রাম গড়বন্দী করা হয়। প্রত্যেক আগড়ের কাছে দেউড়ি ঘর নির্মিত হয়, সেখানে যুবকেরা পাহারা দেয় ও রাজ্যে বাস করে। পার্শ্বপ্রদেশে থাকিতে কুকিরা অধিকতর নিরাপদ হইবার জন্য পর্বতশীর্ষে গ্রাম পত্তন করিত; কাছাড়ে নামিয়া আসিয়া অবধি কৃষিক্ষেত্রে সন্নিহিতে আপনাদের গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে। আসামে দেখা যায় কুকিরা পাহাড় ছাড়িয়া প্রথম আসিয়া বড়-বড় গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে, অবশেষে আপন আপন কৃষিক্ষেত্রে গোলাবাড়ী করিয়া পরম্পরে বিযুক্ত হইয়া পড়ে।

কুকিরা পাকা তামাক খোর এবং অঙ্গমী নাগার মত তামাকের তেল পান করিতে ভালো বাসে।

কস্তাক্ষয়ের তিন দিন পরে ও পুত্রক্ষয়ের পাঁচ দিন পরে শিশুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভোজ দেওয়া হয়। শিশুর মাতা অন্ন চিবাইয়া পাখীর মত মুখে মুখ দিয়া শিশুকে অন্ন খাওয়ায় এবং স্তন্যভ্যাগ না করা পর্যন্ত এইরূপে মধ্যে মধ্যে শিশুকে খাওয়ায়। ১২।১৩ বৎসর বয়স হইলে কোনো বালককে গৃহে রাজিবাস করিতে দেওয়া হয় না; তাহা-দিগকে দেউড়ি ঘরে আশ্রয় লইয়া পাহারার ভাগ লইতে হয়।

বিবাহার্থীকে কস্তা ক্রয় করিতে হয়; কস্তার মূল্য ৩০ টাকা বা কস্তাগৃহে দুই বৎসর দাসত্ব। দেনা পাওনার নিশ্চয়তা হইয়া গেলে কস্তার পিতার বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণে উভয় পক্ষীয় আত্মীয়গণের সন্মিলন হয়। পরদিন প্রভাতে বরবধূকে বিম্পুর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়; বিম্পু এক ভাঁড় মধু দেয় বরবধু তাহা নু করে; তৎপরে বিম্পু বরের গলায় দুই খেই সূতা বাঁধিয়া দেয় এবং বরবধূকে এক একখানি চিকুণী উপহার দিয়া উভয়কে আশীর্বাদ করে। বরের গলায় সূতা আপনি পচিয়া ছিড়িয়া না গেলে খুলিয়া ফেলা হয় না, ছিড়িয়া গেলেও আর নূতন পরিতে হয় না। বৈবাহিক চিকুণী খুব পবিজ ও শুভকর বিবেচিত হয়;

চিকুণী হারাইয়া যাওয়া বড় কুলক্ষণ। স্বামী স্ত্রী ব্যতীত আর কেহ সেই বৈবাহিক চিকুণী ব্যবহার কবিতে পারে না। যখন কাহারো মৃত্যু হয় তখন তাহার চিকুণী তাহার শবের সহিত প্রোথিত করা হয় এবং তাহার নিকট আত্মীয়গণ তাহাদের চিকুণী ভাঙ্গিয়া কয়েক দিন এলো চুলে থাকিয়া নূতন চিকুণী কাড়ে।

কুকিদের জাতীয় পরিচ্ছেদ নাগাদেরই মত সামান্য হাফা রকমের। ইহারা মাথায় পাগড়ী বাঁধে, ধনীরা 'হাতী পাখীর' পালক ও রঞ্জিত ছাগলোমের লাল ফিতা দিয়া সেই পাগড়ী সজ্জিত করে। রাজারা বুনকাকের লম্বা ল্যাজের পালক পাগড়ীতে পরে। ঘাড়ের ধলি ও দা শুঁজিবার পোটির চামড়ার উপরে কড়ির সারি বসানো। দা তিন কোণা অস্ত্র। ছাগলের দাড়ি শুদ্ধ গলার চামড়া কাটিয়া পায়ে গাটীর বাঁধে। বল্লম ইহাদের অপর অস্ত্র; কিন্তু ইহারা দা ও গণ্ডার চর্মের বর্মের উপরই বেশি নির্ভর করে। একটা গণ্ডার চর্ম গলা হইতে ঝুলাইয়া গায়ের চারিদিকে জড়াইয়া বর্ম করা হয়। অধিকন্তু মহিষ চর্মের ঢাল ও যুদ্ধের সময় 'পঞ্জি' ব্যবহার করে। কুকিরা ছুড়ির মালা পরে, এবং পুরুষপরম্পরাগত বলিয়া ইহা বহুমূল্য বিবেচিত হয়। 'টেনো' নামক একখণ্ড প্রস্তরের তিন হাজার টাকা মূল্য বিবেচিত হইয়াছিল।

কুকিদের প্রায় লুপ্ত প্রাচীন ভাষার গান একেবারে কবিত্বভাববিবর্জিত নহে। 'ঘোষেন' নামক বাস্তবিক অনেকটা সাপুড়ের ভুবড়ীর মত, একটা লাউয়ের তুল্য মধ্যে হিঙ্গকরা, বাঁশের নল চুকাইয়া ফুঁ দিয়া ইচ্ছামত স্বর বাহির করে। যখন খুব জমকালো বাজনার আবশ্যক হয় তখন বাঁশীর তালে তালে কঁাসর গিটিয়া তুমুল শব্দ করে।

কুকিরা তাহাদের মৃতদিগকে কবর দেয়; কিন্তু দরিদ্রতম ব্যক্তিরও শব কবর দিবার পূর্বে কয়েকদিন বার দিয়া রাখা হয়। বড় লোকের শব শুনে আত্মনের আঁচে রাখিয়া শুদ্ধ করিয়া লইয়া গোষাক ও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করিয়া এক মাস দুই মাস রাখিয়া দেয়; এই সময়ে নিত্য মহাভোজের আয়োজনে গৃহদ্বার নিরন্তর অব্যাহত থাকে। অবশেষে খাদ্য পানীয় ও অস্ত্রশস্ত্র ভোজ্য নিহত পশুকরোটি সকল দিয়া শব প্রোথিত করা হয়। কবরের চারিদিকে

বেড়া দেওয়া হয়। পুরাকালে রাজার কবরের উপর নরমুণ্ড উপহার দেওয়া আবশ্যিক বিবেচিত হইত, কিন্তু কুকিরা ব্রিটিশ রাজ্যে বাস করিয়া সেই প্রথা ত্যাগ করাই সুবিধা মনে করিয়াছে।

কুকিদিগের পাশাপাশি কপিলি নদীর তীর হইতে প্রায় ত্র্যমুখ পর্যন্ত নওগাঁ জেলার পার্শ্বত্যা অংশ ব্যাপিয়া মিকির জাতির বাস। ইহারা ভাষাগত বৈষম্যে সকল জাতি হইতে পৃথক। ইহাদের আপনার ঐতিহ্যে প্রকাশ যে কাছাড়ীরা ইহাদিগকে নওগাঁ ও কাছাড়ের মধ্যগত টোলাবামের দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয় এবং তাহারা জয়ন্তিয়াদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করে; কিন্তু তাহারা জয়ন্তিয়াদিগের অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে আসামের রাজার শরণাপন্ন হয় এবং তদবধি তাহারা নিরীক্সবাদে বাস করিতেছে। আসামের ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ইহাদিগকে নিরীহ নিরীক্সবাদী পাইয়া তাহাদিগকে নিবন্ধ করিয়া ‘ভালো’ প্রজা করিয়াছেন— কারণ দেখাইয়াছেন যে মিকির যুদ্ধ বিযুদ্ধে, ইহাদের অস্ত্র থাকিলেই অপর বিক্রান্ত জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

মিকিরদের পরিচ্ছদ খাসিয়াদের মত এবং অনেক বিষয়ে ইহারা খাসিয়াদেরই অনুরূপ। ইহাদের পরিচ্ছদ বেশ মজার; লাল ভোরটানা ছুই খণ্ড এক ধারে ঝালরঙা কাপড় একত্র করিয়া মাথা ও হাত গলাইবার ফুটা রাখিয়া সেলাই করিয়া জামা পরে— ঠিক মিশমীদের জামার মত। ইহাদের মুখশ্রী খাসিয়ার মত, কিন্তু অবয়বে হীন। ইহারা উঁচু পোতার একটা বড় ঘরে সকলে মিলিয়া জটলা করিয়া থাকে; কখনো এককক্ষবিশিষ্ট এক গৃহে ত্রিশটি দম্পতিকে থাকিতে দেখা গিয়াছে। একটা কাঠের গায়ে খাঁজ কাটিয়া তাহাই উঁচু ঘরে উঠিবার সিঁড়িরূপে ব্যবহার করে।

মিকির গোরু ভিন্ন সকল পশুই আহার করে, গোরু পবিত্র বলিয়া গণ্য করে, কিন্তু ছুধ খাইতে ভালবাসে না।

বয়স্ক না হইলে বিবাহ হয় না; বিবাহের কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান নাই; কেবল বিবাহ এবং পুত্রজন্ম উপলক্ষে ভোজ দেওয়া হয়। বহুবিবাহ প্রচলিত নাই, বিধবা বিবাহ হইয়া থাকে।

ইহাদের ধর্ম সংস্কার বিশেষ পরিষ্কৃত বা মৌলিক নহে। ইহারা ‘হেম্পাটিম’ নামক পরমেশ্বরের আরাধনা করে।

মিকিরদের জনসংখ্যা মাত্র পঁচিশ হাজার।*

মুদ্রা-রাক্ষস।

ভক্ত ও কবি ।†

এই জগৎ সকলের জন্তই আছে। যিনি জগৎপতি তিনিও সকলের জন্ত আছেন। সকলেই চোখ মেলিয়া জগতের শোভা দেখিতে পারে। জীবনের রহস্য ও ঈশ্বরের অনন্ত ভাব অনুভব করিবার অধিকারও সকলেরই আছে। অথচ বিশ্বের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে অতি অল্প লোকই প্রবেশ করিতে পারে; জীবনের রহস্যদ্বার উন্মোচন করাও সকলের শক্তিতে কুলায় না এবং অধিকাংশ মনুষ্যকেই ভাবের বহির্ভার হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। এজন্য প্রকৃত ভক্তের সংখ্যাও অল্প; প্রকৃত কবির সংখ্যাও বড় বেশী নহে।

একথা প্রায় প্রত্যেক চিন্তাশীল ও হৃদয়মণী ব্যক্তিই অনুভব করিয়া থাকেন যে, বিশ্বের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে প্রবেশ কবিত্তে হইলে এবং মানবজীবনের রহস্যদ্বার উন্মোচন করিয়া অসীম ভাবের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে, বহিঃস্বিরাজিয়ার অতীত কোন মানসিক বৃত্তির সাহায্য চাই। সেই মানসিক বৃত্তির কার্যকে মনের মনন-ক্রিয়া অথবা আত্মার ধ্যানদৃষ্টি বলা যাইতে পারে। মানবপ্রকৃতির মধ্যে এ কি যে এক মানসিক আলস্ত আছে, বুঝা যায় না;— মানুষ দূর ও শারীরিক শ্রম করিতে রাজি হয়, তবু মনের মনন-ক্রিয়া দ্বারা কিম্বা ধ্যানস্থ হইয়া কোন অদৃশ্য বস্তুর সম্ভাব্য তন্ময় হইতে চাহে না। অনেকে ভাবিয়া দেখেন না যে, শুধুই ইন্দ্রিয়ের শক্তি অতি সামান্য। উহার উপর নির্ভর করিলে প্রতিদিন বাহ্য চোখে পড়ে, তাহাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না। প্রতিদিনই পুরাকালেশ্বরবি উদ্ভিত হইয়া তাহার স্বর্ণ বস্তিতে ধরণীকে শোভাময়ী করিয়া তোলে, প্রতিদিনই নীলাকাশ উজ্জল নক্ষত্রমালায় স্নোভিত হয়,

* Col. Dalton, c.s.i. প্রণীত Descriptive Ethnology of Bengal হইতে সংগৃহীত।

† চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী-গৃহে প্রাপ্ত।

প্রতি পূর্ণিমাতেই চন্দ্র তাহার শুভ জ্যোৎস্নায় যামিনীকে হান্তময়ী কবিয়া তোলে। শুধুই আমাদের চোখের দৃষ্টির উপর নির্ভব করিতে হইলে, চন্দ্রসূর্য্যকে সোণার থালা, নক্ষত্রসমূহকে এক একটি আলোকের পুষ্প বলিয়া মনে করিতাম। ভাগ্যে আমাদের মনন-শক্তি ও ধ্যানদৃষ্টি ছিল, তাই ত চন্দ্র উহাদিগকে ক্ষুদ্র দেখিলেও মন ঐ সকলকে বৃহৎ বলিয়া অনুভব করে।

যাহা হোক, অধিকাংশ লোকই মননশক্তি ও ধ্যানদৃষ্টির অভাবে এই সৃষ্টিব অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না; জীবনের রহস্তদ্বার উন্মোচনেও তাঁহারা অক্ষম; জগতের মহা ভাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়াও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত হইতে পাবেন না, প্রকৃত কবি হইতেও পারেন না, কিন্তু যে অল্পসংখ্যক মনস্বী ব্যক্তি মননশক্তি অত্যন্ত অধিক, ধ্যানদৃষ্টি অতিশয় প্রবল;—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা জগৎপতিব স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও বিভূতি দর্শন কবেন, তাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট ও ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া ভক্ত হইয়া উঠেন; এবং ভক্তির প্রাবনে নরনারীর ধর্ম্মহীন শুষ্ক চিত্তকেও অমৃতরসে পূর্ণ করিয়া তোলেন। কেহ কেহ বা জগতের অনন্ত রূপে, জীবনের অসীম রহস্তে নিমগ্ন হইয়া, সৌন্দর্য্যের মধুরতায় ও ভাবের মাদকতায় বিভোর হইয়া উঠেন; এবং স্বরচিত কাব্যের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্য পরিফুট ও ভাবরস উচ্ছলিত কবিয়া কবি আখ্যা প্রাপ্ত হন।

এখন আমরা কবিকে ভক্ত হইতে, ভক্তকে কবি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইব; এবং ইহাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ কবির কথাই আলোচনা করা যাক। ছেলে-বেলায় উপকথায় অনেক আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, বাজপুত্র এক অপূর্ণ পুরীতে উপনীত হইয়া নিরুপমা বাজকন্ঠ্য দর্শন পাইতেন। বাজকন্ঠ্য তাঁহার বিচিত্র স্বর্ণ অট্টালিকার এক একটি দ্বার উন্মুক্ত কবিয়া, বাজপুত্রকে অনেক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখাইতেন। এই কথাটা কবির পক্ষেও খাটে। কবি যখন সূক্ষ্ম ধ্যানদৃষ্টির বলে বিশ্বের সৌন্দর্য্যপুরীতে গিয়া উপনীত হন, তখন প্রকৃতি

স্বহস্তে তাহার সৌন্দর্য্য-অট্টালিকার এক একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কবিকে জগতের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখাইতে থাকেন। শুধু তাহাই নহে। কবি যখন আবার মানবের জীবনরহস্তের মধ্যে তন্ময় হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সম্মুখে মহা ভাবেব রাজ্য খুলিয়া যায়; তিনি তন্মধ্যে মানবেব স্নেহঃখ হর্ষবিবাদ স্নেহপ্রেম ও পাপপুণ্যের অভিনব মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হন। স্মরণ্য সৌন্দর্য্য ও ভাবের অনুভূতি সম্বন্ধে, পূর্বে যে কবি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রভাতকালে হরিৎবর্ণ তরুশাখায় যখন একটি সুন্দর ফুল ফুটিয়া উঠে; তখন একজন সাধারণ লোক ফুলটির কোমল মন্থণ দলগুলির রমণীয় বর্ণ দেখিয়া ও সুমিষ্ট গন্ধ পাইয়াই পুলকিত হন; তাহার বেশী আর কিছুই নহে। কিছু আশা কবাই যায় না। কিন্তু একজন কবি ফুলটির বর্ণ, গন্ধ ও সুষমার অন্তরালে একটি প্রাণ দেখিতে পান; একটি প্রেমের স্পর্শ অনুভব করেন। তাই প্রীতিরসে আর্দ্র হইয়া ফুলের সঙ্গে এমন করিয়া আপনাব প্রাণের ভাব মিশাইয়া ফেলেন যে, তিনি ফুলের ভাষা শুনিতে পান, ফুলের স্নেহঃখের কাহিনী অবগত হন; এমন কি, ফুলটির কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহাকেই আপনাব সখী বলিয়া মনে করেন।

এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, হিমালয়ের একটি মনোরম নির্ঝরিণীর কূলে ছুই বন্ধু গিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক বন্ধু কবি নহেন; আর এক বন্ধু কবি। যিনি কবি নহেন, তিনি অল্প সময় মাত্র নির্ঝরিণীটি দেখিয়া “বাঃ বেশ ত ?” বলিয়াই চলিয়া গেলেন। যিনি কবি, তিনি নির্ঝরিণীটি দেখিতে দেখিতে উহার অনুপম দৃশ্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তখন নির্ঝরিণী তাঁহার নিকট আর একটি নিম্নগামিনী জলধারা মাত্র রহিল না। ঐ নির্ঝরিণী বিবাহিণী-নারী-মূর্ত্তিতে দেখা দিল। কবি দেখিলেন, এক সুন্দরী তরুণী প্রেমাস্পদের বিরহে কাতর হইয়া, করুণ সঙ্গীতে শৈলবন্ধ পূর্ণ কবিয়া, প্রিয়তমের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। কবি এই যে দৃশ্য দর্শন করিলেন, ইহাই মধুব চন্দে ও মিষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিলেন; তাহার বর্ণনাই একটি মন্থস্পর্শ

কবিতা হইয়া দাঁড়াইল। কাব্যের অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা হয় ত এইরূপেই রচিত হইয়াছে।

উক্তরূপ এক একটি দৃশ্য, এক একটি ঘটনা কবির মনকে যে কোথায় লইয়া যায়, কবির সম্মুখের দৃশ্যপটে কত ছবি যে অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহা ববীন্দ্র বাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। ববীন্দ্র বাবুর নব প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে “প্রকৃতিগাথা” ও “সোনার তবী” শীর্ষক দুখানি চমৎকার কাব্য আছে। “প্রকৃতি-গাথা”র এক একটি কবিতা পাঠককেও এক অভিনব সৌন্দর্যের দেশে লইয়া যায়; “সোনার তবী”র এক একটি কবিতা এক অজ্ঞাত অথচ চিরবাহিত রাস্তার সংবাদ ও চিত্র আনিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করে। আমরা এই দুখানি কাব্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। তাহা হইলে আমাদের মনের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

নব বর্ষা সমাগমে বঙ্গভূমি শ্রীশালিনী হইয়া উঠে;—তাহা আমরা সকলেই দেখিয়া থাকি। কিন্তু সেই দৃশ্য কবি রবীন্দ্রনাথের ধ্যান দৃষ্টির সম্মুখে কি অপরূপ মূর্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কবি নববর্ষায় বঙ্গভূমির দৃশ্য দেখিয়া লিখিতেছেন :—

“নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঙ্গন লেগেছে
নয়নে লেগেছে।

নব তৃণদলে ঘনঃঘন ছায়ে
হরষ আমার যিগেছি বিছায়ে,
পুলকিত নীল নিকুঞ্জে আঁজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল বিন্দু মেঘের
নীল অঙ্গন লেগেছে।

* * *
ওগো নদীকূলে তীর তৃণতলে
কে বসে অমল বসনে
জামল বসনে ?
হৃদয় গগনে কাহাবে সে চায় ?
ঘাট ছেড়ে ঘাটে কোথা ভেসে যায় ?

* * *
বিকচ কেতকী তট ভূমি পবে
কে বেঁধেছে তার তবণী
তরুণ তরুণী ?”

এই মনোহর কবিতাটি দীর্ঘ বলিয়া উহার এক একটি স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে কবিতাটির সৌন্দর্য্যই

নষ্ট হইতেছে। আমরা এখন কবিতাটির শেষের কয়েক ছত্র মাত্র উদ্ধৃত করিব।—

“থরে ঘনধাবা নব পল্লবে—
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে।
হৃদয় আমার নাচেবে আজিকে
মঘরের মত নাচেরে।”

যাত্রীর নৌকা গ্রাম্য নদীর ঘাটে ঘাটে লাগিয়া, যাত্রী লইয়া যায়। এ দৃশ্য আমরা অনেকেই দেখিয়াছি। কিন্তু “সোনার তবী”র কবি এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কোন্ রাস্তা গিয়া পৌছিয়াছেন, এবং কোন্ বাজ্যের নেষে ও যাত্রীর কথাবার্তা শুনিতে পাইয়াছেন, তাহা “যাত্রী” শীর্ষক কবিতাটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। এই বিচিত্র কবিতাটির কোনরূপ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। শুধু পড়িয়া ইহার মর্ম্ম কথাটি হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিতে হয়। যাত্রী কবিতাব নেয়ে যাত্রীভরা নৌকায় বসিয়া নদীতীরের একজন যাত্রীকে বলিতেছে—

“আছে, আছে স্থান
একা ভূমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান।

* * *
এস, এস নায়ে
ধূলা যদি থাকে কিছু
ধাক্ না ধূলা পায়ে।
* * *
যাত্রী আছে নানা,
নানা ঘাটে যাবে তারা
কেউ কারো নয় জানা।

ভূমিও গো ক্ষণেব তবে
বসবে আমার তরী পরে,
যাত্রী যখন ফুরিয়ে যাবে
মানবে না মোর মানা।
এলে যদি ভূমিও এস
যাত্রী আছে নানা।

কোথা তোমার স্থান ?
কোন্ গোলাতে বাসতে যাবে
একটি আঁটি ধান ?
বলতে যদি মা চাও তবে
শুনে আমার কি বল হবে ;
ভাবব বসে খেয়া যখন
করব অবমান—
কোন্ পাডাতে যাবে ভূমি
কোথা তোমার স্থান ?”

বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে দেশের প্রত্যেক স্থানস্থানের সম্মুখেই বঙ্গভূমি মনোমোহিনী মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ মাতৃভূমির কি অপরূপ মূর্তি মিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেই কবির মননশক্তি ও ধ্যান-দৃষ্টিব প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কবি বঙ্গভূমির অপরূপ মাতৃমূর্তি দেখিয়া বলিতেছেন;—

“আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপ বাহির হলে জননী।

ওগো মা, তোমার দেখে আঁখি না ফিরে।

জন্মের চুম্বন আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

ডান হাতে তোর খণ্ড ফলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ;

তুই নয়নে মেহের হাসি ললাট-নেত্র আশ্রয় বরণ।

তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জমেঘে লুকাই অশনি:

তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রোক্ত-বসনী?”

আর উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। এই উৎকৃষ্ট সঙ্গীতটি হয় ত অনেকবই কণ্ঠস্থ আছে। এখন কবির নরনারীর জীবন রহস্যের মধ্যে প্রবেশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। এই সংসাবে মানবের জীবন—রঙ্গভূমিতে মেঘ প্রেম বাৎসল্য করুণা পাপ পুণ্য হুঃখ শোক হর্ষ বিবাদের বিচিত্র অভিনয় চলিতেছে। আমরা সাধারণ লোকেরা যেন দূরে দাঁড়াইয়া সেই অভিনয় দেখিতেছি। কিন্তু কবি অভিনয় গৃহের গুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া, হৃদয়ের সহানুভূতিতে নরনারীর সঙ্গে এমন এক প্রাণ হইয়া যান, যে নরনারী আপন আপন হৃদয় দ্বারা উন্মুক্ত করিয়া, অন্তরের রহস্য কথা, হর্ষবিবাদ ও মনোব্যথা কবিকে জানাইতে থাকেন। কবি সেই বিচিত্র কাহিনীই কাব্যের মধ্যে বর্ণনা করিয়া, নানা রসে কাব্যকে বসায় করিয়া তোলেন। সেই জন্তই কাব্য আমাদের মনকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয়।

কবির কবিত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক কথাই বুঝানো হইল। এখন ভক্তের ভক্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন;—

“মদন্তপ ক্রতিমাত্মন ময়ি সর্বগুণহাশয়ে

মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্রোতসুধৌ।

লক্ষণ ভক্তিযোগন্ত নিষ্ঠগন্ত হৃদাঙ্গতঃ।”

অর্থ—গঙ্গার স্রোত যেমন স্বভাবতঃ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত, সেইরূপ আমার গুণাবলী শ্রবণ মাত্র যাহাব সমগ্র চিত্তের গতি অবিচ্ছিন্ন ভাবে আমার অভিমুখেই প্রবাহিত হয়, সেই ব্যক্তিই নিষ্ঠগন্ত ভক্তিযোগের অধিকারী হইয়াছে।

একদিন বাকিপুরের কুলপ্লাবী ধরস্রোত গঙ্গার তীরে বসিয়া এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য কি, ভাবিতেছিলাম। পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম, গঙ্গা যেমন সিদ্ধুব আকর্ষণে আকৃষ্ট, গঙ্গা যেমন সিদ্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিতৃপ্ত; তেমনি যাহার চিত্ত ঈশ্বরের আকর্ষণেই আকৃষ্ট, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনেই পরিতৃপ্ত; তাহাকেই প্রকৃত ভক্ত বলা যায়। বাস্তবিক ইহাই ভক্তের লক্ষণ।

কিন্তু ঈশ্বরের আকর্ষণকারিণী শক্তি কি? সৌন্দর্য্য ও প্রেম। সকলেই জানেন, সৌন্দর্য্য ও প্রেম যেমন আমাদের মনকে মুগ্ধ কবিত্তে পারে, প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে, এমন আর কোন বস্তুই পারে না। একজন্ম পূর্বেও বলিয়াছি এবং পুনর্বার বলিতেছি যে, ভক্ত যখন মননশক্তি ও ধ্যানদৃষ্টির সাহায্যে ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে নিমগ্ন হন; তাঁহার সৌন্দর্য্য, বিস্মিত, মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ ও প্রেমে আত্মহারা হইয়া যান, তখনই তিনি ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন।

ভক্ত ভিন্ন ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও প্রেম অপর কেহ অনুভব কবিত্তেই পারে না। যেমন সাগরে অনন্ত রক্ত থাকা সত্ত্বেও, ডুবুরী অতল জলে নিমগ্ন হইয়া সঞ্চল রকম রক্ত সংগ্রহ করিতে পারে না; তেমনি অনেক সাধকও ঈশ্বরের অনন্তস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও প্রেম অনুভব করিতে পারেন না। একজন্ম এদেশে জ্ঞানপথাবলম্বী ও ভক্তিপথাবলম্বী এই দুই শ্রেণীর সাধকের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞানপথাবলম্বী মায়াবাদী বৈদান্তিকগণ ঈশ্বরকে এক অখণ্ড সত্যরূপে দর্শন করিয়া, তাঁহার লীলাবৈচিত্র্য, তাঁহার সৌন্দর্য্য ও প্রেম কিছুই স্বীকার কবিত্তে চাহেন না। কিন্তু ভক্তিপথাবলম্বী সাধক উহা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, যিনি সত্যম্, তিনিই শিবম্, তিনিই স্বন্দরম্। তাই তাঁহার মতে এই বিশ্বমানব কেবল এক অখণ্ড চৈতন্যেই অভি-
ব্যক্তি নহে; এক অখণ্ড সৌন্দর্য্য ও প্রেমেরও অভিব্যক্তি বটে!

এই জন্ম ভক্ত জগতের প্রত্যেক সৌন্দর্য্য চিত্র ও মানবের প্রতিদিনের প্রেমলীলার মধ্যে, সৌন্দর্য্যময় প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকেই দর্শন কবেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটা ভক্তিগ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত কবিত্তেছি।

মহর্ষি তাঁহার “ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে”র দ্বিতীয় উপদেশের একস্থলে বলিতেছেন ;—

“উহার উদ্দীপনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে ; রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান করে ; তখন সেই জ্যোতিমান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান বয়স্কীয় পুরুষকে তাঁহার দেখিতে পান । * * তখন সূর্য্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই । উহার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আবাদিপের নিকট প্রকাশিত হন । * * যখন চন্দ্রমা সহস্র রশ্মিতে উজ্জ্বল হইয়া জ্যোৎস্নাহা বর্ষণ করে * * তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায় ? * * উষাকালে সেই আনন্দরূপমৃতম্ । প্রদোষকালে সেই আনন্দরূপমৃতম্ । নিশাকালে সেই আনন্দরূপমৃতম্ প্রকাশ পাইতেছেন ।”

মহর্ষি শুধু যে মুখেই এই উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নয় । তাঁহার জীবনেও ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিরাছি, একবার তিনি ও স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় বোলপুর শান্তিনিকেতনে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন । সে দিন পূর্ণিমা তিথি ছিল । রাত্রিকালে শাস্ত্রী মহাশয় ও বসু মহাশয়ের যখন আহার সম্পন্ন হইল ; তখন মহর্ষি দালানের ছাদের উপরে উঠিলেন । ছাদে উঠিয়া সেই জ্যোৎস্নাপ্রাবৃত আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন । কিছুক্ষণ পরে জ্যোৎস্নারঞ্জিত নীলাকাশে কি দেখিলেন ? দেখিলেন, তাঁহারই সৌন্দর্য্যময় স্বামী অপরূপ রূপের আভাস বিধ আলোকিত হইয়াছে ; এবং সেই সৌন্দর্য্যময়ের প্রেম-সুধা জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়া করিয়া পড়িতেছে ।

মহর্ষি এই অল্পপম দৃষ্ট দেখিতে দেখিতে দৈবের স্বরূপে ভুবিয়া গেলেন । তার পর রাত্রি দুইটা বাজিল । শাস্ত্রী মহাশয় ও বসু মহাশয় জাগ্রত হইলেন । তখন তাঁহারা ছাদের উপরে গিয়া কি দেখিলেন ? দেখিলেন, মহর্ষি সুরাসক্ত মাতালের স্থায় দৈবের ভাবে মত্ত হইয়া গিয়াছেন ।

সম্প্রতি মহর্ষির মৃত্যুদিনে “ধর্ম্ম ও কর্ম্ম” শীর্ষক এক খণ্ড

সাময়িক পত্র বিতরিত হইয়াছিল উহার এক স্থানে লেখা আছে যে ;—

একদা মহর্ষি সমুদ্রতীরে অবস্থিতকালে বসন্তকালে ঐ সহরের একটি ফলফুল শোভিত বাগানে গিয়া তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া একান্তে ফলভরে অবনত কতকগুলি বৃক্ষের সম্মুখে হাক্কেলের একটি গজল গাছিয়া পাছিয়া নৃত্য করিতেছিলেন । সেই গজলের অর্থ এই ‘হে ঈশ্বর, বসন্তের সমাগমে ফলফুলে শোভিত এমন যে শোভনীয় বৃক্ষরাজি, ইহাদিসকে এলয়ে লইয়া যাইও না ।’ এইরূপে গাহিতেছেন,

এমন সময় দেখেন, তাঁহার পিছনে একজন মুসলমান শিশুর নৃত্য করিতেছে । তাহাকে দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন “আপনি কে ?” উত্তরে তিনি বলিলেন “আমি দেওয়ান হাক্কেলের ঐ গজল জানি, তাই আপনাকে তাহা গাহিতে দেখিয়া আমিও নৃত্য করিতেছিলাম ।” মহর্ষি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং তাঁহার বেঁটুমাতে (Purse) যে ৪০ টাকা ছিল, তাহা দিলেন ।”

মহর্ষির সম্বন্ধে এরূপ আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে । কিন্তু তাহা বলার আবশ্যক নাই । এক কথা অতি সত্য যে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মধ্যে ভক্ত ভগবানের মাধুর্য্য ও প্রেমই দর্শন করেন । তজ্জন্ত ভক্তের নিকট এই সৃষ্টি-রহস্তের ব্যাখ্যাই অন্তরূপ । ভক্ত বলেন, ঈগৎপতির প্রেমের জন্তই মানবের সৃষ্টি । তিনি ইতর প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ইতর প্রাণীকে তিনি প্রেম দিতে পারেন । কিন্তু ইতর প্রাণীর কাছে প্রেম ত পাইতে পারেন না । বিনিময় ভিন্ন প্রেমের সার্থকতা কি ? তাই ভগবান মানুষকে আপনাই স্বরূপের অমূরূপ জ্ঞানপ্ৰীতিতে ভূষিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন । কারণ, ভগবানের প্রেমের উচ্ছলিত রসধারা যেমন নরনারীর হৃদয়ে নামিয়া আসিবে, তেমনি নরনারীর হৃদয়ের প্রেমও উচ্ছলিত হইয়া ভগবানের অভিমুখে যাইবে । এই দুই প্রেমের মিলনের নামই ভক্তি যোগ । ভক্তিযোগেই জন্ম মানব জন্মের সার্থকতা ।

এই যোগের আকাঙ্ক্ষাতেই মানুষ আকুল হইয়া দৈবকে চাহিতেছে । আবার দৈব এই বিশ্বভুবনে আপনাই সৌন্দর্য্য ও প্রেম প্রকাশ করিয়া মানুষকে আকর্ষণ করিতেছেন । এই আকর্ষণের নিমিত্তই জগতে সৌন্দর্য্যের এত গোরব । প্রেমের এত মহিমা । নচেৎ সৌন্দর্য্য যদি শুধুই প্রাণহীন জড়ের আবরণ মাত্র হইত, প্রেম যদি অধঃপ্রাণ মানবের শুধুই ভাব মাত্র হইত ; তাহা হইলে সৌন্দর্য্য ও প্রেম কি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে, আজ পর্য্যন্ত মানুষকে আকুল করিয়া রাখিতে পারিত ?

মানুষের এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই । মানুষ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের জন্ত না করিতে পারে এমন সাধনা নাই । এই সৌন্দর্য্য ও প্রেম মানুষকে জগতের সীমা হইতে অসীমের দিকে লইয়া যায় ; এই সৌন্দর্য্য ও প্রেম ক্ষুদ্র মানুষকে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয় । এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের শক্তিতেই মানুষ আদিম বর্করতাকে

অতিক্রম করিয়া মনুষ্যস্বৈ আসিয়া পৌছিয়াছে এবং ইহারই শক্তিতে দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু হায়, মানুষের এমনও দুর্ভাগ্য যে, মানুষ সৌন্দর্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যময়কে না দেখিয়া, উহার ভিতর আপনার সুখস্বাদু পরিতৃপ্তির উপকরণই খুঁজিয়া বেড়ায়। প্রেমের আকর্ষণে প্রিয়তম দেবতার অভিমুখে না গিয়া, বাসনার মায়া কুহকেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভক্ত ঐ সকল বাসনা-জালে আবদ্ধ প্রবৃত্তিপারায়ণ অবিখ্যাসী লোকের সম্মুখ দিয়াই, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আকর্ষণে ঈশ্বরের সম্মুখে গিয়া উপনীত হন এবং ভূমানন্দ লাভ করেন।

ভক্ত ও কবির বিষয় মোটামুটি এক রকম বর্ণনা করা গেল। এখন ভক্ত ও কবির মধ্যে পার্থক্য কি, তাহাই নির্দেশ করিব। পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্ত ও কবি দুজনই সৌন্দর্য্য ও ভাবের উপাসক। কিন্তু তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কবি সৌন্দর্য্য ও ভাবের নদীতে কল্লনার তরণী ভাসাইয়া, ছই তীরে জগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধের কত বিচিত্র লীলা,—স্নেহ, প্রীতি, পাপ, পুণ্য, হর্ষ, বিষাদ, সুখ, দুঃখ, দেবত্ব ও মহত্বের কত অপূর্ণ অভিনয় দেখিতে দেখিতে চলিতে থাকেন। কিন্তু ঐ সকল অতিক্রম করিয়া যে সৌন্দর্য্য ও ভাবের এক অনন্ত সমুদ্রে আছে, কবির তাহার সন্ধান পান বটে; অথচ অনেকেই সেই সমুদ্রে গিয়া পৌছিতে পারেন না। সৌন্দর্য্যের মায়াপূরী ভিতর যে ভাবের রাজকতা রহিয়াছেন; অনেক কবি তাঁহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই জন্ত অনেক কবিই ভক্ত নহেন।

কিন্তু যিনি ভক্ত, তিনি সৌন্দর্য্যভাবের নদীতে কল্লনার তরণী ভাসান না; আপনাদের জীবন তরণী ভাসাইয়া দেন। তন্নিম্ন তাঁহার দৃষ্টি তাঁদের কোন মায়াপূরী কোন মায়াবিনী রাজকতার আকর্ষণেও আকৃষ্ট হইয়া থাকে না। সেরূপ উদ্দেশ্যই তাহার নয়। তিনি সৌন্দর্য্য ও ভাবের অনন্ত সমুদ্রের উদ্দেশ্যেই ঘরের বাহির হইয়াছেন এবং সেই সমুদ্রে গিয়াই বিশ্রাম ও তৃপ্তিলাভ করেন।

সুতরাং ভক্তিহীন কবি ও ভক্ত সাধকের মধ্যে এই এক পার্থক্য দেখিতেছি যে, কবি সৌন্দর্য্য ও ভাবের চরমসীমায় গিয়া উপনীত হন না; আর ভক্ত সৌন্দর্য্য ও ভাবের চরম-

সীমায় গিয়াই উপনীত হন। এজন্য অনেক ভক্তিবাহিনী কবি বিধে কেবল সৌন্দর্য্যের লীলা ও ভাবের অভিনয়ই দেখিতে পান; কিন্তু ভক্ত দেখেন, যেমন এক নৃত্যরশ্মিই নানা পাত্রের ভিতর দিয়া নানা বর্ণচ্ছটায় মনোরম হইয়া প্রকাশিত হইতেছে; তেমনি এক অনন্ত সৌন্দর্য্যময় ও প্রেমময় ঈশ্বরেরই সৌন্দর্য্য এবং প্রেম বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে, সুস্বাদু ও স্নেহকরণায় মনোহর হইয়া এই বিধে প্রকাশিত হইতেছে।

কিন্তু ভক্তের সঙ্গে সকল কবিরই যে উত্তমরূপ পার্থক্য আছে, তাহা নহে। যে কবির মধ্যে কবিত্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, যিনি সৌন্দর্য্য ও ভাবের শেষ সীমায় গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই সৌন্দর্য্যময় প্রেমস্বরূপকে দর্শন করিয়া ভক্ত হন। এজন্য ভক্তিতেই কবির কবিত্বের চরমোৎকর্ষ—ইহা বলা যাইতে পারে।

এখানে আর একটি কথা। ভক্তিতেই কবির কবিত্বের চরমোৎকর্ষ, তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু ভক্তের অন্তরে ভক্তি সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে কি কবিত্বেরও উন্মেষ হইবে? এই প্রশ্নের জবাব এক কথায় দেওয়া যায় না। প্রত্যেক ভক্ত যখন সৌন্দর্য্য ও ভাবের উপাসক; তখন ভক্তের মনস্থলে যে কবিত্বের মূল ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ভাবের অল্পরূপ ভাষা না থাকায় অনেকেই তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে। ভক্ত অনেক সময় ভগবানের সৌন্দর্য্য ও প্রেমে এমন উন্মত্ত হইয়া যান যে, অন্তরের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিবার মত তাঁহার সংঘম এবং শক্তিই থাকে না।

কিন্তু তথাপি প্রকৃত ভক্তের মধ্যে কবিত্বের সুরণ পরিলক্ষিত হয়। ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত যিনি রচনা করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি ভক্ত। কিন্তু শুধু কি তিনি ভক্ত? কবি না হইলে ভাগবতের স্থানে স্থানে কি কাব্যরস উচ্ছসিত হইয়া উঠিত? প্রাচীন কালের কথা নয় ছাড়াই দেওয়া যাক। এই বাঙ্গলা দেশে প্রকৃত কাব্যের সূচনা ও উহার চরমোৎকর্ষের বিষয় চিন্তা করিলেই দেখি যিনি ভক্ত, তিনিই কবি। আমাদের বক্তব্য বিষয়টি পরিষ্কৃত করিবার পক্ষে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, যে বৈষ্ণবদিগের দ্বারা

বাল্মীকির চিত্ত ভক্তিরসে আর্জ হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবদিগের দ্বারাই বাঙ্গলা সাহিত্যে কবিত্বের বিকাশ হইয়াছে ।

যদি এক একজন প্রসিদ্ধ ভক্তের নাম ধরিয়া আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখি, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই • কবিত্ব ছিল । নানক, কবির ও তুলসীদাসের এক একটি উপদেশপূর্ণ শ্লোক পাঠ করুন, দেখিবেন, উহা ভাবরসে স্তম্ভুর হইয়া উঠিয়াছে । চৈতন্তচরিতামৃতের অথবা চৈতন্ত ভাগবতে ভক্ত চৈতন্তের উক্তি পাঠ করুন, দেখিবেন উহার ভিতর কি কবিত্ব । আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভক্ত চৈতন্তের রচিত দুইটা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি ;—

“ন ধনং ন জনং ন স্তন্যরীং কবিতাং
জগদীশ কাময়ে ।

মম জন্মনি জন্মনাথরে

ভবভক্তির হৈতুকী ত্বমি ।”

জগদীশ ! চাহিনা ত আমি ধন জন
পাণ্ডিত্য স্তন্যরী বারী মনের মতন ।
আমি চাহি জন্ম জন্ম যেন তোমাপরে
অহৈতুকী ভক্তি থাকে আমার অন্তরে ।

“নয়নং পলদক্ষ ধারয়া বদনং

গদগদা রক্তমা পিরা ।

পুলকৈনিত্তিং বপুঃ কথা ভব

নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ।”

হে প্রভু, আমার কবে অশ্রু বিসলিত হবে
নয়ন যুগল হতে, তব নাম করি ;
কবে গদ গদ ভাবে কণ্ঠ রক্ত হয়ে যাবে
পুলকে উঠবে মোর শরীর শিহরি ।

আমাদের এ কালের ভক্তদিগের কথা যদি আলোচনা করা যায়, তবে তাঁহাদের মধ্যেও কবিত্বের বিকাশ দেখিতে পাই। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন যথার্থ ঈশ্বরভক্ত লোক । তাঁহার সরল মধুর এক একটি ধর্মকথা কবির কাব্যগাথার মতই ভাবমাধুর্য্যে - মনোমুগ্ধকারী । তিনি মাছুষের প্রাণের ভাষাটি আবিষ্কার করিয়া ঘেরূপ ভাবে মনের কথা কহিয়াছেন ;— কই ? এমন ত আর কাহাকেও বলিতে শুনি না । তৎপরে আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও মহাত্মা কেশবচন্দ্রের নামোল্লেখ করিতে পারি । শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে ইহারা ই সর্ববাদিসম্মত ভক্ত ছিলেন এবং ইহাদের মধ্যে কবিত্বের স্ফূরণ হইয়াছিল । আমরা পূর্বেই মহর্ষির স্বরচিত “ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান” হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়াছি । তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার মধ্যে কিরূপ কবিত্বের বিকাশ হইয়াছিল ।

এখন ভক্ত কেশবের “সেবকের নিবেদন” গ্রন্থের “দর্শন ও নিরীক্ষণ” শীর্ষক উপদেশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

“ব্রহ্ম পুষ্পের স্থায় ক্রমে ক্রমে ভক্তের নিকট প্রকৃটিত হন । যদিও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ তথাপি তিনি ক্রমে ক্রমে স্তম্ভুর হইতে স্তম্ভুরতর হইয়া উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া সাধকের আত্মাতে প্রকাশিত হন । * * একটি গোলাপফুল যখন কেবল ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার সমুদায় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা অতীব স্তম্ভুর হইয়া প্রকৃটিত হয় । সেইরূপ ব্রহ্মপুষ্প ক্রমে ক্রমে তাহার সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশ করেন ।”

“মধুর যেমন প্রথমে অল্পে অল্পে পুষ্পমধু পান করে, পরে ক্রমশঃ পুষ্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মত্ত হইয়া যায়, ভক্ত সাধকও সেইরূপ প্রথমাবস্থায় বারংবার ঈশ্বরকে দর্শন করেন । * * যদি ভক্তি নয়নে দেখে ব্রহ্মকে নিকটে দেখিতে পাইবে এবং দেখিবে সেই একজন ক্রমাগত নূতন নূতন বেশ করিতেছেন, নূতন নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছেন ।”

ইহা কেবল উৎকৃষ্ট ধর্মকথা নহে । উত্তম কাব্যের এক একটি অংশও বটে । যাহা হোক যাহার অন্তরে ভক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাঁহার চিত্তে কবিত্বেরও উন্মেষ হইবে, তাহা আমরা সপ্রমাণ করিলাম । এখন দেখাইব, যে কবির মধ্যে কবিত্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাঁহার মধ্যে ভক্তিরও স্ফূরণ হইয়াছে । ইহা দেখাইবার জন্য বাঙ্গলা দেশে বিশেষ ক্রেশ স্বীকার করিতে হয় না । সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণ যদি ইহাই হয় যে, উহা পড়িতে পড়িতে ছায়া-শরীরী সৌন্দর্য্য ও ভাব কান্না ধারণ করিয়া পাঠকের সঙ্গীথে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং পাঠকের মনকে মগ্ন করিয়া মুগ্ধ করিয়া এক বিচিত্র-লোকে লইয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রকৃত কবিত্বের উন্মেষ হইয়াছিল বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে, এবং বিকাশ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় । আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে অনেকেই যথার্থ ভক্ত ছিলেন । প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং মানবীয় প্রেমের মধ্য দিয়াই তাঁহারা শিব-স্বন্দরের অনন্ত রূপমাধুরী ও অসীম প্রেম দর্শন করিয়া-ছিলেন । কবি রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের মধ্য দিয়া ভক্তিতে গিয়া পৌছিয়াছেন ; বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও মানবের প্রেমের ভিতরই অসীমের মহা প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছেন ।

বৈষ্ণব কবিদিগের বিষয় সকলেই জানেন । তাঁহাদের ভক্তিরসাত্মক কবিতা সকলেই পাঠ করিয়াছেন । আমরা রবীন্দ্রনাথের ভক্তিরসাত্মক কবিতা সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই স্মরণীয় রচনাটি সমাপ্ত করিব ।

রবীন্দ্র বাবুর কাব্য পাঠ করিলে, উহার মধ্যে কবিত্বের একটি আশ্চর্য্য বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা রবীন্দ্র বাবুর “শৈশব সঙ্গীত” হইতে “মানসী” রচনার সময় পর্যন্ত তাঁহার কাব্যের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীলা ও মানব প্রেমের নানা রহস্তের বিষয়ই অবগত হই। সোনার তরীর সূচনা হইতেই তাঁহার কবিতার মধ্যে একটি উন্নত লোকের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আভাস পাই। তৎপরে চিত্রার মধ্যে উহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। “চিত্রা”র “দেবী” ও “জীবন দেবতা”কে আর মানবীয় ভাবে ধরা হোঁরা যায় না। উহার মধ্যে ঐশ্বরিক ভাবই পরিস্ফুট। “চিত্রা”র “জ্যোৎস্না রাত্রি” প্রভৃতি কবিতার সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য আর জড়ের রূপ মাত্র নহে; উহা চিন্ময় ঈশ্বরেরই অল্পময় মাধুর্য্য। “চিত্রা”র পর “নৈবেদ্যে”র মধ্যে কবি আর কোন কথা কবিত্বের রহস্তজালে আচ্ছন্ন রাখেন নাই। নৈবেদ্যের এক একটি সরল ও ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে ভক্তিরস উছলিত হইয়াছে; এক একটি ক্ষুদ্র পুষ্প যেমন সুগন্ধ ও সুসমার পূর্ণ হইয়া উঠে তেমনি নৈবেদ্যের এক একটি কবিতা সৌন্দর্য্যে ও প্রেমের মিষ্টরসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

তৎপরে রবীন্দ্রনাথের নব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলী যখন মুদ্রিত হইয়াছে, তখন উহার মধ্যে ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। কবি বাণ্যকাল হইতে এ পর্যন্ত নানা অর্থে নানা ভাবে যত কবিতা রচনা করিয়াছেন, এখন তাঁহার “অস্তর্যামী” “জীবনদেবতা”র প্রকাশে সমস্ত কথার একই অর্থ বুঝিতেছেন। তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বর্ণনার মধ্যদিয়া ঈশ্বর আপনারই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন; ঈশ্বর তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া শুধু আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য কবি তৎপ্রণীত “জীবন-দেবতা” কাব্যের “অস্তর্যামী” শীর্ষক কবিতার বলিতেছেন;—

“বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে
শুনতেছিলাম ঘরের ছায়ে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষায় বহিয়া অনলে
ডুবায় ভাষায় নরনের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।

সে মায়া মুরতি কি করিছে বাঞ্ছী।
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি।
আমি চেয়ে আছি বিশ্বয় মানি
রহস্তে নিমগ্ন।”

কবি নৈবেদ্যের একটি কবিতায় বলিতেছেন;—

“কবি আপনার গানে যত কথা কহে,
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি;
তোমা গানে যার তার শেব অর্থখানি।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কেবল যে এই কয়েকটি কথাই বলিয়াছেন, তাহা নহে। নব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রত্যেকখানি কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ যে এক একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন, সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। এই সকল কবিতার মধ্যে কবি তাঁহার কোন কথা ব্যক্ত করিয়াছেন? বলিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বলীলার কাহিনীই তাঁহার সমস্ত কবিতার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি, রবীন্দ্র বাবুর যে সকল হস্ত কৌতুকের কবিতা আছে; তিনি তাহাকেও ঈশ্বরের কৌতুককাহিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবি তাঁহার “কৌতুক” কাব্যের ভূমিকায় ঈশ্বরকে বলিতেছেন;—

* “আজ আসিরাছ কৌতুক-বেশে
মাথিকের হার পরি এলো বেশে,
নরনের কোণে আধ হাসি হেসে
এসেছ হৃদয়-গুলিনে।

* * *
আজ এই বেশে এসেছ আমারে
ভুলাতে।”

যে কবি আপনার সুখ দুঃখ শোক তাপ হ্রাস্তামোহ সকল অবস্থা ও সকল ভাবের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখেন এবং স্বরচিত কাব্যের মধ্যে তাঁহার নানা ভাবের বর্ণনা করেন; তিনি যদি ভক্ত না হন ত ভক্ত কে? আমরা পূর্বে যে সৌন্দর্য্য ও ভাবের নদীর উল্লেখ করিয়াছি; এদেশের অনেক কবি সেই নদীতীরস্থ মায়াপূরীর অপরূপ রাজকন্ডার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং সেই খানেই আবদ্ধ রহিয়াছেন বটে; কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ কোথাও আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি নদী অতিক্রম করিয়া একেবারে সৌন্দর্য্য ও ভাবের সমুদ্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাই সেখানে অনন্তভাবময় অসীম স্নানর পুরুষের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে; এবং তাঁহাকেই জীবন দেবতা রূপে বরণ

করিয়া স্বীয় জীবন ও স্বরচিত কাব্য এই উভয়কেই গৌরব দান করিয়াছেন ।

রবীন্দ্র বাবুর কাব্যগ্রন্থাবলীর পর “খেয়া” শীর্ষক একখানি অতি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে । কাব্যরসগ্রাহী ভক্ত ভিন্ন, ঐ গ্রন্থের সকল কবিতার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা কঠিন বটে । কিন্তু তথাপি উহার অনেকগুলি কবিতা অতিশয় ভক্তিপূর্ণ ও চিন্তাকর্ষক বলিয়া তৎসম্বন্ধেও হু একটি কথা বলিতেছি । আমরা সর্বাগ্রে উক্ত গ্রন্থ হইতে “মিলন” শীর্ষক কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব । কবি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সংস্পর্শে পুলকিত হইয়া বলিতেছেন;—

“আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
জুড়াল হৃদয় জুড়াল—আমার
জুড়াল হৃদয় প্রভাতে ।
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
পরায় কি নিখি জুড়ালো—ভুবিয়া
নিবিড় নীরব শোভাতে ।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
দেখেছি একেলা আলোকে, দেখেছি
আমার হৃদয়-রাজ্যারে ।
আমি ছয়েকটি কথা কয়েছি তা-সনে
সে নীরব সভা মাঝারে—দেখেছি
চির জনমের রাজ্যারে ।
* * *
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে
দেহমন মোর ফুরালো—যেনরে
নিঃশেষে আজি ফুরালো,—
আজ যেখানে বা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো—আমার
আদি অন্ত জুড়ালো ।”

ভক্ত যখন ঈশ্বরকে দর্শন করেন, ঈশ্বরের প্রেমের স্পর্শ লাভ করেন, তখন তাঁহার অন্তরে কি পুলক ও প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাঁহার মস্তকের ভিতর দিয়া কি সুস্বাস্রোত প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহা এই কবিতাটি পাঠ করিয়া পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি । এই কবিতাটি যত বার পড়ি, তত বারই ভক্তিরসে প্রাণ আদ্রুত হইয়া যায় এবং কবির স্তায় ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইবার জন্ত মন ব্যাকুল হইয়া উঠে ।

এখন “খেয়া”র শেষ কবিতাটি উদ্ধৃত করিব । কবিতাটি এই;—

তুমি এপার ওপার কর কে গো
ওগো খেয়ার নেয়ে,

আমি যরের দ্বারে বসে বসে

দেখি যে তাই চেয়ে

ওগো খেয়ার নেয়ে ।

ভাদ্রিলে হাট দলে দলে

সবাই বাবে ঘাটে চলে,

আমি তখন মনে করি

আমিও যাই থেয়ে

ওগো খেয়ার নেয়ে ।

তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার-পানে

তরুণি যাও থেয়ে,

দেখে মন আমার কেমন হয়ে

ওঠে যে পান গেয়ে,

ওগো খেয়ার নেয়ে ।

কালো লগে কল কলে

আঁখি আমার হল ললে,

ওপার হতে সোনার আভা

পরায় কেলে ছেয়ে

ওগো খেয়ার নেয়ে ।

দেখি তোমার মুখে কথাটি মাই

ওগো খেয়ার নেয়ে,

কি যে তোমার চোখে লেখা আছে

দেখি যে তাই চেয়ে

ওগো খেয়ার নেয়ে ।

আমার মুখে রূপ তরে

যদি তোমার আঁখি পড়ে

আমি তখন মনে করি

আমিও যাই থেয়ে

আমিও যাই থেয়ে

ওগো খেয়ার নেয়ে ।”

ঈশ্বরবিশ্বাসী কবি অনেক শোকতাপ পাইয়াছেন । তাই জন্ম ও মৃত্যুরহস্ত পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছেন । জন্ম ও মৃত্যু যে ভবনদীর এপারে ওপারে আসা যাওয়ার ব্যাপার মাত্র, কবি তাহা দিব্যদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন । তিনি ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকের আভাস পাইয়াছেন । শুধু তাহাই নহে । জীবন সন্ধ্যার কত লোকের সংসারের হাট ভাঙ্গিয়া বাইতেছে ; কত লোকের দোকান পাট বন্ধ হইতেছে ;—আর সেই ভবনদীর নাবিক কত লোককে তাঁহার খেয়ার নৌকায় ওপাবে পৌছাইয়া দিতেছেন ;—এই বিচিত্র দৃশ্যও কবির ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে । কবিতায় তাহার একখানি অনুপম চিত্র আঁকিয়া আমাদের মনকে উদ্বাস করিয়া তুলিয়াছেন । এই সুন্দর কবিতাটির সঙ্গে মূর মুক্ত করিয়া ইহাকে একটি সঙ্গীত করা হইয়াছে । রবীন্দ্র বাবুর প্রিয়শিষ্য এবং আমরা প্রথম স্নেহের পাত্র একজন গায়ক যখন কল্পণ ও মধুর স্বরে এই

গানটি গাহিতে থাকেন, তখন সংসারাসক্ত চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়; বহিমুখীন দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য পরকালের দিকে চলিয়া যায়।

আমরা রবীন্দ্র বাবুর কবিতা সৃষ্টিতে অনেক কথাই বলিলাম। ইহাতে আমাদের রচনাটি অতিশয় দীর্ঘ হইল বটে; কিন্তু আশা করি আমাদের বক্তব্য বিষয়টি পরিষ্কৃত হইয়াছে। কারণ পরিষ্কার দেখা গেল যে, রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের মধ্যদিয়া অবশেষে ভক্তিতে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। স্তূতরাং প্রকৃত কবিত্বের সঙ্গে ভক্তির বনিষ্ঠ সম্পর্ক। সৌন্দর্য ও ভাবের মধ্য দিয়া কবির ঈশ্বরের কাছে আসিয়া পৌছানই স্বাভাবিক। অতএব কবির পক্ষে ভক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়; এবং কবির নীতিহীন ও ভক্তিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছুই নাই।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়।

গত বৎসর আমরা রুড়কী গিয়াছিলাম। এখানে বাঙালীদের একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। এই উপনিবেশের কথা আমরা সময়াস্তরে সাধারণের গোচর করিব। এখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাত গাঙ্গের খাল এবং টমাসন কলেজ প্রধান দর্শনীয় বস্তু; কিন্তু যাহা দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত ও আশাবিত্ত হইলাম তাহাই অল্প আমাদের সংক্ষেপে বক্তব্য। রুড়কী প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এখানে এক অভিনব ও গৌরবজনক ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইনি কাচের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্মাণের একটি কারখানা খুলিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই তাহার কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পথের নূতন পথিক নহেন। বহুবর্ষ ধরিয়া তিনি অমাত্যবিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য করিয়া প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক স্টেপলটন, ডাক্তার ই, জি, হিল ও

ডাক্তার লেদার প্রমুখ অনেকেই বেণীবাবুর নির্মিত যন্ত্রাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে ব্যবহার করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছেন এবং প্রশংসা করিয়াছেন।

ভারতে বৈজ্ঞানিক কার্যের প্রসার বৃদ্ধি পাওয়ার উন্নত প্রণালীর বিবিধ যন্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে। কিন্তু বর্তমানে এদেশে সেই সকল যন্ত্র নির্মাণের কারখানা না থাকায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিমোত্তর এদেশের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এবং রুড়কী টমাসন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়-দ্বয়ের অমুমত্যস্বারা একটি ক্ষুদ্র কারখানা খুলিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে নির্মিত যন্ত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি বহুপরীক্ষিত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রের বর্ণনাত্মক সচিত্র পুস্তিকার প্রথম খণ্ড * প্রকাশ করিয়াছেন। তালিকাতুল্য হয় নাই এমন সকল যন্ত্র, নমুনা বা নক্সা পাইলে তিনি প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং সমগ্র যন্ত্র বা তাহার পৃথক পৃথক অংশ নির্মাণ ও সরবরাহ করেন।

ডাক্তার লেদার (Dr. J. W. Leather, Agricultural Chemist to the Government of India) বেণীবাবুর নির্মিত টপ্লার পম্প প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন—“* * * Both the pumps which you made are very well done and so was the other special glass apparatus * * *

ডাক্তার হিল (Dr. E. G. Hill, Professor of Chemistry, Muir Central College, Allahabad). বেণীবাবুর নির্মিত আণবিক গুরুত্ব নির্ধারণক যন্ত্র (Apparatus for the determination of molecular weights by the rise of Boiling point) ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন—“This was made for me by B. M. Mukerjee. The apparatus was well made and blown. It worked excellently * * *” তিনি অল্প একটি যন্ত্র ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন—“This was made for me (by B. M.

* Catalogue of Scientific apparatus—Section I. Vacuum Pumps, Mercury Distillation apparatus, molecular weight apparatus, &c. &c. &c. made by B. M. MUKERJEE, B.A. F.C.S., Roorkee. Printed at the Indian Press, 1907, Allahabad.

Mukerjee). The work was quite good and the apparatus gave good results.”

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় গত

অক্টোবর মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রে বেণী বাবুর কাচের

• যন্ত্র সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ লেখেন, তাহা হইতে কিছু

উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ।

“The catalogue of Scientific Apparatus by Mr. B. M. Mukherji of the Thomason College, Roorkee, is a new departure in the field of scientific activity, which will not fail to enlist the admiration of connoisseurs of Scientific Apparatus in India. * * * It is a pleasure, therefore, to observe signs of great manipulative skill in close association with mental powers of a high order in the various apparatus described in the catalogue under review. So far as we are aware, this is the first time that glass apparatus requiring such skill and finish, have been manufactured and offered for sale in India. The enormous difficulties, Mr. Mukherji has had to encounter, will be evident from the fact that he taught himself the difficult art of glass-blowing with only the meagre help he might have derived from books, which are far from being perfect. In order to learn the art as thoroughly as he has done, it must have cost him years of hard unremitting labour. * * * Some of the apparatus, moreover, are new designs by Mr. Mukherji, and, being very simple and cheap, ought to find a good market.”

মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় কারখানায় এখনো অধিক কারিগর তৈয়ার করিতে সমর্থ হন নাই । কিন্তু সহদয় বৈজ্ঞানিকগণের উৎসাহ ও সহায়ত্ব পাইলে কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে পারেন । এবং তদ্বারা এদেশে রাসায়নিক পরীক্ষাকার্য্য স্থলভ ও সহজসাধ্য হইতে পাবে । কিন্তু এই মহৎকার্য্যে কৃতকার্য্যতার পরিমাণ সরকার বাহাদুরের সাহায্যের পরিমাণের উপরই অধিক নির্ভর কবিতোছে ।

আমরা আশা করি সর্বসাধারণ বেণীবাবুর এই মহৎকার্য্যের সহায় হইবেন । সরকারী, এবং বে-সরকারী সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলিতেই তাঁহার কারখানার যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া দেশবাসিগণ স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করেন ইহাই আমাদের কামনা । বিলাতের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি এদেশে নির্মাণ করাতেই যথেষ্ট গৌরব আছে, অধিকন্তু বেণীবাবু এমন অনেক যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন যাহা তাঁহারই স্বকপোল-

কল্পিত এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব হইতে তিনি বাঙ্গালীর গৌরবের কারণ এবং সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ।

স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন ।

দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ চেষ্টায় বাহারা

লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় মহাত্মা

গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

ইনি ১২৪৯ সনের ৮ই চৈত্র বিক্রমপুরস্থ ডোমশার নামক

এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার পিতা

কাশীচন্দ্র সেন উচ্চবংশোদ্ভব কুলীন বৈষ্ণবসন্তান । গুরু-

প্রসাদ বাবুর বয়স যখন এক বৎসর তখন তাঁহার পিতৃ-

বিয়োগ হয় । ইহার জননী সারদা স্ত্রীরী তখন নিরুপায়

হইয়া কাঁচাদিয়া গ্রামে স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর রাধানাথ সেন

মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন ;—এই মহীয়সী রমণী অতিশয়

বুদ্ধিমতী এবং পরদুঃখকাতরা ছিলেন । গুরু প্রসাদ বাবুর

ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার মাতার এ সমুদয় সদগুণাবলীর

প্রভাব স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল । তিনি ভবিষ্যৎ

জীবনে যে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহাও

তাঁহার মাতার হৃদয়ঙ্গম গুণে । সে সময়ে বিক্রমপুরে

ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় নাই । প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামে

পার্সী শিক্ষার জন্ত এক একটা মস্তব ছিল । ঐ সকল মস্তবে

এক একটা মুন্সীর অধীনে থাকিয়া নিকটবর্তী গ্রামসমূহেব

বালকবৃন্দ বাংলা ও পার্সী শিক্ষা করিত । গুরুপ্রসাদ বাবুর

বাল্যকালেও এইরূপ একটা মস্তবে বিভাগশিক্ষার সূত্রপাত

হয় । তাঁহার মাতুল রাধানাথ সেন সে সময়ে বিদ্বান ও

বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত ছিলেন । তিনি ময়মনসিংহ জজ

আদালতে ওকালতি করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেন ।

তাঁহার নিজের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না । তিনি তাঁহার

এই ভাগিনের গুরুপ্রসাদ সেন ও তাঁহার অপর ভগ্নীর

গর্ভজাত সন্তান স্বকবি শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ গুপ্তকে পুত্র

নির্কির্দেশে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন । উক্ত গুপ্ত

মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইতি পূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত

হইয়া গিয়াছে । গুপ্ত মহাশয়ও গুরুপ্রসাদ বাবুর ছায়

শৈশবে পিতৃহীন হইয়া ইতিপূর্বে তাঁহার মাতুলের আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে উক্ত দুই মাসভূতো ভ্রাতা একত্র এক পরিবারে প্রতিনিয়ত প্রতিপালিত হওয়ার উভয়ের মধ্যে যেরূপ ভালবাসা জন্মিয়াছিল তদ্রূপ স্নেহ ও ভালবাসা এক মাতৃগর্ভজাত সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যেও অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয় না। ষ্টারিক বাবু গুরুপ্রসাদ বাবু হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। ইহাদের মাতুল রাধানাথ সেন মহাশয় যদিও স্বয়ং ইংরেজী বিজ্ঞান পারদর্শী ছিলেন না কিন্তু পারস্ত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তখন বঙ্গদেশে কেবল ইংরেজী বিজ্ঞান ক্ষীণ জ্ঞাতা চতুর্দিকে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। রাধানাথ সেন মহাশয় উক্ত আলোকে ভাগিনেয় গুরুপ্রসাদকে আলোকিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। গুরুপ্রসাদ মক্তব ছাড়িয়া ইংরেজী বিজ্ঞান অর্জন করিতে বন্ধবান হইলেন। ইনি বালাবধি অতিশয় মেধাবী ছিলেন। যে বয়সে অন্ত বালকগণ খেলিয়া বেড়ায় গুরুপ্রসাদের অধ্যয়নে একান্ত মনোমগ্নিত। সে সময় হইতেই পরিলক্ষিত হয়। তখন আজকালকার মত গ্রামে গ্রামে ইংরেজী বিজ্ঞালয় ছিল না, বর্তমান সময়ের মত প্রতি গ্রামে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যাও দেখা যাইত না, গুরুপ্রসাদ এমন দিনে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার বহু পরে বিক্রমপুরে কাউলিপাড়ার বাবু দিগের যত্নে তাঁহাদের বাসস্থানে একটা ইংরেজী বিজ্ঞালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বাবু ত্রিপুরা চরণ দাস সেই বিজ্ঞালয়ের প্রথম শিক্ষক হইয়াছিলেন। ইহার অশিক্ষাশুণে বিক্রমপুরে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই সময়ে স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ কবি চৈবর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের প্রবর্তিত ‘প্রভাকরে’ যে কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাঙ্গি কয়েক পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল।

“ত্রিপুরা চরণ দাস,

দিলেন সুন্দর চাষ

“বেঘের” সে বেগ হ’ত,

মলিন কুলীন যত •

গাঙ্গুলী লাঙ্গুলি হ’ল সার।”

সে সময়ে বিক্রমপুরের মধ্যে “বেঘে” গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণ-গণের বাসস্থান ছিল। ইহঁরাই তৎকালীন বিক্রমপুরস্থ হিন্দু সমাজের নেতা ছিলেন। কি দীন, কি ধনী সমাজস্থ ছোট বড় সকলেরই ইহঁদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিতে

হইত। ইংরেজী শিক্ষার সাম্যভেরী নিনাদিত হইলে ইহঁদের কঠোর শাসন তিরোহিত হইবার উপক্রম দেখিতে পাইয়াই বোধ হয় কবি এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন। গুরুপ্রসাদ বাবুর ইংরেজী শিক্ষা স্বীয় মাতুল রাধানাথ সেন মহাশয়ের উপাধ্বনিস্থল ময়মনসিংহে আরম্ভ হয়। এই স্থান হইতেই তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ’ন। ইহার পর যথাক্রমে ঢাকা কালেক্স হইতে এক এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন ও পরিশেষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কালেক্স হইতে বি এ ও এম এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পূর্বে বিক্রমপুরে কেহ বি এ পরীক্ষায় পাস করে নাই। এই সময়ে তাঁহার মেধাশক্তির কথা সর্বত্র এইরূপ ভাবে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের অধিবাসিবর্গ দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। গুরুপ্রসাদ বাবু সর্ব প্রথমে প্রেসিডেন্সী কালেক্সের অধ্যাপক নিযুক্ত হ’ন। পরে বি এল পরীক্ষায় পাস করিয়া প্রথমে কৃষ্ণনগরে ও পরে বেহার অঞ্চলে ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া বাঁকিপুর গমন করেন। গুরুপ্রসাদ বাবু চিরকালই তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, অস্ত্রের নিকট আপনার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জায়বুদ্ধি কোন দিনই বিসর্জন দেন নাই। কোন এক ক্ষুদ্র কারণে পার্টনার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হওয়ার তিনি “চিরদিন ভিক্ষা করিয়া থাকিব তথাপি অপরের দাসত্ব করিব না” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সরকারী কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনা হইতেও তাঁহার যথেষ্ট স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার দিনে চাকুরীজীবী বাদ্যলীর পক্ষে এইরূপ একটা উচ্চ পদের আশায় জলাঞ্জলী দেওয়া কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতঃপর তিনি বাঁকিপুরে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই বাঁকিপুরই তাঁহার জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছিল। এই বেহার অঞ্চলেই তিনি ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল বাপন করিয়া ইহার অশেষ কল্যান সাধন করিয়া গিয়াছেন। আইনের কূটতর্কে তাঁহার সুস্থ বুদ্ধি দেখিয়া একদিকে যেমন লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইত অপরদিকে তেমনি প্রত্যেক দেশহিতকর কার্যে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা ও যত্ন দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত।

পাটনা অঞ্চলে গুরুপ্রসাদ বাবুর বাইবার পূর্বে বেহারিগণ নীলকর সাহেব দিগের অত্যাচারে সর্বদা অর্জুনিরিত থাকিত। তাঁহারি বন্ধে নীলকরদিগের অত্যাচার একরূপ নিবারিত হয়। শুনিয়াছি রাজপুরুষগণের খামখেয়ালীতে বেহারিগণ অনেক সময় অস্তায় রূপে উত্থিত হইতেন, কিন্তু গুরুপ্রসাদ বাবুর ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে এবং তাঁর প্রতিবাদে শীঘ্রই সে সকল প্রশমিত হয়। আজ কাল Behar Landholders' Association নামে বেহার প্রদেশের ভূস্বামিগণের যে রাজনৈতিক সর্ববিধ আলোচনার সভা আছে উহাও গুরুপ্রসাদ বাবুর বহু চেষ্টা ও যত্নে স্থাপিত হইয়াছিল।

তিনি আজীবন ইহার সম্পাদক থাকিয়া বেহার অঞ্চলের বহু হিতাহুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। বেহারের অভাব ও অভিযোগ জানাইবার জন্য তিনি "Behar Herald" নামক যে ইংরাজী সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দিয়াছেন তাহা জীবিত থাকিয়া অত্য়পি তাহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এখানি বেহার প্রদেশের সর্বপ্রথম কাগজ। তৎপূর্বে কি ইংরাজী, কি হিন্দী, কোন ভাষাতেই কেহ কোন সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন নাই। গুরুপ্রসাদ বাবু যত দিন জীবিত ছিলেন গভর্ণমেন্টের সামান্য অত্যাচার ও অবিচারে তিনি এরূপ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন যে গবর্ণমেন্টও বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয় নাই, সর্ব বিষয়েই তাঁহার স্মৃতি প্রধাবিত হইত। বেহার প্রদেশে শিক্ষার অভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি সেই স্থানে নিজ ব্যয়ে এক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। সেই বিদ্যালয়ের পরিচালনের ভার পরিশেষে কোনও সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করেন ও উহা পরিশেষে বর্তমান T. K. Ghosh's Academyর সহিত মিলিত হয়। দীন দরিদ্রের জন্য গুরুপ্রসাদ বাবুর হৃদয় যথার্থই কাঁদিত, তিনি বহু নিঃস্ব গরিবের সন্তানকে প্রতিপালন ও নিজের ব্যয়ে নিজের বাসায় রাখিয়া বহু শিক্ষার্থীর শিক্ষার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

চিরকাল বেহার প্রবাসে জীবনাতীত করিয়াও তিনি শতশ্রমলা বঙ্গজননীর স্নেহ বিস্মৃত হ'ন নাই। "দূরে রহিয়াও মাতৃভূমির সর্ববিধ আন্দোলনেও হিতাহুষ্ঠানে যোগদান

করিতেন। পূর্বে বঙ্গ হইতে গুরুপ্রসাদ বাবু একবার ছোট-লাটের আইন সভার সদস্য হইয়াছিলেন। পূর্বে বলিয়াছি যে বিক্রমপুরস্থ কাঁচাদিয়া গ্রামে গুরুপ্রসাদ বাবুর মাতুলালয় ছিল; উক্ত গ্রাম পদ্মার কুক্ষিগত হইলে পর কাঁচাদিয়া গ্রাম-বাসিগণ কামার খাড়া নামক গ্রামে আসিয়া স্ব স্ব বাসস্থান নির্মাণ করেন। গুরুপ্রসাদ বাবুর ভ্রাতা শ্রীব্রজ দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয় উক্ত গ্রামের "স্বর্ণগ্রাম" নামকরণ করিয়া যে সকল জনহিতকর কার্য করিয়াছেন গুরুপ্রসাদ বাবুর সে সকল কার্যের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি বিজ্ঞমান ছিল। অধিকাংশ স্থলে তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

তিনি এক সময়ে সরল বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ছিলেন, এমন কি উক্ত ধর্মে দীক্ষিত পর্যন্ত হইয়াছিলেন। সময়ে তাঁহার সে মত কতকাংশে পরিবর্তিত হইলেও তিনি হিন্দু সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। সমাজের মঙ্গলজনক কোন কার্য সম্পাদনেই তিনি ভীত হইতেন না। গুরুপ্রসাদ বাবু শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার পুত্র ও জামাতৃবৃন্দকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং নিজেও প্রাচীন বয়সে ভ্রমণোদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন। ইংরাজী ভাষার যদিও তিনি কয়েক খানা পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তথাপি বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না। সেকালের সুবিখ্যাত "সোমপ্রকাশ" পত্রে তিনি যে সকল প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

১৩০৭ সনের ২৮শে আশ্বিন বাঁকিপুরে তাহার দেহান্ত হয়।

অমলেন্দু গুপ্ত।

গোয়ালিয়রে জমী ও গ্রাম।

সম্পাদক মহাশয় গত পৌষ সংখ্যায় যে বাঙ্গালীর চাকুরী ত্যাগ করিয়া স্বাধীন বৃত্তি ও শিল্পবাণিজ্যাদি ব্যবসায় অবলম্বন করার প্রয়োজন অল্পভব করিয়াছেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। যে সকল বঙ্গবাসী কিছুকাল প্রবাসে বাস করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে দেশের জলবায়ু বা আবহাওয়ার দ্রব্যাদি এতই প্রতিকূল যে অধিকাংশ যে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাস করা একপ্রকার কষ্টকর ও ব্যর্থিময় বিবেচনা

করেন। অতএব প্রবাসে যাহাতে বাকালিঙ্গ বজায় রাখিয়া বাস করিতে পারেন তাহার চেষ্টা বিধিগত আদর্শগণের কর্তব্য। প্রবাসী পত্রিকায় ৪র্থ ভাগের ৪৭০ পৃষ্ঠায় যে “মাহেন্দ্র যোগ” প্রবন্ধে সিদ্ধিয়ার মহারাজার দেশস্থিত জমী গ্রামাদির নূতন ধরণের বিলিব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায় তাহা তৎপরে উক্ত প্রবন্ধের নায়ক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং “প্রবাসীর” ৫ম ভাগের ৪৯৬ ও ৭০২ পৃষ্ঠায় বিবৃত করিয়াছেন, ও ৬ষ্ঠ ভাগের ১৫৭ পৃষ্ঠায় ও তাহার অন্তর্ভুক্ত জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়াছেন। সকল রাজ-কার্যেই অনেক গোলযোগ ও বিলম্ব ঘটে। শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্তমান সিদ্ধিয়া মহারাজ নিত্যকাল অমায়িক ও কর্মঠ ব্যক্তি। তাঁহার নিম্নতন কর্মচারীরাও ক্রমে ক্রমে স্তম্ভ ও স্তম্ভজিত জ্ঞানশীল হইতেছেন। ইহাতে ভরসার কথা আমি বিশেষ বলিতে পারি। এক্ষণে বীনাগুনা রেল লাইনের ধারে যে তিনটী ষ্টেশন আছে, অর্থাৎ পাছার সাদোরা, ও পাগারা, তাহার নিকটবর্তী স্থানে কয়েক ঘর বাকালী গিয়া বাস আরম্ভ করিয়াছেন। আমি জানিতে উৎসুক যে তাঁহাদের কার্যের কি রূপ অবস্থা। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা একটা কোম্পানিকে বিশেষ লাভজনক সর্বোত্তম গ্রামাদি প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ জানিব্যবস্থা আবশ্যিক। কোম্পানি মহারাজার আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ অর্থাৎ যেমন কোম্পানি অ্যাক্ট, ইংরাজরাজ্যে আছে তদ্রূপ মহারাজাও বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানির মস্তব্য গুলি সংক্ষেপে নিম্নে দিতেছি।

(১) জমী গ্রামাদি মালব প্রদেশে অথবা অন্তর্ভুক্ত সিদ্ধিয়া রাজ্যে গ্রহণ করিয়া স্ববন্দোবস্ত করিয়া কৃষি কার্যের উন্নতি ও তৎসঙ্গে ফ্যাকটরি ও কল কারখানাদি করিয়া কৃষি উৎপন্ন জীব্যাদি বিদেশে প্রেরণ না করিয়া নিকটবর্তী স্থানেই উহা ব্যবহার্য রূপে প্রস্তুত করা। যেমন, তুলা মালব প্রদেশে প্রস্তুত উৎপন্ন হইয়া থাকে জিনিং মিল, প্রেস তথা স্পিনিং মিল ও বুনানি কারখানা স্থাপন করিয়া সেই তুলাকে কাপড় রূপে তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করা। অথবা ইক্ষু ও খেজুর হইতে শুড ও চিনি তৈয়ার করা।

(২) ব্যক্তিগত কার্য।

(৩) কল ও পুষ্ক বগান ও তৎসংক্রান্ত কারবার।

(৪) ঘোড়া, গরু, ছাগল, ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জন্তুগণের কারম।

(৫) হৃদয় মাখনের কারম ইত্যাদি।

এক্ষণে মালবা প্রদেশে প্রায় ৭৮ শত গ্রাম সিদ্ধিয়া সরকারে রাজস্ব আদায় করিতে পারে না ও সেই গ্রামগুলিকে “টুট” গ্রাম কহে। উক্ত কোম্পানিকে যে কোন টুট গ্রাম হউক না কেন লইতে অসম্মতি হইয়াছে। এবং তাহার সর্ব এইরূপ।

১। গত পাঁচ (৫) বৎসরে রাজস্বের বেরূপ গ্রামখানি হইতে আয় হইয়াছে তাহার বাৎসরিক গড়পড়তা হিসাব করিয়া তাহা হইতে ৮ (আট) টাকা শতকরা কম করিয়া যে টাকা হইবে তাহা কোম্পানিকে উক্ত গ্রামের দরুন খাজানা দশ বৎসর পর্যন্ত দিতে হইবে। তৎপরে দশ বৎসরের অন্তর দশম বৎসরে যে প্রজা বিলি প্রত্যেক গ্রামে হইবে অর্থাৎ জমাবন্দীর মোট হইবে তাহা হইতে পনেরো (১৫) টাকা শতকরা বাদ দিয়া বাকী যে টাকা হইবে তাহা রাজস্ব দিতে হইবে।

২। এই বিশ বৎসরে অভাব পক্ষে শতকরা ১৫ হিসাবে গ্রামের চাষের উন্নতি করিতে হইবে।

৩। যদি কোন অংশীদার কোন বিশেষ গ্রাম জমীদারী হিঃ লইতে চাহেন তো কোম্পানির সুপারিশের মত সিদ্ধিয়া দিবেন। অবশ্য সেলামী টাকা বা রাজস্ব তখন বাধ্য হইবে ও অংশীদার সম্মত হইয়া লইবেন।

৪। কল কারখানা ও বাটী ইত্যাদি কোম্পানির যাহা এমারস ইত্যাদি হইবে তাহার পুরা মালিক কোম্পানিই থাকিবেন।

এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে এইরূপ সর্বোত্তম আদর্শগণের প্রবাসী বাকালীর একটা বা বহু উপনিবেশ মালব প্রদেশে অনারাসে স্থাপিত হইতে পারে। এবং শ্রীযুক্ত মহারাজার রূপায় আরো বিশেষ সুলভ বন্দোবস্ত হইতে পারে। তবে একটা বিষয় অত্যাবশ্যক—তাহা এই যে মোং লঙ্কর গোরালিঙ্গবাসী বঙ্গবাসী মাজেই এই বিষয় যোগদান করিয়া মহারাজের পার্শ্ববর্তী অমাত্যগণকে সর্বদা সহযোগী করিয়া রাখেন। বা যাহাতে আদর্শগণের অন্তর্ভুক্ত একজন বা দুইজন সর্বদা মহারাজের সাহচর্য করিয়া আদর্শগণের কার্যকলাপ

তাহার সর্বদা গোচর করিতে থাকেন এরূপ করা চাই। আমার ভরসা আছে যে চেষ্টা করিলে এই কার্যে বিস্তর বঙ্গবাসীর অন্ত হইবে। অবশ্য আশা উচ্চ। কিন্তু আরম্ভেই যে একেবারে আশার উচ্চতম চূড়া অবিকার হইবে তাহা অসম্ভব। চেষ্টা করিলে শ্রীযুক্ত মহারাজা আরও স্থলভ সর্বত্র গ্রামাদি দিতে পারেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে লাভ কোথায়? গত পাঁচ বৎসরে এই সকল “টুট” গ্রামে রাজার রাজস্ব ৫০ হইতে ৭০ টাকা শতকরায় বেশী হয় নাই। তাহার যে রাজস্ব পূর্বে আদায় হইত, তাহা অনারুণি ও প্লেগ কলেরা প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাতে এই ছরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অল্প সংখ্যক গ্রাম একেবারে নির্জন হইয়াছে। তাহার উপর সিদ্ধিয়ার নিম্ন কর্মচারীরা অত্যাচার করায় আর সরকারী টাকার আর পুরা হয় না। এবং মহারাজার বন্দোবস্ত সন্থ ১৯৬০ সালে নতুন করিয়া হওয়ার কথা ছিল। সেই নিমিত্ত প্রজারাও সকল কুপ ও বাণী ও জলাশয় গুলি কতক কতক নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। বাহতে তাহাদের জমা অধিক বৃদ্ধি না হয়। সেই নষ্ট কুপাদি উদ্ধার করিতে সামান্য খরচ পত্র হইবে বটে।

এই বিষয়ে কার্য আরম্ভ করিতে হইলে ন্যূন কয়েক পৌনে দুই লক্ষ টাকার মূলধন আবশ্যক—অর্থাৎ একটা উত্তম জিনিং ও প্রেস করিতে ১লক্ষ ও বক্সী জমীদারী ও গ্রামাদির বন্দোবস্ত জম্ম। আমার বিবেচনা হয় যে এই টাকা আক্ষর্য সমস্ত প্রবাসী বঙ্গবাসী একত্রিত হইলে অনায়াসে হইতে পারে। অথবা জিনিং প্রথম বৎসর না করিলে ক্ষতি নাই। প্রথম বৎসর গ্রাম গুলির বিলি ব্যবস্থা করিতেই যথেষ্ট পরিশ্রম ও চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন হইলেই যথেষ্ট হইবে।

কোম্পানির অধীনে (অঙ্গীকার হইয়া) বাহারা চাষ বাস কার্য করিবেন তাহারা স্থলভে করিতে পারিবেন ও একটা বড় কার্যের সংশ্রবে থাকি প্রযুক্ত বন্দীমান হইয়া করিতে পারিবেন। এক্ষণে যে কয়টা বঙ্গবাসী তথায় আছেন সকলেই স্বতন্ত্র ভাবে কার্য করিতেছেন। যদিও আমরা তৃণবৎ তথাপি কোম্পানি করিয়া গুণপ্রাপ্ত হই না কেন?

যদি কেহ বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন তো আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীকালীপদ বসু,

উকীল, মীরট।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

(পত বর্ষের শেষ সংখ্যার পর।)

মোটের উপর এক কথা এই পুস্তক অসামঞ্জস্যের প্রতি একটি নিপুণ কশাঘাত। ইহা মূল আখ্যান হইতে ছোট ছোট অবান্তর ঘটনা পর্যন্ত—যেমন যুদ্ধির চাচার বাবু পুত্র হারানের চিত্র, যুগল বৈকুণ্ঠী যুবতী বল্লভ বুদ্ধ বৈরাগী ইত্যাদি—সকলগুলিতেই খাটে।

এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে এক একটি অতি সামান্য ঘটনার নিপুণ চিত্র ক্ষয়টাকে ভরিয়া দেয়। যেমন চরিত্রপীড়িতা যুবতী বিধবা মুসলমানীর একনিষ্ঠ মধুর প্রেম, মধু ঘোষার নিমন্ত্রণ ইত্যাদি দুই চারি কথায় ফুটিয়া মনোহর হইয়াছে।

এই গ্রন্থের সকল চরিত্রই এমন স্রষ্ট্রিত যে সকলগুলিরই পরিচয় দিবার প্রয়োজন সংবরণ করা হয়সাধ্য। তথাপি গ্রন্থগত অপরাধের পার্শ্বচরিত্র বিবরণের আবশ্যক নাই পাঠক সহজেই তাহাদের পরিচয় পাইবেন। এই ক্ষমার বাঁধা, স্রষ্ট্রিত, বিপুলকার গ্রন্থ দেড় টাকা মাত্র খরচ করিয়া যিনি পড়িবেন তিনিই শিক্ষামূলক আনন্দ উপভোগ করিবেন।

পরিশেষে বঙ্গবাসী সামাজিক উপস্থাসের কথোপকথনে সকল স্থলে চলিত কথা ব্যবহৃত না হইয়া মাঝে মাঝে সাধুভাষা ব্যবহৃত হওয়ার রসভঙ্গ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে (সম্বর হইবে) আশা করি এই ত্রুটি সংশোধিত হইলে ভালো হয়।

বঙ্গীয় কবি (অষ্টম খণ্ড)—শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত প্রণীত। আধীন ত্রিপুরা, আগরতলা বঙ্গীয় কবি কাৰ্যালয় হইতে প্রকাশিত। অষ্টাংশিত ক্রাউন ৬৭৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ২১০ টাকা। ইহাতে বঙ্গভাষার অতীত কালের বৈচিত্র্যাত্মক লেখকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাহাদের রচিত গ্রন্থাদির স্থূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দীপেন বাবুর মূল্যবান মত সমর্থন করিয়া আমরাও বলি ‘পুস্তকখানি বহু পরিশ্রমে রচিত হইয়াছে। এরূপ ঐতিহাসিক গ্রন্থের বিশেষ আবশ্যক আছে; এই সমস্ত উপকরণ দ্বারা বঙ্গভাষা ভবিষ্যতে নানারূপে উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার ভবিষ্যতে ‘বিপ্র-খণ্ড’, ‘কায়স্থ-খণ্ড’, ‘ইসলাম-খণ্ড’ প্রভৃতি ক্রমে সর্বজাতীয় লেখকগণের বিবরণ প্রকাশ করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। সকল লোকের মধ্যে কবিরাই শুধু জাতিহীন বা সর্ব-জাতিক; তাহাদেরও এমন জাতিবিভাগ বাহ্যনীর নহে। কিন্তু যেকোন এই বিভাগের সূত্রপাত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে গ্রন্থকারকে মার্জ্জনীয় মনে হয়। বৈচিত্র্যাত্মক মধ্যে কবিস্বকৃষ্টি কতদূর হইরাছিল ইহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গীয় কবির অষ্টম খণ্ড রচিত হইয়াছে; অন্তঃপত্র বিবরণ সম্পূর্ণ করিবার জন্য লেখককে জাতি অনুসারে কবি জীবনী প্রকাশ করিতে হইবে। বঙ্গের সুদূরপ্রাচীন ত্রিপুরার যেকোন পরিচয় মুজাফফন সম্পন্ন হইয়াছে তাহা বঙ্গরাজধানীর বহু মুদ্রাশালার অনুকরণীয়। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষাভারাগী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক—শ্রীশিবরতন মিত্র সম্প্রদিত। ইহাতে ৮ম খণ্ড। মূল্য ১ টাকা। এখানি বঙ্গভাষার পরলোকগত যাক্তীয় সাহিত্য-সেবকগণের বর্ণনাত্মক সচিহ্ন চরিত্রাভিধান। ‘ন’ প্রায়-

শেব হইয়া আসিয়াছে। এই পুস্তকখানি বঙ্গ সাহিত্যের একটি মহৎ অভাব দূর করিবে। ইহার মত চরিতাভিধান বাংলায় আরো আবশ্যক আছে। কোনো কোনো লেখকের নাম ও পরিচয় মিতান্ত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, সংগ্রহকর্তার এদিকে আরো অধিক ‘মনোযোগ ও অমূল্যমান আবশ্যক। তবুও ইহাতে বহু অজ্ঞাতপূর্ব লেখকের পরিচয় কিছু না কিছু পাওয়া যায়। এরূপ গ্রন্থ সাধারণের নিকট অমূল্যবোধের অঙ্গই অপেক্ষা রাখে; ইহা আপনাতঃপুর্বে আপনিস প্রচারিত হইবে।

অশ্রমমালা—অসমাহম্মদী সিংহ প্রণীত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা। এবং কলনাকুহুমমালা—ঐহমহম্মদী বঙ্গ প্রণীত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১৩৫ পৃষ্ঠা, মূল্য বারো আনা। দুখানিই কবিতা পুস্তক। সোআহম্মদী ভাষায় মনের সাধারণ চিত্রা হুসে প্রকাশ পাইয়াছে। দুই একটি পঙ্কে কবিত্বের অক্ষুট আভাস আছে। অশ্রম-মালার ‘স্বপ্ন-দ্রষ্ট’ কবিতাটি বেশ লাগিয়াছে। উভয় পুস্তকেই হুম ও ভাষার আবাধ প্রবাহ আছে; কাব্যশৈলী অশ্রমমালা কিঞ্চিৎ পরিপুষ্ট।

সতী সীলা—ঐনিস্তার্কী দেবী রচিত। ৭৫ পৃষ্ঠা, অষ্টাংশিত ক্রাউন। মূল্য ছয় আনা। ইহাতে একটি পতিপ্রাণা নারীর সতী স্বরকার উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। দাম্পত্য ঐতিহ্যের একটি অতি মনোরম কাহিনী ইহাতে হুমের সরস ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। লেখিকার পুরাতন বা সাধারণ ঘটনাও নতুন করিয়া, ঐতিকর করিয়া বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আছে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া হুণী হইয়াছি বলিয়া দুই চারিটি ক্রটির-উল্লেখ করিব। প্রথম, আখ্যানবর্ণনার কলা-চাতুর্যের অভাব; গ্রন্থের প্রথম করেক ছত্র পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় ঘটনা কোন দিকে গড়াইয়া কিরূপে পরিসমাপ্ত হইবে; ইহাতে পাঠকের কৌতুহল ক্ষীণ হইয়া ধৈর্যহানি ঘটে। দ্বিতীয়, সাধু ভাষার মধ্যে মধ্যে চলিত, অপভ্রংশ শিথিল পদ যোগে ভাষার মাধুর্য কতিপয় হইয়াছে। তৃতীয়, স্থানে স্থানে অনবধানতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। যেমন মুসলমান সন্ন্যাসের, হিন্দু ধারবান একই ব্যক্তি এক স্থানে পাড়ে ও অপর স্থানে চোবে হইয়াছে।

চতুর্থ—আখ্যায়িকার সকল চরিত্রগুলি পরিকাররূপে বিকশিত হয় নাই। ঐশ্বরবেগম, চুড়িওয়ালী ও নীর মহম্মদের চিত্র চেষ্টা করিলে এই অল্প পরিসরের মধ্যেই প্রফুল্ল হইতে পারিত। ভবিষ্যতে অবহিত হইয়া আখ্যায়িকা বর্ণনার কলাতনপূর্ণ যোগ করিতে পারিলে ইহার রচনা আরো ঐতিকর হইবে। পুস্তকের শেষে করেকটি এবং প্রথমে একটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি ভাব, ভাষা ও ছন্দের দৈর্ঘ্যে অতি সাধারণ রকমের হইয়াছে। লেখিকার পঙ্ক রচনা অপেক্ষা পঙ্ক রচনার যথেষ্ট নিপুণতা আছে। তাঁহার অনুশীলন দ্বারা পঙ্ক রচনারই উৎকর্ষ সাধনে যত্নবতী হওয়া উচিত। পুস্তকের ছাপা কাগজ পরিকার।

সাবিত্রী—ঐবদন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিবৃত মহাভারতের উপাখ্যান। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা। এই পুস্তকে বিশেষ কিছুই নাই। পুস্তকশেষে গ্রন্থকার সাতা ও কস্তার কথোপকথন ছলে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্রত অনুষ্ঠান দ্বারা মননশক্তির বৃদ্ধি হয় এবং সেই শক্তিতে অসাধ্য সাধন হইতে পারে। সেই ব্রত ধাম্বতুর্কা লইয়া নাড়াচাড়ার নহে পরন্তু সেই ব্রত মানসিক। এই হুমের কথাটির অবতারণা করিয়াছেন মাত্র কিন্তু লেখক তাহা অঙ্গনাগণের বোধগম্য করিতে পারেন নাই। পুস্তকের ভাষাও সরস নহে, সাধু ভাষার মধ্যে মধ্যে মিতান্ত্র চলিত অপভ্রংশ মিশ্রিত হইয়া প্রতিকটু হইয়াছে, ব্যাকরণ চুট শব্দও বহুস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার সাবিত্রীকে সোধোদন করিয়া ভারতীয় জমদীপকে তাঁহার সতীত্বের ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে ব্যস্ততাহেন। সাবিত্রী পত্নীর আদর্শ, জননীর নহেন।

কৌমুদী ও কুহুম—ঐশ্রীশগোবিন্দ সেন প্রণীত। পুস্তকপৃষ্ঠা যথাক্রমে ডিমাই দ্বাদশাংশিত ৪৮ ও ৪৫, মূল্য প্রত্যেক পুস্তকেরই চারি আনা। দুই খানিই কবিতাপুস্তক, কারণ ইহার। যেমনই হোক ছন্দে প্রণীত, অধিকন্তু পুস্তকের মলাটের উপরে ছাপার অঙ্করে ‘কবিতা পুস্তক’ লেখা আছে। পুস্তকের ভূমিকায় বেশ উপনিবদ, পুরাণ সংহিতা, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া অধৈতবাদ, মার্য, আত্মা, আর্ধ্য সত্যতা ইত্যাদি কত অসংলগ্ন কথা গাঁথিয়া এক বিরাট হৈয়ালি রচিত হইয়াছে। ইহা ‘পণ্ডিতে বুদ্ধিতে নারে বৎসর চিন্তে’। কবি এক স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন ‘More is meant than meets the ear’—আমরা এই কবির কাব্যে সেরূপ ভাবের অনুকরণ ত দেখিলাম না, হৃদয়ে প্রতিধ্বনিও অতি-অল্প কবিতাই তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। একটি নোকের বড় জোর প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে—

‘কথা আছে রস নাই আমাদের কবিতার’। পরেই কবি বলিতেছেন

‘আসে মনে বা যখন এল মেল বকে যায়;

জগতের কবিগণ নিশ্চয় পাগল হায়?’

‘আত্মবৎ সমস্তে জগৎ’ এ প্রবচন নেহাৎ মিথ্যা নয়। তারপর কবির উক্তি—‘পাঠক পাগল হ’লে কবিতা বুঝিতে পারে’। আমাদের এমন কবিতা তবে বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা বাহ্য বুঝিয়াছি তাহাতে কবিতা-গুলি অতি সাধারণ রকমের বলিয়াই বোধ হইয়াছে। দেশের মহাপুরুষ দ্বিগুণে লক্ষ্য করিয়া যে সকল সনেট লিখিত হইয়াছে সেগুলিও শুধু রূপগুণের ছন্দোময়ী তালিকা হইয়াছে। কোনো কবিতাতেই অবাধ ভাবপ্রবাহ বা ভাষার ঝঙ্কার নাই। কবি একজন বৈতর রকমের রাজসত্ত্ব। যুবরাজ ও লাট মিষ্টার শুভাগমন উপলক্ষে বাংলা ইংরাজি পঙ্কে নির্জলা স্তুতি গান করিয়াছেন। ভারতের সমস্ত কবির ধারণা—

‘হীন বীর্ঘ এবে ভারত সম্ভান,

ইংলণ্ড প্রসাদে পুষ্ট কলবর।’

এবং

Immense are the blessings heap'd on India,

The labouring swains reap a fruitful field?

লর্ড মিটো সমস্ত কবির ধারণা—

A right man in a right place at a time

When the people are in a heated mood?

টিকা নিম্নরোজন।

হোমিও-পাথা—ঐকুলচন্দ্র দে প্রণীত। অষ্টাংশিত ক্রাউন ৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। এখানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পঙ্ক পুস্তক লেখকের পঙ্ক পঙ্ক রচনার বেশ শক্তি আছে। এমন নীরম বিষয়ও বেশ সরস হুমের করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠ করিতে করিতে ভক্তারি জ্ঞানসের Homeopathic Mnemonics নামক ইংরাজি পদ্যগ্রন্থ মনে পড়ে। সখের প্রথম শিক্ষার্থী বা অন্তঃপুত্রিকার। ইহা পাঠে বিশেষ আমোদ ও শিক্ষা লাভ করিবেন, হোমিও-প্যাথি চিকিৎসার মূলতত্ত্বগুলি দ্বিগুণে শৃঙ্খলার পরিবৃত্ত হইয়াছে। পদ্য মুগ্ধ শাকিবার সহায়, অধিকন্তু ইহা অতীব সরস ও কৌতুকময় হইয়াছে। পুস্তক খানি কুস্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। এমন বই ভ্রমপ্রবাহ শুল্ক হওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই হইবে আশা করি। তখন এই ক্রটির সংশোধন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বাক্সালার পুরাবৃত্ত—ঐপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ, বিএল, প্রণীত। অষ্টাংশিত ফুলস্কাপ ৩৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা। ইহাতে বাংলার প্রাকৃতিক অবস্থা, ভূতত্ত্ব, জীবজন্তু, শিল্প ও উৎপন্ন প্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, জাতিতত্ত্ব, বঙ্গদেশের কল্যাণক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বিভাগ, এবং বঙ্গদেশে আর্ধ্যগণের আগমন কাল হইতে খ্রীষ্টাব্দে ১৭০০ শতাব্দী

পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজি, পার্সী, সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি ভাষার ঐতিহাসিক উপকরণের সহিত লেখকের চিন্তা, আলোচনা ও মৌলিক গবেষণা প্রভৃতির সংযোগে বইখানি বড় উপায়ের হইয়াছে। একত্র সংক্ষেপে এত ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হওয়ার ইতিহাস-সিদ্ধান্ত পাঠক ও ভবিষ্য ঐতিহাসিকের পরম উপকার সাধিত হইয়াছে। লেখকের সকল সিদ্ধান্তই যে অশ্রান্ত তাহা লেখকও স্বীকার করেন না; এবং এরূপ গ্রন্থ কখনো নিতান্ত আধুনিক গবেষণার অনুসারী (up-to date) হইতে পারে না। এসব ত্রুটি অনিবার্য এবং ধর্তব্য নহে। তথাপি আমরা ছই একটির উল্লেখ করিব। ভবিষ্য পুরাণ নিতান্ত আধুনিক, তাহাকে কোনো সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি করা যুক্তি সঙ্গত নহে। লেখক মাল ও কোচ জাতি এক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কারণ উভয় জাতিরই জাতির প্রতীকভাগ একই প্রকারের এবং উভয়ের প্রধান দেবতা মনসা। এরূপ সিদ্ধান্ত আরো প্রমাণসাপেক্ষ। লেখকের ধারণা জলাচরণের জাতি মাজই আর্ঘ্য, অম্বুধা অনাৰ্ঘ্য। হাড়ি মুচি ভোম প্রভৃতি জাতি অনাৰ্ঘ্য। লেখক তুলিয়া গিয়াছেন যে পুরাকালে জাতি গুণের তারতম্যানুসারে সামাজিক উন্নতি অবনতি লাভ করিত। ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু প্রমাণ করিয়াছেন যে হাড়ি, মুচি, ভোম প্রভৃতি আধুনিক অস্ত্রজ জাতি এককালে ব্রাহ্মণ ছিল, সামাজিক শাসনে তাহাদের দুর্দশা ঘটয়াছে। এবং বিখ্যাতের মত বহুব্রাহ্মণত্বের জাতি ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছে দেখা যায়। এই সমস্তার মীমাংসা ভারতীয় সার্বজাতিক তুলনা ব্যতিরেকে হওয়া দুষ্কর। পৌড় জাতি হইতে গোয়ালার উৎপত্তি শুধু অনুমান, প্রমাণ কে? বাংলার অপরাপর জাতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রাশংসনীয় হইলেও এখনো নির্দ্বন্দ্ব নহে। বাহাই হউক এই বইখানি পড়িয়া আমরা অনেক শিখিয়াছি ও শ্রীত হইয়াছি। বই খানির ছাপা ভালো। কাগজে বাঁধা শক্ত মলাটে বহিঃ সৌভবও সুন্দর হইয়াছে। এমন একখানি পুস্তকে বিবরণাত্মক শ্রুতি ও বর্ণনাত্মক নির্দিষ্ট পত্র না থাকার বড়ই অভাব ও অগ্রবিধা বোধ হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয়ভাগ শীঘ্রই প্রকাশ হইবে, তাহাতে যেন এ ত্রুটি না থাকিয়া যায়। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, বাঙ্গালীর সংখ্যা ৮ কোটি। একুত সংখ্যা আর সাড়ে চারিকোটি।

ঠাকুরমার ঝুলি বা বাঙ্গালার রূপকথা—ঐদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। ছপার রয়াল বোডশানিত ২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। আমাদের ঠাকুরমার ঝুলি লুপ্ত আর হইয়াছিল দক্ষিণা বাবু তাহা কুড়িয়া ব্রহ্মসরস-মিষ্টান্নকণাগুলি বক্সীর শিশুগণকে পরিবেশন করিয়াছেন। ইহাতে শুধু শিশু নয়, শিশুর পিতামাতাও তৃপ্ত। যে বাড়ীতে এই মিষ্টান্ন ঝুলি প্রবেশ করিছে, সে বাড়ীতে শিশুর দোহান্না কর্মিরাছে, ধোকা খুকি পড়ার মন দিয়াছে; কেবল বিপদ বাড়িয়াছে ছেলেরের একই সময়ে সকলের ইচ্ছা অধিকার করিবার চেষ্টায় কাড়াকাড়ি ঝগড়া মারামারি কোলাহল ক্রম্ভনে। প্রত্যেক শিশুকে এক খামি কিনিয়া দিলেই মিষ্টান্ন। পুয়াতন গল্প দক্ষিণা বাবুর কবির ভাষায়, ঠাকুরমার ব্রহ্মসরস কণ্ঠস্বরে বাজু হইয়া বড় ঐতিকর হইয়াছে। পুস্তকের বাহ্য সৌভবও সুন্দর, রঙীন কাপীতে ছাপা, দক্ষিণাবাবুর মিলজাতে আঁকা বহুচিত্রসূচিত। চিত্রগুলিতে কলানৈপুণ্য না থাকিলেও শিশুর মনোহর হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালকের সহচর হোক।

মিত্রাভঙ্গ—ফুলমালা ক্রমের প্রথম খণ্ড। ঐক্ককদাস আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত। প্রাচীনত্বান এলবার্ট লাইব্রেরী, লক্ষবপুর, ঢাকা। মূল্যের উল্লেখ নাই। এই অতি ক্ষুদ্র বই খানি যখনই সম্পাদক মহাশয়ের মিকট হইতে সমালোচনার জন্য পাইলাম; তখনই ঐটান বঙ্গদর্শনে স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর একটি সমালোচনা মনে পড়িল। বঙ্কিম বাবু কোনো

একখানি অতি ক্ষুদ্র পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে 'এই পুস্তক খানি লম্বে ৩ ইঞ্চি, প্রস্থে ২.১০ ইঞ্চি; ইহা পশ্চিমবঙ্গের পকেটে লিপিপুটের আয়তানি।' বর্তমান পুস্তকখানিও লিপিপুটীয়; ইহাও লম্বে ৪ ইঞ্চির কম ও প্রস্থে ৩ ইঞ্চির একটু বেশি। অর্থাৎ ফুলমালাপ বোডশানিত ৪৪ পৃষ্ঠা মাত্র। ফুলমালার এই ছোট্ট একটু কুড়ি কিন্তু রূপে গুণে অনিন্দ্য; মালা সম্পূর্ণ হইলে মালীর নিপুণতা ও মালার সৌরভ সকলকে মুগ্ধ করিবে আশা করি। এই ছোট্ট বই খানির একটু বিস্তৃত পরিচয় দিব।

এই গ্রন্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত; ছন্দে প্রাণ ও প্রবাহ আছে; প্রতি পংক্তিতে কবির আছে; বর্ণনার মাধুর্য্য আছে; ভাবে গভীরতা আছে। সমালোচকব্রত অবলম্বন করিয়া এমন প্রাণ ভরিয়া প্রশংসা করিতে শ্রাস্তই পাই না বলিয়া ক্ষুদ্র থাকি; আশ বরি ঐতির আধিক্যে একটু অত্যাতি যট্টে ত' ঘটুক। লেখককে আমি চিনি না, কখনো নামও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তথাপি পরম সমাদরে তাহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে আবাহন করিতেছি। তাঁচার লেখনী স্রবন্ত হউক।

এই গ্রন্থের আখ্যায়িকা এই—তপাবনে শান্ত পবিত্র কুটীরে বনবালা জননী শিশু লইয়া বাস করিতেন; সেবিশিষ্ট সারংপ্রাতে উষ্মরাত্তরে সূর্যের পানে নির্মমেব চাহিয়া উদাস গভীর পাখা পাছিতে গাহিতে আনন্দহারা হইয়া যাইত; যখন আনন্দ থাকিত তখন সিংহশিশু ধরিয়া খেলা করিয়া ভবিষ্য বলবিক্রমের পরিচয় দিত। কৈশোরে সেই বালক 'বনে বনে বহু হাতে দুগরার আলো' ঘুরিত, দেতাগণ দ্বারা ঋত্বিকগণের যজ্ঞবিদ্য দূর করিত। তার পর দ্বিধিকরী পুত্র বনবাসিনী মাতাকে রাজরাজেশ্বরী করিয়াছে; কিন্তু ত্রমে ঐশ্বর্য্যবাসন পুত্রকে মত্ত ও অসতর্ক করিয়াছে, শত্রু আসিয়া মাতার লাঞ্ছনা করিয়া গিয়াছে। তখন পুত্রের চেতনা আসিল কিন্তু তখন মাতার চিতাত্তর মাত্র অবশেষ। কঠোর সাধনান্তেও মাতৃসাক্ষ্য যখন ঘটিল না তখন হতশ পুত্র রক্তের নদীতে ডুব দিল, কিন্তু মরিল না, রাজরাজেশ্বরী মাতাকে পুনর্বার লাভ করিয়া রত্নবেদীতে স্থাপন করিয়া উল্লাসে আবেশে মাতি, জননীকে চাহি, সন্তান উঠিল গাঁহি বশে মাতরম্।'

সরস্বতী নদীতে যেখানে—

‘প্রকৃতির জ্বাল শয়ন—

চির-স্নান-তৃণ-রেশা মিশিয়াছে আসি

পূণ্যতোয়া কলোনি আশ্রমবাহিনী

সরস্বতী-রোপা-রেশা মনে। নব পথে

স্নানপরিচ্ছদে দাঁড়াইয়া বৃক্ষগুলি

প্রদানিছে তারে চিত্র-ছায়া।’

সেখানকার প্রভাত ও সন্ধ্যার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যে কয় ছত্র লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

‘স্নান মুখে মিশারাপি

চকিত নরনে দেখিলা চাহিয়া দূরে

পশ্চিম গগনে, হাড়ি তারে নিশানাথ,—

প্রিয় তার—গিয়াছে চলিয়া। ত্রস্ত পদে

পাছে পাছে তার নিশারাপি গেলা চলি

হৃদয় পশ্চিমে। নব দুর্কাল পরে—

পাছের পাতায়, রাপি গেলা বিরহের

পুত অশ্রুমালা। উষ্ম অচল পথে

সলাজ বয়ানে, লাজ-রক্ত ছুটাইয়া

উবারাপি আশ্রি বরি দিলা দিন-মাথে।

* * * * *
 উজ্জলি পড়িল আসি
 অন্তগামী তপনের সোণার কিরণ
 বালকেব প্রফুল্ল আননে। * *
 * * * * *
 বিপ্লবে বালক চাহি
 দেখিল অদূরে স্বচ্ছতোষা তটিনীর
 রক্তের রেখা হইয়া গিয়াছে সোণা।
 চাহিল আকাশ পানে, দেখে শুধু সোণা,
 ধরণীর পরে দেখে সোণামাখা সব।
 * * * * *
 সার্দ করি দিবসের খেরা, দিনমণি
 জ্বল পাড়ে গেলা চলি ধীরে। পগনের
 স্বর্ণবেশা গুলি সন্ধ্যার ধূসর ছায়ে
 হইল বিলীন। তটিনীর স্বর্ণজলে
 কালো ছায়া উঠিল ফুটিয়া। * *।'

মুজা-রাক্স।

চিত্র পরিচয়।

আমরা বর্তমান সংখ্যায় দুটি তিব্বতদেশীয় বুদ্ধমূর্তির চিত্র প্রকাশিত করিলাম। মূর্তি দুইটি তিব্বতীয় হইলেও ইহাদের ভাব সম্পূর্ণ ভারতবর্ষীয়; এ দুটিতে মঙ্গোলীয় শিল্পের কোন চিহ্ন নাই বলিলেও হয়। তিব্বত হইতে আনীত অধিকাংশ ধাতব শিল্পদ্রব্যের মত এ দুটিও সম্ভবত নেপালী শিল্পীদের নির্মিত। এই দুটি মূর্তি হাবেল সাহেবের মতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় অকুমাৰ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা।* যে সকল সমালোচক কেবল শরীরসংস্থানবিজ্ঞার যথাযথ অনুবর্তনেই শিল্পীর গুণ দেখিতে চান, তাঁহারা এ দুটিতে অনেক খুৎ ধরিতে পারিবেন, কিন্তু বাঁহারা উচ্চতর শিল্পনৈপুণ্যের আদর বুঝেন, তাঁহারা এ দুটির মুখাবয়ব আদিতো ব্যক্ত

• ধর্মভাব ও গাভীর্ষ্য এবং সমুদয় ছবিখানির পরিকল্পনাব অমুরাগী না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

• প্রথম ছবিটি সমস্তই তাম্রনির্মিত ও গিণ্টিকরা, এবং পিটিয়া গড়া। কেবল মূর্তিটির মস্তক ও দেহেব উর্দ্ধদেশ এবং

"These two figures represent the highest type of modern Indian Fine Art. Critics who only look for merit in anatomical precision will find much to cavil out in them, but those who can appreciate higher artistic qualities cannot fail to admire the dignity and religious feeling in the expression of the figures and the beautiful design of the composition as a whole." E. B. Havell, *Technical Art Series*, 1900.

পাদদেশের সিংহ মূর্তি দুটি ঢালা। বুদ্ধের অবতার পদ্মের উপর উপবিষ্ট, বামহস্তে একটি ঘণ্টা ও দক্ষিণে বজ্র ধারণ করিয়া আছেন। ঘণ্টা দ্বারা মঙ্গলকর্ত্তা প্রেতান্ধারা আহত ও বজ্রদ্বারা অমঙ্গলের কারণীভূত দুই আত্মারা তাড়িত হয়। বুদ্ধের এই অবতারকে তিব্বতীয়েরা বজ্রধর বুদ্ধ কহিয়া থাকে।

দ্বিতীয় মূর্তিটি সমস্তই তাম্রনির্মিত, গিণ্টিকরা, এবং ঢালা। বুদ্ধের এই অবতারের নাম অমিতাভ বা অমিতায়ুধ বুদ্ধ। ইহাকেই তিব্বতীয়েরা পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়া থাকেন। তিনি দুই হাতে নির্ঝাণামুতের ভাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভাসমূহে রাজকীয় বার্ষিক আয়ব্যয়ের আলোচনা হইয়া গেল। ভারতবর্ষীয় সভ্যগণের কেবল বক্তৃতা করার পরিশ্রমই সার বলিলেও চলে। গবর্ণমেন্ট প্রধানতঃ নিজের স্বার্থ অনুসারেই ব্যয়ের বন্দোবস্ত করেন। সেই জন্ত জনসাধারণকে ভীত করিয়া রাখিবার জন্ত এবং বহুসংখ্যক ইংরাজেব অন্ন-সংস্থানের নিমিত্ত এক অতি বৃহৎ সৈন্তদল পোষণ করা হইতেছে, প্রায় সেই উদ্দেশ্যে পুলিশের ব্যয়ও ক্রমাগত বাড়ান হইতেছে। অপর দিকে জনসাধারণের শিক্ষার দিকে সরকারের দৃষ্টি নাই। ভারতবর্ষীয়গণ কিসে শিল্প বাণিজ্যে উন্নত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি নাই। লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া ও প্লেগে মারা বাইতেছে; তাহার প্রকৃত প্রতিকারের চেষ্টা নাই। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে, তাহা নিবারণের চেষ্টা নাই।

আমরা জানি যে সকল বিষয়ে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি বা চেষ্টা নাই বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটিতেই সরকার কিছু না কিছু চেষ্টার উল্লেখ করিতে পারেন। কিন্তু যেমন "পিত্তি রক্ষা" পর্য্যাপ্ত আহ্বান নয়, তেমনি এই সকল চেষ্টাও ফলদায়ক নহে। এগুলি লোক দেখান চেষ্টা;—সভ্যজগতের নিকট মান রক্ষার উপায় মাত্র।

হুজিঙ্কেই কথা-ধরুন। ইংরাজেরা বলেন অনাবৃষ্টিতে

হুর্ভিক্ষ হয় ত আমরা কি করিব? অর্থাৎ অনাবৃষ্টির দরুন শস্ত উৎপন্ন হয় না বলিয়া হুর্ভিক্ষ হয়। ইহার উত্তর বিবিধ। অনাবৃষ্টির প্রতিকার খাল ও কূপ খনন। তাহা কি গবর্ণমেন্ট যথেষ্ট পরিমাণে করিয়াছেন? বিদেশী লৌহব্যবসায়ীদের লাভের জন্ত রেলওয়ে লাইন বাড়ান দরকার; বিলাতী জিনিষ দেশের সামান্য গ্রামটি পর্যন্ত চালাইয়া উহার কাটুতি বৃদ্ধি ও স্বদেশী শিল্পের বিলোপ সাধন জন্ত রেলওয়ে বাড়ান দরকার; দেশের সর্বত্র অতি শীঘ্র সৈন্তদল চালান করিতে পারিলে জনসাধারণ সর্বদা ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিবে, স্বাধীনতার চেষ্টা করিবে না, সুতরাং রেল বাড়ান দরকার। প্রধানতঃ এই সব কারণে রেল বাড়িতেছে। ইহাতে আমাদের যে সুবিধা কিছুই হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু রেল বিস্তৃতিতে আমাদের শিল্পগুলি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র মারা গিয়াছে, ম্যালেরিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে এবং দেশের শস্ত বৎসর বৎসর অধিকতর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। বেগের দ্বারা হুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থানে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ও সহজে শস্ত আমদানী করিয়া লোকের প্রাণরক্ষা করা যায়, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু রেলের দ্বারা হুর্ভিক্ষ নিবাসিত হয় না। তাহার প্রমাণ এই যে বেগ বাড়ি সত্ত্বেও পূর্বাপেক্ষা ঘন ঘন হুর্ভিক্ষ হইতেছে, হুর্ভিক্ষ ভীষণতর এবং বিস্তৃততর স্থানব্যাপী হইতেছে। বেলে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার অর্দ্ধেকও খাল ও কূপে ব্যয়িত হইলে দেশের অবস্থা এমন হইত না।

তাহার পর দ্বিতীয় কথা এই যে আমাদের দেশে হাজার অজন্না হইলেও সমুদ্র অধিবাসীর জন্ত যথেষ্ট ঋণ থাকে। কেবল অধিবাসীদের কিনিবার টাকা না থাকায় তাহার আশ্রমে মারা পড়ে। তাহার প্রমাণ এই যে আমাদের দেশ হইতে খুব হুর্ভিক্ষের সময়ও বিদেশে শস্ত রপ্তানী হয়। অর্থাৎ বিদেশের লোকে যত দাম দিতে পারে, আমরা তাহা দিয়া দেশের শস্ত দেশে রাখিতে পারি না। আমবা ধনশালী হইলে সব শস্ত নিজেদের আহারের জন্ত দেশে রাখিতে পারিতাম। কি স্ববৎসব কি চুবৎসর, বর্তমান-কালে ইংলণ্ডে ইংবাজদের আহারের জন্ত যথেষ্ট গম কোন বৎসরই হয় না; যত দরকার আন্না তাহার সিকি পরিমাণ হয়। যদি দেশে অজন্না হইলেই হুর্ভিক্ষ হইত, তাহা

হইলে ইংলণ্ডে চিরহুর্ভিক্ষ বিরাজমান থাকিত। কিন্তু সেখানে ত হুর্ভিক্ষ হয় না। কারণ, তথাকার লোকে শিল্প-বাগিচা দ্বারা এরূপ ধন উপার্জন করে যে বিদেশ হইতে ঋণ কিনিয়া আনিতে পারে।

আমরাও এক সময়ে পৃথিবীতে শিল্পবাগিচার জন্ত বিখ্যাত ছিলাম। কোম্পানীর রাজত্বের সময় প্রধানতঃ নানা আইনকানুন ও অত্যাচারের দ্বারা সে সব নষ্ট হইয়াছে। ভারতের সহস্রাধিক বন্দর এখন আর নাই; এখন যে কয়টিতে ঠেকিয়াছে, তাহা আজুলে জোনা যায়। আমাদের বিদেশগামী শত শত জাহাজ ছিল; সে সবও নাই। আমাদের সরকার সাহিত্য, দর্শন ও পুঁথিগত বিজ্ঞান মুখস্থ কবাইয়াছেন, নিজেদের কার্যসৌকার্য্য কেরাণী ও নিম্নতর কর্মচারী সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু খুব সাবধানতার সহিত শিল্পবাগিচা শিক্ষা হইতে দূরে রাখিয়াছেন।

এখন উপায় কি? অত্যন্ত সভ্য দেশে প্রজারা যে ট্যাক্স দেয়, তাহা তাহাদের মঙ্গলার্থে ব্যয়িত হয়; আমাদের টাকা প্রধানতঃ ইংবাজের সুবিধার জন্ত খরচ করা হয়। আমরা প্রতিবাদ করিলে কেবা শুনে? আমাদের টাকা আমাদের কাজে লাগিতেছে না। আমরা বিরক্ত হইয়া যদি প্রতিবাদ করা পর্যন্ত ছাড়িয়া দি, তাহা হইলে তাহাতে গবর্ণমেন্টের সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা নাই। কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করি বা না করি, দেশরক্ষা ত আমাদের কাছেই করিতে হইবে। একবার সরকারকে ট্যাক্স দিতেছি, অতিরিক্ত মাত্রাতেই দিতেছি। আবার দেশের হিতেব জন্ত টাকা দেওয়া সহজ নহে। কিন্তু দিতেই হইবে। যে পাশে আমরা পরাধীন হইয়াছি, তাহাব প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। সেই প্রায়শ্চিত্ত অর্থ দিয়া, বুদ্ধি বিজ্ঞা দিয়া, দেহপাত, প্রাণপাত করিয়া করিতে হইবে। আমাদের যে পরিমাণ অধোগতি হইয়াছে, আমাদের আত্মোৎসর্গ, সেই পরিমাণে আমাদের জীবনব্যাপী, আমাদের সর্বশক্তিগ্রাসী হওয়া চাই। নতুবা উদ্ধার নাই। আমাদের যুগপৎ সকল দিকেই লাগিতে হইবে। অল্পকষ্ট নিবারণ, সাধারণ ও অর্থকরী বিজ্ঞানদান, দেশের স্বাধীনতা, দেশের লোকদের চরিত্রোন্নতি, সকল দিকেই চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। ঘুমাইবার সময় নাই, আলস্বেব সময় নাই,

বিলাসব্যসনের সময় নাই, হাসিবারও সময় নাই। এখন
কঠোর তপস্বী ও সাধনার সময়।

শ্রীতির দেহের পরাণ 'মেহের'
চাণেরে মোহের স্বপ্ন।

ওগো ও মিত্র, অতি-পবিত্র
তোমার চিত্রতুলিকা ;
বিবিধ বর্ণে সুরভি পর্ণে
একেছ পুণ্যকলিকা।

কবি-সম্ভাষণ ।

(কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের উদ্দেশে রচিত ।)

(১)

সরস ব্যঞ্জে হাসির রঙ্গে
বিপুল বঙ্গ-মঞ্জলি-
করিছ স্রষ্টি বচন মিষ্টি,
আত্ম-শ্রেষ্ঠ কঙ্কলি সে।
ছাড়েনা চাদর "বিলাতি বাদর,"
হচ্ছে তামেরো স্মৃতি ;
পাচ্ছে দণ্ড যতেক ভণ্ড
"চণ্ডী" "নন্দ" ইত্যাদি।

(২)

শুধু কি হাসাও ? কাঁদিয়ে ভাসাও,
পাষাণে বসাও চিহ্ন ;
রূপসী নবীন "পাষাণী" প্রতিমা
রচিবে কে তোমা ভিন্ন ?
তাপেতে তপ্তা সে অভিশপ্তা
কাঁদিলে মুক্তা বরে ;
কুড়ায়ে সে ধন সতীরা এখন
হারের রতন করে।

(৩)

'হিরা' গুণবতী করুণামুরতি
'দৌলত' সতীরত্ন ;

(৪)

মহান উচ্চ দীপ্ত সূর্য
দেবতাপূজ্য "গৌতমে"
হেরিবা মাজে ভক্তিনেত্রে
মলিন চিত্ত ধৌত হে।
জড়তাবৃত্ত চেতনালুপ্ত—
আধারে স্তম্ভ মহীতে
নবভাসুতাপ প্রসারি "প্রতাপ"—
আনিল প্রভাত চকিতে।

(৫)

হাসিয়ে হাসাও, কাঁদিয়ে কাঁদাও,
শৌর্য্যে মাতাও প্রাণ ;
বিভবে গরবে অক্ষয় হবে
এ ভবে তোমার গান।
রহি পবিত্র, সরস নিত্য,
পাশরি চিত্ত-ব্যথা,—
বিবিধ ছন্দে মধুরে মস্তে
গাহু দ্বিজেন্দ্র, গাথা !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।



স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন ।

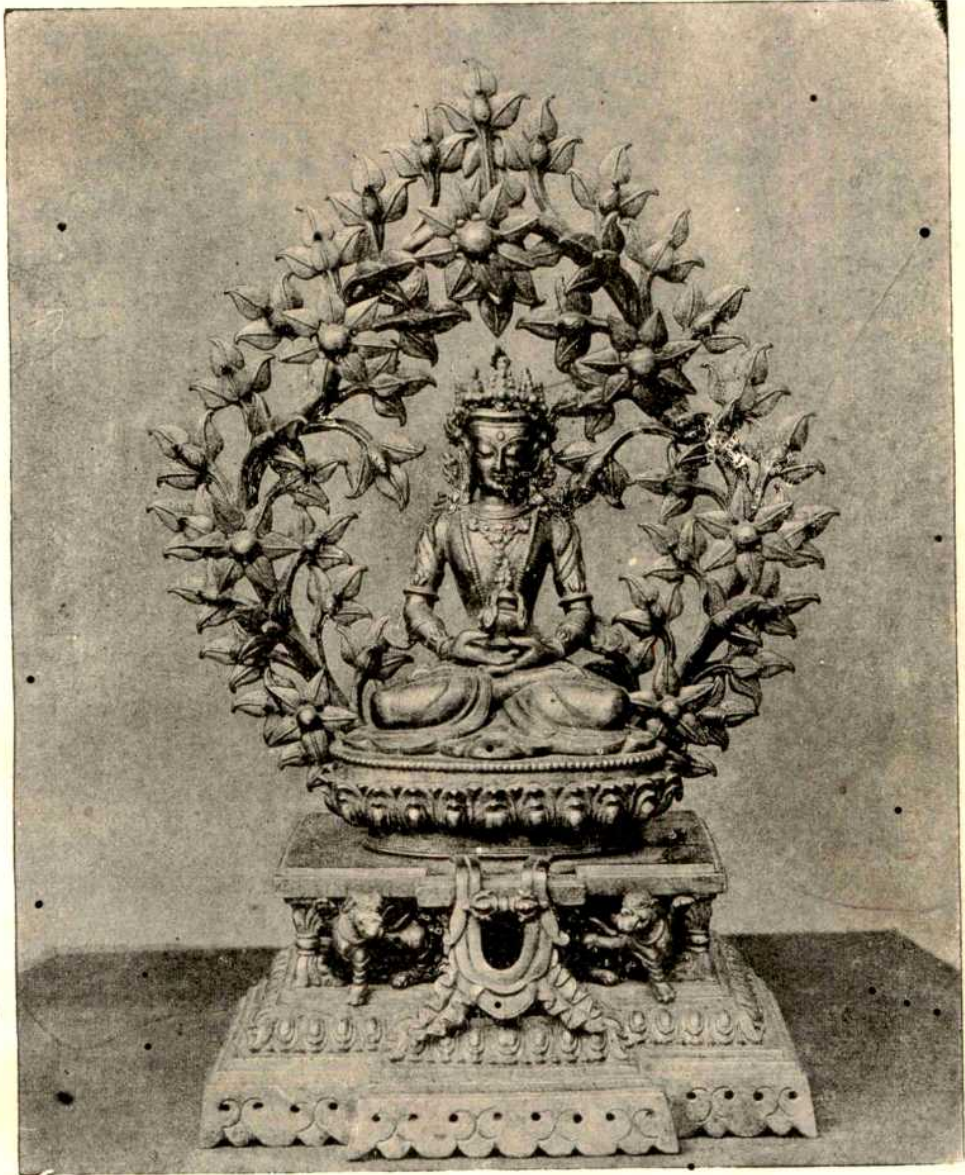


কুকি পুখ।

কুকি জ্বীলোক।

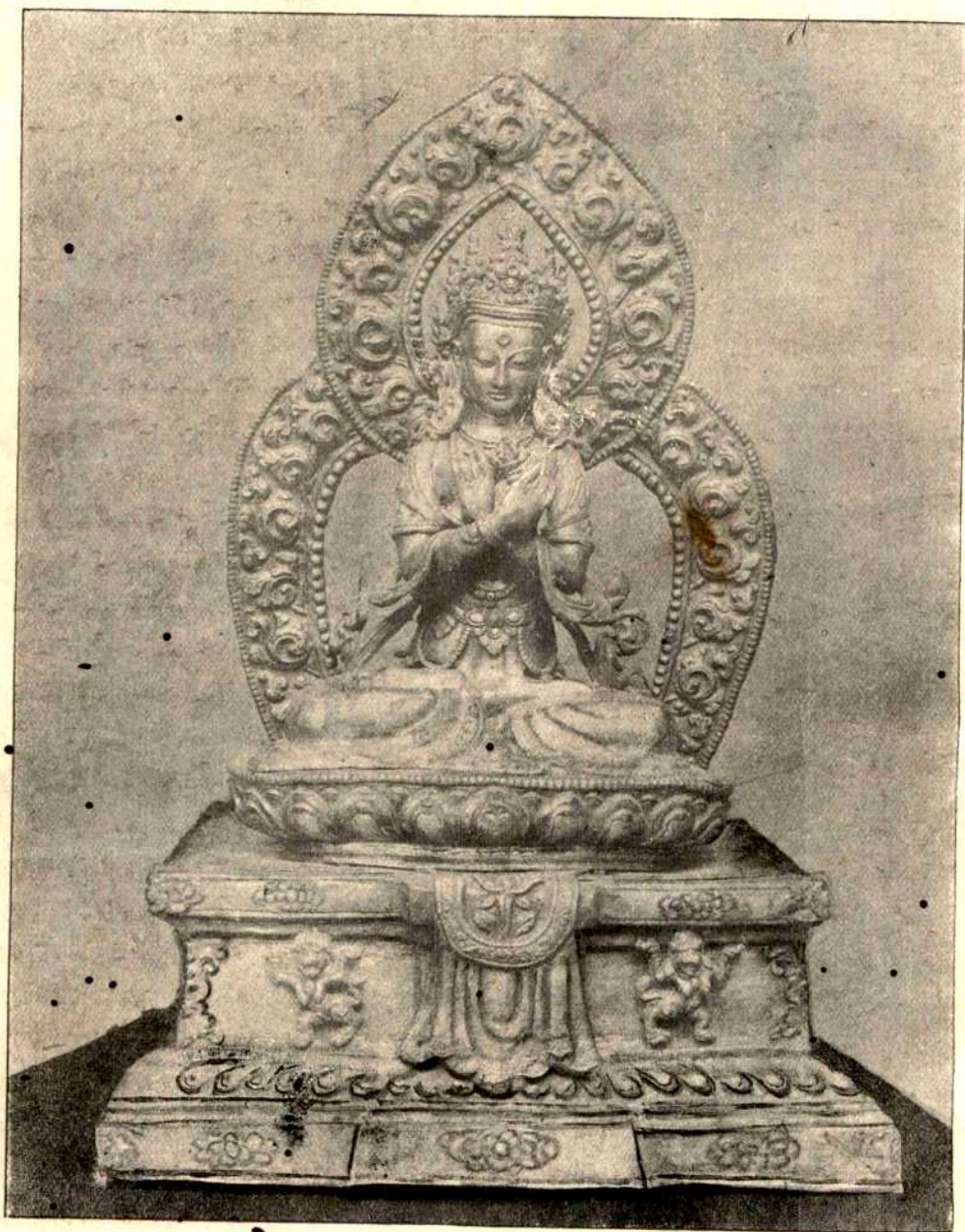


প্রবাসী ।



অমিতাভ বা অমিতায়ুষ বুদ্ধ ।

প্রবাসী ।



বজ্রধর বুদ্ধ ।



শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী ।

শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে ।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

৮ম ভাগ ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫ ।

২য় সংখ্যা ।

গোরা ।

২২

গোরা তাহার স্বাভাবিক দ্রুতগতি পবিত্যাগ করিয়া অশ্রমনস্কভাবে ধীরে ধীরে বাড়ি চলিল। বাড়ি ঘাইবার সহজপথ ছাড়িয়া সে অনেকটা ঘুরিয়া গঙ্গার ধারেব রাস্তা ধবিল। তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বনিকুসভ্যতার লাভ-লোলুপ কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন নীবে ব্রিজের বেড়ি পরে নাই। তখনকাব শীতসন্ধ্যায় নগরের নিঃশ্বাসকালিমা আকাশকে এমন নিবিড় করিয়া আচ্ছন্ন করিত না। নদী তখন বহুদূর হিমালয়ের নির্জন গিরিশৃঙ্গ হইতে কলিকাতার ধূলিলিপ্ত ব্যস্ততার মাঝখানে শান্তির বার্তা বহন করিয়া আনিত।

প্রকৃতি কোনো দিন গোয়ার মনকে আকর্ষণ কবিবার অবকাশ পায় নাই। তাহাব মন নিজের সচেষ্ঠতার বেগে নিজে কেবলই তরঙ্গিত হইয়াছিল;—যে জল স্থল আকাশ অব্যবহিতভাবে তাহার চেষ্টাব ক্ষেত্র নহে তাহাকে সে লক্ষ্যই করে নাই।

আজ কিন্তু নদীর উপরকার ঐ আকাশ আপনার নক্ষত্রালোকে অভিষিক্ত অন্ধকাব দ্বাৰা গোবাব হৃদয়কে

রারধার নিঃশব্দে স্পর্শ কবিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ। কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে, আর, কতকগুলি দীপহীন নিস্তরঙ্গ। ওপারের নিবিড় গাছগুলিব মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই উর্দ্ধে বৃহস্পতিগ্রহ অন্ধকাবের অন্তর্ধামীর মত তিমিরভেদী অনিমেঘ দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।

আজ এই বৃহৎ নিস্তরঙ্গ প্রকৃতি গোয়ার শরীর মনকে মেন অভিভূত করিয়া দিল। গোবার হৃৎপিণ্ডের সমান তাগে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি এতকাল ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির হইয়াছিল—আজ গোয়ার অন্তঃকরণের কোন্ দ্বারটা খোলা পাইয়া সে মুহূর্তের মধ্যে এই অসতর্ক দুর্গটিকে আপনার করিয়া লইল। এতদিন নিজের বিজ্ঞাবুদ্ধি চিন্তা ও কণ্ঠ লইয়া গোরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল—আজ কি হইল? আজ কোন্‌খানে সে প্রকৃতিকে স্বীকার করিল এবং করিবামাত্রই এই গভীর কালোজল, এই নিবিড় কালো তট, ঐ উদার কালো আকাশ তাহাকে বরণ করিয়া লইল। আজ প্রকৃতির কাছে কেমন কবিয়া গোরা ধরা পড়িয়া গেছে।

পথের ধারে সদাগরের আপিসের বাগানে কোন্‌ বিলাতী লতা হইতে একটা অপরিচিত ফুলের মৃদুকোমল গন্ধ গোরাব

ব্যাঙ্কল হৃদয়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। নদী তাহাকে "লোকালয়ের অশ্রান্ত কর্মক্ষেত্র হইতে কোন্ অনির্দেশ্য স্রুদের দিকে আবুল দেখাইয়া দিল ;—সেখানে নির্জন জলের ধারে গাছগুলি শাখা মিলাইয়া কি ফুল ফুটাইয়াছে—কি ছায়া ফেলিয়াছে!—সেখানে নির্মল নীলাকাশের নীচে দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্নীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া। চারিদিক হইতে মাধুর্যের আবর্ত আসিয়া হঠাৎ গোরাকে যে একটা অতলস্পর্শ অনাদি শক্তির আকর্ষণে টানিয়া লইয়া চলিল পূর্বে কোনো দিন সে তাহার কোনো পরিচয় জানিত না। ইহা একই কালে বেদনার এবং আনন্দের তাহার সমস্ত মনকে একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে অভিহৃত করিতে লাগিল। আজ এই হেমন্তের রাত্রে, নদীর তীরে, নগরের অব্যক্ত কোলাহলে, এবং নক্ষত্রের অপরিষ্কৃত আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুপ্ততা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল ;—এই মহারণীকে সে এতদিন নতমস্তকে স্বীকার করে নাই বলিয়াই আজ অকস্মাৎ তাহার শাসনের ইজ্ঞাজাল আপন সহস্রবর্ণের সূত্রে গোরাকে জলস্থল আকাশের সঙ্গে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া ফেলিল। গোরা নিজের সম্মুখে নিজেই বিস্মৃত হইয়া নদীর জলশৃঙ্খ ঘাটের একটা পইঠায় বসিয়া পড়িল। বারবার সে নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল যে, তাহার জীবনে এ কিসের আবির্ভাব, এবং ইহার কি প্রয়োজন! যে সংকল্পদ্বারা সে আপনার জীবনকে আগা-গোড়া বিধিবদ্ধ করিয়া মনে মনে সাজাইয়া লইয়াছিল তাহার মধ্যে ইহার স্থান কোথায়? ইহা কি তাহার বিরুদ্ধ? সংগ্রাম করিয়া ইহাকে কি পরাস্ত করিতে হইবে? এই বলিয়া গোরা মুষ্টি দৃঢ় করিয়া যখন বদ্ধ করিল অমনি বুদ্ধিতে উজ্জল, নম্রতায় কোমল, কোন্ ছুইটি সিদ্ধ চক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে আগিয়া উঠিল—কোন্ অনিন্দ্যস্বন্দর হাত খানির অঙ্গুলিগুলি স্পর্শসৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল ; গোরার সমস্ত শরীরে পুলকের বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিল। একাকী, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রগাঢ় অমৃতত্ব তাহার সমস্ত প্রশ্ন সমস্ত দ্বিধাকে একেবারে নিরস্ত করিয়া দিল ;

সে তাহার এই নূতন অমৃতত্বকে সমস্ত দেহ মন দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল—ইহাকে ছাড়িয়া সে উঠিতে ইচ্ছা করিল না।

অনেক রাত্রে যখন গোরা বাড়ি গেল তখন আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "এত রাত করলে যে বাবা, তোমার খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

গোরা কহিল, "কি জানি মা, আজ কি মনে হল, অনেকক্ষণ গঙ্গার ঘাটে বসে ছিলাম।"

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "বিনয় সঙ্গে ছিল বুঝি?"

গোরা কহিল "না, আমি একলাই ছিলাম।"

আনন্দময়ী মনে মনে কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। বিনা প্রয়োজনে গোরা যে এত রাত পর্যন্ত গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ভাবিবে এমন ঘটনা কখনই হয় নি। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবা তাহার স্বভাবই নহে। গোরা যখন অজ্ঞমনস্ক হইয়া থাইতেছিল আনন্দময়ী লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন তাহার মুখে যেন একটা কেমনতর উতলা ভাবের উদ্দীপনা।

আনন্দময়ী কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বুঝি বিনয়ের বাড়ি গিয়েছিলে?"

গোরা কহিল—"না, আজ আমরা দুজনেই পরেশ বাবুর ওখানে গিয়েছিলাম।"

শুনিয়া আনন্দময়ী চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওঁদের সকলের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?"

গোরা কহিল—"হ্যাঁ হয়েছে।"

আনন্দময়ী। ওঁদের মেয়েরা বুঝি সকলের সাক্ষাতেই বেরন?

গোরা। হ্যাঁ, ওঁদের কোনো বাধা নেই।

অল্প সময় হইলে একদল উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তেজনা প্রকাশ পাইল, আজ তাহার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া আনন্দময়ী আবার চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া গোরা অল্পদিনের মত অবিলম্বে মুখ খুইয়া দিনের ক্রাজের জন্ত প্রস্তুত হইতে গেল না। সে অজ্ঞমনস্কভাবে তাহার শোবার ঘরের পূর্বদিকের দরজা খুলিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের গলিটা

পূর্বের দিকে একটা বড় রাস্তায় পড়িয়াছে; সেই বড়-রাস্তার পূর্ব প্রান্তে একটা ইন্স্কুল আছে; সেই ইন্স্কুলের সংলগ্ন জমিতে একটা পুরাতন জাম গাছের মাথার উপরে প্রাংলা একখণ্ড শাদা কুয়াসা ভাসিতেছিল এবং তাহার পশ্চাতে আসন্ন সূর্য্যোদয়ের অরণ্য রেখা ঝাপসা হইয়া দেখা দিতেছিল। গোরা চুপ করিয়া অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সেই ক্ষীণ কুয়াসটুকু বিশিয়া গেল, উজ্জল রোদ্দ গাছের শাখার ভিতর দিয়া যেন অনেক গুলো বকুবকে সন্তানের মত বিধিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং দেখিতে দেখিতে কলিকাতার রাস্তা জনতার ও কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ গলির মোড়ে অবিনাশের সঙ্গে আর কয়েকটি ছাত্রকে তাহার বাড়ির দিকে আসিতে দেখিয়া গোরা তাহার এই আবেশের জালকে যেন এক প্রবল টানে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সে নিজের মনকে একটা প্রচণ্ড আঘাত করিয়া বলিল—না, এসব কিছু নয়; এ কোনো মতেই চলিবে না।—বলিয়া দ্রুতবেগে শোবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গোয়ার বাড়িতে তাহার দলবল আসিয়াছে অথচ গোরা তাহার অনেক পূর্ব্বই প্রস্তুত হইয়া নাই এমন ঘটনা তাহার পূর্ব্ব আর একদিনও ঘটিতে পায় নাই। এই সামান্য ত্রুটিতেই গোরাকে ভারি একটা বিকার দিল। সে মনে মনে স্থির করিল আব সে পরেশ বাবুর বাড়ি যাইবে না এবং বিনয়ের সঙ্গেও যাহাতে কিছুদিন দেখা না হইয়া এই সমস্ত আলোচনা বন্ধ থাকে সেইরূপ চেষ্টা করিবে।

সে দিন নীচে গিয়া এই প্রারম্ভ হইল যে গোরা তাহার দলের ছই তিন জনকে সঙ্গে করিয়া পারে হাঁটিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক মোড় দিয়া ভ্রমণে বাহির হইবে;—পথের মধ্যে গৃহস্থবাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিবে, সঙ্গে টাকাকড়ি কিছুই লইবে না।

এই অপূর্ণ সংকল্প মনে লইয়া গোরা হঠাৎ কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া এইরূপ খোলা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িবার একটা প্রবল আনন্দ তাহাকে পাইয়া বসিল। ভিতরে ভিতরে তাহার হৃদয় যে একটা জ্বলে জড়াইয়া পড়িয়াছে, এই বাহির হইবার কল্পনাতেই, সেটা যেন ছিন্ন হইয়া গেল বলিয়া

তাহার মনে হইল। এই সমস্ত ভাবের আবেশ যে মায়ামাত্র এবং কল্পাই যে সত্য সেই কথাটা খুব জোরের সহিত নিজের মনের মধ্যে ধনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া লইয়া যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইয়া লইবার জন্ত, ইন্স্কুল-ছুটির বালকের মত গোরা তাহার একতলার বসিবার ঘর ছাড়িয়া প্রায় ছুটিয়া বাহির হইল। সেই সময় কৃষ্ণদয়াল গঙ্গানান সারিয়া ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া নামাবলী গায়ে দিয়া মনে মনে মন্ত্র জপ করিতে করিতে ঘরে চলিয়াছিলেন। গোরা একেবারে তাঁহার বাড়ির উপর গিয়া পড়িল। লজ্জিত হইয়া গোরা তাড়াতাড়ি তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। তিনি শশব্যস্ত হইয়া “থাক থাক” বলিয়া সসঙ্কোচে চলিয়া গেলেন। পূজার বসিবার পূর্ব্ব গোয়ার স্পর্শে তাঁহার গঙ্গানানের ফল মাটি হইল। কৃষ্ণদয়াল যে গোয়ার সংস্পর্শই বিশেষ করিয়া এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন গোরা তাহা ঠিক বুঝিত না; সে মনে করিত তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে সকলেরই সংস্রব বাঁচাইয়া চলাই অহরহ তাঁহার সতর্কতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল; আনন্দময়ীকে ত তিনি ম্লেচ্ছ বলিয়া দূরে পরিহার করিতেন,—মহিম কাজের লোক, মহিমের সঙ্গে তাঁহার দেখা সাক্ষাতেরই অবকাশ ঘটত না। সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল মহিমের কন্যা শশিমুখীকে তিনি কাছে লইয়া তাহাকে সংস্কৃত স্তোত্র মুখস্থ করাইতেন এবং পূজার্ননাবিধিতে দীক্ষিত করিতেন।

কৃষ্ণদয়াল গোরা কর্তৃক তাঁহার পাদস্পর্শে ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিলে পর তাঁহার সঙ্কোচের কারণ সম্বন্ধে গোয়ার চৈতন্য হইল এবং সে মনে মনে হাসিল। এইরূপে পিতার সহিত গোয়ার সমস্ত সম্বন্ধ প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং মাতার অনাচারকে সে যতই নিন্দা করুক এই আচারদ্রোহিণী মাকেই গোরা তাহার জীবনের সমস্ত ভক্তি সমর্পণ করিয়া পূজা করিত।

আহারান্তে গোরা একটি ছোট পুঁটলিতে গোটাকয়েক কাপড় লইয়া সেটা বিলাতী পর্যটকদের মত পিঠে বাধিয়া মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল—“শ্রী, আমি কিছু দিনের মত বেয়ব।”

আনন্দময়ী কহিলেন “কোথায় যাবে বাবা?” গোরা কহিল “সেটা আমি ঠিক বলতে পারচি নে।” আনন্দময়ী

জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোনো কাজ আছে ?” গোরা কহিল—
“কাজ বলিতে যা বোঝায় সে রকম কিছু নয়—এই যাওয়াটাই
একটা কাজ !”

আনন্দময়ীকে একটু খানি চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া
গোরা কহিল—“মা, দোহাই তোমার, আমাকে বারণ করতে
পারবে না। তুমি ত আমাকে জানই, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব
এমন ভয় নেই। আমি মাকে ছেড়ে বেশি দিন কোথাও
থাকতে পারিনে।”

মার প্রতি তাহার ভালবাসা গোরা কোনোদিন মুখে
এমন করিয়া বলে নাই—তাই আজ কথাটা বলিয়াই সে
লজ্জিত হইল।

পুলকিত আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি তাহার লজ্জাটা চাপা
দিয়া কহিলেন—“বিনয় সঙ্গে যাবে বুঝি ?”

গোরা ব্যস্ত হইয়া কহিল—“না, মা, বিনয় যাবে না।
ঐ দেখ, অমনি মার মনে ভাবনা হুচে, বিনয় না গেলে তাঁর
গোরােকে পথে ঘাটে রক্ষা করবে কে ? বিনয়কে যদি তুমি
আমার রক্ষক বলে মনে কর সেটা তোমার একটা কুসংস্কার ;
—এবারে নিরাপদে ফিরে এলে ঐ সংস্কারটা তোমার বৃহবে।”

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন “মাঝে মাঝে খবর
পাব ত ?”

গোরা কহিল, “খবর পাবে না বলেই ঠিক করে রাখ-
তার পরে যদি পাও ত খুসি হবে। ভয় কিছুই নেই ;
তোমার গোরােকে কেউ নেবে না মা,—তুমি আমার যতটা
মূল্য কল্পনা কর আর কেউ ততটা করে না। তবে এই
বৌচকাটির উপর যদি কারো লোভ হয় তবে এটা তাকে
দান করে দিয়ে চলে আসব ; এটা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ
দান করক না—সে নিশ্চয় !”

গোরা আনন্দময়ীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল—
তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া হাত চুষন করিলেন—কোনো
প্রকার নিবেদন মাত্র করিলেন না। নিজের কষ্ট হইবে বলিয়া
অথবা কল্পনায় অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া আনন্দময়ী কখনো
কাহাকেও নিবেদন করিতেন না। নিজের জীবনে তিনি অনেক
বাধা বিপদের মধ্য দিয়া আসিয়াছেন, বাহিরের পৃথিবী তাহার
আছে অপরিচিত নহে ; তাহার মনে ভয় বলিয়া কিছু ছিল
না। গোরা যে কোনো বিপদে পড়িবে সে ভয় তিনি মনে

আনেন নাই—কিন্তু গোয়ার মনের মধ্যে যে কি একটা
বিপ্লব ঘটয়াছে সেই কথাই তিনি কাল হইতে ভাবিতেছেন।
আজ হঠাৎ গোরা অকারণে ভ্রমণ করিতে চলিল শুনিয়া
তাঁহার সেই ভাবনা আরো বাড়িয়া উঠিয়াছে।

গোরা পিঠে বৌচকা বাঁধিয়া রাস্তায় বেঁচে পা দিয়াছে
এমন সময় হাতে ঘনরক্ত বসোরা গোলাপযুগল সবুজে লইয়া
বিনয় তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোরা
কহিল—“বিনয়, তোমার দর্শন অমাত্রা কি সূযাত্রা এবারে
তার পরীক্ষা হবে।”

বিনয় কহিল—“বেরুচ না কি ?”

গোরা কহিল—“হাঁ।”

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—“কোথায় ?”

গোরা কহিল—“প্রতিধ্বনি উত্তর করিল কোথায়।”

বিনয়। প্রতিধ্বনির চেয়ে ভাল উত্তর নেই না কি ?

গোরা। না। তুমি মার কাছে যাও, সব শুনতে
পাবে। আমি চলুম।—বলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

বিনয় অন্তঃপুরে গিয়া আনন্দময়ীকে প্রণাম করিয়া
তাঁহার পায়ের পরে গোলাপফুল দুইটি রাখিল।

আনন্দময়ী ফুল তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ
কোথায় পেলে বিনয় ?”

বিনয় তাহার ঠিক স্পষ্ট উত্তরটি না দিয়া কহিল—“ভাল
জিনিষটি পেলেই আগে মায়ের পূজোর জন্তে সেটি দিতে
ইচ্ছা করে।”

তার পরে আনন্দময়ীর তন্তুপোষের উপর বলিয়া বিনয়
কহিল—“মা, তুমি কিন্তু অস্ত্রমনস্ক আছ।”

আনন্দময়ী কহিলেন—“স্বেন বল দেখি ?”

বিনয় কহিল, “আজ আমার বরাদ্দ পানটা দেবার কথা
ভুলেই গেছ।”

আনন্দময়ী লজ্জিত হইয়া বিনয়কে পান আনিয়া
দিলেন।

তাঁহার পরে সমস্ত ছুপর বেলা ধরিয়া দুইজনে কথাবার্তা
হইতে লাগিল। গোয়ার নিরুদ্দেশ ভ্রমণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে
বিনয় কোনো কথা পুরস্কার বলিতে পারিল না।

আনন্দময়ী কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন “কাল বুঝি
তুমি গোরােকে নিয়ে পরেশ বাবুর ওখানে গিয়েছিলে ?”

বিনয় গত কল্যাকার সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল।
আনন্দময়ী প্রত্যেক কথাটি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শুনিলেন।

বাইবার সময় বিনয় কহিল, “মা, পূজা ত সাদৃশ্য হল,
এবার তোমার চরণের প্রসাদী ফুল দুটো মাথায় করে নিয়ে
• যেতে পারি ?”

আনন্দময়ী হাসিয়া গোলাপ ফুল দুইটি বিনয়ের হাতে
দিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন এ গোলাপ দুইটি যে কেবল
সৌন্দর্যের জন্তই আমার পাইতেছে তাহা নহে—নিশ্চয়ই
উদ্ভিদতত্ত্বের অতীত আরো অনেক গভীর তত্ত্ব ইহার মধ্যে
আছে।

বিকাল বেলায় বিনয় চলিয়া গেলে তিনি কতই ভাবিতে
লাগিলেন। ভগবানকে ডাকিয়া বারবার প্রার্থনা করি-
লেন—গোরা'কে যেন অশ্রুধী হইতে না হয় এবং বিনয়ের
সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদের যেন কোনো কারণ না ঘটে।

২৩

গোলাপ ফুলের একটু ইতিহাস আছে।

কাল রাত্রে গোরা ত পমেশ বাবুর বাড়ি হইতে চলিয়া
আসিল—কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়িতে সেই অভিনয়ে যোগ
দেওয়ার প্রস্তাব শইয়া বিনয়কে বিস্তর কষ্ট পাইতে
হইয়াছিল।

এই অভিনয়ে ললিতার যে কোনো উৎসাহ ছিল তাহা
নহে—সে বরঞ্চ এসব ব্যাপার ভালই বাসিত না। কিন্তু
কোনো মতে বিনয়কে এই অভিনয়ে জড়িত করিবার জন্ত
তাহার মল্লিক মধ্য যেন একটা জেদ চাপিয়া গিয়াছিল।
যে সমস্ত কাজ গোরা'র মতবিরুদ্ধ, বিনয়কে দিয়া তাহা
সাধন করাইবার জন্ত তাহার একটা রোধ জন্মিয়াছিল।
বিনয় যে গোরা'র অশ্রুবর্তী, ইহা ললিতার কাছে কেন এত
অসহ্য হইয়াছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

যেমন করিয়া হোক সমস্ত বন্ধন কাটিয়া বিনয়কে স্বাধীন
করিয়া দিতে পারিলে সে যেন বাঁচে, এমনি হইয়া উঠিয়াছে।

ললিতা তাহার বেগী ছশাইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল—
“কেন মশায়, অভিনয়ে দোষটা কি ?”

বিনয় কহিল—“অভিনয়ে দোষ না থাকতে পারে কিন্তু
ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়িতে অভিনয় কর্তে যাওয়া আমার মনে
ভাল লাগে না।”

ললিতা। আপনি নিজের মনের কথা বলুন, না
আরো কারো ?

বিনয়। অভ্যন্তর মনের কথা বলবার ভার আমার উপরে
নেই—বলাও শক্ত। আপনি হয় ত বিশ্বাস করেন না,
আমি নিজের মনের কথাটাই বলে থাকি—কখনো নিজের
জবানীতে, কখনো বা অভ্যন্তর জবানীতে।

ললিতা একধার কোনো জবাব না দিয়া একটুখানি
মুচুকিয়া হাসিল মাত্র। একটু পরে কহিল—“আপনার
বন্ধু গোরা'বাবু বোধ হয় মনে করেন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণ
অগ্রাহ্য করলেই খুব একটা বীরত্ব হয়—ওতেই ইংরেজের
সঙ্গে লড়াই করার ফল হয়।”

বিনয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিল, “আমার বন্ধু হয় ত
না মনে করতে পারেন কিন্তু আমি মনে করি। লড়াই
নয় ত কি ! যে লোক আমাকে গ্রাহ্যই করে না, মনে করে
আমাকে কড়ে' আঙুল তুলে ইসারায় ডাক দিলেই আমি
কৃতার্থ হয়ে যাব তার সেই উপেক্ষার সঙ্গে উপেক্ষা দিই
যদি লড়াই না করি তা হলে আত্মসম্মানকে বাঁচাব কি
করে ?”

ললিতা নিজে অভিমানী স্বভাবের লোক—বিনয়ের
মুখের এই অভিমানবাক্য তাহার ভালই লাগিল। কিন্তু
সেই জন্তই, তাহার নিজের পক্ষের যুক্তিকে দুর্বল অল্পভব
করিয়াই ললিতা অকারণ বিজ্ঞপের খোঁচায় বিনয়কে কথায়
কথায় আহত করিতে লাগিল।

শেষকালে বিনয় কহিল—“দেখুন আপনি তর্ক করছেন
কেন ? আপনি বলুন না কেন, ‘আমার ইচ্ছা, আপনি অভি-
নয়ে যোগ দেন।’ তা হলে আমি আপনার অমরোধ্য রক্ষার
ধাতিতে নিজের মতটাকে বিসর্জন দিই একটা স্বার্থ পাই।”

ললিতা কহিল—“বাঃ, তা আমি কেন বলব ? সত্যি
যদি আপনার কোনো মত থাকে তাহলে সেটা আমার
অমরোধ্য কেন ত্যাগ করতে যাবেন ? কিন্তু সেটা সত্যি
হওয়া চাই।”

বিনয় কহিল “আচ্ছা সেই কথাই ভাল। আমার
সত্যিকার কোনো মত নেই। আপনার অমরোধ্য নাই
হল, আপনার তর্কেই পরাস্ত হয়ে আমি অভিনয়ে যোগ
দিতে রাজি হলাম।”

এমন সময় বরদাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করিবারাত্রই বিনয় উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে কহিল—“অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হলে আমাকে কি করতে হবে বলে দেবেন।”

বরদাসুন্দরী সগর্বে কহিলেন—“সে জন্তে আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না, সে আমরা আপনাকে ঠিক তৈরি করে নিতে পারব। কেবল অভ্যাসের জন্য রোজ আপনাকে নিয়মিত আসতে হবে।”

বিনয় কহিল—“আচ্ছা। আজ তবে আসি।”

বরদাসুন্দরী কহিলেন—“সে কি কথা? আপনাকে খেয়ে যেতে হচ্ছে।”

বিনয় কহিল—“আজ নাই খেলুম।”

বরদাসুন্দরী কহিলেন—“না, না, সে হবে না।”

বিনয় খাইল, কিন্তু অল্প দিনের মত তাহার স্বাভাবিক প্রকৃষ্টতা ছিল না। আজ সূচরিতাও কেমন অশ্রমস্ব হইয়া চুপ করিয়া ছিল। যখন ললিতার সঙ্গে বিনয়ের লড়াই চলিতেছিল তখন সে বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। আজ রাত্রে কথাবার্তা আর জমিল না।

বিদায়ের সময় বিনয় ললিতার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করিয়া কহিল—“আমি হার মান্‌লুম তবু আপনাকে খুসি করতে পারলুম না।”

ললিতা কোনো জবাব না দিয়া চলিয়া গেল।

ললিতা সহজে কান্দিতে জানেনা কিন্তু আজ তাহার চোখ দিয়া জল যেন ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিল। কি হইয়াছে? কেন সে বিনয় বাবুকে বার বার এমন করিয়া খোঁচা দিতেছে এবং নিজে ব্যথা পাইতেছে?

বিনয় যতক্ষণ অভিনয়ে যোগ দিতে নারাজ ছিল ললিতার জেদও ততক্ষণ কেবলি চড়িয়া উঠিতেছিল কিন্তু যখন সে রাজি হইল তখন তাহার সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। যোগ না দিবার পক্ষে যতগুলি তর্ক সমস্ত তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন তাহার মন পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিল কেবল আমার অম্লরোধ রাখিবার জন্য বিনয় বাবুর এমন করিয়া রাজি হওয়া উচিত হয় নাই। অম্লরোধ! কেন অম্লরোধ রাখিবেন! তিনি মনে করেন, অম্লরোধ রাখিয়া তিনি আমার সঙ্গে ভদ্রতা করিতেছেন! তাঁহার এই ভদ্রতাই বাইবার জন্য আমার যেন অত্যন্ত মাথা ব্যথা!

কিন্তু এখন এমন করিয়া স্পর্ধা করিলে চলিবে কেন? সত্যই যে সে বিনয়কে অভিনয়ের দলে টানিবার জন্য এতদিন ক্রমাগত নির্বুদ্ধ প্রকাশ করিয়াছে। আজ বিনয় ভদ্রতার দ্বারা তাহার এত জেদের অম্লরোধ রাখিয়াছে। বলিয়া রাগ করিলেই বা চলিবে কেন? এই ঘটনায় ললিতার নিজের উপরে এমনি তীব্র ঘৃণা ও লজ্জা উপস্থিত হইল যে স্বভাবত এতটা হইবার কোনও কারণ ছিল না। অল্পদিন হইলে তাহার মনের চাক্ষু্যের সময় সে সূচরিতার কাছে যাইত। আজ গেল না এবং কেন যে তাহার বুকের কাছে ঠেসিয়া তুলিয়া তাহার চোখ দিয়া এমন করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না।

পরদিন সকালে সূর্য্যের লাবণ্যকে একটি তোড়া আনিয়া দিয়াছিল। সেই তোড়ায় একটি বোটার দুইটি বিকচোয়ুথ বসোরা গোলাপ ছিল। ললিতা সেটি তোড়া হইতে খুলিয়া লইল। লাবণ্য কহিল—“ও কি কর্‌চিস?” ললিতা কহিল, “তোড়ায় অনেক শুলো বাজে ফুল পাতার মধ্যে ভালো ফুলকে বাঁধা দেখলে আমার কষ্ট হয়; ওরকম দড়ি দিয়ে সব জিনিষকে এক শ্রেণীতে জোর করে বাঁধা বর্জ্জরতা।”

এই বলিয়া সমস্ত ফুলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ললিতা সে গুলিকে ঘরের এদিকে ওদিকে পৃথক করিয়া সাজাইল; কেবল গোলাপ দুটিকে হাতে করিয়া লইয়া গেল।

সত্যীশ ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “দিদি ফুল কোথায় পেলে?”

ললিতা তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, “আজ তোর বন্ধুর বাড়ীতে যাবি নে?”

বিনয়ের কথা এতক্ষণ সত্যীশের মনে ছিল না, কিন্তু তাহার উল্লেখ মাত্রই লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—“হাঁ যাব!” বলিয়া তখন যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল।

ললিতা তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল “সেখানে গিয়ে কি করিস?”

সত্যীশ সংক্ষেপে কহিল “গল্প করি।”

ললিতা কহিল “তিনি তোকে এত ছবি দেন তুই তাঁকে কিছু দিসনে কেন?”

বিনয় ইংরেজি কাগজ প্রভৃতি হইতে সত্যীশের জন্য নানাপ্রকার ছবি কাটিয়া রাখিত। একটা খাত করিয়া

সতীশ এই ছবিগুলো তাহাতে গঁদ দিয়া আঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইরূপে পাতা পুরাইবার জন্য তাহার নেশা এতই চড়িয়া গিয়াছে যে ভাল বই দেখিলেও তাহা হইতে ছবি কাটরা লইবার জন্য তাহার মন ছটফট করিত। এই

- লোলুপতার অপরাধে তাহার দিদিদের কাছে তাহাকে বিস্তর তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছে।

সংসারে প্রতিদান বলিয়া যে একটা দায় আছে সে কথাটা হঠাৎ আজ সতীশের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে সে বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভাঙ্গা টিনের বাজুর মধ্যে তাহার নিজের বিষয় সম্পত্তি বাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার কোনোটারই আসক্তিবদ্ধন ছেদন করা তাহার পক্ষে সহজ নহে। সতীশের উদ্বিগ্ন মুখ দেখিয়া ললিতা হাসিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিয়া কহিল—“থাক্ থাক্ তোকে আর অত ভাবতে হবে না। আচ্ছা, এই গোলাপ ফুল ছোটো টাকে দিস।”

এত সহজে সমস্তার মীমাংসা হইল দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং ফুল ছুটি লইয়া তখন সে তাহার বন্ধুগণ শোধ করিবার জন্য চলিল।

রাত্তার বিনয়ের সঙ্গে তাহার বৈশা হইল। “বিনয় বাবু”

“বিনয় বাবু” করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে ডাক দিয়া সতীশ তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জামার মধ্যে ফুল লুকাইয়া কহিল, “আপনার জন্তে কি এনেছি বলুন দেখি।”

বিনয়কে হার মানাইয়া গোলাপ ফুল দুইটা বাহির করিল। কহিল “বাঃ, কি চমৎকার! কিন্তু সতীশ বাবু এটি তোমার নিজের জিনিষ নয়। চোরাই ঝাল নিয়ে শেষকালে পুলিশের হাতে পড়বনা ত?”

এই ফুল দুটিকে ঠিক নিজের জিনিষ বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে সতীশের হঠাৎ ধোঁকা লাগিল। সে একটু ভাবিয়া কহিল—“না, বাঃ, ললিতা দিদি আমাকে দিলেন যে আপনাকে দিতে।”

এ কথাটার এই খানেই নিষ্পত্তি হইল, এবং বিকালে তাহাদের বাড়ি যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া বিনয় সতীশকে বিদায় দিল।

কাল রাত্রে ললিতার কথার শ্রোতা পাইয়া বিনয় তাহার বেদনা ভুলিতে পারিতেছিল না। বিনয়ের সঙ্গে কাহারো

প্রায় বিরোধ হয় না। সেই জন্য এই প্রকার তীব্র আঘাত সে কাহারো কাছে প্রত্যাশাই করে না। ইতিপূর্বে ললিতাকে বিনয় স্বেচ্ছায় পশ্চাদ্বর্ত্তিনী করিয়াই দেখিয়াছিল। কিন্তু অজুহাত হাতি যেমন তাহার মাথাকে ভুলিবার সময় পায় না, কিছু দিন হইতে ললিতা সম্বন্ধে বিনয়ের সেই দশা হইয়াছিল। কি করিয়া ললিতাকে একটু খানি প্রসন্ন করিবে এবং শাস্তি পাইবে বিনয়ের এই চিন্তাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়া ললিতার তীব্র-হাস্যদীর্ঘ জালাময় কথাগুলি একটার পর একটা বহি তাহার মনে বাজিয়া উঠিত এবং তাহার নিজ দূর করিয়া রাখিত। “আমি গোরা ছায়ায় মত, আমার নিজের কোনো পদার্থ নাই, ললিতা এই বলিয়া অবজ্ঞা করেন, কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য।” ইহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার যুক্তি সে মনের মধ্যে জড় করিয়া তুলিত। কিন্তু এ সমস্ত যুক্তি তাহার কোনো কাজে লাগিত না। কারণ ললিতা ত স্পষ্ট করিয়া এ অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে আনে নাই—এ কথা লইয়া তর্ক করিবার অবকাশই তাহাকে দেয় নাই। বিনয়ের অব্যব দিবার এত কথা ছিল তবু সেগুলো ব্যবহার করিতে না পারিয়া তাহার মনের ক্ষোভ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে কাল রাত্রে হারিয়াও যখন ললিতার মুখ সে প্রসন্ন দেখিল না তখন বাড়িতে আসিয়া সে নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “সত্যি কি আমি এতই অবজ্ঞার পাত্র?”

এই জন্যই সতীশের কাছে যখন সে শুনিল যে ললিতাই তাহাকে গোলাপফুল দুটি সতীশের হাত দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে তখন সে অত্যন্ত একটা উল্লাস বোধ করিল। সে ভাবিল, অভিনয়ে যোগ দিতে রাজি হওয়াতেই সন্ধির নিদর্শন স্বরূপ ললিতা তাহাকে খুসি হইয়া এই গোলাপ দুটি দিয়াছে। প্রথমে মনে করিল ফুল দুটি বাড়িতে রাখিয়া আসি, তাহার পরে ভাবিল—না, এই স্মৃতির ফুল মায়ের পায়ে দিয়া ইহাকে পবিত্র করিয়া আনি।

সে দিন বিকালে বিনয় যখন পরেশ বাবুর বাড়িতে গেল তখন সতীশ ললিতার কাছে তাহার ইস্কুলের পড়া বলিয়া লইতেছে। বিনয় ললিতাকে কহিল—“বুদ্ধেরই রং লাল, অতএব সন্ধির ফুল শাদা হওয়া উচিত ছিল।”

ললিতা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল। বিনয় তখন একটি গুচ্ছ খেত করবী চানরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ললিতাব সম্মুখে ধরিয়া কহিল—“আপনার ফুল দুটি যতই সুন্দর হোক তবু তাতে কোণের রংটুকু আছে ; আমার এ ফুল সৌন্দর্য্যে তার কাছে দাঁড়াতে পারে না কিন্তু শাস্তির গুণ রঙে নম্রতা স্বীকার করে আপনার কাছে হাজির হয়েছে।”

ললিতা কর্ণমূল রাঙা করিয়া কহিল, “আমার ফুল আপনি কাছে ~~বলে~~ চেন ?”

বিনয় কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল—“তবে ত ভুল বুঝেছি। সতীশ বাবু, কার ফুল কাকে দিলে ?”

সতীশ উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—“বাঃ, ললিতা দিদি যে দিতে বলে।”

বিনয়। কাকে দিতে বলেন ?

সতীশ। আপনাকে।

ললিতা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া সতীশের পিঠে এক চাপড় মারিয়া কহিল—“তোমার মত বোকা ত আমি দেখিনি। বিনয়বাবুর ছবির বদলে তুই তাঁকে ফুল দিতে চাইলি নে ?”

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া কহিল—“হাঁ, তাইত, কিন্তু তুমিই আমাকে দিতে বলেন না ?”

• সতীশের সঙ্গে তক্রুর করিতে গিয়া ললিতা আরো বেশি করিয়া জ্বালা জড়াইয়া পড়িল। বিনয় স্পষ্ট বুঝিল ফুল দুটি ললিতাই দিয়াছে, কিন্তু বেনামীতেই কাজ করা তাহার অভ্যাস ছিল। বিনয় কহিল, “আপনার ফুলের দাবী আমি ছেড়েই দিচ্ছি—কিন্তু তাই বলে আমার এই ফুলের মধ্যে ভুল কিছুই নেই। আমাদের বিবাদ নিষ্পত্তির গুণ উপলক্ষ্যে এই ফুল কয়টি”—

• ললিতা মাথা নাড়িয়া কহিল, “আমাদের বিবাদই বা কি, আর তার নিষ্পত্তিই বা কিসের ?”

বিনয় কহিল—“একেবারে আগাগোড়া সমস্তই মায়া ? বিবাদও ভুল, ফুলও তাই, নিষ্পত্তিও মিথ্যা ? শুধু গুস্তিতে রক্তত ভ্রম নয়, গুস্তিটা শুদ্ধই ভ্রম ? ঐ যে ম্যাড্রিস্টেট সাহেবের বাড়িতে অভিনয়ের একটা কথা হচ্ছিল সেটা—”

• ললিতা কহিল—“সেটা ভ্রম নয়। কিন্তু তা নিয়ে ঝগড়া কিসের ? আপনি কেন মনে করছেন আপনাকে এইটেতে

রাজি করাবার জন্তে আমি মস্ত একটা লড়াই বাধিয়ে দিয়েছি—আপনি সম্মত হওয়াতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। আপনার কাছে অভিনয় করাটা যদি অস্বাভাবিক বোধ হয় কারো কথা শুনে কেনইবা তাতে রাজি হবেন ?”

এই বলিয়া ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সমস্তই উল্টা ব্যাপার হইল। আজ ললিতা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে বিনয়ের কাছে নিজের হার স্বীকার করিবে এবং যাহাতে অভিনয়ে বিনয় যোগ না দেয় তাহাকে সেইরূপ অম্লরোধ করিবে। কিন্তু এমন করিয়া কথাটা উঠিল এবং এমন ভাবে তাহার পরিণতি হইল যে, ফল ঠিক উল্টা দাঁড়াইল। বিনয় মনে করিল, সে যে অভিনয় সম্বন্ধে এতদিন বিরুদ্ধতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহারই প্রতিবাচের উত্তেজনা এখনো ললিতার মনে রহিয়া গেছে। বিনয় যে কেবল বাহিরে হার মানিয়াছে—কিন্তু মনের মধ্যে তাহার বিরোধ রহিয়াছে এই জ্ঞান ললিতার ক্ষোভ দূর হইতেছে না। ললিতা এই ব্যাপারটাতে যে এতটা আঘাত পাইয়াছে ইহাতে বিনয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে স্থির করিল এই কথাটা লইয়া সে আর কোনো আলোচনা উপহাসস্বল্লেপ করিবে না—এবং এমন নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এই কাজটাকে সম্পন্ন করিয়া তুলিবে যে কেহ তাহার প্রতি ঔদাসীন্দের অপরাধ আরোপ করিতে পারিবে না।

সুচরিতা আজ প্রাতঃকাল হইতে নিজের শোবার ঘরে নিভৃত বসিয়া “ত্রীষ্টের অম্লকরণ” নামক ~~একটি~~ ইংরেজি ধর্মগ্রন্থ পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। আজ সে তাহার অস্বাভাবিক নিয়মিত কর্মে যোগ দেয় নাই। যাকে মাঝে গ্রন্থ হইতে মন লষ্ট হইয়া পড়াতে বইয়ের লেখাগুলি তাহার কাছে ছায়া হইয়া পড়িতেছিল—আবার পরক্ষণে নিজের উপর রাগ করিয়া বিশেষ বেগের সহিত চিন্তকে গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ করিতেছিল—কোনো মতেই হার মানিতে চাহিতেছিল না।

এক সময়ে দূর হইতে কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে হইল বিনয় বাবু আসিয়াছেন—তখন চমকিয়া উঠিয়া বই রাখিয়া বাহিরের ঘরে ঘাইবার জন্ত মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজের এই ব্যস্ততাতে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সুচরিতা আবার

চৌকির উপর বসিয়া বই লইয়া পড়িল। পাছে কানে শব্দ
বায় বলিয়া ছই কান চাপিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এমন সময় ললিতা তাহার ঘরে আসিল। সূচরিতা
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—“তোমার কি হয়েছে
বল ত ?”

ললিতা তীব্র ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—“কিছু না।”

সূচরিতা জিজ্ঞাসা করিল—“কোথায় ছিলি ?”

ললিতা কহিল—“বিনয় বাবু এসেছেন, তিনি বোধ হয়
তোমার সঙ্গে গল্প করিতে চান।”

বিনয়বাবুর সঙ্গে আর কেহ আসিয়াছে কি না, এ
প্রশ্ন সূচরিতা আজ উচ্চারণ করিতেও পারিল না।
যদি আর কেহ আসিত তবে নিশ্চয় ললিতা তাহার উল্লেখ
করিত কিন্তু তবু মন নিঃসংশয় হইতে পারিল না। আর
সে নিজেকে দমনের চেষ্টা না করিয়া গৃহাগত অতিথির প্রতি
কর্তব্যের উপলক্ষ্যে বাহিরের ঘরের দিকে চলিল। ললিতাকে
জিজ্ঞাসা করিল—“তুই যাবি নে ?”

ললিতা একটু অধৈর্যের স্বরে কহিল—“তুমি যাও না—
আমি পরে যাবি।”

সূচরিতা বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বিনয়
সতীশের সঙ্গে গল্প করিতেছে।

সূচরিতা কহিল—“বাবা বেরিয়ে গেছেন, এখন
আসবেন। মা আপনাদের সেই অভিনয়ের কবিতা মুখস্থ
করার জন্যে লাগিয়া ও লীলাকে নিয়ে মাষ্টার মশায়ের বাড়িতে
গেছেন—ললিতা কোনো মতেই গেল না। তিনি বলে
গেছেন, আপনি এলে আপনাকে বসিয়ে রাখতে—আপনার
আজ পরীক্ষা হবে।”

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—“আপনি এর মধ্যে নেই ?”

সূচরিতা কহিল—“সবাই অভিনেতা হলে জগতে
দর্শক হবে কে ?”

বরদাস্থানী সূচরিতাকে এ সকল ব্যাপারে যথাসম্ভব
বাধ দিয়া চলিতেন। তাই তাহার গুণপনা দেখাইবার জন্য
এবারও ডাক পড়ে নাই।

অল্প দিন এই ছই ব্যক্তি একত্র হইলে কথার অভাব
হইত না—আজ উভয় পক্ষেই এমন বিষয় ঘটিয়াছে যে কোনো
মতেই কথা জমিতে চাহিল না। সূচরিতা গোয়ার প্রসঙ্গ

তুলিবে না পণ করিয়া আসিয়াছিল। বিনয়ও পূর্বের মত
সহজে গোয়ার কথা তুলিতে পারে না। তাহাকে ললিতা
এবং হয়ত এ বাড়ির সকলেই গোয়ার একটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ
বলিয়া মনে করে ইহাই কল্পনা করিয়া গোয়ার কথা তুলিতে
সে বাধা পায়।

অনেক দিন এমন হইয়াছে বিনয় আগে আসিয়াছে,
গোরা তাহার পরে আসিয়াছে—আজও সেইরূপ ঘটতে
পারে ইহাই মনে করিয়া সূচরিতা যেন এক প্রকার সচকিত
অবস্থায় রহিল। গোরা পাছে আসিয়া পড়ে ~~এই~~ তাহার
একটা ভয় ছিল এবং পাছে না আসে এই আশঙ্কাও
তাহাকে বেদনা দিতেছিল।

বিনয়ের সঙ্গে ছাড়া ছাড়া ভাবে ছই চারটে কথা হওয়ার
পর সূচরিতা আর কোনো উপায় না দেখিয়া সতীশের ছবির
খাতা খানা লইয়া সতীশের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আলোচনা
করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ছবি সাজাইবার ক্রটি ধরিয়া
নিন্দা করিয়া সতীশকে রাগাইয়া তুলিল। সতীশ অত্যন্ত
উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাদাম্বাদ করিতে লাগিল।
আর বিনয় টেবিলের উপর তাহার প্রত্যাখ্যাত করবীণ্ডের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে মনে মনে চিন্তা
করিতে লাগিল যে, অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও আমার এই
“ফুল কমটা ললিতার লওয়া উচিত ছিল।

হঠাৎ একটা পায়ের শব্দে চমকিয়া সূচরিতা পিছন
ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল হারানবাবু ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।
তাহার চমকটা অত্যন্ত অগোচর হওয়ার্তে সূচরিতার মুখ
লাল হইয়া উঠিল। হারানবাবু একটা চৌকিতে বসিয়াই
কহিলেন—“কই, আপনাদের গোরবাবু আসেন নি ?”

বিনয় হারানবাবুর এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া
কহিল—“কেন, তাঁকে কোনো প্রয়োজন আছে ?”

হারানবাবু কহিলেন—“আপনি আছেন অথচ তিনি
নেই এ ত প্রায় দেখা যায় না ; তাই জিজ্ঞাসা করচি।”

বিনয়ের মনে বড় রাগ হইল—পাছে তাহা প্রকাশ
পায় এই জন্য সংক্ষেপে কহিল “তিনি কলিকাতায় নেই।”

হারান। প্রচারে গেছেন বুঝি ?

বিনয়ের রাগ বাড়িয়া উঠিল, কোনো জবাব করিল না।
সূচরিতাও কোনো কথা না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

হারানবাবু দ্রুতপদে সূচরিতার অমুদ্বর্তন করিলেন কিন্তু তাকে ধরিয়া উঠিতে পারিলেন না। হারানবাবু দূর হইতে কহিলেন “সূচরিতা, একটা কথা আছে।”

সূচরিতা কহিল “আজ আমি ভাল নাই।” বলিতে বলিতেই তাহার শয়নগৃহে কপাট পড়িল।

এমন সময়ে বরদাসুন্দরী আসিয়া অভিনয়ের পালা দিবার জন্ত যখন বিনয়কে আর একটা ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন তাহার অনতিকাল পরেই অকস্মাৎ ফুলগুলিকে আব সেই টেবিলে উপরে দেখা যায় নাই—সে রাত্রি ললিতাও বরদাসুন্দরীর অভিনয়ের আখড়ার দেখা দিল না—এবং সূচরিতা “খুঁটের অমুদ্বর্তন” বই খানি কোলের উপর মুড়িয়া ঘরের বাতিটাকে এক কোণে আড়াল করিয়া দিয়া অনেক রাত পর্যন্ত ঘরের বহির্কর্ত্তী অন্ধকার রাত্রির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সম্মুখে যেন একটা কোন্ অপরিসীত অপূর্ণ দেশ মরীচিকার মত দেখা দিয়াছিল; জীবনের এত-দিনকার সমস্ত জানাণ্ডনার সঙ্গে সেই দেশের একটা কোথায় একান্ত বিচ্ছেদ আছে;—সেই জন্ত সেখানকার বাতায়নে যে আলোগুলি জলিতেছে তাহা তিমির নিশীথিনীর নক্ষত্র-মালায় মত একটা সূদূরতার রহস্তে মনকে ভীত কবিতোছে; অথচ মনে হইতেছে, জীবন আমার তুচ্ছ, এতদিন যাহা নিশ্চয় বলিয়া জানিয়াছি তাহা সংশয়াকীর্ণ এবং প্রত্যহ যাহা কবিয়া আসিতেছি তাহা অর্থহীন—এখানেই হয়ত জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে, কর্ত্ত্ব মহৎ হইয়া উঠিবে এবং জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারিব। ঐ অপূর্ণ অপরিসীত ভয়ঙ্কর দেশের অজ্ঞাত সিংহদ্বারের সম্মুখে কে আমাকে দাঁড় করাইয়া দিল? কেন আমার হৃদয় এমন করিয়া কাঁপিতেছে—কেন আমার পা অগ্রসর হইতে গিয়া এমন করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে?

সমসাময়িক ভারত ।

(পিরিউর করাসী হইতে)

গ্রাম্য ভারত ।

২

আবু-পূর্কতের উপর আমি কতকগুলি দেবালয় দর্শন করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিলাম। আমাদের ক্যাথিড্রাল-

গির্জায় যে অংশ গায়কবৃন্দের জন্ত নির্দিষ্ট—এই সকল দেবালয়ের মধ্যে সেই অংশটিরও সমাবেশ হয় না। দালান-গুলি ক্ষুদ্র ও নিম্ন, কিন্তু শিল্পী এই সকল গম্বুজের ভিতর-ছাদের গোলাপের নক্সায়, সরু সরু স্তম্ভ খামের লতাপাতার ভূষণে, এবং যে সকল পৌরাণিক দেবমূর্ত্তি খামকে বেঁঠন করিয়া রহিয়াছে সেই সকল দেবমূর্ত্তির রচনায় এমন একটা ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহার মধ্যে এমন একটা প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে, এবং মর্ম্মর-প্রস্তরগুলি এরূপ অমল-ধবল, মন্দিরের কুলদ্বির মধ্যে বসিয়া যে সকল ভক্ত সাধু ধ্যানে মগ্ন তাঁহাদের এরূপ প্রশান্তভাবে যে, এই ক্ষুদ্রাদর্শের মন্দিরগুলি সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা বলিয়া অমুদ্বৃত্ত হয়... ইহাও কি তোমার মনে হয় না যে, এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য নগর-গুলি—যাহার দিগন্ত এত ক্ষুদ্র, যাহার খিলানমণ্ডপগুলি এত নিম্ন—উহার জীবন-সমস্তাটিকেমন সহজভাবে ও নিজে ধরণে সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়াছে? উহাদের অভাব খুবই কম, তাহাও তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইতেছে,—বিনা প্রয়াসে পূর্ণ হইতেছে। চমৎকার সামাজিক বন্ধন, চমৎকার পরস্পর-সাপেক্ষতা, চমৎকার সোপান-পরম্পরা! ইহার তুলনায়, আমাদের সমাজ অসম্বন্ধ জনতা বলিলেও হয়—অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষে পূর্ণ। বরং এই সমাজ অতিমাত্র পূর্ণতা, অতিমাত্র সর্কাদীনতা, অতিমাত্র সৌষ্টব লাভ করিয়াছে; যেন চরম বিকাশের জন্ত তিলমাত্রও স্থান রাখে নাই।

এতক্ষণ আমরা এই ক্ষুদ্র নগরগুলির আর্থিক অবস্থাই আলোচনা করিলাম। এক্ষণে উহাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যে সকল বন্ধন-সূত্রে বিভিন্ন অঙ্গকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যে সকল মুখ্য শক্তি সর্বত্র সঞ্চার করিতেছে, সকলকে শাসন করিতেছে, সহজ পথ ধরিয়া সহজভাবে অবাধে চলিতেছে, এক্ষণে সেই সমস্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রামের শাসনভাব কৃষকমণ্ডলীর হস্তে। তাহাতে ভৃত্যদের, কারিগরদের কোন হাত নাই। কখন, কৃষকসমাজ অব্যবহিতরূপে নিজেই গ্রাম শাসন করে এবং প্রধানবংশের কর্ত্ত্বপক্ষেরা মিলিয়া একটা স্থায়ী ‘মিউনিসিপালিটি’ গঠন করে; কখনবা, কোন বংশাঙ্ক-ক্রমিক প্রধানের হস্তে উহার নিজ অধিকার ছাড়িয়া দেয়।

প্রথমোক্ত বর্গের গ্রামগুলিতে পার্লেমেণ্ট-ধরনের এক প্রকার শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে। এনষ্টী (Anstey) বলেন,—“প্রাচ্য-মহাদেশই ‘ম্যুনিসিপালিটি’র জনক।” সিদ্ধান্তবাগীশেরা অনুমান করেন, “কুলানুকূলিক প্রধান,” পরে প্রবর্তিত হয়; আদিম আদর্শ অনুসারে, সকল গ্রামেরই শাসনকার্য ক্ষুদ্র পার্লেমেণ্টদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। ভারত যে স্বাধীন বিচারতর্কের অনুগামী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা অনতিবিলম্বেই দেখাইব যে, এই স্বাধীন বিচারতর্ক সেই সকল বিষয় পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, যে সকল বিষয়ে আমরা এখনও নিরুপায়। যে পঞ্চায়ৎ, জাতি-সংক্রান্ত ব্যাপারের নিয়ামক, উহা একটি অপূর্ণ মৌলিক ব্যবস্থা। যাই হোক অনেকগুলি গ্রাম-সমাজই নিজের কাজ নিজে নির্বাহ করে; পরিবারের কর্তারা মিলিয়া একটা স্থায়ী পরিষৎ গঠন করে; ব্যবস্থা পরামর্শ ও শাসনকার্য উভয়ই তাহাদের কাজ; এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তিরই সমান ক্ষমতা, এবং প্রত্যেকেই এই ক্ষমতা সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়োক্তবর্গের গ্রামগুলির শাসনকার্য-পরিচালক প্রধানেরা পূর্বতন বনিয়াদি কুল-প্রধানদেরই বংশধর; তাহারা ই গৌড়ায় গ্রাম পত্তন করে কিংবা সেই গ্রামে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করে। এই কৌলিক প্রাধান্য বশতই এই সকল প্রধানেরা, সরকারি উৎসব অনুষ্ঠানের সময়ে অগ্রাসন প্রাপ্ত হয়; এই জন্তই, ইহারা একটা সর্কবাদি-সুমন্ত্র প্রভৃতি, এবং শাসন ও বিচারকার্যে উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের গৃহই (“ধরি”) গ্রামের ‘পাথুরে কেন্দ্র’।

অধুনা যিনি ভূস্বামী, পূর্বপূর্ব শতাব্দীতে তিনিই যুদ্ধের নেতা। সেই ব্যক্তিই সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে, কিংবা দস্যুদলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। অধুনা “ব্রিটানিকী শান্তি” তাহার কার্যক্ষেত্র কমাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার গৌরব-প্রতিপত্তির কিছুমাত্র হ্রাস করে নাই; কেননা, সে এখনও নিজ পদেই প্রতিষ্ঠিত আছে; নিজ গ্রাম ও কেন্দ্রগত রাজশক্তি—এই উভয়ের মধ্যে সে মধ্যস্থরূপে নির্বাহিত হইয়াছে। ম্যুনিসিপালিটি-সমন্বিত গ্রামগুলিতে, ইংরাজ-সরকার একজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন;

তাহার ক্ষমতা কতকটা “মেয়র ও জস্টিস অফ দি পীসের” ক্ষমতার মত,—তিনিই “লম্বদার”।

বহু পূর্ব হইতেই, গ্রামের মধ্যে একজন লিপিকারের প্রয়োজন হইয়াছিল; সেই লিপিকার গ্রামের হিসাবাদি লিখিত, তাহার নাম ‘করণম’। লেখাপড়া না জানিয়াও গ্রামের মধ্যে কেহ-না-কেহ শীঘ্রই প্রধান হইয়া পড়ে। যেখানে ভূমি অসংখ্য অংশে বিভক্ত, যেখানকার স্বত্বাধিকার অত্যন্ত জটিল সেখানে একমাত্র ‘করণম’ই এই সমস্ত জটিলতার নিরাকরণ করিতে পারে। করণমের উপরেই লম্বদার। করণম ও লম্বদার এই দুইজনে মিলিয়া স্বকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া আশ্রিত গ্রামবাসীদের সর্বনাশ করে। কোন ব্যক্তির পত্নী যদি স্তম্ভরী হয়, আর সে যদি চোখ বুজিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা বড়ই খারাপ। একজন আমাকে বলিল, করণম জাল হিসাব কিংবা জাল পত্র প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, এবং এইরূপ হিসাব প্রস্তুত করিয়া, সেই জ্বালোকের নামে কিংবা ক্ষেতের নামে আদালতে (অনেক সময়ে প্রতিবাদীর অজ্ঞাতে) নালিশ রুজু করিয়া দেয় এবং এইরূপে ডিক্রী করিয়া তাহার সর্বনাশ করে, তাহাকে বে-ইচ্ছয় করে... এইরূপ পিশাচবৃত্তি অসম্ভব হইত যদি ইংরাজ সরকার গ্রামের বিচার সম্বন্ধীয় স্বাভাৱ্য হরণ না করিতেন। কোন যুরোপীয় রাজসরকারের এ বিষয়ে দক্ষতা আদৌ নাই। প্রাচ্যদেশের কোন ব্যবস্থাপ্রণালী যতই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হউক না, তাহাতে স্বল্পমাত্র পরিবর্তন করিতে হইলেও তাহার পূর্বে দীর্ঘ অনুশীলনের আবশ্যক।

ক্ষুদ্র আকারে পরিণত হিন্দুসমাজতন্ত্রই গ্রাম্যসমাজ। এই সহজ সংক্ষিপ্ত আকারেই বৃহৎ সমাজটি আমাদের নিকট ধরা দেয়। গ্রামের দিগন্তটি আমাদের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্মের যে তিনটি মূল শক্তি গ্রামের উপর কার্য করিতেছে তাহা সহজেই আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। সেই তিনটি শক্তি,—বর্ণভেদপ্রথা, বংশানুকূলিকতা ও ধর্ম।

সমাজ ও ধর্ম এই উভয় লইয়াই ব্রাহ্মণ্য; এই ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রে সমাজ ও ধর্ম পরস্পরের সহিত জুড়েছে বন্ধনে আবদ্ধ। ধর্মটি অতি মুক্ত, অতি উদার;—কোন বিশ্বাসকেই, কোন

নীতিকেই উহা বহিষ্কৃত করে না, ক্ষুদ্র বৃহৎ যেরূপ দেবতাই হউক, যে পলবীর দেবতাই হউক, সত্যকেই রেছাপূর্বক আপনার মন্দিরে স্থান দিয়েছে। একই মন্দিরের মধ্যে, এমন কি, একই বেদী উপর, পাশাপাশি বিভিন্ন দেবমূর্তি স্থাপিত অথচ তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার শত্রুতা নাই। ইহা কি কম আশ্চর্যের বিষয়? তাই আমি বলি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম এমন একটি ধর্ম, যাহার বিশেষত্ব ধর্মবিশ্বাস নহে, পরমার্থবিশ্বাস নহে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কলাপ নহে—তাহার বিশেষত্ব ব্রাহ্মণের প্রাধান্য; ব্রাহ্মণই পুরোহিত, ব্রাহ্মণই প্রভু। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম যেমন একদিকে অব্যবহিত্য, আতিথেয়, সর্বগ্রহণশীল, ব্রাহ্মণের অন্তর্গত সমাজটি আবার তেমনি রুদ্ধ; ইহা বর্ণভেদ ও কৌলিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

গ্রামকে বুঝিবার পক্ষে বর্ণভেদপ্রথা যেরূপ আমাদিগকে সাহায্য করে, বর্ণভেদপ্রথা বুঝিবার পক্ষে গ্রামও সেইরূপ সাহায্য করে।

পূর্বেই বলিয়াছি, এক দলের পর আর এক দল ক্রমান্বয়ে আসিয়া একই ভূমিখণ্ডের উপর গোড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে; এবং প্রত্যেক দল নিজ নিজ স্বত্বাধিকার ও স্বতন্ত্রতা প্রাপণের রক্ষা করে। এই আগন্তুক দলগুলিই বিভিন্ন বর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দল ও বর্ণের মধ্যে একটা স্পষ্ট সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। এখন যাহা বর্ণ, গোড়ায় অনেক সময়ে তাহাই একটা উপনিবেশিকের দল ছিল। ভূস্বামী, কৃষক, নাপিত—ইহারা প্রত্যেকেই এখন একএকটা বর্ণভুক্ত; তাহাদেরই অনুরূপ গোড়ায় গায়ের রং ও বংশ অনুসারে পার্থক্য সংঘটিত হয়। উভয়ের মধ্যে এইরূপ একটা সাদৃশ্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কোন ব্যক্তি জন্মস্বত্বস্বত্বেরই কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত; তাহাকে জাতিচ্যুত না করিলে সে তাহা হইতে কখনই বাহির হইতে পারে না। জাতিচ্যুত হইলেই সে চণ্ডাল কিংবা পারিয়া হইয়া যায়। যে বর্ণের যে লোক, সে সেই বর্ণের মধ্যেই বিবাহ করে, সেই বর্ণের লোকদিগেরই সহিত এক সঙ্গে আহারাদি করে। বিবাহ ও ভোজন এই দুইটিই বর্ণভেদপ্রথার মূখ্য জিনিস। এই বর্ণভেদ, বাহ্যিকের দ্বারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত, মুণ্ডিত মস্তকের চূড়ামণ্ডে কেশগুচ্ছ ধারণ—ইহাদের দ্বারা সূচিত

হয়, কোন এক ব্যক্তি পুরাতন আৰ্য-শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তা ছাড়া আবও দেখা যায়, এই বর্ণভেদপ্রথা প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়া কর্মের উপর একটা যেন বিশেষ ধবণের ছাপ বসাইয়া দিয়াছে; জন্মবিবাহ ভোজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে, প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই একটু নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের নীতিতত্ত্ব স্বতন্ত্র, অল্প বর্ণের নীতির সহিত তাহার মিল নাই। চোর ডাকাতদিগেরও একটা বিশেষ বর্ণ আছে—‘মুন-ঠগ’। একজন মুচিও আপনার দলের মধ্যে ‘হাম্-বড়-স্ববর্ণের ভিতরে সবই ভাল, স্ববর্ণের বাহিরে সবই মন্দ’।

সমাজের এই বিভিন্ন অংশের মধ্যে, মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করা একটু কঠিন। এই সমস্ত সমাজের মীমাংসার পক্ষে হিন্দুর ধৈর্য্যও যথেষ্ট নহে। এই জন্তই প্রত্যেক গ্রামে, পুরাতন কুলপতি-শাসনতন্ত্রের ধরণে (Patriarchal) একএকটি ক্ষুদ্র পার্লামেন্ট অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ প্রতিষ্ঠিত। পূর্বেই বলিয়াছি, মুনিসিপ্যালিটির সহিত পঞ্চায়তের একটা প্রভেদ আছে। প্রচলিত প্রথা, সামাজিক আচার ব্যবহার, নীতি-রক্ষা, সাহায্যদান—পঞ্চায়তের উপর এই সমস্ত বিষয়সম্বন্ধে মীমাংসার ভার। সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধেরা গ্রামের গাছতলায় আসিয়া সমবেত হয়। তাহারা পদমর্যাদার নিয়ম নির্ধারণ করে—(এইরূপ সমাজে ইহা একটা গুরুতর কাজ)—জাতি-চ্যুতির দণ্ডবিধান করে, ব্যক্তিচারীকে শাস্তি দেয়, স্বামী স্ত্রীকে পৃথক করিয়া রাখে, কিংবা তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া দেয়, অশান্ত অক্ষম লোকদিগের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে। সন্ধ্যার বৎসরে গ্রামের মধ্যে একটিও দরিদ্র, একটিও পরিত্যক্ত লোক দেখা যায় না। দরিদ্রদের সাহায্যার্থে পঞ্চায়ৎ, গ্রাম হইতে চাঁদা উঠায়। গ্রামের নীতি-রক্ষা করা যেমন প্রয়োজনীয়, গ্রামের দারিদ্র্য মোচন করাও তেমনি প্রয়োজনীয়। গ্রামের জমি বণ্টন করা, হিসাব ঠিক করা, জমি ও ভিটার সীমানা নির্ধারণ করা—এই সমস্তই পঞ্চায়তের অধিকারায়ত্ত কাজ, কিংবা একসময়ে অধিকারায়ত্ত কাজ ছিল। কিন্তু এখন এই ক্ষুদ্র পার্লামেন্টের অধিকার অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন ইংরাজ-স্থাপিত জেলা আদালতে, মৌকদমা-মামলাই প্রাচুর্যবেগে চলিতেছে; এই আদালতের রজতুমিতে চাষা অপেক্ষা ‘কর্ণম’ কিংবা

চেটিই প্রধান অভিনেতা । এমন যে চমৎকার ব্যবস্থা প্রণালী বাহা গ্রাম্য সমাজের কার্যনির্বাহণকে অতীব প্রয়োজনীয়—
 দুঃখের বিষয় ইহা ক্রমশই লোপ পাইতেছে ; তা ছাড়া
 একথাও বলা আবশ্যক, যুরোপীয় শাসনাধীনে দেশের যত
 কিছু অনিষ্ট ঘটয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাও একটি ।
 বর্ণ-বংশানুক্রমিকতা । কোন এক বিশেষ বর্ণের লোক,
 যাহারা বিবাহ, আহার ক্রিয়াকর্ম ও আচার ব্যবহারের
 ভিন্নতা প্রযুক্ত অল্প বর্ণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, তাহারা
 আপনার গণ্ডির মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করিতেছে । সেই গণ্ডির
 মধ্যে আর কেহই প্রবেশ করিতে পারে না । বংশানু-
 ক্রমিকতাই যেন প্রধার জীবন্ত মূর্তি । এই রক্ষণশীল সমাজে
 প্রত্যেক কার্যই যেন একটা নজীর । গ্রামবাসীদের সকল
 কাজই নজীরের উপর, চির-অভ্যাসের উপর, চিরপ্রধার
 উপর স্থাপিত । নূতন কিছু প্রবর্তিত করাই পাষণ্ডতা—
 নাস্তিকতা । বর্ণের জ্ঞান কর্মও বংশানুক্রমিক । আমাদের এই
 কুস্তকারের পিতাও কুস্তকার । নটীর মেয়ে নটী, বেঞ্জার
 মেয়ে বেঞ্জা ; এবং তাহারাও অস্ত্রের জ্ঞান স্বকীয় গোষ্ঠী ও
 কুলের জন্ত গর্কিতা । এ দেশে এমন কি আছে বাহা
 বংশানুক্রমিক নহে ? এখানকার লোকেরা সভ্যতা-স্বর্ঘ্যের
 গতিরোধ করিয়াছে ; সচল জগতের মধ্যে থাকিয়া অচল-
 ভাবে জীবন যাপন করা—ইহাই উহাদের চরম আদর্শ ।

এই মাত্র আমি সামাজিক নাস্তিকতার উল্লেখ করিয়াছি ।
 এ দেশে কোন প্রকার ধর্মমতে নাস্তিকতা হয় না । যেমন
 একদিকে মনোরাজ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তেমনি আবার
 সমাজের মধ্যে ভীষণ দাসত্ব । এখানে ধর্ম একটিমাত্র নহে ;
 সমাজের জ্ঞান ধর্মও ধাপে ধাপে উঠিয়াছে । ধর্ম সকলের জন্ত,
 ধর্ম প্রত্যেকের জন্ত । বড় বড় দেবতা বাদে প্রত্যেক বর্ণেরই
 পৃথক পৃথক নিজস্ব দেবতা আছে, পৃথক ধর্মীয়স্থান আছে,
 পৃথক পূজাপদ্ধতি আছে । কাহারও দেবতা হনুমান, কাহারও
 কৃষ্ণ, কাহারও গণেশ । ভারতে যে সকল আদিম নিবাসী
 লোককে হিন্দুধর্ম আপনার ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিল, বর্ণভুক্ত
 করিয়া লইয়াছিল, তাহারা নিজেদের দেবতাদিগকে সঙ্গে
 করিয়া আনিয়াছিল । হিন্দুধর্ম সেই দেবতাদিগকে শীতাই
 আপনার করিয়া লইল, বৈধ করিয়া লইল, মন্ত্রপুত ও
 বিশোধিত করিয়া লইল । যে সকল নীচবর্ণের লোক

গ্রামের উপকণ্ঠে বাস করে,—তাহারাই ভীষণ শীতলা দেবীকে,
 ওলা-দেবীকে নৈবেদ্যের দ্বারা, মন্ত্রের দ্বারা প্রশমিত
 করিতে পারে । ঐ সব মন্ত্র তাহাদেরই একচেটিয়া ।
 ব্রাহ্মণের মধ্যে যত প্রকার বর্ণ ও জাতি আছে, তত-
 প্রকার বিশেষ ধর্মমতও তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে ।
 তাই, প্রকৃত ধর্ম যে কি, মনের কোন্ অবস্থাকে
 গোড়ানী বলা যায়—হিন্দুর নিকট তাহা চর্য্যোধ্য ।
 উচ্চতর ব্রাহ্মণ্যধর্ম, কতকগুলি বাছা-বাছা দীক্ষিত
 লোকদিগের মধ্যেই বদ্ধ । তাহারা Fontenelleএর
 এই কথাটি বোধ হয় সম্ভ্রামের সহিত আবৃত্তি করিতে
 পারে :—“আমি যদি মুঠা-ভরা সত্য পাই, আমি কখনই
 আমার মুঠা খুলি না ।” তবে এই ধর্মটি কি ?—সামাজিক
 অনুষ্ঠান মাত্র । ভারত, পুরোহিত-তন্ত্রের দ্বারা একেবারে
 অন্ধবিদ্ধ । এই ধর্ম কিংবা বাহ্যানুষ্ঠান (বাহা এ স্থলে
 একই কথা) প্রত্যেক ব্যক্তির—প্রত্যেক বর্ণের ক্ষুদ্রতম
 কার্যের মধ্যে বর্তমান,—গ্রামের সমস্ত আমোদ-আহ্লাদের
 মধ্যে, গ্রাম্যজীবনের সমস্ত বিকাশের মধ্যে বর্তমান ।
 ধর্মোৎসব, ব্রাহ্মণভোজন, তীর্থযাত্রা—ইহারই সমষ্টি হিন্দুধর্ম ।

কি ব্যক্তিগত কার্য, কি পারিবারিক কার্য, কি
 সামাজিক কার্য, কোন কার্যই দেবতাদের আয়ত্তের বাহিরে
 নহে । ঔষধের একটি বড়ি খাইতে চাও, বিদেশে যাত্রা
 করিতে চাও, একটা ভারী জিনিস যন্ত্রের দ্বারা উঠাইতে চাও,
 ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে চাও,—যে কোন কাজই কর,
 তাহার পূর্বে দেবতার সম্মতি চাই ;—ব্রাহ্মণকে মধ্যস্থ
 করিয়া দেবতায় আপনার বৃত্তি এই প্রকাবে নিয়মিতরূপে
 আদায় করিয়া থাকেন ।

• ব্রাহ্মণ ! এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে এখনও আমি কিছু বলি
 নাই । ব্রাহ্মণই এই সমাজ-গৃহের কুক্ষিকা ; তাঁহাতেই এই
 তিনটি মুখ্য শক্তি মূর্তিমান হইয়া রহিয়াছে :—বর্ণভেদ
 কৌলিকতা, ধর্ম । ব্রাহ্মণ হওয়া মহা অহংকারের বিষয়,
 উহা ভারতীয় আভিজাত্যের মুখ্য পদবী ; বহু জন্মের তপস্যার
 ফলে ব্রাহ্মণ হইয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করা—ইহাই ভক্ত
 হিন্দুর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ।

ব্রাহ্মণের বর্ণ বলিতে পুরোহিতের বর্ণ ততটা বুঝায় না যতটা
 আভিজাত্যের বর্ণ বুঝায় ; অথবা আরও ষষ্ঠাধরূপে বলিতে

হইলে, (কেন না, উহার অল্পরূপ আমাদের মধ্যে কিছুই নাই) উহার কতকগুলি বাছা-বাছা বিশিষ্ট লোকের সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বলিয়া থাকে এবং কথাটাও সত্য যে, প্রায় অধিকাংশস্থলেই, বংশের বিস্তৃতি ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা উহাদের মধ্যেই সংরক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ যে-কোন কাজে নিযুক্ত হইতে পারে,—ব্রাহ্মণ, মুটিয়ার কাজ করিতে পারে, বেগিয়ার পাচক হইতে পারে, কিংবা “পানি ! পানি !” চীৎকার করিয়া, রেলওয়ে স্টেশানে রেল-বাড়ীদিগকে পানীয় জল যোগাইতে পারে—সবই করিতে পারে, কিন্তু তবু তাহার প্রভু সর্বাঙ্গে তাহাকে ভক্তিতরে প্রণাম করিবে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিংবা নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই দেবালয়ের কাজে নিযুক্ত হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ধর্মতত্ত্বের কথাও ভাবে না, নীতির কথাও ভাবে না, যজ্ঞানুষ্ঠানের কথাও ভাবে না। তাহার যে কাজ তাহা নিজে বলিতেছি।

ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ লোক-গুরু; তিনি যাঁহা কিছু বলেন তাহা যেন গুরু আসন হইতেই বলেন; তাঁহার প্রভাব নিগূঢ় রহস্যময়, তাঁহার বাক্যই চরম প্রমাণ; তিনিই বিধান দেন, সম্মতি দেন, মন্তব্য দ্বারা সমস্তই শোধন করিয়া লন। ব্রাহ্মণের অনুমোদন ব্যতীত কোন কাজ হইতে পারে না। পারিবারিক উৎসবাদিতে, জন্মে, বিবাহে, বলিকার যৌবন প্রাপ্তিতে, রোগে শোকে; ব্রাহ্মণের উপস্থিতি, ব্রাহ্মণের উপদেশ, ব্রাহ্মণের মন্ত্রপাঠ অপরিহার্য; কৃষিকর্মের, বীজ বপনের, শস্ত কর্তনের শুভদিনকণ তিনিই নির্ধারণ করেন। বিভিন্ন ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠানে, তিনিই বেদমন্ত্র পাঠ করেন; কেন না বেদমন্ত্র একমাত্র তাঁহারই জ্ঞানিবার কথা; কিন্তু কেহই তাহা বুঝে না, তিনি নিজেও বুঝেন না; অথচ এই বেদমন্ত্র পাঠের অধিকারই তাঁহার প্রতিপত্তি—তাঁহার শ্রেষ্ঠতা বজায় রাখিয়াছে।

পরিবারের মধ্যেও তাঁহার অসীম প্রভাব। একজন হিন্দু আমাকে বলিয়াছিলেন :—

“অধ্যয়নের জন্ত আমার পুত্রকে বিলাত পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু বিলাত বাইতে হইলে “কাল-পানি” পান হইতে হয়; আর “কালপানি” পান হওয়া একটা মহাপাপ। আমার সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়া পুরোহিতেরা আমার মায়ের নিকট আসিয়া আপত্তি জানাইল।

আমার এখানে তিনজন ব্রাহ্মণ আসিয়া থাকে; একজন আমার দ্বীপের জন্ত, একজন আমার মেয়ের জন্ত, এবং আর একজন আমার নিজের জন্ত। বলিতে গেলে, উহারাই এখানকার প্রভু; উহাদের প্রত্যেককে, মাসিক ৬ টাকা করিয়া আমার দিতে হয়।”

ছয় টাকা মাত্র! যখন ভাবি, এই মহাপুরুষেরা নৃপোচিত বদান্ততার পাত্র, তখন ইহা অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষ, পুরোহিতের স্বর্গ বলিলেই হয়। ধর্মযাজিত পরামর্শজীবিতা এখানে পূর্ণ স্বাধীনতার বিরাজ করিতেছে। পবিত্র পায়রাগুলার দ্বারা ব্রাহ্মণও সাধারণের ব্যয়ে প্রতিপালিত এবং একইরূপ সম্মানের অংশভাগী। ত্রিবাঙ্কুরে খুব জাঁকালো জাঁকালো সুসজ্জিত পাথশালা আছে, সেখানে শত শত ব্রাহ্মণ রাজার ব্যয়ে আতিথ্যসংকার প্রাপ্ত হয়। এই সকল অতিথিশালায় উহার দিব্য আরাধনে দিনপাত করে; একটা অতিথিশালায় থাকিয়া যখন ক্রান্তি জন্মে কিংবা সেখানকার একঘেয়ে ভোজন অরুচিকর হইয়া উঠে, তখন উহার আর একটা অতিথিশালায় চলিয়া যায়। দরিদ্র গ্রাম্য লোকেরাও রাজার ধরণ-ধারণ অনুকরণ করে। ব্রাহ্মণ-ভোজন একটা মহা পুণ্য কর্ম। কিন্তু হায়, ইহাতেই লোকের সর্বনাশ! এই ফলারে বায়ুনগুলা নিজ ক্ষুধার পরিমাণ বৃদ্ধিতে পারে না, উহাদের উদরে একটা দড়ি বাঁধা থাকে, দড়িটা ছিড়িয়া গেলেই উহার ভোজনে বিরত হইয়া উঠিয়া পড়ে। অথবা ভৃত্যেরা, এক একটা কলাপাতার উপর খানিকটা চাউল, স্বপাকার কল ও ছিটান রাখিয়া তাহা প্রত্যেক অতিথির হস্তে অর্পণ করে—অতিথিরা উহা লইয়া তাড়াতাড়ি গৃহে চলিয়া যায়।

আমি কোন জাপানী গৃহস্থের বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানেও এই প্রথা প্রচলিত দেখিলাম। এই স্মৃতি-বাসনে, কুলঙ্গির পর্দা খোলা হইল, এবং অভিনব রেশমি বস্ত্রে বিভূষিত শুভঙ্কর দেবতাদের সম্মুখে শাল রঙ্গের সমস্ত মোম-বাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। ত্রিশজন দ্বী-পুরোহিত চারিদিকে ঘিরিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছে; তাহাদের সম্মুখে এক একটি ক্ষুদ্র চারের পেয়ালা,—হাতে এক একটি ক্ষুদ্র “পাইপ”। উহার দ্বীয়ে দীয়ে একটি দীর্ঘ অপমালা টিপিয়া টিপিয়া ঘুরাইতেছে—অপমালার বীচিগুলা বাঁদামের

মত বড়, জপমালাটা এত দীর্ঘ যে সমস্ত ঘরটি ঘুরিয়া আসিতেছে। উহার আনন্দ! আনন্দ! বলিয়া গান করিতে লাগিল; তাহার পর, একটু বিরাম;—এই সময়ে সমস্ত পাইপ-চুরোট হইতে সবেগে ধুম উদ্‌গারিত হইতে লাগিল। তাহার পর, সেই প্রকাণ্ড জপমালা অন্তর্হিত হইল। এই সময়ে প্রত্যেক পুরুত্বনীর নিকট এক একটা ক্ষুদ্র ধাতব খঞ্জনী ও এক একটা হাতুড়ী আনা হইল; সমস্ত খঞ্জনী এইবার তাগে তাগে বাজিতে লাগিল—সেই সঙ্গে,—“আনন্দ! আনন্দ! বৃৎস!”—এই গান চলিতে লাগিল, এবং পাইপের আশ্বিনও নিয়মিতরূপে জ্বলিতে লাগিল।

ইহা গৌরচন্দ্রিকা মাত্র! এই সময়ে একদল পরিচারিকা প্রবেশ করিল। তাহারা ‘সাকে’-মদিরার বোতল, চায়ের জল-ভরা চা-দানী, লাল গালায় কতকগুলি গুলি, কতকটা স্থপ—তাহাতে চিংড়ী ভাসিতেছে,—কতকগুলি শামুক, কাঁচা লাল মাছের কতকগুলি টুকরা, কতকগুলি সামুদ্রিক ভূগ, কতকগুলি পিষ্টক ও স্বগন্ধী মিষ্টান্ন আনিল...প্রত্যেক পুরুত্বনীর সম্মুখে এইগুলি রাশীকৃত হইল। এইবার পাইপ-টানা বন্ধ হইল। পুরুত্বনীর স্বকীয় মণ্ডিত মস্তক নত করিয়া, শিষ্টতার বিবিধ মুখভঙ্গী সহকারে, ‘ওক্’ ফলের পেয়ালার প্রমাণ পেয়ালায় ভরা, ধূমায়মান গরম সাকে-মদিরা পরস্পরকে দিতে লাগিল।

ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধাদের নির্দোষ চোখগুলি জ্বলিয়া উঠিল, সব মাথাগুলি মর্কটের মাথার মত নড়িতে লাগিল, আড়-চোখে আমাকে দেখিতে লাগিল, কখনও বা ভুলক্রমে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর একটা হাসির গরুরা উঠিল—এবং নন্দুকের দেওড়ের মত উহা ক্রমেই প্রসারিত হইল। এই সময়ে পরিচারিকারা আবার আসিল এবং হাতের এক সাপটে সেই লাল গালা, ফল, পিষ্টক, স্থপ সমস্ত একস্থানে রাশীকৃত করিল, তাহার পর ঐ সমস্ত সমস্ত কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া গেল। এই গায়িকাবন্দ আবার গম্ভীরভাবে ধারণ করিয়া খাণ্ডের পুটুলিটি বগলে করিয়া সংযতভাবে প্রস্থান করিল—বোধ হয় ঐ খাণ্ড তাহাদের সপ্তাহকাল চলিবে।

আর কিছু না হউক, এই হিন্দু গ্রাম্যতন্ত্র, একটা নূতন মতবাদ ধাঁড়া করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়া গৌরবের ভাগী

হইয়াছে। আবার ইহার বিপর্যয়ও ঘটয়াছে; কেহ কেহ, এইভাবে ইহার আলোচনা করে, যেন ইহা শুধু একটা সামান্য তর্কের বিষয় মাত্র, তাহার অধিক কিছুই নহে। এই কৃষি-মধুচক্রের জীবন-প্রণালী, ইহার নিঃসঙ্গ শাসন-স্বাভাব্যতা, ইহার অন্তর্কর্ত্তী লোকদিগের ঘনিষ্ঠ দলবন্ধন ও ঘনসংহতি, বাহার বিষয় আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং ভূসম্পত্তির প্রকৃতি—এই সমস্ত আলোচনা করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তবাগীশ, কলম্বোসের জ্ঞান “পাইয়াছি, পাইয়াছি” বলিয়া উঠিলেন; কালগণনায়, সমবেত ভূসম্পত্তি—ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির পূর্ববর্ত্তী, তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন... জার্মানদিগের পুরাতন “সাময়িক যাত্রা-প্রণালী” এখন মৃত! কিন্তু এই দেখ, এইখানে আমাদের চক্ষের সমক্ষে—গ্রাম-সমবায়ের একটা প্রত্যক্ষ জীবন্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি। এই সিদ্ধান্তটি চিরকালের মত সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত যতই প্রামাণিক হয় ততই যেন বহুল আক্রমণের বিষয় হইয়া পড়ে। এই সকল জন্মকালো “তুবার-রাণী” নিশ্চিত না হইতে হইতেই উহাদিগকে আবার কন্দুকের আঘাতে ভাঙিয়া ফেলা হয়। লোকে আরও কাছে আসিয়া যখন দেখে, তখন মনে হয় উহা নেত্র-বিভ্রম বই আর কিছুই নহে। ধ্বংসকর্ত্তা করিলেন কি?—না, তিনি সেই একই উপাদান লইয়া আর একটা সিদ্ধান্ত গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কালের অগ্রপশ্চাৎ লইয়াই ইহার বা কিছু নূতনত্ব, তা ছাড়া আর কোন নূতনত্ব নাই। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, কালের হিসাবে, সমবেত ভূসম্পত্তি পূর্ববর্ত্তী না হইয়া, ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তিই পূর্ববর্ত্তী হইল।

গ্রামে ভূসম্পত্তির বোধ-বন্দোবস্ত ছিল,—এই চিন্তাকর্ষক সিদ্ধান্তটি, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আদিম ব্যবস্থাদির ইতিহাস লেখক Sumner Maine প্রচলিত করেন। তিনি বলেন, ‘গোড়ায় একটা মূল-আদর্শ বিদ্যমান ছিল; স্থান বিশেষে এক্ষণে যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তৎসমস্তই সেই মূল-আদর্শের উপর স্থাপিত বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যে ভূসম্পত্তির উপর কোন গ্রাম অধিষ্ঠিত, সেই গ্রামই সেই ভূসম্পত্তির অধিকারী কিংবা সেই ভূসম্পত্তির ফলভোগী। অবশ্য এই সামবায়িক বন্দোবস্তটি সর্বোৎসর্গমূল্য নহে।

কেন নহে? যে হেতু, এই ভাবটি বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। স্থানে স্থানে দেখা যায়, এই আদিম আদর্শটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিংবা রূপান্তরিত হইয়া উহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ক্রমশ প্রবেশ করিয়াছে। এমন গ্রামও আছে যেখানে ভূমি অংশে অংশে বিভক্ত হইয়া আবার ব্যক্তিগত স্বত্বে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও, এই আংশিক বিলোপ সত্ত্বেও,—অত্র স্বত্বাধিকার আসিয়া প্রথম স্বত্বাধিকারের উপর চাপিয়া বসিলেও—মূল আদর্শের স্থূল রেখাগুলি এখনও ধরিতে পারা যায়। এমন কি, যেখানে পৃথক স্বত্ব সৃষ্ট হইয়াছে, সেখানেও তাহার ফলভোগসম্বন্ধে এত অসংখ্য খুঁটিনাটি নিয়ম আছে, যে কার্য্যতঃ উহা অবিভক্ত স্বত্বেরই সামিল হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের শাসনকার্য্য বাহার হস্তে সেই পঞ্চায়তই, মোসমের শেষে হিসাব নিষ্পত্তি করে, ফসল ভাগ করে। অনেক গ্রামই সমবেতভাবে খাজনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্থূল কথা, ব্যক্তিগত পৃথক স্বত্ব উত্তর কালে সৃষ্ট হইয়াছে—এই পরিবর্তনটি হালের। প্রাচীন আদর্শের অবনতি হইয়াই এই ব্যক্তিগত স্বত্বের সৃষ্টি। আধ্যাত্মিক কর্তৃক স্থাপিত আদিম গ্রামে, সমস্ত সমাজ সমবেতভাবেই অবিভক্ত ভূমির অধিকারী ছিল। মেন-সাহেব আরও এই কথা বলেন;—ইহা ত জানা কথা যে, আধ্যাত্মিক সমবেতভাবে একই ভূমি অধিকার করিত; তার সাক্ষী—পুৰাতন আশ্রমজাতির “সামরিক যাত্রী”। ইহাও একটা নূতন প্রমাণ—জলন্ত প্রমাণ।

একটা ইংরাজি কথা আছে—“লাক্‌ডিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া”—এখানে তাহাই হইয়াছে। মেন-সাহেব যখন ১৮৭০ অব্দে, এই অপরিস্রব সিদ্ধান্তটি জনসমাজে প্রচার করেন, তখন বাস্তবিক তিনি এই বিষয়ের কি জানিতেন? উত্তর প্রদেশের গ্রামসমূহেই তাঁহার জ্ঞানগুনা ছিল। রাজস্বের মোট সংস্থান ও তাহার পুনর্ব্যবস্‌টন—এই উভয়ের মধ্যে আপেক্ষিক সম্বন্ধ কিরূপ—ইহার উপরেই সমস্ত অনুশীলন প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু দক্ষিণ ও মধ্য প্রদেশের গ্রামগুলি সম্বন্ধে এ বিষয়ের জ্ঞান তাঁহার যথেষ্টপরিমাণে ছিল না; শিক্ষকের সুবিধার জন্ত ও ব্যবহারের জন্ত, যে সকল সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ ছিল, তাহা হইতেই তিনি যাহা-কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এখন ইংরাজদিগের এ বিষয়ে

অনেক জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন তাহাদের রিপোর্টগুলি, নানাবিধ তথ্য ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। বাহার উপর শাসনভার সেই কালেক্টর এখন সেই আদিম বংশদিগের সমাজগঠনের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পরে, কতকগুলি নূতন সংজ্ঞা আমাদের গোচরে আসিয়াছে, কিন্তু এই গুলি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখে এরূপ সূক্ষ্ম সমালোচক অধুনা কেহ নাই। আর কিছু না হউক, যদি কেহ এই রত্ন-খনিটি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখেন, তা হইলে হয়ত দেখিতে দেখিতে হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িবে—কোন স্থানে একটা স্তর-শিরা বিকসিৎ করিতেছে! মেনের সিদ্ধান্ত প্রাচীন কালের সমাজগঠনসম্বন্ধে, কিন্তু ইংরাজসরকারের কর্মচারী Baden Powell ইঙ্গ-ভারতের প্রচলিত রাজস্ব প্রশালীটি ভাল করিয়া অনুশীলন করিয়াছেন। তাঁহার অনুশীলনের ফল, ১৮৯২ অব্দে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থের নাম “ইঙ্গভারতে জমির বন্দোবস্ত প্রশালী,”—ওথও সমাপ্ত। যে সকল বহু-বিভূত রিপোর্টের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই উপলক্ষে, সেই সব রিপোর্ট তাঁহাকে অনেক ঘাঁটিয়া দেখিতে হইয়াছিল। পৌএল সাহেব তাহার মধ্য হইতে কোন মতবাদ কিংবা সিদ্ধান্ত বাহির করেন নাই, কিন্তু এমন কতকগুলি অনিশ্চিত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা হইতে জানা যায় যে খুব আধুনিক কালেও সমবেত সাধারণ গ্রাম্য সমাজের অস্তিত্ব ছিল।

১৮৭০ অব্দে মেন-সাহেব এইমাত্র বলিতে পারিয়াছিলেন যে গ্রাম্যসমাজ গোড়ায় আধ্যাত্মিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কতকটা এই বিশ্বাসের উপরেই তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপিত। কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে,—ভারতীয় জাতিগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হওয়ার, সে সম্বন্ধে আমাদের মতেব একটু পরিবর্তন হইয়াছে। সকল বিজ্ঞানের মধ্যে জাতিতত্ত্বের সিদ্ধান্তনির্ণয়ে বিশেষ সতর্কতা ও বিবেচনা আবশ্যক হইলেও, এইটুকু নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে ভারতীয় জাতিদিগের দেহে আধ্যাত্মিক অতীব লঘুপরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছিল। তাছাড়া যে সব জাতি আসিয়া দক্ষিণভারত ও মধ্যভারত বসতি স্থাপন করে—নন্দ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া বিষ্ণাচল পর্যন্ত তাহার সমস্তই দ্রাবিড়ীয়। আধ্য-

গণের ধারাবাহিক প্রবাহ বিক্ষাচলে আসিয়া আটকাইয়া পড়িয়াছিল, কেবল কতকগুলি দুঃসাহসিক লোক ও ব্রাহ্মণ ধর্মপ্রচারক এই বাধা লঙ্ঘন করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করে। তাছাড়া আর্য্যজাতির আর একটি দল, সিদ্ধনদ বাহিয়া পশ্চিম প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং সেখান হইতে ক্রমশঃ অবতরণ করিয়া বোম্বাইয়ের দিক দিয়া উচ্চ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপনীত হয়। কিন্তু হিন্দুস্থানেই, অর্থাৎ পাক্‌বাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকাতোই আর্য্যনবপতিগণের ও ব্রাহ্মণিক সভ্যতার পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ কথা বেন মনে থাকে, আর্য্যগণ জেতু-জাতি—শ্রেষ্ঠ জাতি হইলেও, তাহাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তাহারা কৃষি-প্রণালী উদ্ভাবন করে নাই, তাহাদের আগমনের পূর্বে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষি প্রচলিত ছিল। শুধু তাহা নহে, এই শ্রেষ্ঠ আর্য্যজাতির প্রধানেরা কৃষিকার্য্যকে অবজ্ঞা করিত, কেবল দেশের সাধারণ লোক বৈষ্ণোরাই কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। তাহার পর একটা সুদীর্ঘ অন্ধকারের যুগ। এই সময়ে আর্য্যনূপতিগণ প্রায় সকলেই অন্তর্হিত। আর্য্যবংশের বাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারাও দেশ হইতে দূরীকৃত হইল। আবার কতকগুলি নূতন দল আসিয়া হিন্দুস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিল; নিঃশেষিতপ্রায় আর্য্যদের সহিত বাহারা কুটুম্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিল সেই রাজপুতের দল—এবং অন্ত্যস্ত দল,—যেমন হিন্দ-শিখীয় বংশের ‘জাট’ ও ‘শুজার’, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতি, বৈষ্ণজাতির কতকগুলি ভগ্নাবশিষ্ট লোক, রাজপুত, উত্তর প্রদেশের জাট ও শুজার,—এখনকার গ্রাম্যসমাজেব ইহারাই মুখ্য উপাদান। ইহা যদি সত্য হয়, তবে কি এ কথা বলা যাইতে পারে কিংবা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, আর্য্যভিত্তির উপরেই এই সকল গ্রাম্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত? তাহার বিপরীতে বাডেন-পোএল বরং এই কথা বলেন, আর্য্যবংশীয়েরা কিছুই নূতন উদ্ভাবন করে নাই, তাহাদের পূর্বে গ্রামের যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল উহার তাহার কিছুই পরিবর্তন করে নাই। কথাটা একটু বেশী মাত্রায় বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে, এ বিষয়ে আর্য্য-প্রভাব কিছু-মাত্র প্রকটিত হয় নাই। আর্য্যেরা গাঙ্গেয় উপত্যকায় যে সভ্যতা প্রবর্তিত করে, তাহা সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহা কি সম্ভব, এই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধর্মব্যবস্থা ও সামাজিক

ব্যবস্থার যেটি মুখ্য বিষয়—সেই গ্রামের আর্থিক বন্দোবস্ত, তাহাকে এই সভ্যতা একেবারেই স্পর্শ করিল না! আর্য্য-গণকর্তৃক গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এই কথাটা হালকাভাবে বলা হইয়াছে। গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অথচ যদি আমরা বলি—দলিল আদি প্রমাণের অভাবেই যদি আমরা বলি যে—আর্য্যেরা এ বিষয়ে কোন প্রভাব প্রকটিত করে নাই—তবে ইহা কি একটা পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য হইয়া দাঁড়ায় না? কৃষকদিগের মধ্যে আর্য্যের ভাগ কি পরিমাণ ছিল তাহা জানা নাই। তাহাদের কার্য্যের সমস্ত খুঁটিনাটি-বিবরণ—কতটা প্রভাব তাহারা প্রকটিত করিয়াছিল—এ বিষয়ে দলিলাদি একেবারেই মুক। আরও সঠিক তথ্যাদি যতদিন না হস্তগত হয় ততদিন সকলেই যে পথে চলিতেছে আমা-দেরও সেই পথ কাজেই অনুসরণ করিতে হইবে।

উৎপত্তির কথাটা এখন থাক—কেমনা, আর যাই হউক, ইহা যে একটা সংশয়-সঙ্কুল বিষয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রাম্য স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে আমাদের কি বক্তব্য? যে সকল তথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইতে সাধারণ ভূসম্পত্তির অস্তিত্ব কি সপ্রমাণ হয়? বি-পোএল, তাঁহার হিসাবের মধ্যে সরকারী জরিপ-কাগজের শ্রেণীবিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি গ্রামগুলিকে দুই বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন; যেখানে ভূস্বামীরা ব্যক্তিগত হিসাবে কর দেয় সেই দক্ষিণ ও মধ্য প্রদেশের গ্রাম এবং বাহার সমবেতভাবে খাজনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই অল্পসংখ্যক উত্তর প্রদেশের গ্রামসমূহ। এই প্রথম বর্ণের গ্রামগুলির সম্বন্ধে পূর্বে কিছুই জানা ছিল না; ১৮৭০ অব্দেব কাছাকাছি কোন সময় হইতে উহাদের সম্বন্ধে রীতিমত অনুশীলন আরম্ভ হয়। ইহা সন্দেহও উহাদের সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা হইয়াছিল। আসল কথা, এই সকল গ্রামের করণীয় ভূমিখণ্ড গুলি পৃথক ছিল এবং উহাদের কৃষিকার্য্যও পৃথক ভাবেই নির্বাহিত হইত। দলিলাদির অবিজ্ঞমানে ইহা বিশ্বাস কবিবার সম্পূর্ণ হেতু আছে যে, ঐ সকল গ্রামের বন্দোবস্ত বরাবর এই রূপই ছিল। উত্তর প্রদেশের মত, কতকগুলি জাতি আসিয়া ঐ গ্রামগুলি পত্তন করে। কিন্তু ক্রমে উহাদের “জাতীয়” বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি এই সকল জাতি দ্রাবিড়বংশোদ্ভব। দ্রাবিড়ীয়

গ্রামগুলি, আমাদের মতে, শুধু দাক্ষিণাত্যের আদিম আদর্শ নহে, পরন্তু সম্ভবতঃ সমস্ত ভারতবর্ষের আদিম আদর্শ। এই প্রথম আদর্শ-গ্রাম আখ্যায়িকার পূর্বে গঠিত হয়, আখ্যায়িকা আসিয়া তাহার কোন পরিবর্তন করে নাই। অতএব, দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যভারতে সাধারণ স্বত্বাধিকার অথবা অবিভক্ত স্বত্বাধিকারের কোন নিদর্শন দেখা যায় না। তবে দেখ, যে বর্গটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহা গণনার বাহিরে—প্রচলিত সিদ্ধান্তের বাহিরে পড়িয়া যাইতেছে। অবশ্য মেন্ হ্যার প্রত্নবিদ্যে এইমাত্র বলিয়াছেন যে, এমন কতকগুলি গ্রাম আছে যেখানে আদিম আদর্শের গঠনটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন সে গ্রামগুলি নাই, না থাকিলেও এককালে সেই গ্রামগুলির যৌথ স্বত্বাধিকার ছিল।

ভূমির যে বিভাগপ্রণালী লইয়া ভূমি প্রতিবাদ করিতেছে সে সময়ে উহা তর্কস্থলেই আসে নাই। এই বিভাগ প্রণালীর বাস্তবিকতা বহুকাল অস্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রণালীর নিদর্শন এখনও দেখা যায়; তার সাক্ষী এই দেখ না একটা প্রথা আছে—যে প্রথা-অনুসারে জমির বিনিময়ের জন্ত কিংবা পুনর্বন্টনের জন্ত,—যে সব ভূমি পূর্বে বিলি হইয়া গিয়াছে তাহা সাধারণ ভূমির মধ্যে আবার ভুক্ত করা হয়; ইহা সাধারণ স্বত্বাধিকারের একটা বিশেষ লক্ষণ বলিতে হইবে। এই কথ্যটি সম্বন্ধে পৌএল কোন ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন, ইহাতে একটা সাম্য-স্পৃহা প্রকাশ পায় মাত্র। সেই সব জ্ঞাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রতিবেশীর সমান পরিমাণ ভূমি পাইতে চাহে। আর কিছু না, শুধু কথ্যটি এই—যাহাতে কোন সম্পত্তির বেশী বৃদ্ধি না হয়, তাই তাহা হইতে কিয়দংশ বাহির করিয়া লইয়া, সুবিধার জন্ত আর এক অংশের মধ্যে উহাকে আনা হয়।

যাহাই বল না কেন, এই কার্যের মধ্যে সাধারণ অধিকারের একটা ভাব আছে। এ ভাবটী খুব চোখে পড়ে। উত্তর প্রদেশের কোন কোন গ্রামেও ইহা লক্ষিত হয়। সে কথা পরে বলিব।

যাই হউক, এই ধ্বংসদশাগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্যসমাজ-গুলি আদিম আদর্শের পরিচয় দেয় না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, পল্লব প্রদেশে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, এবং গাজেন উপত্যকায়,

এই আদর্শটি অক্ষুণ্ণভাবে,—জীবন্তভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে।

অতএব, এই কৌতুকাবহ নমুনাটি খুব নিকট হইতে নিরীক্ষণ করা আবশ্যিক। দাক্ষিণাত্যের গ্রামগুলিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখিবামাত্র চোখে পড়ে। এই গ্রামগুলি কোন প্রধানের দ্বারা পরিশাসিত হয় না; পরন্তু মুনিসিপালিটির দ্বারা পরিশাসিত হয়। এই মুনিসিপালিটির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বত্বাধিকার সমান এবং এই গ্রাম্য-সমাজ, সাধারণেব হইয়া, খাজনার হিসাবে একটা খোঁক টাকা দিতে স্বীকৃত হয়—পরে আপনাদের মধ্যে অংশ বন্টন করিয়া আদায় করিয়া লয়। এই প্রমাণটি সারবান হইলেও, সমবেত সমাজতন্ত্ররূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এইবার তবে চূড়ান্ত তথ্যটি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করি!—ব্যক্তিগত স্বত্বের হিসাবে ভূমি বিভক্ত হয় না, খণ্ডখণ্ডরূপে জমির বন্টন হয় না; সমস্ত গ্রাম সমবেতভাবে জমির চাস করে, অথবা প্রজাবিলি করিয়া তাহাদের দ্বারা চাস করায়। পঞ্চায়ৎ ফসল ভাগ করে। ইহাই সমবেত-স্বত্বাধিকারবিশিষ্ট গ্রামের অক্ষুণ্ণ জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

যে দৃষ্টান্ত মেনের নিকট স্থানিচিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল,—অধুনা আরও সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কারে, এবং পৌএল-কর্তৃক রাশি রাশি রিপোর্টের অনুসন্ধান ফলে, অধুনা জানা যাইতেছে যে ঐ দৃষ্টান্তটি আসলে ঠিক নহে। যে আদর্শগ্রামের অবলম্বনে মেন্ একটি সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া তুলিয়াছিলেন, আসলে তাহা হইতে ওরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার কোন জায়া হেতু নাই।

প্রথমতঃ রাজস্ব সংগ্রাহকদ্বিগেব রিপোর্টে প্রকাশ পায়, উত্তর প্রদেশে শুধু যে এই সমবেত-অধিকারেরই আদর্শ ছিল তাহা নহে, সেখানে দুইটি বিভিন্ন আদর্শ বর্তমান ছিল—এবং এই উত্তর আদর্শের মধ্যে যে দুইটি সাধারণ লক্ষণ তাহার বিষয় পূর্বেই বিবৃত করিয়াছি; সে দুইটি কি? না, মুনিসিপ্যালিটি এবং রাজস্বের জন্ত সমবেত দায়িত্ব। উত্তর আদর্শের মধ্যে শুধু এই দুই বিষয়েই ঐক্য—ইহার বাহিরে উহা বিভিন্ন। যে প্রথম গ্রামটিকে মেন্ আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন উহা বংশবিশেষের সম্পত্তি; এবং তাহার দ্বিতীয় গ্রামটি কোন ক্ষুদ্র শাখা-জাতির সম্পত্তি। প্রথমটির যে সমবেতত্ব সে শুধু

বাহ্যিক। আবার গোড়ায় ফিরিয়া যাওয়া যাক। বংশ-
তালিকা দৃষ্টে সপ্রমাণ হয় যে, বর্তমান ভূস্বামিগণ সেই সব
উচ্চাধিকারবিশিষ্ট রাজা কিংবা ঠাকুরের বংশধর বাহারা
নিজ প্রাধান্তের অধিকারস্বত্বেই সমস্ত গ্রামটি প্রাপ্ত হয়।
চিরপ্রথা অনুসারে, পরে এই ভূস্বামীর পুত্রপৌত্রাদি গ্রামটিকে
অধিকার করিতে লাগিল, এই বংশ ক্রমেই বিস্তৃত হইতে
লাগিল, অবশেষে গ্রামটি এই বংশেরই সম্পত্তি হইয়া গেল;
কিন্তু অবিভক্ত ভাবেই রহিল;—ইহার কারণ হয়ত উত্তরা-
ধিকারিগণের ঈর্ষা, কিংবা প্রজাদের দ্বারা ভূমি কর্ষিত হইত
বলিয়া। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে রীতিমত ভূমির অংশবিভাগ না
থাকিলেও, বংশ-সোপানের ধাপ অনুসারে, প্রত্যেক উত্তরাধি-
কারী, অল্পাধিক পরিমাণে খাজনা কিংবা ফসলের অধিকারী।
অতএব, অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তি—ইহাই প্রকৃত কথা।
এ কথা ত সকলেই জানে যে, আমাদের পরিবার অপেক্ষা
হিন্দু পরিবার বহুবিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ ঐক্য বন্ধনে বদ্ধ। রোমান-
দিগের জ্ঞান, হিন্দু পিতা, ভূসম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারী
নহে, পরন্তু সমস্ত ভূসম্পত্তিই পারিবারিক সম্পত্তি। পরি-
বারের অন্তর্ভূত ব্যক্তি মাত্রই ঐ স্বত্বের অংশী।

দ্বিতীয় আদর্শের গ্রামটি—একটি ক্ষুদ্র শাখা-জাতি কর্তৃক
স্থাপিত হয়। উহার উৎপত্তি এবং ঐতিহাসিক অবস্থা—
এই উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কিন্তু উহার
মধ্যে অবিভক্ত স্বত্ব আদৌ নাই। এই জাতির অন্তর্ভুক্ত
প্রত্যেক ব্যক্তির একটা অংশ আছে—একটা সমান অংশ
আছে। প্রথম আদর্শটির মধ্যে,—জন্ম-সম্বন্ধ-অনুসারে, বংশ
সোপানের ধাপ-অনুসারে যেরূপ এই অংশের তারতম্য হয়,
এই আদর্শের মধ্যে সেরূপ কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু
আমার মনে হয়, সমবেত স্বত্বাধিকারের সিদ্ধান্ত হইতে
এখনও আমরা বহুদূরে রহিয়াছি। সমবেত স্বত্বাধিকারের
অস্তিত্ব আমরা এখনও উপলব্ধি করিতে পারি নাই।
অবশ্য, পূর্ব-ক্রমবিক্রম ঘটিত স্বত্বাধিকার, স্বজাতির
বাহিবে ভূমির হস্তান্তরীকরণ নিবারণের নিয়মাবলী,
দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ভূমির সাময়িক বিনিময়—এই
সমস্ত প্রথা দেখিয়াই মেন্ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন;
এই প্রথাগুলি হইতে সহসা মনে হয় যেন ব্যক্তি অপেক্ষা
জাতির কতকগুলি উচ্চতর স্বত্বাধিকার ছিল।

এখন তবে, চরম সিদ্ধান্তটি কি? গ্রামের সমবেত স্বত্বাধিকার
ছিল কি?—না, ছিল না। মেনের মতবাদটি তথ্যের রাজ্য
ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে। আর ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার?
সে কথা বলিতেছি। বলিতেছি মাত্র—তাহার অধিক নহে।
দলিলাদির সাহায্যে, B. Powell এই বিষয়ে যেরূপ বিশ্লে-
ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে সমস্ত অস্পষ্ট সিদ্ধান্তের
উচ্ছেদ হইয়াছে। প্রচলিত ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের অস্তিত্ব,
এমন কি, যে স্থলে ভূসম্পত্তি অবিভক্ত, সে স্থলেরও ব্যক্তিগত
স্বত্বাধিকারের অস্তিত্ব তিনি বেশ দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু
গ্রন্থকারের মত যাহাই হউক না কেন, তাহার বিশ্লেষণ হইতে
একথাও কি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে না যে, ব্যক্তিগত
স্বত্বাধিকার—বংশগত উচ্চতর স্বত্বাধিকারকে রহিত করে
নাই! সকলের মধ্যেই এই বিশ্বয়জনক তথ্যটি বিস্তারিত :—
ভূমির সাময়িক বিভাগ কিংবা বিনিময়। B. Powell
ইহার মধ্যে শুধু দুইজন সাম্যপন্থী দেখিতে পান। যদি
সমস্তই সমবেত সম্পত্তি হয়, যদি সকলে মিলিয়া সাধারণ
ভাবেই জমির চাস করে তাহা হইলে, ভূমির কোন অংশ-
বিশেষ অল্প উর্বরতা হউক অধিক উর্বরতা হউক, বৃহৎ হউক,
ক্ষুদ্র হউক, তাহাতে কি আইসে-যায়? সে কথা সত্য, কিন্তু
এই ব্যাপারটা সম্ভব হয় না যদি ঐ বংশ নিজস্ব অধিকার
ও কর্তৃত্ব বজায় না রাখে। এই ভাবে সীমাবদ্ধ হইলে,
প্রত্যেক ব্যক্তির স্বত্বাধিকার, প্রতিনিধির স্বত্বাধিকারে
পরিণত হয়; তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই স্বত্বাধি-
কারের মধ্যে একটা অস্থায়িতার ভাব, আপাত-ব্যব-
হার্যতার ভাব, প্রত্যাখ্যেয়তার ভাব রহিয়াছে। কিন্তু
প্রত্যাখ্যান করিবে কে? ভূমি অংশে অংশে বিভক্ত
হইলেও, যে “গোষ্ঠী” (clan) নিজস্ব স্বত্বাধিকার কখন
ত্যাগ করে নাই, সেই গোষ্ঠী স্বকীয় শ্রেষ্ঠ অধিকার স্বত্বেই
উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। যে কালে, স্বত্বাধিকারের
ভাবটা একটু আচ্ছন্নভাবে ছিল, যে জাতি (race)
অসঙ্গতির জন্ত আদৌ কুণ্ঠিত হইত না, সেই কালে ও সেই
জাতির মধ্যে দুইটি বিভিন্ন স্বত্ব যে একাধারে থাকিবে
তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এস্থলে ব্যক্তিগত স্বত্ব ও সমবেত
স্বত্ব—পরস্পরকে বহিষ্কৃত করে না;—সীমাবদ্ধ করে মাত্র
যে সিদ্ধান্ত শুধু ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের উপর স্থাপিত

অবশ্য সে সিদ্ধান্তটি বাহ্যত দেখিতে বেশ সরল স্তর, তাহার এই সরলতাতেই চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হয়; আর আকৃষ্ট হয় তাহার মিথ্যা একত্বে; কেননা তাহাতে যে একত্ব আছে সে একত্ব আমরাই তাহাতে জুড়িয়া দিয়াছি। আসল কথা, ভারতবর্ষে বাস্তবিক সত্য ততটা সরল নহে।

কিসে জীবনের স্বথ স্বচ্ছন্দতা, ধন, ঐশ্বর্য্য, ও কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি হয়, তাহারই অনুসন্ধানে যুরোপীয় সমাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; ইহাকেই বলে উন্নতি। পক্ষান্তরে প্রাচ্য-সমাজ, বিশেষত হিন্দুসমাজ একেবারেই নিশ্চল। তাহারা মনে করে, পরিবর্তন তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর; সমাজে নূতন কিছু প্রবর্তিত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যেকোন আমাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের মৃগতৃক্ষিকা,—সেইরূপ উহাদের সমক্ষে অতীতের মৃগতৃক্ষিকা প্রসারিত।

ক্ষুদ্র গ্রাম্যসমাজও নিশ্চল। এরূপ অজ্ঞাত নিশ্চলতা একটা অলৌকিক ব্যাপার বলিলেও হয়। আসনটি টলমল করিতেছে, তবু ভারত সেই আসনে দিব্য আরামে বসিয়া আছে। একটা উদগ্র তীক্ষ্ণমুখ শৈলের উপর হিন্দুকে বসাইয়া দেও, তুমি দেখিবে সে তাহাতেই বেশ শুছাইয়া বসিয়াছে, আপনাকে তাহার সহিত বেশ বনি-বনাও করিয়া লইয়াছে; কিন্তু শৈলটি একটু চাঁচিয়া-ছলিয়া লইলে যে স্রবিশা হইতে পারে একথা সে একবারও ভাবে না। এরূপ জড়ধর্ম্মের শৃষ্ঠান্ত আর কোথাও নাই। গ্রামের একটি সংকীর্ণ ঘেরের মধ্যে বিভিন্ন মূল-জাতি (race), বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন বংশ পরস্পরের সম্মান রক্ষা করিয়া, বেশ শান্তিতে বাস করিতেছে। বর্ণদিগের মধ্যে, কতকগুলি নিয়ম দ্রুত প্রাকারের মত খাড়া হইয়া রহিয়াছে—এই প্রাকার কেহই শঙ্কন করিতে সাহস করে না। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, একজন ঝাড়ুর্দার হয় ত তৃণায় মরিবে, তবু সে একটু জল ভিক্ষা করিবার জন্ত একজন উচ্চবর্ণের চাকার মাড়াইবে না;—কেননা, তাহা নিষিদ্ধ। এরূপ নিয়মিতভাবে কাজ, এরূপ অনাগত বিধান, এরূপ অন্ধ ক্রিয় বশবর্তিতা, একটা মধুচক্রেও দেখা যায় না। গ্রামের প্রত্যেক লোকই, মধুমক্ষিকার মত, অত্রান্ত দক্ষতার সহিত, শাভাবিক পটুতার সহিত, আপন আপন নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যাইতেছে।

কিন্তু এই গ্রাম্যজীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এত ঘোঁষাঘোঁসি, এত ঠেলাঠেলি সম্বন্ধে, প্রাচীরগুলা এতকাল ভাঙ্গে নাই কেন?—ভাঙ্গা দুবে থাক, একটুও টলে নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রামগুলি যেন বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন। স্বতন্ত্রশাসিত নগরগুলায়, বাহিরের প্রভাব বড় একটা পৌঁছিতে পারে না। তাহারা যে বায়ুমণ্ডল আপনাদের চতুর্দিকে রচনা করে, তাহা বিছাদবাহী নহে; কিন্তু অভ্যন্তরের ব্যাপার অন্তরূপ হইতেও পারে। অবিশ্রান্ত ঘণাবধি, ঠেকাঠেকিতে এই জটিল যন্ত্রটি এক সময়ে বিগু-ড়াইবার কথা। কিন্তু না,—যন্ত্রটি কখনই থামে না, কখনই বিগুড়ায় না।

ইহার একটা কারণ প্রথমেই মনে হয়—এই গ্রামগুলি চাষাদের নগর। আমার বিশ্বাস,—ঋতুর নিয়মিত পর্যায়, ও কৃষকের অবিশ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় কর্ম্মচক্র হইতেই সর্ব্বদেশীয় কৃষকের মনে, বিশেষতঃ ভারতীয় কৃষকের মনে, প্রাকৃতিক নিয়মের যন্ত্রবৎ সুনিশ্চিততা ও অবিচলতা প্রতি-ভাত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, একটা স্থানীয় বিশেষ কারণও পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুসমাজের যন্ত্রটি নিখুঁত বলিলেও হয়। ইহাতে ভারতের সমস্ত অতীব নিপুণ-ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সমাজতন্ত্রের মধ্যে সকল বিষয়েরই বিধি নিষেধ পূর্ব্ব হইতেই এরূপ সুনির্দিষ্ট হইয়া আছে যে, ব্যক্তিবিশেষ স্বাধীনভাবে যে কোন কাজ করিবে,—নূতন কিছু প্রবর্তিত করিবে,—তাহার কোন পথ নাই। এই সমাজতন্ত্রে, দেবতার কাজও সীমাবদ্ধ,—কতকগুলি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। কি করিতে হইবে, কি করিতে হইবে না—এই বিষয়ের যেকোন পুঙ্খানুপুঙ্খ শাস্ত্রীয় নিয়ম ও শাসন, তাহাতে সমাজ একটা গুরুত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। অমুক স্থলে, অমুক অবস্থায় কি করিতে হইবে, জীবনের মধ্যে একবারও হিন্দুর তাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। একবার নেত্র উন্মীলন করিলেই হিন্দু দেখিতে পায়—তাহার সম্মুখে সুচিহ্নিত পথ প্রসারিত—স্থানে স্থানে পিল্পা, স্থানে স্থানে প্রাচীরের বেড়া। বর্ণগুলা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন—উহাদের প্রবেশ-দ্বার একেবারে রুদ্ধ। এক বর্ণ অপর বর্ণসম্বন্ধে কিছুই জানে না। বর্ণগুলা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ত

কাজ করে, চিন্তা করে। এমনি কড়াকড় শাসন, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহার বাহিরে একপাও যাইতে পারে না। সামাজিক শাসন, ধর্মমন্ত্রেব দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। বন্ধ প্রাচীর, বিবিধ নিষেধ, দুর্লভ্য প্রথা, তাহার উপব আবার ধর্মের শিলমোহর—এই সমস্ত বন্ধনে, এই সমস্ত গ্রন্থিতে, সমাজ অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধ—নিষ্পেষিত—অবরুদ্ধ।

ইহাতেও সম্যক ব্যাখ্যা হয় না; সম্যকরূপে ব্যাখ্যা কবিতে হইলে জাতিগত প্রকৃতিকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনিতে হয়। এখানকার লোকেবা কোন একটা কাজ হইয়া গেলেই তাহা ললাটলিপি বলিয়া শাস্তিচিন্তে গ্রহণ করে, তাহারা পরিবর্তনকে ভয় করে। যাহা কিছু নূতন তাহাই মন্দ, তাহাই পাপ।

যেমন কঠোর তপশ্চর্যা ও সন্ন্যাসব্রত আমাদের রুচি-বিরুদ্ধ, সেইরূপ আমাদের ছটকটানি, আমাদের চলিছুতা, আমাদের সামাজিক কল্লনা, মধুর ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের আকুলতা, আমাদের পার্থিব সুখের অধেষণ, দুঃখিনের জন্ত পৃথিবীতে আসিয়া সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত জীবন যাপন কবিবার আমাদের চেষ্টা—এই সমস্ত হিন্দুর নিকট দুর্কোষ। বাঁচিবার আগ্রহে, পৃথিবীকে আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপযোগী করিয়া তোলা,—ইহাই আমাদের চেষ্টা। আমরা প্রকৃতিকে বশীভূত করি, আমরা প্রকৃতিকে আমাদের কাজে খাটাই, প্রকৃতির দ্বারা আমাদের অভাব মোচন করি। কিন্তু হিন্দুর নিকট জীবনটা—জন্মজন্মান্তরের আবর্ত-পরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা কঠোর, ইহা ভারবহ। ইহা ভবিষ্যতের জন্ত এমন কিছুই দেখাইতে পারে না যাহা লোভনীয়, যাহা আশাপ্রদ, সুতরাং এরূপ জীবন না থাকাই ভাল। প্রত্যেক হিন্দু মনে করে,—এই জন্মপরম্পরায় ক্ষণস্থায়ী জীবন-তরঙ্গে নিঃক্ষিপ্ত হইবার জন্তই সে অনন্ত-ধ্যানের দিবা নিত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে। মনে করিও না, এই স্বপ্ন কল্লনাটি কেবল দার্শনিক পণ্ডিতের মস্তিষ্কের মধ্যেই বদ্ধ। “ভারতের জাতি ও বর্ণ”—এই গ্রন্থের প্রণেতা রিজলী সাহেব আমাদের একদিন কলিকাতায় এইরূপ বলিয়াছিলেন :—“এই চক্রের ছায়াতলে দেখ এই গরিব বেটারারা শুইয়া আছে; ইহারা তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত

নহে; বাস্তবিকই ইহাদের জীবনে বিতৃষ্ণা হইয়াছে, জীবনকে ইহারা কষ্টকর বলিয়া মনে করে, এবং কি করিয়া এই দুঃখময় সংসার হইতে কিছুকালের জন্ত নিষ্কৃতি পাইবে ইহারা এই স্বপ্নই দেখে এবং এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই একেবারে অচেতন হইয়া পড়ে।” এ দেশে “বোগী” নামে অল্পত এক দল লোক আছে; এই ভাবটি,—এই আদর্শটি, তাহাদের মধ্যেই যেন মূর্তিপরিগ্রহ করিয়াছে।

এই “ক্লরোফর্ম”-সুপ্ত হতচেতন সমাজ যদি বা কখন জাগরণোন্মুখ হয়, উহার শিয়রে যে দুই প্রহরী বসিয়া আছে রমণী ও পুরোহিত, তাহারা আবার তাড়াতাড়ি উহার নেত্র নিমীলিত করিয়া দেয়। সমাজের যে কোন সংস্কার হউক না কেন, উহারা তাহার পরিপন্থী। অবশ্য ব্রাহ্মণের প্রতিকূলতা স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সমাজের একটা সামান্য পরিবর্তন হইলেও, তাহার নিজস্ব অধিকারের উপর আঘাত লাগে। জীলোকদের প্রতিকূলতার তেমন কিছু হেতু দেখা যায় না। যে সামাজিক অবস্থা জীলোকের পক্ষে অতীব কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ী তাহার সেই অবস্থায় যদি কিছু পরিবর্তন সম্ভব হইত হয় সে ত আশারই কথা, তাহাতে আশঙ্ক্য বিষয় কি আছে? কিন্তু এই বন্দিনী তাহার শৃঙ্খলকেই আগ্রহের সহিত চুষন করে, এই নির্যাতিতা নারী স্বকীয় কষ্ট যন্ত্রণা স্বেচ্ছাপূর্বক সহ করিয়া থাকে। যখন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সহমরণের বিরুদ্ধে আইন প্রচাৰিত হয়, তখন রমণীরা ইহার প্রতিবাদ করে। যখন অল্পবয়স্ক বালিকার বিবাহের বিরুদ্ধে, বালিকার চিরবৈধব্যের বিরুদ্ধে, আন্দোলন চলিতেছিল, তখন সর্বত্রই প্রতিবাদ করে কে?—রমণীরাই। যখন পবিত্র গঙ্গাতীরে সতীত্বের জন্ত জীলোকেরা অনায়াসে আত্মহত্যা করিত—তখন তাহারা যে চিরবৈধব্যের পক্ষপাতী হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই ভীষণ ব্রতটি মানব-হৃদয় হইতেই প্রসূত। সহমরণ, সন্ন্যাসব্রত, কঠোর বৈধব্যব্রত—এই সমস্ত উচ্চবর্ণেরই বিশেষ-অধিকার,—উহার দ্বারা উচ্চবর্ণের বিশিষ্টতা রক্ষিত হয়। Snobism সমাজের উৎকৃষ্ট পুলিশ-প্রহরী নহে কি? যে রমণী কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে সে একটা উচ্চতর জগতে প্রবেশ করে না কি? সেকালে মৃত স্বামীর চিতায় দণ্ড হওয়া একটা শিষ্টাচারের মধ্যে পরিগণিত হইত।

তীর্থযাত্রী হিম্মত-ধ্বংস একটা অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন :—“অসাধারণ দীর্ঘকায় একজন অর্হান্ কোন পরীক্ষণহীন নেত্র নিম্নলিখিত করিয়া বসিয়াছিলেন। ঘন নিবিড় কেশগুচ্ছ ও শরীরাজিতে তাঁহার স্বচ্ছ ও মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন—রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—এ লোকটি কে? একজন প্রশ্ন উত্তর করিলেন ;—ইনি একজন অর্হান্, ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন। বহুবর্ষ ধরিয়া এই ভাবেই কালাতিপাত করিতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কি উপায়ে ইহাকে জাগ্রত করা যায়? প্রশ্ন উত্তর করিলেন :—বহুবর্ষব্যাপী অনাহারের পর যদি একবার সমাধিভঙ্গ হয়, তবে ঐ যোগীপুরুষের শরীর গলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইবে। প্রথমে মাখন ও হুঙ্কের দ্বারা ইহার শরীরকে সিক্ত ও শরীরের পেশীগুলোকে নরম করা আবশ্যিক। তাহার পর উর্হাকে বেড়াইবার জন্ত ও জাগাইবার জন্ত কাঁশর বাজাইতে হইবে।”

“শ্রমণের এই উপদেশ-অনুসারে, তখনই সেই মৃত কলেবরে হুঙ্ক সেচন করা হইল, ও কাঁশর বাজানো হইল। অর্হান্, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চতুর্দিকের লোকদিগকে দুই চারিটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, পবে স্বকীয় দীর্ঘ কেশগুচ্ছ হস্তে তুলিয়া ধরিয়া ধীরগম্ভীর ভাবে আকাশে উঠিলেন।”

• হিন্দুগ্রাম দেখিয়া আমার এই গল্পটি মনে হয়। এই রুদ্ধ, নিস্তরঙ্গ শ্রমণবৎ গ্রাম্যজীবন,—ঐ কঙ্কালসার অর্হানের যোগনিদ্রার অম্লরূপ। মৃত, না, নিদ্রিত?—কে জানে কি। কিন্তু যদি উহার সমাধিভঙ্গ করিবার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা না যায়, যদি উহার শরীর অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ হস্তের সংস্পর্শে আইসে, তবে উহাও অচিরে গলিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতে ব্রিটিশ শাস্তি ।

The agency which maintains order may cause miseries greater than the miseries caused by disorder.
Herbert Spencer.

ইংরেজ বণিকবেশে যখন এ দেশে প্রবেশ করে, রাজ-বেশ ধারণ করিবার তাহাব কোনই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আর দশ জন বিদেশী যেমন বাণিজ্যের জন্ত ভারতে আসিয়া-

ছিল, সেও তেমনি আসিয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া বুদ্ধির জোরে সে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছে। যখন মোগল শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িল তখন মহারাষ্ট্র শক্তির অভ্যুদয়ে সকলেই মনে করিয়াছিল ঐ শক্তির আশ্রয়ে ভারত অরাজ-কতা হইতে উদ্ধার পাইবে। কিন্তু যখন তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধে মহারাষ্ট্র শক্তি বিনষ্ট হইল তখন ঐ ভারতকে অথও সাম্রাজ্যে পবিণত করিবার মত শক্তি আর রহিল না। চারিদিকে ঘোব অশান্তি উপস্থিত হইল। ছলে বলে কৌশলে এই অশান্তি নিবারণের ওজুহাত লইয়া ইংরাজ ভাবত-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল এবং ভারতবাসীও অবস্থার ফেরে পড়িয়া ঐ শাস্তি স্থাপনকে ইংবাজের বিধাতৃনির্দিষ্ট কার্য বলিয়া মন্তক পাতিয়া গ্রহণ কবিল। সিপাহী যুদ্ধের সময়ে যে ভারতবাসী বিদেশী সহায়তা করিয়াছিল তাহার কারণ এই যে তখনও ইংরাজ আপনার স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করে নাই, তখনও শাস্তির আবরণ তাহার গায়ে অড়িত ছিল। দেশের অশান্তি দূর করিবার জন্ত ইংরাজ তখন শাস্তির জল ছিটাইতেছিল, গুর্খা ইকায় নাই, রেগুলেশন লাঠি চালায় নাই, পিটুনি পুলীশ বসায় নাই; উদারনৈতিক সাম্য ও মৈত্রীর ঘোষণাপত্রের দ্বারা অশান্ত দেশকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; তাই আবার দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আমরা যে শাস্তি পাইলাম, এ শাস্তিতে আমাদের কি কেবলই লাভ হইল? আমরা অশান্তির বিরোধী, কিন্তু শাস্তিও প্রকৃত মঙ্গলজনক হওয়া চাই।

শাস্তি কিম্বা সুখ জীবনের উদ্দেশ্য নহে। মনুষ্যের বিকৃতিশই একমাত্র উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাক, এ উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা সংগ্রামভীরু; অর্থাৎ যাহা কিছু আয়াসসাধ্য তাহা হইতেই তাহারা বিমুখ। কোন রকমে নির্বিবাদে জীবন যাত্রা নির্বাহ করাই তাহাদের জীবনের আদর্শ। এই সমস্ত মানুষকে নরাকার পত্ত বলা যাইতে পারে। কেন না, পত্তর জায় ইহাদের মধ্যে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, মনুষ্যবুদ্ধির কোনও চেষ্টা নাই। ইহারা পত্তর জায় নির্বিশেষে আহার বিহার করিয়াই সন্তুষ্ট। ইহারা চায় এই নিমন্তরের শাস্তি—শাস্তিতে ধন উপার্জন কর, শাস্তিতে সন্তান উৎপাদন কর, শাস্তিতে তাহাদের “শিক্ষা”র ব্যবস্থা কর, এবং শাস্তিতে

তাহাদের জন্ত একটু কাজ কর্ণের ব্যবস্থা কর। এই তাহাদের জীবনের আদর্শ। ইহার মধ্যে এক স্বদেশী ও স্বরাষ্ট্রের হাক্কামা উপস্থিত করিয়া দেশে কি এক মহা অনর্থ টানিয়া আনিয়াছে। সুতরাং এই লোকগুলিকে ধরিয়া শূলে দাও। এই শ্রেণীর জীবে ও পশুতে কোনই বিভ্রমতা নাই। ইহারা কোনও উচ্চতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। তাই ইহারা ভারতে ব্রিটিশ শাস্তির বড়ই পক্ষপাতী। শাস্তি তো সকলেই চায়, অশান্তি চায় না; কিন্তু যাহা মনুষ্যত্বের বিনাশকারী তাহা কি মানুষের পক্ষে একটা আদরের বস্তু হইতে পারে? যে শাস্তি কেবল নির্কিয়ে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে তাহা কি শাস্তি নামের যোগ্য? সে শাস্তি আর মনুষ্যত্বের বিনাশ এ দুইয়ে বিভ্রমতা কি? উহা মৃত্যুর নিশ্চেষ্টতার নামান্তর মাত্র! কিন্তু যে শাস্তি সেই সকল কর্ণের সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করে যাহা দ্বারা মানব আপনাব পুরুষার্থের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, আপনার উচ্চতর আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার চমিতার্থতাকে সাধন করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত শাস্তি। তাহাই একমাত্র লোভনীয় জিনিস। নতুবা যে শাস্তি উন্নত কর্ণচেষ্টার সকল দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া মানুষকে খাওয়া পরা রূপ স্বার্থপর জীবনের নিয়মগতীতে আবদ্ধ করে সেই শাস্তির সুখকে যাহারা একটা মন্ত আদর্শ করিয়া তুলিয়াছে, এই ব্রিটিশ শাস্তি তাহাদিগকে কিরূপ মনুষ্যত্ববিহীন করিয়া সর্বপ্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, এই শাস্তির মহিমা কীর্তন ও তজ্জনিত আশ্বাসদেই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। কর্ণময় জীবনের সকল সংগ্রামকে এক আদর্শের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়া জীবনের সকল বিভাগের কর্ণকে এক উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অধীন করিয়া দিয়া মানুষ যে শাস্তি লাভ করে তাহাই প্রকৃত শাস্তি। নতুবা যেখানে কর্ণ নাই, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম নাই, সেখানে আবাব শাস্তি কি? আমরা কি ব্রিটিশ রাজত্বে এই উচ্চতর শাস্তি এই প্রকৃত শাস্তি লাভ করিয়াছি? শাস্তি দুই প্রকারে লাভ হইতে পারে। এক তমোশুণ্ণাচ্ছন্ন শাস্তি, আর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত শাস্তি। যেখানে রাজশাস্তির আবির্ভাব হয় নাই, যেখানে কর্ণচেষ্টা নাই বা বাহির হইতে খণ্ডবলে কর্ণচেষ্টাকে চাপিয়া রাখা হইতেছে, সেখানে যে শাস্তি তাহা তমোশুণ্ণাচ্ছন্ন, এই শাস্তিই ভারতে ব্রিটিশ শাস্তি নামে অভি-

হিত। এখানে তো মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভবই নয়, ইহা পশুকেও জড়ভাবাপন্ন করিয়া তুলে। সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত যে শাস্তি, তাহাতে কর্ণকে চাপিয়া রাখা হয় না, তাহাতে 'বরং রাজশাস্তি' পূর্ণ বিকাশ। কর্ণ সেখানে আপনাকে পূর্ণতা প্রদান করিয়া নিজেই নিজে নিয়মিত করে। সকল কর্ণ মানবের পুরুষার্থ সাধনে নিযুক্ত হইয়া আদর্শের দ্বারা স্বতঃই নিয়মিত হইয়া যায়, আর সংগ্রাম থাকে না। ইহাই প্রকৃত শাস্তি। আমেরিকায় ব্রিটিশ শাসনেও শাস্তি ছিল আবার এখনও শাস্তি আছে। কিন্তু বিভ্রমতা কি? পূর্বে ছিল কর্ণহীনতার শাস্তি, এখন আছে কর্ণশীলতার শাস্তি। কর্ণহীনতার উপর কর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, সর্বপ্রকার জড়তার অবসান হইল। যে শক্তি কর্ণকে চাপিয়া রাখিয়াছিল সে শক্তি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইল। কর্ণ আপনার ক্ষেত্র লাভ করিল। নূতন সমস্তা উপস্থিত হইল। বাহিরের শক্তি এত দিন যে সমস্ত বিবোধী শক্তিকে চাপিয়া রাখিয়াছিল তাহারা মাথা তুলিল। উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশ বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু এই বিবাদের দ্বারা বিরোধের চিব বীমাংসা হইয়া গেল, আমেরিকায় প্রকৃত শাস্তি স্থাপিত হইল। এত দিন কর্ণহীনতা ও নিশ্চেষ্টতাকে শাস্তি মনে হইতেছিল; কর্ণ আসিয়া নিশ্চেষ্টতাকে বিনাশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণহীনতার অন্তরালে যে অশান্তির বীজ নিহিত ছিল তাহাকেও অপসারিত করিয়া প্রকৃত শাস্তি স্থাপন করিল। প্রকৃত শাস্তির এই একমাত্র পথ। দেড়শত বৎসর পূর্বে যখন ইংরাজ এ দেশে রাজ্যভার গ্রহণ করে, ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন, তখন পরম্পরে বিবাদ কবিতা আমরা উচ্ছন্ন যাইতেছিলাম, সুতরাং ইংরাজের পক্ষে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আর এই দেড়শত বৎসরের পরও শুনিতেছি, ইংরাজ চলিয়া গেলে আমরা পরম্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বিনাশ পাইব। তবে জিজ্ঞাসা করি, এই দেড়শত বৎসর ইংরাজ শাসনের শাস্তিতে বাস করিয়া আমাদের লাভটা হইল কি? মনুষ্যত্বের দিকে কি এক পদও অগ্রসর হই নাই? তাই যদি হয়, তবে যত দিন এই শাস্তি থাকিবে, ততদিনই তো আমাদের মনুষ্যত্ব চাপা পড়িয়া থাকিবে, প্রকৃত শাস্তি লাভ হইবে না; ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ শাস্তির বিড়ম্বনায় প্রয়োজন কি? প্রকৃত শাস্তির রাজ্যে কর্ণের দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে

হয়। সে দবজা যতদিন না খুলিতেছে, দুই হাজার বছর এই ভূয়ো শক্তির আশ্রয়ে বসিয়া থাকিলেও কোন লাভ হইবে না। বরং এই শক্তিরক্ষার মাণ্ডল স্বরূপ বৎসরে ৫০ কোটি টাকা কর দিতে দিতে দিন দিন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িব এবং অবশেষে একেবারে জড়স্ত প্রাপ্ত হইব। আমরা এই পথেই চলিয়া আসিয়াছি। এই অনর্থ হইতে উদ্ধাবের এক মাত্র উপায় কর্মের উপাসনা। এই জন্য আমাদের সর্ব-প্রকার মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় এবং ইংবাজের তাহাতে বাধা না দেওয়ার উভয় পক্ষেবই মঙ্গল। কিন্তু ইংরাজ রাজ মনে করেন কর্ম আসিলেই তাঁহাকে দুর্বল হইতে হইবে। তাই কর্মের নামে তাঁহার কৃৎকল্প উপস্থিত হয় এবং অশান্তি অশান্তি বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। এই অশান্তি নিবারণের ওজুহাতে তিনি দেশের সকল কর্মের মন্তকে লগুড়াঘাত করিতেছেন। আর সম্মোহনমুগ্ধ হতভাগ্য আমরাও তাহাই বুঝিতেছি। রুষ জাপান সন্ধির পর তো জাপানী ছাত্রেরা রাজবাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল। বুয়র যুদ্ধের সময় তো ইংরেজ ছাত্রেরা ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া আনন্দোৎসব করিল। কই, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত তো কার্ণাহিল সাকু'লার, রিজ্জলি সাকু'লারের জন্ম হইল না? আর ভাবতেই কেন ছেলেরা স্থল ছাড়িয়া একটু রাস্তায় আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের উপর এত জুলুম? সব সত্য দেশেই তো ছাত্রেরা রাজনীতির চর্চা করে, তবে আমাদের দেশেই এই বিশেষ ব্যবস্থা কেন? কারণ ব্রিটিশ বাজের কর্মভীতি। এত কাল আমরা যে রাজনীতির চর্চা করিয়াছি তাহা কেবল বাগদেবীর শ্রাদ্ধ, স্তববাং তাহাতে রাজা ভয় পান নাই। কিন্তু ছাত্রদের মধ্য দিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে, হুর্ভিক্ষে, 'স্বদেশী' প্রভৃতিতে কর্মের আবির্ভাব দেখিয়া রাজার প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। সকল বৈদেশিক শাসনই একটা যাক্‌মস্তবলে পরদেশ শাসন করে। সে যাক্‌মস্তবল হইতেছে দেশবাসীদের আপনার নিজ শক্তির উপর অবিশ্বাস—আমরা আমাদের নিজের দেশ নিজেরা শাসন করিতে পারি না। ইহাই বিদেশী শাসনকর্তাগণের হস্তের সর্বপ্রধান অস্ত্র। দেশীয় শাসন কিম্বা বিদেশীয় শাসন কেহই কয়েক সহস্র সৈন্তের সাহায্যে পশুবলে স্বীয় প্রজার উপর আধিপত্য করিতে পারে না। যদিই বা স্বীকার করা যায় কসিয়া পশুবলে

পোলাও শাসনাধীন রাখিয়াছে কিন্তু ভারত ও ইংলণ্ডের সমস্ত স্বতন্ত্র। সমস্ত ইংলণ্ড উঠিয়া আসিয়া ভারত শাসন আরম্ভ করিলেও ভারতের এক কোণে পড়িয়া থাকিতে হইবে। ত্রিশ কোটি প্রজাকে পশুবলে শাসন করিবার ক্ষমতা ইংলণ্ডের নাই। তাই একটা সম্মোহন অস্ত্র চাই। ইংলণ্ডের হস্তে সেই অস্ত্র আমবা দিয়াছি। এটা আমাদের স্বশক্তির উপর অবিশ্বাস। এ অবিশ্বাস বক্তৃতায় যাইবে না, এ অবিশ্বাস রেজলিউশনে যাইবে না। কেবল কর্মক্ষেত্রের পরীক্ষায় এ সম্মোহন বিনষ্ট হইতে পারে। তাই সর্বদাই আমাদের কাণের কাছে বলা হইতেছে তোমরা স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত নও। অথচ যে সকল কর্মের দ্বারা আমাদের ক্ষমতা পরীক্ষিত হইবে তাহার ধারেও আমাদের কাছে যাইতে দেওয়া হইবে না। দিলেই তো সর্বনাশ! সম্মোহন ভাঙ্গিয়া যাইবে যে! সুতরাং সেরূপ কর্ম রাজদ্রোহিতা মাত্র। আমাদেরকে যে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করা হয় না, তাহা কারণ ইহা নয় যে আমরা সে সকল কার্য হাতে পাইলে কাজ চালাইতে পারিব না বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিব, কিন্তু অতি সূচরূপে চালাইতে পারিব বলিয়াই আমাদেরকে দেওয়া হয় না। তাহা হইলে আমাদের নিজেদের উপর অবিশ্বাস চলিয়া যাইবে যে! এ অবিশ্বাস চলিয়া গেলে বিদেশী শাসনের মেরুদণ্ডই ভাঙ্গিয়া গেল। এই যে অন্ধোদয় যোগে গুলীশের সাহায্য ছাড়াই আমরা বিবাত জনসম্মত নিয়মিত কবিতাম, কর্তারা তাহা ভাল করিয়া স্বীকার করিতেছেন না কেন? স্বীকার করিলে তো তাঁহাদের ব্যবসাই চলিয়া যায়? এই যে এত কাল জাতীয় স্বেচ্ছা-সেবকদের এত কুৎসা রটনা করা হইল এমন কি বিলাতের Times পর্যন্ত বলিলেন, "It is high time to exert all the powers of the law to suppress this evil" ইহাও ভিতরে বৈদেশিক শাসননীতির একটি গুচ্ছ চাল নিহিত রহিয়াছে। স্বাবলম্বন মানুষের মনে স্বশক্তির উপর বিশ্বাস আনয়ন কবে এবং এই বিশ্বাস হইতেই আত্মনির্ভর জন্ম গ্রহণ করে। ইংরাজ চলিয়া গেলে আমাদের কি দশা হইবে আমরা একেবারে নিরুপায় হইব, আমাদের মনের এই শোচনীয় অবস্থাই ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের মেরুদণ্ড। আত্মনির্ভর লাভ করিলে এই মেরুদণ্ড

ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং যে স্বৈচ্ছাসেবকদল দেশের বুকে এই স্বাবলম্বন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরের ভিত্তি স্থাপন করিতেছে, রাজপুরুষগণ আত্মরক্ষার জন্ত যদি তাহার উপর ঝুঁকাহস্ত হন তবে আশ্চর্য্য হইবাব কিছুই নাই। যাহা হউক ভারতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শাস্তি একটা জাতির, যে জাতিটা একদিন স্বগৌরবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছিল, তাহার সমস্ত কর্মশক্তি হরণ করতঃ তাহাকে শিশুর ছায় অসহায় অবস্থায় আনয়ন করিয়া তাহার যে ক্ষতি কবিয়াছে, ইংরাজ রাজত্বের প্রকৃত বা কল্পিত কোন উপকারই তাহাব প্রতিদান স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। তবে কথা এই যে পৃথিবী অক্ষশক্তি দ্বারা পবিচালিত নহে, এক জ্ঞানময় জ্ঞানবান্ মহান্ পুরুষ ইহাব বিধাতা। তাই কোন অপকারই একপেশে নহে। অপকারে যে কেবল যাহার অপকার কবা হয় তাহাবই ক্ষতি হয় তাহা নহে, অপকাবকাবীরও অনিষ্ট হয়। ভাবতবাসীকে অস্ত্রহীন কর্মহীন অসহায় অবস্থায় আনিয়া তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে করিতে ইংবেঞ্জ ও ক্রমে মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িতেছে, একথা সকলেই এখন স্বীকার করেন। তাই বেশীদিন একদল ইংরাজের এদেশে থাকা কর্তার নামজুব করিয়াছেন। নেভিনসন সাহেব সেদিন এই বলিয়া ভাবতবাসীদিগকে দোষ দিয়াছেন যে তোমরা একদল ভদ্রলোককে গুণ্ডায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছ (apparent gentlemen into “bouncers”); অর্থাৎ গুণ্ডামহাশয়ের এমন হাতযশ যে ছোড়া পিট্রিয়া গাধা বানাইয়া দিয়াছেন। এ দোষ আমাদের নয়। ইংরাজ আমাদিগকে মানুষ হইতে দিতেছে না। গাধা করিয়া রাখিয়া দিয়াছে এবং গাধাব. সংসর্গে সেও গাধা হইয়া যাইতেছে। ইহা প্রকৃতির প্রতিশোধ। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে কোটা কোটা টাকা লুট করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিদানে তাহার সম্তানগণ পশুত্বপ্রাপ্ত হইতেছে; ইহাই জ্ঞানবান্ বিধাতাব ব্যবস্থা; what doth it avail you if you gain the whole world but lose your own soul? ভাবতবর্ষ বৃটিশ শাস্তি শাঁখের করাতেব জ্ঞান হ্রদিকই কাটিতেছে। তবে সোজা দিকটাই সাধনরূপে চোখে পড়ে, এই মাত্র বিভিন্নতা।

গবর্ণমেন্ট ভাল কি মন্দ তাহা বিচার কবির কোন

মানদণ্ডের সাহায্যে? দেশে শাস্তি বিরাজ করিতেছে, মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ, মানুষ নির্বিঘ্নে আহাৰ বিহাব করিতেছে, কেবল ইহাই কি সেই মানদণ্ড? মনে রাখিতে হইবে man doth not live by bread alone. আবার ধনপ্রাণও আমাদের পূর্বাপেক্ষা কতটা নিরাপদ তাহাও বিবেচ্য। যদিই বা ধবিলাম নিরাপদ তবুও তো মীমাংসা হইল না। যে সমস্ত ব্যাপারে মানুষ ও পশুতে পার্থক্য নাই তাহা নিরাপদ হইলেই কি হইল? তাহা তো নয়। যে সমস্ত বৃত্তির বিকাশে মানুষের মনুষ্যত্ব, যে সমস্ত বৃত্তির বলে মানুষ ইতর প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই সমস্ত বৃত্তির বিকাশ হইতেছে কিনা, এই মাপকাঠির দ্বারাই গবর্ণমেন্টের ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে। ভারতে ব্রিটিশ শাসন এ বিচারে নির্দোষ সাব্যস্ত হইবে কি? ভারতে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত শাস্তি ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব বিকাশের সাহায্য করিতেছে কি? এই কথাই কি সত্য নয়, যে সমস্ত কর্মে দেহ ও মন বললাভ করে, আত্মা পবিপুষ্ট হয়, জাতীয় জীবনের সেই সমস্ত কর্মক্ষেত্রের দ্বার ভারতবাসীর নিকট রুদ্ধ? কর্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া কলনক্ষেত্রে মানুষ গড়িবে না। বিশ্বমানবের সংস্পর্শ ছাড়া মানবহৃদয়ে বিশ্বজনীন ভাব বিকশিত হইতে পারে না। বর্তমান সময়ে ভারতে যে শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত তাহা ভারতবাসীকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বমানবের সংসর্গবিচ্যুত করিয়া আপনার স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; এক কথায় তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল পথই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে জাতি কর্মক্ষেত্রের স্বাধঃ, ভুল ভ্রান্তি, জ্ঞান পরাজয়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষিত না হইয়া কেবলমাত্র ইতিহাসের গৎমুখস্থ করিয়াই জীবনের সিদ্ধি খুঁজিতে যায়, তাহার মনুষ্যত্বলাভ কি সুদূরপর্যন্ত নহে? ব্রিটিশবাজ বিশ্বমানবের বিশাল কর্মক্ষেত্রে হইতে সম্ভবপে ভারতবাসীকে দূরে রাখিয়া তাহাব যে অনিষ্ট করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট মানুষের পক্ষে আর কিছু হইতে পারে না। মানুষ মানুষ হয় উচ্চতর স্বার্থেব কাছে নিম্নতর স্বার্থকে বলি দিয়া, জাতীয় স্বার্থের জন্ত ব্যক্তিগত স্বার্থকে দমন করিয়া এবং কর্মক্ষেত্রে বিশ্বমানবের সংস্পর্শে আসিয়া। কিন্তু যেদেশে প্রকৃত স্বদেশপ্ৰীতি প্রকারান্তরে আইনতঃ দণ্ডনীয় সে দেশে

দেশের স্বাভাবিক আত্মত্যাগেব দ্বারা মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ কোথায়? বাহারা ভারতে ব্রিটিশ শাস্তির স্তাবক, বাহারা ঐ শাস্তির জন্য আর সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাহারা এই কথাটা একবার অনুধাবন করিয়া দেখিবেন কি? যদি মনুষ্যত্বই হারাইলাম তবে শাস্তিতে পশুজীবন ঘাপন করিয়া লাভ কি?

উপসংহারে আর একটা কথা বক্তব্য আছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ইংরাজ বণিকবশে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কেবল দৈবঘটনায় সে রাজবশে ধরিয়াছে। কিন্তু আপনার ডাক কখনও ভুলে নাই। তবে এতদিন যে শাস্তির কথা শুনিয়াছি সে কেবল আপনার বণিকবৃত্তি নির্বিরে চলিতেছিল বলিয়া। যতদিন আমাদের শিল্পবাণিজ্য বিনষ্ট করিয়া ইংরাজের ত্রীবৃদ্ধি হইতেছিল ততদিন কোন গোলমাল হয় নাই। কিন্তু যেই বাণিজ্যের কণামাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা হইয়াছে, অমনি ইংরাজ নিজ প্রকৃত মূর্তি ধারণ করিয়াছে। চুলোয় যাক তোমার শাস্তি, চুলোয় যাক তোমার আইন আদালত। জজ মাজিষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া চৌকীদার কনেইবল পর্য্যন্ত সমস্ত রাজকাৰ্য্য ছাড়িয়া বিলাতী জিনিষের মোট ঘাড়ে করিয়াছে—চাই বিলাতী নুন, চাই বিলাতী কাপড়! বিগত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছে যে শাস্তি অশাস্তি, বাক্যের স্বাধীনতা অধীনতা, ও সব ফক্কিয়ার। ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হইলে ও সব পদদলিত করিতে মুহূর্ত্তও লাগিবে না। যখন প্রয়োজন হইল হিন্দুর বিপক্ষে মুসলমানকে উত্তেজিত করিয়া দেশময় অশান্তির আগুন জালিয়া তুলিতে এক মুহূর্ত্তও লাগিল কি? উদ্দেশ্য হিন্দুকে এই কথা বলা—তুমি যে স্বরাজ চাও, আমি চলিয়া গেলে মুসলমানের হাতে তোমার কি হুঁদশা তাহা দেখ! হুঃবেব বিষয় হিন্দুর উত্তরটা গায়ে বড় লাগিয়াছে! বাহা হউক, এ শাস্তির মূল্য কি তাহাও আমরা বুঝিয়াছি, এ শাস্তির অর্থ কি তাহাও আমরা জানিয়াছি। ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য ইহার জন্ম, ইংলণ্ডের স্বার্থের সঙ্গে ইহার যেখানে বিরোধ, সেখানে ইহার মৃত্যু। ইংরাজরাজ এখন স্ববেশে আবিস্কৃত হইয়া এই শাস্তির অন্তর্নিহিত গুঢ় ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীধীবেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

যুরোপে পদাৰ্পণ।

ইংবাজি ১৯০১সাল ১৮ই জানুয়ারি ভূমধ্যসাগর বন্দে পি এণ্ড ও কোম্পানির “অষ্টেলিয়া” নামক জাহাজ ধানি ছুটিতেছে।—
৫ই জানুয়ারি বোম্বাই ছাড়িয়াছিলাম,—আজ দুই সপ্তাহ কাল একাদিক্রমে মাতা বসুন্ধরার স্পর্শবিরহিত—প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। আজ জাহাজে আমার শেষরাত্রি। কল্যাণ প্রাতে জাহাজ মার্সেল্‌স্ বন্দরে পৌঁছবে। সেখানে এক বেলা থাকিয়া জাহাজ আবার লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিবে। কতক লোক মার্সেল্‌স্ নামিবে,—বাকী লণ্ডনযাত্রী সমস্ত পথই জাহাজে যাইবে। ধন্ত তাহারা—বাহারা নামিবে না। ধন্ত তাহাদের ধৈর্য্য। সমুদ্রকে নমস্কার—আমি স্থলচর প্রাণী, জীবনের অষ্টাবিংশতি বৎসর স্থলে কাটাইয়াছি—স্থলে কাটাইয়াছি;—কিন্তু জলে দুই সপ্তাহেই আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

জাহাজে কি আমার বেশী শারীরিক কষ্ট হইয়াছিল?—তাহা ত নহে। বোম্বাই ছাড়িয়া অবধি সমুদ্র বেশ শান্ত মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছিল। শীতকালে আরব্যাসাগর শান্তই থাকে,—বর্ষাকালেই যাহা কিছু গোলযোগ। বোম্বাই ছাড়িবার পর দশম দিবসে লোহিত সাগর পার হইয়া পোর্ট সেদে পৌঁছিলাম, তখনও পর্য্যন্ত একদিনের তরেও সমুদ্র-পীড়া অনুভব করি নাই। পোর্ট সেদ ছাড়িলে—দিন দুই মাত্র—সমুদ্রে ঢেউ একটু বেশী হইয়াছিল, জাহাজ একটু বেশী হুলিয়াছিল,—একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। “সমুদ্র-পীড়া” বলিতে যাহা বুঝায়, ঠিক তাহা হয় নাই। ক্যাবিনে শয্যার উপর চুপাট করিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ধাত্তব্রব্যের গন্ধও সহ করিতে পারিতাম না। ষ্টুয়ার্ড (খানসামা) দুই একটি আপেল ফল আনিয়া দিত, তাহাই খাইতাম, এক আধ গেলাস নেবুস সরবৎ আনিয়া দিত, তাহাই পান করিতাম; এবং একটি ফাউন্টেন পেন লইয়া, “যোড়শী”তে প্রকাশিত “কানীবাসিনী” নামক গল্পটি রচনা করিতাম। দুই দিন পরে, যখন ইতালী সমীপবর্ত্তী হইল, তখন সমুদ্রও শান্ত হইল, আমিও গা-ঝাড়া দিয়া “চান্সা” হইয়া উঠিলাম। জাহাজে আমার ত কষ্ট হয় নাই। তথাপি জাহাজ আমার কাবাগাব স্বরূপ মনে হইতেছিল, নামিতে পাইলে ধাক্কা।

১৮ই জানুয়ারি বাত্রি দশটার সময় তাই প্রকল্প মনে শয়ন কবিত্তে গেলাম। কল্যা প্রভাতে আমার মুক্তি। “রাজা ও রাণী”র কয়েক লাইন ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল—

একি মুক্তি, একি পরিত্রাণ।

কি আনন্দ হৃদয় মাঝারে।—অবলার—

না—না—অবলাসংক্রান্ত কোনও গোলযোগ জাহাজে উপস্থিত হয় নাই। পাঠক অনুগ্রহ করিয়া উদ্ধৃতাংশ হইতে শেষ কথাটি কাটিয়া দিবেন, ইহা ভুলিয়া বলিয়াছি। জাহাজে একটি অবলার সহিত কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল বটে,— এবং তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ উপহাসও দিয়াছিলেন বটে,— কিন্তু বয়সে তিনি প্রবীণা,—এবং তাঁহার উপহার একশিশি স্নগন্ধি নয়, ঔষধের বড়ি মাত্র। তিনি ও তাঁহার স্বামী কাপ্তেন—আমাকে বলিয়াছিলেন—“বিলাতের শীতে প্রথম প্রথম তোমার সর্দি কাসি উপস্থিত হইবে, ‘সোরথোট’ হইতে পারে, এই ঔষধ তখন এক এক বড়ি খাইও।” হৃর্ভাগ্যবশতঃ পৌছিয়া আমার সর্দি কাসি কিছুই হয় নাই। কিন্তু তথাপি মাঝে মাঝে এক একটা সেই বড়ি খাইতাম। রোগ নাইবা হইল, তাহা বলিয়া কি ভাল ঔষধটা নষ্ট করিতে আছে?

শয়ন করিলাম, কিন্তু ভাল নিদ্রা হইল না। মাঝে মাঝে কাকনিদ্রা আসে, মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠি। বাত্রি পাঁচটার সময় জাগিয়া দেখি, জাহাজের গতি বড় ধীর। এঞ্জিনের যে একটা ধম্ ধম্ করিয়া শব্দ হয়, তাহা অতি ধীরে, দেবিত্তে ঘেরিতে হইতেছে। তবে পৌছিলাম বুঝি? তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বাত্রি-বসনের উপর ড্রেসিং গাউন পরিয়া, চট জুতা পায়, ডেকের উপর ছুটিলাম। গিয়া দেখি, আরোহীর মধ্যে একজন ইংরাজ বালকমাত্র দাঁড়াইয়া আছে, আর নাবিকেরা আছে। অন্ধকার—বিছুই দেখা যায় না। কেবল দূরে একটা লাইট হাউন্স। আলোকটা নিরবচ্ছিন্ন নহে। জলে আর নিবিয়া যায়, ঘন ঘন এইরূপ হইতেছে কখনও স্বেত, কখনও লোহিত, কখনও নীল, এইরূপ বর্ণ পরিবর্তনও হইতেছে। আমি এবং সেই বালকটি তাহাই দেখিতে লাগিলাম। বালকটি বলিতে লাগিল—Isn't it pretty!

নাবিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মার্সেল্‌স্‌ আর তিন চারি মাইল মাত্র ব্যবধান আছে। জাহাজ অতি ধীরে,

মস্তুর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বাত্রির অন্ধকারও কমিতে লাগিল।

ঘণ্টা খানেক পরে, জাহাজ একবারেই থামিয়া গেল। দুবে পাহাড়ের মত দেখা যাইতেছে। তখন সামান্য আলোকও হইয়াছে, একজন নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলাম—“মার্সেল্‌স্‌ কোথা?”

সে তটভূমি দেখাইয়া বলিল—“ঐ।”

“কৈ?”

“ঐ যে।”

“ও ত দেখিতেছি পাহাড়ের মত। সহর কৈ?”

“ঐ সহর।”

“বাড়ী ঘর কৈ?”

“সব আছে। কুয়াসার ঢাকা আছে।”

বিশ্বাস হইল না। তটভূমি ত বেশ স্পষ্টই দেখিতেছি—কুয়াসা ত কৈ দেখিতেছি না। ঐখানেই সহর আছে, ইহাও কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখিলাম, তাহাই হইল। যেন ইন্দ্রজালের প্রভাবে, অল্পে অল্পে, যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে সহর ফুটিয়া উঠিল।

ক্রমে একটি ছইট করিয়া পুরুষ আবোহী ডেকে দেখা দিতে লাগিলেন। সকলেই আমার স্ত্রায় “আন্‌ড্রেস্‌” অবস্থায়, কারণ চটাব পূর্বে মহিলাগণের ডেকে আসিবার অধিকার নাই। শুনিলাম বন্দর হইতে পাইলট বোট আসিবে, আসিয়া আমাদের জাহাজকে বন্দবে লইয়া যাইবে।

যখন সাড়ে সাতটা, তখন বেশ আলো হইল, পাইলট বোট আসিল। বন্দরে পৌছিতে চট্টা বাজিয়া গেল। আমি ইতিপূর্বেই, বেশ পরিধান কবিয়া, জিনিবপত্র শুছাইয়া, প্রস্তুত হইয়া ছিলাম। জাহাজ যখন তীরে লাগিল, নামিবার জন্ত সিঁড়ি পড়িল, ঠিক সেই সময়ে জাহাজের প্রান্তবাহের ঘণ্টা বাজিল। দেখিলাম দলে দলে নরনারী ভোজন কক্ষে গিয়া খাইতে বসিলেন। আমি নামিবার জন্ত এতই ব্যাকুল হইয়াছিলাম যে সে বিলম্ব আমাব সহিল না। পূর্বেই একটু চা ও ছই চারি খানি বিকুট খাইয়া ছিলাম। প্রান্তরশ বাদ দিয়া, পূর্বকথিত কাপ্তেন ও তাঁহার পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া নামিয়া পড়িলাম।

তীব্র টমাস্‌ কুকের পরিচ্ছদধারী একজন কর্মচারী ছিল।

তাহার সাহায্যে কষ্টম হাউসের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। ইংবাজি মুদ্রার (যাহা বোম্বাই হইতে লইয়া গিয়াছিলাম) বিনিময়ে কিছু ফরাসী মুদ্রা সে আমায় আনিয়া দিল। বন্দর হইতে ষ্টেশন চারি মাইল ব্যবধান। বলিল—“ষ্টেশনেও আমাদের লোক আছে, সে আপনাকে ট্রেনে চড়িতে সাহায্য করিবে।”

গাড়ীখানি ক্রহামেব আকাব। সমুদ্রেব তীরে তীরে কিয়দূর ছুটিয়া, গাড়ী নগরে প্রবেশ করিল। তখনও মার্চেল্‌স্‌ নিজ প্রাতরাশ শেষ করে নাই। সেই কারণে পথে লোকসংখ্যা অল্প।

ষ্টেশনে পৌছিয়া, কুকের লোককে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। গাড়ী বিদায় করিয়া, মুটের জিন্মায় জিনিষ রাখিয়া, কুকের লোককে খুঁজিতে লাগিলাম। ট্রেনেব তখনও বিলম্ব ছিল, তাহা আমি পূর্বাধিহই অবগত ছিলাম। ষ্টেশনের নানা স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, অবশেষে দেখি, বাগানে একখানা বেষ্টিতে কুকের কর্মচারী বসিয়া আছে, একজন ক্ষুতাবুকবওয়াল তাহার ক্ষুতাবুকব করিয়া দিতেছে। সে বলিল, দশটার সময় ট্রেন ছাড়িবে, ঘণ্টা খানেক বিলম্ব আছে। যথা সময় আমায় ট্রেনে উঠাইয়া দিবে। ষ্টেশনে ফিবিয়া, আমাব জিনিষপত্রগুলির কাছে একখানি বেষ্টিতে বসিয়া রহিলাম।

বসিয়া বসিয়া বিরক্ত বোধ হইল। উঠিয়া একটু ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলাম। এক স্থানে দেখিলাম, ষ্টেশনের ভোজনশালা, বহু লোক থাইতে বসিয়াছে। আমারও ক্ষুধাটা বিলক্ষণ পাইয়াছিল। একবার ভাবিলাম, প্রবেশ করিয়া বসিয়া যাই, কিন্তু একটা বিষয়ে আশঙ্কা হইল। শুনিয়াছিলাম, ফরাসীবা নাকি বেঙ খায়। কি জানি মহাশয়, যদি না জানিয়া বেঙ খাইয়া ফেলি ? ভাষাও জানিনা যে জিজ্ঞাসা করিব। এই ভয়ে, ক্ষুধিবৃত্তি করিতে সাহস হইল না। অভুক্ত অবস্থায় জাহাজ হইতে নামিয়া আসিয়াছি বলিয়া, নিজের বুদ্ধিকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম।

ক্রমে সময় হইল ; কুকের লোক আসিয়া আমায় ট্রেনে উঠাইয়া দিল। তখন তাহাকে বলিলাম—“আমায় কিছু খাওঁদ্রব্য কিনিয়া দিতে পার ?” সে বলিল—“আম্বন”—

পূর্ষকথিত ভোজনশালায় তাহার সঙ্গে গিয়া, একখানা রুটি, একটু মাখন, বানিকটা রোট মটন এবং কিছু ফল ক্রয় করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া, গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল! দেখিলাম, আমাব হাতবাক্সটি, যাহাতে আমার টাকা কড়ি সমস্তই ছিল, তাহা সেই খালি কামরার বেষ্টির উপর রহিয়াছে ;—ডালাটি খোলা। আমিই তাড়াতাড়িতে অসাবধানতায়, বাক্সটি ওকপ খোলা অবস্থায় রাখিয়া, পাবার কিনিতে নামিয়া গিয়াছিলাম। বাক্সতে আমার সম্বল, দশটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। কেহ যদি তাহা লইয়া থাকে ? তবে এ বিদেশপথে কি বিপদেই না পড়িবে! লণ্ডন অবধি টিকিট অবশ্য আমার আছে ;—কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া, কুলি-ভাড়াই বা দিব কোথা হইতে, পথে খাইবই বা কি ? আমার মাথা ঘুবিয়া গেল। ব্যাকুল হইয়া বাক্স অল্পসন্ধান করিলাম ; দেখিলাম টাকা গুলি আছে, কেহ লয় নাই। তখন দেহে প্রাণ পাইলাম।

গাড়ী যখন ছাড়িল, তখন বোধ হয় সাড়ে দশটা। ইহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীব গাড়ী আমাদের মধ্যম শ্রেণীব মত। এক একখানি গাড়ী পাঁচ ছয়ট কামবায় • বিভক্ত। বসিয়া যাইবার স্থান মাত্র, শয়নের ব্যবস্থা নাই, স্নানাগারও নাই ;—অথচ সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি চলিয়া আমরা প্যারিসে পৌছিবা।

গাড়ী ছাড়িল। আমার কক্ষে আরও দুই তিনটি সহযাত্রী। অল্পক্ষণ পরেই নগরসীমা ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে দিয়া যাইতে লাগিলাম। দুই পার্শ্বে শস্তক্ষেত্র—মাঝে মাঝে কোনও গ্রামের গির্জার উন্নত চূড়া, দুই চারিখানি শাদা বাড়ী দেখা যায়। একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, যাহা আমাদের দেশ হইতে বিভিন্ন। গাড়ী চলিয়া যে শব্দটা হইতেছে, তাহা যেন টং টং করিতেছে। আমাদের দেশেব মৃত্তিকা কোমল, প্রস্তরহীন। তাই শব্দটাও কোমল! অনুমান করিলাম, এখানকার মৃত্তিকা প্রস্তরবহুল হওয়ার জন্য শব্দটা বোধ হয় ধাতব শুনা যায়।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিতে লাগিলাম। আমার কামরায় কঁত লোক উঠিতে লাগিল, আবার নামিয়া যাইতে লাগিল। ফরাসী দেশের প্রথা অনুসারে তাহার আসিয়াই আমাকে শ্রিতমুখে অভিবাদন করে, নামিয়া

যাইবার সময়ও অভিবাচন কবে। কেহ কেহ বা আমাদের কি জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি না। আন্দাজি ইংরাজিতে বলি—“আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছি”—তাহাও তাহাবা বুঝিতে পারে না। অবশেষে উভয়ে হতাশভাবে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া থাকি।

ক্রমে বামে একটা ক্ষুদ্র নদী দেখা যাইতে লাগিল। একজন সহযাত্রীকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—“এটা কোন্ নদী?” উত্তরে সে ব্যক্তি কি বলিল আমি কিছুই বুঝিলাম না; আমার প্রশ্নও সে অসুমান কবিত্তে পারে নাই বোধ হয়। গাড়ীতে একখানা মানচিত্র ছিল, তাহা হইতে ক্রমে আবিষ্কার করিলাম, নদীটি রোন্। নদীটির আকার দেখিয়া নিতান্ত অভক্তি হইল। কলিকাতার বড় বড় রাস্তা-গুলি প্রস্থে যতটুকু, নদীটির প্রস্থ তাহাব অপেক্ষা অধিক নহে। এই রোণ! এই নগণ্য নদীরই নাম বাল্যকালে মুখস্থ কবিয়া মরিয়াছি!

দিবা অবসান হইবার আব অধিক বিলম্ব নাই। একটা স্থলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি আসিয়া উঠিলেন। তিনি আমার ফরাসীতে কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আন্দাজি ইংরাজিতে একটা উত্তর দিলাম। শুনিয়া তিনি ইংরাজিতে বলিলেন—“আপনি ইংরাজি কহেন? আমিও ইংরাজি একটু একটু জানি।”—দেখিলাম, তিনি ইংরাজি জানেন বটে, কিন্তু যৎসামান্য। কষ্টে-কষ্টে, কোন মতে মনের ভাব প্রকাশ কবিত্তে সক্ষম হন মাত্র। আমি ইংবাজের প্রজ্ঞা শুনিয়া তিনি বলিলেন—“The Queen of England is very very bad”—তখন বুঝিনাই যে তিনি মহারানীর স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করিতেছেন। আমি যখন বোধাই ছাড়িয়াছিলাম তখন ভিক্টোরিয়া পীড়িত হন নাই। তাহার সাংঘাতিক পীড়ায় সংবাদ আমরা সমুদ্রের উপর কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি মনে করিলাম, বৃদ্ধ বৃদ্ধি বৃষর যুদ্ধ উপলক্ষ্যে মহারানীর নিন্দা করিতেছেন।

সারাদিন, সারারাত্রি কাটিল। ভোর ছয়টার সময় ট্রেন প্যারিসের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখনও সূর্যোদয়ের বিলম্ব আছে, পথে পথে আলো জ্বলাইয়া প্যারিস তখনও নিদ্রিত। আমি উৎসুক হইয়া জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইলাম। বড় যে সৌন্দর্যের

খ্যাতি শুনিয়াছিলাম, দেখি কেমন প্যারিস! কিন্তু প্যারিস-বধু তখন মুখখানি উপর কুরাসার ঘোমটা টানিয়া রাখিয়া ছিল, ভাল দেখা গেল না।

গাড়ী স্টেশনে আসিয়া থামিল। ইহা দক্ষিণ-প্যারিস। আমাকে পুনর্বার করিতে হইবে উত্তর-প্যারিস স্টেশন হইতে। স্ততরাং নগরের অভ্যন্তর দিয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আমার যাইতে হইবে। ভাবিয়াছিলাম, “কুক” আছে, চিন্তা কি? আমার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। স্টেশনে নামিয়া কুককে অশ্রেষণ করিলাম। কিন্তু কোথায় বা কুক কোথায় বা কে। সেই ভোরে—নীতে—আসিবার ক্ষণ তাহার ত বহিয়া গিয়াছে।

কি করি? ইসারা করিয়া একজন মুটেকে ডাকিলাম আমার টিকিটে লেখা ছিল Paris-Nord হইতে যাত্রা করিতে হইবে। জিনিষ দেখাইয়া মুটেকে বলিলাম—“পারী নর্দ”—বলিয়া ঘোড়ার গাড়ীর দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করিলাম।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত আমার মুখ পানে চাহিয়া দেখিল। কোন্ দূর দেশ হইতে কোন্ বিদেশী আসিয়াছে—বোধ হয় তাহাব একটু মায় হইল। গাড়োয়ান পাছে আমার ঠকাইয়া বেশী ভাড়া লয়, এই কারণে বোধ হয় সে নিজের পকেট হইতে একটি ফ্র্যাঙ্ক (আধুলির আকার, মূল্য দশ আনা) বাহির কবিয়া, বাম হস্তের উপর রাখিয়া, বাম হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা তাহার উপর বারকতক টোকা দিয়া, আমাকে পঞ্চাঙ্গুলি প্রদর্শন করিল। বুঝিলাম বলিতেছে পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক ভাড়া লাগিবে। গাড়ীতে উঠিলাম। বর্ধশিস্ করিয়া মুটেকে বিদায় দিলাম।

তখনও প্যারিস সমস্ত ছায়ার জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া নিদ্রামগ্ন। কচিং কোথাও হুই একটি নয়নারী বাহির হইয়াছে। বেশ দেখিয়াই বুঝা গেল, তাহার দরিদ্র। বড় বড় দোকান, সব বন্ধ। পথগুলি অর্ধ, বোধ করি রাতে বৃষ্টি হইয়া গিয়া থাকিবে। হুই একখানা ইলেকট্রিক ট্রাম-গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। অসুমান অর্ধবর্ণটা পরে উত্তর-স্টেশনে পৌছিলাম।

কুলি ডাকিয়া, ঘোড়ার গাড়ী বিদায় দিলাম। কুলি জিনিষ পত্র নামাইয়া আমার কি বলিল। আমি তাহাকে বলিলাম—“ক্যালো—লঙ্কে”—অর্থাৎ ক্যালো হইয়া লণ্ডন

যাইব। সে আমার জিনিষগুলি তুলিয়া লইয়া, আমার ইসারায় ডাকিয়া অগ্রসর হইল। একটা স্থানে লইয়া গেল, তাহা শুদামের মত। আমার জিনিষগুলি সেই শুদামে দিল। কর্মচারী আমাকে একটি সংখ্যাক্রিত টিনের চাকতি দিল। বুঝিলাম, আমার জিনিষ জিহ্বায় রাখিল, চাকতি খানি আমার নিদর্শন। অতঃপর কুলিটা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—“Neuf.”

এ আবার কি বলে? আমি বুঝিতেছি না দেখিয়া সে আবার বলিল—“নোফ্ নোফ্”। আমি নিরাশ ভাবে ঘাড়টি নাড়িতে লাগিলাম। তখন সে পকেট হইতে নিজের ঘড়িটি বাহির করিল। ছোট কাঁটাটা যেখানে ছিল, কাচের উপর সেই স্থানটার অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। পরে, অঙ্গুলি কাচের উপর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর করিয়া, নয়টার অঙ্কে গিয়া থামিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিল—“Neuf”—বলিয়া, বেলগাড়ী ছাড়িলে এঞ্জিনে যেমন শব্দ হয়, নিজের মুখে সেইরূপ শব্দেব অঙ্গুরণ করিতে লাগিল—পফ্-পফ্-পফ্-পফ্। আমি হাসিয়া ফেলিলাম—বুঝিলাম নয়টার সময় গাড়ী ছাড়িবে। সেও একটু হাসিয়া, কোথায় অন্তর্দান করিল।

নিকটে একটা বেঞ্চি ছিল, তথায় উপবেশন করিলাম। কিন্তু শীতে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা যায় না। উঠিয়া একটু এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলাম। বাহিরে গিয়া, সহর বেড়াইতে সাহস হইল না—শেষে কি যাত্রা শুনিতে গিয়া নীলকমলেব দশা হইবে? ষ্টেশনের বাহিরেই, রাস্তার ওপারে একটা শাশুদ্রব্যোর দোকান ছিল। কাচের জানালায় লেখা আছে—English is spoken here—দেখিয়া মনটা খুসী হইল। যাই, কিছু খাশ সংগ্রহ করিয়া আনি।

দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি মাত্র যুবতী সেখানে বসিয়া আছে। বলিলাম—“আমায় একখানা রুটি, একটু মাখন আর কিছু ফল দাও।”—যুবতীটি ফরাসী ভাষায় কি বলিল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—“তোমরা কি ইংরাজি কহ না?” বলিয়া, তাহাদের কাচের জানালায় সেই লেখাটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিলাম। যুবতীটি একটু মুহূর্ত হাস্য করিয়া ফরাসীতে আশুও কি বলিল। তখন মনোভাব বিনিময় সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, ইসারায় দ্রব্যাদি ক্রম করিলাম।

এ সম্বন্ধে একটি বহুজনক গল্প বলি। একবার একজন জ্বররক্ত জন বুল, প্যারিসে দোকানে এইরূপ লেখা দেখিয়া, জিনিষ কিনিতে প্রবেশ করিয়াছিল। সেখানে দ্রুত পুরুষ অনেক গুলি কর্মচারী ছিল, কিন্তু কেহই এক বর্ণ ইংরাজি বুঝিল না। তখন জন বুল মহা খাপ্পা হইয়া হাঁক ডাক আরম্ভ করিল। গোলমাল শুনিয়া ক্রমে দোকানের মালিক উপর হইতে নামিয়া আসিল। কেবল সেই কিঞ্চিৎ ইংরাজি জানিত। জন বুল রাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“মহাশয়, আপনাদের কেমন ব্যবহার? দোকানের বাহিরে লিখিয়া রাখিয়াছেন ‘এখানে ইংরাজি কথিত হয়’—কিন্তু দেখিতেছি আপনার কর্মচারীবা কেহই ইংরাজি বুঝেনা!—কে ইংরাজি কহে আমি জানিতে চাই।” দোকানদার মুহূর্ত্ত করিয়া বলিল—“কেন মহাশয়, এইত আপনিই ইংরাজি কহিতেছেন। আমাদের অনেক খরিকারই আসিয়া ইংরাজি কহে। আমরা ত জানালায় এমন কথা লিখি নাই যে আগরা ইংরাজি কহিয়া থাকি।”—জায়ের ফাঁকিতে জন বুল অপ্রতিভ হইয়া প্রস্থান করিল।

যথা সময়ে কুলি আসিয়া আমায় গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। নয়টার সময় গাড়ী ছাড়িল। আমার কর্মরায়, অন্তান্ত লোকের সঙ্গে, একটি ফরাসী যুবতীও উঠিয়াছিল। তাহার গলায় একটি অতি সুক্ষ্ম শির্ক বসনের রুমাল জড়ানো। গাড়ী ছাড়িলে, যুবতী সেই রুমালটিকে খুলিয়া সযত্নে শুটাইয়া শুটাইয়া একটি ফুলের মত করিল। কবিতা আবার গলায় পরিল। তাহার পর একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ হইতে সে কিছু খাশ এবং একটি বোতল বাহির করিল। খাশ আর মাঝে মাঝে বোতলে মুখ দিয়া মৃদু পান করে। ক্রমে সমস্ত বোতলটি পান করিয়া, জানালা গলাইয়া সেটি বাহিরে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। তখনকার দিনে আমি অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলাম, মত্ত মাত্রকেই ব্র্যাণ্ডি ও হইস্কির মত তীব্র মনে করিতাম। জানিতাম না, ফরাসীরা জলেব পরিবর্তে যে মত্ত ব্যবহার করে তাহা নিতান্তই লঘু। কোনও ষ্টেশনে পানীয় জলের কোনই বন্দোবস্ত দেখিলাম না। আমার সঙ্গে একটি গেলাস ছিল, কিন্তু তাহার সদ্যবহার কল্পনার অবসর পাই নাই। কমলা নেবু খাইয়াই সাবাপথ তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইয়াছিল।

বেলা ৩টার সময় ক্যালে বন্দবে পৌঁছিলাম। সেখানে মুটিয়ারা ইংরাজি কহিতে পারে, আর কোনও অসুবিধাই বহিল না।

ক্যালে হইতে ডোভার ২৬ মাইল। ইংলিশ চ্যানেল পার হইতে দুই ঘণ্টা লাগিয়াছিল। সমস্ত পথ কি বাতাস! ডেকের উপর দাঁড়াইলে যেন উড়াইয়া জলে কেলিয়া দেয়।

সন্ধ্যা ৫টার সময় ডোভারে পৌঁছিলাম। ঘাটের উপরেই ট্রেন সজ্জিত ছিল। আবোহণ করিলাম। কলিকাতা হইতে যে পবিবারের নামে আমি পরিচয়পত্র আনিয়াছিলাম, লণ্ডনে যাহাদের গৃহে আমি অবস্থিতি করিব,—পূর্বে হইতে পত্র লেখা ছিল যে ডোভারে পৌঁছিয়া আমার আগমনসংবাদ তাঁহাদিগকে তারযোগে জানাইব। গাড়ীতে উঠিলাম, ছাড়িবারও বেশী বিলম্ব নাই, তখন ‘কোথায় তারঘর—কোথায় তারঘর’ যদি অন্তরে বহির্গত হই, তবে হয় ত গাড়ী ছাড়িয়া যাইবে। সুতরাং সে সাহস কবিলাম না। একটা মুটেকে বলিলাম—“দেখ, একটা টেলিগ্রাম লিখিয়া দিতেছি—পাঠাইয়া আসিতে পাব?”—সে বলিল, পাবে। আমার কাছে খুচবা কিছুই ছিল না। টেলিগ্রামটি এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা (মূল্য ১৫) তাহাকে দিয়া বলিলাম—“নমস্কার থাকিতে বাকী টাকা আমার আনিয়া দিতে পারিবে ত?”—সে বলিল—“নিশ্চয়।”—বলিয়া ছুট দিল।

এ দিকে ট্রেন ছাড়িতে আব বেশী বিলম্ব নাই। লোক-টাও আসে না। পূর্বে শুনিয়াছিলাম,—বড় বিষয়ে যাহাই হউক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ইংলণ্ডের সাধাবণ লোক অনেকটা সাধু। তাহারা সুবিধা পাইলে ব্যঙ্গ ভাঙ্গ বটে কিন্তু দুই চাবি টাকা চুরি কবাটা অন্ত্যস্ত হেয়জ্ঞান কবে। সেই সাহসেই আমি লোকটাকে বিশ্বাস কবিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও আসে না কেন? দিল বুঝি ফাঁকি!—শেষ মুহূর্তে দেখিলাম সে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। বলিল ছয় পেনি লাগিয়াছে—বাকী সাড়ে উনিশ শিলিং আমার গণিয়া দিল। আমি তাহাকে ছয় পেনি বখশিস্ কবিয়া বিদায় দিলাম, ট্রেনও ছাড়িল।

লণ্ডনেব চেয়ারিং ক্রস্ স্টেশনে যখন পৌঁছিলাম, তখন ছয়টা বাজিতে দশ মিনিট বাকী আছে। বাজি হইয়াছে। স্টেশনে বিদ্যুৎ আলোক জলিতেছে। আব এত লোক

দাঁড়াইয়া আছে—অসম্ভব জনতা। তখন ভাবিয়াছিলাম, প্রতাহই বুঝি এইরূপ হয়।

পবে শুনিলাম, তাহার অলক্ষণ পরেই জর্জিং-সম্রাটের পৌছিবার কথা ছিল, তিনি মহাবাদীকে দেখিতে আসিতেছেন,—তাঁহাবই প্রতীক্ষায় সেদিন স্টেশনে অত জনতা হইয়াছিল,—আমার প্রতীক্ষায় নহে।

একজন মুটিয়া আমার জিনিষপত্র একখানি ফোর—হইলাবে উঠাইয়া দিল। লণ্ডনে ক্যাব প্রধানতঃ দুই প্রকার—হ্যানসম ও ফোর-হইলাব। হ্যানসমেব মাত্র দুইখানি চাকা—দুই জন লোকেব বসিবার স্থান, বেশ দ্রুত চলে। ফোর-হইলারের চাবি খানি চাকা, গতি অপেক্ষাকৃত মন্দ,—চাবিজন লোকেব বসিবার স্থান,—মালপত্র বেশী থাকিলে ফোর-হইলারেই সুবিধা। গাড়ী লণ্ডনের জনসংঘ ভেদ কবিয়া ছুটিল। আমি দুই পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, অর্ধ ঘণ্টায়, ঠিকানায় পৌঁছিলাম।

বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়োয়ানকে বলিলাম—“নামিয়া বাড়ীল লোককে ডাক—আমার এই কার্ড লও।”—গাড়োয়ান নামিয়া দরজায় “নকাব” ঠক ঠক করিতে লাগিল। দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল—কার্ড লইয়া গেল। কার্ড পাইয়া, বাড়ীল সকলে একবাবে সদলে দ্বাবে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের আদব অভ্যর্থনায় আমার সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইল। একটি বুক, দুইটি যুবতী ও একজন প্রবীণাকে দেখিলাম। তাঁহাদের ড্রিং কমে গিয়া বসিলাম। একটি যুবতী বলিলেন—“স্টেশনে বাবাব সঙ্গে দেখা হয় নাই? তিনি যে আপনাকে আনিতে গিয়াছেন?” আমি বলিলাম—“কে না—কাহাবও সহিত ত দেখা হয় নাই।”

“আপনি কয়টার গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন?”

“পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটের গাড়ীতে।”

“তবে যে ডোভার হইতে আপনি টেলিগ্রাম কবিয়া ছিলেন ‘ছয়টা সময় আজি পৌঁছিব?’ তাহাঁত বাবা আপনাকে miss কবিয়াছেন।”

পাঁচ—টা—পঞ্চাশ—মিনিট আবার কে লেখে, আমি সোজা সুজি ছয়টা লিখিয়া দিয়াছিলাম। আমাকে কেহ স্টেশনে আনিতে যাইবেন ইহা আমার উদ্দেশ্যও ছিল না,—

আমি যে আসিতেছি এই সংবাদটা মাত্র দিয়াছিলাম। আর, কেহ যদি ষ্টেশনেই আসেন, তিনি মিনিট হিসাব করিয়া বাড়ী হইতে যাত্রা করিবেন তাহাট বা কেমন করিয়া জানিব?—আমরা হইলে ত আধঘণ্টা আগে ষ্টেশনে আসিয়া থাকি।

আমি বলিলাম—“তিনি কেন কষ্ট করিয়া ষ্টেশনে গেলেন!”—ইত্যাদি রূপ কথা বার্তা হইতেছে, এমন সময় গৃহকর্তা ফিবিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন,—ষ্টেশনে আমার অনেক খুঁজিয়া, অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গৃহকর্তার আকার ধর, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসব হইয়াছে। তাঁহার নাম ডাক্তার অ,—তিনি ঔষধের ডাক্তার নহেন, একজন H. D. উপাধিধারী। ইনি জাতিতে জর্মান কিন্তু বিগত ৫০ বৎসর ইংলণ্ডেই বাস করিয়াছেন, ইংরাজ-মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। সরস্বতী ইঁহাকে যে পরিমাণে রূপা করিয়াছেন, কমলা সে পরিমাণ করেন নাই। ইনি পূর্বে Royal Naval Collegeএ জর্মান ভাষার অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিভিল সার্কিসের পরীক্ষক হইয়া এবং সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়।*

ইঁহার এক পুত্র এবং দুই কন্যা। পুত্রটি বিবাহিত,—চাকরি করেন,—স্থানান্তরে থাকেন। প্রতি ববিবাব মধ্যাহ্ন কালে সস্ত্রীক আসিয়া পিতা-মাতা ভগিনীর সহিত সাবা দিবস অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যাব পব নিজ গৃহে ফিরিয়া

* এই বৃদ্ধ অদ্ভাবধি জীবিত আছেন। এখন তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর। জীবনের সাংকালে তাঁহার অদৃষ্টে একটি বিশেষ সম্মান লাভ হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারী সজাট, প্রিন্স অব ওয়েলসের দুইটি পুত্র এখন ইঁহার নিকট জর্মান ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। একদিন কুমারস্বর, বিনা সংবাদে, হঠাৎ দক্ষিণ আচার্য্যের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কস্তার নিকট হইতে সম্প্রতি আমি যে পত্র পাইয়াছি, তাহাতে এই বিষয়টির বর্ণনার লেখা আছে—Last year they came here one Sunday for a surprise visit, just two dear little boys who played with the dogs and asked all sorts of questions like Gibby Flemming or any other natural boy. I have an autograph letter from the elder about one of my stories in the “Crown,” which he liked, about the garden and a thrush and a big cherry; have dedicated one of my books to the Prince of Wales’ children by permission and am allowed to send them my books and always get nice letters of thanks.

যান। যে যুবকটির উল্লেখ করিয়াছি, তিনিই এই পুত্র। যুবতী দুইটি একটি তাঁহার পত্নী, একটি ভগিনী। ডাক্তার অ—র কনিষ্ঠা কন্যাটি সে সময়ে জন্মদাতা ছিলেন।

যাহা হউক, তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা ও আশ্রয়বৎ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হইলাম। সে দিনটি গৃহিণীর জন্মদিন ছিল। পবে, অনেক সময়ে, আমাকে দেখাইয়া তিনি লোককে বলিতেন—“He is my birth-day present from L—” (আমি ল—মহাশয়েব নিকট হইতেই ইঁহাদের নিকট পবিচয় পত্র লইয়া গিয়াছিলাম)

পরদিন ২১শে জাম্বুয়াবি—প্রাতরাশের পর আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম “আমাকে শীঘ্রই ভর্তি হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত রমেশ দত্ত মহাশয়ের নিকট আমার পমিচয়পত্র আছে, তিনি আমাকে ভর্তি হইতে সাহায্য কবিবেন। তাঁহার সঙ্গে আমাব দেখা কবা আবশ্যক। তাঁহাকে আপনারা জানেন কি?”

তাঁহার বলিলেন—“খুব জানি। এখন হইতে বেশী দূর নহে। তিনি ৮২নং টলবট রোডে থাকেন।”—বলিয়া লণ্ডনের একখানি মানচিত্র বাহির করিলেন। বলিলেন—“এই দেখ Regent’s Canal ইহার ধারে এই Blomfield Road যেখানে আমাব বাড়ী। এই পথে গিয়া এইখানে আসিয়া সেতু। সেই সেতু পার হইয়া ববারব এই পথে যাইবে। বামে এই Royal Oak Station থাকিবে। আর একটু গিয়া এই দেখ Talbot Road সুরু হইয়াছে। মোড়ের উপর এই যে † চিহ্ন রহিয়াছে, এটা গির্জা। এই পথে গিয়া ৮০নং বাড়ী চিনিয়া লইতে পাবিবে না?”

“খুব পাবিব।” বলিয়া কাগজে মাপের সেই অংশটা আঁকিয়া, বাহির হইলাম।

তখন বেলা সাড়ে নয়টা হইবে। সূর্য্যদেবেব চিহ্নমাত্রও নাই। অল্প অল্প কুয়াসা। পথে যাইতেছি, এমন সময় এক দীনবেশিনী বৃদ্ধা আমাকে স্রষ্টভাত জ্ঞাপন করিয়া বলিল—“Are you an African subject of Her Majesty?”

আমি বলিলাম—“না? আমি ভারতবর্ষীয় প্রজা।”

বৃদ্ধা বলিল—“Poor old lady! She is very ill.”

আমার দেহবর্ণটি কালো বটে—কিন্তু তবু কি আমি নিগ্রো বলিয়া ভ্রান্ত হইবার যোগ্য ? মনে মনে বুড়ীর উপর আমি মহা চট্টয়া গেলাম। পরে জানিয়াছিলাম,—আমরা পরস্পরের মধ্যে যে গৌর-শ্রামের প্রভেদ করি,—তাহারা অতটা লক্ষ্য করিতে পারে না। সেটা দৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতা বলিয়া বোধ হয়। বিলাতে যদি তদ্বৈজ্ঞানিক কথনও বলিতাম—“আমার বন্ধু অমুকের অপেক্ষা অমুক অনেক ফর্সা নহেন কি ?” তাহারা বলিতেন—“কৈ, আমরা ত বুদ্ধিতে পারি না।” তাহাদের দোষ দিব কি, আমি যখন প্রথম দেশে প্রত্যাবর্তন করিলাম—তখন, যে সকল লোক আমাদের মধ্যে খুবই গৌরবর্ণ, তাহাদিগকেও কালো মনে হইত। শাদা রঙের ঘোর চোখে এমনি লাগিয়া গিয়াছিল, যে, সকলকে বেবাক্ কালো মনে হইত। তবে বেশী কালো অল্প কালো তফাৎ করিতে পারিতাম বটে। লোককে জিজ্ঞাসা করিতাম—“আচ্ছা অমুক ত খুব গৌরবর্ণ ছিল, এত কালো হইয়া গেল কি করিয়া ?—উত্তর পাইতাম—“কালো হইবে কেন ? যেমন ছিল তেমনিই ত আছে।”—আমার দৃষ্টিশক্তির এইরূপ বিকৃতি কাটিতে দুই তিন মাস লাগিয়াছিল।

বাড়ীর নম্বর ধরিয়া আমি ত ৮২ নম্বরে উপস্থিত হইলাম। “নক” করিতে দাসী আসিয়া ছয়ার খুলিয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“Is Mr. Dutt in, please ?”

দাসী বলিল—“Junior or senior ?”

• আমি তখন জানিতাম না যে দত্ত মহাশয়ের পুত্রও ঐ বাটীতে থাকেন। আমি বলিলাম—“Senior”

দাসী আমাকে সঙ্গে করিয়া দত্ত মহাশয়ের নিকট লইয়া গেল।

এই ভোরভাগের মহাপুরুষকে আমি তৎপূর্বে কখনও চাক্ষুষ দেখি নাই। আমি প্রবেশ করিবামাত্র দত্ত মহাশয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিলাম, তখন তিনি প্রাতরাশ সমাধা করিয়া, লিখিতে বসিয়াছেন। তাহার টেবিলের উপর নানা পুস্তক, পার্লামেন্টের ব্লুক উদ্ঘাটিত। তখন তিনি তাহার বিখ্যাত Economic History of British India গ্রন্থ রচনায় ব্যাপ্ত ছিলেন।

দত্ত মহাশয় বলিলেন—“আপনি কোন্ innএ ভর্তি হইবেন স্থির করিয়াছেন ?”

“আমি ত কিছুই স্থির করি নাই। আপনি কি বলেন ?”

“ও সকলগুলিরই সমান মর্যাদা। তবে, আমাদের দেশের অনেকেই Middle Templeএর অন্তর্ভুক্ত। আমিও Middle Temple.”

আমি বলিলাম—“তবে আমিও Middle Templeএ ভর্তি হইব। কি করিতে হইবে ?”

“দুই জন ব্যারিষ্টারের সহি করা প্রস্তাবপত্র চাই।”

“আমি ত কাহাকেও চিনি না।”

“আমি Middle Templeএর একজন ব্যারিষ্টারের নামে অনুরোধ পত্র দিতেছি। তিনি নিজে সহি করিয়া দিবেন এবং সেখানে অনেক ব্যারিষ্টার আছে, আর কাহাকেও দিয়া একটা সহি করাইয়া লইবেন। আপনি Middle Templeএ যাইতে পারিবেন ?”

“ক্যাব লইয়া অনায়াসেই যাইতে পারি।”

দত্ত মহাশয় জরাজীর্ণ করিয়া একটু ভাবিলেন। পরে বলিলেন—“Busএ যাইলে—দুই তিন পেনিতে হইবে, অনর্থক কেন দুই তিন শিলিং খরচ করিবেন ?* আচ্ছা, আমি আপনার সঙ্গে লোক দিতেছি।”

• বলিয়া তিনি একখানি অনুরোধপত্র লিখিলেন। লিখিয়া পুত্রের অমুসন্ধান করিলেন। কিন্তু তিনি তখনও নিদ্রিত। তখন দত্ত মহাশয় বলিলেন—“আচ্ছা—আমুন, আর একজনকে সঙ্গে দিতেছি।” বলিয়া আমাকে লইয়া বাহির হইলেন।

দুই তিন মিনিটের পর আমরা অশ্রু একটি বাড়ীতে পৌছিলাম। সেখানে সম্পর্কে দত্ত মহাশয়ের এক ভাতৃপুত্র বাস করিতেন। তিনিও আইনশিক্ষার্থী।

* বড়লোক হইয়াও কি প্রকার মিতব্যয়ী হওয়া যায়, দত্ত মহাশয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। পরে, একবার তিনি Canning Townএ একটি বস্ত্রতা দিবার সময়, আমাকে সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন—“বাড়ী হইতে যেন আমি পথে লাঞ্চার লুণ্ঠ কিছু Sandwiches প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, কারণ ভোজনশালায় অধিক ব্যয়। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন I don't believe in throwing away good money. বিলাতে অনেক সময়ে দত্ত মহাশয়কে রেলের তৃতীয় শ্রেণিতে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি।

দত্ত মহাশয়ের অমুরোধে, সেই যুবক আমাকে লইয়া বাহির হইলেন।

কয়েক মিনিট পদব্রজে বাইবার পর, Electric Tube Railwayর একটি ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। দুই পেনি দিয়া এক একখানি টিকিট কিনিয়া, আমবা একটি স্লুহং থাচার (lift) মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তাহার মধ্যে আরও পনেরো বিশ জন লোক। বিদ্যুৎ জ্বলিতেছে। একজন দ্বারবান তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। লোক ভর্তি হইলে, থাচার দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া, সে ব্যক্তি একটা কল টিপিল। থাচারটা তৎক্ষণাৎ হু হু করিয়া, ভূগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিল। প্রায় চল্লিশ হাত এইরূপ নামিয়া, থামিয়া গেল। দ্বারবান, থাচার দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা বাহির হইয়া দেখিলাম, একটা ষ্টেশনের আকার। নানা স্থানে বিদ্যুৎ আলোক জ্বলিতেছে। যাত্রিগণ ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান। প্র্যাটকর্নের উপর খবরের কাগজের দোকানও আছে। লোকের আপিস বাইবার সময়। এই সময়টা দুই তিন মিনিট অন্তর একখানা কবিয়া গাড়ী আসে। খবরের কাগজ বিক্রেতা বালক রাশি রাশি কাগজ বিক্রয় করিতেছে। হটাৎ কোন কাষে সে কোথায় গেল। তাহার দোকান অবশিষ্ট পড়িয়া রহিল। সেই সময়টুকুতেও যাত্রিগণ টকাটক খবরের কাগজ তুলিয়া লইয়া, সেই টেবিলের উপর পেনি ফেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। বালক ফিরিয়া আসিয়া, তাহার অমুপস্থিতিতে বিক্রীত কাগজের পেনিগুলি জড় কবিয়া লইল।

দেখিতে দেখিতে ট্রেন আসিয়া পড়িল। ইহাতে শ্রেণী বিভাগ নাই। সবগুলি গাড়ীই প্রথম শ্রেণীর তুল্য। দূরত্ব অমুসারে ভাঁড়াবও তাবতম্য নাই। একটা ষ্টেশন গেলেও দুই পেনি, পাঁচটা ষ্টেশন গেলেও দুই পেনি, সারাপথ গেলেও তাহাই।

এই tube railwayটি লণ্ডনের এক প্রান্ত Shepherd's Bush হইতে অপর প্রান্ত Bank পর্যন্ত গিয়াছে। মধ্যে অনেকগুলি ষ্টেশন আছে। আমরা Chancery Lane ষ্টেশনে নামিলাম। আবার থাচার মধ্যে ঢুকিয়া, ধবাপৃষ্ঠে উন্নীত হইলাম। বাহির হইয়া যেখানটায় পড়িলাম, তাহার নাম Holborn—এই থানেই প্রথম লণ্ডনের প্রকৃত মূর্তি

দেখিলাম। গত রাত্রে বাড়ী বাইবার পথে লণ্ডনকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। অল্প প্রাতে, আমাদের বাড়ী হইতে দত্ত মহাশয়ের বাড়ী এবং তথা হইতে ষ্টেশন, যে অংশ দিয়া গিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাকৃত নির্জন। দেখিলাম—হবর্ণের বিশাল বঙ্কের উপর দিয়া অসংখ্য গাড়ী বোড়া মোটর কাব ছুটিয়াছে, বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই। হা—এই লণ্ডনের খ্যাতির উপযুক্ত “ট্র্যাফিক” বটে। কলিকাতায় এরূপ দেখি নাই—বোম্বাইয়ে এরূপ দেখি নাই। আমি বিম্মিত নেত্রে লণ্ডনের অপূর্ণ মূর্তির প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

রাস্তা পার হইয়াই চান্সেরি লেন। মোড়ের উপরই একটা ভোজনশালা আছে—তাহার নাম British Tea Table Co.—ভাবিলাম, এইটা চিহ্ন রহিল। যখন একাকী আসিব, চান্সেরি লেন খুঁজিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইবে না।—গল্প আছে, থানায় গিয়া এক ব্যক্তি নালিস করিল,—“দারোগা বাবু, বাজারে জিনিস কিনিতে গিয়াছিলাম, দোকানদার আমার টাকা কাড়িয়া লইয়াছে।”

“কার দোকান?”

“তাত জানি না ছজুর।”

“দোকান চিনাইয়া দিতে পারিবি?”

“খুব পারিব। সেই দোকানের সামনে একটা কালো গোরু শুইয়া আছে।”

পরে দেখিলাম, আমার চিহ্ন স্থাপনও তদ্রূপ। লণ্ডন সহবে নানা স্থানে অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশটা বৃটিশ টী টের কোম্পানির দোকান আছে;—সমস্ত দোকান গুলির সম্মুখ ভাগই ঠিক একই প্রকার, যেন ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত।

চান্সেরি লেন পার হইয়া ফ্লাট স্ট্রীটে পড়িলাম। সেখানেই Middle Temple Lane—একটি সরু গলির মত। প্রবেশ দ্বারে দ্বারবান দণ্ডায়মান। ওক কাষ্ঠ নির্মিত, বিপুল কবাত যুগল এখন ধোলা, বাত্রে বন্ধ কবিয়া দিবে। Middle Temple অনেকটা স্থান জুড়িয়া,—ইহার মধ্যে অনেক ব্যারিষ্টার বা ছাত্রের বাস করার উপযোগী গৃহাদি আছে। ব্যারিষ্টারগণের কার্যালয় বা চেম্বার আছে। তাহা ছাড়া আফিসাদি, লাইব্রেরি, ডাইনিংহল, বিশ্রামাদি করিবার কমন রুম প্রভৃতি আছে। বাড়ীগুলি সংখ্যাকৃত, রাস্তা গুলি নামাঙ্কিত। স্থানে স্থানে

চত্বরাকৃতি খোলা স্থান আছে, তাহার নাম Court—
ডিকেন্স কর্তৃক অমরীকৃত Fountain Court * এর
নিকট দিয়া, আমবা সেই ব্যারিষ্টারের ঠিকানায় উপস্থিত
হইলাম।

সেখানে গিয়া শুনা গেল, ভদ্রলোকটি কোথায় গিয়া-
ছেন, বৈকাল চারিটার সময় ফিরিবেন। আমার সঙ্গী
বলিলেন—“আপনি এখন কি করিবেন ?”

“অপেক্ষা কবিব। ভক্তি হইবার জন্য, একটা ব্যাক্সের
উপর দেড়শত পাউণ্ডের ড্রাক্ট আছে, ইতিমধ্যে সেইটা
অগ্রগ্রহ করিয়া ভাড়াইয়া দিম।”

তিনি ব্যাক্সে লইয়া গিয়া আমার ড্রাক্ট ভাড়াইয়া দিলেন।
ক্লীটষ্টটিগামী অম্নিবসে আমায় উঠাইয়া দিয়া, তিনি
বাসায় ফিরিলেন।

আমি আবার Middle Temple এ ফিরিয়া ইতস্ততঃ
পর্যটন করিতে লাগিলাম।

চারিটা বাজিল, তথাপি ভদ্রলোকটি ফিরিলেন না।
এদিকে সন্ধ্যা হইতেও আর বিলম্ব নাই। তুতরাং আমি
গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইলাম।

চান্সেরি লেন পার হইয়া, হবর্ণে আসিলাম। দেখিলাম
একটা অম্নিবস যাইতেছে, তাহার গায়ে, অস্ত্রাস্ত্র স্থানসহ
Royal Oak অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহাতেই আরোহণ
করিলাম। ভাবিলাম, রয়াল ওক ষ্টেশন ত অল্প প্রভাতেই
দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানে পৌছিয়া ঠিক বাড়ী চিনিয়া
যাইতে পারিব।

রয়াল ওক বলিয়া যেখানে আমায় নামাইয়া দিল,
দেখিলাম তাহা একেবারেই অদৃষ্টপূর্ব। সে ষ্টেশনও নাই,
কিছুই নাই। লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম “রয়াল ওক
কোথা ?” তাহার একটা বৃহৎ বাড়ী দেখাইয়া দিল।

দেখিলাম, সে বাড়ীর উপর রয়াল ওক লেখা রহিয়াছে
বটে—তাহা একটা পানশালা। সেই পানশালার নাম

* ডিকেন্স Middle Temple এর ছাত্র ছিলেন। তাহার Martin
Chuzzlewit নামক উপন্যাসে, Tom Pinch এর ভগিনী Ruth
বৈকালে আসিয়া এই Fountain Court এর নিকট প্রাতঃ ভ্রমণ
করিতেন। আফিসের কার্য শেষ করিয়া Tom Pinch
সন্ধ্যাবেলা বাহির হইতেন, এবং ভূগীয় সহিত একত্র হইয়া গৃহে
ফিরিতেন।

অল্পসারেই তাহার কিয়দূরে অবস্থিত ষ্টেশনের নামও রয়াল
ওক হইয়াছে। উত্তম পরিচয় বটে। বিলাতে অনেক
সময়, পানশালার নাম অল্পসারেই সেই অঞ্চলটা পরিচিত
হয়। নামও অল্পত অল্পত আছে। একবার একজন
হাস্তরসিক, অম্নিবসে আরোহণ করিয়া চালককে জিজ্ঞাসা
করিয়াছিল—“আমাকে Paradise এ লইয়া যাইতে পার ?”
চালক উত্তর দিল—“I can't take you to Paradise
but I can take you to the Angel”—বলা বাহুল্য,
Angel একটি পানশালার নাম, তদভিমুখ অম্নিবস গুলিতে
Angel বলিয়াই গন্তব্য স্থানের উল্লেখ থাকে।

অনেক জিজ্ঞাসা বাদ করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, দশ-
মিনিটের স্থানে অর্ধঘণ্টার গৃহে পৌছিলাম।

পরদিন প্রভাতে আবার গিয়া দস্ত মহাশয়ের শরণাপন্ন
হইলাম। সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—“তাই ত !”

আমি বলিলাম—“আর ত সময়ও নাই। আজ ২২শে—
নয়দিন পরে টার্ম শেষ হইবে। ইতিমধ্যে আমাকে ছয়টা
ডিনার খাইতে হইবে।* কি করা যায় ?”

দস্ত মহাশয় একটু ভাবিয়া বলিলেন—“All right,
I will beard the lion myself—চল।”

পথে বলিলেন—“হুইজন ব্যারিষ্টারের সহি চাই।
আমিও ত একজন ব্যারিষ্টার। কিন্তু ত্রিশ বৎসর মধ্যে
প্রাকটিস না করিলে নাম কাটিয়া দেয়। আমার নাম
কাটিয়াছে কি না তাহা ত জানি না। কি জানি, যদি Prof.
Murison এর সাক্ষাৎ না—ই পাওয়া যায়। চল, মিস্
ম্যানিং এর নিকট হইতে আর কোনও ব্যারিষ্টারের নামে
এক খানা চিঠি লওয়া যাউক।” মিস ম্যানিং এর বাড়ী
নিকটেই ছিল।† দস্ত মহাশয় তাহার নিকট আমায়
পরিচিত করিয়া দিলেন। চিঠি পাওয়া গেল।

* ব্যারিষ্টার হইতে হইলে, শুধু পরীক্ষা পাস করিলেই খালাস নয়।
প্রত্যেক টার্মে অন্ততঃ ছয়টা করিয়া ডিনার খাইতে হইবে। এইরূপ
১২টা টার্ম বে রাখিয়াছে এবং সমস্ত পরীক্ষা বে পাস করিয়াছে, সেই
ব্যারিষ্টার হইতে পার। অনেক লোকের আশ্রয় ধারণ আছে; ব্যারিষ্টার
হইতে হইলে “খানা দিতে” হয়। দিতে হয় না, খাইতে হয়। তবে
খাইতে মূল্য লাগে বটে। বৎসরে চারিটা করিয়া টার্ম।

† আমি স্থানান্তরে লিখিয়াছি—“সকলে অবগত না থাকিতে পারেন,
মিস্ ম্যানিং লণ্ডনে ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের জননী-স্বরূপ।...তাহাদের
মঙ্গলার্থ এই বর্ষীয়সী মাননীয়া মহিলার যত্ন ও উত্তম আশ্রয়।

ঠিকানা অনুসারে দত্ত মহাশয় আমায় হইয়া গিয়া, সহি কবাইয়া লইলেন। সেখানে Law Directory হইতে জানা গেল, দত্ত মহাশয়ের নাম তখনও কাটে নাই—সুতরাং দ্বিতীয় সহিটি তিনি নিজেই কবিলেন। প্রস্তাবপত্র সহ আমাকে Middle Temple-এর আফিসে লইয়া গেলেন।

কোন পাব্লিক পরীক্ষায় পাস করা না থাকিলে, ভর্তি হইবার সময় একটা পরীক্ষা দিতে হয়। সেই কারণে আমি আমাব বি এ উপাধির ডিপ্লোমাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আফিসের অধ্যক্ষ সাহেব, আমার সার্টিফিকেট এবং আবেদন পাঠ করিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন—“সার্টিফিকেটে রহিয়াছে মুখোপাধ্যায়, আবেদন পত্রে দেখি মুখার্জি।”

দত্ত মহাশয় বলিলেন—“ও একই। কোন তফাৎ নাই।”

তথাপি সাহেবের সন্দেহ যায় না। দত্ত মহাশয় অনেক করিয়া বুঝাইতে, তখন সন্দেহ মিটিল। নব্বই পাউণ্ড দিয়া ভর্তি হইলাম।*

তখন বেলা ১২টা। দত্ত মহাশয়কে বহু ধন্তবাদ দিয়া বলিলাম—“আমি এই খানেই থাকি। খানা খাইয়া গৃহে ফিরিব।” দত্ত মহাশয় প্রস্থান করিলেন। আমি ইতস্ততঃ ঘূষিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

গৃহগুলি দ্বিতল, ত্রিতল। বহির্দেশ অত্যন্ত পুরাতন, কৃষ্ণবর্ণ। প্রত্যেক বাড়ীতে বহুসংখ্যক ব্যারিষ্টারের চেম্বার আছে। দ্বারদেশে ব্যারিষ্টারগণের নাম এবং কক্ষের সংখ্যা লেখা আছে। কক্ষের অভ্যন্তর ভাগ গুলিও স্মরণ নহে। যিনি যত বড়ই ব্যারিষ্টার হউন না,—নিজ বাসগৃহকে তিনি ইচ্ছায় ফরিয়া সাজাইলেও, আপিস কক্ষ ধূলি ধূসরিতই থাকিবে। বাহ্যে আপিসের কার্পেট অত্যন্ত পুরাতন বিবর্ণ ও ছিন্ন নহে, সে ভাল ব্যারিষ্টারই নয়। বাহার আসবাব পত্র চক্ চক্ কবিতোছে তাহাকে বিপজ্জনক নূতন ব্যারিষ্টার স্কানে মজ্জল শতহস্তে তফাৎ থাকিবে। এইত কক্ষগুলির গারপাটা—তাহার উপর আবার অনেক গুলি প্রায়াক্ষ-

বিপদে আপদে শরণাপন্ন হইলেই তিনি উদ্ধার করিয়া দেন।”—কিন্তু ভাবতবর্ষীয় ছাত্রগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মহিলা এখন পরলোকপ্রাপ্ত।

* ভর্তি হইবার সময় এই টাকা এবং বাহির হইবার সময় ৬০ পাউণ্ড লাগে। মাঝে আর কিছুই দিতে হয় না।

কাব—দিনেবে বেলায় আলো জালিতে হয়। ডিক্লেয়ার পাঠকগণ এই সকল চেম্বারের অবিকল বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন। Pickwick Papersএ এক স্থানে একটা “ভূতো” চেম্বারেরও উল্লেখ আছে। একজন ব্যারিষ্টারের চেম্বার—একটা বহুপুরাতন, দেওয়ালে কাটা কবার্ড ছিল। সেটাকে তিনি কোনও দিন খোলেন নাই। একদিন রাত্রে কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পানের পর, ব্যারিষ্টার মহাশয় সেই কবার্ড খুলিয়া দেখেন,—তাহার মধ্যে একটা নবকঙ্কাল। জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কে হে তুমি?”

“আমি কেউ না—একজন ভূত।”

“ভূত!—এখানে কি কবছ?”

“এইটাই আমার চেম্বার ছিল কিনা। আমিও ব্যারিষ্টার ছিলাম। অনশনক্লেশ আর সঙ্ক করতে না পেবে, কাউকে না বলে কয়ে, একদিন এইটের মধ্যে ঢুকে আত্ম-হত্যা করেছিলাম।”

ব্যারিষ্টারটি একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন—“তা বেশ করেছিলে। কিন্তু একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দাও দেখি! লগুনে এখন এই দারুণ শীত, ভয়ানক কুয়াসা, সূর্যের মুখ দেখবার যো নেই, যারা বড় মাছুষ, কেউ ইঁটাশাতে কেউ দক্ষিণ ফ্রান্সে গিয়ে আরাম উপভোগ করছে। তোমাদের ত বাতায়িতে সিকি পরসা থরচ নেই—তা শুধু তোমায় বলছিনে, তোমরা সকলেই, যত অন্ধকাব আর গলিঘূর্ণি আব খারাপ জায়গায় থাকতে কেন ভালবাস বল দেখি? মিছে কেন কষ্ট পাও?”

ভূত শুনিয়া বলিল—“ওহো হো—ঠিক বলেছ। ঠিক বলেছ। ওটা এতদিন আমার মনেই হয় নি।”—বলিয়া হুস কবিয়া উড়িয়া কোথায় সে চলিয়া গেল।

মিডল্ টেম্পল্ এবং ইনার টেম্পল্ পবম্পর সংলগ্ন, ব্যবধানবিহীন। কবিবর চসার মিডল্ টেম্পলের ছাত্র ছিলেন। চার্লস ল্যান্স মিডল্ টেম্পলেই জন্মগ্রহণ করেন, এবং সাত বৎসর বয়স অবধি এখানে বাস করিয়াছিলেন। Brick Court নামক অংশে গোল্ডস্মিথ অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। এই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনারটেম্পল্ তাঁহার সমাধি আছে। মিডল্ টেম্পল্‌র ভোজনাগার

লণ্ডনের মধ্যে একটি দর্শনীয় স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেঙ্গ-
পিয়রের Twelfth Night নাটক এই স্থলেই প্রথম
অভিনীত হয়। এই হল এবং লাইব্রেরীর মধ্যবর্তী স্থান
বিখ্যাত Temple Gardens—এই বাগান ক্রিশ্চিয়ানস্
(গোদাবরী) ফুলের অল্প বিখ্যাত। পূর্বে এ বাগান
গোলাপ ফুলের অল্পও প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু এখনকার লণ্ডনের
বায়ু কমলার ধূমে এত বিবাক্ত যে গোলাপ আর ফুটে না।
সেঙ্গপিয়র তাঁহার ষষ্ঠ হেনরি নামক নাটকে বর্ণনা কবিতা-
ছেন, প্ল্যাণ্টাজেনেট এবং সমরসেটের মধ্যে টেম্পেলের
ভোজনাগারেই বিবাদ বাধিল, পরে তাঁহারা বাগানে আসিয়া
শ্বেত ও রক্ত গোলাপ তুলিয়া লইয়া ভাবী যুদ্ধের সূচনা
করিলেন।*

ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্ত হইলে, বাহিরে গিয়া কিঞ্চিৎ
ভোজন করিয়া আসিলাম। তৎপরে লাইব্রেরীতে বসিয়া
ছয়টা অবধি কাটাইলাম।

ছয়টার সময় ডিনার। গার্ডিন পরিয়া ভোজনে বসিতে
হয়। হলেই এই গার্ডিন ভাড়া পাওয়া যায়;—এক
টার্মের ভাড়া ছই শিলিং মাত্র। ছই শিলিং দিয়া প্রতিবার
ডিনারের টিকিট ধরিয়া ক্রয় করিতে হয়।

হলের অপর প্রান্তে, উচ্চ বেদিকায়, বেঞ্চগণের
বসিবার স্থান। নিম্নে, কক্ষের আড়ভাবে, লম্বা টেবল, তাহা

Suffolk.

Within the Temple hall we were too loud.

The garden here is more convenient. ...

Plantagenet

Let him that is a true born gentleman,
And stands upon the honour of his birth,
If he suppose that I have pleaded truth,
From off this briar pluck a white rose with me.

Somerset.

Let him that is no coward, nor no flatterer,
But dare maintain the party of the truth,
Pluck a red rose from off this thorn with me.

Warwick.

This brawl to-day,
Grown to this faction in the Temple Gardens,
Shall send, between the red rose and the white,
A thousand souls to death and deadly night.

First Part of Henry VI. Act II, Scene 4.

Ancients গণের অল্প অর্থায় প্রাচীন ব্যারিষ্টারগণ তথায়
বসিবেন। ইদানীং মাঝে মাঝে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যো-
পাধ্যায় মহাশয়কে সেখানে বসিয়া ভোজন করিতে দেখি-
য়াছি। দেওয়ালের কাছ ঘেসিয়া লম্বভাবে ছইটি সারি
ছাত্র ও সাধারণ ব্যারিষ্টার গণের অল্প। বেঞ্চে বসিতে
হয়। চারি জন মিলিয়া একটি কবিতা mess গঠিত হয়।
ছই জন দেওয়ালের দিকের বেঞ্চে, দুইজন তাঁহাদের সম্মুখে
অপর অপর দিকের বেঞ্চে উপবেশন করেন। যিনি
দেওয়ালের দিকে আছেন অথচ বেঞ্চগণের বসিবার
স্থানের অধিকতর নিকটবর্তী, তিনিই হইলেন ক্যাপ্টেন।
থানা আরম্ভ হইলে তিনি অপর তিন জনকে জিজ্ঞাসা করেন,
“what wines shall we order, gentlemen?”
শ্রাম্পেন অথবা অল্প কোনও মূল্যবান মদ্য হইলে, এক
বোতল, ক্লারেট প্রভৃতি হইলে দুই বোতল, চারি জনের
বরাদ্দ। তাহা ছাড়া, বিষর মদ্য যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া
হয়। বরাদ্দ মদ্যের অতিরিক্ত চাহিলে, মূল্য দিতে হয়।
ভোজনের মধ্যভাগে পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করার নিয়ম
আছে। যিনি মদ্যপান কবেন না, তাঁহাকে জলের দ্বারাই
স্বাস্থ্যপান করিতে হইবে—যদিও জলের দ্বারা স্বাস্থ্য পানটা
নিম্নদর্শনীয় বলিয়া গণ্য হয়। ভোজনকাল ছয়টা হইতে সাতটা
পর্যন্ত। সাধারণ দিনে, ভোজনান্তে ধূমপানের নিয়ম নাই।
তবে প্রতি টার্মে ছইটি বিশেষ দিন আছে তাহা Grand
Night এবং Call Night। এই ছই বাত্রে “তুবিভোজন”—
মদ্যের বরাদ্দও দ্বিগুণ,—এবং বেঞ্চগণ প্রস্থান করিলে,
ধূমপান করা যাইতে পারে। পূর্বে Grand Night এও
পারা যাইত না। কিন্তু একরাত্রে বর্তমান সম্রাট—তখন
প্রিন্স অব্ অয়েলস, উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভোজনান্তে
একটি চুকট ধরাইলেন এবং বেঞ্চগণকেও নিজ চুকট
উপহার দিলেন। তখন বেঞ্চগণ মহা বিপদে পড়িলেন।
“নিয়মের সম্মান রাখিব না রাজপুত্রের সম্মান রাখিব”—এই
বিবাদ পড়িয়া তাঁহারা শ্রামই রাখিলেন। সেই অবধি
Grand Night এ এবং Call Nightএ ধূমপান আর
নিষিদ্ধ রহিল না।

বর্তমান সম্রাট মিডল্ টেম্পেলর একজন ব্যারিষ্টার।
তাঁহাকে পরীক্ষাও দিতে হয় নাই এবং টার্মও রাখিতে হয়

নাই। তবে রীতিমত তাঁহাকে call করা হইয়াছিল। যে দিন তিনি ব্যারিষ্টার হইলেন সেই দিনই তাঁহাকে বেঞ্চারও মনোনীত করা হইল। আইন ব্যবসায়ীর ভোজাদি উৎসবে যখন স্বাস্থ্য পানের জন্য রাজার নাম প্রস্তাব করা হয় তখন বলা হয়—“The King, Bench of the Middle Temple and Barrister-at-Law.”

গ্র্যাণ্ড নাইটে প্রায়ই বেঞ্চারগণ বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া থাকেন। সে রাত্রে রাজার স্বাস্থ্যপান করিতে হয়—এই কারণেই সেই রাত্রে দুই বোতল স্লাম্পেন বরাদ্দ—কারণ রাজস্বাস্থ্য স্লাম্পেন ভিন্ন অন্য মদে পান করা নিষিদ্ধ। যথা সময় উপস্থিত হইলে, একজন কর্মচারী একটা কাঠের হাতুড়ী লইয়া তিনবার টেবিলে ঠুকিয়া শব্দ কবে। পরে বলে—Gentlemen, charge your glasses.—তখন সকলে, গেলাস হাতে ধরিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া উঠে। যিনি প্রধান বেঞ্চার, তিনি বলেন—“The King”—ইহা শ্রবণ মাত্র হলুদ লোক সমস্তরে বলিয়া উঠে “The King” এবং গেলাস একবার উঠে উঠাইয়া তৎক্ষণাৎ নামাইয়া, পান করে। ইহা ছাড়া, Grand Nightএ, loving cup পান করিবাবও রীতি আছে। সে একটা বৃহৎ রৌপ্য পাত্র। তাহাতে নানাবিধ মত্ত নির্মিত লাল রঙের একটা কি পদার্থ থাকে। পাত্রটির দুইটা আঙুলি। সেই একই পাত্র হইতে সকলকেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান কবিত্তে হয়। এটি বহু প্রাচীন প্রথা। এই প্রথা হইতেই, দুই জনে এক পাত্র হইতে পান করিলে তাহাকে loving cup বলা হয়।

এই প্রথম রাত্রে, আমরা যে সময় খানায় ব্যাপ্ত হিলাম, সেই সময় ইংলণ্ডের পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা উপস্থিত হইল, কিন্তু তখন আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। ছয়টা ত্রিশ মিনিটে, Isle of Wight এ মহারাজী ভিক্টোরিয়ার প্রাণবিরোগ হইল। খানার আরম্ভে ও শেষে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা (Grace) বলা হইয়া থাকে।

সে দিনও, সাতটার সময় যখন খানা শেষ হইল, তখন প্রধান বেঞ্চার দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলেন। তাহার মধ্যে ছিল God Save the Queen—কিন্তু তখন Queen নাই—King—এ কথা তখন লণ্ডনের সকলেই জানিতে পারিয়াছে—কেবল আমরাই অজ্ঞ ছিলাম।* ভোজনান্তে বাহির হইলাম। ফটকের বাহিরেই ফ্লীট স্ট্রীট—সেখানে পড়িয়াই দেখিলাম, কাগজ বিক্রেতা বালকগণ, যেন রক্ত নিখাসে, চাপা গলায়, বলিতেছে—The Queen’s dead—আর হাজারে হাজারে কাগজ বিক্রয় করিতেছে। আমি অর্ধ পেনি দিয়া একখানি Evening News কিনিয়া লইলাম।

বাড়ী পৌছিলে দেখিলাম, তাঁহারা তখনও শুনের নাই। ড্রয়িংরুমে মহিলারা ছিলেন, সেই ধানেই আমি সংবাদটা বলিলাম। কুমারী অ—আমাকে বলিলেন—“আপনি গিয়া বাবাকে বলুন—I am sorry to inform you, Doctor, that the Queen is dead”—কিন্তু ভাবায় বলিতে হইবে, তাহাও আমার শিখাইয়া দিলেন;—বোধ হয় আশঙ্কা ছিল আমি বিদেশী-মাগুব—পাছে “I am sorry” টুকু বাদ দিই!

পরদিন আমি বাহিরে যাইবার সময়, কুমারী অ—একটি কালো বনাতের ব্যাগ আনিয়া আমার হাটের চারিদিকে বসাইয়া দিলেন। বলিলেন, আমার পরিচ্ছদে শোকচিহ্ন না দেখিলে, পথে ঘাটে লোকে আমার অপমান করিতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যায় ডিনারের পর সংক্ষিপ্ত প্রার্থনায় God Save the King উচ্চারিত হইল। উপস্থিত প্রাচীনতম ব্যারিষ্টারও বলিলেন—“এ হলে এ কথা অল্প প্রথম শুনিলাম।”

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

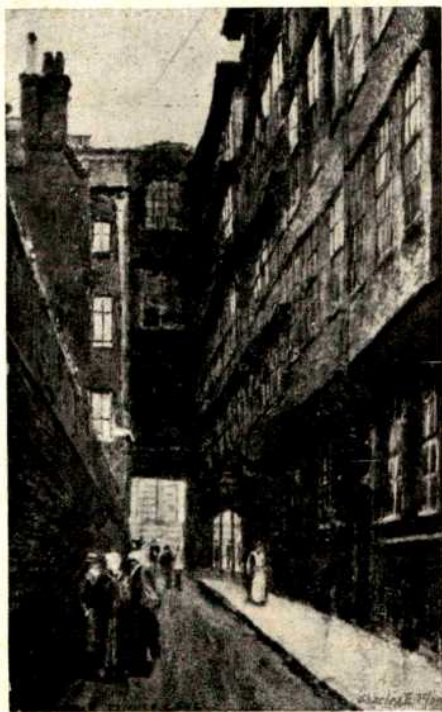
* ছয়টা একত্রিশ মিনিটে লণ্ডনের রাজপথে এ সংবাদ প্রচারিত হয়। বড় বড় সংবাদপত্র আকসের সঙ্গে মহারাজার Isle of Wightএর আসান টেলিকোনের দ্বারা সংযুক্ত ছিল।



হিন্দু বিধবা আশ্রম, পুণা।



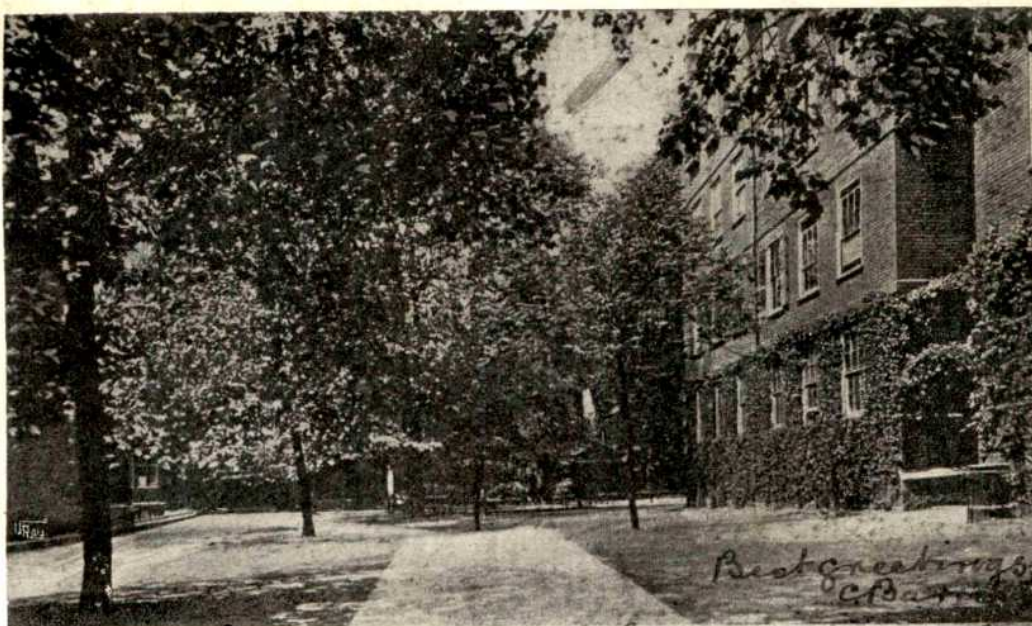
ফাণ্ডামু কলেজ, পুণা।



মিডল্ টেম্পল্ গলি।



গোল্ড স্মিথের কবর। মিডল্ টেম্পল্।



মিডল্ টেম্পল্—ফোন্টেন কোর্ট।

পুণা ।

বোম্বাই অঞ্চলে পুণা একটি পুরাতন এবং বিখ্যাত সहर। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বালাজী বাজী ব্রাওয়ের অধীনে এখানে মহারাঠাদের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৬৩ সালে হায়দারাবাদের নিজাম আলি ইহাকে লুট এবং ধ্বংস করে। পেশবা ও সিন্ধিয়া উভয়ের মিলিত সৈন্য বশাবস্তু রাও হোলকার কর্তৃক এইখানে পরাজিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পুণার সম্মুখে ইংরাজের সহিত কিরকীর যুদ্ধে মহারাঠা অধী-অস্তমিত হয়। কথিত আছে পার্শ্বতী মন্দিরের এক গবাক্ষ হইতে শেষ পেশবা বাজীরাও কিরকীর যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় সৈন্তের পরাজয় দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। এই মন্দির সহরের দক্ষিণে এক পাহাড়ের উপর ১৫,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে পেশবা বালাজী বাজী রাও কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। শিবরাত্রি ও দেবালীর দিনে এখানে বহু লোকের সমাগম হয় এবং অস্তান্ত দিনে সন্ধ্যার সময় কেহ কেহ বেড়াইতে বা দেবীমূর্তি দর্শন করিতে যায়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পুণা সহর ইংরাজহস্তগত হয়। সহরের নিকটেই ইংরাজদিগের সৈন্তাবাস এবং ইংরাজ কর্মচারী ও ধনী লোকের বাসোপযোগী বহু অট্টালিকা আছে। এখানকার জল বায়ু নাতিশীত নাতিউষ্ণ বলিয়া ইংরাজদিগের অত্যন্ত প্রিয়। বোম্বাই অঞ্চলের সৈন্তের প্রধান আড্ডা পুণা ছাউনিতে অবস্থিত। বর্ষাকালে প্রায় তিন মাস বোম্বাই লাট এইখানে বাস করেন। পুণা সহর ও ছাউনিতে ১৫০,০০০ লোকের বাস ছিল বলিয়া ১৯০১ সালের আদম শুমারীতে ধার্য হইয়াছিল।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পুণা ইংরাজহস্তগত হইলে দূরস্থ লোকের এখানে আর বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। বাহিরের লোকের চক্ষে ইহার প্রাধান্য কমিলেও ইহা মহারাঠা ব্রাহ্মণদিগের কেন্দ্র-স্থলরূপে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু ইংরাজ শাসনকর্তাগণ পুণাবাসী ব্রাহ্মণদিগকে সর্বদা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। পুণাবাসী তাহাদের লুপ্ত গৌরবের দিন এখনও সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারে নাই এবং ব্রাহ্মণগণ কুটবুদ্ধিসম্পন্ন এইরূপ বিশ্বাসই এই সন্দেহের কারণ বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে কিছুদিন হইতে পুণা পুনরায় দূরস্থ ভারতবাসীদিগের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিতেছে। এখানে স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি প্রতিভাশালী লোকের বাস; কণ্ড'সন কলেজ, সার্বজনিক সভা; হিন্দু বিধবা বালিকাশ্রম, ভারতবর্ষীয় সেবক সমিতি প্রভৃতি সভা ও মঠের অবস্থান; ইহা রাজনৈতিক আন্দোলনের এক প্রধান আড্ডা; কেশরী ও মহারাষ্ট্রা পত্রিকার উৎপত্তি স্থান। পুণা এক্ষণে আধুনিক স্বদেশ-প্রেমী ভারতবাসীদিগের প্রধান তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। এই তীর্থের প্রধান প্রধান সমিতি ও মঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

দক্ষিণী শিক্ষা-সমিতি ও কণ্ড'সন কলেজ ।

শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক এবং স্বর্গীয় মহাদেব বঙ্গাল নামবোন্ধির সাহায্যে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় মহাত্মা বিষ্ণু কৃষ্ণ চিপ্লোঙ্কর নূতন ইংরাজী বিদ্যালয় (New English School) নামে পুণা সহরে এক পাঠশালা স্থাপন করেন। সাধারণ লোকের পক্ষে শিক্ষা স্থলভ করাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। ক্রমশঃ অস্তান্ত স্বার্থ্যাগী শিক্ষিত লোক স্থাপনকর্তাদিগের সহিত বোগ দিতে লাগিলেন এবং ছাত্র-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চেষ্টার এইরূপ অভাবনীয় সফল্য দেখিয়া স্থাপনকর্তাগণ একটি কলেজ ও স্থানে স্থানে স্থল স্থাপন করিয়া তাহাদের কার্যের প্রসার করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহার প্রসার ও ইহা স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাহারা একটি সমিতির উপর ইহার ভার অর্পণ করিলেন। এই সমিতির নাম Deccan Education Society বা দক্ষিণী শিক্ষাসমিতি। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর তারিখে এই সমিতি মেজেস্টারী হয় এবং পর বৎসর জানুয়ারি মাসে তদ্বারা পুণা সহরে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। বোম্বাই বিভাগের ভূতপূর্ব লোকপ্রিয় শাসনকর্তা কণ্ড'সন সাহেবের নামে ইহার নামকরণ হয়।

"To facilitate and cheapen education by starting, affiliating or incorporating at different places as circumstances permit, schools and colleges under private management or by any other ways best adapted to the wants of the people."

অর্থাৎ অল্প কথায়, দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষা স্থলভ করাই এই

সমিতির উদ্দেশ্য। তিন শ্রেণীর সভ্য লইয়া এই সমিতি গঠিত ;—(১) আজীবন সভ্য (life members), (২) সাধারণ সভ্য (fellows) ও অভিভাবক (patrons)। সমিতির স্থাপিত বিদ্যালয়ে যাহারা অন্ততঃ ২০ বৎসর শিক্ষা কার্যে ছীবন উৎসর্গ করিতে অঙ্গীকার করেন তাঁহারা আজীবন সভ্য। যাহারা অন্যান্য ২০০ টাকা দান করেন তাঁহারা সাধারণ সভ্য এবং যাহারা ১,০০০ বা তদুর্দ্ধ টাকা দান করেন তাঁহারা অভিভাবক রূপে গণ্য হইবেন। আজীবন সভ্যগণ এবং তাঁহাদের সমানসংখ্যক, সাধারণ সভ্য ও অভিভাবকদিগের মধ্য হইতে মনোনীত, লোক লইয়া “কৌন্সিল” গঠিত হয়। এই কৌন্সিলের উপর সমিতি সংক্রান্ত বাবতীর বিদ্যালয় রক্ষা ও পবিচালনের ভার। আজীবন সভ্যগণ ফণ্ড’সন কলেজ ও নূতন ইংরাজী স্কুলের শিক্ষা ও অন্যান্য আভ্যন্তরিক বিষয়ের পরিচালন করেন, কৌন্সিল মূলধন (permanent funds) এবং গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত ও অন্যান্য বহিঃস্থ বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সাতারা নগরে নূতন ইংরাজী স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। পুণায় একটা প্রাথমিক পাঠশালাও ইহার চালাইতেছেন। দক্ষিণী শিক্ষাসমিতি এক্ষণে সর্বসমেত পুণায় একটা প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটি প্রথমশ্রেণীর এন্ট্রান্স বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক পাঠশালা এবং সাতারায় একটি এন্ট্রান্স বিদ্যালয় চালাইতেছেন। ১৯০৬-০৭ সালের শেষে সমিতির তহবিলে ১,১৭,৩০৪।৮০ মূলধন রূপে মজুত ছিল। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সমিতির আর্থিক অবস্থা মন্দ নহে।

ফণ্ড’সন কলেজের অট্টালিকা, ছাত্রাবাস, জমী, পুস্তক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রভৃতি সর্বসমেত প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা মূল্যের হইবে। কলেজমন্দির প্রস্তরনির্মিত, ও সুদৃশ্য। চারিদিকে বাগান ও প্রশস্ত জমী আছে। সীমার মধ্যে খ্রিস্টিয়ান ও অধ্যাপকদিগের বাসের জন্য পাঁচ খানি ‘বাঙ্গলা’ আছে। ছাত্রাবাসে প্রায় ১৫০ ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হয়। ১৯০৬-০৭ সালে কলেজে ৫০০ ছাত্র ছিল—এম্. এ, শ্রেণীতে ৭ জন, সীনিয়র বি, এ, ৬৩, জুনিয়র বি, এ, ৫৫, আই, ই, ১১৪, পি, ই, ২৪৫, বি,

এম্. সি. ১, সীনিয়র আই. এম্. সি. ৮, এবং জুনিয়র আই. এম্. সি. ৭ জন। ঐ বৎসরে নিম্নলিখিত ছাত্র সংখ্যা য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে—এম, এ, ১, বি, এ, ৩৮, আই. এম্. সি. ২, আই. ই. ৪৯, পি. ই. ১০৮। ১৯০৪-৫ সাল হইতে ফণ্ড’সন কলেজ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে বাৎসরিক ১০,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য পাইতেছে। পূর্বে ইহা অপেক্ষা কম সাহায্য পাইত। গভর্ণমেন্টের সাহায্য লইলেও ইহা প্রধানতঃ বেসবকাবী লোকের দ্বারা স্থাপিত ও চালিত। সব দিক বিবেচনা করিয়া ইহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বেসরকারী স্বদেশী কলেজ বলা যাইতে পারে। য়ুনিভার্সিটি কমিশনও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলেজে পদার্থবিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে এবং জীব-বিজ্ঞান (Biology) শিক্ষার আয়োজন হইতেছে। বোম্বাই অঞ্চলে গভর্ণমেন্টের কলেজ অপেক্ষা এখানে বিজ্ঞান শিক্ষার উৎকৃষ্ট আয়োজন আছে বলিয়া অনেকের মত।

পুণা নূতন ইংরাজী স্কুলে ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে ৭২২ ছাত্র ছিল। বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস, খেলিবার স্থান ও বাগান আছে। ১,৩৮,৫০০ ব্যয়ে ইহার জন্য নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে।

ফণ্ড’সন কলেজ ও দক্ষিণী শিক্ষাসমিতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য বিষয় আজীবন সভ্য। ইহার অন্ততঃ ২০ বৎসর অধ্যাপনা কার্যে জীবন উৎসর্গ করেন। সংসার নির্বাহার্থে মাসিক ৭৫ টাকা মাত্র পাইয়া থাকেন। প্রধান অধ্যাপক ভাতা স্বরূপ আরও ২৫ টাকা পাইয়া থাকেন। এইরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া শ্রীযুত বাগলগাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপে প্রমুখ বিদ্বান ও প্রতিভাশালী লোক ইহাতে যোগ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে নিম্নমিত ২০ বৎসর কাল অধ্যাপনা করিয়া এক্ষণে রাজনীতি চর্চায় রত আছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ফণ্ড’সন কলেজের মজলার্ষে কামনো বাক্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত পরাঞ্জপে বিলাতে অধ্যয়ন করিতে যাইবার পূর্বে আজীবন সভ্য হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি সীনিয়র রায়বংশীর হইলে, শিক্ষাসমিতি তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে অন্তরায় না হইবার জন্য

তাঁহাকে অঙ্গীকার হইতে মোচন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অঙ্গীকার পালন কবিত্তে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ফণ্ড'সন কলেজের প্রধান অধ্যাপক, এবং মাসিক ৭৫ টাকা বেতন ও ২৫ টাকা ভাতা পাইয়া থাকেন। সরকারী কার্য করিলে তিনি কত উপায় ও সম্মান লাভ করিতে পাবিতেন, এবং শিক্ষা সমিতিতে যোগ দেওয়াতে কত স্বার্থভাগ করিতে হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পাবিবেন। অধ্যাপকদিগের অসাধারণ স্বার্থভাগই এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রাণ। ভাবতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এরূপ স্বার্থভাগেব দৃষ্টান্ত বিরল। দৃষ্টান্ত বহুল হইলে দেশের মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে। ঋষিদিগের জন্মভূমিতে এ দৃষ্টান্তেব কি অভাব হইবে? আমাদের হৃৎপাণ্ডবশতঃ সত্য সত্যই কি সাগর শুকাইয়া গিয়াছে, লক্ষ্মী লক্ষ্মী-ছাড়া হইয়াছে?

আনন্দাশ্রম, পুণা ।

স্বর্গীয় মহাত্মা মহাদেব চিত্রাজী আপ্তে প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পূর্বে আনন্দাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, এবং উইল দ্বারা এই আশ্রমেব রক্ষার্থে ১,২৫,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। এই আশ্রমের তিনটি উদ্দেশ্য :—

(১) পুঁজিতন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ ও বক্ষা কবা।

(২) মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থের বিস্তৃত সংস্করণ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা ও তজ্জন্ত একটি ছাপাখানা স্থাপন করা।

(৩) অন্ততঃ পাঁচটি বিদ্বান সন্ন্যাসী বা পণ্ডিতকে আশ্রয় ও আহার দেওয়া। ইহারা নানা হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়া তাহাদের উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিবেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।

উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থে আশ্রমস্থাপক আপ্তে-মহাশয় তাঁহার জীবদ্দশায় ১০০০০ টাকা ব্যয়ে পুস্তকাগার, ছাপাখানা, সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় গৃহ নির্মাণ কবিয়া গিয়াছিলেন। প্রস্তব, লৌহ প্রভৃতি, যাহাতে অগ্নি সংযোগের আশঙ্কা না হয়, এরূপ উপকরণে পুস্তকাগার নির্মিত। ইহাতে ৫০,০০০ পুস্তক রাখিবার

স্থান আছে, এ পর্য্যন্ত প্রায় ৭০০০ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার উপবি তলায় শাস্ত্রীয় বক্তৃতাতির ক্ষুদ্র একটি স্নুরহং হলঘর, হলঘরের একদিকে একটি শিবলিঙ্গ আছে। এই ইমারতের চাবিদিকে খালি জমী আছে। নিকটেই সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম এবং সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপিবার ক্ষুদ্র ছাপাখানা।

বিখ্যাত সংস্কৃত অধ্যাপক এবং পণ্ডিতগণের সাহায্যে প্রকাশিত ও অপ্ৰকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থের বিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট সংস্করণ এই আশ্রম হইতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ৫৮ খানি গ্রন্থ ৮১ বালমে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সমগ্র মূল্য ৩৪৫১/০। তন্মধ্যে ২৮ খানি বেদান্ত গ্রন্থ, ৯ খানি বৈদিক, ৮ পুরাণ, ৫ চিকিৎসা, ১ পূর্বমীমাংসা ১ যোগ, ১ ধর্মশাস্ত্র, ২ স্মৃতি, ১ ব্যাকরণ, ১ সঙ্গীত ও ১ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। পুস্তকের মূল্য সাধারণের পক্ষে টাকায় ১০০ পৃষ্ঠা (রয়াল আট পেঞ্জী) হিসাবে। যাহারা আশ্রমের প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে এই মূল্যের তিন-চতুর্থ অংশ।

হিন্দু বিধবা বালিকাশ্রম (Hindu Widows' Home)

প্রায় ১৩ বৎসর পূর্বে ফণ্ড'সন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধোণ্ডো কেশব কর্বে অনাথা হিন্দু বিধবাদিগের জীন্ত এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্রথমে অতি সামান্য ভাবে একটি সামান্য বাড়ীতে দুই চাবি জন বিধবাকে তিনি ও তাঁহার জী লালন পালন করিতে ও লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে সাধারণের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পুণা সহর হইতে দেড় কোশ দূরে একটি স্নুরহং আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রস্তর নির্মিত চতুষ্কোণ বাড়ীতে ৮০।১০ জন ছাত্রী স্থান আছে। ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এই আশ্রমসমিতির সভাপতি। শ্রীমতী কানীবাই দেবধর আশ্রমের প্রধান তত্ত্বাবধাবক। তিনি ছাড়া আরও তিন জন জীলোক শিক্ষয়িত্রী আছেন, এবং চারিজন পুরুষ শিক্ষক আছেন। শ্রীযুক্ত কর্বে, শ্রীমতী কানীবাই এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ তাঁহাদের বিদ্যালয়ের অবকাশের সময় নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সাধারণেব সহায়ত্ব উৎপাদন এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

এ অঞ্চলের রক্ষণশীল হিন্দুগণ এই আশ্রমকে প্রথম প্রথম স্নানজবে দেখিতেন না। কিন্তু কর্বে ও কাশীবাইএর অক্লান্ত পরিশ্রম, মহান চরিত্র ও স্বেচ্ছাবলির গুণে ক্রমে এখান আশ্রম পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং স্থানাভাবে কোন কোন প্রবেশিকা-ক্ষমীকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। প্রথম তিন বৎসর কোনও আশ্রমবাসিনী ছিল না, চতুর্থ বৎসরে চারিজন, পর বৎসরে ১০ জন, ১৯০১ সালে ১৪ জন, ১৯০২ সালে ১৮ জন, ১৯০৬ সালে ৭৫ জন, ১৯০৭ সালে ৬৬ জন, আশ্রমবাসিনী ছিল। বোম্বাই প্রদেশের দ্বন্দ্ব জেলা, মধ্যপ্রদেশ এবং ইন্দোর, বড়োদা, মহীশুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিধবাগণ আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন। নিম্ন-লিখিত নিয়মাবলী হইতে আশ্রমের উপকারিতা বুঝিতে পারা যাইবে। যে সকল উচ্চ বর্ণে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই সেই সকল বর্ণের বালিকা ও যুবতী বিধবাদিগকে চিত্তোৎকর্ষক ও জীবিকা নির্বাহের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক আশ্রমবাসিনীকে গৃহ-কার্য করিতে হয়। গম ভান্ডা প্রভৃতি কষ্টকর কাজ দিনে সিকি ঘণ্টা হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং সর্বশুদ্ধ দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত গৃহকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। রন্ধন সম্বন্ধে এবং তরকারি প্রভৃতির জন্য বাগানে গাছপালা জন্মাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাতে ৬টার সময় এবং অন্নবয়স্কার ৬২টার সময় গাত্রোথান করে। ৭টার সময় সকলে পর্যায়ক্রমে স্নান করিয়া ও বস্ত্রাদি ধোত করিয়া পূজা করিতে বসে। পরে ১০টা পর্যন্ত পাঠে রত হয়। আহাৰাদি করিয়া পাঠশালায় উপস্থিত হয়। ১১টার সময় ১৫ মিনিট কাল গীতা পাঠ প্রভৃতি ধর্মশিক্ষার পর অন্ত্য পাঠ আরম্ভ হয়। ৫টার সময় পাঠশালা বন্ধ হয়। একটু বিশ্রাম ও পাছচারণের পর ৬২টার সময় বৈকালিক আহাৰ হয়। তৎপরে পড়িতে বসে। ছোট ছোট বালিকারা ৮২টার সময় শুইতে যায়। অপর সকলে ৯টার সময় একত্রিত হইয়া সাধুদিগের পদাবলী গান করে। ১০টার মধ্যে সকলে শয়ন করে। উপবাস ও ব্রতাদি সম্বন্ধে আশ্রমবাসীরা নিজ নিজ প্রথানুসারে চলে। সকলে এক ঘরে কিন্তু বর্ণানুযায়ী পৃথক পংক্তিতে বসিয়া আহাৰাদি করে। আহাৰ ও পান ব্যতিরেকে অন্যর্য্য বিষয়ে আশ্রমবাসীদের কোন তারতম্য করা হয়

না। পাঠশালায় প্রথম বৎসরে লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখান হয়। ৪র্থ ভাগ মারাঠী পুস্তক পড়িতে পারিলে ব্যাকরণ, পদ্য, ইতিহাস, ভূগোল ও ইংরাজী শিখান হয়। ইতিহাস ও ভূগোল মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হয়, ইংরাজী শিক্ষা ইচ্ছানুযায়ী। ইংরাজী ৪র্থ শ্রেণী শেষ হইলে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইংরাজী ৪র্থ শ্রেণীর পর ইংরাজী বিভাগের পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা বিধান হয়। আশ্রমবাসিনীদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) যাহাদের অভিভাবক সমস্ত ব্যয় বহন করেন, (২) যাহাদের অভিভাবক ব্যয়ের একাংশ বহন করেন; (৩) যাহারা বৃত্তি পায় এবং (৪) যাহাদের সমস্ত ব্যয় আশ্রম বহন করে প্রথম শ্রেণীর আশ্রম বাসীদিগের দ্ব্য, কাপড় চোপড় লইয়া সর্ব সম্মত মাসিক ৭ টাকা খরচ পড়ে। আশ্রমের স্বেচ্ছাবলি দেখিয়া অনেকে অবিধবা বালিকাও পাঠাইতেছেন। সাধারণ গৃহকার্য ছাড়া সেলাই ও বুননের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। দুই জন বালিকা সহস্রের কাপড় বুননের কাজ শিখিতে গিয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে শিক্ষিত্রীর কাজ, ধাত্রীর কাজ এবং যোগী শুশ্রূষার কাজও শিখান হয়। আশ্রমের জন্য ১৯০৭ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় ১,২০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে ও ৪২,০০০ টাকা মজুত আছে। কলিকাতা অঞ্চলের শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই আশ্রমে কিছু সাহায্য করিয়াছেন। দ্বৈতী লোক দ্বারা পরিচালিত বিধবাশ্রম সর্বপ্রথমে বরাহ-নগরে তাঁহা দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক বাধা ব্যতিক্রমের মধ্যে ১০ বৎসরকাল চালাইয়া উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে ইহা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় সেবক সম্প্রদায়।

২০ বৎসর কাল কণ্ডসন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ পোখলে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে Servants of India Society বা ভারতবর্ষীয় সেবকসম্প্রদায় স্থাপন করেন। যাহারা দেশের কার্যে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের শিক্ষার্থে এবং জাতীয়তাবোধের সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে বিধিবৎ উপায়ে চেষ্টার জন্য এই সম্প্রদায় স্থাপিত। প্রধানতঃ (ক) দৃষ্টান্ত ও উপদেশদ্বারা স্বদেশপ্রেমীতা শিক্ষা, (খ)

রাজনৈতিক আন্দোলন ও শিক্ষা, (গ) বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে সহায়ত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন (ঘ) শিক্ষা বিধান বিশেষতঃ জ্ঞানশিক্ষা, ইতর শ্রেণীর শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা ও (ঙ) ইতর শ্রেণীর উন্নতি, কল্পে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে। পুণাতে এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। সেবক-দিগের জ্ঞান আশ্রম ও পুস্তকাগার আছে। প্রত্যেক সেবককে পাঁচ বৎসর কাল শিক্ষানবিশী করিতে হয়— ইহার মধ্যে সর্বসমেত তিনবৎসরকাল পুণার আশ্রমে থাকিয়া পাঠাভ্যাস ও দুই বৎসরকাল ভারতবর্ষ ভ্রমণ-করিতে হয়। সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার সময় প্রত্যেক সেবককে নিম্ন-লিখিত ত্রয় গ্রহণ করিতে হয়। (১) স্বদেশ তাঁহার অন্তঃকরণে সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার করিবে এবং তাঁহাতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ আছে তাহা স্বদেশসেবায় নিয়োজিত করিবেন। (২) স্বদেশসেবা করিতে গিয়া কোন রকমে নিজ স্বার্থ অন্বেষণ করিবেন না। (৩) সকল ভারতবাসীকে ব্রাহ্মণ দেখিবেন এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের উন্নতিকল্পে কর্ম করিবেন। (৪) তাঁহার নিজের ও (পরিবার থাকিলে) পরিবারের ভরণপোষণার্থে সম্প্রদায় বেক্রয় বন্দোবস্ত করিবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং নিজের জ্ঞান অর্থোপায় করিতে কোনও পরিশ্রম করিবেন না। (৫) তিনি সচ্চরিত্র থাকিবেন। (৬) কাহারও সহিত কলহ করিবেন না। (৭) সর্বদা সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যের উপর লক্ষ্য রাখিবেন এবং যৎপরোনাস্তি চেষ্টার দ্বারা অন্তঃকরণের সহিত ইহার মঙ্গল সাধিবেন; সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য-বিরুদ্ধ কোনও কার্য করিবেন না।

যাঁহারা সম্প্রদায়ের কার্যে লম্বস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন না অথচ তাঁহাদের আয়ের ও পরিশ্রমের কিয়দংশ নিয়োগ করিতে প্রস্তুত, অথবা সম্প্রদায়ের অধীনে শিক্ষা করিতে প্রস্তুত তাঁহারা associates এবং attaches শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। এ পর্য্যন্ত একজন (গোপালকৃষ্ণ গোখলে) প্রধান সেবক, ৮ জন শিক্ষানবিশী ও চারি জন সাহায্যকারী সেবক সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছেন। শীঘ্র সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা আছে।

রানাডে ইকনমিক ইন্সটিটিউট।

গোখলে মহাশয়ের চেষ্টায় অল্পদিন মধ্যে পুণা সহরে Ranade Economic Institute স্থাপিত হইবে। ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষার প্রসার করা এই ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্য। স্বর্গীয় মহাত্মা মহাদেব গোবিন্দ রানাডে দেশের শিল্পের উন্নতির জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণার্থে ইহা স্থাপিত হইতেছে। Economic বিষয়ে পুস্তকাগার হইবে এবং বৎসরে দুই একজন ছাত্রকে শিল্প শিক্ষার জন্ত বিদেশে পাঠানর বন্দোবস্ত করা হইবে।

উপরি উক্ত বিষয় ব্যতিরেকে পুণায় উল্লেখযোগ্য আরও কিছু আছে।

সার্বজনিক সভা।

(১) সার্বজনিক সভা—ইহা পুরাতন রাজনীতিক সভা এবং কিছুদিন পূর্বে এ অঞ্চলের সর্বপ্রধান সভা বলিয়া গণ্য হইত। প্রথম কংগ্রেস এই সভার চেষ্টায় বোম্বাই অঞ্চলে মিলিত হইয়াছিল; পুণাতেই প্রথম বৈঠক হইবার আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু সে সময় মারীভর হওয়াতে বোম্বাই সহরে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল।

(২) শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের মহারাষ্ট্র ভাষায় প্রকাশিত কেশবী ও ইংরাজী “মহারাষ্ট্র” সাপ্তাহিক পত্র। এখনি কেশবীর ছাত্র প্রতাপশালী আর কোনও দেশীয় পত্রিকা নাই বলিতে পারা যায়।

(৩) দৈনিক মহারাষ্ট্র পত্র জ্ঞানপ্রকাশ। এ অঞ্চলে এই একখানি মাত্র দৈনিক মহারাষ্ট্র পত্র। আর একখানি দেশীয় ভাষায় লিখিত দৈনিক পত্র বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইবার আয়োজন হইতেছে।

(৪) চিত্র-শালা—ইহাতে শিশুশিক্ষার্থ নানা প্রকার কিণ্ডারগার্টেন ছবি, মানচিত্র, বিখ্যাত লোকদিগের ছবি প্রভৃতি সুলভ মূল্যে প্রকাশিত হয়।

পুণার নিকটে পণ্ডিতা রমাবাইয়ের অনাধাশ্রম, সিংহগড় (মহারাষ্ট্র বীরস্বের এক প্রধান লীলাভূমি) ও সাধু-তুকারামের আশ্রম দেখিবার স্থান।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দেবদূত ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

কাল—অপরাহ্ন । স্থান—অযোধ্যা ।

অরবিন্দ ও অজয় ।

অর । জগতের গোববের কেন্দ্র-ভূমি কে কহিবে এবে—
এই সে অযোধ্যা !

দেখ একবার ভেবে—

সত্য-বীর দশরথ সত্যের মর্যাদা রক্ষা তরে
আপন আশ্রয় সেই মহাবীরবরে
করেছিল। এইখানে নির্বাসিত বিজন কান্তারে,
পুণ্যভূমি এইখানেই সে সতী-প্রিয়াবে
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, আদর্শ ভূপতিবেশে রাম
আপন ইচ্ছারে দলি', পুরিবারে মনস্কাম
প্রকৃতিপুঞ্জের—দূরে পাঠাইলা গভীর গহনে ।
ভ্রাতৃস্নেহে, এইখানে রাজ-সিংহাসনে
রামেব পাছকা স্থাপি', সঙ্কমে ভরত নৃপমণি
দীনবেশে, স্নানমুখে রক্ষিলা আপনি
চতুর্দশ বর্ষ ধরি' রাজত্ব বিশাল । এ নগর
মবতের তীর্থ, স্বর্গ হ'তে মহন্তর ।

অর । ক্রব কহিয়াছ, যবে সে অতীত স্মৃতি জাগে মনে,
এ মগ্নিন মর্ত্য তাজি', প্রাণ সেই ক্ষণে
উজ্জল, পবিত্র হ'য়ে লব্ধ পক্ষে উর্দ্ধপানে ধায় ।
অযোধ্যা এ মর্হী-ভূমে মৌন মহিমায়
মহাতীর্থ বটে ।

অজ । ভাবো—এই সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রিয়,
আপনি ঈশ্বর আসি' আদর্শ, স্বর্গীয়
রাজত্ব করিলা সেই স্থানে । সেই লীলা-নিকেতন
বিস্তৃত সম্মুখে, বেধা দেব-নাবায়ণ
আদর্শ মানব জন্ম করিয়া গ্রহণ উদেছিল
রামরূপে ।

অর । —অস্ত্র আমি, অবতার-লীলা
না পারি বুঝিতে । সখা, বিধাতা কি তাজি' চরাচর,
এখানে মানবমূর্তি ল'য়ে নিরন্তর
রহিলেন অবতীর্ণ ? কভু এই নিখিল-সংসারে
এও কি সম্ভব ?

অজ । বৃথা বিতর্ক-বিচারে
নাহি প্রয়োজন । শোন—জগতের সর্বজীব মাঝে
বিধাতার স্বপ্নসস্তা নিরন্তর রাজে ।
সে ভাবে, প্রত্যেক জীব তাঁ'র অংশে হ'য়ে সম্ভবান
অবতীর্ণ ;—তাবি মাঝে সে জীবন্ত প্রাণ
অবিরাম অল্পভব করি' তাঁ'রে আপন জীবনে,

আজন্ম নিমগ্ন রহি' তন্ময় সাধনে
তা'র প্রিয় কাণ্ডাবলী নিবন্তর করে অমুষ্ঠান—
অবতার কহি তারে । হেথা ভগবান
যা'র মাঝে যতক্ষণ কবেন প্রকাশ আপনাবে
ততক্ষণ সে-ই অবতার । এ ধরারে
হেনভাবে, নির্বিকার অনন্তের প্রেমে উদ্ভাসিয়া,
উঠিলেন বিশ্বনাথ স্বরূপে ফুটিয়া
খুষ্ট ও চৈতন্যরূপ জীবন-আধাবে । জ্ঞানালোকে
ঘুচাইয়া অন্ধকার—সর্ব দুঃখ-শোক,
পুনঃ, প্রজ্ঞারূপে আসি' উদিলেন বুদ্ধের জীবনে
সুপ্তজীবে সজীবীয়া মহা উদ্বোধনে ।
তন্ময় জীবন যেই,—কেজ্রীভূত যে আধার মাঝে
ঈশ্বরের শক্তি নিত্য দীপ্ত রহিয়াছে,
সেই সে জীবনে পূজে এ সংসার অবতাররূপে ।
ত্রৈত্যযুগে তাই, সেই অযোধ্যার ভূপে
সবে কহে অবতার ।

অর । বুদ্ধিলাম যাহার জীবন
তাঁহারি সন্তার ধ্যানে রহি' নিমগ্ন,
নিষ্কাম কল্যাণ লাগি' যতক্ষণ কর্মরত বহে
ততক্ষণ সেই জনে অবতার কহে
বিশ্ববাসী ।

কিন্তু, বন্ধু, সে ভাবেও বামে অবতার
কহিবারে নাহি পারি । জীবনে তাঁহার
সর্বকর্ম্য নহে ধর্ম্মাশ্রিত ।

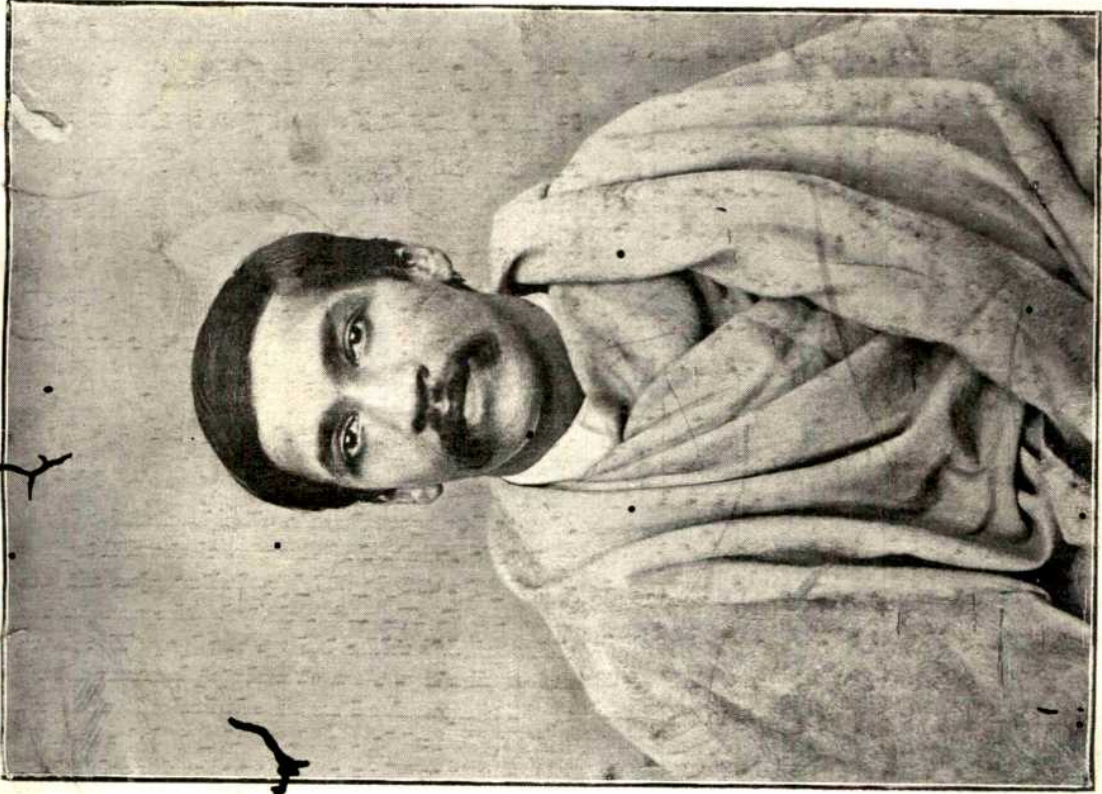
অজ । রামচন্দ্রের জীবন
আদর্শ নৃপতিভাবে চির-অতুলন !
রাজধর্ম্ম তাঁ'র মাঝে মুক্তি লভি' উঠেছিল ফুটি',
সেই ভাবে তিনি অবতার । অস্ত্র ক্রটি
হয় ত বা তাঁ'র মাঝে রহিলেও পারে ।

অর । কি বলিলে—
রামচন্দ্র আদর্শ ভূপতি ? এ নিখিলে
অরুণীক বাজধর্ম্ম তাঁ'র । বন্ধু, ভ্রান্ত, অন্ধ তুমি ।
এ ধবা হয়েছে ধ্বংস যা'র পদ চুমি'
সে বিশ্ব-জননী সীতা—যা'র রূঢ় বিধানের ফলে
লাঞ্ছিতা হইয়া, হায়—উদ্বীপ্ত অনলে
হইলেন পরীক্ষিত ; যা'র মুখ, নির্দম আদেশে
রাজেন্দ্রাণী বিশ্বমাতা জীর্ণ, চীর বেশে
অবমান-স্নান মুখে, রক্তকেশে পশিলেন বনে ;
বাণীবাজে ভুলাইয়া কাপটা-ছলনে
অতি ঘৃণা স্বার্থপর সুম যিনি করিলা সংহার ;
ছায়াসম অমুগান্ধী লক্ষণো যাহার
গর্হিত, নির্দম, দুষ্ট আচরণে হ'য়ে ক্ষিপ্তপ্রায়,



সতী ।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে ।



বোমাওয়ালাদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহে ধৃত
শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ।



বোমাওয়ালাদিগের নেতা বলিয়া ধৃত
শ্রী বাবান্দ কুমার ঘোষ ।



: শ্রীযুক্ত আব্দুল্লাহ আল-মামুন স্মৃতি ওয়ার্ডী, সী. আই. এম., পিএইচ. ডী., এল.এল. ডী., ইত্যাদি, ব্যারিষ্টার ;
১৯০৮ সালের মুসলমান আলোচনা সমিতির সভাপতি। (ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ছবি)।



বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগ ।

যোশিও কাংসুতা নামক জাপানী চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে ।

শীতল সবযুজলে দিল আপনায়
বিসর্জিয়া ; তিনি যদি আদর্শ ভূপতি এই ভবে
নাহি জানি ধর্মহীন কা'রে কহ তবে ।
অজ্ঞ । সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ-ধর্ম এ সংসারে—প্রজার রঞ্জন ।
সেই ধর্মে মহোচ্ছল বামের জীবন ।
আদর্শ নৃপতি তিনি, সিংহাসনে—তিনি অবতার,
সেই ভাবে চিন্তা কবে' দেখ একবার—
অনুপম শ্রায়বান তিনি ।

অর । —বদ্ধ, ক্ষান্ত, স্তব্ধ হও ।

তুমি তো নির্দোষ, মুঢ়, জ্ঞানহীন নও ;
তবে, কেন অকারণে এ অত্যাচারিছ প্রচার ?
রাম শ্রায়বান ! হায়—এ জগতে তাঁর
রাজধর্ম অনুপম !

সর্বধর্ম প্রতিষ্ঠিত রম
সত্যের উপরে নিত্য । যেথা নাহি হয়
সত্যের মর্যাদা বক্ষা সেথা ধর্ম তিষ্ঠিতে না পারে ।
সত্য, শ্রায়, ধর্ম সদা রহে একাধারে—
অবিচ্ছিন্ন সম্মিলনে ।

বামচন্দ্র তাঁহার জীবনে
সত্যের শ্রায়ের সদা মর্যাদা রক্ষণে
কৃতকার্য হন নাই । ধৈর্যল্যাম—তাঁহারে বখন
বৃক্ষ-অন্তরালে রহি' বালীর জীবন
নীচ, কাপুরুষসম করিলা সংহার তবে তাঁ'র
বীরধর্মে—রাজধর্মে হইল সঞ্চার
অলোপ্য কলঙ্ক-কালি । তারপরে, লঙ্কা-বুদ্ধ-শেষে,
বিশ্বের আদর্শ সত্যী সীতা যবে এসে'
দাঁড়াইলা রামের সম্মুখে, সেই মিলনের ক্ষণে
যশোলিপ্সু রামচন্দ্র অকথ্য বচনে
জনাকীর্ণ সেই স্থানে সীতারে করিয়া ছেয় জ্ঞান
করিলা যে ভাবে তাঁ'র বোর অপমান,
রামের সে আচরণে রঘুবংশ হইল মলিন !

নীচকূলে জন্ম যা'ব—অতিশয় হীন
তা'রো মুখে হেন উক্তি শোভা নাহি পায় । অকারণে—

অজ্ঞ । হইও না উত্তেজিত ! ভেবে' দেখ মনে—

রামচন্দ্র আপনার অস্তিত্বে দিয়া বিসর্জন,
শ্রেষ্ঠ রাজ-ধর্ম—সেই প্রজার রঞ্জন
পালন করিয়াছিল। সুখ-স্বার্থে দিয়া জলাঞ্জলি ।

অর । শোন বদ্ধ,—তাই, বৃষি বালীরাজে ছিল'
শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম রাম করিলা পালন ? তাহে কোন
সমাপিত হয়েছিল প্রজার বঞ্জন ?
দূর হোক মিছা তর্ক । আর, তা'ও, শোন সখা, বলি—
প্রজার রঞ্জন কহু নহে তা কেবলি
রাজধর্ম । রাজধর্ম শ্রায়প্রিত সদা ধরাতলে ।

প্রকৃতির ইচ্ছা যবে স্পষ্টভাবে বলে—
সত্যের মর্যাদা ব্যর্থ খর্ব করিবাঁবে, তবে সেই
উদ্ধত প্রজার হীন ইচ্ছা পালনেই
রাজধর্ম হয় কলুষিত । সে ইচ্ছারে প্রতিহত
করি', রাজধর্ম এই সংসারে সত্যত
সর্বোপরে, শ্রায়-সত্যে রক্ষা করা অক্ষুণ্ণ প্রভাবে ।
রামের রাজত্বে আর রামের স্বভাবে
এই নীতি হয়নি রক্ষিত ।

অজ্ঞ । কি কারণে ?

অর । যদি কেহ

মোব সাধ্বী প্রেরণীবে করিয়া সন্দেহ
কহে মোরে—সে সত্যের অকারণে করিতে বর্জন,
গর্হিত সে অনুরোধে করিলে পালন
ধর্ম-ভ্রষ্ট হব আমি । জেনে' শুনে', বয়ুবীর রাম
সেইরূপ প্রজাদের দৃষ্ট মনকাম
পুরিবারে, অকারণে যবে সখা, অতি অনায়াসে
স্বাপদ-সঙ্কুল সেই ঘোর বনবাসে
জগত-জননী সত্যী সীতারে করিলা নির্দাসিতা,
সেই সঙ্গে অত্যাচারে হল নিগৃহীতা
রাজ-নীতি সহ এই ধরিজীর সত্যী নাবী কুল !

অজ্ঞ । হে মিত্র, মূলেই তুমি কবিরাজ ভুল ।

যিনি রাজা, প্রজাদের সর্বরূপে তিনি প্রধিনিধি,
প্রজারি লাগিয়া তাঁ'র ধর্ম, রাজবিধি
নিরন্তর সচেতন । রাজধর্মে স্বাতন্ত্র্য তো নাই ।

প্রজারে ছাড়িয়া কহ—রামচন্দ্রে তাই,
• খুঁজিয়া পাই না আব ! প্রজাদের ইচ্ছা পালিবাঁবে,
কোন অন্তরালে রাম রাখি' আপনারে,
আপনার হৃৎপিণ্ড রাজধর্মে কবিতা ছেদন
প্রাণেব সীতারে মরি—দীলা নির্দাসন
ভীষণ গহনে ।—ধন্য আদর্শ ভূপতি !

অর । কেন বৃথা

করিছ প্রশংসা তাঁ'র । যবে নিগৃহীতা
জননী সীতাবে মোর হেরি—বনে স্তব্ধ, নিশ্চেষ্টম,
রয়ে'ছেন পড়ি' বাম-ধ্যানে নিমগন ;
তখন—তখন সখা, হৃৎখে, ক্ষোভে জলে এ অন্তর ;
রোষ উপজন্ম মনে রামের উপর ।

শ্রায়-দণ্ড ল'য়ে করে, সত্যেরে কবিতা অপমান
যে নৃপ নির্দোষ করে বিচার-বিধান—
হোক না সে রামচন্দ্র, তবু তাঁ'রে করি হীন জ্ঞান ?

তাঁ'র লক্ষ্য নহে কভু বিশ্বের কল্যাণ,
লক্ষ্য তাঁর—স্বীয় স্বার্থ,—যশের কিবীট । অযোধ্যার
এইরূপে রামচন্দ্র অকাতবে, হায়—
জ্ঞান ধর্মে তুচ্ছ কবি, অকারণে জননীকে মোর

পাঠাইলা বনবাসে । জগতী ভিতর
সত্য কহিতেছি বন্ধু, শুনি নাই কখনো এমন
হইয়াছে সতীত্বের ঘোর নির্যাতন ।
বিনা দোষে, অকাবণে, প্রজ্ঞাপুঞ্জ তুষ্ট রাখিবারে,
কে কবে শুনেছে কহ—হেন অবিচারে
নির্মম বিধান হেন ভীষণ, কঠোর ?

জীর প্রতি

স্বামীর দায়িত্ব সখা, মনে কব যদি ;—
সে ভাবে শ্রীরামচন্দ্র গুরুতব কর্তব্যে তাঁহাব
উপেক্ষা করিয়াছিল ।

পুনঃ, বিধাতাব
রমণীবৃন্দেব প্রতি পুরুষের আছে সুমহান
যে কর্তব্য, রামচন্দ্র—কৃত্রিম-প্রধান—
সে কর্তব্য পালনেও উদাসীন ; বিরক্ত অন্তর,
উদয়-বিহীন পঙ্গুসম ।

তারপব,
নির্দিত প্রজ্ঞার প্রতি সে কর্তব্য বিহিত রাজার—
সত্য পক্ষে নিরস্তব করা স্ববিচার ;
সে পক্ষেও বামচন্দ্র সিংহাসনে রহি' অধিষ্ঠিত
জ্ঞানপ্রিত রাজধর্ম্যে হইলা পতিত
মুঢ় সম । জ্ঞান, নারী, পরিহার করি' এ চিন্তারে,
গুরু যদি প্রজ্ঞারূপে মহিষী সীতারে
কর মনে ; ভাবো যদি—সীতা গুরু রাজার সাক্ষাতে
বিচার-প্রার্থিনী প্রজ্ঞা ; তবু, সে চিন্তাতে
রামের চরিত্র নাহি হয় সমর্থিত ; অকারণে,
• দেবীরে নিষ্পাপ জ্ঞানি' আপনার মনে,
নির্দোষীবে রামচন্দ্র-গুরু অবিস্মিত যশো-আশে
মিথ্যা অপবাদ সমর্থিয়া, বনবাসে
নির্কাসিলা স্বেচ্ছাচারে ।

অজয় । আপনাব অস্তিত্বের সনে
সীতারে অভিন্ন রাম ভাবিতেন মনে,—
এমনি নিবিড় প্রেমে চিব-বন্ধ আছিলেন দৌহে !
ভাই অন্তরের মাঝে মহা হৃৎ সথে,
স্বার্থ-স্বার্থে বিসর্জিয়া, সীতারে পাঠায়ে নির্কাসন,
আপনার অর্দ্ধাঙ্গের করিয়া ছেদন
প্রজ্ঞার রঞ্জন রাম সাধিলা অতুল ধৈর্য্য ভরে ।

অর । এই কি প্রণয়রীতি ! প্রেম অকাতরে
চাহেগো প্রিয়ের লাগি বলিদান দিতে আপনারে ;
স্বার্থের লাগিয়া সে তো কভু নাহি পারে
প্রিয়েরে করিতে নির্কাসিত । বুধা, কোনোনা এমন
অন্ধ সংস্কারের বশে রামে সমর্পন ।
সে গর্হিত আচরণ অল্পমোদনেনো যোগ্য আর
: নহে কভু । হয়ত বা হেন ব্যবহার

একান্ত বহল ভাবে পুরাকালে ছিল প্রচলিত ;
কিন্তু, তবু—দেশ-কাল-পাত্রের অতীত
যে সার্বজনীন ধর্ম্ম সৃষ্টিব আদিম কাল হ'তে
মানব-বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত এ জগতে ;
সেই ধর্ম্মে কহে—হেন আচরণ অতীব অন্তায় ।

শুদ্ধ যশোলিপা আর বাজ্যের মায়ার—
সতীর এ ঘোর অপমান, আর এই অবিচার
সমাজের চক্ষে চির-অযোগ্য ক্ষমার ।
অজয় । তা' হ'লে, সত্যের লাগি বনবাসে রামেরে পাঠা'য়ে

জ্ঞান-বুদ্ধ দশবধো করিলা অন্তায় ?
সত্য-পালনের তরে রামেব সে লক্ষণ-বর্জন,
হয় নাই তা'ও সমুচিত ?

অর ।

অকারণ

বাধাবদ্ধহীন হেন সত্য করা—অতি দুর্ব্বলতা,
যা'র লাগি নির্দোষীবে এ রূপে অযথা
সহিবারে হয় হৃৎখ । মোর দুর্ব্বুদ্ধি তরে কভু
কোন মতে অপরে তো নহে দারী ; তবু,
কোন স্বপ্নে করি আমি অন্তরে কঠোর হৃৎখ দান
বিনা কোন অপরাধে ? এ হেন বিধান
অসম্ভব ।

কর্তৃপদে পরিবাবে যে জন প্রধান
দীর্ঘ দেশে কবিছেন যিনি অধিষ্ঠান,
তাঁহার উচিত—গুরু সংসারের কল্যাণের তবে
আদেশ প্রচাব করা । সেরূপ না করে'
যে জন আপন স্বার্থে উপেক্ষিয়া অস্তিত্ব সবার
করেন নিয়ত বন্ধ, অতি অবিচার ;—
পরিবার-ভুক্ত সব মনে মানি' সম্পত্তি আপন
তৈজসাদি সম নিত্য করি' অযতন,
স্বেচ্ছাচারে, স্বার্থ-আশে করি'ছেন সদা অবহেলা—
ন'ন তিনি যোগ্য নেতা ।—এ তো নহে খেলা
'বিশ্বস্থ প্রাণ নিয়া ।—হোক না সে পুত্র-ভ্রাতা মোর,
তবু, তাঁ'র আছে এই ধরণী ভিতর
ব্যক্তিগত জীবনের অনন্ত কর্তব্য নিশি দিন ;
সে-ও জন্মিয়াছে বিশ্বে-ঐতন্য, স্বাধীন,
অমৃতের পুত্র হ'য়ে । অকারণে পেঘিলে তাহারে
হ'ব আমি অপরাধী বিধির বিচাবে ।

অজয় । কহ-শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রামায়ণে তবে, তব কাছে
কোন চিত্র সর্কাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে ?

অর । সীতা ! সেই সতীত্বের অল্পম পুণ্য-গরিমায়
বিশ্বে যিনি চির-মহিষী ! যা'র পায়
কলনা লুটায় পড়ি' করিছে বন্দনা অনিবার ।
অজ । তিনি ভিন্ন নাহি কি গো দিব্য চিত্র আর
মহাকাব্যে ?

অর। —মহান্ চরিত্র নাই ! বিশ্বে একাধাবে
মহন্তর চিত্র কভু কেহ নাহি পারে
কল্পনা করিতে ।

ধৈর্য্যে, ত্যাগে, পুণ্যে ভবতের সম
কে কবে দেখেছে রাজা ? চির অমুপম
ব্রাহ্মসেহে বীরবর লক্ষণের সম আছে কেবা ?
বীর হুম্মান সম সখা, প্রভু-সেবা
কে কবে কবেছে ? কোশল্যার মত আদর্শ গৃহিণী
ধরাভলে উদ্বিগ্নাছে কোথা আর ?—যিনি
স্বীয় স্নাত রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনের ভরে
বনবাসে করিলে গমন, সমাদরে,
স্নেহভরে ভরতেরে জিজ্ঞাসিয়া কুশল-সংবাদ,
অকপটে করিলেন শুভ-আশীর্বাদ
বাৎসল্যে বিশ্বাসি' পুত্র-শোক । পড়ে মনে-তারপরে
রামচন্দ্রের জীবন ।—যিনি অকাতরে
বাক্য আশা পরিহরি, পিতৃ সত্য পালনের তবে
পশিলেন বনবাসে প্রশান্ত অন্তরে
নতশিবে । মানি আমি—রামের সে বিশাল জীবন
অকলঙ্ক নহে ! তবু, তাঁহার মতন
ধৈর্য্যবান, স্নসংঘমী, জ্ঞানী, কর্মী—এ মব-ধরায়
একান্ত বিবল ।

পুনঃ, সেই অসহায়
সতীর সে চিত্র মনে আসে—বিনত, মলিন মুখে
দাঁড়াইয়া অগণিত জনের সম্মুখে
মা আমার, রামের সে বাক্য রাশি কুলিশকঠোর
শুনি'ছেন হৃৎ-লাঞ্জে কপিত অন্তর !
তারপরে, এ অনল পরীক্ষা হইলে সমাপন,
বহিঃকল্প মহোজ্জল স্বর্গের মতন
মিলিলেন যবে আসি পতিদেব সাথে, তবে তাঁ'র
প্রেমানন্দ-উদ্বেলিত নয়ন-আসার
খোঁত করি' দিল রামচন্দ্রের চরণ ।—সেই প্রেমে,
সেইক্ষেণে চ্যুত হ'য়ে, স্বর্গ এল নেমে'
কলঙ্ক-মলিন এই ধরাভালে !

পবে, পড়ে মনে—
যবে রাম পাঠাইয়া লক্ষণের সনে
না কহিয়া কোন কথা, জ্ঞান-হীনা জানকীকে হায়—
বিনা অপরাধে, স্বীয় যশের লিপ্সায়
ভয়ঙ্কর বনবাসে ; যবে সহি' লক্ষণ—অশেষ
মনোব্যথা, নিবেদিতা রামের আদেশ
মাতৃসমা জানকীকে শুক্লমুখে, ব্যথা-কুণ্ঠ স্ববে ;
তখন জানকী সেই অবিচার'তরে
পতিরে ভুলেও কোন রূঢ় বাক্য চাকুলোর ভরে

কহিলা না ; শুধু, স্বীয় অদৃষ্টের পরে
হাহাকারে শতবার করিলা ধিক্কার ।

পড়ে মনে—

পুনঃ, সেই সর্বশেষ মিলনের ক্ষণে !
শুনিয়া আবার পতিদেবতার নির্মম বিধান
অগ্নি-পরীক্ষার লাগি,—তাজিলা পরাণ-
তীব্র অপমানে, মরি—প্রচণ্ড, অসহ্য নির্যাতনে
জননী আমার !

মাগো, তোর আজীবনে
রাজকম্পা, রাজ্ঞী হ'য়ে পুরিল না কোন আশা হায় !
এসেছিলি এ অগতে শুধু যাতনায়
ঝরে' যে'তে নিঃশেষিয়া, বৃন্তচ্যুত প্রহনের প্রায়
ত্রিবিব-সৌরভ ঢালি' এপাণ ধারায় ।
বড় যে মনের হৃৎথে চলে গেলি জননী আমার
শুধু নিজ অদৃষ্টের তবে হাহাকার
করি ; শুধু, বারম্বার, দেগিলি যখন—তোরি তবে
স্বামীর নাহিক শাস্তি সিংহাসন'পবে,
রামের কল্যাণ লাগি,—স্বামীর পাখিব সূখ-পথে
নিফটক করি, তাই, তাজিয়া মরতে
চলে'গেলি অভিমানে । মাগো, তুই রামের কণ্টক !
তুই যে মা, রঘুবংশে পুণ্যেব আলোক
স্নিগ্ধোজ্জল-অচপল-জ্যোতি ! রামাদেশে, মনস্তাপে
যবে মাগো, গেলি চলে,—সেই মহাপাপে,
বিধাতার শাপে রাম-রাজ্য ধীরে হইল অশানে
পরিণত । এ বিশ্বের লক্ষ্মী-অন্তর্জানে
সোনার অযোধ্যা পূর্ণ হ'লো হাহাকারে !
(কর্ণ বাম্প-কদ্ধ হইল ।)
ভগবান,

চিরদিন সতীর এ হেন অপমান
সহিতে অশক্ত ভ্রাতঃ ।

অজ । বন্ধু, মনে করো একবার—

• তোমারো সে অসহায় সতী অনিবার
তব রূঢ় আচরণে সহিতেছে কি মবম-ব্যথা !
সেও পতি-প্রাণা সতী ! দিওনা অযথা
তাহারে বেদনা আর । মুখপানে চাহি' ক্ষণতবে
তুমি কথা কহিলে—যে ধন্ত জ্ঞান করে
আপন জীবন, তা'রে আর পেখিওনা উপেক্ষায়,
স্বণাতরে কর্তব্যে নিয়ত হেলায়
কোরোনা—কোবোনা তুচ্ছ । শাস্ত মনে করহ পালন
বিধাতৃ-নির্দেশ মানি' কর্তব্য আপন ।

অর। (স্বগত) মাধবী !

মরিরে—সে যে একান্তই ভাল বাসিয়াছে
আমারে পবাণ ঢালি' । আর কেবা আছে—

এ সংসার মাঝে তা'র । আহা—সে যে বড় অসহায় !
সে ব্যথিতা কই আব কিছু তো না চায়,
চাহে—শুদ্ধ মোর কৃপা, বিন্দুমাত্র প্রেম ! তবে—তবে,
এমনি কি চিবদিন সে ছাঃখিনী র'বে
উপেক্ষায় চির-নিগৃহীতা !

[চিন্তিতভাবে, ধীরে ধীরে প্রস্থান ।

অজ্ঞ ।

এবে এতদিন পবে,,

বুঝি—এ প্রবাসে আসি' জাগি'ছে অন্তরে
ককণা তাহার লাগি । নাই আব সেই উদ্বেলতা ।
এবে আসিয়াছে চিন্তে সিদ্ধ ব্যাকুলতা
ধর্ম পিপাসায় । ক্রমে, বুচিয়াছে সংশয় আধার,
উদ্ধত পরাণ এবে চাহিছে সবার
সাধিতে কল্যাণ । যবে, যাই মোরা অনাথ-আশ্রমে
আতুরেরে সেবিবারে, সাথে সাথে ভ্রমে
তখনো স্নহদবর । সাধ্য অল্পসারে, সযতনে
দীন অনাথের সেবা কবে কায়-মনে ।
অষ্টমাস হ'লো গত আসিয়াছি মোরা এ প্রবাসে ;
আজ্ঞো নাহি জানি—কেন সংবাদ না আসে
মাধবীর ।

(জীবনরামের প্রবেশ)

এই যে জীবন ! কহ—কহ সমাচার
যদি বা নূতন কিছু থাকে ।

জীবন ।

(প্রণামান্তর) পুত্র তাঁ'র

জন্মিয়াছে অপূর্ব, সুন্দর ।

অজ্ঞ ।

(সোজাসে) বটে !

জীব ।

কিন্তু, তারপ'র

একান্ত পীড়িতা তিনি, অতীব কাতর ।

অজ্ঞ । কি কহিলে মাধবীর পীড়া ?

হা বিধাতঃ কি করি !

সতীব আজন্ম-সাধ নাহি পুরাইলে

কোন মতে । ওহে দেব,—

(জীবনের প্রতি) যাও তুমি—ক্লান্ত পথ-শ্রমে,—

• করগে বিশ্রাম ।

[জীবনের প্রস্থান] ।

যাহা কোন দিন ভ্রমে

কল্পনা করিনি, হায়—হ'ল শেষে সেই পবিণাম !

সে সতীর একমাত্র ছিল মনস্কাম—

পতির চরণ-সেবা ; এ জীবনে বঞ্চিত হ'বে কি

• তা'হতেও কণ্ঠকলে ? হা বিধাতঃ, একি

মর্মান্তিক ছঃসংবাদ ।

কিছুই যে বুঝা নাহি যায়—

কি যে হ'বে ভগবান তোমার ইচ্ছায় !

[অজ্ঞের প্রস্থান] ।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী ।

শিবাজী ও সুন্দরী ।

মহারাক্ষ-ভাগ্যাকাশে সমুদিত যবে ভাহুসম

শিবাজী নৃপতি,

সেনাপতি স্বর্ণদেব একদিন নিবেদিতা আসি

করিয়া প্রণতি,—

“জয় হোক মহারাজ, সম্পাদিত এবে—যে আদেশ

ছিল ভূতা 'পরে,

বিজয়-পতাকা তব সঙ্গোরবে উড়িতেছে আজি

কল্যাণ নগরে ;

বন্দীকৃত আহাম্মদ—বিজাপুর-রাজ-প্রতিনিধি

সহ পরিজন ।”

শিবাজী কহিল “ধন্য স্বর্ণদেব, বীরত্ব তোমার

রহিবে স্মরণ ।”

কহিলেন সেনাপতি, “মহারাজ, আরো কিছু মোর

আছে নিবেদন,

শত্রুপূরী মাঝে এক অপক্লপ সৌন্দর্য্যপ্রতিমা

করিম দর্শন ;—

রূপসী ঘোড়নী বালা—তিলোত্তমা রমা এর কাছে

পায় বুঝি লাজ,

হেন ফুল শোভে শুধু রাজোত্মানে ; তাই আনিয়াছি

সাথে, মহারাজ ।”

ইঙ্গিতে সৈনিক এক লয়ে এল রাজ সভামাঝে

লজ্জিতা যুবতী ;

নিমেষে নিস্তব্ধ সভা, বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্র যত

হেরি সে স্মৃতি ।

যেন এ সৌন্দর্য্যস্বপ্ন—বিধাতার মানবী-কল্পনা

চিত্রপটে আঁকা !

শিবাজী কহিল ধীরে—কণকাল দেখি সেইরূপ

পবিত্রতা-মাধা,—

“মাতঃ তোম গর্ভে যদি জন্মিতাম, আমবাও বুঝি

হতেম সুন্দর !

সেনাপতি, পতিপাশে সযতনে এ কুলবধূরে

পাঠাও সত্বর ।”—

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ ।

বিবিধ প্রসঙ্গ ।

কল্যাণ দুর্গ অধিকারের পব, আবাজী, কল্যাণের শাসনকর্ত্তা মৌলানা আহমদের পুত্রবধু একটি সুন্দরী বালিকাকে বন্দী করিয়া, তাহাকে উপহারস্বরূপ শিবাজীর নিকট প্রেরণ করেন। শিবাজী বালিকাকে দেখিয়া বলিলেন, “আমার না যদি তোমার মত সুন্দরী হইতেন, তাহা হইলে কি সুখের বিষয় হইত! তাহা হইলে আমিও সুন্দর হইতাম।” তিনি বালিকার সহিত পিতার মত আচরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে নূতন পবিচ্ছদ ও অন্যান্য উপহার দিয়া, বিজাপুরে তাহার বাটীতে নিবাপদে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর “শিবাজী ও মুসলমান বন্দিনী” নামক সুন্দর ছবিখানি আঁকিয়াছেন।

শিবাজীর চরিত্রের নানা অসাধারণ গুণের মধ্যে নারীব সহিত পবিত্র ও সংযত ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত “সতী” চিত্র অতি সুন্দর ও সাহিত্যিকভাবপূর্ণ হইয়াছে। বিবাহসম্বন্ধায় সজ্জিতা সতী মহত্তম আত্মোৎসর্গের সময়ও সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতা; তিনি যে অসাধারণ কিছু করিতেছেন, তাহা তিনি মোটেই অনুভব করিতেছেন না। অগ্নিশিখা সকল ভীষণ রাক্ষসের জিহবার মত লক্ লক্ করিয়া উর্দ্ধে বিস্তারিত হইতেছে। তিনি সেই অগ্নিশিখা-সিংহাসনে নির্ভয়ে জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ইষ্ট দেবতার আবাধনার সহিত অশ্রুপাত বা অশ্রুট ক্রন্দনধ্বনির সংমিশ্রণ নাই। তাঁহার চক্ষু আর কিছু দেখিতেছে না—নিম্নস্থ অগ্নিশিখা, বা যে সকল প্রিয়জনকে তিনি ছাড়িয়া যাইতেছেন, কিছুই তাঁহার চোখে পড়িতেছে না—তিনি কেবল তাঁহারই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতেছেন, তাঁহার সহিত তিনি অচিবে মিলিত হইতে যাইতেছেন। তাঁহার চিত্ত স্থির, শান্তিতে প্রাপ্ত। ইহা মিলনের মুহূর্ত্ত। তিনি বিচ্ছেদের কথা জানেন না।

এই সম্পূর্ণ নির্ভীকতায়, আত্মগৌরবান্বিততায় সম্পূর্ণ অভাবে, আমরা নারীচরিত্রের মহিমা সম্বন্ধে ভাবতী

ধারণা কি আশ্চর্য্য সাক্ষ্য পাই! অন্যান্য দেশে, লোকে, ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য, স্বাধীনতার জন্ত, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিস্তারের অধিকার লাভ ও রক্ষার জন্ত, বা এবিধ অজ্ঞ কোন মহৎ ব্যাপারের জন্ত, যাহা করিয়াছে, ভারতে তাহাই কুসুমকোমলা নারী দাম্পত্য প্রেমের জন্ত সহস্র গুণ অধিক বার করিয়াছে! যাহাবা এরূপ মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন, তাঁহাবা সর্ব্বথা পূজনীয়। যে জাতির মধ্যে তাঁহাবা জনাগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সাহস ও নিষ্ঠা কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে। সহমরণ প্রথা তাহা আর দেখা দিবে না, দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু আমাদের জাতিগত এই সাহস ও নিষ্ঠা ভবিষ্যতে অনেক রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বব্যাপী ঘটনায় আবার দেখা দিবে।

বোমা-নিষ্ক্ষেপে মজঃফরপুরে দুটি নিরপরাধ ইংরাজ স্ত্রীলোকের প্রাণ বধ করা হইয়াছে, ইহা, ও তৎপরে বোমার কাবখানা আবিষ্কার, বোমা নিষ্পাদ ও নিষ্ক্ষেপকাবীর দল গ্রেপ্তার, এই সকল ব্যাপার এখন সর্ব সাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। সত্য বটে, স্ত্রীলোক দুটির প্রাণ বধ বোমানিষ্ক্ষেপকারীদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাহারা কিংসফোর্ড সাহেবকে মারিবাব জন্ত মজঃফরপুর গিয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত হত্যা কখনও ধর্ম্মসঙ্গত বা বীরধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বুদ্ধ নরহত্যা ধর্ম্মসঙ্গত কি না, কিম্বা কোন্ কোন্ স্থলে ধর্ম্মসঙ্গত, তাহা এখন বিবেচ্য নহে। ভারতে পূর্বে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও বুদ্ধ ছিল, গুপ্ত হত্যাও ছিল, কিন্তু বোমা ছুড়িয়া মানুষ মারার বুদ্ধিটা ইউরোপ হইতে আমদানী। সর্বপ্রকারের গুপ্ত হত্যা ই কাপুরুষতা ও পাপকার্য্য। অধিকন্তু বোমা-নিষ্ক্ষেপে সর্বত্রই নিরপরাধ বিস্তব লোক মারা যায়। সুতরাং ইহাতে পাপ অধিক। ইহার দ্বারা এ পর্য্যন্ত কোন দেশকে স্বাধীন হইতে দেখা যায় নাই। অবশ্য দ্বারা উন্নতি সম্ভব নয়; কাবণ বিশ্বের বিধান ধর্ম্মবিধান।

আমরা বলিয়াছি, গুপ্তহত্যা কাপুরুষের কার্য্য। কিন্তু শুধু ইহা বলিলে বোমানিষ্ক্ষেপকাবির প্রতি অবিচার কবা হয়। তাহাদের চরিত্র জটিল; উহাতে সদস্যগুণের ভ্রূবোধ্য সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়। তাহাদের চরিত্রে সাহসের ও আত্মোৎ-

সর্গের অভাব নাই। তাহাদের ব্যবহারে দেখা যাইতেছে, তাহারা নিজেদের প্রাণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। তাহারা নিজেদের লাভ, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার চরিতার্থতা বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্ত এই কার্যে প্রবৃত্ত হয় নাই; তাহারা ভ্রান্ত হইলেও নিজেরা মনে করিয়াছিল যে দেশের মঙ্গলের জন্ত এই কাজ করিতেছে। তাহাদের আত্মোৎসর্গ, অমঙ্গলকর ও বিপদচালিত হইলেও, এক-প্রকারের আত্মোৎসর্গ বটে। তাহারা নিজ নিজ স্বীকারোক্তিতে - নির্ভীকতা ও সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়াছে। তাহারা কোথা হইতে বন্দুকাদি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে, নিজেদের ব্যয়নির্বাহের জন্ত টাকা পাইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবে না বলিয়া কথা দিয়াছিল বলিয়া, প্রকাশ করিতেছে না। সুতরাং তাহারা সত্য রক্ষা করিতে জানে। নিরপরাধ জীলোক দুটির মৃত্যুতে তাহারা দুঃখিত হইয়াছে, এবং ইহাতে আপনাদের কার্যে বিধাতার অভিসম্পাত ও সোণের চিহ্ন দেখিয়াছে। সুতরাং, অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদক তাহাদের সম্বন্ধে বেরূপ অতিশয়োক্তি করিতেছেন, তাহা ভ্রান্ত্য নহে; কারণ, ইংরাজী প্রবচন অনুসারে, শয়তানকেও তাহার প্রাপ্য দেওয়া উচিত। ইহাও বলা উচিত যে বাঙ্গালী বোমাওয়ালারা এনাকিষ্ট, বা নিহিলিষ্ট নহে, নিপ্ৰবকারী মাত্র।

এই ঘটনায় অনেক ভাবিবার বিষয় আছে। ইহা কেন ঘটিল? ফ্রান্স স্বাধীন, আমেরিকার যুক্তরাজ্য স্বাধীন; কিন্তু লেখানেও বোমা ছুড়ার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং কেবল রুশিয়ার মত, রাজ্যের দ্বারা স্বেচ্ছাশাসিত এবং উৎপীড়িত দেশেই এরূপ ঘটে, এরূপ সাধারণ নিয়ম নির্দেশ করা যায় না। সাধারণ বিধির অন্বেষণ করিবার আমাদের প্রয়োজনও নাই। আমাদের দেশে ইহার উৎপত্তির কারণ সহজেই ধরা যায়। বঙ্গবিভাগের সময় হইতে আমাদের দেশে আমাদের মত, আমাদের সুখদুঃখ, ও জাতীয় উন্নতির প্রতি, ইংরাজের সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও প্রতিকূলতা স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের কাছে জায়বিচার পাইবার আশা মরীচিকা, পাইবার ইচ্ছাটাও ভ্রমপ্রসূত এবং অনিষ্টকর, ইহা এখন অনেকেবই মত। ইহাদের মধ্যে যাহারা ধীরবুদ্ধি, তাহারা আত্মনির্ভর, স্বাধীনতা, ও আত্মোন্নতির

দিকে সাম্বিক পথে, শান্তির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টিত। যাহাদের ধৈর্য ও সাম্বিকতা কম, তাহারা, নিরস্ত্র দেশে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধের সম্ভাবনা না থাকায়, পাশ্চাত্য ভীতিউৎপাদক দলের (Terrorists) বোমানিক্ষেপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। সুতরাং মূলে ইংরাজই ইহার জন্ত দায়ী। এখন যদি ইংরাজ অবিচার, উৎপীড়ন, নিগ্রহ, আইনের বাধাবীধি ও গোয়েন্দাগিরির মাত্রা বাড়ান, এবং আমাদের যে অল্প স্বাধীনতা আছে, তাহাও হরণ করেন, তাহা হইলে কাহারও মঙ্গল হইবে না। কারণ দেখা যাইতেছে, দেশে (কুদ্র হইলেও) একদল 'মরিয়া' লোক জন্মিয়াছে। ইহা বা রক্তবীজের দল। রক্তপাত করিলে ইহাদের দল বাড়িয়া চলিবে। এই অনর্থের প্রতিকারের উপায়, ধর্মসম্বন্ধ ভাবে দেশশাসন, মানুষকে গায়ের রং নির্বিশেষে মানুষ বলিয়া গণ্য করা, দেশের লোকের ধন, শিক্ষা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

পাশবলের দ্বারা কার্য উদ্ধার হইবে না। কারণ পাশবলের বিরুদ্ধে পাশবল প্রয়োগে, ভয়ের বিরুদ্ধে ভয় প্রদর্শনে স্মরণ ও ইচ্ছুক একদল লোক দেখা দিয়াছে। ভীকতা-অপবাদ-কলঙ্কিত বাঙ্গালীর শাসন রুশীয় প্রথায় পরিচালিত হওয়ায়, এক কুদ্র দল তাহার রুশীয় রকমের জবাব দিতেছে। তাহারা নির্ভীক, মরিতে প্রস্তুত; সুতরাং রুশীয়-শাসন-প্রথা ভাবতে প্রবলতর ও বিহ্বলতর হইলে, তাহার জবাবটাও ভীষণতর হওয়া অসম্ভব নহে।

এখন কথা এই যে, ইংরাজ এখন নরম হইয়া ধর্মপথে চলিলে, তাহাব "প্রেষ্টিজ্" থাকে না, ইচ্ছা থাকে না, তাহার শক্তি ও সাহসের একটা লোক-দেখান আড়ম্বর, নির্ভীকতার ভাণ, থাকে না;—তাহার এই অপবাদ হয় যে সে ভয় পাইয়াছে। কিন্তু এই অপবাদের ভয়ে, "প্রেষ্টিজ্" যাইবাব ভয়ে, ভায়সম্বন্ধ কার্য হইতে বিরত থাকাও একটা মন্ত ভীকতা। মুকিল এই যে অধর্ম শাখারি করাতের মত ছদিকে কাটে। ইংরাজ অধর্ম করার বোমা নিষ্কিপ্ত হইয়াছে; অধর্মের মাত্রা বাড়িলে বোমাও বাড়িতে পারে। অপরদিকে অধর্মপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেও ভীকতা অপবাদের ভয় আছে। বাহা হউক, আমাদের ইংরাজকে

পরামর্শ দিবার ইচ্ছা নাই। কারণ আমাদের পরামর্শ ইংরাজ শুনবে না। আমাদের কি কর্তব্য তাহাই পরে বিবেচ্য।

কোন কোন ইংরাজ সম্পাদক সর্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদেরকে সাফাৎ বা পরোক্ষভাবে, অধিক বা অল্প মাত্রায় বোমানিক্‌পকদিগের সহযোগী বলিতেছেন। ইহার উত্তর দেওয়া আমরা নিম্নয়োজন ও অবজ্ঞার বিষয় মনে করি। কিন্তু যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে সমুদয় দেশবাসীই ঐ দেশের সহায়ত্বকারী, তাহা হইলেই বা এই সম্পাদকেরা কি করিতে চান? সকলকে কাঁসী দিতে, নির্দাসন করিতে, জেলে পাঠাইতে কেহই পারে না। বহুসংখ্যক লোককে ঐ প্রকার সাজা দিয়াও ত রুশিয়ায় দেখা গিয়াছে। কি ফল হইয়াছে? এখন ত এ কথাও বলা চলে না যে রুশীয় চরিত্রে সাহস ও দৃঢ়তা আছে, কিন্তু সকল বাঙ্গালীরই চরিত্রে কেবল ভীকতা ও মৃদুতা আছে।

বেশী জোরে বাধিতে গেলে দড়ি ছিড়িয়া যায়। কোন সদৃশের বা অসদৃশের করিত অভাবে, ভাল বা মন্দ কোন কাজই কোনও জাতির অসাধ্য থাকে না, ইহাও মনে রাখা উচিত।

পাইয়োনীয়ার, ইংলিশম্যান, প্রভৃতি কাগজে এখন কঠোর আইন, কঠোর শাস্তি, প্রভৃতির পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ১৯০৬ সালে রুশীয় প্রধান মন্ত্রী স্টোনিপিনের বাগান বাড়ীতে রুশীয় বিপ্লবকারীরা যখন বোমা ছুড়িয়া কতকগুলি লোককে মারিয়া ফেলে, তখন পাইয়োনীয়ার কি লিখিয়াছিলেন দেখুন।

"The horror of such crimes is too great for words, and yet it has to be acknowledged, almost, that they are the only method of fighting left to a people who are at war with despotic rulers able to command great military forces against which it is impossible for the unarmed populace to make a stand. When the Czar dissolved the Duma he destroyed all hope of reform being gained without violence. Against bombs his armies are powerless, and for that reason he cannot rule, as his forefathers did, by the sword. It becomes impossible for even the stoutest-hearted men to govern fairly or strongly when every moment of their lives is spent in terror of a revolting death,

and they grow into craven shirkers, or sustain themselves by a frenzy of retaliation which increases the conflagration they are striving to check. Such conditions cannot last."—The Pioneer, 29th August, 1906.

অর্থাৎ পাইয়োনীয়ারের মতে রুশিয়ায় মাকড় মারিলে ধোকড় হয়।

ইংরাজকে আর একটা কথা বলিতে চাই। আমাদের কোন কোন কাগজে খুব শীঘ্র বোমানিক্‌পকদিগের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয় নাই বলিয়া ইংরাজ সম্পাদকেরা ভারি বিস্ময় ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিলেন, ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করাইবার জন্য তাগিদ দিতেছিলেন। আমরা অবশ্য নরহত্যাকারী নহি, ওরূপ কাজ ধর্মসঙ্গতও মনে করি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজ হত্যাকারীরা যখন অকারণ নিরপরাধ দেশীয় লোকের প্রাণ বধ করে, তখন তোমাদের ক্রোধ ও ঘৃণা কোথায় থাকে? উদ্বেজনা-প্রসূত রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যাও সমর্থনযোগ্য নহে; কিন্তু অকারণ অসহায় নেটিভ হত্যার বেলা তোমরা চুপ্ করিয়া থাক কেন? তোমরা আর যাহা কর, ভণ্ডামির মাত্রা আর বাড়াইও না।

এখন আমাদের কি কর্তব্য তাহা বিবেচ্য। আমরা দেখিতেছি আমাদের দেশের অনেক বিপথগামী লোকদেরও চরিত্রে, সাহস আছে, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে, (তাহাদের মতে) দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ আছে, দৃঢ়তা আছে, সত্য রক্ষার ক্ষমতা আছে। এই সকল সদৃশ অল্প অনেক লোকের চরিত্রেও নিশ্চয়ই আছে। এই সকল সদৃশ ও শক্তি দেশের কল্যাণকর পথে চালিত করাই দেশের নেতাদের এখন প্রধান কার্য।

বোমানিক্‌পকদের কাজের সমর্থন কেন করি না, তাহা বলিতেছি। ইহা ধর্মসঙ্গত নহে। অধর্মের দ্বারা অধর্মের দমন হয় না, ধর্মের দ্বারা হয়। কিন্তু ধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে যদি মতভেদ হয়, তাহা হইলে বলি, ইহা নিষ্ফল। মনে করুন, যদি কিংসফোর্ড সাহেবই মারা পড়িত, যদি মিণ্টো এবং মল্লীকেও মারা যাইত, তাহাতে তাহাদের স্থানান্তিষিদ্ধ হইবার লোকের অভাব হইত না। শেষোক্ত লোকদের প্রাণবধ করিলে তাহাদেরও যারগার অল্প লোক জুটিত। যোগের বীজ ত এই লোকগুলিতে নয়, যোগের

বীজ ইংরাজের শাসনপ্রণালীতে, আমাদের বাজনৈতিক পরাধীনতায়। গল্প আছে যে একটি ছেলে নিম্নেব ভাইয়ের নিকট এই বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতেছিল যে “ভাই, আমাদের গুরুমহাশয় মারা পড়িয়াছে; আর ঠেঙ্গাইবাব লোক নাই।” তাহাতে তাহার অধিকতর বুদ্ধিমান ভাই বলিল, “বুড়, বোকা, বাবা ত মরে নাই; বাবা আর একজন গুরুমহাশয় ডাকিয়া আনিবে যে।” ইংরাজের দুষিত শাসন-প্রণালী এই “বাবা”র মত। উচ্চতর ইংরাজ কর্মচারীকে মারিলেও এই “বাবা” মরিবে না। যদি কেহ বলেন, অনেক ইংরাজকে এইরূপে মারিলে ইংরাজ ভয় পাইয়া আমাদের বাজনৈতিক অধিকার দিবে, স্বাধীনতা দিবে। তাহার উত্তর এই—ইংরাজ ভয় পাইয়া কোন কাজ করিবে বলিয়া খোঁষ হয় না; কারণ সে ভয় পাইয়াছে, ইহা নিজ আচরণ দ্বারা জানিতে দেওয়াই তাহার পক্ষে বিপজ্জনক। দ্বিতীয় কথা এই, স্বাধীনতা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, উহা নিজ শক্তিতে অর্জন করিতে হয়, এবং অর্জন করিয়া রক্ষা করিতে হয়। তোমার যদি স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষণের শক্তি থাকে তাহা হইলে তুমি গুপ্ত হত্যার পথে বাও কেন? আর যদি তোমার স্বাধীনতা রক্ষার শক্তিও না থাকে, তাহা হইলে ইংরাজ ভয়ে পলাইয়া গিয়া তোমাকে স্বাধীন করিয়া দিলেও তোমার স্বাধীনতা টিকিবে কয় দিন। ইহা পড়িয়া কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি তুমি বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করিতে বল? আমবা বলি, না। বিদ্রোহের ঔচিত্যহীনতা, বা প্রয়োজনের বিচার না করিয়াই বলিতেছি, না; কেন না আমাদের অস্ত্রও নাই, একতাও নাই, দল বাধিবার যথেষ্ট ক্ষমতাও নাই। ভারতবাসী আর বিদ্রোহ করিতে পারে না। আমাদের পথ অস্ত্র প্রকারের। ইহাতেও সাহস চাই, জীবনোৎসর্গ চাই, কঠোর সাধনা চাই। যাহা অনেক শতাব্দী ধরিয়া ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এক দিনে গড়িবে না। কিন্তু ভাঙ্গিতে যত দিন লাগিয়াছে, গড়িতেও তত দিন লাগিবে, ইহা বলা যায় না। আমাদের সাধনা, এবং আত্মোৎসর্গের পরিমাণ ও মাত্রা অল্পসারে আমাদের জাতীয় মোক্ষলাভের দিন ঘনাইয়া আসিবে।

আমাদের অবলম্বনীয় পন্থার বিচার পরে করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে,

উহা একরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে আমরা আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি।

প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে বঙ্গ হাহাকার উঠে। রোডসেসেব টাকায় এই অভাবের অন্ততঃ আংশিক ভাবেও মোচন হইতে পারে; কিন্তু সে বিষয়ে গবর্নমেন্ট উদাসীন, দেশেব ধনিলোকগণ বিলাসবাসনমোহে নিমগ্ন, ইংরাজের পরিতুষ্ট সাধন দ্বারা উপাধি অর্জনে ব্যস্ত, ঋণগ্রস্ত, বা অস্ত্র কোনও কারণে জলাশয়খনন দ্বারা পুণ্যলাভ হইতে বঞ্চিত। এখন জনসাধারণ সমবেত চেষ্টা দ্বারা যাহা কবিতো পারেন, তাহাই ভবসা;—এবং জনসাধারণ একরূপ চেষ্টা দ্বারা না করিতে পারেন, এমন কোনই কাজ নাই। এই ক্ষমতা আমরা শুনিয়া স্তম্ভী হইলাম যে যশোহবেব বাহনন্দী নামক একটি গ্রামে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা এই বিষয়ে যাবলম্বনের সূত্রপাত হইয়াছে। ঐ গ্রামেব পাশ দিয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদীটি শুকাইয়া যাওয়ার লোকের বড় কষ্ট হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকেরা শুষ্ক নদীগর্ভে স্বহস্তে কুপখননে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যত তাহাবা, যাহারা “তন, মন, ধন” পরার্থে উৎসর্গ করিতে পারেন।

সৈয়দ আব্দুল্লাহ্ মামুন সূফাওয়ার্দী বয়সে নবীন হইলেও জানে প্রবীণ, নানা বিজ্ঞান পারদর্শী। তিনি গণ্ডনের বিখ্যাত বিশ্বমুসলমান-সমিতির (Pan-Islamic Society) স্থাপনকর্তা। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রায় এক মাস হইল পূর্ণিয়ার চতুর্থ মুসলমান শিক্ষাসম্মেলন আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। তিনি তাহার সভাপতি মনোনীত হন। তাহার অভিভাব্য উৎসাহপূর্ণ, এবং ধর্মভাব, স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, ধর্ম-বিষয়ক ঔদার্য, ও বিদ্যাভ্রমণেব একত্র সম্মিলনে উপাদেয় হইয়াছিল। অনেকের ধারণা মুসলমানমাজেই অস্ত্র ধর্ম-বিষয়ী ও ধর্মী। সূফাওয়ার্দী মহাশয়ের বক্তৃতার নিম্নোক্ত সুরচিত অংশ ছুটি পড়িলে এই ধারণা দূর হইবে।

“Yet Islam, the very name of your religion, indicates self-abnegation, self-surrender and self-sacrifice, and that spirit pervades all the religious functions and institutions of Islam. You cannot be totally unacquainted with that interpretation of the meaning

of Islam. But yours is a mistaken idea of self sacrifice. At the call for Jihad a thousand Muslims would rush forth and gladly lay down their lives for the holy faith. But it is harder to live than to die for Islam. In order to grasp the full meaning of life, you have only to look back and contemplate the grand and commanding personality of that Great Son of Arabia who was at once an emperor, a conqueror, a warrior, a poet, a philosopher, a prophet and a seer. Life—not death—is writ large on the dramatic history of the achievements of Muhammad, the son of Abdullah. It was not by the vulgar Jihad, the holy war, with whose name and fame you are all familiar, that he established his empire in the hearts and imaginations of the faithful. It was by the Jihad ul-Akbar—the greater Jihad—the sacrifice of the self at the altar of duty. Not only he but every great man who has left his impress on the pages of Time, every one who has robbed death of its darkness and annihilation of its terrors, every man who has asserted himself above all his fellows, has done so by a supreme act of self-effacement, self-abnegation and self-denial. Prince Siddhartha abandons his royal heritage and dedicates his long life to the service of Humanity. He loses the kingdom of Kapilavastu. But wait and measure his gain. Enthroned on the hearts of countless millions, he rules to-day over a wider, vaster and more enduring empire, adored and worshipped as the Lord and Gautama, the Enlightened, the Buddha. Six centuries roll by. We witness the enactment of an awful tragedy in Jerusalem, the city of peace. But the Cross, which wrung from the unwilling lips of the son of Mary the bitter cry of anguish and despair—"My Lord, my Lord, why hast thou forsaken me"—is to-day the Cross of Hope at which thousands of hopeless hands are clinging. Six centuries roll by. Once more we behold another man at Mecca, 13 years of whose ministry have been one long crucifixion, a humble fugitive from the city of his birth seeking an asylum in distant Yathrib. But to-day the name of the son of Abdullah is second only to that of Allah. The lips of his innumerable followers utter his name with reverence and respect five times a day. The cry of the Muezzin, at dawn and at sunset, wafts it from the pillars of Hercules to the Great Wall of China. Eternal life in the Hereafter is a reward of death in the Here. The Crown of Thorns is the price of the Crown of Immortality."

"I for one am proud to declare that the blood of the Aryans flows in my veins with that of the Semi-

tics. A greater and a wider heritage becomes mine when I feel that I owe allegiance not only to Moses, Christ and Muhammad, but also that Zarathustra, Srikrishna and Gautama claim my homage. The Gita as much as the Gospel of Islam, belongs not to this race and that, but to whole humanity."

ধর্মের জন্য মরা অপেক্ষা তজ্জন্ম জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত ব্যয় করা কঠিন, ইহা অতি সত্য কথা।

মুসলমানেরা স্বদেশপ্রেমিক নহে বলিয়া যে অপবাদ আছে, তৎসম্বন্ধে বক্তা বলেন—

"The Muslim is often reproached for lack of patriotism. Yet it was the Prophet of Islam who declared patriotism to be a part of religion. It is true our sympathies travel beyond the bounds of India, that our *patri* is the whole world of Islam. But the true pan-Islamist, who dreams to unite the various sects of Islam, also longs to draw the Hindus and Muslims closer to each other; nay yearns for the dawn of a deeper and wider brotherhood of humanity existing under the ægis of the Imperialism of a universal religion."

তিনি মুসলমানদিগের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক মুসলমানের অনুধাবনযোগ্য।

অনেক বৎসর হইতেই বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালী, মুটে মজুরের কাজ, কল কারখানায় কুলি-ব কাজ, প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কাজ হইতে বঞ্চিত হইতেছিল, বা নিজেই নিজে কৈ বঞ্চিত করিতেছিল। হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া তাহাব স্থান অধিকার করিতেছিল। তের বৎসর পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছি, শ্রমের ক্ষেত্র হইতে, ছুতার প্রভৃতি কারিগরের কাজ হইতে, মুদিখানা, পানের দোকান, সরবতের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় কারবার হইতে, বাঙ্গালী পুরোপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাড়িত হইয়াছে। বাহার বাঙ্গালীর স্থান অধিকার করিতেছে, তাহাদের বিকল্পে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। বোগ্যভ্রমের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। আমাদের বিচার্য এই যে বাঙ্গালী কেন দিন দিন দুর্বল ও শ্রমকাতর হইয়া পড়িতেছে? সাধারণ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বাবুর মত কি শারীরিক শ্রমকে ঘৃণা করিতে শিখিতেছে?

তাহা হইলে ইহার চেয়ে জাতীয় দুর্ভাগ্য, ও অধোগতির কাবণ, আর কি হইতে পারে? ভগবান্ হাত পা দিয়াছেন, বাতে পঙ্ক লোকদের মত অক্ষম হইয়া বলিয়া থাকিবার জন্ত নহে,—কাজ করিবাব জন্ত। ধুলা মাটিতে, ময়লাতে, মানুষ কলঙ্কিত ও অপবিত্র হয় না,—অসাধুতা ও দুর্নীতিতেই কলঙ্কিত হয়। বাহিরের মলিনতা নানাপ্রকারেই দূব হয়, দুর্নীতির দুর্গন্ধ কোনও সুগন্ধি জিনিষে দূব করিতে পারে না। মাটির সঙ্গে, শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে যে জাতির যত কম সম্পর্ক, সে জাতি ততই বিনাশের নিকটবর্তী।

আমরা প্রবাসীতে ছাপিবার জন্ত যত কবিতা পাই, তাহার অতি অল্প অংশই ছাপিতে পারি। প্রকাশযোগ্য কবিতাও অনেক সময় স্থানান্তাবে বাহির হয় না। তন্মিত্র আর একটি কথা আছে।

অনেক প্রেমের কবিতা আসে। লেখকগণ অনেকই যুবা,—বিবাহিত কিম্বা অবিবাহিত। তাঁহাদের প্রেম কথার কথা, ন সত্য, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। টাকার জন্ত বাহার বিবাহ করিয়াছে বা করিবে, তাহাদিগকে প্রেমিক বলিতে পারি না; সুতরাং তাহাদের কবিতাও কেবল বাক্যের শ্রদ্ধা মাত্র। এই জন্ত আমাদের এইরূপ একটা নিয়ম কবিবার ইচ্ছা হইতেছে :—

“১। যে সকল বিবাহিত ব্যক্তি প্রেমের কবিতা পাঠাইবেন, তাঁহারা তৎসঙ্গে লিখিয়া পাঠাইবেন যে বিবাহের পূর্বে, তাঁহাদের, স্বপ্তরের ধন ও স্বপ্তরের কল্পা, কাহার প্রতি কতটা প্রেম জন্মিয়াছিল, এবং তাঁহারা কি পরিমাণে নিজের স্বপ্তরকে স্বপ্তগ্রস্ত, সর্বস্বাস্ত বা পথের ভিখারী করিয়াছেন।

“২। যে সকল অবিবাহিত ব্যক্তি প্রেমের কবিতা পাঠাইবেন, তাঁহারা লিখিবেন যে তাঁহারা হৃদয়ের কতটুকু স্থান ভাবী স্বপ্তরের ধনের প্রতি প্রেমে ও কতটুকু স্বপ্তর-কল্পার প্রেমে পূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা স্বপ্তরকে কি পরিমাণে স্বপ্তগ্রস্ত, সর্বস্বাস্ত বা পথের ভিখারী করিতে অভিলাষী।

“বিশেষ দ্রষ্টব্য। কেহ যদি বলেন যে তাঁহার (বর্তমান বা ভাবী) স্বপ্তরের ধনের প্রতি শোভা নাই, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন চিন্তাপাঠকেব (thought-reader এর) সার্টিফিকেট দিতে হইবে।”

যে দেশে বর ও কল্পা বিক্রী হয়, সে দেশে লোকে কেন প্রেমের নাম করে?

কয়েক মাস হইতে ডাকবিভাগ ভ্যালুপেন্সেল ডাক সম্বন্ধে যে কার্য প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের

কাজের বড় অসুবিধা হইয়াছে। পূর্বে আমরা গ্রাহকদের নাম, ঠিকানা ও নম্বর বাহা লিখিয়া দিতাম, তাহাই ফেরত আসিত। এখন ডাকবিভাগ নূতন একটি কার্যে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিবার নিয়ম করিয়াছেন। কাজে তাহা করিলে আমরা বাধিত হইতাম। কিন্তু এখন আমরা যে সকল কার্য পাই, তাহার অধিকাংশই পুরা ঠিকানা ত থাকেই না, কখন কখন কেবল সহরের বা গ্রামের নামটি সংক্ষেপে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকে, কখন বা অতি অস্পষ্ট অক্ষরে সংক্ষেপে কেবল গ্রাহকের নামটি মাত্র থাকে। ইহাতে আমাদের টাকা জমা করিতে, এবং যথাস্থানে কাগজ পাঠাইতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। এই জন্ত গ্রাহকগণকে অতুরোধ করিতেছি যে তাঁহাদের নাম বা ঠিকানায় কোন ভুল বা অসম্পূর্ণতা থাকিলে তাঁহারা শীঘ্র, গ্রাহক নম্বর সহ, জানানইবেন। আমাদের ঠিকানা ২১০৩১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

সমুদয় সংবাদপত্র-পরিচালকের এবিষয়ে ডাকবিভাগে প্রমাণসহ অভিযোগ করা উচিত।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-সমালোচনা।

বিরাম-সঙ্গীত—শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। হাবড়া, শিবপুর, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, ৩০১ সংখ্যক ভবনে শ্রীচিন্মীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বাদশাংশিত ভিমা ২০ পৃষ্ঠা; আট কাগজে মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। কাগজ ভালো বলিয়া বহিস্ফোটব মন্দ হয় নাই। নতুবা ছাপার অনেক দোষ আছে। হরকের রেজিষ্টার ঠিক হয় নাই; চাপ এত বেশি হইয়াছে যে এক পৃষ্ঠার লেখা অপর পৃষ্ঠার ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; কালী সর্বত্র সমান হয় নাই। পুস্তকখানিকে স্ফুট করিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম। কবিতা মোটে ২১টি; তাহাদের বিষয়ভাস ‘নৈরাশ্র, উপশম, মোহ, শাস্তি ও নির্দেশ’। অনেক কবিতার অনেকগুলি দুর্বোধ্য হইয়াছে; যেখানে যেখানে প্রোক্ত হইয়াছে সেখানকার হৃদয়ের গাভী মনোহর হইয়াছে। ইহার মধ্যে চুল তরলতা নাই, সর্বত্রই একটা গাভী কবিতাগুলিকে আধুনিক কবিতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে। লেখক তাহার অর্থ আরো একটু পরিষ্কৃত করিলে পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক হইত। পুস্তকের মূল্য ছয় আনা মাত্র।

আমার দেশ—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত বিরচিত। কুস্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীবসন্তকুমার দাস কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বাদশাংশিত ভিমা ৩০ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা মাত্র। এই পুস্তিকার উপস্থাপন স্বদেশের কল্যাণকর কার্যে ব্যস্ত হইবে। ইহা কবিতাপুস্তক। ইহার প্রত্যেকটি কবিতা ভাবের প্রাচুর্যে তরুণ হৃদয়ের আশা উৎসাহে, উৎসাহে। একটু উদ্ভাস আছে, তাহা কাল ধিতাইয়া মানা বাধিলে নবীন কবির রচনা আরো উপভোগ্য হইবে। এই সামান্ত মূল্যের পুস্তিকাখানি ক্রয় করিয়া পড়িলে নিজেকে পরিচুত, নবীন কবিকে উৎসাহিত ও স্বদেশের কল্যাণে সাহায্য করা হইবে, প্রবাসীর সকল পাঠক পাঠিকা স্মরণ রাখিবেন।

লিসিঙ্গাস—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত বিরচিত । প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্র-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ক্রাউন অষ্টাংশিত ১২ পৃষ্ঠা—সূচনা ২ পৃষ্ঠা । মূল্য দেড় আনা মাত্র । ইংরাজ কবি মিষ্টনের কাব্যের অনুবাদ । বাঙ্কব হইতে পুনর্মুদ্রিত । এই অনুবাদ মূল্যবান হইয়াও প্রাপ্ত হইয়াছে । বহুদানে কবির পরিচুত হইয়াছে । দীর্ঘপদী ছন্দ কবিতার অধিকতর সৌন্দর্য সাধন করিয়াছে । তরুণ কবির নমুনা আশাশ্রয় ।

অজ্ঞাহার (কাব্য)—শ্রীসতীশচন্দ্র বসু প্রণীত । কুড়িগ্রাম হইতে শ্রীতারকেশ্বর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত । ডিমাই ষাটশাংশিত ৭৭ পৃষ্ঠা । মূল্য ছয় আনা মাত্র । ইহাতে ছাপাব অঙ্করে প্রকাশ, এখানি কাব্য । আমাদের না মানিবার উপায় নাই । যদি অমন স্পষ্টাক্ষরে এই পুস্তক-খানিকে ‘কাব্য’ বলিয়া পূর্বে সিদ্ধান্ত করা না থাকিত, তবে আমবা কি মনে করিতাম ‘ছড়া’ ? হয় ত ইহা অনুমান করিবাই সমালোচকের পক্ষে কাঁটা দেওয়া হইয়াছে । যিনি কাব্য লেখেন তিনি হুতরাং কবি ; কবি নিরঙ্কুশ । এবাবিধ কবি দেখিয়া গোবিন্দ অধিকারীর একটা গানের এক পদ মনে পড়ে, “রাজার নন্দিনী প্যাবী বা করেন তাই শোভা পায় ।” কবি যে কতদূর নিরঙ্কুশ তাহা “মাতৃমূর্ত্তি” নামক গল্পের পাদটীকাব মালুম । কবি লিখিতেছেন “এই কবিতাটি কোন নির্দিষ্ট ছন্দে অবলম্বনে রচিত হয় নাই । পার্থক্য ক্ষমা করিবেন ।” এইটি ও আর একটি পদ্য গ্রন্থকারের সহোদরের রচিত । প্রকাশক নিবেদন করিয়াছেন, “একাদশ বর্ষ হইতেই গ্রন্থকার পিতৃমাতৃহীন । * * * তৎপরে তাহার সাক্ষীপত্নী * * * স্বর্ণধামে গমন করেন । জীবনের এই সকল নিদারুণ ঘটনার স্মৃতি অবলম্বনে এই “অজ্ঞাহার” গ্রন্থিত । ভরসা-করি, পবিত্র শোকাক্রান্ত বলিয়া এই ক্ষুদ্র কাব্যের সহস্র দোষ এবং ইহা জনসমাজে প্রকাশের অপরাধ মাফকরী হইবে ।” সমালোচককে কাব্য-করিবার আভ্যন্তরীণ পূর্ণমাত্রার বিদ্যমান । আমবা গ্রন্থকারের চুপে সমবেদনা দেখাইতে পারি, কিন্তু তাহা কর্তৃক সাধারণের ও সাহিত্যের এই নিগ্রহ সহ্য করিতে অক্ষম । যেগুলি নিত্যন্তই subjective (ব্যক্তি-গত) কবিতা, তাহার মধ্যে আসাধারণ কবিত্ব না থাকিলে সাধারণের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই । একপদ পদ্য বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ চলে, সাধারণগ্রন্থ হইবার আশা করা অস্বাভাবিক । আপনাকে বিধে যিনি যত ব্যাপ্ত লুপ্ত কবিত্তে পারিয়াছেন তিনি তত বড় কবি, তাহার সহিত সাধারণ হৃদয়ের সংযোগ তত প্রগাঢ় । গ্রন্থকার প্রত্যেক কবিতায় আপনাকে সম্পূর্ণ রাখিয়াছেন । যাহাই হউক এই একটি ছপড়িয়া দিয়া পদ্যগুলির নিজস্ব গুণের বিচার কবিলে বলিতে হয় কবিতাগুলি প্রাপ্ত ও সরস হইয়াছে । তথাপি বিশেষত্বের নিত্যন্ত অভাব ।

মেঘদূত—শ্রীঅখিলচন্দ্র, পালিত অনুদিত এবং বিবিধ টীকা টিপ্পনী সহিত সম্পাদিত । ডবল ক্রাউন বোডশাংশিত ১৫১ পৃষ্ঠা, মূল্য একটাকা । এ পর্যন্ত মেঘদূতের অনুবাদ হইয়াছে অনেকগুলি । বর্তমান সংস্করণ পূর্বজগণ অপেক্ষা কবিত্ব ও মাধুর্য্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ না হইলেও, ইহাব বিশেষত্ব আছে, যাহার গুণে ইহা আদৃত হইবে । ইহাতে মূল মেঘদূত আছে, তাহার পদ্যানুবাদ আছে । তাহা প্রাপ্ত করিবার জন্য পদ্য ব্যাখ্যা আছে ; পাদটীকার কঠিন শব্দের অর্থ ও অন্যান্য টিপ্পনী আছে । কবিবর্ণিত মেঘের পথ অনুসরণ কবিরা মেঘাতিক্রান্ত সকল জনপদ, নদ নদী প্রভৃতির ভৌগোলিক সংস্থান ও আধুনিক নাম প্রদত্ত হইয়াছে । এই সঙ্গে একখানি মানচিত্র থাকিলে আরো সুন্দর হইত । দ্বিতীয় সংস্করণ আবৃত্তক হইলে এই একটি অপনোদন করা হইবে আশা করি । ভূমিকায় লেখক সংক্ষেপে মেঘদূতের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উহা নিত্যন্তই সামান্য হইয়াছে । বিষয় স্তীতি উত্তম হইয়াছে । পরিশিষ্টে কালিদাসের সময় নির্ণয় করিবার চেষ্টা ও অন্যান্য

কয়েকটি বিষয়ের টিপ্পনী আছে । পদ্যানুবাদ মন্দ হয় নাই । কিন্তু এক একটা স্লোকের অনুবাদ আট দশ লাইনে কবিত্তে হইয়াছে । তাহাতে একই প্রকারের মিল পুনঃ পুনঃ ঘটায় ক্রান্তিকটু বোধ হয় । অনুবাদকের নিজ হৃদয়ের ইতিহাস স্বকপ অগ্রপশ্চাতের দুটি কবিতা সমালোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত না করিলেও সাধারণের কোনো ক্ষতি হইত না ।

কথাকুহল—শ্রীনাথরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত । “বদেশী” কার্যালয় হইতে প্রকাশিত । বোডশাংশিত ফুলফ্যান ১৬২ পৃষ্ঠা । মূল্য আট আনা মাত্র । এখানি গল্পের বই । আটটি গল্প আছে । সকল গুলিই সুস্থিতি । সকল গল্পগুলিতেই একটি চুপে মিশ্রণের এমন অলঙ্কারে স্তম্ভকর ভাৱ যে গল্প শেষ করিয়াও তাহার অনুসরণ অন্তরে বাজিতে থাকে । লেখকের ভাষা ভালো, কিছু পালিস কম, প্রতি পংক্তি সরস মধুর লাগে না । এই সম্বন্ধে স্বর্ণশোভা নামক হুম্মার গল্পটির আখ্যায়িকা নয়ৎৎ একটু শ্রীহীন বোধ হইয়াছে । গল্পগুলি পড়িলেই নতুন তৃতীয় কাঁটা হাত টের পাওয়া যায় । অগ্রহণীয় দ্বারা ভাষা মাফিক্ত করিলে এই অভাবটুকু দূর হইবে আশা করা যায় ।

চন্দ্রধর—শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত কাব্য । ১৭৪ পৃষ্ঠা । মূল্য এক টাকা । এখানি অমিতাকর কাব্য, বেহলার ভাসান অবলম্বনে লিখিত । ইহাতে কিন্তু চাঁদ সদাগর নতুন নাম পাইয়াছেন ‘চন্দ্রধর’, বেহলা সতী হইয়াছেন ‘বিপুল’, লক্ষ্মীর হইয়াছেন ‘লক্ষ্মীন্দ্র’ । এই সব অনর্থক পরিবর্তনে বা পুরাতন স্বল্পপ্রচলিত নামের পুনঃ প্রচলনে বাঙালীর অতি পরিচিত নামের সঙ্গে যে একটা মধুমর ভাব জড়িত আছে তাহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাতে লেখকও পাঠকের পূর্বসন্ধিত সহানুভূতিতে বঞ্চিত হইয়াছেন । বেহলা ও চাঁদ বেণের চরিত্রেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হইয়াছে । ইহাতে উত্তর চরিত্রই প্রাচীন কাব্যবর্ণিত চরিত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে মনে করি । এই কাব্যে চাঁদ সদাগর শত লাক্ষণীয় বিপর্য্যস্ত হইয়াও অবিচ্যুত বা মাদারুপিণী মনসাকে দেবী বলিয়া স্বীকার করেন নাই, পূজা করা ত’ দূরব কথা । তাহার মহেশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস খ্রীষ্টান মার্টার-দিসকে স্মরণ করায় । কবি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ঈশ্বর এক ও অবিচ্যুত—কর্ম্ম বিভাগে তাহারই শক্তি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকটিত হয় । সেই একের বহুরূপে প্রকাশকে পৃথক জ্ঞান করা নাহা বা অসম্ভব । যে অবিচ্যুতকে স্বীকার করিয়া বহুরূপে এককে দেখিতে পার সেই প্রকৃত জ্ঞানী । আর যে এককে বহু করিয়া দেখে তাহার ত’ গতি নাইই, আব যে একই জানে, ঈশ্বারায় বহুরূপ প্রকাশ মানে না, তাহার অন্তে সঙ্গতি হইলেও জীবনে দুর্ভোগ অনিবার্য্য । চাঁদ সদাগর শেষোক্ত প্রকৃতির বিশ্বাসীকপে চিত্রিত হইয়াছেন । চিত্রটি পরিচুত হইয়াছে । প্রাচীন কাব্যবর্ণিত বেহলার সতীত্ব পরীক্ষা ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ঠিকই হইয়াছে । বেহলা যে আত্মত্যাগ ও স্বামী-শ্রীতি দেখাইয়াছিলেন তাহাই তাহার যথেষ্ট পরীক্ষা । কিন্তু বক্ষ্যমান কাব্যে কবি বেহলাকে দিয়া দেবসভায় গান করাইয়া বেহলার প্রতি দেবপ্রসাদ আকর্ষণ করিয়াছেন । ইহাতে দেবতার দেবত্ব সিদ্ধি, বেহলারও সতীত্বগৌরব দান হইয়াছে । দেবতার নিকট বেহলার চরিত্র অপেক্ষা গানের কদর অধিক হইয়াছে । দেবতার প্রসাদ লাভ বিষয়ে বেহলার চরিত্রই যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কঠোর স্থপাতি নহে । কবি মনসাকে ঈশ্বর বিভূতিরই অংশ করিতে সিদ্ধা একটি প্রবৌলিকা রচনা করিয়াছেন । মহেশ্বরের সহিত মাদারু মনসার সম্বন্ধটা বেশ সম্পূর্ণ হয় নাই । এই পুস্তকখানি লেখকের কাব্য রচনার প্রথম প্রয়াস বলিয়া মনে হয় ; এখানো ভাব সংযত, আখ্যান বিষয়ে পূর্বসঙ্গর সামঞ্জস্য, করিবার ক্ষমতা লেখকের অনাঙ্গত্ব রহিয়াছে । নতুবা ভাষায় বাধুনি, প্রকাশে কবিত্ব ও রচনার পারিপাট্য আছে । সাধনার সুসিদ্ধি মিলিবে ।

উপমা স্তুলিতে এখনো কাঁচা হাতেব দাগ বেশ টের পাওয়া যায়। প্রাচ্য উপমাত্তেই পুথলিক উপমেয় বা উপমানের সহিত স্ত্রীলিক উপমান বা উপমেয়ের তুলনা বিশ্রী ক্রতিকটু হইয়াছে। অথচ কবি ইচ্ছা করিলেই এই বৈসাদৃশ্য পরিহার করিতে পারিতেন। একটি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি—

“অভাগী অমৃত নহে, হে নাথ, বিষম

কালকূট, কাল ফণীবর কঠে তব

কুম্বের মালা বলে’ ধরেছ আমারে,—(৩১ পৃষ্ঠা)

‘ফণীবর’ না লিখিয়া ‘ফণিনীরে’ লিখিলেই ‘অভাগী’ ও ‘মালা’র সহিত সমলিক হইয়া উপমা সার্থক ও স্পন্দন হইত। একপ অনবধানতা বহুবার ঘটয়াছে। ভাষাতেও দুই এক স্থলে অত্যাচার দৃষ্ট হইল—‘হ’ল অস্তর্ধান’ চলিত ভাষায় চলিলেও লিখিত ভাষায় ইহা অশুদ্ধ; ‘হ’ল অস্তর্হিত’ বা ‘কৈল (কবিল) অস্তর্ধান’ লেখা উচিত। ‘নতুবা’ শব্দের বদলে ‘নতু’ ব্যবহার বাংলা ভাষার প্রতি অত্যাচার; ‘নতুবা’ পূর্ণ আকারেই বাংলা, ‘নতু’ কিন্তু বাংলা নহে, সংস্কৃত। পুস্তকখানির ছাপা নিতুল হব গাই।

নবোদন—শ্রীনাথরাম চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাতুষণ প্রণীত। ফুলফাপ বোডশাংশিত ২৮২ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধানো। মূল্য এক টাকা। পুস্তক খানির ছাপা ও কাগজ কমধ্য। বহু স্থানে হবক উন্টিয়া গিয়াছে, সব লাইনগুলি এক দৈর্ঘ্যের নহে, কাবণ বন্দী ভালো করিয়া কহা হব নাই। সকল কর্ম্মীয় কালীও সমান হব নাই। ভুলও মধ্যে মধ্যে আছে। আজ কাল পুস্তকের বহিঃসৌষ্ঠব একটা মন্ত হুপারিশ, খুব বড় আকর্ষণীয়, ইহা গ্রন্থকারগণ ভুলেন কেন? বাহাই হটক, পুস্তকখানি হুস্থিখিত উপস্তাস। দেশে রাজশক্তির অত্যাচারের বিকল্পে ধর্ম্মসহায় হুর্কল প্রজা কি করিতে পারে তাহা হুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। দুই শত বৎসর আগে দেখে শুনে বাঙালী জাতি কি ছিল, ইহা তাহারই হুন্দব চিত্র। বাঙালীর আত্মবিবাদ ও হীন স্বার্থ দেশকে যে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে দেয় নাই ইহাতে তাহাই দেখানো হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি পাত্রে পাত্রী জীবন্ত ও স্বার্থ। সব চেয়ে স্পষ্ট হইয়াছে বোণু হু, কপনাথ, কমলা, শঙ্কর ও আবদুল—ইহারাই আধ্যাতিকাব কেনে। একটু যে বৈসাদৃশ্য আছে তাহা রামরূপ, কৃষ্ণকান্ত ও পার্শ্বতীর চরিত্রে। রামরূপ ও কৃষ্ণকান্তের দেশদ্রোহিতার কার্যকাবণ সম্পর্ক আরো পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। পার্শ্বতীর চরিত্র চিত্র এই হুন্দব উপস্তাস খানিব অমার্জনীয় কলঙ্ক। পার্শ্বতীর দ্রষ্ট চরিত্রেব বর্ণনা ও তাহার অনাচাব ভাবার ধেরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সামান্য ইঙ্গিতেই কার্য সিদ্ধি হইতে পারিত। রামরূপ ও পার্শ্বতীর ব্যবহার ও আলাপ কে আপনার স্ত্রী, কস্তা, ভর্য্যকে গড়িতে দিতে চাহিবে? ইহাদের উৎকট ও বীভৎস অনাচাব স্পষ্ট কবিতা চিত্রিত করিয়া গ্রন্থকার এমন হুন্দর উপস্তাস খানিকে ভদ্র পরিবাবের অপার্য্য কবিযাছেন। ২০৬২০৭ পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যেন এই পুস্তক বাজারে দেওয়া হয়, নতুবা এই পুস্তক পাঠে উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক হইবে। এই সব স্বপ্ন চরিত্রের লোক শেষ পর্য্যন্তও অমৃতপ্ত নহে, ইহাই আরো আপস্তির কাবণ। পাণেব হুধময় চিত্র ও ধর্ম্মের নির্যাতন যদি সতর্কতার সহিত না দেখাইতে পাবা যায়, তবে হুন্দর সঙ্কল্প পাণপ্রবণ মন পাণের চিত্রেব প্রতি অলঙ্কা

আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই পুস্তক বিদ্যাতুষণ মহাশয়ের সাহিত্য সেবার প্রথম কল। কল হুস্থি কিস্ত কীটাকুলিত; এই এক দোষ গুণরাশি-নাশী হইয়াছে। ইহা বাংলা সাহিত্যেব পরিতাপের বিষয়। প্রথম সংস্করণ নষ্ট করিয়া সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কবিলে সাহিত্য ও সমাজ উপকৃত হইবে, গ্রন্থকারও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। প্রথম রচনার অসংযত অংশ পরিপাক না করিয়াই প্রকাশ কবা বুদ্ধিমান গ্রন্থকারেব উচিত হয় নাই।

কুমদানন্দ—শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাতুষণ প্রণীত ঐতিহাসিক উপস্তাস। ডবল ক্রাউন বোডশাংশিত ২৬২ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা চারি আনা; প্রকাশক শ্রীশঙ্করদাস চট্টোপাধ্যায়। এই উপস্তাস খানির আগাগোড়া সব অস্পষ্ট। উদ্দেশ্য অস্পষ্ট, বক্তব্য অস্পষ্ট, পাত্রপাত্রী চরিত্র ও ব্যবহার অস্পষ্ট, ভাষা অস্পষ্ট। এই অন্ন পরিসরের ভিতর বিদ্যাতুষণ মহাশয় এক গাথা পাত্রপাত্রী জড়ো কবিযাছেন, কিস্ত ফুটে নাই একটরও চরিত্র। যদি কেহ একটু ফুটিয়া থাকে তবে সে কুমদানন্দের মাতা জয়া ঠাকুরাণী। আর সব এক একটা প্রহেলিকা, তাহার মধ্যে বিরাট প্রহেলিকা জয়ন্তী। পাত্রপাত্রীগণ কখন কি উদ্দেশ্যে কি কাজ কবে, কে কখন কোথায় যায় কোথায় থাকে, কি করিয়া কি হয়, তাহা কোথাও স্পষ্ট পরিবাস্তব নহে। সব আবছারা, আন্দাজি হাতডাইয়া চলিতে হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য গ্রন্থখানিকে আরো জীতির আপাদ করিয়াছে। ভাষা ত’ না বাংলা, না সংস্কৃত, ‘কুলুপিত হুন্তে’ যুবক যুবতী আলাপ ‘করিছে’, দুঃখে ‘জলধারা বৃষ্ট’ ‘হইছে’, ‘বিপদে রক্ষিতা নারায়ণ’ ইহা ‘দেখিছে’।

বিদ্যাতুষণ মহাশয়ের ব্যবহার পথে হুরকি না দিয়া ‘ইষ্টকচূর্ণ’ দিতে হইবে, বাঙালীর কুললক্ষ্মীদিগকে উনন হইতে ‘বেষ্টিকা’ দিয়া হাঁড়ি নামাইতে হইবে। স্থানে স্থানে ভাষা চলিত ও সংস্কৃত কথার নির্দ্বন্দ্ব সংমিশ্রণে গঠিত, স্থানে স্থানে সাধু সংস্কৃত উৎকট হইয়াছে—কিস্ত ষাটি বাংলা কদাচিত্র মিলে। এই উপস্তাস পক্ষাশ বৎসর পূর্বে লিখিলে চলিলেও চলিতে পারিত, আজকাল নিতান্ত অচল। ইহা পাঠের পর কিস্ত বেশ একটা অবাচ্য কৌতুক অমৃতব করিবাছি। সেই পরম লাভ। এই পুস্তকের বাহা ভালো, বাহা হুন্দব, বাহা উপভোগ্য, তাহা নিজে উদ্ধৃত করিলাম :—

“রাজবাজেখরি ভারতজননি।

আকুলমনিশঃ যোদিষি ছঃখিনি।

(কোরস)

মহীতল-ধন্তে, বহুধন-পূর্ণে,

হুমধুর-জলফল-শস্য-প্রদখিনি।

শ্রীবাম-লক্ষণ, ভীষ্ম-ভীমাঙ্কন,

বাস-মহু-পাণিনি-গোতম-সুতিনি।

তে তব দিবস, বিগন্ত বিবশা,

রিপুল-দারুণ-বন্ধন-কম্পিনি।

দিশ হুতপংগ অরাতি দলনং,

ধাবিংশতিকোট সন্ততিশালিনি।”

(ষিঁকিট বাধাজ—একতাল।)

মুদ্রা-রাক্ষস।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

৮ম ভাগ ।

আষাঢ়, ১৩১৫ ।

৩য় সংখ্যা ।

গোরা ।

২৪

অভিনয়ের অভ্যাস উপলক্ষ্যে বিনয় প্রত্যহই আসে। সুচরিতা তাহাব দিকে একবার চাহিয়া দেখে, তাহাব পদে হাতের বইটাব দিকে মন দেয় অথবা নিজের ঘরে চলিয়া যায়। বিনয়ের একলা আসাব অসম্পূর্ণতা প্রত্যহই তাহাকে আঘাত করে কিন্তু সে কোনো প্রদ্ব করে না। অথচ দিনের পূব দিন এমনি ভাবে যতই যাইতে লাগিল, গোবাব বিকল্পে সুচরিতাব মনের একটা অভিযোগ প্রতিদিন যেন তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। গোরা যেন আসিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, এমনি একটা ভাব যেন সেদিন ছিল।

অবশেষে সুচরিতা যখন শুনিলা গোবা নিতান্তই অকারণে কিছুদিনেব জন্ত কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, তখন কথাটাকে সে একটা সামান্ত সংবাদেব মত উড়াইয়া দিবার চেষ্টা কবিল—কিন্তু কথাটা তাহার মনে বিধিয়াই রহিল। কাজ করিতে কবিত্তে হঠাৎ এই কথাটা মনে পড়ে,—জন্মমন্ড হইয়া আছে, হঠাৎ দেখে এই কথাটাই সে মনে মনে ভাবিত্তেছিল।

গোরাব সঙ্গে সেদিনকার আলোচনাব পর তাহার

এরূপ হঠাৎ অন্তর্ধান সুচরিতা একেবারেই আশা করে নাই। গোরাব মতের সঙ্গে নিজের সংস্কারের এতদূর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেদিন তাহার অন্তঃকরণে বিদ্রোহেব উজ্জান হাওয়া কিছুমাত্র ছিল না, সেদিন সে গোরাব মতগুলি স্পষ্ট বুঝিতেছিল কি না বলা যায় না,—কিন্তু গোবা মানুষটাকে সে যেন একরকম করিয়া বুঝিয়াছিল। গোরাব মত যাহাই থাকুনা সে মতে যে মানুষকে ক্ষুদ্র করে নাই, অবজ্ঞার যোগ্য করে নাই, বরঞ্চ তাহার চিন্তেব বলিষ্ঠতাকে যেন প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া তুলিয়াছে ইহা সেদিন সে প্রবল ভাবে অনুভব করিয়াছে। এ সকল কথা আর কাহারো মুখে সে সহ্য করিতেই পারিত না, রাগ হইত, সে লোকটাকে মুচ মনে করিত, তাহাকে শিক্ষা দিয়া সংশোধন করিবার জন্ত মনে চেষ্টার উত্তেজনা হইত; কিন্তু সেদিন গোরাব সন্ধে তাহার কিছুই হইল না; গোরাব চরিত্রেব সঙ্গে, বুদ্ধিবি বীজ্যতাব সঙ্গে, অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসেব দৃঢ়তার সঙ্গে এবং মেঘমন্ড কর্তব্যের মর্মান্বিত প্রবলতার সঙ্গে তাহার কথাগুলি মিলিত হইয়া একটা সজীব ও সত্য আকার ধারণ করিয়াছিল। এ সমস্ত মত সুচরিতা নিজে গ্রহণ না করিতে পারে, কিন্তু আব কেহ যদি ইহাকে এমন ভাবে সমস্ত বুদ্ধি বিশ্বাস সমস্ত জীবন দিয়া

গ্রহণ করে তবে তাহাকে ধিকার দিবাব কিছুই নাই, এমন কি, বিরুদ্ধ সংস্কার অতিক্রম করিয়াও তাহাকে শ্রদ্ধা করা বাইতে পাবে এই ভাবটা সূচরিতাকে সেদিন সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল। মনেব এই অবস্থাটা সূচরিতার পক্ষে একেবারে নূতন। মতের পার্থক্য সম্বন্ধে সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ছিল;—পরেশবাবুর একপ্রকার নির্লিপ্ত সমাহিত শাস্ত্র জীবনের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও সে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে বাল্যকাল হইতে বেষ্টিত ছিল বলিয়া মত জিনিষটাকে অতিশয় একান্ত কবিতা দেখিত;—সেই দিনই প্রথম সে মানুষের সঙ্গে মতের সঙ্গে সম্মিলিত কবিতা দেখিয়া একটা যেন সমগ্র সমগ্র পদার্থের রহস্যময় সত্তা অনুভব করিল। মানব সমাজকে কেবল আমার পক্ষ এবং অল্পপক্ষ এই দুই শাখা কালো ভাগে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার যে ভেদদৃষ্টি, তাহাই সেদিন সে ভুলিয়াছিল এবং ভিন্ন মতের মানুষকে মুখ্য ভাবে মানুষ বলিয়া এমন করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে ভিন্ন মতটা তাহার কাছে গৌণ হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন সূচরিতা অনুভব করিয়াছিল যে তাহার সঙ্গে আপাত করিতে গৌরা একটা আনন্দ বোধ করিতেছে। সে কি কেবল মাত্র নিজের মত প্রকাশ করিবাবই আনন্দ! সেই আনন্দদানে সূচরিতাবও কি কোনো হাত ছিল না! হয়ত ছিল না! হয়ত গোবাব কাছে কোনো মানুষের কোনো মূল্য নাই—সে নিজের মত এবং উদ্দেশ্য লইয়াই একেবারে সকলের নিকট হইতে স্বদূর হইয়া আছে—মানুষরা তাহার কাছে মত প্রয়োগ করিবার উপলক্ষ্য মাত্র!

সূচরিতা এ কয়দিন বিশেষ করিয়া উপাসনায় মন দিয়াছিল। সে যেন পূর্বের চেয়েও পরেশবাবুকে বেশি করিয়া আশ্রয় করিবাব চেষ্টা করিতেছিল। একদিন পরেশবাবু তাঁহার ঘরে একলা বসিয়া পড়িতেছিলেন এমন সময় সূচরিতা তাঁহার কাছে চূপ করিয়া গিয়া বসিল। পরেশবাবু বই টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি রাখে!”

সূচরিতা কহিল—“কিছু না।” বলিয়া, তাঁহার টেবিলের উপরে বসিচ বই কাগজ প্রভৃতি গোছানোই ছিল তবু সেগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া অন্তরকম করিয়া গুছাইতে লাগিল।

একটু পরে বলিয়া উঠিল, “বাবা, আগে তুমি আমাকে যে রকম পড়াতে এখন সেই রকম করে পড়াও না কেন?”

পরেশবাবু সম্মুখে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন “আমাব ছাত্রী যে আমার ইস্কুল থেকে পাস্ কবে বেরিয়ে গেছে! এখন ত তুমি নিজে পড়েই বুঝতে পার।”

সূচরিতা কহিল, “না, আমি কিছু বুঝতে পাবি নে, আমি আগের মত তোমার কাছে পড়ব।”

পরেশবাবু কহিলেন, “আচ্ছা বেশ, কাল থেকে পড়াব।”

সূচরিতা আবাব কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—“বাবা, সেদিন বিনয়বাবু জাতিভেদের কথা অনেক বলেন, তুমি আমাকে সে সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে বল না কেন?”

পরেশবাবু কহিলেন—“মা, তুমি ত জানই, তোমরা আপনি ভেবে বুঝতে চেষ্টা করবে, আমার বা আর কারো মত কেবল অভ্যস্ত কথার মতো ব্যবহার কববে না। আমি ববাবর তোমাদের সঙ্গে সেই রকম করেই ব্যবহার করেছি। প্রব্রটা ঠিক মত মনে জেগে ওঠবার পূর্বেই সে সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দিতে যাওয়া আব ক্ষুধা পাবার পূর্বেই খাবার খেতে দেওয়া একই—তাতে কেবল অকৃতি এবং অপাক হয়। তুমি আমাকে যখনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে আমি যা বুঝি বলব।”

সূচরিতা কহিল—“আমি তোমাকে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করচি, আমরা জাতিভেদকে নিন্দা করি কেন?”

পরেশবাবু কহিলেন—“একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়—মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায়, সেটাকে অধর্ম না বলে কি বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনই পৃথিবীতে বড় হতে পাবে না—অন্তেব অবজ্ঞা তাদের সহিতেই হবে।”

সূচরিতা গোবাব মুখে শোনা কথার অনুসরণ করিয়া কহিল—“এখনকার সমাজে যে বিকার উপস্থিত হয়েছে তাতে অনেক দোষ থাকতে পারে; সে দোষ ত সমাজের সকল জিনিষেই ঢুকেছে, তাই বলে আসল জিনিষটাকে দোষ দেওয়া যায় কি?”

পরেশবাবু তাঁহার স্বাভাবিক শাস্ত্রস্বরে কহিলেন—

“আসল জিনিষটা কোথায় আছে জানলে বলতে পাবতুম—
আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে মানুষ মানুষকে
অসহ্য ঘৃণা করচে এবং তাতে আমাদের সকলকে বিচ্ছিন্ন
করে দিচ্ছে, এমন অবস্থায় একটা কাল্পনিক আসল জিনিষের
কথা চিন্তা কবে মন সাধনা মানে কই ?”

সুচরিতা পুনশ্চ গোরাবাদের কথা প্রতিনিধিত্ব স্বরূপে
কহিল—“আচ্ছা, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখাই ত আমাদের
দেশের চরমতত্ত্ব ছিল।”

পবেশ বাবু কহিলেন—“সমদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞানের কথা,
হৃদয়ের কথা নয়। সমদৃষ্টির মধ্যে প্রেমও নেই, ঘৃণাও
নেই—সমদৃষ্টি রাগদ্বয়ের অতীত। মানুষের হৃদয় এমনতর
হৃদয়ধর্মবিহীন জায়গার স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।
সেইজন্তে আমাদের দেশে এককম সাম্যতত্ত্ব থাকা সম্ভব
নীচজাতকে দেবালয়ে পর্য্যস্ত প্রবেশ কর্ত্তে দেওয়া হয় না।
যদি দেবতার ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে সাম্য না থাকে তবে
দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সে তত্ত্ব থাকলেই কি আর না থাকলেই
কি ?”

সুচরিতা পরেশ বাবুর কথা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া
বসিয়া মনে মনে বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে
কহিল—“আচ্ছা বাবা, তুমি বিনয় বাবুদের এ সব কথা
বোঝাবার চেষ্টা কর না কেন ?”

পবেশ বাবু একটু হাসিয়া কহিলেন—“বিনয় বাবুদের
বুদ্ধি কম বলে যে এ সব কথা বোঝেন না তা নয়
—বরঞ্চ তাঁদের বুদ্ধি বেশি বলেই তাঁরা বুঝতে চাননা,
কেবল বোঝাতেই চান। তাঁরা যখন ধর্মের দিক থেকে
—অর্থাৎ সকলের চেয়ে বড় সত্যের দিক থেকে এসব কথা
অন্তবেব সঙ্গে বুঝতে চাইবেন তখন তোমার বাবার
• বুদ্ধির জন্তে তাঁদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে না। এখন
• তাঁরা অন্য দিক থেকে দেখছেন, এখন আমার কথা তাঁদের
কোনো কাজেই লাগবে না।”

গোরাবাদের কথা যদিও সুচরিতা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন—
ছিল তবু তাহা তাহার সংস্কারের সহিত বিবাদ বাধাইয়া
তাহার অন্তরের মধ্যে বেদনা দিতেছিল। সে শান্তি
পাইতেছিল না। অল্প পরেশ বাবুর সঙ্গে কথা কহিয়া
সেই বিরোধ হইতে সে ক্ষণকালের জন্ত মুক্তিলাভ করিল।

গোরা বিনয় বা আবু কেহই যে পরেশ বাবুর চেয়ে কোনো
বিষয়ে ভাল বুঝে এ কথা সুচরিতা কোনো মতেই মনে স্থান
দিতে চায় না। পরেশ বাবুর সঙ্গে যাহার মতের অনৈক্য
হইয়াছে সুচরিতা তাহার উপর রাগ না করিয়া থাকিতে
পারে নাই। সম্প্রতি গোরাবাদের সঙ্গে আলাপের পব গোরাবাদের
কথা একেবারে রাগ বা অবজ্ঞা কবিয়া উড়াইয়া দিতে
পারিতেছিল না বলিয়াই সুচরিতা এমন একটা কষ্ট বোধ
করিতেছিল। সেই জন্তই আবাব শিশুকালের মত কবিয়া
পবেশ বাবুকে তাঁহার ছায়াটির স্থায় নিয়ত আশ্রয় করিবার
জন্ত তাহার হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল।
চৌকি হইতে উঠিয়া দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া আবাব
ফিরিয়া আসিয়া সুচরিতা পরেশ বাবু পিছনে তাঁহার
চৌকির পিঠের উপর হাত রাখিয়া কহিল—“বাবা, আজ
বিকালে আমাকে নিয়ে উপাসনা করো।”

পরেশ বাবু কহিলেন—“আচ্ছা।”

তাহার পরে নিজের শোবার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ কবিয়া
বসিয়া সুচরিতা গোরাবাদের একেবারে অগ্রাহ্য করিবার
চেষ্টা করিল। কিন্তু গোরাবাদের সেই বুদ্ধি ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত
মুখ তাহার চোখের সম্মুখে জাগিয়া রহিল—তাহার মনে
হইতে লাগিল, গোরাবাদের কথা শুধু কথা নহে, সে যেন গোরা
• স্বয়ং ;—সে কথার আকৃতি আছে, গতি আছে, প্রাণ
আছে—তাহা বিশ্বাসের বলে এবং স্বদেশপ্রেমের বেদনায়
পরিপূর্ণ। তাহা মত নয় যে তাহাকে প্রতিবাদ করিয়াই
চুকাইয়া দেওয়া যাইবে—তাহা যে সম্পূর্ণ মানুষ—এবং সে
মানুষ সামান্য মানুষ নহে। তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে যে
হাত ওঠে না। অত্যন্ত একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া সুচরিতার
কান্না আসিতে লাগিল। কেহ যে তাহাকে এত বড় একটা
দ্বিধার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ উদাসীনের মত অনায়াসে
দূরে চলিয়া যাইতে পারে এই কথা মনে করিয়া তাহার বুক
ফাটিয়া যাইতে চাহিল অথচ কষ্ট পাইতেছে বলিয়াও থকা-
রের সীমা রহিল না।

এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, ইংরেজি কবি ড্রাইডেনের
রচিত সঙ্গীতবিষয়ক একটি কবিতা বিনয় ভাবব্যক্তির
সহিত আবৃত্তি করিয়া যাইবে এবং মেয়েরা অভিনয়মঞ্চে

উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হইয়া কাব্যলিখিত ব্যাপারের মূক অভিনয় করিতে থাকিবে। এ ছাড়া মেয়েরাও ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি এবং গান প্রভৃতি করিবে।

বরদাসুন্দরী বিনয়কে অনেক ভবসা দিয়াছিলেন যে তাহাকে তাঁহারা কোনো প্রকারে তৈরি কবিতা লইবেন। তিনি নিজে ইংবেজি অতি সামান্যই শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাব দলের দুই এক জন পণ্ডিতের প্রতি তাঁহার নির্ভর ছিল।

কিন্তু যখন আধুড়া বসিল, বিনয় তাহার আবৃত্তি দ্বারা বরদাসুন্দরীর পণ্ডিতসমাজকে বিস্মিত কবিতা দিল। তাঁহাদের মণ্ডলীবহির্ভূত এই ব্যক্তিকে গড়িয়া লইবার সুখ হইতে বরদাসুন্দরী বঞ্চিত হইলেন। পূর্বে যাহা বিনয়কে বিশেষ কেহ বলিয়া থাকিত করে নাই, তাহা, বিনয় এমন ভাল ইংরেজি পড়ে বলিয়া তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না কবিতা থাকিতে পারিল না। এমন কি, হাসান বাবুও তাঁহাব কাগজে মাঝে মাঝে লিখিবার জন্ত তাহাকে অনুরোধ করিল। এবং সুধীর, তাহাদেব ছাত্র-সভায় মাঝে মাঝে ইংবেজি বক্তৃতা করিবার জন্ত বিনয়কে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

ললিতার অবস্থাটা ভারি অদ্ভুত বকম হইল। বিনয়কে যে কোনো সাহায্য কাহাকেও করিতে হইল না, সে জন্ত সে খুসিও হইল, আবার তাহাতে তাহার মনের মধ্যে একটা অসন্তোষও জন্মিল। বিনয় যে তাহাদের কাহাবো অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরঞ্চ তাহাদের সকলের চেয়ে ভাল—সে যে মনে মনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিবে এবং তাহাদের নিকট হইতে কোনো প্রকার শিক্ষার প্রত্যাশা করিবে না ইহাতে তাহাকে আঘাত কবিতা লাগিল। বিনয়ের সম্বন্ধে সে যে কি চায়, কেমনটা হইলে তাহাব মন বেশ সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। মাঝে হইতে তাহার অপ্রসন্নতা কেবলি ছোটখাটো বিষয়ে তীব্র ভাবে প্রকাশ পাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বিনয়কেই লক্ষ্য করিতে লাগিল। বিনয়ের প্রতি ইহা যে সুবিচার নহে এবং শিষ্টতাও নহে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল; বুদ্ধিয়া সে কষ্ট পাইল এবং নিজেকে দমন কবিতা যথেষ্ট চেষ্টা কবিল। কিন্তু অকস্মাৎ অতি সামান্য উপলক্ষ্যেই কেন যে

তাহার একটা অসদত অন্তর্জ্বালা সংঘর্ষেব শাসন লঙ্ঘন করিয়া বাহির হইয়া পড়িত তাহা সে বুঝিতে পারিত না। পূর্বে যে ব্যাপাবে যোগ দিবার জন্ত সে বিনয়কে অবিশ্রাম উত্তেজিত কবিতাছে এখন তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্তই তাহাকে অস্থির কবিতা তুলিল। কিন্তু এখন সমস্ত আয়োজনকে বিপর্যাস্ত করিয়া দিয়া বিনয় অকারণে পলাতক হইবে কি বলিয়া? সময়ও আব অধিক নাই; এবং নিজেব একটা নূতন নৈপুণ্য আবিষ্কার করিয়া সে নিজেই এই কাজে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে।

অবশেষে ললিতা বরদাসুন্দরীকে কহিল, “আমি এতে থাকব না।”

বরদাসুন্দরী তাঁহার মেঝে মেয়েকে বেশ চিনিতেন, তাই নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?”

ললিতা কহিল “আমি যে পারিনে।”

বস্তুত যখন হইতে বিনয়কে আর আনাড়ি বলিয়া গণ্য করিবার উপায় ছিল না, তখন হইতেই ললিতা বিনয়ের সম্মুখে কোনো মতেই আবৃত্তি বা অভিনয় অভ্যাস করিতে চাহিত না—সে বলিত, আমি আপনি আলাদা অভ্যাস কবিতা। ইহাতে সকলেরই অভ্যাসে বাধা পড়িত কিন্তু ললিতাকে কিছুতেই পাবা গেল না। অবশেষে, হার মানিয়া অভ্যাসক্ষেত্রে ললিতাকে বাদ দিয়াই কাজ চালাইতে হইল।

কিন্তু যখন শেষ অবস্থায় ললিতা একেবারেই ভঙ্গ দিতে চাহিল, তখন বরদাসুন্দরীর মাধ্যম বজ্রাঘাত হইল। তিনি জানিতেন যে তাঁহার দ্বারা ইহাব প্রতিকার হইতেই পারিবে না। তখন তিনি পরেশ বাবু শরণাপন্ন হইলেন। পরেশ বাবু সামান্য বিষয়ে কখনোই তাঁহাব মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই অনুসারে সে পক্ষেও আয়োজন করিয়াছেন, সময়ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া পরেশ বাবু ললিতাকে ডাকিয়া তাহার মাধ্যম হাত দিয়া কহিলেন, “ললিতা, এখন তুমি ছেড়ে দিলে যে অঙ্কায় হবে।”

ললিতা রুদ্ধরোদন কণ্ঠে কহিল, “বাবা, আমি যে পারিনে। আমার হয় না।”

পবেশ কহিলেন, “তুমি ভাল না পারিলে তোমার অপরাধ হবে না কিন্তু না করলে অজ্ঞান হবে।”

ললিতা মুখ নীচু কবিতা দাঁড়াইয়া রহিল;—পবেশ বাবু কহিলেন, “মা, যখন তুমি ভাব নিয়েছ তখন তোমাকে ত সম্পন্ন কর্তেই হবে। পাছে অহংকাবে যা লাগে বলে আর ত পালাবার সময় নেই। লাগুক না যা, সেটাকে অগ্রাহ্য করেও তোমাকে কর্তব্য কব্তে হবে। পারবে না মা?”

ললিতা পিতার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল “পারব।”

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় বিশেষ করিয়া বিনয়ের সম্মুখেই সমস্ত সঙ্কোচ সম্পূর্ণ দূর করিয়া সে যেন একটা অতিবিক্ত বলের সঙ্গে যেন স্পর্ধা করিয়া নিজের কর্তব্যে প্রবৃত্ত হইল। বিনয় এত দিন তাহার আবৃত্তি শোনে নাই। আশ্চর্য্য হইল। এমন সুস্পষ্ট সতেজ উচ্চারণ—কোথাও কিছুমাত্র জড়িত নাই, এবং ভাব প্রকাশের মধ্যে এমন একটা নিঃসংশয় বল, যে, শুনিয়া বিনয় প্রত্যাশাতীত আনন্দ লাভ করিল। এই কর্তব্য তাহাৰ কাণে অনেকক্ষণ ধবিত্তা বাক্তিতে লাগিল।

কবিতা আবৃত্তিতে ভাল আবৃত্তিকারকের সম্বন্ধে শ্রোতার মনে একটা বিশেষ মোহ উৎপন্ন করে। সেই কবিতার ভাবটি তাহার পাঠককে মহিমা দান করে—সেটা যেন তাহার কর্তব্য, তাহার মুখশ্রী, তাহাৰ চরিত্রের সঙ্গে জড়িত হইয়া দেখা দেয়। ফুল যেমন গাছের শাখায় তেমনি কবিতাটিও আবৃত্তিকারকের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে বিশেষ সম্পদ দান করে।

ললিতাও বিনয়ের কাছে কবিতার মগ্নিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ললিতা এতদিন তাহার তীব্রতার দ্বারা বিনয়কে অনবরত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিল। যেখানে ব্যাধ সেইখানেই কেবলি যেমন হাত পড়ে, বিনয়ও তেমনি কল্পদিন ললিতার উক্ত বাক্য এবং তীক্ষ্ণ হাস্য ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পাবে নাই। কেন যে ললিতা এমন করিল, তেমন বলিল, ইহাই তাহাকে বাবদ্যার আলোচনা করিতে হইয়াছে;—ললিতার অসন্তোষের রহস্য যতই সে ভেদ করিতে না পারিয়াছে ততই ললিতার চিন্তা তাহার মনকে অধিকার করিয়াছে। হঠাৎ জ্ঞাতাবের বেলা ঘুম হইতে

জাগিয়া সে কথা তাহাৰ মনে পড়িয়াছে; পরেশ বাবুর বাড়িতে আসিবার সময় প্রত্যহই তাহার মনে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে আজ না জানি ললিতাকে কিরূপ ভাবে দেখা যাইবে। যে দিন ললিতা লেশমাত্র প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছে সেদিন বিনয় যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে এবং এই ভাবটি কি করিলে স্থায়ী হয় সেই চিন্তাই করিয়াছে কিন্তু এমন কোনো উপায় খুঁজিয়া পায় নাই যাহা তাহার আয়ত্তাধীন।

এ কয়দিনেব এই মানসিক আলোড়নের পর ললিতার কাব্য আবৃত্তির মাধ্যম্য বিনয়কে বিশেষ করিয়া এবং প্রবল করিয়া বিচলিত করিল। তাহার এত ভাল লাগিল যে কি বলিয়া প্রশংসা করিবে ভাবিয়া পাইল না। ললিতার মুখের সামনে ভাল মন্দ কোনো কথাই বলিতে তাহার সাহস হয় না—কেন না তাহাকে ভাল বলিলেই, যে, সে খুসি হইবে মনুষ্যচরিত্রের এই সাধারণ নিয়ম ললিতার সম্বন্ধে না খাটিতে পাবে,—এমন কি, সাধারণ নিয়ম বলিয়াই হয় ত খাটিবে না—এই কারণে, বিনয় উচ্ছ্বসিত হৃদয় লইয়া ববদাসুন্দরীর নিকট ললিতার ক্ষমতাব অল্প প্রশংসা করিল। ইহাতে বিনয়ের বিজ্ঞা ও বুদ্ধির প্রতি বরদা-সুন্দরীর শ্রদ্ধা আরও দৃঢ় হইল।

আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল। ললিতা যখন নিজে অল্পভব করিল তাহার আবৃত্তি ও অভিনয় অনিন্দনীয় হইয়াছে; সুগঠিত নোকা টেউয়ের উপর দিয়া যেমন করিয়া চলিয়া যায় সেও যখন তেমন সুন্দর করিয়া তাহার কর্তব্যের দ্রুততার উপর দিয়া চলিয়া গেল তখন হইতে বিনয়ের সম্বন্ধে তাহার তীব্রতাও দূর হইল। বিনয়কে বিমুগ্ধ করিবার জন্য তাহার চেষ্টামাত্র রহিল না। এই কাজটাতে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল এবং রিহার্সাল্ ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে তাহাৰ যোগ ঘনিষ্ঠ হইল। এমন কি, আবৃত্তি অথবা অন্য কিছু সম্বন্ধে বিনয়ের কাছে উপদেশ লইতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি রহিল না।

ললিতার এই পরিবর্তনে বিনয়ের বুকের উপর হইতে যেন একটা পাথরের বোঝা নামিয়া গেল। এত আনন্দ হইল যে যখন তখন আনন্দময়ীর কাছে গিয়া বালকের মত ছেলেমানুষি করিতে লাগিল। স্মৃতির তার কাছে বসিয়া

অনেক কথা বকিবার জন্ত তাহাব মনে কথা জমিতে থাকিল, কিন্তু আকস্মিক স্মৃতির তাব সঙ্গে তাহাব দেখাই হয় না। সুযোগ পাইলেই ললিতাব সঙ্গে আলাপ করিতে বসিত কিন্তু ললিতার কাছে তাহাকে বিশেষ সাবধান হইয়াই কথা বলিত হইত;—ললিতা যে মনে মনে তাহাকে এবং তাহাব সকল কথাকে তীক্ষ্ণভাবে বিচার করে ইহা জানিত বলিয়া ললিতার সম্মুখে তাহাব কথার স্রোতে স্বাভাবিক বেগ থাকিত না। ললিতা মাঝে মাঝে তাহাকে বলিত—“আপনি যেন বই পড়ে এসে কথা বল্চেন এমন করে বলেন কেন?”

বিনয় উত্তর করিত—“আমি যে এত বয়স পর্য্যন্ত কেবল বই পড়েই এসেছি, সেই জন্ত মনটা ছাপার বইয়ের মত হয়ে গেছে।”

ললিতা বলিত “আপনি খুব ভাল করে বলবাব চেষ্টা করবেন না—নিজের কথাটা ঠিক করে বলে যাবেন। আপনি এমন চমৎকার করে বলেন যে, আমার সন্দেহ হয় আপনি আর কারো কথা ভেবে সাক্ষিয়ে বল্চেন।”

এই কারণে, স্বাভাবিক ক্ষমতাবশত একটা কথা বেশ সুসজ্জিত হইয়া বিনয়ের মনে আসিলে ললিতাকে বলিবার সময় চেষ্টা করিয়া বিনয়কে তাহা শাদা করিয়া এবং স্বল্প করিয়া বলিতে হইত। কোনো একটা অলঙ্কৃত বাক্য তাহার মুখে হঠাৎ আসিলে সে লজ্জিত লইয়া পড়িত।

ললিতার মনেব ভিতর হইতে একটা যেন অকারণ মেঘ কাটিয়া গিয়া তাহাব হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বরদা-সুন্দরীও তাহার পরিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে এখন পূর্ব্বের ছায় কথায় কথায় আপত্তি প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া বসে না—সকল কাজে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয়। আগামী অভিনয়ের সাজসজ্জা ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাহার মনে প্রত্যহ নানা প্রকার নূতন নূতন কল্পনার উদয় হইতে লাগিল, তাহাই লইয়া সে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল। এ সম্বন্ধে বরদাসুন্দরীর উৎসাহ যতই বেশি হউক তিন খরচের কথাটাও ভাবেন—সেইজন্ত, ললিতা যখন অভিনয় ব্যাপারে বিমুখ ছিল তখনও যেমন তাঁহার উৎকর্ষার কাবণ ঘটনাছিল এখন তাহার উৎসাহিত অবস্থাতেও তেমনি তাঁহার সঙ্কট উপস্থিত হইল। কিন্তু

ললিতার উত্তেজিত কল্পনাবৃত্তিকে আঘাত করিতেও সাহস হয় না—যে কাজে সে উৎসাহ বোধ করে সে কাজের কোথাও লেশমাত্র অসম্পূর্ণতা ঘটিলে সে একেবারে দমিয়া যায়, তাহাতে যোগ দেওয়াই তাহাব পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

ললিতা তাহাব মনেব এই উচ্ছ্বসিত অবস্থায় স্মৃতির তাব কাছে অনেকবার ব্যগ্র হইয়া গিয়াছে। স্মৃতি তাহা হাসিয়াছে, কথা কহিয়াছে বটে কিন্তু ললিতা তাহার মধ্যে বারম্বার এমন একটা বাধা অনুভব করিয়াছে যে সে মনে মনে বাগ করিয়া ফিবিয়া আসিয়াছে।

একদিন সে পবেশ বাবুর কাছে গিয়া কহিল, “বাবা, স্মৃতি দিদি যে কোণে বসে বসে বই পড়বে, আব আমরা অভিনয় করতে যাব সে হবে না। ওকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।”

পরে বাবুও কয়দিন ভাবিতেছিলেন স্মৃতি তাহাব সঙ্গিনীদের নিকট হইতে কেমন যেন দূর্ব্বর্ত্তিনী হইয়া পড়িতেছিল। এরূপ অবস্থা তাহার চরিত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন। ললিতার কথা শুনিয়া আকস্মিক তাঁহার মনে হইল, আমোদপ্রমোদে সকলের সঙ্গে যোগ দিতে না পারাতে স্মৃতির এইরূপ পার্থক্যের ভাব প্রশ্রয় পাইয়া উঠিতেছে। পরেশ বাবু ললিতাকে কহিলেন—“তোমার মাকে বল গে।”

ললিতা কহিল, “মাকে আমি বলব, কিন্তু স্মৃতিদিকে রাজি করবার ভার তোমাকে নিতে হবে।”

পরে বাবু যখন বলিলেন তখন স্মৃতি তাহাব আপত্তি করিতে পারিল না—সে আপন কর্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হইল।

স্মৃতি তাহাব সহিত পূর্ব্বের ছায় আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু এই কয়দিনে কি একটা হইয়াছে, ভাল করিয়া স্মৃতির যেন নাগাল পাইল না। তাহাব মুখশ্রীতে, তাহার দৃষ্টিপাতে এমন একটা সুদৃব্ব প্রকাশ পাইতেছে যে তাহাব কাছে অগ্রসর হইতে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বের মেশামেশার কাজকর্মের মধ্যে স্মৃতির একটা নিলিপ্ততা ছিল এখন সেইটে অত্যন্ত পরিষ্কৃত হইয়া

উঠিয়াছে। সে যে অভিনয় কার্যের অভ্যাসে যোগ দিয়াছিল তাহার মধ্যেও তাহাব স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নাই। কাজের জন্ত তাহাকে যতটুকু দরকাব সেইটুকু সারিয়াই সে চলিয়া যাইত। সূচরিতাব এইরূপ দুরত্ব প্রথমে বিনয়কে অত্যন্ত আঘাত দিল। বিনয় মিস্ত্রিক লোক, যাহাদের সঙ্গে তাহার সৌহৃদ্য তাহাদের নিকট হইতে কোনোপ্রকার বাধা পাইলে বিনয়ের পক্ষে তাহা অত্যন্ত কঠিন হয়। এই পরিবাবে সূচরিতার নিকট হইতেই এতদিন সে বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করিয়া আসিয়াছে, এখন হঠাৎ বিনাকারণে প্রতিহত হইয়া বড়ই বেদনা পাইল। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিল এই একই কারণে সূচরিতার প্রতি ললিতার মনেও অভিমানেব উদয় হইয়াছে তখন বিনয় সাস্থ্যনালাভ করিল এবং ললিতাব সহিত তাহার সম্বন্ধ আবার ঘনিষ্ঠ হইল। তাহার নিকট হইতে সূচরিতাকে এড়াইয়া চলিবার অবকাশও সে দিল না—সে আপনাই সূচরিতার নিকটসংস্রব পরিত্যাগ করিল এবং এমন করিয়া দেখিতে দেখিতে সূচরিতা বিনয়ের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গেল।

এদিকে সূচরিতাকে অভিনয়ে যোগ দিতে দেখিয়া হঠাৎ হারান বাবুও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্যারাডাইস্ গষ্ট হইতে এক অংশ আবৃত্তি করিবেন এবং ড্রাইডেনেব কাব্য আবৃত্তির ভূমিকা স্বরূপে সঙ্গীতের মোহিনীশক্তিসম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিবেন বলিয়া স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে বরদাসুন্দরী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, ললিতাও সন্তুষ্ট হইল না। হারান বাবু নিজে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিয়া এই প্রস্তাব পূর্বেই পাকা কবিতা আসিয়াছিল। ললিতা যখন বলিল ব্যাপারটাকে এত সুদীর্ঘ কবিতা তুলিলে ম্যাজিষ্ট্রেট হয় ত আপত্তি করিবেন তখন হারান বাবু পকেট হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক পত্র বাহির করিয়া ললিতাব হাতে দিয়া তাহাকে নিরুত্তর কবিতা দিলেন।

গোরা বিনা কাজে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে কবে ফিরিবে তাহা কেহ জানিত না। যদিও সূচরিতা এ সম্বন্ধে কোনো কথা মনে স্থান দিবে না ভাবিয়াছিল তবু প্রতিদিনই তাহাব মনেব ভিতরে আশা জন্মিত যে আজ হয়ত গোরা আসিবে। এ আশা কিছুতেই সে মন হইতে দমন করিতে পারিত না।

গোবার ঔদাসীন্য এবং নিজের মনের এই অবাধ্যতার যখন সে নিরতিশয় পীড়া বোধ করিতেছিল, যখন কোনো মতে এই জ্ঞান ছিল করিয়া পলায়ন কবিবার জন্ত তাহাব চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল এ সময় হাবানবাবু, একদিন বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের নাম কবিতা সূচরিতাব সহিত তাহাব সম্বন্ধ পাকা কবিবার জন্ত পরেশবাবুকে পুনরবার অনুরোধ করিলেন। পরেশবাবু কহিলেন—“এখনোত বিবাহেব বিলম্ব আছে এত শীঘ্র আবদ্ধ হওয়া কি ভাল ?”

হারানবাবু কহিলেন—“বিবাহের পূর্বে কিছুকাল এই আবদ্ধ অবস্থায় যাপন কবা উত্তমের মনেব পবিগতিব পক্ষে বিশেষ আবশ্যক বলে মনে কবি। প্রথম পরিচয় এবং বিবাহেব মাঝ খানে এই বকম একটা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, যাতে সাংসারিক দায়িত্ব নেই অথচ বন্ধন আছে—এটা বিশেষ উপকারী।”

পবেশবাবু কহিলেন,—“আচ্ছা, সূচরিতাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।”

হারানবাবু কহিলেন—“তিনিই পূর্বেই মত দিয়াছেন।”

হারান বাবু প্রতী সূচরিতার মনের ভাব সম্বন্ধে পবেশ বাবুর এখনো সন্দেহ ছিল তাই তিনি নিজে সূচরিতাকে ডাকিয়া তাহাব নিকট হারান বাবুর প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সূচরিতা নিজেব দ্বিধাগ্রস্ত জীবনকে একটা কোথাও চূড়ান্ত ভাবে সমর্পণ করিতে পারিলে বাচে—তাই সে এমন অবিলম্বে এবং নিশ্চিত ভাবে সম্মতি দিল যে পরেশ বাবুর সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া গেল। বিবাহের এত পূর্বে আবদ্ধ হওয়া কর্তব্য কি না তাহা তিনি ভালরূপ বিবেচনা করিবার জন্ত সূচরিতাকে অনুরোধ করিলেন—তৎসম্বন্ধে সূচরিতা এ প্রস্তাবে কিছুমাত্র আপত্তি কবিল না।

ব্রাউনলো সাহেবেব নিমন্ত্রণ সারিয়া আসিয়া একটা বিশেষ দিনে সকলকে ডাকিয়া তাবী দম্পতিব সম্বন্ধ পাকা কবা হইবে এইরূপ স্থির হইল।

সূচরিতার ক্ষণকালের জন্ত মনে হইল তাহাব মন যেন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে। সে মনে মনে স্থির কবিল, হারান বাবুকে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কাজে যোগ দিবার জন্ত সে মনকে কঠোরভাবে প্রস্তুত করিবে। হারান বাবুর নিকট হইতেই সে প্রত্যহ খানিকটা করিয়া

ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংবেঞ্জি বই পড়িয়া তাঁহারই নির্দেশ মত চলিতে থাকিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিল। তাহার পক্ষে যাহা গুরুত্ব, এমন কি, অপূরণ্য, তাহাই গ্রহণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সে মনেব মধ্যে খুব একটা ক্ষীণতা অনুভব করিল। যাহা নীচস যাহা হৃদয় আশার পক্ষে তাহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে; নতুবা শৈথিল্যের আকর্ষণে আমি যে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি এবং তাহার পরিণামফল যে কি তাহার কোনো ঠিকানা নাই—এই বলিয়া সে মনে মনে কৈামর বাধিয়া দাঁড়াইল।

হাবানবাবুর সম্পাদিত ইংরেজি কাগজ কিছুকাল ধরিয়া সে পড়ে নাই। আজ সেই কাগজ ছাপা হইবামাত্র তাহার হাতে আসিয়া পড়িল। বোধ করি হাবানবাবু বিশেষ কবিরাই পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সুচবিতা কাগজখানি ঘরে লইয়া গিয়া শিব হইয়া বসিয়া পরম কর্তব্যেব মত তাহার প্রথম লাইন হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল। শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্রে নিজেকে ছাত্রীর মত জ্ঞান করিয়া এই পত্রিকা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

আজ পালে চলিতে চলিতে হঠাৎ পাহাড়ে ঠেকিয়া কাৎ হইয়া পড়িল। এই সংখ্যায় “সেকেন্দ্রে বায়ুগ্ৰস্ত” নামক একটি প্রবন্ধ আছে, তাহাতে, বর্তমান কালের মধ্যে বাঁস কবিরাজ যাহারা সেকালের দিকে মুখ ফিরাইয়া আঁইছ, তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে। যুক্তিগুলি যে অসঙ্গত তাহা নহে, বস্তুত একপ যুক্তি সুচরিতা সন্ধান কবিতেনিছিল কিন্তু প্রবন্ধটি পড়িবামাত্রই সে বুঝিতে পারিল যে এই আক্রমণেব লক্ষ্য গোরা। অথচ তাহার নাম নাই, অথবা তাহার লিখিত কোনো প্রবন্ধের উল্লেখ নাই। প্রত্যেক গুলিতে একটা করিয়া মানুষ মারিয়া সৈনিক যেমন খুঁসি হয় এই প্রবন্ধেব প্রত্যেক বাক্যে তেমনি কোনো একটি সম্ভাব্য পদার্থ বিদ্ধ হইতেছে বলিয়া যেন একটা হিংসার আনন্দ ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রবন্ধ সুচবিতার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহার প্রত্যেক যুক্তি প্রতিবাদের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে তাহার ইচ্ছা হইল। সে মনে মনে কহিল গোরামোহন বাবু যদি ইচ্ছা করেন তবে এই প্রবন্ধকে তিনি খুলাস লুটাইয়া দিতে পারেন। গোরার উজ্জল মুখ তাহার

চোখের সামনে জ্যোতির্ময় হইয়া আগিয়া উঠিল এবং তাহার প্রবল কর্ণস্বর সুচরিতার বকের ভিতর পর্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই মুখের ও বাক্যের অসামান্যতার কাছে এই প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকের ক্ষুদ্রতা এমনই তুচ্ছ হইয়া উঠিল যে সুচবিতা কাগজ খানাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

অনেক কাল পরে সুচবিতা আপনি সে দিন বিনয়েব কাছে আসিয়া বসিল এবং তাহাকে কথায় কথায় বলিল—
“আচ্ছা, আপনি যে বলেছিলেন যে সব কাগজে আপনাদের লেখা বেরিয়েছে আমাকে পড়তে এনে দেবেন, কই দিলেন না?”

বিনয় এ কথা বলিল না যে ইতিমধ্যে সুচরিতার ভাবান্তর দেখিয়া সে আপন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সাহস করে নাই—সে কহিল, “আমি সেগুলো একত্রে সংগ্রহ কবে রেখেছি, কালই এনে দেব।”

বিনয় পর দিন পুস্তিকা ও কাগজের এক পুঁটুলি আনিয়া সুচবিতাকে দিয়া গেল। সুচরিতা সেগুলি হাতে পাইয়া আর পড়িল না বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিল। পড়িতে অত্যন্ত ইচ্ছা করিল বলিয়াই পড়িল না। চিন্তকে কোনো মতেই বিক্ষিপ্ত হইতে দিবে না প্রতিজ্ঞা কবিরাজ নিজের বিদ্রোহী চিন্তকে পুনর্বার হাবানবাবুর শাসনাধীনে সমর্পণ কবিরাজ আর একবার সে সাক্ষ্য অনুভব কবিল।

২৬

বিনয় কয়দিন গোবাব কথা ভাবিবার অবকাশ মাত্র পায় নাই। একদা, মাঝবের মধ্যে গোরাই বিনয়ের চিন্তা কবিরাজ প্রধান বিষয় ছিল। ইতিপূর্বে গোরাব সহিত বিনয়েব এতদিনের বিচ্ছেদ কখনই ঘটে নাই; ষটিলেও বিনয় অন্যাসে তাহা বহন করিতে পারিত না।

এবাবে গোবাব অনুপস্থিতি বিনয় যে কেবল অনুভব কবে নাই তাহা নহে, এই অনুপস্থিতিকালে সে বিশেষ করিয়া একটা স্বাতন্ত্র্যমুখ উপভোগ কবিরাজছিল। গোরা কোন্ কাজটাকে কিরূপ ভাবে দেখিবে বিনয় এপর্যন্ত জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসাবেও তাহাই বিচার কবিরাজ করিয়াছে। বিনয়েব সঙ্গে গোরার প্রকৃতিভেদ থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ইহাতে কোনো বিয় ঘটে নাই। গোবাব

প্রবল ইচ্ছার কাছে বিনয় অনায়াসেই আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে—এমন কি, সে যে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছে সে কথাও সে আপনি জানিত না ।

বিনয়কে গোরাব অমুভবতা বলিয়া ললিতা যখন তাহাকে দুই একটা খোঁচা দিয়াছিল তখন বিনয় সেটাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য মনে করিয়াছিল । কিন্তু তখনই গোরাব সহিত নিজের সম্বন্ধ লইয়া বিনয় সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল । গোরাব আধিপত্য অস্বীকার করিতে গিয়াই গোরাব আধিপত্য সে অমুভব করিয়াছিল । সে মাঝে মাঝে বুকিতে পারিয়াছিল যে, গোরাব ভাবনার দ্বারা নিজের ভাবনাকে বাধিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার মন কখন যে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা সে নিজেই বুকিতে পারে নাই । গোরাব এই আধিপত্যে এতদিন পরে বিনয় পীড়া ও লজ্জা অমুভব করিয়াছে । এমন কি গোরাব সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তাহার মত যে মেলে না এই কথা বলিবার ক্ষমতা তাহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে । অথচ সে কথা বলিতে তাহার হৃদয়ে কষ্টবোধ হইতে লাগিল । গোরা যে এতদিন তাহার সম্পূর্ণ আত্মগত্যা পাইয়াছে সেই আত্মগত্যা হইতে তাহাকে সহসা আঁজ বঞ্চিত করিলে গোরা যে কত বড় একটা আঘাত পাইবে তাহা মনে করিলেও বিনয় বেদনা বোধ করে ।

এবারে কয়দিন গোরা উপস্থিত না থাকাতো বিনয় অত্যন্ত অবাধে পবেশ বাবুর পরিবারের সঙ্গে সকল রকম কবিতা মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল । বিনয়ের স্বভাব এইরূপ অব্যাহতভাবে প্রকাশ পাওয়াতে পরেশ বাবুর বাড়ির সকলেই একটা বিশেষ তৃপ্তি অমুভব করিল । বিনয়ও নিজের এইরূপ বাধ্যমুক্ত স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দ পাইল এমন আর কখনো পায় নাই । তাহাকে যে ইহাদের সকলেরই ভাল লাগিতেছে ইহাই অমুভব করিয়া তাহাব ভাল লাগাইবার শক্তি আরো বাড়িয়া উঠিল । তাহার মুখে চক্ষে হাসিতে কথার প্রসঙ্গতা সর্বদা বিকীর্ণ হইতে থাকিল । পরিবারের বন্ধুবর্গ যে কেহ বিনয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে সকলেই তাহার বুদ্ধির অজস্র প্রশংসা করিল । বাস্তবিক বিনয় নিজের বুদ্ধিকেও নিজে জানিত না ;—সে সর্বদা গোরাব অসামান্যতা অমুভব করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত

করিবার উত্তম প্রয়োগ করিত না । এখন চারিদিকের একটা উৎসাহের উত্তেজনায় সে নিজের বুদ্ধির ক্ষুদ্র নিজেই বোধ করিতে পারিয়াছিল । তাহাব প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিপূর্ণতার জোয়ার আসিয়া তাহাব বকের ভিতরে দিন রাত্রি একটা কলধ্বনি চলিতে লাগিল । অভিনয়ের সহায়তা করা, আবৃত্তি করা, আবৃত্তি দেখানো, কাগজ লেখা, সভায় বক্তৃতা দেওয়া প্রভৃতি নানাদিকেই তাহার আনন্দিত শক্তি যেন ছুটিয়া চলিল । এতদিন পরে সে স্পষ্ট বুকিতে পারিল যে, সে লোককে খুসি করিতে পারে, এমন কি, শিক্ষা দিতেও পারে ।

গোরাব কথা বিনয়ের মনে আর তেমন কবিতা জাগিল না । বাসায় ফিবিতে তাহার রাত হইত ; ফিরিয়া আসিয়া একলা ঘরে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া অন্তরের উত্তেজনাকে পবিপাক করিত । সেই অবকাশের সময়, গোবা কোথায় আছে, কি করিতেছে, এ চিন্তা তাহার মনে যদি ক্ষণকালের জন্ত জাগিত তবে পরক্ষণেই পরেশ বাবুর বাড়িতে দিন-বাপনের বহুবিধ স্থতিতে তাহা একেবারেই আচ্ছন্ন হইয়া যাইত । প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই, আজ বিকালে তিনটার সময় পরেশ বাবুর বাড়িতে যাইতে হইবে, এই কথাটাই সর্বপ্রথমে মনে পড়িত ;—এই চিন্তায় তাহাব প্রথম প্রভাতের সূর্যালোক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত । ইতিমধ্যে কোনো কোনো দিন আনন্দময়ীও ওখানে একবার ছুটিয়া যাইত—আবার কোনোদিন বা সতীশকে তাহার বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাব সমবয়সীর মত তাহাব সঙ্গে আনন্দ করিয়া মধ্যাহ্ন কাটাইয়া দিত ।

প্রকৃতির এই প্রসারণের সময়ে, নিজেকে স্বতন্ত্র শক্তিতে অমুভব করিবার দিনে বিনয়ের কাছ হইতে সূচরিতা দূবে চলিয়া গেল । এই ক্ষতি এই আঘাত অল্প সময় হইলে হ্রঃসহ হইত, কিন্তু এখন সেটা সে সহজেই উত্তীর্ণ হইয়া গেল । আশ্চর্য্য এই যে, ললিতাও সূচরিতার ভাবান্তর উপলক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি পূর্বের তায় অভিমানে প্রকাশ কবে নাই । আবৃত্তি ও অভিনয়ের উৎসাহই কি তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল ?

শশিমুখী তাহার পাশে বসিয়া সুপারি কাটিয়া সুপাকার করিতেছিল। এমন সময় বিনয় আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই শশিমুখী তাহার কোলের আঁচল হইতে সুপারি ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। আনন্দময়ী একটুখানি মুচ্কিয়া হাসিলেন।

বিনয় সকলেরই সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে পারিত। শশিমুখীর সঙ্গে এতদিন তাহার যথেষ্ট হস্ততা ছিল। উভয় পক্ষেই পরস্পরের প্রতি খুব উপদ্রব চলিত। শশিমুখী বিনয়ের জুতা লুকাইয়া রাখিয়া তাহার নিকট হইতে গল্প আদার করিবার উপায় বাহির করিয়াছিল। বিনয় শশিমুখীর জীবনের দুই একটা সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাহাতে যথেষ্ট রংফলাইয়া দুই একটা গল্প বানাইয়া রাখিয়াছিল তাহারই অবতারণা করিলে শশিমুখী বড়ই জন্ম হইত—প্রথমে সে বস্তার প্রতি মিথ্যাভাষণের অপবাদ দিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদের চেষ্টা করিত; তাহাতে হার মানিলে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিত। সেও বিনয়ের জীবনচরিত বিকৃত করিয়া পাণ্টা গল্প বানাইবার চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু রচনাশক্তিতে সে বিনয়ের সমকক্ষ না হওয়াতে এসম্বন্ধে বড় একটা সফলতা লাভ করিতে পারে নাই!

যাহা হোক, বিনয় এ বাড়িতে আসিলেই সব কাজ ফেলিয়া শশিমুখী তাহার সঙ্গে গোলমাল করিবার জন্ত ছুটিয়া আসিত। এক একদিন এত উৎপাত করিত যে আনন্দময়ী তাহাকে ভৎসনা করিতেন কিন্তু দোষ ত তাহার একবার ছিল না, বিনয় তাহাকে এমনি উত্তেজিত করিয়া তুলিত যে আত্মসম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। সেই শশিমুখী আজ যখন বিনয়কে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল তখন আনন্দময়ী হাসিলেন কিন্তু সে হাসি সুখের হাসি নহে।

বিনয়কেও এই ক্ষুদ্র ঘটনায় এমন আঘাত করিল যে সে কিছুক্ষণের জন্ত চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনয়ের পক্ষে শশিমুখীকে বিবাহ করা যে কতখানি অসম্ভব তাহা এইরূপ ছোটখাটো ব্যাপারেই ফুটিয়া উঠে। বিনয় যখন সম্মতি দিয়াছিল তখন সে কেবল গোবার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্বের কথাই চিন্তা করিয়াছিল, ব্যাপারটাকে কল্পনার দ্বারা আবৃত্তি করে নাই। তা ছাড়া, আমাদের দেশে

বিবাহটা যে প্রধানত ব্যক্তিগত নহে তাহা পারিবারিক, এই কথা লইয়া বিনয় গোবব করিয়া কাগজে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছে; নিজেরও এ সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিতৃষ্ণাকে মনে স্থানও দেয় নাই। আজ শশিমুখী যে বিনয়কে দেখিয়া আপনার বর বলিয়া জিভ কাটিয়া পলাইয়া গেল ইহাতে শশিমুখীর সঙ্গে তাহার ভাবী সম্বন্ধের একটা চেহারা তাহার কাছে দেখা দিল। মুহূর্তের মধ্যেই তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। গোরা যে তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাহাকে কতদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতেছিল ইহা মনে করিয়া গোরার উপরে তাহার রাগ হইল, নিজের উপরে দ্বিধার জন্মিল, এবং আনন্দময়ী যে প্রথম হইতেই এই বিবাহে নিবেদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাহার সুন্দরশিতায় তাহার প্রতি বিনয়ের মন বিস্ময়মিশ্রিত ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী বিনয়ের মনের ভাবটা বুঝিলেন। তিনি অন্তরিক্তে তাহার মনকে কিবাইবার জন্ত বলিলেন; “কাল গোরার চিঠি পেয়েছি, বিনয়।”

বিনয় একটু অন্তমনস্ক ভাবেই কহিল “কি লিখেছে?”

আনন্দময়ী কহিলেন, “নিজের খবর বড় একটা কিছু দেয়নি। দেশের ছোট লোকদেব হৃদশা দেখে হুংখ করে লিখেছে। ঘোষপাড়া বলে কোন্ এক গ্রামে ম্যাজিষ্ট্রেট কি সব অন্তায় করেছে তারই বর্ণনা করেছে।”

গোরার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাবের উত্তেজনা হইতেই অসহিষ্ণু হইয়া বিনয় বলিয়া উঠিল—“গোরার ঐ ধরনের দিকেই দৃষ্টি, আর আমরা সমাজের বুকের উপরে বসে প্রতিদিন যে সব অত্যাচার করছি তা কেবলই মার্জনা করতে হবে, আর বলতে হবে এমন সংকল্প আর কিছু হতে পারে না!”

হঠাৎ গোরার উপরে এই দোষারোপ করিয়া বিনয় যেন অস্ত পক্ষ বলিয়া নিজেকে দাঁড় করাইল দেখিয়া আনন্দময়ী হাসিলেন।

বিনয় কহিল, “মা, তুমি হাসচ, মনে করচ হঠাৎ বিনয় এমন রাগ করে উঠল কেন? কেন রাগ হয় তোমাকে বলি। সুধীর সেদিন জামাকে তাদের নৈহাটি ষ্টেশনে তার এক বন্ধু বাগানে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা দেশলায়

ছাড়তেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। শোদপুর স্টেশনে যখন গাড়ি থামল, দেখি একটা সাহেবি কাপড় পরা বাঙালী নিজে মাথায় দিবা ছাতা দিয়ে তার জীকে গাড়ি থেকে নাবালে। জীর কোলে একটা শিশু ছেলে; গায়ের মোটা চাদরটা দিয়ে সেই ছেলোটিকে কোনোমতে ঢেকে ধোলা স্টেশনের একধারে দাঁড়িয়ে সে বেচারী শীতে ও লজ্জায় জড়সড় হয়ে ভিজতে লাগল—তার স্বামী জিনিষ পত্র নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁক ডাক বাধিয়ে দিলে। আমার এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল সমস্ত বাংলাদেশে কি রোদ্রে কি বৃষ্টিতে কি ভদ্র কি অভদ্র কোনো জীলোকের মাথায় ছাতা নেই। যখন দেখলুম স্বামীটা নিরলঙ্কার ভাবে মাথায় ছাতা দিয়েছে, আর তার জী গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে নীরবে ভিজচে, এই ব্যবহারটাকে মনে মনেও নিন্দা করচে না—এবং স্টেশন স্তম্ভ কোনো লোকের মনে এটা কিছুমাত্র অস্ত্রায় বলে বোধ হচ্ছে না তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমবা জীলোকদের অত্যন্ত সমাদর করি, তাদের লক্ষী বলে দেবী বলে জানি এসমস্ত অলীক কাব্যকথা আর কোনো দিন মুখেও উচ্চারণ করব না।”

আনন্দময়ী কহিলেন—“তা হোক বিনয়, তাই বলে—”

বিনয় অধীর হইয়া কহিল—“না, মা, এ সব তর্কের কথা নয়—আর কিছু দিন আগে হলে আমি নিজেই কোনোমতে এ সব কথা ভাবতেই পারতুম না কিন্তু এখন আমি এটা খুবই স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, মেয়েদের আমরা বিশেষভাবে কেবল ঘরের প্রয়োজনের জন্যেই গড়ে তুলেছি—কেবল সেই প্রয়োজনটুকুর মধ্যেই তাদের মর্যাদা আছে, সেই প্রয়োজনের বাইরে মানুষ বলে তাদের প্রতি দরদ নেই, তাদের প্রতি সন্মান নেই। বিশেষ প্রয়োজনের উপযোগী করে থাকেই আমরা খরচ করব তাকেই আমরা অনাদর না করে থাকতে পারব না—এটা মানুষের ধর্ম। গোরা—এক একদিন রাগে জলে উঠে বলতে থাকে—যে, ভারত-বর্ষের লোককে ইংবেজ কেবল সেইটুকু মানুষ করে তুলতে চায় যেটুকুতে এরা তাদের অধীন হয়ে বিনা আপত্তিতে এবং স্বেচ্ছাক্রমে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। আমবাও ঠিক ততটা পরিমাণে মানুষ করে তাদের কাজ বেশ ভাল করেই চালাচ্ছি; এতে মাইনে পাই, মাঝে মাঝে

বাহবাও পাই কিন্তু সন্মান পাইনে; পাওরাও অসম্ভব; কিন্তু যেই আমরা ইংরেজের প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে চাই অমনি তারা আশুন হয়ে ওঠে। তারা বলতে চায় যে তোমরা পৃথিবীর পূবদেশী লোক, স্বভাবতই তোমরা তাঁবেদারী ছাড়া আর কিছুই নও, অতএব সে চেষ্টা করলেই মাথা ভেঙে দেব। গোরা একথা মনেও করে না আমাদের দেশের মেয়েদেরও আমবা ঠিক এই রকম করেই খাটো কবে রেখেছি—তাই রেখেছি বলে আমরা সমস্ত দেশটা শুদ্ধ যে কত খাটো হয়ে গেছি তা আমরা বুঝতেও পারিনে। কিছুদিন থেকে আমার এই কথা মনে হচ্ছে, মা, আমি আর কোনো কাজ করতে পারি বা না পারি, দেশের মেয়েদের অবস্থা যদি কিছুমাত্র উন্নত কবতে পারি তা হলে নিজেই বদ্ধ মনে করব। তোমার পায়ের ধূলা নিয়ে তোমার আশীর্বাদে এ কাজ আমি করবই। এত দিন পরে আমার মনে হয়েছে, আমার নিজের কাজ আমি খুঁজে পেয়েছি।”

আনন্দময়ী বিনয়ের মাথায় হাত দিয়া কহিলেন “ভগবান তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।”

বিনয়। আমরা দেশকে বলি মাতৃভূমি, কিন্তু দেশের সেই নারীমূর্তির মহিমা দেশের জীলোকের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ না করি; বুদ্ধিতে, শক্তিতে, কর্তব্যবোধের ঐদার্য্যে আমাদের মেয়েদের যদি পূর্ণ পরিণত সতেজ সবল ভাবে আমরা না দেখি;—ঘরের মধ্যে দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা এবং অপরিণতি যদি দেখতে পাই তা হলে কখনই দেশের উপলক্ষি আমাদের কাছে উজ্জল হয়ে উঠবে না।

নিজের উৎসাহে হঠাৎ লজ্জিত হইয়া বিনয় স্বাভাবিক সুরে কহিল, “মা, তুমি ভাবচ, বিনয় মাঝে মাঝে এই রকম বড় বড় কথায় বক্তৃতা করে থাকে—আজ্ঞা তাকে বক্তৃতায় পেয়েছে। অভ্যাসবশত আমার কথাগুলো বক্তৃতার মত হয়ে পড়ে, আজ এ আমার কিন্তু বক্তৃতা নয়। দেশের মেয়েরা যে দেশের কতখানি, আগে আমি তা ভাল কবে বুঝতেই পারিনি—কখনো চিন্তাও করিনি। তাঁরা কেবল ঘরের লোকের মা বোন মেয়ে এই বলেই তাঁদের জানতুম। কিন্তু তাঁরা যখন মানুষ তখন ঘরের লোকের বাইরেও তাঁদের সম্বন্ধ আছে, এবং সেই বৃহৎ আত্মীয়তাকে তাঁরা বুদ্ধিব সঙ্গে,

হৃদয়ের সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে পালন করলে তবেই সমস্ত দেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়ে স্নান হয়ে উঠবে এ কথা আমার কাছে আজ ভারি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মা, আমি আর বেশি বকবো না। আমি বেশি কথা কই বলে আমার কথাকে কেউ আমারই মনের কথা বলে বিশ্বাস করে না। এবার থেকে কথা কমাব।”

বলিয়া বিনয় আর বিলম্ব না করিয়া উৎসাহদ্বীপ চিত্তে গ্রহণ করিল।

আনন্দময়ী মহিমকে ডাকাইয়া বলিলেন, “বাবা, বিনয়ের সঙ্গে আমাদের শশিমুখীর বিবাহ হবে না।”

মহিম। কেন? তোমার অমত আছে?

আনন্দময়ী। এ সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত টিকবে না বলেই আমার অমত, নইলে অমত করব কেন?

মহিম। গোরা রাজি হয়েছে, বিনয়ও রাজি, তবে টিকবে না কেন? অবশ্য, তুমি যদি মত না দাও তা হলে বিনয় এ কাজ করবে না সে আমি জানি।

আনন্দময়ী। আমি বিনয়কে তোমার চেয়ে ভাল জানি।

মহিম। গোরার চেয়েও?

আনন্দময়ী। হাঁ, গোরার চেয়েও ভাল জানি, সেই জন্তেই সকল দিক্‌ভাবে আমি মত দিতে পারছি নে।

মহিম। আচ্ছা গোরা ফিরে আসুক।

আনন্দময়ী। মহিম, আমার কথা শোনো। এ নিয়ে যদি বেশী পীড়াপীড়ি কর তাহলে শেষ কালে একটা গোলমাল হবে। আমার ইচ্ছা নয় যে, গোরা বিনয়কে এ নিয়ে কোনো কথা বলে।

“আচ্ছা দেখা যাবে” বলিয়া মহিম মুখে একটা পান লইয়া রাগ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

চক্ষু পদার্থটা কি?

১ম। ‘তুমিও জান’ তোমার চক্ষু আছে—আমিও জানি আমার চক্ষু আছে। আমি কিন্তু আমার চক্ষুটিকে বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াও কোনো স্থানেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। তোমার চক্ষু কোন্ স্থানে বাস করে, তাহার তুমি কোনো

সন্ধান পাইয়াছ কি? সন্ধান যদি পাইয়া থাক,’ তবে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা কবি—বল’ দেখি—পৃথিবীর বিস্তীর্ণ খালে এই যে তরোবেতরো নানা বর্ণের সামগ্ৰী তোমার সম্মুখে নৈবেদ্য-সাজানো রহিয়াছে—ইহার মধ্যে কোন্ সামগ্ৰীটা তোমার চক্ষু?

২য়। (আপন চক্ষুতে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এই দেখ আমার চক্ষু।

১ম। তুমি আগ্নি বাহা জন্মেও দেখ নাই, আমাকে তাহা দেখাইতে আসিয়াছ বুক ফুলাইয়া—এ এক রহস্য মন্দ না! সফ্রেটিস্‌ কি সাধে বলিয়াছিলেন “Physician heal thyself হে চিকিৎসক আপন রোগের চিকিৎসা কর”!

২য়। কে তোমাকে বলিল—আমার আপনার চক্ষু আমি জন্মেও দেখি নাই? ঐ দেখ আয়নার ভিতরে আমার দুইহুটা চক্ষুর প্রতিচ্ছবি জল্ জল্ করিতেছে।

১ম। আয়নাটার আধ-হাত উপরে ঐ যে একটা জাপানি ছবি দেয়ালে টাঙ্গানো রহিয়াছে—না জানি ওটা কোন্ মহাত্মার ছবি! তুমি অবশ্য জান’?

২য়। কেমন করিয়া জানিব—আমি তো দৈবজ্ঞ নহি।

১ম। দৈবজ্ঞ নহ? সে কি? তবে আমার বৃত্তিতে ভুল হইয়াছিল—মার্জনা করিবে। তুমি আয়নাটার ভিতর একটা কিসের প্রতিচ্ছবি যেই দেখিলে—দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলে যে, সেটা তোমার চক্ষুর প্রতিচ্ছবি; অথচ তোমার চক্ষুর সঙ্গে জন্মেও তোমার চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় ঘটে নাই। আমার তাই মনে হইল যে, ঐ জাপানি ছবিখানি দেখিবামাত্রই, উহা যে কোন্ মহাত্মার ছবি, তাহা চিনিতে পারিতে তোমার একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না; বিশেষতঃ, বর্তমান অবশ্যতঃ যখন জাপানে মহাত্মার অভাব নাই।

২য়। তোমাদেরই তো স্মার-শাস্ত্রে বলে “ধৃমাংবহি”। সে ঘাই হোক—এটা তো তুমি মানো যে, “কলেন পরিচীরতে?” এই দেখ আমি চক্ষু বুজিলাম—আর অগ্নি আমার সম্মুখের সমস্ত বস্তু আমার দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া পলাইল; চক্ষু মেলিলাম—আর অগ্নি আমার দৃষ্টিক্ষেত্রে পলায়িত-পূর্ব বস্তুগুলা স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

১ম। চক্ষু পদার্থটা কি? দর্শনেন্দ্রিয় তো? দর্শনেন্দ্রিয়

বলিতে বুঝায় শুদ্ধ কেবল দেখিবাব যন্ত্র। কিন্তু তুমি
যাহা উন্মীলন-নিমীলন করিলে তাহা আব একতরো যন্ত্র—
তাহা আলোকরশ্মিকে ঘরে ঢুকাইবার এবং ঘব হইতে
বহিষ্কৃত করিয়া দিবার কপাট। ঐ রকমের কপাটকে চক্ষু
বলিতে তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তবে—
বহু—তোমার আর একটি ঠিক ঐ রকমের চক্ষু তোমাকে
আমি দেখাইতেছি। পাশের ঐ কুচুৰী ঘরটিতে আলোক
যাতায়াতের একটিমাত্র পথ কেবল তাহার এই প্রবেশদ্বারটি,
এতদ্বিন্ন উহার আর কোনোকিছকো কোনো স্থানে ছায়ার বা
জানালা বা দেয়ালের গায়ে কোনো প্রকার ফুকর নাই।
ঐ কুচুৰী ঘরটির ভিতরে আমি এই প্রবেশ করিলাম;
প্রবেশ করিয়া আমি আর কিছু দেখিতেছি না—কেবল
দেয়ালের এক কোণে কতকগুলি নূতন-ক্লীত চক্চোকে
কাঁসার ঘটকলস স্তুপাকাবে সাজানো বহিয়াছে—এই বা
দেখিতেছি। একবার আইস এখানে। আসিয়াছ ? উত্তম !
এই দেখ আমি কপাট বন্ধ করিয়া আলোকের পথ আটক
করিলাম, আর অগ্নি তোমার দৃষ্টিপথ হইতে ঘটকলস গুলি
অন্তর্ধান করিল; এই দেখ কপাট খুলিয়া আলোককে ঘবে
ঢুকিতে পথ ছাড়িয়া দিলাম—আর অগ্নি তোমার দৃষ্টিক্ষেত্রে
ঘটকলস গুলি যেখানকার সেইখানে অনাহুত আসিয়া
উপস্থিত। “ফলেন পরিচায়তে” এই না তোমার কথা ?
আমারও ঐ কথা। তুমি যেমন ফলেন পরিচায়তের
দোহাই দিয়া বলিতেছ যে, ঐ চক্ষু কপাট হুটা তোমার চক্ষু;
আমিও তেমনি ফলেন পরিচায়তের দোহাই দিয়া বলিতেছি
যে, এই কাষ্ঠ কপাট হুটা তোমার চক্ষু। এখন কাহার
কথা সত্য ? তোমার কথা সত্য—না আমার কথা সত্য ?
দেবদত্ত তো আর মিথ্যা বলিবার লোক নহেন—উহাকে
মধ্যস্থ মানিতেছি—উনি বলুন কোন কথাটা সত্য—তোমার
কথা না আমার কথা ?

—দেবদত্ত। যদি কাষ্ঠকপাট চক্ষু হয়, তবে চক্ষুকপাটও
চক্ষু; আব যদি কাষ্ঠকপাট চক্ষু না হয়, তবে চক্ষুকপাটও
চক্ষু নহে। কেননা, একই রকমের প্রমাণ একটার ব্যালায়
গ্রাহ্য, আর একটার ব্যালায় অগ্রাহ্য, এরূপ হইলে একবাক্য
পৃথক্ ফল হয়; একবাক্যের পৃথক্ ফল হইলে—ফলদৃষ্টে
মূলের পরিচয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়; ফল দৃষ্টে

মূলের পরিচয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইলে—তোমাদের
উভয়সম্মত গোড়া’র কথা সেই যে “ফলেন পরিচায়তে”—
সেই গোড়া’র কথাটি একেবারেই ফাঁসিয়া যায়; বিচারস্থলে
বাদীপ্রতিবাদী উভয়সম্মত গোড়া’র কথা ফাঁসিয়া
গেলে—তাহার উপরে ভর দিয়া ঠাড়াইয়া আর আর যত
কথা অথগুনীয় বেদবাক্যের ভান করে, সমস্তই নস্তাৎ
হইয়া যায়।

২য়। তোমার কথার ভাবটা এতক্ষণে আমি করতলে
নাগাল পাইলাম। তুমি বলিতে চাহিতেছ এই যে, আমার
এই চক্ষুচক্ষুর অন্তঃপুর-মহলে যে এক প্রকার অর্ধ-মানসিক
অর্ধ-শারীরিক দর্শনেন্দ্রিয় লুকাইয়া আছে, সেইটাই আমার
প্রকৃত চক্ষু। তা আবার বলিতে! ও যাহা তুমি বলিতে
চাহিতেছ, উহা বেদবাক্যের ভ্রায় অকাটা। আমিও তাহাই
বলি। অধিকন্তু আমি বলি এই যে, এ চক্ষু (অর্থাৎ
চক্ষুচক্ষু) দ্বৈতগর্ভ; কিন্তু সে চক্ষু (অর্থাৎ খাস দর্শনেন্দ্রিয়)
দ্বিতীয় বর্জিত। হৃৎথের বিষয় এই যে, অন্তঃপুৰটা যেমন
অস্ব্যাপ্পশ্য, অন্তঃপুৰের রক্তটিও তেমনি; চক্ষুগণিটি গৃহস্থামী
ভিন্ন দোস্বা কোনো লোকের সাক্ষাতে প্রাণান্তেও বাহিব
হয় না।

১ম। সে জন্ত তুমি চিন্তা করিও না—তোমাব গুপ্ত
নিধিটিকে আমি দেখিতে চাহিতেছি না। তুমি আপ্নি
তাহাকে দেখিতেছ কিরূপ—সেইটাই আমার জিজ্ঞাস্ত।

২য়। আমি দেখিতেছি যে, পক্ষিশাবক যেমন নীড়ের
অন্তরাকাশে নিমগ্ন থাকে, অথবা সরস্বতী নদী যেমন
বালুকান্তবের অন্তরাকাশে নিমগ্ন থাকেন, সে চক্ষুটি (প্রকৃত
দর্শনেন্দ্রিয়টি) তেমনি এ চক্ষুর (চক্ষুচক্ষুর) অন্তরাকাশে
নিমগ্ন রহিয়াছে।

১ম। কোন্ চক্ষে দেখিতেছ ?

২য়। অবশ্য মনশ্চক্ষে।

১ম। তুমি আমার সঙ্গে বড় চালাকি খেলিতেছ।
মনশ্চক্ষু তো কল্পনা-চক্ষু। জন্মান্তব্যক্তি যদি বলে যে, “গত-
রাজের স্বপ্নে আমি কল্পনাচক্ষে হর্যোদয় দেখিয়াছি” তবে
তাহার সে কথায় তুমি বিশ্বাস কর কি ? জন্মান্ত ব্যক্তি যেমন
জন্মেও হর্যোদয় প্রত্যক্ষ করে নাই, তুমিও তেমনি জন্মেও
তোমার চক্ষুটিকে প্রত্যক্ষ কর নাই; তবুও যদি লজ্জায়

জলাঞ্জলি দিয়া অলান বদনে বল বে, এই চক্ষুর (চক্ষুচক্ষুর) অন্তঃপুরে দর্পণ-প্রতিবিম্বিত চক্ষুর ভ্রায় একটা চক্ষু কল্পনা-চক্ষে দেখিতে পাইতেছ— তাহাতেই বা কি? কল্পনার কাল্পনিক চক্ষু তো আব জলজ্যাস্ত বাস্তবিক চক্ষু নহে। আদ্যাত্মের বিচারক্ষেত্রে জ্যাস্ত দেবদত্তের পরিবর্তে দেব-দত্তের আতপচিত্রকে (ফটোগ্রাফকে) সাক্ষী মান্ত করাও যা, আর, সত্যাসত্যের বিচারক্ষেত্রে জ্যাস্ত চক্ষু পরিবর্তে কল্পনা-চক্ষুকে সাক্ষী মান্ত করাও তা, দুইই সমান।

২২। ভাঙনে-ওয়ালা তোমাব মতো দোসরা একজন খুঁজিয়া পাওয়া ভাব! আমি ব্রহ্মার অবতার, তুমি শঙ্করের অবতার। দক্ষপ্রজাপতি এবং অক্ষপ্রজাপতি বা অক্ষি-প্রজাপতি একই। অক্ষ-দক্ষের জন্ত বিশ্বকর্মা-কে দিয়া যেই আমি একটা শোভন-চণ্ডের পুরী নির্মাণ করাইয়া তুলিতেছি, আর আমি তুমি বীরভদ্র লেলিয়া দিয়া দিব্য-মনোজ্ঞ পুরীটাকে ভাঙিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া ক্ষণে পরিণত করিতেছ। আমার বিশ্বকর্মা হ'ছেন কল্পনা, আর, তোমার বীরভদ্র হ'ছে প্রথর যুক্তি। চক্ষু এ না—ও না—সে না—তা' তো বুঝিলাম! কিন্তু সে ছাই বোকা'তে মনের বোকা বোচো কই? চক্ষু পদার্থটা তবে যে কি—সেইটিই হ'ছে কাক্সের কথা। তাহার যদি কোনো সম্মান তুমি পাইয়া থাক, তবে বাদ-বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া তাহাই আমাকে বল—আমি তাহা কাপ পাতিয়া গুনিতে প্রস্তুত; আর, তাহা যদি সদযুক্তির অনুমোদিত হয়, তবে মথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

২৩। বলি তবে শোনো :—শেষবারে এই যে একটি কথা তুমি বলিলে—যে, তোমার যেটি প্রকৃত চক্ষু সেটি তোমার এই চক্ষুর অন্তরাকাশে নীড়মগ্ন পক্ষিধর্মের ভ্রায়, অথবা বালুমগ্না সরস্বতী নদীর ভ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছে, আব তা' ছাড়া, সেটি দ্বিতীয়-বর্জিত;—এ বাহা তুমি বলিলে এটা খুবই ভাল কথা; আমিও তাহাই বলি; আমিও বলি এই যে, সেইটিই তোমার প্রকৃত চক্ষুই বটে, আর, তাহা দ্বিতীয় বর্জিতও বটে। কিন্তু তাহা সন্দেহও আমি পূর্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, সে যে তোমার দ্বিতীয় বর্জিত প্রকৃত চক্ষু—সে চক্ষুটিকে তুমি তোমার শবীবের অন্তরাকাশের কোনোস্থানেই দেখিতে পাইতে পার' না—

তাহা তোমার নিকটে একান্ত পক্ষেই অদৃশ্য। তুমি প্রবেশিকা'র পরীক্ষা দিবাব সময় বীজগণিত বাহা কর্তৃক কবিতাছিলে তাহা যদি ইহারই মধ্যে উদরস্থ করিয়া বসিয়া না থাক, তবে তোমাকে আমি বলিতেছি এই যে, তোমার এই চক্ষু অন্তরাকাশস্থিত তোমাব সেই দ্বিতীয় বর্জিত চক্ষুটি এক প্রকার বিলাতি বীজগণিতের x , অথবা বাহা একই কথা—দিশী বীজগণিতের y । y কি তা' তুমি জান' তো? y হ'ছে “যাবস্তাবৎ”-শব্দের গোড়া'র অক্ষর। “যাবস্তাবৎ” কি? না যতটা ততটা; অর্থাৎ তাহা যে কতটা—এ কথা'র উত্তর আপাতত আমার ঘটে বাহা মৌজুদ আছে তাহা শুদ্ধ কেবল এই যে, তাহা যতটা—তাহা ততটা; এক কথায়—তাহা যতটা-ততটা। তবেই হইতেছে যে, যাবস্তাবৎ শব্দের গোড়া'র অক্ষর ঐ যে y , উহা unknown quantity'রই নামান্তর। “এতাবৎ” শব্দের গোড়া'র অক্ষর হ'ছে “এ”; “এতাবৎ” কিনা এতটা। মনে মনে আমাব তো খুবই সাধ যায়—পুৰাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া যাবস্তাবৎ শব্দের y , v এবং t কে বীজগণিতের x , y , এবং z এর স্থলাভিষিক্ত করিতে, তথৈব, এতাবৎ শব্দের গোড়া'র e র সঙ্গে o এবং i এই আর-দুইটি অক্ষরকে এক কোটার নিক্ষেপ করিয়া e ও এবং i এই তিনটি দিশী অক্ষরকে বীজগণিতের A , B এবং C র স্থলাভিষিক্ত করিতে। কিন্তু আমি যদি আমার মনের ঈশ্বরপ্ন মনশ্চক্ষে উপভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট না হইয়া, বীজগণিতের গড়ের মাঠে বা ইউক্লিডগানে $x-y-z$ এর মথলি গণিত'র ভিতরে ধ্রুতি চাদর পরা দিশী $y-v-t$ কে ধরিয়া-বাধিয়া প্রবেশ করাই, তাহা হইলে $y-v$ দেখিয়াই তো তুমি প্রথমে যবুধু বনিয়া যাইবে, তাহার পবে যখন আবার ত দেখিবে তখন একে-বারেই p বনিয়া যাইবে! অতএব—তাহাতে কাজ নাই—ইংবাজ-পছন্দ $x-y-z$ ই ভাল। তুমি জানিতে চাহিতেছ যে, তোমার এই চক্ষু অন্তরাকাশে দ্বিতীয় বর্জিত যে একটা চক্ষু জাগিতেছে, সে চক্ষুটি পদার্থটা কি। আপাতত তাহাকে x বলিয়া তো ধরিয়া লওয়া যা'ক; তাহাব পবে, বিবর্তি ভবনের বৃহৎলা যে, লোকটা কে— x এর numerical value যে কি—তাহার তথ্য নিরূপণ না কবিলে রাত্রি তোমাব ঘুমের ব্যাঘাত হইবে এমন যদি মনে কর,

তবে তাহা রীতিমত আঁক কসিয়া বাহির করিবার চেষ্টা দেখা'ই বিধেয়। অতএব দেখা যা'ক্ :—

এক প্রকার দৃশ্য প্রদর্শনী* যন্ত্র আছে, আর, সেই যন্ত্রেব দ্বারপ্রদেশের চৌকোট জুড়িয়া দর্শকের চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য কতকগুলো জোড়া-জোড়া ছবি আছে। ছবির বাণ্ডিলেব মধ্য হইতে একজোড়া ছবি লইয়া সেই ছবিজোড়া যন্ত্রটার বহির্দ্বারের চৌকোটের ফ্রেমে বসাইয়া যন্ত্রটার বিড়কি দ্বারের ছরবিন-চোঙেব মধ্য দিয়া যদি সেই ছবিযুগেব প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কবা যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র ছবি-জোড়াই দর্শকের চক্ষের সম্মুখে মস্ত একটা সত্যিকের দৃশ্য-বেশে সাজিয়া বাহির হয়। ছবিজোড়া যন্ত্রেব অন্তরাকাশে চৌকোটের ফ্রেমে আটকানো রহিয়াছে বটে, কিন্তু দর্শক তাহা দেখিতেছেন না মুলেই; কেবল, যন্ত্রেব বহির্বাশে (অর্থাৎ যন্ত্রেব বাহির অঞ্চলেব আকাশে) সহসা যে এক অপূর্ণ দৃশ্য উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল, তাহাবই প্রতি দর্শকের দৃষ্টি যোলো আনা মাত্রা নিবদ্ধ। কাজেই, যন্ত্রেব অন্তরাকাশস্থিত অদৃশ্য ছবি-জোড়া দর্শকেব নিকটে এক প্রকাব “অবিজ্ঞাত যাবস্তাবৎ” (unknown quantity), সংক্ষেপে x ; আর, যন্ত্রেব বহির্বাশস্থিত সুবিদ্যুত দৃশ্যমান ছবিটি দর্শকেব নিকটে একটা “সুবিজ্ঞাত এতাবৎ” (known quantity), সংক্ষেপে A ।

এখন, জিজ্ঞাসা করি যে, যন্ত্রেব অন্তরাকাশস্থিত সেই যে অদৃশ্য ছবি-জোড়া যাহাকে বলা হইতেছে x , আর, যন্ত্রেব বহির্বাশস্থিত সেই যে সুবিদ্যুত দৃশ্যমান ছবি যাহাকে বলা হইতেছে A , এ দুই ছবি* দুই না এক ? এক—তাহা আবার বলিতে ? যে ছবি-জোড়া যন্ত্রেব অন্তরাকাশে চৌকোটের ফ্রেমে বসানো রহিয়াছে, সেই অদৃশ্য x ই যন্ত্রেব বহির্বাশে সাজিয়া বাহির হইয়াছে দৃশ্যমান A হইয়া ;— তাহা তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। অতএব এটা

স্থির যে, $x=A$ । এ তো গেল উপমা। প্রকৃত বস্তব্য যাহা তাহা এই :—

তুমি বলিতেছ যে, তোমাব এই চক্ষুব (চক্ষু চক্ষুব) অন্তরাকাশে তোমাব প্রকৃত চক্ষু নিমগ্ন রহিয়াছে, আর, সেই সঙ্গে এটাও বলিতেছ যে, সে যে তোমাব প্রকৃত চক্ষু তাহা দৈতবর্জিত। ইহাতে এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দৃশ্য বস্তু সকলের ছবি-বৈচিত্র্য এবং দৃশ্যগ্রাহী চক্ষুর একত্ব দুইই তোমাব চক্ষুচক্ষুব অন্তরাকাশে কোনো-না-কোনো আকাবে কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। কিন্তু, যাহাই হউক্ না কেন—অন্তরাকাশেব ঐ দুইটি ব্যাপাবেব কোনটিকেই তুমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছ না—অন্তরাকাশস্থিত ছবিবৈচিত্র্যও চক্ষে দেখিতে পাইতেছ না, অন্তরাকাশস্থিত চক্ষুর একত্বও চক্ষে দেখিতে পাইতেছ না। চক্ষে দেখিবার মধ্যে তুমি দেখিতেছ কেবল বহির্বাশস্থিত রূপ-সকলের বৈচিত্র্য এবং বহির্বাশস্থিত আলোকের একত্ব। অতএব বীজগণিতের বিধানানুসারে অবশ্য একথা আমি বলিতে পাবি যে,

- (১) অন্তরাকাশস্থিত চক্ষুর একত্ব $= y$
- (২) অন্তরাকাশস্থিত ছবিবৈচিত্র্য $= z$
- (৩) অন্তরাকাশেব মোট ব্যাপার $= x = yz$

• তেমনি আবার

- (১) বহির্বাশস্থিত আলোকের একত্ব $= B$
- (২) বহির্বাশস্থিত রূপ-বৈচিত্র্য $= C$
- (৩) বহির্বাশেব মোট ব্যাপার $= A = BC$

এখন, দৃশ্যপ্রদর্শনী যন্ত্রেব দৃশ্যাদৃশ্য ছবিব ভেদ-রাহিত্য পূর্বে যেকূপ প্রণালীতে দেখানো হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ প্রণালীতে দেখানো যাইতে পারে যে, $z=C$, অর্থাৎ অন্তরাকাশস্থিত ছবিবৈচিত্র্য $=$ বহির্বাশস্থিত রূপ-বৈচিত্র্য।

এইরূপে পাওয়া যাইতেছে :—

প্রথম সিদ্ধান্ত।

$Z=C$ অর্থাৎ অন্তরাকাশস্থিত ছবি-বৈচিত্র্য $=$ বহির্বাশস্থিত রূপ-বৈচিত্র্য।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

• চক্ষু কি ? না দর্শনেন্দ্রিয়। অর্থাৎ দেখন বলিয়া যে একপ্রকাব ক্রিয়া আছে, সেই ক্রিয়ার করণ বা ইন্দ্রিয়।

* বিজ্ঞাপতি শ্রেণীর কবিদিগেব গ্রন্থমধ্যে “মোহিনী যন্ত্র” এই বচনটির প্রয়োগ অনেকানেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। “মোহিনী যন্ত্র” “দৃশ্যপ্রদর্শনী যন্ত্র” দুইই খাস বাঙ্গলা ভাষা তাহাতে আব সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষায় “মোহনী যন্ত্রঃ” অজ্ঞানব লিঙ্গ হিসাবে চলিতেও পারে; একেবারেই যে চলিতে পারে না তাহা নহে।

এই যে, দেখন ক্রিয়া বীজ—দর্শনেন্দ্রিয়, বাহ্য চক্ষু চক্ষুর
অস্তরাকাশে শক্তিরূপে (potential রূপে) অস্তর্নিগূঢ়,
তাহাই চক্ষু চক্ষুর বহিরাকাশে দৃশ্য ফলাকারে অভিব্যক্ত
হয়। অস্তরাকাশের মোট ব্যাপার হ'চ্ছে দৃশ্য-দেখা চক্ষু;
বহিরাকাশের মোট ব্যাপার হ'চ্ছে চক্ষু-দেখা দৃশ্য;
এ দুইটি মোট ব্যাপারের একটিতেও যেমন—আর
একটিতেও তেমনি, দুয়েতেই, চক্ষু, দেখা, এবং দৃশ্য, এই
তিনটি উপাদান পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-স্থিত
জড়িত; প্রভেদ কেবল এই যে, অস্তরাকাশে ঐ তিনটি
উপাদানের সমষ্টি বীজরূপে অস্তর্নিগূঢ়; বহিরাকাশে
উহা ফলরূপে অভিব্যক্ত। তবেই হইতেছে যে, $x=A$
অর্থাৎ অস্তরাকাশের মোট ব্যাপার=বহিরাকাশের মোট
ব্যাপার। কিন্তু $x=yx$ (অর্থাৎ x =অস্তরাকাশস্থিত চক্ষু
একত্ব $\times$ অস্তরাকাশস্থিত ছবি বৈচিত্র্য); তথৈব, $A=BC$
(অর্থাৎ A =বহিরাকাশস্থিত আলোকের একত্ব $\times$ বহিরাকাশ
স্থিত রূপ-বৈচিত্র্য)। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে,
 $yx=BC$

কিন্তু $x=C$ (প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ)। অতএব $y=B$
অর্থাৎ অস্তরাকাশস্থিত চক্ষুর একত্ব=বহিরাকাশস্থিত
আলোকের একত্ব। এইরূপ তাঁক কসিয়া পাওয়া যাই-
তেছে যে, $y=B$ দ্বিতী ভাষায়— $y=B$

অর্থাৎ যে চক্ষু তোমার এই চক্ষুর (চক্ষু চক্ষুর) অস্তরাকা-
শে নিম্ন তাহা ঐ আলোক। ফলেও এইরূপ দেখা
যায় যে,

এক দিকে যেমন—

আকাশ করিলে প্রকাশ বন্ধ

নয়নের হয় নয়ন অন্ধ ॥

আর একদিকে তেমনি

আঁখি দ্বার বন্ধ যার

আলো তার অন্ধকার ॥

অতএব এটা স্থির যে, অস্তরাকাশের চক্ষু=বহিরা-
কাশের আলোক। একই গজাঙ্গল যেমন অসংখ্য পাইপের
জল, তেমনি একই আলোক সর্ব জীবের চক্ষু। চক্ষু হইতে
আলোককে বাহির করিয়া দেওয়াও যা, আর, চক্ষু হইতে
চক্ষুকে বাহির করিয়া দেওয়াও তা, একই; তেমনি আবার

চক্ষুতে আলোক অভ্যর্থনা করিয়া আনাও যা, আর, চক্ষুতে
চক্ষু অভ্যর্থনা করিয়া আনাও তা, একই। আলোকের
আবাহন বিসর্জনেই চক্ষুর আবাহন বিসর্জন হয়; অতএব
বহিরাকাশের আলোকই অস্তরাকাশের চক্ষু। সুস্থ ধরিতে
গেলে—বহিরাকাশ এবং অস্তরাকাশ বলিয়া দুই পৃথক
শ্রেণীর আকাশের অবতারণা একপ্রকার—কল্পনা রাজ্যে
গজবর্ষ নগরের পত্তন বই আর কিছুই না; কেননা আকাশ
অখণ্ড এবং তাহা এক বই দুই নহে; আর, সেই কারণ
গতিকে অস্তরাকাশ এবং বহিরাকাশ একই অখণ্ড আকাশের
দুই কল্পিত খণ্ডাংশ বই আর কিছুই হইতে পারে না।
কিন্তু সে কথা বাবাস্তরে যথাসময়ে হইবে—এ যাত্রা আর
না—যৎ স্বপ্ন তন্নিষ্ঠং।

শ্রীধ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা।

(পিরিউর ফরাসী হইতে)

অভিজাত বর্ণের উত্তরাধিকারিগণ, বাহারা পার্লামেন্ট-শাসন-
তন্ত্রে পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে মনে করিয়া আগ্রহের
সহিত দিন গুণিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমি পরামর্শ দিই,
তাঁহারা একবার এসিয়া ভ্রমণ করিয়া আসুন। তাঁহাদের
ভুল ভাঙ্গিবে। যে অল্প আমাদের হস্ত হইতে স্বলিত হইয়া
পড়িতেছে, এসিয়িকেরা তাহাই ভক্তিতে বুদ্ধাইয়া
গইতেছে। আমাদের পুরাতন সেকলে বন্দুকগুলা নিগ্ৰো
বাজারা খুব জাঁকজমকের সহিত ব্যবহার করিতেছে।
১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানে শাসনকার্যের সার্বজনিক
সভা এবং ১৮৮৬ হইতে ভারতে রাষ্ট্রীয় সভা স্থাপিত হইয়াছে।
এমনও ঘটিতে পারে, আমাদের অল্পগুলা লইয়াই এসিয়া
তাহার নিজের ধরণে তাহাদিগকে আরও ভাল করিয়া
তুলিবে। জাপানীরা যখন সংবাদপত্রে পাঠ করে যে, ফরাসী
পার্লামেন্টে কিংবা অষ্ট্রিয়ার পার্লামেন্টে সদস্যদের মধ্যে
হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে, তখন কি তাহারা হাসে না?
কেননা, জাপানে সদস্যদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি
কখনই হয় না। যখন যুরোপে প্রতিনিধি নির্বাচনের সময়

৭৮ জনের প্রাণ যায়, কিংবা ১০১২ টার ঠ্যাং ভাঙ্গে, কিংবা কতকগুলি চোক ফুটা হইয়া যায়, তখন টোকিওর সংবাদ-পত্র নির্বাচকদিগের এই মধুর ব্যবহার অতীব কষ্টচিন্তে লিপিবদ্ধ কবে সন্দেহ নাই ।

নব্য জাপান Petit Poucetর বৃত্ত পরিয়াছে; পুৰাতন ভাবত, শবের বজ্র গায়ে আঁটিয়া, ধীরে ধীরে চলিয়াছে— হয় ত জাপান অপেক্ষা দ্রুত পথে চলিয়াছে । ভারতে, রাষ্ট্রীয় শাসন-সভার স্থলে রাষ্ট্রীয় পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে ; ইহাও কম উন্নতিব কথা নহে । ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া প্রতিবৎসর চারিদিন ধরিয়া এই রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন হয় । প্রভুদের সরকারী মতামতের বিরুদ্ধে, প্রজাপুঞ্জের স্বাধীন মতামত এই পরিষদে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে । একবার ভাবিয়া দেখ,—এটা কি অভূতপূর্ব অভিনব ব্যাপার ; যেখানে এতদিন বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈরীভাব ছিল—কঙ্কভাব ছিল, সেই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পর্য্যন্ত—কুমাবিকা অন্তরীপ হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত—পবম্পবের সহিত মিলিত হইবার জন্ত বাহ প্রসারণ কবিতোছে ! একটা বৃহত্তর ভাব আসিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্র ভাবগুলি স্থান অধিকার করিয়াছে । জাতীয় পতাকার তলে, এই প্রথম সকলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে । দৃশ্যটি অতীব হৃদয়গ্রাহী, স্বদেশপ্ৰীতি ও পার্লেমেন্টতন্ত্র দুইটি যমজের স্তায় এক সঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছে । ঐ দেখ, চান্দা তাহার গ্রামের মাটির দেয়ালের পিছন হইতে স্বদূরবর্তী কংগ্রেসের কথা কান পাতিয়া শুনিতেছে এবং স্বদেশ ও স্বাধীনতা এই দুই শব্দের অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়াও উহার মোহে মুগ্ধ হইতেছে । * * *

আরম্ভটা বহুকষ্টে সম্পন্ন হইয়াছিল । বোম্বাইয়ের প্রথম কংগ্রেসে শুধু ৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল । তাহাব পবের বৎসরে, কলিকাতায়, প্রতিনিধি সংখ্যা এক লাঞ্চে ৪৩৬ পর্য্যন্ত উঠিল । বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় কংগ্রেসে, ২০০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল, এবং এই দ্বিতীয় কংগ্রেস, সমস্ত দেশের মুখপাত্র বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারে । যদিও কংগ্রেসের সংস্থাপক হিউম একজন ইংরেজ, এবং ইহার সহকারীও কতকগুলি ইংরেজ, তথাপি কংগ্রেস

ভারতীয় ইংরেজের মতামত সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল । একবার কল্পনা করিয়া দেখ, যাহারা সর্বপ্রকার শাসনের বাহিরে, যাহারা কোন প্রকার আটক সহ্য করিতে পারে না, যাহারা পদানত জনতার বৃকের উপর দ্বিগ্না উন্নত মস্তকে চলিয়া যায়, সেই রাজপুরুষেরা কিরূপ বিষমভাবে জাগিয়া উঠিল ! “বিশ্বাসঘাতক” বলিয়া তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল, নানা প্রকার অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিল, কানপুকের হত্যাকূপের কথা স্মরণ কবাইয়া দিল ! কিন্তু কংগ্রেস টলিল না । অরাজদ্রোহী মিত-বাদিতাব দ্বারা, কংগ্রেস, রাজপুরুষদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও গুরুতর অপবাদগুলিকে ব্যর্থ কবিয়া দিল ।

অধুনা, কংগ্রেস বড়লাটের সহিত গণনীয় । এক্ষণে কংগ্রেস, লোক-মতের অধিকারপ্রাপ্ত মুখপাত্র । এই স্বাধীন ও অব্যবহৃত বিচারালয়ে আসিয়া, ধর্ম, কর্ম ও জাতি নির্বিশেষে সমস্ত ভারত, একজাতিতে পরিণত সমস্ত ভারত, —যাহারা ভাবতকে শিক্ষা দিয়াছে, যাহারা ভারতকে শোষণ করিতেছে, সেই বিদেশী প্রভুদের নিকট চির-প্রপীড়িতের দুঃখবেদনা নিবেদন কবে ।

এই ১৯০০ অব্দের শেষভাগে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমায়, হিমালয়ের অনতিদূরে, লাহোরে কংগ্রেস বসিবে । ঙ্গাজেই একটু শীঘ্র শীঘ্র আমাকে বোম্বাই ছাড়িতে হইবে । আট দিন হইল আমি জাহাজ হইতে বোম্বায়ে নামিয়াছি । ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটরের আফিসে কংগ্রেস-ওয়ালাদের আড্ডা । সেইখানে সবাই সমবেত হইতেছে, যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তর্কবিতর্ক করিতেছে । আমি সেই-খানে গিয়া মালাবারির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । বোম্বাইয়ের উকীল মাননীয় চন্দাবরকাবের সহিত আমাব পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল । ইনি. উদারনৈতিক দলের প্রধান, সম্প্রতি হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন । ইনিই এই বৎসরের কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন । এই শেষবার তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন ।

ডিক্টোরিয়া স্টেশনের গুরুভাব গম্ভীর-তলে ঐ খিলান-পথে কি শ্বাসরোধী জনতা ! এই কংগ্রেসের ট্রেন, আমাদের তীর্থযাত্রী কিংবা উপনিবেশযাত্রীর ট্রেন স্মরণ কবাইয়া দেয় ।

মাথার পাগড়ীর উপর বড় বড় তোড়ঙ্গ লইয়া, নগ্নকায় কুলিরা সারি সারি চলিয়াছে এবং রেল-গাড়ীর কাম্বায় চড়াও কবিতা উঠিয়া পড়িতেছে। বাচ্চের ভাবে প্রসারিত হই হস্তে ছই-ছই পয়সা নিঃক্ষেপ কবিরা মাত্র তাহারা ধূলাচ্ছন্ন ও গলদর্শন্য কলেবরে আর একটা তোড়ঙ্গের সন্ধান, একদোড়ে চলিয়া গেল। ইত্যবসরে আমাব 'ছোকরা,' গাড়ীর কাম্বায় উপরিতন বেঞ্চেব উপর আমার বিছানা পাতিয়া দিল। কাম্বার চারিটা শয্যাই অধিকৃত হইয়াছে। আমার নীচেব শয্যাটি একজন পার্সি অধিকার করিয়াছে। আমার সম্মুখস্থ একটা জায়গায় একজন ইংরেজ পূর্ব হইতেই দখল কবিতা বসিয়া আছে তাহাব চুরোটের বাক্সটা খোলা, সে একটুকবা ববফ ভাঙ্গিল, এবং একটা রূপার গেলাস বাহির করিয়া তাহাতে হইস্কি ঢালিল। এক গাদা তোড়ঙ্গ ও বাস্কে গাড়ীব কাম্বাটা ভরিয়া গিয়াছে। এগুলো বোধ হয় তাহারই জিনিসপত্র। পরে কাম্বার ঠিক মাঝখানে একটা টেবিল ষাড়া করিল। এই টেবিল ও তোড়ঙ্গগুলাব মাঝে একটা কুকুর ঘুমাইতেছে। এই তোড়ঙ্গগুলো তুমি যে একটু সবাইয়া রাখিবে তাহার জো নাই। পবদিন প্রত্যুষে হুম্‌দাম্ শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—চোখ মেলিয়া দেখি কি না,—কতকগুলো খলে, কতকগুলো খেলনার প্যাটরা, কতকগুলো অদ্ভুতধরণের বাক্স আমাদের গাড়ীতে চোরা-গোপ্তান চালান দিতেছে। সেই সঙ্গে কতকগুলো ঘর্ম্মাক্তগাত্রও উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। একজনকে গাড়ীর ভিতবে ঠেলিয়া দিয়া, গাড়ীব দবজাটা ধড়াস কবিতা কে বন্ধ কবিতা দিল। লোকটি ভারতবাসী—তোড়ঙ্গাদিব উপব দিয়া অতি কষ্টে প্রবেশ কবিল। আবার সব নিস্তব্ধ। আর স্থান নাই—কি বেঞ্চেব উপর, কি অন্ত্র, কোথাও তিলার্দি স্থান নাই। এখন হইতে আমরা নিশ্চিন্ত।

উপর হইতে আমি আমাব সহযাত্রীদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছি। হিন্দুটি এই গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার জিনিসপত্র বেষ গুছাইয়া রাখিয়াছে। প্রথমে একটি শোহাব বাক্স খুলিল—এটি লেখিবাব বাক্স—আর একটি বাক্স খুলিল;—তাহাতে চাপটা 'কর্ণেটের' আকারে ভাঁজ কবা এক তাড়া সবুজ পাতা রহিয়াছে—এটি পানের

বাক্স। তাবপর সাজসজ্জা আরম্ভ হইল। এই হিন্দুটিব মুখ, ও সমস্ত মাথা কামানো, কেবল চূড়াদেশে লম্বা পাক-ধরা এক গোছা লম্বা চুলে গেরো বাঁধা...পার্সিটির ইংরেজি পরিচ্ছদ—মাথায় ধুচনী টুপী নাই—ধুচনী-টুপিটা কংগ্রেসেই পরা হইবে। এই হিন্দু ও এই পার্সি—দুজনেই প্রধান কংগ্রেস-ওয়ালারা; দশবৎসব পূর্বে, লণ্ডনে হিন্দু-প্রতিবাদের পক্ষ সমর্থন করিবাব ভাব এই হিন্দুটির উপর প্রদত্ত হয়। ইনি অত্যন্ত বহুভাবী। ইনি উকীল, জাত্যাংশে ব্রাহ্মণ। কে জানে কেন উনি প্রথমই আমার সঙ্গে তত্ত্ববিজ্ঞা সম্বন্ধে কথা পাড়িলেন, খুব আশ্চর্যের সহিত স্পেন্সারের কথা পাড়িলেন। স্পেন্সারের উপব তাঁর খুব ভক্তি। কিন্তু আমি কংগ্রেসের কথা পড়িলাম। তিনি কংগ্রেসের সমস্ত বিষয় আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন; —“না, আমরা বিদ্রোহীর দল নহি, আমরা মহাবাণীর নিত্যন্ত অল্পগত ভক্ত প্রজা; কাবণ, সব দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমাদের আত্ম-শাসনের এখনও সময় হয় নাই; আর যদি শুধু প্রভু-পরিবর্তনের কথা হয়, তাহা হইলে কস্ অপেক্ষা ববং আমবা ইংরেজকেই বেশী পছন্দ করিব।” এই কথা বলিয়া, তিনি তাঁহাব সহকর্মী পার্সীর হস্তে একটা দেশী সংবাদপত্র দিলেন। উহাতে কংগ্রেসেব কথা জলন্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধেব লেখক একজন মুসলমান। তিনি বলিলেন, “এই দেখ, লোকটা কতকগুলো জলন্ত চালা কাঠ নিঃক্ষেপ কবিতা, আমাদের উপর দোষাবোপ কবিতেছে যে আমরাই চারিদিকে আগুন জালাইতেছি...কিন্তু এখন, মুসলমানদের রাগ অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে এবং তাদের বিদ্বেষের আর প্রতিধ্বনি হয় না।” পার্সী ঐ সংবাদপত্র আমার হাতে দিলেন; আরও আমাকে একটা চুবোট দান করিলেন। ইংরেজ, তাঁহার বেঞ্চেব উপর নীবব ও গর্জিতভাবে রহিয়াছেন; এই কংগ্রেস-ওয়ালারা, এই বাক্সবর্ষ বস্ত্রারা বাহা বলিতেছে, তাহা তাঁহার স্তনিবাব যোগ্য নহে; তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হয় বাস্তবিকই তিনি যেন বিশ্বয়ে নিমগ্ন—বিশ্বয়েব আরও একটা কাবণ এই যে, একজন “উচ্চতর জাতির” লোক, একজন ফরাসী, এই সকল দ্বিগিত লোকদের সহিত বাক্যালাপ করিতেছে...এই ট্রেনে কংগ্রেস-ওয়ালারা বাই-

তেছে, রাজকর্মচারীরা যাইতেছে, খুষ্ঠধর্ম-প্রচারকেবা যাইতেছে। ভোজনাগারে আবাব সকলেই একত্র মিলিত হইল। মাদ্রাজ হইতে আগত কতকগুলি কংগ্রেসওয়ালার সহিত আমি একত্র প্রাতর্ভোজন করিলাম। উহাদের কেশহীন মস্তক গোলাকাব ও তেল-চুক্চুকে, দেহের গঠন পরিপাটি, মুখাবয়ব গোলগাল ও ভাবী ভারী, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহারা তাঁহাদের হিন্দু ভৃত্যদের নিকট লুকাইয়া আহার করিতেছেন। ভৃত্যেরা যদি দেখিতে পায়, তাঁহারা গোমাংস খাইতেছেন, তাহা হইলে ভয়ানক নিন্দা রটিবে!

আমাদের ট্রেন উত্তরাভিমুখে উঠিতেছে, হাজা-পোড়া ভূমির উপর দিয়া চলিয়াছে,—বুনো ময়ূব ও হবিণেব পালকে ভাগাইয়া দিতেছে; একে একে অনেক গুলি পুল পার হইয়া স্রোত-পথেব বিস্তৃত বালুকাময় ভূমির উপর আসিয়া পড়িতেছে—এই স্রোতপথে স্রোতের মত একটি সরু জলস্রোত প্রবাহিত। ষ্টেশনে ষ্টেশনে, একটা দড়ির পিছনে, দেশীয় রেল-যাত্রী দল, কখন পথ খুলিয়া দিবে তাহারই জন্ত অপেক্ষা করিতেছে; এই সব লোকদিগের নগ্ন জন্তা, স্বল্প শ্রম সযত্নে কুঞ্চিত কিংবা হাত-পাখার আকারে চারি দিকে বিস্তারিত; মাথায়, সাদা, জর্দা, সবুজ রঙ্গের কাপড় শোভন ভাবে জড়াইয়া বাঁধা স্নান শিরোবেষ্টন। জীলোক-দিগের চিক্চিকে মশণ চুলের উপর, তাহাদের গোলাপী কিংবা বেগুনী শাড়ীর কিয়দংশ টানিয়া আনা হইয়াছে গায়ে ও হাতে কাচের গহনা, নাকে একটি অলঙ্কার, কপাল—লাল ও সাদা রেখায় অঙ্কিত, কঁাকে একটি কচি শিশু... দ্বিতীয় দিনেব সায়াহ্নে, দিগন্তদেশে গগনস্পর্শী হিমাচলের নীহারময় চূড়াসকল আমাদের দেখাইয়া দিল। বাত্রি চুইটার সময় সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল “লাহোর”! এই সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চীনের রাস্তার মত গভীর কর্মময় রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, আমার ভৃত্য গাড়ী ও হোটেলের সন্ধান করিতে লাগিল।

সেই রাত্রে, সমস্ত হোটেলই লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে...অনেক কষ্টে আমি একটা শুইবার খাট পাইলাম—তাহাতে গদি নাই লেপ্ কয়লা কিছুই নাই। খুষ্টমাসের পূর্বরাত্রি। এই রাত্রিটা খুব আমার মনে থাকিবে। হিমালয়ের দূরতম পর্বত পর্য্যন্ত—সকল স্থান হইতেই

শিঙ্গাধ্বনি শ্রুত হইতেছিল...ইংবেজ বাজপুরুষ, রাজকর্মচারী, শুদ্ধ আদায়ের লোক—সকলেই আসিয়াছে। ইংবেজ রমণীরা ‘বল্’-নাচের পরিচ্ছদ সঙ্গে আনিয়াছে, ইংবেজ পুরুষেরা “স্মোকিং”-পরিচ্ছদ সঙ্গে আনিয়াছে। অস্থায়ী পার্শ্ব জীবনের কণিক মোহে মুগ্ধ হইয়া, উহারা ছোট্টাটের ‘বলে’ব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে, ডেপুটি কমিশনারের উত্তান-মজলিসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাব পরেই হবত বিজ্ঞান বিষয় কান্দীয়ে কয়েকমাস যাপন করিবে। পায়রাব ঝাঁকেব মত অমান্যকাস্তি নব-যুবতীবা দলে দলে আসিয়াছে। এই উৎসব-আমোদে যোগ দিবার জন্ত মুক্তপঞ্জর মুগ্ধ বিহঙ্গশিশুর মত বালিকারাও একাকী আসিয়াছে।

তাহাব পরদিন, একটা অপ্রত্যাশিত মনোমুগ্ধকর ঘটনা! আমার ঘরটি আলোকে ভবিয়া গিয়াছে, নিবিড় মেঘের পর্দাটি উত্তোলিত হইয়াছে। আমি এখন কোথায় আছি?—খোলা ময়দানের মধ্যে। যে হোটেল দৈবক্রমে আমি আসিয়া পড়িয়াছিলাম তাহার সাদা পিলান-পথ ক্রমশ ফুলেব বাগানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ফুলেব উপর শিশিরবিন্দুগুলি ঝুলিতেছে। হিন্দু সহরটি এখন হইতে প্রায় এককোশ দূরে। সাদা-ছিটোনা নীল আকাশে, শিকারী পাখীরা চক্রাকারে ঘূর্ণিতেছে—টিয়ার ঝাঁক অনবরত কিচিড়মিচিড় করিতেছে...আর্দ্র ভূমি মেঠো-পথগুলি আমার জন্মভূমিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে...এই দৃষ্টান্ত জলন্ত আলোক আমাদের মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। চুইটা রাত্রে এই পাঙ্কশালায় আসিয়া আমি যে বিষাদমেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম সেই মেঘ এখন কাটিয়া গিয়াছে; এই বিস্ময়কর বাজ সেবন করিবার জন্ত, ঐ গোলাপী রঙ্গের ধ্বজ-স্তম্ভটি নিকট হইতে দেখিবার জন্ত, শিশিবিস্তৃত সাদা সাদা গাছের মধ্য হইতে বহির্গত ঐ গোলাপী বাড়ী-গুলা দেখিবার জন্ত আমি থুব ত্বরা করিতেছি...কিন্তু বাস্তব বড় কাদা, গাড়ীর চাকা নাভিদেশ পর্য্যন্ত কাদায় বসিয়া যাইতেছে। ময়লা পরিষ্কারের ভার সূর্য্যের উপর দিয়া, শিকারী পাখীদের উপর দিয়া ইংরেজরা বেশ নিশ্চিন্ত বহিয়াছে। ভ্রমণকারী দল Cookএর নিকটে ভ্রমণপথের সংবাদ লইতেছে—যে প্রাচ্য সহর এখন হইতে

এক ক্রোশ দূরে তাহাব কথা একবারও কেহ মনে কবিতেনে নাই... সুন্দর একটি বাসস্থান স্থাপন করিবার জন্ত মোগল সম্রাটেরা ঐ সহরটিকে সর্বপ্রকার বিলাস বিভবে বিভূষিত করিয়াছিলেন। সেই মোগল সম্রাটেরা মৃত, এখন উহাব সিংহদ্বার দিয়া বাদশাহদিগের নগবযাত্রার জমকালো ঠাট আঁব বাহিব হয় না। এবং এখনকার প্রভুরা এই সকল সুন্দর সিংহদ্বার দিয়া কদাচিৎ যাত্রা করেন। তাঁহারা এই দেশীয় লোকের কুষ্ঠাশ্রমে,—এই সকল সফর রাস্তায় বাইতে ভয় করেন, যেখানে পোকার মত লোক কিলবিল করিতেছে। এই সকল রাস্তা এক এক স্থানে যেন হঠাৎ উপরে চড়িয়া গিয়াছে, এবং কত ঘোরপাক করিয়া মার্কেলের দুর্গপ্রাসাদ পর্য্যন্ত, স্বর্ণ মসজিদ পর্য্যন্ত, চিনেগাটাব মসজিদ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—রাস্তায় অসমান আকারের ঠাসা গোলাপী বাড়ীগুলি জলন্ত আলোকে পরিপূর্ণ। জালিকাটা গবাক্ষগুলি, নীলময়ূরের দ্বারা পরিপূর্ণ, রং করা, খোদিত জাক্রির কাজ করা জালিকা গুলি একটা চমৎকার দৃশ্য! এই সকল সুন্দর আবরণের অন্তরালে কত আগ্রহপূর্ণ জলন্ত নেত্র প্রচ্ছন্ন থাকে! বাজারের ভিতর,—মুসলমান, শিখ, আফগানদের বহুমিশ্র জনতা—লাল পশমি বস্ত্রে উহাদের গাত্র আচ্ছাদিত, মাথায় উচু পাগড়ী। জীলোকেরা তাম্ব-কলস মাথায় বহিয়া লইয়া বাইতেছে; কলসগুলি সূর্যালোকে ঝকঝক করিতেছে; কোথাও বা দৈন্তহৃৎক মলিন চীর বস্ত্র, কোথাও বা কুঠরোগীর জঘন্ত ক্ষত পটী; স্বর্ণবর্ণ ধূলারশি সূর্যাকিরণে ঝিকঝিক করিতেছে... প্রাচ্য দেশের সমস্ত দৈন্ত, জঘন্ততা ও সমস্ত জাঁকজমক একত্র মিলিত হইয়াছে।

বাদশাহী ভোজের খাণ্ড সামগ্রীতেই বাজারের গুজরান চলিত। বাদশাহী ভোজের মত বহুমূল্য ও দুস্তোয়্য সুন্দর রুচির ভোজ আর কোথাও দেখা যায় না। লাহোর ও আগ্রার ঐক্সজালিক প্রাসাদের মধ্যে যাহাবা মোগল বাদশাহদিগের উৎসবাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহাদের চোখ ঝলসিয়া গিয়াছে—চিরকালের মত ঝলসিয়া গিয়াছে... কি চমৎকার এই সকল জালিকাটা সাদা মার্কেলের জাক্রি! একবার কল্লনা করিয়া দেখ, এই সকল দরবাব-দালান আগাগোড়া অসংখ্য শাসি-আয়নার মণ্ডিত, খুদিয়া

ঘর-কাটা রত্নরাজির দ্বায় ঝিকঝিক করিতেছে, তাহার চারিধাবে নীলরঙ্গের লতাপাতায় নক্সা ও মার্কেলের পুষ্প-বাজি, ও তাহা হইতে সাদা সাদা পুষ্পকেশব রাহির হইয়াছে; বাজদরবাবের বিবিধ পোষাক কল্লনা করিয়া দেখ এবং আলোকের ছটা কিরূপ অনন্তশৃঙ্গে চারিদিকে প্রতিকূলিত হইতেছে—ঠিকরাইয়া পড়িতেছে—তাহা কল্লনা কবিয়া দেখ... সমস্তই চোখেব সোহাগ, চোখের বিলাস, চোখের আরাম;—গুধু তাহা নহে, দীপ্তিতে চোখ ঝলসিয়া যায়!

উহা অতীতের কথা। নির্বাপিত দীপ্ত-গৌরবের কতকগুলি দেদীপ্যমান অবশেষ মাত্র!... ভবিষ্যৎ, ভাবী ভারত কংগ্রেসের ক্রোড়ে লালিত হইতেছে... সেই কংগ্রেসের অধিবেশন খুব নিকটেই হইবে।

* * * * *

—“মেরি ক্রিস্মাস্, মেরি ক্রিস্মাস্, মিষ্টাব ফ্রেঞ্চ-ম্যান” ...

এই শুভ কামনাব শুভ বাণী কাম্বীরী মিসিবাবাদের মুখ হইতে, গোলাপী ওষ্ঠাধর হইতে নিঃক্ষিপ্ত হইল। এই শুভ কামনা আমাদের আসল ব্যাপারটা স্মরণ করাইয়া দিল। আজ ক্রিস্মাস্; পবনদিন কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কিরূপে এই কংগ্রেস বর্ধিত হইয়াছে তাহার ইতিহাস তোমাদের নিকট এইবার বিবৃত করিব।

আমাব সহভোজীদের মধ্যে কংগ্রেস সম্বন্ধে খুব কৌতূহল হইয়াছে। ভোজন-টেবিলে, আমার পাশে যে ইংরাজিটি বসিয়াছিল সে আমাকে বলিল “উহাদের কেবলি কথা, কথাই সার”। দেশী কিছুই ইহাদের ভাল লাগে না... কংগ্রেসটা যে ইংরেজের কার্য একথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না। কংগ্রেস, মেকলের মরণোত্তরজাত সন্তান। এই রাজনৈতিক পুরুষ আজ বাঁচিয়া থাকিলে একথা অস্বীকার করিতে পারিতেন না। যিনি সমসাময়িক ভারতের উপর একটা সুস্পষ্ট সুনিশ্চিত প্রভাব প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই মেকলে আজ নিশ্চয়ই তাঁহার জাতভাইদের অঙ্ক ও অধৌক্তিক প্রতিকূলতার প্রতিবাদী হইতেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজি শিক্ষার দ্বারা তিনি ভারতকে অতীতের পথ হইতে ছিনাইয়া আনিবেন। তিনি

যদুচ্ছা দূরদৃষ্টিব দ্বাবা যাহা দেখিয়াছিলেন, এখন তাহা কাজে ঘটিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, মধ্য-বিদ্যালয়ে যে বিলাতী শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহাবই প্রভাবে একটি শিক্ষিত উদারনৈতিক শ্রেণী গঠিত হইয়াছে। তাহাবা বিলাতী ধৰণে চিন্তা করে, বিলাতী ধরণে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। ইহারাই নব্য ভারত; কি কবিয়া ভাবতকে পৃথিবীর বর্তমান উন্নতির উপযোগী করিয়া লওয়া যায়, ইহাই নব্য ভারতের একমাত্র ধ্যান ও করণ। যুবকেবা ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়াছে। কি করিয়া আস্তে আস্তে পবিত্বজন হইয়া সেই স্বাভাবিক পরিবর্তন ক্রমে পার্লামেন্ট-পদ্ধতিতে পর্যাবসিত হইল তাহা ঐ ইতিহাস পাঠেই জানা যায়। উহার ফলের জালাময়ী বক্তৃতা পাঠ করিল, আবৃত্তি কবিল, অমুকরণ কবিল। উহার লক্, বেনথাম ও মিলের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিল। কি বাগ্মী, কি ঐতিহাসিক, কি দার্শনিক—সকলেই উহা-দিগকে একইরূপ শিক্ষা প্রদান করিল। উহাদের মনে অজ্ঞাতপূর্ব বৃহৎ কল্পনা সকল উদ্বোধিত হইল। কিন্তু যখন তাহারা চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিল, তখন দেখিল কি?—দেখিল এই সকল জলন্ত উচ্চতাবের কথা-শুলা কেবল অধ্যাপকদিগের মুখের কথামাত্র—তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এখন সামান্য ইংবেজ বাজকর্মচারী একজন মহারাজা অপেক্ষাও স্বেচ্ছাচারী প্রভু; তাহার কোন আটক নাই; বেক্ বলেন, কর্তব্যের আটকই তাহাব একমাত্র আটক। এই আটকটি একটু বেশীরকম মানসিক! এই আটককে ইচ্ছামত উঠান যায়, নামানো যায়। নিমন্ত্রিত-বর্গের ঠেলা সামলাইবাব পক্ষে, এ আটকটি একটু ভঙ্গুর। যে সকল আকাজ্ঞা পরিভূক্ত করিতে পারিবে না তাহা উদ্বোধিত কবা অদূরদর্শীর কাজ। বিদ্যালয় হইতে প্রথম বাহির হইয়া, উদারনৈতিকতা এখন সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এবং যাহারা সাহস করিয়া “কাশাপানি” পার হয় তাহারা স্বকীয় অধ্যয়ন ও ভ্রমণ হইতে স্বাধীন চিন্তাব একটা রুচি ও স্বাধীনতার একটা জলন্ত অনুভাব আনিয়াছিল।

আবার হিন্দুবা এই কথা বলে, বিলাতী শিক্ষাতেই

সব হয় নাই। বিলাতী শিক্ষা, কেবল কতকগুলি গভীর স্বাভাবিক ভাবকে জাগাইয়া তুলিয়াছে মাত্র। পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুরাই সর্বাপেক্ষা পার্লামেন্ট-পদ্ধতিতে আসক্ত। Anstey ও Sir Bartle Frereও এই মত। Anstey বলিয়াছেন যে, “প্রাচ্য ভূভাগই মুনিসিপ্যালিটির জনক।” বস্তুত একথা খুবই সত্য যে ভারতের সমস্ত ছোটখাটো বিষয় পার্লামেন্ট পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রামের কাজ, সমবেত গ্রামসমূহের কাজ একটা স্থায়ী সমিতির দ্বারা সম্পাদিত হয়। পবিবাববিশেষের ধনশালী ও প্রভাবশালী কর্তারাই এই সমিতির সদস্য। পঞ্চায়ৎ নামে একটা অপূর্ব প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে এমন সকল বিষয় সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে বাদানুবাদ হয় যে সকল বিষয় আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত। প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ এক একটি প্রাচীন লোকের মণ্ডলী আছে। এই পঞ্চায়ৎ সভা জাতের বিষয়ে, সামাজিক বিষয়ে, ধর্মের বিষয়ে, চরম নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। এবং শাস্তিরক্ষার এক প্রকার আদালত রূপে আপনাকে দাঁড় কবাইয়া এই পঞ্চায়ৎ বাটোয়ারা ও সীমানা সরহর্দেব সমস্ত গোলযোগ মীমাংসা করিয়া দেয়। অতএব দেখ, ইহার অধিকার কত বিস্তৃত:—সমাজসম্বন্ধীয় অধিকার, ধর্মসম্বন্ধীয় অধিকার, বিচারসম্বন্ধীয় অধিকার। উহার কোন আপীল নাই। উহার সর্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড—সমাজ হইতে বহিস্করণ। কেহ কেহ বলেন, এই সকল গ্রাম্য সভা এই সকল পঞ্চায়ৎ, ভাবী পার্লামেন্টের বিস্তৃত ও পাকা বনিয়াদ হইতে পারে।

কিন্তু সে যাহাই হউক, এই সকল স্থানীয় সভা হইতে বহু দূরে একটি বাস্তব সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন কি ইহার কল্পনাটিও ইংবেজ অধিকারের পূর্বে কাহাবও মনে উদয় হইবাব সম্ভাবনা ছিল না। রেল-পথ, টেলিগ্রাম দূরতম প্রদেশগুলিকেও নৈকট্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে, বাতায়াতের সুগমতা বিধান করিয়াছে, বৃদ্ধ ভারতের মনে একতাব ভাব উদ্বোধিত করিয়াছে। ইংরেজি, দেশের সাধারণ ভাষা হইয়া এই গ্রীক আরও সম্পূর্ণ কবিয়া তুলিয়াছে। এখন দেখ দক্ষিণের তামিল, পশ্চিমের মাঝাঠা, উত্তরের বাঙ্গালী সকলে কেমন একত্র মিলিত হইয়াছে—পবম্পর পমম্পবের

কথা বুঝিতেছে। আর একটু বেশী যাওয়া যাক; দেশ-শোষণ-কারী বিদেশীদের অবস্থান প্রযুক্তই, দেশীয় স্বার্থরক্ষার জন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন বর্ণ বিভিন্ন জাতি বাহা বা এতদিন পরস্পরের বিরোধী ছিল সেই পার্শ্ব, সেই শিখ, সেই হিন্দু সকলেই একত্রিত হইয়াছে। এই জাতীয় ভাবের নূতন কল্পনাটি, যাহা বাস্তবতায় পরিণত হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে,—ভারতের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। ভাবতের এই দৃষ্টান্ত সমাজতত্ত্ববেত্তাদের পক্ষে খুব ঔৎসুক্যজনক সন্দেহ নাই; কেননা, সপ্রমাণ হইতেছে যে, পার্লামেন্টের কল্পনা ও জাতীয়তার কল্পনা একত্রে গ্রহিত, উভয়ই মানব সমাজের অধিকার সমর্থন করে, এবং উভয়ই স্বাভাবিক নিয়মামুসারে আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়।

এ একটা ভাবী নূতন ব্যাপার। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ইহার প্রতিকূল। সে এক সুখেব দিন ছিল যখন উহারিগকে জৈম্বর ভিন্ন আর কাহাবও নিকট কাল্পেব জন্ত জবাবদিহি কবিত্তে হইত না; যে সময়ে না ছিল কংগ্রেস, না ছিল সভাসমিতি, না ছিল ব্যবস্থাপক সভা, ছিল শুধু স্বাভাও ও নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা! কিন্তু প্রথমে ঘরের লোকেয়াই কংগ্রেসকে আক্রমণ কবিল। সূচ্যগ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত পিরামিডেব জায় টলমলায়মান সমাজ পাছে কোন কিছুর ধাক্কা লাগিয়া ধসিয়া যায়, রক্ষণশীল হিন্দুরা এই ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল। বিপদগ্রস্ত সরকারকে তাহারা 'তেহারা' খেবেব মধ্যে রাখিবাব জন্ত প্রস্তাব কবিল। সে তিনটি খেব;—সন্মান, ভক্তি ও ভয়। কতকগুলি লোক, —যে পক্ষই হোক, কোন এক পক্ষের হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল; তাহারা আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রতীক্ষা কবিত্তে লাগিল। রাজপুত ও ঠাকুরেরা এই উদীয়মান গণশাসনতন্ত্রের (democracy) আবির্ভাবে শঙ্কিত হইল। একজন রাজা—উহারি মধ্যে যে একটু চিন্তাশীল —সেই কালীর রাজা তাহাদের নেতা হইল। সমস্ত ভারতের প্রচণ্ড উৎসাহের মুখে, ও সমস্ত খড়ের মত ভাসিয়া যাইত, যদি না ভারত-সমাজেব আর একটা প্রধান অঙ্গ ৬ কোটি বাহাদেব সংখ্যা, সেই মুসলমানেরা আসিয়া তাহাদের সমস্ত ভাব তৌলদণ্ডের অস্ত্রদিকে নিঃক্ষেপ কবিত।

আজকাল ভারতবর্ষে মুসলমান-সমাজই একটা প্রধান সমাজ। জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ লোক কংগ্রেসের প্রতিকূল কেন, তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে। মুসলমানেরা এখনো হিন্দুদিগকে বিজিত প্রজার জাতি বলিয়া মনে করে, মুসলমানেরা দেখিতেছে যে, হিন্দুরা অস্ত্র প্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে—অর্থাৎ বিশ্ববিখ্যালে, বাজারে, সরকারি চাকরিতে জয়লাভ করিয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে। ইংরেজের আমলে, হিন্দুদের দ্রুত উন্নতি দেখিয়া উহারা যে উদ্ভিগ্ন হইবে তাহাতে বিচিহ্নতা কি! সরকারের সমস্ত অমুগ্রহ, সমৃদ্ধি ও উচ্চ পদ হিন্দুদেরই উপর বর্ষিত হইতেছে! এই বিপদ নিবারণের একটা মাত্র উপায়—মুসলমানদের অপরিণীম অস্ত্রতাকে একেবারে ধ্বংস করা। বিপদ দেখিয়া সর্বপ্রথমে যিনি চীৎকার করিয়া নিজের জাতভাইকে সাবধান করিয়া দিলেন তাঁহার নাম সৈয়দ অর্থাৎ মহম্মদের উত্তরাধিকারী। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, আলিগড়ে তিনি একটা কালেক্স স্থাপন করিয়াছিলেন। কালেক্সটি বেশ উন্নতি লাভ কবিত্তেছিল, এমন সময় খবর আসিল, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! হিন্দুরা কেমন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে! যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে সমূহ বিপদ। সৈয়দ একলাকে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 'যুদ্ধংদেহি' বলিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুসলমানের অধিকাংশই তাঁহার অমুগামী হইলেন।

ইংরেজ ভাল খেলোয়াড়, টপু করিয়া গোলাটা ধরিয়া ফেলিল। বিবাদ উস্কাইয়া দিবার এমন সুযোগ তাহাবা কি ছাড়িতে পাবে? দেশেব লোক ইংরেজকে যে দিন বুঝিবে সেই দিনই ইংরেজ বোচুকা বুচুকা বাধিতে আরম্ভ কবিত্তে; কিন্তু এখনও আবস্ত করে নাই। কিন্তু যদি অভিস্রুতা হইতে ইংবেজ না জামিয়া থাকে যে ধর্মসম্বন্ধীয় প্রচণ্ড ঘেবানল এখন শুধু ছাই-চাপা আছে মাত্র, তাহা হইলে তাহারা প্রচণ্ড ধর্মোন্মত্ততা জাগাইয়া তুলিবার সুঁকি স্বীকাব করিয়াও, এইরূপ বিপদ বাধাইবাব চেষ্টা করিবে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তাছাড়া হিন্দুরা বেকপ দ্রুতবেগে ঠেলিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে আটকানো আবশ্যক। আলিগড়-কালেক্সে, ইংরেজ মুসলমানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া গেল। কালেক্সের প্রধান অধ্যক্ষ খিওডোর

বেক্ সৈয়দেব মনোভাবগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য কবিলেন এবং তাঁহার অনেকগুলি কল্পনাকে ফুৎকাব দ্বারা উস্কাইয়া দিলেন। সৈয়দ ইংরেজি ভাল জানিতেন না ; বেক্ সৈয়দেব হইয়া ইংরাজিতে বক্তৃতা করিলেন, প্রবন্ধ লিখিলেন। তিনি কংগ্রেসেব রাজবিদ্রোহিতা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, এবং “ভারতের বিপদ আসন্ন” এই বলিয়া একটা চীৎকাব তুলিলেন। সেই ধ্বনি উর্দুতে, বাঙ্গলায়, মরাঠিতে প্রতিধ্বনিত হইল :—সকল প্রদেশের ও সকল জাতির অন্তর্ভূত বক্ষণশীল দল ভীত হইয়া তাঁহাব লিখিত পুস্তিকাকে এক একটা প্রবন্ধের দ্বারা ফাঁপাইয়া তুলিল। অস্বৃত ব্যাপার! দেশানুরাগ কোমর বাঁধিয়া অগ্রসব হইল। দেশানুরাগকে এখন দেখাইতে হইবে যে কংগ্রেসওয়ালাদের অপেক্ষা উহার জাতীয় ভাব সমধিক। বেক্, কানীষ বাজা, সৈয়দ আহম্মদ, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, “ভারতের দেশানুরাগী সভা” নামে একটা সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার একটা দোষ এই যে ইহার দুইটা মাথা—দুই মাথা দুই বিভিন্ন দিকে শবীরটাকে সবেগে টানিবার চেষ্টা করিতেছে। স্বচ্চ টেরিয়ারের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। স্বচ্চ টেরিয়ারের গা রৌরয় একপ আচ্ছন্ন যে উহার কোথায় মাথা, কোথায় লেজ তাহা বলা যায় না।

যে দিন সভার চোক কান ফুটাবাব কথা সেই দিনই সভাটা ভাঙ্গিয়া গেল। এই সকল অভিনেতার অঙ্গভঙ্গীর পিছনে বোধ হয় বিদেশী সাহেবেব মুক অভিনয়েব একটু আবছায়া দেখা যাইতেছিল।...

আসলে, এই যুদ্ধকাণ্ডের আতিশয্য ও অতি বিধেয হইতে কংগ্রেসেব অনেকটা কাজ হইয়াছিল। এইরূপে নিন্দিত, অপবাদগ্রস্ত, গোয়েন্দাদৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া, কংগ্রেস কণ্টকময় পথে চলিতে শিথিল। প্রতিপক্ষীয়েরা কংগ্রেসের উপর কি দোষাবোপ করে?—কংগ্রেস বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন। তাই, প্রতি কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেসও স্বকীয় রাজভক্তি, ও বশ্ততা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়া থাকে।

কংগ্রেস এমন কোন আন্দোলন কবে না যাহা বৈধ নহে—যাহা ঠিক আইনসম্মত নহে।

তথাপি প্রতিপক্ষীয়েরা বলিতে লাগিল,—ভাবতের যেরূপ ইতিহাস, ভারত যেরূপ অসংখ্য জাতি ও বর্ণে বিভক্ত, ভারতের যেরূপ প্রকৃতি, ভারতের অজ্ঞতা, তাহাতে ভাবত এখনও পার্লামেন্টেব উপযুক্ত হয় নাই। একটা পার্লামেন্ট এই সকল মূল বিরোধী জাতিদ্বিগকে শাসন কবিবে, তাহাদেব ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিবে?—ইহা আকাশকুসুমের কল্পনা! যত বর্ণ, যত জাতি, যত উপজাতি, ততগুলি দলও গঠিত হইবে, আর তা যদি না হয়,—বলবানেব আপনাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়া হর্ষলদিগকে উৎপীড়ন করিবে। যেখানে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুব সংখ্যা অধিক সেই সকল মুনিসি-প্যাটিটিতে এইরূপ ঘটয়া থাকে। অন্তত একটা লোকমত থাকা আবশ্যক। কিন্তু এদেশে অজ্ঞতাই একমাত্র বাধা নহে,—রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে ওদাসীল্য, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য এদেশীয় লোকের একটা প্রকৃতসিদ্ধ রোগ। চাষা ও ব্রাহ্মণ আইন ও কংগ্রেস লইয়া মাথা বকাইবে! যদি ভারতে প্রতিনিধি নির্বাচনের কোন একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকিত তাহা হইলে উহাদের নির্বাচিত হইবাব কি কোন সম্ভাবনা থাকিত?—সেই সব লোক যাহারা ধর্মোৎসবের ব্যবস্থা করে, যাহারা মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজকোষ শোষণ কবিবে; বিশেষত যাহারা কার্য-তালিকার শীর্ষদেশে প্রথমেই বড় বড় অক্ষবে লিখিয়া রাখিবে “যে কেহ গোহত্যা করিবে তাহার অচিরাত্ প্রাণদণ্ড হইবে।”

কিন্তু একেবারেই সার্বজনিক নির্বাচন-অধিকার দেওয়া হউক, একথা ত এখন উপস্থিত হইতেছে না। কংগ্রেসের মিতবাদী দল অতটা এখন চাহিতেছে না। বিদেশী ও অস্থায়ী রাজপুত্রবদিগের শাসনেব উপব বাহাতে দেশীয় লোকের কতকটা কর্তৃত্ব থাকে,—উহারা এই টুকু শুধু চাহিতেছে।

লাহোবের ‘আকবারি’ নামক মুসলমান সংবাদপত্রের পরিচালকেব নামে মুস্তাফা-কামেল আমাকে একটা পবিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। সেই পত্রখানি ও একতাতা ফরাসী সংবাদপত্র উপহার স্বরূপ তাঁহাকে দেওয়ায়, তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এখন কিরূপ সম্বন্ধ?

—“পূর্বাপেক্ষা ভালও নহে, মন্দও নহে। যদি

ইংরেজরা এখান হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে রক্তনদী বহিয়া যাইবে... দেখ, আমরা কংগ্রেস হইতে তফাতে আছি— কিন্তু তুমি সেখানে যাও, সেখানে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিকে তুমি দেখিতে পাইবে, দেশের মতামত জানিতে পাইবে। সেখানে পদার্পণ করিতে পাবি না বলিয়া আমি নিজে (ব্যক্তিগত ভাবে) হুঃখিত ; তা ছাড়া আরও বেশী, আমি কংগ্রেসের পক্ষপাতী ; হিন্দুর পক্ষ হইতে, হিন্দুরা যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রাব্য।

“কিন্তু আমরা বাস্তবিকই উহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি না। তুমি হয়ত মনে করিতেছ, ধর্মের জন্ত যোগ দিতে পারি না, কিন্তু তাহা নহে। অবশ্য, ধর্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি কুসংস্কার যে না আছে এমন নহে, কিন্তু আসলে আমাদের অনৈক্যের মূল তাহা নহে। দেখ কংগ্রেসের মধ্যে পার্শ্ব আছে, শিখ আছে এবং কতকগুলি স্বপক্ষত্যাগী মুসলমানও আছে। আমি সমস্ত কথা তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত, এবং হিন্দুদেরই ‘পোহা-বারো।’ হিন্দুবা বুদ্ধিমান, আমাদেরিগেব অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত, কেন না তাহারা ভয় পাইয়া ইংরাজি শিক্ষাব সুযোগ ছাড়ে নাই। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়েব উপাধি পাইয়াছে, তাহারা বি-এ, তাহারা এম এ। পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞতা বশতই হউক, কুসংস্কার বশতই হউক, ইংবেজি শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। আমি একটু ইংবেজি বলিতে পারি ; একলা আমিই এই কুসংস্কার-জাল হইতে মুক্ত... হিন্দুরা সকল বিষয়েই কিছু কিছু জানে। আর বাঙ্গালীদের কিছুই অজ্ঞাত নাই, তাহারা যে কোন বিষয় উপস্থিত হোক না কেন, সেই সম্বন্ধে কথা কহিতে পারে। আমরা ইংরেজী ভাল বলিতে পারি না। মনে কবিতা দেখ, ভাল বক্তাদের মধ্যে আমাদের কিরূপ অবস্থা হইবে ; আমাদের বক্তৃতা “আহা ! ওহো ! বাহবা” এইরূপ কতকগুলি উচ্ছ্বাস বাক্যেই পরিণত হইবে।

“আর একটা পরিণাম :—হিন্দুরা অধিক শিক্ষিত, সরকারী কাজকর্ম উহারাই পাইবে, এবং বরাবর যদি এই ভাবে চলে, ক্রমে উহারাই আমাদের শাসনকর্তা হইবে। হিন্দুবা উহাদের সংবাদপত্রে, উহাদের কংগ্রেসে কিসের দাবী করিতেছে ? তাহারা চাহিতেছে—সরকারী নিয়োগের

জন্ত প্রতিযোগিতার পরীক্ষা উদ্ভুক্ত হউক এবং যাহাতে কোন প্রকার বিড়ম্বনা না ঘটে এই জন্ত এই পরীক্ষা ভারত ও লণ্ডন উভয় স্থানেই হউক... আমি শতবার বলিব, উহার যাহা বলিতেছে তাহা খুবই শ্রাব্য। কিন্তু আমাদের কথা স্বতন্ত্র :— আমবা পিছাইয়া পড়িয়াছি, ভোজের স্থানে আমরা হিন্দুদের পরে আসিব, সরকারের প্রসাদটুকুবা যাও হুই একটা আমাদের ভাগ্যে পড়িবে, তাও আমাদের হাত হইতে জোব করিয়া কাড়িয়া লইবে।”

“আমাব শেষ কথা কি তুমি শুনিতো চাও ? হিন্দুরা ধনী, আমরা দরিদ্র। উহার যে আমাদের অপেক্ষা কর্মদক্ষ তাহা আমি অস্বীকার করি না ; কিন্তু কোরাণ আমাদেরিগেব সুদে টাকা ধার দিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং তাছাড়া, টাকা কড়ি সম্বন্ধে আমাদের দক্ষতা মোটেই নাই ... এ বিষয়ে হিন্দুদের কোন সন্দেহ নাই। উহার ভারতবর্ষের ইছরী।”

যদি আমি ঠিক বুঝিয়া থাকি—জাতি, ধর্ম, অহংকার, ঈর্ষা, বিশেষতঃ ক্ষণিক স্বার্থবিরোধ,—এই সমস্ত কারণেই উহার কংগ্রেসে যোগ দিতে বিবত হইয়াছে। অদ্ভুত ভাগ্যবিপর্যয় ! এখন মুসলমানেরাই ভয় করিতেছে পাছে হিন্দুরা তাহাদের প্রতি “পারিয়ার” মত ব্যবহার কবে। কিন্তু এ কথা শুধু লাহোর ও পার্শ্ববর্তী স্থানেব পক্ষেই ধাটে, যেখানে মুসলমানমণ্ডলী বেশ জমাটী ভাবে অবস্থিত হইলেও সংখ্যায় অনেক কম। আলীগড়ের কালেজে এই অনৈক্য পোষণ করিতেছে। যখন আমি সেখানে গিয়াছিলাম, বেঙ্ক-সাহেবের উত্তরাধিকারী কালেজের প্রধানাধ্যক্ষের জীব কোন কাজ ছিল না—তিনি শুধু ঐ কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। বোম্বায়ে, মাদ্রাজে কতকগুলি মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিয়াছে।

কংগ্রেসের গঠন সম্বন্ধে হুই একটা কথা বলি। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ কি দস্তব মত নির্বাচিত হইয়া কংগ্রেসে আইসেন ? উহাদেরিগেব কে নির্বাচন করে ? উহার কি কোন আদেশবাক্য, কোন ক্ষমতাপত্র লইয়া আইসে ?

উহাদের শত্রুরা বলে উহার স্বৈচ্ছাপ্রবৃত্ত আন্দোলনকারী, উহার আপনাই আপনাদের প্রতিনিধি, দেশের প্রতিনিধি মোটেই নহে। উহাদের শুধু কলম আছে, সেই কলম

আফালন করিয়াই সরকারকে ভয় দেখায়। দেশের আসল নেতা তাবাই যাদের তলোয়ার আছে ... কিন্তু খাপের মধ্যে থাকিয়া সে তলোয়ারে যে মর্চ্যা ধরিয়া গিয়াছে কিংবা কোতুহলের জিনিস বলিয়া জাহ্নবীরের দেয়ালে লটকানো বহিয়াছে ... ।

আসল কথা, প্রতিনিধিবা হিন্দু রায়ৎ কর্তৃক নির্বাচিত হয় না। ভোট দেওয়া জিনিসটা যে কি—হিন্দু রায়ৎ তাহা কিছুই বোঝে না। উহা বা মিতবাদী ও শিক্ষিত ভারতেরই প্রতিনিধি। যাহারা মিথৈব প্রবন্ধ ও ফক্সের বক্তৃতা মন্বন করিয়া স্বকীয় বিশ্বাসের বীজমন্ডল পাইয়াছে, ইহা বা সেই নব্যভারতেরই প্রতিনিধি। নির্বাচনপ্রণালী সম্বন্ধে ব্যানার্জি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে এইরূপ বলিয়াছিলেন :— “আমাদের প্রতিনিধিরা দস্তুর মত নির্বাচিত হইয়া থাকে। আমি সাহস কবিত্তা বলিতে পারি, তোমাদের পার্লামেন্টের মেম্বরেরা যে প্রণালীতে নির্বাচিত হয়, আমাদের প্রতিনিধিরাও সেই প্রণালীতেই নির্বাচিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন দল কর্তৃক এই সকল প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। গত বৎসরে বোম্বাই নগরে যে কংগ্রেস বসিয়াছিল, সেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিনির্বাচন কার্যে প্রায় তিন কোটি লোক যোগ দিয়াছিল।” বস্তুত, এই বোম্বাই প্রদেশের প্রত্যেক প্রধান কেন্দ্রে কংগ্রেসের এক একটি স্থায়ী সমিতি আছে। প্রাদেশিক সমিতিগুলি, একটা কেন্দ্রগত সমিতির সহিত সংযুক্ত ;—সেগুলিও স্থায়ী সমিতি। বিভিন্ন দলভাব সহিত একযোগে ঐ সকল সমিতি নির্বাচনকার্য পরিচালনা করে। কংগ্রেসে আর একটি সমিতি আছে, লণ্ডনে তাহাব কার্যালয় ; এই সমিতির অধীনে “ইণ্ডিয়া” নামে একটি সংবাদপত্র আছে ; পার্লামেন্টের অনেকগুলি মেম্বর এই সমিতির সদস্য। এই সমিতির দ্বারাই কংগ্রেসের গঠন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়াছে।

ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ভূত নামানো ।

আমরা কিছুদিন ভূত নামাইয়াছিলাম। আমাদের ভূত-নামানো ব্যাপারটা প্রধানতঃ হিপনটিজমের সাহায্যেই হইত,

এই হিপনটিজমে যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত ভূতভেদ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার অনেকাংশ ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘সম্মোহন-বিদ্যা’ নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে জিপাদ টেবিল লইয়াও ভূত নামানো হইত ; সত্যি ভূত কি না তাহা জানি না। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে নিশ্চল টেবিলটা বাহ কোন শক্তির সাহায্য না লইয়া প্রাণবিশিষ্ট জীবের জ্ঞান নড়িতে থাকে। তাহার ঘাড়ে ভূত না চাপিলেও, তাহার মধ্যে একটা আত্মা—একটা শক্তির যে আবির্ভাব হয় তাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের মধ্যে প্রথম প্রথম কেহ সন্দেহ করিতেন যে আমাদেরই কেহ ছষ্টানী করিয়া টেবিল নড়াইতেছে, কিন্তু সে ভ্রম শীঘ্রই ঘুচিল। একদিন টেবিলের একদিকটা একটু উঁচু হইবা-মাত্রই আমবা সকলেই প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া তাহাকে দাবিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই অজ্ঞাত শক্তি সকলকার বল ধর্ম করিয়া টেবিলের এক পায়া স্বচ্ছন্দে তুলিয়া ধরিল। আমরা অবাক !

চৈত্রের প্রবাসীতে প্রভাত বাবুর ভূত নামানোর বিবরণ আমাদের ভূত নামানোর সঙ্গে অনেকটা মেলে। আমাদেরও চক্রপ্রণালী ঠাহাদের প্রায় অল্পরূপ, তবে আমবা চারিজন ব্যক্তি লইয়া বসিতাম, তাহার কম বা বেশী লইতাম না। ঐ চারিজনের মধ্যে দুইজন স্থলকার, দুইজন স্থল, দুইজন স্থলর দুইজন কালো কিবা দুইজন উদ্ধত প্রকৃতির ও দুইজন নম্র প্রকৃতির লোক নির্বাচন করিয়া লইতাম এবং স্থলের বিপবীতে স্থল স্থলরের বিপবীতে কালো এবং উগ্রের বিপবীতে নম্র এই ভাবে সাজাইয়া বসাইতাম।

চক্রে বসিয়া আমরা সকলেই কোন একটা নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয় একমনে চিন্তা করিতাম। সাধারণত কোন দেব দেবী বা মূর্তি আমবা চিন্তাব জন্ত স্থির করিয়া লইতাম। প্রথম প্রথম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত, পবে দশ পনের মিনিটেব মধ্যেই টেবিল নড়িয়া উঠিত, তখন বুদ্ধিতাম ভূত আসিয়াছে। তাব পরে প্রশ্ন কব আরম্ভ হইত। প্রশ্নের জবাব হাঁ কি না বুদ্ধিবার জন্ত প্রথমই বলিয়া দেওয়া হইত, উত্তর ‘হাঁ’ হইলে টেবিল একবার মাত্র শব্দ কবাবে, ‘না’ হইলে দুইবার। ভূতের নাম ও তাহার বাসস্থান প্রভৃতি স্থির করিবার জন্ত আমরা

নিয়মিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। ‘অ’ ‘আ’ হইতে আরম্ভ করিয়া স্ব ও ব্যঞ্জননের সমস্ত বর্ণগুলি ঠিক পরে পরে আবৃত্তি করিয়া যাইতাম, যে বর্ণ উচ্চারণ করিবারাত্রই টেবিলের প্রথম শব্দ পাওয়া যাইত তাহাই আমাদের প্রশ্নের উত্তরের আদ্য অক্ষর বুঝিয়া লইতাম, আবার ‘অ’ ‘আ’ হইতে আরম্ভ করিয়া যে বর্ণ উচ্চারণে পুনরায় শব্দ হইত তাহা দ্বিতীয় অক্ষর বুঝিতাম, এই ভাবে সমস্ত কথাটা ঠিক হইত। পুরা কথাটা পাওয়া গেলে সেই কথাটা উচ্চারণ করিয়া তাহা ঠিক হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করা হইত। ঠিক না হইলে প্রথম অক্ষর ভুল, কি দ্বিতীয় অক্ষর ভুল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া হইত। এই ভাবে কত প্রেতাশ্বা আমাদের নিকট তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে। অনেক রকমের ভূত আসিত, ইংরাজ, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি। প্রথমে বাংলা ভাষার প্রশ্ন করিয়া জবাব না পাইলে ইংরাজীতে বা হিন্দুস্থানীতে প্রশ্ন করিতাম। ইংরাজ ভূতকে ইংরাজীতে প্রশ্ন না করিলে জবাব পাওয়া যাইত না।

একবার একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে দিন প্রেতাশ্বাকে যতই প্রশ্ন কবি তার একটাবও ঠিক জবাব পাই না। বলিলাম এ প্রশ্নের জবাব ‘হাঁ’ হইলে একবার শব্দ করিও, ‘না’ হইলে দুইবার করিও, কিন্তু টেবিল আমাদের সে নিয়মে বাধ্য বহিল না, অনবরত ঠক ঠক করিয়া শব্দ করিয়া যাইতে লাগিল। প্রশ্নের উত্তর কি তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। নাম জনিবার জন্ত ইংরাজী ও বাংলা ভাষার সকল অক্ষরগুলি আবৃত্তি করিয়া গেলাম কিন্তু কোন অক্ষরেরই উপর টেবিল কোন শব্দ করিল না। আমরা তখন এই বুঝিয়া নিরন্তর হইলাম যে প্রেতাশ্বা যে দেশীয় লোক সে দেশের ভাষা আমরা জানি না।

টেবিলে ভূত আসিলে আমাদের পরিদর্শকদিগের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয়ক নানা রকমের প্রশ্ন করিবার ধুম পড়িয়া যাইত। টেবিল ঠকাঠক করিয়া সব প্রশ্নের জবাব দিয়া যাইত। অনেকে অতীত ঘটনা ঠিক মিলিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস প্রকাশ করিতেন, কেহ বা ভবিষ্যদ্বাণী জব সত্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন; কেহ বা আশায় উৎফুল্ল কেহ বা নৈরাশ্রে শ্রিয়মান হইয়া পড়িতেন; প্রশ্ন করিয়া উদ্গ্রীব

হইয়া সব বসিয়া আছেন,—টেবিলের পায়ের দিকে লক্ষ্য! যাহার উত্তর ‘না’ হইলে ভাল হয় তিনি একটা শব্দ শুনিয়া আর একটা শুনিবার জন্ত ছটফট করিতেছেন, প্রতি মুহূর্তে আশা করিতেছেন ঐ বুঝি টেবিল উঠিতেছে। পরিশেষে যখন দেখিলেন টেবিল অচল, তখন তাহার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া যাইত! ভূতের সব কথা যে ঠিক হইত তাহা নহে, কিন্তু এক একটা ভবিষ্যদ্বাণী খুব আশ্চর্য রকমের মিলিয়াছিল। চক্রস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে বিষয় জানা আছে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে তাহার জবাব নিতুল হয়।

হিপনটাইজ করিয়া মিডিয়মের দেহে প্রেতাশ্বার আবির্ভাব হইলে আমরা তাহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলাম—“আপনারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব বলিতে পারেন?” তাহাতে জবাব পাই,—“ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, মানুষের কাছে ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকারময় আমাদের কাছেও তেমনি,—আমাদের এমন কোন শক্তি নাই যাহার সাহায্যে সেই অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চালাইয়া তাহার রহস্য ভেদ করিতে পারি। তবে আমাদের দেহ জড়বস্তু বিবর্জিত বলিয়া আমরা মুহূর্ত মধ্যে সব স্থানে গিয়া—সে যত দূরদেশই হউক—বর্তমান ঘটনা জানিয়া আসিতে পারি। আপনাদিগকে কোন প্রেতাশ্বা যদি ভবিষ্যতের কোন কথা বলে, বুঝিবেন সে মিথ্যা বলিতেছে, না জানিয়া আন্দাজে বলিতেছে। মানুষের মনেন্দ্র কথা আমরা জানিতে পারি, জড় দেহ হইতে মুক্ত বলিয়া আমরা মানুষের অন্তরটা চোখের সামনে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই—তাহাদের মনেন্দ্র মধ্যে যে ভাব উঠিতেছে, লয় পাইতেছে একটু মনোযোগ করিলেই তাহা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এই জন্ত অতীত ঘটনা অনেক সময় আমরা ঠিক বলিতে পারি—যখন আপনাবা আমাদিগকে অতীত ঘটনা সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন করেন তখন তাহাব জবাব আমরা আপনাদের মন-মধ্যেই অন্বেষণ করি, আপনাবা যাহা জানেন না, আমরা তাহার জবাব দিতে পারি না। আপনাদের যদি তাহার জবাব ভুল জানা থাকে, আমরাও ভুল বলিয়া দিই।”

বর্তমান ঘটনা প্রেতাশ্বার ঠিক বলিয়া দিত। আমরা একবার আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু তখন কোথায়

আছেন তাহা আমাদের মিডিয়মকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি উত্তরে বলেন বোধায়ের পথে রেলগাড়ীতে আছেন। আমরা পরে অনুসন্ধান করিয়া জানি তিনি সত্যই সে সময়ে ট্রেনে ছিলেন, বোধাই হইতে ক্রিতিতেছিলেন।

একদিন টেবিল নাচিয়া উঠিলে আমরা প্রেতাচার্য্য নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। পূর্ব বর্ণিত উপায়ে নাম বাহির হইল তা—ন—সে—ন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম তিনিই সেই জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ তানসেন কি, না। টেবিল ঠক করিয়া কেবল একটা শব্দ করিল, জবাব তইল হাঁ। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—আচ্ছা, আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে যদি কেহ গান করেন তবে আপনি টেবিলের পায়ে শব্দে ‘তাল’ দিতে পারেন কি, না। উত্তর হইল ‘হ্যাঁ’। আমাদের একজন সঙ্গী তখন গাহিতে আরম্ভ করিলেন,—ঠিক তাগে তাগে টেবিল উঠিতে, নামিতে লাগিল—কখন ধীরে ধীরে, কখন দ্রুতভাবে, কখন জোরে, কখন আস্তে আস্তে শব্দ করিয়া নানা ভঙ্গিতে টেবিল ‘তাল’ দিতে লাগিল—সে শুধু একটা নীরস, কেঠা ঠক ঠক শব্দ নয়—মনে হইতেছিল সত্যই যেন কি একটা গুরু গম্ভীর বাস্তব বাস্তবিত্তে! অল্প ক্ষণের মধ্যেই এই টেবিল-বাঞ্চে গানটা রীতিমত জমিয়া উঠিল। আমাদের মধ্যে একজন বাস্তবপুণ ছিলেন। তিনি বলিলেন আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি কোথাও তাগে ভুল হয় নাই।

টেবিলে একদিন ভূত আসিলে আমরা তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা আপনি এমন কোন ব্যাপার আমাদের কাছে দেখাইতে পারেন যাঁহাতে আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়,—যেমন ধরুন আমরা এই ঘরের দরজা অর্গলবদ্ধ করিব, আর আপনি তাহা খুলিয়া দিবেন। উত্তর হইল—হাঁ। আমরা অর্গল বদ্ধ করিয়া দিলাম, সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম দেখা যাউক কি হয়,—তুই মিনিট, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কাটিয়া গেল, দ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ তেমনই। আমরা প্রশ্ন করিলাম—কি হ’ল? কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন টেবিলের ঝাড় হইতে ভূত নামিয়া গিয়াছে। ইহার পরে আর একজন ভূতকে ঠিক ঐরূপ করিতে বলা হইয়াছিল, সে জবাব দিয়াছিল—“প্লারিব না।”

ভূত-নামার টেবিলে একদিন একটা নূতন রকমের

ঘটনা ঘটিল। সে দিন চক্র করিয়া বসিবার খানিকক্ষণ পরে আমাদের দলেব একজন শিথিলান্ন হইয়া চুস্তিয়া পড়িল,—অলক্ষণ পরেই একেবারে অজ্ঞান। আমরা ধরাধরি করিয়া চেয়ার হইতে নামাইয়া এক খাটের উপর তাহাকে শোয়াইয়া দিলাম। সে অনেকক্ষণ নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল, তাহার পরে দেখা গেল, তাহার দক্ষিণ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। আমরা মনে করিলাম, ভূত সেদিন টেবিলের ঝাড়ে না চাপিয়া, সেদিন দয়া করিয়া বন্ধুর ঝাড়ে চাপিয়াছে। আমরা তাহার হাতে একটা পেন্সিল গুঁজিয়া দিয়া, একখানা সাদা খাতা এগাইয়া দিলাম। তারপর প্রশ্ন করা শুরু হইল। কাগজের উপর লিখিয়া ভূত তাহার জবাব দিতে লাগিল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

নেপালে বৌদ্ধধর্ম।

শাক্যসিংহের জীবদ্দশায় কিছা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। যে কুশীনগরে তিনি দেহত্যাগ করেন তাহা নেপালের অন্তর্গত ছিল ইহাও অনেকে প্রমাণ করিতে আশ্বাস করিয়াছেন। কুশীনগর নেপালের অন্তর্গত ছিল কি না তাহা নিশ্চিত প্রমাণীকৃত না হইলেও শুদ্ধোদনের রাজ্য যে নেপালের পাদদেশ পর্যন্ত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেখানে শাক্যসিংহ ভূমিষ্ঠ হন তথা হইতে নেপাল বহুদূর নয় সূত্রাং নেওয়ারদিগের কিম্বদন্তী অনুসারে শাক্যসিংহ সে রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

বর্তমান সময়ে নেপালের অধিবাসীদিগের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ, অবশিষ্ট হিন্দু। হিমাচলের ক্রোড়স্থ অধিকাংশ পার্বত্য রাজ্যসমূহে—যথা নেপাল, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্মই লৌকিক ধর্ম। কিন্তু নেপালের বৌদ্ধ ধর্মের যে বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল প্রভৃতি অপর কোন দেশে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মের সহিত ইহার তেমন সোসাদৃশ্য নাই। হিন্দু ধর্মের সহিত অপূর্ব সংমিশ্রণে ইহা এক

অপূর্ব বেশ ধারণ করিয়াছে। অতি পুরাকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত নেপালে ভারতবর্ষ হইতে নানাবিধ সম্প্রদায়ের লোক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই সঙ্গে অনেক ধর্মমত অনেক প্রকার আচার ব্যবহার এই দেশে প্রচারিত হইয়াছে। সুধু প্রচারিত হওয়া নয় সর্বধর্মের এবং সর্বজাতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বৌদ্ধ নেওয়ারগণের সহিত নেপালের আশ্রিত হিন্দুগণ বিবাহ স্ত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়েন এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধগণ অজ্ঞাত-সারে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নেওয়ারদিগের ভিতর দুইটি সম্প্রদায় আছে, বৌদ্ধমার্গী এবং শিবমার্গী। শিবমার্গীগণ প্রকৃত পক্ষে হিন্দু। গুপ্তাঙ্গগণের আগমনের পূর্বেই নেপালে এই উভয় সম্প্রদায় ছিল। নেওয়ার রাজ্যগণ সকলেই প্রায় হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ প্রজা-দিগের ধর্ম্মে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই; বরং অনেক সাহায্য করিতেন। তথাপি হিন্দু প্রজাগণই যে অধিকতর অনুগ্রহ এবং সহায়তা লাভ করিতেন তাহাতে সংশয় নাই। বর্তমান গুপ্তারাজগণ বৌদ্ধ প্রজাদিগের ধর্ম্মে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ কবেন না বটে কিন্তু তাঁহারা তাহাদের ধর্ম্ম অতি অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করেন; সুতরাং কি পুরাকালে কি বর্তমান সময়ে নেপালের বৌদ্ধগণ কখনই বিশেষভাবে রাজপ্রসাদ লাভে সমর্থ হয় নাই। কেবল এই কারণেই নয় নেপালের বৌদ্ধগণের মোটেই ঐ ধর্ম্ম এখন তথায় অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম তথায় শীঘ্রই লুপ্তধর্ম্ম হইবে।

বৌদ্ধদিগের ভিতর দুইটি প্রধান শাখা আছে; মহায়ান বা উত্তরদেশীয়, হীনয়ান বা দক্ষিণদেশীয়। মহায়ান সম্প্রদায়ই বোধ হয় এই নামের গৌরব স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন নতুবা হীনয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি অধিক পরিলক্ষিত হয়। নেপালের বৌদ্ধ-গণকে মহায়ান বলিব কি হীনয়ান আখ্যা দিব তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অশোকের মহিমা এখনও তথায় ঘোষিত হয়, অশোকের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমন্দির সকল এখনও তথায় দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু তিব্বতের সহিত নেপালের ধর্ম্মগত এবং বংশগত সৌহৃদ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মের আর এক বিশেষত্ব বাহা

কুত্রাপি নাই তাহা এখানে আছে। নেপালের বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের জায় বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। এইরূপ জাতিভেদ তিব্বতেও নাই, চীনেও নাই, জাপানেও নাই, সিংহলেও নাই। ইহা নেপালের নেওয়ারগণের মধ্যেই বিবর্তিত হইয়াছে। এই কারণেই নেপালের বৌদ্ধগণকে মহায়ান বা হীনয়ান কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিতে পারিতেছি না।—নেপালের বৌদ্ধদিগের ভিতর প্রচলিত বর্ণবিভাগ : সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি :—

বর্ণ বিভাগ।

পূর্বে বাহারা ভিক্ষু সন্ন্যাসী—বিহারবাসী ছিল, এখন নেপালের বৌদ্ধদিগের মধ্যে তাহারা ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করিয়াছে; তাহারা “বাহরা” নামে অভিহিত হয়। “বন্দ্য” হইতে “বাহরা” নামের উৎপত্তি। বৌদ্ধ-দিগের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু বর্তমান সময়ে বাহরাগণ অনেক স্থলে বংশানুক্রমে বিহারবাসী বটে কিন্তু তাহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম বিসর্জন দিয়া ভোগাসক্ত গৃহী হইয়াছে। তাহারা অধিকাংশই আমাদের দেশের সুবর্ণ-বাণিকের কর্ম্মনিযুক্ত। “অহিংসা পরমো ধর্ম্ম” বাদী বৌদ্ধগণের ভিতর ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিবার কোন জাতি নাই। বৈষ্ণবদিগের স্থানে দ্বিতীয় জাতি “উদাসী”—ইহারা সকলেই প্রায় ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত। চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও ইহারা বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিয়া থাকে। উদাসীগণ নেপালের বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধনিশ্রেষ্ঠ।

৩।—“জাপু”—ইহারা শূদ্রদিগের জায় কৃষিকর্ম্ম, দাসবৃত্তি এবং নীচ কার্যে লিপ্ত থাকে।

নেওয়ারদিগের ভিতর এই প্রধান তিন বর্ণ আবার নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের সহিত আহার বিহার আদান প্রদান করে না। করিলে জাতিচ্যুত হয়। এই প্রধান তিন জাতি ভিন্ন আট প্রকার অস্পৃশ্য জাতি আছে। তাহাদিগকে নছনি জাত বলে অর্থাৎ তাহাদিগের জল গ্রহণ করা যায় না।

বাহরাগণ ১। আরহান ২। ভিক্ষু ৩। শ্রবক ৪। চৈল্যক এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

উদাসীদিগের ভিতর ৩টি শ্রেণী আছে। জাপুগণ ৩০টি শাখায় বিভক্ত।

নেওয়ারদিগেব এই বর্ণবিভাগ যেরূপ বৌদ্ধধর্মকে মলিন এবং নিপ্ৰভ করিয়াছে এমন আব কিছুই নয়। নেপালে বৌদ্ধধর্মের পতনের ইহাই প্রধান কারণ।

ধর্মমত।

বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্র দুইটা প্রধান শাখায় বিভক্ত, আস্তিক এবং নাস্তিক। এক সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, অন্য সম্প্রদায় আদি বুদ্ধ এই নামে সর্বোচ্চ সর্বশক্তিমান জগতের স্রষ্টা পাতা বিধাতা পুরুষকে অভিহিত কবে। আদি বুদ্ধ অনাদিকাল হইতে শাস্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছেন অনন্তকাল এই ভাবেই স্থিতি করিবেন। আদি বুদ্ধ স্বয়ম্ভু ভগবান “আদি ধর্ম” বা আদি প্রজ্ঞার (জড়শক্তি) সহিত মিলিত হইয়া এই বিচিত্র জগত বচনা করিয়াছেন। ইহাই নেপালের বৌদ্ধধর্মের মূল ধর্মমত। ইহারা মানবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। ইহা আদি বুদ্ধেব অংশ এবং সেই সত্তায় বিলীন হওয়াই মুক্তি বলিয়া বিবেচনা করে।

আদি বুদ্ধ ইচ্ছাক্রমে পঞ্চ বুদ্ধেব সৃষ্টি করিয়াছেন।

আস্তিক নাস্তিক উভয় সম্প্রদায়ই আদিশক্তির ত্রিষ্ব স্বীকার কবিয়া থাকেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহা ত্রিষ্ব নামে অভিহিত, যথা—বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্ত্ব। এই ত্রিষ্বের মধ্যে আস্তিকেবা বুদ্ধেব এবং নাস্তিকেরা ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। বুদ্ধ প্রাণশক্তি অথবা চিং—ধর্ম জড়শক্তি—এবং সত্ত্ব উভয়ের মিলন সত্ত্ব এই দৃশ্যমান জগৎ কিন্তু অন্ত এক অর্থে সকল সম্প্রদায়ই এই ত্রিষ্বের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যথা—বুদ্ধ—শাক্যসিংহ, ধর্ম—তাহার বিধি বা শাস্ত্র, সত্ত্ব অর্থাত্ সম্প্রদায় বা সাধকদল। এই ত্রিষ্বের সাক্ষেতিক চিত্তরূপে নেপালে এবং বৌদ্ধ-জগতে সর্বত্রই একটা মধ্যবিন্দু সমন্বিত ত্রিকোণ ব্যবহৃত হয়। এই ত্রিকোণেব অনেক প্রকার স্তূপার্থ আছে।

সাক্ষেতিক “ওম্” শব্দে এই ত্রিষ্ব বৌদ্ধজগতে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধদিগের নিকট “ওম্” এই বাক্যের অর্থ বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্ত্ব। সমুদায় বৌদ্ধজগতে “ওম্ মণিপদ্মে হুম” বাক্যটি পদ্মপাণির পূজার রত্নরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রকৃত অর্থ লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু নেপালের পূর্বতনু রেসিডেন্ট সুবিখ্যাত হডসন সাহেব (Hodson)

ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন:— “সেই ত্রিষ্বের অন্তরে পদ্ম এবং মণি নিহিত আছে।” পদ্মেব মধ্যস্থানে একটা মণি পদ্মপাণিব চিহ্ন। পদ্মপাণি বৌদ্ধ সত্ত্বেরই মূর্তি। এই মন্ত্র মহাযান সম্প্রদায়েরই বিশেষত্ব। সিংহল প্রভৃতি দেশেব বৌদ্ধগণ এ মন্ত্র ব্যবহার করে না। নেপালে এই মন্ত্র সর্বদাই ব্যবহৃত হয়। আস্তিক বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করে একজন্মে না হউক জন্ম জন্মান্তরের পব বিগুচ্ছাত্মা ও নিষ্কাম হইয়া মানবাত্মা পবমাত্মা বা আদিবুদ্ধে বিলীন হইবে। এই জন্মান্তর বিশ্বাস বৌদ্ধধর্মের একটা মূলভাব। এই বিশ্বাসই “অহিংসা পরমোধর্ম” এই বাক্যেব প্রণোদক। এই হেতু জীবহিংসা বৌদ্ধশাস্ত্রে একান্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বিষয়কর ব্যাপার কি হইতে পারে যে নেপালের বৌদ্ধগণ অতি নৃশংস উপায়ে সর্বদা জীবহিংসা করিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্মের মূলভাব কিরূপে এরূপভাবে পদদলিত হয় ইহাও এক আশ্চর্য্য কথা। বৌদ্ধশাস্ত্রানুসারে পরলোকে স্বর্গভোগের ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধের স্বর্গ নির্কোণ বা পবমাত্মায় বিলীন হওয়া। এই প্রকার মুক্ত জীব বৌদ্ধশাস্ত্রে “বুদ্ধ” নামে অভিহিত হয়।

বৌদ্ধ দেবদেবীগণ।

যে ধর্মে কোন প্রকার পূজা অর্চনা স্তব স্তুতির ব্যবস্থা নাই সেই সাধনশীল ধর্মেও অনেক দেবদেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। আদিবুদ্ধ ইচ্ছাক্রমে পঞ্চ বুদ্ধেব সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদিগের সহিত আদিবুদ্ধের পিতাপুত্রের সম্বন্ধ। ইহারা “অমরবুদ্ধ” বা “দেববুদ্ধ”। যেসকল মানবাত্মা স্বীয় চেষ্টায় জন্ম জন্মান্তরেব পর নির্কোণ লাভ করিয়াছেন তাহাবাও মানবীয় বুদ্ধ। ইহারা পূজার বটেন কিন্তু দেবতা নন। মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদিগের মতে শাক্যসিংহ স্বয়ং মানবীয় বুদ্ধদিগেব মধ্যে শেষ ব্যক্তি। সেই অবধি অন্ত কেহ বুদ্ধ লাভে সক্ষম হন নাই। নিম্নে আদিবুদ্ধ হইতে যে পঞ্চ বুদ্ধ গ্রহণ হইয়াছেন তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল:—

আদিবুদ্ধ।

বৈরচন অশোভ রত্নসম্বল অমিতাভ অমোঘসিদ্ধ
আদি বুদ্ধের সহিত এই পঞ্চবুদ্ধেব পিতাপুত্র সম্বন্ধ।

বৈরচন যেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা—সেই হেতু তিনি এবং চতুর্থ ভ্রাতা অমিতাভ পদ্মপাণির পিতা বলিয়া অধিক পূজা লাভ করেন। এই পঞ্চবুদ্ধ হইতে আবার বোধিসত্ত্বগণ প্রসূত হইয়াছেন। এখানেও পঞ্চবুদ্ধের সহিত বোধিসত্ত্বগণের পিতাপুত্র সম্বন্ধ। এই বোধিসত্ত্বগণকে জন্ম দিয়া পঞ্চবুদ্ধ আদিবুদ্ধে লীন হইয়াছেন। এই বোধিসত্ত্বগণই দৃষ্টমান জগতের সাক্ষাৎ কর্তা। পঞ্চবুদ্ধের সহিত পট্টীভাবে পঞ্চবুদ্ধ-শক্তি মিলিত হইয়া পঞ্চ বোধিসত্ত্বের জন্ম দিয়াছেন। নিম্নে পঞ্চবুদ্ধ, বুদ্ধশক্তি এবং পঞ্চ বোধিসত্ত্বের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

- ১। বৈরচন + বজ্রদন্তেশ্বরী—সামন্তভদ্র
- ২। অমোভ + শোচনী—বজ্রপাণি
- ৩। রত্নসম্ভব + মামুখী—রত্নপাণি
- ৪। অমিতাভ + পানদারা—পদ্মপাণি
- ৫। অমোবসিদ্ধ + তাবা—বিশ্বপাণি
- ৬। বজ্রসম্ভব + বজ্রসম্বাদিকা—ষষ্ঠাপাণি

নেপালে যে সকল বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা পঞ্চবুদ্ধের সহিত বজ্রসম্ভব যুক্ত করিয়াছেন। নেপালের বৌদ্ধদিগের তান্ত্রিক সাধন গ্রহণ হিন্দুধর্মের প্রভাবের অন্ততম প্রমাণ। তান্ত্রিক সাধনের সর্বপ্রকার কুৎসিৎ অঙ্গীলভাবও তাহারা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু গোপন ভাবে এ সাধন সম্পন্ন হয় বলিয়া কদাচ কাহারো চক্ষে পড়ে না।

এই পঞ্চবুদ্ধ ভিন্ন ৭ জন মানবীয় বুদ্ধ আছেন। তন্মধ্যে শাক্যসিংহ শেষ।

নেপালের বৌদ্ধদিগের মতে প্রথম তিন দেববুদ্ধ কার্য সমাধান করিয়া আদিবুদ্ধে বিলীন হইয়াছেন। চতুর্থ বুদ্ধ অমিতাভের পুত্র পদ্মপাণি মৎস্তেন্দ্রনাথের উপর বর্তমান জগতের ভার পড়িয়াছে। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেব দেবীগণের সাহায্যে জগতের তাবৎ কার্য পরিচালিত কবিতেছেন। এইজন্ত পদ্মপাণি মৎস্তেন্দ্রনাথের নেপালের নেওয়ারদিগের নিকট এতাদৃশ সম্মান। অতঃপর সকল বুদ্ধ কেবল নাম মাত্রে আছেন; পদ্মপাণিই সর্বত্র পূজিত হইবেন। পদ্মপাণির কার্য সমাধা হইলে তিনিও আদিবুদ্ধে লীন হইবেন।

নেপালের নেওয়ারগণ মানবীয় বুদ্ধ ব্যতীত অস্তান্ত মানবীয় বোধিসত্ত্বের পূজা করিয়া থাকেন। এই সকল মানবীয় বোধিসত্ত্বের মানবীয় বুদ্ধের সহিত পিতাপুত্রের সম্বন্ধ না হইয়া গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ। যে মহাত্মা চীন হইতে আগমন করিয়া নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই মাজ্জশ্রী এই শ্রেণীর বোধিসত্ত্ব। নেপালে মাজ্জশ্রীর অনেক মন্দির আছে; এবং পদ্মপাণির পবেই নেওয়ার-দিগের হৃদয়ে ইহার আসন। এই সকল মানবীয় বোধিসত্ত্বের নিম্নে আবার এক শ্রেণীর মানব আছেন যাহারা বিশুদ্ধ জ্ঞান কঠোর সাধনা এবং পবিত্র জীবন দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। তাহারা কেহ বা জীবিত আছেন কেহ বা গতাত্ম হইয়াছেন। তিব্বতের লামাগণ এই শ্রেণীভুক্ত। তাহারা বুদ্ধের অবতার বলিয়া পূজিত হইলে, কিন্তু লামা-দিগের অবতারবাদ প্রকৃত বৌদ্ধশাস্ত্রমতে অসম্ভব ব্যাপার। কারণ প্রকৃত বুদ্ধত্ব লাভ করিলে বা আদিবুদ্ধে লীন হইলে আর জন্মগ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু বৌদ্ধগণ অতঃভাবে লামাদিগের বুদ্ধত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন মানব জাতির উপকারের জন্ত যে সকল বোধিসত্ত্ব বারম্বার জন্মপরিগ্রহণ করিয়া থাকেন লামাগণ সেই শ্রেণীর অবতার। নেপালে তিব্বতের লামার বিশেষ সম্মান আছে বটে কিন্তু তাহার সহিত ঐ দেশের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

নেপালের বৌদ্ধশাস্ত্র।

তিব্বতের জায় নেপালে বিস্তর প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম-গ্রন্থ পাওয়া যায়। হডসন সাহেব বিস্তর ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। নেপালের নেওয়ারদিগের দ্বারা এ সকল গ্রন্থ রচিত হয় নাই। তিব্বত হইতে আগত কোন লামা বা ভাবতবর্ষ হইতে ধর্মপ্রচারার্থ সমাগত সাধু মহাত্মাদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় শঙ্কবাচার্য্য বিস্তর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নেপালে দখল করিয়াছিলেন। অল্পসংখ্যক কবিলে নেপালের চতুর্দিকে এই সকল গ্রন্থ আজও পাওয়া যায়। গৃহস্থ এই সকল গ্রন্থ অত্যন্ত যত্নে রক্ষা করে। গৃহে অগ্নি লাগিলে সর্বস্ব ত্যাগ

করিয়া গ্রহণ করিয়া পলাইয়া যায়। এবং এষ্ট কারণেই এখনও নেপালে বৌদ্ধগ্রন্থ বিনষ্ট হয় নাই।

ধর্ম শাসন ।

তিব্বতের লামাবৃত্তায় নেপালের বৌদ্ধদিগের উপর কোন ব্যক্তিবিশেষের অপ্রতিহত শক্তি নাই। গুর্খা বাক্তগুরু তাহাদিগের বর্ণসম্বন্ধীয় সমুদায় বিবাদবিসম্বাদের মীমাংসা করিয়া থাকেন। ধর্মসম্বন্ধীয় সমুদায় মীমাংসা বাহরাগণ সম্মিলিত ভাবে কবিয়া থাকেন। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন কবিলে সামাজিক ভাবে তাহার প্রতিবিধান হয়। হইয়া থাকে, ইহাকে নেওয়ারগণ “গতি” বলে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ নিয়মামুসাবে ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে।

১। প্রত্যেক গৃহস্থকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বজাতীয়-গণকে ভোজ্য দিতে হয়। ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইলেও ইহার অত্যাধিক হইবার নহে।

২। স্বজাতি কাহারও মৃত্যু হইলে প্রত্যেক পরিবার হইতে এক একজন ব্যক্তিকে মৃতের সংকার এবং শ্রাদ্ধাদিতে যোগদান করিতে হয়।

গতির নিয়ম অগ্রাহ্য করিলে অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। গুরুতর সামাজিক অপরাধ করিলে তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয়। জাতিচ্যুতকে আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত ত্যাগ করে। তাহার মৃত দেহের সংকার কেহ করে না। ইহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি আর কি হইতে পারে? সুতরাং নেওয়ারদিগেব ভিতর সামাজিক শাসনের নিয়ম নিতান্ত শিথিল নহে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা ।

বিগত মাঘ মাসেব প্রবাসীতে “বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আজ কাল এ বিষয়ে যতই অধিক আলোচনা হয় ততই আমাদের পক্ষে হিতকর, কিন্তু অধিক আলোচনা যেরূপ হিতকর, ত্রুটিপূর্ণ সংবাদ আবার তদপেক্ষা অধিক অহিতকর। কেদার নাথ বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাতে সাধারণের মনে এরূপ ধারণা হইতে পারে যে দেশী চিনি

সস্তা প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও কারখানার স্বত্বাধিকারিগণ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন; এই ভ্রান্ত ধারণা সাধারণের মন হইতে দূর করিবাব জন্তই আমরা তাহার প্রবন্ধের ভ্রমগুলি প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলাম।

গত ২০শে ও ২৩শে কার্তিকেব “দৈনিক হিতবাদী”তে প্রথমে কেদার নাথ বাবু এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। আমরা ওরা অগ্রহায়ণের হিতবাদীতে তাহার ভ্রমগুলি প্রদর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তিনি প্রবন্ধটি সংশোধন না করিয়াই হিতবাদী হইতে যথার্থ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

আমরা এ কথা বলি না যে—আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইক্ষু আবাদ করিয়া নূতন ও উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্যে ইক্ষুরস হইতে একেবারে চিনি প্রস্তুত করিলে তাহাতে ক্ষতি হইবে; বরং আমাদের স্থির বিশ্বাস যে তাহাতে লাভ থাকিবারই সম্ভাবনা; কিন্তু কেদার নাথ বাবু ৩০।৩৫ হাজার টাকাব কলে ৩৭ হাজার টাকা ব্যয়ে ৭৮ টাকা দবে চিনি বিক্রয় করিয়াও যে ৫০ হাজার টাকা লাভ দেখাইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা নিম্নে একে একে তাহার ভ্রমগুলি প্রদর্শন কবিতোছি।

কেদার নাথ বাবু লিখিয়াছেন যে “প্রধানতঃ steamy পরিচালিত—crushing plant (মাড়াই কল) একটি এবং vacuum pan একটি, বিশেষ আবগার, এই দুইটি অধিক মূল্যবান। তদ্ব্যতীত turbine (তুরপিন) ২।১৮ টা ও অত্যাধিক খুচরা কয়েকটি জিনিষ অল্প ব্যয়েই হইতে পারে।” তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই খুচরা জিনিষ গুলিবু তালিকা ও মূল্য লিখিয়া দিতেন তবে বড়ই উপকার হইত। আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে বলিতে পারি boiler, centrifugal machine, filters, double or triple effect evaporating pan, প্রভৃতিও বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং এই সমস্ত খুচরা জিনিষের মূল্যও কম নয়। আশা করি তিনি কলগুলির একটি তালিকা ও মূল্য প্রকাশ করিবেন।

রিফাইন—ইক্ষু মাড়াই করিয়া রস হইতে একেবারে চিনি তৈয়ার করিতে হইবে অথচ শেওলার দ্বারা রিফাইন করিতে হইবে লিখিয়াছেন, এ কথার কোন অর্থই বুঝিতে

পাবিলাম না। শেওলা রসে দেওয়া যায় না, শুড়ের উপরে দিলে শুড় ক্রমশঃ পরিস্কৃত হয়। ইক্ষু মাড়াই করিয়া রস বাহির করার পর হইতে centrifugal machine হইতে চিনি বাহির হওয়া পর্য্যন্ত কোন্ স্থানে শেওলা দিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আশা করি শেওলা দ্বারা কি প্রকারে ইক্ষুরস পরিস্কৃত হইতে পারে কেদার বাবু তাহা বিস্তৃত ভাবে লিখিবেন। আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে বলিতে পারি যে ইক্ষুরস হইতে একেবারে চিনি তৈয়াব করিলে যদি উপযুক্ত দক্ষ ব্যক্তির হস্তে রস পরিষ্কার কবার এবং চিনি প্রস্তুত কবার ভার থাকে তবে তাহা স্বতঃই সাদা হইবে, কোন জিনিষ দিয়া পরিষ্কার কবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

কেদার নাথ বাবু লিখিয়াছেন যে “গত পৌষ মাসে আমরা উপরোক্ত প্রণালীতে experiment করিয়া বেশ কৃতকার্য হইয়াছি। অবশ্য আমাদের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির অভাবে সাধারণ নিয়মে বলদের সাহায্যে ইক্ষু মাড়াই করিতে হইয়াছিল এবং কড়া পাকে রস জাল দিতে হইয়াছিল।” পাঠক দেখিবেন যে তিনি “উপরি উক্ত” প্রণালীতে কিরূপ experiment করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত প্রণালী দ্বারা আমরা—

১। নিজ আয়ত্ত্বাধীনে উপযুক্ত পরিমাণ জমি রাখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করা।

২। স্টীম পরিচালিত কলে মাড়াই কার্য সম্পন্ন কবা।

৩। স্টীমের আঁচে vacuumএ রস পাক কবা।

৪। শেওলা দ্বারা রিফাইন করা।—

বুঝিয়াছি। কিন্তু এই চারি প্রকার প্রণালীর মধ্যে তিনি যন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করেন নাই তাহা তাঁহার কথাত্তেই জানা যাইতেছে। অতএব তিনি ২নং ও ৩নং উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই, মাত্র ১নং ও ৪নং প্রণালীতে experiment কবিয়া থাকিবেন বলিয়া বোধ হয়। এই সামান্য অভিজ্ঞতাতেই যে তিনি একটা ক্যাক্টরির লাভালাভের হিসাব বাহির করিয়াছিলেন ইহাই আশ্চর্যের বিষয়।

লাভালাভঃ—১০০/০ মণ ইক্ষুতে ৬০ মণ চিনি তৈয়াব হইবে এই হিসাবে তিনি আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়াছেন। এখন

দেখা যাউক যে তিনি আয়েব যে রকম দিয়াছেন তাহা কতদূর ঠিক। তাঁহার মতে প্রতি বিঘায় ৫০/০ মন হিসাবে চিনি উৎপন্ন হইবে। যদি ৬০ মন চিনি তৈয়াব করিতে ১০০/০ মন ইক্ষুর প্রয়োজন হয় তবে বিঘা প্রতি ৫০/০ মন চিনি করিতে ৮০০/০ মন ইক্ষু প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এক বিঘায় এত অধিক ইক্ষু হওয়া সম্ভব-পর নয়। যে জাতের চিনিতে আমাদের দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে সেই জাতাতেই বিশেষ যত্ন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিয়াও একার প্রতি ৩৯ টনেব অধিক ইক্ষু উৎপন্ন হয় নাই।

“Judging by the results,—the method adopted must be of the most perfect kind. In 1905 the average yield of cane per acre, obtained from the whole island was 87118 lbs. or nearly 39 tons. (The Louisiana Planter and Sugar Manufacturer, Sept. 1907' PP. 171).

মহীশূবে (Mysore) experiment করিয়াও ২৮ টনেব অধিক একার প্রতি পাওয়া যায় নাই (Vide Capital of 16th December 1906—Indian Sugar Manufacture)

যদি একার প্রতি ৩৯ টন বা ২৮ টন উৎপন্ন হয় তবে বিঘা প্রতি প্রায় ৩৫০/০ বা ২৫০/০ মন মাত্র ইক্ষু হওয়া সম্ভব। যদি বিঘা প্রতি ৮০০/০ মন না হইয়া মাত্র ২৫০/০ ৩০০/০ মন ইক্ষু হয় তবে ১০০/০ মনে ৬০ মন হিসাবে বিঘা প্রতি প্রায় ১৬/০ হইতে ১৯/০ মন মাত্র চিনি হইবে ও তাহা হইলে যে হিসাব দিয়াছেন তদনুযায়ী ৭ টাকা মন দুয়ে চিনি বিক্রয় করিলে লোকসান পড়িবে।

কেদার নাথ বাবু লিখিয়াছেন যে এ বিষয়ে কেহ কোন বিশেষ তথ্য জানিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে লিখিলে তিনি তাহা জানাইবেন। এই নাকো আশাশ্রিত হইয়া নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম। আশা করি তিনি তৎসমস্তের উত্তর দানে বাধিত কবিবেন।

১। তিনি যে experiment করিয়াছিলেন তাহা Mr. Hadir প্রদর্শিত নিয়মে বা অন্য কোন নিয়মে?

২। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আবাদ করিয়াছিলেন কি না?

৩। বিঘা প্রতি ৮০০/০ মন ইক্ষু উৎপন্ন হইবে ইহা তিনি কি উপায়ে জ্ঞাত হইয়াছেন?

৪। বিধা প্রতি আবাদী খরচা ৭৫ টাকা ও চিনি প্রস্তুত করিবার খরচা ১০০ টাকা ধরিয়াছেন। তাহা কি উপায়ে অবগত হইয়াছেন ?

আমরা পরিশেষে পুনরায় বলিতেছি যে নিজের আয়ত্তা-ধীনে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করিয়া নূতন যন্ত্রাদির সাহায্যে ইক্ষু হইতে একেবারে চিনি প্রস্তুত করিলে তাহাতে লোকসান হইবে না। তবে কেদার নাথ বাবু বেক্সপ ছোট কল করিয়া অল্প মূলধন লাগাইয়া বেশী লাভ দেখাইয়াছেন তাহাই অসম্ভব জানাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল।

শ্রীকালিপদ দাস।

কোটচাঁদপুর।

দেবদূত ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

স্থান—নৈনিতাল।

কাল—প্রভাত।

(অরবিন্দ একাকী।)

অর। উজ্জল, মধুর, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, এই অমল উষায়
অতুল সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি হেথায়।
পরিপূর্ণতার সনে তারুণ্যেব হেন সম্মিলন
চির-অভিনব। স্নিগ্ধ রবির কিরণ
শিশিরের হার-পর্য্য এ ধারারে করি' আলিঙ্গন,
মরি—তা'রে বিবাহের বধূর মতন
সাজায়েছে! ধীবে ধীয়ে, তরুণাথে তুলিয়া স্পন্দন,
মোর দেহে আসি' মৃদু, শীতল পবন
পরশিছে—অদৃশ্য সে দিগ্ধর অঞ্চলের মত
প্রাণোন্মাদী। চতুর্দিকে জাগে সমুদ্রত,
স্তরে স্তরে তরঙ্গিত, স্তম্ভামল, যত সংখ্যাতীত
শৈল-শৃঙ্গগুলি। তা'র মাঝারে বিদ্যুত
সুগভীর হ্রদ থানি—বিমল, নিবিড়, স্বচ্ছ, শ্রাম,
নিটোল লাবণ্যভরা!—নয়নাভিরাম
যেন কোন সুর-বালা খেলিতে খেলিতে শ্রান্তিভরে
এলায়ে পড়ে'ছে হেথা বিশ্রামের তরে;
নির্দ্বাক্ সম্মুখে তাই, সারি সারি ঘিরি' তারে—মরি,
দাঁড়াইয়া মহাকাব্য অগণ্য গ্রন্থী।

লতিকা-বেষ্টনে বৃক্ষ-পত্র-অন্তরালে গুপ্ত রহি',
ছায়ায় ছায়ায় বেগে চলিয়াছে বহি',
“ঝর-ঝর-ছল-কল”-স্ববে গাহি' ত্রিদিব-রাগিণী,
শত শত, সুনির্মল গিরি-নির্বরিণী—
মর্ত্য-জনে সজীবনী সুধা-ধারা করাইতে পান!
এ স্থান যেন বা কোন নন্দন-উদ্যান
অমর বৃন্দের হেথা। সুধা-গন্ধি সমীর-হিলোলে,
উচ্ছৃঙ্খল নির্বরের ‘ছল-কল’-রোলে,
হ্রদ-সলিলের মৃদু উল্লাস-কম্পনে অনিবার,
মর্ম্মরিত বনানীর—তরু-লতিকার
প্রত্যেক স্পন্দনে,—নাহি জানি কেন, করে অন্তমনা
আর্জুনে! যেন কোন সুখের বেদনা
জগে' ওঠে মন-মাঝে, কর্ণে যেন বেজে' ওঠে কোন্
অস্পষ্ট, সুদূর-শ্রুত, বিস্মৃত, মোহন
অতীতের সঙ্গীত-মুচ্ছনা। হেথা প্রকৃতি-সুন্দরী
‘আপন সৌন্দর্য্য দেখি’ যেনরে শিহরি’
উঠিতেছে ক্ষণে ক্ষণে! হেরি' এবে মোহিনী প্রকৃতি
সুধু, জাগে মনে—কোন্ অজানিত স্মৃতি
অনির্দিষ্ট অতীতের শুধু যেন বেদনায় হিয়া
কি এক বিরহ ভরে ওঠে গো কাঁপিয়া
নিশি দিন! যবে ধীরে স্পর্শে তনু মধুর, অলস
সমীর-হিলোলে, যেন হারান পবন
কা'র করি' অনুভব—অপূর্ব্ব বিরহে কেঁপে উঠি!
নিভৃত কানন মাঝে হেরি যবে—ছ'টি
নির্মল কুসুম কুটে' আছে—গন্ধে করিয়া বিহ্বল
জন-শুভ্র, সে নিবিড়, স্তব্ধ বন-স্থল,—
তখন সে পুষ্প হেরি', লভিয়া সে স্নমধুব বাস
জানিনা কিসের তরে ওঠে দীর্ঘবাস
এ অন্তর হ'তে! যবে অজ্ঞাত কুলায় হ'তে পিক
অকুষ্ঠ আবেগে, মৌন, স্তম্ভ দশ-দিক্
কাঁপাইয়া, স্নমধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কারে ওঠে গাহি';
—সে স্বর-তবঙ্গ মাঝে ধীবে অবগাহি'
প্রাণ মোর কেঁপে' ওঠে, রোমাঞ্চিত হয় তনু মোর!
নেহারিলে প্রকৃতির রূপ মনোহর;
শুনিলে তাহার গান বিহঙ্গ ও তটিনীর স্ববে;
হেরিলে তাহার নৃত্য তরু-পত্র' পবে,
তরঙ্গিনী-মাঝে, হ্রদ-সমুদ্রের দোলন-কম্পনে;
শুনিলে তাহার দৃপ্ত, প্রচণ্ড গর্জনে—
বজ্র-ববে, মেঘ-মস্ত্রে, সাগরের স্বনে সুগভীর;
হেরিলে প্রকৃতি তা'র উদ্‌গম, অধীর
জলদ-সংঘর্ষে ক্ষুদ্র দামিনী'ব চকিত চমকে;
হেরিলে তাহার প্রেম জ্যোৎস্না-আলোকে,
হিলোলিত, স্তম্ভামল শান্তক্ষেত্রে, নীরদ-বর্ষণে;

—নিবস্তব নাহি জানি—কি গুপ্ত কারণে
ভাবের সংঘাতে নিত্য আন্দোলিত হয় মোর প্রাণ ;
কি গুপ্ত বিরহে সদা হয় কম্পমান
নাহি জানি এ অশান্ত হিরা ! যেন করি উপভোগ
মুক প্রকৃতির সনে অন্তরের যোগ
অবিবাহ । মনে হয়—যেন বহে কোন চিরন্তন,
বিবাহে ঐক্যের স্তব্ধ, নাড়ীর বন্ধন
মোর সনে প্রকৃতির ।

তবু, আজো কেনরে আমার
বিন্দু শাস্তি নাহি প্রাণে ? হেবি' এ অপাব
অমুপম শোভারশি, কেন গোব এ অন্তর-মাঝ
তবু জাগে হাহাকার ? ওগো বিশ্ব-বাজ,
বলো, বলো—কোন পাপে অহবহ সহি এ দাক্ষ
তুহানল-জালা । কতু হৃৎথের আগুন
নির্বাপিত হ'বে নাকি ? ডুবি' এ সৌন্দর্য্যে চাহি যত
ভুলিতে অন্তর-জালা—আরো অবিবত
ততই যেনবে মোব বেড়ে ওঠে বেদনা হঃসহ
জীবনেব ;—যেন আরো নবীন বিরহ
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে হাহাকারে এ হিয়া আমার !
কোথা যা'ব ? এ বিশাল বিশ্বে বিধাতার—
কোথা, কোথা আছে মোর স্থান !

এই অতি দূর দেশে
স্বপ্ন-ভবন ছেড়ে', এতদিনে, এসে
কিবা ফল লাভিলাম !

[নীরবে, চিন্তিতভাবে পদ-চারণা করিতে লাগিলেন ।]

শুধু আর বৃথা কতদিন
অস্থির, উদ্দামভাবে, হেন লক্ষ্যহীন
কাটা'ব জীবন মোব ? পড়ে'ছে শূন্য যা'র পাশে,
সে অবোধ, হতভাগ্য কেন আর চায়—
মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গেব সম, এই সংসারের মাঝে
কবিবাবে বিচরণ ? বন্দীর না সাজে
স্বাধীন জীবন হেবে ক্ষুধ্র মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলা
—অকাবণে, অবিবাহ ! করি' অবহেলা
আপন কর্তব্য ধর্ম্ম, জীবনেব সর্ব্ব কর্ম্ম ছাড়ি',
উদাসীন হ'য়ে, শুদ্ধ অদৃষ্টে থিকারি'—
এ হেন জীবনে আব কিবা প্রয়োজন ?

কে কোথায়
লাভিযাছে কাম্য কতু বিনা সাধনায় ?
কর্ম্ম বিনা লভ্য বস্তু কা'ব কবে গিলেছে নিখিলে ?
চাহি শাস্তি : কিন্তু, কর্ম্ম-স্রোতে না নামিলে,
না করিলে স্বীয় প্রাণ বিশ্বের কল্যাণে বিসর্জন,
কেমনে লভিব আমি তাহা ? এ জীবন
নিশ্চেষ্ট ঔদাস্যে, আব অক্ষুধ আলস্যে,—স্বথ-আশে,

যদি সদা স্বার্থ লাগি', ক্ষুধ্র দীর্ঘশ্বাসে
জীর্ণ করি নিবস্তব গৃহ-কোণে বসি', তবে আর
কেমনে লভিব আমি শাস্তি-সুখ-ধার
সিক্ত, স্নিগ্ধ করিবারে এ জীবন-মক ? স্বার্থে কবে
পেয়েছে পরম তৃপ্তি এ বিশাল ভবে
সঙ্কীর্ণ মানব ? যদি নাহি পারি একান্তে সঁপিতে
স্বীয় ক্ষুধ্র স্বার্থ-কণা এ ধরার হিতে ;
যদি পরার্থেবি মাঝে বিসর্জিয়া অস্তিত্ব আপন,
পরার্থে না পারি নিতে কবিতা বরণ
নিজেরি স্বার্থের মত কাম-মনে একান্ত সহজে—
তবে বৃথা জন্ম মম, বৃথা তবে ধোঁজে
ফিরিতেছি শাস্তি তবে হাহাকার কবি' ! শাস্তি কোথা
অবেষিছ ওরে অন্ধ, নিয়ত অবধা
সঙ্কীর্ণ, তিমিরাবৃত, রক্ষু হীন বাসনা-কারায় ?
[করতল-স্তম্ভ-গুণ্ড হইয়া শিলাসনে উপবেশন করিলেন ।]

অজয়ের স্মহান আদর্শ আমার
আজো নাহি করিল চেনন ! কিবা অমুপম তা'র
স্বার্থ-ত্যাগ, কর্ম্ম-নিষ্ঠা । নিয়ত সবার
স্তম্ভার্থে, সেবায় দিল কাটা'ইয়া নম্বর জীবন
আপনারে একান্তেই হ'য়ে বিস্তরণ
কর্ম্ম-মোহে ! আজন্ম কুমার-ব্রত করিয়া গ্রহণ
মন-প্রাণে স্বদেশেরি কল্যাণ সাধন
কবিতোছে মৌনভাবে ! যশোলিপা, মান-অভিমান
তুচ্ছ করি', অকাতরে ধে'ছে বলিদান
আপনাবে আর্জ-স্তব-আশে । তাজি' সর্ব্ব স্বার্থ-স্পৃহা
স্বচ্ছায় এ সেবা-ব্রত,—অতুল ইহা
এ মরতে ! কেবা আমি অজয়ের ? তবু, মোব তরে
কি অতুল স্বার্থ-ত্যাগ ! মৌন প্রীতি-ভরে
ফিরিতেছে সাথে সাথে ছায়ার মতন ।

আর, আমি ?

—সদা স্বীয় চিন্তা-ময়, স্বার্থ-অমুগামী !
হেন ঘৃণ্য স্বার্থপর জীবনের কি কতু তৃপ্তি আছে ?
বেদনায়—অশ্রু-জলে, শূন্য গৃহ-মাঝে
ভগিনী-কলত্র মোর করিতেছে নিত্য হাহাকার
নব-জাত শিশুটিরে বক্ষে ধরি', আব,
হেথায় কলঙ্কী আমি শবসম রয়েছে পড়িয়া
—গাঢ় আলস্যেব ভবে নিব্বোধ-হিয়া !
[উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।]

বিধির নির্দিষ্ট মোব জীবনের কর্তব্য সকল
তুচ্ছ কবি', নাহি জানি—কি আশে, কেবল
হেনভাবে যাপিতেছি জীবন আমার । গৃহে মোর
পতি-প্রাণা, সাদৃশী সতী একান্ত কাতব,
শুদ্ধ মৌন বেদনায় চাহিতেছে আমার দর্শন ;

আর, হেথা প্রাণহীন পশুর মতন
আমি শুধু পড়ে' আছি উদাসীন, অনাসক্ত-মন ;
হেরি স্মৃতি—তিলে তিলে সতীর মরণ
নয়ন-সম্মুখে । সেই অকলঙ্ক, নবীন শিশুবে
কোন্ প্রাণে তাক্সি', আজো বহিয়াছি দূবে—
এ প্রবাসে ! কোন্ দোষে অপরাধী হ'ল মরি—সে-ও
মোর কাছে । 'আমা' হেন স্বার্থপর, হেম,
কাপুরুষ জীব আর আছে কিরে এভুবনে ! মোর
উপেক্ষায়, আর সেই একান্ত কঠোর
ব্যবহারে—সেলতিকা গিয়াছে শুকায় ধীবে, ধীরে !
এ জীবনে সে সত্যেরে কভু আর কিবে
দেখিতে পা'ব না ? হায়, আমারি লাগিয়া—

[অজয়ের প্রবেশ]

অজয় ।

সমাচার

এইমাত্র আসিয়াছে—শঙ্কা নাহি আর
মাধবীর জীবনের । কিন্তু, দেবতার ইচ্ছা কভু
পাৰিনা বুঝিতে ! পুনঃ—(নীরব হইলেন ।)

অরবিন্দ ।

অকাবণে, তবু

এমন কুণ্ঠিত ভাব কেন তব ?

অজয় ।

তব তনয়েব

সাংঘাতিক পীড়া ; নাহি আব জীবনের

আশা তার !

অর । (শূন্য দৃষ্টিতে, শুষ্ক কণ্ঠে, অর্ধ-স্বগত)

—দেখিতেও পা'ব নাকি ?

অজয় । (হস্ত-ধারণ করিয়া) চল চল গৃহে ।

স্বীয় কৰ্ম্ম-ফলে সখা, কহ—আজো কিহে
জাগিছে না অমৃতাপ কর্তব্যেরে কবি' অনাদর ?
সে কল্যাণী রমণীর তরে বন্ধুবর,
আজো কি অন্তরে তব বিন্দুমাত্র জাগেনি করুণা ?
—একি মনুষ্যত্ব ? ভ্রাতঃ, এ বিধে কভু না
লভে শাস্তি সেই জন ভ্রমোন্ময় জীবন যাহার ।
আজীবন উপার্কিয়া পাণ্ডিত্য অপার
কোথা তব হিতাহিতজ্ঞান ? কিবা ফল প্রিয়তম,
সেই জ্ঞানে যাহে মনে না আনে সংঘম,
নিদ্রিত বিবেক-শক্তি যাহে নাহি হয়হে জাগ্রত ?

অর । (করে কর সংঘর্ষণ করিয়া)

আমি মূর্খ, অতি হীন !

অজয় ।

—হও কৰ্ম্ম-রত ।

দূর কর হে স্মৃতি, যেচ্ছা-স্মৃতি, নিষ্ফল আক্ষেপ ।
হৃদয়ের ক্ষত-মুখে কৰ্ম্মের প্রলেপ
দেহ লেপি' ;—নির্দোষিত হু'বে জালারাশি । এভুবনে
• এসেছ কবিত্তে কৰ্ম্ম । কর্তব্য-পালনে
হও অবহিতচিত্ত । জ্ঞানী তুমি, জীবনের ধ্রুব

কর্তব্যেরে লহ বুঝি ; আপনার শুভ
সুবিচারে কবি' স্থির—সাধো বীবসম অবিরাম ।
এ জগতে চলিয়াছে যে মহাসংগ্রাম
জয়ী হও তাহে ।

গৃহে দেবীসমা ভগিনী ও জায়া

পড়ে আছে ; আব তুমি তেয়াগিয়া মায়া
তাহাদেব, সদা হেথা কাটাইছ তামস জীবন ।
চিত্তাক্রান্ত, মনোহর মূর্তি যেমন
নির্জীব আঁখিব তারা বিনা ; তুমি হে বন্ধু আমাব,
তেমনি অপূর্ণ সদা সংসার-মাকার
সে কল্যাণী মাধবীরে ছাড়া ! বারেক করহ মনে—
কোন্ দোষে নব-জাত সে পুত্র-রতনে
এমন নির্দয়ভাবে অবহেলা কবিছ নিয়ত !

চলহ তাঁদের কাছে । তব হৃদি-ক্ষত
ধৌত করি' দিবে সেধা সতী ধীরে, মোন অশ্রুণীরে
নিরন্তর সখা ।

অর । (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া)—চল—চল গৃহে ফিরে' ।

জয়ন্তিয়া ও খাসিয়া ।

কপিলি নদী পার হইলেই জয়ন্তিয়া ও খাসিয়া জাতির
সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । জয়ন্তিয়া জেলাব পার্শ্বত্যা ভূভাগের
অধিবাসীদিগকেও সমতলের অধিবাসীবা খাসিয়া বলে ;
ইহারা যে খাসিয়া তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু
ইহারা আপনাদিগকে 'খ্যি' বলে । ইহারা, স্থলী, পেশীপুষ্টি-
শরীর, কৰ্ম্মঠ, এবং বীরোচিতক্রীড়াপ্রিয় । ইহারা সর্বদাই
সশস্ত্র থাকে, ইহাদের অস্ত্র ধনুর্বাণ, দীর্ঘ নখ তরবার, ও
খুব বড় ঢাল যাহা বৃষ্টি বাদলের দিনে ছাতার কাজও
করে ।

জয়ন্তিয়ার রাজা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজ্যভ্রষ্ট ও
নির্দাসিত হইয়াছিল । সে নিতান্ত অসভ্য ছিল না ।
তাহার নিজস্ব সম্পত্তির মূল্য লক্ষমুদ্রা ছিল, সে সকল
নির্দাসন কালে তাহাকে লইয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছিল ।
রাজার বংশীরগণ এক্ষণে হিন্দু আচাবপদ্ধতি পালন করিয়া
সং-শুদ্ধ মধ্যে পরিগণিত হইতেছে । রাজ্যাব উত্তরাধিকার
বাজ্যার বংশে সংক্রমিত হয় না ; বাজ্যার পরে বাজ্যার
ভগ্নী যাহাকে কুয়ারী বা কুগারী বলে সেই রাজ্যাধিকারিণী
হয় এবং সম্রাস্ত পার্শ্বত্যা খাসিয়া হইতে তাহার বর মনোনীত

হয়। এইরূপে রাজ্যাধিকার শুদ্ধ খাসিয়া শোণিতেই আবদ্ধ রাখা হয়। খাসিয়ারা অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা আপনাদের শারীর বিশেষত্ব অবিকৃত রাখিয়াছে।

১৮২৬ সালে খাসিয়াদিগকে তাহাদের তিরুতজিংহ নামক এক বাজার সাহায্যে প্রথম বশীভূত করিয়া শ্রীহট্ট ও আসামের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৮২৯ সালের ৪ঠা এপ্রেল অজ্ঞাত কাৰণে (ইংরাজের মতে অ-কারণে) সাহুচব লেপ্টেনেন্ট বেডিংফিল্ড ও লেপ্টেনেন্ট বার্টন নিহত হন। ইহার ফলে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধাবসানে ১৮৩৩ সালে সমগ্র খাসিয়া পৰ্ব্বত ইংরাজ-অধিকৃত হয় এবং খাসিয়াদের রাজ্য তিরুতসিংহ আত্মসমর্পণ কবে। তখন খাসিয়া পৰ্ব্বতে বংশানুক্রমিক রাজার অধীনে কতকগুলি অধিষ্ঠান দেখা গিয়াছিল; এক এক বাজার অধীনে ২০ হইতে ৭০ খানা গ্রাম। সমগ্র জাতি একজন প্রধানের অধীনে থাকে অথচ প্রত্যেক লোকই অপরেব কর্তব্য নিয়মিত করিয়া সাধারণ-তন্ত্রে মত ব্যবহার কবে। তিরুতসিংহ সকলের অভিপ্রায় না জানিয়াই ইংরাজের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই পূর্বোক্ত হতাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত এক একটা পৰ্ব্বত ৬০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। নিম্নভূমি হইতে ২০০০ ফুট উচ্চে কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি আছে। তাহাতে কমলা ও পাতিলেবু, আনারস, কাঁঠাল, আম, সুপারী, কলা ও টেপারী প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মে। খাসিয়া পৰ্ব্বতের স্বাভাবিক সংস্থান ও দৃশ্য ভিন্ন আব একটি বিশেষত্ব আছে; নানা আকারেব স্তরপ্রস্তর সকল দেশের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রস্তর বোধ হয় মৃতব্যক্তির স্তরপ্রস্তররূপে স্থাপিত হইয়া থাকিবে। এই-সকল স্তরপ্রস্তর এইরূপ:—বড়, চেপ্টা, গোলাকার একখণ্ড প্রস্তর ছোট বড় নানা আকারেব খাড়া পাথরেব অগণিত খুঁটির উপর বসানো থাকে যেন নানা আকারেব বসিবার টুল স্থাপিত হইয়াছে; এই সকলেব উপর গ্রামবৃদ্ধদিগকে বসিয়া গল্প গুজব করিতে দেখা যায়। এই টুলেব মত স্তরপ্রস্তর ব্যতীত পথেব ধাৰে বিচিত্র গঠনের চৌকা স্তম্ভও দেখা যায়। খাসিয়াদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কেন এত কষ্ট করিয়া এই সকল প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিল, তাহা হইলে তাহারা উত্তর করে,

আপনাদের নাম রক্ষার জন্ত। ঠিক এই প্রথা উত্তর সিংভূমের হো জাতির মধ্যে পাওয়া যায়; হয়ত ইহারা এককালে একই জাতি ছিল।

খাসিয়াদিগের অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এইরূপে অনুষ্ঠিত হয়:—শব ৪৫ দিন কখনো বা ৪৫ মাস গৃহে রাখা হয়; অধিক দিন রাখিতে হইলে শব খোদোলা গাছের গুঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ঘোঁয়া দিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সকল আয়োজন শেষ হইলে শব পোড়াইয়া ফেলা হয়। একটা মাচা করিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত চারি জনে শব বহন করিয়া দাহস্থানে লইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের বাঁশীতে বিবাদ সঙ্গীত হয় এবং চুঃখার্ত বন্ধুবর্গ ফ্রেন্স ও চীৎকার করিতে করিতে যায়। নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া শবটিকে ঢাকিয়া সকলের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া চারি-পায়া একটা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বাক্সেব নীচে কাঠ ধরাইয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়; কখনো কখনো বাড়ী হইতেই এই বাক্সে কবিরাই শব দাহস্থানে আনিয়া অগ্নি সংযোগ করে। শব দাহ হইবার সময় সুপারী, ফল প্রভৃতি মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়। চারিদিকে চাৰিটা তীর নিক্ষিপ্ত হয়। দেহ দগ্ধ হইয়া গেলে ভস্মরাশি মৃত্যুভাণ্ডে ভরিয়া গৃহে লইয়া যায় ও এক শুভদিনে ভস্মভাণ্ড প্রোথিত করিয়া সেই স্থানে প্রস্তরচিহ্ন স্থাপন করে; এই কবর দেওয়ার দিন বিপুল ভোজ ও নৃত্যোৎসব হয়। এই নৃত্যে কুমারীগণ দলের মধ্য স্থলে ভূমিসম্মুখ দৃষ্টি হইয়া দুই তিন সারিতে নৃত্য করে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে জীপুরুষ সকলেই আপন আপন সর্বোত্তম পরিচ্ছদ পরিধান কবে। পুরুষেরা ধূতি, রেশমী পাগড়ী, প্রচুর হাতিশিল্পভূষিত জামা, রূপার ভারি শিকল, সোণার হার, ময়ূরপুচ্ছ ও বিবিধ কারুশোভিত তৃণ ধারণ করে; জীলোকেরা লম্বা ঘাঘরার উপর একখানা কাপড় ডান বগলেব নীচে দিয়া আল্লাভাবে লইয়া সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া ডান কাঁধের উপর গিট বাঁধিয়া পরে; মাথায় রূপার বেষ্টনীর সঙ্গে পশ্চাৎ দিকে লম্বা বর্ষাফলকের মত একটা গহনা উচু হইয়া থাকে। এক জাতির ভস্ম এক শিলাতলে বা এক কববস্থানে থাকে। স্বামী জীর ভস্ম কখন মিলিত করা হয় না, কারণ উভয়ে পৃথক জাতীয়। জী ও তাহার সন্তানবো জীর মাতার গোত্রীয়; জী ও সন্তানদিগের

চিতাভঙ্গ্য জ্বীর মাতার চিতাভঙ্গ্যের সহিত রক্ষিত হয়, স্বামীর চিতাভঙ্গ্য তাহার গোত্রীয় সমাধিক্ষেত্রে থাকে। এই জন্ত সন্তানেরা মাতৃকুলের দায়াদিকারী হয়।

বিবাহবন্ধন ইহাদের অত্যন্ত শিথিল। বিবাহ অল্পটান-হীন। কোনো যুবকের প্রস্তাব যুবতী ও তাহার পিতামাতার অমুমোদিত হইলে বর কস্তার পরিবারভুক্ত হয় অথবা মাঝে মাঝে স্বস্তব বাড়ী আসে। দাম্পত্যভঙ্গ্যও সচরাচর ঘটে, যাহার খুসি সে ভঙ্গ করে; যখন উভয়ের অভিমতে ভঙ্গ হয়, তখন পরস্পরে পরস্পরের নিকট হইতে গোটা কয়েক করিয়া কড়ি লইয়া প্রকাশ্য সভায় ফেলিয়া দেয়। সন্তানেরা মাতার নিকটেই থাকে।

খাসিয়ারা পুষ্টি পেশীর জন্ত বিখ্যাত; জ্বী পুরুষ সকলেরই পেশী খুব পুষ্ট ও দৃঢ়। ইহাদের বর্ণ গৌরলাল; যুবজনের হস্তদীপ্ত মুখশ্রী দেখিতে প্রীতিকর; কিন্তু চেপ্টামুখে বাঁকা চোখে সৌন্দর্য্য বড় বিরল, অধিকন্তু সর্করা পান চিবাইয়া বড় নোংরা হইয়া থাকে, মুখ হইতে পানের ছোপ কখন পরিস্কার করে না। তাহাদের পরিচ্ছন্ন প্রায়ই সুন্দর রঙীন হয়, কিন্তু তাহা ধূলিমগিন হইয়া থাকে, দেহও কখনো স্নানের আশ্বাদ জানে না। ইহারা খুব বিশ্বাসী সং ভৃত্য হয়, কিন্তু বড় অঙ্গসংকুচিত। ইহারা বস্ত্রবয়ন করিতে জানে।

চাল, জোয়ার, বাজবা, কচু প্রভৃতি মূল, সর্ষপ্ৰকাব মাসে ও শুটকী মাছ ইহাদের খাদ্য। এক এক দলের এক এক দ্রব্য নিবিদ্ধ অম্পৃশ্য খাদ্য।

খাসিয়াদের পরমেশ্বরে বিশ্বাস থাকিলেও বনপর্ষতের উপদেবতার উপরই আস্থা অধিক। ইহাদের কোনো মন্দির বা দেবমূর্তি নাই। ইহারা ডিম ভাঙিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহারা আপনাদের ইচ্ছামত চিহ্ন দেখিতে পায় ততক্ষণ ডিম ভাঙিতে থাকে; এ জন্ত প্রায়ই শুভফলই নির্ণীত হয়। সুরাপান করিবার পূর্বে ইহারা দেবতাকে নিবেদন করে; তর্জ্জনী তিনবার সুরামধ্যে ডুবাইয়া সেকলে লোকের অস্থখামাকে তেল দিবার উপায়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে অঙ্গুলিগণ সুরা উভয় স্বর্ধে ও পার্শ্বে ছিটাইয়া দেয়।

রাজদরবারে সাধারণ দণ্ড ছিল অসিমানা; কখনো

কখনো সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া দোষীকে সপরিবারে রাজার দাস করা হইত। কখনো বা জলবিচার হইত—বাদী প্রতিবাদী একসঙ্গে কোনো পবিত্র সর্বোবরের দুই ধারে ডুব দিত এবং যে অধিক ক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারিত তাহারই জিত হইত। এই বিচার উকিল প্রতিনিধি দ্বারাও হইতে পারিত। এই জন্ত দীর্ঘশ্বাস, অধিকদমওলা উকিলের দরকার খাসিয়াদেরো ছিল।

খাসিয়ারা শিশু দিতে খুব ভালো বাসে। বালকদেব আমোদ লাটিম ঘুরানো ও চর্চি মাখানো বাঁশে উঠা।

কাছাড়ের অধিবাসীরা খাসিয়াদিগকে মিকি বলে।*

মুদ্রা-রাক্ষস।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

তাপ ও আলোকের চাপ।

আজ পঞ্চাশ বৎসর গত হইল জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল সাহেব তাপ আলোক বিদ্যাৎ ও চুম্বক প্রভৃতির শক্তিকে এক জৈথরেরই তরঙ্গ-আবর্তনাদি বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক সাধারণ এই সিদ্ধান্তে সেই সময় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হেল্মহোল্জ স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া ম্যাক্সওয়েলের কথারই অস্বাস্থ্যতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি বৈজ্ঞানিকগণ নব সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ইহার পর সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হার্জ সাহেব, এবং আমাদেরি স্বদেশবাসী মহাপণ্ডিত ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় কিপ্রকারে নানা পরীক্ষায় ম্যাক্সওয়েলের সিদ্ধান্তের সুপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

ম্যাক্সওয়েল সাহেব যখন আলোক ও বিদ্যুতের পূর্বোক্ত ব্যাপার লইয়া গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি ঘটনাক্রমে জানিয়াছিলেন, যদি জৈথরেরই স্পন্দন ও আবর্তনাদি আলোক, বিদ্যাৎ ও চৌম্বক শক্তির কারণ হয়, তবে কোন লঘুপদার্থের উপর আলোকপাত হইলে,

* Col. Dalton প্রণীত Descriptive Ethnology of Bengal হইতে সংগৃহীত।

পদার্থের উপর একটা মুহূ ধাক্কা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। সময়ভাব প্রযুক্ত এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি হাতের গোড়ায় না পাইয়া ম্যাক্সওয়েল সাহেব এই ব্যাপার লইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু গবেষণা শেষ হইলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরদ্বারা তাপালোকাদির উৎপত্তির কথা যদি সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই একদিন তাপালোকের চাপ বা ধাক্কার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় ধরা পড়িবে।

অষ্ট শতাব্দী পূর্বে ম্যাক্সওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী সকল হইয়াছে। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিকলস্ সাহেব, আজ কয়েকমাস হইল রয়াল ইনস্টিটিউশনের এক বিশেষ অধিবেশনে আলোক-চাপের অস্তিত্ব স্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

কাচ পাত্র হইতে কতকটা বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া যদি তাহার মধ্যে চারিটি ক্ষুদ্র পক্ষবিশিষ্ট চরকি রাখা যায়, এবং প্রত্যেক পাখার এক এক দিক কোনপ্রকার কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা যায়, তবে কাচ ভেদ করিয়া তাপ বা আলোকের রশ্মি পাখায় আসিয়া পড়িলেই চরকি আপনা হইতেই ঘুরিতে আরম্ভ কবে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জুক্স এই যন্ত্রটির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, এবং ইহার কার্য দেখিয়া মনে হইয়াছিল বুঝি বা এটা আলোক-চাপেরই কাজ। কিন্তু পরে জানা গিয়াছিল, ইহা তাপেরই সাধারণ কার্য; পাত্রের স্বল্পাংশিষ্ট বায়ুর উপর তাপই কার্য করিয়া চরকির লঘু পক্ষগুলিকে ঘুরাইয়া থাকে। ইহার পর এপর্যন্ত আলোকের চাপ সম্বন্ধে আর কোন নূতন কথা শুনা যায় নাই। সুতরাং এই আবিষ্কারের সমগ্র গৌরব একক নিকলস্ সাহেবেরই প্রাপ্য বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপক নিকলস্ যে যন্ত্র নির্মাণ করিয়া ম্যাক্সওয়েলের উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার গঠন খুব সরল হইলেও যন্ত্র ব্যবহারে অত্যন্ত কৌশলের আবশ্যকতা দেখা যায়। আলোক-চাপের পরিমাণ এত অল্প যে পরীক্ষকের অতি সূক্ষ্ম ক্রটিতে সকল আরোজন ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। নিকলস্ সাহেব একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট কাচের নল (capillary tube) ছই খানি লঘু দর্পণ বসাইয়া, নলটিকে ঝুলাইয়া রাখিবার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সূর্যের তীব্র কিরণ বা বৈজ্যতিক আলোকের রশ্মি দর্পণদ্বারে পড়িয়া

তাহাদিগকে স্পষ্ট ঘুরাইয়া দিয়াছিল। কি পরিমাণ চাপে দর্পণ ঘুরিল, নিকলস্ সাহেব তাহাও হিসাব করিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন।

সূর্যের আকার পরিবর্তন।

আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর গত হইল বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ রদারফোর্ড সাহেব চৌক বৎসর ধরিয়া সূর্যের অনেকগুলি ফোটোগ্রাফ ছবি উঠাইয়াছিলেন। এগুলি এখন আমেরিকার কলম্বিয়া মানমন্দিরে রহিয়াছে। সূর্যের আধুনিক ছবির সহিত সেই প্রাচীন ছবিগুলির তুলনা করায় সম্প্রতি অনেক অনৈক্য দেখা গিয়াছে।

মোট ১৩৯ খানি ছবি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং এ গুলিকে বৎসর অমুসারে পর পর সজ্জিত করিয়া চিত্রস্থ সূর্যবিষয়ের ব্যাস পরিমাপ করা হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় একই বৎসরের গৃহীত নানা ছবির ব্যাসের মধ্যে কোন অনৈক্য দেখা যায় নাই। কিন্তু ছই তিন বৎসরের পূর্ব বা পনের ছবির সহিত তুলনা করায় ব্যাসের পরিমাণে বিশেষ পার্থক্য ধরা পড়িয়াছিল।

রদারফোর্ড যখন ছবি তুলিয়াছিলেন তখন এখনকার মত নির্ভুলপ্রথার ফোটোগ্রাফ লইবার কৌশল জানা ছিল না। সুতরাং প্রাচীন ছবিতে ভুলভ্রান্তি আছে মনে করিয়া, সূর্যের এই আকার পরিবর্তনের প্রমাণে সহসা কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহে নাই। অপর দেশের প্রাচীন মানমন্দির হইতে সূর্যের পুরাতন ছবি বাহিব করিবার জন্ত সেই সময় হইতে অমুসন্ধান চলিতেছিল। হুর্ভাগ্য বশতঃ প্রাচীন ছবি কোন স্থানেই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু গত ১৮৭৪ এবং ১৮৮২ সালের শুক্রোপগ্রহণ (Transit of Venus) পরীক্ষার জন্ত অধ্যাপক জ্যোতির্বিগণ হেলিয়োমিটার যন্ত্র সাহায্যে সূর্যবিষয়ের যে পরিমাপ লইয়াছিলেন, তাহার কাংক্ষপত্র সম্প্রতি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এবং ঐ ছই বৎসরের মাপের অনৈক্য রদারফোর্ডের ছবির অনৈক্যের সহিত অবিকল একই দেখা গিয়াছে। সুতরাং গভীর বাষ্পমণ্ডিত সূর্য নিজেই বাষ্পাবরণ-খানিকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া যে আকার পরিবর্তন করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গত ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালে উইলসন নামক অনেক মার্কিন জ্যোতিষী নর্থফিল্ড

মানমন্দিবে বসিয়া সূর্যের যে সকল ছবি উঠিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐ প্রকার পরিবর্তন দেখা গিয়াছে।

সূর্যের আকার পরিবর্তন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইলে, কোন্ সময়ে পরিবর্তনের মাত্রা অধিক হয় জানিবার জন্য অমুসন্ধান চলিয়াছিল। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, সূর্যমণ্ডলে যে সকল সৌরকলঙ্ক (Sun-spots) দেখা যায় তাহার সংখ্যা সকল সময়ে সমান থাকে না। কেবল প্রতি এগারো বৎসর অন্তর কিছুদিন ধরিয়া সূর্যমণ্ডল বহু কলঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অমুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এই কলঙ্ক-প্রাচুর্য্যকালেই সৌরদেহেব বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ যেমন সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ চাপা, সূর্যের আকারও কতকটা তজ্জপ। কিন্তু কলঙ্কের প্রাচুর্য্য হইলে সূর্যের আব এই আকার থাকে না। তখন অক্ষ-ব্যাস (Polar-diameter) অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়া সূর্যকে লম্বাটে আকার প্রদান করে। সূর্যের এই আকার-পরিবর্তনের সহিত সৌরকলঙ্কের কি সম্বন্ধ আছে অদ্যাপি জানা যায় নাই।

মঙ্গল বুধ ও শুক্র এই তিনটি গ্রহ সূর্যেব খুব নিকটবর্তী, কাজেই আমাদেরো খুব নিকটবর্তী। ইহাদের গতিবিধি নানা দেশের পণ্ডিতগণ নানা সময়ে অতি সূক্ষ্মরূপে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। তথাপি গণনালক্ষণ হইতে গ্রহগণকে কখন কখন বিচলিত হইতে দেখা যায়। জ্যোতিষিগণ অত্য়পি এই গতিবিভ্রাটের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সূর্যের আকার পরিবর্তনের সহিত ইহার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন।

কৃত্রিম হীরক।

ফরাসী পণ্ডিত ময়সনের (Moisson) নাম আজ লগধিখ্যাত। কয়লা ও হীরক এক অঙ্গার হইতেই উৎপন্ন হয় জানা ছিল, কিন্তু কিপ্রকার প্রাকৃতিক অবস্থায় পড়িয়া কয়লা অঙ্গার উজ্জল ও স্বচ্ছ হীকে পরিণত হয় তাহা জানা ছিল না। ময়সন্ সাহেব তাঁহার পরীক্ষাগারে অঙ্গার লইয়া নানা পরীক্ষা করিয়া যে পদ্ধতিতে কয়লা স্বভাবতঃ হীরকে পরিণত হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন; এবং পরীক্ষাগারে উৎকৃষ্ট কৃত্রিম হীরকও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হিসাবে দেখা গিয়াছিল, নানা আয়োজন করিয়া স্বাভাবিক হীরক প্রস্তুত

করিতে যত অর্থব্যয় হয়, আকরিক হীকে সংগ্রহ করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প খরচ পড়ে। কাজেই হীরক প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব প্রতিযোগিতায় আকরিক হীরককে স্থানচ্যুত করা যায় নাই। কৃত্রিম হীরককে অগত্যা নিছক পুঁথিগত ব্যাপার হইয়া থাকিতে হইয়াছে।

পাঠক অবশ্যই জানেন আমাদের পৃথিবী প্রতিদিনই শত শত উদ্ধাপিও (meteors) টানিয়া নিজেব কুক্ষিগত করে। ইহাদের অধিকাংশই বায়ুব ভিতর দিয়া আসিবাব সময় বায়ুব সংঘর্ষে জলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। তাই কিছুদূর নামিয়া আসাব পরই আমরা উদ্ধাপিওগুলিকে অদৃশ্য হইতে দেখি। কিন্তু বড় বড় উদ্ধাপিওগুলি পড়িবার সময় নিঃশেষে পুড়িয়া যায় না। এ জন্ত কতকগুলি পিও পুড়িতে পুড়িতে ভীমবেগে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পতিত হয়। পৃথিবীর নানা স্থানে উদ্ধাপিওর এই প্রকার দৃষ্টাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি একটি অদ্ভুত রকমের উদ্ধাপিও ময়সন্ সাহেবের হস্তগত হইয়াছে। পরীক্ষায় ইহাতে লৌহ, গন্ধক ও ফস্ফরস্ ছাড়া সাধারণ অঙ্গার এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরককণিকা পাওয়া গিয়াছিল। পূর্বে যে সকল উদ্ধাপিও লইয়া পরীক্ষা করা গিয়াছে, তাহার কোনটিতেই হীরকের চিহ্ন দেখা যায় নাই, এবং তাহাতে লৌহ, গন্ধক ও ফস্ফরসের পরিমাণও এ প্রকার ছিল না। ময়সন্ সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ঐ লৌহগন্ধকাদি পদার্থ উদ্ধাপিওস্থ সাধারণ অঙ্গারকে দানা বিশিষ্ট করিয়া হীরকে পরিণত করার সহায়তা করিয়াছে।

পূর্বোক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ময়সন্ সাহেব বৈজ্ঞানিক চুল্লীতে লৌহ গালাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি ফেলিয়া দিয়াছিলেন। চিনির অঙ্গার লৌহের সহিত বেশ মিশিয়া গিয়াছিল। তা'র পর তাহাতে গন্ধকযুক্ত লৌহ (iron sulphide) মিশাইয়া গলিত অবস্থাতেই জিনিসটাকে শীতল জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করা হইয়াছিল। এই অবস্থায় অঙ্গারকে আর তাহার সাধারণ আকারে দেখা যায় নাই, অধিকাংশ অঙ্গারই উজ্জল হীরকের ক্ষুদ্র দানায় পরিণত হইয়াছিল। লৌহ ও গন্ধক অঙ্গারকে দানাদার করিয়া হীরকে পরিণত করিতে যে এত সাহায্য করে, তাহা অত্য়পি

কোন পরীক্ষাতেই দেখা যায় নাই। ময়সন্ সাহেব ইহাতে হীবক প্রস্তুতের এক নূতন উপায় পাইয়াছিলেন। অল্পব্যয়ে কৃত্রিম হীবক প্রস্তুত করার উপায় উদ্ভাবনের জন্ত ইনি বহুকাল ধরিয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই নূতন তথ্যটি তাঁহার কার্যকে অগ্রসর করিয়া দিবে বলিয়া মনে হয়।

জনসমাগম অস্বাস্থ্যকর কেন ?

বহুজনপূর্ণ সভাগৃহাদিতে অনেকক্ষণ থাকিলে শরীর নানা প্রকারে অস্বস্থ হইয়া পড়ে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই বলেন, প্রাণাসের সহিত এবং লোমকূপ দিয়া শরীরের যে সকল দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, তাহা দ্বারা জনপূর্ণ আবদ্ধ স্থানের বাতাস কলুষিত হইয়া পড়ে। কাজেই আমরা যখন এই অবিষুদ্ধ বাতাস নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি, তখন তাহা অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়।

ব্রেসলা স্বাস্থ্যরক্ষা-সভার (Breslau Hygienic Institute) প্রধান সভ্য ডাক্তার পল সাহেব এই ব্যাপারটি লইয়া কিছুকাল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা শেষে জানা গিয়াছিল, জনপূর্ণ আবদ্ধস্থানে থাকিলে দেহের উত্তাপ বীতিমত বাহির হইতে পারে না। কাজেই শরীরে নানা-প্রকার গীড়ার উপদ্রব দেখা দেয়। মুক্ত স্থানে থাকিলে প্লাস্বে বায়ুকে গরম করিতে এবং গাত্রনির্গত ঘর্ষ প্রভৃতি জলীয় অংশকে বাষ্পীভূত করিতে শরীর হইতে অনেকটা তাপ বাহির হইয়া যায়। তা' ছাড়া প্রাণাসের সহিত অনেকটা তাপ নির্গত হয়। এই প্রকার তাপ নির্গমন স্বাস্থ্যরক্ষার একটা প্রধান সহায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে কেবল বিসুদ্ধ বায়ুতে থাকিলেই শরীর অস্ব থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে তাপ পরিত্যাগের সুব্যবস্থা থাকা চাই। সুশীতল পৃথিবী শতকরা ১৫ ভাগ অজারক বাষ্পমিশ্র বায়ু ব্যবহার করিয়া বহুলোককে অস্ব থাকিতে দেখা গিয়াছে। অথচ সম্পূর্ণ বিসুদ্ধ বায়ু দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস করিয়া কেবল যথোপযুক্ত তাপ নির্গমের অভাবে কেহই অস্ব থাকে নাই। সুতরাং আবদ্ধ স্থানের বায়ুর উষ্ণতা যখন দেহের উষ্ণতার সহিত সমান হইয়া শারীরিক স্বাভাবিক তাপ নির্গমন রোধ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে শরীর যে অস্বস্থ হইয়া পড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

পরীক্ষায় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ডাক্তার পল সাহেব বড় বড় সভাগৃহের অধাক্ষ এবং নাট্যশালায় কর্তৃপক্ষ-দিগকে বলিতেছেন যে, গৃহে বায়ুর গমনাগমনের জন্ত বৃথা অর্থব্যয় না করিয়া তাঁহারা যদি গৃহগুলিকে আবদ্ধকমত শীতল করিবার সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে লোকসমাগম প্রচুর হইলেও আবদ্ধস্থানে শ্রোতৃ ও দর্শকগণের স্বাস্থ্যহানির আব কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

প্রীতি ।

নিভা মর্ত্যপুরবাসিগণ

যেতেছে মৃত্যুভবনে ?

যাক্ যাক্, তবু উপেখি মরণ

রহিব ফুল বদনে ।

হইব সিদ্ধ শবসাধনায়

প্রোতবেষ্টিত শ্মশানে ।

বিভাতিবে গ্রেম হেম-ছোতনায়

সস্তাপে শোক-রসানে ।

দ্রুতধারে দূরে চলিছে জীবন ;

যাক্ তবু প্রীতি বহিব ।

নিমেষে যাহারা তেজিবে ভবন

তাদেরি সেবায় রহিব ।

পারে কি নাশিতে প্রীতির বীরতা

জরা মরণের দুষ্ট ?

আমি কিরে ভবে হারাব ধীরতা

চঞ্চল বলি বিশ্ব ?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

সমস্যা ।

আমি “পথ ও পাথের” নামক প্রবন্ধে আমাদের কর্তব্য এবং তাহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধটিকে সকলে যে অনুরূপভাবে গ্রহণ করিবেন এমন আমি আশা করি নাই।

কোনটা শ্রেয় এবং তাহা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়টি কি তাহা লইয়া ত কোনো দেশেই আজও তর্কের অবসান হয় নাই। মানুষের ইতিহাসে এই তর্ক কত রক্তপাতে পরিণত হইয়াছে এবং একদিক হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া আর এক দিক দিয়া বারবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশে দেশহিত সম্বন্ধে মতভেদ এতকাল কেবল মুখে মুখে এবং কাগজে কাগজে, কেবল ছাপাখানায় এবং সভাসম্মেলনে কথার লড়াই রূপেই সঞ্চার করিয়াছে। তাহা কেবল ধোঁয়ার মত ছড়াইয়াছে, আগুনের মত জ্বলে নাই।

কিন্তু আজ নাকি সকলেই পরস্পরের মতামতকে দেশের হিতাহিতের সঙ্গে আসন্নভাবে জড়িত মনে করিতেছেন, তাহাকে কাব্যালঙ্কারের ঝঙ্কার মাত্র বলিয়া গণ্য করিতেছেন না, সেই জন্ত ঐহাদের সহিত আমার মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে তাঁহাদের প্রতিবানবাক্যে যদি কখনো পরূষতা প্রকাশ পায় তবে তাহাকে আমি অসঙ্গত বলিয়া ফোড় করিতে পারি না। এ সময়ে কোনো কথা বলিয়া কেহ অন্যের উপর দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া যান না ইহা সময়ের একটা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই।

তবু, তর্কের উদ্ভেদনা যতই প্রবল হোক, ঐহাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কোনো জায়গায় মতের অনৈক্য ঘটিতেছে দেশের হিতসাধনে তাঁহাদেরও আন্তরিক নিষ্ঠা আছে এই শ্রদ্ধা যখন নষ্ট হইবার কোনো কারণ দেখি না, তখন আমরা পরস্পর কি কথা বলিতেছি কি ইচ্ছা করিতেছি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। গোড়াতেই রাগ করিয়া বসিলে অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের বুদ্ধির প্রতি সন্দেহ করিলে নিজের বুদ্ধিকে হয়ত প্রতারণিত করা হইবে। বুদ্ধির ভারতমোহে যে মতের অনৈক্য ঘটে একথা সকল সময়ে খাটে না। অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতিভেদেই মতভেদ ঘটে।

অতএব মতের ভিন্নতার প্রতি সম্মান বক্ষা কবিলে যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অসম্মান করা হয় তাহা কদাচই সত্য নহে।

এই টুকু মাত্র ভূমিকা কবিয়া “পথ ও পাথের” প্রবন্ধে যে আলোচনা উপস্থাপিত করিয়াছিলাম তাহারাই অনুরূপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসারে বাস্তবের সঙ্গে আমাদের কখনো আপস করিয়া কখনো বা লড়াই করিয়া চলিতে হয়। অন্ধতা বা চাতুরীর জোরে বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা অতি ছোট কাজটুকুও করিতে পারি না।

অতএব দেশহিতের সংকল্প সম্বন্ধে যখন আমরা তর্ক করি তখন সেই তর্কের একটি প্রধান কথা এই যে, সংকল্পটি যতই বড় হোক এবং যতই ভাল হোক বাস্তবের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য আছে কি না? কোন্ ব্যক্তির চেক-বাহির পাতায় কতগুলি অঙ্ক পড়িয়াছে তাহা লইয়াই তাড়াতাড়ি উৎসাহ করিবার কারণ নাই, কোন্ ব্যক্তির চেক ব্যাঙ্কে চলে তাহাই দেখিবার বিষয়।

সঙ্কটের সময় যখন কাহাকেও পরামর্শ দিতে হইবে তখন এমন পরামর্শ দিলে চলে না যাহা অত্যন্ত সাধারণ। কেহ যখন রিক্তপাত্র লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে থাকে কেমন করিয়া তাহার পেট ভরিবে তখন তাহাকে এই কথাটি বলিলে তাহার প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না যে ভাল করিয়া অন্নপান করিলেই ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই উপদেশের জন্তই সে এতক্ষণ কপালে হাত দিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। সত্যকার চিন্তার বিষয় যেটা, সেটাকে লঙ্ঘন করিয়া যত বড় কথাই বলি না কেন তাহা একেবারেই বাজে কথা।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও প্রধান প্রয়োজনটা কি সে কথা আলোচনা উপলক্ষ্যে আমরা যদি তাহার বর্তমান বাস্তব অভাব ও বাস্তব অবস্থাকে একেবারেই চাপা দিয়া একটা খুব মস্ত নীতিকথা বলিয়া বসি তবে শূন্য তহবিলের চেকের মত সে কথা কোনো মূল্য নাই; তাহা উপস্থিত-মত স্থণের দাবী শাস্ত করিবার একটা কৌশলমাত্র হইতে পারে কিন্তু পরিণামে তাহা দেনদার বা পাওনাদার কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র কল্যাণকর হইতে পারে না।

“পথ ও পাত্থ্য” প্রবন্ধে আমি যদি সেইরূপ ফাঁকি চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি তবে বিচার আদালতে ক্ষমা প্রত্যাশা কবিত্তে পারিব না। আমি যদি বাস্তবকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া কেবল একটা ভাবের ভূয়া দলিল গাড়িয়া থাকি তবে সেটাকে সর্বসমক্ষে খণ্ড বিখণ্ড করাই কর্তব্য। কারণ, ভাব যখন বাস্তবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দেয় তখন গাঁজা বা মদের মত তাহা মানুষকে অকর্ষণ্য এবং উদ্ভাস্ত করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কোন্টা যে প্রকৃত বাস্তব তাহা নির্ণয় করা সোজা নহে। সেই জন্তই অনেক সময় মানুষ মনে করে যেটাকে চোখে দেখা যায় সেটাই সকলের চেয়ে বড় বাস্তব; যেটা মানবপ্রকৃতির নীচের তলায় পড়িয়া থাকে সেটাই আসল সত্য। কোনো ইংরেজ সাহিত্য-সমালোচক বামায়ণের অপেক্ষা ইলিয়ডের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার কালে বলিয়াছেন ইলিয়ড কাব্য অধিকতর human, অর্থাৎ মানবচরিত্রের বাস্তবকে বেশি করিয়া স্বীকার করিয়াছে,—কারণ উক্ত কাব্যে একিলিস নিহত শত্রুর মৃতদেহকে রথে বাঁধিয়া ট্রয়ের পথের ধূলায় লুটাইয়া বেড়াইয়াছেন। আর, রামায়ণে রাম পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছেন। ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিহিংসা মানবচরিত্রের পক্ষে অধিকতর বাস্তব এ কথাটির অর্থ যদি এই হয় যে তাহা পরিমাণে বেশি তবে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থূল পরিমাণই বাস্তবতা পরিমাপের একমাত্র বাটখারা এ কথা মানুষ কোনো দিনই স্বীকার করিতে পারে না; এই জন্তই মানুষ বরভরা অন্ধকারের চেয়ে ঘরের কোণের একটি ক্ষুদ্র শিথাকেই বেশি মান্ত করিয়া থাকে।

যাহাই হোক, এ কথা সত্য, যে, মানব ইতিহাসের বহুতর উপকরণের মধ্যে কোন্টা প্রধান কোন্টা অপ্রধান, কোন্টা বর্তমানের পক্ষে একান্ত বাস্তব এবং কোন্টা নহে, তাহা প্রকৃতির কেবল চোখে দেখিয়াই মীমাংসা করা যায় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে পারি, উদ্ভেজনার সময় উদ্ভেজনাটাকেই সকলের চেয়ে বড় সত্য বলিয়া মনে হয়,—রাগের সময় এমন কোনো কথাকেই বাস্তবমূলক বলিয়া মনে হয় না যাহা রাগকে নিবৃত্ত করিবার জন্ত দণ্ডায়মান

হয়। এরূপ সময় মানুষ সহজেই বলিয়া উঠে, “রেখে দাও তোমার ধর্মকথা!” বলে যে, তাহার কারণ এ নয় যে, ধর্মকথাটাই বাস্তব প্রয়োজনের পক্ষে অযোগ্য এবং রুষ্ট বুদ্ধিই তদপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, বাস্তব উপযোগিতার প্রতি আমি দৃকপাত করিতে চাই না, বাস্তব প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকেই আমি মান্ত করিতে চাই।

কিন্তু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকে বাস্তবের হিসাব অল্পই কবিত্তে হয়, উপযোগিতায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি করা আবশ্যক। মুষ্টিটির পব যে ইংরেজরা ভারতবর্ষকে নির্দয়ভাবে দলন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল তাহারা মানব-চরিত্রের বাস্তবের হিসাবটাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছিল; বাগের সময় এই প্রকার সঙ্কীর্ণ হিসাব করাই যে স্বাভাবিক অর্থাৎ মাথাগন্তিতে অধিকাংশ লোকই করিয়া থাকে তাহা ঠিক কিন্তু লর্ড ক্যানিং ক্ষমার দিক দিয়া যে বাস্তবের হিসাব করিয়াছিলেন তাহা প্রতিহিংসার হিসাব অপেক্ষা বাস্তবকে অনেক বৃহৎপরিমাণে অনেক গভীর এবং দূরবিস্তৃত ভাবেই গণনা করিয়াছিল।

কিন্তু যাহারা ক্রুদ্ধ তাহারা ক্যানিংকে ক্ষমানীতিকে সেক্টিমেন্টালিজম্ অর্থাৎ বাস্তববর্জিত ভাববাতিকতা বলিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হয় নাই। চিবদিনই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। যে পক্ষ অক্ষৌহিনী সেনাকেই গণনাগোরবে বড় সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞা-পূর্বক নিজেব পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি তবে নারায়ণ যতই একলাহোন্ এবং যতই ক্ষুদ্রমূর্তি ধরিয়া আশ্রম্ তিনিই জিতাইয়া দিবেন।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে যথার্থ বাস্তব যে কোন্ পক্ষে আছে তাহা সাময়িক উত্তেজনার প্রাবল্য বা লোকগণনার প্রাচুর্য হইতে স্থির করা যায় না। কোনো একটা কথা শাস্তবশস্তিত বলিয়াই যে তাহা বাস্তবিকতায় ধর্ম, এবং যাহা মানুষকে এত বেগে তাড়না করে যে, পথ দেখিবার কোনো অবসর দেয় না তাহাই যে বাস্তবকে অধিক মান্ত করিয়া থাকে একথা আমবা স্বীকার করিব না।

“পথ ও পাথের” প্রবন্ধে আমি দুইটি কথার আলোচনা করিয়াছি। প্রথমতঃ ভাবতবর্ষের পক্ষে দেশহিত ব্যাপারটা কি ? অর্থাৎ তাহা দেশী কাপড় পরা, বা ইংরেজ তাড়ানো, বা আর কিছু ? দ্বিতীয়তঃ সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া ?

ভারতবর্ষের পক্ষে চরম হিত যে কি তাহা বুঝিবার বাধা যে কেবল আমরা নিজেরা উপস্থিত করিতেছি তাহা নহে বস্তুত তাহার সর্বপ্রধান বাধা আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার। ইংরেজ কোনোমতেই আমাদের প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিতেই চায় না। তাহারা মনে কবে তাহাবা যখন রাজা তখন জবাবদিহি কেবলমাত্র আমাদেরই, তাহাদের একেবারেই নাই। বাংলা দেশের একজন ভূতপূর্ব হর্তাকর্তা ভারতবর্ষের বর্তমান চাকলা সম্বন্ধে যত কিছু উদ্ভা প্রকাশ করিয়াছেন সমস্তই ভাবত-বাসীর প্রতি। তাঁহার মত এই যে কাগজগুলোকে উচ্ছেদ কব, সুবেঙ্গ বাঁড়ুঘো বিপিন পালকে দমন করিয়া দাও। দেশকে ঠাণ্ডা করিবার এই একমাত্র উপায় বাহারা অনায়াসে কল্পনা ও নিঃসঙ্কোচে প্রচার করিতে পারে তাহাদের মত ব্যক্তি যে আমাদের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহাই কি দেশের রক্তগরম করিয়া তুলিবার পক্ষে অন্তত একটা প্রধান কারণ নহে ? ইংরেজের গারে জোর আছে বলিয়াই মানবপ্রকৃতিকে মানিয়া চলা কি তাহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক ? ভারতবর্ষের চাকলা-নিবারণের পক্ষে ভারতের পেনসনভোগী এলিয়টের কি তাঁহার জাতভাইকে একটা কথাও বলিবার নাই ? বাহাদের হাতে কমতা অজস্র তাহাদিগকেই আত্মসম্বরণ করিতে হইবে না, আর বাহারা স্বভাবতই অক্ষম, শমদম নিয়মসংঘের সমস্ত ব্যবস্থা কেবল তাহাদেরই জন্য। তিনি লিখিয়াছেন ভারতবর্ষে ইংরেজের গায়ে বাহারা হাত তোলে তাহারা বাহাতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি না পায় সেজ্জ সতর্ক হইতে হইবে। আর যে সকল ইংরেজ ভারতবর্ষকে হত্যা করিয়া কেবলি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রিটিশ বিচার সম্বন্ধে চিরস্থায়ী কলঙ্কের রেখা আঁগুনদিয়া ভারতবর্ষের চিত্তে দাগিয়া দাগিয়া দিতেছে তাহাদের সম্বন্ধেই সতর্ক হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। বলদর্শে অন্ধ ধর্মবুদ্ধিহীন এইরূপ

স্পর্দ্ধাই কি ভারতবর্ষে ইংবেজ শাসনকে এবং ইংরেজের প্রজাকে উভয়কেই ভ্রষ্ট করিতেছে না ? অক্ষম যখন অস্থি-মজ্জায় জলিয়া জলিয়া মরে, যখন হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার কাছে মানবদর্শ্যের আর কোনো উচ্চতর দাবী তাহাব কাছে কোনোমতেই রুচিতে চাহে না তখন কেবল ইংবেজের রক্তচক্ষু পিনাল কোর্ডই ভারতবর্ষে শাস্তিবর্ষণ করিতে পারে এত শক্তি ভগবান ইংরেজের হাড়ে দেন নাই। ইংবেজ জেলে দিতে পারে ফাঁসি দিতে পারে কিন্তু স্বহস্তে অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিয়া তার পবে পদাঘাতের দ্বারা তাহা নিবাইয়া দিতে পারে না—যেখানে জেলের দরকার সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে জল ঢালিতে হইবে। তাহা যদি না করে, নিজের রাজদম্ভকে যদি বিশ্ববিধানের চেয়ে বড় বলিয়া জ্ঞান করে তবে সেই ভয়ঙ্কর অন্ধতাবশতই দেশে পাপের বোঝা শুপীকৃত হইয়া একদিন সেই বোরতর অসামঞ্জস্য একটা নিদাক্ষণ বিপ্লবে পরিণত না হইয়া থাকিতেই পারে না। প্রতিদিন দেশের অন্তরে অন্তরে যে চিন্তবেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া আত্মপ্রসাদক্ষীত ইংরেজ উড়াইয়া দিতে পার—মর্গি তাহাকে না মানাই রাষ্ট্রনৈতিক সুবুদ্ধিতা বলিয়া মনে করিতে পার এবং এলিয়ট তাহাকে পরাধীন জাতির স্পর্দ্ধা-মাত্র মনে করিয়া বৃদ্ধবয়সেও দস্তের উপর দস্তবর্ষণের অসংকত চেষ্টা করিতে পার কিন্তু তাই বলিয়া অক্ষমেরও এই বেদনার হিসাব কি কেহই রাখিতেছে না মনে কর ? বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের অভ্যাস করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংঘত করিবে না, কিন্তু জীবনের বিধানে সেই অভ্যাসের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য প্রতিকারচেষ্টা মানব হৃদয়ে ক্রমশই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে তখনই বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত কবে ;—কারণ তখন সে অশক্তকে আঘাত করে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি আছে সেই ব্রহ্মশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বদ্ধমুষ্টি চালনা করে। যদি এমন কথা তোমরা বল ভারতবর্ষে আজ যে ক্ষোভ নিবন্ধকেও নিদাক্ষণ করিয়া তুলিতেছে, বাহা অক্ষমের বৈর্য্যকেও অভিভূত করিয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত আত্মঘাতের অভিমুখে তাড়না

করিতেছে তাহাতে তোমাদের কোনো হাতই নাই— তোমরা ভায়কে কোথাও পীড়িত করিতেছ না, তোমরা স্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রতিদিন তোমাদের উপকারকে উপকৃতের নিকট নিতান্তই অরুচিকর করিয়া তুলিতেছ না, যদি কেবল আমাদের দিকে তাকাইয়া এই কথাই বল যে, অকৃতার্থের অসন্তোষ আমাদের পক্ষে অকারণ অপরাধ এবং অপমানের হুঁখুয়াহ আমাদের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অকৃতজ্ঞতা, তবে সেই মিথ্যা বাক্যকে রাজতন্ত্রে বসিয়া বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে এবং তোমাদের টাইমসের পত্রলেখক, ডেলিমেলের সংবাদ-রচয়িতা এবং পয়োনায়ের ইংলিশম্যানের সম্পাদকে মিলিয়া তাহাকে ব্রিটিশ পশুস্বাস্থ্যের ভীমগর্জনে পরিণত করিলেও সেই অসত্যের দ্বারা তোমরা কোনো শুভফল পাইবেনা। তোমার গায়ে জোর আছে বটে তবু সত্যের বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে এত জোর নাই। নূতন আইনের দ্বারা নুতন লোহার শিকল গড়িয়া তুমি বিধাতার হাত বাধিতে পারিবেনা।

অতএব মানবপ্রকৃতির সংঘাতে বিশ্বের নিয়মে যে আবর্ত্ত পাক ধাইয়া উঠিতেছে তাহার ভীষণত্ব স্মরণ করিয়া আমার প্রবন্ধটুকুর দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিব এমন হুশা আমার নাই। দুর্ব্বুদ্ধি যখন জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন একথা মনে রাখিতে হইবে সেই দুর্ব্বুদ্ধির মূলে বহুদিনের বহুতর কারণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; একথা মনে রাখিতে হইবে, যেখানে এক পক্ষকে সর্বপ্রকারে অক্ষম ও অনুপায় করা হইয়াছে সেখানে ক্রমশই অপর পক্ষের বুদ্ধিব্রংশ ও ধর্ম্মহানি ঘটা একেবারেই অনিবার্য্য;— যাহাকে নিয়তই অশ্রদ্ধা অসম্মান করি তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া মানুষ আত্মসম্মানকে উজ্জল রাখিতে পারেই না— দুর্ব্বলের সংস্রবে সবল হিংস্র হইয়া উঠে এবং অধীরের সংস্রবে স্বাধীন অসংযত হইতে থাকে;— স্বভাবের এই নিয়মকে কে ঠেকাইতে পারে? অবশেষে জমিয়া উঠিতে উঠিতে ইহার কি কোথাও কোনই পরিণাম নাই? বাহ্যীন কর্তৃত্বে চরিত্রের অসংযম যখন বুদ্ধির অক্ষতাকে আনয়ন করে তখন কি কেবল তাহা দরিরেরই ক্ষতি এবং দুর্ব্বলেরই হুঁখুয়াহ কারণ হয়?

এইরূপে বাহিরের আঘাতে বহুদিন হইতে দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনা ক্রমশই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সত্যটুকুকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এবং ইংবেজ সমস্ত শাসন ও সতর্কতা কেবল একটা দিকে, কেবল দুর্ব্বলের দিকেই চাপান্ দিয়া যে একটা অসমতাব সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত বুদ্ধিকে, সমস্ত কল্পনাকে, সমস্ত বেদনাবোধকে অহরহ অতিরিক্ত পরিমাণে এই বাহিরের দিকেই, এই একটা নৈমিত্তিক উৎপাতের দিকে উদ্ভিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব, এমন অবস্থায় দেশের কোন্ কথটা সকলের চেয়ে বড় কথা তাহা যদি একেবারেই ভুলিয়া যাই তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু বাহ্য প্রাকৃতিক তাহা দুর্বিবার হইলেও তাহা সকল সময়ে প্রেরণকর হয় না। হৃদয়াবেগের ভীততাকেই পৃথিবীর সকল বাস্তবের চেয়ে বড় বাস্তব বলিয়া মনে করিয়া আমরা যে অনেক সময়েই ভয়ঙ্কর ভ্রমে পড়িয়া থাকি—সংসারে এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। জাতির ইতিহাসেও যে একথা আরো অনেক বেশি খাটে তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

“আচ্ছা, ভাল কথা, তুমি কোনটাকে দেশের সকলের চেয়ে গুরুতব প্রয়োজন বলিয়া মনে কর” এই প্রশ্নটাই অনেকে বিশেষ বিরক্তির সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা আমি অমুভব করিতেছি। এই বিবক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াও আমাকে উত্তর দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে বিধাতা যে সমস্তাটি স্থাপিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুঃসহ হইতে পারে কিন্তু সেই সমস্তাটি যে কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। তাহা নিতান্তই আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে; অল্প দূর দেশের ইতিহাসের নজিরের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহার সম্মান পাওয়া যাইবেনা।

ভারতবর্ষের পর্ত্তপ্রান্ত হইতে সমুদ্রসীমা পর্যন্ত যে জিনিষটি সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেছে সেটি কি? সেটি এই যে, এত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার-জগতে আর কোনো একটিমাত্র দেশে নাই।

পশ্চিম দেশে যে সকল ইতিহাস ইঙ্কলে পড়িয়াছি তাহাৰ কোথাও আমবা এরূপ সমস্তাব পবিচয় পাই নাই। য়ুরোপে যে সকল প্রভেদেৰ মধ্যে সংঘাত বাধিয়াছিল সে প্রভেদগুলি একান্ত ছিলনা;—তাহাদেৰ মধ্যে মিলনেৰ এমন একটি সহজতত্ত্ব ছিল যে যখন তাহাবা মিলিয়া গেল তখন তাহাদেৰ মিলনেৰ মুখে জোড়েৰ চিহ্নটুকু পৰ্যাস্ত খুঁজিয়া পাওরা কঠিন হইল। প্রাচীন য়ুরোপে গ্রীক্ রোমক গণ প্রভৃতি জাতিৰ মধ্যে বাহিৰে শিক্ষা দীক্ষাৰ পার্থক্য যতই থাক তাহারা প্রকৃতই এক জাতি ছিল। তাহাবা পরস্পরেৰ ভাষা, বিজ্ঞা, রক্ত মিলাইয়া এক হইয়া উঠিবার জন্ত স্বতই প্রবণ ছিল। বিবোধেৰ উত্তাপে তাহাবা গলিয়া যখনি মিলিয়া গেছে তখনি বুঝা গিয়াছে তাহারা এক ধাতুতেই গঠিত। ইংলণ্ডে একদিন স্যাক্সন্, নৰ্ম্মান ও কেন্টিক জাতিৰ একত্ৰ সংঘাত ঘটয়াছিল কিন্তু ইহাদেৰ মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক ঐক্যতত্ত্ব ছিল যে ক্ষেতাজাতি ক্ষেতাক্ৰূপে স্বতন্ত্ৰ হইয়া থাকিতে পারিল না; বিরোধ কৰিতে কৰিতেই কখন যে এক হইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

অতএব য়ুবোপীয় সভ্যতাৰ মাহুৰেৰ সঙ্গে মাহুৰকে যে ঐক্যে সঙ্গত কৰিয়াছে তাহা সহজ ঐক্য। য়ুরোপ এখনও এই সহজ ঐক্যকেই মানে—নিজের সমাজের মধ্যে কোনো স্তৰতত্ত্ব প্রভেদকে স্থান দিতেই চায় না, হয় তাহাকে মারিয়া ফেলে নয় তাড়াইয়া দেয়। য়ুবোপেৰ যে কোনো জাতি হোক না কেন সকলেৰই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বাৰ উন্মোচিত রাখিয়াছে আর এলিয়াবাসীমাত্ৰই বাহাতে কাছে বৈধিতে না পারে সে জন্ত তাহাদেৰ সতৰ্কতা সাপেৰ মত ফোঁস কৰিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।

য়ুবোপেৰ সঙ্গে ভারতবৰ্ষেৰ এইখানেই গোড়া হইতেই অনৈক্য দেখা যাইতেছে। ভারতবৰ্ষেৰ ইতিহাস যখনি স্মৃক হইল সেই মুহূৰ্ত্তেই বৰ্ষেৰ সঙ্গে বৰ্ষেৰ, আৰ্য্যেৰ সঙ্গে অনাৰ্য্যেৰ বিরোধ ঘটিল। তখন হইতে এই বিরোধেৰ হুঃসাধ্য সমন্বয়েৰ চেষ্টায় ভারতবৰ্ষেৰ চিত্ত ব্যাপ্ত বহিয়াছে। আৰ্য্যসমাজে যিনি অবতাব বলিয়া গণ্য সেই রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে আৰ্য্য উপনিবেশকে অগ্রসর কৰিয়া দিবার উপলক্ষ্যে যে দিন শুক চণ্ডালব্রাহ্মণ সহিত মৈত্ৰী স্থাপন কৰিয়াছিল, যে দিন কিক্কিয়ার অনাৰ্য্যগণকে উচ্ছিন্ন না

কৰিয়া সহায়তায় দীক্ষিত কৰিয়াছিলেন, এবং লঙ্কাৰ পবাস্ত রাক্ষসরাজ্যকে নিৰ্মূল কৰিবার চেষ্টা না কৰিয়া বিভীষণেৰ সহিত বন্ধুতাব বোণে শত্ৰুপক্ষেৰ শত্ৰুতা নিরস্ত কৰিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতবৰ্ষেৰ অভিশ্রাব এই মহাপুরুষকে অবলম্বন কৰিয়া নিজেৰে ব্যক্ত কৰিয়াছিল। তাহাৰ পর হইতে আজ পৰ্যাস্ত এদেশে মাহুৰেৰ যে সমাবেশ ঘটয়াছে তাহাৰ মধ্যে বৈচিত্ৰ্যেৰ আর অন্ত রহিল না। যে উপকরণগুলি কোন মতেই মিলিতে চাহে না, তাহাদিগকে একত্ৰে থাকিতে হইল। এমনভাবে কেবল বোঝা তৈরি হয় কিন্তু কিছুতেই দেহ বীধিয়া উঠিতে চায় না। তাই এই বোঝা ঘাড়ে কৰিয়াই ভারতবৰ্ষকে শত শত বৎসর ধৰিয়া কেবলি চেষ্টা কৰিতে হইয়াছে, বাহারা বিচ্ছিন্ন কি উপায়ে সমাজেৰ মধ্যে তাহারা সহযোগীক্ৰূপে থাকিতে পারে; বাহারা বিরুদ্ধ কি উপায়ে তাহাদেৰ মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়; বাহাদেৰ ভিতরকাৰ প্রভেদ মানব প্রকৃতি কোনোমতেই অস্বীকার কৰিতে পারে না কিরূপ ব্যবস্থা কৰিলে সেই প্রভেদ যথাসম্ভব পরস্পরকে পীড়িত না করে;—অৰ্থাৎ কি কৰিলে স্বাভাবিক ভেদকে স্বীকার কৰিতে বাধ্য হইয়াও সামাজিক ঐক্যকে যথাসম্ভব মাজ করা যাইতে পারে।

নানা বিভিন্ন লোক যেখানে একত্ৰে আছে সেখানকার ঐতিমুহূৰ্ত্তেৰ সমস্তাই এই যে, এই পার্থক্যেৰ পীড়া এই বিভেদেৰ দুৰ্ললতাকে কেমন কৰিয়া দূর করা যাইতে পারে। একত্ৰে থাকিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই এক হইতে পারিব না মাহুৰেৰ পক্ষে এত বড় অমঙ্গল আর কিছুই হইতে পারে না। এমন অবস্থায় প্রথম চেষ্টা হয় প্রভেদকে স্তনিৰ্দ্ধিষ্ট গণ্ডী দ্বাৰা স্বতন্ত্ৰ কৰিয়া দেওয়া;—পরস্পর পরস্পরকে আঘাত না করে সেইটি সামলাইয়া যাওয়া; পরস্পরেৰ চিত্তিত অধিকাৰেৰ সীমা কেহ কোনোদিক্ হইতে লঙ্ঘন না করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা।

কিন্তু এই নিষেধেৰ গণ্ডিগুলি বাহা প্রথম অবস্থায় বহু বিচিত্ৰকে একত্ৰে অবস্থানেৰ সহায়তা করে তাহাই কালক্ৰমে নানাকে এক হইয়া উঠিতে বাধ্য দিতে থাকে। তাহা আঘাতকেও বাঁচায় তেমনি মিলনকেও ঠেকায়। অশান্তিকে দূরে থেদাইয়া রাখাই যে শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা তাহা নহে। বস্তুত তাহাতে অশান্তিকে চিরদিনই কোনো

একটা জায়গায় জিয়াইয়া রাখা হয় ; বিরোধকে কোনো মতে দূরে বাশিলেও তবু তাহাকে রাখা হয়—ছাড়া পাইলেই তাহার প্রায়মুখি হঠাৎ আসিয়া দেখা দেয় ।

শুধু তাই নয় । ব্যবস্থাবদ্ধভাবে একত্রে-অবস্থানমাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে । তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না । শৃঙ্খল দ্বারা কাজ চলে মাত্র, ঐক্যের দ্বারা প্রাণ জাগে ।

ভারতবর্ষও এতকাল তাহার বহুতর অনৈক্য ও বিরুদ্ধতাকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া প্রত্যেককে এক একটি প্রকৃষ্টে বদ্ধ কবিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত ছিল । অল্প কোনো দেশেই এমন সত্যাকার প্রভেদ একত্রে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, সুতরাং অল্প কোনো দেশেরই এমন জুসাম্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবার কোনো প্রয়োজনই হয় নাই ।

কিন্তু কি বিজ্ঞানে কি সমাজে শ্রেণীবদ্ধ করা আরম্ভের কাজ, কলেবরবদ্ধ করাই চূড়ান্ত ব্যাপার ; ইট কাঠ চূণ সুরতি পাছে বিমিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে নষ্ট করে এই জন্ত তাহাদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখাই যে ইমারত নিৰ্ম্মাণ কবা তাহা নহে ।

আমাদের দেশেও শ্রেণীবিভাগ হইয়া আছে কিন্তু রচনাকার্য হয় আরম্ভ হয় নাই, নয় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই । একই বেদনাব অন্তত্বের দ্বারা আত্মোপাস্ত আবিষ্ট, প্রাণময় রসবস্তুর স্নায়ুপেশীমাংসের দ্বারা অস্থিরাশি যেমন করিয়া ঢাকা পড়ে তেমনি করিয়াই বিধিনিষেধের শুষ্ক কঠিন ব্যবস্থাকে একেবারে আচ্ছন্ন এবং অন্তরাল করিয়া দিয়া যখন একই সরস অন্তত্বের নাড়িজাল সমস্তের মধ্যে প্রাণের চৈতন্তকে ব্যাপ্ত কবিয়া দিবে তখনই জানিব মহাজ্ঞানি কেহ ধারণ করিয়াছে ।

আমরা যে সকল দেশেব ইতিহাস পড়িয়াছি তাহার বিশেষ বিশেষ পথ দিয়া নিজেব সিদ্ধির সাধনা করিয়াছে । যে বিশেষ অমঙ্গল তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায়, তাহাজ্জই সঙ্গে তাহাদিগকে লড়িতে হইয়াছে । একদিন আমেরিকার একটি সমস্তা এই ছিল যে, ঔপনিবেশিক দল এক জায়গায়, আর তাহাদের চালকশক্তি সমুদ্রপারে, ঠিক যেন মাথার সঙ্গে ধড়ের বিচ্ছেদ—এরূপ অসামঞ্জস্য কোনো জাতির পক্ষে বহন করা অসম্ভব । ভূমিষ্ঠ শিশু যেমন

মাতৃগর্ভের সঙ্গে কোনো বন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারে না—নাড়ি ছেদন কবিয়া দিতে হয়—তেমনি আমেরিকার সমুদ্রে যে দিন এই নাড়ি ছেদনের প্রয়োজন উপস্থিত হইল সে দিন সে ছুরি লইয়া তাহা কাটিল । একদিন ফ্রান্সের সমুদ্রে একটি সমস্তা এই ছিল যে, সেখানে শাসনিতার দল ও শাসিতের দল যদিও একই জাতিভুক্ত তথাপি তাহাদের পরস্পরের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ এতই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে সেই অসামঞ্জস্যের পীড়ন মানুষকে পক্ষে ছুঁর্বহ হইয়াছিল । এই কারণে এই আত্মবিচ্ছেদকে দূর করিবার জন্য ফ্রান্সকে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল ।

বাহ্যত দেখিতে গেলে, সেই আমেরিকা ও ফ্রান্সেব সমস্তার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল আছে । ভারতবর্ষেও শাসনিতা ও শাসিত পরস্পর অসংলগ্ন । তাহাদের পরস্পরে সম অবস্থা ও সমবেদনার কোনো ঘোঁসই নাই । এমন স্থলে শাসনপ্রণালীর মধ্যে সুব্যবস্থার অভাব না ঘটতে পারে ;—কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবস্থার অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন অনেক বেশি । যে আনন্দে মানুষ বাঁচে এবং মানুষ বিকাশলাভ করে, তাহা কেবল আইন আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়া নহে । কল কথা, মানুষ আধ্যাত্মিক জীব—তাহার শরীর আছে, মন আছে, হৃদয় আছে—তাহাকে তৃপ্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তকেই তৃপ্ত কবিত্তে হয়—যে কোনো পদার্থে সজীব সর্বাদীনতার অভাব আছে তাহাতে সে পীড়িত হইবেই ;—তাহাকে কি জিনিষ দেওয়া গেল, সেই হিসাবটাই তাহার পক্ষে একমাত্র হিসাব নহে, তাহাকে কেমন কবিয়া দেওয়া হইল সেই হিসাবটা আরও বড় হিসাব । উপকার তাহার পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে যদি সেই উপকারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তির উপলব্ধি না থাকে । সে অত্যন্ত কঠিন শাসনও নীরবে সহ্য কবিত্তে পাবে, এমন কি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বরণ কবিত্তে পারে, যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার আনন্দ থাকে । তাই বলিতেছিলাম, কেবলমাত্র সুব্যবস্থা মানুষকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না ।

অথচ যেখানে শাসনিতা ও শাসিত পরস্পর দূরবর্তী হইয়া থাকে, উভয়ের মাঝখানে প্রয়োজনের অপেক্ষা

উচ্চতর আত্মীয়তর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইতে বাধা পায়, সেখানে রাষ্ট্রব্যাপার যদি অত্যন্ত ভালও হয় তবে তাহা বিগত আপিস আদালত এবং নিত্যন্তই আইন কানুন ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু তৎসঙ্গেও মানুষ কেন-যে কেবলি ক্রম হইতে থাকে, তাহার অন্তর বাহির কেন ঐ আনন্দহীন হইয়া উঠে তাহা কত কিছতেই বুঝিতে চান না, কেবলি রাগ করেন—এমন কি, ভোক্তাও ভাল করিয়া নিজেই বুঝিতে পারে না। অতএব শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে যে জীবনহীন শুষ্ক শাসনপ্রণালী ঘটা একেবারেই অনিবার্য ভারতের ভাগ্যে তাহা ঘটয়াছে সে কথা কেহই অস্বীকার কবিত্তে পারে না।

তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সঙ্গে বর্তমান ভারতের একটা মিল আছে সে কথাও মানিতে হইবে। আমাদের শাসনকর্তাদের জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাধ্য। তাহাদের খাওয়া পরা বিলাস বিহার, তাহাদের সমুদ্রের এপার ওপার ঘুরি পারের রসদ জোগানো, তাহাদের এখানকার কর্ম্মবসানে বিলাতী অবকাশের আশ্রয়ের আয়োজন এ সমস্তই আমাদের কাছে করিতে হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহাদের বিলাসের মাত্রা কেবলি অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সমস্ত বিলাসের খরচা জোগাইবার ভার এমন ভারতবর্ষের, যাহার দুইবেলার অন্ন পূরা পরিমাণে জোটে না। এমন অবস্থায় যাহারা বিলাসী প্রবলপক্ষ, তাহাদের অন্তঃকরণ নিশ্চয় হইয়া উঠিতে বাধ্য। যদি তাহাদিগকে কেহ বলে ঐ দেখ এই হতভাগাগুলো খাইতে পায় না, তাহা বা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হয় যে ইহাদের পক্ষে এইরূপ খাওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহাই

তাহাদের তুলনায় তাহাদের চারিদিকের লোকে কি খায় পরে, কেমন করিয়া দিন কাটায় তাহা নিঃস্বার্থভাবে তাহার বিচার কখনই কবিত্তে পারে না। বিশেষতঃ এক আধজন লোক ত নয়—কেবল ত একটি রাজা নয় একজন সম্রাট নয়—একেবাবে একটি সমগ্র জাতিব বাবুয়ানাব সম্বল এই ভারতবর্ষকে জোগাইতে হইবে। যাহারা বহুদূরে থাকিয়া রাজ্যে হালে বাচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের ক্ষুদ্র আত্মীয়তা-সম্পর্কশূন্য অপবিত্রতাকে অল্পবয়স্ক সমস্ত সঙ্গীর্ণ কবিয়া আনিতে হইতেছে এই যে নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য ইহা যে প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিল তাহা কেবল তাহারাই অস্বীকার করিতেছেন যাহাদের পক্ষে আরাম অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব, একপক্ষে বড় বড় বেতন, মোটা পেন্সন এবং লম্বা চাল—অল্পপক্ষে নিত্যন্ত ক্লেশে আধপেটা আহাবে সংসাধন নির্বাহ;—অবস্থার এই অসঙ্গতি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। শুধু অল্পবয়স্কের হীনতা নহে, আমাদের তরফে সম্রাণের লাঘব এত অত্যন্ত অধিক, পবস্পর্ষের মূল্যের তাবতম্য এত অতিমাত্র, যে, আইনের পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা অসাধ্য; এমন স্থলে যত দিন যাইতেছে ভারতবর্ষের বক্ষের উপর বিদেশীভাব ভাব ততই গুরুতর হইতেছে, উভয় পক্ষের মধ্যকার অসাম্য নিরতিশ্রুত অপরিমিত হইয়া উঠিতেছে ইহা আজ আর কাহাবো বুঝিতে বাকি নাই। ইহাতে একদিকে বেদনা যতই তঃসহ হইতেছে আর একদিকে অসাড়তা ও অবজ্ঞা ততই গভীরতা লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থাই যদি টিকিয়া যায় তবে ইহাতে একদিন না একদিন ঝড় আনিয়া উপস্থিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কতকটা ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তথাপি আমাদের দিগকে বলিতে হইবে বিপ্লবের পূর্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সম্মুখে যে একমাত্র সমস্তা বর্তমান ছিল—অর্থাৎ যে সমস্তাটিব মীমাংসাব উপবেই তাহাদের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিত আমাদের সম্মুখে সেই সমস্তাটি নাই। অর্থাৎ আমরা যদি দবখাস্তের জোবে বা গায়ের জোবে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে রাজি কবিত্তে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্তার কোনো মীমাংসাই হয় না;—

তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয়, এমন কহ আসিবে বাহার মুখেব গ্রাস এবং পেটের পবিধি ইংরেজের চেয়ে হয় ত ছোট না হইতে পারে।

একথা বলাই বাহুল্য, যেদেশে একটি মহাজাতি বাধিয়া ওঠে নাই সেদেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ, স্বাধীনতার “স্ব” জিনিষটা কোথায়? স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালী যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়ব জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমের জাতি যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্বপ্রান্তের আসামী তাহাব সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলা দেশেই হিন্দুব সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীন হইবে কে? হাতের সঙ্গে পা, পায়ের সঙ্গে মাথা যখন একেবারে পৃথক হইয়া হিসাব মিলাইতে থাকে তখন লাভ বলিয়া জিনিষটা কাহার?

এমন তর্ক শুনা যায় যে, যতদিন আমবা পবের কড়া শাসনের অধীন হইয়া থাকিব ততদিন আমবা জাত বাধিয়া তুলিতেই পারিব না—পদে পদে বাধা পাইব এবং একত্র মিলিয়া যে সকল বড় বড় কাজ কবিত্তে করিতে পরস্পর মিল হইয়া যায় সেই সকল কাজেব অবসবই পাইব না। একথা যদি সত্য হয় তবে এ সমস্তার কোনো মীমাংসাই নাই। কারণ, বিচ্ছিন্ন কোনো দিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ কবিয়া জয়লাভ করিতে পারে না। বিচ্ছিন্নেব মধ্যে সামর্থ্যের ছিন্নতা, উদ্দেশ্যের ছিন্নতা, অধ্যবসায়ের ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন জিনিষ জড়ের মত পড়িয়া থাকিলে তবু টিকিয়া থাকে কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তাহার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে; তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্বলতা নানা মূর্তিতে জাগিয়া উঠি। তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্ভূত হয়। নিজেরা এক না হইতে পারিলে আমরা এমন কোনো এককে স্থানচ্যুত করিতে পারিব না বাহা কৃত্রিমভাবেও সেই একের স্থান পূর করিয়া আছে।

অতএব যে দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক

মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সেদেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন একটি উদ্দেশ্য অন্ত সমস্ত উদ্দেশ্যই বাহার কাছে মাথা অবনত করিবে—এমন কি, ইংরেজরাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে তবে ইংরেজরাজত্বকেও আর্মাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা অন্তরের সহিত প্রীতির সহিত স্বীকার করিবার অনেক বাধা আছে। সেই বাধাগুলিকে দূর করিয়া ইংরেজরাজত্ব কি করিলে আমাদের আত্ম-সম্মানকে পীড়িত না করে, কি করিলে তাহার সহিত আমাদের গৌরবকব আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে এই কঠিন প্রশ্নের মীমাংসাস্তারও আমাদেরিগকে লইতে হইবে। রাগ করিয়া যদি বলি, “না আমরা চাই না” তবু আমাদেরিগকে চাহিতেই হইবে; “কাবণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক হইয়া মহাজাতি বাধিয়া উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজরাজত্বের যে প্রয়োজন তাহা কখনই সম্পূর্ণ হইবে না।

আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড় সমস্যা যে কি, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেষ্টনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে কবিয়াছিলাম, পাটিশন ব্যাপাবে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতী নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতী বস্ত্রধারণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধযোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতর আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হইয়া অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার হোক কিন্তু আমাদেরিগকে আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপে আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এবং বাস্তবিকভাবে বিস্তৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই “বাইনা” এই বাস্তবটি আমাদেরিগকে কখনই বিস্তৃত হইবে না। একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু মুসলমানের

সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ কবিয়েছে।

ইংবেজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে সত্যই দাঁড় করাইয়া থাকে তবে ইংবেজ আমাদের একটি পবন উপকাব করিয়াছে—দেশে যে একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে আমরা মূঢ়ের মত না বিচার করিয়াই দেশের বড় বড় কাক্সের আয়োজনের হিসাব কবিতোহিলাম, একেবারে আরম্ভেই তাহার প্রতি ইংবেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। ইহা হইতে কোনো শিক্ষাই না লইয়া আমরা যদি ইংবেজের উপবেই সমস্ত বাগের মাত্রা চড়াইতে থাকি তবে আমাদের মূঢ়তা দূর করিবার জন্য পুনরীর আমাদেরিগকে আঘাত সহিতে হইবে;—হায়া প্রকৃত যেমন কবিয়েই হোক তাহাকে আমাদের বৃত্তিতেই হইবে;—কোনো মতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিবার কোনো পন্থাই নাই।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচবর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাক্সের ব্যাঘাত হইতেছে অতএব কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমবা বললাভ করিব এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড় কথা নয়, স্ততবাং ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজন সাধনের সুযোগ এবং কেবল মাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি না হইলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। যিস্ত বলিয়া গিয়াছেন মানুষ কেবলমাত্র কটির দ্বারা জীবনধারণ করে না; তাহার কল্পন, মানুষের কেবল শাবীৰ জীবন নহে। সেই বৃহৎ জীবনের খাড়াভাব বাটতেছে বলিয়া ইংরেজবাজস্ব সকল প্রকার শাসন সত্ত্বেও আমাদের আনন্দ শেষ করিয়া লইতেছে।

কিন্তু এই যে খাড়াভাব এ যদি কেবল বাহির হইতে

হ্রটিত তাহা হইলে কোনো প্রকারে বাহির হইতে পারিবে

কিন্তু এই যে খাড়াভাব এ যদি কেবল বাহির হইতে

হ্রটিত তাহা হইলে কোনো প্রকারে বাহির হইতে পারিবে

কিন্তু এই যে খাড়াভাব এ যদি কেবল বাহির হইতে

হ্রটিত তাহা হইলে কোনো প্রকারে বাহির হইতে পারিবে

কিন্তু এই যে খাড়াভাব এ যদি কেবল বাহির হইতে

হ্রটিত তাহা হইলে কোনো প্রকারে বাহির হইতে পারিবে

কিন্তু এই যে খাড়াভাব এ যদি কেবল বাহির হইতে

হ্রটিত তাহা হইলে কোনো প্রকারে বাহির হইতে পারিবে

কটিব চেয়ে যে উচ্চতর খাড়া যোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পবিপুষ্ট করিয়া তোলে আমবা পরস্পরকে সেই খাড়া হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত সহযোগিতা, হৃদয়বৃত্তি, সমস্ত হিতচেষ্টা, পবিবার ও বংশের মধ্যে, এবং এক একটা সম্বন্ধের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্ধৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমবা দ্বীপপুঞ্জের মতই ধণ্ড ধণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মত ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মঙ্গলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি কবিতো থাকিবে। এই উপলব্ধি তাহার কোনো বিশেষ কার্যসিদ্ধির উপায় বলিয়াই গৌরবেব নহে, ইহা তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার মনুষ্যত্ব অর্থাৎ তাহার ধর্ম। এই ধর্ম হইতে সে যে পবিমাণেই বঞ্চিত হয় সেই পরিমাণেই সে শুষ্ক হয়। আমাদের চূর্তাগাক্সে বহু দিন হইতেই ভারতবর্ষে আমবা এই শুষ্কতাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞান, কর্ম, আচারব্যবহারের, আমাদের সর্বপ্রকার আদানপ্রদানের বড় বড় রাজপথ এক একটা ছোট ছোট মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া ধণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্ঘাটিত কবিয়া দিবার অবসর পায় নাই। এই কারণে আমরা পারিবারিক আরাম পাইয়াছি, ক্ষুদ্র সমাজের সহায়তা পাইয়াছি কিন্তু বৃহৎ মানুষের শক্তি ও সম্পূর্ণতা হইতে অনেক দিন হইতে বঞ্চিত হইয়া দীন হীনের মত বাস করিতেছি।

সেই প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিবার উপায় আমবা নিজের মধ্যে হইতেই যদি বাধিয়া তুলিতে না পারি তবে বাহির হইতে তাহা পাইব কেমন করিয়া? ইংরাজ চলিয়া গেলেই আমাদের এই ছিদ্র পূরণ হইবে আমবা এক্ষণেই পূরণ করিতেছি? আমরা যে পরস্পরকে প্রজ্ঞা করি নাই, অতএব যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রাও চেষ্টা করি নাই, আনন্দ যে এককাল “ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ” করিয়া

বসিয়া আছি ;—পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের সেই ঔদাসীন্য, অবজ্ঞা, সেই বিরোধ আমাদেরকে যে একান্তই ঘৃণ্য হইবে সে কি কেবলমাত্র বিলাতী কাপড় ত্যাগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সে কি কেবলমাত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের শক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ? এ নহিলে আমাদের ধর্ম পীড়িত হইতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইতেছে ; এ নহিলে আমাদের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হইবে, আমাদের জ্ঞানবিকাশ হইবে না, আমাদের হৃদয় চিন্তা শত শত অন্ধ সংস্কারের দ্বারা জড়িত হইয়া থাকিবে,—আমরা আমাদের অন্তর বাহিরের সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন কবিতা নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে আমাদের মাথা তুলিতে পারিব না। সেই নির্ভীক নির্বাণ বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্তই আমাদেরকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্মবন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনো মতেই বড় হইতে পারে না, কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে যে-কেহ আসিয়াছে সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব ; ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্তার মীমাংসা হইবে। সে সমস্তা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র ; নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই ঐক্য ; সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একত্র করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা ; মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরম প্রেমের দ্বারা ; উচ্চ নীচ আত্মীয় পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে শুভ চেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও ! বাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় কব, বাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত কর। রুদ্ধদ্বারে আঘাত কর, বাবদ্বার আঘাত কর ; কোনো নৈরাশ্রে, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতার ফিরিয়া যাইয়ো না ; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। সেই আহ্বান যে সংবাদ পত্রেব ক্রুদ্ধ গর্জনের

মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে বা চিংস্র উত্তেজনার মুখরতাব মধ্যেই তাহার বথার্থ প্রকাশ একথা আমরা স্বীকার করি না কিন্তু সেই আহ্বান আমাদের হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছে তাহা তখনই বুঝিতে পারি। জাতি বর্ণ নির্বিচারে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া লইয়া চলিয়াছি। যখন দেখি যে জাতি বর্ণের আঘাত কবিতা প্রবাসে সমাগত হইয়াছে তখনই আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি, যখন দেখি যে জাতি বর্ণের নিঃসন্দেহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখেও অত্যাচার-প্রতিরোধের প্রয়োজন-কালে আমাদের যুবকদিগকে কোনো বিপদের সম্মুখীন বাধা দিতেছে না। সেবার আমাদের সঙ্কোচ নাই, কর্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে,—পরের সহায়তায় আমরা উচ্চ নীচের বিচার বিমুক্ত হইয়াছি, এই যে স্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি এবার আমাদের উপরে যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সঙ্কীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদেরকে বাহিরে আনিবে—ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে বাহার কোনো অভাব আছে তাহার পূরণ করিবার জন্ত আমাদেরকে বাইতে হইবে ; অন্ন ও স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্ত আমাদেরকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে ; আমাদেরকে আর কেহই আমাদের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে বড় লইয়া আসে—কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন আবির্ভাবের সকলের চেয়ে বড় অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। সিংহের চাঞ্চল্য, বজ্রের গর্জন এবং বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে,—তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্বপশ্চিম দ্বন্দ্বিতায় আবৃত হইয়া যাইবে—চারিদিকে ধারা বর্ষণ হইয়া ভূমিতের পায়ে জল ভরিয়া উঠিবে এবং সৃষ্টিতের ক্ষেত্রে অন্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে।

মঙ্গল পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র ফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে নিশ্চয় জানিয়া আমরা দ্রুত আনন্দে প্রস্তুত হই। জন্ত ? বর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্ত, মাটি চাষ

ଶ୍ରୀବଦୀକ୍ତନାଥ ଠାକୁର ।

এখানে আমি উপকথার আলোচনা না করিয়া 'ঠাকুর-
মার কুলির' ভাষা বৃত্তিতে চেষ্টা করিতেছি। এই বহিতে
বাংলা ভাষা শিখিবাব প্রচুর উপাদান আছে।

সে ২ । হুটুক, বুপকথা কি ? ইহা কি উপকথার
গ্রাম্য রূপ কোন কোন স্থানে গ্রাম্য লোকেরা উইকে
বলে রুই, আশু নামের লোককে ডাকে রাশু । কিন্তু এই
প্রমাণেও ‘বুপকথা’ পাই না, পাই বুপকথা । বহির নাম
‘বাংলাশার বুপকথা’ । আমরা ছেলেবেলায় গল্প ও উপ-
কথা শুনিতাম ।

‘নিবেদনে’ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, উপকথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার “চোক ‘বুজিয়া’ আসিত,” “আমার মত দ্রবস্ত শিশু, শাস্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।” “মা আমার ‘অক্ষুরণ’ রূপকথা বলিতেন,” “আজ মনে হয়, আজ ঘরের শিশু তেমন করিয়া জাগে না, তেমন করিয়া ঘুম ‘পাড়ে’ না।”

নিবেদনে গ্রন্থকার এমন করিয়া কলম ছাড়িয়া দিয়াছেন কেন ? কেবল এই খানেই চোক বুঁজে নাই, আর এক স্থানেও (১৩৪ পৃঃ) বুঁজিয়াছে। লেখক অত্র কএকটা শব্দেও অনাবশ্যক চক্ষুবিন্দু দিয়াছেন। হুই তিন স্থানে পাই ‘উই’। ‘হেটে কাঁটা উপরে কাঁটা’—হেটে—অধোভাগে—যেমন হেট-মাথা শুনি। ‘ঘোমটার আঁড়ে’ (১০২ পৃঃ), ‘দৃষ্টিব আঁড়ালে’ (১৩৩ পৃঃ)। আড় ও আড়াল শব্দের মূল সংস্কৃত অন্তরাল শব্দে যদিও অন্বনাসিকবর্ণ আছে, বাংলায় আঁড়, আঁড়াল শুনি না। সংস্কৃত অন্বনাসিক শব্দ মাত্রেই বাংলা বর্ণান্তরে অন্বনাসিকত্ব পায় নাই।

এই ভূমিকা পড়িয়া উপকথার বহিখানির ভাষা দেখিতে
কোতূহল হয়। কেন না, প্রাচীন কালের ঠাকুরমাএর
মুখের উপকথা অক্ষরে বসানা যেমন-তেমন কর্ম নয়। মুখে
মুখে যে কথা যেমন শুনি, সে কথা তেমন বানান করিয়া
অস্ত্রের বোধগম্য করা অল্প নৈপুণ্যের পরিচয় নয়। স্থান-
ভেদে ভাষার ইতর বিশেষ হয়; স্থানভেদে উপকথার
ভাষার প্রভেদ হয়। অস্ত্রের, বিশেষতঃ সকল স্থানের
বালক-বালিকাদের বোধগম্য হইবে, অথচ গ্রাম্যতা বা
ভাষার দোষ থাকিলে না; লেখার ভাষার বাঁধন পড়িবে,
অথচ রস-ভঙ্গ হইবে না, এমন ভাষা-চালনা যে-সে
লোকের কর্ম নয়।

• হাসি-তামাসা, হাসি ... হইয়াছে,
তাহাদের কথাটিং এবং ... হ। যিনি
বুড়া হইয়াও ছেলে সাত ... হটি ছেলে-
... যোগ করিয়া

...না গল্প লিখি
 ... উপকথা
 ... উপকথা
 ... নাইতে

প্রমাণ, সংস্কৃত শৃংখল বাংগলায় শিকল, সং তংডুল বাং চাউল। ফুলের পাঁপড়ী (৩২ পৃঃ), শেঁওলা (১৭১ পৃঃ) হাঁলো বেড়াল (২২২ পৃঃ), ইত্যাদি পড়িয়া নদীয়া জেলাব অংশ বিশেষেব গ্রাম্য পইঠা, বৌচকা, হিসাঁব, ছেঁকল, হাঁসি শব্দ মনে আসে।

এক স্থানে আছে, এক কামার 'কাস্তে গড়াইতেছে' (২১৩ পৃঃ),—সেখানে গড়িতেছে হইবার কথা। 'নাক যোড়াইরা দে' (১৭৭ পৃঃ),—ছুড়িয়া দে? 'অত পণ্ডিতী ঢুলিয়ে কাজ নাই' (১৯৮ পৃঃ)—চলাইয়া? ফলাইয়া? 'নিবেদনে,' 'জ্যোচ্ছনা ফুল ফুটেছে, মার মুখের এক একটা কথায় সেই আকাশ-নিখিল-ভরা জ্যোৎস্নার রাজ্যে, * * * কত অছিন্ অভিন্ রাজপুত্রী, কত চিব সুন্দর রাজপুত্র রাজকন্তার অবর্ণনীয় ছবি আমার শৈশব চক্ষুব সামনে সত্যকারটার মত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।'—এখানে বোধ হয় 'ফুটেছে' কবিলে পরের সংগে মিল ধাইত। জ্যোচ্ছনা ফুল ফোটে, না, জ্যোচ্ছনায় ফুল ফোটে? বোধ হয় জ্যোচ্ছনায় ঠিক। এমন জ্যোচ্ছনা যেন বোধ হয় চারিদিকে (শাস্তা) ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। জ্যোচ্ছনায় ফিনও ফোটে। ফুট্ বুটে জ্যোচ্ছনা, কিন্তু জ্যোচ্ছনায় ফুল ফোটে। লেখক জানাইয়াছেন, কেহ কেহ 'তিন ফোটা' কেহ বা 'ফটিক ফোটা' বলে। ফুল ফোটা আর ফটিক ফোটোর মূলভাব এক। ফিন ও ভিন এক বোধ হয়। ভিন্ন শব্দ হইতে ভিন আসিয়াছে। জ্যোচ্ছনায় ফিন ফোটে—গাছপালা ভিন্ন ভিন্ন, স্পষ্ট স্পষ্ট দেখায়। কিংবা সং 'ফুংগিং' শব্দ হইতে ফিন আসিয়াছে। 'ফুংগিং' শব্দের চলিত রূপ ফিনকি শব্দ আছে। কিন্তু অছিন্ অভিন্ পুরী নিশ্চয়ই অছিঙ্গ, অভিন্ন।

বাংগলায় কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি বসে। ইহাই সাধারণ রীতি। কোন কোন স্থানে 'রে', এবং সর্বনামে 'র'ও বসে। আমাকে, আমাবে, আমার,—এই তিন রূপ। আমাকে শব্দের 'কে' বিভক্তির 'ক' লুপ্ত হইয়া 'ই'। সুতরাং 'আমাকে' ও আমা'এ' বা আমা'র' মূলে এক। আমা'এ' পদের 'এ' স্থানে 'রে', 'র' আগম। কোন কোন স্থানে কর্মকারকে 'আমার' পদেরও প্রয়োগ আছে। হয়ত তাহা মূলে ষটীপদ, কিংবা কর্মকারকে 'রে'

হইতে উৎপন্ন। বাংগের স্থানস্থানে কর্মকারকে নানাবিধ বিভক্তি আছে। একবচনে আমা'কে', আমা'র' আনা'রে', আমা'ক', আমা'র'; এবং বহুবচনে আমা'বরক', আমা'দের বরে' আমা'র'গে' ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন পদের মধ্যে লেখার ভাষা আমাকে, আমার, আমাদিকে লইয়াছে। অত্নগুলির প্রশ্ন দেয় না। আমাদিগকে ইলে আনাদিকে করাও চলে। 'ঠাকুয়ার ঝুলি'তে যেন বাছিয়া বাছিয়া কর্মকারকে 'র' এবং 'দেরকে' পোরা হইয়াছে। 'আমবা উহাদেব পুবিব' (৬ পৃঃ); 'আমাদেরকে আনিয়াছ, মাদেরকেও আন' (৭ পৃঃ); 'তাহাদেরকে খেদাইয়া দেন (৮ পৃঃ); 'রাজপুত্রদেরকে খেলেব মধ্যে পুবিয়া' (১৫ পৃঃ); ইত্যাদি। 'তাহাদেরকে দিয়া তিন বুড়ী তিন সন্ধ্যা জল ধাইয়া' (১৫ পৃঃ),—সহজে অর্থ পাই না।

ঝুলির কোন কোন স্থানে-কিয়াপদ প্রয়োগেও একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। 'থোকন নাচতে লেগেছে', 'নাচতে নেগেছে'; 'বিছানা নিলেন' (৩৫); 'মাথার চুল জটা দিয়াছে' (৩৯ পৃঃ); 'যোগাড়-বাগাড় দিক্' (৪২ পৃঃ); 'টান দিল' (৪৯ পৃঃ); 'আসন নিল' (৯৮ পৃঃ);—'নেমন্তন দিতিস্' (১৯৫ পৃঃ) ইত্যাদি। স্থান ভেদে রান্না করা (রাঁধা), টান দেওয়া (টানা), নাচিতে লাগা (নাচা), ইত্যাদি আছে। চুলে জটা ধরে; যোগাড়-বাগাড় করা; নেমন্তন করা, ইত্যাদিও আছে।

ঝুলিতে কোন কোন স্থলে এক এক শব্দের অল্পচর শব্দ যোজিত হইয়াছে। কাপড়-চোপড় শব্দের চোপড়কে অল্পচর বলিতেছি। অল্পচর স্বাধীন নয় বটে, কিন্তু অর্থহীন নয়। সাড়া-শব্দ, কুঁড়লী-মুঁড়লী পাকাইয়া, চটিয়া-মটিয়া, বাধিয়া-ছাদিয়া, ঝুলি হইতে লইলাম। কিন্তু পরিষ্কার বরিস্কার, বাট মাটি, কুঁড়ো মূর্দো, ভাবিয়া টাবিয়া, প্রভৃতির নিরর্থক অল্পচর বা প্রচর শব্দ না থাকিলে ভাল হইত। কারণ ইহারা বৃথা ধোঁকা জন্মায়। ভাবিয়া-চিস্তিয়া আছে; টাবিয়া-মাসিলেও চলিত। অত্নগুলির গোড়ায় ট দিয়া আরম্ভ করা সম্ভাবণ নিয়ম। কএকটি অল্পচরের রূপ দেখিলে অর্থহীন বোধ হয় না। কিংবা বৃদ্ধিতে পারা গেল না। 'তাডাতাড়ি হাতি' (৮১ পৃঃ); 'হাঁপিয়া-জাঁপিয়া' (৮৫ পৃঃ); 'জম-জো-

গড়-মড়
ত-মড়

লেখক মিঠা কবিতা ও ছড়া লিখিতে পারেন। উৎসর্গে

‘ফুলে ফুলে বয় হাওয়া ঘুমে ঘুমে চোখ চুলে,
কাজগুলো সব লুটপুট খায় আপন কথায় ভুলে ।

এমন সময় খুঁটে’ মুটে’ এনে হাজার যুগের ধূলি

চাঁদের হাটের মাঝখানে,—মা !—ধুপস্ করা ঝুলি !!

বিতাটি লেখকের রচিত । তবে কাজ ‘গুনো’ কেন ?

নো শব্দ কলিকাতা ও নদীয়াব জ্বালোকেরা বলে । লেখক

অপেক্ষা নকাবেব অধিক পক্ষপাতী, এবং বাংলা ল ধাতু

াড়াইয়া দিয়া সর্বত্র নি ধাতু আনিয়াছেন । খুঁটিয়া-লুটিয়া

বানে খুঁটিয়া-লুটিয়া হইয়াছে । লুট-পটির স্থানে লুট-পুটি

গম্য বোধ হয় । ‘ধুপস্ করা ঝুলি’—ধুপস্ শব্দে ফেলা

ধূলি ? ‘হাজার যুগের ধূলি’ ঝুলির ভিতরে, না বাহিরে ?

আজকাল ঠাকুরমায়েরা উপকথা ভুলিয়া গিয়াছেন ।

আশা করি তাঁহারা এই বই পড়িয়া উপকথা শিখিতে

পারিবেন । ঠাকুরমায়ের মুখে শিশু যাহা শুনিতে ভাল

বাসে, যাহা শুনিতে বুদ্ধিতে পারে, তাহা এই বহিতে

পাইবে, এমন আশা করিতে পারি না । অন্ততঃ ছোট

ছেলে মেয়েরা পাইবে না । ঝুলির ভাষা সরল বটে,

কিন্তু গ্রাম্য শব্দ এত অধিক প্রবেশ না কবাইলেও চলিত ।

শিশুরা হৃদয় উপমা বুদ্ধিতে পারে না । ‘চাঁদের হাট’ যে

তাহারা, একথা পাকা জেঠা ছেলে মেয়ে ছাড়া অস্ত্রে বুদ্ধিতে

পারিবে না । বোধ হয় এই সব কাণ্ডে শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর মহাশয় ভূমিকাব শেষে প্রস্তাব করিয়াছেন, ‘বাংলা

দেশের আধুনিক দিদিমাদের জন্ত অবিলম্বে একটা স্কুল

খোলা হউক এবং দক্ষিণাবাবুর এই বইখানি অবলম্বন

করিয়া শিশু-শয়ন-রাজ্যে পুনর্ব্যার তাঁহারা নিজেদের

গোববের স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকুন ।’

অনেকে কিন্তু ধরেব ছেলেমেয়েদের হাতেই এই বইখানি

দিতে চাহিবেন । ৮ লাগবেহারী-দে মহাশয় ইংরেজীতে

উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন । এ পর্য্যন্ত বাংলায় কেহ

লেখেন নাই । এই হেতু আশা করি এই বইখানি দ্বারা

দেশের একটা অভাব পূরণ হইবে । লেখকের উৎসাহ ও

কমতা আছে । ঠাকুরমার ঝুলি ‘স্বদেশী’ বলিয়াই তাহা

নিখুঁত দেখিতে চাই ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ।

কটক ।

প্রার্থনা ।

ওগো !

এখনো পরাণ কেন,

স্বপ্নের হিল্লোলে দোলে,

হৃদয় চমকি উঠে,

হুঃখ কথা মনে হলে ।

এখনো স্বপ্নের আশে,

বাসনা জাগিছে প্রাণে,

এখনো রয়েছে সাধ,

সংসারের ধনে মানে ।

লোকের অপ্রিয় বাক্যে,

অবহেলা উপেক্ষায়,

এখনো অন্তর মাঝে,

ব্যথা কেন লাগে হায় ?

এখনো শত্রুর প্রতি,

জিয়াংসা রয়েছে প্রাণে,

নিন্দায় বিভাগ আছে,

সন্তোষ প্রশংসা-গানে ।

ধনীয়ে আদর আর,

দরিদ্রে উপেক্ষা হেন,

উচ্চ নীচ ভেদ জ্ঞান,

এখনো রয়েছে কেন ?

এখনো জনমে রোষ,

লোকে যদি কটু ভাবে,

ব্যথা লাগে প্রিয় জন,

যদি নাহি ভাল বাসে ।

এখনো রয়েছে মম,

আত্ম পব ক্ষেদ্র জ্ঞান,

স্বপ্নে গর্ভ—হুঃখে ক্লেশ,

মানে চাই প্রতিদান ।

মনেব শব্দকার এই,

সকলি ঘুচিবে যবে,

বলেছি তব সাথে,

তখন মিলন হইবে ।

ধ্যানে, জ্ঞানে, নিদ্রা

বিশ্বময় একাকার,

যবে দেখিবে না আঁধি,

তোমা বিনা কিছু আর ;

তখনি আমার হবে,
বলেছিলে, প্রিয়তম !
অবধি দীর্ঘ কাল,
যদি মন ;

এখনো মনি তোমার,
পরে নাই মনস্কাম
তুমি নিশ্চয়ই জানি,
যদি মন ;

বাসনা বিফল হবে,
শুধু অশ্রু মাঝে সাব,
এ রূপে ক'র দাবে দিন ?
দেখা কি দিবে না আর ?

জ্ঞান দিয়ে শক্তি দিয়ে,
হে দেব । সহায় হও,
পদসেবা যোগ্য করি,
হাত ধবে তুলে লও ।

“হিন্দু বিধবা ।”

ধূপ ।

ওহে ধূপ, কোন্ উগ্র তপস্তার ফলে
শিথিলে এ আত্মতাগ সংঘম অটল,
কোন মহাতীর্থে, কোন সাগরের জলে
ভাসাইলে স্বার্থরাশি সাধিতে মজল ?
কোন দধিচির কাছে মন্ত্রশিষ্য হয়ে,
ধরিলে এ মহাত্রত ? হে ক্ষুদ্র মহান ;
কোন্ নবদী

বিশ্বে বিহু উগ্র ছিলে অগ্নির সন্ধান ?
শিখিয়াছ কোন্ হিঁদু বিব্রাব কালে,
পোড়াইতে দেবোদ্দেশ্যে তব আপনায় ?
ওহে আত্মভোলা! আবে
আপনাবে দিলে কবে
হে সংঘর্ষে

তব আত্মতাগ সংঘম অটল,
কোন মহাতীর্থে, কোন সাগরের জলে
ভাসাইলে স্বার্থরাশি সাধিতে মজল ?
কোন দধিচির কাছে মন্ত্রশিষ্য হয়ে,
ধরিলে এ মহাত্রত ? হে ক্ষুদ্র মহান ;
কোন্ নবদী

বিশ্বে বিহু উগ্র ছিলে অগ্নির সন্ধান ?
শিখিয়াছ কোন্ হিঁদু বিব্রাব কালে,
পোড়াইতে দেবোদ্দেশ্যে তব আপনায় ?
ওহে আত্মভোলা! আবে
আপনাবে দিলে কবে
হে সংঘর্ষে

ইতিহাস সম্পূর্ণ মানিয়া চলেন নাই, তাহা তিনি বিজ্ঞাপন কবিরাজে
অন্তএব ইহাকে শুধু উপস্থাপন হিসাবে বিচার করিতে হইবে ।
দিনেই ভবানী বাবু উপস্থাপন রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন ; তাঁ
এই উপস্থাপন তাঁহার যশোবৃদ্ধির সহায় হইবে । আমবা পুস্তক
পাঠিয়া হুঁস্বী হইয়াছি । কবিত্বময় ভাষায় প্রাচীন বঙ্গের একখানি সু
চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । প্রাচীন বঙ্গের নবাবি দরবার, সমাজ, পরি
শ্রুতি কল্প ছিল তাহার একটি চমৎকার চিত্র পাঠকের চি
সমুখে প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে । ভবনকার কালের দরবারি মন্ত্রটি
বিলাসিতা, ধামধেরাল, ঘড়বস্ত্র, পর্দায় পর্দায় উদ্ঘাটিত হইয়া প্রত্যক্ষ
হইয়াছে ; প্রাচীন কালের যুবকদিগের সঙ্গীতানুবাগ ও বলচর
একান্নবস্ত্র পবিবারেব হস্ততা, বধুব সলঙ্ক সবল ব্যবহাব ও বিরক্তি
বস্ত্রতা, সমাজে ভ্রম ইত্যের একতা ও অকপট সত্য, হিন্দু মুসলমান
প্রগাঢ় ঐতি—পরম মনোরম চিত্রপবম্পবার অঙ্কিত হইয়াছে । ইহ
চরিত্রগুলিও সঙ্গাব : তাহাদের প্রাণস্পন্দন, পাঠক পদে পদে অনুভ
কবিবেন । বাঘ মহাশয় ও খাঁ সাহেব, হেমেন্দ্রলাল ও রামমোহন
মহামায়া ও কলাপী, লক্ষ্মী ও হরত, শিখাব ও পান্না, সিরাজ ও ফৈজী—
সকলেই নিজেব নিজেব দিক দিয়া পুঠ ও পূর্ণ হইয়াছে । খাঁ সাহেবে
জাতিধর্মনির্বিশেষে স্নেহ, হেমেন্দ্রলালেব নিষ্ঠা ও চবিত্র-বল, নির্বোধ
বলবান রামমোহনের সবল বিশ্বাস ও সাহস, মহামায়াব বাৎসল্য
লক্ষ্মীর অনাবিল নীরব ঐতি, কৈলীর নারীকেব প্রকাশ ও বাসনাব সহিত
দুর্বার সংগ্রাম, আর সর্কোপরি বালিকা হুস্তের অনাজাত বুধাটির মত
সৌরভভরা নিরুল্লস প্রাণ ও দেবতার নির্মাল্যের মত পরম পবিত্রতা—
চক্কের সমক্ষে আনন্দ-অমবা হুষ্টি করে । কৈলীর ককণ অবসান, হরত
বিবির ককণ বিদায় ও প্রবাসী হিমুরায়েব আপনাব স্নেহবাজ্যে প্রত্যা
বর্তনেব কাক্ষ্যা চিত্তকে বেদনাতুর কবিতা তুলে, নির্মল প্রেমের পূজার
জন্ত সন্ধান পাঠকের অশ্রু আকর্ষণ কবে । হায় আমাদের সেই প্রাচীন
সমাজ । বলে দৃষ্ট, উদারতাব অপরিমেয়, সখে প্রগাঢ় ধর্মে নিষ্ঠাবিত,
আবার আহুক, ফিবিয়া আহুক—হিন্দু মুসলমান, ইতর ভ্রমের মধ্যে
তৈমনি কবিতা সখে একেব রাণী বাধিয়া দিক ।

এমন হৃদয় বইখানির বর্ণাশুদ্ধি বড় অস্ত্রার ব্রকমের হইয়াছে
পুস্তকের মধ্যে হিমুরায়েব দৌত্য-সম্বন্ধীয় দুইটি পরিচ্ছেদ আখ্যায়িকার
একটু লাগিকতা ভঙ্গ কবিয়াছে । এই দুই পবিচ্ছেদে ইতিহাসের বিবৃতি
একটু দীর্ঘ হইয়াছে ।

২। ছেলেদের রামাষণ—ঐউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি. এ.
প্রণীত । দ্বিতীয় সংস্করণ, বিশেষরূপে সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত । ডবল
ক্রাউন ১৬ পেজি ১৬২ পৃষ্ঠা । মূল্য আট আনা ; উৎকৃষ্ট সংস্করণ বারো
আনা । এই পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট শিশুপাঠ্য পুস্তকের অন্ততম । ইহাতে সবল
হৃদয় ভাবে, শিশুবোধ্য সরস ভাষায় রামাষণের মূল আখ্যায়িকাটি
বিবৃত হইয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কার শিশুর কোমল মনেব উপব
রামাষণের হৃদয়িত সকল মুদ্রিত করিয়া দিাব কৌশল আছে । ইহা
শিশুবিগকে রামাষণের আখ্যায়িকার সহিত পরিচিত করিবার উৎকৃষ্ট
পুস্তক । ইহাতে অনেকগুলি কলাবস্ত্র হুচিত্রিত ছবি সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে, তাহার একখানি রঙীন । এই পুস্তক আখ্যায়িকাবিত্তার
হৃদয়পাঠ্য ও হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । মূল্য যথাসম্ভব অল্পই রাখা হইয়াছে ।
আমাদের বালকবালিকাগণ কুশিকার ফলে রামচরিত্রেব মহত্ত উপলব্ধি
করিতে না পাবিয়া আমাদের দেশের এমন একটি বিরাট মহান চরিত্রেব
প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছে । ইহা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়া
ব্যথিত চিত্তে উপায় চিন্তা করিয়াছি । উপেন্দ্রবাবুর এই প্রবাস আমাদের
চিত্তশুদ্ধি নিবারণ করিবে আশা করি । ইহা সকল শিশুর সহচর
হোক,—ইহা হইতে শিশুবা আনন্দ ও শিক্ষা

৩। উচ্ছ্বাস—শ্রীগৌরীকান্ত চক্রবর্তী কাব্যরত্ন প্রণীত। ডবলক্রাউন পেজি ৩৫ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা। ইহাতে তিনটি উচ্ছ্বাস আছে—জাহ্নবী তীরে; (২) উর্বনাস; ও (৩) অশ্রুট স্মৃতি। কবিত্ব ও নিকতার একত্র সম্মিলন। যে জাহ্নবী মহাতাপস হিমালয়ের হৃদয়-স্বত প্রেমপ্রবাহ, যাহার তীরে তীরে মুগ্ধ মনবিগণ “কত জ্ঞান ধর্ম ও কাব্যকাহিনী” প্রচার করিয়াছেন, যাহার তীরে তীরে কত জনপদ ও স্বাস্থ্য সম্পদে পূর্ণ ছিল, সেই জাহ্নবী শুধু জড় নহেন, তিনি চিরায়ী, তিনি চিরায় পুরুষের পবিত্র আশীর্বাদ। জড়বাদী ভিন্ন ইহা কে স্বীকার করিবে? কবির এই স্মৃতি প্রথম উচ্ছ্বাসে পরিব্যক্ত হইয়াছে। র্ননাভকে জ্ঞান পাতিতে দেখিয়া দার্শনিকের সংসারজালের সাদৃশ্য মনে আসিল, তাহাই দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসের বিষয়। মানুষ ভুলিয়া যায়, “বস্তু হার লক্ষ্য নহে, কিন্তু বস্তুমধ্যগত সৌন্দর্যই তাহার লক্ষ্য”। একদিন “মানুষেই এই অমৃত বাণী ঘোষণা করিয়াছিল “শৃঙ্খল বিধে অমৃতস্ত্রীতাঃ, বেদাহমেতম পুরুষঃ মহাস্তম”? আবার কবে মানুষ সেই অমৃতের গন্ধ ধরয়ঙ্গম করিবে। তৃতীয় উচ্ছ্বাসে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রতিধ্বনি করিয়া লেখক বলিতেছেন, আমরা যত শৈশব হইতে বার্ককোর দিকে অগ্রসর হই, তত আমরা আমরা ও আনন্দ হইতে বিযুক্ত হইতে থাকি। শৈশবে বিশ্বের মধ্যে এক ও একের মধ্যে বিষ দেখিতে পাইয়া কি আনন্দ। আর বয়সে বিষ ভুলিয়া, ক্ষুদ্রে মজিয়া কি দুর্নিবার দুঃখ! মাঝে মাঝে একের দেখা পাই বটে, কিন্তু আপের মত চিরদিন কেন পাই না? স্মৃতি অশ্রুট, পরিস্ফুট রহে কেমন করিয়া, ইহা বহু ধর্ম মীমাংসার ভার লইয়াছে—সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে; কিন্তু সেই বিবদমান সিদ্ধান্তের সমন্বয় করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে হার কয়জন? পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র হইলেও স্বত্বপাঠ্য হইয়াছে। কেবল লেখকের সংসারের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখবাদ আমাদের ভালো লাগে নাই। স্বাভাব্য পাশে রোগ, প্রেমের পাশে কলহ, স্বাচ্ছন্দ্যের পাশে অভাব কত অল্প। তাহা শুধু মঙ্গলময় কল্যাণকরপা হুস্পষ্ট করিবার উপায় মাত্র। যে ব্যক্তি চিত্রের মূল বিষয় ছাড়িয়া তাহার পারিপার্শ্বিকটাকেই বড় করিয়া দেখে, সে বঞ্চিত, সে সমর্থ্যার নহে।

৪। হৃদয়—শ্রীহীরালাল সেনগুপ্ত প্রণীত। ২৪ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। মূল্য দুই আনা। ইহাতে গ্রন্থকার রচিত কতকগুলি গানের প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের “বন্দেমাতরম্” ও অবশেষে রবীন্দ্রনাথের “বাংলার মাটি, বাংলার জল” সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের স্বরচিত গানগুলিতে কবিত্ব, চিন্তা ও দেশপ্রীতি আছে। তিনটি গান রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও যুগান্তবসন্তাদিক ভূপেশ্বরের প্রতি আশ্রয় প্রকাশ করিয়াছে। চাষার গান দুটি বেশ হইয়াছে; চাষার ভাষা চাষার প্রাণে আঘাত করিতে পারিলেই তাহার শিল্প উদ্বোধিত হইয়া উঠিবে।

৫। প্রবাসের অশ্রুট স্মৃতি—“আসাম প্রবাসী” প্রণীত। ডিমাই ১২ পেজি, ১৮৬ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র। আসামে অবস্থান সময়ে গ্রন্থকার অসমীয়াসিঙ্গের সঙ্কে যে অভিজ্ঞতালান্ড করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্কে যে সকল প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত কবিয়াছিলেন, তাহারই সমষ্টি এই পুস্তক। পুস্তক বহু পুর্বাতন, ১৩০১ সালে ছাপা। আমরা নূতন করিয়া সমালোচনার প্রস্তুত পাইয়াছি। এই পুস্তকে আসাম দেশের ঐতিহাসিক ও নরনারী-সমাজের, সামাজিক পর্ব ও ভাষা প্রভৃতির তত্ত্ব এবং পরিশিষ্টে দিনলিপিতে মণিপুর যুদ্ধের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। বইখানিতে জটিল মানব-তত্ত্বের এক কোণ একটু পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মানবতত্ত্ব মানবের নিকট চিৎ কোতুকর, বইখানি এজন্য কোতুকরোদ্দীপক ও স্বত্বপাঠ্য হইয়াছে। প্রবাসী

যুরোপীয়গণ যে দেশে যে জাতির মধ্যে থাকেন, প্রচুর গবেষণার তাহার এত তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন যে দেশবাসীদের অনেকের নিকটেই অনেকাংশে নূতন হয়। বন্ধ্যমান পুস্তক তদ্রূপ না হইলেও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ।

৬। হোমিওপ্যাথি মতে গৃহচিকিৎসা—ডাক্তার ৮ জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত। রয়াল ১৬ পেজি ২৪৫ পৃষ্ঠা। মূল্য কাপড়ের দামের দ্বিগুণ বাত্রো আনা। এই পুস্তকের ইহা বহু সংস্করণ, অতএব ইহার স্বত্বপাঠ্য নিশ্চয়রোজন। ইহাতে হোমিওপ্যাথির ইতিবৃত্ত ও বৈজ্ঞানিকত্ব, স্বাস্থ্য-রক্ষার স্থূল স্থূল নিয়ম, ঔষধের ক্রম ও মাত্রা নির্দেশ প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণামুক্রমে রোগ সমাজীয়া তাহার নিদান ও চিকিৎসা সংক্ষেপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আকস্মিক অসুস্থের চিকিৎসাবিধি প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ঔষধ নির্ণয়ের সুবিধার জন্য প্রধান করকেটি ঔষধের সংক্ষিপ্ত ঔষধজাতক্স দেওয়া হইয়াছে। পরিশেষে বর্ণামুক্রমিক নির্ধারিত পাঠকের সাহায্য-কাব্য হইয়াছে। অল্পমূল্যে গৃহ-চিকিৎসাব পুস্তকের মধ্যে ইহা অন্ততম উপায়ের পুস্তক। ইহা গৃহস্থের বন্ধুর মত সহচর হইবার যোগ্য।

মুদ্রা-রাক্ষস।

চিত্র-পরিচয়।

বর্তমান সংখ্যার প্রথম চিত্র “বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগ,” ইহা ঘোষিও কাংসুতা নামক জাপানী চিত্রকর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। বুদ্ধদেবের মুখে শান্ত বিষাদ-পূর্ণভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের ত্রুতের তুলনায় সংসারের সমুদ্র বস্তু যেমন তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল, চিত্রেও তেমনি তাহার স্মৃতিবই প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে।

এতদ্বিধা আমবা পাঁচ খানি উড়িয়ার ছবি দিলাম। ইহাব ফোটোগ্রাফগুলি অনেক বৎসর পূর্বে অধ্যাপক যোগেশ-চন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

কোন দেশকে জানিতে হইলে তাহার পুরাতত্ত্ব ও বর্তমান অবস্থা উভয়ই জানা দরকার। প্রাচীন মন্দিরাদির চিত্র পুরাতত্ত্ব জানিবাব পক্ষে সহায়তা কবে। বর্তমান অবস্থা জানিতে হইলে সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রা নির্বাহ-প্রণালী জানা দরকার। তজ্জন্ত “উড়িয়ার টেকিতে ধান ভানা”র মত ছবি ও তুচ্ছ নয়। অধিকন্তু, এল্প চিত্র দ্বারা সামান্য ভাষাতে সঙ্ক্ষেপে ভারতের কোন কোন প্রদেশের একত্ব প্রতিপাদিত হয়। কারণ তত্তৎপ্রদেশে মানুষের জীবন মূলতঃ এক। ধান-ভানাব ফোটোট ১৬ বৎসর পূর্বে গৃহীত।

বিন্দুসাগরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১৩০০ এবং ৭০০ ফুট। পদ্মপুরাণের মতে সকল তীর্থ হইতে বিন্দু বিন্দু জল আনিয়া ইহা পূর্ণ করা হইয়াছিল বলিয়া, মহর্ষিগণ ইহা নাম দিয়া সাগব রাখিয়াছিলেন।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

৮ম ভাগ ।

শ্রাবণ, ১৩১৫ ।

৪র্থ সংখ্যা ।

গোরা ।

২৮

গোরা যখন ভ্রমণে বাহির হইল তখন তাহার সঙ্গে অবিনাশ, মতিলাল, বসন্ত এবং রমাপতি এই চারজন সঙ্গী ছিল। কিন্তু গোরার নির্দিষ্ট উৎসাহের সঙ্গে তাহারা তাল বাধিতে পারিলনা। অবিনাশ এবং বসন্ত অসুস্থ শরীরের ছুতা করিয়া চার পাঁচ দিনের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। নিতান্তই গোরাব প্রতি ভক্তি বশত মতিলাল ও রমাপতি তাহাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিলনা। কিন্তু তাহাদের কষ্টের সীমা ছিলনা; কারণ, গোরা চলিয়াও শ্রাস্ত হয় না আবার কোথাও স্থির হইয়া বাস কবিতো তাহার বিরক্তি নাই। গ্রামেব যে কোনো গৃহস্থ গোরাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভক্তি করিয়া ঘরে রাখিয়াছে তাহার বাড়িতে আহার ব্যবহাবেব যতই অসুবিধা হোক দিনের পব দিন কাটাইয়াছে। তাহার আলাপ শুনিবার ক্ষমত সমস্ত গ্রামের লোক তাহাব চারিদিকে সমাগত হইত, তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

ভট্টসমাজ, শিক্ষিতসমাজ ও কলিকাতা সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ গোবা তাহা এই প্রথম

দেখিল। এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সঙ্কীর্ণ, কত দুর্বল; সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন; প্রত্যেক পাঁচ সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত; পৃথিবীর বৃহৎ কণ্ঠ-ক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্ববচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত; তুচ্ছতাকে যে সে কতই বড় করিয়া জানে এবং সংস্কার মাজেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে কঠিন; তাহাব মন যে কতই সুস্থ, প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ, তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন কবিয়া বাস না করিলে কোনো মতেই কল্পনা কবিতো পাবিতনা। গোবা গ্রামে বাস করিবার সময় একটা পাড়ায় আগুন লাগিয়াছিল—এত বড় একটা সঙ্কটেও সকলে দলবদ্ধ হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় বিপদের বিরুদ্ধে কাজ করিবার শক্তি যে তাহাদের কত অল্প তাহা দেখিয়া গোরা আশ্চর্য হইয়া গেল। সকলেই গোলমাল, দোড়াদোড়ি, কান্নাকাটি করিতে লাগিল কিন্তু বিধিবদ্ধভাবে কিছুই করিতে পারিল না। সে পাড়ার নিকটে জলাশয় ছিল না; মেরেরা দূর হইতে জল বহিয়া আনিয়া ঘরের কাজ চালায়; অথচ প্রতিদিনেবই সেই অসুবিধা লাঘব করিবার ক্ষমতা ববে একটা স্বল্পব্যয়ে

কুপ খনন করিয়া রাখে সজ্জতিপন্ন লোকেরও সে চিন্তাই ছিল না। পূর্বেও এ পাড়ায় মাঝে মাঝে আগুন লাগিয়াছে, তাহাকে দৈবের উৎপাত বলিয়াই সকলে নিরুত্তম হইয়া আছে, নিকটে কোনো প্রকার জলের ব্যবস্থা কবিতা রাখিবার জন্য তাহাদের কোনোরূপ চেষ্টাই জন্মে নাই। পাড়ার নিত্যন্ত প্রয়োজন সম্বন্ধেও যাহাদের বোধশক্তি এমন আশ্চর্য্য অসাধারণ তাহাদের কাছে সমস্ত দেশের অভাবের আলোচনা করা গোরার কাছে বিজ্ঞ বলিয়া বোধ হইল। সকলের চেয়ে গোবাব কাছে আশ্চর্য্য এই লাগিল যে, মতিলাল ও রমাপতি এই সমস্ত দৃষ্টে ও ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হইত না—বরঞ্চ গোবাব ক্ষোভকে তাহারা অসঙ্গত বলিয়াই মনে করিত। ছোটলোকরাত এইরকম করিয়াই থাকে, তাহারা এমনি করিয়াই ভাবে, এই সকল কষ্টকে তাহারা কষ্টই মনে করে না; ছোটলোকদের পক্ষে এতদূর ছাড়া আর যে কিছু হইতেই পারে তাহাই কল্পনা করা তাহারা বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ করে। এই অজ্ঞতা, জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কি ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড—এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র সকলেরই কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না এই কথা আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া গোরার চিন্তা বাস্তবিক ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।

মতিলাল বাড়ি হইতে গাড়ার সংবাদ পাইয়াছে বলিয়া বিদায় লইল; গোরাব সঙ্গে কেবল রমাপতি অবশিষ্ট রহিল।

উভয়ে চলিতে চলিতে একজায়গায় নদীর চবে এক মুসলমান পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আতিথ্যগ্রহণের প্রত্যাশায় খুঁজিতে খুঁজিতে সমস্ত গ্রামের মধ্যে কেবল একটি ঘর মাত্র হিন্দু নাপিতের সন্ধান পাওয়া গেল। দুই ব্রাহ্মণ তাহাবই ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া দেখিল বৃদ্ধ নাপিত ও তাহাব জ্ঞী একটি মুসলমানের ছেলেকে পালন করিতেছে। রমাপতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সেত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গোবা নাপিতকে তাহার অনাচাবের জন্য ভৎসনা করিতে সে কহিল, “ঠাকুর, আমরা বলি হরি, ওরা বলে আমরা, কোনো তফাৎ নাই।”

তখন রৌদ্র প্রখর হইয়াছে—বিস্তীর্ণ বালুচব, নদী

বহুব। রমাপতি পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া কহিল,—“হিন্দুর পানীয় জল পাই কোথায়?”

নাপিতের ঘবে একটা কাঁচা কুপ আছে—কিন্তু ভ্রষ্টাচারের সে কুপ হইতে রমাপতি জল খাইতে না পারিল—মুখ বিমর্ষ করিয়া বসিয়া রহিল।

গোরা জিজ্ঞাসা কবিল, “এ ছেলের কি মা বাপ নাই?”

নাপিত কহিল, “হুই আছে, কিন্তু না থাকারই মত।”

গোরা কহিল, “সে কি বকম?”

নাপিত যে ইতিহাসটা বলিল, তাহাব মর্ম্ম এই:—

যে জমিদারীতে ইহাবা বাস কবিত্তেছে তাহা নীলকর সাহেবদেব ইজাবা। চবে নীলের জমী লইয়া প্রজাদের সহিত নীলকুঠির বিবোধেব অন্ত নাই। অল্প সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে কেবল এই চব ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবরা শাসন করিয়া বাধ্য কবিত্তে পাবে নাই। এখানকার প্রজারা সমস্তই মুসলমান, এবং ইহাদের প্রধান ফকসদার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষ্যে দুই বার পুলিশকে ঠেঙাইয়া সে জেল খাটিয়া আসিয়াছে; তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, তাহাব ঘুমে ভাত নাই বলিলেই হয় কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না। এবাবে নদীব কাঁচি চবে চাব দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরোধান পাইয়াছিল,—আজ মাসখানেক হইল নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়ালসহ প্রজাব ধান লুট কবে। সেই উৎপাতের সময় ফকসদার সাহেবেব ডানহাতে এমন এক লাঠি বসাইয়াছিল যে ডাক্তারধানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এত বড় দুঃসাহসিক ব্যাপার এ অঞ্চলে আর কখনো হয় নাই। ইহার পর হইতে পুলিশেব উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনেব মত লাগিয়াছে;—প্রজাদের কাহাবো ঘরে কিছুই রাখিল না, ঘরের মেয়েদেব ইজ্ঞৎ আর থাকে না। ফকসদার এবং বিস্তব লোককে হাজতে রাখিয়াছে, গ্রামের বহুতব লোক পলাতক হইয়াছে। ফকর পরিবাব আত নিব্বল; এমন কি, তাহার পবনের একখানি মাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছিল যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না; তাহার একমাত্র বালকপুত্র তমিজ, নাপিতের জ্ঞীকে গ্রামসম্পর্কে মাসী বলিয়া ডাকিত; সে খাইতে

পায়না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী তাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে । নীলকুঠির একটা কাছারি ক্রোশদেড়েক তফাতে আছে, দারোগা এখনো তাহার দলবল লইয়া সেখানে আছে ; তদন্ত উপলক্ষ্যে গ্রামে যে কখন আসে এবং কি করে তাহার ঠিকানা নাই । গত কল্যা নাপিতের প্রতিবেশী বৃদ্ধ নাজিমের বরে পুলিশের আবির্ভাব হইয়াছিল । নাজিমের এক যুবক শ্যালক, ভিন্ন এলেকা হইতে তাহার ভগিনী সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল— দারোগা নিতান্তই বিনা কাবণে “বেটা ত জোয়ান কম নয়, দেখেচ বেটার বৃকের ছাতি”—বলিয়া হাতের লাঠিটা দিয়া তাকে এমন একটা খোঁচা মারিল যে তাহার দাঁত ভাঙিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তাহার ভগিনী এই অত্যাচার দেখিয়া ‘ছুটিয়া আসিতেই সেই বৃদ্ধকে এক ধাক্কা মাঝিয়া ফেলিয়া দিল । পূর্বে পুলিশ এ পাড়ায় এমনতর উপদ্রব করিতে সহসা সাহস করিত না কিন্তু এখন পাড়ার বলিষ্ঠ যুবপুরুষ মাত্রই হয় গ্রেফতার নয় পলাতক হইয়াছে । সেই পলাতক-দ্বিগকে সন্ধানের উপলক্ষ্য করিয়াই পুলিশ গ্রামকে এখনো শাসন করিতেছে । কবে এ গ্রহ কাটিয়া যাইবে তাহা কিছুই বলা যায় না ।

গোরা ত উঠিতে চায় না, ওদিকে রমাপতির প্রাণ বাহির হইতেছে । সে নাপিতের মুখের ইতিবৃত্ত শেষ না হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, হিন্দুর পাড়া কত দূরে আছে ?

নাপিত কহিল—“ক্রোশ দেড়েক দূরে যে নীলকুঠির কাছারি আছে, তাহার তহশিলদার ব্রাহ্মণ, নাম মাধব-চাটুয়ো ।”

গোবা জিজ্ঞাসা করিল—“সুভাবটা ?”

নাপিত কহিল “যমদূত বয়েই হয় । এত বড় নির্দয় অশচ কোশলী লোক আর দেখা যায় না । এই যে ক’দিন দারোগাকে ঘরে পুষে, তার সমস্ত খরচা আমাদেরই কাছ থেকে আদায় করবে—তাতে কিছু মুন্সীও থাকবে ।”

রমাপতি কহিল—“গোব বাবু চলুন, আর ত পারা যায় না ।” বিশেষত নাপিতবোঁ যখন মুসলমান ছেলেকে তাহাদের প্রাঙ্গণের কুয়াটার কাছে দাঁড় করাইয়া ঘটতে করিয়া জল ছুঁলিয়া স্নান করাইয়া দিতে লাগিল তখন তাহার

মনে অত্যন্ত বাগ হইতে লাগিল এবং এ বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে তাহার প্রবৃত্তিই হইল না ।

গোবা ঘাইবাব সময় নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই উৎপাতের মধ্যে তুমি যে এ পাড়ায় এখনো টিকে আছ ? আর কোথাও তোমার আত্মীয় কেউ নেই ?”

নাপিত কহিল—“অনেক দিন আছি এদের উপর আমার মায়্যা পড়ে গেছে । আমি হিন্দু নাপিত, আমার জ্যোতজমা বিশেষ কিছু নেই বলে কুঠিব লোক আমার গারে হাত দেয় না । আস্ত এ পাড়ায় পুরুষ বলতে আর বড় কেউ নেই, আমি যদি যাই তা’হলে মেয়েগুলো ভয়েই মারা যাবে ।”

গোরা কহিল, “আচ্ছা, খাওয়াদাওয়া করে আবার আমি আসব ?”

দারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণার সময় এই নীলকুঠির উৎপাতের সুদীর্ঘ বিবরণে রমাপতি গ্রামের লোকের উপরেই চটয়া গেল । বেটারা প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে চায় ইহা গোয়ার মুসলমানের স্পর্ধা ও নির্কুণ্ঠিতাব চরম বলিয়া তাহার কাছে মনে হইল । যথোচিত শাসনের দ্বারা ইহাদের এই উদ্ধত চূর্ণ হইলেই যে ভাল হয় ইহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না । এই প্রকারের লক্ষীছাড়া বেটারদের প্রতি পুলিশের উৎপাত ঘটাইয়া থাকে এবং ঘটতেই বাধ্য এবং ইহারাই সে জন্ত প্রধানত দোষী এইরূপ তাহার ধারণা । মনিবের সঙ্গে মিটমাট করিয়া লইলেইত হয়, ফেসাদ বাধাইতে যায় কেন, তেজ এখন রহিল কোথায় ? বস্ত্ত রমাপতির অন্তরের সহানুভূতি নীলকুঠির সাহেবের প্রতিই ছিল ।

মধ্যাহ্নরোদ্রে উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়া চলিতে চলিতে গোরা সমস্ত পথ একটি কথাও বলিল না । অবশেষে গাছপালাব ভিতর হইতে কাছারিবাড়ির চালা যখন কিছুদূর হইতে দেখা গেল তখন হঠাৎ গোবা আসিয়া কহিল, “রমাপতি তুমি খেতে যাও, আমি সেই নাপিতের বাড়ি চল্লম ।”

রমাপতি কহিল, “সে কি কথা ? আপনি থাকেন না ? চাটুজের ওখানে খাওয়াদাওয়া করে তার পবে যাবেন ।”

গোবা কহিল, “আমার কর্তব্য আমি করব এখন। তুমি খাওয়াদাওয়া সেরে কলকাতায় চলে যোয়ো—ঐ ঘোষপুর চরে আমাকে বোধ হয় কিছু দিন থেকে যেতে হবে—তুমি সে পাববে না।”

বমাপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গোবার মত ধর্মপ্রাণ হিন্দু ঐ স্নেহের ঘরে বাস কবিবার কথা কোন্ মুখে উচ্চারণ কবিল তাই সে ভাবিয়া পাইল না। গোরা কি পান ভোজন পরিত্যাগ করিয়া প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিয়াছে তাই সে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু তখন ভাবিবার সময় নহে, এক এক মুহূর্ত্ত তাহার কাছে এক এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে; গোরাব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলায়নের প্রস্তাব তাহাকে অধিক অস্বস্তি করিতে হইল না। ক্ষণকালের প্রস্তাব বমাপতি চাহিয়া দেখিল গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটি দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া খবরোদ্বে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।

কুখ্যাত তৃষ্ণায় গোরাকে অভিভূত করিয়াছিল কিন্তু দুর্বৃত্ত অশ্রাব্যকাবী মাধবচাটুজের অন্ন খাইয়া তবে জ্ঞাত বাঁচাইতে হইবে এ কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার অসহ্য বোধ হইল। তাহার মুখ চোখ লাল ও মাথা গবম হইয়া মনের মধ্যে বিষম একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সে কহিল পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিষ করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমবা একি ভয়ঙ্কর অধর্ম করিতেছি! উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমাব জ্ঞাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জ্ঞাত নষ্ট হইবে! যাই হোক এই আচাৰ বিচারের ভাল মন্দের কথা পবে ভাবিব কিন্তু এখনত পারিলাম না।

নাপিত গোরাকে একলা ফিরিতে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। গোবা প্রথমে আসিয়া নাপিতের ঘটা নিজেব হাতে ভাল করিয়া মাজিয়া কূপ হইতে জল তুলিয়া পাইল এবং কহিল ঘবে যদি কিছু চাল ডাল থাকে ত দাও আমি রাখিয়া খাইব। নাপিত ব্যস্ত হইয়া রাখিবার জোগাড়

করিয়া দিল। গোরা আহাৰ সারিয়া কহিল, “আমি তোমার এখানে দু’চার দিন থাকব।”

নাপিত ভয় পাইয়া হাত জোড় কবিয়া কহিল— “আপনি এই অধর্মের এখানে থাকবেন তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আব কিছুই নেই। কিন্তু দেখুন আমাদের উপরে পুলিশের দৃষ্টি পড়েছে, আপনি থাকলে কি ফেসাদ ঘটবে তা ত বলা যায় না।”

গোরা কহিল, “আমি এখানে উপস্থিত থাকলে পুলিশ কোনো উৎপাত করতে সাহস করবে না। যদি করে আমি তোমাদের রক্ষা করব।”

নাপিত কহিল—“দোহাই আপনাব, রক্ষা করবার যদি চেষ্টা করেন তাহলে আমাদের আর রক্ষা থাকবে না। ও বেটারা ভাববে আমিই চক্রান্ত করে আপনাকে ডেকে এনে ওদের বিক্ষিপ্ত সাক্ষী জোগাড় কবে দিয়েছি। এত দিন কোনো প্রকারে টিকে ছিলুম, আর টিকতে পারব না। আমাকে সুরক্ষা যদি এখান থেকে উঠতে হয় তাহলে গ্রাম পরমাণ হয়ে যাবে।”

গোরা চিরদিন সহরে থাকিয়াই মানুষ হইয়াছে, নাপিত কেন যে এত ভয় পাইতেছে তাহা তাহার পক্ষে বুঝিতে পারাই শক্ত। সে জানিত জ্বারের পক্ষে জ্বোর কবির দাঁড়াইলেই অজ্ঞায়ের প্রতিকার হয়। বিপন্ন গ্রামকে অসহায় বাধিয়া চলিয়া যাইতে কিছুতেই তাহার কর্তব্য-বুদ্ধি সম্মত হইল না। তখন নাপিত তাহার পায়ে ধরিয়া কহিল, “দেখুন আপনি ব্রাহ্মণ, আমার পুণ্যবলে আমার বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন, আপনাকে যেতে বল্চি এতে আমাব অপরাধ হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রতি আপনার দয়া আছে জেনেই বল্চি, আপনি আমার এই বাড়িতে বসে পুলিশের অত্যাচাবে যদি কোনো বাধা দেন তাহলে আমাকে বড়ই বিপদে ফেলবেন।”

নাপিতের এই ভয়কে অমূলক কাপুরুষতা মনে করিয়া গোরা কিছু বিবস্ত হইয়াই অপরাহ্নে তাহার দর ছাড়িয়া বাহির হইল। এই স্নেহাচাৰী ঘরে আহাৰাদি করিয়াছে মনে করিয়া তাহার মনের মধ্যে একটা অপ্রসন্নতাও জন্মিতে লাগিল। ক্লান্ত শরীর এবং উত্থাপিত মস্তিষ্ক সময়ে সে নীলকুঠিৰ কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আহাৰ

সারিয়া রম্যাপতি কলিকাতায় রওনা হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করে নাই, তাই সেখানে তাহার দেখা পাওয়া গেল না। মাধবচাঁটুজের বিশেষ খাতিব কবিতা গোরাতে আতিথ্যে আহ্বান করিল। গোরা একেবারেই আশুনা হইয়া উঠিয়া কহিল, “আপনার এখানে আমি জলগ্রহণও করব না।”

মাধব বিস্মিত হইয়া কাবণ জিজ্ঞাসা করিতেই গোরা তাহাকে অস্ত্রায়কাবী অত্যাচারী বলিয়া কটুক্তি করিল, এবং আসন গ্রহণ না কবিতা দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা তত্ত্বপোষে বসিয়া তাকিয়া আশ্রয় করিয়া গুড়গুড়িতে তামাক টানিতেছিল। সে খাড়া হইয়া বসিল এবং কড়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কেহে তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়?”

গোরা তাহার কোনো উত্তর না কবিতা কহিল, “তুমি দারোগা বুঝি? তুমি ঘোষপুরের চবে যে সমস্ত উৎপাত করেছ আমি তাব সমস্ত ধবর নিয়েছি। এখনো যদি সাবধান না হও তাহলে—”

দারোগা। ফাঁসি দেবে না কি? তাইত লোকটা কস নয়ত দেখি! ডেবেছিলেম ভিক্ষা নিতে এসেছে, এয়ে চোখ রাঙায়! ওরে তেওয়ারি!

মাধব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দারোগার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “আরে কর কি, ভদ্রলোক, অপমান করো না।”

দারোগা গরম হইয়া কহিল, “কিসের ভদ্রলোক! উনি যে তোমাকে যাখুসি তাই বল্লেন, সেটা বুঝি অপমান নয়?”

মাধব কহিল—“যা বলেচেন সে ত মিথ্যে বলেন নি, তা রাগ করলে চলবে কি করে? নীলকুঠির সাহেবের গোমস্তাগিরি করে খাই, তার চেয়ে আর ত কিছু বলবাব দরকার করে না। রাগ কোরো না দাদা, তুমি যে পুলিশের দারোগা, তোমাকে যমের পেয়াদা বলে কি গাল হয়? বাঘ মানুষ মেরে খায়, সে বোষ্টম নয়, সে ত জানা কথা।

কি করবে, তাকে ত খেতে হবে।”

বিনা প্ররোজনে মাধবকে রাগ প্রকাশ করিতে কেহ কোনো দিন দেখে নাই। কোন্ মানুষের দ্বারা কখন কি কাজ পাওয়া যায়, অথবা বক্র হইলে কাহার দ্বারা কি অপকার হইতে পারে তাহা বন্ধু যায় কি? কাহারো অনিষ্ট বা অপমান সে খুব হিসাব করিয়াই করিত—বাগ

করিয়া পরকে আঘাত কবিতার ক্ষমতার বাজে ধরচ করিত না।

দারোগা তখন গোরাতে কহিল—“দেখ বাপু, আমরা এখানে সবকারের কাজ করতে এসেছি— এতে যদি কোনো কথা বল বা গোলমাল কর তাহলে মুকিলে পড়বে!”

গোরা কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মাধব তাড়াতাড়ি তাহার পশ্চাতে গিয়া কহিল— “মশায়, যা বলেচেন সে কথাটা ঠিক—আমাদের এ কসাইয়ের কাজ—আব ঐ যে বেটা দারোগা দেখেচেন ওব সঙ্গে এক বিছানায় বসলে পাপ হয়—ওকে দিগে কত যে দুর্কর্ম কবিয়েছি তা মুখে উচ্চারণ করতেও পারিনি। আর বেশি দিন নয়—বছর দুতিন কাজ করলেই মেয়ে কটার বিয়ে দেবার সম্বল করে নিয়ে তার পরে জী পুকুরে কাশীবাসী হব। আর ভাল লাগে না মশায়, এক এক সময় ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি। যা হোক, আজ রাতে যাবেন কোথায়? এইখানেই আহারাদি করে শয়ন করবেন। ও দারোগা বেটার ছায়া মাড়াতেও হবে না, আপনার জন্তে সমস্ত আলাদা বন্দোবস্ত করে দেব।”

গোবাব ক্ষুধা সাধাবণের অপেক্ষা অধিক—আজ প্রাতে ভাল করিয়া খাওয়াও হয় নাই—কিন্তু তাহার সর্ব শরীর যেম জলিতেছিল—সে কোনো মতেই এখানে থাকিতে পারিল না—কহিল “আমাব বিশেষ কাজ আছে।”

মাধব কহিল—“তা রত্ন একটা লণ্ঠন সঙ্গে দিই।”

গোরা তাহার কোনো জবাব না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মাধব ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “দাদা, ওলোকটা সদরে গেল। এই বেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটা লোক পাঠাও।”

দারোগা কহিল—“কেন, কি করতে হবে?”

মাধব কহিল—“আর কিছু নয়, একবার কেবল জানিয়ে আসুক একজন ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে সাক্ষী ভাঙাবার জন্তে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে।”

ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাউন্লো সাহেব দিবাসানে নদীর ধারের রাস্তায় পদব্রজে বেড়াইতেছেন, সঙ্গে হারানবাবু রহিয়াছেন।

কিছু দূরে গাড়িতে তাঁহার সেম পরেশবাবুর মেয়েদের লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন।

ব্রাউন্স সাহেব গার্ডন্ পাটিতে মাঝে মাঝে বাঙালী ভক্তলোকদিগকে তাঁহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিতেন। জিলার এন্ট্রেন্স স্কুলে প্রাইজ বিতরণ উপলক্ষ্যে তিনিই সভাপতির কাজ করিতেন। কোনো সম্পন্ন লোকেব বাড়িতে বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মে তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি গৃহকর্তার অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতেন। এমন কি, যাত্রাগানের মজলিষে আহূত হইয়া তিনি একটা বড় কেদারায় বসিয়া কিছুক্ষণের জন্ত ধৈর্য্যসহকায়ে গান শুনিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আদালতের গভর্নমেন্ট-প্লাডারের বাড়িতে গত পূজার দিন যাত্রা দেখিয়া, যে ছই ছোকরা ভিস্তি ও মেংরাণী সাজিয়াছিল, তাহাদের অভিনয়ে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাব অনুরোধক্রমে একাধিকবার তাহাদের অংশ তাঁহার সম্মুখে পুনরাবৃত্ত হইয়াছিল।

তাঁহার স্ত্রী মিশনরির কন্যা ছিলেন। তাহার বাড়িতে মাঝে মাঝে মিশনরি মেয়েদের চা-পান সভা বসিত। জেলায় তিনি একটি মেয়ে ইন্সকুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সেই স্কুলে ছাত্রীর অভাব না হয় সে জন্ত তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। পরেশবাবুর বাড়িতে মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞা-শিক্ষার চর্চা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে সর্বদা উৎসাহ দিতেন; দূরে থাকিলেও মাঝে মাঝে চিঠি পত্র চালাইতেন ও ক্রিষ্টমাসের সময় তাহাদিগকে ধর্মগ্রন্থ উপহার পাঠাইতেন।

মেলা বসিয়াছে। তত্পলক্ষ্যে হারানবাবু, সুধীর ও বিনয়ের সঙ্গে বরদাসন্দরী ও মেয়েরা সকলেই আসিয়াছেন—তাঁহাদিগকে ইন্সপেকশন বাংলায় স্থান দেখিয়া হইয়াছে। পরেশবাবু এই সমস্ত গোলমালের মধ্যে কোনোমতেই থাকিতে পারেন না এই জন্ত তিনি একলা কলিকাতাতেই রহিয়া গিয়াছেন। সূচরিতা তাঁহার সঙ্গরক্ষণ জন্ত তাঁহাব কাছে থাকিতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু পরেশ, ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণে কর্তব্যপালনের জন্ত, সূচরিতাকে বিশেষ উপদেশ দিয়াই পাঠাইয়া দিলেন। আগামী পরশ্ব কমিশনার সাহেব ও সঙ্গীক ছোট লাটের সম্মুখে ম্যাজিষ্ট্রেটের বুদ্ধিতে

ডিনারের পবে ঈভনিং পাটিতে পরেশবাবু মেয়েদের দ্বারা অভিনয় আরম্ভি প্রভৃতি হইবার কথা স্থির হইয়াছে—সে জন্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের অনেক ইংরেজ বন্ধু জেলা ও কলিকাতা হইতে আহূত হইয়াছেন। কয়েকজন বাছা বাছা বাঙালী ভক্ত-লোকেরও উপস্থিতি হইবার আয়োজন হইয়াছে। তাঁহাদের জন্ত বাগানে একটি তাঁবুতে ব্রাহ্মণ পাচক কর্তৃক প্রস্তুত জলযোগেরও ব্যবস্থা হইবে এইরূপ শুনা যাইতেছে।

হাবানবাবু অতি অল্পকালের মধ্যেই উচ্চতাবের আলাপে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ সম্বৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। খুষ্টান ধর্মশাস্ত্রে হারানবাবুর অসামান্য অভিজ্ঞতা দেখিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন এবং খুষ্টান ধর্ম গ্রহণে তিনি অল্প একটু মাত্র বাধা কেন বাধিয়াছেন এই প্রশ্নও হারানবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

আজ অপরাহ্নে নদীতীরের পথে হারানবাবুর সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালী ও হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় গোরা “গুড ঈভনিং স্তর” বলিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাল সে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া বুঝিয়াছে যে সাতবেলের চোকাঠ উত্তীর্ণ হইতে গেলে তাঁহার পেয়াদার মান্ডল জোগাইতে হয়। এরূপ দণ্ড ও অপমান স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া আজ সাহেবের হাওয়া খাইবার অবকাশে সে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। এই সাক্ষাৎকালে হাবানবাবু ও গোরা, উভয় পক্ষ হইতেই পরিচয়ের কোনো লক্ষণ প্রকাশ হইল না।

লোকটাকে দেখিয়া সাহেব কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। এমন ছয়কুটের চেয়ে লম্বা, হাড়মোটা, মজবুৎ মানুষ তিনি বাংলা দেশে পূর্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। ইহার দেহের বর্ণও সাধারণ বাঙালীর মত নহে। গায়ে একখানা থাকী রঙের পাঞ্জাবী জামা, ধুতি মোটা ও মলিন, হাতে এক গাছা বাঁশের লাঠি, চাদর খানাকে মাথায় পাগড়ির মত বাঁধিয়াছে।

গোরা ম্যাজিষ্ট্রেটকে কহিল—“আসি চর ঘোষপুর হইতে আসিতেছি।”

ম্যাজিষ্ট্রেট একপ্রকার বিস্ময়হচক শিষ্ দিলেন। ঘোষ-

পুরের তদন্ত কার্যে একজন বিদেশী বাধা দিতে আসিয়াছে সে সংবাদ তিনি গত কল্যাই পাইয়াছিলেন। তবে এই লোকটাই সে! গোরাকে আপাদমস্তক ভীক্ষ ভাবে একবার নিবীক্ষণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কোন্ জাত?”

গোরা কহিল, “আমি বাঙালী ব্রাহ্মণ।”

সাহেব কহিলেন, “ও! খববেব কাগজেব সঙ্গে তোমার যোগ আছে বুঝি?”

গোবা কহিল—“না।”

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, “তবে ঘোষপুৰ চবে তুমি কি করতে এসেছ?”

গোরা কহিল, “ভ্রমণ করতে করতে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলুম—পুলিশের অত্যাচাবে গ্রামেব দুর্গতিব চিহ্ন দেখে এবং আরো উপদ্রবেব সম্ভাবনা আছে জেনে প্রতিকারেব জন্ত আপনার কাছে এসেছি।”

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—“চব ঘোষপুৰেব লোক শুলো অত্যন্ত বদমায়েস সে কথা তুমি জান?”

গোরা কহিল,—“তারা বদমায়েস নয়, তারা নির্ভীক স্বাধীনচেতা—তারা অন্তায় অত্যাচার নীবেব সহ্য কবতে পারে না।”

ম্যাজিষ্ট্রেট চটয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন নব্য বাঙালী ইতিহাসেব পুঁথি পড়িরা কতকগুলো বুলি শিখিয়াছে—Insufferable!

“এখানকার অবস্থা তুমি কিছুই জান না” বলিরা ম্যাজিষ্ট্রেট গোরাকে খুব একটা ধমক দিলেন।

“আপনি এখানকার অবস্থা আমাব চেয়ে অনেক কম জানেন” গোবা মেঘমজ্জ স্বরে জবাব কবিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—“আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি তুমি যদি ঘোষপুৰেব ব্যাপাব সম্বন্ধে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ কব তাহলে খুব সস্তায় নিষ্কৃতি পাবে না।”

গোবা কহিল—“আপনি যখন অত্যাচারেব প্রতিবিধান করবেন না বলে মনস্থির করেছেন এবং গ্রামেব লোকেব বিরুদ্ধে আপনার ধাবণা যখন বন্ধমূল, তখন আমার আব কোনো উপায় নেই—আমি গ্রামেব লোকদেব নিজের চেষ্টায় পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্তে উৎসাহিত কব্ব।”

ম্যাজিষ্ট্রেট চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া বিহ্বালেব মত গোরার দিকে ফিবিয়া গর্জিয়া উঠিলেন—“কি! এত চড় স্পর্ধা!”

গোরা দ্বিতীয় কোনো কথা না বলিয়া দীরগমনে চলিয়া গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, “হারানবাবু, আপনাদের দেশের লোকদের মধ্যে এ সকল কিসের লক্ষণ দেখা যাইতেছে?”

হারানবাবু কহিলেন, “লেখাপড়া তেমন গভীরভাবে হইতেছে না, বিশেষত দেশে আধ্যাত্মিক ও চারিত্র-নৈতিক শিক্ষা একেবারে নাই বলিয়াই এরূপ বটিতেছে। ইংবেজি বিস্তার যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ সেটা গ্রহণ করিবার অধিকার ইহাদের হয় নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজেব রাজত্ব যে ঈশ্ববেব বিধান এই অকৃতজ্ঞরা এখনো তাহা স্বীকার করিতে চাহিতেছে না তাহার একমাত্র কারণ ইহারা কেবল পড়ামুখস্থ করিয়াছে কিন্তু ইহাদের ধর্মবোধ নিতান্তই অপরিণত।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, “খুষ্টকে স্বীকার না করিলে ভারতবর্ষে এই ধর্মবোধ কখনই পূর্ণতালাভ করিবে না।”

হারানবাবু কহিলেন, “সে কথা এক হিসাবে সত্য।” এই বলিয়া খুষ্টকে স্বীকার করা সম্বন্ধে একজন খুষ্টানেব সঙ্গে হারানবাবুর মতের কোন্ অংশে কতটুকু ঐক্য এবং কোথায় অনৈক্য তাহাই লইয়া হারানবাবু ম্যাজিষ্ট্রেটেব সহিত স্মৃতাভাবে আলাপ কবিয়া তাহাকে এই কথাপ্রসঙ্গে এতই নিবিষ্ট করিয়া বাখিয়াছিলেন যে, মেমসাহেব যখন পরেশবাবুর মেয়েদিগকে গাড়ি করিয়া ডাকবাংলায় পৌছাইয়া দিয়া ফিবিবাব পথে তাহার স্বামীকে কহিলেন, “স্বাবি, ঘরে ফিরিতে হইবে”—তিনি চমকিয়া উঠিয়া ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন, “বাই জোভ, আটটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট!” গাড়িতে উঠিবার সময় হারানবাবুর কব নিপীড়ন করিয়া বিদায়-সম্ভাষণ-পূর্বক কহিলেন, আপনার সহিত আলাপ কবিয়া আমার সজ্জা খুব সুখে কাটিয়াছে।

হারানবাবু ডাকবাংলার ফিবিয়া আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটেব সহিত তাহার আলাপের বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। কিন্তু গোরার সহিত সাক্ষাতের কোনো উল্লেখমাত্র করিলেন না।

অদ্ভুত শক্তি।

“অদ্ভুত” শব্দের অর্থে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? যাহা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাই অদ্ভুত। কোনও বিষয় “অদ্ভুত” হইলেই যে তাহা অস্বাভাবিক হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই। কোনও কোনও মানুষের মধ্যে এরূপ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সাধারণ মানুষের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং তজ্জপ শক্তিকেও “অদ্ভুত শক্তি” বলা যাইতে পারে।

এইরূপ “অদ্ভুত শক্তি”ই আমাদের অস্ত্রকার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে, আমি একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি। কেহ কোনও “অদ্ভুত” বিষয়ের গল্প করিতে আরম্ভ করিলে, শ্রোতৃবর্গ প্রথমেই স্খিজ্ঞাসা করেন “মহাশয়, এই ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন? না, ইহার বৃত্তান্ত কাহারও মুখে শুনিয়াছেন?” শ্রোতৃবর্গের পক্ষে এইরূপ প্রশ্ন করা অতিশয় স্বাভাবিক। শোনা কথা, মূলতঃ সত্য হইলেও, মুখে মুখে এত রূপান্তরিত হইয়া পড়ে যে, সহজে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। এই কাবণে, শোনা কথা, দৃষ্ট বস্তু বৃত্তান্তের স্ফায়, ষথার্থ এবং অবিকৃত হইলেও, লোকের মনে সহসা প্রত্যয় উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

“অদ্ভুত শক্তি” সম্বন্ধে অস্ত্র আমি যাহা বলিব, তাহা আমি কাহারও মুখে শুনি নাই; তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং আমার স্ত্রায় আরও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে আমার দেখার প্রণালীর মধ্যে কোনও দোষ ছিল না। পাঠকবর্গ নিম্ন-লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে, আমার পিতাঠাকুর মহাশয় চক্ষুচিকিৎসার জন্ত কলিকাতায় আসেন। তাঁহার চক্ষুতে ছানি পড়িতেছিল; তাই ছানি কাটাইবার জন্ত তাঁহার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ছানি তখনও কাটাইবার উপযুক্ত হয় নাই বলিয়া ডাক্তারেরা তখন তাহা কাটাইতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। অগত্যা, তিনি কলিকাতার বাসাতেই কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে, আমার ভ্রাতৃপুত্র শ্রীমান চারুচন্দ্র ও কলি-

কাতার বাসাতে থাকিয়া ক্যান্সেল মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারী পড়িতেছিল। চারুচন্দ্রের স্বস্তর কলিকাতায় থাকেন। চারু স্বাস্থ্যভীর কোনও কঠিন পীড়া হওয়ায়, সে প্রায়ই স্বস্তর-বাড়ী যাইত। একদিন সে বাসায় আসিয়া আমাব-
পিতাঠাকুর মহাশয়কে বলিল, “দাদামহাশয়, একটা সন্ধ্যাসী আসিয়া আমার স্বাস্থ্যভীর চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসার গুণে, আমার স্বাস্থ্যভী অনেকটা ভাল আছেন। শুনিতেছি, তিনি অনেক লোকের চক্ষু-চিকিৎসা করিয়াও চক্ষু ভাল করিয়াছেন। আপনি কি একবার তাঁহাকে আপনার চক্ষু দেখাইবেন?” পিতাঠাকুর মহাশয় পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিত এবং সুপণ্ডিত হইলেও, আমি তাঁহাকে কোনও দিন সাধুসন্ন্যাসীর উপর আস্থাশূন্য হইতে দেখি নাই। সুতরাং তিনি চারুকে কথাসুনিয়াই বলিলেন, “বেশ তো! তাঁহাকে একদিন এখানে নিয়ে এসো।”

আমি পার্শ্বস্থ গৃহে বসিয়া কিছু সাহিত্য-চর্চা করিতে-
ছিলাম। চারুর প্রস্তাব ও সেই প্রস্তাবে পিতাঠাকুর মহাশয়ের সম্মতি-প্রকাশ, এই দুইটাই আমাব কর্ণগোচর হইল। আমি বিবস্ত্র হইয়া চারুকে নিকটে ডাকিলাম, এবং ভৎসনা করিয়া তাহাকে বলিলাম, “তুমি ডাক্তারী পড়িতেছ; আর একটা হাতুড়ের দ্বারা বাবাব চক্ষু-
চিকিৎসা করাইতে চাও? চমৎকার তোমাব বুদ্ধি!” চারু আমার ভৎসনায় কিছু যেন অপ্রতিভ হইল। পরে সে বলিল, “সন্ধ্যাসীটি নেহাৎ হাতুড়ে নয়। আমি শুনিয়াছি, তিনি অনেকের চক্ষু ভাল করিয়াছেন। দাদামহাশয় তাঁহার দ্বারা চক্ষু-চিকিৎসা নাই বা করাইলেন। তাঁহাকে একবার চক্ষু দেখাইতে দোষ কি?” আমি কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলাম, “যাহা ভাল বিবেচনা হয়, কর।”

পরদিন প্রাতে, চারুচন্দ্র সেই সন্ধ্যাসীটিকে সঙ্গে লইয়া বাসায় উপস্থিত হইল। আমি তাঁহার আকার প্রকার বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। তাঁহার পরিধানে একটা রক্তবর্ণের ঢেলী; গলায় রুদ্রাক্ষমালা; বামহস্তে পিত্তলের একটা কমণ্ডলু; দক্ষিণ হস্তে একটা দীর্ঘ ত্রিশূল। পদদ্বয়ে কাষ্ঠপাছকা (খড়ম)। মস্তকের কেশরাশি দীর্ঘ ও পৃষ্ঠদেশে আলুলান্বিত। কপালে সিন্দুরের কতিপয় উজ্জল রেখা। মুখমণ্ডল শুষ্ক ও শ্মশ্রুশোভিত।

তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসরের অনধিক বিবেচিত হইল না।

তাঁহার মুক্তি দেখিয়া আমার মনে ভীতি-ভক্তি-মিশ্রিত কেমন

একটা ভাবের উদয় হইল।

পিতাঠাকুর মহাশয় এবং আমিও তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলাম। তিনি উপবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবের চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি বলিলেন “আমি পদ্মমধু ও ভীমসেনী কর্ণবের সহযোগে একটি অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে লাগাইতে দিই। তদ্বারা অনেকের চক্ষুর উপকাব হইয়াছে। আপনাবও উপকাব হইতে পারে। কিন্তু আপনার চক্ষু যে নিশ্চিত ভাল হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না। আপনি ইচ্ছা করিলে, সেই অঞ্জন লাগাইতে পারেন।” পিতৃদেব ইতঃপূর্বে পদ্মমধু ও ভীমসেনী কর্ণব ব্যবহার করিয়া কিছু উপকার লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সন্ন্যাসীর প্রস্তুত অঞ্জন ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক হইলেন না। অঞ্জন প্রস্তুত করিতে যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইল।

সন্ন্যাসীর ত্রিশূলে কতিপয় স্বর্ণময় চক্ষু খচিত রহিয়াছে দেখিয়া, আমি তাহার কাবণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তদন্তরে তিনি বলিলেন “ঋহাদের চক্ষু ভাল হইয়াছে, তাঁহারা শক্তিপূর্বক এই ত্রিশূলের ফলকে স্বর্ণময় চক্ষু খচিত করিয়া দিয়াছেন।”

সন্ন্যাসীঠাকুর তামাক খাইতে খাইতে পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত গল্প কবিত্তে লাগিলেন। সহসা তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, “মহাশয়, আপনাকে ইহাব পূর্বে যেন আব কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। আপনি কি কখনও মেদিনীপুরে ছিলেন?”

পিতৃদেব বলিলেন, “মেদিনীপুরে ছিলাম বটে; কিন্তু সে তো অনেকদিনের কথা। প্রায় ২৭।২৮ বৎসব হইবে। আমি সেখানে স্কুলের ডেপুটী ইন্সপেক্টর ছিলাম।”

সন্ন্যাসী বলিলেন “ঠিক কথা! আপনার নাম কি হরিবাবু? আপনি প্রত্যহই হেডমাস্টার গঙ্গাধর বাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেন। আমি তখন তাঁহারই বাসাতে থাকিয়া স্কুলে পড়িতাম। সে অনেক দিনের কথা বটে। কিন্তু আপনার চেহারার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নাই।”

পিতাঠাকুর মহাশয় তখন আনন্দিত হইয়া সন্ন্যাসীকে সহিত অনেক বিষয়ে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সেই কথাবার্তা হইতে বুঝিলাম যে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের নাম দুর্গাচরণ ছিল এবং তিনি প্রথম যৌবনেই সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন। ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও সহিত তাঁহার কিরূপ দূর আত্মীয়তা ছিল, ইত্যাদি।

এইরূপ আলাপ পরিচয়ের পর, সন্ন্যাসী ঠাকুর দুই দিন দিন অস্তুর পিতৃদেবকে প্রায়ই দেখিতে আসিতেন। এস্থলে আমি বলা কর্তব্য মনে করি যে, তিনি অর্থের প্রতি কোনও দিন কোনও লোভ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি যেন আমাদের কোনও আত্মীয়ের হস্তমুখে মধ্য আমাদের বাসায় আসিতেন এবং পিতৃদেবের সহিত কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

একদিন পিতৃদেব তাঁহাকে বলিলেন, “আমি কলিকাতায় অনেক দিন রহিয়াছি। মনে কবিত্তেছি, আগামী পরশ্ব বাড়ী যাইব।” সন্ন্যাসী বলিলেন, “আপনি এত শীঘ্র বাড়ী যাইবেন? আচ্ছা যদি যান, তাহা হইলে সেখানেও এই ঔষধ ব্যবহার কবিবেন। এবং ঔষধ ব্যবহার কবিয়া কেমন থাকেন, তাহা আমাকে জানাইবেন।” কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, “আমি মনে করিয়াছিলাম, একদিন আপনার বাসায় মা’র পূজা করিব। কিন্তু আপনি চলিয়া যাইতেছেন। আগামী কল্যা শনিবার। বেশ দিন। যদি বলেন তাহা হইলে কালই মা’র পূজা করি।”

পিতৃদেব চিরকালই স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু। সুতরাং তিনি মা’র পূজায় অমত করিবেন কি কপে? তথাপি বোধ হয়, একবার আমাকে জিজ্ঞাসা কবা আবশ্যক মনে করিয়া, তিনি আমাকে আহ্বান করিলেন।

আমি পার্শ্বের গৃহ হইতে পিতৃদেব ও সন্ন্যাসীঠাকুরের কথাবার্তা শুনিতেছিলাম। পিতৃদেবের আহ্বান শুনিয়াই আমি তাঁহার অভিপ্রায় অনুমান করিয়া লইলাম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, সন্ন্যাসীঠাকুরের প্রস্তাব শুনিয়া আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগিল। আমি ইতঃপূর্বে আরও দুই একটা সন্ন্যাসীর সংসর্গে আসিয়াছিলাম।

প্রথমে তাঁহাৰা অৰ্থেৰ প্ৰতি কোনও লোভ প্ৰদৰ্শন না কৰিলেও শেষে পাকে চক্ৰে কিছু অৰ্থ বাহিৰ কৰিয়া লইবাব চেষ্টা কৰিয়াছিলেন। স্তত্ৰাং সাধাৰণ সন্ন্যাসীদলেৰ প্ৰতি আমাৰ তাদৃশ শ্ৰদ্ধা ছিল না। অৰ্থেৰ প্ৰতি এই সন্ন্যাসী-ঠাকুৰেৰ কোনও লোভ না দেখিয়া আমি তৎপ্ৰতি একটু শ্ৰদ্ধাশিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সহসা মা'ৰ পূজা কৰিবাৰ প্ৰস্তাব শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, সন্ন্যাসীঠাকুৰ নিশ্চয়ই আজ নিজ মুখোস্ খুলিবেন। এইৰূপ চিন্তা কবিত্তে কৰিতে আমি পিতৃদেবেৰ সন্নিহিত হইলে, তিনি আমাকে বলিলেন, “ইনি কাল আমাদেৰ বাসায় পূজা কৰিবাব প্ৰস্তাব কৰিতেছেন।”

আমি বলিলাম, “আমি সে প্ৰস্তাব শুনিয়াছি।”

সন্ন্যাসীঠাকুৰ আমাৰ কথা শুনিয়া সহসা হাসিয়া বলিলেন, “বাবাজি, এই পূজাৰ জন্ত তোমাদিগকে কোনও অৰ্থব্যয় কৰিতে হইবে না। তোমাৰ পিতা আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় ব্যক্তি। এই জন্ত, ইহাৰ ও তোমাদেৰ মঙ্গলসাধনেৰ জন্ত তোমাদেৰ এই বাসায় মা'ৰ পূজা কৰিবাব জন্ত আমাৰ ইচ্ছা হইয়াছে। তোমাকে এই পূজাৰ জন্ত বিশেষ কিছু আয়োজনও কৰিতে হইবে না। কেবলমাত্ৰ তোমাদেৰ ঐ ঠাকুৰদালানটি গঙ্গাজল দিয়া ধোয়াইবে ও একঘটি গঙ্গাজল আনাইয়া বাধিবে। একটা কষলেৰ আসন, একটা প্ৰদীপ ও কিছু ধূপ ধূনাৰ প্ৰয়োজন। এতদ্ব্যতীত, তোমাদেৰ দুই খানা পশ্মী আলোয়ান ও একখানা রেশমী কাপড় হইলে ভাল হয়। এই দ্ৰব্যগুলি সংগ্ৰহ কৰিলেই চলিবে। আৰ কিছু চাই না। আমি আগামী কল্য ঠিক সন্ধ্যাৰ সময় আসিব।”

আমি সন্ন্যাসী ঠাকুৰেৰ কথা শুনিয়া কিছু অপ্ৰতিভ এবং বিস্মিতও হইলাম। আমি ভাবিতে লাগিলাম, সন্ন্যাসী-ঠাকুৰ আমাৰ মনেৰ কথা জানিতে পাৰিয়াছেন কি ?

চাক্ৰ স্কুল হইতে প্ৰত্যাগত হইলে, আমি তাহাকে সন্ন্যাসীৰ প্ৰস্তাবেৰ বিষয় বলিলাম। চাক্ৰ তাহা শুনিয়াই কিছু আনন্দিত হইল। সে বলিল, “ভালই হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুৰেৰ পূজাৰ সময় বোধ হয় কিছু অল্পত ব্যাপাব দেখা যাইবে। আমি আমাৰ খণ্ডৰ মহাশয়েৰ মুখে শুনিয়াছি যে, ইনি বিশেষ অল্পত ব্যাপাৰ দেখাইতে পাবেন।

কিন্তু তাহাতে আমাৰ বিশ্বাস হয় না। কাল বিশেষ সাবধান ও মনোযোগী হইয়া পূজাৰ ব্যাপাৰ দেখিতে হইবে।”

চাক্ৰৰ কথা শুনিয়া আমাৰও কৌতূহল উদ্দীপিত হইল। ঠাকুৰ দালান হইতে আমি সকল দ্ৰব্য সৰাইলাম এবং পৰদিন গঙ্গা হইতে জল আনিবাব জন্ত ভূতাকে আদেশ কৰিলাম। বাড়ীৰ মেয়েবা চাক্ৰৰ মুখে পূজাৰ সময় অল্পত ব্যাপাৰ দেখা'ৰ কথা শুনিয়াছিল। স্তত্ৰাং তাহাৰাও পূজা দেখিবাৰ জন্ত আগ্ৰহাশিত হইল। পৰদিন, আমাব জী ও কস্তাৰা গঙ্গাজল দিয়া স্বহস্তে ঠাকুৰদালান ধুইয়া রাখিল এবং সন্ধ্যাৰ প্ৰাকালে সেখানে একটা আসন বিছাইয়া, তাহাৰ সম্মুখে এক ঘটি গঙ্গাজল রাখিয়া দিল। যথাসময়ে একটা তৈলেৰ প্ৰদীপও প্ৰজ্জালিত হইল এবং ঠাকুৰ দালানটি ধূপ ও ধূনাৰ গন্ধে আমোদিত হইল। দুইখানি পশ্মী আলোয়ান এবং একখানি রেশমেৰ বস্ত্ৰও যথা স্থানে রক্ষিত হইল।

ঠিক সন্ধ্যাৰ সময় সন্ন্যাসীঠাকুৰ খড়মেৰ শব্দ কৰিতে কৰিতে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাৰ বেষভূষা পূৰ্ণবৎ ছিল। আমাৰা তাঁহাকে অভ্যর্থনা কৰিয়া বৈঠকখানায় বসাইলাম। আমি বিশেষ মনোযোগেৰ সহিত তাঁহাৰ বেষভূষা লক্ষ্য কৰিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাঁহাৰ বস্ত্ৰেৰ মধ্যে, কিনা অস্ত্ৰ কোথাও কিছু লুকাইয়া বাধিবাৰ সম্ভাবনা নাই। কেবল পিত্তলেৰ কমণ্ডলুৰ মুখে একটা পিত্তলেৰ ঢাকনা ছিল। সেই ঢাকনাৰ নীচে কি আছে, তাহাই জানিবাৰ জন্ত আমাৰ কৌতূহল হইতে লাগিল।

সন্ন্যাসীঠাকুৰ বৈঠকখানায় বসিয়া পিতৃদেবেৰ সহিত গল্প কৰিতে লাগিলেন ও তামাক খাইতে লাগিলেন। ইত্যবসৰে, আমি ঠাকুৰদালানে আৰও দুই তিনটি হাৰিকেন্ লৰ্ঠন জ্বলাইয়া দিলাম। ঠাকুৰদালানটিৰ সৰ্ব্ব উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল। সেখানে সেই প্ৰদীপটি, হাৰিকেন্ লৰ্ঠনগুলি, আসন, এক ঘটি গঙ্গাজল, ধুতুচি, আলোয়ান দুইটি, ও রেশমী বস্ত্ৰখানি ব্যতীত আৰ কিছুই ছিল না। • জীলোকেৰাও পূজা দেখিবাৰ জন্ত উৎসুক হওয়ায়, আমি সদৰ দ্বাৰ বন্ধ কৰাইয়া দিলাম।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন “যদি সব ঠিক হইয়া থাকে, চল, পূজার প্রবৃত্ত হওয়া যাক।” তিনি ত্রিশূল ও কমণ্ডলু হস্তে ঠাকুর দালানে প্রবিষ্ট হইলেন; আমবাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বাবাজি আজ কালীঘাটে আমি মা’র পূজা কাঁবতে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে মা’র স্নানজল লইয়া আসিয়াছি। এই কমণ্ডলু মধ্যে তাহা আছে। তোমরা সকলেই সেই স্নানজল গ্রহণ কর।” এই বলিয়া তিনি আমার হস্তে কমণ্ডলুটি দিলেন। আমি সাগ্রহে তাহা গ্রহণ কবিয়া ঢাকনা উত্তোলন পূর্বক দেখিলাম, তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ স্নানজল, একটা বিবপত্র ও একটা পুষ্প পড়িয়া আছে। সন্ন্যাসীর উপদেশানুসারে আমরা সকলেই স্নানজল গ্রহণ করিলাম।

সন্ন্যাসীঠাকুর তাঁহার পরিহিত বস্ত্র পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, আমি স্বয়ং তাঁহাকে আমাদের রেশমী বস্ত্রখানি দিলাম। তিনি আমাদের সকলের সাক্ষাতেই বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আমি তাঁহার পরিত্যক্ত বস্ত্রখানি অন্ত্র উঠাইয়া রাখিলাম। তৎপরে, তিনি আলোয়ান চাহিলে, আমি স্বহস্তে তাঁহাকে দুইখানি আলোয়ান দিলাম। একটীর দ্বারা তিনি নিজ দেহ আবৃত করিলেন এবং অপরটির দ্বারা তিনি সম্মুখস্থ গঙ্গাজলের ঘটা ও কটীদেশ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত সমস্ত আবৃত করিলেন। তৎপরে তিনি বামহস্ত দ্বারা ত্রিশূল গ্রহণ কবিয়া, সেই ত্রিশূলের ফলকের উপর দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক, আবৃত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা যেন কিছু জপ করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীঠাকুরের সম্মুখে তৈলের প্রদীপ জলিতেছিল। পার্শ্বে ধুতুচি হইতে স্তরভি ধূম নির্গত হইতেছিল। তাঁহার দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে হারিকেন্ লগ্ননগুলি জলিতেছিল। পিতৃদেব ও আমি তাঁহার অব্যবহিত দক্ষিণ দিকে বসিয়াছিলাম। চারু ও আমার অপর একটা ত্রাতুপুত্র তাঁহার বামদিকে উপবিষ্ট ছিল। মেয়েবা তাহাদের নিকটেই বসিয়াছিল। পশ্চাতে ভৃত্য, কী ও পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। আমাব পুত্র আমার নিকটেই বসিয়াছিল।

সন্ন্যাসীঠাকুর ত্রিশূলের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রায় ১৫ মিনিট কাল জপ করিলেন। সহসা আলোয়ানের ভিতর

তাঁহার দক্ষিণ হস্তের ঈষৎ সঞ্চালন দৃষ্ট হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে খড়্ খড়্ মড়্ মড়্ এইরূপ সামান্য শব্দও শ্রুত হইতে লাগিল। তৎপরে ঠং ঠং এইরূপ ধাতব শব্দ, এবং ঠক্ ঠাক্ এইরূপ কঠিন বস্তুর অভিব্যত শব্দও শ্রুত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া ক্রমশঃ যেন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল;—অর্থাৎ, আমার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন কতকগুলি দ্রব্যকে দক্ষিণহস্ত দ্বারা সরাইয়া, বা সাজাইয়া, রাখিতেছেন। এতদ্ব্যতীত, ইহা বলা উচিত মনে কবি যে, এই সময়ে তাঁহার বামহস্তটি পূর্ববৎ ত্রিশূল ধারণ করিয়াছিল এবং তাঁহার চক্ষু দুটীও ত্রিশূলের উপরেই স্থাপিত ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি গায়ের আলোয়ানটি তুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম তাঁহার সর্বাঙ্গ বর্ণীকৃত হইয়াছে। তৎপরেই, তিনি যে আলোয়ান দ্বারা গঙ্গাজলের ঘটা আচ্ছাদন করিয়া ছিলেন, তাহাও তুলিয়া ফেলিলেন। সেই আলোয়ান তুলিয়া মাত্র, আমরা বাহা দেখিলাম, তাহাতে সকলেই একান্ত বিস্মিত হইলাম। আমি প্রথমে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু সত্য সত্যই দেখিলাম, অদ্ভুত ব্যাপার! দেখিলাম, গঙ্গাজলের ঘটীর উপরে প্রায় এক ফুট উচ্চ একটা মাটীর ঘট স্থাপিত রহিয়াছে। তাহার উপরে একটা আব্রপল্লব ও গলদেশে একটা সম্ভ্র-প্রস্ফুটিত পুষ্পের মালা। সন্ন্যাসীর দক্ষিণ দিকে, একটা আন্ত কলাপাতার উপর কতকগুলি সম্ভ্র-প্রস্ফুটিত পুষ্প—তন্মধ্যে দোপাটী পুষ্পই অধিক—এবং কতকগুলি বিবপত্র। বামদিকে, আর একখানি কলাপাতার উপর আতপ-চাউলের একটা সুসজ্জিত নৈবেদ্য। তাহার পার্শ্বে খোশা-ছাড়ানো কলা, শঁসা ও অন্যান্য ফল রহিয়াছে এবং উপরিভাগে এক জোড়া মণ্ডাও রহিয়াছে। নৈবেদ্যটি এরূপ সুসজ্জিত যে পার্শ্বে বা কোথাও একটাও চাউল পড়িয়া নাই এবং চাউলগুলি সমস্তই সিক্ত। এই নৈবেদ্যের পার্শ্বে একছড়া আন্ত কলা (তাহাতে অন্যান্য ১০।১৫ টা কলা ছিল) এবং একটা আন্ত মধ্যমাকৃতির শঁসা পড়িয়া আছে। সম্মুখে কোশা, কুশী, শঙ্খ ও ঘণ্টা বিস্তারিত। একখণ্ড ক্ষুদ্র কলাপাতার উপর খানিকটা মাড়া সিন্দূরও রহিয়াছে। অর্থাৎ পূজা করিবার জন্য যে যে বস্তু বা উপকরণের প্রয়োজন, সমস্তই প্রস্তুত বা উপস্থিত! মনে বড় ধাঁধা লাগিল। কিছুই বুঝিয়া উঠিতে

পারিলাম না। সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই মাটির ঘটটি গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া মন্তোচ্চারণ পূর্বক পূজা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে পূজা শেষ হইয়া গেলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, “বাবাজি, মা’র পূজা শেষ হইল। এক্ষণে, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলেই তাহা সাজ হয়।” আমি দক্ষিণা আনয়নের জন্য উঠিবার উত্তোষ করিতেছিলাম; কিন্তু তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, “উঠিবার প্রয়োজন নাই; তোমার সঙ্গে যাহা আছে, তাহাই দাও।” আমি পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম, তন্মধ্যে একটি আধূলি রহিয়াছে। এই আধূলিটি পূর্ব হইতেই পকেটে ছিল। স্ততরাং তাহাই দক্ষিণাস্বরূপ দিয়া প্রণাম করিলাম।

পূজার পর বালকবালিকাগণের মধ্যে ফলের প্রসাদ বিতরিত হইল। আমরাও প্রসাদ খাইলাম। বালক বালিকারা আস্ত কলার ছড়াটি ও শঁসাটি লইয়া গেল। সন্ন্যাসী ঠাকুর নৈবেদ্যের চাউলগুলি সম্বন্ধে বক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন অথবা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। আমার সহধর্মিণীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, “তুমি এই ঘটটি গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া সর্বদা সম্বন্ধে রক্ষা করিবে এবং প্রত্যহ স্নানান্তে ইহাতে সিম্বর লেপন করিবে।” আমার স্ত্রী তাহাই করিতেন। ঘটটি এখনও আমার কাছে আছে। কেহ দেখিতে চাহিলে, আমি তাহা দেখাইতে পারি।

বাইবার সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাদের রেশমী বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের চেলী পরিধান করিলেন এবং ত্রিশূল ও কমণ্ডলু এবং পূর্বোক্ত কোশা, কুলী, শঙ্খ ও ঘণ্টা—এই দ্রব্যগুলি লইয়া গ্রহণ করিলেন।

আমি এবং আমার পিতাঠাকুর মহাশয়, ভ্রাতৃপুত্রগণ ও পরিবাববর্গ সকলে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুর ত্রিশূল ও কমণ্ডলু ব্যতীত আর কোনও দ্রব্যই সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। তিনি আমাদের সাক্ষাতেই বস্ত্র পরিবর্তন করিয়াছিলেন; আমি স্বহস্তে তাঁহাকে আলোয়ানগুলি দিয়াছিলাম; তাঁহার গাত্রে উত্তরীয় বা অস্ত্র কোনও বস্ত্র ছিল না। আর এতগুলি দ্রব্য—অর্থাৎ একফুট উচ্চ একটি মুগ্ধর ঘট, শঙ্খ, ঘণ্টা, কোশা, কুলী, একরাশি পুষ্প ও

বিষপত্র, প্রায় অর্ধসেব পরিমিত চাউলের স্তসজ্জিত নৈবেদ্য, কণ্ঠিত ফলাদি, আস্ত একছড়া কলা, আস্ত একটি শঁসা এবং দুইটা বড় কলাপাতা—নগ্নদেহের মধ্যে কোথাও লুকাইয়া রাখা একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তৎপরে, নৈবেদ্যটি স্তসজ্জিত হইল কিরূপে? এবং কলাপাতার মধ্যেও কোথাও মুড়িয়া যাওয়ার চিহ্নমাত্র ছিল না কেন?

বলা বাহুল্য যে, সন্ন্যাসীর পূজা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমি তাদৃশ বিস্মিত হই নাই। এই ঘটনার দুই তিন বৎসর পূর্বে আমি একটি পঞ্জাবী মুসলমানকে এইরূপ একটি অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিতে দেখিয়াছিলাম। সেই মুসলমানটি দিনেব বেলায়, দ্বিতলের ছাদে, প্রায় ত্রিশ জন স্তসজ্জিত ব্যক্তির সম্মুখে একটি উজ্জানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই উজ্জানে পেস্তার গাছ, ফল ও ফুল, বাদামের গাছ, ফল ও ফুল, আতার গাছ, ফল ও ফুল, বাতাপি নেবুর গাছ, ফল ও ফুল, পেয়ারার গাছ, ফল ও ফুল, এবং অন্যান্য ক’একটি ফলের গাছ এবং ফল ও ফুল—সমস্তই অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি সেই ফলগুলি তুলিয়া আমাদের কাছে ধাইয়াছিলেন এবং আমি কতিপয় কণ্ঠিত ফল গৃহেও লইয়া আসিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিয়াছিলাম। সেগুলি বহুদিন সেখানে ছিল। পরে শুকাইয়া গেলে, ভৃত্যেরা তৎসমুদায় ফেলিয়া দেয়। এই মুসলমানের কার্যেব মধ্যে আরও কিছু অদ্ভুত ছিল। তাঁহার সৃষ্ট বৃক্ষগুলি প্রায় তিন চাবি হাত উচ্চ হইয়াছিল এবং ফলফুলে সুশোভিত ছিল। কিন্তু বজ্রাচ্ছাদনের মধ্যে সহসা সেইগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়। কেবল বৃক্ষ হইতে উত্তোলিত ও কণ্ঠিত ফলগুলি ও ভগ্ন শাখাগুলিই আমাদের সম্মুখে পড়িয়াছিল। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক মনে করি, যে পূর্বোক্ত মুসলমানটি যেখানে পেস্তার গাছ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেখান হইতে বোধ হয় চারিশত ক্রোশের মধ্যে কোথাও পেস্তার গাছ ছিল না।

পূর্বে এইরূপ একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম বলিয়া, সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কার্যে আমরা তাদৃশ বিস্ময় হয় নাই। আমার মনে হইয়াছিল, মাহুঘের মধ্যে প্রচ্ছন্ন

একপ কোনও শক্তি আছে, যাহা বিকশিত হইলে, সে অনায়াসেই এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের সৃষ্টি করিতে পারে। সে শক্তি যে কি, অবশ্য আমি তাহা জানি না। সুধীবর্গ তৎসম্বন্ধে কোন বহুস্তেব বিবৃতি করিলে, আমরা আনন্দিত হইব।

এস্থলে, ইহা বলা আবশ্যক মনে করি যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর যেদিন পূজা করেন, তৎপব দিন, আমি কোনও কার্য্য বশতঃ “ইণ্ডিয়ান মিরর”-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ কবিত্তে যাই এবং কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে পূর্বোক্ত পূজার কথা বলি। তিনিও সেই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন। পবে তিনিও একদিন সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের দ্বারা তাঁহার বাটীতে পূজা করাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, আমার বাসায় যেরূপ তাঁহার বাটীতেও তদ্রূপ পূজার সমস্ত দ্রব্যই স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমার জর্নৈক বন্ধুও* সন্ন্যাসী ঠাকুরের দ্বারা তাঁহার বাড়ীতে আর একদিন পূজা করাইয়াছিলেন। সেখানেও পূজার সমস্ত দ্রব্য স্বতঃই আসিয়াছিল; অধিকন্তু পত্রপল্লবসম্বিত বিশ্ববৃক্ষের একটা ক্ষুদ্র শাখাও উপস্থিত হইয়াছিল।

এই পূজার পব, সন্ন্যাসী ঠাকুরের সহিত আমার ক’একবার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়াও তাঁহার এই শক্তি সম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। তিনি এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, মানুষের শক্তি দ্বারাই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়। সন্ন্যাসীর কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, মানুষের সেই শক্তিটি কি ?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস ।

হাতে হাতে ফল ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। সিরাজপুৰ ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ অফিসে বসিয়া, ডাক্তার হবগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিগনালাব বাবুকে বলিতেছিলেন—“তা, কিছু ভয় নেই। আমরা

সঙ্গে একজন লোক দিন, একটা পাউডার আর একটা মিক্‌চার এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, দুঘণ্টা অন্তর খাওয়ান।”

সিগনালাব বাবু বলিতেছিলেন—“আপনার কথা শুনে বড় আশ্বস্ত হ’লাম। ঐ একটি মাত্র ছেলে কিনা, আমাব স্ত্রী ত কেঁদে কেটে অস্থির হয়েছিলেন। আমাদের বড়ই ভয় হয়েছিল।”

এই বলিয়া সিগনালাব বাবু দুইটি টাকা ভিজিট এবং একটি আধূলি গাড়ীভাড়া ডাক্তার বাবু হাতে দিতে চাহিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—“ও কি ও ? না—না—রাখুন, রাখুন।”

সিগনালাব বাবু বলিলেন—“তা হলে যে বড়ই অশ্রায় হয়।”

“না—না। কিছু অশ্রায় হয় না। আপনার ছেলেকে আমি আরাম কবে দিই—তারপর না হয় একদিন—অমাব-বস্ত্রে কি পূর্ণিমে দেখে, আমায় নেমতন্ন করে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দেবেন,—তার আর কি ?”—বলিয়া ডাক্তার বাবু উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। গরীব লোকেব কাছে ইনি কখনও ভিজিট গ্রহণ করেন না।

এই সময়, বাহিরে প্রাটফর্মে, অনেক লোকেব কণ্ঠে বন্দৈমাতরম ধ্বনি শুনা গেল। ডাক্তার বাবু বলিলেন—“ও কি ?”

“কলকাতা থেকে একজন স্বদেশী প্রচারক এসেছিলেন, তাঁকেই বোধ হয় লোকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছে।”

উভয়েই বাহিবে গেলেন। প্রচারক মহাশয় বিখ্যাত “বীরভারত” সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন।

ডাক্তার বাবু সরকারী চাকর হইলেও অশাস্ত সরকারী চাকরের জায় মনে মনে পূর্ণমাত্রায় স্বদেশী। রাজিযোগে দেশী দোকানে গিয়া বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া আনেন, লোকে এ প্রকার কাণামুখা কবিতা থাকে। বিনয় বাবুর সঙ্গে আলাপ করিবার প্রলোভন তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুই চারি মিনিট কথাবার্তা কহিতে কহিতে, ভীমরবে ট্রেনও আসিয়া পড়িল।

উকীল, মোস্তার এবং ছাত্রগণ পরিবৃত্ত হইয়া প্রচারক মহাশয় গাড়ীর দিকে অগ্রসব হইলেন। তাঁহার নিকট

* শ্রীযুক্ত আশুতোষ নাথ, ১১নং মীরজাফস লেন, কলিকাতা।

একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট ছিল। একটি কামরা খুলিয়া যাই প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনি তন্মধ্যস্থিত এক সাহেব বলিল—“এইও—কালী আদমিকা গাড়ী নেহি হয়।”

প্রচারক মহাশয় বলিলেন—“কেন সাহেব, আমাব টাকাগুলোও কি কালী? আমারও দ্বিতীয়শ্রেণীর টিকিট আছে।” বলিয়া তিনি দবজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একে হুকুম অমান্য করা, তাহাতে মুখের উপর জবাব, “বাদশাহ-কা-দোস্ত” আর সহ্য করিতে পারিল না। উঠিয়া সেই ধৃতি-কামিন্জ-রেশমীচাদরধারী মুর্তিমান রাজদ্রোহকে এক ধাক্কা দিয়া প্র্যাটকর্মে ফেলিয়া দিল। বিনয়বাবু “বীর-ভারত” পত্রের সম্পাদক হইলেও, অত্যন্ত ক্লশকায় ব্যক্তি। নিম্ন স্বাস্থ্যবল সমস্তই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পুঞ্জা দিয়া, প্রসাদ স্বরূপ কয়েকখানি কাগজ পাইয়াছিলেন। আর স্থানান্তরে পাইয়াছিলেন একঘোড়া সোনার চশমা,—তাহার অল্প স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইয়াছিল। প্র্যাটকর্মে পড়িয়া তিনি বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন না বটে কিন্তু তাঁহার চশমাখানি চুরমার হইয়া গেল।

ইহা দেখিবামাত্র তাঁহাব সহচরগণ বন্দেমাভরতম্ বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিল। হুই তিন জনে সাহেবটাকে টানিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল। কিল, চড়, ঘুঁসি ও লাথি। গোলমাল শুনিয়া গার্ডসাহেব সেঠ দিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া, উর্দ্ধ্বাসে ধাবন করিয়া, (পলায়ন করিয়া নহে)—ব্রেকভ্যানে আরোহণ করিলেন। অনেক কষ্টে পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকগণ পড়িয়া সাহেবকে উদ্ধার করিলেন;—তাহাব মাথা ফাটিয়া রক্ত রক্ত করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার বাবুও গোলমাল শুনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবের অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে স্নিগ্ধ চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সাহেব সম্মত হইল। ইতিমধ্যে কখন বিনয় বাবু গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া মধ্যমশ্রেণীতে আরোহণ করিয়া বসিয়াছিলেন;—পরদিন নির্ঝিল্লি কলিকাতায় পৌছিয়া, “বীর-ভারতে” এক ভীষণ প্রবন্ধ বাহিব করিয়া ফেলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

হরগোবিন্দ বাবু স্থানীয় হাঁসপাতালের সরকারী ডাক্তার। লোকটি বুদ্ধ হইয়াছেন;—নেটিব ডাক্তার হইলেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। সহবে ছইজন এম্,বি,—কয়েকজন এল্,এন্,এস্, থাকি সবেও হরগোবিন্দ বাবুর বিপুল পসার। তাঁহার উপর লোকের যেমন অগাধ বিশ্বাস, তেমন আর কাহারও উপর নহে। প্রাইবেট কল্ তাঁহার যথেষ্ট, এমন কি সময়ে সময়ে ভদ্রলোক স্নানাহার কবিবার পর্য্যন্ত সময় পান না।

হরগোবিন্দ বাবুর ছই পুত্র;—একটির নাম অজয়চন্দ্র, কলিকাতা রিপন কলেজে বি,এ, পড়ে, সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছে। ছোটটির নাম সুনীল, স্থানীয় জেলা-স্কুলের ছাত্র। অজয়ের বিবাহ হইয়াছিল,—গত বৈশাখ মাসে বধূমাতাকেও আনা হইয়াছে।

রাজি দশটার পর হরগোবিন্দ বাবু হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অজয় বলিল—“বাবা সাহেবটা কেমন আছে?”

“ভাল আছে। মাথায় কিছু বেশী আঘাত পেরেছিল, কিন্তু ভয় নেই। আহা, বেচারীকে বড্ড মেরেছে।”

অজয় বলিল—“তার যেমন কর্ম তেমনি ফল হয়েছে। শাদা রঙ বলে মনে করে যেন লাট। বেশ হয়েছে।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন—“দেখ, সে অজায় করেছিল তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা লোককে পাঁচজনে পাড়ে মারাটা কি রকম বীরত্ব? একে ত জায়যুদ্ধ বলে না।”

অজয় বলিল—“ইংরেজের সঙ্গে বাঙ্গালার কখনও জায়যুদ্ধ হতে পারে?”

“কেন?”

“সবই যে অজায়। দেখুন, এ নিয়ে যদি মোকদ্দমা হয়, তবে হাকিম কি জায়বিচার করবে?”

ডাক্তার বাবু হাসিলেন। বলিলেন—“তোমার যুক্তিতে ত বেশ দেখছি! অজায় অজায় কবে সেই নজিরে আমিও অজায় করব?”

অজয় সহসা এ কথা উদ্ভব দিতে পারিল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল—“দেখুন, এ রকম স্থলে সংখ্যা দ্বারা

জায় অজায় স্থির হতে পারে না। একজন বাঙ্গালী, সে একজন মানুষ মাত্র। একজন ইংরেজ, সে একাধারে একজন মানুষ, একজন রাজজাতীয় এবং সম্ভবতঃ একজন বাঙ্গপুরুষ। স্মৃতবাং একটা ইংরেজ তিনজন বাঙ্গালীর সমান বা তার চেয়েও বেশী। একজন আততায়ী ইংরেজকে তিনজন বাঙ্গালীতে মারলে কোনও দোষ হয় না।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন—“এ যুক্তির অবতারণা করে তুমি নিজের জাতিকে অপমান করছ। একজন ইংবেজ, সেও একজন মানুষ মাত্র। হলই বা সে বাঙ্গপুরুষ, হলই বা সে রাজজাতীয়। সে বাঙ্গপুরুষ এবং রাজজাতীয় বলে কি সে গায়ে বেশী জোর পাচ্ছে?”

অজয় বলিল—“গায়ের জোর না পাক, মনের জোব পাচ্ছে। মনের জোরেই গায়ের জোব।”

পুত্রের এ যুক্তির সারবত্তা ডাক্তার বাবুকে স্বীকার করিতে হইল। বলিলেন—“তা ঠিক বটে। মনের জোরেই গায়ের জোর। বলং বলং ব্রহ্মবলং। মনের জোরকে উপলক্ষ্য কবেই শাস্ত্রকার ব্রহ্মবল বলেছেন বোধ হয়।

—কিন্তু তথাপি কিছুতেই আমি মনে কবতে পারিনে, তিনজন বাঙ্গালী না হলে একজন ইংরেজের সমকক্ষতা করতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর দিকেও কি মনেব উপর আধিপত্য করবার মত বিশেষ ভাব কিছু নেই? বাঙ্গালী যখন আত্মমর্যাদা রক্ষা করবার জন্তে, অত্যাচার নিবারণের জন্তে, মা বোনের সম্মান বাঁচাবার জন্তে কোনও অত্যাচারী ইংবেজের প্রতি বল প্রয়োগ কববে, তখন কি এই ভাবগুলি থেকে তাব বাহতে বলবৃদ্ধি হবে না?”

এই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, আহাবের স্থান হইয়াছে।

১. পিতা পুত্র তখন ভোজনকক্ষে প্রবেশ কবিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পরদিন প্রাতে, সাহেব-মারা ঘটনা লইয়া বাঙ্গপুরুষ মহলে ছলছল পড়িয়া গেল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছেন। পুলিশকে হুকুম দিলেন, তিন দিনের মধ্যে আসামী ধরিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিতে হইবে। ভদ্রভতার কোতোয়ালী দাবোগা বদনচন্দ্র ঘোষের উপর পড়িল। দারোগা বাবু আহাৰ নিজে

তাগ করিয়া, সহরময় ছুটাছুটি করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ কবিতে লাগিলেন। ছোকরা দলেব কয়েকজন উকীল ও মোক্তারকে গেবেস্তার করিয়া ফেলিলেন। যণ্ডা যণ্ডা দেখিয়া কয়েকজন বিতালয়ের বালককেও ধৃত কবিলেন।

একদিনেই তদন্ত অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। পরদিন ভোর ছয়টার সময়, সেই মাত্র ডাক্তার বাবু শয্যাভ্যাগ কবিয়া, বারান্দায় বসিয়া ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন, ধূতি ও চাদবে সজ্জিত হইয়া, রূপা বাঁধানো বেতের ছড়ি ঘুবাইতে ঘুবাইতে, হেলিতে ছলিতে দারোগা বদনচন্দ্র বাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

হুই চারিটা বাজে কথার পর দারোগা বাবু বলিলেন—“আর ত মশায় চাকরি থাকে না।”

ডাক্তার বাবু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন—“কি হয়েছে?”

“পরশুকাব সেই সাহেব-মারা মামলাটা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি।”

“কেন? আসামী ত অনেক গুলি ধরেছেন শুনলাম।” বলিয়া ডাক্তার বাবু একটু ব্যঙ্গস্বচক মুহু হাস্ত করিলেন।

দারোগা বাবু তাহা গায়ে না মাখিয়া বলিলেন—“আসামী ত গ্রেপ্তার করেছি, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ ভাল পাওয়া যাচ্ছে না।”

“সাক্ষী প্রমাণ নেই ত গ্রেপ্তার করেন কি করে?” বলিয়া ডাক্তার বাবু আবার ঈষৎ বক্রহাস্ত কবিলেন।

“গ্রেপ্তার ঠিক লোককেই করেছি। ঐ সব ছোড়া-গুলো বড়ই দুর্দান্ত। এক একটা গুণ্ডা। স্বচক্ষে এমন কতদিন দেখেছি, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাস্তা দিয়ে টমটম হাঁকিয়ে যাচ্ছেন, ওরা উন্টোদিক থেকে আসছে, সেলামটা পর্যন্ত করলে না।”

“তাই গ্রেপ্তার করেছেন?”

“না না তা নয়, ওরাই সাহেবকে মেরেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। সাক্ষী আছে কিন্তু মাতব্বব সাক্ষী তেমন পাওয়া যাচ্ছে না।”

“তবে মিছে কেন ভদ্রলোকের ছেলে গুলোকে হাজতে পুবে রেখেছেন, ছেড়ে দিন।”

দারোগা বাবু আড়ষ্ট হইয়া বলিলেন—“সর্বনাশ!

তা হলে কি চাকরি থাকবে? মাঝে আষ একটি দিন মাত্র আছে, পরশু বিচার। এর মধ্যেই সমস্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে হবে। তাই এখন আপনার কাছে আসা।”

ডাক্তার বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—“আমার কাছে? আমি কি করব?”

“আজ্ঞে হেঁ হেঁ আপনি ত সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন গুনলাম,—সাক্ষীটে দিতে হচ্ছে।”—বলিয়া দারোগা বাবু স্তম্ভচুর দাড়ি গোঁপের মধ্যে হইতে দস্তরাজির গুলশোভা বিকাশ করিয়া ডাক্তার বাবুর মুখপানে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—“আমি সেদিন ষ্টেশনে ছিলাম বটে কিন্তু ঘটনাস্থানে ছিলাম না—অর্থাৎ যে সময় ঘটনা হয়, সে সময় সেখানে ছিলাম না। মারপিট হয়ে গেলে পর আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সাহেবকে কে মেরেছে তা আমি কিছুই দেখতে পাই নি।”

দারোগা বাবু যেন কতই বিমর্ষ হইয়া বলিলেন—“তাই ত! বড় মুক্তি হল যে! আহা, একথা যদি আগে জানতাম!”

“কেন, হয়েছে কি?”

• ঘাড়টি নাড়িয়া নাড়িয়া অকুণ্ঠিত করিয়া দারোগা বাবু বলিলেন—“না জেনে বড়ই অত্যাচার করে ফেলেছি। আপনাকে বড়ই বিপদ গ্রস্ত করেছি।”

“কি, খুলে বলুন না।”

“কাল বিকাল বেলা রুবঘরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—‘দারোগা, কি রকম সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ হল?’—আমি বললাম—‘হজুব, একজন কনেষ্টবল ছজন চৌকিদার এরা ঘটনা দেখেছে, সমস্ত আসামী চিনেছে।’—শুনে সাহেব মহা খাপ্পা হয়ে বলেন—‘ননসেন্স!—কনেষ্টবল আর চৌকিদার? কোনও ভাল সাক্ষী নেই?’—সাহেবের চোখ-রাঙানি দেখে ভয়ে বললাম—‘হাঁ হজুব আছে বৈকি। সরকারী ডাক্তার হরগোবিন্দ বাবু সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সমস্ত আসামী চিনেছেন।’—সাহেব বলেন—‘অলরাইট।’—বলে টেনিস্ থেলতে গেলেন।”

ইহা শুনিয়া হরগোবিন্দ বাবু একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন

—“না জেনে শুনে এমন কথা আপনি সাহেবকে বলেন কেন?”

“বিলক্ষণ! আমি কি করে জানব মহাশয়? আপনি সেখানে উপস্থিত, নিজে সাহেবকে হাঁসপাতালে এনেছেন,—আপনি কিছুই দেখেন নি তা আমি জানব কেমন কবে?”

“তবে যান, এখন প্রকৃত কথা সাহেবকে বলে আসুন।”

দারোগা বাবু একটু মুহূর্ত্ত করিয়া বলিলেন—“তাও কি হয়? এক মুখে দুকথা বলব কেমন কবে? আমার তেমন স্বভাবই নয়।”

“তবে আমি নিজে গিয়ে সাহেবকে বলি।”

দারোগা বাবু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন—“আপনি কি ক্ষেপেছেন? ওকথা বলে সাহেব বিশ্বাস করবে? মনে করবে আপনি স্বদেশীর পক্ষ অবলম্বন করে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করছেন। আপনারও বিপদ আমারও বিপদ। তাতে আবার সাহেবের কাণে গেছে আপনি করকচ খান, আপনার বাড়ীতে দেশী কাপড় ব্যবহার হয়।”

বিরক্তির সহিত ডাক্তার বাবু বলিলেন—“করকচ খাই দেশী কাপড় পরি বলে কি আমি রাজদ্রোহী হয়ে গেলাম না কি?”

দারোগা বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—“আহা আহা চটেন কেন? আজ কাল কি রকম দিন সময় পড়েছে তা ত দেখছেন। ওরা তাই মনে করে।”

ডাক্তার বাবু ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—“তবে এখন উপায়? বেশ কাষটি করে বসেছেন যা হোক!”

“উপায় আর কি? সাক্ষী দিতে হবে। বেড়াতে বেড়াতে একবার চলুন না থানার দিকে। আসামী গুলোকে বসিয়ে বেখেছি দেখবেন। সব গুলোকে কোর্টে সনাক্ত না করতে পারেন, গোটা কতক করলেও হবে। পুলিশ ডায়েরি থেকে অস্ত্র অস্ত্র সাক্ষীদের জবানবন্দী গুলোও পড়ে শোনাব।”

এই কথা শুনিবামাত্র, ক্রোধে হরগোবিন্দ বাবুর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, কাঁপিতে

কাঁপিতে, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন—“কী! যত বড় মুখ তত বড় কথা! মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার আর লোক পেলে না? বেরো—দুবহ—এখান থেকে। কোই হয় রে? দে ত বেটাকে কাণ ধরে উঠিয়ে।”

বদনচন্দ্র বাবু উঠিলেন। চাদর খানি গলায় জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন—“মহাশয়, এর ফলভোগ কবতে হবে।”

হবগোবিন্দ বাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—“যা তোর বাবা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলগে যা। যা পারিস্ তা কর।”

দারোগা বাবু তখন স্বরিত পদক্ষেপে সেখান হইতে অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

রাগে তিনটা হইয়া, হাঁফাইতে হাঁফাইতে, দারোগা বাবু থানায় ফিরিয়া আসিলেন। হাফেজ আলি হেডকনেষ্ট-বলকে ডাকিয়া বলিলেন—“জমাদার সাহেব, ডাক্তারবেব ছেলে ছুটোর নাম কি জানেন?”

“কোন ডাক্তার?”

“হরগোবিন্দ—হরগোবিন্দ। গভর্ণমেন্টের নিমক খেয়ে যে নিমক-হারামী কবে।”

“না—তা ত জানি না।”

“শীঘ্র সন্ধান করে আসুন।”

“কেন?”

“তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। সাহেব-মারা মোকদ্দমায় তাবাও ছিল প্রমাণ পেয়েছি।”

“যে আজে।” বলিয়া জমাদার প্রস্থান করিল। তখন দারোগা বাবু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত থানার বারান্দায় ছুটছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এত অপমান! চাকরে কান ধরিয়া উঠাইয়া দিবে? দারোগাকে তুই তোকারি! কেন, হরগোবিন্দ মনে করিয়াছে কি?

দারোগা বাবু ভাবিতে লাগিলেন—“ছেলে ছটোকেত এমনি ধরে আনছি। কিন্তু ডাক্তারকে আবও জব্দ করতে হবে। ওর নামে একটা মোকদ্দমা খাড়া করতেই হচ্ছে। চোরাই মাল রাখে—ডাক্তার চোরাদের কাছ থেকে অর্দ্ধ মূল্যে চোবাই মাল কেনে। পানা তল্লাসী করে বাড়ী থেকে

রাশি রাশি চোরাই মাল বের কবে ফেলব এখন—তাব কৌশল আছে। হাকিমের বিশ্বাস হবে ত? হবে না আবার? দারোগারা হল ডেপুটি বাবুদের গুরুপুত্র! ছেড়ে দেবেন? সাধ্য কি! পুলিশ সাহেবকে দিয়ে এমন লম্বা রিপোর্ট কবাব—অমনি ডেপুটি বাছাধনেব তিন বছর প্রোমোশন ষ্টপ্। দারোগার এত খাতির ডেপুটিবা কবে কি জন্তে? এই জন্তেই ত! কিন্তু জজ সাহেব যদি আপীলে খালাস দেয়? যদি বলে এত বড় একটা ডাক্তার, এত টাকা রোজগার করে, সে চোবাই মাল বাখে, এও কি সম্ভব হয়? তার চেয়ে ইয়ে করা যাক্।—বরং একটা ঘুষেব মাগলা দাঁড় করাই। এই যে সেদিন হাসামার মোকদ্দমায় কয়েকটা জখমী পাঠিয়েছিলাম পরীক্ষা কবতে, ডাক্তারবাবু সমান্ত্র জখম বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তাবই একটাকে দিয়ে নাশিশ করাই যে তার জখম গুরুতর ছিল, ডাক্তার আসামীদের কাছে তিনটি শো টাকা ঘুষ নিয়ে সামান্ত জখম বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। তা হলে আব যাবেন কোথা? আমার হুকুমে বেটা নাশিশ করবে না? সাধ্য কি!—ধরে ১১০ ধারায় চালান করে দেব সে ভয় রাখে না?”

এই সময় জমাদার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—“ডাক্তারের বড় ছেলের নাম অজয়চন্দ্র, ছোট ছেলের নাম সুলীলচন্দ্র।”

দারোগা বাবু তখন কাগজ কলম লইয়া, কোর্ট বাবুর নিকট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নামে একটি কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইলেন। আমরা নিয়ে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

শ্রীল শ্রীযুত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর

সমীপেযু—

বিচারপতী!

হজুরের হুকুম মোতাবেক সাহেব মারা মোকদ্দমায় তদন্ত করিতে করিতে আব দুই আসামীব নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে অজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুলীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহাদের পীতা সবকাবী ডাক্তার হরগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় হর অজয়চন্দ্র অতী দুর্দান্ত বেস্তী কলিকাতায় গুরেল-বাবুব কালেজে অধ্যায়ন কবে প্রকাশ তাহাবই হুকুম সূত্রে অগ্রত আসামীগন সাহেবকে মাইনগীট করিয়াছে দুইজনকে ৫৪ ধাৰা অনুসাবে অন্তই ধৃত কবিবার বন্দোবস্ত করিয়াছী।

২। বিসেস তদন্তে আরও জানিয়াছী উক্ত অজয়চন্দ্র কলিকাতা বীডিন কোয়ার্‌ হাঙ্গামাতেও লীপ্ত ছিল সে এখানে আসিয়া একটা লাঠি খেলা সমিতি স্থাপন করিয়াছে তাহাতে স্থানীয় অনেক লোক চাঁদা দেয় ডাক্তারের ছোট পুত্র শুশীল চন্দ্র অল্প বয়স হইলেও অত্যন্ত দৃষ্ট সে এখানে অনেক বালক লইয়া একটা টীল ছোড়া সমিতি স্থাপন করিয়াছে উদ্দেশ্য সাহেব মেম দেখিলেই টীল ছুড়িবে।

৩। গোপন অনুসন্ধানে জানিলাম উক্ত ডাক্তারের বাসায় সাহেব মারা রক্তাক্ত লাঠি প্রভিত্তী মুক্কাইত আছে লাঠি খেলা সমিতির চাঁদার খাতা মেম্বরের তালিকা দৃষ্টে অনেক আসামী আক্কায়া হইতে পারে বিধায় প্রার্থনা ফো: কা: বি: ১৬ ধারা অনুসারে উক্ত হরগোবিন্দ ডাক্তারের বাটা খানা তল্লাসী করিতে ছাৰ্চওয়াৰ্ণেট দিয়া শুবিচার করিতে আগ্যা হয়।

আগ্যাধীন

শ্রীবন্দনচন্দ্র ঘোষ,

এছাই।*

১ দফা প্রকাশ থাকে যে উক্ত হরগোবিন্দ ডাক্তার সদেসীং বিসেস স্বপক্ষ দেশী চিণী ও করকচ নবন সবদা আহাৰ করে থ্রি বেনামীতে ভাবত কটন মীলে ৫ শত টাকার সেয়ার খরিদ করিয়াছে তাহাতে পুত্রগণ আসামী কদাচ সত্য কথা বলিবে না এমতে তাহাকে সাক্ষী কবিয়া পাটাইতে সাহস করি না।

২ দফা আরো প্রকাশ পাকে পরপ্ৰায় সুনীলাম উক্ত হরগোবিন্দ বলিয়াছে আমি জজ মাজিষ্ট্রেটকে গ্রাহ্য করি না।

ইতি মধ্যে জমাদাব অজয় ও সুনীলকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিলা। কিয়ৎক্ষণ পবে দুইজন উকীল আসিয়া তাহাদিগকে জামিনে মুক্ত কবিয়া লইতে চাহিলেন কিন্তু দারোগা বলিলেন—“সাহেবেব হুকুম নাই।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উল্লিখিত রিপোর্ট পাইয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সার্চ-ওয়ার্ণেট সহি কবিয়া দিলেন। চাপরাসি আসিয়া পানায় দারোগা বাবুকে ইহা দিল। সে সময় একজন গোরু চুরি

আসামীর সঙ্গে দাবোগাবাবুর দরদস্তব চলিতেছিল। আসামী বলিতেছিল হাল গরু বিক্রয় করিয়া দারোগাবাবুর পান খাইবার জন্ত অনেক কষ্টে একশতটি টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহাই গ্রহণে আসামীকে মুক্তি দিতে আঞ্জা হউক। দারোগা বলিতেছিলেন দুইশত টাকার এক কাপা কড়ি কমেও কিছুতেই হইবে না এমন সময় সার্চওয়ার্ণেট উপস্থিত হইল। দাবোগা তখন খুসী হইয়া, একশত টাকা লইয়াই খাতেমা বিপোর্ট দিলেন—“তদন্তে জানা গেল আসামী নির্দুশী বাদীর বাড়ী হইতে উক্ত গোরু পলাইয়া আসামীর গোহালে অনধিকার প্রবেশ করতঃ জাব খাইতে-ছিল তদাক্রমে আসামী উক্ত গোরুকে বাধিয়াছিল।”

গোক চোরকে বিদায় দিয়া বন্দন বাবু সাবধানে সার্চ-ওয়ার্ণেট খানি পাঠ কবিতে লাগিলেন। মুখে হাসি আর ধরে না।

তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। তাড়াতাড়ি উর্দি পরিধান করিয়া দশ বার জন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া দারোগা বাবু বীরদর্পে ডাক্তার বাবু বাড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তল্লাসের সাক্ষী স্বরূপ দুইজন প্রতিবেশী ভদ্রলোককে ডাকিয়া, দাবোগা ডাক্তার বাবুর ঘরে উপস্থিত হইয়া হাঁক ডাক আরম্ভ করিলেন। হরগোবিন্দ বাবু বাহির হইয়া আসিলেন। দারোগা তাঁহাকে সার্চ ওয়ার্ণেট দেখাইয়া, স্ত্রীলোকগণকে স্থানান্তরিত কবিতে আদেশ করিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। দাবোগা কনেষ্টবলগণকে বলিলেন—“সমস্ত বাল্ল তোরঙ্গ এই উঠানে নিয়ে আয়।”—যে গুলি চাবি ছিল, সে গুলি খুলিয়া, বাকী সমস্ত বাল্ল ভাঙ্গিয়া, উঠানের মধ্যে ধুলার উপর সমস্ত জিনিষ পত্র ঢালিয়া ফেলা হইল। দারোগা বাবু জুতাব চৌকর মারিয়া মারিয়া, সে গুলি বিক্ষিপ্ত কবিয়া, “তল্লাস” করিতে লাগিলেন। শাল, আলোয়ান, ঢাকাই শান্তিপুৰী শাড়ী, কোট, কামিজ, সেমিজ, বডিস, মোজা, রুমাল প্রভৃতি দারোগা বাবুর জুতার চৌকরে চাবিদিকে ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তার বাবুর বহুমাতার বাল্ল হইতে, অজয়-চন্দ্রের হস্তলিখিত এক বাণ্ডিল পত্র বাহির হইল। দারোগা সগর্বে তাহা নিজ পকেটে ভরিলেন। অজয়ের বাল্ল হইতে

এক খানি আনন্দ-মঠ পুস্তক বাহির হইল,—তাহা দেখিয়া দারোগা বাবু উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কনেষ্টবলের হাত হইতে অতি সন্তর্পণে ঠাহা নিজ জিম্বায় লইলেন। পবে কক্ষে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলমাবি সিঁচুক ভাঙ্গিয়া অনেক “তল্লাসী” হইল। ডাক্তার বাবুর প্রেক্ষাপন বহি, দুই তিনটা চিঠির ফাইল, বাজার খরচের হিসাব বহি, হুসেজ বাবুর বাধানো ছবি; বিপিন পাল, লাক্ষণ্য রায় প্রভৃতির ছবি যুক্ত একখানি মাসিক পত্র,—সমস্তই দারোগা বাবু ধৃত কবিতা লইলেন। ঔষধের আলমারি খুলিয়া, এক স্থান হইতে তারের জাল মোড়া একটি শাদা বোতল বাহির করিলেন। তাহাতে অর্দ্ধবোতল পরিমাণ কি একটা পদার্থ ছিল,—লেবেলে একটা হরিণের চিত্র ছিল। বোতলটি লইয়া, কর্কট খুলিয়া দারোগা বাবু একবার ভ্রাণ করিলেন। পরে সাক্ষীদ্বয়কে বলিলেন—“ডাক্তার তয়ের লোক।—একটু হবে?”

সাক্ষী দুইটি বলিলেন—“না মশায়, আমরা মদ খাইনে।”

দারোগা বাবু তখন একটি মেজার গ্যাসে খানিক ঢালিয়া, এক মুহূর্তে তাহা নির্জলা পান করিয়া ফেলিলেন। পর মুহূর্তে মুখ শিটকাইয়া বলিলেন—“এটা কি? ত্র্যাণ্ডি বটে ত?”

সাক্ষীগণ লেবেল পড়িয়া বলিলেন—“হ্যাঁ ত্র্যাণ্ডিই বটে।”

অন্তঃপর শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দারোগা বাবু বলিলেন—“গদি বালিস গুলো কাট ত। অনেক সময় বালিসের ভিতর থেকে মাল পাওয়া যায়।”

কনেষ্টবলগণ তখন বাড়ীর সমস্ত বিছানা পত্র লইয়া গিয়া উঠানে গাছা করিল। গদি বালিস একে একে কাটিয়া সমস্ত তুলা বাহির কবিতা ফেলিল। তুলা বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া পাড়া ছাইয়া গেল। কোনও মাল বাহির হইল না।

এইরূপে খানাতল্লাসী শেষ হইল। দারোগা বাবু তখন কাগজ কলম লইয়া, দ্রব্যগুলির ফিরিস্তি প্রস্তুত কবিতা লাগিলেন।

কিয়ৎকাল অগ্রসর হইয়া হঠাৎ বদন বাবু বলিয়া উঠিলেন—“হ্যাঁ হ্যাঁ—লাঠি আছে কিনা দেখ।”

কনেষ্টবলগণ তখন চতুর্দিকে লাঠি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। বাঁটার পশ্চিমা ভূত্যা শিউরতনের সম্পত্তি মজঃ-

ফরপুর জেলা হইতে আনীত উত্তম পাকা বাশেব দুইটি লাঠি বাহির হইল। সে দুইটি হাতে লইয়া, চশমা চক্ষে দিয়া দারোগা বাবু সাবধানে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও রক্তচিহ্ন দেখা গেল না। ফিরিস্তিতে লিখিলেন—“বৃহৎ বাশেব লাঠি দুইটা রক্তেব চিহ্ন পূর্বেই ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে দেখা যায়।”

ফিরিস্তিতে সাক্ষীগণের সহি লইয়া, হরগোবিন্দ বাবুকে ব্যঙ্গশূচক একটি সেলাম করিয়া, সদলবলে দারোগা প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার বাবু এতক্ষণ পাকশালার বারান্দার একটি কোণে একটি চেয়ারে চূপ করিয়া বসিয়াছিলেন।—পাকশালার মধ্যে মহিলাগণ আবদ্ধ ছিলেন, তাই ডাক্তার বাবু এক মুহূর্তেব জ্ঞাতও সে স্থান ত্যাগ করেন নাই।

দারোগা চলিয়া গেলে, হরগোবিন্দ বাবু বাহিরে আসিলেন। সাক্ষী দুইজন তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু গিয়া বলিলেন—“মশায় দেখলেন?”

বাবু দুইটি বলিলেন—“দেখলাম ত।”

“আমার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একবার আসতে পারেন?”

“একটি বাবু বলিলেন—“কি হবে?”

“একবার সাহেবকে গিয়ে সকল কথা বলি।” দেখি এর কোনও বিচার হয় কি না।”

বাবু দুইজন চূপ করিয়া রহিলেন।

হরগোবিন্দ বাবু অধীর হইয়া বলিলেন—“কি বলেন? আসবেন আপনারা?”

একজন বলিলেন—“তার চাইতে এক কাষ করুন। আপনি নিজে গিয়েই একবার সাহেবকে বলে দেখুন। এরূপ অবস্থায় আমাদের বাগুয়াটা—” অপর বাবুটি স্পষ্ট-বক্তা। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—“ও সব ছেঁদো কথায় দরকার নেই। মশায়, আমি আসল কথা খুলে বলি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে কোনও ফল পাবেন না। আর, আমরাও পুলিশের বিরুদ্ধে সাক্ষী টাক্ষী দিতে পারব না। গরীব মানুষ, ছেলে গিলে নিয়ে ঘর করি। দেখলাম ত আপনার দুর্গতিটা স্বচক্ষে। আপনি একজন সরকারী

কিন্তু নৃশংস ব্যক্তি। আপনাব

সিদ্ধি—তাহার ত ইচ্ছা হত

কিন্তু তাহাকে বাস্তব করে

খনও আজ পাকাদির কোনও

কাহাবও ক্ষুধা নাই—কেহই

বাবু বড় মাথা ধরিয়েছে।

চুনা পাতিয়া শয়ন করিলেন।

বলিয়া দিতে লাগিল। বধূমাতা

বসিছেন।

একটা ভীষণ বান্ধা

একটা ভীষণ বান্ধা কে ডাকিল—“ডাক্তার বাবু—

ফিবিয়া বলিল—“একটো
হ।”

স্বপ্ন করিয়া, যাকেট খানি

“আজ আমার শরীর অসুস্থ।

কিন্তু তাহাকে

যেতে পারব না বল। ডাক্তার নিয়ে যাক।”

সাহেব

বলিল।

সাহেব

কে ডাকিল—“ডাক্তার বাবু

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বাবু?”

—ডাক্তার বাবু।

“মহাশয়, আজ আমার উপর দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষ
বড় অত্যাচার করিয়াছে। খানাতল্লাসীও ভাণ করিয়া—”

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন—“আপনার ছুই ছেলে
সাহেব-মারা মোকদ্দমায় আসামী না?”

“আজ্ঞা হাঁ। দারোগা মিথ্যা চক্রান্ত করিয়া তাহা-
দিগকে আসামী করিয়াছে। অস্ত্র প্রভাতেই—”

শুনিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সাহেব চীৎকার করিয়া
উঠিলেন—“How dare you! ছুই দিন পরে আমার
কাছে আপনাব ছেলেদেব বিচার, আজ আপনি আমাকে
মোকদ্দমা সম্বন্ধে biassed করিয়া দিতে আসিয়াছেন?”

এই কথা বলিয়া, বাইসিক্লে উঠিয়া সাহেব বৌ করিয়া
বাহির হইয়া গেলেন।

হরগোবিন্দ বাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে
বাসায় ফিবিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইল। অস্ত্রঃপুরের মধ্যে ডাক্তার বাবু জী
কত্যাগণেব নিকট বসিয়াছিলেন। একে পুত্র ছুইটি বিনা
কারণে কারাবদ্ধ, তাহার উপর এই অপমান, লাঞ্ছনা,—
সকলেই আজ বড় বিব্রত।

শিউরতন আবার আসিয়া বলিল—“ঐ লোকটো আবার
এসেছে। বলে ডাংদার বাবু সাধ ভেট না করে হামি
যাব না।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন—“আমি ত উঠতে পারি নে—
আচ্ছা বাবুকে এইখানে নিয়ে আয়।”

বধু, কত্যা উঠিয়া গেলেন। লোকটি আসিয়া ডাক্তার
বাবুকে প্রণাম করিল। বলিল—“বড় বিপদ। আপনি
না গেলে নয়।”

“কার ব্যারাম?”

লোকটি চুপ করিয়া রহিল।

“কার ব্যারাম হয়েছে? কি ব্যারাম?”

“সে আর কি বলব! কোন্ মুখেই বা বলি?”

ডাক্তার বাবু একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—“আপনি
কে?”

“আমি খানার বাইটার কনেটবল। আমার নাম
হারাদন সরকার। দারোগা বাবুর বড় ব্যারাম। আজ যে
কাণ্ডটা হয়ে গেছে, তার জন্তে তিনি লজ্জায় মরে আছেন।
তার উপর এই বিপদ।”

“কি ব্যারাম?”

“বুকে মাথায় ভরানক যন্ত্রণা। আপনি না গেলেনই নয়।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন—“আমাকে কেন ? আর কি ডাক্তার নেই ?”

মুন্সী বাবু তখন পকেট হইতে একশত টাকা বাহির করিয়া ডাক্তার বাবু পায়েব কাছে রাখিয়া দিলেন—বলিলেন—“দয়া করুন।”

টাকা দেখিয়া ডাক্তার বাবু জলিয়া উঠিলেন। একটু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—“টাকার শোভ দেখাতে এসেছেন ? সকলেই কি পুলিশের মত অর্থপিপাচ ?—লক্ষ টাকা দিলেও আমি যাব না। উঠুন—আপনার পথ দেখুন।”

টাকাগুলি উঠাইয়া লইয়া, অধোবদনে মুন্সী বাবু প্রস্থান করিলেন। বধু, কস্তা প্রভৃতি আবাব আসিয়া তাঁহাব শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি নয়টা বাজিল। গৃহিণী বলিলেন—“একটু গবম দুধ এনে দেব ?” ডাক্তার বাবু বলিলেন—“দাও।”

গৃহিণী পাকশালায় প্রবেশ করিয়া দুধ গরম করিতে লাগিলেন। এমন সময় খিড়কী দবজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

পৰক্ষণেই দ্বির সহিত একটি যুবতী প্রবেশ করিলেন। যুবতীটি বলিলেন—“গিন্নীমা কোথা ?”

“কে গা তোমরা ?”

ঝি বলিল—“উনি বদন দাবোগার পরিবার।” সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি গৃহিণীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন।

গৃহিণী পা ছাড়াইবাব চেষ্টা করিয়া বলিলেন—“কেন—কেন ?”

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“মা, আমার স্বামী প্রাণ যায়। আমার হাতের নোয়া যাতে বজায় থাকে তা করুন।”

গৃহিণী বলিলেন—“এমন ব্যারাম ?”

“হাঁ মা। ডাক্তার বাবু বলেছেন অস্ত্র ডাক্তার কেন নিয়ে যায় না। তা মা,—তাঁর ব্যারাম অস্ত্র ডাক্তারে বুঝবে না ত বাঁচাবে কেমন কবে। এইখানে কি খেয়ে গছেন, সেই থেকে এমন হয়েছে।”

গৃহিণী বলিলেন—“এখানে কি খেলেন ? এখানে ত কিছু খান নি।”

যুবতী বলিলেন—“আমায় একবার ডাক্তার বাবুর কাছে

নিয়ে চলুন। তিনি আমার বাপ—এ সময় আমার লজ্জা নেই।”

গৃহিণী ইহাঁকে হয়গোবিন্দ বাবুর কাছে লইয়া গেলেন। যুবতী ডাক্তার বাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—“বাবা আমায় রক্ষা করুন।”

গৃহিণী সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

যুবতী তখন বলিলেন—“তিনি বলছিলেন খানাতল্লাসী করবার সময় ঔষধের আলমারিতে একটা ব্রাণ্ডির বোতল ছিল, ব্রাণ্ডি মনে কবে তিনি এক চুমুক খেয়েছিলেন। এখন তাঁর সন্দেহ হচ্ছে সেটা ব্রাণ্ডি নয়, কোনও বিষ টিষ।”

একথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন—“ঔষধের আলমারিতে ব্রাণ্ডি বোতল ?”

শুনিবামাত্র ডাক্তার বাবু মুখ শুষ্ক হইল। তিনি যুবতীকে সত্বোধন করিয়া বলিলেন—“আপনি কি গাড়ীতে এসেছেন ?”

“হাঁ।”

“তবে আমি ঐ গাড়ীতে থানায় চলাম। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। গাড়ী ফিরে এলে আপনি যাবেন।”

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সম্মুখভাগে বলিলেন—“বাবা, আমার কপালের সিঁদুর থাকবে ত ?”

ডাক্তার বাবু বলিলেন—“সে দৈবের হাত মা।” বলিয়া তিনি ঔষধ ও যন্ত্রাদি লইয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজগৃহে লইয়া গেলেন।

সারা রাত্রি জাগিয়া ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করিলেন। সে যাত্রা দারোগা রক্ষা পাইল।

যথাসময়ে সাহেব-মাবা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। প্রমাণভাবে অজয় ও স্ত্রীল খালাস পাইল। অস্ত্র সকলের ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

ঐপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব ?

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে যখন ম্যাগেবিসা, প্লেগ, বোমা প্রভৃতি আপদগুলি'ব নামও আমরা জানিতাম না, আব, বাহাত্তর সালে কোন্ জন্মে কবে একবার আমাদের এই সোনার ভাবতে দুর্ভিক্ষের পদধূলি পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয়-বিদ্রাবণ আধ্যাত্মিক শুনিলে আমাদের মনে হইত—আর এখন আমাদের ভয় নাই, এখন আমরা রামরাজ্যে বাস করিতেছি; যখন, যে দিকে চক্ষু কিবাইতাম সেই দিকেই দেখিতাম প্রসন্নবদনে লক্ষ্মী হাসিতেছেন—সে এক দিন ছিল ! তখন, আমার রঘুবংশের পাঠ সাজ হইয়াছে, কুমার-সম্ভবও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ইতিমধ্যে একদিন, মাঘ-ভারবী না জানি কাণ্ডখানা কিরূপ—তাহা পাতা উন্টাইয়া দেখিতে গিয়া দিব্য একটি পাকা চণ্ডের শ্লোক আমার চক্ষে পড়িল। তাহার শেষ চরণটি আজিও আমি ভুলি নাই; সেটা এই :—

“হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ—হিতং যেমন মনোহারিও তেমি, এরূপ বচন দুর্লভ।” ইহার খোলাসা তাৎপর্য এই :—অপ্রীতিকর হিতবাক্যও সুলভ, আর, মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যও সুলভ; প্রীতিজনক হিতবাক্যই দুর্লভ।

হিতবক্তার তবে তো দেখিতেছি মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়। তোমার শাস্ত্রে কি লেখে ?

॥ ২ ॥ আমার শাস্ত্রে লেখে এই যে, হিতবাক্য লোকের মনোহারী হইবে কি হইবে না তাহা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন করে না—চোক কাণ বুজিয়া তাহা বলিয়া ফালাই ভাল; যে শোনে সে শুনবে, যে না-শোনে না শুনবে; তুমি তো বলিয়া খালাস! তুমি যদি জানিতে পারিয়া থাক' যে গঙ্গার ঘাটে কুমীরের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে, তবে সে কথা সহরময় রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তবে এটা সত্য যে, জ্ঞানের হিতবাক্য কাহারো প্রাণে সহে না; তাহা এক কাণ দিয়া শ্রোতার মস্তিষ্কসদনে প্রবেশ করে—শুদ্ধ কেবল ভদ্রতা'র অমুগ্রহে ভর করিয়া; কিন্তু প্রবেশ কবিয়া যখন দেখে যে, হৃদয়দ্বারে কপটি বদ্ধ, তখন বসিতে জায়গা না পাইয়া আর এক কাণ দিয়া ঝড়ঝড় করিয়া বাহির হইয়া যায়। মনস্তুষ্টিকর

অহিত বাক্যের কুহকে ভুলিয়া রসাতলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এরূপ রূপাপাত্র আমি কত যে দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, পরন্তু তাহাদের মধ্যে'কার একজন'কেও আজ পর্যন্ত দেখিলাম না যে, সে কাহাবো হিতবাক্য শুনিয়া সংশ্লিষ্ট লান্ত করিয়াছে। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! যে শেখে, সে ঠেকিয়া শেখে। বলিতেছি বটে “ঠেকিয়া শেখে” কিন্তু ঠেকিয়া শেখা বলে কাহাকে তাহা যদি শোনে, তবে তোমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত শিহরিয়া উঠবে;— ঠেকিয়া শেখা'র আর এক নাম মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা। দশজন স্নানযাত্রী গাম্‌চা কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছে দেখিয়া তুমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্ববে বলিতেছ “জলে নাবিও না—গঙ্গায় কুমীর দেখা দিয়াছে।” পাঁচজন তোমার সেকথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া এক-কোমর জলে নাবিলা, আর-পাঁচজন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক-হাঁটু জলে নাবিয়া ধমকিয়া দাঁড়াইল। কোমর-জলের মহারথীরা চকিতের মধ্যেই জলগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল;—ইহারই নাম ঠেকিয়া শেখা! হাঁটু-জলের অর্দ্ধরথীরা দ্রুতগতি ডাঙ্গায় উঠিল;—ইহারই নাম দেখিয়া শেখা।

॥ ১ ॥ শুনিয়া শিখিলেই তো আপদ চুকিয়া যায়, তাহা হইলে ঠেকিয়া শিখিতেও হয় না, দেখিয়া শিখিতেও হয় না। শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাধুখ কেন ?

॥ ২ ॥ লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাধুখ।

॥ ১ ॥ বেস্ বা হো'ক্ তুমি বলিলে! তুমি কি আর জান' না যে, কচি বয়সেব মনুষ্যও মনুষ্য, যুবা বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য, প্রবীণ বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য? সত্য বলিতে কি—তোমার মতো লোকের মুখে “মনুষ্যের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়াছে” এরূপ একটা আগা-পাছতলা প্রহিত বেথাপ কথা শুনিলে আমার কেমন কেমন ঠাাকে!

॥ ২ ॥ বলিলাম আক—শুনিলে আর! আমি বলিলাম—“লোকের বয়স”, তুমি শুনিলে “মনুষ্যের বয়স?”

॥ ১ ॥ আমি তো জানি—মনুষ্য নামাই লোক।

॥ ২ ॥ সে দিন তোমার অষ্টম বর্ষীয় বালকটি যখন তোমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল যে, “সকালে পড়া মুখস্থ ক'রেছি, বিকালে পড়া মুখস্থ ক'রেছি, আবার এখন

রাত্রে পড়া মুখস্থ করিতে বলিতেছ ! অতবাব ক'রে পড়া মুখস্থ ক'লে লোকে পাগল হ'য়ে যায়", এ কথা প্রত্যুত্তরে তুমি যাহা তাহাকে বলিলে তাহা তো আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি ! তুমি বলিলে "তোমার এখনি গোপ দাড়ি ওঠে নি—তুই আবার লোক হ'লি কবে ? যা'—প'ড়গে যা' !" লোক শব্দের এইরূপ বিশদ তাৎপর্য-ব্যাখ্যা তোমারই মুখে যখন আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তখন আমি কেমন করিয়া জানিব যে, তোমার অভিধানে মনুষ্য নামাই লোক—একটি পঞ্চমবর্ষীয় বালকও লোক !

১১৥ তুমিতো ঘর-সন্ধানী—(Detective) মন্দ না ! বয়স শুদ্ধ আমাকে পাকড়া কবির্যছ ! তোমার সঙ্গে কথা কহা দেখিতেছি বিপদ ! তুমি যদি, সখে, একটা কাজ কর—বড় ভাল হয় ; আশ পাশের কঁাকড়া কথাব চুলচেরা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া তুমি যদি আমাকে তোমার পেটের কথাটি পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া-খালিয়া বল, তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে সমস্ত গোল মিটিয়া যায় ।

১২৥ বলি তবে শোন' :—এটা তুমি তো জান'ই যে, ঘুম-পাড়ানী মাসী-পিসীরা সেদিনকার ছেলে'কে বড় হইয়া টাকা উপার্জন করিতে দেখিলে আঁচলের কোণ দিয়া চক্ষু মুছিতে-মুছিতে বলেন "আমি উহাকে বুকে পিঠে ক'রে মানুষ ক'বেছি !" বোড়া পেট থেকে পড়িয়াই বোড়া হয়, গোক পেট থেকে পড়িয়াই গোক হয় ; কিন্তু মানুষের একি বিপরীত কাণ্ড—অন্তে তাহাকে মানুষ না করিলে সে মানুষ হয় না । কচি বয়সে মনুষ্য যখন পিতামাতা'ব নিকট হইতে এক-মেটে শিক্ষা লাভ কবে, তখন সে অর্দ্ধ মানুষ হয় ; তাহার পরে পঠদশায় যখন শিক্ষকদিগেব নিকট হইতে দ্বোমেটে শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম ক্ষেত্রে চরিয়া পাইতে শেখে, তখনই সে পূবা-মানুষ হয় । কচি-বয়সে গৃহ মনুষ্যেব জীবন-ক্ষেত্র ; এই জীবন-ক্ষেত্রে মনুষ্য পানাহার করিতে শেখে, পায়ে হাঁটিতে শেখে, বসিতে দাঁড়াইতে শেখে, মাতৃভাষা শেখে, জীবনের যত কিছু মুখ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহাব-প্রণালী সমস্তই অবলীলাক্রমে শেখে । মনুষ্যেব এইরূপ কচি বয়সেব শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে, কিন্তু, শিক্ষা শব্দের বাচ্য নহে ; কেননা এ বয়সে মনুষ্য-সন্তান শিখিব মনে করিয়া কিছুই শেখে না ; তাহার

মাতাপিতা এবং ভ্রাতা ভগ্নীরা যাহা তাহাকে গিলা-ইয়া ছায়, তাহাই সে হাসিয়া খেলিয়া গলাধঃকরণ করে । বাচ্ছা-মনুষ্যেব শিক্ষা একপ্রকার অঘাচিত দান-গ্রহণ । আদিম জীবন-ক্ষেত্রে মনুষ্য ঐরূপ অঘাচিত দান-গ্রহণেব পথ দিয়া জীবন-নির্বাহের নানাবিধ অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহার-কার্যে অশিক্ষিত-পটুতা উপার্জন কবে । জীবন-ক্ষেত্র হইতে মনুষ্য যখন মানস-ক্ষেত্রে ভর্তি হয়, তখনই প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহার শিক্ষার গোড়া-পত্তন আরম্ভ হয় । মানস ক্ষেত্র কি ? না বিদ্যালয় । বিদ্যালয়কে মানস-ক্ষেত্র বলিতেছি এই জন্ত—যেহেতু মনোযোগই এ ক্ষেত্রেব প্রধানতম শিক্ষাপ্রণালী । মনুষ্যেব পঠদশায় শিক্ষকের বাক্য মন-দিয়া না শুনিলে তাহার বিদ্যাশিক্ষা অস্ত্র কোনো উপায়ে ঘটিয়া ওঠা সম্ভবে না । পঠদশায় বয়সই প্রধানতঃ মনুষ্যেব শুনিয়া-শিখিবার বয়স । মনুষ্যেব পঠদশায় বয়স অতীত হইলেই সেই সঙ্গে তাহার শুনিয়া-শেখার বয়স অতীত হইয়া যায় । মানস-ক্ষেত্রে ধীবে ধীবে বাড়িতে থাকিবার সময় পণ্ডিত মহাশয়ের, তথৈব, অধ্যাপক মহাশয়ের ছাত্রেরা মনোযোগের পথ দিয়া বিদ্যাবুদ্ধি উপার্জন করে । বুদ্ধি পরিফুট হইবার পূর্বে, মনুষ্য-সন্তান, শিক্ষক বাহা বলে তাহাই শুনিয়া শেখে ; বুদ্ধি পরিফুট হইবার পরে—বুদ্ধি বাহা বলে তাহাই শুনিয়া চলে । বুদ্ধি-বিকাশের পালা সাজ হইলে মনুষ্য যখন মানস-ক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে ভর্তি হয়, অথবা যাহা একই কথা—বিদ্যালয় হইতে লোক সমাজে ভর্তি হয়, তখনই সে লোক হয় । মনুষ্য যত দিন বালক থাকে, ততদিন সে কাহাবো নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিতে লজ্জিত বা কুস্তিত হয় না ; পক্ষান্তবে, বুদ্ধির ফুটন্ত অবস্থায় লোক-সমাজের বাতাস গায়ে লাগিয়া বালক যখন লোক হইয়া ওঠে (ডার্বিনের শাস্ত্রানুসারে—বানর যখন নর হইয়া ওঠে) তখন গোপ দাড়ির প্রাজ্জ্বল্যে তাহার মুখের চেহারাও যেমন কিরিয়া যায়, পদগোববের প্রাজ্জ্বল্যে তাহার মনের ভাবও তেমনি কিরিয়া যায় ; মন তখন বলে—“অন্তের নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিলে আপনার বুদ্ধিকে অপমান করা হয় ।” এতগুলো কথা আমার পেটের মধ্যে ছিল, তাই তুমি যখন বলিলে “শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাশ্রুত কেন”, আমি তাহার

উত্তর দিলাম এই যে, লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাশ্রয়।”

৥১৥ তুমি যাহা বলিলে—সবই সত্য; কিন্তু তথাপি ঐ বিষয়টির সম্বন্ধে একটা বিষয় ধন্য আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে—সেটা’র একটা মীমাংসা আশু প্রয়োজনীয়; কথটা এষ্ট :—মনুষ্য যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উত্তত হয়, তখন, কচি বয়সে মাতা কিম্বা ধাত্রী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বিপদ হইতে রক্ষা কবে; পঠদশায় শিক্ষক তাহাকে সহপদদেশ দিয়া বিপদ হইতে বক্ষা কবে; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তের সংপরামর্শ শুনিয়া চলিতে ভাব বোধ কবে, সে ব্যক্তি যদি কুবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া বিপথে পদার্পণ কবিতো উত্তত হয়, তবে কে তাহাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা কবিলে ?

৥২৥ আমাদের দেশের একটি পুৰাতন শাস্ত্রবচন এই যে, “ধর্ম্মো রক্ষতি বক্ষিতঃ” ধর্ম্মকে যে বক্ষা করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা কবে। গৃহক্ষেত্রে পিতামাতা কচি বালকের জীবনের নিয়ামক, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরু বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের মনের নিয়ামক, কর্ম্মক্ষেত্রে বুদ্ধি বিষয়ী লোকের কর্ম্মের নিয়ামক; এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এটাও তেন্নি দেখা চাই যে, কুশিক্ষা যেমন শিক্ষা নামের যোগ্য নহে, কুবুদ্ধি তেন্নি বুদ্ধি নামের যোগ্য নহে। সুবুদ্ধিই বুদ্ধি, আর, ধর্ম্মবুদ্ধিই সুবুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ। কর্ম্ম, কবিবার বস্তু; ধর্ম্ম, ধর্ম্মিা থাকিবার বস্তু। কর্ম্ম, বুদ্ধির দাঁড়; ধর্ম্ম, বুদ্ধির হাল। কর্ম্মক্ষেত্রের বিষয়ী লোকেরা যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উত্তত হয়, তখন, তাহারা আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে—কেবল যদি তাহারা ধর্ম্ম-বুদ্ধির কথায় কর্ণপাত কবে; তাহা যদি না কবে, তবে আব নিস্তার নাই।

৥১৥ ধর্ম্ম, বুদ্ধির হাল, তাহা তো বুদ্ধিলাম; কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইবে কোন্ দিক্ বাগে? কুল বাগে অবশ্য। তবেই হইতেছে যে, কুলের ঠিকানা-নির্দেশ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। দাঁড়, তুমি বলিতেছ কর্ম্মকে, হাল বলিতেছ ধর্ম্মকে, ইহা শুনিয়া আমি পবন আনন্দ লাভ করিলাম; কুল তুমি বলিতেছ কাহাকে, সেইটাই এখন জিজ্ঞাস্য।

৥২৥ কুল, আমি বলি, পুরুষার্থ। • পুরুষার্থ,

স্বাধীনতা, স্বারাজ্য, মুক্তি, শব্দ বটে চারিটা—কিন্তু বস্তু একই। মনুষ্য-পক্ষী যখন আপন পক্ষে ভর করিয়া উড়িতে শেখে, উড়িতে শিখিয়া আপনি আপনাব নেতা হয়; তখন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ধর্ম্মবুদ্ধি স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যেব প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ কবিয়া তাহাকে আহ্বান কবে, আর, কুজ্ঞা পাপ-বুদ্ধি ক্ষণিক সুখেব স্বর্ণ-পিঞ্জরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ কবিয়া তাহাকে আহ্বান করে। এক শ্রেণীর পক্ষী অধি-দেবতাব আহ্বান শুনিয়া মুক্তিব মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সুপথে চলে, আর এক শ্রেণীর পক্ষী উপদেবতার আহ্বান শুনিয়া ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য কবিয়া বিপথে চলে। মনুষ্য যখন মানসক্ষেত্র হইতে বিভা-বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে স্বপদে ভর দিয়া দাঁড়ায়, তখন সে আপনাকে চালাইবার ভার আপন হস্তে টানিয়া লইয়া স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেইতো-আব স্বাধীন হওয়া যায় না। স্বাধীন হইতে হইলে স্বাধীনতা’র যোগ্যতা লাভ করা চাই। যাহারা স্বাধীনতাব মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সুপথে চলেন তাহারা স্বাধীনতাব যোগ্যতা লাভ কবেন, আব, যাহারা ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ কবিয়া বিপথে চলেন, তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীনতার অযোগ্য হইয়া পড়েন। সুপথ-যাত্রীবা প্রাণপণ চেষ্টায় স্বাধীনতার যোগ্যতা উপার্জন কবেন, কাজেই তাহারা অভীষ্ট ফল-লাভে কৃতকার্য হ’ন। বিপথ-যাত্রীরা গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি’ব জন্তু আগ্রহাঘ্রিত হ’ন, কাজেই অভীষ্ট ফলে বঞ্চিত হ’ন। পুরুষার্থেব কূলে পৌছিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় কি—তাহা বলি শোন :—

(১) কুলের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া ঠিক পথে হাল বাগাইয়া ধর্ম্মিা থাকিয়া স্বাধীনতাব যোগ্যতা লাভ করা চাই।

(২) বাস্তবিক বিজ্ঞা শিক্ষা এবং কাজ শিক্ষা করিয়া মাঝ পথেব বাধাবির অতিক্রম করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা লাভ করা চাই।

স্বাধীনতাও যা, স্বারাজ্যও তা, একই; তা’ব সাক্ষী—
স্বাধীন = স্ব + অধীন • অর্থাৎ আপনি আপনাব অধীন;
স্বরাজ = স্ব + রাজ অর্থাৎ আপনি আপনাব রাজ

হুয়ের ভাবার্থ অবিকল সমান। যাহারা স্বাধীনতা এবং স্বাভিজ্যের কান্দালী, তাহাদের দুইটি বিষয় সর্বদা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্তব্য।

(১) ঈশ্বরের অধীনতা স্বাধীনতা'র সোপান; সৌভাগ্য (অর্থাৎ মঙ্গলরাজ্য) স্বাভিজ্যের সোপান; ধর্মবন্ধন মুক্তির সোপান।

(২) স্বেচ্ছাচাষ স্বাধীনতার বিপরীত পথ, নৈবাজ্য (অর্থাৎ অব্যাজকতা) স্বাভিজ্যের বিপরীত পথ, উচ্ছৃঙ্খলতা মুক্তির বিপরীত পথ।

এই দুইটি বিষয় সর্বদা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্তব্য। স্বাভাজ্য কিছু আব আমাদের পোষা কুকুর নহে যে, তাহাকে আমবা ডাক দি'বা মাত্র তৎক্ষণাৎ অগ্নি সে দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের পদলেহন করিতে থাকিবে। স্বাভাজ্য লাভ করিতে হইলে একদিকে চাই ধর্মকে ধরিয়া থাকিয়া স্বাভাজ্য-ভোগেব যোগ্যতা লাভ করা, আব একদিকে চাই রীতিমত জ্ঞান এবং কাজ শিক্ষা কবিয়া বিধিমত প্রকারে অভীষ্ট সাধন করিতে পাবিবার মতো উপযোগ্যতা লাভ করা। সৌভাগ্য-প্রাপ্তি জাপানীরা তাহাই করিয়াছে; আর সেই জন্ত— তাহাবা যে কার্যে হাত দিতেছে, তাহাতেই সোণা ফলিতেছে। তাহার পরিবর্তে তাহারা যদি অসম্মদারের উত্তেজনার অথবা দৃষ্ট সরস্বতীর কুমন্ত্রণায় ঐরূপ যোগ্যতা এবং উপযোগ্যতা লাভ করিবার পূর্বেই ইউরোপীয় ভল্লকের প্রতি গুলিগোলা চালাইতে আবস্ত করিত, তাহা হইলে তাহারা সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লকের নথের আঁচড়ে এবং দাঁতের কামড়ে ধনে প্রাণে মারা যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জাপানীরা তাহাদের এই নিজ-বুদ্ধিসম্মত নূতন উত্তমের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ধর্মকে কেমন অপরাধিত-চিন্তে রক্ষা কবিয়া আসিয়াছে—তাহা তো আব কাহারো দেখিতে বাকি নাই! তাহাবা রাগের মাথায় চীন রাজ্যকে হাবথার করিয়া দিতে পারিত—তাহা তাহারা করে নাই; উর্টা আবো তাহাবা চীনদিগকে সংশিক্ষা প্রদান করিবার জন্ত যত্নেব ক্রটি করিতেছে না। তাহাবা কনগ্রেসবীরদিগেব জায় আপনা-আপনি'র মধ্যে কামড়াকামড়ি, আঁচড়া-আঁচড়ি এবং চুসচুসি করিয়া জাতীয় অধঃপতনের দিব্য একটা জম্বুকীলো সোপান গাঁথিয়া তুলিতে পারিত—তাহা

তাহারা কবে নাই; উর্টা আবো তাহাবা প্রভূত ধন ঐশ্বর্য ব্যয় করিয়া, আপনাদের মধ্যে বাহাতে বিবাদ বিসম্বাদের চিহ্নমাত্রও না থাকে, তাহার যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বল্পমাত্রও কালবিলম্ব করে নাই। কষীয় বন্দীদিগের প্রতি শত্রুচিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারিত, তাহা না করিয়া বন্ধুচিত যত্ন সমাদর এবং সম্মানপ্রদর্শন কবিতে কিছুমাত্র ভারবোধ কবে নাই। একপ জাতির জয় হইবে না তো আর কাহাব জয় হইবে? আমাদের দেশেব এই যে একটি পুরাতন বাক্য “মতোধর্মন্ততোজয়ঃ” ইহা অব্যর্থ বেদবাক্য। ধর্মই যোগ্যতা'র নিদান; আর ডাক্তরইনের কথা যদি সত্য হয়, তবে যোগ্যতাই জয়ের নিদান। ধর্মনিষ্ঠ এবং কর্তব্যপবায়ণ জনসাধারণই স্বাভাজ্য-লাভের যোগ্যপাত্র। জাপানেব অধিবাসীরা ধর্মকে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধবিয়া রহিয়াছে দেখিয়া বিজয়লক্ষ্মী দ্রুতপদে অগ্রসব হইয়া আপন হস্তে জাপানের গলে জয়মালা পরাইয়া দিলেন “চিরজীবী হও” আশীর্বাদ করিয়া। আমাদের দেশের স্বাভাজ্য-পন্থীদিগকে আমি তাই জোড়হস্তে বলি— “দেখিয়া শেখো! নচেৎ ঠেকিয়া শিখিতে হইবে!” ঠেকিয়া শেখা যে কিরূপ সর্বনেশে শেখা তাহা যে জানে সেই জানে। বিপথ-যাত্রী যখন উঠিতে পড়িতে, বসিতে দাঁড়াইতে, বা খাইয়া খাইয়া চৈতন্ত লাভ করে, তখন সে বিপথে পড়িয়া বলিবার সময় বলে “এ পথে বাপ-মা বলিয়া ডাকিলে কেহ সাড়া দিবার নাই” অথচ চলিবার সময় বলে—কি সর্বনাশ—সেই পথেরই আলেয়া'ব পশ্চাৎ পশ্চাৎ! ফল কথা এই যে, বিপথে চলা যখন বাহাব প্রাণের সামিল হইয়া হাড়ে মিশিয়া যায়—নূতন-লক্ষ জ্ঞানের নূতন পথে চলা তখন তাহাব পক্ষে মৃত্যু তুল্য। একে তো এই দশা—তাহার উপরে যদি আবাব বিপথ-যাত্রীর দুর্ভিক্ষ ঘাড়ে চাপে, তবে আর রক্ষা নাই! তখন সে হিতবস্তার মুখপানে খটমট করিয়া চাহিয়া দস্ত সহকারে বলে—“আমি বিনাশের পথে যাইব—আমার ধূসী! তুমি বলিবার কে? আমি তোমার হিতবাক্য শুনিতে চাই না!” ইহার উত্তরে ভদ্রলোকটি কিই-আর তাহাকে বলিবে—“খুব তুমি বাহাজুর” বলিয়া আপন মনে ইষ্ট দেবতার নাম জপিতে থাকে।

॥ ১ ॥ সভ্য জাপান সেদিনকার ছেলে বই না—তাহার গলা টিপিলে দুধ বেবোয়! পক্ষান্তরে সুসভ্য ইউরোপেব বয়ঃক্রম হইতে চলিল চারি শতাব্দীর বেশী বই কম না। দেখিয়া যদি শিখিতেই হয়, তবে ইউরোপ আমেরিকার খ্যাতিনামা মহাসম্রাটদিগের পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রণালী-পদ্ধতিই আদর্শ-পদবীতে দাঁড় কবাইবাব উপযুক্ত, তা বই একটা অকালপক কচিছেলে'র কাণ্ডকাবখানা দেখিয়া-শিখিবাব জিনিসই নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশে তো আর বিভাবুদ্ধি-সম্পন্ন ইতিহাস-লেখকের অভাব নাই; তাঁহাদের লিখিত তবো-বেতরো স্বাবাক্যের তবো-বেতবো অভ্যুদয়-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে যে, সর্বত্রই ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার-বর্জিত নৈরাজ্যের মধ্য হইতেই স্বাবাক্য মন্তক উন্মোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে।

॥ ২ ॥ ফরাসী দেশের অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দীয় নৈরাজ্যের মধ্য হইতে কিরূপ স্বাবাক্য মন্তক উন্মোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা তো আব কাহারো দেখিতে বাকি নাই! সেটা যে একটা সর্ব্বনেশে কালসর্প! শ্বেনন বিবাস্ত্রা কালসর্প কোথাও আর দেখা যায় না! ইংরাজিতে তাহার নাম Revolution, আর দেশীয় ভাষায় তাহার নাম রাষ্ট্রবিপ্লব। সেই সহস্রশিরা সর্পটাকে সুদূরদর্শী প্রথম নেপোলিয়ন খুব ভালমতেই চিনিতেন, আব, চিনিতেন বলিয়া তাহাকে ধমন করিবার জন্ত বিহিত বিধানে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু হইলে হইবে কি—ধর্ম্মের নামে নহে পরন্তু গর্ব্বক্ষীত ফরাসী জাতীয় গোঁববের নামে তিনি তাহার বিষ দাঁত ভাঙিতে গিয়াছিলেন তাই হিতে বিপরীত হইল। ঐ দুঃস্থ কালসর্পটার কোপে পড়িয়া অবধি, তাহাব বিষম্বাসে জলিয়া পুড়িয়া ফরাসী দেশের অধিবাসীবা একদিনের জন্তও সৌরাজ্যসুখ যে কাহাকে বলে তাহা জানিল না। স্বাবাক্যের যোগাড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়া মার্কিনেবাই বা কেন (জাপানী-দিগের মতো) অত্যন্ত কালের মধ্যে অবলীলাক্রমে আশাতীত ফল-লাভ কবিল, আব ফরাসীসেবাই বা কেন আজও পর্যন্ত তাহাদের হেঁট মন্তক উন্মোলন করিতে পরাভব মানিতেছে? ইহার গোড়ার কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ভূতগত উচ্ছৃঙ্খলতা'র ভূতগত ফল হইবে

* নিঃ+রাজ=নীরাজ=বাক-বর্জিত। নৈরাজ্য=অরাজকতা।

তাহাতে আব বিচিত্র কি? মার্কিনদিগেব রাজনৈতিক অধ্যবসায়েব গোড়াপত্তন কবা হইয়াছিল ধর্ম্মেব উপরে, তাই তাহার ফল হইল নিষ্কটক স্বাবাক্য-লাভ; ফরাসীসদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়েব গোড়াপত্তন কবা হইয়াছিল অবিজ্ঞা দস্ত-মাৎসর্য্য এবং অধর্ম্মের উপরে তাই তাহার ফল হইল জাতীয় অধঃপতন। পুৰাকালের একটি শাস্ত্র বচন শ্রবণ কর:—

“অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ—অধর্ম্ম দ্বারা ভূরাস্বাজনের সমস্তই হস্তায়ত্ত হয়,” “ততো ভদ্রানি পশ্চতি—তাহার পরে মঙ্গল দৃশ্য সকল দেখা যায়,” “ততঃ সপত্নান্ জয়তি—তাহার পরে শত্রুদিগেব উপরে জয় লাভ হয়,” “সমূলস্ত বিনশ্চতি—তাহার কপালে কিন্তু লেখা আছে ‘সমূলে বিনাশ’। ধর্ম্মভ্রষ্ট ফরাসী জাতির ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। তা'ব সাক্ষী:—

(১) অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ।

অধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত ফরাসী রাজ্য চকিতের মধ্যে বিপ্লব কর্তাদিগের হস্তায়ত্ত হইল।

(২) ততো ভদ্রানি পশ্চতি।

তাহার পরে চারিদিকে মঙ্গলের সুখস্বপ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিল, আব, সেই সুখ-স্বপ্নের আবেশে ফ্রান্স, ইংলণ্ড আইরলণ্ড, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশ বিদেশেব ভ্রাতায় ভ্রাতায় কোলাকুলি ধুম পড়িয়া গেল।

(৩) ততঃ সপত্নান্ জয়তি।

তাহার পবে ভীষণ বক্তারক্তির মধ্য হইতে প্রথম নেপোলিয়ন মাথা তুলিয়া উঠিয়া তোপের ধমকে অর্দ্ধেক ইউরোপ আপনার বজ্রকঠিন মুঠাব মধ্যে আনয়ন করিলেন।

(৪) সমূলস্ত বিনশ্চতি।

তাহার পবে ফরাসীসদিগেব স্বাবাক্য সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। বিদেশীয় রাজারাজ্জ'বা একঘোট হইয়া তাহাদের চিরাভিলষিত স্বাবাক্যের মন্তকে বজ্রাঘাত কবিল।

ফরাসী দেশীয় ধর্ম্মদেবী আদিম বিপ্লব-কর্তাবা যেরূপ একটা বিশাল যহ-যজ্ঞের ফাঁদ ফাঁদিয়া কার্য্যারম্ভ কবিতা ছিলেন, তাহা দক্ষ্যজেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। সে মহাযজ্ঞে বড় বড় দেবতাদের সবাইকেই বিহিত বিধানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সাম্যদেব'কে (Equalityকে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, মৈত্রী দেবীকে (Fraternity কে)

নিমন্ত্রণ কবা হইয়াছিল, স্বাধীনতা দেবীকে (Liberty কে) নিমন্ত্রণ কবা হইয়াছিল; কেবল শিব'কে (মঙ্গল'কে) এবং সতীকে (সদ্ধর্মকে) অপমানিত কবিয়া ঠেলিয়া রাখা হইয়াছিল। কুহকিনী অবিজ্ঞা-দেবীর ভাষ্কর্যমতী (enlightenment) নামের ভেঙ্কি বাজিতে দেশবিদেশে সাম্য ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে হইবে—এই ছিল যজ্ঞ-কর্তাদিগেব প্রাণগত সংকল্প। এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপাবেব প্রস্তাবনা শেষে গড়াইল আসিয়া কোথায়—ওনিবে? ব্রাহ্মের ভবিষ্যৎ খ্রীসমুদ্ভিব সমস্ত আশাভরসা প্রথম নেপোলিয়নের সঙ্গে সেন্ট হেলেনায় গোর প্রাপ্ত হইল; তাহার পরে তাহার ছিটা ফোঁটা যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাকি ছিল, তাহা দ্বিতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলণ্ডে গোর প্রাপ্ত হইল। গড়াইল আসিয়া এইখানে!

পক্ষান্তরে মার্কিন দেশীয় স্বাধীনতা পন্থীরা ধর্মকে উল্লঙ্ঘন কবিয়া একটি কথাও মুখে উচ্চারণ কবে নাই—একটি কার্যেও হস্ত প্রসাধন কবে নাই, অপর কোনো জাতিব জ্ঞাত্য অধিকারেব অন্তঃপাতী স্বচাগ্র পরিমাণ ভূমিবওও—দ্রুতপ্রসারণ কবে নাই; আবার তাঁহাদের নেতা যিনি ওয়াশিংটন্ তাঁহাব তো কথাই নাই! তিনি সাক্ষাৎ ধর্মের অবতার ছিলেন বলিলেই হয়। তাই তাঁহাদের স্বাধীনতার জয়-পতাকায় “যতো ধর্ম ততো জয়ঃ” স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিতেছে তাবকা-বেশে।

॥ ১ ॥ তোমার ওকথা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম—যদি ইংরাজের নিকটে ব্যারেরা যুদ্ধে পরাজিত না হইত।

॥ ১ ॥ কে বলিল ব্যারেরা পরাজিত হইয়াছে—পরাজিত হইতে তাহাদের শত্রুপক্ষেরাই পরাজিত হইয়াছে। ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক যিনিই যাহা বলুন না কেন, তাহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা দিবালোকের জ্ঞান স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে, বিগত ব্যার যুদ্ধে ইংরাজদিগেব লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ধনহানি, মানহানি এবং প্রতাপহানিব একশেষ হইয়াছে। কিন্তু ব্যারদের কি হইয়াছে? কিছুই হয় নাই! বরং তাহারা পূর্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা জাতীয় গৌরব-নোপানের অনেক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে—বই একধাপও নীচে নাবে নাই;—আর-যে-এখন কোনো বলবান্ জাতি তাহা-

দিগকে ঘাঁটাইতে সাহসী হইবে তাহার পথ জন্মের মতো অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যারদিগকে ধর্মপুস্তক হাতে করিয়া রণে অবগাহন কবিতে দেখিয়া ইংরাজ বণিকেরা মৃদুমন্দ হাসিতে পাবেন, এবং তাঁহাদের দেখাদেখি বঙ্গের ধামাধরেবা হাসির চোটে ভূত ভাগাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সহস্র হাসিলেও আমার এ বিশ্বাস একচুলও টলিবে না যে, ব্যারেরা যে, পরাজিত হইয়াও জয়ী হইয়াছে, তাহার কারণই ঐ—কি? না ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া।

বৃথা আমি অবশ্যে রোদন কবিতেছি! ব্যারদের, জাপানিদের এবং মার্কিনদের প্রদর্শিত মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত কি আমাদের জ্ঞান লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং লক্ষ্মীভ্রষ্ট বিপথপন্থীদিগের মনেব এক কোণেও স্থান পাইতে পারে? তাহা হইলে আব আমাদের ভাবনা ছিল না! আমরা এতদিন ঠেকিয়া শিথিয়াও এখনো আমাদের ঠেকিয়া শিথিবার আশ মিটিতেছে না। নৈবাজ্যই আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ; পিপীলিকাব পক্ষই আমাদের জয়পতাকা'ব আদর্শ; আর আমাদের রাজনৈতিক গোরা-গুর্কদিগের প্রসাদাৎ একটি জপমন্ত্র যাহা আমরা শিখিয়াছি তাহাই আমাদের ব্রহ্মাজ্ঞ, তাহা এই :—ঈশ্বর চাহিনা—ধর্ম চাহিনা—কেবল চাই স্বাধীনতা—খাঁটি স্বাধীনতা—যাহার গাত্রে ঈশ্বরের এবং ধর্মের নাম গন্ধও নাই সেইরূপ নিকটক স্বাধীনতা!”

॥ ১ ॥ তুমি এই যে সকল শত্রু শত্রু কথাগুলি বলিলে, তাহা হিতবাক্য হইতে পাবে, কিন্তু মনোহারী একটুও না।

“হিতং মনোহারিচ তুল্যং বচঃ।”

আমি তাই বলি যে, তোমার ব্যবস্থানুযায়ী তিন্ত হিতবচনের সঙ্গে একটু আধটু মনোহারি বচনের অনুপান মিশাইয়া উহাকে সুখসেব্য কবিয়া লইলে ভাল হয়। আমি একটা অনুপানের জোঁগাড় করিয়াছি—বোধ কবি তাহা চলিতে পারে; তাহা এই :—

স্বাধীনতা-পথেব আমরা নূতন ব্রতী। সে পথে যাত্রা করিবার সময় পদে পদে আমাদের যে ভুল ভ্রান্তি ব্যতিক্রম এবং পতন ঘটবে, তাহা ঘটবারই কথা। পাঠশালা ছাত্রেরা যেমন লিখিতে লিখিতেই ক্রমে ক্রমে হাত তাহাদের পাকিয়া ওঠে, তেমনি আমাদের দেশের স্বাধীনতা-পন্থীরা কোমর বাঁধিয়া

কাজ করিতে করিতেই ক্রমে ভুল ভ্রান্তি ব্যতিক্রম এবং পতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আপনা হইতেই ঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করিবে। পথেব মাঝখানে তাহা-দিগকে বিভীষিকা দেখাইয়া নিরুত্তম করিয়া দেওয়া উচিত হয় না।

॥ ২ ॥ কোনো পাঠশালার ছাত্র যদি আমাকে বলে যে, “লিখিতে লিখিতেই আমাব হাত পাকিয়া উঠিবে; ‘এটা ঠিক হয় নাই’ ‘ওটা ঠিক হয় নাই’ বলিয়া লোককে ‘বিরক্ত করিও না’ তবে আমি তাহাকে বলিব এই যে, ‘তোমার হাত পাকিবে তাহা তো জানি; কিন্তু চাও তুমি কি? ইজিবিজি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, না সুন্দর ছাঁদের লেখায় হাত পাকাইতে চাও—সেই কথাটি আমাকে ভাবিয়া বল।’ যদি ইজিবিজি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, তবে যথেষ্ট মতে লেখনী যেমন চালাইতেছ তেমনি চালাইতে থাকো;’ তাহা হইলেই ইজিবিজি লেখায় তোমাব অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে। পক্ষান্তরে, তুমি যদি সুন্দর ছাঁদের লেখায় হাত পাকাইতে চাও, তবে আদর্শ লিপি চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া, যত্নের সহিত তাহার প্রদর্শিত পথে লেখনী চালনা করিতে থাক;’ তাহা হইলেই ক্রমে তোমার হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মতো সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর হইয়া উঠিবে।’ আমি তাই বলি যে, স্বারাজ্য-পন্থীরা যদি বিধিপূর্বক অভীষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হ’ন, তাহা হইলেই ক্রমে ভালো’র দিকে, অর্থাৎ ইষ্টসিদ্ধির দিকে, তাঁহাদের হাত পাকিয়া উঠিবে দেখিতে দেখিতে—তা’র সাক্ষী জাপান; আর, তাহার পবিত্রত্ব যদি অবিধিপূর্বক স্বাভিমত কার্যে গড়লিকা-প্রবাহের তায় চোক কান বুজিয়া অগ্রসর হ’ন, তাহা হইলে অনিষ্টসিদ্ধির দিকে তাঁহাদের হাত পাকিয়া উঠিবে তরতর করিয়া; তার সাক্ষী—ফরাসীস্ রাষ্ট্র বিপ্লব। কাহাকেই বা আমি বলিতেছি বিধি, আর, কাহাকেই বা আমি বলিতেছি অবিধি, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে প্রণিধান কর :—

অবিধি।

(১) গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি’র প্রত্যাশা।

(২) স্বারাজ্যের যোগ্যতা-লাভে জলাঞ্জলি দিয়া স্বারাজ্যের অধম নাট্যাভিনয়।

(৩) জন্মভূমি যেমন মাতা, ধর্ম তেমনি পিতা, ইহা ভুলিয়া-বসিয়া-পাকিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা’ব দৌরাত্ম্যে পিতাকে দেশ ছাড়া করিয়া—মাতাকে “সুজলা, শ্রামলা” প্রভৃতি ঝুড়ি ঝুড়ি বাক্যালঙ্কার পরিধান করাইয়া কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা প্রদান।

বিধি।

(১) দৈন্যবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম মরিয়া থাকিয়া স্বাবাজ্যের যোগ্যতা-উপার্জন।

(২) বীতিমত জ্ঞানশিক্ষা এবং কাঙ্গ-শিক্ষা করিয়া বিহিত প্রণালীতে অভীষ্ট-সাধন করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা উপার্জন।

(৩) পুরাতন ভারতের ভগবদগীতা প্রভৃতি লোক-পূজ্য ধর্মগ্রন্থ সকলের বাক্যামৃত পানে আত্মাকে পবিত্র করিয়া নব্য-ভারতের হিতার্থে কাজের মতো কাজ করিয়া মানুষের মতো মানুষ হওয়া।*

* সংক্ষেপে বলিলাম, “গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্যামৃতপানে আত্মাকে পবিত্র করিয়া”—কিন্তু এই ক্ষুদ্র কথাটির ভিতরে ভাব-একটি বাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ বিশাল; এমনি বিশাল যে, তাহা রীতিমত বিবৃত করিয়া বাক্য করিতে গেলে একটা বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। এখানে তাহার ধ্বংস ইঙ্গিত-আভাস জ্ঞাপন করা ভিন্ন তাহার অধিক আর কিছুই হইতে পারে না। সে ইঙ্গিত-আভাস এই :—

খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল আছে; মুসলমানদিগের কোরান আছে; ভারতবাসীদিগের তেমন-তরো কোনো একটা ধর্মশাস্ত্র কি নাই? অবশ্যই আছে :—ভগবদগীতা। গীতা যেমন আকর্ষণ ধর্মশাস্ত্র; অত্যন্ত দেশের ধর্মশাস্ত্রের সহিত গীতাশাস্ত্রের প্রভেদও তেমনি আশ্চর্য্য প্রভেদ। তার সাক্ষী :—বাইবেলের পুরাতন বিধান ইহুদীজাতির ঐকান্তিক পক্ষপাতী; বাইবেলের নববিধান খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের ঐকান্তিক পক্ষপাতী; কোরান মুসলমানসম্প্রদায়ের ঐকান্তিক পক্ষপাতী, এমন কি তাহা কাকেরদিগের প্রতি ঋণগ্রহস্ত; কিন্তু গীতাশাস্ত্র পক্ষপাতের নামগন্ধও নাই—উটা আরো জগৎস্থত সর্বপক্ষের সমন্বয় তাহার পাতায় পাতায় গাঁথা রহিয়াছে। গীতাশাস্ত্র দেশ-কাল-জাত-নির্বিশেষে পৃথিবীস্থত মনুষ্য-মণ্ডলীর মহাশাস্ত্র। তা ছাড়া, তাহা জ্ঞানীর জ্ঞানশাস্ত্র; ভক্তের ভক্তি-শাস্ত্র, কর্মীর কর্মশাস্ত্র। এখানে আমি একটি ইংরাজি প্রবাহকেই সার করিতেছি—A word to the wise is sufficient। তা বই, সবিস্তরে গীতাশাস্ত্রের গুণ-কীর্তন একপ্রকার সমুদ্রে অর্ঘ্য প্রদান। ইহুদীরাধনার অমৃতরস, ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল জ্যোতি, যোগের তেজোজ্বল অধ্যাক্ষ-শক্তি, ধর্মের ভূতি, অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের পুরুষার্থ সাধনোপযোগী যত কিছু পাথের সমল আছে—ভগবদগীতা পাঠে সমস্তই হাত মেলিয়া পাওয়া যায়। ভারতের ধর্মশাস্ত্র জাতিবিশেষের ধর্মশাস্ত্র নহে, তাহা মনুষ্যের ধর্মশাস্ত্র—আত্মাব ধর্মশাস্ত্র। তাই তাহার বাক্যামৃতপানে আত্মা পবিত্র হয়—ভগবদ্বস্ত হয়—বিশ্বপ্রেমী হয়—কর্তব্যকর্ত্তে উৎসাহী হয়—সদানন্দচিন্ত হয়—অকুতোভয় হয়—সেজোময় জ্যোতির্গম্য এবং মধুময় হয়। ভগবদগীতাব ধর্ম গ্রহণ করিলে মনুষ্য হিন্দু হয় না, মুসলমান হয় না, খ্রীষ্টান হয় না, ইহুদী হয় না, প্রটেস্ট্যান্ট হয় না, কাথলিক হয় না; হয় তবু কি? না মনুষ্য। অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্টময় মনুষ্য—মানুষের মতো মানুষ।

শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর।

ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা ।

(পিরিউর ফরাসী হইতে) ।

২

২৭ ডিসেম্বর, মধ্যাহ্নে রাষ্ট্রীয় মহাসভার ষোড়শ অধিবেশন । মণ্ডপ-শালাটি কৃত্রিম-গথিক-ধরণের একটা বিশাল দালান, এন্জিনিয়ারবরা এইরূপ মিশ্র-ধরণের ইমারৎ রেলওয়ে ষ্টেশানেব জন্ত, ক্যাথিড্রাল-গির্জাব জন্ত, আদালতের জন্ত, শুদোম ঘরের জন্ত নির্বিশেষভাবে নির্মাণ কবে । মালা ও পতাকায় বিভূষিত হাওয়ায় মণ্ডপটি উৎসবের ভাব ধারণ কবিয়াছে । ইহার পার্শ্বদেশে চটুচটে ভিজা ময়দানের উপর, প্রতিনিধিগণ তাঁবু পাতিয়া রহিয়াছেন । উঁহাঁবা তাঁবুতেই আহার করেন, তাঁবুতেই শয়ন করেন । একটা ওষধের দোকানের পাশে, অনেকগুলো পুস্তকের দোকান বসিয়াছে, উহার উদ্দেশ্য-পত্র (prospectus) বিলি করিতেছে, মোক্ষমূল্যের গ্রন্থাবলী, বেদ, স্পেন্সারের “First Principles”, লোকদিগকে দেখাইতেছে । কেহ বা ম্যানি বেসাস্তের থিয়সফি-সংক্রান্ত পুস্তিকা সকল বিক্রয়ার্থ চারিদিকে ঘুবিয়া বেড়াইতেছে । যাহারা মণ্ডপেব অভ্যন্তরে স্থান পায় নাই—কতকগুলি বক্তা তাহাদের সম্মুখে খোলা জায়গায় বক্তৃতা করিতেছে । এই শীতকালের দিনে, ধূসর বস্ত্রাধারী প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ীওয়ালা জনতার মধ্যে, লম্বা ও পাতলা পাঞ্জাবীরা সকলের উপরে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে ।

যে পার্শ্ব-প্রতিনিধির সহিত আমি এবত্র ভ্রমণ কবিয়াছিলাম, তিনি আমাকে ‘কমিটির’ পাশে সম্মানের আসন-মঞ্চের উপর বসাইলেন । আমার পাশে দুইটি হিন্দু মহিলা ছিলেন ; তাহার মধ্যে একটি বিধবা, পুনর্বিবাহ করিয়া অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন এবং আজ তিনি পুরুষদের সম্মুখে কথা কহিবেন । এইবার অধিবেশনের কার্য্য আবস্ত হইল : আসন-শ্রেণীর উচ্চ হইতে নিম্নগত পর্য্যন্ত, বন্দুকের দেউড়ের মত কবতালি ধ্বনিত হইল, এবং যখন নির্ধারিত সভাপতির নাম সকলের কাণে পৌছিল তখন যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—একপ সম্মোহে করতালি হইতে লাগিল । সভাপতি—বোম্বারের উকীল চন্দাবর্কার । যেক্রপ ভীষণ শব্দ কোলাহল—প্রথমে ভাবিয়াছিলাম জনতা বুকি মাতাল

হইয়াছে ।……কিন্তু তাহা নহে, “ঘবেব ছেলে আবার ঘবে ফিবিয়া আসিয়াছে”, তাই এই উৎসব । চন্দাবর্কার গোড়াকার একজন কন্নী । কিন্তু কোন ব্যক্তিগত কাৰণে, এই দশ বৎসবকাল তিনি কংগ্রেস্ হইতে তফাৎ ছিলেন । তিনি বক্তৃতা কবিবার সময় যখন তাঁহাব সেই হিন্দু যোগী-স্থলভ প্রশান্ত, সংসার-বন্ধনমুক্ত, সুন্দর মুখখানি, উত্তোলন করিলেন, সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী একজন ধর্ম্ম-নেতার হ্রায় তাঁহাব কথা শুনিবার জন্ত ব্যগ্র হইল ; আজ সন্ধ্যাতেও একটা ধর্ম্ম-মন্দিরে তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ লোকে শ্রবণ করিবে । কি হৃদয়গ্রাহী চিত্রবৎ দৃশ্য ! শ্রোতৃমণ্ডলী যখন চন্দাবর্কারকে দেখিয়া জয়ধ্বনি করিতেছিল এবং পার্শ্ব দাদাভাই ও বাঙ্গালী কেশবের নামে সিংহনাদ কবিতেছিল, তখন ভাবত-সন্তান-দিগেব মনে, তাহাদের সাধারণ জননী ভারতভূমিই যেন স্পন্দিত হইতেছিল ।

সভাপতি, “প্রতিনিধি-ভাইদিগকে” সম্বোধন কবিয়া, জলন্ত অনুরাগ ও আদবেব স্ববে সম্বোধন করিতে লাগিলেন । তিনি যুরোপীয়ধরণে পবিচ্ছদ পবিয়াছিলেন ; একটা আঁটসাঁট লম্বা ‘ফ্রক্ কোট্’, কিন্তু মাথাব পাগড়ীটা বজায় রাখিয়া-ছিলেন । কার্য্য নির্বাহক সমিতির সকল সভ্যেরই মাথায়, দেশীয় শিরোবেষ্টন,—কাহারও মলমলের, কাহারও রেশমের, গোলাপী, জর্দা, বেগুনি প্রভৃতি নানা রঙ্গের ; এবং তাহাদের গুশ্শরাঞ্জিও সূক্ষ্ম ও উজ্জলকাস্তি ; পার্শ্ব-প্রতিনিধিটির মাথায় সাদা ধুচনী-টুপী, এবং বাঙ্গালী বাবুদের মাথায়, গ্রীক্-পোপ্-দের মত কালো কিনারা হীন টুপী…… যে পার্শ্বটি আমার পাশে বসিয়াছিলেন তিনি আমাকে বলিলেন ;—“জাতিতত্ত্ব সংক্রান্ত একটা ‘মিউজিয়ম’ তোমার সম্মুখে উপস্থিত ।” বাস্তবিক, মাথার-খুলী-পবীক্ষকেব পক্ষে কি নয়ন-রঞ্জন দৃশ্য ! শিখেরা লম্বা ও পাতলা, উহার ঝাড়া হইয়া দাঁড়ায় ; বাঙ্গালীদের মুখ স্থূল ও কোমল ; পার্শ্বদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মুখের এক পাশেব অবয়ব-বেধা শকুনির মত ; মাদ্রাজিদের চাঁচা পোঁচা, চ্যাপটা, ফোঁটাকাটা তিলক-চর্চিত মুখ,—পশমি-গলাবন্দে ধানিকটা আচ্ছাদিত । আশ্চর্য্য রকম সন্ন ও অস্থিসার হাত, গায়েব চামড়া রোক্তপোড়া, শ্রামল, সাদা ও কালোর অন্তবর্তী সকল প্রকার রং ; ল্পকান, আচ্কান, অম্পষ্ট ধরণের যুরোপীয় ফ্রক্-

কোট, কাশ্মীরি কাপড়, সাদা মলমল—এই সমস্তই বংবেরং আধা-বিলাতী ভারতের বহির্বাণ ; ভাবতের এই সকল লোকই সভ্যত্বের সমাসীন।

চন্দাবর্কার বিপ্লবকারী দলের লোক নহেন। “ইনি মিতবাদী, রাজভক্ত প্রজা, আনাদের একজন মিত্র”—এই কথা, Times of India'র পবিচালক আমাকে বলিলেন। কিন্তু দেখিবে, এই মিত্রটি খুব স্পষ্টবক্তা। আশাময় সুখের ছবি আঁকিবার এ সময় নহে। হুর্ভিক্ষ ত ভারতের একটা পুৰাতন রোগের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এবার আবও ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে; এরূপ মাঝাক্ষর হুর্ভিক্ষ হুর্ভিক্ষেব ইতিহাসে অজ্ঞাতপূর্ব। বাগ্মী বলিলেন;—“তোমাদের বিগত অধিবেশনের পর হইতে ভারতের উপর দিয়া একটা ভয়ানক বিপদ চলিতেছে... ভারতের কর্তৃপক্ষ স্বীকার কবিয়াছেন, এরূপ দাক্ষ হুর্ভিক্ষ ভাবতে আর কখন হয় নাই...বর্তমান সময়ের এখন যেটি মহাসমস্তা, সেই সমস্তাটি কতটা গুরুতর ও জরুরী,—এই হুর্ভিক্ষ, দারী কর্তৃপক্ষকে চোখে বাস্তব দিয়া দেখাইল; ইহাতে আর কিছু না হউক, সবকারের একটা শিক্ষা হইয়াছে।” স্থূল কথাঃ—ভাবত অনাহারে মরিতেছে; তাহার অন্ন চাই। অতএব এ সমস্তাটি এমন নহে, যাহাব আলোচনা অল্প দিনের জন্ত স্থগিত রাখা যাইতে পারে। আজই এবিষয়ের একটা মীমাংসা করা কর্তব্য। ত্রিশকোটি ভারতবাসীর পক্ষে ইহা একটা জীবন-মরণের সমস্তা।

দেখ, কেমন সময়ে ১৯০০ অব্দের কংগ্রেসের অধিবেশন আবস্ত হইয়াছে। এরূপ বিষাদ-অন্ধকার ইহাব পূর্বে কেহ কখন দেখে নাই। তার পর ভাবিয়া দেখ, শাসন-কার্যে যে জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান, সৌভাগ্যের বিষয়, ভারত সেই জাতির দ্বারা পরিশাসিত হইতেছে—আর, ১৫০ বৎসর হইতে এই শাসনকার্য চলিতেছে; ভাবিয়া দেখ, ভারতে কত খাল আছে, কত রেল-পথ আছে...ইহার গুঢ় রহস্তটা এইখানেই, এই রহস্তটি উদ্বেগ করা আবশ্যক।

চন্দাবর্কার বলিলেন, এখানে ইংরাজের রাষ্ট্রনীতিই ধোরতব অপবাদী। এই রাষ্ট্রনীতি সমস্তই উপেক্ষা কবিতোছে, সমস্তই ঘটিতে দিতেছে, ইহা একেবারেই

উদাসীন : একি কখন কল্পনা করা যায় যে, আপনা-আপনিই সব ছরস্ত হইয়া আসিবে? যখন উহাবা প্রতিবিধানকল্পে কোন কাজে হাত দেন, তখন কি ভাবে কাজ কবেন? এখানে একটা গর্তের মুখ বুজাইয়া দেন, ওখানে একটু ফাটার মুখে কাঠ গুজিয়া দেন, যেখানে একটু চাঁদ খাইয়াছে, যেখানে একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উপস্থিত মত সেই সেই স্থানে টুকি টাকি মেরামৎ করেন। এ সমস্ত টুকুবাটাকুরা মেরামৎ না করিয়া, শুধু প্রশমনকারী ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া, একটা সর্বতঃ-প্রসারিত দৃষ্টির দ্বারা, অনিষ্টেব সমস্ত কাণ নিরীক্ষণ করিয়া, উহাদিগকে সমূলে উৎপাটন কবা আবশ্যক...ইহাদেব এই শাসন যন্ত্রটা অত্যন্ত গুরুতর ও মহুরগামী; কমিসন্ বসে, পরামর্শ সভা বসে, রিপোর্ট গাদা করা হয়, কিন্তু কাজে কিছুই হয় না এই কথাটা আমার কানে বাজিল; ইহার পূর্বেও এই কথা আমি অন্তর্য শুনিয়াছি। অসম্ভব লোকেরা আমাদের সরকারী কচারীবর্গের কার্যসম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরাজের এমন নিয়ম-পদ্ধতি, এমন চমৎকার সিভিল সার্ভিস,—ইহাবা সমস্ত উন্নতি-জনক কার্যের স্বতঃপ্রবর্তক,—এমন “বাদশাই-জাতি” ?—এ সমস্তই আকাশ-কুসুম!

দুই তিনটি সুবিধাজনক অলস কুসংস্কার—এই জড়বৎ বাস্তবকৃষবর্গের দুইটি কাণ। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, “হুর্ভিক্ষ অনিবার্য, কেন না ফসল জন্মায় না, বৃষ্টি হয় না” পূর্বাপেক্ষা কম বৃষ্টি হয়, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? M. De Buelow'র ভ্রাতৃ কেহ কেহ আবার বলেন:—ইহা হিন্দুদেবই দোষ, উহাবা “ধর্গোসেব ভ্রাতৃ বংশবৃদ্ধি করে।” আরও একটা বলবৎ কারণ,—উহারা উৎসবে, তোজে, বিবাহে আপনাদিগকে সর্বস্বাস্ত কবিয়া ফেলে... চন্দাবর্কার বলেন, যে সকল কথা উহাদের পক্ষে সুবিধাজনক, সেই সকল অযুক্তিপূর্ণ কারণের উল্লেখ করিয়া উহারা চোখ বুজিয়া থাকেন; চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেও উহারা দেখেন না যে, হুর্ভিক্ষের দারুণতা ও ব্যাপকতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, কারণ সর্বস্বাস্ত চাষা অর্থ সঞ্চয় কবিতে পারে না, তাই অগত্যা ধর্মগের কবলে পতিত হয়! ইহাই প্রকৃত কথা, এবং পাছে নিজের উৎসব-আমোদেব ব্যাঘাত

হয় তাই এই দাকণ সভ্যটি রাজপুকুৰেবা একপাশে সরাইয়া
রাখেন। চন্দাবৰ্কার বলেন, তাইস্বয়ং প্রদত্ত তথ্য-
তালিকা হইতে আমি এই সকল সংখ্যাঙ্ক সংগ্রহ কৰিয়াছি।

ব্যবস্থাপক সভায় সম্ভাষণকালে বড়লাট নিজেই চাষায়
আয়েব অঙ্ক ১৭ টাকা বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। ইহাই
সুৰুষ্টি ও সুজন্মা বৎসরের আয়। এই অবস্থায় চাষাকে
কি বলা যাইতে পারে, তোমাদের এই মুখের গ্রাস
হুইভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ হৰ্বৎসবের জন্ত
বাখিয়া দেও ?

ইংরাজসরকার এক একবার হঠাৎ জাগিয়া ওঠেন,
হঠাৎ এক একবার তাঁহাদের মনে দয়াব আবেশ উপস্থিত
হয়, তাঁহাদের প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি অববিকারেব রাষ্ট্রনীতি,
মৃগীযোগেব রাষ্ট্রনীতি ! মহাজনেব উপব আড়ী কবিয়া
উঁহারা তাড়াতাড়ি চাষাব সাংখ্যো ধাবিত হয়েন। উঁহারা
এইভাবে কতকটা কাজ কৰিয়াছিলেন ; কিন্তু ইংরাজ-
সরকাৰের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা শুধু একটা চোখ ভুলানো
জিনিস। এটা বেশ জেনো, যাতে সরকারের বিৰুদ্ধে
চাষা আত্মরক্ষা কৰিতে না পারে সে বিষয়ে সবকাৰেব
বিশেষ দৃষ্টি আছে,—সরকার মহাজন অপেক্ষাও অধিক
অর্থলোলুপ ! এদিকে চাষা, এত বেশী খাজনা দিতে
পারে না বলিয়া চীৎকার কৰিতেছে, ওদিকে রাজস্বের
কৰ্মচাৰী খাজনা আদায়েব জন্ত ঘাটিদিয়া বসিয়া আছেন।
মনে কব, কোন চাষা,—সুজন্মাব দকণই হউক, খাল-
কাটার দকণই হউক, রেল আসাব দকণই হউক—ফসলের
কিছু বৃদ্ধি কৰিতে পারিয়াছে ; অমনি রাজস্ব-কৰ্মচাৰী
তাঁহাব খাজনাৰ হাব বৃদ্ধি কৰিলেন। উৎসাহ দিবার
চমৎকাৰ পদ্ধতি ! আব একটা দৃষ্টান্ত :—লৰ্ড মেয়ো কৃষি-
সচিবের পদ প্রতিষ্ঠিত কৰিয়াছিলেন—সে পদটা তাঁহার
সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইল। একদিন তাঁহাদের মনে হইল,
তাঁহাদের কাৰ্য্যপদ্ধতি সমস্ত উল্টাইতে হইবে ;—এই
মনে কৰিয়া তাঁহারা আপনাৰ ব্যবসাই বোঝেন না তাঁহারা
চাষাকে চাষাব ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে উদ্বৃত্ত হইলেন।
আবাব পৰদিনই তাঁহাদের হঠাৎ মনে হইল,—না, পুরাতন
পদ্ধতিটাই ঠিক। চাষাদের কাৰ্য্য চাষাবা পূৰ্ণতায়
উপনীত হইয়াছে ; উহাদিগকে নূতন শিক্ষা দিবার কিছুই

নাই। কলত, এতদিনের মধ্যে আসল কাজ কিছুই হয়
নাই।

তাঁহার পর বাগ্‌মী, সবকাৰের শিল্পসম্বন্ধীয় নীতিব
কথা উপস্থিত কৰিলেন। এই বাজভক্ত ইংরাজের মিত্র,—যে
বিষয়ে বলিতে খুবই সঙ্কোচ হয় সেই বিষয় সম্বন্ধেও
কতকগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট কথা তাঁহার মিত্রদিগকে শুনাইয়া
দিয়াছেন। আরও কতকগুলি বলবত্তব স্বার্থ যদি তাঁহার
মিত্রদিগকে অঙ্ক কৰিয়া না বাখিত, তাহা হইলে তাঁহাব ঐ
উত্তেজনা-বাক্য তাঁহাদের ধৰ্মবুদ্ধিকে নিশ্চয়ই উদ্বোধিত
কৰিতে পারিত। প্রথমে,—বাহা সৰ্বসাধাণের মনোগত
ভাব তাহাই বাক্যে ব্যক্ত কৰিয়া তিনি বলিলেন, যাহাতে
আমাদের যুবকেরা হাতেব কাজ কিছু শিক্ষা কৰিতে পারে
এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবহারিক-শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত
করা নিতান্তই আবশ্যক। আমি ভাবতে আসিয়া অবধি
সংবাদপত্রে সভাসমিতিতে, এই বিষয়েরই কথা সৰ্বত্র
শুনিতোছি। একথা খুবই ঠিক, যে দেশে ধানের দিকেই
লোকের বেশী ঝোঁক সে দেশে মিল্কিকৰ্মের শিক্ষানবীসী
নিতান্তই আবশ্যক। পর বৎসরে, যখন আবার চন্দা-
বৰ্কেবের সহিত ফ্রান্সে আমাব সাক্ষাৎ হইল, তাকে আমি
জিজ্ঞাসা কৰিলাম, এই বিষয়টা কতদূৰ অগ্রসর হইয়াছে।
“একই ভাবে আছে, কিছুই অগ্রসব হয় নাই। এবিষয়ের
কথা অনেক হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ সবকাৰ এই
বিষয়ে কোন সাহায্য কৰিলেন না, কোন ভারই গ্রহণ
কৰিলেন না। তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা ও যত্নেব
উপবেই নির্ভৰ কৰিয়া আছেন।” এই সমস্তাব আর এক
দিক আছে, বাগ্‌মী সেটি বেশ বিষদ কৰিয়া দেখাইয়া
দিয়াছেন। সাদা কথাটা এই :—ভারত ব্যবসা-বাণিজ্যেব
উন্নতি কৰিবে, ইহা ইংলণ্ড মোটেই চাহে না ; ম্যাঞ্চেষ্টাৰেব
কাপড়ের কাট্‌তির জন্তই ভারত রহিয়াছে। ইংলণ্ডেব
বড় বড় কাৰখানাওঘালাবা বড়লাটেব হাত আটকাইয়া
বাখিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইংরাজেব বিধিব্যবস্থা যতই
স্বার্থপৰ ও গৰ্হিত হউক না কেন, কোন প্রতিবাদই সেই
সকল বিধিব্যবস্থাকে ঠেলিয়া বাখিতে পারে না। প্রথমত,
ম্যাঞ্চেষ্টাৰেব কাপড়ের শতকরা ৫ টাকা যে প্রবেশ শুল্ক
ছিল তাহা বহিত হইল। তাহাতেও যখন প্রকৃত অভিপ্ৰায়

সিদ্ধ হইল না, তখন বড়লাট দেশীয় কলের কাপড়ের উপর আন্ত্যন্তবিক (excise) শুল্ক স্থাপন করিলেন—বাহাতে দেশীয় কাপড় ক্রয় করা ক্রেতাদের পক্ষে হুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভারত অনাহাবে মরিতেছে; কিন্তু বড় বড় কারখানাওয়ালাদের বেশ উদর পুষ্টি হইতেছে। এই স্বার্থপরতাকে, উচ্চভাবের বড় বড় কথা দিয়া ঢাকিবার আবশ্যক কি? Lord Salisbury শতকরা ৫ টাকা হারেব প্রবেশ-শুল্ক বহিত কবিবাব সময় যে চমৎকার হেতু প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা আমাব বেশ স্মরণ হয়। “ভাবতেব কল-কারখানার তরুণ শিল্প বড় শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতেছে, উহাব এই অতিক্রম বৃদ্ধি নিবারণ করা আবশ্যক।” এই আশীর্ব্বাদময় উচ্চারণ কবিবাই তিনি দেশীয় কারখানা-গুলাব অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এ যেন একজন দস্যু কোন পথিককে বাস্তায় পাকড়াও কবিয়া বলিতেছে:—“তাই আমি দেখছি, তুমি বড় মোটাচ্ছ—তোমাব ভুঁড়ি বাড়িয়া যাইতেছে—এ বড়ই হুঃখের বিষয়...আমি নির্মূল করিয়া তোমার বোগটা সারাইয়া দিব—এস তোমাব ভুঁড়ী গালিয়া দিই—আর তোমার ঐ টাকার থলিয়াটা...”

কিন্তু তবু ভাবত কিছুই বেশী দাবী করিতেছে না। ভারত শুধু নতুনভাবে বলিতেছে,—ইংরাজ তুমি যে আমা-দিগকে বন্ধা করিবাব ভাগ কবিতেছ এ মিথ্যা ভাগ ছাড়িয়া দেও, মাঝেঠাবের কাপড়ের স্থায়, ভাবতে ভাবতীয় দ্রব্য-জাতকেও নিঃশুল্ক করিয়া বিক্রয়েব পথ মুক্ত করিয়া দেও। বাগ্মী আবও চাহেন যে, রুড়কী ও লগুনের এঞ্জিনিয়ারিং কালেক্স যাহা ভাবতের অর্থে পবিপোষিত হইতেছে তাহাব দ্বার দেশীয়দেব জন্তও মুক্ত রাখা হয়। এ কথা কি গ্রাহ্য হইবে? না। এ সকল মোটা মোটা বেতনের কাজ, ইংবাজ এঞ্জিনিয়ার, ইংবাজ কার্য পবিচালকদেব জন্ত বক্ষিত; এই সকল মোটা বেতনেব কাজ পাইবাব জন্ত ইংলণ্ডের লোক দাপাদাপি কবিয়া বেড়াইতেছে! এই সকল কাজের গুপ্ত ভিক্ষুক অনেক, কিন্তু অল্প লোকই নির্ধাচিত হইয়া থাকে। এই নির্ধাচনেব কত প্রার্থী, কত ক্ষুধিত লোক, কত উমেদাব কাজ পাইবার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই!

তারপব, ভাবত, শাসন-ব্যয় ও সামবিক-ব্যয়ের ভারে একেবারে হুইয়া পড়িয়াছে। ভারতের তহবিল—ইংলণ্ডের যুদ্ধ-ভাণ্ডার; ভাবতের গড়খাই ছাউনি হইতেই ইংলণ্ড, আফগানিস্থানেব উপব, তিব্বতেব উপব, চীনের উপব, ব্রহ্মদেশেব উপব, এমন কি ঈজিপ্টেব উপব আক্রমণ করিয়া থাকেন। যে ভাবত চীরবসন পবিধান করিয়া আছে, অনাহাবে মরিতেছে, সেই ভারতকে এই সকল আমীরী-চালের রাজপুরুষদের জন্ত, —এই সকল রাজ-পুরুষদের বিলাসসামগ্রীব জন্ত, অর্থ যোগাইতে হইবে... উহাবা প্লেগের অছিলা করিয়াও কি ভারতকে শোষণ কবিতেছে না? উহারা ভাবতেব ব্যয়ে, ইংলণ্ড হইতে ডাক্তাব আনিতেছে, বোগ-সেবকদিগকে আনিতেছে—

দেশের এই ভীষণ অবস্থায়, প্রতিবিধানের উপায় কি? একটুও কালবিলম্ব না করিয়া, উত্তমের সহিত ইহাব একটা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, শুধু ভাসা-ভাসা উপায় না—এমন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক যাহা মূল পর্ধ্যন্ত স্পর্শ করিতে পাবে। ধাক্কনা কমাইতে হইবে, কৃষিবিভাগে একজন সচিব নিযুক্ত করিতে হইবে, অধিক পরিমাণে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে, দেশীয় পণ্যকে অস্ত্যত দেশের মধ্যে অবাধ কবিয়া দিতে হইবে!

এই বক্তৃতাটি একটা দলিল বিশেষ। তাই এই বক্তৃতাটিকে আমি এত প্রাধান্য দিতেছি। বর্তমানকালে দেশেব যে সকল দাবী দাওয়া আছে, বাগ্মী সংক্ষেপে সেই সমস্তেব উল্লেখ কবিলেন। তিনি বর্তমান সমস্তা গুলির সমালোচনা কবিলেন, এবং কোন প্রকাব উগ্রতা প্রচণ্ডতা কিম্বা উত্তেজনা প্রদর্শন না করিয়া বেশ শাস্তভাবে ঐ সকল সমস্তা সম্বন্ধে দেশীয় লোকেব কি অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করিলেন। তাহাব এই বক্তৃতাটি বাস্তবজ্ঞ মিতবাদী ভারতের মনের কথা।

সভাপতি সভার কার্য-তালিকা ধবিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিবাব জন্ত আহ্বান করিলেন, এবং সভার নির্ধারিত প্রথম প্রস্তাবটি পাঠ কবিলেন। সভায় বক্তা অনেক, প্রোতাও অসংখ্য। প্রতিনিধির সংখ্যা এক সহস্রের অধিক। সভার বিচ্ছিন্ন উপাদান, সময় সংক্ষিপ্ত; সভাগণ বৎসরের মধ্যে শুধু একবার সকল বিষয় ছুইয়া যান মাত্র

কিন্তু এলোমেলো ভাবে নহে, অস্পষ্ট ভাবে নহে ;—
আমাদের পার্লেমেন্ট-অঙ্গনে এই দৃষ্টান্ত অমুকবর্ণেব যোগ্য ।
ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্তর্বিবাদ হইবে, বিচ্ছেদ
ঘটিবে, বগড়া বাধিবে বলিয়া ঐহাবা ভবিষ্যৎবাণী করিয়া-
ছিলেন, তাঁহা বা তাঁহাদের ভবিষ্যৎবাণীর মূল্য আদায়
করিবাব জন্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনার ভাব হইতেই হউক, কিম্বা
আত্মমর্যাদার ভাব হইতেই হউক, বক্তাবা নাটকীয় ধরণের
অঙ্গভঙ্গী, রাজা-উজীর মারার ভঙ্গী, বিরক্তিক্রমক ভঙ্গী
সময়ে পরিহাব করিয়া ছদ্মবেশী বিপক্ষদলের সকল চেষ্টা
ও মংলব ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন । এই বিষয়ে একটা
ঐকমত্য ছিল । তবে, এই সভার মধ্যে কোন্ দল বেশী
বেশী দাবী কবে, কোন্ দল একটু বেশী ভীত, উহাদের
মধ্যে কাহার “দক্ষিণ পক্ষ” কাহার “বাম পক্ষ”—উহাদের
মধ্যে প্রকৃতিগত তাবতম্য কিরূপ, তাহা বোঝা কঠিন
নহে ।

নির্দ্ধারিত প্রস্তাবগুলি ঐকমত্য-সহকারে গৃহীত হইল ;
সভাসমিতিতে এরূপ ব্যাপার অনন্তসাধারণ । সকল
বক্তাই প্রস্তাবের সমর্থন কিংবা পোষকতা করিতে লাগি-
লেন । তবে কি, অনুকূলবাদীদিগকে বাছাই কবিয়া
লইয়া প্রতিকূলবাদীদিগকে বহিষ্কৃত কবা হইয়াছিল ?—
না, তাহাও নহে । ঘর অবিরত ছিল । সমস্ত ভাবতের
লোক, এক পরিবারের মত, ঘাব রুদ্ধ না করিয়া, আপনাদের
স্বার্থসম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিতেছিল । ভারত কথা
কহিতেছেন—আর সমস্ত রাখাল-বালক যেমন ক্রুরের
বংশীধ্বনি শুনিয়া চারিদিক হইতে আসিয়া জোটে, সেইরূপ
ভারতের সমস্ত প্রতিনিধি এখানে সমবেত হইয়াছেন ।

এই সভায় অনেকগুলি বাগ্মী আছেন, ভাল ভাল বক্তা
আছেন, ভাল কথা-কহিয়ে লোক আছেন, তাঁহারা
অতীব দক্ষতার সহিত ইংরাজি বলেন । একজন
ইংরাজ আমাকে বলিতেছিলেন ;—“উহারা বেশ ইংরাজি
বলে, আমাদের অপেক্ষাও ভাল বলে ; আমাদের ভাষা,
উহাদের মুখে, একটা অজ্ঞাতপূর্ব সৌন্দর্য লাভ করে ।”
হাঁ, উহাদের ইংরাজিতে কেমন একটা তবলতা, কেমন একটা
প্রাচ্যধরণের অলস উচ্চ্বাসের ভাব আছে । তবে, উহাদের

ইংরাজি উচ্চারণে একটু বৈদেশিক ‘টান’ আছে । বক্তাদের
মধ্যে, চন্দাবর্কাবেব বক্তৃতা সর্বাপেক্ষা মধুর ও তাঁহাব
বক্তৃতায় হিন্দুস্ত সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশ পায় ।
তবে, বাঙ্গালীরা তাঁহাবও উপব টেকা দিয়াছে ; ‘র্যাডি-
ক্যাল’ বক্তা ব্যানার্জি শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়া তুলিলেন ।
তাঁহার বক্তৃতায় লাহোরের ছাত্রবৃন্দ খুব হাততালি দিতে
লাগিল । ব্যানার্জি খুব উৎসাহেব সহিত ‘দাঙ্গাব’ মধ্যে
প্রবেশ করিলেন, একবার বামে, একবার দক্ষিণে, গবর্ণ-
মেন্টের জঙ্গলে, অনবরত কুড়ালীব ঘা মারিতে লাগিলেন ।
ইনি ইংরাজসরকারেব একজন ভূতপূর্ব কর্মচারী—ইংরাজ-
সরকার অজ্ঞায় করিয়া ইহাকে কর্মচ্যুত করে । পুণাব
সংবাদপত্র-পরিচালক তিলক,—একজন পণ্ডিতলোক, কাজেব
লোক, একজন উৎসাহী “জাতীয়-পন্থী,” (nation-
alist) ইনি সম্প্রতি জেল হইতে বাহিব হইয়া আসিয়াছেন,
ইহার তীব্র লেখনীই ইহাকে কারাগারে নিঃক্ষেপ করিয়া-
ছিল । এখন ইনি লোকের পূজাব পাত্র । এই সকল
প্রবীণ বধীদের পাশে ছেলের দল, শিক্ষানবীসের দল ।
ইহাদের গারে এখনও ছুধের গন্ধ ছাড়ে । ইহার আলম্বা-
বিক ধরণে, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ‘মরিয়্য’ হইয়া লোকদিগকে
উদ্বোধিত কবিতে লাগিল । ইংরাজি-অনভিজ্ঞ কোন কোন
ব্যক্তি স্বদেশী ভাষায় বক্তা করিল । এই বক্তৃতাব ভাবা
সকলেরই খুব পবিচিহ্ন হাতে হাতেরস আঁইছ, চলিত
প্রবাদ ও প্রবচনে ইহা রিপূর্ণ,—এই বক্তৃতায় সভাস্থ
লোক প্রভুল্লিত হইয়া উঠিল ; কেহবা উর্দুতে, কেহবা
গুজরাটীতে, কেহবা বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিল ; এই ভাষা-
বৈচিত্রের মধ্যে ইংরাজ, ভারতের অদ্ভুত ঐক্য উপলব্ধি
করিতে পাবেন ।

যে সকল প্রস্তাব ঐকমত্য-অনুসাবে সভায় গৃহীত
হইল তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি । বুঝিতেই পাবিতেছ,
এই সকল প্রস্তাবেব মধ্যে অশরীরী প্রেমের ভাব
(platonic) কিছুই নাই । কোথায় কে ফুস্ ফুস্ করিল,
কোথায় কে টু-শব্দ করিল, বাতাসের গতি কোন্ দিকে,
লোকমতের কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে,—ইংবাজ সজাগ-
ভাবে সর্বদাই কাণ পাতিয়া রহিয়াছেন । ইংবাজের অনেক
বিধিব্যবহার এই কথা সপ্রমাণ করিয়াছে । ইহা বেশ

জানাই আছে, ইংরাজ-সিংহ সিংহ-গ্রাসটা আপনাব জন্তই বাখিয়া দেন। যে সকল দুঃখ কখনই ঘোচে না—সর্বদাই বর্তমান—সেই সকল দুঃখের কথা, অদম্য জ্বিদের সহিত, কংগ্রেসে, প্রতি বৎসব পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হইয়া থাকে ;—এই আশায় যে বড়লাটের দববারে ইহাব আলোচনা ও বিচার হইবে।

কংগ্রেসেব এই সকল প্রস্তাব বিবৃত করিলে, ভাবতের অন্ধশতাব্দী ব ইতিহাস বলা হইবে। সম্প্রতি যে সব প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইল এক্ষণে আমি তাহাই বিবৃত কবিব।

প্রথম প্রস্তাব দেশেব ছুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে। একটা ফসলের ক্ষতি হইলেই দেশে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই ছুর্ভিক্ষ চাউলের অভাবে, কিংবা বাজরাব অভাবে উৎপন্ন হয় না—কেননা, এই সকল শস্ত পার্শ্ববর্তী প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ব্যবসাদাররা সর্বদাই উহার আমদানী করিতেছে;—চাষা যে এক মুষ্টি বাজরাব অভাবে মবে, সে শুধু অর্থের অভাবে। সরকার বাহাদুর উত্তর করেন:—“বৃষ্টি হয় না”, এবং এই কথা বলিয়া হতাশভাবে হাত শুটাইয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু একেবারে অন্ধ কিংবা বধিব না হইলে, একথা কেহ বিশ্বাস করিবে না যে (কংগ্রেসেব প্রত্যেক বক্তাই এই বিষয়ে পোষকতা করেন) জলপ্লাবন কিংবা আশ্বিন্যগিবির অগ্ন্যুৎপাতের মত, ইহা একটা ব্যোম-তাত্ত্বিক ব্যাপাব—কিংবা অনিবার্য ছুর্ঘটনা। ইহা কি শুধু একটা মৌসম-বায়ুব খেলা ?—হাস্যজনক কথা। আসল কথাটা এই, ক্ষুদ্র কৃষক,—দৈন্য-দায়ে একেবারে বিজহন্ত,—ছুর্ভিক্ষের দুই অঙ্গুলী ব্যবধানে সর্বদাই রহিয়াছে ; কেননা, সে বোজ্র আনে রোজ্র খায় ; ফসল জমিলে সে বাজরাব কটি একটু খাইতে পায়, অজন্মা হইলে, আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে, সঞ্চয়ের অভাবে, খাণ্ড ক্রয় কবিবাব অর্থের অভাবে, সে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। তাহাকে অর্থ সঞ্চয় কবিবাব অবসব দেও—দেখিবে, তাহার ভাল অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাহার পব কংগ্রেসে একটা অনুসন্ধান-সমিতির প্রস্তাব হইল, যে সমিতি স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারা সকল বিষয়ের উপর জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করিতে পারিবেন। অবশেষে

সরকার বাহাদুরের জ্ঞান উচিত,—যদি বোগ গুরুতর হইয়া থাকে, তাহাব ঔষধ সরকার বাহাদুরেরই হাতেই আছে, সরকার বাহাদুরই তাহা প্রয়োগ করিতে পাবেন। দেশের ধন-উৎস কোথায়, অবশ্য সরকার বাহাদুর তাহা জানেন, এবং ইহাও জানেন সেই সকল ধন-উৎস পর-হস্তগত হওয়ায়, ও তাহার স্রোত-মুখ উন্টা দিকে ফিরাইয়া দেওয়ায় তাহা শুকাইয়া যাইতেছে। এখন এই উন্টা স্রোতের পথ রুদ্ধ করিবার জন্ত কতকটা বীরত্ব চাই।

দ্বিতীয় প্রস্তাব শাসনকার্য সম্বন্ধে। যাহাতে সরকার বাহাদুর বিচারশক্তিকে শাসনশক্তি হইতে পৃথক রাখেন, কংগ্রেস এই বিষয়ে খুব জোর করিয়া বলিয়াছেন। এই বিষয়ের সংস্কারটি হইবে বলিয়া অনেকবার অঙ্গীকৃত হইয়াছে, ক্রমাগত স্থগিত রাখা হইতেছে ; কিন্তু এখন ইহা কার্যে পরিণত করিবার পরিপক্ব সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ভাবতের কতকগুলি রাজপুরুষ ও কতকগুলি বেসরকারী স্বাধীন ব্যক্তি ইহার পোষকতা করিয়াছেন। লর্ড হব্‌হৌস, সার ডাব্লিউ ওয়েডারবর্ন, ইহাব অনুকূলে একটা আবেদন স্বাক্ষর করিয়া সেই আবেদনু ষ্টেট সেক্রেটারীর যোগে ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই সংস্কারে ভারতের ক্ষতটা স্বার্থ আছে তাহা একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। একজন ইঙ্গ-ভারতীয় শাসনকর্তার হাতে, জেলা মেজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা, উকীল মোক্তারের ক্ষমতা, আপীল-বর্জিত বিচাবকের ক্ষমতা একত্র সম্মিলিত। তিনিই নালীস দায়ের করেন, তিনিই অপরাধ সাব্যস্ত কবেন, তিনিই দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। ইহা যেন চিবস্তন “অবরোধের অবস্থা”। কোন বাধা আটক না থাকায়, কোন প্রাচ্য নবাব যেমন যথেষ্টাচার করিতে পাবেন, আমি সেইরূপ থাম্‌থেয়ালাী যথেষ্টাচারের কথা বলিতেছি না। এখানকার বিপদ—ইংরাজ বাজ-পুরুষের ক্ষমতা। তাহার এতটা অবজ্ঞা,—নেটিভকে তিনি মানুষের মধ্যেই গণনা কবেন না, তাহার কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়াই তিনি মনে করেন না—তিনি তাহার সংস্রব সম্বন্ধে বর্জন কবেন। তিনি তাহার পরিচয় পান শুধু পুলিশের দ্বারা ! ক্ষুধস্তন কর্মচারীবা যে রিপোর্ট দেয়, যে সংবাদ দেয়, তাহাবা যে অদক্ষতা প্রকাশ করে,

তাহাতেই তিনি একেবারে “হাত-পা-বাঁধা” হইয়া পড়েন।

কংগ্রেস হইতে ৮ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া, সেই প্রতিনিধিগণ এই দুই প্রস্তাব বড়লাটের দরবারে অর্পণ করিবে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবে কতকগুলি বিষয়ের দাবীদাওয়া করা হইয়াছে, এই দাবীদাওয়াগুলি প্রত্যেক কংগ্রেসেই লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাতে “নেটিভেবা” শাসন বিভাগের ও সামরিক বিভাগের কাজ পায়, এবং কতকগুলি বিশেষ বিভাগে প্রবেশ করিবার অধিকার পায়, তাহাই এই প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে।

হিন্দুদের অর্থে সরকারের তহবিল পুষ্টি হইতেছে, অথচ হিন্দুদের নিজের দেশেই হিন্দুদিগকে সরকারী উচ্চপদ হইতে “একগুঁয়েমি”-সহকারে তফাৎ রাখা হইতেছে। ১৮৩৩ অব্দে ইংবাজি শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় এবং “জন্ম জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় প্রজামাত্রই সবকারী কার্যের অধিকারী” এই সাম্যনীতিসূচক সনদটি রাণী

—ফর্তুক ১৮৫০ অব্দে অঙ্গীকৃত হওয়ায় ও ১৮৫৫ অব্দে আবার গম্ভীরভাবে পরিপোষিত হওয়ায়, দেশের লোকের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই সেই সকল আশা উন্মূলিত হইল। ১৮৩০ হইতে ১৮৫০ পর্য্যন্ত ভারতের “স্বর্ণযুগ” কিংবা উদারনীতির যুগ। এই উদারনীতি, ইংরাজের উপনিবেশ-রাজ্য পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল... তাহার পর হইতে আবার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। “সাম্রাজ্যিক-নীতি” বলবতী হওয়ায় আবার উন্টা শ্রোত বহিতে আবদ্ধ করিয়াছে। উপনিবেশরাজ্যে “নেটিভের” বিরুদ্ধে, বিদেশীর বিরুদ্ধে—ইংবাজ “রক্ষিত শ্রেণী”দের আক্রমণ চলিতেছে। দেশীয় লোকেরা যে সব ছিদ্র দিয়া, ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, সেই সব ছিদ্র এখন সমস্তে বুজাইয়া দেওয়া হইতেছে।

সিভিল-সার্ভিসের পরীক্ষা, লওনে হইয়া থাকে; সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইয়া তাহাতে যোগ দেওয়া ভারতীয় যুবকদের পক্ষে কতটা সহজ তা বৃদ্ধিতেই পারিতেছে... ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বার তাহাদের প্রতি বন্ধ; তাহারা সৈন্ত্যবিভাগের, পুলিশ-বিভাগের, পুর্ন্ত-বিভাগের, ষ্টেট-রেলওয়ে-বিভাগের, আফিম-বিভাগের,

পর্মিট-বিভাগের, টেলিগ্রাফ-বিভাগের বড় বড় কাজে প্রবেশ করিতে পায় না। মাসিক ৩০, ৪০ টাকার ছোট ছোট কাজ, খুব উদ্যমভাবে উদ্যোগের জন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। লওনে, কোন হিতকারী সভার নাম খুঁদিয়া দিলেও উহা অপেক্ষা বেশী টাকা পাওয়া যায়। বানার্জি বলেন, মোগল-সম্রাট আকবর, তাঁহার সৈন্তের মধ্যে ও তাঁহার দরবারে রাজপুত ও ব্রাহ্মণদিগকে গ্রহণ করিতেন। ত্রায়-বিচারের কথা আমরা বলিতেছি না, ইহা রাষ্ট্রনীতির অমুমোদিত। যাহারা দুবদেশে থাকিয়া উচ্চ আসন হইতে ভাবত শাসন করিতেছেন, তাঁহারা যদি দেশীয়দিগকে উচ্চ-পদে নিযুক্ত করেন,—তাহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাব সাহায্য পাইয়া, তাঁহাদের সর্বাংশেই লাভ হইবাব কথা। ইংবাজকে যে বেতন দিতে হয় তাহার বিশ অংশের এক অংশ দিলেই, একজন হিন্দু কিংবা মুসলমান, সেই কাজ অনায়াসেই করিতে পারে।

কংগ্রেস একটা নূতন কথা বলিয়া শিক্ষাসমস্যার মীমাংসা পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক শিল্পশিক্ষা,—আজকালের আলোচনার একটা প্রধান বিষয়। লর্ড কর্জন মাদ্রাজে বলিয়াছিলেন, এই শিল্পশিক্ষার কথা শুনিয়া শুনিয়া তাঁব কাণ ঝালাঁপালা হইয়াছে। এই শিল্পশিক্ষার সাধারণ ভূমিতে সকল দলই একত্র মিলিত হইতে পারেন। দেশের পুরাতন শিল্পের অবনতি হইতেছে, কল-কারখানা ছোট ছোট ব্যবসায় ধ্বংস করিয়াছে বলিয়া যাহারা আক্ষেপ করেন সেই রক্ষণশীল দল, এবং যাহারা আশা করেন, আমাদের কারিগরেরা, বিলাতী কলকোশলে একবার দক্ষতা লাভ করিলে, আমাদের দেশের অনেক অল্পপন্ন জিনিস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে, সেই সংস্কারের দল—এই উভয় দলই একত্র সমবেত হইতে পারেন। বৈজ্ঞানিক শিক্ষালয় স্থাপন করিবার জন্ত, বৎসর একজন ধনকুবের পার্সি,—কাণেজির একজন প্রতিদ্বন্দী,—বহু লক্ষ টাকা গবর্ণমেন্টকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কংগ্রেস এই জন্ত তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন। কংগ্রেস স্থির করিলেন, এখন হইতে প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশনে, ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক শিল্পের আলোচনার অন্ততঃ দিনের অর্দ্ধভাগ

নিয়োগ করা হইবে। তখনই এই বিষয়ের আলোচনা ও ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্ত দুইটি বিশেষ কমিটি নির্দ্ধারিত হইল।

সমাজসংস্কারের আলোচনার জন্ত কংগ্রেসের শেষ দিনটি রাখা হইয়াছিল। এই বিষয়ে ভারতের অনেক কবিবার আছে। যদি ভারত আপনার গৃহ-সংস্কারে সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে ভারত আবার গৃহের কর্তৃত্ব ফিবিয়া পাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সভাপতি বলিলেন, “সমস্ত হিন্দু-সমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বেশ অল্পভব করা যায়।” কথাটা সত্য। বামমোহন রায়, বিজ্ঞানাগর, কেশব এই আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সময়ে, কত লৌকিক সভা—বিশেষত কত ধর্ম-সভা যে স্থাপিত হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই;—আর্য্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, পরামর্শ-সমিতি গঠন কবিতোছে, প্রচাৰেব জন্ত প্রচারক পাঠাইতেছে, পুস্তিকা বিতরণ করিতেছে। সভাপতি বলিলেন, পাঁচ বৎসর হইল, বর্ণগত কুসংস্কার সম্বন্ধে, তিনি তাঁর বাল-বিধবা কন্তার পুনর্বিবাহ দিতে ভয় পান নাই। তিনি এই বিষয়ে আটঘাট বাঁধিয়া কাজ করিয়াছিলেন; তিনি কাশীর

- পণ্ডিতদের মত আনাইয়াছিলেন। ইহার পর, আর ৫ জন তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। ৫ জন মাত্র—তুমি বলিবে, ইহাত তুচ্ছ ব্যাপার! হাঁ, কিন্তু মনে থাকে যেন, ইহা আন্দোলনের আরম্ভ কাল মাত্র, এই সবে—সে দিন হিন্দু বিধবারা পতির চিগায় পুড়িয়া মরিত। এই মাত্র আমি বলিয়াছি যে কংগ্রেসে কোন প্রস্তাবের প্রতিবাদ হয় নাই; আমার ভুল হইয়াছে। একজন ভীষণ-দর্শন ধর্মোন্মাদ স্বস্থানে দাঁড়াইয়া সভাপতির বক্তৃতায় প্রতিবাদ করিতে লাগিল, তারপর তাড়াতাড়ি বক্তৃতার জন্ত নির্দিষ্ট বেদীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে উহাকে কেহ কথা কহিতে দিতেছিল না। কিন্তু সে কোন প্রকারে আপনার বক্তব্য শুনাইয়া দিল; সে মুণী-রোগীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে বুঝাইয়া বলিল যে, সভাপতির কথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এই কদাকার ভীষণ লোককে দেখিয়া ও তাহার উন্মাদবৎ অপ্রবুদ্ধেপ নিরীক্ষণ করিয়া হঠাৎ মনে হয় যে এ লোকটা তাহার জীকে এবং তাহার সহিত যাহাদের

মতের মিল নাই তাহাদিগকে অনায়াসে আগুনে পুড়াইতে পারে—তাহার জন্ত উহার কিছুমাত্র পশ্চাত্তাপ হয় না। কিন্তু সভার লোকেরা কি করিল?—তাহাদের ভয়ানক আশ্রয় হইল। এ একটা শুভ চিহ্ন। কিন্তু কুসংস্কারপন ভারতের রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা এই দেশাচারকে বেশী আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে। অতএব অগ্রে উহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন কবিবার জন্ত, সমাজ-পরিষদ পরামর্শ দিলেন। বিবাহেব বৈধ বয়ঃক্রম ১২ হইতে ১৪ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হওয়া কর্তব্য বলিয়া একটি প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত হইয়া সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল।

সমাজ সংস্কারের সমস্ত চেষ্টা একস্থানে যাহাতে কেন্দ্রীভূত হয়, ইহাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই পরিষদের প্রভূত প্রতিপত্তি। এই পরিষৎ নিষেধ-আজ্ঞা কিংবা সমাজ-চ্যুতির আদেশ প্রচার করেন না। কিন্তু পরিষদের বক্তৃতা কুসংস্কারের অঙ্ককার দূরীকৃত করিয়া সমাজ-দিগন্তে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করে।

এই বৃহৎ মন্দিরের চতুর্দিকে যে সকল ছোট ছোট মন্দির উঠিয়াছে এখন সেই সকল মন্দিরগুলি দেখিতে আমার বাকী আছে। একটা খোলা জায়গায় আর্য্য সমাজের একজন প্রচারক ধর্মপ্রচার করিতেছিল, আমি সেইখানে গেলাম। যে দিন কংগ্রেসের কাজ শেষ হইয়া গেল সেই দিন সন্ধ্যাকালে চন্দাবর্কার তাঁহার ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের সহিত লাহোর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মিলিত হইলেন। আমি সেখানকার মাড়রের উপর একটা স্থান অধিকার করিয়া-ছিলাম। সেখানে অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক ছিল, আমিও তাহাদের সহিত, অনন্ত অসীম নির্বিকার অদ্বিতীয় পুরুষের গুণ বহুস্তর উচ্চ আকাশে “উত্থান” করিলাম।

আমার শ্রবণ হয়, দক্ষিণ-দেশে বেজওয়াদার (Bez-wada) একবার আমি দেখিয়াছিলাম, দুইটি যুবক হাত ধরাধরি করিয়া যাইতেছে,—একটি তামিল, আর একটি মারাঠা; ভাষা ও ধর্ম বিভিন্ন হইলেও, ইংরাজি-বিদ্যালয় উভয়কে একসূত্রে বাঁধিয়াছে,—ইংরাজিই উভয়ের সাধারণ ভাষা। এইরূপে ধর্ম ও বর্ণঘাট কুসংস্কার দিন দিন হ্রাস হইতেছে। এই সংকীর্ণ ও প্রাচীর-বদ্ধ সমাজমণ্ডলী,

বর্ণের স্থানে, একটা অপেক্ষাকৃত উদার ও স্বাধীন সভা স্থাপন করিয়াছে,—জাতীয় সভা স্থাপন করিয়াছে। এই জাতীয়তার ভাব হইতেই কংগ্রেস প্রসূত হইয়া, দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, জাতীয়তাবের বীজ হ-হাতে ছড়াইতেছে।

সমসাময়িক ভারতের মধ্যে, এই জ্ঞানানাল কংগ্রেস যে সর্বাঙ্গীণ কোতূহলব জিনিস, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দু-প্রকৃতি পার্লেমেন্ট-শাসনতন্ত্রের বিরোধী নহে : তার সাক্ষী, এখানকার গ্রাম্যমণ্ডলীসমূহ ও সেই সব ক্ষুদ্রাকারের পার্লেমেন্ট যাহারা “জাতের” উপর কর্তৃত্ব করে। এই সকল পঞ্চায়ৎ-সভার দোষ এই যে উহারা বড়ই সংকীর্ণভাবাপন্ন, “একল-বোঁড়ে”, পর-প্রবেশরোধী, ও সর্বতোভাবে রুদ্ধ—তাই, উহাবাই দেশের দুর্ভাগ্যের একটা প্রধান কারণ হইয়াছিল। প্রত্যেক মণ্ডলীই, সমবেত গ্রামশাসনের পক্ষপাতী না হইয়া, নিজ গ্রামের স্বতন্ত্র শাসনের পক্ষপাতী ছিল : উহারা জাতিচ্যুতির দণ্ডাজ্ঞা প্রচাৰ কবিত, এবং পুরুষাত্মক প্রাধান্য বজায় রাখিত। মাটীর প্রাচীরে দেবা গণগ্রামগুলি, স্বাভাবিক সুখ উপভোগ করিত। ভাবত, অনন্ত ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। আজ ভারতে খুব একটা নতনভাব দেখা দিয়াছে ;—ইহা জাতীয়তার ভাব। এই জাতীয় ভাবের প্রোত,—জটিল বর্ণভেদ প্রধাব বন্ধন একটু শিথিল কবিয়াছে, প্রাদেশিক কুসংস্কারকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং শুধু বিভিন্ন বর্ণ নয়—সমস্ত সম্প্রদায়কে, সমস্ত জাতিকে, সমস্ত গ্রামকে, সমস্ত প্রদেশকে এক কার্যের হাঁচে আনিয়া ফেলিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ, মাদ্রাজ ও কলিকাতা, বাঙ্গালী ও শিখ, এমন কি মুসলমানেরাও কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে। যদি একবার ভাবিয়া দেখ, এখানকার কত ভৌগোলিক বাধা, ঐতিহাসিক বাধা, ধর্মব্রত বাধা, সামাজিক বাধা,—এই প্রবাহকে প্রতিরোধ কবিবার জন্য, আটকাইবার জন্য কত, “বাধা” বাধিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, এই কংগ্রেসের কতটা শক্তি ও কতটা বিস্তার। আমি জানি, এমন লোকও আছে যাহারা চোখ থাকিতেও অন্ধ ; এমন লোকও আছে, যাহারা বাগিসের

মধ্যে মুখ লুকাইয়া ভূতের ভয় এড়াইতে চাহে। ইহারাই ইংরাজ আমলাবর্গ।

এদেশে দেশভক্তির উদয় হইয়াছে—ইহা যে একটা বৃহৎ সত্য—একটা নতন ব্যাপার,—ব্রাহ্মণ্যিক আমলে যাহার অস্তিত্বই ছিল না—ইহা ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেখিয়াও দেখিবে না। ব্রাহ্মণ্যিক সমাজ এ ভাবের ভাবুক ছিল না, তাহারা এ ভাবটা আদৌ বুদ্ধিত না। কত বিদেশী জাতি ক্রমান্বয়ে আসিয়া ভারত রাজ্য অধিকার করিয়াছে, বন্যার মত ভাবতে প্রবেশ করিয়াছে। যেমন যেমন প্রবাহের জল সরিয়া যাইতে লাগিল, নতন পলি-মাটিগুলা পুঁবাতন “পলি”গুলাকে আচ্ছন্ন কবিল, পরস্পরের পাশাপাশি হইয়া রহিল, কিন্তু মিশিল না, কিংবা পরস্পরের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল না। ব্রাহ্মণ্যিক সভ্যতা হইতে,—আর্য্যগণের আক্রমণ হইতে আবস্ত করিয়া, যে জাতি যখন আসিয়াছে, তাহারা দেশের লোকের সহিত মিশিয়া যায় নাই, একটা নতন বর্ণরূপে পৃথকভাবেই এখানে অবস্থিতি কবিয়াছে ; আজিকার দিনেও, যাহারা নিছক সেকলে ভাবের রক্ষণশীল লোক, যাহারা বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসভাবের ভাবুক, যাহারা পুরুষাত্মক ও চিরপ্রধান-সারে, ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থের প্রতি উদাসীন, তাহারা এই দেশপ্রীতিকে একটা সংকীর্ণ ও অবিষম ভাব বলিয়া মনে করে। ইহা বিস্তৃত আকারে আত্মসত্ত্বিতা ও বিষয়স্বার্থের তৃষা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; স্বতন্ত্র-শাসনের আকাঙ্ক্ষা,—“ভারতের জন্ত ভারত” এই ধ্বনির প্রতিধ্বনি—তাহারা অন্তরে অনুভব করে না। সংস্কৃত ভাবাব একজন অধ্যাপক আমাকে বলিয়াছিলেন ;—“ইংরাজই আমাদের শাসন করুক, কিংবা আমরা আপনাই আপনাদের শাসন করি, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না—শাসন কার্যটা চলিলেই হইল।” আর আমার বোধ হয়, একথাটাও তিনি বলিতে পারিতেন, “শাসনকার্য চলুক বা না চলুক তাহাতেই বা কি আসিয়া যায় ?”

ইংরাজের উপনিবেশে, এই জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় পার্লেমেন্টের নজির আছে। কিন্তু তবু কতটা প্রভেদ ! ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার যে সব লোক ইংলণ্ডের

শাসন-তন্ত্র স্বদেশে প্রবর্তিত করিয়াছে, তাহারা জাতিতে ইংরাজ; ভারত শুধু শিক্ষাবিষয়ে ইংরাজ। এইবারকার অভিজ্ঞতা নূতন, ক্ষেত্র অসীম, কার্য্যপরিসর অশেষ। এইবার প্রাচ্য লোকদিগের সহিত ইংবাজের কারবার, —এমন দেশের সহিত কারবার যেখানে নানা প্রকার ভাষা প্রচলিত; এক দেশের মধ্যে এত ভাষা আর কোথাও দেখা যায় না। এইবার কার্য্যক্ষেত্রে এমন সব লোক আনিতে হইবে যাহারা সাংসারিক বিষয়ে নিঃস্বার্থ; এইবার স্বাধীন আলোচনার শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করিয়া, যে দেশে ত্রিশকোটি লোক সাংসারতটের বালু-কণার মত পরিব্যাপ্ত, সেই দেশের লোকেব চিত্ততৃষ্টি সম্পাদন করিতে হইবে ... এই সকল বালুকণা এখন জমাট বাঁধিতেছে। এই জাতীয় আন্দোলনটা এরূপ প্রবল ও এরূপ সংক্রামক,—একদিন হয়ত ইহা প্রান্তসীমা পাব হইয়া যাইবে। লাহোরের একটি ছাত্র আমাকে বলিয়াছিলেন:—“সবকার বাহ্যিক চীনের সহিত যুদ্ধ করিবাব জন্ত এখান হইতে শিখসৈন্য পাঠাইতেছেন—এ কাজটা ভাল হইতেছে না। চীনেরা যে আমাদেরই ভাই-বেবাদব, আমাদেরই লোক।”

কথাটা নূতন। যদি জাপান কিংবা চীন, কোন দিন যুরোপের বিরুদ্ধে সমস্ত এসিয়াব সহিত মৈত্রীবন্ধন করে—সেই দূর-ভবিষ্যতের কথাটা একবার ভাবিয়া দেখ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি রামকুমার নন্দী ।

কবি রামকুমার নন্দীর জন্মভূমি ব্রিহট্ট জিলাব অন্তর্গত বেজুরা নামক স্থানে। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল সপ্ততিবর্ষদেহীয় কবি রামকুমার নন্দী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার যখন শৈশবকাল তখন পূর্ববঙ্গে স্থল-কলোজ স্থাপিত হয় নাই। ব্রাহ্মণের ছেলেরা চতুপাঠিতে অধ্যয়ন কবিত; কায়স্থ বৈষ্ণবের ছেলেরাও কদাচিৎ কেচিৎ টোলে পড়িত কিন্তু অধিকাংশেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িত। হুর্ভাগ্য বশতঃ রামকুমার টোলেও পড়েন নাই—পাঠশালায়ও যে বিশেষ পড়িতে আসিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। পিতার

অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল, অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র চলিত; গ্রামে পাঠশালা ছিল না—পুত্রকে দূরদেশে পাঠাইয়া পড়ার নিমিত্ত অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। পরিবারস্থ লোকেরাই রামকুমারকে অক্ষর পরিচয়ে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলেন। অধ্যবসায়শীল বালক রামকুমার নিজচেষ্ঠায় যাহা কিছু তাৎকালিক বাক্যলাগে পাড়া শিখিয়াছিলেন; কিয়দিন এক মুন্সীব নিকট পারসীও কতকটা পড়িয়াছিলেন। যত্নের সহিত হস্তাক্ষরটি স্মরণ করিয়াছিলেন এবং কালিদাসের মহাভারতখানি প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বাল্যকালেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল; গ্রামস্থ জনৈক কলাবিৎ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এতদ্বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেন। রামকুমারের যখন বয়স চতুর্দশ বৎসর মাত্র তখনই তিনি “দাতাকর্ণ” নামক একটি যাত্রার পালা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একজন অল্পশিক্ষিত পল্লী-গ্রামস্থ বালকের পক্ষে ইহা কম প্রতিভাব পবিচায়ক নহে।

অবস্থা ভাল না হইলেও রামকুমারের বংশীঘেরা—বেজুরার নন্দী মজুমদারগণ, আভিজাত্যে পূর্ববঙ্গের পূর্ববংশে—বিশেষ সম্মানিত। ইহারা যদিও নিজেদের কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন, তথাপি উহারা মূলতঃ বৈষ্ণব। এই অঞ্চলে বৈষ্ণব-কায়স্থের স্বাতন্ত্র্য নাই—উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ অবাধে চলিয়া থাকে—এই নিমিত্তই বোধ হয় ঈদৃশ জাতি-বিভ্রম। যাহা হউক, নন্দীদেব পূর্বপুরুষেরা রাঢ়-দেশ হইতে প্রথমতঃ ময়মনসিংহ গঢ়িহাটা-বনগ্রামে আইসেন, তৎপর রামচন্দ্র নন্দী নামক তাঁহাদের একজন বেজুরা আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। প্রাপ্ত বনগ্রামে এখনও এই নন্দী বংশের শাখা বিরাজমান এবং সহর সেরপুরস্থিত এই বংশেরই জমিদারগণ “নন্দীগুপ্ত” এই উপাধি গ্রহণ পূর্বক আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এতদঞ্চলে বেজুরার নন্দীদিগকে “কাউরা” নন্দী বলে, ইহাও উহাদের বৈষ্ণবের এক প্রমাণ; কেননা বৈষ্ণব সাত শ্রেণীর মধ্যে “ছহি সেন” “ত্রিপুর গুপ্ত” “কাউ নন্দী” ইত্যাদি সংজ্ঞা সুপ্রসিদ্ধ।

এই প্রসিদ্ধ নন্দীবংশের অনেকেই কাছাড় শিলচরে রাজকার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করিতেন। রামকুমারের

শিক্ষাদীক্ষা অল্প হইলেও দাবিদ্র্যের তাড়নায় তাঁহাকে সত্ত্ববই কাজকর্মের চেষ্টা দেখিতে হইল এবং আত্মীয়বহুল শিলচরের দিকেই তদর্থে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি প্রথমতঃ তিনটাকা মাত্র বেতনে তদ্রূপ ডিপুটি কমিশনরের আফিসে চুকিয়া, অবশেষে স্বাভাবিক উত্তম ও অধ্যবসায় সহকারে নিজে নিজে কার্যোপযোগী ইংরেজী লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া ঐ আফিসের একাউন্টেন্ট গিরি ও সর্বশেষে ৮০ বেতনে খাজাঞ্চির কার্য পর্যন্ত করিয়াছিলেন।

আজি কালি যেমন যে সে লোকেই লেখনীধারণ করিয়া প্রবন্ধ লিখে, কবিতা করে, গল্প সাজার, তখন অর্থাৎ অষ্ট শতাব্দী পূর্বে যখন রামকুমার নন্দী কার্যাজীবনে প্রবিষ্ট হন, তেমনটা ছিল না। বিজ্ঞানাগর মদনমোহন অক্ষয়কুমার প্যারিচাঁদ ঈশ্বর গুপ্ত মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যসেবকগণ তখন গল্পপত্র রচনার নূতন নূতন আদর্শ বঙ্গজগতে প্রদর্শন কবিত্তেছিলেন। তাঁহাদের অনুকরণে কেহ কেহ কিছু কিছু লিখিত বটে কিন্তু দেশে মুদ্রাযন্ত্রের তখন এমন প্রাচুর্য্য ছিল না, অথবা পাঠশালায় বিজ্ঞানও এমন প্রচাৰ ছিলনা যে সুলভে ও অল্পমূল্যে গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন হইবে এবং মুদ্রিত পুস্তকের লাভজনক বিক্রয় হইবে। সুতরাং নানাকারণে সেই সময়ে কবি বা গ্রন্থকার শ্রেণীব লোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল।

কবি বা গ্রন্থকার অল্পসংখ্যক হইলেও তখন বঙ্গদেশে কাব্যের যে অপ্রাচুর্য্য ছিল একথা কিন্তু বলিতে পারি না; প্রত্যুত সঙ্গীত সহযোগে কাব্যের যে ক্ষুষ্টি তাহা ঐ সময়ে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বর্তমান সময় হইতে অধিকতর পরিমাণে পরিলক্ষিত হইত। আমবাই স্বকীয় শৈশবাবস্থায় বঙ্গের গ্রাম পূর্ব্বতম প্রান্তে গ্রামে গ্রামে যতগুলি কবির দল, যাত্রার দল প্রভৃতি দেখিয়াছিলাম এখন তাহার চতুর্থাংশও দেখিতে পাইতেছি না।

এই যে কবির দল যাত্রার দল পাঁচালীর দল বঙ্গের সুদূর পল্লীতেও দেখা যাইত ইহাদের জ্ঞান গান ও কবিতা বাঁধিয়া দিত কে? গাজনে ও কীৰ্ত্তনে যে সকল পদাবলী প্রযুক্ত হইত অথবা শ্রামা পূজাদিতে যে সকল মালসী গান হইত এই সকলেরই বা রচয়িতা ছিল কে? পাঠক কখনও মনে করিবেন না যে কেবল হক ঠাকুর নিতাই

বৈবাগী বা আর্টুনী ফিবদী, দাশুবার বা বসিকবার, রামপ্রসাদ বা কমলাকান্ত প্রভৃতিব গান ও বচনাবলী লইয়াই পূর্ব্ববঙ্গবাগীরা নাড়াচাড়া করিত। ফলতঃ কবি বা গ্রন্থকার নামে পরিচিত হইবার স্পৃহা অথবা স্বেযোগ সুবিধা না থাকিলেও ঐ সকল প্রান্তবর্তী স্থানেও প্রতিভা-শালী লোক জন্মিত, কিন্তু স্থানদোষে তাহাদের কথা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইতেছে না।

শিলচারে অবস্থান কালে রামকুমার সঙ্গীতের সবিশেষ চর্চা কবিবার অবসর পাইয়াছিলেন; কিন্তু সাহিত্যের অহুশীলনকরে তৎকালপ্রচারিত পুস্তক ও পত্রিকাদির পাঠ ভিন্ন আব কিছু করিতে পাবিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক যাত্রার দলে গীত হইবার জন্ত পালা প্রস্তুত কবিত্তেই তিনি তদানীং তদীয় ভারতী প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন। পাঁচালীর পালাও তিনি কয়েকটা প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার বচিত সমস্ত যাত্রা ও পাঁচালীর পালার নাম নিয়ে লিখা হইল :—

যাত্রা।

- ১। নিমাই সন্ন্যাস, ২। সীতার বনবাস, ৩। বিজয় বসন্ত,
- ৪। পদাঙ্ক দূত, ৫। কংশ বধ, ৬। উমার আগমন,
- ৭। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৮। বাসলীলা, ৯। দোল, ১০। ঝুলন,
- ১১। ভগবতীর জন্ম ও বিবাহ।*

পাঁচালী।

- ১। কলঙ্কভঞ্জন, ২। লক্ষ্মী সরস্বতীর দ্বন্দ্ব, ৩। ১৩০৫

বাঙ্গালার বোধন।
বলা আবশ্যক যে এই সকল পালার অনেকগুলি শিলচার হইতে পেনশন গ্রহণপূর্ব্বক বাটী প্রত্যাবর্তনের পর রচিত হইয়াছিল। এই পালাগুলিব অধিকাংশই স্থানীয় গানওয়ালাদের দল কর্তৃক গীত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু কোনটিই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই।

নব্য লেখকগণের বীতিতে তিনি গ্রন্থরচনায়ও মনো-নিবেশ করিয়াছিলেন। নিয়ে তদীয় গ্রন্থাবলীর নাম প্রদত্ত হইল।

* রামকুমারের বালা-রচিত “দাতাকর্ণ” পালার উল্লেখ এখানে করা হইল না, কেননা তাহার পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে।

পত্ন

১। বীরাদনা পত্রোত্তর কাব্য, (অমিত্রাক্ষরে), ২।
উষোদাহ কাব্য, প্রথম ভাগ (অমিত্রাক্ষরে), ৩। উষো-
দাহ কাব্য দ্বিতীয় ভাগ (অমিত্রাক্ষরে), ৪। নবপত্রিকা
কাব্য (মিত্র ও অমিত্রাক্ষরে), ৫। প্রবন্ধমালা (নানা-
বিষয়ক), ৬। জীবন-মুক্তি (গল্পমিশ্রিত)।

এতদ্ব্যতীত “মালিনীর উপাখ্যান” নামক একখানি
উপন্যাস, এবং গণিত-তত্ত্ব নামক একখানি অঙ্কের পুস্তকও
তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পত্ন গ্রন্থাবলীর প্রথম ও
দ্বিতীয়খানি ছাপান হইয়াছিল। অঙ্কের পুস্তকখানিও
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া কিয়দ্দিন কাছাড় জেলার পাঠ-
শালার পাঠ্যরূপে প্রচলিত হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া রামকুমার কীর্ত্তন মালসী প্রভৃতি অধ্যাত্ম-
বিষয়ক যে সকল গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে
“পরমার্থ সঙ্গীত” ১ম ২য় ও ৩য় ভাগ এই তিন খণ্ড পুস্তক
সংকলিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহার পত্ন-গ্রন্থাবলীর মধ্যে “বীরাদনা পত্রোত্তর”
কাব্যই সর্বপ্রথম তাঁহাকে সাহিত্য জগতে কতকটা পবিচিত
করিয়াছিল। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, লাতিন কবি
ওভিড লিখিত “নায়িকাগণের লিপিমাল্য” (Ovid's
Epistolæ Heroidum or Letters of the
Heroines) গ্রন্থের অনুকরণে, রামায়ণ ও মহাভারতোক্তা
নায়িকাগণ দ্বারা স্বীয় স্বীয় ভর্তৃসমীপে অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে
যে সকল অভিযোগমূলক লিপি লিখাইয়াছিলেন,
রামকুমার নায়কদের দ্বারা ঐ গুলিব উত্তর মাইকেলী
ছন্দেই এই “পত্রোত্তর” কাব্যে লিখাইয়াছেন। ইহা ১২৭৯
সালে প্রকাশিত হয় এবং তৎকালীন অনেক পত্রিকায়
ইহার প্রশংসাসূচক সমালোচনাও হইয়াছিল। সাহিত্য-
মহারথী স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন; “ইহাতে
শুদ্ধচাতুর্য আছে, ভাবুকতা আছে এবং কবিতাগুলি শ্রুতি-
মধুর হইয়াছে।” একখানি ক্ষুদ্র কাব্যের পক্ষে ইহা কম
প্রশংসা নহে।* পত্রোত্তরের সমালোচনা কবিত্তে গিয়া সেই

* ঐযুক্ত দক্ষিণাচরণ রায় নামক কোনও ব্যক্তি এই কাব্যখানির
ভূমিকা ও টীকা করেন—তাহাও কাব্যের সঙ্গেই মুদ্রিত হইয়াছিল।
সমালোচকরাজ বঙ্কিমচন্দ্র এই টিপ্সনী পড়িয়া বিবস্ত্র হইয়া দক্ষিণা বাবুকে
বহু বিদ্রূপ করিয়াছিলেন

সময়কার পূর্ববঙ্গের মুখপত্র সুপ্রসিদ্ধ “চাকাপ্রকাশ” লিখিয়া-
ছিলেন:—“কবিকেশরী মাইকেলের বীরাদনা পত্র পাঠ
করিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম পত্রগুলি যাহার সরস
লেখনী-প্রসূত তিনিই উত্তর লিখিয়া আমাদের সন্তুষ্ট
করিবেন। বোধ হয় সমস্তভাবে অথবা অস্বাস্থ্য নিবন্ধন
তিনি তাহা পাবেন নাই। যাহা হউক রামকুমার বাবু
আমাদের সেই আশা পূর্ণ করিয়াছেন; আমরা তাহার এই
পুস্তক পাঠে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। * * * *”

এই অবস্থায় মাইকেলের বীরাদনা কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে
রামকুমারের বীরাদনা পত্রোত্তর কাব্যও উল্লেখযোগ্য এবং
সমালোচ্য কিনা পাঠক মহোদয়গণ তাহার বিচার করিবেন।

বীরাদনা পত্রোত্তর কাব্যে রামকুমার কতদূর কৃত্তি
দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন নিম্নে মধুসূদনের
“দশরথের প্রতি কৈকেয়ী” এই লিপিব উত্তরটি যদৃচ্ছাক্রমে
তুলিয়া দিলাম।

চতুর্থ সর্গ। কৈকেয়ীর প্রতি দশরথ।

“রাজর্ষি দশরথ আপন দ্বিতীয়া মহিষী কেকয়ী দেবীর প্রতি সন্তুষ্ট
হইয়া তাঁহাকে ছুটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; মহিষীও সেই
বরদ্বয় যথাকালে গ্রহণ করিবেন বলিয়া সে সময় আপনার মনোগতভাবে
প্রকাশ করেন নাই। যখন রাজা প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র
বামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন
কেকয়ী আপন পুত্র ভবতের মন্ত্র সেই পদ প্রার্থনা করেন এবং রাজাকে
পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনার্থ অসত্যবাদী বলিয়া যে পত্র লিখেন, দশরথ
নিম্ন পত্রিকাখানি তাহার উত্তররূপ লিখিয়াছিলেন। ফলতঃ পূর্বে
কোনও স্পষ্টতঃ প্রতিজ্ঞা না হওয়াতে রাজা অসত্যবাদী নহেন বরং
কেকয়ী তাহার বিপরীত লিপি করিতে তাঁহাকেই মিথ্যাবাদী বলা
গীতে পারে।

“হায় কে হানিল হেন নিশিত বিশিখে,
হৃদেব সময় মোরে বিবাদ সাধিয়া,
ফলিল মূনির শাপ এতদিনে বুধি
দশরথে। করিখাছি কুর্কর্ণ যেমন,
পাইলু তাহার ফল হাতে হাতে আজি।
জাগে মনে (ভাগ্য দোষে) যুগমার ছলে
একদিন, বনমাধে, বাক্য লক্ষ্য করি
এডি শব্দভেদি বাণ, ভেদিমু সহসা,
(যুগবোধে) না জানিয়া মূনির তনয়ে।
তাজিল তখনি প্রাণ,—তিরস্কারি মোরে
মূনিপুত্র। পিতা তার অন্ধ ঋষি (ছিল
তপোব্রত) ধান ভান্ধি শাপিল আমারে
রোষ বশে, “প্রাণাধিক তনয় আমার
“বধিরা, বধিলি মোরে, ক্ষত্রকুল প্রাণি।
“মরিষি তেমন তুই তনয়ের শোকে।”



কবি রামকুমার নন্দী ।

অমোঘ মুনির শাপ । সাপিনীর রূপে
নিবসিয়া এতদিন রাজ-অবসথে,
দংশিলি হৃদয় মোব বিধাত্ত দশনে ;
ছিলি লো পাপিনি । তুই পরাণ-প্রতিমা
এতদিন, স্থাপি তোর হৃদয়-মন্দিরে,
কত যে তুষেছি নিত্য প্রেমজ্বলি দানে
গুণে তোর ; কে জানে এমন নিশাচরী,
নারীরূপে প্রবেশিলি বিনাশিতে মোরে
অকালে, অধবে মাথিয়া মধু ভুলালি
সহজে, হৃদয়ভাণ্ড পূর্ণ হলাহলে ।
হায় রে অবোধ আমি, তোর এই মারা—
মিছে নিলি আপনারে, নারীর চরিত্র
নাহি বুঝে হর্যাহর, কি ছাঁর মাহুষ
আমি জানিব কি গুণে, এ হৃদক তব ?
তুমিলি মধব বাক্যে এতদিন কত,
সেবিলি আমারে সদা, পতিব্রতা নারী
সেবে যথা পতির চরণ কায়-মনে ।
সরল হৃদয় মোর—ভুলিল অমনি,
বুঝিতে না পারি তোর কপট ভক্ততি,
করিয়াছি সত্য আমি ধর্ম সাক্ষী কবি,
তোর কাছে, ধর্মভরে, নহে কামবশে ;
আছে এ দম্পতিধর্ম আজিও জগতে
যে নারী পুঞ্জিবে পতি ইষ্টদেব মানি,
অভীষ্ট তাহার সদা পুরাইবে পতি,
পতির কর্তব্য এই ধর্মনীতি মতে ।

করে'ছি পতির কার্য, প্রতিজ্ঞা কবিয়া
করিয়াছি "প্রাণাধিকে । পতিপ্রাণা তুমি,
তুমিলে আমারে যেন আমিও তেমনি,
পালিব তোমাব বাক্য যা' কহিবে যবে ।"
কিন্তু কোন্ দিন, ক' দেখি আবার শুনি,
বাহিরিল হেন কথা বাঘবের মুখে,
ভরতেরে দিবে রাজ্য না দিবা বামেরে ?
আ-মরি কি সত্যবাদী লিখেছেন পুনঃ
"অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকরীব, মাথা তাব কাটি তুমি আসি
নররাজ, কিংবা দিয়া চূর্ণ কালি গালে
দেও বনে ।" কি কবির নারী তুই নারি
বধিতে জীবনে, ইচ্ছা নতুবা এখনি,
প্রহারিবা তীক্ষ্ণ অসি পাপীরসি । তোরে
দ্বিগুণ করিয়া ঋণি মনোদ্বংস যত ;
যদি এ হৃদয় আজি হত তোর মত,
নিবমিত বজ্রে কিংবা লোহ কি পাষাণে,
নির্বাসি এখনি তবে, বিজন কাননে,
এই রঘুকুলকলঙ্গিনী তুই, তোবে,
রক্ষি এ বিপুলকুল, "কুলবন্ধা হেতু,"
নীতি বাক্য আছয়ে, "তাজিবে একজনে ।"
তবে যদি রাজ্যলোভে থাকিস্ সেবিয়া
মোরে, বারাজনা যথা পর পুণ্যধরে
অর্থলোভী হবে, মুখে দেখারে কপট
প্রেম ; ক' তবে এখনো ভাল ভাঙ্গি আজি
সে প্রতিজ্ঞা করেছি যা তোর কাছে আমি,
কে করে প্রতিজ্ঞা হেন গণিকার সনে ?
নহ তুমি ধর্মপত্নী কৃত অভিষেকা ।
• কেন আজি হেন কথা বাঘবের মুখে
শুনিলি ? শুননি যাহা আব কোন কালে,
কেবল আপন গুণে, গুণবতী তুমি ।
তবু কি অসত্য কথা বাহিরিবে মুখে
প্রাণান্তে ? জেননা হেন রঘুবাংশধবে ।
কয়েছে কি কোন দিন পরিহাস ছলে
মিথ্যা কথা দশরথ ? ক' তবে এখনি
কাটিয়া ফেলিব স্ত্রীবা তোর বিদ্যমানে ।
• এখনো চাহিস্ যদি (লজ্জা পবিত্র)
ঘোবরাস্ত্রো অভিযুক্ত করিতে ভবতে,
হবেনা অন্তথা আছে এ প্রতিজ্ঞা মম
"পালিব তোমার বাক্য যা কহিবে যবে" ।
পুত্র মম রামচন্দ্র কুলপদ্মস্বরি,
পালিবেক পিতৃসত্য প্রাণপণ করি ।
ভরত তনয় মোব (মিথ্যা না কহিলি)
ভাবতের শিরোরত্ন অতুল্য জগতে,
ধাকিত যত্নপি এই অধোধ্যা ভবনে,
নাহি করি আমি যাহা করিত সে আজি,
পবন্তুরামের মত (শুনেছ যেমন)
শোধিয়াছ মাতৃদার ধাবাল কুঠারে ।
• কহিবি অযশ মম দেশ দেশান্তরে,
"পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি" ?

দেখাব এ কলধর্মে তোরে আজি আমি,
তাজিব জীবন তবু প্রতিজ্ঞা পালিব।
যদি আমি পতি হই শুক্লজন তোর,
কলিবে আমার বাক্য ও পতিষাতিনি।
একদিন তোরে; ঘৃষিবে জগতে তোর
অবশকাহিনী এ ত্রোতা ছাপর কলি
তিনধুগ ভরি; তোর এ কলকগীত
রচিলা যতনে, পাইবে শ্রুতবিগণ,
ভারত ভবনে। কাঁদাইলি যেন মোরে,
কাঁদিবি তেমন কোন দিন যদি ভাগ্যে
দিব্যজ্ঞান হয় তোর এই পাপ দেহে।”

তঁাহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ উষোদাহ ১ম ভাগ ১৮৮৬ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ মুদ্রণে তঁাহার বান্ধব অনেকে কিছু কিছু সহায়তা করিয়াছিলেন। গ্রন্থকাব শিলচায়ে অবস্থান করিয়া কলিকাতার একটি প্রেসে তাহা মুদ্রিত করান। ইহাতে গ্রন্থ মধ্যে অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যায়। যঁাহারা সহায় সমালোচক তঁাহারা এই সকল দোষ উপেক্ষা করিয়া গ্রন্থগত ভাবের উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাই “হিতবাদী” “শিক্ষাপরিচর” প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরা এই পুস্তকখানির প্রশংসাই করিয়াছিলেন।

কিন্তু রামকুমারের অদৃষ্টের মন্দতা নিবন্ধনই বোধ

- হয়, কোনও বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের খর নজর এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির উপরে পতিত হয়। তৎকালে সেই পত্রিকা সম্পাদকের ঘাড়ে একটা খেয়াল চড়ে যে সমালোচনারূপ সম্বারজ্জীব দ্বারা তিনি সাহিত্যপ্রাঙ্গণে নিপতিত যাবতীয় খড়কুটা একেবারে পরিক্ষাব করিয়া ফেলিবেন। এতদর্থে দুই সপ্তাহকাল ধারাবাহিকরূপে কয়েক খানি গ্রন্থের মুণ্ডপাত্ত কবিতা উষোদাহ কাব্যখানিও ধরেন। কিন্তু জনৈক সাহিত্যসেবী মহাত্মা * পত্রিকাস্তরে সেই সম্পাদকের নিজ পত্রিকা হইতে ভুরি ভুবি গলদ প্রদর্শন পূর্বক বিজ্ঞপবাণে সম্পাদক পুস্তককে ক্ষতবিক্ষত করাতে তঁাহার সেই খেয়াল চিরদিনের জন্য তিরোহিত হয়। ফলতঃ কেবল মুদ্রাকর-প্রমাদাদি মাত্র অবলম্বনে একখানি কাব্যের দোষ প্রদর্শন সমালোচনা-পদবাচ্য হইতে পাবে না, ইহার নাম “পোরোভাগ্য”।

* সাধুচকিত প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়

বিশেষতঃ রামকুমার গ্রন্থের ভূমিকার পৃষ্ঠে “নিবেদন” ছিল; স্বয়ংই বলিয়াছিলেন, “নানাপ্রকাব অন্তবিধার মধ্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। প্রফ সংশোধন দোষে যদি কোন কোন স্থলে কোনরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে, পাঠকগণ অন্তগ্রহ পূর্বক ক্ষমা কবিবেন।” ইহা সত্ত্বেও, প্রধানতঃ ঐকগ দোষ লইয়া ঘাঁটানটা কতদূর জায়সজ্জত তাহা স্মৃতি পাঠক-বৃন্দই বিবেচনা করুন।

যাহা হউক উষোদাহের তৃতীয় সর্গের প্রথমংশ হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; ইহা হইতেই রামকুমারের কবিতা লিখিবার ক্ষমতা কতদূর ছিল, তঁাহার কাব্যের দোষগুণই বা কি পরিমাণ ছিল, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পাৰা যাইবে :—

“লুকাইল বিভাবরী, তাবাগণ যত
তাজিলা অশ্বরশয়া লক্ষা অন্তবোধে,
বিচ্ছেদ রিষাদে এবে মলিন চলমা।
ভুবনমোহিনী উবা দাঁড়াইলা আসি
পূর্বচল শিরে পরি সীমস্তের মাঝে,
সিন্দুর-বিন্দুর সম তরুণ-অঙ্গণে;
বিনাশি তিমির রাশি জগতের রিপু,
পবকাশি দল দিশা আপনার রূপে।
কলধনাগণ যত নিকুলগায়িকা,
জাগিয়া আনন্দে নিজ নিজ পতিসহ,
সুতিলা সতীরে তারা প্রাত্যহিক রাগে,
ভুবিয়া জগৎ কর্ণ বৈতালিক সম।
যেন যে ভুবারগিরি। তোর ভুজ শিরে
দাঁড়াইলা তেজোময়ী ত্রিদেশবৎসলা,
পরকাশি দশদিক আপনার তেজে
নাশিলা অন্তবদলে ত্রিপুয়ের রিপু,
অমবগণের কথা হয়ে শু মনান।
হরিল শীতল বায়ু পশি ফুলবনে,
ফুল কুসুমের যত পবিসল ধন
বিতবিল বিনামূল্যে জীবজন্তুগণে।
সাধিছে মধুপচর জুগি মৃচনাদে
পখিনীর পদে পডি হাসাইতে তারে;
সাধিলা মাধব যথা প্রভাতে আসিয়া
পায়ে ধরি বিশ্রলকা মানিনী রাধারে
ভাসিতে দুর্জয়মান বৃন্দাবন-বনে।”

রামকুমারের কাব্য সমালোচনার স্থান ইহা নহে; নচেৎ তঁাহার কাব্যসমূহ হইতে আরও কতিপয় কবিতার উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করা যাইত, কি জন্য মহাত্মা বঙ্কিমবাবু কবির শব্দচাতুর্য্য ও ভাবুকতার এবং তদীয় কাব্যের শ্রুতি মাধুর্য্যে কথা বলিয়া গিয়াছেন।

কাব্য ও সঙ্গীত এক বস্তুরই দুইটি ফুল, অথবা সংস্কৃত কবি ভাষায় বলিতে গেলে, মা' সবস্বতী'ব দুইটি স্তন । * কিন্তু উভয়ের পার্থক্যও বিস্তর । কাব্যের প্রচলন অনেকটা সৌভাগ্যসাপেক্ষ, বিশেষতঃ আজকাল । মুদ্রণসৌষ্ঠব এবং সদয়-সমালোচনার সহায়তায় অনেকস্থলে অমুৎকৃষ্ট গ্রন্থও সাধারণ্যে বেশ বিকাইয়া যায় ; অথচ তদভাবে উৎকৃষ্ট কাব্যেবও তেমন আদর হয় না । কিন্তু সঙ্গীতের অবস্থা তদুপ নহে ; কোনও বাহু চাকচিক্য বা সমালোচকের প্রশংসাবাদে আকৃষ্ট হইয়া লোকে গান শিখে না ; যে গান প্রাণের ভিতর দিয়া "মরমে পশিয়া" প্রাণ আকুল না কবে, কেহই তাহা কণ্ঠস্থ করিবার নিমিত্ত জোর অববদন্তি করিবে না । কাব্য ও সঙ্গীতের পার্থক্য এতদ্বাবাই পরিষ্কৃত হইবে যে কাব্য প্রথমতঃ রচিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় তৎপর প্রসিদ্ধি লাভ কবে ; কিন্তু গান বচিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ না করিলে তাহা গ্রন্থনিবদ্ধ হইয়া কখনও প্রচারিত হয় না ।

বামকুমার কাব্যরচনার সৌভাগ্যশীল হইতে পারেন —মাই বলিলে অতুক্তি হয় না ; তাহার গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর প্রশংসালভ কবিতা থাকিলেও, এবং তৎকালে তাহা বিক্রীত হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ আনিয়া দিয়া থাকিলেও, উহা যে পুনর্মুদ্রিত হইবে, নানা কারণে তাহার সম্ভাবনা বড় কম । কিন্তু তিনি অধ্যাত্মবিষয়ক যে সকল গীতাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন সেইগুলি তাঁহাকে বহুদিন স্মরণীয় করিয়া রাখিবে । পূর্ববঙ্গের সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনেকেই তাঁহার গীত আদরসহকায়ে কণ্ঠস্থ করিয়া ষড় তত্ত্ব গান করিয়া থাকে । তাঁহার গানের আদর দেখিয়া শিলচাবের ভূতপূর্ব একত্বা এসিষ্টেন্ট কমিশনার গুণগ্রাহী ৮প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয় "পরমার্থ-সঙ্গীত" নাম দিয়া রামকুমারের সঙ্গীতাবলীর প্রথমভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন । এই প্রথমভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া ষড়য়াতে ইহাব তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে এবং পরমার্থ-সঙ্গীত দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগও প্রকাশিত হইয়াছে ।

স্বপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তদীয় "সাধক-সঙ্গীত" নামক সংগ্রহ গ্রন্থে "পরমার্থ-সঙ্গীত" হইতে অনেক গীত উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গের সর্বত্র রামকুমারের গানের পবিচয় প্রদান করিয়াছেন ।

প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীতরচনাকাব্যগণ সকলেই নিজের একটা বিশেষ রাগিণী'ব সৃষ্টি করিয়া যান । বামকুমারেরও কতিপয় সঙ্গীত তাঁহার উদ্ভাবিত বাগিণী-বিশেষে রচিত । "পরমার্থ-সঙ্গীত" হইতে সেই শ্রেণীর একটি গীত এস্থলে নমুনাস্বরূপ ষড়চ্ছাঙ্কমে উদ্ধৃত করা হইল :—

বাগিণী মনোহরসাই মিশ্রিত—তাল চুংরী ।

তাইত শিবে, মা ব'লে কাঁদিগো কাতবে ।

যদি কান্না শু'নে দয়া ক'রে কোলে নেও মা কুমারে ।

শুনেছি মা কথায় বলে, খে'তে পায় মা কাঁদলে ছেলে,
মাগো না কাঁদিলে আদর ক'রে খে'তে দেব মা কে তারে ? ॥

যাব আছে মা অনেক ছেলে, রাখতে নারে কোলে কোলে
বেলতে দেয় মা ব'সে ধবাতলে—

খেলে নিয়ে মালা মাটি পত্রপুষ্প ঘটা বাটি.

মায়ের মায়াতে মুগ্ধ হ'লে

খেলা ছেড়ে যেই ছেলে কেঁদে উঠে মা মা ব'লে, মা-গো—

অমনি মা এসে তারে কবে কোলে, আর কি গো থাকতে পারে ?

অচিন্ত্যরূপ তোমার চিন্তিতে নারে সুরাহার—

কিভাবে চিন্তিবে রূপ আমি—

এখন তুমি চিন্ত তোমার রূপ, তোমার মন্ত্র তুমিই জপ,

তোমার পূজা কর এসে তুমি—

আমি সন্ধ্যা পূজা সকল ফেলে কাঁদব বলে মা মা বলে মা—গো—

দেখব মায়ের মতন মায়া তোমার আছে কিনা অন্তরে ।

যে ছেলের মা, মা না থাকে তাব কান্না শুনে বা কে

কে তারে মা ক'রে থাকে কোলে—

যদি না থাকতে মা তুমি শিবে, আমি কিগো কাঁদতাম তবে,

কাঁদি কেবল তুমি আছ ব'লে—

তুমি জগন্নিবাসিণী কালভয়নিবারিণী মা—গো—

আমি ডাকব কারে এ সংসারে না ডেকে মা তোমারে ॥

তারে শাস্তি করে যাবে ধ'রে কথায় কথায় আশুট ক'রে

যে ছেলে মা কাঁদে দিনে রো'তে—

কিন্তু কাঁদে যদি শুধে প'ড়ে মা যে তখন চায়না ফিরে

এমন মা কি আছে ত্রিঙ্গতে—

যদি সাথে সাথে কাঁদি আমি শাস্তি কব এ'সে তুমি, মা—গো—

কাঁদি কালান্তে কালের ভয় আছে ব'লে অন্তরে ॥

বলা বাহুল্য বামকুমারের পরমার্থ সঙ্গীতগুলির প্রায় সমস্তই ভক্তিরসাত্মক । ষট্চক্রাদি সম্বন্ধে দুই একটি ভিন্ন ভাবের কথা থাকিলেও কবিবরের সরস হৃদয়ে ভক্তিরই প্রাধান্য ছিল । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবেদন আব্দার নিষ্ফল ভিক্ষানীতি (mendicant policy) বলিয়া আজ-

* সঙ্গীত কাব্যশাস্ত্রের সর্বস্বত্যাঃ স্তনদ্বয়ম্ ।

একমাপাতমধুরং অস্তদালোড়নামৃতম্ ।

কাল অনেকেই সেই পথ ছাড়িতেছেন বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম-রাজ্যে এই কালাকাটিব অর্থাৎ ভক্তিব পথ সোজা এবং আশু-ফলক বলিয়া চিরদিনই সমাদরণীয় থাকিবে। রাম কুমার স্বধর্ম্মে আস্থাবান ও সত্যত ইষ্টনিষ্ট ছিলেন; তাঁহার সঙ্গীতচ্ছলে আবেদন আবদাব নিষ্ফল হয় নাই। তাই মৃত্যুর অতি অল্পদিন মাত্র পূর্বে জগদম্বা তাঁহাকে মুক্তিক্ষেত্র বারাগসীতে টানিয়া আনিয়াছিলেন; অনধিক পাঁচবৎসব হইল ভক্তকবির পাঞ্চভাতিক দেহ কাশীব মহাশ্মশানে বিলীন হইয়াছে এবং তদীয় বিমুক্ত আত্মা মায়েব ক্রোড়ে লীন হইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।*

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা।

ভারতীয় ব্রহ্মবাদ।

(উপনিষদ ও শঙ্করের মত)।

১। নিত্যানিত্য বিবেক।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য উপনিষদাণ্যে লিখিয়াছেন যে, এই সংসার ‘জন্ম-মরণ-শোকাদি বহু অনর্থাত্মক’, মায়া ও মরীচিহ্ন উদ্ভক এবং গন্ধর্ব্বনগরের স্তায় নিত্য পরিবর্তনশীল, এবং ইহা ‘কদলী-স্তম্ভের স্তায় অন্তঃসারশূন্য’।

কঠ ভাঃ ৬।১।

এই উক্তির মূলে কি কোন সত্য নাই। আজ যিনি রাজচক্রবর্ত্তী কাল তিনি নির্কাসিত—পরের অঙ্গে প্রতি-পালিত,—ইতিহাস কি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না? আত্মীয় স্বজন লইয়া পবন স্রুপে সংসারে বাস করিতেছি। প্রাণের প্রিয়জন হঠাৎ স্রুপস্রুপ ভাঙ্গাইয়া কোথায় চলিয়া গেল! যাহার স্মৃতি কথ্য শুনিয়া, যাহার প্রেমমাধা মুখ দেখিয়া, যাহাকে বক্ষুঃস্থলে ধারণ কবিয়া প্রাণে কত শান্তি কত আরাম লাভ করিতাম, সেই প্রিয়তম সম্মান আজ কোথায়? যাহাকে বিশ্বাস করিয়া প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া-ছিলাম, যাহার পদতলে জীবন যৌবন ঢালিয়া দিয়াছিলাম,

* অতীত যুগের বিষয় যে রামকুমার নন্দীর সম্পূর্ণ জীবনী ও তদীয় প্রহ্লাবলীর সমালোচনা সম্বন্ধিত একখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দেব নামক জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হইতেছে। তাঁহার সংগৃহীত সরঞ্জাম হইতে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সংকলনে অনেক সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে।

সে আজ আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল, জগৎ আমার নিকটে অন্ধকার। পরিবর্তন—পরিবর্তন—এ সংসারে কেবলই পরিবর্তন! এ সংসারে জরা আছে, ব্যাধি আছে, মরণ আছে, হিংসা, বিদ্বেষ, বিশ্বাসঘাতকতা, ছুঃখ দারিদ্র্য সবই আছে। এ সব দেখিয়া কি মনে হইতে পারে না যে, এ সংসার অসাব,—কদলীস্তম্ভের স্তায় অসার? কেবল বুদ্ধদেবই যে জরা মৃত্যু বোগ শোক দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন তাহা নহে—প্রতিনিয়ত আমরাও এই সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা অনুভব কবিতোছি। তবে কি নিত্যবস্ত কিছু নাই? তবে কি মানুষ নিতান্তই নিরাশ্রয়? এই প্রশ্ন সংকলরেণেই চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে উথিত হইতেছে এবং নানালোকে নানাভাবে ইহার উত্তর দিতে-ছেন। কেহ বলিতেছেন নিত্যবস্ত না হইলে মানুষের চলে না, নিত্যবস্ত না থাকিলে মানুষের শান্তি নাই, আরাম নাই, আশ্রয় নাই—সুতরাং একজন নিত্য-সত্য সনাতন পুরুষ নিশ্চয়ই আছেন। কেহ বলেন যখন বুঝিয়াছি এ সংসার অসাব ও অনিত্য—দেই সঙ্গে সঙ্গেই এক নিত্যবস্তব আভাস পাইয়াছি। নিত্যতার আভাস পাইলে অনিত্যতার জ্ঞানই আসিতে পাবিত না। কাহারও কাহারও বিশ্বাস এই, নিজেব আদর্শেই বুঝিয়াছি যে, অনিত্যের অন্তরালে এক নিত্যসত্তা বর্তমান বহিয়াছে। আমাব আত্মাতে কত পরিবর্তন, পরিবর্তনের পর পরিবর্তন—অথচ এই পরিবর্তনসমূহকে একই আত্মা ধারণ কবিয়া রাখিয়াছে। এই আত্মার স্থায়িত্ব হইতেই সেই পবনস্রাব নিত্যতাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। এইরূপে লোকে আরও কত ভাবে অগ্রসর হইয়া অবশেষে সেই এক নিত্য-সত্তার অন্তিম্বেই উপনীত হইয়াছে।

সেই নিত্যবস্তব প্রকৃতি কি? ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ইহার ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেওয়া হইয়াছে। উপনিষদ ও শঙ্কর এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, অল্প আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

২। শঙ্কর ও ‘পার্মিনাইডিস’

যান্ত্রবদ্ধ্যপ্রমুখ ঋষিগণ সেই নিত্যবস্তব বিষয়ে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য সেই মতই দার্শনিক ভিত্তির

উপব দাঁড় করাইয়াছেন। এই মতেব সহিত পার্মিনাইডিস্ (Parmenides)এব মতেব দৌসাদৃশ্য আছে। ‘ইলিয়া’ (Elia) নগরীতে যে সমুদয় পণ্ডিত দর্শনশাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পার্মিনাইডিসের নাম দর্শন-জগতে সুপরিচিত। ইহার মতে Nothing exists but one indivisible unalterable absolute reality—এক অদ্বিতীয় অংশবিহীন অপরিবর্তনীয় সত্তা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুব অস্তিত্ব নাই। বেদান্তেও বলা হইয়াছে ব্রহ্ম ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ এই ব্রহ্ম নিত্য অপরিবর্তনীয় এবং স্বগতভেদবহিত। পার্মিনাইডিসের মতে “All variety and change are a delusion” সমুদয় ভেদ ও পরিবর্তন ভ্রান্তি ভিন্ন আব কিছুই নহে। তাঁহাব মতে দেই নিত্যবস্তু অসৃষ্ট, অগ্নিনাশী, ইহাব হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ইহাতে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—ইহা আপনাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য ইহা শঙ্করেরও মত এবং বেদান্তেও এ মতের অভাব নাই।

‘ইলিয়া’ দর্শন ২৫০০ বৎসর পূর্বে পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ যাক্সবদ্যাদি ঋষিগণও ২৫০০ বা ৩০০০ বৎসর পূর্বে ভাবতে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক উভয় দর্শনে যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়।

৩। ‘সত্যম্ জ্ঞানমনস্তম্ ব্রহ্ম ।’

সেই নিত্যবস্তুর নাম ব্রহ্ম। উপনিষদের ব্রহ্মকে ‘সত্যম্ জ্ঞানমনস্তম্’ বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

“যাহা যেক্রমে নিশ্চিত তাহার যদি সেই রূপেব ব্যভিচার না হয় তবেই তাহা সত্য। আর যাহা যেক্রমে নিশ্চিত তাহার সেইরূপের যদি ব্যভিচার হয় তবেই তাহা অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা স্মৃতবাং বিকার অনৃত। কারণ ঋতিতে বলা হইয়াছে ‘বিকার ভাষাজনিত নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য।’ ‘সদস্তুই সত্য’ ইহা নির্ণীত হওয়াতে ‘সত্যম্ ব্রহ্ম’ এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের বিকাব নিষেধ করা হইল। মৃত্তিকার দৃষ্টান্তে মনে হইতে পারে যে ব্রহ্মই কারণ। ব্রহ্মই যখন কাবণ

তখন অপরাপব বস্তুব ত্রায় ইহাব কাবকত্ব বহিয়াছে এবং ইহাও মনে হইতে পারে যে মৃত্তিকাব ত্রায় ইহা অচিৎ। এই সমুদয় আপত্তি দূর কবিবাব জন্য বলা হইল ‘জ্ঞানম্ ব্রহ্ম’। ‘জ্ঞান’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞপ্তি’, ‘অববোধ’। ব্রহ্ম ‘জ্ঞানম্’—এই সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইল ব্রহ্ম ‘সত্যম্’ এবং ‘অনন্তম্’; স্মৃতবাং ব্রহ্মে জ্ঞানকর্তৃত্ব স্বীকাব করা যাইতে পারে না। যেখানে জ্ঞানকর্তৃত্ব সেই থানেই কার্য্য (অর্থাৎ বিকার ও পরিবর্তন) স্মৃতবাং জ্ঞানকর্তৃত্ব স্বীকাব কবিলে কিরূপে ব্রহ্মকে সত্য ও অনন্ত বলা যাইতে পারে? যাহাকে কোন বস্তু হইতে বিভাগ করা যায় না তাহাই অনন্ত কিন্তু জ্ঞান-কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে পৃথক করা হয় স্মৃতবাং এ অবস্থায় ব্রহ্মকে অনন্ত বলা যায় না। ঋতিতেও আছে যেখানে অস্ত্র কিছু দেখা যাব না, অস্ত্র কিছু জ্ঞান যাব না তাহাই ভূমা এবং (যেখানে অস্ত্র কিছু দেখা যায় এবং) অস্ত্র কিছু জ্ঞান যাব তাহাই ‘অস্ত্র’। কেহ কেহ বলিতে পারেন ‘এই ঋতিতে অস্ত্র বস্তুব জ্ঞানই অস্বীকাব করা হইল, আত্মা নিজে নিজেই জ্ঞানে ইহা ত হইতে পারে।’ না, এ প্রকার আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। কাবণ উক্ত বাক্যে কেবল অপব বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করা হইয়াছে—আত্মা নিজেই জ্ঞানিতে পারেন, ইহা উক্ত বাক্যের অর্থ নহে। আত্মাতে যখন ভেদ নাই তখন আত্মাতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। আত্মাকে যদি জ্ঞেয় বলা যায় তাহা হইলে ইহাকে আর জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে না—কারণ ইহাতে কেবল জ্ঞেয়ত্বই অর্পণ করা হইয়াছে। আবার যদি বল এক আত্মাই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই উভয়ই—আমরা বলিব, না, একই আত্মা যুগপৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা হইতে পারেন না, কারণ আত্মা অংশবিহীন। যাহা নিরবয়ব তাহা যুগপৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই একরূপ হইতে পারে না। স্মৃতবাং ‘জ্ঞানম্ ব্রহ্ম’ এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের কর্তৃত্বাদি কারক অস্বীকাব করা হইল এবং ইহাও বলা হইল যে ব্রহ্ম মৃৎ ‘অচিৎ’ নহেন। ‘জ্ঞানম্ ব্রহ্ম’—ইহাতে লোকে মনে করিতে পারে ব্রহ্ম বুঝি সাস্তু—সীমাবিশিষ্ট, কারণ লৌকিক জ্ঞান সাস্তু—এই জন্য বলা হইয়াছে ব্রহ্ম ‘অনন্তম্’। তৈত্তিরীয় উঃ ভাঃ ২। ১।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম এক মাত্র অদ্বিতীয় নিত্য অপরিবর্তনীয়

সত্তা ; ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত । কর্তৃত্বাদি কারক ইহাতে অর্পণ করা যাইতে পারে না । এমন কি ইহাও বলা যায় না যে ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জানেন ।

৪ । সংও নহেন, অসংও নহেন ।

উপনিষদে ব্রহ্মকে সংস্বরূপ বলা হইয়াছে কিন্তু গীতাকাব ইহাতেও সম্ভট নহেন । তিনি বলেন ব্রহ্ম সংও নহেন অসংও নহেন । (১৩।১৩) । শ্লোকটির অর্থ এইঃ—“যাহা জ্ঞেয় তাহা তোমাকে বলিব—ইহা জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয় । সেই আদিরহিত পরব্রহ্মকে সংও বলা যায় না অসংও বলা যায় না” । শঙ্কর ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—“পূর্বপক্ষ বলিতে পারেন—বিশেষ-রূপে বদ্ধপরিকর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হইল ‘যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিব’ ; কিন্তু শেষে বলা হইল ‘তাঁহাকে সংও বলা যায় না অসংও বলা যায় না’—ইহা অনুরূপ হয় নাই” । সিদ্ধান্তী বলিবেন—না ঠিকই হইয়াছে । কেন ? না তিনি বাক্যের অগোচর ; এইজন্য উপনিষদে “তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন” এইরূপ নিবেদন-মুখেই সেই জ্ঞেয়কে—সেই ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

(পূর্বপক্ষ),—যে বস্তুকে ‘অস্তি’ অর্থাৎ আছে এই শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় তাহাই আছে । যাহা নাই তাহাকে ‘অস্তি’ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় না । ‘অস্তি’ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায় না এমন ‘জ্ঞেয়’ অসিদ্ধ ।

(সিদ্ধান্তী)—না, তাহা হইতে পারে না কারণ ইহাও বলা হইয়াছে যে ‘তিনি নাই’ ইহাও নহে যেহেতু তিনি ‘নাস্তি’—বুদ্ধির অতীত । (নাস্তি=নাই) ।

(পূর্বপক্ষ) সমুদয় বুদ্ধিই হয় ‘অস্তি’ বুদ্ধি না হয় ‘নাস্তি’ বুদ্ধির অগুণত, সুতরাং বলিতে হইবে, জ্ঞেয় হয় ‘অস্তি’ বুদ্ধি না হয় ‘নাস্তি’ বুদ্ধিব অধিগম্য ।

(সিদ্ধান্তী)—এই জ্ঞেয় উক্ত কোন প্রকার বুদ্ধিবই অধিগম্য নহেন । কারণ ইহা একমাত্র শব্দ প্রমাণ দ্বারা অধিগম্য এবং ইহা ইন্দ্রিয়ের অতীত । সুতরাং ঘটাদির ত্রায় ইহাকে উভয় বুদ্ধির অধিগম্য বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না । এইজন্যই বলা হইয়াছে তিনি সংও নহেন অসংও নহেন ।

আর যে বলিয়াছিল যে ‘তিনি সংও নহেন, অসংও নহেন’ ; এপ্রকার বলা আশ্চর্যবোধী কথা । ইহাও ঠিক নহে কাবণ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে “তিনি বিদিত হইতে অন্ত এবং অবিদিত হইতে শ্রেষ্ঠ” ।

উক্ত ভাষ্যের শেষাংশে শঙ্কর আবও বলিয়াছেন যে শব্দ মাত্রই জ্ঞাতি, ক্রিয়া, গুণ বা সম্বন্ধ প্রকাশ করে । জ্ঞাতি যেমন গো বা অশ্ব ; ক্রিয়া যেমন—পাঠ করা বা রন্ধন করা ; গুণ যেমন শুক্ল বা কৃষ্ণ ; সম্বন্ধ যেমন ধনবান বা গোমান । ব্রহ্ম কোন জ্ঞাতিভূক্ত নহেন সুতরাং তিনি সদাদি শব্দ বাচ্য নহেন । ব্রহ্ম গুণবান নহেন যে তাঁহাকে গুণ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতে পারে কারণ তিনি নিগুণ । তিনি ক্রিয়া শব্দ বাচ্যও নহেন কারণ তিনি নিষ্ক্রিয়—শ্রুতিতে বলা হইয়াছে তিনি নিফল, নিষ্ক্রিয় ও শাস্তি । ইহার সহিত কোন বস্তুব সম্বন্ধও নাই কারণ ইনি এক অদ্বিতীয় আত্মা । সুতরাং ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত যে ‘কোন শব্দ দ্বারাই ইহাকে বর্ণনা করা যায় না’ । শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে ‘যতো বাচো নিবর্তন্তে’ ইত্যাদি ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে গীতাকারের মতেও ব্রহ্ম সর্বপ্রকার ক্রিয়া ও কারক বর্জিত ।

৫ । ব্রহ্মে স্বগতভেদ নাই ।

ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় ; ব্রহ্মেব স্বজাতীয় কোন বস্তু নাই, বিজাতীয়ও কোন বস্তু নাই—তিনি স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ রহিত । শঙ্কর ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ এর এই প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াও তৃপ্ত হন নাই । ব্রহ্ম যে কেবল স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ বহিত তাহা নহে তাঁহাতে স্বগত ভেদও নাই । যদি বলা হয় ব্রহ্মে নানা প্রকার শক্তি আছে, তাঁহাতে জ্ঞান আছে, প্রেম আছে, ইচ্ছা আছে—তাহা হইলে ব্রহ্মে স্বগত ভেদ স্বীকার করা হইল । কিন্তু শঙ্কর বলেন ব্রহ্মে এপ্রকার কোন ভেদ নাই । এ বিষয়ে তিনি বেদান্ত ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন :—“কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে যেমন বৃক্ষ এক হইলেও শাখা স্বল্প মূল প্রভৃতি রূপে অনেকাত্মক তেমনি আত্মাও নানারস ও বিচিত্র । এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—তাঁহাকে এক আত্মা-

রূপেই জানিবে।” বে: ভা: ১।৩।১। ভাষ্যের অর্থ একস্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন :—“যদি বল ব্রহ্ম বহুরূপ, বৃক্ষ যেমন বহুশাখাযুক্ত, ব্রহ্মও তেমনি বহু শক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত সূতরাং ব্রহ্মের একত্ব ও বহুত্ব উভয়ই সত্য। যেমন বৃক্ষ সমগ্র বৃক্ষরূপে এক কিন্তু শাখাদি রূপে বহু, সমুদ্র সমুদ্র রূপে এক কিন্তু কেনরসাদি রূপে বহু, মৃত্তিকা মৃত্তিকা রূপে এক ঘটশাবাদি রূপে বহু—তেমনি ব্রহ্মের একত্ব ও বহুত্ব উভয়ই সত্য। এই একত্বাংশে মোক্ষব্যবহার ও নানাভাবে লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে। ইহাব উত্তরে আমবা বলি—না এরূপ নহে।” বে: ভা: ২।১।১৪। বৃহদারণ্যক ভাষ্যেও এই মত বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সমুদ্রেব দৃষ্টান্ত লইয়া শঙ্কর বলিতেছেন যে অনেকে মনে করেন যেমন তরঙ্গ-কেন-বুদ্বাদি বশতঃ সমুদ্রে স্বগতভেদ স্বীকার করিতে হয় তেমনি ব্রহ্মেও স্বগতভেদ স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু এ মত সত্য নহে। কারণ শ্রুতিতে তাঁহাকে সৈন্ধব ঘনবৎ প্রজ্ঞান-ঘন একরস অন্তরবিহীন, পূর্ব-অপব, বাহ্য-অভ্যন্তর ভেদ বর্জিত বলা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে তাঁহাকে ‘একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্’—তাঁহাকে একরূপ বলিয়া জানিবে। সূতরাং তাঁহাকে সমুদ্রেব স্থায় বা বনের স্থায় সাবয়ব বা অনেকরস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রত্যুত বলা হইয়াছে যে ‘যে ইহাতে ভেদ দর্শন করে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করে। যখন ভেদ দর্শনেব নিন্দা কবা হইয়াছে তখন বলিতেই হইবে ব্রহ্মে স্বগতভেদ নাই।’ বৃহ: ভা: ৫।১। শঙ্কর বেদান্ত ভাষ্যের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে “শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে ব্রহ্ম চৈতন্য মাত্র নির্বিশেষ, ইহাব কোন মাত্র রূপ নাই। যেমন সৈন্ধব খণ্ড অন্তর ও বাহ্য বহিত এবং একমাত্র রসঘন তেমনি আত্মাও অন্তর ও বাহ্য রহিত ও একমাত্র চৈতন্যঘন। ইহাতে বলা হইল যে আত্মাব অন্তরীক্ষ নাই এবং চৈতন্য ভিন্ন অস্ত্র রূপ নাই; তিনি অন্তর বিহীন অর্থাৎ ভেদ বিহীন; নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ইহার স্বরূপ। যেমন সৈন্ধব খণ্ডেব অন্তরে ও বাহিবে একমাত্র লবণরস, ইহাতে অস্ত্র কোন বস নাই; ব্রহ্মও সেই প্রকার। বে: ভা: ৩।২।৬।

৬। ব্রহ্ম ক্রিয়া, কারক ও ফল বর্জিত।

অনেকে মনে করেন ব্রহ্ম অনন্তশক্তিশালী, প্রেমময়, ইচ্ছাময়, তিনি স্রষ্টা, পাতা, সংহর্তা, ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে শঙ্কর এ সমুদয় কিছুই স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম এ সমুদয়ের অতীত। “ইহাতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কিম্বা ক্রিয়া, কারক বা ফল কিছুই নাই।” প্রশ্ন ভাষ্য ৬।৩। কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণাদিকে কারক বলে। ব্রহ্ম কোন কার্যের কর্তা নহেন, কর্মও নহেন। তাহা দ্বারা কোন কর্মও সম্পাদন করা যাইতে পারে না—সূতবাং তিনি কবণও নহেন। তাহা হইতে কোন বস্তু উদ্ভূত হয় না সূতরাং তাঁহাকে অপাদান বলা যায় না। তাহাতে কোন বস্তু অবস্থিত নহে সূতরাং তিনি অধিকরণও নহেন। ব্রহ্মেব কারকত্ব স্বীকার কবিলে তাহাতে ভেদ এবং ক্রিয়াও স্বীকার করিতে হয়। আবার যেখানে ক্রিয়া সেই থানেই পরিবর্তন। কিন্তু ব্রহ্ম অপরি-বর্তনীয় সত্তা। সূতবাং ব্রহ্মে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, ক্রিয়া, কারক ফল কিছুই স্বীকার করা যায় না। এই মত শঙ্কর বহুস্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন (বে: ভা: ২।১।১৪, গী: ভা: ১।৩২, বৃহ: ভা: ৪।৪।২, ২।৪।১৪, ৩।৩।১, ৩।৪।১ ইত্যাদি)।

৭। ‘ধ্যায়তীব লেলায়তীব।’

শঙ্কর বলিতেছেন আত্মার কর্তৃত্বাদি কিছুই নাই অথচ দেখিতেছি এ সমুদয় সকলেরই প্রত্যক্ষ। যাহা সকলেই দেখিতেছে, সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছে সে বিষয়ে কি কোন প্রকাব সন্দেহ হইতে পারে? ইহাব উত্তরে শঙ্কর বলেন ‘তোমবা যাহা দেখিতেছ তাহা ভ্রমাত্মক, তোমাদের জ্ঞান হয় নাই বলিয়াই তোমরা এই প্রকাব ভ্রম কবি-তেছ’। এই মত সমর্থনের জন্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে (৪।৩।৭) “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” কথাটী বহু স্থলে উদ্ধৃত কবিয়াছেন (বে: ভা: ২।৩।৩০, ৪০, বৃহ: ভা: ১।৩।২ ২।১।২০ ইত্যাদি)। ধ্যায়তীব = ধ্যায়তি + ইব = যেন বিচরণ করেন। লেলায়তীব = লেলায়তি + ইব = যেন বিচরণ করেন। ‘ইব’ শব্দের ব্যবহারে প্রমাণিত হইতেছে যে আত্মা ধ্যানাদি করেন না কিন্তু ভ্রম হয় যেন ধ্যানাদি করেন। শঙ্কর ধোবতর অদ্বৈতবাদী, সেই জন্য ‘ইব’ শব্দ তাঁহার

বড়ই প্রিয়। উপনিষদ ও গীতাতে যে সমুদয় স্থলে ব্রহ্মেব কর্তৃত্বাদি স্বীকার কবা হইয়াছে, শঙ্কর সেই সমুদয় স্থলেও ‘ইব’ শব্দ ব্যবহাৰ কৰিয়া সেই সমুদয় কাৰ্য্যকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। নিম্নে ছই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

জায়মানঃ=জায়মান ইব (যুঃ ভাঃ ২।১।৬)।

প্রতিষ্ঠিতঃ=প্রতিষ্ঠিত ইব (যুঃ ভাঃ ২।১।৭)।

যাতি=যাতি ইব (কঠঃ ভাঃ ২।২।১)।

ব্রহ্মতি=ব্রহ্মতি ইব (কঠঃ ভাঃ ২।২।১)।

এজ্জতি=চলতি ইব (ঈঃ ভাঃ ৫)।

অতোতি=অতোতি ইব (ঈঃ ভাঃ ৪)।

সম্ভবামি=সম্ভবামি ইব (গীঃ ভাঃ ৪।৬)।

যজ্ঞাকৃঢ়াণি=যজ্ঞাকৃঢ়াণি ইব (গীঃ ভাঃ ১৮।৬)।

ইচ্ছন্তঃ=ইচ্ছন্ত ইব (গোড়ঃ পাঃ ভাঃ ৪।১০) ইত্যাদি।

বেদান্ত সূত্রে (২।৩।৪৩) জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। কিন্তু জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিলে শঙ্করের দর্শন বেদান্তদর্শনের বিবোধী হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে তিনি বলিলেন অংশঃ=অংশ ইব।

সুতরাং শঙ্করের মতে ব্রহ্ম ক্রিয়া কাবকাদি বর্জিত।

৮। স্রষ্টি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে ‘যখন কোন পুরুষ নিদ্রিত হয় (স্বপিতি), তখন সে সৎ-স্বরূপের সহিত একীভূত হয়—তখন সে আপনাকে প্রাপ্ত হয় (স্বং অপীতঃ); এই জ্ঞাত বলা হয় সে নিদ্রা যাইতেছে (স্বপিতি)। ৬।৮।১। ‘স্বপিতি’ শব্দের অর্থ ‘নিদ্রা যাইতেছে’; স্বং অপীতঃ=আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া। কয়েকটী অক্ষরের সাদৃশ্য দেখিয়া ঋষি বলিতেছেন যে ‘স্বপিতি’ এবং স্বং অপীতঃ’ একই কথা অর্থাৎ “নিদ্রিত হওয়া=স্ব-রূপ প্রাপ্ত হওয়া”। শঙ্করচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (বেঃ ভাঃ ১।১।২ ; ১।৩।১৫ ; ৩।২।৭, ১০ ; ৩২, ৩৫ ইত্যাদি)।

স্রষ্টির সময় আত্মা সৎ-স্বরূপের সহিত একীভূত হয় সুতরাং এই অবস্থাই আত্মার স্ব-রূপ, ইহাই ব্রহ্মত্ব। অতএব ব্রহ্মের প্রকৃত রূপ কি তাহা জানিতে হইলে এই

স্রষ্টিব দিকেই দৃষ্টিপাত কৰিতে হইবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এবিষয়ে এই প্রকাৰ লিখিত আছে :—

“ইহাই তাঁহার কামনারহিত পাপরহিত অভয়রূপ। ‘প্রিয়য়া দ্বিযা সম্প্রিষক্তঃ’ হইলে পুরুষ যেমন অন্তর ও বাহ্য জানে না, তেমনি এই পুরুষ প্রজ্ঞাত্ব কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে অস্তব বা বাহ্য কিছুই জানে না। ইহাই তাঁহার আশ্রয়কাম, আশ্রয়কাম, অকাম ও শোকরহিত অবস্থা। এই অবস্থাতে পিতা অপিতা হয়েন, মাতা অমাতা, দেব অদেব, বেদ অবেদ হয়েন। এই অবস্থাতে স্তেন (=চোব) অস্তেন, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌন্ডস অপৌন্ডস, শ্রমণ অশ্রমণ এবং তাপন অতাপন হয়। পুণ্য ইহাব অনুগমন কৰে না, পাপও ইহার অনুগমন করে না, তখন এই পুরুষ হৃদয়ের সমুদয় শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন। এই অবস্থাতে তিনি দর্শন করেন না। দূর্শন কৰিয়াও দর্শন কৰেন না। (দর্শন করেন ইহার কারণ এই যে) দ্রষ্টার দৃষ্টি কখন বিলুপ্ত হয় না, কাৰণ ইহা অবিনাশী ; (দর্শন করেন না ইহার কাৰণ এই যে) তাহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি দর্শন করিবেন। এই অবস্থায় তিনি আত্মা করেন না, আত্মা করিয়াও আত্মা করেন না। (আত্মা আত্মা করেন, কাৰণ) ভ্রাতাব ভ্রাণ কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী ; (আত্মা কৰেন না, কাৰণ) ইহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি আত্মা করিবেন। এই অবস্থায় তিনি রসাস্বাদন কৰেন না, রসাস্বাদন করিয়াও রসাস্বাদন করেন না (রসাস্বাদন করেন, কাৰণ) রসায়িতাব রসাস্বাদন কখন বিলুপ্ত হয় না কাৰণ ইহা অবিনাশী ; (রসাস্বাদন করেন না, কাৰণ) তাহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি আত্মা করেন। এই অবস্থায় তিনি বলেন না, বলিয়াও বলেন না ; (তিনি বলেন, কাৰণ) বক্তার বক্তৃতা কখন বিলুপ্ত হয় না, কাৰণ ইহা অবিনাশী ; (তিনি বলেন না, কাৰণ) তাহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি বলিবেন। এই সময়ে তিনি শ্রবণ কৰেন না, শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ কৰেন না ; (শ্রবণ করেন, কাৰণ) শ্রোতার শ্রুতি কখন

বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী; (শ্রবণ করবেন না, কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি শ্রবণ করিবেন। এই অবস্থায় তিনি মনন করেন না, মনন কবিয়াও মনন করেন না; (মনন করেন, কারণ) মননকারীর মনন কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী; (মনন করেন না, কারণ) ইহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি মনন করিবেন। এই অবস্থায় আত্মা স্পর্শ করেন না; (স্পর্শ করেন, কারণ) স্পর্শকারীর স্পর্শ কখন বিলুপ্ত হয় না কারণ ইহা অবিনাশী; (স্পর্শ করেন না, কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি স্পর্শ করিবেন। এই অবস্থায় আত্মা জ্ঞানেন না, জানিয়াও জ্ঞানেন না; (জ্ঞানেন, কারণ) জ্ঞাতার জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী; (জ্ঞানেন না, কারণ) তাঁহা হইতে এমন কোন দ্বিতীয় বা অবিভক্ত বস্তু নাই যাহা তিনি জ্ঞানিবেন। যেখানে অন্ত বস্তু রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, তখন এক অপরকে দর্শন করে, —এক অপরকে আভ্রাণ করে, এক অপরকে আবাদন করে, এক অপরকে বলিয়া থাকে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে স্পর্শ করে এবং এক অপরকে অবগত হয়। কিন্তু এই সলিল (অর্থাৎ সলিলের ছায় অন্তর্কর্ষাভেদ বহিত আত্মা) এক অদ্বিতীয় দ্রষ্টা। ইহাই ব্রহ্মলোক।... ইহাই পরমাগতি, ইহাই পরম সম্পৎ, ইহাই পরমলোক। ইহাই পরমানন্দ। বৃহঃ উঃ ৪।৩।

উদ্ধৃত অংশের ভাষ্য অতি বিস্তীর্ণ, সুতরাং ইহা উদ্ধৃত করা অসম্ভব। এই অংশ শঙ্করের অত্যন্ত প্রিয়, বেদান্ত দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ইহা ২৩।৩০ বাব উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত অবস্থাকে ‘ব্রহ্মলোক’ বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন ‘ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ’ অর্থাৎ ব্রহ্মকেই লোক বলা হইয়াছে। ইহাই পুরুষের আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম, শোকরহিত রূপ। এই অবস্থাতে পুণ্য ইহাব অমুগমন করে না, পাপও ইহার অমুগমন কবে না। তখন পুরুষ স্বপ্নের সমুদয় শোক হইতে বিমুক্ত হইবেন। এই অবস্থাই পরমাগতি, পরম সম্পৎ, ও পরমানন্দ—সংক্ষেপে ইহাই মুক্তাবস্থা। বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন “ব্রহ্ম

এবহি মুক্তাবস্থা” ৩।৪।৫২ অর্থাৎ ব্রহ্মই মুক্তাবস্থা। সুতরাং পূর্বেকৃত অবস্থাই ব্রহ্ম।

স্বপ্নাবস্থায় আত্মা একাকার প্রাপ্ত হয়—এই অবস্থাতে আত্মাতে কোন প্রকাব ভেদ দৃষ্ট হয় না। শঙ্কর একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভাব পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন “যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা অবিভাজ্যমানং সর্ষম্ ঘনমিব, তদ্বৎ প্রেক্ষান ঘন এব (মাঃ ভাঃ ৫।) অর্থাৎ ব্যক্তিতে নৈশ অন্ধকারে সমুদয় বস্তু যেমন অবিভক্ত ঘনাকার হয়, প্রেক্ষান ঘনও তদ্রূপ”।

৯। তুরীয় ব্রহ্ম ।

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার বিষয় সকলেই জ্ঞানেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদে জাগ্রিত স্থানকে ‘বিশ্ব’ বা ‘বৈশ্বানর’; স্বপ্ন স্থানকে ‘তৈজস’ এবং সুষুপ্ত স্থানকে ‘প্রাজ্ঞ’ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের মতে সুষুপ্তাবস্থাই মোক্ষাবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মাবস্থা কিন্তু মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলা হইয়াছে আত্মাব প্রকৃতাৱস্থা সুষুপ্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। এই অবস্থার নাম তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থা। শঙ্কর বলেন ‘এই জগত্ই মুনিগণ জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাৱয় বর্জন করেন।’ বৃহঃ ভাঃ ৪।৪।২৩।

গৌড়পাদীয় কারিকার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য পূর্বেকৃত অবস্থা চতুষ্ঠয়ের এই প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন:—

“তুরীয় আত্মা কি প্রকার তাহা অবধারণ কবিবার জন্ত বিশ্বাদির সামান্য ও বিশেষ ভাব নিরূপণ করা যাইতেছে। যাহা করা যায় তাহাই কার্য্য, তাহাই ফল স্বরূপ, যে করে সে কারণ, ইহাই বীজ স্বরূপ। ‘বিশ্ব’ তত্ত্বগ্রহণ কবিত্তে পাবে না এবং ‘তৈজস’ তত্ত্বের বিপরীত ভাব গ্রহণ করে অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থায় আত্মার তত্ত্বজ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে এবং স্বপ্নাবস্থায় আত্মার বিপরীত জ্ঞান হইয়া থাকে। এই ‘বিশ্ব’ ও ‘তৈজস’ বীজ ও ফল ভাব দ্বারা আবদ্ধ। ‘প্রাজ্ঞ’ কেবল মাত্র বীজ ভাব দ্বারাই আবদ্ধ। সুতরাং বিশ্ব ও তৈজস তুরীয় ব্রহ্মে বিদ্যমান নাই। প্রাজ্ঞ ও তুরীয় কেহই যৈত গ্রহণ করিতে পারে না। এ বিষয়ে ইহার একরূপ। এখন আশঙ্কা হইতে পারে কেন প্রাজ্ঞকে কারণবদ্ধ বলা হইল এবং তুরীয়কে এ প্রকার বলা হইল না। এই আশঙ্কা নিবৃত্তি করা যাইতেছে। তত্ত্বের প্রতিবোধ না হওয়াই নিদ্রা, ইহাই

বিশেষ প্রতিবোধের বীজ, ইহাই বীজনিদ্রা। প্রাজ্ঞ এই বীজনিদ্রায়ুক্ত। কিন্তু সর্বদা দর্শনই তুরীয়ে স্বভাব, স্ততরাং তত্ত্বপ্রতিবোধরহিত নিদ্রা তুরীয়ে বর্তমান নাই— স্ততরাং তুরীয়ে কাবণভাব নাই। স্বপ্ন=অন্তথা গ্রহণ; যেমন রজ্জুতে সর্প গ্রহণ হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান না থাকাই নিদ্রা, ইহাই তমঃ। বিশ্ব ও তৈজস এই স্বপ্ন ও নিদ্রায়ুক্ত। স্ততরাং ইহার কার্য্যাকাবণবদ্ধ। প্রাজ্ঞ স্বপ্নবর্জিত কেবল নিদ্রায়ুক্ত স্ততরাং কেবল কারণবদ্ধ। অর্থে যেমন অন্ধকাব দৃষ্ট হয় না তেমনি তুরীয় ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদগণ স্বপ্ন ও নিদ্রা দর্শন করেন না; কারণ তুরীয়ে এই প্রকাব দর্শন বিরুদ্ধ কথা। স্ততরাং তুরীয়ে কার্য্য কারণ বন্ধন নাই।”

১।১১—১৪।

মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে (৭) শঙ্কর বলিয়াছেন:—

‘তুরীয় ব্রহ্ম অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন’—ইহাতে বলা হইল যে তিনি ‘তৈজস’ নহেন। ‘তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন’ ইহাতে বলা হইল তিনি বিশ্ব নহেন। ‘তিনি উভয়প্রজ্ঞ নহেন’—ইহাতে বলা হইল যে তিনি জাগ্রত ও স্বপ্নেব মধ্যবর্তী কোন অবস্থাও নহেন। ‘তিনি প্রজ্ঞানঘন নহেন’—ইহাতে বলা হইল তিনি স্নবৃণ্ড অবস্থাও নহেন। কারণ স্নবৃণ্ডই অবিবেক এবং বীজ স্বরূপ। ‘তিনি প্রজ্ঞ নহেন’ ইহাতে বলা হইল যে ‘স্তাহার যে যুগপৎ প্রজ্ঞাত্ব আছে তাহাও নহে’। ‘তিনি অপ্রজ্ঞ নহেন’ ইহাতে বলা হইল তিনি অচেতন নহেন।

মা: ভা: ৭।

১০। নেতি নেতি ।

মাণ্ডুক্য উপনিষদের মতে “ব্রহ্ম বহিঃ প্রজ্ঞ নহেন, অন্তঃ প্রজ্ঞ নহেন, উভয় প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞান ঘন নহেন, প্রজ্ঞও নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন”—তবে ব্রহ্ম কি? উপনিষদের ভাষা উদ্ধৃত কবিয়া শঙ্কর বলিতেছেন “নেতি নেতি” “তিনি ইহা নহেন ইহা নহেন।” এই ভাবেই ব্রহ্মকে জ্ঞানিতে হইবে।

• আস্মা, অবিস্তা, জগৎ ইত্যাদি বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ ।

দেবদূত ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

স্থান—অববিন্দের শয়ন-কক্ষ ।

কাল—মধ্যাহ্ন ।

(অববিন্দ ও মাধবী । সম্মুখে—পীড়িত শিশু শায়িত ।)

অর।—ঘুমায়েছে। যাও এবে ক্ষণেক বিশ্রাম তরে;
আজি চারিদিন হ’তে ওই ছু’টা নেত্র পূরে
নিদ্রা নাহি। অপলক চক্ষু কেমনে না জ্বাঝি
—অনিবার এত যত্নে কর সেবা হে কল্যাণি,
অগ্রাহ্য কবিয়া সর্ব স্বপ্ন-স্বাস্থ্য আপনার !

তুমি বড় মায়াময়ী !

মাধবী।—(স্তম্ভ পান করাইতে বুধা বারম্বার চেষ্টা কবিয়া)

আহা—বাছারে আমার,

দেখ্ চেয়ে—দেখ্ চেয়ে—আমি যে জননী তোরা !

এত ঘুম কেন ধন?—ও মাণিক !

অর। (স্বগত)

কি স্থানর !

(প্রকাশে) থাক, থাক,—যাও তুমি ক্ষণেক বিশ্রাম তরে।

ঘুমাক্ না আরো কিছু। জাগিবে যখন পরে,
তোমারে আনিব ডাকি। যাও তুমি। আপনার
শরীরে তাচ্ছীল্য হেন কবিলে গো অনিবার,
তোমারি তনয়ে সেবা করিতে পা’বেনা;—নিজ
পীড়িতা হইলে তুমি, ভাবিছ না হ’বে কি যে।

যাও এবে;—শোন কথা !

মাধবী।

কি বলিছ?—এই যাই।

দেখো—দেখো ! এ কি ঘুম? না না।—থাক।

কি যে ছাই

• মনে ভাবি !

শোন নাথ, বহুক্ষণ থেকে ওয়ে

খায় নাই ! যাছ মোর,—উঠো !

অর।

আজ্ঞা ও কি বোঝে

কথা তব? হেন ভাবে বিরক্ত করিলে ওরে,

পীড়ার যে বৃদ্ধি হ’বে ! বিশ্বাস করগো যোবে,

শোন কথা—যাও তুমি; জাগিলে, নিজেই আমি

ডাকিয়া আনিব পুনঃ। যাও, কথা শোনো।

মাধবী।

স্বামি,

যাব? যাব? কোথা যাব নাথ? ও ছাড়া যে আর

কেহ কোথা নাহি মম ! জানো নাথ, ও আমার

কত গুণ্য-কষ্টে পাওয়া নিম্নাশ্য-কুসুম? তুমি

দেখো চেয়ে—এ ফুল তো ত্যজিবে না মর্ত্য-ভূমি !

—ও যে বড় প্রভাময় ! ও যে বড় স্নমধুব !—

দেখিছ না মুখখানি ! (মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া)

ওই দেখো—নীচে ক্রুর

তুলি-আঁকা, ফুটে' আছে যেন ছ'টি পদ্ম-ফুল !

কি সুন্দর দেখো বড় ! গঠনটি কি অতুল !

বল দেব, বল প্রভু, একি সত্য মোর কেহ ?—

না, এ স্বপ্ন-লব্ধ দেব-আশীর্বাদী ?

অব । (স্বগত)

—মাতৃস্নেহ !

কি অসীম ভালবাসা ! কি প্রেমাম্বু এ আগ্রহ

হুনিবার ! এ বিশ্বের প্রতি রঞ্জে অহবহ

এই প্রেম ! ওই ক্ষুদ্র রমণী-জীবন-নাথ

জগতের মূল তত্ত্ব ফুটিয়া উঠেছে আশ্রয় !

কি অপূর্ণ এই শক্তি ! আছ তুমি হে ঈশ্বর !—

বৃথা ভ্রান্ত জীবকুল সন্দেহেতে নিবস্তুর

আধাবে ঘুরিয়া মরে ব্যথাপূর্ণ, থিন্ন প্রাণে !

—আছ তুমি !

মাধবী । (সন্ন্যস্ত ব্যাকুলতাব সহিত ক্রুর নিকটে আসিয়া)

কি ভাবিছ ? সত্য বল,—বল কাণে,

—বাঁচিবে তো ?

(অর্ধ স্বগত) এত ঘুম ! ঘুমেও তো স্তন মোর

লভেনি বিশ্রাম কভু !

(প্রকাশ্যে) ঘুমিয়ে কখনো ওর

এমন বিরাগ আর প্রভু, দেখিনি তো কভু !

থাকে ঘুমে ; স্বভাবতঃ—এই বক্ষ থেকে তবু,

টেনে' লয় স্তন হ'তে হৃদয়ের স্নেহ-ধারা !

কখনো তো মা'র ডাকে বাছা দেয় নাই সাড়া,—

এমন তো ঘটে নাই ! বল—বল দেব, বল—

এ তো কিছু মন্দ নয় ?

(নিকটে গিয়া, তনয়ের গাত্রে হস্ত দিয়া)

একি ! কেন অবিরল

এত ধাম ঝরে ?

(স্তম্ভ দানের চেষ্টা করিয়া, শিশুর প্রতি চাহিয়া)

এরি মধ্যে এত অবহেলা !—

নিবিনে আমাব দান ? • আজি, এইটুকু বেলা,—

এরি মধ্যে মা'র অপমান ?

(সরোদনে) অভাগী ব'লে কি

তুই-ও চা'বিনে মোরে—ধন !

অব । (স্বগত)

হা—বিধাতা, একি ?

অবহেলা কে করে তোমা'য় ? অভাগী বলিয়ে

কে চাহে না বলে, 'শিশু-পুত্র বক্ষে নিয়ে

এত অভিমান তব ? হায়—কে সে ঘৃণ্য প্রাণী ?

কে সে ?—আমি ! এতদূর ! হা অদৃষ্ট !

(প্রকাশ্যে)

শোনো বাণী—

যাও তুমি, করগে বিশ্রাম । বৃথা, হেন ভাবে

পাগলিনী হ'লে প্রিয়ে, কিবা শুভ ফল পাবে ?

পীড়িত তনয় তব ; তাই, এবে নাহি চাহে

স্তন-পান করিবারে তব ; আবো হের তাহে

একান্ত নিদ্রিত ওবে !

যাও ! শোন মোর কথা ।

কখনো তো মোর বাক্যে তোমার এ বধিবতা

হেবি নাই । তবে, কেন ?

(কাছে আসিয়া হস্ত ধারণ পূর্বক)

—যাও প্রিয়ে, ওই গৃহে

ক্ষণেক শয়ন কর । আমিই তোমারে গিয়ে

আনিব ডাকিয়া দেবি, পুনঃ স্বল্পকাল পরে ।

যাও হোথা হে প্রেমসি, বারেক বিশ্রাম তরে ।

—কথা শোন ।

[মাধবী নীরবে, পুত্রের প্রতি চাহিতে চাহিতে

বক্ষে হাত দিয়া নিস্তাস্ত হইলেন ।]

কি আশ্চর্য মহানের এ সৃজন !

ওই টুকু বক্ষে গুণ-সমুদ্রের এ প্রাবন

কেমনে—কি ভাবে এল ? ও জীবন-মাঝে, আহা—

এত বুদ্ধি, এত সজ্জ, এত পবিত্রতা, যাহা

আমাদেবো এ জীবনে হ'ল নাক সঞ্চারিত—

কেমনে ও হিয়া মাঝে হ'ল তাহা বিকশিত !

করিয়াছি অবহেলা,—সত্য, বিনা দোষে, মরি—

তোমারে গো এতকাল নিয়তই তুচ্ছ করি' !

এত গুণ তব ! তবে, করিবে না কিগো ক্ষমা—

আমার সে শত দোষ দেবি ?

চিব-মনোবমা*

সত্যই এ নারী-জাতি ! রূপে ? নহে—তাহা নহে !

অতুল গুণেরি প্রভা নিত্য দীপ্ত হ'য়ে বহে

ওই পুণ্য তম্বু' পবে ;—স্বচ্ছ ওই দেহ যেন

করিতেছে বিকিরণ অন্তরের আভা হেন ।

তাই, তুমি মধুময়ী,—অপরূপ রূপবতী !

তাই, বিশ্ব নানা ভাবে ওঠে নিত্য এ আরতি

তোমাদের হে স্তম্ভরি !

[অন্তর্পূর্ণা, অজয় ও চিকিৎসকের প্রবেশ ।]

(শয্যা'পবে উপবিষ্ট হইয়া, শিশুর প্রতি চাহিয়া)

অন্ন । এখন কেমন আছে ?

একি !—এত দর্শ্য কেন ? (গাত্র-স্পর্শ করিয়া বোদন)

অজ্ঞ । (বন্ধু-শিশুর প্রতি চাহিয়া) অর্দ্ধ ঘণ্টা !—এবি মাঝে

এতই মগ্ন কেন ?

(শিশুর নিকটে অগ্রসর হইয়া, চিকিৎসকের প্রতি)

দেখো—স্পন্দন যেন !

আছে তো ?

(অন্নপূর্ণার প্রতি)

ও দিদি, সরো !

[অলক্ষিত ভাবে, এই সময়ে, স্থির দৃষ্টিতে, ধীর পদক্ষেপে
মাধবীর প্রবেশ । আকাশে মেঘ-গর্জন ও তৎসহ
সহসা ক্ষণপ্রভার তীব্র দীপ্তি !]

চিকি । (শিশুর তলুতে হস্ত দিয়া)—নাই !

বৃথা, আর কেন ?

বৃথা শোক ! বিধে এই উদ্দাম উচ্ছ্বাস হেন—
নিরর্থ আক্ষেপ ! হৃৎ-শোক এই দেহ সহ্যে ;
তবু জীব কাঁদে !

সব যায়, পুনঃ সবি রহে !

[চিকিৎসকের প্রস্থান ।]

[অন্নপূর্ণা ছিন্ন-মূল ব্রততীর স্নায় ভূমিতলে লুপ্ত হইয়া
আর্দ্রনাভ কবিতা উঠিলেন, অজয় চক্ষু বজ্রাবৃত করিয়া
বালকের স্নায় রোদন করিতে লাগিলেন ; শুধু, দূরে—
নিষ্পন্দ প্রস্তর-মুষ্টির স্নায়, শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া,—দাড়াইয়া
রহিলেন অরবিন্দ ।]

মাধ । (ধীরে অন্নপূর্ণার হাত ধরিয়া, ধীর কণ্ঠে,
অর্দ্ধ স্বগত ভাবে)

চুপ কর দিদি ! দেখো—কিবা এ স্থনের রূপ !
—যেন শুধু রশ্মি-কণা !

খামো, স্থির হও, চুপ !—

দেখি'ছনা কত গাঢ় ঘুম ? এত শীঘ্র আর
জাগামো না । চুপ কর । দেখো, এ ঘুম বাছার
ঘুম নহে, জাগরণ ! এ যে করিতেছে খেলা !
—জাগিয়ে ঘুমের ভাণ ! শোনো—চলো এই বেলা
গৃহকাষ সেরে' আসি । বাছা স্বপ্নটিরে ল'য়ে
খেলুক না কিছুক্ষণ হেন ভাবে ভোর হ'য়ে ।—
কিবা ক্ষতি ? ও শুকি ঘুম,—না, চেতনা ?

অব । (গম্ভীর স্বরে) মাধবী,
কি কহি'ছ ?—ক্ষান্ত হও !

মাধ । (স্বামীর প্রতি ব্রন্ত নেত্রে চাহিয়া, মাধার
কাপড় টানিয়া)

(স্বগত) প্রভু !—এখানে ! এখন !

একি ? কেন ?—দিদি কেন হেন করেন রোদন !
একি হলো ?—

(ক্ষণ পরে, প্রকাশ্যে, ক্রন্দন সহ)

খোকা !—যাহু মোর !

অন্ন । ডাকিছ এমন

ক'রে চির-হতভাগি ! ওরে, সে বুকের ধন
চলে গেছে, চলে গেছে ! কর—যতই ক্রন্দন,
পা'বিনে তাহারে আর !

মাধ । (মৃত দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সচুর্ষনে)

ওরে ও বুকের ধন,

ওরে মোর অশ্রুবিন্দু, ও নিধি, নয়নমণি
ওরে রে সর্বস্ব মোর, দেখ—আমি যে জননী !
কোথা—কোথা গেলি বাপ, ফেলি' আমারে ?—

কোথায় ?

বল, বল ! (চুর্ষন)

কোথা বাস বল ! এই-টুকু হায়,—
বড়ই যে ছোট তুই ! একা, একা, কোথা যা'বি ?
কিছু তো জানিনা ধন ! বল—হৃৎ কোথা পা'বি
মায়ের এ বুক ছাড়া ! ওরে বৌটা-ছেঁড়া কুঁড়ি,
আমারে ফেলিয়া গেলি ?—বাপ ! (মুর্ছা)

অর । (সবেগে অগ্রসর হইয়া) কেহো দূরে ছুঁড়ি'
ওই ও শিশুও ওই তুচ্ছ, বিনশ্বর দেহ !
কেহ ওরে চিনিয়াছ ? জেনেছ কি আজো কেহ—
কে ছ'দিন তরে হেথা আসিয়াই গেল চলি' ?

দেবদূত ! মোর প্রতি আজি গিয়াছে ও বলি'—

বিধির নির্দেশ-বাণী, সে অপূর্ব মহাদেশ !
ক্ষান্ত হও ! মিশাইয়া দাও—এই, এই শেষ
উপলক্ষ চিহ্নটিরে ওই মৃত্তিকার সনে
কৈদোনা বিমুঢ় সম ।—আসে নাই অকারণে ।
কি জন্ত ও এসেছিল, আমি জানি ।

এবে তবে,

যাও—ওরে নিরে যাও দূরে হেথা হ'তে । হ'বে
এবে হেথা নিরঞ্জন, এই পূণ্য-ক্ষেত্রে, মোর এ
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য-পালন ।

(ছুটিয়া মাধবীর সমীপবর্তী হইয়া, তাহার শিব স্মার
জাম্বদেশে উঠাইয়া লইলেন ।)

অন্ন । ওরে,
ও অজয়, শোন্—শোন্, দেখ—কি হ'ল আবার !
হৃৎসহ এ দৃষ্ট ঘেরে দেখিতে পারিনে আর !
ভগবান, হে শ্রীহরি, আজো নে'বে নাকি এই—
এই চির-হৃৎখিনীরে ?—দয়া এটুকুও নেই !

[গৃহ-বহির্গতা হইলেন ।]

অজ । অরবিন্দ, তুমিও কি হেন হইবে উতলা ?
বন্ধু, প্রিয়বর !

অর । —যাও এবে হেথা হ'তে !

(মাধবীর প্রতি) বালা,

মাধবী, উঠিয়া দেখো—আজি কে ডাকে তোমারে !

—আমি, হীন অরবিন্দ তব । এতদিন যা'রে
চাহিয়া, মাধিয়া, ভালো বাসিয়া অনন্ত মনে,—
কিছুতেই পাও নাই ; আজি দেখো—সে কেমনে
তব কৃপা, ক্ষমা-প্রার্থী ! প্রিয়ে,—

অজয় । (মৃত কায়টি বস্ত্রাবৃত করিয়া, কোলে
উঠাইয়া গৃহ নিজস্ব হইতে হইতে স্বগত)

হে মঙ্গলময়,

এ কেমন দীলা প্রভু, তব ? জয় তব জয় ।

[নিজস্ব হইয়া গেলেন ।]

অর । প্রিয়ে, আমি স্বামী তব । হের কহি পুনঃ পুনঃ
ওঠ, চেয়ে দেখো—আমি !

মাধবী ।

—প্রাণনাথ, তুমি !

অর ।

শুন—

আমি চিরদিন অগ্নি দেবি, তোমাবে—তোমাবে
—আমার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ওই স্বর্ণ-প্রতিমারে
করিয়াছি অবহেলা—অকারণে ! কেন জানো ?
—এত দিন অন্ধ, মৃত ; ছিল না আমার প্রাণো ;
এত দিন অচেতন আছিলাম আশ্র-মোহে ;
তাই, রক্ত চিনি নাই । তুমি সে সকলি সহে'
দেবীত্ব উন্নীতা আজি ! আর, আমি ?—আজি হায়,
দাঁড়াইয়া চাহি ক্ষমা ঘৃণ্য অপরাধী প্রায় !
ক্ষমা কি কবিলে দেবি, করিবে কি রূপা মোরে ?
তেমনি অতুল ধৈর্য্যে দিবে স্থান বক্ষ'পরে ?
চাহো নাকি আর মোবে ? বল ! বলিতেই হ'বে—
কবিবে না ক্ষমা মোরে ?

—মাধ । (চরণ-ধারণ করিয়া, বাস্পাক্ক কণ্ঠে)

—সর্বস্ব আমাব !

অর ।

—তবে,

এসো—এসো বক্ষে এসো হে নিখিল-দিব্য-জ্যোতি ;
এসো আলিঙ্গন-পাশে সতি, সতি, সতি, সতি !

• [মাধবী আলিঙ্গন-বদ্ধা হইলেন ।]

[যবনিকা-প্রক্ষেপ ।]

সমাপ্ত ।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী ।

সতুপায় ।

বরিশালের কোনো একস্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর
পাইলাম যে, যদিও আঙ্গকাল করকচ লবণ বিলাতী লবণের
চেয়ে শস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত
মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতী লবণ খাইতেছে ।
তিনি বলেন যে সেখানকার মুসলমানগণ আঙ্গকাল স্রবিধা
বিচার করিয়া বিলাতী কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না,
তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে ।

অনেকস্থলে নমস্কৃতদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ
পাওয়া যাইতেছে ।

আমরা পাটিশন ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে
বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা
অপেক্ষা বড় কথা এবং দূরের কথা আমবা ভাবি নাই ।

যদি জিজ্ঞাসা কব ইহা অপেক্ষা বড় কথাটা কি তবে
আমি এই উত্তর দিব যে—বাংলাদেশকে দুইভাগ কবাব
দ্বারা যে আশঙ্ক্য কাবণ ঘটয়াছে, সেই কারণটাকেই দুব
করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা—রাগপ্রকাশ করাটা তাহার
কাছে গোণ ।

পাটিশনে আমাদের আশঙ্ক্য কাবণ কি ? সে কথা
আমরা নিজেবা অনেকবা আলোচনা কবিয়াছি । এমন
কি, আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেই দিকে লক্ষ্য
রাখিয়াই কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব অপূর্ব এই দুইভাগে
বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ করিয়াছেন ।

বাংলাদেশে পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক ।
ধর্ম্মগত ও সমাজগত কাবণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে
ঐক্য বেশি—সুতবাং শক্তিব প্রধান উপকবণ তাহাদের
মধ্যে নিহিত হইয়া আছে । এই মুসলমান অংশ, ভাষা
সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একস্ববশতঃ হিন্দুদের সঙ্গে অনেক-
গুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে । যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও
মুসলমানপ্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায়,
তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল
কবিয়া দেওয়া সহজ হয় ।

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া
দেওয়া কঠিন । কারণ বাঙালী হিন্দু মধ্যে সামাজিক
ঐক্য আছে । কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা
ভেদ বহিয়া গেছে । সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা
উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছি বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে
অনুভব করা যায় নাই ;—হুই পক্ষে একরকম করিয়া
মিলিয়াছিলাম ।

কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজ্য যদি চেষ্টা করিয়া সেই
ভেদটাকে বড় কবিতো চান এবং হুই পক্ষকে স্বাধীন
স্বতন্ত্র কবিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের
দুব্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া
চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই ।

আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে ভেদ জন্মাইয়া

দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন। বেহারীগণ বাঙালীর প্রতিবেশী এবং বাঙালী অনেক দিন হইতেই বেহারীদের সঙ্গে কারকারবার করিতেছে কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে বেহারীর সৌহার্দ্য নাই সে কথা বিহারবাসী বাঙালীমাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালী হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামীদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িয়া আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলা দেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই এবং বাঙালীও বেহারী উড়িয়া এবং আসামীকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞাঘারা পীড়িত করিয়াছে।

অতএব বাংলাদেশের যে অংশেব লোকেবা আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া জানে সে অংশটি খুব বড় নহে এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শস্তে উর্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ, যেখানকার অধিবাসী বশীবে বল আছে, মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং জুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সাবভাগ গুণিয়া লয় নাই সেই অংশটিই মুসলমানপ্রধান—সেখানে মুসলমান সংখ্যা প্রতি বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিবল হইয়া পড়িতেছে।

এমন অবস্থায় এই বাঙালীব বাংলাটুকুকেও এমন কবিতা যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলা দেশের মত এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।

এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্ত আমরা ইংবেজরাজের প্রতি যতই রাগ কবি না কেন এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ কবিবার জন্ত বিলাতী বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হোক না, তাহার চেয়ে বড় আবশ্যক আমাদের পক্ষে কি ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট ব্যাপারটাকেই

এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনো প্রকারেই হোক বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জ্ঞেদ এত বেশিমানায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা সুরবিধা অসুরবিধা বিচারমাত্র না কবিয়া বিলাতী লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কারসাধনের কাছে আব কোনো ভালমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকেব সম্মতিকে জয় কবিয়া লইবাব বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে তাহার কর্মফল দেখাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষ্যে আমরা দেশেব নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুরবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম সে কথা স্বীকার কবিত্তে আমাদের ভাল লাগে না কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।

তাহাব ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মত কাপড় পরাইতে কত দূর পারিলাম তাহা জানি না কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত কবিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অসুরবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি একথা সত্য নহে। এমন কি, যাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ইহার কারণ, আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মন পাই নাই—মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই—আমাদের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবারই চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সেই জন্ত সহসা একদিন

ইহাদের স্পৃহা প্রায় ঘবের কাছে আসিয়া ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে, বিরোধকেই জাগাইয়া তুলিয়াছি। ইহাদিগকে আত্মীয় কবিতা না তুলিয়াই ইহাদের নিকট হইতে আত্মীয়তা দাবী করিয়াছি। এবং যে উৎপাত আপন লোক কোনোমতে সহ্য করিতে পারে সেই উৎপাতের দ্বারা ইহাদিগকে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ দুবে ফেলিয়াছি।

এবাবে এতকাল পবে আমাদের বক্তাবা ইংবেজি সভার উচ্চমঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বাবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে সহজেই একটা প্রশ্ন উদয় হইল—একি ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্ত বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন?

বস্তুতই তাহাদের জন্ত আমাদের মাথাব্যথা পূর্বের অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনো একমুহূর্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে “দেশি কাপড় পবিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে এই জন্তই আমাদের দিনে আহাৰ নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটতেছে না।” আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, “ইংরেজকে জব্দ কবিতো চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না অতএব ক্ষতি স্বীকার কবিতো তোমাদিগকে দেশি কাপড় পবিতো হইবে।”

কখনো বাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে ববাবর অশ্রদ্ধাই কবিতো, ক্ষতি স্বীকার কবাইবাব বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপব হয় না।

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয়, যে, কোনদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্যমাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর কবিতো বণ করিতে পাবিলাম না। উল্টা ইহাদের গুমব বাড়িয়া যাইতেছে।

যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নীচের লোকদের সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ অধৈর্য্য ঘটে। অশ্রদ্ধাবশতই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় জন্মে। ইংবেজিও ঠিক এই কাবণবশতই

আমাদের দ্বারা তাহাব কোনো অভিপ্রায়সাধনের ব্যাঘাত ঘটলেই কার্যকাবণ বিচার না করিয়া একেবাবে রাগিয়া উঠে;—আমরা যখন নীচে আছি তখন উপরওয়ালার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কাবণে বাধা পাইলেও সে বাধাকে অবিশিষ্ট স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে হয়।

ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তাবা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পাবেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত বাগ করিয়াছিলেন। একথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে আমরা যে, মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের বথার্থ হিতৈষী তাহাব কোন প্রমাণ কোন দিন দিই নাই অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে বোম্বী কবা যায় না। ভাইয়ের জন্ত ভাই ক্ষতি স্বীকার কবিতো থাকে বটে কিন্তু ভাই বলিয়া একজন ধামকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে আমরা তখনি কেহ তাহাকে যবেব অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতর ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃত্বাব অত্যন্ত জাগরুক আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

*পূর্বেরই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালবাসাবশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় “ভাই” শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না—যে কড়ি সুরটা আব সমস্ত স্ববগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অস্ত্রের প্রতি বিদ্রোহ।

আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জনভূমিকে লক্ষ্য কবিতো শব্দটাকে ধ্বনিত কবিতো তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি কেবল গানের দ্বারা কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এই জন্ত দেশের সাধাবণ জন-সমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অস্ত্রভব না করে তবে আমরা

অধৈর্য্য হইয়া মনে কবি সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভান, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃ-বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমবাই যে মাকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপবাদটা আমরা কোনমতেই নিজেব স্বক্ষে লইতে রাজি নহি। ছাত্রকে মাষ্টার পড়া-বুঝাইয়া দেয় নাই, বুঝাইবার ক্ষমতাও তাহাব নাই, অথচ ছাত্র যখন পড়া বলিতে পাবে না তখন রাগিয়া তাহাকে মারিতে যাওয়া যেমন এও তেমনি। আমবাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে বাখিয়াছি; অথচ প্রয়োজনের সময় তাহাবা দূরে থাকে বলিয়া আমবাই রাগ করি !

অবশেষে যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কাবণেই যোগ দিতে পাবে নাই, যাহাবা ববাবব যে পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরান্তান্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংবাঙ্গি পড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না আমরা অনেক স্থলেই যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বল প্রয়োগ কবিয়াছি, তাহাদিগকে পবাস্ত কবিবার জন্ত আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি যাহাবা আত্মহিত বুঝে না, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত কবাইব।

আমাদের ছুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমবা অন্তবের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা বাখিবার মত ধৈর্য্য আমাদের নাই;—আমবা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে ক্রতবেগে পদানত করিবার জন্ত চেষ্টা কবি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবা নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথেব মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তবের মধ্যে চিবহায়ী করিয়া দিবার উপায়—কাজ ফাঁকি দিবার পথ বাঁচাইবার জন্ত আমরা যখন এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখন প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কি অমূল্য ধন তাহা আমবা জানি না। আমবা মনে কবি আমার মতে সকলকে চালানই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়্য অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চলাইতে হইবে অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জ্বরদন্তি।

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধিব মূলে আঘাত কবিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি সেখানকার কোন একটি বড় বাজারের লোকে নোটিশ পাইয়াছে যে যদি তাহারা বিলাতী জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিষের আমদানী না করে তবে নির্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় নিকটবর্ত্তী জমিদারদের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

এইরূপ ভাবে নোটিশ দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদদারদিগকে বলপূর্ব্বক বিলাতী জিনিষ খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

হুংখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অজ্ঞায় বলিয়া মনে করিতেছেন না—তাঁহারা স্থির করিয়াছেন দেশের হিতসাধনের উপলক্ষ্যে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পাবে।

ইহাদের নিকট জ্ঞানধর্ম্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা;—ইহারা বলেন মাতৃভূমিব মঙ্গলের জন্ত বাহা কবা যাইবে তাহা অধ্যক্ষ হইতে পাবে না। কিন্তু অধ্যক্ষের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনই হইবে না সে কথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বারবার বলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতী কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইরা ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিবদিনের জন্ত বিদ্রোহী কবিয়া তুলি না? দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচাবের ব্রত লইয়াছেন তাহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না?

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটতেছে না? “যাহারা কখনো বিপদে আপদে স্রুখে হুংখ আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পণ্ডর অপেক্ষা অধিক

ঘৃণা কবে তাহাবা আজ কাপড় পরানো বা অস্ত্র যে কোনো উপলক্ষ্যে আমাদের প্রতি জবাবদস্তি প্রকাশ করিবে, ইহা সহ্য করিব না” দেশের নিরস্ত্রশ্রেণীব মুসলমান এবং নমশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন কি, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতী-সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

তাই বলিতেছি, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মত এত বড় অহিত আর কিছুই নাই। দেশেব একপক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোবেব দ্বারা অপব ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মত-শৃঙ্খলে দাসের মত আবদ্ধ করিবে ইহাব মত ইষ্টহানিও আর কিছুতে হইতে পাবে না। এমন করিয়া, বন্দে মাতবম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃত্বোচিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না,—ভয় দেখাইয়া, এমন কি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত কবাকেও জাতীয় ঐক্য সাধন বলে না।

এ সকল প্রণালী দাসত্বের প্রণালী। যাহাবা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লজ্জাকর হীনতাবতী পরিচয় দেয় এবং এই প্রকার উৎপাত করিয়া যাহাদিগকে দলন দমন করিয়া দেওয়া যায়—সেইসকলকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়।

সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, মলিকের বধন বলা হইয়াছিল যে প্রাচ্যগণ কোনো প্রকার আপসে অধিকাব প্রাপ্তির মূল্য বোধে না—তাহারা জোরকেই মানে—তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পাবে কিন্তু আমবা ত প্রাচ্য নই আমবা পাশ্চাত্য।

কথাটা শুনিয়া মনেব মধ্যে আক্ষেপ বোধ হইয়াছিল। আক্ষেপের কাণে এই যে আমাদের ব্যবহারে আমরা প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে এই গুরুতব অপবাদের সমর্থন করিয়া থাকি। হাতে কোনো প্রকার ক্ষমতা পাইবামাত্র অস্ত্রকে জোরের দ্বারা অভিতূত করিয়া চালনা কবিবার অতি হীনবুদ্ধিকে আমবা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতা চাই সেখানেও আমরা নিজের কর্তৃত্ব অস্ত্রের প্রতি অবৈধ বলের সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে ধর্য করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল হইবে না অতএব যেমন করিয়া পারি আমাদের উহার উপরে কর্ত্তা হইতে হইবে। হিতাহুষ্ঠানেরও উপায়ের দ্বারা আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এই প্রকার অশ্রদ্ধার ঔদ্ধত্য দ্বারা আমরা নিজের এবং অস্ত্র পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে থাকি।

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের

ঘরে আশ্রয়-নাগানো এবং মারধোর কবিয়া শুণামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে, মানুষের ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কি কাপড় পবিবে বা কি ছুন খাইবে তাহাকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া চাহিব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়—নিজেকে নষ্ট করিতে হয়। মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনো মতে আমার মতে ভিড়াইবার আমার দলে টানিবাব অস্ত্র টানটানি মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সে যখন বুদ্ধিবে আমি তাহাকে আমার অন্তরবর্তী অধীন কবিবাব অস্ত্র বলপূর্বক চেষ্টা করিতেছি না—আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গল সাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি তখন সে বুদ্ধিবে আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তখন সে বুদ্ধিবে বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মাকে বন্দনা করিতেছি দেশের ছোটবড় সকলেই—যাহার সম্মান। তখন মুসলমানই কি আর নমশূদ্রই কি—বেহারী উড়িয়া অথবা অস্ত্র যে কোনো ইংরাজি শিক্ষায় পশ্চাদ্বর্তী জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত করিব না। তখন সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা, যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি, তাহার প্রদত্ততা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা, আমরা বাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের ইচ্ছাকে আমার অন্তর্গত করিব ইহা কোনো বাগ্মিতাব দ্বারা কদাচ ঘটবে না।—ক্ষণকালের জন্য একটা উৎসাহের-উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি কিন্তু তাহা সত্যকার ইচ্ছার অভাবে কখনই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্য পদার্থ মানুষ;—সেই সত্য পদার্থ মানুষের হৃদয় বুদ্ধি, মানুষের মনুষ্যত্ব; স্বদেশী মিলেব কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলেব কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না; বরঞ্চ উন্টা ফলই পাইতে থাকিব।

একটা কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অস্ত্রের দ্বারা অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধাবের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন সীমার মধ্যে

সংঘত করিবে? দেশহিতের নাম কবিতা যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অত্যাগকেও জ্বায়ে আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব? শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক হইয়া উঠে এবং উন্নতও যদি দেশের উন্নতিসাধনের ভারগ্রহণ কবে তবে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর ব্যাপ্তি মত তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। তখন দেশহিতের ভয়ঙ্কর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা কবাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে। দুর্বুদ্ধি স্বভাবতই কোনো বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহৎভাবে সকলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে সে সহজেই অক্ষম। দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসঙ্গত অসংলগ্নভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অবাঞ্ছকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কাণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবাব আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্টিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের উদ্যোগ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চাবিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং কাণ্ডোজানহীন মস্ততা মাতৃভূমির স্বপ্নপিকেকেই বিদীর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।* এইরূপ ধর্মহীন ব্যাপাবে প্রাণালী ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের শুকলযুতা বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসঙ্গতি স্থান পায় না, একটা উদ্ভ্রান্ত হুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে।* অস্ত্র বাববাব দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্য্যই দুর্বলতা; প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংঘম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহঙ্কার করে; কিন্তু তাহাব প্রবলতা কিসে? সে কেবল আমাদের যথার্থ অস্তবতব বলের সম্বলকে অপহরণ করিবাব বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্তই একবার প্রশ্রয় দিলে সন্ন্যাসের কাছে মাথা বিকাইয়া বাধা হয়। প্রেমের কাছে, স্বপ্নের কাছে, পালনের কাছেই যথার্থ-
* ভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে; কোনো একটা দিকে আমবা মঙ্গলের পথ নিজের শক্তিতে একটু মাত্র

* কানিনাডার কারখানার ইংবেজ কর্মচারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রেলগাড়িতে 'বোম' ছুড়িবাব পূর্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। কোনো ছিদ্রে পাপ একবার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্রমশই মানুষকে তাহা কিরূপে বিকৃতিতে লইয়া যায় এই লক্ষ্যকর শ্বেচনীয় ঘটনাই তাহাব প্রমাণ।

কাটিয়া দিলেই তাহা অভাবনীয়রূপে শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে;—একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিতে কতকটা কৃতকার্য্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিস্তনীয়রূপে নবনব সৃষ্টিধাবা নিজেকে চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ, স্বপ্নের পথই ধর্মের পথ। কিন্তু ধর্মের পথ দুর্গম—দুর্গমপথস্বত্বকবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথের সংগ্রহ কবিতেই আমাদের সর্বস্ব ভাগ করিতে হইবে, ইহার পারিতোষিক অহংকারতৃপ্তিতে নহে অহংকার বিনশ্জনে; ইহার সফলতা অত্যন্ত পবাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পবিপূর্ণ করিয়া।

শ্রীবীজনাথ ঠাকুর।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ ও মিশরের পুরাতত্ত্ব।

পৃথিবীর মধ্যে যত গুলি পুরাতত্ত্বের মিউজিয়ম্ আছে, তন্মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ই সর্বাপেক্ষা প্রধান। এখানে সব পুরাতন দেশের অতীত ইতিহাসের নিদর্শন সংগৃহীত হইয়া, অথবা তাহার অল্পকণে প্রস্তুত নমুনা সকল অতি যত্নে ও অস্তিত্ব ব্যবস্থায় সাজান, আছে। সে সাজানর প্রথা এমন সুন্দর, যে ঠিক স্থান হইতে দেখিতে আবিস্ত করিয়া নিয়ম মত পরে পরে ক্রমান্বয়ে দেখিয়া যাইলে, কেহ না কিছু বুঝাইয়া দিলেও, মোটামুটি সকল কথা বুঝা যায়। মনে হয় যেন স্বপ্ন বাজ্যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া, বাস্পময় সৌর জগতের মধ্য দিয়া, ক্ষলন্ত গোলার মত পৃথিবীতে আসিয়া—তাহাব পর, আজ অবধি পৃথিবীর যাবতীয় পবিবর্তন সবই চোখের উপরে দেখিলাম।

একরূপ পদার্থ হইতেই যাবতীয় পদার্থের স্তরে স্তরে অভিব্যক্তি; ও সকল দেশের সকল সমাজের ইতিহাসের মোটামুটি একতা। সামান্য অবস্থা হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমে ক্ষমতাশালী ও দিগ্বিজয়ী হইয়া, কোনও কোনও মানব সমাজ কিছু দিন মেদিনী কাঁপাইয়া, পরে সকল জিনিসেরই যেমন স্বধর্ম—লয় প্রাপ্ত হইয়া, এখন কেবল মাত্র নিজের কঙ্কাল রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। আবার তারই ভস্মাবশেষ হইতে নূতন ভাবে নূতন দেশের নূতন রাজ্যের আবির্ভাব। ঠিক যেন পিতার পর পুত্রের বংশ পবম্পরায় আবির্ভাবের মত। যেমন একটি লোকের ইতিহাস, তেমনি একটি সংসারের ইতিহাস ও তেমনিই সেই দেশের ও মানবজাতির ইতিহাস। সেটি কি?—না—জ্ঞান, অতিবুদ্ধি, মৃত্যু, ও শেষে স্মৃতি চিহ্ন ও কোনও

না কোনও রূপে ভবিষ্যতের বীজ রাখিয়া—অনন্তের গর্ভে লুকান ।

এখানে থাকিতেই সে জ্ঞানবত্তাভাণ্ডারের নাম শুনিয়া—ছিলাম, ও বিভিন্ন পুস্তকে তাহার সম্বন্ধে অনেক মনোহর কথাও পড়িয়াছিলাম । তাই যাইবার পূর্বে হইতেই সে স্থান দেখিবার একান্ত বাসনা অহরহ মনে জাগিয়া থাকিত ।

লণ্ডনে পৌছাবার পর এক দিন লণ্ডনের নিকটবর্তী “ইষ্টকিন্‌চলে” নামক এক স্থানে একটি রমণী আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । তাঁহা— ভারতবাসী জানিলেই এইরূপ সৌহৃদ্য করেন । এরূপ সেখানে অনেক লোক আছেন । সেই দিনই স্বদেশীয় ইংরাজ পরিবারের আচার ব্যবহার প্রথম দেখিলাম । বেলা ২টা হইতে ৬টা পর্যন্ত তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম । সে দেশে নিমন্ত্রণ মানে খাওয়া দাওয়াই সব নহে । একত্র কথাবার্ত্তাই তার প্রধান উদ্দেশ্য । এমন সহজ কায়দা দ্রবস্ত সবল আত্মীয়তা, যে মনেই হয় না পরের বাড়ীতে আছি । পিয়ানোতে গান গাহিয়া শুনাইলেন । নিজের লেখা কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন । তাব অধিকাংশই ভালবাসার কবিতা । সেগুলি অতি স্বরূচিপূর্ণ ও সে দেশের প্রথার অনুমোদিত । নিজের ছোট লাইব্রেরীটি দেখাইলেন—তাতে অধিকাংশই উপভাস । বিংশতিবর্ষীয়া রমণী, সব মাত্র বিবাহ হইয়াছে । স্বামী একখানি ধবরের কাগজের লেখক । শরীর ক্ষীণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা ও কথা কহিবার ভাব অতি তৎপর । মিষ্ট কথাব তুলনা নাই । তিনিই কথায় কথায় ওই মিউজিয়ামের (British Museum) কথা তুলিলেন—ও আপনিই বলিলেন—“আমি আপনাকে সঙ্গে কবিতা কাল লইয়া যাইব ।” একত্র মিলিবার স্থান ও সময় নির্দেশ করিয়া, কাগজে টুকিয়া দিয়া, আমাকে বিদায় দিলেন ।

পরদিন যথা সময়ে টিউব স্টেশনে ঠিক একটাব সময় সাক্ষাৎ হইল । তাঁর সহিত আরও ছুটি লোক ছিলেন—একটি ডার্বিসারারের এক রমণী—অপরটি ময়ূরভঙ্গ বাজার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার—“মার্টিন” সাহেব ।

সেখান হইতে একত্রে চলিতে চলিতে আমরা (British Museum) “ব্রিটিশ মিউজিয়ামে” গেলাম । সে সব চলিবাবই স্থান—যেমন রাস্তা ভাল, সুন্দর নির্মল হাওয়া, তেমনি সে দেশের লোকেরাও সজোবে দ্রুতপদে ও সুনিয়মে অতি সুন্দর চলে।—সে দেশের সকল লোক পদব্রজে চলিতে বড়ই ভালবাসে । আমি সেরূপ চলায় অভ্যস্ত ছিলাম না বলিয়া একত্রে চলিতে বাধ বাধ লাগিতে লাগিল । কথা কহিতে কহিতে একত্র পা ফেলিতে হয়, অথচ অল্প কোনও যাত্রীর গায়ে গালাগে সে বিষয়েও বেশ লক্ষ্য রাখিতে হয়—সে চলা শিক্ষাসাধ্য ।

কিছু দূরে যাইয়াই কাল পাথরের সে প্রকাণ্ড বাড়িটি

দেখা যাইতে লাগিল । লণ্ডনের অধিকাংশ বড় বড় বাড়ি গুলিই কালো । ধোয়া ও কুয়াশায় আপনিই কাল হইয়া যায় । মোটা উচু ধামের সারিগুলির চারিদিকে প্রাচীরে ঘেঁষা । সম্মুখেই অনেকগুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রস্তবময় মূর্তি । ও ভিতরে ঢুকিলে পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনোপযোগী পুৰাতন ইতিবৃত্ত স্বচক্ষে দেখা যায় ।

কি পুস্তক পড়া, কি দর্শনীয় স্থান দেখা, এ সকল বিষয় আলোচনা করিতে আমি প্রথমেই তাব সম্বন্ধে মোটা-মুটা একত্রে একটি জ্ঞান পাইতে চাই । তাবপব তার উপর বিশেষ বিশেষ স্থানের সবিস্তার অনুসন্ধান সহজেই বুঝা যায় । এইরূপ প্রণালী অনেক সুবিধা আছে । সমস্ত অংশগুলি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া একটির স্মৃতি অপবটিকে ডাকিয়া আনে । বিষয়গুলি মনে রাখিতে বড় বেকী আয়াস হয় না । আর তা ছাড়া—সবগুলি একত্রে দেখিলে সকল জিনিষেই একটি সুন্দর নিয়ম অন্তর্নিহিত দেখা যায়—আলাদা আলাদা করিয়া দেখিলে তা থাকে না । তাই সেরূপ কল্পনার অভীক্ষায় একটি মধুব ভাব আছে ।

বাড়িটি দ্বিতল । এক তালায় ঢুকিয়া সামনেই একটি বড় হল আছে, সেইখানে সমিতির অধিবেশন হয় । আব তাব পিছনে, চারিদিকের পুস্তকাগারের মধ্যস্থিত বড় একটি পড়িবার ঘর । বাম দিকে সব ব্রুকগুলিতে মিশর, বেবিলন, ফিনিশিয়া, এসিরিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি সকল পুৰাতন দেশের অনেক প্রস্তবমূর্তি ও অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্যাদি আছে । ও দক্ষিণদিকের ব্রুকগুলি সব পুৰাতন পুঁথি ছবি ও অস্ত্রাস্ত্র পুস্তকসম্বন্ধীয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ । এদিকে বই পড়, আব ওদিকে সেই সব জিনিষ স্বচক্ষে দেখিয়া লও, এই উদ্দেশ্যে এমন করিয়া সাজান ।

উপরে উঠিবার অনেকগুলি সিড়ি আছে । তারও চারিদিকেই সব দর্শনীয় দ্রব্যাদি সাজান । এইরূপ একটি স্থানে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধীয় কতক স্মৃতি বক্ষিত আছে । এত দূরদেশেও ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রস্তর মূর্তি দেখিয়া আমাব্বাড়াট আপনা আপনিই নত হইয়া পড়িল । এমন দেবতা তো কোথাও জন্মান নাই, যার ভুবনের যাবতীয় প্রাণীরই হুঃখ মোচন করা একমাত্র ব্রত ছিল । আমাদের ও অস্ত্রাস্ত্র সকল দেশের ধর্মশাস্ত্রে লেখা, তোবামোদপ্রিয় ও প্রতীহিংসালোলুপ ধর্মের কল্পনা হইতে এই কল্পনাটি কত সুন্দর,—কত মহান্ । কেবলই পরের হুঃখে অশ্রুজল—ও কেবলই ক্ষমা ।

উপরে উঠিয়াও একধার আবার কেবল মিশর, বেবিলন, ফিনিশিয়া, এসিরিয়া, গ্রীস, রোম, ইত্যাদি দেশের পুরা-কালিক ছোট ছোট দ্রব্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ । অপর দিকে অস্ত্রাস্ত্র নানা বিষয়ের প্রত্নদ্রব্য সাজান আছে । তাব মধ্যে আশ্বেবিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, ব্রিটেন, প্রভৃতি

স্থানের দ্রব্যগুলিই অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। ভারতীয় দ্রব্যাদি কেবল ছোট ছোট ছুটি ঘরে মাত্র ভরা।

এই গেল ব্রিটিশ মিউজিয়মে দ্রব্যাদি সাজাইবার মোটামুটি ব্যবস্থা। তাহা হইতে বুঝা যায় মিশরই সর্কাপেক্ষা উচ্চ স্থান পাইয়াছে। মিশরই সর্কাপেক্ষা আদিম বলিয়া বিবেচিত। ও মিশর সম্বন্ধেই সর্কাপেক্ষা অল্পসম্বন্ধেই সম্ভবস্থা। বর্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধেই কিছু কথা বলিব।

মিশর ইউরোপের অতি নিকটবর্তী স্থান, ও পূর্বাঞ্চলে বাইবার পথে অবস্থিত, ও আবহাওয়া অতি ভাল বলিয়া, ক্রীতকালে অনেক লোক সেইখানে স্থান পরিবর্তনে যান। এইরূপ নানা কাবণে মিশরসম্বন্ধে চর্চা সমগ্র ইউরোপেই বড়ই বলবতী। কত শত ধনী লোকেরা রাশি রাশি টাকা দিয়া এই সকল বিষয় অল্পসম্বন্ধে সাহায্য করেন, ও স্বয়ং গবর্ণমেন্টরাও এই কাজে সাহায্য ও উৎসাহ দেন। সকল কলেজেই মিশরের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা হয়। এই সব কাবণে পুৰাতন মিশরসম্বন্ধে কত তত্ত্বই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর সে আবিষ্কারের অল্প সুবিধাও অনেক। সে দেশে এক অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল, যে মৃত লোকেরা ভবিষ্যতে আবার নিজ নিজ দেহেই ফিরিয়া আসিবেন। এবং মৃতদেহের যত্ন করিলে, পরলোকে আসিয়া সুখে থাকে। এই মধুব কল্পনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, সে দেশের লোকেরা অশেষপ্রকারে মৃত আত্মীয়দের দেহ রক্ষা করিতে যত্ন করিতেন। সেই কারণেই এত “মামী” বা সুরক্ষিত মৃত দেহের বাহুল্য, ও সেই কারণেই সুন্দর সুন্দর চিত্রিত “শবধার”, ও কাঠ বা প্রস্তরময় “কবর” (sarcophagus)। এমন কি সেই কারণেই অতি বিস্ময়কর “পিরামিদেরও” উৎপত্তি। এই পিরামিদের ভিতরেই ছোট বড় কামবায় ধনী লোক ও রাজা রাজড়ার মৃতদেহ সুরক্ষিত আছে। আর তাব সহিত জীবনধারণ ও ভোগবিলাসের আবশ্যকীয় যত কিছু দ্রব্যাদিও স্তস্ত আছে, ও চারিদিকের চিত্রে সে সময়ের সামাজিক ক্রিয়া কলাপ ও অবস্থারও বিবরণ স্পষ্টাক্ষরে প্রচারিত। এই সকল কারণে সে সব পুরাতত্ত্ব উদ্ভাবন করিবাব বা বুঝিবাব কিছুই অসুবিধা নাই।

এই সকল দ্রব্যাদি, চিত্র, ও লেখা হইতে জানা যায় যে অন্ততঃ আজ হইতে ১০,০০০ বৎসর পূর্বেও পুৰাতন মিশরবাসীরা সুসভ্য ছিল, ও “নীল” নদীর ধারে তাহারা “মেমফিস” নামক সমৃদ্ধিশালী নগরাদি নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিত। নীল নদী বছরে বছরে জলপ্রাধনে ভাসিয়া যায়, তাহা নিবারণের জন্ত তাহারা যে সুন্দর ও দুঢ় পাথরের বাঁধ বাঁধিয়াছিল, আজও তাহাব কতক অংশ বিদ্যমান আছে। অত পুরাকালেও তারা এক বাজার অধীনে বাস করিত, ও নানা রূপ জ্ঞান চর্চায় ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিল।

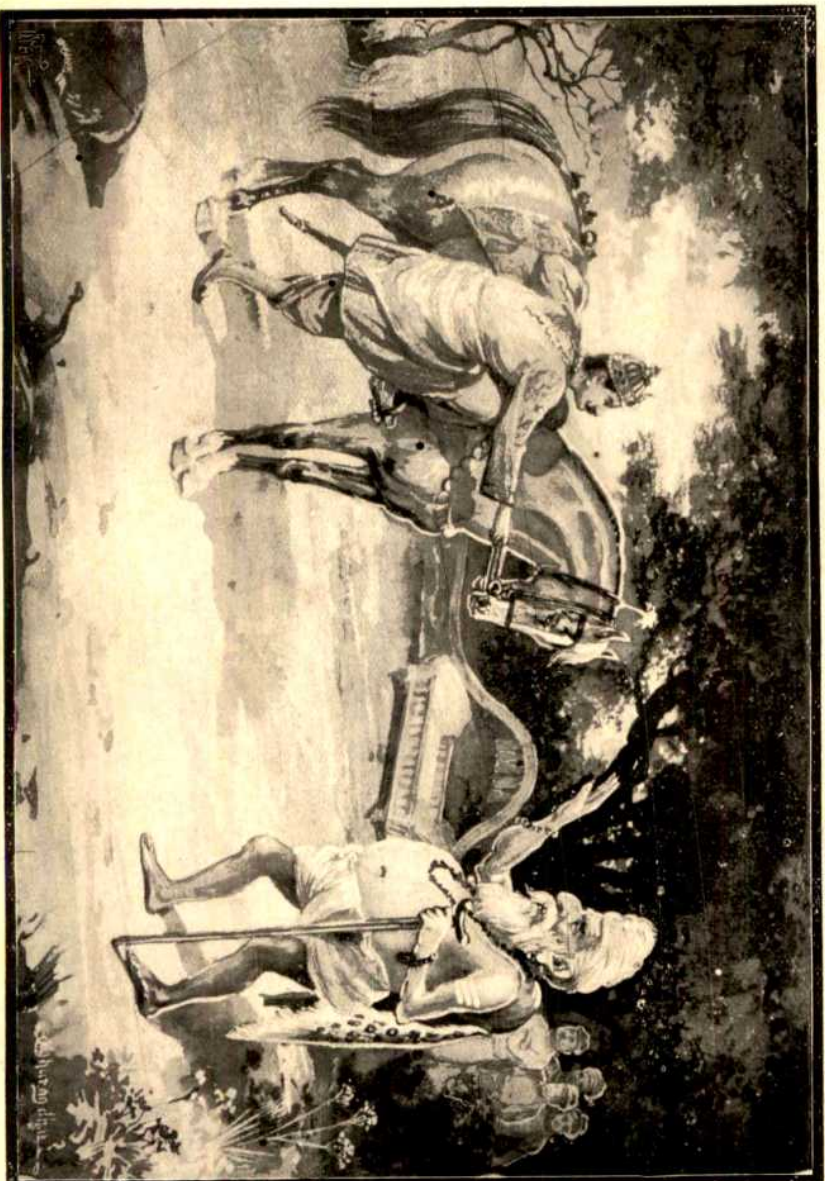
“কেরো” নগরের নিকটবর্তী মরুভূমিতে যে তিনা পিরামিদ আছে, তার মধ্যে সর্বোচ্চটি ৫০০ ফুট উচ্চ তার পাথব গুলি এমন সুন্দর গাঁথা বে ছাটিব মধ্যে এক চুল অবধি গলে না। তাব ভিতর সুড়ঙ্গ পথ আছে—তদ্বারা একটি কামবা হইতে অপর কামবায় যাওয়া যায় এই সকল কামবাগুলিই বড় লোকের মৃত দেহ রাখিবার স্থান। পাছে কোনও লোক দেহটি সেখানে হইতে ল এই ভয়ে অনেকগুলি পথ একেবাবে গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া। সহজে খুঁজিয়া পাইবার যো নাই। উপযোঁগ দ্রব্যাদি, ও চিত্র, ও লেখাব সহিত এই মৃতদেহগুলি এমন সুন্দর ও স্থায়ীভাবে বক্ষিত বলিয়াই, সে গুলি আজ কাল পুরাকালের মিশর দেশের পুরাতন বার্তা জানায়।

মৃতদেহ রক্ষাব জন্ত সেকালে বহু আয়োজন ও ব্যবস্থা ছিল। রাজ্য হইতেই এক শ্রেণীর লোক নির্দিষ্ট ছিল যাহাদের কেবল এই মাত্র কাজ। ভালরূপে দেহবে স্তব্ধ ও সেদন করিয়া বক্ষা করা বহু ব্যয়সাধ্য, তাহার জহ মোট প্রণালী এইরূপ।

অধিকাংশ স্থলেই পেট চিরিয়া মৃত দেহের অন্তর্গত বাহিব কবিতা লওয়া হইত, কারণ এই সকলগুলিই সহজে পচে। এবং সেইগুলি চারিটি বৃহৎ সুন্দর কাককার্য করা হাঁড়িব মধ্যে পচা নিবারক দ্রব্য বিশেষের ভিতর ডুবাইয়া রাখিয়া, কবরের মধ্যে শবধাবেব নীচে চারি কোণে রক্ষিত হইত। তারপর দেহটির ব্যবস্থা অল্পরূপ। সেটি নানা রূপ আরকে ডুবাইয়া ও মূল্যবান গন্ধদ্রব্যে সিক্ত করিয়া—পরে একরূপ লেপদ্বারা নিবৃত্ত করিয়া ফালি ফালি কাপড় দিয়া আপাদ মস্তক জড়াইয়া—“মামী” করা হইত। এইটি একটি কাঠের বাকসের ভিতর রক্ষিত হইয়া শব সমেত একটি কবরের ভিতর স্থাপিত হয়। সেই কাঠের বাস্কাটির ভিতর পিটেই সেই পূর্বোক্ত চিত্রগুলি অঙ্কিত থাকে। সবগুলিই ইচ্ছা লৌকিক বা পারলৌকিক চিত্র। আর সেই মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে তার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি, যথা আহাার রসন ভূষণ অস্ত্রশস্ত্র গন্ধদ্রব্যাদিও দেওয়া হয়। আবার অনেক সময় কতকগুলি ছোট পুঁতুল থাকে—তাহারা যেন তাঁর পরলোকে সেবা করিবাব ভৃত্য স্বরূপ। আবার সেই চারিটি অন্তর্গত ভাঁড়ের কথা তো পূর্বেই বলিয়াছি—সেগুলিবে “কপটিক জার” বলে। এতগুলি সব কবরের উপকরণ। সে লোকের বা সে সময়কার সকল ইতিবৃত্তই এই সব হইতে সহজেই জানা যায়।

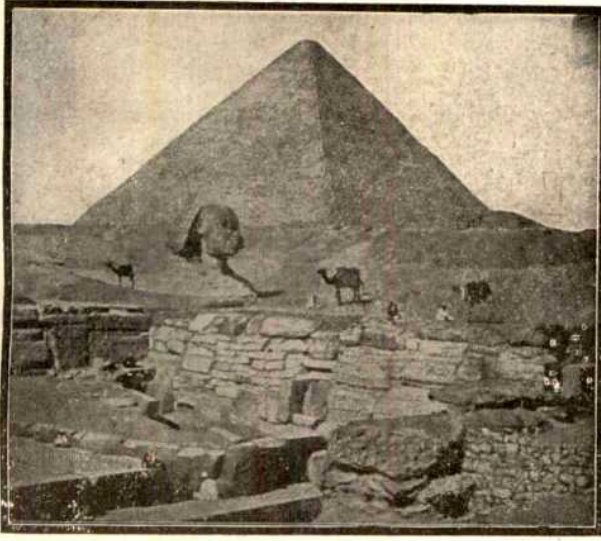
এত বাহুল্য ব্যবস্থাব কাবণ, মৃত আত্মীয়েরা এই সকল সৌষ্ঠব উপভোগ করিবেন বলিয়া। সকল দেশেই অল্প বিস্তর এইরূপ বিশ্বাস। তাহারা যেন উপভোগ করেন। যদিও তাহাদের উপভোগ করার কথা দূরে থাকুক পরলোকে

• প্রবাসী ।



অষ্টাবক্রহীন জনকরাজকে আশীর্বাদ করিতেছেন ।

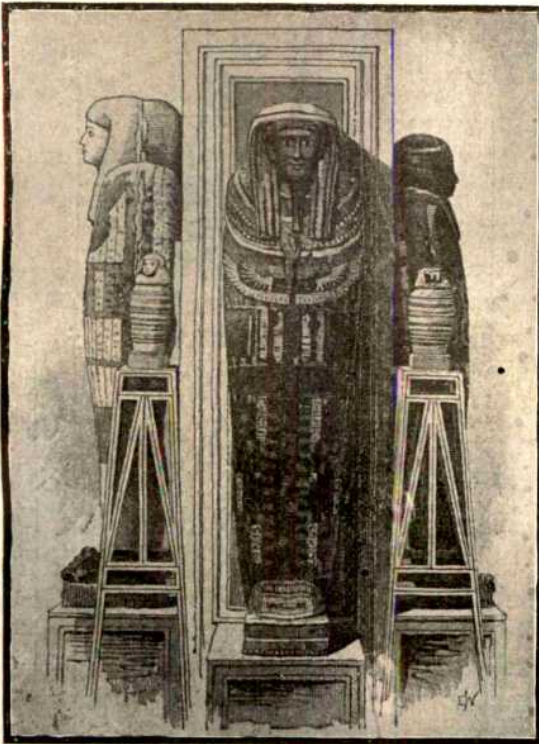
KUNTAINE PRESS, CALCUTTA.



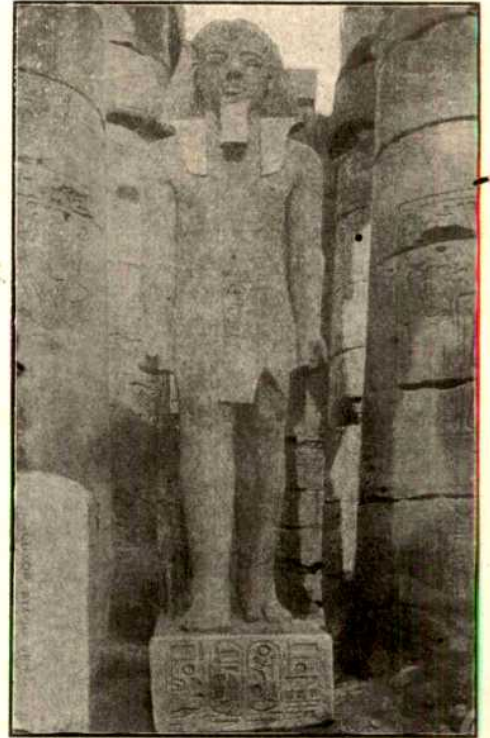
ফিংস্, এবং মিসরের একটি পিরামিড্।
চারি সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে নির্মিত।



২য় রাম্সেসের পিতা
১ম সেটির রক্ষিত শবের মস্তক।



“থা-হোর্”এর রক্ষিত শবের আধার।
অল্প দুটির মধ্যে স্থিত।
মিসরের কায়রো নগরে বোলাক বাড়ঘরে রক্ষিত।



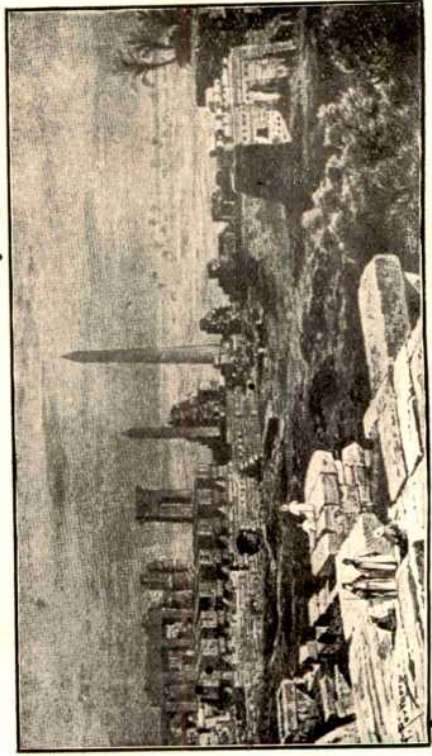
লন্ডনে ২য় রাম্সেসের মূর্তি।



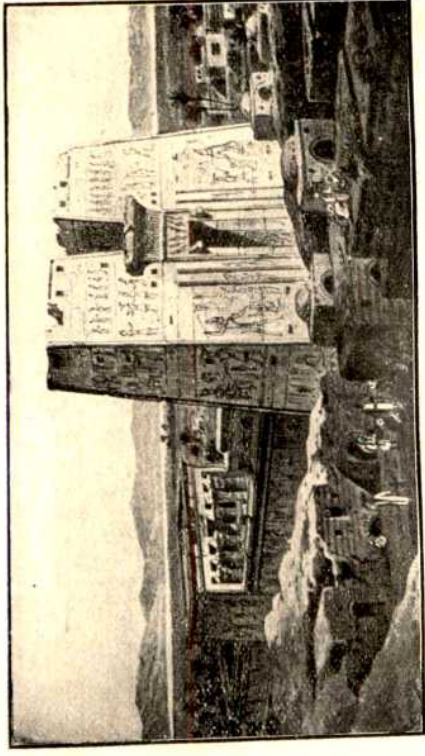
প্রাচীন থীবস্ নগরস্থ একটি চিত্র ।



থীবসের একটি কবরের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র ।



কানীকের সুচাগ্র স্তম্ভাবলী ।



এদফুর মন্দির ।

আম্মার কোনও ভাবে অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ অনেকে করে, —তবুও কিন্তু আমাদের মনে সেইরূপ ভাবিয়াই স্থখী হয়, বলিয়া—আমাদের মনে এরূপ বিশ্বাস সহজেই আসে।

মিশর সম্বন্ধে এই সকল গালাগালাহীতে—সে সব বিষয়ের যাবতীয় দ্রব্যাদি সাজান আছে। একবার ঘুরিয়া দেখিলেই সবগুলি দেখা যায়। মনে হয়—ঠিক আমাদের মতনই তাদের সব আবশ্যক ছিল, ঠিক আমাদের মতনই তাদের সুখ দুঃখ। অভাবেরও উৎপত্তি, ও তার ব্যবস্থা আদি মনুষ্যেরা প্রায় এক প্রকারেই করে।

সে সময়ে তাদের দেশে রাজাই পুরোহিত ছিলেন। ও তাঁহারই অধীনে অগ্ন্যগ্ন পুরোহিত মন্দিরে পূজাদি সম্পন্ন করিতেন। আমাদের মত তাঁহারাও প্রকৃতির শক্তি পূজা করিতেন—যথা—সূর্য্য বায়ু আকাশ ইত্যাদি। সূর্য্যদেবই তাঁহাদের প্রধান দেবতা। ইহারই প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি “কেরোর” বালুময় মরুভূমে অর্ধ প্রোথিত আছে। সেটি পিরামিড হইতেও পুরাতন। সে বৃহৎ প্রস্তর মূর্তিটির মুখ জ্বীলোকের মত, আর দেহ সিংহের মত। তার নাম “স্ফিংস্।” সূর্য্যের জন্ত জলের আবশ্যক বলিয়া তাঁহারাও আমাদের মত আকাশের পূজা করিতেন। ও হানিকর দেবতাদের প্রসন্ন করিবার জন্ত সাধনা করিতেন। এইরূপে অনেক দেবীমূর্তিরও পূজা হইত, এবং সিংহ বলীবর্দ্ধ ও কুস্তীর আদি জন্তদের পবিত্র বলিয়া মনে করাতে—এগুলিরও পূজা হইত, কখনও তাদের মারা হইত না। “Apis Bull” বা বাৎসরিক মহাসমারোহে বাঁড়-পূজা প্রাচীন মিশরের একটি প্রধান উৎসব ছিল।

সোনা লোহা তামা আদি সকল ধাতুরই তাঁহারা সদ্যবহার জানিতেন। সেই সব ধাতু নিশ্চিন্ত কত দ্রব্যাদিই সংগ্রহীত হইয়া সাজান আছে। ও এই সকল দ্বারা কত কারুকার্য ও ব্যবসা বাণিজ্যও চলিত। সে দেশে তখন কামার চুতার সেকরা রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি সকল কারবারী লোকই ছিল। তাঁহারা বলদএর সাহায্যে, ও বাঁকা লাঙল দিয়া, ক্ষেত চাষিয়া চাষ বাস করিতেন।

আর লেখা পড়া ও শাস্ত্রচর্চার কথাতো কিছু বলিবারই নয়। সকল শাস্ত্রই অধীত হইত। সে ক্ষুদ্র মরুভূমির দেশে চাষের উপযোগী জমীর বড়ই অনাটন বলিয়া হৃদয়-রূপে জমী মাগিবার জন্ত সেখানেই প্রথম জ্যামিতি শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়। চিকিৎসা শাস্ত্র দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহারা বড় পারদর্শী ছিলেন। আমাদের দেশেও এই সকল শাস্ত্রগুলিই প্রথমে পরিপুষ্ট হয়। বিজ্ঞান পরে আসে। লিখিবার ও পুস্তকের তত্ত্বাবধান করিবার জন্ত সেখানে এক আলাহিদা শ্রেণীর লোক ছিলেন তাদের “স্ক্রাইব” বা লেখক বলা হইত। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান

ছিলেন। অনেক পরেও দেখা গিয়াছে, তাহাদের দেশে নানা বিষয়ক “হাতে লিখা” পুস্তকপূর্ণ ভাল ভাল লাইব্রেরীও ছিল। এলেকজান্দ্রিয়া নগরের লাইব্রেরী মুসলমানেরা মিশর জয় করিলে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দেন—সেই হইতেই কয় খণ্ড জ্যামিতি চিরকালের জন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহাদের পুস্তকাগার পুড়াইয়া দিবার কারণ—“কোরোনে বাহা লিখা আছে তা ছাড়া আর কিছু পুস্তকের আবশ্যক নাই, বা অন্তত্রে কোনও সত্য থাকিতে পারে না।” সকল দেশেই গৌড়াদের মধ্যে অন্ধধর্মবিশ্বাস এইরূপ। তাতে অলক্ষিতে মানব জাতির কতই ক্ষতি হইয়াছে।

সে দেশের পুরাকালের লেখা বিশেষ একরূপ ছিল। “প্যাপিরাস্” নামক গাছের ছালে—সরকাটির কলমে লেখা তখন হইত। সে হরফগুলি এক রকম ছবি আকার মত। তাকে Hieroglyphic বলে—মানে “ছবির মত লিখা”। “মাহুয” এই নাম লিখিতে হইলে তারা সত্য সত্য একটি মাহুযই লিখিত। সেইরূপ সকল নামই তার প্রতিকৃতি দিয়া লেখা। পরে এই লেখা ভান্সিয়া সংক্ষেপ হইয়াই—অগ্ন্যগ্ন দেশের বর্ণমালা হইয়াছে। ব্যবসাদার ফিনিসিয়ানরাই—ব্যবসা সূত্রে অগ্ন্যগ্ন দেশে যাওয়া এই লেখা সে সকল দেশে প্রচলিত করিয়া দেন। এই হইতেই আমাদের “আনিকানি” বর্ণমালা ও ইউরোপের “আলফাবেট”। মিশরেও অনেক পরিবর্তনের পর, তবে অক্ষরগুলি আধুনিক অক্ষরের মত দাঁড়ায়। অতি পুরান অক্ষর পড়িবার যো নাই। গ্রীস মিশর জয় করার পর, কতকগুলি আদেশ পুরাতন মিশর ভাষায় ও গ্রীক ভাষায়, প্রস্তর গাত্রে খোদিত হইয়াছিল। সেইগুলি মিলাইয়াই মিশরের আদি অক্ষর নিরূপিত হয়। সে “রোজেটা” পাথর খানিও মিউজিয়মে আছে। ইংরাজ ফরাসীকে পরাস্ত করিয়া তার কাছ হইতে ইহা কাড়িয়া লইয়া আনিয়াছে।

সে দেশের লোকেরা চিরকালই বড় সদানন্দচিত্ত ও আনন্দপ্রিয়। নাচিয়া খেলিয়া সময় কাটায়। এমন কি জাহাজের কুলিরাও কাজ কর্মের অবসরে নাচিয়া গাহিয়া আনন্দ করে। সে ভাব তাদের রাণী ক্লিওপেট্রার চরিত্র হইতে বেশ লক্ষিত হয়। কিন্তু তারা মোটেই পরিশ্রমী, বা বলবান বা সাহসিক নয়। অথচ ভীষণ ভীষণ প্রতিবাদী শত্রু দ্বারা সেই ধনশালী দেশটি তখন চারিদিকে পরিবৃত্ত ছিল। তাতে আত্মরক্ষা কেবল বুদ্ধিবলেই হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রাচীর তুলিয়া দক্ষিণে নিউবিসা দেশ হইতে দেশরক্ষা, ও সুর্য্যোজ্জ্বলজকের উপর প্রাচীর দিয়া বলশালী নীরিয়া এসিরিয়া বেবিলন ও অগ্ন্যগ্ন জাতি হইতে আত্মরক্ষা, করিয়াছিলেন। সে সকল প্রাচীরের, বুদ্ধির কীর্তিস্তম্ভের মত, কতক কতক অংশ এখনও বিদ্যমান আছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের যে ঘরে তাদের নিত্য ব্যবহার্য্য

দ্রব্য সামগ্রীগুলি আছে সে ঘরটি দেখিলে বিশ্বয়ের আর সীমা থাকে না। এগুলি অধিকাংশই গোর হইতে খুঁজিয়া লওয়া হইয়াছে। কারিগরের যন্ত্রগুলি ও ব্যবহার্য্য বাসন-কোষণগুলি প্রায় আমাদেরই মত। তাদেরও পেয়ালা, থালা, ঘটি, হাঁড়ী, কলসীর ব্যবহার ছিল। অলঙ্কারগুলি নানা ধাতুর ও নানা ছাঁদে গড়া। বালা আছে হার আছে কর্ণ ভূষণ আছে, সবগুলিই অতি পরিপাটীরূপে নক্সা কাটা। মুখ দেখিবার আরসীগুলি চকচকে ধাতু নির্মিত, কাঁচের নহে। চিক্কাণী ও মাথার কাঁটাগুলি ঠিক প্রায় আধুনিক মতই দেখিতে। ডাক্তারী যন্ত্রগুলি আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলাম। তাদেরও অস্ত্র চিকিৎসার ছুরিগুলি আমাদের মত ছাঁদে গড়া। সলা বা “প্রোব্” গুলিও আধুনিক মত। চিমটা ও কাঁচিগুলির নাচি নাই, তারা স্ত্রী-এ কাজ করে। তাহারাও “আরসিনিক্” ও “পারার” ব্যবহার জানিতেন। এই সকল দেখিয়া বুঝা যায়—পুরাকালেও আধুনিকদিগের মত অনেক দ্রব্যাদি ছিল। কেবল কালক্রমে তাহারা হইয়াছে। একথা সকল বিষয়েই খাটে। মনের ভাব, সামাজিক প্রথা, দর্শন বিজ্ঞান ও তত্ত্বচিন্তা, সবই সমান ছিল। কেবল কালক্রমে সে সব আরও উন্নত হইয়াছে। “History repeats itself”—অর্থাৎ ইতিহাসেরও পুনরাবৃত্তি হয়—একথার বোধ হয় এই মানে।

যে ঘরগুলিতে “মামী” ও “কবর” গুলি রক্ষিত আছে সে ঘরগুলি সর্বাপেক্ষা লোমহর্ষক। সেখানে গিয়া সে সকলের কথা ভাবিলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ বছরেরও নরদেহ সেখানে রক্ষিত আছে। একটি দেহ শুকাইয়া তার অস্থি পঞ্জর ও ক্ষীণ দেহের শুকনা চামড়া মুক্ত—একটি গোরের ভিতর খুলা অবস্থায় দেখান আছে। ঠিক যে অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই রক্ষিত। মাথার চুলগুলি অবধি বিদ্যমান। আর একটি কবরে অনেকগুলি পুরোহিতের দেহ একত্র রক্ষিত আছে। তাদের যজ্ঞমানেরা, নিজ হাতে বুনিয়া যে সকল বস্ত্রাদি তাদের অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্ত উপহার দিয়াছিল সে গুলিও রাখা আছে। অতি পরিপাটী করিয়া বুনা ও কারুকাকার্য্যে খচিত। কোনওটিতে একটুও হ্রস্বগন্ধ নাই। আবৃত গোরের উপরও হাতগড়া নান ছাঁদের প্রতিমূর্তি কোথাও কোথাও রাখা দেখিলাম, সে সবই ভোগবিলাসে রত। এক রাণী নিজের গোরের উপর বিবস্ত্রা হইয়া বসিয়া দর্পণে আপনাদের প্রতিমূর্তি দেখিতেছেন। আর একটির উপর রাজা ও রাণী দুজনে একত্রে পাশাপাশি উপবিষ্ট। এইরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে জপমালা সমেত জোড় হস্ত একটি মূর্তি স্থাপিত হইত।

শবকোবের ভিতরকারদিকের চিত্রগুলি ও দেওয়ালের

বৃহৎ চিত্রগুলিতে অনেক পরলোকের কল্পনা অঙ্কিত আছে। মৃত্যুর পর কিছু দিন আত্মা সেই দেহের নিকটই ঘুরে। পরে পাতালের কোন রাজ্যে চলিয়া যায়—অন্ত্যমান হৃদয়েরও সেই স্থানে থাকিবার স্থান। দেহকে যত যত্নে রাখা যায় আত্মাও পরলোকে তত সুখে থাকে। আত্মার প্রতিকৃতি তাহাদের কল্পনায় কতকটা পাখীর মত, কারণ পাখীর মত সেটিও উড়িয়া যায়। এইরূপ পাখীর মুখবিশিষ্ট সেখানে অনেক ছবি দেখিলাম।

পরলোকের বিচারের কথা অতি সুন্দর ছবিতে, দেওয়ালের উপর, বরাবর, পরে পরে, চিত্রিত আছে। তার নাম “ইনির” বিচার। মৃত্যুর পর “ইনি” জোড় হাতে একটি তৌল দাঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া বিচারের অপেক্ষা করিতেছে। এই দাঁড়িতে তাহার আত্মা ওজন হইবে। নিকতির অপর দিকে একটি মাত্র পক্ষীর পালক রাখা। আর “ইসিস্” নিকতির কাঁটাটি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া জানাইলেন যে “ইনির” আত্মা তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় নাই। অমনি দেবতার আসিয়া তাহাকে স্বর্গের দ্বারে লইয়া গেলেন। সংকল্পের পুরস্কার ও অসং কল্পের সাজা তাহাদের মতে পরলোকে অবশ্যম্ভাবী ফল।

নীচের তলায় যে সকল মিশর দেশীয় প্রতিমূর্তি ও অট্টালিকা বা মন্দিরের ভগ্নাংশগুলি সংগৃহীত আছে সেগুলিও অতি মনোহর ও বিস্ময়কর। তাহা হইতেও মিশরের অনেক ইতিহাস জানা যায়। তার কারণ সেসব গুলি অতিশয় পরিপাটী ও সুরক্ষিত। মন্দিরের ভিতরদিকেই এইসব বেশী লক্ষিত হয়। তার কারণ আমাদের দেশের ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান সম্বন্ধে যে রূপ একটা সাধারণ লোক হইতে লুকানর ভাব আছে, সকল পুরোহিতবিশ্বস্ত দেশেই সেরূপ ছিল। সে সম্বন্ধে বাহিরে সাধারণ লোককে কিছু দেখান যুক্তিযুক্ত বা স্বার্থ সম্বন্ধে নিরাপদ মনে হয় নাই।

এই সকল ইতিহাস হইতে আর একটি বিস্ময়কর কথা জানা যায়। সে এই, যে পুরাতন জাতি মাট্রেই বংশ রক্ষা বড় আবশ্যকীয় ও ধর্ম্মানুসৃত বলিয়া বিবেচনা করিত। পারলৌকিক কাজের জন্ত তাহা বড়ই আবশ্যকীয়। ধন-সম্পত্তি সব সংসারের সকল লোকের একত্রে ও সমান স্বত্ব। কাহারও কোনও অংশে আলাহিদা অধিকার নাই। ঠিক আমাদের দেশের মিতাক্ষরা আইনের মত। তাহাদের সংসারে অনেক ক্রীত দাস দাসীও থাকিত এবং পোষ্যপুত্র লইয়া বংশরক্ষা করা তাহাদেরও প্রথা ছিল। আমাদের দেশেও এইরূপ পোষ্যপুত্র গ্রহণের ব্যবস্থা আছে;—জাপানেও এইরূপ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। তাই সে দেশের জাপানের মত কত সহস্র বৎসর ধরিয়া বংশ পরম্পরায় একই রাজ্য চলিয়া আসিতেছিল।

খৃষ্টপূর্ব ৪,০০০ বৎসরে প্রথম মিশরের রাজ-
পুরোহিত বা রাজা বা “ফেরোয়ার” কথা জানা যায়।
তারপর হইতে অনেক বংশ চলিয়া আসিয়াছে। মোটামুটি
এই পরবর্তী কালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা প্রথম হইতে একাদশ বংশ পর্য্যন্ত বা ২,৫০০
খৃঃ পূঃ বৎসর অবধি রাজত্বকে—পুরাতন রাজ্য বলা যায়।

সেইরূপ ১২ হইতে উনবিংশতম বংশ পর্য্যন্ত অর্থাৎ
১২০০ খৃঃ পূঃ বৎসর অবধি—মধ্যম রাজ্য।

এবং বিংশ হইতে ত্রিংশ বংশ বা ৩৫০ খৃঃ পূঃ বৎসর
অবধি—নূতন রাজ্য বলা যায়।

প্রথম রাজা “মেনিস্”ই “মেমফিস্” নামক রাজধানী
স্থাপন করেন। কিন্তু চতুর্থ বংশের রাজারাই যত
বড় বড় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। “গীজার” বড়
“পিরামিদ” তাঁদেরই কীর্তি, এইরূপে তিনটি পিরামিদ
সৃষ্ট হয়—তাতে অনেক বৎসর সময় লাগে ও অনেক
অর্থব্যয় হয়, সর্বাপেক্ষা বড়টি ৫০০ ফিট উচু। ইহাদের
ভিতরকার স্তূভগুলি সব জুব তারার দিকে ফিরান।
তার নিকটেই যে নরমুণ্ড বিশিষ্ট এক সিংহের প্রকাণ্ড
ছবি আছে সেটিকেই “সিংস্” বলে। সেটি ইহাদের
প্রধান দেবতা স্বর্ঘ্যদেবেরই ছবি—ও পিরামিদ হইতেও
পুরাতন।

অনেক হাজার বৎসর পরে মিশর পরাধীন হইয়া পড়ে
ও নিকটবর্তী সিরিয়ার লোক আসিয়া রাজ্য দখল করে।
এত সহজে দখল করিবার কারণ—যে, অনেক ভিন্ন দেশীয়
লোকে মিশর দেশে আসিয়া বাস করিতেছিল, তাহারাও
বিদ্রোহী হইয়া সিরিয়ানদের সাহায্য করে। ইহাদেরই
নাম Shepherd King বা “রাখালরাজা” কিন্তু কিছুদিন
পরেই ইহার নিজেরাই মিশর দেশের আচার ব্যবহার
লইয়া মিশরবাসীর মতই হইয়া পড়িলেন। রোম যখন
গ্রীস জয় করেন তখন জেতা হইয়াও গ্রীসের সভ্যতা নিজে
লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও দলে দলে এইরূপ ঘটনা
ঘটিয়াছে। যথার্থ পক্ষে উন্নতির এমনিই আকর্ষণ যে
মুহাবলশালীও তার কাছে মাথা নিচু করে। কিছুদিন পরে
মিশরের আরও দক্ষিণ দেশস্থ “খীবস্” এর করদরাজা
কর অস্বীকার করিয়া—মিশর দেশ হস্তগত করিয়া ফেলি-
লেন। ইনিই অষ্টাদশ বংশীয় রাজা। ইহাদের আগমনের
পর বাইবেলে উক্ত মিশর দেশের ঘটনাগুলি ঘটে। ইহারাই
ইহুদী দলপতি “জোসেফ”কে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।
এখন হইতে মিশরের প্রতাপের আর সীমা রহিল না।
তারা জয়োল্লাসে নিঃশ্রান্ত হইয়া—আরো নিকটবর্তী স্থানের
রাজ্যসমূহ যথা “বেবিলন” “এসিরিয়া” প্রভৃতি জয় করি-
লেন। কিন্তু একরূপ সৌভাগ্য বেশী দিন রহিল না।
তারপর আসিরিয়ার লোকেরা আসিয়া অচিরে মিশর দেশ

জয় করিয়া ফেলিল। এই প্রতাপশালী অষ্টাদশ বংশীয়
রাজারাই মিশরের দক্ষিণে ও নীল নদীর পশ্চিম তীরবর্তী
রাজধানী “খীবস্” নগর নানারূপ বড় বড় মূর্তি গড়িয়া
সাজাইলেন, এই মূর্তির গ্রীক জাতিরা “মেমন” নাম
দিয়াছিল। টুঙ্গুন্ধে কাথিত আছে এই “মেমন” রাজাই
লড়াই করিতে গিয়া হত হন।

এই বংশের আর এক রাজা ভিন্ন দেশীয় মাতার গর্ভজাত
বলিয়া এক নূতন ধর্ম মতের আবির্ভাব করেন। তাঁহার মতে
মিশরের চিরকালের দেবতা স্বর্ঘ্যদেবকে পূজা করা উচিত
নয়। কিন্তু তিনি এ পরিবর্তনে কৃতকার্য হন নাই। আমা-
দের দেশেও সেই রূপ ভিন্ন জাতি আসিয়া বসবাস করার ফলে
অনেক নূতন ধর্মের সংস্থান হইয়াছে। শকদের আগমনে
বৌদ্ধ ধর্ম উঠে। মুসলমানেরা আসার পর—“বৈষ্ণব ধর্ম”
বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার অধুনা ইংরাজদের আগমনে—
“ব্রাহ্ম ধর্মও” প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। সংসর্গে সকল
জিনিষই কাল ক্রমে পরিবর্তিত হয়। তা না হইলে অপরিবর্তিত
একই অবস্থাতে পৃথিবীর অবস্থা কি শোচনীয় হইত ?

ইহাদের পরই উনবিংশ বংশ—খৃঃ পূঃ ১,৪০০ বিখ্যাত
রাজা প্রথম “রামেসিস্” রাজা হন। ইনি বড় বড় অট্টালিকা
ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্বাপেক্ষা বিদিত হইয়াছেন। ইনি
সিরিয়াতে যুদ্ধ করিতে যান—এবং সেখানে ইহার বীরত্বের
কথা খীবস্ নগরের একজন কবি চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

নিউবিয়া দেশে খীবস্ নগরে নীল নদীর পার্শ্ববর্তী
পাহাড়ে খোদিত ইহঁদের চারিটি মূর্তি মন্দিরের তলায়
দণ্ডায়মান। সে ছবিটি এখানে দিলাম। মন্দিরের গায়ে
গায়ে ইহঁদের কীর্তি কথা লিখা আছে। ইহঁদের আমলেই
ইহুদিজাতি এখানে আসিয়া নানারূপ অত্যাচার সহ করে।
ধনাগার তৈয়ারী করিবার জন্ত তাহাঁরাই ক্রীত দাসের মত
খাটিয়া সে সব কাজ করিয়া দেয়। এ সময়ে “সেমিটিক”
বা অগ্র জাতীয় লোক এখানে সংখ্যায় এত বাড়িয়া
পড়ে—যে দেশের লোকের সংখ্যায় তারা অনেক বেশী
হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের দিয়া সব কাজ করিয়া লওয়া
হইত বলিয়া তাহারা বিদ্রোহী হয়—ও পরিশেষে ইহুদিরা
মিসর ত্যাগ করিয়া বনে বনে লুকাইয়া পলায়। একেই বলে
“একজোডাস্” বা বাইবেলে কথিত পলায়ন যুদ্ধ। ইহার
পরই “মধ্য রাজ্যের” অবসান ও তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার
বিলুপ্তি—ও যত পরাজয়, উপসর্গ ও যন্ত্রণা ঘটে। বাইবেলে
লিখিত আছে—“বিদেশী এসিরিয়ানরা মন্দির হইতে ও
রাজপ্রাসাদ হইতে সব ধনরত্ন লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল।”

এই সময়কার রাজারা সব বিদেশীয়। তাহাদের
মূর্তি সকল—দেখিতে অগ্ররূপ ও সুশ্রী। এইবার মিশর
দেশের অধোগতির সময়। দুঃসময় বহিয়া উত্তর হইতে
এসিরিয়ান ও দক্ষিণ হইতে এথিওপিয়ানরা আসিয়া মিশর

আক্রমণ করিল। এবং মিশর জয় করিয়া “বিংশতি বংশ” হইয়া সিংহাসনে বসিল। এই সময় হইতে সকল বড় বড় পদবী এসিরিয়ানরই লইতে লাগিলেন ও মিসরবাসীরা বিদ্রোহী হইলে হারাইয়া দিয়া “খীবস” নগর ধ্বংস করিলেন। সকল সময়ের জেতারাই এইরূপ করিয়া থাকে।

কিন্তু ভাগ্যচক্র কখনও কোথাও সমান থাকে না। কিছুদিন বাদে বেবিলন দেশের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল আর সেই গোলমালে মিশরও উঠিয়া আপনার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিল। এইটি যড়বিংশতি বংশ। ইহার পর হইতেই আবার শুভদিন দেখা যাইতে লাগিল। এই সময়ে কলা বিজ্ঞার উন্নতির আর অবধি ছিল না। এবং সিরিয়া দেশ জয় করিয়া ও নিজে বরাবর স্বাধীন থাকিয়া পারস্ত দেশের অভ্যুত্থানে মিশর আবার স্বাধীনতা হারাইল। এই সময়েরই একটি সুন্দর “সূচ্যগ্রন্থ” ছাপাইলাম।

৫৩৯ খৃঃ অঃ পারস্তদেশ অতিশয় ক্ষমতাবান হইয়া বেবিলন অধিকার করিল ও তার অব্যবহিত পরেই আর্ট জেরেক-সেসের আমলে মিশর আক্রমণ করিয়া মেমফিস নগর অধিকার করিল। একশত বৎসর মিশরকে পারস্তের অধীনে থাকিতে হইয়াছিল।

তার পর গ্রীকবীর এলেকজান্ডার আসিয়া মিশর জয় করেন। ও তাঁর মৃত্যুর পর এক সৈন্যধ্যক্ষ টলেমী নামে রাজা হন। এই সময়ে গ্রীসই মিশরের রাজভাষা হয়, ও অনেক লিপি সেই ভাষাতেই খোদিত আছে। পরে ক্রিও-প্যাট্রার সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া রোমানেরা মিশরের সিংহাসন অধিকার করেন।

এই টলেমীর আমলেই সেই প্রসিদ্ধ “রোজেটা” স্তম্ভ খোদিত হয়। পুরোহিতের আদেশ—ও ৫ম টলেমীর

সন্মান সূচক অনুষ্ঠান এই পাথরে তিন রকম ভাষায় লিখা থাকে—যথা—পুরোহিতের ছবি আঁকা ভাষা বা Hieroglyphic, সাধারণ লোকদের ভাষা, ও গ্রাম্য ভাষায়। এই হইতেই মিলাইয়া মিশরের পুরাতন হরফ নির্ণয় হয়। রাজার নাম গুলি সব আঁকসী দিয়া অঙ্কিত। তাই হইতেই হরফ ঠিক হয়। ফরাসীরা ১৭৯৮ খ্রীঃ অঃ এই পাথর নীল নদীর মোহানা হইতে আনে। পরে এলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধে হারাইয়া ইংরাজরা ইহা লইয়া আসেন। সেই অবধি ইহা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বিদ্যমান।

পরে আরব জাতিরা মিশর জয় করিল। সেই অবধি এদেশটি এখন তুর্কীয় স্থলতানের অধীনেই আছে। এবং ইংরাজ ইহার তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন মানুষ মরিয়া গেলে আর যেমন সেরূপ ভাবে বা সে দেহে আর বাঁচিতে পারে না, জাতির পক্ষেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ পুরাকালে যে সকল জাতি উন্নত ও ক্ষমতাবান হইয়া এখন পড়িয়াছেন তাহাদের আর উঠিবার আশা নাই। মিশর দেশ, গ্রীস দেশ, রোম দেশ কেহই পারে নাই। অবশ্য আমাদের ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও ওই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু গ্রীস তো উঠিয়াছে—তাহার ভাষা, দর্শন, কলা বিজ্ঞা, পৃথিবী জুড়িয়া আদৃত হইয়াছে। সব তো তার নষ্ট হয় নাই। জিনিষের ফলাফল এমনি ভাবেই থাকে। সব থাকে না; যে টুকু ভাল ও থাকিবার উপযুক্ত সে টুকু অবিনাশী ও পরিশেষে গৃহীত ও আদৃত হইবে। অনেক বিষয়ে পতিত হইলেও নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও এমন অনেক জিনিষ আছে। সেগুলি কি আমরা এখনও জানি না।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

প্রবাসী ।



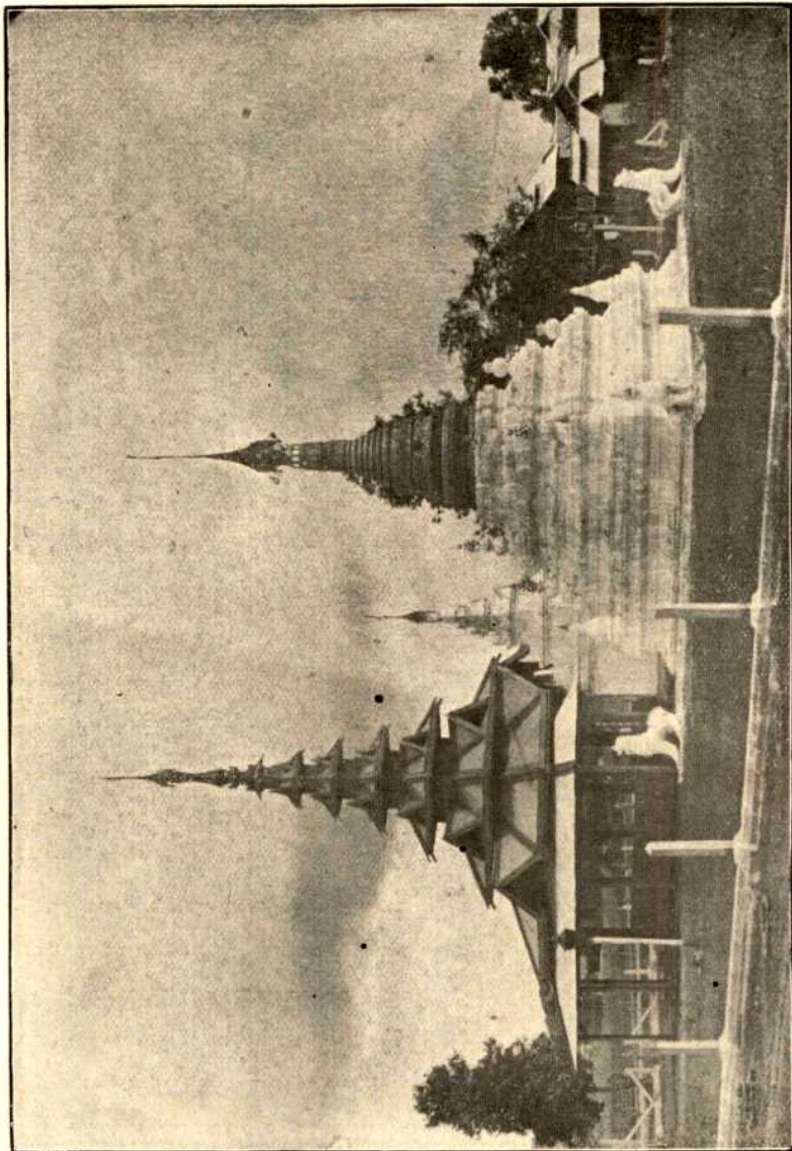
শ্রীখুদীরাম বসু ।



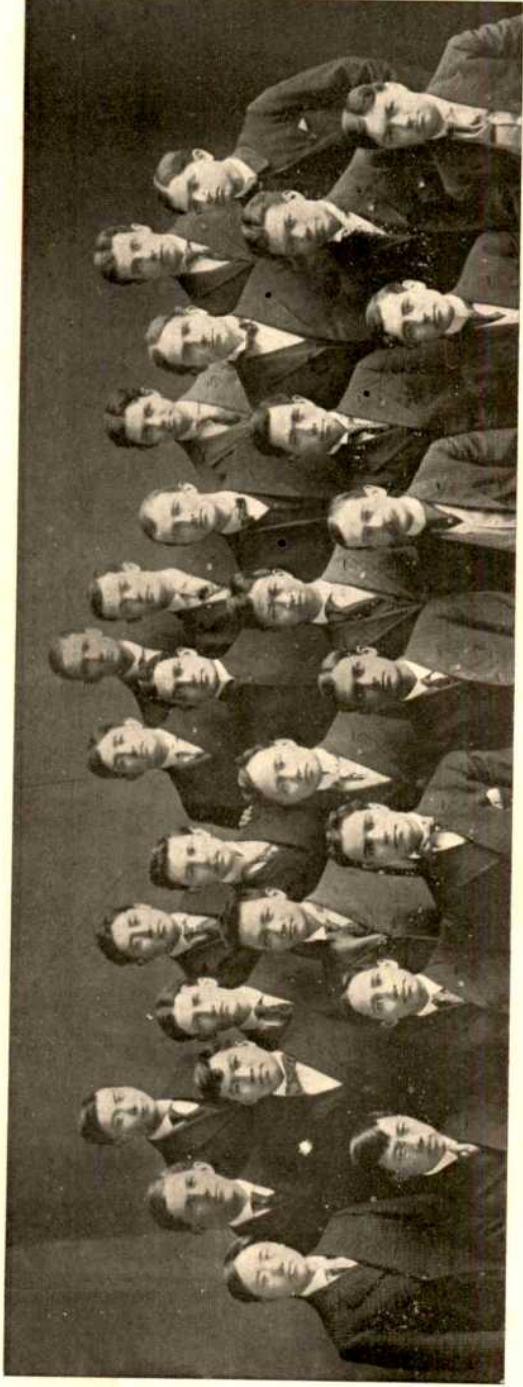
শ্রীযুক্ত বালগন্ধার টিলক ।



ব্রহ্মদেশীয়া নারী—মন্দির পথে ।



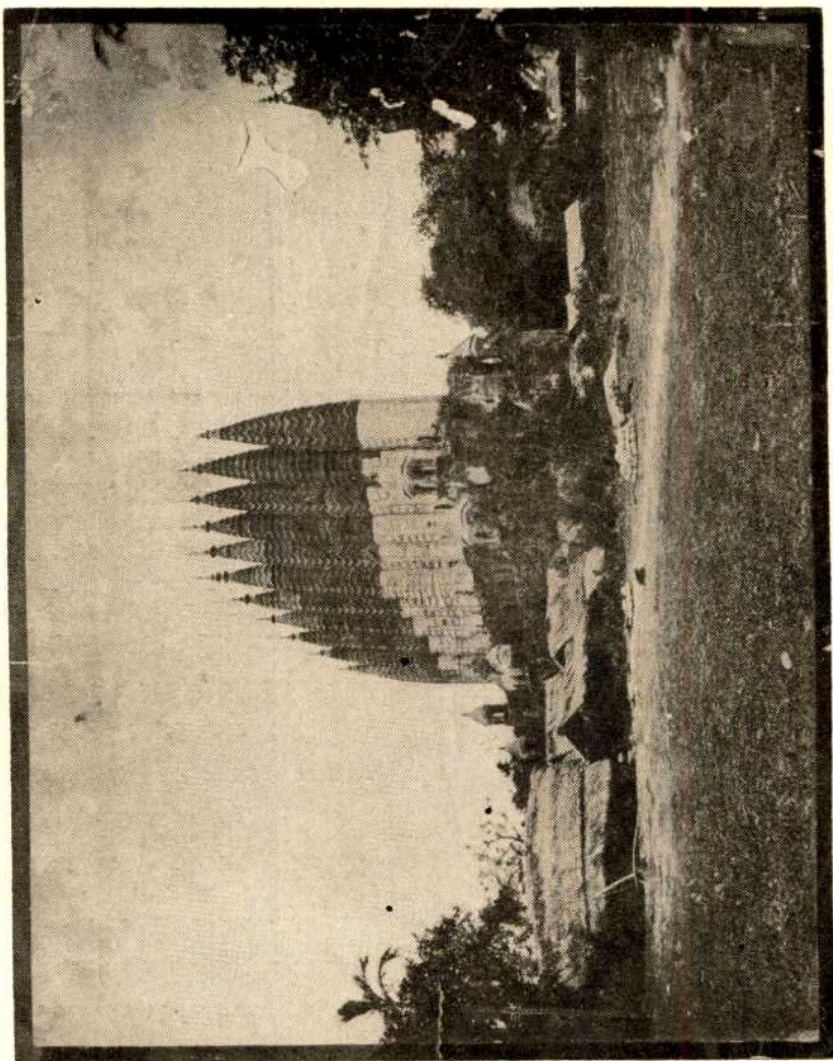
জিগন ফায়া চাউঙ—একটি ব্রহ্মদেবী মন্দির ।



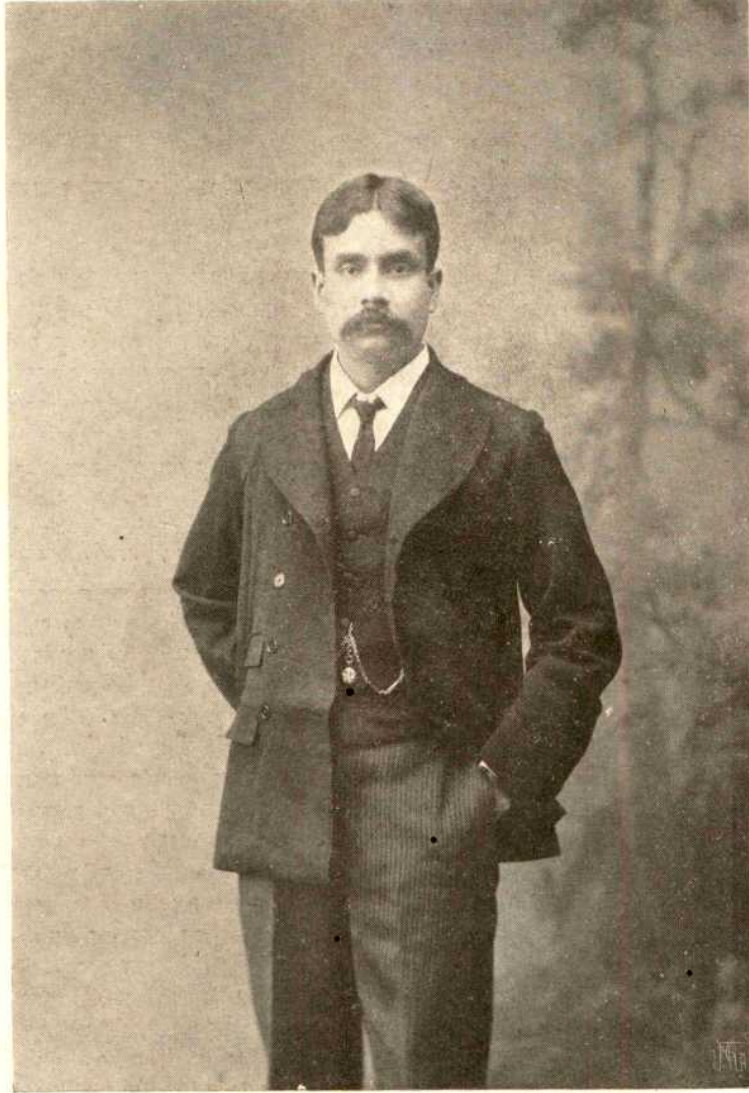
ইলিনয় সার্করাষ্ট্রিক সমিতি ।

এই চিত্রে চীন, মেক্সিকো, আর্গেন্টাইন রিপাব্লিক, স্পেন, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ-আমেরিকা, ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, জার্মানী, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান ও গ্রীসদেশের ছাত্র, এবং অধ্যাপক ড, সী, বন্ডউইন্স আছেন । কেবল তাঁহারই গৌরব আছে । তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট যুবক শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর । রথীন্দ্রনাথের টিক্ পশ্চাতে বা উপরে দণ্ডায়মান শ্রীমান সন্তোষচন্দ্র মজুমদার । উপর

হইতে দ্বিতীয় সারির সর্ব দক্ষিণে দণ্ডায়মান শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।



রাজনগরের একুশ রত্ন মঠ ।



এই আগষ্ট কলিকাতায় বিদেশীবর্জন ও স্বদেশীপ্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতি
শ্রীযুক্ত আব্দুল হালিম গজ্জনবী ।

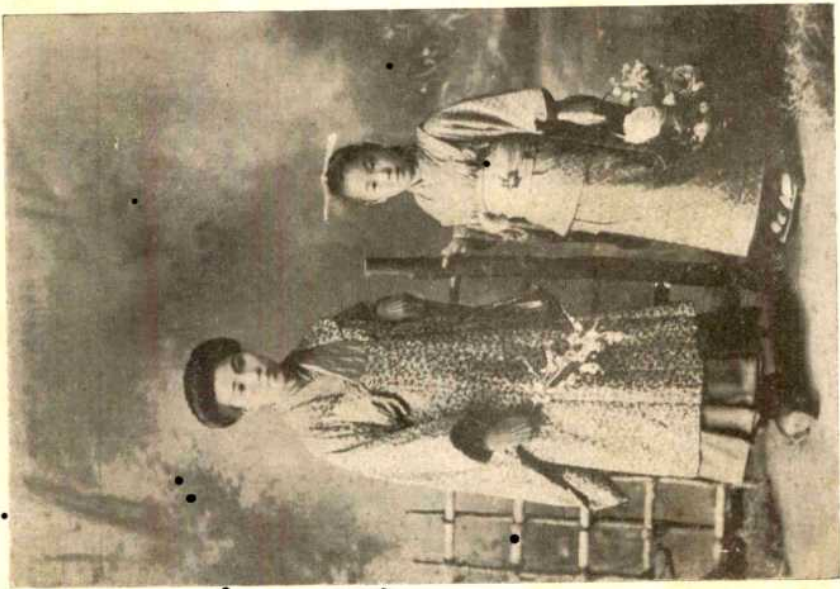
প্রবাসী ।



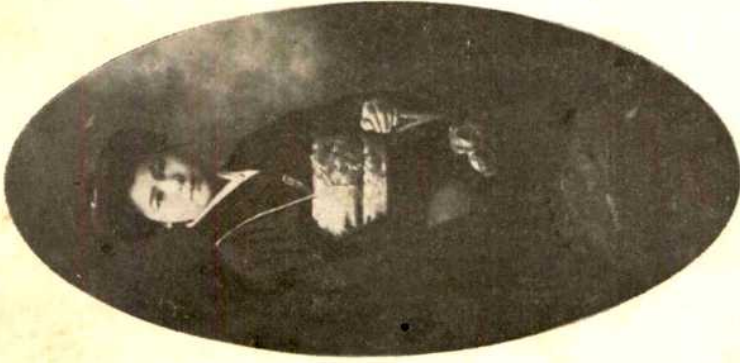
রাজা রামমোহন রায় ।

Three colour blocks by U. Ray.

Kuntaline Press, Calcutta.



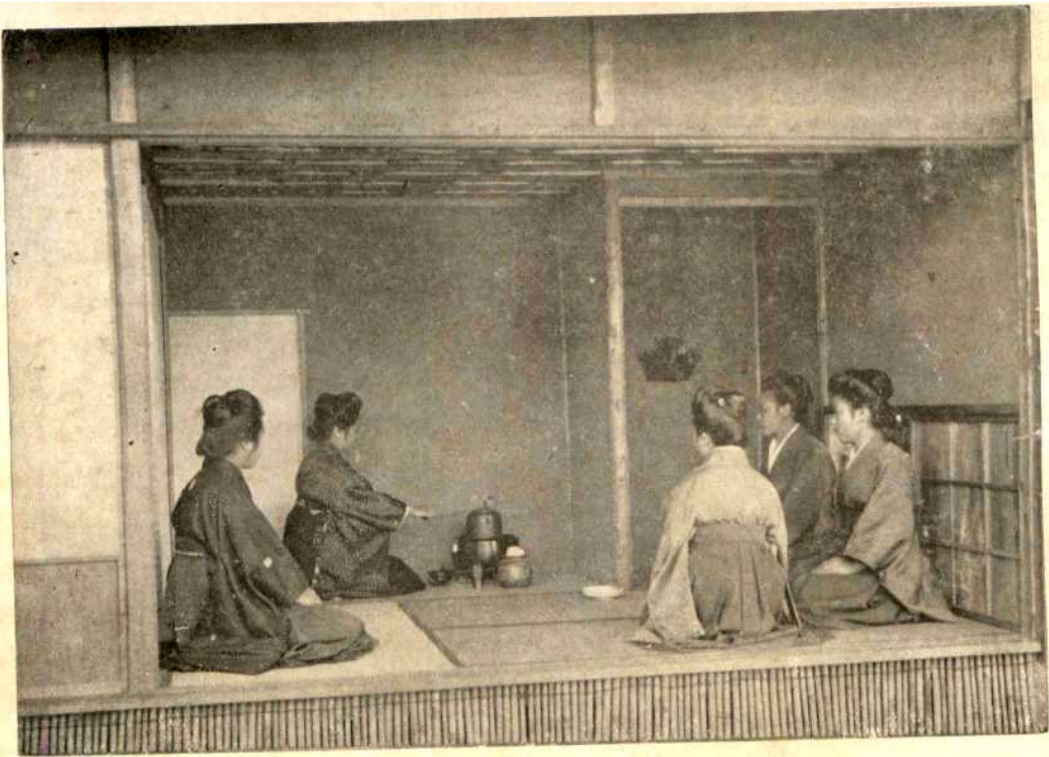
শিক্ষিতা জাপানী মহিলাদের আধুনিক পরিচ্ছদ।



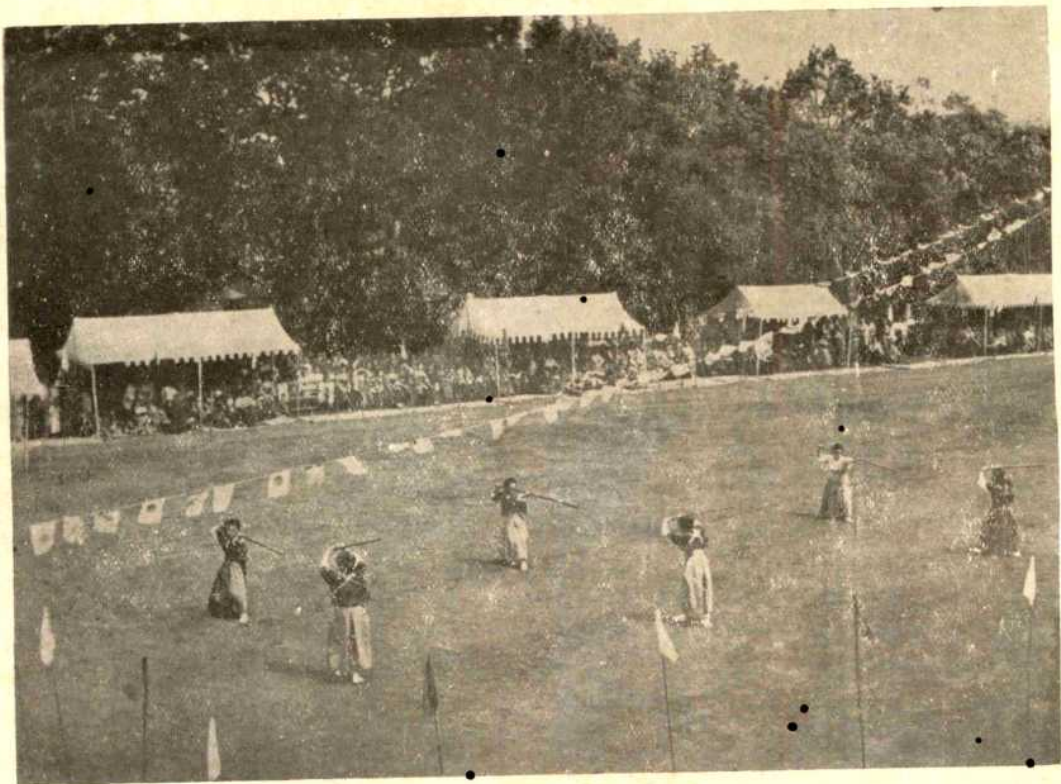
একজন শিক্ষিতা জাপানী মহিলা।



জাপানে প্রথম নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রতিষ্ঠাতা জিনজো নারসে।



জাপানী নারীগণকে চা প্রস্তুত ও পরিবেশন করিবার প্রণালী শিক্ষা দান ।



জাপানী নারীগণের তরবারি ক্রীড়া শিক্ষা । •

[বহুবার দেবীমোহনবাবীকে অস্ত্র-শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা স্মরণীয়]

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

৮ম ভাগ ।

ভাদ্র. ১৩১৫ ।

৫ম সংখ্যা ।

গোরা ।

৩০

কোন প্রকার অপবাদ বিচার না কবিয়া কেবল মাত্র গ্রামকে শাসন করিবার জন্য সাতচল্লিশজন আসামীকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে ।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাতের পর গোরা উকিলের সন্মানে বাহির হইল । কোনো লোকের কাছে খবর পাইল সাতকড়ি হালদার এখানকার একজন ভাল উকিল । সাতকড়ি বাড়ি বাইতেই সে বলিয়া উঠিল—“বাঃ, গোরা যে ! তুমি এখানে !”

গোরা যা মনে কবিয়াছিল তাই বটে—সাতকড়ি গোরার সহপাঠী । গোরা কহিল, চরবোমপুরের আসামীদিগকে জামিনে খালাস করিয়া তাহাদের মকদ্দমা চালাইতে হইবে ।

সাতকড়ি কহিল—“জামিন হবে কে ?”

গোরা কহিল—“আমি হব ।”

সাতকড়ি কহিল,—“তুমি সাতচল্লিশ জনের জামিন হবে তোমার এমন কি সাধ্য আছে ?”

গোরা কহিল,—“যদি মোক্তাবরা মিলে জামিন হয় তাব কি আমি দেব ।”

সাতকড়ি কহিল—“টাকা কম লাগবে না ।”

পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের এক্সলাসে জামিন খালাসের দরখাস্ত হইল । ম্যাজিষ্ট্রেট গতকল্যকার সেই মলিন বস্ত্রধারী পাগড়িপরা বীরমূর্তির দিকে একবার কটাক্ষ নিক্ষেপ কবিলেন এবং দরখাস্ত অগ্রাহ্য কবিয়া দিলেন । চৌদ্দ বৎসরের ছেলে হইতে আশি বৎসরের বুড়া পর্যন্ত হাজতে পচিতে লাগিল ।

গোরা ইহাদের হইয়া লড়িবার জন্য সাতকড়িকে অনুরোধ করিল । সাতকড়ি কহিল, “সাক্ষী পাবে কোথায় ? যারা সাক্ষী হতে পাবত তারা সবাই আসামী ! তার পবে এই সাহেব-মাবা মামলাব তদন্তের চোটে এ অঞ্চলের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে । ম্যাজিষ্ট্রেটের ধাবণা হয়েছে ভিতবে ভিতরে ভদ্রলোকের যোগ আছে ; হয় ত বা আমাদেরও সন্দেহ করে, বলা যায় না । ইংরেজি কাগজগুলোতে ক্রমাগত লিখচে দেশিলোক যদি এ বকম স্পর্দ্ধা পায় ত্রা হলে অবশ্যই অসহায় ইংরেজবাবু আর মফস্বলে বাস করন্তেই পারবে না । ইতি মধ্যে দেশের লোক দেশে টিক্তে পারচে না এমনি হয়েছে । অত্যাচার, হচ্ছে জানি কিন্তু কিছুই কবাব জো নেই ।”

গোরা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল—“কেন জো নেই ?”

সাতকড়ি হাসিয়া কহিল—“তুমি স্কুলে যেমনটি ছিলে

এখনো ঠিক তেমনিটি আছ দেখছি। জো নেই মানে আমাদের ববে জোপুত্র আছে--রোজ উপার্জন না কবলে অনেকগুলো লোককে উপবাস কবতে হয়। পবেব দায় নিজেব ঘাড়ে নিয়ে মবতে বাজি হয় এমন লোক সংসারে বেশি নেই--বিশেষত যে দেশে সংসার জিনিষটি বড় ছোট খাট জিনিষ নয়। বাদেব উপব দশজন নির্ভর কবে তারা সেই দশজন ছাড়া অত্র দশজনের দিকে তাকাবাব অবকাশই পায় না।”

গোরা কহিল, “তাহলে এদেব জন্তে কিছুই কববে না ? হাইকোর্টে মোশন কবে যদি—”

সাতকড়ি অধীব হইয়া কহিল—“আরে ইংবেজ মেরেছে যে--সেটা দেখুনা ! প্রত্যেক ইংরেজটিই যে বাজা--একটা ছোট ইংবেজকে মাবলেও যে সেটা একটা ছোট রকম রাজবিদ্রোহ। যেটাতে কিছু ফল হবে না সেটার জন্তে মিথ্যে চেষ্টা কবতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কোপনয়নে পড়ব সে আমার দ্বারা হবে না।”

কলিকাতায় গিয়া সেখানকার কোনো উকিলের সাহায্যে কিছু সুবিধা হয় কিনা তাই দেখিবার জন্ত পবদিন সাড়ে দশটার গাড়িতে রওনা হইবার অভিপ্রায়ে গোরা যাত্রা কবিয়াছে এমন সময় বাধা পড়িয়া গেল।

এখানকার মেলা উপলক্ষ্যেই কলিকাতাব একদল ছাত্রের সহিত এখানকার স্থানীয় ছাত্রদলের ক্রিকেটযুদ্ধ স্থিব হইয়াছে। হাত পাকাইবাব জন্ত কলিকাতার ছেলেরা আপন দলের মধ্যেই খেলিতেছিল। ক্রিকেটের গোলা লাগিয়া একটি ছেলের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। মাঠের ধারে একটা বড় পুষ্কবিণী ছিল--আহত ছেলেটিকে দুইটি ছাত্র ধবিয়া সেই পুষ্কবিণী ব তীরে বাধিয়া চাদব ঈঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া তাহাব পা বাধিয়া দিতেছিল এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একটা পাহারাওয়াল আসিয়াই একে-বাবেই একজন ছাত্রের ঘাড়ে হাত দিয়া ধাক্কা মাবিয়া তাহাকে অকথা ভাষায় গালি দিল। এই পুষ্কবিণীটি পানীয় জলের জন্ত বিজার্ড কবা, ইহার জলে নামা নিষেধ, কলিকাতার ছাত্র তাহা জানিত না, জানিলেও অকস্মাৎ পাহারাওয়ালাব কাছে এরূপ অপমান সহ্য করা তাহাদের অভ্যাস ছিল না, গায়েও জোর ছিল তাই অপমানের বোধোচিত প্রতিকার আরম্ভ করিয়া দিল। এই দৃশ্য দেখিয়া

চাব পাঁচ জন কন্ঠেবল ছুটিয়া আসিল। ঠিক এমন সময়টিতেই সেখানে গোবা আসিয়া উপস্থিত। ছাত্ররা গোবাকে চিনিত--গোবা তাহাদিগকে লইয়া অনেকদিন ক্রিকেট খেলাইয়াছে। গোরা যখন দেখিল, ছাত্রদিগকে মাবিতে মারিতে ধবিয়া লইয়া যাইতেছে সে সহিতে পাবিল না--সে কহিল--“শ্বরদার মাবিন্দে।” পাহারাওয়ালার দল তাহাকেও অশাব্য গালি দিতেই গোবা ঘৃষি ও লাধি মাবিয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া তুলিল যে বাস্তায় লোক জমিয়া গেল। এদিকে দেখিতে দেখিতে ছাত্রের দল জুটিয়া গেল। গোরার উৎসাহ ও আদেশ পাইয়া তাহারা পুলিশকে আক্রমণ কবিত্তেই পাহারাওয়ালার দল রণে ভঙ্গ দিল। দর্শকরূপে বাস্তাব লোকে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল ; কিন্তু বলা বাহুল্য এই তামাসা গোরাব পক্ষে নিতান্ত তামাসা হইল না।

বেলা যখন তিন চাবটে,--ডাকবাংলার বিনয়, হারান বাবু এবং মেয়েরা রিহার্সালে প্রবৃত্ত আছে এমন সময় বিনয়ের পবিচিত দুইজন ছাত্র আসিয়া শ্বর দিল গোরাকে এবং কয়জন ছাত্রকে পুলিশে গ্রেফতার কবিয়া লইয়া হাজতে বাধিয়াছে, আগামী কাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে প্রথম এজলাসেই ইহাব বিচার হইবে।

গোরা হাজতে ! একথা শুনিয়া হারান বাবু ছাড়া আর সকলেই একেবারে চমকিয়া উঠিল। বিনয় তখনই ছুটিয়া প্রথমে তাহাদের সহপাঠী সাতকড়ি হালদারের নিকট গিয়া তাহাকে সমস্ত জানাইল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া হাজতে গেল।

সাতকড়ি তাহার পক্ষে ওকালতি ও তাহাকে এখনি জামিনে খালাসের চেষ্টা করিবার প্রস্তাব করিল। গোরা বলিল, “না, আমি উকীলও রাখব না, আমাকে জামিনে খালাসেরও চেষ্টা করতে হবে না।”

সে কি কথা ! সাতকড়ি বিনয়ের দিকে ফিরিয়া কহিল --“দেখেছো ! কে বলবে গোবা ইস্কুল থেকে বেরিয়েছে ! ওব বুদ্ধিগুদ্ধি ঠিক সেই বকমই আছে।”

গোবা কহিল--“দৈব্যাং আমার টাকা আছে বন্ধু আছে বলেই হাজত আর হাতকড়ি থেকে আমি খালাস পাব সে আমি চাইনে। আমাদের দেশের যে ধর্মনীতি তাতে

আমরা জানি সুবিচার কবার গব্বর রাজার ; প্রজার প্রতি
অবিচার রাজারই অধর্ম । কিন্তু এ রাজ্যে উকীলের কড়ি
না জোগাতে পেবে প্রজা যদি হাজতে পচে জেলে মরে,
রাজা মাথার উপরে থাকতে শ্রায় বিচার পরসা দিয়ে কিন্তে
যদি সর্বস্বাস্ত হতে হয় তবে এমন বিচারেব জন্তে আমি
সিকি পরসা খবচ কবতে চাইনে ।”

সাতকড়ি কহিল—“কাজির আমলে যে ঘুষ দিতেই
মাথা বিকিয়ে যেত ।”

গোরা কহিল—“ঘুষ দেওয়া ত রাজ্যের বিধান ছিল না
—যে কাজির মন ছিল সে ঘুষ নিত এ আমলেও সেটা
আছে । কিন্তু এখন রাজ্যেব বিচারেব জন্তে দাঁড়াতে
গেলেই বাদী হোক্ প্রতিবাদী হোক্ দোষী হোক্ নির্দোষ
হোক্ প্রজাকে চোখেব জল ফেলতেই হবে । যে পক্ষ নির্দন,
বিচারেব লড়াইয়ে জিত হার দুই তার পক্ষে সর্বনাশ ।
তারপবে রাজা যখন বাদী আব আমার মত লোক
প্রতিবাদী তখন তাঁর পক্ষেই উকীল বারিষ্টার—আর আমি
যদি জোটতে পাবলুম ত ভাল নইলে অদৃষ্টে যা থাকে !
বিচারে যদি উকীলের সাহায্যের প্রয়োজন না থাকে তবে
সবকারী উকীল আছে কেন ? যদি প্রয়োজন থাকে ত
গব্বরমেটের বিকল্প পক্ষ কেন নিজের উকীল নিজে জোটতে
বাধ্য হবে ? এ কি প্রজার সঙ্গে শত্রুতা ? এ কি বকমের
বাজধর্ম ?”

সাতকড়ি কহিল—“ভাই, চট কেন ? সিভিলিজেসন
সস্তা জিনিষ নয় । স্বল্প বিচাব কবতে গেলে স্বল্প
আইন কবতে হয়—স্বল্প আইন করতে গেলেই আইনের
ব্যবসায়ী না হলে কাজ চলেই না—ব্যবসা চালাতে গেলেই
কেনাবেচা এসে পড়ে—অতএব সভ্যতার আদালত আপনিই
বিচার কেনাবেচার হাট হয়ে উঠবেই—যার টাকা নেই
তার ঠকবার সম্ভাবনা থাকবেই । তুমি রাজা হলে কি
করতে বল দেখি ?”

গোবা কহিল, “যদি এমন আইন করতুম যে হাজার
দেড় হাজার টাকা বেতনেব বিচারকেব বুদ্ধিতেও তার রহস্য
ভেদ হওয়া সম্ভব হত না তাহলে হতভাগা বাদী প্রতিবাদী
উভয় পক্ষেব জন্ত উকীল সবকারী খবচে নিযুক্ত করে
দিতুম । বিচাব ভাল হওয়াব খবচা প্রজার ঘাড়ে চাপিয়ে

দিয়ে সুবিচারের গোবব কবে পাঠান মোগলদেব গাল
দিতুম না ।”

সাতকড়ি কহিল—“বেশ কথা, সে শুভদিন যখন আসে
নি—তুমি যখন রাজা হওনি—সম্প্রতি তুমি যখন সভ্য
রাজ্যব আদালতের আসামী তখন তোমাকে হয় গাঠের
কড়ি খবচ করতে হবে, নয় উকীল বন্ধুর শবণাপন্ন হতে
হবে, নয় ত তৃতীয় গতিটা সদগতি হবে না ।”

গোবা জেদ করিয়া কহিল—“কোন চেষ্টা না করে
যে গতি হতে পাবে আমার সেই গতিই হোক্ । এবাজ্যে
সম্পূর্ণ নিরুপায়ের যে গতি আমারো সেই গতি ।”

বিনয় অনেক অনুনয় কবিল কিন্তু গোরা তাহাতে
কর্ণপাতমাত্র কবিল না । সে বিনয়কে জিজ্ঞাসা কবিল
“তুমি হঠাৎ এখানে কি করে উপস্থিত হলে ?”

বিনয়ের মুখ জঁষৎ বস্তান্ত হইয়া উঠিল । গোবা যদি
আজ হাজতে না থাকিত তবে বিনয় হয় ত কিছু বিদ্রোহের
স্ববেই তাহার এখানে উপস্থিতির কাবণটা বলিয়া দিত ।
আজ স্পষ্ট উদ্ভবটা তাহার মুখে বাধিয়া গেল—কহিল,
“আমার কথা পরে হবে—এখন তোমার”—

গোরা কহিল—“আমি ত আজ রাজ্যব অতিথি ।
আমাব জন্তে রাজা স্বয়ং ভাব্চেন তোমাদের আর কারো
ভাব্বে হবে না ।”

বিনয় জানিত গোরাকে টলানো সম্ভব নয়—অতএব
উকিল রাখার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইল । বলিল—“তুমি
ত খেতে এখানে পাববে না জানি, বাইবে থেকে কিছু
খাবাব পাঠাবার জোগাড় করে দিই ।”

গোরা অধীর হইয়া কহিল—“বিনয়, কেন তুমি বৃথা
চেষ্টা করচ ! বাইবে থেকে আমি কিছুই চাইনে । হাজতে
সকল্বেব ভাগ্যে যা জোটে আমি তার চেয়ে কিছু বেশি
চাইনে ।”

বিনয় ব্যথিত চিত্তে ডাকবাংলার ফিরিয়া আসিল ।
সুচবিতা বাস্তাব দিকেব একটা শোবার ঘরে দবজা বন্ধ
করিয়া জালনা খুলিয়া বিনয়ের প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করিয়া
ছিল । কোনো মতেই অস্ত্র সকলের সঙ্গ এবং আলাপ
সে সুস্থ করিতে পাবিতেছিল না ।

সুচবিতা যখন দেখিল বিনয় চিন্তিত বিষমরূপে ডাক-

বাংলাব অভিমুখে আসিতেছে তখন আশঙ্কায় তাহাব বুকের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। বহু চেষ্টায় সে নিজেকে শান্ত করিয়া একটা বই হাতে কবিতা এ ঘরে আসিয়া বসিল। ললিতা শেলাই ভালবাসে না কিন্তু সে আজ চুপ করিয়া কোণে বসিয়া শেলাই করিতেছিল,—লাবণ্য সুধীরকে লইয়া ইংবেজি বানানেব খেলা খেলিতেছিল, লীলা ছিল দর্শক; হারান বাবু বরদাসুন্দরীর সঙ্গে আগামী কল্যাকাব উৎসবের কথা আলোচনা করিতেছিলেন।

আজ প্রাতঃকালে পুলিশের সঙ্গে গোয়ার বিরোধের ইতিহাস বিনয় সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিল। সূচরিতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া বহিল—ললিতার কোল হইতে শেলাই পড়িয়া গেল এবং তাহাব মুখ লাল হইয়া উঠিল।

বরদাসুন্দরী কহিলেন—“আপনি কিছু ভাববেন না বিনয় বাবু—আজ সন্ধ্যা বেলায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেমব কাছে গোবমোহনবাবুব জন্তে আমি নিজে অনুবোধ করব।”

বিনয় কহিল—“না, আপনি তা করবেন না—গোরা যদি শুনতে পায় তাহলে জীবনে সে আমাকে আর ক্ষমা করবে না।”

সুধীর কহিল—“তাঁর ডিফেন্সেব জন্ত ত কোনো বন্দোবস্ত কবতে হবে।”

জামিন হইতে খালাসের চেষ্টা এবং উকিল নিয়োগ সম্বন্ধে গোরা যে সকল আপত্তি কবিতাছিল বিনয় তাহা সমস্তই বলিল—শুনিয়া হারান বাবু অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন—“এ সমস্ত বাড়াবাড়ি!”

হাবান বাবুর প্রতি ললিতার মনের ভাব বাই থাক সে এ পর্যন্ত তাঁহাকে মাজ কবিতা আসিয়াছে, কখনো তাঁহার সঙ্গে তর্কে যোগ দেয় নাই,—আজ সে তীব্রভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—“কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি নয়—গোর বাবু যা করেছেন সে ঠিক করেছেন—ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের জঙ্গ করবে আর আমরা নিজেরা নিজেকে রক্ষা করব! তাদের মোটা মাইনে জোগাবার জন্তে ট্যাক্স জোগাতে হবে, আবার তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে উকীল ফি গাঁঠ থেকে দিতে হবে! এমন বিচার পাওয়াব চেয়ে জেলে যাওয়া ভাল!”

ললিতাকে হাবান বাবু এতটুকু দেখিয়াছেন—তাহাব

যে একটা মতামত আছে সে কথা তিনি কোনোদিন কল্পনাও করেন নাই। সেই ললিতাব মুখের তীব্র ভাবা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন—তাহাকে ভৎসনাব স্ববে কহিলেন, “তুমি এ সব কথার কি বোঝ? যারা গোটাকতক বই মুখস্থ করে পাস করে সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে, যাদের কোনো ধর্ম নেই ধারণা নেই, তাদের মুখ থেকে দায়িত্বহীন উদ্ভাস্ত প্রশ্ন গুলে তোমাদের মাথা ঘুরে যায়!”—এই বলিয়া গত কল্য সন্ধ্যার সময় গোরাব সহিত ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষাৎ-বিবরণ এবং সে সম্বন্ধে হারান বাবুব সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের আলাপের কথা বিবৃত করিলেন। চরঘোষপুরেব ব্যাপার বিনয়ের জানা ছিল না; শুনিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল—বুঝিল ম্যাজিস্ট্রেট গোরাকে সহজে ক্ষমা করিবে না।

হারান যে উদ্দেশ্যে এই গল্পটা বলিলেন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি যে গোবার সহিত তাঁহার দেখা হওয়া সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্যন্ত একেবারে নীবব ছিলেন তাহার ভিতবকার ক্ষুদ্রতা সূচরিতাকে আঘাত কবিল এবং হারান বাবুর প্রত্যেক কথার মধ্যে গোয়ার প্রতি যে একটা ব্যক্তিগত ঈর্ষা প্রকাশ পাইল তাহাতে গোয়ার এই বিপদের দিনে তাঁহার প্রতি উপস্থিত প্রত্যেকেবই একটা অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিল। সূচরিতা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল; কি একটা বলিবার জন্ত তাহার আবেগ উপস্থিত হইল, কিন্তু সেটা সম্বরণ করিয়া সে বইয়ের পাতা খুলিয়া কম্পিত হস্তে উন্টাইতে লাগিল। ললিতা উদ্ধতভাবে কহিল, “ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত হাবান বাবুর মতের যতই মিল থাক, ঘোষপুরেব ব্যাপারে গোবমোহন বাবুব মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।”

৩১

আজ ছোটলাট আসিবেন বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক সাড়ে দশটায় আদালতে আসিয়া বিচারকার্য সকাল সকাল শেষ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন।

সাতকড়ি বাবু ইকুলেব ছাত্রদেব পক্ষ লইয়া সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার বন্ধুকে বাঁচাইবাব চেষ্টা কবিলেন। তিনি গতক দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, অপরাধ স্বীকার করাই এ স্থলে ভাল চাল। ছেলেরা দুঃস্থ হইয়াই পাক্তে, তাহারা অর্ধাচীন নির্বোধ ইত্যাদি বলিয়া তাহাদের জন্ত ক্ষমা

প্রার্থনা কবিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট ছাত্রদিগকে জেলে লইয়া গিয়া বয়স ও অপরাধের তারতম্য অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশ বেতের আদেশ কবিয়াছিলেন। গোবাব উকীল কেহ ছিল না। সে নিজেব মামলা নিজে চালাইবাব উপলক্ষে পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া তাহাব মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন ও পুলিশের কর্ত্তে বাধা দেওয়া অপরাধে তাহাকে একমাস সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন এবং এইরূপ লঘু দণ্ডকে বিশেষ দয়া বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন।

সুধীর ও বিনয় আদালতে উপস্থিত ছিল। বিনয় গোয়ার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। তাহাব যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, সে তাড়াতাড়ি আদালত ঘব হইতে বাহির হইয়া আসিল। সুধীর তাহাকে ডাক-বাংলায় ফিরিয়া গিয়া স্নানাহারের ক্ষুদ্র অমুরোধ কবিল—সে শুনিল না—মাঠের বাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। সুধীরকে কহিল, “তুমি বাংলায় ফিরিয়া যাও কিছুক্ষণ পরে আমি যাইব।” সুধীর চলিয়া গেল।

এমন কবিয়া যে কতক্ষণ কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতে পারিলনা। সূর্য্য মাথাব উপর হইতে পশ্চিমের দিকে যখন হেলিয়াছে তখন একটা গাড়ি ঠিক তাহার সম্মুখে আসিয়া থামিল। বিনয় মুখ তুলিয়া দেখিল সুধীর ও সূচরিতা গাড়ি হইতে নামিয়া তাহাব কাছে আসিতেছে। বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। সূচরিতা কাছে আসিয়া স্নেহাঙ্গুণ্যে কহিল, “বিনয় বাবু আসুন।”

বিনয়ের হঠাৎ চৈতন্ত হইল যে এই দৃশ্যে রাস্তাব লোকে কোতুক অমুগ্ধব কবিতেছে। সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। সমস্ত পথ কেহ কিছুই কথা কহিতে পারিলনা।

ডাক বাংলায় পৌছিয়া বিনয় দেখিল সেখানে একটা লড়াই চলিতেছে। ললিতা বাঁকিয়া বসিয়াছে সে কোনোমতেই আজ ম্যাজিস্ট্রেটের নিমন্ত্রণে যোগ দিবেনা। ববদা-সুন্দরী বিষম সঙ্কটে পড়িয়া গিয়াছেন—হারান বাবু ললিতার মত বালিকার এই অসঙ্গত বিদ্রোহে ক্রোধে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বাবাব বলিতেছেন, আজকালকার ছেলে

মেয়েদের এ কিরূপ বিকাব ঘটিয়াছে—তাহারা ‘ডিসিপ্লিন’ মানিতে চাহে না। কেবল যে-সে লোকের সংসর্গে যাহা-তাহা আলোচনা কবিয়াই এইরূপ ঘটতেছে।

বিনয় আসিতেই ললিতা কহিল—“বিনয় বাবু, আমাকে মাপ করুন। আমি আপনার কাছে ভাবি অপবাধ কবেছি; আপনি তখন যা বলছিলেন আমি কিছুই বুঝিতে পারিনি;—আমবা বাইবের অবস্থা কিছুই জানিনে বলেই এত ভুল বুঝি! পানুবাবু বলেন ভারতবর্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের এই শাসন বিধাতাব বিধান—তা যদি হয় তবে এই শাসনকে সমস্ত কায়মনোবাক্যে অভিশাপ দেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দেওয়াও সেই বিধাতারই বিধান।”

হারান বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—“ললিতা, তুমি—”

ললিতা হারান বাবুব দিক হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “চুপ করুন! আপনাকে আমি কিছু বলচিনে! বিনয় বাবু, আপনি কারো অমুরোধ বাধ্বেন না! আজ কোনোমতেই অভিনয় হতেই পারে না।”

ববদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি ললিতার কথা চাপা দিয়া কহিলেন—“ললিতা, তুই ত আচ্ছা মেয়ে দেখ্‌চি! বিনয় বাবুকে আজ স্নান কর্ত্তে খেতে দিবনে? বেলা দেড়টা বেজে গেছে তা জানিস? দেখ্‌দেখি গুঁর মুখ শুকিয়ে কি রকম চেহারা হয়ে গেছে।”

বিনয় কহিল—“এখানে আমরা সেই ম্যাজিস্ট্রেটের অতিথি—এবাড়িতে আমি স্নানাহাব করতে পারবনা।”

ববদাসুন্দরী বিনয়কে বিস্তব মিনতি করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। মেয়েরা সকলেই চুপ কবিয়া আছে দেখিয়া তিনি বাগিয়া বলিলেন—“তোদের সব হল কি? সূচি, তুমি বিনয় বাবুকে একটু বুঝিয়ে বলনা! আমরা কথা দিয়েছি—লোকজন সব ডাকা হয়েছে, আজকের দিনটা কোনোমতে কাটিয়ে যেতে হবে—নইলে ওরা কি মনে করবে বল দেখি? আর যে ওদের সামনে মুখ দেখাতে পারব না!”

সূচরিতা চুপ করিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

বিনয় অদূরে নদীতে ষ্টীমারে চলিয়া গেল। এই ষ্টীমার আজ ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই যাত্রী লইয়া কলিকাতায় রওনা

হইবে—আগামী কাল আটটা আন্দাজ সময়ে সেখানে পৌঁছিব।

হারান বাবু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বিনয় ও গোরাকে নিন্দা করিতে আবিস্ত করিলেন। সূচরিতা তাড়াতাড়ি চৌকি হইতে উঠিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া বেগে দ্বার ভেজাইয়া দিল। একটু পরেই ললিতা দ্বার ঠেলিয়া বরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সূচরিতা ছুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বিছানার উপর পড়িয়া আছে।

ললিতা ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সূচরিতার পাশে বসিয়া তাহাব মাথায় চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সূচরিতা যখন শান্ত হইল তখন জোর করিয়া তাহাব মুখ হইতে বাহর আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল—“দিদি, আমরা এখান থেকে কলকাতায় ফিরে যাই, আজ ত ম্যাজিষ্ট্রেটের ওখানে যেতে পারব না।”

সূচরিতা অনেকক্ষণ এ কথার কোনো উত্তর কবিল না। ললিতা যখন বাব বার বলিতে লাগিল তখন সে বিছানায় উঠিয়া বসিল—“সে কি করে হবে ভাই? আমার ত একেবারেই আস্বার ইচ্ছা ছিল না—বাবা যখন পাঠিয়ে দিয়েছেন তখন, যে জন্তে এসেছি তা না সেরে যেতে পারব না।”

ললিতা কহিল—“বাবা ত এসব কথা জানেন না—জানলে কখনই আমাদের থাকতে বলতেন না।”

সূচরিতা কহিল, “তা কি করে জানব ভাই!”

ললিতা। দিদি, তুই পারবি? কি করে যাবি বল দেখি? তার পবে আবাব সাক্ষগোজ কবে ঠেঞ্জে দাঁড়িয়ে কবিতা আওড়াতে হবে! আমার ত জিভ ফেটে গিয়ে বক্ত পড়বে তবু কথা বের হবে না!

সূচরিতা কহিল—“সেত জানি বোন্! কিন্তু নরক-যন্ত্রণাও সহিতে হয়। এখন আর কোনো উপায় নেই! আজকের দিন জীবনে আর কখনো ভুলতে পারব না।”

সূচরিতার এই বাধ্যতায় ললিতা রাগ করিয়া ঘব হইতে বাহির হইয়া আসিল। মাকে আসিয়া কহিল—“মা তোমরা যাবে না?”

বরদাসুন্দরী কহিলেন,—“তুই কি পাগল হয়েছিস? রাস্তির নটার পব যেতে হবে।”

ললিতা কহিল—“আমি কলকাতায় যাবার কথা বল্চি।”

বরদাসুন্দরী। শোন একবার মেয়ের কথা শোন!

ললিতা সুধীরকে কহিল, “সুধীব-দা, তুমিও এখানে থাকবে?”

গোবার শান্তি সুধীরের মনকে বিকল করিয়া দিয়া ছিল কিন্তু বড় বড় সাহেবের সম্মুখে নিজের বিত্তা প্রকাশ করিবার প্রলোভন সে ত্যাগ করিতে পারে এমন সাধ্য তাহার ছিল না। সে অব্যক্তস্বরে কি একটা বলিল—বোঝা গেল সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে কিন্তু সে থাকিয়াই যাইবে।

বরদাসুন্দরী কহিলেন, “গোলমাগে বেলা হয়ে গেল। আর ঘেরি করলে চলবে না। এখন সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বিছানা থেকে কেউ উঠতে পারবে না—বিশ্রাম করতে হবে। নইলে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে মুখ শুকিয়ে যাবে—দেখতে বিপ্রী হবে।”

এই বলিয়া তিনি জোব করিয়া সকলকে শয়নবধে পুরিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন। সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল কেবল সূচরিতাব ঘুম হইল না এবং অগ্র ঘরে ললিতা তাহার বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

ষ্টীমারে ঘন ঘন বাঁশি বাজিতে লাগিল।

ষ্টীমাব যখন ছাড়িবার উত্তোগ করিতেছে, খালাসীবা সিঁড়ি তুলিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে এমন সময় জাহাজের ডেকের উপর হইতে বিনয় দেখিল একজন স্ত্রীলোক জাহাজের অভিমুখে দ্রুতপদে আসিতেছে। তাহাব বেশ-ভূষা প্রভৃতি দেখিয়া তাহাকে ললিতা বলিয়াই মনে হইল কিন্তু বিনয় সহসা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে ললিতা নিকটে আসিতে আর সন্দেহ রহিল না। একবার মনে করিল ললিতা তাহাকে ফিরাইতে আসিয়াছে কিন্তু ললিতাইত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণে বোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। ললিতা ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িল—খালাসী সিঁড়ি তুলিয়া লইল। বিনয় শব্দিতচিন্তে উপরেব ডেক হইতে নীচে নামিয়া ললিতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ললিতা কহিল, “আমাকে উপবে নিয়ে চলুন।”

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল, “জাহাজ যে ছেড়ে দিচ্ছে !”

ললিতা কহিল, “সে আমি জানি।” বলিয়া বিনয়ের
জন্ত অপেক্ষা না করিয়াই সম্মুখেব সিঁড়ি বাহিয়া উপরের
তলায় উঠিয়া গেল।

ষ্টীমার বাঁশি ফুঁকিতে ফুঁকিতে ডাডিয়া দিল।

বিনয় ললিতাকে ফাষ্টক্লাসের ডেকে কেমাবাধ বসাইয়া
নীচের প্রান্তে তাহাব মুখের দিকে চাহিল।

ললিতা কহিল—“আমি কলকাতায় যাব—আমি
কিছুতেই থাকতে পাবলুম না।”

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—“ওঁবা সকলে জানেন ?”

ললিতা কহিল—“এখনো পর্য্যন্ত কেউ জানেন না।
আমি চিঠি বেধে এসেছি—পড়লেই জানতে পাববেন।”

ললিতার এই দুঃসাহসিকতায় বিনয় স্তম্ভিত হইয়া
গেল। সঙ্কোচের সহিত বলিতে আরম্ভ করিল—“কিন্তু—”

ললিতা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল—“জাহাজ ছেড়ে
দিয়েছে এখন আব ‘কিন্তু’ নিয়ে কি হবে! মেয়ে মানুষ হয়ে
জন্মেছি বলেই যে সমস্তই চূপ কবে সম্ব্ব করতে হবে সে
আমি বুঝিনে। আমাদের পক্ষেও ছায় অছায় সম্ভব অসম্ভব
আছে। আজকের নিমন্ত্রণে গিয়ে অভিনয় করার চেয়ে
আত্মহত্যা করা আমার পক্ষে সহজ।”

বিনয় বুঝিল, যা হইবার তা হইয়া গেছে, এখন এ
কাজের ভালমন্দ বিচার করিয়া মনকে পীড়িত করিয়া
তোলায় কোনো ফল নাই।

কিছুক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া ললিতা কহিল, “মেথুন
আপনাব বন্ধু গৌরমোহন বাবু প্রতি আমি মনে মনে বড়
অবিচার কবেছিলুম। জানিনে, প্রথম থেকেই কেন তাঁকে
দেখে তাঁর কথা শুনে আমার মনটা তাঁর বিরুদ্ধ হয়ে গিয়ে-
ছিল। তিনি বড় বেশি জোব দিয়ে কথা কইতেন, আর
আপনারা সকলেই তাতে যেন সায় দিয়ে যেতেন—তাই দেখে
আমার একটা রাগ হতে থাকত। আমার স্বভাবই ঐ—
আমি যদি দেখি কেউ কথায় বা ব্যবহারে জোর প্রকাশ
কবচে সে আমি একেবারেই সহ্যে পারিনে। কিন্তু গৌর-
মোহন বাবু জোব কেবল পবের উপরে নয় সে তিনি
নিজের উপরেও খাটান—এ সত্যিকার জোব—এবকম
মানুষ আমি দেখিনি।”

এমন কবিয়া ললিতা বকিয়া যাইতে লাগিল। কেবল
যে গোরা সম্বন্ধে সে অনুতাপ বোধ করিতেছিল বলিয়াই
এ সকল কথা বলিতেছিল তাহা নহে; আসলে, য়োঁকের
মাধ্যম যে কাজটা কবিয়া ফেলিয়াছে তাহাব সঙ্কোচ মনেব
ভিতব হইতে কেবলি মাথা তুলিবাব উপক্রম করিতেছিল;
—কাজটা হয়ত ভাল হব নাই এই দ্বিধা জোব কবিবাব
লক্ষণ দেখা যাইতেছিল; বিনয়ের সম্মুখে ষ্টীমাবে এইরূপ
একলা বসিয়া থাকা যে এত বড় কুষ্ঠাব বিষয় তাহা সে
পূর্বে মনেও কবিতে পারে নাই; কিন্তু লজ্জা প্রকাশ
হইলেই জিনিষটা অত্যন্ত লজ্জাব বিষয় হইয়া উঠিবে এইজন্ত
সে প্রাণপণে বকিয়া যাইতে লা গল। বিনয়ের মুখে ভাল
কবিয়া কথা জোগাইতেছিল না। এদিকে গোবাব দুঃখ ও
অপমান, অন্তর্দিকে সে যে এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি
আমোদ করিতে আসিয়াছিল তাহাব লজ্জা, তাহার উপরে
ললিতাব সম্বন্ধে তাহার এই অকস্মাৎ অবস্থাসঙ্কট, সমস্ত
একত্র মিশ্রিত হইয়া বিনয়কে বাক্যহীন কবিয়া দিয়াছিল।

পূর্বে হইলে ললিতার এই দুঃসাহসিকতায় বিনয়ের মনে
তিবন্ধারের ভাব উদয় হইত—আজ তাহা কোনো মতেই
হইল না। এমন কি, তাহার মনে যে বিশ্বয়ের উদয়
হইয়াছিল তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ছিল—ইহাতে আরো
একটি আনন্দ এই ছিল তাহাদেব সমস্ত দলেব মধ্যে গোবাব
অপমানের সামান্য প্রতিকারচেষ্টা কেবল বিনয় এবং
ললিতাই করিয়াছে। এজন্ত বিনয়কে বিশেষ কিছু দুঃখ
পাইতে হইবে না, কিন্তু ললিতাকে নিজের কর্মফলে অনেক
দিন ধরিয়া বিস্তর পীড়া ভোগ করিতে হইবে। অথচ এই
ললিতাকে বিনয় ববাবব গোবাব বিরুদ্ধ বলিয়াই জানিত।
যতই ভাবিতে লাগিল ততই ললিতার এই পরিণাম-বিচার-
হীন সাহসে এবং অজ্ঞায়েব প্রতি একান্ত ঘৃণায় তাহাব প্রতি
বিনয়ের ভক্তি জ্বলিতে লাগিল। কেমন কবিয়া কি বলিয়া
যে সে এই ভক্তি প্রকাশ করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।
বিনয় বাববাব ভাবিতে লাগিল ললিতা যে তাহাকে এত পব-
মুখাপেক্ষী সাহসহীন বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছে সে ঘৃণা
যথার্থ। সে ত সমস্ত আত্মীয় বন্ধুব নিন্দা প্রশংসা সবলে
উপেক্ষা করিয়া এমন কবিয়া কোনো বিষয়েই সাহসিক
আচরণেব দ্বাৰা নিজের মত প্রকাশ কবিতে পাবিত না

সে যে অনেক সময়েই গোরাকে কষ্ট দিবার ভয়ে অথবা পাছে গোরা তাহাকে ছর্সল মনে করে এই আশঙ্কায় নিজের স্বভাবের অনুসরণ করে নাই—অনেক সময় সূক্ষ্ম যুক্তিভ্রাম বিস্তার করিয়া গোরার মতকে নিজের মত বলিয়াই নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে আজ তাহা মনে মনে স্বীকার করিয়া ললিতাকে স্বাধীন বুদ্ধিশক্তিগুণে নিজের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিল। ললিতাকে সে যে পূর্বে অনেকবার মনে মনে নিন্দা করিয়াছে সে কথা স্মরণ করিয়া তাহার লজ্জা বোধ হইল—এমন কি, ললিতার কাছে তাহার ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা করিল—কিন্তু কেমন করিয়া ক্ষমা চাহিবে ভাবিয়া পাইল না। ললিতার কমনীয় জীমূর্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে, নারীর এই অপূর্ণ পরিচয়ে বিনয় নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল। সে নিজের সমস্ত অহঙ্কার সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্য্যমণ্ডিত শক্তিব কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।

চক্ষু পদার্থটা কি ?

(দ্বিতীয় ক্ষেপ ।)

“চক্ষু পদার্থটা কি” এই এক মৃগতৃক্ষিকা’র পশ্চাতে ধাবমান হইয়া আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয়’টিকে হাবাইয়া বসিয়া ছিলাম বলিলেই হয়—চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়া মারপথে থামিয়া দাঁড়াইয়া শেষে দেখিলাম—কি আশ্চর্য্য—সারারাজ্য ঘুঁটিয়া কোথাও যাহাকে আমরা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, তাহা চৌপহর দিন আমাদের সম্মুখে বিরাজমান ! তাহা আব কিছু না—আলোক ! আলোক সর্বজীবের চক্ষু !

যাহা সর্বজীবের চক্ষু, তাহা কি প্রত্যেক জীবের চক্ষু নহে ? অবশ্যই তাহা প্রত্যেক জীবের চক্ষু ; কিন্তু তথাপি—কিন্ভাবেই বা তাহা সর্বজীবের চক্ষু, আর, কি ভাবেই বা তাহা বিশেষ-বিশেষ জীবের বিশেষ-বিশেষ চক্ষু, তাহা বিধিমত প্রকারে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা কর্তব্য ; তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

৥১৥ আলোক যে সময়ে আমাদের চক্ষে পড়ে, স্তে সময়ে আমরা তাহাকে দেখিতো বটেই—না দেখিলে সে আমা-

দিগকে ছাড়ে কই ? কিন্তু শুধুই কি কেবল দেখি ? স্পর্শ কি করি না ? আলোক দর্শকের চক্ষে পড়িলে, অথবা যাহা একই কথা, দর্শকের চক্ষুরিন্দ্রিয়ে আলোকের সংস্পর্শ ঘটিলে, তবে তো দর্শক আলোককে দেখে ; তাহার পূর্বে তো আর না ? তবেই হইতেছে যে, আগে আলোকের স্পর্শ ; পরে আলোকের দর্শন।

৥২৥ তোমাব কথাব ভাবে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, আলোকেব দর্শন এবং স্পর্শ দুইই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার। কথাটা ঠিক যে, আলোক’কে দেখি-ও আমরা চক্ষে, স্পর্শ কবি-ও আমরা চক্ষে ; পরন্তু চক্ষুগোলকের কোন স্থানটাই বা দর্শনক্ষেত্র, কোন স্থানটাই বা স্পর্শক্ষেত্র, সেইটাই হ’চে জিজ্ঞাস্য।*

৥১৥ আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি বলি এই যে, চক্ষুগোলকের বহিরাকাশ আলোকেব দর্শনক্ষেত্র, আর চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ আলোকের স্পর্শক্ষেত্র।

৥২৥ সে আবার কি ? অন্তরাকাশ বহিরাকাশ আবার কি ?

৥১৥ তা’ আর জান’না ? বল দেখি—ঐযে একবাটি গরম হুধ তোমাব সম্মুখে ধুমায়মান, উহা ঐ বাটি’টার অন্তরাকাশে অবকচ্ছ, না বহিরাকাশে পবিব্যাপ্ত ? আবার, ছুদেব উপর দিয়া ঐযে উষ্ণ বাষ্প উঠিতেছে, উহা বাটি’টার অন্তরাকাশে চাপা থাকিতেছে, না বহিরাকাশে গা ঢালিয়া দিতেছে ?

৥২৥ আব বলিতে হইবে না—বুঝিয়াছি ! ঐ বাটি’টার ভিতরপ্রদেশ যাহা ছুদে ভরা রহিয়াছে, তাহাই উহার অন্তরাকাশ, আব, উহার বাহিরের মুক্ত প্রদেশ যাহা বাষ্পে আক্রান্ত হইতেছে, তাহাই উহার বহিরাকাশ ; এই না তোমার অস্তিত্ত্রায় ?

৥২৥ ঠিকই বুঝিয়াছ ! এটাও তেমি বুঝিয়া দেখা চাই যে, ঐ বাটি’টাব অ্যাক্লা’ব কেবল না, পরন্তু সকল বস্তুবই

* চক্ষুগোলক ডাহা সংস্কৃত ; তাই উহার রেক ইঁটিয়া উহাকে শোভন বাঙলা করিয়া লওয়া হইল। কলে, দেশী ভাষা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) ডাহা সংস্কৃত, (২) ভাঙা সংস্কৃত, (৩) ডাহা বাঙলা। ইহার নমুনা :—

(১) ডাহা সংস্কৃত—গুবাক ;

(২) ভাঙা সংস্কৃত—গুবা ;

(৩) ডাহা বাঙলা—গুবারি।

অস্তরাকাশ বহিরাকাশ আছে ; তা'র সাক্ষী—নাসিকার অস্তরাকাশে নিশ্বাস * প্রবেশ করে, বহিরাকাশে প্রশ্বাস বিনির্গত হয় ; সমুদ্রের বহিরাকাশে ঝড় উঠিলে, তাহার অস্তরাকাশে তরঙ্গ ওঠে ; জলপূর্ণ কলসের অস্তরাকাশে জল, বহিরাকাশে বায়ু ; শূন্য কলসের অস্তরাকাশেও যেমন, বহিরাকাশেও তেয়ি, উভয়স্থানেই বায়ু ; ইত্যাদি । অস্তরাকাশ বহিরাকাশ কাহাকে বলে, তাহা দেখিলে তো ? এখন তোমাকে দেখিতে বলিতেছি এই যে, (১) চক্ষুগোলকের বহিরাকাশ আলোকের দর্শনক্ষেত্র ; (২) চক্ষুগোলকের অস্তরাকাশ আলোকের স্পর্শক্ষেত্র ।

৥২॥ তুমি যাহা আমাকে গিলাইতে চাহিতেছ, তাহার প্রথমার্দ্ধটি বেস্ আমার গলাধঃকরণ হইয়াছে ; দ্বিতীয়ার্দ্ধটি কিন্তু গলায় নাবিতেছে না । বলিতে কি—চক্ষুগোলকের বহিরাকাশে আলোকের রূপ যেমন আমি দর্শন করি, চক্ষুগোলকের অস্তরাকাশে আলোকের স্পর্শ তেমন অল্পভব করি না ; অল্পভবই যখন কবি না, তখন, তোমার মনোরক্ষার্থে আমি না হয় মুখে বলিলাম যে, চক্ষুগোলকের অস্তরাকাশ আলোকের স্পর্শক্ষেত্র ; কিন্তু আমার মন তাহা শুনিবে কেন ? মন আমার বাকিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে প্রত্যুত্তর শুনাইয়া দিবে এইরূপ যে, “স্পর্শাল্পভব-বর্জিত স্পর্শক্ষেত্র, আর, শিরো-নাস্তি শিরঃপীড়া, এহুয়ের মধ্যে প্রভেদ তো আমি কিছুই দেখিতে পাই না !”

৥১॥ গতবাত্রে তোমায় আমার একসঙ্গে নাট্যশালা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়, যখন, অন্ধকারাবৃত গলি-ঘুচির পিছল মাটিতে অতীব সন্তর্পণের সহিত ধীবে ধীরে পদ-নিষ্ক্ষেপ করিতেছিলাম, আর, সেই সময়ে যখন সেই হৃতভাগা পুলিশের চৌকিদার'টা হঠাৎ তোমার চক্ষুতে বুঝা ল্যাপ্তানের আলোকচ্ছটা নিষ্ক্ষেপ করিল, তখন তুমি চমকিয়া উঠিয়া পা পিছলিয়া কাদায় পড়িয়া চিত্রবিচিত্রিত

হইয়াছিল কেন—সেই কথাটি আগে আমাকে বল', তাহার পবে আমি তোমার কথা'র উত্তর দিব ।

৥২॥ বলিব কি—আমার চক্ষুর মর্দনস্থানটিতে, সেই প্রথর রশ্মির সংস্পর্শ—বোধ হইয়াছিল তখন—ঠিক্ যেন চাবুকের আঘাত ।

৥১॥ তা' তো বোধ হইবেই ! যিনি হাসিতে হাসিতে বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নখাগ্রে কবিতা গোবর্দ্ধন পর্বত উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অমানুষিক নখেব আগায় গোবর্দ্ধন পর্বতের স্পর্শ অল্পভূত হইয়াছিল কি না, এ বিষয়ে বারো মূনির বারো মত হইতে পারে, পরন্তু গত রাত্রে এটা যখন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, বুঝা-দীপালোকের পীড়নে তোমাব চক্ষুয়ুগলে কেবল জল বাহির হইতে বাকি ছিল, তখন, সেই মুখ্য সময়টিতে তোমার চক্ষুগোলকের অস্তরাকাশে আলোকের স্পর্শ যে, বিলক্ষণই অল্পভূত হইয়াছিল, এ বিষয়ে তোমার আমার মধ্যে মতান্তর ঘটনা মনান্তরে পরিণত হইবার বিশেষ কোনো কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না ।

৥২॥ একব্যক্তি যদি অন্ধকার রাত্রে রুমালের পুঁটুলির মধ্যে করিয়া গোটা-দুই-তিন জোনাক পোকা ধরিয়া আনিয়া আর এক ব্যক্তিকে বলে “এই দেখ—অগ্নি নিস্তেজ পদার্থ”, আর, দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তৎক্ষণাৎ দিএসলাই জ্বালাইয়া সেই রুমাল'টার আগুন ধরাইয়া দিয়া বলে “এই দেখ—অগ্নি সতেজ পদার্থ”, তবে কাহার কথা সত্য ? প্রথম ব্যক্তিব কথা, না দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা ? জোনাক পোকায় দৃষ্টান্তে প্রমাণ হয় কেবল এই যে, কোনো কোনো স্থলে অগ্নি-নিস্তেজ পদার্থ ; তেয়ি, গতবাত্রেব বিশেষ ঘটনাটির দৃষ্টান্তে প্রমাণ হয় কেবল এই যে, কোনো কোনো স্থলে দ্রষ্টাব চক্ষুগোলকে আলোকের স্পর্শ অল্পভূত হয় ; তা' বই, এরূপ প্রমাণ হয় না যে, সর্বসাধারণত চক্ষুগোলক আলোকের স্পর্শক্ষেত্র । এখনো তো আমার চক্ষে যথেষ্ট আলোক নিপতিত হইতেছে ; তাহাতে আবার, এ আলোক যেমন-তেমন আলোক না—এ আলোক' মধ্যাহ্ন দিবালোক । এখন তবে আলোকের স্পর্শ আমার চক্ষুগোলকে অল্পভূত না হইবার কারণ কি ?

৥১॥ বছর দুয়েক পূর্বে তুমি যখন ব্যায়াম অভ্যাস

* এখানে নি (=in) + শ্বাস = নিশ্বাস । নিশ্বাস কিনা অন্তর্মুখী শ্বাস । এখানকার নিশ্বাসের প্রতিপক্ষ প্র (=pro) + শ্বাস অর্থাৎ প্রশ্বাস । যেমন নিশ্বাস = অন্তর্মুখী শ্বাস, প্রশ্বাস = বহির্মুখী শ্বাস । পক্ষান্তরে, “প্রজার নিঃশ্বাসনলে রাজ্য বদ্ধ হইতেছে” এরূপ স্থলে নিঃশ্বাস = নিঃ (=ex) + শ্বাস অর্থাৎ বহিঃশ্বাস ; এ নিঃশ্বাসের প্রতিপক্ষ বিসর্গ-বিহীন নি + শ্বাস । “নি + শ্বাস” এ নিশ্বাস নিঃশ্বাসেরও যেমন, প্রশ্বাসেরও তেয়ি, দুয়েরই প্রতিপক্ষ ।

করিতে, তখন আমার বেস্ মনে পড়ে—একদিন তুমি আমাকে তোমার কোম্পাণ্ডা হাতের তেলো দেখাইয়া কাতর স্ববে বলিলে “স্বধর্ম্মে নিধনঃশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ”—পরধর্ম্ম অল্পুঠানের ফল এই দেখ হাতে হাতে ! যাহারা প্রত্যহ ছুইসন্ধ্যা ঘোড়া’র ধোরাক চিবাইয়া পরিপাক কবে বিনা বাক্যব্যয়ে, তাহাদের লোহার শরীরে সবই সয় ; কিন্তু ভাই, বলিতে কি, তোমার আমার মতো লোকের যতদুঃখ-মৎস্তের শরীর মুণ্ডরের কঠিন স্পর্শে বড়ই নারাজ ।” এখন কিন্তু তুমি তাহা বল’না । আজকাল তুমি যে সময় মুণ্ডর ভাঁজো, সে সময় মুণ্ডরের পরিভ্রামণ ব্যাপারটির প্রতি তোমার মন এম্মি ভবপূর নিবিষ্ট থাকে যে, তাহার কঠিন স্পর্শ তোমার হস্তস্বকের গ্রাহের মধ্যেই আসে না । এখন যেমন তোমার পাকা হাতের অধিকারক্ষেত্রে মৃদুগর পরিভ্রামণের কর্ম্মোত্তম মুণ্ডরের স্পর্শাভূতবকে গ্রাস করিয়া ফালে, দর্শকের তেম্মি সুপবিস্কুট চক্ষুর দৃষ্টিক্ষেত্রে আলোকের রূপ-দর্শন উহার স্পর্শাভূতব’কে গ্রাস করিয়া ফালে । ফেলুক না গ্রাস করিয়া—তাহাতে কাহার কি ক্ষতি ? স্পর্শাভূতব যায় না তো কোথাও ! রূপ-দর্শনের উদবের মধ্যে দিব্য সে লুকাইয়া থাকে নিরাপদে—রাহগ্রস্ত সুধাকর যেমন রাহব বদন-সদনে ।

২২॥ লুকাইয়াই যদি থাকে, তবে তো তাহা দর্শকের চক্ষে ধরা না পড়িবারই কথা । মুখে তুমিও বলিতেছ, আব কাণে আমিও শুনিতেছি যে, আলোকের স্পর্শাভূতব রূপদর্শনের উদরের মধ্যে লুকাইয়া আছে ; চক্ষে কিন্তু তুমিও তাহা দেখিতেছ না—আমিও তাহা দেখিতেছি না ; এরূপ অবস্থায় তাহা যে সত্যসত্যই ঐ স্থানটিতে লুকাইয়া আছে তাহা তুমিই বা কিরূপে জানিলে, আমিই বা কিরূপে জানিব ? তাহার নিতান্তই প্রমাণাভাব ।

২১॥ স্থূল বস্তুব স্পর্শাভূতবও যেমন—আলোকের স্পর্শাভূতবও তেম্মি—ছুইই ফলেন পরিচীয়তে । তার সাক্ষী :—এটা যেমন একটা দেখা কথা যে, একতরো অঙ্গুলি-স্পর্শে পায়ে ঝড়ঝড়ি লাগে, আরেকতরো অঙ্গুলি-স্পর্শে গায়ে কাঁতুকুতু লাগে, আবার, তৃতীয় আরেকতরো অঙ্গুলি-স্পর্শে পাঁজরে ধোঁচা লাগে ; এটাও তেম্মি একটা দেখা কথা যে, জ্বাফুলের মুখালোকের স্পর্শ চক্ষুতে লাল

ঠাকে, বেলফুলের মুখালোকের স্পর্শ চক্ষুতে সাদা ঠাকে, সরিষাফুলের মুখালোকের স্পর্শ চক্ষুতে হোলদে ঠাকে । এইরূপ তরো-বেতরো ফলের উৎপত্তিই তরো-বেতরো স্পর্শাভূতবের প্রমাণ । আমাদের বাল্যকালের সেই রাগী পণ্ডিতকে তোমার মনে পড়ে ? তোমার তো মনে পড়িবেই, যেহেতু তুমি তাঁহার নাম রাখিয়াছিলে অগ্নি শর্ম্মা । তাঁহার আশীর্ব্বাদে—চপেটাঘাতের ফল যে কিরূপ মর্ম্মাস্তিক ব্যাধাভূতব, আর, সে যে ব্যাধাভূতব আহত কপোলের স্পর্শক্ষেত্রেই ব্যাপ্তি লাভ করে, এ তত্ত্বটির নিগূঢ় রহস্য তুমি যেমন জান’ এমন আর কেহই না ; কেননা তুমিই ব্রাহ্মণটিকে বাগাইবার প্রধান অধিনায়ক ছিলে । এটাও তেম্মি তোমার জানা উচিত যে, জ্বাফুলের মুখালোকের করাঘাতে (কিনা রশ্মি আঘাতে) দর্শকের চক্ষুতে রক্ত বর্ণের অল্পুভব যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা আহত চক্ষু-গোলকের স্পর্শক্ষেত্রেই ব্যাপ্তি লাভ করে—অন্তত্বে কোথাও না ; অথবা, যাহা একই কথা—চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশেই ব্যাপ্তি লাভ করে—বহিরাকাশে না । তবে যে কেন জ্বাফুলের লাল রঙ চক্ষুগোলকের বহিরাকাশে ভাসমান হয়, তাহার কারণ অগ্ৰতম । ব্যাপারটা তবে তোমাকে আত্মোপাস্ত খোলাসা কবিয়া ভাঙিয়া বলি, প্রণিধান কর :—

শুভাদৃষ্ট বশত স্মৃচিকিৎসকের হস্তে পড়িয়া কচিং-কদাচিং কোনো জন্মাক্ষ ব্যক্তি যখন সহসা চক্ষু লাভ করে, তখন প্রথম প্রথম তাহার মনে হয়—যেন তাহার চক্ষু-গোলকের অন্তরাকাশ একখানি স্বচ্ছ কাচ-ফলক, আর, সম্মুখস্থিত দৃশ্যরাজি সেই কাচ-ফলকের গায়ে যেন ছবি আঁকা । মনে কর ঐরূপ একজন নূতন দর্শন-ব্রতী একটা গোচারণের মাঠ ভাদ্রিয়া গঙ্গান্নানে যাইতেছে । এরূপ অবস্থায় দর্শক তাহার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-ব্যাপী কাল্পনিক কাচ ফলকটার শিরঃস্থানে দেখিবে—গঙ্গাব ওপারের শ্রামল তটচ্ছবি ; তাহার একপংক্তি নীচে দেখিবে—গঙ্গার জলচ্ছবি ; আর এক পংক্তি নীচে দেখিবে—গঙ্গার এপারের বালুকা-ময় তটচ্ছবি ; তাহার নীচের পংক্তিতে দেখিবে—ভৃগাস্তৃত মাঠের ছবি ; আব যদি দর্শক গ্রীবা নতু করিয়া আপনার শরীর-পানে ঠাহরিয়া

দেখে, তবে সর্বনীচে (মাঠের ছবিরও নীচে) দেখিবে—
আপনার তৈলাক্ত বক্ষকপাটের দৃষ্টি। তাহার পরে,
গঙ্গার দিকে যতই সে পদব্রজে অগ্রসর হইতে থাকিবে—
দেখিবে যে, ততই গঙ্গার জলচ্ছবি উত্তরোত্তর ক্রমশই
চওড়ায় বাড়িতে থাকিয়া তাহার বক্ষচ্ছবির কাছবাগে
নাবিয়া আসিতেছে। এইরূপ ক্রমশ উপর হইতে নীচে
নাবিয়া-আসাগতিক গঙ্গার এপাবের কিনা বা যখন দর্শকের
বক্ষচ্ছবির নীচে চাপা পড়িয়া যাইবে, তখন দর্শকের
পদতল গঙ্গাজলের সংস্পর্শ লাভ করিবে। নূতন দর্শনব্রতী
মাস তিনেক ধবিয়া প্রতিদিন এইরূপ গঙ্গাস্নানে যাওয়া-
আসা করিলেই সর্কদা-কাজে-লাগিবার-মতো কতকগুলি
নূতন সংস্কার তাহার মনের মধ্যে জন্মের মত বদ্ধমূল হইয়া
যাইবে। তাহার মধ্যে যে দুইটি সংস্কার সর্বপ্রধান সেই
দুইটি এই :—

(১) চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-স্থিত আতপচ্ছবি ক্রমশ
আয়তনে ছোটো হইয়া-হইয়া নীচে হইতে উপরে প্রসারিত
হওয়ার নামই—বহিরাকাশস্থিত দৃষ্টরাজি দর্শকের সরিধান
হইতে উত্তরোত্তর দূরে দূরে স্থিতি করা।

(২) চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশস্থিত আতপচ্ছবি ক্রমশ
লম্বায় চওড়ায় বড় হইয়া-হইয়া উপর হইতে নীচে নাবিয়া
আসিতে থাকার নামই—বহিরাকাশস্থিত দৃষ্টরাজি দূর
হইতে ক্রমশ দর্শকের নিকটবাগে সরিয়া আসিতে থাকা,
আর, তাহারই নাম—প্রায়গস্থান হইতে দর্শকের উত্তরোত্তর-
ক্রমে দূরে দূরে অগ্রসর হইতে থাকা।

ঐরা মাত্রেরই ঐরূপ কতকগুলি কচি-বয়সের পরীক্ষা-
লব্ধ সংস্কার আলোকের স্পর্শামুভবমূলক বর্ণাদিবোধের
সহিত একত্র জমাটবদ্ধ হইয়া চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশস্থিত
আলোকের স্পর্শক্ষেত্রে বহিরাকাশস্থিত দর্শনক্ষেত্র করিয়া
গড়িয়া তোলে।

৥২৥ এ যাহা তুমি বলিলে, তাহার মধ্যে'কার মোট
কথাটা আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই যে,
চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশব্যাপী আলোকের স্পর্শামুভবমূলক
বর্ণাদিবোধই রূপদর্শনবেশে বহিরাকাশে সাজিয়া বাহির
হয়। তা' যেন হইল—এখন জিজ্ঞাস্য আমার এই যে,
ঐরূপে বহিরাকাশে সাজিয়া বাহির হইবার পূর্বে আলো-

কের স্পর্শামুভব যখন চক্ষুগোলকের সাক্ষরবে (অর্থাৎ
অন্তরাকাশে—স্পর্শক্ষেত্রে) বেশ বিস্তারিত করিতে থাকে,
তখন শুধুই কি তাহা বর্ণাদিবোধ—রূপদর্শন মূলেই না ?

৥১৥ তাহা আমি বলি না। একথাও আমি বলি না
যে, ব্যাঙাটী মূলেই ব্যাঙ নহে, আর, একথাও আমি বলি
না যে, চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশব্যাপী বর্ণাদি-বোধ মূলেই
রূপদর্শন নহে। উল্টা বরং আমি বলি এই যে, ব্যাঙাটি=
হবু ব্যাঙ (অর্থাৎ potential ব্যাঙ); বর্ণাদি-বোধ=
হবু-রূপদর্শন। ব্যাঙাটী জলে কিল্ বিল্করিতেছে দেখিলে
একটি সপ্তমবর্ষীয় বালকের এরূপ মনেই হইতে পারে না
যে, ঐ লাঙ্গুল-সর্বস্ব জলকীট-গুণার জন্ম চারিপেয়ে জীবের
বংশে; আবার আর-কিছুদিন পরে বালকটি যদি উহাদের
কাহাকেও পাকে ল্যাজ গাড়িয়া পড়িয়া থাকিতে
দেখে, তবে নিশ্চয়ই সে মনে ভাবিবে যে উহা একপ্রকার
ভিজ্জে টিক্‌টিকি। আর একদিকে তেমনি আবার, একটা
সপ্তাহজ্বরের বিড়াল-ছানা'ব অক্ষুট চক্ষুগোলকে যখন
আলোক ডুব-সাঁতার খ্যালে, তখন আলোকের সেই বে
স্পর্শামুভব, সে-যে স্পর্শামুভব রূপ-দর্শনেরই পূর্বাভাস,
এ তত্বটি সহসা বুঝিতে পারা স্মকঠিন। যাহাই হোক না
কেন—এটা তো তোমার জানিতে বাকি নাই যে, এই
বেরাল বনে গেলেই বন-বেরাল হয় ? এটাও তেমনি তোমার
জানা উচিত যে, চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-ব্যাপী বর্ণাদি-
বোধ বহিরাকাশে প্রসারিত হইলেই রূপ-দর্শন হইয়া
ওঠে।

৥২৥ বহিরাকাশে প্রসারিত হয়—তাহা তো বুঝিলাম;
কিন্তু, কেমন করিয়া তাহা বহিরাকাশে প্রসারিত হয়—
বহিরাকাশে প্রসারিত হওনের প্রকরণ-পদ্ধতি কিরূপ—
সেইটিই হ'ছে জিজ্ঞাস্য; তাহার তুমি কি-উত্তর দ্যাও ?

৥১৥ পূর্বোন্নিখিত দৃষ্টান্তের নূতন দর্শনব্রতী যখন
পদব্রজে গঙ্গাস্নানে যাইতেছে, তখন, এ তো দেখিতেই
পাওয়া যাইতেছে যে, একদিকে যেমন দৃষ্ট আলোকের
ক্রিয়া চলিতেছে চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে, আর-এক-
দিকে তেমনি, দর্শকের পা চলিতেছে চক্ষুগোলকের বহিরা-
কাশে। এটাও তেমনি দেখা চাই যে, অন্তরাকাশে
আলোকের ঐয়ে ক্রিয়া চলিতেছে, উহা চক্ষুরিস্রিয়েব

একপ্রকার অন্তঃস্বর্গ, আর, তাহার ফল—বর্ণাদি-বোধ ; যেমন ঔজ্জ্বল্য-বোধ, শুভ্রতা-বোধ, রক্তিমতা-বোধ ইত্যাদি। আবার বহিরাকাশে দর্শকের ঐষে পা চলিতেছে, উহা একপ্রকার কৰ্ম্মোজ্জ্বলের বহিঃস্বর্গ, আর, তাহার ফল—বহিরাকাশস্থিত দৃশ্যবস্তুতে বর্ণাদি-বোধের উপসংক্রান্তি অর্থাৎ চালান। সেতার-বাজিএ যখন সাবে গান্না বাজাই-তেছে, তখন আপন অঙ্গুলি-তাড়না'র বহিঃস্বর্গ'ব কথায়-ভুলিয়া এইরূপ সে মনে কবে যে, তাহার হস্তেব বহিরাকাশ-স্থিত সেতারের তার সারেগামা বলিতেছে ; কিন্তু সত্য এই যে, সেতার-বাজিএ'র কর্ণকূহরের অন্তরাকাশ ব্যাপী বায়ু'ব তবল-তাড়না সারেগামা বলিতেছে। উদ্ভানপতি, তেমি, একটি প্রস্তুতিত রক্তবর্ণ গোলাপফুলেব অভিমুখে পদব্রজে অগ্রসর হইবার সময়, পায়ে-হাঁটার বহিঃস্বর্গ'র কথায়-ভুলিয়া মনে করেন যে, বহিরাকাশস্থিত গোলাপ-ফুলটি'র গায়ে রক্তিমবর্ণের ছাপ লাগানো রহিয়াছে ; কিন্তু সত্য এই যে, ঐ বর্ণের ছাপ লাগানো বহিয়াছে—বহিরাকাশে কোথাও না পরন্তু—দর্শকের আপনারই চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে। উদ্ভানপতি প্রথমে গোলাপ-ফুলেব রক্তিম মুখালোকের স্পর্শ অনুভব করেন ঐস্থান-টিতেই অর্থাৎ আপন চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে ; তাত্ক্ষণ পরে যথাক্রমে পায়ে-হাঁটয়া এবং হাত বাড়াইয়া গোলাপ-ফুলের দল-সংঘাতের স্পর্শ অনুভব করেন আপনার হস্তত্বকে। উদ্ভানপতি তিনটি বিষয় তিনক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অনুভব করেন :—

(১) গোলাপ-ফুলেব রক্তিম মুখালোকেব স্পর্শ অনুভব করেন চক্ষুগোলকেব অন্তরাকাশে।

(২) দলসংঘাতের স্পর্শ অনুভব করেন—চক্ষুগোলকের বহিরাকাশস্থিত হস্তত্বকে।

(৩) পায়ে হাঁটা এবং হাত বাড়ানো'র বহিঃস্বর্গ'র অনুভব করেন—চক্ষুগোলকের বহিরাকাশস্থিত হস্তপদের মাংসপেশীতে।

স্পষ্টই তো এই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দর্শকের দেহক্ষেত্রেব এ মুড়ায়—অর্থাৎ চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে—গোলাপ-ফুলের রক্তিমবর্ণ অনুভূত হয় ; ও-মুড়ায়—অর্থাৎ চক্ষুগোলকের বহিরাকাশস্থিত হস্তত্বকে—

দল-সংঘাতের কোমল স্পর্শ অনুভূত হয় ; এবং দুই মুড়ার মাঝের জায়গা'টিতে—অর্থাৎ হস্তপদের মাংসপেশীতে—কৰ্ম্মোজ্জ্বলের বহিঃস্বর্গ'র অনুভূত হয়। ইহাব একটা উপমা দেখাইতেছি—প্রাণধান কর :—এটা যেমন তুমি দেখিয়াছ যে, বৃক্ষের শিকড়-জাল ব্যাপ্তি-লাভ করে ভূত্বকের অন্তরাকাশে, এবং শাখা প্রশাখা ব্যাপ্তি লাভ করে ভূত্বকের বহিরাকাশে ; এটাও তেমি দেখা চাই যে, গোলাপ-ফুলের মুখরশ্মিব রক্তিমতা-বোধ ব্যাপ্তি লাভ করে দর্শকের চক্ষু-গোলকেব অন্তরাকাশে, এবং দলসংঘাতের কোমল স্পর্শানুভব ব্যাপ্তি লাভ করে চক্ষুগোলকের বহিরাকাশে হস্ত ত্বকে। ছয়ের মধ্যে (অর্থাৎ উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে) সৌসাদৃশ্য এইরূপ :—শিকড়ের বিস্তার যেমন ভূত্বকের অন্তরাকাশের ব্যাপার, আলোকের স্পর্শানুভবমূলক বর্ণবোধ তেমি চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশের ব্যাপার ; শাখার বিস্তার যেমন ভূত্বকের বহিরাকাশের ব্যাপার, দল-সংঘাতের স্পর্শ-অনুভব তেমি চক্ষুগোলকের বহিরাকাশের ব্যাপার ; আর, অনুভবদগম যেমন বৃক্ষেব ঐ দুইমুড়ার দুই ব্যাপারের মধ্যবর্তী সোপান, কৰ্ম্মোজ্জ্বলের স্বর্গ-অনুভব তেমি চক্ষু-রিজিমেব ঐ দুইমুড়ার দুই ব্যাপারের মধ্যবর্তী সোপান। তবেই হইতেছে যে, পায়ে-হাঁটা হাত-বাড়ানো প্রভৃতি কৰ্ম্মোজ্জ্বলের স্বর্গ-অনুভবেব মধ্য-দিয়াই চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-ব্যাপী বর্ণবোধ বহিরাকাশে প্রসারিত হয় ; আর, তাহার ফল হয়—রূপ-দর্শন। প্রকৃত কথা এই যে, জ্বলেব ব্যাঙাটী এবং ডাঙাব ব্যাঙের মাঝের জায়গা'টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যেমন-তরো, চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-ব্যাপী বর্ণবোধ এবং বহিরাকাশ-পরায়ণ রূপ-দর্শনের মাঝের জায়গা'টিতে তেমি-তবো একটা ক্রমবিকাশের সোপান এমুড়া হইতে ও-মুড়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নে প্রসারিত রহিয়াছে, তাহাতে আব ভুল নাই। এখন দেখিতে হইবে এই যে, কৰ্ম্মোজ্জ্বলের অভ্যাস-বলে সেই ক্রমবিকাশের সিঁড়ি ভাঙিয়া চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ-ব্যাপী বর্ণবোধ বহিরাকাশে রূপ-দর্শন-বেশে সাজিয়া বাহির হয়।

২২। “ক্রমবিকাশ” যে বলিতেছে—কিসেব ক্রমবিকাশ আলােকের না চক্ষুজিমেব ?

৥১৥ তোমার কথা বার্তাব ভাবে আমার এইরূপ মনে হইতেছে যে, পৃথিবীস্থ জীবজন্তুদিগের চক্ষুরক্ষীপনের গোড়া'র বৃত্তান্তটা'ব তুমি বড় একটা খোঁজ খবর রাখ'না। বিজ্ঞানের মুখে তুমি যদি সেই গোড়া'র বৃত্তান্তটি শুনিতে, তাহা হইলে স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিতে যে, জীবের চক্ষুরিঙ্গিয় আলোক হইতে স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নহে, পরন্তু তাহা আলোকের উপাদানে আপাদমস্তক পরিগঠিত— তাহা আলোক'ই। পৃথিবীমাতাব এমনও এক সময় ছিল যখন তাঁহার ক্রোড়স্থ সত্ত্বোজাত জীবদিগের চক্ষু ফোটে নাই; কিন্তু তখনও সূর্যালোক ছিল। হইতে পারে যে, তখন সূর্যালোক ঘন কুণ্ডলিকায় আবৃত ছিল, কিন্তু ছিল। সূর্যালোক ছিল কিন্তু দ্রষ্টা ছিল না। দ্রষ্টা যখন ছিল না, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, দর্শন বলিয়া যে একটা চাক্ষুষ উপলক্ষিব ব্যাপার, সে সময়ে পৃথিবীতে তাহাব নাম গন্ধও ছিল না। দর্শনক্রিয়া যখন ছিল না, তখন, ইহা বলা বাহুল্য যে, সূর্যালোক থাকা সত্ত্বেও সূর্যালোকের প্রকাশ ছিল না, কেননা আলোকের অদর্শনের নামই আলোকের অপ্রকাশ। সূর্যালোকের প্রকাশই না-হয় না-ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া সেই আদিম সময়ে সূর্যালোক কি আপনার কর্তব্য কার্যে একমুহূর্ত্তও বিবত ছিল? কখনই না! তখনকার সেই অপ্রকাশের অবস্থাতেও সূর্যালোকের কল্যাণ-হস্ত পৃথিবী-মাতা'র নবপ্রসূত অপ্রাপ্তচক্ষু জীবদিগের মস্তকের উপরে স্থাপিত ছিল—

এখনকারই মতো এইরূপ কার্যকর ভাবে। আদিমকালে যে-সূর্যালোক অপ্রকাশ ছিল, অধুনাতন কালে সেই সূর্যালোকই সুপ্রকাশ। তবেই হইতেছে যে, যুগযুগান্তর-ব্যাপী ক্রমবিকাশের সোপান-পরম্পরা'র মধ্য দিয়াই সূর্যালোক অপ্রকাশ হইতে সুপ্রকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। মাকড়সা যেমন আপনারই দৈহিক উপাদান হইতে আগ্নেই জ্বাল নির্মাণ করিয়া সেই জ্বালের উপর দিয়া যাতায়াত করে, আদিম কালের অদৃশ্য সূর্যালোক তেমনি আপনারই অপ্রকাশের ভাণ্ডার হইতে জীবশরীরে আপনার প্রকাশোপযোগী দর্পণ ক্রমে ক্রমে নির্মাণ-কল্পিয়া-তুলিয়া এক্ষণে সেই সকল অনির্নিত দর্পণে পলকে পলকে এবং অহোরাত্রে প্রকাশপ্রকাশ হইতেছে।

সত্ত্বোজাত শিশুর চক্ষুগোলকের স্পর্শক্ষেত্রে আলোক প্রথমে ডুব-সাঁতার খালে; তাহার পবে শিশুটি'র বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাবানুযায়ী পারে-হাঁটা এবং হাত-বাড়ানো প্রভৃতি কৰ্ম্মোচ্চমের মধ্যদিয়া সেই-আলোকই স্পর্শক্ষেত্রে হইতে দৃষ্টি-ক্ষেত্রে (অথবা, যাহা একই কথা— চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ হইতে বহিরাকাশে) দৃশ্য-বেশে সাক্ষিয়া বাহির হইতে থাকে। আলোকের ক্রমবিকাশ ব্যষ্টি-জীবক্ষেত্রে এ-যেমন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সমষ্টি-জীবক্ষেত্রে উহারই বিস্তারিত ডালপালা'র এক এক বারের পালা এক-এক যুগ-পরিমাণ দীর্ঘ কাল ধরিয়া অভিনীত হইতে থাকে। তাব সাক্ষী:— সূর্যালোক প্রথমে কেঁচো, জোক, কুমি প্রভৃতি নিতান্ত অধম শ্রেণীর জীবদিগের স্বগিজ্রিয়েব স্পর্শক্ষেত্রে ডুবসাঁতার খেলিত। তাহার পরে উত্তরোত্তর শ্রেণীর জীবের স্বগিজ্রিয়েব বিশেষ একটি স্থানের (যেমন লগাটের) দুই পার্শ্বে আপনার প্রকাশোপযোগী দুইটি দর্পণ ক্রমে ক্রমে ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল; তাহার পরে, পরপবর্ত্তী জীবদিগের চক্ষুগোলকে আপনার স্পর্শানুভবের মূল পত্তন করিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চোচ্চতর জীবের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে দৃশ্য-বেশে সাক্ষিয়া বাহির হইতে লাগিল। ব্যষ্টি জীবক্ষেত্রেও যেমন, সমষ্টি জীবক্ষেত্রেও তেমনি। দুই ক্ষেত্রেই "আলোকের ক্রমবিকাশের আনুপূর্বিক তিনটি সোপান-পংক্তি বা পঁইটা পরে পরে দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ:—

(১) অনাকাশের অদর্শন-সমুদ্রে নিমজ্জন:—যেমন, আদিম যুগে, তথৈব, গর্ত্তস্থ শিশুর চক্ষে।

(২) চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশের সাক্ষ্যেরে (স্পর্শ-ক্ষেত্রে) সংক্রমণ:—যেমন, মধ্যম যুগে, তথৈব, সত্ত্বোজাত শিশুর চক্ষে।

(৩) বহিরাকাশের দর্শন-ক্ষেত্রে (দৃষ্টিক্ষেত্রে) দৃশ্য বেশে সাক্ষিয়া বাহির হওন:—যেমন, বর্ত্তমান যুগে, তথৈব, বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যের চক্ষে।

এতক্ষণ ধরিয়া চাক্ষুষ আলোক-দর্শনের পৃথক পৃথক অবয়ব ভাগ ভাগ করিয়া যাহা দেখানো হইল, তাহাতে এটা বেস্ বুদ্ধিতে পারা যাইতেছে যে, চক্ষু পদার্থটা আর কিছু না—আলোক। আলোকের প্রকাশের

নামই চক্ষুৰ দৃষ্টিক্ষুণ্ণ, আলোকের অপ্ৰকাশের নামই চক্ষুর দৃষ্টিরোধ; আর চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশের স্পর্শক্ষেত্রে হইতে বহিরাকাশের দৃষ্টিক্ষেত্রে দৃষ্ট-বেশে আলোকের সাক্ষিয়া বহির হওনের নামই চক্ষুর দৃষ্টি-বিকাশ।

॥২॥ তা তো বুঝিলাম, কিন্তু গোড়া'র প্রশ্নটির-মীমাংসা হইল কই? প্রশ্নটি তোমার মনে আছে তো? জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—“আলোক কি-ভাবেই বা সর্বজীবের চক্ষু—কি-ভাবেই বা বিশেষ-বিশেষ জীবের বিশেষ-বিশেষ চক্ষু?” ইহার তুমি কী * উত্তর দাও?

॥১॥ উহার উত্তর প্রদানের বাকি আছে নাকি? “সাত কাণ্ড রামায়ণ, সীতা কা'ব ভার্য্যা!” এতক্ষণ ধরিয়া তোমাকে আমি যে কথাকাটা'র ধারাবাহিক যুক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে অন্ততঃ এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, আলোক যে-অংশে দৃষ্টিক্ষেত্রে (অর্থাৎ চক্ষুগোলকের বহিরাকাশে) প্রকাশ পায়, সেই অংশে তাহা সর্বজীবের চক্ষু; আর যে-অংশে তাহা দর্শকের চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশের স্পর্শক্ষেত্রে ছাপ লাগানো থাকে, সেই অংশে তাহা বিশেষ-বিশেষ জীবের বিশেষ-বিশেষ চক্ষু। তোমার চক্ষুগোলকের বহিরাকাশ-তো-আর আমার চক্ষুগোলকের বহিরাকাশ হইতে ভিন্ন নহে; ভিন্ন যখন নহে—এটা যখন স্থির যে, তোমার চক্ষুগোলকের বহিরাকাশ এবং আমার চক্ষুগোলকের বহিরাকাশ একই অভিন্ন বহিরাকাশ, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, আলোক যে-অংশে চক্ষুগোলকের বহিরাকাশে ভাসমান সেই অংশে তাহা তোমারও চক্ষু—আমারও চক্ষু। পক্ষান্তরে, তোমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ কিছু-আর আমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ নহে; তথৈব; আমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ কিছু-আর তোমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশ নহে; তাহা যখন নহে, তখন ইহা বলা বাহুল্য

যে, আলোক যে-অংশে আমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে ছাপ লাগানো আছে, সে অংশে তাহা কেবলমাত্র আমারই চক্ষু—অপর কাহারো না; তথৈব, যে অংশে তাহা তোমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে ছাপ লাগানো আছে, সে অংশে তাহা কেবলমাত্র তোমারই চক্ষু—অপর কাহারো না। ইহার একটি উপমা দিতেছি, তাহা হইলেই তোমার মনের ধন্দ মিটিয়া যাইবে:—

গঙ্গাজল যে-অংশে গঙ্গায় বহিতেছে, সে অংশে তাহার উপরে তোমার এবং আমার উভয়েরই স্বত্বাধিকার সমান; তেমনি, আলোক যে-অংশে বহিরাকাশে প্রকাশমান, সে অংশে তাহা তোমার এবং আমার উভয়েরই চক্ষু। পক্ষান্তরে গঙ্গাজল যে-অংশে আমার গৃহের জল-নালাতে বহিতেছে, সে অংশে তাহা যেমন আমার নিজস্ব সম্পত্তি; তেমনি, আলোক যে-অংশে আমার চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে ছাপ লাগানো আছে, সে অংশে তাহা আমারই চক্ষু, তা বই, তাহা তোমার বা অপর কাহারো চক্ষু নহে। অতএব এটা স্থির যে, চক্ষুগোলকের বহিরাকাশের দৃষ্টিক্ষেত্রে আলোকের রূপ যাহা কুটিয়া বহির হয় তাহাই সমষ্টি জীবের চক্ষু, আর, বিশেষ-বিশেষ জীবের চক্ষুগোলকের অন্তরাকাশে আলোকের বিশেষ-বিশেষ রকমের ছাপ যাহা নিপতিত হয়, তাহাই বিশেষ-বিশেষ জীবের বিশেষ বিশেষ চক্ষু।

॥২॥ চক্ষু পদার্থটা কি—এতো মোটা মুটি একরূপ বৃথিতে পাবা গেল;—আচ্ছা—দ্রষ্টা পদার্থটা কি? তাহার তুমি কোনো প্রকার সন্ধান-বার্তা বলিতে পার' কি? সেই কথাকাটা'ই হচ্ছে প্রকৃত কাজের কথা।

॥১॥ শুধু টানিয়া নৌকা চালানো বড়ই পরিশ্রমের কাজ; এই খানে এখন নোঙড় নিক্ষেপ করাই পরামর্শ-সিদ্ধ! জোয়ার আসিলে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* কিশোরের দ্ব্যর্থ দিবারণের একটা তো উপায় করা চাই। তাহার সহজ উপায় এই:—

প্রশ্ন। কুখা মান্য হইলে কি আহার করা কর্তব্য?

উত্তর। কোনো ক্রমেই না।

প্রশ্ন। কুখা মান্য হইলে কী আহার করা কর্তব্য?

উত্তর। লবু পখা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ।

(জি-দে-লাফৌর ফরাসী হইতে)

শত বৎসর পূর্বে, আমাদের যুগের পূর্ববর্তী প্রাচ্য ভূভাগের পরিচয় যাহা কিছু আমরা পাইয়াছিলাম, তাহা গ্রীক ও ল্যাটিন ইতিহাসের খণ্ডাংশ হইতে এবং কতকগুলি দেশ পর্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে। প্রমাণের মধ্যে তখন একটি ধর্মগ্রন্থ মাত্র ছিল :—সেটি বাইবল; সেই বাইবল-অনুসারে প্রাচীন জাতিবিগেব মধ্যে শুধু একটি সভ্য জাতি ছিল :—সেই ইহুদি জাতি,—“নির্দোষিত জাতি।”

খৃষ্ট জন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়; বিদিত ব্যবস্থাকর্তাদের মধ্যে মুসাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পূর্বে, ফারাওদের কথা, সাইরসের কথা, আসিরিয়ান রাজাদের কথা, গ্রীসের সপ্ত জ্ঞানীর কথা অস্পষ্টভাবে বলা হইত,—শুধু ইহুদি জাতির শ্রেষ্ঠতা আরও ভাল করিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য। পাশ্চাত্য দেশে এখনও যে “পেগান” শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত আছে—একদিকে সেই পেগানেরা,—আব একদিকে, হিব্রু জাতি,—ঈশ্বরের নির্দোষিত জাতি।

এখন সেকাল আব নাই—কালের পরিবর্তন হইয়াছে! এখন পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন, পৃথিবী গঠিত হইতে কোটি কোটি বৎসর লাগিয়াছিল; ভূতত্ত্ববেত্তারা বলেন,—লক্ষ বৎসর হইল, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে, বহু অমূল্য ও অমূল্যমানের ফলে, প্রাচ্য জগৎ এখন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে; অষ্টাদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত যে সত্য বোর অন্ধকারের মধ্যে সুপ্ত ছিল, সেই দীপ্যমান সত্য অন্ধকার ভেদ করিয়া এখন উদ্ভূত হইয়াছে। আমাদের যুগের পূর্বে, বিজ্ঞ-জননী মিসরে ৫০০০ বৎসরব্যাপী সভ্যতা বিস্তারিত ছিল—ইহা কনিষ্ঠ Champollion, Champollion Figeac, Bunsen, Osburn, Lenormant, Chabas,—ইহঁরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কীর্তিস্তম্ভ পিরামিড, সমাধি-মন্দির, মিসরের ত্রিশটা রাজবংশ—এই সমস্ত, মিসরের ঔপত্যাসিক প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয়। শঙ্কু-আকৃতি স্তম্ভের অবিহার হওয়ার, চ্যাল্ডিয়া ও আসিরিয়ারও কতকটা গুণ রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

Burnouf, Westergaard, Oppert, Menant. Rawlinson, Lenormant—ইহঁাদের অমূল্যলন ও অমূল্যমানের ফলে জানা গিয়াছে যে, যিশুখৃষ্টের পূর্বে উহাদের সভ্যতা ৪০০০ বৎসরের পুরাতন। চীন সভ্যতাব আরম্ভকাল, প্রাগৈতিহাস-কালের মধ্যে এতটা বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, চীনভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা মধ্য-চীন-সাম্রাজ্যের সভ্যতার কাল নির্দেশ করিতে সাহস পান না। পরিশেষে, William Jones, Colebrooke, Burnouf, Lassen, Max Muller প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারত ও পারস্য দেশের প্রধান প্রধান পুঁথি অমূল্যবাদ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা আরও অধিক বিস্তৃত হইয়াছেন। কেননা, তুলনা-সিদ্ধ শব্দতত্ত্ব এবং বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার অমূল্যলনের দ্বারা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ভারতীয় আর্ঘ্যগণ, পাবসিক জাতি, গ্রীক জাতি, ল্যাটিন জাতি, স্ক্যান্ডিনেভীয় জাতি, সেলট-জাতি—ইহারা সকলেই একই কণ্ডের বিভিন্ন শাখা। Pictet তাঁহার “ইন্দ-ইউরোপীয় জাতির উৎপত্তি” গ্রন্থে ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। যে সময়ে মুসা (Moses) মিসর হইতে বহির্গত হইলেন (Exodus,) সেই সময়ে ভাবতের যে সভ্যতা ছিল তাহার তুলনা নাই;—ইহারও অকাটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতে যে সব অসংখ্য পুঁথি আছে, সেই সকল পুঁথির দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, দর্শন ও ধর্মের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি, ভাবতের বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিদেব দ্বাৰাই প্রথম আলোচিত হইয়াছিল। ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে পিথ্যাগোরাস, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীসের বড় বড় দার্শনিকেরা, ভারতের ঐ সকল মূল-উৎস হইতেই তাঁহাদের চিন্তা-বট পূর্ণ করিয়াছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের আবরণ এখন উদ্ভাটিত হইয়াছে; ঐখান হইতেই আমরা আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি।

আলেকজান্দ্রিয়ার Philon বহুপূর্বে বলিয়াছিলেন : “এখানে প্রাচী (Orient) নামে একব্যক্তি আছেন।” Fernon বলিয়াছেন, “এসিয়ার চুল্লি হইতেই আলোক বাহির হইয়া আমাদের দেশগুলোকে আলোকিত করিয়াছে।” এবং Panthier তাঁহার “প্রাচ্যখণ্ডের ধর্মগ্রন্থাবলী” ভূমিকায় আবও এই কথা বলিয়াছেন :—“সূর্য্যের উদয়-কালের সহিত প্রাচী-ব যেমন সংস্রব, জগতের সমস্ত শৈশব-

স্বতির সহিত প্রাচ্য দেশের তেমনি সংশ্রব। প্রাচ্য ভূমি সৈকত-সমুদ্রে কত কত জাতি শয়ান; এই প্রাচ্য ভূমি চিরকালই বর্তমান। প্রাচ্যখণ্ড এখনও তাহার বক্ষে উপর মানব-জাতির প্রথম প্রহেলিকা ও আদিম স্থিতিগুলি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি ধর্মতত্ত্ব, কি দার্শনিক তত্ত্ব—সকল বিষয়েই প্রাচ্যখণ্ড পাশ্চাত্যখণ্ডের পূর্ববর্তী। অতএব আমাদের নিজে কৈ জানিতে হইলে, উহাকে জানিবার জন্ত আমাদের চেষ্টা কবা আবশ্যক।”

আমাদের সভ্যতার জন্ত আমরা প্রাচ্যখণ্ডের নিকট গণী। শিল্পকলাব মধ্যে যদি চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাকী আব সমস্ত শিল্পকলা আমরা প্রাচ্যখণ্ড হইতে প্রাপ্ত হইয়া উহাদিগের অঙ্গপুষ্ট করিয়াছি মাত্র। দর্শন কিংবা ধর্মবিষয়িত যে সকল তত্ত্ব এখন আমরা আমাদের নিজস্ব বলিয়া জানি, তাহাদের মধ্যে এমন একটি তত্ত্বও নাই যাহার মূলতন্ত্র প্রাচীন জাতিবা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। বাস্তবিকতার কথা যদি বল,—তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ কীর্ষি মন্দিরের চাপে আমরা নিষ্পেষিত বলিলেও হয়। সে সময় তাহাদের সভ্যতা আমাদেরই মত উন্নতি লাভ করিয়াছিল; তাছাড়া, কোন কোন প্রাচীন জাতির আচার ব্যবহারের মধ্যে যে একটি মাধুর্য দেখা যায়, তাহাতে আমাদের আচার ব্যবহারের সম্বন্ধে আমরা আর অহঙ্কার করিতে পারি না।

Bournouf-এর কথা-অনুসারে, ব্রাহ্মণিক ভারতব অসাধারণ সভ্যতার শুধু একটা প্রমাণের আমরা উল্লেখ করিব। সে কথাটি সভ্যতার ইতিহাসে অনন্ত-সাধারণ। ভারতীয় নাট্য সাহিত্যে এমন কতকগুলি নাটক ছিল যাহা একেবারেই দার্শনিক, তাহার পাত্রগণ কতকগুলি মানসিক ভাবমাত্র। তাহার একটি দৃষ্টান্ত “প্রবোধ-চন্দ্রোদয়।” Bournouf উপসংহারে এই কথা বলিয়াছেন:—“ইহা হইতে অনুমান করা যায়, ভারতীয় নাটকের এরূপ শ্রোতৃ-মণ্ডলী ছিল যাহা—কি প্রাচীন কি আধুনিক কোন নাট্যক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের শিষ্ট সমাজেব ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। এ—ত গেল বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষাব কথা। আর একটা ব্যাপার,—হিন্দুজাতির মধুর প্রকৃতি ও উচ্চ জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়। মেগাস্থিনিওস বর্ণনা

করেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছই পক্ষীয় সৈন্তদেব মধ্যে, হিন্দু ক্রমক শাস্ত্যভাবে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে দেখিয়া গ্রীকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। তিনি বলেন,—“ক্রমকের শরীর পবিত্র, ক্রমক অবধ্য,—কেননা, ক্রমক শত্রু মিত্র উভয়েরই হিতকাৰী।”

কতকগুলি স্থল ধবংগের ভ্রম যুরোপীয়দের মনে বদ্ধ-মূল হইয়া গিয়াছে; যুরোপীয় পণ্ডিতেরাই সেই ভ্রমগুলি প্রচার করিয়াছেন; এবং সঠিক তথ্যে অভাবেই তাঁহারা এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

ছই একটা দৃষ্টান্ত দেখাই:—Deguignes তাঁহার “হুন্দিগেব ইতিহাস” গ্রন্থে, চীনেরা মিসরের লোক হইতে উৎপন্ন এই কথা এইরূপ ভাবে বলিয়াছেন:—“চীনেবা ইজিপ্টীয়দিগের একটা ঔপনিবেশিক দল মাত্র—উহার নিতান্তই আধুনিক। ‘একাদ্যামি’ সভায় পঠিত আমার সন্দর্ভে আমি ইহা সপ্রমাণ করিয়াছি। মিসরীয় ও কিনিসীয় অক্ষর শুধু যুক্ত করিয়া চীনে-অক্ষরগুলি গঠিত হইয়াছে। এবং খ্রিস্টের পুরাতন রাজারাই চীনের আদিম সম্রাট।” আবার ঐ গ্রন্থকারই তাঁহার “সামানীয় ধর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য” গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, “হিন্দু পুরাণের কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, উহা ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে।” তিনি বলেন,—“ঐ সকল পুরাণের কথা, হিন্দুবা গ্রীকদের নিকট হইতেও গ্রহণ করিয়াছে,—কেননা, সংস্কৃত ভাষাব মধ্যে কতকগুলি গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দ পাওয়া যায়।” পরিশেষে, তিনি বলেন,—“খ্রিস্ট-খৃষ্টাব্দ ১১০০ বৎসর পূর্বে, হিন্দুবা বর্বর ও দস্যুমাত্র ছিল।”

তাহাব পব, Philarete Chasles বলিলেন যে, ভাবত গ্রীসের দুহিতা। কংফুচু-সম্বন্ধে Hegel এই কথা বলিয়াছেন:—“তিনি একজন ব্যবহারিক দর্শনবেত্তা; তাহার লেখার মধ্যে ঔপপত্তিক দর্শনের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; তাহার নীতিতত্ত্বগুলি সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। সিসিবোর “de officiis” নামক নৈতিক গ্রন্থে কংফুচুর লিখিত সমস্ত কথাই পাওয়া যায়। এই সকল মৌলিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনে হয়, ঐ সকল গ্রন্থ কংফুচু যদি অনুবাদ না কবিতেন তাহা হইলে তাঁহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকিত।”

Ritter তাঁহার “প্রাচীন দর্শনের ইতিহাস” গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আবও একটু বেশী দূর গিয়াছেন।

“যে সকল লেখা কংফুচু বলিয়া আরোপিত হয় এবং যাহা তাঁহার জ্ঞাত-ভাইরা জ্ঞানের মূল-প্রস্তাবণ বলিয়া মনে করে, সেট সকল লেখা সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায়,— এই “জ্ঞানের কথা” মধ্যে আমবা যাহাকে philosophy বলি তাহাব কিছুই নাই—চীনেদের “জ্ঞানের কথা” বোধ হয় ফিলজফি ছাড়া আব কিছু; কেননা এই সকল চারিত্র-নিয়ম, ও নৈতিক বাক্য—কংফুচুর গ্রন্থে যাহাব বহুল পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়,—এই সমস্ত এমন ভাবে বলা হইয়াছে যেন উহার মধ্যে কি গুরুতব কথাই আছে—কিন্তু উহা কেবল আমাদের হাত্তোদ্রেক করে মাত্র।”

হুই জন জর্জর্ন দার্শনিক কংফুচুর দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে বলিয়াছেন। কংফুচু স্বয়ং নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই:—“বিজ্ঞান শাস্ত্রে আমাব দখল মোটেই নাই; আমি প্রাচীন কালের লোকদিগকে ভালবাসি এবং আমি তাঁহাদের জ্ঞান অর্জন করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।” আবও তিনি এই কথা বলেন:—“যে ব্যক্তি সত্য ও মঙ্গলের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি বিনা শৈথিল্যে ও অধ্যবসায় সহকারে উহাতে লাগিয়া-পড়িয়া থাকে সে কি মনের মধ্যে একটু সন্তোষ অনুভব কবে না? উচ্চ প্রকৃতির লোকদের ভাবনা, পাছে তাহারা সবল পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়, দারিদ্র্যের জন্ত তাহাবা চিন্তিত হয় না।” কংফুচুর শিষ্যেরা কংফুচুর মত এইরূপ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন:—“আমাদের গুরুব মতটি শুধু এই,—সরল-অন্তঃকরণ হইবে, এবং প্রতিবাসীকে আশ্রয় ভালবাসিবে।” হুই সহস্র বৎসর পূর্বে কংফুচু জীবিত ছিলেন, ৪০ কোটি লোক তাঁহার মতাবলম্বী ছিল; তিনি প্রাচীনদিগের নিকট হইতেই শিক্ষা পাইয়াছেন—এই কথা তিনি বিনীত ভাবে স্বীকার করিয়াছেন; আর, হেগেল ও রিটার যাহারা কংফুচুর ২৫০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাবা “ফিলসফি” আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া অভিমান কবেন। গ্রীকেবা প্রাচীন কালকে অবজ্ঞা করিয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিল,

উইবাও সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রেটো, তাঁহার Timee নামক গ্রন্থে, একজন মিশর দেশীয় পুরোহিতের মুখ দিয়া সলমনের প্রতি এই কথা গুলি বলাইয়াছেন:— “এখনোয়গণ! তোমরা নিতান্তই শিশু! তোমাদের কালের পূর্বেরকার যে সকল পুৰাতন জিনিস আছে তোমরা তাহাব কিছুই জ্ঞান না; আশ্রয়গোববে ও জাতীয় গোববে ক্ষীত হইয়া, তোমাদের পূর্বে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে, সে সমস্ত তোমরা অবজ্ঞা করিয়া থাক; তোমাদের বিশ্বাস, শুধু তোমাদের সহিত ও তোমাদের নগরটিরই সহিত একসঙ্গে পৃথিবীর অস্তিত্ব আরম্ভ হইয়াছে।” এখন এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় যে মিশরের লোকেরা জীবজন্তুকে, হিন্দুরা পঞ্চভূতকে, পারসিকেরা সূর্য্যকে পূজা করে— কিন্তু একথা বলিলে জানিয়া-শুনিয়া সত্যের অপলাপ কবা হয়; এরূপ বলিলে, ত্রিচিনাপলি-বিজ্ঞানস্বয়ব একজন সমসাময়িক ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই তিরস্কারেব পাত্র হইতে হয়। সেই ব্রাহ্মণ এই কথা বলেন:—“আমাদের গুরুহস্তগুলি যুরোপীয়েবা বুদ্ধিতে পারেন না—উহার অধিকাংশই জ্যোতিষের স্মৃতিসাহায্যকারী কতকগুলি সংকেত মাত্র। অতএব আমাদের যুক্তির বিকক্ষে তাঁহাদের অজ্ঞতাকে খাড়া করা উচিত হয় না।”

১৪০০ বৎসরের পুরাতন—বাইবেলের “পুরাতন বিধান-গ্রন্থ” সম্বন্ধে কি বক্তব্য? এই সমস্ত গোববোজ্জল সভ্যতার মধ্যে হিত্র জাতিব স্থান কোথাব? খৃষ্টধর্মের প্রধান আচার্যেরা নব-বিধান-গ্রন্থের সহিত পুরাতন-গ্রন্থটি জুড়িয়া দিয়া একটা ভারী ভুল করিয়াছেন—খৃষ্টধর্মের উপর একটা হুঃসহ বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। উহাব ফলে, পরম্পরাক্রমে অনেকগুলি ভ্রমেব উৎপত্তি হইয়াছে; সমস্ত খৃষ্টীয়মণ্ডলী ইহা স্বীকার করেন। এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগে, বিজ্ঞানের সহিত বাইবেলের মূল-বচন-গুলার মিল রাখিবার জন্ত চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়াছে। ব্যাপাবটা বড় সোজা নহে! বাইবেলের স্মৃতিপ্রকরণ সমর্থন করিবার জন্ত এইরূপ যুক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছে যে, স্মৃতিপ্রকরণে যে হিত্র শব্দ “দিন” বলিয়া অনুদিত হইয়াছে তাহা আসলে দিন নহে—তাহা একটা অনির্দিষ্ট দীর্ঘ

সময়। এই যুক্তি যুক্তির আভাস মাত্র। ১৮০০ বৎসব হইতে খৃষ্টধর্মের আচার্য্যগণ এই শব্দ দিন বলিয়াই অনুবাদ কবিতা আসিয়াছেন, এবং আধুনিক খৃষ্টানদের মধ্যে এখনও অনেকেই এই কথা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। St. Thomas এই বিষয় স্পষ্ট কবিতা বলিয়াছেন :—“সৃষ্টির প্রথম দিনটি এক-সংখ্যার দ্বারা সূচিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে দিনের পরিমাণ ২৪ ঘণ্টা সেই দিন সূচিত হইয়াছে।” St. Augustin, St. Basile, St. Chrysostome এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মূসার কালনির্ণয়ও ঐরূপ ছেলমান্‌সি ব্যাপাব। কবরের গায়ে মিসরীয় রাজাদের জন্মমৃত্যুর যে তাবিখ লেখা আছে তাহাতেই সপ্রমাণ হয় যে, সে সময়ে মনুষ্যের পবনায়ু এখনকার লোকদের অপেক্ষা বেশী ছিল না। এবং সেই সময়ে মিসরবাসীরা, চ্যান্ডীয়েরা, হিন্দু বা ক্রান্তিপাতের গতিব কথা অবগত ছিল, সূতরাং তাহাদের কালগণনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপবেই স্থাপিত। অতএব হিব্রু কুলপতির যে বহুশত বৎসব জীবিত ছিলেন, এ কথা নিতান্তই কাল্পনিক।

ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, Pentateuque গ্রন্থ যাহা মূসার লেখা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, উহাব অধিকাংশই অপ্রামাণিক; সম্ভবত ঐ গ্রন্থ Josiah রাজাব যুগে রচিত হয়। খৃষ্টজন্মের ৬২১ বৎসর পূর্বে, দেবালয়ের মহা-পুৰোহিত Helkiah ঐ গ্রন্থ পুনঃপ্রাপ্ত করেন। “রাজাদের গ্রন্থে”-র ২২ পরিচ্ছেদে এই বিবরণের একটা সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা আছে। ইহাব দ্বারা আরও এই কথা সপ্রমাণ হয় যে ইহুদি জাতি, বহু শতাব্দী কাল উহাদের আদিম বহুদেব-বাদে ফিবিয়া গিয়াছিল। এখন পুৰাতন বাইবেলের প্রামাণিকতাব কথা এক পাশে সবাইয়া রাখিয়া, পুৰাতন গ্রন্থ আসলে যেমনটি তাহাই গ্রহণ করা যাক।

খৃষ্টধর্মের মধ্যে যে সকল মূল্য ব্রম আছে তাহার মধ্যে একটি এই যে, ইহুদি জাতিই নির্বাচিত জাতি—ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি।

নির্বাচিত জাতি কেন?—খৃষ্টীয় আচার্য্যেরা বলেন, যে হেতু, পুৰাকালে শুধু ইহুদি জাতিই একেশ্বরবাদী ছিল, ইহুদিরাই এক অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরকে জানিত।

একপ অভিমানেব কথা আজিকাব দিনে আর গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে যে মিসর, চাল্ডিয়া ও ব্যাবিলনের পুৰোহিতেরা, তাহাদের দীক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বেদ, মানব ধর্মশাস্ত্র, প্রভৃতি ভারতের বাবতীয় ধর্ম-গ্রন্থ, পাবসিকদিগের আবন্তা—এই সমস্ত হইতে পর্যাপ্তরূপে সপ্রমাণ হয় যে, হিন্দু ও পাবসিকেবা পরব্রহ্মেব একত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিত।

অ্যারিস্টটেল তাহার দর্শনশাস্ত্রে স্পষ্ট কবিতা এইরূপ বলিয়াছেন :—“যে সকল উপদেশ বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং যাহা পুরাণেব আকারে ভবিষ্যৎ বংশের নিকট উপনীত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে ঈশ্ববই জগতেব সর্বোদ্যম মূলতত্ত্ব এবং ঈশ্বরেরই শক্তি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অবশিষ্ট অংশ, ইতর সাধারণকে বুঝাইবার জন্ত ও সামাজিক ব্যবস্থা ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই, গল্পচ্ছলে সংযোজিত হইয়াছে।”

এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, সমস্ত পুরাকালে, ধর্মের শুদ্ধ মত কেবল অল্পসংখ্যক দীক্ষিত ব্যক্তির নিকটেই ব্যক্ত করা হইত; প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়েব মধ্যেই, ধর্মের শুদ্ধাংশ কেবল দীক্ষিত ব্যক্তিদের জন্ত ও ধর্মের বাহ্যাদ সাধারণ লোকের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। এমন-কি, প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টধর্মেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেন্ট-পিটার ও সেন্ট-পাউলের মধ্যে যে বাববিসম্বাদ চলিয়াছিল তাহা হইতেই ইহা সপ্রমাণ হয় : সেন্ট-পাউল শুদ্ধধর্ম প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং সেন্ট-পিটার তাহাতে স্বীকৃত হন নাই—এই কাবণে তাহাদের মধ্যে একটা পার্থক্য উপস্থিত হয়। আরও বহুকাল পরে, বিশপ Synesius এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন :—“জনসাধারণ নিতান্তই চাহে যে তাহাদিগকে ভুলাইয়া বাধা হয়। তাহাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা ছাড়া আব উপায় নাই। মিসরের পুরাতন পুরোহিতেরা এইরূপ ব্যবহারই করিত; লোক ভুলাইবাব জন্তই তাহারা দেবালয়েব মধ্যে আপনাদিগকে বদ্ধ কবিতা রাখিত এবং সেই থানি থাকিয়া লোকেই অগোচরে শুদ্ধ ব্যাপার সকল প্রস্তুত কবিত। এ কথা লোকেরা

যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা কবা হইয়াছে বলিয়া অবশ্যই রুষ্ট হইত। তাই, সাধারণ লোকের সহিত সাধারণ লোকের মতই ব্যবহার কবিত্তে হয়। আমি নিজে চিরকাল তত্ত্বজ্ঞানী মতই থাকিব, কিন্তু লোকের নিকট আমি কেবলই পুৰোহিত।”

অতএব পুরাতন মিসরের লোকেরা যে কেবল জীব-জন্তুরই উপাসক ছিল এই অসঙ্গত কাহিনীটা নিতান্তই অমূলক সন্দেহ নাই। আমরা আরও একটু বেশী দূর যাইব : ইহুদি জাতিকে যে ঈশ্বরের নির্ধাচিত জাতি বলা হয়, আমরা দেখাইব, ইহুদি জাতি সে সম্মানের যোগ্য নহে। যে ঈশ্বরের অল্প ইহুদি জাতি এত গর্বিত, সেই ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কিরূপ ছিল ? তাহারা ঈশ্বরকে মানুষের ভাবে দেখিত ; তাহাদের ঈশ্বরের কল্পনা মানব-সাদৃশ্যমূলক কল্পনা ; ইহুদিদের ঈশ্বর শরীরী ঈশ্বর। সৃষ্টি-প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে, ঈশ্বর মানুষকে নিজ মূর্তির অনুরূপ সৃষ্টি কবিলেন ; ঈশ্বর পার্থিব স্বর্গে বিচরণ করেন ; তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি অনুতাপ কবেন, বিস্মৃত হইলেন, তিনি স্মরণ করেন। মুসার বহির্ঘাতার (Exodus) প্রকরণে, ঈশ্বর, নিয়মাবলী স্বহস্তে লিখিয়াছেন। কি প্রস্তর খোদিত করিয়া, কি চিত্র কণ্ঠের দ্বারা, তাহাব মূর্তির প্রতিমূর্তি নির্মাণ কবিত্তে তিনি নিষেধ কবিয়াছেন। এই ঈশ্বর উচ্ছিন্নকারী ঈশ্বর—যিনি পিতা মাতার অপরাধেব জন্ত, তাহাদের সন্তানের উপর তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত, প্রতিশোধ লইলেন ; এই ঈশ্বর ইহুদি জাতিবই ঈশ্বর, অল্প জাতির ঈশ্বর নহেন। এবং যখন তিনি ইহুদি জাতিব প্রতি রুষ্ট হইলেন, মুসাকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন,—“আমাকে নিরস্ত কবিও না, আমার প্রজ্ঞালিত বোধানল ইহুদি জাতিকে একেবারে ধ্বংস কবিয়া ফেলুক।” এইত ইহুদিদিগেব একেশ্বরবাদের ধারণা ; তাছাড়া একেশ্বরবাদের ধারণাকে তাহারা বজায় রাখিতে পাবে নাই। প্রতি যুদ্ধেই তাহারা বিদেশী দেবতাদের নিকট বলি দিত, ইহুদিদিগেব ভবিষ্যদ্বক্তারা ও ইহুদিদিগের ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন যে ইহুদিদের “মাথা-ওলা নিবেট।” ইহুদি জাতি অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের ভাষা এতই কম বুঝিত যে, ওলডটেস্টমেন্ট খুঁজিয়া আশ্রাব অমরত্ব সম্বন্ধে একটা কথাও পাওয়া যায় না ; পুরাকালের সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে

এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, ইহুদিদের ইতিহাস,—চৌর্য্য, দস্যবৃত্তি, ধুন, লোকহত্যা, আবও অন্তান্ত জঘন্য আচরণের সুদীর্ঘ বিবরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহারা ইহুদি জাতিকে জানে না তাহারা যদি ওলডটেস্টমেন্টের একটা প্রতিলিপি কবে এবং তাহা হইতে ইহুদি নাম শুলা বাদ দেয়, তাহা হইলে তাহারা ভ্রাত্য রূপে মনে কবিত্তে পাবে, যে জাতিব উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা অসভ্য জাতি, বর্বর জাতি। ইহুদি জাতিব উৎপত্তিব কথা ধরিতে গেলে, ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? উহার কোথা হইতে আসিয়াছে ? এ বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় হইতে পাবে না। মুসার সময়ে, ইহুদি জাতি, মিসরের তাড়িত জাতিচ্যুত পাবিয়া মাত্র ছিল। মিসরের আদিম কালের ইতিহাস রচনা করিবার জন্ত Ptolemee Philadelph যাহাব উপর ভার দিয়াছিলেন, সেই মিসরের পুৰোহিত Manethon এইরূপ বলেন ;—“ইহুদি জাতিব পূর্বপুরুষেবা বিভিন্ন জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে—এমন কি মিসরের পুৰোহিত জাতি সমূহের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। উহাদের অনাচার, উহাদের অপবিত্র আচরণ, উহাদের কুঠ রোগ—এই সকলের দরুণ, উহাদিগকে রাজা Amenoph মিসব হইতে বহিষ্কৃত কবিয়াছিলেন।” উহাদিগকে Jacobএব কেশধর বলা নিতান্তই অসঙ্গত।

* * * *

এক্ষণে ইহুদি জাতির ঈশ্বরের ধারণার সহিত, আৰ্য্য-জাতির ঈশ্বরের ধারণাব তুলনা করিয়া দেখা যাক।

“ভারতীয় আৰ্য্যদের মধ্যে ব্রহ্ম, ক্রীতলিঙ্গ, নামহীন, মনের অগম্য, ইন্দ্রিয়ারির অগ্রাহ্য। মনুর লক্ষণানুসারে,—“বিনি স্বয়ম্ স্বপ্রকাশ, বহিরিঙ্গিয়ের অগম্য, নিত্য, বিশ্বের অন্তরাত্মা তিনিই ব্রহ্ম।” তিনিই পবিপূর্ণ, নির্বিকার, উপাধিহীন, নির্বিশেষ। সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে প্রকাশ কবিবার জন্তই তিনি আপনাকে সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন, জগৎ সৃষ্টি করিয়াই তিনি ব্রহ্ম নামেব বাচ্য হইলেন ; পুংলিঙ্গবাচক এই ব্রহ্ম স্বজনশক্তিরূপে অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত।

পুংলিঙ্গ দেশীয় আৰ্য্যদের মধ্যেও ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধে এই একইরূপ ধারণা :—Zervane—Ackerne ইনিও

নিষ্ক্রিয়, শাস্ত, পরিপূর্ণ; আত্মপ্রকাশ কবিবাব জন্মই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহা হইতেই শুভ ও অশুভের মূলতত্ত্ব—অর্মজ্জ ও আহরিমান নিঃসৃত হইয়াছে। পারসিকদিগের ঐশ্বর্যবাদ সম্বন্ধে যে ভ্রম সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, সেই ভ্রমটি প্রসঙ্গক্রমে এই খানে সংশোধন কবিয়া দিই। জের্মান—আক্কেরেন এক অদ্বিতীয় বস্তু; কিন্তু অর্মজ্জ আহরিমান এই দুই প্রতিদ্বন্দী তত্ত্ব, যমজ হইলেও সমান নহে। ফলতঃ মঙ্গলব মূলতত্ত্ব অর্মজ্জ প্রথমে জন্মগ্রহণ করে; অর্মজ্জ আহরিমান অপেক্ষা অধিক শক্তিমান এবং কল্পকালেক অস্তে, আহরিমান একেবারেই অস্তহিত হইবে। আব গ্রীক আর্ধ্যদের কথা যদি বল, সকলেই জানে,—পিথাগোরাস, সক্রেটিস ও প্লেটো, পরমেশ্বরের একত্ব অবগত ছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে উপদেশও দিতেন। প্লেটো ঈশ্বরকে এক অদ্বিতীয় ও জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়াছেন; অ্যাবিষ্টটেলে বলিয়াছেন, “তিনি সেই চিং—যাহা আপনাকে আপনি চিন্তা করে।”

ঈশ্বর সম্বন্ধে আর্ধ্যদিগের অতীন্দ্রিয় ধারণা ও ইহুদি-দিগের মানবিক ধারণা—এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। উহাব মধ্যে একটি যেমন উন্নত ও দার্শনিক, অস্তটি তেমনি স্থূল ও সীমাবদ্ধ। এখন, একেশ্বর বাদের উপর স্থাপিত যে শ্রেষ্ঠতার জন্ম ইহুদিরা বড়াই করে, সেই স্পর্ধাক্রমকে আমরা বেশী আশ্চর্য্য হইব কিংবা যে আর্ধ্যবংশধর খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থেব দোহাই দিয়া ইহুদিরা আপনাদিগকে “নির্ধাচিত জাতি” বলে—সেই খৃষ্টানদের অজ্ঞতার বেশী আশ্চর্য্য হইব তাহা বলিত পাবি না। মিসরের “পাবিয়া” হইতে যাহাদের উদ্ভব, যাহারা অবিরত নিজ প্রতিবেশীগণের গ্রাম নগর লুটপাট করিত; জয়লাভ করিলে, যাহারা আবাগবনিতা সকলকে হত্যা করিয়া, শুধু মুসা-শ্রেণী পুরোহিতদিগের ব্যবহাবেব জন্ম কুমারীদিগকে রাখিত; পায়গম্বরদের নিষেধবাণী সত্ত্বেও, যাহারা নিজ পৌত্তলিক দেবতাদের নিকট পুনঃপুনঃ ক্ষমিয়া আসিত; যাহারা স্বকীয় ধর্মবিশ্বাসের জন্ম কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন আপনাদের মধ্যে না পাইয়া, ইজিপ্ট ও চ্যাল্ডিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল; যাহাদের না আছে শিল্পকলা, না আছে দর্শন, যাহারা কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই যোগ্যতা দেখাইয়াছে এবং যাহারা শুধু নিজ

ঐতিহাসিকদের কলাকৌশলে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, সেই ক্ষুদ্র ইহুদি জাতি মিসর, চ্যাল্ডিয়া, ভারত প্রভৃতি দীপ্তগোরব প্রাচীন সভ্য দেশের সমক্ষে, এই কথা স্পর্ধা করিয়া বলে কি না—তাহাবা ঈশ্বরের “নির্ধাচিত জাতি”! ভারত প্রভৃতির যখন উন্নত অবস্থা তখন ইহুদি জাতির অস্তিত্বই ছিল না, এমন কি, উহারা প্রাচীন গ্রীক-দিগেরও পরে সমুদ্ভূত হইয়াছে। উহাদের এই স্পর্ধাক্রমের ভিত্তি কি?—না, উহাবাই কেবল ঈশ্বরকে জানিত। আব সে ঈশ্বর কিরূপ ঈশ্বর?—তিনি মহাশক্তিমান ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর, সৈন্ত সামন্তের ঈশ্বর, সর্বোচ্ছেদক, যথেষ্টাচাৰী, বৈরনির্ধাতক, নির্ভুব ঈশ্বর; মিসরে মহামারী আনয়ন কবিবার উদ্দেশ্যেই এই ঈশ্বর “ফ্যাবাও”র হৃদয়কে পাষণ-কঠিন কবিয়া দিয়াছিলেন; মনুষ্যের কোন এক বংশকে সৃষ্টি কবিয়া তাঁহাব অমুতাপ হইল এবং সেই বংশকে তিনি প্রলয় বন্তায় ডুবাইয়া মাঝিলেন। যে “লেভিটে”র স্বকীয় ভ্রাতা, পুত্র, জনক জননীদের হত্যা কবে সেই লেভিটদিগকে, মুসাব (Moses) মুখ দিয়া এই ঈশ্বরই আশীর্বাদ কবেন। এইরূপ তাহাদের ঈশ্বর-নিন্দামূলক ঈশ্বরের কল্পনা! এই ঈশ্বর তাহাদেরই ঈশ্বর, আব কাহাবও ঈশ্বর নহেন। এখন খৃষ্টানেরা তাঁহাদের মধুব-প্রকৃতি মহাপুরুষ যিশু-খৃষ্টকে এই ঈশ্বরেরই পুত্র বলিয়া কি স্বীকার কবিতো পাবেন? হায়! অষ্টাদশ শতাব্দী কালব্যাপী অজ্ঞতা আমাদের মধ্যে কত ভ্রমই বদ্ধমূল কবিয়া দিয়াছে! কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে; বিজ্ঞান, খৃষ্টধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় জটিলতার নিরাকরণ কবিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, আর্ধ্যজাতির মতবাদের কিয়দংশ, খৃষ্টধর্ম আলোকজ্যোতিষায় বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে, এবং অল্প অংশই সেমিটিক জাতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

খৃষ্টধর্মের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা প্রাচীনকালের আর্ধ্য ধারণার অনেকটা কাছাকাছি; সেই ঈশ্বর বিধেব ঈশ্বর, তিনি শুদ্ধাত্মা ও পরিপূর্ণ। এবং খৃষ্টবাদও আর্ধ্য মতবাদ, উহা সেমিটিক মতবাদ নহে। ফলত, ইহুদিদের “মেসায়্য” (ওল্ড-টেস্টামেন্টে ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত খৃষ্ট) পার্শ্বিক মেসায়্য, ডেভিডের বংশধর, একমাত্র ইহুদিদিগেরই মেসায়্য; যে ঈশ্বরের পুত্র জগতেব পরিব্রাজকের জন্ম আসিয়াছেন এ সে

মেসায়্য নহে। তাহাব প্রমাণ, ইহুদিরা সাইবস্কে “ঈশ্বরের খুঁট” বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। তাহাব অনেক পবে, যাজকর সাইমন্, সাইবস্কেই মেসায়্য বলিয়া চালাইয়াছিল।

তা ছাড়া ইহুদিরা যিশুকে মেসায়্য বলিয়া জানিত না, কেননা, যিশু আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিতেন। সেন্ট-জনের মতামতসাবে, যে Evangile গ্রন্থে খৃষ্টধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট আছে, কাল-গণনাব হিসাবে, চাৰিটা Evangile-গ্রন্থের মধ্যে উহাই শেষ গ্রন্থ; কেননা, উহা ১৬০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হয়, এবং কেবল ঐ এভ্যাঞ্জিল-গ্রন্থেই খৃষ্টকে দেবপ্রতিম, বিশ্বজনীন মেসায়্য বলা হইয়াছে—যিনি জগতের পবিত্রাণের জন্ত আসিয়াছেন। শব্দবাদ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। সেন্টজন্স স্বীকাৰ কবিয়াছেন যিশুর বহুপূর্বে শব্দবাদ (শব্দব্রহ্ম) লোকের জ্ঞান ছিল এবং কিয়ৎ শতাব্দী ধবিয়া অ্যালেকজান্দ্রিয় সম্প্রদায়গণ শব্দবাদের কথা প্রকাশ্যভাবে বলিতেন।

অবতাববাদও আৰ্য্য মতবাদ—উহা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছে। অ্যালেকজান্দ্রিয়ায়, Hypostases নামে এই মতবাদেবই শিক্ষা দেওয়া হইত। এই মতবাদ হঠতেই “একে তিন, তিনে এক” এই ত্রিত্ববাদের জন্ম হইয়াছে। বাইবেলের পূর্বভাগে, একপ কোন মতবাদই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহুদিধর্মের সহিত উহাদেব কোন সংস্রব নাই। তাছাড়া, Burnouf তাঁহাব “ধর্ম বিজ্ঞান” গ্রন্থে কি বলেন শোনো :—“খৃষ্টানদের সমস্ত দার্শনিক মতবাদই জেন্না-বেস্তার মধ্যে আছে :—যথা, এক ঈশ্বর, জীবন্ত ঈশ্বর, অন্তৰাত্মা, ঈশ্বর ঈশ্বরের বাণী, ঈশ্বরের মধ্যবর্তী পুরুষ, পিতৃজাত পুত্র, শবীলের প্রাণ ও আত্মাব পাবন। পতনবাদ, উদ্ধারবাদ, আরম্ভে ঈশ্বরের সহিত অসীম আত্মাব সমবায়, যে অবতার-বাদ ভারতে প্রভূত পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছে সেই অবতার-বাদের কিঞ্চিৎ আভাস, ধর্ম সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, Amschaspand ও Darvend নামক শুভ ও অশুভ দেবদূত, আমাদের অন্তবে যে ঈশ্বরের বাণী অবস্থিত সেই বাণীর প্রতি অবাধ্যতা, এবং মুক্তির আবশ্যকতা—এই সমস্ত কথাও উহার মধ্যে পাওয়া যায়। আবেস্তা-ধর্মে পশুবলি নাই। ইহুদিবাও খৃষ্টীয় পুনরুত্থান উৎসবে মেঘ-বলি উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে মৃনসিক বলি প্রবর্তিত

কবে। মতবাদ ছাড়িয়া, যদি খৃষ্ট ধর্মের বিবিধ অনুষ্ঠান, সাংকেতিক চিহ্ন, ও ধর্মভোজ আদিব (sacrament) কথা ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহুদি ধর্ম অপেক্ষা আৰ্য্য ধর্মাদি হইতেই উহাব অধিকাংশ গৃহীত হইয়াছে :—যথা অগ্নি ও সুরাপাত্রেব সাংকেতিক চিহ্ন, ক্রুসেব চিহ্ন, খৃষ্টের পুনরুত্থান উৎসবে ব্যবহার্য্য মোম-বাতি, কোন কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য্য তৈল,— এই সমস্ত বৈদিক ধর্মের সামগ্রী। অবগাহন-সংস্কার (baptism), দোষ স্বীকাৰ-প্রণা, আচার্য্য-নিয়োগ-অনুষ্ঠান, মন্তক মুণ্ডন—এ সমস্ত ব্রাহ্মণিক ধর্ম হইতে গৃহীত। সকল আৰ্য্য ধর্মের মধ্যেই বিবাহ সংস্কার প্রচলিত ছিল। পুৰোহিতদিগেব চিরব্রহ্মচর্য্য, দোষস্বীকাৰ, অনুতাপ,—এই সমস্ত বৌদ্ধ-ধর্ম হইতে গৃহীত।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকেব মঠ, সজ্জ, ধর্মপ্রচাব—এই সমস্তের জন্ত খৃষ্ট-মণ্ডলী বৌদ্ধধর্মের নিকট ঋণী। Saint Basile বৌদ্ধ মঠেব আদর্শে তাঁহার বৃহৎ ধর্মসমাজ গঠিত কবিয়াছিলেন।

আর সন্ন্যাসী তপস্বী সম্প্রদায়েব কথা যদি বলা, যিশু-খৃষ্টেব চতুর্দশ শতাব্দী পূর্বে, ঐ সকল সম্প্রদায় ব্রাহ্মণিক ভাবে ছিল। ক্যাথলিক পাদ্রিদের মধ্যে যে শ্রেণীব সোপানপরম্পরা আছে তাহাব অবিকল আদর্শ বৌদ্ধ-তিব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে ডালাই-লামা আছে,—লামাদের সভায় সেই ডালাই-লামা নির্বাচিত হইয়া থাকে। এই লামারা তাহাদেব পদমর্যাদা অনুসারে, ক্রুস ধারণ ও “metre” হুপি, শাদা আলখাল্লা প্রভৃতি পবিধান কবিয়া থাকে। চীনেব ক্যাথলিক পাদ্রি father Bury চীনেব পুরোহিতদিগকে, ক্যাথলিক পাদ্রি মত মুণ্ডিত-মন্তক দেখিয়া, ও স্তম্ভমালা ব্যবহাব করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন :—“আমাদের মধ্যে এমন একটিও পবিচ্ছদ নাই, পুরোহিতিক কর্ম নাই, ক্যাথলিক ধর্মের অনুষ্ঠান নাই,—সবতান যাহাব নকল এ দেশে করে নাই।” “গৌতম সম্বন্ধে আলোচনা” নামক গ্রন্থে Gerson da Cunha আবও এই কথা বলেন :—“এই সম্প্রদায় (যাহারা “মহা-মুন” মতাবলম্বী) অনেক বিষয়ে রোমান ক্যাথলিক-দিগের সহিত উহাদেব মিল দেখিতে পাওয়া যায়; উহাদের

মধ্যে জী পুঙ্খবৎ মর্ত আছে, শুধু তাহা নহে, ধর্মপদবীতে উন্নত ভিক্ষুশ্রেণী আছে, মস্তক মুগুন প্রথা, চিরব্রহ্মচর্য ও স্মারক চিত্রের পূজা ও পাপস্বীকার পদ্ধতিও উহাদের মধ্যে আছে। উহাদের মোচ্ছব আছে, সমবেত উৎসব-যাত্রা আছে, প্রার্থনা-সংহিতা আছে, ঘণ্টা আছে, জপমালা আছে, শাস্তিজল আছে এবং উহারা সিদ্ধ মহাপুঙ্খদেব মধ্যবর্তিতায় বিশ্বাস করে।” উৎপত্তি হিসাবে ইহুদিধর্মের অপেক্ষা আর্য্য ধর্মসমূহের সহিত খৃষ্টধর্মের যে অধিক যোগ তাহা বোধ হয় যথেষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

সেমিটিক ধর্মসমূহের সহিত ইহুদি ধর্মের একটা তুলনাত্মক সমালোচনা করিলেই ইহুদি ধর্মের উৎপত্তি এবং ইহুদিধর্ম ও খৃষ্টধর্মের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহাও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। আসীরীয়দিগের ঈশ্বর যেমন জিহোবা, মুসলমানদের ঈশ্বর যেকপ আল্লা, ইহুদিদেব ঈশ্বর সেইরূপ জিহোবা। সমস্ত সেমিটিক জাতির মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ-কল্পনা একই প্রকার: ঈলু (যাহা হইতে এলোহিম, আল্লা, এল উৎপন্ন) বাহাব অর্থ মহাশক্তিমান,—কি পুৰাতন কি আধুনিক, সমস্ত সেমিটিক জাতির ঈশ্বর এই নামেই পরিচিত: এই ঈশ্বর আদেশ-প্রচারক প্রভু; আসীরীয়দিগের মধ্যে ইনিই অসুর, এবং দেশের রাজা ইহাঁবই মন্ত্রী; ইহুদিদেব মধ্যে ইনিই জিহোবা এবং মুসাই তাঁহার প্রবক্তা; মুসলমানদের মধ্যে ইনিই আল্লা, এবং মহম্মদই আল্লাব “নবী” বা প্রবক্তা।

অসুর, জিহোবা ও আল্লা, বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; নরহত্যা দ্বারা তাঁহাদের নাম প্রচলিত হয়, এবং তলোয়ারবই তাঁহাদের সাংকেতিক চিহ্ন ছিল। তাঁহাদের লইয়া যে যুদ্ধ তাহা দিগ্বিজয়ের যুদ্ধ ও ধর্ম-প্রচারের যুদ্ধ; এইস্থলে দিগ্বিজয় ও ধর্মপ্রচারের মধ্যে একটা হৃদয়ঙ্গম সন্ধান বিদ্যমান ছিল। “লেশমাত্র দয়া প্রদর্শন করিবে না”—ইহাই তাঁহাদের বীজমন্ত্র ছিল। এই ক্ষত্ৰই এই সকল ঈশ্বর বিশ্বজ্ঞানী ঈশ্বর হইতে পারে নাই; অসুর, চিবকালের মত অস্থিহীত হইয়াছে; জিহোবার উপাসকেরা পৃথিবীর সর্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং যে মুসলমান ধর্ম কত কত সভ্যতার ভগ্নাবশেষের উপর স্বীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাও প্রতিপত্তি

হ্রাস হইয়াছে। মধ্যযুগে যে ইসলাম-ধর্ম যুবোপের বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই ধর্ম আজ পবাতৃত হইয়াছে। কি স্পেন, কি আফ্রিকা, কি ইজিপ্ট কি তুর্কি, কি ভাবতবর্ষ—এই সমস্ত দেশের আর্য্যদেব নিকট ঐ ধর্ম হটিয়া গিয়াছে। এইরূপ বোমকগণ কর্তৃক ইহুদিরা ও আর্য্য-পাবসিকগণ কর্তৃক আসীরীয়েরা বহিস্কৃত হইয়াছে।—

ইহুদিদের সাংকেতিক চিহ্ন সকল, আসলে ইহুদিদের নিজস্ব ছিল না। “মৈত্রী-তোষণ” মিশর দেশের একটা সাংকেতিক চিহ্ন এবং যে দুই দেবশিশু উহাকে আগুলাইয়া থাকিত,—উহা আসীরিয়া-দেশের সাংকেতিক চিহ্ন। জেকসালেমেব দেবালয়,—যুগপৎ মিসর ও ফিনিসিয়া দেশীয়: অনেক বিষয়ে ইহুদি ও সেমিটিক জাতি যে এক-স্বত্রে বদ্ধ,—তুলনা করিয়া তাহাব বেশী দৃষ্টান্ত দেখাইবার আব প্রয়োজন নাই। আমি শুধু এইটুকু দেখাইতে চাহি যে, ইহুদিজাতি হইতে খৃষ্টধর্মের উৎপত্তি হয় নাই। উহাদের সভ্যতা অতাব সীমাবদ্ধ; মিশর দেশ হইতে বাহির হইবার সময়, মিশর দেশ হইতে, এবং যে ব্যাবিলোনিয়া ও পারস্ত দেশ উহাদিগকে বন্দীভূত করিয়াছিল,—ঐ দুই দেশ হইতেও উহারা কতকটা সভ্যতা প্রাপ্ত হয়। উহাদের একেশ্বরবাদ, অজ্ঞাত সেমিটিক জাতির একেশ্বরবাদেবই অমুকপ; এই একেশ্বরবাদেব শ্রেষ্ঠতাব কথা দূরে থাক, বং উহার অপকৃষ্টতাই সপ্রমাণ হয়; কেন না, উহাদের ঈশ্বরের স্বরূপ-কল্পনা মানবিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাদের ঈশ্বর ইহুদিজাতিরই ঈশ্বর—সীমাবদ্ধ ঈশ্বর, উহাদেব ঈশ্বর-কল্পনা অতীন্দ্রিয় একতায় উন্নীত হইতে পারে নাই।

ইহাতে বিশ্বাসের বিষয় কিছুই নাই, কেননা উহারা পশ্চাৎশিরক (Occipital) জাতি,—অর্থাৎ ঐ সকল জাতির মস্তিষ্কের পশ্চাভাগ, পুরোভাগ অপেক্ষা অধিক পবিপুষ্ট। উহাদের দৈহিক বুদ্ধির দ্রুততা প্রযুক্ত, মাথার খুলির অস্থিগুলি, ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই, পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে যোড় লাগিয়া যায়; স্তবরাং মস্তিষ্কের ধূসর অংশ পবিপুষ্ট হইতে পারে না।

• পক্ষান্তরে, আর্য্যজাতীয় লোকের করোটির (মাথার

খুলী) অস্থিখণ্ডগুলা বেশী বয়সে পবম্পবেব সহিত সম্পূর্ণ-রূপে ঘোড় লাগে এবং এই কাণে উহাদের নড়াচড়ার ব্যাঘাত হয় না। এই দেহতাত্ত্বিক প্রভেদপ্রযুক্ত, কোন সেমিটিক জাতিব পক্ষে, কোন প্রকার সমুন্নত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ধারণা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়। উহাদের সাহিত্যিক কীর্তিগুলিই ইহাব প্রমাণ।

খৃষ্টধর্মের প্রসাধেই ইহুদি জাতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া এত উচ্চ আদান দখল কবিয়া বসিয়াছে। কিন্তু খৃষ্টধর্মের উৎপত্তি-বিবরণ ইহুদি জাতিব সহিত যুড়িয়া দেওয়ায় খৃষ্টধর্ম এখন বিপদে পড়িয়াছে। বিজ্ঞানব আলোকে চোখ ফুটিলেও, আধুনিক খৃষ্টধর্ম ঐ দুর্বল বোকাটাকে স্বদ্ধ হইতে ফেলিয়া দিতে পারিতেছে না। সত্য কথাটা প্রকাশ কবিবার কিন্তু এখন সময় হইয়াছে। যে প্রাচ্যভূখণ্ডকে এত কাল কেহ আমলে আনে নাই—সকলেই কেবল “দূরছাই” কবিয়া আসিয়াছে, এবং যাহার ভাষা সিংহাসন, স্বকীয় পুৰাতন কিংবদন্তী অমুসাবে ইহুদিজাতি ১৮০০ বৎসর ধবিয়া জীব দখল করিয়া বসিয়া আছে, সেই প্রাচ্যভূখণ্ডকে এখন তাহার প্রাপ্য সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কবা আবশ্যক।

বিভিন্ন সভ্যতা, একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হয়; প্রত্যেক সভ্যতা পূর্ববর্তী সভ্যতাব সমস্ত জ্ঞানসমষ্টি গ্রহণ কবিয়া, তাহাব নিজেব বিশেষ প্রতিভার দ্বারা আবাব তাহা হইতে নূতন পরিণাম-পবম্পবা উৎপাদন কবে। অতএব, এইরূপ সহসা মনে হইতে পাবে যে, প্রাচীন সভ্যতা সমূহেব উত্তরাধিকারী পাশ্চাত্য সভ্যতা অবশ্য প্রাচীন সভ্যতা সমূহ হইতে উৎকৃষ্ট। কিন্তু তথ্যের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয় না। কোন জাতির শ্রেষ্ঠতা তিন জিনিসেব উপর নির্ভর কবে:—দর্শন, ধর্মনীতি, ও শিল্পকলা। বৈবয়িক সভ্যতা, জ্ঞান ধর্মের সভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। স্পিনোজা, লাইবনিজ, কান্ট, দেকার্ট, হইতে আরম্ভ করিয়া ফিল্ডে, স্পেন্সার, শপেনহোয়ের পর্য্যন্ত, আমাদের মধ্যে এমন একটিও দর্শনতত্ত্ব নাই যাহা আমাদের নিজস্ব রত্নখনি হইতে উৎপন্ন; আমবাও এখনও গ্রীক দর্শন সম্প্রদায়ের দর্শনাদি অমুলীন কবিয়া থাকি; আবাব এই গ্রীকেবা তাহাজেব দার্শনিক তত্ত্বসকল গোড়ায় মিসবদেশীয় পুৰোহিত ও ভারতব ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ কবে। প্রাচ্যভূখণ্ডেব সমস্ত দর্শনশাস্ত্র

আসিয়া, আলেকজান্দ্রীয় দর্শনসম্প্রদায়েব মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল; এবং সমস্ত পাশ্চাত্যভূখণ্ড সেই ভাণ্ডার হইতে আপন আপন খাত্তসামগ্রী সংগ্রহ কবে। Saint Jerome, Magnusকে যে পত্র লেখেন তাহাতে এইরূপ আছে:—“খৃষ্টধর্মের আচার্য্যদেব কথা আর কি বলিব, যে প্রাচীনদিগেব মত তাহাবা খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত, সেই প্রাচীনদিগেব অম্নেই তাহারা পরিপুষ্ট।”—যত কিছু উন্নত নীতি উপদেশ তাহা ভাবত ও চীন হইতেই আসিয়াছে। পীত-জাতিব মধ্যে আবাব এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায় যে, উহারা ঈশ্বরের কল্পনা বর্জন কবিয়া, শুধু ধর্মনীতিব ভিত্তি উপর, উহাদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। আমার প্রণীত “মল্ল ও ভগবদ্ গীতা” গ্রন্থে আমি যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে ব্রাহ্মণিক ভাবতের অতীব উন্নত ও বিশুদ্ধ ধর্মনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেই মধুব প্রকৃতি শাক্যমুনিব এই সকল নীতি স্বত্—যথা “কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে ক্ষমা করিবে”, “ক্ষুদ্রতম জীবকেও হিংসা করিবে না”, “দরিদ্র ও ধনীকে সমভাবে দেখিবে”—এই সকল উপদেশ বাক্য অতিবড় নিষ্ঠুর জাতিদিগকেও সভ্য করিয়া তুলিতে,—কোমল ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। এ কথা সত্য, অবনতিগ্রস্ত ভাবত, পারস্ত, গ্রীশ ও রোমেব চিত্র যাহা আমাদের সম্মুখে এখন রহিয়াছে তাহা বড় একটা গৌরবজনক নহে; কিন্তু আমি এ কথা বলিতে পারি না, আমাদের সভ্যতার চিত্র উহাদের অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট।

ধর্ম সংক্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ, পায়ণ-দলনী বিচাব-সভা, (Inquisition) দাসত্বপ্রথা—এই সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাব রক্তময় কলঙ্ক; আরও কাছাকাছি সময়ের কথা যদি ধর,—৮৯র রাষ্ট্র বিপ্লব—স্বাধীনতা ও ন্যায়ের যুগ উদ্ঘাটন করা যাহাব উদ্দেশ্য ছিল—সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের বক্তাপ্লুত আতিশয্য ও অত্যাচার, বুদ্ধদেবেব শাস্তিময় বিপ্লবেব কথা মনে করাইয়া আমাদের চিন্তকে বিষাদে আচ্ছন্ন কবে।

লোকে যাহার এত নিন্দা করে সেই হিন্দুদেব বর্ণভেদ প্রথাও আমাদের মধ্যযুগের সামন্ত-তন্ত্র,—উহাদেব অপব্যবহার সত্ত্বেও,—সভ্যতাকে যে অনেক পরিমাণে অগ্রসব করিয়া দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তা ছাড়া, যে

অবিনশ্বর মূলতত্ত্বগুলির উপর বর্ণভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত সেই বর্ণভেদপ্রথা কি যুবোপেও আজিকার দিনে রহিত হইয়াছে ? রহিত যে হয় নাই, তাহাব সাক্ষী—যুবোপের সোস্টিলাইট ও অ্যানার্কিষ্ট সম্প্রদায়ের আন্দোলন। বর্ণভেদ প্রথা যে অত্যায়েব উপর প্রতিষ্ঠিত একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না ; কিন্তু যে মূলতত্ত্ব হইতে বর্ণভেদ প্রথাব উৎপত্তি সেই মূলতত্ত্বটি নিজে স্থায়ীমুদিত এবং তাহাব পরিণামও মহৎ ও বহুফলপ্রসূ। সভ্যতা-সমূহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু মানুষ সেই মানুষই থাকিয়া যায়। শব্দের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্বের পরিবর্তন হয় না। ব্রাহ্মণিক ভারতে ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু হইলেও, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ; উনবিংশতি শতাব্দীর যুরোপে, ধনপতিই প্রভু,—পণ্ডিত নহে, সন্ন্যাসীও নহে। “ক্ষত্রিয় ধর্ম—” আজিকার দিনে সৈনিকতার (militarism) এক-শেষ, অসির শাসনতন্ত্র, স্থায় ধর্মের উপর বলের প্রাধান্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; বৈশ্বেব স্থান বড় বড় কারখানাওয়ালারা অধিকার করিয়া, তাহাদের মূলধনের চাপে ক্ষুদ্র বণিক-দিগকে নিষ্পেষিত করিতেছে। এখনকার শূদ্র—শ্রমজীবী, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া, উত্থান করিয়াছে ও Socialism-এর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখনকার চণ্ডাল, পাশিয়া, সেই দরিদ্রগণ যাহারা স্ত্রায় বিচার পায় না, সেই আইরিশ লোক,—নিজ ভিটা-ভূমির উপর যাহাদের কোন অধিকার নাই—যাহারা একপ্রকাব বাট্টিক মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়াছে যাহারা তপ্ত-গোহারি ছাঁকা-দেওয়া দাগী গোলাম ! মনুষ্য সমস্ত নীতি-উপদেশ অল্পসাবে, নিজের ওজনে কাঁজ হইত না সত্য, কিন্তু একথাও নিশ্চিত, যে জাতি ওরূপ উচ্চ রাজনৈতিক, সামাজিক, ও ধার্মিক আদর্শ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল, তাহাদের জ্ঞান ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে তাহাদের সেই কল্পনাই তাহাদের শ্রেষ্ঠতাব সাক্ষ্য দিতেছে। কোন্ রাজ্য কিংবা কোন্ পার্লেমেন্ট আজিকার দিনে ব্যবস্থা সংস্কারের নেতৃত্ব সাহসপূর্ব্ব গ্রহণ করিতে পারে ?—জুয়া খেলা ও কপাল-চোকা বাজির খেলা নির্ভীকভাবে নিষেধ করিতে পারে ? মনুষ্য কিন্তু তাহা করিয়াছেন। আমাদের ব্যবহার-চবিত্রও দূষিত হইয়া পড়িয়াছে ; কাঞ্চনেব প্রলোভনে আমাদের রাষ্ট্রশাসক লোকেরা, আমাদের লেখকেরা,

আমাদের শিল্পীরা, আমাদের পাদ্রিরা, আমাদের অভিজাত-বর্গ, নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

এখন বাকী রহিল শিল্পকলা ; এবিষয়ে একটু তারতম্যের বিশেষত্ব আছে। পূর্বকালে, বাস্তবিক বিষয়ে,—মিসর, আসীরিয়া, ও গ্রীশের সর্বপ্রধান আসন ছিল, এখনও উহাদের কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ছুঁচাল খিলানব শিল্প ছাড়া, পাশ্চাত্য ধণ্ডু, এই বিষয়ে কিছুই নূতন উদ্ভাবন করে নাই, কেবলই দাসবৎ নকল করিয়াছে। ভাস্কর-কর্ম্মে গ্রীকেরা চিরকালই আমাদের শিক্ষাগুরু ; গ্রীকদের ও একরিয়া-বাসীদের মৃণ্ময় পাত্রাদি আমাদের নিকট বিশেষ প্রশংসার জিনিস। তবে, আমাদের শ্রেষ্ঠতা (ইহা বড় কম গোববেব কথা নহে) সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার উন্নতি সাধনে ; কেবল এই বিষয়েই নিজস্ব ও নূতনত্ব প্রদর্শন করিয়া আমরা পুর্বাতন জগতের সমক্ষে স্পর্দ্ধার সহিত উপস্থিত হইতে পারিয়াছি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের ইহাই তুলনাসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত চিত্র। অবশ্য, ব্যবহারিক বিজ্ঞান-রাজ্যের বড় বড় আধুনিক আবিষ্কার সকল, আমাদের প্রধান সুলল ও প্রকৃত উন্নতির পরিচায়ক, কিন্তু আসলে উহাদের মূল কোথায় ? স্থায়তঃ যাহার যে প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত ; অতএব প্রাচ্যকে ভাল করিয়া বুঝিলে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, প্রাচ্য ধণ্ডুই সেই মূর্খা যেখান হইতে আমবা আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন কুলপতির স্থায় প্রাচ্য-ভূমিকে আমাদের ভক্তি করা উচিত, যেহেতু আমবা তাহাবই বংশধর। একথাও যেন আমরা বিস্মৃত না হই, যে সময়ে আমরা পশ্চত্মে দেহ আবৃত্ত কবিয়া, যুবোপেব বিস্তীর্ণ অরণ্যে, জীবন-সংগ্রামে প্রযুক্ত ছিলাম, সেই সময়ে প্রাচ্যধণ্ডু, সভ্যতাব দীপ্ত আলোক চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

“হারামণির অন্বেষণ” ।

(সাব-সংকর্ষণ ও সমালোচনা ।)

‘হারামণির অন্বেষণ’ নামক একখানি পুস্তক আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। গ্রন্থকাব একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইনি বে কেবল ভাবতীর্থ দর্শনশাস্ত্রেই পাবনরী তাহা নহে, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রেও ইহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে এবং ইনি নিজেও একজন দার্শনিক। সুতরাং ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে ইনি যাহা বলেন তাহাই মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা আবশ্যিক।

গ্রন্থকাব একজন বিশিষ্টাশ্রিতবাদী। লোকে পাছে তাহার মত পরিহার করিয়া বৃথিতে না পাবে এইজন্য তিনি “অদ্বৈতবাদেব সমালোচনা” নামক গ্রন্থে আপনাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা পাঠকগণকে এই ‘সমালোচনা’ পাঠ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। পুস্তকখানি স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত, জ্ঞানপূর্ণ এবং অতি উপাদেয়। ‘হারামণির অন্বেষণ’ অধ্যয়ন করিবার পূর্বে যদি পাঠকগণ এই ‘সমালোচনা’খানি পাঠ করিয়া লইতে পাবেন তাহা হইলে গ্রন্থকাবের মতামত বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।

আমাদের এই সমালোচ্য গ্রন্থখানি এতই উপাদেয় হইয়াছে যে ইহার সার সংকলন করিয়া পাঠক মহোদয়গণকে উপহার দিতেছি এবং যে যে স্থল অস্পষ্ট আছে সেই সেই স্থল সুস্পষ্ট করিবার জন্য ‘সমালোচনা’ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিব।

গ্রন্থে (১) কি আছে ও কি চাই, (২) ব্যক্তব্যক্ত বহুস্ত, (৩) ত্রিগুণ বহুস্ত, (৪) দ্বন্দ্ব রহস্ত এই কয়কটা বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

(১)

— কি আছে ? কি চাই ? ইহার উত্তর ‘আছে সত্য—চাই মঙ্গল’। “সত্য ছাড়া দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই—সুতরাং সত্য আপনিই চান, সত্য আপনাকেই চান, সত্য আপনি আপনাকে পান, সত্য আপনাকে আপনি বিহার করেন—এই সত্যই মঙ্গল”।

কথার ভাবে মনে হইতেছে পরমাত্মাই সব—তবে জীবাত্মার স্থান কোথায় ? জীবাত্মাবও স্থান আছে; কারণ “সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা জীবাত্মা লইয়াই একমাত্র অদ্বিতীয় অগুণ পবিত্র সত্য”। পৃঃ ৬৩। কথটা কিছু অস্পষ্ট সেই জন্য “অঃ সঃ” হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

“দ্বৈতাদ্বৈত বাদই আমার সমগ্র মত; প্রকৃত প্রস্তাবে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তা ছাড়া অদ্বৈত-বাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের অঙ্গীভূত, সেই অংশে আমি অদ্বৈতবাদী; দ্বৈতবাদ যে অংশে দ্বৈতাদ্বৈতের অঙ্গীভূত, সেই অংশে আমি দ্বৈতবাদী। যে অদ্বৈতবাদ এবং যে দ্বৈতবাদ—দ্বৈতাদ্বৈত হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা যোদ্ধার ছিন্ন হস্তের স্ত্রাব নির্জীব, শুষ্ক এবং অকর্মণ্য”। পৃঃ ১৫। “ঈশ্বর দ্বৈতাদ্বৈত মতের কেন্দ্র স্বরূপ। প্রকৃতি অরাবলী স্বরূপ। সৃষ্টির যেমন করাবলী, কেন্দ্রেব তেমনি অরাবলী, আত্মার তেমনি আত্মপ্রভাব, পরমাত্মার তেমনি ঐশী শক্তি। প্রাক্ত জীবমণ্ডলী পরিধি স্বরূপ এবং এক একটা প্রাক্ত জীব এক একটা অরব বহিঃপ্রাক্ত স্বরূপ। (চক্রেব পরিবর্তে কুণ্ডলীর বা আবর্তের উপমা দিলে আরো ঠিক হইত। কেননা কুণ্ডলীর বেটন পথের যে কোনো স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া—একদিক দিয়া চলিলে আবর্ত মুখে পতিত নৌকাব স্তায় উত্তরোত্তর কেন্দ্রেব নিকটবর্তী হইতে হয়—আর একদিক দিয়া চলিলে কেন্দ্র হইতে উত্তরোত্তর দূরে পড়িতে হয়।

চক্রেব বেটন রেখাস্থিত বিন্দু সকল কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্তী, কিন্তু কুণ্ডলীর বেটন রেখাস্থিত বিন্দু সকলের মধ্যে কেহ বা কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে, কেহ বা অল্পদূরে অবস্থিত করে। এই জন্য জীবগণের উত্তরোত্তর শ্রেণীবিভাগ বুঝাইবার পক্ষে কুণ্ডলীর দৃষ্টান্ত সবিশেষ উপযোগী। যাহাই হউক—আমার বর্তমান মন্তব্য কথা বুঝাইবার পক্ষে চক্রেব উপমাই যথেষ্ট।) অরাবলী—কেন্দ্র এবং পরিধির ব্যবধান ও বন্ধন ভষেবই সম্পাদক,—প্রকৃতি একদিকে ভ্রমোত্তাপ দ্বারা জীবের নিকটে ঈশ্বরের ভাব ঢাকিয়া রাখিয়া জীবের মধ্য ব্যবধান স্থাপন করে, আর একদিকে সমস্ত দ্বারা জীবের নিকটে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করিয়া জীবের মধ্য বন্ধন ঘনীভূত করে। সাংখ্যদর্শন কেন্দ্রেব গণনা হইতে বর্জিত করিয়া অরাবলী এবং পরিধির উপবেই সমস্ত বিষয়বস্তু প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন অরাবলীকে মাত্রাবোধে তুচ্ছ করিয়া কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যে ব্যবধান একেবারেই বিলুপ্ত করিয়াছেন—ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়কেই নিঃশূন্য ব্রহ্মে পরিসমাপ্ত করিয়াছেন।... অদ্বৈতবাদী, জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে, পরমাত্মার সহিত ভেদাত্মেব সূত্রে প্রথিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি প্রকৃতিকে একবারেই নশ্রাৎ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী একদিকে বলেন যে, ব্রহ্ম নিঃশূন্য, আব একদিকে বলেন যে তিনি মাত্রাকপে উপাধিতে অধিকার হইবা ঐশী শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। নিঃশূন্য ব্রহ্ম যদি একান্ত পক্ষেই শক্তিহীন হ’ন তবে তিনি কিরূপে মাত্রাতে অধিকার হইয়া সগুণ ব্রহ্মকপে বিবর্তিত হইবেন। আব, যদি বল যে, গোড়া হইতেই নিঃশূন্য ব্রহ্ম ‘সমুৎপন্ন নিগূঢ়’ আপনাব গুণরাশির অভ্যন্তরে নিগূঢ় রহিয়াছেন তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে গোড়া হইতেই তিনি সগুণ ব্রহ্ম। প্রকৃত কথা এই সগুণ ব্রহ্ম সমগ্র সত্য—নিঃশূন্য ব্রহ্ম বীজ সত্য। এপিট ওপিট দুই পিট লইয়া একটা কাগজ হয়; তাহার মধ্যে আমি যখন এপিটে লিখিতেছি তখন এপিটেই দেখিতেছি কিন্তু তাহা বলিয়া একথা বলিতে পারি না যে এই কাগজের এপিট আছে ওপিট নাই; কেননা যদি এপিট না থাকিত তবে এপিটও থাকিত না। ব্রহ্ম সর্বকণ্ঠ্যই তাহাব সমস্ত শক্তি-সমবিত সগুণ ব্রহ্ম। যদি জগৎ নাও থাকে তাহাপি সেই মহাপ্রসঙ্গের অবতারণাও ব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিতে পারি না—কেননা তখন স্বয়ং পরমাত্মা আপনার শক্তিতে আপনি স্থিতি করিতেছেন—এবং তাহার সেই আত্মশক্তিতে সমস্ত শক্তিই অন্তর্নিহিত।” পৃঃ ৬০-৬৩। “যদি আপনার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঈশ্বর জীবকে আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া না রাখিয়া কি জন্য সংসারে প্রেরণ করিলেন—তবে তাহার উত্তরে আমি বলি, এই যে, জীবের মধ্য জ্ঞানের বিষয়, প্রতিবিষ এবং প্রেমের আদান প্রদানই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্কৃত না হইলে কে ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য উত্তরোত্তর ক্রমে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবে, প্রেমে উপভোগ করিবে এবং যত্নে উপার্জন করিয়া ধর্মভূষণে ভূষিত হইবে? এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টিকে জড় দ্বারা একমেটে করিলেন; এবং জীবদৈত্য দ্বারা দোমেটে করিলেন। জীব ব্যক্তিরূপে অপরিণীত ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার ত্রী সৌন্দর্য থাকিলেই বা কি আব না থাকিলেই বা কি, তাহা শাকা না থাকা দুইই অবিকল সমান”। পৃঃ ৪২।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গ্রন্থকাবের দর্শনে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই স্থান আছে। পরমাত্মা নিত্য সত্য এবং জীবাত্মা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত ও পরমাত্মাবই অঙ্গীভূত এই জন্য জীবাত্মাও সত্য। গ্রন্থকার বলিতেছেন যে মানব “আমি কেমন করিয়া বলিব তুমি সত্যের কেহই না, বা ত্বত্ত্ব তোমার কেহই না। তুমি ত আর অসত্য নহ, তুমি যে আমার চক্রেব সমুখে সত্য দেদীপমান। তুমি যদি অসত্য হইতে তবে

* হারামণির অন্বেষণ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক S. K. Lahori & Co., 54, College Street, Calcutta. মূল্য চারি আনা মাত্র।

কে তোমাকে পুছিত? তুমি সত্য বলিষাই সত্য তোমার নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন পবের নিকটে না। অতএব এটা স্থির যে তোমার নিকটেই হ'ক, আমার নিকটেই হ'ক আর তৃতীয় ব্যক্তির নিকটেই হ'ক, বাহার নিকটেই হ'ক প্রকাশ পান তিনি সত্যেরই নিকটে,—আপনারই নিকটে। সত্যের এই যে আপনার নিকটে আপনার প্রকাশ, ইহারই নাম আপনাকে আপনি পাওয়া। কেন না সত্যের প্রকাশেরই নাম সত্যের উপলক্ষ।

ইংরাজীতে Appearance এবং Reality নামক দুইটা কথা আছে। Reality=সত্য, Appearance=প্রকাশ। কিন্তু Appearance কথাটা বড়ই ছেয় হইয়া পড়িয়াছে কেবল ইউরোপে নহে—ভাবতবর্ষেও। ভাবতীয় দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে 'আভাস' বা 'অবভাস' বলা হয় তাহাই Appearance। কথাটা এই—সত্যের প্রকাশ হইলে যেন 'সত্য'র আর 'সত্য' থাকে না; 'সত্য' অর্থাৎ সত্য যেন অস্বাভাবিক কুলবধু। অন্ধরেই ইঁহার চিব বসতি; বাহিরে ইনি কখন দেখা দেন না দিলেও স্বকোপে নহে—বস্তাবস্তাধিত 'কিছুত কিমাকার' বেশে গুটিপোকাক গুটিকপে। সত্যের প্রকাশ যেন অসম্ভব—পেচকরাজের ভ্রায় সত্য যেন চিরদিনই অন্ধকারে বিরাজমান। ক্যান্ট (Kant) প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন Noumena কখন প্রকাশিত হন না—বেদান্তেও তাহাই। এই জগৎ এবং এই মানবের বহিরিঙ্গিয় ও অন্তরীঙ্গিয়—অর্থাৎ এই বহির্জগৎ ও এই অন্তর্জগৎ এই দুইটাই জ্ঞানলাভের উপায় অথচ এ দুইটাই অবিদ্যামূলক। এ অবস্থার ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি? বেদান্তে আত্মাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সত্য কথা কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে মানবের আত্মাও অবিদ্যাগ্রস্ত। হুতরাং এই আত্মা যে বিষয়েই যে সিদ্ধান্ত করুক না কেন, সেই সিদ্ধান্তই প্রামাণ্যক হইতে পারে। যদি কেহ বলেন 'নির্ণাল আত্মাতে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন' এ সিদ্ধান্তও গ্রহীতব্য নহে। কারণ এ সিদ্ধান্তও মানবাত্মারই সিদ্ধান্ত। মানবাত্মাই যখন অবিদ্যাগ্রস্ত তখন তাহার সিদ্ধান্তের মূল্য কি? প্রকৃত কথা এই বেদান্তের 'অবিদ্যাবাদ' গ্রহণ করিলে ব্রহ্মবিষয়ে কোন সিদ্ধান্তই উপনীত হওয়া যাইতে পারে না। "স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে এই জগৎ অবিদ্যামূলক নহে—ইহা ব্রহ্মেরই। ইহা অবিদ্যাবাদ খেলা নহে 'ব্রহ্ম-সর্প' নহে—ইহা ব্রহ্মেরই প্রকাশ। আমাদের গ্রন্থকারও এই মতই পোষণ করেন। ব্রহ্মের প্রকাশ বিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন:—"সত্য যদি কল্পিত কালেও কাহারো নিকটে প্রকাশিত না হ'ন, না আপনার নিকটে না অন্তের নিকটে, কাহারো নিকটে কোনোকালে প্রকাশিত না হ'ন, আর, কোনো কালে যে প্রকাশিত হইবেন মূলেই যদি তাহার সম্ভাবনা না থাকে; তাহা হইলে 'সত্য আছেন'—কথাটাই মিথ্যা হইয়া যায়। সত্য যদি প্রকাশই না পান, তবে তিনি যে আছেন তাহা কে বলিল? সত্য যদি তোমার নিকটে জন্মেও প্রকাশ না পাইয়া থাকেন, আর তবুও যদি তুমি বলো 'সত্য আছেন', তবে তোমার সে কথার মূল্য এক কাণ কড়িও নহে।"

২। ব্যক্তাব্যক্ত রহস্য।

"যে চেনন আমাদের প্রপাচ নিদ্রাবস্থার আমাদের ভিতরে থকাইরা থাকে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না,—আমাদের স্বপ্নাবস্থার সেই চেননই বাসনাবশে ছিন্ন ভিন্ন ভাবে ছুটিয়া বাহির হয়, আবার জাগরণ কালে সেই চেননই অন্তঃকরণেব আপাদমস্তক অধিকার করিয়া মুক্ত চিদাকালে ইশনার (...বলবতী ইচ্ছার) জয় পতাকা উড্ডীয়মান করে।...প্রথমাবস্থায় অব্যক্ত চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম প্রাণ; মাঝেব অবস্থার অর্ধক্ষুত চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম মন; তৃতীয় অবস্থার স্বব্যক্ত

চেতনের নাম জ্ঞান"। "মনোবৃত্তি মাজেই—জ্ঞান, মন এবং প্রাণ তিনই—এক সঙ্গে বর্তমান থাকে; প্রভেদ কেবল এই যে কোথাও বা জ্ঞানের বিশেষ প্রাভুর্ভাব, কোথাও বা মনের বিশেষ প্রাভুর্ভাব, কোথাও বা প্রাণের বিশেষ প্রাভুর্ভাব। যেখানে জ্ঞানের বিশেষ প্রাভুর্ভাব, সেখানে সেই জ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণ-বৃত্তিই মোটামুটি জ্ঞান শব্দের বাচ্য, যেখানে ইচ্ছা বা মনের বিশেষ প্রাভুর্ভাব সেখানে সেই মন-প্রধান অন্তঃকরণ-বৃত্তিই মোটামুটি মন: শব্দের বাচ্য, আর যেখানে প্রাণের বা অব্যক্ত সংস্কারের বিশেষ প্রাভুর্ভাব সেখানে সেই প্রাণ-প্রধান, অন্তঃকরণ-বৃত্তিই মোটামুটি প্রাণ শব্দের বাচ্য।"

আত্মার এই তিনটি অবস্থার যে তিনটি নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা নিতান্তই পাঁজুরি বলিয়া মনে হয়। এই মত সমর্থনের জন্য কোন প্রকার যুক্তি দেওয়া হয় নাই। স্বপ্নাবস্থাতেই যে মনের অধিকতর ক্ষুষ্টি এ কথাটা নিতান্তই অযৌক্তিক। বরং ইহা বলাই সম্ভব যে স্বপ্নে জ্ঞান ও মন উভয়ই অর্ধক্ষুত অবস্থায় কার্য করে এবং জাগ্রতাবস্থাতে উভয়েরই পূর্ণ ক্ষুষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মা, যে সমুদয় মনো-বৃত্তির সাহায্যে স্বপ্নজগৎ রচনা করে, জাগ্রতাবস্থায় তাহার প্রত্যেক বৃত্তিই স্বব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞান (Psychology) এই কথাই বলিতেছে। গ্রন্থকারও প্রকারান্তরে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন; কারণ তিনি 'বলিয়াছেন যে জাগরণ কালে সেই চেতনই ইশনার জয়পতাকা উড্ডীয়মান করে। এবং স্বপ্নাবস্থায় সেই চেতনই বাসনার বশীভূত হয়। প্রভুপ্রধান (অর্থাৎ প্রবলা) ইচ্ছার নাম ইশনা এবং অধীনতাপ্রধান (অর্থাৎ অবলা) ইচ্ছার নাম বাসনা। আবার গ্রন্থকারের মতে ইচ্ছা=মন। জাগ্রতাবস্থায় ইশনাব প্রভু এবং স্বপ্নাবস্থা বাসনা ক্ষেত্র। হুতরাং বলা হইতেছে যে জাগ্রতাবস্থায় মন প্রবল এবং স্বপ্নাবস্থায় মন দুর্বল হইয়া থাকে। হুতরাং কি করিয়া বলিব যে স্বপ্নাবস্থাতে মন অধিকতর ক্ষুষ্টি লাভ করে?

৩। ত্রিগুণ রহস্য।

"বিশব্রহ্মাণ্ড সম্ব, রক্ষো ও তমো, এই তিন গুণের ত্রীভাষ্কত্র। সম্ব গুণ প্রকাশাম্বক, রক্ষো গুণ চেষ্টাম্বক এবং তমো গুণ প্রতি-বন্ধাম্বক। এখানে প্রথম বক্তব্য এই যে নৈশ অন্ধকারের প্রতিযোগে যেমন দীপালোক পরিস্ফুট হয়, অপ্রকাশের প্রতিযোগে তেমনি প্রকাশ পরিস্ফুট হয়। আবার রাত্রিকালে শয়ন ঘরের প্রদীপ নিভিয়া যাইবার সময় বিগত আলোকের প্রতিযোগে যেমন আগত অন্ধকার পরিস্ফুট হয় তেমনি প্রকাশের প্রতিযোগে অপ্রকাশও প্রকাশ পাইয়া উঠে। 'অতএব এটা স্থির যে প্রকাশের সঙ্গে কোনো না কোনো অংশে অপ্রকাশের অঙ্গন বা বিপ্রকাশের রঞ্জন লাগিয়া থাকে চাই-ই চাই, তাহা নহিলে প্রকাশের প্রকাশের রক্ষা পাইতে পারেনা'। 'দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে সবগুণই যেমন ত্রিয়ার রঙ্গ, প্রকাশ ও অপ্রকাশ গুণও তাই। যাহা প্রকাশ পায়, তাহা ক্রিয়া যোগেই প্রকাশ পায়; যাহা অপ্রকাশ হয়, তাহা কর্মোচ্চম গুটাইয়াই অপ্রকাশ হয়। প্রকাশিতব্য বিষয়ের আপাদ মস্তক সবটাই যদি এক উরামেই প্রকাশ পাইয়া চোকে, তাহা হইলে অপ্রকাশ একাই—যে কেবল ঘুচিয়া যায় তাহা নহে, অপ্রকাশের প্রতিযোগিতার অভাবে প্রকাশের প্রকাশও ঘুচিয়া যায়।...প্রকাশের আবির্ভাবে ক্রি-শক্তি উদ্যম প্রকাশ পায়; প্রকাশেব তিরোভাবে ক্রিয়াশক্তির সংযম প্রকাশ পায়; আবির্ভাব, তিরোভাব ভাবভাবেরই ওলোট্ট-পালোট্ট; অভাব হইতে ভাবে উত্থান করার নাম আবির্ভাব; ভাব হইতে নাবিয়া পড়িয়া অভাবে পরিসমাপ্ত হওয়ার নাম তিরোভাব।" হুতরাং 'দেখা যাইতেছে প্রকাশ গুণের সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটা গুণ অপরিহার্যরূপে জড়িত রহিয়াছে; একটা হচ্ছে অপ্রকাশ অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধককণী

জড়তা গুণ এবং আব একটা হচ্চে শক্তির প্রভাব অর্থাৎ প্রকাশের সোপানরূপী ক্রিয়া গুণ ।”

স্বাস্থ্য চেতনকেই সর্বশেষ প্রাচুর্য্যব এবং অস্বাস্থ্য চেতন-ক্ষেত্রে বজ্রোত্তপ্তের সর্বশেষ প্রাচুর্য্যব এবং অস্বাস্থ্য চেতন-ক্ষেত্রে তমোত্তপ্তের সর্বশেষ প্রাচুর্য্যব । কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিন গুণ একসঙ্গে বাস করে এবং একসঙ্গে কাজ করে ; প্রভেদ কেবল এই যে, সর্বশেষের প্রকাশক্ষেত্রে সর্বশেষ আর দুইগুণকে মাথা তুলিতে না দিয়া আপনি তাহাদের মাথা হইয়া দাঁড়ায় । বজ্রোত্তপ্তের ক্ষেত্রে বজ্রোত্তপ্ত অপর দুই গুণকে দাবিয়া বাধিয়া বল প্রকাশ করে । তমোত্তপ্তের জড়তাক্ষেত্রে তমোত্তপ্ত অপর দুইগুণের উপরে প্রভু হইয়া দাঁড়ায় । একসঙ্গে থাকে সবাই সর্বত্র ; তবে কি না কোথাও বা কেহ সঙ্গি-দৌহার পায়ের নীচে, কোথাও বা কেহ সঙ্গি-দৌহার মাথাব উপরে, কোথাও বা কেহ কেহ সঙ্গি-দৌহার মাথের জায়গার আসন পাড়িয়া বসিয়া যায় । যেখানে যেগণ সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করে, সেখানে সেই গুণেবই নাম কীৰ্ত্তিত হয়, অপর দুইগুণ গণনা মধ্য হইতে বহিষ্কৃত হয় ।”

এক প্রেরণ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আছেন তাঁহার্য্য বলেন ‘মূল প্রকৃতি এক প্রকার জড়ধর্ম্মী ত্রিঘাশক্তি—তমঃপ্রধান রজোত্তপ্ত’ । শ্রীমুক্ত বিজ্ঞানোন্মাদ ঠাকুর মহাশয় বলেন প্রকৃত কথা তাহা নহে ‘মূল প্রকৃতি ঈশ্বর্য্যধিষ্ঠিতা ব্রহ্মময়ী ঐশী শক্তি’ । মূল প্রকৃতিকে অজ্ঞান বলিতে চাও বলো ; যেহেতু তোমার আমার মুখের কথার প্রকৃত সত্যের কিছুই আসে যায় না—কিন্তু এটা অবশ্য গোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সে যে অজ্ঞান তাহা জ্ঞানভরা অজ্ঞান । তার সাক্ষী পশুপক্ষীরা যখন প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত হয়, তখন তাহাদের সব কাজই পাকা সজ্ঞান জ্ঞানের নিয়মে পরিচালিত হয় । বলিতে পারো যে, মোমাছি যখন প্রকৃতির অঙ্ক উত্তেজনার শুদ্ধ কেবল আপনার আপনার উদর পূর্ত্তি কবিবার জন্য মধু সঞ্চয় করে ; কিন্তু এটাও তো তোমার দেখা উচিত যে, তাহাদের সেই নিজের নিজের অঙ্ক প্রকৃতির ভিতরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল প্রকৃতি চাপা দেওয়া রহিয়াছে ; সেই বিশ্বব্যাপিনী মূল প্রকৃতি মোমাছির মধু সঞ্চয়ের ছদ্মবেশে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে রেণু চলাচল করিতে থাকে আর সেই গতিকে ফুলের গর্ভসঙ্কার হইয়া পুষ্পবৃক্ষের বংশ যুগযুগান্তর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নে প্রবাহিত হইয়া চলিতে থাকে । মোমাছির নিজের অঙ্ক প্রকৃতির সহিত ফুলের মধুর শুদ্ধ কেবল, ভক্ষ্যভক্ষক সম্বন্ধ ; মূল প্রকৃতির স্পর্শমণির সংস্পর্শে সেই ভক্ষ্যভক্ষক সম্বন্ধ রক্ষারক্ষক সম্বন্ধরূপে পরিণত হইতেছে—ইহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-গণের দেখা কথা । মোমাছি সচেতন জীব, আর, পুষ্পবৃক্ষ অচেতন উদ্ভিদ, একপ অবস্থায় পুষ্পবৃক্ষের বংশবন্ধার জন্য মোমাছির এত মাথা-ব্যথা কেন ? ফলকথা এই মাথাব্যথা মোমাছির নহে—মাথাব্যথা মূল প্রকৃতির । উদ্ভিদপ্রকৃতি এবং জীবপ্রকৃতির মধ্যে যে একটা বৈষম্য আছে মূল প্রকৃতির কাছে সে বৈষম্য মূলেই নাই । মূল প্রকৃতি ঈশ্বর্য্য-ধিষ্ঠিতা ঐশী শক্তি সূত্রায় জ্ঞানময়ী ।”

ক্রিপণের সঙ্গে ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ তাহা ‘অষ্টৈতবাদের সমালোচনা’ গ্রন্থে অতি পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে । পাঠকগণের হ্রবিধার জন্য সে অংশ উদ্ধৃত হইল :—“ঐশী শক্তিব প্রকাশ, অপ্ৰকাশ এবং বিচেষ্টা এই তিন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকাব্যেরা তাহাকে ক্রিপণায়ক বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন । জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশের প্রতিবন্ধক অম্ম আব কিছুই নহে, সে প্রতিবন্ধক তাঁহাকে ইচ্ছাপ্রবর্ত্তিত নিয়ম... জগতে ঈশ্বরের প্রকাশ ক্ষুণ্ণিত হইবার আপনারই নিয়মের অধীন । ঈশ্বর আপন ইচ্ছার বীর চেষ্টা বিচেষ্টিত করিয়া আপনারই নিয়মে আপনার ভাব এবং আপনার অভিপ্রায় জগতে প্রকাশ করিতেছেন । যদি বস্তু

যে ঈশ্বর এক মুহূর্ত্তে আপনার সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন না কেন ? তবে তাহাব উত্তর এই যে তিনি কাহাব নিকট তাহা প্রকাশ কবিবেন ? দ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকটে ? শবীবের মধ্যে যেমন জীবাত্মা অদ্বিতীয়, সর্ব-জগতে তেমনি পরমাত্মা অদ্বিতীয়—সুতরাং দ্বিতীয় ঈশ্বর দ্বিতীয় মহা-কাশেব স্তায় অসম্ভব । তবে কি ঈশ্বর আপনার সমস্ত ভাব কোনো জীবাত্মাব নিকটে প্রকাশ কবিবেন ? তাহা হইতে পারে না—যেহেতু ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের সমগ্রভাব বুদ্ধিতে পাবা অসম্ভব । এইজন্য ঈশ্বর জগতে একেবারেই আপনার সমস্তভাব প্রকাশ না কবিয়া জগৎকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দিকে, পাপ হইতে পুণ্যের দিকে, দুর্দ্বিপশি এবং অশান্তি হইতে শান্তি দিকে যথাক্রমে ও যথানিয়মে লইয়া যািতেছেন । অতএব জগতে অজ্ঞান থাকিবেই, পাপ থাকিবেই, অশান্তি থাকিবেই । কিন্তু আবার ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এমনি সর্বজন্য যে, অজ্ঞানকে দমন-করিয়া জ্ঞান উত্তরোত্তর বিকশিত হইবেই—পাপকে দমন করিয়া পুণ্য উত্তরোত্তর বিকশিত হইবেই—নাশ প্রকার অশান্তি এবং উপদ্রব দমন করিয়া শান্তি উত্তরোত্তর বিকশিত হইবেই । কেন না ঈশ্বর আপনার ভাব এবং অভিপ্রায় উত্তরোত্তর প্রকাশ করিবার জন্যই আপনার অস্বাস্থ্য শক্তিকে ব্যস্ত জগতে পরিণত কবিতেছেন । পৃথিবীতে ঐশ্বরিক ভাবের চরম অভিব্যক্তি কি ? না জীবাত্মার বুদ্ধির জ্ঞানালোক ; কেন না জগৎ হইতে জ্ঞানালোক অপসারিত হইলে জগৎ অন্ধকার হইয়া যায় । জ্ঞানালোকের প্রতিবন্ধক কি ? না তমোত্তপ্ত । তমোত্তপ্ত কি ? না ঈশ্বরের আপন ইচ্ছাপ্রবর্ত্তিত নিয়ম—ঈশ্বরের হস্তেব রাশ ; কেন না ঈশ্বরের প্রকাশ ক্ষুণ্ণিত ঈশ্বরেরই নিয়ম দ্বারা প্রতিবন্ধক হইতে পাবে, তা বই, তাহা বাহিরের কোনো প্রতিবন্ধক দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেনা । এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, ঈশ্বরের ঐশী শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা শব্দের বাচ্য হয় কেন ? ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশাত্মিকা, বিচেষ্টাত্মিকা, নিয়মাত্মিকা—তাই ত্রিগুণাত্মিকা ।” পৃঃ ৬৪-৬৬ ।

(৪) দ্বন্দ্ব রহস্য ।

এই প্রকরণে সমাধির কথা বলা হইয়াছে । “মনঃ সমাধান কবিবে যাঁহা বুঝার তাহাই সমাধি । গঙ্গাজলই যেমন গঙ্গার সর্বত্র তেমনি মানস বলিয়া একটা মনোবৃত্তি আছে, তাহাই মনের সার-সর্বস্ব । মানস, সমস্ত, ইচ্ছা, মন, একই । এই মানস সরোবরের দুই পাশ । এক কূলে প্রাণ, অপর কূলে জ্ঞান । মানস সরোবরের জ্ঞানখ্যাসা কিনারাটি প্রভাবাত্মক বা প্রভুত্বপ্রধান বা ‘পাণ্ডয়া-প্রধান’ ইচ্ছা, সংক্ষেপে ঈশনা ; আর মনের যে পার্শ্বটি প্রাণের কূল ঘেষিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস সরোবরের সেই পার্শ্বখ্যাসা কিনারাটি অভাবাত্মক বা অধীনতাপ্রধান, বা ‘চাণ্ডয়া-প্রধান’ ইচ্ছা, সংক্ষেপে বাসনা । সরোবরের মধ্যস্থলে একটা উপদ্বীপ আছে, সেইটির নাম সমাধি উপদ্বীপ । সমাধি উপদ্বীপের মাঝখানে একটা কোয়ারা আছে, সেই কোয়ারাটির চারিদিকে একটা পদ্মবন-সুশোভিতা পুষ্পবর্ষি আছে । কোয়ারা এবং পুষ্পবর্ষির জলের আসান প্রদান চলিতেছে ক্রমাগতই । পুষ্পবর্ষি বারাবার কোয়ারাতে স্নান সঞ্চার করিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে এবং বারান্তরে কোয়ারাব জলে স্নানটি হইয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে । পুষ্পবর্ষিটির নাম হৃৎপদ্মিনী এবং কোয়ারাটির নাম আনন্দ-উৎস । জ্ঞানের-পাণ্ডয়া (অর্থাৎ ঈশনা) এবং প্রাণের চাণ্ডয়া (অর্থাৎ বাসনা) মানস সরোবরের চর্চাচর্চী । বিচ্ছেদের সময় চর্চা এপার হইতে (প্রাণের কূল হইতে) ডাকাডাকি করে, চর্চা ওপার হইতে (জ্ঞানের কূল হইতে) সাড়া দায় । মিলনের সময় চর্চা এপার হইতে প্রাণের সম্বল লইয়া এবং চর্চা ওপার হইতে জ্ঞানের সম্বল লইয়া সমাধি উপদ্বীপে হৃৎপদ্মিনী ধারে একত্রে মিলিত হয় ; আর অগ্নি আনন্দের কোয়ারা খুলিয়া যায় । চাণ্ডয়া ও পাণ্ডয়া (অর্থাৎ বাসনা ও ঈশনার) বিচ্ছেদ মিলনের এই যে বহুত ইহারই নাম দ্বন্দ্ব রহস্য ।”

যিনি সমস্ত বিষ ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দের প্রস্রবণ তিনিই মহাপুরুষদিগের মনের আনন্দ প্রস্রবণ। এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই সমুদ্রের সমগ্র জ্ঞান মন প্রাণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেনা। সেই এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্যে সবই আছে; আনন্দ আছে, জ্ঞান আছে, প্রাণ আছে, শক্তি আছে, 'নাই' শব্দই সেখানে নাই। তাঁহারই একতম শক্তি বাহা আমাদের স্বশক্তিকপিণী সেই অহমাম্বিকা অপরা শক্তির বশতাপন্ন হইয়া আমরা -মণিহারী স্বর্গীয় স্ত্রায় মণি অন্বেষণ করিয়া সারা হইতেছি এবং আর যে শক্তি—সেই দিব্যাপরা শক্তি—আমাদের মন হইতে বাহা ভ্রম প্রমাদ মোহের নিবিড় অন্ধকার সবাইয়া দিবে, সে শক্তি তাঁহাবই শক্তি। সে শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, সে শক্তি তিনিই স্বয়ং, সে শক্তি জগতের সর্বত্র কার্য করিতেছে; ভূগর্ভে অগ্নিরূপে কার্য করিতেছে, জীবের হৃদয়ে প্রাণরূপে কার্য করিতেছে, মস্তকে বুদ্ধিরূপে কার্য করিতেছে, আকাশে জ্যোতিরূপে দীপ্তি পাইতেছে। আমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষেরা সেই শক্তিরই ত্রিসন্ধ্যা গান করিতেন, তাঁহাদের ধ্যানের মন্ত্র ছিল শুধু এই যে 'সেই জগৎপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় তেজ বাহা ভূ-ভূ-ব-স্ব-কপী বিশ্ব ভুবনের সার্ব সর্বত্র—সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি—তিনি আমাদের পক্ষে জ্ঞান দান করুন। তাঁহার মঙ্গলময়ী শক্তিতে আমাদের জ্ঞানের সমুদ্র হইতে মোহের আড়াল সরিয়া গেলে—(সে আড়াল আর কিছুই না কেবল আমাদের চিরান্ত সন্তারের ঘূমের ঘোর এবং বাসনার স্বপ্ন—তাঁহা সরিয়া গেলে—) সাক্ষাৎ সত্যকে পাইয়া আমরা প্রাণ, জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি এবং আর বাহা কিছু আমাদের চাই সবই পাইব একাধারে—আমাদের কিছুই আর অভাব থাকিবেনা। তখন আশ্চর্য্যমিত হইয়া দেখিব যে হারামণি আমাদের অন্তরতর আশ্রি, তোমার আমাব—চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরতর আশ্রি; তাহা হারাইবার জিনিষই নহে। তখন দেখিয়া আমাদের আনন্দ ধরিবেনা—যে, যাহার ক্ষমতা আমরা বৎসহা বা গভীর স্ত্রায় সারা রাজ্যে কামিয়া বেড়াইয়াছিলাম তাহা কোথাও যায় নাই, তাহা আমাদের নিকট হইতে নিকটে—হাতের মুঠার মধ্যে, আমরা তিনি, প্রাকৃতি, জ্ঞান তিনি, আনন্দ তিনি।"

সংক্ষেপে ইহাই প্রস্তাবের মত। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা কীত হইয়াছি—আশা করি পাঠকগণও কীত হইবেন।

আমরা এক অর্থে ব্রহ্ম হইতে পৃথক, অন্য অর্থে অপৃথক। প্রাণ, মন, জ্ঞানাদি সমুদয়ই আত্মা, কিছুই আত্মার বহির্ভূত নহে। 'ব্রহ্ম সর্বক্ষণই তাঁহার সমস্ত শক্তিসমমিত সত্ত্ব ব্রহ্ম'। তিনি জ্ঞানময় ও প্রেম স্বরূপ। এ জগৎ তাঁহারই জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির পরিচয়। ইত্যাদি মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহামুভূতি আছে। কিন্তু প্রহৃৎকালের দুই একটা মত নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতেছে। স্বপ্রাস্ত চৈতন্যকে মন বলা হইয়াছে। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে এই মনই সমাধির স্থল। তবে কি সমাধি স্বপ্নাবস্থার স্ত্রায় শূন্য চৈতন্য? এমন বুদ্ধিবৃত্ত বলিয়া মনে হয় না। সমাধি জ্ঞানের নিম্ন ভাগে নহে।

গ্রন্থের আরও দুই একটা ক্রটি আছে। প্রথমত: 'হারামণি' নামটা উপযোগী হয় নাই। আমি কি পরমেশ্বরকে প্রাণের সহিত চাহিয়া জ্ঞান দ্বারা লাভ করিয়াছিলাম? তাহার পর কি এই মার্গ হারাইয়াছি? ইহা যদি না হয় তবে 'হারামণি' নামের উপযোগিতা কোথায়? দ্বিতীয় ক্রটি অমার্জনীয়। গ্রন্থকার বহুস্থলে কলিকাতার অপভাষা ব্যবহার করিয়া গ্রন্থের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। এ সমুদয় ক্রটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

বিবাহবৈচিত্র্য।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কচিছেলেবাই ঠাকুরমার মুখে তাহার ভবিষ্যতেব রাজা বউ ও বিবাহেব কথা শুনিতে শুনিতে আনন্দে ঘুমাইয়া পড়ে। বিবাহের প্রতি মানুষের বক্তের টান; কাজেই অমন সুমিষ্ট কথা—কেবল বালক কেন, কবি দীনবন্ধুর বাজীব মুখোপাধ্যায়ও শুনিতে ভালবাসেন। অত্মদেশের ছেলের বিবাহেব কথায় ঘুম পায় কিনা, জানি না; কিন্তু পেঁচোর মা যত নিন্দা রটাইলেও অনেক নামজাদা দেশেব বুড়াও সুবিধা পাইলে বিবাহেব উদ্ভোগ করিতে ছাড়ে না। ক্ষুধা এবং প্রেম, এই দুইটি স্তম্ভেব উপরই সমাজের স্থিতি; কাজেই আহার এবং বিবাহে বৈরাগীরও বৈরাগ্য হয় না।

আহার এবং প্রেম সমাজবন্ধনেব মূলে; কাজেই নর-সমাজের সর্বত্রই বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। মানুষেব যখন সমাজতন্ত্র ভাল কবিয়া বুদ্ধিবাদ বয়স হয় নাই, বিবাহাদি অশুষ্ঠানেব ইতিহাস আবিষ্কাবেব ক্ষমতা জন্মে নাই, তখনও মানুষে এক একবার ভাবিত, বিবাহ প্রথাটা কেমন কবিয়া জমিল, এবং ঐ প্রথা না থাকিলে চলিতে পারিত কি না। সৃষ্টির একটা তত্ত্ব খাড়া কবিতে হইলে যেমন ধরিয়া লইতে হয়, যে এক সময়ে কিছুই ছিল না; এবং তাব পর কাবণ জানিলে মা হোক একটা কিছু ঘটিল; তেমনি বিবাহের একটা তত্ত্ব গড়িতে হইলেও প্রথমে উহা ছিল না বলিয়াই লোকে কল্পনা কবে। তাই মহাভারতাদি গ্রন্থে আছে, যে এক সময়ে রমণী স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন, পরে ঘটনাবশে স্ত্রীকে বিবাহের আইন জারি করিয়া দিলেন। মিসর এবং মহা-চীন ভারতের মত প্রাচীন দেশ; সে দেশেও স্ত্রীকে তুর স্থলে যথাক্রমে মেনেস এবং ফাউ-হির উদ্ভাবনার কথা শুনি।

স্বেচ্ছাচারেব পর বিবাহ, একথা মেক্লিনেন, লাবক, লিতর্নো প্রভৃতি একালেব সমাজতত্ত্ববিদেরাও কতকগুলি কুপরীক্ষিত ঘটনা-অবলম্বনে লিখিয়াছিলেন। এই সমাজ-তত্ত্বজদিগেব মত অনুসরণ করিয়া আমি ৩৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রেমবিকাশ নামক কবিতা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ফিন-

লাঙের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ওয়াষ্টারমার্কের সমস্ত বিচারে ব্যক্তিচরিত্র নিয়মে ব্যক্তিচরিত্র বা ব্যক্তিক্রম বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। অধিকাংশ পণ্ডিতেবাই তাঁহার উপপত্তি* স্বার্থ বলিয়া মনে করিতেছেন। যে সকল তর্কে ও দৃষ্টান্তে ঐ উপপত্তি উপস্থাপিত, তাহার পরিচয় দিবার পূর্বে,—বিবাহ প্রথা যেমন কবিতা ক্রমবিকাশ লাভ করিল, তাহাও জ্ঞানিবার পূর্বে, একালে যত রকম বিবাহ আছে তাহার সহিত পরিচয় লাভ করার প্রয়োজন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সকলেই ঋষি জ্ঞাবাল নহেন; বানবন্দ্য অতি পূর্বপুরুষেরাও বিবাহে বদ্ধ হইত, এ সংবাদটা ভাল।

কত রকমের বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে পারিলে যে সমাজে যে বিবাহ আছে সেই সমাজের ইতিহাস এবং পাবিপাশ্বিক অবস্থার আলোচনা করিয়া বিবাহের প্রকৃতি এবং বিকৃতির সমালোচনা করা চল। দৃষ্টান্ত বিদেশী হইলে এদেশের পাঠকদের পক্ষে ঘটনার কিম্বা উপপত্তির সত্যতা নির্ধারণ করা সম্ভবপূর্ণ হয় না। সেইজন্য কেবল ভারতবর্ষের আর্থ্যোত্তর জাতির বিবাহ বৈচিত্র্য-কথা বলিব। আশাকবি একালের শিক্ষিতেরা অনার্যের বিবাহসভার উপস্থিতির নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিবেন না।

বঙ্গদেশে বহুশ্রেণীর অনার্য জাতির বাস; কিন্তু উহারা এখন সম্পূর্ণরূপে অপনাদের প্রাচীন প্রথা পদ্ধতি পবিত্রাব কবিতা, আর্থ্যদিগের সকল অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছে। কায়েই খাটা বঙ্গদেশে অনার্য বিবাহ প্রথা কোন নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে না। ওড়িশা প্রদেশেও আর্থ্যসমাজ-ভুক্ত অনার্যেরা ছাড়া বিবাহ প্রথা ভিন্ন সকল বিষয়েই আর্থ্য প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। যাহা করে নাই, তাহার, প্রায়শঃ পার্শ্ব প্রদেশে আর্থ্যের গণ্ডির বাহিরে বাস করে।

* Theory কথায় বাঙ্গালা উপপত্তিই বেশ। একালে জায়ের কচ্চি ছাডিয়া সাহিত্যে উহার অর্থ এইরূপ।—(১) বস্তু শতাব্দীর ক্রিয়াতত্ত্বনীয়ে reason, ground অর্থে ব্যবহার আছে; যথা—প্রিয়মু যৈঃ পার্থিবোপপত্তিঃ। তাহার পর তর্কের সহিত উপস্থাপিত কথাও ঐ অর্থে উপপত্তি; যথা :—উপপত্তি মন্বজ্জিতং বচঃ। (২) সাহিত্য-দর্পণের ৪৮২ কারিকায় ক্রিয়াতে ব্যবহৃত শেষ অর্থ আরও পরিষ্কার।

ওড়িশা এবং গঙ্গার আশ্রয় এবং পার্শ্ব প্রদেশে কন্দ জাতি এখনও বিবাহপ্রথা প্রাচীন বজায় রাখিয়াছে। আর্থ্যের স্মৃতি শাস্ত্রে যাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে তামিল ভাষায় সেই প্রকার বিবাহ প্রথা নাম ইরবাক্ষন। কন্দদিগের মধ্যে এখন বিবাহের পূর্বে সম্বন্ধ স্থির করা প্রথা হইয়াছে, এবং পাত্রীর সুলভতার অভাবে “গস্তি” বা শুদ্ধ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাচীন স্বামীন ভাব দূর হয় নাই এবং এখনো রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত আছে। অনুষ্ঠান গুলি আর্থ্য-অনার্য মিশ্রণ, পাঠকেরা নিজে দেখিয়া লইবেন; আমি কেবল একটি একটি করিয়া বিবাহ প্রথার বর্ণনা করিব।

কন্দ বিবাহ।

কন্তা বয়স্ক না হইলে বিবাহ হয় না, কিন্তু বিবাহ স্থির করিবার ভার সাধারণতঃ পিতামাতার উপর। কন্তার মূল্যের জন্য অবস্থা বিচারে কোন একটি দ্রব্য “গস্তি” স্বরূপে দিতে হয়; যথা :—একটি মহিষ কিম্বা একটি শূকর কিম্বা একখানি পিতলের পাত্র। সকল অনার্যদের মধ্যে গোত্র ভাগ দেবিত্তে পাওয়া যায়; এই গোত্র পরিচয় এখানে দিতে পারিব না। কন্দদিগের গোত্র প্রায়শঃ “মুতা” বা গ্রামসীমায় বদ্ধ থাকে। আপনাদ “মুতা”য় বিবাহ করা নিষিদ্ধ। কন্তার বিবাহ পিতৃগৃহে হয় না। কন্তার মাতুলের ঘাড়ের উপর চড়িয়া কন্তাকে বরব গ্রামে যাইতে হয়; এবং কন্তাঘাত্রী কেবল গ্রামের যুবতীরাই থাকে। বাজনা বাজাইয়া এবং মামা-বোড়ার কাঁধে চড়িয়া যখন কন্তা বরব গ্রামে কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বরব গ্রামের যুবকরা লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া কন্তা লুটিতে যায়। অমনি যুবক যুবতী দলে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কন্তার পক্ষের যুবতীরা ঢিল পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করে এবং বর পক্ষের যুবকেরা লাঠির আঘাতে সেগুলি উড়াইয়া দেয়। এই লাঠিখেলায় বেশ কৌশল আছে; কিন্তু কখন কখন যুবতীর হাতের ঢিল পাথর অনেক বলিষ্ঠ যুবককে কাহিল করিয়া দেয়। লবঙ্গলতার দোলনিত্তে সমীরণ ললিত হয় স্তনিয়াছি, কিন্তু যুবতীর হাতেব ঢিল হয়ত বড় ললিত হয় না। যাহা

হউক, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরে বরের মাতুল আসিয়া কস্তাটি ছিনাইয়া লইয়া বরের ঘবে পৌছাইয়া দেয় ।

অনার্যদের প্রথার প্রভাবে বঙ্গদেশে একটি বীতি জন্মিয়াছে যে, বধূকে মামাশুশুরের মুখ দেখিতে নাই । কন্দ সমাজের মামাশুশুরের উক্তবিধ কত্তা সংগ্রহের মূলে, এমন কোন লুকান ইতিহাস নাই ত, বাহার জন্ত ঐ প্রথার উৎপত্তি ? যাহা হউক রাত্রে আহার, মদ্যপান এবং নৃত্যের পর, প্রেমসম্ভাষণে বর কস্তাব বিবাহ সমাপ্ত হয় । পূর্বে বলিয়াছি যে বিবাহ মাতা পিতা স্থির করেন, কিন্তু পার্শ্বত্যাগ কন্দেরা আপনাবাই স্থির করিয়া থাকে । এক গ্রামের অবিবাহিত এবং অল্প গ্রামের অবিবাহিতাগণ, যাহাতে পূর্বরাগে উদ্দীপ্ত হইতে পারে, তাহার জন্ত ব্যবস্থা আছে । উভয় গ্রামের বাহিরে একটি ঘরে বহুসংখ্যক কুমার কুমারী একত্রে রাত্রি যাপন করে । প্রণয় সম্ভাব্যেব পর বিবাহ স্থির হইয়া গেলে, “গস্তি” প্রভৃতি দিয়া পূর্ব বর্ণিত মতে বিবাহ হয় ।

শবর বা শহরা বিবাহ । -

আর্যেরা প্রাচীনকালে বিজ্ঞাপ্রদেশের সকল অনার্যকেই শবর বলিতেন বলিয়া মনে হয় । সম্বলপুৰ অঞ্চলের শবরেরা আপনাদের ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে, এবং অনেক বিষয়েই হিন্দু প্রতিবেশীর প্রথা অবলম্বন করিয়াছে । কিন্তু এখনও শবর এবং গোঁড়েরা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের জল পর্যন্ত স্পর্শ করে না । ওড়িশায় জগন্নাথ দেবের ইতিহাসে পাই, যে এই শবরজাতিব ঘবেই জগন্নাথ ঠাকুর ছিলেন । যাহা হউক, ওড়িশায় একদল শবর, ঠাকুরের রূপায় এখন গ্রাম ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণিত । গঙ্গাম প্রদেশের শবরেরা অনার্যত্ব সন্মান বজায় রাখিয়াছে বলিয়া, তাহাদের বিবাহেব কথাই বলিব । ১৮৮৮ সালের সোসাইটির পত্রিকায় ফস্টে নামক এক ইংরেজ ইহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিয়াছিলেন ।

শবর যুবক যুবতীর পূর্বরাগ জন্মে পথে-ঘাটে ; কিন্তু বিবাহার্থী বরকে, কস্তার গৃহে গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিতে হয় । বিবাহার্থী বর, আপনার মনোনীতা পাত্রীর গৃহে, তীর ধনুক, এক হাঁড়ি মদ, এবং এক জোড়া পিতলের খাড়া লইয়া উপস্থিত হয় । কস্তাব পিতা আসিয়া বলেন, “বাপু, যদি আরো মদ দিতে পাব, তবে তোমার সঙ্গে কথা কহিব ।”

যাহা হোক, এক হাঁড়ি মদেই সকলকে মুখর করিয়া তোলে । বিবাহার্থী তখন ঘরের চালে তীর বিধাইয়া দিয়া কস্তাব মর্তার হাতে খাড়ু পবাইয়া দেয় । তীব বিধাইবার অর্থ, ভূতের উপদ্রব নাশ করা, প্রেমশর নিক্ষেপের অভিনয় নহে । ইহার পর বিবাহার্থী আর একদিন পাত্রীর গৃহে যায় ; সেদিন কস্তাব পিতা উঠাকে দু এক ঘা প্রহার করিয়া বিদায় করিয়া দেয় । তাহার পর বিবাহেব নির্দিষ্ট দিনে, বর কয়েকজন যুবক সঙ্গী লইয়া পাত্রীর গ্রামের কোন জলাশয়ের তীরে বসিয়া থাকে । পাত্রী কলসী কঁাকে জল আনিবার ছল করিয়া যায়, এবং বর ও বরযাত্রীরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া পলাইয়া যাওয়ার অভিনয় করে । গ্রামের লোক “ধর ধর” বলিয়া পিছনে ছোটো ; কিন্তু ধবে না । ছুটিতে ছুটিতে সকলে বরকে গ্রামে উপস্থিত হইয়া আমোদ প্রমোদ করে । বিবাহের সময়ে অবিবাহিতা মেয়েরা গায়ে জল ছিটাইয়া দেয়, সধবারা কস্তাকে নূতন কাপড় পরায়, এবং গ্রামের যুবকেরা অমঙ্গল নাশেব জন্ত চাবিদিকে শব পুঁতিয়া দেয় । বিবাহের পর বর কস্তা তীর ছুঁড়িয়া চালে বিধাইয়া গৃহে প্রবেশ করে ।

মালজাতির বিবাহ ।

গোদাবরী জেলায় মালজাতির মধ্যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কস্তাহরণ প্রচলিত আছে । যুবতী কুমারীকে পথে ঘাটে ধরিয়া বাড়িতে লইয়া যে বিবাহ হয়, তাহাতে কুমারীর সম্মতি থাকে না । বিবাহের পর কুমারীর পিতামাতাকে শুদ্ধ না দিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, এই পর্যন্ত । অল্প দিন পূর্বে, বিদেশী পুলিশ, উহার একটা ঘটনা দণ্ডবিধির অপরাধ মনে করিয়া বরকে ফৌজদারীতে চালান দিয়াছিল । কোইষাটুরের ওড়ুডে এবং উরালি জাতির মধ্যে এই প্রকাব বিবাহের নিদর্শন পাওয়া যায় ।

বাদাগা বিবাহ ।

নীলগিবিব বাদাগা জাতির বিবাহার্থী প্রথমে গ্রামের লোককে জানায়, যে যদি অমুক কুমারীকে সে বিবাহ কবিতে না পারে, তবে সে আত্মহত্যা করিবে । গ্রামের লোকে তাহাকে সঙ্গে করিয়া গিয়া কুমারী চুরি করিয়া আনে ; বলা বাহুল্য যে কেহ বাধা দেয় না ।

গদবা বিবাহ ।

বিজ্ঞাপনস্বত্বের গদবা জাতির বিবাহের রীতি এই, যে বিবাহ প্রস্তাবের পর বরকন্তাকে একটি জুঙ্গলে যাইতে হয়। কন্তাটি সেখানে একথানা কাঠে আগুন ধরাইয়া বরের গায়ে চাখিয়া ধরে; এ দ্বাৰা সহ্য করিয়াও যদি বর চীৎকার না করে, তবে বিবাহ হয়; নচেৎ নহে। হাড় জালাইবার পূর্বেই কুমারীরা যে এই অমুষ্ঠান করেন, সেটা ভাল। হইতে পারে যে কন্তার অভিরুচি অনুসারে এই দাহ-প্রক্রিয়া কোথাও অল্প হয়, কোথাও বা চীৎকার করাইবার জন্য বেশি মাত্রায় হয়।

পল্লন বিবাহ ।

পল্লনেরা তামিল-ব্রূহক। বিবাহ সম্ভার বরকে কৃত্রিম অভিমান দেখাইয়া সভা হইতে উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিতে হয়, “আমি আর সংসারে থাকিব না; এবারে বনবাসে চলিলাম।” কন্তার পিতা তখন আসিয়া বলেন,—“বাবু, বনে গিয়া কাজ নাই; আমাব মেয়েটিকে তোমায় দান করিতেছি।” রাগ মিটিয়া যায়; এবং বিবাহ সম্পন্ন হয়। হিন্দুস্তাবাপন্ন কমসলা জাতির মধ্যেও এই প্রথা আছে; সম্ভবতঃ উহার মূলতঃ পল্লনের মত কোন জাতি। কমসলা বর একটা ভাঙ্গা ছাতা এবং একটি ঘাট হাতে কবিয়া বলে, “আমি ব্রহ্মচর্য্য করিতে কাশী চলিলাম।”

হেগ্গড়ে বিবাহ ।

কাণাড়া (কর্ণাট) দেশের এই জাতিটার নাম বড় খটমটে; কিন্তু ইহাদের বিবাহে একটুখানি কবিত্ব আছে। বরকে কন্তার একটি আংটি চুরি করিয়া পলাইতে হয়। কন্তা বলে, যে চোর তাহার অলঙ্কার চুরি করিয়া পলাইয়াছে। তখন বাড়ীর লোককে “চোবের” অমুসন্ধানে বাহির হইতে হয়। খুঁজিয়া ত পাইবেই; যখন চোর ধরা পড়ে, তখন তাহাকে কন্তার সমক্ষে চুরি কবুল করিতে হয়। বিচারে যে সাক্ষ্য হয়, তাহা অর্থা-অনার্থ্য সকল সমাজেই এক; এই ব্যবজীবন কাব্যবাসেব জন্য সকলেই লালায়িত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

সিয়ার্-উল্-মুতাখখরীন

এই গ্রন্থ বাঙ্গলার এক অমূল্য ইতিহাস। ইহাতে ১৭০৭ হইতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পোনে এক শতাব্দী কালের অতি সুবিস্তৃত বিবরণ আছে। আওরাঙ্গজেবের মৃত্যু হইতে আরম্ভ কবিয়া, মোঘল রাজবংশের দ্রুত অবনতি, বাঙ্গলার নবাবদের স্বাধীনতা অবলম্বন ও ধন-জন-বল-বৃদ্ধি, ইংরাজ বণিকদিগের উন্নতি এবং বঙ্গে রাজ্যের উপর রাজা হওয়া, উত্তরভারত-ব্যাপী মহাযুদ্ধ, এবং শেষে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক ভারতে ইংরাজশক্তি প্রধান ও স্থায়ী করা,—এই সমস্ত প্রধান প্রধান ও আশ্চর্য্য ঘটনা ইহাতে যেমন বর্ণিত হইয়াছে এমন আর কোন মূল গ্রন্থে হয় নাই। ইহার রচয়িতা সৈয়দ বোলাম হোসেন (আল্ তবা তবাই আল্ হসেনী) একজন সম্ভ্রান্ত দিল্লীর মুসলমান। তিনি ও তাঁহার পিতা হেলাৎ আলি খাঁ বাঙ্গলাব নবাবদের রাজ-সভায় অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। বোলাম হোসেন এই ইতিহাসের অনেক ঘটনা স্বচক্ষে দেখেন, এবং আবও অনেকগুলি সেই সেই ঘটনার অভিনেতাদের নিকট শুনেন। (ফারসী গ্রন্থেব ভূমিকা)। অনেক ইংরাজ কর্ম-চারীর সঙ্গেও গ্রন্থকারের বন্ধুতা ছিল। সেনাপতি হেক্টর মন্রো তাঁহাকে লেখেন “আপনি যদি যোগাড় করিয়া রোহতাস দুর্গ ইংরাজদের হাতে দিতে পারেন তবে আপনার সহিত আমাদের বন্ধুতা আরো বাড়িয়া যাইবে।” (মূল ফারসী বহিব ৩৩৮ পৃষ্ঠা)। গুর্গান খাঁর সঙ্গে তাঁহার কথা-বার্তা ৩০৫ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান ও ইংরাজ উভয় পক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব থাকায় সেই শতাব্দীর প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে বোলাম হোসেন যেরূপ সুবিধা পান সেরূপ সুবিধা আব কাহারই হয় নাই। সুতরাং সমসাময়িকতা ও মৌলিকতার হিসাবে এ গ্রন্থ অমূল্য।

দ্বিতীয়তঃ ইহাতে প্রচুর উপাদান আছে। গ্রন্থকার শাহআলম বাহাদুর শাহ হইতে ৭ জন দিল্লীর বাদশাহের ইতিহাস কতকটা সংক্ষেপে দিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সকল অসাব অক্ষম বাঙ্গ-পুস্তলিকার দীর্ঘ বিবরণ আবশ্যক নহে। তাহার পর আলীবর্দি হইতে বাঙ্গলাব নবাবদের বিবরণ এত দীর্ঘ এত সুন্দর ও বিবিধ ঘটনাপূর্ণ যে তাহা হইতে

ইতিহাস কেন, সমাজের অবস্থা, দেশের দশা, ধর্মের পরিবর্তন, জনসাধারণের আচার, ব্যবহার, বিশ্বাস, প্রকৃতি অনেক বিষয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ সেই সময়কার ঐতিহাসিক চবিত্তগুলির এক একটা দীপ্ত ছবি পাঠকের মানসপটে আসিয়া পড়ে। ইহাব পাশে বিদ্যাজ্ঞ-উদ্-সালাতীনকে স্কুলেব ছেলেরেব ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসারের সংক্ষিপ্তসার বলিয়া বোধ হয়।

তৃতীয়তঃ ইহা আমাদের দেশের লোকের লেখা দেশের ইতিহাস। আমবা ইংবাজ-লিখিত ইতিহাসই বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ কবি; “অপব পক্ষ” কি বলেন জানি না, জানিতেও চেষ্টা কবি না। স্মৃতবাং আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, আংশিক সত্য মাত্র। যে অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব ঘটনাবলি বঙ্গের—বঙ্গের কেন, সমস্ত ভাবতের—ভাগ্যপরিবর্তন করিল, তাহা তখনকার একজন শিক্ষিত সম্রাট ও চিন্তাশীল ভাবতবাসীর জন্মে কেমন লাগিয়াছিল একথা বুঝিতে হইলে সিয়াব-উল-মুতাখ্বারীন পড়িতেই হইবে। গ্রন্থকার সরাঙ্গ-উদ্-দৌলাব নিমকহারাম কর্মচাবীদের নির্ভয়ে নিন্দা করিয়াছেন (ফার্সি ২৩০ পৃষ্ঠা); শূজা-উদ্-দৌলা যে আশস্ত ও অসাবধানতায় বক্রাবে মুষ্টিমাত্র ইংবাজসেনার নিকট পরাস্ত হইলেন তাহাও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন (৩৩১ পৃঃ); মীব কাসিমের বিবরণে সেই তেজস্বী ও দক্ষ নবাবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইয়াছেন।

অথচ ঘোলাম হোসেন ধর্ম্মাঙ্ক ক্ষুদ্রচেতা কুপমণ্ডক ছিলেন না। গ্রন্থের শেষ দিকে মোঘলবাজের অধঃপাতের কাবণ, ইংবাজ ও মুসলমান শাসনের তুলনা প্রভৃতি কয়েকটা চিন্তাপূর্ণ অধ্যায় আছে। অতি কম ফার্সি গ্রন্থে এইরূপ ইতিহাসের দার্শনিকতত্ত্ব (Philosophy of History) দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সব কাবণে বিজ্ঞ সমাজে এই পুস্তকের বড়ই আদর। গ্রন্থ লেখা হইবা মাত্র বড় লাট ওয়াবেন হেষ্টিংস ইহার অনুবাদ করাইবার জন্ত ব্যগ্র হন।

So valuable was it deemed on its first appearance, that Mr. Warren Hastings became extremely anxious to have it translated into English. (*Briggs's Siyaur-ul-Mutakherin*, iv.)

এ অনুবাদ মুস্তাফা নামক একজন মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী

ফরাসী বচনা করেন। তাহার পর শিক্ষাসমিতির আজ্ঞায় (by order of the General Committee of Public Instruction) ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হাকিম আব্দুল-মজিদ কর্তৃক আসল গ্রন্থেব এক বৃহদাকার মূল্যবান ও স্নন্দব সংস্করণ কলিকাতায় মেডিক্যাল প্রেসে ছাপা হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বিলাতের বিখ্যাত Oriental Translation Fund নামক সমিতির উদ্যোগে কর্ণেল ব্রিগ্গস্ আঁব এক ইংবাজী অনুবাদেব প্রথম খণ্ড বাহির করেন। তিনি লিখিয়াছেন—

The work is written in the style of private memoirs, the most useful and engaging shape which history can assume, nor, excepting in the peculiarities which belong to the Mahomedan character and creed, do we perceive throughout its pages any inferiority to those of the historical memoirs of Europe. The Duc de Sully, Lord Clarendon, or Bishop Burnet, need not have been ashamed to be the authors of such a production. (p iv.)

অর্থাৎ “এই গ্রন্থ লেখকের সমসাময়িক বিবরণের আকারে লেখা। এই প্রকারেব ইতিহাস সব চেয়ে বেশী কার্যকর এবং মনোবশ। মুসলমান লেখকের নিজ চরিত্র ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে বিশেষত্ব আছে তাহা বাদ দিলে এই পুস্তক ইউরোপীয় সমসাময়িক বিবরণ গুলি হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। ফরাসীবাজা চতুর্থ হেনরির মন্ত্রী ডিউক অব সালী, প্রথম চার্লসের মন্ত্রী এবং ইংলণ্ডের রাজবিদ্রোহের ঐতিহাসিক লর্ড ক্রেবেণ্ডন, ওয় উইলিয়মের প্রিয়পাত্র এবং কাহিনীলেখক বিশপ বার্ণেট ও এরূপ গ্রন্থ লেখা অগৌরব মনে করিতেন না।” প্রাচীন ধরণের ইতিহাসেব ইহা অপেক্ষা আর কি উচ্চ প্রশংসা করা যাইতে পারে?

সিয়াব-উল-মুতাখ্বারীনের বাঙ্গলা অনুবাদ বিশেষ আবশ্যক। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে হাজী মুস্তাফা নামধারী একজন ফরাসী সাহেব মুসলমান কেরাণী ইহার ইংবাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন (*A translation of Seir Mutakharin*, 3 vols quarto, Calcutta, 1789)। এই অনুবাদের প্রায় সমস্ত খণ্ডই কলিকাতা হইতে বিলাত যাইতে জাহাজ-ডুব হইয়া লোপ পাইয়াছে। আজি কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার ক্যান্ডে এণ্ড কোং ইহাব অবিকল পুনর্মুদ্রণ

করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুবাদে অনেক দোষ আছে ; স্থলে স্থলে ভুল লেখা হইয়াছে, কারণ মুস্তাফা ফারসীর ঠিক অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, কতকগুলি টিপ্সনীরও অন্তর্ভুক্ত। শেষ মোঘলদের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসে অতুলনীয় জ্ঞানসম্পন্ন লেখক উইলিয়ম আর্ভিন সাহেব, মুস্তাফার অনুবাদ কলিকাতায় আবার ছাপা হইতেছে শুনিয়া আমাকে লিখিয়াছেন, “আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে এই অনুবাদের অবিকল পুনর্মুদ্রণের জন্য গবর্ণ-মেন্ট সাহায্য করিতেছেন। অগ্রে ইহার ভ্রম সংশোধন করা উচিত, বিশেষতঃ মুস্তাফার অন্তর্ভুক্ত ও অল্পীল টিপ্সনীর গুলি বাদ দেওয়া আবশ্যিক।” এলিয়াট ও ডাউসন তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মৌলিক ভারত-ইতিহাসের ৮ম খণ্ডে এই অনুবাদ ভ্রমাস্কন্ধ বলিয়াছেন। তাহার পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ব্রিগ্‌স্ যে অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা অসম্পূর্ণ; ইহাতে অধুনা নবাব সরকারাজ খাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত আছে। এখানি নূতন অনুবাদ নহে, কেবল মুস্তাফার ইংরাজীটুকু সংশোধন করা হইয়াছে। অনুবাদের সব ভ্রমগুলিই রহিয়াছে। (এলিয়াট ও ডাউসন ৮ম খণ্ড।)

প্রায় ৩০ বৎসর গত হইল গোরমোহন মৈত্রেয় মহাশয় সিয়াব-উল-মুতাফখরীনেব এক অবিকল বাঙ্গলা অনুবাদ রচনা করেন। তাঁহার পুত্রেরা এখন উহা ছাপাইতেছেন। সকল বাঙ্গালী পাঠকেরই এই অনুবাদ লওয়া উচিত। ইহার প্রথম গুণ এই যে অনুবাদ শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ। আমি আসল ফার্সি বহির সহিত তাঁহাব অনুবাদের প্রথম তিন অধ্যায় মিলাইয়া দেখিয়াছি যে অনুবাদ পদে পদে ঠিক, একটি কথাও ছাড়া যায় নাই অথবা কোন স্থানে গোঁজা-মিলন দিয়া অর্থ করা হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ মৈত্রেয় মহাশয় হাকিম আবদুল মজিদের ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ছাপান ফার্সি বহি হইতে অনুবাদ করিয়াছেন; এই সংস্করণ অত্যন্ত যত্নে ও পণ্ডিত লোকদের তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়। ছাপার শুদ্ধতা ও আবদুল মজিদের বিজ্ঞতা সম্বন্ধে হব্‌স্ হেমান্ উইলসন্, ডাক্তার টিটলার, অধ্যাপক মির্ প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সাহেবেরা প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। মুস্তাফা হস্তলিপি হইতে অনুবাদ করেন। ফারসী হস্তলিপি সাধারণতঃ কত ভ্রমপূর্ণ ও অস্পষ্ট তাহা সকলেই জানেন।

আসলের দোষগুলি সম্ভবতঃ মুস্তাফা এড়াইতে পাবেন নাই। এ বিষয়ে এ বঙ্গানুবাদের শ্রেষ্ঠতা রহিয়াছে।

মৈত্রেয় মহাশয়ের ভাষা গম্ভীর ও তেজস্বী। সাহিত্য-পরিষদের অধী কর্তৃপক্ষ হস্তলিপি পড়িয়া ইহা ছাপাইতে অনুমোদন ও উৎসাহ দিয়াছেন। আশা কবি বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে এই গ্রন্থেব যথেষ্ট আদর হইবে।

শ্রীযত্ননাথ সরকার, এম্ এ,
পাটনা কলেজের অধ্যাপক।

নিয়াগুতে ফায়া পোয়ে ।

সে দিন নিয়াগুতে ফায়া পোয়ে। বাঙ্গালা ভাষায় “ফায়া” কথার অর্থ দেবতা, আর “পোয়ে” কথার অর্থ আমোদ প্রমোদ। নিয়াগুতে ফায়া পোয়ে, নিয়াগু বৌদ্ধমন্দিরের বাৎসরিক উৎসব মাত্র। যেমন আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষে কোনও কোনও প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরে পূজা অর্চা হয়, দশ জায়গাব লোক আসিয়া মিলিত হয়, কুড়ি পঁচিশ খানা দোকান বসে, দুই চাবিজন রসিক নাগরিক সঙ্ঘ সাজিয়া বঙ্গ কবে, এবং দুই একদল যাত্রা বা কীৰ্ত্তনওয়ালা ধোলকবতাল বেহালা মন্দিরা লইয়া আসিয়া খুলিয়া দেয়, ব্রহ্মদেশেও ফায়া পোয়ে তেমনি। প্রথম যেদিন নিয়াগুতে পোয়ে দেখিতে গেলাম সেদিন দেখিলাম—কেবল ছোট বড় কতকগুলি দোকান বেগলাড়ীর মত সাবি গাঁথিয়া দাঁড়াইয়া আছে, লোকজনের হট্টগোল নাই, কোনো রকম গান বাজনা নাই, অত্যাশ্চর্য্য আমোদ প্রমোদেরও কোনো বন্দোবস্ত নাই; দোকানগুলি সবমাত্র ঘর খুলিয়াছে, এখনো যেন পাকাপাকি বসে নাই। মেলার প্রথম দুই একদিন সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে সেদিনকাব ফায়া পোয়েও তেমনি—সকলি প্রস্তুত অথচ কিছুই প্রস্তুত নহে।

মেলার দোকান পসার আমাদের দেশেও যেমন এখানেও তেমনি। ঘরগুলির উপবে ছনের পাতলা ছাউনী, পাশে বনের বা চাটাইর বেড়া, সম্মুখে ধারাব দুইখানি তিনখানি দ্বিজা, আর ভিতরে রাশি রাশি জিনিষপত্র। মালমসলাও আমাদের দেশের স্থায়। দেশ—ব্রহ্মদেশ;

কিন্তু জিনিষ বিদেশী—আগাগোড়া বিদেশী; শবীৰ হইতে আরম্ভ করিয়া স্ফটী পর্য্যন্ত বিদেশীর হাতে অর্পিত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশেব খাস আমদানী লইয়া লইয়া যাহাবা দোকান কবিয়াছে, তাহারা অতি অনাদৃতের জায় একটি কোণে বসিয়া আছে। বিলাতী জিনিষেব চাকচিক্য অতদূরে যাইয়াও তাহাদিগকে নৈবাস্ত বিলাইয়া আসে; কিন্তু দোকানীরা জানে যে ঘৃণার দৃষ্টি তাহাদের শির পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে; কাজেই তাহার প্রতিদানে স্বীয় কাতর দৃষ্টি টুকু নিক্ষেপ করিয়াই তাহারা নিরস্ত হয়।

মেলায় কাপড়ের দোকানই বেশী, কাপড়ের গ্রাহকও যথেষ্ট। তাই দেশী বিদেশী নানা বকমের কাপড় দোকানে দোকানে রানীকৃত হইতেছিল। বর্ম্মা বা বড় বর্ণপ্রিয়, যত দিন ভিতরে বঙ্গ রস থাকিবে ততদিন ইহাবা বড়ীন কাপড় ছাড়ে না; সুতরাং প্রত্যেক দোকানেই রক্ত পীত নীল হবিং প্রভৃতি নানা বঙের কাপড় গাদায় গাদায় ক্রেতাদেব আগমন প্রতীক্ষা কবিতেছিল। আর সুধু কাপড়ের সমৃদ্ধি ছাড়া প্রত্যেক কাপড়ের দোকানেই আবও একটা প্রকাণ্ড আকর্ষণেব আয়োজন কবা হইয়াছিল। প্রত্যেক দোকানেই একটা দুইটা কবিয়া “আপিসো” (অবিবাহিতা যুবতী) বিক্রেত্ৰী; তাহাদেব গা-ভরা গয়না, মুখ-ভবা হাসি, মাথা-ভরা চুল, আব আধি-ভবা অভিবাদন। একবার কাপড় কিনিতে গেলে ইহাদেব মিষ্টকথায় কাপড়ের মহার্ঘতা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে হয়, মনে হয়—“যাক চুটে পয়সা, জিনিষটা না কিনিলে বুঝি এমন সুন্দর হৃদয়ে আঘাত লাগিবে।” সত্য সত্যই বাঙ্গলা দেশ হইতে প্রথম আসিয়া এদের মুখে ঝলক ঝলক হাসি, স্ফুটুর বাক্যবিজ্ঞাস, ও বিলাসবাজক দৃষ্টি দেখিয়া হয়ত একটু লঘুচিত্তই হইতে হয়; কিন্তু দুই তিন দিনেই মনের সে অবস্থা চলিয়া যায়; বাজাবে বসিয়া হাসিয়া কথা কহিলেই যে স্ত্রীলোকের স্বভাব ছুট হইবে সে ভাবটা তখন আর থাকে না। কারণ, আমাদিগকে মনে বাধিতে হইবে, ব্রহ্মদেশে অবরোধপ্রথা নাই; সুতরাং সকল শ্রেণীৰ স্ত্রীলোকই বাহিরে চলাফিরা ও কাজ কর্ম্ম করিতে পাবেন।

এখানে আসিয়া এক কাপড়ওয়ালীর সহিত আমাদের চেনা পবিচয় হইয়াছিল। সেও নিয়াতুর ফায়া গোয়েতে

দোকান লইয়া আসিয়াছে। তাহার দোকানেব নিকট দিয়া যাইতেই সে আমাদিগকে ডাকিল। আমরাও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম—তাহার অভ্যর্থনা সাদবে গ্রহণ করিয়া দোকানে প্রবেশ করিলাম।

দোকান জুড়িয়া একখানি পাটি পাতা; তার উপর একখানি মাঝারি আকারের সুন্দর গালিচা; আমবা সেই গালিচার উপর উপবেশন করিলাম। কাপড়ওয়ালী চক্চকে ঝক্‌ঝকে একটা পানের বাস আমাদের সম্মুখে বসাইয়া দিয়া নম্রভাবে বলিল—“বাবু পান খাও।” বর্ম্মার পানের বাসগুলিতে ৩৪টি করিয়া ডালা থাকে। একটাতে পান, একটাতে সুপারী ও জাঁতি, আর একটাতে খয়ের, চূণ, ও অন্যান্য মসলাদি থাকে। আমরা বাঙ্গালী, গৃহিণীর হাতের সাজা গোলাপী থিলি খাওয়া আমাদের অভ্যাস, আমরা বর্ম্মাদেব মতন শিরা ফেলিয়া সুপারী কাটিয়া, পান সাজিয়া খাইতে পারিব কেন? আমি পানের বাসটি ভট্টাচার্য সাহেবের নিকট ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম—“খাও দাদা, পান খাও।” ভট্টাচার্য সাহেবও “মহাজিষু খেশিয়া” বলিয়া পানের বাসটি অল্প একটা বন্ধুব নিকট ঠেলিয়া দিলেন। তিনি কিছু গৃহস্থ কিসিমের লোক; আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ ব্রহ্মদেশেই পড়িয়া আছেন, পরিবার দেশে বাড়ী পাহারা দিতেছেন, কাজেই দায়ে পড়িয়া তাহাব সবই শিথিতে হইয়াছে। তিনি বেশ মেয়ে মানুষেব মত ধীরে ধীরে গুটিকতক পান তৈয়ারী করিলেন; তখন আমি ও দাদা দুই জনেই ভদ্রলোকের মত অর্থাৎ অমুরোধ উপবোধ এড়াইতে পাবিব না বলিয়া তাহার পরিশ্রমের ফলে অংশ বসাইলাম।

একটু পর আমবা মেলার অন্ত দিকে চলিলাম। সে দিকে কয়েকটা মদী দোকানে চাল ডালের পিরামিড তুলিয়া নিরুদ্ভিগভাবে বসিয়াছিল। সবে মাত্র পহেলা দিন, দোকানে বিক্রী নাই, লোকজনেব তত ভিড় নাই, দুই চার জন ক্রেতামাত্র মধুর মাছিৰ জায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এক দোকানওয়ালী আয়নাতে মুখ দেখিতেছিল। আমরা কাছে আসিতেই, সে আয়নাখানি নীচে নামাইয়া জিজ্ঞাসা কবিল—“বা লো কিন্‌ঙ্গে বাবুজি?” উত্তরে দাদা কি একটা মাথামুণ্ড বলিলেন, সে আবার আয়নাখানি হাতে

লইয়া নিজেব মুখ দেখিতে লাগিল। কতকগুলি জল ধাবাবের দোকানও মেলাব পশ্চাদিকে টেবল পাতিয়া বসিয়া গিয়াছিল। তা'দেব কিন্তু অবসব নাই, মুখে তানাখা মাখিবাব জন্তও ততটা ব্যস্ততা নাই। নাকে মুখে কালী, কাল ময়লা লুঙ্গি, গায়ে ছাতাপড়া এঞ্জি; রঙ্গিনীগণ ঘন ঘন হস্ত সঞ্চালনে উদ্ভূত তৈলকটাহে ত্রিঈর্ষ "তবোছা"গুলিকে ছেঁচড়া পোড়া কবিত্তেছিলেন আর ধূম্র-কুলিতনেত্র প্রত্যেক আগন্তকের প্রতি প্রশ্রয়ী নৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। গন্ধে প্রাণ যায়, কাব সাধ্য সেখানে এক মিনিটও দাঁড়ায়; তবু সে সব দোকানে ভিড় কত !

পরদিন সহবেব বাজার নিরাণুতে বদলী হইল, আমবাও আবার মেলায় বেড়াইতে গেলাম। দেখিলাম—সান্ মেয়েরা টুকুবা ভরিয়া তবকারী আনিয়াছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, সাংগম, নানাবকম শাক, আলু, টমাটো, সাদামুলা, লালমুলা, নীলমুলা, হলদে মুলা, প্রভৃতি হরেক বকমের শাক সবজীতে বাজাব পরিপূর্ণ। পাহাড়ের উপব জায়গাব অভাব নাই, শাক সবজীরও অভাব নাই। যে পবিশ্রম করে, তাবই প্রাঙ্গণে কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শ্রামল সম্পদ ফল পুষ্পে সুশোভিত, আর তারই ঘবে লক্ষ্মী দেবীব বেঁতেব বুড়ীটুকু টাকা পরসায় পরিপূর্ণ। যাবা অশক্ত অর্থাৎ বৃদ্ধ রোগী বা সহায়হীন তারাই গরীব; তারা কেউবা চারিটা কাঁচা লঙ্কা, কেউ বা কয়েকখানি আদা, কেউ বা কতকগুলি কাঁচা তেঁতুল, আব কেউ বা গরম গরম ভাত আর শাক পাতাব ঝোল লইয়া ক্রেতাগণের অনুরোধেব অপেক্ষা কবিত্তেছে। ইহাদের কাছে বেশী দরদস্তুর কবিত্তে হয় না, এবা বড় মন-খোলসা লোক; কাউকে ঠকাইবার মন্তলব বাধে না, তোমার যে দাঁমে পোষায় তুমি বলিয়া দেখ, সে দিবার হয় দিবে, না দিবায হয় "ম ইমাবু" বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। আব যদি ঠকিত্তেও হয়, তবে এদের কাছেই ঠকা ভাল; এবা বড় গরীব লোক; হুঁচার পরসায় যা' পায়, তাতেই এদের দিন চলে। এদের কাছে এক আধ পরসায় ঠকিলে, সে পরসায় এদের অন্ন সংস্থান হয়।

অনেক ভদ্রঘরের স্ত্রী পুরুষ—বর্ষা, জেববাদী, ফিবিজি—সে দিন মেলায় বাজার দেখিতে আসিয়াছে। মেলাব জিনিষের চেয়ে, তাহেব শোভাই চমৎকার। যে দিকে চাও,

সেই দিকেই চোক্ষ লাগিয়া থাকে। জিনিষের দাম কবিত্তেছে, কেউ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেউ হাতে-সাজি, মুখে-সেলেই ঘবে ফিরিতেছে, আবার কে বা চাঁপা আঙ্গুলে চক্চকে মনিব্যাগটী খুলিতে খুলিতে বলিতেছে—"Oh God, how dear"! শুনিয়াছিলাম নিরাণুর ফায়াপোয়েতে ফিরিঙ্গিনীদের মধ্যে প্রণয়িসম্মিলনের মাহেন্দ্রযোগ; জোড়ায় জোড়ায় অনেক যুবক যুবতীও দেখিলাম। এরা আসাতে মেলাব সমৃদ্ধি যে খুব বাড়িয়াছিল তার আব সন্দেহ নাই।

বেলা দশটা এগারটা হইতে বাজাব মন্দা ধবিল। বাবটার পব হইতেই মন্দিরে পূজা আরম্ভ হইবে। সন্ধ্যাতা বর্ষা ও সানরমণীগণ উজ্জলবর্ণে উজ্জলবসনে উদ্ভানবস্ত্র ঝলসিত কবিয়া মন্দিবাভিমুখে চলিয়াছে। গায়ে ইস্তিবকবা সাদা এঞ্জি, তাবউপর সোণার হু-লহরী সূর্য্যহাব, হাতে লতানো বলয়, কাণে মণিখচিত সোণাব ফুল, মুখে তানাখার পাতলা প্রলেপ, পায়ে রক্ত মধমলেব "কানা", মাথায় কুণ্ডলীকৃত কেশভাব, আব পরনে বেশমেব রঙ্গীন লুঙ্গি। প্রায় সকলেরই ষা হাতে একটা কবিয়া ফুলেব সাজি, তা'তে একবাশি মনোমত ফুল; আর ডান হাতে ছোট একটা নৈবেদ্য পাত্র, তাহাতে বিবিধ উপহার দ্রব্য ধরে ধরে সুসজ্জিত। যে যাহা ভালবাসে, সে আজ তাহা ঈশ্ববেব প্রীতিসম্পাদনেব জন্ত লইয়া আসিয়াছে, যেন সেই টুকু দিলেই হৃদয়েব তৃপ্ত হইবেন।

মাউঙ লুডিনের ছয়াকাডোও আজ নিরাণুতে পূজা দিতে আসিয়াছেন। জেন English Churchএর দলভুক্ত; তিনি আসেন নাই। কজা মা টিন ছোট একটা ফুলের সাজি হাতে করিয়া মাতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। আমি ছয়াকাডো মা মিয়াইকে অভিবাদন কবিয়া হুঁচার কথাব পব হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা কবিলাম—"এ ফুল ও চিনির পুতুলে আপনাব দেবতা ধুসী হবেন তো?" ছয়াকাডো হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আপনি হিন্দু, আপনিও এমন কথা জিজ্ঞাসা করিত্তেছেন?" আমি বলিলাম—"তা' বটে; আমাদের ধর্মেও এরকম ফুল নৈবেদ্য দিবায রীতি আছে, কিন্তু আপনাদের ধর্মে এ সম্বন্ধে কি মত?" দেবতাকে ছেলে-ভুলানো চিনির খেলনা আব বসগোল্লা দেওয়াটা যেন কেমন কেমন!"

ছায়াকাড়ো ঘেন হৃদয়ে একটু আঘাত পাইয়া বলিলেন—
“না বাবু, সেটা কেমন কেমন নয়, বরং আমার কাছে ভালই
বোধ হয়। যাকে ভাল বাসিলাম, তাঁকে আমি বা’ ভালবাসি
তাই দিলে তবে নিজের মনটা খুসী হয়। প্রিয়জনকে তাঁহার
অভীপ্সিত জিনিষ সকলেই দেয়, কিন্তু যেখানে অমুসারে
আধিক্য, সেখানে স্নেহ প্রার্থিত জিনিষের সম্প্রদানেই মন
শান্তি লাভ কবে না; এটা তাব ভাল লাগিবে, ওটা সে
ভালবাসে, সেটা সে ভাল বলিয়াছিল, সেখানে সে ভাল
থাকিবে, এইরূপ নানা প্রকার অযাচিত স্নেহ প্রদানের ইচ্ছা
মনে অভ্যস্ত বলবতী হয়। তখন হইতেই স্বার্থত্যাগ আবস্ত
হয়, নিজের স্নেহ ও প্রীতি বিসর্জন দিয়া হৃদয়েবের প্রীতি
অমুসন্ধান কবিত্তে ইচ্ছা হয়। বলা বাহুল্য, ইহা ঈশ্বরেব্রমের
শৈশব অবস্থা মাত্র।” বলিতে বলিতে মা মিয়াই হঠাৎ
সঙ্কুচিত হইলেন—বোধ হয় ভাবিলেন—“বড় একটা বক্তৃতা
আরম্ভ হইয়া গিয়াছে”,—তাই সসঙ্কোচে পুনরায় বলিলেন—
“বাবুজী, আপনারা হিন্দু, আপনারা কি আর এ জানেন না;
আমাকে পরীক্ষা কচ্ছেন বই তো নয়।”

“পরীক্ষা নয়, ছায়াকাড়ো, এ সম্বন্ধে আপনাদের মত
সত্য সত্যই চমৎকার।” আমি ভাবিলাম মা মিয়াই বুঝি
মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি “তা’ নয়
বাবুজী আ’ নয়” বলিতে বলিতে হাসির ঝলকে রাস্তা
প্রাবিত করিয়া মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

নিম্নাঙ্ক মন্দির বর্ম্মার অস্ত্রান্ত মন্দিরের স্তায় ভারতবর্ষীয়
বৌদ্ধ মন্দিরের ছাঁচে তৈয়ারী হইয়াছে। মন্দিরে একটা
সিংদরজা ভিন্ন দরজা জানালা নাই, আবাব সে সিংদরজাটীও
একখানি ছোট খাট জানালাহীন কোঠা মাত্র। কাজেই
মন্দিরের ভিতরে ঈশ্বর অঙ্ককার, বুদ্ধদেবের প্রস্তর মূর্ত্তি
সেই প্রশান্ত অঙ্ককারের মধ্যে ধ্যাননিমগ্ন। আজ পার্শ্বের
দিন; মন্দিরের অভ্যন্তরে কয়েকটা কায়ার ডাই আলিয়া
দেওয়া হইয়াছিল; তাদের মিষ্টি আলোতে বোধি বুদ্ধের
সমাধি-মূর্ত্তি আরও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। উহার চতুর্পার্শ্বে
ভক্তগণ শিখো আসনে জপনিবত; তাঁহাদের পরিধানে
পীত চীনাংগু, মস্তক মুণ্ডিত, হাতে জপমালা, নয়ন
মুদ্রিত, মনে মনে জপিতেছেন “আনেইছা, ডুখা আনাট্টা”
—“এ জড়জগতে সকলই নশ্বর, সবই অনাস্থা, এখানে

কেবলই দুঃখ, কেবলই কষ্ট। এ মোহে মজ্জিওনা,
মজ্জিওনা।”

এসব দেখিয়া শুনিয়া মনটা ঘেন কেমন হইয়া গেল।
দাদাব পায়ে বুট ছিল, তিনি ভিতরে আসিতে পাবেন নাই;
অল্প বয়সীও ভিতরে আসিতে ইচ্ছা কবিলেন না, একা
আমিই কৌতূহলের বশে ভিতরে আসিয়াছিলাম। আমার
আব বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলনা, একটা কোণার ধীবে
ধীবে বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম বহিঃস্থ জনকোলাহল
সে তপোগহবরে প্রবেশ করেনা, জড়জগতেব বিশাসভাণ্ডার
সে অঙ্ককার হইতে নয়নগোচর হয়না, ভিতরে গেলেই ইচ্ছা
কবে স্নেহ প্রস্তবমূর্ত্তি স্তায় সমাধি দ্বারা একীবনটি
“নির্কীর্ণে” মিশাইয়া দেই। মনটা ঘেন কেমন কেমন বোধ
হইতে লাগিল, আমি চুপ কবিয়া একটা কোণে বসিয়া
রহিলাম।

যখন বাহির হইলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা। দাদাতো
চটাইয়া লাগ; বরং বলা উচিত গাঢ় কালো; কেননা দাদা
রঙে কৃষ্ণবর্ণ, বাগ করিলে তিনি আবো কাল হইয়া যান।
তিনি বলিতে লাগিলেন—“এমন মানুষ নিয়ে কেউ কোথাও
যায়, কোথায় গেল কি হলো ভেবে ভেবে অস্থির, ভিতরে
গিয়ে চুপ কবে বসে আছে, কিছু বলতে হয়না।” আমি
স্নেহ দাদাকে বলিলাম—“দাদা ভিতরে তো যাও নাই,
মজ্জাটীও পাও নাই, সেখানে গেলে আব আসতে ইচ্ছা
হয় না।” দাদা বিবস্ত্রভাবে বলিলেন—“হয়েছে, এসো
এখন বাড়ী যাই।” আমার ক্ষুধা পাইয়াছিল; আমি
বলিলাম—“কিছু খাওয়া হবে না, দাদা?” আমাদের খাবার
জিনিষ বাজারে কিছুই নাই। দাদা কয়েকটা কলা কিনিয়া
একটা লেমনেডের দোকানে বসিলেন। কলা কয়েকটা
আমি একটা একটা করিয়া উদরসাৎ করিলাম। দাদা
এক গ্লাস লেমনেড পান করিলেন; আমাকেও একগ্লাস
দিলেন। আমারও বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল, লেমনেড খাইয়া
বড়ই তৃপ্ত হইলাম।

মন্দিরের পার্শ্বে একটা পটমণ্ডপের নীচে বহু ব্রহ্মরমণী
উপবাসী অবস্থায় জপ করিতেছিলেন। কেউ বা বালিকা
কেউ বা কিশোরী, কেউ বা যুবতী, আর অধিকাংশই প্রোচা
ও বুদ্ধা। সকলেই স্নবেশা। হাতে অনতিদীর্ঘ জপমালা,

মস্তক দেবতাব সম্মুখে সন্নত, আব নয়ন ?—তাহা এ জগতের বাহিবে না জানি কোন চিরসৌন্দর্য্যেব নিত্য ভাঙাবে নির্গিমেধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া আছে। যাদেব মনে ব্রহ্মদেশেব জ্বীলোক মাংসেবই সম্বন্ধে কুধাবণা, তাঁহাবা একবার উপাসনা-মন্দিবে আসুন, দেখিবেন—সমাজের শিথিলতায় যে জ্ঞাতি বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে, ধর্ম্মেব উদারতায় তাহা এখনো কত মহৎ ।

তবে ধর্ম্মের ভিতর জ্বাল জ্বালাচুবী অত্যাশ্র দেশেও যেমন আছে ব্রহ্মদেশেও তেমন না আছে তা' নয়। মেলার পশ্চাৎদিকে একটি “নাক্কডো” অর্থাৎ নাটসিদ্ধা জ্বীলোক একটি সুবৃহৎ আস্তানা খুলিয়া পরস্যা উপার্জ্জনের ফাঁদ পাতিয়াছিল। আমি পূর্বে একবার এক “নাক্কডোব” সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিয়া চাৰি আনা পরস্যা দণ্ড দিয়া আসিয়াছিলাম ; স্মৃতবাং ইহাদের উপর আমার যে ক্ষুদ্র বিশ্বাস টুকু ছিল তাহাও এখন ছিলনা। তবু ভট্টাচার্য্য দাদাকে এই মজ্জাব ব্যাপারটা দেখাইবার জন্ত তিনজনে মিলিয়া নাট দেখিতে গেলাম।

আমাদেব যেমন ভূত ডামব ডাকিনী যোগিনীতে বিশ্বাস, বর্ম্মারাও তেমনি নির্ঝাণেব উপাসক হইলেও ভূত ডামবে বিশ্বাস রাখে। বর্ম্মা ভাষায় এই সমস্ত বক্ষ রক্ষ ভূত পিশাচের সাধারণ নাম “নাট।” আমাদেব দেশে যেমন বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রদেবেব, রোগ শাস্তির জন্য সূর্য্যাদি গ্রহগণের, ধন সম্পত্তির জন্ত লক্ষ্মী দেবীর, জলের জন্ত বরুণ দেবের বা মহামারী হইতে পরিত্রাণের জন্ত কালীদেবীর পূজা হইয়া থাকে, ব্রহ্মদেশেও সেইরূপ কোনও নাট বোগ শাস্তির জন্য, কেহ বা শত্রুবৃদ্ধিব জন্য, কেহ বা ধন দানেব জন্য, আব কেহ বা প্রেমাস্পদের প্রেম লাভেব জন্য পূজিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও নাট অতিশয় জাগ্রত দেবতা বলিয়া দুব দুবাস্তরেও প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়া থাকেন, দিব্যাজি ইহাদের নিকট কাল মুবগী, কাল পাঠা, চিনির মিঠাই ও ধূপদীপাদি নানাপ্রকার উপচাব দ্রব্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। নিয়াঙুতে যে নাটসিদ্ধা ত্রীপাট স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার দখল প্রায় পনব ষোলটা নাট। অহাব কোনোটী বোড়ায় চড়িয়া ভবোয়াল হাতে লইয়া কন্ধি অবতারেব মত সর্কদাই ধুবনশীল, কোনঙটী

বাঘেব মত মুথ, লোড়ার মত পা, ও কুকুবেব মত শরীব-ধাবী একটা। কিন্তু কিম্বাকাব জানোয়াবেব উপব সওয়ার হইয়া ত্রুকুটিকুটিল মুখচ্ছবিব দ্বাবা সম্মুখস্থ ভক্তবৃন্দকে নিবস্তবই ভয় প্রদর্শন কবিতেছেন, কোনটী বা প্রশান্ত-ভাবে উপবেশন কবিয়া ভক্তেব কবপুটে অন্ন প্রদানের জন্য না অন্নপূর্ণাব ন্যায় সর্কদাই লোহাব হাতা উত্তত কবিয়া বহিয়াছেন, আবাব কোনওটী না চতুর্দুপে চাৰিদিকে নয়ন প্রসাবিত কবিয়া কোনগ্রামে, কোন সহবে মহামাবী রূপে আবির্ভূত হইবেন তাহাবই অল্পসন্ধান কবিতেছেন।

আমবা ত্রীপাটে উপস্থিত হইবামাত্রই “নাক্কডো” দাদার মুখের দিকে চাহিয়া মিশিবজিত দন্তমালায়, বঘুবংশেব সিংহেব মত একটা অট্টহাস্ত হাসিয়া উঠিলেন। মুখেব ও কপালেব বেখাগুলি মেঘাচ্ছন্ন আকাশেব চঞ্চল বিজলীবেখাব জায় সহসা চমকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে হাস্ত, সে কুঞ্চনমালা, বিলীন হইয়া মুখে বর্ষণোমুখ বারিদবৃন্দেব অতুলনীয় গান্ধার্য্য ফুটিয়া উঠিল। তখন নেত্র স্থির ও গম্ভীর, দৃষ্টি যেন কোনও অতল সাগরেব তল স্পর্শের জন্ত ডুবিয়া যাইতেছে, ঠোঁট দুইখানি যেন কোনও দুকহ মানসিক পরিশ্রমের আত্মবিক্ষিক স্নায়বিক বিক্ষোভ প্রকাশ করিবাব জন্ত কুঞ্চিত ও কম্পিত হইতেছে আব কপালেব রেখাগুলি কোনো সময় আকুঞ্চিত, কোনো সময় প্রসারিত, কোনো সময় বক্রীভূত, কোনো সময় বা সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া নাক্কডোর অসীম মনোবিকার বিকাশ কবিতে আবন্ত কবিল। আমরা সেখানে না বসিতেই এতখানি ব্যাপাব সম্পন্ন হইয়া গেল ! ভাবিলাম—পবে যেন কতই কি আছে। দাদা তো সে অমানুষিক মুষ্টি দেখিয়া স্তম্ভিত ; সেরূপ বেদে নাই পুবাণে নাই, আগমে নাই নিগমে নাই, তন্ত্রে নাই মন্ত্রে নাই—সুতরাং তাহা বেদাগমেব অতীত ; সে চেহাবা—সে কাল, এ কাল, আসে কাল—এ ত্রিকালেব কোনো কালেই কেউ কখনো দেখে নাই, দেখিতেছে না ও দেখিবে না, সুতরাং তাহা ত্রিকালাতীত ; সে আকার ইঙ্গিত, শশানে মশানে, বনে জঙ্গলে, তুমি আমি, “দাদা” ভাই, বন্ধু বান্ধব কোন লোকেই কোনো দিন সাক্ষাৎ পায়-নাই—কোনদিন পাইবে কি না সন্দেহ স্মৃতবাং তাহা লোকাতীত। এমন নভূত নভাবী হাবভাব দেখিয়া

চমৎকৃত না হইবে এরূপ মানুষ সংসাবেই কিছু হ্রস্বত । নাক্কডো তাহার লম্বা লম্বা চুলগুলিতে একটা বিরশি সিকার ঝাঁকি মারিয়া একখানি টুলের দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্বক পুনরায় সেই হাত—সেই আগের মত এক অট্টহাস্ত হাসিয়া উঠিলেন । আমি একবার নাটগৃহবহু হইতে ফিরিয়া আসি য়াছি, কাজেই সে সব বদনভঙ্গী আমার কাছে বড় নূতন নহে ; কিন্তু এ মহীয়সীর ভাবচক্র আয়োজন নিয়োজন দেখিয়া আমিও কিছু অভিভূত হইয়া পড়িলাম । আমরা ধীবে ধীরে সসঙ্কোচে পূর্ব প্রদর্শিত টুল খানিব উপব বসিলাম । নাক্কডো সহসা নয়ন মুদ্রিত করিয়া “কালী কালী” রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন ।

কিঞ্চিৎ দূবে এক কৃষ্ণবর্ণ জেববাদী পুরুষ সম্ভবতঃ গঞ্জিকা সেবনে চক্ষু লাল করিয়া এক পাশে বসিয়াছিলেন । ইনি নাক্কডোর দোভাষী । তিনি আমাদের নিকটে আসিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“নাটের নিকট কি অভিপ্রায়ে আগমন ?” দাদাব বাক্শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল, তিনি আমার গা টিপিয়া ইসারা করিলেন—“উত্তর দেও ।” আমি দাদার দিকে চোখ ঠারিয়া দোভাষী মহাশয়কে বলিলাম—“ইহাব অদৃষ্ট গণনা করিতে হইবে ।” দোভাষী নাক্কডোকে আমাদের অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন ।

নাক্কডো তখন গস্তীরভাবে নাটের দিকে পাশ ফিবিয়া বসিলেন । দোভাষী মহাশয় ডুঘুরাকৃতি একখানি ১ হাত উচু টেবল তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাহার উপরে ৭টা কড়ি ছড়াইয়া দিলেন । নাক্কডো ইত্যবসবে ভূত প্রেত যক্ষরক্ষ দৈত্যদানব যিনি যেখানে থাকেন তাঁদের আহ্বান করিয়া পালি ও বন্দী মিশ্রিত মন্ত্রবাজি উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । উদাস্ত অমুদাস্ত ও প্লুত স্বরে নাটগৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কপালের ও মুখের রেখাগুলি আবার গিরি নির্ঝরিণীর কুটিল আবর্জের স্তায় উন্মত্তভাবে চমকিত বিধারিত ও প্রলুপ্ত হইতে লাগিল, কুণ্ঠিতকোণ নয়নদ্বয় কোনো সময়ে উজ্জ্বলিত কোনো সময়ে অধঃপ্রবেশিত, কখনো বা পার্শ্বস্থ, আবার পরক্ষণেই বিজ্যৎ গতিতে নিম্নীলিত হইতে লাগিল । তাম্বল-রাগ রক্ত অধবে ফিক্ ফিক্ হাসি যেন সংলিপ্তই রহিল, যেন সেগুলি প্রদস্ত-যৌবন নাটসমূহের প্রীতি-সম্ভাষণ হইতেই স্বলিত হইতেছিল ।

কিছুক্ষণ মাত্র পাঠ করিয়া তিনি পুনরায় স্থির হইয়া বসিলেন এবং বন্দী ভাষায় দাদাকে বলিলেন—“সম্মুখে বসো ।” দাদা নিঃশব্দে সেই ডাইনীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন । এখানে চক্ষুপাত্কার প্রবেশনিষেধ দেখিতে পাইলাম না । দাদা বুট লইয়াই উপবেশন করিলেন ।

নাক্কডো বলিতে লাগিলেন—“তোমার প্রশস্ত কপাল আছে, ডাগর ডাগর চোখ আছে, চোকের ভিতর লালের আভা আছে,—ঐ—ঐ—কপালের ঐ উচু যায়গার প্রতিভা-দেবীর আসন আছে—টাকা পয়সার জন্ত বন্দীতে আসা হইয়াছে,—তা—হবে—হবে না ?”

দাদা কি মনে ভাবিতেছিলেন তিনিই জানেন ।

নাক্কডো স্থির দৃষ্টিতে দাদাব দিকে একবার তাকাইলেন ; তারপর বলিলেন—“কয়েক বছর বড় স্নেহে গেছে—তা’—হবে—বন্ধুবান্ধবের বন্দী আস্তে নিষেধ করেছিল ; তোমার অদৃষ্ট এখানে নিয়ন্ত্রিত—এখানে সোণা ফলবে” ।

“হে—হে—হে—নাটেবা ঐ বলছে শোন—তোমাদের যেমন স্বভাব—দেখ ! স্বদেব ভিতর এ জালা পুষিতেছে কেন ! সে তোমাব হবে না ।” নাক্কডো আবার পূর্ব দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চাহিলেন ।

বলিলেন—“সে তোমাব হবে না । তোমাব যে সে এ দিকে বসিয়া আছে, এই এই, এই উত্তর দক্ষিণ দিকে খোঁজ খোঁজ, মিলবে ।”

ইহার পব আবার মন্ত্র পাঠ আবস্ত হইল ; দাদা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন ; নাক্কডো একটু খামিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—“এখনও চাকুবী হইতেছে না ; আবও কিছু দিন কষ্টে যাবে । প্রতিজ্ঞা স্বরণ আছে ত ?”

বলা দরকার—দাদার বাঁসা ওকালতী ; ছ পয়সা হয়, চাকুবীর অল্পসন্ধান করিতে হয় না ।

নাক্কডো বলিতে লাগিলেন, “সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে ; দেশে পরিবার বাখিয়া আসিয়াছে—সে ভাবিতেছে ।”

টিপ্পনী করা আবশ্যক—দাদার পরিবার দাদাব সঙ্গে বন্দী অবস্থিতি করিতেছেন ।

“কিন্তু তা হোলো—তোমার বড়ই বিপদ দেখিতেছি । চাকুরীর সম্বন্ধেও বিষম গোলযোগ । সে অঙ্গীকারটাও ভুলিয়া গিয়াছে ।”

দোভাষী বলিলেন—“বাবুজি। তোমার যে অঙ্গীকার ছিল, সে অঙ্গীকার ভুলিয়া গিয়াছে।”

দাদা ক’নেব মত জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি অঙ্গীকার ?”

নাক্কডো বলিলেন—“পূজার অঙ্গীকার !! কালী মায়ের নিকট পূজাব অঙ্গীকার ; কালী মায়ের মাথাব অস্ত্র একখানি বেশগী কমাল দিতে হইবে। তবে তিনি তুষ্ট হইবেন।”

দাদা সন্দিগ্ধভাবে মাথা নীচু করিয়া বলিলেন—“হঁ।—আচ্ছা আমার একটা অভিশাপ আছে ; দেখুন দেখি ফলিবে কি না ?”

নাক্কডো সম্মুখস্থ টেবলের উপর দুই তিনবাব কড়ির ঢেঁলু দিলেন। সহস্র বদনে নাটের দিকে দুই তিনবাব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন—“পথে কণ্টক ; আত্মীয়ই শত্রু ; তিন মাস ১৫ দিন বাসে আশা পূর্ণ হবে। নাটকে ভোগ দিও।”

নাক্কডো আরও দুই একটা বাজে কথা বলিয়া অদৃষ্ট গণনা সমাপ্ত করিলেন।

আমি একদিন চাবআনা পরস। নাক্কডোর পোড়া মুখে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিলাম। আজ দাদা ধীরে ধীরে ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা টাকা বাহির করিলেন। একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন—মনে—“কত দিব” ? আমি বলিলাম—“দেও—একটা কিছু যা’হয়”। দাদা আবার পকেটে হাত দিলেন, সম্পূর্ণ পকেটটা এধার হইতে ওধার দুই তিনবাব জালছাবা করিলেন—পুঁটি চাঁদা মিলিল না ; দাদা মুখ বেঁকাইয়া আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“বেজ্‌গী হবে”। আমি দাবার কাঁধে চাপিয়া মেলা দেখিতে আসিয়াছিলাম, স্তবধা স্পষ্টাক্ষরে বলিলাম—“কিছুই না”। দাদা অগত্যা আবার পকেট হইতে পাঁচটা আঙ্গুলে ধরিয়া ১টা টাকা তুলিলেন—যেন জমিদারের লোককে বেকাবেব মাছ দিতে হইবে। টাকাটা ধুপ করিয়া নাক্কডোর আসনের উপর চিৎ হইয়া পড়িল। আমরাও নাক্কডোর আন্তানার দিকে পিঠ ফিরাইয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম।

তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে ; আঁকাশের রঙ্গীন মেঘগুলি হইতে ধোঁজুল প্রভাচ্ছটা ভূতলে ছাইয়া পড়িয়াছে ; চারিদিকে পাহাড়, তাহার নীল পীত লোহিত কত রঙের

চূড়া সেই উজ্জ্বল আলোকে ঝল্ ঝল্ করিতেছে ; যে পাহাড় গুলি অনেক দূরে, তাহাদের গায়ে গভীর কালো ছায়া ; দেখিলে মনে হয় এক একটা ভূটিয়া কঞ্চল গায়ে দিয়া আফিংখোর জঙ্গলী-সানের মত টীপ্ হইয়া বসিয়া বহিয়াছে। তখনো সন্ধ্যা হয় নাই, তবুও নিকটের পাহাড়গুলি বাষ্পের মোটা মোটা লেপগুলি মাথাব উপর টানিয়া টানিয়া বাজিব প্রচণ্ড শীতের অস্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল। আমরা চিরদিনই বাদশার সমতলক্ষেত্রের শ্রামল শোভা ও বিস্তীর্ণ নদীর উন্মুক্ত বক্ষঃস্থল দেখিতে অভ্যস্ত। আমাদের চোখে এ দৃশ্য কত নূতন, কত সুন্দর, কত মনোহর।

আমরা স্বভাবের সেই অভিনব মাধুরী চড়া গলায় আলোড়ন আন্দোলন করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেছি, এমন সময় অপর বন্ধুটি হঠাৎ আমাদের কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন—“আ-এই যে।” তিনি অঙ্গুলী হেলাইয়া দেখাইলেন—একটা গাছের নীচে কতকগুলি লোক জড় হইয়াছে, মধ্য হইতে একটা সুমধুর বাস্তবস্ত্র বাতাসের তরঙ্গে তবঙ্গে তানলহবী ছড়াইয়া উছলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে। বন্ধুটি বলিলেন—“এ সেই লোকটা”। আমি অর্ধ অজ্ঞাতসারে প্রশ্ন করিলাম—“কোন্ লোক” ? “কেন, তোমাকে একদিন এরু কথা বলিয়াছিলাম—মনে আছে, সেই ‘জইয়াব’ নিকটে ?” আমি বলিলাম—“বটে, চল দেখে আসি”।

গাছের তলায় বাইয়া দেখিলাম একটা কাশ্মীরী যুবক একটা সারঙ্গের সহিত গজল গাহিতেছে। চারিদিকে কতকগুলি বর্ম্মা বর্ম্মা জেরবাদী ও হিন্দুস্থানী জমিয়া গিয়াছে। মাঝখানে একখানি কঞ্চলাসনে বসিয়া গায়ক মধুবকণ্ঠে গাহিতেছে—

আহির মে কঁহি বহতে হ্যায়
বাতিন্ মে কঁহি হ্যায়
ইয়েহ্‌ওয়াস্প উন্‌হি মে হ্যায়
কেঁহ হ্যায় আউর নেহি হ্যায়।

যুবকের বয়স বড় জোর ২২ বৎসব ; মুখে ভ্রমবক্রম গুফরাতির গভীর বেখা, চক্ষু বিশাল, তাহাতে কৃষ্ণবোম-নিচয় কতই সুন্দর ! আমি নভেল লিখিতে বসি নাই ; নয়নমনোহর নায়ক অঙ্কিত কবিবার ইচ্ছা আমার নাই ; যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিতেছি ; আব গাঁহাব কাশ্মীর-

বাসী যুবকগণেব কাস্তিমণ্ডিত দেহ দেখিয়াছেন, তাঁহারাও অবিশ্বাস করিবেন না—তাহাদের শাবণ্যময় স্তম্ভমুখমণ্ডলে কৃষ্ণগুপ্তের শোভা কত মধুর, তাহাদের বিশাল চক্ষু ও উন্নত নাসিকা কত গর্বের জিনিষ, তাহাদের উদারতা ও সরলতা আবণ্ড কত মনোহারী। যুবক ভাবে বিহবল হইয়া গাইতেছিল—

হাম বঙ্গুগে তাজা ভ

হাম নিগ'হতে গুলসান্

হাম নব'ম্যে বুল'বুল' হ্যায়

হাম আওবাজে হার্জি' হ্যায় ॥

গানের প্রতি তবঙ্গে তবঙ্গে মধু বর্ষিত হইতেছিল, প্রতি গমকে ও ক্রান্তনে দেশেব কত সন্মোহন দৃশ্য স্বপ্নের ছবির জায় বিচিত্র চিত্রে অঙ্কিত করিতেছিল, হৃদয়েব প্রত্যেক তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কেমন যেন মাদকতাময় প্রকম্পন তুলিয়া দিতেছিল। ভাই, তোমরা স্বদেশে রহিয়াছ—মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের আদর সোহাগ সম্ভোগ করিতেছ, আমার মত দেশত্যাগীর মনোবেদনা তোমরা বুঝিবে না। দেশে অন্ন জুটে নাই—মায়ের অক্ষয় ভাণ্ডাবে আমার মত ক্ষুদ্র সন্তানের জন্ত ছ'বেলা দুটা শাকভাত মিলে নাই বলিয়াই দেশের সেই শস্যভরা শ্রামল প্রান্তর পরিত্যক্ত করিয়া বিদেশে আসিয়াছি; আর এক কান্দারী যুবকও—সে হতভাগ্যরও দেশে অন্ন জুটে নাই বলিয়া—একটা সাবঙ্গ হাতে লইয়া দেশ পবিত্যাগ করিয়াছে—ভাই, তোমরা জ্ঞানাদের মনোবেদনা বুঝিবে না—দেশের একগাছি তৃণকেও আমাদের মত দেশত্যাগীর নিকট মৃত মাতার দণ্ডাস্থির ছায় পরম পবিত্র ও প্রীতিকর মনে হয়, স্বদেশের একটু স্নেহবব যে দেয় তাকে পরম স্নেহদ বলিয়া মনে হয়, দেশের একজন লোক দেখিতে পাইলে মনে হয়—এতদিনে হারানো রক্ত কুড়াইয়া পাইলাম—আকুল চিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—“ভাই দেশের অবস্থা কেমন?” একটু ভাল সংবাদ পাইলেই মন কত খুসী! তাই বলিতে ছিলাম, একটুখানি সারঙ্গের বাজনা—বাহা তোমরা নিতাই শুন, তাহাতে আমাদের মনে বত আলোড়ন বিলোড়ন হয় তাহা তোমরা বুঝিবে না। মায়ের কোলে বসিয়া কি কাল-ছাড়া পরিত্যক্ত সন্তানের হৃৎ বুকিতে পাবিবে?

কিছুক্ষণ গান শুনিয়া আমরা ঘরে ফিরিলাম। পথে ছোট হাকিম মাউঙ লুগলেব সহিত দেখা হইয়াছিল, তিনি বলিলেন “রাজিতে পোয়ে দেখিতে আসিও”। কিন্তু সে ব্যক্তিতে আর আসা হইল না।

শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

মুরজাহান।

গ্রীকজাতির কবিকল্পিত হেলেনের মত, মোগল-ইতিহাসের মুরজাহানেব নামে, বেশ একটু ভেল্কি আছে। নাম করিলেই কমনীয় যৌবন-সম্রাজ্ঞা মোহিনীর কথা মনে পড়ে। কাব্যে এবং ইতিহাসে জয়ার তুব্বারপাতের কথা থাকিলেও, পাঠকেব কল্পনার চিরদিন স্থির-যৌবনার ছবিই ফুটিয়া উঠে। কত কাব্যে, কত ইতিহাসে, কত মোহিনীর কথা আছে, কিন্তু সকল নায়িকার কপালে চিরযৌবন লাভ ঘটে না। ইহার কারণ এই যে, যে সকল নায়িকার স্মৃতি, নিরবচ্ছিন্ন যৌবন-সম্ভোগের কথার সহিত গাঁথা পড়ে, তাহাদের নামেব সঙ্গে সঙ্গে বয়সের তরুণতার কথা মনে জাগে। আশ্চর্য্য সরকার, বিলাসের পাপমন্ত্রিসিদ্ধ হাড় খানি না ঘুরাইয়া, উহাদের ঐতিহাসিক ছবির দিকে তাকাইতে যেন না বলিয়াই এই ভেল্কির সৃষ্টি। সীতার চরিত্রে পাপের দাগ নাই বলিয়া, রূপ ও বয়সের সহিত অসম্পর্কিতা এক দেবীমূর্ত্তিই মানসপটে অঙ্কিত হয়; এবং সেই মূর্ত্তিব চারিদিকের বিক্ষিপ্ত আলোকে, অনন্তত্বত অপার্বিবতা চ্ছুরিত হয়।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যখন তাঁহার এই নাটকের ভূমিকায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে তিনি আদর্শচরিত্র গড়িবেন না, তখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধা মুরজাহান, উপযুক্ত আখ্যান-বস্ত্র বটে। কবি এই মোহিনীর চরিত্রচিত্রে কুড়াপি ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই; এত বড় প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী, তাহা করিলেও ভাল হইত না। আদর্শ গড়িতে গেলেই অনেক বদলাইতে হয়; এবং মনের মত পরিবর্তন করিয়া কাব্য গড়াও অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। প্রকৃতিতে বাহা যথার্থতঃ ঘটিয়াছে, তাহার তথ্য বুদ্ধি লইয়া, তাহার অন্তর্নিহিত কাব্যটুকু ফুটাইয়া তোলা কঠিন কার্য। সকল

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিত্যসংঘটিত কার্যেব মধোই কবিতা আছে ; কিন্তু বড় কবি ভিন্ন সকলে তাহা ধরিতে পাবে না । তাই নবীন কবির সাংসারটা পায়ের তলায় ফেলিয়া একেবারে আকাশে উঠাও হইয়া কেবল মেঘেব মেলা এবং বিজুলির খেলা বর্ণনা কবেন ; বড়জোব পৃথিবীব ঘাসেব উপবকাব শিশিবিন্দুটুকু অকণ আলোকে ভাস্বব কবেন ।

এই নাটকেব কাব্যকৌশল সম্বন্ধে কবি একটি কথা নিজেই লিখিয়াছেন ; এ দৃশ্যকাব্যে “স্বগত” নাই । শ্রব্য কাব্যে অনেক কথা বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চলে । বলিয়া, শ্রব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্য বচনা একটু শক্ত ; তাহার উপর আবার স্বগত অবলম্বনে যে সাহায্যটুকু পাওয়া যায়, তাহাও যদি না থাকে, তবে স্নকৌশলের প্রয়োজন খুব অধিক হইয়া পড়ে । কবি যে এই স্নকৌশল সম্পূর্ণরূপেই দেখাইয়াছেন, তাহা কাব্য না পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে না ; সমালোচনায় উহা বুঝাইতে গেলে, কোন একটা বড় দৃষ্টের উদাহরণ দিয়া, অনেক উক্তি বিশ্লেষণ কবিয়া দেখাইতে হয়, যে যে সকল স্থানে স্বগত থাকিতে পারিত, সেখানে তাহা না থাকায়, কাব্যের মর্ম্ম হ্রস্বাধ্য হয় নাই । কাজেই এ বিচারেব ভাব পাঠকদেব উপবেই বহিয়া গেল ।

প্রথম দৃশ্বে, মুরজাহান অথবা মেহেব-উল্লিসাকে দেখিতে পাই, স্বামী কস্তা এবং ভ্রাতৃপুত্রী লইয়া “অতুল চিত্তবিমোহন স্তম্ভব স্তম্ভধামে” । মেহেবের মনে যে তখন কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বীজ ছিল, পতি ব্যতিবিক্ত কোন পুরুষেব ছায়া খেয়ালের ফলেও যে তখন তাহার শতস্মিত প্রেমা-লোকের পার্শ্বে কাঁপিতেছিল, তাহা গভীর প্রণিধান না করিলে বুঝিতে পারা যায় না । অদ্বিতীয় কবি ভবভূতির উত্তর চবিতের প্রথম অঙ্কে যে অপূর্ণ নাট্যকৌশল, এখানেও তাই । এই কৌশলটুকু বুঝিতে না পারিলে নাটক পড়া বৃথা হয় বলিয়া আমরা বক্তব্যটুকু পরিষ্কার করিতেছি ।

উত্তর চবিত পড়িতে গিয়া প্রথমেই মনে হয় যে রাম এত প্রগল্ভ বাক্যে সীতাব সম্বন্ধেই সীতাব সাহায্য বর্ণনা করিতেছেন কেন ? ষথার্থ প্রণয়ীত কখনো এমন করে না ? গুপ্তচর আসিয়া রামচন্দ্রকে মাহা পরে জানাইয়া ছিলেন, রামচন্দ্র অনেক পূর্বে হইতেই যে তাহা জানিতেন, তাহা গুপ্তচর নিয়োগ হইতেই বুঝিতে পারি । তিনি

সংপূর্ণ বুঝিয়াছিলেন, যে প্রজারঞ্জনের জন্ত, আজ হউক কাল হউক, তাহাব হৃদয় দ্বিতীয়ং কে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে । তিনি অন্তরে অন্তবে বিয়ের জালায় জলিতে-ছিলেন । তাই জনকের গমনের পব অন্তঃপুর পবিত্যাগ করেন নাই ; তাই কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত ভাবায় সীতাদেবীব মুক্তি স্থিতির কথা বলিয়া সীতাকে লজ্জিতা করিতেছিলেন ।

মুরজাহানের মনে ছঃস্বপ্ন ছিল, তাই সে অত স্নখ সহিবে না ভাবিতেছিল ; তাই জোর করিয়া আপনায় পাবিবাবিক স্নখের কথা অত করিয়া আলোচনা করিতে-ছিল ; তাই শিশুদের সৌন্দর্যেব কনকরশ্মিতে আপনাকে ডুবাইতে চাহিয়াছিল । যে সৌন্দর্যেব ভিতরে থাকে, স্নখের ভিতরে থাকে, সে কদাপি অত প্রত্যক্ষভাবে সৌন্দর্য্য এবং স্নখ দেখিতে পায় না । আগ্রার নামে চমকটুকু ঠিক এই দৃশ্বে না থাকিলেও চলিত ; কবি বরং উহাতে মুরজাহানের মনেব ভাব একটু বেশিবকমেই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন ।

মেহেবেব পতি শের খাঁ সবলস্বভাব, উদারপ্রকৃতি, সাহসী, বীর এবং ধর্ম্মভীরু । মেহের সেই দেব-প্ৰীতি সাধনায়, স্বপ্ন ও ছায়াশূন্য সমাধি লাভ কবিত্তে চেষ্টা করিতে-ছিল ; সে তর্পণে দেবতা তৃপ্ত হইতেছিলেন । কোন ছিদ্র দিয়া শনি আসিয়া স্বন্ধে চাপে তাহা কেহই জানে না ; এত বড় রাজা শ্রীবৎসও জানিতে পারেন নাই । বালিকা সৌন্দর্যেব দৃষ্টে ও যৌবনেব খেয়ালে, একটু খানি রঙ্গলীলা করিয়াছিল বইত নয় ? কিন্তু কবি বুঝাইয়াছেন, যে আমাদের অতি ক্ষুদ্র বঙ্গের অভিনয়টুকুও বিরাট নাট্য-মঞ্চে অভিনয়ত মহানাটকেব অঙ্কে অঙ্কে—দৃশ্বে দৃশ্বে গাঁথা । খেয়ালেব ধাবা হউক, বর্ষার ধারা হউক, কেবল “রাশি রাশি হাসি ফুটাইয়া”ই শেষ হয় না, কখনো উহার ফলে—“অন্তরে দাক্ষণ জালা, জলে যায়—জলে যায়” । কথায় বলে, শনির দৃষ্টি একবার পড়িলে, না পোড়াইয়া ছাড়ে না । লালসা এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষার হতাশন হইতে, চিত্রিত পতঙ্গটি বহু দূবে ছিল ; নিয়তিব বাত্যাভাঙনে সে আগ্রায় গেল ।

শেরখাঁর মত বীরের পত্নীর মনের মধ্যে ছায়া লুকাইয়া ছিল, এ কথা—মেহেরের পক্ষে ঘূণাক্ষবে কাহারো কাছে

প্রকাশ করা অসম্ভব; অত্যন্ত বিশ্বস্ত সখীকেও এমন কলঙ্কেব আভাষ দেওয়া স্বাভাবিক নয়। তবুও মেহেব-উম্মিসা আগ্রায় এক সখীকে ডাকিয়া, সকল কথা খুলিয়া বলিয়া সদবুদ্ধির উপদেশ চাহিল। এই ক্ষুদ্র দৃষ্টটির কোণাল-ময় অবতারণায় কবি বুঝাইয়া দিলেন, যে সুন্দরীর অন্তরেব মধ্যে এমন ঝড় বহিতেছিল, যে সে কিছুতেই আত্মবক্ষা করিতে পারিতেছিল না। ছায়া ও দুঃস্বপ্নেব কথাটা, মুখ ফুটিয়া একবার বলিয়া ফেলিলে যদি লজ্জা-প্রভাবে উহা বা কণী হইয়া পড়ে; এই আশা। আবার্তে পড়িয়া একটা তৃণ ধরিয়া প্রাণ রক্ষার মত একবার বিশ্বস্তা সখীৰ উপদেশ ভিক্ষা; এই মাত্র। চতুর্থ দৃষ্টটি পড়িয়া দেখ, উহার একটি কথায় কোন জোর নাই, রমণীর উপদেশে কিছু বিশেষত্ব নাই এবং মেহেরের প্রতিজ্ঞার মধ্যেও কোন তেজ নাই। কিন্তু গভীরভাবে পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, যে সুবজ্রাহান যত বাহ্যিক স্থিরতা দেখাইলেও তাহার মনেব মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। ব্যাধমস্ত্রে চঞ্চলা বিহঙ্গিনী একবার প্রাণপণে পাখা নাড়িয়া আপনার ক্ষুদ্র নীড়ের দিকে চলিল। নিঃশব্দে অল্প কথায় এমন করিয়া অন্তরেব ছবি ফুটাইয়া তোলা সহজ ক্ষমতার কথা নয়।

শেরখাঁ বুঝিয়া ফেলিলেন তাহার স্বপ্ন গিয়াছে; তিনি তখন মৃত্যুব আহ্বানে অগ্রসব হইলেন। প্রথম অন্তরে অষ্টম দৃষ্টে এই মর্যাস্তিক কাহিনী। যে কথাগুলি কহিয়া শেরখাঁ পত্নীর নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাহা যদি স্বতন্ত্র একটি গীতি কবিতায় রচিত হইত, তবে বাঙ্গালার ঐ শ্রেণীৰ কবিতার ভাঙারে একটি অমূল্য বস্তু সংগীত বহিত। নিয়তি-প্রজ্জ্বলিত বহির দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত মর্মবেদনার কবণায় সিক্ত, সেই সরস ও সুকোমল প্রীতির হতাশগীতি, অনেক বার পড়িয়াছি। উপমাৰ ভাবব্যঞ্জকতায়, প্রীতির মাধুর্য্যে এবং ধীবোদাস্তেব চাঞ্চল্যহীন কাতবতায়, কবির বর্ণনা অতি চমৎকার হইয়াছে:—“আমি মানুষ—দুর্বল মানুষ মাত্র। আব সে আমাব প্রথম যৌবন, মেহের! প্রথম যৌবন! যখন আকাশ বড়ই নীল, পৃথিবী বড়ই গ্রামল; যখন নক্ষত্রগুলি বাসনার ফুলিঙ্গ, গোলাপ ফুলগুলি হৃদয়ের রক্ত; যখন কোকিলেব গান একটা স্মৃতি, মলয় সমীপে একটা স্বপ্ন;

যখন প্রণয়ীর দর্শন উষার উদয়, চুষন সজল বিদ্যুৎ, আলিঙ্গন আত্মার প্রলয়। সেই যৌবনে আমি তোমার রূপের সুখ পান কবেছিলাম।”

ইহাব পর যখন শেরখাঁ মরিয়া গেল; তখনো মুরজাহানেব অন্তর্বিরোধ ছিল। কেননা লয়লার মুখে শুনিতে পাই, যে মেহেব পোষাপাখীটির মত ধরা দিয়াছিল। লয়লার সন্দেহের কাবণ ছিল; নচেৎ সে হামলেটের মত ক্রমাগতই হতভাগিনীর মনে পিতৃশ্রুতি জাগাইয়া দিতে আসিত কেন? কিন্তু যখন সুবজ্রাহান পিতা ও ভ্রাতার সুখসম্পদের কথায়ও বিবাহে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু শেষে প্রতিহিংসাব সুবিধার কথায় নূতন আলোক পাইয়া উৎসাহিতা হইয়া উঠিল, তখন কি বালিকা লয়লার অনুমান অস্বীকার করিতে হইবে? না। সে কথা বিস্তৃতভাবে পবে বলিতেছি। মুরজাহান অবশ্য বলিয়াছিল, যে সে শয়তানীর প্রভাব প্রায় দমন করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু সে কথাটা সহজ অর্থে গ্রহণ করিলে, প্রতিহিংসার জন্ত অতটা উৎসাহের ভাব বোঝা যায় না। শেরখাঁর পত্নী নাবী বই নয়; তাহার পক্ষে মাঝে মাঝে চবণ-তলে-নিষ্কিঞ্চ ভারতবাস্তবের কথা ভাবা, আশ্চর্য্য নয়। ইঙ্গিতে তাহা বুঝিয়া লয়লাও রাগ করিতে পারে; শেরখাঁর মত দেবতাব কথা স্মরণ করিয়া বিবাহে স্বীকৃতি মুরজাহানও সে ভাবটাকে শয়তানী বলিয়া আত্মগোপন প্রকাশ করিতে পাবে। কিন্তু উহার যথার্থ সিদ্ধান্ত, মনুষ্যচবিত্রের জটিলতায় অনুসন্ধান করিতে হয়। কেবল প্রতিহিংসার জন্ত সুবজ্রাহান বিবাহ কবে নাই; মুখে যাহাই বলুক, কথা তাহা নয়। মনকে যখন আমবা চোখঠারিয়া কাছ করি, তখন ক্ষুদ্র একটা বাহানাকেই বড় করিয়া তুলিয়া থাকি। জাহাঙ্গীর সন্মুখে একটি কথা বলিয়া লইয়া, পবে একথা আবার বলিতেছি।

রেবা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, পুণ্যময়ী, পতিভক্তিপরায়ণ; কোন স্বামীৰ পক্ষেই জীব এত গুণের মধ্যে, তাহার প্রতিদিনের ঘরসংসার-করা-প্রেমের অন্তরালে, প্রেমের পূর্বসংসারের মধুবতা মাখানো একটু চক্চকে প্রেমের অভাব, লক্ষ্য করা সহজ নয়। কিন্তু যাহার চিত্ত প্রথম হইতেই লালসাদীপ্ত, তাহার কাছে ঐ গুণসমষ্টি লাবণ্যহীন অঙ্গ

সৌষ্ঠবেব মত । প্রথমযৌবনেব নবদীপ্তিতে নম্রবেব বে
বিলাসলীলা, অবশুষ্ঠনেব সহসা উল্লোচনে লক্ষ্য কবিতা-
ছিলে, জাহাঙ্গীর তাহা কদাচ ভুলিতে পাবেন নাই ;
ভোগের তত্ত্ব লালসায় পুণ্যময়ী সংসৃত প্রেম, মধুব হইতে
পাবে না । সেই জন্ত একপ স্তলে অনেক হতাশেবা মদ
খাইয়া মবে । আমি সত্ৰাট, ক্ষমতাশালী ; আমি কি
আমাব কাম্যপদার্থ-উপভোগে বঞ্চিত থাকিব ? এ ভাবটিও
জাহাঙ্গীরেব চিন্তকে চঞ্চল করিবা তুলিয়াছিল । তাই
তিনি ছলে, বলে, ভোষণে, অমামুখিক নরহত্যা পর্য্যন্ত
করাইয়া, মুরজাহান লাভ করিয়াছিলেন । লালসাব প্রবল
উত্তেজনায়, ভোগের গভীর সাধনায়, পাপ পুণ্য তুচ্ছ
কবিতা যাহা লাভ কবা যায়, মানুষ সকল স্থলেই তাহাব
গোলাম হইয়া থাকে । বুদ্ধিমান জাহাঙ্গীরও তাই
মুরজাহানের গোলামীতে বুঝিয়া স্বীকিয়া আপনাব ও দেশেব
মঙ্গল দলিত কবিতাছিলেন । এই স্বাভাবিকতাৰ জন্তই,
প্রথমতঃ জাহাঙ্গীরেব ভীষণ পাপানুষ্ঠানে ক্রুদ্ধ হইয়াও পরে
তাহার নিঃসহায়তা এবং পতন দেখিয়া হুঃখিত হই । কিন্তু
মুরজাহান ? সেই কথাই বলিতেছি ।

মুরজাহানেব শরতানী কি কেবল তাহাব গৌরব-
লালসা ? এবং বিবাতে সম্মতি কি কেবল প্রতিহিংসা
সাধনের সুগমতা লাভে ? পুরুষের মরণ কোথায়, প্রায়
সকল বমণীই তাহা বুঝিতে পারে ; বুদ্ধিমতী মুরজাহান,
উৎকৃষ্ট জাহাঙ্গীরেব অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে
পারিয়াছিল, যে সত্ৰাটের ক্ষমতা তাহার পদতলে ; এবং
ইচ্ছা কবিলে সে তাহাব তর্জনীসঞ্চালনে বাঁহুনিতির
সকল অবস্থা হেলাইতে দোলাইতে পারে । কেবল কি
সেই ক্ষমতাৰ পিপাসায় সে উত্তেজিতা ? মূলে কি ভোগ-
লালসা ছিল না ? লয়লাব অনুমান কি মিথ্যা ? এই জটিল
কথা কবি অতি দক্ষতাৰ সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; তবে
একটু বুঝিয়া লইতে হয় ।

কবি, শেখখাঁকে দেবতার মত করিয়া গড়িয়াছেন ;
কিন্তু মুরজাহান তাঁহাকে ভক্তিই করিত, নারীর প্রাণ
ঢালিয়া ভালবাসিত না । একথা মুরজাহান নিজেই
বলিয়াছে । ইহাতে আশ্চর্য্যেব বিষয় কিছুই নাই ।
অঙ্গরাজ অযোগ্য না হইলেও হীনমতী তাঁহাকে গ্রহণ করেন

নাই ;—“নারী ন কাম্যো, ন চবেদ সম্যক্ ; দ্রষ্টুং ন সা
ভিন্নকচির্হি লোকঃ” । উল্টাদিক দিয়াও ঐ কথা । “সুজন,
সুন্দর, বীৰ, ছিল প্রিয়পতি,” তথাপি আৰ্য্য-বমণী কৃষ্ণকায়
দহ্মার প্রেম চাহিয়াছিল । সে বলিয়াছিল :—

সুন্দর আমাব স্বামী, কিন্তু মুখে তাঁর
কামনা লালসা মাথা হাসি রাশি নাই ;
শুধুই বৈদিক নিষ্ঠা, শুদ্ধ সদাচার,
নিয়মিত হাসি কথা—আমি নাহি চাই ।

একটু লালসাব বাতাস না বহিলে, শুধু যৌবনগর্বে, শুধু
খেয়ালে, মুখেব কাপড় উড়িয়া যাইত না । কিন্তু মুরজাহান
যে-সে মেয়েব মত চপলা নয়, তাহাব আত্মসম্মান বোধ
ছিল, সে বুদ্ধিমতী ছিল ; নহিলে এতবড় রাজ্য শাসন
কবিত্তে পারিতনা । তাই সে প্রাণপণে দেবতা লইয়া
যব সংসার কবিতা স্থখী হইতে চেষ্টা করিয়াছিল । সে
আত্মসম্মান রক্ষাব জন্ত যথেষ্ট যুদ্ধ কবিতাছিল ; কিন্তু ঘটনা
তাহাব অনুকূল হয় নাই । সে দেখিয়াছিল, যে ক্রমাগতই
নিয়তির তাড়নায় সে যেন ফাঁদে পড়িতেছিল । একদিকে
আত্মসম্মান বক্ষা, অত্রদিকে ভোগলালসাব প্রচ্ছন্ন বহি,
এবং গৌরব-আকাজ্জক বাতাস ; এস্থলে জয় পরাজয়
কাহাণী হয়, তাহা বলিতে হইবে না । যাহা স্বাভাবিক,
তাহাই হইয়াছিল ; এবং স্বাভাবিকতা প্রদর্শনই কাব্যেব
কার্য্য । প্রবল আত্মসম্মান বোধ, এবং লয়লাৰ তিবন্ধাব
চারি বৎসর তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল ।

সাহিত্যবথী বক্ষিমচন্দ্রের ভাষায় বলি, যে, পাপেব পথ
বড় পিচ্ছিল ; প্রতিপদে পতনশীলেব গতিবুদ্ধি হয় । পূর্ণ
ক্ষমতা মুষ্টিগত করিবার জন্ত মুরজাহান প্রতিদিন যাহা
অনুষ্ঠান করিতেছিল, তাহার ভীষণতায় একদিন নিজেই
কাঁপিয়া উঠিয়াছিল । মুরজাহান যে লয়লাৰ একদিনকাব হঠাৎ
বাগেব কথায় বড় একটা পাপকাৰ্য্য করিয়াছিল, তাহা নয় ;
অনুষ্ঠিত পাপ, “প্রতিহিংসার” নাম দিয়া ঢাকিতে গিয়া
অর্থাৎ মনকে চোখুঠারিতে গিয়া, পুণ্যময়ী লয়লাব কথা
আপনাব নজীর বলিয়া খাড়া কবিত্তে চাহিয়াছিল । অতি
ক্ষুদ্র, লুকানো, নিন্তেজ পাপও একবাৰ প্রশ্রয় পাইলে সকল
পুণ্য গ্রাসকরিতে পাবে ; তাই মুরজাহান বিষম আবর্তে
পড়িয়াছিল ।

সমাজতত্ত্বের একটা অতি স্থূল ও শিক্ষাপ্রদ সত্যের কথা বলিতেছি। কোন জাতি (যত উচ্চ হইলেও,) অন্য জাতিকে (অতি হীন ও দুর্বল হইলেও) পরাজয় করিয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করা দূরে থাকুক, বরং শেষ ফলে নিজেই হটিয়া যায়। এদেশের আর্ধ্য-অনার্য সংঘর্ষের পর আমাদের যে হৃদশা হইয়াছে, উহার মূলে ঐ সত্যটি লক্ষ্য করিতে পাওয়া যায়। সমাজতত্ত্ববিৎ ষ্টুয়ার্ট মেনির ভাষায় ঐ কথাটি এই ভাবে আছে :—

In the conflict of races, the conquerors are often the conquered, becoming merged in and modified by those whom they physically subdue. This is a truth of great sociological importance.

হয়ত এই ফল এড়াইবার জন্য একালের জেতাবা অনেক চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু ভাগ্যচক্র মানুষের চালাকি উপেক্ষা করিয়া ঘুরিয়া যায়। বিস্তৃত সমাজ সম্বন্ধে যাহা সত্য, প্রতি মনুষ্যের ইতিহাসেও তাহাই সত্য; কেননা মানবের সমষ্টিই সমাজ।

মুর্জাহান যে প্রতিদিন বুদ্ধি করিয়া একটা নীতিজাল (১) রচনা করিয়া, প্রতিহিংসার জন্য, সেইটি ফেলিতেছিল ও তুলিতেছিল, একথা এ নাটকে নাই। কেননা কথাও তাহা নহে। আপনাব স্নেহের মাত্রা চড়াইতে গিয়া, আপনাব ক্ষমতা অটুট রাখিতে গিয়া, সে যত পাপ করিয়াছিল, তাহাতে সে একদিন নিজেই চমকিয়া উঠিয়াছিল। উদ্ভাস্ত স্বামী যেদিন মদমত্ততার আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মুর্জাহান তুমি দেবী না মানবী?” সেদিন মুর্জাহান বিকৃত কণ্ঠে বলিয়াছিল, “আমি পিশাচী।” এই বকমের গোটাকতক কথা, মুর্জাহানচবিত্রের অসীম সাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত জাগিয়া উঠিয়া সমুদ্রের প্রসার দেখাইয়া দিতেছে; নহিলে অবিশ্রান্ত প্রসার আশ্রয় কবা যাইতে পারিত না।

মুর্জাহান যদি প্রতিহিংসার জন্যই কাজ করিতেছিল, এবং গৌরবের জন্যই লালায়িত ছিল, তাহা হইলে মহাবতের কাছে পরাজিত হইয়া সে কাদিয়া কাটিয়া প্রাণ রক্ষা করিত না। যাহারা ক্ষমতার জন্য পাগল, এবং প্রতিহিংসায় উত্তেজিত, তাহারা অতি যৎসামান্য পরাজয়েই আত্মহত্যা

পর্যন্ত কবে। কবি যদি একবার মুর্জাহানকে এ অবস্থায় না কাদাইতেন, তবে এই বিষম জটিল চরিত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না।

মুর্জাহান সুন্দরী, মুর্জাহান মোহিনী; তাহাব রূপ-মোহের আবেশে পড়িয়া সমগ্র ভাবতসাত্ত্বিক্য ঘূর্ণিত হইয়াছিল। যে দিন নিয়তির নির্মম ফুৎকাবে সে ভেল্কি উড়িয়া গেল, এবং নিজের উত্তোলিত আবেশে পড়িয়া মুর্জাহান ক্ষমতার তৃণ মাত্র ধরিয়া দাঁড়াইতে চাহিল কিন্তু পাবিলনা, সেদিন সে পাগল হইয়া গেল। তীব্র লালসাব (২) এই শেষ কল, তাহার ঐরূপ পরিণাম, মডুলের মস্তিষ্ক-বোগ গ্রহেও দেখিতে পাই। এই স্থানে অভিমানিনী লয়লার নূতন রূপ দেখিতে পাই। লয়লা, মোগল পরিবারের অভিজ্ঞতায় বুদ্ধিরাছিল, যে সম্পদজনিত স্নেহের অর্থ অপবিত্রতা। তাই সে দুঃখের দিনে অসহায় অন্ধ স্বামীকে, এবং সম্পদহীন ভিখারিণী জননীকে বুকে টানিয়া সুখিনী হইয়াছিল। আমি মুর্জাহান নাটকের সমালোচনায় কেবল মুর্জাহানের কথাই বলিয়াছি। ইহাই বক্তব্য; কেননা অন্য চবিত্রের কথা কেবল মুর্জাহানের চবিত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা মাত্র।

প্রত্যেক অঙ্কের টীকা না করিলে, অঙ্কে অঙ্কে যে সংযোগ আছে, তাহা বুঝাইতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই সুস্পষ্ট হয় নাই কি, যে মুর্জাহান চিত্রে কবি যে চবিত্র জটিলতা আঁকিয়াছেন, তাহার প্রতিরেখা বর্ণ-বৈচিত্রে এবং ভাবের উদ্বোধনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে? এ গ্রন্থে মানবচরিত্র বিশ্লেষণে কবি যে অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাহাব অপূর্ণ বচনা-শিল্পের সহিত মিলিয়া মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(২) মোগলগৃহের তীব্র লালসাব কথা, বাব বার বলিয়াছি। কিন্তু ঐ গৃহের বিভ্রাটের কথা বলি নাই। সারাসেনসিগেব সম্ভ্রাতা এবং বিভ্রাটের, পূর্ণ মাত্রায় মোক্ষল পরিবাসে ছিল। দারা উপনিষদ গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন; গ্রীক বিভ্রাতার পণ্ডিত্যেবো মোগলদরবারে উপস্থিত থাকিত। শাহজাহানের মুখে মেটোর গ্রন্থের কথা সেইজন্য এ গ্রন্থে অস্বাভাবিক ন্যূন।

(১) নীতি শব্দ প্রাচীনের মত policy অর্থেই ব্যবহার করিলাম।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বরাষ্ট্রিক সমিতি ।

এক শক্তির অপব কোনো এক শক্তিকে ধর্ম করিয়া প্রাধান্য লাভ করা চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের একটা প্রধান বিশেষত্ব । সাম্রাজ্যবাদমততাব আবেগে এক একটা জাতি কোটি কোটি প্রাণীহত্যা করিয়া ও যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে ক্ষান্ত হয় নাই । নবশোধিতে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে, তবু পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই । জগতের সমুখে আপনাব শক্তিকে সর্বাপেক্ষা বড় কবিয়া তুলিবার এই আকাঙ্ক্ষা সমস্ত জাতিকে অত্যন্ত ক্ষীণ ও সংকীর্ণমনা করিয়া রাখিয়াছে । ব্রিটিশ সিংহের Rule, Britannia, জার্মান-রাজ্যের Deutschland uber Alles অর্থাৎ Germany over everything ইত্যাদি সংগীত তাহার পরিচায়ক ।

কিন্তু এই “উৎকট” স্বদেশপ্রীতির শতাব্দীর মাঝে শান্তি ও সংঘমেব বাক্তী আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; সমগ্র মনুষ্য-জাতির ভিতরে সহায়ত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন কবিসবার জন্ত বৈশ্বাচার্য্য চেষ্টা আজ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির ভিতরে দৃষ্ট হইতেছে । The Hague Peace Conference এর উদ্বোধন, জার্মান সোসিয়ালিষ্টগণ, ফ্রান্সের সোসিয়ালিষ্টগণ, জগতে সন্মানে প্রতীষ্ঠার জন্ত চেষ্টা কবিত্তেছেন । যাতে এক জাতি অপব জাতির স্মৃতিতে যথোচিত সহায়ত্ব প্রকাশ করিতে পারে, এক জাতি অপব জাতির প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করে, যাতে একে অপরের রক্ত শোষণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ না কবে, সেই জন্ত আজ জগতের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র চেষ্টা নানা আকারে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে । এই প্রবন্ধে যে সমিতির কথা উল্লেখ কবিব তাহাবও সৃষ্টি এই মহৎ চেষ্টাকে জাগ্রত রাখিবার জন্ত ।

আমেরিকাব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতি বৎসরই বিভিন্ন দেশ হইতে অনেক যুবক অধ্যয়ন করিতে আসেন ; এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপ্রণালী ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা কবিসবার মহা সুযোগ বিভিন্ন দেশ হইতে যুবক-দিগকে এখানে আকৃষ্ট কবে । আমেরিকাব প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদেশী ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে ।

এই সকল শিক্ষা-কেন্দ্রস্থলে আশা ও আনন্দ লইয়া বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল যুবক আসেন, তাঁহাদের পবম্পরের ভিতরে সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্ত বহুদিন অবধি একটা সমিতির অভাব বোধ হইতেছিল । সমস্ত প্রকার সংকীর্ণতা বিদ্বেষ ভাব ও ‘উৎকট’ স্বদেশপ্রীতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে ইহঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঔদার্য্য, সার্বভৌমিক প্রীতিতে দীক্ষিত হন এই উদ্দেশ্য লইয়া একটা সমিতি স্থাপনের চেষ্টা ইহঁল । ক্ষুদ্র চেষ্টার ভিতর দিয়া বিধাতার আশীর্বাদ কত বৃহৎ আকারে প্রকাশিত হইয়া উঠে, সার্বরাষ্ট্রিক (Cosmopolitan) সমিতির জন্ম তাহার একটা অলঙ্কার প্রমাণ । উইস্কন্সিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্রগণ সর্বপ্রথমে এই সমিতি স্থাপনের সংকল্প করিলেন—স্বপ্নপ্রহেলিকাব ত্রায় এই সংকল্প সূক্ষ্ম আগিয়াই মিশিয়া গেল না, ইহা বিদেশী ছাত্রদিগকে যথার্থ উদ্বোধিত কবিয়া তুলিল । ১৯০৩ সালের ১২ই মার্চ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বোলটা বিদেশী ছাত্র কার্ল কাবা কামি (Karl Kawa Kami) নামক একজন জাপানী ছাত্রের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মিলিত হইলেন । একাদশটা বিভিন্ন জাতির মিলনের সৌন্দর্য্য তাঁহাদের হৃদয়ে আশা আনন্দ ও উৎসাহকে আরো ঘন উন্মুখ করিয়া তুলিল । তাঁহারা স্থির করিলেন যে উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা কবিত্তে হইবে যেখানে বিদেশী ছাত্রগণ পবম্পর পবম্পরের বন্ধুত্বে সাহায্য ও সহায়ত্বভিত্তিতে বিদেশবাসকাল আনন্দে যাপন কবিত্তে পারেন, যে স্থলে বিভিন্ন জাতি পবম্পর পরস্পরকে ভাল করিয়া জানিতে পাবে । সেইদিনকার সেই সভাতেই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল । সভাপতি, ও অগ্রাঙ্ক কর্মচারী নিযুক্ত হইল । একজন আরমেনিয়ান সভাপতি, একজন নবউইজিয়ান সহকারী সভাপতি, একজন জাপানী সম্পাদক, একজন আমেরিকান ধনাধ্যক্ষ, একজন জার্মান হিসাব-পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইলেন ; বোলজন সভ্য লইয়া সমিতির সূচনা কবা হইল । অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন সমিতি বেশী দিন চলিবে না । কিন্তু যে সংকল্পে বিশ্বাস মঙ্গলমুর্শে এত শক্তি, এত উত্তম, এত উৎসাহ লইয়া আইসে তাহা অসম্ভব না হইয়া থাকিতে পারে না । আশা

নিবাশা, অন্ন পরাজয়, সফলতা নিশ্চলতার ভিতর দিয়া এই ক্ষুদ্র সমিতিটী আজ বৃহৎ আকার ধারণ কবিয়াছে। উইস্কসিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমিতির প্রভাব উত্তবোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ সর্বশুদ্ধ প্রায় ১২০ জন ইহাব সভ্য। দুঃখের বিষয় আমাদের ভারতবর্ষীয় কোনো ছাত্র এখানে নাই; উইস্কসিন্ বিশ্ববিদ্যালয় গোয়ালাব ব্যবসায় (Dairy farming) শিক্ষা করিবার উৎকৃষ্ট স্থান। আমাদের যুবকেরা যাহা বা ঐ বিজ্ঞা ও ব্যবসায় শিখিতে চান, উইস্কসিন্ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

উইস্কসিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী যুবকেরা এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়া এদেশের অন্ত্যন্ত অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্রগণের সম্মুখে এক নব আদর্শ স্থাপন করিলেন। ইহাদের দৃষ্টান্তে একে একে ঐক্যপ সমিতি আজ আমেরিকাব সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আমি সংক্ষেপে আবার দু'একটি সমিতির ইতিহাস আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র। ভারতবর্ষ হইতে আমাদের দুই তিন জন বন্ধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিবিয়াছেন। এখনও একাদশটি ভারতবর্ষীয় যুবক এই স্থলে অধ্যয়ন করিতেছেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্করাষ্ট্রিক সমিতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একজন উৎসাহী আরগেন্টাইন্ রিপাবলিকান (Argentine Republic, S. A.) যুবকের নাম বিশেষ ভাবে যুক্ত। ইহাব নাম মডেস্টো কুইরোগা (Modesto Quiroga) কর্নেলের কোনো ভারতবর্ষীয় বন্ধুব কাছে শুনিয়াছি—কুইরোগা বিশাল অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবের নম্রতা, চারিত্রের মাধুর্য, কর্নেলের ছাত্র-মণ্ডলীকে তাঁহার ভক্ত করিয়া তুলিয়াছিল; তিনি যথার্থই জীবনে সাধনা দ্বারা বৃদ্ধিতে পাবিয়াছিলেন “Above all nations is humanity.” উইস্কসিনের দৃষ্টান্তে বিদেশী যুবকদিগকে লইয়া একটি সমিতি গঠন করিবার জন্ত কুইরোগা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; তিনি কালেজের কোনো কোনো অধ্যাপক ও বন্ধুদের কাছে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ১৯০৪ সালের ১০ই নভেম্বর বারন্ হলে এক মহতী সভা আহত কবিয়া তাহার প্রস্তাবকে সফল কবিয়া

তুলিলেন; কর্নেলের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রফেসর কম্পষ্টক, বেইলি, বিষ্টল, প্রভৃতি মনীষিগণ সর্বান্তঃকরণে কুইরোগাব এই মহৎ চেষ্টাকে ফলবতী করিবার জন্ত বহু কবিত্তে লাগিলেন; এক পক্ষ মধ্যে আর একটি সভা আহত হইল; কসিয়ার একজন ছাত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন; কর্নেলের বহুসংখ্যক অধ্যাপক, ছাত্র উপস্থিত থাকিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠাকে মহাগৌরব দান করিয়াছিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে একখানি গৃহ ভাড়া কবিয়া সমিতির কেন্দ্র-স্থান নির্দেশ করা হইল। সভাপতি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গৃহখানিকে সুসজ্জিত কবিলেন; বিভিন্ন জাতির পতাকা সংগ্রহ করিয়া গৃহে বস্কিত হইল; এমন মিলন, এমন বিচিত্র সমাবেশ, জগতের সুদিনের মহাশাহির সম্ভাবনাকে ঘোষণা করিতেছে।

এদেশে যতগুলি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কর্নেলের সমিতি তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার মোট সভ্যসংখ্যা ৩৫০ জন। ভারতবর্ষীয় যুবক বাবু ইন্দুভূষণ দে মজুমদার কিছুদিন এই সমিতির সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সার্করাষ্ট্রিক সমিতির কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিবার পূর্বে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতিটির বিবরণ কিছু লিখিব।

আমেরিকার নয়টি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইলিনয় (Illinois) বিশ্ববিদ্যালয় একটি। এদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকালেজের খুব খ্যাতি আছে। এতদ্ব্যতীত Engineering, Ceramics প্রভৃতি শিক্ষা করিবার বন্দোবস্ত এখানে বেশ ভাল। এই শিক্ষা-কেন্দ্রে বিদেশী যুবকসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার্করাষ্ট্রিক সমিতি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়া উঠিল। কতিপয় উৎসাহী সভ্যের চেষ্টায় ১৯০৬ সালের ২০শে অক্টোবর সমিতি স্থাপিত হইল; আমাদের তিনজন বাঙ্গালী যুবক তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে ছিলেন। তাঁহারা খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা কার্যে যোগদান করিলেন। বিক্রমপূবনিবাসী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ বসু সমিতির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে সমিতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি প্রধান স্থান লাভ করিতে পাবিয়াছে। কতিপয় অধ্যাপকের

সহানুভূতিতে, সভ্যদের উৎসাহে সমিতিটাব কার্য্য অতি স্নন্দররূপে পবিচারিত হইতেছে । বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সমিতির সভাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া আমা দিগকে গোবন্দিত কবিয়াছেন । আমাদের ভারতবর্ষীয় যুবকদের মধ্যে ইনিই সর্ব প্রথমে এই সম্মান প্রাপ্ত হইলেন । ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তিনটা বাঙ্গালী যুবক অধ্যয়ন করিতেছেন ।

পূর্বে উল্লেখ কবিয়াছি এদেশের অধিকাংশ বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে সার্বরাষ্ট্রিক সমিতি উদ্ভবোত্তর প্রাধান্যলাভ কবিতেছে । বিগত ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতি হইতে প্রতিনিধিদিগকে লইয়া উইস্কন্সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সভা আহ্বান করা হইয়াছিল । এ দেশের সমিতিগুলিকে আরো সতেজ করিয়া তুলিবার জন্ত এই সভা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন । যাহাতে বিভিন্ন বর্ণ, জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত হয় তন্নিমিত্ত এই সভা বিশেষ উদ্যোগ কবিয়াছেন । কর্নেল

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সভাপতি The Hague Peace Conferenceএ আমেরিকার প্রতিনিধি মাননীয় এন্ড্রু ডি: হোয়াইট (The Hon. Andrew D. White) আমাদের সমিতিতে সম্বোধন কবিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমরা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ । যে কার্য্যে, যে উদ্দেশ্যে Hague Conference নিযুক্ত, তোমরাও সেই কার্য্য সম্পন্ন কবিতেছ ।”

আমাদের সমিতির কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে এখনো কিছু উল্লেখ করি নাই । সাধাবণত: জনসাধারণের জন্ত মাসিক একটা করিয়া সভা আহত হয় এবং বিভিন্ন দেশের এক একজন যুবককে তাঁহাব নিজের দেশের সম্বন্ধে কিছু বলিতে দেওয়া হয় । বিভিন্ন দেশের কান্নিনী, নানা প্রকার সঙ্গীত, ইত্যাদিতে সভাগুলি খুবই উপাদেয় হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীগণ উৎসাহের সঙ্গে ইহাতে যোগদান করেন ।

মাঝে মাঝে এক এক জাতিকে এক একদিনের সমস্ত কার্য্যপ্রণালীভ ভার লইতে হয় । এই “series of national nights” আমাদের সমিতিব একটা বিশেষত্ব ।

এদেশের ছাত্রছাত্রীগণ খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সকল অভিনব ব্যাপাবে যোগদান করেন । কিছুদিন পূর্বে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ছাত্রগণ “Indian night” সম্পন্ন করিয়াছিলেন । তাঁহাবা তাঁহাদের জাতীয় পতাকা ও দেশোৎপন্ন জুএকটা দ্রব্য দ্বাবা গৃহখানি সজ্জিত কবিয়া সমবেত ব্যক্তিদিগের সম্মুখে ভারতের কাহিনী প্রচাব কবিয়াছিলেন ; একজন যুবক এশাজের গুমধুর বন্ধারে উৎসবের অঙ্গকে পরিপূর্ণ কবিয়াছিলেন । সে দিনকার সে উৎসবের নাধুর্য্য উপস্থিত জনসাধারণের স্মৃতিতে আজো স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে । আজো বহুজনের কাছে এশাজ যন্ত্রের ব্যাখ্যা ও গুণকীর্ত্তন কবিতে হয় ।

সাধারণ সভা ব্যতীত মাঝে মাঝে সভ্যগণ একত্র হইয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন । বৎসবে একবার বহু আড়ম্বরে সমিতির ভোজ হয় । এতদ্ব্যতীত কখনো কখনো বন-ভোজন ইত্যাদি সম্পন্ন হয় ।

সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার কার্য্যপ্রণালী সর্বদাই উদ্দেশ্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া-নির্দ্ধারণ করেন । যাহাতে বিভিন্ন জাতি ও দেশকে আমরা যথার্থ খাটি ভাবে বুঝিতে পারি, যাহাতে একে অপরের কোনো প্রকার স্বতন্ত্রতাব জন্ত ঘৃণা পোষণ না কবে, আমাদের শিবায় শিবায় যে একই বস্তু প্রবাহিত ইহা আমরা যাহাতে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পাবি, আমাদের সমিতির কার্য্যকলাপ সেইদিকেই চালিত হয় । এই মহৎ উদ্দেশ্য, ও নব আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদের সমিতি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে ।

ক্ষুদ্র হইতেই বৃহত্তর সৃষ্টি হয় । কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে উইস্কন্সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জাপানী ছাত্রের কক্ষে যে সমিতিটা বোলটা মাত্র সভা লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আজ অতি অল্পকাল মধ্যে এদেশের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাহা নব নব আকারে প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে—আজ সর্বশুদ্ধ সভ্যসংখ্যা নয় শত । যে উদ্দেশ্য, যে আকাঙ্ক্ষা এতগুলি প্রাণকে অনুপ্রাণিত কবিয়া তুলিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহা যে জগতে মহাকল্যাণ সাধন করিবে, তাহাতে আব সন্দেহ কি ? সমস্ত দ্বন্দ্ব, ঘৃণা, নিষ্পেষণ ও যুদ্ধবিগ্রহের অবসানে মানব জাতির ভিতরে যে মহাশান্তি বিরাজ কবিবে,—এই সকল

ক্ষুদ্র চেষ্টা সেই ভবিষ্যতেব হৃদিনেব সম্ভাবনাকে সূচিত কবিতেন্বে। সমিতিব সভা গৃহে যখন জাপান, চীন, ফিলিপাইন, পাকিস্তান, গ্রীস, স্পেইন, ইতালী, জার্মানি ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে আগত বহুদেব সঙ্গে একত্রে মিলিত হই, তখন যথার্থই উপলব্ধি করিতে পারি—“মোরা মিলেছি সব মায়ের ডাকে।”

স্বপ্নরাজ্যের গান।*

লুকায়ে বেধেছিলাম হৃদয় আমার
ববি-দৃষ্টি হ'তে দূরে গোলাপেব নীড়ে,
হৃদ-ফেন হ'তে সেট অতি সুকোমল
গোলাপের অস্তবালে মোর মনটিবে !
ঘুমায় না মন কেন, চমকিয়া উঠে,
একটি গোলাপপাতা যদিও না হলে ?
বুম কেন অকারণ থাকি থাকি টুটে ?
বেজেছে গোপন গান তার প্রাণমূলে !
চুপ কর, বলিলাম, পেলব পল্লব
তীক্ষ্ণ-রবিকবজাল দিয়েছে ঢাকিয়া ;
তোব চেয়ে অশান্ত সে বায়ুব তাণ্ডব
ঘূমে পড়ে সাগরেব উরসে চলিয়া ।
কণ্টকের সূচীমত কোনো কি আঘাত
জাগায় অশান্তি তোয়, বল্ দেখি খুলে ।
অথবা হতাশা করে ঘূমেব ব্যাঘাত ?
বেজেছে গোপন গান তার প্রাণমূলে !
মাতৃভূমি—যার নাম সূজলা সূফলা,
স্বপ্নরাজ্য সম যার অগণিত সুখ,
ঘুম-পাড়ানিয়া গান গাহিয়া কমলা
অচেতনে ভরেছিল আমাদের বুক !
জাগানিয়া গান এবে মার কণ্ঠে বরে,
হৃদয় ঘূমতে নারে, জাগে ঢুলে ঢুলে ।
শোনে না কাহাবো বাণী, কি হয়েছে ওরে ?
বেজেছে গোপন গান তার প্রাণমূলে !
চাক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

* স্বইনবর্ণের কবিতার ভাবানুবাদ ।

একটি লাভজনক ব্যবসায় ।

সে দিন আমরা নাইনিতাল হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত “ভওয়ালী” নামক একটি স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। উহা নানা কারণে নাইনিতাল-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগেব আকর্ষণের স্থল। বাঙ্গালী-গোবব শ্রীমৎসোহহং স্বামীর আশ্রম এই স্থানে অবস্থিত। এই আশ্রমেব অনতিদূরবর্তী পুতসলিলা গির্জাদীর তটভূমি হিন্দুদিগের চির-বিশ্রামের স্থল। সোহহং স্বামী এই শ্রমের অধিষ্ঠাতা দেবতার জায় অবস্থিতি করিয়া যুতের সংকারে সর্বপ্রকার সহায়তা করিয়া থাকেন। তাঁহার আশ্রম শোকার্ন্তের শাস্তিস্থল। এই ভওয়ালীর পথ দিয়াই বট্টানাপ, কেদারনাথের যাত্রিগণ গমনাগমন করিয়া থাকেন। সম্মুখে বিশালবপু গর্গাচলশ্রেণী অলভেদ করিয়া দণ্ডায়মান। এক্ষণে ইহার পৌবাণিক নাম ঘুচিয়া “গাগববেজ” নাম হইয়াছে। ইহারই এক স্থানে মহামুনি গর্গের আশ্রম ছিল। তাঁহার পদরেণু মাখিয়া এই শৈলভূমি চিরপবিত্র হইয়া রহিয়াছে; শত শত বর্ষের বারিপাতেও তাহা যেন বিধোত করিতে পারে নাই। এই গর্গাচল-পাদমূলে বিবিধ বস্ত্রবৃক্ষ, লতাশুষ্ক এবং অরণ্য-পুষ্পতরুশোভিত ক্ষুদ্র শৈলরাজ্যপবিত্রীত একটি উপত্যকাভূমি আছে। এই উপত্যকাভূমিতেই ফলপুষ্পোদ্বোন-সংলগ্ন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর আশ্রম রহিয়াছে। আমরা সেই চিব-নবীনা চিরবিস্ময়োৎপাদিকা, নয়নেব চিরতৃপ্তিদায়িনী মনোমোহিনী প্রকৃতি সতীর সৌন্দর্য-জগতে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকালের জন্ত আশ্রমহারা উদ্দেশ্যহারা হইয়া ইতঃস্তত বিচরণ কবিতেছিলাম। অদৃষ্ট ঐচ্ছজালিকের মন্ত্রপুত ভূমিতে পদার্পণ করায় ক্ষণকালের জন্ত এই সংসার-তাপ-তপ্ত গুরু আমাদেরও হৃদয় সরস হইয়া উঠিয়াছিল; বিষয়-বিবদিক্ত চিন্তাক্রিষ্ট মনও ক্ষণকালের জন্ত মুক্ত শাস্ত হইয়াছিল। আমরা ক্রমে “সপ্ততাল”, “ভীমতাল” এবং ষ্বেতশতদলশোভিত “নবকুচিয়া তাল” দেখিতে দেখিতে পুনরায় ভওয়ালীব পথে প্রত্যাবর্তন করিলাম। আমরা অশ্বপৃষ্ঠে ছিলাম বটে কিন্তু ১৬:৭ মাইল পার্কত্যা প্রদেশের পথপ্রমে ইতি-মধ্যেই আমাদের মোহ ভঙ্গ হইয়াছিল। অত্বেহার উপর ভওয়ালী প্রত্যাগমন করিয়া তথাকার তার্গিনের কাবধানায়

প্রবেশ করিলাম। এখানে কৰ্মক্ষেত্ৰের মৃত্তিকার কঠোর স্পর্শে, প্রচ্ছলিত চুল্লীর উত্তাপে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহেব ফুটন্ত তার্পিনেব তীব্র গন্ধে এবং কাবখানাব ঘর্ঘর ধ্বনিতে আমাদেব কন্ননার ঘোর সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছিল। তখন কাবখানাব কার্য্য পরিদর্শন কবিতে কবিতে তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়কে চীড় গাছ (Pinus Longifolia) হইতে বস নিষ্কাশন, বস হইতে তৈল বহিষ্করণ এবং তাহার ব্যবসায় লাভ ও ক্ষতি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন পৰম্পৰায় ব্যতিব্যস্ত কবিয়া তুলিলাম। তিনি ধীবে ধীবে স্বীয় অভিজ্ঞতাব ভাণ্ডাব আমাদেব সম্মুখে উন্মুক্ত কবিয়া দিলেন। আমাদেব তখন এই পাইনবৃক্ষবহুল প্রদেশে তার্পিনেব কারবার বেশ লাভজনক বলিয়া ধারণা জন্মিল। চীড়গাছ হইতে রস সংগ্রহ করা বড় কঠিন কার্য্য নহে। তাড়িওয়ালারা যেকপ তাল গাছ হইতে বস গ্রহণ করে চীড়গাছ সেইরূপ ক্ষত (tap) কবিয়া রস লইতে হয়। একটি চীড়গাছ হইতে গড়ে ২৥ সের ১১ পোষা আন্দাজ রস বাহিব হয়। মার্চ মাসেব ১৫ই হইতে নভেম্বর ১৫ই পর্য্যন্ত অর্থাৎ বৎসবে ৮ মাস কাল এই কার্য্য চলিতে থাকে। একটা গাছ হইতে ৫ বৎসব বস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ রস গামলায় জমা কবা হয়, পবে তাহা টিনেব কেনেজার কবিয়া কাবখানায় পাঠান হয়। সেই কাঁচা ও অসংস্কৃত (crude) আঠা তখন গলাইয়া মলামাটি বাহির কবিবাব জন্য ইঁকিয়া লওয়া হয়। অতঃপর সেই কাঁচা আঠা একটি চাকনিদাব (cylinder boiler) বাষ্পস্থালী বা পাকপাত্রে জাল দেওয়া হয়। ভাঁটিতে যখন উহা বেশ ফুটিয়া উঠে তখন একটি 'ইউ' আকৃতিব ফানল (U shaped funnel) দিয়া অল্প অল্প জল তাহাতে দেওয়া হয়। ফানলটা বাষ্পশবনি বা বাষ্পনিঃসারণ দ্বাবেব কাজ করে। এই অল্প অল্প জল সংযোগে উহা বাষ্পাকারে একটি লম্ব-নালী (tube) দিয়া বাষ্পগাঢ়কারক যন্ত্রে (condenser) গিয়া পড়ে। এই লম্ব-নালীর সহিত বাষ্পগাঢ়কারক যন্ত্রমধ্যস্থ একটি কুণ্ডলীকৃত নলেব (coiled tube) যোগ আছে। কণ্ডেন্সেব বাহিরে যে পিত্তল-পাইপ (brass cock) আছে তাহার ভিতব দিয়া বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল ও তার্পিনে পরিণত হয়। ঐ মিশ্র পদার্থ একটি তাম্র পাত্রে

গৃহীত হয়। ঐ তাম্রপাত্র-সংলগ্ন দুইটা পিত্তল-পাইপ আছে। একটি নিম্নে ও একটি মধ্যভাগে। তার্পিন জল অপেক্ষা লঘু বলিয়া উপরে ভাসিতে থাকে এবং জল নিম্নস্থ পাইপ দিয়া বাহিব হইয়া যায়। তৈলাংশ তখন মধ্যস্থ পিত্তলনালী দিয়া বোতলে ধরা হয়। তখনও ঐ তার্পিন বিস্কৃত নহে, কারণ তখনও উহাতে অতি সামান্য জলীয় পদার্থ থাকিয়া যায়। এক্ষণ বোতলগুলি রোদ্রে বাখা হয়। সূর্য্যেব রশ্মিযোগে তার্পিন পবিষ্কাব হইতে থাকে এবং জলীয়ভাগ তলায় পড়িয়া যায়। তখন ফানলেব মুখে ব্লটিং কাগজ বাধিয়া বোতলস্থ তৈল টিনেব কেনেজার ইঁকিয়া বাখা হয়। এই সকল টিনেব মুখ বন্ধ কবিয়া দেশ বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

উপরে তার্পিনেব সঙ্গে মিশ্রিত যে জলের কথা বলা হইল, তাহা সাধারণ জল নহে। উহাতে Acetic Acid, Pyro-ligneous acid ও Wood spirit থাকে, কিন্তু ইহাদেব পরিমাণ এত অল্প যে তাহা কোন লাভ জনক কাজে লাগান হইতে পাবে না। চার মণ কাঁচা (crude) আঠা হইতে ২৪ গ্যালন বা ২ মণ ২৮ সেব তৈল ও ৩৫।৩৬ সের হইতে ১ মণ পর্য্যন্ত বজন উৎপন্ন হয়। চাব মণ কাঁচা আঠা হইতে ২ মণ ৩৮ সের তৈল বাহিব হইলে ভাঁটির কাজ বন্ধ কবা হয় এবং ভাঁটির গায়ে সংলগ্ন পিত্তল নালি দিয়া বজন বাহির কবিয়া লওয়া হয়। সে সময় বজন অতিশয় তবল থাকে। উহা বাহিব হইবার কালে ছাকনি কাপড়ের ভিতর দিয়া একটি লোহ কটাহে পড়ে এবং তাহা হইতে কেটো বা বারকোসে রাখা হয়। ৫৬ ঘণ্টাব মধ্যে উহা জমাট বাধিয়া বজন হইলে তাহাকে ভাসিয়া বস্তাবন্দী কবা হয়। বজন ছাপার কালি (Printing ink), বার্গিস, ছিট (Calico printing) এবং দেশী গালার চুড়ীতে ব্যবহৃত হয়। তার্পিন-ও রং, বার্গিশ, এবং ঔষধাদিতে ব্যবহার হয়। এই ভণ্ডারালীর কারখানার কার্য্য ১৮৯৬-৭ অব্দে আরম্ভ হয়। তখন বৎসবে ৭ শত গ্যালন তার্পিন ও প্রায় সাড়ে তিন শত মণ বজন প্রস্তুত হইত। তখন এই কারখানা শ্রীযুক্ত হবিদন্ত জোষী বেঞ্জর ও ডেপুটী-রেঞ্জব শ্রীযুক্ত ববিদন্তেব তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৮৯৯ অব্দে ইহাব মাল খারাপ হওয়ায় কাজেব উন্নতি হয় নাই। তখন কার্য্য চলিবে কি না তদ্বিষয়ে অনেকের

সন্দেহও হইয়াছিল। প্রথম পরীক্ষায় কৃতকার্য না হইয়া অনেক ব্যবসায়ী উৎসন্ন গিয়াছে। এমন কি এই তার্পিনের ব্যবসায়ী পঞ্জাব প্রদেশের কাংড়া জেলায় আশঙ্কনক বলিয়া বোধ না হওয়ার বন্ধ হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে জরীক বিশেষজ্ঞ ১৯০৬ অক্টোবর ১৪ই মে তাবিখেব পাইওনিয়র পত্রে লিখিয়া ছিলেন :—

“The Punjab Government has tried the distillation of turpentine on a small scale at Nurpur, in the Kangra District, as an experiment. The Forest report of the last year announces the closing of the small Nurpur factory without giving any explicit reason for the same. Two reasons are assigned. (1) that the trade in the raw material is more profitable than the distillation of the turpentine oil, (2) that the tapping is injurious to the life of the trees. When the consumption of turpentine is obviously so great, there seems no reason why the manufacture of the last product out of a raw material in this case should be less paying than the trade in the raw material itself. Having devoted some time to this industry, I am of positive opinion that the turpentine distillation cannot but be very profitable, especially when the Government itself takes the industry in hand because of the great pine forests at its disposal. In France and America enormous quantities of this oil are distilled and very little injury is done to the life of the tree. In Japan, I have seen, with my own eyes, the operations of such a distillery and their experience in tapping says nothing against the life of the trees.”

ভাওয়ালীর কাঁচখানার ভাব ১৮৯৯ অব্দে নভেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি লাহিড়ী (Forest Ranger) মহাশয়ের হস্তে স্তম্ভ হওয়ার উহা স্থায়ী হইয়া যায়। তিনি ডেপুটি কনজারভেটর শ্রীযুক্ত ক্যাথল সাহেবের উৎসাহ পাইয়া ৬ বৎসরের শ্রম ও যত্নে ইহাকে একটি বিলক্ষণ লাভজনক ব্যবসয়ে পরিণত করেন। তাঁহার চেষ্টায় এই কাঁচখানা হইতে বার্ষিক আট হাজার গ্যালন তার্পিন ও তিন হাজার ছয় শত মণ বজ্র উৎপন্ন হইতে থাকে। প্রথমে ইহাতে খরচ পড়িত ১২।১৩ শত টাকা আর আয় হইত ১৪।১৫ শত টাকা। স্তূতরায় দুই শত বা আড়াই শত টাকা মাত্র লাভ থাকিত। সেইস্থলে এক্ষণে ১৭।১৮ হাজার টাকা খরচে ৩২।৩৩ হাজার টাকা আয় হইতে

লাগিল। এখানকার উৎপন্ন তার্পিন রেলওয়ে এবং অর্ড-নান্স তৈরীখানায় (arsenal) অধিক সরববাহ হয়। যৎসামান্য বাহা বাকি থাকিয়া যায় (প্রায় ২০০ গ্যালন) তাহা খুচরা বিক্রয় হয়। এই উন্নতির কারণ তিনকড়ি বাবু অভিজ্ঞতা। তিনি এই শিল্পবিজ্ঞানে স্বয়ং পবিপক। হাতে কলমে কাজ করিতে সমর্থ। তাঁহার জ্ঞানের সহিত ক্যাথল সাহেব ও লভগ্ৰোভ সাহেবের উৎসাহ এই উন্নতির অন্ততম কারণ। এই তার্পিন বিলাতী হাটবকের তার্পিন হইতে কোন অংশে নিরেশ নহে অথচ মূল্যে গ্যালন প্রতি প্রায় ৬০ হইতে ১ সত্তা পড়ে। এখানকার রজন মার্কিন বজ্র হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কানপুবে মার্কিন বজ্রের আমদানি আছে। ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় উহা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখানকার রজন মণ প্রতি ৫ টাকা ও তার্পিন এক গ্যালনে (৪।০ সের) ২৬০ পড়ে। পাইকারদিগকে ২।০ হইতে ২।০ টাকা গ্যালন হিসাবে দেওয়া হয়। রজন প্রায় সমস্তই কানপুরস্থ এক্সেপ্টের নিকট প্রেরিত হয় এবং তথায় বাজার দরে বিক্রয় হয়। তথায় গড়ে মণ প্রতি ৫।০ হইতে ৬।০ টাকা পর্যন্ত পড়ে।

নাইনিতাল হইতে কিছু দূরে কুবপাতাল প্রভৃতি স্থানে এবং আলমোড়া প্রভৃতির জঙ্গলে অতি উৎকৃষ্ট তার্পিন গাছ জন্মে। এখনও এক্ষেত্রে প্রাত্যহিকতা অল্প। যদি চীড় জঙ্গল জমা লওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে তার্পিনের কাঁচখানা খুলিতে পারিলে, বিলক্ষণ লাভ হয়। অন্তথা এখানকার কোন কোন স্থানের পার্শ্বতা ভূমি ক্রয় করিয়া বা খাজনা লইয়া তাহাতে চীড় গাছের চাষ করিয়া এই কার্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। অবশ্য এক্ষণে অধিক মূলধনের প্রয়োজন; এবং যিনি স্বয়ং এই কার্যে অভিজ্ঞতা বা হাতে কলমে শিক্ষালাভ করেন নাই তাঁহার সিদ্ধিলাভেও সন্দেহ আছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

দুঃখ ।

দুঃখ একাকী বোদে বরষায়
চষিয়া প্রাণেব ভূমি,
কর্কশ হাতে বুন চলে যায়
প্রেম বীজ । শেষে তুমি,
ওবে স্বপ্ন, এসে চোজের মতন
ফসল লুটিবে পরে ?
গচ্ছিত আমি বাধিব এ ধন
বাজাধিরাজের ধরে ।
শ্রীবিক্রমচন্দ্র মজুমদার ।

রাজনগর ।

অত্যাভাব তরঙ্গমালাসঙ্কুল। বিভীষিকাময়ী পদ্মাব দক্ষিণ তটে প্রায় পঁয়ত্রিশবৎসর পূর্বে রাজনগর নামে এক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বিস্তারিত ছিল। এই গ্রাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকুলোদ্ভব মহারাজা রাজবল্লভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পূর্বে ইহার নাম ছিল বিলদাওনিয়া, তখন উহা বিলপরিপূর্ণ বিরল-বসতির একটা ক্ষুদ্রগ্রাম মাত্র ছিল। বিক্রমপুবেব গৌরব বামপাল নগরীর ধ্বংসাবসানে এবং দ্বাদশ ভৌমিকের অন্ততম ভৌমিক চাঁদবায় কেদার-বায়ের বড় সাধের শ্রীপুর নগরী পদ্মার কুক্ষিগত হইলে পব, বাজনগরের ত্রায় সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী স্থান কেবল বিক্রমপুরে কেন সমগ্র বঙ্গদেশেও তৎকালে অতি বিরল ছিল।

• বাজনগর সে সময়ে সত্য সত্যই রাজনগর ছিল। তখন উহা “নবরত্ন”, “পঞ্চরত্ন” “সপ্তদশরত্ন” বা “শতরত্ন” ও “একবিশ্বরত্ন” প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর সৌধাবলীর দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্য ও স্থপতি-কৌশলের শ্রেষ্ঠতার জন্তে বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। যিনি এ সমুদয় অট্টালিকা একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহাদের সৌন্দর্য্য-স্মৃতি হৃদয় হক্কুতে কখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না! কিন্তু হায়! সে সমুদয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা কারুকার্য্যখচিত অট্টালিকাসমূহ চিরদিনের জন্ত

পদ্মাব রাক্ষসী-উদরে অন্তর্হিত হইয়াছে, আব সে সমুদয় নয়নাভিরাম সৌধাবলী কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইবে না। পদ্মার তবঙ্গপ্রহারে বিক্রমপুবেব যে কতদূর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে তাহা লেখনীদ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। বিক্রমপুবেব যাহা কিছু দেখিবার এবং গৌরবের ছিল সে সমুদয় গ্রাস করিয়া “কীর্তিনাশা” এই অপনাম লাভ করিয়াছে। পদ্মাব ভীষণ ক্ষুধার শেষ হয় নাই, এখন বিক্রমপুবেব অতীত গৌরবেব শেষ কঙ্কাল-চিহ্ন, বঙ্গের শেষবীর চাঁদবায় কেদার বায়ের মাতাব শ্মশানোপবি বিনিশ্চিত রাজাবাড়ীর সুবিখ্যাত মঠটি গ্রাস করিবার জন্য এই রাক্ষসী অত্যন্ত ব্যগ্রা;—পদ্মা বর্তমান সময়ে এই মঠের দুই তিন খানা মাত্র ক্ষেত্রেব অন্তর দিয়া প্রবাহিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিক্রমপুর কেন, সমগ্র বঙ্গভূমিব মধ্যেই ইহার কীৰ্ত্তি-গবিমা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন এই স্থান ধনে, জনে, মানে, সম্মানে, বিজ্ঞান ও শিক্ষায় দেশের আদর্শ স্বরূপ বিবেচিত হইত। যখন রাজনগর নিশ্চিত হয় তখন কি কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে একদিন ইহার বক্ষোপরি পদ্মাব চঞ্চল তরঙ্গ ভীষণ রোলো নৃত্য করিবে। শতাধিক বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুবেব ভৌগোলিক পরিবর্তন সঙ্ঘে আলোচনা করিতে গেলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার এক অতি ক্ষুদ্র শাখা বাজনগরেব বহু উত্তর দিক্ দিয়া ক্ষীণ কলেবরে পূর্ব পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইত। সে সময়ে জনসাধারণে ইহাকে “বথখোলার” নদী নামে অভিহিত করিত। ইহার উৎপত্তি সঙ্ঘে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে এইক্ষুদ্র খালের অবস্থান স্থলে গ্রামবাসী জন-সাধারণের রথোৎসব সম্পাদিত হইত; রথের চক্রের আবর্তনে কালক্রমে উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে নিম্ন হইয়া যায় এবং বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইতে হইতে খালের আকার ধারণ করিয়া রথখোলা খাল নামে অভিহিত হয়। এই উক্তি কেবল অর্থোক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, কাবণ ১৭৮১ সনে দ্বৈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টরগণের অমুমত্যানুসারে তৎকালীন বঙ্গদেশের সার্কেরয়ার জেনেবেল

জেমস রেনেল, এফ, আর, এস, সাহেব ঢাকার ও তন্নিকট-বর্তী স্থানসমূহের যে ম্যাপ অঙ্কিত করেন তাহাতেও এখানে কোনও নদীৰ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে সময়ে পদ্মানদী ঢাকা জেলার দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাথরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মেহেদিগঞ্জ নামক স্থানে মেঘনা বা মেঘনাদ নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। তখন রাজনগরের মধ্য দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম দিকে একটা খাল থাকায় এখানে নানাবিধ দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইত। একদিকে যেমন সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও “রাজসাগর”, “পুরাতন দীঘি”, “কালীসাগর”, “কৃষ্ণসাগর”, “মতিসাগর”, “শিব পাড়ার দীঘি” প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয় সমূহ এখানেই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত অল্প দিকে আবার তেমনি “নারিকেলতা”, “মান্দারিয়া”, “চাকলাদার পল্লী”, “ভরদ্বাজ পল্লী”, “রাইয়ত-পাড়া” প্রভৃতি জনপূর্ণ পল্লীসমূহ থাকায় রাজনগর গ্রাম সর্বদাই আমোদ-কোলাহল-মুখবিত্ত থাকিত। সেকালে সাধারণতঃ সকলেরই অবস্থা ভাল ছিল, খাওয়া পরার চিন্তা বড় কাহাকেও একটা করিতে হইত না, সকলের ঘরেই মরাই-ভবা ধান থাকিত, কাজেই সকলে হয় লাঠি তবোয়াল খেলা নয়ত গান বাজনা প্রভৃতি নির্দোষ আমোদে দিন কাটাইত। এই নিমিত্তই সেকালের রাজনগর গ্রামে বর্তমানের ভয়ঙ্করী অগ্নিচিন্তায় কাহাকেও ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত না। এখানে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কায়স্থ, কামার, কুমার, গোপ, মালাকার, কাংড়াবণিক, গন্ধবণিক, তস্তাবয় প্রভৃতি বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের যত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস ছিল তদ্রূপ বর্তমান সময়েও বিক্রমপুরের কোনও বর্ধিষ্ণু গ্রামে এত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকেব বাস পরিলক্ষিত হয় না।

সেকালের রাজনগরবাসিগণের কেবল যে আমোদ প্রমোদ ও ব্যায়ামের প্রতি লক্ষ্য ছিল তাহা নহে, শিক্ষার প্রতিও তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল। জন-সাধারণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা প্রচারিত হয় সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ছোট বড় সকলেই যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে এবিষয়ে তাঁহারা সবিশেষ

মনোযোগ করিতেন। বাজনগরের প্রতি পল্লীতেই বাংলা শিক্ষার জন্য পাঠশালা, পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য মন্ডব ও সংস্কৃত শিক্ষার্থ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভি-ভাবকগণ নিজ নিজ কচি অনুসারে স্থায়ী স্থায় সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিতেন। তবে পাবসী ও সংস্কৃতের আদরই বেশী ছিল, বালকেবা সামান্য বাংলা শিক্ষা কবিধা সকলেই মৌলভির নিকট পারসী ভাষায় শিক্ষা লাভার্থ ছুইবেলা পুঁথি হস্তে অধ্যয়ন করিতে বাইত। অন্তঃপুরেও শিক্ষার দ্বার অবরুদ্ধ ছিল না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বিহুসী আনন্দময়ী ও গঙ্গাদেবীৰ সুমধুর কবিত্ববদ্ধাবে বর্তমান বিহুসী মহিলাগণও গোবদামিতা বোধ করিতেন না। শ্রীযুক্তবাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” নামক গ্রন্থেও এই বিহুসী কবিদ্বয়ের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান হৃদয়ঙ্গম কবা মানববুদ্ধিৰ অগোচর। বিক্রমপুরবাসীর দুর্ভাগ্য তাই ১২৭৬ সনে কীর্তিনাশাব তরঙ্গ-প্রহাবে রাজনগর চিরদিনেব জন্ত লোক-লোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। আমরা এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে বাজনগরের দ্রষ্টব্য জলাশয় গুলি ও ইমারতাদিৰ বিবরণ প্রদান করিলাম। ভরসা করি পাঠকগণ ইহা হইতেই মহারাজা রাজবল্লভের বাসগ্রামের একটা ছায়া-চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিবেন।

রাজনগরের বক্ষভেদ কবিতা যে খালটি পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত ছিল, সেই খাল ধরিয়া পূর্বদিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই “রাজসাগর” নামক একটা হ্রদের স্তায় প্রকাণ্ড সর্বোবব দৃষ্টিপথে পতিত হইত। এই জলা-শয়ের জল অত্যন্ত নির্মল ও সুপেয় ছিল। ইহার চারি তীরেই ইষ্টকনির্মিত সোপানাবলী থাকায় জনপদ-বধুগণেব জল লইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ ছিল। এই সরোবরের উত্তর তীরে ‘রাজসাগরের হাট’ নামক রাজ-নগরের সুবিখ্যাত বন্দর থাকায় এস্থান সর্বদাই জন-কোলাহলে মুখরিত থাকিত। সেকালের সভ্যতা ও কচি অনুযায়ী এই হাটে সমুদ্রীয় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। বন্দরের ভিতরে বহু রাস্তা এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান ছিল। রাজসাগরের পশ্চিমতটে স্থপতিকৌশলের নিদর্শন স্বরূপ

নানা কারু-কার্য-খচিত দুইটি দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটিতে “মহাপ্রভু” নামক দেবতা ও অপরটিতে ‘জগন্নাথদেব’ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিদিন বোড়শোপচারে এই বিগ্রহের অর্চনা ও যথাবীতি প্রাতে সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘণ্টার গগন-ভেদী নিনাদে আরতি হইত। এই সর্বোবরের অস্ত্রাশ্র ভীরে নানাজাতীয় বণিকবৃন্দ পরমানন্দে বাস কবিত। এই সরোবরের বৃহৎ সঞ্চদ্রে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যদি ইহা এক ভীত হইতে বন্দুকের আওয়াজ করা যাইত তবে অপবতী হইতে তাহা শুনা যাইত না। মুহূ পবন স্পর্শেই ইহার বক্ষে তবঙ্গনিচয় উদ্ভিত হইয়া ক্রীড়া কবিত।

পুরাতন দীঘি ।

আমরা পূর্বে যে পথেব উল্লেখ কবিয়াছি সেই পথ অনুসরণ করিয়া প্রায় এক মাইল পর্যন্ত পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে পুরাতন দীঘি নয়ন-গোচর হইত। রাজমাগব অপেক্ষা ইহা স্নায়তনে ছোট ছিল। এই দীঘিব পশ্চিমতে চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসেব শেষ তারিখ পর্যন্ত দুইমাস কাল স্থায়ী একটি মেলা বসিত। এই মেলা “কাল-বৈশাখী মেলা” বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ঢাকা জেলাস্থ উত্তর বিক্রমপুরের কার্তিকবাকলীৰ মেলা অপেক্ষা ইহাব খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। প্রাচীন ব্যক্তিদেব মুখে অবগত হওয়া যায় যে এই স্থানে চড়ক পূজার যেরূপ সমারোহ হইত পূর্ববঙ্গেব আর কোথাও সেকপ হইত না। শতাব্দিক ঢাকের প্রচণ্ড নিনাদে হৃদয়ে এক আশ্চর্য্য ভাবেব উদয় হইত। এক বিশাল চড়ক বৃক্ষে ঘোড়শ সংখ্যক বলিষ্ঠ যুবক একত্র বৃণিত হইত, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ত চতুর্দিকস্থ অগণন দর্শকবৃন্দের কল-কোলাহল ও ঢাকের ভীষণ শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত।

পুৰাতন দীঘি ছাড়াইয়া কিয়দূর অগ্রসর হইলেই সমুখে মহাবাজা বাজবল্লভের জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয়ের বাটাব তোরণ দ্বার দৃষ্টি অবরোধ কবিত। রাজবল্লভেব মৃত্যুব পরে রায় মৃত্যুঞ্জয়ই রাজনগরের মধ্যে ধনে, মানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের আবাসবাটীও নানারূপ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সমূহে পরিশোভিত ছিল। পুৰাতন

দীঘিব পশ্চিমতীরের উত্তর দিক হইতে একটি বাস্তা ববাবর পশ্চিমদিকে গিয়াছিল। এই পথের পার্শ্বে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু সর্বোবর ছিল, সে সকলেব বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। এই পথটি রাজনগরেব “পুৰাতন দরজা” নামে অভিহিত ছিল। ইহার পশ্চিমদিকে রাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারেব বাড়ী ছিল। এখানে বহু ছোট বড় অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে “নবরত্ন” নামক রমণীয় প্রাসাদটিব কথাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

নবরত্ন ।

একটি চতুষ্কোণ একতল অট্টালিকাব হলেব চারিদিকে চারিটি ও প্রত্যেক কোণে এক একটি চতুষ্কোণ মঠ ও দুইটি মঠের প্রত্যেকটিব মধ্যভাগে এক একটি “ঝিকটি ঘর” (যে ঈষ্টকনির্মিত গৃহের দোচালা ঘরেব স্থায় চাল) সন্নিবিষ্ট। ছাতের মধ্যস্থলে যে মঠটি ছিল তাহাব উচ্চতা চতুর্দিকস্থ ঝিকটি ঘব হইতে অধিক ও মাটি হইতে প্রায় শতাব্দিক হাত উচ্চ ছিল। এই অট্টালিকা ঈষ্টক ও প্রস্তবে নির্মিত এবং উহার প্রাচীরেব গারে নানা প্রকাব লতা, পাতা ও ফুল ফল অঙ্কিত থাকায় ইহা বড়ই সুন্দর দেখাইত।

একবিংশরত্ন ।

ইহাই রাজা বাজবল্লভেব বাড়ীর সিংহ দরজা বা তোরণ-দ্বার ছিল। পুৰাণ দীঘিব পশ্চিমতেব সুপ্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া কিয়দূর অগ্রসর হইলেই এই সুবিশাল তোবণদ্বার দৃষ্টিগোচর হইত। এই তোবণদ্বার একটি ত্রিতল অট্টালিকা। প্রথম তলের নিম্নে সিংহদ্বার, ইহার ছাত অর্দ্ধ-বৃত্তাকাবে নির্মিত ছিল এবং ইহার নিম্নস্থ পথ এতদূর সুপ্রশস্ত ছিল যে তাহাব মধ্য দিয়া অনায়াসে তিনটি হস্তী হাওদাসহ পাশাপাশিভাবে বাতায়াত করিতে পারিত। এই দ্বাবেব দুই দিকে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদী ছিল, উহাদেব উপর দণ্ডায়মান হইয়া দিবারাত্রি দৌবারিকগণ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত।

এই তোবণদ্বারপার্শ্বস্থ উত্তরদিকেব একতল অট্টালিকাব মধ্যে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল। সে সকল প্রকোষ্ঠে বাজকীয় সৈন্তগণ বাস করিত। এই একতল অট্টালিকার ছাতের প্রতি কোণে এক একটি মঠ ও সমুখস্থ দুই মঠের

মধ্যাংশে ও সিংহ দ্বজার উপরে তিনটি “ঝিকটি” ঘর পবম্পর সংলগ্ন ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে যখন পূর্বগগন লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত, যখন বিহঙ্গম-কুল বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া মনের আনন্দে স্তম্ভুর স্ব-লহরীতে চারিদিকে স্রাববর্ণ করিত, তখন এ সকল ঝিকটি ঘর হইতে নহবতের স্তম্ভুর প্রভাতীরাগিণী সানাইয়ের মোহিনী আলাপের সঙ্গে সঙ্গে রাজনগরবাসীর হৃদয়ে অপূর্ণ পুলক সঞ্চার করিয়া দিত। দ্বিতলের ছাতের প্রত্যেক কোণে এক একটি মঠ ও ত্রিতলের ছাতের মধ্যদেশে একাদশটি মঠ বিদ্যমান ছিল। ত্রিতলের ছাতের এই একাদশটি মঠের মধ্যস্থিত মঠটি সর্বোপেক্ষা উচ্চ এবং ইহার উভয় পার্শ্বের মঠগুলি ক্রম-নিম্ন থাকায় দূর হইতে ইহাকে ধলুকের উপবাক্কের ত্রায় দৃষ্ট হইত।

পশ্চিমদিকের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সেঘরা বা তিনটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একাকী দ্বিতল অট্টালিকা বিবাজিত ছিল। উৎসব উপলক্ষে বাদকগণ এস্থান হইতে বাতাস্বনি করিত। সেঘরার উত্তরদিকে কারুকাৰ্য্যচিত্র একটি ঝিকটি ঘর ছিল। কথিত আছে যে মহারাজা রাজবল্লভ এককোটি শিবলিঙ্গ পূজা কবিতা তাহার উপরে ঐ ঘরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই প্রথম তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হইলেই দ্বিতীয় তোরণদ্বার। ইহা পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় তোরণদ্বার পার হইলেই সমুদয় বিস্তৃত প্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে “রঙ্গমহাল” নামক সুসজ্জিত ও কলা-নৈপুণ্য-পূর্ণ বৈঠকখানার দালান দর্শকের নয়নগোচর হইত। ইহার সম্মুখেই সুন্দর একটি মন্দিরে বাসুদেব নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই মন্দিরের উত্তর দিকে আব একটি সিংহদ্বার স্থাপিত ছিল। সেই সিংহদ্বার পার হইলেই সুপ্রসিদ্ধ “সপ্তদশরত্ন” বা “শতবত্ন” নামক দোলমঞ্চ তৃতীয় প্রাঙ্গণের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হইত।

সপ্তদশ রত্ন বা শত রত্ন ।

একটি উচ্চ চাবিতল অট্টালিকা একপ ভাবে নির্মিত ছিল যে প্রত্যেক উর্দ্ধতল তাহার নিম্নতলের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল, এবং প্রতিতলের কোণে এক একটি সমআয়তন চতুষ্কোণ মঠ বিদ্যমান ছিল। সর্বোচ্চ তলে অর্থাৎ চতুর্থ তলের ছাতের মধ্যদেশে মঠের আকারে একটি মন্দির

প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা চতুর্দিকস্থ অত্যন্ত মঠ অপেক্ষা উচ্চ ছিল। যখন বসন্তের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের দোলের একটা উদ্গাদ-উচ্ছলতা পাড়ায় পাড়ায় জাগিয়া উঠিত ও বাতাস্বরের সঙ্গে সঙ্গে ছই দলু বাঁধিয়া গানের প্রতিযোগিতা চলিত সে সত্য সত্যই একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। যুদ্ধের তালে তালে হোরীর স্তম্ভুর সঙ্গীত লহরীর সহিত দোল-পূর্ণিমার সেই শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশীথে ঐ সর্বোচ্চতলস্থ মন্দিরের মধ্যে রাজ-বল্লভের স্থাপিত ৮ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র কুঙ্কম-রাগে সুরঞ্জিত হইয়া স্বর্ণসিংহাসনে দোলারমান হইতেন। প্রত্যেক তলের এবং প্রত্যেক মঠের নীচেই বাসোপযোগী এক একটি প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল। প্রতি নিম্নতল হইতে তদুর্দ্ধতলে আরোহণ করিবার জন্য সুপ্রশস্ত সোপানাবলী নির্মিত ছিল। এই হিন্দোল-মন্দিরের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিসর্গের প্রাণারাম পবিত্র সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হইত। বিশাল মহীকহবাজি ছোট ছোট গুল্মের ত্রায় এবং অদৃবস্থ রথখোলাব নদীকে একখানি শুভ্রবস্ত্রের ত্রায় দেখাইত। এই উচ্চ মন্দিরের সর্বোচ্চ মঠ প্রায় ১৫০ দেড় শত হাত উচ্চ ছিল। শতবত্ন মঠের অঙ্গনের একভাগে একতল অট্টালিকায় বৈষয়িক কার্যাদি নিষ্পন্ন হইত ও সেঘরের পার্শ্বস্থ একটি ঝিকটি ঘরে মাতা সর্বমঙ্গলা শরতে পূজিতা হইতেন। পদ্মার অপর তীর হইতে লোকে শতবত্ন মঠের অভ্যন্তরী চূড়া লক্ষ্য করিয়া পদ্মা নদীতে পাড়ি ধবিত।

পঞ্চরত্ন মঠ ।

এই প্রাঙ্গণেই পঞ্চরত্ন নামক সুন্দর শিল্প-চাতুর্ধ্যময় দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গলগবের মধ্যে শিল্পচাতুর্ঘ্যে ও স্থপতি-নৈপুণ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। পাঁচটি দ্বিতল মন্দির একত্র সংযুক্ত ভাবে নির্মিত হওয়ায় ইহাকে “পঞ্চরত্ন” মন্দির কহিত। এই সকল মন্দিরের একটি মধ্যস্থলে এবং অবশিষ্ট চাবিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির উহার প্রত্যেকের কোণ দেশের সহিত সংলগ্ন ভাবে গঠিত হইয়াছিল। এই পাঁচটি মন্দিরের প্রত্যেকটির প্রাচীর গায়েই নানাবিধ দেবদেবী ও লতাপাতার চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত ছিল। এই মন্দিরের এক কক্ষে সুবিখ্যাত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র, এক কক্ষে

বাজবল্লভ, এক কক্ষে অসংখ্য দেবতাগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চবক্স মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইলে অন্তঃপুরথও প্রবেশ করা যাইত। অন্তঃপুর থওব চাবি-ধারে চারিটি সুবৃহৎ সৌধ পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রত্যেকটি অট্টালিকার ভিতবেই বহু প্রকোষ্ঠ ও সম্মুখে বাবান্দা ছিল। উত্তরভাগেব অট্টালিকাটি ত্রিতল ও অন্তঃস্থ অট্টালিকা-গুলি একতল ছিল। ত্রিতল অট্টালিকার একটি প্রকোষ্ঠে মহাবাজার শয়ন-কক্ষ ছিল। তিনি বাড়ী আসিয়া সে স্থানেই বাস করিতেন।

বাজবল্লভের বাড়ীর পশ্চিমদক্ষিণ কোণে তাঁহার গুফা কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের বাসভবন ছিল। ইহার বাড়ীতেও তোরণদ্বার এবং মনোহর অট্টালিকা সমূহ বিবাজমান থাকিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত।

আমরা পূর্বে রাইতপাড়া, নারিকেলতা পাড়া প্রভৃতি রাজনগরান্তর্গত যে সকল পল্লীর নাম কবিয়াছি সে সব স্থানেও বিস্তৃত সর্বোবর, মঠ ও বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নয়োজন। হাণ্টার সাহেব তৎসংকলিত ঢাকার Statistical Accountএর একস্থানে রাজা বাজবল্লভ ও তাঁহার স্ত্রীসিদ্ধ বাজনগরের বাড়ীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহাকে “Splendid residence” বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

১২৭৬ সনে ক্ষুদ্র বধধোলায় নদী ক্রমশঃ বিস্তারশাভ করিতে করিতে বিশাল পদ্মাব সহিত মিলিত হইয়া চিব-দিনেব জন্ত বাজনগরের অতুল গোবব-প্রভা-প্রকাশক প্রাসাদাবলী গ্রাস করিয়া ফেলিল। চিরদিনেব জন্ত যাহা পৃথিবীর বুক হইতে মিলাইয়া গিয়াছে—তাহাব স্মৃতি আর কতদিন থাকিবে? মহাবাজা বাজবল্লভের এসকল কীর্তি-স্তম্ভ যিনি দর্শন কবিয়াছেন তিনি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। বাজনগরের এই দাক্ষিণ্য হ্রগতির সময় শ্রীহট্টনিবাসী সন্ন্যাস ভট্ট নামক একজন ব্যক্তি বাজনগরের রাজকবি স্বরূপ বাস করিতেছিলেন। তিনি বাজনগরেব এই দৃশ্য দেখিয়া মনের ভূঃখে যে সুদীর্ঘ কবিতা বচনা কবিয়াছিলেন অত্য়পি তাহা বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ভাট কবিগণ স্ববসংযোগে গান কবিয়া দর্শকের মনে একটা বিষাদের ভাব জাগাইয়া দেন। আমাদের প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে ; নচেৎ পাঠক-দিগকে সে কবিতার বসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত রাখিতাম না, আব সামান্য কতকাংশ উদ্ধৃত কবিয়া দিলেও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে বলিয়া বিবত হইলাম।

মহাবাজা বাজবল্লভকে ঐতিহাসিকগণ যে বর্ণেই চিত্রিত ককন না কেন তিনি যে একজন ক্ষমতাশালী ও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে কেহ কোনওরূপ আপত্তি করিতে

পাবেন না। বাজবল্লভ সমাজ-সংস্কার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার কন্তা অভ্যাস অষ্টম বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল। এই কন্তা রাজবল্লভেব সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া বিশেষ আদরেব ছিল। কিন্তু বিধাতার লীলা মানব-বুদ্ধিব অগোচর। এই বালিকা বিবাহের অত্যল্পকাল পবে বিধবা হওয়ায় তিনি বাল-বিধবার প্রতি হিন্দু-সমাজের পৈশাচিক অত্যাচার দূব করিবার জন্ত ও তাহাদের পুনর্বিবাহের নিমিত্ত ভাবতবর্ষের নানাস্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট দূত প্রেরণ কবিয়া মতামত সংগ্রহ কবিয়াছিলেন। সর্ব দেশেব পাণ্ডিতমণ্ডলীই শাস্ত্রানুশীলন দ্বাবা বাল বিধবাগণেব বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া পাক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু নবদ্বীপেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেব শঠতায় নবদ্বীপেব পণ্ডিতমণ্ডলী বিকল মত দেওয়ায় তাহা সম্পাদিত হইতে পাবে নাই। কাবণ সেকালে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর অনভিমতে কোন কার্যই শাস্ত্র-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত না। এই একটি মাত্র মহৎকার্যের সূচনার জন্তও সমাজেব সংস্কাবেচ্ছু ব্যক্তিবর্গেব হৃদয়ে তাঁহার নাম গৌরবেব সহিত অঙ্কিত থাকিবে।*

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

* আমাদের একুশ রত্ন মঠের চিত্রখানি প্রাচ্য চল্লিশ বৎসরের পুরাতন। ইতিপূর্বে কোনও মাসিক পত্রিকাদিতে কিংবা কোনও গ্রন্থে ইহার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে কিনা জানি না। “বোকার-দপ্তর” গ্রন্থেব আমার প্রকাশিত হস্তদ্ব হকবি শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন মহাশয় এই ছোটো খানার সন্ধান বলিয়া দেন। পরে আমার বাসগ্রামস্থ বিক্রমপুরান্তর্গত মুলচর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডার কল্যাণ-ভাঙ্গন শ্রীযুক্ত ভজহারি সরকারেব যত্নে ইহা সংগ্রহ কবিতো পারিয়াছি। তাঁহাদের এই অবাচিত উপকারের জন্ত আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই চিত্রখানা দৃষ্টে পাঠকগণ রাজনগরের স্ত্রীসিদ্ধ প্রাসাদাবলীর গঠন-নৈপুণ্য কতকটা বুঝিতে পারিবেন। এখানে আর একটা কথা প্রসঙ্গতঃ উদ্বেষ করা আবশ্যক বিবেচনা কবি। অনেকের বিশ্বাস যে পদ্মার প্রবল তরঙ্গে রাজা বাজবল্লভেব কীর্তিধ্বংস হওয়ার পর হইতেই পদ্মার নাম “কীর্তিনাশা” হইয়াছে। কোন কোন সাহিত্যসেবীকেও এইরূপ নিখিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। কিন্তু ইহা ভুল—চাঁদবায় কেদার বায়ের কীর্তিনাশ হেতুই ইহাব নাম কীর্তিনাশা হইয়াছে। পরে বাজবল্লভের কীর্তিরাশি ধ্বংস করায উহা আবও দূত হইয়াছে। ১২৭৬ সনে রাজনগর কীর্তিনাশার প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে ম্যাপেও পদ্মাব নামেব পরিবর্তে কীর্তিনাশা লেখা আছে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Surgeon James Taylor কৃত “A sketch of the topography and statistics of Dacca” নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে যে “The first of these channels, which is represented as the Calliganga in Rennel’s Maps, is now called the Kurtinessa, or Seeripore river.” অতএব বিক্রম-পুরের সন্নিকটস্থ পদ্মাব নাম “কীর্তিনাশা” যে বাজবল্লভের রাজনগরেব ধ্বংসের পূর্বে চাঁদবায় কেদার বায়ের কীর্তিগ্রাস কবায় হইয়াছে ইহাই ঠিক।—লেখক।

পূর্ব ও পশ্চিম ।

ভাবতবর্ষের ইতিহাস কাহাদেব ইতিহাস ?

একদিন যে খেতকায় আৰ্য্যগণ প্রকৃতিব এবং মানুষের সমস্ত দুঃস্বপ্ন বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন ; যে অন্ধকাবময় অবিজ্ঞান অবগা এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল তাহাকে একটা নিবিড় স্ববনিকাব মত সবাইয়া দিয়া ফলশস্ত্রে বিচিত্র, আলোকময়, উন্মুক্ত বঙ্গভূমি উদঘাটিত করিয়া দিলেন ; তাহাদেব বুদ্ধি, শক্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসেব ভিত্তি বচনা করিয়াছিল। কিন্তু এ কথা তাহারা বলিতে পাবেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভাবতবর্ষ।

আৰ্য্যবা অনার্য্যদেব সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম যুগে আৰ্য্যদেব প্রভাব যখন অক্ষুণ্ণ ছিল তখনো অনার্য্য শূদ্রদেব সহিত তাহাদেব প্রতিযোগিতা বিবাহ চলিতেছিল। তারপৰ বৌদ্ধযুগে এই মিশ্রণ আৰো অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগেব অবসানে যখন হিন্দুসমাজ আপনাব বেড়াগুলি পুনঃসংস্কার কবিত্তে প্রবৃত্ত হইল এবং খুব শক্ত পাখব দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তখন দেশেব অনেক স্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ক্রিয়াকর্ম্য পালন কবিবাব জন্য বিস্কন্ধ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল ; অনেক স্থলে ভিন্নদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ কবিয়া আনিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে রাজ্যজ্ঞায় উপবীত পবাইয়া ব্রাহ্মণ রচনা কবিত্তে হইয়াছে একথা প্রসিদ্ধ। বর্ণেব যে স্ত্রত্বতা লইয়া একদিন আৰ্য্যবা গৌবব বোধ কবিয়াছিলেন সে স্ত্রত্বতা মলিন হইয়াছে ; এবং আৰ্য্যগণ শূদ্রদেব সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাদেব বিবিধ আচাৰ ও ধর্ম, দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ কবিয়া, তাহা-দিগকে সমাজেব অন্তর্গত কবিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ বচিত হইয়াছে ; বৈদিক সমাজের সহিত কেবল যে তাহার ঐক্য নাই তাহা নহে অনেক বিরোধও আছে।

অতীতেব সেই পর্কেই কি ভাবতবর্ষেব ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে ? বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস ? হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন বাঙ্গপুত রাজারা পরস্পর মারামারি

কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে ভাবতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এদেশে প্রবেশ কবিল, চাবিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষাণুক্রমে জন্মিয়া ও মবিয়া এদেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

যদি এইখানেই ছেদ দিয়া বলি, বাস্, আর নয়—ভাবতবর্ষেব ইতিহাসকে আমবা হিন্দুসমাজেরই ইতিহাস কবিয়া তুলিব, তবে যে বিশ্বকর্মা মানবসমাজকে সঙ্কীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশই বৃহৎ পরিধির দিকে গড়িয়া তুলিতেছেন তিনি কি তাহার প্ল্যান বদলাইয়া আমাদেরই অহঙ্কারকে সার্থক কবিয়া তুলিবেন ?

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে, কি আর কোনো জাতি আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সবচেয়ে বড় করিয়া আলোচিত হইতেছে, তাহা নহে। তাহার আদালতে নানা পক্ষের উকীল নানা পক্ষের দরখাস্ত লইয়া লড়াই করিতেছে। অবশেষে একদিন মকদ্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দু, নয় মুসলমান, নয় ইংরেজ, নয় আব কোনো জাতি চূড়ান্ত ডিক্রি পাইয়া নিশান গাড়ি করিয়া বসিবে একথা সত্য নহে। আমবা মনে করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহঙ্কার ; লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলেব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহাই নানা আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবাব দিকে চলিয়াছে,—আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমবা যে পুৰিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা কবিব সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে ; নিজেকেই ব্যক্তি হিসাবেই হউক আর জাতি হিসাবেই হউক জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। গ্রীসের জয়পতাকা আলেকজান্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে যে একচ্ছত্র করিতে পারে নাই তাহাতে গ্রীসেব দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে—পৃথিবীতে আজ সে দম্ভের মূল্য কি ? মোমের বিশ্বসাত্রাজ্যেব আয়োজন বর্করের সংঘাতে ফাটিয়া থান থান হইয়া সমস্ত যুরোপময় যে বিকীর্ণ হইল তাহাতে রোমকের অহঙ্কার অসম্পূর্ণ

হইয়াছে কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে ? গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোকাই করিয়া দিয়াছে ; কিন্তু তাহার নিজেও সেই তবণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভাব লাঘব করিয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভাবতবর্ষেও যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য্য এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড় হইবে বা আব কেহ বড় হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্ত্তি পবিগ্রহ করিবে, পবিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে ;—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভাবতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু, মুসলমান বা ইংবেজ যদি নিজের বর্ত্তমান বিশেষ আকাবটিকে একবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাভাৱিক অভিমানেব অপমৃত্যু ঘটতে পাবে কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

আমবা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত আছি। আমবা তাহাব একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ কবিতো থাকে যে আমরাই চবম, আমরা সমগ্রেব সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে খণ্ড সামগ্রী কোনো মতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টিকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই নই, যে সমগ্র রচিত হইতেছে তাহারই উদ্দেশ্যে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট ক্ষুদ্রকে সেই ত্যাগ কবিয়া বৃহত্তর মধ্যে রক্ষিত হইবে। ভাবতবর্ষেও যে অংশ সমস্তেব সহিত মিলিতে চাহিবেনা, যাহা কোনো একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তর্বালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্ত সকলের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনাব চারিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভাবত ইতিহাসেব বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে, ইন্দ্র পরম হৃৎখে সকলের সঙ্গে সমান কবিয়া দিবেন নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জন করিবেন। কারণ, ভারতবর্ষের

ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমবাই ভাবতবর্ষেব ইতিহাসেব জন্ত সমাহৃত ; আমবা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি তবে আমবাই নষ্ট হইব। আমবা সর্বপ্রকারে সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিগুহভাবে স্বতন্ত্র থাকিব এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে কবি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিবস্তন করিয়া রাখিবাব ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষ ভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজাক্ষেত্রে আর কেহ পদার্পণ কবিবেনা, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে, তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডেব আদেশ হইয়া আছে, এক্ষণে তাহারই জন্ত আত্মবচিৎ কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংবেজ আসিয়া ভাবতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহুত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভাবতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। যুরোপেব প্রদীপের মুখে শিখা এখন জলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বলাইয়া লইয়া আমরাগকে কালের পথে আব একবার যাত্রা কবিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমবা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসব গুর্কেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দবিদ্র নহে ; আমবা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পুর্কেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতেব কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা ত পৃথিবীর ভাব হইয়া থাকিতে পারিব না। যাহারা প্রপিতামহদেব মধ্যেই নিজেকে সর্বপ্রকাবে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারেব দ্বাৰা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহাবা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন্ বর্ত্তমানের তাড়নায়, কোন্ ভবিষ্যতেব আশ্বাসে ? পৃথিবীতে আমাদেরই যে প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের

সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্তব্য নানা পবিত্রমান সম্বন্ধে, নানা উদ্ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় আগ্রহ থাকিবে ও আগ্রহিত করিবে, আমাদের মধ্যে সেই উত্তম সঞ্চার কবিবার জন্ত ইংরেজ জগতেব যজ্ঞেবের দূতের মত জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরেব মধ্যে প্রবেশ কবিয়াছে। তাহাদের আগমন যে পর্য্যন্ত না সফল হইবে, জগৎ-যজ্ঞেব নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে পর্য্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত তাহারা আমাদের পীড়া দিবে, তাহারা আমাদের আশ্রমে নিদ্রা যাইতে দিবে না।

ইংবেজের আহ্বান যে পর্য্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে পর্য্যন্ত না সার্থক হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিদায় কবিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে ভাবতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্ত প্রেবিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভাবতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ—আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংবেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কি অধিকার আছে? বৃহৎ ভাবতবর্ষের আমরা কে? একি আমাদেরই ভারতবর্ষ? সেই আমরা কাহারা? সে কি বাঙালী, না গাৰ্ঠা, না পাঞ্জাবী; হিন্দু না মুসলমান? একদিন যাহারা ম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অথগু প্রকাণ্ড “আমরাব” মধ্যে যে কেহই মিলিত হউক, তাহাব মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংবেজ অথবা আবও যে কেহ আসিয়াই এক হউক না—তাহাবাই হুকুম কবিবাব অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

ইংবেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক কবিত্তে হইবে। মহাভাবতবর্ষ গঠন ব্যাপাবে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না, এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভাবতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত কবিত্তে পারিব না।

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাহাব সকলের চেয়ে বড় মনীষী তাহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত বাম-

মোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তি উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত কবিবাব জন্ত একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাহার দৃষ্টিকে অবকল্প কবিত্তে পারে নাই। আশ্চর্য্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্ব্বকে পবিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্ত্তের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদের মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন;—আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্ত বুদ্ধ খুঁটি মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান কবিয়াছেন; ভারতবর্ষের ধর্ম্মদেব সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্তই সঞ্চিত হইয়াছে; পৃথিবীর যে দেশেই যে কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন কবিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন তিনি আমাদেরই আপন, তাহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্ত। বামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিন্তকে সমুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত কবিয়াছেন, ভাবতবর্ষ ও যুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন কবিয়াছেন; এই কাৰণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্য্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিবাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কার-বশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূর্খের মত তিনি বিদ্রোহ কবেন নাই; যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উত্তত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মত বহন করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে রাণাডে পূর্ব্বপশ্চিমের সেতু-বন্ধন-কার্য্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছা শক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই স্বজনশক্তি, সেই মিলনতত্ত্ব, রাণাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল; সেইজন্ত ভারতবাসী ও ইংবেজের মধ্যে নানা প্রকাব ব্যবহার-বিরোধ ও স্বার্থ-সংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভ ক্ষুভতার উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত ইতিহাসেব যে উপকরণ

ইংবেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভাবতরবের সম্পূর্ণতা সাধনের কোনো বাধাত না ঘটে, তাহাব প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টার চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।

অল্পদিন পূর্বে বাংলা দেশে যে মহাস্থাব মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভাবতবর্ষকে সঙ্গীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জ্ঞান সঙ্কলিত করা তাহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, স্বজন কবিবার প্রতিভাই তাহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভাবতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জ্ঞান নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া ছিলেন।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন সেইদিন হইতে বঙ্গ-সাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল, সেই দিন হইতে বঙ্গ-সাহিত্যে মহাকাালের অভিশ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতাব পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বুদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ, এ সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যাহাতে বিশ্বসাহিত্যেব সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ কবিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহাব জ্ঞানই যে তিনি বড় তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব পশ্চিমের আদান প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভাল করিয়া মলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যেব মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহাব সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি কবিতা আমরা যেদিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাহাদের মধ্যে মানবের মহত্ব প্রকাশ পাইবে, যাহারা নবযুগ প্রবর্তক কবিবেন, তাহাদের প্রকৃতিতে • এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত

হইবে না, পূর্ব পশ্চিম তাহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবাব চেষ্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল বল লাভ করা। এমনি করিয়া, যে জিনিষটা বড় তাহাকে আমরা ছোটর দাস কবিতা দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব ইহা অল্প সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে, স্ততরাং সর্ব-প্রকার শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্বত্রই বাধা পাইতেছে; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম্মনষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।

সেই ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে এই মিলন চেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি ত কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কার বা প্রয়োজনের মধ্যে বদ্ধ নহে। সেই বুদ্ধি অম্লগত হইলে আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভাবতবর্ষেব ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এই চেষ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষেব করিয়া লইবাব জ্ঞান নিয়ত নিযুক্ত হইবে।

সম্প্রতি ইংবেজের সঙ্গে ভাবতবর্ষেব শিক্ষিত, এমন কি, অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে আমরা কিভাবে গ্রহণ কবিব? তাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই? কেবল তাহা কয়েকজন চক্রান্তকাবীব ইন্দ্রজাল মাত্র? ভাবতবর্ষেব মহাক্ষেত্রে যে নানাজাতি ও নানাপ্রান্তের সমাগম হইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সম্মিলনে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে বর্তমান বিবোধেব আদর্শ কি একেবারেই তাহাব প্রতিকূল? এই বিরোধের তাৎপর্য কি তাহা আমাদেরগকে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বেব বিবোধকেও মিলন সাধনাব একটা অঙ্গ বলা হয়। লোকে প্রসিদ্ধ আছে যে, বাবণ ভগবানের শত্রুতা কবিতা মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যেব নিকট পবাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যেব উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিবোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না।

এইজ্ঞত সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে ।

আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে যুরোপের কাছে শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম ; আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল ; এমন করিয়া যথার্থ-ভাবে লাভ করা যায় না । জ্ঞানই বল আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বল, তাহা উপার্জনেব অপেক্ষা রাখে—অর্থাৎ বিবোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহাব উপলব্ধি ঘটে—কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না । যেভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সেভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে ।

এইজ্ঞতই কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের বিক্ষোভ আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে । একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদের দৃষ্টি দিয়া নিজেব দিকে ঠেলিয়া দিতেছে ।

যে মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অনুরূপ হইয়াই এই আত্মাভিমানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল । আমরা নির্বিশেষে নির্বিশেষে দুর্বলভাবে দীন-ভাবে বাহা লইতেছিলাম, তাহা বাচাই করিয়া তাহার মূল্য বুঝিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না, তাহা বাহিরের জিনিষ পোষাকী জিনিষ হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্ধৰ্ম্মের তাড়না আসিয়াছে ।

রামমোহন বায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাব প্রধান কাৰণ, পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত কবে নাই ; তাঁহাব আপনাব দিকে দুর্বলতা ছিল না । তিনি নিজেব প্রতিষ্ঠাতৃমির উপবে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন । ভাবতবর্ষের ঐশ্বর্য্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন ; এইজ্ঞতই যেখান হইতে বাহা পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিবার নিজি ও মানদণ্ড তাঁহাব হাতে ছিল ; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মত আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ কবেন নাই ।

যে শক্তি নব্য-ভারতের আদি অধিনায়কেব প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাত

প্রতিঘাতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াব দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিযান্ত্রিক হইবাব চেষ্টা করিতেছে । এই কারণে সেই চেষ্টা পর্যায়-ক্রমে বিপরীত সীমাব চূড়ান্তে গিয়া ঠেকিতেছে । একান্ত অভিযুক্ততা এবং একান্ত বিমুগ্ধতায় আমাদের গতিকে আঘাত কবিত্তে কবিত্তে আমাদের লক্ষ্যপথে লইয়া চলিয়াছে ।

বর্তমানে ইংরেজ ভারতবাসীয যে বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার একটা কাৰণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ;—ইংবেজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেষ্টভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল । সেই পীড়াব মাত্রা অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাৎ দেশেব অন্তঃকরণ প্রবলবেগে ঝাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে ।

কিন্তু কাৰণ শুধু এই একটিমাত্র নহে । ভারতবর্ষেব গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; তাহাকে গ্রহণ কবিত্তেই হইবে, তাহাকে আপনাব শক্তিতে আপনাব কবিত্তা লইতে হইবে । আমাদের তবকে সেই আপন কবিত্তা লইবাব আত্মশক্তিব যদি অভাব ঘটে, তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিপ্লব উপস্থিত কবে । আবার অন্তঃক্ষেপেও পশ্চিম যদি নিজেব সত্যভাবে প্রকাশ কবিত্তে ক্লপণতা কবে, তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হয় ।

ইংবেজের বাহা শ্রেষ্ঠ বাহা সত্য তাহাব সহিত আমাদের যদি সংস্রব না ঘটে, ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানতঃ আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রাঙ্গত দেখিতে থাকি ; যে ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়-ভাবে মিশিয়া পবম্পবকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পাবে, সে ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পবম্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি, তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিব । একরূপ স্থলে প্রবল পক্ষ সিডিশনের আইন করিয়া দুর্বল পক্ষের অসন্তোষকে লোহাব শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসন্তোষকে বাঁধিয়াই রাখা হইবে, তাহাকে দূর কবা হইবে না । অথচ এই অসন্তোষ কেবল এক পক্ষের নহে । ভারতবাসীর মধ্যে

ইংবেজের কোনোই আনন্দ নাই। ভাবতবাসীরা অস্তিত্বকে ইংবেজ ক্লেশকর বলিয়া সর্বতোভাবে পবিত্র করিয়াই চেষ্টা করে। একদা ডেভিড হেরারের মত মহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংবেজচরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে সন্মুখে আনিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন—তখনকার ছাত্রগণ সত্যি ইংরেজ জাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। এখন ইংবেজ অধ্যাপক স্বজাতির বাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে, তাঁহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে ধর্ম কবিতা ইংবেজের দিক হইতে বাল্যকাল হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া দেন। তাহার ফল এই হইয়াছে, পূর্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্য ইংবেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্রবা তাহা করে না; তাহারা গ্রাস কবে তাহারা ভোগ কবে না। সেকালের ছাত্রগণ ঘেরপ আন্তরিক অহুরাগের সহিত শেক্সপীয়ার ব্যঙ্গের কাব্যরসে চিত্তকে অভিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংবেজ জাতির সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বল, ম্যাজিষ্ট্রেট বল, সদাগর বল, পুলিশের কর্তা বল, সকল প্রকার সম্পর্কেই ইংবেজ তাহা ইংবেজ সম্ভার চরম অভিযুক্তির পবিত্র অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না—সুতরাং ভারতবর্ষে ইংবেজ-আগমনের যে সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ, তাহা হইতে ইংরেজ আমাদের বঞ্চিত করিতেছে; আমাদের আত্মশক্তিকে বাধাগ্রস্ত এবং আত্মসম্মানকে ধর্ম করিতেছে। সুশাসন এবং ভাল আইনই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় লাভ তাহা নহে। আপিস আদালত আইন এবং শাসন তাহা নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়—তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজি আছে। মানুষের পরিবর্তে বিচার এবং আইন কটব পরিবর্তে পাথরেরই মত। সে পাথর ভাঙে এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুদ্র দূর হয় না।

এইরূপেই পূর্ব ও পশ্চিমের সম্যক মিলনের বাধা ঘটতেছে বলিয়াই আজ যত কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে।

কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্টকর। সুতরাং একদিন না একদিন ইহা প্রতিফলিত হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেই প্রশ্ন ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার কবিতোও প্রস্তুত হয়।

তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য যে এ সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের সত্য ভাবেই মিলিতে হইবে এবং তাহার বাহা কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত ফল পরিণত হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ তাহাকে বোটার বাধা থাকিতে হইবেই—এবং বোটার বাধা না থাকিলেও তাহা পবিত্র হইবে না।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংবেজের বাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সে প্রশ্ন আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্ত ঘুচাইলে তবেই তাহাদেরও রূপগতা ঘুচিবে। বাইবেলে লিখিত আছে, বাহা আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে।

সকল দিকেই আমাদের শক্তিশালী হইতে হইবে; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ বাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। বর্তমান তাহা আমাদের অসম্মান করিবে, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন হইতে পারিবে না। আমরা বিস্তরহস্তে তাহাদের দ্বারা দাঁড়াইলে বার বার ফিবিয়া আসিতে হইবে।

ইংরেজের মধ্যে বাহা সকলের চেয়ে বড় এবং সকলের চেয়ে ভাল তাহা আমাদের গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদের দিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। আমাদের মধ্যে বাহা উপাধি বা সম্মান বা চাকরীর লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংবেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহা ইংবেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ কবে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অল্পপক্ষে বাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংবেজকে উদ্ভাসিত করিতে চায়, তাহারা ইংবেজের পাণ্ড-প্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত

অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে ঔদ্ধত্যকে, ইংবেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয়, তবে এজন্য ইংবেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপবাদের প্রধান অংশ আমাদের কাছে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বদেশে ইংবেজের সমাজ ইংবেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্বকেই উদ্দীপিত রাখিব। জন্ত চাষিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিব। জন্ত অশ্রান্ত ভাবে কাজ করে; এমনি করিয়া মোটের উপর নিজেব নিকট হইতে যত দূর পর্যন্ত পূর্ণফল পাওয়া সম্ভব, ইংবেজ সমাজ তাহা জাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আঘাত করিয়া লইতেছে।

এ দেশে ইংবেজের প্রতি ইংরেজ সমাজের সেই শক্তি সম্পূর্ণ বলে কাজ করিতে পাবে না। এখানে ইংবেজ সমগ্র মানুষের ভাবে কোনো সমাজের সহিত যুক্ত নাই। এখানকার ইংবেজ সমাজ হয় সিভিলিয়ান সমাজ, নয় বণিক সমাজ, নয় সৈনিক সমাজ। তাহারা তাহাদের বিশেষ কার্যক্ষেত্রের সর্জনকারী দ্বারা আবদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রের সংস্কার সকল সর্বদাই তাহাদের চাষিককে কঠিন আবরণ বুচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বের সম্পর্কে সেই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারিদিকে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে না। তাহারা এদেশের হাওয়ায় কেবলি কড়া সিভিলিয়ান, পূর্বা সঙ্গাগ এবং ষোলো আনা সৈনিক হইয়া থাকিয়া উঠিতে থাকে; এই কারণেই ইহাদের সংস্রবে আমরা মানুষের সংস্রব বলিয়া অনুভব করিতে পারি না; এই জন্যই যখন কোনো সিভিলিয়ান হাইকোর্টের জজের আসনে বসে, তখন আমরা হতাশ হই; কারণ তখন আমরা জানি এ লোকটির কাছ হইতে যথার্থ বিচারকের বিচার পাইব না, সিভিলিয়ানের বিচারই পাইব; সে বিচারে জাযগের সঙ্গে যেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মের বিরোধ ঘটিবে, সেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মই জয়ী হইবে। এই ধর্ম ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষেরও প্রতিকূল।

আবার যে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কাবাব, সেই

ভারতবর্ষের সমাজও নিজের দুর্গতি দুর্বলতা বশতই ইংবেজের ইংবেজকে উদ্বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না; সেই জন্যই যথার্থ ইংরেজ এ দেশে আসিলে ভারতবর্ষে যে ফল পাইত সেই ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেই জন্যই পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আপিস আদালতের বড় সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্বের মানুষের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এ দেশে যাহা কিছু বিপ্লব বিরোধ, আমাদের যাহা কিছু দুঃখ অপমান। এবং এই যে প্রকাশ পাইতেছে না, এমন কি, প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সে জন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে, তাহা আমাদের কাছে স্বীকার করিতেই হইবে। “নাশনাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” পবনাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না; কোনো মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে; যে ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহাব প্রকৃতিতে দেবতাব গুণ থাকা আবশ্যিক।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ হুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ হয় না। ত্যাগেব দ্বাবাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগশীলতা দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আবামকে সমগ্র দেশেব হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংবেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজেব দেশকে যখন আমরা নিজেব চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষাব জন্য স্বাস্থ্যেব জন্য, আমাদের সমস্ত সামর্থ্য-প্রয়োগ করিয়া দেশের সর্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতির সাধনের দ্বারা আমবা দেশেব উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমবা ইংরেজবাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংবেজকে আপস করিয়া চলিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মুঢ়তা বশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের

জমিদার প্রজাদিগকে নিজেব সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল পক্ষ দুর্বলকে পদানত করিয়া বাধাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্ন-বর্ণকে পশুব অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমবা ইংরেজের নিকট হইতে সম্ভাব্যভাবে প্রাপ্য বলিয়া দাবী করিতে পারিব না ; ততক্ষণ পর্যন্ত ইংবেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্বোধিত করিতে পারিব না এবং ভারত-বর্ষ কেবলি বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে । ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্ম্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে ; নিজেব আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ভাগেব দ্বারা উদ্বোধিত করিতেছে না, এই জন্তই অস্ত্রের নিকট হইতে যাহা পাঠবার তাহা পাইতেছে না । এই জন্তই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভাবতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না, সে মিলনে পূর্ণ ফল জন্মিতেছে না, সে মিলনে আমবা অপমান এবং গীড়াই ভোগ করিতেছি । ইংবেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিবৃত্তি পাইব না । ইংবেজের সঙ্গে ভাবতবর্ষের সংযোগ পবিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে, তখন বর্তমানে ভারত ইতিহাসেব যে পর্কটা চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বিবিধ প্রসঙ্গ ।

ভাবতবর্ষের সকল প্রদেশে এখন ভয়েব দ্বারা শাসন করিবার চেষ্টা চলিতেছে, বাজ্ঞনৈতিক অপবাধে অভিযুক্ত লোকদিগকে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দেওয়া হইতেছে । ইহাতে গবর্ণমেন্টের কি ক্ষতি তাহা বলিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই । সরকার নিস্তের ভালমন্দের বিচার নিজেট কবেন, আমাদের পৰামর্শ দিবার জন্ত ডাকেনও না, আমাদের পরামর্শের অপেক্ষাও বাধেন না । বরং আমবা গায়ে পড়িয়া পরামর্শ দিলে ভাবেন, লোকগুলা ভয় পাইয়াছে, তাই আমাদের লোহদণ্ড তুলিয়া রাখিতে বলিতেছে । অতএব কঠিন শাস্তিতে আমাদের ক্ষতিলাভ কি, কেবল তাহাই আমাদের বিচার্য্য ।

মানুষ যখন অসাড় হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে আঘাত করিলে হয় সে সংজ্ঞালাভ করে, সচেতন হয়, জাগে, নয় মুতামুখে পতিত হয় । এই দুইয়ের এক বা অত্র ফল জীবনী-শক্তির পরিমাণের উপর নির্ভব করে । যাহার জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে, সে আঘাতে মরে, যাহার কিছু জীবনীশক্তি আছে, সে জাগিয়া উঠে । আমবা কঠিন শাস্তির আঘাতে মরিব, না জাগিব, তাহাই বিচার্য্য । যষ্টি

না জাগি, তাহা হইলে তিলক, চিদাম্বরম প্রভৃতিব উপব অবিচার আমাদের কোন উপকাব করিবে না ; তিলক বে বলিয়াছেন যে “এক মহাশক্তি জাতিসমূহের ভবিতব্যেব বিধাতা, তিনি আমার মুক্তি অপেক্ষা হয়ত আমার শাস্তি দ্বারাই আমার জাতিব অধিক উপকাব করিবেন”, তাহা হইলে সেই মহাশক্তি আমাদের নিজ হস্তেব উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিবেন না, আমাদের বাদ দিয়া কাজ করিবেন । কিন্তু আমাদের আশা হইতেছে, ক্ষণিক ভয় যাহার যত হউক, আমবা জাগিব ।

তেষটি বৎসব বয়স্ক দিনাজপুরেব সম্ভ্রান্ত উকীল, “বঙ্গালাব সামাজিক ইতিহাস” নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকেব লেখক, শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সাত্তাল বেলাগাড়ীতে উঠিয়া অকাবণ ছজন ইংবেজের প্রাণবধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, হয় ত বা চুরি করিতে গিয়াছিলেন, এই অপবাধে হাইকোর্টেব দুইজন জজ তাহাকে চারি বৎসর সশ্রম কাবান্ডু দিয়াছেন ! তিনি কোন রাজনৈতিক অপরাধ কবেন নাই ; কিন্তু সকলেই মনে করিতেছে যেবিচারটা বাজ্ঞনৈতিক বকমেবই হইয়াছে । এই তথাকথিত “বিচারে” আমাদের যেকণ মর্যাদাত্তিক ক্লেশ ও অপমানবোধ হইয়াছে, তাহা বলিয়া লাভ কি ? রোদন, এবং প্রতিকারে অসমর্থের ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ, সমর্থের বিজ্ঞপ উৎপাদক কাপুকবতা মাত্র । আমাদের সমুদয় শক্তি ও সমুদয় হৃদয়ের আবেগ প্রতিকাবেব চেষ্টাব জন্ত সক্ষিত থাকুক । প্রতিকাব আব কিছু নয়, দেশের আইন প্রণয়ন ও দেশেব বিচার কার্য্যকে আমাদের আয়ত্তাধীন করা ।

এই আগষ্টেব বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী প্রতিষ্ঠাব উৎসব দেশেব নানা স্থানে হইয়াছে । কলিকাতায় খুব উৎসাহ দেখিলাম । কাগজে দেখিতেছি যে মেদিনীপুর ব্যতীত অন্যান্য প্রধান প্রধান সহবে এই বার্ষিক উৎসব উৎসাহেব সহিত সম্পন্ন হইয়াছে । স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনেব চেষ্টা এই আন্দোলনের গোড়া হইতেই আছে, চেষ্টাব মাত্রা যাহাতে প্রবলবেগে ক্রমাগত বাড়িতে থাকে, তাহার আয়োজন কবা কর্তব্য । এই আন্দোলনে কোথাও কাহাবও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কবা হয় নাই, কাহাকেও জোর করিয়া বিদেশী ছাড়ান এবং দেশী ধবান হয় নাই, কোথাও আইনেব সীমা লঙ্ঘিত হয় নাই, ইহা বলা যায় না । কিন্তু আমাদের ধাবণা যে মোটের উপর বল প্রয়োগ ও আইন লঙ্ঘন খুব কম স্থলে হইয়াছে ।

ক্ষুদিরামের জীবনলীলা সাজ হইল । আমরা তাহাব বিচারক হইবার অযোগ্য । কারণ, তাহার কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও, তাহাব হৃদয়ে দেশভক্তি উৎকট বিদেশীদ্বয়ে পরিণত হইলেও, ইহা সত্য যে দেশভক্তি যেমন করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, উহা তেমন করিয়া আমাদের

গ্রাস করে নাই। তাহার জীবন যেমনই হউক, সে মবিয়াছে বীরেব মত। তাহার বিপথচালিত বার্থ জীবন আমাদিগকে বিষাদ ও চিন্তায় আকুল কবিয়াছে। মানুষ তাহাকে সুপথে চালিত কবিবার উপায় কবিত্তে পাবিল না, ভগবান কবিবেন। বিধাতা অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের সৃষ্টি কবেন; আমরা বিশ্বাস কবি, এ ক্ষেত্রেও তাহা কবিবেন। নিবপরাধ ইংরাজ স্ত্রীলোক ছুটিব আত্মা তাহার আত্মাকে ক্ষমা কবিবে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

১। হামারী স্ত্রীশী ওর উনকী শিক্ষা—ভূমিহাব ব্রাহ্মণ মহাসভা যে যথার্থই সামাজিক উন্নতিবিধানের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন তাহা কুমার সরযুপ্রসাদ নাবাধ সিংহ মহাশয়ের এই ক্ষুদ্র হিন্দী নিবন্ধ হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। স্ত্রী-শিক্ষা না হইলে পারিবারিক উন্নতি হয় না, এবং আমাদের অর্দ্ধ শরীর অজ্ঞানতায আচ্ছন্ন থাকে, এ সকল কথা অতি সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক সভ্যব সকলকে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতে অমুরোধ করিয়াছেন। আশাকরি সভ্যগণ লেখকের অমুরোধ বক্ষা করিতেছেন। প্রবন্ধটি যখন বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে, তখন উহার বহু প্রচার প্রার্থনীয়।

২। মা বা আহতি—জাতীয় গীতিকাব্য—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ছয় আনা মাত্র। কবিতাগুলিতে আবেগ আছে, স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আছে, গীতের রকমার ও কমনীয়তা আছে, তবে বক্তব্য সকল স্থলে স্পষ্ট নহে, কেমন প্রচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট। তথাপিও বহু কবিতা কবিত্বপূর্ণ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

৩। অহল্যাবাই—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি,এ, সংকলিত। তৃতীয় সংস্করণ। সমুদায়িত ও পবিত্রিত। শিবপূজানিরতা অহল্যাবাইর চিত্রসম্বলিত। ডবল ফুলস্বাপ অষ্টাংশিত ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র। পবিত্রচরিত সাধনী মহিলার জীবনাত্মিকানা অনাডম্বর ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা তৃতীয় সংস্করণই ইহা গুণেব পরিচায়ক। এইরূপ পুস্তক পড়িলে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ উপকৃত হইবেন, কস্তাগণ মহৎ চরিত্রের আদর্শ পাইয়া ভবিষ্যৎকালের উপযুক্ত হইতে পাবিবেন, এবং অতি দুর্বিনীত অবিবাহিত পুরুষচিহ্নও নারীমহিমায় প্রদাহিত হইবে। এইরূপ চরিত্রাখ্যান আত্মা স্বাস্থ্য, গৃহের কল্যাণ। ভ্রমশ্রিত্য উগ্র অথচ দম্যতে কোমল এমন করণকর্তার চরিত্র সংসারে দুর্লভ, সকলেব অমুখ্যানেব সামগ্রী।

৪। আর্ধ্য ধর্ম নিত্য—শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্তী কাব্যরত্ন প্রণীত, ক্রাউন অষ্টাংশিত ৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা মাত্র। আর্ধ্য ধর্ম যে নিত্য ধর্ম তাহা এই গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বেদ আশ্রম, বর্ণভেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখকের সহিত আমরা একমত হইতে না পাবিলেও পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। বাহা সত্য তাহা সর্বসম্মত, সর্বসম্মত নিরপেক্ষ। আর্ধ্যধর্ম এই সার্বজনীন মহৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই তাহার চরম লক্ষ্য। সাধনের প্রকা

ভেদ থাকিতে পারে কিন্তু উপায়ের মধ্যে বিরোধ নাই। হৃদয় সরস-ভাষায় এই তত্ত্ব সুস্পষ্ট ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসী ব্যক্তি ইহা পাঠ কবিলে আপনাদের বহু কুসংস্কার ও ক্ষুদ্রতা বিদূরিত কবিয়া ব্রহ্মানন্দের আভাস পাইবেন। ইহা সকল সম্প্রদায় নিরপেক্ষ নিত্যধর্মের ব্যাখ্যান পুস্তক—ইহা সকল সম্প্রদায়েবই নিজস্ব হইতে পারিবে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ হৃদয়।

৫। উপকথা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশীল গুপ্ত, বি,এল, প্রণীত। কলিকাতা সিটবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১৫৪ পৃষ্ঠা। হৃদয় কাপড়ের মলাটে বাঁধা। মূল্য ১ টাকা মাত্র। ইহাতে ২৬টি গল্প আছে। শিশুরা ইহা একবার নাগাল পাইলে নিজেদের আটপৌরে কথায় এতগুলি গল্পের পরিচয় পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিবে। ভাষার মধ্যে কারিগরি বা কবিত্ব নাই, চলিত সরল ভাষায় গল্পগুলি বলা হইয়াছে, পড়িতে ভাবোদ্বেগ না হইলেও ক্লান্তি বোধ হয় না। ছাপা ও কাগজ পবিত্র। ছেলেদের পাঠ্য বই বড় হরণে ছাপিলে ভাল হইত। একঘেয়ে স্রলপাইকা হরণ যেন আমাদের বাংলা বইগুলোকে পাইবা বসিয়াছে।

৬-৭। বামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর।—কলিকাতা সিটবুক সোসাইটি হইতে শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সবকার কর্তৃক প্রকাশিত। আকার যথাক্রমে ডবল ফুলস্বাপ ১৬ পেজি ৯২ ও ৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য প্রত্যেকেরই পাঁচ আনা কবিয়া। ভারতগৌরব মহাত্মাদিগের জীবনী প্রকাশ এই গ্রন্থমালাব উদ্দেশ্য; ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধু ও মনসীদিগেরও জীবনী প্রকাশিত কবিবার কল্পনা করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। পুস্তক দুইখানি পড়িয়া স্থবী হইয়াছি। প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষত্ব, জীবনের যাহা কিছু মহৎ ও গৌরবের তৎসমস্তই এই অল্প পরিসরেব মধ্যে সুব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ চরিত্র-চিত্রণ আমাদের জাতীয়জীবন সংগঠনে সহায়তা করিবে, পাঠকের মন এসময় উদার করিবে। বইগুলি সুপাঠ্য হইয়াছে বলিবা কিছু ত্রুটিরও উল্লেখ করিব। বামমোহন রায় যিনি লিখিয়াছেন তাঁহার ভাষা হৃদয়, কিন্তু বড় জিনিসকে অল্প পরিসরে ভরিবার নিপুণতাব অভাব বোধ হইল; প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদ যেন শুধু গুণ ও কার্যতালিকার মত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মহাপুরুষদিগের জীবন এমনই চমৎকার ও কোতুলোদ্দীপক যে এই ত্রুটি সত্ত্বেও বামমোহন রায় সুখপাঠ্য হইয়াছে। বিদ্যাসাগর রুচিযার ভাষার সবসত্য আছে, কিন্তু বর্ণনার চটা হইয়াছে উপভাসের মত—ইহা জীবনচরিতের বর্ণনার একেবারেই বেমানান হইয়াছে। একই পর্যায়ের সকল পুস্তকই একই রীতিতে রচিত হওয়া উচিত; বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন রকমেব বর্ণনভঙ্গী অনুসৃত হইলে সমতা বক্ষিত হয় না। বিভিন্ন লোক দিয়া বিভিন্ন পুস্তক রচনা করানই বুদ্ধিসঙ্গত; এবং বিভিন্ন লোকের লিখন ধারা বিভিন্ন হইবেই; কিন্তু সেই বিভিন্নতার মধ্যে সমতা দিবার জন্য একজন সাধারণ সম্পাদক থাকা প্রয়োজন। এই নিয়ম প্রতিপালিত হয় বলিয়াই ইংরাজি এক পর্যায়ের পুস্তক বিভিন্ন লোক দ্বারা লিখিত হইলেও সমতা রক্ষিত হয়। ভবিষ্যৎ প্রকাশ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা কবিত্তে পারিলে এই গ্রন্থমালা একবিধ ও নিখুঁত হইতে পারে। বাহাই হউক এইরূপ মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠে স্ত্রী পুরুষ আবালবৃদ্ধ সকলেই স্থবী ও উপকৃত হইবেন। ইহার জন্য যোগীন্দ্র বাবু ধন্যবাদের পাত্র।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

৮ম ভাগ ।

আশ্বিন, ১৩১৫ ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

গোরা ।

৩১

ললিতাকে সঙ্গে লইয়া বিনয় পবেশ বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল ।

ললিতার সম্বন্ধে বিনয়ের মনের ভাবটা কি তাহা ষ্টীমারে উঠিবার পূর্বে পর্য্যন্ত বিনয় নিশ্চিত জানিত না । ললিতার সঙ্গে বিরোধেই তাহার মন ব্যাপৃত ছিল । কেমন করিয়া এই দুর্বশ মেয়েটিব সঙ্গে কোনোমতে সন্ধিস্থাপন হইতে পারে কিছুকাল হইতে ইহাই তাহার প্রায় প্রতিদিনের চিন্তার বিষয় ছিল । বিনয়ের জীবনে জীমাদুর্ঘ্যেব নির্মল দীপ্তি লইয়া সূচবিতাই প্রথম সন্ধ্যাতারাটির মত উদ্ভিত হইয়াছিল । এই আবির্ভাবের অপক্লপ আনন্দে বিনয়ের প্রকৃতিকে পরিপূর্ণতা দান করিয়া আছে ইহাই বিনয় মনে মনে জানিত । কিন্তু ইতিমধ্যে আরো যে তারা উঠিয়াছে এবং জ্যোতিরুৎসবের ভূমিকা কবিতা দিয়া প্রথম তারাটি যে কখন ধীরে ধীরে দিগন্তবালে অবতরণ করিতেছিল বিনয় তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে নাই ।

বিদ্রোহী ললিতা বেদিন ষ্টীমারে উঠিয়া আসিল সেদিন বিনয়েব মনে হইল ললিতা এবং আমি একপক্ষ হইয়া সমস্ত

সংসারের প্রতিকূলে যেন ঋড়া হইয়াছি । এই ঘটনায় ললিতা আর সকলকে ছাড়িয়া তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একথা বিনয় কিছুতেই ভুলিতে পারিল না । যে-কোনো কারণে, যে-কোনো উপলক্ষ্যেই হউক, ললিতাব পক্ষে বিনয় আজ অনেকের মধ্যে একজন মাত্র নহে— ললিতার পার্শ্বে সেই একাকী—সেই একমাত্র ; সমস্ত আত্মীয়স্বজন দূরে, সেই নিকটে । এই নৈকট্যের পুলকপূর্ণ স্পন্দন বিদ্যাদুর্গভ মেঘেব মত তাহার বুকের মধ্যে গুণ্ড গুণ্ড করিতে লাগিল । প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনে ললিতা যখন ঘুমাইতে গেল তখন বিনয় তাহার স্বস্থানে শুইতে বাইতে পারিল না—সেই ক্যাবিনেব বাহিরে ডেকে সে জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল । ষ্টীমারে ললিতার প্রতি কোনো উৎপাত ঘটিবাব বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু বিনয় তাহার অকস্মাৎ নূতনলব্ধ অধিকারটিকে পূরা অমুভব কবিবাব প্রেলোভনে অপ্রয়োজনেও না ষাটাইয়া থাকিতে পারিল না ।

রাত্রি গভীর অন্ধকারময়, মেঘশূন্য নভস্তল তারায় আচ্ছন্ন, তাঁরে তরুশ্রেণী নিশীথ আকাশের কালিমাঘন নিবিড় ভিত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নিম্নে প্রশস্ত নদীর প্রবল ধারা নিঃশব্দে চলিয়াছে ইহার মাঝখানে ললিতা

নির্জিত। আর কিছু নয়, এই সুন্দর, এই বিশ্বাসপূর্ণ নিদ্রাটুকুকেই ললিতা আজ বিনয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। এই নিদ্রাটুকুকে বিনয় মহামূল্য রত্নটির মত রক্ষা করিবাব ভার লইয়াছে। পিতামাতা ভাই ভগিনী কেহই নাই, একটি অপরিচিত শস্যার উপর ললিতা আপন সুন্দর দেহখানি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে—নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেন এই নিদ্রাকাব্যটুকুর ছন্দ পরিমাপ করিয়া অতি শাস্তভাবে গতায়ত করিতেছে, সেই নিপুণ কবরীর একটি বেণীও বিস্তৃত হয় নাই, সেই নারীহৃদয়ের কল্যাণ-কোমলতায় মগ্নিত হাত ছইখানি পরিপূর্ণ বিরামে বিছানাব উপরে পড়িয়া আছে; কুসুম-সুকুমার ছইটি পদতল তাহার সমস্ত বর্মণীয় গতি-চেষ্টাকে উৎসব-অবসানের সঙ্গীতের মত স্তব্ধ করিয়া বিছানাব উপর মেলিয়া রাখিয়াছে—বিশ্রুত বিশ্রামের এই ছবিখানি বিনয়ের কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল; শুষ্কির মধ্যে মুক্তাটুকু যেমন, গ্রহতারামগ্নিত নিঃশব্দতামির-বেষ্টিত এই আকাশমণ্ডলের মাঝখানটিতে ললিতার এই নিদ্রাটুকু, এই সুডোল সুন্দর সম্পূর্ণ বিশ্রামটুকু জগতে তেমনি একটিমাত্র ঐশ্বর্য বলিয়া আজও বিনয়ের কাছে প্রতিভাত হইল। “আমি জাগিয়া আছি” “আমি জাগিয়া আছি” এই বাক্য বিনয়ের বিস্তারিত বক্ষঃকুহর হইতে অভয় শঙ্করবিন মত উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দ বাণীর সহিত মিলিত হইল।

এই ক্লমপক্ষের রাত্রিতে আরো একটা কথা কেবলি বিনয়কে আঘাত কবিতোছিল—আজ রাত্রে গোরা জেল-খানায়! আজ পর্য্যন্ত বিনয় গোরার সকল সুখ দুঃখেই ভাগ লইয়া আসিয়াছে, এইবার প্রথম তাহার অন্তর্থা ধটিল। বিনয় জানিত গোবার মত মানুষের পক্ষে জেলের শাসন কিছুই নহে কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে গোরাব কোনো যোগ ছিল না—গোরাব জীবনের এই একটা প্রধান ঘটনা একেবারেই বিনয়ের সংস্রব ছাড়া। ছই বন্ধুব জীবনের ধারা এই যে এক জায়গায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—আবার যখন মিলিবে তখন কি এই বিচ্ছেদের শূন্যতা পূরণ হইতে পারিবে? বন্ধুত্বের সম্পূর্ণতা কি এবার ভঙ্গ হয় নাই? জীবনের এমন অথগু এমন দুর্লভ বন্ধুত্ব! আজ একই বাক্রে বিনয় তাহার এক

দিকের শূন্যতা এবং আর একদিকের পূর্ণতাকে একসঙ্গে অনুভব করিয়া জীবনের স্রবন-প্রলয়ের সন্ধিকালে স্তব্ধ হইয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

গোরা যে ভ্রমণে বাহিব হইয়াছিল দৈবক্রমেই বিনয় তাহাতে যোগ দিতে পারে নাই, অথবা গোরা যে জেলে গিয়াছে দৈবক্রমেই সেই কারাগৃহের ভাগ লওয়া বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে, একথা যদি সত্য হইত তবে ইহাতে করিয়া বন্ধুত্ব ক্ষুদ্র হইতে পারিত না। কিন্তু গোরা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল এবং বিনয় অভিনয় করিতেছিল ইহা আকস্মিক ব্যাপার নহে। বিনয়ের সমস্ত জীবনের ধারা এমন একটা পথে আসিয়া পড়িয়াছে যাহা তাহাদের পূর্ব বন্ধুত্বের পথ নহে, সেই কারণেই এতদিন পরে এই বাহু বিচ্ছেদও সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু আজ আর কোনো উপায় নাই—সত্যকে অস্বীকার করা আর চলে না; গোরার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন একপথ অনন্তমানে আশ্রয় করা বিনয়ের পক্ষে আজ আর সত্য নহে। কিন্তু গোরা ও বিনয়ের চিরজীবনের ভালবাসা কি এই পথভেদের দ্বারাই ভিন্ন হইবে? এই সংশয় বিনয়ের হৃদয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত করিল। সে জানিত গোরা তাহার সমস্ত বন্ধুত্ব এবং সমস্ত কর্তব্যকে এক লক্ষ্য পথে না টানিয়া চলিতে পারে না। প্রচণ্ড গোরা! তাহার প্রবল ইচ্ছা! জীবনের সকল সঞ্চয়ের ধারা তাহার সেই এক ইচ্ছাকেই মহীমসী করিয়া সে জয়-যাত্রায় চলিবে বিধাতা গোরার প্রকৃতিতে সেই রাজমহিমা অর্পণ কবিয়াছেন!

ঠিকা গাড়ি পরেশ বাবুর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নামিবার সময় ললিতার যে পা কাঁপিল এবং বাড়িতে প্রবেশ করিবার সময় সে যে জোর করিয়া নিজে একটু শক্ত কবিতা লইল তাহা বিনয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। ললিতা যৌকের মাথায় এবার যে কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে তাহাব অপরাধ যে কতখানি তাহার গুঞ্জন সে নিজে কিছুতেই আন্দাজ করিতে পারিতেছিল না। ললিতা জানিত পরেশ বাবু তাহাকে এমন কোনো কথাই বলিবেন না যাহাকে ঠিক ভৎসনা বলা যাইতে পারে—কিন্তু সেই জন্তই পবেশ বাবু চুপ করিয়া থাকাকেই সে সব চেয়ে ভয় কবিত।

ললিতার এই সঙ্কোচের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিনয়, এরূপ স্থলে তাহার কি কর্তব্য ঠিকটি ভাবিয়া পাইল না। সে সঙ্গে থাকিলে ললিতার সঙ্কোচের কারণ অধিক হইবে কি না তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্ত সে একটু দ্বিধাব স্বরে ললিতাকে কহিল “তবে এখন যাই।”

ললিতা তাড়াতাড়ি কহিল—“না, চলুন, বাবার কাছে চলুন।”

ললিতার এই ব্যগ্র অনুরোধে বিনয় মনে মনে আনন্দিত হইয়া উঠিল। বাড়িতে পৌঁছিয়া দিবার পর হইতেই তাহার যে কর্তব্য শেষ হইয়া যায় নাই—এই একটা আকস্মিক ব্যাপাবে ললিতার সঙ্গে তাহার জীবনের যে একটা বিশেষ গ্রন্থি বন্ধন হইয়া গেছে—তাহাই মনে করিয়া বিনয় ললিতার পার্শ্বে যেন একটু বিশেষ জোরের সঙ্গে দাঁড়াইল। তাহার প্রতি ললিতার এই নির্ভর-কল্পনা যেন একটি স্পর্শের মত তাহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চার কবিত্তে লাগিল। তাহার মনে হইল ললিতা যেন তাহার ডান হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। ললিতার সহিত এই সম্বন্ধে তাহার পুরুষের বন্ধ ভরিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল পরেশ বাবু ললিতার এই অসামাজিক হঠকারিতায় বাগ কবিবেন, ললিতাকে ভৎসনা কবিবেন, তখন বিনয় যথা-সম্ভব সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে লইবে—ভৎসনার অংশ অসঙ্কোচে গ্রহণ করিবে, বর্ষের স্বরূপ হইয়া ললিতাকে সমস্ত আঘাত হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু ললিতার ঠিক মনের ভাবটা বিনয় বুঝিতে পারেন নাই। সে যে ভৎসনার প্রতিবোধক স্বরূপেই বিনয়কে ছাড়িতে চাহিল না তাহা নহে। আসল কথা, ললিতা কিছুই চাপা দিয়া রাখিতে পারেন না। সে যাহা করিয়াছে তাহার সমস্ত অংশই পবেশ বাবু চক্ষে দেখিবেন এবং বিচারে যে ফল হয় তাহার সমস্তটাই ললিতা গ্রহণ করিবে এইরূপ তাহার ভাব।

আজ সকাল হইতেই ললিতা বিনয়ের উপর মনে মনে রাগ করিয়া আছে। রাগটা যে অসঙ্গত তাহা সে সম্পূর্ণ জানে—কিন্তু অসঙ্গত বলিয়াই রাগটা কমে না বরং বাড়ে।

ষ্টীমারে যতক্ষণ ছিল ললিতার মনের ভাব অজ্ঞান ছিল। ছেলেবেলা হইতে সে কখনো রাগ করিয়া কখনো

জ্বৈর করিয়া একটা না একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইয়া আসিয়াছে কিন্তু এবারকার ব্যাপারটি গুরুতব। এই নিষিদ্ধ ব্যাপারে বিনয়ও তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িতে সে একদিকে সঙ্কোচ এবং অন্যদিকে একটা নিগূঢ় হর্ষ অনুভব করিতেছিল। এই হর্ষ যেন নিষেধের সংঘাত দ্বারাই বেশি করিয়া মখিত হইয়া উঠিতেছিল। একজন বাহিরের গুরুত্বকে সে আজ এমন করিয়া আশ্রয় করিয়াছে, তাহার এত কাছে আসিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে আত্মীয়-সমাজের কোনো আড়াল নাই, ইহাতে কতখানি কুণ্ঠার কারণ ছিল—কিন্তু বিনয়ের স্বাভাবিক ভদ্রতা এমনি সংঘর্মের সহিত একটি আক্রে রচনা করিয়া রাখিয়াছিল যে এই আশঙ্কাজনক অবস্থার মাঝখানে বিনয়ের স্নকুমার শীলতাব পরিচয় ললিতাকে ভারি একটা আনন্দ দান করিতেছিল। যে বিনয় তাহাদের বাড়িতে সকলের সঙ্গে সর্বদা আমোদ কোতুক কবিত, যাহার কথাব বিরাম ছিল না, বাড়ির ভৃত্যদেব সঙ্গেও যাহার আত্মীয়তা অব্যাহত এ সে বিনয় নহে। সতর্কতার দোহাই দিয়া যেখানে সে অনায়াসেই ললিতার সঙ্গ বেশি করিয়া লইতে পারিত সেখানে বিনয় এমন দৃবদ্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল যে তাহাতেই ললিতা হৃদয়ের মধ্যে তাহাকে আরো নিকটে অনুভব করিতেছিল। রাত্রে ষ্টীমারের ক্যাবিনে নানা চিন্তায় তাহার ভাল ঘুম হইতেছিল না;—ছটফট কবিত্তে কবিত্তে এক সময় মনে হইল রাত্রি এতক্ষণে প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। ধীবে ধীবে ক্যাবিনের দরজা খুলিয়া বাহিবেব দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্রিশেষের শিশিরার্জ অন্ধকার তপনো নদীর উপরকার মুক্ত আকাশ এবং তীরের বনশ্রেণীকে জড়াইয়া রহিয়াছে—এইমাত্র একটি শীত বাতাস উঠিয়া নদীর জলে কলধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং নীচের তলায় এঞ্জিনের খালাসীরা কাজ আবস্ত করিবে এমনতব চাকুল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ললিতা ক্যাবিনের বাহিবে প্রবেশ কবিয়াই দেখিল অনতিদূবে বিনয় একটা গরম কাপড় গায়ে দিয়া বেতের চৌকির উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়াই ললিতার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি বিনয় ঐখানেই বসিয়া পাহারা দিয়াছে! এতই নিকটে, তবু এত দূরে! ডেক হইতে তখন ললিতা কম্পিত

পদে ক্যাবিনে আসিল; ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া সেই হেমন্তের প্রত্যুষে সেই অন্ধকারজড়িত অপরিচিত নদীদৃশ্যের মধ্যে একাকী নিদ্রিত বিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল; সম্মুখের দিক্‌প্রান্তের তারাগুলি যেন বিনয়ের নিদ্রাকে বেঁধেন করিয়া তাহার চোখে পড়িল; একটি অনির্কচনীয় গাঙ্গীর্ষ্য ও মাধুর্য্যে তাহার সমস্ত হৃদয় একেবারে কুলে কুলে পূর্ণ হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে ললিতার হৃই চক্ষু কেন যে জ্বলে ভরিয়া আসিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার পিতার কাছে সে যে-দেবতার উপাসনা করিতে শিখিয়াছে সেই দেবতা যেন দক্ষিণ হস্তে তাহাকে আজ স্পর্শ করিলেন এবং এই নদীর উপরে এই তরুপল্লবনিবিড় নিদ্রিত তীরে রাত্রির অন্ধকারের সহিত নবীন আলোকের যখন প্রথম নিগূঢ় সম্মিলন ঘটিতেছে সেই পবিত্র সন্ধিক্ষণে পরিপূর্ণ নক্ষত্রসভায় কোন্ একটি দিবা সঙ্গীত অনাহত মহাবীণায় হৃঃসহ আনন্দ-বেদনার মত বাজিয়া উঠিল।

এমন সময় ঘুমের বোরে বিনয় হাতটা একটু নাড়িয়া-মাত্রই ললিতা তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার হাত পায়ের তলদেশ স্পর্শিত হইয়া উঠিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য নিবৃত্ত করিতে পারিল না।

অন্ধকার দূর হইয়া গেল। শীমাব চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ললিতা মুখ হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া-রেল ধরিয়া দাঁড়াইল। বিনয়ও পূর্বেই জাহাজের বাণির আওয়াজে জাগিয়া প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্বতীরে প্রভাতের প্রথম অভ্যাস দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। ললিতা বাহির হইয়া আসিবামাত্র সে সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই ললিতা ডাকিল—“বিনয় বাবু!”

বিনয় কাছে আসিতে ললিতা কহিল, “আপনার বোধ হয় রাতে ভাল ঘুম হয়নি।”

বিনয় কহিল, “মন্দ হয়নি।”

ইহার পরে দুইজনে আর কথা হইল না। শিশিরসিক্ত কাশবনের পরপ্রান্তে আসন্ন সূর্য্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইহারা দুইজনে জীবনে এমন প্রভাত আর কোনো দিন দেখে নাই। আলোক তাহাদিগকে এমন করিয়া কখনো স্পর্শ করে নাই—আকাশ যে শূন্য নহে,

তাহা যে বিশ্বয়নীরব আনন্দে সৃষ্টিব দিকে অনিমেঘে চাহিয়া আছে তাহা ইহারা এই প্রথম জানিল। এই দুই জনের চিন্তে চেতনা এমন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে যে, সমস্ত জগতের অন্তর্নিহিত চৈতন্ত্যের সঙ্গে আজ যেন তাহাদের একেবারে গায়েগায়ে ঠেকাঠেকি হইল। কেহ কোনো কথা কহিল না।

শীমার কলিকাতায় আসিল। বিনয় ঘাটে একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া ললিতাকে ভিতরে বসাইয়া নিজে গাড়োয়ানের পাশে গিয়া বসিল। এই দিনের বেলাকার কলিকাতার পথে গাড়ি কবিতা চলিতে চলিতে কেন যে ললিতার মনে উল্টা হাওয়া বহিতে লাগিল তাহা কে বলিবে! এই সন্ধ্যার সময় বিনয় যে শীমারে ছিল, ললিতা যে বিনয়ের সঙ্গে এমন করিয়া জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, বিনয় যে অভিভাবকের মত তাহাকে গাড়ি করিয়া-বাড়ি লইয়া যাইতেছে ইহার সমস্তই তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। ঘটনাবশতঃ বিনয় যে তাহার উপরে একটা কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছে ইহা তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। কেন এমন হইল! রাত্রের সেই সঙ্গীত দিনের কর্ম্মক্ষেত্রেব সম্মুখে আসিয়া— কেন এমন কঠোর সুরে খামিয়া গেল!

তাই ঘাবের কাছে আসিয়া বিনয় যখন সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল—“আমি তবে যাই” তখন ললিতার রাগ আরো বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিল যে, “বিনয় বাবু মনে করিতেছেন তাহাকে সঙ্গে করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত হইতে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি।” এ সম্বন্ধে তাহার মনে যে লেশমাত্র সন্দেহ নাই ইহাই বলের সহিত প্রমাণ করিবার এবং পিতার নিকট সমস্ত জিনিষটাকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত করিবার জন্ত সে বিনয়কে ঘাবের কাছে হইতে অপরাধীর স্তায় বিদায় দিতে চাহিল না।

বিনয়ের সঙ্গে সম্বন্ধকে সে পূর্ব্বের স্তায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে চায়—মাঝখানে কোনো কুণ্ঠা, কোনো মোহের জড়িমা রাখিয়া সে নিজেকে বিনয়ের কাছে খাটো করিতে চায় না।

• ৩২

বিনয় ও ললিতাকে দেখিবামাত্র কোঁথা হইতে সতীশ ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের দুইজনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া

উভয়ের হাত ধরিয়া কহিল—“কই, বড় দিদি এলেন না ?”

বিনয় পকেট চাপড়াইয়া এবং চারিদিকে চাহিয়া কহিল—“বড় দিদি ! তাই ত, কি হল ! হাবিয়ে গেছেন ।”

সতীশ বিনয়কে ঠেলা দিয়া কহিল—“ইস, তাই ত, কখনো না ! বল না, ললিতা দিদি !”

ললিতা কহিল “বড় দিদি কাল আসবেন ।” বলিয়া পরেশ বাবুর ঘরের দিকে চলিল ।

সতীশ ললিতা ও বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—“আমাদের বাড়ি কে এসেছেন দেখে চল !”

ললিতা হাত টানিয়া লইয়া কহিল, “তোব যে আসুক এখন বিবস্ত্র করিসনে । এখন বাবাব কাছে যাচ্ছি ।”

সতীশ কহিল, “বাবা বেরিয়ে গেছেন, তাঁব আসতে দেরি হবে !”

শুনিয়া বিনয় এবং ললিতা উভয়েই ক্ষণকালের জন্য একটা আরাম বোধ করিল । ললিতা জিজ্ঞাসা করিল—“কে এসেচে ?”

সতীশ কহিল “বলব না ! আচ্ছা, বিনয় বাবু বলুন দেখি কে এসেচে ! আপনি কখনোই বলতে পারবেন না । কখনো না, কখনো না !”

বিনয় অত্যন্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত নাম কবিত্তে লাগিল—কখনো বলিল, নবাব সিরাজউদৌল্লা, কখনো বলিল রাজা নবকৃষ্ণ, একবার নন্দকুমারেরও নাম করিল । এরূপ অতিথি-সমাগম যে একেবারেই অসম্ভব সতীশ তাহারই অকাট্য কারণ দেখাইয়া উচ্চৈঃস্ববে প্রতিবাদ করিল—বিনয় হার মানিয়া নতশ্রমে কহিল, “তা বটে, সিরাজউদৌল্লা যে এরাড়িতে আসার কতকগুলো গুরুতর অসুবিধে আছে সেকথা আমি এপর্যন্ত চিন্তা করে দেখিনি । যাহোক তোমার দিদি ত আগে তদন্ত করে আসুন তার পরে যদি প্রয়োজন হয় আমাকে ডাক দিলেই আমি যাব ।”

সতীশ কহিল, “না, আপনারা দুজনেই আসুন ।”

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, “কোন ঘরে যেতে হবে ?”

সতীশ কহিল, “তেতালার ঘরে ।”

তেতালার ছাঁদেব কোণে একটি ছোট ঘর আছে, তাহার দক্ষিণের দিকে রোঙ্গ বৃষ্টি নিবারণের জন্য একটি

চালু টালির ছাদ । সতীশের অসুস্থতা ছইজনে সেখানে গিয়া দেখিল ছোট একটি আসন পাতিয়া সেই ছাদের নীচে একজন প্রোচা জ্বীলোক চোখে চষমা দিয়া কুস্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেছেন । তাঁহার চষমাব একদিককাব ভাঙা দণ্ডে দড়ি বাঁধা, সেই দড়ি তাঁহার কানে জড়ানো । বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি হইবে । মাথাব সামনের দিকে চুল বিরল হইয়া আসিয়াছে কিন্তু গোবর্গ মুখ পরিপক্ব ফলটির মত এখনো প্রায় নিটোল রহিয়াছে ;—ছুই জব মাঝে একটি উদ্ধীব দাগ—গায়ে অলঙ্কার নাই, বিধবাব বেশ । প্রথমে ললিতার দিকে চোখ পড়িতেই তাড়াতাড়ি চষমা খুলিয়া বই ফেলিয়া বাখিয়া বিশেষ একটা ঔষ্মক্যের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন ; পরক্ষণেই তাহার পশ্চাতে বিনয়কে দেখিয়া দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন । সতীশ তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “মাসিমা পালাচ কেন ? এই আমাদের ললিতা দিদি, আর ইনি বিনয় বাবু । বড় দিদি কাল আসবেন ।” বিনয় বাবুর এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই যথেষ্ট হইল ; ইতিপূর্বেই বিনয় বাবু সম্বন্ধে আলোচনা যে প্রচুর পরিমাণে হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । পৃথিবীতে সতীশের যে কয়টি বলিবার বিষয় জন্মিয়াছে কোনো উপলক্ষ্য পাইলেই তাহা সতীশ বলে এবং হাতে রাখিয়া বলে না ।

“মাসিমা” বলিতে যে কাহাকে বুঝায় তাহা না বুঝিতে পারিয়া ললিতা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল । বিনয় এই প্রোচা রমণীকে প্রণাম কবিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেই ললিতা তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল ।

মাসিমা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে একটি মাড়ব বাহির করিয়া পাতিয়া দিলেন এবং কহিলেন—“বাবা বোস, মা বোস ।”

বিনয় ও ললিতা বসিলে পব তিনি তাঁহার আসনে বসিলেন এবং সতীশ তাঁহার গা ঘেঁষিয়া বসিল । তিনি সতীশকে ডান হাত দিয়া নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কহিলেন, “আমাকে তোমরা জ্ঞান না, আমি সতীশেব মাসী হই—সতীশের মা আমার আপন দিদি ছিলেন ।”

এইটুকু পবিচয়ের মধ্যে বেশি কিছু কথা ছিল না কিন্তু

মাসিমার মুখে ও কণ্ঠস্থরে এমন একটি কি ছিল যাহাতে তাঁহার জীবনের সুগভীর শোকের অশ্রুমাৰ্জিত পবিত্র একটি আভাস প্রকাশিত হইয়া পড়িল। “আমি সতীশের মাসী হই” বলিয়া তিনি যখন সতীশকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিলেন তখন এই রমণীর জীবনের ইতিহাস কিছুই না জানিয়াও বিনয়ের মন করুণায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। বিনয় বলিয়া উঠিল, “একলা সতীশের মাসিমা হলে চলবে না ; তা হলে এত দিন পবে সতীশের সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। একে ত সতীশ আমাকে বিনয় বাবু বলে, দাদা বলে না, তার পরে মাসিমা থেকে বঞ্চিত করবে সে ত কোনো মতেই উচিত হবে না।”

মন বশ করিতে বিনয়ের বিলম্ব হইত না। এই প্রিয়দর্শন প্রিয়ভাষী যুবক দেখিতে দেখিতে মাসিমাব মনে সতীশের সঙ্গে দখল ভাগ করিয়া লইল।

মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা, তোমার মা কোথায় ?”

বিনয় কহিল, “আমার নিজের মাকে অনেক দিন হল হারিয়েছি কিন্তু আমার মা নেই এমন কথা আমি মুখে আনতে পারব না।”

এই বলিয়া আনন্দময়ীর কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাহার হৃদয় চক্ষু বেষ্টন ভাবের বাষ্পে আর্দ্র হইয়া আসিল।

হৃদয় পক্ষে কথা খুব জমিয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে আজ যে নূতন পরিচয় সে কথা কিছুতেই মনে হইল না। সতীশ এই কথাবার্তার মাঝখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল এবং ললিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

চেষ্টা করিলেও ললিতা নিজেকে সহজে যেন বাহির করিতে পারে না। প্রথম পরিচয়ের বাধা ভাঙিতে তাহার অনেক সময় লাগে। তা ছাড়া, আজ তাহার মন ভাল ছিল না। বিনয় যে অনায়াসেই এই অপরিচিতার সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিল ইহা তাহার ভাল লাগিতেছিল না ; ললিতার যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে বিনয় তাহার গুরুত্ব মনের মধ্যে গ্রহণ না করিয়া যে এমন নিরুদ্ভিগ্ন হইয়া আছে ইহাতে বিনয়কে লবুচিস্ত বলিয়া সে মনে মনে অপবাদ দিল। কিন্তু মুখ গম্ভীর কবিতা বিবরণভাবে চুপচাপ বসিয়া

থাকিলেই বিনয় যে ললিতার অসন্তোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইত তাহা নহে ;—তাহা হইলে নিশ্চয় ললিতা রাগিয়া মনে মনে এই কথা বলিত—“আমার সঙ্গেই বাবার বোঝাপড়া, কিন্তু বিনয় বাবু এমন ভাব ধারণ করিতেছেন কেন, যেন উহার ঘাড়েই এই দায় পড়িয়াছে।” আসল কথা, কাল রাত্রে যে আঘাতে সঙ্গীত বাজিয়াছিল, আজ দিনের বেলায় তাহাতে ব্যথাই বাজিতেছে—কিছুই ঠিকমত হইতেছে না। আজ তাই ললিতা প্রতিপদে বিনয়ের সঙ্গে মনে মনে ঝগড়াই করিতেছে ; বিনয়ের কোনো ব্যবহারেই এ ঝগড়া মিটিতে পারিত না—কোন মূলে সংশোধন হইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারিত তাহা অন্তর্ধার্মীই জানেন।

হায় রে, হৃদয় লইয়াই যাহাদের কারবাব সেই মেয়েদের ব্যবহারকে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া দোষ দিলে চলিবে কেন ? যদি গোড়ায় ঠিক জায়গাটিতে ইহার প্রতিষ্ঠা থাকে তবে হৃদয় এমনি সহজে এমনি স্নান চলে যে যুক্তিতর্ক হার মানিয়া মাথা হেঁট করিয়া থাকে কিন্তু সেই গোড়ায় যদি লেশমাত্র বিপর্যয় ঘটে তবে বুদ্ধির সাধ্য কি যে কল ঠিক করিয়া দেয়—তখন রাগবিভাগ হাসিকান্না, কি হইতে—যে কি ঘটে তাহার হিসাব তলব করিতে যাওয়াই বুধ।

এদিকে বিনয়ের হৃদয়যন্ত্রটিও যে বেশ স্বাভাবিকভাবে চলিতেছিল তাহা নহে। তাহার অবস্থা যদি অবিকল পূর্বের মত থাকিত তবে এই মহুর্ভেই সে ছুটিয়া আনন্দময়ীর কাছে যাইত। গোয়ার কারাদণ্ডের খবর বিনয় ছাড়া মাকে আর কে দিতে পারে ! সে ছাড়া মায়ের সামান্যই বা আর কে আছে ! এই বেদনার কথাটা বিনয়ের মনের তলায় বিষম একটা ভার হইয়া তাহাকে কেবলি পেষণ করিতেছিল—কিন্তু ললিতাকে এখনি ছাড়িয়া চলিয়া যাত্র ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে আজ সেই যে ললিতার রক্ষক, ললিতা সম্বন্ধে পবেশ বাবুর কাছে তাহার যদি কিছু কর্তব্য থাকে তাহা শেষ কবিতা তাহাকে যাইতে হইবে এই কথা সে মনকে বুঝাইতেছিল। মন তাহা অতি সামান্য চেষ্টাতেই বুঝিয়া লইয়াছিল ; তাহার প্রতিবন্ধ করিবার ক্ষমতাই ছিল না। গোরা এবং আনন্দময়ীর অন্ত বিনয়ের মনে যুত বেদনাই থাক্ আজ ললিতার অতি সন্নিকট অস্তিত্ব তাহাকে এমন

আনন্দ দিতে লাগিল—এমন একটা বিস্ময়ভরতা, সমস্ত সংসারের মধ্যে এমন একটা বিশেষ গৌরব—নিজের সম্ভার সে এমন একটা বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতে লাগিল যে তাহার মনের বেদনাটা মনের নীচে তলাতেই রহিয়া গেল। ললিতার দিকে সে আজ চাহিতে পারিতেছিল না—কেবল ক্ষণে ক্ষণে চোখে আপনি যেটুকু পড়িতেছিল, ললিতার কাপড়ের একটুকু অংশ, কোলের উপর নিশ্চলভাবে স্থিত তাহার একখানি হাত—মুহূর্তের মধ্যে ইহাই তাহাকে পুলকিত করিতে লাগিল।

দেরি হইতে চলিল। পরেশ বাবু এখনো ত আসিলেন না। উঠিবার জন্ত ভিতর হইতে তাগিদ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল—তাহাকে কোনো মতে চাপা দিবার জন্ত বিনয় সতীশের মাসীর সঙ্গে একান্তমনে আলাপ করিতে থাকিল। অবশেষে ললিতার বিবক্তি আর বাধ মানিল না; সে বিনয়ের কথার মাঝখানে সহসা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—“আপনি দেরি করছেন কার জন্তে? বাবা কখন আসবেন তার ঠিক নেই। আপনি গৌর বাবুর মার কাছে একবার যাবেন না?”

বিনয় চমকিয়া উঠিল। ললিতার বিরক্তিস্বর বিনয়ের পক্ষে অপরিচিত ছিল। সে ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া একমুহূর্তে একেবারে উঠিয়া পড়িল—ঠাৎ গুণ ছিঁড়িয়া গেলে বাণ যেমন সোজা হইয়া উঠে তেমনি করিয়া সে দাঁড়াইল। সে দেরি করিতেছিল তাহার জন্ত? এখানে যে তাহার কোনো একান্ত প্রয়োজন ছিল এমন অহঙ্কার ত আপনা হইতে বিনয়ের মনে আসে নাই—সে ত দ্বারের নিকট হইতেই বিদায় লইতেছিল—ললিতাই ত তাহাকে অন্ত্রবোধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিল—অবশেষে ললিতার মুখে এই প্রশ্ন।

বিনয় এমনি ঠাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল যে, ললিতা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। দেখিল, বিনয়ের মুখের স্বাভাবিক সহাস্ততা একেবারে এক ফুৎকারে প্রদীপের আলোর মত সম্পূর্ণ নিবিয়া গেছে। বিনয়ের এমন ব্যথিত মুখ, তাহার ভাবের এমন অকস্মাৎ পরিবর্তন ললিতা আর কখনো দেখে নাই। বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়াই তীব্র অমৃততাপের জ্বালাময় স্তবধাত তৎক্ষণাৎ

ললিতার হৃদয়ের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে উপরি উপরি বাজিতে লাগিল।

সতীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিনয়ের হাত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া মিনতির স্বরে কহিল—“বিনয় বাবু, বসুন, এখনি যাবেন না! আমাদের বাড়ীতে আজ খেয়ে যান! মাসিমা, বিনয় বাবুকে খেতে বল না। ললিতা দিদি, কেন বিনয় বাবুকে যেতে বললে!”

বিনয় কহিল—“তাই সতীশ, আজ না তাই! মাসিমা যদি মনে রাখেন তবে আর একদিন এসে প্রসাদ খাব। আজ দেরি হয়ে গেছে।”

কথাগুলো বিশেষ কিছু নয় কিন্তু কর্তৃস্বরের মধ্যে অশ্রু আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তাহার করুণা সতীশের মাসিমার কানেও বাজিল। তিনি একবার বিনয়ের ও একবার ললিতার মুখের দিকে চকিতের মত চাহিয়া লইলেন—বুঝিলেন অদৃষ্টের একটা লীলা চলিতেছে।

অনতিবিলম্বে কোনো ছুতা করিয়া ললিতা উঠিয়া তাহার ঘরে গেল। কত দিন সে নিজেকে নিজে এমন করিয়া কাঁদাইয়াছে।

*কাব্যে বঙ্গদেশের বিশেষত্ব।

মাটির গুণ এবং জলবায়ুর উপর ফসল নির্ভর করে; কাজেই ফসলের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে জল বায়ু এবং মাটির প্রকৃতি বুঝিয়া লইতে হয়। বঙ্গদেশের যে বিশেষত্বের ফলে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যেব একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাই, এ পর্য্যন্ত কোন ইতিহাস বা খণ্ড-সমালোচনায় তাহার আলোচনা হয় নাই। একালের হুইজন প্রধান কবি,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্য সমালোচনা কবি বলিয়া সংকল্প করিয়াই দেখিলাম, যে “বাংলার ফলের” কথা বলিবাব পূর্বে, “বাংলার মাটি বাংলার জল” সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লওয়া চাই। নহিলে কাব্যের স্বাভাবিক বিকাশ এবং বিশেষত্ব বুঝিতে পারা যায় না।

এ কালের বঙ্গসাহিত্যের নেতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের প্রকাশের সময়ে, ১৮৮৫

খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে (১) লিখিয়াছিলেন :—“বঙ্গসাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই—বিজ্ঞাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত অনেক স্রুতিবি বাংলায় জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন। বলিতে গেলে বং বলিতে হয় যে বাঙ্গালা সাহিত্য কাব্যরাশি ভাবে কিছু পীড়িত।” বিজ্ঞাপতি এবং চণ্ডীদাস এক সময়েই লোক ছিলেন; এবং ঐ কবিদ্বয়ের পরস্পরে যথেষ্ট পরিচয় এবং সৌহার্দ্য ছিল। বঙ্কিম বাবু যদি মিথিলাব বিজ্ঞাপতির নাম না করিয়া চণ্ডীদাসের নাম করিতেন, ভাল হইত। পবিত্রতায়, ভাবগাম্ভীর্য্যে, সৌন্দর্য্য অল্পভূতিতে এবং আকাজ্জক্যের সরস ও সরল অভিব্যক্তিতে চণ্ডীদাসের রচনা যখন বিজ্ঞাপতির অনেক উচে, তখন নাম-মাহাত্ম্যেও কিছু বাধা হইত না।

বাঙ্গালার কবিতাবাহুল্যের প্রতিও বঙ্কিম বাবু কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই; ওবিষয়ে বাঙ্গালীর একটু অপবাদ না আছে তা নয়। কবি বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়ের তীব্র পরিহাসে আছে—“আমবা বক্তৃতায় যুক্তি, ও কবিতায় কাদি, কিন্তু কাজের সময় সব “চুঁ-চুঁৎ”। তা হোক, যে দেশে যে জিনিস বেশি জন্মে সে দেশে মন্দ অংশটা চোখে একটু বেশি ঠেকিবেই। বাঙ্গালা দেশ কাব্যভারে যত পীড়িত হইলেও কবিতা রচনা মাত্রেরই, কিম্বা স্রুতিবি রচনায় এ দেশের বিশেষত্ব বলিলে, অত্র প্রদেশের প্রতি অবিচার করা হয়। ভাষা বচনাব আদি ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বঙ্গসাহিত্যের বিশেষত্ব অল্পসন্ধান করিব।

সংস্কৃত হইতে যে সকল প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি (২) উহার কোনটিতেই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ের রচনার

(১) এই মন্তব্য প্রকাশের সময় কবি বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায় ইংলও-প্রবাসী বিজ্ঞানী। তখন তাঁহার বাংলা রচনা ‘আর্য্যপাখা ১ম ভাগ’ বঙ্কিমবর্গের বাহিরে বেশি প্রচার লাভ করে নাই। ‘পতাকা’য় প্রকাশিত রচনাতেও তাঁহার নাম মুদ্রিত হইত না। যতদূর স্মরণ হয়, তাঁহার ইংলও যাত্রাব অল্পপূর্বে কেবল একটি স্বন্দর কবিতা তাঁহার নামযুক্ত হইয়া ‘নব্য ভারতে’ প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাটির নাম, ‘দেবগৃহে সূর্য্যাস্ত’ বলিয়া মনে হইতেছে।

(২) ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশের বিশেষত্বের কথায়, তেলেগু, তামিল, মলয়ালম্ ও কাণাডার সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য কবি নাই। ঐ সকল আর্য্যেতর ভাষার সাহিত্যের সহিত আমার কিছুমাত্র পরিচয় নাই। পরোক্ষ সংবাদে অবগত আছি, যে কাণাডায় (প্রাচীন কর্ণাটে) অতি প্রাচীন ভাষাসাহিত্য আছে,—এবং ইহঁত “বৃহৎ কথা” আশু (প্রাচীন তেলেগু) ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

নমুনা পাওয়া যায় না। মাড়ওয়াড়ের ‘শিবসিংহ সর্বোচ্চ’ গ্রন্থেব মতে, উজ্জয়িনীৰ পুণ্য কবি ৮ম শতাব্দীতে যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই নাকি ‘ভাষা কা জড়’। কিন্তু ঐ রচনা হিন্দিতে হইয়াছিল, কি না, তাহার প্রমাণ নাই। নবম শতাব্দীতেও ‘খুমানসিংহ চরিত’ যে ঠিক কি প্রকার ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা জানা হুঃসাধ্য; কারণ ১৬শ শতাব্দীতে উহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই নববিধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে, সকল প্রদেশেই ভাষা সাহিত্য বিকাশের সূত্রপাত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রভাবের এই নব সাহিত্য যে “নব গোড়ী বীতিতে” লিখিত হইতেছিল, তাহা বঙ্গভাষাবিধেরী গ্রন্থার্সনও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এখানে গোড়ী রীতির গোড় দেশ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। এ কথা স্বীকার কবিত্তেই হইবে যে অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্তও বঙ্গদেশ গোড় আখ্যা পায় নাই। সে সময় পর্য্যন্ত নেপালের দক্ষিণ সীমান্তস্থিত এবং মিথিলার উত্তরবর্তী প্রদেশের নাম ছিল গোড়। (১) পববর্তী সময়ে যখন মগধের পূর্বাঞ্চলের সহিত বাঢ় (প্রাচীন স্রুজ) বরেন্দ্র (পৌণ্ড্র বর্দ্ধন এবং গোড়ভুক্ত পৌণ্ড্র বর্দ্ধনের উত্তর-পশ্চিম অংশ) বঙ্গ, মিথিলা ও গুড়্র দেশের অনেক অংশ, একত্রে যুক্ত হইয়া, প্রাচীন গোড়ের স্থিতিতে ‘নব গোড়’ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনো নব বৈষ্ণব ভাবেব তরঙ্গ উঠে নাই। (২) তখনো বিহার বঙ্গ ও উৎকলে বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক-বৌদ্ধ ধর্ম্মেব প্রভাব প্রবল।

আর্য্যেতর জাতির ভূত প্রেতের মন্ত্র, যাহা বিজ্ঞা এবং জননেত্রিয়সংস্কৃষ্ট ধর্ম্মসাধনা, যখন স্রুপবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটা বিকৃত মতের সহিত যুক্ত হয়, তখনি তান্ত্রিক-বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবলতা লাভ করে। বঙ্গদেশ এবং উৎকল বহু কাল হইতেই অনার্য্যপুত ছিল; এবং তখনও এই উভয় দেশের অধিকাংশ অধিবাসী অনার্য্যজাতীয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মেব অত্র ফলেব কথা এখানে আলোচনা করিব না; কিন্তু

(১) শঙ্কর পাণ্ডুরাং পণ্ডিতের গৌড়বহো কাব্যের ভূমিকা, এবং R. A. S. ১৯০৬ সালের জুলাই মাসীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(২) দেশসংস্থানের যৈ অবস্থা দেওয়া গেল, তাহা বিতৃত ভাবে প্রমাণ সহ না লিখিলে পাঠকদের তৃপ্তি জন্মিতে পারে না; কিন্তু এই প্রবন্ধে সে কথা লিখিতে গেলে, প্রবন্ধ লেখাই বন্ধ করিতে হয়।

দেশব্যাপী অনার্যোবা এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া, ইহাদের উপর প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যের বাধাবীধি নিয়মেব প্রভাব ছিল না। ধর্ম সাধনায় এবং চিন্তায় দেশব্যাপী একটা স্বাধীনতা ছিল। সমাজেব নিয়ন্তব্যই সমাজেব স্বার্থ ভিত্তি, উহাই সমাজেব মাটি। আর্যোবা যখন আসিয়া ঐ মাটিতে নূতন সার দিয়াছিলেন, তখন উর্বরতা বাড়িয়াছিল—কিন্তু মাটির প্রকৃতি বদলায় নাই। বরং অল্পসংখ্যক আর্যোবা অনার্যেব প্রভাব প্রথমতঃ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ধর্ম সেবায় এবং দেব পূজায় কেবল ব্রাহ্মণ পুৰোহিতেব অধিকার, এ কথা চালাইতে না পাবিয়া ব্রাহ্মণেরা শূদ্রাদি স্বাধীন ধর্ম চর্চা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ গুরুবা নূতন ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ধর্মের শূদ্রাদি সকলকেই মন্মদান করিবাব প্রথা সৃষ্টি কবেন; এবং মন্মদীক্ষিতেরা নিজে নিজে ধর্ম সাধনা করিতে পারিবে বলিয়া, একটা মিলন ও সন্ধিস্থাপন কবেন। প্রাচীন মধ্য দেশে আর্যেব পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু চিবাগত নিয়ম পালনেব অতিবিক্ত নূতন চিন্তার বিকাশ হয় নাই।

পরে যখন দক্ষিণ প্রদেশেব নব বৈষ্ণব ধর্ম (ইহাও জনসাধারণেব মধ্যে প্রথমে প্রচাৰিত) প্রবলতা লাভ করিল, তখন অল্প দেশের মত বঙ্গদেশেও উহা সাধাবণ শ্রেণীৰ লোকেব নিকট আদৃত হইতে লাগিল। নিয়ন্তবেব প্রভাবে সমাজেব উচ্চস্তবেও এই নব ধর্ম বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। যে ধর্ম কেবলমাত্র বৈদিক ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহাব সাধনায় সংস্কৃত বাধা মন্ত্ৰের প্রয়োজন হয় না; কাজেই সাধাবণ লোকেব সাধারণ ভাষায় “গীত” প্রস্তুত হইয়া, ও পুৰাণ লিখিত হইয়া, এ ধর্ম প্রচারিত হইতেছিল। ধর্মবিপ্লবেব ইতিহাসেই দেখিতে পাই যে, প্রাচীন সংস্কৃত বা পালি, প্রাচীন বৈদিক ভাষা অগ্রাহ্য করিয়া নব বিকাশ লাভ করিয়াছিল; এই ধর্ম-বিপ্লবেই যুগে যুগে সকল ‘প্রাকৃত’ ভাষাব মর্যাদা বাড়িয়াছে। নব গোড়ী রীতিতে প্রাকৃত ভাষায় বচনা ছাড়াও বঙ্গ সাহিত্যে যে যে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব দেখিতে পাই, তাহা নির্দেশ করিতেছি।

(১) নূরবৈষ্ণবধর্মপ্রণোদিত নবগোড়ী বীত্তিব প্রথম কবি কে, তাহা হয়ত সম্পূর্ণ স্থিৰ করা যায় না; কিন্তু

এই বীত্তির বিকাশ এবং প্রচারে যে বীরভূম জেলাব কেন্দুবিশ্বগ্রামবাসী বাঙ্গালী কবি জয়দেব চক্রবর্তী প্রধান সহায়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? অক্ষর ছন্দ-ছাড়িয়া কেবল গানের সুরে যখন গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল, তখন কবিভূঁই ভাষা সংস্কৃত বলিয়া সকল প্রদেশেই অচিরাৎ উহার সুনাম হইয়াছিল। যে ছন্দ এবং পদলাপিত্য গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই, মীরাবাই, শ্রবদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি সকলেই তাহাব অনুকরণে ভাষা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির উপর জয়দেবেব প্রভাব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গভাষায় খুব প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিদ্যাপতিব সমসাময়িক কবি চণ্ডীদাস যখন বঙ্গের, তখন বাঙ্গালার কবিতা মিথিলাব ভাবে উদ্ভূত নহে।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সংস্কৃত ছাড়িয়া প্রাদেশিক ভাষায় কাব্য রচনা আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্ত্র সর্বস্থলেই সংস্কৃত বীত্তি যথেষ্ট রক্ষিত হইতেছিল। শ্রবদাস প্রভৃতি কবিব বচনা জয়দেবেব প্রভাবে গানের ছন্দে রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চাবণ পরিত্যক্ত হয় নাই। গুজরাট এবং মর্হাট্টা কবিতা ত আঞ্জিকালিও একেবারে নিখুঁত সংস্কৃত ছন্দে রচিত হয়; প্রাদেশিক নূতন কোন ছন্দ এ পর্যন্তও বিকশিত হয় নাই। উৎকলেও প্রথমতঃ গানের সুরে কবিতা লিখিবাব প্রথা হইয়াছিল বটে; কিন্তু এখনও সেই প্রাচীন কালের সুর বা ছন্দে সকল কবিতাই রচিত হয়। বাঙ্গলা দেশেব মত ওড়িয়ায় স্বাধীন নূতন ছন্দ জন্মিতেছে না। ওড়িয়াব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, বিদ্যাপতির দেশ মিথিলা সম্বন্ধেও সেই কথা। নব গোড়ী প্রথার উদ্ভবেব সময় মিথিলা এবং বঙ্গ যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তাহা স্মরণ বাধিতে হইবে।

যে নূতনত্ব এবং নিরক্ষুশতা কবিতার জীবন, একালেব নব গোড়ী প্রথায় তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। যে পূর্ব-প্রদেশে অতি প্রাচীন কালে বৈদিক ক্রিয়াকলাপময় ধর্মের নবজীবনী শক্তিরূপে জনক-যাজ্ঞবল্ক-সংবাদে, উপনিষদেব প্রথম উৎপত্তি; যে প্রদেশে জিন মহাবীর এবং ভগবান বুদ্ধদেব, প্রাচীন নিগড় ভাঙ্গিয়া মুক্তিব নব মন্ত্র দান করিয়াছিলেন; সেই অবাধ স্বাধীনতাব ক্ষেত্রেই নবগোড়ী

রীতিতে নব-সাহিত্যের অভ্যুদয়। বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে তৈলঙ্গের প্রভাবে উৎকল সাহিত্য, এবং বক্ষণশীল মধ্যদেশের প্রভাবে মিথিলাব সাহিত্য, নবলব্ধ স্বাধীনতা বক্ষণ কবিত্তে পারিল না; জয়দেবের প্রভাব পাইয়াও হারাইয়া ফেলিল। কিন্তু যাহাবা গোড়, মিথিলা এবং মগধ হইতে আসিয়া দ্রবিড়জাতিপরিপ্লুত বঙ্গদেশটিকে সুসভ্য করিয়াছিলেন, এবং দেশটিকে যাহারা যথার্থই দেশ-সংজ্ঞা-বাচ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা কদাচ জাতিনিষ্ঠ স্বাধীনতা পবিত্যাগ কবেন নাই। ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া বঙ্গের দায়ভাগ সমগ্র ভারতবর্ষের স্বতির ব্যবস্থা নূতনভাবে গড়িয়া লইয়াছিল। চিন্তার স্বাধীনতায় সেকালে একালে বঙ্গদেশের একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের মূল যে ঐতিহাসিক অবস্থায়, এখানে সম্যকরূপে তাহার আলোচনা হইতে পাবে না; কেবল সাহিত্যের হিসাবে একটা দিক দেখাইবার চেষ্টা করিলাম।

জয়দেব এবং চণ্ডীদাসের দেশে, কাব্য কখনো একটা নির্দিষ্ট প্রকার নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া মলিন হয় নাই। জয়দেব, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভাবতচন্দ্র, দাশবতী, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; পবে পরে দেখিয়া যাও, বাঙ্গলা সাহিত্য, ছন্দে, আখ্যানবস্তুতে এবং ভাবে, ক্রমাগতই নূতন পথে চলিয়াছে। কোন পরবর্ত্তী কবি পূর্ববর্ত্তী কবি অপেক্ষা নিকৃষ্ট রচনা করিতে পারেন, কিন্তু নূতনত্ব সকলেবই বিশেষত্ব আছে। যে কয়েকজন কবির নাম কবিলাম, ইহঁরা কেহই ইংরাজি প্রকার প্রভাবে কবিতা লেখেন নাই।

দেশব্যাপী পবাবীনতার দিনে মহারাষ্ট্রে নব রাষ্ট্র-নীতির অভ্যুদয় হইয়াছে, পঞ্জাব সামবিক দক্ষতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে উত্তরোত্তর কেবল কাব্য চর্চাতেই নূতনত্ব বিকশিত হইয়াছে। সকলেই হয় ত একালে সামবিক গৌরবের পক্ষপাতী; কাজেই তাঁহারা ইহা বাঙ্গালার কলঙ্ক বলিয়া ঘোষণা কবিতেন। কলঙ্কের কথা হউক, অধ্যাত্তির কথা হউক, কিন্তু ইহাই যে বঙ্গের বিশেষত্ব তাহা বলিতেই হইবে। সাধারণ লোকের উপভোগের জন্য অতি প্রাচীন কালে যে শ্রেণীব যাত্রা অভিনয় ছিল, লোক বিশেষের জন্য যে শ্রেণীব কথকথা ছিল, মহাবাহুঁ এবং উত্তর-

পশ্চিমে আজিও তাহাই সেই প্রাচীন অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার যাত্রা, বাঙ্গালার ঢপ, বাঙ্গালার পাঁচালী, বাঙ্গালার কথকতা, একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালা। নিম্নশ্রেণীব দ্রবিড় জাতির “ডাল খাই” এবং “তর্জা লড়াই” এখনো সম্বলপুৰ অঞ্চলে দূব পল্লীতে কষ্টে প্রাণধারণ করিতেছে; কিন্তু উহাই একটুখানি (বড় বেশি নয়,) বিশুদ্ধ কবিতা লইয়া বাঙ্গালায় একদিন কবির গানের নূতন স্রষ্টা হইয়াছিল। কাব্যের জিনিস—আমোদের জিনিস, বাঙ্গালী কখনো ফেলিয়া দিতে জানে না।

(২) বাঙ্গালার আব একটা বিশেষত্বের কথা বলিব; সেটা কাব্যো হাস্যরস। সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রহসন এবং ভাণ ভিন্ন অল্প কাব্যো হাস্যরসের অবতারণা অধিক নাই। বাঙ্গালা ভিন্ন অল্প কোন দেশের প্রাকৃত সাহিত্যে (হয়ত দেশনিষ্ঠ গান্ধীর্থের ফলে) হাস্যরসের মাধুর্য্য দেখিতে পাই না। মহাটি নাটক শারদায় যে শ্রেণীর হাস্যরসের অবতারণা আছে গুজরাটি সাহিত্যেও তাহা পাই, কিন্তু বাঙ্গালার হাসি-বৈচিত্র্য বঙ্গের নিজস্ব। বাঙ্গালায় বাবত্বের আদর আছে কিনা পাঠকেবা জানেন, কিন্তু বাঙ্গালী যদি দেখে যে কোন ব্যক্তির হাস্যরস-অনুভূতির ক্ষমতা অল্প, অমনি তাহাকে কাট-খোঁট্টা বলিয়া গালি দেয়। কত ছুঃখ কষ্টের ঝড় মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তবু আমরা হাসিতে ভুলি নাই। তাই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই লিখিয়াছেন, “এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গভরা।” ধর্ম্মের মহিমা প্রচারের জন্য লিখিত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলের বারই পাড়াতেও এ বঙ্গের অভাব নাই। কচিব কথা লইয়া যদি তর্ক না করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার কবিত্তে হইবে, যে ভারত চন্দ্র বর্ণিত, নারীগণের পতিনিন্দায় যে হাস্যরসের প্রাচুর্য্য, অল্প কোন তৎসাময়িক প্রাদেশিক সাহিত্যে তাহা নাই। আকবরের সময়ে হিন্দি সাহিত্যে হাসির আমদানি হইয়াছিল বটে; কিন্তু সে হাসি লালিকায় (Parody,) এবং কথায় উত্তর চাপানে (Pun) বদ্ধ ছিল। যে সভায় পৃথ্বীরাজ ও তানসেন বাদসাহের প্রশস্তি বচনা কবিতেন, সে সভায় রসিকতা যে ভাঁড়ামিঁকে দাঁড়াইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি? (১)

(১) ষোড়শ স্মৃতি আকবরের সভায় তানসেন গোড় ব্রাহ্মণ ছিলেন; একথা ইতিহাসে ও ঐতিহ্যে স্বীকৃত। কিন্তু সঙ্গীতাচার্য্যের

সরস, স্বাধীন, গালভরা হাসি, বাঙ্গালা সাহিত্যেই পাই। দাণ্ডারায় এবং ঈশ্বর গুপ্তের হাসিতে, একালের স্মৃতিসম্পদের বাও মুগ্ধ। মাংসপাণ্ড বাড়াইয়া বাঙ্গালী মোটা তাক্সা বীব হইতে পারিবে কি না, কংগ্রেস সভায় তাহার বিচার হউক। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, যে বাঙ্গালী যদি চুধে ভাতে থাকে, তবে তাহার কার্য্যামুবাগ এবং গালভরা হাসি, বজায় থাকিবে, এবং স্বদেশ বিদেশের লোক খুসি হইয়া বলিবে—চোখের জল ফেলিয়া বলিবে—“এত ভদ্র বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।”

(৩) শ্রীযুক্ত বোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মধুসূদনের জীবনচবিতের সমালোচনায় একালের প্রকৃতি এবং বিশেষ-ত্বের কথা দক্ষতার সহিত লিখিয়াছেন। পাঠকদিগকে তাহা পড়িতে অনুরোধ করি। সে বিষয়ে অল্প দুচারটি কথা বলিব। বঙ্গসাহিত্যের সেকাল ও একালের সন্ধিস্থলে, দাশবণি রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, যাহা অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যের বিষয় নহে বলিয়া উক্ত আছে, তাহা লইয়াও কবিতা লিখিয়াছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকেবাও, দাণ্ডারায়ের ‘চারি ঈয়ারি’ সম্বোধন করিতেন, এবং গুপ্ত কবি “এণ্ডাওয়াল্লা তপসী মাছ” প্রলোভনের সামগ্রী মনে করিতেন।

কবি মধুসূদনের সময় হইতে যখন বঙ্গসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে ইংবেজি শিক্ষিতদেব নেতৃত্বে চালিত হইতে লাগিল, যখন (উৎশৃঙ্খল হইলেও) নববিধ স্বাধীন ভাবের আঘাতে সমাজে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইল, তখন সংস্কৃতজ্ঞ কবিও বাসবদত্তার সৌন্দর্য্য ভুলিয়া, প্রকৃতির দিকে চাহিয়া ‘পাখীসব করে বব’ লিখিলেন। এখানেও একটা কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না; ভারতের সকল প্রদেশেই ইংরাজী শিক্ষা ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং হইতেছে; কিন্তু কোথায়ও ভাবার প্রকৃতির সহিত মিলা-ইয়া, কোন কবি, বঙ্গের মধুসূদনের মত ইউরোপীয় ছাঁচে

অমিত্রাক্ষর রচনা করিয়া, কাব্যবিকাশের নব-পন্থা বাহির করেন নাই।

(৪) একালের বঙ্গসাহিত্যের চালক ইংবেজী শিক্ষি-তেরা; একথায় অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু কথটা কি সত্য নয়? ইংরেজী আমলের বিশেষ ব্যবস্থায়, ইংবেজী শিক্ষা ভিন্ন গতি নাই; নহিলে অন্নসংস্থান হয় না, মানসম্মত বজায় থাকে না। সম্পদ এবং সম্মতের জন্ত কে না লালামিত? কাজেই যাহাদের কিছুমাত্র সুবিধা আছে, তাহারা সকলেই ইংরেজী বিদ্যালয়ে ছাত্র। যাহা-দেব বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে, বিজ্ঞার অনুরাগ আছে তাহা-যখন প্রধানতঃ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল, তখন সংস্কৃত টোলের জন্ত যাহা-বাকি বহিয়া গেলেন, তাহাদের মধ্যে সবস্বতী-ব ববপুত্র হইবার ক্ষমতা কল্পনের রহিল? যাহা-ব বুদ্ধিবলে শ্রেষ্ঠ, সম্পদে পুষ্ট, এবং পদমর্যাদায় জ্যেষ্ঠ, তাহারা লকারার্থ নির্ণয়ে বিশেষ পটু না হইলেও, সমাজেব নেতা এবং সাহিত্যের চালক হইলেন। স্বাভাবিকতাকে কেহ উল্টাইয়া দিতে পারে না। সমাজে যাহাদের পদ-মর্যাদা অধিক ছিল, তাহা-বা আদর করিতেন বলিয়াই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা আদৃত হইতেন। ঘঘর সভায় কোঁস হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি লঘু সভায় কুৎসিৎ পণ্ডিত পর্য্যন্ত, সকলের পক্ষেই একই ব্যবস্থা। যে অবস্থায় আজিকালি পদমর্যাদা বাড়ে, তাহা ইউরোপ-প্রত্যাগত-দিগেব অধিক। তাহা ছাড়াও একালে যাহারা ইংরাজি শিক্ষার ফলে পদমর্যাদা লাভ করেন, টোলের হিসাবে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অনাচার-দুষ্ট। এই উচ্চপদস্থেরা একালের স্বতির ব্যবস্থাদাতাদিগকে বিভ্রাবুদ্ধি বা বহুদর্শিতায় বড় মনে করেন না বলিয়া, আদর পাইবার যথার্থ স্থান হইতে পণ্ডিতদের আদর চলিয়া গিয়াছে।

মুখে যিনি যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ সকলেই ইংরেজিওয়ালার দিগকেই নেতা বলিয়া মানিয়া চলেন। রাষ্ট্রসমস্তায় সুরেন্দ্র নাথ প্রমুখ হিতৈষিবর্গের, বিচারালয়ে রাসবিহারী প্রভৃতি সুধীগণেব ব্যবস্থা উপেক্ষা করিয়া, কাহারো পক্ষে আব নবদ্বীপ ভাটপাড়ায় যাওয়া চলে না। যে কারণেই যাহা হউক, ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাই দেখাইতেছি। একালের শিক্ষার যাহারা কৃত্তী হইয়াছেন, সমাজের অগ্রবিধ

বাসস্থান কোথায় ছিল জানা যায় না। গোয়ালিয়রে সঙ্গীত শিক্ষা করার পর, মহম্মদ গোস্বামীর সংসর্গে ইনি পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। উহার যথার্থ নাম জুগু না হইলে, নামের প্রকৃতি হইতেও বাসস্থান অনুসন্ধানের সুবিধা হইতে পারিত; কারণ আকবরের সময়ে প্রাদেশিকতায় নামের বিশেষত্ব জন্মিয়াছিল। গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী বলিলে উত্তর-পশ্চিমের লোক বুঝার না, কি বৈজ্ঞানিক পাণ্ডে ব. বাঙ্গালী হয় না।

অবস্থা থাকিলেও, এই শ্রেণীর বুদ্ধিমানবাই, আত্মগুণে যশস্বী হইতেন। ক্ষমতা ও বিজ্ঞা অর্জনের সুবিধা লইয়া যাহাবা জন্মগ্রহণ করেন, কোন কালের সমাজেই তাঁহাদের নেতৃত্ব অস্বীকৃত হইতে পারে না।

নূতন শ্রেণীর বঙ্গসাহিত্য বিকাশের প্রথম দিনে, শ্রব্য-কাব্যের মধ্যে পঞ্চকাব্যে মধুসূদন, ও গল্পকাব্যে বঙ্কিমচন্দ্র, এবং দৃশ্যকাব্যে দীনবন্ধু, বেরূপে বিদেশীয় নূতন নূতন ভাব, স্বদেশের সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়া সাহিত্যে নব জীবন দান করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকট ঋণী। ইচ্ছা করিয়া ‘সমগ্র ভাবতবর্ষ’ কথাটা ব্যবহাব করিয়াছি। কেননা বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু গ্রন্থেব মর্হাট্ট ও গুজরাটী অনুবাদেব পব হইতেই, ঐ সকল দেশে ইংরেজি ধরনেব নূতন সাহিত্য বচিত হইতে দেখিতেছি। একালে সর্বত্রই সমান ভাবে ইংবেজি চর্চা চলিতেছে বটে, কিন্তু বিদেশের জিনিষ দেশেব মত করিয়া লইবার নূতনদৃষ্টকু বঙ্গদেশে বেশি দেখিতে পাই। অলঙ্কার শাস্ত্রেব লক্ষণ ধরিয়া, মেঘনাদবধ বা কৃষ্ণকান্তের উইলেব কাব্যস্থ নিরূপিত হয় না। পঞ্চসন্ধিনাময়িত না হইলেও, নীলদর্পণখানি “অক্ষ”(১) শ্রেণীস্থ একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক।

(৫) যাহাদের লেখাপড়া শিশুবার ক্ষমতা আছে, তাহাবাই ইংবাজী পড়ে; যাহারা শিক্ষিত এবং বহুদর্শী তাহাবাই দেশেব নেতা হয়েন। ইংবাজি-শিক্ষিতাবা বঙ্গসাহিত্যের নেতা হওয়াতে একালের সাহিত্য কি উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই? ইউরোপেব সভ্যতাকে যাহারা স্নেহ ববনেব হয় সভ্যতা বলিয়া দস্ত প্রকাশ করেন, এবং ইউরোপেব কাব্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি ফুৎকাবে উড়াইতে চাহেন, তাহারা বীর হইতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধিমান নহেন। যাহা স্বস্ত এবং পথ্য, তাহা ভাবতবর্ষের একচেটিয়া নহে। সৌন্দর্য্য অনুভূতিতে, মানবচবিত্র বিশ্লেষণে এবং ভাবের অভিব্যক্তিতে ইউরোপের যে নূতনত্ব এবং বিশেষত্ব আছে ইউরোপীয় শিক্ষাব ফলে তাহার প্রভাব কি আমাদের সাহিত্যের উপব বাঞ্ছনীয় নয়? যাহা স্নন্দব,

যাহা মধুব, যাহা জীবনপ্রদ, তাহা সকল জাতিব পক্ষেই কল্যাণকব বলিয়া গ্রহণীয়। কোন জাতিবই জীবনীশক্তি জাতি সংবর্ধণ এবং জাতি সংমিশ্রণ ভিন্ন বর্দ্ধিত হইতে পারে না; সমাজতত্ত্বেব এই অতি ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তটি আমবা ভুলিব কেন? উদ্ভবনৌশক্তি এবং চিন্তার সর্বতোমুখ গতি, কোন জাতিতেই বহুদিন স্থায়ী হয় না; ক্ষয় এবং অবনতিব দিনে নবজাতি সংবর্ধণই উহার পুনরুদ্ধারপনের উপায়।

হন জাতিব সংবর্ধণ এবং সংমিশ্রণেব পর, এবং চালুক্যাদি গুর্জব জাতিব অভ্যুদয়ের পর, যখন ভাবতবর্ষ কেবল আপনাতেই অবস্থিতি কবিতে লাগিল, তখন হইতেই ভাবতবর্ষ অবনতিব আরম্ভ। ভারতের আর্থ্যজাতিব জীবনী শক্তি বহুসহস্রবৎসরব্যাপী জীলাব পব যখন ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হইল, তখনকাব সাহিত্যে কেবল চর্কিতচর্কণ; কিছুমাত্র নূতনত্ব নাই। হস্তীব নাম কবিতে গিয়াই মদস্রাবেব বর্ণনা, রমণীর মুখেব কথা বলিবাব পূর্বেই চন্দ্রেব উপর অত্যাচাব, এই পতিত যুগের কবিতার অবলম্বন। বিরহের বর্ণনার যখন কোকিলেব নামে ২৭টি এবং মলয় সমীরণের নামে ২১টি কবিতা পড়া যায়, তখন দময়ন্তী অপেক্ষা পাঠকেব কষ্ট অধিক হইয়া উঠে।

(৬) একথাও স্বীকাব করিতে হইবে, যে যখন ইংরেজি-শিক্ষিতের হাতে সাহিত্যের ভাব পড়িল, তখন এ দেশেব প্রাচীনতার মধ্যে, যাহা স্নন্দর এবং জীবনপ্রদ ছিল, তাহা অনেক পৰিমাণে উপেক্ষিত হইতেছিল, এখনো সে দোষ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই; কিন্তু কাল-বশে হইবে, এরূপ আশা আছে। খাঁটি বিলাতি ধরণে এবং বিলাতি দৃষ্টান্তের বাহুল্যে বঙ্গ-সাহিত্য রচিত হইলে, বিলাতি অভিধানের সাহায্য ভিন্ন, তাহাব অর্থবোধ হইতে পারে না; এবং ঐ অভিধানের তিবোধানের সঙ্গেই ঐ প্রকারের সাহিত্য হ্রস্বোধ্য এবং অগ্রাহ হইয়া পড়িবে। কিন্তু এরূপ কোন রচনা, এদেশে প্রসিদ্ধি লাভ কবে নাই।

যাহাবা এখন নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতচর্চা লইয়া আছেন, তাহাদের মধ্যে মানসিকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিব এখনো অভাব না থাকিতে পারে। কিন্তু সমষ্টি লইয়া তুলনা কবিলে, অন্যায়সে বলিতে পারি, যে মানসিকশক্তিসম্পন্নবাই ইংবাজি শিক্ষায় শিক্ষিত; এবং একালের অবস্থায় ফলে

(১) অন্ধের প্রধান লক্ষণগুলি এই :—(ক) নেতাব: প্রাকৃতনরাঃ, (খ) রসোহত্র করুণঃ স্থায়ী, (গ) বহুস্ত্রী-পরিদেবিতঃ; (ঘ) প্রখণ্ডমিত্তিবৃত্তক, (ঙ) কবি-বুদ্ধ্য প্রপঞ্চবেৎ।

তাহাবাই বহুদর্শিতা এবং বুদ্ধিব বিকাশ বেশি লাভ করিতে-
ছেন। এরূপ স্থলে যখন সাহিত্যসেবক ইংরেজি-শিক্ষিতেরা
প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেছেন,
তখন নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে প্রাচীন ভাষা-জ্ঞানের
গৌরবটুকুও একালের শিক্ষিতেবা অপহরণ কবিবেন।
পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চলে, ভাউদাজি, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি,
টোলেব গৌরব আশ্রয় কবিযাছেন; অচিরে বঙ্গও সেই
ফল ফলিবে।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না; কাল-ধর্ম্যে
যাহা হইতেছে, তাহাই লিখিতেছি। কেবল মাত্র সংস্কৃত
জ্ঞানের ফলে যে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কোন নূতনত্বের বিকাশ
নাই, এবং টোলেব-পণ্ডিতের সমালোচনায় যে তীক্ষ্ণতা,
গভীরতা, বা সর্বদেশদর্শিতা নাই, তাহা অস্বীকার করিতে
পারা যায় না। একালের জ্ঞানের সহিত ইহাদের কিছুমাত্র
সম্পর্ক নাই; অথচ ধর্ম্যত্বের ব্যাখ্যায় নিতান্ত না বুঝিয়াই
বৈজ্ঞানিক শক্তি লইয়া থেলা কবিতো চাহেন। কাজেই,
একালের শিক্ষিতদের নিকটে উঁহারা “হিং টিং ছট্” বলিয়া
পদে পদে উপহাসসম্পদ মাত্র হইতেছেন। সকল বিষয়ের
নেতৃত্ব হারািয়া, যে মোক্ষশাস্ত্র লইয়াছিলেন, তাহাতেও
ঐরূপ ব্যাখ্যার ফলে, কেবল অভক্তি এবং হাসির বৃষ্টি
হইতেছে। “গীতার একটি অধ্যায়ের মধ্যেই” সব আছে,
মনে কবিয়া, বিশ্বনাথের বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের প্রকাশ অগ্রাহ্য
করা চলেন।

ছাচরি জন বুদ্ধিমান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, পালি নামে খ্যাত
প্রাচীন প্রাকৃত-সাহিত্যের আলোচনা করিতেছেন দেখিয়া
সুখী হইয়াছি। আশা কবি উত্তবোত্তর ইহাদের সংখ্যা
বর্ধিবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বৈদিক ধর্ম ।

[জি-মে লাক্টোর ফরাসী হইতে]

বৈদিক যুগ—দিগবিজয়ের যুগ; এই যুগে, আর্যেরা
সিন্ধুনদের প্রদেশে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণাভিমুখে ক্রমশঃ
অগ্রসর হইয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত যাত্রা কবে।

আর্য্য বংশের প্রথম দলেবা, স্বকীয় জন্মভূমি বাক্ত্রিয়ানা
(বাখ্লিক) ছাড়িয়া, সিন্ধুনদ পার হইয়া, যখন এই বিশাল
ভাবত-প্রায়দ্বীপ জয় করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহারা
এই দেশের ভূম্যধিকারী অধিবাসীদিগের সংস্রবে আসিল।
এই আদিম অধিবাসীদিগের নাম দস্য্য। ঋগ্বেদের মতে,
এই দস্য্যগণ,—বৃষ-মুখ, নাসিকাহীন, হৃষ্বাহ বলিয়া
বর্ণিত হইয়াছে; আর্য্যেরা উহাদিগকে ক্রব্যাদ নামে
অভিহিত করিত; ক্রব্যাদেব অর্থ—মাংসভোজী রাক্ষস।
আর্য্যেরা মাংস স্পর্শ করিত না। এই সকল বর্ষেরেরা
কোন দেবতা মানিত না, তাহাদের কোন ধর্ম ছিল না।
ইহারা কোন্ জাতীয় লোক?—বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহাব
উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। বেদে উহাদের যেরূপ বর্ণনা
আছে, তাহাতে পীতজাতির সহিত অনেকটা মিল হয়।
এই অল্পমানেব ভিত্তি—উহাদের দৈহিক প্রকৃতি। দস্য্যদেব
রং ছিল কালো; উহাদের চর্ম্ম রোমশ ছিল না—যাহা
আর্য্যদেব একটা বিশেষ লক্ষণ; উহাদের নাক ছিল
চ্যাপটা। দস্য্যদেব কোন ধর্ম ছিল না; ইহাও একটা
বিশেষ লক্ষণ বলিতে হইবে; এই লক্ষণটি পীতজাতির
সহিত মেলে; পৃথিবীতে যতপ্রকার মানবজাতি আছে,
তন্মধ্যে একমাত্র পীতজাতির মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে
কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। কংক্ষুব ধর্ম্ম ও লাও-
ৎসুয় ধর্ম্ম—নীতি ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম—
যাহা নিরীশ্বর ধর্ম্ম—উহাই পীতজাতির অধিকাংশ লোক
পরে অবলম্বন করে।

বেদে দেখা যায়,—দস্য্যদের মধ্যে কতকটা ভৌতিক
সভ্যতাও বিদ্যমান ছিল। এই বিষয়েও পীতজাতির সহিত
একটু মিল আছে। পীতজাতীয় লোকেরা খুব কেজো,
উহাদের সভ্যতা, নবোদ্ভাবিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর
উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রথম প্রথম আর্য্যেরা, যাহাদেরই
সংস্রবে আসিত তাহাদের সকলকেই নির্বিশেষে দস্য্য বলিয়া
অভিহিত করিত। পরে তাহারা জানিতে পারিল যে দুই
প্রকার দস্য্য আছে; এক—পার্বত্য দস্য্য, আব এক
মধ্য-দেশের দস্য্য; প্রথমোক্ত দস্য্যবা কৃষ্ণবর্ণ, ও
দ্বিতীয়োক্ত দস্য্যবা পীতবর্ণ।

“দস্য্যগণ কৃষ্ণবর্ণ, বস্ত্র, ভীষণ হিংস্র, পর্ব্বতের মধ্যে

প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থিতি করে, মানুষ অপেক্ষা বানরেরই সহিত উহাদের বেশী সাদৃশ্য, উহাবা সমস্ত দাক্ষিণাত্যে পরিব্যাপ্ত—বিদ্যাচলে উহারা ‘পিল পিল’ কবিতেছে বলিলেও হয়।—Marians Fontane তাঁহাব “বৈদিক ভারত” গ্রন্থে উহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা কবিয়াছেন। অতএব, আর্থোবা যে এই দুই জাতি অপেক্ষা আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি।...

এই আর্থ্য কাহার? কোথা হইতে উহারা আসিল? Burnouf তাঁহাব প্রথ্যাত বেদ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে এইরূপ বলেন :—“আর্থ্য শব্দ, চিরকালই ভারতবর্ষে, “শ্রেষ্ঠ”—এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জার্মান শব্দ Ehre, যাহা পুরাতন জার্মান ভাষায় Ere—এইরূপ লিখিত হইত, উহা বোধ হয় এই আর্থ্য শব্দেরই রূপান্তর এবং উহা একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদিম জার্মান শব্দ Ermann—জার্মান বীরের নাম—যাহাকে রূপান্তর করিয়া বোমকেরা Arminius বলিত, তাহাও বোধ হয় আর্থ্য শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। যুরোপের পুরাতন ও আধুনিক আরও অনেক শব্দের মধ্যে এই আর্থ্য শব্দের ছায়া লক্ষিত হয়; পাশ্চাত্য এসিয়ায় যে সকল শ্বেতবর্ণের লোক সেমিটিক্ নহে তাহাদেরই জাতিবাচক সাধারণ নাম—আর্থ্য। বিভিন্ন দেশেব ও বিভিন্ন আকারের এই আর্থ্য নাম, ঐ সকল দেশের লোকের আপনাদেরই দেওয়া; অতএব দেশবাসীদিগের অপেক্ষা উহারা যে শ্রেষ্ঠ ইহাই ঐ শব্দের দ্বারা স্থচিত হয়। প্রাচ্যবর্ণের পীতজাতিদিগের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব আর্থ্যদিগেরই যে শুধু নিঃসম্পর্কতা তাহা নহে, ইন্দ-ইরোপীয় অন্তজাতিরাও ঐ পীতজাতিদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারে। মূলে, আমাদের পূর্বপুরুষ ও দক্ষিণ-পূর্ব আর্থ্যদের পূর্বপুরুষ একই।”

যে জাতি, সগর্বে আপনাদিগকে “আর্থ্য” বলিত, “বিশুদ্ধ” বলিত, “আলোকের গুরুবর্ণ হুহিতার” বংশধর বলিত, তাহাদের কতকগুলি বিশেষ দৈহিক লক্ষণ ছিল :—তাহাদের ফর্সা রং, তাহাদের কেশ ও শ্রবণ সূক্ষ্ম, তাহাদের গাত্র কোমল রোমে আচ্ছন্ন, তাহাদের নাসিকা সরল (সুশিপ্র), তাহাদের দেহখণ্ড পাতলা। পামিবেব উচ্চ ভূমি হইতে বহির্গত হইয়া তাহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

তাহাদের সম্বলের মধ্যে ছিল কতকগুলি সাধারণ বিশ্বাস ও ধর্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ সাংকেতিক সামগ্রী। এই স্বল্প পুঞ্জি লইয়াই তাহাবা চতুর্দিকে সভ্যতা বিস্তার কবিতো প্রবৃত্ত হয়। সেরূপ উন্নত সভ্যতা আর কোন জাতি কর্তৃক কোনও কালে প্রবর্তিত হয় নাই।

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে,—ভাবতবর্ষে, এই আর্থ্যরাই ব্রাহ্মণিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। উহাদের বিপুল দার্শনিক ও সাহিত্যিক কীর্তি;—যে দর্শন ও সাহিত্যের সৃষ্টি গ্রীষ ছাড়া আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। পূর্বাঞ্চলে, ইবানী আর্থ্যরাই পারস্ত-রাজ্যের সংস্থাপক। দক্ষিণে, গ্রীষ ও ইটালী দেশেব আদিম আর্থ্যরা (Pelasges) গ্রীক ও ল্যাটিন সভ্যতা প্রবর্তিত কবে; এবং আর্থ্যদের শেষ শাখা-গুলি, উত্তরে গিয়া—পাশ্চাত্যবর্ণে গিয়া—সপ্তসিদ্ধির আর্থ্যদের প্রায় দুই তিন সহস্র কিংবা ততোধিক বৎসর পরে, আবার আপনাদের মধ্যে একটা নূতন সভ্যতা গড়িয়া তোলে।

অতএব সপ্তসিদ্ধির দেশেই, আমাদের আর্থ্যশাখাব প্রবর্তিত সভ্যতা, সর্বপ্রথমে বিকশিত হইয়া উঠে; যে মহতী কীর্তির উপব এই সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত তাহা—বেদ। এই বেদ—বৈদিক ভাষায় লিখিত ধর্মসম্বন্ধীয় সমূহের সংগ্রহ মাত্র। এই বৈদিক ভাষা হইতেই সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি। বেদ শব্দের অর্থ—বিজ্ঞান, ইহাই আর্থ্যদিগের পবিত্র গ্রন্থ। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—এই চারি বেদ।

ঋগ্বেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা পূজ্য; আর তিনটি উহা হইতেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। আমাদের আর্থ্যশাখাব উহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কীর্তি। বুনুফ্ (Burnouf) অনুমান করেন, ন্যূনকল্পে খৃষ্টাব্দের ১৭০০ বৎসর পূর্বে বেদ রচিত হয়, কিন্তু কিংবদন্তী উহাকে আরও পুরাতন বলিয়া প্রতিপন্ন করে; ঋগ্বেদের সমস্ত মন্ত্র হইতে ইহা সহজেই সপ্রমাণ হইতে পারে, কেন না ঐ সকল মন্ত্রে ঋগ্বেদগায়িতাদের পূর্বপুরুষের নাম অবিরত কীর্তিত হইয়াছে।

“এসিয়াটিক বিসার্চ” গ্রন্থের বিবিধ স্থানে, কোলকট্ বেদের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহচিত্তে প্রতিপাদন করিয়াছেন :—“বেদগ্রন্থের যে সকল বচন এখন পাওয়া

গিয়াছে, উহার প্রামাণিকতা আমি সমর্থন করি—এই বেদগ্রন্থ প্রামাণিক ; অর্থাৎ সহস্র সহস্র বৎসর না হউক, অন্ততঃ শত শত বৎসর ধরিয়া—এই সকল গ্রন্থ, এই সকল বচন, বেদ নামেই হিন্দুগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া আসিতেছে । সম্ভবত এই বেদগ্রন্থ দ্বৈপায়ন কর্তৃক সংকলিত হয়, তাই দ্বৈপায়নের নাম ব্যাস অর্থাৎ সংগ্রহকর্তা ।”

কোনক্রমে বৈদিক জ্যোতিষ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেনঃ—“যৎকালে বেদ-ব্যবহৃত পঞ্জিকার নিয়ম সকল স্থিবিহীন হইয়াছিল, তখন প্রথম অন্নান্ত, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আবস্তভাগে ও দ্বিতীয় অন্নান্ত অশ্লেষা নক্ষত্রের আরম্ভভাগে অবস্থিত ছিল এইরূপ গণনা কবা হয় ; অতএব খৃষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্বে, দিগ্ বিভাগের এইরূপ অবস্থান ছিল । ইতঃপূর্বে বেদের একটা বচন হইতে আমি দেখাইয়াছিলাম যে, মাস-পর্যায়ের সহিত ঋতুপর্যায়ের সম্পূর্ণ মিল আছে এবং জ্যোতিষ হইতে উদ্ধৃত একটা বচন হইতেও দেখা যায়, দিগ্-বিভাগের সহিতও উহার মিল আছে ।” সাহিত্যিক

দৃষ্টিতে দেখিলে,—ঋগ্বেদের কবিতাগুলি, বাহ্য প্রকৃতি কিংবা আর্ধ্যদিগের দৈনন্দিন জীবন হইতে গৃহীত । কিন্তু ঐ সকল বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে, বাস্তব বিশ্বের পাশা-পাশি, যেন একটা রূপক-কল্পনায় জগৎ অধিষ্ঠিত । মন্ত্রগুলি যেখানে গীত হইত সেই সকল স্থানের ভৌগোলিক বর্ণনা, নৈসর্গিক ঘটনা, শত্রু লোকের মধ্য দিয়া আর্ধ্যদের যাত্রা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ ও গোব দিব্য কথ্য, ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রত্যেক খুঁটিনাটি—এই সমস্ত বিষয় ঋগ্বেদের মধ্যে আছে । ঋগ্বেদ হইতে আমরা আরও জানিতে পাই,—আর্য্যোবা তখন পিতৃশাসন তন্ত্রের নিয়মানুসারে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিত,—তাহারা পৃথক্ ভাবে একএকটা পবিবারের মধ্যে বাস করিত ; তাহারা কোন নগর নির্মাণ করিত না ; যখন বিপদ-আপদ উপস্থিত হইত তখন তাহারা সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়া সাধারণ শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত । পিতাই তাহাদের গৃহ-কর্তা, ও মাতাই তাহাদের গৃহ-কর্ত্রী ছিলেন । তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল না । বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সে যুগেও বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা গম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাব

ছিল । বর্ণভেদ প্রথা আদৌ ছিল না । মোটের উপর,—ঐ যুগের আর্ধ্য-ব্যবস্থাবলী আমাদের মধ্যযুগের সামন্ত-তন্ত্রের অনুরূপ ছিল । পুরোহিত-সম্প্রদায় মোটেই ছিল না ; তখন পুরোহিতের আধিপত্য ও পিতাব প্রভুত্ব একত্র মিশ্রিত ছিল,—কেননা, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে কোন গুরুত্ব ছিল না, সমস্ত অনুষ্ঠান প্রকাশ্যভাবে হইত । এবং তখন মন্ত্র সমূহের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব পবিবাবের মধ্যে বংশানুক্রমে প্রবাহিত হইত ; পিতাই নিজ সন্তানের উপদেষ্টা ও দীক্ষাগুরু ছিলেন ।

তখন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও খুব সাদাসিধা ছিল : কোন দেবালয় ছিল না, কোন অনাবৃত স্থানে, শুধু এক-একটা ঘাসের চাপড়ায় যজ্ঞবেদী নির্মিত হইত, দুই কাঠ খণ্ডের সংঘর্ষণে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত ; উহাতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইত ; পবে যখন আগুন জলিয়া উঠিত, পুরোহিত দেবতাদের উদ্দেশে নৈবেদ্যরূপ মোদক-আদি মিষ্টান্ন ও সোমলতা অর্পণ করিত এবং পুরোহিতের সহকারীরা বেদমন্ত্র গান করিত । এই সাদাসিধা অনুষ্ঠান, দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া হইত : উষাকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সূর্যাস্তকালে । অনেক দিন পর্য্যন্ত, যুগোপায়ী পণ্ডিতেরা বেদমন্ত্রের মধ্যে প্রাকৃতিক ধর্ম্মতত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই ;—অর্থাৎ, তাহারা বলিতেন,—প্রাকৃতিক শক্তিদিগকে আহবান কবা ঐ সকল মন্ত্রের একমাত্র কাজ ; এক কথায়, উহা বহুদেব-বাদাত্মক ধর্ম্ম ; এই ধর্ম্মানুসারে আগুনের নামে অগ্নিদেবকে, আকাশের নামে ইন্দ্রদেবকে, সূর্য্যের নামে সূর্য্যদেবকে, জলের নামে বরুণ দেবকে উপাসনা কবা হইত—সমস্ত মহাভূত ও সমস্ত আন্তরীক্ষিক ব্যাপাবই—বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্ভূত দেব-মণ্ডলী । বৈদিক ধর্ম্মের আদি-যুগে, খুব সম্ভব, আর্য্যোবা বহুদেব-বাদী ছিল ; যাই হোক্ বহুদেব-বাদ ও মহাভূতের উপাসনা—এই দুয়ের মধ্যে অনেকটা ব্যবধান আছে । স্বকীয় দেবপূজার প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে আর্ধ্যদের একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল ; তাহাদের নিকট, বেদমন্ত্র প্রার্থনা বই আর কিছুই নহে । Burnouf বলেন :—“মনে হয়, তাহাদের বিশ্বাস ছিল তাহাদের যে সকল প্রার্থনা মন্ত্রাকাষে জন্ম হইতে নিঃসৃত হয়, উহা যে শুধু পরিবর্তন-

শীল বায়ু ও বৃষ্টির উপর প্রভাব প্রকটিত করে তাহা নহে, পরন্তু উহা অধিকতর সুব্যবস্থিত ও অধিকতর স্থায়ী প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহেরও অমুখ্যঙ্গী ও সেই সকল ব্যাপারকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।” ঋগ্বেদের (Rogation) পার্থিব গুণসম্পদের জন্য প্রার্থনা, ঐ একই বিশ্বাস হইতে কি উৎপন্ন নহে ?

বামদেবের বচিত মস্ত্রে আমবা দেখিতে পাই :—“কর্শু-কাব যেমন লোহকে গড়িয়া তোলে, সেইরূপ আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেবতাদের গড়িয়া তুলিয়াছেন।” অতএব বৈদিক মন্ত্রকাবেরা স্পষ্টই বলিতেছেন যে তাঁহারা নিজেই দেবতাদের স্রষ্টা, স্বভাবাং মন্ত্র ব্যতীত দেবতাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ইহা প্রকৃতিবাস্তবের স্বীকার কবা হয় যে, তাঁহারা দেবতাদিগকে বিশ্বাস করেন না। অতএব, বহুদেব-বাদের সহিত ইহাব অনেক পার্থক্য; এবং শব্দবাদ কিংবা বাণীবাদ (Logos) হইতে ইহাব এক-পাদ মাত্র ব্যবধান। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এই ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়াছে।

কিন্তু “অমুর”-বাদ সম্বন্ধেই অর্থাৎ প্রাণের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধেই বৈদিক ধর্ম, কুট দার্শনিকতার জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃত ‘অমু’-শব্দের অর্থ প্রাণ এবং ‘র’-অক্ষর যোগে “প্রাণের উৎপাদক” এইরূপ বুঝায়—ইহাই অমুর-শব্দের মূল-অর্থ। আর্যেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—প্রাণ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি। তাঁহারা বলিতেন, প্রাণই প্রাণকে পোষণ করে। প্রাণীরা অন্য প্রাণীকে আশ্রয়সাং করে; সেই সব প্রাণী আবার, বৃক্ষ লতাদি খাইয়া জীবনধারণ করে; বৃক্ষ লতাও আবার উদ্ভিজ্জ ও জীবশবীবের পরিত্যক্ত অংশের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাকেই বলে “চক্র,”—অর্থাৎ প্রাণের চক্রগতি। প্রকৃতি রাজ্যে, প্রাণ ও গতিশক্তি বিনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ফলত, যাহার গতি-নাশ হয়—তাহাবই প্রাণনাশ হইয়া থাকে। যুক্তির সম্ভ্রতি বক্ষা করিবার জন্তই, আর্যেরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, অমুরেবা গতিমান, তাহাদের শবীব দীপ্তিমান—মৃতবাং তাহারা সর্বব্যাপী ও অমব।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই মতবাদটি, বহুদেব-বাদাত্মক; কিন্তু আর্যগণের যে স্বাভাবিক প্রবণতা পবম-মূলতত্ত্বরূপ দার্শনিক একতাব দিকে,—সেই প্রবণতাই

উহাদিগকে একেশ্বরবাদে শীঘ্র উপনীত করিল। অগ্নিদেবের ধারণা হইতেই উহা একেশ্বরবাদে আসিয়া পৌছিল। —“সমস্ত জগতের সত্তা তোমা হইতেই; কি হোম-পাত্র, কি মানব-হৃদয়ে, কি জলে, কি অগ্নিকুণ্ডে, সমস্ত প্রাণের মধ্যে তোমার মহিমার মধুব লহরী প্রবাহিত হইতেছে।” —এইরূপ বামদেব বলিয়াছেন। অতএব অমুর্ত্তাবাপন্ন (idealised) অগ্নিই এই বহুদেববাদের পত্তন ভূমি। ভরদ্বাজের বেদমন্ত্র শ্রবণ কর: “সমস্ত জীবের মধ্যেই তাঁহার কর্তৃ-শক্তি বিদ্যমান; সমস্ত দেবতার মিলিয়া এই শক্তিমান পুরুষকে বেঠন করিয়া আছেন। যখন ভাবি, এই জ্যোতি-র্শ্ময় পুরুষ আমার অন্তরে রহিয়াছেন, তখন আমার কর্ণ ব্যথিত হয়, আমার চক্ষু কাঁপিতে থাকে, আমার মন সনেহে বিক্ষিপ্ত হয়। আমি কি বলিব? আমি কি চিন্তা করিব?” তবেই দেখ, ভৌতিক অগ্নি অমুর্ত্তাবাপন্ন হইয়া, তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম ধারণার খুবই কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছে। কিয়ৎ-কাল পরে এই অগ্নির আব বিশেষ অস্তিত্ব বহিল না; পুংলিঙ্গ-বাচক পরম পুরুষ ব্রহ্মা ইহার স্থান অধিকার করিলেন।

দীর্ঘতম ঋষির (Dirghatamas) মহামন্ত্র ঋগ্বেদের একত্র প্রতিপাদন করিতেছে: “যাহার শরীর নাই তাহাকে অগ্নি শবীর বিধান করিতেছেন—ইহা কি অন্যকালে কেহ দেখিয়াছে? পৃথিবীর মন, রক্ত, আত্মা কোথায় ছিল? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত এই ঋষির কাছে কে আসিয়াছিল? আমি দুর্বল ও অজ্ঞ—আমি এই সকল বহুস্ত উদ্ভেদ করিতে চাহিতেছি...আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর আরম্ভ কোথায়, পৃথিবীর মধ্য কোথায়? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ফলবান অশ্বের মূলবীজটি কি? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বাক্যের আদিম আশ্রয় কে? এই পবিত্র যেরটিই পৃথিবীর আবস্ত এবং এই যজ্ঞ হোমই জগতের কেন্দ্র। এই সোমই ফলপ্রসূ অশ্বের বীজ। এই পুরোহিতই বাক্যের আদিম আশ্রয়। আমি জানি না, কাহাব সহিত এই জগতের সাদৃশ্য আছে। আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি, এবং আমি চিন্তাশূন্যে জড়াইয়া পড়িয়াছি...মৃত্যুর মধ্যেই অমৃত অবস্থিত; এই দুই নিত্য বস্তু সর্বত্রই গমনাগমন করে; কেবল লোকে একটি না জানিয়া অন্যটিকে জানে...যে ব্যক্তি পবমপুরুষকে জানে না, সে এ মস্ত্রেব কিছুই বুঝিতে

পাবিবে না; যে তাঁহাকে জানে, সে মৃত্যু ও অমৃতত্ব সম্মিলনও অবগত আছে...“যে দেবতা সমস্ত আকাশে পবিত্রমণ কবেন, লোকে তাঁহাকে মিত্র বলে, বরুণ বলে, অগ্নি বলে; সদ্বিপ্রেরা এই অদ্বিতীয় পুরুষকে,—অগ্নি, বরুণ, মাতবিশ্বনু—এইরূপ বহু নামে ব্যক্ত কবেন।”

অবশেষে প্রজাপতি জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন: তখন কিছুই ছিল না, নংও ছিল না, অসংও ছিল না। ভূও ছিল না, ভুবও ছিল না, স্বও ছিল না। এই আচ্ছাদনটি কোথায় ছিল?—কোন জলগর্ভের মধ্যে নিহিত ছিল? এই আকাশের গভীৰতম প্রদেশ-সকল কোথায় ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না অমৃতও ছিল না। দিবা ও রাত্রির সৃষ্টি কবে এমন কিছুই ছিল না। একমাত্র তিনিই আপনার মধ্যে লীন থাকিয়া, বায়ুহীন নিঃশ্বাস নিঃশ্বাসিত কবিতেন। তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন। সেই আদিকালে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল; জলের কোন বেগ ছিল না; সমস্তই একাকার ছিল। এই বিশৃঙ্খল একাকারের মধ্যে পরমপুরুষ অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তাঁহার করুণাতেই এই মহাবিশ্বের জন্ম হইল। আদিতে তাঁহার প্রেম আপনার মতোই ছিল, পরে তাঁহার জ্ঞান হইতেই আদি বীজ ছুটিয়া বাহির হইল। ঋষিরা তপস্তার বলে সং-এর সহিত অসং-এব যোগ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন...এ সকল বিষয়ের জ্ঞাতাই বা কে? বস্তাই বা কে? এই সকল সত্তা কোথা হইতে আসিল? এই উৎপত্তি-ব্যাপারটি কি? দেবতারাও তাঁহা কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সত্তা কিরূপে হইল? যিনি এই জগতের আদিপ্রস্টা, তিনিই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ভিন্ন ইহা আর কে কবিত্তে পারে? দ্যলোক হইতে, বাহ্যর চক্ষু জগতের উপর নিপতিত রহিয়াছে তিনিই ইহা জানেন। তিনি বাস্তবিক এ বিজ্ঞান আর কাহার হইতে পারে?”

একজন ঋষি, আর এক মন্ত্রে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অমূল্যজ্ঞান কবিতেন দেখিতে পাই:

“যিনি আত্মদা, বলদা, বাহ্যর শাসনে বিশ্বসংসার চলিতেছে, দেবতারা বাহ্যর শাসন অবনত মস্তকে বহন করিতেছেন, বাহ্যর ছায়া অমৃত, বাহ্যর ছায়া মৃত্যু, হৃদয়

দ্বারা আর কোন দেবতার অর্চনা করি? এই হিমবস্ত পর্বত সকল বাহ্যর মহিমা, সকল নদী সহিত সমুদ্র বাহ্যর মহিমা, এই দিক্ সকল বাহ্যর বাহু, হবিঃ দ্বারা আর কোন দেবতার অর্চনা করি? বাহ্যর দ্বারা দ্যলোক প্রদীপ্ত, পৃথিবী সূদৃঢ়, বাহ্যর দ্বারা স্বর্গলোক, বাহ্যর দ্বারা জ্বলোক প্রতিষ্ঠিত, যিনি অস্তবীক্ষে মেঘের নির্মাতা, হবিঃ দ্বারা আর কোন দেবতার অর্চনা কবি? বাহ্যর পালনোপকরণ দ্বারা সূপ্রতিষ্ঠিত ও দীপ্যমান এই দ্যলোক ও জ্বলোক বাহ্যকে দিবা চক্ষে নিবীক্ষণ করিতেছে, বাহ্যতে সূর্য উদিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, হবিঃ দ্বারা আর কোন দেবতার অর্চনা করি? যিনি পৃথিবীর জনয়িতা, তিনি আমাদের বিনাশ না করুন। যে সত্যদ্বারা দ্যলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আনন্দদায়িনী বৃহৎ জলরাশি সৃষ্টি করিয়াছেন, হবিঃ দ্বারা আর কোন দেবতার অর্চনা করি?”

পরব্রহ্মের একমাত্র প্রতিপাদন করিয়াই বৈদিক যুগের শেষ হইল; তাহার পরেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আরম্ভ। বেদের ভাষ্য যে উপনিষদ্—সেই সকল উপনিষদে পরব্রহ্মের একমাত্র প্রতিপাদিত ও পরিপুষ্ট হইল। তাহার পর ব্রাহ্মণ্যধর্মের আর কিছু করিবার রহিল না, শুধু তাহা হইতে একটা সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া সেই সিদ্ধান্তের উপবেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিশ্বব্রহ্মবাদের বীজমন্ত্রস্থাপন করিল।

আমি কেবল উপনিষদ্ হইতে—যজুর্বেদের উপনিষদ্ হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত কবিত্তে; “এই জগৎ এবং এই জগতে বাহ্য কিছু অবস্থিতি করিতেছে, সমস্তই বিধাতা-পুরুষের শক্তি দ্বারা পূর্ণ; অতএব, পার্থিব বিষয় হইতে বিমুক্ত হইয়া, অস্তবের মধ্যে তাঁহাকে অর্চনা কর।... মানুষ্য স্বকীয় কর্ম সমাধা করিবার জন্য শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে; হে মনুষ্য! এই সকল কর্ম ছাড়া তোমার মধ্যে এমন কিছুই নাই বাহ্য কলুষিত না হয়। বাহ্যর পার্থিব স্তম্বে আসক্ত হইয়া আত্মহত্যা করে, তাহার অক্ষতমসাদ্ধন অস্বর্গ্যলোকে গমন করে। এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষ চলেন না, অতএব তিনি মন হইতে বেগবান, তাঁহাকে দেবতারাও ধবিত্তে পারে না। তিনি বাহ্যইন্দ্রিয়ের অগ্রাঙ্ক, তিনি অস্তরিত্ত্বদিগকেও অনন্তরূপে অতিক্রম কবেন। তিনি সমস্ত আকাশে অচলভাবে অবস্থিত হইয়া

এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন! তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূবে, তিনি নিকটে; তিনি সকলের অন্তরে, তিনি সকলের বাহিরে! যিনি পবমাত্ম্য মধ্যে সর্বভূত দর্শন করেন, এবং সর্বভূতের মধ্যে পবমাত্ম্যকে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। বিশ্বাত্ম্য মধ্যে সর্বভূত সর্বজীব অবস্থিত—ইহা যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার অবিদিত কি আছে? তিনি সর্বগত, শুভ্র নির্মল, আকার, শিরা ও ব্রণহীন, শুদ্ধ, অপাপবিক্ত; তিনি কবি, তিনি মনোবী, তিনি পরিভূ, তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি সর্বকালে প্রজ্ঞাদিগকে যথাযথ অর্থসকল বিধান করেন। যাহাবা অবিদ্যাকে অর্চনা কবে তাহারা ঘোর অন্ধকাবের মধ্যে গমন করে, এবং যাহাবা বিদ্যালাভ করিয়াছে তাহাবা আবও গভীবতব অন্ধকাবের মধ্যে প্রবেশ কবে। ঋষিবা বলেন, বিজ্ঞানের ফল একরূপ, অজ্ঞানের ফল অন্তরূপ; এই উপদেশ আমরা পূর্বপূর্ব ঋষিদের হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা একসঙ্গে শিক্ষা কবিয়াছেন, তিনি অবিদ্যাব দ্বারা প্রথমে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তাহাব পর বিদ্যাব দ্বারা অমৃত লাভ করেন। যাহারা সৃষ্ট বস্তুর পূজা কবে তাহারা অন্ধকাবের মধ্যে প্রবেশ কবে, যাহাবা নশ্বব সৃষ্ট পদার্থে আসক্ত হয় তাহারা গভীরতর অন্ধকাবের মধ্যে প্রবেশ কবে। ঋষিবা বলিয়াছেন, নশ্বব পদার্থের ফল একরূপ, অবিনশ্বব পদার্থের ফল অন্তরূপ। পূর্বপূর্ব ঋষিদিগের নিকট হইতে আমরা এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি নশ্বব পদার্থ ও লয়তত্ত্ব—এই উভয় জিনিস একসঙ্গে শিক্ষা কবেন, তিনি প্রলয়ের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, পবে অকৃত পদার্থের দ্বারা অমৃত লাভ কবেন। গৌরবান্বিত হিবগম্য অবগুণ্ঠনে সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। জগৎ-পোষণ হে সূর্য্য! আমাব সমক্ষে সত্যকে প্রকাশ কব—যাহাতে আমি তোমাব চিবভক্ত হইতে পাবি,—তাহায়েব সূর্য্য ও সত্যেব সূর্য্যকে দর্শন কবিতে পাবি। হে লোক-পোষণ সূর্য্য! হে নিঃসঙ্গ তাপস! পবম প্রভূ পরম নিয়ন্তা! প্রজ্ঞাপতিব পুত্র! তোমাব দীপ্ত কিরণ বিকীর্ণ কব; তোমার প্রথব তেজ সংহরণ কর, যাহাতে আমি তোমার মোহন রূপ ধ্যান করিতে পাবি, তোমাব মধ্যে যে দিব্য পুরুষ বিচরণ কবেন, তাঁহার অংশ

হইয়া যাইতে পারি! আমাব প্রাণবায়ু যেন আকাশেব বিশ্বাত্ম্য ও ভূতাত্ম্যর মধ্যে বিলীন হয়! আমার এই ভৌতিক ও নশ্বব দেহ যেন ভস্মে পরিণত হয়! হে দেব! আমার প্রদত্ত হবি তুমি শ্রবণ করিও, আমাব যজ্ঞাহুষ্ঠানের কথা শ্রবণ করিও। হে অগ্নি! সরল পথ দিয়া, আমাদের সমস্ত পুণ্যকার্যের পুরস্কার স্বরূপ গন্তব্য স্থানে আমাদের উপনীত কর। হে দেব! তুমি আমাদের সমস্ত কর্মই অবগত আছ, আমাদের পাপ সকল অপনীত কর। আমবা তোমাকে বন্দনা করি, আমরা তোমাকে প্রণিপাত কবি।”

বৈদিক ধর্ম্য হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্যে উত্তীর্ণ হইবার পথে এই মহান উপনিষদই সন্ধিস্থান। এই উপনিষদই বৈদিক মত ও বিশ্বাসেব সংক্ষিপ্তসার, এবং এই উপনিষদের মধ্যেই সেই সকল মতবাদেব বীজ নিহিত ছিল যাহা পবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্য-সংশ্লিষ্ট দর্শনশাস্ত্রেব উদ্ভবে বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে।

বেদ যে ব্রাহ্মণ্যিক ভাবতেব চক্ষে এত পবিত্র, তাহাব কাবণ, বেদই সমস্ত ধর্ম্যতত্ত্বেব, দার্শনিকতত্ত্বের, সামাজিক ও রাষ্ট্রিকতত্ত্বের সূত্রস্থান; বেদ আসলে বিশুদ্ধ আর্য্য জাতিব নিজস্বসামগ্রী, উহাব মধ্যে কোন বিদেশী ‘ভেজাল’ প্রবেশ করে নাই, অন্তান্ত জাতি হইতে পৃথক্ হইয়া, সপ্তসিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে যে আর্য্যজাতি আবদ্ধ ছিল,—বেদ তাহাদেরই জ্ঞানোন্নতির ফল; একমাত্র নিজ সম্বলেব উপব নির্ভর কবিয়া আর্য্যজাতি কিরূপে জ্ঞানসম্ভাতায় উন্নতিসাধন কবিয়াছিল—বেদ তাহারই নিদর্শন। অতএব, আর্য্যধর্ম্য-সমূহেব সহিত সংশ্লিষ্ট যে সব ক্রিয়াকর্ম্ম আছে, যে সব সাংকেতিক সামগ্রী আছে, যে সব মতবাদ আছে—সে সমস্তেব মূল অনুসন্ধান কবিতে হইলে, বেদের মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম্যমত ও ধর্ম্য-বিশ্বাসের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই, আর্য্যবংশীয় পুরাণাদির ভিতরকাব ভাব অনেকটা বুঝা যায়—তাহাদের মূল মর্ম্ম অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এবং একমাত্র বেদই,—গ্রীক, ল্যাটিন, স্যুড, জর্জান ও সেন্টজাতির পুরাণাদি প্রকৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ।

এখন দেখা যাক, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্য কিরূপে বেদ হইতে জন্মগ্রহণ

করিল। দেশজয় করিতে করিতে, আর্থোরা যে পরিমাণে অগ্রসর হইতে লাগিল, বিজিত দেশে আপনাদিগের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল, এবং সেই সর্ব স্থানে স্থায়ী ভাবে বসতি করিতে লাগিল,—সেই পরিমাণে তাহাদের জীবন নির্বাহের প্রণালীও একটু একটু পরিবর্তিত হইতে লাগিল।

প্রথমে তাহারা এক এক পরিবার পৃথকভাবে বাস করিত, তাহার পর তাহাদের এক একটা মণ্ডলী হইল। প্রথমে পবিবাবের অন্তর্গত পিতাই পুরোহিত ছিলেন, তিনিই আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পৌবোহিত্য কাঙ্ক্ষা করিতেন। ক্রমে পৌবোহিত্য কার্য, কতকগুলি বিশেষ পবিবারের হস্তে গিয়া পড়িল।

কলতঃ, বৈদিকযুগের আবস্তকালে, যে সকল ক্রিয়া-কর্মের জন্ত একজন পুরোহিত আবশ্যক হইত, পরে তাহার জন্ত সাত জন পুরোহিতের আবশ্যক হইল; তা ছাড়া, দস্যুদেব সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিতে হইত বলিয়া, কতকগুলি বর্ণদক্ষ নেতাব প্রয়োজন হইল। এই ছই প্রয়োজন হইতেই, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি।

আর্থাদিগের মনে কতকগুলি দার্শনিক সমস্তা উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা ভাবিল,—ঐ সকল সমস্তা, যে সকল ব্যক্তির জীবনের বিশেষ আলোচ্য বিষয়, কেবল তাহারাঐ ঐ সকল সমস্তার মীমাংসা করিতে সমর্থ। তা ছাড়া আর্থোরা দেখিল, তাহারা স্বল্প লোক—পীত ও কৃষ্ণবর্ণের অসংখ্য লোকের মধ্যে বাস করিতেছে, যদি তাহারা ঐ সকল লোক হইতে পৃথক হইয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্ব পর্যাস্ত বিলুপ্ত হইবে। এই জন্ত, বিজ্ঞতা বাহাতে বিজিত জাতির মধ্যে একেবাবে মিশিয়া না যায়, যাহাকে আর্থোরা সগর্বে বলিত “অম্লব-গর্ভজাত উৎকৃষ্ট জাতিব নির্বাচিত বীজ”—সেই বীজের বিশুদ্ধতা বাহাতে সংরক্ষিত হয়—এই উদ্দেশ্যে তাহারা উত্তমবে সহিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই উপায়ে, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণের অনার্য জাতিদিগের সহিত আর্থাজাতির বিবাহ নিবাবিত হইল, আর্থোরা অনার্যদিগকে, আপনাদের ধর্মমত হইতে দূবে বাধিল, তাহাদের জন্ত কেবল কতকগুলি নীচবিশ্বাস ও স্থূল উপধর্ম রাখিয়া দিল। ইহা হইতে ব্রাহ্মণ্যিক ভারতের বর্ণভেদ-প্রথাও উৎপত্তি। সকলের শীর্ষস্থানে

ছই শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—ইহারা বিশুদ্ধ আর্থাবংশীয়; তারপর বর্ণিক ও কারিগবংশেগী—বৈশ্য ও শূদ্র,—ইহাবা বিজিত লোক লইয়া গঠিত।

যে বর্ণভেদ-প্রথা পরে এত নিন্দিত ও লাঞ্চিত হইয়াছে তাহাই হিন্দুসভ্যতার শৈশব-দোলা বলিলেও হয়; এই বর্ণভেদ-প্রথা না থাকিলে,—যাহা হইতে সমস্ত ধর্মসিদ্ধান্ত, সমস্ত দার্শনিকসিদ্ধান্ত নিঃসৃত—সেই পবমাশ্রম্য ব্রাহ্মণ্য-যুগের আবির্ভাবই হইত না; যাহার অল্পপম সৌন্দর্য, যাহাব বিচিত্র আকার—সেই সংস্কৃত সাহিত্যের উদয়ই হইত না। এক কথায় এই বর্ণভেদ-প্রথা না থাকিলে আর্থাজাতির অস্তিত্বই থাকিত না; বহুকাল পরে, সমস্ত মানব-ব্যাপাবে যাহা স্বভাবত ঘটয়া থাকে—যখন প্রভুত্বের অপব্যবহার হইতে নানা প্রকার অশ্রম অত্যাচার উৎপন্ন হইল তখনই শাক্যমুনি বুদ্ধদেব অবিভূত হইলেন এবং তিনি সর্বজীবের দয়া ও অহিংসার ধর্মপ্রচাব করিয়া, শাস্ত্র-ভাবে একটা সমাজবিপ্লব সংঘটিত কবিলেন;—অনার্য-জাতির কিয়দংশ লোককে, আর্থাজাতির নৈতিক মর্যাদাব পদবীতে উত্তোলন করিলেন।

ত্রিজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানের নারী-সমাজ ।

জাপান সম্বন্ধে বৈদেশিক নানা ভাষায় নানা গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিলেও একখানিতেও জাপ-রমণীর সামাজিক অবস্থার বিষয় এবং প্রাচীন জাপানে তাহাদের কিরূপ প্রভুত্ব প্রতিপত্তি ছিল এবং তাহাদের দ্বারা কি কি কার্য অমুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জাপানের সর্বপ্রথম নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক জিন্জো নরুসি (Ginzo Naruse) লিখিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য সমালোচকগণ জাপান-রমণীকে কদাচিত বৃত্তিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাহারা তাহাদিগকে চীন ও কোরিয়া দেশের বমণী-সমাজের জায় এক অপ্রয়োজনীয় ও স্বতন্ত্রসত্তাহীন সামাজিক-জীব বলিয়া মনে কবিয়া থাকেন। পুর্বাতন বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত জাপ-রমণীর বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা সুসঙ্গত নহে।

তদ্ব্যতীত এখানে প্রাচীন জাপানের বর্মীগণের অবস্থার সহিত বর্তমানকালের জী-শিক্ষার উৎপত্তি ও উন্নতির কথা এবং ভবিষ্যতে তাহাদের শিক্ষার গতি কোন্ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে তাহার আলোচনা করিতেছি।

পুর্বকালে বিশেষতঃ বৌদ্ধ এবং কনফিউসীয়-ধর্ম জাপানে প্রচলিত হওয়ার পূর্বে বর্মীগণের দ্বারা জাপানে নানা অলৌকিক কার্য সাধিত হইয়াছে। সে সময় জী-পুস্তকের অবস্থা সমাজে একই প্রকার ছিল। পুরুষই যে সর্বস্বার্থী এবং বর্মী কিছুই নহে—নগণ্য, এ বর্ষবোচিত ধারণা তখনো জাপানে প্রচলিত হয় নাই। রাজনৈতিক-ক্ষেত্রেও বর্মীরা ক্ষমতাশালিনী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, পুর্বকালে নরমণ বর্মী জাপ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বর্মীরা সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক কোন অংশেই নিরুৎসাহ ছিল না। সমব-ক্ষেত্রে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া তাহারা গৌরবান্বিতা ও প্রখ্যাতা এবং অত্যন্ত রাজ-রাজি রচনা দ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রেও বর্মীরা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের নৈতিক-চরিত্র সর্বথা কলঙ্ক-শূন্য ছিল না এবং তজ্জন্ত সার্বজনীন প্রশংসা বা সম্মান প্রাপ্ত হইত না। পক্ষান্তরে তাহাদের স্বাভাবিক-বৃত্তি বা মেজাজ আনন্দময় ও মনোজ্ঞ ছিল এবং তদ্বারা পুরুষশ্রেণীকে সম্মোহিত কবিত্তে সক্ষম হইত। সে কালের বর্মীসমাজেব এই ক্ষমতা, গুণগণনা ও চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলে স্বভাবতই মনে উদ্ভিত হয় যে, পুরুষশ্রেণীর অল্পরূপ প্রাচীন বর্মীশ্রেণীও অশিক্ষিত হইয়াছিল,—যদিও সে সময় জী-শিক্ষার উপযোগী কোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

ইহাই জাপানের বর্মীত্বের বসন্তকাল,—যখন উহা অবাধে ও অক্লেশে প্রস্ফুটিত হইয়া প্রাচীন জাপ সমাজের উপর অপ্রতিহত ও কার্যকরী শক্তির পবিচালন করিয়াছে। তাব পূর্বে বৌদ্ধ ও কনফিউসীয় ধর্মের প্রচলনে বর্মীর অবস্থার প্রভূত পরিবর্তন আরম্ভ হয়। তবে ইহাও সত্য যে বর্মীগণের প্রভাবেই জাপদেশে ঐ দুই ধর্ম প্রগতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। জাপানে বৌদ্ধধর্মের আদিম প্রচা-বকই,—জাপ-বর্মী, এবং এই ধর্মের মূলতত্ত্বসম্বন্ধেব ভার তিন জন বর্মীর প্রতিই অর্পিত হয়! তদন্তসারে জেন্সিনি,

জেন্সিনি এবং কেইজেন্সি নামী তিন জন বিদ্বান ভারতবর্ষে আগমন করেন। কেবল ধর্মক্ষেত্রে নহে, বৌদ্ধ এবং কনফিউসীয় ধর্মের প্রবর্তন হইলেও—বহুদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক এবং সাহিত্যক্ষেত্রেও বর্মীপ্রাধান্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ের বর্মীদের লেখনীগ্রহণ বহুতর প্রাচীন জাপানী-সাহিত্য-গ্রন্থ সজ্জাত হইয়াছে। পূর্বোক্ত নবাগত ধর্মতত্ত্বের আবির্ভাবের বহু বৎসর পর পর্যন্তও যেমন বর্মীগণের সর্বতোমুখ প্রভাব জাপ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমনি পক্ষান্তরে ঐ দুই ধর্মমতের অণুপ্রাণনাতেই বর্মীগণের অবস্থা ক্রমশ অবনমিত হইতে আবস্ত হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত অবস্থা ফিউডেল (Feudal) বা সামন্ততন্ত্রের সময় প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইতে থাকে। তৎকালীন সামাজিক কুর্বাতি এবং বৌদ্ধ ও কনফিউসীয় ধর্মগত একত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে বর্মীগণের স্বাধীনতা হ্রাসের সহায়তা করিতে লাগিল। টোকুগাওয়া শাসনকালেও এইরূপ অবস্থাই চলিতে থাকে। এই সময় আবার সমাজে শ্রেণীবিভাগের কঠোরতা আরম্ভ হয়;—বর্মী-সমাজ সম্পূর্ণরূপে গৃহকোণে বন্দী হয় এবং গৃহের বাহিরে তাহাদের কোন প্রভাবই ফুটিবার অবসর পায় না। জী-শিক্ষা বলিয়া যদি কিছু সে সময়ে থাকে,—তবে তাহা কেবল বর্মীদের অবশ্য কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ। যথা,—দেলাই, বয়ন, রন্ধন, চা ও ফুল সবববাহেব কোশল এবং লেখাপড়া বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রাথমিক পাঠ শিক্ষা—ইহাই সে কালের জী শিক্ষা নামে পরিচিত ছিল। তাহাদের মানসিক উন্নতিকল্পে কোন চেষ্টাই হইত না এবং নৈতিক-শিক্ষা বিষয়ে সেই প্রাচীন তিনটি সূত্র আবৃত্তি করা হইত,—বাল্যকালে পিতামাতার অধীনে থাকিবে, বিবাহ-অন্তে স্বামীর অধীন এবং বিধবা-বস্থায় পুত্রের অধীন থাকিবে। এই মন্ত্রই প্রত্যহ বর্মীদের কর্তব্য হিসাবে প্রবেশ লাভ করিত। এবম্ব্যকারে বর্মী জাতি এমনি শোচনীয় দশায় নীত হয়, যে তাহা হইতে উদ্ধারের আব কোনই উপায় পবিলক্ষিত হয় নাই। জাপানী বর্মীত্বের ইহাই শীতুকাল,—যখন তাহা কষ্টপ্রদ সামাজিক কুর্বারূপে তুষারচ্ছন্ন ভূমি-চাপে বিস্তৃতপ্রায় হইয়া উঠে।

তারপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবর্তনে বর্মীত্বের পুনঃ

বসন্ত উদ্ভিত হয় এবং যে শক্তি ও চৈতন্য এককাল তিমির গহবরে নিমজ্জিত ছিল, তাহা যেন সূর্য-স্বর্ষোব মুখাবলোকনেব অবসর প্রাপ্ত হয়। বসন্তসমাগমে ধরণীবক্ষ যেমন বিদীর্ণ হইয়া বীজের অঙ্কুর উন্মেষের সহায়তা করে, পাশ্চাত্য সভ্যতাও তদ্রূপ জাপানেব কঠিন-মুক্তিকারূপ সামাজিক প্রথা খণ্ডিত করতঃ সমাজে বমণীকমতা পবিচালিত হইবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান কবে। ইয়ুরোপীয় সভ্যতাপ্রভাবে জাপানেব প্রত্যেক বিষয়েই পরিবর্তন প্রোত প্রবাহিত হইতে আবস্ত হয়। শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া পাশ্চাত্য জাতিদেব অনুরূপ ভাবে গঠিত হয়। গবর্ণ-মেন্ট এবং জনসাধারণ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পাবে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালীর মূলেই পাশ্চাত্য সভ্যতা অবস্থিত; সুতরাং কেবলমাত্র শিক্ষা-প্রণালী সংস্কারেই জাপান ইয়ুরোপীয় সভ্যতার সমকক্ষতা করিতে পারিবে। এই ভাবে শিক্ষা-সংস্কার কার্য আরম্ভ হইতেই জ্ঞী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—যাহা একাল পর্যন্ত সকলে অবহেলা করিয়া আসিতেছিল,—তাহা সকলের বোধগম্য হইতে থাকে।

দেশের চারিদিকে বালকদিগেব সঙ্গে বালিকাদিগের নিমিত্তও নানাশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। খৃষ্টদ্বাদশ মিশনাবীবাই সর্বপ্রথম জাপানে বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্টও এই সংস্কারেব পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং ছয় হইতে বারো বৎসরের বালক বালিকার প্রাথমিক শিক্ষা আইন দ্বারা অবশ্যকর্তব্য (Compulsory) কবেন। নর্মালস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে গবর্ণমেন্ট তাহাতে বালিকাদিগেরও প্রবেশাধিকার প্রদান কবেন। ইহাব অন্ত্যকাল পরে বমণীদিগের নিমিত্ত “সবকারী উচ্চ নর্মাল স্কুল” স্থাপিত হয়। বর্তমানকালে স্থাপিত রমণী-বিশ্ববিদ্যালয়েব পূর্বকালেব ইহাই সর্ববৃহৎ বালিকা-বিদ্যালয়রূপে পরিগণিত।

খৃষ্টাব্দ ১৮৮৪ হইতে ১৮৯১ সালের মধ্যে—সংস্কারের এই পূর্ণ যুগে জ্ঞী-শিক্ষা উন্নতির দৃঢ়-সোপানে আরম্ভ হয়। বালিকা বা আধুনিক শিক্ষা পাইলেই উন্নত মতাবলম্বী এবং স্বাধীনচেতা হইয়া উঠে। তাহাদেব জনক জননী প্রায়ই প্রাচীনমতাবলম্বী থাকার কথাদের মতের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন বা তাহাদের মতের সহিত একমত হইতে পারেন

না; তাহাব ফলে গৃহের সুখশান্তির গুরুতর অন্তরায় এবং দুই বিভিন্ন মতের গুরুতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। বালিকাদের শিক্ষাব অপূর্ণতা কিছু থাকিলেও এবং তাহা হইতে অনর্থক গৃহ-কলহেব সূত্রপাত হইয়া থাকিলেও, জাপানের বর্তমান সংস্কারযুগে প্রাচীন ও আধুনিক মতের এই সংঘর্ষ কিছুতেই পরিহার কবা সম্ভবপব নহে। অশিক্ষিত জনসাধারণ এই অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবা কেবলি বর্তমান শিক্ষার দোষারোপ কবিয়া থাকে। এই সাধারণ মতের প্রাধান্য হইতেই জ্ঞী-শিক্ষার উন্নতির গতি অवरুদ্ধ হয় এবং কিয়দ্বিবস একই অবস্থায় অপবিবর্তনীয় হইয়া থাকে। তাবপব বালিকাদিগকে সংপন্নী ও জননী হইতে উপদেশ দেওয়াই বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিবোধিত হয়। সে সময়ের জনসাধারণ ব্যাবহারিক শিক্ষারই পক্ষপাতী ছিল। এই সময়ে জ্ঞী-শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। অনেক দিন এইরূপ অবস্থাই ছিল,—সে সময় বালিকাদিগের প্রকৃত শিক্ষা-উন্নতি অবকল্প দশায় ছিল।

অধ্যাপক জিন্জো নকসি লিখিয়াছেন যে, তিনি জ্ঞী-শিক্ষাব গুরু প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম কবিয়া,—প্রথমতঃ প্রকাশ্যে কোনরূপ মতামত ব্যক্ত না কবিয়া পাশ্চাত্য দেশ সমূহের জ্ঞী-শিক্ষা-প্রণালী অবগত হইবাব নিমিত্ত আমেরিকায় গমন করেন। তথায় তিনি তিন বৎসরকাল অতিবাহিত করেন; এই সময়েব মধ্যে তিনি উত্তর-প্রদেশের সমস্ত রমণীকলেজই দর্শন করিয়াছিলেন। এই পর্যটনে ও পবিদর্শনে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাঁহার সংকল্পিত শিক্ষা-প্রণালীও সুচিন্তিত প্রকারেব হইবার সুবিধা পায়। ১৮৯৪ অব্দে অধ্যাপক জাপানে প্রত্যাবৃত্ত হন কিন্তু এক বৎসরকাল নীরবে কেবল দেশের সবকারী ও বে-সরকারী বালিকা-বিদ্যালয়গুলিই পরিদর্শন করিতে থাকেন। এবশ্রকারে তিনি জাপানের জ্ঞী-শিক্ষা-বিষয়ক তাঁহার অভিমত গঠিত করিয়া ‘জ্ঞী-শিক্ষা’ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। পুস্তকখানি অচিরকাল মধ্যেই জাপ-জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় এবং জন-সাধারণ আগ্রহের সহিত তাঁহার অভিমতের পোষকতা করিতে থাকে। আশ্চর্য্যেব বিষয়, ঠিক এই সময় হইতেই জাপানে প্রকৃত জ্ঞী-শিক্ষার সংস্কার ও সূত্রপাত আরম্ভ

হয়। অধ্যাপকের গ্রন্থপ্রচারেব ফলেই যে একরূপ অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি স্বয়ং এ বিষয় স্বীকার না করিয়া লিখিয়াছেন যে, জনসাধারণেব মন উত্তরোত্তর জ্ঞী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ তদভিমুখেই ধাবিত হইতেছিল; এমন সময় তাঁহার ‘জ্ঞী-শিক্ষা’ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সাধারণ মতেব কার্য্যকরী শক্তির প্রয়োগ করেন মাত্র। এই সংস্কারের প্রথম ফল—‘কোটো জো গাকু’ (উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা; প্রতি বৎসরই এই বিদ্যালয়েব ছাত্রীসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। অতিরিক্ত বিষয়ের বিষয় এই যে, জাপানে বর্তমানকালে যতগুলি বালিকা-বিদ্যালয় বা কলেজ আছে, তাহাতে শিক্ষার্থিনী সমস্ত বালিকার স্থান সংকুলান হইতেছে না। কাজেই সাম্রাজ্যের নানাস্থানে নানা উদ্দেশ্যে বে-সবকাষী বালিকা-বিদ্যালয়েব প্রতিষ্ঠা হইতেছে, জ্ঞী-পাঠ্য পুস্তক, সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বালিকাদিগেব মধ্যে বিতরণ হইয়া থাকে। এই ভাবে জাপানে জ্ঞী-শিক্ষাব সুবর্ণ-যুগের আবির্ভাব হইয়াছে।

দশ বৎসর হইল পূর্বোক্ত অধ্যাপক তাঁহার চিরকল্পিত রমণী-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন এবং একজ্ঞদেস্ত্র সাধন মানসে তিনি টোকিও নগরের জন-সাধারণের সমক্ষে তাহার মহজ্ঞদেস্ত্র প্রকাশ করেন। ইহাব অত্যল্পকাল পূর্বে তিনি তাঁহার সংকল্পিত কার্য্য সাধন কল্পে মারকুইস ইটো, মাঝকুইস সাইগুনজি, কাউণ্ট ওকুমা, ব্যারন উটসুমি প্রভৃতি মনস্বীর সহায়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে সাধ্যাঙ্গসাবে সাহায্য করিতেও প্রতিক্রমিত হইয়াছিলেন। সেই ভরসাতেই নবমি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে জাপানের বর্তমান রমণী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কেবল জাপানে নহে, সমগ্র প্রাচ্য দেশের মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম রমণী-বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া জাপানবাসীরা প্রাচ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বিভাগ আছে;—(১) হোম বা গৃহস্থালী বিভাগ (Home Department); (২) জাপানী-সাহিত্য বিভাগ; এবং (৩) ইংরেজি সাহিত্য বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার প্রথম

উদ্বাটিত হইবার সময়, উহাব প্রতিষ্ঠাতাবা প্রতি বিভাগে ৩০টা কবিতা ছাত্রী জুটিবার আশা করিয়া ছিলেন; কিন্তু অচিবেই ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়া যায়, -- প্রথম জুই বিভাগে একশত করিয়া এবং তৃতীয় বিভাগে পঞ্চাশটি, মোট আড়াই শত ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন Preparatory বিভাগে তিন শত ছাত্রী ভর্তি হয়। সুতরাং প্রথম বৎসরেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা পাঁচ শত হয় এবং দ্বিতীয় বৎসরে উহা আট শতে এবং তৃতীয় বর্ষে এক সহস্রে পবিত্র হয়। ইহা হইতেই অনুমিত হইবে যে, জাপ-জাতি বর্তমান সময়ে জ্ঞী-শিক্ষার প্রতি কিরূপ অমুগাধী এবং জাপ বালিকারাও পাশ্চাত্য জ্ঞানসঞ্চয়ের নিমিত্ত কিরূপ উৎসুক।

তৎপর একটি গুরুতর প্রশ্ন এই যে, বর্তমান কালে যে ভাবে জ্ঞী-শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে তাহাই সর্বাঙ্গসুন্দর এবং ঐ ভাবেই চলিতে থাকিবে, না ভবিষ্যতে উহার শিক্ষাপ্রণালীর পবিবর্তন সাধন করিতে হইবে।

একাল পর্য্যন্ত রমণীগণের মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল শিল্প, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতি শাস্ত্রেই তাহাদিগকে পারদর্শিনী করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ইহা বস্তুত বড়ই ভুল। বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও রমণী-হৃদয় বিকশিত ও পরিমার্জিত করিতে হইবে; রমণীগণের আধ্যাত্মিক শিক্ষা কোন প্রকারেই ত্যাগ করিলে চলিবে না। রমণীগণের পর্য্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ-ক্ষমতা কবিত হওয়া প্রয়োজন; এইরূপ শিক্ষায় তাহাদেব মন গঠিত হইলে পর, তাহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। যাহারা ভবিষ্যৎ জ্ঞী-শিক্ষার নিমিত্ত দায়ী তাঁহারা এই বিষয়টা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

জ্ঞী-শিক্ষা বিষয়ে আর একটি বিষয় বিবেচ্য আছে। বালিকা-বিদ্যালয়গুলি এ ভাবে পরিচালন করা কর্তব্য যে, বালিকাদেব স্কুল-জীবন কখনো যেন তাহাদেব গৃহ-স্থলের অন্তরায় না হয়। বর্তমান বালিকা-বিদ্যালয় সমূহ দ্বারা একদিকে যেমন প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে, অপর দিকে উহা তেমনি নানা দোষেব আকর; এতদ্ব্যতীত প্রধান

দোষ এই যে, উহা বালিকাদিগকে ভবিষ্যতে সংসারাপ্রবেশ কর্তব্য সমূহেব প্রতি অমনোযোগিনী করিয়া তোলে। এই দোষ কি ভাবে পরিহার করা যায় এবং কি ভাবেই বা এই সমস্তাব সমাধান হইতে পারে, তাহাই ভবিষ্যৎ চিন্তার বিষয় এবং জাপানের ছাত্র পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহেও এই সমস্তা আলোচিত হইতেছে। বিদ্যালয় যত বড় হইবে, তাহা হইতে বিপদেব আশঙ্কাও তত বেশী হইবে। এই বিপদ যত দূর পবিহার করা যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই নরুসি তাঁহাব রমণী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত কবেন। যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ বহুদূরদেশাগত প্রায় পঞ্চশত ছাত্রী অবস্থান কবে, তথাপি প্রথম হইতেই প্রত্যেক ছাত্রী নিজ নিজ গৃহেব ছাত্র তথায় স্কুল-জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছে। জাপানের ‘রমণী-বিশ্ব-বিদ্যালয়েব’ ইহাই বিশেষত্ব এবং সমগ্র দেশীয় সমাজ কর্তৃক তাহা প্রশংসিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শয়নাগাবেব উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাপানের রমণী-বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডিং গৃহে বোর্ডারদেব শয়নাগাবে সপ্তদশটা প্রশস্ত কক্ষ আছে; প্রত্যেক কক্ষে ২৫টা ছাত্রীর বেশি থাকিবাব ব্যবস্থা নাই। ছাত্রীবা শয়নাগাবেব ধাত্রীকেই জননীতুল্য এবং পরম্পর পরম্পরকে ভগিনীর ছাত্র বিবেচনা করে। রন্ধন, বস্ত্র-পরিষ্কার, টেবিল চেয়ার প্রভৃতি যথা স্থানে সংরক্ষণ, কক্ষ সুসজ্জিত করণ এবং গৃহ সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য এই বোর্ডার ছাত্রীগণকেই সম্পন্ন কবিত্তে হয়। স্ততবাং তাহাদের প্রাত্যহিক জীবন গৃহ-জীবনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় এবং গৃহ সুসজ্জিত এবং যথাস্থানে দ্রব্য সামগ্রী রক্ষা বিষয়ে তাহারা ব্যবহারিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে থাকে। নরুসি বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সফলকাম হন নাই বটে, কিন্তু স্ততবাং বিষয় এই যে তাঁহাব চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই এবং ঐ মহা সমস্তা সমাধানের উপযোগী কোন নূতন ভাব বা প্রণালী ভবিষ্যতে আবিষ্কার কবিত্তে সক্ষম হইবেন এই আশায় তিনি পূর্ণ উৎসাহেব সহিত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। যে ভাবেই হোক—ভবিষ্যৎ শিক্ষাব প্রধান লক্ষ্য, বালিকাগণের স্কুল-জীবন ও গৃহজীবনেব মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা; তাহা নরুসি কবিত্তে পাবিবেন। বলিয়া আশা কবেন। তিনি লিখিয়াছেন,—“আমাদিগকে

আরো মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের স্কুলসমূহে যে সকল ছাত্রী প্রবেশ কবে, তাহারা সকলেই জাপ-বালিকা, একটাও অন্তর্জাতীয় নাই। এমতাবস্থায় তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী ও উদ্দেশ্য স্থির করিতে হইলে, তাহাদের অতীত সাহচর্য্য, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের অভাব সমস্তই একত্রে বিবেচনা করিতে হইবে। বালিকাদের স্বশ্রেণীর উপযোগী স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন। বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ছাত্র বিজাতীয় শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন করিয়া, ভ্রমে পতিত হওয়া আমাদের উচিত নহে;—ইহাতেই শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইতেছে। আবাব সংকীর্ণচেতা ও ধর্ম্মাঙ্ক ব্যক্তিবর্গের সমর্থিত শিক্ষা-প্রণালীও গ্রহণ কবা উচিত নহে। আমাদের নিজেদের ঘা ভাল তাহা রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য জাতিদের ভাল জিনিষ গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের বিধিসম্মত শক্তির পূর্ণবিকাশ এবং বৈদেশিক ভগিনীবৃন্দের সংগুণরাজি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা—ইহাই জাপ-বালিকাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হওয়া উচিত।

রমণী কেবল রমণীব ছাত্রই শিক্ষিত হইবে না, পক্ষান্তরে সে যে সমাজের একজন সভ্য এবং গ্রামের একজন অধিবাসী—তুচ্ছপযোগী শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। একাল পর্যন্ত জাপ বালিকাদিগকে কেবল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই অংশে বড়ই অসম্পূর্ণ। এই শিক্ষার ফলে বালিকারা গৃহকার্য্য বিষয়ে পূর্য্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশি নিপুণ হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাজের কার্য্যে তাহারা উপযুক্ততা প্রদর্শন করিতে পারে না। পবিবাবেব প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি যেমন একটা কর্তব্য আছে, বমণীরা সমাজেব নিকটও তদ্রূপ কর্তব্যপাশে বদ্ধ,—এ চিন্তা বা ভাব এযাবৎকাল উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। স্ততবাং বমণীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-প্রণালী নির্ধারণের সময় আমরা তাহাদিগকে প্রশস্ততর ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিব এবং নারীগণ যে সামাজিক জীব. সাধাবণ সমাজের প্রতি পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে তাহাদের যে কর্তব্য আছে, এ ভাব তাহাদের মনে প্রবেশ কবাইতে প্রয়াস পাইব।

আরো প্রশস্ততর ভাবে আমাদিগকে দেখিতে হইবে। আমবা বমণীগণকে কেবলমাত্র সামাজিক সভ্যরূপে বিবেচনা

করিব না, তাহা বা সমাজের প্রাণ এই ভাবিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিব। আমরা তাহাদিগকে কেবল বাহিরের পদার্থ—ব্যবহারিক যন্ত্ররূপে গণ্য না করিয়া, তাহারা যে অতি পবিত্র পদার্থ—কায়িক ও মানসিক অতি অদ্ভুত ক্ষমতায় বিমণ্ডিত, এই ভাবে তাহাদিগকে দর্শন করিব। আমরা যদি বালিকাদিগকে প্রথমতঃ সমাজের প্রাণরূপে এবং তাহাব পব রমণীরূপে শিক্ষাদান না করি, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কখনো সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না।”

অতঃপর নরসি ধর্মক্ষেত্রেও রমণীদিগেব অধিকারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাব মতে ধর্মপ্রচাবক-দিগেব হস্তে শিক্ষাভার অর্পণ কবা বুদ্ধিযুক্ত নহে; কাবণ তাঁহারা স্ব স্ব স্কুলের ছাত্রদিগকে স্ব স্ব প্রচাবিত এক বিশেষ ধর্মমতে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা পান। এবং সময় সময় তাঁহাদের শিক্ষাদান ব্যাপার কেবলমাত্র বালক বালিকা-দিগকে স্বধর্মের পতাকামূলে আনয়ন করিবার কৌশল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই প্রণালী দ্বা বা শিক্ষা এবং ধর্ম উভয় বিষয়েই লাভের অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। শিক্ষা এবং ধর্মে গোলমাল বাধাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। একদিকে ধর্মের ভাণ যেমন অনিষ্টকর, অপর দিকে ধর্মের বিরুদ্ধতাও তেমনি আপত্তিজনক। ধর্মবিরোধী বা ধর্মমত-শূন্য ব্যক্তিদের হস্তেও শিক্ষাভাব প্রদত্ত হওয়া সম্ভব নহে, কারণ তাহারা শিশুদের মনে নাস্তিকতা ঢুকাইয়া দেয় এবং এই ভাবে তাহাদের মত গঠিত করিয়া তোলে যে,—এই যে ধর্মমত সকল ইহা কিছুই নহে—মাত্র কুসংস্কার বা অলীক কল্পনা। ধর্মমতের উপর আক্রমণ করিবার কোন ক্ষমতা শিক্ষার নাই; তদ্রূপ করিলে উহার কর্তব্যকক্ষে ক্রটি ঘটে। বিভাগে কোনো বিশেষ ধর্মের শিক্ষা বা প্রচার যেমন অসম্ভব, তেমনি উহার বিরুদ্ধমত প্রকাশও নিন্দনীয়। শিক্ষাকর্তাদের এই ভ্রম হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা কর্তব্য। শিক্ষকেবা সর্বধর্মের প্রতি সমান ভাব দেখাইবেন, এবং ছাত্রদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত ধর্মমত স্বীকার করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি, আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম অর্থ কি—এই

সকল বিষয় কোন ধর্মবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখাইয়া ছাত্রদিগকে উপদেশ কবিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষায় ছাত্রদের বিশ্বাস বাড়িবে এবং তাহারা মহাসত্যের অল্পসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। ধর্ম-ক্ষেত্রের শিক্ষা বিভাগে এই পর্যন্ত হইতে পারে, তাহাব বেশি অগ্রসর হওয়া অমুচিত। ‘রমণী-বিশ্ববিদ্যালয়’ এই লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। সমদর্শিতা এবং সর্বধর্মের প্রতি সহানুভূতির ভাব—বিভাগের গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে বিরাজিত থাকিবে। যাহারা পবিত্র শিক্ষা-কার্যে জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, তাহারা সর্বত্র সকল সময়ে এই মতেরই পোষকতা করিয়া থাকেন।

আজকাল জাপানেব দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু জাপান যেরূপ অধ্যবসায়বলে আত্ম-শক্তি লাভ করিয়াছে, সেরূপ অধ্যবসায় ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। জাপান প্রথমেই বুঝিয়াছিল জাতী-শিক্ষা ও জনসাধারণের শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় অভ্যুত্থান সুদূরপর্যন্ত; তাই প্রথমেই দেশ মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের—অভিনব জ্ঞানবিতরণের ব্যবস্থা করে। জাপান জাতী-শিক্ষাবিসয়ে কিরূপ আয়োজন করিয়াছে এবং সাধারণ শিক্ষাই বা কি ভাবে তথায় নির্বাহিত হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র প্রস্তাবে আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীব্রজমূলের সন্মিলন।

খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর ।

খুদাবক্সের কীর্তি ।

অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে সমস্ত ভারতের মধ্যে একটি অতুলনীয় জিনিষ বাঁকিপুবে আছে। এটি খুদাবক্স-পুস্তকালয়। পুরাতন ফারসী ও আরবী হস্তলিপি এবং মুসলমানকালের ছবির যেমন অপূর্ণ মূল্যবান সংগ্রহ এখানে আছে, এমন আর ইউরোপের বড় বড় রাজধানী ভিন্ন কোথাও নাই। এবং খুদাবক্সের কতকগুলি গ্রন্থবল্ল ইউরোপেও অপ্রাপ্য। এই সব হস্তলিপির সংখ্যা এখন পাঁচ হাজার; ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যখন শুধু তিন হাজার বহি ছিল, তখন তাহাদের দাম আড়াই লাখ টাকা স্থির কবা হয়।

সুতরাং এখন দাম চারি লক্ষের কাছাকাছি হইবে। তা ছাড়া অনেকগুলি ছাপান ইংরাজী পুস্তক ও চিত্রসংগ্রহ আছে, তার দাম প্রায় এক লাখ টাকা। পুস্তকের দরটি রাজবাড়ীর মত সান্দ্রান, এবং ৮০,০০০ টাকায় তৈয়ারি। এ সমস্ত পুঁথি, মুদ্রিত পুস্তক, দালান এবং জমি খাঁ বাহাদুর খুদাবক্স, সি, আই, ই, সাধারণের নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানের এমন দাতা আর ভারতে হয় নাই। বড়লী সাহেবেব নাম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত বডলিয়ান লাইব্রেরী চিবস্ববণীয় করিয়াছে। তেমনি খুদাবক্স ভাবতীয় বড়লী বলিয়া গণ্য হইবেন। সার্থক তাঁহাব নাম খুদাবক্স, অর্থাৎ “ঈশ্বরের দান” (যেমন সংস্কৃত দেবদত্ত), কাবণ এরূপ সাধারণের উপকারী লোক অগণন, ঈশ্বরেবিত।

জীবনী ।

ছাপরা জেলার একটি মুসলমান বংশে খুদাবক্স ২রা আগষ্ট ১৮৪২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা নির্ধন হইলেও জ্ঞানের জ্ঞাত বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাদের একজন, কাকী হায়বৎউল্লা, অত্যন্ত মুসলমান পণ্ডিতগণের সহিত “ফতাওয়া-ই-আলমগিরী” সংকলনে সাহায্য করেন। খুদাবক্সের পিতা মুহম্মদ বক্স পাটনায় ওকালতী করিতেন। আরবী ও ফার্সী হস্তলিপি সংগ্রহ তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও তিনি পৈত্রিক ৩০০ খানা হস্তলিপিকে বাড়াইয়া ১৫০০ খানা করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি খুদাবক্সকে আজ্ঞা করিলেন যে প্রত্যেক বিষয়েই গ্রন্থসংগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে হইবে এবং এ গুলির জ্ঞাত একটি দালান কবিতা সাধারণকে দান কবিতা হইবে। খুদাবক্স অল্পান বদনে এই আদেশ গ্রহণ করিলেন, যদিও তাঁহাদের পরিবারে তখন বড়ই অর্থকষ্ট ছিল, এবং মুহম্মদবক্স এক পরসাত্ত বাখিয়া যান নাই। খুদাবক্স-লাইব্রেরী এই আদেশ পালনের অমব দৃষ্টান্ত এবং এক মহাপুরুষের চিরস্মরণীয় কীর্তি।

বালক খুদাবক্স কিছুদিন পাটনায় ও তারপর কলিকাতায় ইংরাজী পড়েন। কিন্তু ইতিমধ্যে পিতাব পক্ষাঘাত রোগ হওয়ায় তাঁহাকে বাকিপুরে কবিতা আসিতে হইল। সংসারের অবস্থা বড় খারাপ, একজন তিনি চাকরীর

খোজ করিতে লাগিলেন। এক মুন্সিফের কাছাকাছি নায়ের-গিবিব প্রার্থনা কবিতা পাইলেন না; অথচ তিনিই আবাব একদিন ভাবতবর্ষের এক বাজধানীতে চিফ্ জাষ্টিস হইয়াছিলেন! কিছু দিন পরে যদি বাজ্ঞেব পেষ্কাব হইলেন, কিন্তু জজ মিষ্টার লাটুয়ের সহিত না বনায় বিবর্ত হইয়া পদত্যাগ করিলেন। তাবপব তিনি ১৫ মাস ডেপুটি ইন্স্পেক্টর অব স্কুলস্ হইয়া কর্ম করবেন। শেষে ওকালতী পরীক্ষা (প্লিডাবশিপ) পাশ করিয়া ১৮৬৮ সালে বাকিপুরের কাছারীতে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। আদালতে ঘাইবার প্রথম দিনই ১০১ খানি ওকালংনামা সহি কবিলেন। এমন সফলতা আব কোন উকীলেবই বিষয়ে শুনা যায় না। ওকালতীতে তাঁহাব যথেষ্ট আয় হইতে লাগিল এবং তিনি প্রথম শ্রেণীর উকীলেব মধ্যে গণ্য হইয়া শেষে সরকারী উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। খুদাবক্সের স্মরণ-শক্তি এমন তীক্ষ্ণ ছিল যে যদিও প্রত্যহ অসংখ্য মোকদ্দমা করিতে হইত অথচ শুধু একবার চোখ বুলাইয়া নথি অভ্যস্ত করিয়া লইতেন, বাড়ীতে খাটিতে হইত না। একবাব হাইকোর্টের এক জজ (বোধ হয় সার লুই অ্যাকসন্) বাকিপুরে বেড়াইতে গিয়া আদালতে খুদাবক্সের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং যখন জানিতে পারিলেন যে উনি তাঁহাব বাকিপুরে জন্মিত কবিতাব সময়ে পবিচিত ও আদৃত উকীল মুহম্মদ বক্সেব পুত্র তখন তিনি শয্যাগত মুহম্মদ বক্সেব বাড়ী গিয়া দেখা করিলেন এবং খুদাবক্সকে একটি সবজজি দিতে চাহিলেন, এবং পবে ষ্টাটুটরি সিবিলিয়ান কবিতাবও আশা দিলেন। কিন্তু খুদাবক্সের তখন খুব পশাব, তিনি চাকরী স্বীকার করিলেন না।

এ দিকে সাধারণ হিতের জ্ঞাত বিনা পরসায় খাটিতে খুদাবক্স কখনও পরাণুখ ছিলেন না। স্কুল কমিটিব সভ্য হইয়া জ্ঞান বিস্তারের সাহায্য করার ১৮৭৭ সালের দিল্লী-দববারে তাঁহাকে সম্মানের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যখন লর্ড রিপনের আমলে স্বায়ত্বশাসন স্থাপিত হইল, খুদাবক্সই পাটনা মিউনিসিপালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি পুরাতন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েব ফেলো ছিলেন।

অবশেষে ১৮৯৪ সালে নিজাম তাঁহাকে হায়দরাবাদের উচ্চ বিচারালয়ের প্রধান জজ নিযুক্ত করিলেন; ভারতে ওকালতীব এই চবম উন্নতি ও সম্মান। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর এবং ১৯০৩ সালে C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৯৮ সালে হায়দরাবাদের কর্মত্যাগ করিয়া বীকি-পুবে ফিরিয়া আসিলেন এবং আবার ব্যবসায় আবস্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এবং শেষাশেষি মতিভ্রম ঘটে। গত ৩রা আগষ্ট বৈকালে ১টার সময় তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল।

খুদাবক্সের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ আবুল হসন, বারিষ্টার, কলিকাতা ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতি। চারি পুত্রের মধ্যে মিঃ সালাহ-উদ্-দীন, এম্ এ, বি, সি, এল্ (অক্সফোর্ড) বারিষ্টার, আরবীয় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মিঃ শিহাবুদ্দীন এখন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব্ পুলিশ; আরবী ফার্সী হস্তলিপি সম্বন্ধে ইনি অনেক সংবাদ রাখেন। তৃতীয় মুহীউদ্দীন এক এ অবধি পড়িয়াছেন, কনিষ্ঠ ওয়ালীউদ্দীন স্কুলের ছাত্র।

মুসলমান লেখকদের জীবনী ও গ্রন্থ সম্বন্ধে খুদাবক্সের অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতা ছিল। এই বিষয়ে তিনি বিলাতের নাইনটীন্থ সেঞ্চুরী কাগজে এক প্রবন্ধ লেখেন; এবং নিজের সংগৃহীত হস্তলিপির অনেকগুলির বিস্তৃত বর্ণনাসহ এক কেটেলগ ফার্সীতে ছাপান (নাম মহবুব-উল্-আলবাব, হায়দরাবাদে ১৩১৪ হিজরীতে লিখা করা)। একদিন আমার সম্মুখে তিনি মুহম্মদের সময় হইতে ৮০০ হিজরী পর্য্যন্ত যত আরব জীবনচরিতকার ও সমালোচক হইয়াছে তাহাদের নাম ও গ্রন্থের ধারাবাহিক উল্লেখ করিলেন এবং প্রত্যেকের গুণ দোষ ও গ্রন্থ-সীমা বর্ণনা করিলেন। ইহার অনেকগুলিই তাঁহার পুস্তকালয়ের জন্ত জোটাইয়াছেন। কিন্তু ভারতে মুসলমানদের মধ্যেই বা আরবীর গভীর চর্চা কয়জন করেন?

পুস্তকের গৃহ।

পিতৃ আক্তায় খুদাবক্স যে লাইব্রেরী বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন তাহা দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। বাড়ীটি দোতলা,

চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা। পশ্চিম বারান্দা, দুই সিঁড়ি এবং নৌচের মেঝেগুলি মার্বেল পাথবে মোড়ান, এবং নানা কারুকার্যে খচিত, কোথায় বা দাবা খেলার ঘবেব মত, কোথায় বা নানারঙ্গের পাথব বসাইয়া ছক্ কাটা। আর আর বারান্দা ও মেঝে রঙ্গীন ইটে আবৃত, যেমন কলিকাতার বাইটার্স বিল্ডিংএর মেঝে।

লাইব্রেরী সম্বন্ধে স্বপ্ন।

এই পুস্তকালয় খুদাবক্সের সমস্ত হৃদয় জুড়িয়াছিল; আগরণে স্বপ্নে তিনি এর বিষয় ভাবিতেন। এ সম্বন্ধে নিজের দুটি স্বপ্ন মধ্যে মধ্যে বলিতেন; তাহা এইরূপ :—

“প্রথমে আমি বড়ই কম পুথি পাই। কিন্তু একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে কে যেন আমাকে বলিল ‘যদি হস্তলিপি চাও তবে আমার সঙ্গে এস।’ আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া লক্ষ্মোয়ের ইমামবাবার মত একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বাবে উপস্থিত হইলাম। পথপ্রদর্শক একেলা ভিতরে গিয়া কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিল এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া আবার মধ্যে গেল। দেখিলাম যে ইমামবাবার— প্রশস্ত হলের মধ্যে এক মহাপুরুষ বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখ আবৃত, চারিপার্শ্বে তাঁহার সঙ্গিগণ উপবিষ্ট। পথপ্রদর্শক আমাকে দেখাইয়া বলিল ‘এই লোকটি হস্তলিপি চায়।’ মহাপুরুষ উত্তর করিলেন ‘উহাকে দেও।’ এর পর হইতেই আমার পুস্তকালয়ে নানাদিক হইতে হস্তলিপি আসিয়া জুটিতে লাগিল। [খুদাবক্সের স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ মুহম্মদ এবং তাঁহার চাবিপাশে মুহম্মদেব সঙ্গিগণ, আসহাব্।]

“এক রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে পুস্তকালয়ের পাশের বাস্তা লোকে লোকাবণ্য হইয়াছে। কাবণ জানিবার জন্ত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। সকলে বলিল ‘ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ তোমাব পুস্তকালয় দেখিতে আসিয়াছেন, আব তুমি এতক্ষণ অনুপস্থিত ছিলে!’ আমি তাড়াতাড়ি উপরে পুথিব ঘরে গিয়া দেখি যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুইখান হুদৌসেব হস্তলিপি টেবিলের উপর থোলা রহিয়াছে; লোকে বলিল যে প্রেরিত-পুরুষ, এই দুখানি পড়িতেছিলেন। [এই দুই পুথির উপর খুদাবক্স

স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন “এ বহি কখনও পুস্তকালয় হইতে বাহিরে যাইতে দিবে না ।”]

খুদাবক্সের সমস্ত হৃদয় সমস্ত মন এই পুস্তকালয়ে মগ্ন ছিল। শেষ বয়সে মতিভ্রমের সময় তিনি প্রায়ই পুস্তকালয় সম্বন্ধে নানারূপ কাল্পনিক বিপদ ভাবিয়া বাস্তব হইতেন। প্রতি পুস্তক যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে থাকিত। মৃত্যুর দুই দিন আগেও একখান “মসনদ” নামক গ্রন্থের আলমারী শেল্ফ ও স্থান ঠিক বলিয়া দিলেন।

শেষ বয়সে পুস্তকালয়ের বারান্দায় অথবা বাগানে খুদাবক্স প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা কাটাইতেন। সেই ধবল-কেশ ও শ্মশ্রুযুক্ত স্থিবি গম্ভীর মুষ্টি এখনও যেন মানসচকুতে দেখিতে পাই। বুদ্ধ খাঁ বাহাদুর সাধারণ মত সাদা পোষাক পরিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন, তাঁহার হাঁকাটি একটি নীচু তিন-পায়া টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া; তিনি হয় ত দুই একজন আগন্তুককে সঙ্গে কথা কহিতেছেন অথবা কোন হস্তলিপির পাতা উন্টাইতেছেন,—এ দৃশ্য কতদিন রাস্তা হইতে দেখা গিয়াছে

— এই পুস্তকালয়ের জাতীয় আবশ্যিকতা ।

লাইব্রেরী এবং পাঠাগারের মাঝে একটি ছোট আঙ্গিনায় খুদাবক্সের সমাধি হইয়াছে। গোরাটি নীচু এবং সাধারণ বকমের। ইহাই তাঁহার শেষ বিশ্রামের স্থল, যিনি ভাবতবর্ষের জ্ঞান রাজা রাজদ্বার চেয়েও বেশী মূল্যবান দান করিয়া গিয়াছেন। প্রতি জেলাতেই খুদাবক্সের মত ৩৪ জন প্রধান উকীল থাকেন; কিন্তু তাঁহার কীৰ্ত্তি ভাবতে অদ্বিতীয়। যতই আমাদের জ্ঞানের চর্চা বাড়িবে ততই আমরা খুদাবক্স-পুস্তকালয়ের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিব। এখন আমাদের দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদগণের সংখ্যা বড় কম; তাঁহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত ও পার্শ্ব চর্চা করেন, ফার্সী দিকে দুই তিনজন মাত্র গিয়াছেন, আরবী দিকে কেহই না। একজন বিলাতী পণ্ডিত খুদাবক্স-লাইব্রেরী পরিদর্শন করিয়া বলেন, “পুস্তকের জ্ঞান কি সুন্দর গোর নির্মাণ করিয়াছেন! ইউরোপ হইলে এই লাইব্রেরীতে প্রত্যহ শত শত লেখক ভ্রমার্ষেণ করিত; কিন্তু এখানে একটিও পাঠক দেখিতেছি না।” কিন্তু ভারতবর্ষের কি চিরদিনই এই দশা থাকিবে? ইতিনধ্যেই আমাদের কয়েকজন দেশের

প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িবে। খুদাবক্স-লাইব্রেরী স্থাপন হওয়ায় এই লাভ হইয়াছে যে দেশের অমূল্য অনেক গ্রন্থ চিবাদিনের জ্ঞান দেশে থাকিয়া যাইতেছে। অনেক মুসলমান ও হিন্দু ভ্রমলোক তাঁহাদের পৈত্রিক হস্তলিপিগুলি এই লাইব্রেরীতে দান করিয়া তাহাদিগকে সাধারণের ব্যবহারে লাগাইতেছেন এবং বিনাশ বা বিক্রয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

ইরাজদেব একটি মহা গুণ এই যে তাঁহারা যেখানেই যান, হস্তলিপি, প্রাচীন কলাবস্তু, বৈজ্ঞানিক সামগ্রী প্রভৃতি সমস্ত সংগ্রহ করেন এবং তাহা নিজের দেশের মিউজিয়াম ও পুস্তকালয়ে দান করিয়া স্বজাতির জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্য করেন। বিলাতের বডলিয়ান্, ব্রিটিশ মিউজিয়াম্ এবং ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরীতে অনেক হস্তলিপি প্রাচীন ম্যাংগোইণ্ডিয়ান্ কক্ষচারীদের দান। সেই ব্রিটিশ বাজ্যের অভ্যুদয়ের সময়ে তাঁহারা একদিকে এদেশ বিজয় ও শাসন-শৃঙ্খলাস্থাপন করিতেন, আর অপর দিকে যত অমূল্য হস্তলিপি ও ছবি পারিতেন সংগ্রহ করিতেন। এইরূপে কত কত সংস্কৃত ও ফার্সী পুথি একেবারে ভারত হইতে লোপ পাইয়াছে। সেগুলি বিলাত না গেলে আর দেখিবার উপায় নাই। ভারত ইতিহাস লেখার মালমশলা বিলাতে যত সহজলভ্য ও প্রচুর, এদেশে তেমন নহে। প্রাচীন ইজিপ্ট জ্ঞানিতে হইলে, লণ্ডন প্যারিস ও বার্লিনে যাইতে হয়, নব্য মিসরে নহে। ভারতের দশাও প্রায় তেমনি।

কিন্তু খুদাবক্স লাইব্রেরী স্থাপিত হওয়ায় এবং সাধারণের নামে লিখিত পণ্ডিত করিয়া দেওয়ায় আমরা এই ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইয়াছি। আর এসব গ্রন্থরত্ন হারাইবাব সম্ভাবনা নাই। লাইব্রেরীটি দেশময় বিখ্যাত; সকল পুথির মালিককে যেন ডাকিতেছে,—“যদি তোমাদের গ্রন্থ নিরাপদ রাখিতে এবং সাধারণের সেবায় লাগাইতে চাও তবে আমাকে দেও; তাহা না করিলে গুলি হয় ধ্বংস হইবে না হয় অল্প দেশে চলিয়া যাইবে।” এইরূপে খুদাবক্স ভিন্ন অল্প লোকের দানেও লাইব্রেরী পুষ্ট হইতেছে। তার ছাট দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

বারশাহ জাহাঙ্গীর ভবিষ্যৎ গণনা করিবার জ্ঞান এক-খণ্ড হাকিজের পতাবলী হঠাৎ খুলিয়া যে ছত্রে প্রথম দৃষ্ট

পড়িত তাহাব অর্থ লইন্তেন, এবং কোন ঘটনা সম্বন্ধে কোন তারিখে ঐ বহি দেখিলেন ও ভবিষ্যৎ বাণীব কি ফল হইল তাহা স্বহস্তে ছত্রটির পাশে লিখিয়া বাধিতেন! যেমন ইউরোপেব মধ্যযুগে ভার্জিলের পঞ্চগ্রন্থ লোকে দেখিত এবং এখনও অনেক মুসলমান কোরান দেখিয়া ভবিষ্যৎ জানিতে চাহেন, ঠিক সেই মত। এই জন্তই হাকিজের নামান্তর লিসান-উল-বাব্ব (অদৃশ্য জিহ্বা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-বক্তা)। এই অমূল্য পুথিখানি গোরক্ষপুরের মৌলবী সুতানুউল্লা খাঁ বৎসব ছই হইল খুদাবক্স লাইব্রেরীতে উপহাব দিয়াছেন। ইতিপূর্বে তাঁহাব দপ্তরী বইখানি বাধিবাব সময় অনাবশ্যক বোধে মার্জিনে জাহাঙ্গীরের হস্তেব লেখা এক ইঞ্চি পবিমাণে কাটিয়া ফেলিয়াছে !!! আব দেয়ী করিলে বোধ হয় পুথিখানি একেবাবে লোপ পাইত।

আবাব আওবাজীবের মুসী (Secretary) ইনায়াৎ উল্লাখাঁর “আহকাম্—ই—আলমগীরী” এতদিন নামে মাত্র জানা ছিল; ভারতে বা ইউরোপের কোন সাধারণ পুস্তকালয়ে এখানি দেখা বাইত না, এবং কোন ঐতিহাসিক উহা পাঠও করেন নাই। ১০০৭ খৃঃ পূজাব ছুটিতে আমি বামপুখ (রোহিলখন্দ) নবাবের পুস্তকালয়ে উহাব এক বাদশাহী হস্তলিপি প্রথমে পাই এবং নকল লইবার বন্দোবস্ত কবি। তারপব বাঁকিপুখ ফিরিয়া দেখি কি না কিছুদিন পূর্বে উহাব আর এক হস্তলিপি (দিল্লীব কোন সম্রাট লোকেব জন্ত লিখিত) খুদাবক্স লাইব্রেরীতে পটনার সফদর নবাব দান কবিয়াছেন! এইরূপে কত কত বহি এখানে আসিতেছে।

চিত্রে ও লেখার কারুকার্য।

প্রাচ্য চিত্রবিজ্ঞান আদর্শ এখানে এত সংগ্রহ হইয়াছে যে তাহা দেখিয়া, মিঃ জাভেল মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। মোঘল বাদশাহদিগের অনেক ছবির বহি ও সচিত্র ইতিহাসের হস্তলিপি, রণজিৎ সিংহেব কতকগুলি সচিত্র বহি, এবং দিল্লী ও লক্ষ্ণৌয়ের বড়লোকদের ছবির মালবাম্ (“মুবাচ্কা”) এখানে অনেক আছে। অনেক বৎসরের পরিশ্রমের পর একখানি একখানি করিয়া ছবি সংগ্রহ কবিয়া কোন কোন বালুম সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। প্রথমে মধ্য এসিয়ায় চীনে চিত্রকরদিগের প্রভাব এবং মোঘল বাদশাহদেব সঙ্গে মধ্য

এসিয়া হইতে সেই চীনে চিত্রপ্রণায় ভারতে আগমন, পবে আবতীয় (হিন্দু) চিত্রবিজ্ঞান বিকাশ, অবশেষে বিলাতী আর্টের আধিপত্য,—এ সমস্ত এই ছবিগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যায়। এব অনেকগুলি ছবির ফটোগ্রাফ লইয়াছি, ক্রমে প্রবাসীতে বাহিব হইবে। এবাব সাধু কবীর দেওয়া গেল। এত যুগের এত দেশেব এবং এত বকমের কাগজে এই সব পুথি লেখা যে এই লাইব্রেরীতে বসিয়া কাগজ তৈয়ারিব ইতিহাস বচনা করা যায়। কতকগুলি কাগজ পেকিনের (নাম “খাঁবালিব”), কতক বুখারা ও সমরকন্দেব, কতক কাশ্মীরী, বাদশাহদিগেব নিযুক্ত কারিগরেব প্রস্তুত!

খুদাবক্সেব পুস্তকালয়েব ইংবাজী বইগুলিও মূল্যবান এবং অনেক। দাম প্রায় লক্ষ টাকা হইবে। বিশেষতঃ তিনি বিলাতে এক সম্পূর্ণ লাঠিব্রেরী নিলামে কিনিয়া লন, তাহার চামড়াব বাধাই দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়।

গ্রন্থসংগ্রহের গল্প।

এই সব ফার্সী ও আববী হস্তলিপি সংগ্রহের রিবরণ উপগ্ভাসেব মত কোতুলজনক। মুসলমান বাজসেব সময়—যত সব শ্রেষ্ঠ হস্তলিপি দিল্লীর বাদশাহেব নিকট আসিয়া জুটিত। কতকগুলি শত শত এমন কি হাজার মোহব দিয়া কেনা হইত; কতকগুলি বাদশাহের বেতনভোগী লেখক ও চিত্রকরদেব দ্বাবা রচিত হইত; কতকগুলি বা যুদ্ধের পর বিজিত দেশ হইতে আনা হইত (যেমন বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা হইতে); আব অনেকগুলি প্রথমে ওমবাহদের ঘবে ছিল এবং তাঁহাদের মৃত্যুর পব অজ্ঞাত সম্পত্তিব সহিত বাদশাহী সবকাবে ভুক্ত হইত। আকবরেব সভা-কবি ফৈজির মৃত্যুর পর তাঁহাব ৪,৩০০ হস্তলিপি বাদশাহ জব্ব কবিয়াছিলেন। এইরূপে ১৬ ও ১৭ শতাব্দীতে এসিয়ায় সব চেয়ে বড় ও মূল্যবান পুস্তকালয় দিল্লীর বাদশাহদের ছিল। ১৮ শতাব্দীতে এব কতকগুলি লক্ষ্ণৌয়েব নবাবেবা হস্তগত কবেন। অবশেষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহেব পর দিল্লী ও লক্ষ্ণৌয়ের রাজবাড়ী লুট হইল, পুস্তক পুথিগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বোহিলখন্দেব নবাব ইংরাজদের পক্ষে ছিলেন। দিল্লী জয়ের পর তিনি ঘোষণা করেন যে প্রতি পুথির জন্ত এক

টাকা দিবেন ; এইরূপে সিপাহী ও গোবাবা তাঁহাকে কত বাদশাহী ও ওমরাহদের হস্তলিপি বেঁচিল ।

অনেক দিন ধরিয়া এই নবাবের সঙ্গে খুদাবক্সের পুথি কেনা লইয়া পাল্লাপাল্লা চলে । অবশেষে খুদাবক্স মুহম্মদ মক্কী নামক একজন অত্যন্ত চতুৰ আববজাতীয় পুথির দালালকে নবাবের পক্ষ হইতে ভাড়াইয়া আনেন, এবং আঠারো বৎসর পর্যান্ত তাহাকে মাসিক ৫০ টাকা বেতন দিয়া, সিরিয়া, আববাব, মিসর, এবং পারস্তে পুথি খুঁজিতে ও কিনিতে নিযুক্ত করেন । এই লোকটি অনেক মূল্যবান ও দুর্পাণ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দেয় ।

যে কোন হস্তলিপি-বিক্রেতা বাঁকিপুৰে আসিত খুদাবক্স বহি কিছুন আর না কিছুন তাহাকে আসিবাব ঘাইবার রেলভাড়া দিতেন । এইরূপে তাঁহাব নাম ভারতময় বিখ্যাত হইল এবং কোথায়ও কোন হস্তলিপি বিক্রয় হইতে গেলে প্রথমে তাঁহাকে দেখান হইত ।

মজাব বিষয় এই যে, একবার একজন পূৰ্বতন দপ্তরী রায়ে এই পুস্তকালয়ে ঢুকিয়া প্রায় ২০ খান মহামূল্য হস্ত-লিপি চুরি করিয়া লাহোবে একজন দালালের নিকট বেচিতে পাঠান । দালাল সৰ্ব্বপ্রথমে খুদাবক্সকে সেগুলি পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করে যে তিনি কিনিবেন কি !!! এইকপে চোর ধরা পড়িল ।

আব একবার ঠিক এই মত ধর্ম্মের কাঠি বাতাসে নড়িয়া-ছিল । মিঃ জে, বি, এলিয়াট্ নামে পাটনার প্রাদেশিক জজ মুহম্মদ বক্সের নিকট হইতে কমানুদ্দীন ইসমাইল ইস-ফাহানীর দুর্লভ পদ্মাবলী ধাব লইয়া পবে কিরিয়া দিতে অস্বীকার করেন, বলেন যত দাম চাও দিব । মুহম্মদ বক্স রাগিয়া এক পয়সা লইলেন না । পরে যখন এলিয়াট্ সাহেব পেন্সন লইয়া বিলাত যান তাঁহাব সব ভাল পুথি গুলি কয়েকটি বাক্সে প্যাক করিয়া বিলাত পাঠান হইল ।

অকেজো কাগজ পত্র ও বহি নিলামে বিক্রয় করিবার জন্য অপর এক বাক্সে বদ্ধ করিয়া পাটনায় রাখিয়া গেলেন । ধর্ম্মের এমনি কাজ ঐ কেড়ে লওয়া হস্তলিপি এবং আরও ৩৪ খানি অমূল্য পুথি তাব একখানিতে শাহ জাহানের সহী আছে ।) ভ্রমক্রমে এই বাক্সে রাখা হয়, এবং নিলামে মুহম্মদ বক্স তাহা কিনিয়া লন !!! সাহেব বিলাত

পৌছিয়া ভ্রম টের পাইলেন, কিন্তু তখন আব কি হইবে ?

পুস্তক সংগ্রহ করা একটা নেশা । ইহাতে খুদাবক্সেরও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না । পাটনার একজন প্রাচীনবংশের মূৰ্খ মুসলমানের নিকট একখান দুর্লভ হস্তলিপি ছিল । সে তাহাব এক অক্ষবও পড়িত না অথচ কিছুতেই তাহা খুদাবক্সকে বেচিতে বা দান করিতে সম্মত হইল না । অবশেষে খুদাবক্স ৩ দিনের জন্ত পুথিখানি ধাব করিলেন, এবং মলাট হইতে কাটিয়া বাহিব করিয়া লইয়া সেই মলাটের মধ্যে নিজের একখান সেই আকারের কিন্তু অসার হস্তলিপি সেলাই করিয়া ফেরৎ দিলেন ; মালিক তাহা পাইয়াই সন্তুষ্ট !

ব্রহ্মান সাহেবের মৃত্যুব পৰ কলিকাতায় তাঁহাব হস্তলিপি সংগ্রহেব নিলামেব সময় খুদাবক্স গিয়া জজ আমীর আলীর সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া দাম হাঁকিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন “আজ দেখিব জজ জেতে কি উকীল জেতে ।” অবশেষে জজ মহাশয়ই পিছাইয়া গেলেন ।

একবার হায়দরাবাদে কাছাবী হইতে ফিরিবার সময় খুদাবক্সের তীক্ষ্ণ চক্ষু দেখিতে পাইল যে এক মুদীর অন্ধকার দোকানের মধ্যে ময়দার বস্তাব উপর কয়েকখান পুথি আছে । অমনি গাড়ী থামাইয়া সেগুলি উন্টাইয়া দেখিয়া দাম জিজ্ঞাসা করিলেন । মুদী উত্তব করিল, “এই সব পুরাতন কাগজ অন্য কাহাকেও হইলে ৩ টাকায় বেচিতাম । কিন্তু হজুব যখন লইতে চান তখন এব মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দামী জিনিষ আছে । আমি ২০ টাকা চাই ।” খুদাবক্স সেই দামই দিলেন । পুথিগুলিব মধ্যে একখান আরবী জীবনচরিত ছিল যাহা অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না । স্বয়ং নিজাম তাহা ৪০০ টাকায় কিনিতে চাহিলেন, কিন্তু খুদাবক্স সে বহি ছাড়িলেন না ।

শ্রেষ্ঠ পুথির বিবরণ ।

এখন এই লাইব্রেরীর গ্রন্থসমূহের কতকগুলি বর্ণনা করিব । জাহাঙ্গীরের ভাগ্য-গণনার বহির কথা আগেই বলিয়াছি । তুর্কীর সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদের কনষ্টান্টিনোপল ও অন্তান্ত ইউরোপীয় দেশ জয়ের বিবরণ এক মহাকাব্যের আকারে লিখিয়া সেই সচিত্র পুথি গ্রন্থকার

১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান তৃতীয় মুহম্মদকে উপহার দেন। তুর্কী রাজবাড়ী হইতে বইখানি চুরী হইয়া শাহ জাহানের রাজত্বকালে ভাবতে আসে। পৃথিবীতে ইহার অবস্থিতি নাই। এর একখানি যুদ্ধের ছবি প্রবাসীতে দিব।

ফার্সী লেখায় নূব আলী ভারতে সব চেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার নকল কবী আমির কাব্য “ইউজুক ও জুলেখা” বাদশাহ জাহাঙ্গীর হাজার মোহর দামে কেনেন। এখানি এখন খুদাবক্স লাইব্রেরীতে স্থান পাইয়াছে। শাহ জাহানের সহী করা দুইখানি বহি আছে, একখানির লেখা তাঁহার ১৪ বৎসর বয়সের। দারামিকোর স্বহস্তে লিখিত “সাধুচবিত” (সফিনা-উল-আওলিয়া),—গোল-কুণ্ডাব সুলতানের দিউয়ান-ই-হাফিজ,—আমীর খসরুর “মসনবী” যাহা বৃথাবার সুলতান মীর আলীকে তিন বৎসর জেলে পুরিয়া রাখিয়া লেখাইয়া লন!—বণজিৎ সিংহের সৈনিক বিভাগের হিসাবের বহি (ফার্সী ও গুরুমুখী অক্ষরে লেখা), আলী মর্দান খাঁ শাহ জাহানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় যে সচিত্র ফির্দৌসীর “শাহনামা” বাদশাহকে উপহার দেন, সেখানি,—আমীর খসরুর গ্রন্থাবলী, আকবরের মাতা হামিদাবান্নুর মোহবযুক্ত,—হাতিফির কাব্য “শীবীন ও খসরু” বিজাপুর রাজ্যের জন্ত অতি হৃদয় অক্ষরে লেখা,—জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, যাহা তাঁহার আজ্ঞায় গোলকুণ্ডাব রাজাকে উপহার দেওয়া হয় এবং পরে আওরাঙ্গজেব ঐ দেশ জয় করিয়া কাড়িয়া লইয়া আসেন, একখানি অনেক চিত্র-পূর্ণ তাইমুর বংশের ইতিহাস, ভাবতীয় সর্কশ্রেষ্ঠ ছবিব আদর্শ সহিত শাহ জাহানের ইতিহাস,—এ সমস্ত খুদাবক্স সংগ্রহ করেন। শেষোক্ত দুইখানির অনেক ছবি প্রবাসীর জন্ত কটো লইয়াছি। আব কত বর্ণনা করিব? সবগুলিব নাম করিতে গেলে প্রবন্ধ শেষ হইবে না।

আববী বিভাগে তফসির-ই-কবীর নামক কোরানের এক টীকা আছে, তিন প্রকাণ্ড বালুমে, অতি ক্ষুদ্র অথচ পরিষ্কার ও আগাগোড়া এক রকমের অক্ষরে লিখিত। একজন লোক এত পরিশ্রম করিয়াছিল ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মুসলমান জগতের অনেক পণ্ডিত আন্দলুস

অর্থাৎ দক্ষিণ স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। যখন অত্যন্ত ইউরোপীয় দেশ অন্ধকারে আবৃত তখন এই মুর রাজ্যেই জ্ঞানের দীপ জলিয়াছিল। আবব বৈজ্ঞানিক জোহরাবীর লেখা অল্ফটিকিংসার এক পুথি আছে, তাহাতে সব অঙ্গের ছবি দেওয়া! বিখ্যাত বলিকা হারুনের পুত্র মামুনেব রাজত্বকালে ডিয়স্কোবাইডেস রচিত উদ্ভিদতত্ত্বের এক গ্রীক বহির আরবীতে অনুবাদ হয়, নাম “কিতাব-উল-হাশায়েশ”। ইহার এক অতি পুরাতন হস্তলিপি আছে, সমস্ত উদ্ভিদের রঞ্জিত ছবিসমূহ, শিকড়টি পর্যন্ত আঁকা! একখণ্ড ভেড়াব চামের কাগজে (পার্চমেন্টে) কতকগুলি কুক্ষিক অক্ষব আছে, প্রবাদ যে সেগুলি মুহম্মদের জামাতা আলীর হস্তাক্ষর! যে সময়ে আরবীতে আকার ইকার উকারের চিহ্ন (জের, জবর, পেশ) ব্যবহারে আসে নাই, সেই পুরাকালের লিখিত এক কোবান আছে; (মুর্শিদাবাদে নিজাম লাইব্রেরীতেও একরূপ আর একখান দেখিয়াছি।) যেসময় মত পাতলা একখান সুক অথচ অতি দীর্ঘ পার্চমেন্টে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে সমগ্র কোরান লেখা; অথচ সাধারণ চক্ষে পড়া যায়!

আর দুই খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ আকবর বাদশাহের আরবী প্রার্থনা-পুস্তক, এবং ফারসীতে লিখিত “বীশুর কাহিনী” (দাতান-ই-মাসিহ)। শেষ পুথি খানির ভূমিকায় লেখা আছে যে বাদশাহ ষষ্ঠধর্ম্মের সারমর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ক্যাথলিক পাদ্রী জেবো (অথবা জব্র) এবং হম্মু শুটার খৃষ্টান, এই দুই জন বাইবেল হইতে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়া এই ফার্সী বহি বচিয়া বাদশাহকে উপহার দেন; গ্রন্থখানি আকবরের মৃত্যুর একবৎসর পূর্বে, ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে, লেখা।

গত দিল্লী দরবার হইতে ফিবিয়া লর্ড কার্জন প্রথমেই বাঁকিপুবে আসেন। তখনও তাঁহার মনে মোঘল বাদশাহ-গণের গৌরবচিহ্ন জাগিয়া ছিল। খুদাবক্স লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি দিল্লীর দিউয়ান-ই-খাসের সোণায় লিখিত পত্ৰটি আবৃত্তি কবিলেন:—

আগর ফির্দৌস বরু-এ-জমীনস্ত।

হমিনস্ত ও হমিনস্ত ও হমিনস্ত ॥

অর্থাৎ

ধরাতলে যদি কোথা স্বর্গলোক থাকে ।

এই তাহা, এই তাহা, এই তাহা বটে ॥

হইহই খুদাবক্স-পুস্তকালয়ের প্রকৃত বর্ণনা ।

শ্রীযত্ননাথ সরকার,

পাটনা কলেজের অধ্যাপক ।

মা ।

সুখচবের চক্রবর্তীদেব বধু দয়্যঠাকুরাণী যখন তাঁহার বহু মানত ও ব্রতসাধনার ফল একমাত্র পুত্র যষ্টীচরণকে লইয়া বিধবা হইলেন, তখন যষ্টীচরণের বয়স মাত্র তিন বৎসর, দয়্যঠাকুরাণীর বয়স তখন ত্রিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি অকস্মাৎ আপনার গৃহেব গৃহিণী ও বিষয় আশ্রয়েব কর্ত্রী হইয়া কিছু স্বাধীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জ্ঞাতি ভাস্কর রামবাম চক্রবর্তী যখন অকস্মাৎ ভ্রাতৃবিয়োগে ব্যথিত হইয়া বধুমাতার বিষয় তত্ত্বাবধানের ভাব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন দয়্যঠাকুরাণী তাঁহার এই পরোপকারব্রতে কিছুমাত্র উৎসাহ না দিয়া বলিলেন, “থাক, সে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, যষ্টীচরণ যতদিন না মানুষ হয়, ততদিন আমিই কোনো মতে চালিয়ে যেতে পারব।” রামবাম চক্রবর্তী নাসিকা কুণ্ঠিত কবিয়া সাহসিকা রমণীর নিন্দা প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়া গেলেন। কুলপুৰোহিত সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য আসিয়া কহিলেন, “বোমা, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার ত কিছুবই অপ্রতুল নাই, তুমি স্বামীর প্রীত্যর্থ সাবিত্রীব্রত ও পুত্রের কল্যাণার্থে কুক্কটব্রত অমুষ্ঠান কর।” দয়্যঠাকুরাণী বিনম্র বচনে বলিলেন, “স্বামীকে যদি তাঁহার জীবদ্দশায় শুধু প্রীতি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া থাকিতে পাবি, পরলোকেও তিনি শুধু অন্তবের ভক্তি পাইয়াই তৃপ্ত হইবেন, প্রেমের নিষ্ঠাই আমার শ্রেষ্ঠ ব্রত। আর পুত্রের মঙ্গলেব জন্ত মাঝে মাঝে প্রাণ যাহা কবিবে তাহা শাস্ত্রাচারে অপেক্ষা ছেদে শ্রেষ্ঠ।” ভট্টাচার্য্য মহাশয় বার্ষিকমনোয় হইয়া ক্ষুদ্রমনে চলিয়া গেলেন। ক্রপণ বিধবাব নিকট তাঁহার প্রাপ্তির আশা আব রহিল না।

দয়্যঠাকুরাণীর নিন্দা প্রত্যেক চণ্ডীমণ্ডপে স্নানের ঘাটে বিবোধিত হইতে লাগিল। দয়্যঠাকুরাণী স্তনিতে লাগিলেন কিন্তু কিঙ্কিন্মাত্রও দমিলেন না। নিন্দা কুৎসা গায়ে না মাখিবার মত তাঁহার চবিত্র স্বাধীন ও বলশালী ছিল।

গ্রামে তাঁহার আত্মীয়েরও অভাব ছিল না। বাহাব সকলের নগণ্য, যাহারা সকলের হেয়, যাহারা উপেক্ষিত, তাহাবাই ছিল দয়্য দেবীর আপনাব জন। তিনি হাড়ি ডোম হলে বাগদি প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির বাড়ী মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতেন। তাহাদের নোংবা ছেলে মেয়েদের ছুইয়া আদর করিতেন, কাহাবো গীড়া হইলে তাহার মলিন শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিতেন, বাড়ী কিবিয়া স্নান করিতেন না, অবস্থা বিশেষে শুধু হাত পা ধুইয়া, খুব বেশি, ত কাপড়খানা ছাড়িয়াই তিনি আপনাকে শুচি বোধ করিতেন, একটু গঙ্গাজল পর্য্যন্ত স্পর্শ কবা আবশ্যক বোধ করিতেন না। কেহ অন্তত পক্ষে একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে বলিলে তিনি উত্তর করিতেন, “এক ঘড়া পুকুর জলে যদি আমি শুচি না হয়ে থাকি, এক ফোঁটা গঙ্গাজলে আর আমার বেশি কি শুচি করবে?” এ উত্তরে পল্লী-বিধবাগণ অবাক হইয়া শুধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করিত।

দয়্য দেবীর অনাচারের জন্ত যখন তথাকথিত ভদ্র-সমাজেব নরনারী বিমুখ হইয়া তাঁহার স্নেহ-সংসর্গ ত্যাগ করিল তখনো তিনি ভীত হইলেন না, অথবা আপনাকে নিঃসঙ্গ বোধ করিলেন না। সকল দরিদ্র, সকল নির্যাতিত, সকল উপেক্ষিত নরনারী তখন তাঁহার পবমান্বীয়, এবং তাঁহার প্রেমবদ্ধ অমুচর সেবক অগণ্য।

হলে বাগদির ছেলেরা অপর কোনো শুচিবামুগ্রস্তা বমণীকে দেখিয়া “ওবে বামনী আসছে, পথ ছেড়ে দাঁড়া” বলিয়া স্নান কুণ্ঠিত মুখে অপথে গিয়া দাঁড়ায়; স্নানের সময় পাছে গায়ে জলের ছিটা লাগে বলিয়া নিতান্ত সঙ্কোচভরে স্নান করে; আব দয়্য দেবীকে দেখিয়া তাহাবা মা বলিয়া হাসিয়া নাচিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে; শিশুহৃদয় সমগ্র গ্রামেব মধ্যে কেবল একজনের কাছে হৃদয়ের পরিচয়, স্বাধীনতার সংবাদ পাইয়া কৃতার্থ হয়। অন্ত্যজ পুরুষেবা দয়্য দেবীর অভিলাষমাত্র তাঁহার কর্ম সম্পাদন করিয়া আপনাদিগকে

রুতার্থ জ্ঞান করে, নারীগণ আপনাদেব গৃহপ্রাক্ষণের তরী-
তরকারী দিয়া আপনাদেব ভক্তিপ্রদা দেখাইতে প্রতি-
যোগিতা কবে।

একদিন দয়া দেবী সমাগতা রমণীগণকে জিজ্ঞাসা কবি-
লেন, “হ্যাঁ রে, মোছলমান বউ অনেকদিন এদিকে আসে
নি কেন ? তার কিছু খবর জানিস ?”

একজন বলিল, “তার মা বড় ব্যামো, বাঁচে কি না
বাঁচে। আহা মাগী মোলে তাব ছেলেটার কি যে আবস্থা
হবে কে জানে ? আহা মাগী বড় ভালো মানুষ ছিল।
মোছলমান ত’ নয়, যেন হিঁদ্র ঘবের বিধবা, এমনি তার
নিষ্ঠে, এমনি তার মন।”

সমবেত রমণীগণ সকলেই সেই মোছলমান বউয়ের
জন্ত সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। দয়া দেবী অনেক-
ক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, “হু-
লো বৌ, তুই একটু আমার সঙ্গে যাবি, আমি একবার মোছলমান
বউকে দেখতে যাব।”

হুলে বউ বলিল, “তা কেন যাব না মা, কিন্তু সে যে
অনেকটা পথ।”

“তা হোক আমি একবার যাব” বলিয়া দয়া দেবী
যাত্রার উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন।

একখামা পরিষ্কার জাকড়া ছিড়িয়া তাহার কোণে
কোণে কিছু সাপ, বাগি, মিছরী, কিসমিস, একটু আমসত্ত্ব
বাঁধিয়া লইলেন, আর আপনার অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া লইলেন
পাঁচটি টাকা।

মুসলমান বধূটির গৃহ গ্রামান্তরে প্রায় এক মাইল
পথ হইবে। মুসলমানী তাহার পরিপূর্ণ যৌবনের মারখানে
পঁচিশ বৎসর বয়সে একমাত্র পুত্র জহর আলিকে কোলে
লইয়া বিধবা হইয়াছে। সে নিঃস্ব চাবীর গৃহিণী ছিল,
সে বিধবা হইয়া আপনার শিশুপুত্রটির লালন পালনের
জন্ত বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সামান্ত চাবীর ঘরে জন্মিয়াও
আসমানীর এমন একটি প্রস্তুত অথচ স্নিগ্ধ শ্রী ছিল বাহা
চাবীর ঘরে চুলভ, আর সেই ললিত শ্রীকে মহিমান্বিত
কবিতাছিল তাহার শ্রমগুটু নিটোল স্বাস্থ্য ও কোমল মধুর
প্রাণটি। এত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য বাহার তাহাকে আশ্রয়
দিবার পুরুষের অভাব কখনই ঘটে না। অনেকে তাহাকে

নিকা করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আসমানী সে সকল
প্রস্তাবের উত্তরে বলিয়াছিল, “খোদাব দোয়াতে বার
ছেলেকে আমি কোলে পেয়েছি, তার ছেলেরই মা হয়ে
আমি মবব, খোদাতালাব দোয়াতে জহর আমাব বেচে-
খাহুক।” অতঃপর আসমানী চিঁড়া কুটিয়া ধান ভানিয়া
আপনাব শিশু পুত্রকে পালন করিতে লাগিল।

আসমানী দয়াঠাকুরাণী বড়ী চাল চিঁড়া উঠান
দিত। দয়াঠাকুরাণী যখন আসমানীব হৃদয়ে ইতিহাস
শুনিলেন, তাঁহাব নিজের পতিপ্রেমনিষ্ঠ মাতৃহৃদয় আর একটি
হৃদয়ে আপনারই প্রতিবিম্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইল, অম্বরক্ত হইল,
সেই দিন হইতে মোছলমান বউ দয়াঠাকুরাণীর পবমানীয়
সখী হইল। গ্রামের লোক আরো ছি ছি কবিতা উঠিল।

দয়াঠাকুরাণী যখন আসমানীব দীন কুটীরে আসিয়া
উপনীত হইলেন তখন আসমানীব অস্তিমকাল। দয়া-
ঠাকুরাণী তাহাব শিয়রে বসিয়া মুখে উপব খুঁকিয়া বলিলেন,
“মোছলমান বউ, আমি এসেছি। চিনতে পার ?”

আসমানী চোখ মেলিয়া বলিল, “এ্যা কে ? দিদি-
ঠাকুরণ এসেছ ? খোদাব বড় সেহেরবানি, দিদিঠাকুরণ
আমাব জহব রইল, তাকে দেখো, সে তোমাব বধীর
নফর।”

দয়া দেবী অশ্রুমার্জিত করিয়া বলিলেন, “জহর বধীর
নফর নয়, বধীর ভাই। জহব, বোন, আমারই ছেলে।”

“এখন আমি স্বখে মরতে পারব। দিদি, জহবকে
আমাব বুকে দেও, আমি গবে গেলে জহর তোমারই
গলগ্রহ।”

পুত্রকে বুকে লইয়া আসমানীর মৃত্যু হইল, সূর্যাস্তের
শেষ বশির মত একটি ক্ষীণ হাতজ্যোতি তাহাব স্তব্ধমৃত্যু
ঘোষণা করিল।

২

জহর আলি এখন হিন্দুমাতার নিকট জহর লাল।
সে বধীচরণের ক্রীড়া সহচর, সে অশনে বসনে, আদব
মমতায় বধীচরণের সমকক্ষ, উভয়ে একত্রে পাঠশালে বাস,
কিন্তু সেই শিশু আপনার মাকে কি ভুলিতে পারিতাছিল ?

দয়াঠাকুরাণী যথেষ্ট স্বাধীন ও কুসংস্কারমুক্ত হইলেও
ঠিক সহজভাবে জহরকে আদব যত্ন করিতে পারিতেন

না। একই ঘরে হইলেও তাহার জন্ম একটা স্বতন্ত্র বিছানা ছিল, শয়নগৃহ যথাসাধ্য আসবাব শূন্য করা হইয়া-
ল, পাছে জহর সে সকল স্পর্শ করে। অত্যন্ত ঘরেও সর্বদা সতর্কভাবে শিকল দেওয়া থাকিত, বালক জহর প্রবেশ না করে। আহাবের সময় যষ্টিচরণ ও জহরকে একটু তফাতে তফাতে বসানো হইত, যষ্টিকে মা খাওয়াইয়া দিতেন এবং জহর অল্প স্পর্শ করিবার আগেই তাহার ভাত মাখিয়া গ্রাস ভাগ করিয়া দেওয়া হইত এবং বালক জহর ভালো করিয়া খাইতে না পারিলে দয়া ঠাকুরাণী একটু তফাতে বসিয়া বাক্যে ইঙ্গিতে তাহাকে উপদেশ দিতেন, কখন কখন বা বাড়ীর কুবাণ আলিঙ্গানকে ডাকিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিবাব ব্যবস্থা করিতেন। খাইতে খাইতে এক একদিন শিশু জহর অকারণ কাদিয়া ফেলিত, তাহার সে উচ্ছ্বসিত অশ্রু সহজে থামিতে চাহিত না। সেই শিশুচিত্তে স্নেহভারতম্য কি আবাত করিত ? শিশুচিত্ত কি এত সূক্ষ্ম অমূল্যবনশীল ?

একদিন বর্ষার বিরস সন্ধ্যায় চারিদিক মেঘে গম্ভীর আচ্ছন্ন হইয়া স্তম্ভিত হইয়া ছিল ; সিন্ধু নীতল বায়ু একটু জোবেই বহিতেছিল। অঙ্গনে কর্দম, গগনে অন্ধকার, এমনি দিনে নরনারীর প্রাণে একটা নিবিড় মিলন, একটা মধুর সঙ্গ, একটা প্রগাঢ় স্নেহ লাভ করিবার ব্যাকুল বাসনা জাগ্রত হয়। নিরুপায় শিশুচিত্ত আজ দোলাই জড়াইয়া ঘরের দাওয়ায় চুপটি কবিয়া বসিয়া থাকাকে বড় ক্লান্তিকর মনে করিতেছিল। যষ্টিচরণ বসিয়া বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। জহর বসিয়া বসিয়া স্তব্ধ গম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন ভাবিতে-ছিল। দয়াঠাকুরাণী মালাঞ্জপ করিতে করিতে বলিলেন, “জহর, ঘুম পেয়েছে ? যাও বাবা, ঘবে আপনার বিছানায় গিয়ে শোওগে, আমিও জপ সেয়ে যাচ্ছি।”

জহর শুধু বলিল, “এখনো ঘুম পায় নি।” শিশু-নেত্রের ঘুম আজ কিসে টুটিয়াছে ?

দয়াঠাকুরাণী মালাঞ্জপ শেষ করিয়া আপনাব নিদ্রিত পুত্রকে বুকে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, “জল জহর, ঘরে চল।”

জহর কিনা বাক্যব্যয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গিয়া ঘরের কাছে দাঁড়াইল।

দয়াঠাকুরাণী বলিলেন, “শোও বাবা, শোও।”

জহর নড়িল না।

দয়াঠাকুরাণী আবাব বলিলেন, “শোও বাবা, বাত হয়েছে, ঘুমোও।”

জহর তথাপি নির্বাক, নিশ্চল।

দয়াঠাকুরাণী যষ্টিকে বিছানায় শোয়াইয়া উঠিয়া আসিয়া জহরের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া তাহার দাড়িতে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে বাবা, বল কি চাই ?”

তখন সেই সাত বৎসরের বালক মাথা নীচু করিয়া ক্ষুদ্র জদয়েব সকল বলে সকল বিধা সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া অতি করুণ মিনতির স্বরে বলিল “মা, তুই আমাকে একবার আপনার মার মত কোলে নে না।”

শিশুর মুখে এ কি নিদারুণ করুণ বাণী। দয়াদেবীর প্রাণ ফাটিয়া যাইবার মত হইল, তিনি বাস্পাকুল লোচনে দু বাহ মেলিয়া জহরকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, তাহাকে কোলে উঠাইয়া তাহার মুখ চুষনে চুষনে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন, হিন্দুবিধবার সকল আঁচাব আজ হৃদয়ের কাছে, প্রেমের কাছে, থর্ব্ব হইয়া গেল ! জহরকে কোলে করিয়া দয়াদেবী বড় কান্নাটাই কাদিলেন, আর মাতৃস্নেহসতৃপ্ত জহর তাঁহাব কাঁধে মাথা রাখিয়া পরম স্নেহে হাসিমুখে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন দয়াদেবী আপনারই শয্যার এক পার্শ্বে তাহাকে শোয়াইয়া নিজে উভয় পুত্রের মধ্যে শয়ন কবিলেন। সেদিন হইতে সকল ব্যবধান ঘুচিয়া গেল। দয়াদেবী গ্রামে পতিতা হইলেন।

৩

যষ্টি ও জহর বড় হইয়াছে। তাহারা উভয়েই এফ, এ, পাশ করিয়াছে। যষ্টি ঠিক কবিল সে বি, এ, পড়িবে ; জহর বলিল, সে পুলিশের দারোগাগিরির পরীক্ষা দিবে। ইহা শুনিয়া যষ্টি বলিল, “ছি ছি, যে চাকরী দেশের লোকের হয়, তাই তোমার চরম অবলম্বন ঠিক করলে।” জহর গম্ভীর ভাবে বলিল, “না করে’ করি কি ? যত শীঘ্র হয় আমাকে উপার্জন করতে হবে, আর কত কাল পরের গলগ্রহ হয়ে থাকব।” যষ্টি আর তাহাকে কিছু বলিল না, কথাটা মাকে বলিল।

দয়াকরুণ জ্বরকে ডাকিয়া বলিলেন, “হ্যা রে জ্বর,
আমি তোমার পর, আর তুই আমার গলগ্রহ !”

জ্বর নিরুত্তর হইয়া শুনিয়া মাত্র । কিন্তু আপন সমস্ত
ত্যাগ করিল না ।

শৈশবে মাতৃস্নেহ লইয়া উভয় শিশুর মধ্যে যে ঈর্ষা
জন্মিয়াছিল, অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত বঞ্চিত জ্বরের সেই
ব্যথা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিয়াছিল, এবং
ক্রমশ জ্বরকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল । তাই সে
আজ স্বাধীন হইবার জন্ত, যষ্টির মার 'অনুগ্রহ এড়াইবার
জন্ত অকস্মাৎ বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল ।

যষ্টি থাকিতে না পারিয়া রাত্রে আরার জ্বরকে বলিল,
“জ্বর ভালো কবে ভেবে চিন্তে কাজ করো । আজ
যে-তোমাকে লোকে যতটা শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, সেই-
তোমাকে কাল পুলিশের পোষাক পরা দেখে ততটা শ্রদ্ধা,
ততটা বিশ্বাস করতে সঙ্কুচিত হবে, এমন ঘৃণ্য অধম যে
জীবিকা তার চেয়েও কি মার স্নেহদান হয় ?”

“হের শ্রেয় আমি জানি না, অত কথার মারপেঁচও বুঝি
না । দেশের হাজারো লোক পুলিশের কাজ কবচে, আমিও
করব । আর, পুলিশে যে কাজ করে সেই কি বদমাইস,
ভালো লোক কি পুলিশে নেই ?”

“থাকতে পারে । কিন্তু আমি জানি কত লোক দেবতার
মর্ত, পুলিশের কাজে গিয়ে পিশাচ হয়েছে । অনেকেই
মন বলেই ত' দুর্গাম । আমাদের অন্ন যদি এই বারো বৎসর
হজম হয়ে থাকে, তবে আবার কিছুদিন হজম হবে, তুমি
মেডিকেল কলেজে বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাও ।”

“ও বাবা, পাঁ—আঁচ বচ্ছর ?”

“তবে বি, এ, পাশ করে বি, এল, দিয়ে ।”

“সেও ত' চাব বচ্ছর ।”

“তবে পি, এল, পড় ।”

“তবু ছবচ্ছর ।”

“তবে মোক্তারী বেও ।”

“এক, এ, পাশ কোবে মোক্তার ?”

“ক্ষতি কি । পুলিশের চেয়ে ভালো ।”

“ছি ! কক্থনো না ।”

“তবে দারোগা হওয়াটা নিতান্তই বাঞ্ছনীয় ?”

“নিতান্তই ।”

“বেশ !”

তুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়িয়া গেল ।

এবারে মাঝ বুঝাইবার পালা । দয়াকরুণী জ্বরকে
বলিলেন, “বাবা, চাকবীই যদি তোমার নিতান্তই করতে হয়,
অল্প চাকরী কর না ; আরো ত' ঢেব আপিস আছে ।”

“অল্প চাকরীতে মা পয়সা নাই, পুলিশের চাকরীতে
ছপয়সা তবু আছে ।”

“ছি বাবা, একি তোমার কথা ? একি আমার ছেলের
উপযুক্ত কথা ! মাইনের অতিরিক্ত যে উপরি পাওনা সে ত'
চুরি ?”

“না মা চুরি না করেও পয়সা রোজকার করা যায়,
অনেক অমিদার বড় লোকে ইচ্ছে কোবে মাঝে মাঝে
উপহার দেয় ।”

“সে উপহার নয়, ঘুষ ।”

“যষ্টি তোমায় এই রকমই বুঝিয়েছে । আমার কথা
তুমি আর বুঝবে না । যাই হোক, আমি আর যষ্টির অন্নদাস
হয়ে থাকচি নে । যষ্টির অনুগ্রহ পেয়ে জীবন ধারণ করা
আমার অসম্ভব হয়ে উঠেছে ।”

“যষ্টির অনুগ্রহ না মনে কবে তোমার মার স্নেহদান মনে
করলেও ত' পারিস ।”

“সে ত' কল্পনা, সত্য যে অন্তরূপ ।”

দয়াকরুণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, “সত্য
কি তা' ভগবান জানেন, একদিন তুইও জানবি । জ্বর,
তুই আমার বড় দুঃখের ছেলে, ঈশ্বর তোকে শুভমতি দিন ।”
তাঁহার মনে পড়িল এই জ্বরের জন্ত তিনি কতখানি ত্যাগ,
কতখানি নিন্দা, কতখানি নির্যাতন সহ করিয়াছেন, সে
কথা তিনি যষ্টি বা জ্বর কাহাকেও জানিতে দেন নাই ।
আজ সেই দুঃখপালিত জ্বরকে বিদ্রোহী দেখিয়া তাঁহার
প্রাণে যে বেদনা জাগিয়া উঠিল তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর
কেহ বুঝিতে পারিল না ।

জ্বর চারি বৎসর দারোগা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যখন
নবাবগঞ্জে আসিল তখন যষ্টি এম, এ, পাশ করিয়া নবাবগঞ্জ
স্কুলের প্রধান শিক্ষক ।

জহর সুখচর ছাড়িয়া যষ্টী বা তাহার মাতার কোনো সংবাদই রাখে না। এতদিন পকে যষ্টীকে দেখিয়া বিশেষ খুসি হইল না। জহর এখন পুৰাদস্তুর পুলিশ, হৃদয় নামক পদার্থটা প্রশ্রয় না পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

নবাবগঞ্জ স্বদেশীভাবের প্রধান আড্ডা, জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট জহরকে ডেমি অফিসিয়াল চিঠি লিখিলেন, হুঁসিয়ার, জহর প্রত্যুত্তবে লিখিল, যো হকুম খোদাবন্দ! জহর গোপনে গোপনে বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি কাগজের পাঠকের নাম সংগ্রহ করিতে লাগিল; কে কে সাধ্যপক্ষে স্বদেশীভূত পালন করিতেছে তাহাদের সন্ধান লইল; এবং বিশেষভাবে যষ্টীচরণ কি করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল।

একদিন এক স্বদেশী-দ্রব্য-বিক্রেতা আসিয়া যষ্টীচরণকে বলিল, “মাষ্টার বাবু, শুনেছি দারোগাবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে। আমি বড় বিপদে পড়েছি, আমায় যদি রক্ষা করেন।”

যষ্টীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, কি হয়েছে?”

দোকানদার বলিল, “দাবোগাবাবু আমাকে ডেকে নিয়ে শাসিয়ে বলেছেন, তাঁকে ছশো টাকা না দিলে তিনি আমার দোকান আর বাড়ী লুট কবাবেন।”

শুনিয়া যষ্টীচরণের চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। যষ্টী জহরের সঙ্গে দেখা করিয়া তীব্র ভৎসনার স্ববে বলিল, “জহর, তুমি অধঃপাতে গেছ জানি, কিন্তু একেবারে জাহান্নমে গেছ জানতাম না। এ সব কি ব্যাপার? হুর্কল নির্দোষীকে পীড়ন করায় তোমার কি পৌরুষ?”

এ ভৎসনার জহরও ক্রুদ্ধ হইল, বলিল, “যাও যাও, নিজের চবকায় তেল দেও গে যাও। আমি ত’ আর তোমার ইস্কুলের ছাত্র নই যে চোখ রাঙানি দেখে ডরাব।”

যষ্টীচরণ উত্তত ক্রোধ কিষ্কিং সংযত করিয়া বলিল, “যষ্টীচরণ, নবাবগঞ্জে থাকতে তুমি কোনো জুলুম করতে পারবে না।”

জহর একটু হাসিয়া বলিল, “সে দেখা যাবে।”

ছুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ আরো বাড়িয়া গেল।

সেইদিন হইতে জহর সপ্তাহে সপ্তাহে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে যষ্টীচরণের নামে নানাবিধ রিপোর্ট কবিত্তে লাগিল। যষ্টী স্কুলের ছাত্রদের লইয়া

বাজারে লোককে বিলাতীদ্রব্য কিনিতে বাধা দেয়, ক্রীত বস্তু কাড়িয়া জালাইয়া লোকসান করে, বিলাতী পণ্য-ব্যবসায়ীদিগকে মারপিট ও ঘর জালাইয়া দিবার ভয় দেখায়, এবং সর্বোপরি যষ্টী কার্গাইল সাকুঁলাব অমান্ত করিয়া ছাত্রদিগকে রাজদ্রোহে তালিম করিতেছে।

উপর হইতে গোপন হুকুম আসিল যেমন কবিয়া পাব যষ্টীচরণকে জব্দ কব। জহর চিঠি পড়িয়া মুচ্কি হাসিয়া গোঁফে চাড়া দিল।

সেই দিন বাজারের মাতব্বর গোলদার সলিম-উল্লা দাবোগা সাহেবের আস্থানে ধানায় গিয়া ঘণ্টা দুই গভীর পরামর্শের পর বড় গভীরভাবে চলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রি প্রায় ছটার সময় সলিম-উল্লার বিলাতী-পণ্যের দোকানে আগুন লাগিল। দেখিতে দেখিতে আগুন প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। বাজারে মহা চাৎকাব, ব্যস্ততা ও সোরগোল লাগিয়া গেল, যষ্টীচরণ এই গোলমালে ঘুম হইতে উঠিয়া দিগ্‌দাহকর বহ্নিশিখা দেখিলেন এবং অমনি তূর্য্যধ্বনি করিয়া স্কুলের ছাত্রগঠিত আশাবাহিনীকে আহ্বান করিলেন। স্কুলের প্রথম তিন ক্লাশের ছাত্রগণ চকিত মধ্যে যষ্টীচরণের গৃহের সম্মুখে সাবি দিয়া দাঁড়াইল এবং যষ্টীর পশ্চাতে পশ্চাতে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিত নৈশ গগন ধ্বনিত করিয়া বহ্নিনির্কণ কবিত্তে ছুটিল। যষ্টীচরণের নেতৃত্বে আশাবাহিনী হাটে পৌছিতে না পৌছিতে জহর আলির আদেশে কনেষ্টবলগণ তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া গ্রেপ্তার করিতে লাগিল। এই অকস্মাৎ বাধা পাইয়া ছাত্রবৃন্দ ক্লেপিয়া গেল, পুলিশের সহিত “বন্দে মাতরম্” হাঁকিয়া মারামারি যুড়িয়া দিল। যষ্টী ব্যাপাব বুঝিয়া বালকদের ধামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কথা শুনিবার পূর্বেই উভয় পক্ষেই রক্তপাত হইয়া গেছে, এবং সকলে পুলিশ ও ক্রুদ্ধ দোকানীদের দ্বারা ধৃত হইয়াছে।

বন্দে মাতরম্ ধ্বনি কবিত্তে করিতে গভীর রাত্রে বিলাতীপণ্যব্যবসায়ীর দোকান ঘর জালানো, দোকান লুঠ, মারপিট ইত্যাদি বহুতর অপরাধের নালিশ সহ যষ্টীচরণ ও ছাত্রবৃন্দ জেলায় চালান হইল। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচার, আসামীদের আমিন নামঞ্জুর কবা হইল।

দ্বাঠাকুরাণী পুত্রের বিপদের কথা শুনিলেন, তিনি

নিজেই জেলায় গিয়া হাজতে পুত্রের সঙ্গে দেখা কবিলেন।
যষ্ঠীচরণ মাকে দেখিয়া ক্ষোভে বোষে উদ্বেজিত হইয়া
কহিল, “মা, জহর এই কাজ কবেছে।”

মা শাস্ত স্বরে কহিলেন, “বাবা, জহর তোমার অবাধ
ছোট ভাই। তার প্রতি তুই কষ্ট হোস না। সে আমাদের
ছেড়েছে বলে’ আমরা তাকে ছাড়তে পারি না। তুই
আপন কর্তব্য করেছিস, ফলের ভার ভগবানের উপর। যে
পবিত্র বন্দে মাতরম্ নাম গ্রহণ করে’ তুই সেবাব্রত গ্রহণ
করেছিস, তাতে নির্যাতন-ক্লেশ সহ্য করবার জন্তে প্রস্তুত
থাকতে হবে। তুই যদি হাসিমুখে সহ্য করতে পারিস,
আমি আপনাকে যত্ন মনে করব। আর এক কাজ তোকে
করতে হবে, জহরকে বাঁচিয়ে তোমার আত্মসমর্থন করতে
হবে।”

যষ্ঠীচরণ মার মহত্ব মুগ্ধ হইয়া কহিল, “আত্মসমর্থন করতে
গেলে জহরকে দোষী করা ছাড়া ত’ উপায় দেখি না।”

মা অকম্প কর্তে কহিলেন, “তবে তোমার আত্মসমর্থনে
কাজ নাই। কিন্তু নিরপরাধী বালকগুলি কি উপায়
হবে?”

অমনি কতকগুলি কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, “মা, আমবা তোমার
কুপুত্র নই, আমবা একটুও ভয় পাই নি, আমরা কেউ
কিছু বলব না, আদালত যা খুসি, তাই কক।”

দয়্যাতুরানী বলিলেন, “আলীকাদ করি, বাপ সকল, এই
হৃদয়বল লাঞ্ছনাতে বিগুণিত হোক। যে মাকে বন্দনা
করে’ ব্রত গ্রহণ করেছ, তাঁর মুখ উজ্জ্বল কর।”

৫

আজ যষ্ঠীচরণের বিচার। এজলাস লোকারণ্য।
সরকাবি উকিল যাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবেন, সকলের
একই উত্তর, “বলিব না।” আসামী পক্ষে উকিল বলিলেন,
তাঁহার মক্কেলবা আস্ত্রপক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন না;
সাফাই সাক্ষীও দিবেন না। আদালতের যাহা খুসি কবিত্তে
পারেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ফবিয়াদীপক্ষের সাক্ষীদের কথা বিশ্বাস
করিয়া এবং জহর আলি দারোগার কর্মপটুতার বিশেষ
প্রশংসা করিয়া যষ্ঠীচরণের ছয় মাস ও ৫ জন বালকের চুই
মাস করিয়া কারাদণ্ড বিধান করিলেন। অন্তান্ত বালকেরা
সনাক্ত কবার গোলমালে ও প্রমাণাভাবে মুক্তি পাইল।

জহরলাল যখন উৎক্লষ হইয়া গোঁফে চাড়া দিয়া পানায়
ফিবিল, তখনই একখানি গবর গাড়ী আসিয়া পানায় লাগিল।
গাড়োয়ান গিয়া সেলাম করিয়া দাবোঁগা সাহেবকে জানাইল,
একজন স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।
জহর আলিব মনটা আজ প্রফুল্ল ছিল; সে তাড়াতাড়ি
বাহিবে আসিয়া গাড়ীর সামনে দাঁড়াইল এবং গাড়োয়ান
গাড়ীৰ মুখেব পর্দা উঠাইয়া ধবিল।

জহর বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “মা!”

গাড়ী হইতে নামিয়া দয়া দেবী বলিলেন, “হাঁ বাবা
জহর, তোমার মা। আমি তোকে ভোব মানের বৃকে ফিরিয়ে
নিতে এসেছি।”

এই স্নেহের আহ্বান জহরকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।
সে মার পদতলে কাঁদিয়া পড়িল, বলিল, “মা, এলে যদি তবে
আব কিছু দিন আগে এলে না কেন?”

মা পদানত সন্তপ্ত পুত্রকে বৃকে উঠাইয়া বলিলেন, “এব
আগে এলে তোকে ফিরাতে পাবতাম না;—তুই মনে
কবতিস আমি বৃকি যষ্ঠীকে বাঁচাবার কৌশল পেতেছি।
আজ আমি পুত্রহারা, আজ তোকে ফিরতেই হবে, আজ ত’
আর তোমার মার স্নেহের শবিক নেই।”

জহর ক্ষণেক চিন্তা কবিয়া কহিল, “মা, আমি ফিরব,
আবার তোমাব ছেলে হব।”

মা পুত্রকে বৃকে চাপিয়া বলিলেন, “জহর মানে রত্ন;
এতদিন আমি গণিহাবা হয়ে ছিলাম।”

জহর বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, “মা, তুমি কি ভুলে
গেলে যে জহরের আর এক মানে বিষ? আমি ঢের
জালিয়েছি, নিজে জলেছি। কিন্তু আর না, এবার মা
তোমার কোলে ফিরব।”

জহর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল।
সাহেব তখন জহরকে ইস্পেকটর করিবার সুপারিশ
লিখিতেছিল। জহর সাহেবকে পদত্যাগ পত্র দিল। সাহেব
পরম বিশ্বাসে অবাক হইয়া জহরের মুখের দিকে চাহিল,
দেখিল কি এক প্রশ্ন দৃঢ়তা তাহার মুখে দীপ্তি পাইতেছে।

চার বন্দোপাধ্যায়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের গবেষণা ।

বর্তমান ভারতের কৃত্তী সন্তানদিগের মধ্যে, যে কয়েকজন বিজ্ঞা ও জ্ঞানে বিদেশে সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম প্রথমেই মনে পড়িয়া যায়। যে বিজ্ঞান আঙ্গ সমগ্র জগতের কর্মকাণ্ড ও ভাবচিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া সেগুলিতে নূতন শক্তির যোজনা করিয়াছে, উভয়ে সেই বিজ্ঞানেরই গবেষণাতে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। বোধ হয় এই জুই হইঁদের নাম সর্বপ্রথমে মনে পড়িয়া যায়।

ডাক্তার বায় এবং বসু মহাশয় জড়বিজ্ঞানের একই বিষয় লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন নাই। প্রাণী উদ্ভিদ এবং সজীব নির্জীবের মূলগত পার্থক্য আবিষ্কারের জন্ত ডাক্তার বসু মহাশয় গবেষণা আবিস্ত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জড় ও জীবতত্ত্ব যে নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করিবার উপক্রম করিতেছে, পাঠক তাহা অবশ্যই অবগত আছেন।

ডাক্তার রায় মহাশয় এ পর্য্যন্ত কেবল রাসায়ন শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। ছই বা ততোধিক বস্তু যে বিধানানুসারে পরস্পরের সহিত মিলিয়া পৃথক গুণবিশিষ্ট নানা পদার্থের রচনা কবে, তাহাই এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে বোধ হয় রাসায়ন শাস্ত্রই অতি প্রাচীন। প্রাচীনতার দাবি সত্ত্বেও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের হাতে পড়িয়া ইহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। শত শত বৎসর নানা পরীক্ষা করিয়া পদার্থের বিভিন্ন সংযোগ বিয়োগ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রাচীন পণ্ডিতগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের সূক্ষ্ম পরীক্ষায় তাহার অনেক ভ্রম ধরা পড়িয়াছে, এবং পুরাতনের স্থানে অনেক নূতন নিয়ম বসাইতে

হইয়াছে। স্ততরাং গত শতাব্দীতে জড়বিজ্ঞান এই বিভাগের যে সকল নূতন তত্ত্ব জানা গিয়াছে, তাহা লইয়া রাসায়নশাস্ত্রকে একপ্রকার নূতন করিয়াই গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। ছই বা ততোধিক বস্তু সংমিশ্রণে যে সকল নূতন পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে, পূর্বপণ্ডিতগণ তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আধুনিক

রাসায়নবিদগণের সূক্ষ্ম পরীক্ষায় তাহাতেও ভ্রম ধরা পড়িয়াছে। তা'ছাড়া পূর্বপণ্ডিতগণ যে সকল পদার্থের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন, এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলিকেও পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন। বলা বাহুল্য ইহাতে রাসায়ন শাস্ত্রের প্রসার খুবই বাড়িয়া চলিতেছে, এবং রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগের প্রকৃত নিয়মও ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। ডাক্তার রায় মহাশয় তাঁহার গবেষণা দ্বারা সংযোগ বিয়োগের নিয়মগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অনেক সহায়তা করিয়াছেন, এবং পূর্বপণ্ডিতগণ বহু চেষ্টাতেও যে সকল যৌগিক পদার্থের সম্ভাবন পান নাই, বায় মহাশয় সেগুলিকে পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিবার কৌশল দেখাইয়া, রাসায়নশাস্ত্রকে সম্পূর্ণতার দিকে অনেকটা অগ্রসর করাইয়াছেন। আজও তাঁহার গবেষণা শেষ হয় নাই। প্রতি বৎসরেই তাঁহার আবিষ্কৃত ছই চারিটি নূতন তত্ত্ব রাসায়নশাস্ত্রের পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছে।

ডাক্তার বায় মহাশয় তাঁহার গবেষণা দ্বারা এপর্য্যন্ত যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার আনুল বৃত্তান্ত একটি প্রবন্ধের বিষয়ীভূত করা হুঃসাধ্য। তা' ছাড়া সেগুলি এতই জটিল যে, তাহাদের বিবরণ বিশেষজ্ঞ পাঠক ব্যতীত অপব কাহাবো প্রীতিকর না হইবাবই সম্ভাবনা। আমরা এই প্রবন্ধে ডাক্তার রায় মহাশয়ের আবিষ্কৃত নানা তত্ত্বের মধ্যে কেবল কয়েকটি প্রধান বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিব।

গন্ধকদ্রাবকের (Sulphuric Acid) সহিত তাম্র লৌহ ও নিকেল প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু মিশিয়া এক-জাতীয় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। তুঁতে বা তুথ এবং হীরাকশ প্রভৃতি যৌগিকগুলি এই জাতীভূত পদার্থ। এই সকল বস্তু পরস্পরের সহিত মিশিলে, তাহাদের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে এবং ইহার ফলে কয়েকটি নূতন যৌগিকের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। ডাক্তার রায় মহাশয় সর্বপ্রথমে এই ব্যাপাট লইয়া গবেষণা আৰম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তুঁতে-জাতীয় জিনিসের পরস্পর সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছিল। গত ১৮৮৮ সালে

এডিন্‌বরা রয়্যাল সোসাইটির পত্রিকায় এই গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হইলে, সকলে রায় মহাশয়ের প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। যুরোপ বা আমেরিকায় কোন উচ্চ উপাধি লাভ করিতে হইলে, মৌলিক গবেষণা দ্বারা উপাধি-প্রার্থীকে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে হয়। এই গবেষণাটিতে রায় মহাশয় D. Sc. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পর ১৮৯৪ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশনে ডাক্তার রায় মহাশয় দ্ব্যত মাখন চর্কি প্রভৃতির স্বরূপ ও বিশুদ্ধি নির্ণয়ের এক রাসায়নিক পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দ্ব্যত মাখন তৈল সকলই আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। এই সকল খাত্তের সহিত প্রত্যেক ব্যবসায়িগণ নানা অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশ্রিত কবে বলিয়া, বিশুদ্ধি পরীক্ষার একটা পদ্ধতি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যুরোপ ও আমেরিকা অঞ্চলের তৈল দ্ব্যত ও দুগ্ধাদির উপাদানের সর্ব্বাঙ্গীন মিল দেখা যায় না। এক্ষণে এসকল জিনিসের বিশুদ্ধি পরীক্ষার বৈদেশিক পদ্ধতি ভারতবর্ষে খাটিত না। গ্লিসারিনের (Glycerine) সহিত Fatty Acids নামক অজ্ঞারযুক্ত দ্রাবকের সংযোগ হইলে, অধিকাংশ তৈলজাতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়। Fatty Acid নানা প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটা হইতে এক এক পৃথক জাতীয় তৈল উৎপন্ন হইতে পারে। ডাক্তার রায় মহাশয় তৈল-জাতীয় পদার্থের রাসায়নিক সংগঠনের এই পার্থক্যটিকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহার গবেষণা করিয়াছিলেন। আলি-পুর-জেল হইতে বিশুদ্ধ সন্নিধাব তৈল এবং আগুমান দ্বীপ হইতে খাঁটি নারিকেল তৈল আনিয়া, তুহাদের তুলনায় বাজারের সাধারণ তৈল কি পবিমাণে অশুদ্ধ ডাক্তার বনু মহাশয় তাহা দেখাইয়াছিলেন।

১৮৯৬ সাল হইতে ডাক্তার রায় মহাশয় পারদ সম্বন্ধীয় গবেষণা আরম্ভ করেন। এই গবেষণায় ইহার খ্যাতি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। পারদ জিনিসটা লইয়া আমাদের দেশে যত আলোচনা হইয়া গেছে, বোধ হয় আর কোন দেশেই সে প্রকার হয় নাই। এই ভারত-বর্ষ হইতেই অতি প্রাচীনকালে ইহার গুণ ও মাহাত্ম্য সর্ব্বপ্রথমে জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। পারদসংযুক্ত

নানা পদার্থ হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হইতে দেখিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাকে শ্রদ্ধা চক্ষু দেখিতেন। শেষে ভবনদী পার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত এই জিনিসে আরোপ করিয়া, প্রাচীন হিন্দুগণ ইহাকে “পার-দ” নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। “বসেন্দ্র চিন্তামণি” নামক প্রাচীন গ্রন্থের রচয়িতা “রসবিজ্ঞা শিবেনোক্তা” পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন। ইহাঁব সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছিল পারদতত্ত্ব স্বয়ং ভগবানই জগতে প্রচাৰ করিয়াছেন। তাত্ত্বিক মতে পারদ মহাদেবেরই অংশস্বরূপ এবং পঞ্চভূতের সমবায়ের গঠিত। তাই “রসার্ণব” নামক তন্ত্রগ্রন্থে পারদকে “পঞ্চ-ভূতাত্মকঃ সৃষ্টিষ্ঠিতোকঃ সদাশিবঃ” বলা হইয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহাঁব নানাগুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক পারদকেই অবলম্বন কবিয়া—তাঁহারা “রসেশ্বর দর্শন” নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন। পারদ জিনিসটা অক্সিজেন (Oxygen) ও গন্ধক প্রভৃতি কয়েকটি বস্তুর সহিত মিলিলে বিচিত্র বর্ণের বহু যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহার এই গুণটির সহিত বিশেষ পবিচিত ছিলেন। “নানাবর্ণ ভবেৎ সূতং বিহায় ঘনচালম্” এই শ্লোকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।* যখন জগতের অপরাংশে রসায়ন শাস্ত্রের অঙ্কবও দেখা যায় নাই, সেই সময়ে যে ভারতে পারদতত্ত্ব লইয়া এত আলোচনা হইয়াছিল, ডাক্তার রায় মহাশয় সেই দেশে জন্মগ্রহণ কবিয়া আধুনিক প্রথায় পারদের গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া আপনাকে পিতামহদিগের উপযুক্ত বংশধর বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এখন ডাক্তার রায় মহাশয়ের পারদ সম্বন্ধীয় গবেষণার আলোচনা করা যাউক। গাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, পারদ জিনিসটা অনেক দ্রাবকেরই সহিত মিশ্রিত হয় সত্য, কিন্তু সোয়াক্সের (Nitric Acid) সহিত এটি

* পারদ লইয়া প্রাচীন ভারতবাসিগণ কি প্রকার পবীকৃতি করিয়া ছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ কাহারো জ্ঞান ছিল না। এক ডাক্তার রায় মহাশয়েরই চেষ্টায় নানা দ্রব্যাদি হইতে সেই বিবরণের উদ্ধার হইয়াছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ইনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কাশ্মীর ও নেপাল অঞ্চল হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে পারদতত্ত্ব কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠক রায় মহাশয়ের “Hindu Chemistry” নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন।

যত সহজে মিশে অপব কোন দ্রাবকের সহিত সে প্রকারে মিশিতে পারে না। এই প্রকারে দ্রবীভূত করিতে হইলে, পারদে উত্তাপ প্রয়োগেবও আবশ্যক হয় না। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পারদ হইতে অনেকগুলি যৌগিক পদার্থেব উৎপত্তি দেখা যায়। প্রায় শতাধিক বৎসর ধরিয়া নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ এই সকল যৌগিকের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু দ্রাবণের ঠিক অব্যবহিত পরে পারদ কোন্ যৌগিক পদার্থটিকে উৎপন্ন করে তাহা অজ্ঞাত থাকায়, বৈজ্ঞানিক-দিগের শতবর্ষব্যাপী চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া আসিতেছিল। ডাক্তার রায় মহাশয় অতি অল্প দিন গবেষণা করিয়া সেই অজ্ঞাত যৌগিকটির (Mercurous Nitrite) সম্বন্ধান পাইয়া-ছিলেন। ধাতুৰ উপর সোরকাল্লেব ক্রিয়া যে রহস্ত-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন ছিল, এই আবিষ্কারে তাহা অপসাবিত হইয়া পড়িয়াছিল।

চন্দের সম্মুখে যে সকল জিনিস রহিয়াছে, তাহাদিগকে নাড়াচাড়া করিয়া কোন তত্ত্বাবিস্কার কবিবার শক্তি ভারত-বাসীদিগের নাই বলিয়া একটা অপবাদ কিছুদিন পূর্বেও বিদেশীদিগেব নিকট শুনা যাইত। ভারতবাসী বহুকাল এই অপবাদেব ভাব নীবে বহন করিয়া আসিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র আমাদের ঐ জাতীয় কলঙ্কের ফালন করিয়াছেন, এবং সুর্যোগ পাইলে ভাবত-বাসীও যে মৌলিক গবেষণায় যুরোপ ও আমেরিকাৰ বড় বড় বৈজ্ঞানিকদিগের সমকক্ষ হইতে পাবেন তাহাও প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। যুরোপীয় পণ্ডিতেরা পারদঘটিত যৌগিক পদার্থগুলিকে বহুকাল নাড়াচাড়া করিয়া যে ফল লাভ করিতে পারেন নাই, হিন্দু রাসায়নিক রায় মহাশয় অতি অল্প দিনের গবেষণাতেই তাহাই পাইয়াছিলেন। টোকিয়ো এন্জিনিয়ারিং কলেজের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার ডাইভার্স সাহেব, রায় মহাশয়েব গবেষণার ফল জানিতে পারিয়া ভারতবাসীর স্বহস্ত বিচারশক্তি ও পরীক্ষাকুশলতার প্রশংসা করিয়া অবিকল পূর্বোক্ত কথাগুলিই বলিয়াছিলেন।

পারদঘটিত নূতন যৌগিকটির (Mercurous Nitrite) আবিষ্কার বৃত্তান্ত, সর্বপ্রথমে কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই

পত্রখানিকে কখনই বৈজ্ঞানিক পত্র বলা যায় না। কিন্তু ডাক্তার রায় মহাশয়ের আবিষ্কারেব গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জর্মান্ রসায়নবিদগণ সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধটিরই আমূল অনুবাদ করিয়া, জর্মানির সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিকপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে তত্ত্বাবিস্কারে পেলিগট্ (Peligot), নিম্যান (Niemann) ও ল্যাঙ্গ্ (Lang) প্রমুখ বিখ্যাত রসায়নবিদগণ পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন, একজন হিন্দু বৈজ্ঞানিককে তাহাতেই জয়যুক্ত হইতে দেখিয়া, জর্মান্ সুধীগণ বিষয় প্রকাশ কবিয়াছিলেন, এবং আবিষ্কারকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কাল হইতে তাম্র, বোপা, পারদ, প্রভৃতি ধাতু দ্রবীভূত করিবার জন্ত মহাদ্রাবক (sulphuric acid), শঙ্কুদ্রাবক বা সোবকদ্রাবক (nitric acid), প্রভৃতি দ্রাবকের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ ধাতু সকল কেন দ্রবীভূত হয় বা কি অন্তর্নিবিষ্ট গুণ কারণে দ্রবীভূত হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। অধ্যাপক রায়ের গবেষণা দ্বারা এই তমসাচ্ছন্ন ও জটিল বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোক পাতিত হইয়াছে। ডাক্তার ডাইভার্স এই সম্বন্ধে যে সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তিনি ১৯০৪ খৃঃ অঃ Journal of the Society of Chemical Industry নামক পত্রে “Theory of the action of metals upon nitric acid” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাব ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন যে ডাঃ রায়ের গবেষণা ব্যতীত তিনি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না।*

পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, অল্প ও ক্ষারজ পদার্থের সংযোগ হইলে লবণ জাতীয় এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহাতে অল্প বা ক্ষার কাহারও গুণ থাকে না। ডাক্তার রায় মহাশয়েব আবিষ্কৃত মার্কিউবস্ নাইট্রাইট্ এই প্রকার জাতীয় লবণ (Salt) পদার্থ। অল্পের ভাগ ইহা নাইট্রস্ এসিড (Nitrous acid) হইতে প্রাপ্ত হয়, এবং

* “The occasion for presenting the theory in a more developed form to the Society has been given by the reading last month to the Chemical Society, of an important paper on mercurous nitrites by Prof. Ray of the Presidency College, Calcutta.”

ক্ষারের অংশ পারদ হইতে সংগ্রহ কবে। উক্ত নাইট্রস এসিডকে সোয়াক্সের সহিত তুলনা করিলে তাহাতে অল্পজ্বানের একটি পবমাণু কম দেখা যায়। ইহাই উভয় দ্রাবকের একমাত্র পার্থক্য। নাইট্রস এসিডকে $HO-NO$ বা $H-NO$, এই দুই প্রকারের সাস্থ্যতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। একটিতে হাইড্রোজেনের সহিত নাইট্রোজেন সংযুক্ত আছে, অপবটিতে সে প্রকার সংযোগ নাই। যৌগিক পদার্থের পরমাণু সকল কিরূপ ভাবে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, তাহা এই সকল সাস্থ্যতিক চিহ্ন দ্বারা বুঝা যায়, এবং এই আণবিক গঠন দ্বারা দ্রব্যের রূপ ক্রিয়া ও গুণ নিরূপিত হয়। এই সকল কারণে পদার্থের সাস্থ্যতিক চিহ্ন নব্যরসায়ন শাস্ত্রের একটি আবশ্যক অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নাইট্রস এসিডের আণবিক গঠন কিরূপ তাহার মীমাংসার জন্ত নানা ধাতুর * সহিত মিশিয়া উহা যে সকল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন কবে সেগুলিতে উদ্ভাপাদি প্রয়োগ করিয়া রায় মহাশয় পরীক্ষা আবস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অপ্রত্যাশিত ফললাভ করিয়াছেন,—আম্লসঙ্গিক রূপে Ethyl Nitrite এবং Nitroethane নামক দুইটি অজ্ঞাবমূলক পদার্থ নূতন প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার রায় মহাশয় ইহাব পরে হাইপোনাইট্রস এসিড (Hyponitrous Acid) নামক আর একটি নাইট্রোজেন-বাহিত দ্রাবকের আণবিক গঠন স্থির করিবার জন্ত গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। টোকিয়ো এনজিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার ডাইভার্স সাহেব এই দ্রাবক হইতে উৎপন্ন যৌগিক হাইপোনাইট্রাইটের (Hyponitrite) আবিষ্কার করেন। তৎপবে অনেক বিখ্যাত রসায়নবিদ ব্যাপারটিতে হাত দিয়া নানা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মূল দ্রাবকটিকে যদি হঠাৎ বিশ্লেষণ করা যায়, তবে তাহা হইতে নাইট্রস অক্সাইড (Nitrous oxide) বা হাস্তোদ্দীপক বায়ু উৎপন্ন হয় জানা গিয়াছিল। এই ব্যাপারটির সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও

ইহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া এখন স্বীকার করা যাইতেছে না। ডাক্তার রায় মহাশয় স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন, দ্রাবকটিকে যদি ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট করা যায়, তবে উহা হঠাৎ সোয়াক্স (Nitric acid) উৎপন্ন হইতে পারে। এই আবিষ্কারটি দ্বারা হাইপোনাইট্রস এসিডের আণবিক সংস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা গিয়াছে।

ডাক্তার ডাইভার্স হাইপোনাইট্রাইট লইয়া বহুকাল গবেষণা করিয়াছিলেন। এইজন্ত আধুনিক রসায়নবিদ মাঝেই উক্ত পণ্ডিতের মীমাংসাকে চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ডাক্তার রায় মহাশয়ের হাইপোনাইট্রাইট সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান রাসায়নিক সভার পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে, ডাইভার্স সাহেব এই গবেষণা সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ডাক্তার ডাইভার্স লিখিয়াছিলেন,—

"This interesting observation throws much light on the nature of the decomposition of silver and mercury hyponitrites by heat. Through Ray and Ganguli's observations, we are at length in possession of much knowledge of what the products are, when hyponitrous acid decomposes, without explosion by the heat generated by liberating it from its salts."

আমরা এই প্রবন্ধে যখন ডাক্তার রায়ের মৌলিকত্ব ও গবেষণাব উল্লেখ করিতেছি, তখন বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সংস্থাপন বিষয়ে ছই একটি কথা না বলিয়া ইহা শেষ করিতে পারি না। লক্ষ লক্ষ টাকাব বিলাতী ও বিদেশী ঔষধ এদেশে আমদানী হয়। ডাঃ রায় ভাবিলেন যে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেশের শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে ত্রতী না হইলে আমাদের আর উদ্ধার নাই। এই উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সামান্তভাবে উক্ত কারখানা স্থাপিত হয়। ১৮৯২ সালে যে সূত্রপাত হয়, তাহা এখন কলিকাতার উপকণ্ঠে মাণিকতলায় বিবটি ব্যাপাবে পরিণত হইতেছে। দেশ কাল ও অবস্থানভেদে অল্প মূলধনে যে প্রকার যন্ত্রের দ্বারা যে প্রণালীতে এদেশে ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাই প্রবর্তন করিবার জন্ত অনেক প্রকার প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। কেবল পাশ্চাত্য যন্ত্র ও প্রক্রিয়ার অমুকরণ দ্বারা এ কাজ

* Mercury, Barium, Calcium, Magnesium, Sodium, Potassium, Silver, Copper, Cobalt এই সকল ধাতু লইয়া রায় মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছেন।

হয় নাই। এস্থলে বলা আবশ্যক যে প্রেসিডেন্সী কলেজের অল্পতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাট্টা মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তি ও যত্ন-নিষ্ঠা-নৈপুণ্য ব্যতিরেকে এই কার্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারিত না। তাতা বিজ্ঞান-মন্দিরের শিক্ষাপরিচালক ডাঃ ট্রেভার্স রাসায়নিক জগতে প্রথিত-নামা। তিনি এই কার্যখানা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিয়ে প্রকটিত করা গেল :—

"I wish to make special mention of a piece of research work for which Prof. P. C. Ray and Mr. C. Bhaduri are responsible, for the reason that no account of it will be published. The construction and management of the Works of the Bengal Chemical and Pharmaceutical Co., is the work of the passed students of the Chemistry Department of the Presidency College acting under the advice of these gentlemen. The design and construction of the Sulphuric Acid plant, and of the plant required for the preparation of drugs and other products involved a large amount of research of the kind which is likely to be of the greatest service to this country, and does the greatest credit to those concerned."

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ডাক্তার রায় মহাশয়ের এই আবিষ্কারের মধ্যে কেবল মাত্র কয়েকটির স্থূল বিবরণ প্রদান করিলাম। ইহা হইতেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পবিচয় পাওয়া যাইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ডাক্তার রায় মহাশয় সকল কার্যে জয়যুক্ত হইয়া স্বদেশের মুখোচ্ছল কবিত্তে থাকুন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ছকার জন্ম ।

মর্ত্য হইতে পঞ্চাশতকোটি বোজন উর্দ্ধে ধূম্রলোক ;—
সেখানকার সবই বাষ্পময়,—বায়ু বাষ্পপূর্ণ, সাগর সরিৎ
সরোবর বাষ্পে ভরা, পর্ত্ত কেবল বাষ্পস্তূপ মাত্র, পশু
পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলে বাষ্পাকারে বিরাজ করিতেছে।
সেই ধূম্রলোকে একদিন মহা কোলাহল শোনা গেল।

তখন স্বর্গের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্মার সাহায্যে
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড-স্বজন এক রকম শ্বেষ হইয়াছে—মাথার
ভিত্তর ঘা' ঘু' প্ল্যান ছিল, জল মাটি ইট কাট চূণ সূঁকী
পাথর প্রভৃতির সমষ্টিতে তা সবই মুর্ত্তমান হইয়া উঠিয়াছে।

এইবার ব্রহ্মা নাকে সর্বপ তৈল দিয়া বহু অনিষ্ট রজনীর
শোধ তুলিবেন মনে করিতেছেন, কিন্তু তাহা ঘটয়া
উঠিল না।

ধূম্রলোকবাসী ধূম্রপায়িগণ সেদিন ধূম্রধামের সহিত এক
সভা আহ্বান করিয়াছিলেন ;—সর্বত্র তাম্রকূটপত্রে ছাপা
বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া ধূম্রপায়ীর দল একত্র করা হইয়াছে ;—
নানা তাম্রকূটাগারসম্বিত ধূম্রকেতুধ্বজমণ্ডিত সভাস্থল
জনসমাগমে গম্ গম্ করিতেছে, গঞ্জিকা-ধূপে ও চরস-রসে
সভাগৃহ আনোদিত ; সে দিন সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—
“ধূম্রপায়ীর কষ্ট নিবারণ।”

যথানিয়মে হাত তালির চটপট-পটাপট শব্দে মনোনীত
হইয়া সভাপতি আসন গ্রহণ করিলেন। সভার সম্পাদক
শ্রোতাদিগের হাতে হাতে তাম্রকূটপত্রে ছাপা রেজোল্যুশনের
অমূল্যিপি বাঁটিয়া দিলেন,—হাততালির শব্দ মিলাইতে না
মিলাইতে চতুর্দিকে তাম্রকূটপত্র নাড়াব একটা খস্ খস্
শব্দ উঠিল।

প্রথম বক্তা দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুখের সম্মুখে রেজোল্যুশন
পত্রখানি ধরিয়া ছাপার হরণে লেখা সভার প্রস্তাবটা পাঠ
করিলেন ;—“ধূম্রপানের নিমিত্ত কোন যন্ত্র সৃষ্টি না হওয়ার
সমস্ত ধূম্রসেবিগণ বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন,
এবং এই অসুবিধা দূরীভূত না হইলে ধূম্রপায়ীর সংখ্যা
স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়া শীঘ্রই একেবারে নির্বাণ প্রাপ্ত
হইবার আশঙ্কা আছে। তজ্জন্ত আমরা সমস্ত ধূম্রগ্রাহী একত্র
হইয়া এককণ্ঠে ব্রহ্মার সদনে আবেদন করিতেছি যে, তিনি
ইহার কোন উপায় বিধান করুন ; এই সঙ্গে তাঁহাকে
জ্ঞানান হউক যে, পূর্বোক্ত কারণে ইতিমধ্যে ১৯৯ জন
ধূম্রলোক ত্যাগ করিয়াছেন।”

প্রস্তাবপাঠ শেষ হইলে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা
আরম্ভ করিলেন,—“ধূম্রলোচন সভাপতি মহাশয় ও ধূম্র-
লোকবাসী ভাই সকল ! কেহই অপরিজ্ঞাত নহেন যে
ইন্দ্রাদি দেব যেমন জ্যোতিতে পরিপুষ্ট, মানবজাতি যেমন
অগ্নে পরিবর্দ্ধিত, তেমনি ধূম্রলোকবাসী যে আমরা, আমাদের
এই বাষ্পদেহ প্রচুর ধূম্র-ধূম্রায়িত না হইলে একেবারে
অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। হবিষানল যেমন দেবতাদিগের,
শাকার যেমন মানবদিগের, তেমনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্তী

ধূম্রলোকবাসী আমাদের এই যে না-মানব-না-দেব দেহ ইহার সংগঠনে ধূম্র যে নিত্য আবশ্যক এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে ধূম্রজ্যোতি সংমিশ্রণে আমাদের এই বিপুল দেহ গঠিত হইয়াছে ; এই বাস্পময় দেহ লইয়া একদিন আমরা রামগিরি হইতে অলকা, অলকা হইতে রামগিরি, চক্ষু নিমেষে গতায়ত করিয়াছি ; সে কিসের বলে ? একমাত্র ধূম্রপানই কি তাহার কাবণ নয় ?

“তাই সব ! ধূম্রপানের কষ্টের কথা আপনাবা সকলেই জানেন। প্রথমত ধূম্রপত্র যে পরিমাণে খরচ করা হয় সে পরিমাণে নেশা হয় না। স্তূপীকৃত পত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহার চারিপাশ বিবিধা বসিয়া ধূম্র গ্রহণ করিতে হইলে, সে ধূম্রের অধিকাংশ কেন সবই প্রায় নষ্ট হইয়া যায়,—অতি অল্প পরিমাণ নাক ও মুখের মধ্যে প্রবেশ কবিত্তে পারে। ভরপুর নেশায় পরিপূর্ণ ধূম্রকুণ্ডলী মেঘাকাবে, আমাদেরকে বৃদ্ধানুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক, হেলিতে হুলিতে বাতাসে ভর দিয়া স্বর্ণ লোকে চম্পট প্রদান করে, আর আমরা হাঁ কবিত্তা তাকাইয়া থাকি, না পাবি ধরিত্তা মুখে পুরিতে, না পারি আব কিছু করিতে। হায় হায় একি কম আপশোষ—কম ক্ষতিব কথা ! (করতালি ধ্বনি) শুধু কি তাই ? হাঁ কবিত্তা ধূম্রগ্রহণ করিতে কবিত্তে মুখে চোয়াল ধবিত্তা আসে, কবিত্তাজ ডাকিত্তা ঔষধ মালিস করিতে হয় তবে সে বেদনা যায়। (হাতধ্বনি) তাহাতে একে শারীরিক কষ্ট আবার অর্থব্যয় ! আবার শুশুন, একেলা বসিত্তা আরামে যখন-খুসী তখন ধূম্রপান করিতে পাইনা ; একেলার জন্ত এত করিত্তা ধূম্রপত্র কখন পোড়ান যায় ?—যে ধূম্র পঁচিশজন ধূম্রলোচন হইতে পারেন, তাহা কি একটি প্রাণীব জন্ত খরচ কবা যায় ? ঘোঁষার আড্ডার সকলকে একত্র করিবার জন্ত প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধবিত্তা অপেক্ষা করিতে হয়। তাহাতে যে কত সময় নষ্ট হয় তাহা কহতব্য নয়। অনেকে হয়ত যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারেন না, বেচারাদের আব সেদিন ধূম্রগ্রহণ করা হয় না ; তাহাদের সে কষ্ট দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল আসে,—মনে প্রফুল্লতা নাই, শরীবে বল নাই, কাজে মন নাই, আহাবে অকচি, কেবল অবসাদ, জড়তা, অসুস্থতা—। সে দিনটা তাহাদের কাছে যেন বিধাতাব অভিসম্পাত !

(করতালি) হায় হায় ! এত ক্ষতি স্বীকার করিত্তাও রীতিমত নেশা জমে কই ! ইহার উপায় বিধান করিতে না পারিলে আর চলে না। ভ্রাতৃগণ, আপনারা একত্র হউন উঠিয়া-পড়িয়া লাগুন, শীঘ্রই যদি কোন ধূম্রপান যন্ত্র আবিষ্কৃত না হয় তবে জানিবেন ধূম্রপানের ব্যাপার ধূম্রই শেষ হইবে।”

বক্তা তাম্বকুটপত্র দ্বারা মুখেব ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিত্তা পড়িলেন। প্রস্তাবটি যথাক্রমে অগ্রাঙ্গ সভ্যের দ্বারা সমর্থিত ও পরিপোষিত হইয়া শেষে সমগ্র সভার অনুমোদিত হইল।

ঠায় বসিত্তা বক্তৃতা শুনিতে শ্রোতৃগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িতে-ছিলেন, সকলেরই শরীরে অবসাদ পরিলক্ষিত হইতেছিল। কেহ কেহ গাত্র প্রসারণ হস্তোত্তোলন ও মুখব্যাদান পূর্বক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিত্তা সে অবসাদ ঘুচাইবার নিফল চেষ্টা কবিত্তেছিলেন। ক্রমে তাহা সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে সভাস্থল চাই-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল,—সেই হাইয়ের অফুট শব্দ ও তৎসংলগ্ন তুড়ির তুড়-তুড় ধ্বনি মিলিত্তা এক অপরূপ কলববের সৃষ্টি হইল।

কক্ষান্তরে ধূম্রপত্র সজ্জিত ছিল, তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করা হইল, বর্ষার মেঘের মত পুঞ্জ পুঞ্জ ঘোঁষা উদ্গীর্ণ হইয়া গৃহ আচ্ছন্ন করিত্তা ফেলিল, তাহার মধ্যে আসন পাতিয়া সভ্যমণ্ডলী উপবেশন করিলেন। তৎক্ষণাৎ মুখের হাই মুখে মিলাইয়া গেল, হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল ; শরীরেব অবসাদ ঘুচিয়া গেল, উৎসাহ আসিল, মন প্রফুল্ল হইল। ধূম্রগ্রহণ শেষ কবিত্তা যে যেখানকার সেখানে চলিত্তা গেলেন।

২

ধূম্রপায়সভার রেজোল্যুশন সকল সভ্যের স্বাক্ষরিত হইয়া যথাসময়ে ব্রহ্মার নিকট প্রেরিত হইল। ব্রহ্মা তাহা পাঠ করিত্তা মাথায় হাত দিয়া বসিত্তা পড়িলেন। এতদিনে তাঁহার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে নাই যে ধূম্রসেবন যন্ত্রের কোন আবশ্যকতা আছে। স্বজন-কার্য শেষ হইয়াছে মনে করিত্তা এবং অনেকটা খরচ বাঁচাইবার জন্ত তিনি বিশ্বকর্ম্মার ডিপার্টমেন্টটা তুলিত্তা দিবার সংকল্প করিতেছিলেন ; এই মর্মে একটা ধসড়াও প্রস্তত হইয়াছিল, দেবসভায় আগামী অধিবেশনে তাহা প্রণীত কবিত্তেন স্থির করিত্তাছিলেন ; এমন সময় এই কাণ্ড ! ব্রহ্মাব ভাবনার আরো একটু কাবণ ছিল। এবারকার বজ্ঞেটে তিনি বিশ্বকর্ম্মার ডিপার্টমেন্টের

খরচটা ধবেন নাই ; মনে করিয়াছিলেন সেটা ত উঠিয়াই যাইবে । এখন তাহা বজায় রাখিতে গেলে অর্থ যোগাইবেন কেমন করিয়া ? এইরূপ নানা চিন্তায় ব্রহ্মা মুহমান হইয়া পড়িলেন ।

স্বপতিকার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য, ও যন্ত্রনির্মাণ সংক্রান্ত দরখাস্ত-সমূহের সর্বপ্রথম বিবেচনা কবিবার ভাব বিশ্বকর্ম্মাব উপর ছিল । ধূমপানিসভার দরখাস্তখানা বিশ্বকর্ম্মাব দপ্তরে চালান কবিয়া দিয়া ব্রহ্মা তখনকার মত কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন ।

অনেক দিন হইতে বিশ্বকর্ম্মাব হাতে কোন কাজ-কর্ম্ম নাই ; কি করেন, কি করেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে সেই দরখাস্তখানা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল । তিনি আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন । কিন্তু কি-রকম-একটা যন্ত্র আবশ্যক তাহা চট্ কবিয়া তাঁহার মাথায় আসিল না । তিনি নিজে ধূমপান কবিতেন না, কাষেই একটা পরিকাষ ধারণা তাঁহার কিছুতেই হইতেছিল না । তখন তিনি স্থির কবিলেন যে, ধূমপানিসভার সম্পাদকের সহিত এবিষয়ে বাচনিক পৰামর্শ করিয়া ব্যাপারটা খোলসা করিয়া লইবেন ।

যথাসময়ে বিশ্বকর্ম্মাব আপিসেব শিলমোহরাস্থিত এক-খানা সরকারি চিঠি সম্পাদকের নিকট পৌছিল । সম্পাদক আপিসে উপস্থিত হইলে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল-ব্যাপী তর্ক বিতর্ক কবিলেন । তর্কে তাঁহার মাথাটা বেশ পরিকার হইয়া আসিতেছিল ;—সহসা তাঁহার মাথায় একটা ‘আইডিয়া’ প্রবেশ করিল । তিনি সম্পাদককে লক্ষ্য করিয়া খুব দস্তের সহিত কহিলেন,—“যন্ত্র আসি স্বজন করিবই । কিন্তু এবিষয়ে আপনাদের একটু সাহায্য চাই ।”

সম্পাদক আগ্রহসহকাষে কানটা খাড়া করিয়া বলিলেন—“নিশ্চয়ই ; আমবা আপনাই আঞ্জালুবর্তী আছি ;
কি করিতে হইবে বলুন ।”

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন,—“আব কিছু না, কেবল স্বর্গেব তিন প্রধান দেবতা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট হইতে যন্ত্র নির্মাণের উপকরণ আপনা-দিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে ; উপকরণ আমার সন্ধানে নাই ।”

‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া সম্পাদক উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; এবং চাদরখানা স্বন্ধে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন ।

৩

ধূমপানিসভার জনকতক বাছা বাছা লোক মিলিয়া একটা প্রতিনিধিদল গঠিত হইল । তাঁহারা এক শুভদিনে বাম্পাষানে আবোহণ কবিয়া ব্রহ্মলোক যাত্রা করিলেন । সহস্র যোজন দূৰ হইতে এক বহুবিস্তীর্ণ সমুজ্জল জ্যোতি-মণ্ডল তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল, যেন লক্ষ লক্ষ চন্দ্র একত্রে সমুদিত হইয়া অত্যুজ্জল প্রভায় ব্রহ্মলোক মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে । সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অব্ ও শু নামক দুইটি সুধা-হ্রদ ব্রহ্মলোককে চক্রাকারে বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছে, তাহার তীবে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মলোকবাসিগণ আকর্ষণ স্থাপান করিতেছেন । সেখানকার ভূমি বিচিত্ররঙ্গময়ী ; স্থানে স্থানে হেম অট্টালিকা ও অপূর্ব রত্নময় অসংখ্য দিব্য মন্দির শোভা পাইতেছে ; সেই শঙ্খ-ঘণ্টা-কাংস্ত-নির্নাদিত মন্দির মধ্য হইতে ব্রহ্মবিদিগেব সমকণ্ঠে গীত সাম গান উথিত হইয়া জলস্থল আকাশ মুখবিত করিতেছে, সেই গানের সহিত একতানে ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিয়া গান গাহিতেছে ; ধূপধুনা চন্দন কস্তুরী কুসুম ও পুষ্পের সৌরভে দিক্ আমোদিত । বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী মহামুভব ব্রাহ্মণগণ যথাপদ ও যথাক্রম ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন । বিস্তীর্ণ যজ্ঞকার্য্য আবস্ত হইয়াছে, চতুর্দিকে হোমানল প্রজ্জ্বলিত, তাহাতে বারম্বার আহুতি প্রদত্ত হইতেছে—আজ্যধূমে দিম্বাগুল পবিপূর্ণ । ব্রহ্মবিদিগের সুরলয়সংযোগে বেদাধ্যয়ন শব্দে ব্রহ্মলোক শব্দায়মান । ধূমপানিগণ সেই সকল সুরমুখ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শরীর পবিত্র বলিয়া বোধ করিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না ।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একস্থানে মহা জনতা—বেদাঙ্গনাগণ অমৃতবর্ষী অশ্বখতলে দাঁড়াইয়া কলসে কলসে অমৃত আহরণ করিতেছেন ; অন্নময় ও মদকর সর্বোবর তীবে দক্ষপ্রমুখ প্রজাপতিগণ দ্বারা অতিথিগণ সংকৃত হইতেছেন ।

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সদনে আসিয়া পৌছিলেন ; প্রকাণ্ড রত্নময় হেম অট্টালিকা ; পদ্মবাগ, নীলকান্ত, অন্নকান্ত,

বৈজ্ঞানিক ও হীরক, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি নানা রত্নখচিত অট্টালিকাপ্রাচীরের ঔজ্জ্বল্য তাঁহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দিল ; ঘারে অসংখ্য চতুর্ভুজ প্রহরী পাহারা দিতেছে, তাহাদের চারি হস্তে চারি প্রকার অস্ত্রশস্ত্র বিবাজ করিতেছে ।

ব্রহ্মা তখন পূজায় বসিয়াছেন, সেই ক্ষণে তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল ;—একজন প্রহরী তাঁহাদিগকে বিশ্রামঘর দেখাইয়া দিয়া গেল ।

নামাবলী গায়ে কমণ্ডলু হাতে চার কপালে চারিট ফোঁটা কাটিয়া ব্রহ্মা বৈঠকস্থানায় দেখা দিলেন । সকলে সমস্ত্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন । ব্রহ্মা চতুর্ভুজ নীরবে তুলিয়া সকলকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন । তাঁহার সদাপ্রশান্ত চতুর্মুখ আজ কেমন বিষাদ-ভারাক্রান্ত, বিরক্তির চিহ্নবিজড়িত । তিনি আসন গ্রহণ করিলে পব সকলে উপবেশন করিলেন ।

তখন ব্রহ্মার বাক্যসুধ হইল, তাঁহার চারি কর্ণের গম্ভীর স্বর একত্রে বাহির হইয়া সকলকার ভীতি উৎপাদন করিল । দলের মধ্যে একজন ছোকরা ছিল, ব্রহ্মার চাব জোড়া ওষ্ঠ এক সঙ্গে কম্পিত হইয়া “বে একটা হাঙ্গোদীপক শব্দ করিতেছিল তাহাতে সে হাসি চাপিতে পাবিতেছিল না, তাহার আকর্ষণ গণ্ড ক্ষণে ক্ষণে লাল হইয়া উঠিতেছিল ।

ব্রহ্মা বিরক্তিবিজড়িত কর্ণে কহিলেন,—“আমার সময় বড় অল্প, হাতে বিস্তর কাজ, যাহা বলিবার আছে চটপট সারিয়া লও ।”

প্রতিনিধিদলেব প্রধান ব্যক্তি তখন তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—“আমরা আপনার অধিক সময় নষ্ট করিব না ; কেবল ধূমপানযন্ত্রসংক্রান্ত দুই চারিটা কথা বলিব । আপনি আমাদের দরখাস্ত—”

ব্রহ্মা বাধা দিয়া বলিলেন—“অত বিশদ বর্ণনার আবশ্যক নাই, মোট কথাটা বল ।”

যিনি কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন বাধা পাইয়া তিনি ধতমত থাইয়া গেলেন, কি বলিবেন গোলমাল হইয়া গেল, কিন্তু তাহা সামলাইয়া লইয়া পুনরায় কহিলেন,—“একদিন বিশ্বকর্মা আমাদের সভার সম্পাদক—”

ব্রহ্মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“সমস্ত কথা শুনিবার আমার সময় নাই, এখুনি স্নানাহার শেষ করিয়া আমাকে

দেবসভায় যাইতে হইবে, সেখানে অনেক কাজ আছে । তোমাদের আসল কথাটা কি শীঘ্র বল, নয় ত সময়াস্তবে আসিও ।”

প্রধান ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—“না, না; আমি এখুনি সারিয়া লইতেছি । শুধুন না, এ—ই বিশ্বকর্মা আ-স্বা-স দিয়াছেন ধূমপানযন্ত্র তিনি নির্মাণ করিবেন, কিন্তু—”

ব্রহ্মা আরো চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—“বিশ্বকর্মা আশ্বাস দিয়াছেন তা’ আমার কি ?”

সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—“না, না, তা নয় কিন্তু—”

“কিন্তু কিন্তু করিয়াই তুমি আমাকে বিবক্ত করিলে, এত চেষ্টা করিয়াও আসল কথাটা এখনও শুনিতে পাইলাম না, আমি এমন করিয়া আর সময় নষ্ট করিতে পারি না ।” এই বলিয়া ব্রহ্মা গাত্রোত্থান করিলেন ।

সেই প্রধান ব্যক্তি অল্পে ছাড়িবার-পাত্র নহেন । তিনি জোড়করে ব্রহ্মার স্তবগান করিয়া কহিলেন—“হে দেব-শ্রেষ্ঠ ! হে স্বষ্টিকর্তা ! হে পদ্মযোনি ! আপনারই অমৃতগ্রহে আমরা দেহে প্রাণ, নয়নে আলোক, নাসিকায় বাতাস পাইতেছি, আপনারই প্রসাদে জীবন ধারণ করিতেছি, আপনার কৃপায় সর্ববিষয়ে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছি, আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা, সর্বো-সর্বা, আমরা আপনার শ্রীচরণের দাস মাত্র ; আপনি আমাদের প্রতি বিমুখ হইবেন না । হে দেব ! অধমদিগের প্রতি করুণা-কটাক্ষ করুন ।”

ব্রহ্মা স্তবে গলিয়া গেলেন, নিজের উপর একটু গর্ব বোধ করিয়া কহিলেন—“অবশ্য, অবশ্য ; তোমাদের হৃৎকণ্ড আমাব কাছে নয় ত আব কাহাব কাছে জানাইবে ? আমি তোমাদের সমস্ত অভাব দূর করিব ।” এই বলিয়া তিনি পুনরায় উপবেশন কবিলেন ।

তখন ধূমপানযন্ত্রেব বৃজাস্ত আত্মোপাস্ত তাঁহার সম্মুখে বিবৃত করা হইল ; কথায় মত্ত হইয়া তিনি দেব-সভার কথা ভুলিয়া গেলেন । বক্তৃতা মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রশংসা গান কবিয়া তাঁহার শ্রবণের আগ্রহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ।

সমস্ত শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—“আমাব বাপু, যা’ সম্ভল

ছিল, তা ব্রহ্মাণ্ডস্বপ্নে সব গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে এই কমণ্ডলুটি। তাহা তোমাদিগকে দিতে পাবি, যদি কোনো কাষে লাগে,—কিন্তু বিশ্বকর্মাকে বলিও যদি উহা ব্যবহারে না লাগে ত আমায় যেন ফিরাইয়া দেন; ওটা আমার বড় সখের, বড় আদরের, বড় দরকারের।”

৪

ধুমপানিসভাব বাস্পযান একদিন কৈলাস অভিমুখে উড়িয়া চলিল। অসংখ্য জনপদ, নদ, নদী, অবগ্য অতিক্রম করিয়া প্রতিনিধিগণ দূব হইতে দেখিতে পাইলেন, এক রজতশুভ্র পর্বত, দূব হইতে তাহাকে মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়; মন্দোদ-
নামক স্বচ্ছতোয় শীতলবারিপূর্ণ সর্বোবব তাহাব পদচূষন করিতেছে, তাহাবই তীরে নানা বিচিত্রসুগন্ধিপুষ্প-ভারাবনতবৃক্ষাবলি-শোভিত এক পবিত্র মনোরম নন্দন কানন, তাহার মধ্যে যক্ষ রক্ষ কিন্নব গন্ধর্ব ও অম্ববাগণ নৃত্যগীতবাঞ্চে ও ক্রীড়াকলাপে মত্ত রহিয়াছে।

কৈলাস মধ্যে পরম শাস্তি মুর্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন,—কোথাও চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার লেশমাত্র নাই; বিশ্বেশ্বর সিদ্ধগণ সংযতব্রত হইয়া তপশ্চরণ করিতেছেন, সকলেই যেন ধ্যানমগ্ন, গম্ভীর, সংযত। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু হিংসাধেবাদি ভুলিয়া মৃগযুথের সহিত একত্রে ক্রীড়া করিতেছে। বলাকামালায় নভস্তল যেমন সূশোভিত হয়, অতিস্নানব কামধেনু সকল শ্রেণীনিবদ্ধ থাকায় ঐ স্থান সেইরূপ সূশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঘণ্টাকর্ণ, বিরূপাক্ষ, দীর্ঘবোমা, শতগ্রীব, উকবজ্র, প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূতগণ চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ত্রাসের উদয় হয়।

রুদ্রাক্ষমালাশোভিতকর্ণ . জটাভারাক্রান্ত দেবাদিদেব মহাদেব বসিয়া বসিয়া স্তিমিতনেত্রে নতমস্তকে বিমাইতেছেন, সতীদেবী সম্মুখে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন।

ঘরের চারিদিকে অনেক জিনিস ছড়ান; গোটাকতক শুষ্ক বিষপত্র ও ধূতরাফুল বাতাসে ইতস্তত করিতেছে, একদিকে একছড়া ছেঁড়ামালা ও একখানা বাঘছাল পড়িয়া আছে; তাহারই পাশে মহাদেবের ডমরুটি বর্তমান। এককোণে স্তূপীকৃত ছাই, মধ্যে মধ্যে পবনতাড়িত হইয়া সতী ও মহাদেবের অঙ্গে আসিয়া লাগিতেছে। অদূর্বে

ভৃঙ্গী একটা প্রকাণ্ড নিমকাঠা গইয়া সিদ্ধি ঘুটিতেছে এবং শুন্ শুন্ স্বরে গান গাহিতেছে। মহাদেবের বাহন বলদটা গোয়ালে শুইয়া বোমস্থ কবিতোছে, সাপগুলা একটা গর্তের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতেছে। নন্দী লগুড়হস্তে বহির্দ্বার রক্ষা করিতেছে, গঞ্জিকাসেবনে তাহার চক্ষুওটা জ্বাফুলেব মত রক্তবর্ণ।

প্রত্যহ বৈকালে সিদ্ধিসেবন করা মহাদেবের অভ্যাস। এখনও সিদ্ধি না পাইয়া তাঁহার ক্রমাগত হাই উঠিতেছে, মনটা কেমন ফস্ ফস্ করিতেছে,—তিনি একবার ভৃঙ্গীকে হাঁক দিলেন। এমন সময় নন্দী বহির্দ্বার ছাড়িয়া মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করঘোড়ে নিবেদন করিল যে, দর্শন আকাজ্জক ভক্তবৃন্দ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে ভিতরে আনিবাব হুকুম দিলেন। সতীদেবী স্বামীর পা ছাড়িয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

অন্নকণ মধ্যে ধুমসেবিসভার প্রতিনিধিদল সেখানে দেখা দিলেন। ভৃঙ্গী সিদ্ধি ঘোঁটা ফেলিয়া তাঁহাদেব বসিবাব ক্ষণ ক্ষিপ্ৰহস্তে বাঘছালখানা পাতিয়া দিল। মহাদেব ভক্তগণকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন, কুশলাদি প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে ধূম্রলোকবাসিগণ! ধুমসেবনে তোমাদের কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছেন না, মর্ত্যের যজ্ঞধুম তোমাদের দিকে নিয়ত পৌছিতেছে ত, কেহ কোনপ্রকার উপদ্রব ঘটায় না ত?”

দলের প্রধান ব্যক্তি উত্তর করিলেন—“হে দেবাদিদেব! কলিকালে জম্বুদ্বীপে যজ্ঞকার্য্য বন্ধ বটে কিন্তু কল কারখানা, কলের গাড়ী প্রভৃতি হইতে যে ধূমোদগিরণ হয় তাহা বড় কম নয়। উক্ত দ্বীপে বৈজ্ঞাতিক ব্যাপারের প্রসার বৃদ্ধি ব সঙ্গে মনোমধ্যে আশঙ্ক্য উদয় হইতেছে বটে, কিন্তু আপনার প্রীচবর্ণাশীর্ষাদে আশ্রয় প্যাস্ত ধূম সেবনে কেহ কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে উন্নতিবিধায়িনী পত্রিকাখানা আমাদের প্রতি কটুবাক্য বর্ণণ কবে। আমরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করি না প্রতিবাদও করি না, আমরা বাক্যেব দ্বারা নয়, কার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন কবিতো চাই যে ধূম সেবন ও ধূমপায়ী সভা হইতে ত্রিলোকের প্রভূত উপকাব সাধিত হইবে।”

মহাদেব সাধু সাধু শব্দে এই উক্তির সমর্থন করিলেন

তখন সেই দলের প্রধান ব্যক্তি কহিলেন—“কিন্তু ধূমসেবনের জন্য কোন যন্ত্র না থাকায় আমাদেরকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে।” এই বলিয়া তিনি আহুপূর্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলেন। মহাদেব শুনিয়া পবন সঙ্কট হইলেন, এবং তাঁহাদের উদ্ভবে ভয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন—“তোমাদের চেষ্টায় যদি একটা যন্ত্র সৃষ্টি হয় তাহা হইলে আমিও বাঁচি, গঞ্জিকা সেবনে আমাবও তেমন সুবিধা হইতেছে না,—ইচ্ছা হয় সমস্ত ধূমটাই গলাধঃকরণ করি, কিন্তু তাহা পারি না।”

দলের প্রধান ব্যক্তি তখন বলিলেন—“হে দেবোত্তম! যন্ত্র-নির্মাণ অসাধ্য বলিয়া অস্বীকার হইতেছে না, বিখ্যাত্তা আমাদেরকে ভরসা দিয়াছেন, ত্রাস কাছ হইতে কমণ্ডলুটী পাইয়াছি। এখন আপনি কোন উপকরণ দিলেই হয়।”

মহাদেব উত্তর করিলেন—“দেখ ভক্তগণ, প্রায়ই আমার মনে হয় যে, আমার ডমরুটীর দ্বারা জগতের অশেষ উপকার সাধিত হইবে; যখন বাজাই তখন তাহাব গন্তীর রব হইতে যেন অক্ষুট আভাস পাই—যেন সে আপনি গুমরি গুমরি বলে—“হে দেব, আমাব কার্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দাও, শুধু শব্দ স্বজন আমার চরম লক্ষ্য নয়; আমার অন্ত যা গুণ আছে তাহা প্রকাশিত হইতে দাও, কেবল তালমানলয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখিও না।” তাই বলিতেছি হে ধূমপায়িগণ! দেখদেখি পরীক্ষা করিয়া আমার অস্বপ্ন সত্য কি না। আমাব বিশ্বাস ডমরুটী ধূমসেবন যন্ত্রেব একটা অত্যাশ্চর্য উপাদান হইতে পারিবে।” এই বলিয়া তিনি ভূঙ্গীকে ডমরু আনিতে আদেশ করিলেন। ভূঙ্গী তাহা উঠাইয়া আনি। কাঁধ হইতে গামছাখানা লইয়া তাহার ধূলা ঝাড়িয়া মহাদেবেব হাতে দিল। তিনি তাহা গ্রহণ কবিয়া নিজের পাশে রাখিয়া দিলেন।

তারপর অন্ত কথাবার্তা আরম্ভ হইল; ইতিমধ্যে ভূঙ্গী সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল, মহাদেব খানিকটা পান করিয়া ভক্তদিগকে প্রসাদ দিলেন। ধূমপান যন্ত্রের কথাটা আর উঠিল না। ধূমপায়ীর দল প্রস্থান করিবার জন্য বাস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ডমরুটী হস্তগত না হইলে যাইতে পারেন না, মহাদেবেব কোলেব কাছে সেটা পড়িয়া আছে, তিনি তাহা দিবার নামও কবেন না। সকলে প্রমাদ

গণিলেন। অনেকক্ষণের পর একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—“হে দেব! তাহা হইলে ডমরুটী লইবার জন্য কবে আসিব?”

মহাদেব একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—“না, না, ওটা আজই নিয়ে যাও। আমি ওটার কথা একদম ভুলেই গিয়াছিলাম।” তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন—“এই জন্তেই ত নূতন উপাধি পেয়েছি,—ভোলানাথ।”

(৫)

বিষ্ণু ধূমপায়ীদের উপর বড় চটা ছিলেন। ধূমপায়ী সভা উঠাইয়া দিবার জন্য স্বর্গের কৌশলি সভায় অনেকবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবেব জন্য তাহা পারেন নাই, তিনি ববাবর বিষ্ণুর প্রস্তাবেব তীব্র প্রতিবাদ কবিয়া আসিতেছেন। বিষ্ণু তথাপি ছাড়েন নাই; উন্নতিবিধায়িনী পত্রিকায় ধূমপানের বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া বিষয়টাকে সজীব বাধিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কোন ফল হয় নাই;—এ সমস্ত বাধা সত্ত্বেও ধূমপায়ী সভা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছিল।

যে দিন প্রতিনিধিদল উপকরণ আহরণের চেষ্টায় তাঁহাব প্রাসাদে আসিল, তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন; প্রহরীকে ডাকিয়া বলিলেন—“যা বোলগে আমার সঙ্গে দেখা হইবে না।”

প্রহরীর মুখে এ কথা শুনিয়া ধূমপায়ীর দল পশ্চাৎপদ হইল না, “তোমার মনিবকে বলগে যে, আমরা অতি মল্ল সময়ের জন্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।”

প্রহরী প্রভুর অগ্নিমূর্তি দেখিয়া আসিয়াছিল, সে অবস্থায় তাঁহার কাছে আর যাইতে সাহস কবিল না, বলিল—“বৃথা চেষ্টা, দেখা হ'বে না।”

অমনি কবিয়া তিন তিন দিন ধূমপায়ী সভার প্রতিনিধিদল বিষ্ণুর বহির্দ্বার হইতে ফিবিয়া আসিল। তখন তাঁহাবা এক মতলব আঁটিলেন।

মর্ত্য স্বজন হইবার পর হইতে সেখানে লীলা খেলা করিবার জন্য স্বর্গের কুনক দেবতা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর উপর ভার পড়িয়াছিল যে তাঁহাকে মর্ত্যধামে বংশীবাদন করিয়া গোপিনীকুলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে।

বাঁশী বাজান তাঁহার কখন অভ্যাস ছিল না, সেইজন্য আজ কাল প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা একটা কম্পার্টেব আড্ডায় বাঁশী বাজান শিখিতে যান। ধূমপায়ীরা সে সন্ধান পাইয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ধূমপায়ীদের একটা ছোকরা ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া বিষ্ণুর বাড়ীর সম্মুখে পায়চারি করিতেছিল। সে দিন বিষ্ণু বাঁশীটা হাতে করিয়া যেমনি বাহির হইয়াছেন, অমনি সেই ছোকরা চিলের মত ছোঁ মাঝিয়া বিষ্ণুর হাত হইতে বাঁশীটা কাড়িয়া লইয়া ছুট দিল— তাহাব বাস্পময় স্তম্ভদেহ নিমেষের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল তাহা বিষ্ণু দেখিতে পাইলেন না ; বিরস বদনে বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহার কম্পার্টের আড্ডায় যাওয়া বন্ধ হইল।

বিষ্ণু অল্পদিনের মধ্যেই জানিতে পাবলেন যে, ধূমপায়ী-দিগের চাতুরীতে তাঁহার বাঁশীটা গিয়াছে। বাঁশীটা যে কেহ কাড়িয়া লইয়াছে, সে কথা লজ্জায় দেবসভায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না ; ধূমপায়ীরাও কি উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন অপ্রকাশ রাখিলেন। আসল ব্যাপারটা কেহ জানিল না ; সকলে বুঝিল, ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরের ঈর্ষ্য তিনিও দান করিয়াছেন। কিন্তু বাঁশীটা হস্তান্তর হওয়ার বিষ্ণুর মর্ন্ত্যে আসিবার দিন পিছাইয়া গেল।

(৬)

ব্রহ্মার কমণ্ডলু, বিষ্ণুর বাঁশী ও মহেশ্বরের ডমরু পাইয়া বিশ্বকর্মা যন্ত্র নির্মাণে লাগিয়া গেলেন। এই তিনটি সামগ্রী দর্শনমাত্রেই তাঁহার উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্কে ধূমপান যন্ত্রের একটি ছায়া পড়িল ; তাহারই অনুকরণ করিয়া তিনি একটি কায়ারচনা কবিলেন। কমণ্ডলুব মুখের ফাঁদ ক্রমাইয়া ফেলিলেন, বাঁশীর ছিত্রগুলি বুজাইয়া দিলেন, ডমরুর দুই মুখের চর্ম ফাঁসিয়া গেল। তখন কমণ্ডলুব উপর বাঁশী, বাঁশীর উপর চর্মবিহীন ডমরুটা স্থাপন করিয়া দেখিলেন, ঠিক হইয়াছে।

সকলিকা হুকার সৃষ্টি হইল। বিষ্ণু কুৎস হইলেন, ব্রহ্মা নিশ্চিন্ত হইলেন, মহেশ্বর মহা খুসী। তাঁহার ডমরুটিকে তিনি যে বাস্তবজ্ঞান হইতে মুক্তি দিতে পাবিয়াছেন, সেই জন্ত তাঁহাব বেশী আনন্দ। প্রিয় ডমরুটিকে তিনি এক ভাবে দান করিয়া আর একভাবে গ্রহণ করিলেন ; গঞ্জিকা

সেবনের জন্য কেবলমাত্র কলিকাটি লইয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ ও অমরত্ব দান করিলেন। সেই অবধি গঞ্জিকা সেবনে কলিকাই প্রস্তুত।

হুকা সৃষ্টি হওয়ার কথা ইন্দের কানে পৌঁছিল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন—“করিয়াছেন কি দেব ! সৃষ্টি বক্ষা হইবে কি করিয়া ?”

ব্রহ্মা ব্যগ্রপুর্বে বলিয়া উঠিলেন—“কেন, কেন ?”

ইন্দ্র—“মর্ত্যালোকবাসীরাও যজ্ঞকার্য্য বন্ধ করিয়াছে, তাহার উপর আমার বজ্রটা চুরি কবিয়া লওয়া অবধি তাহাকে তাহারা সকল কাষে লাগাইতেছে, অগ্নিদেবকে আর বড় ‘কেয়াব’ করে না ; ধূম্রঅভাবে বর্ষণ কোথাও বীতিমত জলবর্ষণ কবিতে পারিতেছেন না ; তামাকু ব্যবহারের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার হওয়ার একটু আশার উদয় হইতেছিল। তাহার ধূমও যদি যজ্ঞ সাহায্যে টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে আব উপায় কি ? বাবি অভাবে পৃথিবী প্রাণিশূন্য হইয়া পড়িবে—আপনাব সৃষ্টি বসাতলে যাইবে।”

ইন্দের কথা শুনিয়া ব্রহ্মার চতুর্মুখ ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি জড়িত কর্ণে বলিলেন—“তাই ত, তাই ত, ধূম্রলোকবাসীরা ত আমায় এ কথা বলে নাই, তাহারা আমাকে ভয়ঙ্কর ঠকাইয়াছে।”

ইন্দ্র বলিলেন,—“ইহাব উপায় বিধান করুন।”

ব্রহ্মা বলিলেন—“নিশ্চয়ই, ধূমপায়ীরা আমার সঙ্গে যেমন জুয়াচুরি কবিয়াছে, আমি তাহাদেব তেমনি অভি-সম্পাত দিব। ইন্দ্র ! তুমি জল আন।”

‘জলগণ্ডুষ লইয়া ব্রহ্মা তখন শাপ দিলেন—“কোন ধূমসেবী আজ হইতে ধূমপানযন্ত্রনিঃসৃত সমস্ত ধূম গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না,—ধূমের অধিকাংশ ভাগ তাহাকে ছুঁ দিয়া মুখের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে সে ধূমপানে কোন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে না, তাহাকে যক্ষাক্রাশে অকালে দেহত্যাগ করিতে হইবে।”*

* বাহারা তামাকু সেবন করেন তাঁহারা জানেন যে, ধোঁয়া টানিয়া মুখ হইতে বাহির কবিয়া দিয়া তাহা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে না পাইলে তামাকু খাইয়া কোন তৃপ্তি হয় না। তাহার কাবণ আমার মনে হয় ব্রহ্মার এই অভিলাষ।—লেখক।

তাহার পর একদিন ধূমপায়িসভায় হকার প্রতিষ্ঠা হইল। চন্দনচর্চিত পুষ্পমাণ্ডে স্নানোত্তিত করিয়া হকার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া হকা-শাস্ত্র খুলিয়া সকল সভা হকাস্তোত্র পাঠ কবিলেন—“হে হকে! হে ধূমপায়িসভা-সভ্যজনহঃস্বহারিণি! হে কুণ্ডলীকৃতধূমবাশিসমুদগারিণি! তোমাকে বারম্বার নমস্কাব কবি, তুমি আমাদিগের প্রতি সদা প্রসন্ন থাক। হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলসজনপ্রতিপালিনী, ভাৰ্য্যাভৎসিতচিন্তাবিকারবিনাশিনী; মুঢ় আমবা তোমার মহিমা কেমনে বর্ণিব? তুমি শোক-প্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্বস্বত্বপ্রদায়িনি! তুমি আমাদের ঘবে অক্ষয় হইয়া বিবাজ কর, তোমার যশঃসৌভ সূর্য্য-কিরণের স্তায় ছড়াইয়া পড়ুক, তোমার গৰ্ভস্থ জলকল্লোল মেঘগর্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক, তোমার মুখ ছিদ্ৰের সহিত আমাদের অধরোষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি!”

ইতি হকার জন্ম-কথা সমাপ্ত।*

ফল-কথা।

এই হকার জন্মকথা যিনি নিত্য সাগ্রহে ও অবহিতচিত্তে শ্রবণ করেন তাঁহাব অক্ষয় ধূললোকবাস হয়। যিনি একবার মাত্র শ্রবণ করেন তাঁহার পুণ্যের ইয়ত্তা থাকে না।

যিনি ধূমপান করেন দেবী ধূমাবতী ও অনুরঞ্জন ধূম-লোচন সকল বিপদে তাঁহার সহায় হন; তাঁহাব বুদ্ধির জড়তা থাকে না, মাথা বেশ পবিত্র হইয়া উঠে, কল্পনা অতীব প্রতিভাশালী হয়, তিনি সম্ভব অসম্ভব গুলিখোরোচিত নানা গল্প শুভবের সৃষ্টি কবিত্তে পাবেন, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার প্রতি সদা প্রসন্ন থাকেন, দেহান্তে তাঁহার কৈলাসবাস হয়। যিনি হকার নিন্দা কবেন তাঁহাকে জন্মান্তরে শৃগাল-দেহধারণ কবিয়া কেবল ‘হকা হকা’ বব কবিত্তে হয়।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

* হকার সৃষ্টি হওয়ার ধূললোকে ধূমপান অত্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্ত তামাক সাজিবার নিমিত্ত, একদল ভূত্যের প্রবোজন হওয়ায় ধূললোকবাসীরা মর্ত্যলোকে সিগারেট ও বিড়ি পাঠাইয়াছেন;—বালকেরা সিগারেট ও বিড়ি খাইয়া অকালে মর্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া ধূললোকে গিয়া তামাক সাজিবে, এই উদ্দেশ্য।

শিল্প-সমিতির প্রবন্ধাবলী।

তূলা।

প্রাচীন ভাবে তূলাব চাষ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা ও অভিজ্ঞতা ছিল তাহা গত বৎসর ঢাকার মসলিন প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আমরা দেখাইয়াছি। তথাপি আগের বর্তমানে যে সকল প্রবন্ধ অবলম্বন কবিয়া এই প্রবন্ধ সম্বলন করিতেছি, তাহাদেব অন্ততম প্রবন্ধের লেখক গামি সাহেবের মত আমরা উদ্ধৃত করিয়া ভারতে তূলার প্রাচীনত্ব দেখাইব।

মহুসংহিতায় তূলার প্রথম উল্লেখ দেখা গেলেও তৎপূর্বেও যে তূলা ভারতে ছিল না তাহা মনে কবিবার কোনো কারণ নাই। হেবোডোটস ও থিয়োক্রেটাস ভারতে তূলার গাছ দেখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাচুর্য্যত্ব এরিয়ানের সময়ে তূলা বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল। আরবেরা ইহা আমদানি করিত। ভারত হইতে তূলার চাষ দক্ষিণ যুরোপে বিস্তৃত হয়। চীনদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর খুব সম্ভব ভারত হইতেই তূলার চাষ প্রবর্তিত হয়। ক্রমশ বস্ত্রবয়ন-প্রণালীও ভারত হইতে বিস্তৃত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে পরিজ্ঞাত হয়। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিক তূলা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় তূলার উৎকর্ষ সাধনের জন্ত পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

ভড়োচ অঞ্চলের ভালো তূলা প্রায় আমেরিকার তূলার সমান। কিন্তু ভারতের পরিবর্তনশীল আবহ-অবস্থায় তূলা বেশ পরিস্কাব কবিয়া তূলা যায় না; তূলা তুলিতে ভারতে শতকরা ২৫ হইতে ৭ ভাগ পর্য্যন্ত ধারাপ হয়; আর আমেরিকায় মাত্র ২ ভাগ নষ্ট যায়।

ভারতীয় তূলাব আঁশ বীজে দৃঢ় সন্নদ্ধ থাকে; এজন্য মিশরী বা মার্কিনী তূলা অপেক্ষা ভারতীয় তূলা ধুনিবার সময় অধিক নষ্ট হয়।

ভারত-উৎপন্ন তূলা গুণানুক্রমে নিম্নে লিখিত হইল :—
হিঙ্গনঘাট (মধ্যপ্রদেশ), ভড়োচ (গুজরাট), খুলিয়া, ভাওনগব (গুজরাট), অমবাবতী, কামতা, ধারওয়ার, সিদ্ধ, বাঙ্গাল (মধ্যভারত, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ), পশ্চিম বাঙ্গাল

(শোলাপুৰ ও উত্তৰ মাজ্জা,) সাপেম, কোকনাৰা, তিনে-
ভিল্লী প্রভৃতি ।

ভারতোৎপন্ন তুলাৰ উৎকৰ্ষ সাধনেৰ জন্ত শ্ৰেষ্ঠ মিশৰী
ও মাৰ্কিনী তুলা এ দেশে উৎপন্ন কৰিবার চেষ্টা যথেষ্ট
সফলতা লাভ কৰে নাই । সৰ্ব্ব নিৰ্বাচন দ্বাৰা উত্তম তুলাৰ
বংশবৃদ্ধি এদেশে অসম্ভব নহে, তবে তৎপক্ষে চাষী ও
ব্যাপাৰী উভয়েই সততা ও চেষ্টা থাকা আবশ্যক ।
চাষীবা ক্ৰমশঃ ভালো বীজৰ পৰিপোষিত হইয়া তুল্লাভে সচেষ্ট
হইতেছে ।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন তুলা চাষের যত্নাদি যাঁহা এখন
ব্যবহৃত হইতেছে তাঁহা নিতান্তই অল্পপযোগী নহে, কেবল
দূষিত প্রক্রিয়াই উত্তম তুলা উৎপাদনের অন্তরায় ।

তুলা উৎপাদনের পক্ষে কালো মাটি খুব উপযোগী ।
লালমাটি কদাচ ব্যবহৃত হয় । কালো মাটির স্তর গভীর ও
খুব আঠালো হয়, একজন্ত তাহা অনেকক্ষণ ভিজা থাকিতে
পারে ।

গুজৰাট, থানেশ, বেরাৰ ও দক্ষিণ মহাবাহু দেশে
আমেৰিক ধরণে সারি বাঁধিয়া সমান্তরে তুলার গাছ লাগানো
হয় । মাজ্জা প্রভৃতি অন্তান্ত প্রদেশে বীজ যথেষ্ট ছড়াইয়া
ফেলা হয় । প্রথমোক্ত প্রণালী জমি নিড়ানো যথেষ্ট সুবিধায়
ও সম্ভায় হয়, চাৰাগুলিও বেশ ভালো হয় ।

তুলা ফসলের শেষ অবস্থায় ক্ষেত্রে জল সেচন ফসলের
ক্ষতিজনক এবং তুলার আঁশ তাহাতে কম মজবুত হয় ।

জমির উর্বরতা রক্ষার জন্ত কাহার পব কি ফসল
উৎপন্ন করা উচিত তাহা ভারতীয় চাষা খুব ভালোই জানে ।
এক্ষেণে শ্ৰেষ্ঠতা নিৰ্বাচন ও শাক্ষ্য সাধন দ্বাৰা তুলার
উৎকৰ্ষবিধান কৰিতে হইবে ।

বেরাৰের আটান নাম বিদৰ্ভ । ইহা চিরদিনই তুলার
চাষের জন্ত বিখ্যাত । মধ্যপ্রদেশ ও বেরাৰে ১৯০৭ সালে
৫৮২০৪১ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল । চালের
চাষ অপেক্ষাও তুলার চাষ প্রসার লাভ কৰিয়াছে । বৰ্ষার
অন্নতা হেতু অত্যন্ত ফসল অপেক্ষা তুলা অধিক উৎপন্ন
হয় ; এই জন্ত চাষাৰা সকল ফসল ছাড়িয়া তুলাকে আশ্রয়
কৰিয়া সচ্ছল হইতেছে ।

এই প্রদেশের কালো মাটির স্তর ২ হইতে ১২ ফুট

পর্যন্ত গভীর । বৰ্ষার অন্নতা তুলাৰ পক্ষে উপকাৰী ।
কিন্তু নবেম্বৰ মাস হইতেই জমি ফাটিতে আৰম্ভ কৰে
এবং বৰ্ষার জল সেই ফাটায় ঢুকিয়া অনেক চাৰাব শিকড়
আলগা কৰিয়া দেয় । ইহা নিবারণেৰ জন্ত চাৰাতে ফুল
হওয়া পর্যন্ত জমিতে ঘন ঘন পাইট কৰিতে হয় । ইহাতে
জমিৰ উপবিতল সমান হইয়া আন্তববস বক্ষা কৰে, জমি
আব ফাটে না । তুলা প্রায় পাঁচ মাসে পাকে । মধ্য-
প্রদেশের প্রধান তুলা জরি (কাটি বিলায়তী) ও বানী
(হিন্দনঘাট বা ঘাটকাপাস) । জরি তুলার আদৰ ইংলণ্ডে
নাই । ইহাৰ আঁশ মোটা ও ছোট । ইহা জাপান ও
জৰ্ম্মানীতে রপ্তানি হয়, এবং মোটা পশমী বস্ত্র তৈয়ারী
কৰিতে পশমেৰ সহিত ভেজাল দেওয়া হয় । ইহাৰ আঁশ
শক্ত বলিয়া আবহ পরিবৰ্তনে ইহাৰ কোনো ক্ষতি হয়
না । কিন্তু গত শতাব্দীতে যখন ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে
তুলা পাইত না, তখন এই তুলাই ইংলণ্ডকে বক্ষা কৰিত ।

বানী তুলাৰ আঁশ লম্বা ও বেশম চিকুণ । জবির আঁশ
৫ ইঞ্চি, বানীর আঁশ ১ ইঞ্চি লম্বা হয় । বানী তুলায়
বাঁচিও কম থাকে । জবি হইতে ১০ নম্বৰ সূতা ও বানী
হইতে ৪০ নম্বৰ সূতা হয় । কিন্তু তথাপি জরি ক্ৰমশঃ
বানীকে বিভাডিত কৰিতেছে । বানীৰ দাম জবি অপেক্ষা
ছই তিন টাকা বেশি হইলেও জবি অধিক উৎপন্ন হয় ;
এই জন্ত বানীর আদর ক্ৰমশঃ কমিয়া যাইতেছে ।

এতদ্ভিন্ন একজাতীয় মাৰ্কিনী তুলা উৎপন্ন হয় । তাহাও
প্রায় বানীর মত । তাহা হইতে ৪০ নম্বৰ সূতা তৈয়ারি
হয় । অন্তান্ত বিদেশীয় তুলাৰ ফসল এ দেশে ভালো হয় না ।

বুড়ি নামক একপ্রকার বিদেশী তুলা সাঁওতাল পৰগণা
হইতে লইয়া গিয়া পৰীক্ষা করা হইতেছে । ইহা মধ্য-
প্রদেশের উপযোগী । বে ওজনেৰ জরিৰ দাম ৯০, বানীৰ
দাম ১৩০, সেই ওজনের বুড়িৰ দাম ১৫০ টাকা । বুড়ি
হইতে চল্লিশের সূতা হইতে পারে ।

তুলার উৎকৰ্ষ সাধনের জন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়
অনুসৃত হইতে পারে :—(১) বীজ নিৰ্বাচন, ইহাৰ জন্ত
নীৰোগ স্বস্থ সবল শ্ৰেষ্ঠ চাৰার বীজ সংগ্রহ । (২) শাক্ষ্য-
বিধান, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণেৰ জন্ত গত বৎসরের
প্রবাসী দ্রষ্টব্য । (৩) সাব নিৰ্বাচন । বৰ্ত্তমানে গোবর

ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহা প্রচুর পাওয়া যায় না। চোনাও উত্তম সার; তাহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা হইতেছে। নাইট্রো-জেনীয় সার (যথা সোডা নাইট্রেট ও সলফেট এমোনিয়া) সস্তায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই প্রদেশের জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব আছে। তাহা পূরণের পক্ষে সোডা নাইট্রেট চমৎকার সস্তা সার। পটাশ প্রয়োগে তুলার কিছু সুবিধা হয় না। তাহা কোম্পানির লোহার কারখানায় আনুষঙ্গিকভাবে সোডা নাইট্রেট প্রস্তুত হইতেছে; যদি তাহা সস্তায় তৈয়ারি হয় তবে ঐ প্রদেশে তুলার চাষের খুব সুবিধা হইবে।

কৃষিবিভাগ হইতেও বীজসংগ্রহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

জমির পাট।

কালো মাটিতে তুলার ফসলের জন্য প্রতি বৎসর লাঙল দিতে হয় না। তিন বৎসর অন্তর একবার চাষ দিলেই যথেষ্ট হয়। লাঙল দেওয়া অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম-সাধ্য ও ব্যয়সম্বল ব্যাপার। এক একবে লাঙল দিতে ৪ টাকা খরচ পড়ে। কিন্তু প্রতি বৎসর জমিতে বিধে দেওয়ার দরকার হয়। তুলার একটা ফসল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঙল দিলে খরচ ও কষ্ট কম হয়। নববর্ষারম্ভে বিধে দেওয়া শুরু করিয়া বর্ষাপর্যন্ত চালানো হয়। যত অধিকবার বিধে দেওয়া যায়, চাষ তত ভালো হয়। বিধে দিবার খরচ ৪ একর জমিতে ৫ টাকা। ৪ একর জমিতে একঘোড়া বুলদ ও একজন মানুষে তিন দিনে বিধে দিতে পারে।

সাধারণত পচানো গোবর ও চোনার সার জমিতে দেওয়া হয়। কেহ বা গরু মহিষ, ছাগ মেষ প্রভৃতির পাল কিছু দিন ধরিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে রাখিয়া দেয় এবং তাহাদের মূত্রবিষ্ঠা জমিকে সাবালো করে। মানুষের বিষক্রান্ত বাদ যায় না। এই সার খুব তেজালো। গ্রামসন্নিহিত যে সব ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা প্রাত্যহিক শৌচক্রিয়া করে, সে সব জমির উৎপাদন শক্তি অপবাপর জমির দ্বিগুণ ত' বটেই। অধুনা সাব দিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে:— লাঙলে তিনটা ফলা থাকে, একটা ফলা চষে, দ্বিতীয় ফলার মধ্য দিয়া গুঁড়া গোবর সার পড়িতে পড়িতে যায় ও তৃতীয় ফলা হইতে বীজ পড়ে। ইহাতে ঠিক সারের উপর বীজ পড়িয়া ফসল ভালো হয়, এবং সারের মিতব্যয় হয়। কিন্তু এই প্রথম প্রদত্ত সারের জোর এক বৎসরের বেশি থাকে না। এ সম্বন্ধে এখনো পরীক্ষা চলিতেছে। আর একটা নিখরচা সারের উপায়—বিভিন্ন প্রকারের ফসল পর পর উৎপাদন করা। এক জমিতে ক্রমান্বয়ে তুলা না বুনিয়া অন্য

কোনো ফসলের সহিত অদল বদল করিলে জমি বেশ উর্বর থাকে।

বীজ-নির্ব্বাচন ও বীজ প্রস্তুত।

বীজ সংগ্রহ করিয়া একটা চারপাই-এর উপর বীজ ছড়াইয়া বসিয়া বসিয়া চালুনিতে ছাঁকার মত করিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। তৎপবে কালো মাটি ও গোবর মিশ্রিত জলে সেই বীজ ধুইয়া লওয়া হয়। বীজগুলি পাছে গায়ে গায়ে তুলার আঁশ লাগিয়া আটকাইয়া থাকে এবং লাঙলের ফাঁপা ফলার মধ্য দিয়া অক্লেশে না পড়ে এই জন্য ঐকপে ঘসা ও ধোয়া হয়। জুন মাসের প্রথমই বর্ষণ হইলেই বীজ বুনিতে আৰম্ভ করা হয়। কখনো কখনো কেহবা বৃষ্টির অপেক্ষা না করিয়া ধূলায় মধ্যই বীজ বপন করে; পরে বৃষ্টি পাইয়া অক্লুরোদগম খুব ভালোই হয়; কিন্তু এ প্রথম বীজ পাখী দ্বারা ও অন্যান্য কারণে অধিক নষ্ট হইবার ভয় থাকে।

উৎপন্ন।

চারি দিনেই অক্লুরোদগম হয় এবং সপ্তাহ মধ্যে প্রথম দুটি পাতা দেখা দেয়। পনের দিন পরে চারার ধাবে নূতন মাটি দেওয়া হয়। এক ফসলের সময়ের মধ্যে দুই হইতে চারি বার নূতন মাটি দেওয়া হয়; যত বেশিবার দেওয়া যায় ততই অধিক পরিপুষ্ট হয়। আশ্বিন মাসে গাছে ফুল হয়। তুলার কোষ না হওয়া পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে জমি নিড়াইতে হয়। তুলাব চারা, ফাঁক ফাঁক হইলে চারা সবল হয়, বেশি ঘোঁষা ঘোঁষি হইলে মাঝে মাঝে চারা উপড়াইয়া পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার হয়।

চারি একব জমিতে গড়ে ৩০০ সের তুলা হয়, তাহার মূল্য ১০০ টাকা আনান্ন। প্রতি একারেব আয় ২৫ এবং গ্রন্থধর্ম্মেন্টের খাজনা ২ ও চাষের খরচ ৬। নেট আয় ১৭ টাকা। সাধারণ চাষেই এই হয়; ভালো সার ও উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিলে দ্বিগুণ লাভ হওয়া সম্ভব।

দীপালির পর জীলোক ও শিশুরা তুলা তুলিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেকেব সংগৃহীত তুলাব কুড়িভাগের এক ভাগ তাহাকে মজুবী স্বরূপে দেওয়া হয়, ক্রমশ নগদ মজুরীর প্রচলন হইতেছে। নগদ মজুরী মণকরা তিন আনা। একদিনে একজন মজুব দুই তিন মণ তুলা সংগ্রহ করিতে পারে।

পীড়া।

ফুলের সময় বৃষ্টি হইলে ফুল বরিয়া যায়। বেশি শীত পড়িলেও গাছ পীড়িত হয়। শীতের সময় জল হইলে গাছে পোকা হয়; ইহা ধবংসের কোনো কৃত্রিম উপায় জানা নাই। গরম পড়িলে পোকা আপনি মরিয়া যায়। পাণ্ডার নীচের

পিঠে একপ্রকার দানা দানা হলদে কালো ক্ষুদ্র কীট জন্মে ।
প্রত্যয়ে পাতা শিশিরে ভিজা থাকিতেই শুঁড়া ছাই গাছে
ছড়াইয়া দিলে পোকা মবে । গরম পড়িলে কৃত্রিম উপায়ের
সাবশ্যক হয় না । গাছের গোড়াব কাছে একরকম লম্বা
শাদা পোকা হয়, তাহা গাছ মারিয়া ফেলে, গাছ হলদে হইয়া
শুকাইয়া যায় । এই পোকা ধ্বংস করিবার উপায় নাই ।
পীড়িত গাছগুলি উপড়াইয়া জ্বালাইয়া কীট নষ্ট করিয়া অপর
গাছগুলিকে রক্ষা করা উচিত । গাছের ডগাতেও একরকম
সবুজ পোকা হয় এবং সে সব পাতাগুলো জড়ো করিয়া গাছ
মারিয়া ফেলে । ইহাকেও ধ্বংস করিতে গাছ পুড়াইয়া
ফেলিতে হয় । গাছে তুলার কোষ ধরিলেই মাঝে মাঝে
পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত তাহাতে কীট লাগিয়াছে কি না ।
পোকা লাগিতে দেখিলেই সেই কোষ তুলিয়া দগ্ধ করা
উচিত, কারণ ইহাদের অসম্ভব বংশবৃদ্ধিপটুতা আছে । ছুটি
কীট হইতে দুইশত কীট উৎপন্ন হয় । প্রথমেই সাবধান
হইলে সামান্য ক্ষতিতেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ।

উন্নতির উপায় ।

বীজ নির্বাচনের উপর তুলার পরিমাণ ও গুণ নির্ভর
করে । বিভিন্ন প্রকারের শাক্ষর্য বিধান ও বিদেশী তুলা
এ দেশের ধাতসহা করিয়া ভালো তুলা উৎপাদনের চেষ্টা
চলিতেছে ।

কালো মাটিতে নাইট্রোজেন বড় কম থাকে । উহা সার
দিয়া বাড়ানো দরকার । সোয়ার সার ভালো । তার পর
গোবর । তার পর ঘুঁটের ছাই । গোবর সার সস্তা । সোডার
নাইট্রেট ও এমোনিয়ার সালফেট সম্বন্ধে পূর্বেই বলা
হইয়াছে । তুলার আঁশ ভালো করিতে পটাশ সার ভালো ।
গোবরের সহিত চোনাও সম্বন্ধ করিয়া পচাইয়া ক্ষেত্রে
ধেওয়া উচিত ।

চাষের লাঙল প্রভৃতির উন্নতি সাধন ও সস্তা হুদে
চাষাদের মূলধনের সংস্থান করার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক
হইয়াছে । কৃষি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি দ্বারা অনেক উপকার হইতে
পারে ।*

নির্বাণ ।

জিজ্ঞাসু । কপিলধ্বি-উষিত পুরী
ভূষিত করি কিরণে—
দেবতা ও কে আসিল লোকে সঞ্চরি' ?
অমরবালা জ্যোতির মালা
দোলায়ে নভ-তোরণে
নমিছে রাঙ্গা আবুলে বীর্ধি-জঞ্জলি ।

* ১৯০৭ সালের কংগ্রেস-সংগঠিত শিল্পসমিতির অধিবেশনে পঠিত ।
তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধের সার সঙ্কলন ।

জাগ্রত । কুশার আজি রাজাধিরাজ-
বেশে প্রবেশে ভবনে ;
দেব ও দেবী, এসগো অভিনন্দিতে ।
তরিতে যদি ভবজলধি
হেরি স্নগতে নয়নে,—
জগতজন, এস চরণ বন্দিতে ।

(কথা) । শুদ্ধোদন, দেবী গৌতমী,
লভি অমনি বার্তা—
আকুল আঁধি জুড়াল, দেখি নন্দনে ।
মরণ-গত- অমৃতপথ
হেরিল যেন আত্মা !
সুধার ধারা বরে অধীর ক্রন্দনে ।
সজল আঁধিয়গল মুছি'—
অর্দ্ধ অবশুষ্টিতা,—
হেরি' পতির জগদতীত দীপ্তি,
চরণমূলে রাহুল কোলে
রহিল ধূলি-দুষ্টিতা ।
শাক্যকুল, লভিল নবভূমি ।
উদ্বোধিয়া মুগ্ধপ্রাণী—
বুদ্ধবাণী ক্ষরিল ;
ধ্বনিল ভবে “শান্তি, চিরশান্তি !”
বিরহ-শোক- বিগত লোক,
জীর্ণ জরা মরিল ;
নাহি যে দেখে শ্রান্তি, মনে ভ্রান্তি ।

* * * * *
শুদ্ধোদন । আমি জনক,—পালক তুমি
কুল-পাবন পুত্র !
শুধু মরু করুণাধারে ভরিলে ।
মুছিয়া বাধা, আঁধার, ধাঁধা,
অন্ধে দিলে নেত্র !
জীবন-তরু তরুণ করি গড়িলে !
গৌতমী(১) । এস, নয়নপুতলি স্নত
উতলা চিত-মাঝারে !
স্তম্ভপানে করিয়াছিলে থন্না !
আজি যে তব ধর্ম্মে, নব
জন্মলভি, বাছারে,
হইলু,—লোকজনক, তব কন্না !

(১) মূল্যূর্ণ ভাষাট—অপমানের গৌতমীবাধা হইতে গ্রহীত ।
অপমানে—৩৪—৩৬ ।

(কথা)। শ্রীপদ সেবা কবিত্তে যেরা
ছিল রে অধিকারিণী—

অগাধ-য়ার চিত্তভরা ভক্তি ;—
চাহি শ্রীমুখ- পানে সে, মুক-
ভাষায় যেন কামিনী,
যাচিল প্রাণে প্রাণেশ-সেবা-শক্তি।
যাচিল গ্রিয় বাহুল তরে
বহুল প্রীতি-বিস্ত,
বিনয়ে শীলে ভূষিবে শিশু-সন্তান।
যেন রে স্নাত, সাধনা-পূত
দৃষ্টি লভি নিত্য,
পতিব মত লভে অমৃত নির্মাণ।

* * * *

(গাথা)

গাহে কাশ্যপ মুনি(২) শাস্ততবাণী
বিস্তিত শুনি বিশ্ব।
বাক্সা অধিরাজ ভিখারী সমাজ
হইল স্নগত শিষ্য।

ভণে পুণ্যে বিনয় বর্ণন করি (৩)
অগ্রগণ্য উপালি ;
কি গৃহী, শ্রমণ, কিবা ব্রাহ্মণ,
ধন্ত, শুনি সে গাথাশ্রী।

কহে আনন্দ, দেব-বন্দিত-কথা ;
স্তুতি নর, মস্ত্রে।
অতীব শুদ্ধ বিবিধস্তুত (৪)
ধ্বনিত হৃদয়-যন্ত্রে।

গাহে থের ধোবী, (৫) পুত গাথা অগণন।
বাধা কোথা ব্যথা ভয়ে ?
জীবনে বর্ষ শ্রী অভিধম্ম (৬)
জন্ম-মরণ-জন্মে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(২) কাশ্যপ, আনন্দ এবং উপালি, ভগবান বুদ্ধের শিষ্য। উহারাই
ত্রিপিটক আবৃত্তি করিয়া উহার পাঠ নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

(৩) বিনয় পিটক।

(৪) স্তুত-পিটক ;

(৫) অভিধম্ম নামক পিটক।

(৬) জ্ঞানবুদ্ধ সাধু পুরুষ ও বর্মণীগণ—যাঁহাদের গাথা শ্রুত্বক নিকালে
অমর হইয়া আছে।

প্রতিবাদ।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আপনার আবেগের ৪র্থ সংখ্যা “প্রবাসী” পত্রিকার শ্রীমুখ
ইন্দুমাধব মল্লিক লিখিত “ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও মিশরের পুরাতত্ত্ব”-শীর্ষক
প্রবন্ধে এলেকজেন্দ্রিয়ার লাইব্রেরী মুসলমানেরা মিশর জয় করিলে আস্তান
লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়ার বিষয় যে উল্লেখ করিয়াছেন ইহা প্রকৃত
ইতিহাস নহে। এই কলঙ্কোপাধিত ইতিহাসের মূলে কতদূর সত্য
নিহিত আছে, তাহা আলীগড় কলেজের আরবী প্রফেসর মওলানা
শিবলী তাঁহার সংগৃহীত “আলেকজেন্দ্রিয়া পুস্তকালয়” নামক উর্দু
ইতিহাস পুস্তকে বিশেষ প্রমাণের সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আলেক-
জেন্দ্রিয়ার পুস্তকালয় ধ্বংসের জন্য মুসলমানগণের প্রতি দোষারোপ
অযথা। উক্ত উর্দু ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ “ইসলাম প্রচারক” পত্রিকায়
প্রায় তিন বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতি

বিনীত
আনওয়ার আলী।

প্রাপ্ত পুস্তক পরীক্ষা।

গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। কলিকাতা, সিটি বুক
সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত চারিশতাধিক পৃষ্ঠা,
মূল্য সাধারণ বাধাই ১০, উৎকৃষ্ট বাধাই ২,। রবীন্দ্রনাথের গান সমা-
লোচনার অপেক্ষা রাখে না। এ সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহাই যথেষ্ট
হইবে না। যে গান আবালবৃদ্ধবনিতার মনোহরণ করে, তাহার
পরিচয়ও অনাবশ্যক। ভগবন্তত্ত্ব রবিবাবুর গানে মুক্ত, প্রেমিক
মোহিত; জাতীয়তাব উদ্দীপনে তাঁহার গান অদ্ভুত কাজ করিয়াছে।
নানা বয়সের লোকের হৃদয়ের নানা অবস্থার উপযোগী এমন সংগীত-
সংগ্রহ আর নাই। পুস্তকে কবিরের নিত্য আধুনিক বহুসংখ্যক
গানও স্থান পাইয়াছে। ইহাতে মারার খেলা ও বায়োলিক-প্রতিভা নামক
গীতিনাট্য ছুটিও সমগ্র দেওয়া হইয়াছে। এষ্টক কাগজে হুম্মর, নির্ভল
মুদ্রাক্ষন এই বহিধানিকে প্রিয়জনের উপহারের যোগ্য করিয়াছে।
একত্রে এত গান এমন হুম্মরভাবে আর কেহ কখন প্রকাশিত করেন
নাই। বর্তমান সংস্করণের জন্য সিটিবুক সোসাইটি সাধারণের ধন্যবাদার্থ।

ছেলেদের মহাভারত—শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, কর্তৃক
বিস্তৃত। শিশুসাহিত্য রচনার উপেক্ষা বাবুর কৃতিত্ব অসাধারণ। হুম্মর
সরল সরস ভাষায় মহাভারতের মূল আখ্যান শিশুদের উপযোগী করিয়া
বিস্তৃত হইয়াছে। শুধু ছেলে নয়, বয়স্কগণও ইহা পড়িয়া মুগ্ধ হইবেন।
উপেক্ষাবাবু কলাকুশল; তাঁহার রচনার বর্ণনার পারিপাট্যে এক একটী
চিত্র আলেখ্যবৎ স্পষ্ট ও মনোরম হইয়াছে। রচনার ভিতর দিয়া একটী
প্রচ্ছন্ন অমল হাস্যরস প্রবাহিত আছে, পড়িতে পড়িতে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া
উঠে। মহাভারতবর্ণিত চরিত্রগুলির বিশেষত্বও বর্ণনাপ্রসঙ্গে দিয়া পরিষ্কৃত
হইয়াছে। উপেক্ষাবাবু নিজে অসিদ্ধ চিত্রকর। তাঁহার অঙ্কিত
হুম্মর চিত্রগুলি এই বহিধানির মূল্য ও মনোহারিত্ব বর্ধিত করিয়াছে।
এবার ছেলেমেয়েদের বড় শ্রীযোগ, কেন না অনেকগুলি ভাল বহি বাহির
হইয়াছে। কিন্তু পিতামাতার ব্যবহৃত্তির জন্য আমরা দুঃখিত হইব কি
না, বুঝিতে পারিতেছিলাম। কারণ, এই সকল পুস্তক পুস্তকায় সময় গৃহে গৃহে

প্রতি শিশুর হাতে বিরাজ করিবে, ইহা আমরা আশা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—৬৪ কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা, হইতে সিটিবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ভারত-পৌরব গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ড। ফুলকাপ অষ্টাংশিত ৭৭ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ আনা। সাধু-মহাক্সার জীবনাবলীর এমনি মাহাক্সা যে যেমন করিয়াই বিবৃত হোক তাহা চিত্র মুদ্র করে। আলোচ্য পুস্তকে বিশুদ্ধ সরস সরল ভাষায় অল্প পরিময়ের মধ্যে মহর্ষির বিরাট চরিত্রের অভিব্যক্তি ও সাধুর্য্য হৃদয় দেবাসো হইয়াছে। বুদ্ধ হইতে শিশু পর্য্যন্ত, নর ও নারী ইহা পাঠে রস ও আনন্দ পাইবেন। মহর্ষির একটা হৃদয় ছবিও ইহাতে আছে।

কর্ণ, জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা—শঙ্কর-সেবক ভারতী শতাব্দী বিরচিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে কর্ণ, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, উহার ব্রহ্মলাভের তিনটি প্রধান বা প্রণালী মাত্র। কর্ণ, জ্ঞান ও ভক্তি কথাকে বলে তাহা পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করিয়া শেষে তিনের সমন্বয় করা হইয়াছে। এই দুইকই মীমাংসা সংক্ষেপ করিতে গিয়া অনেক স্থান জটিলই রহিয়া গিয়াছে, সাধারণ পাঠকের মোটেই উপযোগী হয় নাই, পণ্ডিতদের জ্ঞান এরূপ শুকের আবশ্যকই নাই। অধিকন্তু এই অল্পপরিময়ের মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বাপিয়া উদ্ধৃত সংস্কৃত বিভীষিকার মত হইয়াছে। কিন্তু কোন চিত্তাঙ্গীল পাঠক ধৈর্য্য ধরিয়া ইহা পাঠ করিলে চিন্তার স্বাস্থ্যপ্রদ ধোরাক পাইতে পারিবেন। ছাপা ও কাগজ ভাল।

সটীক মার্কলিখিত হুসমাচার—আচার্য্য আর্থার হুসন কর্তৃক লিখিত। বঙ্গীয় সপ্ত-মূল সম্মিলনী কর্তৃক প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ৪৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য কাগড়ে বাঁধান ১ টাকা; মোটা কাগজে বাঁধান ৬০ আনা। সাধু মার্ক মহাক্সা বিশু সঙ্কে বাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহারই বাংলা অনুবাদ। ইহা বাইবেলের এক অংশ। বাঁহার বাংলা ভাষায় বাইবেলের মর্ম্ম জানিতে অভিল্যাবী তাঁহার ও দেশীয় গ্রীষ্টান সম্প্রদায় ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। কিন্তু পুস্তকের ভাষা বাংলা রচনাভঙ্গী (idiom) অসুসারে শুদ্ধ হয় নাই। পাঠ করিতে বহুস্থলে হাত্তোকে হয়। আমি সে সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়া এমন পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থকে হাত্তাম্পদ করিতে চাহি না। পুস্তকের মূখপত্রে লেখা আছে যে “কতিপয় বঙ্গীয় বঙ্গুর সাহায্যে লিখিত”। তাঁহার একটু ক্রেশ স্বীকার করিয়া পুস্তকের সাহেবী বাংলাটাকে বাংলা করিয়া দিলে ভাল হইত।

কবিতাকুঞ্জ—আবুল-মাসুদী মহাপ্রদ হামিদ আলী প্রণীত। ডিমাই ঘাদশাংশিত ৪৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা মাত্র। বাঙালী সর্ব্বধর্ম্ম-মিশ্রণেই বাঙালী। হিন্দু মুসলমান গ্রীষ্টান বৌদ্ধ জৈন যিনি যে ধর্ম্মই স্বীকার করুন না বাংলার বাঁহার বাস তিনি বাঙালী, তাঁর ভাষা বাংলা, তাঁহার স্বার্থ দেশের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ তাঁহার স্বার্থ। এই সাধারণ সহজ সত্যটি আজ কাল অনেকে উপলব্ধি করিতেছেন, ইহা দেশের পক্ষে জাতির পক্ষে শুভ লক্ষণ। শ্রীযুক্ত মহাপ্রদ হামিদ আলী এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই কবিতাকুঞ্জ রচনা করিয়াছেন। তিনি হিন্দু বালবিধবার দুঃখে গলদ্রব, জটিল মুখাঙ্কির বিধবা কন্ডার বিবাহকে বাঙালী জাতির প্রকৃত উন্নতির হুত্রেপাত জানিয়া আনন্দে উৎফুল্ল। লেখকের সহধর্ম্মিণীর দুটি কবিতা এই পুস্তক মধ্যে স্থান পাইয়াছে, তাহাও এই ভাবে অনুপ্রাণিত। তিনি লেডি কার্জনের হিন্দু মুসলমানের প্রতি উপেক্ষাও গ্রীষ্টানদিগের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়া দুঃখী এবং বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদে স্বদেশী ভাবের প্রসূরণে তিনি উন্নতি। হৃদয়ের দিক দিয়া

দেখিলে এই কবিতাকুঞ্জ বড় হৃদয় ছায়াশীতল। কিন্তু সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা নিতান্ত সাধারণ ও বিশেষত্ববর্জিত।

ওলাউঠা চিকিৎসা—বিক্রমপুর, স্বর্ণগ্রাম সেবকলক্ষ্মীদায়ের জনৈক সেবক প্রণীত। ফুলকাপ অষ্টাংশিত ৭০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৬ আনা। ইহাতে সংক্ষেপে রোগের ইতিহাস, লক্ষণ, চিকিৎসা, ঔষধ, পথ্য, প্রতিষেধ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে ঔষধ-নির্বাচনপ্রদর্শিকা বেশ উপযোগী ও হিতকর হইয়াছে। ঔষধের ক্রম পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়াতে প্রথম শিক্ষার্থীর সুবিধা হওয়া সম্ভব।

বেণু ও বীণা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১ টাকা। ইহা অনেকগুলি খণ্ড গীতিকবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি পড়িয়া তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি। এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব-নামা কবিতা এত ভাবসম্পন্ন, এত রস-প্রেরণা ও এত বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়া অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চমকিত করিয়াছেন। নবীন কবিদের লেখার মধ্যে এমন স্বাধীন কবিত্বরস খুব অল্পই উপভোগ করিয়াছি। নবীন কবি প্রধানতঃ প্রেমের কবি, প্রেমকে তিনি সকলের উপর রাখিয়া বিজয়মুদ্রা পরাইয়াছেন, “কুহানাদপি” প্রেমকে পবিত্র মঙ্গল জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছেন, শুক “মমি” ও জড “ডাকটিকিট” তাঁহার কাছে প্রেমের সংবাদ, বিশ্বের নাড়ীস্পন্দন বহন করিয়া আনিয়াছে। সহমরণের চিতা হইতে পলায়িতা বালবিধবার আশ্রয়দাতা মাঝির প্রতি প্রেম প্রস্তুতি হইয়া তাহাও কবিকে মুগ্ধ সম্মগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। জড়ের মধ্যেও কবি প্রেম-চেতনা অনুভব করিয়া “কিশ-লবের জন্মকথা” ও “জলিত পল্লব” প্রভৃতি কবিতা লিখিয়াছেন। রেশমকীটের বিনাশে কবির ব্যাধা “কুলাচার” কবিতায় হৃদয় হইয়াছে। দেশের প্রতি কবির প্রেম কখন সরস কখন গম্ভীর। এইরূপে প্রতি কবিতায় প্রেম সুধাক্ষরণ করিয়াছে। ছন্দের লীলা-প্রবাহ, ধ্বনি—তাহাও হৃদয়। কেবল লঘু ছন্দগুলি কবির হাতে যেন প্রাণহীন বোধ হয়। কবি যেখানে গম্ভীর সেখানে লালিত্য মনোরম হইয়াছে। এই পুস্তক কবির প্রথম রচনা। এমন কবি আপনাবিরুদ্ধে আপনি চিন্মিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল, বাহাদুর ও হৃদয় পরিপাটি।

হোমশিখা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১৫৭ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। এখানিও নবীন কবির কাব্যগ্রন্থ, ইহাতে ৮টি দীর্ঘ কবিতা গম্ভীর ছন্দে, একটা বিরাট ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহার তেজস্বিতা হোমশিখার মতই, ব্যাপ্তি হোমশিখারই মত লকলকে, বিষমিগ্ধারী। সর্ব্বশেষের সাম্য-সাম কবিতাটিতে কবির নির্ভীক স্বাধীনতা, উদার প্রেম ছড়ে ছড়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে যে যেখানে অত্যাচারিত, কবি তাহাকে ডাকিয়া, সাম্য-সামের গান শুনাইয়াছেন। শূদ্র, নারী তাঁহার নিকট মহিমামণ্ডিত মনুষ্যকে উজ্জলরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমরা সকল কাব্যরসগ্রাহী পাঠকপাঠিকাকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল।

মুদ্রারক্ষক।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সংগৃহীত। গ্রন্থকার প্রভূত পরিজ্ঞান স্বীকার করিয়া প্রচলিত ইতিহাস, কিংবদন্তী, কুলগ্রন্থ এবং অজ্ঞাত উপকরণ হইতে, এই ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার স্বয়ং বারেন্স ব্রাহ্মণ, তাঁহার গ্রন্থেও বারেন্স ব্রাহ্মণের কীর্ত্তিই সমধিক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। ইহা বাস্তবিক। গ্রন্থকারের সম্ভবতঃ ইঁহাদিগের বিবরণ সংগ্রহেরই অধিক সুযোগ ঘটয়াছে। গ্রন্থলিখিত বিবরণ অধিকাংশই সাধারণ ইতিহাসিকের অপরিজ্ঞাত, অনেক স্থলে, প্রচলিত ইতিহাসবিরুদ্ধ। আমরা পুস্তকখানি

উপস্থাসের ছায় কৌতূহলের সহিত পাঠ করিয়াছি কিন্তু গ্রন্থের বিষয় গ্রন্থকার বিষয়গুলি ঐতিহাসিকের ছায় আলোচনা না করায় গ্রন্থের মূল্যও অনেকটা উপস্থাসের ছায় হইয়া গিয়াছে। ছাপার অক্ষরে বাহা ইতিহাস বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক, ইতিহাস তাহাকেই নির্বিবাবে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। কোথা হইতে কোন বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে, অবলম্বিত উপকরণের প্রকৃত মূল্য কি, সাধারণকে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিবার সুযোগ দেওয়া ঐতিহাসিকের অবশ্য কর্তব্য। এ গ্রন্থে সে সুযোগ দেওয়া হয় নাই। বিরুদ্ধ মত খণ্ডনের জন্য যুক্তি তর্কেরও অবতারণা নাই। গ্রন্থকার এখন কারাগারে, হুতরাং এই মারাত্মক অভাব দূরীকৃত হইবার আশা কম। তবে তিনি যে ফুলের সাজি সাধারণকে উপহার দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে যদি তাঁহার উদ্ভাসের সন্ধান ও পরীক্ষা ঘটিয়া উঠে, তবে বঙ্গীয় ইতিহাস নিশ্চয়ই উপকৃত হইবে।

সমালোচক ।

৪। দত্তপরিবার অর্থাৎ হালিসহর-কুমারহট্ট নিবাসী দত্ত বংশধর-গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।—ঐমহিমচন্দ্র দত্ত প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ডিমাই ১২ পেজি ৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। এখানি একটি বিশেষত্ব-বর্জিত কুলজিগ্রন্থ। ইহার সহিত সাধারণের কোনো সম্পর্ক নাই। লেখক নিজের জীবনী লিখিতে গিয়া নিজের বিপত্নীক হওয়া প্রসঙ্গে নিজেই লিখিতেছেন “আমরা এ বিষয়ে মহিম বাবুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। এরূপ ললনাকে হারাইয়া মহিমবাবুর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ সমীচীন হইয়াছে কি না, সে আলোচনার সময় এখনও আসে নাই, হুতরাং আমরা সে বিষয়ে কোনও মতামত এক্ষণে প্রকাশ করিব না।” অতুত!

৫। প্রমোদ।—মজুমদার লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। ক্রাউন ১৬ পেজি ১০২ পৃষ্ঠা। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি চুটকী রসিকতার পুস্তক। নির্দোষ শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও উপস্থিত সরস উত্তর প্রভৃতির পুস্তকহ গল্পগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। বন্ধুবান্ধবের মজলিসে ইহার দুই একটা সময় মত বলিতে পারিলে মজলিস আনন্দময় হইবে নিঃসন্দেহ।

মুদ্রা-রাক্ষস।

৬। ভীষ্মমহাদর্শন বা মহাশক্তি আর্ঘ্যদর্শন—উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীজ্ঞানকীনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। রয়াল অষ্টাংশিত ৪৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২ টাকা। লেখকের নাম নাই—তিনি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ভালই করিয়াছেন। পুস্তকখানি ‘হিং টিং ছট্’—বিরাট হৈয়ালি, তাহা নামেই মানুম। মানব পরমাবু এত অল্প যে এরকম বই লিখিয়া বা পড়িয়া সময় অপব্যয় করা কোনো বুদ্ধিমানের কার্য নহে। কর্তব্যের ব্যতীরে কুইনিনের বিরাট পিলের মত এই অতিকায় গ্রন্থখানিও আমাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছে। বুদ্ধির অল্পতা বশতঃই বোধ হয় এ মহাদর্শন আমাদের অসুখে অর্ধশনই রহিয়া গেল। যতটুকু বুঝিয়াছি ইহাতে ভীষ্মচরিত্রকে বাস্তবে রূপকে, দর্শনে বিজ্ঞানে, গম্ভৈর্যে, বাংলা সংস্কৃতে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা অবাস্তব পাণ্ডিত্যের ভাণ বা আড়ম্বর মহা বিড়ম্বনার স্তূপপাত করিয়াছে। ইহাতে ভীষ্মের চরিত্র উজ্জ্বল বা প্রচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। রবি বাবু এই জাতীয় লেখককেই লক্ষ্য করিয়া ‘হিং টিং ছট্’ নামক কবিতা ও ‘স্বয়ং পরাজয়’ নামক গল্প লিখিয়াছিলেন। ইহার পৃথিবীর উপর হইতে বসন্তের সবুজ রংটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিতেই ভাল বাসেন। তবে গ্রন্থের বিষয় সাদাগোকারে ডোঁটো পক্ষীর মত এ জাতীয় লেখক ছাপায়া হইয়া আসিতেছেন।

৭। স্বরাজ—ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ প্রণীত। ডিমাই ১২ পেজি ৪৩ পৃষ্ঠা। মূল্য চারি আনা। ইহাতে স্বরাজলাভের উপায়

নির্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখক বলেন যে “আদর্শ (রাষ্ট্রীয়) স্বরাজের রূপ ভিন্নপথাবলম্বী জাতীয় জীবনীশক্তির সমবায় মাত্র, সেইরূপ ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক স্বরাজও প্রত্যেক মনুষ্যের বিপর্নিত মার্গপানী মনোবৃত্তি নিচয়ের একটি উদার সমন্বয় ব্যতীত আর কিছুই নহে।” এই আধ্যাত্মিক স্বরাজকেই ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কথা খুব ঠাট। এতদ্ব্যতীত আরো কতকগুলি পন্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে; (১) স্বধর্মে আস্থা স্থাপন; (২) শিতব্যয়িতা শিক্ষা; (৩) কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞানোন্নতি ইত্যাদি। পন্থা কমটিই অবশ্য অমুহুতব্য; কিন্তু পন্থা অমুসরণের প্রণালী লেখক বাহা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সর্ববাদিসম্মত ত নহেই, তিনি স্বয়ংই সকল স্থলে স্বকীয় মতপন্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। লেখকের মতে মৌখিক বস্তুতা, দরখাস্ত, নিবেদন, সভাসমিতিতে স্বরাজলাভ ঘটিবে না। কথাটা আংশিক সত্য; সভাসমিতিতে বস্তুতা ও রাজ-শক্তির নিকট আবেদন একেবারে নিরর্থক নহে; প্রজাশক্তিকে বলিষ্ঠ করিয়া রাজশক্তিকেও যথেষ্টাচার হইতে বিরত রাখিবার জন্য সভা সমিতি ও বস্তুতার এখনো যথেষ্ট আবশ্যক আছে। লেখকের এই সমালোচ্য পুস্তকই তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। স্বধর্মে আস্থা স্থাপন অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে যে সমস্ত অদ্ভুত উৎকেন্দ্রিকতা আছে, তাহাও কি পালন করিতে হইবে? হাঁচি, টিকটিকি, কাকের ডাক প্রভৃতির ফলাফল চিন্তা করিতে করিতে কি এই বিরাট হিন্দু জাতিটা অকর্ম্ম হইয়া পড়ে নাই? খাড়াখাড়া, স্পর্শ, অস্পর্শ বিচার করিতে করিতে কি হিন্দু কৃপ-মতুলের মত সর্দারী অঙ্গুলার হইয়া পড়ে নাই? বৈদেশিক পোষাক পরিচ্ছন্ন প্রভৃতিতে অমুরাগই কি তাহাদিগকে আপনার দেশে বিদেশীর মত করিয়া রাখে নাই? এখন কি আবার হিন্দু নতন করিয়া টিকি রাখিয়া স্নেহসংসর্গ সম্বন্ধে পরিহার করিবে, না মুসলমান কাকেরকে জাহান্নামে পাঠাইবার অতুল প্রযত্ন মন দিবে? লেখকের মতটা অনেকটা এইকপই। তিনি স্নেহে বাবুকে সটিকি হইবার উপদেশ দিয়াছেন, হোট্টেলে বা হিন্দুমুসলমানের একত্র আহারকে তিনি কুংসিত ভাষায় গালি দিয়াছেন। ইহারই নাম কি “উদার সমন্বয়?” লেখকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলিও প্রণিধান-যোগ্য। দেশ ম্যালেরিয়ার উৎসম্ভব হইতেছে, তাহার কারণ স্বধর্মে অনায়া। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থা সমস্তই বিজ্ঞানসম্মত, কেন না “বাগান হইতে বাগানান্তরে পুষ্পচরনাদিতে” প্রাতঃসম নিমগ্ন হয়। হারি আর্ধ্য ঋষিগণ, তোমাদিগকে বৈজ্ঞানিক হইতেই হইবে, নতুবা এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের মান থাকে না। পুষ্পচরনের মধ্যে আধ্যাত্মিক যে মধুর ভাব আছে তাহাও বর্নন করিয়া আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা চাই। ইহাই স্বধর্মের মর্যাদা রক্ষা। লেখকের অভিপ্রায় জাতিভেদ সম্বন্ধে রক্ষা করিতে হইবে, কারণ তিনি নতন ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে “জাতিভেদ প্রথাব দিগে এই ভারত উন্নতির চরম সীমার উঠিয়াছিল।” ইহার মতে প্রাচীন বিধিব্যবস্থা অবিচারে অবনত মস্তকে পালন করা উচিত। আমাদের দেশের লোক এইকপ জড়ধর্মী হইয়া, আপনাদের স্বাধীন চিন্তা বিনশ্চিন্তা সর্ববিষয়ে এমন পরাধীন হইয়াছে, যে স্বরাজ লাভের উপায় বলিতে গিয়াও সে শৃঙ্খল ছাড়াইয়া চলিতে পারে না। লেখক বলেন “জাপানের বৌদ্ধধর্মে প্রবল অমুরাগের জন্যই জাপান ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সম্মুখে বীরদর্পে দণ্ডায়মান।” উপদেষ্টা সাজিয়া যিনি পরকে নিজের কথা বা মত পরিপাক করাইতে চান, তাহার এত বড় একটা জাতি অমার্জ্জব। জাপানের অভ্যাসধারণ এখনো রহস্যবৃত্ত। বিশেষ কোন ধর্ম্মমুরাগ ত নহেই। জাপান ধর্ম্ম পরিবর্তন করিবার জন্য কত জল্পনা কল্পনা করিতেছে বাণিজ্যের বিনাশের কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে “প্রত্যাশা শিক্ষা ও

তাহা সংবাদপত্রের পাঠক মাঝেই জানে। আমাদের কৃষি শিল্প সর্ববিধে প্রতীচ্য আশ্রয়ের অমুকরণ বা অনুগমন”। ঠিক কি তাই? বিদেশী রাজশক্তি আইন কানুন, জোর জবরদস্তিতে কি করিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্য নষ্ট করিয়াছে, তাহা Modern Review নামক ইংরাজি মাসিকের পাঠক অবগত আছেন। দেশের শিল্প রক্ষা দেশের কল্যাণের জন্তই উচিত; তাহার প্রতি অনুরাগের জন্ত বৈজ্ঞানিক দোহাই যেমন ব্যর্থ তেমনি হাতোদ্দীপক। আমাদের বেশনির্মিত কার্পাস ও উর্গাজাত বস্ত্রে ইলেকট্রিসিটি থাকুক বা না থাকুক তাহাই আমাদের পরিধেয়, বিলাতী পাটের কাপড় নহে। পাটের কাপড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া লেখক বলিয়াছেন—“পাটের কলের মজুদ ও কর্মচারীদের প্রায়ই হাঁপকাশ হইতে দেখা যায়, হুতরাং পাট নির্মিত বস্ত্র পরিধানের শারীরিক মঙ্গলের আশা কোথায়?” আপনাদের সুবিধার অমুখ্যায়ী এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ বিরল। লেখক চিকিৎসাশাস্ত্র ক্রিয়াক্রান্ত আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন হাঁপকাশ উৎপন্ন করিতে আঁশালো সব জিনিষই সমান পটু, তাহার ইলেকট্রিসিটিওলা কার্পাস রেশমও রেশমত করিয়া চলে না। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন নিঃস্বার্থতা ও সমর্পিতা স্বরাজ লাভের প্রধান উপায়। এই দুইগুণ আছে বলিয়া ইটালী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পুত্র কোচমান-পুত্রের সহিত একসঙ্গে খেলা কবে, এক গাড়ীতে বেড়ায় এবং একই ত্রয়া একসঙ্গে বসিয়া ভ্রমণ কবে। এই সমর্পিতাই যুক্তযাজ্যের স্বাধীনতার ভিত্তি। লেখক যদি এতটাই স্বীকার করিয়াছেন তবে বাঁহারা “ফ্রান্সিস্কালা ডিনার নামক যজ্ঞে” জাতিভেদ প্রচার উচ্ছেদ সাধনে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা-দিগকে “হিন্দু ও মুসলমান কুলদার” বলিয়া গালি দিয়া নিজেদের উপহাস্ত করিলেন কেন? নিজে সাম্যবাদ জীবনে উপলব্ধি করিয়া তবে উপদেশ দিতে আসিতে হয়। যে সব কথা ইংরাজিতে প্রকাশ না করিলে প্রকাশের উপায়াস্তর নাই, যাঁহা অনুবাদ করিয়া বুঝাইতে লেখকের মহা বিজ্ঞতার ভাণ ধরা পড়িত, সেই সব কথা ইংরাজিতে দিয়া ধামোখা ফুটনোট মিষ্টার বা বাবুসম্প্রদায়কে “পঞ্চাচারপ্রিয়” বলিয়া গালি দিয়া আপনাদের ভ্রমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমাদের দেশের স্বাভাবিক বিড়ম্বনার মধ্যে এই এক বিড়ম্বনা অপবিপণ্যচিন্তা হামবড়া বিজ্ঞের দল। এইরূপ লেখককে ইসপের ভাষায় বলি “Physician, first heal thyself,” এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কবি “হে ভগবান, আমাদিগকে বজ্রুর কবল হইতে রক্ষা কর।”

বেণু—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চৌধুরী বিবচিত। পুষ্টিয়া রাজসাহী হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজি ১২৫ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই। এখানি পদ্ম পুস্তক। কবিতা ও পদ্ম এই দুই প্রভেদ বিস্তর। ছন্দোবদ্ধ কথা যেমনি হোক সে পদ্ম, কিন্তু তাহা কবিতা হইতে হইলে তাহাও মধ্যে এমন একটা মাধুর্য, রস ও সৌন্দর্য্য থাকি আবশ্যক বাহা মনকে বিচিত্র ভাবে স্পর্শ করে। এ গ্রন্থে সে বিশেষ নাই।

সরল কুন্তিবাস—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, হুপার বয়াল অষ্টাংশিত ২৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৬০ আনা। এই অঙ্গনিদের মধ্যে বাংলা দেশে যে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় তাহার যে বিশেষ আদর হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এমন হৃদয় হৃদয় গার্হস্থ্য সংস্করণের কুন্তিবাসী রামায়ণ যে আবার বৃদ্ধ বনিতার মনোহরণ কবিবে তাহা বিচিত্র নহে। গ্রন্থাবলী কুন্তিবাস পণ্ডিতের পরিচয় ও গ্রন্থশেষে কঠিন পুরাতন শব্দ সকলের অর্থনির্ঘট গ্রন্থ বুঝিবার বিশেষ সহায়।

হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে অনেকগুলি বাসায়বাণিত স্থান ও ঘটনার স্মরণ কলাসঙ্গত চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে ছাখানি নূতন চিত্র অধিক দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ রূপকে সীতা-দেবীর ভিক্ষাদান চিত্রখানি পরবর্তী সংস্করণে স্থান না পাইলেই ভালো হয়। এই চিত্রখানিতে রামায়ণের উচ্চভাব মোটে কুটে নাই, অধিকন্তু অনুস্বাভাবিক হিসাবে এ চিত্রখানি অকিঞ্চিৎকর। গ্রন্থখানি দ্বিতীয় সংস্করণেও শুদ্ধিপত্র কলঙ্কপ্রসূত মত বহন করিতেছে, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এমন একখানি মনোহর হৃদয় সংস্করণ বিস্তার করা কি একেবারেই অসম্ভব? এই সংস্করণে একখানি বহীন মানচিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা আখ্যান বৃত্তিতে বিশেষ সহায়তা করিবে।

সবল কাশীরামদাস—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, সম্পাদিত। সিটিবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। হুপারবয়াল অষ্টাংশিত ৫৫৯ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ কোথাও বুঝিয়া পাইলাম না। গুনিয়াছি নাকি সাধারণ বাঁধাই ২৬০ ও উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৩ টাকা মাত্র। এই অষ্টাদশ পর্বের বিবর্ত পুস্তক এমন স্মরণ ছাপা, বাঁধা ও অনেকগুলি কলাসঙ্গত স্মরণ চিত্র ও মানচিত্র সহিত ২৬০ বা তিন টাকার খুব সস্তা বলিতে হইবে। নূনকল্পে চারি টাকা হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু বোধ হয় সাধারণ পাঠকবর্গের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা কবিয়া যোগীন্দ্রবাবু মূল্য কম রাখিয়াছেন। আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী করিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়াছে। অল্পীল ও বাহুল্য অংশ বর্জিত হইয়াছে অথচ আখ্যানের সুলভতা কোথাও নষ্ট হয় নাই। পূর্বাপর সংযোগ রাখিবার জন্ত বর্জিতাংশের স্থানে সম্পাদককে মাঝে মাঝে যে দুই চারি পংক্তি রচনা করিয়া সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছে, তাহা কোথাও অসমঞ্জস্য হয় নাই। খুব যোগাতার সহিতই সম্পাদন কার্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। পুস্তকের প্রারম্ভে কাশীরাম দাসের পরিচয় ও পবিত্রিষ্টে দুইশ শব্দের অর্থ নির্ঘট পুস্তকের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই হৃদয় পুস্তক গৃহে গৃহে বিরাগিত হইয়া আমাদের প্রাচীন আদর্শকে পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায় হইবে, আমাদের জাতীয়তা সংগঠনে সাহায্য করিবে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থেব একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি ছাপার ভুল পরিহার করিতে পারে নাই। নবনয়নের বাঁহা আনন্দকর, তাহা নিধুত পাইতে ইচ্ছা করে, সেই জন্তই একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিলাম।

শারদোৎসব—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ৭০১ হুজিরা স্ট্রিট, কলিকাতা। রয়াল বোডাংশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। ইহা রবীন্দ্রবাবুর সন্তসমাগু নাটিকা, স্বতঃসমাগমে প্রকৃতির যে আনন্দোচ্ছ্বাস, তাহা কবিস্বদেবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই নাটকির আকারে সাধারণের উপভোগ্য হইয়াছে। হাঙ্গ ও করণ রস, মাধুর্য ও মহত্ব অপব্যয় কোশলে পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকগুলি মধুর গান ইহাতে আছে। এই শব্দে সকলেবই উৎসব, এই শারদোৎসব পাঠ করিয়া সেই উৎসবেব আনন্দ পবিত্রতর ও পরি-ক্ষুট হইবে। ইহা ছাত্র ও বালকদিগের অভিনয়ের উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহাতে স্কুলোক্তের পাঠ নাই। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ইত্যাদি সমস্ত, গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অভিনব-রূপে নয়নাভিরাম করা হইয়াছে। কবির রচনার সৌন্দর্য্যকে প্রকাশক-দিগের চেষ্টা, বহিঃ-সৌষ্ঠবে অধিকতর ব্যস্ত করিয়াছে। এই সাময়িক সরস মহত্বভাবপূর্ণ নাটিকাখানি সকলেই এক একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন, আশা করি।

মুদ্রারক্ষক।

একটা বসন্ত প্রাতের প্রসুতিত সুরুর পুষ্প (সত্যমূলক জাপানী গল্প) —শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত; প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং

হাউস, ৭৩১ ব্রুকলিন স্ট্রীট, কলিকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ; ডিমাই অষ্টাংশিত ১২২ পৃষ্ঠা; মূল্য ৮০ আনা মাত্র। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ইত্যাদি সমস্তই অশ্রুবর্ণিতবিষয়োপযোগী ভাবে জাপানী ক্যাশানে করা হইয়াছে—ইহাতে গ্রন্থের সহিসৌষ্ঠব অভিনবরূপে নবনাতিবাস হইয়াছে।

জাপানের স্কুরা তারুকের তদানীন্তন ছোট্টাভাজেব, ততোধিক রাজস্বভোগের অত্যাচারে উৎপীড়িত প্রজামণ্ডলী দেহপাত কবিয়া কিরূপে দেশের মধ্যে শান্তিসংস্থাপন করিতে কৃতকার্য হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহারই অশ্রুপাঠ্য কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। যে স্থানে অত্যাচারী রাজা নিঃশব্দ ও নিরীহ প্রজার কাতরকল্লম উপেক্ষা করিয়া আপনার ব্যক্তিচারী বিলাসবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চায়, সেখানে সাধারণের হিতার্থ ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থভাগ ও আত্মদান কতদূর ফলপ্রসূ হইতে পারে—দেশের ক্ষয় যে মহাপুরুষ জীবনদান করিতে প্রস্তুত, তাহার সহধর্ম্মিণী প্রস্তুত হইলে কতখানি তেজ, কতখানি শক্তি ধাকা অবশ্যক—যে রাজা স্নায়ুদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া অবিচারকে বরণ করিয়া লয়, কোন্ নরকেব উত্তম্ত লোহশলাকা তাহার গুণিতব্যকে দগ্ধ করিতে ছুটিয়া আসে—সোপোদোর বীবোচিত আত্মদান, চুতঠাকুবাণী আদর্শ পত্নীত্ব ও অত্যাচারী ছোট্টাভাজের শোচনীয় পরিণাম-কাহিনীপ্রসঙ্গে এই গ্রন্থে তাহা জীবন্ত ভাবে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। অশ্রুবর্ণিত এই উপাদেশ বিষয়টী সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থের মাধুর্য ও মনোহাবিষ্য সহস্রগুণে বর্ধিত কবিয়াছে। সম্পূর্ণ বিদেশীয় গল্পকে অবিকৃত রাখিয়া লিপি কৌশলেব চমৎকারিণ্ডে ও দ্বিধা-মধুর ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবাহে সরস কবিয়া তোলা বিশেষ ক্ষমতার কার্য। কৃতী লেখক সুরেন্দ্রবাবুর স্বপকহস্ত একাধারে বংশোচিত গৌবর দক্ষা করিয়াছে।

আমার জীবন—ঈশ্বরী রাসহন্দরী কর্তৃক লিখিত; ঈশ্বর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা-সম্বলিত; ঈশ্বরমৌলিক সবকার দ্বারা প্রকাশিত; তৃতীয় সংস্করণ; ভবল ক্রাউন্ড যোডশাংশিত ১৫০ পৃষ্ঠা; মূল্য ৮০ মাত্র; প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ৭৩১ ব্রুকলিন স্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থচরিত্রী ২২ বৎসর বয়সী হিন্দু-মহিলা, ৮৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। যে সময়ে সম্ভাব্যতাপরিবেষ্টিত প্রৌঢ় হিন্দুমহিলাকেও আপনার দেহহস্ত পরিমিত ঘোমটার অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া গৃহকর্ম করিতে হইত—“স্বামীর পালিত ঘোড়াটা” কে দেখিলেও স-সঙ্কোচে লজ্জার আবরণ রক্ষা করিয়া চলিতে হইত—মসীলিপ্ত কাগজের খণ্ডটুকু পর্যন্ত অতর্কিতে হস্তস্পৃষ্ট হইলে শাস্তি-দীনদিনীর গল্পনা ও প্রতিবাসিনীর তীব্র সমালোচনাব কথায় তাতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত—গ্রন্থকর্ত্রী সেই সময়ের মহিলা। ইনি ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া ‘চৈতন্য ভাগবত’াদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবার লালসায় পরিণত যৌবন বয়সে অপরের সাহায্য ব্যতীত আত্মচেষ্টাবলে বিদ্যাশিক্ষায় প্রযুক্ত হন। এবিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, বঙ্গমানে গ্রন্থখানিই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। একজন ‘সেকেন্ডে’ হিন্দুমহিলার দ্বাৰা এমন একখানি চমৎকার গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে, ইহা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। এই আত্মজীবনচরিত পাঠে একদিকে যেমন আমরা গ্রন্থকর্ত্রীর নিপুণ গৃহীপণা, ধর্ম্মপ্রাণতা, বিদ্যানুরাগ, অধ্যবসায় প্রভৃতি প্রকৃত মনুষ্যোচিত সদগুণরাশির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যাই, অপবদিকে গ্রন্থেব সরল, সরস ভাষা ও ভাবমাধুর্যের ঐন্দ্রজালিক শক্তি আমাদের মস্তমুগ্ধ চিত্তকে অতর্কিতভাবে টানিয়া লইয়া যায়। গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে কৌতুহল ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। এরূপ একখানি হৃদয় গ্রন্থ প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত।

ঈক—।

জাপানের কথা ও শিল্প সংবাদ—ঈশ্বরীশচন্দ্র গুহ, এম্. এ. কর্তৃক সম্বলিত। মূল্য ৮০ আনা। এই পুস্তকে জাপান সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞাতব্য বিষয় সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। জাপান ও আমেরিকা প্রবাসী-পত্র হইতে অনেক কাজের কথা তোলা হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে “জাপানে মিতব্যয়ী ভাবভীষ ছাত্রের পক্ষে ৩০০০ টাকা এক প্রকার যথেষ্ট।” তিনি বলেন “যাহারা জাপানে আসিতে চাহেন, তাহারা জাপান ঈমার কোম্পানী N. Y. K. (Nippon Yasen Kaisha & Co.) ঈমারে আসিবেন, কারণ এই কোম্পানীর ভাড়া সর্বাপেক্ষা কম।” ইউরোপে শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞাতব্য কথা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বর্তমান যুগে বঙ্গীয় যুবক-মণ্ডলীর নিকট বিশেষ আদর পাইবার যোগ্য। সমালোচক।

কুস্তলীন পুরস্কার (ষাশ বৎসবে, ১৩১৫ সাল)—ঈএইচ বহু কর্তৃক দেলপোস হাউস হইতে প্রকাশিত। ভবল ক্রাউন্ড ২৪ পেজি ১৬৬ পৃষ্ঠা। ইহাতে ১০টি গল্প, ৬ খানি পুজাব চিত্র ও ৪টি কবিতা আছে। সবগুলিই অলিখিত, সবস, স্বপাঠ্য; স্বামী সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। এক যুগ ধরিয়া বহু মহাশয় নিম্ন ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষায় পুষ্টি-সাধনে যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, কণ্ঠ্য যুগের মত প্রচ্ছন্ন-গুণসম্পন্ন কত লেখকলেখিকাকে যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত কবিয়া দিয়াছেন, এজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্থ। পুস্তকেব আকার, ছাপা, বাঁধাই সমস্তই হৃদয়ের হৃদুগ্ধ। কেবল ছাপাব ভুল অনেক। এ বিষয়ে কুস্তলীন প্রেসেব অধ্যক্ষেব মনোযোগ বাব বার কবিয়া আকর্ষণ করিবার প্রয়াস আমার ব্যর্থ হইয়াছে মনে হয়। বাংলার একটি শ্রেষ্ঠ ছাপাখানা নিকলজ দেখিতে আমাদের বাসনা; তাই পুনঃ পুনঃ একই ক্রটিব উল্লেখ কবিত্তে বাধ্য হইতেছি। পুস্তকেব ক্রটিপি মূল্যে উল্লেখ নাই। আগামী বর্ষ হইতে স্বকল্পিত পত্রের পরিবর্তে লেখকলেখিকাগণকে প্রাচীন উপকথা সংগ্রহ কবিয়া দিবা পুরস্কার পাইতে হইবে। সংকল্প সাধু। অনেক লুপ্তপ্রায় রত্ন উদ্ধার পাইবে। মুদ্রারক্ষস।

চিত্র-পরিচয় ।

মহাশা রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। ঐ দিবসে প্রতি বৎসব তাহার সম্মানার্থ ভাবতবর্ষের নানা স্থানে সভা হয়। আমরা তাহার যে ছবি প্রকাশ করিলাম, তাহা তাহার ব্রিষ্টল নগরের মিউজিয়মে রক্ষিত তৈলচিত্রের অনুলিপি। ইহাই তাহার সর্বোৎকৃষ্ট ছবি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বাবা কবীর ভারতবর্ষীয় সাধু মহাস্বামীদিগের অন্যতম। তাহার মতাবলম্বীরা কবীরপন্থী বলিয়া পরিচিত। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, এবং হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ব্যবসয়ে জোলা অর্থাৎ তাঁতি ছিলেন। বর্তমান সংবাদ প্রকাশিত তাহার ছবিখানি ঝাঁকপুরেব খুবাবঙ্গ পুস্তকালয়ে বক্ষিত একটি প্রাচীন চিত্রসংগ্রহে ‘(মুরাজা)’ হইতে গৃহীত। তিনি ভগবৎপ্রেমমহাপানে বিভোর ও নিমলিতনেত্র। তাহার বামে একজন স্তম্ভ খন্ডনী বা তরুণ কোন বাস্তব্য বাজাইতেছেন। দক্ষিণে তাহার শিষ্য কোন মুসলমান বাজবংশীয় পুরুষ, এবং তাহার পশ্চাতে একজন ময়ূ-পুচ্ছের বাজবংশীয় ভৃত্য। কবীরেব মস্তকে কুঞ্চুড়া অপট্টকপে লব্ধিত হইতেছে। বোধ হয় তাহাকে কুঞ্চাপাসক বলিয়া অঙ্কিত করা চিত্র-করের অভিপ্রেত ছিল। দক্ষিণে নীচের কোণে কুঞ্চের প্রিয়পাখী ময়ূরের সহিত বিড়ালের কুড়ির অহিংসা সূচিত হইতেছে। কবীর তাঁতের সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন। তিনি পরোপকারী অকর্ম্মী তথাকথিত ‘সাধু’ ছিলেন না।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

৮ম ভাগ ।

কার্তিক, ১৩১৫ ।

৭ম সংখ্যা ।

গোরা ।

৩৩

বিনয় তখনি আনন্দময়ীর বাড়ীর দিকে চলিল। লজ্জায় বেদনায় মিশিয়া মনের মধ্যে ভারি একটা পীড়ন চলিতেছিল। এতক্ষণ কেন সে মার কাছে যায় নাই! কি ভুলই করিয়াছিল! সে মনে করিয়াছিল তাহাকে ললিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে! সব প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া সে যে কলিকাতায় আসিয়াই আনন্দময়ীর কাছে ছুটিয়া যায় নাই, সেজন্য ঈশ্বর তাহাকে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়াছেন! অবশেষে আজ ললিতার মুখ হইতে এমন প্রশ্ন শুনিতে হইল “গৌর বাবুর মার কাছে একবার যাবেন না?” কোনো এক মুহূর্ত্তেও এমন বিলম্ব ঘটিতে পারে যখন গৌর বাবুর মার কথা বিনয়ের চেয়ে ললিতার মনে বড় হইয়া উঠে। ললিতা তাঁহাকে গৌর বাবুর মা বলিয়া জানে মাত্র কিন্তু বিনয়ের কাছে তিনি যে জগতের সকল মায়ের একটি মাত্র প্রত্যক্ষ প্রতিমা।

তখন আনন্দময়ী সস্ত্র স্নান সারিয়া ঘরের মেঝের আসন পাতিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন;—বোধ কবি বা মনে মনে জপ করিতেছিলেন। বিনয় তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের কাছে জুটাইয়া পড়িয়া কহিল—“মা।”

আনন্দময়ী তাহার অবলুপ্তিত মাথায় দুই হাত বুলাইয়া কহিলেন, “বিনয়।”

মার মত এমন কণ্ঠস্বর কার আছে! সেই কণ্ঠস্বরেই বিনয়ের সমস্ত শরীরে যেন কণকণার স্পর্শ বহিয়া গেল। সে অশ্রুজল কণ্ঠে রোধ করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিল, “মা, আমার দেহি হয়ে গেছে।”

আনন্দময়ী কহিলেন, “সব কথা শুনেছি বিনয়।”

বিনয় চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, “সব কথাই শুনেছ।”

গোরা হাজত হইতেই তাঁহাকে পত্র লিখিয়া উকিল বাবুর হাত দিয়া পাঠাইয়াছিল। সে যে জেলে যাইবে সেকথা সে নিশ্চয় অনুমান করিয়াছিল।

পত্রের শেষে ছিল—“কাবাবাসে তোমার গোরার লেশ-মাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি একটুও কষ্ট পাইলে চলিবে না। তোমার হৃৎপিণ্ডই আমার দণ্ড, আমাকে আর কোনো দণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেটের দিবার সাধ্য নাই। একা তোমার ছেলের কথা ভাবিও না মা, আরো অনেক মায়ের ছেলে বিনা দোষে জেল খাটিয়া থাকে, একবার তাহাদের কষ্টের সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে; এই ইচ্ছা এবার যদি পূর্ণ হয় তুমি আমার জন্য ক্ষোভ করিও না।

“মা, তোমার মনে আছে কি না জানি না, সেবার

হুর্ভিক্ষের বছরে আমার রাত্তার ঘরের ঘেঁষে টেবিলে আমার টাকার খলিটা রাখিয়া আমি পাঁচ মিনিটেব জন্ত অস্ত্র ঘরে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি খলিটা চুবি গিয়াছে। খলিতে আমার স্বলারশিপের জমানো পঁচাশি টাকা ছিল; মনে সংকল্প করিয়াছিলাম আরো কিছু টাকা জমিলে তোমার পা ধোবার জলেব জন্ত একটি রূপার ঘটি তৈরি করাইয়া দিব। টাকা চুরি গেলে পর যখন চোরের প্রতি ব্যর্থ রাগে জলিয়া মরিতেছিলাম তখন ঈশ্বর আমার মনে হঠাৎ একটা স্রবুদ্ধি দিলেন; আমি মনে মনে কহিলাম, যে ব্যক্তি আমার টাকা লইয়াছে আজ হুর্ভিক্ষের দিনে তাহাকেই আমি সে টাকা দান করিলাম। যেমনি বলা অমনি আমার মনের নিষ্ফল ক্রোড সমস্ত শাস্ত হইয়া গেল। আজ আমার মনকে আমি তেমনি কবিতা বলাইয়াছি যে, আমি ইচ্ছা কবিতাই জেলে যাইতেছি। আমার মনে কোনো কষ্ট নাই, কাহারো উপরে রাগ নাই। জেলে আমি আতিথ্য লইতে চলিলাম। সেখানে আহাৰ বিহারের কষ্ট আছে—কিন্তু এবারে ভ্রমণের সময় নানা ঘরে আতিথ্য লইয়াছি; সে সকল জায়গাতে ত নিজের অভ্যাস ও আবশ্যকমত আরাম পাই নাই। ইচ্ছা করিয়া যাহা গ্রহণ কবি সে কষ্ট ত কষ্টই নয়; জেলের আশ্রয় আজ আমি ইচ্ছা কবিতাই গ্রহণ করিব; যতদিন আমি জেলে থাকিব একদিনও কেহ আমাকে জোর করিয়া সেখানে রাখিবে না ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।

পৃথিবীতে যখন আমরা ঘরে বসিয়া অনায়াসেই আহাৰ বিহার করিতেছিলাম, বাহিরের আকাশ এবং আলোকে অবাধ সঞ্চরণের অধিকার যে কত বড় প্রকাণ্ড অধিকার তাহা অভ্যাসবশতঃ অনুভবমাত্র করিতে পারিতেছিলাম না সেই যুহুর্ভেই পৃথিবীর বহুতর মানুষই দোষে এবং বিনা দোষে ঈশ্ববদন্ত বিশ্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যে বন্ধন এবং অপমান ভোগ কবিতেন আজ পর্যন্ত তাহাদের কথা ভাবি নাই, তাহাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখি নাই—এবার আমি তাহাদের সমান দাগী হইয়া বাহির হইতে চাই; পৃথিবীর অধিকাংশ কৃত্রিম ভাল-মানুষ যাহারা ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়া আছে তাহাদের দলে ভিড়িয়া আমি সম্মান বাঁচাইয়া চলিতে চাই না।

মা, এবার পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হইয়া আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। ঈশ্বব জ্ঞানেন পৃথিবীতে যাহারা বিচারের ভার লইয়াছে তাহাবাই অধিকাংশ রূপাপাত্র। যাহারা দণ্ড পায় না দণ্ড দেয়, তাহাদেরই পাপের শাস্তি জেলের কয়েদিবা ভোগ করিতেছে; অপরাধ গড়িয়া তুলিতেছে অনেকে মিলিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ইহারাই। যাহারা জেলের বাহিরে আবামে আছে সম্মানে আছে তাহাদের পাপের ক্ষম কবে কোথায় কেমন করিয়া হইবে তাহা জানি না। আমি সেই আরাম ও সম্মানকে দিকার দিয়া মানুষের কলঙ্কেব দাগ বৃকে চিহ্নিত করিয়া বাহির হইব, মা তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর, তুমি চোখের জল ফেলিও না। ভৃগু-পদাঘাতের চিহ্ন ত্রীকৃষ্ণ চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন; জগতে ঔদ্ধত্য যেখানে যত অস্ত্রায় আঘাত করিতেছে ভগবানের বৃকের সেই চিহ্নকেই গাঢ়তর করিতেছে। সেই চিহ্ন যদি তাঁর অলঙ্কার হয় তবে আমার ভাবনা কি, তোমারই বা দুঃখ কিসেব ?—

এই চিঠি পাইয়া আনন্দময়ী মহিমকে গোরাব কাছে পাঠাইবার চেষ্টা কবিতাছিলেন। মহিম বলিল, আগিল আছে, সাহেব কোনোমতেই ছুটি দিবে না। বলিয়া গোরার অবিবেচনা ও ঔদ্ধত্য লইয়া তাহাকে যথেষ্ট গালি দিতে লাগিল, কহিল, উহার সম্পর্কে কোনদিন আমার স্নেহ চাকরিটি যাইবে। আনন্দময়ী কৃষ্ণদয়ালকে এসম্বন্ধে কোনো কথা বলা অনাবশ্যক বোধ করিলেন। গোবা সম্বন্ধে স্বামীর প্রতি তাহাব একটি মধ্যাস্তিক অভিমান ছিল;— তিনি জানিতেন, কৃষ্ণদয়াল গোবাকে হৃদয়ের মধ্যে পুত্রের স্থান দেন নাই;— এমন কি, গোবা সম্বন্ধে তাঁহার অন্তঃকরণে একটা বিকল্প ভাব ছিল। গোরা আনন্দময়ীর দাম্পত্য সম্বন্ধকে বিদ্ধ্যাচলব মত বিভক্ত করিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার একপারে অতি সতর্ক শুদ্ধাচার লইয়া কৃষ্ণদয়াল একা, এবং তাহার অন্তপাবে তাঁহার স্নেহ গোবাকে লইয়া একাকিনা আনন্দময়ী। গোরার জীবনের ইতিহাস পৃথিবীতে যে দুজন জানে তাহাদের মাঝখানে যাতায়াতের পথ যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে সংসাৰে গোবার প্রতি আনন্দময়ীর স্নেহ নিতান্তই তাঁহার একলার ধন ছিল। এই পরিবারে

গোবাব অনধিকাবে অবস্থানকে তিনি সবদিক দিয়া যত হান্ধা করিয়া বাখা সম্ভব তাহার চেষ্টা করিতেন। পাছে

কেহ বলে, তোমার গোবা হইতে এই ঘটিল, তোমার গোৱার জন্ত এই কথা শুনিতে হইল, অথবা তোমার গোৱা আমাদেব এই লোকসান করিয়া দিল, আনন্দময়ীর এই এক নিয়ত ভাবনা ছিল। গোৱার সমস্ত দায় বেঁ তাঁহারই! আবাব তাঁহার গোবাও ত সামান্ত দুঃস্থ গোবা নয়!

যেখানে সে থাকে সেখানে তাহার অস্তিত্ব গোপন কবিয়া বাখা ত সহজ ব্যাপাব নহে। এই তাঁহার কোলের ক্ষাপা গোৱাকে এই বিকল্প পরিবাবেব মাঝখানে এতদিন দিন-রাত্রি তিনি সামলাইয়া এতবড় কবিয়া তুলিয়াছেন;—অনেক কথা শুনিয়াছেন যাহাব কোনো জবাব দেন নাই, অনেক দুঃখ সহিয়াছেন যাহার অংশ আব কাহাকেও দিতে পাবেন নাই।

আনন্দময়ী চুপ কবিয়া জালনার কাছে বসিয়া বহিলেন;—দেখিলেন, কৃষ্ণদয়াল প্রাতঃস্থান সাবিয়া লগাটে বাহতে বন্ধে গঙ্গামুক্তিকাব ছাপ লাগাইয়া মস্ত উজাবণ করিতে করিতে বাড়িতে প্রবেশ কবিলেন, তাঁহার কাছে আনন্দময়ী যাইতে পাবিলেন না। নিষেধ, নিষেধ, নিষেধ, সর্বত্রই নিষেধ। অবশেষে নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনন্দময়ী উঠিয়া মহিমের ঘবে গেলেন। মহিম তখন মেঝের উপব বসিয়া খববের কাগজ পড়িতেছিলেন, এবং তাঁহার ভৃত্য দ্বানব পূর্বে তাঁহার গায়ে তেল মালিশ কবিয়া দিতেছিল। আনন্দময়ী তাঁহাকে কহিলেন, “মহিম, তুমি আমাব সঙ্গে একজন লোক দাও, আমি যাই গোবাব কি হল দেখে আসি। সে জেলে যাবে বলে মন স্থির করে বসে আছে; যদি তার জেল হয় আমি কি তার আগে তাকে একবার দেখে আসতে পাবব না?”

মহিমের বাহিরের ব্যবহার যেমনি হউক, গোৱার প্রতি তাঁহাব একপ্রকারেব স্নেহ ছিল। তিনি মুখে গর্জন কবিয়া গেলেন যে, “যাক্ লক্ষ্মীছাড়া জেলেই যাক্—এতদিন যায় নি, এই আশ্চর্য্য” এই বলিয়া পরক্ষণেই তাঁহাদেব অল্পগত পরাণ ঘোড়ালকে ডাকিয় তাহাব হাতে উকিল খরচার কিছু টাকা দিয়া তখন তাহাকে রওনা করিয়া দিলেন এবং আপিসে গিয়া সাহেবেব কাছে ছুটি যদি পান

এবং বৌ যদি সম্মতি দেন তবে নিজেও সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন।

আনন্দময়ীও জানিতেন, মহিম গোবাব জন্ত কিছু না করিয়া কখনো থাকিতে পাবিবেন না। মহিম যথা-সম্ভব ব্যবস্থা করিয়াছেন শুনিয়া তিনি নিজেব ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি স্পষ্টই জানিতেন গোবা যেখানে আছে সেই অপরিচিত স্থানে এই সঙ্কটের সময় লোকেব কৌতুক কৌতূহল ও আলোচনার মুখে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে এ পরিবাবে এমন কেহই নাই। তিনি চোপের দৃষ্টিতে নিঃশব্দ বেদনাব ছায়া লইয়া ঠোঁটের উপব ঠোঁট চাপিয়া চুপ কবিয়া রহিলেন। লছমনিয়া যখন হাউ হাউ কবিয়া কাঁদিতে লাগিল তাহাকে তিরস্কার কবিয়া অতৃষ্ণে পাঠাইয়া দিলেন। সমস্ত উদ্বেগ নিস্তকভাবে পরিপাক করাই তাঁহাব চিরদিনের অভ্যাস। সুখ ও দুঃখ উভয়কেই তিনি শাস্তভাবেই গ্রহণ করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের আক্ষেপ কেবল অন্তর্যামীবই গোচর ছিল।

বিনয় যে আনন্দময়ীকে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু আনন্দময়ী কাহারো সাহসনাবাক্যের কোনো অপেক্ষা রাখিতেন না;—তাঁহার যে দুঃখের কোনো প্রতিকাব নাই সে দুঃখ লইয়া অন্তলোকে তাঁহাব সঙ্গে আলোচনা কবিতো আসিলে তাঁহার প্রকৃতি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। তিনি আব কোনো কথা উঠিতে না দিয়া বিনয়কে কহিলেন, “বিষ্ণু, এখনো তোমার স্থান হয় নি দেখছি—যাও, শীঘ্র নেয়ে এস গে—অনেক বেলা হয়ে গেছে।”

বিনয় স্থান কবিয়া আসিয়া যখন আহাব করিতে বসিল তখন বিনয়ের পাশে গোবাব স্থান শূন্য দেখিয়া আনন্দময়ীর বুকের মধ্যে হাহাকাব উঠিল;—গোৱাকে আজ জেলের অন্ন খাইতে হইতেছে, সে অন্ন নিঃশ্রমশাসনের দ্বারা কটু, মায়েব সেবার দ্বাবা মধুর নহে, এই কথা মনে কবিয়া আনন্দময়ীকেও কোনো ছুতা করিয়া একবার উঠিয়া যাইতে হইল।

বাড়ি আসিয়া অসময়ে ললিতাকে দেখিয়াই পরেশ বাবু বুকিতে পারিলেন তাঁহাব এই উদ্দাম মেয়েটি অভূতপূর্বরূপে

একটা কিছু কাণ্ড বাধাইয়াছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে বলিয়া উঠিল, “বাবা, আমি চলে এসেছি। কোনো মতেই থাকতে পারলুম না।”

পরেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন কি হয়েছে?” ললিতা কহিল—“গৌব বাবুকে ম্যাজিস্ট্রেট জেলে দিয়েচে।” গৌর ইহার মধ্যে কোথা হইতে আসিল কি হইল পরেশ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ললিতার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎক্ষণাৎ গোবার মার কথা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে ভাবিতে লাগিলেন, একজন লোককে জেলে পাঠাইয়া কতকগুলি নিরপরাধ লোককে যে কিরূপ নির্ভর দণ্ড দেওয়া হয় সে কথা যদি বিচারক অন্তঃকরণের মধ্যে অনুভব করিতে পারিতেন তবে মানুষকে জেলে পাঠানো এত সহজ অভ্যস্ত কাজের মত কখনই হইতে পারিত না। একজন চোবকে যে দণ্ড দেওয়া গৌবাকেও সেই দণ্ড দেওয়া ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে যে সমান অনায়াসসাধ্য হইয়াছে এরূপ বর্বরতা নিতান্তই ধর্মবুদ্ধির অসাধ্যতা বশত সম্ভবপন হইতে পারিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের দোষাওয়া জগতের অন্য সমস্ত হিংস্রতার চেয়ে যে কত ভয়ানক, তাহার পশ্চাতে সমাজের শক্তি রাজার শক্তি দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে যে কিরূপ প্রচণ্ড প্রকাণ্ড করিয়া তুলিয়াছে গোবার কাবান্ডের কথা শুনিয়া তাহা তাঁহার চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।

পরেশ বাবুকে এইরূপ চূপ কবিতা ভাবিতে দেখিয়া ললিতা উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল—“আচ্ছা, বাবা, এ ভয়ানক অন্তায় নয়?”

পরেশ বাবু তাঁহার স্বাভাবিক শাস্ত্রস্বরে কহিলেন—“গৌব যে কতখানি কি কবেচে সেত আমরা ঠিক জানিনে; তবে এ কথা নিশ্চয় বলতে পারি গৌর তার কর্তব্যবুদ্ধির প্রবলতার বোঝে হয়ত হঠাৎ আপনার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন কবতে পাবে কিন্তু ইংবেজি ভাষায় যাকে ক্রাইম বলে তা যে গৌরার পক্ষে একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ তাতে আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করবে যা—কালের স্মারবুদ্ধি এখনো সে পরিমাণে বিবুদ্ধ লাভ কবে নি। এখনো অপরাধের যে দণ্ড, ক্রটিবশত সেই

দণ্ড; উভয়কেই একই জেলের একই বানি টানতে হয়। এ রকম যে সম্ভব হয়েছে কোনো একজন মানুষকে সে ক্ষত দোষ দেওয়া যায় না। সমস্ত মানুষের পাপ একজ্ঞ দায়ী।”

হঠাৎ এই প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া পরেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, “তুমি কার সঙ্গে এলে?”

ললিতা বিশেষ একটু জোব করিয়া যেন খাড়া হইয়া কহিল, “বিনয় বাবুর সঙ্গে।”

বাহিরে যতই জোর দেখাক তাহাব ভিতরে দুর্বলতা ছিল। বিনয় বাবুর সঙ্গে আসিয়াছে এ কথাটা ললিতা বেশ সহজে বলিতে পারিল না—কোথা হইতে একটু লজ্জা আসিয়া পড়িল এবং সে লজ্জা মুখে ভাবে বাহির হইয়া পড়িতেছে মনে করিয়া তাহাব লজ্জা আবো বাড়িয়া উঠিল।

পরেশ বাবু এই খামখেয়ালি দুর্বল মেয়েটিকে তাঁহার অন্তান্ত সকল সন্তানের চেয়ে একটু বিশেষ স্নেহই করিতেন। ইহার ব্যবহার অথবা কাছে নিন্দনীয় ছিল বলিয়াই ললিতার আচরণের মধ্যে যে একটি সত্যপরতা আছে সেইটিকে তিনি বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা কবিয়াছেন। তিনি জানিতেন ললিতার যে দোষ সেইটেই বেশি করিয়া লোকের চোখে পড়িবে কিন্তু ইহার যে গুণ তাহা যতই দুর্বল হউক না কেন লোকের কাছে আদর পাইবে না। পবেশ বাবু সেই গুণটিকে যত্নপূর্বক সাবধানে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন;—ললিতার ভুবন্ত প্রকৃতিকে দমন করিয়া সেই সঙ্গে তাহার ভিতরকার মহত্বকেও দলিত কবিতেন তিনি চান নাই। তাহাব অন্ত দুইটি মেয়েকে দেখিবা মাত্রই সকলে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করে; তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল, তাহাদের মুখে গড়নেও খুঁৎ নাই—কিন্তু ললিতার রং তাহাদের চেয়ে কালো, এবং তাহার মুখে কমলীয়তা সঘনো মতভেদ ঘটে। ববদাসুন্দরী সেইজন্ত ললিতার পাত্র জোটা লইয়া সর্বদাই স্বামীর নিকট উদ্বেগ প্রকাশ কবিতেন। কিন্তু পরেশ বাবু ললিতাব মুখে যে একটি সৌন্দর্য দেখিতেন তাহা রঙের সৌন্দর্য নহে, গড়নের সৌন্দর্য নহে তাহা অন্তরের গভীর সৌন্দর্য। তাহাব মধ্যে কেবলমাত্র লালিতা নহে, স্বাভাবিক তেজ এবং শক্তির দৃঢ়তা আছে—

সেই দৃঢ়তা সকলের মনোবশ নহে। তাহা লোকবিশেষকে আকর্ষণ করে কিন্তু অনেককেই দূরে ঠেলিয়া রাখে।

সংসারে ললিতা প্রিয় হইবে না কিন্তু খাঁটি হইবে ইহাই জানিয়া পবেশ বাবু কেমন একটু বেদনাব সহিত ললিতাকে কাছে টানিয়া লইতেন—তাহাকে আর কেহ ক্ষমা করিতেছে না জানিয়াই তাহাকে করুণাব সহিত বিচার কবিতেন।

যখন পবেশ বাবু শুনিলেন, ললিতা একলা বিনয়ের সঙ্গে হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছে তখন তিনি এক মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন এজন্ত ললিতাকে অনেকদিন ধরিয়া অনেক জুখ সহিতে হইবে; সে যে টুকু অপরাধ কবিয়াছে লোকে তাহার চেয়ে বড় অপরাধের দণ্ড তাহার প্রতি বিধান কবিবে। সেই কথাটা তিনি চুপ করিয়া ক্ষণকাল ভাবিতেন এমন সময় ললিতা বলিয়া উঠিল, “বাবা, আমি দোষ কবেছি। কিন্তু এবাব আমি বেশ বুঝিতে পেরেছি যে, ম্যাক্সিম্‌স্‌টের সঙ্গে আমাদের দেশের লোকের এমন সম্বন্ধ যে তাঁব আতিথেয় মধ্যে কিছুই সম্মান নেই কেবলি অল্পগ্রহ মাত্র। সেটা সহ করেও কি আমার সেখানে থাকা উচিত ছিল?”

পরেণ বাবুর কাছে প্রশ্নটি সহজ বলিয়া বোধ হইল না। তিনি কোনো উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া একটু হাসিয়া ললিতার মাথায় দক্ষিণ হস্ত দিয়া মৃদু আঘাত কবিয়া বলিলেন—“পাগলি!”

এই ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে সেদিন অপরাহ্নে পবেশ বাবু যখন বাড়ীর বাহিবে পায়চারি করিতেছিলেন এমন সময় বিনয় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম কবিল। পবেশ বাবু গোরাব কারাদণ্ড সম্বন্ধে তাহাব সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন কিন্তু ললিতার সঙ্গে ষ্টীনারে আসার কোনো প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন না। অন্ধকার হইয়া আসিলে কহিলেন “চল, বিনয়, ঘরে চল।”

বিনয় কহিল—“না, আমি এখন বাসায় যাব।”

পরেণ বাবু তাহাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন না। বিনয় একবার চকিতের মত দোতলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

উপর হইতে ললিতা বিনয়কে দেখিতে পাইয়াছিল। যখন পরেশ বাবু একলা ঘরে ঢুকিলেন তখন ললিতা মনে

করিল বিনয় হয়ত আব একটু পরেই আসিবে। আর একটু পরেও বিনয় আসিল না। তখন টেবিলের উপরকার ছোটো একটা বই ও কাগজচাপা নাড়াচাড়া করিয়া ললিতা ঘব হইতে চলিয়া গেল। পরেশ বাবু তাহাকে ফিবিয়া ডাকিলেন—তাহার বিষমুখেব দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কহিলেন—“ললিতা আমাদের একটা ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাও।” বলিয়া বাতিটা আড়াল করিয়া দিলেন।

৩৫

পবদিনে বরদাসুন্দরী এবং তাঁহাদের দলের বাকি সকলে আসিয়া পৌছিলেন। হারান বাবু ললিতা সম্বন্ধে তাঁহার বিরক্তি সম্বরণ করিতে না পারিয়া বাসায় না গিয়া ইহাদেব সঙ্গে একেবাবে পবেশ বাবুব কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরদাসুন্দরী ক্রোধে ও অভিমানে ললিতাব দিকে না তাকাইয়া এবং তাহাব সঙ্গে কোনো কথা না কহিয়া একেবাবে তাঁহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। লাবণ্য ও লীলাও ললিতাব উপরে খুব বাগ করিয়া আসিয়াছিল। ললিতা এবং বিনয় চলিয়া আসাতে তাহাদের আবৃত্তি ও অভিনয় এমন অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদের লজ্জাব সীমা ছিল না। সূচরিতা, হাবান বাবুর ক্রুদ্ধ ও কটু উদ্বেজনা, বরদাসুন্দরীর অশ্রুমিশ্রিত আক্ষেপে অথবা লাবণ্যলীলাব লজ্জিত নিকংসাহে কিছুমাত্র যোগ না দিয়া একেবাবে নিস্তব্ধ হইয়া ছিল—তাহাব নির্দিষ্ট কাজটুকু সে কলের মত করিয়া গিয়াছিল। আজও সে যন্ত্রচালিতের মত সকলের পশ্চাতে ঘবে আসিয়া প্রবেশ করিল। সুধীব লজ্জায় এবং অনুতাপে সম্মুচিত হইয়া পবেশ বাবুর বাড়ীব দরজাব কাছ হইতেই বাসায় চলিয়া গেল—লাবণ্য তাহাকে বাড়ীতে আসিবার জন্ত বারবার অনুরোধ করিয়া কৃতকার্য না হইয়া তাহার প্রতি আড়ি কবিল।

হারান পবেশ বাবুব ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—“একটা ভারি অজ্ঞার হয়ে গেছে।”

পাশেব ঘরে ললিতা ছিল, তাহার কানে কথাটা প্রবেশ কবিবা মাত্র সে আসিয়া তাহার বাবার চৌকিব পৃষ্ঠদেশে দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইল এবং হাবান বাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পবেশ বাবু কহিলেন, “আমি ললিতাব কাছ থেকে সমস্ত সংবাদ শুনেছি। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এখন আলোচনা কবে কোনো ফল নেই।”

হারান শাস্ত্র সংঘত পরেশকে নিতান্ত দুর্বলস্বভাব বলিয়া মনে করিতেন। তাই কিছু অবজ্ঞার ভাবে কহিলেন—“ঘটনা ত হয়ে চূকে যায় কিন্তু চরিত্র যে থাকে, সেই জগ্গেই যা হয়ে যায় তারও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ললিতা আজ যে কাজটি কবেচে তা কখনই সম্ভব হত না যদি আপনাব কাছে বাবাব প্রশ্ন পেয়ে না আস্ত—আপনি ওর যে কতদূর অনিষ্ট করেচেন তা আজকেব ব্যাপাব সবটা শুনলে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।”

পরেশ বাবু পিছন দিকে তাঁহার চৌকির গায়ে একটা ঈষৎ আন্দোলন অনুভব করিয়া তাড়াতাড়ি ললিতাকে তাঁহাব পাশে টানিয়া আনিয়া তাহাব হাত চাপিয়া ধরিলেন, এবং একটু হাসিয়া হাবানকে কহিলেন, “পাছু বাবু, যখন সময় আসবে তখন আপনি জান্তে পারবেন, সম্ভানকে যাহুয করতে স্নেহেবও প্রয়োজন হয়।”

ললিতা এক হাতে তাহার পিতার গলা বেড়িয়া ধরিয়া নত হইয়া তাঁহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল—“বাবা, তোমার জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচে তুমি নাইতে যাও।”

পরেশ বাবু হাবানেব প্রতি লক্ষ্য কবিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—“আরেকটু পবে যাবো—তেমন বেলা হয়নি।”

ললিতা স্নিগ্ধস্ববে কহিল, “না বাবা, তুমি স্নান করে এস—ততক্ষণ পাছু বাবুব কাছে আমরা আছি।”

পরেশ বাবু যখন ঘব ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তখন ললিতা একটা চৌকি অধিকার করিয়া দৃঢ় হইয়া বসিল এবং হারান বাবুব মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল—“আপনি মনে করেন সকলকেই আপনার সব কথা বলবার অধিকার আছে।”

ললিতাকে স্মৃতিচরিতা চিনিত। অল্পদিন হইলে ললিতাব একপ মুক্তি দেখিলে সে মনে মনে উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিত। আজ সে জানলার ধাবের চৌকিতে বসিয়া একটা বই খুলিয়া চুপ কবিয়া তাহার পাতার দিকে চাহিয়া রহিল। নিজেতে সম্বরণ করিয়া রাখাই স্মৃতিচরিতাব চিরদিনেব স্বভাব ও অভ্যাস। এই কয়দিন ধরিয়া নানাপ্রকার আঘাতের

বেদনা তাহার মনে যতই বেশি কবিয়া সঞ্চিত হইতেছিল ততই সে আবার বেশি করিয়া নীরব হইয়া উঠিতেছিল। আজ তাহাব এই নীরবতার ভার তুর্কিবহ হইয়াছে—এই জন্ত ললিতা যখন হাবানেব নিকট তাহাব মস্তব্য প্রকাশ করিতে বসিল তখন স্মৃতিচরিতার কঙ্ক হৃদয়ের বেগ যেন মুক্তিলাভ করিবার অবসর পাইল।

ললিতা কহিল—“আমাদের সম্বন্ধে বাবার কি কর্তব্য, আপনি মনে কবেন, বাবাব চেয়ে আপনি তা ভাল বোঝেন! সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের আপনিই হচ্ছেন হেডমাষ্টার।”

ললিতার এই প্রকার ঔদ্ধত্য দেখিয়া হাবান বাবু প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। এইবাব তিনি তাহাকে খুব একটা কড়া জবাব দিতে যাইতেছিলেন—ললিতা তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে কহিল—“এতদিন আপনার শ্রেষ্ঠতা আমবা অনেক সহ করেছে কিন্তু আপনি যদি বাবার চেয়েও বড় হতে চান তা হলে এবাড়িতে আপনাকে কেউ সহ করতে পারবে না—আমাদের বেয়াবাটা পর্যন্ত না।”

হারান বাবু বলিয়া উঠিলেন—“ললিতা তুমি—”

ললিতা তাঁহাকে বাধা দিয়া তীব্রস্বরে কহিল—“চুপ করুন। আপনার কথা আমরা অনেক শুনেছি আজ আমার কথাটা শুনুন। যদি বিশ্বাস না করেন তবে স্মৃতি চিঠিকে জিজ্ঞাসা করবেন—আপনি নিজেই যে যত বড় বলে কল্পনা করেন আমার বাবা তাব চেয়ে অনেক বেশি বড়। এইবার আপনার যা কিছু উপদেশ আমাকে দেবার আছে আপনি দিগে যান।”

হারান বাবুব মুখ কালো হইয়া উঠিল। তিনি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন—“স্মৃতিচরিতা!”

স্মৃতিচরিতা বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিল। হারান বাবু কহিলেন—“তোমাব সামনে ললিতা আমাকে অপমান করবে।”

স্মৃতিচরিতা ধীরস্বরে কহিল, “আপনাকে অপমান করা ওর উদ্দেশ্য নয়—ললিতা বলতে চায় বাবাকে আপনি সম্মান করে চলবেন। তাঁর মত সম্মানেব যোগ্য আমরা ত কাউকেই জানিনে।”

একবার মনে হইল হারান বাবু এখনি চৌকি ছাড়িয়া

উঠিয়া যাইবেন কিন্তু তিনি উঠিলেন না। যুগ্ম অভ্যন্ত গম্ভীর করিয়া বসিয়া বহিলেন। এ বাড়ীতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সম্মুখ নষ্ট হইতেছে ইহা তিনি যতই অনুভব করিতে-ছেন ততই তিনি এখানে আপন আসন দখল করিয়া বসিবার জন্ত আরো বেশি পবিমাণে সচেতন হইয়া উঠিতে-ছেন। ভুলিতেছেন যে, যে আশ্রয় জীর্ণ তাহাকে যতই জোরের সঙ্গে আঁকড়িয়া ধরা যায় তাহা ততই ভাঙিতে থাকে।

হারান বাবু রুগ্ন গাভীরের সহিত চুপ করিয়া রহিলেন দেখিয়া ললিতা উঠিয়া গিয়া সূচরিতাব পাশে বসিল এবং তাহার সঙ্গে মৃদুস্বরে এমন করিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিল যেন বিশেষ কিছুই ঘটে নাই।

ইতিমধ্যে সতীশ ঘরে ঢুকিয়া সূচরিতার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, “বড় দিদি এস!”

সূচরিতা কহিল, “কোথায় যেতে হবে?”

সতীশ কহিল, “এস না, তোমাকে একটা জিনিষ দেখাব! ললিতা দিদি, তুমি বলে দাও নি?”

ললিতা কহিল, “না”।

তাহার মাসী কথায় ললিতা সূচরিতার কাছে ফাঁস করিয়া দিবে না সতীশের সঙ্গে এইরূপ কথা ছিল; ললিতা আপন প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিল।

অতিথিকে ছাড়িয়া সূচরিতা যাইতে পারিল না—কহিল, “বক্তার, আর একটু পরে যাচ্ছি—বাবা আগে জ্ঞান করে আসুন।”

সতীশ ছটফট করিতে লাগিল। কোনোমতে হারান বাবুকে বিলুপ্ত করিতে পারিলে সে চেষ্টার ক্রটি করিত না। হাবান বাবুকে সে অত্যন্ত ভয় করিত বলিয়া তাঁহাকে কোনো কথা বলিতে পারিল না। হাবান বাবু মাঝে মাঝে সতীশের স্বভাব সংশোধনের চেষ্টা করা ছাড়া তাহার সঙ্গে আর কোনো প্রকার সংশ্রব রাখেন নাই।

পরেশ বাবু স্থান করিয়া আসিবামাত্র সতীশ তাহার হুই দিকিকে টানিয়া লইয়া গেল।

হাবান কহিলেন, “সূচরিতা স্তম্ভে সেই যে প্রস্তাবটা ছিল, আমি আঁব বিলম্ব করিতে চাইনে। আমার ইচ্ছা, আস্তে রবিবাবেই সে কাজটা হয়ে যায়।”

পবেশ বাবু কহিলেন, “আমার ভাঙে ত কোনো আপত্তি নেই, সূচরিতার মত হলেই হল।”

হাবান। তাঁর ত মত পূর্বেই নেওয়া হয়েছে।

পরেশ বাবু। আচ্ছা তবে সেই কথাই রইল।

৩৬

সেদিন ললিতার নিকট হইতে আসিয়া বিনয়ের মনের মধ্যে কাঁটার মত একটা সংশয় কেবলি কিরিয়া ফিরিয়া বিধিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, “পরেশ বাবুর বাড়ীতে আমাব যাওয়াটা কেহ ইচ্ছা করে বা না করে তাহা ঠিক না জানিয়া আমি গায়ে পড়িয়া সেখানে যাতায়াত করিতেছি। হয়ত সেটা উচিত নহে। হয়ত অনেকবার অসময়ে আমি ইহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছি। ইহা-দেব সমাজের নিয়ম আমি জানি না; এ বাড়ীতে আমার অধিকার যে কোন্ সীমা পর্যন্ত তাহা আমাব কিছুই জানা নাই। আমি হয়ত মুঢ়ের মত এমন জায়গায় প্রবেশ কবি-তেছি যেখানে আত্মীয় ছাড়া কাহারো গতিবিধি নিষেধ।”

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল ললিতা হয়ত আজ তাহার মুখের ভাবে এমন একটা কিছু দেখিতে পাইয়াছে যাহাতে সে অপমান বোধ করিয়াছে। ললিতার প্রতি বিনয়ের মনের ভাব যে কি এতদিন তাহা বিনয়ের কাছে স্পষ্ট ছিল না, আজ আর তাহা গোপন নাই। হৃদয়ের ভিতরকার এই নূতন অভি-বাস্তি লইয়া যে কি করিতে হইবে তাহা সে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। বাহিরের সঙ্গে ইহাব যোগ কি, সংসারের সঙ্গে ইহাব সম্বন্ধ কি, ইহা কি ললিতার প্রতি অসম্মান, ইহা কি পরেশ বাবুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, তাহা লইয়া সে সহস্রবার কবিয়া তোলাপাড়া করিতে লাগিল। ললিতার কাছে সে ধরা পড়িয়া গেছে এবং সেই জন্তই ললিতা তাহার প্রতি রাগ করিয়াছে এই কথা কল্পনা করিয়া সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল।

পবেশ বাবু বাড়ী যাওয়া বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব হইল এবং নিম্নের বাসাব শূন্যতাও যেন একটা ভাবের মত হইয়া তাহাকে চাপিতে লাগিল। পরদিন ভোবের বেলাই সে আনন্দময়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, “মা, কিছুদিন আমি তোমার এখানে থাকব।”

আনন্দময়ীকে গোবার বিচ্ছেদশোকে সাস্থনা দিবার অভিপ্রায়ও বিনয়ের মনেব মধ্যে ছিল। তাহা বৃত্তিতে পাবিয়া আনন্দময়ীর হৃদয় বিগলিত হইল। কোনো কথা না বলিয়া তিনি সন্মুখে একবার বিনয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন।

বিনয় তাহাব খাওয়া দাওয়া সেবাসুশ্রাবা লইয়া বহুবিধ আবদার জুড়িয়া দিল। এখানে তাহার যথোচিত যত্ন হইতেছে না বলিয়া সে মাঝে মাঝে আনন্দময়ীর সঙ্গে মিথ্যা কলহ করিতে লাগিল। সর্বদাই সে গোলমাল বকাবকি কবিয়া আনন্দময়ীকে ও নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। সন্ধ্যার সময় যখন মনকে বাঁধিয়া রাখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইত, তখন বিনয় উৎপাত করিয়া আনন্দময়ীকে তাঁহার সকল গৃহকর্ম হইতে ছিনাইয়া লইয়া ঘরের সম্মুখের বারান্দায় মাত্র পাতিয়া বসিত; আনন্দময়ীকে তাঁহাব ছেলেবেলার কথা, তাঁহার বাপের বাড়ীর গল্প বলাইত; যখন তাঁহাব বিবাহ হয় নাই, যখন তিনি তাঁহার অধ্যাপক পিতামহের টোলের ছাত্রদেব অত্যন্ত আদরের শিশু ছিলেন, এবং পিতৃহীনা বালিকাকে সকলে মিলিয়া সকল বিষয়েই প্রশ্ন দিত বলিয়া তাঁহার বিধবা-মাতার বিশেষ উদ্বেগের কারণ ছিলেন, সেই সকল দিনের কাহিনী। বিনয় বলিত, “মা, তুমি যে কোনো দিন আমাদের মা ছিলে না সে কথা মনে করলে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমার বোধ হয় টোলের ছেলেরা তোমাকে তাদের খুব ছোট্টো এতটুকু মা বলেই জানত। তোমার দাদামশায়কে বোধ হয় তুমিই মানুষ কবাব ভর নিয়েছিলে।”

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মাত্রের উপরে প্রসারিত আনন্দময়ীর ছই পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া বিনয় কহিল, “মা, ইচ্ছা করে আমার সমস্ত বিভ্রাবুদ্ধি বিধাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে শিশু হয়ে তোমার ঐ কোলে আশ্রয় গ্রহণ করি। কেবল তুমি, সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কিছুই না থাকে।”

বিনয়ের কণ্ঠে হৃদয়ভারাক্রান্ত একটা ক্লাস্তি এমন করিয়া প্রকাশ পাইল যে আনন্দময়ী ব্যাধাব সঙ্গে বিস্ময়-অনুভব করিলেন। তিনি বিনয়ের কাছে সবিস্ময় বসিয়া

আস্তে আস্তে তাহাব মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিদ্যু, পরেশ বাবুদের বাড়ীর সব খবর ভাল ?”

এই প্রশ্নে হঠাৎ বিনয় লজ্জিত হইয়া চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, “মার কাছে কিছুই লুকানো চলে না, মা আমার অন্তর্যামী।” কুণ্ঠিতস্ববে কহিল, “হাঁ, তাঁরা ত সকলেই ভাল আছেন।”

আনন্দময়ী কহিলেন, “আমার বড় ইচ্ছা কবে পরেশ বাবুর মেয়েদের সঙ্গে আমার চেনা পরিচয় হয়। প্রথমে ত তাঁদের উপর গোয়ার মনের ভাব ভাল ছিল না কিন্তু ইদানীং তাকেসুদূর যখন তাঁরা বশ করতে পেরেছেন তখন তাঁরা সামান্য লোক হবেন না।”

বিনয় উৎসাহিত হইয়া কহিল, “আমাবো অনেক বার ইচ্ছা হয়েছে পরেশ বাবু মেয়েদের সঙ্গে যদি কোনো-মতে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারি। পাছে গোরা কিছু মনে করে বলে আমি কোনো কথা বলিনি।”

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা কবিলেন, “বড় মেয়েটির নাম কি ?”

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে পরিচয় চলিতে চলিতে যখন ললিতার প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল তখন বিনয় সেটাকে কোনোমতে সংক্ষেপে সারিয়া দিবার চেষ্টা কবিল। আনন্দময়ী বাধা মানিলেন না। তিনি মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, “শুনেচি ললিতাব খুব বুদ্ধি।”

বিনয় কহিল, “তুমি কাব কাছে শুনলে ?”

আনন্দময়ী কহিলেন—“কেন, তোমার কাছে !”

পূর্বে এমন এক সময় ছিল যখন ললিতার সম্বন্ধে বিনয়ের মনে কোনো প্রকার সন্দোহ ছিল না। সেই মোহমুক্ত অবস্থায় সে যে আনন্দময়ীর কাছে ললিতার তীক্ষ্ণবুদ্ধি লইয়া অবোধে আলোচনা কবিয়াছিল সে কথা তাহার মনেই ছিলনা।

আনন্দময়ী স্নানপূর্ণ মাঝির মত সমস্ত বাধা বাঁচাইয়া ললিতার কথা এমন করিয়া চালনা করিয়া লইয়া গেলেন যে বিনয়ের সঙ্গে তাহার পরিচয়ের ইতিহাসের প্রধান অংশগুলি প্রায় সমস্তই প্রকাশ হইল। গোত্রার কারা-দণ্ডের ব্যাপারে ব্যথিত হইয়া ললিতা যে ষ্টীমারে একাকিনী

বিনয়ের সঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছে সে কথাও বিনয় আজ বলিয়া ফেলিল। বলিতে বলিতে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল—যে অবসাদে সন্ধ্যাবেলায় তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া-

—ছিল তাহা কোথায় কাটিয়া গেল! সে যে ললিতার মত এমন একটি আশ্চর্য্য চরিত্রকে জানিয়াছে এবং এমন কবিতা তাহার কথা কহিতে পাবিতেছে ইহাই তাহার কাছে একটা পরম লাভ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাত্রে যখন আহাবের সংবাদ আসিল এবং কথা ভাঙিয়া গেল—তখন হঠাৎ যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বিনয় বুঝিতে পাবিল তাহার মনের যাহা কিছু কথা ছিল আনন্দময়ীর কাছে তাহা সমস্তই বলা হইয়া গেছে। আনন্দময়ী এমন করিয়া সমস্ত শুনিলেন, এমন কবিতা সমস্ত গ্রহণ করিলেন যে, ইহার মধ্যে যে কিছু লজ্জা কবিতার আছে তাহা বিনয়ের মনেই হইল না। আজ পর্য্যন্ত মার কাছে লুকাইবার কথা বিনয়ের কিছুই ছিল না—অতি তুচ্ছ কথাটিও সে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিত। কিন্তু পরেশ বাবুর পরিবারের সঙ্গে আলাপ হইয়া অবধি কোথায় একটা বাধা পড়িয়াছিল।

সেই বাধা বিনয়ের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয় নাই। আজ ললিতার সম্বন্ধে তাহার মনের কথা স্বন্দর্শিনী আনন্দময়ীর কাছে একবাক্যে কবিতা সমস্ত প্রকাশ হইয়া গেছে তাহা অনুভব করিয়া বিনয় উল্লাসিত হইয়া উঠিল। মাতার কাছে তাহার জীবনের এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিবেদন করিতে না পাবিলে কথাটা কোনোমতেই নিঃশব্দ হইয়া উঠিত না—ইহা তাহার চিন্তার মধ্যে কালীর দাগ দিতে থাকিত।

রাত্রে আনন্দময়ী অনেকক্ষণ এই কথা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলেন। গোরাব জীবনের যে সমস্তা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছিল, পরেশ বাবুর ঘবেই তাহার একটা শীমাংসা ঘটিতে পারে এই কথা মনে করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন যেমন কবিতা হউক মেয়েদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে হইবে।

ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গ ।

ভাবতবর্ষের ইতিহাস সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত; স্বাধীনকাল, মুসলমান শাসনকাল এবং ব্রিটিশ শাসনকাল। ভাবতবর্ষের স্বাধীন যুগ এবং মুসলমান শাসনাধীন যুগের মধ্যে স্পষ্ট বেধা টানিয়া দেওয়া সম্ভবপূর্ণ নহে। কারণ, ভাবতবর্ষ মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়াও সুদীর্ঘকাল আপনাব স্বাধীনতা বক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে কদাচিৎ কোন স্থানে মুসলমানের অধিকার স্থাপিত হইত; কিন্তু হুজুর হিন্দুগণ অচিরে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সাধন করিতেন; কেবল পঞ্জাবের একাংশে মুসলমানের স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৬৩৬ খৃষ্টাব্দে আরবদেশীয় মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইহাই মুসলমান কর্তৃক প্রথম ভারত আক্রমণ। এই প্রথম আক্রমণের পাঁচশত সাতাল্ল বৎসর পবে পাঠানজাতীয় মুসলমানগণ উত্তর ভাবতে অধিকার স্থাপন করেন।

প্রাগুক্ত সময় মধ্যে কতিপয় আবদা লেখক ভাবত-বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল লেখকের গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের মধ্য যুগের বিবরণ সঙ্কলন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমরা প্রধানতঃ ছয় জন লেখকের গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহ করিব। এই সকল লেখকের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথমে প্রদত্ত হইতেছে।

বার্শক সোলেমান, ইনি বাগিচা উপলক্ষে ভাবতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ৮৫১ খৃষ্টাব্দ সোলেমানের ভারত ভ্রমণের সময়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ইবন খুরদতবা, ইনি বোংগাদাদের খলিফাগণের বাজত্ব কালে বিশিষ্ট রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ৯১২ খৃষ্টাব্দে ইবন খুরদতবাব মৃত্যু হয়।

অলমহুদি, ইহার প্রকৃত নাম আবু হাসন আবি; অলমহুদি উপাধি মাত্র। অলমহুদির জনৈক পূর্বপুরুষ মহাপুরুষ মোহাম্মদের মক্কা পবিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন-কালে তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। অলমহুদির জীবনের

অধিকাংশ দেশভ্রমণে অতিবাহিত হয়। ১৫৬ খৃষ্টাব্দ তাঁহার মৃত্যুকাল।

অলইন্তখরি, ইন্নি সুপ্রসিদ্ধ ইন্তখবে জন্মপরিগ্রহ করেন বলিয়া অলইন্তখরি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, প্রকৃত নাম সেখ আবু ইসাক। আবু ইসাক একজন প্রসিদ্ধ দেশপর্যটক ছিলেন। মুসলমান অধ্যুষিত সমস্ত দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়।

ইবন হৌকন,—ইবন হৌকন বোগদাদের অধিবাসী ছিলেন, ইহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ আবুল কাসিম। আবুল কাসিমের বালাকালে তুর্কীগণ বোগদাদ আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের নির্মম আক্রমণে তিনি সর্বস্বাস্ত হন; এ কারণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জন করিতে সংকল্প কবেন। আবুল কাসিম ৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ পরিত্যাগ করেন এবং বহুদেশে পর্যটন করিয়া ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগত হন।

অল ইদ্রিসি। ইনি মবোক্কোর অধিবাসী ছিলেন; নানা ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া সিসিলিতে স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করেন। সিসিলির অধিপতির আদেশে তিনি আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে বচনা করেন।

আমাদেব অবলম্বনস্বরূপ ছয়জন লেখকই দেশ পর্যটন বা বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ইহারা সকলেই আববাকুল-সম্বৃত ছিলেন। এই সকল আববাকুল ভারতবর্ষে যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তৎসাময়িক সুন্দর চিত্র।

অলমহুদি স্বীয় গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ, সমুদ্র ভূমি ও পর্বতে বিভূত; যবদ্বীপ পর্যন্ত ভারতের সীমা বিভূত, অস্ত্র দিকে সিদ্ধ ও ধোরসান পর্যন্ত বিভূত; ভারতবর্ষের অস্ত্র পার্শ্বে তিব্বত অবস্থিত। এই দেশে ধর্ম ও ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট ভেদ বিস্তারিত রহিয়াছে; ভারতবাসীরা অনেক সময় পরস্পর যুদ্ধ করে। অধিকাংশ ভারতবাসীই পরকাল ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। বিজ্ঞা বুদ্ধি, শাসনপ্রণালী, দর্শনশাস্ত্র, শারীরিক বল ও বর্ণের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে হিন্দুগণ অস্বাভাবিক কৃৎসন্য জ্ঞানিত হইতে বিভিন্ন।

এই নানা ভাষা ও নানা ধর্ম সংবলিত অনন্তসাধারণ সুবিভূত দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মণ্ডলে স্বতন্ত্র রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। আববাকুল পর্যটকগণ বহুসংখ্যক রাজবংশের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা কতিপয় রাজ্যের বিবরণ অবগত হইয়া থাকি। আমরা এখানে সেই সকল রাজ্যের নাম উল্লেখ করিতেছি। বল্লার, জুরজ, তাকন, ক্রমি, কাসবিন, ঘান, কামরুন, সর, কুমাব।

বল্লার, আরব্য ভ্রমণকারিগণের হস্তে পতিত হইয়া বল্লভিপুর বল্লার নামে পবিচিত হইয়াছে। এই বল্লভিপুরের রাজত্বগণ বল্লভি নামে এক অধির প্রচলন করিয়াছিলেন। টড সাহেব লিখিয়াছেন যে, বল্লভিপুর রাজ্য মালব দেশে অবস্থিত ছিল। ফরাসী পণ্ডিত রেইনাড সাহেবও এই মতাবলম্বী। দক্ষিণে তাপ্তী নদী এবং উত্তরে আরাবলী পর্বত পর্যন্ত বল্লভিপুর রাজ্যের সীমা প্রসারিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চৈনিক পবিত্রাজক হায়েন সাঙ বল্লভিপুর রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। টমাস সাহেবের মতে ৭৪৫ খৃষ্টাব্দে বল্লভি বংশের বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। টমাস সাহেবের নিরূপণ সঙ্গত নহে। কারণ আরব্য লেখকগণের সময়েও বল্লভিপুর রাজ্যের প্রত্যাপ অক্ষুণ্ণ ছিল; আরব্য লেখকগণের ভারত আগমনের কাল ৮৫১ খৃঃ—১৬৮ খৃঃ। যাহা হউক, বল্লভিবংশের রাজধানীর ভূগোলের এখনও ভবনগরের ২০ মাইল দূরে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

জুরজ, আরব্য লেখকগণ গুজ্জর বা গুজরাট নাম বিকৃত করিয়া জুবজ করিয়াছেন। গুজরাট রাজ্য বল্লভিপুরের উত্তরে অবস্থিত ছিল। হায়েন সাঙ বল্লভিপুর রাজ্যে অতিক্রম করিয়া সুরাট ও গুজরাটে উপনীত হইয়াছিলেন।

তাকন—সোলেমান লিখিয়াছেন, “তাকফ;” ইবন খুরদতবা এবং মহুদির মতে “তাকফ”। আরব্য লেখকগণ তাকফ বা তাকনবাসিনী রমণীগণের শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আপনাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত রেইনাড সাহেব এই বর্ণনার সুদে মহাবাহী রমণীর সাদৃশ্য দেখিয়া তাকফ বা তাকন আবজাবাদেব

নিকট কোন স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বেইনাড সাহেবের নির্দেশ ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। সোলেমান লিখিয়াছেন, তাকফ গুর্জরের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। মস্দি লিখিয়াছেন, তাকফ পার্শ্বত্যা রাজ্য। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ তৈফন্দ নামক দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া আসফ-ল-বিলাদ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত রহিয়াছে। “তৈফন্দ” “তাকফ” হইতে অভিন্ন, একরূপ নির্দেশ করা যাইতে পারে। আসফ-ল-বিলাদে তৈফন্দ রাজ্যের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি জন্মায়, তাকফ রাজ্য বিলাম ও সিন্ধুনদের মধ্যস্থিত পর্বত মালায় অবস্থিত ছিল।

কমি,—প্রাগুক্ত বেইনাড সাহেব লিখিয়াছেন, কমি রাজ্য প্রাচীন বিশাপুর রাজ্যের সহিত অভিন্ন। কিন্তু এই বিশাপুর রাজ্যের অবস্থানও অল্প পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হইতে পারে নাই। মস্দি লিখিয়াছেন, কমি রাজ্যের পার্শ্বে কামন নামক এক দেশ অবস্থিত ছিল; ইবন খুদতবা লিখিয়াছেন, কামফন রাজ্য কমির সহিত সংযুক্ত এবং কামফন রাজ্যের পার্শ্বেই চীন রাজ্যের সীমা ছিল। আমাদের বোধ হয় যে, কামফনই আবব লেখকগণের হস্তে পতিত হইয়া “কামন” বা “কামফনে” দাঁড়াইয়াছে। যদি আমাদের এষ্ট অবধারণ যথার্থ হয়, তবে কমি রাজ্য পূর্ববঙ্গে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

কাসবিন,—টড লিখিয়াছেন, কাসবিন রাজ্য প্রাচীন কচ্ছ ভোজ রাজ্যের নামান্তর মাত্র। কিন্তু বেইনাড সাহেবের মতে কাসবিনের আধুনিক নাম মহীশূর। ঐতিহাসিক ডোসন সাহেব লিখিয়াছেন, কাসবিন রাজ্যের বর্তমান নাম নিভুলরূপে ঠিক করিবার কোন উপায় নাই।

ধান,—ধানবাজ্য কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা অজ্ঞাপি নির্দ্ধারিত হয় নাই।

কামফন,—কামফন বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কামফন হইয়াছে।

যাব,—যাবরাজ্য কোন স্থানে ছিল তাহা অজ্ঞাপি নির্দ্ধারিত হয় নাই।

কুমার,—কুমারিকা অন্তরীপ এবং ত্রিবিক্রের পার্শ্ববর্তী

স্থানে কুমাররাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইবন ককিয়া নামক একজন আরব্য ভ্রমণকাব্য লিখিয়াছেন, মদ্যপায়ীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য উত্তপ্ত লৌহশলাকা তাহাদের শরীরে স্থাপন করিয়া উহা শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত তদবস্থাতেই রাখা হইত; ইহাতে অনেক ব্যক্তির জীবন নাশ পর্য্যন্ত ঘটিত।

আরব্য লেখকগণের মতে ভারতীয় রাজ্য সমূহে বজ্রারব নরপতি প্রতাপে, ক্ষমতায়, সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমরা অলমস্দির গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। “বর্তমান সময়ে মানকিব সম্রাট ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। ভারতবর্ষের অনেক অধিপতি মানকির রাজ্য-দূতের তোষামোদ করিয়া থাকেন। বজ্রারব চারিদিকে অনেক ক্ষুদ্র বাজ্য বিস্তারিত। বজ্রারব সৈন্য ও হস্তীর সংখ্যা অপরিমিত। রাজধানী মানকির পর্বতে অবস্থিত, এ কারণ অধিকাংশ সৈন্যই পদাতিক।”

বজ্রারব নরপতির সমকক্ষ না হইলেও তৎকালে গুজরাটাদিপতিও সাতিশয় প্রতাপশালী ছিলেন। বণিক সোলেমান লিখিয়াছেন, গুজরাটের সৈন্য সংখ্যা অগণ্য। ভারতবর্ষের রাজত্বগণের তাদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য নাই। ভারতীয় বাজত্ববৃন্দ মধ্যে গুজরাটাদিপতিই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন শক্তি। গুজরাটাদিপতি সাতিশয় সম্পদ-শালী, তাহার উষ্ট্র ও অশ্বের সংখ্যা অপরিমিত। গুজরাটে বিনিময়ের জন্য স্বর্ণবোপ্যের কণিকা সকল ব্যবহৃত হয়; এই দেশে স্বর্ণ বোপ্যের খনি আছে বলিয়া লোকশ্রুতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

আরব্য লেখকগণ ভারতীয় রাজবংশের পরিচয় প্রদান করিয়াই আপনাদের গ্রন্থ সমাপ্ত করেন নাই, রাজনীতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য ঐ আলোচনায় কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মস্দি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, “ভারতীয় রাজকুমারগণ চল্লিশ বৎসরের পূর্বে রাজপদ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। রাজত্ববৃন্দ কদাচিৎ প্রকৃতি-পুঞ্জের সম্মুখীন হইতেন; রাজকার্য্য সম্পাদনের সময় ব্যতীত অল্প কোন উপলক্ষে প্রকৃতিপুঞ্জের পক্ষে রাজদর্শন করিবার উপায় নাই। হিন্দুজাতির মতে নরপতি সর্বদা প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মুখীন হইলে তাহার মর্যাদার লঘব এবং

বিধিভুক্ত ক্ষমতার অপব্যবহার হয়। ভারতবর্ষে শাসন কার্য প্রকৃতিগুঞ্জের সত্তাব এবং রাজপুরুষগণের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজপদ বংশাশ্রমিক। রাজমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজপুরুষগণও পুরুষাঙ্কুরে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। হিন্দুজাতি সুরাপানে বিরত রহিয়াছেন; বাহারা সুরাপান করিয়া আপনাদের চরিত্র কলুষিত করে, তাহারা হিন্দু সমাজে সাতিশয় তিরস্কৃত হয়। সুরাপান কেবল শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়াই যে, হিন্দুজাতি উহার ব্যবহারে বিরত রহিয়াছেন, তাহা নহে; সুরা বুদ্ধির ভ্রংশ এবং শক্তির বিলোপ সাধন কবে, এজন্তও তাঁহারা সুরাপানে বিরত রহিয়াছেন। যদি এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন নরপতি সুরাপানে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তবে তিনি রাজ্য শাসনের অযোগ্য বলিয়া রাজ্যচ্যুত হন।”

সোলেমানের গ্রন্থেও ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমবা তাঁহার মতামতও এখানে উদ্ধৃত কবিয়া দিতেছি। ভারতবর্ষের রাজ্য সমূহে অভিজাত সম্প্রদায় এক বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। সর্বপ্রকাব ক্ষমতা কেবল এই অভিজাতগণের হস্তগত রহিয়াছে। নরপতিগণ আপনাদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। হিন্দুজাতি বিলাস-ব্যসনের বিরোধী। তাঁহারা সুরাপান করেন না; সুরা তাঁহাদের নিকট ঘৃণ্য। তাঁহাদের মতে সুরাপানী নরপতি রাজা নামের যোগ্য নহেন। ভারতবর্ষের রাজত্বগণ শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন, এই কারণ তাঁহাদিগকে সর্বদা সন্ধি বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। প্রকৃতিগুঞ্জ বলিয়া থাকে, যদি রাজা সুরাপানে মত্ত হন, তবে কি প্রকারে তিনি রাজ্যের গুরুভার বহন করিবেন? ভারতীয় নরপতি কখন কখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। যদি পার্শ্ববর্তী কোন রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হন, তবে বিজয়ী রাজা পরাজিত বংশের কোন রাজকুমারকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, এই নবাভিযুক্ত রাজা বিজ্ঞতার অধীন হইয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হন। ঈদৃশ ব্যবস্থার প্রবর্তন ব্যতীত বিজিত দেশের প্রজাবর্গকে শাস্ত ও বশীভূত করিবার অন্য উপায় নাই।

ভারতীয় রাজত্ববৃন্দের অসংখ্য সৈন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল সৈন্তকে বেতন দিবার প্রথা নাই। (১) কোন ধর্মযুদ্ধ উপস্থিত হইলে এই সকল সৈন্ত সমবেত হইয়া যুদ্ধ কবে। তারপর যুদ্ধ শেষ হইলে তাহারা কপর্দক, মাত্রাও গ্রহণ না করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

ভারতবর্ষের কোন কোন দেশের রাজ্যের যুত্ব হইলে এক অদ্ভুত প্রথা অনুষ্ঠান হইত বলিয়া সোলেমান উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এখানে ঐ প্রথার বর্ণনা করিতেছি। রাজ-শব শ্মশানে বহন করিয়া লইয়া যখন একজন জ্ঞীলোক অগ্রে অগ্রে সম্মার্জনী হস্তে গমন কবিত এবং চীৎকার করিয়া বলিত, “নগরবাসিগণ, তোমরা দেখ, এই ব্যক্তি গত কল্যা তোমাদের অধিপতি ছিলেন, তোমাদিগকে শাসন করিতেন, তাঁহার সমস্ত আদেশ জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিপালিত হইত; দেখ আজ তাঁহার কি দশা হইয়াছে। তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ কবিয়াছেন, সমুদ্র বা বিষুদ্রুত তাঁহার আত্মা লইয়া গিয়াছেন। অতএব জীবনের স্তূপে উদ্ভাস্ত হইয়া বিপথগামী হইও না।” এই বর্ণনার পব ভারতবর্ষের রাজবংশে যে সতীদাহের প্রথা বিদ্যমান ছিল, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজ-শব দাহন করিবার সময় রাজমহিষীগণ চিতায় প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জন কবিতেন। কিন্তু তাঁহারা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জীবন নাশ, কি জীবিত থাকিয়া বৈধব্য অবলম্বন করিবেন, তৎসম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণ তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত।

সোলেমানের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে ভারতবর্ষের রাজ্যান্তঃ-পুবিাগণের অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ অবগত হইতে পারি। সোলেমান লিখিয়াছেন যে, অধিকাংশ নরপতিই পুৰাণনাদিগকে রাজসভায় আনয়ন করিতেন; তাঁহারা বিনা অবগুণ্ঠনে সর্বজন সমক্ষে উপস্থিত থাকিতেন। জাতিভেদ ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। এই বর্ণবৈষম্য বিদেশী মাত্রেরই চোখে পড়ে। আমাদের আরব্য পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তেও ভারতবর্ষের বর্ণবৈষম্য সম্বন্ধে নানা

(১) কোন কোন স্থলে এই প্রথার ব্যতিক্রম হইল। বঙ্গারের নরপতি অর্থ দ্বারা সৈন্ত পরিপোষণ করিতেন, আরব্য ভ্রমণকারিগণের লেখা হইতেই এই প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তথ্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা এখানে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

ইবন খুর দতবা লিখিয়াছেন, হিন্দু জাতি সাত ভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর নাম সার কুফ্রিয়া। অল ইদ্রিসি লিখিয়াছেন, কফ্রিয়া। এই শ্রেণীর দ্বারা কোন্ বংশ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা নির্দেশ করিতে অক্ষম। ইবন খুর দতবা এবং অল ইদ্রিসি উভয়েই লিখিয়াছেন, ঐ শ্রেণী অতিশয় সম্ভ্রান্ত; রাজগণ এই শ্রেণী হইতে গৃহীত হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের আগমন সাধারণ সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত লোকদিগকে সম্মান প্রদর্শন করে; কিন্তু ইহারা কাহাবও নিকট মস্তক অবনত করেন না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগণ কখনও সূরা স্পর্শ কবেন না। শাস্ত্র চর্চায় ইহাদের জীবন অতিবাহিত হয়। ব্রাহ্মণগণ ব্যাঘ্রচর্ম বা অন্ত কোন পশুচর্ম পরিধান কবিত্তা লজ্জা নিবারণ করেন। কখন কখন ব্রাহ্মণগণ দণ্ডধারণ করিয়া চতুঃপার্শ্বে সমাগত জনমণ্ডলীকে ধর্মোপদেশ প্রদান পূর্বক পরমেশ্বরের শক্তি ও মহিমা ঘোষণা করেন। ইহারা দেবোপাসক; ইহাদের বিশ্বাস যে, দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলে সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের করুণা লাভ করা যায়। জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক, কবি এবং গণক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিদ্বজ্জন মাঝেই ব্রাহ্মণবংশজাত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। রাজত্বগণ তাদৃশ বিদ্বজ্জনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। ইহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ এই সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনায় কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার আছে।

তৃতীয় শ্রেণীর নাম ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তিন পাত্রের অধিক সুরাপান নিষিদ্ধ। ইবন খুর দতবা লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়কন্তা বিবাহ করেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণকন্তা বিবাহ করিতে অসমর্থ। কিন্তু অল ইদ্রিসি অন্তরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণকন্তার পাণি পীড়ন করেন; ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় কন্তার পাণিপীড়ন করিতে অসমর্থ।

চতুর্থ শ্রেণীর নাম শূদ্র। শূদ্রগণ কৃষি ও শ্রমজীবী।

পঞ্চম শ্রেণীর নাম বৈশ্য। বৈশ্যগণ শিল্প-ব্যবসায়ী।

ষষ্ঠ শ্রেণীর নাম চণ্ডাল। চণ্ডালগণ সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট

কাজ করে। চণ্ডালগণ গান বাজ পটু, তাহাদের রমণীবা সুন্দরী।

সপ্তম শ্রেণীর নাম ষাজিকর ইত্যাদি।

আবব্বা লেখকগণের মতে হিন্দুগণ ৪২টি ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কবিতেন। ইহাদের কোন কোন সম্প্রদায় অবতারবাদী ছিলেন। তৎকালে নিবোধব ধর্মসম্প্রদায়ও পবিত্র হইত। অনেকে শালগ্রাম বা লিঙ্গ উপাসক ছিলেন। এই সকল শিলার মস্তকে ঘৃত ও তৈল মর্দিত হইত। কোন কোন সম্প্রদায় সূর্য্যোব উপাসনা করিতেন; তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, সূর্য্যই সৃষ্টিস্থিতিপালনকর্তা। কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে হোমের অন্ত্যেষ্ঠান দেখা যাইত। কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে বৃক্ষ বা সর্পের পূজা প্রচলিত ছিল। দুই একটি ধর্মসম্প্রদায় সর্ব প্রকার ধর্মচর্চা হইতে বিরত হইয়া সমস্ত মত অস্বীকার করিতেন।

আমরা আবব্বা পর্য্যটকগণের গ্রন্থ অবলম্বন কবিত্তা যে বিবরণ সঙ্কলন কবিত্তাম, তাহা হইতে দুইটি বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। প্রথম হিন্দু জাতির বিলাসবিমুখতা, দ্বিতীয়, কষ্টসহিষ্ণুতা। হিন্দু জাতির সাধু সন্ন্যাসীর জীবনে বিলাস-বিমুখতা ও কষ্টসহিষ্ণুতাব চরম দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। এতৎ সম্বন্ধে বণিক সোলেমান যাহা লিখিয়াছেন, এখানে আমরা তাহা উদ্ধৃত কবিত্তা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধেব উপসংহাৰ করিতেছি। “ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর লোক পর্বতে ও বনে বাস কবেন। তাহাবা কদাচিৎ লোকালয়ে উপস্থিত হন। অনেক সময় তাহাবা কেবল স্বচ্ছন্দবনজাত ফল বা শাক শবজি আহাৰ করিত্তা ক্ষুদ্রিত্তি কবেন। তাহাদের অনেকে উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থিতি করেন। অনেকে সূর্য্যভিমুখ হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। আমি একজন সাধুকে এইভাবে দণ্ডায়মান দেখি; তাবপব ষোল বৎসর পরে পুনর্বার ঐ স্থানে আগমন করিত্তা তাহাকে তদবস্থাতেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, বৌদ্ধতাপে সাধু দ্রবীভূত হইেন নাই।”

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

মার্কিনরা ধর্মের দ্বারা স্বারাজ্য লাভ করিয়াছিল কি না।

প্রাচীন মাসের প্রবাসীতে প্রকাশ্যে প্রযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

“মার্কিনদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল ধর্মের উপরে, তাই তাহার ফল হইল নিকটক স্বারাজ্য লাভ।”

পুনশ্চ—

“পক্ষান্তরে মার্কিনদেশীয় স্বারাজ্যপন্থীরা ধর্মকে লঙ্ঘন করিয়া একটি কথাও মুখে উচ্চারণ করে নাই—একটি কার্যেও হস্তপ্রসারণ করে নাই, অপর কোনো জাতির ন্যায় অধিকারের অস্তঃপাতী সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমিখণ্ডেও হস্তপ্রসারণ করে নাই; আবাব তাঁহাদের নেতা যিনি ওয়াশিংটন তাঁহার তোঁ কথাই নাই! তিনি সাক্ষাৎ ধর্মের অবতাব ছিলেন বলিলেই হয়। তাই তাঁহাদের স্বারাজ্যের জন্ম-পতাকায় ‘যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ’ স্বর্ণাক্ষরে জল্ জল্ করিতেছে তাবকার বেশে।”

মার্কিনদিগের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা প্রকৃত দ্বিজেন্দ্র বাবুর একেলার হইলে এ বিষয়ে আলোচনার বিশেষ আবশ্যিকতা ছিল না। কিন্তু দেখিয়াছি, এদেশে অনেক শিক্ষিত লোকই মনে করেন, মার্কিনগণ যে স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ, তাহারা বরাবর ধর্মের পথে চলিয়াছে, সুতরাং ধর্মই তাহাদিগকে জয়ন্তী দান করিয়াছেন। এই প্রকার ধারণার ঐতিহাসিক ভিত্তি কি, একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি।

মার্কিনদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের

গোড়া পত্তন—

(১) আমেরিকায় উপনিবেশস্থাপন।

সকলেই জানেন, আমেরিকা খোঁজাঙ্গণের “স্বদেশ” ছিল না। তাঁহারা ইয়ুরোপ হইতে দলে দলে বিভিন্ন সময়ে বাইয়া তথায় বসতি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের এই বিদেশ-গমন ব্যাপারটা নিরবচ্ছিন্ন ধর্মমূলক ছিল না।

সত্য বটে, ইংলণ্ডের পিউরিটান সম্প্রদায়ের অনেকে ধর্মের খতিবেই স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। উপনিবেশিকগণের অধিকাংশই ধনলোভে আমেরিকায় গমন করেন, অনেকে ধর্মের ভাণ করিতেন, এই মাত্র। প্রথম যুগের যাত্রীদিগের চিত্তে অর্থ ও পরমার্থ একই পর্যায়ভুক্ত ছিল।* বাহারা সরল ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও দেবত্ব ও পশুত্ব একসঙ্গে বাস করিত। তাঁহারা যেমন একদিকে ধর্মের জন্ত আশ্চর্য আশ্চর্যতা দেখাইয়াছেন, অপরদিকে তেমনি লোমহর্ষণ নির্ভবতা, অর্থগৃহুতা ও প্রবঞ্চনাপরায়ণতা দ্বারা ধর্মের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিয়াছেন। ধর্মের জন্তই কলম্বু ও অগ্নাত্ত অনেকে আদিমনিবাসীদিগকে হত্যা ও দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন, এবং ধর্মের জন্তই Las Casas তাহাদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন। ধর্মের জন্তই De Gourgues স্পানিয়ার্ডদিগকে ফাঁসিকাঠে বিনাশ করেন। ধর্মের জন্তই পিউরিটানগণ ইংলণ্ড হইতে হল্যান্ডে ও হল্যান্ড হইতে আমেরিকায় গমন করেন, এবং তথায় ধর্মচর্চার স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভিন্নমতাবলম্বী প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানদিগকে নির্বাসিত, ও কোয়েকারদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন।† স্মতবাং দেখা যাউতেছে মার্কিন-

* “In the creed of the early explorers God and gold were closely bracketed.”—The Historians' History of the World, Vol. XXII, p. 532.

+ ‘In the colonisation of America, religion appears everywhere, now as the inspiration of unbounded heroism, endurance and justice, now as the technical excuse for unlimited duplicity, ravage, and murder. It was “for the good of the Catholic cause” that Columbus and others advocated the enslaving and slaughter of the heathen; it was “for the good of the Catholic cause” that Las Casas advocated liberty, gentleness, and the importance of setting the uncon-verted a good example. It was “for the sake of calvinism” that De Gourgues hanged the Spaniards left by Mendez. It was religious example that led the Puritans to forsake England for Holland, then Holland for America, and in the new home of religious liberty, to banish dissenters, and to inflict heathenish cruelties upon the Quakers who had left the same country for

দিগের রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন ধর্মোপেক্ষা অধর্মই অধিক হইয়াছিল। একজন ইংবেজ লেখক যথার্থই বলিয়াছেন, “স্বর্ণই স্প্যানিয়ার্ড ও ইংরেজদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।”* ধর্ম তাহাদিগকে হিংসা, ক্রোধ, বিপৎ, মহামারীতে অদম্য সাহস দিয়াছে, সত্য—কিন্তু তাহা অন্ধকুসংস্কার ও পৈশাচিক পাপাচার হইতে মুক্ত ছিল না।

(২) আমেরিকা কাহাদের ।

স্বর্ণখনির লোভেই হউক, আর ধর্মচর্চাব্যবাহিত অধিকার লাভের জন্তই হউক, খেতাজগণ পঙ্গপালের মত আমেরিকায় যাইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু আমেরিকা তো মরুভূমি ছিল না! সহস্র সহস্র বৎসব ধরিয়া আদিমনিবাসিগণ সেখানে বাস করিতেছিল। সুতরাং ইয়ুরোপ হইতে যাইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া (হত্যার কথা পরে বলিব) তাহাদিগকে জন্মভূমি দখল করিবার খেতাজগণের কি ধর্মসঙ্গত স্বত্ত্ব ছিল, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। সহজ বুদ্ধিতে বোধ হয় পরদেশ হরণ ও পরস্বাপহরণ একই কথা। কিন্তু যাহারা বড় বড় রাজনীতিবিৎ, বিশালদেশের অধিনায়ক, তাহারা আমেরিকা অধিকারের পক্ষে একটা যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। যুক্ত রাজ্যের বর্তমান দেশনায়ক রুজভেল্ট বলেন, আমেরিকায় “সীমাহীন প্রাপ্তব ও বনে ইণ্ডিয়ানদিগেরই একমাত্র স্বত্ত্ব—অর্থাৎ জনকয়েক নোংরা বর্ষর সহস্র যোজনব্যাপী দেশে কখনও কখনও শিকার করিয়া বেড়ায়; সুতরাং এই দেশে কেবল তাহাদিগেরই একমাত্র অধিকার—এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে উহা যে কোন খেতাজ শিকারী, খেচ্ছাধিবাসী, ষোটকা-গহারক, বা ষায়াবর গোবক্ষকের হইবে না কেন?†

the same religious liberty. It was religion that warmed them in the bleak wilderness; and upheld them through pestilence, starvation, and the dread of the stealthy and ghostly Indian enemy.’—History,—p. 532.

* ‘The Spanish and the English made gold their first ambition.—Do.

† ‘To recognise the Indian ownership of the limitless prairies and forests of this continent—that is, to consider the dozen squalid savages who hunted at long intervals over a territory of a thousand square miles.

আব একজন লেখক বলেন, “আমেরিকার বিস্তীর্ণ বনভূমিগুলি কয়েক শত ইণ্ডিয়ানের সম্পত্তি, ইহা অতি হস্তাপ্পন্ন কথা। তাহাবা ঐ ভূমিগুলি পরিত্যক্ত বা কর্তৃত্ব কবে নাই, উহাতে গৃহ নির্মাণ করে নাই, উহাদিগেব সীমানা সরহদ নির্দেশ কবে নাই, এমন কি, ওগুলি দখল করিবার জন্ত এক শিকারের সময় ভিন্ন অল্প সময়ে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহও কবে নাই। সুতরাং ঐ সকল ভূমিতে খেতাজদিগেব সমান স্বত্ত্ব ছিল—বরং তাহাবা যে ভাবে বন জঙ্গল আবাদ করিতে আবস্ত করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদিগের স্বত্ত্বই শ্রেষ্ঠতব বলিতে হইবে।”* অনেকটা এইরূপ যুক্তির অনুসরণ করিয়াই একজন ইংবেজ (দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, না রাজনীতিবিৎ ঠিক বুঝিতে পারি নাই) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, “এমন দিন আসিতেছে, যখন ইয়ুরোপের উন্নত ও ধর্ম্মিষ্ঠ জাতি সকল উচ্চপ্রধান দেশসমূহের শাসনভাব গ্রহণ করিবে। তাহারা তদ্রূপবাসীদিগকে কুকুব বিড়ালের মত হত্যা করিবে না বটে, কিন্তু ঐ সকল দেশেব স্বভাবজ্ঞ ঐশ্বর্য্য উহাদিগের হাতে পড়িয়া যে মাটী হইতেছে, ইহা তাহারা কিছুতেই সস্থ করিবে না।”†

as owning it outright—necessarily implies a similar recognition of the claims of every white hunter, squatter, horse-thief, or wandering cattle-man.’—History, p. 502.

‘It is ridiculous to say that a few hundred Indians secured a property-right over the great forest lands which they did not clear and till, did not mark out with boundaries, fixed no habitations upon, and about whose ownership they did not even fight among one another, except when it was for the time rich in game. The whites had quite as good a right here as the Indians, and the nature of their plans made the right superior.’—History, p. 505.

† It will probably be made clear, and that at no distant date, that the last thing our civilisation is likely to permanently tolerate is the wasting of the resources of the richest regions of the earth through the lack of the elementary qualities of social efficiency in the races possessing them. The right of those races to remain in possession will be recognised; but it will in all probability be no part of the future conditions of such recognition that they shall be allowed to prevent the utilisation of the immense natural resources which they have in charge. At no

এই লেখকের মতে, ইহাই ভবিষ্যতের পবিত্রপরা! (altruism!) অতএব ঐশ্বর্য্যগণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের অক্ষম হস্ত হইতে তাহাদিগের দেশ কাড়িয়া লইয়া যে অশ্রুচরিত্র কবিয়াছে, এমন কথা বলিতে আমাদের সাহস হইতেছে না! সুতরাং তাহাদিগের সহিত ব্যবহাবটা কেমন হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য।

আদিম অধিবাসীদিগের ব্যবহার।

মোরোভিয়ান সম্প্রদায়ের জার্মানদেশীয় একজন প্রচাবক (Rev. John Heckewelder) দীর্ঘকাল ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে বাস করেন। তাঁহার নিকট তাহারা ঐশ্বর্য্যগণের আচরণ সম্বন্ধে যে অভিযোগ করে, তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম দিতেছি।—

“ইংবেজগণ যখন ভার্জিনিয়া প্রদেশে আগমন করে, তখন আমরা তাহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করি, এবং সহোদরের তায় আমাদের সহিত বাস কবিত্তে আহ্বান করি। কিন্তু তাহারা আমাদের সদয় অভ্যর্থনার কি প্রতিদান দিয়াছে? তাহারা প্রথমে আমাদের নিকট স্বীয় জীবিকোপযোগী শস্তোৎপাদন ও গোচারণের জন্ত সামান্য ভূমিখণ্ড যাক্কা কবে, আমরাও আহ্লাদের সহিত তাহা প্রদান কবি। কিন্তু কাল পবেই তাহারা আরও ভূমি চাহে,—তাহাও আমরা দান করি। আমাদের জীবিকার জন্ত মহান পুরুষ (The Great Spirit) বনে অনেক মৃগ রাখিয়াছিলেন; দেখিয়া তাহাও তাহারা প্রার্থনা করে। আমাদের বনে প্রবেশ করিয়া তাহারা অনেক স্পৃহণীয় ভূমিখণ্ড দেখিতে পায় এবং আমাদের উহাও দান করিতে অমুবোধ করে! আমরা দেখিলাম, উহারা যথেষ্ট ভূমি পাইয়াছে, সুতরাং আব ভূমি দিবার প্রয়োজন নাই; তখন উহারা বল প্রয়োগ কবিয়া আমাদের বহুদূবে তাড়াইয়া * দিয়া আমাদের পৈতৃক বাসভূমি অধিকার করে।”

remote date, with the means at the disposal of our civilisation, the development of these resources must become one of the most pressing and vital questions engaging the attention of the Western races.—Social Evolution, by Benjamin Kidd, p. 348.

* American History told by Contemporaries, Vol. III, pp. 467-68.

তার পর ওলন্দাজদিগের পালা; তৎপর অন্ত্য ইয়ুরোপীয় জাতির আগমন। ঐ একই কাহিনী। যাহারা সেই করুণ কাহিনী পাঠ কবিত্তে চাহেন, তাঁহারা পাদটীকায় উদ্ধৃত গ্রন্থের ৪৬৭ হইতে ৪৭১ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করিবেন।

মনে হইতে পারে, ইণ্ডিয়ানদিগের এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত। কিন্তু একজন ইংবেজ ঐতিহাসিক কি বলেন? “ঐশ্বর্য্যগণ ইণ্ডিয়ানদিগকে অজ্ঞপ্র প্রবঞ্চিত করে, তাহাদিগের নিকট লক্ষ মিথ্যা কথা বলে, তাহাদিগের সর্ব্ব স্বয়ং করে, তাহাদিগকে দাসত্বে আবদ্ধ করে এবং জিহ্বাংসা বশবর্ত্তী হইয়া রম মদ দ্বারা তাহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করে।”*

বসন্ত ও ব্রাণ্ডী।

ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ এই একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন যে অমূল্য বর্ষজ জাতি উন্নততর, সুসভ্য জাতির সংস্পর্শে আসিলে স্বভাবতঃই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই নিয়মানুসাবেই অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যান্ডে আদিম অধিবাসিগণ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমেরিকার বিভিন্ন জাতিসমূহ বৃষ্টি এই নিয়মেই এক রকম নিশ্চল হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। সুইডেন দেশীয় অধ্যাপক Peter Kalm ১৭৪৮—১৭৫১ সনে আমেরিকায় ভ্রমণ করেন। তিনি কি বলেন, শুনুন। “ইয়ুরোপীয়দিগের সংশ্রবে আসিবার পূর্বে, ইণ্ডিয়ানগণ বসন্ত কাহীকে বলে জানিত না। তাহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া অসংখ্য ইণ্ডিয়ান এই বোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। * * * কিন্তু ব্রাণ্ডীই অধিকাংশ ইণ্ডিয়ানকে বিনাশ করিয়াছে। ইয়ুরোপীয়গণের আগমনের পূর্বে ইণ্ডিয়ানেবা এই মদিরা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিল।”†

* The White cheated the Indian right and left, lied to him, robbed him, enslaved him, gave him rum with malice prepense.—The Historians' History, Vol. XXII, p. 505.

† “—the small pox, a disease which the Indians were unacquainted with before their commerce with the Europeans, and which since that time has killed incredible numbers of them. * * But brandy has killed most of the Indians. This liquor was likewise entirely unknown to them before the Europeans came hither.”—American History: told by Contemporaries, Vol. II, pp. 330-331.

অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ।

জন্মভূমি পবহস্তগত ও স্বদেশীয়দিগকে লাক্ষিত, প্রতারিত ও দিনে দিনে যত্নমুখে পতিত দেখিয়া বর্বরজাতি স্থিতির থাকিতে পারে না। সুতরাং ইয়ুরোপীয়গণের সহিত ইণ্ডিয়ানদিগের শতাব্দীব্যাপী জীবন-মরণ সংগ্রাম আবিস্কৃত হইল। এই সংগ্রামের ফলাফলে উপর আমেরিকাব বর্বর অধিবাসীদিগের ধন, জন, জীবন—এমন কি, তাহাদিগের জাতীয় অস্তিত্ব—নির্ভব করিত;—সুতরাং তাহারা যে উদ্ধাপিণ্ডবৎ সহসা আপতিত জাতীয় শত্রুদিগকে হাতে পাইলে তাহাদিগের প্রতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু উন্নত, সভ্যভাগবর্তিত, ধর্ম্মাঙ্ক ইয়ুরোপীয়গণ আমেরিকায় যে পৈশাচিক লীলার অভিনয় করিয়াছে, বর্তমান যুগে তথাকথিত অল্পমত এসিয়াবাসী কোনও জাতিব ইতিহাসে তদনুরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না। এই প্রসঙ্গে স্প্যানিয়ার্ডদিগের ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতা ও রাক্ষসোচিত নৃশংসতা বর্ণনা করিবাব অবসর নাই। মার্কিনজাতির ধর্ম্মপ্রাণ পূর্ব-পুরুষগণের আচরণই প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। অপর প্রমাণের আবশ্যক নাই। স্বয়ং দেশপতি রুডল্ফ ভেন্ট সুললিত ও ওজস্বিনী ভাষায় ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধ-কাহিনী বিবৃত করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন—“এই যুদ্ধের ইতিহাসে আমাদের পূর্বপুরুষগণের ভীষণ দুর্দর্শ বীৰত্ব কাহিনী সহিত অতি কদর্য্য পরস্বাপহরণপ্রিয়তা, অজ্ঞত বিশ্বাসঘাতকতা ও লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতা জড়িত রহিয়াছে। আমরা তাহাদিগের মধ্যে অনেক কঠোর, বীরোচিত গুণ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু পতিত, দুর্বল, অসহায়জনের প্রতি দয়া, কিংবা পবাস্তিত, নির্ভীক শত্রুর প্রতি করুণার পরিচয় অতি অল্পই প্রাপ্ত হই।”* যুদ্ধে যে সকল ইণ্ডিয়ান

বন্দী হইত, খেতাদগণ তাহাদেব সকলকেই হত্যা করিত। শুধু তাহাই নহে। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ স্বাধীনতা সমর আরম্ভ হইবার মোটে দশ বৎসর পূর্বে, তখন দেশে শান্তি বিবাজমান), সুবিখ্যাত সাধু উইলিয়ম পেনের পৌত্র ঘোষণা করেন, প্রত্যেক ইণ্ডিয়ান নাবীর মস্তকেব জন্ম ৫০ ডলার, এবং দশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক প্রত্যেক ইণ্ডিয়ান বালকের মস্তকেব জন্ম ১৩০ ডলার পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এখন যে ইণ্ডিয়ানগণ বস্ত্রতাস্বীকার কবিয়াছে—এখনও তাহাদিগের সহিত ব্যবহারে এরূপ বৃদ্ধা যায় না, যে সাধুতা, দয়া ও সত্যবাদিতা ইয়ুরোপীয়গণেরই একচেটিয়া গুণ।*

(২) দাসত্ব-প্রথা ।

এইরূপে একদিকে বহুযুগব্যাপী সংগ্রামে ও নির্দয় অত্যাচারে আদিম অধিবাসিগণ উচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, অপবদিকে সুতরাং শ্রমজীবীর অভাব উপস্থিত হইল। তখন ঋষ্টাশ্রিত ইয়ুরোপীয়গণ আফ্রিকা হইতে সহস্র সহস্র নর, নারী, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী অপহরণ করিয়া আমেরিকায় বিক্রয় কবিত্তে লাগিল। আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় পথে এই সকল হতভাগ্য কৃষ্ণকায় মানুষগুলি যে যমযাতনা ভোগ করিত, এবং দাসরূপে বিক্রীত হইয়া ইহাবা আজীবন যেরূপ মুক পশুবৎ ব্যবহৃত হইত, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিবার প্রয়াস করিয়া আমি আপনাব অক্ষমতার পরিচয় দিতে চাহি না। এদেশে শিক্ষিতদিগের মধ্যে ‘টমকাচার কুটার’ কে না পাঠ কবিয়াছেন? যাহারা শতাব্দীর পব শতাব্দী লক্ষ লক্ষ নবনাবীকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ বাধিয়া তাহাদিগকে কুকুব বিভাল অপেক্ষাও হেয় রূপে লাক্ষিত করিতে পারে—পতি হইতে পত্নীকে, জননী হইতে সন্তানকে নির্দয়ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরদিনের জন্ত তাহাদিগের জীবনের যৎকিঞ্চিৎ ম্লান আনন্দটুকু নির্ধাপিত করিয়া দিতে পাবে—ঈশাব শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াও তৈজসপত্রের ছায় মাহুষ লইয়া ব্যবসায় করিতে পাবে—ধর্ম্ম যদি একান্ত তাহাদিগেরই পক্ষাশ্রিত হইয়া থাকেন, তবে তাহাকে নিতান্তই পক্ষপাতী বলিতে হইবে। পব-

* “Their feats of terrible prowess are interspersed with deeds of the foulest and most wanton aggression, the darkest treachery, the most revolting cruelty; and though we meet with plenty of the rough, strong coarse virtues, we see but little of such qualities as mercy for the fallen, the weak and the helpless, or pity for a gallant and vanquished foe.”—Historians’ History, Vol. XXII, p. 530.

* Historians’ History, Vol. XXII, p. 505.

দেশ হবণে যে জাতীয় জীবনের আরম্ভ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও নির্ভুততায় যাহার পরিপুষ্ট, নারকীয় দাসত্বপ্রথা যাহার ঐহিক সম্পদের ভিত্তি—সেই মার্কিন জাতীয় জীবনের গোড়া পত্তন যদি নিববচ্ছিন্ন ধর্মের উপরে করা হইয়া থাকে, তবে ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য কি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

স্বারাজ্য-লাভ।

একণে দেখা যাউক, “মার্কিন দেশীয় স্বারাজ্যপন্থীরা ধর্মকে লঙ্ঘন করিয়া একটি কথাও মুখে উচ্চারণ কবে নাই,” এই উক্তি যথার্থ কি না।

মার্কিনদেশে স্বারাজ্যপন্থীদিগের প্রথম আবির্ভাব ষ্ট্যাম্প-আইন ঘটিত কলহ লইয়া। কথাটা একটু পবিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। স্বাধীনতার সংগ্রাম পর্য্যন্ত মার্কিন দেশ তেরটা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন শাসনকর্তা ও জনসাধারণ সভা ছিল। উহারা ইংলণ্ডের অধীন হইলেও কোনও প্রকার কব প্রদান কবিত না; এমন কি শাসনকর্তাদিগের বেতন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে যোগাইতে হইত। এতদ্ব্যতীত, ১৭৫৬ হইতে ১৭৬৩ সন পর্য্যন্ত কবাসিদের সহিত ইংরেজদিগের বিপুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই সংঘর্ষে ইংলণ্ডেব সাহায্য না পাইলে মার্কিনেরা ফরাসিদিগের গ্রাসে পতিত হইত। উহারা তখন ইংরেজদিগের সহিত মিলিত হইয়া যথাসক্তি যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের ব্যয় অধিকাংশ ইংলণ্ডকেই বহন কবিতে হয়, এবং যুদ্ধাবসানে মার্কিনদেশের রক্ষার্থ যে দশ সহস্র সৈন্য প্রদেশে রাখা হয়, তাহার ব্যয়ভারও ইংবেজদিগেব স্বন্ধেই পতিত হয়। ইংলণ্ডের সহিত যুক্ত থাকিয়া আপদে বিপদে বন্ধিত হইবে, এবং শান্তি ব সময় পূর্ণমাত্রায় সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিবে, অথচ মার্কিনেরা তদর্থে এক কপদিকও ব্যয় করিবে না, ইহা ত্রায়বিগর্হিত মনে করিয়া ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী জর্জ গ্রেভিল ১৭৬৫ সনে পার্লামেন্টে ষ্ট্যাম্প আইনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উহার মর্ম্ম এই যে বিবাহে, কুসীদব্যবসারে, বাণিজ্যে, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে, আদালতে মামলা মোকদ্দমায় ষ্ট্যাম্পযুক্ত দলিল ব্যবহার কবিতে হইবে। প্রস্তাবটা শুনিবামাত্র মার্কিনেরা জলিয়া উঠিল। তাহাদের প্রধান আপত্তি, পার্লামেন্টে

তাহারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে না, সুতরাং উহা তাহাদিগের উপব কব স্থাপন কবিতে পারে না। বলা বাহুল্য, বার্ক, মেকলে প্রভৃতি সুপণ্ডিত রাজনীতিজ্ঞগণের মতে এই আপত্তি অকিঞ্চিংকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পার্লামেন্টের কোন কোন সভা একপ বুঝাইতেও চেষ্টা কবিলেন যে, তাহারা যেমন ইংলণ্ডেব, তেমনি আমেরিকারও প্রতিনিধি। (যেমন ভূতপূর্ব ভারতসচিব সর্ হেনরী ফাউলাব বলিয়াছিলেন, পার্লামেন্টের প্রত্যেক সভাই ভারতের প্রতিনিধি!) কিন্তু মার্কিনেরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। তাহাবা বিস্তর আবেদন নিবেদন করিতে লাগিল, এবং বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিধি (agent) রূপে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া ষ্ট্যাম্প আইন যাহাতে বিধিবদ্ধ না হয়, তাহাব চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা প্রধান মন্ত্রীর নিকট একপ প্রস্তাবও করিল, “ষ্ট্যাম্প আইন উঠাইয়া লউন, আমরা নিজেরাই আমাদিগের উপর কর স্থাপন করিতেছি।” কিন্তু জর্জ গ্রেভিল অত্যন্ত একগুঁয়ে লোক ছিলো। তিনি দেখাইতে চাহেন, পার্লামেন্টের উপনিবেশ সমূহেব উপব কর স্থাপনের অব্যাহত ক্ষমতা আছে। সুতরাং মার্কিনদিগের সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হইল। জনসাধারণসভায় দুই চাবিজন আইনের প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশেব মতে উহা বিধিবদ্ধ হইয়া গেল এবং অভিজাতবর্গের সভায় উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

• মার্কিনদিগেব অসন্তোষ দূর কবিবার জন্ত গ্রেভিল ধাৰ্য্য করিলেন, মার্কিনদের কাঠের ব্যবসায়ের উন্নতিব জন্ত অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইবে এবং কফি ও অন্যান্য পণ্যেব ব্যবসাতে বিশেষ অধিকার দেওয়া যাইবে,* এবং ষ্ট্যাম্প বিক্রয় কবিয়া যে আয় হইবে, উহা আমেরিকায়ই ব্যয়িত হইবে। অধিকন্তু তিনি মার্কিনদিগকেই ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি প্রতিনিধিগণেব প্রত্যেকেই মনে কবিতে লাগিলেন অতঃপর সমস্ত গোলযোগ ধামিয়া যাইবে। তাহারা কেহই কল্পনা কবেন নাই যে মার্কিনেরা

* Bancroft's History of the United States, Vol. IV, p. 177.

বরং যুদ্ধ কবিবে, তথাপি ষ্ট্যাম্প আইন মানিয়া চলিবে না ।

তাঁহারা স্বদেশীয়দিগকে উপদেশ দিলেন, রাজার আইন শিবোধার্য্য করিয়া লওয়া কর্তব্য । প্রতিনিধিদিগের কেহ

কেহ প্রকাশ্যে ষ্ট্যাম্প আইনের সমর্থনও কবিয়াছিলেন ।

কিন্তু মার্কিনদেশীয় স্বারাজ্যপন্থীরা কোন্ পন্থা অবলম্বন কবিল ? সেই পন্থা, যাহাতে কৃতকার্য্য হইলে ধর্মের জয় হইল বলিয়া লোকে যশোগীতি গান কবে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে

অধম, নারকীয় রাজদ্রোহী বলিয়া বিশ্বসংসাবেব ঘৃণাভাজন হইতে হয় । তাঁহারা লক্ষ কণ্টে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, “দেখি কাহার সাধ্য আমাদের দেশে ষ্ট্যাম্প বিক্রয় কবে ।”

কনেক্টিকট প্রদেশবাসী Jared Ingersoll ইংলণ্ডে ঐ প্রদেশের প্রতিনিধি ছিলেন, এবং ষ্ট্যাম্প আইন পাস হইলে উহার ষ্ট্যাম্পবিক্রেতা নিবৃত্ত হন । তিনি ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন কবিয়া স্বদেশে যাইতেছিলেন ।

Wethersfield এ উপস্থিত হইলে একমল লোক তাঁহাকে

ধিবিয়া ফেলিল । তাঁহারা বলিল, তাঁহাকে এখনই কর্ম্ম-ত্যাগ করিতে হইবে । তিনি বলিলেন, “আমি গবর্ণমেন্টের

অভিপ্রায় জানিবাব জন্ত অপেক্ষা করিতেছি ; আব, আমি

যদি কর্ম্মত্যাগ কবি, সরকার বাহাদুর আর একজনকে নিযুক্ত করিতে পারেন ।” জনমণ্ডলী বলিয়া উঠিল, “গবর্ণ-মেন্টের অভিপ্রায় আবার কি ? আমাদের অভিপ্রায়ই

গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় । এদেশে কেহ ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের কর্ম্ম কবিত্তে পারিবে না ।” Ingersoll জিজ্ঞাসা কবিলেন, “যদি আমি কর্ম্মত্যাগ না করি, তবে কি হইবে ?” সহস্র-কণ্টে যুগপৎ ধ্বনি হইল, “মৃত্যু ।” তিনি বলিলেন, “একবার বই দুইবার মরিতে হইবে না, আমি এখন মরিতে প্রস্তুত ।”

জনমণ্ডলীর নেতা বলিলেন, “ইহাদিগকে উত্তেজিত কবিবেন না ।” তখন অনন্তোপায় হইয়া Ingersoll বলিলেন, “আচ্ছা, আমাকে হার্টফোর্ডে বাইতে দেও ।” সকলে

বলিল, “না, এখানেই কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে ।” তখন অগত্যা তিনি নিকটবর্তী একগৃহে কয়েকজনের সহিত

প্রবেশ করিলেন, এবং শাসনকর্তাকে সংবাদ দিয়া কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তা বলিয়া ভুলাইতে চেষ্টা কবিলেন । কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । বিলম্ব দেখিয়া বাহিরের জন-মণ্ডলী ক্ষিপ্তপ্রায় হইল । তখন প্রাণরক্ষার জন্ত Ingersoll

শপথপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ কবিলেন, এবং বাহিরে আসিয়া সকলের সমক্ষে তিনবার “স্বাধীনতা ও স্বত্বের” উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি করিতে বাধ্য হইলেন ।*

এইরূপে, অন্যান্য প্রদেশের ষ্ট্যাম্পবিক্রেতাদিগকেও প্রাণের ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল । নানা স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে লাগিল । কোন কোন স্থানের সরকারী আফিস ও কাগজপত্র পুড়াইয়া দেওয়া হইল । এই গোলযোগের মধ্যে গ্রেনভিল পদচ্যুত হন এবং লর্ড বকিংহাম তাঁহার স্থান গ্রহণ কবেন । আমেরিকা হস্তচ্যুত হয় দেখিয়া নূতন মন্ত্রীসমাজ ষ্ট্যাম্প আইন রহিত করেন—কিন্তু তাঁহা মুখবন্ধে একথা বলিয়া বাধেন যে মার্কিনদিগের উপর কর স্থাপনের অধিকার পার্লামেন্টের অবশ্যই আছে ।

বিদ্রোহবহি আপাততঃ নির্বাপিত হইলেও প্রধুমিত অবস্থায় বহিল । প্রেম একবার বাহত হইলে তাঁহাকে আবার অথঙাকারে পুনরুজ্জীবিত কবা কঠিন । উভয় পক্ষই বুঝিলেন, অমুকুল বাতাস পাইলেই আগুন পুনরায় জলিয়া উঠিবে । কাজেও তাহাই হইল । কুক্ষণে পার্লামেন্ট চায়ের উপর শুষ্ক ধার্য্য করিলেন । মার্কিনদেশের স্বারাজ্য-পন্থীরাও “যুদ্ধংদেহি” বলিয়া অগ্রসর হইল ।

ষ্ট্যাম্প আইন কবিয়া ইংরেজেরা অধর্ম্ম করিয়াছিল, এরূপ বলা যায় না ; কাজটা বুদ্ধিমানের মত হয় নাই, এ কথা বলাই ঠিক । স্বাধীনতা-সংগ্রামেও মার্কিনদিগের জয় হইল—এজন্ত নয়, যে তাঁহারা মোটেই ধর্ম্মলঙ্ঘন করে নাই, কিন্তু প্রধানতঃ এই জন্ত যে ইংলণ্ডের চিরশত্রু ফ্রান্স ও স্পেন তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল । ফরাসিরা ইহাব কয়েক বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের নিকট পরাজিত হইয়া ও কানাডা হারাইয়া মর্মান্বাহে জলিয়া মবিত্তেছিল । এখন তাঁহারা বৃটিশসাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংরেজদিগকে ব্রহ্ম কবিবাব জন্ত উৎসাহেব সহিত মার্কিন-দিগের সহায়তা করিতে লাগিল । মার্কিনেরা শুধু “অপরের শ্রাঘ্য অধিকাবেব অন্তঃপাতী সূচ্যগ্র ভূমিখণ্ড” কেন, সুবিস্তীর্ণ কানাডা দেশেও হস্তপ্রসারণ কবিয়াছিল, কিন্তু সেখানে দস্তফুট করিতে না পারিয়া ভয়মনোরথ ও হৃদশাপন্ন

হইয়া ফিরিয়া আইসে। তাঁহাদের নেতা ওয়াশিংটন “সাক্ষাৎ ধর্মের অবতারণা” ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও একজন গরিব শিক্ষককে গুপ্তচরের বেশে শত্রুশিবিরে পাঠাইয়া-ছিলেন, বেচারী ধবা পড়িয়া ফাঁসিকাঠে প্রাণ হারায়। মার্কিনদেশীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের জয়পতাকায় তাহাদিগের স্বদেশপ্রেম, সাহস ও আত্মত্যাগ, এবং করাসিদিগের স্বার্থ-গন্ধযুক্ত উদারতা স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিতেছে, সত্য ; কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রথমাবধি ধর্মের সহিত এতখানি পাণ-মিশ্রিত, সেখানে “যতো ধর্ম ততো জয়ঃ” এই নীতি তারকার বেশে শোভা পাইতেছে কিনা, সন্দেহ।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে কেবল বিশুদ্ধ ধর্মেরই জয় হয়, ইহা একটা কুসংস্কার। কোনও জাতির ইতিহাসেই ইহাব প্রমাণ পাওয়া যায় না। জাতীয় জীবনে যে সকল গুণ থাকিলে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যাইতে পারে গ্রীক ও রোমকদিগের তাহা ছিল, এই জন্তই তাহাদিগের এত গৌরব—নতুবা তাহাদিগের ধর্মসম্পদ অধিক কি ছিল ? বরং তাহাদিগের মধ্যে যে সকল জঘন্য পাপ বর্তমান ছিল, পবনদলিত ভাবতবর্ষে তাহা কখনও দেখা যায় নাই। অধিকদিনের কথা নয়—ইটালীর অভ্যুত্থানের ইতিহাসে কি দেখিতে পাই ? দেবচরিত্র ম্যাটসিনি দ্বারা ইটালীব উদ্ধার সম্পন্ন হইল না। ইহাদিগের নিকট ইটালী জাতি স্বাধীনতার জন্ত ধনী, তাহাদিগের মধ্যে করাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ধর্মোপদেশ-বর্জিত, পিডমন্টের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল চবিত্তহীন, রাজনীতিবিৎ ক্যাভুর মিথ্যা-বাদী। বর্তমান জর্জান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিস্মার্ক যথেষ্ট মিথ্যাকথা বলিতে পাবিতেন। এই সকল দেশের অভ্যুত্থান বিশুদ্ধ ধর্মের উপর নির্ভর করিলে, অনন্তকাল অপেক্ষা করিতে হইত।

তবে কি আমি অধর্মপ্রচারের সমর্থন করিতেছি ? না, তাহা নহে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহাব মর্ম এই যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে হয় ধর্মের নূতন সংজ্ঞা দেওয়া আবশ্যিক ; নতুবা যথার্থ ধর্মপিতামহ ব্যক্তিদিগের উহা হইতে বিমুক্ত থাকা অপরিহার্য।*

শ্রীরজনীকান্ত গুহ ।

* স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেই ধর্মবিপ্লবিত কোনও না কোন কাজ করিতেই হইবে, অথবা কেবল ধর্মপথে থাকিয়াও স্বাধীনতা লাভ

রাজা দেবী সিংহ ।

(১)

কলঙ্ক টাকা ।

Mr. Hastings was very far from indifferent to the character of the persons he dealt with. On the contrary, he made a most careful selection ; he had a very scrupulous regard to the aptitude of the men for the purposes for which he employed them ; and was much guided by his experience of their conduct in those offices which had been sold to them upon former occasions. Except Ganga Govind Singh (whom, as justice required, Mr. Hastings distinguished by the highest marks of his confidence), there was not a man in Bengal, perhaps not upon earth, a match for this Devi Singh.—E. Burke.

করা যায়, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। তবে মোটের উপর একথা বলা যায় যে, সাধুতম ব্যক্তির জীবনের অস্বাভাবিক কাজেও যেমন ধর্মোপদেশ মিশ্রিত থাকে, তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতেও তেমনি ধর্মোপদেশ মিশ্রিত থাকিতে পারে। কোন মানুষের দীর্ঘকালব্যাপী কোন কাজই এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দোষত্রুটিগুক্ত দেখা যায় নাই। আমি অধর্মের পক্ষে ওকালতী করিতেছি না। ধর্মই সর্বদা ও সর্বথা অবলম্বনীয়, ইহাই আমার মত। আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, অধর্মের লেশমাত্র শূন্য নহে বলিয়া মানুষ যখন জীবনের অস্বাভাবিক কাজ পরিত্যাগ করে না, তখন সম্পূর্ণ ধর্মপথে থাকিয়া যদি স্বাধীনতা লাভ করা না যায়, তাহা হইলে তাহা হইতেই বা বিরত থাকিবে কেন ? দুষ্টান্ত স্বরূপ ধর্ম, ধর্মপ্রচারকের কাজ খুব পবিত্র ও ধর্মসঙ্গত। কিন্তু এমন ধর্মপ্রচারকের নাম কেহ করিতে পারেন কি, যাহার কার্যে অধর্মের লেশমাত্র ছিল না বা নাই ? শিক্ষকের কাজ খুব পবিত্র ও ধর্মসঙ্গত ; কিন্তু তাহারা ঐ কার্যে ছাত্রদের প্রতি ব্যবহারে বা স্বীয় কর্তব্যপালনে, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের স্বাভাবিক অধিকার ভয়ে পরিত্যাগে, ক্রিষ্টা কোম কোন মিথ্যাকথাসংবলিত ভাষাতে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার তাহারা কোনও অধর্ম করেন না কি ? ধর্মপথে থাকিয়াই স্বাধীনতার চেষ্টা করিব, কিন্তু অধর্ম যদি আমাদের প্রকৃতিদোষ বা অজ্ঞ কারণে আসিয়া জুটে, তাহা হইলে জীবনের অস্বাভাবিক কাজ যেমন ছাড়িয়া দি না, স্বাধীনতার চেষ্টাও তেমনি ছাড়িব না,—ইহাই বোধ হয় মানুষের ঠিক আদর্শ। কারণ, স্বাধীনতা ব্যতীত ধর্ম রক্ষা হয় না। পরাধীন দেশে কোন ধর্মোপদেশ সম্পূর্ণ সত্য কথা বলিতে পারেন ? যীশুও পারেন নাই। তাহাকে কৌশলপূর্ণ উত্তর দিয়া ফিলিস্তিনিকে নিরস্ত করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশেও ত এখন অনেক ধর্মোপদেশী আছেন। তাহারা দেশের রাজনৈতিক ঘটনা ও অবস্থা সম্বন্ধে নির্ভীক ভাবে সম্পূর্ণ সত্য কথাটা কেন বলিতে বা লিখিতে পারিতেছেন না ? কারণ, তাহারা পরাধীন। আমরাও খবরের কাগজ চালাইয়া প্রত্যহ, সত্য মত গোপন করিয়া, অধর্ম করিতেছি। পরাধীন দেশে আদর্শ ধর্মিকের কথা না বলাই ভাল।

পরিশেষে বক্তব্য, ধর্ম ঐ জন্ত অবলম্বনীয় নহেন যে তিনি স্বাধীনতা বা ঐরূপ দেন ; ধর্মের জন্তই ধর্ম অনুসৃতব্য ;—কল যুগাই হউক। —প্রবাসীর সম্পাদক।

বাঙ্গালার এমন দিন ছিল যখন গঙ্গাগোবিন্দ বা দেবী সিংহের নাম শ্রবণ করিলে লক্ষপতি হইতে পৰ্ণকুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই আতঙ্কে শিরিয়া উঠিত। কোম্পানী বাহাদুরের আমলে এই সকল অর্থ-গুরু নরপিণাচগণ নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি ও কোম্পানীর তুষ্টিবিধান মানসে বঙ্গদেশ উৎসন্ন দিতে বসিয়াছিল। তাহাদিগের ঘৃণিত চিত্র বাঙ্গালার ইতিহাসেব পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার কাহিনী বাঙ্গালীর স্বথের চিত্র নহে—রক্তরাঙ্গা বেদনার অশ্রুসিক্ত কাহিনী।

মহম্মদ রেজা খাঁ যখন কোম্পানী বাহাদুরের নায়েব-সুবাদার তখন দেবী সিংহ নানা অসুস্থপায়ে অর্থসঞ্চয় করিতেছিলেন। রেজা খাঁ তাঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন—দেবী সিংহের অদৃষ্ট কিবিল—পূর্ণিমা, রজপূব ও দিনাজপুরের শিরে বজ্র পতন হইল—দেবী সিংহের ভবিষ্যৎ মুক্তির পথ সূগম হইয়া রহিল।

পূর্ণিমা তখন ধনে জনে বাঙ্গালার একটা সুবিখ্যাত জনপদ বলিয়া পরিচিত ছিল। রেজা খাঁ দেবী সিংহকে পূর্ণিমার রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করিলেন। তিনি তথায় ষাইয়াই (১৭৬৮) প্রায় সকল পবগণাগুলিই ইজ্জাবা লইলেন। তাঁহার কার্যকুশলতা ও অর্থলাভের উৎসাহে অল্পকাল মধ্যেই পূর্ণিমা প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল—তাহার সে শোভা, সে সমৃদ্ধি আর রহিল না। পূর্ণিমা শ্মশান হইল। দেবী সিংহের ইজ্জাবাব কাল শেষ হইলে যাহারা একান্ত আশ্রয়িত হইয়া পূর্ণিমার রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেশের অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখিয়া তাঁহারা অবিলম্বে ইস্তফা দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং এক লক্ষ বিংশ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিয়াও যে দায়মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন সে ক্ষন্ত আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান মনে করিয়াছিলেন! * যে পূর্ণিমা হইতে ১৬ লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব আদায় হইত, দেবীসিংহের দোহন-

নৈপুণ্যে সেই পূর্ণিমা পরে ৬ লক্ষ মুদ্রাব অধিক আর দিতে পারে নাই।

১৭৭০ খৃঃ অব্দে বঙ্গের সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, দেবী-সিংহেব রাজস্ব তাহাতে কমিল না—কোম্পানী-বাহাদুরের রাজস্বও কমিল না। দেশে ধান্ন ছিল না, সুতরাং প্রজাগণ রাজস্ব দিতে পারিল না। মহম্মদ রেজা-খাঁ সে কথা শুনিলেন না—দেবী সিংহ কাহাবও দুর্দশার দিকে দৃষ্টিপাত কবিলেন না। তিনি জমীদারদিগেব উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সিদ্ধক তখন শূন্য ছিল—দেবী-সিংহই উহা শূন্য করিয়াছিলেন! অগ্নিশিখা যেমন সর্বদা অতৃপ্ত—দেবীসিংহও তজ্জপ ছিলেন। তিনি জমীদারদিগের জাতি-কুল-মান ধ্বংস করিতে লাগিলেন—তাঁহাদিগকে কারাবদ্ধ করিলেন—প্রহার কবিলেন—অপমানিত করিলেন। তাহাতেও যখন বাঙ্কিত অর্থ আসিল না, তখন পাণ্ডিত্য দেবীসিংহ তাঁহাদিগের জননী—ভগিনী—দুহিতাদিগকে কাছারিতে আনাইয়া অঙ্গের ভূষণাদি কাড়িয়া লইলেন এবং বিবজ্জা করিয়া সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিলেন!*

দেবীসিংহের অত্যাচারকাহিনী অধিক দিন গুপ্ত থাকিল না। মহম্মদ রেজা খাঁ তখন পদচ্যুত হইলেন। সেনাপতি গেলেন বটে—কিন্তু উপযুক্ত অধিনায়ক দেবীসিংহ তখনও অক্ষত বেহে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে যে পরিদর্শন কমিটি বসিয়াছিল হেষ্টিংস বাহাদুর তাহাব সভাপতি ছিলেন। কমিটিব বিচারে দেবীসিংহও পদচ্যুত হইলেন। বিচার শেষে হেষ্টিংস সাহেব মন্তব্য লিখিলেন—মানুষ যতদূর নৃশংসতা করিতে সক্ষম, মানুষ যে সকল ভীষণ কুকার্য্য করিতে পারে, তাহার কোনটাই দেবীসিংহের পক্ষে অসম্ভব নহে! গবর্ণর জেনেরলের স্বহস্তপ্রদত্ত কালিমা টাকা কালে দেবীসিংহের ভালো রাজটীকা স্বরূপ সুশোভিত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস “দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহে” আমরা দেখিতে পাই যে ছই ব্যক্তি কথোপকথন করি-

* They were so shocked at the hideous and squalid scenes of misery and desolation that glared upon them in every quarter, that they instantly fled out of the country, and thought themselves but too happy to be permitted, on the payment of a penalty of £12000, to be released from their engagements.—E. Burke.

* বাঙ্গালী যে এই অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক ও পাপ আর নাই। ইহাব প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।

তেছেন। একজন কৃষ্ণকায় দীর্ঘপুরুষ—তিনি দেবী সিংহ, এবং অপর আর একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ—তিনি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন—

“মহাশয় দাসী হওয়াই ভাল। আবশ্যক মত সেই দাগ দেখিয়াই লোক বাছিয়া লওয়া যায়। সেই দাগ ছিল বলিয়া মুর্শিদাবাদের রাজস্ব সমিতির দেওয়ান হইয়াছেন।”

“আপনার এই সকল কথার কিছু অর্থ আমি বুঝি না। গবর্ণর-জেনেরল যদি আমাকে কার্যদক্ষ বলিয়া মনে করিতেন, তবে ১৭৭২ সনের পরিদর্শনকালে আমাকে পদচ্যুত করিলেন কেন?”

“তিনি কি আর ইচ্ছাপূর্বক আপনাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন, বিলাতি সভ্যতার অনুরোধে খ্রীষ্টীয়ধর্মের অনুরোধে আপনাকে তখন বরখাস্ত না করিলে চলে না, তাই আপনাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।”

দেবী সিংহের কর্মকুশলতা ধীবে ধীরে গুরুপক্ষের শরীর জায় পূর্ণাঙ্গ হইতে লাগিল। তখন হেষ্টিংস তাঁহার স্বহস্ত প্রদত্ত “বাজীতাকা” অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং সেই লগাটিলক দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত দেবী সিংহই উপযুক্ত অস্ত্র। তাই ১৭৭৩ সালে যখন কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বর্ধমান, ঢাকা ও দিনাজপুরে বাজস্ব আদায়ের জন্ত প্রাদেশিক সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তখন দেবী সিংহই মুর্শিদাবাদের রাজস্ব আদায় করিবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদে দেওয়ান হইয়াই দেবী সিংহ দেখিলেন যে প্রাদেশিকসমিতি দামোদ্রসিংহের তরবারির জায় তাঁহার মস্তকের উপর বিলম্বিত রহিয়াছে। সে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবার সামর্থ্য তাঁহাব ছিল না—তাই তিনি অস্ত্রের পূজা আরম্ভ করিলেন। সে পূজা-পদ্ধতি অভিনব এবং দেবী সিংহেরই উপযুক্ত ছিল।

সেকালে বাববনিতাদিগের উপর একটা কর ধাৰ্য ছিল। দেবী সিংহ তাহার ইচ্ছারা লইলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে একটা বাববনিতাশালা খুলিলেন বলিলেও বলা যায়। সমিতির কর্তাগণ তখন তরুণ যুবক—তাঁহারা চঞ্চলচিত্ত ও বিলাসী ছিলেন। তাঁহাদিগের তুষ্টিসাধনের জন্ত দেবী সিংহ বাছিয়া বাছিয়া একদল সুন্দরী যুবতী রমণী সংগ্রহ করিলেন এবং নানাবিধ তরঙ্গ শ্লথ ও উন্মাদনাপূর্ণ নামে তাহাদিগকে আখ্যাত করিয়া কামোন্মত্ত ইংবাজকর্তাদিগকে

জানাইলেন যে তাঁহার নারীবিপণিতে “তপ্তকাঞ্চন,” প্রভৃতি অনায়াসে পাওয়া যায়। * তরুণ ইংরাজযুবকগণ স্রূপের স্রুয়া এবং দেবী সিংহের “তপ্তকাঞ্চন” প্রভৃতি লইয়াই পরম পরিতুষ্ট বহিলেন—তাঁহাব কার্যকলাপ পরিদর্শন কবিবার আর অবসর রহিল না। তাঁহারা যখন ফরাসী মন্ত্রের মত্ততায় এবং “তপ্তকাঞ্চন” প্রভৃতির রূপলাবণ্যে একান্ত বিমোহিত—একান্ত অজ্ঞান, যখন ফটিকাধারে উজ্জল শেবি বা জ্যাম্পেন জলিতেছে, যখন রমণীগণেব লীলা-চঞ্চল অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে শত বিদ্যৎ চমকিতেছে, যখন তাহাদিগের কলকণ্ঠে প্রাণ-মন বিমোহিত হইতেছে, যখন গ্রীষ্মাতিশয়াপূর্ণ আসিয়ায় বসিয়া শীতকামী ইংবাজ “পুঙ্খব” এইরূপে যুবোপের স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন—সমতান দেবী সিংহ তখন নিজে অবিচলিত থাকিতেন। স্রুবাব তরঙ্গ—রমণীর লীলা-বিভঙ্গ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। কোন্ শুভ মুহূর্তে, কোন্ মাহেঞ্জরক্ষেপে, কোন্ উন্নততাব সাহায্যে তিনি তাঁহার ঘৃণিত কর্মগুলি প্রাদেশিক সমিতির সভ্যদিগের নিকট হইতে ‘মন্জুব’ করিয়া লইবেন, তখন দেবী সিংহ সর্বদা সেই চিন্তাতেই ব্যাকুল থাকিতেন।

দেবী সিংহ ধীরে ধীরে নানা ছদ্মবেশে নানা নামে পরিচিত হইয়া নানাপ্রকাব রাজস্বের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কখনো বা আত্মপ্রকাশ করিয়া, কখনো বা আত্মগোপন পূর্বক নামাস্তব গ্রহণ করিয়া তিনি কার্য কবিত্তে আরম্ভ করিলেন। প্রাদেশিক সমিতি তখনও স্রুয়া এবং রমণী লইয়াই মত্ত ছিলেন। একবার এমনও হইয়াছিল যে ছদ্মবেশধারী নামাস্তরে পরিচিত দেবী সিংহ সবকারের কোন একটা রাজস্বের যোগাইতে না পারায় তাঁহাব উপর বেত্রদণ্ডেব আদেশ হইয়াছিল। দেবী সিংহকে সে দণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই—তাঁহার প্রতিনিধি উহা

* For, if they (the names) were to be translated, they would sound—Riches of my life ; Wealth of my soul ; Treasure of Perfection ; Diamond of Splendour ; Pearl of Price , Ruby of Pure Blood and other metaphorical descriptions that calling up dissonant passions to enhance the value of the general harmony, heightened the attractions of love with the allurements of avarice.—E. Burcke.

ভোগ করিয়া কোম্পানী বাহাদুরের আদেশের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল ।*

হেষ্টিংস সাহেব এতদিন নিদ্রিত ছিলেন না । তিনি আগ্রহেব সহিত দেবী সিংহের ক্রমোন্নতি (!) দর্শন কবিত্তে-
ছিলেন ;—পিতা যেকপ গর্কক্ষীতহৃদয়ে পুত্রের ক্রমোন্নতি
দর্শন করে সেইরূপ ! সূচতুব হেষ্টিংস যখন বুঝিয়াছিলেন
যে দেবী সিংহ এতদিনে কসিত কাঞ্চন সদৃশ হইয়াছেন,
এতদিনে কৰ্ম্মক্ষম হইয়াছেন তখন একদিন অকস্মাৎ
প্রাদেশিক সমিতির মন্ততা ছুটিয়া গেল । তাঁহারা ঘৃণাব
সহিত দেখিলেন, নবপিপাচ দেবীসিংহ কোম্পানী বাহাদুরের
রাজত্বে ঘনমসী ঢালিয়া দিয়াছে ! তাঁহারা তখন দেবী
সিংহকে বিদূষিত করিবার জন্ত কৃতসংকল্প হইলেন ।

বাজা দেবী সিংহের অর্থের অভাব ছিল না—কিরূপে
উৎকোচ গ্রহণ করিতে হয়, সে কালের অনেক ইংরাজও
তাহা বিশেষরূপেই জানিতেন । তাই আশায় বুক বাধিয়া
দেবী সিংহ তখন প্রাদেশিক সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে
যথোপযুক্ত উৎকোচ দিতে চাহিলেন—তাহার পর বিশেষ
উৎকোচের প্রলোভন দেখাইলেন—শেষে কহিলেন, যে
যাহা চাহিবে আমি তাহাই দিব—আমার ভাণ্ডারদ্বার মুক্ত
করিয়া দিয়াছি ।

কিছুতেই কিছু হইল না । প্রাদেশিক সমিতি সেই
ঘৃণিত উৎকোচের প্রস্তাবে পদাঘাত পূর্বক দেবী সিংহকে
পদচ্যুত করিতে বসিলেন । দেবী সিংহ আব কালবিলম্ব
না করিয়া কোম্পানীর শিরোমণির অধেষণে চলিলেন ।
তিনি জানিতেন যে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেষ্টিংসের দক্ষিণ
হস্ত, হেষ্টিংস বাহাদুর কোম্পানীর কর্ত্তা এবং উৎকোচ
হেষ্টিংসের বিধাতা পুরুষ !

দেবী সিংহ গঙ্গাগোবিন্দের শরণ লইলেন । তাঁহার
কলঙ্কটাকা বাজটাকা হইল ।

যোগং যোগ্যেন যোজয়েৎ ।

It was not enough that the English were thus sacri-
ficed to the revenge of Debi Singh. It was necessary

And for one of those frauds committed by him
in another name, by which he became deeply in
balance to the revenues, he was publicly whipped
by proxy.—E. Burke.

to deliver over the natives to his avarice. By the inter-
vention of bribe brokerage he (Hastings) united the
two great rivals in iniquity, who before, from an emu-
lation of crimes, were enemies to each other, Ganga
Govinda Singh and Debi Singh.—Burke.

বঙ্গের জমীদারগণ সকালে প্রজাদিগকে অপত্যনির্কি-
শেষে স্নেহ কবিত্তেন—তাঁহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন,
ধ্বংস কবিত্তেন না । হেষ্টিংস সাহেব মনে করিতেন যে
জমীদার উপর জমীদারের কোন স্বত্ত্ব নাই । হেষ্টিংস বাহাদুর
অনেকের সহিত ইজারা বণোবস্ত করিলেন । কালে তাহাতে
আদৌ কোন ঝগড়া ছিল না । ইজাবাদারগণ বাজালাব
বল্লশেষণ কবিত্তেই আসিয়াছিল—বাজালাকে সম্ভাব
বাধিতে আসে নাই ! অর্থলোলুপ ইজারাদারগণ অল্পকালের
জন্ত ইজারা গ্রহণ কবিয়াই ছলে বলে বা কোর্শেলে বঙ্গের
যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত এবং সেই অর্থ কোম্পানীর
বাজস্ব ও প্রতিশ্রুত উৎকোচাদি প্রদান কবিয়া আপনাদেব
শুভ্র সিদ্ধক পূর্ণ কবিত !

যে সকল ইংরাজ কালেক্টরগণ সকালে কোম্পানীর
রাজস্ব আদায় করিবার জন্তই সৃষ্ট হইয়াছিলেন—তাঁহারা
রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইলেন । ইতিহাস-বিশ্রুত পাঁচসনা
বন্দোবস্তের পর (১৭৭২) নবসৃষ্ট ইংরাজ তহশিলদারগণ
বোন্দারী কবিয়া ইজারা গ্রহণ কবিত্তে লাগিলেন । তাঁহারা
যে রাজস্ব আদায় কবিত্তেন তাহার অধিক পবিমাণই
আত্মসাৎ করিতেন—কোম্পানী বাহাদুরের অর্থাগার শূন্যই
থাকিত । সুতরাং কোম্পানীর রাজস্ব ক্রমেই বাকি
পড়িতে লাগিল ।

উৎকোচগ্রাহী হেষ্টিংস * ইংবাজ তহশিলদারদিগকে
শাসন করিতে পাবিতেন না ; পাছে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া
বিলাতে তাঁহাব চরিত্র কীর্ত্তন করে এই ভয়ে তাঁহাকে
সর্ব্বদাই নির্দাক থাকিতে হইত ! প্রবিস্ময়াল কোমিসলের
উচ্ছেদ সাধন কবা ক্রমে ক্রমে হেষ্টিংস সাহেবের অবশ
কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল ।

* "In the late proceedings of the Revenue Board"
observes the majority of the council, "there is no species
of *peculation* from which the Hon'ble Governor
General has thought it right to abstain."

—History of India, Beveridge, p. 383.

বেহার প্রদেশ তখন বাঙ্গালার সহিত যুক্ত ছিল। মহারাজা সিংহবরায়ের পুত্র পাটনা বিভাগের অনেক জমী বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহিলেন। পাটনা কোমিসলের সেরূপ অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু কল্যাণ সিংহ উপযুক্ত উপায় অবলম্বন কবিলেন; তিনি গবর্ণর জেনেরালকে চাবি লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ দিতে চাহিলেন! সুতরাং পাটনাব প্রেভিসিয়াল কোমিসলও বিলুপ্ত করিবার আবশ্যকতা ঘটিল! *

কিছুদিন পর ইংরাজ তহশিলদারদিগের আমলে দেশীয় তহশিলদারগণ আসিয়া বসিলেন—এ দিকে তখন পাঁচসনা বন্দোবস্তের কালও শেষ হইয়া গেল। এই দীর্ঘ পঞ্চবর্ষ ধরিয়া হেষ্টিংস বাহাদুর দেখিয়া আসিতেছিলেন, যে প্রাদেশিক সমিতি জমী বন্দোবস্ত কবিলে তাঁহার কোনো লাভ থাকে না। সুতরাং দেশেব শাসন-ব্যবস্থা ভাল হউক বা মন্দ হউক প্রাদেশিক সমিতিগুলিকে বিলুপ্ত করিতেই হইবে। সমিতির সভ্যগণ তখন শির উত্তোলন পূর্বক দেবী সিংহকে দংশন করিবার জন্ত রোষনত্রে চাহিতেছিল। হেষ্টিংস সাহেব প্রমাদ গণিলেন। যদি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং দেবী সিংহ না থাকেন তবে আব তাঁহাব থাকিল কি? কোম্পানীর সিংহাসন ভাগীরথী মধ্যে নিমজ্জিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু দেবী সিংহ এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে চাই-ই-চাই! যে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নামে সমগ্র ভারতভূমি বিবর্ণ হইয়া উঠিত, যে গঙ্গাগোবিন্দের ছায় পাপিষ্ঠ, ভীষণপ্রকৃতি, নিষ্ঠুর, খলস্বভাব, নৃশংস দম্ভ্য তৎকালে আব ছিল না বলিলেও চলো—হেষ্টিংস দেখিলেন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকে চাই-ই-চাই! যে দেবী সিংহের নাম করিলেও পাপ স্পর্শে, হেষ্টিংস অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাকেও চাই, নতুবা বাঙ্গালার মননে বসিয়া লাভ নাই!

কিন্তু ডিরেক্টর সভা গবর্ণর জেনেরালের কোন কথাই শুনিলেন না—হেষ্টিংসের অনুচর এণ্ডারসন এবং বোগেল সাহেবের ১৭৭৬ সালের মক্কা-রপোর্টেও কোন ফল হইল না। তৎকালে নিয়ম ছিল যে ইংরাজ তহশিলদারগণ

কিন্দা তাঁহাদের অধীনস্থ কোন ব্যক্তিই ইজারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু হেষ্টিংসের “বেনিয়ান” কাস্ত বাবু অন্যান্য উনত্রিশটি পরগণা ইজারা লইয়াছিলেন। ধান্দু বাহাদুর নাম গ্রহণ করিয়া মুন্সেরের তহশিলদার বোম্যান সাহেব মুন্সের এবং খারিদাপু ইজারা গ্রহণ কবিলেন—থেকারে সাহেব গোপনে শ্রীহট্টের ইজারদার হইলেন! ছুষ্ঠী লোকে কহে গবর্ণর জেনেরালের সভার অন্যতম সভ্য বাবওয়েল সাহেবও এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। গবর্ণরজেনেরাল এবং বারওয়েল ইজারদার থেকারের কার্যাদি গোপন করিবার জন্ত যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ডিরেক্টর সভার পত্রাদিতেই তাহার প্রমাণ আছে।* ডিরেক্টর সভা সমস্তই বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন বলিয়া প্রেভিসিয়াল কোমিসল উঠাইয়া দিতে অসম্মত হইলেন।†

ডিরেক্টর সভাব বিরুদ্ধে বীরের ছায় অজ্ঞধারণ কবিবার শক্তি হেষ্টিংস সাহেবেব ছিল না। তিনি তখন কি করিলেন? তাঁহাব স্বদেশীয়েব বাক্য আশ্রিত মেঘমস্ত্রে সেই কথা কহিয়া থাকে—বিধাশূন্য সঙ্কেচশূন্য হেষ্টিংস নিরপরাধী কর্মচারীগণকে বিক্রীত করিলেন; কোম্পানী কর্মচারিগণ—কর্তব্যের অমুরোধে হেষ্টিংস সাহেব বাহাদিগকে আশ্রয় দিতে বাধ্য ছিলেন—তিনি তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন; যে সকল ইংরাজপ্রজা, জাতীয় সহানুভূতিব বন্ধনে তাঁহার সহিত আবদ্ধ হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকেও বিক্রয় করিলেন—এমন কি ইংরাজের সম্মান পর্যন্ত তিনি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। বিনা অভিযোগে—বিনা অপরাধে—অপরাধের সন্দেহ পর্যন্ত না থাকাতেও তিনি কোম্পানীর কর্মচারীগণকে সে দেশের (বাঙ্গালার) একজন ঘৃণিত পরিত্যক্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিলেন!

‘মুর্শিদাবাদ কোমিসল দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া সে দেশ (বাঙ্গালা) শাসন করিতেছিল (ভারতের পবিত্রতনু ইতিহাসে

* Company's General Letter, paras 45 and 48, Dated 28th Nov., 1777, and para 131 of General Letter, Dated 23rd Dec., 1778.

† Company's General Letter to Bengal, paras 36 and 37, Dated 4th July, 1777.

* Edmund Burke in 1788.

† Edmund Bruke in 1788.

ষাটশব্দ অতিশয় দীর্ঘ কাল), যখন সেই কোম্পিউল অনেকাংশে ক্ষুদ্র এবং অভিজ্ঞ হইয়াছিল, যখন কর্মতৎপব হইয়া সেই কোম্পিউল পূর্বকৃত ভ্রমসংশোধনে নিযুক্ত ছিল —হেষ্টিংস সাহেব সেই সময়ে শুধু দেবী সিংহের জন্ত উহা বিলুপ্ত করিয়া দিলেন!*

তখন কর্ণেল মনস্ এবং জেনেরাল ক্লেবারিংকে সমাহিত করিয়া, ক্রাসিন্ সাহেবকে নিষ্কিন্ত করিয়া হেষ্টিংস নিম্নাং ফেলিবার অবসর পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার যখন সত্ততা ও সম্মানের রাজত্ব ছিল, হেষ্টিংস সাহেব তখন বাধ্য হইয়া পবনাপহরণ হইতে বঞ্চিত ছিলেন—এখন নির্মক্ষিক হইয়া তিনি তাহার স্নানসহ আদায় করিবার জন্ত আশ্চরিত প্রকাশ করিয়া বসিলেন।

দেবী সিংহের প্রতিহিংসামন্দিরতলে শুধু যে ইংরাজ-দিগকে বলি দিয়াই হেষ্টিংস সাহেব ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে—তাহার ধনলিপ্সার সম্মুখে নির্দোষী ভারত-বাসীদিগকেও সমর্পণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। গঙ্গাগোবিন্দ এবং দেবী সিংহ যদিও পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলেন, কিন্তু উৎকোচের দালালীর খাতিরে হেষ্টিংস সাহেব সেই প্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডিত্যকে একত্র মিলাইয়া দিয়া-ছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ মধ্যস্থ হইয়া গবর্ণর-জেনেরালের সহিত দেবী সিংহের উৎকোচ এবং ইজারার কথাবার্তা জানাইতে লাগিলেন! শেষে দেবী সিংহ একদিন দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও ইজাকপুরের ইজাবা প্রাপ্ত হইয়া দস্তাবেজি আরম্ভ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস একদিন যাহাকে সর্কপাপকম বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কালপূর্ণ হইলে তাহার সেই কলঙ্কটাকা বাজটাকা হইয়া উঠিল।

দেবী সিংহের আগমনেই রঙ্গপুরের রাজত্ব সাত লক্ষ মুদ্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কাগজপত্র ঠিক রাখিবার মানসেই বোধ হয় হেষ্টিংস সাহেব তখন আদেশ দিলেন—কৃষির উন্নতি বিধান করিয়া ইজারাদার দেবী সিংহ রঙ্গপুরের বর্জিত জমা আদায় করিবেন, অত্যাচার করিয়া নহে।

বঙ্গভাগ্যলক্ষ্মী তখন একান্ত অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। দিনাজপুরের মহারাজা তাই একত্র দত্তক পুত্র রাখিয়া ১৭৮০ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিলেন। সিংহাসনের

অধিকার লইয়া সেই দত্তক পুত্রে এবং মহারাজার বৈগাত্রেয় ভ্রাতার বিবাদ আরম্ভ হইল। বঙ্গের রক্ষক হেষ্টিংস বাহাদুর নিজে সেই বিবাদ মিটাইতে বসিয়া দত্তক পুত্রকে পিতার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হেষ্টিংস সাহেব এই সুযোগ পরিহার না করিয়া চারিলক্ষ মুদ্রা “মেহনৎ আনা” গ্রহণ করিলেন—দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ এই উৎকোচের দালালী করিয়াই যশস্বী হইলেন।

একজন ইংরাজ গুড্‌ল্যাড্ এই সময়ে কলেক্টর রূপে অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালী গুড্‌ল্যাডের সহিত মিলিত হইলেন। রঙ্গপুর দিনাজপুর ও ইজাকপুর তাহাদিগের শাসনে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিয়া উঠিল! রঙ্গপুরে তখন ইংরাজ গুড্‌ল্যাড্ কলেক্টর—বাঙ্গালী গুড্‌ল্যাড্ তাহার দেওয়ান এবং সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের ইজারাদার। যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হইল।*

নাবাগকের সংসারে ব্যয়বাহ্য্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া গুড্‌ল্যাড্‌গণ তখন পুরাতন রাজকর্মচারীদিগকে বিতাড়িত করিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্ত রাণী যে মুশহারা পাইতেন অবিলম্বে তাহা রহিত হইয়া গেল—রাজভ্রাতার প্রাপ্য ১৬০০০ টাকা সঙ্কুচিত হইয়া ৬০০০তে আসিয়া দাঁড়াইল—এমন কি রাণীর পিতা বা অগ্র আত্মীয় কেহ আসিলে রাজ-বাটীতে আর আহার পাইত না। এদিকে ম্যানেজার গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের বন্ধুবান্ধবগণ রাজসরকারের ব্যয়ে শেরি স্ট্রাম্পেনের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন।

রঙ্গপুরের ঐতিহাসিক মেজির সাহেব বলিয়াছেন, দেবী সিংহ যতই কেন কুক্রিয়াসক্ত না থাকুন, গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের সহিত সে সংকল কুকর্মের কোন সংশ্রব ছিল না। এদমন্দ্ বার্ক হেষ্টিংসের নামে অভিযোগ করিবার সময় এতই বিচারবিবেচনাশূন্য হইয়াছিলেন যে গুড্‌ল্যাডের নামেও অমথা হোষারোপ করিয়াছিলেন।†

ইতিহাস মেজির সাহেবের উক্তির বিচার করিবে।

নরমেধ যজ্ঞ ।

I Charge him (Mr. Hastings) with having committed to the management of Debi Singh three great

* Edmund Burke.

• Glazier's Rungpore.
† Do Do

provinces ; and thereby, with having wasted the country, ruined the landed interest, cruelly harassed the peasants, burnt their houses, seized their crops, tortured and degraded their persons, and destroyed the honour of the whole female race of that country.

—E. Burke.

দেবী সিংহের ইজ্জাবা লইবার পূর্ব হইতেই দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতির আর সে পূর্ব সমৃদ্ধি ছিল না। জমীদারগণ সেই সময়েই সবকাবী বাজস্ব সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে পারে নাই। দেবী সিংহ আসিয়াই তাঁহাদিগের নিকট বৃদ্ধি জমা চাহিলেন। একে ছিয়ান্তরেব মনস্তরে লোকক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আয়ক্ষয়, তাহাব পব আবার পাঁচশালা বন্দোবস্ত কালে বৃদ্ধি জমায় জমী গ্রহণ! জমীদারগণ দেবী সিংহের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলেন না। দেবী কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। নিরপরাধ জমীদারগণ লোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সে কালের ছাদহীন কারাগৃহে অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যাহারা ইন্তফা দিতে চাহিলেন, বাকি রাজস্বের অল্প তাঁহাদিগকেও কাবাকদ্ধ হইতে হইল। যখন যতুণা অসহ্য হইল, তখন তাঁহারা নিকুপায় হইয়া বৃদ্ধি হাবে কবুলিয়ত দিতে সম্মত হইলেন—কোন প্রকারে জীবন বক্ষা হইল!

জমীদারদিগকে একবার আশ্রয়বশে লইয়াই রাজা দেবী সিংহ নূতন নূতন কর ধাৰ্য্য কবিত্তে লাগিলেন। ভূস্বামীদিগের যথা সর্বস্ব সেই দায়ে বিকাটতে লাগিল! দেবী সিংহ সেই সকল সম্পত্তির মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়া নিজেই সমুদয় ক্রয় কবিত্তা লইলেন! ইহাতেও জমীদারদিগের ঋণ শোধ গেল না। সূতবাং স্বাববেব সঙ্গে সঙ্গে অস্থাবর দ্রব্যাদিও বিক্রীত হইয়া গেল। রমণী ভূস্বামিনীদিগের গৃহের চতুর্দিকে সশস্ত্র সৈনিক প্রভুরা প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পলায়নের পথ বন্ধ কবিত্তা দিল। তখন নাবী পেঙ্গাদাংগণ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা পাইল তাহাই লইতে লাগিল। তখন পর্য্যন্তও দেবী সিংহ রমণী ব সন্মান রক্ষা কবিত্তাছিলেন।

দেবী সিংহ কর্ষোপলক্ষে দিনাজপুরেই থাকিতেন। তাঁহাব কর্ষচারী কৃষকপ্রসাদ রাজস্ব আদায়ের অল্প রঙ্গপুবে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কোন কোন জমীদার দেবী

সিংহের নিকট আবেদন জানাইবাব মানসে দিনাজপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। দেবী সিংহ সেই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ প্রসাদের অক্ষমতা দর্শনে তাঁহাব স্থানে হরবামকে প্রেরণ করিলেন ও সেই সঙ্গে আবেদনকাবী করুণাপ্রাপী ভূস্বামীগণও বন্দিরূপে বঙ্গপুবে প্রেরিত হইলেন! শৃঙ্খলাবদ্ধ জমীদারগণ তখন হররামের বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইতে লাগিলেন।

দেশেব জমীদারদিগেবই যখন এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তখন বামধন, মবারক ও জবান্ অনন্দের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। দেবী সিংহ নিজেই একবার বলিয়াছিলেন—“এ দেশের সকল স্থান অপেক্ষা বঙ্গপুবেব কৃষকগণই নিতান্ত দরিদ্র। ফসলের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে তাহাদিগের কপর্দকও থাকে না।... কয়েক ধানি মুগ্ধ তৈজস ও খড়ের ভগ্ন জীর্ণ কুটার ভিন্ন কৃষকদিগের আব কিছাই নাই!” অথচ দেশিতে পাওয়া যায়, এই প্রকার ধনাঢ্যদিগেব নিকট হইতেই ইজ্জাদারের নিজ লভ্যাংশ এবং বৃদ্ধি জমা ছাড়াও হেষ্টিংস স্তাহেবেব চারি লক্ষ মুদ্রা উৎকোচ আদায় কবা হইয়াছিল।

যতই অর্থের অভাব হইতে লাগিল দেবী সিংহেব চবগণ ততই চতুর্দিকে বাক্ষসের মত ছুটিয়া দরিদ্র নিরন্ন হতভাগ্য কৃষকদিগকে বন্ধন করতঃ ছলে, বলে ও কৌশলে বৃদ্ধি জমায় কবুলিয়ত আদায় করিয়া লইতে লাগিল। তাহারা তখন ঋণগ্রহণ করিতে আরম্ভ কবিল। উত্তমর্গগণ এই সুযোগে কৃষকদিগের সর্বনাশ কবিত্তা নিজেদেব অর্পলালসা পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। হেষ্টিংস সাহেবেব প্রাপ্য উৎকোচ এবং পেযকস্ পরিশোধ কবিত্তা অল্প হতভাগ্য অন্নহীন দীন দরিদ্রগণ শতকরা কত হারে সুদ দিয়া ঋণ গ্রহণ করিত্তাছিল? পাঁচ, দশ, কুড়ি, চল্লিশ মুদ্রা? ইহার অধিক আর কল্পনা আইসে না। কিন্তু দেবী সিংহের কালে কল্পনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিত্তাছিল। শতকবা ছয় শত মুদ্রা সুদে যে দেশের কৃষকগণ ঋণ গ্রহণ পূর্বক কোম্পানীর রাজস্ব পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে দেশ বিধাতার অভিসম্পাতে ভয়সাং হয় নাই কেন তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

² And what were the terms these poor people were obliged to consent to to answer the bribes and peshkush

বামধন ও মবারক কাবাগাংবে গেল—দেবী সিংহেব দূতেরা তাহাদিগেব যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিল—
হুর্কৎসবের অস্ত্র সঞ্চিত ধাতু পর্য্যন্তও রাখিল না ! এত
করিয়াও দেবী সিংহেব আশা মিটিল না ।

তিনি প্রতিদিন যতই বিফল মনোবশ হইতে লাগিলেন
ততই তাঁহাব ক্রোধ বৃদ্ধি পাঠিতে লাগিল। তিনি মনে
করিলেন গৃহস্থগণ কোন গুপ্ত স্থানে অর্থ লুকাইয়া রাখিয়া
তাহাকে ফাঁকি দিতেছে। তাই তাঁহাব আদেশে গৃহস্থদিগেব
শূণ্য গৃহ পর্য্যন্ত পড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তাহাবা তখন
কারাগাংবে। গৃহ গেল, তৈজসাদি গেল, শস্ত্র গেল, পঞ্চাদি
গেল—যখন সমস্তই গেল তখন রহিল শুধু তাহাদিগেব
শক্তিশীন দেহ ও অরহীন পবিবার-পবিজন। বাজকব
দিতোঁ হইবে—তাহাতে ক্ষমা নাই, রূপা নাই, মুক্তি নাই !
অবশেষে পিতা পুত্রকে বিক্রয় করিয়া—স্বামী স্ত্রীকে বিক্রয়
করিয়া সেই অর্থে বাজস্ব এবং উৎকোচ পরিশোধ কবিতো
লাগিল ! হেষ্টিংস সাহেবের অত্যাচারে পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-
ভগিনী, পতি-পত্নী প্রভৃতি স্নেহেব সম্বন্ধগুলি লুপ্ত হইয়া
গেল—বঙ্গপুংবে আর স্নেহ মমতা কিছুই বহিল না !*

দেবী সিংহ মনে কবিলেন ‘এখনো হয় নাই—আব একটু
অধিক শাস্তি না দিলে অর্থ আদায় হইবে না, গুপ্ত শস্ত্রাদিও
পাওয়া যাইবে না।’ কিন্তু তখন কেবল অবশিষ্ট ছিল
বেত্রাঘাত-বিক্ষত কাবাক্রিষ্ট অর্দ্ধজীবিত দেহ। হতভাগ্য
রামধন ও মবারক সেই দেহ বক্ষার জন্তই গ্রাম পবিত্যাগ
পূর্বক পলায়ন কবিতো চাহিল—কিন্তু তাহাব উপায় ছিল
না, পথে পথে সৈনিকেব ঘাঁটি বসিয়াছিল। দেবী সিংহ
সেই সকল সৈনিকদিগের বেতন দিতেন না—রামধন ও
মবারক নিজেদের চরণশৃঙ্খলেব* মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য
হইল—সেই নবীন আবওয়াব “চৌকীবন্দী” নামে পরিচিত
থাকিয়া আজিও দেবী সিংহেব অত্যাচার কাহিনী কহিতেছে !

কাবাগার, গৃহদাহ, ভয়প্রদর্শন প্রভৃতি যখন ব্যর্থ

paid to Mr. Hastings ? five, ten, twenty, forty per
cent ? No ! at an interest of six hundred per cent per
annum, payable by the day !—E. Burke.

* The tyranny of Mr. Hastings extinguished every
sentiment of father, son, brother and husband !

—E. Burke.

হইয়া গেল—তখন দেবী সিংহের রাক্ষসী প্রকৃতি রক্ত
চাহিল—দরিদ্র, নিরস্ত্র, সহায়-সম্বলবিহীন কাঙ্গালের রক্ত
চাহিল ! তিনি জানিতেন যে হেষ্টিংসের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায়
পবিশোধ করিতেই হইবে—হেষ্টিংস বিলম্ব মানিবেন না,
কপর্দক কমও লইবেন না। দেবী-দূত তখন বামধন,
মবারক ও জবান অস্ত্রদ্বিগকে ধৃত করিয়া তাহাদিগের
হস্তেব অঙ্গুলীগুলি কঠিন পেবণে বন্ধন কবিল। সে বজ্র-
বন্ধনে একটা অঙ্গুলী অপবটীর সতিত যেন মিলিয়া মিশিয়া
এক হইয়া গেল। হুর্কৎগণ তখন সেই নিষ্পিষ্ট অঙ্গুলী-
গুলিব মধ্যে স্ত্রীক্ক লৌহশলাকা প্রবিষ্ট কবাটবাব জন্ত
শলাকাশিবে মুদগাব প্রহার করিতে লাগিল ! হৃদয়বিদাবক
কবণ আর্ন্তনাদে দিগ্বাণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হায়,
হরস্ত দেবী সিংহেব হৃদয় তাহাতে গলিল না।

আঘাতের পর আঘাতে সেই লৌহ শলাকা দৃঢ়বদ্ধ অঙ্গুলী-
গুলি ভাজিয়া ছিঁড়িয়া প্রবেশ কবিতো লাগিল—রামধন ও
মবারকের হস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অত্যাচারকারীদিগের পদতলে
পতিত হইল। যে ক্ষীণ হস্ত হয়ত একবেলা ভিন্ন অনেক
দিন দুই বেলা অন্ন তুলিয়া মুখে দিতে পাবে নাই—যে বাহর
বলে ধবলীবক্ষ হইতে স্বর্ণবাশি উথিত হইয়া পঞ্চদশ বর্ষ
পর্য্যন্ত কোম্পানী বাহাদুরের চীন বাণিজ্যেব অর্থ বোগাইয়া-
ছিল—যে অর্থ প্রতি বৎসর বিলাতে যাইয়া লর্ড দিগের
“ডিনাব” সজ্জিত কবিত, লণ্ডনেব শোভা বর্দ্ধন করিত—
সেই বাহ এখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

সম্পন্ন এবং প্রধান গৃহস্থগণ, গ্রামের দলপতিগণ কৃষকগণ
তখন পদে পদে সম্বদ্ধ হইয়া যুগলে যুগলে আনীত হইতে
লাগিল। একখানি কাঠেব উপর তাহাদিগকে অবনত শিরে
স্থাপন করিয়া নৃশংসগণ পদতলে বেত্রাঘাত করিতে আরম্ভ
করিল। সেই নিদারুণ আঘাতে যতক্ষণ পাদাঙ্গুলী হইতে নখ
খসিয়া না পড়িল, ততক্ষণ সে আঘাতের বিবাম ছিল না।
যখন নখ খসিয়া গেল—যখন কধির শ্রোতঃ ছুটিল, তখন সেই
যমদণ্ড আবার ভীমবেগে তাহাদিগেব অবনত-শিরে পতিত
হইতে লাগিল ! দেখিতে দেখিতে নয়নে, বদনে, নাসিকায়
রক্ত-নদী বহিল। সেই স্তম্ভ-তরল শোণিতে আপন
আপন পাদমূল রঞ্জিত কবিয়া সয়তানের অমুচরণ হতভাগ্য-
দিগকে কারামধ্যে নিষ্কেপ করিল !

সাধাৰণ বেত্র বা বংশযষ্টি নিগ্রহের পক্ষে উপযুক্ত নহে বিবেচনায় সৰ্গটক বিঘ্ণাখা আসিল। তখন দীনেব দেহ বেত্রের পবিত্রত্বে বিঘ্ণাখার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল—প্রতি আঘাতে শত কণ্টক দেহ মধ্যে বিদ্ধ হইয়া মাংস, মেদ, মজ্জা টানিয়া ছিড়িতে লাগিল! বিছুটীর যাতনা-ময় দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কাহারও কাহারও দেহে দোষযুক্ত ক্ষত দেখা দিল—জালা!—জালা!—অগ্নিময়ী জালায় তাহা বা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে রাজি আসিল। বিশ্বসংসার তখন নিজাব শাস্তিময় ক্রোড়ে অচেতন, কিন্তু দেবী সিংহের বন্দী-দিগের নিজা ছিল না—নিজার অবসর ছিল না। তাহারা প্রতি রজনীতে তিনবার করিয়া প্রহৃত হইয়া প্রহর গণনা করিতে বাধ্য হইত!

ধীরে ধীরে রজনী প্রভাত হইতে চলিয়াছে, তখনও অরুণোদয় হয় নাই। মাঘের দারুণ শীতে জীব-জগৎ জড়বৎ অবস্থান করিতেছে—উত্তরপবন শরীষ মধ্যে যুটীবিদ্ধ করিয়া দিতেছে। সেই সময়ে দেবী সিংহের অথবা যমের কারাঘার মুক্ত হইল; প্রহরীদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে ভয়পাদ ভয়বাহ শতক্ষতপূর্ণদেহ বন্দিগণ অতি কষ্টে বাহিরে আসিল—অতি কষ্টে প্রহরীদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। উহারা কোথায় যাইতেছে? শ্মশানে না মশানে? শ্মশানে নহে, মশানে নহে; ওই দেখ, উহারা সেই দারুণ শীতে তুহিনশীতল বারি মধ্যে আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে—ওই দেখ, শীতে উহাদিগের অস্থি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে, দস্তে দস্তে সংঘর্ষণ হইতেছে। তারপর দেখ, দেবী সিংহের অনুচরদিগেব সেই সৰ্গটক বিঘ্ণাখা বা বিছুটীর যষ্টি উহাদিগের সিন্ধুদেহে পতিত হইতেছে—ওই শুন, মৰ্ম্মস্পৃক যাতনায় আৰ্ত্তনাদ মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না—শীতে কথা ফুটিতেছে না! ওই দেখ, ছিন্নদেহ শতছিন্ন হইয়া রুধির স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। দয়া নাই—মমতা নাই—করুণা নাই—মৃত্যুও নাই!

মাঘের হিমরজনী প্রভাত হইল। তরুণ অরুণ বস্তুরাজ্য হইয়া পূৰ্ণগগনে হাসিয়া উঠিল। সৈনিকদিগের উল্লঙ্ঘনপাণে, পরিচ্ছন্ন বসনে সেই অকণরাগ বলিয়া

উঠিল। তাহাদিগকে দেখিয়া গ্রামের নরনারী উৰ্দ্ধ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল—মৃগ যেমন সিংহকে দেখিয়া পলায়ন করে সেইরূপ। ওই দেখ সৈনিকদিগের পশ্চাতে হারাধন ও গঙ্গারাম কিছু সর্দার ও মতিমুখা পড়িতে পড়িতে পথ হাঁটিতেছে। হাঁটিতে হাঁটিতে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। তাহাদিগের নগ্নদেহ শত স্থানে ছিন্ন—শতধারে রক্ত বহিতেছে। দেবী সিংহের সৈনিক যখন হারাধনের গৃহের নিকটে আসিল, তখন বজ্রনিদায়ে ডাকিয়া কহিল—

“কোথায় চাউল লুকাইয়া রাখিয়াছিস্ দে—”

“আমি চাউল কোথায় পাইব?”

“তবে চল, টাকা ধার কর।”

“আমি আর ধার করিব না, কে আমাকে ধাব দিবে?”

“চল তবে আবাব কারাগারে।”

হারাধন তখন কি কবাবে? পুনবার কারাগৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল—যাইতে যাইতে দেখিল তাহার জীর্ণ কুটীর অগ্নিসংযোগে জ্বলিতেছে—সৈনিকগণ তাহার পুত্র ও পত্নীকে বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে।

এই সকল অত্যাচার দেখিয়া যাহারা একান্ত মরিয়া হইয়াছিল, তাহারা অত্যাচারকারীদিগের বশ্বতা স্বীকার করিল না—অগ্নানবদনে সকল যন্ত্রণা সহ করিয়াও অটল রহিল। তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদেব পুত্র কন্যা কারাবারে আনীত হইল। পায়গুণ পিতার সহিত পুত্রকে দৃঢ়বন্ধনে বাঁধিয়া কখনো বা পুত্রকে—কখনো বা পিতাকে প্রহার করিতে লাগিল। যে বেত্রদণ্ড হয় ত পিতার দেহ লক্ষ্য করিয়া উণ্ডিত হইয়াছিল তাহা যদি অকস্মাৎ তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারিল—তথাপি একেবারে বৃথা গেল না। উহা সেই ভীত রোক্তমান ঋধিপাপ্ত দেহ ক্ষুধাকাতর শুককণ্ঠ সন্তানের কোমল দেহেব উপর পতিত হইয়া তাহার মাংস কাটিয়া লইল—পুত্রের শোণিতে পিতার হৃদয় রঞ্জিত হইয়া গেল—মুমূর্ষু সন্তান “বাবাগো” বলিয়া পিতার দেহের উপর চলিয়া পড়িল! তখনো বিরাম নাই, তখনো প্রহারের শেষ নাই! হারাধন আর সহ্য করিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল, ‘দোহাই তোমাদের আমার কালুকে আর মারিও না, আমি এখনই টাকা কর্জ করিয়া খাজানা দিতেছি।’

পৃথিবীতে বুঝি আর এমন দেশ নাই যে দেশের ইতিহাস এইরূপ ক্লম্ববর্ণ—এইরূপ পাপলিপ্ত—এইরূপ ঘণিতচিত্রে পূর্ণ! পাঠক! তুমি চক্ষু কিবাইও না।

ওই দেখ মবারকের ছহিতা, রামধনের বনিতা, দাদা-সুকুরের পুত্রবধূ দেবী সিংহের অন্ধকার কারাগৃহে, অন্ধ গহ্বর মধ্যে বন্দিণী। ওই দেখ, তাহাদিগকে বলপূর্বক টানিয়া বাহিব করিয়া দেবী সিংহের দূতগণ নির্দয়রূপে প্রহার করিতেছে—ওই দেখ, তাহাদিগের নগ্নদেহ ফাটিয়া বক্ত ছুটিতেছে! বেদনার দিকে ভ্রক্ষেপ নাই—তাহাবা কাতরে কাদিয়া কহিতেছে, ‘যদি কেহ পুত্র থাক নয়ন নিম্নীলিত কব—উলঙ্গিনী জননীর দিকে চাহিও না!’ ওই দেখ, কোন যুবতীর উন্নত কূচ-যুগে বংশের বাতা টাচিয়া বাধিয়া দিয়া প্রহরিগণ হাসিতেছে—বংশখণ্ড স্তনদ্বয় ছিন্ন করিয়া লইয়া ছুটিয়া যাইতেছে! ওই দেখ, প্রজ্বলিত মশাল জীবজগতের জন্মান্বান দগ্ধ করিয়া দিতেছে! পশুও যে সেও লজ্জাশীলতা রক্ষা কবে—হায়! সে কালে মাহুমেও তাহা করে নাই! ধন্ত অর্থলিপ্সা—ধন্ত হেষ্টিংস বাহাদুর—ধন্ত পাপাচাবী রাজা দেবী সিংহ!

করণ-হৃদয় পাঠক! তুমি কি আরও দেখিতে চাও? তবে দেখ, অপর্যাপ্তা কুলকামিনীগণ ভয়ে বোদনবিহ্বলা। ওই দেখ, ‘রক্ষা কর—রক্ষা কব’ বলিয়া তাহারা বিচার-মণ্ডপতলে লুটাইয়া পড়িতেছে! কিন্তু হায়, যে আসন ধর্মের জন্ত—পাপের জন্ত নহে—সেই আসনে বহুদিন হইতে আর ধর্মপ্রাণ ত্রায়নিষ্ঠ বিচারক বসিয়াছিলেন না, সে আসন তখন হেষ্টিংস সাহেবের হৃর্কৃত লুঠেড়া ঘাতকগণে পূর্ণ ছিল। রমণীগণ সেই আসনতলে দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তকরে কাদিয়া কহিতেছে—‘রক্ষা কর, জাতি বক্ষা কর—ধর্ম রক্ষা-কর!’ দেবী সিংহের হৃদয় কি টলিল?

হতভাগিনীদিগের হস্তপদবন্ধ পিতা বা ভ্রাতা বা পতি বা পুত্র তখন একান্ত শক্তিহীন। তাহারা কি করিবে? নীরবে সহস্রবৃন্দিকদংশন সহ্য করিতে লাগিল। দেবী-সিংহের অশ্রুচরগণ—সেই নরপিষাচগণ ওই দেখ, রমণীদিগকে স্পর্শ করিল—ওই দেখ বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে সর্বসমক্ষে উলঙ্গিনী কবিল। তাব পব বিশ্বসংসার অন্ধকার হইয়া গেল—সর্বলোচন সমক্ষে সত্যের ধর্ম নষ্ট হইল! পিতার

সমক্ষে কন্ডার—ভ্রাতাব সমক্ষে ভগ্নীর—পতির সমক্ষে পত্নীর ধর্ম গেল—বঙ্গভূমি অনন্ত পাপসাগরে নিমজ্জিত হইল!

শ্রী—

প্রবাসীর পত্র ।

অনেক দিন হইতে আমার জীবনের ইচ্ছা যে এমেরিকা যাইয়া কোন প্রকার কার্য শিখিয়া আসি। ভগবানের রূপায় আজ (২রা জুন) সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এখানে মাদ্রাজ হইতে চামড়া তৈয়ার করা কার্য শিখিয়া আজ এমেরিকায় তাহা আবে ভালরূপ শিখিবার জন্ত রওনা হইতেছি। আজ সকাল ৮।০ টার সময় আমাদের জাহাজ ছাড়িবে। সকালে ৫।০টার সময় উঠিয়া মুখ হাত প্রক্ষালন করিয়া পোষাক পরিয়া ভগবানকে স্মরণ করিতে কবিত্তে জাহাজের জন্ত রওনা হইলাম। চাঁদপাল ঘাট হইতে ছোট Steam Launchএ করিয়া আমাদের জাহাজে লইয়া গেল। যখন জাহাজ ছাড়িল তখন মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া আমাদের মাতৃ-ভূমি ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া কোথায় এক নূতন স্থানে চলিয়াছি। কেবল মনে হইতে লাগিল যে যখন ভাল কার্যের জন্ত যাইতেছি তখন ভগবানের রূপায় কখনই মন্দ হইবে না। ক্রমশ জাহাজ ছাড়িল। এক এক কবিত্ত পরিচিত স্থানগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া আমাদের জাহাজ বঙ্গ উপসাগরেব দিকে চলিল। আমি একখানি চেয়ার লইয়া জাহাজের ডেকেব উপর বসিয়া নানা রকম বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন নিজের কেবিনে যাইলাম। এই জাহাজের নাম “ডানেরা” (Dunera)। যখন প্রভাত হইল তখন দেখি যে মাথা ঘুরিতেছে ও গা বমি বমি করিতেছে। ইংরাজীতে ইহাকে Sea-sickness বলে। সেদিন আরো উঠিতে পারিলাম না এবং কিছু খাইতেও পারিলাম না। দুইদিন এই অবস্থায় থাকিয়া তৃতীয় দিনের দিন আস্তে আস্তে ডেকে যাইয়া বসিলাম। সেদিন কিছু খাইতেও পারিলাম।

আমি যখন আসি তখন অনেকের নিকট হইতে শুনিয়া-ছিলাম যে জাহাজে ব্যবহারের জন্ত একটা কিম্বা দুইটা পোষাক হইলেই হয় কিন্তু সেটা বড় ভুল। অস্ত্রত ৩টা সাদা প্যান্টালুন ও কোট এবং একটা কোনরূপ কাপ বৎএর ছিটের কোট ও প্যান্টালুন চাই। ইহা ছাড়া ৩টা কিম্বা ৪টা টুইলের সার্ট চাই। সার্টগুলির প্লেট ও শক্ত কাফ না থাকাই ভাল। ক্রমশ চতুর্থ দিনেব দিন আমাদের জাহাজ মাদ্রাজ আসিয়া পৌঁছিল। মাদ্রাজে জাহাজ দুইদিন ছাড়িয়া ৮ দিনেব দিন কলোম্বো আসিয়া পৌঁছিল। জাহাজে মিঃ হরটন্ বলিয়া একটা সাহেবেব সহিত আলাপ হইল। তিনি রসায়নী বিজ্ঞা খুব ভাল রকম জানেন। তাঁহার সঙ্গে কেমিস্ট্রী সম্বন্ধে ও ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইত। আমাদের জাহাজ কলম্বোতে ১২ ঘণ্টা থাকিয়া এডেনের (Aden) দিকে রওনা হইল। কলোম্বো ছাড়িয়া ক্রমশ হাওয়াব জোর হইতে লাগিল ও সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ দেখা যাইতে লাগিল। ৩৪ দিন পরে জাহাজ এত দ্রুতিতে লাগিল যে বসিয়া থাকাও কষ্টকর হইয়া উঠিল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সেই প্রকাণ্ড ঢেউগুলি দেখিলে যেমন মনে ভয় হয় সেই সঙ্গে প্রকৃতির অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। খাটবার সময় টেবিলে কাঠের সিংড়ির মতন একবকম পাতিয়া দেয়। পাছে প্লেট ও অন্যান্য জিনিষ টেবিল হইতে পড়িয়া যায়। জাহাজ যখন অতিশয় দ্রুতিতে থাকে তখন এইরূপ দেয়। আমাদের জাহাজেও সেইরূপ দিতে হইয়াছিল। যাহা হউক ভগবানের রূপায় আমাদের জাহাজ এডেনে আসিয়া পৌঁছিল। এডেনে ৮ ঘণ্টা থাকিয়া জাহাজ ৫ দিন বাদে সুয়েজে আসিয়া পৌঁছিল। সুয়েজে ১দিন থাকিয়া ২৪ ঘণ্টা বাদে পোর্টসেড্‌এ আসিয়া পৌঁছিল। সুয়েজ হইতে পোর্ট সেড্‌ আসিতে যে বাস্তবী তাহা অতি মনোরম। তাহাকে ‘সুয়েজ ক্যানাল বলে।’ সুয়েজ ক্যানাল প্রস্থে খুব ছোট। জাহাজ হইতে মনে হয় যে জোবে বাঁপ দিয়া পড়িলে অগিতে পড়া যায়। দুইধারে সুন্দর সুন্দর গাছ, সবুজ ঘাস ও ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি দেখিলে ঠিক মনে হয় যেন আমাদের দেশের কোন পাড়াগাঁর ভিতর দিয়া যাইতেছি। ২০ দিন খালি জল দেখিবার

পর যখন এইরূপ দৃশ্য দেখা যায় তখন মনে যে কি আনন্দ হয় তাহা বলা যায় না। পোর্টসেড্‌এ যখন আমাদের জাহাজ আসিল তখন আমাদের জাহাজের উপর রীতি মত দোকান বসিয়া গেল। কলিকাতায় একটা ছোট বাজার আশুরের দাম ছয় আনা কিন্তু এখানে একসের আশুরের দাম ছয় আনা। পোর্টসেড্‌এ আমাদের জাহাজ একদিন থাকিয়া ৫দিন বাদে জেনোয়া আসিয়া পৌঁছিল। ছেলে-বেলায় গল্পে পরীর বাজ্যেব কথা শোনা যায়। রাত্রে জাহাজ হইতে জেনোয়া সহরটা সেই রকম দেখায়। এ রকম সুন্দর সহর কোথাও দেখি নাই। বড় বড় পাহাড় তাহার উপর স্তরে স্তরে বাড়ীগুলি রহিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ বর্ণের গাছগুলি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিতে বড়ই সুন্দর। জেনোয়াতে দুইদিন থাকিয়া তৃতীয় দিনে আমাদের জাহাজ মার্সেল্‌এব দিকে বওনা হইল। ৩৬ ঘণ্টা বাদে মার্সেল আসিয়া পৌঁছিল। মার্সেল সহরটাও দেখিতে সুন্দর কিন্তু জেনোয়াব মতন অত সুন্দর নহে। মার্সেল হইতেই বিলাতী সহরের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মার্সেলে ২দিন থাকিয়া ১০দিন বাদে আমাদের জাহাজ লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিল, লণ্ডন একটা প্রকাণ্ড সহর। লণ্ডন সম্বন্ধে এত লেখা হইয়াছে যে সে বিষয় আর অধিক কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাট। লণ্ডনে ১০দিন থাকিয়া টিউটনিক্ নামক ষ্টীমারে করিয়া এমেরিকার জন্ত রওনা হইলাম। এই জাহাজের অতি সুন্দর বন্দরবন্দ। ৮দিন বাদে আমাদের জাহাজ New Yorkএ আসিয়া পৌঁছিল। জাহাজ যখন নিউ ইয়র্কএব কাছে আসিল, তখন আমি Statue of Liberty দেখিতে পাইলাম। সমুদ্রের মাঝে প্রকাণ্ড এক মূর্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জগৎকে দেখাই-তেছে যে এই সেই স্বাধীন রাজ্য যেখানে সবাই সমান। New Yorkএ জাহাজ আসিয়া পৌঁছিলে প্রথমে ভাবনা হইল কোথায় যাই। এখানে হোটেল ভরানক ধরচ। ছোট হোটেলগুলোতেও সপ্তাহে ১০ ডলার (অর্থাৎ ৩১০ টাকা) করিয়া দিতে হয়। তাহা ছাড়া নূতন যায়গা, কোথায় কি বকম কিছুই জানা নাই। এখানে India House বলিয়া একটা স্থান আছে। সেখানে যুবকরা আসিয়া উঠিতে পারে এবং তাহাদের উঠা উচিত। ইহা বাঙ্গালী যুবকদের

একটি প্রধান নিবাপদ স্থান। এখানে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়া একটি বাঙ্গালী আছেন। তিনি এই India House-এর Secretary। ইনি বাঙ্গালী যুবকদের জ্ঞাত তাঁহার শরীর মন সমস্ত দিয়াছেন ও দিতেছেন। যখন এখানে আসা যায় তখন মনে হয় যেন কোন আপনার লোকের বাড়ী আসিলাম। গিরীন্দ্র বাবু যে সকল যুবক আসেন তাহাদের সমস্ত বিষয় দেখা এবং তাঁহারা যে কার্যেব জ্ঞাত আসিয়াছেন যাহাতে তাহা সকল হয় তাহার জ্ঞাত প্রণয়ন করেন। ইহার যিনি President তাঁহার নাম Myron Phelps। ইনি যুবকদের জ্ঞাত মাহুয়ের ক্ষমতাতে যাহা হয় তাহা করিতে ক্রটি করেন না। এই বাড়ীটির ভাড়া ও চাকরের মাহিনা ইত্যাদিতে মাসিক ৩০০ টাকা কবিতা লাগে। এই টাকাটা সমস্ত Mr. Phelps ও গিরীন্দ্র বাবুকে দিতে হয়। এই রকম একটি আশ্রয় থাকায় যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এখানে যে কেহ বিপদে পড়িয়া এই বাড়ীতে আসে তাঁহারা তাহাকে স্থান দেন এবং কোন কোন সময় তাঁহাদের খাবার খরচ পর্য্যন্ত দেন। এই রকম একটি বাড়ী থাকা খুব দরকার এবং ইহা রক্ষা করিবার জ্ঞাত যদি কেহ কিছু সাহায্য পাঠান তাহা হইলে তাহা যুবকদেরই সাহায্য করা হইবে। এই নিউ ইয়র্ক সহরটা একটি প্রকাণ্ড সহর। এখানকার লোকেরা দিন রাত ব্যস্ত। এখানকার লোকেরদের দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা কার্য্য কবিতাই জন্মিয়াছে। নিউ ইয়র্ক সহরে কোন ফ্যাক্টরী নাই বটে কিন্তু সহরের কাছেই বড় বড় কারখানা সব আছে। এখানে যদি কোন বাড়ীতে কোন ভদ্র পরিবারের সহিত থাকা যায় তাহা হইলেও মাসে ২২ ডলার করিয়া লাগে। ২০২১ ডলার খাবার খরচ এবং ১ ডলার ধোবা ইত্যাদিতে লাগে। ইহার কম কোন মতেই থাকা যায় না। এখানকার এক ডলার আমাদের ৩০/০। এখানে সমস্ত জিনিষেরই দাম অতিশয় বেশী। একটি সার্ট ধুইতে ১/০ আনা লাগে। এখানকার যাহা বা রাস্তা পরিষ্কার কবে তাহারাও মাসে ১২০ টাকা করিয়া রোজগার করে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে একটি যুবকের পক্ষে থাকিতে ২২ ডলার বা ৬৮ টাকা কিছুই নয়। এখানে

কোন ফ্যাক্টরীতেই বাঙ্গালীদের লইতে চাহে না। অনেক চেষ্টা করিয়া তবে ফ্যাক্টরীতে কার্য্য শিখিতে পারা যায়। ভগবানের রূপায় এবং এখানকার দুইটি ভদ্র বড়লোকের রূপায় নিউ ইয়র্ক সহরের কাছে নিউ জার্সী সহরের একটি ফ্যাক্টরীতে যাইতে পারিয়াছি। আর একটি কথা বলিবার আছে। যখন আসি তখন কি কি জিনিষ লইয়া আসিব এই লইয়া একটি মহা ভাবনা হইয়াছিল। নানা লোকের নিকট নানা প্রকার গুনিয়া কতকগুলি জিনিষ আনিয়াছি যাহার কোন দরকার নাই। সার্জিস্ট, প্যান্টলুন ও কোট চিলা হওয়া চাই। ৪টি সাদা সার্ট, দুইটি ফ্রান্স সার্ট (এখানে সকলেই ছিটের সার্ট ব্যবহার করে, এবং তাহা এখান হইতে কেনাই স্থবিধা)। একটি মোটা ওভার কোট, ৬টি কলার, ৬ খানি রুমাল, একটি পাগড়ী, একটি ছাতা, কামাইবার সরঞ্জাম, একজোড়া বুট জুতা, একজোড়া এলবার্ট শ্লীপার, একটি স্বাট, দুটি সুপীং স্ফট, একটি বেস্ট, এক বোতল নারিকেল তৈল, দুইখানি তোয়ালে, সাবান ৩ বাস, বেঙ্গল কেমিকালের টুথ পাউডার, আরশী, চিরুণী, জুতার ক্রস, চিঠির কাগজ ও খাম, একটি ফাউন্টেন পেন, ৪টি টাই (টাইগুলি চওড়া হইলেই ভাল), ২৪ খানি ভাল বই; একটি ডেসিং গার্ডিন (জাপানী স্তার ডেসিং গার্ডিন হইলেই হইবে), ৪ জোড়া মোজা। আমার মনে হয় এই হইলেই হইবে। এখানে সেন্ট্রাল পার্ক বলিয়া একটি সকলের বেড়াইবার জ্ঞাত বাগান আছে। সেটা প্রকাণ্ড বাগান। লম্বায় ১ মাইলের উপর এবং চওড়ায় অর্দ্ধ মাইলের উপর। তাহাব ভিতর ৩৪টি বড় পুরুষিণী (Lake) আছে। সেই বাগানটার ভিতর রাস্তাগুলি কোথাও উঁচু কোথাও নীচু কোথাও গাছেব ঝোপগুলি সুন্দর ভাবে সাজান, দেখিলে মনে একটি শান্তির ভাব আসে। সেই বাগানের ভিতর একটি মিউজিয়াম আছে। সেখানে নানা রকম ছবি ও নানা দেশের পুরাতন জিনিষ সমস্ত আছে। ইহার পরের দেখাতে সমস্ত খবর দিব।

শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ।

রাজসাহী, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, রঙ্গপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলা লইয়া আধুনিক “রাজসাহী-বিভাগ” গঠিত। তাহাই “উত্তর-বঙ্গ” নামে কথিত হইয়া থাকে। তাহার কিয়দংশ মিথিলার, কিয়দংশ বরেন্দ্রের এবং কিয়দংশ কমতা-বিহাবেব পুরাতন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহা এক সময়ে পৌণ্ড বর্দ্ধনভুক্তি নামেও উল্লিখিত হইত।*

এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে যে সকল হিন্দু-বৌদ্ধ কীর্তিচিহ্ন বর্তমান ছিল, এখনও স্থানে স্থানে তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল পুরাতন ইষ্টকপ্রস্তর-গঠিত অট্টালিকা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াই অধিকাংশ মুসলমান-মসজ্জের নির্মিত হইয়া থাকিবে। ইহা কেবল অমুমানের উপর নির্ভর কবে না। এখনও কোন কোন মসজ্জে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন মসজ্জের পুরাতন দেবস্থানের উপরেই নির্মিত হইয়াছিল। তাহারও নানা নিদর্শন বর্তমান আছে। এ সকল কথা মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে গৌরবের সঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে। যে সকল ইংরাজ-রাজপুত্র পুরাকীর্তির তথ্যসম্বন্ধে করিয়া গিয়াছেন, তাহারা সকলেই এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল কাণ্ডে, উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই হিন্দু-বৌদ্ধকীর্তি অক্ষত অবস্থায় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তোবণ, তন্তু, এবং প্রস্তবমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ মাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃত বিবরণ সংকলনের জন্য কোনরূপ ধারাবাহিক আয়োজন আরম্ভ হয় নাই।*

হিন্দু-বৌদ্ধ-শাসন সময়ের যে সকল কীর্তিচিহ্ন অপেক্ষাকৃত অক্ষতকলেবরে স্বস্থানে বর্তমান আছে, তাহা কেবল দৌর্য্যিকা এবং সর্বোবর। তাহাদের পুরাতন নাম এখনও জনসমাজে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে মালদহের “সাগর দীঘি”, এবং দিনাজপুরের “মহীপাল দীঘি” সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত।

উত্তর-বঙ্গে একপ পুরাতন দীঘি সরোবরের অভাব নাই। কোন কোন সরোবরের সোপানাবলীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে; কিন্তু অধিকাংশ সরোবরেই তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল সরোবর উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ;—তাহাই হিন্দু-বৌদ্ধ-শাসনকালের পরিচয়-বিজ্ঞাপক বলিয়া ঐতিহাসিক-সমাজে সুপরিচিত।†

সরোবরতীরে দেবায়তন নির্মাণ করিবার প্রথা ছিল। তজ্জন্ত সেকালের অধিকাংশ সরোবর তীরেই দেবায়তন দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন তাহা বর্তমান নাই। কেবল কোন কোন সরোবর তীরে মুসলমান-মসজ্জের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা যে পুরাতন দেবায়তনের ইষ্টকপ্রস্তর লইয়াই গঠিত হইয়াছিল, চুই একস্থলে তাহার নিদর্শনও অস্বাভাবিক দেখীপ্যমান।

উত্তরবঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে এইরূপ পুরাতন সরোবর বর্তমান আছে,—জনসমাজে তাহা কোন্ নামে সুপরিচিত,—তাহার সহিত কাহার পুণ্যস্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে,—সুকল স্থলে তাহার বিবরণ সংকলন করিবার উপায় না থাকিলেও, অনেক স্থলে এখনও কিছু কিছু পূর্ববিবরণ সংকলিত হইতে পারে।‡

উত্তরবঙ্গে এই সকল দীঘি-সরোবরের আধিক্য দেখিয়া মনে হয়,—মুসলমান শাসন সময়ে নূতন করিয়া সরোবর খনন করাইবার অধিক প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। এই সকল পুরাতন সরোবর জননিবাসপূর্ণ গ্রাম নগরেই খনিত হইয়াছিল। যেখানেই এরূপ দীঘি সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিকটই—অনেক দূর পর্য্যন্ত—পুরাতন গ্রাম নগর বর্তমান থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার অনেক স্থল এখন নিবিড় বনে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—সেখানে আর জনসমাজের বসতি বর্তমান নাই। কেবল সাঁওতালগণ সম্প্রতি বনভূমি পরিষ্কৃত করিয়া, কৃষিকার্যের সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সকল স্থানেব জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

* মহারাজ তোড়রমঙ্গের “জমা তুমারী”তে সমগ্র বঙ্গদেশ ১৯ সরকারে বিভক্ত হইয়াছিল। তদনুসারে সরকার লক্ষণাবতী, সরকার তাজপুর, সরকার পাঞ্জুরা, সরকার ঘোড়াঘাট, সরকার বার্বাকাবাদ, এবং সরকার বাজুহা মধ্যে উত্তরবঙ্গ অবস্থিত।

† পৌণ্ডের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল পুরাতন দীঘি সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বর্ণনা করিবার সময়ে মিষ্টার রাতেনশা এই কথাই পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

‡ মালদহের “হোমদীঘি” এবং দিনাজপুরের “তর্পণ দীঘি” ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ রূপে উল্লিখিত হইতে পারে।

তথাপি পুরাতন দীঘি-সরোবরের অবস্ফানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সকল শ্রম একেবারে ব্যর্থ হইবাব আশঙ্কা নাই। তাহাতে আর কিছু না হউক, পুরাতন গ্রামনগরের অবস্থান সম্বন্ধে অনেক তথ্য লাভ করা যাইতে পারিবে। ইউরোপের কোন কোন স্থান কালক্রমে সমুদ্রগর্ভে এবং ভূগর্ভে নিহিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বিলুপ্ত তথ্য আবিষ্কৃত করিবার জন্ত এখনও লোকে কত আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে। আমাদেরিগের আবাসস্থলের নিকটে যে সকল পুরাতন গ্রাম নগর এখন বিজ্ঞন বনভূমিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার তথ্যসম্বন্ধান করা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি তাহার জন্ত যথাযোগ্য আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রামনগরের শোভা সম্পাদনের জন্তই এই সকল দীঘি, সরোবর খনিত হইত না। ইহা হইতেই সেকালের বাঙ্গালী স্বাস্থ্য এবং শক্তি লাভ করিত। কেবল কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচন করিবার উদ্দেশ্যেও অধিক সরোবর খনিত হইত না। নদীবহুল উত্তরবঙ্গে অধিকাংশ স্থানেই বর্ষাকালের প্রবলপ্রাবন নৈসর্গিক নিয়মে ভূমি উর্ধ্বরতা সাধন করিত। স্নান তর্পণ এবং পিপাসা শাস্তির জন্তই দীঘি সরোবর খনিত হইত। উত্তরবঙ্গে সকল নদনদী অবস্থাই একরূপ;—তাহা কেবল হিমালয়ের পাদদেশক বহন করিবার জন্তই সমুদ্রভিমুখে ধাবমান! তাহাব জলের উপর নির্ভর কবিত্তা, উত্তরবঙ্গের লোকে স্বাস্থ্য রক্ষা কবিত্তে পারিত না বলিয়াই, দীঘি সরোবর খনন করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবে। এখনও উত্তর বঙ্গে অনেক স্থানে নদনদীর জল ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এখন আর সেকালের মত সুবিস্তৃত সরোবর খনিত হইতেছে না।

গৌড়েশ্বরগণ এবং তাঁহাদিগের রাজ্যরক্ষক রাজন্তবর্গ উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে যে সকল দুর্গ নির্মাণ কবিত্তাছিলেন, তাহার অনেক দুর্গ এখনও স্বস্থানে বর্তমান আছে। তাহাদের মৃৎপ্রাচীরের উপরে বৃক্ষলতা অঙ্গবিস্তার কবিত্তাছে;—পরিখার জল শুষ্ক অথবা শৈবালাকীর্ণ হইয়াছে,—স্থানে স্থানে আধুনিক হলকর্ষণ প্রভাবে দুর্গ-প্রাচীরের কিয়ৎংশ সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।

কোন কোন দুর্গাভ্যন্তরে এখনও পুরাতন অট্টালিকাদি বধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে; এবং তাহাব সহিত কোন না কোনরূপ গ্রাম্য জনশ্রুতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। দুর্গরক্ষার জন্ত দুর্গের বাহিবে অনেকদূর পর্য্যন্ত “জাদাল” নামক মৃৎপ্রাচীর গঠিত হইত। কোন কোন স্থানে তাহাবও যথেষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।* এই সকল “জাদাল” নানা প্রয়োজন সিদ্ধ কবিত্ত;—শত্রুসেনার আক্রমণবেগে প্রতিহত কবিত্ত,—জলপ্রাবন হইতে দুর্গমূল রক্ষা কবিত্ত,—একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের রাজপথ রূপেও ব্যবহৃত হইত। দুর্গের জন্ত স্থান নির্বাচনের এবং “জাদালেব” জন্ত দিগ্দিগন্তেব প্রতি লক্ষ্য কবিলে, এখনও সেকালের সামরিক প্রতিভাব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গের কোন স্থানে কোন পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে, তাহাব তালিকা সংগ্রহ কবিবা মাত্র দেখা যাইবে,—এক সময়ে এদেশেব অধিবাসিবর্গ আত্ম-রক্ষার জন্ত কিরূপ সামরিক আয়োজন কবিত্তে বাধ্য হইত। তাহাব কারণপরিণতি অবস্থাব ছিল না। উত্তরে পার্শ্বত্যা রাজ্য, পূর্বে কামরূপেব অধিকাং, পশ্চিমে মিথিলার পুরাতন জনপদ বর্তমান থাকায়, প্রায় সকল দিক হইতেই উত্তরবঙ্গ পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইত। সত্বেব আত্মরক্ষার জন্তই দুর্গ বচনাং প্রয়োজন উপস্থিত হইত।

যাহাব এইরূপে নিয়ত বাহবলে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইত, তাহাবা রণভীক বা কাপুরুষ বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। যাহাবা এই সকল দুর্গপ্রাচীর বচনা কবিত্তাছিল, তাহাবা বাহবলে মুসলমানের গতিরোধ কবিত্তেও ক্রটি করে নাই। উত্তর বঙ্গের রাজন্তবর্গ তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, অধ্যাপক ব্রহ্মদেব তাহার পরিচয় লিপিবদ্ধ কবিত্তা গিয়াছেন।† মুসলমান-

* বগুড়ার নিকটবর্তী “বহাদুর গড়” ইহার বিশিষ্ট নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। তথ্য এখনও “জাদাল” বর্তমান আছে।

† The Rajahs of Northern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence in spite of the numerous invasions from the time of Bakhtiyar Khilji, when Devkote, near Dinajpur, was looked upon as the most important military station towards the North.—Prof. Blochmann.

লিখিত ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়,—বল্লিয়ার খিলিজি এবং তাঁহার দিগ্বিজয়ী অহুচরবর্গ লক্ষণাবতীর রাজধানী ছাড়িয়া, উত্তর বঙ্গের সেনানিবাসে,—দেব-কোটাই,—অবস্থান করিতে বাধ্য হইতেন। অষ্টাদশ অষ্টারোহীর অলৌকিক দিগ্বিজয় কাহিনীর সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাঁহারা ইতিহাসের অস্পষ্ট ছায়া অবলম্বন করিয়া উপাখ্যান নাটকাদি রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা উত্তর বঙ্গের সকল স্থানেই তাহার পর্যাপ্ত আখ্যানবস্ত্র লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের চেষ্টা সে পথে ধাবিত হইলে, উত্তর বঙ্গের অনেক পুৰাতন দুর্গ বীৰবিক্রমেব লীলাভূমি বলিয়া জনসমাজে সুপরিচিত হইতে পারিবে।

উত্তরবঙ্গ চিরবিপ্লবের লীলানিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। একসময়ে পার্শ্বতা হুনজাতি উত্তর বঙ্গের উপর আপতিত হইয়া অনেক অনর্থ উৎপন্ন করিত। পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় নরপালগণের শাসন সময়েও তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিঙ্গ-সমর, কালী-সমর, কামরূপ-সমর উত্তরবঙ্গের পুৰাতন ইতিহাসের বিচিত্র বীৰত্বকাহিনীতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কখন হিন্দু-বৌদ্ধ-সংঘর্ষ, কখন হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ উত্তরবঙ্গের পুরা-কাহিনীকে রুধিরাস্ত্র করিয়া রাখিয়াছে! তথ্যসম্বন্ধেই অত্যাধিকারের অভাবে তাহার সকল কথাই ক্রমে ক্রমে জনসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে উপযুপরি বিপর্যস্ত হইয়া, মুসলমান শাসনকালের অবসান সময়েও, উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে যে সকল পুরাতন বৌদ্ধকীর্তি অপেক্ষাকৃত অক্ষত কলেবরে স্বস্থানে বর্তমান ছিল, তাহার কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। তাহার যথাযোগ্য আলোচনার অভাবে নানা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবার সুযোগলাভ করিতেছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটি'র প্রসিদ্ধ পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—“ভারতবর্ষের অজ্ঞাত স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের ভাগ্যে যাহা ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষের পূর্বাংশে বৌদ্ধধর্মকে বড়ই নিদারুণ নির্যাতন সহ করিতে হইয়াছিল। এমন কি,—এতদূরও বলা যাইতে

পারে,—প্রাচ্যভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম অগ্নি এবং তরবারি বলেই তাড়িত হইয়া গিয়াছিল।”*

উত্তরবঙ্গের ইতিহাস এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারে না। ইহাই প্রকৃত তথ্য হইলে, উত্তরবঙ্গে কোনরূপ অক্ষত বৌদ্ধকীর্তি বর্তমান থাকিতে পারিত না। পাল-নরপালগণের শাসন সময়ে বৈদিকাচাৰ্যপরাশ্রয় ব্রাহ্মণগণ প্রাধান্যমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন;† হিন্দু ধর্মের পুনঃ সংস্থাপনপরাশ্রয় সেননরপালগণের সময়ে বৌদ্ধ পুরুষোত্তম দেব বাক্সসভায় সমাদর লাভ করিতেন।‡ লক্ষণসেন দেবের তান্ত্রশাসনে যে সকল ভূমির চতুঃসীমা উল্লিখিত আছে, তাহার পার্শ্বেই বৌদ্ধবিহার বর্তমান থাকিবার কথাও উল্লিখিত আছে। ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারিত না।

উত্তরবঙ্গের নানাস্থানের অক্ষত বৌদ্ধমূর্তি, প্রস্তর-চৈত্য, সাধনগুহা “অগ্নি এবং তরবারি” প্রয়োগের আধ্যাত্মিককে অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে পারে। অল্পকাল পূর্বেও দিনাজপুরের অন্তর্গত পত্নীতলা থানার অধিকার মধ্যে এই শ্রেণীব একটি প্রস্তরচৈত্য বর্তমান

* Whatever might have been the fate of Buddhism in other parts of India, in the provinces of Eastern India, it had to suffer serious persecution; nay, it may be said, that Buddhism was expelled from Eastern India by fire and sword.—J. A. S. B. vol. LXIV. P. 55.

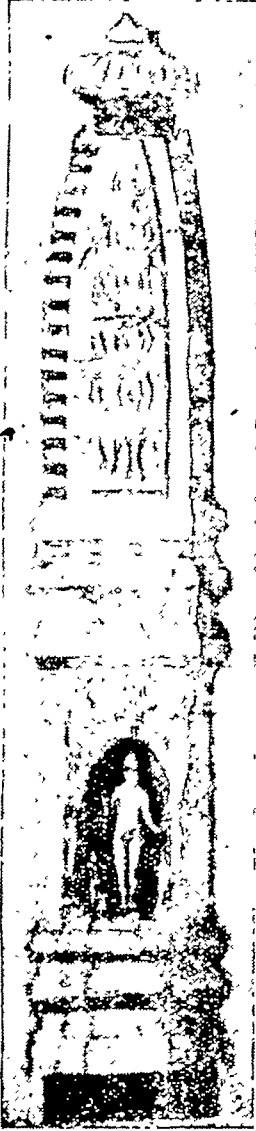
† কেবল উত্তরবঙ্গে কেন, প্রশান্ত মহাসাগরের প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জও বৌদ্ধকীর্তির পার্শ্বদেশেই শৈবকীর্তি,—উভয় কীর্তিই অক্ষতকলেবরে বর্তমান।

‡ ভট্টস্বরের গরুড় ত্তমলিপিতে ইহার অত্রান্ত প্রমাণ বর্তমান আছে।

§ লক্ষণসেন দেবের আজ্ঞায় বৌদ্ধ পুরুষোত্তম দেব পাণিনির লৌকিক হস্তের “ভাষ্যবৃতি” রচনা করিয়াছিলেন; তাহার পঠন পাঠন অল্পদিন পূর্বেও উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছিল।

|| সৌভদ্র লক্ষণসেন দেবের বিজয় রাজ্যের সমুদয়বর্ষের তৃতীয় ভাদ্রমাসে যে তান্ত্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা দিনাজপুরের তর্পণদীপির নিকট আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট কর্তৃক তাহা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহাতে “পূর্বে বুদ্ধ-বিহারী দেবতা” ইত্যাদি লিখিত আছে। মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট তাহার অনুবাদ উপলক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন,—bounded on the East by the eastern ail of the rent free aman and given to the god Buddha-Bihar, which is sown with an arha of seed.

ছিল। দিনাজপুরেব ভূতপূর্ব কালেক্টার মিষ্টার ওয়েষ্ট-মেকট তাহা স্থানান্তরিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাহার চিত্রপটেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে,—“অগ্নি বা তরবারি” তাহাকে স্পর্শ করিবার জন্ত



একবারও চেষ্টা করে নাই; কোনও আকস্মিক কারণে চৈতন্যচূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকিবে, কিন্তু বুদ্ধমূর্তি অক্ষুণ্ণ বহিয়া গিয়াছে! * একপ একটি মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেক জয়না কল্পনা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। উত্তরবঙ্গে এরূপ বৌদ্ধ চৈতন্যের অভাব ছিল না;—যাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা যে “অগ্নি বা তরবারি” বলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ অসম্মানেব অবতারণা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ অত্যাধিক প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই! যাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা বাষ্ট্র-বিপ্লবেব অপবিহার্য্য পরিণাম বলিয়াই উল্লিখিত হইতে পারে।

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব-কালে যে সংঘর্ষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শীঘ্রই সামঞ্জস্যসাধনে শান্তি সংস্থাপিত করিয়াছিল। তাহার পর ভগবান বুদ্ধ নারায়ণের

অবতাররূপে হিন্দুসমাজেও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৌদ্ধ-বিহার শিক্ষা এবং সনাতনের বিজ্ঞানভূমি বলিয়া পরিচিত

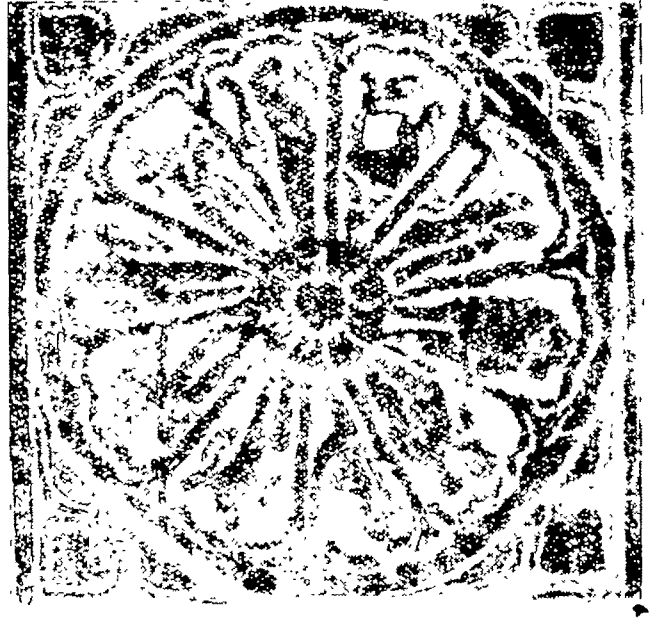
* এই প্রস্তরচৈতন্যের পাদদেশের খোদিত লিপিতে বৌদ্ধবিজয় বিবোধিত; তাহা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্তমান আছে।

ছিল; বৌদ্ধচৈতন্য জনসমাজের নিকট সমাদরের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত; বৌদ্ধমূর্তি শ্রীমদ্রানাবারণ মূর্তি বলিয়াই হিন্দুসমাজেব নমস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বতরাং উত্তর-কালের হিন্দু সমাজেব পক্ষে বৌদ্ধাচার্য্য তাড়িত করিবার জন্ত উত্তরবঙ্গে “অগ্নি বা তরবারি” প্রয়োগেব কারণ উপস্থিত হইতে পারে নাই। উত্তরবঙ্গের কোন স্থানেই তাহাব জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বর্তমান নাই। বৎস সম্বন্ধ-সংস্থাপনের কিছু কিছু পবিচয় অত্যাধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বগুড়া জেলাব অন্তর্গত বেল আমলা নামক গ্রাম হইতে সম্প্রতি এইরূপ পবিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বগুড়ার ডেপুটি কালেক্টার চিরস্নেহাস্পদ শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, তৎসম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের (রঙ্গপুরেব) প্রথম অধিবেশনে পঠিত হইবাব জন্ত প্রেবণ করিয়াছিলেন।

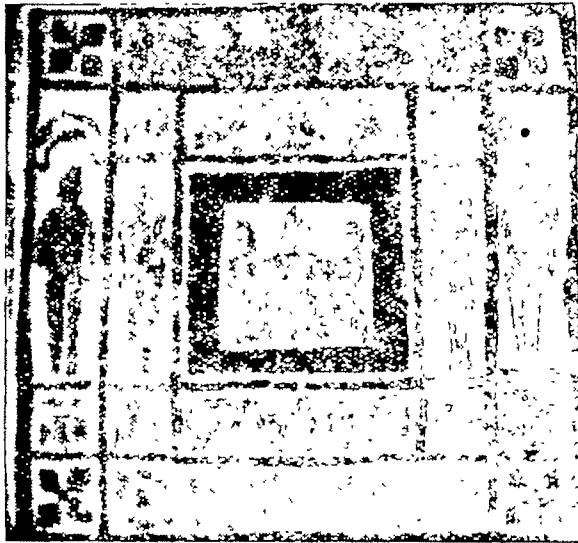
বেল আমলা একটি পুরাতন গ্রাম। তথায় কতকগুলি পুরাতন দেবমন্দির বর্তমান আছে। তাহা সমধিক পুরাতন না হইলেও, অসুসন্মানেব যোগ্য বলিয়া, শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল তথায় উপনীত হইয়া, গ্রামেব মধ্যে একটি পুরাতন চতুর্ভুজা মূর্তির সন্ধান লাভ করেন। এই মূর্তি কোনও পুরাতন মন্দির হইতে আনীত হইয়া, গ্রামের মধ্যে রাখিত হইয়াছিল। মূর্তিটি প্রস্তরগঠিত; তাহাব পাদদেশে পুরাতন অক্ষরের একটি খোদিত লিপি বর্তমান আছে। যতদূর পাঠ করিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয়—“রাজ্ঞী * * শ্রীগীতা তারা” লিখিত আছে। হিন্দুদিগের তারামূর্তির সহিত এই মূর্তির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহা বৌদ্ধ ভাব-মূর্তি। তাহাকে কখন “অগ্নি বা তরবারি” স্পর্শ কবে নাই! গ্রামের নিকটে একটি পুরাতন মন্দির ছিল বলিয়া এখনও জনশ্রুতি বর্তমান আছে। তাহার চিত্রমাণ্ডও বর্তমান নাই। কবে কিরূপ ঘটনাসূত্রে সে মন্দির বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারও তথ্যভাভের আশা নাই। যেখানে মন্দির ছিল, সেখানে এখনও ইষ্টকপ্রস্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় অসুসন্মানকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল একখানি খোদিত প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা প্রায় সমচতুর্কোণ;—তাহার উত্তর পৃষ্ঠেই নানামূর্তি খোদিত আছে।

একপৃষ্ঠে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকোষ্ঠে অঙ্কিত আছে। তাহার প্রধান প্রকোষ্ঠে একটি যোগাসনে উপবিষ্ট, চতুর্ভুজ মূর্তি ;— উপরের দুই হস্তে গদাপদ্ম,—নীচের দুই হস্তে জাম্ববিন্ধ্যস্ত,—দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারা যায়, বুদ্ধ মূর্তির সহিত দুইটি অতিবিক্ত হস্তযোজনা কবিয়া, তাহাকে শ্রীমন্নারায়ণ মূর্তিতে পরিবর্তিত করা হইয়াছে। শ্রীমূর্তির পদতলেব প্রকোষ্ঠে যে সকল বিচিত্র কাককার্য্য খোদিত ছিল, তাহাবই অংশবিশেষ পরিবর্তিত কবিয়া, একটি পঞ্চভুজ মূর্তির আভাস প্রদান কবিবাব চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু উভয় পার্শ্বে বা শীর্ষদেশের প্রকোষ্ঠগুলিঃ অজ্ঞাত খোদিত মূর্তির কোনরূপ পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয় নাই। তাহাতেই এই প্রস্তাব ফলকের



বৌদ্ধকীর্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পাবে নাই। রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

অপর পৃষ্ঠায় একটি দশদল পদ্ম ;— তাহার প্রতি দলে বিষ্ণুব দশাবতারের এক একটি



চিত্র খোদিত করা হইয়াছে। প্রথমে মৎস্য, তাহার পব যথাক্রমে ককি পর্য্যন্ত অজ্ঞাত অবতাব। নৃসিংহ হিবণ্য কশিপুব উদব বিদীর্ণ কবিতেন ;—বামন ছত্রমস্তকে দণ্ডায়মান ;—কুঠারহস্তে পবশুবাম ;—সংগ্রামোচিত পদবিজ্ঞাসে বামচন্দ্র ;—হলফলকধারী বলবাম ;—বোগীবব বুদ্ধ ;—অশ্বাবোহী ককিদেব ;—সকলেই যথাযোগ্য আয়ুধাদিতে শোভা পাই-
তেছেন !

উভয় পৃষ্ঠেব শিল্পকৌশলেব তুলনা করিলে দেগিতে পাওয়া যায়,—দশাবতার অঙ্কনের শিল্পকৌশল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ; বুদ্ধমূর্তির সহিত যে দুই থানি অতিবিক্ত হস্ত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাব শিল্পকৌশলও তদ্রূপ। ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধের স্পষ্ট পবিচয় অভি-

মূর্তি ; দুই দিক হইতে দুইটি হস্তি তাহাব মস্তকে জলসেক করিতেছে। ঠিক এইরূপ একটি চিত্র সাঁচি স্তূপের পূর্বদ্বারেসংযুক্ত আছে। স্তূপের ইহা যে বৌদ্ধ-যুগের কীর্তিচিহ্ন, তাহাতে সংশয় নাই। তাহাকে সম্বন্ধ-যুগে নারায়ণবিগ্রহের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ যথাসাধ্য

ব্যক্ত হইয়া বহিয়াছে। পালনরপালগণের শাসন সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধ সাধিত হইবাব প্রমাণপবম্পবাব অভাব নাই। তাহার মহাভারত পাঠ করা হইয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিতেন ; মহা সামন্তাধিপতির আবেদনে শ্রীমন্নারায়ণ বিগ্রহেব স্থাপনাব জন্ত ভূমিদান করিতেন ;—

এইরূপ নানা প্রমাণ তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাব সহিত “অগ্নি এবং তরবারির” আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য নাই।

দিনাজপুরের অন্তর্গত একটি স্থান এখনও “যোগীশুকা” নামে কথিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত “শুকা,” পালি “কুভা,” উত্তর বঙ্গে “শুকা” নামে পবিচিত ছিল। “যোগী-শুকা” একটি দর্শনীয় স্থান। সেখানে এখনও অর্চনার অভাব উপস্থিত হয় নাই। সেখানেও বুদ্ধমূর্তি নাবায়ণ “চতুর্ভূজ” রূপে পবিবর্তিত হইয়াছে। মায়াদেবীর মূর্তি বর্তমান আছে। ভূগর্ভনিহিত “যোগী-শুকার” এই সকল অক্ষত বৌদ্ধমূর্তি দর্শন করিয়া, মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট তাহাব সাক্ষ্যদান করিয়া গিয়াছেন।* সেখানেও “অগ্নি এবং তরবারি” প্রয়োগেব পবিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খেতলাল নামক স্থানে, থানার নিকটে, মায়াদেবীর মূর্তি এবং অস্ত্রান্ত বৌদ্ধমূর্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকে এখনও তাহার অর্চনা করিয়া থাকে।

উত্তরবঙ্গের অনেক স্থান “পাহাড়পুর” নামে কথিত। রাজসাহীর উত্তরাংশে একটি “পাহাড়পুর” নামক স্থানে এখনও প্রায় একশত ফুট উচ্চ একটি বৌদ্ধস্তূপ বর্তমান আছে। মিষ্টার বুকানন হামিল্টন্ এই স্তূপ পরিদর্শন করিয়া, বহুকাল পূর্বে তাহার সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার যথাযোগ্য অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ হয় নাই।†

* At the curious subterranean place of worship called Jogigupha, I saw stone carvings of undoubted Buddhist origin. On one slab, twenty one inches long, was carved Mayadevi, recumbent, with the baby by her side and attendants round her. With it was a slab, 40 inches long, with a relief of Narayana Chaturbhuj bearing the Shankha, gada, lotus and the disc, showing that the Buddhist carving had been preserved by the votaries of a later religion. The carvings were singularly perfect. In a field near the Thanah of Khetlal, * I saw carvings corresponding curiously with those at Jogigupha. The carvings at Khetlal are four. They are set up in a field as objects of worship.—Westmacott.

† পরম হোমস্পদ শ্রীমান শ্রীরাম মৈত্রেয় আমার উপদেশে নানা ক্রমে এই স্তূপের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার বিবরণ সংকলনেব জন্ত চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপে এক একটি পুরাকীর্তির তথ্যসন্ধানের জন্ত এক এক জন ভাষ্য গ্রহণ করিলে, সহজেই নানা তথ্য সংকলিত হইতে পারে।

উত্তরবঙ্গের হিন্দুদিগেব দ্বাবা বিবিধ বৌদ্ধকীর্তি প্রকারান্তরে স্তব্ধকৃত হইবারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—“অগ্নি বা তরবারি” প্রয়োগে কোনও কীর্তি বিনষ্ট হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আমাদেব লিখিত ইতিহাস বর্তমান না থাকায়, ইতিহাস বচনার ব্যস্ততা আমাদিগকে তথ্যনির্ণয়েব জন্ত অবসর দান করিতে সম্মত হইতেছে না। তাহাতেই আমরা একদেশ-মাত্র পর্যালোচনা কবিয়া যে কোনও সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক তথ্যরূপে প্রচাবিত কবিতোছি। উত্তরবঙ্গের বিবিধ পুরাকীর্তির যথাযোগ্য তথ্যানুসন্ধান ও সমালোচনা সমাপ্ত হইবার পূর্বে, বঙ্গভূমির প্রকৃত পুরাতত্ত্ব সংকলিত হইতে পাবে না। কিন্তু সময় নষ্ট কবিয়া, পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অস্বাস্থ্যকর উত্তরবঙ্গের নিবিড় অরণ্যপথে ভ্রমণক্লেশ সহ করিয়া, নিপুণভাবে তথ্যবিদ্ভাবের জন্ত এখনও অধিক লেখক অগ্রসর হন নাই। বাহারা ইহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই নানা বিশ্বয়-বিজড়িত পুরাতত্ত্বের সন্ধান লাভ কবিয়া, কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

কবি ।

যদি কেউ না শোনে তবু—তবু কবি, তোমার অনুরাগে গেয়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে। তোমার এমন হৃৎস্পর্শ নাইক কোন—নিজের কুঁড়ের দ্বারে বসে’ নিজেই গাহ, নিজেই তাহা শোন। নেহাইৎ ধাবাপ সে গান নহে—যদি তোমার নিজের

ভালো লাগে।

উষাব রাগে সন্ধ্যা-রাগে মিলিয়ে একটি মধুর স্বপ্ন বোনো ;—তোমার নিশীথ-নিদ্রাখানি আলোকিত কর্কে তাহার আলো। কেন মুচ, অলসভাবে দিনেব দীপ্ত গ্রহরঞ্জলি গোণো ? গাহো। গাহো কবি, অন্তের লাগে কিষা নাইবা লাগে ভালো। আরও—যে সম্পত্তি তুমি নিয়ে কবি, এসেছ এ ভাবে—গাইতে যদি নাহি চাহো অভিমানে, গাইতে তবু হ’বে !

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

প্রাথমিক শিক্ষা।

আমাদের দেশেব লোকেরদের মধ্যে যে সমস্ত ব্যবধান আছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে। শিক্ষিতে অশিক্ষিতে যে কেবল সমবেদনা নাই তাহা নহে অনেক জায়গায় তাহাব ঠিক উল্টাভাব আছে। দুঃখের বিষয় এই যে এ ব্যবধানটা আমবা নিজেবাই গড়িয়া তুলিয়াছি। যে শিক্ষা অল্প দেশে মিলনেব সেতু বন্ধন কবে কপালগুণে আমাদের কাছে তাহাই বিঘোষেব হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এতদিন ইহা একরকম চাপাই ছিল, এবাবে বন্ধছেদের আন্দোলন উপলক্ষ্যে অশিক্ষিতদের ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া আমাদের চেতনা হইয়াছে, আমরা বুঝিয়াছি ইহার। যদি আমাদের পশ্চাতে থাকিত তাহা হইলে গভর্নমেন্ট এত সহজে আমাদের উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। দেশের প্রকৃত শক্তি যে কোথায় তাহা জানিতে পারিয়া আমরা অবসাদের মধ্যেও একটি আনন্দলাভ করিয়াছি।

কাজেই এখন শিক্ষিত অশিক্ষিতের মিলনেব দিকে কাহারো কাহারো দৃষ্টি পড়িয়াছে। যে যে উপায়ে এই মিলন সাধিত হইতে পারে তাহার মধ্যে একটি প্রধান উপায় যে শিক্ষার বিস্তার তাহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিবেন না।

এই শিক্ষার প্রসাব যে আমাদের সমাজে কত সঙ্কীর্ণ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য Statistics খুঁজিয়া অল্পদেশের সঙ্গে তুলনাব অপেক্ষা রাখে না। একবার দেশেব প্রতি চোখ মেলিয়া তাকাইলেই বোঝা যায়। ইহার জন্য আমরা সাধারণতঃ গবর্নমেন্টকে দোষ দিয়া থাকি কিন্তু বিদেশী গভর্নমেন্ট তাহার নিজেব আঁচড়াই বাধিবার দিকে যে বেশী মজব দিবে ইহা কিছু বিচিন্ন নয়। এ অবস্থায় তারা যা কবে তাই যথেষ্ট।

গভর্নমেন্টকে দোষ দেবার সময় স্বতঃই আমাদের নিজের দিকে একবার দৃষ্টিটা পড়ে। তখন দেখি আমবাও কিছুই করিতছি না, কাজে কিছু করা দূরে থাকুক চিন্তাও করি না। যুরোপেদিন দিন শিক্ষার নব নব প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে আর আমাদের প্রাচীন শুক মহাশয়েরা সেই মাঙ্কাতার আমল হইতে একই বাঁধা নিয়মে শিক্ষা দিতেছেন।

এইখানে বলা আবশ্যক যে আমি কেবল 'প্রাথমিক' শিক্ষা সম্বন্ধেই কিছু বলিব; কারণ উচ্চশিক্ষার গোড়ার পত্তন এইখানেই হইয়া থাকে।

পাঠশালার কথা বলিতে গেলে আমাদের মনে যে স্বতির উদয় হয় তাহা খুব সুখকর নহে। এমন কি কাহারো কাহারো হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

পাঠশালার এইরূপ বিভীষিকাব কারণ হইতেছে প্রাচীন শুক মহাশয়েরা। ছেলেদের অজ্ঞানতা দূর করিবার পক্ষে লাঠিকেই তাঁহারা একমাত্র ঔষধ বলিয়া জ্ঞানেন। আমাদের দেশেব শিক্ষার যদি কোনো সংস্কার করিতে হয় তাহা হইলে সর্বপ্রথমে ইহাদিগকে বিদায় দিতে হইবে। তা না হইলে সবস্বতী কখনো আমাদের শিশুসম্প্রদায়েব প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন না।

কিন্তু এই সমস্ত লোককে বিদায় দিলেইত হইল না! ইহাদের স্থান অধিকার করিবেন কারা? আমাদের সমাজ ত শুকমশায়গিরি কাজকে খুব সম্মানের চক্ষে দেখে না! শিক্ষিত ভদ্রসন্তান কেন এ কাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিবে?

ইহাব ফল আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবার পূজাব ছুটিতে আমাদের গ্রামে নূতন ধরনের একটি শিশু-বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করি। প্রথমে ত শিক্ষক পাওয়াই মুশ্কিল হইল, তারপরে অনেক সাধ্যসাধনার পর একটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান এ কাজে রাতি হইলেন, কিন্তু যেদিন 'বিদ্যালয় খুলিবার কথা সেদিন গুণিলাম যে এই কাজে নিযুক্ত থাকিলে বিবাহেব সময় মেয়ে হ্রস্ব হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহাব আত্মীয়েরা বাঁকিয়া বসিয়াছেন।

এই ত সম্মান! টাকা পয়সার দিক দিয়া দেখিলেও তথৈবচ। সাধারণ গ্রাম্য শিক্ষকের মাসিক আয় উর্ধ্ব সংখ্যা পাঁচ টাকা, তাও নিয়মত আদায় হয় না; খাওয়া আবার নিজের মধ্যে। মনে করিয়া দেখিবেন আমাদের একজন চাকরও ইহা হইতে বেশী উপায় করে।

কাজেই শুক মশায়কে পবিবার প্রতিপালনের জন্য অল্প কাজ করিতে হয়। কেউ দোকানদারি করেন কেউবা ডাকপিয়ন হন, সময়ে সময়ে ছাত্রগণকে শিক্ষক মহাশয়ের এই সমস্ত কাজে সাহায্যও করিতে হয়।

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যিক যে আমাদের মধ্যে যাহারা সহরবাসী তাঁহারা কেহ কেহ আমার কথা-গুলিকে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু যাহারা খাঁটি পল্লীগাঁয়ের লোক তাঁহারা ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন ।

এই ত গেল শিক্ষক সম্বন্ধে । এখন শিক্ষার প্রণালীটা দেখা যাউক । সাধারণতঃ শিক্ষার বিষয় তিনটি বাংলা—লেখা, পড়া ও অঙ্ক । ইহাদের এক একটা করিয়া ধরা যাউক ।

লেখা—প্রথমে একটা তালপাতায় অক্ষরগুলি দাগিয়া দেওয়া হয় এবং ছেলেকে সেই দাগের উপর দিয়া কলম বুলাইয়া লিখিত অক্ষরটি উচ্চারণ করিয়া যাইতে হয় । ইহাকে আমাদের দেশে বলে ‘খাড়া’ লেখা । এইরূপে দাগা পাতার উপর যখন কলম বেশ সহজে চলিতে লাগিল তখন ছেলেকে একটা শাধা পাতায় দেখিয়া দেখিয়া ক, খ লিখিতে হয় । কিছুদিন পরেই অবশ্য না দেখিয়া লিখিতে শেখে । এইটুকু অভ্যাস করিতে এক বৎসর চলিয়া যায় । না দেখিয়া ক, খ, লেখা যখন দুবস্ত হইয়া আসিল তখন বানান ধরানো হয় । একটা পাতায় ক, কা, কি, কী, কু, কু, কে, কৈ, কং, কঃ এইরূপ লেখা থাকে । ছেলেরা এই স্বরগুলিকে অল্প সমস্ত ব্যঞ্জনে যোগ করিয়া লিখিয়া যায় যথা ; খ, ধা, ধি, ধী ; গ, গা, গি, গী ইত্যাদি । এই বানানেও ছয় মাস, তার পরে ফলা । সে ত আরো ভয়ানক জিনিস । সাধারণতঃ যে ব্যঞ্জন-গুলি যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয় সেই গুলিকে লইয়া বানানেরই মত একটা লিষ্ট তৈরি কবা হইয়াছে ; যথা—ক-য়ে র-ফলা কু, খ-য়ে র-ফলা প্রু ; ক-য়ে য-ফলা ক্য, খ-য়ে য-ফলা ধ্য ইত্যাদি । এই ফলা শেষ হইবার পূর্বে ছেলেরা একটুও বাংলা শব্দ লিখিতে শেখে না । ইহাব পব তালপাতা ছাড়িয়া কলাপাতায় নাম লেখা আবশ্যক হয়, যথা ‘কামিনীমোহন সেন’, ‘শশাঙ্ক ভূষণ গুপ্ত’, ইত্যাদি । ফলা এবং নামও একবছরের কমে হয় না । তার পরে ছেলেরা বই দেখিয়া কাগজে হস্ত-লিপি প্রভৃতি লেখে । অন্যান্য তিন বছরের পূর্বে কোনো ছেলে বাংলার একটি সামান্য কথাও লিখিতে বা পড়িতে পারে না ।

পড়া—এই ত গেল লেখার কথা । পড়ায়ও এইরূপ । ক, খ লেখা পাকা হইবার পূর্বে ত পড়া আরম্ভই হয় না । যে

বইগুলি পড়ান হয় সে গুলিকে ছেলের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য কোনো চেষ্টা করা হয় নাই । তারপর বইয়ের মধ্যে এমন সকল শব্দ দেওয়া হইয়াছে যাহার মানে জানিবাব জন্য সময় সময় অভিধানেব পাতা উন্টাইতে হয় । তা ছাড়া কতকগুলি শব্দকে গাঁথিয়া একটা পুরা বাক্যও কবিয়া দেওয়া হয় নাই,—যেন শব্দগুলিকে পৃথক পৃথক পড়িতে পারিলেই সব হইয়া গেল । রামসুন্দর বসাকের ‘বাল্যশিক্ষা’ এবং বিভাসাগর মহাশয়ের ‘বর্ণপরিচয়’ এ দু’খানি বইই ইহার একটা দৃষ্টান্ত ।

গণিত—লেখা এবং পড়া যদি এইরূপ হয় তবে অঙ্কটা কি রকম হয় তা বুঝিতেই পারেন । কিছুমাত্র গুণিতে শিবিবার পূর্বেই ছেলে অল্পাংশ বালকের সঙ্গে ‘নামতা’ ‘কড়াকিয়া’ প্রভৃতি পড়িয়া যায় এবং তোতা পাখীর মত মুখস্থ করে । যে ১, ২ গোণা ছেলেদেব পক্ষে অধিক দরকারী তাহাই পরে আরম্ভ হয় । তারপরে সে গোণাটাও মুখে মুখে হওয়াতে সংখ্যা সম্বন্ধে কোনো সম্যক জ্ঞান হয় না । লিখিবার সুবিধার জন্য একটা অতি কদর্য নিয়ম আমাদের পাঠশালায় প্রচলিত আছে এই যে ১০ এর পর হইতে ১ এর পিঠে ১ এগাব, ১ এর পিঠে ২ বার ইত্যাদি করিয়া গুণিতে শেখান হয় । ইহাতে ছেলেদেব স্থানীয় মান বা local value সম্বন্ধে জ্ঞান হইবার বিশেষ বাধা জন্মায় । আরম্ভই যদি এইরূপ ত পরে কিরূপ হয় বুঝিতেই পারেন । শিক্ষার যতগুলি বিষয় আছে তাব মধ্যে অঙ্কশিক্ষাই বোধ করি সর্বাপেক্ষা দুর্বল । আমাদের পাঠশালাসমূহে ইহার কিরূপ শ্রদ্ধা হয় তাহার উল্লেখ মাত্র কবিশ্যাম । বেশী উদাহরণ দ্বারা প্রবন্ধের আকার বাড়াইতে ইচ্ছা করি না ।

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর কথা আলোচনা করিতে গেলেই নবপ্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর কথা মনে পড়ে । ইহা অতি উৎকৃষ্ট প্রণালী সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমার মনে হয় এখনো কেহ ইহাকে হজম করিয়া আমাদের দেশোপযোগী আকারে খাড়া কবিতে পাবেন নাই । কেবল যে যে জায়গায় যুরোপীয়দের নকল চলে তাহারি অনুকরণ করিয়া বই লিখিয়াছেন মাত্র । তারপব আজকালকার কিণ্ডার গার্টেনের মালমসলা যোগান সাধারণ পাঠশালায় পক্ষে অসাধ্য এবং ইহার মূলভাবটা হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ গুরু মহাশয়ের

পক্ষে একেবারে অসম্ভব। বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর সমালোচনা অত্যন্ত সংক্ষেপে সাবিল্যম। এক্ষণে আমি যে প্রণালী অনুসরণ করিয়া ক্রিষ্ণ ফললাভ করিয়াছি তাহাব কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় ইহাও যথাসাধ্য সংক্ষেপ করিব।

আজকাল যে সমস্ত বিষয় সাধারণ পাঠশালার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, প্রথমতঃ সেই সমস্ত বিষয় অবলম্বন করিয়াই আমার বক্তব্য বলিব। বাংলা লেখা ও পড়া সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবাব পূর্বে ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে একটা সাধারণ কথা মানিয়া লওয়া আবশ্যক। সেটি এই যে ভাষা শিক্ষাকালে আগে ব্যবহৃত হয় ‘কান’ তাবপরে ‘জিব’ পরে ‘চক্ষু’ এবং সর্বশেষে ‘হাত’। এটি যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী তাহা বোধ হয় আপনারা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমি অন্ততঃ এটিকে ভাষা শিক্ষার মূলমন্ত্র বলিয়া গণ্য করি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া কান ও জিবের কাজটা কথাবার্তার দ্বারা আপনা আপনিই হইয়া আসে। কাজেই বাংলা শিক্ষাটা আবশ্য করিতে হইবে ‘চক্ষু’ দিয়া। এইখানেই বর্তমান প্রণালীব বিরুদ্ধে আমার প্রথম নম্বরের নালিশ। ইহাতে হাতের কাজ চোখের আগেই হইয়া থাকে অর্থাৎ অক্ষর চেনার আগেই লেখা আবশ্য হয়। প্রথমে পড়া আবশ্য কবিত্তে হইলে আগে অক্ষর চেনা দরকার, কিন্তু এই অক্ষর চেনা ব্যাপারটা যে অত্যন্ত নীরস! ইহাকে একটু সরস করিয়া তুলিবাব জন্ত আমি এটাকে খেলার আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছি। শিক্ষক এবং ছাত্রের হাতে এক জোড়া করিয়া বর্ণমালার তাস থাকিবে, শিক্ষক তাহার তাস হইতে একখানি লইয়া ছাত্রের সামনে রাখিবেন এবং তাহাব অনুসরণ তাস খানি ছাত্রকে বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিতে বলিবেন। ছাত্র যদি ঠিক তাসখানি বাহির করিতে পারিল তবে তাব জিত হইল আর তা না পাবিলে আবাব চেষ্টা করিতে দেওয়া যাইবে। এইরূপে যখন আশ্বে আশ্বে অক্ষরগুলির চেহারা মাথায় এক রকম বসিয়া গেল তখন অক্ষরের নাম শেখানো যাইতে পারে। এই প্রণালীতে আমি অল্প সময়ের মধ্যেই সহজে ছেলের অক্ষর পরিচয় হইতে দেখিয়াছি। অক্ষর পরিচয় হবার পব বই ধরাইতে হইবে। আশ্চর্য্য যতগুলি বই দেখিয়াছি তাহার মধ্যে রামানন্দ বাবুর বর্ণপরিচয়কেই

সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বাছিয়া লইয়াছি। ছঃখের বিষয় আমাদের পূর্ববঙ্গ রামানন্দব বসাকের এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মায়া এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়াই আজ কাল ছেলেরা বিজ্ঞান-রীডার নামক এক কিছুত-কিমাকার বই ধরে, তাহাতে না হয় বিজ্ঞান শিক্ষা—কারণ বিজ্ঞানকে বইয়ের জিনিস করিয়া তুলিলেই তাহাব জ্ঞাত মারা হয়—না হয় ভাষাশিক্ষা। এই সমস্ত পুস্তকেব অভিনব বাংলা অনুসার-মতি বালকদের পক্ষে দস্তখুট করাই কঠিন। আমার মনে হয় বানানটা শেষ হইলেই শাদা-কথায়-লেখা কোনো গল্পের বই ছেলের পড়িতে দেওয়া উচিত। ইহাতে যেমন একদিকে তাহাদের গল্পের তৃষ্ণা মিটিবে তেমনি অন্তর্দিকে জ্বলন্ত ভাষার সঙ্গে পরিচয় সাধন হইতে থাকিবে।

লেখা—লেখা শিখাইবার জন্ত আমি বাংলা বর্ণমালার আকার সাদৃশ্য অনুসারে কয়েকটা শ্রেণী তৈরি করিয়া লইয়াছি যথা—‘ব’ শ্রেণী—ইহাতে ব, র, ক, খ, ঙ, ঞ এই কয়টি প্রায় একই চেহারার অক্ষর আছে। ইহাদের একটিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই আর সবগুলি লেখা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। এই প্রণালী অনুসারে লেখা শেখাইয়া আমি বেশ কল পাইয়াছি। অক্ষর যখন কিছু কিছু লিখিতে শিখিল তখন হইতেই ছোট খাট শব্দ লিখিতে দেওয়া উচিত। ক্রমে ক্রমে বানান ও ফলা আনিয়া যোগ করিতে হইবে।

তার পরে গণিত। গণিত সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে দৃষ্টতা মাত্র; তবু প্রবন্ধের অঙ্গহানির আশঙ্কায় দুই এক কথা বলিতে হয়। এ সম্বন্ধে বর্তমান প্রণালীর বিরুদ্ধে আমার প্রধান অভিযোগ এই যে ইহাতে গণিত ব্যাপারটাকে অত্যন্ত abstract অর্থাৎ জড় পদার্থের সহিত সম্বন্ধ হীন কবিত্তা তোলা হয়। বস্তুবিষয়ের সঙ্গে না মিলাইয়া আমরা যে কোনো জ্ঞান লাভ করি তাহাই অসম্পূর্ণ। গণিত শিক্ষাকে যদি কার্যকরী করিতে হয় তাহা হইলে ইহাকে ইঞ্জিয় গ্রাহ বস্তুর সাহায্যে আয়ত্ত করিতে হইবে।

আমার নিয়মে ছেলেরা বকুলবীচি, বাঁশ, বটপাতা প্রভৃতির সাহায্যে গুণিতে শেখে—তার পরে উহাদের সাহায্যে ছোট ছোট যোগ বিয়োগ শেখে। ক্রমে অধিক

সংখ্যার যোগ বিয়োগে অগ্রসব হয়। ইহার পর স্থানীয় মানটা বোঝাইয়া লেখা ধরাইয়া দি।

অঙ্ক সম্বন্ধে আর কিছু বলিয়া আপনাদেব বিরক্তি উৎপাদন করিব না।

আজকালকার পাঠশালার লেখা, পড়া এবং গণিত ছাড়া আর কোনো বিষয়ই শেখানো হয় না। কিন্তু অস্ত্রান্ত্র সভ্য-দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে কিছু কিছু বিজ্ঞান, ইতিহাস ভূগোলও স্থান পাইয়াছে। ইহাতে তাহাদের শিশুরা কেবল যে জড় ভাবে মুগ্ধ করে তাহা নহে, নিজের চোখ কান বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বাধীন ভাবে খাটাইতে পায়। আমাদের এখানেও তাহাই করা উচিত, কিন্তু গোড়ায় যে গলদ! সে শিক্ষক কোথায় যিনি স্বদেশেতিহাসের সম্ভাবমূর্ত্তি ছেলেদের সম্মুখে ধরিবেন, যিনি আমাদের দৃষ্টমান জগতের উপরে বিজ্ঞানের আলোক নিক্ষেপ করিবেন—যিনি গিরি নদী কানন সমুদ্র অধিষ্ঠিত এই বস্তুজগতকে শিশুদের চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত কবিতা দিবেন? এরকম শিক্ষক হ্রদ্বত বটে কিন্তু সম্পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এই সব অত্যাশঙ্কক জিনিসকে ত বাদ দেওয়া চলে না। এই ভাবিয়াই আমি আমার বিদ্যালয়ে যথাসাধ্য একটু বিজ্ঞানের স্থান করিয়া দিয়াছি এবং ভবিষ্যতে ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা দিবারও আশা রাখি।

বিলাতে নৈতিক শিক্ষা বলিয়া একটা ব্যাপার প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেও সে জিনিসটা ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতেছে, তবে এখনো পাঠশালা পর্যন্ত গিয়া পৌঁছায় নাই। যদি পাঠশালাব মধ্যেও ইহার স্থান কবিতো হয় তবে যেন ইহাকে অন্ত জায়গাব মত নীরস করিয়া তোলা না হয়, আমাদের দেশের অক্ষয় ভাণ্ডার রামায়ণ ও মহাভারতের ভিতর দিয়া ছেলেরা যেন গল্পের মাধুর্য্য, সাহিত্যের রস এবং নৈতিক শিক্ষা একই সঙ্গে উপভোগ কবিতো পারে।

এতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের শিশুসম্প্রদায়কেই সামনে রাখিয়া আমার বক্তব্য বলিয়াছি। কিন্তু অশিক্ষিত বলিতে কেবল ত শিশু বোঝায় না। আমাদের দেশের অধিক বয়স্ক মেয়ে পুরুষও ত অনেকেই অশিক্ষিত, তাদের ত আর পাঠশালায় যাবার সময় নাই, তাদের ব্যবস্থা কি হইবে?

আমার মনে হয় অধিক বয়স্ক পুরুষদের জন্ত নাইট-স্কুল

স্থাপন করা দরকার। যদিও এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট ও ক্রীশ্চিয়ান পাণ্ডীবা কিছু কিছু কাজ করিতেছেন বটে, তবুও এত বড় দেশের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। এদিকে সমাজের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

আমাদের সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সাধারণ পাঠশালার ক্রীশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব। কাজেই বাড়ীতে বসিয়া যাতে তাঁরা কিছু শিখিতে পারেন তার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু সকল পবিবারেই ত শেখাবাব মত লোক থাকে না এবং সকলেই ত মাহিনা করিয়া ক্রীশিক্ষক রাখিতে পারে না।

আমার মনে হয় এই সব স্থলে অন্ততঃ ভদ্রপল্লীসমূহে একটা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। আপনাবা সকলেই জানেন যে আমাদের দেশের ক্রীলোকেরা বাড়ীব কাজ কর্ত্ত সারিয়া অনেক সময়ে একত্র সমবেত হন। এই সময়ে তাঁদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত তাঁরা যদি অথকে কিছু কিছু করিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে কতকটা উপকার হইতে পারে। আমি জানি এইরূপে আমাদের গ্রামের অনেক ক্রীলোক কাজ চালানো রকমের লেখা পড়া শিখিয়াছে। এই কাজে বিধবা ক্রীলোকদের নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহাতে একদিকে যেমন তাঁহাদের কাজে কর্ত্তে অন্তমনস্ক রাখিবে তেমনি অথদিকে মঙ্গলকর্ষের গৌরব তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যকে সার্থক কবিবে।

তবে এইখানে শেষ করি। আমার মোট কথা এই যে বাংলা দেশের শিশুশিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে প্রাচীন গুরু মহাশয়দের স্থলে শিক্ষিত ভদ্র সম্ভানকে বসাইতে হইবে এবং সমাজকেও তাহার অনুকূল হইতে হইবে। শিক্ষা-প্রণালীকে পূর্ব সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া ইহার মধ্যে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, অধিক বয়স্ক মেয়ে পুরুষদের শিক্ষার জন্ত নাইট-স্কুল স্থাপন এবং বিধবাদের নিরোগ করিতে হইবে। এইরূপে শিক্ষাকে বিস্তৃত করিলেই শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যের বিচ্ছেদসমুদ্র আপনাবা আপনাবা বুজিয়া আসিবে এবং বাংলা দেশের হৃদয়ের মঙ্গল দিয়া এমন একটা রাস্তা প্রস্তুত হইবে যাহা ধরিয়া একদিন ‘স্ববাজে’ উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

১। শক্তি প্রয়োগের নূতন ব্যবস্থা।

প্রকৃতির নানা উচ্ছৃঙ্খল শক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ঘরের কাজে লাগানো, আজকাল বিজ্ঞানচর্চার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিছক জ্ঞানোন্নতির ইচ্ছায় অতি অল্প লোকেই বিজ্ঞানচর্চা করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ কয়লা ও কাষ্ঠাদির অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে স্নকোশলে বিদ্যুৎ ও বাষ্প উৎপন্ন করিয়া যে সকল ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার জন্ত এখন আর কয়লা পোড়াইবাব আবশ্যক হয় না। বড় বড় জলপ্রপাত ও পার্শ্বত্যা নদীর দ্বারা কল পাতিয়া চলিযু জলের শক্তিতে কলে বিদ্যুৎ উৎপাদিত করা হইতেছে, এবং শত শত মাইল দূরবর্তী সহবগুলির কলকংরখানার কাজ সেই বিদ্যুতেব শক্তিতে চলিতেছে। আমাদের দেশেও কাম্বীর ও মালদা অঞ্চলের দুইটি জলপ্রপাতকে ঐ প্রকারে শৃঙ্খলিত করিয়া কাজে লাগাইবার জন্ত আয়োজন হইতেছে। পবনদেব বহুকাল হইতেই নিগডবদ্ধ হইয়া বহিয়াছেন। নৌ-চালন ও ছোট-খাটো কলের পরিচালনা অতি প্রাচীন কাল হইতে বায়ু দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বায়ু জিনিসটার গতিবিধি এত অনিশ্চিত যে, ছোটখাটো দুই একটা কাজ ছাড়া বৃহৎ ব্যাপারে ইহাকে লাগাইবার সুব্যবস্থা আজও উদ্ভাবিত হয় নাই।

সূর্যের তাপ ও জোয়ার ভাঁটার জলোচ্ছ্বাসে যে বিশাল শক্তি নিহিত আছে, আজ কাল তাহারি প্রতি বৈজ্ঞানিক-দিগেব দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাপ ও আলোকের আকার পরিগ্রহ করিয়া যে শক্তি সূর্য হইতে পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হয়, তাহার অতি অল্পই সংসারের কাজে লাগে। ইহার অধিকাংশই পৃথিবী মহাশূন্যে বিকিরণ করিয়া নষ্ট কবে মাত্র। চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রের যে জলোচ্ছ্বাস হয়, তাহারো শক্তি নদ নদীর জলে আলোড়ন উপস্থিত করিয়া ও তীব্রভূমিকে অনাবশ্যক ভাঙিয়া চুরিয়া বুখা ক্ষয় প্রাপ্ত করে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির এই দুটা কাজে খরচ

কমাইয়া, উদ্ভূত শক্তিকে আমাদের ঘরের কাজে লাগাইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন।

এ চেষ্টা একবারে নূতন নয়। আমরা বাল্যকাল হইতেই সূর্যের তাপে কারখানা চালাইবার কথা শুনিয়া আসিতেছি, এবং এই শক্তি প্রয়োগের সুবিধা অসুবিধার কথাও বৈজ্ঞানিকদিগের মুখে অনেক শুনিয়াছি; কিন্তু এপর্যন্ত কোন সর্বাঙ্গসুন্দর যন্ত্রের উদ্ভাবন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ যোবী মহাশয়ের ভাবুতাপ যন্ত্র অনেকেরই পরিচিত। সম্প্রতি একখানি মার্কিন বৈজ্ঞানিক পত্রে (Scientific American) যে এক সুন্দর সৌরতাপ চালিত যন্ত্রের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আশা করা যাইতেছে, হয় ত বৈজ্ঞানিকগণ শীঘ্রই সূর্যের বিশাল তাপরাশির কিয়দংশ যন্ত্রায়ত্ত করিয়া কাজে লাগাইতে পারিবেন।

নিম্নপৃষ্ঠ দর্পণ (Concave Mirror) এবং স্থূলমধ্য কাচ খণ্ডের (Convex lens) কার্য পাঠক অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। তাপ বা আলোকের রশ্মিজাল ইহাদের উপরে পড়িলেই, সেগুলি প্রতিফলিত বা বিবর্তিত (Refracted) হইয়া এক সংকীর্ণ স্থানে জড় হয়। যে তাপালোক সমগ্র দর্পণখানি জুড়িয়াছিল, এই ব্যবস্থায় তাহার প্রায় সকলি স্বল্পপরিসর স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া পড়ায়, তাপ ও আলোক উভয়েরই প্রাথম্য বাড়িয়া যায়।

বড় বড় দর্পণ সাহায্যে পূর্কোক্ত প্রকারে সূর্যের তাপ পুঞ্জীভূত করিয়া কল চালাইবার জন্ত বৈজ্ঞানিকগণ এপর্যন্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। অধিক তাপ পাইতে হইলে, দর্পণকেও খুব বড় করা আবশ্যক, এবং দর্পণ বড় করিতে থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাব নির্মাণ ব্যয়ও খুব বাড়িয়া যায়। হিসাবে দেখা গিয়াছিল, দর্পণ সাহায্যে সূর্য্যতাপ সংগ্রহ করিয়া কল চালাইতে যে খরচ পড়ে, কয়লা দ্বারা সেই কল চালাইলে খরচটা তাহা অপেক্ষা অনেক কম হয়। কাজেই বৈজ্ঞানিকগণ হতাশ হইয়া সূর্য্যতাপ সংগ্রহের এই পদ্ধতিটিকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সৌরতাপ সংগ্রহের যে নব পদ্ধতির কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে ঐ প্রকার বহুমূল্য বৃহৎ দর্পণের আবশ্যক হয় না, এবং সাক্ষরজ্ঞানের খরচও অতি অল্প

লাগে। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, কেবল কাচ দ্বারা আচ্ছাদিত বায়ুকে দিকে সূর্যালোক ফেলিলে, তাপ ও আলোক স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া অনায়াসে বায়ু প্রবেশ করে, এবং তাহাতে ভিতরের বায়ু বেশ গরম হইয়া উঠে। কিন্তু এই গরম বায়ু যখন নিজের তাপ বিকিরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই সকল তাপরশ্মি কাচের বাধা ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পারে না। কাচ ও সৌর-তাপের এই সম্বন্ধটি অতি সুপরিচিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গাছপালা শীতের দেশে জন্মে না। কারণ ইহাদের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষা অল্প যে পরিমাণ উষ্ণতার আবশ্যক শীত-প্রধান দেশে তাহা পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উদ্ভিদকে শীতের দেশে জীবিত রাখিতে হইলে, উহাকে কাচের ঘরের ভিতর আবদ্ধ রাখা হয়, এবং মাঝে মাঝে তাহার ভিতর সূর্যের তাপ ও আলোক প্রবেশ করানো হয়। এই ব্যবস্থায় সূর্যতাপ কাচের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আব বাহির হইতে পারে না। কাজেই ঘরের বাতাস গরম থাকিয়া যায়—এবং গাছগুলিও সুস্থ থাকে।

সূর্যতাপ সংগ্রহের মার্কিনপদ্ধতিটি কাচ ও সূর্যতাপের পূর্বোক্ত ধর্মাবলম্বনে উদ্ভাবিত হইয়াছে। ফিলাডেল্ ফিয়া'য় ইহাব যে পরীক্ষা হইয়া গেছে, তাহাতে পরীক্ষক কেবল কাচ-ফলকদ্বারা একটি নাতি উচ্চ বৃহৎ বায়ু প্রস্তুত করিয়া তাহারি ভিতরে পূর্বোক্ত প্রকারে সূর্যতাপ সংগ্রহ করিতে আবশ্য করিয়াছিলেন। বায়ুর ভিতরে ইথরপূর্ণ বড় বড় নল কুণ্ডলিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, এবং বাহাতে আবদ্ধ সূর্যতাপ সহজে শোষণ করিয়া নলের ইথর বাষ্পীভূত হইয়া পড়ে, তাহার অল্প নলগুলির উপরে কালো রঙের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল। অতি অল্পক্ষণের অল্প বায়ুটিকে সূর্যালোকে উত্তপ্ত রাখার পর নলের ইথর ফুটিয়া এত বাষ্প উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, সাড়ে তিন ঘোড়ার জোরের* একটি কল উহার বলে সবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

* ইংরাজি "Horse-power" কে "ঘোড়ার জোর" বলিতেছি। এই কথাটিকে পাঠক অথের ভারবহনশক্তি না বুঝেন। প্রায় চারিশত মণ ওজনের জিনিসকে এক মিনিট সমস্ত ভূমি হইতে এক ফুট উর্ধ্বে উঠাইতে যে শক্তির আবশ্যক হয়, তাহাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় Horse-power বলে।

বহুকালের চেষ্টা ও চিন্তার ফলে কলে সূর্যতাপপ্রযোগের পূর্বোক্ত উপায়টির সম্ভাবনা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু জোয়ার ভাটার শক্তি গার্হস্থ্য কার্যে লাগাইবার চেষ্টা সম্পূর্ণ আধুনিক এবং ইহাতে যতটুকু সাফল্য লাভ করা গিয়াছে, তাহার গৌরব আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগেবই প্রাপ্য। যান্ত্রবিজ্ঞানে মার্কিনেবা আম্রকাল যে প্রকাব কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়। কিন্তু জোয়ার ভাটার শক্তিকে যন্ত্রায়ত্ত করার ব্যাপাবে জার্মান বৈজ্ঞানিকেরাই অগ্রণী হইয়াছেন। এলব নদীর সম্মুখস্থানে ইতিমধ্যেই ইহার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পেইন্ নামক জনৈক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই কার্যের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, অতি শীঘ্রই কেবল জোয়ার ভাটার শক্তির দ্বারা জার্মানির বড় বড় সহরের ট্রামগাড়ি ও বিদ্যুতের কল চলিবে। অর্থের অভাব হয় নাই। আরম্ভকার্যেব সাফল্য অবশ্যস্বাভাবী জানিয়া নিশ্চিন্ত চিন্তে সকলে অর্থদান করিতেছে।

জার্মানির উৎসাহ দেখিয়া ইটালির কয়েকজন বৈজ্ঞানিক জোয়ার ভাটার শক্তিকে ব্যবহারোপযোগী করিবার আয়োজন করিতেছেন। ভূ-মধ্যসাগরে জোয়ার ভাটার শক্তি তত প্রবল নয়। এই অল্প শক্তি দ্বারাও কল চালাইয়া ইহার সাফল্য পাইয়াছেন। ইটালীর বৈজ্ঞানিকদিগের যন্ত্রটি একেবারে জটিলতাবর্জিত। তীর হইতে স্ক্রু করিয়া কতকগুলি রেল সমুদ্রগর্ভ পর্যন্ত সাঁজাইয়া রাখা হয়, এবং এই সকল চালু রেলের উপর কতকগুলি গাড়ি সজ্জিত থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গ ও জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস ধাক্কা দিয়া এই গাড়িগুলিকে উপরে উঠাইয়া দেয়, এবং তরঙ্গ সুরিয়া গেলে বা উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে গাড়িগুলি নিজেদের ভারে নিজেসাই নীচে নামিতে আবশ্য করে। ক্রমশঃ বেলের উপরে সজ্জিত গাড়িগুলিতে এই প্রকার উর্দ্ধাধোগতি আপনা হইতেই অবিরাম চলিতে থাকে। ইটালির যান্ত্র-শিল্পিগণ এই গতি দ্বারা পম্প সাহায্যে সমুদ্রজলকে উচ্চ স্থানে উঠাইতেছেন, এবং পরে এই সঞ্চিত জল ছাড়িয়া দিয়া তাহারি নিম্নগমনবেগে যন্ত্রাদি চালাইতেছেন। হিসাবে দেখা গিয়াছে, কয়লা পোড়াইয়া কল চালাইতে যে ব্যয় হয়, এই উপায় অবলম্বন করিলে তদপেক্ষা অনেক অল্প খরচে কল কারখানা চলে।

২। এক নূতন বিভীষিকা ।

মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যত মসীপত্রের অপব্যবহার ও তর্ককোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে, বোধ হয় অপব কোন বিষয়েই সে প্রকার হয় নাই। কাবণ যে তত্ত্ব যত হ্রস্বগম্য তাহাকে অবলম্বন করিয়া ততই অযথা বাক্যব্যয় করা মানুষের একটা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। বলা বাহুল্য ইহাতে মূল জিনিসটাকে কোন ক্রমেই চেনা যায় না, বরং শত শত বিবোধী মতবাদের কুহেলিকা চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে অস্পষ্ট করিয়া তোলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাব মর্মস্থানে পৌছিবাব পথটাও হুর্গম হইয়া পড়ে।

“মৃত্যু” ও “পরলোক তত্ত্বের” জায় পৃথিবীর পরিণামটাও আজকাল বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট একটা প্রকাণ্ড তর্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জগতে কোন বস্তুই অবস্থা চিরস্থির নয়। সূতরাং নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া পৃথিবী আজ যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে যে চিরকাল সেখানে থাকিবে না, তাহা আমরা সকলেই বুঝি। জীব যেমন জন্মকাল হইতে পলে পলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, পৃথিবীও সেইপ্রকার প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুপথকে ছোট করিয়া আনিতেছে। মৃত্যু নিশ্চয়। এই মৃত্যু কোন্ বশে দেখা দিয়া এই উদ্ভিদ-প্রাণিময় সম্ভাব পৃথিবীকে নিজীব করিয়া দিবে, তাহাই তর্কের বিষয়। বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞগণ পৃথিবীর নাড়ী টিপিয়া তাহার মৃত্যুদিন ও মৃত্যুব্যাধি এখনি ঠিক কবিয়া রাখিতে চাহিতেছেন।

বৈজ্ঞসঙ্কট হইলে রোগীৰ মৃত্যুপথ পরিষ্কার হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাযাত্রাব মুহূর্তটি পর্য্যন্ত জানা হুসাহ্য হইয়া পড়ে। ভূতত্ত্ববিদ জীবতত্ত্ববিদ রসায়নবিদ ও জ্যোতির্বিদ প্রভৃতি মিলিয়া সত্যই বৈজ্ঞসঙ্কট উপস্থিত কবিয়াছেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিকগণ মৃত্যুকে টানিয়া আনিতে পারিতেছেন না সত্য, কিন্তু মৃত্যুদিন ও মৃত্যুরোগের নির্ণয় ক্রমেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার ধূমকেতুর মুণ্ডপাত, নক্ষত্রের সংঘর্ষণ, জলবায়ুর লোপ, ভূকম্প ও সূর্যের নির্ঝাঁপ প্রভৃতি নানা মৃত্যুব্যাধিৰ উল্লেখ করিয়াও ক্ষান্ত

হন নাই। সম্প্রতি লায়েল নামক জনৈক মার্কিন বৈজ্ঞানিক পৃথিবীকে আর এক নূতন বিভীষিকা দেখাইতেছেন।

ভূ-গোলকের (globe) প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, কর্কট ও মকর ক্রান্তির (Tropics of cancer and capricorn) মধ্যে যে বলয়াকার প্রদেশ আমাদের পৃথিবীকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, তাহাব অনেকটাই অমূল্য ও জীববাসের অমূল্যযোগী। ইহারি বিশেষ বিশেষ অংশ অধিকার করিয়া আরব ও মধ্যএসিয়ার মরুভূমি এবং আবিজোনা ও সাহাবা প্রভৃতি মহামক-অবস্থান করিতেছে। লায়েল সাহেব এই বলয়াকার ভূভাগেব প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, ইহাই পৃথিবীর মৃত্যু চিহ্ন। দৃষ্ট ক্ষত প্রাণিদেহের সূচ্য প্রমাণ স্থান অধিকার করিয়া যেমন ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেহটিকে আচ্ছন্ন কবিয়া ফেলে, ঐ মরুভূমিগুলিও লায়েল সাহেবেব মতে কালক্রমে পৃথিবীর সর্বাঙ্গ অধিকার করিয়া ফেলিবে। ইহারাই পৃথিবীর মৃত্যুর সূচনা করিয়া দিয়াছে, এবং আমাদের অজ্ঞিতে ইহারাই পরিসরযুক্ত হইয়া সংহারকার্যকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। মরুভূমির গ্রাস হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার আর উপায় নাই।

লায়েল সাহেব কিপ্রকারে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন এমন দেখা যাউক। ইনি বলেন, আমেরিকার আরিজোনা মরুপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে গেলে, বড় বড় শাখা প্রশাখা সহ বৃক্ষকাণ্ড ভ্রমণকারী মাত্রেই চোখে পড়ে। হঠাৎ দেখিলে সেগুলিকে সজ্জ্বিম দেখায়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। ইহাদের সকলেই শিলাময়। বহুকাল যুৎপ্রোথিত থাকায় বৃক্ষের কষ্টময় দেহ শিলায় পরিণত হইয়া গেছে। কাজেই বলিতে হয়, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে এই মরুভূমির অধিকাংশই উর্বর ছিল, এবং সেই সময়ে এই সকল মহাতরু জন্মগ্রহণ করিয়া কোন আকস্মিক দৈব উৎপাতে ভূশায়ী ও যুৎপ্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সকল প্রদেশের বর্তমান অমূল্যবততার কারণ অনুসন্ধান করিলে বৃষ্টিহীনতা ব্যতীত অপর কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অজ্ঞা প্রদেশও যে ক্রমে স্বল্প-পরিসর হইয়া মরুর প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে, তাহা এই সকল প্রদেশের প্রাক্তবর্তী ভূভাগ পরীক্ষা করিলে বেশ

বুঝা যায়। ইহাদের নানা অংশে আধুনিক বৃক্ষাদিৰ চিহ্ন ভূগর্ভে বর্তমান রহিয়াছে।

প্রদেশের উচ্চতা লইয়া হিসাব করিলেও মরুভূমির ক্রমপ্রসারণের আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। লায়েল সাহেব দেখাইয়াছেন, আমেরিকার আধুনিক মরুভূমির অন্তর্গত বেসকল স্থানের উচ্চতা দেড় হাজার ফিট মাত্র, এ অঞ্চলে তাহাতে প্রচুর বারিপাত হইত। ভূপ্রোথিত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরীভূত বৃক্ষ অত্মাপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে সেই সকল প্রদেশেবই সাড়ে ছয় হাজার ফুট উচ্চ স্থানে বৃষ্টি হয় না। ইহা যে আকস্মিক ভূবিপ্রবের ফল নয়, তাহা লায়েল সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন। কাজেই বলিতে হয়, যুগযুগান্তর ধরিয়া ভূবায়ু ধীবে ধীবে শুষ্ক হইয়া এখন এপ্রকাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্বের তুলনায় চারি হাজার ফুট উচ্চস্থানেও এখন বারিপাত হইতেছে না।:

লেখক কেবল এক আমেরিকাব এক মরুপ্রদেশ লইয়া পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। পৃথিবীর অপর অংশের মরুভূমি গুলি এই প্রকারে বিস্তারলাভ করিতেছে কি না, সে সম্বন্ধে কোন কথাই শুনা যায় নাই।

৩। বৃহস্পতির অষ্টম উপগ্রহ।

গ্রহরাজ বৃহস্পতির কেবল চারিটি উপগ্রহের সহিতই আমাদের পরিচয় ছিল। আধুনিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের জনক গ্যালিলিয়ো ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বহস্তনির্মিত দূরবীণে ঐ চারিটি উপগ্রহকে সর্বপ্রথমে দেখিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে প্রায় তিনশত বৎসব ধরিয়া জ্যোতিষিগণ বৃহস্পতির অন্তর্য্যের সংখ্যা চারিটি বলিয়াই জানিয়া আসিতেছিলেন। গত ১৮৯২ সালে হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, সুবিখ্যাত আমেরিকান জ্যোতিষী বার্নার্ড সাহেব সেই চারিটি উপগ্রহের নিকটে আব একটি অতি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাইয়াছেন। গণনায় সেটিকে বৃহস্পতির উপগ্রহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। ইহার পর কয়েক বৎসর আব বৃহস্পতি-পরিবাবেব নূতন খবর পাওয়া যায় নাই। আক তিন বৎসর হইল, হঠাৎ একদিন শুনা গিয়াছিল গ্রহরাজের আরো দু'টি নূতন অন্তর্য্যের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। এই ষষ্ঠ ও সপ্তম উপগ্রহের আবিষ্কারও

মার্কিন জ্যোতিষিগণের চেষ্টায় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আমেরিকান জ্যোতিষী পেরিন্ (Perrine) সাহেব লিক্ মানমন্দিরের বৃহৎ দূরবীণেব সাহায্যে উভয়কেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

অষ্টম উপগ্রহটির আবিষ্কারের গোঁবব এবারে ইংলণ্ডেব ভাগ্যে পড়িয়াছে। গ্রীন্ডইচ্চ মানমন্দিরের জ্যোতিষী অধ্যাপক ক্রমেলিন্ (Crommelin) ইহাব আবিষ্কর্তা। গ্যালিলিয়োব চারিটি উপগ্রহ আবিষ্কার হওয়াব পরও তিনটি নূতন ক্ষুদ্র উপগ্রহের সন্ধান পাইয়া, বৃহস্পতির আরো ক্ষুদ্র সহচর আছে বলিয়া আধুনিক জ্যোতিষিগণের মনে হইয়াছিল। এজন্ত কয়েক বৎসব ধরিয়া বৃহস্পতিক্ষেত্র শত শত জ্যোতিষীব লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোতিষিগণ বড় বড় দূরবীণ দ্বারা বৃহস্পতিকে সন্ধান কবিয়া যন্ত্রসংলগ্ন ফটো-গ্রাফের ক্যামেবায় তাহার ছবি উঠাইতেন। কাচফলকে বৃহস্পতি ও তাহার অন্তর্য্যগুলিব ছবি উঠিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেইস্থানের শত শত ছোট বড় নক্ষত্রের চিত্রও অঙ্কিত হইয়া যাইত। চিত্রস্থ বহুজ্যোতিষ্কের মধ্যে কোন্টি নক্ষত্র এবং কোন্টিই বা উপগ্রহ তাহা স্থির করা কঠিন নয়। আকাশের সর্বোংশেব নক্ষত্রগুলিব ফোটোগ্রাফ ছবি প্রত্যেক জ্যোতিষীরই হাতেব গোড়ায় থাকে। এই নক্ষত্রচিত্রের সহিত নূতন নক্ষত্রচিত্র মিলাইয়া দেখিলেই কোন নূতন জ্যোতিষ্ক চিত্রে স্থান পাইয়াছে কি না সহজে ধরা যায়।

গ্রীন্ডইচ্চের জনৈক জ্যোতিষী দূরবীন্ ও ক্যামেরার দ্বারা বৃহস্পতিক্ষেত্রের এক ছবি প্রস্তুত করিয়া, নাক্ত্রিক চিত্রের সহিত তাহাকে মিলাইতে আরম্ভ কবিয়াছিলেন। উভয় চিত্র ঠিক্ মিলিয়া গিয়াছিল, এবং সাতটি উপগ্রহসহ বৃহস্পতিকে চিত্রে সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। কিন্তু একটি অতিক্ষুদ্র নূতন জ্যোতিষ্কের ছবি কাচফলকে কিপ্রকারে মুদ্রিত হইয়া পড়িল, পর্য্যবেক্ষক তাহা স্থির কবিতে পাবেন নাই। এই সময়ে অধ্যাপক ক্রমেলিন্ ছবিখানিকে লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইহাবি পরীক্ষায় ছবিব জ্যোতিষ্কটি যে সত্যই বৃহস্পতির একটি নূতন উপগ্রহ তাহা নিঃসন্দেহে স্থির হইয়া গিয়াছিল।

ক্রমেলিন্ সাহেব প্রথমে মনে কবিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ নূতন জ্যোতিষ্কটি কোন কোইডিট-গ্রহ (Asteroids)

হইবে। এই ক্ষুদ্রকার গ্রন্থগুলি মঙ্গল ও বৃহস্পতির পরি-
ভ্রমণ পথের মধ্যস্থানটি অধিকার করিয়া দলে দলে সূর্যের
চাবিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্রমেশিন সাহেবের এই ভ্রম
শীঘ্রই দূরীভূত হইয়াছিল। তিনি জ্যোতিষ্কেব নূতন গতিবিধি
কয়েক দিন মাত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন, সেটি
সত্যই বৃহস্পতির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

নূতন উপগ্রহটির পবিত্রমণ কালাদি সম্বন্ধে আজও ঠিক
সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আবিষ্কারক মহাশয় বলিতেছেন,
বৃহস্পতির অপর উপগ্রহগুলি যেদিক ধরিয়া গ্রহরাজকে
প্রদক্ষিণ করে এই নূতন জ্যোতিষ্কটি সম্ভবতঃ তাহার বিপরীত
দিক ধরিয়া চলে।

শ্রীকগদানন্দ রায়।

অতুল।

স্তম্ভ-সুধাপায়ী শিশু হাসে 'মা, মা' বলে ;
চুমি'ছে সে মুখ মাতা ভাসি' আঁধি-জলে ।
দার্শনিক হেরি' তাহে কহে—“এ যে ভুল” !
মুগ্ধ কবি কাঁদি কহে—“অতুল, অতুল” !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল।

(১) হাসির কবিতা।

একালে বাঙ্গালা সাহিত্যেব নেতা ইংরেজিনবীসেরা ; কিন্তু
এ কথায় কেহ মনে করিবেন না, যে ইংবেজি শিক্ষিতেরা
সকলেই বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চা করিয়া থাকেন। অতি
অল্পসংখ্যক কয়েক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি দেশেব ভাবায়
গ্রন্থাদি রচনা করিতেছেন বটে, কিন্তু ইংবেজি শিক্ষিত
দলেব মধ্যে পাঠকের সংখ্যা তত অধিক নয়। এখনো
অনেকে মনে করেন যে বাঙ্গালায় পড়িবার মত জিনিস
কিছুই নাই। টোলের পণ্ডিতেরা ত ভাষা সাহিত্য পড়িয়া
কদাপি তাঁহাদের গৌরব নষ্ট করিতেন না ; এখনো করেন
না। নৈষধের কবিত্বশূল শব্দালঙ্কারের ছটা দেখিয়া তাঁহারা
মুগ্ধ থাকেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের যে কবিতায় “অমির

বরিধে” তাহা তাঁহারা স্পর্শও করেন না। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল
নিমাই ঠাকুরের আহ্বানে বাহাদিগকে বলিয়াছেন, “ছেঁড়া
পুখি ফেলে তোবা চলে আয়”, কে তাঁহাদিগকে আজি
শ্রীহর্ষের দময়ন্তী ভুলিয়া মধুসূদনের প্রমীলা দেখিতে বলিবে,
ভ্রমরের কালরূপে মুগ্ধ হইতে বলিবে, এবং চাষার মেয়ে
ক্ষেত্রমণির সতীত্বের পূজা করিতে বলিবে? অত্মদিকে
আবাব বাঁহাবা কিপ্লিং ও মেরী কোরালী প্রভৃতির
অতি অসার অপদার্থ রচনা পড়িতে পারেন, তাঁহারা
যে কেন বক্ষিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের কথাগ্রন্থ পড়েন না,
তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কমলাকান্ত চক্রবর্তী
পদাঘাতে খবরের কাগজে জড়ান অপক্ক কদলীগুলি
একেবারে দূরীভূত হয় নাই বটে ; কিন্তু এখন যে বঙ্গ-
সাহিত্যের দোকানে অনেক সরস ও সুপক্ক ফল পাওয়া
যায়, তাহা দেখাইতেছি। কিন্তু ঘটন্যের দোকানেব
গ্রহরীরা এখনো বুনা নারিকেলের ছোবড়াই কামড়াই-
তেছেন ; এবং এখনো শালের গভীর অর্থের আলোচনার
সভায় “নরহরি শাস্ত্রীর” দল, “মহু হাতে ক'রে”, “পাত্ৰাধাব
তৈল”র ব্যাখ্যার শেষে, “কোরে দেন সুসম্পন্ন পরস্পবেব
শ্রদ্ধা।”

তবেই দাঁড়াইল এই, যে, বাঁহাদের ঘরে কিছু পয়সা
আছে, অথবা পয়সা থরচ করিবার বাতিক আছে, তাঁহারা
কয়েকজন বঙ্গসাহিত্যে গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। একজন
ইংরেজিশিক্ষিত জমীদার একটা বড় মজলিসে আপনাব
গৌরব দেখাইবার জন্ত বলিয়াছিলেন,—“আমি বক্ষিমবাবুর
রচনার একছত্রও পড়ি নাই।” ঘটরাম ডেপুটির মত
বাঁহারা ইংরেজিতে ভারি শায়েক, অর্থাৎ “কেটে জোড়া
দেন”, এখনো তাঁহারা কেবল মাত্র বাঙ্গালা না পড়ার
স্বয়শ্বেব জোরে, ইংরেজিতে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে
চাহেন। যে রূপার পাত্রেব মধুসূদন, দীনবন্ধু, বক্ষিমচন্দ্র
এবং হেমচন্দ্রের রচনা পড়েন নাই, রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্র-
লালের কতকগুলি রচনার সহিত তাঁহারা পরিচিত হইয়াছেন
দেখিয়াছি। তাহার কারণ আছে। যিনি ইংবেজিতে
যত বড় পণ্ডিতই হউন, সামাজিক আমোদ প্রমোদ, হাসি
তামাসাটা আগাগোড়া খাটি ইংরেজিতে চালাইয়া উঠিতে
পারেন না। সামাজিকতার সন্তোগের জন্য প্রেমের গান

কিষ্ণা হাসির গান, বিলাত হইতে আমদানি করা চলে না। এই জন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমবিষয়ক কয়েকটা গান, এবং দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলি নূতন “পালিস্ বষ্টী” লুটিয়া য়াছেন। কিন্তু ঐ গানগুলি ছাড়া কবিষয়ের বচনায় আব কি আছে, তাহা তাঁহারা জানেন না; সম্ভবতঃ ঐ গানগুলিও কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিয়াই তাঁহাদের মজ্জাসি পৌছিয়াছে; ছাপাব অক্ষবে সেগুলি মুদ্রিত দেখেন নাই। বাহাদুর পড়া উচিত তাঁহারা পড়েন না; এই সমালোচনা প্রকাশ করিলেও বে বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক বাড়িবে তাহাও নয়। তবুও চেষ্টা করা মন্দ কি?

(১) সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রতিষ্ঠা হাস্য-বসেব রচনায়। বঙ্গসাহিত্যে সে কালে একালে হাস্য-বসেব যথেষ্ট আদর থাকিলেও অনেক পেচক পণ্ডিতেরা উহা ভাড়াবিব অঙ্গমাত্র মনে কবেন। হাসি যে শারীরিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের অভিব্যক্তি, সে কথা কি কাহাকেও বুঝাইতে হইবে? লবক যথার্থই বলিয়াছেন, যে হাস্যরস (Humour) সাহিত্যব্যঙ্গনের লবণ। যে হাসিতে পারে না সে রাক্ষস। সকল ঝড় তুফান মাথায় করিয়া, যাহার প্রাণ, বদ্যাব মত ভাসিয়া থাকিতে পারে, আমি তাহাকে অসাধারণ মানুষ মনে কবি। যদি কেবল হাসির গানেই দ্বিজেন্দ্রলালের যশ প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবুও কবির প্রতিভা অসাধারণ বলিয়া মনে কবিতাম। সমাজের যে সকল নীচতা এবং ভণ্ডামি দেখিয়া সংস্কারকেবা ছটফট করিয়া উঠেন, কেহ বা রাগ করিয়া গালি দেন, কেহবা গস্তীরভাবে উপদেশ দিতে বসেন, কবি তাহা দেখিয়া কেবল হো হো করিয়া হাসিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে এ বিষয়ে কবি Francis এব উল্লেখটি ঠিক, যে যেখানে গস্তীর বিচার নিষ্ফল হয়, সেখানে তামাসায় বেশি কাজ দেখে।

Ridicule shall frequently prevail

And cut the knot when graver reasons fail.

কবি যখন যৌবনের প্রারম্ভে ইউরোপ হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন, যে দেশবিশেষ পরি-ভ্রমণের দোষে (১) চিরপরিচিত সমাজ তাঁহাকে কাছে ধঁসিতে দিতে চায় না। কেন? মানুষ কি এত নির্ম্মগ, এত ভণ্ড, এত মুর্থ? কবির একটু বাগ হইয়াছিল; তিনি “একধরে”

লিখিয়াছিলেন। যাক্ বইখানি আব মুদ্রিত হয় না। সবল হৃদয়ের রাগটুকু দেখিতে দেখিতে উবিয়া গেল; তিনি শেষে এই অলীম ভণ্ডতা, এবং অমানুষিক নির্ম্মতার দিকে চাহিয়া হো, হো, কবিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার হাসির প্রথম কবিতা Reformed Hindus।

লোকে বলিল হাস কেন? কবি বলিলেন,—

বলিত হাসবনা, হাসি রাখতে চাইত চেপে,—

কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে।

যবে নিরে উড়োতরু শাজীবগ টিকি ধীর নাড়ে;

একটু খানো পোড়ে কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই খাড়ে;

কস্তে এক ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া;

তখন আমি হাসি জোরে, শুষ্ক ভরে, ছেড়ে প্রাণের মায়া।

যিনি নাট্যবচনায় মানবচরিত্রবিব্রমণে যথেষ্ট ক্ষমতা দেখাইতেছেন, কোন ভণ্ডই ধর্ম্মের নামে তাঁহাব চোখে ধূলা দিতে পারে নাই। নবযুগের বঙ্গসাহিত্যের প্রথম অবস্থায় কালীপ্রসন্ন সিংহ অতি সরল গ্রাম্য ভাষার ভণ্ডদের মুখের উপর বলিয়াছিলেন যে তাহারা ভণ্ড। তিনি নির্ভীক পুরুষ ছিলেন বটে; কিন্তু সময়মহাত্ম্যে তাঁহাকে একটু অন্ধকাবে গা ঢাকা দিয়া ছতুম পাঁচা সাজিতে হইয়াছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল নির্ভীক, এবং তাঁহার সেই তেজস্বিতায় বৃথা দস্ত (Bravado) নাই; তিনি সরলস্বভাব—কোন রকম পেঁচালো ভাষায় হুকুল বাধিবার কথা কহেন নাই। চণ্ডীচরণেব দল যখন দেশমাত্ত গীতার দোহাই দিয়া আসরে নামিল, তখন গীতার খাতিরে অনেকে কি বলিবেন, কি না বলিবেন, ভাবিতেছিলেন। কিন্তু কবি যখন দেখিলেন ভণ্ডেরা বৃথা আত্মাভিমানের জ্বালে লোকগুলিকে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং বিশ্বের সকল জ্ঞান “গীতার একটি অধ্যায়ের মধ্যে” আছে বলিয়া টিকি নাড়িতেছে, তখন অতি সহজেই তাহাদের গীতার আবিষ্কার করিয়া ভণ্ডদলকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। দেশের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে মধুসূদনও একবার কলম তুলিয়াছিলেন। কিন্তু “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ”র পবে তিনি আর কিছুই লেখেন নাই।

কবি “একধরে” লিখিয়া দেশের লোককে দৈবাৎ গালি দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যখন দেখিলেন চারিদিকেই ভণ্ডামির ব্যবস্থা, তখন সকল ভণ্ডকে জড় করিয়া কবী অবতারেব কাছে পেশ করিয়া দিলেন। তোমরা ধর্ম্মচর্চা কবিয়া স্বর্গে যাইবে যাও; কিন্তু স্বর্গে যখন বাঘে মেঘে এক

ঘাটে জল ধায়, তখন এ পৃথিবীতে তোমরা ধর্মের নামে দলাদলি বাধাইয়া মাছুয়ে মাছুয়েও এক নদীতে জল ধাইতে দিতে চাও না কেন? ধর্মের মূল যে নরপ্রীতি, তাহা উড়িয়া গিয়া কেবল কিচিরমিচির দেখিয়া, কবি উদার প্রাণে সকলকে কোলাকুলি করিতে আহ্বান করিলেন। কবি বলিতেছেন :—

কদিন সমাজ একঘরের ভয়ে টি কে থাকে?

বিশ্বাস, প্রেম, মনুষ্যত্বই সমাজকে বাধে।

খাওয়া শোবা পরা নিষে কেন ঘুণা ঘৃণা?

সেটা কর বাউ গিয়ে যার যেমন খুসী।

জাতি রাখতে চাও—থাকো এই সত্য ধরি,

ভুলো না ক মনুষ্যত্ব সমাজ ও হরি।

(২) তেজস্বিতা, সরলতা এবং উদারতা যাহার হাসিব

মূলে, তাহার হাসিব কবিতা এবং হাসির গানে দেশের লোক মুগ্ধ হইবেই হইবে। সরল ভাবে সত্য কথা বলিলে এবং সত্য কথা বলিয়া হাসিলে, হাসির উদ্ভিষ্ট ব্যক্তিব প্রাণে একটু ব্যথা লাগিতে পারে। কিন্তু কবির হাসি টুকু ব প্রীতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই বেদনা ভুলিতে পাওয়া যায়। কবির ব্যঙ্গ যে লোক বিশেষের প্রতি প্রযুক্ত নহে কিম্বা কুৎসা রটনার ঘৃণা কার্যে উন্মুখ নহে, সে কথা পরে বলিতেছি।

স্বীকার করি, যে এদেশের (একালের) পণ্ডিত সমাজের প্রতি কবির ছ চাবিটি ব্যঙ্গশর নিক্ষেপ হইয়াছে। তাহাতে কেবল ভাব নাই তাহা দেখাইবার প্রয়োজন আছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে একালের টোলে বিজ্ঞান প্রগাঢ়তা তেমন নাই। স্পষ্টবাদী কবির সমালোচনায় সে কথাটাও স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল। একালের পণ্ডিতেরা ব্যাকরণে কিম্বা জায়শাস্ত্রের অংশ বিশেষে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞানভেদে বড় প্রয়াসী নহেন। বাঙ্গালাদেশের নৃত্যনৃত্যেব মহিমার কথা বলিয়াছি, দোষের কথাও একটা বলিব। বহুকাল হইতে এদেশে নব্য জ্ঞান, নব্য স্মৃতি প্রভৃতির আলোচনা হইয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন জ্ঞান স্মৃতির আলোচনা আদৌ ছিল না। সংস্কৃত বিজ্ঞা অতি সঙ্গীর্ণ ভাবেই ছিল। সোসাইটি হইতে যখন প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ আরম্ভ হয়, তখন বেদগ্রন্থের ত কথাই নাই, প্রাচীনকালের বিখ্যাত স্মৃতির গ্রন্থও বঙ্গদেশে পাওয়া যায় নাই। বেদ যে কি জিনিস, বাঙ্গালার পণ্ডিত তাহা কদাপি জানিতেন না; কিন্তু মুখে বেদের দোহাই দিয়া যে কোন

সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। কবি নির্ভীকতার সহিত বলিয়াছেন, যে কক্ষী অবতাবের দরবারে তর্কালঙ্কারের দল, খনার বচন আবৃত্তি করিয়া বৈদিক বিজ্ঞা জাহির করিয়াছিলেন। যাহারা সংস্কৃত ভিন্ন অল্প কোন সাহিত্য পড়েন না, আশ্চর্যের কথা এই যে তাহারা কোন একখানা কাব্য গ্রন্থও আগাগোড়া ভাল কবিতা পড়েন না। জিজ্ঞাসা করিলেই বলেন, যে আমরা অনারাসে পাঠ লাগাইতে পারি এবং ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারি। ব্যাকরণের জোরে অপঠিত গ্রন্থ বুঝিবার ক্ষমতা আছে, তাহা না হয় স্বীকার করিলাম; কিন্তু বিজ্ঞার অর্থ কি কেবল তাই? পণ্ডিত-বর্গের মধ্যে যাহারা একালের ভাবের সংস্পর্শে আসেন নাই, তাহাদের অনেকেই আমূল মহাভারতখানা যত্ন করিয়া পড়েন নাই; ক্ষুদ্রতর রামায়ণ খানিও নহে। কবির বিজ্ঞপের ফলে যদি পণ্ডিতেরা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রাদি পাঠে মনোযোগী হইলেন, তবে হয় ভাল। তাহা না করিয়া যদি কেবল বলেন, যে “কলিকালের মহাবোরে এবার আমরা গেলাম,” তাহা হইলে ফল কেবল “ক্রন্দন করিতে করিতে নিরাস্ত হওয়া।”

(৩) ধর্মভণ্ডারিগের বিজ্ঞপের দৃষ্টান্তে কবির হাসির গানের মূলে যে সকল বিষয়-বিহীন উচ্চ ভাব আছে সাধারণতঃ তাহাই বলিয়াছি। এখন কবির হাসির গানের ও হাস্যরসের প্রকৃতি এবং বিচিত্রতা আলোচনা করিব। হাসি, আনন্দের হউক, ঘৃণার হউক, বিজ্ঞপের হউক, উহার ছইটি সাধারণ বিভাগ আছে; যথা, নৃশংস হাসি এবং হস্ত হাসি। আমাদের দৃষ্টান্ত এই, যে একালের বঙ্গসাহিত্যে নৃশংস হাসির অভাব নাই। নৃশংস নির্দ্বন্দ্ব নীচ প্রকৃতির লোকেরা পরশ্রীকাতবতার যদি কেবল উচ্চপদকে অপদস্থ হইতে দেখিয়া একটু হাসিয়া মনেব জ্বালা জুড়াইয়া লইত ক্ষতি ছিল না; কিন্তু ভগবান বুদ্ধদেব যাহাকে মহাপাপ বলিয়াছেন, এবং পরবর্তী স্মৃতি গ্রন্থেও যাহা পাতক বলিয়া উক্ত, নরাদমেরা সে পাপ কার্য কবিত্তে কুণ্ঠিত নহে। কুলকামিনীর কলঙ্ক রটনা করিয়া, অথবা কলঙ্কের একটা মিথ্যা কথা পেঁচালো ভাষায় ধ্বনিত করিয়া, যাহারা রসিকতা কবিবার প্রয়াস করে, সেদ্রুপ মহাপাপিষ্ঠেরাও বঙ্গসাহিত্যে অবসিক লেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছে। ঐ পিষাচ-

গুলির উপদ্রবে এক সময়ে ভারতী পত্রিকায় হেঁয়ালি-নাট্য প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেটের মত উহাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন :—“How the Devil jests”। কাজেই পিশাচগুলি এখন ভয়ে নসীরাম পালের আঁতাকুড়ে আপনার নরকে আপনি মুখ লুকাইয়া আছে। কবির স্ত্রপ্রসন্ন হস্তমুখের প্রকাশে পাঠকদিগকে এখন আর তাহাদের মুখ-বিকৃতি দেখিতে হয় না। এখন দৃষ্ট হাসিতেই দেশ ভরিয়া গিয়াছে।

(৪) হস্ত রসেরও প্রকাব ভেদ আছে। যে হাসি স্বাস্থ্যের নির্ধাৎ, যাহা বর্ষার রসপুষ্ট পত্রাবলীর সতেজ শ্রামলতায় প্রতিকলিত শরদিন্দুর মত ভাস্বর, যাহা প্রিয়জন সম্মিলনের আনন্দে স্বতঃ-অভিব্যক্ত, পরিহাস কথার রচনায়ও কবি সেই চিন্ময় হাসির সৃষ্টি করিয়াছেন। যে স্থূলতা-বর্জিত রস—

সম্বোধকাদিও স্বপ্রকাশক চিন্ময়ঃ
বেস্তান্তর স্পর্শ শূন্যে ব্রহ্মস্পন্দ সহোদরঃ

তাহা নাটক এবং কাব্য গ্রন্থেই ফোটে ভাল। তাই, আত্মী—সরলা সহবাসে, কমলমণির চূষন যুদ্ধে, জীবানন্দেই ভোজন বাহুল্যে, মেহের-উন্মিসার সম্মল হান্তে, এবং রাজস্বায় গানে, তাহা বেশি প্রস্ফুট। কবি দীনবন্ধু মিত্র, ‘যমালয়ে জীৱন্ত মানুষের’ কথায়, পুরাতন বদ্বদর্শনের প্রায় ১৬টি পৃষ্ঠা ভরিয়া, এই জ্যোৎস্নাময় হাসি, ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। স্বীকার করি, যে ব্যাকরণের হিসাবে সকল হাসিরই উৎপত্তি, হস্ ধাতু হইতে; কিন্তু এ শ্রেণীর হাসিকে “হাসস্” (চন্দ্র) হইতে উৎপন্ন বলিতে ইচ্ছা কবে। ব্যাকরণের খাতিরে ধাতু বদলাইতে না পারে; কিন্তু এ হাসি স্বতন্ত্র “ধাতের”, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। (১)

(১) একালের পাঠকদিগকে (অবাস্তব হইলেও) প্রাচীন অলঙ্কারের হাসি-বিভাগের একটি তালিকা উপহার দিতেছি,—

- ১—স্মিত—অধরে ঈষৎ প্রকাশিত হাস্যের নাম।
- ২—হসিত—কিঞ্চিৎ লক্ষ্য হইলে হসিত হয়; পুনরপি :—
হসিতস্ত বৃথা হাসো যৌবমোক্তের সম্ভবঃ
- ৩—বিহসিত—“মধুরস্বয় বিহসিতঃ”
- ৪—অবহসিত—“সামস্মিতঃ কস্মৎ অবহসিতঃ”
- ৫—অপহসিত—“অপহসিতঃ সাম্রাজ্যং”
- ৬—অতিহসিত—“বিক্ৰিশ্যাসঃ ভবতি—অতিহসিতঃ”।

পরিহাস অর্থ তামাসা, এবং উপহাস অর্থ ঠাট্টা।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের তানসান, কুম্ভ-রাধিকা, কালরূপ, প্রাণাস্ত, বিদ্যুৎবারের বাববেলা, প্রভৃতি গানগুলি ঐ শ্রেণীর নিরবচ্ছিন্ন জ্যোৎস্নায় বচিত। একটা কিছু-না কথায় হাসি সৃষ্টি করা, বড় শক্ত; কেবল অমিল ও বিসম্বাদী কথার যোজন্য করিলেই হয় না। শুধুই যদি এঁড়ে গরু পিঁজ্বা ভেঙ্গে খেজুর গাছে ওঠে, তাহাতে হয় মাতলামি, না হয় গ্রাম্য রকমের ভাঁড়ামির সৃষ্টি হয়। তানসান-বিক্রমাদিত্য সংবাদের বিসম্বাদী কথা যোজনায় কাব্যকৌশল আছে। উহার সহজ সময়বিভ্রাট টুকুতে বেশি আশ্চর্য্য কিছু নাই। কিন্তু তানসানের শ্রাদ্ধের কথা বলিয়াই কবি যখন লিখিলেন, “অর্থাৎ তাঁর গানেব শ্রাদ্ধ, তাঁর ত হয়ে গেছে কবে; আর তানসান মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন করেই হবে”, তখন গানের আগাগোড়া সব কথাগুলি একটা হাসির মন্তব্যে উড়িয়া গেল; আর কিছুই বহিল না। বহিল কেবল, —কোরসের “তা-ধিন্ তা কি” টুকু। বিদ্যুৎ বেলায় বারবেলায় প্রতিছন্দ্রে যে নূতন স্ব এবং পরিহাসবৈচিত্র্য আছে, তাহা অতি দুর্লভ।

(৫) কবির যে সকল পরিহাস, তীব্রতার জন্ত প্রসিদ্ধ, তাহাতেও দাহের জ্বালা অপেক্ষা জ্যোৎস্নার নীতলতাই অধিক। স্বীকার করি, যে চণ্ডীচরণের দল গীতাব আশীর্বাদে অনেক ঘৃষি ও কাহুটি ভোগ করিয়াছে এবং নন্দলাল বোচাবাকে কবি বিলক্ষণ গলাটপুনির চোটে নাকে খৎ দিয়া লওয়াইয়াছেন; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, যে উহার গানের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া “আর মেরোনা” বলিয়া কবির সহিত ভাব করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে। একেলে হিন্দুর টিকিটি গোপনে পিছনে ঝুলিয়াছিল এবং বিলাত ফেরত পরমানন্দে পা ফাঁক করিয়া সিগারেট টানিতেছিলেন, কবি সেই টিকিটি ধরিয়া টানিয়া এবং ফুৎকারে সিগারেটের ছাইটুকু ডে, বে ও মিটারের মুখে ছড়াইয়া দিয়া যখন হাসিয়া বলিতেছেন,—

শুধু লুটিব একটু মজা শুধু করিব একটু পেয়ার,
শুধু নাটিব একটু, পাখিব একটু,—

তখন কি কেহ রাগ কবিতে পারে? রাগ করে না; বরং ভণ্ডেরা ভণ্ডামি ছাড়ে, বাদরেরা বাদরামি পরিত্যাগ করে।

• অর্থাৎ কিনা “অমন অবস্থায় পড়লে সবাই মত বদলায়।”

(৬) যখন স্বদেশনাথ এবং আনন্দমোহন ভারতসভা স্থাপন করিয়া দেশের মধ্যে একটা নূতন শক্তি জাগাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সে সময়ে ঐ চেষ্টার উপহাসে “ভারত উদ্ধার” রচিত হইয়াছিল। ঐ শ্রেণীর সবস, সত্যেন্দ্র ও তীব্র ব্যঙ্গ, বঙ্গভাষায় হয় ত সেই প্রথম। আমাদের সাহিত্য-সমাজে উহার রচয়িতাব প্রতিভা এবং ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। নির্মাণকৌশল এবং হস্তবসে গ্রন্থখানির সাহিত্যিক মূল্য আছে; কিন্তু ঐ উপহাসের ফলে যে স্বদেশসেবকেব নব উত্তমে বাধা পড়িয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। দেশব্যাপী উদাসীনতা এবং স্বার্থপরতায় যাহারা কোন কাগজে অগ্রসব হইত না, তাহারা উন্টা তাহাদের বিজ্ঞতা দেখাইয়া ঐ ব্যঙ্গ কবিতা আওড়াইত। বিধাতার রূপায় আজিকালিকার দিনে কেহ ঐরূপ গ্রন্থ লিখিলে তাহা পঠিত হইবে কি না সন্দেহ। এ সংসাবে এমন জিনিষ নাই যাহার একটা উপহাসের দিক্ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া যে খুঁজিয়া পাতিয়া উপহাস করিতে হইবে; কিম্বা একটা “সরস” কথা জোগাইলেই, সেই সরস কথাটার খাতিরে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা নয়। সাহিত্যেও সংযমের একটা দিক্ আছে।

স্বিজেন্দ্রলালের হাতে “পেয়েছে দণ্ড, যতেক ভণ্ড, চণ্ডী নন্দ-ইত্যাদি;” কিন্তু স্বদেশপ্রেম তাঁহার কাছে উপহাসের বিষয় নহে। যাহারা আলমতকে উপহাসের হাসির আবরণে লুকাইয়া সহজে বিজ্ঞ নাম পাইতে চাহেন, কবি সে শ্রেণীর লোক নহেন। বরং এই “হোতে পাত্তাম” দল তাঁহার কাছে উপহাসিত। কবি স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন, যে, আপনাদের অসাব্যতা ঢাকিবাব জন্ত অকস্মণ্য অলসেরা—

* ২ বোঝাতে চান হিন্দু ধর্মের অতি সুন্দর মর্ম—
ভীকতাটা আধ্যাত্মিক ও কুড়েমিটা ধর্ম।”

(৭) কবির এক শ্রেণীর গানে হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে হয়। ইবান দেশেব কাজিব ক্ষমতাজ্ঞাপক নির্মম অবজ্ঞায়, খুন্দোজের উৎসবরঙ্গের নিরুপায় অভিনয়ে, ‘আমি যদি’ ও ‘জিজিয়া করে’র পাছকা তাড়নায়, না হাসিয়া নিস্তার নাই বলিয়া হাসি; নহিলে মোগলেব আদর মোগ্লাই কোন্দার মত মিষ্ট নয়। কাঁদা আমাদের স্নানামি বই কি ?

কারণ অশ্রুজলে পদাঘাতকারী চরণরেণুও সিক্ত হয় না। চাচাজিব উক্তি মনুষ্যত্বহীনতার প্রতি স্বার্থ প্রযুক্ত :—

লাধি ধৈর্যে ওরে চাষা,

ববংরে তোর উচিত হাসা :—

যে তোর কথাও মাঝে মাঝে তবু আমার মনে জাগে।

এই মর্মান্তিক হাসি চোখের জলে মিশিয়া যুগপৎ রোদ্র এবং করুণরসের সৃষ্টি কবিতা, “আমাব দেশ” ফুটাইয়া তুলিয়াছে, এবং আশা করি সে গীতি বঙ্গের গৃহে গৃহে স্রষ্টা বৃষ্টি কবিতা তেছে। কবির কর্ণবিমর্দনকাহিনী প্রভৃতি যদি বহু পূর্বে রচিত না থাকিত, তাহা হইলে ‘আমি যদি’ রচনায় সাময়িক উত্তেজনার প্রভাব কল্পিত হইতে পারিত। শিল্পের ‘ডন কার্লস’ সমালোচনায় কার্লসইল্ বলিয়াছিলেন, “Had the character of Posa been drawn 10 years later, it would have been imputed to the French Revolution, and Schiller himself might have been called a Jacobin.” খাঁটি বান্ধালা পাঠকেব জন্ত এ ইংরাজিটুকুর অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

(৮) দেশের অধিকাংশ লোকের মতে সাম দিয়া, বাহবা লইবাব জন্ত, অনেক ক্ষমতাসালী ব্যক্তি হিতকর অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে উপহাস অস্ত্র ধরিয়া থাকেন। কিন্তু স্বিজেন্দ্রলাল লোকশিক্ষক, তিনি অসার যশেব জন্ত লালায়িত নহেন। দেশের সব ভাল, একথা শত্রুতে বলে, এবং পাগলে বলে, স্বদেশপ্রেমিক বলে না। শত্রুব ইচ্ছা বোঙ্গী ঔষধ না খাইয়া মরুক; অথবা কুতূষণে ভূষিত হইয়া সমাজে দশ-জনের কাছে গিয়া উপহাসাস্পদ হউক। স্বদেশপ্রেমিক সাগর ছেঁচিয়া মানিক আনিয়া প্রেমের পাত্রকে ভূষিত করিতে চায়, তাহার হুঃখজর্গতি নাশ করিতে চায়। অলস স্বদেশদ্রোহীরা সহজলভ্য বাহবা লইয়া ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্ত যখন অগ্রসর হয়, এরং উপহাসের নামে মুখ ঘিঁচায়, তখন কবির—“তা, সে হবে কেন ?” শুনিয়াই পলায়ন কবে।

বমণীর উপস্থিতিতে যে সামাজিক পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়, তাহা সম্ভবতঃ শীলোব (১) অভাবে আমাদের মুখসর্কস্ব ব্রহ্মচর্যা ওয়ালাবা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যেখানে মনে থাকে যে পাঠক কেবল পুরুষ, সেখানে ভাষায় সংযম থাকে না। এই জন্তই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারত-

চন্দ্রের রসিকতা শ্রীলতার সীমা অতিক্রম কবিয়াছিল।
দাহুরায়ের বারোয়ারি সভায় পাঁচালি, এবং গৃহস্থের ঘরে
গীত পাঁচালির চেহারা দেখিলেই চিনিতে পারা যায়।

শ্রীলতার কথা উপহাস কবিয়া উড়াইবাব চেষ্টা করিলেই
সুরসিক বলিয়া আপনাকে প্রচাব করা যায় না। প্রাচীন
কালের অলঙ্কারে ব্রীড়া জুগুপ্সাদি ব্যঞ্জক কথার উপর এত
কড়াকড়ি ছিল, যে একালে আমরা তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত
হইয়া যাই। যে সকল নগণ্য লেখক, অবনতির দিনের
জঘন্ড সাহিত্যের মোহাই দিয়া হাসাইবার ক্ষমতার অভাবে
বীভৎসতার অবতারণা করে, তাহাদের কথা লইয়া সময়
নষ্ট করিব না। কবির হাসির গানের ‘জীব উমেদার’;
‘নয়নে নয়নে রাখি’, ‘চাষার প্রেম’, প্রভৃতিতে গ্রাম্যতা,
অবাচকত্ব, প্রভৃতি দোষ আদৌ নাই,—অথচ ঐগুলি
প্রেমবিকৃতির কথা লইয়া পরিহাস। অন্তান্ত হাসির গানের
কথা দুবে থাকুক, এ সকল গানও যে কোন ভঙ্গ্যসমাজে
মহিলাদের সমক্ষে গাহিয়া হাসিতে পারা যায়। হাসির
সাহিত্যের সার্বজন্য প্রসার, দ্বিজেন্দ্রলালের হাতেই হইয়াছে।
— কুচরিত্র বেহায়ারাই প্রায়শঃ জীজ্ঞাতির শ্রীলতার প্রহরী
হইয়া দাঁড়ায়, এবং নদেরচাঁদের মত, জীলোকের মুখে
একটু হাসি পর্য্যন্ত সহ্য কবিতো পাবে না। ইহারাই যে
জীজ্ঞাতির উন্নতির বিবোধী, সকল সংকার্য্যের বিরোধী,
তাহা নসীরাম পাল প্রভৃতির বক্তৃতায় এবং কন্ধ্যী অবতারের
গোড়াদের চিত্রে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

(১) আনন্দ সম্ভোগ আছে, অপবিত্রতা নাই; স্থপিত্ত
আছে—অথচ নীরস কথা নাই; উচ্চ হাস্ত আছে—কিন্তু
গ্রাম্যতা নাই; এমন রচনা বঙ্গসাহিত্যের গৌববের
সামগ্রী। হাসিব পবিত্রতা এবং বিচিহ্নতায়, মানবচরিত্র
বিশ্লেষণের দক্ষতায়, এবং রচনার চতুরতা ও সৌন্দর্য্যে,
দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা ও গান, সাহিত্যে চিবস্থায়ী
হইবে। সাময়িক কথার রঙ্গরসের মত, ইহা হুদিনে নীরস
হইবার সামগ্রী নহে; সাহিত্যে এই হস্তের বস অক্ষয়,
এবং ইহাব উপভোগ অক্ষয়। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(১) Moral cultureকে আমরা নৈতিক সাধনা প্রভৃতি নাম
দিয়া থাকি। পবিত্র পিটকে নির্দিষ্ট “শীল” যখন ঠিক moral culture,
তখন সেই প্রাচীন শব্দই ব্যবহৃত হইক; ইহাতে ভাব প্রকাশ অতি
চমৎকার হয়।

বৈদিক শারদোৎসব ।

গীত্মো হেমন্ত উত নো বসন্তঃ

শরৎ বর্ষা হচিৎ নঃ অশ্ব ।

ভেবামতুনাং শত শারদানাং ॥

নিষাতে এষামন্তয়ে জ্ঞাম ॥

১৩-স-৫-৭-২-৩

কিছু দিন হইতে আমাদের আশ্রমে ঋতুৎসব প্রবর্তিত
হইয়াছে; এবং তত্পলক্ষে আশ্রমবাসী বালকবৃন্দ প্রতি
ঋতুতে কালোচিত অমুষ্ঠানের দ্বারা কিছুক্ষণ বিমল আনন্দ
উপভোগ কবিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে,
পুরাকালে ভারতে কোনরূপ ঋতুৎসব প্রচলিত ছিল কি
না, এবং থাকিলেই বা তাহা কিরূপ ছিল—ইহা জানিবার
জন্ম কাহারো কাহাবো হৃদয়ে কোতুহল উৎপন্ন হয়।
তাঁহাদের সেই কোতুহলকে কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিবার
জন্মই এই প্রবন্ধের অবতারণা। জানি না ইহার দ্বারা
কতদূর অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

সম্প্রতি শারদোৎসবের সময় উপস্থিত হইয়াছে, একান্ত
বর্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা
যাইবে। অন্তান্ত ঋতুর উৎসব সেই সেই ঋতুতেই আলোচনা
করিবার ইচ্ছা থাকিল।

পৌরাণিক সময়ে আমাদের দেশে যে শারদোৎসব
প্রবর্তিত হয়, তাহা আজও চলিয়া আসিতেছে; এবং
বঙ্গদেশে তাহাব যেরূপ প্রভাব আজও দেখা যায়, তাহাতে
ইহা আরও শত শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিবে
বলিয়া আমরা অনায়াসেই মনে কবিতো পারি। আমি
ইহা দুর্গোৎসবের সম্বন্ধে বলিতেছি। শারদোৎসব বলিলেই
‘আমর’ দুর্গোৎসব ভিন্ন আর কিছুই মনে কবি না;
দুর্গোৎসবের প্রভাবে অন্তান্ত পৌরাণিক শারদ উৎসব
হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে।

দুর্গোৎসবকে ছাড়িয়া দিলেও অন্তান্ত আলোচনাবোধ্য
পৌরাণিক শারদ উৎসব আছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের
আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সম্প্রতি আমরা বৈদিক
কালেরই শারদ চিত্র উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিব।

এখানে ঋতু সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া লইতে
হইবে। আমরা আজকাল যে হিসাবে ঋতু গণনা কবিয়া
থাকি, বৈদিককালে সেরূপ ছিল না। আমরা বৈশাখ ও

জ্যৈষ্ঠ মাসকে গ্রীষ্ম ঋতু বলিয়া ব্যবহাব করি, কিন্তু বৈদিক ঋষিরা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসকে গ্রীষ্মঋতু বলিয়া গণ্য করিতেন। অন্ত্যায় ঋতু সম্বন্ধেও এইরূপ। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে উক্ত হইয়াছে :—

“মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসস্তিকাবৃত্ত,
শুক্লশ্চ শুচিশ্চ গ্রীষ্মাবৃত্ত,
নভশ্চ নভস্তশ্চ বার্ষিকাবৃত্ত,
ইবশ্চোজ্জ্বলশ্চ শারদাবৃত্ত,
সহস্চ সহস্রশ্চ হৈমন্তিকাবৃত্ত,
তপশ্চ তপস্তশ্চ শৈশিরাবৃত্ত।”

জৈ-স-৪-৪-১১০

মধু ও মাধব (অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ) বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা ঋতু, আশ্বিন ও কার্তিক শরৎ ঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু, এবং মাঘ ও ফাল্গুন শিশির ঋতু।

অতএব বৈদিককালের শরদ উৎসবের কথা বলিতে হইলে আমাদেরকে সেই সময়ের আশ্বিন ও কার্তিকেরই উৎসব সমূহের উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রত্যেক ঋতুরই এমন একটি বিশেষ বৈচিত্র্য ও আলোকিক প্রভাব আছে, বাহাতে মানব হৃদয় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। মানবসমাজ তাহার সেই সৌন্দর্য-লহবীতে নিমগ্ন হইয়া ও মাধুর্য্যধারায় প্রবাহিত হইয়া ক্রিবিধ বিধানে আনন্দ অমৃতবের জন্ম প্রাপ্ত হয়। আনন্দ না হইলে উৎসব হয় না; প্রতি ঋতুতেই প্রকৃতির সুবিশাল চিত্রফলকে এমন সুন্দর এমন মধুর—এমন হৃদয়স্পর্শী চিত্রসমুদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এবং তাহার প্রভাবে ভুবনেব প্রত্যেক পবমাণু হইতে এমনই এক অভূতপূর্ব আনন্দধারা প্রস্রুত হইতে আরম্ভ করে যে, নয়ন-হৃদয়-শালী মানবসমাজ সঙ্গে সঙ্গেই সেই আনন্দ অমৃতব করিবার জন্ম উৎসবের অনুষ্ঠান না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারে না।

আমরা দেখিতে পাই শারদলক্ষ্মী যখন নিজ পরিবারে পরিবৃত্ত হইয়া প্রকৃতির বিমল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাব সেই রূপচ্ছটায় আকৃষ্ট হইয়া আনন্দোদ্বেলহৃদয়ে বৈদিক ঋষিগণ গাহিয়া উঠিয়াছিলেন :—

“অক্ষিভূতঃখোষিতস্তেব বিপ্রসঙ্গে কনীনিকে ।
আন্তঃস্তে চাদংশঃ নাশ্চিৎ স্বতুনঃ তন্নিবোধত ।

কনকভানি বাসাসি অহতানি নিবোধত ।
অন্নমশ্নাত মুজ্জীত অহং বো জীবনপ্রদঃ ॥
এতা বাচঃ প্রযুক্তান্তে শরদ বজ্রোপদৃশতে ॥”

জৈ, আ, ১-৪-১২।

নয়নরোগ হইতে মুক্তিলাভকারী লোকের জ্ঞান আজ শরৎ-ঋতুর নয়নতারকাঙ্কুর বিশেষরূপে প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তিনি যেন নয়ন যুগলে অঞ্জন প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আব কোনরূপ মলিনতা নাই। (হে শ্রোতৃগণ,) তোমরা অবগত হও, সমস্তই ঋতু—(অর্থাৎ সূর্য্যারম্ভ) সমূহের শক্তিতে সম্পন্ন হইয়াছে। তোমরা দেখ, শরৎ ঋতুর বসনসমূহ নবীন ও কনকসদৃশ! (ঐ দেখ, শরৎ বলিতেছেন—) “তোমরা অন্ন ভোজন কর, (গৃহ) মার্জনা কর, আমি তোমাদের জীবনদাতা, আমি আসিয়াছি।” শরৎকে যেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে এইরূপ বাক্যই প্রচুর হইয়া থাকে।

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বৈদিক ঋষিগণের নিকট অন্ত্যায় ঋতু অপেক্ষা শরৎ ঋতুই সমধিক প্রিয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। এই জন্মই দেবতাদির নিকটে কোন অভীষ্ট সন্তোষ দীর্ঘকালের জন্ম প্রার্থনা করিতে হইলে, তাঁহারা সাধারণত শরতের উল্লেখ করিয়াই প্রার্থনা করিতেন, যেমন “জীবেম শরদঃ শতম্”—আমরা যেন শত শরৎকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকি! শত বৎসব না হইলে শত শরৎ হয় না, এই জন্ম এতাদৃশ স্থলে কালক্রমে শবৎ শবৎ বৎসরবাচী হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু প্রথমাবস্থায় শবৎ শবৎ স্পষ্টত ঋতুকেই বুঝাইত।

বর্ষীয়তম বলিয়া শরৎ শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন বৎসর অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইংরাজী সাহিত্যে Summer প্রভৃতি শব্দও সেইরূপ স্থলবিশেষে গোণভাবে বৎসরকে বুঝাইয়া থাকে।

শরতের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আর অধিক কিছু আলোচনা না করিয়া এখন দেখা যাউক যে, প্রাচীন সময়ে সেই ঋতুতে কিরূপ উৎসব প্রচলিত ছিল।

আশ্বযুক্তী কৰ্ম্ম ।

শারদ লক্ষ্মীর সমাগমে আৰ্য্যগণ প্রথমে যে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাব নাম “আশ্বযুক্তী কৰ্ম্ম”—অর্থাৎ যে কার্য্যকে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা-দিন অনুষ্ঠান করিতে

হয় ।^১ আশ্বযজ্ঞী কশ্মের জন্ত ঔষিরা পুরাতন গৃহকে পুনর্কার আচ্ছাদন করিয়া, লেপন করিয়া, সমান করিয়া নুতন করিতেন ও অলঙ্কৃত করিতেন । সেই দিন গৃহস্থিত সকলেরই বিশেষভাবে স্নান করিবার নিয়ম ছিল । এবং সকলেই শুক্রবসন পরিধান করিতেন । পরিবারবর্গ স্নানান্তে শুক্রবসন পরিধান করিয়া সমবেত হইলে গৃহপতি একটি হোম করিতেন । হোমশেষে গৃহপতি ‘পৃষাতক’ অর্থাৎ একত্র মিশ্রিত ঘৃত ও দুগ্ধের দ্বারা আর একটি হোম করিতেন । হোম সময়ে তিনি বলিতেন :—“যাহা আমার উন রহিয়াছে, তাহা যেন পূর্ণ হয়, এবং যাহা পূর্ণ আছে, তাহা যেন বিশিষ্ট হইয়া না যায় ।^২

পৃষাতক ।

পূর্বে পৃষাতক (একত্র মিশ্রিত ঘৃত-দুগ্ধ) দ্বারা যে হোমের কথা বলা গিয়াছে, তাহা আশ্বিনের পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হইলেও কোন কোন সূত্রকার ইহাকে আশ্বযজ্ঞী কশ্মের অন্তর্গত না করিয়া পৃষাতক নামে পৃথক কশ্ম বলিয়াই নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এবং তাহার প্রণালীও পূর্বোক্ত হইতে বিভিন্ন ।^৩ পারশ্বর গৃহসূত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তদনুসারে জানা যায়, গৃহপতি আশ্বিন পৌর্ণমাসীতে দুগ্ধ দ্বারা চরু প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে দধি মধু ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, অশ্বিন, আশ্বিন পৌর্ণমাসী ও শরৎ এই সকলের হোম করিতেন ; এবং তাহার পর পূর্বের স্তায় পৃষাতক দ্বারা পূর্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিতেন । অনন্তর গৃহপতির অমাত্যগণ অর্থাৎ ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ দধি মধু ঘৃত মিশ্রিত হৃতশেষ সেই পায়স চরুকে কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অবলোকন করিতেন ।^৪ তাহার পর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সেই কার্য সম্পন্ন করা হইত । সেদিন রাত্রিতে বাহুরগুলিকে পৃথক্ না বাঁধিয়া গাভীগণের সহিতই রাখিবার নিয়ম ছিল ।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা ‘কৌমুদী পূর্ণিমা’ বা কোজাগরী পূর্ণিমা নামে আমাদের দেশে সুপ্রসিদ্ধ । আজ কাল

কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে আমরা লক্ষ্মীপূজা করিয়া অক্ষকীড়া করিতে করিতে জাগরণ করি, কিন্তু পুরাকালে ইহার স্থানে অন্য উৎসব প্রচলিত ছিল ।

সীতায়জ্ঞ ।

শবৎকালে অমুঠের অপর কার্যের নাম ‘সীতায়জ্ঞ’ । সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গল-পদ্ধতি । লাঙ্গল-পদ্ধতিতে অমুঠের যজ্ঞের নাম ‘সীতায়জ্ঞ’ । পুরাকালে ত্রীহি ও যব এই দুই শস্যই অতি প্রধানভাবে পরিগণিত হইত । ত্রীহি শবৎকালে ও যব বসন্তকালে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া সীতায়জ্ঞ বৎসরে দুইবার অনুষ্ঠান করিবার নিয়ম ছিল । ইহার অনুকরণে ক্রমশঃ আরও কতকগুলি কৃষিঘটিত উৎসবানুষ্ঠান সমাজমধ্যে প্রচলিত হইয়া পড়ে, যথা ‘হলাভিযোগ’ অর্থাৎ প্রথম কৃষি আরম্ভ করিবার সময় যে যজ্ঞ করা হয় ; ‘প্রবপন যজ্ঞ’—অর্থাৎ ক্ষেত্রে সমস্ত বীজ বপন করা হইয়া গেলে যে যজ্ঞ করা হয় ; ‘প্রণবন যজ্ঞ’—অর্থাৎ শস্ত ছেদনের সময় অমুঠের যজ্ঞ ; ‘খন যজ্ঞ’—অর্থাৎ শস্ত কর্ত্তন করার পর যে স্থানে শস্ত বাধা হয় (থামা), সে স্থানে অমুঠের যজ্ঞ, ও ‘পর্যায়ণ যজ্ঞ’—অর্থাৎ থামার হইতে সর্বতোভাবে শস্ত লইয়া যাইবার পর অমুঠের যজ্ঞ ।^২

• সীতায়জ্ঞ ক্ষেত্রের পূর্ব বা উত্তর দিকে চাষ করা পবিত্র স্থানে অনুষ্ঠিত হইত । ক্ষেত্রের মধ্যেই এই যজ্ঞ করিতে হইত বলিয়া যজ্ঞকারিগণ লক্ষ্য রাখিতেন যে, যাহাতে শস্তের কোন অনিষ্ট না হয় । কখন কখন বা গ্রামের বহির্ভাগে লাঙ্গলচাষ জমির উপরেই সেই যজ্ঞ সম্পাদন করা যাইত । যে স্থানেই সেই যজ্ঞ করা হউক না কেন, তাহাকেই লেপন ও অলঙ্কার দ্বারা অভ্যঙ্গন করিয়া লইতে হইত । এইরূপে যজ্ঞস্থান প্রস্তুত হইলে তত্পরি ত্রীহিমিশ্রিত (বসন্তকালে যবমিশ্রিত) কুশধণ্ডসমূহ বিছাইয়া দিয়া অগ্নি স্থাপন পূর্বক সীতা প্রভৃতির উদ্দেশে হোম করা হইত । সীতার উদ্দেশে যে যে মন্ত্রে আহুতি প্রদান করা যাইত, তাহাব অনুবাদ এইরূপ :—

১ আশ্বলায়ন গৃহসূত্র-২-২-১ ।

২ “ ২২-২-৩, ২-৩-৩ গার্গ্য বৃত্তি দ্রষ্টব্য ।

৩ পারশ্বর গৃহসূত্র ২-১৩ ।

৪ ঋষেদ ৪-২১-১ ।

১ আজকাল হেমন্ত ঋতুতেই প্রচুর পবিমাণে ধান হইয়া থাকে দেখা যায়, কিন্তু পূর্বে তাহা শরৎকালেই যে প্রচুর হইত তাহা বক্ষ্যমান ‘আগ্রবণ’ বিধির দ্বারা ইহা সম্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে ।

২ গোতিল গৃহসূত্র ৪-৪-২৭-৩০ ।

“যাহার সজ্জাবে বৈদিক এবং লৌকিক কৰ্ম্মসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, আমি সেই ইন্দ্রপত্নী সীতাকে আহ্বান করিতেছি; তিনি আমার প্রত্যেক কার্য্যেই অন্ন প্রভৃতি বর্দ্ধনকাবিণী হউন। তিনি জনগণের গো ও অশ্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন; সত্যমধুরভাবিণী সীতা অনলসভাবে জীবগণকে পোষণ করেন। তিনি ধাত্তরাশিশালিনী, উৰ্দ্ধরা ও স্থিবা; আমি তাঁহাকে এই কার্য্যে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমার দুঃখ বিনাশ করুন।”

হোম সমাপ্ত হইলে যজ্ঞকারী স্বয়ং ও পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ চতুর্দিকে অবস্থিত সীতারক্ষকগণকে নমস্কার করিয়া বলিপ্রদান করিতেন, এবং এইরূপে সীতায়জ্ঞের পরিসমাপ্তি হইত।^১

এ পর্য্যন্ত যে কয়টি শারদ অমুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইল, তৎসমুদয়ই যজ্ঞকালে প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যজ্ঞের মধ্যেও কেবল গৃহযজ্ঞ সমূহেই ইহাদের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রৌতযজ্ঞে ইহাদের উল্লেখ নাই, এবং থাকিবার কথাও নহে। কেন না শ্রৌতযজ্ঞসকল হবির্যজ্ঞ ও সোমযজ্ঞ সমূহেই বিধিব্যবহার জন্ত প্রবৃত্ত। মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ ভাগে ঐ সকল যজ্ঞের কোন স্থানাংশ দেখা যায় না। সীতায়জ্ঞ প্রভৃতিতে এরূপ কতকগুলি মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা সংহিতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। রোধ হয় সেই সেই কৰ্ম্মের উৎপত্তির সহিত ঐ সকল অভিনব মন্ত্রও রচিত হইয়া থাকিবে।

আগ্রয়ণ।

বেদের সংহিতা সময়ের শারদ অমুষ্ঠানের মধ্যে একটি মাত্র আমরা জানিতে পারি। ইহার নাম ‘আগ্রয়ণ’। সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক সপ্তবিধ হবির্যজ্ঞের মধ্যে ‘আগ্রয়ণ’, অজ্ঞাতম। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, শ্রৌতযজ্ঞ, গৃহযজ্ঞ, ধর্ম্মযজ্ঞ প্রভৃতি সর্বত্রই ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

আজকাল অগ্রহায়ণ মাসে আমরা যেমন ‘নবান্ন’ নামক উৎসব করিয়া নব অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকি, পুরাকালে ‘আগ্রয়ণও’ তাহাই ছিল। ‘আগ্রয়ণ’ বিধি অমুষ্ঠান করিয়া আর্ঘ্যগণ নব শস্ত্র ভোজন করিতেন। আশ্বলায়ন শ্রৌত-যজ্ঞের গার্গ্যনারায়ণীয় বৃত্তিতে ‘আগ্রয়ণ’ শব্দের এইরূপ

ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইছে:—“অগ্রে অন্নং ভক্ষণং যেন কৰ্ম্মণা ওদাগ্রয়ণম্। প্রথম দ্বিতীয়য়ো হৃদ্বদীর্ঘব্যত্যয়ঃ (২-২-১)।” যে কৰ্ম্মের দ্বারা প্রথমে ভক্ষণ করা যায়, তাহার নাম ‘আগ্রয়ণ’। পারস্কর গৃহ যজ্ঞকার এই আগ্রয়ণকে স্পষ্টত ‘নবপ্রাশন’ শব্দেই উল্লেখ করিয়াছেন (পা-গৃ-সূ-৩-১-১)।^১

ভারতে এখনও একটি নিয়ম কোন কোন স্থানে প্রচলিত দেখা যায় যে, কোন উপাদেয় শস্ত্রাদি উৎপন্ন হইলে প্রথমে তাহা দ্বাৰা শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দু তাহা ব্যবহার করেন না। অগ্রহায়ণ মাসের নবান্ন-শ্রাদ্ধ ইহাও একটি দৃষ্টান্ত। আম একটি উপাদেয় ফল। আম পাকিয়া উঠিলে এখনও পিতৃলোককে উৎসর্গ না করিয়া নিষ্ঠাবান্ হিন্দুবা গ্রহণ করেন না। ইহা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে কোন উপাদেয় অভিনব শস্ত্র উৎপন্ন হইলেই, দেবলোককে প্রথমে উৎসর্গ করা হিন্দুগণের স্বভাব।

‘আগ্রয়ণ’ সম্বন্ধেও তাহাই; নবশস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, দেবলোককে তাহা প্রদান না করিয়া ভোজন করিতে পারা যায় না, তাই তাঁহারা তৎকালের উপাদেয় যব, ত্রীহি ও শ্রামাক দ্বারা বৎসরে তিনবার আগ্রয়ণ অমুষ্ঠান করিতেন।

এখানে আর একটি কথা আছে। বৎসবের মধ্যে কেবল যব, ত্রীহি ও শ্রামাক এই তিনটি শস্ত্রই হইত না আবও বহুবিধ শস্ত্র জন্মিত? সংহিতাগণেব মধ্যেই অনেক শস্ত্রের নাম দেখা যায়। তবে কিজন্ত আর্ঘ্যগণ কেবল ঐ তিনটি শস্ত্রেব দ্বারা আগ্রয়ণ করিতেন? এ সম্বন্ধে তাঁহাও উত্তর কবেন:—

নব শস্ত্রের যজ্ঞে শ্রামাক, ত্রীহি ও যবই অধিকৃত হইয়া থাকে, হোম না করিয়া এই সকল ভোজন করা বিধেয় নহে; আর সমস্ত শস্ত্রের কোন নিয়ম নাই। আগ্রয়ণ না করিলেও তিল-চণক-নৌবারাদি ভোজন করিতে পারা যায়। কেন না ইহাদের হবিঃসম্পাদনোচিত গুণ আছে বলিয়া উক্ত হয় নাই।^২

^১ পারস্কর গৃহ যজ্ঞের অন্যতম ভাষ্যকার কৰ্কচাৰ্য্য বলেন যে, আগ্রয়ণ হইতে “নবপ্রাশন” ভিন্ন, এই জন্যই ইহার অমাবস্তা বা পূর্ণিমা বলিয়া কোন কালের নিয়ম নাই, সাধারণতঃ শুর্য ও বসন্ত কালে করিলেই চলে।

^২ পারস্কর গৃহযজ্ঞ ৩, ১, ১।

যাহাই কেন হউক না, সমস্ত শত্ৰুর মধ্যে শ্রামাক, ব্রীহি, ও যব এই তিনটির দ্বারাই আর্ঘ্যগণ ‘আগ্রয়ণ’ অমুষ্ঠান করিতেন। তাহার মধ্যে বর্ষাকালে শ্রামাক দ্বারা, শরৎকালে ব্রীহির দ্বারা, এবং বসন্তকালে যবেব দ্বারা আগ্রয়ণ হইত।

এই আগ্রয়ণ যাগেব উৎপত্তি সম্বন্ধে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নানাবিধ আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই :—পুরাকালে যাহাবা নবোৎপন্ন ব্রীহি প্রভৃতি ওষধি দ্বারা দেবগণের যাগ না করিয়াই ঐ সমস্ত বস্তু ভোজন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই পরাভব প্রাপ্ত হন। তাহার পর হইতে দেবগণের প্রীতির ও যজ্ঞমানের অপরাধের জন্ত এই আগ্রয়ণ নামক ইষ্টির উৎপত্তি হইল।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১-৩-৫) ইহার উৎপত্তি দুই প্রকার

১) বর্ণিত হইয়াছে :—

প্রথমতঃ, কুবীরকপুলে কহোন বলেন যে, ব্রীহি যন্ত্র প্রভৃতি ওষধিরূপ বস এই ছালোক ও পৃথিবীর দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব এই রসের দ্বারা আমরা দেবগণের হোম কবিতা তাহার পর ইহাকে ভোজন করিব—এইরূপ চিন্তা করা হেতুই লোকে আগ্রয়ণ-ইষ্টিব দ্বারা যাগ কবে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন সময়ে প্রজাপতিপুলে দেব ও অশ্বরগণ পরস্পর স্পর্শ কবিতা উঠেন। তখন অশ্বরসমূহ মানব ও পশুগণের উপভোগ্য ওষধিসমূহে বিষ লেপন করিয়া দেবগণকে অভিভব করিবার জন্ত ইচ্ছা করিলেন। মনুষ্য ও পশু সমূহ তাহা জানিতে পারিয়া ওষধি ভক্ষণ হইতে বিরত হইল, ও অনশন হেতু ক্রমশই অভিজুত হইতে লাগিল।

দেবগণ জানিতে পাইলেন যে, প্রজাসমূহ অনশন হেতু পরাভূত হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, কোন্ উপায়ে এই অশ্বরকৃত উপদ্রবকে নিরস্ত করিতে পারা যায়; পরিশেষে স্থির হইল, যজ্ঞের দ্বারাই তাহা সম্পাদন করিতে হইবে।

কিন্তু সেই যজ্ঞ কাহার হইবে ইহা লইয়া দেবগণের

মধ্যে এক গোলমাল উৎপন্ন হইল। সকলেই বলিতে লাগিলেন—“আমাব হইবে! আমার হইবে!” কিন্তু কিছুই নিষ্পত্তি হইল না। অবশেষে তাঁহারা একটি লক্ষ্য স্থির করিয়া দোড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন, এবং ঠিক হইল যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইহাতে জয় লাভ করিবেন, যজ্ঞ তাঁহারই হইবে।

বাক্ষিতে ইন্দ্র ও অগ্নির জয় লাভ হইল, যজ্ঞের অধিকারী তাঁহারা হইলেন। এমন সময়ে বিশ্বদেবগণ তাঁহাদের অনুগমন করিয়া সেই যজ্ঞের একাংশ লাভ করেন, এবং অন্তান্ত দেবতারও কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়।

অনন্তর দেবগণ সেই যজ্ঞেব দ্বারা ঐ সমস্ত ওষধির দোষ নিরস্ত করিয়া দিলে মানব ও পশু সমূহ পুনর্বার ভোজন করিতে লাগিল।

যে ব্যক্তি এই (আগ্রয়ণ) যজ্ঞের অমুষ্ঠান করে কোন লোকই তাহাব ওষধি সমূহকে বিধের দ্বারা লিপ্ত করিতে পারে না। তাহার মনুষ্যভোজ্য ও পশুভোজ্য উভয়বিধ ওষধিই নীবাগ নিষ্পাদ হইয়া থাকে, প্রজাগণ তাহা উপভোগ করিতে পারে।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই শেষোক্ত বিবরণটি আলোচনা করিলে বুঝা যায় পুরাকালে আগ্রয়ণ-ইষ্টির অমুষ্ঠানকারীরা মনে করিতেন যে তাহাব দ্বারা উপভোজ্য শস্ত সমূহের দোষ সকল নিবারিত হইয়া যায়, এবং তাহা হইলে তাঁহাদের ভোজনে কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে ইন্দ্র ও অগ্নি যজ্ঞকে জয় করিয়াছিলেন, এবং বিশ্বদেব প্রভৃতি দেবতাগণও তাহার অংশ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সেই আগ্রয়ণ-যজ্ঞে ঐ দেবতাগণেরই যাগ কবা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—যদর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসর ওষধীঃ পঞ্চতথ কস্মাদত্ভাভ্যো দেবতাভ্য আগ্রয়ণং নিরূপ্যত ইতি।” তৈ-স-৫-৭-২-৫।

ব্রহ্মবাদিগণ পরস্পর বিচার করিয়া বলিতেছিলেন—যখন অর্ধমাস, মাস, ঋতু ও সংবৎসরই ওষধিসমূহকে পরিপক্ব কবে, তবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ কবিতা অস্ত্র দেবতাগণকে আগ্রয়ণ-ইষ্টিতে হবিঃ প্রদান করা হয় কেন ?

ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে :— ১

কেন না ঐ দেবতাগণই তাহা জয় করিয়াছেন। ২
তাহাদিগকে না দিয়া যদি ঋতুগণকে দেওয়া যায়, তাহা
হইলে দেবতাগণের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। অতএব
দেবতাগণকে আগ্রয়ণ প্রদান করিয়া অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু
ও সংবৎসরকে আহুতি প্রদান করিবে। তাহা হইলে
অর্দ্ধমাস প্রভৃতির প্রীতি সম্পাদন করা হইবে, অথচ
দেবতাগণের কলহ হইবে না।

শারদ লক্ষ্মী আগমনে চতুর্দিক্ ধাতুমঞ্জরীতে উদ্ভাসিত
হইয়া উঠিলে আর্ঘ্যগণ এই আগ্রয়ণ নামক যজ্ঞের বিধান
করিয়া, সর্ব প্রথমে দেবগণকে নব শস্তের নৈবেদ্য প্রদান
করিতেন, ও তাহার পরে স্বয়ং তাহা উপভোগ করিতেন।
তাহাদের শারদ উৎসব এইরূপেই পরিসমাপ্ত হইত।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য,
বোলপুর।

য়ুরোপীয় রাজার অত্যাচার।

বেলজিয়মের রাজা লিয়োপোল্ড কঙ্গো “স্বাধীন” রাজ্যে
রবার সংগ্রহের জন্ত তদৈশীয় কৃষ্ণকায়-মনুষ্যদিগের প্রতি
যে কুরুপ অমানুষিক অত্যাচার করেন তাহাই সাধারণের
গোচর করিবার জন্ত আমেরিকার প্রসিদ্ধ লেখক মার্ক
টোয়েন একখানি ব্যঙ্গ-পুস্তক রচনা করিয়াছেন।* এই
পুস্তকে রাজার যে সকল রোমহর্ষণ অত্যাচারকাহিনী
বিবৃত হইয়াছে তদপেক্ষা নৃশংসতা জগতে কোনো দেশে
কোনো কালে অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

কঙ্গো রাজ্যে লিয়োপোল্ডের ক্ষমতা অবাধ; স্ততরাং
যথেষ্টাচারিতার ইয়ত্তা নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই রাজ্যে
কোনো নিয়ম প্রবর্তিত বা প্রত্যাহার করিতে পারেন।
এমন কি তাহাব ইচ্ছা মাঝেই মানবেব অতি সামান্য

অধিকার পর্যন্ত অপহৃত হইতে পারে। তিনি সভ্যতালব্ধ
সাম্যভাব ও দয়াধর্মকে উপহাস করেন, লোকনিন্দাকে
অগ্রাহ্য করেন, তিনি একদৃষ্টে অদম্য। তাহার কুড়ি
বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে কঙ্গোরাজ্যের লোকসংখ্যা ২
কোটি ৫০ লক্ষ হইতে কমিয়া ১ কোটি ৫০ লক্ষ হইয়াছে।
এই এক কোটি জীবননাশের কারণ রাজারই অমানুষিক
অত্যাচার।

তিনি কৃষ্ণকায়দিগের নিকট হইতে নানা রকমে এত
অধিক কর আদায় করেন যে প্রজাবৃন্দ অনাহারে মরিতে
বাধ্য হয়। এই কর প্রদান করিতে তাহাদিগকে অতি কঠিন
নিয়মে বাধ্য হইয়া রবার সংগ্রহ করিয়া দিতে হয়, এবং
সরকারি কর্মচারীদিগের জন্ত বিনামূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া
দিতে হয়। এবং ইহার ফলে এই হয় যে যখন অনাহার,
পীড়া, হতাশা, এবং অবিশ্রাম অত্যধিক কঠিন শ্রম তাহা-
দিগকে নিরুৎসাহ ও শ্রান্ত করে, তখন তাহারা শাস্তি
হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত গৃহ ছাড়িয়া বনে পলায়ন
করে; কিন্তু তাহাতেও তাহাদের নিষ্কৃতি নাই, সৈন্তদল
তাহাদিগকে তাড়া করিয়া বধ করে, গ্রামকে গ্রাম জালাইয়া
দেয়, যুবতীদিগকে অপহরণ করিয়া আনে। রাজার পকেটের
প্রত্যেকটি টাকা এইরূপ অনাবশ্যক নৃশংস রক্তপাত ও
নারী-সতীত্বনাশে অর্জিত কৃষ্ণতম কলঙ্কখণ্ড। অনেকের
ধারণা কঙ্গো রাজ্যে নির্দোষী প্রজার যত অনাবশ্যক রক্তপাত
হইয়াছে তাহা বাণতি ভরিয়া সারি দিলে ২০০০ মাইল
লম্বা হইতে পারে; এক কোটি হত নরনারীর কঙ্কাল যদি
লিয়োপোল্ডের সম্মুখ দিয়া সাবি বাঁধিয়া যাত্রা করে, তবে সে
সারি শেষ হইতে সাত মাস চারি দিন সময় লাগে।

প্রচুর রবার সংগ্রহ করিতে না পারিলে হতভাগাদের
হাত পা কাটিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। একজন ধর্মপ্রচারক
একস্থানে একাশিটা কাটা হাত আশ্বনের উপর শুকাইতে
দেখিয়াছিলেন; কাটা হাত আশ্বনে শুকাইয়া রাজ-
কর্মচারীদিগকে বাজ্যশাসনের নিদর্শন স্বরূপ ভেট দেওয়া
হয়।

কখনো কখনো নরহত্যা করিয়া নরখাদক সৈন্তদল সেই
হত ব্যক্তিকে খাইয়া ফেলে। নর-কংপাল লইয়া এই
রাক্ষসেরা তামাক মলিবার পাত্র করে।

১ তৈ-স-৫-৭-২।

২ তৈ-ত্রা-১-৬-১-১০—“দেবা বা ওষধীযাজিময়ঃ, তা ইন্দ্রাণী
উদজয়তাম্।”

* King Leopold's Soliloquy, a Satire by Mark
Twain. With illustrations. T. Fisher Unwin. 1s. net.

গবর্ণমেন্ট একটি জীলোকের শিশুগুলিকে তাহার চোখের সামনে অনাহারে রাখিয়া হত্যাকরে এবং তাহার পুত্রদিগকে কসাইয়ের মত বধ কবে ।

একটি বন্দিনীকে উদ্ধার করিবার জন্ত তাহার আত্মীয়-গণ নিজস্ব অর্থ লইয়া উপস্থিত হইয়া যখন সেই বন্দিনীকে মুক্তি প্রার্থনা করিল, তখন সাত্তী তাহাকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করিয়া বলিল যে বন্দিনী যুবতী—শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর তাহাকে দরকার আছে ।

একবার ষাট জন জীলোককে ক্রুশে বিধিয়া হত্যা করা হয় ।

এই সমস্ত ভীষণ অবিস্মৃতা ঘটনা প্রমাণ সহ লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গা করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতের দুর্ভিক্ষ লঙ্ঘিত হইয়া লিয়োপোল্ডের পদলুপ্তিত হইয়া বলিতেছে—“হে বিচিত্রকর্মী প্রভু, আমি বৎসরে ২০ লক্ষ মারিয়া থাকি, কিন্তু তোমার হত্যাকাণ্ড দেখিয়া আমি বুঝিয়াছি আমি হত্যাকাণ্ডে শিক্ষানবিশ মাত্র । হে গুরু, আমাকে শিক্ষা দাও, যেন আমি তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের ভার লঘু করিতে পারি।” তারপর স্বয়ং যম আসিয়া লিয়োপোল্ডকে আপনার কঙ্কাসম্প্রদান করিয়া জামাতৃপদে বরণ করিতেছে এবং ধ্বংসকার্য্য সূচরুপে নিষ্পন্ন করিবার উপায় ও পরামর্শ বলিয়া দিতেছে ।

খুষ্ঠান রাজ্যের এই বীভৎস অত্যাচার খৃষ্টীয়সমাজকে, সভ্যতাগর্ভকে ধিকার দিতেছে, লজ্জা দিতেছে । ইহার শতাংশ অত্যাচার এসিয়ার কোনো রাজ্যে অনুষ্ঠিত হইলে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের করুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—সেই রাজ্যকে অত্যাচারের কবলমুক্ত করিবার ছলে আত্মসাৎ করিবার কত উপায়ই হইত । “কিন্তু এই নৃশংস রাজার বিরুদ্ধে কেহ তত্ত্বপ আচরণ করা আবশ্যক মনে করে না । হুহাই কি খুষ্টের আদর্শ !

রাজা লিয়োপোল্ড গুরু মাঝিয়া ক্ষুতা দান করিয়া যুরোপের মুখ বদ্ধ করিয়াছেন । তাঁহার পাপলব্ধ অর্থে কত ধর্ম্মমন্দির, বিদ্যা ও শিল্পশালা, কত আতুর-আশ্রম ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, আর তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন যে কঙ্গো-রাজ্যের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির জন্তই তিনি সতত সচেষ্ট ! এই মিথ্যাবাক্যে স্বার্থাঙ্ক

যুরোপ চূপ করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু জগতের মনুষ্যস্ব চিরকাল মনুষ্যস্বের প্রতি অত্যাচার কখনো সহ করিবে না । অত্যাচারীর পতন নিশ্চয়, আজ বা কাল !

অত্যাচারিত নরনারীর হৃদয়শোক করুণ নিদর্শন কয়েকটি পাঠককে চিত্রে দেখান হইল । এই সকল সঙ্কট নরনারীর মর্ম্মবেদনা অত্যাচারীর বলদর্পিতের চিত্তকে জ্বালাময় করিয়া তুলিবেই—ভগবানেব ইহা অমোঘ বিধান !*

জাগরণ ।

যশোধরা ! বিশ্বভরা একি আর্ন্তনাদ ?
পর্ণের কুটীর কিম্বা স্বর্ণের প্রাসাদ
বাসনা-অনল-তাপে, বাতনার ধূমে—
ক্লম্বকাস্তি, শাস্তিহীন । তবু ত্রাস্তি ধূমে
মুবিছে নয়ন নর শয়ন পাতিয়া ;
ভীষণ দুঃস্বপ্নে পুনঃ স্বসিছে কাদিয়া ।

মধিয়া আনন্দ-গীতি, রোধিয়া শ্রবণ—
সে ভীম রোদনধ্বনি, অসীম গগন
ব্যাপিয়া কাঁপিয়া ভ্রমে অশনি সমান ;
ক্ষুরিছে বিদ্যুত জ্বলন্ত বলি বিমান ।
বেদনা-জ্বলদ-জ্বাল—নিবিড় ধূসর,
ঢাকে আসি ববি শশী নক্ষত্র ভাষর ।
যন্ত্রণার অন্ধকার উজলিয়া তাপে,
বজ্রনাথে আর্ন্তনাদ গরজিয়া কাঁপে ।

ভ্রমিতে জীবন-পথে ঘোবনের রথে—
সারথি দেখাল, সতি, চরিছে মরতে
জরা, ব্যাধি, যুত্মা আদি গৌরবের দ্বারে ।
কে দিবে মানবে শাস্তি কে তারে উদ্ধারে ?

* এতদিন কঙ্গো দেশ লিয়োপোল্ডের বাস সম্পত্তি ছিল । সম্পত্তি উহা বেলজিয়াম রাজ্যের সম্পত্তি হইয়াছে । কিন্তু কঙ্গোর দাসত্বপ্রথা উচ্ছিন্ন হয় নাই ; কঙ্গোবাসীদের জনো যে বাজেরাগু করা হইয়াছিল, তাহাও রদ হয় নাই । হতরাং তাহাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে কিনা বলা যায় না ।

মানবেব আনন্দের ক্ষেত্র মধু-বনে
 হেরিয়াছি মার আর মাঝ-বধু গণে ।
 নহেক সুন্দর তারা ; ভূষণে বসনে
 প্রচ্ছন্ন করেছে অঙ্গ লীর্ণ অনশনে ।
 বিবসনা বাসনার হাসি নাই মুখে,
 নয়নেতে দীপ্তি নাই তৃপ্তি নাই বৃকে ।
 অবশা লালসা তথা অনবশুস্তিতা,
 গলায় বীধিয়া ফাঁস ধূলায় লুপ্তিতা ।
 মারপুত্র্য লজ্জাহীন হেরিলাম রতি,
 অলঙ্কারহীন তমু কঙ্কালমুরতি ।
 বীভৎস উৎসব শব ছিঁড়ে সবে ধার,
 গৃধিনী প্রেতিনী সম ক্ষুধাব জ্বালায় ।

মার-দত্ত-বিস্তৃত ত্যজি শুদ্ধ নিত্য মণি
 কোথা পাব ? কহ মোরে হে রমণী-মণি ।
 রোগ শোক জরা মৃত্যু উতরিতে চাই ;
 কহ কাণ্ডে কোথা পছা ! দেখিতে না পাই
 খুঁজিয়া কাঁদিয়া সারা হতেছে অস্তর ।
 নব জাত শিশু সম অসহায় নর ।

* * * * *
 ইঙ্গিতে সঙ্কেত বুঝি পেয়েছি এবার
 তব প্রেমে প্রিয়তমে সেবাত্রত ভার
 বহিয়ে কিরিব প্রিয়ে সংসারের দ্বারে ;
 লভিব অতুল শাস্তি, সংহারিব মারে ।

* * * * *
 শুনিতে শুনিতে কথা অমৃত-নিচিত,
 বক্ষেতে শয়ন পাতি—প্রেম-বিরচিত—
 রাখি তথা দেব-তনু দেবী যশোধরা
 চিস্তিল, “করুণা ধাবে ধন্ত হবে ধরা ।”
 “ধন্ত আমি পুণ্যফলে পেয়েছি এ পতি,
 জীবনে মরণে যিনি জগতের গতি ।”

* * * * *
 নিশায় সেধায় দেবী যশোধরা

স্বপ্নে শুনিল বাণী :—

“কষায় বসনে সাজ তুমি স্বরা

হবে যদি রাজরাণী !

“নির্বোধে দূরে ধর্মচক্র,
 রথেতে তোমার পতি ;
 “জ্বালাও আলোক, সাজাও কক্ষ ;
 কেন বিলম্ব সতি ?
 টুনব উৎবাহে মিলিবে হুজুনা,
 পতি আসিছেন রথে ;
 “স্বর্গে মর্তে বাজিছে বাজনা
 আলোক জ্বলিছে পথে ।”

কহে যশোধরা, “বিবাহ আবার ?
 কেননা শুনিছ আগে ?
 অলস অঙ্গ ঘূমে যে আমাব,
 পরাণ যে নাহি আগে ।

বাজনা বাজায় ঐ আসে বর ?
 প্রদীপ হয়নি জ্বালা ;
 সাজাব কখন ধূলাভরা ঘর ?
 গাঁথা হয় নাই মালা ।

বিনয়-খচিত কোথা নীলাশ্বরী,
 কোথা ত্রিরতন হার ?
 শীলৈর সূত্রে বাধিনি কবরী,
 লুটিছে কেশের ভার ।

হৃদয়-আলয়ে আসিছেন হেসে
 হুগুভ নব সাজে ;
 পদধ্বনি ওই শুনি দ্বারদেশে,
 সন্মানে বাজনা বাজে ।

* * * * *
 নিশীথে জাগিলা দেবী হেরিয়া স্বপন ।
 কোথা চক্রবর্তী পতি ? নিশ্চিন্ত ভবন ।
 শয্যায় নিদ্রিত পুত্র না জানে বিবাদ,—
 পতিদেবতার সেই মূর্ত আশীর্বাদ ।
 কবে গো আসিবে পতি কিরিয়া ভবনে ?
 অপেক্ষিয়া আগে সতী নব জাগরণে ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

সংক্ষিপ্ত পুস্তকপরিচয় ।

শ্রীমন্তগবলগীতা—(বাহালা পন্য)—শ্রীহরিদাস ঘোষ প্রণীত ।

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত, ফুলফ্যাপ অষ্টাংশিত ১১৮ পৃষ্ঠা, পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত । মূল্য রাত্ত সংস্করণের ৯০/০ ও সাধারণ সংস্করণের ৯০/০ আনা । ইহা টিক গীতার অনুবাদ নহে । মধ্যে মধ্যে শ্লোকের সমিল পংক্তি পর্যায়ে অনুবাদ আছে, তাহার পরে তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে । ধৃতরাষ্ট্র, সম্ভর, পাণ্ডব, কৌরব কেহই আধ্যাত্মিকতার হাত হইতে নিস্তার পান নাই । বর্তমানে গীতা এক শ্রেণীর লোককে শত্রু-নাশে উত্তেজিত করিতেছে বলিয়া গ্রন্থকার এক ইংরাজি নিবেদন পক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, গীতোক্ত শত্রু বহিঃশত্রু নহে, সে শত্রু অন্তরের । এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হাত্তোদ্দীপক হইলেও আমাদের দেশে নুতন নহে । সঙ্গে সঙ্গে গীতাব তত্ত্ব গ্রন্থকার নিজে যেরূপ বুঝিয়াছেন তাহাও টীকার ও গ্রন্থবধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । মোটের উপর বইখান। আমাদের ভালো লাগে নাই ।

মহামতি রানাদে—স্মারতগৌরব গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত । শ্রীমথাবাম গণেশ দেউস্বর প্রণীত । সিটি বুক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত । ফুলফ্যাপ অষ্টাংশিত ১১০ পৃষ্ঠা । মূল্য ১/০ আনা । যে সকল মহাত্মা আধুনিক ভারতের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রভৃতি সকল বিভাগের সংস্কারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তন্মধ্যে রানাদে অন্যতম । তাহার মহৎ ও বলিষ্ঠ চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহার মধ্যে আছে । পুস্তকের ভাষা কিঞ্চিৎ নীরস ও রচনা ভাড়াভাড়াতে সমাপ্ত বলিয়া বোধ হইল । তথাপিও এ পুস্তক পাঠে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উপকৃত হইবেন । এই মহাত্মার জীবনচরিত বাংলায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল ।

মোহসেন চরিত—শ্রীহামেদ আলী প্রণীত । বগুড়া নিউ স্কুল জাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত । ডবল ফুলফ্যাপ ষোড়শাংশিত ৬৪ পৃষ্ঠা । মূল্য ১/০ আনা । এই পুণ্যপ্রসঙ্গ শিক্ষাবন্ধু, দীনবৎসল সাধু মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম । জীবনচরিত লিখিবার টিক ধারাটি এ পুস্তকে নাই ; কি অবস্থা বা ঘটনার বশে এই মহৎ চরিত্র গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মনস্তত্ত্বের অনুসরণও ইহাতে পরিস্কৃত দেখিলাম না । কিন্তু তথাপি ইহা স্বথপাঠ্য হইয়াছে । পুস্তকের ভাষা ও রচনাভঙ্গী হৃদয় ও মার্জিত । মুসলমান লেখকগণ যে বাংলাকে আপনার ভাষা বলিয়া ক্রমশ স্বীকার করিতেছেন এবং তাহার রচনার কৃতিত্বও দেখাইতেছেন, ইহা বাস্তবিকই আনন্দদায়ক ও শুভকর । যে মানবপ্রেম মোহসেনের জীবনকে ধন্য করিয়াছিল, তাহারই সন্মুখান্ত আমাদের দীর্ঘকালুধিত চিন্তকে বিরোধ হইতে মিলনের দিকে আকর্ষণ করিবে আশা করি ।

শুভবিবাহ-তত্ত্ব—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত । শ্রীশঙ্করদাস

চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত । ডবল ফুলফ্যাপ ষোড়শাংশিত ৬৮২ পৃষ্ঠা, বাঁধাই মলাট । মূল্য ২/০ টাকা । ইহাতে সাধারণত বিবাহের উদ্দেশ্য ও বিবাহকে শুভ কথিয়া তুলিবার উপায় নিয়মাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তৎপরে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে হিন্দুবিবাহের নিয়ম ও পদ্ধতি ; রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণের কুল ও মেল ; বৈজ্ঞ ও কায়স্থ জাতির বিবাহ নিয়ম ; বিবাহ সম্বন্ধে জ্যোতিষ ও নানা শাস্ত্রের মত-মত, বর ও কন্যা নিরূপণের লক্ষণ বিচার ; এবং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে আচার ও অনুষ্ঠান । এই গ্রন্থে হিন্দুদিগের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে । ইহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে দুর্দশায়িত কুলীন অপেক্ষা সচ্চরিত্র নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ পাত্র ইহা শাস্ত্রের মত । শাস্ত্রবচন যত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে শাস্ত্রপ্রণয়ন-কালে এদেশে বালিকাবিবাহ প্রচলিত ছিল না । বাল্যবিবাহের ও অসংযমের বহুবিধ দোষ গ্রন্থকার বহুস্থলে বর্ণন করিয়া বুঝাইয়াছেন । পণ বা শুক গ্রহণ যে পাণ ও গৃহীতা যে সমাজে রূপ হওয়ার উপযুক্ত তাহাও শাস্ত্র প্রমাণে দেখানো হইয়াছে । দম্পতির স্বাস্থ্য ও গাইস্থা ব্যবহারও একটা বেশ হৃদয় আভাস দেওয়া আছে । প্রাচীন সমাজে নারীর কিরূপ সম্মান ও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাহাও গ্রন্থকার জোর করিয়া দেখাইয়াছেন । মোটের উপর গ্রন্থখানি অবহিত হইয়া পাঠ করিয়া শাস্ত্রের সকল অমুশাসন প্রকৃতভাবে মানিয়া চলিলে গৃহ ও সমাজ পবিত্রতর কল্যাণময় হইবে আশা করা যায় । যে সকল লোক শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য উল্লঙ্ঘন করেন, তাহার ইহা একবার পাঠ করিয়া দেখিলে আপনারদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন । গ্রন্থকাব একজন হিন্দু ।

বন্দনা—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার দ্বারা প্রকাশিত । *প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশকের নিকট ও ৭৩১ হুজিরা স্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস । দুই খণ্ডে মূল্য ৯০/০ আনা । প্রথম খণ্ড কুন্তলীন প্রেসে ও দ্বিতীয় খণ্ড কাস্তিক প্রেসে মুদ্রিত । ছাপা কাগজ বহির্দৃশ্য দৃষ্টবন্ধক ও হৃদয় হইয়াছে । ইহাতে বহু স্বদেশী সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে । বহু নুতন ভালো গান ইহাতে আছে । ঐ সকল গান অন্য কোনো পুস্তকে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই । গ্রাম্য ভাষায় রচিত কতকগুলি স্বদেশী সঙ্গীতও ইহাতে আছে । এই বন্দনা জনসাধারণকে মায়ের বন্দনায় প্রোদিত করিবে আশা করি ।

ভুতুড়ে কাণ্ড—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত । ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ৭৩১ হুজিরা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত । কাস্তিক প্রেসে মুদ্রিত । ডবল ক্রাউন ২৪ পেজি ১৭৩ পৃষ্ঠা । মূল্য ১/০ আনা মাত্র । দেশী এটিক কাগজে হৃদয় হৃদু ছাপা । মলাটের উপর ভুতুড়ে পরিকল্পনা কোতুকপ্রদ হইয়াছে । ইহাতে সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় সম্মোহন বিচার বেশবিশেষের অভিজ্ঞতার ফল বর্ণিত হইয়াছে । লেখকের নিজ অভিজ্ঞতার তত্ত্বগুলি খুব আমোদ ও কৌতুকপ্রদ । ইহাতে আকর্ষণজনক বহু

ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। পরলোক বা ভৌতিক রাজ্যের বহু বিষয় সম্মোহিত ব্যক্তির মুখে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই বিবিধ কর্তৃক হইয়াছে। লেখক নিজের কোনো মতামত না দিয়া বুদ্ধিমানের মত পাঠককে কোনো তত্ত্ব গ্রহণ বা বর্জনের সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন। ইহা উপন্যাস অপেক্ষাও কৌতূহল উদ্দীপক। গ্রন্থের আকার ও সৌষ্টব্য অনুপাতে মূল্য অসম্ভব হইয়াছে।

মুদ্রারাক্ষস ।

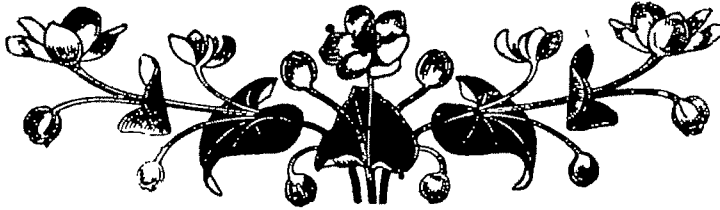
চিত্রপরিচয় ।

এ মাসের প্রবাসীর গোড়ায় যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা জগদ্বিখ্যাত ইতালীর চিত্রকর লেনার্দো দা ভিন্সি কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি হইতে গৃহীত। ছবির মুখে যে ভাব ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর।

উড়িষ্যার চারিখানি চিত্রের মধ্যে পাঠশালার চিত্রটি আমাদের বাল্যের গ্রাম্য বঙ্গীয় পাঠশালার কথা মনে পড়াইয়া দিবে।

বৈতাল দেউলের বিশেষত্ব, ইহার আকৃতি এবং খোদিত অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য। উড়িষ্যার অস্ফাট মন্দিরের সহিত ইহার চূড়ার পার্থক্য আছে; ইহা চতুস্তম্ভ। ইহা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্মিত।

বাজপুত্রের সম্ভাস্তম্ব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে নির্মিত হয়। ইহা মাটি হইতে শীর্ষ ভাগ পর্য্যন্ত ৩৬ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা। ফাণ্ডার্সন বলেন:—“Its proportions are beautiful and its details in excellent taste.”



প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

৮ম ভাগ ।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৫ ।

৮ম সংখ্যা ।

গোরা ।

৩৭

শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ যেন একপ্রকার স্থির হইয়া গেছে এইভাবে মহিম এবং তাঁহার ঘরের লোকেরা চলিতেছিলেন। শশিমুখী ত বিনয়ের কাছেও আসিত না। শশিমুখীর মা ব সঙ্গে বিনয়ের পরিচয় ছিল না বলিলেই হয়। তিনি যে ঠিক লাজুক ছিলেন তাহা নহে কিন্তু অস্বাভাবিক বকমেব গোপনচাবিগী ছিলেন। তাঁহার ঘরের দরজা প্রায়ই বন্ধ। স্বামী ছাড়া তাঁহার আর সমস্তই তালাচাবির মধ্যে। স্বামীও যে যথেষ্ট বোলা পাইতেন তাহা নহে—স্ত্রী শাসনে তাঁহার গতিবিধি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং তাঁহার সঞ্চরণক্ষেত্রের পরিধি নিত্য সঙ্কীর্ণ ছিল। এইরূপ ঘের দিয়া লগ্নার স্বভাব বশত শশিমুখীর মা লক্ষ্মীমণি বঙ্গগুটি সম্পূর্ণ তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল—সেখানে বাহিরের লোকের ভিতরে এবং ভিতরের লোকের বাহিরে যাওয়াব পথ অব্যাহত ছিল না। এমন কি, গোরাও লক্ষ্মীমণির মহলে তেমন করিয়া আমল পাইত না। এই বাজ্যের বিধিব্যবস্থার মধ্যে কোনো বৈধ ছিল না। কারণ, এখানকার বিধানকর্ত্তাও লক্ষ্মীমণি এবং

নিম্ন আদালত হইতে আপিল আদালত পর্য্যন্ত সমস্তই লক্ষ্মীমণি—একজিক্যুটিভ এবং জুডিশিয়ালে ত ভেদ ছিলই না, লেজিস্লেটিভও তাহার সহিত জোড়া ছিল। বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে মহিমকে খুব শক্ত লোক বলিয়াই মনে হইত কিন্তু লক্ষ্মীমণির এলাকার মধ্যে তাঁহার নিজের ইচ্ছা খাটাইবাব কোনো পথ ছিল না। সামান্য বিবয়েও না।

লক্ষ্মীমণি বিনয়কে আড়াল হইতে দেখিয়াছিলেন, পছন্দও করিয়াছিলেন। মহিম বিনয়ের বাল্যকাল হইতে গোরার বন্ধরূপে তাহাকে এমন নিয়ত দেখিয়া আসিয়াছে যে প্রতিপবিচয়বশতই তিনি বিনয়কে নিজেবুঁ কত্তার পাত্র বলিয়া দেখিতেই পান নাই। লক্ষ্মীমণি যখন বিনয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন তখন সহধর্ম্মিণীর বুদ্ধির প্রতি তাঁহাব শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। লক্ষ্মীমণি পাকা করিয়াই স্থির কবিয়া দিলেন যে বিনয়ের সঙ্গেই তাঁহার কত্তার বিবাহ হইবে; এই প্রস্তাবের একটা মন্ত সুবিধার কথা তিনি তাঁহাব স্বামীর মনে মুদ্রিত কবিয়া দিলেন যে, বিনয় তাঁহাদের কাছ হইতে কোনো পণ দাবী করিতে পাবিবেন না।

বিনয়কে বাড়িতে পাইয়াও ছই একদিন মহিম তাহাকে

বিবাহের কথা বলিতে পারেন নাই। গোরার কারাবাস-
সম্বন্ধে তাহার মন বিষন্ন ছিল বলিয়া তিনি নিরস্ত ছিলেন।

আজ রবিবার ছিল। গৃহিণী মহিমের সাপ্তাহিক
দিবানিজ্জাটি সম্পূর্ণ হইতে দিলেন না। বিনয় নূতন
প্রকাশিত বন্ধিমের বঙ্গদর্শন লইয়া আনন্দময়ীকে শুনাইতে-
ছিল—পানের ডিবা হাতে লইয়া সেইখানে আসিয়া মহিম
তক্তপোষের উপরে ধীরে ধীরে বসিলেন।

প্রথমত বিনয়কে একটা পান দিয়া গোরার উজ্জ্বল
নির্বুদ্ধিতা লইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তাহার
পরে তাহাব খালাস হইতে আর কয়দিন বাকি তাহা
আলোচনা কবিত্তে গিয়া অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে পড়িয়া
গেল যে, অত্রান মাসের প্রায় অর্ধেক হইয়া আসিয়াছে।

কহিলেন “বিনয়, তুমি যে বলেছিলে, অত্রান মাসে
তোমাদের বংশে বিবাহ নিষেধ আছে সেটা কোনো কাজের
কথা নয়। একেত পাজি পুঁথিতে নিষেধ ছাড়া কথাই
নেই তার উপরে” যদি ঘরের শাস্ত্র বানাতে থাক তাহলে
বংশ রক্ষা হবে কি করে ?”

বিনয়ের সঙ্কট দেখিয়া আনন্দময়ী কহিলেন “শশিমুখীকে
এতটুকু বেলা থেকে বিনয় দেখে আসচে—ওকে বিয়ে
করার কথা ওর মনে লাগচে না ; সেই জন্তেই অত্রান
মাসের ছুতো কবে বসে আছে।”

মহিম কহিলেন—“সে কথা ত গোড়ায় বলেই হত।”

আনন্দময়ী কহিলেন “নিজের মন বুঝতেও যে সময়
লাগে। পাত্রের অভাব কি আছে মহিম! গোরার ফিরে
আসুক—সে ত অনেক ভাল ছেলেকে জানে—সে একটা
ঠিক করে দিতে পারবে।”

মহিম মুখ অন্ধকার করিয়া কহিলেন—“হঁ।” খানিক-
ক্ষণ চুপ কবিয়া রহিলেন, তাহার পরে কহিলেন—“মা,
তুমি যদি বিনয়ের মন ভাঙ্গিয়ে না দিতে তাহলে ও একাজে
আপত্তি করত না।”

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল,
আনন্দময়ী বাধা দিয়া কহিলেন—“তা সত্য কথা বলি
মহিম, আমি ওকে উৎসাহ দিতে পারি নি। বিনয় ছেলে-
মানুষ, ও হয়ত না বুঝে একটা কাজ করে বসতেও পাবত,
কিন্তু শেষকালে ভাল হত না।”

আনন্দময়ী বিনয়কে আড়ালে রাখিয়া নিজের পরেই
মহিমের রাগের ধাক্কাটা গ্রহণ করিলেন। বিনয় তাহা
বুঝিতে পারিয়া নিজের দুর্বলতায় লজ্জিত হইয়া উঠিল।
সে নিজের অসম্মতি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে উদ্বৃত্ত
হইলে মহিম আর অপেক্ষা না করিয়া মনে মনে এই বলিতে
বলিতে বাহির হইয়া গেল যে, বিমাতা কখনো আপন
হয় না।

মহিম যে একথা মনে করিতে পারেন এবং বিমাতা
বলিয়া তিনি যে সংসারের বিচারক্ষেত্রে বরাবর আসামী
শ্রেণীতেই ভুক্ত আছেন আনন্দময়ী তাহা জানিতেন।
কিন্তু লোকে কি মনে করিবে একথা ভাবিয়া চলা তাঁহার
অভ্যাসই ছিল না। যেদিন তিনি গোরাকে কোলে তুলিয়া
লইয়াছেন সেইদিন হইতেই লোকের আচার লোকের
বিচার হইতে তাঁহার প্রকৃতি একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া
গেছে। সেদিন হইতে তিনি এমন সকল আচরণ করিয়া
আসিয়াছেন যাহাতে লোকে তাঁহার নিন্দাই করে।
তাঁহার জীবনের মর্ম্মস্থানে যে একটি সত্যগোপন তাঁহাকে
গর্ব্বদা পীড়া দিতেছে, লোকনিন্দায় তাঁহাকে সেই পীড়া
হইতে কতকটা পবিমাণে মুক্তিদান করে। লোকে যখন
তাঁহাকে খুঁটান বলিত তিনি গোরাকে কোলে চাপিয়া
ধরিয়া বলিতেন—ভগবান জানেন খুঁটান বলিলে আমার
নিন্দা হয় না।—এমনি করিয়া ক্রমে সকল বিষয়েই লোকের
কথা হইতে নিজের ব্যবহারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া
তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল। এই জন্ত মহিম তাঁহাকে
মনে মনে বা প্রকাশে বিমাতা বলিয়া লালিত করিলেও
তিনি নিজের পথ হইতে বিচলিত হইতেন না।

আনন্দময়ী কহিলেন, “বিনয়, তুমি পরেশ বাবুদের বাড়ি
অনেক দিন যাও নি।”

বিনয় কহিল, “অনেক দিন আর কই হল ?”

আনন্দময়ী। ষ্টীমার থেকে আসার পরদিন থেকে
ত একবারও যাও নি।

সেও ত বেশিদিন নহে। কিন্তু বিনয় জানিত মাঝে
পরেশ বাবুর বাড়ী তাহাব যাতায়াত এত বাড়িয়াছিল
যে আনন্দময়ীর পক্ষেও তাহার দর্শন দুর্লভ হইয়া উঠিয়া-
ছিল। সে হিসাবে পবেশ বাবু বাড়ি অনেক দিন যাওয়া

হয় নাই এবং লোকেব তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছে বটে !

বিনয় নিজের খুতির প্রাপ্ত হইতে একটা সূতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে চুপ করিয়া রহিল।

এমন সময় বেহাবা আসিয়া খবর দিল, “মাজি, কাঁহাসে মায়ীলোক আয়া।”

বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। কে আসিল, কোথা হইতে আসিল, খবর লইতে লইতেই সূচরিতা ও ললিতা ঘবেব মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিনয়ের ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া ঘটিল না ; সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দুজনে আনন্দময়ী পায়েব ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। ললিতা বিনয়কে বিশেষ লক্ষ্য করিল না ; সূচরিতা তাকে নমস্কার কবিয়া কহিল, “ভাল আছেন ?” আনন্দময়ীর দিকে চাহিয়া কহিল—“আমরা পরেশ বাবুর বাড়ি থেকে আসচি।”

আনন্দময়ী তাহাদিগকে আদর করিয়া বসাইয়া কহিলেন, “আমাকে সে পরিচয় দিতে হবে না। তোমাদের দেখিনি, মা, কিন্তু তোমাদের আপনার ঘরেব বলেই জানি।”

দেখিতে দেখিতে কথা জমিয়া উঠিল। বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া সূচরিতা তাকে আলাপের মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল ;—মুহুরবে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি অনেক দিন আমাদের ওখানে যান নি যে।”

বিনয় ললিতাব দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া লইয়া কহিল,—“ঘন ঘন বিবস্ত্র কবলে পাছে আপনাদের মেহ হারাই মনে এই ভয় হয়।”

সূচরিতা একটু হাসিয়া কহিল—“স্নেহও যে ঘন ঘন বিরক্তির অপেক্ষা রাখে সে আপনি জানেন না বুঝি ?”

আনন্দময়ী কহিলেন, “তা ও খুব জানে মা ! কি বলব তোমাদের—সমস্ত দিন ওব ফরমাসে আব আফারে আমার যদি একটু অবসর থাকে !” এই বলিয়া স্নিগ্ধদৃষ্টি দ্বারা বিনয়কে নিরীক্ষণ করিলেন।

বিনয় কহিল, “ঈশ্বর তোমাকে ধৈর্য্য দিয়েছেন, আমাকে দিয়ে তারই পরীক্ষা কবিয়ে নিচ্ছেন।”

সূচরিতা ললিতাকে একটু ঠেলা দিয়া কহিল, “শুনচিস্

ভাই ললিতা, আমাদের পরীক্ষাটা বুঝি শেষ হয়ে গেল ! পাস করতে পারি নি বুঝি ?”

ললিতা এ কথায় কিছুমাত্র ঘোঁগ দিল না দেখিয়া আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন,—“এবার আমাদের বিদ্যু নিজের ধৈর্য্যের পরীক্ষা করচেন। তোমাদের ওয়ে কি চক্ষে দেখেচে সে ত তোমরা জান না। সঙ্কেবেলায় তোমাদের কথা ছাড়া কথা নেই। আর পরেশ বাবুর কথা উঠলে ও ত একেবারে গলে যায়।”

আনন্দময়ী ললিতার মুখের দিকে চাহিলেন, সে খুব জোব করিয়া চোখ তুলিয়া রাখিল বটে, কিন্তু বৃথা লাল হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, “তোমারঃ বাবার জন্তে ও কত লোকের সঙ্গে ঝগড়া কবেচে ! ওর দলেব লোকেরা ত ওকে ব্রাহ্ম বলে জ্ঞাতে ঠেলবাব জো করেচে। বিদ্যু, অমন অস্থির হয়ে উঠলে চলবে না বাছা—সত্যি কথাই বলচি। এতে লজ্জা কববারও ত কোনো কায়দা দেখিনে। কি বল মা !”

এবার ললিতার মুখের দিকে চাহিতেই তাহাব চোখ নামিয়া পড়িল। সূচরিতা কহিল, “বিনয় বাবু যে আমাদের আপনার লোক বলে জানেন সে আমরা খুব জানি—কিন্তু সে যে কেবল আমাদেরই গুণে তা নয়, সে ওর নিজের ক্ষমতা।”

আনন্দময়ী কহিলেন, “তা ঠিক বলতে পারিনে মা। ওকে ত এতটুকুবেলা থেকে দেখেচি, এত দিন ওর বজুর মধ্যে এক আমার গোবাই ছিল ; এমন কি, আমি দেখেছি ওদের নিজের দলের লোকেব সঙ্গেও বিনয় মিলতে পারে না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ওব ছ’দিনের আলাপে এমন হয়েছে যে আমরাও ওর আব নাগাল পাইনে। ভেবেছিলুম এই নিয়ে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করব কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদেরও ওবই দলে ভিড়তে হবে। তোমরা সকলকেই হার মানাবে।”

এই বলিয়া আনন্দময়ী একবার ললিতার ও একবার সূচরিতার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা চুঘন গ্রহণ করিলেন।

সূচরিতা বিনয়েব দ্রববস্থা লক্ষ্য করিয়া সদয়চিত্তে

কহিল, “বিনয় বাবু, বাবা এসেচেন; তিনি বাইরে কক্ষ-দয়াল বাবু সঙ্গে কথা কছেন।”

শুনিয়া বিনয় তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। তখন গোবা ও বিনয়ের অসামান্য বন্ধুত্ব লইয়া আনন্দময়ী আলোচনা করিতে লাগিলেন। শ্রোতা দুই জনে যে উদাসীন নহে তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকি ছিল না। আনন্দময়ী জীবনে এই ছুটি ছেলেকেই তাঁহার মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন, সংসারে ইহাদের চেয়ে বড় তাঁহার আর কেহ ছিল না। বালিকাব পূজাব শিবের মত ইহাদিগকে তিনি নিজের হাতেই গড়িয়াছেন বটে কিন্তু ইহারাই তাঁহার সমস্ত আরাধনা গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার মুখে তাঁহার এই ছুটি ক্রোড়দেবতাব কাহিনী শ্রবণে এমন মধুর এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে স্মৃতিতাপ এবং ললিতা অতৃপ্তদ্বয়ে শুনিতে লাগিল। গোবা এবং বিনয়ের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না কিন্তু আনন্দময়ীর মত এমন মায়েব এমন স্নেহের ভিতর দিয়া তাহাদের সঙ্গে যেন আর একটু বিশেষ করিয়া নতন করিয়া পরিচয় হইল।

আনন্দময়ীর সঙ্গে আজ জানাশুনা হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি ললিতার রাগ আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। ললিতার মুখে উন্মত্তবাক্য শুনিয়া আনন্দময়ী হাসিলেন। কহিলেন, “মা, গোরা আজ জেলখানায় এ ছুঃখ যে আমাকে কি রকম বেজ্ঞেছে তা অন্তর্ধর্মীই জানেন। কিন্তু সাহেবের উপর আমি রাগ করতে পারিনি। আমি ত গোরা'কে জানি, সে যেটাকে ভাল বোঝে তাব কাছে আইন কাহুন কিছুই মানে না; যদি না মানে তবে যারা বিচারকর্তা তারা ত জেলে পাঠাবেই—তাতে তাদের দোষ দিতে যাব কেন? গোরা'র কাজ গোরা' করেচে—ওদেরও কর্তব্য ওরা করেচে—এতে যাদের ছুঃখ পাবার তারা ছুঃখ পাবেই। আমার গোবার চিঠি যদি পড়ে দেখ, মা, তা'হলে বুঝতে পাববে ও ছুঃখকে ভয় করে নি। কারো উপর মিথ্যে রাগও করে নি—যাতে বা ফল হয় তা সমস্ত নিশ্চয় জেনেই কাজ করেছে।” এই বলিয়া গোরা'র সম্বন্ধরক্ষিত চিঠিখানি যাক্স হইতে বাহির করিয়া স্মৃতিতাপের হাতে দিলেন। কহিলেন, “মা, তুমি চোঁচিয়ে পড় আমি আর একবার শুন।”

গোবার সেই আশ্চর্য্য চিঠিখানি পড়া হইয়া গেলে পর তিন জনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আনন্দময়ী তাঁহার চোখেব প্রাপ্ত আঁচল দিয়া মুছিলেন। সে যে চোখের জল তাহাতে শুধু মাতৃহৃদয়ের ব্যথা নহে, তাহার সঙ্গে আনন্দ এবং গোরব মিশিয়াছিল। তাঁহার গোরা কি যে সে গোরা! ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার কসুর মাপ করিয়া তাহাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিবেন সে কি তেমনি গোরা! সে যে অপরাধ সমস্ত স্বীকার করিয়া জেলের ছুঃখ ইচ্ছা করিয়া নিজেব কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে! তাহার সে ছুঃখের জন্ত কাহারো সহিত কোনো কলহ করিবার নাই। গোরা তাহা অকাতরে বহন করিতেছে এবং আনন্দময়ীও ইহা সহ্য করিতে পারিবেন।

ললিতা আশ্চর্য্য হইয়া আনন্দময়ীর মুখেব দিকে চাহিয়া বহিল। ব্রাহ্মপরিবারের সংস্কার ললিতার মনে খুব দৃঢ় ছিল; যে মেয়েরা আধুনিক প্রণায় শিক্ষা পায় নাই এবং বাহাদিগকে সে “হিঁদুবাড়ির মেয়ে” বলিয়া জ্ঞানিত তাহাদের প্রতি ললিতার শ্রদ্ধা ছিল না। শিশু-কালে ব্রহ্মস্মরণী তাহাদের যে অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, “হিঁদুবাড়ির মেয়েরাও এমন কাজ করে না” সে অপরাধের জন্ত ললিতা বরাবর একটু বিশেষ করিয়াই মাথা হেঁট করিয়াছে। আজ আনন্দময়ীর মুখের কয়টি কথা শুনিয়া তাহার অন্তঃকরণ বাব বার করিয়া বিশ্বাস অমুভব করিতেছে। যেমন বল, তেমনি শাস্তি, তেমনি আশ্চর্য্য সহিবেচনা! অসংখ্য হৃদয়াবেগের জন্ত ললিতা নিজেকে এই রমণীব কাছে খুবই খর্ব্ব করিয়া অমুভব করিল। তাহার মনের ভিতরে আজ ভারি একটা দৃকতা ছিল, সেই জন্ত সে বিনয়ের মুখের দিকে চায় নাই, তাহার সঙ্গে কথাও কয় নাই। কিন্তু আনন্দময়ীর স্নেহে করুণায় ও শাস্তিতে মণ্ডিত মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার বুকের ভিতরকার সমস্ত বিদ্রোহেব তাপ যেন জুড়াইয়া গেল—চারিদিকের সকলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সহজ হইয়া আসিল। ললিতা আনন্দময়ীকে কহিল, “গোরা বাবু যে এত শক্তি ক্রোধে থেকে পেয়েচেন তা আপনাকে দেখে আজ বুঝতে পারলুম।”

আনন্দময়ী কহিলেন, “ঠিক বোঝ নি। গোরা যদি

আমার সাধাবণ ছেলের মত হত তা'হলে আমি কোথা থেকে বল পেতুম! তা'হলে কি তা'র দুঃখ আমি এমন কবে সহ্য করতে পারতুম!”

ললিতার মনটা আজ কেন যে এতটা বিকল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার একটু ইতিহাস বলা আবশ্যক।

এ কয়দিন প্রত্যহ সকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই প্রথম কথা ললিতার মনে এই জাগিয়াছে যে, আজ বিনয় বাবু আসিবেন না। অথচ সমস্ত দিনই তাহার মন একমুহূর্তের জন্তও বিনয়ের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে ছাড়ে নাই। ক্ষণে ক্ষণে কেবলি সে মনে করিয়াছে বিনয় হয়ত আসিয়াছে; হয়ত সে উপবে না আসিয়া নৌচের ঘরে পরেশবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে। এই জন্ত দিনের মধ্যে কতবার সে অকারণে এঘরে ওঘরে ঘুরিয়াছে তাহার ঠিক নাই। অবশেষে দিন বখন অবসান হয়, বাত্রে যখন সে বিছানায় শুইতে যায় তখন সে নিজের মনখানা লইয়া কি যে কবিরে ভাবিয়া পায় না। বুক ফাটিয়া কান্না আসে;—সঙ্গে সঙ্গে রাগ হইতে থাকে; কাহার উপরে রাগ বুঝিয়া উঠাই শক্ত। রাগ বুঝি নিজের উপরেই! কেবলি মনে হয়, একি হইল! আমি বাঁচিব কি করিয়া! কোনো দিকে তাকাইয়া যে কোনো রাস্তা দেখিতে পাই না! এমন কারয়া কতদিন চলিবে!

ললিতা জানে, বিনয় হিন্দু; কোনোমতেই বিনয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না। অথচ নিজের হৃদয়কে কোনোমতেই বশ মানাইতে না পারিয়া লজ্জার ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেছে। বিনয়ের হৃদয় যে তাহার প্রতি বিমুখ নহে একথা সে বুঝিয়াছে; বুঝিয়াছে বলিয়াই নিজেকে সধরণ করা তাহার পক্ষে আজ এত কঠিন হইয়াছে। সেই জন্তই সে যখন উতলা হইয়া বিনয়ের আশাপথ চাহিয়া থাকে সেই সঙ্গেই তাহার মনের ভিতরে একটা ভয় হইতে থাকে পাছে বিনয় আসিয়া পড়ে। এমনি করিয়া নিজের সঙ্গে টানাটানি করিতে করিতে আজ সকালে তাহার ধৈর্য আর বাঁধ মানিল না। তাহার মনে হইল বিনয় নু আসাতেই তাহার প্রাণের ভিতরটা কেবলি অশান্ত হইয়া উঠিতেছে; একবার দেখা হইলেই এই অস্থিরতা দূর হইয়া যাইবে।

সকালবেলা সে সতীশকে নিজের ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল। সতীশ আজকাল মাসিকে পাইয়া বিনয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বচর্চাব কথা একবকম ভুলিয়াই ছিল। ললিতা তাহাকে কহিল—“বিনয় বাবুর সঙ্গে তোর বৃদ্ধি ঝগড়া হয়ে গেছে!”

সে এই অপবাদ সতেজে অস্বীকার কবিল। ললিতা কহিল—“ভারিত তোব বন্ধু! তুইই কেবল বিনয় বাবু বিনয় বাবু করিস্ তিনি ত ফিরেও তাকান্ না!”

সতীশ কহিল, “ইস্! তাইত। কথখনো না।”

পরিবাবের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সতীশকে নিজের গোরব সপ্রমাণ কবিবাব জন্ত এমনি করিয়া বারম্বার গলার জোর প্রয়োগ করিতে হয়। আজ প্রমাণকে তাহার চেয়েও দৃঢ়তর কবিবার জন্ত সে তখন বিনয়ের বাসার ছুটিয়া গেল। ফিবিয়া আসিয়া কহিল “তিনি যে বাড়িতে নেই, তাই জন্তে আস্তে পাবেন নি।”

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল—“এ ক’দিন আসেন নি কেন?”

সতীশ কহিল, “ক’দিনই যে ছিলেন না।”

তখন ললিতা সূচবিভার কাছে গিয়া কহিল, “দিদি ভাই, গোর বাবুর মায়ের কাছে আমাদের কিন্তু একবার যাওয়া উচিত।”

সূচবিভা কহিল “তাদের সঙ্গে যে পরিচয় নেই।”

ললিতা কহিল—“বাঃ, গোর বাবুর বাপ যে বাবার ছেলেবেলাকার বন্ধু ছিলেন।”

সূচবিভার মনে পড়িয়া গেল—কহিল, “হাঁ তা বটে।”

সূচবিভাও অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল—“ললিতা ভাই, তুমি যাও, বাবার কাছে বল গে।”

ললিতা কহিল, “না, আমি বলতে পারব না, তুমি বলগে।”

শেষকালে সূচবিভাই পরেশ বাবুর কাছে গিয়া কথাটা পাড়িতেই তিনি বলিলেন, “ঠিক বটে, এতদিন আমাদের যাওয়া উচিত ছিল।”

আহারের পর যাওয়ার কথাটা যখন স্থির হইয়া গেল তখন ললিতার মন বাকিয়া উঠিল। তখন আবার কোথা হইতে অভিমান এবং সংশয় আসিয়া তাহাকে উন্টাদিকে

টানিতে লাগিল। সূচরিতাকে গিয়া সে কহিল—“দিদি, তুমি বাবার সঙ্গে যাও। আমি যাব না।”

সূচরিতা কহিল, “সে কি হয়! তুই না গেলে আমি একলা যেতে পাবব না। লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার—চল্ ভাই, গোল করিস্ নে!”

অনেক অনুমনয়ে ললিতা গেল। কিন্তু বিনয়ের কাছে সে যে পরাস্ত হইয়াছে; বিনয় অনায়াসেই তাহাদের বাড়ি না আসিয়া পারিল, আব, সে আজ বিনয়কে দেখিতে ছুটিয়াছে এই পৰ্য্যন্তের অপমানে তাহার বিষম একটা রাগ হইতে লাগিল। বিনয়কে এখানে দেখিতে পাইবার আশাতেই আনন্দময়ী বাড়ি আসিবার জন্ত যে তাহার এতটা আগ্রহ জন্মিয়াছিল, এই কথাটা সে মনে মনে একেবারে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং নিজের সেই জিদ বজায় রাখিবার জন্ত, না বিনয়ের দিকে তাকাইল, না তাহার নমস্কার ফিরাইয়া দিল, না তাহার সঙ্গে একটা কথা কহিল। বিনয় মনে করিল, ললিতার কাছে তাহার মনের গোপন কথাটা ধরা পড়িয়াছে বলিয়াই সে অবজ্ঞার দ্বারা তাহাকে এমন কবিতা প্রত্যাখ্যান করিতেছে। ললিতা যে তাহাকে ভালবাসিতেও পারে একথা অনুমান কবিবার উপযুক্ত আত্ম-ভিমান বিনয়ের ছিল না।

বিনয় আসিয়া সন্ধ্যাে দরজাব কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, “পবেশ বাবু এখন বাড়ি যেতে চাচ্ছেন, এঁদের সকলকে ধবব দিতে বসেন।” ললিতা বাহাতে তাহাকে না দেখিতে পায় এমন করিয়াই বিনয় দাঁড়াইয়াছিল।

আনন্দময়ী কহিলেন “সে কি হয়! কিছু মিষ্টিমুখ না করে বুঝি যেতে পাবেন! আব বেশি দেরি হবে না। তুমি এখানে একটু বোস বিনয়, আমি একবার দেখে আসি। বাইরে দাঁড়িয়ে বইলে কেন, ঘরের মধ্যে এসে বোস।”

বিনয় ললিতার দিকে আড় করিয়া কোনোমতে দূরে এক জায়গায় বসিল। যেন বিনয়ের প্রতি তাহার ব্যবহারের কোনো বৈলক্ষণ্য হয় নাই এমনি সহজভাবে ললিতা কহিল “বিনয় বাবু, আপনার বন্ধু সতীশকে আপনি একেবারে ত্যাগ করেছেন কি না জানবার জন্তে সে আজ সকালে আপনার বাড়ি গিয়েছিল যে!”

হঠাৎ দৈববাণী হইলে মানুষ যেমন আশ্চর্য হইয়া যায় সেইরূপ বিনয় চমকিয়া উঠিল। তাহার সেই চমকটা দেখা গেল বলিয়া সে অভ্যস্ত লজ্জিত হইল। তাহার স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যের সঙ্গে কোনো জবাব করিতে পারিল না; মুখ ও কর্ণমূল লাল কবিতা কহিল—“সতীশ গিয়েছিল না কি! আমিত বাড়িতে ছিলাম না।”

ললিতার এই সামান্ত একটা কথায় বিনয়ের মনে একটা অপরিমিত আনন্দ জন্মিল। একমুহূর্তে বিশ্বজগতের উপর হইতে একটা প্রকাণ্ড সংশয় যেন নিশ্বাসরোধকর ভ্রংশপ্লেব মত দূর হইয়া গেল। যেন এইটুকু ছাড়া পৃথিবীতে তাহার কাছে প্রার্থনীয় আব কিছু ছিল না। তাহার মন বলিতে লাগিল, “বাঁচিলাম,” “বাঁচিলাম!” ললিতা রাগ করে নাই, ললিতা তাহার প্রতি কোনো সন্দেহ করিতেছে না।

দেখিতে সমস্ত বাধা কাটিয়া গেল। সূচরিতা হাসিয়া কহিল—“বিনয় বাবু হঠাৎ আমাদের নথী দস্তী শৃঙ্গী অস্ত-পাণি কিম্বা ঐরকম একটা কিছু বলে সন্দেহ করে বসেচেন।”

বিনয় কহিল—“পৃথিবীতে যারা মুখ ফুটে নাগিশ করতে পারে না, চুপ করে থাকে তারাই উর্দে আসামী হয়। দিদি, তোমার মুখে একথা শোভা পায় না,—তুমি নিজে কতদূরে চলে গিয়েছ এখন অন্তকে দূর বলে মনে করচ।”

বিনয় আজ প্রথম সূচরিতাকে দিদি বলিল। সূচরিতার কানে তাহা মিষ্ট লাগিল। বিনয়ের প্রতি প্রথম পবিত্র হইতেই সূচরিতার যে একটি সৌন্দর্য জন্মিয়াছিল এই দিদি সম্বোধনমাত্রেই তাহা যেন একটি স্নেহপূর্ণ বিশেষ আকার ধারণ করিল।

পরে বাবু তাঁহাব মেয়েদের লইয়া যখন বিহার হইয়া গেলেন তখন দিন প্রায় শেষ হইয়া গেছে। বিনয় আনন্দময়ীকে কহিল, “মা, আজ তোমাকে কোনো কাজ করতে দেব না। চল উপরের ঘরে।”

বিনয় তাহার চিন্তের উজ্জলতা সম্বরণ করিতে পাবিতে-ছিল না। আনন্দময়ীকে উপবেশ ঘবে লইয়া গিয়া মেঝের উপরে নিজের হাতে মাতুর পাতিয়া তাঁহাকে বসাইল। আনন্দময়ী বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—“নিহু, কি, তোর কথাটা কি?”

বিনয় কহিল, “আমার কোনো কথা নেই, তুমি কথা বল।” পবেশ বাবুর মেয়েদিগকে আনন্দময়ীর কেমন লাগিল সেই কথা শুনিবার জন্যই বিনয়ের মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, “বেশ, এই জন্তে তুই বুঝি আমাকে ডেকে আনলি। আমি বলি, বুঝি কোনো কথা আছে।”

বিনয় কহিল, “না ডেকে আনলে এমন স্বর্যাস্তাতিত দেখতে পেতে না।”

সেদিন কলিকাতার ছাদগুলির উপরে অগ্রহায়ণের স্বর্য মলিনভাবেই অস্ত যাইতেছিল—বর্ণচ্ছটার কোনো বৈচিত্র্য ছিল না—আকাশের প্রান্তে ধুমলবর্ণের বাষ্পের মধ্যে সোণাব আভা অস্পষ্ট হইয়া জড়াইয়াছিল। কিন্তু এই স্নান সন্ধ্যার ধূসরতাও আজ বিনয়ের মনকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, চাবিদিক তাহাকে যেন নিবিড় করিয়া বিবিসাছে, আকাশ তাহাকে যেন স্পর্শ করিতেছে।

আনন্দময়ী কহিলেন, “যেহে ছুটি বড় লক্ষ্মী।”

বিনয় এই কথাটাকে ধামিতে দিল না। নানা দিক্‌ দিয়া এই আলোচনাকে জাগ্রত করিয়া রাখিল। পবেশ বাবুর মেয়েদের সম্বন্ধে কত দিনকার কত ছোটখাট ঘটনার কথা উঠিয়া পড়িল—তাহার অনেকগুলিই অক্লিষ্টকব কিন্তু সেই অগ্রহায়ণের স্নানমান নিভৃত সন্ধ্যায় নিরালাষে বিনয়ের উৎসাহ এবং আনন্দময়ীর ঔৎসুক্য দ্বারা এষ্ট সকল ক্ষুদ্র গৃহকোণের অধ্যাত ইতিহাসখণ্ড একটি গম্ভীর মহিমায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী হঠাৎ এক সময়ে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, “সুচরিতাব সঙ্গে যদি গোরাব বিয়ে হতে পারে ত বড় খুসি হই।”

বিনয় লাফাইয়া উঠিল, কহিল, “মা, এ কথা আমি অনেক বাব ভেবেছি। ঠিক গোরাব উপযুক্ত সঙ্গিনী।”

আনন্দময়ী। কিন্তু হবে কি ?

বিনয়। কেন হবে না ? আমাব মনে হয় গোরা যে সুচরিতাকে পছন্দ কবে না তা নয়।

গোরাব মন যে কোনো একজায়গায় আকৃষ্ট হইয়াছে।

আনন্দময়ীর কাছে তাহা অগোচর ছিল না। সে মেয়েটি যে সুচরিতা তাহাও তিনি বিনয়ের নানা কথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ধানিকঙ্কণ চূপ কবিসা থাকিয়া আনন্দময়ী কহিলেন, “কিন্তু সুচরিতা কি হিন্দুর ঘরে বিয়ে করবে ?”

বিনয় কহিল, “আচ্ছা মা, গোরা কি ব্রাহ্মব ঘরে বিয়ে কবতে পারে না ? তোমার কি তাতে মত নেই ?”

আনন্দময়ী। আমার খুব মত আছে।

বিনয় পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, “আছে ?”

আনন্দময়ী কহিলেন, “আছে বৈ কি বিহু ! মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিল নিয়েই বিয়ে,—সে সময়ে কোন মন্তরটা পড়া হল তা নিয়ে কি আসে যায় বাবা ! যেমন করে হোক ভগবানের নামটা নিলেই হল।”

বিনয়ের মনেব ভিতর হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। সে উৎসাহিত হইয়া কহিল, “মা, তোমার মুখে যখন এ সব কথা শুনি আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয় ! এমন ঔদার্য্য তুমি পেলে কোথা থেকে।”

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, “গোরার কাছ থেকে পেয়েছি।”

বিনয় কহিল, “গোরা ত এম উল্টো কথাই বলে।”

• আনন্দময়ী। বলে কি হবে ! আমাব যা কিছু শিক্ষা সব গোরা থেকেই হয়েছে। মানুষ বস্তুটি যে কত সত্য আর মানুষ যা নিয়ে দলাদলি করে, ঝগড়া করে’ মরে, তা যে কত মিথ্যে, সে কথা, ভগবান গোরা'কে যে দিন দিয়েছেন সেই দিনই বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাবা, ব্রাহ্মই বা কে, আর হিন্দুই বা কে ! মানুষের হৃদয়ে ত কোনো জাত নেই—সেই ধানেই ভগবান সকলকে মেলান এবং নিজে এসেও মেলেন ;—তাকে ঠেলে দিয়ে মন্তব আর মতের উপরেই মেলাবাব ভাব দিলে চলে কি ?”

বিনয় আনন্দময়ীর পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, “মা, তোমার কথা আমার বড় মিষ্টি লাগল ! আমার দিনটা আজ সার্থক হয়েছে !”

শ্রীবীজনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম।

(স্মি-দে-লাফৌর-করাসী হইতে)

ধর্ম ও দর্শনের দিক্ দিয়া দেখিলে—ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্ম সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় ধারণা, এবং সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া দেখিলে—বর্ণভেদপ্রথা—এই দুই লইয়াই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। ভারতের এই গোববোচ্ছল যুগে, সভ্যতার যেকোন বিকাশ ও উন্নতি হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত। এই প্রবন্ধের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে, সবিস্তারে আমি কিছুই বলিতে পারিব না; এই যুগ সম্বন্ধে শুধু একটা আভাস দিবার জন্ত, আমি ঐ যুগের কতকগুলি সাহিত্যিক কীর্তির উল্লেখ করিব মাত্র। মহাকাব্য-বিভাগে, মহাভারত ও রামায়ণ—এই দুইটি প্রধান গ্রন্থ; মহাভারতে ২৫০,০০০ শ্লোক আছে। তাহার পর পুরাণ। নাট্য-বিভাগে, কালিদাস ও ভবভূতিব নাট্যকাবলী, যুদ্ধকটিক বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। তাহার পব গীতি কাব্য—মেঘদূত ও গীত গোবিন্দ; আখ্যায়িকা—পঞ্চতন্ত্র। পাণিনীর ব্যাকরণ ও তাহার অনেকগুলি ভাষ্য; তাছাড়া অলঙ্কার, ছন্দ ও জ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধেও অসংখ্য গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান-বিভাগে, জ্যোতিষের অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পাটীগণিত, দার্শনিক সংখ্যাসূত্র, ও বীজগণিতের উদ্ভাবনার জন্ত আমবা হিন্দুদিগের নিকট ঋণী। আববৈরা আমাদের জন্ত আব কিছুই করে নাই, কেবল ঐ সকল বিজ্ঞা হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া, আমাদের নিকট প্রচার করিয়াছে মাত্র। সর্বশেষে, মনুসংহিতা কিংবা মানব-ধর্মশাস্ত্র এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অত্যন্ত ব্যবস্থা-গ্রন্থ; (ভারতবর্ষে এইরূপ ৫৬টি কিংবা ততোধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়),—এই সকল গ্রন্থ হইতে, ভারতবর্ষের সভ্যতা যে চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইয়াছিল এবং উহা যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন—ইহাই সপ্রমাণ হয়। যে জটিলনিয়ানেব সংহিতা আমরা এক্ষণে অনুসরণ করি, উহার কিয়দংশ মনুসংহিতাব আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র; এক্ষণে এই পরমাশ্রয় সংহিতাখানি, ব্রাহ্মণ্য-মহিমার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান বহিয়াছে। মনুসংহিতার বিশোধিত সংস্করণ—William Jones, Chezy, Loeseleur-Delonchamps কর্তৃক, আমাদের যুগের পূর্বে, জয়ো-

দশ শতাব্দী হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে বেদের উপর এই সংহিতা প্রতিষ্ঠিত সেই বেদেরই জ্ঞান ইহা ভারতে পুঞ্জিত হইয়া আসিতেছে এবং আজিকার দিনেও এই সংহিতাটি একটি পরম পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। এই সংহিতা ১২ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহাব মধ্যে, ধর্মসম্বন্ধীয়, রাষ্ট্রসম্বন্ধীয়, সমাজসম্বন্ধীয় তাবৎ বিষয়ের আলোচনা সন্নিবিষ্ট আছে।

আমার বিবেচনায়, এরূপ গুরুতর ও প্রামাণিক গ্রন্থকে শুধু বিশ্লেষণ করিয়া দেখান অপেক্ষা, উহা হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া দিলে আবও সমুচিত হইবে। আমি যে অনুবাদ অবলম্বন করিয়া বচন সকল উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা Loiseleur-Deslonchamps-র অনুবাদ; William-Jones-র অনুবাদের সহিত ইহার মিল আছে এবং ইহা মূলের মধ্যম অনুবাদ।

প্রথম অধ্যায়ে (প্রকৃত হিন্দু সৃষ্টি প্রকরণ) ব্রহ্মেব অতীন্দ্রিয় স্বরূপ এই বচনে পরিব্যক্ত হইয়াছে:—“এই বিশ্বজগৎ এককালে তমসচ্ছন্ন ছিল—অচিন্ত্য অবিজ্ঞেয় রূপে—প্রস্থপ্ত রূপে সর্বত্র প্রসারিত ছিল। অনন্তর স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান্ মহাভূতাদিতে শক্তি প্রয়োগ করিয়া, এই বিশ্বসংসারকে প্রকাশ করিলেন এবং অন্ধকার বিনাশ করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। যিনি অতীন্দ্রিয়গ্রন্থ হৃদয়, অব্যক্ত, সনাতন, সর্বভূতময়, অচিন্ত্য, তিনি স্বয়ং প্রোদ্ভূত হইলেন। তিনি স্বকীয় শবীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া, ধ্যান মাত্রে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে বীজ অর্পণ কবিলেন।”

তিন সহস্র বৎসর পরে, জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে Darwin যে মতবাদ প্রকাশ কবিরাজেন, নিম্নলিখিত বচনে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়:—(১৯, শ্লোক) “মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্ত্র এই সাতটি মহাবীর্ষ্য পুরুষশক্তিবিশিষ্ট পদার্থের হৃদয় মাত্রা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—অব্যয় ও অদ্বয় কারণ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন।” (২০ শ্লোক)—“এই সকল মহাভূতের মধ্যে প্রত্যেকে পর-পর পূর্ব-পূর্বের গুণ গ্রহণ করে—পর্যায়ের মধ্যে যে যত দূর, তাহার গুণ সেই পরিমাণে অধিক।”

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, দ্বিজদিগের সংস্কার ও

দীক্ষার কথা আলোচিত হইয়াছে। দ্বিজ শব্দের অর্থ—
হইবার জাত। পুত্র জন্মে স্বান কবাইয়া, যন্তোচ্চারণ
সহকায়ে, মধু ও ঘৃত শিশুর গুঠে স্থাপন করিয়া, প্রথম তিন
বর্ষের দ্বিজত্ব অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। তাহার পর,
তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে, শিশুর চূড়াকরণ, পরে ১৬ হইতে
২৪ বৎসর বয়সে, দ্বিজ জাতির নিয়মানুসারে উপনয়ন
হইয়া থাকে। এই তিনটি অনুষ্ঠান কিংবা সংস্কার দীক্ষার
কৃত্য নিত্যন্তই আবশ্যিক।

বচনগুলি এইঃ—(২৯ শ্লোক) “বালক জন্মিবামাত্র
নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে তাহার জাত কৰ্ম্ম নামক সংস্কার করা
বিধেয়; তৎকালে স্বর্গছোক্ত মন্বে তাহাকে স্বর্ণ, মধু ও
ঘৃত ভোজন করাইতে হয়।” (২৭ শ্লোক)—“গর্ভ-
কালীন গর্ভাধানাদি সংস্কার, জাতকৰ্ম্ম, চূড়াকরণ ও
উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজ ও গর্ভজন্তু
পাপসমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে।” (৬৬ শ্লোক)—জীলোক-
দের দেহশুদ্ধির জন্তু সমুদায় সংস্কারই যথাকালে এবং
যথাক্রমে বিধেয়—পরন্তু ঐ সকল অনুষ্ঠান অমল্লক হইবে।
(৬৭ শ্লোক)—“বিবাহ সংস্কারই জীলোকের বৈদিক
উপনয়ন-সংস্কার।”

এইরূপে, জাতকৰ্ম্ম, চূড়াকরণ, ও বিশেষত উপনয়ন—

এই তিনটি দ্বিজ জাতির দ্বিজত্বের চিহ্ন—এবং এই সকল
অনুষ্ঠানের দ্বারাই দ্বিজের দেহশুদ্ধি হইয়া থাকে।
ব্রহ্মচারীর পক্ষে অর্থাৎ “থিয়লজির” ছাত্রের পক্ষে যে সকল
কর্তব্য নির্ধারিত আছে তন্মধ্যে চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,
সর্বপ্রধান। (৯৫ শ্লোক)—“যে জন সমস্ত কামনাব
বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর যে জন সমস্ত কাম্য বিষয়
তাগ করিয়াছেন,—এই উভয়ের মধ্যে ত্যাগবান্ পুরুষকেই
শ্রেষ্ঠ বলা যায়।” (৯৩)—“ইন্দ্রিয়গণের বিষয়প্রসক্তি
হইতেই মনুষ্য দুষিত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই;
তাহাদিগকে সংযম করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ করা
যায়।” (৯৭)—“বেদ বল, দান বল; যজ্ঞ নিয়ম
তপস্শ্রাদ্ধি যে কোন পুণ্য কার্য বল; এ সকল স্বভাব-
চুষ্ট ব্যক্তিকে কখনই সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ হয় না।”

হিন্দুদের চক্ষে, একমাত্র জ্ঞানই (জ্ঞান অর্থে প্রধানত
বেদবেদাঙ্গের জ্ঞানকেই বুঝায়) মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা স্থাপন

কবে। (১৫৩)—“কাবণ, অজ্ঞ ব্যক্তি বৃদ্ধ হইলেও
বালক। যিনি জ্ঞানোপদেশী তিনি বালক হইলেও পিতৃবৎ
পুত্রনীয়। অজ্ঞ ব্যক্তিকে যে বালক বলা যায় এবং
দেবতাদিগকে যে পিতা বলা যায়, ইহা অতি পুরাকাল
হইতেই প্রসিদ্ধ আছে।” (১৫৪)—“বয়সে, শুরু কেশে,
ধনে কিংবা বন্ধু বান্ধবে বড় হওয়া যায় না। যিনি বেদ
বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ, ঋষিরা তাঁহাকেই মহৎ বলিয়াছেন।”
ব্রাহ্মণদের মধ্যে ক্ষোষ্ঠতাব নিয়ম জ্ঞানের উপর নির্ভর
কবে। (১৫৬)—“মস্তকের কেশ পাকিলেই যে বৃদ্ধ হয়
এমন নহে, কিন্তু যিনি যুবা হইয়াও বিদ্বান্, দেবতারা
তাঁহাকেই বৃদ্ধ বলেন।” (১৫৭) “যেমন কাঠনির্মিত
হস্তী, যেমন চর্ম্মনির্মিত মৃগ, সেইরূপ বেদহীন ব্রাহ্মণ।”
(১৫৫)—“দশজন উপাধ্যায় অপেক্ষা, একজন আচার্যের
গৌরব অধিক। একশত আচার্য অপেক্ষা পিতার গৌরব
অধিক এবং সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতার গৌরব অধিক।”
(১৫৬)—“যিনি সংস্কারাদি করেন নাই, কেবল মাত্র
জন্মদাতা, এবং যিনি সাক্ষ বেদ প্রদান করেন—এই
উভয়েই পিতা বটেন, কিন্তু তন্মধ্যে বেদপ্রদ পিতাই
শ্রেষ্ঠ। কারণ দ্বিজগণের দ্বিতীয় জন্ম বা ব্রহ্মজন্মই ইহ-
পরকাল সর্বত্রই শাস্ত।” (১৫০)—“যিনি বেদ-
অধ্যাপনাদি দ্বারা ব্রহ্মজন্মের কারণ হন, যিনি বেদাদি-
ব্যাখ্যান দ্বারা স্বধর্ম্মের উপদেশ করেন,—বালক হইলেও,
তিনি ধর্ম্মতঃ বৃদ্ধেব পিতা।” নিম্নলিখিত উপদেশ গুলিতে
অতীব উচ্চতাব মুদ্রিত রহিয়াছে। (১৬২)—“ব্রাহ্মণ
ঐহিক সম্মানকে যাবজ্জীবন বিষয় ছায় জ্ঞান করিবেন
এবং অবমাননাকে সর্বদা অমৃতের ছায় আকাঙ্ক্ষা
করিবেন।” (১৬১)—“একান্ত পীড়িত হইলেও অস্ত্রের
মর্দপীড়ন করা উচিত নয়; যাহাতে, পরের অনিষ্ট হয়,
এমন কোন কৰ্ম্ম বা চিন্তা কবিত্তে নাই এবং যে কথা
বলিলে লোকের উদ্বেগ জন্মে, পরলোক-বিরোধী এমন
বাক্য উচ্চারণ করিতে নাই।” (২২৭)—“পিতা মাতা
যে ক্রেশ সহ করেন, পুত্র শত বৎসরেও তাহা পরিশোধ
করিতে সমর্থ হয় না।” এই অধ্যায়ে, দুইটি খুব উচ্চতাবেব
শ্লোক আছেঃ—মাতাপিতা অপেক্ষা সহস্রগুণে পুত্রনীয় এবং
শত শত বৎসর সেবা করিলেও, সন্তান সে ধার শুধিতে

পারে না। জ্ঞীলোকের সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পরে আছে, এই দুইটি উপদেশ তাহাবই কতকটা কাছাকাছি।

এই বিষয়টি বিশেষ আলোচনার যোগ্য: সকল আৰ্য্য-জাতিব ছায়, বৈদিক ও ব্রাহ্মণিক প্রাচীন ভাবতের আৰ্য্যদিগের মধ্যেও নারীজাতি সম্মানিত হইত; বর্তমানে, ভারতে নারীজাতির যে দুর্গতি দেখিতে পাওয়া যায়, মুসলমানের ভাবত-বিজয় তাহাব মূলীভূত কাৰণ। সে সময়ে নারীজাতিব অবস্থা কিরূপ ছিল, তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা অবগত হওয়া যায়। ঐ অধ্যায়ে, বিবাহের বিষয় ও পিতার কর্তব্য আলোচিত হইয়াছে; বিবিধ বর্ণের মধ্যে বিবাহসংক্রান্ত নিষেধের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐহাদের বিশ্বাস, খৃষ্টধর্মের যুগ হইতে ভারতীয় সভ্যতার আরম্ভ এবং স্বকীয় অধিকার পুনঃপ্রাপ্তিব জন্ত ভাবতের রমণী খৃষ্টধর্মের নিকট ঋণী, তাঁহারা নিম্নলিখিত বচনগুলি দেখুন: (৩২ শ্লোক)—“কন্তা এবং বর—উভয়ের পবম্পবের ইচ্ছায় যে মিলন হয় তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে, উহা মৈথুন ও কাম-সম্ভূত।” (৪৩)—“সর্ব্বা জ্ঞীর পক্ষেই পাণিগ্রহণ সংস্কার উপদিষ্ট হইয়াছে।” এই পাণিগ্রহণ বিবাহ অমুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ।

(৫১)—“ধনগ্রহণ-দোষজ পিতা কন্তাদান নিমিত্ত অন্ন মাত্র শুদ্ধ ও গ্রহণ করিবেন না; কাৰণ লোভ বশত: শুদ্ধ গ্রহণ করিলে অপত্য-বিক্রয়ী হইতে হয়।” (৫৫)—“জ্ঞী-লোককে বহুমান পূর্ব্বক ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা বহুকল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের কর্তব্য।” (৫৬)—“যে কুলে নারীগণ পূজিত, দেবতাবা সেখানে আনন্দিত হয়েন। আর যে পবিবাবে, জ্ঞীলোক পূজিত না হয় সেই পবিবাবের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম নিষ্ফল হয়।” (৫৭)—“যে পরিবাবে জ্ঞীলোকেবা সদাই দুঃখিত থাকেন, সেই কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়; যেখানে জ্ঞীলোকেব কোন দুঃখ নাই, সেই পবিবাবেব নিয়ত শ্রীবৃদ্ধি হয়।” (৫৮)—“অপূজিত থাকা প্রযুক্ত জ্ঞীলোকগণ যে গৃহে অভিসম্পাত কবেন, সেই গৃহ অভিচাব-হতের ছায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।” (৫৯)—“অন্তএব ঐহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা কবেন, বিবিধ সংস্কার্যকালে এবং উৎসবকালে নিত্যই অশন-বসন-ভূষণাদি

দ্বারা জ্ঞীলোকেব সমাদর করা তাঁহাদের কর্তব্য।” (৬০)—“যে পবিবাবেব মধ্যে ভর্ত্তা ও ভাৰ্যা পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবাবে ক্রব কল্যাণ।” (৬২)—“জ্ঞী যদি ভূষণাদির দ্বারা শোভমানা হন, তবেই গৃহেব শোভা হয়, আর যদি জ্ঞী শোভমানা না হন, তবে সমস্ত গৃহই শোভাহীন হইয়া পড়ে।”

আতিথ্য সংস্কারও পুণ্যকর্ম্মের মধ্যে পবিগণিত: (১০৫)—“স্বর্ঘ্যদেব কর্ত্তক আনীত সাংকালে অতিথি কোন ক্রমেই প্রত্যাখ্যেয় নহে। যথাকালেই আনুন, আর অকালেই বা আনুন, অতিথিকে গৃহে কখন উপবাসী রাখিবে না।” (১০৬)—“যে দ্রব্য অতিথিকে ভোজন করাইতে পাবিবে না, তাহা স্বয়ং ভোজন করিবে না। অতিথির প্রসন্নতা-বলে গৃহস্থ, — ধন, যশ, আয়ু ও স্বর্গ লাভ করেন।” (১১৪)—“নববিবাহিতা জ্ঞী, পুত্রবধূ বা হুহিতা প্রভৃতিকে, বালকদ্বিগকে, রোগীদ্বিগকে এবং গর্ত্তবতীদ্বিগকে কোন বিচার না করিয়া অতিথিব অগ্রেই ভোজন করাইবে।” শেষোক্ত শ্লোকটি হইতে জানা যায়, অতিথি অপেক্ষাও জ্ঞীলোকের সম্মান অধিক। আমরা যে সকল শ্লোক পরে উদ্ধৃত করিব, তাহার মধ্যে এই ভাবের কথা অনেক পাওয়া যাইবে। (১১৮)—“যে ব্যক্তি আপনাকে উদ্দেশ্য করিয়া অন্ন পাক করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে। যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নই সাধুদিগেব জন্ত বিহিত হইয়াছে।” (২৫৯)—“গৃহস্থ পিতৃলোকের নিকট এই সকল বব প্রার্থনা করিবে যে ‘হে পিতৃগণ! আমাদের কুলে যেন দাতা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ও যাগাদিব অমুষ্ঠান দ্বারা বেদশাস্ত্রের যেন সম্যক আলোচনা হয়; আমাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশ-পবম্পবা যেন চিবকাল বিস্তৃত থাকে; বেদেব উপর অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদের কুল হইতে তিরোহিত না হয় এবং দান করিবার জন্ত দেয় দ্রব্যেরও যেন কখন অসদৃভাব না থাকে।”

চতুর্থ অধ্যায়ে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও সাধারণ উপদেশেব কথা আছে। (৩২ শ্লোক)—“ঐহাবা পাক কবেন না— এমন ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে গৃহস্থ যথাশক্তি অন্নাদি প্রদান করিবেন এবং যাহাতে আশ্বকুটুম্বের পীড়া না জন্মে, এই কারণ তাঁহাদিগের জন্ত পর্য্যাপ্ত রাখিয়া সমুদায় প্রাণিগণকে

খাদ্যাদি বিভাগ কথিয়া দিবেন ।” (১৩৪)—“পরদ্রো গমনে যেমন আয়ুঃক্ষয় হয়, ইহ সংসারে অল্প কোন ব্যাপাবে পুরুষের তেমন আয়ুঃক্ষয় হয় না ।” (১৩৮)—“সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, অপ্রিয় সত্য বলিবে না, প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম ।” (১৭১) “ধর্মপথে থাকিয়া অবসন্ন হইলেও কখন অধর্মে মনোনিবেশ কবিবে না ।” (১৬৮) —“ভূমিপতিত ব্রহ্মবতে যতকাল ধূলিকণা মিশ্রিত হয়, শোণিতোৎপাদক ব্রহ্মবাতীকে তত বৎসর পবলোকে শৃগাল কুকুবাди ভক্ষণ কবিতো থাকে ।” (১৮৪)—“বালক, বৃদ্ধ, দরিদ্র ও আতুর লোক—ইহাদিগকে আকাশের ঈশ্বর বলিয়া বিবেচনা করিবে; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার সমান ও আপনার স্ত্রী পুত্রকে স্বকীয় দেহ বলিয়া বিবেচনা কবিবে ।” (১৮৫)—“দাসবর্গকে আপনার ছায়া ও হুহিতাকে পবন মেহেব পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিবে । এ কারণ ইহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও অক্ষয় মনে সর্বদা সঙ্ক করিবে ।”

(২০৪)—“ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্যকথন, নিষ্পাপ অন্তঃকরণ, হিংসা ও অপহরণ না করা এবং মধুব ভাব—ইহাদিগকে যম বলা যায় । স্নান, মৌনাবলম্বন, উপবাস, যজ্ঞকার্য্য ও বেদাধ্যয়নাদিকে ধর্মনিয়ম বলা যায় । সর্বদা যমেরই সেবা করিবে, কেবল নিয়ম লইয়া থাকিবে না । যমাচরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মাচরণ কবিলে পতিত হইতে হয় ।” ধর্মকর্ম্মের আগে নৈতিক কর্তব্য—ইহা একটি গভীর তত্ত্বকথা ! ব্যবস্থাকর্ত্তা যাজ্ঞবল্ক্যের মতামুসারে, নৈতিক কর্তব্য দশটি : জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, ধৈর্য্য, ধ্যান ধারণা, সত্যপরায়ণতা, ঋজুতা, ক্ষমা, অস্তেয়, মাধুর্য্য ও মিতাচার ।

নিম্নলিখিত দুইটি উপদেশে-খুব একটা উচ্চ ভাব আছে : (২৩৪)—“যে যে ভাবে যে যে দান করা যায়, প্রতিপূজিত হইয়া সেই সেই ভাবে সেই সেই দান জন্মাস্তবে পাওয়া যায় ।” (২৩৭)—“স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে মিথ্যাকথনে ব্রহ্মল নষ্ট হইয়া যায়, স্বীয় তপস্বী সম্বন্ধে বিস্ময়াপন্ন হইলে পশ্চাৎ ক্ষয় হয়, ব্রাহ্মণনিন্দার আয়ুঃক্ষয় হয় এবং দান করিয়া তাহার কীর্ত্তন কবিলে দানের ফল নষ্ট হইয়া যায় ।”

পঞ্চম অধ্যায়ে, অশৌচ, অশৌচের প্রায়শ্চিত্ত ও জ্রীলোকদিগেব কর্তব্য আলোচিত হইয়াছে ।

এই অধ্যায়ে, যে সকল অন্ন স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়, তাহার একটা দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইয়াছে । এই অনুসারে, তবকাবীষ মধো বহুন, পেয়াজ, বেঙেব ছাঁতা আহার কবা নিষিদ্ধ ; মেঘদুগ্ধ উষ্ট্রদুগ্ধ, হিংস্র পশুদেব দুগ্ধ, পাখীর মাংস, চতুষ্পদ পশুব মাংস, এমন কি পুঁটি ও কুই মংস্ত্র ছাড়া অল্প মংস্ত্র আহাব কবাও নিষিদ্ধ । এবং কোন দ্বিজ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার কবে ত সে তৎক্ষণাৎ পতিত হয় ।

(৪৮ শ্লোক)—“প্রাণিহিংসা না করিলে কখন মাংস উৎপন্ন হয় না ; প্রাণিবধ কিছুতেই স্বর্গজনক নহে ; অতএব মাংস ভোজন পরিবর্জন কবিবে ।” (৪৫)—“যে ব্যক্তি আত্মস্বখেচ্ছাব বশবর্ত্তী হইয়া, হিংসাশূন্ত নিবীহ জীবগণকে হত্যা করেন, তিনি কি জীবিতাবস্থায়, কি মৃত্যুর পব কদাপি সুখলাভ কবিতো পাবেন না ।” (৪৬)—“যে ব্যক্তি প্রাণীদিগকে বধ বন্ধনাদি ক্রেশ দিতে ইচ্ছা না কবেন, সকলেব হিতাকাঙ্ক্ষী সেই ব্যক্তি, অত্যন্ত সুখ ভোগ কবেন ।”

অশুদ্ধ দ্রব্যাদির আলোচনা করিয়া এবং বেদাধ্যয়ন, তপস্বী, অগ্নি, শুদ্ধ অন্ন, জল, ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি শুদ্ধিকর উপায় সকল নির্দ্ধাবিত করিয়া তাহার পব মমু এই কথা বলিতেছেন । (১০৬)—“দেহ-মন-আদি শুদ্ধিকর সমুদায় পদার্থ মধো অর্থশৌচ অর্থাৎ অর্থার্জন বিষয়ে অত্যাশ্র বা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করাকে ঋষিবা পবম শৌচ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যে ব্যক্তি অর্থার্জনে শুচি তিনিই প্রকৃত শুচি ; অর্থশুদ্ধি না থাকিলে কেবল মৃত্তিকা বা জল দ্বারা দেহ শুদ্ধ কবিলে শুচি হয় না ।” (১০৭)—“বিদ্বান্ জনেবা ক্ষমা দ্বারা শুদ্ধ হন ; অকার্য্যকারীরা দান দ্বারা, প্রচ্ছন্ন পাপীবা জপদ্বারা এবং বেদবিদ ব্রাহ্মণেরা তপস্বী দ্বারা পাপ হইতে শুদ্ধ হন ।” (১৩০)—“স্ত্রীলোকের মুখ সর্বদাই শুচি ।” (১৬০)—“অনেক সহস্র কোমার ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ সম্ভান উৎপাদন না করিয়াও স্বীয় ব্রহ্মচর্য্য বলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ কবিয়াছেন, ঐ সকল ব্রহ্মচারীর তায় অপূত্রা হইলেও সাধবী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পব একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য বলে স্বর্গে গমন করেন ।” (১৬৩)—“নিজের পতি অপকৃষ্ট বলিয়া যে স্ত্রীলোক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের আশ্রিত হয়, লোকে তাহাকে

পরপূর্ণা বলিয়া থাকে ।” (১৬৬)—“যে জীৱীলাক এইরূপে মনোবাগ্বেহ সংযতা হইয়া নাবীধর্মে জীবন যাপন কবেন, তিনি ইহলোকে পবমাকীর্তি লাভ কবেন ও পবকালে পতিলোকে গমন কবেন ।”

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, সন্ন্যাস-জীবন সম্বন্ধে উপদেশ আছে । ফলত ব্রাহ্মণেব জীবন চার কালবিভাগে বিভক্ত । এই চার কালবিভাগেব সহিত চতুর্বাশ্রমের মিল আছে । প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রম । এই সময়ে ব্রাহ্মণযুবক গুরুব নিকট বেদাধ্যয়ন কবেন । দ্বিতীয় গৃহস্থাশ্রম । এই সময়ে ব্রহ্মচারী বেদাদিবে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বিবাহ করেন ও বিবাহ কবিয়া গৃহস্থ হইয়েন । তৃতীয় বানপ্রস্থাস্রম । গৃহী সাংসারিক সমস্ত সুখ সম্ভোগ করিয়া অবশেষে সংসার ত্যাগ কবিবার জন্ত বনে গিয়া তাপসেব ছায় জীবন যাপন কবেন ; তখন তিনি শুধু ভিক্ষারের দ্বাৰা জীবন ধারণ কবেন । তাহার পব যখন তিনি বার্কিক্যে উপনীত হন এবং পার্শ্বিব বস্ত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হন, তখন তিনি ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ কবিবার উদ্যোগ কবেন এবং সন্ন্যাসী হইয়েন । এই উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইলে পব তিনি ভৌতিক জীবনের খুটিনাটি নইয়া আব ব্যাপৃত থাকেন না, পরন্তু চরম লক্ষ্যের দিকে চিন্তকে স্থিৰ রাখিয়া কঠোর আত্মনিগ্রহে প্রবৃত্ত হন ।

(২১ শ্লোক)—“অথবা বানপ্রস্থ ধর্মবিধি প্রতিপালন করিয়া কেবল পুষ্প-মূল-ফল দ্বাৰা সর্বদা জীবিকা নির্বাহ করিবেন, কিংবা স্বয়ংপতিত কালপক ফলদ্বাৰা জীবিকা নির্বাহ করিবেন ।” (২২)—“ভূমিতে গড়াগড়ি দিবেন, অথবা সাবাদিন একপদে দণ্ডায়মান থাকিবেন, কিংবা কখন আসনস্থ, কখন বা আসন হইতে উত্থান করিয়া কাল কাটাইবেন । প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সাংকালে স্নান করিবেন ।” (২৪)—“ত্রৈকালিক স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবলোকের তর্পণ কবিবেন এবং উগ্রতর তপস্তা কবিয়া দেহকে শোষণ করিবেন ।” (২৬)—“সুখকর বিষয়ে যত্নশীল হইবেন না, ক্রীসম্ভোগাদি করিবেন না ; ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন, বাসস্থানে মমতাশূন্য হইবেন এবং বৃক্ষমূলে বসতি করিবেন ।” (২৯)—“বানপ্রস্থাবলম্বী ব্রাহ্মণ এই সমুদায় ও অপরাপব নিয়ম প্রতিপালন করিবেন এবং আত্ম-সাধনার

জন্ত উপনিষদাদি বিবিধ শ্রুতি অভ্যাস করিবেন ।” (৩৪)

—“আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গমন কবিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যা, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ ধর্মের অমুষ্ঠান করিয়া তন্ত্বে আশ্রমে অগ্নিহোত্রাদি হোম সমাধান কবিয়া জ্বিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিয়া ভিক্ষাদান বা বলিদানাদি কর্মে শ্রান্ত হইলে পর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কবিলে পবলোকে পরম অভ্যায় লাভ করা যায় ।” (৪০)—“সর্বসঙ্গ রহিত হইলে সিদ্ধলাভ হয় জানিয়া আত্মসিদ্ধিৰ জন্ত তখন অসহায় অবস্থায় নিত্য একাকী বিচরণ করিবেন ।” (৪৭)—“ভুক্তি বা অপমান-জনক বাক্য সকল সম্বন্ধ কবিয়া থাকিবে, কাহাকেও অপমান দ্বাৰা পরাভব কবিবে না ; এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ কবিয়া কাহাবও সহিত শত্রুতা কবিবে না ।” (৪৮)—“কেহ ক্রোধ কবিলে তাহাব প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কবিবে না ; কেহ আক্রোশেব কথা কহিলে তাহাব প্রতি কুশলবাক্য প্রয়োগ করিবে । সপ্তদ্বাব বিষয়ক যে বাক্য, তাহাকে মিথ্যাতে নিয়োগ কবিবে না ।” (৪৯)—“সর্বদা ব্রহ্ম-

ধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিবে ; কোন বিষয়েব অপেক্ষা রাপিবে না—সর্ববিষয়ে নিম্পৃহ হইবে ; কেবল আত্মসহায়েই একাকী মোক্ষার্থী হইয়া ইহংসংসারে বিচরণ করিবে ।” (৬০)—“ইন্দ্রিয়গণেব নিবোধ, রাগদ্বেষাদির ক্ষয় এবং সর্বভূতে অহিংসা—এই সকল উপায় দ্বাৰা মহামুখ্য যুক্তিগাভে অধিকারী হন ।” (৭২)—“প্রাণায়াম দ্বাৰা ইন্দ্রিয় বিকাবাদি দোষ সকল দূর করিবে ; স্থান বিশেষে চিন্তাবন্ধনরূপ ধারণা দ্বাৰা পাপ সকল নষ্ট করিবে ; স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় আকর্ষণরূপ প্রত্যাহার দ্বাৰা বিষয়সংসর্গরূপ পাপ সকল হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা কবিবে এবং পরব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া কামক্রোধাদি অনীশ্বব গুণ সকলকে জয় করিবে ।” (৭৬)—“এই দেহ অস্থিরূপ স্তম্ভে বিশ্বত, স্নায়ুরূপ রজ্জুদ্বাৰা বদ্ধ, বস্ত্র ও মাংসদ্বাৰা প্রলিপ্ত, চর্মদ্বাৰা আচ্ছাদিত, মূত্র ও বিষ্ঠাব ভূগর্ভে পূর্ণ । (৭৭)—“এই দেহ জবাপোকে আক্রান্ত, নানাপ্রকাৰ ব্যাধি-মন্দির, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, প্রায়ই রক্তোশ্মণযুক্ত, অনিত্য এবং পঞ্চভূতের আবাস স্বক—ইহা জানিয়া ইহার নাম্য পরিত্যাগ করিবে ।” (৮৩)

—“যে কিছু কর্মফল পূর্বে পূর্বে কথিত হইয়াছে, সকল ধ্যানপব্যয়ন জনেব প্রাপ্য ; কিন্তু ধ্যানহীন, স্মৃতবান্

আত্মজ্ঞান বিরহিত ব্যক্তি কোন ক্রিয়াবই কল লাভ করিতে পাবে না।”

উপরে যে সকল বচন উদ্ধৃত করা হইল, উহা সমাসা-শ্রমে প্রবিষ্ট ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযুক্ত। উহা তাহাদের কর্তব্যের মূখ্য অংশ মাত্র; সমস্ত কর্তব্য বিবৃত কবিত্তে হইল, সমস্ত অধ্যায়ই উদ্ধৃত করিতে হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়েব শেষভাগে, দ্বিজ ও দ্বিজদেব ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর উপদেশ আব কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবে, যে অসাধু ব্যবহার কবে তাহাব প্রতি সাধু ব্যবহার করিবে,—এই যে ষষ্ঠমতবাদেব মূলভিত্তি—এই সকল উপদেশ ষষ্ঠ আবির্ভাবের ত্রয়োদশ শতাব্দি পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছিল। (১১)—“এই চাবি আশ্রমবাসী দ্বিজাতিগণেব বক্ষ্যমান দশপ্রকাব কর্ম নিত্য যত্নসহকাবে অমুষ্ঠান করা কর্তব্য। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিজ্ঞা, সত্য ও অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।” (১৩)—“ধর্মের এই দশ লক্ষণ যে ব্রাহ্মণ সম্যক্ অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যয়ন করিয়া তাহাব অমুষ্ঠান কবেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।”

সপ্তম অধ্যায়টি রাজাদেব জ্ঞত। এই অধ্যায়টি পাঠ করিলে জানা যায়, সভ্যতাব কতটা উচ্চ ধাপে ভারত এক সময়ে উপনীত হইয়াছিল;—এই হিসাবে আমাদের নিকট এই অধ্যায়েব সমধিক গুরুত্ব। এই সংহিতার প্রতিপত্তি ও প্রামাণিকতার প্রভাব এতটা বেশী ছিল যে রাজারা বাধ্য হইয়া উহা হইতে রাজধর্ম শিক্ষা করিতেন। “রাজার দেবদত্ত অধিকার” এই বীজমন্ত্রটি এই অধ্যায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়; বহুকাল পবে এই মন্ত্রটি এবং রাজার অভিব্যেক-অমুষ্ঠান পাশ্চাত্যধর্মেব আখ্যেবা গ্রহণ করে। (২ শ্লোক)—“যথাবিহিত উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া যথাক্রমে আপন আপন প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ কবা রাজার কর্তব্য।” (৩)—“ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের—এই অষ্ট দিক্‌পালের সাবভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।” (১৪)—“বাজার হিতার্থেই ঈশ্বর পূর্বকালে, সর্বপ্রাণীর রক্ষাকর্তা ধর্মস্বরূপ আত্মজ ব্রহ্মতেজোময় দণ্ডকে সৃষ্টি

করিয়াছিলেন।” (১৯)—“সেই দণ্ড যদি সম্যক্ বিবেচিত হইয়া ধৃত হয়, তবে প্রজাসমুদয় সুখে থাকে; পরন্তু অন্যথা হইলে, অর্থাৎ অবিচার পূর্বক সেই দণ্ড বিহিত হইলে, সকলকেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়।” (২০)—“যদি রাজা অনলস থাকিয়া দণ্ডনীরেব প্রতি দণ্ডবিধান না করিতেন, তাহা হইলে জলহিত মৎস্তেব জ্ঞায়, চরল জনেবা বলবানেব বধ্য হইত।” (২৫)—“যে স্থলে জ্ঞানবর্ণ আরক্ত-লোচন দণ্ড, পাপবিনাশার্থ বিচরণ কবে এবং দণ্ডবিধাতা সর্ববিষয়ে জায়দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, প্রজাবা তথায় কদাচ কাতর হয় না।” (৩০)—“মূর্থ, লোভপর, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন মন্ত্রপুরোহিতাদিসহায়শূত্র এবং ভোগাসক্ত নরপতি কদাচ যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।” (৩১)—“পবিত্রপ্রকৃতি বিশুদ্ধাত্মা, সত্য-প্রতিজ্ঞ, বেদাদিশাস্ত্রামুষ্ঠায়ী এবং সুবুদ্ধি নরপতি সুমন্ত্রিসহ যথানিয়মে দণ্ডবিধান কবিত্তে সমর্থ হন।” (৩৮)—“ঈহাদের দেহ-মন অতি পবিত্র, এবমুত বেদজ্ঞ ধর্মবুদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সর্বদা সেবা করা রাজার কর্তব্য। কারণ, যে রাজা বৃদ্ধসেবায় সদা নিরত;—তিনি ব্রাহ্মসদিগেব দ্বারাও পূজিত হইয়া থাকেন।” (৩৯)—“স্বভাবসিদ্ধ নিজ সুবুদ্ধিগুণে এবং শাস্ত্রাধ্যয়নগুণে রাজা বিনীত হইলেও সর্বদা ঐ বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণগণসমীপে বিনয় শিক্ষা করা তাঁহার কর্তব্য; কাবণ, বিনীত রাজা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হন না।” (৪৪)—“চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ কবিবার নিমিত্ত রাজাব দৃঢ়রূপে যত্নবান হওয়া আবশ্যক; কাবণ, সম্পূর্ণ ক্ষিতেন্দ্রিয় রাজাই কেবল প্রজাগণকে নিজ কর্তব্যাসক্ত বাধিতে পারেন।” (৫০)—“দশবিধ কামজ দোষেব মধ্যে সুরাপান, পাশক্রৌড়া, স্ত্রীলোকে আসক্তি এবং মৃগয়া—এই চারিটি যৎপনোনাশ্তি কষ্টজনক বলিয়া রাজাব জানা উচিত।” (৫১)—“ক্রোধজ অষ্টবিধ দোষের মধ্যে নিষ্ঠুর কথন, প্রাপ্য ধনে প্রবঞ্চনা করা এবং নির্ধাত প্রহাব—এই তিনটি রাজার নিত্য অনর্থকব বলিয়া জানা উচিত।” (৫৩)—“ক্রোধজ কিংবা কামজ দোষ মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কষ্টজনক; কাবণ দেহান্তে, কাম-ক্রোধজ-দোষাসক্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ক্রমে নিরয়গামী হয়; কিন্তু নির্দোষ নর, দেহান্তে স্বর্গগামী হইয়া থাকে।”

(৮০)—“শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বৎসরান্তে রাজা প্রজাবর্গের নিকট হইতে বিশ্বস্ত কর্মচারী দ্বারা কব সংগ্রহ কবিবেন। অধীনস্থ সমস্ত প্রজাবর্গের উপর পিতৃব্য ব্যবহার কবিবেন।” যে যুগে, রাজা ও ক্ষত্রিয়বর্গকে এই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, পণ্ডিতবর Deguigne সেই যুগকে, “বর্ষব ও দস্যব যুগ” বলিয়া কি না অভিহিত কবিয়াছেন! (৯০)—“পরস্পর যুদ্ধকালে কুটিল অর্থাৎ গুপ্ত বিষাক্ত বাণ, কর্ণাকার ফলকযুক্ত বাণ অগ্নিপ্রদৌষ্টান্ত কাছাকেও প্রহার করা বিধেয় নহে।” (৯১)—“বধ পরিত্যাগ পূর্বক স্থলারুঢ়, নপুংসক, প্রাণভয়ে রুতাজ্জলি, মুক্তকেশে পলায়মান, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আসনোপবিষ্ট, অথবা যে ‘আমি তোমার’ এই কথা বলে—একপ শত্রু কদাপি বধা নহে।” (৯২)—“বর্ষহীন, নিবৃত্ত, নিদ্রিত, উলঙ্গ, যুদ্ধবিয়থ, কেবলমাত্র দর্শনার্থ সমাগত এবং অন্তের সহিত যুদ্ধে আসক্ত—এ কয়েক ব্যক্তিও ঘোড়ার অবধা।” (৯৩)—“ভগ্নাস্ত্র, পুত্রশোকে কাতর, শত্রুবাণে জর্জর কলবব, যুদ্ধভয়ে ভীত এবং রণপবাস্থ—ইহা সর্বাঙ্গ রাজার নিত্যন্ত অবধা।”

আমরা বিশ্বমানবের উচ্ছেদকল্পে যতপ্রকার ভীষণ সাংঘাতিক উপায় আবিষ্কার করিতে পারি, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির সমস্ত উত্তম সেইদিকেই উদ্ভূত হইয়া আছে,—সেই আমরা কি সবল-অস্ত্রকরণে বলিতে পারি, আমাদের যুগের সভ্যতা, পুরাতন সভ্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট? শেষে শেষে যে সব যুরোপীয় যুদ্ধ হইয়াছিল সেই সব যুদ্ধ—রুস্‌সৈন্য ধ্বংস কবিস্থ জন্ত প্রথম নেপোলিয়ান যখন বরফের উপর দিয়া কামান টানিয়া লইয়া যান সেই সময়ের যুদ্ধ, স্পেনের ‘গেরিলা’-যুদ্ধ, তুর্ক-রুসের যুদ্ধ, আলেকজান্দ্রিয়া নগরের উপর গোলাবর্ষণ,—এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে, যাহার দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয় যে আমরা আবার বর্ষব-অবস্থায় কিবিয়া আসিয়াছি।

নিম্নলিখিত স্বতঃসিদ্ধ নীতিসূত্রটি সর্বকালের জন্ত সত্য। (১২৩)—“রক্ষণার্থ নিয়োজিত রাজভৃত্যগণ প্রায় অধিকাংশই পরস্বাপহারী এবং প্রবঞ্চক হইয়া থাকে; অতএব সবিশেষ যত্নসহকারে তাহাদের উপদ্রব হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য কর্ম।”

(১৩৭)—“সামান্য বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকাব্যী, অতি সামান্যবস্ত্র প্রজাদের নিকট হইতেও বাৎসবিক কর-স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ রাজ্যের গ্রহণ করা কর্তব্য।” (১৩৮)—“কারু-কর্মকারী, শিল্পকব, দাস, দাসী, অথবা যাহা বা কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কবে, তাহাদিগের দ্বারা রাজা মাসিক একদিন করিয়া নিজ কার্য কবাইয়া লইবেন।” ইহাষ্ট্র ব্যব্যবিনয় পদ্ধতিব গোড়া—আজিকার দিনেও যাহার প্রয়োগ দেখা যায়। (১৪৪)—“সর্বধর্মীপেক্ষা প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম; শাস্ত্রোক্ত-করাদিভোক্তা রাজা সর্বতোভাবে তৎপ্রতিপালনে বাধ্য।” (২০৩)—“বিজিত-রাজ্যবাসীদিগের দেশচার ও গুণকবম্পর্বাগত শাসনপ্রণালী, নিজদেশোচাব বিকল্প হইলেও যদি ধর্মসঙ্গত হয়, তবে তাহাই তথায় প্রচলিত বাধা আবশ্যক এবং রত্নাদি উৎকৃষ্ট দ্রব্য দান দ্বারা তত্রতা অভিযুক্ত রাজা ও তদমাত্যবর্গের পবিত্রতা সাধন করা রাজ্যের কর্তব্য।” (২১১)—“আর্যতা, পুরুষজ্ঞান, শৌর্য, করুণবেদিতা, দানশৌণ্ডতা—এই সকল ধর্ম রাজাদের অঙ্গকার।”

অষ্টম অধ্যায়টি বিচারকর্তাদিগের জন্ত। নিম্নলিখিত হৃদয় নীতিসূত্রটি এই অধ্যায়ের আরম্ভ ভাগেই আছে। (১৭)—“ধর্মই জীবের একমাত্র স্নহৎ—মৃত্যুব পরেও ধর্ম আমাদের অমুগামী হয়, আর সমস্তই দেহের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়।” ইহাতে যে সকল অসংখ্য স্বত্বাধিকারের মূলসূত্র আছে, তাহাব মধ্যে কতকগুলি এখনও আমাদের ব্যবস্থাসংহিতার মধ্যে বলবৎ রহিয়াছে।

(২৭)—“পিতৃমাতৃবিহীন অনাথ বালকের ধন, রাজা নিজে তাবৎকালের জন্ত রক্ষা কবিবেন, যাবৎ বালক গুরুকুল হইতে গৃহস্থশ্রমে সমাবৃত্ত না হয়, অথবা যে পর্যন্ত না সে অতীতশৈশব হয়।” (২৮)—“বন্ধ্যাত্ত্রী, যাহার স্বামী দাবাস্তর পরিগ্রহ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন-নির্বাহোপযোগী ধন দিয়া তাহাকে ক্ষান্ত কবিয়াছে; পুত্রহিত প্রোষিত-ভর্তৃকা; যে স্ত্রীব সপিণ্ডাদি অভিভাবক কেহ নাই এবং সাধ্বী; বিষবা ও বোগিণী স্ত্রী—ইহাদের ধন, অনাথ-বালকের ধনের স্থায় রাজা রক্ষা কবিবেন।” (৩০)—“অজ্ঞাত-স্বামীক ধন পাইলে, রাজা সর্বত্র উহা প্রকাশ্য ঘোষণা

কবিয়া তিন বৎসব পর্যন্ত আত্মকোষে স্থাপিত রাখিবেন। তিন বৎসবের মধ্যে ধনস্বামী আগত হইলে ঐ ধন সে পাইবে। ঐ সময় অতীত হইলে, রাজা নিজ কার্যে ঐধনের নিয়োগ করিবেন।” (৬৪)—“যাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ আছে, যাহারা মিত্র, যাহারা সাহায্যকারী ভৃত্যাদি, যাহারা শত্রু, যাহাদের কুটসাক্ষিত্ব পূর্বে জানা গিয়াছে এবং যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত বা মহাপাতকাদি দোষে দূষিত—ইহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয়।” (৬৫)—“রাজাকে সাক্ষী করিবে না। (৬৬)—“একমাত্র ব্যক্তিকে সাক্ষী করিবে না।”

মিথ্যা সাক্ষ্য, মহাপাতকের সামিল। (৯০)—“হে ভদ্র! অম্মাবধি তুমি যে কিছু পুণ্য অর্জন করিয়াছ, সে সমুদয় পুণ্য কুকুরে গমন করিবে—যদি তুমি সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বল। (৯১)—“তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি একাকী আছ, কিন্তু তাহা নহে—পাপপুণ্যের দ্রষ্টা সর্বজ্ঞ যিনি এই পবমাত্মা নিত্য তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।” (৯২)—“এই বৈবস্বত দেব তোমাব হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তুমি সত্য করিলে তাঁহার সহিত তোমাব কোন বিবাদ থাকিবে না এবং তাঁহার সহিত নির্বিবাদে অবস্থান করিলে গঙ্গা বা কুরুক্ষেত্রগমনে কোন প্রয়োজন হয় না।”

(৮৪)—“আত্মাই আত্মাব সাক্ষী এবং আত্মাই আত্মাব গতি, মনুষ্যদিগেব এমন যে উত্তম সাক্ষী স্বকীয় আত্মা, তাহাকে অবমাননা করিবে না।” (১৫২)—“শাস্ত্রানুসারে অধিক হারে স্তূদ লওয়া সিদ্ধ নহে; একপ অধিক হারে স্তূদ গ্রহণকে পণ্ডিতেরা কুসীদপথ বলিয়া নিন্দা করেন। উত্তমর্ণ একপ স্তূদ শতকবা পাঁচের উর্দ্ধ লইতে পারে না।” (১৬৮)—“বলপূর্বক যাহা কিছু দত্ত হয়, বলপূর্বক যাহা কিছু ভুক্ত হয়, বলপূর্বক যাহা কিছু লেখিত হয়, বলপূর্বক যাহা কিছু ঋণ হয়, সকলই অকৃত বা অসিদ্ধ, এই কথা মনুষ্য বলিয়াছেন।”

(২২৬)—“বিবাহ বিষয়ে যে সকল মন্ত্র আছে, উহা কেবল কস্তার প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে—কুত্রাপি অকস্তা স্ত্রীলোকের প্রতি বিহিত নহে;—কারণ তাহাবা ধর্ম-ক্রিয়াব বহির্ভূত।” (২২৭)—“বৈবাহিক মন্ত্র সকলই ভাধ্যাত্মের নিশ্চয় কারণ এবং ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা কস্তাব

সপ্তপদী গমন হইলে ভাধ্যাত্মের সমাপ্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন।” (৩১২)—“যিনি আত্মহিত কামনা করেন সেই রাজা অর্থীপ্রত্যাধিগের এবং বালক, বৃদ্ধ ও আতুর্দিগের আক্ষেপোক্তি কটুক্তি ক্ষমা করিবেন।” (৩১৩)—“পীড়িত অবস্থায়, লোকে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করে যে রাজা অমান ভাবে তাহা সহ্য করেন, তিনি স্বর্গেও পূজা প্রাপ্ত হন; পবস্ত যিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ক্রিষ্টের কটুক্তি ক্ষমা না করেন, তিনি নরকগামী হন।” নিম্নলিখিত নীতিশ্লোকটির দ্বারা ইহাই স্থচিত হইতেছে যে, কোন অপরাধী, সামাজিক সোপানে যত উন্নত স্থান অধিকার করে, ততই কঠোররূপে সে দণ্ডনীয়। (৩৩৭)—“চৌধুর গুণদোষজ্ঞ শূদ্র চুরি করিলে সে বিহিত দণ্ডেব অষ্টগুণ দণ্ডনীয়, তাদৃশ বৈশ্য চোর ষোড়শগুণ দণ্ডনীয় এবং ঐরূপ ক্ষত্রিয় চোরের বত্রিশগুণ দণ্ড হইবে।” (৩৩৮)—“যে অপরাধে অস্ত্র প্রাকৃত জনের একপ দণ্ড হইবে, রাজা স্বয়ং যদি সেই অপরাধ করেন, তবে তাঁহার সহস্রগুণ দণ্ড হইবে—ইহাই ধর্ম ব্যবস্থা।”

নিম্নলিখিত বচনে, আত্মরক্ষাব অধিকার সমর্থিত হইয়াছে (৩৫০)—“শুদ্র, বালক, বৃদ্ধ বা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ—যেকোন হউক না কেন, বধ কবিলেব অস্ত্র ভ্রাগত হইলে এবং অস্ত্র কোন আত্মরক্ষার উপায় না থাকিলে, কোন বিচার না করিয়াই উহাদিগকে বধ করিতে পারে।” (৩৪৯)—“আত্মরক্ষার্থে, স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণের বক্ষার্থে, ধর্ম্য লোকহিংসা কবিলে দোষভাগী হইতে হয় না।” (৩৫১)—“প্রকাশ বা অপ্রকাশভাবেই হউক আততায়ী-বধে হস্তাব কিছুই দোষ হয় না; মনুষ্য মনুষ্যতেই গমন করে।” (৩৫২)—“পরদার-সন্তোষে প্রবৃত্ত মনুষ্যদিগকে রাজা নানাবিধ উদ্বেগজনক নাসাকর্ণচ্ছেদাদি দণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বহিস্কৃত করিবেন। (৩৫৩)—“পরদাব-সন্তোষে লোকমধ্যে বর্ষসংখ্য উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে অধর্ম ও তাহা হইতে সর্বনাশ ঘটে।”

(৩৯৪)—“অন্ধ, জড়, ভয়শীল, সপ্ততিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ এবং ধনধাত্মাদি দ্বাবা যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয়ের সর্বদা উপকার

কবেন—ইহাদের নিকট হইতে রাজা কোন কর লইবেন না ।

(৩৯৫)—“বিজ্ঞাচাবসম্পন্ন, ব্যাধিত, আর্জ, বালক, বৃদ্ধ, অকিঞ্চন, মহাকুলীন, আৰ্য্য—ইহাদিগকে রাজা দান-মানাদি সম্মাননা করিবেন।”—দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, বৈশ্ব ও শূদ্রজাতির ধর্মাদি নবম অধ্যায়ের বিষয় । ইহাব মধ্যে অনেকগুলি নীতিমূলক জীলোকের প্রতি প্রযুক্ত্য এবং ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, হিন্দুবা জীলোককে সম্মান করিত, নির্ভুবাচরণ হইতে জীলোককে রক্ষা করিত, এবং যাবৎ সাধবী ও শুদ্ধচরিত্রা থাকিত, তাবৎ তাহাদিগকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত । তা ছাড়া, পবে আমরা দেখাইব, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে, জীলোক নিজে প্রকাশ্যভাবে কাজকর্মে প্রবৃত্ত হইত, ধর্মসম্ব গঠন করিত, প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিত, দরিদ্র ও আর্জদিগের সেবা করিত ।

(১০ শ্লোক)—“কেহ কখন বলপূর্ব্বক কোন জীকে সংপথে বন্ধা করিতে পাবে না।” এবং ইহার পরেই মনু ইহার সহিত একটি তাত্ত্বিক ভাষ্য যোগ করিয়া দিয়াছেন (১২) “আপ্ত পুরুষদিগের দ্বারা গৃহে রুদ্ধা হইলেও রমণীবা অবক্ষিতা । যে আপনাকে আপনি রক্ষা করে সেই সুবক্ষিতা ।” (২৬)—“গৃহদ্বীপ্তিকারিণী নাথীগণ, সন্তান উৎপাদনার্থ বহুকল্যাণভাজন ও পূজার্হ ; একাধা, গৃহমধ্যে জীতে ও প্রীতে কোন বিশেষ নাই ।” (৪৫)—“মহুয়া, পুত্রকলত্রসহযোগে সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় । বিপ্রেবা বলেন, যে ভর্তা সেই ভাৰ্য্যা ; তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ।” (৮৯)—“ঋতুবতী হইয়াও কল্পা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে—ইহাও শ্রেয়তাপি তাহাকে নিগুণ পাত্রে সমর্পণ করিবে না ।”

(১০১)—“সংক্ষেপতঃ, মবণাবধি পরম্পর অব্যভিচার-বন্ধায় অবস্থান করাই জীপুরুষের পবম ধর্ম্য ।” (১০২) “বিবাহিত জী ও পুরুষ পবম্পর কোন মতে বিযুক্ত না হইয়া বাহাতে কোনরূপে ব্যভিচার না করেন, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা কর্তব্য ।”

সাধারণতঃ, উত্তরাধিকাবেব নিয়ম অনুসারে, পরিবাবের অন্তর্ভুক্ত সকল সন্তানেব মধ্যেই ধনসম্পত্তি সমানরূপে

বিভাগ করা বিধেয় । কিন্তু (২০১)—“ক্লীব, পতিত, জন্মান্ত, জন্মবধির, উন্নত, জড়, মুক এবং কাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শূন্য ব্যক্তিগণ পিতাদি ধনে অধিকারী নহে ।”

(২০২)—“ধনাধিকারীরা ঐ সকল ক্লীব প্রভৃতিতে তায়া গ্রাসাচ্ছাদন দিবে ; যদি না দেয়, তবে তাহারা পাপী হইবে ।” (২১৩)—“যে জ্যেষ্ঠ লোভ বশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা-দিগকে বঞ্চনা করে, সে জ্যেষ্ঠোচিত মানার্ন নহে—পবস্ত রাজগণ কর্তৃক সে দণ্ডনীয় ।” (২০০)—“ভর্তার জীব-দশায় জীলোক যে অলঙ্কার ধারণ করে, ভর্তার মবণোত্তর পুত্রাদি দায়াদেরা জীলোক জীবিত থাকিতে তাহা ভাগ করিতে পারিবে না ; যদি করে, তবে পাপী হয় ।”

এই দেখ, দ্যুতক্রীড়া সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা আছে । পাশা, বাজির খেলা, বাজি রাখিরা মেঘ কুছুটাদির লড়াই, এই সমস্ত নিষিদ্ধ । কি প্রকাশ্যে, কি গোপনে যাহারা জুয়া খেলে, তাহাদিগের প্রতি শারীরিক দণ্ড বিধান করা হয় ; যে হেতু জুয়াখেলায় ঘেব, ক্রোধাদি উত্তেজিত হয়, অতএব ঐ সকল খেলা আশ্রয় করিয়াও খেলিতে নাই ।

(২২১)—“রাজা, রাজ্য হইতে দ্যুতক্রীড়া ও সমাহবয় নিবারণ করিবেন । এই দুই দোষ রাজাদিগের রাজ্য-নাশক ।” (২২২)—“দ্যুত ও সমাহবয় প্রকাশ্য চৌর্য্যমাত্র ; এজন্ত ইহাদের নিবারণে রাজা নিত্য যত্ববান থাকিবেন ।” (২২৫)—“কিতব অর্থাৎ দ্যুত-সমাহবয় কর্তা, নটবৃন্দজীবী, ক্রুরচেষ্ঠ, চৌবাদি, বেদবিদেবী, পরধর্ম্মবত এবং শৌণ্ডিকা-দিকে পুরের ভিতর বাস করিতে দিবে না ।” যে সকল আধুনিক সভাদেশ পুরাতন সভাদেশের আইনাদি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কিংবা অবজ্ঞাকারী, সেই সকল আধুনিক সভ্য-দেশের আইনাদির সহিত পুরাতন সভাদেশের আইনাদির যদি তুলনা করি এবং তাহা হইতে একটা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করি, তাহা হইলে সে সিদ্ধান্তটি আধুনিক সভ্যদেশ-সমূহের পক্ষে একটু মর্ম্মভেদী হইবে সন্দেহ নাই ।

নিম্নলিখিত কতকগুলি বিধিব্যবস্থা যেন বর্তমান কালের বিধিব্যবস্থা বলিয়া মনে হয় । (২৩১)—“প্রাড়ুবিবা-কাদি বাজনিযুক্ত পুরুষেরা ধনলোভে বিকৃত হইয়া উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক যদি অর্থ-প্রত্যর্থীর কার্য্য নষ্ট করে, তবে

বাজা উহাদিগকে একেবারে সর্বস্বান্ত করিবেন।” এই বচনটিতে বিচার্য বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে :—(২৩৩)—

“ব্যবহার সম্বন্ধে কোন পক্ষকে সং বা অসং বলিয়া সভ্যবা যাহাকে একবার ধাৰ্য্য করিয়াছেন, অথবা যে দণ্ড ধাৰ্য্য হইয়াছে তাহা ধর্ম্মতই করা হইয়াছে—এই বোধে তদ্বিষয়ের আর পুনর্বার আলোচনা করিবে না।” (২৪৩)—“সাদু বাজা, মহাপাতকীর ধন কদাচ গ্রহণ করিবেন না; লোভ বশতঃ এইরূপ করিলে, ঐ মহাপাতক সংযুক্ত হইতে হয়।”

(২৫৬)—“রাজা চার-পুত্র দ্বারা প্রকাশ এবং অপ্ৰকাশ—পবদ্রব্যাপহাবক হই প্রকাব চোর অবগত হইবেন।”

(২৫৮-৬০)—“উৎকোচগ্রহণকারী, মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করাইয়া পরধনহারী, বঞ্চনাকাবী, দ্যুতক্রীড়াকারী কিতব, ‘তোমার ধনপুত্র লক্ষ্মীলাভ হইবে’—এইরূপ মিথ্যাবাক্যে তোষামোদকাবী—মদলাদেশবৃত্ত, ভিতরে পাপ গোপন করিয়া বাহ্যে ভদ্রবেশে পরধনহারী, যাহারা ঈক্ষণিক অর্থাৎ হস্তের রেখা দেখিয়া শুভাশুভ ফল বলিয়া জীবিকা

নির্ভর করে, অশিক্ষিত মহামাত্র অর্থাৎ মাহত ও চিকিৎসক, যাহাবা শিল্পোপায়ে উৎসাহ দিয়া লোকের ধন হরণ করে;

বর্ষীকরণাদি কার্য্যানিপুণ এবং বেঙ্গা-জীলোক—ইহারা প্রকাশ্য লোককণ্টক জ্ঞানিবে; ইহাদিগের এবং স্বিজবেশ-ধারী শূদ্র প্রভৃতির বিষয় রাজা চার দ্বারা অবগত হইবেন।”

নিম্নলিখিত বচনটি একটি বিবেচ্য বিষয় :—(২৮৪)—

“চিকিৎসকেরা যদি মিথ্যা চিকিৎসা কবে, তবে গবাদি পশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে তাহাদের প্রথম সাহস দণ্ড এবং মানুষ-চিকিৎসা সম্বন্ধে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে।”

(৩২৪)—“রাজা ঐরূপে সদা রাজধর্ম্মে যুক্ত হইয়া সমুদয় ভৃত্যদিগকে লোকের হিতার্থে নিয়োগ করিবেন।”

হুং হুর্দশাব সময়ে প্রত্যেক বর্ণের কিরূপ কর্তব্য তাহা দশম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। যে হুর্ভিক্ষে ভাবত উৎসন্ন হইতেছে সেই হুর্ভিক্ষের কথা ভাবিলে, এই সকল কর্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। বর্ণসঙ্কর-জাত সন্তানের অবস্থা সম্বন্ধেও এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। (৬২)

—“পুরস্কার প্রত্যাশা না করিয়া গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী এবং বালক—ইহাদের মধ্যে কাহারও বিপৎ পরিত্রাণের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করা, প্রতিলোমজ্ঞ জাতির স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ

হইয়া থাকে।” (৬৩)—“অহিংসা, সত্যবাক্যকথন, শুচিস্ব এবং ইন্দ্রিয়সংযম—এই কয়েকটি ধর্ম্ম সর্ব-সাধাবণের—চাতুর্ক্যের্যে ও সংকীর্ণজাতির অন্তর্গত বলিয়া মহাত্মা মনু নির্দেশ করিয়াছেন।”

(১১৭)—“ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের কদাচিৎ ক্ষুদ্র গ্রহণ পূর্ব্বক ঋণদান কর্তব্য নহে।” ইহাব টীকা করা বাহুল্য।

একাদশ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তাদির কথা আছে।

(৯)—“নিজের পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ গ্রাসাচ্ছাদনেব কষ্ট পাইতেছে, অথচ পবকে দান করিবার বেলা যাহার শক্তির ত্রুটি নাই,—তাহার সেই দানধর্ম্ম ধর্ম্মের ছানামাত্র, উহা আপাতত মধুব বটে, কিন্তু উহার পবিণাম বিষময়।” (১০)—“ভরণীয়গণকে বঞ্চিত করিয়া যিনি পারলৌকিক ধর্ম্মবুদ্ধিতে যে দান করেন, তাহাব অশুভকর পরিণাম তিনি জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও ভোগ করেন।”

কতকগুলি পাপকে মনু মহাপাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সকলের উপর—ব্রহ্মহত্যা, মত্তপান, ব্রাহ্মণের ধনাপহরণ মহাপাপ। গুরুপত্নী প্রভৃতির সহিত ব্যভিচারও মহাপাপ। অস্তায় পূর্ব্বক গুরুব অপবাদ করা, বেদের অবমাননা, মিথ্যাসাক্ষী দেওয়া, মিত্রকে বধ করা, সহোদরা গমন, অসবর্ণা স্ত্রীতে গমন, মিত্রপত্নী গমন—এই সকলও মহাপাপ। গোহত্যা, আত্মবিক্রয়, ব্যভিচার, গুরু পবিত্যাগ, পিতৃমাতৃ পবিত্যাগ, পুত্রের প্রতি অবহেলা, বালিকার ধর্ম্মনাশ, কুসীদগ্রহণ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, স্বজন পরিত্যাগ, ঋণ পরিশোধ না করা, অধর্ম্মজনক গ্রন্থাদি পাঠ করা, পবকালে অবিস্থান, মৃত্যুর পর দণ্ড পুরস্কাবে অবিস্থান—এই সকল মধ্যম শ্রেণীর মহাপাপ।

গর্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, হবিণ, হস্তী, ছাগ, মেঘ, মৎস্ত, সর্প ও মহিষ হত্যা করিলে অসবর্ণজাত লোকের জ্ঞান পতিত হইতে হয়। কীট, পতঙ্গ, পক্ষী হত্যা করিলে, বনের ফল অপহরণ করিলে, ভীকৃত্য প্রদর্শন করিলে অশুচি হইতে হয়।

স্বরাপারী ব্রাহ্মণ জাতিচ্যুতি দণ্ডে দণ্ডনীয়। (৯৭)—“ব্রাহ্মণ মত্তপানে মত্ত হইয়া অশুচি স্থানেই পড়ে—গোপনীয় বেদবাক্যই বলিয়া ফেলে, অথবা অপরাপের অকার্য্যই বা

করে,—ইহার কিছুই বলা যায় না; অতএব ব্রাহ্মণের মস্তপান কদাপি উচিত হয় না। বাহাব কায়গত ব্রহ্ম একবারও মস্ত দ্বারা আশ্রিত হয়, তাঁহার ব্রহ্মণ্য দূবীভূত হয় এবং তিনি শূদ্রের প্রাপ্ত হন।”

এই দেখে নিম্নলিখিত বচনে আত্মদোষ স্বীকার ও অমৃত্যুতাপের কথা আছে। (২৩৯)—“লোক সমাজে নিজের পাপ জ্ঞাপন, পাপের জন্ত অমৃত্যুতাপ, তপস্তা ও অধ্যয়ন দ্বারা পাপকারী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং আপন পক্ষে দানের দ্বারাও পাপের নিষ্কৃতি হয়।” (২৪০)—“যাহা কিছু ছন্দ, যাহা কিছু হস্তাশ্রয়, সমুদায়ই তপস্তাসাধ্য; তপস্তাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।” (২৪১)—“ব্রহ্মহত্যা দি মহাপাতকীরা এবং অপবাপর অকার্য্য-কারীরা স্নতপ্ত তপস্তা দ্বারাই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়।” (২৪২)—“লোক সকল কায়মনোবাক্যে যে কিছু পাপ করে, তপোদানেরা তপোবলে তাহা শীঘ্র দম্ব করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ অধ্যায়টি মনুসংহিতার মাধার মুকুট। এই অধ্যায়ে, আত্মাব অমবদ্ব, মনুষ্য পাপকর্ম্মফলে যে যে বোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং অন্তিম মোক্ষ—এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকা প্রযুক্ত মানুষ, আপন আপন শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ ক্তবে। ফলতঃ মনই জীবগণের সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক—কায়মনোবাক্যে দ্বারা সেই কার্য্য অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে। (৫)—“পরের দ্রব্য অস্বাভাবিক প্রকারে লইব এই চিন্তা, মনদ্বারা অনিষ্ট চিন্তা, পরলোক নাই—দেহই আত্মা,—এইরূপ বিতথ অভিনিবেশ,—এই ত্রিবিধ অশুভদায়ক মানস কর্ম্ম।” (৬)—“পক্ষ্যবাক্য; মিথ্যাবাক্য; পরোক্ষে পরের দোষ কথন; রাজার, দেশের বা পুরাদি সম্বন্ধীয় নিপ্ত্রয়োজন অসদ্বন্ধ প্রলাপ—এই চতুর্বিধ অশুভকর বাচিক কর্ম্ম।” (৭)—“অদত্ত-ধন গ্রহণ, অর্থে হিংসা, পরদারসেবা—এই ত্রিবিধ শারীরিক অশুভ কর্ম্ম।” (৮)—“দেহী মানস-শুভাশুভ কর্ম্মের ফল মনদ্বারাই ভোগ করে, বাচিক কর্ম্মের ফল বাক্যের দ্বারা, এবং শরীর-কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল, শরীর দ্বারাই ভোগ করে।” (২৪)—“সদ্ব, রজ ও তম—এই তিনটি মহত্ত্ব নামক আত্মার গুণ

জানিবে। এই তিন গুণ ব্যাপ্ত থাকিয়া স্বাবর জন্মমরুপ তাবৎ পদার্থে অবস্থান করিতেছে।” (২৬)—“সব্ধে জ্ঞান লক্ষিত হয়।”

(৮৩)—“বেদাভ্যাস, তপস্তা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা—এই সকল কর্ম্ম মোক্ষসাধন। এই সকল মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; উহা সকল বিস্তার মধ্যে প্রধান এবং উহা হইতেই মোক্ষ লাভ হয়।” (১০৩)—“অজ্ঞ লোক অপেক্ষা, গ্রহেব অধ্যোতা শ্রেষ্ঠ, গ্রহের কেবলমাত্র অধ্যোতা অপেক্ষা যিনি গ্রহোত্তর বিষয় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ; ধাবণকারীর অপেক্ষা বাহার তাহাতে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী অপেক্ষা যিনি সেই জ্ঞানানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ।”

(১০৪)—“তপস্তা ও আত্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের প্রথম মোক্ষ-সাধন। তপস্তাদ্বারা পাপ নষ্ট হয় এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়।”

(১১৪)—“যাহাদের কোন ব্রত নাই—যাহাদের বেদা-ধ্যয়ন নাই, যাহারা জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ—এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইলেও তাহাতে পরিষদ্ব নাই জানিবের সেই পরিষদের উপদেশ গ্রাহ্য হইতে পাবে না।”

(১১৮)—“সমুদয় সদসন্ময় জগৎ—ধানস্ব হইয়া—পরমাত্মাতে অবস্থিত দেখিবে। যিনি আত্মাতে সমুদয় দর্শন করেন, তাঁহার মন অর্ধেক কথন ধাবিত হয় না।”

(১২২)—“পশ্চাৎ সকলের শাস্তা, অণু হইতেও অণু, প্রকাশস্বরূপ, স্বপ্নধীগম্য সেই পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে।” (১২৪)—“এই পবমাত্মাই পৃথিব্যাদি পঞ্চমূর্ত্তি দ্বারা সমুদয় প্রাণী ব্যাপিয়া, বুদ্ধি ও নাশ দ্বারা এই সংসার প্রবর্ত্তিত করিতেছেন।” (১২৫)—“এইরূপে যিনি আত্মা দ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তিনি সর্ব্বসমতা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ ব্রহ্মকে লাভ করেন।”

ইহাই মানবধর্ম্মশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সার। এই চমৎকার জনক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ব্রাহ্মণিক ভারতের গোবব বর্দ্ধন করিয়াছে এবং এই গ্রন্থখানি এখনও ব্রাহ্মণিক ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে বিরাজমান। বিশ্বমানব এযাবৎ ইহা অপেক্ষা সুন্দর স্বপ্নের পূর্ণ আদর্শ কল্পনা করিতে পারে নাই। মনস্তত্ত্বের দিক্

দিয়া দেখিতে গেলে,—মহুসংহিতার ঈশ্বরের যে সুন্দর স্বরূপ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় সেরূপ আব কোথাও নাই; নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে,—তপস্শা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, আত্মসংযম, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানধর্ম, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, অনিষ্টকারীর প্রতি সাধু আচরণ, অতি অধম জীবের প্রতিও অহিংসা—এই সকল উপদেশ অতীব প্লাম্য; বুদ্ধির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, উহাতে জ্ঞানবিজ্ঞানেরই সর্বপ্রাধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। জট্টিনিয়ানের ব্যবস্থাসংহিতা এবং যে দেওয়ানি আইনের সংহিতা অধুনা আমাদের মধ্যে প্রচলিত, উভয়ই যে “মানব-ধর্মের” বচন সমূহ হইতে গৃহীত, তাহা তুলনাব দ্বারা অনায়াসে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। আমার এই গ্রন্থের যেরূপ সংকীর্ণ পরিসর, তাহাতে ঐরূপ তুলনা করিয়া দেখান আমাব পক্ষে অসম্ভব। আমি এখন কেবল (Burnouf) বুনুফ হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত কবিয়া এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাব পরিসরনাশ্চি কবিব। ইহা অপেক্ষা ভাল উপসংহার আর কিছুই হইতে পারে না। বুনুফ লিখিয়াছেন :—“মহুব ব্যবস্থাস্থলি যেভাবে অনুপ্রাণিত, তাহা দুইটি কথায় সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে :—দেহ শুদ্ধি ও মনঃ শুদ্ধি এবং মানুষ্যের মধ্যে উচ্চনীচ শ্রেণী বিভাগ...মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় কবিরাহিল, কিন্তু বর্ণভেদ প্রথা কিংবা আর্ধ্যধর্মকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যিক জাতি, মুসলমানজাতির সহিত যদি কিছু মিশিয়া থাকে—সে নিতান্তই অগুপরিমাণে। বহুকাল পূর্বে, ভারতবর্ষেই সমাজসংস্কারক বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্ম, ভাবতে সাম্যবাদ প্রচার করিয়া বর্ণভেদ প্রথাকে আক্রমণ করে; লোকের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ কবিলেও, শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার অনেক পরে, খৃষ্টধর্মের একটি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচাবে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণ্যিক ধর্মের খাতিরে কতকটা নিম্ন মত ত্যাগ করিয়া তবে সেই সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম প্রচারে কতকটা সফলতা লাভ করে। খৃষ্টধর্ম লোকের মনঃপুত না হওয়ায়, মহুর ধর্মব্যবস্থা আবার পূর্ণপ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও প্রাচ্যজাতি সম্বন্ধীয় যে সকল কথা যুরোপীয়দিগের পথের অন্তরায়—মহুসংহিতার প্রভূত নৈতিক বল তাহার মধ্যে একটি।”

ব্রাহ্মণ্যিক যুগের দার্শনিক সম্প্রদায় দুই বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত :—মীমাংসা ও সাংখ্য। বেদান্ত কিংবা মীমাংসাও আবার দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত :—উত্তর মীমাংসা ও পূর্ব মীমাংসা। নামের দ্বাবাই সূচিত হইতেছে—বেদান্ত এমন একটি ধর্মসিদ্ধান্ত যাহা বেদ বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্তের মতবাদ আধ্যাত্মিক।

এসিয়াটিক রিসার্চ গ্রন্থে, কোলব্রুক বলেন :—“বেদে যে সকল উপদেশ আছে, সেই সকল উপদেশের প্রামাণিকতা ও বলবত্তা স্থাপন ও বেদব্যাখ্যাব নিয়ম নির্ধারণ এবং সেই সকল নিয়ম হইতে যাহাতে একটা যুক্তিসাজ্ঞ গঠিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা—ইহাই মীমাংসা দর্শনের লক্ষ্য। বেদ যে গুহ্য ধর্মের শিক্ষা দেয় সেই গুহ্য ধর্মের ব্যাখ্যা করা, একটা অসম্ভব পূর্ণ রকমের অবস্থায় উপনীত হইবার জন্ত সেই ধর্মের সাধনা করা, ঈশ্বরের সহিত যোগ নিবদ্ধ করা—ইহাই বেদান্ত দর্শনের চরম লক্ষ্য।

পরব্রহ্মের অতীন্দ্রিয় একতা হইতে যাত্রা আবিস্ত করিয়া বেদান্ত, ক্রীবলিঙ্গ শব্দবাচক ব্রহ্মেব কল্পনায় উপনীত হইয়াছে। এই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ, নির্বিকার, নিত্য, নিরূপাধি, —সুতরাং সৃষ্ট জীবদিগের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া থাকে :—“তিনি একমাত্র আত্মা, স্বয়ম্ভূ, জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ; তিনি নিঃশব্দ, নিঃক্রিয়, তুমি আমি, তিনি—এইরূপ আশ্রয়বিহীন,—নির্কির্ষেব।”

এইরূপ অবস্থায়, ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে আত্মপ্রকাশার্থ আপনাকে সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন; তখন তিনি অনন্ত সত্তা হইতে নিঃসৃত হইয়া, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু ক্রীবলিঙ্গ ব্রহ্ম হইতে পুংলিঙ্গ ব্রহ্মা কিরূপে উৎপন্ন হইল? বৈদান্তিক সম্প্রদায়, মায়াতত্ত্বের অবতারণা করিয়া এই সমস্তার মীমাংসা করিয়াছেন। মায়, অথবা জড়প্রকৃতি; মায়ার অর্থে পরিমাণ বুঝায়—আকাশ বুঝায়। তাহার অনেক পরে, প্রোটো এই মতবাদকেই পরিপুষ্ট করিয়া ইহাফে Topos নামে অভিহিত করিলেন, Topos, কিনা—বিশ্ব-জননী, হ্রাসবুদ্ধির মহতী সম্ভাবনা। বিশ্বের আত্মা পরব্রহ্মই জীবনের মূল-উৎস;—সেই একমাত্র উৎস যাহা হইতে

সমস্ত নিঃসৃত হয় এবং যাহাতে সমস্ত পুনর্বীর প্রবেশ করে ; তিনি সেই জ্ঞান স্বরূপ, যাহার কণামাত্র জ্ঞান জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের “আমি” কিংবা অহঙ্কার। সেট জ্ঞান হইতেই, জীবের নিজস্ব, জীবের আমিত্ব ; সুতরাং এই আমিত্ব হইতেই জীবশ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে। ফলত, মায়ার দ্বারাই—মায়াময় জড়প্রকৃতিব দ্বারাই—পুংলিঙ্গ ব্রহ্মা, অসীমসত্তা ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পবমাস্তা, ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন ; জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়ীভূত মনঃ পরমাত্মারই একটা বিশেষ আকার এবং এই মন হইতেই জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের আমিত্ব উৎপন্ন ;—সুতরাং সমস্ত জীব ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন। জীবে যে পরিমাণে জ্ঞানের বিকাশ হয়, জীব যে পরিমাণে স্বীয় বুদ্ধিব প্রয়োগ কবিতে পাবে, সেই পরিমাণে জীব ব্রহ্মার নিকটবর্তী হইয়া থাকে। এই জীব শ্রেণীর মতবাদ হইতেই জাতির উৎপত্তিবাদ প্রসূত ; মনুর প্রথম অধ্যায়ে এই উৎপত্তিবাদের কথা আছে, ইহার অনেক পরে ডারুইন আবার সেই তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। মনুতে আছে :—“প্রত্যেক জীব পূর্ববর্তী জীব হইতে গুণ প্রাপ্ত হয় ; এবং জীব-পর্যায়ে যে জীব যে পরিমাণে পরবর্তী, সে তত অধিক গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।”

বেদের ভাষ্য সমূহে যে সকল বচন আছে সেই সকলের সমন্বয় বিধান করা এবং তাহাদের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা ইহাই পূর্ব-মীমাংসার উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু মীমাংসা প্রধানত, কতকগুলি ধর্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সংগ্রহ মাত্র ; ইহাতে বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক যুক্তিশাস্ত্রের আলোচনা, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনা, ভাষার উৎপত্তি ও চিন্তার সহিত তাহার সম্বন্ধ বিষয়ক আলোচনা থাকা সত্ত্বেও, যে সকল ভ্রম কুটধর্ম্মবিচারেব স্বাভাবিক সহচর, মীমাংসা সেইরূপ ভ্রমের ভূবি ভূরি অবতারণা করিয়া একটা কৃত্রিম শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহাব ফলে একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়।

এই প্রতিক্রিয়া—কপিলের সাংখ্যে, অর্থাৎ যুক্তিবিচার-মূলক ও জড়বাদমূলক দর্শনশাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। যাহাই হউক, বাণীর (logos) নিত্যতা অর্থাৎ চিন্তার ব্যঞ্জনার নিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া মীমাংসা ভ্রাপনাকে গৌণবাণিত করিয়াছে। কপিল মুনি, বেদ ঈশ্বরের মুখ-

নিঃসৃত বাক্য এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া, ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। সাংখ্যের মতে, প্রকৃতি নিত্য ; এই আদিম মূল-বস্তু হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং এই প্রকৃতির মধ্যে যে একটি অতীন্দ্রিয় মূলতত্ত্ব আছে সেই মূলতত্ত্ব হইতে আত্মার উৎপত্তি। সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন এবং অস্তিত্ববাদকে নিম্নলিখিত উভয়সম্বাদ-সমস্তার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছেন :—“ঈশ্বরের যদি বাসনা না থাকিত তাহা হইলে তিনি কখনই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, সুতরাং জগৎ সৃষ্টি করিবার তাঁহার সামর্থ্য থাকিত না ; পক্ষান্তরে যদি তাঁহার বাসনা ছিল এরূপ হয় তবে তাঁহাব সামর্থ্য ছিল না ; আবার, যদি তাঁহাব সামর্থ্য ছিল এরূপ হয়, তবে তাঁহার বাসনা ছিল না।” সাংখ্য বলেন,—যাহা নাস্তি তাহা অস্তি হইতে পারে না, এবং যাহা অস্তি তাহাব অস্তিত্বের কখনই অবসান হইতে পারে না। অতএব, এমন একটি অপরিবর্তনীয় নির্বিকার মূলতত্ত্ব আছে যাহা হইতে সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা স্বয়ং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। এই তত্ত্বটিই—সেই, “মূলহীন মূল” প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই সকল পদার্থের নিত্য কারণ, এবং এই প্রকৃতিব মধ্যেই “সমস্ত পদার্থের সম্ভাবিতা ও সমস্ত শক্তি” অবরুদ্ধ। ইহাব প্রতিযোগী—সজ্ঞান ও সচেতন মূলতত্ত্ব—পুরুষ। কপিলের মতে, পুরুষই বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয় ; এবং জ্ঞানের দ্বারাই “মাহুয় আত্মজ্ঞানে উপনীত হইতে পারে ; এবং স্বকীয় উৎপত্তি ও নিয়তির বিষয় অবগত হইতে পারে। পুণ্য অনুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নের দ্বারাই পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি এবং ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিরশান্তি লাভ করা যাইতে পারে,—ইহাই বেদান্তের শিক্ষা।

ইহার বিপবীতে কপিল বলেন,—যিনি আত্মাকে জানেন, যিনি আপনাব উৎপত্তি ও নিয়তির বিষয় অবগত, আছেন, একমাত্র তিনিই জ্ঞানী ও ধর্ম্মিষ্ঠ। পুরুষ ও প্রকৃতিব সংযোগেই অন্তঃতের উৎপত্তি, এবং পুরুষ জ্ঞানেব দ্বারাই প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ কবিতে সমর্থ হয়। পবীক্ষার দ্বারা জানা যায়—মানসিক ব্যাপার সকল যে পুরুষের উপর প্রকটিত হয়—সেই পুরুষ অবিনশ্বর

এবং তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ; অতএব, পুরুষ ও প্রকৃতি—দুইটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব একই অধিকার-স্থানে জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। সার কথা—কপিলের দর্শন, সমস্ত আশু বাক্য পবিত্রাঙ্গ কবিতা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়বোধের বিষয় সমূহ হইতে যাত্রা আরম্ভ কবিয়াছে। যাহা নাস্তি তাহা অস্তি হইতে পারে না, এবং যাহা অস্তি তাহা কখনই নাস্তি হইতে পারে না—এই স্বতঃসিদ্ধ মূলমন্ত্রটি হইতে সাংখ্যদর্শন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, প্রকৃতিও নিত্য। পুরুষও নিত্য ; এই পুরুষ হইতেই জীবাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে, স্তব্ধাং জীবাত্মা অমর। আমরা পরে দেখাইব,—সাংখ্য দর্শনের সহিত বৌদ্ধধর্মের ঘনিষ্ঠ যোগ। Lassen ও Burnouf-এর মতে, কপিলের সাংখ্য হইতেই বৌদ্ধধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে ; কেবল প্রভেদ এই—কপিলের মতটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত,—কেবল পণ্ডিতদিগেরই অধিগম্য ; পক্ষান্তরে, শাক্যমুনির মতবাদটি সকল মনুষ্যেবই বোধগম্য, এবং এই জন্তই ইহা ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, কপিলের পরবর্ত্তী দার্শনিক পাণ্ডুলল, কপিলের দর্শন অবলম্বন করিয়া তাঁহারই সিদ্ধান্তকে আরও একটু বেশী দূর লইয়া গিয়া, যুক্তি পরম্পরাক্রমে, একজন অদ্বিতীয় নিত্য ক্লীবলিঙ্গ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই দ্বিতীয় সাংখ্য দর্শন। ফলত, যদি একটি বিশ্বজনীন মূল সত্তারূপ প্রকৃতিকে স্বীকার করা যায়, যাহা হইতে এই সমস্ত জড়জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয়,—একটি বিশ্বজনীন আত্মাও আছে যাহা হইতে এই সমস্ত জীবাত্মা প্রসূত হইয়াছে এবং এই সঁকল জীবাত্মা সেই পরমাত্মাবই বিশেষ বিশেষ রূপ মাত্র। পুরুষ ও প্রকৃতির যোগেই জীবাত্মা উৎপন্ন হয়, এবং প্রকৃতি—সমস্ত সত্তার একটা স্বল্প অবস্থা মাত্র। কেবল জীবাত্মাই জগতের সাব উপাদান এবং সেই জীবাত্মাতেই সত্য ও পূর্ণতা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, জীবাত্মা,—পরমাত্মারই একটা বিশেষ রূপ মাত্র ; অতএব, সেই পবম-পুরুষ পরমাত্মার একটি সর্বাদিম রূপ অবশ্যই আছে—যাহা ক্লীবলিঙ্গবাচক, যাহা নিত্য, যাহা একমাত্র ;—তিনিই ঈশ্বর।

এই সাংখ্যদর্শনের সহিত যোগবাদ যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই যোগবাদ—আধ্যাত্মিক ও গুহ্যধর্মাপ্রাপ্তি। এই যোগ-শব্দেব দ্বারাই যোগবাদের তাৎপর্য স্পষ্টরূপে সূচিত হইতেছে। ঈশ্বরের সহিত সম্মিলনই আধ্যাত্মিক যোগ। হিন্দু দর্শন ও হিন্দু নীতিবাদের ইহাই উচ্চতম অভিব্যক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদ্গীতাতে এই দর্শনেরই শিক্ষা দিয়াছেন। ভগবদ্গীতা,—মহাকাব্য মহাভারতেরই একটি অঙ্গ। ভাবতবর্ষে ভগবদ্গীতার এতই আদর ও গোঁবব—এই ভগবদ্গীতার মতবাদটি এক প্রকার ধর্মমতে পরিণত হইয়াছে ; ইহাই কৃষ্ণধর্ম। এই ধর্মের শিষ্যেরা যোগী নামে খ্যাত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মরণজয়ী প্রেম ।

বর্ষা গল্প)

আমি আজ পাঠকদিগকে ব্রহ্মদেশের একটি গল্প উপহার দিব। গল্পটি অতিপ্রাকৃত হইলেও মূল্যহীন নহে। ব্রহ্মদেশে ইহা বড় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কোথাও ইহা কাঠফলকে খোদিত—কোথায়ও প্রস্তরে। ব্রহ্মের যে সর্বপ্রধান তীর্থস্থান—রেঙ্গুনের কঠলগ্ন “সোয়ে ডা গোন” বৌদ্ধমঠ, তাহাতেও ইহা রক্ষিত হইয়াছে। আবার নাট্যাশালায়ও ইহা অভিনীত হইয়া থাকে। আমি যতদূর জানি তাহাতে দেখিখাছি গল্পটি সমস্ত ব্রহ্মবাসীই অবগত। তবে কোন কোন জেলায় ইহার আকাবের কিছু পরিবর্তন আশ্চর্য্য নহে।

গল্পটি ব্রহ্মকুমাবীর ভাবী বিবাহিত জীবনের আদর্শ—তাই ইহার এত আদর।

ব্রহ্মবালিকা তাহার দশ বৎসর বয়সে “কর্ণবেধ” উৎসব সম্পন্ন কবিতা বসিয়াছে—মাথার চুল আর নিয়ম করিয়া কাটা হয় না—বাড়িতে দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে যখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর, তখন হঠাৎ একদিন দেখা গেল—তাহার সেই অনতিদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণকুন্তলদাম বেগীবদ্ধ হইয়া কুণ্ডলাকারে শিরোপবি রক্ষিত !—বুঝিলাম তখন তাহার—

“শৈশব যৌবন হুঁ হুঁ মিলি গেল।”

এই সময়ে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিল, এবং নানারূপ সুখকল্পনার একটি প্রস্ফুট কদম্বকুসুমের মত সে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার প্রেম-জীবনের আদর্শ—গল্পটির কেন্দ্রস্থল—পবিত্র ভালবাসা।

অবশ্য ব্যবহারিক জীবনে ব্রহ্মবাসিনীর বিবাহিত জীবন যে ঠিক এই আদর্শেই সব স্থানে চলিয়া থাকে—তাহা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আদর্শের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় কি ?

তা যা হোক, এখন গল্প বলি। চাউছে গ্রামের (এখন সহর) একটি বালিকা “মা সোয়ে-উ” প্রতিবাসী বালক “কো সোয়ে-মং”কে বড় ভালবাসে। অবশ্য বালকও তাহাকে তাহা অপেক্ষা কম ভালবাসে না। এমন কি তাহাদের ছদ্ময়ের ব্রতই হইল এই যে, জীবনে মরণে হই জন্মের প্রেমকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

যৌবনে দাঁড়াইয়া ছই জন্মের বিবাহের কথা আসিল। কিন্তু অর্থ না হইলে জীবন চলিবে কিরূপে ? তাই বিবাহের পূর্বেই অর্থোপার্জনবৎ জন্ত কো সোয়ে-মং নিম্ন ব্রহ্মে কার্ত্তির ব্যবসা করিতে গেলেন। বৎসরের মধ্যে তাঁহার ফিরিবার কথা রহিল। কিন্তু যখন ব্রহ্মের পীযুষরূপা “ইরাবতী” প্রাণপ্রিয়কে লইয়া দ্রুত সাগরের দিকে ছুটিল, তখন মা সোয়ে-উর মনে কেমন যেন একটু অসহায়ের মত ভাব আসিল—যেন মনে হইতে লাগিল প্রিয়ের দৈহিক ছবি দেখাব এই বুঝি শেষ। তাহার বক্ষপিঞ্জর ভিন্ন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ইরাবতীর তটতরু-আন্দোলিত বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল। চোখের পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দু সাক্ষ্য অন্ধকারে কেহ দেখিতে পাইল না !

এক বৎসর কাটিল। ছই বৎসরও যায়। কো সোয়ে-মংএব ফিরিবার কোন লক্ষণ নাই। মা সোয়ে-উ সারাদিন চরকাই নিযুক্ত থাকে। আর প্রত্যেক দিন প্রভাতে মনে করে—তাহার প্রাণপ্রিয় সেই দিন আসিবে। কিন্তু দিন চলিয়া যায়, প্রাণপ্রিয় ত আসে না !

এদিকে সমস্ত ব্রহ্মের উপবে মাসোয়ে-উর সৌন্দর্য্যখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যৌবনের রূপ-লাবণ্যে তাহার স্বভাব-সুন্দর দেহটুকু ভরপুর। কত দেশ দেশান্তর হইতে তাহার পাণিগ্রহণের নিমিত্ত লোক আসিল। কিন্তু মা সোয়ে-উর জন্মব্রত অটল। কেহ তাহা টলাইতে পারিল না।

চাউছে পাহাড়ের দেশ। কত ছোট বড় পাহাড়ে চাউছেকে বরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া আসে ;—সেই সব পাহাড়ের উপরে দিনান্তের মধুর হাসি দেবশিশুর মত নৃত্য করিয়া চলিয়া যায়। মা সোয়ে-উ আপনার অন্তরে কেমন একটু ভীতিবিভীষিকা লইয়া সেই সব দেখিতে দেখিতে তাহাদের উপরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

একদিন একটি পাহাড়ের দেবতা (নাট=নাথ (?)=প্রভু =দেবতা, অপদেবতা প্রভৃতি) মা সোয়ে-উর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া সুন্দর যুবকের বেশে চাউছে আসিয়া উপস্থিত। অত্যাশ্চর্য্য বিবাহার্থীর মত তিনিও মাসোয়েউকে টলাইতে পারিলেন না। তাঁহাব সমস্ত গুণগুণাবলী, মূল্যবান দান-সামগ্রী এবং এমন কি তাঁহাব দৈবী মায়াও বিকল হইয়া গেল। একদিন দেবতাটি আপনার মানসিক বলে ঠিক পাইলেন—কো সোয়ে মং বাড়ী ফিরিতেছেন, কিন্তু দেবতাটি তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। কারণ কোসোয়ে মংএব কর্মফল তাঁহার জীবনচক্র অত্যাশ্চর্য্যে ঘুরাইয়া দিয়াছে, কোন দেবতার বলই তাহার নিজের মতে ফিরাইতে পারে না !

ভাবিয়া চিন্তিয়া পাগলের মত আবাব তিনি মা সোয়ে-উর কাছে উপস্থিত। রমণী যে তাঁহার হইবে না—একথা কিন্তু দেবতার মানসিক বল একবারও পরীক্ষা করিল না। মা সোয়ে-উর কর্মফল যেমন ছিল—কার্য্যও তেমনি হইতে লাগিল। দেবতাটি এবাবও কত অনুনয় বিনয় করিলেন, মা সোয়ে-উ অটল। কতরূপ ভয় দেখান হইল, কিন্তু ভয় কিসের ?—মৃত্যুর ? সে ত অবশ্যস্বাবী। মা সোয়ে-উ সেজ্ঞা ভীত নহে। তাই সে নিতান্ত নির্বিকার চিত্তে চরকার কাখে নিযুক্ত রহিল। দেবতাটি আর বৈধব্য রাখিতে পারিলেন না। সহসা তিনি ক্রোধে ব্যাধের মূর্ত্তি ধবিলেন এবং শেষে মা সোয়ে-উকে মুখে লইয়া স্বদূর পাহাড়ে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান সময়ে মৃতের বুক স্থানে স্থানে প্রস্তরে ঘর্ষিত হইয়া রক্ত পড়িতে পড়িতে গেল। প্রেমের কি আশ্চর্য্য শক্তি ! সেই সব রক্তবিন্দু হইতে সুগন্ধি পীত “ইয়েংগা” (ইয়েং—বুক, থা—আবাত) কুসুম উৎপন্ন হইয়া উঠিল। আজও চাউছের কত পাহাড় পর্ব্বত সেই ইয়েংগা কুসুমে পরিপূর্ণ !

সেই মৃত্যু-রাত্রীই আবার কো সোয়ে মং অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তাঁহার নৌকার পাল বাতাস পাইয়া আনন্দে ফুলিয়া উঠিতেছিল। অপরাহ্নের বাতাস স্বর্ঘ্যের মানামমান তরল কিরণ-মাথা আকাশের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল—সে কি মধুব! নৌকা-প্রতিহত তরঙ্গবীচির কল-কোলাহলে কত রকম হর্ষচিন্তা কো সোয়ে মংএর মনে আনিয়া দিতেছিল। তাঁহার দৃষ্টি বাহিবে আবদ্ধ থাকিলেও মন কিন্তু তাহাব ভিতর দিয়া অন্তর উড়িয়া গিয়াছে! কোথায়? ঐ যে পাহাড়েব কোলে নিজিত শিশুব মত চাউছে গ্রাম শোভা পাইতেছে, ঐখানে কো সোয়ে মংএব মন উপস্থিত। তিনি দেখিতে-ছেন—গ্রামবৃদ্ধেবা একটি বাড়ীতে মিলিয়াছেন। চাষিদিকে দীপেব আলো রাত্রিকে মধুব করিয়া তুলিয়াছে। “তানে-থা”র (একবকম গন্ধদ্রব্য—বৃক্ষবকুল বিশেষ) গন্ধ, ফুলের গন্ধ, চুরুটের গন্ধ মিশিয়া এক অপূর্ব গন্ধপুরী সৃষ্টি করিয়াছে। সেইখানে কো সোয়ে মংএর করতল আর একখানি গৌর স্নগোল করতলের উপরে ন্যস্ত—বিবাহেব জল পড়িবে পড়িবে!—এমন সময় ঐবে মঙ্গল-বাশী বাজিয়া উঠিল।—বাশী? কই, বাশী ত নহে। যেন কতকগুলি বোপ্যবণ্টানিনাদ জল-কোলাহলের সঙ্গে মিশিয়া আসিল। কো সোয়ে মং চমকিয়া উঠিলেন। কই, সে মধুর স্বপ্নদৃশ্য কই? সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল! তিনি দেখিলেন, তাঁহার নৌকা পূর্বমত তীরবেগে ছুটিতেছে। হঠ তটের সাদ্য অন্ধকাব হাত বাড়াইয়া নদীটাকে জড়াইয়া ধরিতেছে! আকাশে তারা ফুটিতেছে, দূরে কোলাহল থামিয়া যাইতেছে!

কিন্তু ও আবার কি? শূন্যে সঙ্গীত হয় কোথায়? পাখীরা বুকি ডাকিয়া যাইতেছে! কিন্তু না, এ সঙ্গীত যে একস্থান হইতেই উথিত। ঢালু আকাশের উপর দিয়া তবে কি ইহা ভাবকাব মুখ হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে? কি আশ্চর্য! শুনিতে শুনিতে নদীর শাদা জল অন্ধকারে মিশিয়া গেল—তটতরঙ্গশ্রেণী অন্ধকাবে একটা বৃহৎ কালো রজ্জুর মত দেখাইতে লাগিল।

আবার শুকি আশ্চর্য! একটা জমাট কুজাটিকা রাত্রির অন্ধকারে নৌকার উপরে আসিয়া বসিল। কুজাটিকা?

না, না,—এবে মূর্তি! কো সোয়ে মং ধবিতে গেলেন, শূন্য মূর্তিব মধ্যে হা-হা কবিয়া উঠিল। কিন্তু মূর্তি ত অপসৃত হয় নাই।—এ কি রকম? আবার তাহার চারিদিকে জোনাকীর মত কতকগুলি জ্যোতির্মূর্তি!

তারপব কুজাটিকাবং মূর্তিটা হাত উঠাইল—তাহার মুখখানা যে মা সোয়ে-উর মত!—বলিল, “এস”। আর নাই। সে জোনাকীর মত—সে কুজাটিকাব মত মূর্তি কোথায়? সব অন্তর্হিত। শুধু অভিনব একটা গন্ধে সে স্থানটি পবিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—সেটা ইয়েনুগা কুসুমের গন্ধ।

কো সোয়ে মং বুঝিলেন—মা সোয়ে-উ আর মর্ত্যজীবনে নাই। তাঁহার মুখের একটি কথা “প্রিয়ে যাই” আর দীর্ঘনিশ্বাস নৌকার অন্তর আবোহীবা শুনিতে পাইল—তাবপর সহসা তাহাবা দেখিল তাঁহার জীবনশূন্য দেহটি নৌকার উপবে লুপ্তিত হইতেছে।

* * * * *

সেই দিন হইতে কত পথভ্রান্ত পথিক দেখিতে পাইয়াছে—রাত্রির অন্ধকারে, চাউছের পাহাড়ে, ইয়েনুগা-পুষ্পবিকীর্ণ পথে দেবদেহী জুইট যুবক ও যুবতী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এবং তখন মা সোয়ে-উ ও কো সোয়ে মংএর মরণজয়ী প্রেমের কথা তাহাদের মনে পড়িয়াছে।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

জাপানে স্ত্রী-শিক্ষা ।

অপরূপার প্রাচ্য দেশসমূহেব রমণীগণের অবস্থা হইতে জাপানের নাবী-সমাজের অবস্থার গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জাপানের সহস্র বৎসর পূর্বের ইতিহাসেও, ভাবতবর্ষের গার্মা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ত্রায় তীক্ষ্ণবীশক্তিসম্পন্ন সুবিখ্যাতা রমণীর পবিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাপানী বীবেব পার্শ্বে জাপানী রমণীকেও সময়-ক্রীড়ানিরতা দেখা গিয়াছে। বহুতর স্ত্রী-কবি, ঔপন্যাসিক ও শিল্পী জাপানের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার কবিয়া আছেন। জাপানের ভূতপূর্ব মন্ত্রিপ্রেমীর লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী

মধ্যে যখন জাপান দেশে চীন ভাষা পঠিত এবং জনসাধারণে প্রচারিত হইত, তখন জাপানেব জাতীয় নবীন সাহিত্য প্রকৃত পক্ষে নারীহস্তেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সময়েই “জেন্জি-মনোগাতারি” (Genji monogatari)—গ্রন্থকর্তা মুরাসকি শিকিবু (Murasaki Shikibu), “মাকুরা-নো-শিশি” (Makura-no-soshi)-রচয়িত্রী শিশোনাগোন (Shishonagon) প্রভৃতি লেখিকা দেশীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিতা হইয়াছিলেন। টোকুগাওয়া—(Tokugawa)—শাসন কালের শেষভাগে কামাই সোকিন, হারা সাইহিন্, ইয়েমা সাইবেন, চো কোরান প্রভৃতি বহুতর জাপানী রমণী চীন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ সুপ্রসিদ্ধা হইয়া উঠেন। এই সময়ে রেনজোতমু, সিও, বোটানি প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ-কবিরও আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং এই সময় হইতে জাপ-সম্রাটের হস্তে দেশের শাসন-ক্ষমতা পুনঃ ন্যস্ত হওয়ায় পূর্ব সময় মধ্যে অনেকানেক জাপানীরমণী স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের রমণীগণের অনুরূপ স্বাধীনতা না থাকিলেও জাপ-রমণীগণ সামাজিক নানা স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। এবং তদ্ব্যতীত জাপানের ইতিহাসে সময় সময় সর্বগুণসম্পন্ন রমণীমূর্তির আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; বর্তমান সময়েও এরূপ দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নহে। চীন ও জাপান দেশের বিদ্যালয় সমূহে জাপ-রমণী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হইয়া থাকেন এবং অপর একজন জাপানী বিদ্বদী মঙ্গোলিয়ার জনৈক দেশীয় সরদার কর্তৃক গৃহ-শিক্ষয়িত্রীরূপে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

যাহা হোক জাপানে জ্যৈষ্ঠ-শিক্ষা সর্বদাই এক কঠিন সমস्यারূপে বিবেচিত হয়। স্বভাবতই বিষয়টি অতি গুরুতর এবং সহসা কোনরূপ সন্তোষ-জনক মীমাংসায় উপনীত হওয়া সুদূর। তথাপি ইয়ুরোপীয়দিগের ত্রায় জাপানীরাও বিষয়টিকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং বর্তমান শাসনপ্রথার প্রারম্ভ সময় হইতে একাল পর্যন্ত তাহারা এবিষয়ের উৎকৃষ্টতর সাধন-প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কতিপয় জাপ-বালিকা বিদ্যাশিক্ষার্থে আমেরিকায় প্রেরিতা

হন; তাহাদের একজন এক্ষণে অ্যাডমিরাল উরিউর (Admiral Uriu) পত্নী। ইহীর নাম বিগত ঋতু-জাপান যুদ্ধের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। পূর্বোক্ত প্রেরিতা বালিকাদের আর একজন—বর্তমান মারশিয়নেস্ ওয়ায়া;—জাপানের সাধারণ বিভাগের সর্বো সর্বা মার্শাল মারকুইস্ ওয়ামার ভায়া। যাহা হোক আমরা এক্ষণে জাপানের সবকারী বিবরণ অবলম্বনে তথাকার জ্যৈষ্ঠ-শিক্ষার বর্তমান অবস্থাবিষয় আলোচনা করিতেছি।

জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা বহুবিস্তৃত; এমন একটা পল্লীও দেখা যায় না, যথায় সরকারী ব্যয়ে চালিত অন্ততঃ একটা বিদ্যালয় নাই। কারণাধীনে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইলেও প্রধানতঃ প্রত্যেক শিশুই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ দুইভাগে বিভক্ত;—সাধারণ বা নিম্নপ্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক স্কুল। চারি বৎসর ও তদুচ্চকালের শিশুকে নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে চারি বৎসর এবং নয় বৎসরের বালিকাদিগকে উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে অধ্যয়ন করিতে হয়। শৈশবকাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের কাল নির্দিষ্ট নাই; কারণ তথায় কএক বৎসর অধ্যয়ন করার পর বালিকাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বিভাগে প্রবেশের অধিকারিণী হইতে পারে। কিন্তু নিম্নপ্রাথমিক স্কুলে শিশু বালক বালিকার চারি বৎসর অধ্যয়ন করাই রাজ-বিধি-নির্দিষ্ট।

এই সকল প্রাথমিক স্কুলসমূহে প্রবেশ সময়ে বিভিন্ন বালকবালিকাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য আচরিত না হইলেও শিক্ষাবিবরণের সৌকর্যার্থে তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ১৯০১-০২ অব্দে কেবল জাপানী সহরের প্রাথমিক স্কুলসমূহে ৩,৮৭৬,৪৯৫টা বালক; ৩,৫৯০,৩৯১টা বালিকা, মোট ৭,৪৬৬,৮৮৬টা শিশু অধ্যয়ন করে। এতদ্ব্যতীত নিম্নপ্রাথমিক শ্রেণীতে ১,৭১৪,৫০৯টা বালক এবং ১,৬৩২,০১৮টা বালিকা, মোট ৩,৩৪৬,৫২৭টা ছিল; এবং ১,৪৬২,৯৭৭টা বালক ও ৯১১,৪২২টা বালিকা, মোট ২,৩৭৪,৩৯৯টা বালকবালিকা এই শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্ত করে। পক্ষান্তরে সরকারী উচ্চ প্রাথমিক স্কুলসমূহে ৭০৫,২৩৮টা বালক; ২৩,৯৫৫টা বালিকা, মোট ৭২৯,১৯৩টা এবং বে-সরকারী বিদ্যালয়

সমূহে ৪,২৬৮টি বালক ও ৩,৪৩৭টি বালিকা, মোট ৭,৭০৫টি ছাত্র বর্তমান ছিল। সুতরাং উচ্চশ্রেণীতে সর্বমুদ্র ৭০৯,৫০৬টি বালক এবং ২৩৪,৩৯২টি বালিকা, মোট ৯৪৩,৮৯৮টি ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বড় বড় সহবে কিণ্ডার গার্টেন ধরনের বহুতর বিদ্যালয় আছে ; এবং দেশের জনসাধারণ উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় দিন দিনই উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এই সকল বিদ্যালয়ে নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের অনুরূপ তিন-বৎসর বয়সের বালক বালিকা হইতে বেশি বয়সের ছাত্র ছাত্রী গৃহীত হয় এবং অভ্যাস বিষয়ের সহিত ব্যায়াম, সংগীত, কথোপকথন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত-শিল্প বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

আলোচ্য বর্ষে জাপানে ১৮২টি সরকারী এবং ৭২টি বে-সরকারী কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় ছিল ; সবকারী স্কুল সমূহে ১০,৩২৭টি বালক ও ৮,৯৭২টি বালিকা মোট ১৯,২৯৯ জন এবং বে-সরকারী বিদ্যালয় সমূহে ২,২৩৫টি বালক, ২,১৩৭টি বালিকা মোট ৪,৩৭২ জন ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর বালকবালিকাদের বিভিন্নরত্ন শিক্ষাকার্য্য আবদ্ধ হয়। বালিকাদিগের নিমিত্ত পৃথক উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চ নর্ম্যাল স্কুলসমূহ বিদ্যমান আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে পাঠার্থী বালিকাদিগের সংখ্যা বালকদিগের তুলনায় কম বটে, কিন্তু তাহার প্রথম কারণ বয়সীগণের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও সামাজিক অবস্থা এবং দ্বিতীয় কারণ বিদ্যালয়সমূহে অধিকতর পাঠার্থিনীর স্থানান্তর। বালক বালিকাদের পাঠ্য এবং শিক্ষাদান-প্রণালীও এক নহে। এতৎ বিষয়ের প্রত্যেক বিবরণ প্রদান করিতে হইলে পাঠকবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতিব সম্ভাবনা বিধায় সাধারণতঃ জাপানে কি ভাবে রমণীগণের শিক্ষা-ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহারই স্থল বিবরণ প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব। জাপানের শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী স্বীয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—

“রমণীগণের উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পূর্ণকাল চারি বৎসর, কিন্তু স্থানীয় অবস্থানুসাবে ইহার এক বৎসর কমানোও যাইতে পারে, আবার স্থলবিশেষে বাড়ানোও

যাইতে পারে। সাধারণ পাঠ্য ছাড়া, আবো দুই বৎসর কাল শিক্ষার্থিনীর প্রবৃত্তি অনুযায়ী কোন বিশেষ শিল্প-কার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইতে পারে ; সাধারণ শ্রেণী ব্যতীত বিশেষ শিল্পশ্রেণী প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীতে দুই বৎসর হইতে চারি বৎসর কাল শিক্ষা কবিত্তে হইবে। যে সকল গ্রাজুয়েট কোনো বিশেষ বিভাগে ব্যাপন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের উপকারের নিমিত্ত দুই তিন বৎসরের ‘বিশেষ বিভাগও খোলা যাইতে পারে।’

উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে,—বয়স অন্যান্য দ্বাদশবর্ষ এবং তৎপূর্বে প্রাথমিক স্কুলের উচ্চ বিভাগের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করা চাই। ১৯০১-২ অব্দে জাপানে রমণীগণের নিমিত্ত ৬১টি সরকারী এবং ৮টি বে-সরকারী মোট ৬৯টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল ; সরকারী স্কুলে ১৪,৯৭৫ জন, বে-সরকারী স্কুলে ২,২৪০ জন, মোট ১৭,২১৫ জন রমণী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। ঐ বৎসর রমণী-গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ;—সরকারী স্কুলের ২,৭৭৮টি, বে-সরকারী বিদ্যালয় সমূহের ৮১২টি, মোট ৩,৫৯০টি ছিল।

রমণী-উচ্চ-বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা এই ;—নীতি শিক্ষা, জাপানী-ভাষা শিক্ষা, বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা ; ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কণ, গৃহস্থালী কার্য্য-শিক্ষা, দরজির কার্য্য-শিক্ষা ; সংগীত এবং ব্যায়ামচর্চা করিতে হয়। যে স্থলে পাঠের নির্দিষ্টকাল কথঞ্চিৎ কম করা হয়, সে স্থলে বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা পরিত্যক্ত হয়। বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা অর্থে জাপানে কেবল ইংরেজি বা ফরাসী ভাষা শিক্ষাই বুঝায়। প্রত্যেক স্থলেই বৈদেশিক ভাষা-শিক্ষা—ইচ্ছাধীন পাঠ্য (optional course) রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে এবং যে সকল রমণীর স্বভাব কলাশিক্ষার অনুরোধী বোধ হইবে, তাহাদিগের পক্ষে সংগীত-শাস্ত্রের আলোচনাও নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত ‘পণ্ডিতী’ এবং ‘শিল্পী’ শ্রেণী আছে ;—তাহাও ইচ্ছাধীন রূপে পরিগণিত।

টোকিও সহরে বালিকাদের নিমিত্ত একটা (Higher Normal School for women) কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই কলেজে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং প্রাদেশিক নর্ম্যাল

স্কুলসমূহের নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারি করা হয়। কলেজে তিনটা শ্রেণী আছে; সাহিত্যশ্রেণী, বিজ্ঞানশ্রেণী এবং শিল্প-শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীতে নিম্নলিখিত বিষয় শিক্ষা করিতে হয়;—নীতি-শাস্ত্র (Ethics), শিক্ষাদানবিজ্ঞান, জাপানী সাহিত্য, চীনভাষা, ইংবেজি, ইতিহাস, ভূগোল, সংগীত এবং ব্যায়াম। দ্বিতীয় বিভাগে, জাপানী ও চীন সাহিত্য এবং ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা করিতে হয় না। তৎপরিবর্তে অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, এবং জীব-বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে অঙ্কশাস্ত্র এবং জীব-বিজ্ঞান ব্যতীত দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল বিষয়ই শিক্ষা করিতে হয়, অধিকন্তু দুইটির পরিবর্তে সাতটা নূতন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ আবশ্যক হয়, যথা,—গৃহস্থালীর সুবন্দোবস্তপ্রণালী, কাপড় কাটা ও সেলাই, হস্ত দ্বারা ছোট ছোট শিল্পকর্ম, চিত্র অঙ্কন ও উদ্ভাবন (drawings এবং designs) প্রণালী। জাপানী-ভাষাব সহিত চীন-সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য—লিপি-চাতুর্য লাভ করা। গৃহস্থালীর সুবন্দোবস্ত প্রণালী দুই বিভাগে বিভক্ত;—এক বিভাগে শুদ্ধ গৃহস্থালীর কাজকর্ম বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয় এবং অপর বিভাগে ‘পারিবারিক-শিক্ষা-দানের’ বিষয় উপদিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত কলেজে আরো কতিপয় স্বতন্ত্র বিভাগ আছে;—যথা পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণী; ইহাতে দুই বৎসব অধ্যয়ন করিতে হয়। স্বমনোনীত পাঠ্যশ্রেণী;—উচ্চ বিদ্যালয়ের নিরূপিত পাঠ্য শেষেব পব প্রত্যেক ছাত্রীই স্ব স্ব ইচ্ছামত পাঠ্যশ্রেণী নির্দিষ্ট কবিয়া লইতে পারে। এই বিভাগে চারি বৎসরেরও অধিককাল অধ্যয়ন করিতে হয়। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের উপযোগী শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারি শ্রেণী এবং বিশেষ শ্রেণী নামে অপর দুইটা বিভাগ আছে, ইহার প্রতিবিভাগে একবৎসর কাল পাঠ কবিতে হয়। কলেজের প্রত্যেক প্রধান তিন শ্রেণীর শিক্ষাদান কার্য সমাপ্ত কবিতে চারি বৎসরেরও উর্দ্ধকাল করিয়া প্রয়োজন হয়। আলোচ্য বর্ষে উক্ত কলেজে ৩১১টা ছাত্রী এবং ৮৬ জন গ্রাজুয়েট ছিল। মিস্ ইয়াসুই এই কলেজের একজন উত্তীর্ণ শিক্ষয়িত্রী; তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল শ্রাম দেশের রাণীর আহ্বানে তৎকার বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরূপে ইয়াসুই শ্রামদেশে গমন করিয়াছেন। এই

স্কুলের সহিত উচ্চ-বালিকা-বিদ্যালয়ও সংযুক্ত আছে এবং তৎকার শিক্ষার কাল অন্তান্ত বালিকা-বিদ্যালয় অপেক্ষা এক বৎসর বেশী অর্থাৎ পাঁচ বৎসর।

পূর্বোক্ত কলেজের অধীনে একটা উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত আছে। স্ত্রী-শিক্ষার সাধাবলপ্রণালী শিক্ষা এবং অপরাপর ব্যবহারিক শিক্ষাদানই এই বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। আলোচ্য বর্ষে স্কুলে ৪১৬টা ছাত্রী ছিল। এতদ্ব্যতীত একটা প্রাথমিকস্কুলও কলেজের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইহাও ঐ একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই স্কুলে তিনটা বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেক বিভাগে দুই হইতে চারি বৎসর অধ্যয়নকালরূপে নির্দিষ্ট আছে। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৪৬২টা, তন্মধ্যে ১০৮টা ছাত্র এবং ৩৮২টা ছাত্রী। কলেজের অধীন অপব একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

জাপানের নানাস্থানে বমণী-শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারীর নিমিত্ত বিশেষ নর্ম্যাল স্কুলসমূহ বর্তমান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত নর্ম্যাল স্কুলেও বালিকাদিগের নিমিত্ত একটা স্বতন্ত্র বিভাগ থাকে। জাপ-সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে একটা বালিকা-বিদ্যালয় আছে; ইহা রাজপরিবারের মন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে; রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের সাধারণ মন্ত্রীর এই বিদ্যালয়ে কোনকণ ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার নাই। এই স্কুলের নাম—পিয়ারেস্ স্কুল (Peeress School); অপরাপর সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালিকাদিগের প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত না হইলেও সর্বপ্রথম উচ্চ পরিবারের (noble family) বালিকাদিগকেই স্থান দান করা হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর বালিকাদের স্থান সংকুলান হওয়ার পরও যদি অতিরিক্ত স্থান থাকে, তবেই প্রথমোক্ত শ্রেণীর বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। ইহাব অধীনেও একটা কিণ্ডারগার্টেন শ্রেণী আছে।

শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রীর অধীনে টোকিওতে একটা সংগীতসমিতি (Music Academy) আছে। ইহাব পাঁচটা শ্রেণী বিভাগ আছে;—(১) প্রাথমিক, (২) মূল, (৩) পোষ্ট গ্রাজুয়েট, (৪) নর্ম্যাল এবং (৫) মনোনীত। বালক বালিকা উভয় শ্রেণীর ছাত্রই ইহাতে প্রবেশের

অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জাপানী-শিক্ষক ব্যতীত সমিতিতে পাঁচটি বৈদেশিক শিক্ষক নিযুক্ত আছেন; তাহার দুইজন জার্মান দেশীয়, একজন আমেরিকা-বাসী, একজন রুশীয় এবং একজন ফরাসী।

জাপানে বে-সরকারী ব্যক্তিদের স্থাপিত যত প্রকার বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহার সকলগুলির বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। তাহাদের সংখ্যাও যেমন বিপুল, প্রত্যেকের কার্য্যপ্রণালীও তেমনই স্বতন্ত্র। নিম্নে এই শ্রেণীর প্রধান কতিপয় বিদ্যালয়ের পবিচয় প্রদত্ত হইল।

টোকিওব Jioakkwan বিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা অতি প্রশংসনীয়। বৈদেশিক উদ্বার ‘মিশন’ বিভাগেব কতিপয় সদাশয় বৈদেশিকের চেষ্টায় এই বিদ্যালয় প্রথম উৎপত্তি লাভ করিলেও তথায় ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না; কেবল উচ্চশ্রেণীর জাপ-বালিকাগণের এম্মো-শ্বাক্সন শিক্ষা দীক্ষায় অভ্যস্ত করাই বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। প্রথ্যাতনামা বহুতর ব্যক্তি দ্বারা এই প্রণালী সমর্থিত হইয়াছে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় অসংখ্য ব্যক্তি শিক্ষা-ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। রাজপরিবার হইতেও বিশেষ সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। ১৯০৩ অব্দের অক্টোবর মাসে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ২৩০ জন ছিল।

টোকিওনগরে ‘রমণী বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে (Women's University) একটি রমণী কলেজও প্রতিষ্ঠিত আছে। পুরুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এই বিদ্যালয়ের নামকরণ অল্পপযুক্ত হইলেও ইহাতে অসংখ্য রমণী শিক্ষার্থীর সমাবেশ হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে ইহার ছাত্রীর সংখ্যা এক সহস্রেরও অধিক।

এতদ্ব্যতীত জাপানের নানা স্থানে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন, চিত্র-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, এমন কি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য শিক্ষার নিমিত্তও রমণীগণের পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। জাপানে রমণীচিকিৎসকেব—যাহারা সাধারণ ভাবে ডাক্তারী ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, সংখ্যা প্রচুর না হইলেও জাপানের সরকারী পরীক্ষাতেও রমণী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

বৈদেশিক ‘মিশন’ হইতে টোকিও, ইয়োকোহামা,

নাগোয়া, ওসাকা, কোবা, কিওটো প্রভৃতি স্থানে বহুতর বে-সরকারী বালিকা বিদ্যালয় আছে, এবং ইহাদের অনেকের দ্বারাই দেশের রমণীসমাজের প্রভূত উপকার সাধন হইয়া থাকে। এক টোকিও নগরে সর্বশ্রেণীর মোট ৭৩টি বালিকাবিদ্যালয় আছে। পূর্বের উল্লিখিত স্কুলসমূহও এই গণনার অন্তর্ভুক্ত এবং ধাত্রীবিশ্বা শিক্ষাব ও ‘সেবিকা’ (nursing) তৈয়ারির স্কুলগুলিও এই তালিকার মধ্যে গণিত হইয়াছে।

রমণীগণেব কার্য্য সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। জাপানে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। জাপ-বালিকারা বিবাহের পর স্বামী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধানতঃ গৃহকার্য্যেই মনোনিবেশ করে এবং সংস্কারী এবং জননী হইবার নিমিত্ত একান্ত চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে তুলার কাপড়ের কল, বেশমী কাপড়ের কল, কাগজের কল, প্রভৃতি কারখানায় বহুতর জাপ-রমণী শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী কার্যালয়সমূহে নিযুক্ত রমণীর সংখ্যা অধিক নহে। তবে তাহারা প্রভূত পরিমাণে বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। যাহারা কম সৌভাগ্যশালিনী এবং উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিতা তাহারা ডাক্কি ও টেলিফোন বিভাগ এবং বেলওয়ার নানা বিভাগে নিযুক্ত হইয়া থাকে। নানা বেসরকারী কোম্পানীর কার্য্যালয়ে পরীক্ষাধনভাবে রমণী কেরানী নিযুক্ত করা হইতেছে; স্বথের বিষয় তাহাদের দ্বারা কাষ উত্তমরূপেই নির্বাহিত হইতেছে। ইহা হইতে আশা করা যায়, জাপ-রমণীরা নিজেদের ধী-শক্তির পরিচয় দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রশস্ততর ক্ষেত্রে উপনীতা হইবেন।

এ স্থলে রমণীদেব দ্বারা চালিত ও তাহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত কতিপয় কার্য্যের উল্লেখ না করিয়া নিবস্ত হইতে পারিলাম না। টোকিওতে একপ কুড়িটি সমিতি আছে। তথাকার দাতব্য হাসপাতাল জাপ-সাম্রাজ্যীর প্রত্যক্ষ যত্নাধীন এবং জাপ-রাজকুমারী আরিসুগাওয়া (Princess Arisugawa) হাসপাতালকমিটী প্রধান সভ্য; ‘জাপান রমণী-শিক্ষা সমিতির’ (Japanese Ladies' Educational Society) সভাপতি জাপ-রাজকুমারী কানিন (Princess Kanin);

‘পীড়িত শুল্কযার বিশেষ সমিতি’ (Special society for Nursing the sick) স্বয়ং সাম্রাজ্যীয় আত্মাধীন; এতদ্ব্যতীত রেড ক্রস সোসাইটী, জাপানী রমণীদের ‘স্বাস্থ্য বিষয়ক সমিতি,’ পিতৃমাতৃহীনা বালিকা সমিতি,’ রাজ-বিচারে দণ্ড প্রাপ্তা ‘বমণী অপরাধিনীগণেব শিশুসন্তান রক্ষা সমিতি’ এবং প্রকারে অপূর্ণ কতিপয় সাধারণ সমিতির কার্য জাপানের সুপ্রসিদ্ধ বংশসমুত্তা রমণীবৃন্দের অধিনায়কত্বে নির্বাহিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ সমিতির অবস্থাই প্রশংসনীয়। ইংলণ্ডেব মিস্ পার্কারের তত্ত্বাবধানে একটা ‘রমণী দাতব্য-শিক্ষা-সমিতি’ বর্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত এবং প্রকারে বহুতর জনহিতকর সমিতি জাপানের নানাহানে প্রতিষ্ঠিত জাপ-রমণীকুলের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে।

পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহের ভগিনীদের মানসিক শক্তিব সহিত তুলনা কবিলে জাপ-রমণীরা নিকৃষ্ট হইবে না, সমান স্থানই অধিকার কবিবে বলিয়া বিশ্বাস। অবশ্য এখনই বলা যায় না, ভবিষ্যতে জাপ-রমণী সমাজের কোন স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে! কিন্তু একটা বিষয় ঠিক যে বালকদেব শিক্ষালয় বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের শিক্ষালয় সমূহও এমনি বহুবিস্তৃতি লাভ কবিয়াছে যে, জাপানের প্রাচীন ইতিহাসে কুত্রাপি তাহাব তুল্য দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার। ‘জাপ-রমণীগণের বিদ্যার্জন-স্পৃহা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা সকল দিন দিন এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে যে, তাহার তুলনায় তাহাদের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির উপায়সমূহ অতি অল্পই বিবেচিত হইয়া থাকে।*

ক্রী-শিক্ষা ব্যতীত সমাজ সর্বাঙ্গসুন্দর হইবাব জ্ঞান নাই—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই জাপানে ক্রী-শিক্ষার এই বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। জাপান-সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য সকল দেশ সম্বন্ধেই একরূপ সেই ব্যবস্থাই অনুসৃত হইতে পারে। কেবল বালকদিগের শিক্ষাব ব্যবস্থা করিলেই, দেবের প্রতি—তথা সমাজের প্রতি কর্তব্য শেষ হইল না। সুখের বিষয় আমাদের দেশেও এক্ষণে অনেকের নিকট ক্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ হইয়াছে, কিন্তু এখনও তদ্বৎসল সাধনের নিমিত্ত

কোনরূপ প্রকৃষ্টতর পন্থা অবলম্বিত হয় নাই। জাপান যেমন নিজের সভ্য বজায় রাখিয়া—নিজের বাহা ভাল তাহা বক্ষা কবিয়া, পাশ্চাত্য দেশবাসীর মহৎ গুণেব অনুসরণ করিয়াছিল, আমবাও যদি তদ্রূপ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের কল্যাণ হইবে, নচেৎ নহে।

শ্রীব্রজসুন্দর সামান্য।

বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা।

বিগত মাঘমাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত “বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোটচাঁদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস, গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে বাহা প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাব মন্তব্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। আমি উক্ত প্রবন্ধে যে সকল বিষয় লিখিয়াছি, তাহার কয়েকটা বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার মতৈক্য হয় নাই। সন ১৩১৪ সালের ২০শে ও ২৩শে কার্তিকের দৈনিক হিতবাদীতে প্রথমে আমি উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। গত ৩রা অগ্রহায়ণের হিতবাদীতে কালীপদ বাবু প্রথম প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত ভ্রমগুলির প্রতিবাদ গত ২৪শে ফাল্গুনের বহুসতীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। বোধ কবি তাহা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সে কারণ তিনি গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে পুনরায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অবগতির জন্য পুনরায় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি ইহা পাঠ করিয়া কালীপদ বাবু আমার সহিত সহজে একমত হইতে পারিবেন।

কালীপদ বাবু লিখিয়াছেন, “১ একবিঘা জমিতে ৮০০/০ আট শত মণ ইন্দু হওয়া আমরা সম্ভবপর মনে করি না।” আমার প্রবন্ধে পশ্চিমাঞ্চলের মাপের বিষয় লেখা আছে। বোধ করি, তিনি ত্রিহাতাঞ্চলের জমির মাপের বিষয় সম্যকরূপে অবগত না থাকায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রবন্ধে স্পষ্ট লেখা আছে, “পশ্চিমাঞ্চলের মাপের ৪০০/০ চারিশত বিঘা জমি আবশ্যক।” উক্ত চারিশত বিঘা জমি আমাদের অর্থাৎ বঙ্গদেশের ১ একহাজার ৫৬২ বিঘা জমির সমান। অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চলের ১ বিঘা জমি আমাদের দেশের ২২২৮/০ জমির সমান। কারণ আমাদের দেশে চারি হাতের মাপ; (৪ হাত × ৮০ হাত = ১ এক কাঠা)। পশ্চিমাঞ্চলে ৬২ হাতের মাপ; (৬২ হাত × ১০ হাত = ১ এক কাঠা)। সামান্য দৃষ্টিতে কেবল দুই অঞ্চলের মাপ দেখিয়া, হিসাবানভিজ্ঞ সাধারণ লোকে অনুমান করিতে পারেন যে পশ্চিমাঞ্চলের ৪০০/০ চারিশত বিঘা জমি আমাদের দেশের ৬৫০/০ বিঘা জমির সমান। কিন্তু বাহাদের জমির ক্ষেত্রফল সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তাহারা পশ্চিমাঞ্চলের ৪০০/০ চারিশত বিঘা জমি বঙ্গদেশের ১ একহাজার ৫৬২ বিঘা জমির সমান—ইহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাধারণের অবগতির জন্য দুই অঞ্চলের জমির ক্ষেত্রফল নিয়ে প্রদত্ত হইল:—

$$\begin{aligned} \text{পশ্চিমাঞ্চলে } ৬২ \text{ হাতে কাঠা।} \\ \therefore \text{ } \quad \quad \quad ১ \text{ বিঘা জমি} &= (৬২ \times ২০) (৬২ \times ২০) = ১০০ \times ১০০ \\ &= ১০০০০ \text{ বর্গ হাত।} \end{aligned}$$

* Japan by the Japanese ক্রষ্টাব্দ।

বঙ্গদেশে ৪ হাতে কাঠা ।

$$\therefore \text{১ বিঘা জমি} = (৪ \times ২০) (৪ \times ২০) = ৮০ \times ৮০ = ৬৪০০ \text{ বর্গহাত} ।$$

$$\therefore \text{পশ্চিমাঞ্চলের ১ বিঘা জমি} = \frac{১৬২০০}{৬৪০০} = ২ \frac{৪১}{৬৪} = ২।৬৪ ।$$

বঙ্গদেশের জমির সমান ।

$$\therefore \text{৪০০ চারিশত বিঘা জমি} = \frac{১৬২০০}{৬৪০০} \times ৪০০ = ১০৫৬ ;$$

বঙ্গদেশের বিঘা ।

আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইক্ষু আবাদ করিলে কালীপদ বাবুর হিসাবানুযায়ী যম্পি বিঘাপ্রতি ৩৫০/০ মণ ইক্ষু হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে পশ্চিমাঞ্চলের বিঘা প্রতি ৯২০/০ মণ ইক্ষু হওয়ার আশা করা যায় । কিন্তু বিঘাপ্রতি ৩৫০/০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন না হইয়া ৩০০/০ মণ হিসাবে উৎপন্ন হইলেও পশ্চিমাঞ্চলের ১ বিঘা জমিতে ৭২০/০ মণ ইক্ষু হওয়া অসম্ভব মনে করি না । আমি বিশ্বস্তসূত্রে ইহাও অবগত আছি যে, পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকেরা সাধারণ নিয়মে চাষ করিয়াও কখন কখন বিঘাপ্রতি ৮০০/০ আট শত মণ ইক্ষু পাইয়া থাকে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করিলে উহার আরও বেশী ফল লাভ করিবে ভবিষ্যে সন্দেহ কি ? এবং যম্পি পূর্বোক্ত হিসাবে বিঘাপ্রতি ৮০০/০ আট শত মণ ইক্ষু হওয়া অসম্ভব না হয় তাহা হইলে তৎতৎ বিঘাপ্রতি ৫০/০ মণ চিনি (ও ৫০/০ মণ নিরা বা ছোঁষা) উৎপন্ন হওয়া কোন ক্ষেত্রেই আশ্চর্য্য নহে । এবং উৎপন্ন চিনি যদি ৭ সাত টাকা মণ দবে বিক্রয় হয় তাহা হইলে আমার আর ব্যয়ের তালিকায় যেকপ লাভের বিষয় লেখা আছে—তাহা অত্যধিক বলিয়া অনুমিত হইবে না ।

আমি প্রবন্ধে ধেরূপ কলকাবধানার প্রস্তাব করিয়াছি তাহার আনুমানিক মূল্যতালিকা পঠকগণের অবগতির জন্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

যন্ত্রের নাম	আনুমানিক মূল্য ।
১। ভ্যাকুয়াম প্যান ...	১৫০০
২। ইঞ্জিন ১৬ হর্ষপাওয়ার (কেবল প্যান চালাইবার জন্ত)	২৫০০
৩। ইঞ্জিন ৩০ বা ৪০ হর্ষপাওয়ার তুরপিন, মাডাই কল, ও জুসপাম্প চালাইবার জন্ত ...	৩৫০০
৪। বড় বয়েলার দুইটা (উপরি উক্ত দুইটা ইঞ্জিন ও প্যানের টিমের জন্ত)	১২০০০
৫। Multiple Effect Evaporator রস মোটা করিবার কল ...	৩৫০০
৬। তুরপিন ৩টা প্রত্যেক ২০০০ হিঃ	৬০০০
৭। Crushing Plant (মাডাইকল)	২৫০০
৮। Tanks (ট্যাঙ্ক) রসের জন্ত ১০টা	১৫০০
মোলাসেসের জন্ত ৫টা	
জলের জন্ত ৩টা	
একুনে ১৮টা	
৯। ব্যাপকিলটার (ছাকনি কল)	২০০০
১০। Water Pump...	১০০০
	৬৬০০০

উপরি উক্ত মূল্যের যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যাহ ১০০/০ একশত মণ আদ্য চিনি তৈয়ারি হইতে পারে । অবশ্য একটা ফ্যাক্টরী স্থাপন করিতে হইলে, কারখানার যব তৈয়ারি করিবার খরচ, যন্ত্রাদি আনাইবার ও বসাইবার খরচ ও যোডাড করিবার জন্ত পাইপ কর্ক, রবার ইত্যাদির

খরচ ইক্ষু চাষের উপযোগী নবাবিকৃত যন্ত্রাদির খরচ এবং চাষের উপযোগী বলদ ও জমির মূল্য ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যয় অপরিহার্য্য । হতরং আমি যে ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরীর কথা লিখিয়াছি তাহা স্থাপন করিতে হইলেও অন্ততঃ দেড় লক্ষ টাকা মূলধন আবশ্যক । অতএব যে ফ্যাক্টরীর কার্য্য নির্বাহের জন্ত আমাদের দেশের যাপের এক হাজার সওয়া ছাপ্পান্ন বিঘা জমি আবাদ করিতে হইবে এবং পূর্বোক্ত মূলধন ব্যয় করিতে হইবে তাহা হইতে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা আর—তত দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না । বরং হুচার বন্দোবস্তে উহা অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক হইবার সম্ভাবনা ।

কালীপদ বাবু লিখিয়াছেন, “আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে বলিতে পারি যে, রস হইতে ভ্যাকুয়াম প্যানে চিনি তৈয়ারি করিলে তাহা স্বতঃই সাদা হয়; কোন জিনিষ মিমা পরিষ্কার করিতে হয় না।” তিনি বাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য । কিন্তু ইক্ষুরস ভ্যাকুয়াম প্যানে পাকান হইবার পূর্বেই হাড়ের কলার ফিল্টার দ্বারা পরিকৃত হয় । ঐ রস ফিল্টারের গুণেই সাদা হয় উহাতে লাগে রং কিছুমাত্র থাকে না । পরে ঐ পবিকৃত রস ভ্যাকুয়াম প্যানে পাকান হইলে স্বভাবতঃই শুভ্রতর চিনিতে পরিণত হয় । অতএব হাড়ের কলার ফিল্টার ও ভ্যাকুয়াম প্যান উভয়ের গুণেই ইক্ষুরস হইতে সাদা চিনি পাওয়া যায় । কিন্তু ইক্ষুরস হাড়ের কলার ফিল্টার দ্বারা পরিকৃত না হইয়া কেবলমাত্র ভ্যাকুয়াম প্যানে পাকান হইলেই কালী বাবুর মতানুসারে শুভ্র চিনি পাওয়া যাইবে—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি । দ্বিতীয় কথা—বিশুদ্ধ ভাবে চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে হাড়ের কলার ফিল্টারের দ্বারা অস্পৃশ্য পদার্থ সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য হতরং তাহার অভাব মোচনের জন্ত আমাদের দেশীয় প্রথামতে শেওলা দ্বারা কার্য্য নির্বাহ করিতে হইবে ।

আমি শেওলা দ্বারা চিনি রিফাইন করা সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছি, সম্ভবতঃ কালীপদ বাবু তাহা সম্যক জ্ঞয়ঙ্গম করিতে না পারায় উক্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছেন । শেওলা রসে দিলে কোন কার্য্য হয় না । ভ্যাকুয়াম প্যানে পাকান হইয়া তুরপিন হইতে যে চিনি বাহির হইবে তাহাতেই আমাদের দেশীয় প্রথা মতে শেওলা ব্যবহার করিতে হইবে । তাহা হইলে হাড়ের কলার ফিল্টারের পরিবর্তে শেওলার সাহায্যেই রসের পরিকৃত চিনি পাওয়া যাইবে । তুরপিন হইতে যে চিনি বাহির হয় তাহা তৎকালে দেখিতে শুভ্র হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার স্বাদিগুণ কম । উহাকে স্বাদিগুণবিশিষ্ট বা পাকা চিনি করিবার উদ্দেশ্যেই শেওলা ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা ।

ঐক্যদারনাথ দাস ।

গুসকরা, বর্ধমান ।

একডালা-দুর্গ ।

যে যুগ বাঙ্গালার ইতিহাসের “স্বাধীন পাঠান শাসন-যুগ” নামে কথিত হইয়া আসিতেছে, তাহার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এখনও তমসাক্ষম হইয়া রহিয়াছে ।

তজ্জন্ত বত কাল্পনিক কাহিনী ইতিহাস বলিয়া পবিত্রিত হইতেছে, তাহাব আলোচনা কবিত্তে বসিলে, বিন্ময়ে

অভিভূত হইতে হয় ।

বঙ্গভূমি রত্নপ্রসবিনী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত ছিল। তাহার জন্তই বক্তৃত্যর খিলিজি এদেশে খিলিজিদিগের উপনিবেশ সংস্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহাব চেষ্টা স্বাধীন চেষ্টা। তাহা দিল্লীর বাদশাহের দিখিজর বলিয়া কথিত হইতে পারে না। শিষ্টাচার রক্ষার্থ বক্তৃত্যর খিলিজি সময়ে সময়ে দিল্লীর বাদশাহের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিলেও তাঁহাকে লক্ষণাবতীরাজ্যের রাজচক্রবর্তী বলিয়া স্বীকার করিতেন কি না, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। কিন্তু বক্তৃত্যর খিলিজিব আকস্মিক অকাল মৃত্যুর অব্যবহিত পরে খিলিজিদিগের মধ্যে প্রাধান্ত লাভেব জন্ত যে গৃহকলহের সূত্রপাত হয়, তাহাতেই দিল্লীর প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠালাভ কবে। স্বাধীন হইয়া কেহ কেহ দিল্লীর বাদশাহের শবণাপন্ন হইয়া, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে লক্ষণাবতীরাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভেব চেষ্টা করেন। প্রজা সাধারণ,—কি হিন্দু, কি মুসলমান,—তাহাতে সন্মত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তখন এ দেশে সামন্তপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। সামন্তগণ স্বাধীন নরপতির জায় স্বাধিকার মধ্যে স্বাধীন ভাবেই শাসনক্ষমতা পরিচালিত করিতেন। বক্তৃত্যর খিলিজি সেই সামন্তপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোন কোন স্থলে হিন্দুসামন্তের পরিবর্তে মুসলমান জায়গীরদার সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি সকল স্থান জয় করিতে না পাবিয়া, যতদূর জয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই বাজ্য গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উত্তর বঙ্গের সামন্তগণ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ছিলেন,—তাঁহারা শক্তিশালী বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। বক্তৃত্যর খিলিজির সময় হইতে তাঁহারা পুনঃপুনঃ আক্রমণবেগ সহ্য করিয়া প্রকরা-স্তরে স্বাধীন ভাবেই রাজ্য শাসন করিতেন।* তাঁহাদের জন্তই বক্তৃত্যর খিলিজিকে নিয়ত দেবকোটের সেনা নিবাসে কাল যাপন করিতে হইত। এই স্বাতন্ত্র্যালিপ্সা হিন্দু সামন্তগণের জায় মুসলমান জায়গীরদারগণকেও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা লক্ষণাবতীরাজ্যে

সুলতান হইবার জন্ত চেষ্টা করিলেও, দিল্লীর বাদশাহের অধীন বলিয়া পবিচয় দিতে স্বীকৃত হইতেন না। কালে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্বার্থসম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে, এই স্বাতন্ত্র্যালিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন গোড়ীয় সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্ত বাঙ্গালী মাঝেই বন্ধপরিবর্তন হইয়াছিলেন। অবশেষে ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে হাজি সামসুদ্দীন ইলিয়াসের চেষ্টায় গোড়ীয় সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করে। তাহা সহজে সাধিত হয় নাই। দিল্লীর কিরোজ শাহ পাণ্ডুর রাজধানী আক্রমণ করিয়া, হাজি ইলিয়াসের পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন;—হাজি ইলিয়াসকে একডালার দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন;—অবশেষে একডালার নিকটবর্তী উন্মুক্ত প্রান্তরে এক লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান জীবন বিসর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিল!*

একডালার যুদ্ধক্ষেত্র বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের চিরস্মরণীয় বিষয় ক্ষেত্র। বাঙ্গালী মাঝেই স্বাধীন পাঠান শাসনের কথা অবগত আছেন, কোন কোন গোড়ীয় বাদশাহের নাম এখনও অনেকের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু যে বিষয়ক্ষেত্রে এই স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহাব নাম পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।

একডালা-দুর্গ কোথায় ছিল, বাঙ্গালী তাহাব তথ্য নির্ণয়ের জন্ত যথাযোগ্য আগ্রহ প্রকাশিত করে নাই। ইমরাজ লেখকগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা তর্ক বিতর্কের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাহা যেরূপ বিশ্বাস্যবহ, সেইরূপ হাস্যোদ্বীক্যকর। অথচ তাহাই ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

দিনাজপুরের কালেক্টর মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট লিখিয়া-
ছিলেন—একডালা দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত।†

* The Rajas of Northern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence, in spite of the numerous invasions from the time of Bakhtyar Khilji. —Professor Blochmann, J. A. S. B., 1873.

* বাব্বী-বিরচিত “তারিখ-ই-ফিবাজশাহী” গ্রন্থে লিখিত আছে Firuz Shah laid siege to the Fort of Ekdala for several days, and nothing decisive occurring, made a feint retreating movement westward seven *kosh* from Ekdala when Ilyas Shah, thinking Firuz Shah was retreating, came out of the fort Ekdala, advanced and attacked the Imperialists, who defeated and killed one *lak* of the Bengal army.

† J. A. S. B., Vol. XLIII, p. 244.

উত্তর বঙ্গের অনেক স্থানেই পুৰাতন সামন্তগণের এবং জায়গীর্দারগণের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে । তাহারই একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া,—সে স্থান স্বয়ং পরিদর্শন না করিয়াই,—মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট একডালা দুর্গের স্থান নির্ণয় করিয়া গিয়াছিলেন । তাহাই কিছু দিন পর্যন্ত একডালা দুর্গের প্রকৃত স্থান বলিয়া ইংরাজ লেখক-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল ।

প্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিৎ মিষ্টার টমাস পুনর্ভবানদীতীরবর্তী জগদলা নামক স্থানকে একডালা বলিয়া ইঙ্গিত করিয়া যে তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করিয়া যান, অধ্যাপক ব্রহ্মদাস তাহাব অলীক প্রতীপাদিত করিয়া লিখিয়াছিলেন,—একডালা দুর্গ পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী বলিয়া মুসলমানলিখিত ইতিহাসে সুস্পষ্ট উল্লিখিত থাকিলেও, অত্য়াপি তাহার স্থান নির্ণয়ে সংশয় রহিয়া গিয়াছে ।* অতঃপর মিষ্টার ওয়েষ্টমেকট পাণ্ডুয়ার ২৩ মাইল দূরে একডালার স্থান নির্ণয় করায়, ইংরাজলেখকগণ তাহাকেই প্রকৃত স্থান বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । পরে মিষ্টার বিভারিজ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—একডালা ঢাকাজেলার অন্তর্গত ।† এপর্যন্ত ইহার অধিক আর কোনও আলোচনা মুদ্রিত হয় নাই । কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মিষ্টার বিভারিজ এই সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সার মর্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল । বলা বাহুল্য, একডালাদুর্গ পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী বলিয়া মুসলমান লিখিত ইতিহাসে যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত মিষ্টার বিভারিজের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করা অসম্ভব । তিনি নিজেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি বলেন,—এ বিষয়ের প্রথম লেখক দিল্লী নিবাসী জিয়াউদ্দীন বার্লী ; তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না ; বুদ্ধ বয়সে দিল্লীতে বসিয়া ইতিহাস লিখিতে গিয়া বার্লী ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়া থাকিবেন ।‡ এরূপ অনুমানের

আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, মিষ্টার বিভারিজের সকল তর্কই বার্লীর এক কথায় খণ্ডিত হইয়া যায় ।

মিষ্টার বিভারিজ যেরূপ তর্কপ্রণালীর অবতারণা করিয়া গিয়াছেন তাহা হাস্যোদ্বীকক । তিনি বলেন,—“ঢাকার উত্তর-উত্তর-পূর্বকোণে ২৫ মাইল দূরে নদীতীরে একডালা নামে একটি স্থান রেনেলের মানচিত্রে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাব একদিকে নদী, অপর দিকে ভাওয়ালের জঙ্গল । এই প্রাকৃতিক সংস্থান ইতিহাস-বর্ণিত একডালার প্রাকৃতিক সংস্থানের অনুরূপ । ইহাব ৮ মাইল দূরে ছবছড়িয়া নামক স্থানে দুর্গটি সংস্থাপিত ছিল বলিয়া বোধ হয় ।” এখানেও মিষ্টার বিভারিজের অনুমান অসঙ্গত হইয়া পড়িতেছে । কারণ মুসলমান লিখিত ইতিহাসে একডালা গ্রামেই দুর্গ থাকা দেখিতে পাওয়া যায় । মিষ্টার বিভারিজের একডালা এবং ছবছড়িয়ার মধ্যস্থলে নদীস্রোত ;—একপারে একডালা, অপর পারে ছবছড়িয়া । হাজি ইলিয়াস পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া, নদী পার হইয়া একডালাদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কবিবার কথা মুসলমান লিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় । মিষ্টার বিভারিজ এস্থলে যে প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—“ডাক্তার টেলর ঢাকাবিবরণী নামক যে গ্রন্থ-রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হুস্তাপ্য হইয়া উঠিয়াছে । সেই গ্রন্থে একডালার বিশেষ বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে ।”

ডাক্তার টেলর লিখিয়া গিয়াছেন,—“একডালার অপর পাবে ছবছড়িয়া নামক স্থানে একটি পুৰাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় । একডালার নিকটেও একটি পুৰাতন রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান । লোকে বলে,—তাহা বুনিয়া রাজাদিগের রাজবাটা ছিল ; তাহারাই দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন । দুর্গটি এখন বাণীবাড়ী নামে পরিচিত, এক সময়ে রাণী ভবানীর অধিকারভুক্ত ছিল ।

local knowledge. বার্লী সমসাময়িক ইতিহাস লেখক । তাহার ভ্রম হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমান কবিবার কারণ নাই । তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :—Ekdala is the name of a mouza close to Pandua, on one side of it is a river, and on another a jungle. সামস্-ই-সিরাজের “তারিখ ফিরোজ শাহী” গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় উত্তর কালে একডালা “আজাদপুর” নামেও কথিত হইয়াছিল ।

* J. A. S. B., Vol. LXIV, p. 227.

† The actual site of this fort is still a matter of doubt.—J. A. S. B., Vol. XLII, p 212.

‡ The only objection to the Dacca Ekdala is that Ziyah-uddin Barani speaks of Ekdala as being near Pandua. But he wrote in his old age at Delhi, and apparently he had never visited Bengal and had no

বোধ হয় এই দুর্গেই হাজি সামসুদ্দীন ইলিয়াস ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীখর ফিরোজশাহ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবেন। তৎকালে সামসুদ্দীন একবার ছদ্মবেশে দুর্গত্যাগ করিয়া “রাজা বিয়াবাণী” নামক মুসলমান সাধুপুরুষের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিবার কথা মুসলমান লিপিত ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হয় রাজা বিয়াবাণী রাণী ভবানীব বংশধর হইবেন।”

মিষ্টার বিভারিজ তাঁহার কথার উপর নির্ভর কবিত্তাছেন, তাঁহার কথা কিরূপ হস্তোদ্ধাপক তাহা বাঙ্গালী মাঝেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মিষ্টার বিভারিজ আবার তাহাকে অধিক হস্তোদ্ধাপক করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,— “ডাক্তার টেলবের এই উক্তি বড়ই সারগর্ভ,—মুসলমান সাধুর নাম রাজা হইতে পারে না,—তিনি পূর্বে হিন্দু ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়,—বিয়াবাণী এবং রাণী ভবানী হয়ত একই শব্দ।” *

“বিয়াবাণী” একটি পারসিক শব্দ; তাহার অর্থ—আরণ্যক। যে সাধুপুরুষ মালদহ প্রদেশে “রাজা বিয়াবাণী” নামে কথিত হইতেন, তিনি লোকালয় ছাড়িয়া নিয়ত অবগ্য মধ্যেই বাস কবিতেন। তজ্জন্ত লোকে তাঁহাকে অরণ্যের রাজা (রাজা বিয়াবাণী) বলিত। অত্মপি তাঁহার সম্বন্ধে কত অলৌকিক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মালদহেব ইতিহাসলেখক গোলাম হোসেন এবং ইলাহিবক্স উভয়েই তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন্ স্থানে বাস কবিতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত ইলাহিবক্স স্বরচিত হস্তলিপিত পাবস্তভাষানিবদ্ধ “খুশেদজ্জাহানামা” নামক ইতিহাসে অলিখিত স্থান রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি

“রাজা বিয়াবাণীকে” মালদহনিবাসী বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডুর নিকটবর্তী স্থানে একালেব জায় সেকালেও অরণ্যের অভাব ছিল না। লোকালয় ত্যাগ কবিত্তাছিলেন বলিয়া, “রাজা বিয়াবাণী”ব সমাধিক্ষেত্রে কোনও সমাধিসম্মতির নির্দিষ্ট হয় নাই। তাহাতেই সে স্থান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাকে পূর্ববঙ্গে নির্দেশ করিবার কারণ নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বাণী ভবানী বর্তমান থাকিতে পারেন না; ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তিনি স্বর্গারোহণ কবেন। মিষ্টার বিভারিজ বা ডাক্তার টেলব তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেও, এই সকল হস্তোদ্ধাপক তর্ক এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় স্থান লাভ করিতে পারিত না।

একডালা কোথায় ছিল? সমসাময়িক মুসলমান লেখকেব কথাই তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ। সে প্রমাণেব অভাব নাই। সকলেই লিখিয়া গিয়াছেন,— তাহা পাণ্ডুর নিকটে—নদীপাৰে—মহাবনের নিকটে। কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন,—ফিরোজশাহ দুর্গজয়ে অসমর্থ হইয়া, গঙ্গাতীরে শিবিরসন্নিবেশ কবিত্তাছিলেন; তাঁহার সেনাদল মশকদংশনে বিব্রত হইয়াছিল। উত্তরকালে গোড়েশ্বর হোসেনশাহেব একডালা দুর্গে বাস করিবার কথাও লিখিত আছে।* তৎকালে তিনি বর্ষে বর্ষে একডালা হইতে পাণ্ডুর আসিয়া মুর কুতব নামক স্বনামখ্যাত সাধুপুরুষের সমাধিক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন করিতেন।†

এই সকল বিবরণ পাঠ কবিত্তাও, মিষ্টার বিভারিজ ভ্রম পবিহারের চেষ্টা না করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন— “ইহার সকল কথাই পূর্ববঙ্গের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে। ফিরোজশাহ গঙ্গাতীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গা না বলিয়া বুড়ীগঙ্গা বলিলেই হইল। ঢাকার অন্তর্গত

* He then tells the story of Ilyas Shah's coming out of the fort to attend the funeral of Rajah Biyabani, and suggests that this saint was a descendant of Rani Bhabani. This seems a valuable suggestion. The title of Rajah is a curious one for a Mahomedan saint, and in all probability points to the fact that he was a converted Hindu. Biyabani means wild or desert in Persian, but it closely resembles the name of the Rani, and it is likely that the two words are identical. —J. A. S. B., Vol. LXIV., p. 228.

† Sultan Alauddin Husain Shah, girding up the waist of justice, unlike other Kings of Bengal, removed his seat of Government to Ekdaia, which adjoins the city of Gour. And excepting Husain Shah, no one amongst the Kings of Bengal, made his seat of Government anywhere except at Pandua and the City of Gour.—Riaz-us-Salateen.

একডালাব নিকটেও এক মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির আছে; তাহাই হয়ত মুর কুতবের সমাধিমন্দির। হোসেনশাহ অনেক সময়ে পূর্ববঙ্গেও বাস করিতেন; তদ্রূপে তাঁহার নির্মিত মসজিদ অজাপি দেবীপ্যমান।
গৌড়েশ্বরগণ যে বিপদে পড়িলে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, লক্ষণ সেনের আমল হইতেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মশকদংশনের কথা ঢাকার পক্ষেই সর্বতোভাবে সঙ্গত।”

বলা বাহুল্য এরূপ তর্কপ্রণালী কেবল এদেশের ঐতিহাসিক তথ্যালোচনায় এবং বিচাবশালায় সময়ে সময়ে ইংরাজেরাই অবলম্বন করিয়া থাকেন। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ কাহার অধিকারভুক্ত ছিল, মিষ্টার বিভাবিজ তৎপ্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন নাই। ফিরোজশাহ পরাভূত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পরে পূর্ববঙ্গ হাজি সামসুদ্দীন করতলগত হয়। তৎপূর্বে তাঁহার পক্ষে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। মুর কুতব একজন সুবিখ্যাত সাধুপুরুষ, তাঁহার সমাধিমন্দির পাণ্ডুয়া নগরেই অবস্থিত;—জিজ্ঞাসা করিলে যে কোনও বাঙ্গালী মুসলমান মিষ্টাব বিভাবিজকে তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন।

একডালা যে পাণ্ডুয়াব নিকটে, নদীর অপব পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে একবার বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান অসাধারণ আত্মত্যাগে স্বদেশের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। এখানেই আবার হিন্দু মুসলমানের চিব প্রিয়পাত্র হোসেন শাহের রাজধানী ছিল,—এখানেই পুণ্যশ্রোক রূপসনাতন, সাকব মল্লিক এবং দবিরখাস রূপে বাদশাহের প্রধান পার্শ্বচর হইয়া রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেন;—এখানেই বঙ্গসাহিত্য মুসলমান বাদশাহের নিকট উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। স্মরণ্য বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে একডালাব স্থাননির্ণয়ে আগ্রহ প্রকাশিত হওয়া সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

যাঁহাও ইংরাজ লেখকগণের পদাঙ্কানুসরণ না করিয়া, স্বাধীনভাবে গোড়মণ্ডল পরিদর্শন কবিত্তে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা সহজেই একডালাব স্থান নির্ণয় করিতে পারিবেন। রাতেনসার গ্রায়ে তাহার উল্লেখ না থাকায়, কেহ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু গোড় পরিদর্শকগণ অনেকেই দেখিয়াছেন,—সাগবদীঘির অনতিদূরে এক ভূর্গাকার বিজন বন পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার একদিকের পরিখা এবং মৃৎপ্রাচীর এখনও বর্তমান আছে। তাহাই একডালা-ভূর্গের পুঁবাতন স্থান,—এখন জনসমাজের নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে।

হোসেন শাহ যে পথে একডালা হইতে পাণ্ডুয়া গমন করিতেন, সে পুঁবাতন রাজপথের চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়;—তাহা বাদশাহী রাজপথের জায় ইষ্টকমণ্ডিত ছিল। এই পথে অগ্রসর হইয়া যেখানে নদীপাব হইতে হইত, সেখানে অল্পকাল পূর্বেও লোকে সেতুর চিহ্ন দর্শন করিয়াছে বলিয়া এখনও গল্প কবিত্তা থাকে। একডালাব অনতিদূরে মুরকুতবের পিতৃগুরু মক্চুম আধি সিবাঙ্কদীন নামক সাধুপুরুষেব পুঁবাতন সমাধিমন্দির। হোসেন শাহ তাহাব একটি স্তোরণদ্বার নির্মিত কবাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে এখনও হোসেন শাহের কীর্ত্তি প্রস্তরফলকে খোদিত আছে। অল্পকাল পূর্বে এই ভূর্গান্তবাবে কৃষকগণ পুঁবাতন বোপ্যমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার একটি মুদ্রা মালদহ-ইংরেজাবাদের জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। সে মুদ্রা হাজি সামসুদ্দীন ইলিয়াসের মুদ্রা। এই সকল কারণে, পুঁবাতন লক্ষণাবতী নগরের চতুঃসীমার মধ্যে সাগবদীঘির অনতিদূরবর্তী পুঁবাতন ভূর্গস্থানকেই একডালা ভূর্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহার সহিত সমসাময়িক মুসলমান লেখকের সকল কথাই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি যাঁহারা একডালাকে বগুড়া জেলায় টানিয়া লইতে চাহিতেছেন, তাঁহারা এই সকল কথা আলোচনা করিলে আত্মদ্রম পরিহার কবিত্তে পারিবেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

† And for the maintenance of the rest-house in connection with the eminent Saint Nur Qutub-ul-Alam, he endowed several villages, and every year from Ekdala, which was the seat of his Government, he used to come to Pandua, for pilgrimage to the bright shrine of the holy Saint. —*Ibid.*

সুপারি শব্দ দেশজ কি ?

ভাদ্র মাসের ‘প্রবাসীতে’ ‘চক্ষু পদার্থ কি’ এই নামের প্রবন্ধের পাদটীকায় শ্রদ্ধাশ্রাদ্ধ শ্রীধিচ্ছেননাথ ঠাকুর মহাশয় সুপারি শব্দ বাংলা বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়, শুবাক—ডাহা সংস্কৃত, শুয়া—ভাঙা সংস্কৃত, সুপারি—ডাহা বাঙলা। ‘ডাহা বাঙলা’ অর্থে বোধ করি বংগদেশজ শব্দ।

কিন্তু বাংলাভাষায় সুপারি শব্দ অধিক দিন প্রবেশ কবে নাই। কৃত্তিবাসে (লংকাকাণ্ডে), ‘বাটা ভরিয়া শুয়া দিব,’ কবিকংকণে, ‘তাম্বুলিতে দেয় শুয়া পান’। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতোক্ত ‘শুয়া’। ভারত চন্দ্রে, এমন কি প্রায় এক শত বৎসর পূর্বের মাণিক গাংগলীর ধর্মমংগলোক্ত সুপারি বা সুপারী শব্দ পাই না, পাই শুয়া। পূর্ববংগে (যেমন ঢাকা ও ফরিদপুরে) নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অজ্ঞাপি শুয়া বলে। ওড়িয়াতে শুয়া ; সুপারি বা সুপারি শব্দ অজ্ঞাত। তেলে-গুতে বাকলু। বাক শব্দ সংস্কৃত শুবাক শব্দের সংক্ষেপ বোধ হয়। ‘লু’টা বিভক্তি মাত্র। হিন্দী ও মরাঠিতে সুপারী শব্দ চলিত। উর্দুতে সুপারী। বাংলায় সুপারি বলে। পান সুপারি শুনি।

সুপারী শব্দ উর্দুতে আছে বটে, কিন্তু আবার কিছল ফার্সীতে নাই। অতএব বাবনিক বলিতে পারা যায় না। তবে উৎপত্তি কি ? ‘দেশজ’ ? কোন্ দেশজ ? বংগদেশজ নহে।

দুই অনুমান হয়। হয়ত সংস্কৃত খপুয় শব্দ হইতে সপুর, সপুরী, সুপারী, সুপারী আসিয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমে খপুয় শব্দের এক অর্থ শুবাক আছে। খপুয় শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত বোধ হয়। সংস্কৃত শব্দের শ য় স স্থানে হিন্দীতে থ হইতে দেখি। সংস্কৃত শব্দের থ স্থানে হিন্দীতে স হইতে দেখি না। কিন্তু সংস্কৃত কদ্রুম হইতে বাংলা কুমুম কুমুম (গরম), হিন্দীতে সুহুম। এখানে সংস্কৃত শব্দের ক স্থানে হিন্দীতে স হইয়াছে।

এমনও হইতে পারে, হিংদী সুপারী সংস্কৃতে খপুয় আকার পাইয়াছে। তাহা হইলে মূল শব্দ সপুরী বা সপরী হইতে পারে। সকলেই জানেন, সুপারি গাছ উত্তর ভারতে

জন্মে না। ভারতের সমুদ্রতটবর্তী স্থান হইতে বণিকেরা উত্তর ভারতে সুপারি লইয়া যায়। সফর করিয়া যায় বলিয়া সফরী, সপরী, সুপারী, সুপারি ? এই অনুমান সত্য হইলে সুপারি শব্দের মূল, বাবনিক সফর।

ইহার সহিত বাংলা সপরী কুমড়া নাম তুলনা করা যাইতে পারে। বিলাতী কুমড়াকে কোন কোন স্থানে সপরী কুমড়া বলে। ইংরেজী আনানস শব্দ হইতে বাংলা আনারস নাম হইয়াছে। বিদেশ হইতে আগত বলিয়া আনারসকে ওড়িয়াতে সপরী বলে। অতএব বাবনিক সফর হইতে সফরী, সুপারী, সুপারি শব্দ আসা অসম্ভব নহে।

ঠাকুর মহাশয় বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত। এই হেতু তাঁহার অনুমানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলে ভয়ে ভয়ে বলিতে হয়। আশা করি, তিনি সন্দেহ ভাংগিয়া দিবেন।

কটক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

অশরীরীর আবির্ভাব।

গত চৈত্রের ও আষাঢ় মাসের “প্রবাসী”তে “ভূত নামানো” শীর্ষক দুইটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধ “অঞ্জলি”র কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহোদয়, তাঁহার পরিবারে যে অভূতপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া আমার নিকট গল্প করেন, তাহা নিয়ে বর্ণনা বিবৃত হইতেছে।

“আমি গত ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজমারীতে বেড়াইতে যাই; সেখানেই ত্রিপাদবিশিষ্ট মেজে অশরীরীর আবির্ভাব প্রথমে দেখিতে পাই; একদিন সন্ধ্যা বেলা আমাদের রাজমারীতে বৈঠকখানায় প্রভাত বাবুর বর্ণনামু-
যায়ী প্রণালীতে প্রেতাঙ্কাকে আকর্ষণ করা হইয়াছিল। আমাদের প্রেমের উত্তরে প্রেতাঙ্কা সঙ্কেতে জানায় সে সুখেই আছে; কিন্তু তাহার ভাত খাইবার ইচ্ছা কবে, আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই, তৃপ্তহীন সুখ কিরূপ!

আমাদিগের অন্তরীক্ষে পূর্বোক্ত প্রেতাঙ্কাটী ঠিক একঘণ্টা পরে অল্পদিন পূর্বে মৃত স্থানীয় একজন ভদ্রলোককে

মেজে আনয়ন করে। তিনি সঙ্কেতে উত্তর দেন, তিনি অত্যন্ত কষ্টে আছেন এবং এখনও তিনি তাঁহাব বসত-বাটিতেই অল্পবয়স্কা ভায়া এবং শিশু পুত্র দ্বয়েব নিকটে অবস্থান করিতেছেন। আমি পূর্বোক্ত প্রেতাঙ্গাকে আমার বয়স কত—এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সমস্ত মেজটী হঠাৎ আমার দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকে, তখন আমার জেঠা মহাশয় (বাঙ্গামাটির বর্তমান সিভিল সার্জেন) বলেন যে, “এরূপ প্রশ্ন করা সঙ্গত নহে, জীবিতাবস্থায় যাহা লোকে জানিতে পাবে না, মৃত্যুর পরেও সে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভে সক্ষম নহে।” আমি ঐ প্রেতাঙ্গাটির সম্পূর্ণ অপরিচিত, সুতরাং প্রেতাঙ্গাব প্রতি অবিশ্বাস হেতু তাহার পরীক্ষার্থ—অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্ন করাতে সে হয়ত কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। যাহা হউক, চক্রস্থিত একজন ভদ্রলোক “জীবেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করিলেন” এরূপ বলাতে মেজ শাস্ত ভাব ধারণ কবিল :

তারপর স্থানীয় একজন ভদ্রলোক সেই প্রেতাঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেধানকার পুলিশ আফিসের হেড ক্লার্ক মহাশয়ের উপরে তাহার কোন বিদ্বেষ ভাব আছে কি না ? সে সঙ্কেতে উত্তর দেয়, “আছে।” স্থলকায় হেড ক্লার্ক মহাশয় আমার পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রফুল্ল বদন শুষ্ক হইয়া গেল এবং তিনি ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। তখন আমার জেঠামহাশয়ের আদেশে প্রেতাঙ্গাকে প্রশ্ন করা হয় যে, সে তাঁহার কোন অনিষ্ট কবিত্তে পারে কি না ? উত্তর পাওয়া গেল, “না।” তখন হেড ক্লার্ক মহাশয় অকস্মাৎ এক লক্ষ্য প্রদান কবিয়া বলিলেন “তবে বে বেটা শালা ভূত, তোকে কে ডবায় ?” হেড ক্লার্ক মহাশয় সিভিল সার্জেন মহোদয়ের নিকট নিতান্ত নম্র ভাবে অবস্থান করিতেন ; অকস্মাৎ তাঁহার এই প্রকার ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া আমরা সকলেই যৎপবোনাস্তি বিস্মিত হইলাম।

ইহাব কিছুদিন পবে আমি চট্টগ্রাম কবিয়া আসি। আমাদের নিকটে অশরীরীর আবির্ভাবের গল্প শুনিয়া অনেকে প্রেতাঙ্গাকে আকর্ষণ করিতে উৎসুক হন। কোন গ্রামস্থিতা আমার জনৈক আত্মীয়্যও অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ কবিত্তা নিত্য নানা প্রকার প্রশ্ন কবিত্তা আনন্দানুভব

করিতে থাকেন। গত অগ্রহায়ণ মাসে তিনি আমাদের বাড়ীতে আইসেন। সেই সময়ে আমরা তাঁহাকে লইয়া অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করি। প্রথমতঃ স্থানীয় পবলোকগত প্রসিদ্ধ উকীল কমলাকান্ত সেন মহাশয়কে আহ্বান করা হয়।

সেই দিনই রাত্রে পরীক্ষার্থ আমার খুল্লতাত এবং পিতৃদেব মহাশয় উক্ত আত্মায়াকে লইয়া মেজ ধারণ করেন, আমার মাতামহ মহোশয়ও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। ২।১ মিনিটেব মধ্যেই প্রেতাঙ্গাব আবির্ভাব হইলে পব তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “যদি বাস্তবিকই ভূত হও, তাহা হইলে মেজখানি শূন্সে উত্তোলন করিতে পারিবে কি না।” উত্তর হইল “পারিব না।” আমি তখন জিজ্ঞাসা কবিলাম “কম্বজন প্রেতাঙ্গা হইলে মেজ খানি তুলিতে পারিবে” উত্তর হইল “১৪ জন” ! অতিরিকালমধ্যেই আমার অনুরোধে ১৪ জন প্রেতাঙ্গার আবির্ভাব হইল। তখন আমাদেরইগের স্তবিত্তত বৈঠক থানা গৃহেব চারিদিকে সেই ক্ষুদ্র মেজ খানি ছুটিতে আবস্ত করিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার উক্ত আত্মীয়্যও ছুটিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মেজখানি গৃহের মেঝের উপরে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। এইখানে একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। প্রেতাঙ্গাদের নাম জিজ্ঞাসা কবিলে আমাদেরইগের বহুকাল পূর্বে মৃত আত্মীয়গণের নাম সঙ্কেতে জানিতে পারা গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, আমরা ইংরেজী বর্ণমালাদ্বারা এই নাম সংগ্রহ কবিত্তাছিলাম (মনিলাল বাবু লিখিত উপায় হইতে এই উপায়ই সহজ)।

প্রেতাঙ্গাব এত গোলবোগসঙ্কেও আমার মাতামহ প্রেতাঙ্গার উপস্থিতিতে সন্দেহ প্রকাশ কবায় পুনর্বার তখনই মেজ ধরা হয়। সেইবার আমার আত্মীয়্য মহোদয় একলাই একটা অঙ্গুলি দ্বারা মেজ ধারণ করেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই “আমি আর হাত বাগিতে পারি না” বলিয়া হাতখানি তুলিয়া লইলেন, কিন্তু আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলাম, আমার আত্মীয়্যর মস্তকটী যেন একটা তীব্র আবাত লাগিয়া বাম দিকে ঈষৎ হেলিয়া পড়িল এবং তাঁহাব দক্ষিণ হাতখানি তীব্রবেগে ত্রিয্যকগতিতে মেজ হইতে টানিয়া লইলেন, যেন অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তাব পব তিনি হঠাৎ চীৎকার কবিত্তা পড়িয়া গেলেন, এবং কয়েক

মুহূর্ত্ত পবেই আমাব মৃত্যু পিশিমাৰ আত্মা তাঁহাৰ শৰীৰে আবিৰ্ভূত হইলেন। তৎপবেই আমাৰ আত্মীয়া উন্মাদিনীৰ ত্ৰায় জোৰে বলিতে লাগিলেন, “আৰ সখ্ হয় না; তোবা বিশ্বাস কৰিস্ না, কোথায় বড় দাদা, কোথায় বাবা, কোথায় প্ৰিয় কেশব (ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰ সেন), কোথায় রাম-মোহন? নব বিধান, ব্ৰাহ্ম ধৰ্ম্ম” একুপ কত সুসংলগ্ন অসংলগ্ন কথা! শেষে সম্মেহ স্বরে বলিলেন, “জীবেন্, জীবেন্, তুইও বিশ্বাস কবলি না—” এ রূপ আরও কত কি। এমতাবস্থায় প্ৰায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাবপৰ নানা ঔষধ পত্ৰাদি ব্যবস্থাৰ পবে আমাব আত্মীয়া প্ৰকৃতিস্থ হইলেন; কিন্তু প্ৰাপ্তস্তব ঘটনাৰ কিছুই তখন তাঁহাৰ স্মৰণ ছিল না।

আমাৰ জাগ্ৰত অবস্থায় সেই ৰাতি কাটাইতে লাগিলাম, আমাব আত্মীয়া প্ৰথম ৰাত্ৰে প্ৰগাঢ় নিদ্ৰায় ছিলেন; তাহাব পৰ ৰাতি যখন ১২ ঘটিকা, তখন তিনি হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন “আমাৰ হাত পা অবশ হইয়া পড়িতেছে, আমাব ডানহাতের মধ্য দিয়া যেন কি একটা শক্তি আমাব শৰীৰে প্ৰবেশ কৰিতেছে”। অলক্ষণ পৰেই তাঁহাব শৰীৰে আমাব পিসীমাৰ প্ৰেতাশ্মাটি পুনৰায় আবিৰ্ভূত হইলেন, এবং আমাদেৰ পাৰিবাৰিক অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, যাঁহা এখানে উল্লেখ কৰা যুক্তিসঙ্গত মনে কৰি না। কিন্তু এইটুকু বলা আবশ্যিক যে, সেই অশৰীৰী আত্মাটি কয়েকটা ব্ৰহ্মসঙ্গীত কৰিয়া প্ৰভূত তৃপ্তিলাভ করেন, তাবপৰ তিনি আমাদেৰ সকলেৰ নিকট যথাযোগ্য অভিবাদনাদি কৰিয়া বিদায় লন। বলা বাহুল্য, এ কাৰ্য্যটি আমাৰ আত্মীয়াৰ দেহদ্বাৰাই সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি আমাৰও মন্তকে হাত দিয়া আশীৰ্বাদ করেন। * * * * তাৰপৰ আমাৰ কনিষ্ঠ ভাই শ্ৰীমান স্বৰ্ণকুমাৰকে বলিলেন “সংসাৰ দুঃখময়, আমি আশীৰ্বাদ কৰিতেছি তুমি সুখী হইবে, ভবিষ্যতে তুমি একজন সুগায়ক হইবে, এবং তোমাৰ দ্বাৰা দেশেৰ অনেক কাজ সাধিত হইবে।” সে আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

আমাৰ পিসীমাৰ প্ৰেতাশ্মাব পবে আমাৰ পিতামহ, পিতামহী এবং সৰ্বকনিষ্ঠ সহোদৰেৰ প্ৰেতাশ্মা একে একে উক্ত আত্মীয়াৰ শৰীৰে আবিৰ্ভূত হইলেন, এবং তাঁহাদিগেৰ

অভিলষিত গুটীকতক কথা বলিয়া প্ৰস্থান করেন। তাঁহাদিগেৰ নিকট হইতেও আমি পূৰ্বোক্ত প্ৰকাৰ আশীৰ্বাদ বা ভবিষ্যদ্বাণী শ্ৰবণ কৰিয়াছিলাম।

যাহা হউক তাহাব পৰ হঠাৎ আৰ একটা প্ৰেতাশ্মাৰ আবিৰ্ভাব হয়। আমি তখন জিজ্ঞাসা কৰিলাম “তুমি কে?” সে বলিল “আমাকে চিনিতে পারিবে না, আমি একজন মহা পাপী।”

আমি—তথাপি নাম জানিতে চাই।

সে—প্যারী। (আমাদেৰ অতি বিশ্বস্ত পুৰাতন মৃত ভৃত্য)

আমি এই উত্তবে মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা কৰিলাম “তুমি কেমন আছ?”

সে—অহো! কোথায় শাস্তি, কোথায় তৃপ্তি, চাৰিদিকে ধু-ধু-চিতা জলিতেছে। আমি দ্বিতীয়বার দাবপৰিগ্ৰহ কৰিয়াছিলাম, কত আশা কৰিয়াছিলাম, কত সাধ হইয়াছিল, কিছুই পূৰ্ণ হইল না। আমি কতবার চেষ্টা কৰিয়াছি, তোমাদিগেৰ এই আত্মীয়াৰ শৰীৰে প্ৰবেশ কৰিব, কিন্তু ইনি শুদ্ধচরিত্ৰা বলিয়া আমি এতদিন তাহাকে স্পৰ্শ কৰিতে পাবি নাই। আজ দেখিলাম সকলেই একে একে আসিতেছে, আমিও আসিলাম, আমি আৰ কিছুতেই যাইব না।—

আমি—(বাধা দিয়া) যাইতেই হইবে।

সে—(সজোৰে) যাইব না; আমাব শসা খাইতে ইচ্ছা কৰে, মিঠা কুমড়া খাইতে ইচ্ছা কৰে, থিয়েটার দেখিতে ইচ্ছা কৰে, সার্কাস দেখিতে ইচ্ছা কৰে, অহো কি জালা, কি পিপাসা, আমায় একটু চিনি কিম্বা মিশ্ৰীৰ সৰবৎ দাও।”

অচিৰে আমাৰ আদেশে উভয় সৰবতই প্ৰদত্ত হইল।

সে—(পান কৰিয়া) অহো। কি তৃপ্তি! কি তৃপ্তি!!

তখন আমাব আত্মীয়া হঠাৎ প্ৰকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন “কি দুৰ্গন্ধ, কি দুৰ্গন্ধ!” কিন্তু পৰ মুহূর্ত্তে আবাব ঐ প্ৰেতাশ্মাটি আসিয়া বলিল—“তোমবা ভূত বিশ্বাস কৰ কি না বল; নচেৎ আমি যাইব না এই তোমাদেৰ আত্মীয়াৰ দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতেছি।”

আমি—সাধ্য থাকে ভাঙ্গ।

দেখিলাম দাঁত গভীৰৰূপে নিষ্পেষিত হইতেছে; কিন্তু

প্রেতাত্মার চেষ্ঠা সকল হইল না। তারপর সে পুনর্বার বলিতে লাগিল—“আমি তোমাদের কাছে স্বামী, বল তাহা মাপ কবিয়াছ কিনা ?” আমি আমাদের পরিবাবের প্রতিনিধি স্বরূপে বলিলাম “তোমাব সমস্ত স্বর্ণ, সমস্ত অপরাধ, ক্ষমা করিতেছি, তুমি শাস্তিলাভ কর।”

সে—কি শাস্তি ! কি শাস্তি ! আমি চলিলাম।

রাত্রি তখন প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, আমার আত্মীয়া জ্ঞানলাভ করিলেন ; কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার আত্মীয়াটি আমার মাতৃদেবীর সহিত এক শয্যাতেই শুইয়াছিলেন। প্রেতাত্মাব প্রথম আবির্ভাবেই মাতৃদেবী অভিভূতা হইয়া পড়েন। আমবা তাঁহার ভ্রাতৃ ব্যস্ত হইয়া উঠিলে, প্রেতাত্মা আমাদের আশ্বাস দিয়া বলেন, “তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি চলিয়া গেলেই ইনি সংজ্ঞা লাভ করিবেন। এক্ষণে প্রিয় আত্মীয়াটিব এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার কষ্ট হইবে বলিয়া আমিই তাঁহাকে মুচ্ছিতা কবিয়া রাখিয়াছি। তোমরা তাঁহাকে একটু বাতাস কর।” তার পব যথাসময়ে সেই

প্রেতাত্মাটি প্রস্থান কালে আমার মাতৃদেবীর বক্ষে হাত দিয়া “ঈশ্বর, ঈশ্বর, বোধী, বোধী, উঠ, জাগ” বলিয়া জ্ঞানদান কবিয়া গিয়াছিলেন। অপর প্রেতাত্মাগুলিব কার্যকলাপ সময়ে তিনি বেশ সম্ভ্রমেই অবস্থিতি করিতেছিলেন।

ইহাব কিছুদিন পর আমার উক্ত আত্মীয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যান। হঠাৎ একদিন তাঁহাব পত্রে জানিলাম তিনি কিছুই আহ্বার কবিতে পারিতেছেন না। সকল স্থানে, সকল খান্দ্রব্যে বিষ্ঠার দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছেন। আমার পিতা ও পিতৃব্য পত্রোত্তরে উপদেশ দিলেন “একান্ত হৃদয়ে পবমেশ্বরে প্রার্থনাশীল হও।” আমি লিখিলাম “আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর।”

কিছুদিন পরে তাঁহার আব এক পত্রে অবগত হইলাম তিনি এখন বেশ স্বচ্ছন্দে আছেন, তাঁহার আর কোন কষ্ট নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি একদিন দেবার্চনার্থ পুষ্প আহরণে অনুজ্ঞা করিয়া অতি সামান্য ফুলই প্রাপ্ত হন। ইহাতে তিনি মনে মনে কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া গৃহান্তরে গমন করেন। সেখানে

দেখিলেন, একখানা ক্ষুদ্র কাগজে লেখা আছে, “তোমাব ভ্রাতৃ ফুল অমুক ঘরে আছে।” তৎপর সেখানে যাইয়া দেখিলেন, যথার্থই কতকগুলি গোলাপফুল সুন্দর ভাবে সাজানো বহিয়াছে ; তৎপব অনুসন্ধানে জানিলেন, এ ফুলগুলি ৩৪ মাইল দূরস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছেন ! সেই দিন প্রাতে উক্ত ব্রাহ্মণেব হঠাৎ যেন মনে হইল, অমুক জমিদারেব পুত্রবধূর ফুলের আবশ্যক। তাবপর তিনি কোন দৈবশক্তির বশীভূত হইয়া তাঁহাব সাধের বাগান ধানি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শূন্য করিয়া বৃষ্টির মধ্যেও, এত দূবে ফুলগুলি স্বয়ং আনয়ন কবিয়াছিলেন। আমাব বিশ্বাস, ইহা দৈবশক্তির অভিব্যক্তি, কোন সং প্রেতাত্মারই প্রেরণা।”

প্রবাসীতে “ভূত নামানো” শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিয়া জীবেন্দ্র বাবু আরও বলেন—“এই সকল প্রবন্ধকে ‘ভূত নামানো’ আখ্যায় অভিহিত করা কর্তব্য নহে ; কেননা আমরা ‘ভূত’ শব্দটা কতকটা বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যেব ভাবেই সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি ; সুতবাং এই সকল ব্যাপাবকে ‘অশবীরীর আবির্ভাব’ নামেই প্রকাশ করা সম্ভব।”

আমাব দ্বারাও ত্রিপাদ টেবিলে অশবীরী আত্মা আকৃষ্ট হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা না ঘটায় তাহা এ স্থলে লিখত হইল না !

আমাদিগেব বিশেষ অনুবোধ এই, যেন কোন মহিলা কোতূহলাক্রান্ত হইয়া কোনরূপে অশবীরী আত্মাকে আকর্ষণ না করেন ; কেন না তাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহার সমুহ অনিষ্টেরই বিশেষ সম্ভাবনা।

শ্রীকালীশঙ্কর সেন ।

অদ্ভুত শরীর-সাধন ।

আমাদেব একটা প্রবাদবাক্য আছে, “শবীরেব নাম মহাশয়, বাহা সহ্যও তাহাই সয়।” অভ্যাস ও অনুশীলনের দ্বারা শরীর প্রকৃতিব যে কি অভাবিতপূর্ব পবিবর্তন সম্ভবিত হইতে পারে তাহা আমরা প্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিক পত্র Strand Magazineএব দুইটা প্রবন্ধের সাব সঙ্কলন করিয়া প্রদর্শন করিব।

যন্ত্রপ্রকৃতিক বালিকা।

১৯০৫ ইং সনের মে মাসেব ষ্ট্যাণ্ড মেগেজিনে এই অদ্ভুত বালিকার কথা লিখিত হইয়াছে। ইহাকে “যন্ত্রপ্রকৃতিক” (automaton) নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাব প্রকৃতি বিজ্ঞানবাজ্যে একটা নূতন আলোচ্য বিষয় হইতে পারে।

আমেরিকার নিউইয়র্ক সহবে সেন্টেল পার্ক নামক স্থানের অনতিদূরে ইহাব জন্ম হয়। ইহার নাম কুমারী ডবিস্ চার্টনি (Miss Doris Chertney)। ইহাব পিতামাতা সমৃদ্ধ অবস্থাপন্ন ছিলেন। সামাজিক ও চতুৰ বলিয়া ইহাবা পরিচিত ছিলেন। কুমারী ডবিস্ বাল্যকালেই অসাধারণত্ব প্রকাশ করে।

বালিকা বয়স হইতেই কুমারী ডবিস্ ইহার বয়স্কদিগকে যান্ত্রিক পুতুলদিগের অভিনয় দ্বারা আমোদিত ও চমৎকৃত কবিতা আনন্দলাভ করিত। মুখভঙ্গীর পবিবর্তনে তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। সে ইচ্ছামত যান্ত্রিক পুতুলের নিশ্চলতা বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনেব ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিত। এই অভিনয় একরূপ জীবন্তভাবে প্রদর্শিত হইত যে ইহাতে ইহাব সহচরগণ আমোদিত না হইয়া বরঞ্চ ভীতই হইত।

আমেরিকায় ইহাব জন্ম হইলেও, বার্লিন ইহাব মাতার জন্মস্থান ছিল; এবং জার্মান কলেজে ইহার শিক্ষা হইয়াছিল।

তাহাব পিতামাতাব মৃত্যুরপৰ, সে, মেলভিল ও তৎপত্নী কর্তৃক দত্তকপুত্রীরূপে গৃহীত হয় ও তাহাদের হেভানা স্থিত বাটীতে বাস করিতে থাকে। সেখানে অবস্থানকালে একটা কোতুকাবহ ঘটনায় সর্বসাধারণের নিকট তাহাব প্রথম প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হয়।

হেভানাতে তৎকালে দারুময় অশ্বচক্রেব তামাসা হইতেছিল; তাহাতে রুম্ববর্ণের একটা কলের বালক তৎসংলগ্ন বাস্তবশ্বেব বাদকরূপে কার্য্য করিত। তাহাকে নূতন পোষাকে সজ্জিত কবা আবশ্যক হয়। কিন্তু ২৩ দিবসের মধ্যে দরজি পোষাক প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারিল না, সুতবাং ঐ কলের বালককে উপস্থিত করা যাইতে পারিল না। এদিকে ঐ বালক ব্যতীত তামাসাই পণ্ড হইবাব কথা। একরূপ স্থলে কুমারী ডবিস্ বাজি রাখিয়া ঐ পুতুলের স্থান আবশ্যক মাত্রই পূরণ করিবার জন্ত স্বীকৃত হইল। তখন

কুমারী ডবিস্কে কালবন্ডে চিত্রিত ও সজ্জিত করিয়া ঐ কলের পুতুলেব মত করা হইল; এবং তাহাকে নিয়ন্ত্রিত বাদ্যযন্ত্রেব সঙ্গে বাধিয়া দেওয়া হইল। বালিকার অঙ্গভঙ্গী—এইরূপই যন্ত্রেব ত্রায় ও দৃঢ়তাব সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল যে যাহাবা রহস্ত জানিত তাহারা ব্যতীত আর কেহই, সে যে কলের পুতুল নয়, ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিল না।

এই ঘটনায় তাহার আশ্চর্য্যম ও সম্পূর্ণ তন্ময়তার অদ্ভুত শক্তিব কথা তথায় সকলেরই মুখে শ্রুত হইতে লাগিল। এই প্রকারে তাহাব খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইলে—সে, তিনবৎসব পুতুলরূপে পৃথিবীর নানাস্থানে তামাসা দেখাইয়া পুনঃ আমেরিকাতে ফিবিয়া আসিবে এবং ইহার জন্ত ত্রিশ হাজার টাকা পাইবে এইরূপ আর একটা চুক্তির প্রস্তাব উপস্থিত হইল। এই প্রস্তাব তাহার প্রতিপালক পিতামাতা কর্তৃক তৎক্ষণাৎ গৃহীত হইল। কিন্তু ইহাতে পুতুলপ্রকৃতি বালিকাব গুরুতর শ্রমের প্রয়োজন হইল। বালিকা প্রতিদিন ১০ দশ ঘণ্টা কবিতা প্রায় একবৎসরের জন্ত যান্ত্রিক পুতুলের অভিনয়ের অনুশীলন কবিল। অবশেষে সে ইহাতে একরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িল যে তাহাব মনুষ্যবালিকাস্ব ও পুতুলরূপ দ্বৈতভাবে তাহাব নিকট ধাঁধার মত বোধ হইতে লাগিল; কখন যে পুতুলেব প্রকৃতি নিবৃত্ত হইয়া বালিকা ভাবের স্মৃতি হইত বা বালিকাব ভাব নিবৃত্ত হইয়া পুতুলভাবেব আবেশ হইত তাহা বুঝিতে তাহার কষ্ট হইত।

তাহার অভিনয়ের বিবরণ এইঃ—“রঙ্গমঞ্চে তাহার অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষের মত লইয়া অস্ত্র কেহ, তাহার পৃষ্ঠের কলটা টিপিয়া দেয়, তখন সেই বালিকা পুতুল, পুতুলেরই জ্ঞান অঙ্গবিক্ষেপাদি কবিতা নড়িতে থাকে; এবং পরিশেষে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে নীত হয়; তখন ইহাকে স্পর্শ ও উত্তোলন কবিবাব জন্ত তাহাদিগকে অনুরোধ করা হয়। ইহাবা সকলেই একবাক্যে ইহাকে অদ্ভুত যান্ত্রিক পুতুল বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। “ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ! ধন্যবাদ! অস্ত্র রাজির জন্ত বিদায়!” সম্মিত বদনে এইকথা বলিয়া পুতুলবেশধাবিণী বালিকা অভিনয়ের উপসংহার করিলেও, তাহাদের পূর্বোক্তমত পরিবর্তিত হয় না। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে ফনোগ্রাফ

(স্বরমুদ্রণ যন্ত্র) বা এবধিধ অল্পকোন কোশলেব দ্বারাই পূর্বোক্ত্রিখিত কথা বলা হইয়া থাকে ।”

জ্ঞানেনিতে ইহার অনুকরণ হইলে অনুকৃতির বিকল্পে একটা অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে এই যান্ত্রিক বালিকাই অভিযোগকাবিনী রূপে দাঁড়ায়। বিচারকগণের নিৰ্দ্ধন পরামর্শ কবিবার সময় হইলে, যখন উপস্থিত সকলকেই বিচারালয় হইতে সরাইয়া দেওয়া হয় তখন এইটিকে নিৰ্জীবপুতুল মাত্রবোধে দাববান্ সবাইবার প্রয়োজন মনে করে নাই। দুইবণ্টা ব্যাপিয়া তর্কবিতর্কেব মধ্যে বিচারকগণের তৌদ্ধৃষ্টির সম্মুখে ইহার ক্ষটিকবৎ নিশ্চল চক্ষুর একটা পলকও পড়িতে দেখা গেল না। তথাপি সেই পুতুলবৎ প্রতীমমান বালিকা তাহাব জ্ঞানেন-ভাষাজ্ঞান দ্বারা বিচারকদিগের তর্কের সম্পূর্ণ মর্ম পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মোকদ্দমা ইহাব বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলেও, ইহার পুতুলভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না; আকৃতি প্রকৃতি অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। কিন্তু বিচারালয়ে পরাক্রান্ত হইলেও অনধিক এক সপ্তাহের মধ্যেই সাধাবণ্যে নিম্নোক্ত মর্মে তাহার বিজয় ঘোষিত হইলঃ—“একটা ক্ষুদ্র ক্ষীণ চতুর মার্কিন বালিকা কেবল যে অর্ধ পৃথিবীকেই তাহার বিশ্বয়জনক পুতলাভিনয় দ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সুধীর বিচারপতিগণও, তাহা দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন। বিচারপতিদিগের নিৰ্দ্ধন পবামর্শের সময় অর্থী প্রত্যর্থী বা অপার কাহারও তাঁহাদের সহিত অবস্থান অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার হইলেও, এই বালিকাদ্বারা তাহা সম্বটিত হওয়ায় তাহাব গর্ষ করিবার বিশেষ কারণ আছে।”

কোন সময়ে এই বালিকা “গুপ্তাঙ্গসন্ধানকারী পুলিশের কার্যও করিয়াছিল। নিউইয়র্ক সহরে কোন গোদাম হইতে প্রভূত মালপত্র ক্রমাগত চুরি যাইতে থাকে। এরূপ ধূর্ততার সহিত চৌর্য্যকার্য্য সম্পাদিত হয় যে তাহার কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। গুপ্তাঙ্গসন্ধানকারী পুলিশ কুমাবী ডরিসেব অদ্ভুত ক্ষমতার কথা জানিয়া তাহাবই সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। স্থিব হয় যে ডরিস্ খেলার পুতুলের বেশে অস্ত্রাত্ম মোমের পুতুলেব সঙ্গে গোদামে রক্ষিত হইবে।

এইরূপে রক্ষিত হইয়া ডরিস্ নিত্যন্ত ক্ষুধিতীন বোধ করিতে লাগিল, এমন সময় চৌকীদার তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাক হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া লইয়া দ্রুত পদক্ষেপে তথা হইতে প্রস্থান করিল। আরও জিনিস লইবার ক্ষণ পুনর্বার তথায় এমনই বেগের সহিত প্রবেশ কবিল যে, ডরিস্ ও আরও তিনটা পুতুল তাহার পায়ের ধাক্কাতে পড়িয়া গেল। তখন একটা পুতুলকে সঙ্গে লইয়া রাখিতে রাখিতে সে অমুচ্চয়রে বলিতে লাগিল ‘এ সমস্ত বোবা পুতুল নিপাত ঘাউক।’ এবং বোবা জ্ঞানে ডরিস্ ও অপার কয়েকটা পুতুলকে পতিত অবস্থায় বাধিয়াই সে দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না যে ইহাদেরই মধ্যে তাহার কুকার্য্যব কথা প্রকাশ করিবার ক্ষণ একটা বালিকা অচেতন বোবা পুতুলবেশে লুক্কায়িত রহিয়াছে। তখন বালিকা সাবধানে উঠিয়া বাহিরে আসিল, এবং মালসহ চৌকীদারকে ধৃত করাইয়া দিল। ইহাতে পুৰস্কার স্বরূপ সে ২০০০ টাকা প্রাপ্ত হইল। তাহার এরূপ আশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতা দর্শনে গুপ্তাঙ্গ-সন্ধানকারী পুলিশ তাহাকে বিশেষ আর্থিক উন্নতির আশা দিয়া তাহাদের বিভাগে প্রবিষ্ট হইবার ক্ষণ অমুরোধ কবিল, কিন্তু বালিকা, পুতুলের অভিনয় করিয়া যশ উপার্জন করাই অধিকতর ভাল বোধ করিয়া অমুরোধ উপেক্ষা করিল।

তাহার পুতুল প্রকৃতির নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটী আরও বিশ্বয়কর। মেকসিকোতে বৃষযুদ্ধের চক্রের একস্থানে বালিকাটিকে রাখিয়া মদোদ্ধত একটা বৃষকে তাহার দিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শিশু-নাদের সহিত উন্মুক্ত বৃষটি অকস্মাৎ প্রবল আলোক ও উত্তালতরঙ্গবৎ দর্শকগণেব জনতায় স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া পবক্ষণেই উন্মত্তবেগে, অবনত মস্তকে, কর্ণবধিরকারী গর্জনের সহিত অগ্রপাদের আঘাতে মৃত্যিকা উৎখনন করিতে কবিত্তে ধাবিত হইল। সম্মুখে একটা উচ্চস্থানের উপব স্মিতমুখী বালিকাকে দেখিয়া তাহার নিকটবর্তী হইল। বালিকার মুখেব উপর তাহার উচ্চশ্বাস আসিয়া পড়িতে লাগিল। বালিকা পলক ফেলিলেই তাহার মৃত্যু অবধারিত ছিল। বৃষ সেখানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। কিন্তু বালিকা

একপই নিশ্চল নিম্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া বহিল যে বুধ জীবনের কোন চিহ্ন তাহার মধ্যে লক্ষ্য কবিত্তে না পাবিয়া সম্মীৰ প্রতিপক্ষ মল্লের সন্ধানে ধাবিত হইল ।

এই প্রকাষেব অঙ্কুর কার্য্য সকল কবিবাব জ্ঞানই যেন তাহার শরীরেব গঠনও, আশ্চর্য্য বকমেব হইয়াছে । তাহার শরীরেব উচ্চতা ৫ ফুট হইলেও, ২৩ ইঞ্চ দীর্ঘ, ১৩ ইঞ্চ প্রশস্ত ও ১৩ ইঞ্চ উচ্চ পেটিকাৰ ভিতর তাহাকে পুৰিয়া বাধা হয়—ইহাতে তাহার শরীরে অস্থি আছে বলিয়াই বোধ হয় না । কোন সময়ে জার্ঘেনী হইতে ইহাকে ফ্রান্সে লইয়া যাইবার কালে সীমান্তে পরীক্ষার সময় ইহাকে একপ সঙ্কীর্ণভাবে জড়াইয়া দেখান হয় যে কোন মতেই ইহাকে পুতুল বলিয়া মাণ্ডল আদায়কাবীদিগের ভ্রম না হইয়া পাবে নাই । ইহাতে তাহার দলের প্রচুর মাণ্ডলের পরস্যাও বাঁচিয়া যায় । তাহার গায়ে আল্পিন বিদ্ধ করিলেও তাহার বেদনা বোধ হয় না । ইহাতে তাহার শরীরে স্নায়ু নাই বলিয়াই মনে হইবে ।

একবাব তাহার পুতুল পরীক্ষার জ্ঞান তাহার মুখে ছোরে চপেটাঘাত করা হয়, অন্তরার মস্তকে যেন আঘাত লাগে এজ্ঞান তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাতেও তাহার পুতুল প্রকৃতির কিঞ্চিৎজ্ঞানও অন্তর্ধা দৃষ্ট হয় নাই ।

যখন শরীরেব সংলগ্ন কল্ টিপিয়া দেওয়া হয় তখন সে একপই দৃঢ় হয় যে পড়িয়া গেলেও ব্যথা পায় না ।

এক বাজিতে যখন অধ্যক্ষ ও বালিকা সঙ্কীর্ণ মঞ্চের উপর দিয়া দর্শকমণ্ডলীৰ নিকট যাইতেছিল, তখন তাহারা পদস্থলিত হইয়া ৬ ফুট নিম্নে পড়িয়া যায় কিন্তু সেই পুতুল প্রকৃতিক বালিকার একটা কেশও নড়ে নাই, পরন্তু পূর্ববৎ ক্ষটিকনিভ নিশ্চল দৃষ্টি ও দৃঢ় দেহে বালিকা উত্তোলিত হইল ।

পুতুলের অভিনয়কালে তাহার শরীর আশ্চর্য্যরূপে স্থিতিস্থাপকতা গুণবিশিষ্ট হয়—তখন ঠিক পুতুলেব ত্রায় যেরূপভাবে ইচ্ছা সেকপভাবে বাখিলেও, সে পড়িয়া যায় না—শরীর অসম্ভবরূপ বক্রভাবে দোলাইলেও, তাহার ভারকেন্দ্রচ্যুতি হয় না ।

এই সমস্ত সম্বন্ধে বালিকাব নিম্নের উক্তি নিম্নে দেওয়া

গেল :—“যখন আমার শরীরেব যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করা হয়, তখন আমার গ্রন্থি সকল দৃঢ় হয় এবং আমি বিশেষরূপে স্থিতিতে পারি । আমার অভিনয়েব মধ্যে সময় সময় আমি সম্মুখস্থ মঞ্চের সমতলবর্তী দীপাবলীর দিকে অসম্ভবরূপ হেলান-ভাবে ঢুলিয়া পুনঃ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি—আমি একপ কবিত্তে থাকিলে দর্শকগণেব মধ্যে জ্বীলোকেরা ভাবকেন্দ্রচ্যুত হইয়া সম্মীত স্থানের মধ্যে আমার উল্টিয়া পড়িবার আশঙ্কায় চীৎকার কবিত্তে থাকে । কোন সময়ে আমাকে পরীক্ষা করিবার জ্ঞান দর্শকমণ্ডলীর জনৈক ব্যক্তি আমার গণ্ডদেশে সজোবে চপেটাঘাত করে, অন্ত সময় কোনও সন্ধিহান আমেরিকাবাসী আমি ভঙ্গুব কি না দেখিবার জ্ঞান আমাকে মস্তকে আঘাত লাগে একপভাবে উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয় ।”

মানব-সর্প (Man-Serpent) ।

গত মে মাসেব Strand magazineএ “মানব-সর্প” শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটা অত্যাশ্চর্য্য অঙ্গ-বিক্ষেপ (contortion) ব্যাপারের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :—

কয়েক সপ্তাহ মাত্র গত হইল বার্লিন রঙ্গমঞ্চে একটা বিস্ময়াবহ কাণ্ড সম্ব্যটিত হইয়াছে—যাহাতে দর্শকবৃন্দকে আবেগভাবে বিলোড়িত হইতে হইয়াছে ।

একটা ভদ্রলোক ভোজনকালোচিত অঙ্গরক্ষা ও দীর্ঘ মস্তকাবরণে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন । তিনি পশ্চাদিকে পদক্ষেপ করিয়া দর্শকদিগের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন—কিন্তু তাহা হইলেও তাহার মস্তক দর্শকদিগেরই দিকে পরাবর্তিত হইয়া তাহাদিগেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল । যখন তিনি মঞ্চের পাদ-আলোব প্রায় সন্নিকট আসিলেন, তখন মস্তক তদবস্থায় বাখিয়াই পৃষ্ঠদেশ দ্বীরে দ্বীরে স্বাভাবিক অবস্থায় স্থাপন করিলেন । অতঃপর দর্শকদিগকে অভিবাদন করিয়া প্রত্যাবর্তন কবিলেন । এই ব্যাপারে যে কিরূপ বিস্ময় উৎপাদিত হইয়াছিল, তাহা কল্পনা কবা সম্ভবপর নহে ।

বিখ্যাত ব্রুগিন্স যেমন পাশ্চাত্য জগতে সটান বজ্রুব উপর দিয়া পাদচারণকাবীদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকৃত হন, তদ্রূপ সুপ্রসিদ্ধ মানব-সর্প Marinelli (ম্যারিনেল্লি),

অঙ্গবিক্ষেপকারীদিগের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়া থাকেন।

তিনি কেবল সর্বসাধারণেরই সমক্ষে আত্মগুণের পরিচয়

দিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার্থ তিনি

Paris (প্যারী) নগরীর চিকিৎসাসমিতির নিকটেও

আপনার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। তথায় চারিশত

চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। ইহারা প্রকাশ করিয়াছেন

যে শরীরবিজ্ঞান ও অস্থিবিজ্ঞানের মূল-নিয়ম ইহার

সম্বন্ধে প্রযুক্ত্য নহে।

ভারতীয় যোগিগণ হঠযোগের অভ্যাস দ্বারা ৪৮ প্রকার

অঙ্গভ্রাস শিক্ষা করিয়া থাকে। বাবা লক্ষণ দাস মধ্য-

ভারতের কৃষ্ণগহ্বরের (Black Caves) ধর্মযাজকদিগের

নিকট ১৪ বৎসর হঠযোগ শিক্ষা লাভ করিয়া অঙ্গভ্রাস-

প্রদর্শনীর ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কান্ধিতে ইহার

পূর্বোক্ত কৌশল দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বোধাইর একজন

ইংবেজ্ঞবিনিক ইহাকে ইউরোপে যাইয়া কৌশল প্রদর্শন

করিবার পবামর্শ প্রদান করেন। অঙ্গুলির অগ্রভাগে

উপব ভব দিয়া সমস্ত শরীর শূণ্যে বিলম্বিত রাখাই সম্ভবতঃ

ইহাব সর্বোৎকৃষ্ট কৃতকার্যতা। শিক্ষা সময়ে এই কৌশলী

আয়ত্ত করিবাব জন্ত ক্রমাগত ৭দিন ৭রাত্রি অবিচ্ছেদে

ইহাকে অঙ্গুলির অগ্রভাগের উপর ভরদিয়া গুরুদিগের

চক্ষুর সম্মুখে থাকিতে হইত।

উপরি বিবৃত দৃষ্টান্ত সকলের দ্বারা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত

যে অসম্পূর্ণ ও শারীরবিকাশের যে অচিন্তনীয় প্রদেশ

এখনও অননুশীলিত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে তাহা আমাদের

সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। তৎপ্রতি আমাদের গভীর

চিন্তা ও অন্বেষণ নিয়োজিত হইলে যে আরও অদ্বিত

সত্য প্রকাশিত হইতে পারে ইহা আমরা আশা করিতে

পারি।

শ্রীশীতলাচন্দ্র চক্রবর্তী, (এম, এ,)।

কেড্‌মাটার

আগরতলা হাইস্কুল

পোঃ আগরতলা জিপুর।

ধর্ম ।*

“সাধুদিগের রক্ষা এবং পাপীদিগের বিনাশের জন্ত আমি
যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।”

ভগবান সত্য সত্যই অবতীর্ণ হয়েন কি না সে বিষয়ে
সন্দেহ এবং মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু আবশ্যক বোধে
তিনি যে, কোথা হইতে একরূপ সূক্ষ্ম কলকাটি নাড়িয়া দেন
যাহাতে সমস্ত অসম্ভব হয় এবং অসম্ভবও সম্ভব হয়,—সে
বিষয়ে কাহারও সন্দেহ এবং মতভেদ থাকিতে পারে না।

জগতের ইতিহাসে স্পষ্ট দেখা যায়, দেশে যখনই অধ্যর্থ
এবং পাপের বোঝা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠে, তখন কোথা
হইতে যেন একটা রাক্ষসী ঝড় আসিয়া সমস্ত তোলপাড়
কবিত্তে থাকে,—নাড়িয়া চাড়িয়া, ভাড়িয়া, কাটিয়া কুটিয়া,
উড়াইয়া ছুড়াইয়া মুহূর্ত্তে সমস্ত ছার খার করিয়া দেয়,
চোখে মুখে দেখিবারও অবসর দেয় না,—ফলে কিন্তু দুর্গন্ধ-
ময় দূষিত বায়ু সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যায়, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বাস্থ্য
পুনরুজ্জীবিত হয়, বহুকাল সঞ্চিত অপ্রকৃতিস্বতা দূর হইয়া
সমগ্র দেশ সমগ্র জাতি প্রকৃতিস্বতা লাভ করে।

দেশের দুঃস্বস্থার যে সকল কারণ বর্ত্তমান রহে তন্মধ্যে
প্রধান কারণগুলি অস্বর্নিহিত, এবং সেই জন্ত আমাদের
নিকট অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ভাবে দেখা দেয়। তাহারা মূল
কাবণ হইলেও বৃক্ষমূলের জায় তাহাদের গতি সর্বত্র
আমাদের চক্ষুর গোচর নহে। কিন্তু তাই বলিয়া
তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার যো নাই—তাহারা
অতিপ্রকাণ্ড অতিবৃহৎ সত্য। ভূমিকম্প বাহিরে ঘর দোর
বাড়ি ভূমিসাৎ হয়, কিন্তু তাহা ভূমধ্যস্থ অস্তর্বিপ্লবের
বহির্বিকাশ মাত্র।

স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে এই অস্তর্বিপ্লব, ভিতরকার
এই অসামঞ্জস্যই সমস্ত দুঃখ দৈন্তের মূল। কি সামাজিক কি
রাজনৈতিক কি দৈব দেশের সকল দুঃস্বস্থার সকল
বিপৎপাতে আমরা কেবল মাত্র বাহিরে কারণ অন্বেষণ
করি, কিন্তু মূল কারণ যে অন্তরে অন্তরে শিকড় গাড়িয়া

* দেবদেবের স্বামী ষেওকা-ওঁও-এর আশ্রমে পঠিত।—লেখক।

এই প্রবন্ধ প্রায় দুই মাস পূর্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল।
—প্রবাসী-সম্পাদক।

কোথায় কোন দূরে অধিষ্ঠিত তাহা দেখিতে পাই না। একটু যদি প্রণিধান করিয়া দেখি, দেখিতে পাইব, সকল হুংখ, সকল দারিদ্র্য সকল অমঙ্গলের মূল—সেই এক কালবৃক্ষ “অধর্ম”।

অনেকে হয় ত বলিবেন, কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম কেমন করিয়া বুঝিব? মাপকাঠি কোথায়?—তুমি যাহা ধর্মসম্মত বলিয়া মনে করিতেছ আমি তাহা ধর্ম-বিরুদ্ধ অধর্ম বলিয়া মনে করি, তুমি যাহা অধর্ম বলিয়া মনে করিতেছ আমি তাহা ধর্মামুগত মনে করি,—দাঁড়াইব কোথায়?—কথাটা কি সত্যসত্যই এইরূপ? সত্যসত্যই কি আমি মনে করি বা তুমি মনে করার উপর ধর্মোপনির্ভর করে; না ধর্মোপনির্ভরই উপর তোমার আমার মনে করা, তোমার আমার অস্তিত্ব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করে?—ঈশ্বর যেমন এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, নিরবচ্ছিন্ন পরিপূর্ণ সত্য, তাহার মঙ্গল নিয়ম ধর্মও কি সেইরূপ নহে? স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি ধর্মের প্রকাশ নহে? ঈশ্বরের সত্তা যেমন একইরূপে একই ভাবে সকলের নিকট প্রকাশমান, ধর্মও কি সেইরূপ একইরূপে একই ভাবে চরাচরে বিস্তারিত নহে?—ধর্ম এক বই হই নহে,—ধর্ম তোমার নিকট একরূপ অস্ত্রের নিকট বিভিন্নরূপ হইতেই পারে না।

পুস্তকে পাঠ করা যায় চীনজাতির মধ্যে পূর্বে এক প্রথা ছিল যে, পিতা অতিরিক্ত বৃদ্ধ হইলে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিয়া ভবযজ্ঞণা হইতে নিষ্কৃতি দান করিবার চেষ্টা করিত। তাহার মনে করিত অনেক বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া অনর্থক কেবল যজ্ঞণা ভোগ করিতে দেওয়া অপেক্ষা বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করাই শ্রেয়। চীনজাতি এই পিতৃহত্যাকে হয়ত মনে মনে ঠিক ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিত, কিন্তু তাহাদের এই মনে করা, এই বিশ্বাস, এই ধারণা সত্য-সত্যই কি ধর্মপদবাচ্য! জ্ঞান বিচার ও বিবেকের মুখ বন্ধ করিয়া অন্ধসংস্কার বশতঃ কাজ কবার নাম কি ধর্ম?—হত্যা যদি অধর্ম হয়, তাহা কখনও কোন সময়ে কোন জাতির নিকট ধর্ম হইতে পারে না,—ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে, ধারণা হইতে পারে, সংস্কার হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম নহে।

ঘড়িতে অতিবিক্ত দম দিলে প্রথমটা যেমন খট্ কবিয়া একটা শব্দ হয় এবং তাহা ক্রক্ষেপ না করিয়া আরও দম চালাইতে লাগিলে শেষে যেমন সমস্ত শ্রিংস্কন্ধ খুলিয়া আসিয়া ঘড়িকে নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ ধর্মের অল্পশাসন অতিক্রম কবিয়া চলিতে গেলে প্রথমে বৃকের মধ্যে একটা “ধড়াস” কবিয়া উঠে এবং তথাপি সাবধান না হইয়া না মানিয়া চলিতে থাকিলে অবশেষে নিশ্চিত একেবারে বিনাশের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। বৃকের মধ্যে এই “ধড়াস” কবাকে বিবেকের “ইসারা” বা “তাড়না” বলা যাইতে পারে।—স্থাননির্কিশেষে, কালনির্কিশেষে, জাতিনির্কিশেষে লোকনির্কিশেষে কাহারও ইহার হাত হইতে এড়াইবার ঘো নাই। পিতৃবধকালে পিতৃহন্ত চীনজাতির বৃকের মধ্যে কোথাও না কোথাও এইরূপ একটু ধড়াস করিয়া উঠিত না কি? নিশ্চয়ই! তাহারই ফলে আজ তাহারা এই বর্ষের প্রথা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিচার ও তর্ক দ্বারা ধর্মের যে অর্থ প্রতিপন্ন হয় সহজ জ্ঞানেও তাহাই হয়। যাহা শুভ, যাহা শ্রেয়স্কর, যাহা মঙ্গলময় তাহাই ধর্ম,—ধর্ম মঙ্গলের নামান্তর মাত্র। “অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা”—এই হৃদয়ের ব্যাখ্যায় শবর স্বামী লিখিয়াছেন, “য এব শ্রেয়স্করঃ স এব ধর্মশব্দেনোচ্যতে”—তিনি আরও বলিয়াছেন “যঃ পুরুষঃ নিঃশ্রেয়সেন সংযুক্তি স ধর্মশব্দেনোচ্যতে।”—অমর লিখিয়াছেন—“জাক্ষর্যম দ্বিযাং পুণ্য শ্রেয়সী স্কৃতং বৃষঃ।”—ভবিষ্যপুরাণে আছে—“ধর্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্ভিঃ শ্রেয়োহভ্যুদয় সাধনম্।”—তর্কশাস্ত্রে “অধর্ম” শব্দের অর্থ আছে—“প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোহ ধর্ম উচ্যতে।”

তবে দাঁড়াইতেছে বাহা শুভ, বাহা বিহিত, বাহা সঙ্গত তাহাই ধর্ম,—বাহা অশুভ, অবিহিত, অসঙ্গত তাহাই অধর্ম।

ইংরাজি Religion শব্দ আমাদের ধর্ম শব্দের ভাব-বাচক প্রতিশব্দ নহে। ধর্ম শব্দ আমাদের শাস্ত্রে বহু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। বাহা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধৃত, বা বাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম। সকল বস্তুই ইহার অন্তর্গত। ইহকাল পরকাল অনাদিকাল লইয়া ইহার স্থিতি,—পরমানন্দরূপে ইহার প্রতিষ্ঠা,—ইহার

অনুশাসন জীবনের প্রত্যেক পৃষ্ঠা, প্রত্যেক পংক্তি প্রত্যেক অক্ষরে সংযুক্ত ।

লৌকিক, ব্যবহারিক, সামাজিক, বাস্তবনৈতিক ধর্ম প্রভৃতি নামে কেবল প্রভেদ মাত্র—সকলই সেই এক চক্রবর্তী স্রোতঃ বৃহদ্রশ্মেরই ছায়ামাত্র,—জল একই, কেবল আধার বিভিন্ন । ইহা আমাদের দেশ বেকপ বুঝিয়াছিল অল্প কোন দেশ সেরূপ ভাবে বুঝে নাই । এই জন্ত আমাদের দেশে আচারে ব্যবহাবে, ক্রিয়াকর্ম্মে জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে ধর্ম্মের এত অনুশাসন । ধর্ম্মের নামে যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে সকলই যে, প্রকৃত ধর্ম্ম তাহা নহে, ধর্ম্মের নামে সংযুক্ত হওয়াতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ পালনীয় হইয়াছে । ইহাতে ধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য বাড়ান হইয়াছে—নিয়মের চুপ্ততায় ধর্ম্মের মূল্য হ্রাস হয় নাই ।

ধর্ম্ম শব্দে যাহা বুঝায় তাহা সাংসারিক সুখদুঃখের বহু উর্দ্ধে স্থিত । আপাত ভাল লাগা বা না লাগা, আপাত মধুব বোধ হওয়া বা না হওয়া, আপাত সুখোৎপাদন বা দুঃখোৎপাদনের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই । উষর ক্ষেত্রে বীজ উৎপ হওয়া এবং শাখাগ্রভাগে ফল বিলম্বিত হওয়াব মধ্যে যে সকল বহিকংপাত, যে কালবিলম্ব বর্ত্তমান রহে, তাহা অবশ্যস্তাবী ফলের সহিত বীজের সম্বন্ধ কখনই বিচ্ছিন্ন কবিত্তে পারে না । যখন একবার ফল ধরিয়াছে, ফল পাকিয়াছে, বীজশক্তি ফলরূপে পরিণত হইয়াছে—তখন অন্তর্বর্ত্তী ঝঙ্কাবাত, শিলাঘাত কীটানুদংশন প্রভৃতি সহস্র উৎপাত বহির্বিবরণ মাত্র,—ফল কিম্বা বীজের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই । কোথা হইতে যে, রসপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া শুষ্কতক মুঞ্জরিত হয় তাহা কে বলিতে পারে !—ধর্ম্ম বীজ একবার রোপিত হইলে অবিলম্বে হোক, বা কালবিলম্বে হোক, তাহা হইতে স্মৃষ্টি ফল ফলিবেই ফলিবে,—সুখ দুঃখ তাহাকে কিছুতেই নষ্ট কবিত্তে পারে না ।

বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মের যে আটটি চরমপন্থাব উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে আত্মার নির্ম্মল নিম্পৃহ স্বাধীন অবস্থাকে অন্ততম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এই অবস্থায় সত্য স্বীয় যথার্থ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয় । এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তির নিকট সঙ্গার পৃথিবীর অধীশ্বর ও চীরবদ্ধলধারী

ভিক্ষুকের কোনই প্রভেদ নাই । এই অবস্থা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিতেছেন,—“সংসারাসক্ত ব্যক্তি ইহাকে একেবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া—‘নৈরাশ্র’ বলিবে, কিন্তু যিনি বুদ্ধ তিনি ইহাকে নির্ম্মল পরিপূর্ণ ‘আনন্দ’ বলিবেন,—সংসারাসক্ত ব্যক্তি ইহাকে ‘বিধবংস’ বলিবে, কিন্তু যিনি বিমুক্ত তিনি ইহাকে ‘অমরতা’ আখ্যা দিবেন,—সংসারাসক্ত ব্যক্তি ইহাকে ‘মৃত্যু’ বলিবে, কিন্তু যিনি আত্মজয়ী তিনি ইহাকে ‘অনন্ত জীবন’ বলিয়া নির্দেশ কবিবেন ।”

এই আত্মজয়ীর নিকট সকলেই পবাস্ত । যাহার স্পৃহা নাই, কামনা নাই, স্নেহ দুঃখ ভেদ নাই, তাহার নিকট পৃথিবীপতিও বিজিত,—তাহার নিকট হইতে কিই বা কাড়িয়া লইবে, তাহাকে কিই বা দিবে ! নেপোলিয়ন বিশ্বজয়ী হইয়াও আপনাকে জয় করিতে পারেন নাই, সেই-জন্ত তাঁহার এত দুঃখ, জীবনের শেষ অঙ্গ এত নিরানন্দময় ! নেপোলিয়নের মানসিক ক্লেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল ;—তাঁহার তখনকার অবস্থার তুলনায় পৃথিবীর সর্ব্বা-পেক্ষা পবাদীন জাতির অতি নিকৃষ্ট দীনহীন প্রজারও অবস্থা স্পৃহনীয় বলিয়া বোধ হয় । নেপোলিয়নের হরাকাজ্জা, নেপোলিয়নের বর্কসতা; নেপোলিয়নের অকাবণে নিরপরাধিনী লক্ষ্মী স্ত্রী যোসেফাইনকে পরিত্যাগ,—এই সকল অধর্ম্মের ফল যাইবে কোথায় !—বাইবেলে ধর্ম্মহীন্যের এই কণিক অভ্যুত্থান সম্বন্ধে লেখা আছে—

“They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn.”

আত্মার স্বাধীনতা হারাইয়া বাহিরের অধীনতায় কি আসে যায় !—যাহার আত্মা স্বাধীন, তাহাকে বাহিরের সহস্রনিগড়ে আবদ্ধ বাধিলেও নিম্প্রভ নিস্তেজ হতশ্রী কবিত্তে পারে না । যাহারা বলেন, সংসারে থাকিয়া এইরূপ নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সংসার কখনই চলিতে পাবে না, তাঁহারা অতিশয় ভ্রান্ত । নিষ্কাম ধর্ম্ম অর্থে নিশ্চেষ্টতা নহে, জড়তা নহে, আলস্য নহে,—নিষ্কাম ধর্ম্ম অর্থে আত্মবশে থাকিয়া ভগবদ্রূপ শক্তির যথার্থ প্রয়োগ, সম্পূর্ণ সম্ভাবহার । সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মপথে চলিলে কি হইতে পারে বা না পারে আমাদের পুবাণে তাহার ভুরি

ভূরি দৃষ্টান্ত আছে,—বাইবেলে “যোবে”র আধ্যাত্মিক ইহার একটি স্নন্দর চিত্র অঙ্কিত ।

অধুনাতন আমবা “বৈরাগ্য” শব্দ যেরূপ অসঙ্গত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, প্রকৃতই উহা অর্থ সেরূপ নহে । “রাগ” অর্থে যাহা রঙ করে, যাহা মনকে অন্তর্য্যক্কে সূত্র দ্বারা অন্তরঙ্গিত করে, যাহা আত্মার স্বাভাবিক নিখিল অবস্থাকে ষড়রিপুর প্রকাশে কলুষিত করে । “বৈরাগ্য” বা “বৈবাগ্য” অর্থে যাহাতে বাহিরের কোন রঙ ফলান নাই যাহাতে আর কিছুই ছাপ নাই, যাহা আত্মার সহজ শুভ নিখিল অবস্থা । “রাগ” হইতেই সকল প্রকার ক্লেশের উৎপত্তি । ইংরাজি Passion শব্দ এবং আগাদের “রাগ” শব্দ একই ভাববাচক । ইংরাজি Passion শব্দ লাতিন Passio, from Patior to suffer হইতে উৎপন্ন । নানা কারণে অন্তরে ক্লেশানুভূতির নামই Passion । এই জন্ত ক্রুশবিক্ত যীশুখ্রীষ্টের শেষ যন্ত্রণাকালকে ইংরাজিতে Passion কহে । এই রাগ বা Passionকে পবিত্রজন পূর্বক সংসারে থাকিয়া “বৈবাগ্য” অবলম্বন কবিলে সংসার কখনই অচল হয় না,—বরঞ্চ সংসারের, সমাজের, সমস্ত দেশের মুখশ্রী ফিরিয়া যায় । এই নিমিত্তই আমাদের শাস্ত্র সংসারে থাকিয়া বৈবাগ্য অভ্যাস করিবার পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন, বৈবাগ্যেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বৈবাগ্যকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছেন । বৈবাগ্য অর্থে আত্মার সহজ স্বাভাবিক অবস্থানুযায়ী কৰ্ম্ম,—আত্মার কৰ্ম্মের নাশ নহে ।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কি একটা আশ্চর্য্য ঐক্য দেখা যায় । এই যে জগতে সং এবং অসতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে সং-এরই জয়লাভ, ইহাই পরিস্ফুট করা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই মুখ্য উদ্দেশ্য । আমাদের শাস্ত্র বল, খ্রীষ্টিয়ানদের বাইবেল বল, বৌদ্ধদের ধর্ম্মপদ, শিখদের গ্রন্থসাহেব, জৈনদের কল্পতরু, পারসীদের আবেস্তা—সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই “সং,” “শ্রেয়,” “ধর্ম্মের”ই জয়বোধনা কবিতোছে । “যতোধর্ম্মন্ততোজয়ঃ” ইহা একটি মহাসত্য না হইলে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে এই বিষয়ে এইরূপ একটা স্নন্দর ঐক্যবন্ধন থাকিত না । ধর্ম্মের শুভ ফল এবং অধর্ম্মের অন্তঃ ফল আমরা সাংসািবিক হিসাবে হাতে হাতে পাইলাম ।

না বলিয়া মনে কবিতো পারি, কিন্তু কালোহং নিরবধি,—কালেরও ত সীমা নাই !

আমবা আজ সহসা অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছি,—বিকারগ্রস্ত রোগীর আক্ষেপের তায় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া দ্বিধাদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি ;—আমরা গৃহদ্বারে পাপ-আবর্জ্জনা রাখিয়া পরের মলিনতায় নাসিকা কুণ্ঠিত কবিতোছি,—অন্তরে অধীনতার শৃঙ্খল বহন কবিতোছি বাহিরের স্বাধীনতার জন্ত লোলুপ হইয়াছি,—ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কবিতোছি না, স্বার্থসিদ্ধির জন্ত যে কোন উপায় হোক না কেন অবলম্বন করিতে বসিয়াছি,—ভাবিতোছি না যে, শুধু পরেব দোষ দেখাইয়া নিজের দোষ ফালন হয় না—নিজ স্কন্ধে দ্বারাই একমাত্র পরেব দুষ্কৃতিকে জয় করা যায় । সত্যসত্যই যদি আমরা ভগবৎকৃপার অধিকারী হইতে চাহি, তবে ধর্ম্মকে সহায় করিয়া আমাদের দীর্ঘে দীর্ঘে উঠিতে হইবে,—ধর্ম্মের নামে যে সকল পাপাচার চুকিয়াছে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিতে হইবে—অন্তরের বাহিরেব সমস্ত জঞ্জাল পরিস্কৃত করিয়া আমাদের বিপুল হইতে হইবে । যে অধর্ম্ম করে সে তাহার ফলভোগ ত করিবেই, তাই বলিয়া আমবা কেন অধর্ম্মের দ্বারা আমাদের পাপেব ভার আরও বদ্ধিত করি ! একটি সামান্য ফুল ফুটাইতে ভগবানের কি অসীম ধৈর্য্য !—তিনি আপন মঙ্গল-নিয়মকে কখনও লঙ্ঘন করেন না,—আর আমরা আজ ধৈর্য্য হারাইয়া রাতারাতি দেশকে যেমন তেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহি !—তাহাও কি সম্ভব !—ধৈর্য্য ভিন্ন আর আমাদের উপায় নাই, ধর্ম্ম ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই,—

“ধর্ম্মং চর,—

ধর্ম্মানুষ্ঠান কব,

“ধর্ম্মাৎপরং নাস্তি,—

ধর্ম্মের পব আর নাই,

“ধর্ম্মঃ সর্কেবাং ভূতানাম্ মধু ।

ধর্ম্মই সমস্ত জীবের মধুস্বকপ ।

শিশুকে যেমন সহস্রব্যঞ্জনসংযুক্ত দিব্য রাজভোগ দিলেও তাহাব মুখে কচো না, কিন্তু মাতা যদি সামান্য অনটুকুও স্বহস্তে মুখে তুলিয়া দেন তাহা তাহার নিকট

কি স্মৃতিষ্ট কি অমৃতময় বলিয়া বোধ হয়!—সেইরূপ যিনি প্রকৃত ধার্মিক তাঁহার নিকট পৃথিবীর আর যাবতীয় ভোগ-বিলাস স্মৃতিধর্ম সমস্তই তুচ্ছ নগণ্য, কেবল ধর্ম-মাতার স্বহস্তপরিবেশিত সামান্য সামগ্রীটুকুও মধুরূপ, অমৃতময়।

শ্রীস্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধর্মের বলবত্তা ।

পরম সমান্যাস্পদ লেখকপ্রধান শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ কার্তিক মাসের প্রবাসীতে আমার “দেখিয়া শিথিব কি ঠেকিয়া শিথিব” প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়টির সম্বন্ধে যেরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে লেখকের সহিত পাঠকের সাধারণ-ভাবেব একটা বোঝা পড়া না থাকিলে, লিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা কখনই ঠিক হইতে পারে না। সমালোচক পাছে মূল্যের ভাবার্থ এক বুদ্ধিতে আব বুদ্ধিয়া তাহার ভুল ধরেন, এই ভয়ে প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে টীকা টিপ্পনী এবং ভাষ্য জুড়িয়া দিতে হইলে লেখকের পক্ষে তাহা যে কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার তাহা বুদ্ধিতেই পারা যাইতেছে। তাহা হইলে,—হয় একটা বিদ্যুটে কাণ্ড ভয়ঙ্কর! পথ চলিবার সময় তীর্থযাত্রীকে ঘটি বাটি থালা পাখর চা’ল ডা’ল লবণ প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ সামগ্রী অঙ্কুর গোটের গণ্ডাছুই প্রকাণ্ড পকেটের মধ্যে পুবিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিতে হইলে সে-বেচারীর যেরূপ দশা হয়, টিপ্পনীভারগ্রস্ত প্রবন্ধের অবিকল সেইরূপ দশা হয়। তাহা হইলে পথিকের পক্ষেও যেমন—প্রবন্ধের পক্ষেও তেমনি—ছয় দিনের পথ ছয় মাসেও অতিবাহন করা হুঁচকি হইয়া ওঠে। আমার ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে আমি যে, কি ভাবে কোন্ কথার বলিয়াছি, তাহা বুদ্ধিতে পারা কিছুই কঠিন নহে:—অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী স্বারাজ্যপন্থীদিগের বীতি পদ্ধতির সঙ্গে মার্কিন দেশীয় স্বারাজ্যপন্থীদিগের কার্যকলাপের বীতিপদ্ধতির তুলনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি “ওয়াশিংটন্ ধর্মের অবতাব ছিলেন, বলিলেই হয়,” আর বলিয়াছি যে, উহার ধর্মপ্রধান অধ্যবসায়ের ফল “নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য-লাভ”।

আমার ঐ সকল কথার সঙ্গে আমি অনায়াসে এইরূপ একটা টীকা বা টিপ্পনী সংলগ্ন করিয়া দিতে পারিতাম:—

“আমাব কথার ভাবার্থ এ নহে যে, ওয়াশিংটন্ দ্বিতীয় যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন বা দ্বিতীয় শতকদেব গোস্বামী ছিলেন। আমার কথার ভাবার্থ এই মাত্র যে, রব্‌স্পিয়ন্ প্রভৃতি করাসীস স্বারাজ্যপন্থীদিগের এবং ঐ শ্রেণীর আর আর বিপ্লবকারীদিগের তুলনায় ওয়াশিংটন্ দেবতা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ভাবার্থটি এক কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ওয়াশিংটন্ যথাসম্ভব ধর্মের অবতাব ছিলেন। তেমনি, যে জায়গাটিতে আমি বলিয়াছি “নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য-লাভ,” সে জায়গায় নিষ্কণ্টক শব্দের ভাবার্থ—যথাসম্ভব নিষ্কণ্টক।

যাহা আমি অনায়াসে করিতে পারিতাম তাহা যে আমি কবি নাই—আমাব ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে ঐ বকয়ের টীকা এবং টিপ্পনী যোজনা করিয়া আমি যে, সময়েব, পুঁথিব পাতা’ব, এবং পরিশ্রমের অপব্যয় করি নাই, সমালোচক মহাশয় যদি ভাবিয়া দেখেন তবে তিনি আপনাই বলিবেন যে, তাহা না করিয়া তাঁহাকে আমি বহুতর বুঝা-পরিশ্রমের দায় হইতে বাঁচাইয়াছি।

ফল কথা এই যে, আমার ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে আমি যে বিষয়টির প্রতি সহৃদয় সজ্জনমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্ত আয়াস পাইয়াছি, বাদ-প্রতিবাদের তরঙ্গ-কোলাহলে তাহা চলিবার বস্তু নহে। “যতোধর্ম্যন্ততোজয়ঃ” এটা যদি আমরা ব্যালা থাকিতে দেখিয়া না শিখি, তবে যথাকালে আমাদেরকে তাহা ঠেকিয়া শিল্পিতে হইবেই হইবে, ইহা অশ্রান্ত বোধব্যাক্য।

কিন্তু দেখিয়া শিখিবার প্রণালী পদ্ধতি আছে। আমার ঐ প্রবন্ধটির মস্তব্য কথা ইহা নহে যে, যতো ধর্ম্যন্ততো জয়ের প্রামাণিক দৃষ্টান্ত পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যাইতেছে—দর্শক কেবল চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেই তাহা সম্বন্ধে বিরাজমান দেখিতে পাইতে পারে। “যতোধর্ম্যন্ততোজয়ঃ” এ কথাটি মনে বোঝা যদিচ খুবই সহজ, কিন্তু উহা কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবৎ মূর্ত্তমান দেখিতে হইলে বিধিমতে বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাইয়া মুখ্য মুখ্য দেশ কাল পাত্রের অনুসন্ধান চালনা ব্যতিরেকে উহা সহজে দেখিতে পাইবার বিষয়

নহে। প্রবাদই আছে “ধর্মন্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।” ধর্মের তত্ত্ব অথবা কেবল না—ধরিতে গেলে বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব সকলও “নিহিতং গুহায়াং”; কিন্তু তাহা সম্বন্ধে বিজ্ঞানতত্ত্বও যেমন—ধর্মতত্ত্বও তেমনি—হুইই—গুহার মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া যথাকালে, যথাদেশে, যথাপাত্র, যথা-পরিমাণে দেখা দিতে কার্পণ্য কবে না। “যতোধর্মন্ততো-জ্ঞয়ঃ” এটা যেমন একটা সোজা কথা, এটাও তেমনি একটা সোজা কথা যে, সকল বস্তুর যেমন গুরুত্ব আছে বায়ুরও তেমনি গুরুত্ব আছে। কিন্তু একটি অনভিজ্ঞ বালককে শিক্ষক যখন বলেন যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুবট এক হাত পরিমাণ চোকা অংশের উপরে অনন্য পঞ্চাশ মণ বায়ুভার চাপানো রহিয়াছে, তখন বালকটি সে কথার অর্থ বুঝাফুরেও বুঝিতে না পারিয়া শিক্ষকের মুখেব দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। শিক্ষক বালকটিকে ঐ বিজ্ঞানতত্ত্বটা অনেক করিয়া বুঝাইলেও, বায়ুমণ্ডল যে লোহার সিঁদুলের জায় ভারি বস্তু, এ কথায় ক্ষুদ্র বেচাবীটির মন কিছুতেই সায় দিতে পারিয়া ওঠে না। শেষে যখন বালকটি শিক্ষকেব নিকটে বায়ুভাবেব একটি দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রার্থনা জানায়, তখন শিক্ষক একটা বায়ুমান যন্ত্র তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে বলেন “এই দেখ বায়ুভাবেব চাপে চোঙের ভিতরে পারা’ব দাঁড়িটা কত উচ্চে উঠিয়াছে।” বায়ুভাবেব দৃষ্টান্ত শিক্ষক এ যাহা দেখাইলেন, বালকটি তাহা চক্ষে দেখিল বটে; কিন্তু শুধু কেবল চক্ষে দেখিলে—কি হইবে? তাহার মন বোঝে কই? সে ভাবিল—বায়ুভারের চাপে পারা তো নীচে নাবিবারই কথা—উপরে উঠিবে কেমন করিয়া? এরূপ সংশয়ের অবস্থায় বালকের উচিত—আপনার কথা পাঁচ কাহন না করিয়া, শিক্ষককে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার কথার প্রকৃত তাৎপর্য্যটি ভাল কবির্য্য বুঝিতে চেষ্টা করা। “বায়ুব আবার ভাব আছে” এ কথাটি যেমন অনভিজ্ঞ বালকের বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না; “ধর্মের আবার জয় হয়” এ কথাটিও তেমনি অধুনাতন কালের আপাতদর্শী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। “যেখানে বায়ু, সেইখানেই বায়ুভার” এ কথা যেমন অজ্ঞ লোকের সংস্কার বিরুদ্ধ; “যেখানে ধর্ম সেইখানেই জয়” এ কথাও

তেমনি আপাতদর্শী পণ্ডিত লোকের সংস্কারবিরুদ্ধ। অজ্ঞ লোকের ঐরূপ কুসংস্কারের কারণ যেমন বায়ুর স্থলতা; আপাতদর্শী পণ্ডিত লোকের কুসংস্কারের কারণ তেমনি ধর্মের স্থলতা। কথাই আছে—“ধর্মন্ত স্থলগতিঃ।” পুনশ্চ, বায়ুব ভার যেমন সব স্থানে বিদ্যমান থাকে—সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ ফল সকল স্থানে সকল ভাবে দর্শকেব চক্ষে ধরা দায় না;—বায়ুমান যন্ত্রের পাবদ-কোষে এক ভাবে ধরা দায়—উচ্চ পর্বতশিখরে আর এক ভাবে ধরা দায়—বায়ুনিষ্কাশনী যন্ত্রেব (air pumpএব) বায়ুশূন্য কাচবরে কারাবরুদ্ধ জল-চয়ের বাষ্পোদগীরণে তৃতীয় আর এক ভাবে ধরা দায়, তা বই সকল স্থানে সকল ভাবে ধরা দায় না; সেইরূপ ধর্ম্যধর্মের ফলাফল জনসমাজের সর্বত্রই তলে তলে কার্য্য করা সম্বন্ধে, তাহা সকল স্থানে সকল ভাবে দর্শকের চক্ষে ধরা দায় না। যতোধর্মন্ততোজ্ঞয়ের বিশিষ্টরূপ পরিচয় লাভ করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনায় বিধিমত বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে অনুসন্ধান চালনা করা নিতান্তই আবশ্যিক। রব্‌স্পিরের আমলে রব্‌স্পিরের খুবই জয় হইয়াছিল, কিন্তু সেরূপ বেতালা এবং বেহুলা জয় যে, সর্বনাশেব পূর্ব-স্থচনা ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তির চক্ষে ধরা পড়িতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। আবার তাও বলি—অপবে যে যাহা বোঝে বুঝুক—কিন্তু আমবা এটা বেশ বুঝিতে পারি যে, ইংরাজ রাজপুরুষেবা দ্বায়ে পড়িয়া যখন মার্কিনদিগেব সহিত বিবাদ মিটাইবার ভান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সেই কুইনস্ প্রোক্লেমেশন-গতিকের ক্ষণিক সদয়ভাবেব বালির বাঁধেব উপরে বিশ্বাস স্থাপন না কবা’তে মার্কিন দেশীয় স্বাধিপায়ী আপনাদেব-স্ববুদ্ধিমত্তা’র বিশিষ্টরূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই; বাক্য দ্বাবা নহে—পরন্তু কার্য্য দ্বারা—তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে অদূবদর্শী লোকদিগের মতো তাঁহাবা একটুতেই নাচিয়া উঠিবার পাত্র ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমার বক্তব্য এই যে, ওয়াশিংটন্ এবং তাঁহাব দলস্থ ব্যক্তির স্পেনের দুর্ব্বল সেনাপতিদিগের ন্যায় নির্ভুরাচারীও ছিলেন না, আর, এলিজাবেথের আমলের জাহাজের ক্যাপ্টেনদিগের ন্যায় বোম্বটেও ছিলেন না;

তঁাহারা স্বাধীনতাপ্রিয় বীরপুরুষ ছিলেন, আব, সেইমতো কার্য্য করিয়াছিলেন—উচ্চ অঙ্গেব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এবং রাজ্য-ধর্ম্মের প্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি স্থিৰ বাখিয়া ন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা সকলেবই জানা কথা ।

পূর্বাণের যে জায়গাটিতে লেখা আছে “ধর্ম্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং” সেই জায়গায় উহাব সঙ্গে আব একটি কথা জোড়া লাগানো আছে এই যে, “মহাজনো যেন গতঃ স পশ্বা ।” এ কথাটির ভিতবেব ভাব এই যে, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বেব ঠিকানা পাওয়া জনসাধারণের পক্ষে দুর্লভ হইলেও মহাপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত কার্য্যকলাপে তাহা প্রত্যক্ষবৎ মূর্ত্তিমান্ হয় । খ্রীষ্টান লোকেরা যে বলেন “যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে নিহত হইয়াও বিশ্ববিজয়ী” তঁাহাদের এ কথা একটুও মিথ্যা নহে । এটাও তেয়ি বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধদেব রাজ্যপ্রার্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়া পথের ভিখারী হইয়াও বিশ্ববিজয়ী । এ সকল কথা হিমালয় পর্ব্বতেব জায় মহা প্রকাশ, তাই আমার ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি ও-সকল অলোকসামান্য বিষয়েব আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া আমার মনে হয় নাই । আত্মার গভীর অন্তস্তলম্পর্শী সার্বভৌমিক এবং সনাতন ধর্ম্মের চিবস্তন জয় স্বতন্ত্র, আর, সময়োচিত ধর্ম্মের সময়োচিত জয় স্বতন্ত্র । ওয়াশিংটন্ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপবায়ণ বীরপুরুষদিগের দৃষ্টান্তে সময়োচিত ধর্ম্মের সময়োচিত জয়ই দেখিয়া শিখিবাব বিষয়, ইহা বলা বাহুল্য । “সময়োচিত ধর্ম্ম আবার কি ? সব ধর্ম্মই তো সনাতন ধর্ম্ম !” কথাটা খুবই ঠিক ! কিন্তু হায়—বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের আধিপত্য পৃথিবী-মধ্যে যেরূপ হওয়া উচিত—হইয়াছে তাহা কথায় এবং পুঁথির পাতায় বতটা-দূর পর্য্যন্ত, কার্য্যে (বিশেষতঃ বড় বড় রাজা এবং রাজপুরুষদিগেব বড় বড় কার্য্যে) তাহার সিকির সিকিও হইতে পাবিবাব পক্ষে বাধাবিয় এতাদিক প্রবল যে, তাহার উন্নত তরঙ্গকোলাহলেব ভিড় ঠেলিয়া বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের সারগর্ভ উপদেশ লোকেব কর্ণকুহরে পৌছিতে না পৌছিতেই মাঝপথে লোপ পাইয়া যায় । এক্ষণকার কালে তাই রাজ্যস্বদ্ধ লোকের ধারণা এইরূপ যে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মের ভাব কার্য্যে পরিণত কবিতে যাওয়া একপ্রকার বৃথা চেষ্টা, অতএব তাহাতে ক্ষান্ত থাকাই

পবামর্শসিদ্ধ । কিন্তু যাহাই হোক না কেন—সনাতন ধর্ম্মের পবিত্র আদর্শ সভ্যজাতি মাত্রেই পরম পূজ্য সামগ্রী তাহাতে আর ভুল নাই । কলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশ বিদেশের সমস্ত সভ্য জাতিই ঐ পরম পবিত্র আদর্শটিকে—সভ্যতাই বলা—মহুয়াত্বই বলা—আব মহুয়ের দেবত্বই বলা—এমিতবো যত প্রকার মহদগুণ মহুয়জাতির মস্তকের ভূষণ, সমস্তেবই মূল আকর বলিয়া হৃদয়ঙ্গম কবিয়া থাকেন, আর, সেই জন্ত কোনো সভ্যজাতিই উহার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন কবিতে পারৎপক্ষে ত্রুটি করেন না । তবে কেন হুসভ্য জনসমাজের ভদ্রলোকেরা বিশেষত কর্তৃপক্ষীয় ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিবা বিশুদ্ধ ধর্ম্মেব আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত না হ’ন । কেন যে তঁাহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হ’ন না, তাহার কারণ ইচ্ছার অভাব তত নহে—যত শক্তির অভাব । মহুয়ের সে বল কই—সে স্বর্গীয় প্রভাব কই—যুব চক্ষুর জ্যোতি কই ? তেজোময় ঐশী শক্তিকে আশ্রয় করিয়া যে-মঙ্গলশক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পাবে—সে শক্তিতে কাহার স্বত্বাধিকার ? মহুয়ের—না আব কোনো জীবের ? কিন্তু সে শক্তি কোথায় ? তায় সত্য ক্ষমা দয়া কোথায় ? ঈশ্বরামুবাগ কোথায় ? মহুয়াত্ব কোথায় ? আমি তাই বলি যে মানুষ এনো মানুষ হয় নাই । মহুয়সমাজে ব্যাঘ্র ভল্লুক আছে লক্ষ লক্ষ, ছাগ-মেঘ আছে লক্ষ লক্ষ, ভূত পিশাচ আছে লক্ষ লক্ষ ; কিন্তু যাহাকে মানুষ বলা যাইতে পাবে, সেরূপ মহুয়া যদি কোটির মধ্যে একটি আধটিও খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহা মহুয়মণ্ডলীর আশাতীত পরম সৌভাগ্যের বিষয় । ফল কথা এই যে পৃথিবীর মস্তক-স্থানীয় ক্ষমতামালী পুরুষেবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহুয়াত্বেব উচ্চ শিখরে অধিকার না হইতেছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত মহুয়ের কিছুতেই নিস্তাব নাই ; আব, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সনাতন ধর্ম্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করা ব্যতিরেকে অস্ত্র কোনো উপায়েই তাহা সম্ভাবনীয় নহে । অধুনাতনকালে, যেখানে যে পরিমাণে বাহুবল এবং মস্তিষ্ক-বল গর্বে ক্ষীণ হইয়া ধবাকৈ সরা জ্ঞান করিতেছে দেখিতে

পাওয়া যায়, সেখানে সেই পরিমাণে আসল বলের শোচনীয় হীনাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আর, সেই দেবস্পৃহনীয় মনুষ্যোচিত মঙ্গল-শক্তির অভাবে পৃথিবীস্থ সমস্ত সুসভ্য জাতিগণের মধ্য হইতে ক্রন্দন এবং হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে গগন ভেদ করিয়া দিবারাত্র, ইহাও আমরা চক্ষে দেখিতেছি। এ কথা সত্য যে, সুসভ্য জাতিগণের কর্তৃপক্ষীয় মহাত্মাবা বিস্তৃত সনাতন ধর্মের আদর্শকে লোকসমাজে মূর্তিমান করিয়া স্ব স্ব দেশীয় জনসাধারণকে উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার বা মনুষ্যত্বের ব্রহ্মডাঙায় টানিয়া তুলিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন খুবই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া; আর একেবারেই তাঁহারা অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধি লাভ না করিতেছেন তাহাও নহে; যোলো আনা বজায়গায় অন্ততঃ এক আনা সিদ্ধি লাভ করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কোনো সুসভ্য জাতিই “ধর্মোন্নতিতে কাজ নাই” বলিয়া মনুষ্যসমাজের প্রধানতম কার্যে জলাঞ্জলি দিয়া—চারিরিকের তুফানের মাঝখানে হাল ছাড়িয়া দিয়া—নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। সুসভ্য জাতিদিগের মাথাগো মাথাগো বিজ্ঞ এবং কর্মী লোকেরা সাধারণ লোকসমাজকে ধর্মসোপানের আব এক ধাপ উচ্ছে উঠাইয়া দিবার জন্ত চেষ্টারও ক্রটি করিতেছেন না—অমুষ্ঠানেরও ক্রটি করিতেছেন না;—সমুখের বাধা-বিঘ্নেব সঙ্গে যুদ্ধও করিতেছেন কম না;—পারিয়া উঠিতেছেন না কিন্তু কিছুতেই! এ যাহা আমি বলিতেছি ইহাব একটা আঞ্জল্যমান প্রমাণ—

অধুনাতন সুসভ্য জাতিগণের মধ্যে সার্বলৌকিক রাজ সভার (International Parliamentএর) গোড়া-পত্তনেব প্রস্তাবনা। কিন্তু ঐ সুমহৎ মঙ্গল কার্যটির উদ্যোগকর্তারা এখনো পর্যন্ত এটা জানেন না যে, তাঁহাদের জাতির বহির্মুখী সভ্যতা যেরূপ দুর্দমনীয় প্রচণ্ড বেগে স্বার্থের পথে দৌড়িয়া চলিয়াছে, সেই দানবী সভ্যতাটাকে যত দিন পর্যন্ত তাঁহারা মানবী সভ্যতার পথে অর্থাৎ পরমপরিশুদ্ধ সনাতন ধর্মের পথে বাগাইয়া আনিতে না পারিবেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা সকলে মিলিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া সহস্র চেষ্টা করিলেও আশারূপ ফল-লাভে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। এটা তাঁহাদের জানা উচিত যে, কোনো এক জাতি ধর্মের প্রতি

দৃষ্টিশূন্য স্বার্থাঙ্ক বাণিজ্যব্যবসায়ের সাধনপটুতায় অপবাণর জাতিকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আত্মগবিমায় ক্ষীত হইয়া উঠিলে পার্শ্ববর্তী বলবান জাতিরা কখনই তেমনতরো বিযাক্ত জাতির সহিত সদ্ভাবে মিলিতে পারিবেনও না—সদ্ভাবে মিলিতে চাহিবেনও না। এটা যেমন উহাদের জানা উচিত, আর-একটি কথা তেমনই দেশীয় স্বাধা-পন্থীদিগের জানা উচিত; সে কথা এই যে, বিভিন্ন পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে স্বার্থমূলক প্রতিদ্বন্দিতা যেরূপ মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, আমাদের দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে তেমনতর কোনো ছরপনের প্রতিদ্বন্দক বিদ্যমান নাই। এই জন্ত সনাতন ধর্মকে আদর্শরূপে মাঝখানে দাঁড় করাইয়া আমাদের দেশের চতুঃপীমার অন্তর্কর্তী বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের উপায় চেষ্টা ওরূপ একটা অসাধ্যসাধন ব্যাপার নহে। আমি তাই বলি যে, ঐ সময়োচিত ঐক্যসাধন কার্যটির উপরে আমাদের স্বদেশের মঙ্গল তো বটেই তা ছাড়া সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল প্রধানত নির্ভর করিতেছে জানিয়া কার্যমনোবাক্যে সেইটি বঁটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রধানতম কর্তব্য কার্য।* আব পুঁথি বাড়াইব না;—

হুই জাতিব হুইতবো বিভিন্ন ধাঁচাব স্বভাবচবিত্র পর্যালোচনা

* লক্ষ্মীর বরপুত্র আক্‌বর শাহ সনাতন ধর্মের আধিপত্য বধাসম্ভব মানিয়া চলিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কেবল, তাঁহার উত্তরাধিকাবাদিদের দৌরাণ্ডে তাঁহার সে চেষ্টা রীতিমত ফলবতী হইতে পারিল না। অলক্ষ্মীর বরপুত্র ঔরঙ্গজেব সেই ঐক্যের পথে কষ্টক আয়োজ করিয়া আপনার এবং মোগল-সাম্রাজ্যের রসাতল-প্রয়াণের পথ প্রস্তুত করিবার কেমন গুস্তাঘ ছিলেন তাহা কাহারো অবদিত নাই। আমাব এইরূপ মনে হয় যে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে অর্থাৎ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিরোধ এবং বৈরিতার পরিবর্তে ঐক্য এবং সম্ভাব থাকিলে আমাদের দেশের একপ দুর্গতি হইত না। কোনো চীনদেশীয় বিজ্ঞ লোক যদি বলেন যে, ভাল মন্দ নির্কির্শে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের আবালবৃদ্ধবনিতার উপরে যেরূপ মর্ধ্যবিদারক নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া তাহাদিগকে আবর্জনার স্থায় ভারতবর্ষ হইতে সমূলে ঝাঁটাইয়া ফালা হইয়াছিল, সেই পাপের ফলে তাহার অনতিপরে ভারতবর্ষ পরহস্তগত হইল, তবে তাঁহার সে কথা আমরা যে হাসিয়া উড়াইয়া দিব, তাহার জো নাই। কেননা, পৃথিবীরাজের আমলে যদি বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেশ হইতে সমূলে লোপ পাইয়া না বাইত, তাহা হইলে অশ্বমেধের অলীক আডম্বর হুতাশয্যা হইতে কৃষ্ণে পাশ্রোধান করিয়া দেশীয় রাজাদিগের আপনা আপনির মধ্যে বৈরিতানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিত না; আর তাহার উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভারতলক্ষ্মী সম্ভ্রান্ত জলাঞ্জলি দিয়া মুসলমান সেনাপতির আশ্রয় ধাড়া করিতে বাইতেন না।

কবিয়া থেকুপ প্রণালী পদ্ধতি অবলম্বন করা আমাদের দেশের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া আমার মনে হয়, তাহা যতদূর পারা যায় সংক্ষেপে (অর্থাৎ ইঙ্গিত ইসায্য কোনোমত প্রকাবে) বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করি ।

আমাদের দেশে প্রতি প্রকৃতি যেরূপ সদয়, পাশ্চাত্য ভূগোল-বিশেষের প্রতি তাহার সিকির সিকিও নহে । কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রকৃতির কার্য-প্রণালী প্রভূত যত্ন এবং অধ্যবসায়ের সহিত দেখিয়া শেখা গতিকে পাশ্চাত্য জাতিরা জিতিয়া গিয়াছে, এবং এ দেশের লোকেরা এক্ষণে ঠেকিয়া শিথিতে বাধ্য হইতেছে । পাশ্চাত্য জাতিদিগকে প্রকৃতিমাতা যাহা দান নাই, তাহারা বৈজ্ঞানিক কলকৌশল প্রভৃতির সাহায্যে তাহার ঋণী পূরণ করিয়া মস্ত বড়লোক হইয়াছে । কিন্তু আমাদের প্রকৃতিমাতা অপরিপূর্ণ দানদাতা দিয়াছেন ; আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা তাই বৈজ্ঞানিক কলকৌশলের দিকে না গিয়া, অধ্যাত্ম যোগের সাধন দ্বারা আত্মার অভাব পূরণ কবিবার জন্য কষ্ট স্বীকার যত দূর কবিতো হয় তাহা করিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য দেশের সাধন বিজ্ঞান-প্রধান ; আমাদের দেশের পূর্বতন মহাত্মাদিগের সাধন নিঃশ্রেয়সপ্রধান । পাশ্চাত্য-ঐন্দ্রিয় বৈজ্ঞানিক সাধন দ্বারা জনসমাজে মঙ্গলফল যতটা ফলানো যাইতে পারে, তাহা অনেকদূর পর্য্যন্ত ফলিত হইয়া চুকিয়াছে ; তাহা হইতে তাহা অপেক্ষা আর বেশী ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না । আমরা চক্ষে দেখিতে পাই বা না পাই, তাহাতে বড় একটা আইসে যায় না—কিন্তু কথা এটা খুবই সত্য যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষদিগের তপস্তার ফল কোথাও যায় নাই ; এই ধানেই—এই চুপ্‌খতারপ্রাপ্তিভিত্তি ভারতভূমিতেই—তাহা সরস্বতী-নদীর তায় অন্তর্নিগূঢ় রহিয়াছে । যাহার চক্ষু আছে তিনি দেখিতে পাইতেছেন যে, স্বার্থপ্রধান দানবীসভ্যতার অন্তিম দশা ক্রমে যুগাইয়া আসিতেছে ; ধর্ম্মপ্রধান মানবী-সভ্যতা শুভাগন্তবরের মধ্য হইতে আলোকে মস্তক উত্তোলন করিবে, তাহার জন্ত ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছে । ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রথমে অরাজকতার গর্ভে একপ্রকার ক্ষত্রিয়-প্রধান (chivalric) সভ্যতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; তাহার পবে

সেই ক্ষত্রিয়প্রধান সভ্যতার গর্ভে এক্ষণকার কালের এই বৈজ্ঞানিক (industrial) সভ্যতা জন্মগ্রহণ কবিয়াছে । ইহার পরে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার গর্ভে যে প্রতিভোম-ক্রমে অর্থাৎ উল্টা পদ্ধতিক্রমে ধর্ম্মপ্রধান সভ্যতা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না । ধর্ম্মপ্রধান সভ্যতা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ, আর সেই জন্ত মঙ্গল শক্তির সবিশেষ কার্যকারিতা ব্যতিরেকে তাহা ঘটনা উঠিতে পারে না । দানবীসভ্যতা বিরোধমূলক, মানবী-সভ্যতা ঐক্যমূলক । আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, ধর্ম্মপ্রধান মানবীসভ্যতা আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমিতেই গোকুলে বাড়িতেছে । সমস্ত ভারতবর্ষ যদি আজ ঐক্যে ভর করিয়া দাঁড়ায়, তবে সেই ঐক্যের মধ্য হইতেই মনুষ্যজাতির চিরাভিলষিত মানবীসভ্যতা হিমালয় পর্বতের মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইবে ইহাতে আব সন্দেহ মাত্র নাই । আমরা এখন বেঘোরে পড়িয়া প্রাণের দ্বায়ে শক্তি শক্তি করিয়া সাবা হইতেছি, এবং পাশ্চাত্য জাতিদিগের দেবাদেশি বিরোধশক্তি উদ্বোধনের পন্থা অবলম্বন কবিতোছি ; জানি না যে ঐক্যশক্তির কিরূপ অপব্যক্তি বল । পৃথিবীতে যে, বিরোধের পালা সাজ হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে সার্বলৌকিক রাজসভা সংস্থাপনের প্রস্তাবনা । এখনকার এই নূতন যুগের প্রত্যেক নূতন ঘটনা আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছে যে, কালের গতি নূতন আর একদিকে ফিরিয়াছে । অতএব, আর এখন ঠেকিয়া শিথিতে না গিয়া ব্যালা থাকিতে দেখিয়া-শেখাই বুদ্ধমানের কার্য । নচেৎ, সব'ভাবেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিগণের ধামা ধরিয়া চলিলে তৃণাচ্ছাদিত কুপে পড়িয়া প্রাণ হারাইব । এখন যে, পৃথিবীতে দানবীশক্তির পালা সাজ হইবাব এবং সেই সঙ্গে মানবীশক্তির পালা আরম্ভ হইবাব উপক্রম হইয়াছে—এটা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না ; তাই মঙ্গল বা স্বাধীনতা লাভের উপায় ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম, এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রশ্ন উঠিতে পাতিতেছে ।

শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর।

“উপনিষদের উপদেশ।”

‘উপনিষদের উপদেশ’ ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবন্ধ এম. এ. মহাশয়, সমালোচনাব জন্ত আমাদিগকে এক খণ্ড গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। গ্রন্থখানি ৩৬৪ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ, ইহার মধ্যে অবতরণিকাষ্ট ১৮৩ পৃষ্ঠা ব্যাপিনী। এই অবতরণিকাতে গ্রন্থকার শব্দরেব মতামত বিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। ব্রহ্ম নিত্য জ্ঞান স্বরূপ।

ব্রহ্ম যে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। তবে একটী কথা মনে রাখা উচিত যে ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে না—ব্রহ্ম ‘জ্ঞানম্’ ইহাই সত্য (ভেঃ ভাঃ ২।১)। গ্রন্থকারের মতে “শব্দ স্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি আত্মার জ্ঞেয়।” এই কথাগুলি ব্যবহারিক ভাবেই সত্য, পাবমার্থিক ভাবে নহে। গীতাভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন “অবিক্রিয় বিজ্ঞান-স্বরূপে বিজ্ঞাতৃত্ব উপচার করা হইয়াছে”—“বিজ্ঞাতৃত্বোপচারাৎ” (১৩।৩)। ‘উপচারাৎ’ (figuratively) শব্দটার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আত্মার জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, জ্ঞেয়ত্বাদি সমুদয়ই উপচার বশতঃ “কর্তৃত্ব মুপচর্যাত আত্মনঃ” (বুঃ ভাঃ ৪।৩।১১) তেন কর্তৃত্ব উপচর্যতে, ন বশতঃ কর্তৃত্বম্ (৪।৩।১৭); তেন উপচর্যতে জ্ঞেয় ইত্যাদি (৩।৪।২)।

২। ব্রহ্ম নিত্য শক্তি স্বরূপ।

গ্রন্থকারের এই সিদ্ধান্তটী অতি গুপ্তকর। তাঁহার মূক্তি এই ব্রহ্ম যখন সমস্ত বস্তুর প্রেরক, তখন বলিতেই হইবে ব্রহ্মে কর্তৃত্ব আছে হুতরাং ব্রহ্ম শক্তিশালী। গ্রন্থকার ইহাও বলিয়াছেন “ব্রহ্ম, সন্নিধি মাতেই ইন্দ্রিযাদির প্রেরক” পৃ ৩৪। শঙ্কর ব্রহ্মকে প্রেরক বলিয়াছেন ইহা সত্য কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের প্রেরকত্ব ব্যবহারিক ভাবেই সত্য, পারমার্থিক ভাবে ব্রহ্মেব প্রেরকত্ব স্বীকার করা যায় না। গীতাভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—“সন্নিধি মাতেপ্যপি কর্তৃত্বম্ গোণমেব ১৮।৬৭। অর্থাৎ সন্নিধি বশতঃ ব্রহ্মের যে কর্তৃত্ব তাহা গোণ (figurative)। “ন গোণেন মুখ্য কার্য্য নির্বর্ত্যতে” অর্থাৎ এই কর্তৃত্বে কোন মুখ্য কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। “এ অবস্থার আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে বলা হয় যে কার্য্য না করিলেও কাৰক হওয়া যায়”—“তৎ অসৎ অকুর্ব্বতঃ কারকত্ব প্রসঙ্গাৎ।” হুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মের প্রেরকত্ব লৌকিক ভাবেই সত্য। পাবমার্থিক ভাবে ইহা সত্য নহে। হুতরাং কল্পিত কর্তৃত্ব বশতঃ ব্রহ্মকে কর্তা, শক্তিশালী বা শক্তি স্বরূপ বলা যাইতে পারে না।

ব্রহ্মের প্রেরকত্ব প্রমাণ করিবার জন্ত গ্রন্থকার কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(ক) তিনি বলেন কেনোপনিষদ ভাষ্যে (১।২) ব্রহ্মকে ‘তৎ সামর্থ্যম্’ অর্থাৎ ‘সামর্থ্যস্বরূপ’ বলা হইয়াছে। দুই একখানা বাজে সংস্করণে (যেমন ঐমহেশচন্দ্র পাল বা ভুবনমোহন বসাকের) এইরূপ পাঠই আছে, কিন্তু এ সমুদয় সংস্করণে কোন মূল্যই নাই। পুণ্য ‘আনন্দাশ্রম’ সংস্করণে “তৎসামর্থ্য নিমিত্তম্” এইরূপ পাঠ আছে। এই পাঠই যে ঠিক পাঠ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। (১) নাবারং কৃত ‘দীপিকাতে’ এখানে শব্দরের ভাষ্যই অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এই দীপিকার পাঠ ‘তৎসামর্থ্য নিমিত্তম্’। (২) পূর্ব্বোক্ত স্থলে ‘শ্রোত্র’ বিষয়ে ‘তৎসামর্থ্য নিমিত্তম্’ বলা হইয়াছে। মন আদি ইন্দ্রিয় বিষয়েও

দীপিকাতে ‘নিমিত্ত’ শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে। (৩) ঐ অংশের দীপিকাতে—“শঙ্করানন্ম” বহুবচন ‘সামর্থ্যকাবণম্’ ব্যবহার করিয়াছেন। ‘কারণম্’ এবং ‘নিমিত্তম্’ সমপর্ধ্যাধের কথা। হুতবাং দেখা যাইতেছে ভাষ্যের পাঠ ‘তৎ সামর্থ্য নিমিত্তম্’;—‘তৎসামর্থ্যম্’ নহে। ইহাও অর্থ ব্রহ্ম “শ্রোত্রাদির সামর্থ্যের কারণ।” ইহা যে ব্যবহারিক ভাবে সত্য তাহা আমরা গীতাভাষ্যেই (১৮।৬৭) দেখিয়াছি এবং পরেও দেখিব, (‘ধ’ অংশে উষ্টব্য)। আর এখানে যদি ‘তৎসামর্থ্যম্’ এইরূপ পাঠই থাকিত তা হইলেও নিমিত্ত ব্রহ্মবাদের কোন হানি হইত না। কারণ লৌকিকভাবে ব্রহ্মকে অনেক অসুচিত বিষয়ও আবোপ করা হইয়া থাকে। (বেঃ ভাঃ ১।২।১৪)।

এই অংশের টীকাতে আনন্দ গিরি বলিয়াছেন “বহু যেমন সর্পাদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান, তেমনি চৈতন্য ও শ্রোত্রাদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান।” হুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রোত্রাদি সর্পাদির স্থায় মিথ্যা কল্পনা।

(খ) উক্ত উপনিষদের ভাষ্য হইতে (১।৪) গ্রন্থকার আরও একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অংশটী এইরূপ অমুবাদ করা হইয়াছে, “বাগিন্দ্রিয় ব্রহ্ম জ্যোতি ঘারা প্রেরিত হইয়াই বস্তব্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়।” পৃ ২২।

পাদটীকার (foot note) লিখিয়াছেন “স্পষ্টতঃই এ সকল স্থলে পূর্ব্ব নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই ‘সামর্থ্য স্বরূপ’ বলা হইয়াছে।” পৃ ২২।

আনন্দগিরির ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে বাগিন্দ্রিযাদি রজ্জু-সূর্যের স্থায় মিথ্যা। মিথ্যা কল্পনা বিষয়ে ব্রহ্মকে ‘সামর্থ্য স্বরূপ’ প্রমাণ করিয়া কোন লাভ নাই।

আর আমরা এখানেও ভাষ্যে “সামর্থ্য স্বরূপ” বা অমুদ্বয় কোন কথাই খুজিয়া পাইলাম না। বরং ভাষ্যে বাহা লিখিত আছে তাহাতে গ্রন্থকারের বিরোধী মতই প্রতিপন্ন হয়। ভাষ্যকার এই স্থলে বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন “যো বাচসন্তরো যময়তীতি বাজসনেরকে।” এখানে “অন্তর্ধামী”র কথাই বলা হইয়াছে। শব্দরেব মতে এই অন্তর্ধামী—সপ্তম ব্রহ্ম, ইনি অবিদ্যা-মূলক (বুঃ ভাঃ ৩।৮ ভাষ্য শেষ)।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন “আত্মচৈতন্যই ইন্দ্রিযাদির প্রেরক।...এই জ্ঞাতাই ক্রটিতে আত্মচৈতন্যকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, মনের মন বলা হইয়াছে।—পাঠক এ সকল অপেক্ষা স্পষ্টতর উক্তি আর কি হইতে পারে?” পৃ ২১—২২। কেনোপনিষদে ব্রহ্মকে শ্রোত্রের শ্রোত্রাদি বলা হইয়াছে সত্য কথা কিন্তু কি অর্থে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে, শঙ্কর ত কেনোপনিষদের পূর্ব্বোন্নিখিত অংশেই তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে অংশ উদ্ধৃত করিলে নিজের মত আপাতঃ সমর্থিত হয় গ্রন্থকার সেই অংশই উদ্ধৃত করিয়াছেন আর সেই ভাষ্যেরই যে অংশ নিজ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী গ্রন্থকার সে অংশ গোপন করিলেন। ইহাতে কি সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হইয়াছে? ঐ ভাষ্যেরই (১।৪) শেষ অংশে শঙ্কর বলিতেছেন “তিনি বাক্যের বাক্য, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, কর্তা, ভোক্তা, বিজ্ঞাতা, নিয়ন্তা, প্রশাসিতা; ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ ইত্যাদি কথা ব্যবহারিক ভাবেই বলা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্ম অব্যবহার্য্য, নির্বিশেষ, পরম ও সাম্য। ব্যবহারিক ভাবে বাহা বলা হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া আত্মাকেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান ইহাই শব্দার্থ। ঐশ্বর্য্যাদি অনাস্ববস্ত এবং উপাধি ভেদ বিশিষ্ট। লোকে ঐশ্বর্য্যাদিকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে কিন্তু ঐশ্বর্য্যাদি ব্রহ্ম নহে।”

পাঠকগণ দেখিলেন যে লৌকিক ভাষায় ব্রহ্মকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, কর্তা, জ্ঞাতা, নিয়ন্তাদি বলা যাইতে পারে কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাহাকে

এ প্রকারে বর্ণনা করা যায় না। আরও একটি বিবরণ লক্ষ্য করা উচিত—এখানে ঈশ্বরকে ‘অনাস্থা’ বলা হইয়াছে।

(গ) ঐতরেয় উপনিষদ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—“নিষ্ক্রিয় শাস্ত সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত ব্রহ্মই জগতের বীজ স্বরূপ অব্যক্ত শক্তি বা মায়ার শক্তির প্রবর্তক” পৃঃ ২৬।

৭। গ্রন্থকার একটি মারাত্মক কথা গোপন করিয়াছেন। কথাটি এই—“উপাধি সম্বন্ধে ন।” উপাধি বশতঃই ব্রহ্মকে সর্বত্রাদি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। এই “উপাধি” শব্দের অর্থ কি? মনে কর-ফটিকের নিকট জবাকুহর রাখিয়াছে; এই জন্ত স্বচ্ছ ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। এই স্থলে জবাকুহরকে ফটিকের উপাধি বলা হয়। ফটিক যেমন কখন রক্তবর্ণ হয় না তেমনি ব্রহ্মও কখন শ্রোতা, মন্তা জ্ঞাতা অন্তর্গামী ইত্যাদি হইতে পারেন না। ফটিককে যেমন রক্তবর্ণ বলিয়া ভ্রম হয় তেমনি উপাধি বশতঃই ব্রহ্মকে অন্তর্গামীাদি বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। বিদ্যাবত্ত মহাশয় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন সে অংশে এই উপাধির কথাই বলা হইয়াছে।

(ঘ) গীতা ভাষ্য দ্বারাও গ্রন্থকার নিজ মত সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন “শঙ্করাচার্য্য এই নির্বিশেষ শক্তিকে গীতায় ‘বল শক্তি’ নামে নির্দেশ করিয়াছেন। ইহারই পূর্ব শ্লোকের ভাষ্যে মায়ার শক্তির উল্লেখ আছে। এই স্বরূপভূত বলশক্তি—মায়ার শক্তি হইতে ভিন্ন, ইহাও সে স্থলে দেখাইয়াছেন। পৃঃ ৩৪—৩৫।

“বলশক্তি” মায়ার শক্তি হইতে ভিন্ন শব্দের পূর্ব শ্লোকের ভাষ্যে একপ কোন কথা বলেন নাই। পরন্তু আনন্দ গিরি ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছেন। ভাষ্যে আছে “বল শক্তি”। আনন্দ গিরি বলেন “শক্তিমায়া তথা” অর্থাৎ ‘শক্তি’ অর্থ ‘মায়ার’।

সুতরাং নিষ্ঠুর ব্রহ্ম যে শক্তি স্বরূপ তাহা প্রমাণিত হইল না।

কোকিলেশ্বর বাবু ব্রহ্মকে “শক্তি স্বরূপ” বলিতে চাহেন। তাঁহার মতে “শক্তি”ই ব্রহ্মের “স্বরূপ” অর্থাৎ ‘শক্তি’ ও ‘ব্রহ্মসত্তা’ একই বস্তু। এখন দেখা যাউক গ্রন্থকারের মতে এই শক্তির প্রকৃতি কি। তিনি এ বিষয়ে এই মত প্রকাশ করিতেছেন :—

“শক্তির অবস্থান্তর ঘটে মাত্র কিন্তু তদ্বারা শক্তির ধ্বংস হয় না। শক্তির রূপান্তর হইলেও শক্তি ঠিকই থাকে। কেবল রূপ বা আকারগুলি মাত্র নিবৃত্ত পরিবর্তিত হইতেছে।” পৃঃ ১১৮—১১৯। গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন শক্তি ‘নিরন্ত’ পরিবর্তনশীল। শক্তিই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ তখন ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে “ব্রহ্ম নিরন্ত পরিবর্তনশীল”। ব্রহ্মকে ‘শক্তি স্বরূপ’ বলিলে এই প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হইবে।

গ্রন্থকার বহু স্থলে “নির্বিশেষ শক্তি” এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। বলা হইতেছে ‘শক্তি’ অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে ইহা ‘নির্বিশেষ’। ইহাকেই বলে ‘সোনার পাথর বাটী’। গ্রন্থকার কি ইতিপূর্বেই এই শক্তির অশেষ গুণ বর্ণনা করেন নাই? হে-শক্তি (গ্রন্থকারের মতে) এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে সে শক্তি কি ‘নির্বিশেষ’?

উপনিষদাদি গ্রন্থের অনেক স্থলে এবং শঙ্করের গ্রন্থেও ব্রহ্মকে শক্তিশালী বলা হইয়াছে আবার বহু স্থলে ইহাও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মে কোন প্রকার শক্তি নাই। এখন ইহার মীমাংসা কি? শঙ্কর নিজেই ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম ‘শক্তি বহিত’ কেবল অবিস্তারশতঃই তাঁহাকে শক্তিশালী বলিয়া

ভ্রম হয়। পারমার্থিক ভাবে তিনি নিষ্ঠুর, লৌকিক ভাবে তিনি সন্তপ।* জ্ঞানচক্ষে তিনি নির্বিশেষ অজ্ঞানতার চক্ষে তিনি সর্বিশেষ।

৩। নিষ্ঠুর ব্রহ্মের বিকার!

গ্রন্থকার আর একটি মারাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন “সন্তপ ব্রহ্মও নিষ্ঠুর ব্রহ্মের অবস্থান্তর মাত্র”। শঙ্করের কোন শিষ্য শঙ্করের নামে এই মত চালাইতে পারেন তাহা আমাদের ধারণা ছিল না। বৃহদারণ্যক ভাষ্যে এই প্রম উৎপাদিত হইয়াছে যে সন্তপ ব্রহ্ম বা জীবাত্মাকে কিম্বা অপর কোন বস্তুকে নিষ্ঠুর ব্রহ্মের অবস্থা কিম্বা শক্তি বলা যাইতে পারে কি না। শঙ্কর নানা প্রকার যুক্তি তর্ক দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইহাদিগকে ব্রহ্মের অবস্থা বা শক্তি বলা যাইতে পারে না। “অবস্থা-শক্তি ভাবং ন উপপদ্যতে” বৃঃ ভাঃ ৩।৮ গীতা ভাষ্যেও বলা হইয়াছে যে আত্মার অবস্থা ভেদ স্বীকার করা যায় না “আত্মনোইবহাভেদামুপপদ্যতেঃ” ১।৩৩।

সন্তপ ব্রহ্মকে যে শঙ্কর ‘অনাস্থা’ বলিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি।

আত্মা কখন অনাস্থা রূপে পরিণত হইতে পারেন না এবং অনাস্থাও কখনও আত্মা হইতে পারে না। বেদান্ত ভাষ্যের প্রারম্ভেই শঙ্করাচার্য্য ইহার সম্যক আলোচনা করিয়াছেন।

৪। মায়ার ব্রহ্মসত্তারই বিকার!

গ্রন্থকার বলেন শঙ্করের মতে “মায়ার ব্রহ্ম সত্তারই রূপান্তরিত অবস্থা” “উহা নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই একটি বিশেষ অবস্থা—একটি রূপান্তর মাত্র”। পৃঃ ৭৮। “উহা ব্রহ্মসত্তারই অবস্থা বিশেষ মাত্র” পৃঃ ৯৩। “ব্রহ্ম অনন্ত শক্তি স্বরূপ। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই অনন্তশক্তি জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল, শক্তির এই পরিণাম বা আগন্তুক অবস্থা বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে একটি পৃথক নাম দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। পরিণামোন্মুখিনী এই শক্তির নাম মায়ার শক্তি”। পৃঃ ৩৬। তদ্বদর্শী জানেন “উহাকে মায়ার শক্তিই বল, আর যাহাই বল না কেন, উহা একটি অবস্থান্তর মাত্র, উহা ঐ পূর্ণ শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে”। পৃঃ ৫৬।

গ্রন্থকার বলিতেছেন যে মায়ার ব্রহ্ম “সত্তা”র রূপান্তর, ব্রহ্ম “স্বরূপের” রূপান্তর। ইনিই অন্তত (পৃঃ ৭৩) আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে “ব্রহ্মের কোন রূপান্তর হয় না” “অবস্থান্তর প্রতীত হয় মাত্র”। কোন কথাটি সত্য?

আমরা পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে ব্রহ্মের কখনও অবস্থান্তর হয় না।

‘মায়ার ব্রহ্মসত্তাতে সত্তাবান’ এই প্রকার ভাষা শঙ্কর বহু স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কি ভাবে এই মায়ার, এই মায়াময় জগৎ, ব্রহ্মসত্তাতে সত্তাবান তাহা জ্ঞানী আবশ্যক। সর্বত্র যেমন রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রজতভ্রম যেমন শুভিকাকে আশ্রয় করে তেমনি মায়ার এবং মায়াময় এই জগৎ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে (গীঃ ভাঃ ১৩।১৬)। রজ্জু কিম্বা শুভিকা না থাকিলে যেমন সর্প বা রজত ভ্রম থাকিত না, তেমনি ব্রহ্ম না থাকিলেও মায়ার কিম্বা মায়াময় এই জগৎ সম্ভব হইত না। এই অর্থেই কোন কোন স্থলে মায়াকে ব্রহ্মের ‘আত্মভূত’ বলা হইয়াছে (উঃ ভাঃ ২।৬)।

* “শঙ্কর দর্শন” (প্রবাসী, মার্চ ১৩১৪) ও “ভারতীয় ব্রহ্মবাদ” (প্রবাসী, অক্টোবর, ১৩১৫) এই দুইটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা গিয়াছে।

আবার কোন কোন স্থলে এই ‘আত্মভূত’ কথার সঙ্গে ‘ইব’ শব্দেরও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় (বে: ভা: ২।১।১৪)। ‘ইব’ শব্দ ব্যবহারের অর্থ এই যে প্রকৃতপক্ষে মারা ব্রহ্মের আত্মভূত নহে কিন্তু ভ্রম হয় যেন ইহা ব্রহ্মের আত্মভূত। “মারা ব্রহ্মেরই শক্তি” এ কথাও বহুবার উক্ত হইয়াছে কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে এ সমুদয় কথা লৌকিকভাবেই বলা হইয়াছে।

গ্রন্থকাব স্বীকার করিয়াছেন “মারা, অবিদ্যা, অজ্ঞান এ সকল নাম একার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।” পৃ ৩৮।

শব্দরচা এই মারকে মোহ, অবিবেক, ভ্রম, সমুদয় অনর্থের প্রসব বাহক, ইত্যাদি নামেও অভিহিত করিয়াছেন (বু: ভা: ৪।৩।১)। আমাদের গ্রন্থকাব মহাশয়ও এ কথা অস্বীকার করেন নাই। পৃ: ৪৩।

কোকিলেশ্বর বাবু বলিতেছেন “ব্রহ্মসত্তাই মারারূপে পরিণত হইয়াছে।” আমরা এখন সিজ্ঞাসা করি ব্রহ্ম কি কখন অজ্ঞানতা, অবিদ্যা, মোহ, অবিবেক, ভ্রম ইত্যাদি রূপে পরিণত হইতে পারেন? যিনি জ্ঞান স্বরূপ, তাহার পক্ষে কি অজ্ঞানতারূপে পরিণত হওয়া সম্ভব? প্রথমতঃ ব্রহ্মের বিকারই সম্ভব নহে (বু: উ: ভা: ১।২।২০) তাহার উপর মোহাদি রূপে বিকার। অসম্ভবের উপর অসম্ভব। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে হইবে ইহা বেদান্তেরই মত। গ্রন্থকাবের মতে অবিদ্যা ব্রহ্মসত্তারই পরিণাম। হুতরাং অবিদ্যাকে ধ্বংস করা আর ব্রহ্ম সত্তাকে ধ্বংস করা কি একই কথা হইতেছে না? বৃহদারণ্যক ভাষ্যে আছে “গো দাঁড়াইয়া থাকিলে কিংবা গমন কবিলে তাহাকে গো বলা হইবে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে অশ্বাদি জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইবে এমন নহে ২।১২০।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ও তৃতীয় পুরুষ স্থলে ‘প্রথম পুরুষ’ ব্যবহার করিয়া ঠিক ঐ একই দৃষ্টান্ত দিতেছেন:—“আমি এখন বসিয়া লেখিতেছি, আবার আনিই যখন কিছুকাল পরে ভ্রমণে বহির্গত হইব, সেই ভ্রমণের সময় কি আমি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া উঠিব? তাহা কদাপি হইতে পারে না। এই নির্কলেশ সত্তারও যখন আঙ্গীকক অবস্থা বিশেষ মার্গেণ্মুখ পরিণাম উপস্থিত হয়, তখন কি তাহার স্বতন্ত্রতার হানি হয়? কখনই না।” পৃ: ২৫—২৬। অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা অবিদ্যারূপে পরিণত হইলেও তিনি ব্রহ্মই থাকিবেন। পূর্বোক্ত গরুড়ীর কথা মনে করা যাউক। গরুড়ী নিদ্রিত অবস্থায় আছে। হঠাৎ তাহার অবস্থান্তর হইল। সে এখন ভ্রমণ করিতেছে। এই অবস্থায় যদি গরুড়ী মারা যায়, তবে কি নিদ্রিত গরুড়ী জীবিত থাকিবে? ‘কখনই নহে’। ব্রহ্ম সত্তাই যখন অবিদ্যারূপে পরিণত হইয়াছেন, তখন অবিদ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে কি ব্রহ্মও গরুড়ীর জ্ঞায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন না? অবিদ্যা ভ বিনষ্ট হইয়াই থাকে এবং প্রতিনিমিত্তই বিনষ্ট হইতেছে; হুতরাং বলিতে হইতেছে ব্রহ্মও নিমিত্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহাকেই বলে “ব্রহ্ম হত্যা”। বিদ্যারত্ন মহাশয় কি এই ব্রহ্ম হত্যার দাশিষ্ট্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন?

প্রকৃত কথা এই মারা ব্রহ্মের পরিণতি নহে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য মারাব্যব প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাকেও বলিতে হইয়াছে যে বিচারের চক্ষে এই মারা অনির্কলীয়। ইহা বস্তু কি অবস্তু তাহা বিচার করিয়া বলা অসম্ভব (বে: ভা: ১।৪।৩)। ইহাকে বস্তু বলা যায় না, কারণ ব্রহ্ম অদ্বিতীয়; ইহাকে অবস্তুও বলা যায় না, কারণ অবস্তু কখন এত অনর্থের মূল হইতে পারে না। এই অস্তুই পঞ্চদশীতে বলা হইয়াছে যে ‘জ্ঞান চক্ষুতে ইহা শূন্যময়, বৃত্তি দৃষ্টিতে ইহা স্তুনির্কলীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে ইহা বাস্তব’ ৬।২২-১৩০। বিদ্যার দৃষ্টিতে এই

মারা “নিত্য নিবৃত্তা”, পঞ্চদশীকার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এমত নৃসিংহ-উত্তর-তাপনীর উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি। এই উপনিষদের ‘দীপিকা’তে বিদ্যারূপা (সারণ) বলিয়াছেন “যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি ঘৃতপিণ্ডকে দগ্ধ করে, আত্মাও তেমনি অবিদ্যাকে দগ্ধ করিতে পারে। তবে কি অবিদ্যা অস্তিত্ব বিহীন? হী এই অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই।” (২ম খণ্ড)। বেদান্ত ভাষ্যে ও (২।১।২) অবিদ্যাকে ‘অবস্তু’ বলা হইয়াছে। মাণ্ড্যাক্যাবিকার মতে এই মায়াব অস্তিত্ব নাই “সা চ মারান বিদ্যতে” ৪।৫৮ ইহার ভাষ্যে আচার্য্যদেব বলিয়াছেন “এই মায়াব অস্তিত্ব নাই, বাহ্য অবিদ্যমান, তাহারই নাম মারা। সা চ মায়া ন বিদ্যতে, মারা ইতি অবিদ্যমানস্ত আত্মা ইতি অস্তিত্বপ্রাপ্তঃ” ৪।৫৮।

বাহ্য অবিদ্যামা! তাহাই মারা; মায়া—অবস্তু; আত্মা কখন অবস্তুরূপে পরিণত হইতে পারেন না, হুতরাং আত্মা কখন মারারূপেও পরিণত হইতে পারেন না।

বৃহদারণ্যক ভাষ্যে এই অবিদ্যাকে ‘অনান্দ্য’ বলা হইয়াছে (১।৬।১)। শব্দের মতে ‘আত্মা’ এবং ‘অনান্দ্য’ পরস্পর বিরোধী, ইহাদিগের মধ্যে এক অপরের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না (বে: ভা: প্রাবস্ত)। হুতরাং আত্মা কখন অবিদ্যারূপে পরিণত হন নাই।

এই অবিদ্যাই জগৎরূপে প্রকাশিত (বু: ভা: ১।৬।১)। গীতাশাস্ত্রে এই অবিদ্যাই ‘ক্ষেত্র’ এবং আত্মাই ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’। আত্মার সহিত মারার, ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত ক্ষেত্রের কি সম্বন্ধ তাহা গীতাভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। “ঘটের অবয়ব রজ্জুকর্ষক সন্নিষ্ট হইলে যে প্রকার সংযোগ হয়, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ সে প্রকার নহে। তন্তু ও পটের জ্ঞাত ইহা সমবার লক্ষণও নহে। ইহাদিগের সংযোগ অধ্যাসমূলক। রজ্জুস্তম্বাদি বিষয়ে বিবেক না থাকিলে যেমন এই সমুদয়ে সর্পরজ্জুতামির অধ্যাসরূপে সংযোগ হয় তেমনি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বিষয়ে বিবেক না থাকিলে উভয়ের মধ্যে অধ্যাস হইয়া থাকে। এই অধ্যাসমূলক সংযোগ মিথ্যা-জ্ঞানপ্রসূত।” ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত। গী: ভা: ১।৪।২।

এস্থলে মারাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। অতএব আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিব। বিদ্যাবত্ন মহাশয় যে মারাকে ব্রহ্মসত্তার অবস্থা বিশেষ বলিয়াছেন; আমরা কেবল তাহারই অসারতা দেখাইলাম। সর্পর সহিত রজ্জুর যে প্রকার সম্বন্ধ মারার সহিত ব্রহ্মেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। ‘মারা ব্রহ্মের শক্তি’—ইহা লৌকিক ভাবে বলা যািতে পারে কিন্তু দার্শনিকের চক্ষে ইহা নিতান্তই অসত্য।

৫। ঈশ্বর ও জগৎ।

বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন “বেদান্ত ভাষ্যে একটা শব্দবোক্তি দেখিয়া অনেকে আবার ইহাও মনে করেন যে শব্দর সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরকে পর্যন্ত মারাময় ও অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আমাদের কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস এই যে ইহাও নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা” পৃ ১৩৫। আচ্ছা একটা স্থলেই যদি শব্দর, ঈশ্বর ও সৃষ্টি ব্যাপারকে মারাময় ও অসত্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেই কি যথেষ্ট হইল না? “সত্য জ্ঞানমনস্তা ব্রহ্ম” এই মহা সত্যটি একটা স্থলে রহিয়াছে বলিয়াই কি ইহার মূল্য চলিয়া গেল?

বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন “একটা শব্দবোক্তি” কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন “দুইটি”। এই দুইটি অংশ গ্রন্থকারের মনঃপূত নহে, এই অস্তুই বোধ হয় তিনি ইহাও অস্বীকার দেন নাই। অস্বীকার এই:—

(১) “উপাধিবশতঃই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তি—পর-মার্থতঃ এ সমুদয় সত্য নহে” বে: ভা: ২।১।১৪।

(২) যখন “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি অভেদ হৃদক উপদেশ দ্বারা অভেদ

জ্ঞান জাগ্রত হই তখন জীবের সংসারিক ও ব্রহ্মের সৃষ্টক—উভয়ই অপগত হয়। তখন কোথায় সৃষ্টি? বে: ভা: ২।১।২২।

এই দুইটা স্থলে শব্দর কি ঈশ্বর ও সৃষ্টিকে মায়াময় ও অসত্য বলেন নাই?

কেবল দুইটা স্থলে কেন, বহু স্থলে শব্দর ঐ কথাই আবও স্পষ্ট কবিয়া বলিযাছেন। নিম্নে ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

(৩) বেদান্তভাষ্য ৩।২।১১। এখানে বলা হইয়াছে ব্রহ্মের সত্ত্বগুণ অবিচ্ছিন্নমূলক।

(৪) বে: ভা: ৪।৩।১৪—সত্ত্বগুণ ব্রহ্মাদি অবিচ্ছিন্নমূলক।

(৫) বে: ভা: ৪।৩।১৪—ইহাবই অপর স্থলে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্তই সৃষ্টি প্রতিষ্ঠা। সৃষ্টাদি বর্ণনা করা ইহার উদ্দেশ্য নহে।

(৬) বে: ভা: ২।১।২৭—পরিণাম প্রতি সমূহ সৃষ্টি প্রতিপাদক নহে।

(৭) বে: ভা: ২।১।৩০—সৃষ্টি প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মের সর্বজন্যতামূলক প্রতি পরমার্থ বিষয়িণী নহে।

(৮) বৃহৎ উ: ভা: ২।১।২০—আনন্দাত্ম সংস্করণ পৃ: ২৯৬।

(৯) বৃ: ভা: ২।১।২০, পৃ: ২৯৭।

(১০) বৃ: ভা: ২।১।২০, পৃ: ২৯৮।

(১১) বৃ: ভা: ২।১।২০, পৃ: ২৯৯।

(১২) বৃ: ভা: ১।৪।৭, পৃ: ১২৬।

(১৩) বৃ: ভা: ১।৪।৭, পৃ: ১২৭।

এই শ্রেণীতে ছয়টা স্থলেই বলা হইয়াছে যে সৃষ্টি প্রতিষ্ঠা প্রতিপাদনপক্ষে, ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনই এ সমুদয়ের উদ্দেশ্য।

(১৪) বৃ: ভা: ৪।৪।২৫। লোক শিক্ষার জন্তই সৃষ্টাদি কল্পনা করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টাদি কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(১৫) বৃ: ভা: ৩।৮—শেবাংশ। সত্ত্বগুণ ব্রহ্মাদি সমুদয়ই অবিচ্ছিন্নমূলক এবং অধ্যাসপ্রসূত।

(১৬) প্রঃ উ: ভা: ৬।৪। চক্ষুর প্রান্তভাগে অঙ্গুলি দ্বারা নিপীড়ন কবিলে যেমন বিচলিত, মশক, মক্ষিকাদি দৃষ্ট হয় এবং স্বপ্ন প্রভৃতি যেমন নানা বস্তু সৃষ্টি কবে, অবিচ্ছিন্ন রচিত এই সৃষ্টিও ঠিক সেই প্রকার।

(১৭) প্রঃ উ: ভা: ৬।২ নিম্নার্ণ ব্রহ্মকে বর্ণনা করা অসম্ভব সেইজন্য প্রথমে তাঁহাতে সত্ত্বগুণ আরোপ করা হয়। তৎপর এই দ্বৈত সংশোধনের জন্ত বলা হয় ব্রহ্মে এ সমুদয় কিছুই নাই।

(১৮) প্রঃ ভা: ৬।৩ ব্রহ্মের সত্ত্বগুণ অবিচ্ছিন্নমূলক।

(১৯) ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়েব আবর্তেই শব্দর বলিযাছেন যে “সৃষ্টাদি অর্থবান, কিন্তু ইহা বলাই অধিকতর সূক্ষ্মসঙ্গত যে লোক শিক্ষার জন্ত যেমন আখ্যাতিকার রচনা করা হয় তেমনি সেই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টির গল্প বচনা করা হইয়াছে।”

(২০) যুক্ত ভা: ২।১।৩ অপরূপের পুত্র যেমন, ব্রহ্ম হইতে প্রাণাদির উৎপত্তিও তদ্রূপ।

(২১) বে: ভা: ৪।৩।১৩ সত্ত্বগুণ ব্রহ্ম বিনাশশীল।

(২২) গীতা: ভা: ৮।২০ সত্ত্বগুণ ব্রহ্মের বিনাশ আছে।

(২৩) গী: ভা: ১৩।১৪ ব্রহ্ম নিম্নার্ণ। প্রথমে তাঁহাতে স্তব্ধ “অধ্যারোপ” করা হয়, তৎপর ঐ সমুদয়ের “অপবাদ” দ্বারা তাঁহাকে বর্ণনা করা হয়।

(২৪) মাছুক্যাকারিকা ভা: ৪।৪। কার্য করণাদি সবই মিথ্যা।

(২৫) মা: কা: ভা: ৪।২২ উৎপত্তি বলিযা কিছুই নাই।

(২৬) ঐ ২।৪ জাগ্রতাবস্থায় দৃষ্ট বস্তু স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্থায় মিথ্যা।

(২৭) ঐ ২।৩। এই বিষ আকাশকুণ্ডলের স্থায় অলীক।

(২৮) ঐ ২।৩২ উৎপত্তি প্রলয়াদি অসম্ভব। এ জগৎ “মানস বিকল্পিত”।

(২৯) ঐ ১।১৭ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অস্তিত্ববিহীন।

(৩০) ঐ ৪।৪২ মূর্খদিগকে প্রবোধ দিবার জন্তই সৃষ্টি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টাদি কিছুই নাই।

(৩১) ঐ ৪।৫২ সমুদয়ই মায়াবশ—জ্ঞাননাশাদি কিছুই নাই।

(৩২) ঐ ৪।৩৬ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্থায় জাগ্রতাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুও অসং।

(৩৩) ঐ ৪।৬৮—৭০। মনুষ্যাদিও অস্তিত্ববিহীন, সমুদয়ই চিন্তের “বিকল্পনা”।

(৩৪) ঐ ৩।১৫ সৃষ্টাদি কিছুই নাই; ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্তই সৃষ্টি কল্পনা।

(৩৫) ঐ ৩।৪৮ উৎপত্তাদি কিছুই নাই।

(৩৬) ঐ ৩।২৩ সৃষ্টি অপ্রসিদ্ধ ও নিম্নপ্রবোজন।

(৩৭) ঐ ৩।২৪ আত্মাব একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্ত সৃষ্টি কল্পনা।

(৩৮) ঐ ২।৬ এই জগৎ মূর্খভূক্তিকার স্থায় মিথ্যা।

(৩৯) ঐ ৪।৫৮ উৎপত্তাদি মায়াময়, এই মাযার অস্তিত্ব নাই।

(৪০) শেতাশ্বতথ উপনিষৎ ভাষ্যের আরম্ভেই শব্দর পুরাণ বচন উদ্ধৃত কবিয়া মীমাংসা কবিযাছেন যে রজ্জ্বতে যেমন সর্প ভ্রম তেমনি জগৎ ভ্রম। এ জগৎ অস্তিত্ববিহীন। ইহাব উৎপত্তিও নাই, নাশও নাই এবং ইহার কারণও নাই। অধিক দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

৬। ব্রহ্মজ্ঞান ও জগৎ ।

বিদ্যাবত্ত মহাশয় বলেন “পরমার্থ দৃষ্টি জন্মিলেও এই সন্যাসরা-বন-শৈলা মেদিনী অন্তর্হিত হইয়া যাব না। জগৎ বা জগতের উপাদান শক্তি অলীক হইয়া উড়িয়া যাব না। জগৎ জগৎই থাকে, শক্তি শক্তিই থাকে। ইহাই শব্দরের মত”। পৃ: ১০০।

মহোদ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ স্থায় পঞ্চানন মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার নিজ মত সমর্থন কবিযাছেন। আমরা কিন্তু জানিতে চাই শব্দর কোন পুঁথি কোন স্থলে এই প্রকার সিদ্ধান্ত কবিযাছেন। যে পর্যন্ত এই পুঁথির আবিষ্কার না হইতেছে সে পর্যন্ত আমাদেরকে বাধ্য হইয়া প্রাচীন শাস্ত্রেরই অনুসরণ করিতে হইতেছে।

বেদান্তভাষ্যে শব্দর এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন:—“বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যাজনিত জগৎ প্রপঞ্চকে লয় কর, লয় করিযা সেই আরতনভূত এক আত্মাকে একরস বলিযা অবগত হও” ১।৩।১।

ভগবান শব্দরচার্য্য জ্ঞানীর শিরোমণি, তিনি পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এ বিষয়ে অনেক মহাপণ্ডিতও মহাত্মা পণ্ডিত হইবেন। ইহা জানিয়া গুনিয়াই তিনি ইহার একটা স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। মীমাংসাসী এই:—

“জিজ্ঞাস্ত প্রপঞ্চ বিলয় কাহাকে বলে? অগ্নির উত্তাপে ঘৃতের কাঠিক্ত যেমন বিলীন হয়, তেমনি কি এই প্রপঞ্চকে বিলীন করিতে হইবে? অথবা নেত্রের তিমির দোষে একচক্ষকে বহুচক্ষ বলিয়া দৃষ্টি হইলে যেমন সেই দোষ নিবারণ করিতে হয় সেই প্রকার অবিদ্যা-বশত: ব্রহ্মে যে নাম রূপাদি আরোপ করা হয় তাহা বিদ্যা দ্বারা বিলীন করিতে হইবে? এই বিদ্যামান দেহাদি লক্ষণ আধ্যাত্মিক প্রপঞ্চ এবং পৃথিব্যাগ্নি লক্ষণ বাহ্যিক প্রপঞ্চকে বিলীন করিতে হইবে—ইহাই যদি বলিবার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এরূপ বিলাপন পুরুষ মাত্রেই

অশক্য হতবাং একপ বিলাপনের উপদেশও অসম্ভব বিষয়ের উপদেশ । আব (এই প্রকার বিষয় সম্ভব বলিয়া কল্পনা কবিলেও স্বীকার কবিত্তে হইবে যে) প্রথম স্তম্ভ পুরুষই পৃথিব্যাধি প্রপঞ্চ বিলীন কবিত্তে ছেন হতবাং জগৎ এখন পৃথিব্যাধি শূন্য । আর যদি বল যে অধিতীয় ব্রহ্মে এই প্রপঞ্চ অবিস্মা কর্তৃক অধ্যস্ত হইয়াছে এবং বিদ্যাধারা ইহাই বিলোপ করিত্তে হইবে ইহাই উপদেশের অর্থ—তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে “ব্রহ্ম এক ও অধিতীয়, তিনিই সত্য, তিনি আত্মা, তিনিই তুমি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অবিস্মাধ্যস্ত প্রপঞ্চ প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্রহ্মোপদেশ দিতে হইবে । এই ভাবে ব্রহ্মকে জ্ঞানগোচর করাইলে বিদ্যা আপনা আপনিই উৎপন্ন হইবে এবং সেই বিদ্যা দ্বারা অবিস্মা বিদূরিত হইবে । তখন অবিস্মাধ্যস্ত এই নাম-রূপ-প্রপঞ্চ স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুব ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে । বে: ভা: ৩।২।২১ ।

জ্ঞানোদয় হইলে কেবল যে এই জগৎই বিলীন হইয়া যায় তাহা নহে, যিনি জগদাত্মা (অর্থাৎ সপ্তম ব্রহ্ম) তিনি পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যান । বৃহঃ উপঃ ভাষ্যে লিখিত আছে যে যেমন ব্রহ্মতে সর্প, উবর-ভূমিতে উদক, শুষ্কিতে রক্ত এবং গগনে মলিনত্বাদি আরোপ করা হয়, তেমনি ভ্রম বশতঃ নিকপাধি ব্রহ্মেও উপাধি আরোপ করা হয় । আবার যেমন জ্ঞানজ্বলে ব্রহ্মতে সর্প বিলীন হইয়া যায়, উবরে উদক, শুষ্কিতে রক্ত এবং গগনে মলিনত্বাদিও বিলীন হইয়া থাকে তেমনি জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মে উপাধিভূত সপ্তম ব্রহ্মও নিস্তম্ভ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান । যাক্ষবক্ষ্য জনক রাজাকে এই উপদেশই দিয়াছিলেন । বৃহঃ ভা: ৪।৩।১ ।

ব্রহ্মতে সর্পকে বিলীন করিবার অর্থ কি ? জ্ঞানোদয়ও হইবে অথচ ব্রহ্ম সর্পও বর্তমান থাকিবে ইহা কি কখন সম্ভব হয় ? জগৎ ও সপ্তম ব্রহ্মকে বিলীন করিবার অর্থও ঠিক ইহাই । সর্প যেমন অস্তিত্ববিহীন হইয়া যায়, জ্ঞানোদয় হইলে সপ্তম ব্রহ্মও তেমনি বিনাশ প্রাপ্ত হন; ইহার অস্তিত্ব আর থাকে না । আসল কথা এই, সর্পাদি যেমন প্রথম হইতে অস্তিত্ববিহীন, সপ্তম ব্রহ্মাদিও তেমনি প্রথম হইতেই অবিস্মা ।

৭। উপনিষদের অনুবাদ ।

গ্রন্থকার অবতরণিকাতে লিখিয়াছেন যে শঙ্করভাষ্যের সম্পূর্ণ অনুবাদের সহিত এই উপনিষদ দুইখানি (কঠ ও মুণ্ডক) এই গ্রন্থে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । উপনিষদ দুইখানির কোন অংশ বা ভাষ্যেরও কোন স্থল পরিত্যক্ত হয় নাই ।” পৃ: ৩ ।

আমরা গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিয়া দেখিলাম গ্রন্থকার এ প্রতিজ্ঞা বক্ষা কবিত্তে পাবেন নাই । শঙ্করাচার্য্য যে সমুদয় স্থলে জগদাত্মিক অস্তিত্ববিহীন বলিয়াছেন বিদ্যাবত্ত মহাশয় তাহার অধিকাংশ স্থলে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট স্থল একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন । ইহার দুই একটি অংশ নিম্নে অনূদিত হইল :—

“দেবদত্তের যদি পুত্র উৎপন্ন না হয় তবে বলা হয় দেবদত্ত অপুত্রক । ঠিক এই মর্মেই বলা হইয়াছে যে পুরুষে প্রাণাদি অববর্তমান । (তবে কেন বলা হইল সেই পুরুষ হইতে প্রাণাদি উৎপন্ন হয় ?—ইহার উত্তর এই—) নাম ও রূপ বীজরূপ, এই বীজরূপ উপাধি বশতঃই পুরুষ হইতে প্রাণাদি উৎপন্ন হয় । এই প্রাণ অবিস্মামূলক বিকার, ইহা নাম মাত্র এবং অনূতাত্মক । অপুত্রক ব্যক্তি স্বপ্নে পুত্র দর্শন করিয়া যেমন পুত্রবান হয় না, তেমনি অবিস্মামূলক অনুতাত্মক প্রাণ আছে বলিয়া পুরুষকে প্রাণবান বলা যায় না ।” মুণ্ডক ভাষ্য ২।১।৩ ।

বিদ্যাবত্ত মহাশয় এই প্রাণকে হিবণ্যপর্ড বলিয়াছেন । সুতরাং দেশা যাইতেছে স্বপ্নরূপ পুত্র যে অর্থে অস্তিত্ববান হিবণ্যপর্ডাদি সপ্তম

ব্রহ্মও ঠিক সেই অর্থে অস্তিত্ববান । গ্রন্থকার পূর্বোক্ত অংশেব এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়াছেন (পৃ: ৩১৬—৩১৭) । স্বপ্নরূপ পুত্রের সঙ্গে যে প্রাণাদির তুলনা দেওয়া হইয়াছে তাহা কোকিলের বাবু একবার উল্লেখও করেন নাই । স্থানান্তাবে গ্রন্থকারেব অনুবাদ উদ্ধৃত করা সম্ভব হইল না ।

নিম্নে আরও একটি স্থল অনূদিত হইল :—

“শূন্যস্থিত গন্ধর্ব্বনগরীর স্থায়, মবীচিহ্নিত জল ও মায়ার স্থায় এই সমুদয় জগৎ সেই পরমার্থ সত্য—সেই ব্রহ্ম—উৎপত্তি স্থিতি ও লয়কালে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে; পরমার্থ দর্শন না হইলেই এই সমুদয় জগতের অস্তিত্ব প্রতীক্ষমান হয়” কঠ: ভা: ৬।১ ।

গ্রন্থকার এ অংশ একবারেই অনুবাদ করেন নাই । কেন করেন নাই, তাহা বুঝাও কঠিন নহে ।

৮। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ।

বিদ্যাবত্ত মহাশয় ষাটক শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ করেন প্রকৃতপক্ষে তাহা গ্রন্থকারের নিজেরই মতামত । নিজের মতই গ্রন্থকার শঙ্করের নামে চালাইতে চেষ্টা কবিত্তেছেন । ইনি একজন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী । শঙ্করের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুমাত্রী করিয়া ব্যাখ্যা কবিলে যাঁহা হয় এ গ্রন্থও তাহাই হইয়াছে । গ্রন্থ হইতে ‘শঙ্কর’ কথাটি তুলিয়া দিয়া সেই সেই স্থলে ‘রামানুজ’ কথাটি বসাইয়া দিলেই সত্যের মর্যাদা কথঞ্চিৎ বক্ষা হইত ।

অবতরণিকা খানা পড়িবার মনে হয় ব্যক্তিশেষের মতামত ধওন কবিবার জন্তই ইহার অবতারণা করা হইয়াছে । এই ভাব দ্বারা তিনি এতই প্ররোচিত হইয়াছেন যে গ্রন্থ অনুবাদ করিবার সময়েও কথটি তুলিয়া যাইতে পারেন নাই । ইহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অনেক নষ্ট হইয়াছে ।

সমালোচনা অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িল । এই স্থানেই বিদ্যাবত্ত লওয়া যাউক ।

মহেশচন্দ্র বোষ ।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ।

নাট্য রচনা—(১) ভূমিকা ।

অভিনয়ের কাব্য বা দৃশ্যকাব্যের প্রাচীন সাধাবণ নাম ছিল রূপক । রূপক কথার সার্থকতার- ব্যাখ্যায় পাঠ,— কপাবোপাৎ-তু রূপকম্ । “নটে বামাদিস্বরূপারোপ,” নাটকে আছে ; কিন্তু রূপ আরোপ করার প্রধান অর্থ এই, যে যাহা কেবল গুণমাত্রে অনূভূত, তাহার রূপ আরোপ করার বিশেষত্বেই দৃশ্যকাব্যের নাম রূপক । শ্রব্যকাব্যে যাহা নানা কথায় এবং নানা বর্ণনায় বুঝাইতে পাওয়া যায়, দৃশ্যকাব্যে তাহা কেবল নায়ক বা নায়িকা-নিষ্ঠ বর্ণনা বা কথায় ফুটাইয়া তুলিতে হয় । অত্যাশ্চর্য্য কৌশল এবং প্রয়োগ বিজ্ঞানেব কথার মধ্যে এই চবিত্ত-চিত্তই নাট্য-রচনার প্রধান কথা ।

এই ক্ষমতা দ্বিজেন্দ্রলালের যে কত অধিক, তাহা তাঁহাব কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতার নৃষ্ঠান্তে দেখাইতেছি। “আবাড়ে”র ‘কেরানী’ কবিতাটি পাঠকেরা প্রায়শঃ পরিহাস-কবিতা বলিয়া মনে করেন। ইহাতে কবিও দোষ আছে; তিনি এমন কবিতার গানে ‘আবাড়ে’ ছাপ দিয়াছেন। এই অতি ক্ষুদ্র কবিতাটিতে একালকাব বঙ্গদেশের চাকুরে পরিবারেব চিত্র অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। বাবুর অল্পপস্থিতিতে চাকর এক পা কাদা লইয়া ফবাসে শুইয়া ঘুমাইতেছে,—এবং পরিশ্রান্ত বাবু কাচারি ফেরৎ ঘরে আসিয়া দেখিলেন—

ধুতি গেছে উড়ে,

দিয়েছে কে ছুঁড়ে

একপাট চট বিছানায়, আর একপাট আঁস্তাকুড়ে।

বিশু গেছে বাজারেতে, ঘুমোয় রামা কুঁড়ে;

বামুন দিয়েছে ষির সঙ্গে মহা তর্ক জুড়ে।

তাহার পর আবার বসিবার স্থানেব দুর্দশা!

করাসেব সতরঞ্চ একট কোমর মাটি।

পুত্রবয় গিয়ে

হুকো গাছটি নিয়ে

ঘুনসি পোরে তাকিয়েতে কচেন বসে নৃত্য;

ঘুমোছেন তাঁর পার্শ্বে প্রিয় শ্রীরামকান্ত ভূতা।

এবং যখন বাবু মেজাজ খারাপ হইয়া গেল, এবং ববে চাঁ, ভাঁ শব্দ উঠিল, তখন প্রণয়িনীও বাদ গেলেন না; কেন না, “সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা।” তুলির একটা টানে এত বড় একটা ছবি উজ্জ্বল কবিতা তোলা সহজ ক্ষমতার কথা নয়।

“আলেখ্যে”র ষষ্ঠ চিত্রটির দিকে চাহিতে গেলেই চোখে জল গড়ায়; অমন করুণরসাত্মক কবিতা সকল দেশের ভাষায়ই দুর্লভ। কবির করুণ রসের কবিতা আরো অনেক আছে, কিন্তু এ চিত্রে সমগ্র অসহায় মাতৃহাবা জগতের যে ছবিটি পাই তাহা দক্ষ নাটককাবেব তুলিকায়ই সম্ভব। আলেখ্য গ্রন্থেব অধিকাংশ চিত্রেই এই বিশেষত্ব। ক্ষুদ্র চিত্রে যিনি বিশ্বব্যাপী ভাব ফুটাইতে পারেন, নাট্য-রচনায় তাঁহাব চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশেব পবিচয় লইতেছি।

নাট্যরচনা—(২) কবির পূর্ববর্তী সময়।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যাব যাহাই থাকুক, নাটক ছিল না। পাল বাজাদেব সময়ে, যে বেগীসংহার নাটক রচিত হয়, তাহা ত সংস্কৃত; ঐ নাটকের উপর বাঙ্গালীর কোন

দাবি চলে কিনা, তাহা স্থিৰ করিতে পারি নাই। ঐ সময় হইতে নিমাই ঠাকুরের চৈতন্যলীলাব সময় পর্যন্ত সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত নাটক পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সংস্কৃত অনর্থবাক্যব বাঙ্গালী পণ্ডিতের বচনা।

মধুসূদনের অভ্যুদয়কালে যখন ইংরেজশিক্ষিতদের প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের নবজীবন সঞ্চারের আরম্ভ, তখন মহাবাজা ষতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির উদ্বোধনে নাটক অভিনয়েব সূত্রপাত হয়। যোগীন্দ্রনাথ বসু ‘মহাশয়ের সমালোচনায় ইহাব বিশেষ বিবরণ আছে। কবি তাঁহার পদ্মাবতী এবং শর্মিষ্ঠা নাটকে প্রাচীন নাটকের ধবণ অনেকটা বজায় রাখিয়াছিলেন, এবং চবিত্র চিত্রেও তাদৃশ মনোযোগী হইয়াছিলেন বোধ হয় না। লৌকিক কথাব নাটক কৃষ্ণকুমারীতে ও মেঘনাদবধ এবং ব্রজাঙ্গনা বচয়িতার প্রতিভাব পরিচয় নাই।

মধুসূদনের “একেই কি বলে সভ্যতা” নামক সংকীর্ণ প্রহসনে নূতন ইংরেজ শিক্ষার প্রভাবের সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার একটা দিক বেশ পরিস্ফুট। একদিকে সেই সময়কার প্রাচীন সমাজেব অর্থোক্তিক এবং অহিতকর বন্ধন, অন্যদিকে নব্যসম্প্রদায়েব বিলাসী ছাঁচেব বিলাস-প্রিয়তা; এই দুইটি জিনিষই প্রহসনের সামগ্রী বটে। কবির “বুড়াশালিকের ঘাড়ে রোঁ” এই সামাজিক নস্কাত সুন্দর ‘ভাণ’। অলঙ্কারের লক্ষণে ওধানি প্রহসন নহে, ভাণ; সেই জন্ত ‘ভাণ’ নামই দিলাম।

উক্তবিধ সামাজিক অবস্থা যে সকল কবিবই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাহা নিশ্চিত। পণ্ডিত বামনাবায়ণ তর্কালঙ্কারও তাঁহাব কুলীনকুলসর্বস্ব এবং নব নাটক নামক প্রকরণ কাব্যে (১) বহুবিবাহাদি কুপ্রথার কথাই লিখিয়াছেন। সে সময়ে সামাজিক কথা ছাড়িয়া কেবল নাট্যকলাব বিকাশেব জন্ত নাটক বড় লিখিত হয় নাই; যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও তেমন ভাল হয় নাই।

যে সময়ে মেঘনাদবধ প্রভৃতি কাব্যে মধুসূদনের

(১) নাটক হইল দৃশ্যকাব্য বা কণকের সাধারণ নাম; কিন্তু যাহাকে Historical Drama বলে নাটক তাহাই। নাটকের লক্ষণবৃত্ত কাব্য কবিকল্পিত ঘটনায় রচিত হইলে তাহাকে প্রকরণ বলে। পূর্বে চরিত যে ক্ষুদ্র নাটকে প্রধানতঃ বর্ণিত, তাহার নাম ভাণ।

স্বখ্যাতি দেশব্যাপী হইতেছিল, সেই সময়ে আর একজন প্রতিভাসম্পন্ন লেখক দৃশ্যকাব্য রচনায় যশস্বী হইতেছিলেন; ইনি খ্যাতনামা দীনবন্ধু মিত্র। তিনি কোন প্রকারে একখানি দৃশ্যকাব্য রচনার জন্য “শর্মিষ্ঠা” কিম্বা “রামাভিষেক” রচনা করেন নাই! কবি দীনবন্ধু, প্রয়োগ-বিজ্ঞানপটু, মানবচরিত্রদর্শী এবং ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রাচীনতার অথবা নিয়মেব বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া, হাস্য, করুণ এবং রোদ্দরসেব অবতারণা করিয়া তিনি যে সকল দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন, দৃশ্যকাব্যে বঙ্গের স্থায়ী সাহিত্যে তাহাই প্রথম।

ত্রিবিজ্ঞাপ্তির এবং হিমাবণ্যের আর্ঘ্যেতর জাতিব যে সকল জঘন্ততা তাত্ত্বিক ধর্ম্মেব নামে সম্মান লাভ করিয়া পরাধীনতাপীড়িত আর্য্যসমাজকে মলিন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে নারীজাতির মাহাত্ম্যের কথা সাহিত্যে গীত হওয়া অসম্ভব হইয়াছিল। কেবল লালসা এবং উপভোগের উপযোগী করিয়াই নায়িকার বর্ণনা হইত। যেখানে সতী নারীর বর্ণনা ছিল, সেখানেও কেবল অবরুদ্ধার অভাব-পক্ষের একটা গুণের (negative virtue) কথাই ছিল। যে সতী স্ব স্ব স্বাভাব্যে পরিস্ফুট, যে মাহাত্ম্য স্বাধীনতায় পবিপুষ্ট, যে মাধুর্য্য পারিবারিক ঘটনাচক্রে পরীক্ষিত, তাহাব বর্ণনা দীনবন্ধুব হস্তেই প্রথম। কবির গ্রন্থসমালোচনা এখানে অসম্ভব; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ববর্তী যে গ্রন্থকার যথার্থ দৃশ্যকাব্যের রচয়িতা এ সমালোচনায় তাঁহার উল্লেখ উপযোগী বলিয়া এই অল্প কয়েকটি কথা লিখিলাম।

কবি দীনবন্ধুর স্বর্গারোহণের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত সুপাঠ্য স্থায়ী দৃশ্যকাব্য রচিত হয় নাই। বাকস্থানের অমব কাহিনী আখ্যানবস্ত্ত করিয়া সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্নোজিনী নাটক লিখিয়াছিলেন। উহাতে ইকিজিনিয়ার ফবাসীকবিবিরূত একটা ঘটনার ছায়া আছে। থাকুক; কিন্তু ঐ প্রকার অমুকরণে সাহিত্যের বিকাশ ভিন্ন হয় না; উহার কোন বর্ণনাতেই বিদেশীয় ভাবের কিঞ্চিৎমাত্র গন্ধও নাই। একালে প্রায় এমন লেখক নাই, যিনি ইউরোপীয় ভাব সংকলনে পরাধীন। এই নাটক খানি সম্ভবতঃ এখন আর পাওয়া যায় না; আমি যখন বালাকালে পড়িয়াছিলাম, তখন খুব মুগ্ধ হইয়া-

ছিলাম মনে আছে। জ্যোতিবিন্দবাবু প্রায় সকলগুলি নামজাদা সংস্কৃত নাটকেবই অনুবাদ কবিয়াছেন; কিন্তু সন্নোজিনী রচনার পর দৃশ্যকাব্যের মৌলিক রচনায় অধিক মনোনিবেশ করেন নাই, (২) কবিলে ভাল হইত।

রঙ্গালয় গুলিব পুষ্টিব জন্য অনেক নাটক, প্রহসন, হল্লীশ, ভাণ প্রভৃতি রচিত হইয়াছে; সেগুলি সংগ্রহ কবিলে হয় ত একটা বড় পুস্তকাগার ভরিয়া যায়। কিন্তু তাহার মধ্যে নাম কবিবার মত গ্রন্থ বড় খুঁজিয়া পাই নাই। কোন কোন লেখকের ব্যঙ্গরস রচনার ক্ষমতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু যে সকল সামাজিক নক্সায় ঐ রঙ্গ-লীলা, সেগুলি সাহিত্যের হিসাবে নাম করিবার মত নয়। একে ত অতিরঞ্জিত চিত্র বা অভ্যুত্থিতে সামাজিক ছবির যথার্থতা থাকে না, দ্বিতীয়তঃ উহা অনেক স্থলে স্মৃশিকার বিরোধী।

কবির প্রথম রচিত নাটক।

(১)—কঙ্কি-অবতার। হস্তরসেব অবতারণায়, এখন দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ কেহ নাই। তাঁহার প্রথম রচিত নাটক (প্রহসন) ‘কঙ্কি অবতার’ আগাগোড়া হাস্যবসে ভবা। প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রেব প্রহসনের প্রধান লক্ষণ-গুলি লইয়া বিচার কব, হস্তরসেব অভিনবত্ব লইয়া সমালোচনা কর, কিম্বা সমষ্টিভাবে পণ্ডিত, গোঁড়া, বিলাতফেরৎ ও নব্যহিন্দুদের চিত্রের যথার্থতার অনুশীলন কর, যেরূপভাবে বা যেদিক দিয়াই দেখ, এই প্রহসন ধর্ম্মনিকে প্রশংসা করিতে হইবে। কেন যে বঙ্গের রঙ্গালয়ে উহা অভিনীত হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারি; কিন্তু যদি একবার উহার অভিনয় হইত, তবে নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর দর্শকদলে উহার আদর বাড়িত।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে কপট ও ভণ্ড গোঁড়াদের কথা বাহাই হউক, পণ্ডিত সমাজকে লইয়া ঠাট্টা তামাসা করা ভাল হয় নাই। কথাটা স্বীকার করি না। পণ্ডিত সমাজেব এখন যে অবস্থা, স্বতন্ত্রভাবে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। পরিহাসের ফলেই কেবল তাঁহারা

(২) এই সমালোচনায় কবি রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থেবই নাম উল্লেখ বা সমালোচনা করিব না; তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিব।

আপনার দোষ দেখিয়া লজ্জিত হইবেন, অস্ত্র উপায়ে নহে ; কারণ তাঁহারা লোক-শিক্ষক বলিয়া অভিমান কবিতা দূৰে বসিয়া আছেন, এবং কাহারো সহুপদেশ শুনিলে তাঁহাদের মান-হানি হয় ।

তাহা ছাড়া কবি চক্ষে এ দৃশ্য একটা বিপুল প্রহসন, যে কতকগুলি বুদ্ধিমান মানুষ, গম্ভীরভাবে বিচার করিতে বসিয়া গিয়াছেন, যে ভাবতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা পাব হইয়া গেলে মানুষের জাতি-ধর্ম থাকে কি না ! কবি যদি ঐক্য হান্ডকব গবেষণার যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ উপস্থিত কবিতেন, তবে সেটাও একটা প্রহসনে দাঁড়াইত । যে কথার অসাব্যতা বালকেরও বুঝা উচিত, তাহা লইয়া যদি কেহ একটা বৈজ্ঞানিক (বিজ্ঞান কি তাহা একেবারে না জানিয়া) শক্তির ভেলকি গড়িয়া তোলে, কিম্বা তাহার গায়ে একটা আধ্যাত্মিকতার ছাপ মারিয়া দেয়, তবে হাসি ছাড়া গতি নাই । • মুর্গী না খাইতে চাও খাইও না ; কিন্তু উহা খোলটুকু লইয়া আকর্ষণী বিকর্ষণী শক্তির টানা-হেঁচড়া কব কেন ?

গোঁড়া দলের কথা, অতি সহজ । ইংবেজের আমলে আমাদের যখন দেশবন্ধাব দায়িত্ব নাই, তখন সকল উৎসাহ পশুশ্রম বলিয়া ঘরে বসিয়া বিজ্ঞতা দেখান অতি সহজ । উদরপূর্তির সময়ে, ও সালসাবিক্রির সময়ে, “কৈবর্ত” পুৰাণের দোহাই দিয়া ইহঁরা ধর্ম ও সালসা একত্রে বিলি করেন । ইহা দেখিয়া যদি শিক্ষিত নব্যহিন্দু এবং বিলাতফেষতেরা চটিয়া যায়, তবে দোষ কার ? এই সামাজিক অবস্থার নকসাদানি পণ্ডিত এবং গোঁড়াসমাজে যাহাতে পণ্ডিত হয় তাহা চেষ্টা করা উচিত ।

এ ত গেল গ্রন্থের স্মৃশিকার দিক্ ; এই স্মৃশিকার বিষয়ে (শেষ দৃষ্টে কথায়) পূর্বেও কিছু বলিয়াছি । নাট্য-কৌশলে শেষ চিত্রটি অতি চমৎকার হইয়াছে । কিন্তু আব একটু সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত । সমাজের বিভিন্ন দলের চিত্র, সমষ্টিভাবেই হইয়াছে ; এবং উহা সমষ্টিভাবেই সুন্দর । কেবল বিভ্রান্তিবিধি কবির একটি পৃথক মনোহর চিত্র । পণ্ডিত, গোঁড়া এবং নব্য-সাগব হেঁচিয়া কবি এই অপূর্ণ নিধিটি তুলিয়াছেন ।

(২) বিরহ । কবির নাট্যরচনার দ্বিতীয় গ্রন্থ বিরহ ।

এখানি অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে প্রস্থান-শ্রেণীর উপরূপক বা ক্ষুদ্র নাটক । (১) দুটি অঙ্কের বঁধা নিয়ম প্রধান লক্ষণের মধ্যে ধরা বাইতে পারে না । ইহাতে গীত-বাঙ-বিলাস যথেষ্ট আছে, এবং যাহাকে কৌশিকী বৃত্তি বলে তাহাই ইহাতে অধিক । কৌশিকীর লক্ষণ এই :—

বা লক্ষ নেপথ্য বিশেষ চিত্রা
দ্বী সঙ্কল্য পুঙ্কল নৃত্য গীতা,
কামোপ ভোগ প্রভবোপচার
সা কৌশিকী চার বিলাস যুজা ।

রামকান্ত এবং গোলাপীকে যখন বিবাহের প্রধান নায়ক-নায়িকার মধ্যে গণনা করিতে পারি, তখন এই ক্ষুদ্র নাটকখানিকে ‘প্রস্থান’ সংজ্ঞা দেওয়াই সম্ভব ।

চিত্রাঙ্কনে, স্মৃশিকায় এবং নাট্যকৌশলে, কল্পি অবতার বিরহের অনেক উপরে । বিরহে চরিত্রচিত্র অপেক্ষা তামাসার সমাবেশ অধিক । পড়িলে যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করা যায় ; কিন্তু নাটকত্বের কোন বিশেষ গুণে মুগ্ধ হইবার বড় কিছু নাই । গোবিন্দ এবং নির্মলব প্রেম ও বিরহ অত্যধিক মাত্রায় প্রহসন-ঘেঁষা, কাজেই উহাতে খানিকটা মজা ভিন্ন আর কিছুই নাই । নাটকের হিসাবে যতটুকু যা কিছু আছে, তাহা গোলাপী এবং রামকান্তেই পাওয়া যায় ।

কলিকাতার রঙ্গালয়ের ইতিহাসে বিরহের অভিনয় একটা বিশেষ কথা । পূর্বে অনেক স্ত্রীলতাবিরোধী উচ্ছৃঙ্খল ধবণের আমোদ উপভোগেব উপলক্ষ্যে যে সকল হল্লীশ (farce) এবং নাট্যবাসক (Opera) অভিনীত হইত, বিরহের আবির্ভাবে সেগুলি বহুপরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে । প্রতিভাশালী কবি যদি হল্লীশ এবং নাট্যবাসক রচনা কবেন, তবে বঙ্গদেশের দর্শকেরা হাসি তামাসায় বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে শিখিব ।

(৩) ত্র্যাহম্পর্শ হল্লীশ শ্রেণীর কাব্য বটে ; কিন্তু কবির এখনকার পাকাহাতে একবার উহাকে মাজিয়া বসিয়া

(১) প্রস্থানের লক্ষণ এই :—

প্রস্থানে নায়কো দাসো হীনঃস্বাহুপনায়কঃ
দাসী চ নায়িকা, বৃত্তিঃ কৌশিকী ভারতী তথা ।
• স্বরাপানসমাবোগাচ্ছিন্ধিষ্ঠার্থস্ত সংহতিঃ
অক্ষৌ ঘো, লয়তালাদিবিলাসো বহুস্তথা ।

তুলিলে ভাল হয়। এ গ্রন্থেব হাসিব গানগুলি গ্রন্থ সৃষ্টিব অনেক পূর্বে রচিত। তাহাতেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিক ডাল পালার মত বসে নাই। পড়িলে বরং মনে হয়, যে ভাল ভাল গোটী কতক হাসির গান যেন একসঙ্গে গাঁথিয়া দিবার জন্তই একটা চলনসই গল্পের সূতাপাকানো হইয়াছে। হল্পীশে গল্পের ভাগের সামঞ্জস্য অপেক্ষা, নাচ গান ও তামাসাই অধিক থাকে; ইহাতেও তাহাই আছে।

(৪) প্রায়শ্চিত্তখানিও খুব ‘বহুৎ আচ্ছা’ হইয়াছে মনে হইল না। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মে এখানি দুর্শ্লীকা। বিটক্রীড়াময়, কৌশিকীবৃত্তিবৃত্ত দুর্শ্লীকা, একালেব সমাজচিত্রের পক্ষে খুব উপযোগী। কয়েকটি চিত্র ফুটিয়াছে বেশ; কিন্তু কবি ইচ্ছাপূর্বক যেন ত্রাহস্পর্শের মত এখানিও পূর্বরচিত কতকগুলি গান জুড়িয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের সমাজ এখন মৃত্যব সমাজ। দায়িত্বহীনতা, কর্মশূন্যতা, এবং কর্মের নামে কেবল নিজের জীবন ধারণের চেষ্টায় ক্ষুদ্রতা এবং স্বার্থপরতা; এবং এই সকলের সমবেত ফলে দাঁড়াইয়াছে—একটা জড়তা। এ অবস্থায়, যাহারা জীবন্ত, কর্মঠ এবং নিত্য উন্নতিশীল, তাহাদের সাহিত্য এবং সমাজের সহিত আমাদের পরিচয় হইলে প্রভূত উপকার হয়। ইউরোপ ভ্রমণে এই পরিচয় বেশি হয় বলিয়া এ কালে ইউরোপ ভ্রমণ আমাদের পক্ষে হিতকর। কিন্তু কেহ কেহ, ইউরোপ ভ্রমণের ফলে, নানা কাবণে তাঁহাদের পরিবর্তা ও সংযম হারািয়া কেলিয়াছেন। যে বয়সে সাজান কাঠের পুতুল দেখিয়াও ভ্রাস্তি জন্মে, সে বয়সে যদি বিদেশ প্রবাসেব সময়ে স্বকের গোবতা মাজেই নীচ শ্রেণীর রমণী দেখিয়া মতি ভ্রাস্তি জন্মে, তবে আশ্চর্য্যের কথা নয়। ভাবিলেও কষ্ট হয় যে শিক্ষাব অভাবে এদেশের রমণীরা যে অবস্থায় আছেন, তাহা নূতন শিক্ষিতদিগের কাছে “জড় ভরত” বলিয়া মনে হয়। তাই অনেক স্থলেই নাকি অনেক “রেবেকার” আমদানি হইতেছে। সকল চপলমতি বালক বুদ্ধিন্ধন হইল না কেন, না ভাবিয়া, আমবাই কেন গৃহসংস্কার কবিতেছি না? এই সংসাবটাকে সকলের বাসের উপযোগী করিয়া তোলাই ত বাহাদুরি; নহিলে “এক ঘরে” কবিত্তে বসিলে নিজেরই ক্ষীণতা জন্মে। কবি বিদেশ-

প্রবাসের মন্দ দিকটা দেখিতেও ভুলেন নাই। চপলের চাঞ্চল্য যথেষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ের পরিহাস তাঁহাব ছ’ তিনটি গানে যাহা ফুটিয়াছে, সমগ্র প্রায়শ্চিত্তে তাহা ফুটে নাই।

সমষ্টি ভাবের চিত্রের বিচারেও যাহা কবিত্ত-অবতাবে বিকশিত, এ গ্রন্থের চিত্রে তাহাব উপব অধিক কিছুই নাই। বেবেকা যখন স্বামীব সঙ্গে ধূয়া ধরিয়া গান গায়, তখন সবটা একেবারে হল্পীশে (farce) দাঁড়ায়; উদ্ভিষ্ট শিক্ষার পথে বাধা জন্মে। নাট্যরচনার হিসাবে যাহাই হউক, কিন্তু এই শেষোক্ত গ্রন্থ দুখানি পড়িলে বুঝিতে পাওয়া যায়, যে সামাজিক সকল অবস্থার সহিত কবির যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে; এবং সকল প্রকার লোকচরিত্রই কবি সমস্তে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এই বহু বিস্তৃত অভিজ্ঞতার ফল, তাঁহার পরবর্তী নাটক গুলিতে দেখিব।

(৫) পাষাণী। এই নাটক খানি প্রায়শ্চিত্তের পূর্বে লিখিত; কিন্তু এই দৃষ্টকাব্যেই কবি একখানি যথার্থ নাটক রচনা করিবার প্রয়াস, সর্বপ্রথমে করিয়াছেন।

পাষাণীর আখ্যানবস্তু অহল্যার বিবরণ, একটি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক কথা। এ দেশেব প্রায় সকল পৌরাণিক কথারই নানা সংস্করণ পাওয়া যায়; কবি রামায়ণে বর্ণিত পুরাণ অনুসরণ করিয়া অহল্যাকে ‘স্বৈচ্ছায় পাপিনী’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ‘মস্ত্রের’ ভূমিকা পড়িয়া বুঝিলাম, যে এইপ্রকার বর্ণনায় হিন্দুধর্মের কোন কোন প্রহরী চটিয়া গিয়াছিলেন। কবির আক্ষেপ, তাহারা রামায়ণ পড়েন নাই; আমার আক্ষেপ যে অহল্যাকে প্রাচীনেরা পাষাণী করিয়াছিলেন কেন, তাহার সার্থকতা উহারা বুঝেন নাই। এ শ্রেণীর লোকের পক্ষে নাটক পড়া বিড়ম্বনা।

জ্ঞানকৃত পাপভিন্ন নারী পাষাণী হয় না; এবং পাষাণীর দেবীত্ব লাভেব ইতিহাসই মানবচবিত্রে পুণ্য অর্জনের যথার্থ ইতিহাস। ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র প্রসাদে কত পাষাণী যে দেবী হইয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন, ভারতনারীর মাহাত্ম্যেব জরামরণাতীত সাক্ষী ‘থেরী-গাথায়’ তাহা পাই। যাহা পাপ, উহাই যে স্বর্গেব সিঁড়ি, এ তত্ত্ব সকলেব পক্ষে বুঝিয়া উঠা একটু শক্ত; কারণ ধর্মটা অনেকেব কাছেই বাহু অমুঠান মাত্র। এই কাব্য খানিতে কবি, রূপ আরোপ

করিয়া, সাধু অগস্তিন্ অথবা লংফেলোর কথাই যেন প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝাইয়াছেনঃ—

Saint Augustine ' well hast thou said
That of our vices we can frame
A ladder, if we will but tread
Beneath our feet each deed of shame.

তথাগত বুদ্ধ যজ্ঞেব—ক্রিয়াকলাপ-ভ্রান্তদিগকে সর্বপ্রথমে বুঝাইয়াছিলেন, যে যথার্থ মনুষ্যত্বের নামই ব্রাহ্মণত্ব। পরে অনেক পুৰাণে অনেক স্থতিতে উহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। কবি এই মনুষ্যত্ব বা ব্রাহ্মণত্বের যে আদর্শ রচনা করিয়াছেন, ইংলণ্ডেব হালেব কবি টেনিসনের আর্থাৎ তাহা নাই। মাংসপিণ্ডেব ধ্বংসের পূর্বে মাংস-বর্জিত পাণ্ডা যার না বলিয়া গুইনিভিয়র পবিত্রত্ব। আমাদের যদি ভগবানের দিকে চাহিয়া, একথা বলিবাব অধিকার থাকে,—“আর একবার ভালবাস”, তবে মানুষেব দিকে চাহিয়া মানুষ তাহা বলিতে পারিবে না কেন? এ অধিকার গুইনিভিয়রের থাকিবে না কেন, পাবাগীর থাকিবে না কেন? যে তাহাব তীব্র যন্ত্রণায় বুঝিয়াছে, যে “পাবাগী হইয়া গেছি অন্তরে অন্তরে,” সে যে দেবী, তাহা গৌতমেব মত ব্রাহ্মণেই বুঝিতে পারেন। গৌতমেব মাহাত্ম্য, এবং পাবাগীর দেবীত্ব, শূদ্রতা পরিহার না করিলে হৃদয়ঙ্গম কবা যায় না।

সংসারে সাধুতা আছে, ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানই পাপীর পুণ্যলাভের প্রথম সোপান। অমৃতপ্তা পাবাগী রাম নামে একেবারে মুক্তি লাভ না করিয়া সাধুতাব প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে নবজীবন লাভ কবিত্তে আরম্ভ করিল। এ স্থানে কবি ধর্মতত্ত্ববিদেব সূক্ষ্ম অনুভূতি ফুটাইয়া তুলিয়া পুরাণের উপর নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। পাবাগীর যথার্থ মুক্তি গৌতমেব আহ্বানে। প্রিয়তমের আহ্বানেব অনুভূতি ভিন্ন যে পাপীব মুক্তি নাই, এ কথা ধর্মসাধকের গ্রন্থে পড়িয়াছি বটে; কিন্তু কবির চিত্রে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। কবি, গৌতমচরিত্রে যে দেবত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহারই ফলে যে পাপীব মুক্তি, কেবল রাম নামে নহে, এ কথা শেষ দৃষ্টে জনকেব কথায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কবির এই নূতনত্ব, মনস্তত্ত্বের বিচারে সঙ্গত। পাপী যখন প্রিয়তমস্পর্শে নবজীবন লাভ কবে, তখন যে সে নবজাতক অসহায় শিশুর মত, অন্ধের মত, নবপ্রসারিত করুণা অবলম্বন

করিয়া থাকিতে চাহে, অহল্যার শেষ কথায় তাহাই পাইঃ—

নাথ, তব পুণ্যতত্ত্বে আজি অন্ধ আমি,
কোথা তুমি? কতদূর? সঙ্গে করে লও।

জটিল মনস্তত্ত্বেব এমন সুন্দর ব্যাখ্যা, সহসা দেখা যায় না। গেটের ফষ্ট বড় উচ্চ দরের জিনিস, সমগ্র ইউরোপেব কাব্য-ভাণ্ডারে এমন গ্রন্থ আর আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বঙ্গভাষায় গেটের মত মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা কবিয়া এমন নাটক রচিত হইতে দেখিলে বাঙ্গালী সমালোচক যদি আনন্দে অধীর হইয়া উহা গেটের অমূল্য নম্র বলিয়া বোষণা কবেন, তবে আমি সেই অত্যাশ্চর্য্য দোষজনক মনে করি না। কাব্যশিল্পে ‘পাবাগী’ বঙ্গভাষায় অতি নূতন সামগ্রী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিদেশে বাঙ্গালী ছাত্র।

শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বোষ আড়াই বৎসর পূর্বে শিল্পবিজ্ঞান-সমিতি কর্তৃক আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় প্রাট্ট টেকনোলজিক্যাল কলেজ নামক সুবিখ্যাত ব্যবহারিক রসায়নের (applied chemistry) কলেজে ভর্তি হন, এবং যথেষ্ট সহিত তথাকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজেব প্রশংসাপত্র পাইবামাত্রই তিনি কলগেট সোপ্ ওয়ার্ক্ নামক জগৎবিখ্যাত সাবানেব কাবখানায় কার্যে নিযুক্ত হন। সাবান সঞ্চকে তাঁহার মৌলিক গবেষণায় ঐ কাবখানাব ডাক্তার বজারস, পিএইচ. ডি., এরূপ প্রীত হন, যে তাঁহার সুপারিসে শ্রীমান্ অবনীমোহন শীঘ্রই আমেরিক রাসায়নিক সমিতির (American Chemical Society) সভ্য নির্বাচিত হন। ভাবতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি দেশে ফিরিলে ভারতে সাবান প্রস্তুতকরণ বিজ্ঞায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ থাকিবে না। তিনি জাপান হইয়া ভূপ্রদক্ষিণ-পূর্বক বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহার “Chemical Technology of Oils, Fats and Manufactured Products” নামক পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্বে সন্তোষের জমীদার বাবু প্রমথনাথ রায় চৌধুরী কৃষিবিজ্ঞা শিখিবার জন্ত শ্রীযুক্ত

যত্নাধ সবকারকে জাপানে পাঠান। তিনি সেখানে কৃষি কলেজে ভর্তি হন, এবং টোকিও ইম্পেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিষয়ক শেষ পরীক্ষায় এই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র ব্যতিবেকে তিনি নিজ অধ্যাপকগণের নিকট হইতেও তাঁহাব ক্ষমতা ও গুণের পরিচায়ক অনেক প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। “Elements of Practical and Scientific Agriculture” নামক কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বহি তিনি সম্প্রতি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জাপানের অধ্যাপক ও সংবাদপত্র সমূহ এই বহি প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। ইম্পেরিয়াল কৃষিকলেজেব অন্ততম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস্ হাট্টা পুস্তক সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে যদি পুস্তকে আবও কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আবও কয়েক পৃষ্ঠা লেখা থাকিত তাহা হইলে মিঃ সরকার জাপান সাম্রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হইতে কৃষিবিজ্ঞানচাৰ্য্য উপাধি পাইতে পাবিতেন। সম্প্রতি শ্রীমান্ যত্নাধ সবকার জাপান কৃষিসভা (Dai Nippon Nokai)র সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি দেশে কিবিয়া আসিয়াছেন।

কলিকাতার শিল্পবিজ্ঞান সমিতি প্রথমে যে একদল ছাত্রকে বিদেশে প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে শ্রীমান্ শান্তিপদ গুপ্ত একজন। শ্রীমান্ শান্তিপদ এক সময়ে এলাহাবাদে মিওব কলেজে পড়িতেন। তখন আমরা তাঁহাকে একজন অতি শাস্তিশিষ্ট ধর্ম্মানুরাগী যুবক বলিয়া জানিতাম। তিনি জাপানে গিয়া টোকিওর হাইয়ার পলিটেকনিক্ ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হন। তাঁহাব শিক্ষার বিষয় ছিল, মাটির বাসন নির্মাণ ও সীমেন্ট (বিলাতী মাটি) প্রস্তুত কৰণ। তিন বৎসরের শিক্ষিতব্য বিষয় শিখিয়া তিনি ভাবতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রথমে এই শিক্ষালয় হইতে শেষ প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি কলেজের অধ্যাপকদেরও অনেক গুলি উচ্চ প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। তিনি জাপানের কয়েকটি কারখানা ও পরীক্ষাকেন্দ্রে (Experimental Stations) অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পবে শিক্ষা সর্বাঙ্গসম্পন্ন কবিবাব জ্ঞান আমেরিকা বাইতে ইচ্ছা করেন। পূর্বোক্ত শিক্ষালয়ে ভর্তি হইবার পূর্বে তিনি পেন্সিল প্রস্তুত করিতে শিখেন।

জাপানে বসিয়া ভারতীয় কাষ্ঠ হইতে পেন্সিল তৈয়ার করিয়া তিনি কাণী শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠান ও তজ্জন্ত একটি প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র পান।

শ্রীযুক্ত জে, সি, দাস আমেরিকায় বাণিজ্য শিখিতে গিয়াছেন। সেখানকাব “উচ্চতর হিসাব-রক্ষা” (Higher accounting) বিষয়ে একটি প্রধান কলেজ হইতে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। তিনি পরীক্ষায় শতকরা ৯৯ নম্বর পাইয়াছেন। কলেজের অধ্যক্ষ প্রশংসাপত্রদান-সভায় বলেন যে কলেজ যত দিন চলিতেছে, তাহাব মধ্যে মিঃ দাসের পূর্বে কেহই একপ অধিক নম্বর পান নাই। কলেজের ৬০০ ছাত্রের উচ্চ কবতালি ও “ছব্রে” ধ্বনির মধ্যে তিনি প্রশংসাপত্র লাভ কবেন ও সকলের অনুরোধে ভাবতবর্ষে শিক্ষার ছববস্থা সম্বন্ধে কিছু বলেন।

স্বর্গগত শ্রীমান্ শশধর হালদাবকে আমরা তাঁহার বাল্যকাল হইতে জানিতাম। তিনি বড় ধর্ম্মপিপাসু ও সচরিত্র ছিলেন। তিনি বিলাতে অক্সফোর্ডে মাঞ্চেষ্টর কলেজে দর্শন ও ব্রহ্মবিজ্ঞা শিক্ষা করিতে যান। তথাকাব শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কোন জর্মন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসারে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধীয় গবেষণা প্রণালী শিক্ষা করিবাব জন্ত জর্মনী যান। তথায় প্রথমে ড্রেসডেন সহরে যান। তথা হইতে বার্লিন বাইবার জন্ত যখন তাঁহার জিনিব এবং বিজ্ঞানাপত্র বাধা হইয়াছে, এমন সময় তাঁহাব একজন সঙ্গী তাঁহার জর হইয়াছে বুঝিতে পাবেন। সে দিন ৯ই অক্টোবর। পাঁচ দিনেব জবে ১৩ই অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শিক্ষক মাঞ্চেষ্টর কলেজের সুপণ্ডিত ও সুবিখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল আচার্য্য জে, জে, কার্পেন্টার লণ্ডনের ইনকোয়ারার এবং কৃষ্টিয়ান্ লাইফ নামক ছ’বানি সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার দীনতা, ধর্ম্মভাব, জ্ঞানলিপ্সা, ধর্ম্মোপদেশদানক্ষমতা, স্বদেশপ্রেম, প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। কৃষ্টিয়ান্ লাইফে তাঁহার ছবিও বাহির হইয়াছে। নীচে আমরা আচার্য্য কার্পেন্টারের কোন কোন কথা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“In occasional preaching he found an opportunity

of expressing some of his strong religious emotion, and those who heard his first sermon in an English chapel, one December day at Southend, were deeply moved by the fervour of his utterance. He visited different parts of Eng and to gain an insight into the varying phases of its life, urban and rural He gave addresses on the work of the Brahma Samaj, and knew how to interest the young men in a Lancashire manufacturing centre, or a Leicestershire country town. He made a pilgrimage into Dorsetshire to visit the veteran Alred Russell Wallace, and he was at home among the agencies of a domestic mission.

"He had an insatiable curiosity," writes one of his fellow students, 'and the question "What does it mean?" was never off his lips. It is not surprising, therefore, that he very soon acquired a fair knowledge of English life, and his opinion of it was far from favourable.' In the little circle of the College he excited a warm affection, and some of his comrades recognised in him the most beautiful character they had ever seen. He appeared to them to combine in a singular way a saintly meekness and a lofty pride. The sufferings of his native land moved him profoundly, and were the object of his constant thought. The attitude of most Englishmen whom he met wounded him deeply, and at times he betrayed to his intimates a passion of extraordinary intensity. "He repaid any sympathy displayed to his beloved mother country with a devotion quite pathetic," says the friend already quoted, "and, though all loved him, only those knew him well who could enter into his feelings on this subject."

কৃষ্ণিয়ান্ লাইফেব সম্পাদক লিখিয়াছেন:—

"His piety was deep, tender, and true; his enthusiasm for the spread of the free faith was unbounded, his thirst for knowledge unquenchable; while his outlook upon life as a whole was broad and optimistic."

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী ।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতীয়দিগকে তাড়াইবার জন্য তাহাদের উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন হইতেছে। নানা প্রকার মিথ্যা কাণের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু সত্য কথা এই যে তথাকার ভারতীয় শ্রমজীবী, কাষিকব, ব্যবসাদাব প্রভৃতি মিতাচারী,—নেশাখোব নহে, এবং পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে ষ্টেতকায়েরা শ্রমের ও

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। তজ্জন্ত বলা হইতেছে যে, দাগী বদ্মায়েসেব মত আবুগেব ছাপ দিয়া প্রত্যেককে নিজেকে রেজিষ্টারি কবিত্তে হইবে, সহরে যেখানে সেখানে থাকিতে বা দোকান করিতে দেওয়া হইবে না, নির্দিষ্ট অপকৃষ্ট স্থানে থাকিতে হইবে, বিনা অনুমতিতে কেহ ফেরিওয়ালার কাজ করিতে পারিবে না, ফুটপাথ দিয়া চলিতে পারিবে না, বেল গাড়ী বা ট্রাম গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। সুতরাং সেখানকার মুসলমান, হিন্দু, জৈন ও পার্শিগণ একমত হইয়া এই সকল অন্তায় আইন অমান্য করিতেছেন। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও মাতৃগণ্য লোক গরীব স্বদেশীয়দের সঙ্গে সমতুল্যভাঙ্গী হইবার জন্য বাস্তায় বিনা লাইসেন্সে জিনিস ফেরী করিয়া জেলে বাইতেছেন। আবু-গেব ছাপ দিয়া রেজিষ্টারী না করায় শত শত লোক কাবাকুদ্ধ ও ট্রান্সভাল হইতে নির্বাসিত হইতেছেন, এবং কারামুক্ত হইয়া বা নির্বাসিত হইয়া আবার ট্রান্সভালে আসিতেছেন ও জেলে বাইতেছেন। শিশু, অশীতিপর বৃদ্ধা জীলোক পর্যন্ত বাদ বাইতেছেন না। সম্প্রতি তথাকার অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান সওদাগর ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভাপতি ইসুফ মিঞার স্বশ্রু ঠাকুবাণী (আশীব অধিক বঙ্গ), তাহার ছোট ভাই প্রভৃতি, ৫০৬০ জন শিশু, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ কাবাকুদ্ধ হইয়াছেন। তাহাদিগকে তিন দিন অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। ইসুফ মিঞার স্বশ্রু প্রভৃতি মক্কা হইতে হজ্জ (তীর্থ) করিয়া ফিবিতেছিলেন। তাহাদিগকে, জাহাজ হইতে নামিবার পর, হুপব বাত্রে একটা বিষ্ঠাময় সংকীর্ণ চালাতে অনেকক্ষণ থাকিতে হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি এই ভারত-বাসীদের নেতা। তিনি কয়েকবার কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাহাকে এখন ভদ্রাষ্ট নগরে রাস্তায় পাথর ডাঙ্গিতে হইতেছে। রাস্তা সাফ করার কার্য, যাহা আমাদের দেশে ধাকড় ও মেথরেরা কবে, তাহাও তাহাকে করান হইতেছে। *

* এই মহাপ্রাণ কণ্ঠবীরের ছবি গত বৎসরের ফাল্গুনের প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। ঐ সংখ্যার মূল্য পাঁচ আনা।

জেলে হিন্দু মুসলমান ভাবতবাসীকে এক রকম চর্কি-মিশ্রিত ময়দা বা চালজুঁড়া ঘাঁটা খাইতে দেওয়া হয়। অনেকে অনাহারে থাকিতেছেন। অনেকের জাতি যাই-তেছে। কাবণ গরু ও শূকরের চর্কি হিন্দুর অস্পৃশ্য ও অধাত্ত, এবং শূকরের চর্কি মুসলমানের অস্পৃশ্য ও অধাত্ত। মুসলমানের খাত্ত অস্ত্র জঙ্কও যদি তাঁহাদের ধর্মমতানুসারে জবাই করা না হয়, তাহা হইলে তাহাব চর্কিও অস্পৃশ্য ও অধাত্ত।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতনাবীগণও খুব সাহস ও স্বজাতিপ্রেমের পরিচয় দিতেছেন। একটি জীলোকের স্বামী জেল যাইবাব ভয়ে সঙ্গীদের পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আশ্রয় লন। তাহাতে তাঁহার জী বলেন, “তুমি আমার সাক্ষী পরিয়া ঘবে থাক, আমি তোমার পোষাক পরিয়া জেলে যাই।” এই ধিকারে স্বামী আবার কার্যক্ষেত্রে গিয়া সঙ্গীদের সহিত মিশিয়া জেলে যান। এইরূপ কত ঘটনা ঘটিতেছে।

আমরা বর্তমান সংখ্যায় কয়েকজন দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় কারারুদ্ধ বীরের ছবি দিলাম। নাম দেখিলেই বুঝা যায় যে ইহারা ভারতীয় নানা ধর্মাবলম্বী; ভাইয়ের মত একত্র কাজ করিতেছেন। আর আমরা মূর্থ; তাই ভারতে বসিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিতেছি।

চাপকান চোগা পরিহিত ভদ্রলোকটি মুসলমানদিগের একজন ভক্তিভাজন ইমাম বা ধর্মোপদেষ্টা।

হত্যাপ্রবৃত্তি।

বঙ্গের লাট সাহেব সার এণ্ডু ফ্রেস্কারকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া একজন যুবক ধৃত হইয়া বিচারাদীন আছে। বিচারাদীন বিষয়ে কিছু বলা নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু সাধারণতঃ হত্যাপ্রবৃত্তি বিষয়ে কিছু বলা যাইতে পারে।

যদি বাস্তবিক রাজপুরুষদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক কোন ক্ষুদ্র দল থাকে, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় এই দলের লোকদের কার্য সমর্থনযোগ্য নহে। যদি ইহা মানিয়াও লওয়া যায় যে কোনও রাজপুরুষ আমাদের দেশের

বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা অনিষ্টের প্রকৃত প্রতিকারচেষ্টা নহে; কিন্তু ইহা প্রতিহিংসামূলক মাত্র। ইহা ধর্মবিরুদ্ধ; এবং যদি কেহ মনে কবেন যে ধর্মবিরুদ্ধ হইলেও ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে বলি, যে, (১) অধর্মের দ্বারা মঙ্গল হয় না, ইহাই বিশ্বের নিয়ম; (২) ইহাতে আমাদের দেশের শাসনপ্রণালী উন্নততর হইবে না; (৩) ইহাতে ইংরাজেরা ভয় পাইয়া আমাদের দেশ ছাড়িয়া পলাইবে না; (৪) যদিই তাহা পলাইয়া যাইত, তাহা হইলেও তদ্ব্যবহাি আমাদের দেশের অজ্ঞতা, দাবিদ্যা, রোগ, দুর্নীতি, সামাজিক কুপ্রথাাদি দূর হইত না। অথচ এই সকল দূর না হইলে দেশের মঙ্গল হইবে না। এই সকল দূর করা বিদেশীবিষয়ে দ্বারা সম্পন্ন হইবে না; স্বদেশ-বাসীকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্ত আত্মজীবন পরিশ্রম করিলে সম্পন্ন হইবে। যদি কেহ দেশের জন্ত জীবনোৎসর্গ করিতে চান, সেবায় প্রাণ দান করুন, প্রতিহিংসায় নহে। যদি কেহ সাহস দেখাইতে চান, দেশের প্রতি প্রেমমূলক সেবায় সাহস দেখান, কাহাকেও হত্যা করিয়া নহে।

এইরূপ হত্যা দ্বারা কোন দেশের মঙ্গল হয় নাই। আমাদের দেশেরও হইবে না। পক্ষান্তরে ইহাব দরুন দেশে কঠোরতর শাসন প্রবর্তিত হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে অনেক নিরপবাধ ব্যক্তি উৎপীড়িত ও দগ্ধিত হইবে। দেশে শিক্ষাবিস্তার, স্বদেশী প্রসারবৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যে বাধা পড়িবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভায় বক্তৃতা করিবাব স্বাধীনতা সামান্য বাহা আছে, তাহাও লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য এরূপ অবস্থাতেও আমবা যদি সাহসের সহিত ধর্ম ও অহিংসার পথে থাকি, তাহা হইলে ভগবান্ আমাদের মঙ্গল করিতে পাবেন। কিন্তু, তাহা হইলে প্রথম হইতেই ধর্ম ও অহিংসার পথে থাকি না কেন?

স্থলবিশেষে প্রাণরক্ষার জন্ত আততায়ীর প্রাণবধ পর্য্যন্ত আইনানুসারে। সভ্যজগতে স্বাধীনতা রক্ষা বা লাভের জন্ত যুদ্ধে নরহত্যা বৈধ বলিয়া পরিগণিত। (ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর আদর্শ, সম্পূর্ণ অহিংসামূলক আদর্শ, ভবিষ্যতে মানবসমাজে গৃহীত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।) কিন্তু

যে সকল হত্যা বা হত্যার চেষ্টার কথা হইতেছে, তাহা প্রাণ-রক্ষার জন্ত নয় ; এবং স্বাধীনতায়ুদ্ধ যে নয়, তাহা পাগল ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, ইহা কেহ মনে কবে কিনা, জানি না ; আমবা করি না।

আমরা স্বীকার কবি যে কিছুদিন হইতে দেশের লোকদের উত্তেজিত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ও ক্রুদ্ধ হইবার অনেক কাৰণ ঘটিতেছে। কিন্তু উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ কর্তব্য নির্ণয় করিতে পারে না। ধীবেবাই পারেন। কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন—“বিকাবহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাম্ ন চেতাংসি ত এব ধীবাঃ ;”—“বিকারের হেতু থাকে সন্তোষ ও যাহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাঁহাবাই ধীর।” আমাদের সকলের ধীর হওয়া উচিত, কিন্তু কাপুরুষ হওয়া উচিত নয়। নয়হত্যা ও বৈবদ্য সমার্থবাচক নহে।

পরিণেবে সত্যের অনুবোধে ইহা বলা দবকাব যে এখন ভারতে ইংরাজ ও ভারতবাসী উভয়দলেরই মন ঘেমে পূর্ণ। (প্রত্যেক ইংরাজ বা প্রত্যেক ভারতবাসীর মন এরূপ, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।) সুতরাং এই সকল হত্যা বা হত্যার চেষ্টার জন্ত উভয় দলই দোষী। হস্তা বা হননেছ যে দেশীয়ই হউক, তাহাব তিতর দিয়া এই তীত্র ঘেব প্রকাশ পায় মাত্র। এই ঘেবের নাশ প্রকৃত পক্ষ।

রাজনৈতিক হিসাবে একজন শাসনকর্তার জীবনের মূল্য একজন কুলির বা গাড়োরানের জীবনের মূল্য অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে উভয়েই সমান। ইংরাজের পাগল অবস্থায় বা ইংরাজের আকস্মিক পদাব্যাহত বা গুলিতে নির্দোষ অনেক ভারতবাসী মাঝা যায়। ইংরাজের নিজের দেশে এরূপ আকস্মিক মৃত্যু এত হয় না। সুতরাং ভাবত-বর্ষে ইংরাজ ইচ্ছা করিয়া ভারতীয় কুলির প্রাণবধ না করিলেও, এদেশেই এরূপ মৃত্যু এত কেন হয়, তাহা জিজ্ঞাস্য, এবং ইহা, ইংরাজ বাঙ্গালপুরুষের হত্যাচেষ্টা অপেক্ষা কম গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা নয়। উভয় সমস্যার সমাধান-চেষ্টা যুগপৎ করা উচিত। নতুবা সফল হইবে না।

ইংরাজের অবশ্য কর্তার শাসনের জন্ত চীৎকার করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে ঘেব ও উত্তেজনা আবও বাড়িবে।

প্রকৃত উপায় হইতেছে—ইংরাজ ও ভাবতবাসী উভয় দলেরই ঋায় ও ধর্ম্মানুসারিত ব্যবহাব। কাহাব দোষ বেশী, বা কে আগে দোষ করিয়াছে, তাহাব বিচার এখন স্থগিত থাক।

আমবা এবং আমাদের ছেলেরাও যে মানুষ, ইংবেজেব তাহা কার্য্যতঃ মানিলে সফল হইবে। ইংবাজেব নিজেদেব ছেলেরা কিছু হঠকাবিতা বা বাদরামি করিলে তাহাদিগকে বেরূপ দণ্ড দেন বা তিবন্ধার করেন বা কখন কখন ছেলেমানুষী বলিয়া দেখিয়াও দেখেন না, আমাদের ছেলেরদের সম্বন্ধে সেরূপ ব্যবহাব না কবায় অনেক কুফল ফলিয়াছে। (অবশ্য হত্যা বা হত্যার চেষ্টাকে আমবা এই শ্রেণীব দোষ বলিতেছি না।) ইংরাজ যুবকদের মত আমাদের যুবকেবাবও স্বদেশসেবক হইতে ও মাথা উঁচু করিতে ইচ্ছুক। ইহা স্বাভাবিক বলিয়া ইংরাজেবাব কার্য্যতঃ মানিলে সফল হইবে।

শরীরেব রক্ত চুষ্ট হইলে ত্রণ, ফোড়া আদি হয়। তৎসমুদয় কেবল কাটিয়া চাটিয়া দেওয়াই সুরচিকিৎসা নয়। বস্ত্রদুষ্টিব কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা সংশোধন সুরচিকিৎসকের কাজ। যে ঘেবেব হাওয়া বহিতেছে, তাহাব বাহ্য উপসর্গগুলাকে নিমূল করিবার চেষ্টাই প্রকৃত রাজ-নীতিজ্ঞতা নহে। ঘেবেব ও উত্তেজনার প্রকৃত কাবণ আবিষ্কার করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টাই প্রকৃত রাজ-নীতিজ্ঞেব কাজ।

চিত্র-পরিচয় ।

বর্তমান সংখ্যার প্রথম চিত্রের বিষয় বোধ হয় অনেকেরই পরিচিত। এই স্মরণ ছবিখানিব বিষয় ষাতিংশ পুস্তলিকা নামক প্রাচীন গল্প হইতে গৃহীত। কথিত আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশটি পুস্তলিকা ধৃত এক সিংহাসন ছিল। বিক্রমাদিত্যের পর কোন সময়ে ভোজ রাজা উহাতে আবোহণ কবিত্তে যান। তাহাতে একটি পুস্তলিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, মহাবাজ, আপনি কি বিক্রমাদিত্যের মত শৌর্য্যবীর্য্যশালী, উদার, ধার্ম্মিক ও বিত্তোৎসাহী? ভোজও তাহার উত্তর দেন।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত উড়িয়াব চিত্রগুলি অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহীত ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি। তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গত সংখ্যায় বৈতাল দেউলের ছবি ছাপা হয় নাই, অথচ ভ্রমক্রমে তৎসম্বন্ধে মন্তব্য ছাপা হইয়াছে। ঐ ছবি প্রস্তুত ছিল। স্থানাভাবে যায় নাই। পরে সুযোগ হইলে ছাপিব।

প্রেম ।

প্রেম শুধু বার্থ অঘেষণ ।
প্রেমে পূর্ণ এ বিশ্ব-সংসার ;
প্রাণে প্রাণে উঠিছে ক্রন্দন—
‘কোথা তুমি হে আমি আমার’ ।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী ।

পারস্য-প্রসূন ।

(হাফেজ হইতে *)

নির্ভর ।

গৌরব মম হবণ তুমি
কবেছ সকলি যদিও,
হুয়াবে তব নুটায় রব
কিরিয়ে না যাব তবুও !
অরির দরা চাহে না হিয়া
বারেক তুলিয়া জগতে—
মিতার শত নিঠুরাচার
ভাল যে হাজার তা’হতে !

গৌরব ।

জদরে মোব দিও গো মান,
করিও না হেলা তাহাবে ;—
যে দিন তোমা বেসেছে ভালো
ছোট সে দীপ জ্বলেছে আলো
হরিতে বিশ্ব-আধাবে ।

আশা ।

সুন্দরতর বদন তব
করিয়া নিতে আপনা,
সুন্দরতব প্রকৃতি মম
নিয়ত কবি কামনা,
তা’ হলে আর মন আমার
তোমাতে হারা হবে না !
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

প্রাপ্তপুস্তক পরীক্ষা ।

তীর্থসঙ্গীত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত । সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারী
কর্তৃক প্রকাশিত, মেটাকা প্রেসে মুদ্রিত । ডবল ক্রাউন বোর্ডশাংশিত
১৭৫ পৃষ্ঠা । মূল্য এক টাকা মাত্র । এখানি কবিতা-পুস্তক, জগতের

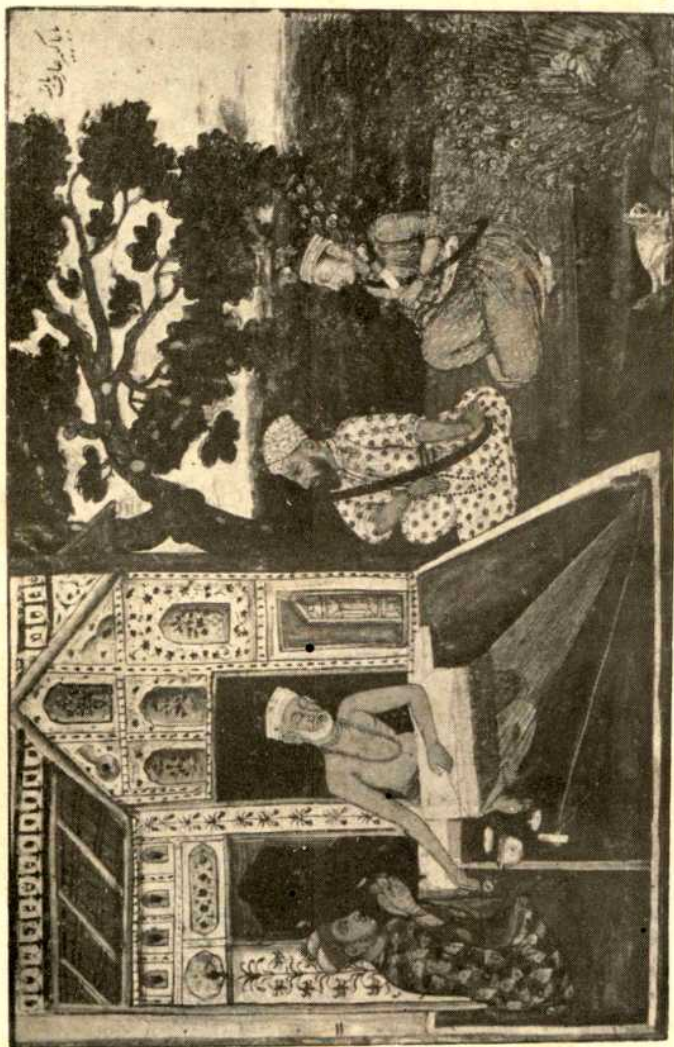
* মঙ্গলবাদ ।

সকল দেশের সকল কালের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সকল ভাবের রচনার
কাব্যাত্মবাদ এই পুস্তকে একত্র করিয়া একটি মনোজ্ঞ সংগ্রহ হইয়াছে ।
অনুবাদগুলি এমন সরস স্নগদ স্বচ্ছন্দ প্রবাহে প্রাণময় হইয়াছে যে
কবিতাগুলি মৌলিক রচনার সৌন্দর্যে মগ্নিত । পরের ভাবকে আলোর
করিয়া নিজের কবিত্বরসধারা এমনভাবে উৎসারিত হইতে অন্নই দেখা
যায় । আমরা বহু কবিতার মূলের সহিত পরিচিত আছি, তাহাদের
নিজস্ব আন্তর রসটুকু অনুবাদেও অক্ষুর থাকিতে দেখিবার কবির ক্ষমতায়
আশ্চর্য হইয়াছি । এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ হইয়াছে । বাঙ্গালী
পাঠক এই পুস্তকের ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের স্বত্বসম্পন্ন অনুভব করিয়া
শ্রীত ও পুলকিত হইবেন । গ্রন্থারম্ভে ও গ্রন্থশেষে কবির দুইটি মৌলিক
কবিতা বিবরণোপযোগী ও মধুর হইয়াছে । পবিশিষ্টে সকল কবির
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াতে পাঠকের বিশেষ সাহায্য হইবে ।
কাব্যরসপিপাসু বা মানবচরিত্রজিজ্ঞাসু পাঠক এই গ্রন্থে আনন্দের
উপাদান পূঞ্জীকৃত দেখিবেন । জাপান চীন হইতে আমেরিকা অবধি,
বৈদিক কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তি, নরপ্রেম ও
দেশপ্রেম বিধে বচনভাবের কবিতা বিশ্বমানবের অন্তর হইতে ক্রিয়িত
হইয়াছে তাহাই সংগ্রহীত হইয়া বঙ্গবাসীর মন্দিরে আনীত হইয়াছে ।
তীর্থসঙ্গীত নামটি যেমন অর্থহীন তেমনি কবিত্বময় । তীর্থসঙ্গীত-সংগ্রহ-
কর্তা নবীন কবিকে আমরা সাধরে অভিনন্দন করিতেছি ।

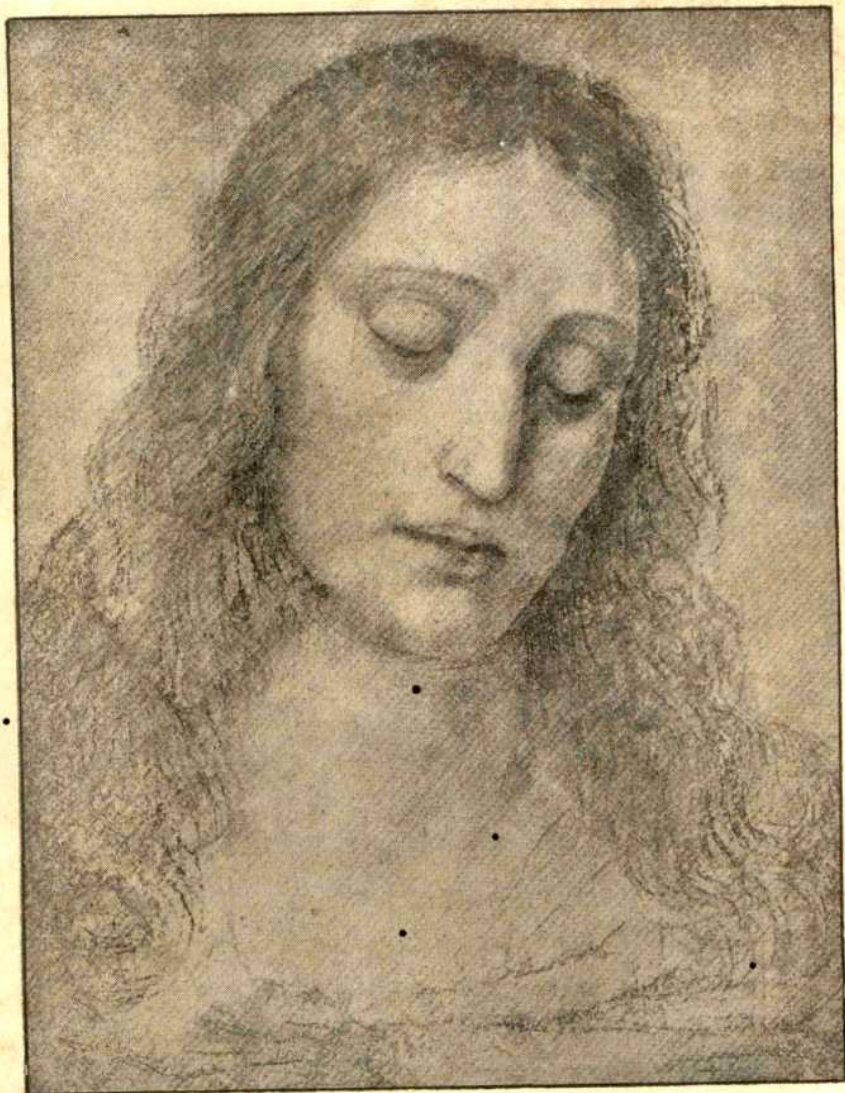
উবা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ তালুকদার প্রণীত । কুস্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও
তথ্য হইতে প্রকাশিত । ডবল ক্রাউন বোর্ডশাংশিত ২০৭ পৃষ্ঠা, মূল্য
এক টাকা মাত্র । এখানি নাটক । ইহাতে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে
যে, রাজা উদাদীন হইয়া অমাত্যের উপর নির্ভর করিয়া
যুঝিলে রাজ্যে অত্যাচার উৎপাদন আরম্ভ হয় ; নিরীহ প্রজাও
উৎপীড়িত হইলে শুধু আত্মরক্ষার জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠে ; তখন
সেই তিন দল লোক দেখা যায়—বিদ্রোহকারী চরমপন্থী, রাজভক্ত
সামন্তস্বত্বপ্রবাসী ও দেশবৈরী । স্বার্থলুপ্ত দেশবৈরীর কোথাও প্রতিষ্ঠা
প্রতিপত্তি নাই, অসন্তোষ দলেরও সাফল্য ক্লেশিক বা আপাতঃপ্রসূত
হইতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা প্রজা মিলিত স্বার্থ সংস্কার-
ব্রত গ্রহণ করেন ততক্ষণ দেশের কল্যাণ নাই ; ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিলেই
ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণের গুণ বাহার আছে সেই দেশনায়েক হইবার
উপযুক্ত । এই গেল মোটামুটি গ্রন্থের প্রতীপাত্ত বিবরণ । গ্রন্থকার
আপনার বক্তব্য প্রকাশ করিতে কৃতকার্য হইলেও সাধারণ পাঠকের
সহজবোধ্য করিতে পারেন নাই, সকল ঘটনাই কেমন একটা প্রচ্ছন্ন
প্রহেলিকা হইয়া আছে । নাটকখণ্ডে এ গ্রন্থে পরিণত নহে—কোনো
চরিত্রই স্বীয় ব্যক্তিকে পরিষ্কার পুট বা পরিষ্কৃত হয় নাই । নাটকীয়
ঘটনার দৃষ্ট বা অকল্পিতের মধ্যে একটা-লাগিতার অভাব দৃষ্ট হয়,
অনেক কথা চিন্তার দ্বারা পূর্ণ করিবার লইতে হয়, তাহাতে মন রাস্তা
হইয়া পড়ে, রসাত্মক হেতু পাঠ বিরক্তিকর হইয়া উঠে । নাটকখানি
আত্মোপাস্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত । ইমার্সন বলেন—Cultivated
men often attain a good degree of skill in writing
verses ; but the sense remains prosaic. It is a cater-
pillar with wings, and not yet a butterfly. এই নাটক-
খানিও তেমনি কবিত্বশূন্য অপরিণত রচনা । গ্রন্থকারের প্রশম প্রশাস
বলিয়া মনে হয় । বাহাই হউক বর্ষিত ঘটনার ব্যক্তির ইহা পাঠক-
সমাজে আদৃত হওয়া সম্ভব ।



খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর ।

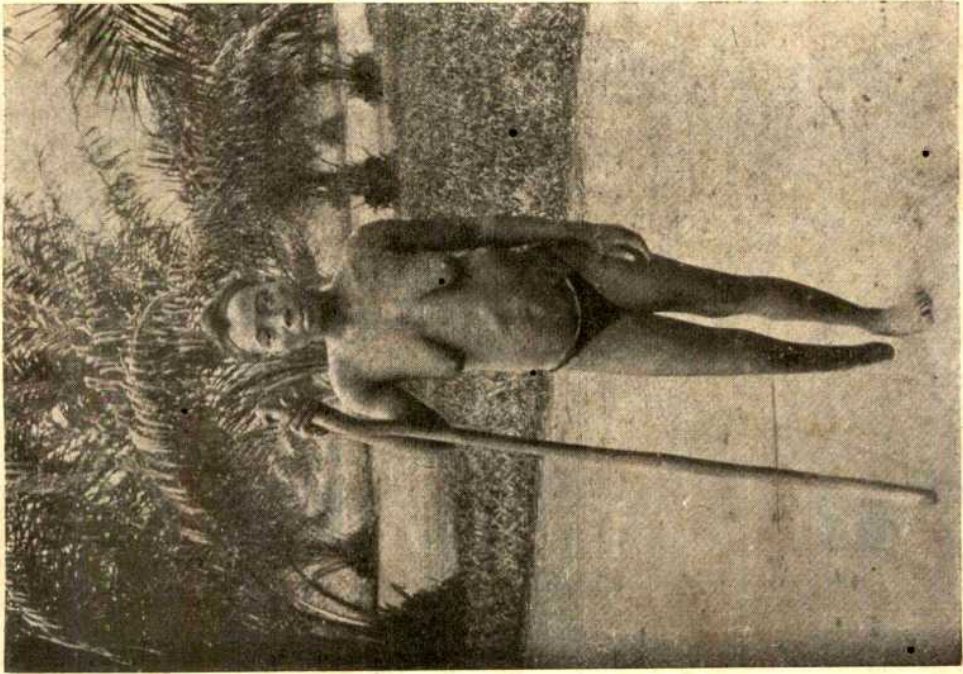


माधु कबीर ।

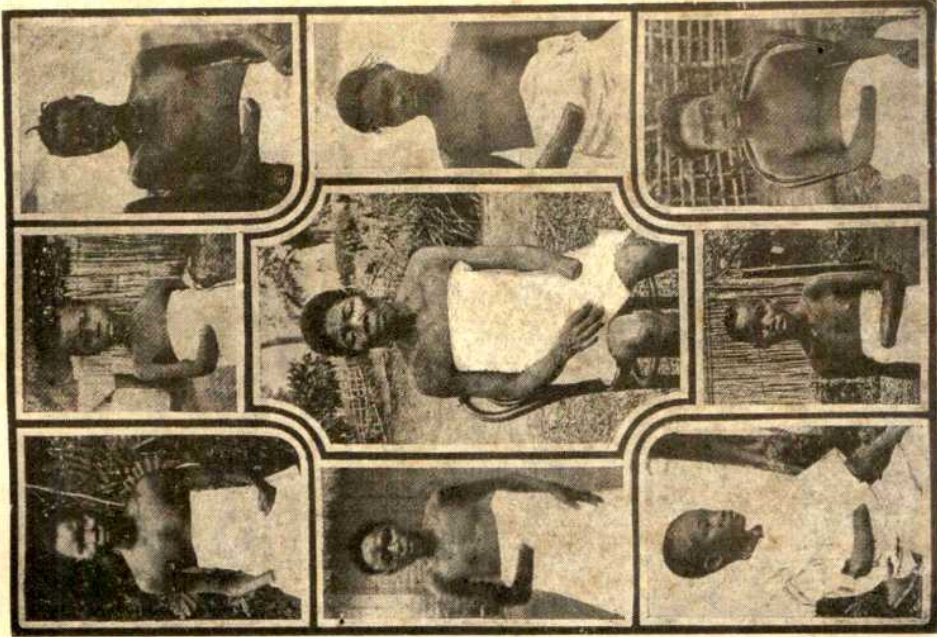


করণ।

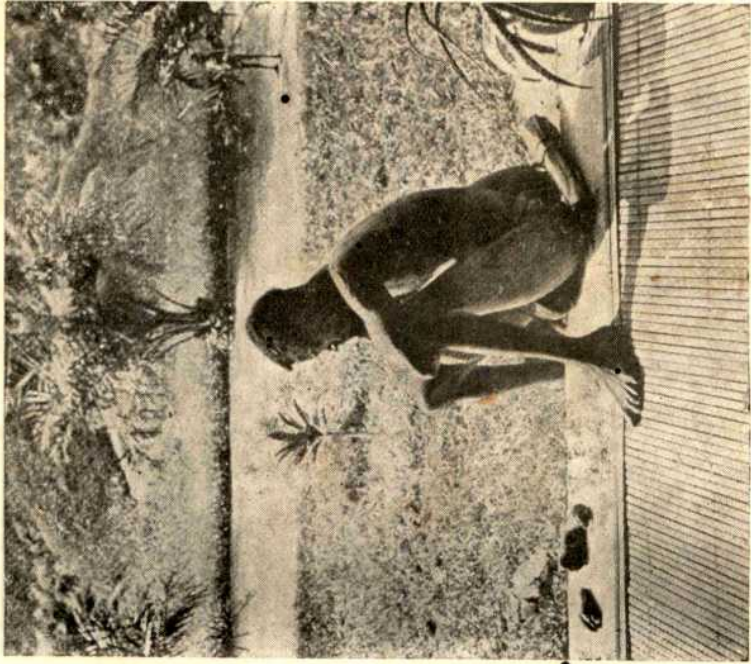
লেনার্ডো ডাভিন্সি কর্তৃক অঙ্কিত ঈশার চিত্র হইতে।



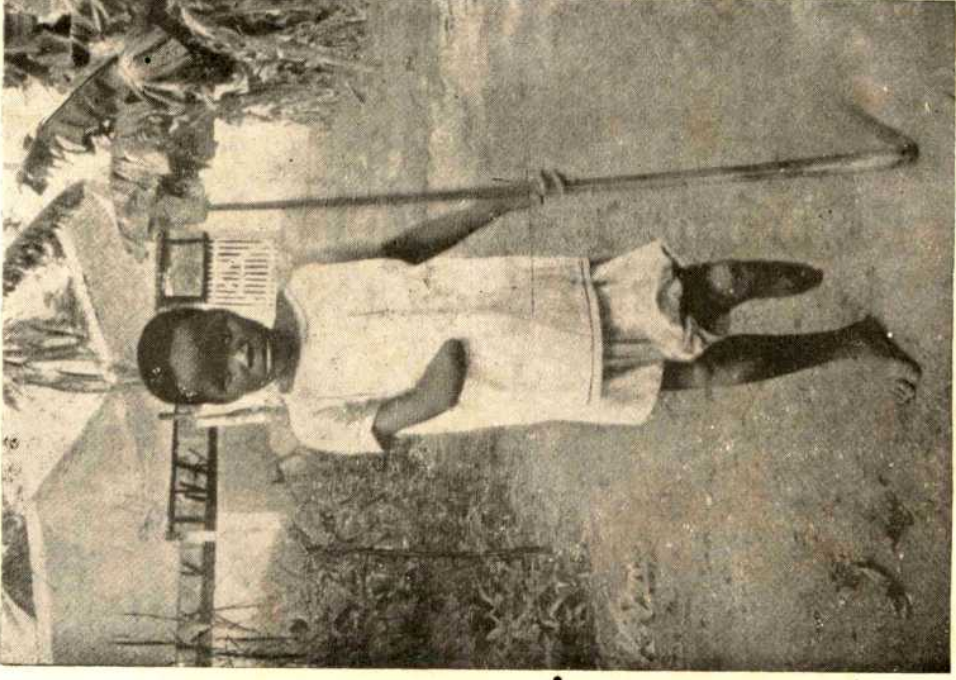
যথেষ্ট রবার না আনায় ইহার পা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।



যথেষ্ট রবার না আনার জন্ত হাত কাটি আরও কয়েকজনের ছবি।



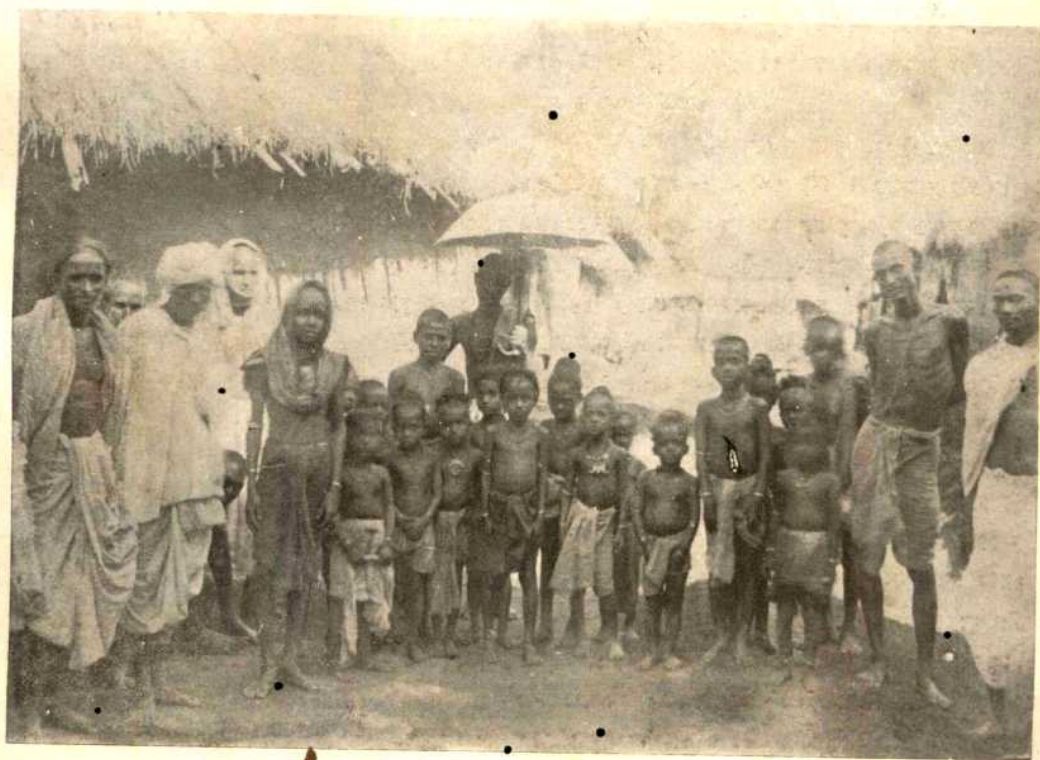
এই লোকটির পাঁচ বছরের কন্যাকে বেলজিয়ম রাজ্যের নয়মাংসভোজী
সাম্রাজ্যী থাইয়া ফেলিয়াছে। হাতপায়ের অঙ্গ অংশ অবশিষ্ট আছে।



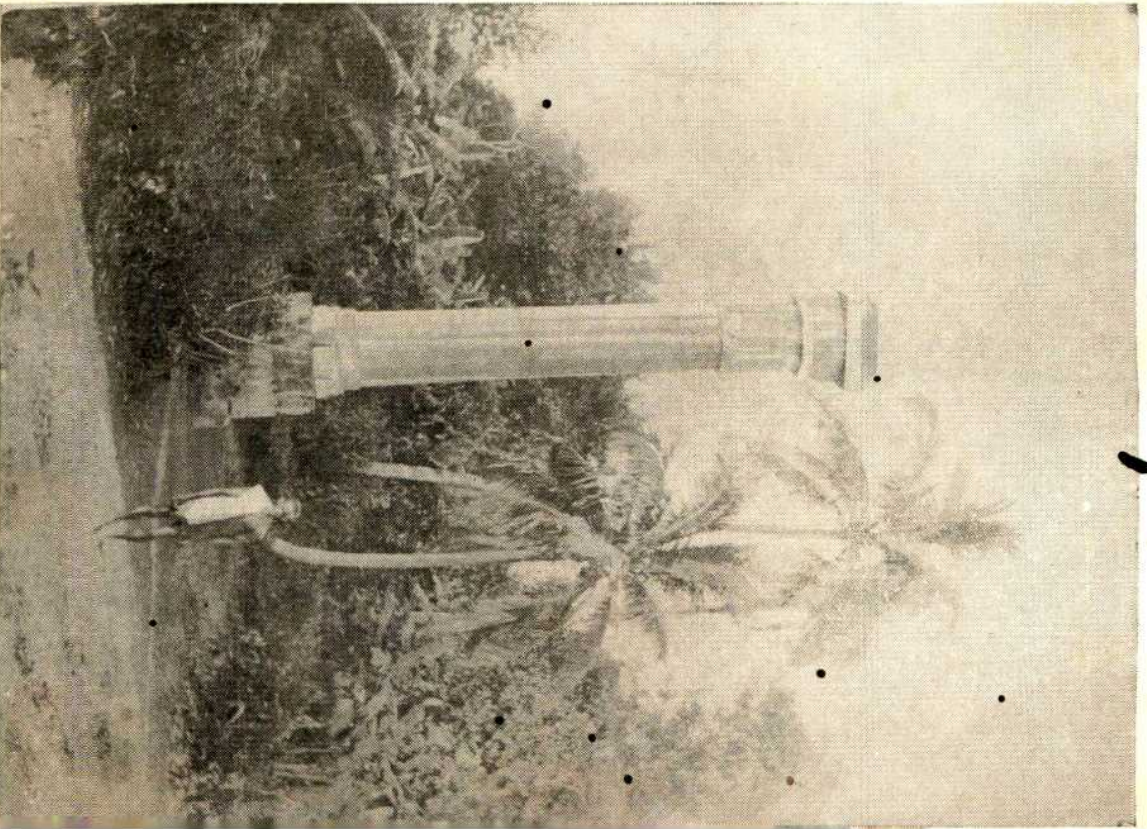
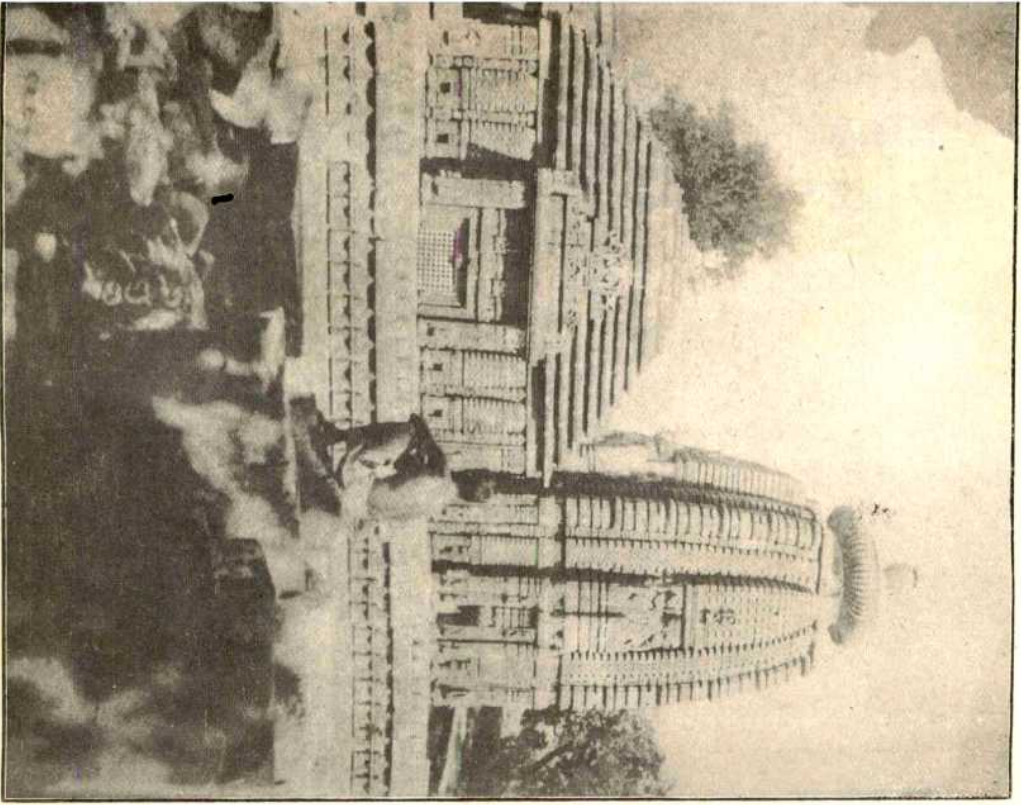
যথেষ্ট রবার না আনায় ইহার হাত পা কণ্ঠিত হইয়াছে।



যাজপুরের সপ্তমাতৃকা-মন্দির ।



ডিঘ্যার গ্রাম্য পাঠশালার ছাত্রবৃন্দ ।





ভোজরাজা ও পুন্ডলিকা ।

শ্রীম্মরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে ।



শ্রীযত্ননাথ সরকার।



স্বর্গীয় শশধর হালদার।



শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ।



শ্রীশান্তিপদ গুপ্ত।



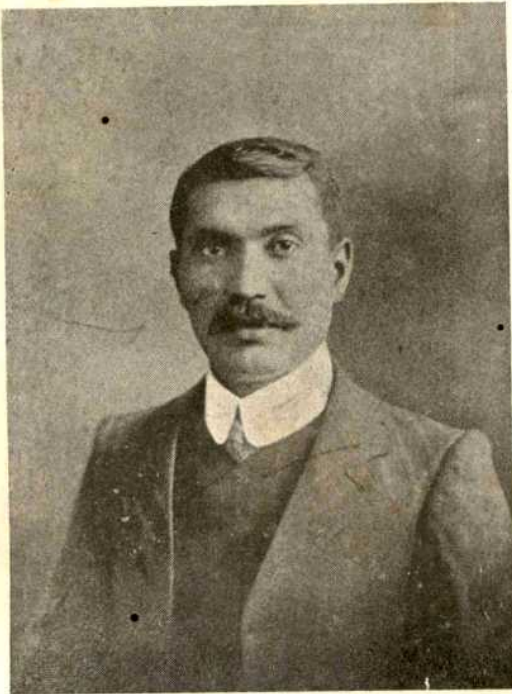
শ্রী জে. সী. দাস।



ইমাম আব্দুল কাদির বাওয়াজীর।



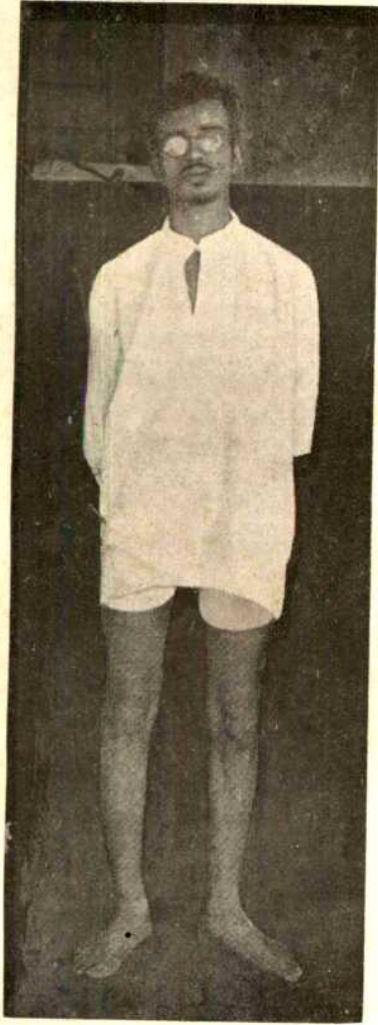
পার্সী রুস্তমজী, এম্ সি আঙ্গ'লিয়া, দাউদ মহম্মদ।



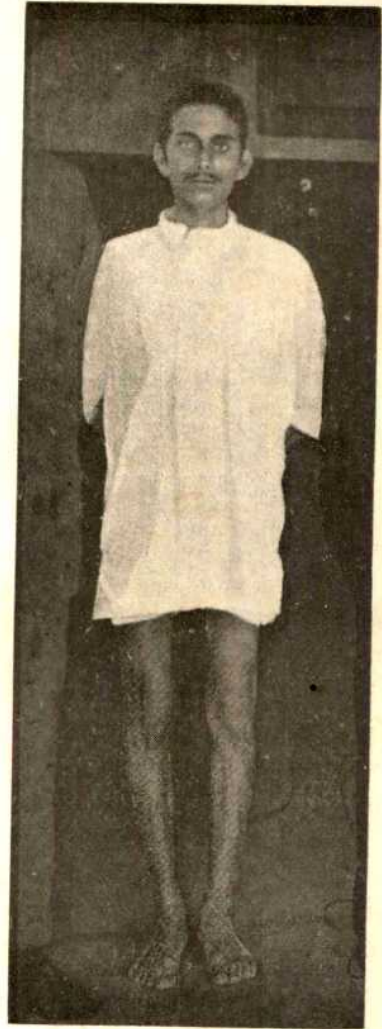
সোরাবজী শাপুরজী।



সি. কে. খাশি নায়ুহ।



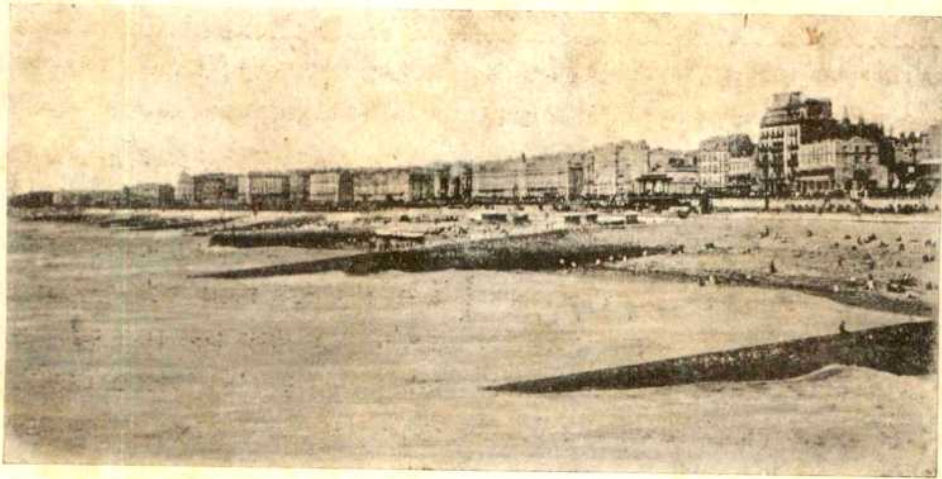
কানাইলাল দত্ত ।
(কয়েদীর বেশে)



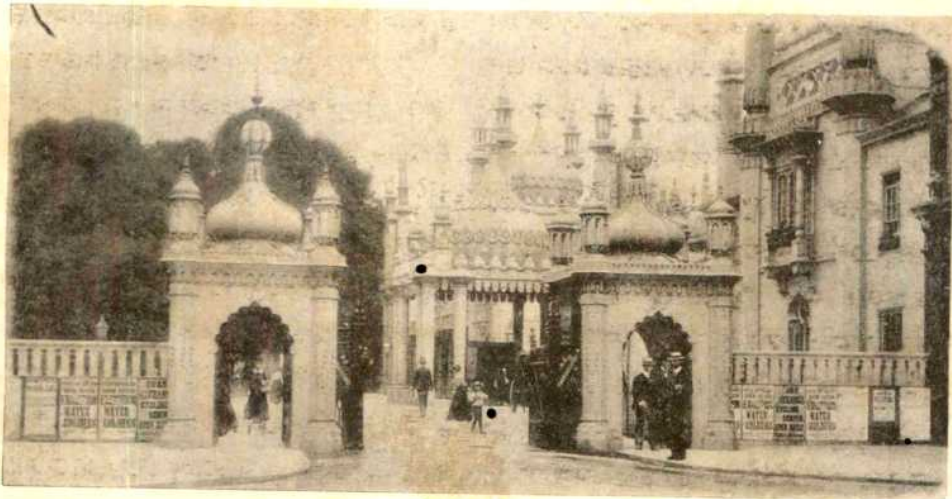
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ।
(কয়েদীর বেশে)



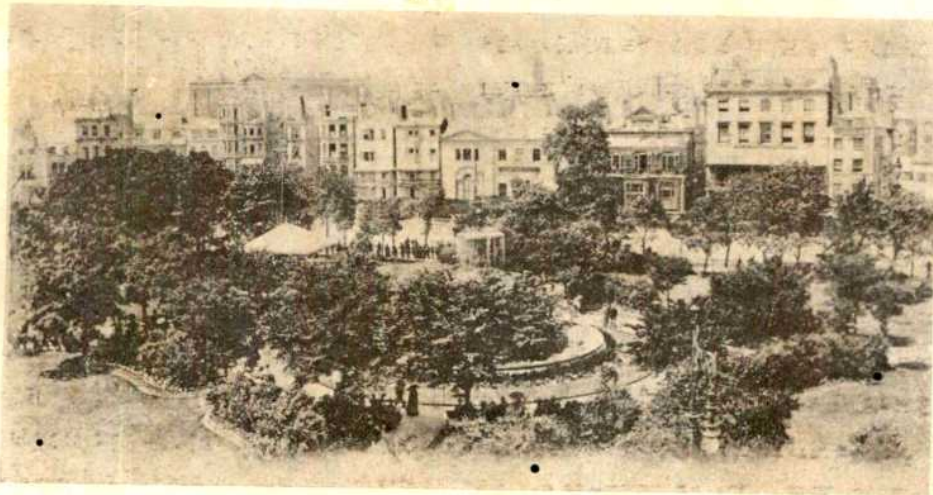
স্বদেশসেবক কৰ্মযোগী
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ।



ব্রাইটনের সমুদ্রতট।



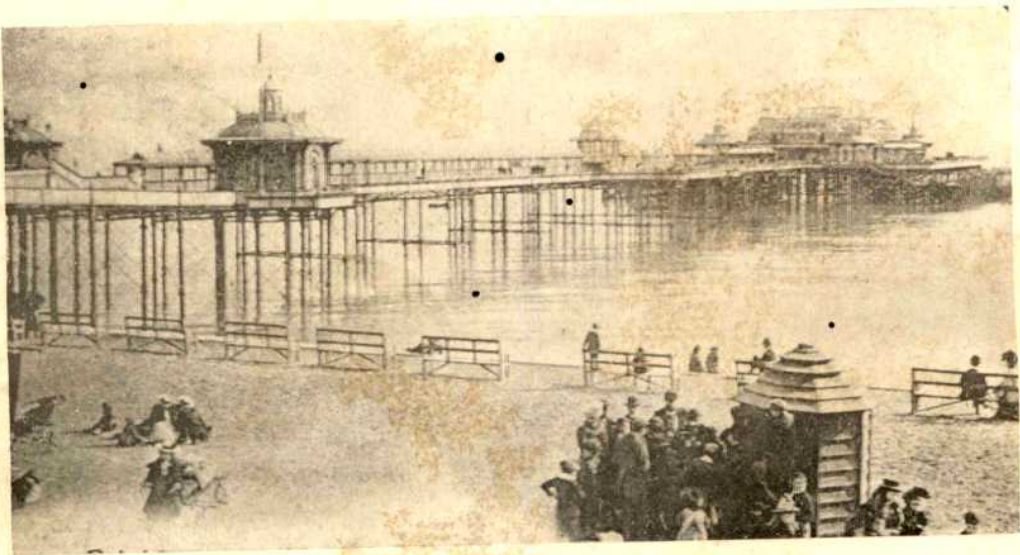
ব্রাইটনের রয়্যাল প্যাভিলিয়ন।



ব্রাইটনের ওল্ড হাইন্ উদ্যান।



ঝড়ের সময় ব্রাইটনের সমুদ্রতীরস্থ বৈজ্ঞানিক রেলওয়ে ।



ব্রাইটনের পিয়ার ।



শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী বোষ,
মাদ্রাজ কংগ্রেসের ভারী সভাপতি।



দেওয়ান বাহাদুর কে, কৃষ্ণস্বামী রাও,
মাদ্রাজ কংগ্রেসের অন্তর্গত সমিতির সভাপতি।

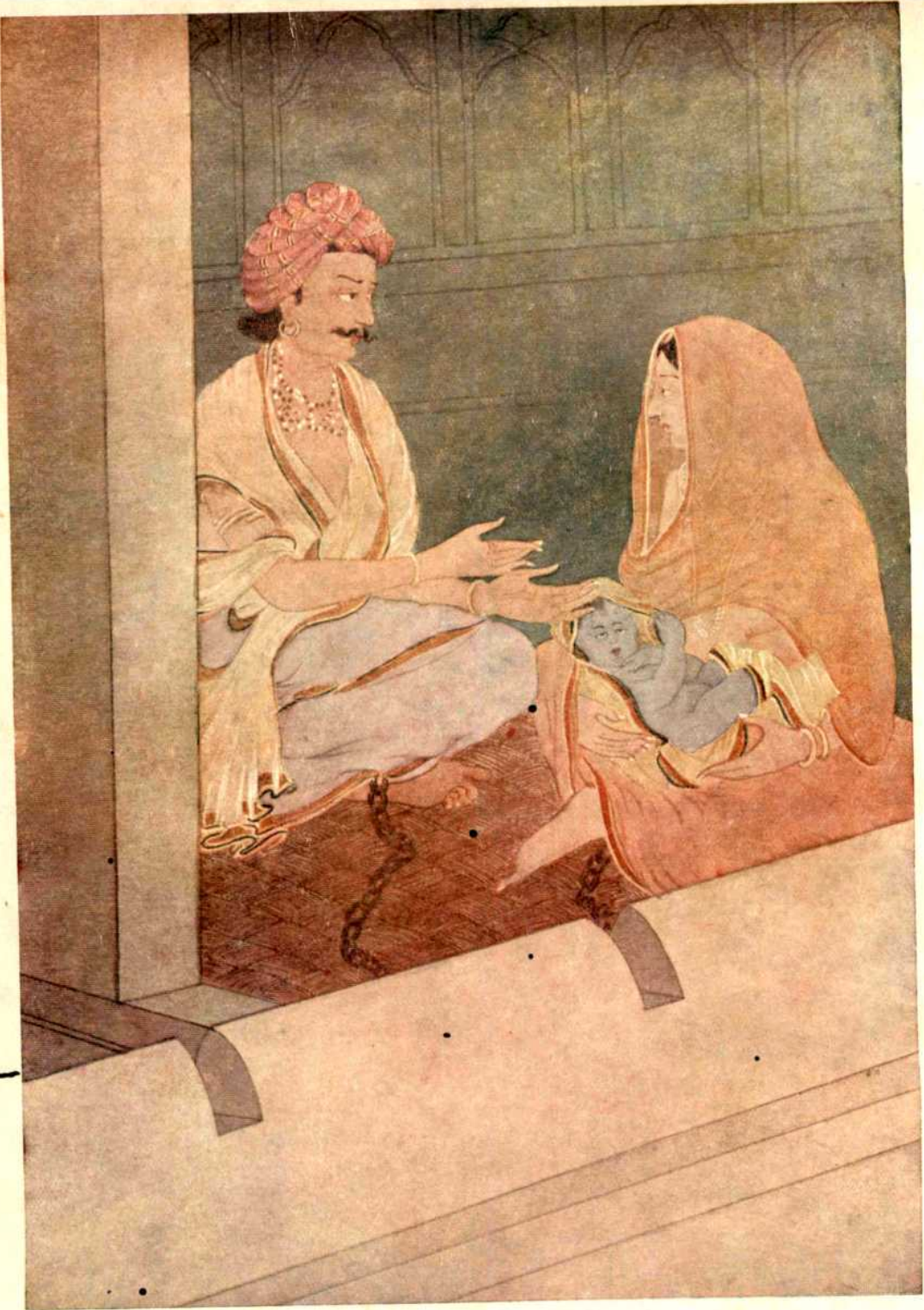


রাও বাহাদুর আর, এন্, মুখোলকার,
মাদ্রাজের শিল্প আলোচনা সমিতির ভারী সভাপতি।



অন্তঃপুরিকা।

শ্রীযুক্ত লাল দীপক প্রসাদ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

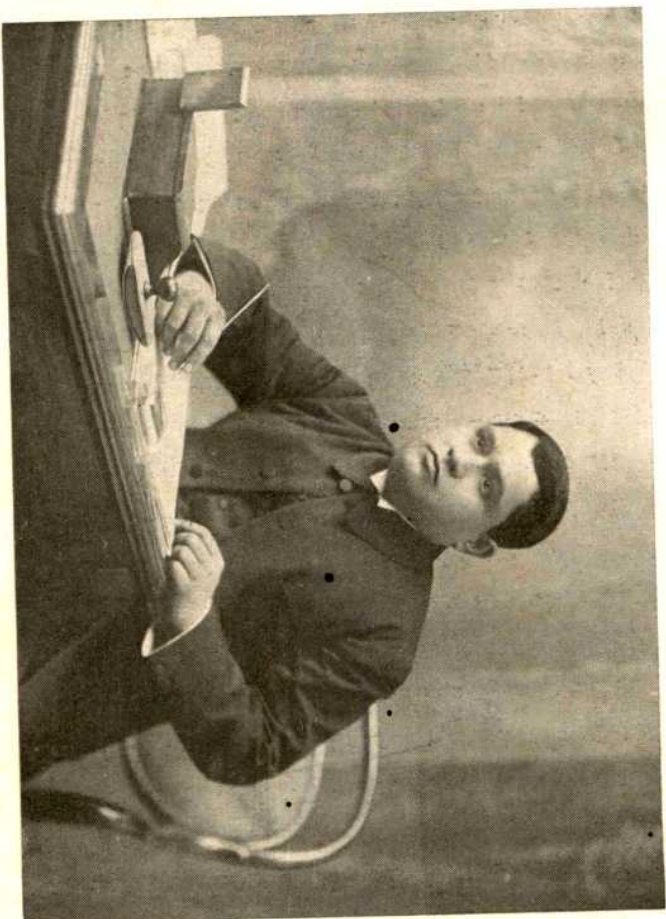


কারাগারে শিশুকুণ্ড ।

শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে ।

Three-colour blocks by U. Ray.

KONTALINE PRESS, CALCUTTA.



স্বর্গীয় নান্দাধনাথ ভট্টাচার্য ।



শ্রী অশ্বিনীকুমার দত্ত ।



শ্রী যুবোধচন্দ্র মল্লিক ।
(দণ্ডায়মান)



শ্রী শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ।
(অধিশয়নাবস্থায়)



শ্রীপুলিনবিহারী দাস,
ঢাকা অম্মশীলন সমিতির নেতা।

প্রবাসী ।



মহাভারত লিখন—বাস বত্তা, গণেশ লেখক ।

সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক আঁকিত চিত্র হইতে ।

Three-colour blocks by U. Ray.

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

৮ম ভাগ ।

পৌষ, ১৩১৫ ।

৯ম সংখ্যা

গোরা ।

৩৮

সুচরিতার মাসী হরিমোহিনীকে লইয়া পরেশের পরি-
বাবে একটা গুরুতর অশাস্তি উপস্থিত হইল। তাহা বিবৃত
করিয়া বলিবার পূর্বে, হরিমোহিনী সুচরিতার কাছে
নিজের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাই কিছু সংক্ষেপ করিয়া
নীচে লেখা গেল।

আমি তোমার মায়ের চেয়ে ছই বছরের বড় ছিলাম।
বাপের বাড়িতে আমাদের ছই জনের আদরের সীমা ছিল
না। কেননা, তখন আমাদের ঘরে কেবল আমরা ছই
কতাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—বাড়িতে আর শিশু কেহ
ছিল না। কাকাদের আদবে আমাদের মাটিতে পা ফেলি-
বার অবকাশ ঘটিত না।

আমার বয়স যখন আট তখন পালসার বিখ্যাত রায়-
চৌধুরীদের ঘরে আমার বিবাহ হয়। তাঁহারা কুলেও
যেমন ধনেও তেমন। কিন্তু আমার ভাগ্যে সুখ ঘটিল না।
বিবাহের সময় খরচপত্র লইয়া আমার স্বপুত্রের সঙ্গে পিতার
বিবাদ বাধিয়াছিল। আমার পিতৃগৃহের সেই অপবাধ
আমার স্বপুত্রবংশ অনেকদিন পর্য্যন্ত ক্ষমা করিতে পারেন

নাই। সকলেই বলিত, আমাদের ছেলের আবার কি
দেব, দেখি ও মেয়েটার কি দশা হয়। আমার ছা
দেখিয়াই বাবা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কখনো ঘনীর
মেয়ে দিবেন না। তাই তোমার মাকে গরীবের ঘা
দিয়াছিলেন।

বহু পরিবারের ঘর ছিল, আমাকে আট নুয় বৎ
বয়সের সময়েই রান্না করিতে হইত। প্রায় পঞ্চাশ
জন লোকে খাইত। সকলের পরিবেষণের পরে কো
দিন শুধু ভাত, কোনো দিন বা ডাল ভাত খাই
কাটাইতে হইত। কোনো দিন বেলা ছইটার সময় কো
দিন বা একেবারে বেলা গেলে আহা করিতাম। আ
করিয়াই বৈকালের রান্না চড়াইতে খাইতে হইত। ৩
এগারোটা বারোটোর সময় খাইবার অবকাশ ঘটি
শুইবার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। অন্তঃপুরে যা
সঙ্গে বেদিন সুবিধা হইত তাহার সঙ্গেই শুইয়া পড়িতা
কোনো দিন বা পিড়ি পাতিয়া নিদ্রা দিতে হইত।

বাড়িতে আমার প্রতি সকলের যে অনাদর ছিল আ
স্বামীর মনও তাহাতে বিকৃত না হইয়া থাকিতে প
নাই। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি আমাকে দূরে দূ
রাখিয়াছিলেন।

এমন সময়ে আমার বয়স যখন সতেরো তখন আমার কল্পা মনোরমা জন্মগ্রহণ করে। মেয়েকে জন্ম দেওয়াতে শ্বশুরকূলে আমার গঞ্জন আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। আমার সকল অনাদর সকল লাঞ্ছনার মধ্যে এই মেয়েটিই আমার একমাত্র সাধনা ও আনন্দ ছিল। মনোরমাকে তাহার বাপ এবং আর কেহ তেমন কবিতা আবৃত্তি করে নাই বলিয়াই সে আমার প্রাণপণ আশ্রয়ের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল।

তিন বৎসর পরে যখন আমার একটি ছেলে হইল তখন হইতে আমার অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল। তখন আমি বাড়ির গৃহিণী বলিয়া গণ্য হইবার বোঁগা হইলাম। আমার শান্তি ছিলেন না—আমার শ্বশুরও মনোবদ্য জন্মিবার ছই বৎসর পবেই মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরেই বিষয় লইয়া দেবদেবের সঙ্গে মকদ্দমা বাধিয়া গেল। অবশেষে মামলার অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া আমরা পৃথক হইলাম।

মনোরমার বিবাহের সময় আসিল। পাছে তাহাকে দূরে লইয়া যায়, পাছে তাহাকে আর দেখিতে না পাই এই ভয়ে পালসা হইতে ৫৬ ক্রোশ তফাতে সিমুলে গ্রামে তাহার বিবাহ দিলাম। ছেলেটিকে কার্তিকের মত দেখিতে। যেমন রং তেমনি চেহারা—খাওয়া পরার সঙ্গতিও তাহারদের ছিল।

একদিন আমাব যেমন অনাদর ও কষ্ট গিয়াছে, কপাল ভাঙিবার পূর্বে বিধাতা কিছুদিনের জন্ত আমাকে তেমনি সুখ দিয়াছিলেন। শেষাংশে আমার স্বামী আমাকে বড়ই আদর ও শ্রদ্ধা করিতেন, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোনো কাজই করিতেন না। এত সৌভাগ্য আমাব সহিবে কেন? কলেরা হইয়া চারিদিনের ব্যবধানে আমাব ছেলে এবং স্বামী মারা গেলেন। যে ছুঃখ কল্পনা করিলেও অসহ্য বোধ হয় তাহাও যে মাস্তবের সয় ইহাই জানাইবার জন্ত দীর্ঘকাল আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন।

ক্রমেই জামাইয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। স্বন্দর ফুলের মধ্যে যে এমন কাল সাপ লুকাইয়া থাকে তাহা কে মনে করিতে পারে? সে যে কুসংসর্গে পড়িয়া নেশা ধরিয়াছিল তাহা আমার মেয়েও কোন দিন আমাকে বলে

নাই। জামাই যখন তখন আসিয়া নানা অভাব জানাইয়া আমার কাছে টাকা চাহিয়া লইয়া যাইত। সংসারে আমার ত আর কাহারও জন্ত টাকা জমাইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না তাই জামাই যখন আবদার করিয়া আমার কাছ হইতে কিছু চাহিত সে আমার ভালই লাগিত। মাঝে মাঝে আমার মেয়ে আমাকে বারণ করিত—আমাকে ভৎসনা করিয়া বলিত, তুমি অমূল্য করিয়া উহাকে টাকা দিয়া উহার অভ্যাস ধারাপ করিয়া দিতেছ—টাকা হাতে পাইলেই উনি কোথায় যে কেমন করিয়া উড়াইয়া দেন তাহার ঠিকানা নাই।—আমি ভাবিতাম তাহার স্বামী আমার কাছে এমন করিয়া টাকা লইলে তাহার শ্বশুরকূলের অগৌরব হইবে এই ভয়েই বুঝি মনোরমা আমাকে টাকা দিতে নিষেধ করে।

তখন আমার এমন বুদ্ধি হইল আমি আমার মেয়েকে লুকাইয়া জামাইকে নেশার কড়ি জোগাইতে লাগিলাম। মনোরমা যখন তাহা জানিতে পারিল তখন সে একদিন আমার কাছে আসিয়া কাদিয়া তাহার স্বামীর কলঙ্কের কথা সমস্ত জানাইয়া দিল। তখন আমি কপাল চাপড়াইয়া মরি! ছুঃখের কথা কি আর বলিব আমার একজন দেওরই কুসঙ্গ এবং কুবুদ্ধি দিয়া আমার জামাইয়ের মাথা পাইয়াছে।

টাকা দেওয়া যখন বন্ধ করিলাম এবং জামাই যখন সন্দেহ করিল যে, আমার মেয়েই আমাকে নিষেধ করিয়াছে তখন তাহার আব কোনো আবরণ রহিল না। তখন সে এত অত্যাচার আরম্ভ করিল, আমার মেয়েকে পৃথিবীর লোকের সামনে এমন করিয়া অপমান করিতে লাগিল যে তাহাই নিবারণ করিবার জন্ত আবার আমি আমার মেয়েকে লুকাইয়া তাহাকে টাকা দিতে লাগিলাম। জানিতাম আমি তাহাকে রসাতলে দিতেছি কিন্তু মনোরমাকে সে অসহ্য পীড়ন করিতেছে এ সংবাদ পাইলে আমি কোনোমতে স্থির থাকিতে পারিতাম না।

অবশেষে একদিন—সে দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। মাঘ মাসের শেষাংশে, সে বছর সকাল সকাল গরম পড়িয়াছে; আমরা বলাবলি করিতেছিলাম এরি মধ্যে আমাদের খিড়কির বাগানের গাছগুলো আমের বোলে ভরিয়া গেছে! সেই মাঘের অপরাহ্নে আমাদের দরজাব

কাছে পাক্কী আসিয়া থাকিল। দেখি, মনোরমা হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, “কি মনু, তোদের খবর কি?” মনোরমা হাসি মুখে বলিল, “খবর না থাকলে বুঝি মার বাড়ীতে শুধু শুধু আসতে নেই!”

আমার বেয়ান মন্দলোক ছিলেন না। তিনি আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, বউমা পুত্রসন্তাবিতা, সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাহাব মার কাছে থাকিলেই ভাল। আমি ভাবিলাম সেই কথাটাই বুঝি সত্য। কিন্তু জামাই যে এই অবস্থাতেও মনোরমাকে মারখোব করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বিপৎপাতের আশঙ্কাতেই বেয়ান তাহার পুত্রবধূকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। মনু এবং তাহার শাশুড়ীতে মিলিয়া আমাকে এমন কবিরায়ী ভুলাইয়া বাধিল। মেয়েকে আমি নিজের হাতে তেল মাখাইয়া স্নান করাইতে চাহিলে মনোরমা নানা ছুতার কাটাইয়া দিত;—তাহার কোমল অঙ্গে যে সব আঘাতের দাগ পড়িয়াছিল সে তাহা তাহার মায়ের দৃষ্টির কাছেও প্রকাশ করিতে চাহে নাই।

জামাই মাঝে মাঝে আসিয়া মনোরমাকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত গোলমাল করিত। মেয়ে আমার কাছে থাকিতে টাকার আবদার করিতে তাহার ব্যাঘাত ঘটত। ক্রমে সে বাধাও আর সে মানিল না। টাকার জন্ত মনোরমার সামনেই আমার প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। মনোরমা ক্ষেদ করিয়া বলিত কোনোমতেই টাকা দিতে পারিবে না—কিন্তু আমার বড় দুর্বল মন, পাছে জামাই আমার মেয়ের উপর অত্যন্ত বেশি বিরক্ত হইয়া উঠে এই ভয়ে আমি তাহাকে কিছু না দিয়া থাকিতে পারিতাম না।

মনোরমা একদিন বলিল, মা, তোমার টাকা কড়ি সমস্ত আমিই বাধিব। বলিয়া আমার চাবি ও বাক্স সব দখল করিয়া বলিল। জামাই আসিয়া যখন আমার কাছে আর টাকা পাইবার সুবিধা দেখিল না এবং যখন মনোরমাকে কিছুতেই নব্বন করিতে পারিল না—তখন স্ত্রীর ধরিল মেজবোকে বাড়িতে লইয়া যাইব। আমি মনোরমাকে বলিতাম, দে, মা, ওকে কিছু টাকা দিইয়া বিদায় করে দে,

—নইলে ও কি কবে বসে কে জানে। কিন্তু আমার মনোরমা একদিকে যেমন নরম আব একদিকে তেমনি শক্ত ছিল। সে বলিত, না, টাকা কোনোমতেই দেওয়া হবে না।

জামাই একদিন আসিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ কবিরায় বলিল—কাল আমি বিকাল বেলা পাক্কী পাঠাইয়া দেব। বোকে যদি ছেড়ে না দাও তবে ভাল হবে না, বলে রাখছি।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে পাক্কী আসিলে আমি মনোরমাকে বলিলাম, “মা, আব দেরি করে কাজ নেই, আবাব আস্তে হুণ্ডায় তোমাকে আনবার জন্ত লোক পাঠাব।”

মনোরমা কহিল, আজ থাক, আজ আমার যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না মা, আর দুদিন বাদে আসতে বোলো।

আমি বলিলাম, “মা, পাক্কী ফিরিয়ে দিলে কি আমার ক্ষেপা জামাই রক্ষা রাখবে? কাজ নেই, মনু, তুমি আজই যাও।”

মনু বলিল, না, মা, আজ নয়; আমার স্বস্তব কলকাতায় গিয়েছেন কাস্তনের মাঝামাঝি তিনি ফিরে আসবেন তখন আমি যাব।

আমি তবু বলিলাম, না, কাজ নাই মা।

তখন মনোরমা প্রস্তুত হইতে গেল। আমি তাহার স্বস্তর বাড়ীর চাকর ও পাক্কীর বেহারাদিগকে খাওয়াইবার আয়োজনেই ব্যস্ত রহিলাম। যাইবার আগে একটু যে তাহার কাছে থাকিব, সে দিন যে তাহাকে একটু বিশেষ করিয়া যত্ন করিয়া লইব, নিজের হাতে তাহাকে সাজাইয়া দিব, সে যে খাবার ভালবাসে তাহাই তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়া বিদায় দিব, এমন অবকাশ পাইলাম না। ঠিক পাক্কীতে উঠিবাব আগে আমাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইয়া কহিল “মা আমি তবে চলিলাম।”

সে যে সত্যই চলিল সে কি আমি জানিতাম! সে যাইতে চাহে নাই আমি জোর করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছি—এই দুঃখে বুক আজ পর্যন্ত পুড়িতেছে; সে আর কিছুতেই শীতল হইল না।

সেই রাত্রেই গর্ভপাত হইয়া মনোরমার মৃত্যু হইল এই খবর যখন পাইলাম তাহার পূর্বেই গোপনে তাড়াতাড়ি তাহার লংকার শেষ হইয়া গেছে।

যাহার কিছু বলিবার নাই, কবিবার নাই, ভাবিয়া যাহার কিনারা পাওয়া যায় না, কাঁদিয়া যাহার অন্ত হয় না, সেই হুঃখ যে কি হুঃখ, তাহা তোমরা বুঝিবে না—সে বুঝিয়া কাজ নাই।

আমার ত সবই গেল কিন্তু তবু আপদ চুকিল না। আমাব স্বামীপুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই দেববরা আমার বিষয়ের প্রতি লোভ দিতেছিল। তাহারা জানিত আমাব মৃত্যুর পবে বিষয়সম্পত্তি সমুদয় তাহাদেরই হইবে কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের সবুর সহিতেছিল না। ইহাতে কাহারো দোষ দেওয়া চলে না; সত্যই আমার মত অভাগিনীর বাঁচিয়া থাকাই যে একটা অপরাধ। সংসারে যাহাদের নানা প্রয়োজন আছে, আমাব মত প্রয়োজনহীন লোক বিনাহেতুতে তাহাদের জাধগা জুড়িয়া বাঁচিয়া থাকিলে লোকে সঙ্ক করে কেমন করিয়া!

মনোরমা যত দিন বাঁচিয়াছিল ততদিন আমি দেবরদের কোনো কথায় ভুলি নাই। আমার বিষয়ের অধিকার লইয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের সঙ্গে লড়িয়াছি। আমি যতদিন বাঁচি মনোরমার জন্ত টাকা সঞ্চয় করিয়া তাহাকে দিয়া যাইব এই আমার পণ ছিল। আমি আমার কন্টার জন্ত টাকা জমাইবার চেষ্টা করিতেছি ইহাই আমার দেবরদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাদের মনে হইত আমি তাহাদেরই ধন চুবি কবিতছি। নীলকান্ত বলিয়া কন্টার একজন পুরাতন বিশ্বাসী কর্মচারী ছিল সেই আমাব সহায় ছিল। আমি যদি বা আমাব প্রাপ্য কিছু ছাড়িয়া দিয়া আপসে নিষ্পত্তির চেষ্টা কবিতাম সে কোনোমতেই রাজি হইত না—সে বলিত আমাদের হকের এক পয়সা কে লয় দেখিব! এই হকের লড়াইয়ের মাঝখানেই আমার কন্টার মৃত্যু হইল। তাহার পরদিনেই আমার মেঝেদেবর আসিয়া আমাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন। বলিলেন, বৌদিদি ঈশ্বর তোমার যা অবস্থা কবিলেন তাহাতে তোমার আব সংসারে থাকা উচিত হয় না। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাক তীর্থে গিয়া ধর্মকর্মের মন দাও আমরা তোমার থাকিয়া পরার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

আমি আমাদের গুরুঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। বলিলাম ঠাকুর, অসম্ভব হুঃখের হাত হইতে কি করিয়া

বাঁচিব আমাকে বলিয়া দাও—উঠিতে বসিতে আমার কোথাও কোনো সাহায্য নাই—আমি যেন বেড়া-আঙনের মধ্যে পড়িয়াছি, যেখানেই যাই, যেদিকেই ফিবি, কোথাও আমাব যন্ত্রণাব এতটুকু অবসানের পথ দেখিতে পাই না।

গুরু আমাকে আমাদের ঠাকুর ঘবে লইয়া গিয়া কহিলেন, এই গোপীবল্লভই তোমার স্বামী পুত্র কন্টা সবই। ইহার সেবা কবিয়াই তোমার সমস্ত শুল্ল পূর্ণ হইবে।

আমি দিনরাত ঠাকুরঘরেই পড়িয়া বহিলাম। ঠাকুরকেই সমস্ত মন দিবার চেষ্টা কবিতো লাগিলাম—কিন্তু তিনি নিজে না লইলে আমি দিব কেমন করিয়া? তিনি লইলেন কই?

নীলকান্তকে ডাকিয়া কহিলাম, নীলদাদা, আমার জীবনস্বত্ব আমি দেবরদেরই লিখিয়া দিব স্থির কবিয়াছি। তাহাবা খোবাকীবাবদ মাসে মাসে কিছু কবিয়া টাকা দিবে।

নীলকান্ত কহিল, সে কখনো হইতেই পাবে না। তুমি মেয়েমানুষ এ সব কথায় থাকিয়ো না।

আমি বলিলাম, আমার আর সম্পত্তিতে প্রয়োজন কি?

নীলকান্ত কহিল, তা বলিলে কি হয়! আমাদের যা হক তাহা ছাড়িব কেন? এমন পাগলামি কবিয়ো না।

নীলকান্ত হকের চেয়ে বড় আব কিছুই দেখিতে পায় না। আমি বড় মুস্তিলেই পড়িলাম। বিষয় কর্ম আমার কাছে বিষের মত ঠেকিতেছে;—কিন্তু জগতে আমাব ঐ একমাত্র বিশ্বাসী নীলকান্তই আছে তাহার মনে আমি কষ্ট দিই কি কবিয়া! সে যে বহু হুঃখে আমার ঐ এক ‘হক’ বাঁচাইয়া আসিয়াছে।

শেষকালে একদিন নীলকান্তকে গোপন করিয়া একখানা কাগজে সহি দিলাম। তাহাতে কি যে লেখা ছিল তাহা ভাল কবিয়া বুঝিয়া দেখি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার সহি করিতে ভয় কি—আমি এমন কি রাখিতে চাই যাহা আব কেহ ঠকাইয়া লইলে সহ্য হইবে না। সবইত আমাব স্বত্ত্বের, তাহাব ছেলেরা পাইবে পাক।

লেখাপড়া রেজেষ্ট্রী হইয়া গেলে আমি নীলকান্তকে

ডাকিয়া কহিলাম, নীলুদাদা, রাগ করিয়ো না, আমাব যাহা কিছু ছিল লিখিয়া পড়িয়া দিয়াছি, আমাব কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

নীলকান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিল, আঁ, করিয়াছ কি !

যখন দলিলেব খসড়া পড়িয়া দেখিল সত্যি আমি আমার সমস্ত স্বত্বভাগ কবিয়াছি তখন নীলকান্তের ক্রোধের সীমা বহিল না। তাহাব প্রভুৰ মৃত্যুর পব হইতে আমার ঐ 'হক্' বাচানোই তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তাহার সমস্ত বুদ্ধি সমস্ত শক্তি ইহাতেই অবিশ্রাম নিযুক্ত ছিল। এ লইয়া মামলা মকদ্দমা, উকীল-বাড়ি হাঁটাইটি, আইন খুঁজিয়া বাহির করা ইহাতেই সে স্নখ পাইয়াছে—এমন কি, তাহার নিজের ঘরের কাজ দেখিবাবও সময় ছিল না। সেই হক্ যখন নির্দোষ মেয়েমানুষেব কলমের এক আঁচড়েই উড়িয়া গেল তখন নীলকান্তকে শাস্ত কবা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সে কহিল, যাক্ এধানকাব সঙ্গে আমার সমস্ত সঞ্চয় টুকিল, আমি চলিলাম।

অবশেষে নীলুদাদা এমন করিয়া রাগ করিয়া আমার কাছ হইতে বিদায় হইয়া যাইবে স্বপ্নরবাড়ির ভাগ্যে এই কি আমার শেষ লিখন ছিল। আমি তাহাকে অনেক মিনতি করিয়া ডাকিয়া বলিলাম. দাদা, আমার উপব রাগ করিও না। আমার কিছু জমানো টাকা আছে তাহা হইতে তোমাকে এই পাঁচশো টাকা দিতেছি—তোমার ছেলেব বৌ বেদিন আসিবে সেইদিন আমার আশীর্বাদ জানাইয়া এই টাকা হইতে তাহাব গহনা গড়াইয়া দিয়ো।

নীলকান্ত কহিল, আমার আর টাকায় প্রয়োজন নাই। আমাব মনিবেব সবই যখন গেল তখন ও পাঁচশো টাকা লইয়া আমাব স্নখ হইবে না। ও থাক্ !

এই বলিয়া আমার স্বামীৰ শেষ অকৃত্রিম বদ্ধ আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আমি ঠাকুবঘরে আশ্রয় লইলাম। আমার দেবববা বলিল, তুমি তীর্থবাসে যাও।

আমি কহিলাম আমার স্বপ্নবেব ভিটাই আমার তীর্থ, আর আমার ঠাকুর যেখানে আছে সেখানেই আমার আশ্রয়।

কিন্তু আমি যে-বাড়ীৰ কোনো অংশ অধিকার কবিয়া থাকি তাহাও তাহাদেব পক্ষে অসম্ভব হইতে লাগিল। তাহারা ইতিমধ্যেই আমাদের বাড়ীতে জিনিষপত্র আনিয়া কোন্ ঘর কে কিভাবে ব্যবহার কবিবে তাহা সমস্তই ঠিক করিয়া লইয়াছিল। শেষকালে তাহারা বলিল তোমাব ঠাকুর তুমি লইয়া যাইতে পার আমবা তাহাতে আপত্তি করিব না।

যখন তাহাতেও আমি সন্তোচ করিতে লাগিলাম তখন তাহারা কহিল, এখানে তোমাব খাওয়া পরা চলিবে কি করিয়া ?

আমি বলিলাম—কেন, তোমরা যা ধোরাকী বরাদ্দ করিয়াছ তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে।

তাহারা কহিল, কই ধোবাকির ত কোনো কথা নাই !

তাহাব পর আমাব ঠাকুব লইয়া আমার বিবাহের ঠিক চউত্রিশ বৎসর পবে একদিন স্বপ্নর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নীলুদাদাব সন্ধান লইতে গিয়া শুনিলাম তিনি আমার পূর্বেই বৃন্দাবনে চলিয়া গেছেন।

গ্রামের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আমি কান্নিতে গেলাম। কিন্তু পাপমনে কোথাও শাস্তি পাইলাম না। ঠাকুবকে প্রতিদিন ডাকিয়া বলি, ঠাকুর, আমার স্বামী আমাব ছেলে-মেয়ে আমাব কাছে যেমন সত্য ছিল তুমি আমার কাছে তেমনি সত্য হয়ে ওঠ!—কিন্তু কই, তিনি ত আমার প্রার্থনা শুনিলেন না ! আমাব বুক যে জুড়োয় না, আমার সমস্ত শবীর মন যে কাঁদিতে থাকে ! বাপ্প্রে বাপ ! মানুষের প্রাণ কি কঠিন !

সেই আটবৎসব বয়সে স্বপ্নর বাড়ী গিয়াছি তাহাব পরে একদিনেব জন্তুও বাপের বাড়ী আসিতে পাই নাই। তোমাব মায়ের বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্ত অনেক চেষ্টা কবিয়াছিলাম, কোনো ফল হয় নাই। তাহাব পর বাবাব চিঠিতে তোমাদেব জন্মের সংবাদ পাইলাম, আমার বোনের মৃত্যুসংবাদও পাইয়াছি। মায়ের কোলছাড়া তোদের যে আমার কোলে টানিৰ ঈশ্বর, এপর্যন্ত এমন স্নযোগ ঘটান নাই।

তীর্থে যুবিয়া যখন দেখিলাম মায়্য এখনো মন ভবিয়া আছে, কোনো একটা বৃকের জিনিষকে পাইবার জন্ত

বুকের তৃষ্ণা এখনো মবে নাই—তখন তোদের খোঁজ করিতে লাগিলাম। শুনিয়াছিলাম তোদের বাপ ধর্ম ছাড়িয়া সমাজ ছাড়িয়া বাহিব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তা কি করিব! তোদের মা যে আমার এক মায়ের পেটের বোন।

কানীতে এক ভদ্রলোকের কাছে তোমাদের খোঁজ পাইয়া এখানে আসিয়াছি। পবেশ বাবু শুনিয়াছি ঠাকুর দেবতা মানেন না, কিন্তু ঠাকুর যে উহার প্রতি প্রসন্ন সে উহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। ঠাকুর পূজা পাইলেই ভোলেন না, সে আমি খুব জানি—পরেশ বাবু কেমন করিয়া তাঁহাকে বশ করিলেন সেই খবর আমি লইব। যাই হোক বাছা, একলা থাকিবার সময় এখনো আমাব হয় নাই—সে আমি পারি না—ঠাকুর যেদিন দয়া করেন করিবেন, কিন্তু তোমাদের কোলেব কাছে না রাখিয়া আমি বাঁচিব না।

৩৯

পবেশ বরদাসুন্দরীর অসুপস্থিতিকালে হরিমোহিনীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ছাতের উপরকার নিভৃত ঘবে তাঁহাকে স্থান দিয়া যাহাতে তাঁহাব আচার বক্ষা করিয়া চলার কোনো বিঘ্ন না ঘটে তাহাব সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বরদাসুন্দরী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ঘর কন্নার মধ্যে এই একটি অভাবনীয় প্রাচুর্য্য দেখিয়া একেবারে হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। তিনি পরেশকে খুব তীব্র স্বরেই কহিলেন, এ আমি পারব না।

পরেশ কহিলেন, তুমি আমাদের সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারচ এবং ঐ একটি বিধবা অনাথাকে সহিতে পারবে না?

বরদাসুন্দরী জানিতেন পবেশের কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্র নাই, সংসারে কিসে স্তুবিধা ঘটে বা অস্তুবিধা ঘটে সে সম্বন্ধে তিনি কোনো দিন বিবেচনা মাত্র করেন না; হঠাৎ এক একটা কাণ্ড করিয়া বসেন। তাহার পবে বাগই করো, বকো আর কাঁদো একেবারে পাবাণের মূর্তির মত স্থির হইয়া থাকেন। এমন লোকের সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে বল! প্রয়োজন হইলে যাহার সঙ্গে ঝগড়া করাও অসম্ভব তাঁহার সঙ্গে ঘর করিতে কোন জীলোকে পারে!

সুচরিতা মনোবমার প্রায় একবয়সী ছিল। হরিমোহিনীর মনে হইতে লাগিল সুচরিতাকে দেখিতেও যেন অনেকটা সেই মনোরমাবই মত; আর স্বভাবটিও তাহার সঙ্গে মিলিয়াছে। তেমনি শাস্ত অথচ তেমনি দৃঢ়। হঠাৎ পিছন হইতে তাহাকে দেখিয়া এক এক সময়ে হরিমোহিনীর বুকের ভিতরটা যেন চমকিয়া উঠে। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকাবে তিনি একলা বসিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছেন এমন সময় সুচরিতা কাছে আসিলে চোখ বুজিয়া তাহাকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন “আহা আমার মনে হচে যেন আমি তাকেই বুকের মধ্যে পেয়েছি। সে যেতে চায়নি আমি তাকে জোর করে বিদায় কবে দিয়েছি, জগৎ সংসারে কি কোনো দিন কোনো মতেই আমার সে শাস্তির অবসান হবে না! দণ্ড যা পাবার তা পেয়েছি—এবার সে এসেছে; এই যে ফিরে এসেছে; তেমনি হাসিমুখ কবে ফিরে এসেছে; এই যে আমার মা, এই যে আমার মণি, আমাব ধন!” এই বলিয়া সুচরিতার সমস্ত মুখে হাত বুলাইয়া তাহার চুমো খাইয়া চোখের জলে ভাসিতে থাকিতেন; সুচরিতারও দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িত। সে তাঁহাব গলা জড়াইয়া বলিত, “মাসি, আমিও ত মায়ের আদর বেশি দিন ভোগ করতে পারিনি; আজ আমার সেই হারানো মা ফিরে এসেচেন! কতদিন কত দুঃখের সময় যখন ঈশ্বরকে ডাকবার শক্তি ছিল না, যখন মনের ভিতরটা শুকিয়ে গিয়াছিল, তখন আমার মাকে ডেকেছি। সেই মা আজ আমার ডাক শুনে এসেচেন।”

হরিমোহিনী বলিতেন “অমন করে বলিসনে, বলিসনে! তোর কথা শুনে আমাব এত আনন্দ হয় যে আমার ভয় করতে থাকে! হে ঠাকুর, দৃষ্টি দিয়ো না ঠাকুর। আর মায়া কবব না মনে করি—মনটাকে পাবাণ করেই থাকতে চাই কিন্তু পারি নে যে! আমি বড় দুর্বল, আমাকে দয়া কব, আমাকে আর মেয়ো না। ওরে রাধারানী, যা, যা, আমার কাছ থেকে ছেড়ে যা! আমাকে আর জড়াসনে, জড়াসনে! ও আমার গোপীবল্লভ, আমাব জীবননাথ, আমার গোপাল, আমার নীলমণি, আমাকে এ আবার কি বিপদে ফেল্চ!”

সুচরিতা কহিত, “আমাকে তুমি জোর করে বিদায়

করতে পারবে না মাসি ! আমি তোমাকে কখনো ছাড়ব না—আমি বরাবর তোমার এই কাছেই রইলুম !” বলিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া শিশু বসন্ত চূপ করিয়া থাকিত ।

দুই দিনের মধ্যেই সূচরিতার সঙ্গে তাহার মাসির এমন একটা গভীর সম্বন্ধ বাড়িয়া গেল যে ক্ষুদ্র কালের দ্বারা তাহার পরিমাপ হইতে পারে না ।

বরদাসুন্দরী ইহাতেও বিরক্ত হইয়া গেলেন । “মেয়েটার রকম দেখ ! যেন আমরা কোনো দিন উঠাব কোনো আমরা যত্ন করি নাই ! বলি, এত দিন মাসি ছিলেন কোথায় ! ছোটো বেলা হইতে আমরা যে এত কবিতা মানুষ কবিতাম আর আজ মাসি বলিতেই একেবারে অজ্ঞান । আমি কৰ্ত্তাকে বরাবর বলিয়া আসিয়াছি ঐ যে সূচবিতাকে তোমরা সবাই ভাল ভাল কর ও কেবল বাহিরে ভাল মানুষী করে কিন্তু উহার মন পাবাব জো নাই । আমরা এতদিন উহার যা করিয়াছি সব বুধাই হইয়াছে !”

পরেণ যে বরদাসুন্দরীর দবদ বুঝিবেন না তাহা তিনি জানিতেন । শুধু তাই নহে হরিমোহিনীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি যে পবেশেব কাছে খাটো হইয়া যাইবেন ইহাতেও তাঁহার সন্দেহ ছিল না । সেই জন্তই তাঁর রাগ আরো বাড়িয়া উঠিল । পরেশ বাহাই বলুন কিন্তু অধিকাংশ বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গেই যে বরদাসুন্দরীর মত মেলে ইহাই প্রমাণ করিবার জন্ত তিনি দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের সমাজের প্রধান অপ্রধান সকল লোকের কাছেই হরিমোহিনীর ব্যাপার লইয়া সমালোচনা যুড়িয়া দিলেন । হরিমোহিনীর হিঁচুমানি, তাঁহার ঠাকুর পূজা, বাড়িতে ছেলে মেয়ের কাছে তাঁহার কুদৃষ্টান্ত, ইহা লইয়া তাঁহার আক্ষেপ অভিযোগেব অন্ত রহিল না ।

শুধু লোকের কাছে অভিযোগ নহে, বরদাসুন্দরী সকল প্রকারে হরিমোহিনীর অসুবিধা ঘটাইতে লাগিলেন । হরিমোহিনীর রন্ধনাদির জল তুলিয়া দিবাব জন্ত যে একজন গোয়ালী বেহারী ছিল তাহাকে তিনি ঠিক সময় বুঝিয়া অত্র কাজে নিযুক্ত করিয়া দিতেন । সে সম্বন্ধে কোনো কথা উঠিলে বলিতেন, “কেন, রামদীন আছে ত ?” রামদীন জাতে দোসাদ ; তিনি জানিতেন তাহার হাতের

জল হরিমোহিনী ব্যবহার করিবেন না । সে কথা কেহ বলিলে বলিতেন—“অত বামনাই করতে চান ত আমাদের ব্রাহ্ম বাড়িতে এলেন . কেন ? আমাদের এখানে ও সমস্ত জাতের বিচার করা চলবে না । আমি কোন মতেই এতে প্রস্রয় দেব না ।” এইরূপ উপলক্ষ্যে তাঁহার কৰ্ত্তব্যবোধ অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিত । তিনি বলিতেন ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে সামাজিক শৈথিল্য অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেছে ; এই জন্তই ব্রাহ্মসমাজ যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করিতে পারিতেছে না । তাঁহার সাধ্যমত তিনি এরূপ শৈথিল্যে যোগ দিতে পারিবেন না । না কিছুতেই না ! ইহাতে যদি কেহ তাঁহাকে ভুল বোঝে তবে সেও স্বীকার, যদি আত্মীয়েরাও বিরুদ্ধ হইয়া উঠে তবে সেও তিনি মাথা পাতিয়া লইবেন । পৃথিবীতে মহাপুরুষেবা যাহারা কোনো মহৎ কৰ্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই যে নিন্দা ও বিরোধ সহ্য করিতে হইয়াছে সেই কথাই তিনি সকলকে স্মরণ করাইতে লাগিলেন ।

কোনো অসুবিধায় হরিমোহিনীকে পরাস্ত করিতে পারিত না । তিনি ক্রুদ্ধসাধনের চূড়ান্ত সীমায় উঠিবেন বলিয়াই যেন পণ করিয়াছিলেন । তিনি অন্তরে যে অসহ্য দুঃখ পাইয়াছেন বাহিরেও যেন তাহার সহিত ছন্দরক্ষা করিবার জন্ত কঠোর আচারের দ্বারা অহরহু কষ্ট স্বজন করিয়া চলিতেছিলেন । এইরূপে দুঃখকে নিজের ইচ্ছার দ্বারা বরণ করিয়া তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইয়া তাহাকে বশ করিবার এই সাধনা ।

হরিমোহিনী যখন দেখিলেন জলের অসুবিধা হইতেছে তখন তিনি রন্ধন একেবারে ছাড়িয়া দিলেন । তাঁহার ঠাকুরেব কাছে নিবেদন করিয়া প্রসাদ স্বরূপে দুধ এবং ফল পাইয়া কাটাইতে লাগিলেন । সূচবিতা ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইল । মাসি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন “মা, এ আমার বড় ভাল হয়েছে । এই আমার প্রয়োজন ছিল । এতে আমার কোনো কষ্ট নেই, আমার আনন্দই হয় !”

সূচবিতা কহিল, “মাসি আমি যদি অন্তর্জাতের হাতে জল বা খাবার না খাই তাহলে তুমি আমাকে তোমার কাজ করিতে দেবে ?”

হরিমোহিনী কহিলেন—“কেন মা, তুমি যে ধর্ম মান সেই মতেই তুমি চল—আমার অন্তে তোমাকে অন্ত পথে যেতে হবে না। আমি তোমাকে কাছে পেয়েছি, বুকে রাখছি, প্রতিদিন দেখতে পাই এই আমার আনন্দ। পবেশ বাবু তোমার গুরু তোমার বাপের মত, তিনি তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তুমি সেই মেনে চল, তাতেই ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।”

হরিমোহিনী বরদাসুন্দরীর সমস্ত উপদ্রব এমন কবিতা সহিতে লাগিলেন যেন তিনি তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পবেশবাবু যখন প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে স্নিগ্ধাঙ্গা করিতেন কেমন আছেন, কোনো অসুবিধা হইতেছে না ত, —তিনি বলিতেন আমি খুব সুখে আছি।

কিন্তু বরদাসুন্দরীর সমস্ত অন্তায় সূচরিতাকে প্রতি-মুহূর্তে জর্জরিত কবিতো লাগিল। সে ত নাশিশ করিবার মেয়ে নয়; বিশেষত পরেশবাবুর কাছে বরদাসুন্দরীর ব্যবহারের কথা বলা তাহার ছাড়া কোনোমতেই ঘটিতে পারে না। সে নিঃশব্দে সমস্ত সহ্য করিতে লাগিল—এসময়ে কোনোপ্রকার আক্ষেপ প্রকাশ করিতেও তাহার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইত।

ইহার ফল হইল এই যে, সূচরিতা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবেই তাহাব মাসির কাছে আসিয়া পড়িল। মাসির বাববার নিবেদন সঙ্কট ও আহার পান সম্বন্ধে সে তাহারই সম্পূর্ণ অনুবর্তী হইয়া চলিতে লাগিল। শেষকালে সূচরিতার কষ্ট হইতেছে দেখিয়া দ্বায়ে পড়িয়া হরিমোহিনীকে পুনরায় রক্ষনাদিতে মন দিতে হইল। সূচরিতা কহিল, “মাসি, তুমি আমাকে যেমন করে থাকিতে বল আমি তেমনি কবেই থাকিব কিন্তু তোমার জল আমি নিজে তুলে দেব, সে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।”

হরিমোহিনী কহিলেন, “মা তুমি কিছু মনে কোনোনা কিন্তু ঐ জলে যে আমার ঠাকুরের ভোগ হয়।”

সূচরিতা কহিল—“মাসি, তোমার ঠাকুরও কি জ্ঞাত মানেন, তাঁকেও কি পাপ লাগে? তাঁরও কি সমাজ আছে না কি?”

অবশেষে একদিন সূচরিতাব নিষ্ঠাব কাছে হরিমোহিনীকে হার মানিতে হইল। সূচরিতার সেবা তিনি

সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিলেন। সতীশও দিদির অনুকবণে মাসির রান্না খাইব বলিয়া ধরিয়া পড়িল। এমন করিয়া এই তিনটিতে মিলিয়া পরেশবাবুর ঘরের কোণে আর একটি ছোট সংসার জমিয়া উঠিল। কেবল ললিতা এই ছোট সংসারের মাঝখানে সেতুস্বরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। বরদাসুন্দরী তাহার আর কোনো মেয়েকে এদিকে ঘেসিতে দিতেন না—কিন্তু ললিতাকে নিবেদন কবিতা পারিয়া উঠিবার শক্তি তাহার ছিল না।

ব্রাইটন্ ।

“এবার গ্রীষ্মে কোথায় যাইতেছ?”

“সমুদ্রতীরে।”

“কোথা?”

“ব্রাইটন্।”

“ব্রাইটন্? ছি! গ্রীষ্মকালে ব্রাইটন্? গ্রীষ্মকালে টম্ ব্রাইটনে যায়, ডিক্ যায়, হ্যারি যায়;—যাইও না। শীতকালে যাইও। শীতকালেই ব্রাইটন্ কেশানেবল। বোর্মাউথ্ যাইতে পার,—টব্-কী যাইতে পার;—ব্রাইটনে যাইও না।”

একদিন অপরাহ্নে, টেম্পে, ফাউন্টেন কোর্টেব নিকট দাঁড়াইয়া একজন সহপাঠীর সহিত আমাব পূর্বোক্ত প্রকার কথাবার্তা হইতেছিল। বন্ধু যাহাই বলুন, মাস ছই ব্রাইটনে গিয়া অবস্থিতি করিব স্থির করিয়াছি। তাহার বিশিষ্ট কারণও আছে।

আগষ্ট মাস,—অসহ্য গরম পড়িয়াছে। রাত্রে দুই-থানাব বেশী কম্বল আর গায়ে সহ্য না। এমন কি, কোন কোন রাত্রিতে, শয়ন কক্ষের জানালা একইক্ষি ফাঁক করিয়া রাখিতে হয়। প্রসিদ্ধ হান্তরসিক মার্ক টোয়েন ভাবতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের শীত ও গ্রীষ্মের তুলনায় সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—“ভারতবর্ষে শীত ও গ্রীষ্মেব তফাৎ এই যে, গৃহদ্বারলগ্ন পিতলের হাণ্ডেলগুলি গ্রীষ্মকালে গলিয়া যায়, শীতকালে গলে না।”—আমি কিন্তু বিশাখী গ্রীষ্মেব বর্ণনায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করি নাই। জুন জুলাই মাসেও রাত্রে অন্ততঃ

ছইখানা কঞ্চল গায়ে দিতে হয়। ফ্ল্যানেলটা সে দেশে গ্রীষ্মকালেব পোষাক বলিয়াই গণ্য। শব্দা জিনের পোষাক প্রভৃতি সেখানে কেহ চক্ষেও দেখে নাই। তবে ভরপুর গ্রীষ্মের সময় ছই চারিদিন দিবাভাগে মনে হয় বটে টানাপাখার বন্দোবস্ত থাকিলে মন্দ হইত না। মোটা গবম কাপড়ে আবৃত ছইচারি জন অতি সাবধানী লোকের কোন কোন বৎসর সন্ধিগর্হিও উপস্থিত হয়। তখন রয়টাব পৃথিবীময় সে ছঃসংবাদ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলেন।

অনেক দিন ধরিয়া লণ্ডনে বাস করিলে, প্রাপটা মুক্ত বায়ুব জন্ত হাঁফাইয়া উঠে। লণ্ডনের বায়ুর অবিভক্ততাই বোধ করি ইহার প্রধান কাৰণ। এত জনাকীর্ণ নগর ত আর পৃথিবীতে নাই। মনে আছে, বাল্যকালে যাত্রায় একটা প্রহসন দেখিয়াছিলাম,—“একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব।”—সাহেব সত্ত্ব প্রত্যাগত। একজন জিজ্ঞাসা করিল,—“লণ্ডন কি কলিকাতার মত এত বড় সহর হইবে?” সাহেব অবজ্ঞাব হাসি হাসিয়া বলিলেন—“একুপ দশটা বারোটা কলিকাটা সহর একটুটো করিলে যট বড় হয়, লণ্ডন সহর টট বড়।”—দশটা বারোটা না হউক, চারি পাঁচটা বটে। যট লক্ষ মানুষের নিশ্বাস, আর না জানি কত লক্ষ চিমনীর ধূম,—ইহাতেই বায়ু ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে আমাদের দেশে জনাকীর্ণ বড় বড় নগরে স্থানে স্থানে বেক্রপ জুগুৎ হয়, সেক্রপ কিন্তু লণ্ডনে কোথাও দেখা যায় না—পরিচ্ছন্ন-তাৰ বন্দোবস্ত এতই চমৎকার।

শুধু শারীরিক অবসাদ নহে, লণ্ডনে অধিক দিন থাকিলে মানসিক অবসাদও উপস্থিত হয়। পথে বাহির হইলেই বিনা প্রয়োজনে নানা কারণে অনিচ্ছায় মস্তিষ্ক চালিত হইতে থাকে। একটা মাত্র উদাহরণ দিতেছি। মনে করুন প্রতিদিন সহবসয় ভিত্তিগাত্রে যত নূতন নূতন বিজ্ঞাপনের প্ল্যাকার্ড নয়নপথে পতিত হয়, বিনা আগ্রহেও তাহার যতগুলি শব্দ মস্তিষ্কমধ্যে প্রবেশ করে, দিনান্তে তাহার বোগফল হিসাব কবিবাব উপায় থাকিলে দেখা যাইত যেন একখনি ছোটখাট গ্রন্থ পাঠ হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক অনেক সময় লণ্ডনে আমার এক্রপ মনে হইয়াছে,

যদি এমন স্থানে যাইতে পারি যেখানে দেওয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন নাই, তবে প্রকৃত বিশ্রামলাভ হয়।

কিছু দিন সমুদ্রতীরে যাপন করিতে হইবে, অথচ অধিক ব্যয় হইবে না, এই প্রকার একটি স্থানেব অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলাম। স্থানটি ভাল হইবে, ব্যয় অল্প হইবে, অথচ সস্তা বোর্ডিং হাউসে টম-ডিক-হারিষ সহবাস করিতে হইবে না, শিক্ষিত ভদ্র সমাজের লোকের সহিত থাকিব,—এমন একটি ব্রাহ্মণের গোক পাই কোথায়? ইহা শুনিয়া বন্ধুবর প্রা—মহাশয় সন্ধান বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—“ব্যান্টিষ্ট সম্প্রদায়, বিখ্যাত ধর্মযাজক ডাক্তার স্পার্ক্সনের স্মৃতি রক্ষার্থ, ব্রাইটনে ঠিক সমুদ্রের উপর একটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, তাঁহাদের ধর্মযাজকগণ সেখানে গিয়া অবসর সময়ে বিশ্রাম লাভ করিবেন। প্রথম প্রথম ধর্মযাজক ও তাঁহাদের পরিজন ভিন্ন সেখানে অন্ত কেহ স্থান পাইত না। ক্রমে তাঁহারা দেখিলেন, যথেষ্ট লোক না হওয়াতে ঘর থানি পড়িয়া থাকে এবং শরঙ্গমৌ খরচ পোষায় না। সেই অবধি তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন, স্থান থাকিলে, বন্ধুবান্ধব কর্তৃক পরিচিত বাহিরের ভদ্রলোককেও লওয়া যাইতে পারে। আমি সে স্থানে কিছু দিন ছিলাম। উত্তম বন্দোবস্ত—সপ্তাহে পচিশ শিলিং মাত্র (১৮৮০) লাগিবে। আমি পত্র লিখিয়া আপনার জন্ত ঠিক করিতেছি।”

বন্ধুবর পত্র লিখিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দিলেন। তৎকালকার Lady Superintendent এর নিকট হইতেও পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, ষ্টেশনে নামিয়া Kemp Town অঙ্কিত সবুজ রঙের ‘অমনিবসে’ আবেহণ করিয়া শেষ পর্যন্ত আসিলে, বাড়ীর অন্ন দূরেই নামা যাইবে। পত্র মধ্যে তিনি একখানি ‘পাস’ পাঠাইয়া দিয়াছেন; টিকেট কিনিবার সময় সেখানি দেখাইলে, “কনসেসন” মূল্যে যাতায়াতের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট পাওয়া যাইবে।

এমন সুযোগ কে পরিত্যাগ করে? তাই গ্রীষ্মকালে ব্রাইটন “ফেশানেবল” না হইলেও আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে একদিন আমার বৃহৎ গ্যাড্‌স্টোন ব্যাগটিতে জব্যাদি বোঝাই করিয়া ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিলাম। ব্রাইটন, লণ্ডনের ৫০ মাইল দক্ষিণে। ট্রেন থানি “ব্রাইটন এক্সপ্রেস”

—কোথাও না দাঁড়াইয়া একেবারে ব্রাইটনে গিয়া উপস্থিত হইল। বিলাতে দূরগামী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি বেশ আবামদায়ক। পবিত্রাব পবিচ্ছন্ন বড় বড় কামবা, সুশ্রী গদী মোড়া। সে দেশের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া এ দেশের প্রথম শ্রেণীর ভাড়াবই তুল্য। কিন্তু সে দেশের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া এ দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর সমান।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া নানাবর্ণের অমনবস দেখিলাম। সবুজ একখানিতে আরোহণ করিয়া, দুই পেনি মূল্যে শেষ অবধি টিকিট কিনিলাম।

ব্রাইটনেব ভিতর দিয়া দেখিতে দেখিতে গেলাম। যেন লণ্ডনেবই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ব্রাইটনকে London-Super-mare অর্থাৎ সমুদ্রতীরস্থ লণ্ডন বলে। সেই লণ্ডনেব Salmon and Gluckstein এখানে আসিয়াও তামাকের দোকান খুলিয়াছে। সেই Hope Brothers এর পোষাকের দোকান। লণ্ডনে তাহাদের অসংখ্য শাখা-গুলির বহির্দেশে যেমন হুবহু একই ছাঁচে ঢালা,—এখানেও তাহাই। মাঝে মাঝে পান ও ভোজনশালা। তবে স্নেহের বিষয় দোকান পশারের অংশ বহুবিস্তৃত নহে, শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাল পরে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। সেখানে একটি পোষ্ট-অফিস। পথচারী লোককে পথ প্রিজ্ঞাসী করিতে করিতে Baptist's Homeএ গিয়া উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম বাড়ীটির নাম Arundel House। দক্ষিণ দিকে একটি, পূর্বদিকে একটি প্রবেশ দ্বার। দক্ষিণ দিকের দরজার নিম্নেই রাজপথ—তাহার নিম্নেই সমুদ্র। রাজপথের সমুদ্রের দিকটা রেলিং দেখা। রেলিং নীচে হইতে খানিকদূর অবধি বেলাভূমি (beach) চলিয়া গিয়াছে—তাহার পরে নীলাম্বরশাশি। বাড়ীটি ব্রাইটনের একবারে শেষ ভাগে অবস্থিত। বাড়ীর পূর্বে আর দুই চারি খানি মাত্র বাড়ী—তাহার পবেই বিস্তীর্ণ ময়দান। এই ময়দানেব নাম The Downs—ইহার বর্ণনা William Blackএর কয়েকখানি উপজ্ঞাসে দেখা যায়। সমুদ্রের তীবে তীরে এই মাঠ অনেক দূর অবধি চলিয়া গিয়াছে। মাঠের শেষে একটি গ্রাম—সেই গ্রামে একটি বাড়ীতে

কিছু দিন রাডিসার্ড কিপ্লিং বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার দর্শনলালসায় ব্রাইটন ভ্রমণকাব্যী বহুলোক তাঁহার বাড়ীর কাছে গিয়া জানালা দিয়া উকি মাঝিত, এই কারণে কিপ্লিং “স্থানত্যাগেন” অগ্রজ চলিয়া যান।

ব্যাপ্টিষ্ট্‌স্‌ হোমের যিনি পরিচালয়িত্রী, তাঁহার নাম মিস্‌ বুশ। ইহার কনিষ্ঠা ভগিনী মিসেস্‌ ক্লিকর্ড ইহার সহকারিণী। শেযোক্ত মহিলা, ওয়েষ্টবোর্ণ পার্ক চ্যাপেলের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ভারতবন্ধু ডাক্তার ক্লিকর্ডের বিধবা পুত্রবধূ। দুই বোনে ইহারা অনায়াসে এত বড় গৃহস্থালীটি সুশৃঙ্খলায় পরিচালনা করিতেছেন। একটি দাসী ও দুইটি ভৃত্য আছে। ইহা ছাড়া পাকশালাব পাতালা * কয়জন ছিল অনুসন্ধান করি নাই—সেও দুই তিন জন হইবে।

বাড়ী খানি তিনতাল। নীচের তালায় ভোজনকক্ষ, পাঠাগার, পুরুষগণের স্নানাগার ও দালান। দ্বিতলে ড্রয়িং-রুম ও মহিলাগণের স্নানাগার ছাড়া কতকগুলি শয়নকক্ষ আছে। ত্রিতলের সকলগুলিই শয়নকক্ষ। সর্ব্বমুখ পঁচিশ ত্রিশ জনের স্থান আছে। কতকগুলি single-bed room—অবিবাহিত ব্যক্তিগণের জন্ত। বাকীগুলি double-bed room—বিবাহিত ব্যক্তিগণের জন্ত। শেযোক্ত কক্ষ-গুলি অপেক্ষাকৃত পরিসর, বৃহত্তর পালঙ্কযুক্ত। সে দেশে, (স্বামী জী ভিন্ন) এক বিছানায় দুই জন শয়ন করা দুবের কথা, এক কক্ষে দুই জন শয়ন করার প্রথা নাই। এ দেশে Anglo-Indian সমাজ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন বটে—“একটি বড় শয়নকক্ষ খালি আছে—বিছান্তের আলো ও পাখা—দুই জন বন্ধুর শয়নের উপযুক্ত—ট্রাম হইতে এক মিনিট” ইত্যাদি—কিন্তু বিলাতী কাগজের বিজ্ঞাপনে এরূপ দেখা যায় না। এই স্থানে, সে দেশের শয়নকক্ষ সম্বন্ধে একটা বিশেষ নিয়মের উল্লেখ কবি। কোনও পুরুষের শয়নকক্ষে স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রীলোকের শয়নকক্ষে পুরুষ

* পাতালা বলিলাম ইহার কারণ এই যে বিলাতে অধিকাংশ গৃহের পাকশালা, একতালার নিম্নে হইয়া থাকে। তথায় রাজপথগুলি পার্শ্ববর্তী ভূমি হইতে উঠে। বাড়ীর একতালার অর্থাৎ ground floor রাজপথেরই সমতল। রাজপথ হইতে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, পাকশালার যাইতে হইলে, সোপান অবতরণ করিতে হয়। বাড়ীর দরজার বাহিরে, দক্ষিণে বা বামেও সিঁড়ি থাকে, বাহিরের লোক তাহা দিয়া নামিয়া পাকশালার ঘারে যাইতে পারে। কুটিওয়ালা, দুধওয়ালা, মাংস-ওয়ালা ঘোপান দিবার সময় এই পথ ব্যবহার করে।

প্রবেশ করে না।—আমাদের দেশে, সকলের শয়নকক্ষে বাড়ীর অপর সকলের অবাধ গতি। বউদিদি হয়ত নিজের শয়নঘরে বসিয়া পান সাজিতেছেন, আমি অনায়াসে সেখানে প্রবেশ করিয়া দুইটা পান খাইয়া কিঞ্চিৎ গল্প শুদ্ধব কবিয়া আসিলাম। কিন্তু সেখানে ইহা নিয়মবিরুদ্ধ। ভাই বোনেও পরস্পরের শয়নকক্ষে প্রবেশ কবে না। ভাই হয়ত নিজের শয়নকক্ষে বসিয়া দিবা ভাগে একখানি পত্র লিখিতেছে, সে সময় বোনের যদি কিছু বলিবার কথা থাকিল, সে দ্বাবে আসিয়া আঘাত করিবে, ভাই বাহির হইয়া আসিবে, বোন আপনার বক্তব্য বলিয়া চলিয়া যাইবে। কোনও পুরুষ শয়নকক্ষে থাকিলে, বাড়ীর ঝি মুখ ধুইবার জল অথবা চিঠি অথবা টেলিগ্রাম দ্বারেব বাহিরে রাখিয়া, দ্বারে কবাবাত কবিয়া প্রস্থান কবে।

সাধারণতঃ বিলাতী শয়নকক্ষের আসবাব এই। একটি বস্ত্রাদি বাধিবাব আলমারি অর্থাৎ ওয়ার্ড-বোর্ড—একটি wash-hand stand তাহার উপর মুখ ধুইবার জলের চিলিমচী প্রভৃতি দ্রব্য। পাশে একটি দর্পণসংযুক্ত ডেসিং টেবিল। একটি ছোট লিখিবার টেবিল, খান দুই চেয়ার, বিছানার কাছ রাখিবাব জন্ত একটি ক্ষুদ্র টিপ্প। ভিত্তিগাত্র সজ্জিত কাগজে আবৃত। মেঝেট কার্পেট মোড়া। মশাও নাই, মশাঝিও অজ্ঞাত। এই হইল শয়নকক্ষের বর্ণনা। ভারত-বর্ষে যুরোপীয় ধরণের গৃহে, প্রত্যেক শয়নকক্ষের সহিত যেমন একটি স্বতন্ত্র স্নানাগার সংযুক্ত থাকে, এ স্থল টুকু যুরোপে নাই—অন্ততঃ আমি কোথাও দেখি নাই।

এই ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমে আমি দুই মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলাম—কেবল মাঝে একটি সপ্তাহ ভিন্ন। আমি যখন পৌছিলাম তখন অনেকগুলি পুরুষ ও মহিলা তথায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি কি রোম্যান্ ক্যাথলিক্?” আমি মোটে ষ্ঠানই নহি শুনিয়া তাঁহারা বোধ হয় কিছু নিরাশ হইয়াছিলেন। আমার অস্থানস্থ সবেও তাঁহারা সকলেই আমার সহিত বেশ ভাল ব্যবহার করিতেন,—এবং আমার ধর্মমত পবিত্রকন কবিস্থ জন্ত তাঁহারা কোনও দিন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই—ইহাও আমি তাঁহাদের প্রশংসা স্বরূপ বলিতে বাধ্য।

পৌছিলি, জিনিষপত্র শুছাইয়া, চা পান করা গেল। বৈকালে সমুদ্রতীরে একটু বেড়াইয়া আসিলাম। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় ডিনার। ভোজন কক্ষে দুইখানি লম্বা টেবিল আছে। একখানির শিবোভাগে মিস্ বৃশ্, অপর খানিতে তাহার ভগ্নী মিসেস্ ক্লিফোর্ড, “প্রিন্সাইড” কবেন। আমি বিদেশী বলিয়া, মিস্ বৃশ্ স্বীয় টেবিলে নিজ দক্ষিণ হস্তে আমাকে আসন দান করিলেন। গৃহকর্ত্রী দক্ষিণ-হস্তেব যে আসন, তাহাই হইল সীট্ অব্ অনার অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আসন। যতদিন ছিলাম, আমার জন্ত এই আসনই নির্দিষ্ট ছিল।

ভোজনের পর, ড্রয়িং রুমে বসিয়া মহিলা ও পুরুষগণ গল্প শুদ্ধব কবেন। কেহ কেহ বা লাইব্রেরীতে বসিয়া পাঠ অথবা ক্রীড়াদি করেন। সে সময়টা পিং পং অথবা টেবিল-টেনিস্ খেলিবার ভাবি ধুম। লাইব্রেরী কক্ষে পিং পং খেলিবাব উপযোগী একখানি টেবিল ছিল;—অনেকে সে খেলায় মত্ত হইতেন। ধূমপায়ী, বাতীর দরজার বাহিরে বাবান্দায় চেয়ার টানিয়া ধূমপান করিতেন। গৃহান্তরে ধূমপান অথবা অল্প “কিছু” পান একেবাবেই নিষিদ্ধ। এই ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমে আমি এমন অনেক ধর্মযাজক দেখিয়াছি যাহারা মাদক সেবন বা থিয়েটার দর্শন করাকে পাপ বলিয়া মনে করিতেন।

রাত্রি নয়টা বাজিলে আবাব সকলে ভোজন কক্ষে গিয়া বসেন,—দুই এক পেয়ালা কফি পান করা হয়। এইটি একটু বড়মানুষীর পরিচায়ক। বড়লোকের গৃহে এবং ভাল হোটেলে এই প্রথাটি আছে। সাধারণতঃ মধ্যবিন্ত গৃহস্থশ্রেণীর লোক ‘ঘরযোগে’ রাত্রে কফিপান কবেন না। বাহিরের লোক নিমন্ত্রিত হইলে, সেদিন ডিনারের ঘণ্টা-খানেক পরে কফি পানের আয়োজন হয়।

কফি পানের পর সকলে সন্ধ্যা-উপাসনার জন্ত আবার ড্রয়িং রুমে সমবেত হন। প্রত্যেক কক্ষে মুদ্রিত নিয়মাবলীতে লেখা আছে—“Visitors are expected to join in the morning and evening prayers”—অর্থাৎ আগন্তুকগণ প্রভাতে ও সন্ধ্যাব উপাসনায় যোগ দিবেন ইহা আমবা আশা কবি। প্রাতঃবাশের পূর্বে প্রাতাতিক উপাসনা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। সন্ধ্যোপাসনার ধর্মপুস্তক

হইতে কোনও অংশ পাঠ, একটু প্রার্থনা, তাহাব পব হই একটি সঙ্গীত হইত। মিসেস্ ক্লিফোর্ড প্রায়ই হার্মোনিয়মে বসিতেন। মনে আছে, একদিন রাত্রে বড় হর্যোগ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় বহিতেছে। বহিয়া বহিয়া প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘন ঘন মেঘ গর্জন। অদূরে উন্নত সিন্ধু ভৌমকল্লোলে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্যে যোগ দিয়াছে। সে বাত্রে উপাসনাব পব একটি ধর্মসঙ্গীত হইল। তাহার ভাবার্থ এই,—হে প্রভু, অস্ত্র রত্ননীতে সমুদ্রবক্ষে অর্ণবপোতে তোমার যে সকল সন্তান অবস্থান কবিতেছে, তুমি তাহাদিগকে সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা কবিও।—আমি ধার্মিক ব্যক্তি না হইলেও সে বঙ্গনীত সে প্রার্থনাটি আমাব মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে।

গাঙ্ঘ্যোপাসনা শেষ হইতে বাজি দশটা বাজিয়া যায়। তখন সকলে পবস্পর্শক শুভবাতি অভিষাদন কবিয়া নিজ নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন।

যে বাত্রে ঐ প্রকাব হর্যোগ গিয়াছিল, তাহার পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের পর আমবা কয়েকজন সমুদ্রতীরে ভ্রমণ কবিতে গেলাম। দেখিলাম আশ্চর্য্য কাণ্ড! সমুদ্র-তীরে ইলেক্ট্রিক রেলওয়েব যে লাইন পাতা ছিল, তাহা ঝিকিঝা, চুবিয়া, ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রস্তবাকীর্ণ তটভূমিব উপর বিলক্ষণ মজবুদ ভাবে লোহাণ রেল বসানো ছিল। কেবল মাত্র জলের ঢেউ আসিয়া তাহাতে লাগিয়াছে—তাহার উপর দিয়া জল চলিয়া গিয়াছে। তাহাবই বলে লোহাব বেল ছিন্ন ভিন্ন! না জানি কি প্রাণ্ডবেগেই জল আসিয়া সে গুলির উপর আঘাত কৰিয়াছিল।

আমাদের বাড়ী হইতে এক মাইল দূরে, পশ্চিম দিকে, Palace Pier অবস্থিত। সেই পিয়র হইতে, সমুদ্রের কূলে কূলে, লাইন পাতা আছে। তাহাবই উপর দিয়া কয়েকখানি ইলেক্ট্রিক্ কাব যাতায়াত কবে। এই লাইনটির কিয়দংশ বা তটভূমিব উপর স্থাপিত, কিয়দংশ বা কাঠনির্মিত মঞ্চের উপর দিয়া গিয়াছে। তটভূমি ত সর্বত্র সমতল নহে,—যেখানে নিম্নভূমি, সেইখানেই এই প্রকাব মঞ্চ নির্মাণের প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রবন্ধ সংলগ্ন ছবিতে পাঠক এইরূপ একটি অংশ দেখিবেন। মঞ্চের

নিম্নে সমুদ্রের জলবাশি সময়ে সময়ে আসিয়া মহোন্মাদে নৃত্য কবিয়া যায়। সে সময় বাঁধে প্রতিহত হইয়া উচ্চ জলকণা সমূহ (sprays) উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। আমবা অনেক সময় এই ট্রামে আসিতে আসিতে, এই প্রকার জলকণা-সমূহেব দ্বাৰা অভিষিক্ত হইয়াছি। কণাগুলি এত সূক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী যে তাহাতে বস্ত্রাদি আর্দ্র হয় না,—একটু নরম হয় মাত্র।

পিয়র হইতে শেষ সীমা অবধি এই ইলেক্ট্রিক্ রেলওয়েতে আসা এবং সেই কাবেই ফিবিয়া যাওয়া অনেকে অত্যন্ত আমোদের বিষয় মনে কবে। আমবা যেদিন এই কাবে হই একবার ভ্রমণ না কবিতাম সেদিন ঘন দিবসেব কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। রেলওয়েব শেষ সীমা ঠিক আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই ছিল।

সকল সমুদ্রতীরবর্তী নগরে হই একটি কবিয়া পিয়ব থাকে। অস্ত্র নগবে যেমন সাধারণেব বায়ুসেবনার্থ উদ্ভানাদি থাকে, সমুদ্রতীরবর্তী নগবে তেমনি পিয়ব। ব্রাইটনে দুইটি পিয়ব আছে—একটির নাম প্যালেস্ পিয়ব,—অপরটির নাম ওয়েষ্ট পিয়র। প্রথমোক্তটি অপেক্ষাকৃত নূতন এবং লোক সমাগম তাহাতেই অধিক। নদীৰ উপর যেমন কৰিয়া সেতু বাঁধা হয়, তীরস্থ বাজপথ হইতে সমুদ্র-জলের কিয়দূর অবধি সেইরূপ বাঁধিয়া, শেবাংশ বিস্তীর্ণ চত্বাকার কৰিয়া তত্পরি প্রমোদভবনাদি নির্মাণ করা হয়। এই সেতুবৎ মঞ্চ রাজপথ পবিত্যাগ কবিয়া কিয়দূর বেড়াভূমিব উপর দিয়া যায়,—তাহার পর জল। চত্বরাকৃত শেবাংশ গভীর জলের উপর অবস্থিত। প্যালেস্ পিয়বের মধ্যস্থলে একটি নাট্যশালা আছে, তথায় প্রতিবাত্রে অভিনয় হইয়া থাকে। নাট্যশালার বাহিবে চাবিদিক দ্বিবিয়া নানাবিধ দোকান পাট। খববের কাগজ হইতে আরম্ভ কৰিয়া পানাহারেব দ্রব্য পর্য্যন্ত সবই পাওয়া যায়। আমবা প্রাতরাশেব পর, একটি দল প্যালেস্ পিয়বে গিয়া আশ্রয় লইতাম—বেলা ১২টা ১টা অবধি থাকিতাম। কখনও বেড়াইয়া বেড়াইতাম, কখনও বসিয়া গল্প শুদ্ধ কবিতাম। মাঝে মাঝে ব্যাণ্ড বাজিত। কত তামাসা দেখা যাইত। এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ঘর নির্মাণ কবিয়া ডুবাৰি তামাসা দেখাইতেছে। বাহিব হইতেই দেখা যায়, এক ব্যক্তি

ডুবাবি সাঙ্গে সজ্জিত হইয়া লোক আকর্ষণ কবিবার জন্য উচ্চস্থানে বসিয়া আছে। তাহার গাত্র রববের জামায় আবৃত। মুখে একটা কিস্তুতকিমাকাব রববের মুখস, তাহাব বখাস্থানে কাচের চক্ষু বসানো আছে। ডুবাবির নাসিকা হইতে দুই রববের নল বাহিব হইয়াছে। লোকে দর্শন দিয়া ভিতবে প্রবেশ কবিতোছে। যথেষ্ট লোক হঠলে ডুবাবি খেলা দেখায়। সে স্থানে পিয়বেব মেয়ে কাটা, নিম্নে সমুদ্র। ডুবাবি জলে নামিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। কিস্তুতক্ষণ পবে তাহাব সহকারী আবাব তাহাকে উঠাইয়া লয়। পিয়বেব অন্ত স্থানে প্রতিদিন এক ব্যক্তি বাইসিক্ল খেলা দেখাইত। বাইসিক্লে নানা বকম কসবৎ দেখাইয়া, অবশেষে যাহা দেখাইত তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য। পিয়বেব প্রাপ্তভাগেব বেলেং খুলিয়া দিত। তাহাব পব, অনেকটা হুবে পিছাইয়া গিয়া, সেইখান হইতে বাইসিক্ল চড়িয়া, বায়ুবেগে আসিয়া একেবাবে পিয়ব হইতে সমুদ্রে পড়িত। দল হইতে পিয়ব অন্ততঃ একটা দ্বিতল বাড়ীর মত উচ্চ। কিস্তুতক্ষণ পবেই অবশ্য ভাসিয়া উঠিত—কিস্তু তাহার ঠোঁটবী এই যে সে বাইসিক্লটি ছাড়ে নাই হাতে ধরিয়া আছে। তাহাব সহকারী উপব হইতে একটা দড়ি জলে ফেলিয়া দিত। সে সেই দড়িতে বাইসিক্লটি বাধিয়া দিয়া, নস্তরণ করিয়া অন্ততঃ হইতে উঠিয়া আসিত। সজীব তামাসাওলা ছাড়া কলের তামাসাওলাও বিস্তব আছে—সেগুলি penny-in-the-slot যন্ত্র। কলটির একস্থানে একটা ছিদ্র (slot) আছে, তাহাব ভিতরে একটা পেনি ফেলিয়া দিয়া হ্যাণ্ডেল ঘুবাইতে হয়। কোনও কল হইতে বা এক প্যাকেট সিগারেট বাহিব হইয়া আসে, কোনটা হইতে একখানি চক্লেটেব বিস্কুট ;—কোনও কল গা একটা গৎ বাজাইয়া গুনাইয়া দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনটাতে দেখা আছে—“ইহাতে একটা পেনি ফেলিলে তামাব ভবিষ্যৎ স্বামীব ফোটোগ্রাফ বাহিব হইবে।”—ময়েরা ক্রমাগত তাহাতে পেনি ফেলিতেছে—আর নূতন নূতন একখানি করিয়া ক্লাউনব অপেকাও সুন্দব পুকবেব হবি বাহিব হইয়া আসিতেছে। মেয়েদেব হাসির ফোফাবাব বন্ধ হয় না। একটা কল আছে তাহাতে পেনি ফেলিলে “তোমার প্রিয়তমেব নিকট হইতে প্রেমপত্র

বাহিব হইবে।” এইরূপ নানা প্রকার হাস্য কৌতুকেব কল।

আমরা কোন কোনও দিন ডিনারেব পব সন্ধ্যাকালেও প্যালেস্ পিয়বে বাইতাম। দীপাদিতা অমাবস্ত্যাব রাত্রে আমরা যেমন কবিতা গৃহাদি আলোকিত কবি, এই প্যালেস্ পিয়বটি বাজপথোপবি তোবণদাব হইতে আরম্ভ কবিতা সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত প্রতিবাত্রে সেইরূপ বিজ্ঞাৎ আলোকে আলোকিত হয়। দুব হইতে সে এক রমণীয় দৃশ্য। শত শত নবনারী সুন্দর বসনে আবৃত হইয়া, পিয়বেব সর্বত্র আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে ব্যাণ্ড বাজিতেছে। যেন ধবাতলে নন্দন-কানন অবতীর্ণ। রাত্রি ১২টা পর্যন্ত পিয়ব খোলা থাকে। আমাদের ধর্ম্মেব সংসার—বাত্রি ১০টার সময় দরজা বন্ধ হয়, তাই শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে হইত। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি সেখানে থাকিয়া, ডবল-কুইক-মার্চ কবিতা আমরা বাড়ী আসিতাম। তখন হয়ত সাঙ্ঘ্যোপাসনা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ মিসেস্ ক্লিফোর্ডেব সম্মুখে পড়িয়া গেলে তিনি বলিতেন—“You wicked men!”—তাঁহার জয়গল স্বত্ৰিম ক্রোধে কুঞ্চিত,—মুখে অকৃত্রিম হাসি।

ব্যাণ্ডিষ্টে হোমে আমাব উপস্থিতিকালে বহুলোক আসিল এবং বহুলোক চলিয়া গেল। আমার মত দুই মাস ত কেহ থাকে নাই। কেহ বা এক সপ্তাহ, কেহ বা দুই সপ্তাহ কেহ বা দুই চাবি দিন থাকিয়া চলিয়া যান। ইহারা যে সকলেই ধর্ম্মবাজক, তাহা নয়,—ব্যাণ্ডিষ্ট সম্প্রদায়েব মাংস গণ্য লোকও আসিতেন। সদাম্টন হইতে একজন সলিসিটর ও তাঁহার স্ত্রী এবং ইহাদেব লগুনস্থ কন্ডা ও জামাতা আসিয়া কিছু দিন ছিলেন। জামাতাটি একজন রসায়নবিৎ, কোনও ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় কর্ম্ম করেন। ইহাদের সঙ্গেই আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এই চাবিজন লোক বেণ আয়ুদে। সে সময় আমি আইন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছি কিস্তু তখনও “বারে কলড” হই নাই। তাঁহার আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, কলিকাতায় আইন ব্যবসায়ীস্ব যোগ কিরূপ। আমি বলিলাম, তেমন সুবিধা নয়, তবে একজন ভাল সলিসিটরেব কন্ডাকে বিবাহ করিতে পারিলে বেশ চলে। সলিসিটর মহাশয়ের কন্ডাব প্রতি

চাহিয়া বলিলাম—“Here is a solicitor's daughter thrown away on a chemist. You ought to have married a barrister, madam.”—অর্থাৎ—“এই দেখুন, একটি সলিসিটরের মেয়ে রসায়ন বৎকে বিবাহ করিয়া লোকসান হইয়া গিয়াছে। মহাশয়া, আপনার উচিত ছিল একজন ব্যাবিষ্টাবকে বিবাহ করা।”—মহিলাটি কৃত্রিম রোষে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিলেন—“তা বই কি! সেই জন্তই আমবা জন্মিয়াছি কি না!”—বড় হাসি পড়িয়া গেল।—আব একজন বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি ধর্ম্মবাজক। তাঁহার নাম Rev. Mr. W.—লোকটি এমন হাসিতে মজবুদ।—সামান্ত সামান্ত তুচ্ছ কথায় হাসিয়া অজ্ঞান। একদিন আমবা চারি পাঁচজনে বেড়াইতে যাঁতেছিলাম। একজন গল্প করিতেছিলেন, একটি অত্যন্ত স্থূলকায়া রমণী, অমনিবসে আবোহণ করিয়াছিল। কিন্তু সে এমন স্থূল যে অমনিবসের দরজার ভিতর দিয়া প্রবেশ কবিত্তে পাবিত্তেছিল না। তখন কণ্ঠস্তব বলিল—“মহাশয়া, পাশ ফিবিয়া ঢুকুন, পাশ ফিবিয়া ঢুকুন।”—হাসিব কথা ত এই টুকু। ইহা শুনিয়া শ্রীযুক্ত W—মহাশয় ধমকিয়া বাস্তায় ফুটপাথে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কোমরে হুঁইটি হাত দিয়া, হো হো শব্দে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া হাস্ত। সে হাসি স্ফার থামে না। প্রশস্ত দিবালোকে প্রকটীয়া রাজপথ—শত শত লোক চলিতেছে। একেই W—মহাশয়ের চেহারাটি Pickwickএব মত স্থূল,—তাহার উপর ঐ হাসিব তুফান। পথচারী লোক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে আমরা ত অপ্রতিভেব শেষ। কোনও ক্রমে তাঁহাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম। W—মহাশয় কিছু অতিরিক্ত ধূমপানপ্রিয় ছিলেন। নিজের সাক্ষাই স্বরূপ, ভাল ভাল সাধুলোকগণ কিরূপ ধূমপানাসক্ত ছিলেন, তাহারই গল্প মাঝে মাঝে করিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, যে Dr. Spurgeonএর স্মৃতিবক্ষার্থ এই বাড়ী হইয়াছে—তিনিও নাকি একজন পাকা ধূমপায়ী ছিলেন। একদিন Dr. Spurgeon যাই একটি চুরট মুখে করিয়াছেন, অমনি তাঁহার একজন বন্ধু বলিল—“ah, your idol!”—তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—“Yes, going to burn it!”—এই

গল্প শুনিয়া ওমব থৈয়ামেব উক্তি স্ববর্ণ হয়—“মদিবা মনুষ্যের শত্রু—অতএব আমবা শত্রুর রক্তপান করি এস।”—ডাক্তার স্পার্জেনেব একটি পৌত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। পৌত্র অবকাশ সময়ে বাড়ী আসিলে ডাক্তার একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—“শুনিলাম, তুমি না কি ধূমপান কবিত্তে শিখিয়াছ?” পৌত্রটি কিছু বিপন্ন হইল—ভাবিল, বড় কেমন করিয়া টের পাইয়াছে! বলিল—“হাঁ দাদা মহাশয়, আমি ধূমপান আরম্ভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছা কবেন তবে আমি উহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।”—ইহাতে ঠাকুর্দা যাহা উত্তর দিলেন, তাহা যুবকের অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি পৌত্রের পিঠ চুকিয়া বলিলেন—“My boy, stick to your pipe. Next to God and your Grand-mother, my pipe is the greatest blessing of my life”—অর্থাৎ—“বৎস, পাইপটি ছাড়িও না। ঈশ্বর এবং তোমার ঠান্দিব পরেই, আমার পাইপটিই আমার জীবনের চরম সুখ।” এইরূপ আরও কত গল্প W—মহাশয় বলিতেন; লোকটি বেশ মজলিসি।

সে বাড়ীতে আমি বহুলোকের সঙ্গে মিশিবাব স্বেচ্ছা পাইয়াছিলাম। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক তর্ক বিতর্ক হইত। দেখিলাম, ধর্ম্মবাজকগণের মধ্যে অনেকে বাইবেলের কথা literally গ্রহণ করেন না। এমন লোক আছেন যাহারা বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্বাস কবেন না। এমন লোক আছেন যাহারা খৃষ্টধর্ম্মের একটা প্রধান বিষয়—অনন্ত-নবক-বাদ পর্যাস্ত উড়াইয়া দেন। আমি একদিন একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কবি শেলি তাঁহার “কুর্জেন ম্যাব” কাব্যের পরিশিষ্টে যে প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার উত্তর কি? প্রশ্নটি এই “খৃষ্টকে যে পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করিল না তাহার পক্ষে অনন্ত নরক বাইবেলের বিধান। তবে খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে যে সমস্ত মনুষ্য জন্মিয়াছে ও মরিয়াছে তাহাদের আত্মা—এবং বর্তমান সময়ে অসভ্যদেশের লোক যাহাদের কাছে খৃষ্টধর্ম্ম কখনও প্রচারিত হয় নাই, তাহাদের আত্মা—সমস্তই অনন্তনরকযোগ্য। ইহা কি রকম বিচার?” বন্ধু বলিলেন—ইহাদের পক্ষে বাইবেলের ও বিধান প্রযুক্ত্য নহে। যাহারা খৃষ্টকে গ্রহণ করিবার কোনও অবসর পায় নাই,—তাহারা কখনই দণ্ডযোগ্য নহে। অপর

একজন ধর্মযাজকের সহিত একদিন আমার এই বিষয়ে কথা হইতেছিল। আমি বলিতেছিলাম—“খুষ্ট যে ঈশ্ববপ্রেরিত পরিব্রাজা তাহা আমার জ্ঞানবুদ্ধিতে আমি বুঝিতে পাবি না। সেই জন্ত আমার পক্ষে অনন্ত নরক বিধান। তবে ঈশ্বর আমাকে এ রূপ জ্ঞানবুদ্ধি কেন দিলেন?”

বন্ধু বলিলেন—“আপনার জ্ঞানবুদ্ধি যে চিবকাল এইরূপ থাকিবে, একথা কে বলিল?”

আমি বলিলাম—“ঐ দেখুন, আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে জ্ঞানবুদ্ধি ঋষিভূলা হার্কীট স্পেন্সার বাস কবিতেন। উনি অজ্ঞেয়বাদী—খুষ্টধর্মের বিশ্বাস করেন না। এই অবস্থায় যদি উনি দেহত্যাগ কবেন, তবে কি আপনি বলেন যে উনিও অনন্ত নরক ভোগ করিবেন?”

বন্ধু বলিলেন—“না,—তাহা নহে। অনন্ত জীবনের মধ্যে কোন না কোন সময়ে প্রত্যেক আত্মার নিকট খুষ্টধর্ম সফলভাবে প্রচারিত হইবে। নধর জীবনে যে যীশুখুষ্টকে গ্রহণ করে নাই, মৃত্যুর পর তাহার আত্মা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে। আমার বিশ্বাস, হার্কীট স্পেন্সার মৃত্যুর পর যেখানে অবস্থান করিবেন, সেখানে তাঁহার নিকট দেবদূতগণ পুনরায় খুষ্টধর্ম প্রচার কবিবেন।—তখন স্পেন্সারের জ্ঞানচক্ষু হইতে মোহাঙ্ককার কাটিয়া গিয়াছে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ খুষ্টকে গ্রহণ করিবেন।”

আমি বলিলাম—“তবে আর অনন্ত নরক কাহার জন্ত?”

একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন, তাঁহার কাছে পরে আমি উক্ত খিওরির বিষয় বলাতে তিনি বলিলেন—“ও সব একেলে মত টত ভুল। হার্কীট স্পেন্সারকে নিশ্চয়ই অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে।”

স্পেন্সার যে ব্রাইটনে বাস করেন তাহা আমি পূর্ক্সা-বধিই জানিতাম; তাই আমি লণ্ডন পরিত্যাগেব সময় “Who's Who” নামক প্রতিবৎসর প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে স্পেন্সারের ঠিকানাটি টুকিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাতাদি করিব এ স্পর্ক্সা আমার ছিল না। তবে অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার গৃহখানি দেখিব, হয়ত বা কোনও দিন তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির হইতে দেখিব, এ আশা আমার মনে ছিল। ব্রাইটনে গিয়া অল্পসন্ধান করিয়া জানিলাম, পূর্ক্সে তিনি ব্যাপ্টিষ্টন্ হোমের সম্মুখ দিয়া একখানি টমটমে করিয়া Downs মাঠে প্রায়ই বেড়াইতে যাইতেন। এখন তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া আর বা'হয় হন না। ক্রমে আমি আবিকার করিলাম, আমাদের বাড়ী হইতে অল্পদূরেই প্যাগেল্‌স্‌ পিয়র যাইবার পথেব মাঝামাঝি একটি বাড়ীতে স্পেন্সার থাকেন। যাইতে আসিতে অনেক সময় আমি উৎসুক নেত্রে বাড়ীখানির প্রতি চাহিয়া

থাকিতাম—যদি কোনও সুযোগে মহাপুরুষ দর্শনলাভ ঘটে। চিত্রাদি হইতে তাঁহার মূর্ত্তি আমার নিকট সুপরিচিত ছিল, দোঁধলেই বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু একদিনও তাঁহাকে দেখিলাম না। অবশেষে একদিন আমার একখানি কার্ড লইয়া, তাহাব উপরিভাগে লিখিলাম—“To the Grand old man of the West from one of his humblest admirers from the East.” নিম্নে বর্তমান ঠিকানা লিখিয়া কার্ডখানি তাঁহার বহির্দ্বার সংলগ্ন

Mr Herbert Spencer regrets that by inadvertence he has failed to acknowledge before this the card left by Mr. Mukerji. He also regrets that being now a confirmed invalid and confined to his room he is unable to acknowledge Mr. Mukerji's courtesy otherwise than in writing.

*Perceval Terrace,
Brighton 15 Sept 1903*

হার্বার্ট স্পেন্সারের হস্তলিপি ।

‘চিঠির বাত্রে’ ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম। আমি মুহূর্তের জন্তও ভাবিও নাই যে তিনি উক্ত কার্ডের উত্তরে কিছু করিবেন। পাঁচ সাত দিন পরে একদিন হঠাৎ একখানি অপরিচিত হস্তাক্ষরে শিরোনামা লেখা পত্র পাইলাম। সাধারণ গ্রে-এ্যানিট কাগজের লেফাফা-খানি—কে লিখিল?—খুলিয়া দেখিলাম—হার্কার্ট স্পেন্সার লিখিয়াছেন।

পত্রখানি এই :—

Mr. Herbert Spencer regrets that by inadvertence he has failed to acknowledged (sic) before this the card left by Mr. Mukerji. He also regrets that being now a confirmed invalid and confined to his room, he is unable to acknowledge Mr. Mukerji's courtesy otherwise than in writing.

5 Percival Terrace
Brighton

15 Sept. 1903.

প্রথম পুরুষে লিখিত হইলেও, হার্কার্ট স্পেন্সারের স্বহস্তাক্ষর। যদি তাঁহার শরীর অসুস্থ না হইত, তবে হয়ত তিনি আমার সাক্ষাতের জন্ত আহ্বান করিতেন। কিন্তু আমি প্রাচ্যের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিবার কি যোগ্য? কি জানি আমি প্রাচ্য দর্শনের, কি জানি আমি প্রাচ্য বিজ্ঞানের, কি জানি আমি প্রাচ্য ধর্মতত্ত্বের!—পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছি—বিজ্ঞানপ্রেমিক বন্ধুবান্ধব আসিলে দেখাইয়া থাকি। আমার পাঠকগণের তৃপ্ত্যর্থ পত্রখানির একটি প্রতিলিপি (fac simile) প্রকাশিত হইল।

সমুদ্রতীরে দুইমাস রহিলাম বটে, কিন্তু সমুদ্রস্নান একদিনও হয় নাই। সঙ্গী পাই নাই বলিয়া হয় নাই।—আব ক্রমে একটু ঠাণ্ডাও পড়িয়া আসিল। একস্থানে একটা বৃহৎ বাড়ীতে swimming bath (সস্তরণ কবিবার চৌবাচ্চা) ছিল—নগের দ্বারা সমুদ্র জল আনিয়া, ইবদ্রুৎ করিয়া এক বৃহৎ চৌবাচ্চার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে কয়েকবার স্নান করিতে গিয়াছিলাম। একজন ধর্মযাজক আসিয়াছিলেন—তাঁহার নাম সেক্সপিয়র। তিনি ব্যাপ্টিষ্ট সমাজের সম্পাদক। তিনি দুইটি পুত্র সঙ্গে

আনিয়াছিলেন—দশ বারো বৎসর বয়স—বড়টিকে প্রথম দিন জিজ্ঞাসা করিলাম “কিহে বাবাজী! তোমার নাম কি?”—সে বলিল—“Will Shakespeare”—বলিলাম—“তুমিই হামলেট লিখিয়াছ না কি?” সে গম্ভীরভাবে বলিল—“আমি নয়।”—ইহাদের পিতাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে আসল সেক্সপিয়রের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও সম্পর্ক আছে কি না—কিন্তু তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই।—ইহঁার অমুরোধে, পুত্র দুইটিকে লইয়া আমি মাঝে মাঝে swimming bathএ স্নান করাইতে লইয়া যাইতাম। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকগণের স্নানের দিন ভিন্ন ভিন্ন। চৌবাচ্চাটি ঘরিয়্যা ছোট ছোট কাঠের কামরা আছে। তাহার মধ্যে স্নানের বস্ত্র, তোয়ালে প্রভৃতি আছে। কামরায় প্রবেশ করিয়া বেশ পরিবর্তনের পর জলে নামিয়া খুব সস্তরণ করা যাইত। অনেকে স্নান করিতে আসিত। এক একজনের প্রাবেশিক এক শিলিং করিয়া।

সমুদ্রে বাঁহারা স্নান করেন, তাঁহাদের জন্ত জলের ধারে বহুসংখ্যক bathing machines আছে। নামটা machine হইলেও, কল-কজা কিছুই নহে—একটি একটি ক্ষুদ্র কাঠগৃহ মাত্র। কাঠগৃহের নিম্নে ঢাকা বসানো আছে। জোয়ার ভাঁটায় জল যেমন বাড়ে কমে, কামরাজলি সেইরূপ সরানো হয়। প্রত্যেক কামরার ভাড়া ছয় পেনি, তাহার মধ্যে স্নানবস্ত্র (bathing drawers), তোয়ালে, আর্সি, চিকণী প্রভৃতি দ্রব্য আছে। সম্মুখে ও পশ্চাতে দ্বার। সম্মুখ দ্বার দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বস্ত্র পরিবর্তনেব পর, পশ্চাতের দ্বাৰা খুলিয়া জলে নামা। স্নান বস্ত্র একটা কালো চটেব মত কাপড়ের তৈরি। নিম্নে হাঁটু পর্যন্ত এবং উর্দ্ধে কনুই পর্যন্ত পৌছে—বেশ আঁটো সাঁটো। স্নানান্তে কামরায় প্রবেশ করিয়া পূর্ববেশ ধারণ করিয়া, সভ্যভাষ্যটি হইয়া বাহির হওয়া যায়। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের স্নানেব স্থান স্বতন্ত্র। কোথাও কোথাও নাকি একত্র আছে—তাহাকে mixed bathing বলে। বলা বাহুল্য ভদ্রগৃহেব স্ত্রীলোকেবা কদাপি সেখানে স্নান করিতে যান না। কোন কোন বাঙ্গালা লেখক বিলাতী সমুদ্র স্নানের বর্ণনা লিখিতে গিয়া যুরোপীয় জাতির রুচিদোষ ঘরিয়্যা নিন্দা করিয়াছেন—বলিয়াছেন, স্নানেব পোষাক ত

একপ্রকার উলঙ্গাবস্থা। বঙ্গমহিলাবা গঙ্গাব বাটে স্নানান্তে উঠিলে কখনও কখনও যে দৃশ্য দেখা যায়, যুবোপীয় মহিলার স্নানবেশ তাহাব অপেক্ষা অনেক আকর্ষণীয়, তাহাব সন্দেহ মাত্র নাই। তবে যুবোপীয় হিসাবে, পুরুষের কোট গায়ে না থাকিলে, শুধু কামিসের উপর ওয়েষ্টকোট থাকিলে, সে উলঙ্গ। জীলোকের পায়েব কজ্জি দেখিতে পাওয়া বড়ই নিন্দাব কথা। সে conventionএর হিসাবে বাহাই বলুন। তবে, যুরোপীয় আবরণ-নীতি বড়ই অদ্ভুত ইহাও বলিতে হইবে। টেনিসকোর্টে মহিলাবা, কোটশূন্য পুরুষ-গণের সহিত স্বচ্ছন্দে খেলিয়া আসিলেন; কিন্তু গৃহে যদি কোটশূন্য কোনও পুরুষ দৈবাৎ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল, তৎক্ষণাৎ পতন ও মুচ্ছা। জীলোকের পা দেখিতে পাওয়া লজ্জাব কথা কিন্তু নৃত্যবসন রুচিসঙ্গত বলিয়া গণ্য, ইহাও বিদেশীর পক্ষে একটা গ্রহেলিকা। স্নানবস্ত্রে আবৃত জীলোকের পা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় উপবাস্ত লেখকগণ মুচ্ছা গিয়াছেন।

ব্রাইটনে থাকিতে একবার একটা টার্কিশ বাথুও গিয়াছিলাম। সঙ্গে ছিলেন একটা ধর্মযাজক বন্ধু। এই বাথটি তথাকার একটা প্রধান হোটেলের অন্তর্গত। প্রবেশিক চারি শিলিং করিয়া। বন্ধু পরিবর্তনানন্তর প্রথম যে কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তাহার বায়ু, বাহিরের বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ। ধরুন যেন আমাদের বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাস। ছোট ঘব খানি, দুই একটি লোহার বেঞ্চি পাতা আছে। বেঞ্চিতে কিয়ৎকণ দুইজনে বসিয়া রহিলাম। একটু একটু ঘাম হইতে লাগিল। সেই কামবার একটা কোণে ঘাব আছে, তাহা দিয়া দ্বিতীয় কামবার প্রবেশ করা গেল। তাহার হাওয়াটি আঁব একটু গরম, যেন আমাদের ভবপূর্ব গ্রীষ্ম। সে কামবার কিছুকণ বসিয়া, তৃতীয় কামবার প্রবেশ করা গেল তাহার বায়ু উষ্ণতর। বেশ ঘাম বহিতে লাগিল। তাহাব পর একটা কি দুইটি কামবার আমি প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম মাত্র। বন্ধু বহিলেন, আমি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলাম। শেষ কামবার যখন আমি সিদ্ধ হইতেছিলাম,—আমার মাথা পর্যাস্ত ঝন্ ঝন্ করিতেছিল,—বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“মহাশয়, আগনাগের গুটীয় নরক কি ইহা অপেক্ষাও গরম ?

—তাহা যদি হয় তবে এটবেলা আমার দৌক্ষিত করিয়া ফেলুন।” বন্ধু হাসিয়া উষ্ণতর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বাহিবে আসিয়া দেখিলাম একজন খানসামা শাবানাদি হস্তে অপেক্ষা করিতেছে। দুর্বলতা বশতঃ আমার পা তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। কল-তলায় আমার দাঁড় করাষ্টয়া, আমাব গাত্রচর্ম শাবান ও বৃকষ দিয়া রগড়াইয়া দিয়া মলিয়া খুব কবিয়া আমার স্নান কবাইয়া দিল। আমাব স্নান শেষ হইতে হইতে বন্ধুও বাহিবে হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে আর একজন স্নান কবাইতে লাগিল। সেখানেও একটা ঈষদুষ্ণ swimming bath ছিল। স্নানান্তে তিনি বলিলেন—“আমুন এইটেতে একটু স্নাতার কাটিয়া লওয়া যাউক। আমার তখন অবস্থা শোচনীয়, দাঁড়াইতে পারিতেছি না।” বলিলাম—“আমি আর পারি না।” বন্ধু swimming bathএ নামিলেন। টার্কিশ বাথের পর এক পেয়লা কফি খাইয়া আধ ঘণ্টা কঘল মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিতে হয়। আমি ত গিয়া কফি পান করিয়া শুইলাম। ক্রমে বন্ধুও আসিয়া তাহাই করিলেন। শেষে যখন পোষাক পবিয়া বাহির হইলাম, পথে চলিতে লাগিলাম, তখন মনে হইতেছিল যেন শরীরের অর্ধেক ভার কমিয়া গিয়াছে।

বড় আনন্দে দুই মাস ব্রাইটনে কাটাইয়াছিলাম। মাঝে মাঝে ১০।১৫ জন দল বাঁধিয়া একখানি বৃহৎ গাড়ী (Char-a-banc) ভাড়া করিয়া কোনও দূর পল্লীগ্রামে বেড়াইয়া আসা যাইত। দুইটি পিয়র হইতে প্রতিদিন দুই একখানি কবিয়া জাহাজ ছাড়ে, তাহাতে আরোহণ করিলে অর্ধ দিন সমুদ্রবক্ষে বেড়াইয়া আসা যায়। একদিন আমবা কয়েকজনে এইরূপ একখানি জাহাজে সন্ডামটন বেড়াইতে গিয়াছিলাম। যেখানে এই বাড়ী, তাহার নিকটেই একটা সুরম্য উদ্যান—নাম Sussex Gardens—এই বাগানটি নিকটবর্তী বাড়ীগুলির চাঁদায় রক্ষিত হইত। বাগানের চারি পাঁচটি ফটক,—একই চাবিতে সকল গুলি খোলা যায়। ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমের ব্যবহারার্থ একটা চাবি ছিল। বাগানের চতুর্দিক প্রাচীরিত, সাধাবণ লোক তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। বাগানের ভিতর টেনিস, ক্রোকে, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলিবার স্থান ছিল। মিস্ ব্লু ও তাহার ভগ্নীর ক্রোকে

খেলাব বড় সখ—সেই জন্ত আমবা প্রায়ই বৈকালে সেখানে গিয়া ক্রোকে খেলিতাম। আব, এই অলস মাসদ্বয়ে আমি উপভাস গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম কি কম? স্থানীয় পোষ্ট অফিসটিতে একটি মনোহাবীর দোকান এবং পুস্তকালয়ও ছিল। সেখানে পুস্তক ভাড়া পাওয়া যাইত। পুরাতন একখানি উপভাসেব ভাড়া দুই পেনি, নতুন উপভাসেব তিন পেনি। ইহা এক সপ্তাহের ভাড়া। লণ্ডনেও নানা স্থানে এইরূপ পুস্তকালয় আছে। আমি একবার লণ্ডনেব একটি রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে, একটি লাইব্রেরি দেখিয়া, পুস্তক ভাড়া চাহিলাম। একটু আশ্চর্যের বিষয় এই যে গ্রন্থবক্ষক আমাব নিকট কোনও ডিপজিটও চাহিল না, আমার নাম ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করিল না।

এই দুই মাসেব মধ্যে কেবল একটি সপ্তাহ আমি ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমে ছিলাম না। দুই মাস থাকিব এমন কথা ত আমি পূর্বে ঠিক কবিয়া লই নাই। সেই জন্ত মিস্ বৃশ্ অপর একজনকে আমাব শয়নকক্ষ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। একদিন তিনি আমায় একথা বসিলেন। বলিলেন—“আপনি অল্প কোথাও সপ্তাহ খানেক থাকুন, সপ্তাহ পরে আবার আমার অল্প ঘব খালি হইবে, আপনাকে লইতে পারিব।”

কোথায় যাই? এক ছিল Y. M. C. A.—সেখানে এক সপ্তাহ থাকা যাইতে পারে। কিন্তু সেখানে খুষ্টান ব্যতীত অপব কাহাকেও তাহাবা সহজে লইতে চাহে না। যে বন্ধুটিব সঙ্গে টার্কিশ্ বাথে গিয়াছিলাম সেই ধর্মযাজক মহাশয় অনুগ্রহ কবিয়া, স্বয়ং আমাকে Y. M. C. A-র সম্পাদকের নিকট লইয়া গিয়া বন্দোবস্ত কবিয়া দিয়া আসিলেন। বন্ধু আমাকে সাবধান কবিয়া দিলেন—“আপনি আমাদের সহিত ধর্ম সঙ্ঘে যেকপ তর্ক বিতর্কাদি কবেন, ওখানে সেরূপ কবিবেন না। উহাবা গোঁড়া লোক,—মতভেদ সহ কবিবে না। হয়ত আপনাব সহিত অভদ্র ব্যবহার করিবে।”—আমি ভাবিলাম, পাণ্ডিতে এবং মূর্খে, ভদ্রে এবং অভদ্রে ইহাই ত প্রভেদ,—পণ্ডিতের, ভদ্রের উদাবতা মূর্খে ও অভদ্রে কোথায় পাইবে?

Y. M. C. A.তে এক সপ্তাহ মাত্র ছিলাম। সারাদিন প্রায় বাহিরেই থাকিতাম, আহ্বারের সময় আসি-

তাম। Y. M. C. A.র ঠিক সম্মুখেই একটি সুন্দর বাগান ছিল। মধ্যস্থলে জলেব একটি ফোয়ারা। ইহা Old Steine Gardens নামে খ্যাত।

সপ্তাহ পবে আবার ব্যাপ্টিষ্টস্ হোমে ফিরিয়া আসিলাম। সমস্ত ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্যাপ্টিষ্ট ধর্ম-যাজকগণের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। অনেকে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন,—আমি দেশে ফিরিবার পূর্বে, তাঁহাদের গৃহে গিয়া দুই চারি দিন যেন অবস্থিতি করি। তাঁহাবা নিজ নিজ ঠিকানা লেখা কার্ড আমাকে দিয়াছিলেন,—এক গোছা কার্ড জমিয়া গিয়াছিল। আমি যদি সকলের এই সাদব নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার সময় পাইতাম,—তাহা হইলে আমার ইংলণ্ডের বহুস্থান দেখা হইয়া যাইত। কিন্তু সেই নভেম্বরে আমি “বারে ক্লড্” হইয়া দেশে ফিরিব—সময় ছিল না। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া-ছিলাম কেবল সদামুটনের সেই সলিসিটর মহাশয়ের। কথা ছিল, তাঁহার লণ্ডনস্থ কন্ডা ও জামাতা এং আমি, তিন জনে একত্র হইয়া যাইব। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে তাঁহাব কন্ডা ও জামাতা কার্য্য গতিকে যাইতে পাবেন নাই—আমি একাই গিয়াছিলাম। সলিসিটর মহাশয় ও তাঁহার পত্নী আমার বড় যত্ন কবিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কৃষ্ণধর্ম ।

(জি-দে লাকোঁর ফরাসী হইতে)

হিন্দুরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুব অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। মানুষকে উদ্ধাব কবিবার নিমিত্ত একজন ত্রাণকর্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন,—এই বিশ্বাস, পুরাকালের সমস্ত জাতির মধ্যেই বদ্ধমূল।

ইহুদিরা যে মেসিয়া কিংবা ত্রাণকর্তার প্রতীক্ষায় ছিল, তিনি ডেভিডের পুত্র,—পার্বব ত্রাণকর্তা; কিন্তু হিন্দু ও পারসিকদিগেব ত্রাণকর্তা ঈশ্বব-প্রসূত—“বেদান্ত গ্রন্থাদিতে কথিত আছে,—কোন এক বমণীর গর্ভে, দিব্য জ্যোতির কিরণ প্রবেশ কবিয়া মানবেব রূপ ধারণ কবিবে, এবং সেই বমণী কুমাবী অবস্থাতেই একটি পুত্র প্রসব করিবে,

যেহেতু কোন প্রকার অপবিত্র স্পর্শ তাহাকে কলুষিত করিতে পারিবে না।—“এই কলিযুগেব আবস্তেই সেই কুমারীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবে।” (বেদান্ত) এই কথা অর্থহীন বোধে আরও সুস্পষ্টঃ—“তিনি জ্যোতির্গণ্য কিবীটে বিভূষিত হইরা আসিবেন তাঁহার আগমনে, দ্যুলোক ও ভুলোক আনন্দিত হইবে, তাঁহার আগমনে অমৃত মৃত্যুকে পরাভূত করিবে। প্রলয়-যুগেব ভীষণ প্রলয়-কাণ্ড স্তম্ভিত হইবে; সমস্ত জীবের দেহ অভিনব শোণিতে পূর্ণ হইবে, সমস্ত চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে... এবং সমস্ত হৃদয় প্রেম-রসে প্রাবিত হইবে। ধন্য সেই গর্ভ যে তাঁহাকে ধারণ করিবে! ধন্য সেই কর্ণযুগল যাহা তাঁহার প্রথম বাণী শ্রবণ করিবে! ধন্য সেই স্তনযুগল যাহা তাঁহার স্বর্গীয় মুখে নিষ্পেষিত হইবে!... উত্তর হইতে দক্ষিণে, পূর্বে হইতে পশ্চিমে, ঐ দিন উৎসব আনন্দের দিন হইবে; কারণ, ঈশ্বর ঐ দিনে তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবেন, তাঁহার শক্তি প্রকটিত করিবেন, এবং আপনার সহিত তাঁহাব সৃষ্ট জীবসমূহের মিলন ঘটাইবেন।” তাহার পর, মানব-ধর্ম-শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ১৫-২০ শ্লোকে, মন্ত্র স্পষ্টই বলিষাছেন, * “ব্রহ্মার প্রেরিত একজন দূতের মুখ হইতে এমন এক পুরুষ এই দেশে (Madoura) জন্ম গ্রহণ করিবেন, যাহার নিকটে পৃথিবীর সমস্ত লোক কর্তব্য শিক্ষা করিবে।”

জেনাবেস্তায় পারসিক ভবিষ্যদ্বাণী ও ব্রাহ্মকর্তার আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ বলে :—“জগতেব পরিব্রাতা ও সংস্কারক Sosiosch, মৃতদিগকে পুনর্জীবিত করিবেন। মৃতের এই পুনরুত্থান নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে। মৃত শরীরে শিরাসকল কিবিয়া আসিবে। জীবসৃষ্টির সময় যেদ্রুপ হইয়াছিল সেইদ্রুপ ভূমি হইতে অস্থি, জল হইতে রক্ত, বৃক্ষাদি হইতে চর্ম, অগ্নি হইতে প্রাণ সমুদ্ভূত হইবে। তাহার পর, পুণ্যবানেরা স্বর্গে ও পাপীরা নবকে গমন করিবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করিবে। (৩০)”

ভারতীয় আর্ধ্যদের জন্য, মন্ত্র যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ভগবান কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিলেন। বস্তুত তিনি মধুবাতেই (Madoura)

জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা, রূপবতী দেবকী (Devanagny) রাজবংশোদ্ভব; এবং যে ধর্মকে মন্ত্র-যোরা স্বীয় হৃদয় হইতে বিদূষিত করিয়াছিল সেই স্বর্গীয় ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত, বিষ্ণুদেব বাছিয়া বাছিয়া কৃষ্ণকে দেবকীর গর্ভে বদ্ধ করিলেন। নিদ্রাবস্থাতেই দেবকীর গর্ভসঞ্চাব হইল। বিষ্ণুর তেজ, দেবকীর গর্ভে নিহিত হইয়াছে; দেবকী এমন এক পুত্র প্রসব করিবে যে, সে রাজ্যের সমস্ত অত্যাচারের জন্য রাজাকে দণ্ডিত করিয়া বিশ্বমানবকে উদ্ধার করিবে—এই কথা একজন ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করিয়া, তাঁহার মাতুল কংস-বাজা দেবকীকে কারাগারে বদ্ধ করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু জাগ্রত ছিলেন; এবং যে সময়ে কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইল, একটা ঝড় আসিয়া নবজাত শিশু ও মাতাকে কুমারিকার পর্ষতে উড়াইয়া লইয়া গেল। তখন কংস কোপাবিষ্ট হইয়া, সেই রাত্রে যত পুংশিগু জন্মিয়াছিল সকলকেই নিহত করিলেন,—এই আশায় যে সেই সঙ্গ কৃষ্ণও নিহত হইবে। Pratamany-yoga গ্রন্থে এই পৌরাণিকী কথার উল্লেখ আছে।

ভগবদ্গীতাই কৃষ্ণধর্মের ভিত্তিভূমি। ভগবদ্গীতাহেই ঐ ধর্মমত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক অর্থে এই ধর্মমতকে ধর্মসংস্কার বলা যাইতে পারে; কেন না উহার মূলে নিম্নলিখিত তত্ত্বটি আছে :—নর-দেহধারী একজন ঈশ্বর জগৎকে উদ্ধার করবেন। বৈদাস্তিক ধর্ম অপেক্ষা এই ধর্ম এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ; উভয়ের একই গন্তব্য স্থান অর্থাৎ মোক্ষ হইলেও বেদান্তের ত্রায় এই ধর্ম আত্মনিগ্রহকারী কঠোর কর্মসাধন করিতে কাহাকে বাধ্য করে না, পবিত্র সকলকেই স্বাধীনতা প্রদান করে—এই জন্ম কৃষ্ণধর্মের যোগ-বাদ ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকের নিকট এত প্রিয়। এই মতামুসারে, চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই মনুষ্য অজ্ঞান হইতে—পাপ হইতে মুক্ত হয়; প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অহুতাপের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারাই উহা সম্পূর্ণ হয়। এই জ্ঞান আত্মহারা সমাধির দ্বারা লাভ করা যায় না, পরন্তু সুস্পষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ তত্ত্বসমূহের আলোচনা ও চিন্তার দ্বারা উপলব্ধ হয়।

* আমরা ত মানব-ধর্মশাস্ত্রের ঐ অংশে এই কথা দেখিতে পাই না।—অনুবাদক।

কৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্য অর্জুন—এই উভয়ের কথোপ-

কখন লইয়াই ভগবদ্গীতা রচিত হইয়াছে। ইহা ১৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। আমরা Burnoofএর অনুবাদ হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া ভগবদ্গীতা, সাংখ্যের মতানুযায়ী জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—“যাহা নাই তাহার ‘হওয়া’ হইতে পারে না, এবং যাহা আছে তাহার ‘না হওয়া’ হইতে পারে না, তদ্বদর্শীরা এই উভয়ের অন্ত দেখিয়াছেন।”—“যিনি এই সকল ব্যাপিগ্না আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। কেহই সেই অব্যয়ের বিনাশ করিতে পারে না।”—“নিত্য অবিনাশী ও অপবিচ্ছিন্ন আত্মার এই দেহ সকল নশ্ব বলিয়া কথিত হয়।”—“ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেন না; অথবা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হয়েন না; ইনি জন্মরহিত নিত্য, শাস্ত, পূর্ণাঙ্গ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হয়েন না।”—“জাত মাত্রের মরণ নিশ্চিত এবং মৃতেরও জন্ম নিশ্চিত।”

ইহার পর ভগবান্ যোগবাদের কথা বলিতেছেন। যে কর্ম একটা শৃঙ্খলের জায়, সেই কর্মপবম্পরার ফলা-কাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা এবং ধ্যানের দ্বারা যোগে নিমগ্ন হওয়াই এই যোগবাদেব চবম লক্ষ্য।—“নিকাম ধর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক; কর্মফলে কদাচ যেন না হয়; তুমি কর্মফলাগ্নী হইও না; সকাম কর্মে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া, যোগে অবস্থিত হইয়া কর্ম কর; সমস্তই যোগ বলিয়া উক্ত হয়। জ্ঞানযোগে অপেক্ষা কাম্যকর্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট; অতএব তুমি সেই জ্ঞানকে আশ্রয় কর; ফলকামী মানবেরা ক্রুপাপাত্র। বুদ্ধিযোগে নিরত মনীষীরা কর্মজ ফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হন। যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন চূর্ণ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের বৈবাগ্য প্রাপ্ত হইবে। যখন শ্রুতিতে স্প্রতিপন্ন তোমার বুদ্ধি অবচলিত হইয়া ঈশ্বরেতে নিশ্চলা হইবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে।”

ধর্ম্মের জন্তই ধর্ম্ম সাধন করিবে, পুরস্কারের লোভে করিবে না, এই কথাটি স্পষ্টরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত, নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে :—“যোগ-বিরহিত ব্যক্তির

বুদ্ধি নাই; যোগ-বিরহিত ব্যক্তির ধ্যানও হয় না; আত্মধ্যান-বিরহীন ব্যক্তির শাস্তি নাই, শাস্তিহীনের স্তম্ভ কোথায়? যেহেতু বায়ু যেমন নোকাকে জলে বিক্ষিপ্ত করে, সেইরূপ মন, বিষয়ে ভ্রমণশীল অবলীকৃত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুগমন কবে, সেই ইন্দ্রিয়ই পুরুষের প্রজ্ঞাকে হরণ করে।”—জ্ঞানবান্ও স্বীয় প্রকৃতিব অনুসরণ করে; প্রাণিগণও প্রকৃতিব অনুসরণ করে; অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আব কি করিবে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েবই স্ব স্ব বিষয়ে অনুবাগ ও হেব অবশ্যস্বাবী। অতএব এই উভয়ের বশীভূত হইবে না। কেন না, তাহাবা মুমুকুর প্রতিপক্ষ।” কিন্তু কে মানুষকে পাপপথে বলপূর্বক লইয়া যায়? কৃষ্ণ উত্তর করিলেন :—“ইহা রজোগুণজাত হৃম্পুরণীয় ও অত্যাগ্র কাম ও ক্রোধ; মোক্ষমার্গে এই কামকে বৈরী বলিয়া জানিবে। যেমন অগ্নি ধূম দ্বারা, দর্শণ মলদ্বারা, গর্ভ জবাযু দ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপ জ্ঞানীও চিবশত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নি দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি এই কামের অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হয়। এই কাম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত কবে। অতএব তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়ের বিনাশক পাপরূপ এই কামকে জয় কব। ইন্দ্রিয়গণকে দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়; ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি সেই আত্মা। অতএব এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া, আত্মাব দ্বারা আত্মাকে নিশ্চল করিয়া এই দুর্নিবাব শত্রুকে জয় কব।” জ্ঞানযোগে কৃষ্ণ,—ঈশ্বরের সহিত নিত্য যোগ নিবদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহার শরীরধারণের উদ্দেশ্য কি তাহাবও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং আপনার স্বরূপ-লক্ষণ নির্দেশ করিয়া ছেন :—“জন্মরহিত অবিনশ্বব ও প্রাণিগণের ঈশ্বব হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ী বশতঃ প্রকাশিত হই। যখনই ধর্ম্মেব হানি এবং অধর্ম্মেব আধিক্য হয় তখনই আমি আবিভূত হই। সাধুদিগের পবিত্রাণের জন্ত, দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশেব জন্ত, ধর্ম্ম স্থাপনেব নিমিত্তে আমি যুগে যুগে আবিভূত হই। যিনি ক্রামার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম বথার্থরূপে জ্ঞানেব তিনি দেহত্যাগ করিয়া

পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন । অমুরাগ ভয় ও ক্রোধশূন্য এবং মদেকচিন্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞান তপস্তাব দ্বারা পূত হইয়া অনেকে আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন । যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই ভজন করি । মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই পথ অনুবর্তন করে ।” ইহাই ত্যাগ ও কর্মের মতবাদ । এই মতবাদ ভারতবর্ষে একটা গুরুতর কার্য সাধন করিয়াছে ; ইহানিফল বাহু অমুষ্ঠানের প্রবণতা হইতে ভারতের চিন্তা ও ভাবকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছে । ঋগ্বেদার্থের যোগবাদের সহিত ইহাব কতকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায় ।

—“যিনি কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দেখেন, জন-গণের মধ্যে তিনিই 'বুদ্ধিমান' এবং সর্বকর্মকাবী হইলেও তিনিই যোগযুক্ত । নিষ্কাম, সর্ববন্ধনমুক্ত, জ্ঞানঅবস্থিত চিন্তা এবং প্রাণ-যজ্ঞামুষ্ঠানকারী ব্যক্তির সমুদয় কর্ম বিলয় প্রাপ্ত হয় । তাঁহার অর্পণ ব্রহ্ম, দ্রব্য ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্ষক হোমও ব্রহ্ম, তিনি সেই ব্রহ্মকর্মসমাধি দ্বারা ব্রহ্মকেই পাইয়া থাকেন । দ্রব্যাময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু জ্ঞানেতেই সমুদায় কর্মের পরিসমাপ্তি হয় ; —যে জ্ঞান অবগত হইলে পুনর্বার এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না এবং যদ্বারা আত্মাতে ও অনন্তব আমাতে ভূতগণকে অশেষরূপে দর্শন করিবে । যদি সমুদায় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপী হও, তথাপি সমুদায় পাপসমুদ্র জ্ঞান-পোত দ্বাবাই সম্যকরূপে উত্তীর্ণ হইবে । যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্মকে ভস্মসাৎ করে । ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই । যোগসিদ্ধ ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞান আত্মাতে স্বয়ংই লাভ করে । শ্রদ্ধাবান, তৎপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন ; জ্ঞানলাভ কবিয়া অচিরাত্ মোক্ষ প্রাপ্ত হন । অতএব অজ্ঞানোৎপন্ন) হৃদয়স্থ এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া যোগকে অবলম্বন কর । হে ভাবত উঠ !”

উক্ত বচনগুলির দ্বারা জানা যায় যে, যোগীরা জ্ঞানকেই তাহাদের প্রযত্নের পরম লক্ষ্য, এবং মোক্ষপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচনা করিত । ইহা সাংখ্যদর্শনের প্রতিকূল

সমালোচকদিগের প্রতিবাদের একপ্রকার উত্তর বলিবেও হয়, যেহেতু, যোগীরা জ্ঞানবাদকে আদৌ পবিত্রজ্ঞান কবে নাই । বস্তুত কৃষ্ণ এই কথা বলেন ! “অজ্ঞেবাই জ্ঞান যোগ ও কর্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিত-বা তাহা বলেন না । একমাত্র সাধন সম্যকরূপে অবলম্বন করিলে হৃদেরই ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় । জ্ঞাননিষ্ঠগণ যে স্থান লাভ কবেন, কর্মযোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন । যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন তিনিই সম্যক দর্শন করেন ।”

কিন্তু যোগমার্গে উপনীত হইতে হইলে, অগ্রে সন্ন্যাস অবলম্বন করা আবশ্যিক । “যেহেতু, ফলকামনা ত্যাগ কবেন নাই এরূপ কেহই যোগী নহেন । আত্মা দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করিবে না । যেহেতু আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু । যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনিই আত্মার বন্ধু, অবশীভূত আত্মা শত্রুবৎ আচরণ করিয়া থাকে ।”

তাহার পর, যোগীর লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :— “যাহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি কুটস্থ, জিতেন্দ্রিয়, লোভ প্রাষণ কাঙ্ক্ষনে যাহার সমদৃষ্টি, তিনিই যোগযুক্ত যোগী । যিনি আমাকে সর্বভূতে দেখেন, এবং সর্বভূত আমাতে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না । যিনি সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে, একত্বকে আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, বিষয় সকলে পাকিয়াও সেই যোগী আমাতেই অবস্থান করেন । যিনি আত্মতুলনায় সর্বত্র সমান দেখেন,—স্বপ্ন হৃৎ সমান দেখেন, সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ ।

জ্ঞানযোগের অধ্যায়ে, কৃষ্ণ আপনাব স্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—কৃতি, অপ, তেজ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটরূপে তাঁহার অপবা প্রকৃতি বিভক্ত । যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা কবিতোছে সেই জীবভূতা প্রকৃতিই তাঁহার পরাপ্রকৃতি । “আমি হইতে শ্রেষ্ঠ আব কিছুই নাই ; সূত্রে মনিগণের দ্বায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গাঁথা আছে । আমি যে অদৃশ্য—অজ্ঞজনেবা আমাকে দর্শনেব গ্রাহ্য বলিয়া মনে করে ; তাহারা আমার নির্বিকার পবাপ্রকৃতিকে জানে না ।” সংক্ষেপে বলিতে গেলে,—

তিনি ঈশ্বর, পবিত্রাত্মা, পূর্ণশক্তি, আদি সত্তা, আদি দেব, আদি যজ্ঞ। এই ঈশ্বর কে? ভগবান্ এই প্রশ্নেব এইরূপ উত্তর দিতেছেন:—পবন যে অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম; স্বভাবই অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়; ভূত সকলেব উৎপত্তি ও উদ্ভবের কাৰণ,—বিসৰ্গ ও কৰ্ম্ম শব্দবাচ্য। বিনশ্বব দেহাদি পদার্থ প্রাণিমাত্রকে অধিকার কবিয়া অবস্থান কবে একান্ত তাহা অধিভূত; পুরুষ অর্থাৎ সূর্য্যামণ্ডল মধ্যবর্তী বিরাট পুরুষ বলিয়া অধিদৈবত এবং এই দেহে অন্তর্ধানিকপে অবস্থিত আমিই যজ্ঞেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া অধিযজ্ঞ। অন্তকালে আমাকেই স্মরণ কবিতে কবিতে যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই। অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া আছি; চবাচর ভূত সমুদায় আমাতে অবস্থিত, আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। আমি ভূত-ধাবক ও ভূত-পালক, তথাপি ভূতগণে অবস্থিত নহি। আমিই এই জগতের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, স্তম্ভ, প্রভব, প্রলয়, স্থান, আমিই অব্যয় বীজ। আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, আমিই সং, আমিই অসং। আমিই যজ্ঞ, আমিই ব্রহ্ম, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই হোমের যুত, আমিই অগ্নি, আমিই হোম।

যিনি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্রপুষ্প ফল ও জল প্রদান করেন, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তিকর্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত পত্রপুষ্পাদি গ্রহণ কবি।” অবশেষে কৃষ্ণ বলিতেছেন:—“দেবগণ আমার উৎপত্তি অবগত নহেন, মহর্ষিগণও অবগত নহেন, যেহেতু আমি দেবগণেব ও মহর্ষিগণেবও সর্ব্বতোভাবে আদি। আমি সকলেব প্রভব, এবং আমি হইতেই সমস্ত প্রবর্তিত হয়।” ভগবদ্গীতার ঈশ্বরের একস্থ য়েকপ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা বেশী কবিয়া বলা অসম্ভব। ভগবদ্গীতার দর্শন,—আধ্যাত্মিকত্ব ও নীতিতত্ত্বের উচ্চশিখরে আবোহণ করিয়াছে। বৈদিক ও ব্রাহ্মণিক ভাবে যত কিছু দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, ভগবদ্গীতা তাহাব সংক্ষিপ্তসার,—এবং যেন সেই সকল তত্ত্বের “মাধার মুকুট”। ভগবদ্গীতায়, জ্ঞানযোগ ও কৰ্ম্মযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; যে বিজ্ঞান, জড় ও চৈতন্য উভয়কেই

এক আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তাহাই প্রকৃত বিজ্ঞান; কেননা, সমস্ত জড়পদার্থের মধ্যে জড়ের মূলতত্ত্বরূপী যে চৈতন্য বিস্তারিত সেই চৈতন্যই কৃষ্ণ—তিনিই ব্রহ্ম। —“মহাভূত সমূহ, অহঙ্কার বুদ্ধি, মূলপ্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি মনোবৃত্তিকপা চেতনা ও দৈর্ঘ্য—এই ইন্দ্রিয়াদি-বিকার-সহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল।” পরমাত্মাব নিত্য ধ্যানই বিজ্ঞান, তাহা হইতেই সত্যেব জ্ঞান জন্মে। ঈশ্বকে জানা, আমাদেব সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা জানা এবং জগতে যাহা কিছু আছে তাহার কাৰণ বলিয়া তাঁহাকে জানা—মানুষের ইহাই কর্তব্য। কৃষ্ণ বলেন,—“অনাদি পরব্রহ্ম, তিনি সংও নহেন, অসংও নহেন সর্ব্বেন্দ্রিষেব গুণ তাঁহা কর্তৃক প্রকাশিত হয়, অথচ তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত, সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধাবভূত, নিগুণ অথচ সকল গুণের ভোক্তা। তিনি অবিভক্ত হইয়াও ভূতগণের মধ্যে বিভক্তেব স্তায় অবস্থিত; তিনি ভূতভর্তা, এসিষ্ণু ও প্রভবিস্ণু, অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রায়কর্তা। তিনি জ্যোতির জ্যোতি, অজ্ঞান-অন্ধকারেব অতীত; তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য, এবং তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।”

—“প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সম্ভবজন্তম এই তিন গুণ প্রকৃতি-জাত বলিয়া জানিবে। কার্য্য ও কাৰণ ইহাদেব কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হন, আব পুরুষ স্তম্ভস্থাদিবি ভোক্তৃত্বেব হেতু বলিয়া কথিত হন। হে ভারতবর্ষ, যে কিছু স্বাবব জন্ম সম্ব উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ হইতে হয় জানিবে। কেহ ব্রহ্ম ভূতগণেব পৃথক্ ভাবে একস্থ দর্শন এবং তাহা হইত ভূতগণের বিস্তার দর্শন করেন তখন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবেন। যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত লোককে প্রকাশিত কবেন সেইরূপ ক্ষেত্রী অর্থাৎ পরমাত্মা সমুদায় ক্ষেত্র অর্থাৎ সমস্ত জড়জগৎকে প্রকাশিত কবেন।” বিশ্বব্রহ্মবাদেব সমস্ত মতটি এই বচনগুলিবি মধ্যে বদ্ধ; কিন্তু যদিও সর্ব্বভূত সেই পরম পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু তথাপি উহাবা একই প্রকারে উদ্ভূত হয় নাই; এই জন্তই কৃষ্ণ

উপদেশের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, মানুষ কেবল যোগের দ্বারাই স্বকীয় উৎপত্তির মূল কাণের অভিমুখে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া অবশেষে তাহাতে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে। বস্তুত,—যেহেতু ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, অতএব মানুষ বুদ্ধি ও জ্ঞানে যতই উন্নত হইবে ততই তাহার নিকটবর্তী হইতে পাবিবে। সে যাহাই হউক, কৃষ্ণ এ কথা স্বীকার করেন—যে, যাহার যেকপ প্রকৃতি তদ-মুসাবে, বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষ অমৃত উপনীত হইতে পারে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন:—“কেহ বা ধ্যানযোগে আত্মাকে আত্মার দ্বারা আত্মাতে দেখেন, কেহ বা সাংখ্যযোগে, কেহ বা কর্মযোগে আত্মাকে দর্শন করেন। কিন্তু কেহ কেহ এই প্রকারে অর্থাৎ সাংখ্য যোগাদি দ্বারা আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে না জানিয়া আচার্যাদি নিকট আত্মকর্মের উপদেশ পাইয়া উপাসনা করেন; তাহাবাও প্রতিপারণ হইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।” তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় এবং নির্বিকার দেহীকে দেহের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়:—
এই ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তম।—সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে অনুরাগ ও তম হইতে জড়তা, ভ্রম ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়।” যে যোগের দ্বারা পরম পুরুষের নিকটবর্তী হওয়া যায়, সেই জ্ঞানযোগ ভগবদ্গীতার একটি পরমোৎকৃষ্ট বিষয়; কেন না, জগতের সহিত ব্রহ্মের কিরূপ সম্বন্ধ, উহা দ্বারা তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; ইহাতে অবতাবাদেব কথা আছে, এবং মানুষকে যিনি নিত্য ধামে লইয়া যান সেই জ্ঞানকর্তার উল্লেখ আছে।—“জীবলোকে, আমারই অংশ এই যে জীবভূত সনাতন পদার্থ—ইহা প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। দেহী কর্মবশে যে শরীর প্রাপ্ত হন এবং যে শরীর পরিত্যাগ করেন, পূর্ব শরীর হইতে প্রাপ্ত শরীরে এই সকল ইন্দ্রিয়াদি লইয়া যান। যেমন বায়ু আশয় হইতে অর্থাৎ কুন্ডমাди হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে সেইরূপ দেহান্তব-গমনকারী অথবা সেই নেহেই অবস্থিত অথবা বিষয়-ভোগকারী অথবা ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট দেহীকে মূঢ়েরা দেখিতে পায় না; কিন্তু জ্ঞান-চক্ষু ব্যক্তবা দেখিতে পান। আদিতো যে তেজ, চন্দ্রমাতে যে তেজ, অগ্নিতে যে তেজ অখিল জগৎকে

প্রকাশিত করিতেছে সেই তেজ আমারই জানিবে। আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত সকলকে বলের দ্বারা ধারণ করি এবং বসময় চন্দ্র হইয়া সমুদয় ওষধি সম্বর্দ্ধিত করি। আমি সমুদায় প্রাণিগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি—আমি হইতেই স্মৃতি জ্ঞান ও বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে। সমুদায় বেদের আমিই বেদ; আমিই বেদান্তরূপ ও বেদার্থবেত্তা। ক্ষব ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ, লোকে প্রসিদ্ধ। তাহার মধ্যে সমুদায় ভূতগণ ক্ষর পুরুষ, আব কুটস্থ চৈতন্য অক্ষর পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে অত্র উত্তম পুরুষ—পরমাশ্রা বলিয়া কথিত হন—যিনি অব্যয় ঈশ্বর এবং যিনি লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধারণ করিয়া আছেন। যেহেতু আমি সর্ববের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম; এই জন্য আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছি।”

বৌদ্ধনীতি হইতে যোগ-নীতির শ্রেষ্ঠতা একটি বিষয়ে উপলব্ধি হয়। উভয় নীতিই ত্যাগ ও সন্ন্যাসের উপদেশ দিয়া থাকে, কেবল প্রভেদ এই, বৌদ্ধেরা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতায় উপনীত হন; পক্ষান্তরে যোগীরা কর্মফলের বাসনা পবিত্যাগ করিয়া কর্ম করেন। এই জন্যই বৌদ্ধ ধর্ম প্রাচ্যখণ্ডের অধিকাংশ স্থানের উপর জয় লাভ করিয়াও, একস্থানেই দাঁড়াইয়া আছে। বৌদ্ধ ধর্মের অধ্যায়ে আমি তাহা বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিব। কিন্তু এই ভগবদ্গীতা একটি অপূর্ব অনন্তসাধারণ গ্রন্থ। ইহাতে যে উপদেশ আছে তাহা—কি পণ্ডিত কি যোগী, কি ক্ষুদ্রবুদ্ধি সামান্য ব্যক্তি, সকলকেই পরিভূক্ত করে। যোগীর যে ত্যাগ তাহা কর্মত্যাগ নহে—তাহা কর্মফলের কামনা ত্যাগ। কৃষ্ণ বলিতেছেন:—“বস্তু দান ও তপস্তারূপ কর্ম পরিত্যজ্য নহে, নিশ্চয়ই কর্তব্য; যজ্ঞ দান ও তপস্তা বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধিকর। কিন্তু এই সকল কর্মেও আসক্তি ও ফল ত্যাগ করা কর্তব্য; ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত... দেহী নিঃশেষরূপে কর্ম সকল ত্যাগ করিতে পাবে না। কিন্তু যিনি কর্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হইবেন।” “বিভক্ত সর্বভূতের মধ্যে যাহার দ্বারা এক অব্যয় অবিভক্ত সত্তা অবলোকিত হয়, সেই জ্ঞানই সার্বিক জ্ঞান। যে জ্ঞানের দ্বারা পৃথকবিধ নানা সত্তাকে পৃথকরূপে অবগত হওয়া যায়, তাহা বাজসিক জ্ঞান; যে জ্ঞান, সমস্ত মনে

করিয়া এক কার্য্যেই আসক্ত হয় সেই অহেতুক অভাবার্থবৎ
অন্ন জ্ঞানই তামসিক জ্ঞান।*

কৃষ্ণ, চতুর্বর্ণের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ধর্ম নির্দিষ্ট
করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের জন্য তিনি যে সকল ধর্ম নির্দিষ্ট
করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, কেবল জ্ঞান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা
হইতেই ব্রাহ্মণ ভারতে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করিয়া-
ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের জন্য যে ধর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা আমাদের
যুরোপীয় অভিজাতবর্ণের (Aristocracy) পক্ষেও খাটে।
আমাদের অভিজাতবর্ণ কোন প্রকার জ্ঞানমূলক আন্দোলনের
নেতা হয়েন না,—তাহাদের নামে এই যে একটা কলঙ্ক
আছে তাহা নিতান্ত অমূলক নহে; কারণ, কোন যুগের
কোন অভিজাতবর্ণকেই জ্ঞানাত্মন প্রাধান্য লাভ
করিতে কখনও দেখা যায় নাই।—শম, দম, তপস্যা, ক্ষমা,
সরলতা, জ্ঞান বিজ্ঞান, ও আস্তিক্য, এই সকল ব্রাহ্মণদের
স্বভাবজ কর্ম। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপলায়ন,
দান, প্রভুতাব এই গুলি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম।
কৃষি, গো-বক্ষা, বাণিজ্য ইহাই বৈশ্যদের কর্ম এবং
পরিচর্যাস্বক কর্মই শূদ্রদের পক্ষে স্বাভাবিক। “স্ব স্ব
কর্মে অভিরত মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। যাহা হইতে
মানবগণের প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা হয় এবং যিনি এই সমুদায়
বিষ ব্যাপিরা আছেন, মানবগণ স্বকর্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা
করিয়া সিদ্ধি লাভ করে। সদোষ স্বধর্মও সম্যকরূপে
অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকে স্বভাবজ কর্ম
করিয়া পাপ প্রাপ্ত হয় না। হে কোন্তেয়, সদোষ হইলেও
সহজ কর্ম ত্যাগ করিবে না, যেহেতু ধুম্বাশু অগ্নির জ্বালা,
সকল কর্মই দোষে আবৃত।”

ভগবদ্গীতার শেষ অংশটা সমস্তই উদ্ধৃত করিবার
যোগ্য; কেননা, যোগবাদসংক্রান্ত সমস্ত উপদেশ ও
বচনের উহাই সংক্ষিপ্তসার; উহাতে ইহাই প্রদর্শিত
হইয়াছে যে, ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ নিবদ্ধ
করিয়াই মনুষ্য ঈশ্বরের প্রসাদে ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ

* এ কথা আমাদের ক্ষত্রিয়দের সম্বন্ধে খাটে না—উপনিষদের
অনেক ধর্মই ক্ষত্রিয় ছিলেন। বেদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাহারাই
প্রথমে প্রতিবাদ উত্থাপন করেন।—অমুবাদক।

করে এবং নিত্য শান্তি লাভ করে; এই যোগবাদ মানুষকে
নিজ কার্যের উপর স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছে;
প্রথমে তাহাকে সত্যের পথ দেখাটয়া দিয়াছে; যে পথই
সে নির্বাচন করুক না—সে তার ইচ্ছাধীন। পরিশেষে
এই যোগবাদ, জ্ঞানী ও পণ্ডিতদিগের জন্য যে পুরস্কার, সেই
একই পুরস্কার শ্রদ্ধাবান অজ্ঞব্যক্তিদিগের জন্যও অঙ্গীকার
করিয়াছে।—“সর্বদা সর্বপ্রকার কর্ম করিয়াও মৎপরায়ণ
ব্যক্তি আমার প্রসাদে শান্ত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়।
তুমি চিন্তাবাদী সর্বকর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ
হইয়া, বুদ্ধিযোগ আশ্রয় পূর্বক সর্বদা মতিস্থ হও। মতিস্থ
হইলে তুমি আমার প্রসাদে সমুদায় বিপদ উত্তীর্ণ হইবে।
যদি অহঙ্কার বশত তুমি না গুন তবে বিনষ্ট হইবে। হে
অর্জুন, ঈশ্বর মায়াধারা দেহরূপ যন্তে অবরুদ্ধ ভূত সকলকে
তন্তুকর্মে প্রবর্তিত করিয়া সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান
করিতেছেন। হে ভারত, সর্বতোভাবে তাহারই শরণ
লও; তাহারই প্রসাদে পরাশ্রয় ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত
হইবে। এই গুহ্য হইতেও গুহ্যতর জ্ঞান আমি তোমাকে
বলিলাম। ইহা বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া যাহা
ইচ্ছা তাহাই কর। সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য
পুনরায় শ্রবণ কর; তুমি আমার অতি প্রিয়, এজন্য
তোমার হিত কহিতেছি। তুমি মতিস্থ, মদন্ত ও
আমারই উপাসক হও, আমাকেই নমস্কার কর, তাহা
হইলে আমাকেই পাইবে। তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা
করিয়া বলিতেছি; যেহেতু তুমি আমার প্রিয়। সমুদয়
ধর্ম পবিত্র্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর,
আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও
না। তুমি এই গীতার্থতত্ত্ব, ধর্মহীন ভক্তিহীন, গুরুসেবাহীন
এবং আমার অনুসারীকে কদাপি বলিও না। এই পরম
গুহ্য গীতাজ্ঞ আমার ভক্ত সকলকে যিনি বলিবেন, তিনি
আমাতে পরমাভক্তি অর্পণ করায় সংশয়শূন্য হইয়া আমাকেই
পাইবেন। মনুষ্যমধ্যে তাঁহা অপেক্ষা কেহ আমার অধিক
প্রিয়কাবী নাই এবং কোনকালে তাঁহা অপেক্ষা আমার
অধিক প্রিয় পৃথিবীতে আর কেহ হইবেও না। আব
যিনি আমাদের এই ধর্মসংবাদ পাঠ করিবেন, তিনি
জ্ঞানযন্তদ্বারা আমারই অর্চনা করেন;—আমার এইরূপ

মত। শ্রদ্ধাবান অশ্রুহীন হইয়া যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকারিগণের পবিত্র লোক সকল - প্রাপ্ত হন।” গ্রন্থের এই অংশটি কি গুরুগম্ভীর; ইহার বৈরাগ্য সৌন্দর্য্য ও অনুগম্য মাধুর্য্য তাহাতে পর্তে প্রদত্ত বাইবেলের উপদেশগুলিকে শ্রবণ করাইয়া দেয়; ২৪০০ শতাব্দী পুরাতন হইলেও, উহা এরূপ আধুনিক যে উহার সমস্তটাই কোন খৃষ্টান গির্জায় পঠিত হইতে পারে— ভিন্ন ধর্ম্মের জিনিস বলিয়া কাহারও মনেও হয় না।

ভগবদ্গীতাৰ শেষে, “সৰ্ব্বজীব সুখী হউক!” এই যে প্রার্থনাটি আছে, ইহা সেই উদার ও মধুবপ্রকৃতি ভারতীয় আৰ্য্যবংশেরই অনুরূপ।

ভারতের ধর্ম্মমতগুলি যাহা আমি বিবৃত কবিলাম, তাহা হইতেই উপলব্ধি হইবে, যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম আবির্ভূত হয় তখন ভাবত, সভ্যতা-নোপানের কত উচ্চধাপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। শাক্য মুনি সংস্কারকর্তারূপেই ভাবতে আবির্ভূত হইলেন। এই সংস্কার কার্য্যের উদ্দেশ্য কি, তাহা আমি বুদ্ধের জীবনীতে বিবৃত করিব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ।

(নাট্য রচনা)

প্রতাপসিংহ ও দুর্গাদাস ।

“মেবাব পাহাড় ! উড়িছে বাহার

রক্তপতাকা উচ্চ-শির,—

তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প

দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।”

সে দৃষ্টে কে না মুগ্ধ হয়? কে না সেই পতাকার দিকে বিস্ময় ও আশ্বাসে চাহিয়া থাকে? কবি প্রতাপসিংহ এবং দুর্গাদাস, রাজস্থানের বীরকীর্ত্তির কথায় রচিত।

সমগ্র প্রকৃতি চঞ্চল বলিয়াই উহার নাম জগৎ।

অনিভ্যতার ছায়া-কম্পনই বৈচিত্র্য, এবং সেই বৈচিত্র্যই সৌন্দর্য্যের প্রাণ। সুন্দরের মধ্যে সুন্দরতম মানব-হৃদয়; এবং সেই সুন্দর ও পুণ্যচরিত্রে কেবলই দেবানু-যুদ্ধের

ইতিহাস। তাই চিত্রশিল্পের এই সমালোচনা বড় যথার্থ— যে, চিত্রের অসম্পূর্ণতাই যথার্থ পূর্ণতা।

গৌতমের অটল দেবদত্ত, আমাদের সাধু আকাজ্জব দৈব স্বপ্ন; পাষাণীও মানস প্রতিমা। কিন্তু কবির ঐ চিত্র-যুগলে, নিত্যউপলব্ধ পাপপুণ্যের সংঘর্ষ আছে বলিয়া উহা বা সুন্দর; অতিমানুষ হইলে সুন্দর হইত না। কবির প্রতাপসিংহ ও দুর্গাদাসও আদর্শ মাত্র হইলে আদৃত হইত না। অন্ততঃ নাটকে ত নয়।

কবি প্রতাপসিংহ নাটকে দুইটি অতি স্থির ভাবের এবং সুন্দর তারকা চিত্রিত আছে; একটি ইরা, আর একটি মেহেব উল্লিসা। উহাদের আলোক অপার্থিব বলিয়া মনে হইলেও, পার্থিবতা যথেষ্ট আছে। সত্য বটে, যে ইরা সত্যরাজ্যের পুরোহিতের মত, হৃৎথের মোহমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, এবং শক্তের প্রাণে ভক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া ডুবিয়া গেল; এবং যে উদীয়মান সূর্য্যের পূরশ্চর হইয়া আসিয়াছিল, তাহার দীপ্তিতে উহার আলোক-মাধুর্য্য কেবল স্বপ্নেব মত স্থত রহিল। কিন্তু উহার চরিত্রে পার্থিবতা আছে, ক্ষীণতা আছে, অন্ধকাব আছে! মেহেব উল্লিসা অন্তগামী সূর্য্যের অমুচারিণী বটে; সে প্রেমবাজ্যের সম্যাসিনী সত্য; কিন্তু তাহার সম্যাসে অমীমাংসিক উদাসীনতা নাই। কেহ কেহ প্রতাপসিংহের অনেক চরিত্রে সম্পূর্ণতা দোষ আরোপ করেন বলিয়া প্রথমেই একথাটার উল্লেখ কবিলাম।

যে প্রতিজ্ঞা-পাঠ প্রতাপসিংহ নাটকেব আরম্ভ, উহা ঐতিহাসিক। বাণাপ্রতাপেব দেশেব প্রথম দৃষ্টের চিত্র, ম্যাটলিনির দলের প্রতিজ্ঞাপাঠের অনুরূপ নহে। প্রতিজ্ঞার সে অটলতা আজ আর নাই; কিন্তু এখনো রাজস্থানের রাজত্বেরা সোণার থালাব নীচে একটি পাতা বাখিয়া আহাৰ করে; এবং সুকোমল শয্যাতে একটি তৃণ বাখিয়া সুখ-সুপ্ত হয়। হায় প্রতাপ, এই তোমার সেই দেশ! কবির প্রতাপসিংহ, পরপদলিতা, হতালঙ্কারা প্রণীড়িতা, দীন জন্মভূমিকে দেখাইতেছেন; আর শক্তসিংহ বলিতেছেন (শক্তসিংহ কাপুরুষ নহে বলিয়া এস্থলে, “শক্তসিংহেব মত আমরাও বলিতেছি” বলিয়া একটু অলঙ্কারেব মাত্রা চড়াইতে পারিলাম না):—“জন্মভূমি?

সে আমাদের কে ১^ম যে গাভীরীষ এবং উদ্দীপনায় প্রথম দৃষ্টে অভিনয়, যে সাধনা এবং সন্ন্যাস এই অভিনয়ে স্থচিত, তাহার অন্তর্ভালেও যে অলঙ্কার তবলতা, উদাসীনতা এবং স্বার্থপরতা ছিল, কবি তাহা প্রথম দৃষ্টে দেখাইয়াছেন। আমাদের প্রাচীন অলঙ্কারের বিচারে ইহা অতি সুকৌশল। এতটা উৎসাহের দীপ্তি জাগিয়া না উঠিলে, অন্তরের অন্ধকারের গভীরতা মর্মে মর্মে বুঝিয়া লইতে পারা যায় না।

হর্গাদাস নাটকের প্রথম দৃষ্ট সঙ্ক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারিত, কিন্তু উহাতে স্থচনা অপেক্ষা পবিপূর্ণতার ভাগ অধিক। প্রথম দৃষ্টেই হর্গাদাস সমরসিংহ, ঔরংজেব এবং শ্রামসিংহের চরিত্র সঙ্ক্ষেপে যাহা বুঝিয়া ফেলি, শেষ-পর্যন্ত তাহাই দেখিতে পাঠি; ঘটনাচক্রে কাহাবো চবিত্তেব লুকানো দিক্ বড় বেশী ফুটিয়া উঠিতে দেখি না। স্বীকার কবি যে হর্গাদাসের চবিত্ত দেবচূর্ণভ—স্বর্ণপটে আঁকিয়া বাধিবার জিনিস; এবং কবি-অঙ্কিত-পট ধানিও স্বর্ণপট বটে। কিন্তু প্রথমদৃষ্ট হইতে শেষপর্যন্ত সে চিত্রপট একই ফ্রেমে বাঁধা দেখিতে পাই। প্রথমচিত্রেই হর্গাদাসের পরার্থপরতা, বুদ্ধিকৌশল এবং শৌর্য্য, সম্পূর্ণ বিকশিত। সমরসিংহের সরলতা এবং তেজস্বিতা, এবং ঔরংজেবের চলনা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একটি ঘটনায়ই প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রতাপসিংহের প্রথম চিত্রে, শক্তসিংহকে ত মোটেই চিনিতে পারি না; প্রতাপকেও নয়। রাজস্থানের প্রদীপ্ত সূর্য্যকে অনেকবার মেঘে ঢাকিয়াছে, অনেকবার তাঁহাকে মেঘমুক্ত নবসূর্য্যের মত দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক চরিত্র প্রথম হইতেই একটু গড়া পেটা রকমে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তবুও প্রতাপের চিত্রে, ঐ চিত্রের সুনির্দিষ্ট বহিঃ-সীমার মধ্যেই ঘটনাপরম্পরায় বর্ণবৈচিত্রে ছবিটির বিভিন্ন বেধাগুলি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তসিংহ-প্রহেলিকার সিদ্ধান্তের জন্ত ত প্রায় শেষচিত্র পর্যন্ত যাইতে হয়।

গড়াপেটা চরিত্র লইয়া কি নাটক হয় না? আমি সে কথা বলি নাই; হর্গাদাস এবং প্রতাপসিংহ নাটকের প্রভেদ বুঝাইবার জন্ত এত কথা বলিলাম। প্রথম চিত্রের দৃষ্টান্তেই আমি তুলনায় সমালোচনা করিয়া হর্গাদাসকে,

প্রতাপসিংহের নীচে ফেলিতে চেষ্টা পাই নাই। হর্গাদাস নাটকের প্রকৃতি স্বতন্ত্র,—উহার নাট্যকৌশল একটু নূতন ধরণের। কথাটা সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সমুদ্রের প্রকৃতি চিরদিনের মত যেন গড়াপেটা হইয়া বহিয়াছে; একদিন যদি অল্প আলোকে এবং জীৎ চঞ্চল সমীপের উচ্ছ্বাসে উহার সৌন্দর্য্য অনুধ্যান করি, তাহা হইলে ঐ প্রকৃতিতে যাহা দেখি, দীপ্তালোকে হউক, ঝটিকায় হউক, সেই প্রকৃতিরই আশামুরূপ পরিবর্তিত নববৈচিত্র দেখিতে পাই। ঝড়ে তরঙ্গলীলা বাড়ে, কিন্তু মুহূ সমীপেরও সে লীলার পূর্ণ বিবাম নাই। কেনিলাঘ্রাশির মাহাত্ম্যের চারিদিকে সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্ত, আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা ও প্রসন্নতা, তটভূমির দীপ্তি ও অন্ধকার, পবন প্রবাহের ধীরতা ও প্রবলতা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে যায়। ক্ষুদ্র এবং চঞ্চল দৃষ্টগুলির অভিনব সমুদ্রস্পর্শে অধিকতর নবগোবব লাভ করে, এবং সৌন্দর্য্যের ঘাতপ্রতিঘাতে, সমুদ্রের ক্ষুদ্র মাহাত্ম্য অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়। কবি শিল্পবেব Wilhelm Tell খুব উপযোগী দৃষ্টান্ত। কোন্ মহাসাধনা ক্ষেত্রে তাঁহার গুণাবলীর বিকাশ, তাহা জানি না; কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উহার অভিনয় দেখি। সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, যে ঐ গুণবিশি যেন স্বতঃই বিকশিত ছিল—“Without the help of education or great occasions to develop them”। টেলের চাবিপাশের চরিত্রগুলি উহাবই স্পর্শে ফুটিয়া উঠিয়াছে; এবং সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রগুলির বৈচিত্র্যেব মধ্য দিয়া টেলের একই মহিমা বিবিধভাবে দর্শন করি। টেলের চরিত্র সমালোচনায় কার্লাইল যাহা বলিয়াছেন, হর্গাদাস সঙ্ক্ষেপে সেই কথাগুলি সম্পূর্ণ প্রযুক্ত। ...a deep, reflective, earnest spirit, thirsting for activity, yet bound in by the wholesome dictates of prudence; a heart benevolent, generous, unconscious alike of boasting or of fear; গভীর চিন্তাশীল, উৎসাহী, কর্ম-পিপাসু, অথচ সং বিবেচনার নিয়মিত সীমায় বদ্ধ; উপচিকীর্ষ, বদাত্ত, দান্তিকতা বা ভীতির সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত।

নরজাহান নাটকখানির সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সমালোচনা

কবিরাছি ; কিন্তু একটি কথা এখানে বলিবার প্রয়োজন আছে। প্রতাপসিংহ, হুর্গাদাস এবং নূরজাহান, ইহার যে কোন কাব্যেই হউক, মোগলশাসনকালের রাজ-স্থানের আভ্যন্তরিক ভাব এবং দিল্লীস্ববিদগের অন্তঃপুরের অবস্থা অতি পবিত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাসে যে কথা নানা ঘটনা ছুড়িয়া লইয়া বুলিতে হয়, ঠিক সেই কথাই অতি প্রত্যক্ষভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আকবরকে কেহ প্রশংসা করে, কেহ বা নিন্দা করে ; কিন্তু সম্রাট-দিগেব রাজ্যভোগেব প্রকৃতি, ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই প্রদর্শিত হইয়াছে। বাজ্যশাসন ছিল, কিন্তু বাজ্যভোগ এত অধিক মাত্রায় ছিল, যে কাহাবো বেলায় ঐ ভোগের উচ্ছ্বাস শাসনেব কুলভূমি উপছিয়া উঠিয়াছে, কাহারো বেলায় বা কথঞ্চিৎ সংযমে কূলে কূলে বহিয়া গিয়াছে। একটু ছায়পরতার পথে চলিলেই হিন্দু দেশে শাসনকার্য্য অতি নির্বিবাদে চলিয়া যায়। রাজকার্য্যেব পর বিস্তর অবকাশ ; এবং সেই অবকাশে অমিত ধনভাণ্ডারেব অধীশ্বরেব নিত্য নূতনবিধ উপায়ে প্রবল ভোগতৃষ্ণা চবিতাৰ্থেব উল্লুপ্ত হইতেন। স্বা বঙ্গীত ও সুন্দরী প্রতিদিনই মোগলের লালসা বর্ধনের জন্ত “তাজা ব তাজা, নও ব নও” ছিল। খোসরোজে বাহারী জোব করিয়া অপবিত্রতা অস্বীকার করিবেন, তাহাদেবও স্বীকার করিতে হইবে, যে পৃথ্বীরাজ ও তানসান্ প্রতিদিনই নবপ্রশস্তি রচনা করিয়া আকবরের দ্বায়চক্রটাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি কবিয়া তুলিয়াছিলেন। কোন স্থরের উপকরণই যখন যথেষ্ট হয় না, যখন ভোগের স্পৃহা অগ্নে সানান্ন না, তখন নরহত্যা করিয়া নূরজাহান সংগ্রহ করিতে হয়। ঐতিহাসিক চিত্রে যাহার রেখাবয়ব পাই, নাটকের চিত্রে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া ফুটিয়াছে।

কেবল ঐ চিত্রেই নয় ; পাবিপার্ষিক সকল অবস্থাই চিত্রপটের ভিত্তিরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া চিত্রশুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছে। এ গেল দৃষ্টপট এবং রঙ্গভূমিব বিচার ; এখন একবার প্রযুক্ত পাত্রগণের কথা বলিতেছি।

নাটকখানি ঐতিহাসিক হইলেও শক্ত সিংহ এবং দৌলৎ, কবির দুইটি নূতন মনোহর সৃষ্টি। শক্ত সিংহের চরিত্রে স্বাভাবিকতা খুব বেশি। অতিশয় সদাশয় ব্যক্তিও যে

উচ্চ আকাজ্জক্য বিচলিত হইয়া সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলে, এটি তাহার স্মন্যব দৃষ্টান্ত। তাঁহার উদেলিত আকাজ্জক্য তলায়, যে এত আশ্বাসস্থানবোধ, আশ্বনিগ্রহ এবং আশ্ববিসর্জন লুকাইয়াছিল, শক্ত সিংহ তাহা নিজেই জানিতেন না। অবস্থা-বৈচিত্রে এবং ঘটনাব তাড়নায় যখন তাঁহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইল, তখন অন্ততঃ একমুহূর্ত্তেব জন্তও প্রতাপের দীপ্তি মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্থ অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যের কথা বলিতেছি না ; সেখানেত প্রতাপের গুণমুগ্ধ স্বদেশ-প্রেমিক শক্ত সিংহ পরিপ্রাপ্ত সিংহকে নববল বিধানের উদ্বোধন করিতেছেন। আমি বলিতেছিলাম সেই স্থানের কথা, যেখানে শক্তসিংহ হত-সর্ব্বস্ব। সম্রাট শক্ত সিংহ চিরদিনই নির্ধন ; কিন্তু তবুও বিধাতা তাহাকে ‘দৌলৎ’ দিয়াছিলেন। যিনি দিয়াছিলেন, তিনিই আবার তাহা কাড়িয়া লইলেন ;—বে দিন শক্ত বিশেষভাবে সে দৌলতেব মাহাত্ম্য বুলিয়াছিল, সেই দিন কাড়িয়া লইলেন। যে বস্ত্র হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার কথা বলায় লাভ ছিল না ; বিশেষ, উহাতে প্রাত্যহিকের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বুদ্ধিমানদের সে কথা উদারপ্রেমিক শক্তের মনে স্থান পায় নাই। প্রতাপ বলিলেন,—শক্ত, তুমি আমার ভাই নও ; কেননা তুমি ধনীর বিবাহ করিয়াছিলে। সেই মুহূর্ত্তে একবার শক্ত সিংহের দিকে চাহিয়া দেখ ; দেখিবে, প্রতাপপ্রত্যাখ্যাত শক্ত সিংহ প্রাত্যহিকের ক্ষুদ্রতা এড়াইয়া সমগ্র বিশ্বজনের ভাই হইয়া দাঁড়াইল। প্রতাপ শক্তের কাছে ছোট হইয়া পড়িলেন।

আর দৌলৎ-উল্লিঙ্গ ? কবি ভাষায় বলি,—“প্রতাপ তুমি দেবতা বটে, কিন্তু সেও ছিল দেবী।” যে দেশেব “ধেবি-গাথা” সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে রমণীবচিত সাহিত্যের সর্বপ্রথম সাক্ষী, যে দেশেব ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী আদর্শ পত্নীর প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত, শক্তসিংহ-দৌলৎ-মিলনের চিত্র, সেই দেশের কবির তুলিকার উপযুক্ত হইয়াছে বটে। নীচতাব ধূল্য এবং সংকীর্ণতার অন্ধকাবে আমবা দৃষ্টি-শক্তি হারাইয়াছি, তাই এ মিলনের মহিমাময় সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না। হুর্গাদাস নাটকেও দেখিতে পাই, যে দিল্লির ষাঁ সম্রাটকে হিন্দুর ভবিষ্যৎ বুঝাইতে গিয়া

বলিয়াছিলেন, “তাবা একবার ধর্মভেদ, আচাৰভেদ, জাতি-ভেদ ভুলে,—নতজ্ঞাহু হ’য়ে, কবঘোড়ে ভক্তিবাপ্পগদগদ-স্ববে, এই শ্রামলা সজ্জলা ভাবতভূমিকে, প্রাণভ’রে, মা বলে ডাকুক দেখি!” সম্রাট বুঝেন নাই; আমরাও বুঝি নাই! তাই এই হৃদিশা।

এই নাটকে কবিব আব একটি অভিনব সৃষ্টি মেহের-উল্লাস। স্বপ্নময়ী মেহের, কবির কল্পনায় চির আবাধ্যা কাব্যসুন্দরীর মত, তাহার লাবণ্য-তরঙ্গের অন্তরালে প্রশান্ততা লুকাইয়া রাখিয়াছে। কবি মেথু আর্পল্ডের ভাষায়—

Such, poets, is your bride, the Muse! Young, Gay,
Randiant, adorn’d outside, a hidden ground

Of thought and of austerity within.

প্রতাপসিংহ নাটকে ঘটনার বহুল সমাবেশ; এবং চরিত্রও অনেকগুলি চিত্রিত। যে কোশলে এগুলি সূক্ষ্ম হইয়া জমাট বাঁধিয়াছে, তাহা অশেষ প্রশংসার জিনিস। লক্ষ্মীর তিবোধানে, যৌবন মরণে, পৃথ্বীর পরিতাপে,—যে আলোক অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহাতেই প্রতাপসিংহ ভাস্বর। সকলি একস্থানে গাঁথা পড়িয়াছে বলিয়া ঘটনাবাহুল্যে এবং চিত্রাধিক্যে কোন দোষ ঘটে নাই।

হুর্গাদাস নাটকে, দিলির খাঁ, কাশেমু, গুলনেয়ার ও মহামায়া, সম্বন্ধে চিত্রিত। নৈষধকারেব অন্তিমাত্রায় অলঙ্কার-ছড়ছড়ির বর্ণনায় আছে, যে দময়ন্তীকে গড়িয়া ব্রহ্মাঠাকুর যখন হাত ধুইয়াছিলেন, তখন হাতের সেই রংটুকুতে পদ্মের জন্ম হইয়াছিল। আমি শ্রীহর্ষ হইলে বলিতাম,—যে কবি যখন মেহের আঁকিয়া তুলিটি কাড়িয়া-ছিলেন, তখন তাহারি ছিটেকোঁটায় চিত্রপটের উপর রাজিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাজিয়ার মেহেরের সূক্ষ্মতা ও দীপ্তি আছে, কিন্তু বর্ণের গভীরতা নাই। মেহের স্বপ্ন; কেননা স্বপ্ন, সৌন্দর্য ও চিন্তাময়। কিন্তু রাজিয়া যেন গোলাপী নেশার একটু খানি খেয়াল। রাজিয়ার গায়ে প্রজাপতির রং, কণ্ঠে পাপিয়ার স্বর, এবং সর্বোচ্চে হরিণীর চঞ্চলতা। কবি এবং বিজ্ঞানবিৎ গ্রাণ্ট এলেন যদি উহাকে পরীক্ষা করিতেন, তবে একটু পাগলের ছিটও পাইতেন। মুমূর্ষু,

মাতার সংবাদ দিতে আসিয়াও সে নিরুদ্বেগে গান শুনিয়া, রাগিণীর ক্রটি সমালোচনা করিতেছে। কিন্তু কবির নাট্যকৌশলের হিসাবে, রাজিয়ার চিত্রের প্রয়োজন আছে; নহিলে গুলনেয়ারেব কবিত্বশূন্য নিরবচ্ছিন্ন ভোগলালসা, ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইত না।

গুলনেয়ার সম্বন্ধে অনেকের মনে খটকা লাগিতে পাবে। সে ছায়ানাট বুঝিতে না পারুক, বেলা-মোতিয়া-চম্পায় শব্দাতীত সুরগরিমা বুঝিতে না পারুক, কিন্তু কোন জড়-প্রাণ মহাপাপিষ্ঠাও কি স্বামীর মুখের উপর জোর করিয়া অপরের প্রতি আসক্তির কথা বলিতে পারে? চরিত্রের অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার লোক উদ্ভাদ হয়; কিন্তু অন্তিমাত্র লালসার উদ্ভাসতায়ও অত বড় বাদসাহের মুখের উপর অমন কথা বলা স্বাভাবিক কি? কিন্তু প্রাতঃসাহের মুখে শুনিতেছি যে গুলনেয়াব অন্তিমাত্র মন্তপান করিয়াছিল।

মহামায়া চরিত্র অতি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। সে যখন গুলনেয়ারকে ক্ষমা করিল, তখনো তাহার প্রাণে প্রুতিহিংসার আশ্রয় জলিতোছিল। ইহাই স্বাভাবিক। তেজস্বিনী মহামায়া নারী,—দেবী নহেন; কিন্তু নারী হইলেও তিনি অসাধারণ নারী। যে দর্পে তিনি শিশু-কোড়ে, অশ্রুপূর্ণে ছুটিয়াছিলেন, স্বয়ং দিলির খাঁ তাহার সাক্ষী। রাজস্থানে যাহা সত্য সত্য ঘটত, তাহার চিত্র “আদর্শ মাত্র” বলা চলে না।

দিলির খাঁ নির্ভীক বীরপুরুষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, উদার এবং মহৎ। যোদ্ধার স্নায়ুজালে ও মস্তিষ্কচক্রে, এ গুণসমূহের যুগপৎ বিকাশ বিসম্বাদী নহে কিন্তু দিলিরের মাহাত্ম্য, তাহার সকল গুণের অন্তরালস্থিত কবিত্বেই সমধিক উদ্ভাসিত। ঔরংজেব, দিলিরকে কাপুরুষ বলিয়া ব্যঙ্গ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; কিন্তু উদার ও নির্ভীক দিলির তাহাতে টলিলেন না। দিলির খাঁ ব্যঙ্গ বুঝিয়াই স্বীকার করিলেন, যে সৈন্তেরা মহামায়াকে ধরিতে পারিল না; এবং নিজেব কথা কবিত্বেব ভাষায় বলিলেন:—“দেখলাম, সে এক মহিমাময় দৃশ্য। আলুলায়িতকেশা নারী; বুকের উপর সূক্ষ্ম শিশু! নির্মেষ উষার চেয়ে নিখুঁত, বীণার ঝঙ্কারের চেয়ে সঙ্গীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র,—সেই মাহত্ম্য।” “ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র”, কথাটায়

কাহারো আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিতে হইবে যে কবিত্বের ভাষায় ব্যঙ্গকারীকে দিলির ঐ কথা বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহার জাঁহাপনা সবলবিশ্বাসী বটে; কিন্তু নিতান্ত সরলবিশ্বাসীর ঈশ্বর, পুতুলের একটু অন্ন উপবে। কাজেই একটা জীবন্ত যথার্থতা সেই সংকীর্ণ নাম অপেক্ষা পবিত্র বৈকি? ক'জনের কাছে ঈশ্বরের নাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অসীমতায় এবং বিশ্বপ্রীতির-অকুরন্ততায় প্রভাসিত হয়?

আব একটা কথা—ধর্মী শাস্ত্র নয়, গবেষণা নয়, দর্শন-গ্রন্থের মত নয়। জীবনই ধর্ম,—মানুষের মৈনন্দি জীবনে যে পবিত্রতা এবং মহত্বের প্রত্যক্ষ অভিনয় দেখি উহাই ধর্ম। এই জন্তই দিলির খাঁ হুর্গাদাস ও কাশেমকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—“স্বর্গে ধারা দেবতা আছেন শুনি, তাঁরা কি এদের চেয়েও বড়?” দিলির খাঁটি সোণা; এবং খাঁটি ভিন্ন কখনো মেকি দেখিরা ভুলিত না।

দিলির খাঁ মহৎ, হুর্গাদাস মহৎ, দরিদ্র কাশেম মহৎ; এখন কথা এই, যে দিলির খাঁ, হুর্গাদাস ও কাশেমের মধ্যে দেবতা কে? হুর্গাদাস এবং দিলির খাঁ ধর্মপ্রাণ, তেজস্বী, উদারপ্রকৃতি, এবং বীর; কাজেই তাঁহারা সাধক, দেবতা নহেন। কিন্তু উচ্চআকাজ্জাহীন, স্বার্থের কিছুমাত্র আকাজ্জা-শূন্য কাশেম, নিঃস্ব অধচ পবার্পর কাশেম, কর্তব্যে অবতার, ও কর্মণার মূর্তি। তিনিই দেবতা। দেবতা কদাপি স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া থাকেন না; তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফেরেন, নর-সেবা করিয়া ফেরেন।

প্রতাপসিংহ এবং হুর্গাদাস কিয়ৎপরিমাণে তুলনার সমালোচিত হইয়াছে। তুলনায় আব একটা কথার উল্লেখ করিব। হুথানি নাটকই এক শ্রেণীর আত্মরক্ষা এবং যুদ্ধ ঘটনা লইয়া লিখিত; কিন্তু হুর্গাদাসে কর্মসমারোহের ব্যস্ততা, ক্ষিপ্তকারিতা এবং কাজেই সংক্ষিপ্ততা অধিক;—অতীতকে প্রতাপসিংহ নাটকে কর্মের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। হুর্গাদাস সদর্পে সম্রাটের সভা হইতে বাহির হইলেন, অমনি দিলিরের সসৈন্ত যাত্রা, যশোবন্তের শিশু পুত্র লইয়া কাশেমের পলায়ন, অশ্বপৃষ্ঠে মহামায়ার প্রয়াণ প্রভৃতি দৃশ্যের পর দৃশ্বে নিয়ত উৎসাহের প্রবাহ ছুটিতেছে, কুত্রাপি বিশ্রাম নাই। এই জন্ত সম্ভবতঃ হুর্গাদাস নাটক বঙ্গদেশে দর্শকদিগের অধিক তৃপ্তিবিধান করিতে পারে।

কর্মের গতি, উৎসাহের প্রবাহ, বিপদের বাত্যা প্রতাপসিংহেও আছে, কিন্তু বোদ্ধারা রাত্রি দিনই যুদ্ধ করিতেছে না; শক্তের সমস্তা পূরণে, ইমার স্বর্যাস্ত দর্শনে, আকবরের মন্ত্রণায়, অনেক অবসর আছে। রণক্ষেত্র এবং মন্ত্রণাগারের বাহিরে একটু কবিতা পড়ার সময়ও আছে। পৃথ্বীরাজের ‘প্রথম চুষনের’ কবিতা লইয়া বড় বড় বাজা মহাবাজাও একটু সময় কাটাইতে পারেন। সৈন্তেব ছাউনিতেও দৌলৎ প্রেমে মজিতে পারে, এবং মেহেব তাহার জীবনের স্বপ্ন বনাইয়া তুলিতে পারে। রাজিয়ার ‘চামেলিয়া বেলা চম্পায়’ যে অর্থ ধরা যায় না, এ কথা বুদ্ধিবার জন্ত হুর্গাদাস নাটকে কেহই বসিয়া নাই; সকলেই আপনার কর্মে, আপীসেব বাবুর মত যেন নাকে মুখে ছুটি ‘জুজিয়া’ ছুটিতেছে। গতিব মন্থবতায় প্রতাপসিংহ ভাবুক পাঠকের বেশি প্রিয়, ঘবে বসিয়া ধীরে ধীরে পড়িলে এই গ্রন্থে কবিত্ববাস্তাদান করিবার সুবিধা অধিক। ইরা, মেহেব, দৌলৎ এবং শক্তসিংহের অনেক উক্তি জমাটবান্দা গীতিকবিতা; অনেকবাব ফিবিয়া ফিরিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। রাজিয়াতে বক্তার আছে, কিন্তু সেটা ধবিয়া লইয়া কেহ গীতি গড়ে নাই; কমলাব গীতিত বঁড়শির টোপ, এবং যিনি টোপ ফেলিয়াছেন, তিনি স্বামীগ্রাসের ব্যস্ততায় উদ্ভাস্তা। কর্মক্ষেত্রের জীবন্ত ছবিব হিসাবে হুর্গাদাস সুরচিত; এবং এই শ্রেণীর নাটকই, অভিনয়ের পক্ষে বেশী উপযোগী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ইবনে বতুতার ভারত ভ্রমণ ।

(পূর্বভাষ্য।)

আবদুল্লা অল মহম্মদ লাওয়াতি তানজি ওরফে ইবনে বতুতা ৭০৩ হিজিবা (১৩০৩ খৃষ্টাব্দে) ১৭ই রজব সোমবার দিবসে মরক্কো রাজ্যেব তানজির নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাব নাম আবদুল্লা। দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হজরত ও দেশ পর্যটন উদ্দেশ্যে বুদ্ধ পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, জীবন সহচর বন্ধুবান্ধবের স্নেহ-মমতা-পাশ ছিন্ন করিয়া, একাকী নিঃসহায় অবস্থায় ৭২৫ হিজিরার ২৮৮ রজব বুহম্পতিবার দয়াময় অনাথ সহায়ের নাম স্মরণ করিতে

করিতে জম্মুভূমি হইতে বিদায়গ্রহণ কবেন। তিনি ভূমধ্য সাগরোপকূলস্থ সমুদ্র নগর পল্লী একে একে পবিত্রমণ করিতে কবিত্তে অবশেষে মিশবে আসিয়া উপনীত হন। পুণ্যভূমি মক্কা পবিত্রদর্শন আশা হৃদয় মধ্যে অধিকতর বলবতী হওয়ায়, আদন বন্দরের অনতিদূরে অবস্থিত আরজাব বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা কবেন। আশা ছিল, এই স্থানে অর্ঘ্যবপোতে আরোহণপূর্বক আদন বন্দরে উপনীত হইবেন কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না। এই স্থানের রাজা মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকায় তথায় জাহাজ না পাইয়া অগত্যা তাঁহাকে মিসরে প্রত্যাবর্তন কবিত্তে হইয়াছিল। ৭২৬ হিজিরাব শাবান মাসে তথা হইতে পূর্বাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে দামস্কে উপনীত হন; তথায় তিনি কিছু দিন অবস্থান কবিয়া হাদিস সরিফ শিক্ষা কবেন। এ সময়েও মুসলমানগণের মধ্যে বিজ্ঞার যথেষ্ট সমাদর ছিল, এমন কি, জ্রীলোকগণের মধ্যেও বিদ্যার অভাব ছিল না। এই সময়ে বিজ্ঞানজ্ঞাবিভূষিতা সদ্গুণ-শালিনী জুইটী বদুদী মহিলা তথায় বাস কবিতেন। একজন কামালদিনের কস্তা নাম জয়নব, অপব জন মহম্মদের কস্তা আয়শা। ইহারাও বতুতার বিজ্ঞাশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

৭২৬ হিজিরাব শওরাল মাসে তিনি স্থানীয় হজরাজিগণ সমভিব্যাহারে মক্কা ও মদিনাভূমে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বছরদ্বয়ের পোষিত আশা পূর্ণ কবেন। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত হইলে তিনি আবব-সমাগত আজমবাসিগণের সহিত ইরাক যাত্রা কবেন। ইরাকে হজরত আলীব কবব জিয়ারত করিয়া বোংদাদে উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি ওয়াছেত হইয়া বওয়াকে আগমন কবিয়া শেখ আহম্মদ রাফায়ির কবর জিয়ারত করেন। তৎপরে বাসরা পথে পুনঃ ইরাকে উপনীত হন। এস্থলে কিছু দিন অবস্থান করিয়া বতুতা ইম্পাহান অতিক্রম পূর্বক প্রসিদ্ধ সিরাজ নগরে আগমন করেন। সিবাজ ভ্রমণকালে তিনি প্রসিদ্ধ তাপস শেখ আবু অবদুল্লা খফিক ও ধর্মীস্বা কবি শেখ সাদির পবিত্র সমাধি-দর্শন কবতঃ গাজ্বন * বন্দবে উপস্থিত

* পার্শ্বভাষায় গাজ্বর ধোপাকে বলে। পারস্তের টাব নদীর তীরে বহু ধোপা অবস্থান করিত। সেই জন্ত লোকে এই স্থানকে গাজ্বন বলিয়া থাকে।

হন। তথা হইতে ইরাক, কুফা ও অবশেষে বোংদাদ গমন করেন। বোংদাদ এক সময়ে উম্মিয়া বংশীয় খলিফাদের পবন রমণীয় বাজধানী ছিল, কিন্তু প্রকৃতিব চিরন্তন নিয়মে এই বংশের বিলোপ পাইলেও এই নগরের সৌন্দর্য্য তখনও নষ্ট হয় নাই। বোংদাদ হইতে মোসাল ও মারদিন পথে তিনি দ্বিতীয় বাব হজ কবিত্তে মক্কায় আগমন করেন। তথায় একবৎসর বাস করেন, পরে চতুর্থ বার হজ শেষ হইলে জেদ্দায় উপস্থিত হইয়া জলপথে লোহিত সাগর হইতে জাজিরাব, মোশাসা পবিত্রমণ পূর্বক পুনরায় আদন বন্দরে উপস্থিত হন। তথা হইতে আফ্রিকাব পূর্বাংশ ভ্রমণ কবিয়া আববেব উত্তর ও কশিয়ার দক্ষিণস্থ স্থান সমূহ একে একে পরিদর্শন কবিত্তে করিতে দৃঢ়ব্রত বতুতা ইস্তাযুলে আগমন কবেন। এবং তথা হইতে খোরাসান, বোখা, সমবকন্দ, বালখ, হিবাত ও নিসাপু নগরসমূহ পরিদর্শন কবিয়া কাবুল রাজ্য পবিত্রমণ পূর্বক হিন্দুকুশ পর্বতের পার্শ্ব দিয়া সিদ্ধনদের তটে উপনীত হন। ভূবন-প্রসিদ্ধ পর্যটক ইবনে বতুতা এইরূপে হিন্দুস্থান, মালদ্বীপ, সিংহল, সুমাত্রা, চীন, আবব, ইবান, শাম, মিসর, ইম্পাহান, মরক্কো প্রভৃতি স্থান পবিত্রমণে ২৫ বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। তিনি হিন্দুস্থান ও অন্তান্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আববিভাষায় যে সকল বিষয় ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা সেই মূল গ্রন্থের যথাযথ অম্লবাদ প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহাস দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১। সিদ্ধনদ। ৭৩৪ হিজিরার মহরম মাসের প্রথম দিবসে—সিদ্ধনদোপকূলে * উপনীত হই। সিদ্ধনদ

* সিদ্ধ শব্দের অর্থ বড় নদী। আধাপণ পশ্চিমদিক হইতে পূর্বাভিমুখে গমনকালে সমুখে যে নদীকে সর্বাপেক্ষা বড় দেখিয়াছিলেন, তাহাকেই সিদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই অম্ল্যারে তটবর্তী ভূভাগকে সিদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। পারস্তবাসী সিদ্ধপ্রদেশকে হিন্দ ও সিদ্ধ নদাকে সিদ্ধ নামে অভিহিত করেন। ভুলক্রমে কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, হজরত মুহ আলায়হেছালামের সিদ্ধ নামক এক পুত্র সিদ্ধপ্রদেশ অধিকার করেন, সেই জন্ত ইহাকে সিদ্ধ বলে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

পাঞ্জাব* নামেও অভিহিত। পৃথিবীর অন্তান্ত বৃহৎ বৃহৎ নদনদীর মধ্যে ইহাও একটা বৃহৎ জলপ্রবাহ। মিসর প্রবাহিত নীলনদী মধ্যে মধ্যে ক্ষীত হইয়া উহার তটবর্তী ভূভাগ যেমন কৃষি কর্ত্তের উপযোগী করিয়া তুলে, তদ্রূপ সিন্ধুনদও গ্রীষ্মকালে ক্ষীত হইয়া তটভূমি প্রাবিত করতঃ ইহাব শল্যোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। এই নদতট হইতে সম্রাট মহম্মদ তোগলকেব রাজ্য আরম্ভ। কোন প্রবাসী এখানে উপস্থিত হইলে সম্রাটের স্থানীয় সংবাদদাতা তাহার নিকটে আগমন পূর্বক এদেশে আসার কাবণ জ্ঞাত হইয়া—বাদসাব নিকটে সংবাদ প্রেবণ করেন। আমি এইখানে যে সময়ে পৌছিয়াছিলাম, সেই সময় জনৈক সংবাদদাতা আমার নিকটে আগমনপূর্বক আমার আগমনের কারণ ও তাহাব জ্ঞাতব্য অন্তান্ত বিষয় (আমাব চেহারা, পোষাক পরিচ্ছদ, লোকজন সঙ্গে আছে কি না ইত্যাদি) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া, মূলতানের বিচারকর্ত্তা কুতবল্ মালেকের সমীপে তৎকরণ সংবাদ প্রেবণ করিলেন। এমাহুল মূলক সেয়েতেজ্ঞ† এই সময়ে সিদ্ধব বিচারকর্ত্তা ছিলেন। ইনি প্রথমে সম্রাটের সেবার নিযুক্ত হন, কিন্তু দৌভাগ্যগুণে কালক্রমে সে পদ হইতে উন্নীত হইয়া সৈন্তগণের বেতন বণ্টনের

* শতরূপ, বিপাশা, ইরবতী, চলভাগা ও বিতস্তা এই পাঁচটা উপনদী সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে পঞ্চনদ বা পঞ্জাব (পঞ্জ-আব) বলা হয়। মোগল অধিকার কালে সিন্ধুনদকে পঞ্জাব বলা হইত। যে সময়ে নাসিরুদ্দিন কাবাচা সিন্ধুনদে জলমগ্ন হন, সেই সময় বাদাশনি তাহার উল্লেখছলে বলিয়াছেন (নাসিরুদ্দিন দার পঞ্জাব গরিক বাহারে ফানাগাস্ত) অর্থাৎ “নাসির পঞ্জাব জলে পেয়েছে বিলয়।” ইহার দ্বারা প্রতীতি হব যে, সিন্ধুনদকে পঞ্জাব বলা হইত।

† নীলনদী, ভিক্টোরিয়া নিম্ননজা হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০০০ তিন হাজার মাইল। ইহা ১৭ই জুন হইতে ক্ষীত হইতে আরম্ভ হইয়া আগষ্ট মাসে এত অধিক ক্ষীত হব যে, ইহার নিকটবর্তী গ্রাম সমূহ একেবারে জলমগ্ন হইয়া যায়। গ্রামবাসী কাঠের মাচা প্রস্তুত করিয়া তথায় আশ্রয় লয়। ইহার প্রাবনে মিসরবাসী প্রভূত উপকার পাইয়া থাকে, যেহেতু মিসরে, কখন বৃষ্টি হয় না। নীলনদের প্রাবনে উভয় পার্শ্বের ভূমি জলমগ্ন হইয়া কৃষিকর্মেপযোগী হইয়া থাকে।

‡ সেয়েতেজ্ঞ কোন একটা সম্প্রদায়কে বলিয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ভূক্ত লোক দেখিতে তুর্কদের মত। এমাহুল মূলক এই দলভূক্ত ছিলেন। ইনি ভাগ্যবলে মহম্মদ সাহ তোগলকের জামাতা ও সৈন্তাধ্যক্ষ হন। ৭৪৮ হিজরায় দাক্ষিণাত্যে হোসেন বাহমনির সহিত যুদ্ধে ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

ভার প্রাপ্ত হন। তথায় আমাব উপস্থিতিকালে তিনি সেওস্থানে অবস্থিতি করিতে ছিলেন।

২। ডাকের নিয়ম। সেওস্থান হইতে মূলতান দশ দিবসের পথ ও মূলতান হইতে দিল্লী ৫০ পঞ্চাশ দিবসের পথ। কিন্তু ডাকযোগে সেওস্থান হইতে দিল্লিতে পাঁচ দিবসে সংবাদ পঁছছে। এদেশে ডাককে বুরিদ * বলে। ডাক দুই প্রকাবেব, মনুঘের ও ঘোড়াব। মনুঘেব ডাককে “দাওয়া” বলে। একক্রোশের মধ্যে তিনজন মনুঘে ডাক লইয়া যায়। প্রত্যেক ক্রোশ† অন্তরে এক একটা গ্রাম স্থাপিত। গ্রামের বাহিরে—হবকবার অবস্থিতির জন্য এক একটা গৃহ নির্দিষ্ট আছে। তথায় এক একজন হবকবা আছে। প্রত্যেক হরকবার নিকট দুইগজ লম্বা একটা লাঠী ও লাঠির অগ্রভাগে তাম্র নির্মিত ঘুঁঘুর বান্ধা আছে। হবকবার একহস্তে ঐ লাঠী ও অপর হস্তে লম্বিত ব্যাগ, এই অবস্থায় সে দৌড়িতে আবস্ত কবে। অপর হরকবা দূরে হইতে তাহার ঘুঁঘুরের শব্দ শুনিয়া প্রস্তুত হয়। এবং ডাক পৌছিয়া মাত্র সে তাহার নিকট হইতে ব্যাগ ও লাঠী লইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করে। এই প্রকাবে অতি অল্প দিবস মধ্যেই বাদসার নিকট সংবাদ পঁছছান হয়। ঘোড়াব ডাক অপেক্ষা মনুঘেব ডাকে অল্প সময়ে সংবাদ পৌছছে। এমন কি, সময়ে সময়ে বাদসাহেব অন্য খোবাসান হইতে টাটকা টাটকা ফলও এই ডাকে আনীত হইত। ঘোড়াব ডাককে

* আরবী ভাষায় বুরিদ শব্দে কাসেব ও ১২ মাইল দূরত্বকে বুঝায়। তুর্কি ভাষায় গুলাগ ও পারসী ভাষায় চাপার বলে।

† ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকাবে ক্রোশের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ করা হয়। পশ্চিম ভারতের ক্রোশ ইংরাজী ১২ মাইল গজার তার ভূমে ২½ মাইলে ক্রোশ এবং বৃন্দেলখণ্ড ও দাক্ষিণাত্যে ৪ মাইলের ক্রোশ ধরা হইত। বতুতা ও তাহার সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা মার্কো পোলো কোন স্থানের দূরত্বের উল্লেখ কালে কেবল “মনজেল” শব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন কিন্তু মনজেলের পরিমাণ কত তাহার সবিশেষ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদের দূরত্ব ৮০০ মাইল কিন্তু ইহাকে চল্লিশ দিনের পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে ১০ ক্রোশে এক মনজেল বুঝায়। দিল্লী হইতে মূলতান কোন প্রকারেই ৫০০ শত মাইলের অধিক নহে, কিন্তু বতুতা ইহা ৫০ দিনের পথ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেওস্থান হইতে মূলতান ৪৮৫ মাইল, কিন্তু তিনি ১০ দিনের পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হতরায় বতুতা দূরত্ব নির্দেশ করিবার কালে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

“আওলাক” বলে। প্রত্যেক চারিক্রোশ অন্তর ঘোড়া বদলান হইয়া থাকে। আমি যে সময়ে দৌলতাবাদে ছিলাম, সে সময়ে বাদশাহ জন্ত ডাকবোলে গঙ্গার জল আসিতে দেখিয়াছি। বাদসাহ সেই জল পান করিতেন। গঙ্গাতীর হইতে দৌলতাবাদ ৪০ দিনের পথ।

৩। প্রবাসীর সম্মান। কোন পথিক মূলতানে উপস্থিত হইলে তাহাকে বাদসার হুকুম না আসা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিতে হইত। যে যে প্রকাব লোক, তাহাকে সেই প্রকার সম্মানের সহিত রাখা হইত। হিন্দের বাদশা মহাম্মদ ভোগলক বিদেশীদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকারের উচ্চ পদ প্রদান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহার জামাতা ও মন্ত্রী বিদেশী। বাদসাহ আপনাব কর্মচারী ও প্রজাবর্গকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন সাধ্যপক্ষে প্রবাসীর সেবা শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতে ক্রটি না করেন।

কোন বিদেশী বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইলে তৎকালীন প্রধানুযায়ী এবং দর্শনেচ্ছু ব্যক্তির অবস্থানসারে তাহাকে কোন না কোন প্রকারের উপঢৌকন বাদসাহেব সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইত। বাদসাহ তাহা গ্রহণ করিয়া, তাহার ২৩ গুণ বা ততোধিক মূল্যের জব্বাদি প্রস্তুত করিতেন। বিদেশীয় সওদাগবর্গ এবং প্রকাব প্রভূত অর্থোপার্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিত। কিন্তু প্রদেশে উপস্থিত হইলে, আমারও ঐরূপ করিতে ইচ্ছা হওয়ায়, তৎকালীন বাসী * মহাম্মদ দুবী নামক জনৈক সওদাগবের নিকট হইতে, গোলাম, উট্টু, ত্রিশটি অশ্ব ও ইহাদেব জন্ত বিবিধ কারুকার্য শোভিত, “চিত্র বিচিত্র—গাত্রাবরণ ক্রয় করিয়া সওদাগবকে বলিলাম, “আপনি দিল্লীতে আগমন করিলে ইহাব সমুদয় মূল্য এককালে পবিশোধ করিব।” সওদাগব আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অগ্ন্যাত্র ও ইত্যন্তঃ না কবতঃ সমুদয় জিনিষ ছাড়িয়া দিলেন। পরে তিনি দিল্লীতে আগমন করিলে আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য মূল্য পবিশোধ করিয়াছিলাম।

৪। গণ্ডার। সিদ্ধনন্দ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদে কোন বাঁশেব জঙ্গলেব নিকট উপস্থিত হই। ইতিপূর্বে কখন বাঁশ দেখি নাই, কারণ আমাদের দেশে ইহা জন্মে না। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া সাধারণের যাতায়তের পথ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই পথে কিয়দূর অগ্রসর হইলে, হঠাৎ একটি গণ্ডাব * আমার দৃষ্টি গোচর হয়। ইতিপূর্বে গণ্ডাব কখন দেখি নাই। একজন অশ্বারোহী আমার অগ্রে অগ্রে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু সে হঠাৎ ইহার সম্মুখে পতিত হওয়ায় সেই গণ্ডাবটী তাহার শৃঙ্গের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাব অশ্বটী বিদীর্ণ করিয়া জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল। আব তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। এই স্থানে এক দিন বৈকালে আব একটি গণ্ডার ঘাস খাইতেছে দেখিতে পাইলাম। আমি ইহাকে মাঝিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ জঙ্গল মধ্যে পলাইয়া গেল। কোন সময়ে আমি দিল্লীব সম্রাট ভোগলক সাহের সমভিব্যাহারে মুগয়ার বহির্গত হই। মুগয়া শেষে একটি গণ্ডারের মস্তক রাজধানীতে আনয়ন করা হইয়াছিল।

• ৫। জানানি। অনন্তর দুই দিবস চলার পর—সিদ্ধতীরে অবস্থিত জানানি† সহবে উপনীত হই। সহরটী বেশ

* সম্রাটর দুই জাতীয় গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়, একজাতীয় একশূর বিশিষ্ট। ব্রহ্মপুত্রের তীরে ও আফ্রিকা অঞ্চলে ইহাদের আবির্ভাব। হমাত্রা, বাবা প্রভৃতি স্থানে আর এক জাতীয় গণ্ডার দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের দুইটা শৃঙ্গ আছে; চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশে ইহাদিগকে কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কদমে পড়িয়া থাকিতে ভালবাসে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা কালুখিনি ইহাদিগকে “কারকান্দ” নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহারা আকৃতিতে হস্তীর সমতুল্য। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা মহিষ অপেক্ষা বৃহৎ, হস্তী অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র। ইহার চর্ম একপ কঠিন ও স্থূল যে অতি তীক্ষ্ণ ছোরা কিবা তরবারির ধারে তাহা ভেদ করা যায় না। পুরাকালে গণ্ডারের চর্ম চালা নির্মিত হইত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, গণ্ডারের শৃঙ্গনির্মিত পায়ে বিধ কিবা কোন বিধান্ত দ্রব্য রাখিলে উহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। আরও শুনা যায় যে, ইহার শৃঙ্গনির্মিত কোন দ্রব্য বিধান্ত দ্রব্যের নিকট রাখিলে তাহা বিধস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

† অথবা এ নামে কোন সহরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না বা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আইন আকবরীতেও “জানানি” নামীয় কোন সহরের উল্লেখ নাই। সিদ্ধতীরের ঠেঠ (Thatha) সহর হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত শামীরপরে সামাবা জাতির বাসস্থান। মহাম্মদ তুর নগরেও সামারা জাতির বাস ছিল। ইহাও ঠেঠের নিকটবর্তী। তবে বোধ হয় সিদ্ধনদের দক্ষিণতীরের কোন স্থানে জানানি সহর অবস্থিত ছিল। পরে প্রকৃতির চিরন্তন সিরমে কুটিল কালাচক্রে এই সহর ধ্বংস হইয়া অতীতের গর্ভে ইহার নামটী পর্য্যন্ত নিমজ্জিত হইয়াছে।

সুন্দর। বাজারগুলি অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। এই সহরে সামারা নামক এক জাতীয় লোকের বাস দেখিলাম। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যে সময়ে হেজাজ বেন ইউছুক সিন্ধুপ্রদেশ-জয় করেন, সেই সময়ে সামারা জাতির আদি পুরুষ এই সপুবে বাস করিতেন। মুলতান নিবাসী সেখ বাহা উদ্দিন বংশধর শেখ রুকুনদ্দিন এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যে সময়ে হেজাজ, সিন্ধু জয় করিবাব আশায় মহম্মদ বেন কাসেমের সাহায্যার্থ এরা কই হইতে সৈন্ত প্রেরণ করেন, সামারা জাতির আদি পুরুষ সেই সময়ে সৈনিকরূপে এদেশে আগমন করেন, এবং যুদ্ধান্তে তিনি অন্তান্ত সৈনিকগণের সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করিয়া, বিবাহাদি করিয়া এ স্থানে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। এই সহরের অধিকাংশ অধিবাসী তাঁহার বংশধর। অন্ত কোন জাতির সহিত ইহারা সম্পর্ক স্থাপন কবিতো চায় না। এমন কি তাহাদের সহিত একত্রে ভোজনও কবে না। তাহাদের মধ্যে যদি কেহ তাহাদের জাতীয় বন্ধন লঙ্ঘন করিয়া অন্ত কাহারও সহিত গোপনে একত্রে আহার করে এবং এই সংবাদ যদি এই সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি বিশিষ্টরূপে অবগত হয়, তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত করা হয়। আমার ভারতগমন কালে ওমর এই জাতির সর্দার (প্রধান পুরুষ) ছিলেন। পশ্চাৎ ইহার পবিচয় দিব। আর একটি কথা বলিয়া রাখি ইসকান্দারিয়ায় আমাব আগমনকালে, সেখ বোরহান উদ্দিন এমরাজ যাহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতো বলিয়াছিলেন, ইনি সেই রুকুনদ্দিন।

+ সেখ বাহা উদ্দিন জিকরিয়া আল কোরেশী মুলতানীর পূর্বপুরুষ ৯৮ হিজিরায় মহাম্মদ বেনে কাসেমের সৈন্যদলসহ হিন্দুস্থানে আগমন করেন। কিন্তু ফেরিস্তা বলেন, “সেখ বাহা উদ্দিনের পিতামহ সেখ কামালুদ্দিন কোরেশী মজা হইতে ইরানে উপনীত হন, পরে তথা হইতে মুলতানে আগমন করিয়া কোটিকোর নিবাসী মওলানা হোসামদ্দিন হারমজির কস্তার সহিত নিজ পুত্র ওজিহ উদ্দিনের উদ্ধাধি ক্রিয়া সমাপন করেন। তাঁহারই ঔরসে ৭৭৮ হিজিরায় সেখ বাহা উদ্দিন জিকরিয়ার জন্ম হয়। কালে ইনি একজন যোগিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইনি সেখ সাহরাবর্দি সিদ্ধিকোর সমীপে থাকিয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করিতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ৬৬৬ হিজিরায় ইহার লোকান্তর ঘটে। অত্যাধিও মুলতান কেলা বন্দে ইহার সমাধি, মানব মনে অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। ইহা মুসলমানগণের একটি বিপাত তীর্থস্থান। এই বনাম বস্ত্র যোগিষ্ঠ মহামুস্তব বাহা উদ্দিন, সেখ রুকুন উদ্দিনের পিতামহ।

৬। সেওস্থান বা সেওয়ান।* জানানী সহব হইতে সেওস্থান গমনকালে পথি মধ্যে একজন সঙ্গী ও আহার অমুগামী হন। সেওস্থান একটি বৃহৎ সহর। অধিবাসিগণ অধিক পরিমাণে ধরবুজার চাষ করিয়া থাকে। উহাদের খাদ্য দ্রব্য মধ্যে কটাই প্রধান। বিদেশ হইতে অপর্যাপ্ত কাবুলী মটর ও জুনীর আমদানী হইয়া থাকে। অধিবাসিগণ ইহারই কটি খাইয়া জীবন ধারণ কবে। মহিষের দুগ্ধও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মৎস্যও যথেষ্ট। যে সময় আমি এ স্থানে আগমন কবি সে সময় দাক্ষিণ গ্রীষ্মের প্রারম্ভ। এই সময়ের প্রথম সূর্য উত্তাপ আর সহ্য করিতে না পারিয়া পথি মধ্যেই আমার সঙ্গীটী গাত্র বসন উন্মোচন কবতঃ জলে রুমাল ভিজাইয়া দেহ আবৃত করিতেন। এবং অন্ত একটি সিন্ধু রুমাল স্বল্পে রাখিয়া দিতেন। যখন গাত্র আবৃত সিন্ধু রুমালটী সূর্য তাপে শুষ্ক হইয়া যাইত তখন অন্ত সিন্ধু রুমালটী দ্বাৰা পুনরায় দেহ আবৃত করিতেন। সম্মুখে জল পাইলে শুষ্ক গামছাটী পুনরায় সিন্ধু করিতেন। এইরূপ ভাবে বহু কষ্টে উভয়ে সহরে প্রবেশ করিয়া একটি মসজিদে উপস্থিত হইলাম। মসজিদের খতিবের নাম শিবানী। পরিচয়ে জানিতে পারিলাম তাঁহার পুরুষানুক্রমে খতিবের কার্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রপিতামহ প্রথম খতিব পদে নিযুক্ত হইবার কালে খলিফা আমিরুল মোমেনিন ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট হইতে একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ সনন্দ খানি আমাকে দেখাইলেন। ৯৯ হিজিরায় খলিফা নিজ হস্তে সনন্দ খানি লিখিয়া ছিলেন। শেখ মহাম্মদ বোগদাদী নামক জনৈক বয়ঃপ্রাপ্ত বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইল। এই সময়ে তাঁহার বয়স ১৪০ বৎসরেরও অধিক। যদিচ তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছে বটে তথাপি শরীর সবল রহিয়াছে। যথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেছেন। সেখ মর্মজী নামক স্থানীয় লোকের আবাসে

* সেওস্থান বা সেওয়ান। এই নামের একটি জনপদ করাচি বন্দরের ১২০ মাইল দূরে এখনও রহিয়াছে। প্রায় পাঁচ সহস্র লোকের বাস। এই সহরে সাহাবাজকলন্দের সমাধি রহিয়াছে। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে সহরটী স্থাপন হয়। কথিত আছে এই সহরের দুর্গটী সম্রাট সেকেন্দরের নির্মিত ছিল। সহরের নিকটে একটি জলপূর্ণ ঝিল রহিয়াছে। মৎস্যজীবগণ এই ঝিলের নিকট বাসস্থান নির্মাণ করতঃ মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করে। বর্ষাকালে ঝিলটী প্রায় ১০ মাইল পর্যন্ত জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

অবস্থান করেন। বুদ্ধ বলিতেছিলেন যে সময় চাঙ্গেজ খাঁএর গোত্র হালাকু খাঁ বোগদাদের আব্বাসীয় বংশের শেষ খলিফা “মোস্তায়াসমবিলাহ” কে * হত্যা করেন তখন আমি বোগদাদে উপস্থিত ছিলাম।

ইতিপূর্বে আমরা সম্প্রদায়ের সর্দার ওনারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। তিনি এই সহরে অবস্থান করেন। এখানকার শাসনকর্তার নাম আমির কয়সরেকমি। তিনিও ওনার উভয়ে সম্রাটের নিকট হইতে ১৮০০ অব্দারোহী সৈন্ত লইয়া এ দেশ শাসন করিতেছেন। “রতন” নামক জনৈক হিন্দু জ্যোতিষী পণ্ডিত কোন আমিরের সাহায্যে সম্রাটের নিকট পরিচিত হন। অল্প দিবসের মধ্যে তিনি বাদশার প্রিয়পাত্র হইয়া এই সহরের বিচারকের ও কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। যখন তিনি এই সহরে উপস্থিত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করেন সেই সময় তাঁহার কতকগুলি শত্রুও জুটিয়া গেল। আমির কয়সরও ওনার তাঁহার অধীনে থাকিতে লজ্জা বোধ করতঃ একদা রজনী বোগে অধীনস্থ সৈন্ত দ্বারা রতনকে নিহত করেন এবং সরকারী সমস্ত টাকা কড়ি বাহা তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল লুণ্ঠনপূর্বক আপন সৈন্তদ্বিগকে বণ্টন করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত উভয়ে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীতমান করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না। কিন্তু ওনারের মনে ভয়ের উদ্রেক হওয়ায় তিনি তথা হইতে পলায়ন করেন। যখন এই সংবাদ মুলতানের শাসনকর্তা সেয়েতেজ এমাজুল মুলুকের নিকট পহঁছিল তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া সৈন্ত সমভিব্যাহারে সেওস্থানাভিমুখে গমন করিলেন। কয়সর এমাজুল মুলুকের আগমন জানিতে পারিয়া আপন সৈন্তদ্বিগকে তাঁহার গতিরোধ জন্ত প্রবেশ করিলেন। সহরের সন্নিগটে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষেই বহুসংখ্যক সৈন্তক্ষয় হইল। অবশেষে কয়সরের অল্পসংখ্যক সৈন্ত দুর্গাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করতঃ দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। এ দিকে এমাজুল মুলুক

ঐ সকল সৈন্তের পশ্চাদবর্তী হইলেন বটে কিন্তু তাহার এমাজুল মুলুকের গমনের পূর্বেই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘররুদ্ধ করিয়া দেয়। এমাজুল মুলুক বহু চেষ্টা করিয়াও দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দুর্গের চতুর্দিকে সৈন্ত প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। চল্লিশ দিবস এই ভাবে গত হইলে একদা একটা দুর্গ দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া সৈন্ত দল দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করতঃ দুর্গস্থ সকলকে বন্দী করিলেন। পর দিবস বহুসংখ্যক সৈন্তকে হত্যা করিয়া ফেলেন এবং কয়সরকে হত্যা করিয়া তাহার চক্ষু ভূষিপূর্ণ করিয়া সহরের এক অত্যুচ্চ স্থানে ঝুলাইয়া দেন। সৈন্তগণের মৃতদেহ সহরের বাহিরে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করেন। ইহার অল্প দিবস পরেই আমি এই সহরে আগমন করি।

রাত্রিকালে আমি একটা মাদ্রাসাতে আশ্রয় লইলাম। গৃহের মধ্যে অভ্যস্ত গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায় গৃহের ছাদের উপর শয়ন করিলাম। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সহরের বাহিরে কয়সরের ভূষিপূর্ণ মৃত দেহটী নয়নপথে পতিত হইল। উহা দেখিয়া আমায় মনে ভয় ও দুঃখের সঞ্চার হয়। সেই জন্ত আমি শীঘ্র শীঘ্র এ সহর পরিত্যাগ করিলাম।

৭। লাহিরী বন্দর*। হিরাতবাসী কাজী আলাউল মুলুক কসিহ উদ্দিন খোরাসানী রোজগার মানসে সপরিবারে দিল্লী আগমন করতঃ বাদশার দরবারে কিছুকাল অবস্থানের পর সিদ্ধপ্রদেশস্থ লাহিরী বন্দরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তিনি একজন আমোদপ্রিয় লোক। যে সময় এমাজুল মুলুক, কয়সরের বিরুদ্ধে সেওস্থান আগমন করেন, সেই সময় লাহিরীর শাসনকর্তা আলাউল মুলুকও স্বসৈন্তে তাহার সাহায্যার্থে আগমন করেন। একদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বাসনার নিকটে উপস্থত হইলে উভয়ের পরিচয়ে বিশেষ

* লাহিরীবন্দর। ইন্টার সাহেব ও ইহাকে লাহিরীবন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান করাচীবন্দরের সন্নিগটে এই নামে একটা গও গ্রাম রহিয়াছে। ইহা সিন্ধ নদের পশ্চিম শাখা হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এ সময় এই শাখা বালুকা পরিপূর্ণ হওয়ায় এই স্থানের পূর্ব গৌরব অতীতপর্বে বিলীন হইয়া ইহা এক্ষণে সামান্য ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। আইন আকবরিতে ইহাকে লাহিরী বন্দর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে সম্রাট আকবরের সময়েও এই বন্দর বর্তমান ছিল। আবুল ফজল এই বন্দরের আর এক লক্ষ টাকা লিখিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে একটা কুঠী নির্মাণ করেন। বোধ হয় ইংরাজের অধিকারের পর এই বন্দরটা বন্ধ হইয়া যায়।

* মোস্তায়াসম বিলাহ বোগদাদের আব্বাসীয় বংশের শেষ খলিফাকে ৬৫৬ হিজিরায় দুর্দাস্ত হালাকু খাঁ কবলের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া গোত্র (এক প্রকার অস্ত্র) দ্বারা মারিয়াফেলে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন তাঁহাকে পদাঘাত দ্বারা মারিয়া ফেলে। এই বংশের খলিফাগণ প্রায় ৫০০ শত বৎসর বোগদাদের শাসনও পরিচালন করেন। হতভাগ্য হালাকু খাঁ এই বংশে নিধন করেন।

প্রীতিলভ কবিরাম । তিনি লাহিরী বন্দবে প্রত্যাগমন-
কালে আমিও তাঁহার অঙ্গুগামী হই । তাঁহার সহিত সৈন্ত
ও যুদ্ধাঙ্গাদিপূর্ণ পঞ্চদশখানি জাহাজ ছিল । এতদ্ব্যতীত
নিজের থাকিবাব জন্ত “আহারা” নামক একখানি সুসজ্জিত
জাহাজ ছিল । এই জাহাজেব উভয় পার্শ্বে দুইটা নৌকাতে
পবিচাবক থাকিত ও অপর পার্শ্বে দুইটাতে গানবাঙ্গাদি
হইত । যখন জাহাজগুলি একত্রে সার বাধিয়া বায়ুন্তরে চলিতে
আবস্ত কবিত সেই সময়ে গানবাঙ্গাদিও আরম্ভ হইত ।
সিদ্ধুবক্ষে যখন গান আবস্ত হইত সে সময় আমার মনের
অবস্থা একেবারে পবিবর্তন হইত । বাস্তবজ্ঞের সুমিষ্ট স্বর,
গায়কের স্বর তান সহ গান যদিচ আমি ভালরূপে
বুঝিতে পারিতাম না, তথাপি হৃদয়ে যে এক অনির্বচনীয়
ভাবের উদয় হইত তাহা বর্ণনাতীত । সে সময় সংসারের
যাবতীয় বিষয় ভুলিয়া মত্তমুগ্ধ ভূজঙ্গের জায় একমাত্র সেই
বিশ্বনাথ ধোদাতালার প্রতি নন ধাবিত হইত । ইহাতে মনে
যে কি প্রকাবের সুখসম্ভোগ করিতাম তাহা জীবনে কখন
ভুলিব না । সেরূপ সুখ জীবনে আর কখন ভোগ করিতে
পারিব কি না তাহা বলিতে পারি না । আহারের সময়
উপস্থিত হইলে জাহাজগুলি একত্র করিয়া একখানি
জাহাজেপরি আহারের পরিবেশন হইত । আলাওল সকলের
আহারের শেষে আহাব করিতেন । সূর্য উদয়ের পূর্বেই
নামাজ শেষ করিয়া সকলে আহারে উপবেশন করিতেন ।
আলাওল যে সময় আহারে বসিতেন সে সময় তাঁহার
চিন্তাবিনোদনের জন্ত আহার সমাপ্তির কাল পর্যন্ত
স্বললিতস্বরে গানবাঙ্গ হইত । রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে
জাহাজগুলি তীরস্থ করা হইত । আলাওল তীব্রভূমে শিবির
সন্নিবেশ করিয়া তন্মধ্যে নিশাযাপন করিতেন । রাত্রিকালে
সকলে একত্রে নামাজ শেষ করিয়া আহারে উপবেশন
করিতাম । আহার শেষে সকলে আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে
সুমন করিয়া শয়ন করিতাম । নিশাকালে জাহাজগুলিতে
রীতিমত ঢৌকি দিবার জন্ত সিপাহীর স্বেন্দোবস্ত ছিল ।
সিপাহীগণ রীতিমত আপন আপন নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত
হইয়া ঢৌকি দিত এবং প্রত্যেক প্রহরে রাত্রি কত হইল
তাহা আলাওলকে জ্ঞাপন করিতে হইত । প্রাতঃকাল
উপস্থিত হইবার পূর্বে আহারাদি পাক করা হইত । আহারাদি

শেষে জাহাজগুলি চলিতে আরম্ভ করিত । আলাওল সময়
সময় অশ্বে আবোহণ করিয়া স্থলপথে গমন করিতেন ।
অগ্রে অগ্রে নাকারা নিনাদিত হইত । এই সময় জাহাজ-
গুলি সিদ্ধুবক্ষে অতি ধীরভাবে গমন করিত । এইরূপে
আমবা পঞ্চ দিবসের শেষে লাহিরী বন্দরে উপস্থিত হইলাম ।
বন্দরটি অতি সুন্দর । সমুদ্রের তীব্র অবস্থিত বলিয়া
এই বন্দর অতি সমৃদ্ধিশালী । সহরের সন্নিকটে সিদ্ধুনদ
সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে । ইমন, পারস্ত এবং
গত দেশের বহুসংখ্যক লোক ব্যবসা বাণিজ্য করিবার
জ আগমন করেন । এই সকল কারণে বন্দরটি ঐশ্বর্যশালী
ও সৌন্দর্য্যশালী বলিয়া খ্যাত । আমির আলাওল মুলুকের
প্রমুখ্যে গুনিলাম এই বন্দরের মোট আয় ৬০ লক্ষ মুদ্রা ।
আলাওলাল ইহার বিশ অংশের এক অংশ প্রাপ্ত হন ও
বাকি সমস্তই বামশার নিকট প্রেরণ করিতে হয় ।

একদিবস আমীরের সহিত সহরের প্রান্তভাগে ভ্রমণ
করিতে বাহগত হইয়া প্রায় সাতকোশ পথ অতিক্রমের
পর তাবনা* নামক এক বিস্তৃত ময়দানে উপনীত হইলাম ।
এই ময়দানে প্রস্তরময় বহুসংখ্যক মনুষ্য ও জীবজন্তুর মূর্তি
ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইলাম । অনেক অট্টালিকা,
প্রাচীরেরও ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে । অত্র এক স্থানে একটা
প্রস্তরের গৃহমধ্যে একটা চতুস্তারার উপর একটা মনুষ্য-
মূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে । ইহার হস্ত দুখানি কোমরের নিকট
স্থাপিত । মস্তকটি জীবৎ লম্বা, মুখটি একপার্শ্বে ঘুরান
ছিল । এই গৃহের পার্শ্বে একটা গর্ভমধ্যে দুর্গন্ধ জল

* তাবনা। জেনেরাল কনিংহামের মতে এই স্থান দেবলের
ধনশাল্যেব । দেবল লাহিরী বন্দর হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত ।
এই স্থানে সিদ্ধুপ্রদেশের অতি পুরাতন রাজধানী ছিল । আবুল ফজল
ও কেরতা উভয়েই দেবল ও ঠেঠ (Thatha) একই স্থান বলিয়া নির্দেশ
করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু ইহা তাহাদের ভ্রম । ঠেঠ, দেবল ঠেঠ নামে
আখ্যাত হইলেও দেবল একটা পুরাতন পৃথক সহর । কেহ কেহ
এরূপ অনুমান করেন যে অধুনা করাচীবন্দরের যে স্থান আলোগৃহ
(Light house) নির্মিত হইয়াছে সেই স্থানটা দেবলের অন্তর্ভুক্ত ।
কিন্তু ইহার মূলে আদৌ সত্য নিহিত নাই । ঠেঠ (Thatha), অতি
প্রাচীন সহর নহে । স্থলতান আলাউদ্দিনের সময় হইতে এই নগরের
প্রতিষ্ঠা । তৎকাল-কেরামের সঙ্কলন কর্তা লিখিয়াছেন যে অধুনা
যাহাকে লাহিরীবন্দর বলা হয় পুরাকালে তাহাকেই দেবলবন্দর বলিত ।
ইহা সত্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে । যদিও ইলিয়ট সাহেব এ মত
সমর্থন করেন না । কিন্তু আমাদের বিশেষতায় দেবলের ধ্বংস হইলে
ইহার অতি অল্পদূরে লাহিরী বন্দর স্থাপিত হয় ।

জন্ম রহিয়াছে। প্রাচীরগাত্রে হিন্দিভাষায় খোদিত একটা প্রস্তর ফলক রহিয়াছে কিন্তু ইহার অনেক স্থানের অক্ষর একবারেই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া পাঠ করা যায় না। আলাওল বলিতেছিলেন এ দেশের ঐতিহাসিকগণ বলেন এক সময়ে এই নগরের অধিবাসিগণ কোন দেবতার শাপ-ভ্রষ্ট হইয়া প্রস্তর-দেহে পরিণত হইয়াছে। উপরন্তু মূর্তিটা এই সহরের অধীশ্বর ছিলেন। এই স্থানে তিনি বাস করিতেন বলিয়া আজও সকলে স্থানটাকে রাজবাড়ী বলিয়া থাকে। আরও শুনা যায় এইরূপ অবস্থা প্রায় এক সহস্র বৎসরের পূর্বে ঘটিয়াছে। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন কবিয়া আমরাইব নিকট পাঁচ দিবস অবস্থান করতঃ ভাকরাভিমুখে গমনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

মহাম্মদ হাকিমজল হোসেন।

উদ্ভিদের দৃষ্টিশক্তি ।

বিজ্ঞানতপস্বী আচার্য অগরীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, চেতনা আছে, অল্পভূতি আছে, এমন কি চিন্তা করিবার শক্তিও তাহাদের আছে। উদ্ভিদ ও জীবে পরিণতি পরিমাণে মাত্র তারতম্য নতুবা মূলত উভয়েই প্রাণী। সংপ্রতি অধ্যাপক ডার্কহইন স্বতন্ত্র-ভাবে গবেষণা দ্বারা এই সত্য উপনীত হইয়া ভারতীয় আচার্যের পোষকতা করিতেছেন। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ ওষধির মধ্যে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানের অনুভব তাঁহাদেরই বংশধর দ্বারা প্রথম প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণীকৃত হইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিয়াছে, উদ্ভিদ দেখিতে পায় কি না? এই প্রশ্নের উত্তর ‘দেখা’ শব্দের সংজ্ঞার উপর নির্ভর করিতেছে।

কি পরিমাণ আলোকের অনুভূতি দৃষ্টি নামে অভিহিত হইতে পারে? আলোক-উত্তেজনা ইন্দ্রিয়-বিশেষের উপযুক্ত সঞ্চরণ দ্বারা সাদা-দেওয়াই যদি “দেখা” হয় তবে উদ্ভিদ নিশ্চয়ই দেখে। কিন্তু যদি বহিঃপদার্থের বিশিষ্ট মূর্তির প্রকাশ ও অনুভূতি, দেখা হয়, তবে উদ্ভিদ-রাজ্য এখনো অন্ধ। উদ্ভিদের একজাতীয় পত্র-কোষ ঠিক আমাদের

চক্ষুগোলকের মতই আলোকবস্তি সকলকে কেন্দ্রীভূত ও পবিচালিত করিতে সক্ষম—এই তত্ত্ব সংপ্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আলোকপাতে উদ্ভিজ্জের উত্তেজনা প্রকাশ ও তৎকালে তাহাদের সঞ্চরণশীলতার পরিচয় সূর্যমুখী ফুল, সূর্যের গতির সহিত ফিরিয়া ফিরিয়া বহুদিন পূর্বেই দিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে এতদপেক্ষা অধিক কিছু জ্ঞান আমাদের হইয়াছে কি না দেখা যাক।

কার্ণেগী ইন্সটিটিউশনের উদ্ভিজ্জ-গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর ডাক্টার ম্যাকডুগাল (Dr. D. T. Macdougall, Director of the Department of Botanical research of the Carnegie Institution) বলেন—উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে সম্ভবত আলোকই সর্বাধিক আবশ্যক উপাদান। কারণ, আলোক-রশ্মি হইতেই মুখ্যত উদ্ভিদে শক্তি সঞ্চিত হয় এবং বায়ু ও মৃত্তিকা হইতে লব্ধ আহাৰ্য্য সকলকে আলোকই উদ্ভিদ-জীবনের উপযোগী কবিয়া গঠন করে। আলোক হইতে শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা উদ্ভিদ ইহার সর্বশরীরকে এমন করিয়া আলোকের অভিমুখী করিয়া পাতিয়া দেয় যে সে যথোপযুক্তভাবে আলোক গ্রহণ করিতে পারে—যে হেতু, আলোকের তীব্রতা ও উদ্ভিদ-শরীরে আলোকপাতের কোণের বিশিষ্টতার উপর আলোক-লব্ধ শক্তি নির্ভর করে। এবং এই আলোকপাতের কোণ ও তীব্রতা নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা উদ্ভিদের যে আছে তাহা প্রমাণ দেখিয়া অনুমান করিতে বাধ্য হইতে হয়।

জানালা বা দেয়ালের ধারে যে সব গাছ থাকে তাহারা এমন করিয়া ঝুঁকিয়া আপনাদের পত্রতল প্রসারিত করিয়া দেয় যেন সব চেয়ে বেশি আলোটা আসিয়া পত্রতলের সহিত সমকোণ করিয়া পড়ে।

উদ্ভিদের সর্ব অবয়বই আলোক অনুভব করিতে সক্ষম নহে। কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গই আলোকানুভূতির প্রতিক্রিয়া সহিত সঞ্চয়যুক্ত। উদ্ভিদের অঙ্গবিশেষ আবৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

যদি জানালাশোভা চারাগাছের কাণ্ডের গারে টিনের পাত জড়াইয়া আলোকের দিক হইতে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, তবে পবদিন দেখা যাইবে যে কাণ্ডটি আলোকের দিকে

বাকিয়া গিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক এই প্রমাণ হয় যে গাছ কাণ্ডের সাহায্য ব্যতীতও আলোক প্রাপ্ত হয় এবং আলোকানুভূতিব প্রতিক্রিয়াতে ঢাকা কাণ্ড বাকিয়া যায়। তৎপরে সেই গাছের ফুলগুলি কাণ্ডে ঢাকনি দিয়া ঢাকিয়া দিলেও দেখা যায় যে গাছ তাহার দৈনিক বৃদ্ধি আলোক সংগ্রহের জন্য ঠিক অভ্রান্তভাবেই আলোকের দিকে ঘুরিতে থাকে। অতএব বৃক্ষশরীরের অবশিষ্ট বহিরঙ্গ পাতাই উদ্ভিদের আলোকানুভূতির ইঙ্গিত।

প্রায় সকল বৃক্ষের পত্রের একটা করিয়া লম্বা দাঁটা বা বোঁটা ও একটা চওড়া পাতা থাকে। এই পাতার প্রধান কার্য আপনাকে বিদ্যুত কবিতা দিয়া রশ্মিসংগ্রহ করা ও সেই শক্তি পত্রহরিত উৎপাদনে নিয়োজিত করা। পাতার বোঁটা টিনের পাত বা কালো কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলেও গাছ আলোকের দিকে ঘুরিতে পারে, কিন্তু পত্রফলক ঢাকিয়া দিলে গাছ আর আলোকের সন্ধান পায় না, আলোকের দিকে ঘুরে না, গাছ তখন বাস্তবিকই অন্ধীকৃত। কোনো কোনো গাছ তাহাদের কাণ্ড ও পাতার বোঁটা দিয়াও অল্প অল্প আলোক অনুভব করিতে পারে।

যে সকল গাছের আলোকানুভবশক্তি খুব তীব্র তাহাদের একটা পত্রফলক অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে বহিঃস্থকোষের উপরিপৃষ্ঠ বাহিরের দিকে ফোলা—যেন কুর্শপৃষ্ঠ আতলী কাচের মত আলোকরশ্মিগুলিকে কোষের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেয় এবং নিম্নকোষে চালনা করিয়া পত্রহরিত হইতে আহাৰ্য্য সামগ্রী উৎপাদন করিতে নিয়োজিত করে।

মনে কর এই বহিঃস্থকোষ যেন একটা ঘর (পর পৃষ্ঠায় ক চিত্র দেখ)। তাহার ছাদ কুর্শপৃষ্ঠ রোশনদান = (Skylight)-ওয়াল ও মেঝে কাচের। যখন রশ্মিগুলি কুর্শপৃষ্ঠ রোশন-দানের উপর পড়ে তখন তাহা কেন্দ্রীভূত হইয়া কাচমেঝে ভেদ করিয়া নীচের ঘবে যায় এবং পত্রহরিত হইতে শর্করা ও অন্যান্য পদার্থ প্রস্তুত করে। রোশনদান-ওয়াল ঘরের পাশদেয়াল আলোক-অনুভবনশীল; যদি বৃক্ষপত্র অর্থাৎ সমগ্র ইমাবত নড়িবার সময় রশ্মি পাশদেয়ালে পড়িয়া আঘাত করে তবে একটি দূরস্থ নড়ন-সক্ষম কলে গিয়া সাড়া পৌঁছায়। তখন ধীরে ধীরে, কিন্তু অভ্রান্ত সতর্ক-

ভাবে, সেই কল গতিপ্রাপ্ত হয় এবং পত্রগুলিকে এমন ভাঙ্গিয়া আনে যে রশ্মিগুলি রোশনদানের ভিতর দিয়া গিয়া মেঝে ভেদ করিয়া নীচের খাণ্ডপ্রস্তুতকাবী কোষে পৌঁছায়। এইরূপে গাছ প্রাত্যহিক আলোক সঞ্চয়ের জন্য আপনায় সকল পত্রগুলিকে একটি বিশেষ অবস্থায় নড়াইয়া নড়াইয়া রাখিতে থাকে। যখন পত্রফলকের উপর তীব্র আলোক পতিত হয় এবং সেই তীব্রতা যদি গাছের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তবে গাছ আলোকের দিক হইতে পত্রফলকের উপরিতল সরাইয়া লয়। আলোকের সামান্য শক্তি পবিবর্তনও বৃদ্ধিতে সক্ষম এবং দ্রুত অথচ অভ্রান্তভাবে নড়িতে সমর্থ একটি কল বৃক্ষশরীরে থাকায় আপনা আপনি এই সকল কার্য ঘটিয়া থাকে।

গাছের এই আলোকের পরিমাণ আন্দাজ করিবার নিপুণতা খুব সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে:—একটা ছোট দ্রুত পবিবর্তনশীল চারাগাছ (যথা রাই সরিষার চারা) কয়েক ঘণ্টা অন্ধকাবে রাখিয়া দিবার পূর্বে যদি ছোট বাতিব আলো গাছের দুই বিপরীত দিকে রাখা যায় এবং একটা আলোককে অপরটা অপেক্ষা এক ইঞ্চিমান্ন নিকটস্থ করা যায় তবে চারাটি অসম উত্তেজনার নিকটস্থ আলোর দিকে ঝুঁকিতে থাকিবে। কোনো কোনো গাছের অনুভবশক্তি এত প্রখর যে একগজ তফাতে রক্ষিত একটি বাতির আলোব তীব্রতাব একের তিন লক্ষ ভাগের একভাগ তার-তম্যও সেই সকল গাছ ধরিতে পারে। এই ক্ষম তারতম্য ধরিতে মানুষের নঞ্চক্ষু সম্পূর্ণ অক্ষম।

গাছ যে শুধু আলোক তাবতম্যই ধরিতে সক্ষম এমন নহে, অধিকন্তু বর্ণ নির্ণয় করিবারও ক্ষমতা স্পষ্ট তাহাদের আছে। বর্ণপর্যায়ের (spectrum) বিভিন্ন অংশ গাছে বিভিন্ন প্রকারের সাড়া উৎপন্ন করে। নীল ও লাল রং একই প্রকার সাড়া উৎপন্ন করে না। গাছ নীল আলোর দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, কিন্তু লালের উপস্থিতিতে কোনো উত্তেজনা প্রকাশ পায় না।

উপরি লিখিত পরীক্ষা সকল নিঃসন্দেহই প্রমাণ করিতেছে যে পত্রফলক আলোক হইতেই উত্তেজনা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই উত্তেজনাপ্রাপ্ত গতির উদ্ভব পত্রফলকে হয় না, বোঁটার গোড়া বা কাণ্ড হইতে হয়। সেই গতির

অস্বাস্থ্য পত্রফলক হইতে হয়ত কয়েক ইঞ্চি বা এক ফুট ব্যবধানও থাকিতে পারে। প্রায় সকল গাছেই এই গতি আলোক অমুভবক্ষম অংশ হইতে দূরে অবস্থিত অবয়বের মধ্যেই উৎপন্ন হয়। ইহা পরীক্ষার জন্য যদি একটা চাবার একটি মাত্র পাতা অনাবৃত রাখিয়া সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দেওয়া হয় এবং সেই অনাবৃত পাতার উপর আলোকপাত করা যায়, তবুও গাছের আবৃত অংশেই বক্রতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা নিঃসংশয়ে অনুমান করিতে পারি যে গাছের আলোকগ্রহণক্ষম ইঞ্জিন হইতে দূরস্থ অমুভূতি ক্ষেত্রে একটা সাড়া বা সংবাদ প্রেরিত হয় এবং তাহা হইতেই গতি উৎপন্ন হয়। মানুষের দৃষ্টিও এইরূপ—চোখ শুধু আলোক গ্রহণ করিয়া মস্তিষ্কে অমুভূতি পৌছাইয়া দেয়। অতএব উদ্ভিদেরও দর্শনক্ষমতা একেবারে অস্বীকার করিবার জো নাই।

উদ্ভিদের বহিরস্থিয় সকল ও প্রাণ আছে কি না, তাহা আমরা আমাদের আঁখি পিতামহগণের বিরূপ ধারণা ছিল, তাহা মহাভারত হইতে জানা যায়। শাস্তিপর্কের অন্তর্গত মোক্ষধর্মপর্কাদ্যায়ের ১৮৪ অধ্যায়ে আছে :—

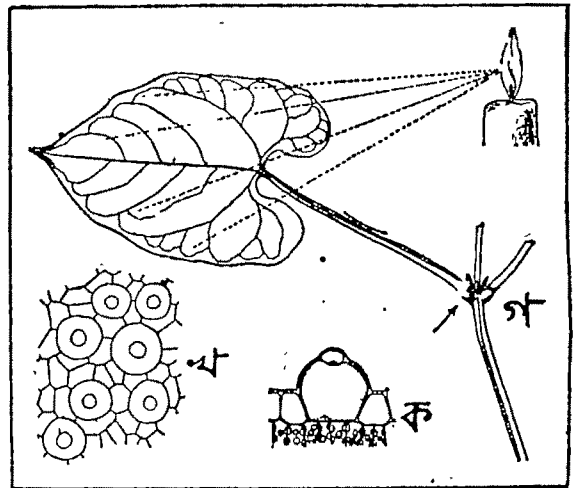
“ভরদ্বাজ কহিলেন, ব্রহ্মন্! কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সমুদায় পদার্থই যদি পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থাবর দেহে কি নিমিত্ত পঞ্চভূত লক্ষিত হয় না? দেখুন বৃক্ষলতাদি শ্রবণ, দর্শন, আশ্রাণ, আশ্বাদন বা স্পর্শ করিতে পারে না। উহাদের শরীরেও কথিরাদি দ্রব পদার্থ, অগ্নিরূপ তেজ, অস্থিমাংসাদিরূপ পৃথিবী, চেষ্টারূপ বায়ু ও ছিদ্ররূপ আকাশ বিদ্যমান নাই; তবে উহারা কিরূপে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?”

“ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিত্যন্ত বনীভূত বলিয়া মূল দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফলপুষ্পাদগম হইতেছে, তখন বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদের পত্র, ছক, ফল ও পুষ্প সমুদায় স্নান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদিগেব স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে সংশয় কি? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফল পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে

হইবে যে, উহাদের শ্রবণ শক্তি বিদ্যমান বহিয়াছে। দর্শন-হীন জন্তু কখনই স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে পারে না। অতএব যখন লতাসমুদায় বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পবিবেষ্টন ও ইতস্ততঃ গমন করে, তখন উহাদের দর্শন শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্রগন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা রোগবিহীন হইয়া পুষ্পিত হইতেছে, তখন তাহা বা নিঃসন্দেহ আশ্রাণ করিতে পাবে। যখন উহারা মূলদ্বারা সলিল পান করিতে সমর্থ হয়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। যেমন মুখদ্বারা উৎপলনাল গ্রহণ কবিতা জল শোষণ করা যায়, তদ্রূপ পাদপগণ পবনসহযোগে মূলদ্বারা সলিল পান করে। এইরূপে যখন উহাদিগকে সুখ দুঃখ সংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দেশ করা কদাপি কর্তব্য নহে। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ মূল দ্বারা যে জলগ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পবিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর পদার্থ লাবণ্যবিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়।”

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ।

চিত্র পরিচয় ।



ক—পত্রপৃষ্ঠে বহিঃকোষ। মনুষ্যচক্ষুর অমুভবরূপ।

খ—পত্রকোষের সংস্থান।

গ—পত্রফলকে তির্যকপাতিত আলোকউত্তেজনার সাড়া ধরাইয়া অমুভব-ক্ষেত্রে গতি উৎপন্ন করিতেছে।

ঔপন্যাসিক সাহিত্যে নব রীতি ।

মানুষের মনকে বাদ দিয়া ঘটনাপরম্পরার সমষ্টি লইয়া উপন্যাস রচিত হইলে উহা সাধারণ পাঠকের নিকট গ্রহণীয় হইতে পারে কিন্তু উন্নত সমাজের নিকট ঐকপ উপন্যাস সমাদর লাভ করিতে পারে না। যে অমূল্য চিত্তশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি, মানব চবিত্র চিত্রণের সময় যদি মানব-মনের সেই সকল অদৃষ্ট ক্রিয়াকে বাদ দিয়া কতকগুলি মানুষকে উপন্যাসের মধ্যে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে সে মানুষগুলি যে নিতান্ত প্রাণবিহীন জড়-পদার্থবৎ প্রতীয়মান হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? শিক্ষার দ্বারা বাহাদেব কচি পরিমার্জিত হইয়াছে ও বাহাদেব মন শিক্ষার গুণে গভীরতম বিষয় সমূহের মধ্যে প্রবেশ লাভের অধিকার পাইয়াছে তাহাদের নিকট শুধু ঘটনাসমূহের সমষ্টি উপন্যাস নামে গৃহীত হইতে পারে না, হইলেও তাহার মূল্য স্বল্প মাত্র।

বিগত শতাব্দীতে এবং বর্তমান সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজে জর্জ ইলিয়টের উপন্যাস সকল যেরূপ সমাদৃত হইয়াছে এরূপ আর অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে। ভাবতবর্ষে বাহারা ইংবাজী শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও জর্জ ইলিয়টের খুব আদর। এমন কি বাহারা উপন্যাস পাঠের বিরোধী এমন লোককেও জর্জ ইলিয়টের উপন্যাস সকল মনোবিজ্ঞানের হিসাবে পড়িতে দেখা গিয়াছে। জর্জ ইলিয়টের কোনো কোনো উপন্যাসকে উপন্যাস হিসাবে বাস্তবিক উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না—যেমন রমোলা। কিন্তু দোষ ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাহার গ্রন্থ সকলের মধ্যে উচ্চতর এমন কোনো বস্তু আছে বাহার জন্ত সেগুলি সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। সে বস্তু মানব-মনের অন্তিম্যক্তি।

যে সকল লেখক লেখনী-তুলিকায় মানব মনের চিত্র প্রতিকূলিত কবিয়া শিক্ষিত সমাজের বিশ্বয়োগপাদন করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ তাহাদের মধ্যে একজন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ স্বত্তে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে উপন্যাস হিসাবে তাহার সকল গ্রন্থ যে আদর্শস্থানীয় তাহা নহে।

কিন্তু একজন প্রতিভাবান লেখক বাহা লিখিবেন তাহার সবটুকুই স্বন্দব, নিখুঁত হইবে এরূপ আশা করাও অত্যাশ। বরং এইরূপ লেখকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রটি তুলিয়া, তাহার রচনার বিশেষত্বটুকু কি পরিমাণে বিকশিত হইতেছে সেদিকে দৃষ্টি রাখাই বাঞ্ছনীয়। রবিবাবুর রচনার মধ্যে আমরা বুঝিতে পারি এবং বুঝিতে পারি না এমন অনেক ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে কিন্তু বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সারথিরূপে, বিশেষতঃ ঔপন্যাসিকরূপে তিনি কি নূতন রীতি প্রচার কবিয়াছেন আজ অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ব্যক্তিমান বিষয়টী অতি গুরুতব সংক্ষেপে তাহার আলোচনাও অসম্ভব। কিন্তু তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে উপন্যাসের মধ্যে মানব মনের বহিঃপ্রকাশ অপেক্ষা অন্তঃপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের রচনার একটা বিশেষত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ও পরবর্তী বহুযুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের মধ্যে মানব মনের ব্যবসা অনেকটা বেশী করিয়াছেন। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে মানব মন কেমন সংগ্রাম করে, কত আবর্তের মধ্যে হাবুডুবু খায়, যদি তাহা ভাল কবিয়া দেখিতে ও বুঝিতে হয় তবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়িতেই হইবে। মনো-বিজ্ঞানে বিশ্লেষিত মনের চিত্র যখন আমাদের নিকট নিতান্ত ছায়াময় (abstract) বলিয়া মনে হয় তখন যদি এক একটা মনোবৃত্তি জীবন্ত মানুষের অর্পণ করিয়া আমরা তাহাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাই তাহা হইলে দর্শনশাস্ত্র একটা জটিল পদার্থ না হইয়া আমাদের নিতান্ত পরিচিত বিষয় হইয়া পড়ে।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে রবিবাবু যে হুঁখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন সে হুঁখানির মধ্যেই তাহার এই রীতি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। চোখের বালি ও নৌকা ডুবি সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত থাকিতে পারে কিন্তু উপন্যাসের আখ্যানবস্তু লইয়া আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাসের হিসাবে এই হুঁখানিকে যে খুব উচ্চস্থান দেওয়া যায় না এরূপ মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ

আছে। কিন্তু রবিবাবু উপভাসজগতে যে নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন উহা সমরোপযোগী হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ কেহ বঙ্গের স্কট আখ্যা দিয়া থাকেন। স্কটের উপভাসাবলী যেমন বৈচিত্রে, দৌন্দর্য্যে, গাষ্ঠীর্ঘ্যে ও অভাবনীয় ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ বঙ্কিমের উপভাসগুলিও সেইরূপ। কোথাও প্রেমিকের কথা, কোথাও বিষেবুদ্ধি পরিচালিত শত্রুর প্রতিহিংসার কাহিনী, কোথাও বীরের বীরত্বের চিত্র, কোথাও বা পরজুংখকাতরা রমণীব করুণ মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নয়। তাহার মধ্যে গভীর দার্শনিক ভাব সকলও স্থান পাইয়াছে। যেমন স্কট শুধু গল্প লেখেন নাই বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি গল্প রচনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। কত উচ্চভাব, কত দার্শনিক গবেষণা তাঁহার উপভাস সকলকে অলঙ্কৃত করিয়াছে তাহা চিন্তাশীল পাঠক মাঝেই অবগত আছেন। “আনন্দমঠ” সকলেই পাঠ করিয়াছেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র “আনন্দমঠের” উপসংহারকালে যে কয়টা কথা লিখিয়াছেন অনেক লোকের পক্ষেই তাহার নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করিতে পারা যে কঠিন কাজ ইহাতে সন্দেহ নাই। কতদিন মনে মনে বলিয়াছি “বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল” কিন্তু ইহার গভীর অর্থ এখনও বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় “আনন্দ মঠের” আচার্য্য ব্যতীত আর কেহ তাহার গভীর অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে লোকে স্কট আখ্যা দিয়া থাকে রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি কেহ কেহ জর্জ ইলিয়ট বলিয়া থাকেন। এক বিষয়ে যে রবি বাবুর সহিত জর্জ ইলিয়টের স্রুগভীব মিল আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রসঙ্গক্রমে সে কথা বলা গিয়াছে। সে মিল মনেব ব্যবসায় লইয়া। এডাম বীড্ (Adam Bede), সাইলাস্ মার্নার (Silas Marner), প্রভৃতি উপভাস দিন দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-দিগের নিকট সুপরিচিত হইতেছে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জর্জ ইলিয়ট উপভাস জগতে যে নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন তাহা শিক্ষিত সমাজের

অনুমোদিত। তাঁহার গ্রন্থের দোষ ক্রটি থাকা সত্ত্বেও এই বিশেষত্বের জন্য তিনি স্বদেশ এবং বিদেশের সাহিত্যিক ও দার্শনিকদিগের নিকট প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ মনোবৈজ্ঞানিক উপভাস যুগের প্রবর্তক। যুগ-প্রবর্তকগণকে অনেক সময়েই নিন্দাতাগী হইতে হয়। ইংলণ্ডে মিল্টন নিন্দাতাগী হইয়াছিলেন—আমাদের দেশে মাইকেলকে ব্যঙ্গ করিয়া কাব্যগ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। রবি বাবুর এ চেষ্টাও যে সর্বত্র সহানুভূতি পাইবে এমন আশা করা অস্বাভাবিক। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে—উপভাস রচনা করিতে হইলে নায়কনায়িকার কার্য্যকলাপ বর্ণনাই যথেষ্ট নহে। তাহাদের মনের পরিচয় চাই। কোন্ বর্ণে কাহাব মনটা চিত্রিত তাহা জানিতে পারিলে পাঠকের কল্পনাশক্তি কার্য্য করিতে পারে—কাহাব চিন্তাশক্তি জাগ্রত হয়। নতুবা শুধু গল্প পড়িতে পড়িতে পাঠকের কল্পনাশক্তি মরিয়া যায়—লেখকের লেখনীর গতির সহিত কল্পনার গতি একীভূত হইয়া যায়। আপনার স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে!

চোখের বালি ও নোকাডুবি পাঠ কবিত্তে করিতে পাঠক এমন অনেক স্থান পাইবেন যেখানে নায়কনায়িকাব কোনো চিন্তা বা বিশেষ কোন মানসিক অবস্থা অবিকল তাঁহার নিজের বলিয়া মনে হইবে। এই হুঁপানি গ্রন্থের মধ্যে এমন অনেক স্থান পাইবেন যেখানে চিন্তার ভাষা শবীরে এবং মনে অদ্ভুত Sensation উৎপাদন করে। জর্জ ইলিয়ট (আসল নাম মেরী এ্যান্ ইভান্স) এই অদ্ভুত শক্তির জন্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি একজন সুবিখ্যাত মার্কিন লেখক তাঁহাব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—
George Eliot's contribution, to history lies in the fact that she has given the best picture to be found in all literature of English provincial life in the reign of Queen Victoria. Sir Leslie Stephen says. “She has done for it what Scott did for the Scottish peasantry, or Fielding for the eighteenth century Englishmen, or Thackeray for the higher social stratum of his time.”
রবিবাবুর উপভাসাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লেখক এইরূপ সাক্ষ্য দিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

একটা কথায় উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ

করিব। মনোবৈজ্ঞানিক উপল্লাস সর্বসাধারণের জন্য নয়। উপল্লাস হইলেই যে সকলের নিকট সহজবোধ্য হইবে এরূপ আশা করা যায় না। বুদ্ধিমত্তার সর্বজনপ্রিয় এবং সর্বজনপঠিত উপল্লাসগুলিও স্থানে স্থানে গভীর এবং জটিল ভাবে পূর্ণ। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকটই এই শ্রেণীর উপল্লাসের সন্ধান আশা করা যাইতে পারে। যেমন উচ্চতর গণিতবিজ্ঞান সাধারণ সংযোজন ও বিয়োজন নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণ গণিত বিজ্ঞান পারদর্শী ব্যক্তির পক্ষে অনধিগম্য, তেমনি মানবমনের নিগূঢ় রহস্য সকল চিন্তা করিতে ও তাহার রহস্যজাল ভেদ করিতে অনভ্যস্ত ও অক্ষম পাঠকের নিকট রবিবাবুর উপল্লাসগুলি অনেক স্থলে শুধু “মিছে কথা গাঁথা” ব্যতীত আর কিছু নয়। রবিবাবুর উপল্লাসের আখ্যানবস্ত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, সহস্র পাঠকবর্গ সে সকল সমালোচনা হইতে সার সঙ্কলন করিতে পারিবেন। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু তাঁহার প্রবর্তিত রীতি সম্বন্ধেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

শ্রীহনুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী ।

পণ্ডিতগণের অন্তান্ত ধর্মের মধ্যে ভবিষ্যৎ উক্তি করা অত্যন্ত প্রকৃতি। ‘বেণুণ গাছে আঁকুসি দিয়া বেণুণ পাড়িতে হইবে’ যেমন একদল মানবশক্তির হ্রাসলক্ষ্যকারী হতাশ অভিজ্ঞত পণ্ডিতদের কৌতূহলজনক ভবিষ্যদ্বাণী আছে, বর্তমানে মানবশক্তির উৎকর্ষ ও বৃদ্ধি লক্ষ্যকারী আশাপ্রদ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক মানবের ভবিষ্যৎ ক্ষমতা ও অবস্থার কল্পনাও তদপেক্ষা কম কৌতূহলজনক নহে। অবশ্যই বিশ্বাসীর নিকট তাহা সত্যের আভাস বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে কিন্তু বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের নিকটই বড় কৌতূহলপ্রদ।

কিছু দিবস পূর্বে ফরাসী বৈজ্ঞানিক মুসোঁ মার্সেলিস বার্বেলো,—বাহার রাসায়নিক উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলে যেন বোধ হয় তিনি প্রকৃতির কর্মশালা পরিদর্শন করিয়া, তথাকার কার্য সম্ভাবজনক নহে প্রচার পূর্বক,

মানব কর্তৃক উচ্চ অঙ্গের কর্মশালা স্থাপনের ব্যবস্থায় রত হইয়াছিলেন, বাহার দীর্ঘজীবনের স্বভাবের সহিত ঘনিষ্ঠতার বোধ হয় প্রকৃতি যেন তাঁহার নিকটে ধরা পড়িয়া জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এতদিন মনুষ্যহস্তের চালনার অভাবেই প্রকৃতি সম্যক পরিষ্কৃত হইতে পারেননাই,—সেই রসায়ন শাস্ত্রেব সিদ্ধার্থ অতিরথ বার্বেলো মানবের ভবিষ্যৎ আহার্য, কার্য, ভোগ, লক্ষ্য সম্বন্ধে যে আভাস বিদ্যাছেন তাহা যুগপৎ বিশ্ব ও কৌতুক উৎপাদন করে।

রসায়ন বিজ্ঞাই তাঁহার প্রধান অবলম্বন। এই বিজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের যে মত ও তাঁহাদের কর্তৃক এই বিজ্ঞার যেটুকু ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইত তিনি তাহাতেই আবদ্ধ থাকেন নাই। তাঁহার পূর্ববর্তীগণ এই বিজ্ঞার এইরূপ সংজ্ঞা দিয়া আসিতেন যে, রসায়ন শাস্ত্রের কার্য বিশ্লেষণপ্রক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ—ইহার কার্য ভাগ, বিভাগ, প্রতি-বিভাগ দ্বারা নৈসর্গিক বস্তুর পরিচয় গ্রহণ করা মাত্র। পণ্ডিত ল্যাভোজিয়ের এই সংজ্ঞার প্রবর্তক এবং বার্বেলোর পূর্ববর্তী সকলেই ইহা মানিয়া আসিতেন। বস্তুতঃ রসায়ন শাস্ত্র বহুকাল হইতেই এই শিক্ষা দিয়া আসিতেছিল মাত্র যে জল, অম্লজান ও হাইড্রোজেন সংমিশ্রণে উদ্ভূত; কিন্তু ঐ দুই জ্ঞানের সংমিশ্রণে জল প্রস্তুত প্রণালী রসায়ন শাস্ত্রের কার্য নহে, আয়ত্তাধীনও নহে সকলেরই বিশ্বাস ছিল। ভাদ্রিয়া চুরিয়া বস্তুর পরিচয় গ্রহণ করাই এই বিজ্ঞার সীমা, গঠন-রহস্য প্রকৃতির গুপ্তধন; মানুষের তাহাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই। পুৰাতন রাসায়নিকের ইহাই সংস্কার ছিল। কিন্তু বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্বেই বার্বেলো ঘোষণা করিলেন—‘এই সংস্কার যে সত্য ইহা যে কুসংস্কার নহে, তাহার প্রমাণ কোথায়? যদি প্রকৃতি মূল পদার্থসমষ্টির সংমিশ্রণে যৌগিক পদার্থ গঠন করিতে পারে তবে আমি তাহা করিতে অসমর্থ থাকিব কেন? প্রকৃতি যে শক্তির সহায়তায় উহা সংসাধিত করে সে শক্তি আমা হইতে গোপন থাকিতে পারিবে কেন?’ বৃদ্ধা জীলোকের প্রকৃতির দ্বারা প্রকৃতি বৃদ্ধি তাহার যে গুপ্ত জীধন ভাবী উত্তরাধিকারী হইতে সর্বদা গোপন রাখিত যুবক বার্বেলো তাহাকে হস্তগত করিবার প্রয়াসে বহুপরিকর হইলেন।

আবিষ্কারের পর আবিষ্কারে বার্বেলো প্রমাণ করিতে সমর্থ হইলেন তাঁহার যৌবণার মূলে যে সন্দেহ ছিল তাহা সম্ভব সন্দেহ এবং সময়ে সেই সন্দেহ সত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এখন রাসায়নিকেরা বিশ্বাস করেন না যে রসায়ন বিজ্ঞা ধ্বংস ভিন্ন নির্মাণ করিতে পারেনা; তাঁহারা বিশ্বাস করেন উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং উপযোগী অবস্থার অধীনে এই বিজ্ঞা দ্বারা স্বভাবের তুল্যরূপে এবং স্বলবিশেষে উৎকৃষ্টতর রূপে যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে, নানাবিধ রং ও স্ফুটন দ্রব্য যাহা রসায়ন বিজ্ঞার সাহায্যে প্রস্তুত হইতেছে তাহা স্বভাবজ রং ও স্ফুটন দ্রব্য অপেক্ষা অধিক মনোরম ও উৎকৃষ্টতর। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বার্বেলো অঙ্গারক ও হাইড্রোজেন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অধীনে মিশ্রিত করিয়া নয়ন মনোহর এসিটিলিন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন এবং বিজ্ঞান জগতে চমৎকার ও মহানন্দ উৎপাদন করিলেন। সফলতা পরম্পরায় এখন বহু রসায়নবিজ্ঞাবিদেই বিশ্বাস ও ধারণা জন্মিয়াছে যে এমন কোন স্বাভাবিক যৌগিক বস্তুই নাই যাহা এই বিজ্ঞার সাহায্যে সময়ে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারিবে না। এই বিশ্বাস ও ধারণা অবলম্বন করিয়া বার্বেলো রসায়ন বিজ্ঞার সাহায্যেই মানবের আহাৰ্য্য প্রস্তুতের জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন শস্তক্ষেত্রে বা উদ্ভানে কিম্বা প্রাণিহত্যা দ্বারা মানবের আহাৰ্য্য আর সংগ্রহ করিতে হইবে না; রসায়নাগারেই ল্যাবোরেটরিতেই আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইবে। অবশ্যই তিনি নিজ জীবনে বা তাঁহার পরবর্তী কেহ এপর্যন্ত, এই উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু তিনি যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে অতি দস্তুর সহিত বলিয়া গিয়াছেন কতিপয় দশক কাল মধ্যেই রসায়ন শাস্ত্র ইহার পূর্ণ সফলতা দেখিতে পাইবে।

তাঁহার বক্তব্য ও কার্য সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে একটু আনুসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনারও আবশ্যক—মানুষের আহাৰ্য্যের উপকরণ কি তদ্বিষয়ে অতি সামান্ত লক্ষ্য করিতে হইবে মাত্র। মানব ভক্ষ্যের প্রধান উপকরণ প্রধানতঃ ৪ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম চর্কি বা বস। অর্থাৎ তৈলমূলীয় পদার্থ, ২য় কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ অঙ্গারক ও

হাইড্রোজনের সংমিশ্রণমূলক পদার্থ, ৩য় নাইট্রোজেন মূলক পদার্থ, ৪র্থ খনিজ পদার্থ। এবীর নির্মাণ, গঠন, রক্ষণ কার্যে ইহার প্রত্যেকেই অত্যাবশ্যক। এই চারি পদার্থের সহিত জলও নিতান্ত আবশ্যক। জলের অজ্ঞাত কার্যের মধ্যে একটা প্রধান কার্য এই যে ঐ সমস্ত পদার্থ কঠিনভাবে সহজে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, জলের সহায়তায় উহারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া অতি সহজে শরীরে প্রবেশ করে। আহাৰ্য্যের উদাহরণ স্বলে আমরা দুগ্ধকে গ্রহণ করিতে পারি। দুগ্ধে জল ব্যতীত উপরোক্ত চারি পদার্থই বর্তমান আছে। জলের পরিমাণ অবশ্যই অত্যন্ত অধিক। শতকরা হিসাবে দুগ্ধের উপকরণের ভাগ এইরূপ—

	শতকরা
জল	৮৮
তৈল পদার্থ	
যাহা ননীরূপে	
বিদ্যমান	৩
হাইড্রোকার্বন	
যাহা শর্করা	
রূপে বিদ্যমান	৪.৫
নাইট্রোজেন	
মূলক পদার্থ	
যাহা ছানা ও	
এলবুমেন রূপে	
বিদ্যমান	৪
খনিজ পদার্থ	
যাহা লবণ রূপে	
যথা ক্লোরাইড্ অব্	
সোডিয়ম্, ফসফেট্	
অব্ লাইম্ আকারে	
বিদ্যমান এবং লৌহ	৫

১০০

এইরূপ মাংস, অন্ন, রুটী, ডিম প্রভৃতি মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্যগুলি বিশ্লেষণে দেখা যায় জল ভিন্ন পুরোক্ত ৪ প্রকার পদার্থ প্রত্যেক গুলিতেই বিভিন্ন পরিমাণে বিদ্যমান। উপরোক্ত ৪ প্রকার পদার্থের মধ্যে খনিজ পদার্থ যথা লবণ, লৌহ, ফসফেট্ প্রভৃতি যাহা অস্থি ও রক্তের উপকরণ তাহার জন্ত মানুষকে চাষ আবাদ প্রাণিহত্যা করিতে হয়না

এবং তাহা যে আকারে শরীবে গ্রহণ কবিত্তে পারে তাহাও রসায়নাগারেই প্রস্তুত হইতে পারে। চাষ আবাদ প্রাণিহত্যার একমাত্র প্রয়োজন অবশিষ্ট ৩ প্রকারের অর্থাৎ চর্কি মূলক, কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেন মূলক পদার্থেব সংগ্রহ, কাবণ তাহাবা যে আকারে শরীরের উপযোগী তাহা ইতিপূর্বে প্রাকৃতিক ভিন্ন অপ্রাকৃতিক উপায়ে প্রস্তুত হয় নাই। এই তিন পদার্থ অপ্রাকৃতিক উপায়ে প্রস্তুত করিতে পারিলেই মানবের ঋণ রসায়নাগারেই প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া বার্থেলো বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মানবশরীরে এই তিন প্রকার পদার্থেরই বিশেষ আবশ্যকতা আছে এবং তাহারাই মানবদেহের গঠন, রক্ষণ, পোষণ প্রভৃতি সমুদয় কার্য সম্পন্ন করে। তাহাদের যোটাছুটি কার্য এইরূপ। মানব দেহে প্রতি মুহূর্তে যজ্ঞকুণ্ডের স্থায় যে সমস্ত কোষ প্রস্তুত হইতেছে তাহার মূল উপাদানই চর্বি বা তৈল পদার্থ অর্থাৎ চর্বি কণাই ঐ সমস্ত নূতন কোষের বীজ স্বরূপ। আমরা বাহিরে যেমন দেখিতে পাই তৈলই অগ্নিশিখার প্রাণ, তজ্জপ মানবশরীরভাঙ্গুরেও সর্বদা যে বহি প্রজ্জ্বলিত আছে তাহারও প্রধান উপাদান তৈল। এই সমস্ত কোষে আবার নাইট্রোজেন মূলক পদার্থ নীত হইয়া তথাকার কার্যে, যাহাকে মেটাবোলিজম বলে, তদ্বাচা তাহা মাংসে পরিণত হয়। শরীরবিভাব এই বিশেষ শব্দ মেটাবোলিজম সম্বন্ধে এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাহা জীব-শরীরভাঙ্গুরের সেই রাসায়নিক কার্য যদ্বারা তথায় নীত সমুদয় জড়পদার্থ প্রাণময় পদার্থে পরিণত হয়। কার্বোহাইড্রেট পদার্থও কোষগুলি নির্মাণের উপকরণ চর্কি বা তৈল পদার্থের সরববাহ ব্যতীত মেটাবোলিজমের সহায়তা করে। এই তিন পদার্থেব সাহায্যেই প্রধানতঃ শরীরের সমুদয় কার্য সর্বদা চলিতেছে। বার্থেলো বিশ্বাস করিয়াছিলেন এই তিন পদার্থ রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত কবিত্তে পারিলেই মানবের আহাৰ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে এবং সেই বিশ্বাস মূলে রসায়নাগারেই ঐ গুলি প্রস্তুতের জন্ত বদ্ধপরিকর হন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্বেই বার্থেলো তাঁহার চেষ্টার ফলে চর্কিমূলক পদার্থগুলি রসায়নাগারেই প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার নিজ পদ্ধতি অব-

লম্বনেই অনতিবিলম্বেই কার্বোহাইড্রেট পদার্থ অর্থাৎ শর্করাদি অঙ্গারক রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য হইলেন। অবশিষ্ট নাইট্রোজেন মূলক পদার্থ অর্থাৎ এলবুমেন জাতীয় পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতের প্রণালী এপর্যন্ত উদ্ভাবিত না হইলেও বার্থেলো এবং আধুনিক বহু প্রসিদ্ধ রাসায়নবিৎগণই বিশ্বাস কবেন অত্যন্ত কাল মধ্যেই ঐ পথ উদ্ভাবিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এইরূপ বা তজ্জপ প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে বার্থেলো বলেন, এক বিশেষ আবিষ্কারের প্রয়োজন আছে এবং তাহা কোন বিশেষ 'শক্তি'র আবিষ্কার ও সেই শক্তি এত অমিতভাবে সঞ্চিত থাকিবে যে ঈজিত মাত্রে সামান্য বা বিনা আয়াসে আমাদের কার্যে যে কোন পরিমাণে তাহাকে আমবা প্রযুক্ত করিতে পারিব। পূর্ববর্ণিত এসিটলিন প্রস্তুতপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য কবিলেই দেখিতে পাই সাধারণ অঙ্গারক ও হাইড্রোজেন মিশ্রণ দ্বাৰা উহা উদ্ভূত হয় বটে কিন্তু ঐ দুই পদার্থের যে প্রকারের মিশ্রণ আবশ্যক তাহা বিশেষ ও প্রবল শক্তি ইলেকট্রিসিটির সাহায্যে সম্পাদিত হয়। এই স্থলে রাসায়নিক 'মিশ্রণ' ও 'শক্তি'র তাৎপর্য সংগ্রহে একটু সচেত হইলেই আমরা বুঝিতে পারি এক পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হওয়াই 'মিশ্রণ' এবং যাহা ঐরূপ সংলগ্ন হইবার সুবিধার জন্ত এক পদার্থকে বহু সূক্ষ্ম অংশে বিভাগ করিতে সমর্থ হয় তাহাই রাসায়নিক 'শক্তি' এবং যাহা বত বেশী অংশে বিভাগ করিতে পাবে তাহা তত বড় 'শক্তি'। প্রকৃতি এই শক্তিশালিনী বলিয়াই তাহাকে নির্মাত্রী ধাত্রী স্বরূপে দেখিতে পাই। মানব যত পরিমাণে এই শক্তিকে হস্তগত করিতে পাবিবে ততই প্রকৃতির স্থান অধিকার করিতে থাকিবে। অক্সিজেনবিৎ আর্কেমিডিস যেমন বলিয়াছিলেন দণ্ড স্থাপনের স্থান পাইলে তিনি পৃথিবীকেও কক্ষচ্যুত কবিত্তে পারিতেন, তজ্জপ বার্থেলো বলিয়াছেন উপযুক্ত 'শক্তি' হস্তগত হইলেই মানব প্রকৃতির স্থান নিজ আবশ্যকীয় বহু পদার্থ নির্মাণে সক্ষম হইয়া প্রকৃতির মুখাপেক্ষিতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতে সমর্থ হইবে।

'শক্তি'র এই অর্থ জল, তাপ, ইলেকট্রিসিটি সকলই রাসায়নিক 'শক্তি'; ইহারা সকলেই পদার্থ নিচয়কে বহুধা

বিভক্ত করিতে সক্ষম এবং তজ্জন্তই এই সকল শক্তির সাহায্যেই প্রায় সমুদয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হয়। চাপের অধীনেও যে রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয় তাহারও কারণ অল্প কিছু নহে, তাহাও এই যে, এক পদার্থের স্বল্প অণু অল্প পদার্থের স্বল্প অণুর সহিত চাপ দ্বারা, নূতনতর পদার্থের সৃজন করে, নৈকট্যভাবে পাশাপাশি হইতে পারে। এইরূপ বলিলে রাসায়নিক ক্রিয়ার অর্থও অল্প কিছু নহে—সচরাচর দুই বা ততোধিক পদার্থের স্বল্প অণুগুলি নূতন ভাবে সজ্জিত হইয়া যে নূতন পদার্থের সৃজন করে সেই ক্রিয়ার নামই ‘রাসায়নিক ক্রিয়া’। কখন বা একটা মাত্র পদার্থও এইরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইতে দেখা যায় ও তৎকাল ক্রিয়াকেও ‘রাসায়নিক ক্রিয়া’ বলে; যথা অক্সিজেন হইতে ওজোনের উদ্ভব। অক্সিজেনের স্বল্প অণু (atoms) গুলি পূর্বে যে ভাবে সজ্জিত ছিল ইলেক্ট্রনসিটি শক্তির প্রভাবে তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়া নূতন আকারে সজ্জিত হয় তাহারই নাম ওজোন হয়, তাহাতে আর অল্প কোন নূতন পদার্থ সংযুক্ত হয় না। অক্সিজেন তাহার স্বল্প অণু (atoms) গুলি পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে দুইটা আকর্ষণী বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত থাকিয়া যেমন গোটা বা molecules বাঁধিয়া থাকিত সেই দুইটা একটা রক্ষু মুক্ত হইয়া গিয়া, তেমন গোটা ভাঙিয়া ফেলিয়া, অল্প একটা মুক্ত স্বল্পতম অণু (atom) কে বন্ধন করিয়া ফেলে এবং এইরূপে তিন তিনটা অণুর এক একটা গোটা বা molecule বাঁধে ও তাহাদের সমষ্টির নাম ওজোন হয়। যথা, যদি কোন অক্সিজেন কণা ৬টা স্বল্প অণু বা atoms এর সমষ্টি হয় তাহাতে ৩টা গোটা বা molecules থাকিবে, কিন্তু যখন ওজোনে পরিণত হইবে তখন তাহাতে ২টা গোটা বা molecules হইবে।

রাসায়নাগারে প্রকৃতির ছায় স্বাভাবিক পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে ইহা নূতন কথা নহে। রাসায়নাগারে হীরকও প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু তাহার জন্ত তাপ, চাপ, ইলেক্ট্রনসিটি তিনটা শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় এবং তাহা বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। সুতরাং ব্যবসায়ের হিসাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হীরক তত কাষের হয় নাই। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বার্থেলো বলিয়াছেন রাসায়নাগারে মানবের খাড়া প্রস্তুত করিতে হইলে এমন কোন শক্তির

আবিষ্কার আবশ্যক যাহা এত অসুবস্ত ভাবে পাওয়া চাই যে সামান্য বা বিনা ব্যয়ে যে কোন সময়ে যে কোন পরিমাণে তাহা আমরা রাসায়নাগারের কার্যে লাগাইতে পারি।

এমন ‘শক্তি’ কোথায় পাওয়া যাইবে বার্থেলো তাহার আভাস স্বরূপে বলিয়াছেন প্রকৃতি কর্তৃক ব্যবহৃত সম্পূর্ণ শক্তি মানবের হস্তগত হওয়া অসম্ভব বা কল্পনাতীত হইলেও পূর্বোক্ত ক্রিয়াদি সাধনের উপযুক্ত শক্তি পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপের কিয়দংশ গ্রহণ করিতে পারিলেই মানবের হস্তগত হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি বলেন পৃথিবীর অভ্যন্তরে ৩ মাইল গভীরে যে তাপ পাওয়া যায় তাহাই যথেষ্ট। এজন্ত পৃথিবীর যে কোন স্থানে ৩ মাইল গভীর একটা গর্ত বা গহ্বর খনন করিলেই হইবে। বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তিনি বলেন, তাহাতে এইরূপ খাত খনন নিতান্ত কল্পনার কথা নহে এবং অত্যল্পকাল মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যার যে উন্নতি হইবে তদ্বারা ইহা যে নিশ্চিত সাধিত হইতে পারিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। পৃথিবীর আবরণের ৩ মাইল নিম্নে যে তাপ পাওয়া যাইবে, বার্থেলো বলেন, তাহাই পৃথিবীস্থ প্রাণিজগৎ বিশেষতঃ মানবজগৎ ও শিল্পজগতের পক্ষে যথেষ্ট। মানব এখানে-ওখানে শক্তি ক্ষমতার অন্বেষণ করিয়া ফিরে, কিন্তু তাহার পদতলে যে মহাভূতা পড়িয়া আছে তাহাকে কাষে লাগাইতে পারিলেই যে সকল মানবই প্রভূত ক্ষমতালী হইয়া সমান সুখস্বচ্ছন্দ ভোগের অধিকারী হইবে তাহাতে আব সন্দেহ কি? এইরূপ শক্তি রাসায়নাগারের সহায় হইলে তথায় প্রকৃতির অনুকরণে বহু পদার্থ নিশ্চিত হইবে তাহা ত সর্ববাদিসম্মত কথা।

এইরূপ গভীর খাতের অন্ত্যন্ত সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলিয়াছেন এত নিম্নে জলকে যেরূপ তাপ ও যত উচ্চ চাপের অধীনে পাওয়া যাইবে তাহার সাহায্যে মানবচালিত যে কোন কল বা এঞ্জিন একরূপ বিনাব্যয়ে চালিত হইতে পারিবে। পানীয়েব প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা দেখিতে পাই পানীয়েব (জলেব) অপবিত্রতা জন্তই মানব বহু পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমন কোন নদী

বা প্রস্রবণ নাই বাহ্যিক জলে পীড়াজনক জীবাণু (microbes) বহুপরিমাণে বিস্তারিত থাকেনা বা এমন কোন প্রক্রিয়া দ্বারা মানব এথেনা জলকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় নাই যাহা দ্বারা ব্যয় করিয়াও পানীয় পীড়োৎপাদক জীবাণু হইতে একেবারে মুক্ত হয়। প্রত্যহই আমরা পানীয়ের সহিত নানা ব্যাধি-উৎপাদক বহু জীবাণু উদরস্থ করি। কিন্তু আমরা একপ্রকার বিনা ব্যয়ে ৩ মাইল নিরে পরিষ্কৃত যে বিপুল জল পাইব তাহা অতি পবিত্র জল হইবে এবং তদ্বারা মানব অকালমৃত্যুর অন্ততম কারণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত
দিনাজপুর।

লবকোট ও কুশাবতী ।

(‘খজি’ ও ‘হজি’ সম্বন্ধ)

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্রের পুত্র লব ও কুশ লবকোট ও কুশাবতী নামক দুইটি নূতন নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বলিয়া ক্রিষ্টদস্তী আছে।* তাঁহাদিগের পরবর্তী বংশধরগণ জ্ঞাতিগণের সহিত সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া এই নগরদ্বয়ে আধিপত্য করিতে থাকেন। অবশেষে কুশাবতীতে কুলপুত্রের ও লবকোটে কুলরাওয়ের শাসন সময়ে প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞাতিকলহ উপস্থিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা প্রাচুর্য হইয়া ফলে কুলপুত্র নিদারুণ প্রতিহিংসাবশে প্রবল সেনাসহকারে লবকোট আক্রমণ করিয়া স্বীয় অধিকারে আনয়ন করেন। এইরূপে কুলরাও স্বাধিকারচ্যুত হইয়া নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের তদানীন্তন অধিপতি মহারাজ অমৃতের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। অমৃত তাঁহার হৃৎখে নিতান্ত হৃৎখিত হইয়া নানারূপ সদয় ব্যবহারে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন; এবং ক্রমে সহায়ভূতি ও আন্তরিকতা বৃদ্ধির সহিত কুলরাওয়ের ভ্রায় অভিজ্ঞাত পায়ে স্বীয় কন্ডা-সম্প্রদান পূর্বক তাঁহাকে স্বীয় ঐশ্বৰ্য্যের অধিকার প্রদান করিলেন। এই শুভাহুষ্ঠানের অল্পকাল পরেই অমৃত

পরলোক গমন কবেন এবং অমৃতের কন্ডার গর্ভে কুলরাওয়ের এক পুত্র জন্মে। ইহার নাম সাদীরাও। দক্ষিণাপথের শাসনদণ্ড কালসহকারে সাদীরাওয়ের হস্তে পতিত হইলে, তিনি আর্ঘ্যাবর্ত আক্রমণ করিয়া তাহার কিয়দংশে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন। তিনি সম্ভবতঃ শিশুকালেই পিতৃমাতৃহীন হন, সুতরাং অমাত্যমুখে কুলপুত্র-কর্তৃক পিতার নির্বাসন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, সদলবলে কুলপুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পিতৃবান্ধ লবকোটের পুনরুদ্ধার ও সেই সঙ্গে কুলপুত্রের রাজ্য অধিকার করেন। রাজ্যভ্রংশে কুলপুত্রের বৈরাগ্যোদয় হয়; সুতরাং তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে পুণ্যভীর্থ বাবাংসীতে উপনীত হইয়া ধর্মসঙ্কয়ের সহিত শান্তিলাভাশায় বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। অধীযমান বেদের স্থানবিশেষে হর্ষভূতার পুনঃ পুনঃ নিবেদ পাঠে কুলরাওয়ের প্রতি স্বীয় হর্ষব্যবহার স্মরণ করিয়া, নিতান্ত অমৃতপুঙ্খদয়ে তিনি সাদীরাওয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বকৃত দুষ্টত স্বীকার পূর্বক পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সাদীরাও পরিতপ্ত পিতৃশত্রুর মুখে স্বমধুর বেদপারায়ণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার বিগত ব্যবহার ক্ষমা করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, অধিকন্তু পিতৃসিংহাসনে কুলপুত্রকে স্থাপিত করিয়া লবকোটের সমস্ত অধিকার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কুলপুত্রের এই বেদানুশীল হইতে তিনি ও তৎস্বীয়গণ ‘বেদী’ নবীন আখ্যা প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ শিখসম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তনিতা গুরু নানকের জনক কালু এই কুলপুত্রেরই একজন অধস্তন বংশধর এবং কুলক্রমাগত ‘বেদী’ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। নানক ও পরবর্তী শিখগুরুগণ ‘খজি’ বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত। পাল্লাবে ‘খজি’ নামক যে জাতি দৃষ্ট হয়, তাহারা আপনা-দিগকে প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন*। ‘খজি’ শব্দও ক্ষত্রিয়েরই অপভ্রংশ

* প্রাচীন লবকোট এক্ষণে লাহোর নামেই বিশেষ পরিচিত। বর্তমান কিরোরপুর নগরের ত্রয়কোণ দূরে কুশাবতী নগর অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

কানীছ নাগরাপ্রচারিণীসভার উপসভাপতি ক্ষত্রিয়বংশীয় বাবু ভ্রামহন্দর দাস বি-এ, বলেন,—‘হজি’ বা রাজপুত জাতি খজি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহারা আধুনিক জাতি। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অমিরজুল রাজপুতগণ শকসম্রাট নহে। পক্ষান্তরে খজিদিগের আচার ব্যবহার পাল্লাবের সারথত ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যবিশিষ্ট। তাহারা খজিপক ‘কাচ্চা’ অন্নগ্রহণে আপত্তি করেনই না বরং হারপারাবাদ

বলিয়া অল্পমতি হয় ; কারণ পাঞ্জাবীবা বঙ্গীয়দিগের ভায় 'ক্ষ' স্থানে সাধারণতঃ 'খ' উচ্চারণ করিয়া থাকেন। অন্ততঃ উল্লিখিত আলোচনা হইতে অবগত হওয়া যায়, সূর্য্যবংশীর ক্ষত্রিয়বংশধরদের কুশের বংশে শিখগুরু নানকের জন্ম হয়।

পঞ্চাস্তরে লবের বংশের একটি শাখা লবকোট (বর্তমান লাহোর) পরিত্যাগ করিয়া, সৌরাষ্ট্রে (দ্বারকা) গিয়া বসতি করিয়া, বীরনগর নামে একটি নগর সংস্থাপন করেন। কনক সেন এই শাখার আদিপুরুষ বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। তাঁহাব প্রপৌত্র বিজয় সেন বিজয়পুর ও বিদর্ভ (সিহোর) নামক নগরদ্বয় নির্মাণ করেন। বলভীপুর * ইহাদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু কালসহকারে বলভীপুর অসভ্য ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ কর্তৃক † আক্রান্ত হইয়া রাজবংশ বিলুপ্ত হইলে, রাজীগণ মহারাজ শিলাদিত্যের ‡ সহমৃত্যু হন ; কিন্তু অন্ততমা অন্তর্কর্ত্তী মহিষী চন্দ্রাবতীর প্রেমার রাজহুহিতা পুষ্পবতী পিতৃগৃহ হইতে বলভী যাইবার পথে এই শোকসংবাদ অবগত হইয়া, পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া সমীপবর্ত্তী মালিয়া শৈলমালায় গহবরে আশ্রয় লইয়া পূর্বকালে একটি স্নলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন এবং বীরনগরনিবাসিনী কমলবতী নামী এক ব্রাহ্মণীর হস্তে সম্ভ্রজাত শিশুর লালন পালন ভার সমর্পণ করিয়া পতিয় অল্পমৃত্যু হন। গিরিশুহার জন্মহেতু পরে এই শিশু শুহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শাস্ত্রচরিত্র ব্রাহ্মণবালকগণের সহিত সাহচর্য্য ও তত্প্রয়োগিনী শিক্ষা শুহের ভাল লাগিত না, বরং উগ্রস্বভাব পার্শ্বত্যা ভীলবালকগণের প্রতিই তাঁহার অত্যধিক অমুরাগ লক্ষিত হইত। তাহারাত্ত তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত শুহের

রাজোচিত গুণাবলী সম্যক পরিশুদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া তাহারাত্ত তাঁহাকে নেতাক্রমে বরণ করিল। ইহাতে তিনি বিদ্যুদ্ভ্রম রক্তপাত না করিয়াই ইন্দর-ভূমির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। এই শুহ হইতেই রাজস্থানের শিরোমণি গিহেলাট (গেহিলোট বা গোহিলোট) বংশের উৎপত্তি।

অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত শুহের সম্ভ্রতিগণ এই পার্শ্বত্যা জাতির উপর শাসনদণ্ড পরিচালিত কবেন। অবশেষে রাজা নাগাদিত্যের আচরণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীলগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার রাজ্য পুনর্গ্রহণ করে। এই বিপ্লবে নাগাদিত্যের তিন বৎসব বয়স্ক পুত্র বাপ্পার জীবন বিপৎ-সংকুল হইয়া উঠিল। গিহেলাট-রাজপরিবারের কুল-পুরোহিত নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে ভাণ্ডীব হুর্গে একজন যজুবংশীয় ভীলের আশ্রয়ে রাখিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না ; সুতরাং তথা হইতে তাঁহাকে পরাশর বনে লইয়া যাওয়া হয়, এবং ত্রিকুট পর্ব্বতের সামুদ্রেশসন্নিহিত নগেন্দ্র নগরে ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্বাবধারণে তাঁহাকে রাখিয়া, তিনি কতকটা নিকরোগ হন। কিন্তু শাস্ত্রশীল ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মোপদেশ ও শাস্ত্রময় ধর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যে নিরাপদে থাকিয়াও বাপ্পা বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ শোলাদ্বিবংশীয় নগেন্দ্ররাজের ভয়ে তথা হইতেও পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন। এই সময়ে চিতোরপ্রদেশ প্রেমারবংশীয় মোরী বা মোর্য্য রাজ-গণের অধিকৃত ছিল। বাপ্পার পূর্বপুরুষ শুহ প্রেমারবংশীয় চন্দ্রাবতীবাজের দৌহিত্র—এই পরিচয় দিয়া চিতোররাজ মান সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে সামরে গ্রহণ করিয়া, বাপ্পার শৌর্য্যবীর্য্যে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে সেনাপতিপদে বরণ কবেন।* এই সময়ে বৈদেশিক শত্রু-কর্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইলে, সামন্তগণ বিদেশীয় বাপ্পার উন্নতিতে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলে, এক বাপ্পাই অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া চিতোরের বহিঃশত্রু নিবারণ করিলেন। এদিকে বিদ্রোহপরায়ণ সামন্তগণ মানরাজের পক্ষপাতিত্য প্রতিহিংসা নিবৃত্তির উপায়ান্তর না দেখিয়া, বাপ্পাকেই কৌশলে স্বদলে আনয়ন করিয়া রাজ্যলাভের দুর্ভাষনা তাঁহাব হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দিলেন। এই প্রলোভন ও উত্তেজনার

অঞ্চলে অল্পকাল প্রতিলোমক্রমে যত্রি ও সামন্তব্রাহ্মণে বিবাহের আদানপ্রদান হইয়া থাকে। ইহা সমাজসংস্কারকণের অমুসন্ধানের বিষয় সম্বন্ধ নাই।

* বর্তমান ভবনগরের পাঁচকোণ উত্তরপশ্চিমে প্রাচীন বলভীপুরীর ভগ্নাবশেষ আছে বলিয়া উল্লিখিত হয়।

† কিম্বদন্তী এইরূপ, ৭ম শতাব্দীতে সিন্ধুতটবর্ত্তী স্ত্রামনগরে পায়দ নামক অনার্য্য জাতি বাস করিত। তাহারাই বলভীপুর আক্রমণ করে।

‡ কর্ণেল টড বলেন, জন্মরহস্ত হেতু ইহার নাম গরবী ছিল। মিথ্যার ১ অং।

ফলে অতিরিক্তকাল মধ্যেই মোরীবংশের উচ্ছেদ সাধিত হইল এবং পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমে বাপুপাই খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে কৃতদ্বতাপাপপঞ্চিল চিত্তোবরাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহার পব ছত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত তিনি চিত্তোরে শাসন-ও পরিচালিত করিয়া পারস্ত রাজ্যাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে।

শেখবৈবী কাভকুলবাজ জয়চের বিদ্বৎমূলক আহবানে সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরি মহারাজ পৃথ্বীবাজের বিরুদ্ধে যে সময় ভারতে সমরযাত্রা করেন, সেই ধানেশ্বরের যুদ্ধক্ষেত্রে দেশবাসল পৃথ্বীবাজের পার্শ্বে, তদীয় ভগিনীপতি চিত্তোর-রাজ যোগীন্দ্র সমরসিংহকে দেখিয়া বাপুপার বংশধরের বীরতা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। আবার পানিপথ যুদ্ধের পর ভারতসাম্রাজ্য যখন বাবরের করায়ত্ত, সমবলীরের অধস্তন পুরুষ সংগ্রামসিংহই তাহার গতিরোধ করিবাব উদেষ্ট করিয়া সিক্রির যুদ্ধে বিফল মনোরথ হ'ন। আবার মাকবর যখন প্রবল পরাক্রমে ও কুটবুদ্ধিসাহায্যে বাজ-স্থানে অশান্ত রাজপুতগণকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়া পশ্যরূপে কাহারও কাহারও হুহিতা স্বীয় অবরোধভুক্ত করেন—এক মহাবীর প্রতাপসিংহই স্বাধীনতার, স্বদেশের ও স্বার্থের নামে অসি উত্তোলিত করিয়া হৃদয়ঘাত ও দেবির যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের পবিত্রতীরে পরিণত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। স্বদেশপ্রেমিকগণের চূড়ামণি প্রাতঃস্ববগীয় বীরেন্দ্র প্রতাপ অমিতভৈরবঃ মাংগলশক্তির নিকট জাতিমান বিক্রম হরা অপেক্ষা অনশনে বনে বনে ভ্রমণ করাও শ্রেয়ঃ বিবেচন করিয়া নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জীবন শেষমুহুর্ত্ত পর্য্যন্ত যাপিত করেন। আবার জুরকর্মী আওরঙ্গজেবের হস্ত হইতে রূপনগর-রাজহুতিকে রক্ষা করিবার জন্ত মহারাজ রাজসিংহ যেক্রপ মহত্ব, শৌর্য ও যুদ্ধনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও চিত্তোরের রাজবংশের যশঃ ও স্বাধীনতা-চিন্তা ইতিহাসে অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীনতার লীলাস্থলী চিত্তোবের গিল্লোট বা শিশৌদীয় বংশীয় যে পুরুষসিংহগণ হৃদয়ের তপ্ত শোণিত দানে মাতৃভূমিব কল্যাণ কামনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ভারতপূজ্য মহাবাজ রামচন্দ্রজ্ঞ লবেরই বংশধর বলিয়া আমাদেরই আশাও

অধিক সম্মানের পাত্র। অভিহিতপূর্ব্ব যে মহামুভবগণ স্বদেশের, স্বজাতির ও স্বার্থের জন্ত—সংক্ষেপতঃ ভারতের জন্ত স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, বাপুপা হইতে আবস্ত করিয়া ইহঁরা সকলেই রাজপুত নামে অভিহিত। রাজপুত ও 'ছত্রি' পর্যায়সম্ব। 'ছত্রি' ক্ষত্রিয় শব্দেরই অপভ্রষ্ট রূপান্তর মাত্র।* এইরূপে মহারাজ রামচন্দ্রের বংশাবলী তদীয় পবিত্র নামের মাধ্যমে গুরু নানকের জ্ঞায় মহামুভব ও প্রতাপসিংহপ্রমুখ স্বদেশব্রতী রাজসম্রাসীর উৎপাদনে প্রাচীন ইতিহাসের জ্ঞায় আধুনিক ইতিবৃত্তেও চিরস্ববগীয় হইয়া রহিয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে 'খত্রি' ও 'ছত্রি' জাতির উৎপত্তিস্থল একই বলিয়া প্রতীত হয়। প্রদেশবিশেষের উচ্চারণবৈষম্য হইতে পৃথক্ নামকরণ হইয়া থাকিবে। মূলতঃ এক জাতি হইলেও ভিন্ন প্রদেশে বাসনিবন্ধন আচার ও ব্যবহারের পার্থক্য উপস্থিত হওয়ায় ক্রমে ভোজনসম্বন্ধ ও বিবাহেব আদানও রহিত হইয়া গিয়া পৃথক্ জাতি রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। বোধ হয় 'খত্রি' ও 'ছত্রি'গণ আপনাদিগের পরস্পরাভুগত বিরোধ বিস্মৃত হইয়া উভয় সম্প্রদায়ের একত্ব প্রতিপাদনে উদযুক্ত হইলে উপস্থিত কলহের বিনিময়ে একতারূপ অমৃতফলের উৎপত্তি হয়।

কালচক্রের নিষ্পেষণে আমরা এক ভাঙ্গিয়া অনেক হইয়া পড়িয়াছি এবং যতদিন আমরা এই অনেকত্ব দূবে ফেলিয়া একত্বে মিশিতে চেষ্টিত না হইব ততদিন আমাদেরই কোন আন্দোলনেরই ফল যে বিশেষ স্থায়ী হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। যাহাতে অপরের সহিত বৈষম্য আনয়ন করে, তাহাকে বিষধর সর্প বলিয়া দূরে পরিহার না করিলে, মহাপাতকের মহাপথ মনে না করিলে, আমাদেরই মুক্তির উপায়ান্তর নাই। অতএব কি রাজনীতিক বক্তা, কি নৈতিক উপদেশক, কি ধর্ম-উপদেশী, সকলেরই এখন একই মাত্র কর্তব্যের অন্তরঙ্গ বন্ধপরিকর হওয়া উচিত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন যিনি-যে ধর্মপন্থতি

* রাজপুতগণ মিবার বংশকে 'অমৃতরত্নাকর খত্রিকুল' বলিয়া সম্বোধন করেন। ইহাতেও বোধ হয় খত্রি ও ছত্রি এক পর্যায় বোধক প্রতীক মাত্র। টডের মিবার অং ১৫ দ্রষ্টব্য।

অমুসরণ করুন না, বাদ্গালী, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী যিনি যে প্রদেশবাসীই হউন না কেন, তাঁহাদিগের সকলেই 'ভারতীয়' এই সাধারণ নামের সমান ভাবে অধিকারী। ভারতীয়ত্বই তাঁহাদিগের একত্ববিধায়ক মহৎ গুণ, বা নৈয়ামিকের 'জাতি'। আমরা কিসে ভিন্ন তাহা না দেখিয়া, কিসে অভিন্ন জানিতে বুঝিতে শিক্ষা করাই আমাদের জাতীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। যে দিন হইতে আমরা সমস্ত বৈসাদৃশ্য বিস্মৃত হইয়া ভারতবাসীমাত্রকেই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে দ্বিধা বোধ করিব না, সেই দিন হইতেই বুঝিব ভারতীয় জাতি গঠিত হইয়াছে। তখন ইংরাজ কেন, সমস্ত জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও আমাদের বিরুদ্ধে স্বরাজ্যের স্বত্ববঞ্চিত করিতে সমর্থ হইবে না। উপরে বেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, এক রামচন্দ্র হইতেই 'খত্রি' ও 'ছত্রি' বিবদমান জাতিদ্বয়ের উৎপত্তি, সেই রূপ মনুষ্য হইতেই কি আমরা সকলে উৎপন্ন হইয়া মানব আখ্যা ধারণ করি নাই? বাহাদুরের মধ্যে এই প্রধান একত্ববীজ বর্তমান, অস্ত্রাস্ত্র ক্ষুদ্র বিসদৃশ ভাব যতই প্রবল হউক না, ইহার নিকট তাহাদের সমস্ত শক্তি সম্যকরূপেই পরাহত। দুঃখের বিষয় আমরা মূল ভুলিয়া গিয়া শাখার বিভিন্নতা লইয়া মূর্খের শ্রায় বিবাদ করিয়া মরি। মূলের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই কিন্তু সব কলহ মিটিয়া যায়, অন্ধ অভিমান যখনই তাহাতে বাধা দেয়, তখনই অধোগতি ঘটিতে আরম্ভ হয়—তখনই (এক রামচন্দ্রের বংশধর হইয়াও) এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে বন্ধপরিকর হন। সুতরাং এই জাতীয় ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ভুলিয়া গিয়া আমাদের ভারতীয়ত্বে আত্মবিসর্জন করিয়া তাহাতেই তন্ময় থাকিতে হইবে, তবেই আমরা কিছু করিতে পারিব—মহাজাতি বলিয়া পরিচয় দিবার উপযোগী হইব। এই ক্ষুদ্র লবকোট কুশাবতীর উপাখ্যান উপগম্য করিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এককাণ্ডের শাখাধর এক্ষণে কিরূপ বিভিন্নজাতীয় বৃক্ষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং অন্তর্দৃষ্টি ও একপ্রাণতার অভাববশতই আমরা তাহাদিগকে এ বাবৎ কিরূপ পৃথক্‌চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছি। অতঃপরও যদি আমরা এই ভেদনীতির অমুসরণ করিয়া আত্মকলহের বীজ প্রতি হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা

করি, তাহা হইলে এ অধঃপতন হইতে আমাদের উদ্ধার-বাসনা নিঃশব্দমাত্র—আমাদিগের জাতীয় উন্নতিবিধানের পথ কণ্টকাক্রান্ত! অতএব হে ভারতবাসী ভ্রাতৃগণ! আত্মন, বিবোধী ধর্ম, বিরুদ্ধ ব্যবহার, বিভিন্ন ভাষা, পৃথক্ প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আমরা সকলেই 'ভারতসন্তান' এই অভিন্ন একত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরস্পরের সহিত সহৃদয়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শন জন্ত ক্রমশঃ বলসম্মত করিতে বন্ধপরিকর হই।

বাস্যপীপ্রবাসী

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ।

কঃ পন্থাঃ ।

১৫১৬ বৎসরের কথা, পালামোএর জঙ্গলের মধ্যে এক দিন বৈকালে, এইরূপ প্রথম গ্রীষ্মের বৈকালে *, কএকজন বাদ্গালী বসিয়া গল্প করিতেছিল। বাদ্গালী গল্পপ্রিয়, সমাজপ্রিয়, বাদ্গালী যেখানে থাকে সেই খানেই পাঁচজনে একত্র বসিয়া গল্প শুদ্ধব করিয়া থাকে; বিদেশী বাদ্গালীর জীবনে এই একটু স্মৃতি, তাহার ক্লাস্তিপূর্ণ পরিশ্রমময় জীবনে এই একটু আশ্রয়।

ছোট নাগপুরের জঙ্গলের মধ্যে পালামোকে একটা ক্ষুদ্র বাদ্গালী উপনিবেশ বলিলে চলে। অন্ততঃ যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ঠিক তাই ছিল। আজকাল পালামোএ কলের গাড়ী চলিতেছে, তখন কলের গাড়ীর পথ হয় নাই। তখন সাধারণতঃ লোকে গয়া হইতে গরুর গাড়ী করিয়া ছোটনাগপুরের সেই ভয়ানক পাহাড় জঙ্গলের মধ্যদিয়া কএক দিন ধরিয়া যাইয়া পালামো গিয়া পহুঁছিত। এই ছিল সাধারণ পথ। কখন কখন দৃষ্টপ্রিয় নূতনত্বপ্রিয় কোন কোন বাদ্গালীকে একত্র করিয়া বাকুণ্ডিহিরির পথে, কখন পালামো জেলার বাণিজ্যপ্রধান স্থান গাড়োরা হইয়া রোটার্স হুর্গ দেখিয়া, সমস্ত সাহাবাদ জেলার সুরমা নদী দেখিয়া, পশ্চিমের কলেব গাড়ীর পথে যাতায়াত করিতে শুনা যাইত, কিন্তু সে অতি কঠিন। সাধারণ পথ গয়ার পথ ছিল। পথের দুর্গমতা, স্থানের স্বাস্থ্য দেখিয়া, দুই চারি ঘব বাদ্গালী পালামোএ ঘর বাড়ী করিয়া বসবাস

* এই প্রবন্ধ গত মার্চে লিখিত হয়।

করিতেছিলেন। এই সকল বাসিন্দা বাঙ্গালীর মধ্যে ৮ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান। শশীবাবু তখন জীবিত। প্রাচীনস্বৰ্গীয় শশীবাবুর নাম উল্লেখ আর কেহ না হোক তদানীন্তন পালামোবাসী বাঙ্গালী মাঝেই সম্ভট হইবেন। যে সময়েব কথা বলিতেছি তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা লইয়া পালামোএ বাঙ্গালীব সংখ্যা প্রায় দুইশত হইবে।

তখনকার বৈকালি বৈঠক প্রায়ই সরকারী প্রধান চিকিৎসক (Civil Surgeon) কুঞ্জবাবুর বাসায় বসিত, কখন কখন শশীবাবুর বাড়ীতে।

যেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিন আসর কুঞ্জবাবুর বাসায়। যেমন হইয়া থাকে,—পারিবারিক কথা, দেশের সমাচার, কর্মস্থানের সাহেবকৃত তিরস্কার, শেষ গিয়া পড়িল কথা বাঙ্গালার ভাবী উন্নতিতে,—বিদ্যাশিক্ষা, বিলাত যাওয়া, জমাট বাঁধিল দেশের কলকারখানায়; রিষড়ার কল, ববাহ-নগরের কল, চামদানীর কল, বোধ হয় নিমতলার মড়া পোড়ান কলের কথাও হইয়া থাকিবে।

সকলেরই একমত, সকলেরই একরায়, সকলেই এক আশায় আশুস্ত; দেশের ভবিষ্যৎ বড়ই পরিষ্কার, বড়ই আশা-প্রদ। অল্পদিন অপেক্ষা সেদিন অধিকক্ষণ বৈঠক চলিল, শেষে সভা ভঙ্গ হইল। বনি পুরাতন হিসাব থাকে ডাক্তার বাবু বলিতে পারেন তাঁহার তামাকু খরচ সেদিন দ্বিগুণ হইয়াছিল কি না। আর বাসার ঠাকুর ও গৃহস্থ পরিবারের গৃহিণীবা বলিতে পাবেন সেদিন রাত্রে অনশনে অথবা অদ্বাশনে থাকিতে হইয়াছিল কি না। সেইদিন বৈঠকের তর্কবিতর্কে যোগ দেন নাই কেবলমাত্র উপস্থিত একজন ভদ্রলোক, তিনি নীরবে সভাস্থলে বসিয়াছিলেন। সভা ভঙ্গ হইলে তিনি নীরবে বাসায় চলিয়া গেলেন। তিনি পূর্তবিভাগেব লোক; পালামো তখন নূতন জেলা হইয়াছে, তিনি সরকারী ইমারত সকল প্রস্তুত করিতে আসিয়াছিলেন।

পরদিন বৈকালে ডাক্তার বাবুর বাসায় ঐ বাবুটী উপস্থিত আরও দুই একজন উপস্থিত, মজলিস্ তখন পুৰা হয় নাই, সকলে আসিয়া জুটিতে তখনও পারে নাই। বাবুটী স্বভাবতঃ অতি ধীর প্রকৃতির লোক, তিনি আশ্তে আশ্তে আরম্ভ করিলেন;—তিনি বলিলেন:—“আপনারা যে কল-

কারখানার কল অত প্রশংসা করিলেন তাহাতে দেশের কি সর্বনাশ হইতেছে তাহা আপনারা জানেন না তাই অত কথা বলিলেন; আমার বাড়ী চামদানী, কলকাবখানায় দেশের যে কি অনিষ্ট ঘটতেছে তাহা আমরা স্বক্ষে দেখিতেছি। যে চরিত্র মানুষের সর্বস্বধন, যে চরিত্র জাতীয় জীবনের প্রধান উপাদান, আমরা এই কল কারখানার দায়ে তাহা ধোয়াইতে বসিয়াছি; দেশ নিরন্ন, মালেরিয়াতে অনেক পরিবার নির্বংশ হইয়াছে, হয়তো কোন সংসারে দুই একটা বিধবা আছে, তাহাদের দিনান্তে অন্ন জুটে না, গৃহে সম্বল এক আধখানি ভাঙ্গা পাখব, আর বাঁহা কিছু বিক্রয়ের উপযুক্ত ছিল, তাহা পুর্কেই বিক্রয় করিয়া খাইয়াছে; এখন আর পেটে অন্ন নাই, শরীরে একখণ্ড জীর্ণ ছিল নেকড়া ভিন্ন বস্ত্র নাই, গৃহস্থের মেয়ে সাধারণে ভিক্ষা করিতে যাইতে পারে না, আর ভিক্ষা চাহিলেই বা দেয় কে? অনেক দিন অনশনে যায়। এখন আর দেশে কাটনা কাটা নাই বা এমন কোন সংবৃদ্ধি নাই যাহা অবলম্বন করিয়া গরীব ভদ্র লোকের মেয়ে ঘরে বসিয়া আপনার জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। সম্মুখে চামদানীর কল। ধর্মপথ ত্যাগ কব, ঘর হইতে পা বাড়ান, পাপস্রোতে গা ঢাল, আর তোমার অন্ন বস্ত্রের কষ্ট নাই, স্বচ্ছন্দে দিন কাটয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত অতি ভয়ানক। অত্যাগিনী দেখিতেছে, তাহার পাড়ার কত হতভাগিনী তাহাবই মত অন্ন বস্ত্রের অভাবে, তাহারই মত নানা কষ্টে ছিল, আজ তাহাদের আর কোন কষ্ট নাই। এইরূপে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে।” ভদ্রলোক নীরব। উপস্থিত সকলেই নীরব।

কথা ভাবিবার বটে। কেবল যে দেশে পাপের সংসার বৃদ্ধি পাইতেছে আর ধর্মের সংসার উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা নয়। দেশে যে কেবল কল কাবখানায় নৈতিক পতন হইতেছে আব আর্থিক উন্নতি হইতেছে তাহা নয়। দেশ সকল প্রকাবেই উৎসন্ন যাইতেছে। স্বজনবর্জিত, সমাজ-রহিত স্থানে, দেশেব যত যুবক যুবতী আসিয়া জুটিতেছে, তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ সঞ্চয় করে বা সদ্য্য করে এমন পবামর্শ দেয় কে? যে স্বাস্থ্য তাহাদের সর্বস্বধন, যাহার সাহায্যে তাহাদের এই স্বপ্ন, এই আপাত মধুর স্বপ্ন, তাহা রক্ষা করিতে পরামর্শ দেয় কে? তাহাদের

দৈনিক উপার্জন ভ্রমরাশির জায় কোথায় যাইতেছে, পাপের পুঞ্জায় তাহাদের শরীর, ও অত শারীরিক পরিশ্রম করিয়া উপার্জিত অর্থ কোথায় চলিয়া যাইতেছে ; দেশ যে নির্ধন সেই নির্ধন থে নিরন্ন সেই নিরন্ন, লাভের মধ্যে দেশের মধ্যে পাপের স্রোতের বিস্তার পাইতেছে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নিরন্নের রোগের সহিত অবৈধাচরণ জনিত রোগ সকল আসিয়া দেশকে উৎসন্ন দিতেছে। তাহার উপায় ? এখন হাল যেমন ধরিবে নৌকা সেই পথে যাইবে। কিন্তু একবার দিক নির্ণয় হইলে একবার নৌকা স্রোতে গা ঢালিলে তখন তাহার গতি কিরান শক্ত হইবে, হয়তো আর কিরবে না, অধঃপাতের পাকে পড়িবে।

বিষয় সমস্তা ;—অন্যভাবে এই জাতি কি ধ্বংস হইবে ? না পাপস্রোতে অন্নের চেষ্টায় গিয়া অধঃপাতের পাকে পড়িয়া নষ্ট হইবে ? অনেকে বলিতে পারেন, যে জীলোক-দিগকে কলে কাজ দেওয়া উচিত নয় ; কিন্তু সে উপায়ে আত্মরক্ষা সম্ভবপর নয়। যাহারা কল করিবে, তাহারা স্বার্থের অনুরোধে জীলোকদিগকে কলে কাজ দিবে ; আইনের অববোধ অনেক সময় দুর্বল প্রকৃতির লোকদিগকে আটকাইয়া রাখে, নীতির অববোধ তাহা পাবে না। লোককে তাহা মানে না। ইহার উত্তরে সুনীতি হয়তো বলিবেন, “চরকার হুতায় হাতে বুনা কাপড় ব্যবহার কর।” কলে বুনা কাপড়ের জায় যদি সর্বতোভাবে হাতে বুনা কাপড় সম্ভা হইত, তাহা হইলে কোন আপত্তি থাকিত না। কিন্তু তাহা হইতে পারে না।

যে স্রোত বহিয়া যায় তাহা আব কিরিয়া বিপরীতে বহে না, সময় যাহা কাটিয়া যায় তাহা আর আসে না। সময় যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাব আত্মসঙ্গিক সামগ্রী চলিয়া যায়, তাহা না হইলে সময়কে চিনি কিসে ? সময়কে জানি কিসে ? কাল যে আমাদের ছিল, আজ সে আমাদের নাই, আর সে সেই মূর্তিতে আমাদের মধ্যে আসিবে না, আর সে আমাদের হইবে না ; সময়কে চিনি তাহার পরিবর্তনে, আবার সেই পরিবর্তনকে চিনি সময়ে। যেদিন আর পরিবর্তনকে চিনিব না, সেই দিন আমাদের স্থান হইবে অনন্তে। আবার যে কালের আর পরিবর্তন

ধাকিবে না তখন সেই কাল আর কাল থাকিবে না, সে হইবে অনন্ত।

যাহা এককালে সম্ভবপর ছিল, অত্ৰকালে সম্ভবপর নয়। সময়ের উপযোগী না হইলে কোন পদার্থই কালের মুখে তিষ্ঠে না, তাহা কালের নিয়ামক হইতে পারে না। ভীমের গদা কুরুক্ষেত্রের নিয়ামক হইয়াছিল ; কিন্তু ওএডের তববারি সেন্টমিলের যুদ্ধে নিয়ামক হয় নাই, সেখানে ইংরেজ পক্ষে নিয়ামক হইয়াছিল ওএলিংটনের বুদ্ধি। তাই বলিতেছিলাম চরকা আর ভবিষ্যৎ বাঙ্গালার স্বচ্ছন্দের নিয়ামিক হইবার আশা নাই, তাহার উপর ভরসা করিলেই কালে তাহা মরীচিকা হইয়া দাঁড়াইবে।

অতীতের নাশেই, বর্তমানের প্রকাশেই, কালের আত্ম-বিকাশ ; কালের এই অতীত বর্তমানের প্রভেদ বুদ্ধিবাব অভাবে তাহার এই গতকে জীবন্তরূপে আলিঙ্গন করিতে যাইয়াই তাহার এত দুর্গতি। আপান বর্তমানকে বর্তমান বলিয়া চিনিয়াছিল, বর্তমানের ভালে ভবিষ্যতের আলোক দেখিতে পাইয়াছিল, সেই আলোকে আপনার পথ চিনিয়া লইয়াছিল, তাই তাহার আজ এত স্নকৃতি। আমাদের তাহাই বুদ্ধিয়া চলিতে হইবে। বর্তমানের মুখে ভবিষ্যতের মঙ্গল আবতি শুনিতে হইবে। তবে আমরা তাহার মঙ্গল রাজ্যে উঠিতে পারিব।

মানুষের প্রকৃতিই সংরক্ষণশীল, যাহা আছে তাহা ছাড়িতে চায় না। ভারতবাসী আবার সংরক্ষণশীলের মধ্যে সংরক্ষণশীল। তাহার শিক্ষাতে বল দীক্ষাতে বল, তাহার সমাজে তাহার ধর্মে বল, তাহার আচাবে তাহার ব্যবহারে বল, সকল বিষয়েই ভারতবাসী অতি সংরক্ষণশীল। ঋগ্বেদ ধর্মপ্রচাবক তাহার এই সংরক্ষণশীলতা দেখিয়া, গৈরিক বেশধারী সন্ন্যাসী সাজিয়া, পুরাতনের সাজে নূতন দীক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সংরক্ষণশীল জাতির পক্ষে নূতন বিষয়ে সফল হওয়া অপেক্ষা “নষ্ট বিষয় উদ্ধার” করাই সহজ। তাহা তাহার প্রকৃতিগত। সেই জন্য এই “স্বদেশী আন্দোলনে” অস্ত্র ব্যবসায় অপেক্ষা বাঙ্গালার কাপড় বুনাব ব্যাপাবটা অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। দেখিয়াছি অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সন্তান, আপনার ঘরে তাঁত বসাইয়া, আপনাদের সংসারের প্রায় সমস্ত কাপড় নিজে বুনিতেছে।

কিন্তু সখ ও ব্যবসা স্বতন্ত্র। চরকায় সূতা কাটিয়া, হাত-
তাতে কাপড় বুনিয়া, কলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা
চালান অসম্ভব।

চিবিদিন বণসাজ সাজে না, চিরদিন লোকে যুদ্ধ
করিতে পাবে না, যুদ্ধের পরিণাম আছে ;—যুদ্ধের পরিণাম
জয় পবাজয়, এক পক্ষের জয় অপব পক্ষের পরাজয়।
আমাদের দেশে বৈশ্ববুদ্ধ চলিয়াছে, তাহারই আব একটা
নাম “স্বদেশী আন্দোলন।” এই স্বদেশী আন্দোলন চিরদিন
চলিবে না, চিরদিন চলিতে পারে না। তখন যে পক্ষ
বাজারে ভাল দ্রব্য সুবিধা দরে বিক্রয় করিতে পারিবে
তাহারই জয় হইবে।

এই স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের দেশে নানারূপ
দেশী দ্রব্যের কারখানা খুলা হইতেছে ; আন্দোলন ধামিয়া
গেলে সকল প্রকারই যে আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে
পারিবে এরূপ আশা করা যায় না। সকল দেশ, সকল
প্রকার দ্রব্যের উৎপাদনের উপযুক্ত নয়, উপযুক্ত নয়
বলিয়াই জগতে বাণিজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বস্ত্রবয়ন, যে
আমাদের পক্ষে একটা উপযুক্ত উপজীবিকা, তাহা এই
দেশের বহুকালের বাণিজ্য বিবরণেই জানা যায়। এই
ব্যবসা বাঙ্গালী জাতির মধ্যশ্রেণীর স্বচ্ছন্দের মূল ছিল।
যে কোন জাতির মধ্য শ্রেণীই তাহার মেরুদণ্ড স্বরূপ। যে
জাতির মধ্যশ্রেণী পরিপুষ্ট, সেই জাতিই জগতে বলবান।

এক্ষণে আমরা যতরূপ ব্যবসায়, আমাদের মধ্যে সৃষ্টি
করিবার চেষ্টা করি না কেন, বস্ত্রবয়ন ব্যবসায়ের পুনরুদ্ধার
সর্বাপেক্ষা সহজ ও আমাদের অভ্যাসের অম্লরূপ। এই
বস্ত্রবয়ন শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত
রহিয়াছে। এখনও দেশী কাপড়ের আদর আমাদের মধ্যে
সকলের কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক রহিয়াছে। এখনও
চরকায় সূতা কাটার কথা পৌরাণিক উপভাসে দাঁড়ায়
নাই। এখনও বর্তমান বাঙ্গালীর অনেকেই পিতামহী বা
প্রপিতামহী চরকায় সূতা কাটিতেন, একথা তাহারা
জানেন। এখনও চরকায় সূতা কাটা হীন কাজের মধ্যে
পরিগণিত হয় নাই। কিন্তু এই এক কালের জাতীয়
উপজীবিকাকে পুনরপি আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে
হইবে, কিন্তু এই প্রাচীন উপজীবিকাকে মধ্যশ্রেণীর জীব

পুঙ্খ উভয়েব আয়ত্তের মধ্যে আনিত হইবে, কিন্তু গৃহ-
মহিলা আপনার পরিবার মধ্যে থাকিয়া, স্বামিপুত্রকে বস্ত্রবয়ন
কার্যে সহায়তা করিতে পারিবে, তাহাই আমাদের বিবেচ্য,
তাহাই আমাদের আলোচ্য। বড় বড় কল কারখানায়
তাহাদের স্থান নাই। বড় বড় কলকারখানায় সম্ভবতঃ
বিদেশী মূলধন থাকিবে। অথচ হাতে বোনা কাপড়
কলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিবে না। তবে
কর্তব্য কি ?

পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া আপনার পরিবারের
মধ্যে থাকিয়া আপনার সংসারধর্ম বজায় রাখিয়া, আপনার
জীবিকা অর্জন করিবার পরিজনপ্রিয় বাঙ্গালীগৃহস্থের
কোন উপায় আছে কি ?

যে রূপ বড় কল কারখানা নানা স্থানে আছে আজকাল
সেইরূপ ছোট ছোট কল কারখানা হইতেছে, জাপানে
ঐরূপ কল কারখানা অধিক। প্রত্যেক দোকানের নিজের
নিজের কারখানা ঘর আছে। তাহাতে আপনার বিক্রয়ের
দ্রব্য আপনার দোকানের একপ্রকার মধ্যেই, হইতেছে।
যে রূপ কলিকাতার উপকণ্ঠে বড় বড় ময়দা প্রভৃতির কল
আছে, আবার আজকাল কলিকাতার মধ্যেই অন্তরূপ
ছোট ময়দার কল ও অন্ত অন্ত প্রকার ছোট ছোট কল
হইয়াছে ; ঐ সকল কল অধিকাংশই বৈজ্যতিক বলে চলে।
আবার আজকাল এত ছোট “অস্থাবর বাষ্পীয় কল”
(Portable Steam Engine) পাওয়া যায়, যে নতি-
বৃহৎ একটা ঘরের মধ্যে ঐরূপ কলের সাহায্যে একটা
কারখানা খোলা যাইতে পারে।

দেশে বিদেশে আমাদের যুবকেরা “বিষয় বিজ্ঞা”
(technical education) শিক্ষা করিতেছে। আশা করা
যায়, ঐরূপ শিক্ষিতের সংখ্যা অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট
হইয়া ঐ সকল কল আবশ্যক মত মেরামত করিতে পারিবে।
ঐরূপ কারখানা খোলা অধিক টাকার কাজ নয়। যদি টাকা
করিয়া ঋণ দিয়া, উপযুক্ত পরিবার বিশেষকে দেশের মধ্যে
মধ্যে উপযুক্ত স্থানে ঐরূপ “পারিবারিক শিল্পশালা”
করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা ঐ টাকা পরিশোধ
করিলে উহাতে নূতন কারখানা খোলা হয়, তাহা
হইলে কালে দেশ ঐরূপ “পারিবারিক শিল্পশালা”

পুরিয়া যাইবে। সত্য বটে বড় বড় কলকাবখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের বাহা পড়ন পড়িবে সমস্ত খবচা খতাইলে ঐ সকল “পারিবারিক শিল্পশালায়” প্রস্তুত পণ্যের খবচা তাহা অপেক্ষা বেশী হটবার সম্ভাবনা ; কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র কারখানাগুলির শ্রমজীবীর পাবিত্রমিক ও ধনীর লাভ সমস্তই একহস্তে যাইবে, সমস্তই গৃহস্থ শিল্পশালাকর্তা পাইবেন। সমস্ত আয়ই তাঁহার সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় হইবে, তাহার ভাগ কাহাকেও দিতে হইবে না। আর এক কথা, এই সকল “পারিবারিক শিল্পশালায়” কারখানার কর্তার পরিবারের সকল জীবীলোকেই আবাস বিশ্রাম সময় বাদে তাহাদের নিরুপায় সময় শিল্পশালায় কাজে লাগাইতে পারিবেন ; এইরূপে পূর্বে চরকা কাটিয়া গৃহস্থ মহিলারা দেশের যে উপকার করিতেন, “পারিবারিক শিল্পশালা” সকল দেশে স্থাপিত হইলে, তাহারা তাহাতে কাজ করিয়া দেশের সেই উপকার করিতে পারিবেন। এই প্রথায়, দেশে “পারিবারিক শিল্পশালা” খোলা হইলে, তাহার লব্ধ আয়, বড় বড় ধনীর ধন বৃদ্ধি না করিয়া, চবিত্রহীন স্বজনভ্রষ্ট শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া, প্রকৃত সমাজের সাব অংশ, মধ্যশ্রেণীর উন্নতি সাধন করিবে। সমাজের অর্থাভাব ঘুচিবে, অন্নকষ্ট ঘুচিবে। অন্নভাব জনিত মারাত্মক সকল আর দেশকে প্রজ্বলিত অশানে পরিণত করিয়া বাধিতে পারিবে না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চন্দ্র ।

বৌদ্ধধর্মের বিশ্বপ্রেম ।*

কপিলবাস্তু নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহারাজ শুদ্ধোদন ঘণ্টা ঘোষণায় প্রচার করিয়াছেন—অম্ব হইতে সপ্তম দিবসে কুমার সিদ্ধার্থ নগরোদ্ভান দর্শন করিতে যাইবেন ; নাগরিকগণ যেন সেজন্ত প্রস্তুত থাকেন ;—নগরের অপ্রীতিকর বস্ত্রসমূহ অপনীত করিয়া তাঁহারা যেন চতুর্দিকে প্রিয়দর্শন দ্রব্যসম্ভাব সংগৃহীত রাখেন।

শুদ্ধোদন পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সিদ্ধার্থ সংসার পবিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তজ্জন্তই তিনি সাবধান

বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক-সমিতিতে পঠিত।

হইতেছিলেন যে, যেন কোনও প্রকারে কুমারের হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব আসিয়া উপস্থিত না হয়।

সপ্তম দিবসে সমস্ত নগর অলঙ্কৃত হইল। উদ্যানভূমি বহুবিধ কুসুমবিতানোজ্জ্বল ও ছত্রধ্বজপতাকাশ্রিত হইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কুমারের যে সকল পথ দিয়া গমন করিবার কথা, সেই সমস্ত সুবিস্তীর্ণ পথ সজ্জ, সম্মার্জিত, গছোদকপরিষিক্ত ও বিকচকুসুমাবকীর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। কদলীশুস্ত ও পূর্ণকুস্ত, এবং কনক কিকিনী-দাম ও ক্ষটিক মৌক্তিক হাব সেই সমস্ত পথকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল। কুমার চতুর্দিক সৈন্ত ও অপরাপর যথাযোগ্য পরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া রথযোগে নগরের পূর্বদ্বার দিয়া বহিরুদ্ভান ভূমি সন্দর্শন কামনার বহির্গত হইলেন। মহোৎসব যেন শরীর পরিগ্রহ করিয়া নগর মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল।

নগরের সেই আনন্দোৎসব অবলোকন করিয়া মহারাজ শুদ্ধোদন ভাবিতেই পাবেন নাই যে, কুমারের চক্ষে তেমন কোন বস্তু আকৃষ্ট হইবে, বাহাতে তাঁহার হৃদয়ে কোন উদ্বেগ বা বৈরাগ্য জন্মিতে পারে। কিন্তু সমগ্র জগতেই মঙ্গলের জন্য, আজীবন রাজভোগলালিত সুখমাত্রপরিচিত সিদ্ধার্থ তাহার মধ্যেও প্রাণিগণের ব্যাধি-জরা-মৃত্যুর ভীষণ চিত্র সন্দর্শন করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তখন হইতে রাজকুমারের নিজের ভাবনা দূর হইল, তিনি পরের জন্য ভাবনা আরম্ভ করিলেন—কেমন করিয়া ঐ দুঃখ জালা হইতে সকলকে উদ্ধার করিবেন। মহাধর্ম প্রচারকের কোমল হৃদয়ে পরম রমণীয় বিশ্বপ্রেমের বীজরত্ন এই প্রথম প্রবেশ লাভ করিল। রাজ্যভোগ তাঁহার নিকটে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল, তিনি সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া দিবা-রাত্রি অবিচ্ছেদে চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিপ্রকারে জীবগণের মঙ্গল করিতে পারিবেন। সঙ্গীত-প্রসাদে বা সুখ-শয়নে থাকিলেও তাঁহার ঐ এক চিন্তা চিরসহচরী হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি মহাভিনিক্ষেপ করিবার পূর্বে জীবগণকে দুঃখিত দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন—“হায় ! জীবগণ সংসাররূপ মহাকাবাগারে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আছে, ইহাদের এই কাবাগার বিনষ্ট করিয়া মুক্তির কথা উচ্চারণ করিব। তাহারা তৃষ্ণা-শূন্যে গাঢ় নিবদ্ধ হইয়া বহিয়াছে, তাহা হইতে ইহাদিগকে

প্রমোচিত করিয়া দিব। হায়! লোক সংসারের অবিচারপূর্ণ গহন অন্ধকারে আবৃত, তাহাদেব প্রজ্ঞাচক্ষু নাই; আমি ইহাদেব এই মহাঅন্ধকারে মহান ধর্মালোক উৎপাদন করিব; আমি ইহাদেব জ্ঞানপ্রদীপকে সমুদীপ্ত করিয়া দিব; ঐবধ প্ররোগের দ্বারা মোহতিমিবজ্জালের কালুন্ধ্য অপনয়ন করিয়া ইহাদেব প্রজ্ঞাচক্ষুকে বিশোধিত করিয়া দিব।”*

এই ভাব তাঁহার হৃদয়কে এতদূর অধিকার করিয়া ফেলিল যে, মহারাজ শুদ্ধোদনের সমস্ত প্রয়াসই বার্থ হইয়া গেল। বোধিসত্ত্বকে গৃহে রক্ষা করিবার জন্ত প্রাকার প্রস্তুত হইল, পরিখা খাত হইল, দ্বার সমূহ দৃঢ়তর করা হইল, রন্ধনালয় স্থাপিত হইল, শূর সমূহ প্রেরিত হইল, এবং নগব-দ্বার ও চতুর্দিক সমূহে মহাসৈন্যবাহ নিয়োজিত হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তিনি সারথি ছন্দকে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে মহাভিনিক্ষেপণ করিলেন। প্রভুবৎসল ছন্দক সিদ্ধার্থকে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্ত অল্পনয় বিনয় করিয়াছিল, বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কুমার তাহার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন:—

“ছন্দক, এই জগৎ ক্লেশ ও ব্যাধিতে আবৃত হইয়া দহমান হইতেছে; ইহা মোহ-অবিজ্ঞাব অন্ধকারে পতিত হইয়া অশরৎ ও অনাথ; ইহা জরা-ব্যাধি ও মৃত্যু ভয়ে পীড়িত; এবং শত্রুশত্রুপ জন্মজন্মিত দুঃখ সমূহে নিতান্ত আহত।... আমি ধর্মনৌকা আনয়ন করিয়া ডাবার্ণব উত্তীর্ণ হইব, এবং অনন্ত জগৎকে উত্তীর্ণ করাইব। ছন্দক, পরর্তরাজ্য মেকর ত্যায় আমাব এই সঙ্কল্প নিশ্চল বলিয়া জানিবে।”

ভগবান্ শাক্যসিংহ সমগ্র জগতের দুঃখে ব্যথিতচিত্ত হইয়া তাহার অপনোদনের দুর্ভব ভাব স্বীয় মস্তকে বহন পূর্বক কঠোর পরিশ্রমে ও অবিশ্রান্ত উত্তম যে ধর্মচিন্তামণি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে ভারতভূমি সেই সময়ে অদ্বুতরূপে উজ্জাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়াও, এবং মৃত্যুর পূর্বরূপ পর্যন্তও যে ধর্মকে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহাতে বলিয়া যাইতে ভুল করেন নাই যে, সেই অভিনব ধর্মের মূল কি, এবং তাহার প্রাণই বা কি। তিনি যেমন বিশ্বজনের মঙ্গলের জন্ত নিজেকে উৎসর্গ

করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার সেই অভিনব ধর্মপ্রচার কবিয়া শিষ্যগণকেও শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সেই বহিরুজ্জ্বলভূমি সন্দর্শনের দিনে তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের বে বীজ বোপিত হইয়া কালক্রমে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, এবং শাখা-পল্লবে শোভিত ও পুষ্পফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার পব তন্নীয় শিষ্যগণ সেই সূমহান্ বিশ্বপ্রেমতরঙ্গ স্নানীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া বহু বহু গ্রন্থ বচনা কবিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেব সেই সমস্ত গ্রন্থ ঐ সমৃদ্ধ লতকবৎসেব দিগন্তবিসর্পী সৌভদসম্মারে আমোদিত এবং তাহারা অত্মাপি বোপণকর্তার ধর্মবৈভব প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

আজ আমবা মহাবান-সম্প্রদায়েরই গ্রন্থ হইতে আলোচনা কবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব যে, ঐ বিশ্বপ্রেম-প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম কত মধুর ও কত স্নন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

“ভিক্ষু প্রকীর্তক” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—একদিন কোন ব্যাধিপীড়িত ভিক্ষুকে ভগবান্ বৌদ্ধ বলিতেছেন—“ভিক্ষু, তুমি ভয় করিও না, ভয় করিও না। আমি তোমার পরিচর্যা করিব। কৈ তোমার চীবর দাও, আমি ধুইয়া দিতেছি।” ইহা শুনিয়া তাঁহার সহচর প্রিয় ভিক্ষু আশ্চর্যান আনন্দ বলিলেন—“ভগবন্, আপনি এই অশুচিপদার্থযুক্ত চীবর ধুইবেন না, আমি ধুইব।” ভগবান্ বলিলেন—“আনন্দ, যদি তাহাই হয়, তবে তুমি এই ভিক্ষুর চীবর ধুইয়া দাও, আমি জল ঢালিয়া দিব।” এইরূপে আনন্দ সেই ভিক্ষুর চীবর ধুইয়া দিতেন, ভগবান্ জল ঢালিয়া দিতেন; আনন্দ তাহাকে ভাল কবিয়া বাহিরে আনিয়া স্নান করাইয়া দিতেন, আঁব ভগবান্ জল ঢালিয়া দিতেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধ লাভ করিয়া এই রূপেই জীবের সেবা আরম্ভ করেন। তিনি জীবগণকে লক্ষ্য করিয়া এক স্থানে বলিয়াছিলেন—“যাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া বহু ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এই সেই জীবগণ বিজ্ঞান বহিয়াছে; জীবগণ ছাড়া জগতে অপর কোন সিদ্ধকত্র নাই।”

ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধ ‘বোধিসত্ত্ব প্রাতিমোক্ষে’ শাবিপুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন—“হে শাবিপুত্র, বোধিসত্ত্বগণ চিত্তশূর; তাহারা (অন্তের জন্ত) হস্ত পরিত্যাগী, নাসা-পরিত্যাগী, শীর্ষ পরিত্যাগী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিত্যাগী, পুত্র

পবিত্রাঙ্গী, হুহিত পবিত্রাঙ্গী, ভাষ্যা পবিত্রাঙ্গী, রতি পবিত্রাঙ্গী, পবিবাব পবিত্রাঙ্গী, চিত্ত পরিত্রাঙ্গী, স্মৃথ পবিত্রাঙ্গী, গৃহ পবিত্রাঙ্গী, বস্ত্র পবিত্রাঙ্গী, দেশ পবিত্রাঙ্গী, রত্ন পবিত্রাঙ্গী ও সৰ্ব্বস্ব পরিত্রাঙ্গী।”

‘নাব্যয়ণ পবিপূচ্ছাতে’ও এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে:—
“হে কুলপুত্র, বোধিসত্ত্বের সেকপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নহে, যাহাতে তাহাব দানবুদ্ধি উৎপন্ন না হয়।
হে কুলপুত্র, মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিয়া—আমাব যখন এই শবীবই সমস্ত জীবকে বিতরণ করা হইয়াছে, তখন ত অন্তান্ত বাহু বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছেই; অতএব যে যে জীবের যে যে বস্ত্রের প্রয়োজন, আমি তাহাকে তাহাই বিতরণ করিব—যদি আমাব ঐ বস্ত্র থাকে; হস্তাঙ্গীকে হস্ত, চবণাঙ্গীকে চবণ, মাংসাঙ্গীকে মাংস, কৃষিবাঙ্গীকে কৃষি, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাঙ্গীকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পবিত্রাঙ্গ কবিব; ধন-দাত্ত বস্ত্র-কাঞ্চন, হয়-গজ-বলবাহন ও গ্রাম-নিগম-নগরজনপদ প্রভৃতি বাহু বস্ত্রের আর কথা কি? যাহাব যাহা প্রয়োজন উপস্থিত থাকিলে, তাহাকে তাহাই প্রদান করিব;—এবং তাহা শোকহীন, অমৃতাপহীন ও ফলকামনাহীন হইয়া প্রদান কবিব। আমি সমস্ত ফল নিবপেক্ষ হইয়া, কেবল জীবগণকে অমৃতগ্রহণ কবিয়া, ককণা কবিয়া, অমুকম্পা কবিয়া তাহাদেবী, সংগ্রহেব জন্ত দান কবিব, যাহাতে তাহাবা সংগৃহীত হইয়া বোধিপ্রাপ্ত ধর্ম্মকে জানিতে সমর্থ হয়। হে কুলপুত্র, যেমন কোন ভৈষজ্য বৃক্ষকে মূল হইতে, বা শাখা হইতে, বা পত্র হইতে, বা ফল হইতে বা সার হইতে গ্রহণ করিলেও তাহাব কোন বিকল উপস্থিত হয় না, সে ভৈষজ্য বৃক্ষ নির্বিকল হইয়া—হীন-মধ্যম-উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবের ব্যাধিকে অপনয়ন করে, হে কুলপুত্র, মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্বেরও সেইরূপ এই চাতুর্মহাভৌতিক শবীব সম্বন্ধে ভৈষজ্য বুদ্ধি উৎপাদন করা উচিত যে, যে যে জীবের যে যে অঙ্গের প্রয়োজন, সে তাহা ঐ গ্রহণ করুক, হস্তাঙ্গী হস্ত গ্রহণ করুক, চবণাঙ্গী চবণ গ্রহণ করুক...।”

‘আর্য্যাক্ষর যন্তিত্ত্রে’ এ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায়:—“আমি সমস্ত জীবের কার্য্যে এই শবীরকে ক্ষয় কবিব। যেমন পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজ নামক ত্রিহিংস্র চতুর্মহাভূত নানাপ্রকারে নানা পরিভোগে নানা স্রুখে

জীবগণের উপভোগযোগ্য হয়, আমিও সেই রূপ এই চতুর্মহাভূতোৎপন্ন শবীরকে সর্ব্বজীবের উপভোগ্য করিব।” সে যদি এই প্রকার চিন্তা কবে, তবে শবীর দুঃখকে আর দেখিতে পায় না, এবং তাহাব দ্বাবা পরিখিন্নও হয় না।”

‘আর্য্য বজ্রধবসূত্রে’ সর্ব্বজীবের কল্যাণের জন্ত আত্মোৎসর্গ বিষয়ে বিবিধ কথাব মধ্যে এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—
“বোধিসত্ত্ব দাসত্বের জন্ত নিজেকে প্রার্থয়িতার নিকটে প্রদান করিয়া নিজেকে নীচ বলিয়া চিন্তা করিবে, পৃথিবীর স্ত্রায় সমস্ত দুঃখ সমস্ত কবিত্তে পাবিব বলিয়া মনে করিবে ও সমস্ত জীবের পবিচর্য্যায় অক্লান্তমানস হইবে।” (ক্রমশঃ)

শ্রীবিষ্ণুশেখর ভট্টাচার্য্য।

পারস্ব-প্রসূন।

(হাফেজ হইতে)

বার্থতা।

খুঁজিতে খুঁজিতে তোমা নেত্র মোর অশ্রুরূপ
মুক্তাপুঞ্জ কবিল বর্ষণ,
—জলিল অনল মনে— হইল না তব সনে
মোব হার স্রুথ-সন্মিলন!

প্রতীক্ষা।

তোমাব পথের ধূলি ব্যাকুল দর্শকগণ
করিবারে নয়ন-অঞ্জন,
তুমি যাবে বলে সখা, স্থাপি’ ছুঁটা স্থিবি আধি
বহুকাল কবিছে কর্তন।

আবেদন।

একটি চুঘন শুধু ছিল মোর দিতে বাকী
সরে গেল অধর তোমাব; —
স্বমধুর অধবোষ্ঠ করেছে একপ তব,
তুমি কব ইহার বিচার।

বিশ্বাস।

তোমাব অধব তবে প্রাণ যবে উৎসর্গিলু,
ভেবেছিলাম মনে,—
সে অধব-স্রুধা-বস একবিষ্মু মোব মুখে
পড়িবে গোপনে।

নিত্য-বস্ত্র।

এ বিশাল বিশ্ব-চক্রে পবিত্র প্রেমের বার্তা
একমাত্র শাস্ত-রতন,
ইহা হতে শ্রেষ্ঠতর স্মৃতি-চিহ্ন কিছু আর
কবি নাই কখনো দর্শন।

অনুরোধ ।

বসন্ত-সন্ধ্যার সাধে, তোমাব উদ্ভান হতে
পাঠাইও ফুল ফুল-রাশ,
সম্ভবতঃ তা'রি মাঝে সখা, তব মাশঙ্কের
পাব আমি ধূলিব সুবাস !

অনুমান ।

আমার নিদ্রিত ভাগ্য হয়ত উঠিবে আগি'
শিশিরাস্ত্রে মাধবীর সম ;—
তব পূণ্য-মুখ-জ্যোতিঃ কবিরাজে অশ্রুসিক্ত
আঁখি ছু'টি মোর প্রিয়তম !

যাত্রী ।

ভগ্ন তরী বাহি' ধীরে অসীম সাগর-নীরে
চলেছি একা,—
বহ অমুকুল-বায়, সখাসনে হবে হায়,
হয়ত দেখা !

ভ্রান্তি ।

অস্তিম শয়ন যাব ছু'টি হস্ত পরিমিত
মুস্তিকা কঠিন ;—
সে কেন গগনচুম্বী বিরচে প্রাসাদপুঞ্জ
হর্ষে নিশিদিন !

অমর ।

প্রেমেতে বাহার মন জীবিত এ বিশ্বমাঝে
মৃত্যু তার নাহি কোন দিন ;
জগতের কার্যালয়ে মোর সেই অমরত্ব
সুঅঙ্কিত, কলঙ্কবিহীন !

প্রার্থনা ।

হুয়াবে তব দেবার কাজ
রয়েছে বহু নাথ,
করুণা করে আবাব দাসে
কবগো আঁখি-পাত !

ভরসা ।

নিবাশ হয়ে ছয়ার হ'তে
ফিরিয়া আমি যাব না !

হয়ত কোন নিশার কালে
ঈপ্সিত-চাঁদ গগন-ভালে
উদিবে,

আকুল কবা পরাণ ভবা
বিমল আভা জ্যোছনা
হয়ত মোর ছাদেব 'পর
পড়িবে !

সাধ ।

ধরার মাঝ জীবন হেন
যাপ না,—
মরণ হ'লে কহিবে সবে
'মবেও অমর এ জনা' !
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

প্রার্থনা ।

আমারে টানিয়া আন
গোপন নিভুতে,
হে অনন্ত ! হে মহান !
সারা বিশ্ব হ'তে ।
বিক্ষিপ্ত হৃদয়-অণু
বাহিরের শত কাজে,
আপনা হারা'য়ে ফেলি
চঞ্চল বিশ্বের মাঝে ।
জীবনের কণাগুলি
নিজ হাতে কুড়াইয়ে,
হে বিধাতা, বেঁধে দাও
সুদৃঢ় সঙ্কল্প দিয়ে ।
বাসনা'ব সচঞ্চল
মলিন তাড়না আসি,
যেন না উড়িয়ে দেয়
যথা তুচ্ছ, ধূলি-রাশি ।
যেখানে শুষ্কতা আসি
শুষ্ক করি দিবে হিয়া,
বাঁচা'ও করুণাময়
স্নেহ ধারা বরষিয়া ।
তুচ্ছ মলিনতা যথা—
তব দীপ্তি, হে উজ্জ্বল !
অস্তব বাহির মম
ভ'রে দি'ক সর্বস্থল ।
শ্রীসরলা দত্ত ।

চিত্র পরিচয় ।

প্রবাসী বর্ধমান সংখ্যার গোড়ায় যে চিত্রটি দেওয়া গেল তাহা কলিকাতা গবর্ণমেন্ট আর্টস্কুলের শ্রীযুক্ত লাল ঈশ্বরীপ্রসাদ কর্তৃক অঙ্কিত ছবির প্রতিলিপি। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়ন্টাল আর্টের অনুমতি অনুসারে উহা মুদ্রিত হইল। এই অস্তঃপুত্রিকার চিত্র হিন্দুজাতি আদর্শে কল্পিত হইয়াছে। ইহার বিষয়পূর্ণ শাস্ত্র সৌন্দর্য্য সহজেই উপলব্ধ হয়।

এবার মাল্লাজে কংগ্রেসের আয়োজন হইতেছে; নাগপুরেও হইতেছে। মাল্লাজ কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। অধ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হইয়াছেন, জিবাকুডের ভূতপূর্ব দেওয়ান দেওয়ানবাহাদুর কে, কুরুশামী রাও। শিল্প-আলোচনা-সমিতিও বসিবে। তাহার সভাপতি হইবেন, রাও বাহাদুর আর. এন্. মুখোপকার। এই তিন জনের ছবি দেওয়া গেল।

প্রাপ্তপুস্তক পরীক্ষা।

যৎকিঞ্চিৎ—শ্রীসৌরভমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ, প্রণীত। শ্রীযুক্তদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, কর্তৃক প্রকাশিত। কাস্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন বোডুশাংশিত ৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা মাত্র। এখানি ব্যঙ্গ-নাট্য, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। একটি মহিলার অধিক লেখাপড়া শিথিল মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাইয়াছিল; আর একটি শিক্ষিতা মহিলার যত্নে তাহার চৈতন্য হয়। ইহাই মূলতঃ প্রস্তাব বিষয়। উচ্চ শিক্ষার বিকারের প্রতি ব্যঙ্গ ও ঘটনার সমাবেশ আগাগোড়াই অস্বাভাবিক। এই বই পড়িতে পড়িতে মাটিবিকার নামক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত একখানি প্রাচীন ব্যঙ্গনাট্য স্মরণ হয়। তাহার লেখকগণ ইহাতে আছে, কিন্তু তাহার সময় হস্তরসটুকু ইহাতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। একযেবে ব্যাপার পড়িতে পড়িতে বিরক্তি জন্মে, হাড্ডের বিকট আয়োজন দেখিয়া হস্ত কঁাদিয়া বিদায় লয়। গ্রন্থকার উচ্চ শিক্ষার গর্ব রাখেন, তাহা তাঁহার নামের শেষে বিধিবিদ্ভালয়ের ছাপেই প্রকাশ; অথচ এই স্বল্প জ্ঞানিকার দিনে তিনি নিত্যন্ত স্বয়ং-হীনের মতই উচ্চ জ্ঞানিকাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। উষা ও হরমার যে চিত্র তাহা এমন অস্বাভাবিক যে পাগল ভিন্ন এমন আর কেহ হইতে পারে না। পাগলের খেবাল যদি বর্ণনীয় হয় তবে বর্ণনীয় বিষয়ের আর অভাবই থাকিবে না। তবে উষা ও হরমার পাশে লাবণ্যের চরিত্র আঁকিয়া গ্রন্থকার যে প্রারম্ভিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আমাদের বিবেচনার যথেষ্ট হয় নাই। একেই আমাদের দেশের লোকে জ্ঞানিকার বিরোধী, তার পরে যদি শিক্ষিত লোকে কাপুরুষের মত, জ্ঞানিকাকে এইরূপ নিত্যন্ত অস্বাভাবিক, মিথ্যা বর্ণে চিত্রিত করিয়া বিদ্রূপ করেন, তবে সমাজের অকল্যাণ ও অপকারই করা হইবে। বাংলা থিয়েটারে জোপাড করিয়া অভিনয় করাইলে বা রঙ্গপ্রিয় অচিন্তাশীল অজ্ঞবর্ণকের হাততালি পাইলেই রচনার মার্ককতা হয় না। বাহা প্রকাশ করা হয় তাহা দেশের, সমাজের ও সাহিত্যের উপকার করিবে কি না সে বিষয়েও চিন্তা করা আবশ্যিক। হেমন্ত দত্তের চরিত্র ব্যাখ্যানটা আরো একটু সংযত প্রচ্ছন্ন ভাষায় করিলে ভালো হইত। গানগুলির মধ্যে কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাইলাম না—তবে গান হয় অভাবে সূত, আমরা হয়ে শুনি নাই হতরাজ অধিক কিছু বলিতে পারি না। এই গ্রন্থে নাটকদেহও নিত্যন্ত অভাব—আগাগোড়া কেমন খাপছাড়া। নবীন গ্রন্থকার শিক্ষিত, তিনি মহন্তর আদর্শ লইয়া সাধনা করুন, হলভ খ্যাতির মোহ যেন তাঁহাকে জাম্ব না করে। গ্রন্থকারের এই প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, সেই জন্তই সকল ক্রটিগুলিই তাঁহাকে দেখাইলাম, নতুবা তাঁহার সর্বনয় ভূমিকা পাঠের পরও এমন হৃদয়হীনতাব পবিত্র দিবার প্রবৃত্তি হইত না।

মুদ্রারক্ষস।

অজ্ঞতা-স্বীকার।

ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র বার আমার “চকু পদার্থ টা কি” প্রবন্ধের একটি ক্ষুদ্র ফুটনোটকে ফেনাইয়া তুলিয়াছেন একটু বেশী মাত্রা। “সুপারি” বাঙলা ভাষায় একটা অটিপছিন্ন শব্দ, এই যা আমি জানি; তা বই, তাহা যে, আসিয়াছে কোথা হইতে তাহা তিনিই বা কিরূপে জানিবেন, আর, আমিই বা কিরূপে জানিব, তাহার তো কোনো সুরাহা দেখিতেছি না। বাঙলা-মূল্যে বাহা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অথচ বাহার মূল মুক্তিকাপর্ডে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এইরূপ দ্বিতী ধাঁচার শব্দগুলি উপরেই আমি “ভাষা বাঙলা” উপাধি আরোপ করিয়াছি, ইহা বলা বাহুল্য।

শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর।

জাপানে ভারতীয় ছাত্রের

কত ব্যয় হয় ?

প্রতিবাদ।

সর্বনয় নিবেদন,

গত আর্থনের “প্রবাসী”র সমালোচনাস্তম্ভে “জাপানের কথা ও শিল্পসংবাদ” নামক পুস্তকের উল্লেখ দেখিলাম। এই গ্রন্থে “জাপানে মিতব্যয়ী ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে ৩০-৩৫ টাকা এক প্রকার যথেষ্ট”, এই প্রকার মত প্রকাশ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার বোধ হয় কখন জাপানে পদার্পণ করেন নাই, এবং শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া সংবাদের সত্যাসত্য বিচার করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। বলা বাহুল্য মিতব্যয়ী ছাত্রের পক্ষে জাপানে, পৌষাক পরিচ্ছদ ও পুস্তকের ব্যয় ছাড়া, ৭৫ হইতে ৮০ টাকার এক প্রকার চলে। কেহ মনে করিবেন না যে এই টাকাতে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দে থাকা চলে। অবশ্য জাপানী ছাত্রেরা কম খরচে চালাইতে পারে, কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যিক যে এদেশ জাপান, এবং বাহা জাপানী ছাত্রের পক্ষে সম্ভব তাহা ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে নয়।

এই প্রকার ভ্রান্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গত বৎসর প্রায় ৭৬ জন ভারতীয় যুবক (যত দূর স্মরণ হয় সকলেই বলীয়) টাকা কড়ির কোনও বন্দবস্ত না করিয়াই এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা জাপানে আসিয়া টাকা উপার্জন করিয়া লেখা পড়া চালাইবেন এই প্রকার দাবকার বশবর্তী হইয়াই আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এখানে আসিয়া তাঁহারা প্রায় ছয় মাস বাবৎ অশেষ ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করেন, এবং শুধুই তাহাই নয়, অন্ত্যস্ত ভারতীয় ছাত্রকেও অশেষ অসুবিধা ঘটিলেন।

অন্ত্যস্ত ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা অসুস্থ হইয়া এই পত্রখানি লিখিলাম; আপনাদের হৃদয়বাত পত্রিকার কিঞ্চিৎ স্থান দান করিলে শুধু লেখককে বাধিত করিবেন তাহা নয়, দেশের কিছু উপকার করা হইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলী এই প্রকার ভ্রমপূর্ণ সংবাদে যত কম আস্থা স্থাপন করেন ততই মঙ্গল।

বিনীত

শ্রীভারতীয় ছাত্র।

টো কও, জাপান।

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নামমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

৮ম ভাগ ।

মাঘ, ১৩১৫ ।

১০ম সংখ্যা ।

লক্ষণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক ।*

প্রথম ভাগ আদৌ লিখিত হয় নাই, অথচ দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে,—এরূপ গ্রন্থ সকল দেশেব সাহিত্যেই নিতান্ত সুদূরভ, কেবল বঙ্গসাহিত্যেই এরূপ একখানি মাত্র গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহাব নাম “বাঙ্গালার ইতিহাস”। পুণ্যলোক বিজ্ঞানাগর মহাশয় সেই “অধিতীর্থ” গ্রন্থ রচনা করিয়া যেরূপ বিচারবুদ্ধির প্রার্থনা, প্রকাশিত, কবিয়াছিলেন, তাহাব প্রকৃত মর্যাদা অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহার জীবিতকালেই অনেকে বাঙ্গালার ইতিহাসেব “প্রথম ভাগ” রচনা করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার ফলে, বঙ্গ-সাহিত্যে এক অলৌকিক উপাখ্যান, ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করিয়া, সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা “বক্তার থিলিজির বঙ্গ-বিজয়,”—অথবা “লক্ষণ-সেনেব পলায়ন-কলঙ্ক!” এই কলঙ্ককাহিনী বহুতাত্ত্বিত আবজ্ঞানারামের দ্বারা রচনা করিবার দ্বারদেশে পুঞ্জীকৃত হইবা-

মাত্র, তদ্বারা অর্থোপার্জনের সুযোগ লক্ষ্য করিয়া, বঙ্গ-রঙ্গালয় তাহাকে পরম সমাদরে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবাব পর, তাহা ক্রমে নিরক্ষর নবনাবীর নিকটেও সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে! এত কালের পর সম্প্রতি একজন সুনিপুণ চিত্রকর তাহা লইয়া একখানি চিত্রপট রচনা করিয়া, লক্ষণসেনেব পলায়ন-কলঙ্ক চিরস্মরণীয় কবিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা এইরূপে বাঙ্গালীব গৃহে গৃহে চিরপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যে সর্বথা অলৌক, এখন তাহার আলোচনা করিতেও অনেকে অসম্মত হইতে পারেন। কিন্তু স্বদেশের ইতিহাসের সকল ঘটনাই স্বাধীন-ভাবে আলোচনা করা কর্তব্য,—যাহা সত্য, তাহা নির্ণয় করিয়া, প্রচলিত ইতিহাসের সংশোধনকার্যে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য,—কালবিলম্বে অসত্য কখনও সত্যের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। লক্ষণসেনের পলায়ন-কলঙ্কেব মূলে আদৌ কোন সত্য সংশ্রব বর্তমান আছে কিনা, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। পূর্বে অনেক বার “বক্তার থিলিজির বঙ্গবিজয়” সমালোচনা করিতে গিয়া, প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণসেনের পলায়ন-কলঙ্কেব কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। এখন চিত্রপট প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া মনে হইতেছে,—

* শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রপট দর্শনে লিখিত ও রাজসাহী শাখা-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয়বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।

বঙ্গসাহিত্যে যাহা প্রকাশিত হয়, সকল শিক্ষিত বঙ্গবাসী তাহা পাঠ করেন কিনা সন্দেহ!

বক্তার খিলিজির বঙ্গগমনের ষষ্টি বর্ষ পবে, সুবিখ্যাত মুসলমান ইতিহাসলেখক মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ এদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি “তবকাৎ-ই-নাসেরী” নামক দিল্লী-সাম্রাজ্যের যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিংশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গভূমির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে—বক্তার সপ্তদশ অখাবোহী লইয়া “নওদিয়া”



লক্ষ্মণসেনের পলায়ন।

নামক রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্র, “রায় লছমনিয়া” নামক হিন্দু নরপতি পলায়ন করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ বিচারনিপুণ ঐতিহাসিকের জ্ঞান এই কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া, লিখিয়া গিয়াছেন—যাহারা বক্তারের সহিত বিজয়-যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা তখন পর্যন্ত জীবিত ছিল, তাহাদের মুখে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজের গ্রন্থ প্রমাণ-

রূপে উল্লিখিত করিয়া, বিজ্ঞানজ্ঞের পাঠ্যপুস্তকে এই কাহিনী সংকলিত হইবার পর, ইহা ক্রমশঃ সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মূল প্রমাণ মিন্‌হাজের গ্রন্থ,— একমাত্র প্রমাণ মিন্‌হাজের গ্রন্থ,—তাহারও একমাত্র প্রমাণ বৃদ্ধ সৈনিকের পুরাতন আখ্যায়িকা! বক্তার খিলিজির বঙ্গগমনের ষষ্টিবর্ষ পরে এদেশে আসিয়া, মিন্‌হাজ যে বৃদ্ধ সৈনিকেব নিকট এই অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি তখন অশ্রীতপর বৃদ্ধ;—তাহার সত্যনিষ্ঠা বা আত্মগৌরব-ঘোষণার প্রবল প্রলোভন কতদূর প্রবল ছিল, এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার সম্ভাবনা নাই!

মুসলমানগমনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগে যাহারা এ দেশের রাজসিংহাসন অলংকৃত করিতে, সেই সকল সুগৃহীতনায়ী নবপালগণের নানা শাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়া, আমাদের নিকটে যে সকল পুৰাতত্ত্বের দ্বাৰা উদ্ঘাটিত কবিতা দিয়াছে, তাহা সপ্তদশ অখাবোহীর অলৌকিক দ্বিখিল্লয়কাহিনীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রধান ভূভাগ্য সকল যুগেই সমানভাবে বর্তমান,—সকল যুগেই তাহা বিজ্ঞতার বিদ্যে-পূর্ণ বিকৃত লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে,—কোন যুগেই দেশের লোকে দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার আয়োজন করেন নাই।

বক্তার স্বাধীনভাবে প্রাচ্যভারতে সাম্রাজ্যসংস্থাপনে অগ্রসর হইয়া, কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য হইবামাত্র, দিল্লীর মুসলমান বাদশাহ, তাহাকে দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্ত লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার জন্ত প্রথম হইতেই দিল্লীসাম্রাজ্য এবং গৌড়ীয়সাম্রাজ্যের মধ্যে কলহ সংঘটিত হইবার সূত্রপাত হয়,—এবং ইহার জন্তই দিল্লীর ইতিহাসলেখকগণ দিল্লীর গোঁবব ঘোষণা করিয়া (গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের কলঙ্ক কীর্তন করিয়া) ইতিহাস-রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। যে সকল মুসলমান বীর-শোণিত কবিগণ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে অধিকাংশ বিস্তার করিয়া ছিলেন, তাহাদেরই তঁহাদিগের কোনরূপ সহায়তাসাধন না করিয়াই, তাহাদিগের বিজয়গৌববের ফলভোগ করিবার জন্ত লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লীসাম্রাজ্যের

ইতিহাস লেখকের পক্ষে এই সকল কাৰণে গোড়ীয় মুসলমানগণের দিগ্বিজয় ব্যাপাবকে অনাস্থাসলক অকিঞ্চকর যুদ্ধগৌরব বলিয়া ব্যাখ্যা করা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল । মিন্‌হাজের কাহিনী আদৌ কোনও যুদ্ধ সৈনিকের নিকট হইতে সংকলিত, অথবা তাঁহার কপোলকল্পিত মাত্র, তদ্বিষয়েও সন্দেহশূন্য হইবাব উপায় নাই !

যাহা হউক, বক্তার খিলিজির বঙ্গাগমন সময়ে এদেশ রাঢ়, মিথিলা, ববেঙ্গ, বঙ্গ এবং বাগ্‌ড়ী নামক ভাগপঞ্চকে বিভক্ত থাকিবার কথা আমবা মুসলমান-লেখকদিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাই । তৎকালে এই পঞ্চবিভাগ গোড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও এক রাষ্ট্রাব অধীন ছিল । বিক্রমপুর, লক্ষ্মণাবতী এবং লক্ষ্মোর নামক তিন স্থানে তিনটি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল । এই বর্ণনায় “নওদিয়া” নামক স্থানে কোনও রাজধানী সংস্থাপিত থাকিবার উল্লেখ নাই । “নওদিয়া” কোথায় ছিল,—তাহা রাজধানী হইলে, তৎপ্রদেশে মুসলমান জায়গীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা,—বায় লছমণিয়াই বা কাহার নাম—এ সকল প্রশ্নের কোনরূপ সহস্তর প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই ।

গোড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যবর্তী খালিমপুর নামক আধুনিক গ্রামে ধর্মপাল নামক নরপালের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত ও স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের যত্নে প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—ধর্মপালের রাজধানী পাটলিপুত্রেই সংস্থাপিত ছিল । তিনি মগধাধিপতি হইয়াও, গোড়ীয় সাম্রাজ্যের কিয়দংশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন । মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপাল নামক নরপালের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—তৎকালে রাজধানী মুদগগিবি নগরেই সংস্থাপিত ছিল । তাহার পর বঙ্গভূমির নানা স্থানে—পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গে—পালনরপালগণের রাজ্য ও রাজধানী সংস্থাপিত হইবাব পরিচয় নানা শাসন-লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । পাবনার অন্তর্গত মাধাইনগরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেন দেবের একখানি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—“কর্মটি ক্ষত্রিয়বংশের” সেন নরপালগণ বঙ্গভূমিতে কিরূপে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন । এই রাজবংশের বিজয়সেন দেব নামক নরপাল রাজসাহীর

অন্তর্গত ববেঙ্গ প্রদেশে প্রতাপেশ্বর মন্দির নামক মন্দির প্রতিষ্ঠাব সময়ে যে ফলকলিপি রচনা কবাইয়াছিলেন, তাহাতে বিজয়সেন দেবের বিজয়কাহিনী উল্লিখিত আছে । বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন গোড়াধিকার করিয়া, “গৌড়েশ্বর” নাম গ্রহণ করেন । তিনিও বীৰকীর্্তিব জন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব পশ্চিমে কাশী এবং পূর্বে কামরূপ পর্য্যন্ত বিজয় লাভ করিয়া, বীৰকীর্্তিব জন্ত বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন । মুসলমান-ইতিহাসলেখকগণ বলেন,—এই নবপতিব নামানুসারেই পুৰাতন গোড়নগরের নাম “লক্ষ্মণাবতী” বলিয়া পবিচিত হইয়া উঠিয়াছিল । অনেক দিন পর্য্যন্ত এদেশেব মুসলমান রাজ্য দিল্লীব ইতিহাসলেখকদিগেব গ্রন্থে “লক্ষ্মণাবতীবাজ্য” বলিয়াই উল্লিখিত আছে । লক্ষ্মণসেনের বীৰপুত্র বিশ্বরূপ-সেনের শাসনলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি বাহুবলে আশ্রবক্ষা করিয়া—

“গর্গযবনারয় প্রলয় কালকূট্র”

নামে পবিচিত হইয়াছিলেন । মিন্‌হাজ যখন এদেশে পদার্পণ করেন, তখনও (বক্তার খিলিজির বঙ্গাগমনের ষষ্টিবর্ষ পবেও) পূর্ববঙ্গ লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের অক্ষুণ্ণ অধিকারে বর্তমান ছিল,—তদ্বশে তখন পর্য্যন্তও মুসলমানশাসন বিদ্যুত হইতে পারে নাই ।

শাসনলিপি ও মুসলমান-ইতিহাসলেখকের এই সকল উক্তির সমালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়,—বক্তার সহজে এদেশে অধিকার বিস্তার কবিতে পারেন নাই;—তিনি যেখানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্তী কয়েকটি পরগণা মাত্র; এবং সেখানেই মুসলমানদিগের সর্বপ্রথম জায়গীর লাভের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । অধ্যাপক ব্রহ্মান পুরাতন বঙ্গভূমির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সংকলনের জন্ত প্রভূত অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন,—“দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোট নামক স্থানে একটি সেনানিবাস সংস্থাপিত করিয়া, বক্তার যুদ্ধকলহে লিপ্ত ছিলেন; এবং সেই সেনানিবাসই তাঁহার বিজয়রাজ্যের পূর্বোত্তর সীমা বলিয়া পরিচিত ছিল ।” এই সেনানিবাসে ১২০৫ খৃষ্টাব্দের সম-

সময়ে বক্তৃত্তার খিলিজির মৃত্যু হয়। উত্তর বঙ্গের “রাজ-
রাজন্যকগণের” দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাহুবলে স্বাধীনতা রক্ষা
করিবার কথা ধ্যাপক ব্রহ্মম্যান স্পষ্টাক্রমে ব্যক্ত করিয়া
গিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ অতিবৃদ্ধ মুসলমান সৈনিকের
অলৌকিক আখ্যায়িকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না।

সে আখ্যায়িকায় যে “নওদিয়াব” রাজধানী ও “রায়
লছমনিয়া” নামক নরপতির উল্লেখ আছে, তাহার সহিতও
শাসনলিপির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ
ক্ষেত্রে কেহ কেহ অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন,—“নওদিয়া”
নবদ্বীপের অপভ্রংশ মাত্র, এবং “লছমনিয়াও” তবে লক্ষণ-
সেনেরই অপভ্রংশ! মিনহাজ লিখিয়া গিয়াছেন,—“রাজ্যেশ্বর
অশীতিবর্ষে বক্তৃত্তার খিলিজির দিঘিজয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল।”
তদনুসারে আরও একটি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা
অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। কাহারও পক্ষে অশীতিবর্ষ
পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না;—
শৈশবে সিংহাসনে আরোহণ করিবার অনুমানও লক্ষণ-
সেনের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে না। কারণ, তিনি
যে পরিণত বয়সেই পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন,
তাহার নানা প্রমাণ ও কিংবদন্তী সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরি-
চিত। বল্লাল ও লক্ষণসেনের মধ্যে যে সকল কবিতা-
বিনিময় হইত, তাহা এখনও কঠে কঠে ভ্রমণ করিতেছে।
এরূপ অবস্থায় একটি অসামান্য অনুমানের অবতারণা করা
অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। সকল রাজার পক্ষেই
সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় হইতে রাজ্যব্যব গণনা
করিবার রীতি প্রচলিত ছিল;—কেবল লক্ষণসেনের পক্ষেই
তাঁহার জন্মতিথি হইতে অব্দ গণনা করিবার একটি
অসামান্য রীতির অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছিল। “লক্ষণ-
সংবৎ” নামক একটি অব্দগণনারীতি অত্য়াপি মিথিলায়
কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে;—এক সময়ে নানা
স্থানে এই অব্দ ধরিয়া শিলালিপি খোদিত হইত। খ্রীষ্ট
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার দুইখানি
শিলালিপিতে এইরূপ অব্দ গণনার উল্লেখ দেখিয়া, তাহার
সমালোচনা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,—“৫১ লক্ষণাব্দের
পূর্বে কোনও সময়ে লক্ষণসেনদেবের দেহান্তর সংঘটিত
হয়।” মুসলমান-ইতিহাসলেখক লক্ষণসেনকে পলায়ন

কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই;—তদীয় রাজ্যাব্দের অশীতি
বর্ষে দিঘিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন;—আমরাই
তথ্যনির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া, অনুমানবলে “রায় লছমনিয়াকে”
লক্ষণসেন বলিয়া ধরিয়া লইয়া, অথবা কলঙ্কে স্বদেশের
ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিতেছি।

দুঃখ এই—যে বর্ষে এই সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া,
লক্ষণসেনের অলীক কলঙ্কের অপনোদন করিয়া দিয়াছে,
ঠিক সেই বর্ষেই কলাসমিতির পক্ষ হইতে এক চিত্রকরের
“পলায়ন কলঙ্ক” নামক একখানি সর্ব্বথা কাল্পনিক চিত্র
প্রকাশিত হইয়াছে; আর—আর—সেই সুনিপুণ চিত্রকর—
একজন বাঙ্গালী।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী ।

(পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত অংশের পর।)

এমন তাপখনির আবিষ্কার হইলে কয়লার খনিগুলির
কোন আবশ্যকতাই থাকিবে না ইহা বলা বাহুল্য। কারণ
এইরূপ গভীর গহ্বরে তাপ-সৌদামিনী সংযোগে যে বৃহৎ
শক্তির আবির্ভাব হইবে তাহা লক্ষ লক্ষ শতাব্দী অতীত
হইলেও অফুরন্ত থাকিবে এবং তদ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র
কল যন্ত্রাদি চালিত হইয়া অতি অল্প ব্যয়ে রসায়ন শাস্ত্র
সাহায্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে থাকিবে। আজকাল
পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য প্রস্তুত
হয় কিন্তু ঐরূপ শক্তি হস্তগত হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই
সমান সুবিধায় সকল প্রকার দ্রব্য একই ভাবে প্রস্তুত
হইতে পারিবে। স্থান বিশেষেব সুবিধা বা অসুবিধা বশতঃ
তথাকার অধিবাসী অল্প স্থানের অধিবাসী অপেক্ষা ভাল
বা মন্দ অবস্থায় আজকাল বাস করে কিন্তু তখন এই ইতর
বিশেষ ক্রমশঃ লোপ হইয়া আসিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানব-
সমাজে মঙ্গলময় সমতা স্থাপিত হইয়া আসিবে।

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন বিজ্ঞান যখন মানবজগতের
অধিপতি হইবে তখন বুদ্ধি শিল্প সৌন্দর্য্যের মহিমা বিলুপ্ত হইয়া
গিয়া তাহাদের স্থলে রুঢ়তা, শুষ্কতার অধিকার বিস্তৃত হইবে।
কিন্তু বার্ষেলো বলেন বিজ্ঞানের অভাবই পৃথিবীতে এখনো
কুৎসিতের স্থান আছে। বিজ্ঞানরাজ্যের শাসনদণ্ড চালিত

না হওয়াতেই ক্ষুদ্র শত্রুর আক্রমণে অভিজ্ঞত হইয়া মানব এখনো পৃথিবীতে কুৎসিত আকারে পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞানের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই সকল অসৌন্দর্য্য দূর হইয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত স্থলে বার্থেলো বলেন, ক্ষুৎরাঙ্কসের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আর্হাব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মানব পৃথিবীর মনোহর পাত্রকে কুৎসিত আকারে পরিণত করিয়া, ধরিজীব অঙ্গের অলঙ্কার, প্রকৃতির ভূষণ, লতা, গুল্ম, বিটপীশ্রেণীর ধ্বংস সাধন করিয়া, নয়নমনোহর সুবিস্তীর্ণ কান্তারকে বিসদৃশ খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করতঃ, তাহার মন্থণ চিকণ গাত্রকে মানবগাত্রের কুৎসিত ব্যাধি দক্ষপীড়ার ছায়া হলয়জ্বাদি সংযোগে বন্ধুর করিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য নশ কবে। কিন্তু যে দিন বিজ্ঞানরাজ্য প্রকৃতি রাণীর হাতে হাত ধরিয়া স্বরাজ্য দর্শনে বহির্গত হইবেন, যে দিন মানব ক্ষুৎশত্রুর অধীনতানিগড় ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী উড়াইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে সেদিন অম্লন্দর, কুৎসিত, মন্দ কিছুই পৃথিবীতে আবস্থান থাকিবে না। আর্হাব সংগ্রহের জন্য চাষ আবাদের আর প্রয়োজন না থাকিলে, পূর্ববর্ণিত 'শক্তি' মানবের হস্তগত হইলে, ধরিজীর গাত্র সর্বদা নয়নানন্দ দায়ক শল্পশ্রামলা হরিৎ-বসনাবৃত থাকিবে, পুষ্পালঙ্কারে সর্বদা সজ্জিতা থাকিবে। বিটপীরাজ্যপরিবৃত্তা কোমলভবচিত মুকুটে সর্বদা ভূষিতা থাকিবে, পৃথিব্যভ্যন্তর-উদ্ধৃত জলে সিক্ত হইয়া এই রুম্ম মোদিনী মনোহর উজ্জ্বলবীথিকায় পরিণত হইবে এবং মানব সেখানে সত্যযুগের ছায়া অমিত সুখস্বচ্ছন্দের অধিকারী হইয়া সোণার দেশে বাস করিবে।

কেহ বা আশঙ্কা করিতে পারেন পৃথিবীর এই অবস্থা ঘটিলে মানবসমাজের বন্ধনীশক্তি যে শারীরিক পরিশ্রম তাহা শিথিল হইয়া যাইবে এবং মানব সকল অলস হইয়া পড়িবে। কিন্তু বার্থেলো বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে উচ্চ নীচ ভেদ থাকা হেতু, অধিকারী অনধিকারী পার্থক্য থাকা বশতঃ একদিকে যেমন ক্লেশকর পরিশ্রমের নিষ্পেষণে পেষিত হইয়া মানবসমাজেব কতক অংশ হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে, অপরদিকেও কতকগুলি বিলাসমন্দিরের আমোদে সর্বদা নিমজ্জিত থাকিয়া আপনাদিগকে অপদার্থ করিয়া ফেলিতেছে। ঐ যে নিদ্রাধে রোদ্ভাতপক্লিষ্ট শরীরে কৃষককুল ক্ষেত্র কর্ণ

করিতেছে, যাহারা শ্রাবণের মৃণলধারাকে মস্তকে করিয়া, ঘর্ঘরনাদী বজ্রসম্পাতকে বুক পাতিয়া গইয়া, অক্ষুরগুচ্ছ কর্দমে রোপণ করিবে, যাহারা হেমস্তাবসানে শিশিরনিহার গীড়িত আড়ষ্ট হস্তে শস্ত সংগ্রহ করিবে তাহারা তাহাদের পরিশ্রমের কতটুকু অংশের পুরস্কারের অধিকারী? আর ঐ সম্রাট-সমীরণ-ব্যাকুল-হৃদয় ধনী রাজকুমারবতুল্য-পালিত অশ্বকুমার যুগল চালিত রথাবোহণে যখন বাজপথের উপর দিয়া অশনি-নিনাদে চলিয়া যায়, যখন বোধ হয় সেই শকট দরিদ্র কুলি-কুলের বক্তাক্ত হস্তপ্রস্তুত পথের উপর দিয়া নহে, তাহাদের পাতা বন্ধকে দলন করিয়া দোড়িয়া যায়, তাহারা হই বা তাহাদের কোন পরিশ্রমের পুরস্কারের ফলে ঐ সম্রাটের অধিকারী? বিজ্ঞানের দণ্ড চালিত হইলে এই বৈষম্য বিদূরিত হইয়া পরিশ্রমের সমতা স্থাপিত হইবে; নিজ নিজ পরিশ্রমে মানব নিজ নিজ উন্নতির জন্যই ব্যস্ত হইবে, নিজেব সুখসম্ভোগ স্বীয় পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করিবে। তখনই পবিত্রমের ক্লেশকরতা দূরে গিয়া সুখ-করতা আসিবে। Love's Labour ব্যর্থ হইবে এতদিন মানবসমাজে lost বা নষ্ট হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বিজ্ঞানের রাজ্য স্থাপিত হইলে যে কোন পরিশ্রম তাহা সকলই প্রেমের ভালবাসার পরিশ্রম হইবে, সকলই আনন্দও সুখ-দায়ক হইবে। তখন যে যত পবিত্রম করিবে তাহার পূর্ণফলভোগী নিজেই হইবে এবং স্বীয় পরিশ্রম ব্যতিরেকে কি জ্ঞান কি নীতি, কি সৌন্দর্য্য সুখভোগ, কোন পথেই কেহ কোন উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। তখনই মানব প্রকৃত পক্ষে সত্য শিব সুন্দর যাহা, তাহারই উপাসক হইবে ও তাহারই জন্ত শ্রম করিবে।

যুদ্ধ বিগ্রহ মাঝামাঝি কাটাকাটি বিবাদ কলহের স্থানও তখন পৃথিবীতে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিবে। ভবিষ্য মানবসমাজে যুদ্ধের কোন আবশ্যকই থাকিবে না। বর্ষের যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও আজকাল (বর্তমানে) যে যুদ্ধবিগ্রহাদি দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের সকলেরই এক মূল কারণ উদর-চিন্তা। এই যে সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় রক্তবত্তা বহিয়া গেল বা পূর্বপ্রভাতে রুম্ম-জাপ-বলপরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে কত মানব যে পতঙ্গের ছায়া আপনাদিগকে আছতি দিল তাহার সকলেরই মূল

কাবণ আহাব সংগ্রহ। আধুনিক পৃথিবীতে বাণিজ্যব্যবসার যে অজুহাত উঠিয়াছে তাহার অর্থ অল্প কিছুই নহে, কেমন করিয়া কোন জাতি অশ্বচ্ছন্দে উদব পুষ্টি করিয়া থাকিতে পারিবে। যদি বিজ্ঞানের দববাবে তাহার সমস্তা মীমাংসিত হইয়া যায় তবে আর যুদ্ধ বিগ্রহাদির কাবণ কি থাকিবে? মানুষেব বাসস্থান লইয়া পুৰাতন পৃথিবীতে বহু যুদ্ধাদি অবশ্যই সংঘটিত হইয়াছে—কিন্তু তৎসময়েও একটু বিবেচনা কবিলেই বুঝা যায় মানব যে দেশে শস্তাদি উৎপন্ন হইবাব সুবিধা দেখিয়াছে সেই দেশের প্রতি লোলুপতা বশতঃই এক দল অপব দলেব সহিত সমবে লিপ্ত হইয়াছে। স্বাস্থ্য-কর কি অস্বাস্থ্যকর বিবেচনা না কবিয়া যেখানে ভাল বকম শস্ত উৎপন্ন হয় সেই খানেই সকলে মাথা ঝুঁজিবাব চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রকারে বহু অস্বাস্থ্যকর, অববোগের আকর, সিন্ত নিরভূমি মানবেব বাসস্থান হইয়াছে ও তথা-কার অধিবাসীবা বহুব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে। অনেক জাতির ণারীক অবনতিব প্রধান কারণই তাহাদেব অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান। বার্থেলো বলেন, মানবকে আহাবেব জন্ত শস্তক্ষেত্রের প্রতি আর তাকাইয়া থাকিতে না হইলে মানব স্বাস্থ্যকর উচ্চ ভূমিতে গিয়া বাসস্থান নিৰ্মাণ করিবে। আজ যাহা মর্য বলিয়া পরিচিত ও পবিত্যক্ত, বিজ্ঞানের আমলে তাহাই মনোবম উদ্ভান সমন্বিত মানবেব সুবাসস্থানে পরিণত হইবে। বহু অর্থ ব্যয়ে শৈলাবাস নিৰ্মাণ করিয়া কেবল ধনীই এখন তাহার সুখভোগ কবিতে সমর্থ কিন্তু বিজ্ঞানের রাজত্ব ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকিলে উচ্চে উচ্চ পর্ত্তশিখরগুলিতেও সৰ্বসাধাবণ মানব কর্তৃক নগর উপনগর প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া আসিবে।

শেষ কথা, ধর্ম্ সন্মুখে অনেকেরই বিষম সন্দেহ ও আশঙ্কা আছে। অনেকেই মনে করেন বিজ্ঞানের বিস্তাবেব সঙ্কে সঙ্কে ধর্ম্মের ক্ষেত্র ক্রমশঃ খাট হইয়া আসিবে—বিজ্ঞানব্যাঘ্র ধর্ম্মের মেঘশাবকটিকে বুঝি উদবসাৎ কবিয়া ফেলিবে—অথবা বিজ্ঞানেব ভাষায় বলিতে গেলে, বিজ্ঞানেব প্রথর তাপে ও জ্ঞানচক্ষুর বৈদ্যাতিক বিশ্লেষণে জলমতিতরলং ধর্ম্মটুকু বুঝি হাওয়া হইয়া উড়িয়া যাইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর সন্দেহবাদীদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ধর্ম্মকর্ত্তা

ও বিজ্ঞানকর্ত্তা কি দুই, ধর্ম্মের ফলভোগী যে মানব বিজ্ঞানের ফলভোগীও কি সেই মানব নহে? যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, যে মানব ইষ্টকামনায় কঠোর তপস্তায় শুহানিহিত ধর্ম্মতত্ত্বকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে সেই মানবই কি সত্যসন্ধ বেশে গিরিশৃঙ্গে, অতল জলধিতলে, ব্যোমাকাশে, ভূগর্ভে প্রবিষ্ট অগাধধাতে প্রকৃতি দেবীর অমুসরণ কবিয়া কঠোব আরাধনায় তাঁহার সম্ভাবসাধন পূর্ব্বক বরস্বরূপে একটা একটা বিজ্ঞানতত্ত্ব গ্রহণ করিতেছে না? তবে তাঁহাদেব কি উত্তর আছে জানি না। ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের শত্রুতা বা বিবোধভাব হইবাব সম্ভাবনা কোথায় তাঁহার কি বুঝাইয়া দিবেন জানি না। বার্থেলোও বলেন ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান মধ্যে কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই, হওয়াও সম্ভব নহে। যে ধর্ম্ম যে যুগে উদ্ভূত হইয়াছে তৎধর্ম্ম তাৎকালিক বিজ্ঞানের উপব ভিত্তি গাঁথিয়াই দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু বিজ্ঞান কিছু স্বাধীন, কারণ অন্নসংখ্যকের মুখাপেক্ষী, তাহার আবার জ্ঞানবর্গিকার উদ্দীপনায় অগ্রসর ও তৎপর, সুতরাং অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতি। তাই বিজ্ঞান অন্ধকারকে কোলিয়া রাখিয়া আগে আগে চলে, ধর্ম্ম বহুভারাক্রান্ত, অন্ধকাবকে সঙ্গে টানিয়া লইয়া চলিতে হয় বলিয়া কিছু ধীবে পিছু পিছু হাঁটে; এই দূরত্বেই ভ্রম হয় উভয়ের মধ্যে যেন বিরুদ্ধভাব থাকা বশতঃ উভয়ে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানই ধর্ম্মের জন্ত পথ প্রস্তুত কবিয়া অগ্রবর্ত্তী হয়, ধর্ম্ম তাহার পশ্চাদবর্ত্তী থাকে। বিজ্ঞান সচল, ধর্ম্মও অচল নহে—দৃষ্টিভ্রম বশতঃ তদ্রূপ বোধ হয় মাত্র। উদাহরণ দিয়া বার্থেলো বুঝাইয়াছেন বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়েই যেন দুই ব্যক্তির হায়ে কোন উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিতেছে, বিজ্ঞান আগে আগে ধর্ম্ম পিছে পিছে। উপরের স্তরে উঠিতে উঠিতে বিজ্ঞানের দৃষ্টিপথে যে নূতন নূতন দৃশ্য আবির্ভূত হয় সে সর্বদাই তাহা ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু ধর্ম্ম নীচের স্তরে থাকায় তাহার দৃষ্টি শক্তির প্রসাব এখনো তত বিস্তৃত হয় নাই বলিয়া প্রথমে তাহা অবিশ্বাস করিতেছে কিন্তু যেই অগ্রসর হইয়া বিজ্ঞানের পুরাতন স্থানে পৌছিতেছে তখন বিজ্ঞানেব পূর্ব্ব উক্তির সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছে বটে কিন্তু ইত্যবসরে আরও উপরে উঠিয়া বিজ্ঞান যে আবার নূতন ঘোষণা করিতেছে

ধর্ম তদ্বিশয়ে আবার সন্নিহান হইতেছে; ধর্ম পুনরায় বিজ্ঞানের স্থানে পৌঁছিলে বিজ্ঞানের এই উক্তির বিষয়ে তাহাব যে সন্দেহ তাহা দূর হইবে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের নূতনতর বোষণা বা প্রচারে পূর্ববৎ সন্নিহান থাকিয়াই যাইবে। এইরূপে বিজ্ঞান ও ধর্ম আশু পিছু হইয়া উভয়েই অগ্রসর হইতেছে। বিজ্ঞান আগে হাঁটিলেই ধর্মের গতির সম্ভাবনা হয়, বিজ্ঞানের উন্নতির অভাবে ধর্ম নিশ্চল হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান বেলগাড়ীৰ এঞ্জিন, আগুন জ্বলে সিদ্ধ হইয়া, তাপতাড়না স্রষ্ট করিয়া তাহাকেই আগে মাথা তেলিতে হয়; ধর্ম স্রষ্টদায়ক গাড়ি আঁটা আরোহীৰ গাড়ী; গণ্ডব্য পথে যাইতে হইলে মানব ইহাবই আশ্রয় গ্রহণ করে-বটে কিন্তু বিজ্ঞানের দগ্ধ এঞ্জিনেব গতি না থাকিলে, অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে যুড়িয়া না লইলে স্রষ্টাসন ধর্মস্থানেব সাধ্য নাই মানুষকে ঠিক যায়গায় পৌঁছাইয়া দেয়। অনাদি অনন্ত কাল বিজ্ঞান ও ধর্মের এইরূপ দ্বন্দ্ব থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাব কাৰণ দ্বন্দ্ব নহে ধর্মের প্রতি বিজ্ঞানের আকর্ষণ ও বিজ্ঞানের প্রতি ধর্মের সমাক্ নির্ভরই তাহাব একমাত্র কাৰণ। বিজ্ঞানের প্রতি ধর্মবিশ্বাসীর যে সন্দেহ তাহা ভ্রান্তিমূলক; স্তববাং বিজ্ঞানভয়ে ভীত ধর্মোচরণীৰ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাৰে অকৃতজ্ঞতা পাপে লিপ্ত হওয়া হেতু প্রকৃত ধর্ম অর্জন হয় কিনা তদ্বিশয়েও ঘোরতর সন্দেহ হইতে পারে।

এইরূপ নানা কথায় মুসা মার্সিলিস্ বার্বেলো তাঁহার প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার সত্যাসত্য, যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতা, সম্ভবতা অসম্ভবতা, ভ্রাতৃবর্গেব নিজ নিজ বিবেচ্য। পূর্বেই বলিয়াছি কৌতুক উদ্দেশ্যেই অশ্রুকাব এই প্রবন্ধ উপস্থিত কবা হইয়াছে স্তবরাং এই প্রবন্ধেব কোন অংশ কাহারো কোন বিশ্বাস বা জ্ঞানের কিম্বা ধারণা* বিরুদ্ধবাদী হইলে প্রবন্ধপাঠককে তজ্জন্ত দায়ী করিবেন না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫। দিনাজপুর।

বৌদ্ধধর্মের বিশ্বপ্রেম ।

(পৌষেব প্রবাসীতে প্রকাশিত অংশেব পর্ব।)

ঐ গ্রন্থেবই আর এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়— বোধিসত্ত্ব স্থিৰ সঙ্কল্প করিবেন—“আমি এই কুশল-মূল দ্বারা সর্বজীবের নয়ন-স্বরূপ হইব, যাহাতে তাহাদের সমস্ত দুঃখ-রাশি নিবৃত্ত হয়; আমি সমস্ত জীবের সমস্ত ক্লেশ পবিশোচন করিয়া তাহাদের ত্রাণস্বরূপ হইব; আমি সমস্ত জীবকে সমস্ত ভয় হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের শরণ হইব; সমস্ত স্থানে অনুগমন করিয়া আমি তাহাদের গতি স্বরূপ হইব; ...এবং তিমিরহীন জ্ঞান সন্দর্শন করাইয়া আমি তাহাদের আলোক স্বরূপ হইব...। সমস্ত জীব গুণ-জ্ঞানে অভিজ্ঞাদিত হইয়া সমস্ত ক্লেশ হইতে নিমুক্ত হউক; ...সমস্ত জীব দশবল-রূপ বিজ্ঞানযুক্ত হইয়া সংসারেব ছত্র-স্বরূপ হউক, ...এবং সমস্ত জীব বুদ্ধবিক্রম রূপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র জগতের অবলোকনীয় হউক।”

‘আর্য্য বজ্রধ্বনুত্রে’ এই বিষয়টি অতিবিস্তৃত ও অতিগভীর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ স্থানে তাহা সঙ্কলন কবা অসম্ভব। কেবল দিগদর্শন মাত্র করিয়া সম্প্রতি বিবৃত হইতে হইতেছে।

‘আর্য্য গগনগঞ্জসূত্রে’ নামক গ্রন্থে একটী অতি ক্ষুদ্র কথায় বিশ্বপ্রেমের ভাবটি সুপ্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে :—

“মাতৃং তন্মম কুশলমূলং, ধর্মজ্ঞান কোশলং বা, যম সর্বজীবোপভোগ্যং ভবেৎ।”

“আমার যেন সেরূপ পুণ্যমূল বা ধর্মজ্ঞানে কুশলতা না হয়, যাহা সমগ্র জীবের উপভোগ্য না হইবে।”

‘বীৰদত্ত পরিপৃচ্ছায়’ লিখিত হইয়াছে :—“শকটের ভায় ভার বহন কবিবার জন্ত ধর্মবুদ্ধিতে এই শরীরকে বহন করিতে হইবে।”

ভগবান্ ‘বোধিসত্ত্বপ্রতিমোকে’ বলিয়াছেন—“শারিপুত্র, এই ধর্ম বন্ধছেদের জন্ত, এই ধর্ম জন্মজরা, ব্যাধি-মরণ, ও শোকদুঃখাদির ছেদের জন্ত; ইহাকে রত্ন বলিয়া, ঔষধ বলিয়া চিন্তা করিবে; ইহা সমস্ত জীবের রোগগ্রাসি উপশমনের জন্ত। সমস্ত জীবের বোগগ্রাসি উপশমনের জন্ত আমাদের এইরূপ ধর্মই অভিলষণীয়।”

‘অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতায’ (৩০ অঃ ৪৯৫ পৃঃ)

* ক্রীড়াবকাশ উপলক্ষে ‘দিনাজপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে’ পঠিত।

সদা-প্রকদিত নামক কোন বোধিসত্ত্বকে এক শ্রেষ্ঠদারিক। তাঁহার পুজাব কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—“তাহাতে আমরা শিক্ষা কবিব, শিক্ষা করিয়া সমস্ত জীবের শরণ হইব।”

‘ধর্ম সঙ্গীতিসূত্রে’ উক্ত হইয়াছে :—“বোধিসত্ত্ব সমস্ত জীবের কার্য সম্পাদন কবিয়া দাসের ভায় হইয়া থাকিবে।”

‘আর্য্য বিমল কীর্ত্তি নির্দেশে’ সংসার-ভয়-ভীত ব্যক্তির কি কবা কর্তব্য—মঞ্জুশ্রীর এই প্রশ্নে একজন উত্তর করিতেছেন :—“হে মঞ্জুশ্রী, সংসার-ভয়-ভীত বোধিসত্ত্বের বুদ্ধমাহাত্ম্য অমুসরণ কবা উচিত।”

“যে ব্যক্তি বুদ্ধমাহাত্ম্য অমুসরণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কি কবা উচিত ?”

“তাহার সমস্ত জীবের সমস্ত দর্শন করা উচিত ; এবং সমস্ত দর্শন কবিত্তে হইলে সমস্ত জীবের মোক্ষের জন্ত অবস্থান করা উচিত।”

‘ধর্ম-সঙ্গীতিসূত্রে’ সার্থবাহ বোধিসত্ত্ব ভগবানকে এই কথাই বলিয়াছেন :—“হে ভগবন্, যে ব্যক্তি (বস্তুতঃ) বোধিসত্ত্ব, সে প্রথমে সমস্ত জীবের জন্ত বোধি (জ্ঞান) প্রার্থনা কবে, নিজের জন্ত নহে।”

ঐ গ্রন্থেবই অন্তর্ভুক্ত বোধিসত্ত্বগণের মহামৈত্রী ও মহাকামনা কাহাকে বলে—এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিত হইয়াছে :—“বোধিসত্ত্বগণ যে, নিজের শরীর, জীবন ও সমস্ত পুণ্য জীবসমূহকে প্রদান করিয়া তাহার জন্ত কোন প্রতীকার ইচ্ছা করেন না, ইহাই তাঁহাদের মহামৈত্রী ; এবং তাঁহারা যে সর্বপ্রথমে নিজের বোধি (জ্ঞান) প্রার্থনা না করিয়া সমস্ত জীবের বোধি ইচ্ছা করেন, ইহাই তাঁহাদের মহাকরুণ।”

বোধিসত্ত্বগণ কি জন্ত শীল রক্ষা কবেন, তদ্বিষয়ে ‘নারায়ণ পরিপুচ্ছার’ উক্ত হইয়াছে :—“সে যে শীল রক্ষা করে, তাহা নিজের জন্ত নহে, স্বর্গের জন্ত নহে, ইন্দ্রদেবের জন্ত নহে, ভোগের জন্ত নহে, ঐশ্বর্য্যের জন্ত নহে, রূপের জন্ত নহে, বর্ষের জন্ত নহে, এবং যশের জন্তও নহে ; সে নরক-ভীত হইয়া……বা তির্ধ্যাগবানি ভয়-ভীত হইয়া শীল রক্ষা করে না ; সে সমস্ত জীবের হিত, সুখ ও যোগক্ষেমের প্রার্থী হইয়া শীল রক্ষা করে।”

‘বোধিচর্য্যাবতাবে’* একজন জীব ভক্ত বলিতেছেন :—

“এই জীবগণ চিস্তামণির স্বরূপ, ভজ্যবটের † স্বরূপ, ও কামদুহ্ম ধেমুর স্বরূপ ; অতএব শুধু ও দেবতার ভায় ইহাদের আরাধনা করা উচিত।…জীবগণের আরাধনা ত্যাগ করিলে অপব নিষ্কৃতি আব কি আছে ? (বোধিসত্ত্বগণ) যাহাদেব জন্ত নিজের শরীরকেও ভেদ কবেন ও অর্থাৎ নবকেও প্রবেশ কবেন, তাহাদের মঙ্গল করিলেই (বস্তুতঃ) মঙ্গল করা হয় ; তাহারা মহাপকারী হইলেও তাহাদের মঙ্গল করা উচিত। যাহাদের জন্ত আমাং স্বামীরাই (পূর্ব্ব বুদ্ধ বোধিসত্ত্বগণ) নিজের প্রতি নিবপেক্ষ হন, সেই স্বামিগণের নিকটে আমরা দাস্ত না করিয়া মান করি কেন ? যাহাদের স্তূপে মুনীজ (বুদ্ধ) গণ প্রীত হন, এবং যাহারা ব্যথা পাইলে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন, তাহাদের তুষ্ট হইলেই মুনীজগণ তুষ্ট হইবেন, এবং তাহাদের অপকার হইলে মুনীজগণের অপকার করা হইবে। শরীর চাবিদিকে অগ্নিতে জালিয়া উঠিলে, যেমন নিখিল কাম্য বস্তুতেই সৌম্যন উপস্থিত হয় না, সেইরূপ জীবগণের যদি ব্যথা হয়, তবে দয়াময় (মুনীজ) গণের প্রীতি উৎপাদনের অপার কোন উপায় নাই। ইহাই (অর্থাৎ জীবগণের আরাধনাই) তথাগতের আরাধনা, ইহাই স্বার্থের আরাধনা, এবং ইহাই লোকের দুঃখাপহ ; অতএব ইহাই আমার ব্রত হউক।—

“তথাগতাবাধনমেতদেব
স্বার্থস্ত সংরাধনমেতদেব
লোকস্ত দুঃখাপহমেতদেব
তস্মান্নমাস্ত ব্রতমেতদেব।”

যেমন একজন রাজপুরুষ বহুজনকে প্রমথিত করে, আর দূরদর্শী জনগণ তাহার কোন বিকারই কবিত্তে সমর্থ হয় না, কাবণ সে একাকী নহে, তাহার বল রাজ-বল,—সেইরূপ কোন দুর্বল ও অপরাধীকে অবমাননা কবিত্তে না, কেন না দয়ালু নরপালগণ তাহার বল। অতএব ভৃত্য যেমন চণ্ড প্রভূকে আরাধনা করে, জীবগণকে সেইরূপ সেবা কবিত্তে।

* ৩।১১২—১৩০ ; ইহা শিক্ষা সমুচ্চয়েও আছে, ১৫৫ পৃঃ।

† যে খটে হস্ত প্রদান করিলেই অভিমত বস্তু পাওয়া যায়।

ঐ 'বোধিচর্যাবতাবেই' অত্র আর এক ভক্ত প্রেম-
পরিপূর্ণ হৃদয়ে বলিতেছেন :—

“জীবগণ নবকচুংখের বিশ্রামোপায় স্বরূপ যে পুণ্য কর্ম
কবিয়াছে, আমি তাহা অনুমোদন কবিত্তেছি ; দুঃখিতোবা
আনন্দের সহিত সুখে অবস্থান করুক ।... দিক্ সমূহে
অবস্থিত সংবুদ্ধ জনগণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ হইয়া
প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা মোহবশতঃ দুঃখপতিত
লোক সমূহেব জ্ঞাত ধর্মপ্রদীপ (উৎপাদন) করুন। যে
সমস্ত জীব (কৃত-কৃত্য হইয়া) নির্কীর্ণ কামনা কবিত্তেছেন,
আমি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি যে,
তাঁহারা অনন্তকল্প পর্য্যন্ত (এখানে) অবস্থান করুন, এই
জগৎ যেন (তাঁহাদের অভাবে) অন্ধ হইয়া না যায়।
আমি এইরূপে এই (পূজাদি) করিয়া যাহা কিছু শুভ প্রাপ্ত
হইয়াছি, তাহা দ্বাৰা আমি যেন জীব সমূহের সর্বদুঃখ
প্রশমনকাৰী হইতে পারি। আমি পীড়িত ব্যক্তিগণের
ঔষধ ও বৈদ্য, এবং যতদিন বোগ নিবৃত্ত না হয়, ততকাল
পর্য্যন্ত তাহাদের পবিচারক। আমি অন্ন ও পান বিতরণ
করিয়া জীবগণেব ক্ষুধা ও পিপাসা নাশ করিব, এবং
দুর্ভিক্ষের মধ্যে ও প্রলয় সময়ে (যখন আহাবাদিব অভাবে,
লোক সমূহ মরিয়া যায়, বা পবম্পব পবম্পবেব মাংস শোণি-
তাদি ভোজন কবে, সেই সময়ে) তাহাদের পান ও ভোজন
হইয়া দবিজ জীবগণেব অগ্রে আমি অক্ষয়নিধি সদৃশ হইয়া
নানা উপকরণেব আকারে তাহাদের পবিচর্যা করিব।
আমি সমস্ত জীবের প্রয়োজন সিদ্ধি বজ্র নিবপেক্ষ হইয়া
(অর্থাৎ কোনরূপ প্রত্যাশকাবের আশা না কবিয়া) নিজের
শরীরকে, উপভোগ্য দ্রব্য সমূহকে, এবং (ভূত-ভবিষ্যৎ-
বর্তমান) এই কালত্রয়স্থিত নিখিল কল্যাণকে পবিত্যাগ
করিতেছি। সমস্ত বস্তব ত্যাগই নির্কীর্ণ, এবং আমার
মন সেই নির্কীর্ণকে প্রার্থনা কবিত্তেছে ; অতএব আমাকে
যখন সমস্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করিতেই হইবে, তখন তাহা
জীবগণকে দেওয়াই ভাল। আমি আমাব এই শরীরকে
সমস্ত প্রাণীর নিকটে, তাঁহাদের যথাস্থে ব্যবহাবেব
উপযুক্ত করিয়া দিয়াছি, তাঁহারা এখন আমাকে আঘাত
করুন, নিন্দা করুন, বা ধূলি দ্বারা আকীর্ণ করুন ; অথবা
তাঁহারা আমার শবীর লইয়া ক্রীড়া করুন, হাঙ্গ করুন, বা

বিনাশ করুন, আমি তাঁহাদিগকে আমাব শবীর দান করিয়া
দিয়াছি, আমার সে চিন্তাব প্রয়োজন কি ? বাহাতে তাঁহাদের
সুখ হয়, তাঁহারা সেই সমস্ত কার্যই তাহাব দ্বারা করাইয়া
লউন। আমাকে গ্রহণ করিয়া কাহাবো যেন কখন
কোন অনর্থ না হয়। যে সমস্ত লোক আমার নিন্দা
করিবেন, যাঁহারা আমাব অপকার করিবেন, ও যাঁহারা
আমাকে উপহাস কবিবেন, তাঁহারা সকলেই বোধি (জ্ঞান)
লাভী হইবেন। আমি অনাধগণের নাথ, যাত্রিকগণের
সার্থবাহ, এবং পাবেচ্ছুগণের নৌকা, সেতু ও পথ। আমি
দীপপ্রার্থীগণের দীপ, আমি শয্যাপ্রার্থীগণের শয্যা, এবং
দাসপ্রার্থী লোক সমূহের দাস ।—

“দীপার্থিনামহং দীপঃ

শয্যা শয্যার্থিনামহম্ ।

দাসার্থিনামহং দাসো

ভবেয়ং সর্বদেহিনাম্ ॥” *

এতক্ষণ বৌদ্ধধর্মের যে একটি মধুরভাব আপনাদের
নিকটে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে
আব কিছু অধিক না বলিয়া তুই এক কথায় উপসংহার
করিব।

‘আর্যাবল্লমেষ (সূত্র)’ নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :—

“যে কুলপুত্র, বোধিসত্ত্বগণ কি প্রকারে বোধিসত্ত্বোচিত
শিক্ষা উপদেশে সংবৃত্ত হইয়া থাকেন ? বোধিসত্ত্ব মনে
বিচার করে, ‘প্রীতিমোক্ষোচ উপদেশ মাত্রে অনুভব সম্যক্
সংবোধিকে লাভ করিতে পারা যায় না। তবে কি
করিতে হইবে ? তথাগত সেই সেই সূত্রাস্ত সমূহে
বোধিসত্ত্বগণের যে যে সমুদাচার ও শিক্ষাপদ সমূহ
জানাইয়াছেন, সেই সমস্ত আমাকে শিক্ষা কবিত্তে
হইবে, কিন্তু তাহা বিস্তর, অতএব আমাদেব ত্রায়
মন্দবুদ্ধি লোক সমূহের দ্বারা তাহা দুর্বিজ্ঞেয়। তবে কি
করা উচিত ? মর্ম্মস্থান সমূহ জানিতে হইবে, তাহা হইলে
দোষ হইবে না। সে মর্ম্মস্থান কতগুলি—যে গুলিকে
(ভগবান্ তথাগত) মহাবান্ভিরত জনগণের জ্ঞাত সূত্রাস্ত
সমূহে বলিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন ঐ মর্ম্মস্থান একটি মাত্র, এবং তাহা

* বোধিচর্যাবতার, ৩, ১—১২ ।

এই:—“নিজের শরীফকে, উপভোগ্য দ্রব্য সমূহকে, ও (ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই) কালত্রয়সহিত কল্যাণকে সমস্ত জীবের জন্য যে উৎসর্গ, তাহাই রক্ষা ও শুদ্ধির বুদ্ধি কারক।”

“আত্মভাবস্থ ভোগানার

ত্র্যষ্টবৃত্তে: শতশ্চ চ।

উৎসর্গ: সর্বসম্বোধ্য-

শুভ্রক্ষা শুদ্ধিবর্জনম্ ॥”*

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ।

ঐতিহাসিক প্রশ্ন ।

ভারতবর্ষের পরাধীনতা-সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মত চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি। তন্মধ্যে একটা মত অতি প্রসিদ্ধ। কনোজ-রাজ জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীকে এই স্বর্ণ-প্রসূ ভাবতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। কারণ, দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার মনোমালিঙ্গ ঘটিয়াছিল। এই গৃহ-বিবাদে ফলে ভারত লক্ষ্মীর চরণে মহম্মদ ঘোরী দাসত্ব-শৃঙ্খল পবাইতে সমর্থ হন। বিগত অগ্রহায়ণ মাসেই “প্রবাসীতে” প্রজ্ঞাপদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “ধর্মের বলবত্তা” শীর্ষক প্রবন্ধে পাদ-টীকায় এই প্রসঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

“পৃথ্বীরাজের আগে যদি বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেশ হইতে সমূলে লোপ না পাইয়া বাইত, তাহা হইলে অশ্বমেধের অলীক আডধর যত্নাশ্রয় হইতে ক্রমশঃ গাজোখান করিয়া দেশীয় রাজাদিগের আপনা আপনির মধ্যে বৈরিতানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিত না; আর তাহার উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভারতলক্ষ্মী লজ্জার জলাঞ্জলি দিয়া মুসলমান সেনাপতির আশ্রয় বাচঞা করিতে বাইতেন না।”

যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এদেশে মূর্তিপূজার (ইংরাজী-নবিশদিগেব মতে বলিতে গেলে, ভারতের সর্বপ্রকার অধঃপতনের মূল “পৌত্তলিকতার”) বহুল প্রচার হইয়াছিল, সংসারের প্রেতি ঔদাস্তম্যচক যতি-ধর্ম ও অদৃষ্টবাদে প্রাবল্য

* বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকা, ৪, ৪৮; শিক্ষা সমুচ্চয় ১৭ পৃ:। এই প্রবন্ধটি ললিতবিস্তম্ব, বোধিচর্য্যাবতার ও শিক্ষা সমুচ্চয় হইতে সংকলিত। বোধিচর্য্যাবতার, তাহার টীকা পঞ্জিকা, এবং ইহার প্রধান আশ্রয় শিক্ষা-সমুচ্চয় অতি উপাদেয় গ্রন্থ। শিক্ষাসমুচ্চয়ে মহাযানের বিবিধ গ্রন্থের বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা Prof. Cecil Bendal (Bibliotheca Buddhica, St. Petersburg) প্রকাশ করিয়াছেন। বোধিচর্য্যাবতার Buddhist Text Societyতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং পঞ্জিকার সহিত মূল A. S. B. তে প্রকাশিত হইবে।

বুদ্ধি পাইয়াছিল, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিনাশের সহিত ক্ষত্রিয়-জাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছিল এবং বেতনগ্রাহী যুদ্ধ-ব্যবসারীদিগের হস্তে দেশরক্ষার ভার পড়িয়াছিল, যে বৌদ্ধ-ধর্মের পরিণামে দেশে তাত্ত্বিক মতের অর্থাৎ পঞ্চমকার-সাধনের শ্রোত প্রবাহিত হওয়ায় সমাজের নৈতিক বল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল বলিয়া শুনিতে পাই, সেই বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব দেশ হইতে লোপ পাওয়ার ভারতলক্ষ্মী লজ্জায় মুসলমান সেনাপতির আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন,— এই সিদ্ধান্ত কতদূর ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জানিতে স্বতই বাসনা হয়। আত্মকর্মের ফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়, এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের জন্য অপরকে দায়ী করা কতদূর সম্ভব, তাহাও বিবেচ্য। “যোগ্যতমের উদ্ধর্তন” যদি প্রকৃতির নিয়ম হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম সেই নিয়মবশেই পুনরুদ্বোধ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এ কথা বলিলে কি ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হয়?

জয়চন্দ্রের ললাটে বাহারা ভারতবর্ষের পরাধীনতার সমগ্র কলঙ্ককালিমা লেপন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রশ্ন এই, জয়চন্দ্রের পূর্বে কি মুসলমান রক্তপ্রসূ ভারতবর্ষের কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই? জয়চন্দ্রই কি সর্বপ্রথম মুসলমানকে পথ দেখাইয়া ভারতবর্ষে আনয়ন করেন? জয়চন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে কি মুসলমানের লোলুপ-দৃষ্টি ভাবতবর্ষের উপর নিপতিত হয় নাই? তাঁহার পূর্বে হইতেই কি ভারতবর্ষ অধিকারের চেষ্টা মুসলমানদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই? জয়চন্দ্রের সহিত পৃথ্বীরাজের মনোমালিঙ্গ না ঘটিলে কি মহম্মদঘোরীর সৈন্ত-দল ভারতবর্ষ অতিমুখে যাত্রা করিবার অবসর পাইত না? এই মনোমালিঙ্গ বা “দেশীয় রাজাদিগের আপনা আপনির মধ্যে বৈরিতানল” ভারতের পরাধীনতার কত দূর সহায়তা কবিয়াছিল?

ইতিহাসে দেখিতে পাই,—তিরোঁরির যুদ্ধে পরাজিত হইবার দুইবৎসর পরে ১১৯৩ খ্রী: অব্দে মহম্মদ ঘোরী একলক্ষ বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্তসহ অতি গোপনে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। তাহার পর তাঁহার স্তম্ভাগমনবার্তা যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন হিন্দু

রাজত্ববর্গ তাঁহাকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ তখন যদিও বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, এবং হয়ত সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিদিগের মধ্যে সোদরতুল্য প্রীতিও বিস্তৃত ছিল না; তথাপি “অনতিবিলম্বে ১৫০ জন হিন্দু রাজা সসৈন্তে আসিয়া পৃথ্বীরাজের বিশাল পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা সকলেই গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, হয় শত্রু নিপাতসাধন করিবেন, নচেৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিবেন। তিন লক্ষ অশ্বরোহী, তিন সহস্র হস্তী ও অগণ্য পদাতিসৈন্ত দ্বারা সুবিশাল হিন্দুবাহু গঠিত হইল। হিন্দু সৈনিকদিগের বিকট গর্জনে চতুর্দিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল। একরূপ বিশাল সৈন্ত সম্ভবতঃ আর কখনও একত্র সম্মিলিত হয় নাই।” (“ভারতবর্ষের মুসলমান বাজত্বের ইতিবৃত্ত”—৮৩ পৃষ্ঠা)।

ইহার পর যুদ্ধে যে বর্ণনা পাই, তাহার মধ্যেও হিন্দুপক্ষ হইতে কাহারও কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল রাজপুতই প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। তথাপি তাঁহাদিগের পরাভব ঘটিল! কেন একরূপ হইল? ১ লক্ষ ২০ সহস্র মুসলমান সেনার হস্তে হিন্দুর “৩ লক্ষ অশ্বরোহী, ৩ সহস্র হস্তী ও অগণ্য পদাতিসৈন্ত” কেন পরাণ্ড হইল? এই পরাজয়ের মূল উভয়পক্ষের অবলম্বিত স্বতন্ত্র যুদ্ধনীতি ও রণকোশলের মধ্যে, অথবা অশ্বমেধের অলৌক আড়ম্বরের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া

ঐতিহাসিক হট্টার বলেন, ভারতবর্ষ সেকালে নানা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইলেও বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণকালে ঐ সকল রাজ্যের অধিপতিদিগের মধ্যে একতার সংগঠন হইত; সকলে সমবেত হইয়া বৈদেশিক শত্রুকে বাধাদান করিতে অগ্রসর হইতেন। সার্বভৌম শক্তির বিলোপ ঘটিলেও সামন্ত রাজারা বৈদেশিক শত্রুকে বাধাদানে কখনও উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই। এই কারণে মুসলমানের পক্ষে ভারতবর্ষ জয় করা অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষ সহজে মুসলমানের করায়ত্ত হইয়াছিল—এ সংস্কার যাহা পোষণ করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। হট্টার সাহেব তাঁহার “ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার” নামক গ্রন্থে এই সকল কথা বলিয়াছেন। তাঁহার

মতে ভারতবর্ষ কখনই সম্পূর্ণ ভাবে মুসলমানের পদানত হয় নাই। হিন্দুগণ শেষ পর্যন্ত আপনাদের প্রাধান্ত-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল এবং সে চেষ্টার প্রায় সর্ব্বাংশেই সফলকাম হইয়াছিল।

এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবের মতে হিন্দু বৌদ্ধশক্তির অভাব কখনই ছিল না—তবে রণকোশলে বা কুটিয়া যুদ্ধনীতিতে মুসলমানের অপেক্ষা হীন বলিয়াই হিন্দু বহুস্থলেই মুসলমানের হস্তে পরাজিত হইয়াছে। ইতিহাসেও দেখিতে পাই, পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধেও তৎপরে যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছে, তাহাতে হিন্দু প্রায় অসতর্কভাবে আক্রান্ত হইয়া অথবা স্বীয় সৈন্ত-সংখ্যার আধিক্যসত্ত্বেও রণনীতির দোষেই মুসলমানের হস্তে পরাস্ত হইয়াছে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের সহিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সম্পর্কের বিষয় কোনও বিজ্ঞ ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন নাই। শ্রদ্ধাঙ্গদ্বিজেন্দ্র বাবু সে সম্বন্ধ প্রদর্শন করিলে ঐতিহাসিকদিগের উপকাব সাধিত হইতে পারে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, “আমার এইরূপ মনে হয় যে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে আর্য ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিরোধ এবং বৈরিতার পরিবর্তে ঐক্য এবং সম্ভাব থাকিলে আমাদের দেশের একরূপ উন্নতি হইত না।” তাঁহার এই অনুমানের মূল কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে? হিন্দুধর্ম ও বিরোধ-গ্রাসিতার জন্তই চিরপ্রসিদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম অতি অল্পদিন পরেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ্যভাবাপন্ন বৌদ্ধধর্ম মহাবানসম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই মহাবানের উৎপত্তি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার পর হইতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্মই উহার স্থান অধিকার করে। এই পরিবর্তনকালে সমাজে উল্লেখযোগ্য কোন সংঘর্ষ সংঘটিত হয় নাই, এইরূপ উল্লেখ ঐতিহাসিকদিগের রচনায় আমরা দেখিতে পাই। সুপ্রসিদ্ধ ক্তাপানী অধ্যাপক ওকাকুরা বলেন, খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে জাপানে যে বৌদ্ধধর্ম গমন করিয়াছিল, তাহা পৌরাণিক হিন্দুধর্মের নামান্তর মাত্র। তাই ঐ সময়ের জাপানী স্থাপত্য-শিল্পে

শিব, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সৰস্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান আগমনের বহুপূর্বে যে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অপূর্ণ সংমিলন ঘটয়াছিল, এবং হিন্দুধর্ম বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া যে ক্রমশঃ উহাকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইতেছিল, জাপানী স্থাপত্য-শিল্প তাহারই পরিচায়ক। প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণের কোণে প্রায় বিনা সংঘর্ষেই বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িতেছিল বলিয়াই মনে হয়। পূর্ববঙ্গের রাজা শশাঙ্ক ও হনবংশীয় কাম্বীর “মিহিরকুল” ভিন্ন আর কেহ কি কখন বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন? জাপানী অধ্যাপক ওকাকুরা তাঁহার *Ideals of the East* নামক গ্রন্থে ৮০ পৃষ্ঠায় বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় অবস্থার পরিচয়-দান-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

Hinduism—that form in which the Indian national consciousness had been striving to resolve Buddhism ever since its appearance as a creed—is now recognised once more as the inclusive form of the nation's life. The great Vedantic revival of Sankaracharya is the assimilation of Buddhism, and its emergence in a new dynamic form.

এই গ্রন্থে ভূমিকায় শ্রীমতী নিবেদিতা লিখিয়াছেন,—

The thing we call Buddhism can not in itself have been a defined and formulated creed, with strict boundaries and clearly demarcated heresies, capable of giving birth to a Holy office of its own. Rather must we regard it as the name given to the vast synthesis known as Hinduism when received by a foreign consciousness, for Mr. Okakura in dealing with the subject of Japanese art in the 9th century makes it abundantly clear that the whole mythology of the Buddha, was the subject of interchange. Not the Buddhising but the Indianising of the Mongolian mind, was the process actually at work—much as if Christianity should receive in some strange land the name of Franciscanism, from its first missionary.

দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখার ভাবে বোধ হয় পূর্বোক্ত মতসমূহ ভ্রমপূর্ণ। বিশেষতঃ তিনি যখন মনে করেন,—“কোন চীনদেশীয় বিজ্ঞানক যদি বলেন যে, ভাগমন্দনির্কীর্ণে বৌদ্ধমতাবলম্বীদের আবালবৃদ্ধবনিতার উপরে যে রূপ ধর্মবিদ্যারক নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া তাহাদিগকে আবর্জনার

স্থায় ভারতবর্ষ হইতে সমূলে ঝাঁটাইয়া ফেলা হইয়াছিল, সেই গাণেব ফলে অনতিপরে ভারতবর্ষ পরহস্তগত হইল, তবে তাঁহার সেকথা আমরা যে হাসিয়া উড়াইয়া দিব তাহার যো নাই।”—তখন তাঁহার ঐরূপ মতের দৃঢ়তা সন্দেহে আনাদিগের মনে আব সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না। কিন্তু এইরূপ দৃঢ়তা সহকারে তিনি যে মতের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কি অসম্ভব ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে? আমবাও বাল্যকালে ঐরূপ বৌদ্ধ-নিষ্ঠাতন ও নির্দাসনেব কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, ভিন্সেন্ট স্মিথ মহোদয়ের স্থায় পুণ্ডিতবিশিষ্ট তাঁহার নূতন অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ লিখিতেছেন :—

Under the Gupta dynasty (A. D. 320—480), a great revival of Brahmanical Hinduism took place and Buddhist worship slowly decayed. But Buddhism was not as a rule violently extirpated.—Page 121.

The gradual decay of Indian Buddhism was due to the fact that *other religious systems suited the people better on the whole*. Persecution, although it had some effect, was only a minor factor in the change. ... Proved cases of real persecution of religion are too rare to have seriously affected the slow change in the popular creed. Buddhism declined, for the most part, *because people no longer cared for it*, and not because it was suppressed by force. A similar process of gradual decay may now be observed in the case of Shikhism, which would become extinct if it were not kept alive by the *esprit de corps* of the Shikh regiments.—(Page 298—99,.)

* এই বঙ্গদেশেই দীর্ঘকাল অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল; কিন্তু এখান হইতেও উহার বিলোপ যে হিন্দুপক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত কোন অত্যাচারের ফলে হয় নাই, তাহা কিছুদিন পূর্বে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় “প্রবাসী”তেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এসব কথা কি মিথ্যা? এই সন্দেহক্ষেত্রে কাহাব কথায় বিশ্বাস করিব? হিন্দুদিগের অত্যাচারে যে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ হয় নাই, একথা ভিন্সেন্ট স্মিথ সাহেব পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁহার যে প্রবন্ধ হইতে পূর্বোক্ত ইংবাদী অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই প্রবন্ধগুলি সরকারী গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডে (The Imperial Gazetteer of India, vol II.

১৯০৪.) উদ্ধৃত হইয়াছে। এই খেতাব পুরাতত্ত্ববিদ বলেন, “বৌদ্ধযুগ” এই নাম ভারতীয় ইতিহাসের কোনও অংশের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা অসঙ্গত নহে।—

Although the Imperial patronage and missionary zeal of Asoka had given an immense impetus to the propagation of Buddhist doctrine, the older Brahmanical and Jain religions continued through all the ages to claim multitudes of adherents. ...It thus appears that the term “Buddhist Period” applied to the earlier ages of Indian history in many popular books, implies a misunderstanding of the facts. Although during six centuries, from 250 B. C. to A. D. 350, Buddhism enjoyed a larger measure of popular favour than it has ever obtained since, these centuries can not be described accurately as a “Buddhist Period”; for many parts of India never received Buddhism to any considerable extent, and at all times numerous princes and communities held aloof from it.—p. 298.

কল কথা, এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য বা আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদগণের অভিনব ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত স্বার্থ, অথবা প্রকৃত্ব দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অত্রান্ত, তাহার বিস্তারিত আলোচনা হওয়া আবশ্যিক। বিশেষতঃ ভারতলক্ষীর পরাধীনতা-স্বাধীনতার সহিত যখন বৌদ্ধ-প্রভাবের ও বৌদ্ধনির্ভরাসনমূলক আখ্যায়িকার সম্বন্ধ-স্থাপনে দ্বিজেন্দ্র বাবুর আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করা কি সঙ্গত? অল্প কোন লেখক এরূপ কথা লিখিলে তাহা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারিতাম; কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবুর স্থায়ী সুবিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ কথা লিখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার উক্তি সম্বন্ধে উল্লিখিত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি। আশা করি, তিনি প্রশ্নকাবীর দোষ গ্রহণ না করিয়া উত্থাপিত সন্দেহ কয়টির নিরাকরণে যত্নশীল হইয়া বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজের উপকার সাধন করিবেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউসুর।

বৌদ্ধধর্ম ।

গৌতমের জীবন-কাহিনী ।

(জি-দে লাকোঁব কবাসী হইতে)

কোন সময়ে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। বুদ্ধকে বাহাবা “কো” বলিয়া অভিহিত কবে সেই চীনেরা এবং উত্তর দেশের বৌদ্ধেরা বলে, বুদ্ধদেব খ্রিঃ পূঃ ১১শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সিংহল-বাসীরা খ্রিঃ পূঃ ৭ শতাব্দীতে তাঁহার জন্মকাল নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে। প্রাচ্য পুরাতত্ত্ববিৎ যুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যেও এই বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমি বুনুফের মতের পক্ষপাতী; বুনুফ বলেন, সিংহলবাসীদের কথাই ঠিক। “ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন :—“খ্রিঃ পূঃ ৪ শতাব্দী হইতে ভাবতীয় ইতিবৃত্ত তাহার যেরূপ বঙ্গসহকারে ও নিয়মিতরূপে সংবক্ষিত করিয়াছে তাহাতে তাহাদেরই লিখিত বৃত্তান্ত সর্বাঙ্গপেক্ষা মৌলিক ও প্রামাণিক বলিয়া মনে হয়।”

সিদ্ধার্থ বিভিন্ন নামে পরিচিত;—শাক্যমুনি, গৌতম, ভগবৎ, তথাগত, ও বুদ্ধ; ইনি আর্যাবংশের শাক্যগোত্র হইতে সমুদ্ভূত; ইনি রাজবংশোদ্ভব, ইহার পিতা অযোধ্যার রাজা ছিলেন, ইনি নিজেও রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজ। খ্রিঃ পূঃ ৬৫০ অব্দে কপিলবস্তুর নগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার জননী মায়াদেবী, প্রসবের সাত দিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে :—“মায়াদেবীর কুক্ষি একপ পবিত্র ঘে, বুদ্ধের পর আর কেহ ঘে তাহা অধিকার করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই।” জনশ্রুতি অমুসারে, বুদ্ধের জননী এমন পরিবাঁবে জন্ম গ্রহণ করিবেন, যে পরিবার চৌষট্টি গুণে বিভূষিত, এবং তিনি নিজেও বত্রিশটি গুণে বিভূষিত হইবেন—এবং এই সকল চিহ্নের দ্বারাই তিনি বুদ্ধের জননী হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ললিতবিস্তরে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—“সুদোদনের মনোমোহিনী পত্নী সহস্রের মধ্যে একটি, কাবণ, তিনি পূর্ণতায় উপনাত হইয়াছিলেন। মায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি চিত্তহারিণী; তাই মায়াদেবী নামে তিনি অভিহিত হইয়াছেন। দেব-বালার স্থায় তিনি পরম স্নহদরী;

তাঁহার স্ত্রীম দেহ, তাঁহার সর্বাঙ্গ অনিন্দ্য সুন্দর...কি অল্পরোগ, কি বিদেহ—কিছুতেই তাঁর আসক্তি নাই; তিনি প্রিয়দর্শন, মধুবাক্তি, জ্ঞানানুসারিণী ও হিতবাদিনী, তিনি লজ্জাশীলা ও সত্যসামর্থী, তিনি ধর্ম পালন করিয়া থাকেন। তিনি গর্ভশূন্য, কার্কশ্বরহিত, চাপলাহীন; তাঁহার কাপট্য কিম্বা ছলনা নাই। তিনি ইচ্ছানুযায়ী ত্যাগ স্বীকার করেন, তিনি সকলেব হিতকামনা করেন। তিনি কশ্মীরের মাহাত্ম্য বোঝেন, তিনি কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না, তিনি সর্বদাই সত্য পথে বিচরণ করেন, এবং তাঁহার মন সুসংযত। সমস্ত পৃথিবীতে পরিখ্যাত রমণীদের মধ্যে যে সকল দোষরাশি পরিলক্ষিত হয়, সে সব দোষ তাঁহাতে নাই... ধর্মের নিয়মানুসারে, তপস্বিনীর স্থায় তিনি কঠোর ব্রতচরণে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। রাজ্যবা অল্পমতি পাইয়াছেন, ৩২ মাস তিনি কামপ্রবৃত্তির অল্পবর্তিনী হইবেন না। তিনি দাঁড়াইয়া থাকুন, বসিয়া থাকুন, শুইয়া থাকুন,—যেখানেই থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন, শুভ কশ্মীরের জ্যোতিতে তাঁহার সমস্ত জীবন উদ্ভাসিত হইতেছে। কি দেব, কি দানব, কি মানব, কেহ তাঁহার প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিতে পারে না—সকলেই তাঁহাকে জননী রূপে হৃদিতা রূপে দর্শন করে মায়াদেবীর স্মৃতির প্রভাবে, বৃহৎ রাজপরিবারের নিয়ত উন্নতি হইতেছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজ্য আক্রমণ করেন না বলিয়া এই নৃপতির খ্যাতি প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। যেমন মায়ী উপযুক্ত পাত্র, তেমনি সেই পরমারাধ্য পুরুষও অপূর্ণ মহিমায় দীপ্তি পাইতেছেন। এইরূপে দেখা যায়, পুত্র ও তাহাব মাতা মায়াদেবী—উভয়ই সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত।” (৩০)

সমস্ত প্রখ্যাত মহাপুরুষদিগের স্থায়, ভগবান বুদ্ধেরও জন্ম শুভসূচক নিমিত্ত সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল; একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা শুদ্ধোদনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করে— তাঁহার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে হয় একজন বড় রাজা, নয় একজন প্রখ্যাত মুনি হইবে। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীতে রাজা ভীত হইয়া পুত্র জন্মিবার মাত্র তাহাকে তিনটি বৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, তাহার বাহিরে সে যাইতে পাইত না। কেবল যুবকবৃন্দ ও সর্বাঙ্গসুন্দর রূপসী ললমারা তাহার নিকট যাইতে পারিত, এবং দরিদ্র, আতুর

জবাগ্রস্ত লোকদিগের প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল। শুদ্ধোদন ভাবিয়াছিলেন এইরূপ উপায়ে মানবজন্মের দৃশ্য সমূহ পুত্রের দৃষ্টিপথে কখনই পড়িবে না। ১৬ বৎসর বয়সে, পুত্রের বিবাহ দিয়া, রাজা তাঁহাকে রাজ্যোচিত সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। ক্ষণেকের জন্ত তাঁহার মনে হইয়াছিল, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল তাহাই ফলিবে—তাঁহার পুত্র চক্রবর্তী রাজা হইবে। বিজ্ঞান শিল্পকলা ব্যায়াম প্রভৃতি ক্ষত্রোচিত সমস্ত শিক্ষিতব্য বিষয়ই তাহাকে উত্তমরূপে শেখান হইল। এবং জনশ্রুতি এইরূপ, সেই সকল বিষয়ে যুবা সিদ্ধার্থ বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু বিধাতা এই রাজপুত্রের জন্ত আর একটি মহত্তর জীবন নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন—পৃথিবীতে যতগুলি বৃহৎ ধর্মমত আছে তাহারই একটির তিনি নেতা হইবেন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। শাক্যরাজা সিদ্ধার্থের লক্ষ লক্ষ প্রজা পাকা সম্বন্ধে তাঁহার নাম বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইল; পক্ষান্তরে, সেই সিদ্ধার্থ জ্ঞান ও ধর্মের প্রভাবে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ৪০ কোটিরও অধিক লোকের নিকট এক্ষণে পুজিত হইতেছেন।

তিনি সুদর্শন ও প্রিয়বাদী ছিলেন; বিশিষ্ট লোকের সমস্ত লক্ষণই তাঁহাতে ছিল। তাঁহার জননীও স্থায়, তিনিও ৩২টি মহাপুরুষের লক্ষণে এবং ২৪টি গোণ গুণে বিভূষিত ছিলেন। ললিতবিস্তরে এইরূপ কতকগুলি গুণের বর্ণনা আছে:—“যুবা পুরুষ সিদ্ধার্থেব চূড়াদেশ তুঙ্গ ছিল। তাঁহার ললাট বিশাল ও সমান; নেত্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; ৪০টি দন্ত সমান, ঘনসন্নিবিষ্ট ও শুভ্র; চর্ম্ম সূক্ষ্ম ও স্বর্ণাভ। দেহের বহিঃশিংগেব স্থায়। গঠন অগ্ৰোধ বৃক্ষের স্থায়; তাঁহার জন্ম এন-হরিণের স্থায়; তাহার হস্ত পদ অতীব শোভন ও সূক্ষ্মর। তাঁহার মস্তক বৃহৎ ও পরিপুষ্ট, তাঁহার কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত। তিনি সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।” (৩১)

একটি আখ্যানিকা হইতে জানা যায়, কিরূপে তাঁহার জীবনের কর্তব্য নির্দ্ধারিত করিলেন। একদিন যখন তিনি তাঁহার প্রাসাদের উত্তানে বিচরণ করিতেছিলেন সেই সময়ে

একটি দুর্বল অশক্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। বিস্মিত হইয়া, এই অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পরিচাবককে জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচাবক বলিল, সকল মনুষ্যই ঐ বৃদ্ধের মত হইবে এবং তিনিও একদিন এইরূপ হইবেন। এই কথা শুনিয়া বিষমভাবে তিনি তাঁব প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। আর একদিন, ক্ষতাক্ষ একজন আত্মবকে দেখিতে পাইলেন; পরিচাবককে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, সকল মনুষ্যই বোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। তৃতীয় দিনে একটা গলিত শব্দ দেখিতে পাইলেন; এইবার তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন, কেন না, তিনি জানিতে পারিলেন, মৃত্যু হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। পরিশেষে তিনি মুণ্ডিত-মস্তক, কষায়বস্ত্র-পরিহিত একজন ধর্মব্রত বৃদ্ধ ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলেন। এইবার তিনি শাস্তি ও মোক্ষের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া একেবারে স্থিৎসঙ্গ হইলেন; কেন না তিনি জীবনের ক্ষণভঙ্গুতা ও নশ্বতা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি দুঃখ-শোক-জরা-মৃত্যু ও অবশ্রাস্তাবী পুনর্জন্মের কারণ এবং ঐ সমস্ত নিবারণের উপায়চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। আবও ভাবিলেন, ইহাতে সুসিদ্ধ হইতে হইলে, পিতৃগৃহে, স্বকীয় প্রাসাদ, স্বকীয় পবিবার—এমন কি, যাহা কিছু তাঁহার ধ্যানের ব্যাঘাত করিতে পারে, সমস্তই পবিত্যাগ কবিত্তে হইবে।

এই সময়ে তিনি শুনিলেন, তাঁহার একটি পুত্র জন্মিয়াছে; ইহাতে যে সংসার হইতে পলাইতে উত্তম হইয়াছেন, সেই সংসারবন্ধনেই আবার বদ্ধ হইতে হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, “আমার পুত্র রাহুল জন্মগ্রহণ কবিয়াছে। উহা আমাকে সংসারে বদ্ধ করিবার জন্য আর একটি শৃঙ্খল।”

তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন: “ধন্ত সেই মাতার শাস্তি, ধন্ত সেই পিতার শাস্তি,—যাহারা এইরূপ পুত্র লাভ কবিয়াছেন; ধন্ত সেই পত্নীর শাস্তি—যে একপ স্বামী লাভ কবিয়াছে।” তখন সিদ্ধার্থ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন:—“হাঁ, ঠিক কথা; কিন্তু যে শাস্তিতে হৃদয়ে সুখ আনয়ন কবে, সে শাস্তি কোথা হইতে আইসে?” পরিশেষে, একদিন রাত্রে, তিনি তাঁহার সঙ্কল্পকে কার্যে পবিত্ত করিলেন; যে ঘবে তাঁহার স্ত্রী নিদ্রা

ঘাইতেছিলেন সেই ঘবে গিয়া তাঁহার প্রতি ও তাঁহার পুত্রের প্রতি অন্তিম বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া এবং শুধু একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া নিজ প্রাসাদ চিবকালের জন্ত পরিত্যাগ করিলেন। (অনেক বৎসব পরে, ভিক্ষুর বেষে, কমণ্ডলু হস্তে, আব একবার নিজ প্রাসাদে প্রত্যাগমন কবিয়াছিলেন)। রাত্রে একাকী পলায়ন করিয়া, শাস্তি লাভের উদ্দেশে, এবং আপনাব ও বিশ্বমানবের মুক্তির উপায় নির্দ্ধাবণ কবিবার জন্য একটি অরণ্যে অভিযুগে যাত্রা করিলেন। অমনি প্রলোভক মাঝ ছায়ায় জায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, এবং দৌর্দল্য, কাম, পরিতাপ প্রভৃতি তাঁহার কোন রক্ষা অধেষণে প্রবৃত্ত হইল। মার ভাবিল, এইরূপ কোন রক্ষা পাইলেই,—যে তাহার হস্ত হইতে সমস্ত মানব-আত্মাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই শত্রুকে আবার স্বকীয় বশে আনিতে সমর্থ হইবে।

অনোমা নদীর তীরে উপনীত হইয়া, তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ স্নানব কেশগুচ্ছ অসির দ্বারা ছেদন কবিলেন এবং তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র ও অশ্ব ভূত্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে কপিলবস্ত্রতে ফিরিয়া পাঠাইলেন। এখন হইতে, জগতের সহিত তাঁহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইল।

সেই যুগেব প্রচলিত প্রথা অনুসারে, সিদ্ধার্থ প্রথমেই কতকগুলি কৃতবিদ্বা ব্রাহ্মণের শিক্ষাধীনে তাপসব্রত অবলম্বন করিলেন। ৭ বৎসব কাল ধরিয়া তিনি কঠোর তপশ্চরণ, শরীর্বাণিগ্রহ, দীর্ঘ উপবাস, গভীর ধ্যান ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাদির অমুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু, তাহাতে তাঁহার মনের শাস্তি হইল না, এবং তিনি যে বীজমন্ডের অন্বেষণ করিতেছিলেন সেরূপ মোক্ষ-প্রদ কোন বীজমন্ড লাভ কবিত্তে পারিলেন না।

তাই তিনি তাঁহার দীক্ষাগুরুদিগকে পবিত্যাগ করিয়া, প্রবজ্রা অবলম্বন করিলেন; এবং ইতস্তত ভ্রমণ কবিত্তে কবিত্তে, নৈরঞ্জনা নদীর নিকটবর্তী, উরুবল্লা নামক এক মহারণ্যে উপনীত হইলেন। কঠোর হইতে কঠোরতর তপশ্চরণ কবিয়া সেই অরণ্যে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিলেন। অলৌকিক পরম জ্ঞান লাভে যাহাতে সুসিদ্ধ হইতে পাবেন এই অভিপ্রায়ে, অপরিহার্য্য দৈহিক প্রয়োজনসমূহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত, বিবিধ কঠোর কর্ম সাধন

কবিত্তে লাগিলেন:—জিহ্বাকে তালুদেশে সংসক্ত করিয়া, আহাবে বিবত হইয়া, নিঃশ্বাস রোধ করিয়া, একাগ্র চিত্ত হইয়া, সমস্ত মনকে এক লক্ষ্যের প্রতি স্থির রাখিলেন;—সেই লক্ষ্য—বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। পার্শ্ববর্তী আশ্রমেব পাঁচ জন তাপস, তাঁহার কঠোর তপশ্চরণে বিস্মিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। কিন্তু তথাপি তিনি পবন জ্ঞান লাভ করিতে পাবিলেন না; শরীরকে যতই নিগ্রহ করিতে লাগিলেন, তাঁহার চরম লক্ষ্য হইতে ততই দূরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন তিনি প্রকাশ্যরূপে তাপস-জীবন পরিত্যাগ করিলেন; তিনি বুঝিলেন, কঠোর তপশ্চরণ নিষ্ফল, উহা শরীরকে অবসন্ন করিয়া ফেলে, এবং উহার কুফল মন পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে। শিষ্যদিগের নিন্দার ভাজন হইয়াও তিনি, শরীরকে সবল ও সতেজ করিবার জন্ত আবার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাব সঙ্গীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন; তিনি এখন একাকী রহিলেন। এইবার তিনি উত্তম মার্গ প্রাপ্ত হইলেন; ইন্দ্রিয় সুখ হইতে বিরত হইয়া, বোধি-বুদ্ধের তলে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এইবার তাঁহার অন্তরে শেষ-যুদ্ধ—ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, বাহাদিগকে তিনি জয় করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই সব পার্থিব প্রবৃত্তি ও কামনা তাঁহার অন্তরে আবার জাগরুক হওয়ায়, তিনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাহা আমাদের সকল হৃৎথেব মূল, সেই সব মায়ামোহেব সহিত, জীবন-তৃষার সহিত, ভোগ-তৃষার সহিত যুদ্ধ আবস্ত হইল। এখনও পর্য্যাপ্ত, সমস্ত পার্থিব সুখ তাঁহার মানস-চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছিল:—মান, বশ, প্রভুত্ব, আসক্তি, পারিবারিক সুখ।

পবিশেষে, সর্কাপেক্ষা ভীষণ আর এক সংগ্রামে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন; সংশয় আসিয়া তাঁহাব হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল। কিন্তু স্বকীয় সংকল্পে অটল থাকিয়া গৌতম সমস্ত সন্দেহই জয়লাভ করিলেন। তদনন্তর, একদিন রাত্রিকালে পরম জ্ঞান তাঁহাব নিকট উপনীত হইল; সেই জ্ঞানের বৈজ্ঞাতিক আলোকচ্ছটার তাঁহার মন আচ্ছন্ন হইল। তাঁহার আত্মা, পরম্পরাক্রমে বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতর অবস্থায় উপনীত হইল; এবং অবশেষে

পরম সত্য স্বকীয় পূর্ণ মহিমায় তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল।

বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন। জীব পরম্পরার উৎপত্তির কারণ, হৃৎথের মূল, হৃৎথমোচনের উপায়, তিনি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। এখন হইতে তাঁহার জীবনের গতি ফিরিল; তাঁহার জীবন একটা সুনির্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। তিনি ধ্যান হইতে উঠিয়াই দেখিলেন তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি পরম জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তখনই তিনি,—স্বয়ং যে স্তরের অংশভাগী হইয়াছেন, তাহা বিশ্বমানবকে দিবার জন্ত বহির্গত হইলেন। ইহাই তাঁহার ধর্মপ্রচারের আরম্ভ কাল। জনশ্রুতি অনুসারে, সিদ্ধার্থের বয়স তখন ৩৬ বৎসর। তিনি বিভিন্ন নাম নির্কিশেষে গ্রহণ করিতেন; কখন কোলিক নাম গৌতম, কখন শাক্যমুনি, কখন ভগবান, কখন তথাগত, কখন সত্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সমুদ্রত “পূর্ববর্তী মুনিদিগের স্তায় একজন মুনি,” কখন বুদ্ধ—এইরূপ বিভিন্ন নামে পরিচিত হইতেন।

যে ধর্মপ্রচার ৪৫ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, সেই ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার পূর্বে, দীর্ঘ ধ্যানের ফলে বুদ্ধদেব যে বিজয়ানন্দ লাভ করিয়াছিলেন সেই আনন্দ কিছুকাল উপভোগ কবিত্তে অভিলাষী হইলেন; তদনন্তর, “মহাভগবৎ জেন জনশ্রুতি অনুসারে, তিনি ২৮ দিন এবং অশ্রান্ত জনশ্রুতি অনুসারে ৪৯ দিন উপবাস-ব্রত পালন করেন। ললিতবিস্তরে আছে,—প্রথম ৭ দিনের পর, পাণ্ডা মার শাক্যমুনিকে মোহযুক্ত করিবার জন্ত শেষ চেষ্টা ও প্রাণপণ চেষ্টা করে। ইহার পূর্বে যখন তিনি কঠোর তপস্তায় মগ্ন হইয়া পরম সত্যের অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন মার তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিবার জন্ত অশেষ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পাবে নাই।

গৌতম বলিয়া উঠিলেন: “মার তোকে আমি জয় করিব! তোর প্রথম সৈন্ত কাম সমূহ; দ্বিতীয় সৈন্ত অসন্তোষ; তৃতীয় সৈন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা; চতুর্থ সৈন্ত লোভ; পঞ্চম সৈন্ত—আলস্য ও ঞ্জড়তা; ষষ্ঠ সৈন্ত—ভয়; সপ্তম সৈন্ত সংশয়; অষ্টম সৈন্ত ক্রোধ, কাপট্য, বশম্পূহা, প্রশংসা, মানসম্মদ, মিথ্যাঙ্জিত খ্যাতি; আত্মপ্লাব, পরনিন্দা; এই দানব সৈন্ত তাহাদের

সহিত মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ, যাহাবা ক্লম্ববর্ণ, যাগারা দহন করে।
শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয়ই উহাদের মধ্যে নিমজ্জিত। তোব
এই সমস্ত সৈন্ত যাহারা ত্রিলোক জয় করিয়াছে, তাহাদিগকে
আমি জ্ঞানের দ্বারা চূর্ণ করিব, যেমন অদম্য মৃৎপাত্র জলের
দ্বারা চূর্ণ হয়।” (৩২)

বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার
গর্ভকে উত্তেজিত করিয়া, সংশয়ের দ্বারা তাঁহার চিন্তাকে
বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়া, তদনন্তর মার, শেষ প্রলো-
ভন পরম রূপসী রমণীর আকারে তাঁহার নিকট প্রেরণ
করিলেন। বিজনে দীর্ঘকাল তপস্তা করিয়া তাঁহার
দেহের তেজ নিঃশেষ হইয়াছে—এই সময়ে সেই সকল
রমণী তাহাদের ছলাকলার দ্বারা তাঁহার ধর্মকে আক্রমণ
করিবার চেষ্টা করিল। মার, স্বকীয় হুহিতাদিগকে সোধন
করিয়া বলিল : তোমরা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া তোমাদের
নারীমাতা প্রদর্শন কর এবং তিনি কামের বশবর্তী কি না,
পরীক্ষা করিয়া দেখ। তখন মার-কন্তাগণ, বোধিসত্ত্বের
কাম উত্তেজিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত গাথা বলিল :
“বসন্ত-কাল সমাগত, এই সুন্দর ঋতুতে তরুগণ পুষ্পিত
হইয়াছে, এস বঁধু আমরা সুখ সন্তোগ করি। তোমার
সুন্দর দেহ, অতীব কমলীয়, রাজচক্রবর্তীর চিত্র-সমূহে
সমলঙ্কৃত। আমরা সুভাত, দেবমানবের সুখ বিধানার্থই
আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ঐ উদ্দেশ্যেই আমরা
প্রাণধারণ কবিতেছি। শীঘ্র উত্থান কর, উত্থান করিয়া
সুন্দর যৌবন উপভোগ কর; পরম জ্ঞানলাভ করা বড়ই
কঠিন; সে চিন্তা পরিত্যাগ কর। সাজসজ্জায় সুসজ্জিতা,
অলঙ্কারে বিভূষিতা এই দেখ দেব-কন্তারা তোমাব উদ্দেশ্যে
আসিয়াছেন। কীটদষ্ট কাষ্ঠখণ্ড যতই শুষ্কশীর্ণ হউক না
কেন, কোন্ মনুষ্য এইরূপ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হইবে?
উহাদের সুচিকণ কেশরাশি সরস সুগন্ধে পরিবিস্ত;
উহাদের ক্রিরাট ও কর্ণবলয় বিভূষিত মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত
পুষ্প সদৃশ, উহাদের সুন্দর ললাট, উহাদের মুখ সুরঞ্জিত,
উহাদের নেত্র প্রস্ফুটিত পদ্মদলের জায় বিশাল, উহাদের
আনন পূর্ণচন্দ্রের জায়, উহাদের ওষ্ঠ পঙ্ক বিম্বের জায়,
উহাদের সুন্দর দন্তরাজ্য শব্দের জায়, যুথিকার জায়,
তুণ্যবের জায় শুভ্র। উহাদের দিকে চাহিয়া দেখ,

উহারা কেমন প্রিয়দর্শন—উহাবা কেবল সুখেরই
ধ্যান করিতেছে। দেখ প্রভু, উহাদের পরোদর
কেমন কঠিন, কেমন তুঙ্গ, কেমন পীন; ঐ দেখ
উহাদের সুন্দর ত্রিবলী বেধা, উহাদের সুগঠিত
বিশাল নিতম্ব, উহারা বাস্তবিকই প্রিয়দর্শন। উহারা
মরাল-গতি; উহারা কেমন ধীর পদক্ষেপে চলিতেছে;
উহারা কেমন লাগিত্যসহকারে কথা কহে; উহাদের
প্রেমের ভাবা একেবারে হৃদয়ে পৌঁছে; বেশভূষায়
বিভূষিতা এই সকল রূপসী ললনা, বিলাস-লীলায় সুপণ্ডিত।
গীত বাস্তব নৃত্যে ইহারা সুনিপুণ, এই সকল গুণবতী
রূপসীরা সুখের উদ্দেশ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই সকল
প্রেমবিক্রম-ললনাদিগকে যদি তুমি প্রত্যাখ্যান কর,
তাহা হইলে এই পৃথিবীতে আসাই তোমার বিধম
বিড়ম্বনা।”

তখন বোধিসত্ত্ব সম্মিতমুখে এইরূপ উত্তর করিলেন :
“হায়! বাসনাই হৃৎথের সদৃশ, এবং এই হৃৎথ-
মূল বাসনাই ধ্যান, অলৌকিক শক্তি এবং জ্ঞানহীন
ব্যক্তিদের তপস্তাকে বিনষ্ট কবে; নারীর কামনায় তৃপ্তি
নাই,—এইরূপ ঋষিরা বলিয়াছেন। আমি জ্ঞানের দ্বারা
অজ্ঞদিগের তৃপ্তি উৎপাদন করিব। লবণাধু পানে যেমন
তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ যাহারা বাসনাকে পোষণ করে
তাহাদেরও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। যাহারা বাসনায়
আসক্ত হয় তাহাদের দ্বারা, কি আপনায়, কি পরের—
কাহারও হিতসাধিত হয় না। কিন্তু আমি আপনায় ও
পরের হিতসাধনে নিরতিশয় ইচ্ছুক হইয়াছি। তোমার
শরীর ফেনের জায়, জলবদবৃদ্ধের জায়; উহা মায়ার দ্বারা
রঞ্জিত,—উহা যদৃচ্ছাক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া
থাকে। যেমন স্বপ্নলব্ধ সুখ চিরস্থায়ী নহে, সেইরূপ
জ্ঞানহীন অবিবেকী জনের চিত্ত সর্বদাই বিপথে গমন
করে। চক্ষু সংহত-বস্ত্র গোলাকার ফোটকের জায়;
উদর, যুগিত মূত্রপূরীষের আধার, কন্দুজ স্বাভাবিক কলুষ-
রাশি হইতে উৎপন্ন,—হৃৎথের যন্ত্র বিশেষ। অজ্ঞান
ব্যক্তিদেরই মন শিচলিত হয়, জ্ঞানীদের তাহা কদাপি হয়
না; অজ্ঞান ব্যক্তিরাই শরীরকে সুন্দর বলিয়া মিথ্যা কল্পনা
করে...কটদেশ হইতে অপ্রিয় দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়; জাহ্ন,

জজ্ঞা, ও গদ যজ্ঞের জ্ঞায় একত্র আবদ্ধ; তোমাদের বাস্তবিক বাহা আছে তাহা মায়ী ভিন্ন আর কিছুই নহে। মিথ্যা কার্য্যকারণ হইতে তোমরা উৎপন্ন। কামের কোন বাস্তবিক গুণ নাই,—উহার গুণ সকল মিথ্যা—শ্রদ্ধের বিজ্ঞান-পথের বিরোধী। উহা বিষ-পত্রের জ্ঞায়—ভীষণ অজাগর সর্পের জ্ঞায়। মূঢ়েরা অর্থ জ্ঞান করিয়া উহাতে মত্ত হয়। কাম-বশীভূত স্ত্রী ও পুরুষ, সংমার্গ হইতে—ধ্যানের মার্গ হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া বিজ্ঞান হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করে, প্রবৃত্তির দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া, তাহারা ধর্ম্মজনিত সুখকে পরিত্যাগ করে, পরিশেষে কামজনিত সুখও তাহারা সম্ভোগ করিতে পারে না। আমি কামেতেও আসক্ত নই—পাপেতেও আসক্ত নই; আমি প্রিয়তে আসক্ত নই—আমি প্রিয় অপ্রিয় কিছুতেই আসক্ত নই। আকাশ-বায়ুর জ্ঞায় আমার মন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছে।”

মারের হুহিতারা তবুও এইরূপ বলিতে লাগিল :—
“যতদিন না যৌবন তোমার চলিয়া যায়,—যতদিন তোমার রূপ যৌবন থাকে এবং তোমার সুখও আমরা যতদিন থাকিব, ততদিন তুমি হাসিমুখে কামসুখ উপভোগ কর।” কিন্তু বোধিসত্ত্ব কিছুতেই বিচলিত হইলেন না :—“তৃণাঞ্জলিযুক্ত শিশির বিন্দুব গায়—শরৎকালীন মেঘের জ্ঞায় বাসনা সকল ক্ষণস্থায়ী। নাগকন্ডাদের রোষের জ্ঞায় উহা ভীতিজনক।” মারের হুহিতারা আবার বলিল ;—“উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তুমি যেমন চন্দ্রানন, উহারা তেমনি পদ্মাননা, উহাদের কণ্ঠস্বর মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী; উহাদের দন্তপংক্তি তুবারের জ্ঞায়—রজতের জ্ঞায় শুভ্র; প্রধান দেবতাদিগের দ্বারা চিরবাহিত, বাহাদের সমতুল্য ললনা দেবলোকেও দুর্গভ, তাহাদিগকে তুমি মর্ত্যলোকেই পাইতে পার।” বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন :—“আমি দেখিতেছি, এই শরীর মলিন, অপবিত্র, কীটপূর্ণ, অগ্নিদাহ্য, ভক্ষ্য, ও জুংঘের দ্বারা সমাচ্ছন্ন; আমি জ্ঞানিজনের পূজিত সেই অক্ষয় গুহলাভ করিব, বাহা সমস্ত চরাচরের সুখোৎপাদক।” (৩৩)

উহাদের সমস্ত মায়াজালই নিষ্ফল হইল। বোধিজ্ঞানের তলদেশে ধ্যান-মগ্ন নিষ্কল বুদ্ধদেব একাগ্রচিত্ত হইয়া,

সমস্ত পার্থিব চিন্তা, পার্থিব কামনা দমন করিয়া, জয়ী হইয়াছিলেন; এখন তাঁহার মুখে একটি নিষ্কল প্রশান্ত-স্মিত হাস্য প্রকটিত হইল। পাপাত্মা মার, বুদ্ধদেবকে মায়াজালে বদ্ধ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু বাহাতে তিনি ধর্ম্মপ্রচাৰ করিয়া বিশ্বমানবকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে না পারেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নির্দোষসাধনের বিরোধোৎপাদনে সচেষ্ট হইল।

মার তাঁহাকে যেরূপ ভূলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, ললিত-বিস্তরে তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে :—বহুদিন পরে, বুদ্ধদেব স্বকীয় শিষ্য আনন্দের নিকট তাঁহার প্রলোভনের বৃত্তান্ত এইরূপ ব্যক্ত করেন; “এই সময়ে পাপাত্মা মার আমার নিকটবর্ত্তী হইল। তারপর দেখে আনন্দ, আমার পাশে দাঁড়াইয়া সে আমাকে এইরূপ বলিল :—‘হে মহাত্মন! এক্ষণে আপনি নির্দোষ লাভ করুন, হে সিদ্ধপুরুষ! আপনি নির্দোষে প্রবেশ করুন। মহাত্মন, এক্ষণে আপনার নির্দোষের সময় হইয়াছে।’ দেখে আনন্দ, মার এই কথা বলায় আমি এইরূপ উত্তর করিলাম। ‘দেখ মার, যতদিন না আমি ভিক্ষুদের মধ্য হইতে এমন কতকগুলি শিষ্য পাই বাহার জ্ঞানী ও কৃতবিশ্ব, সর্কসিদ্ধান্তে পান্দর্শী, বিধিব্যবস্থায় পারদর্শী, বাহারা এই ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া,—গুরু মুখ হইতে বাহা শুনিয়াছে তাহা দূবদেশে প্রচার করিবে, প্রকাশ করিবে, ব্যাখ্যা করিবে, কোন প্রতিবাদ উত্থাপিত হইলে, বীজসূত্রসমূহের দ্বারা তাহাকে ধ্বংস করিবে—চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে, দেখে পাপাত্মন! ততদিন আমি নির্দোষে কখনই প্রবেশ করিব না। যতদিন না আমার ধর্ম্ম বিশ্বমানবের মধ্যে প্রচারিত হইবে ততদিন আমি নির্দোষে কখনই প্রবেশ করিব না।’ (৩৪)

মারের সহিত এই শেষ যুদ্ধে জয়ী হইলেও, বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্ম, জগতে প্রচার করিবেন কি না সে বিষয়ে একটু ইতস্তত করিতেছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমতে সংসার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া যে তিনি ইতস্তত করিতেছিলেন তাহা নহে,—কেন না পরম সত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস ছিল—তাঁহার শুধু এই আশঙ্কা হইতেছিল পাছে লোকে তাঁহার ধর্ম্ম বৃথিতেনা পারে। তিনি ভাবিলেন, বিশ্বমানব—বাহারা সংসার-আবণ্টে বিক্ষুব্ধচিত্ত—

যাহা বা উহাতেই স্থখ পায়, তাহাদেব পক্ষে কার্য্যকারণত্বের মর্ম্ম গ্রহণ করা কঠিন ; তাহাদিগকে আরও বোঝান কঠিন—সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর লয়, সমস্ত পার্শ্বিক বস্তুর বিয়োগ, বাসনার বিলোপ, পরিসমাপ্তি, নির্বাণ। এই নৈরাশ্রের অবস্থায় তিনি বলিয়া উঠিলেন :—“কত কষ্ট স্বীকার করিয়া, কত যুদ্ধ করিয়া আমি যাহা আর্জন করিয়াছি তাহা জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া কি ফল ? রাগ ঘেষে যাহার অন্তর পূর্ণ, তাহার নিকট সত্য চিবকালই প্রচ্ছন্ন থাকে। যাহা বহু কষ্টে অর্জিত হয় সেই গভীর রহস্য স্থলবুদ্ধির নিকট প্রকাশ পায় না। যাহার তমসচ্ছন্ন মন পার্শ্বিক বাসনার সমাচ্ছন্ন, সে কখনই উহা উপলব্ধি করিতে পারে না।” কিন্তু ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া, এই সকল আশঙ্কা অতিক্রম করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ; তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া এইরূপ বলিলেন :—“হে মুক্তিদাতা ! জন্মজবামৃত্যু ভোগ করিতেছে যে বিশ্বমানব তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। হে প্রভু ! তোমার কথা উচ্চৈঃস্ববে প্রচাব কব, সে কথার মর্ম্ম অনেকেই বুঝিতে পারিবে।”

এক্ষণে তাঁহার সম্মুখে মহৎ কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইল, আর তাঁহার ধর্ম্ম জগত্বেব নিকট প্রচার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না :—“নিত্যধামের দ্বার যেন সকলের নিকটেই উন্মুক্ত হইয়াছে ! যাহার কর্ণ আছে সে যেন এই কথা শোনে ও বিশ্বাস কবে। আমি নিজে যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা ভাবিতেছিলাম, এবং সেইজন্য, হে ব্রহ্ম, এই মহাবাক্য লোকের নিকট প্রকাশ কবি নাই।” (৩৫)

এইখানেই বারাগসীব ধর্ম্মোপদেশ, মুক্তিবিসম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে সকল তাপস পূর্বে তাঁহার শিষ্য ছিল, কিন্তু পবে যাহারা তাঁহাকে স্বধর্ম্মত্যাগী মনে করিয়া পরিত্যাগ করে, তাহাদের সহিত বুদ্ধদেবের আবার সাংলাৎ হইল। তাহাদিগকে আবার তাঁহার নবধর্ম্মে দীক্ষিত কবিত্তে ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু তাহা সহজ হইল না। তাহারা বুদ্ধদেবকে দেখিবা মাত্র মনে মনে চিন্তা করিল : “এই যে গৌতম এইদিকে আস্চে, ওকে সম্মান দেওয়া হবে না। যদি ইচ্ছা কবে ত এইখানে বসিতে পারে।” কিন্তু বুদ্ধের ভাব দেখিয়া তাহারা স্বকীয় সংকল্প রক্ষা করিতে পারিল না, তখনই তাঁহার নিকটে গমন

করিল। বুদ্ধ তাহাদিগকে বলিলেন ; “আমার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ কর, ইহলোকেই তোমরা সত্যকে প্রাপ্ত হইবে।” কিন্তু ঐ তাপসেরা উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলিল :—“কঠোর তপশ্চরণ করিয়া যাহা তুমি লাভ করিতে পার নাই, প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়া কিরূপে সেই পরম সত্য লাভ কবিবে ?”—কিন্তু বুদ্ধ, এইরূপ আপত্তি হইবে বলিয়া পূর্বেই ভাবিয়াছিলেন। অনেক দিন হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন কঠোর তপশ্চরণ প্রকৃত পন্থা নহে। উপবাসাদিতে পার্শ্বিক চিন্তা-সমূহ মন হইতে দূরীভূত হয় না, পবিত্র পরম জ্ঞানে উপনীত হইবার জন্য যে আত্মচেষ্টা আবশ্যক সেই আত্মচেষ্টার দ্বাবাই পার্শ্বিক চিন্তা সকল দূরীভূত হয়। ভোগবিলাসের দ্বায় শরীরশোষণও মুক্তির পথ হইতে দূরে অবস্থিত। চিত্তবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য ও আভ্যন্তরিক সমন্বয়ই আদ্যদিগকে সত্যোত্তে উপনীত করে। বুদ্ধদেব জীবনকে বীণার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বীণা হইতে ঠিক স্রব বাহির কবিত্তে হইলে, বীণার তারগুলিকে বেশী টানাও উচিত নহে—বেশী শিথিল করাও উচিত নহে। তাই, সেই তাপসদিগের আপত্তির উত্তরে তিনি এইরূপ বলিলেন :—“যিনি আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়াসী, তিনি এই দুই সীমান্ত হইতে দূরে থাকিবেন। সেই সীমান্ত দুইটি কি ? একটি ভোগবিলাসের জীবন এবং আর একটি কঠোর আত্মনিগ্রহের জীবন ; উভয়ই হয় ও অসার। হে ভিক্ষুগণ ! তথাগত এই উভয় সীমান্ত হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখেন ; তিনি এমন একটি পথ আবিষ্কার করেন যাহা উভয়ের মধ্যবর্তী ; ঐ পথই চক্ষু ও মনকে উদ্ঘাটিত করে, ঐ পথই সাধককে শান্তিতে, জানেতে, বুদ্ধিতে, নির্বাণে উপনীত কবে। হে ভিক্ষুগণ ! সেই মধ্যম পথটি কি ? সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি ; এই আটটিকে আধ্যাত্মিক মার্গ বা মধ্যম পথ বলে। হে ভিক্ষুগণ ! হুঃখ সম্বন্ধে ইহাই পবিত্র সত্য :—জন্ম হুঃখ, জরাহুঃখ, মৃত্যুহুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ ও প্রিয়-বিরোগ হুঃখ, কাম্যবস্তুর অপ্রাপ্তি হুঃখ, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পাণ্ডিত্যবিষয়ে এই পঞ্চধা আসক্তিই হুঃখ। হে ভিক্ষুগণ ! হুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাই পবিত্র সত্য ; তৃষ্ণাই পুনর্জন্মের

মূলীভূত হেতু—স্বথের তৃষ্ণা, জীবনের তৃষ্ণা, শক্তিমানর্থের তৃষ্ণা। বাসনাব ধ্বংস হইলেই এই তৃষ্ণার ধ্বংস হয়। বাসনাকে একেবারে দূবীভূত কবিত্তে হইবে, বাসনা হইতে একেবারে বিমুক্ত হইতে হইবে—মনের মধ্যে বাসনাকে তিলমাত্র স্থান দিবে না। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই হুঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃত পন্থা।” (৩৬)

ইহাই ধর্মচক্র প্রবর্তনের উপদেশ। পঞ্চতাপস বুদ্ধদেবের উপদেশে বশীভূত হইয়া, তাঁহার জয়কীর্ত্তন কবিত্তে লাগিল এবং তাহাবাই সর্বপ্রথমে ভিক্ষুসম্প্রদায়ভুক্ত হইবার জন্ত প্রার্থনা করিল। “আইস ভ্রাতৃগণ, আমার ধর্মমত উত্তমরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে; এখন হইতে তোমরা বিমুক্তভাবে অভিমুখে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তোমাদের সকল হুঃখ নিবৃত্তি হইবে।” কণ্ডান্ত, ভাষ্য, ভাপ্প, মহাম্মা ও অমার্জ্জি এই পাঁচ শিষ্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধদেব বিনায়ুদে পৃথিবী জয় করিবার জন্ত বহির্গত হইলেন।

তদনন্তর, যশ নামক সম্ভ্রান্ত বংশের একজন যুবা পুরুষ বুদ্ধদেবের উপদেশে বিমুক্ত হইলেন। ইনি একজন ভোগ-বিলাসী, বারাগদী নগরে বিলাস-সুখে মগ্ন ছিলেন। বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইনি ঐহিক সুখের অসাবিতা উপলব্ধি করিলেন, এবং পূর্বে যেমন তাঁহার ভোগ-বিলাসে ঐকান্তিক আসক্তি ছিল, এখন আবার তেমনি আগ্রহের সহিত তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। ইনি বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুর পীতবসন ধারণ করিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত অশেষ চেষ্টা করিলেন কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই তাঁহার ব্যর্থ হইল। অবশেষে তিনিও বুদ্ধের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। যশ এই নবধর্মে সহসা দীক্ষিত হওয়ায় তাঁহার বন্ধুগণ বিস্ময়বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল:—“যে ধর্মের প্রভাবে আমাদের বন্ধু বশীভূত হইয়াছে, না জানি সে ধর্মটি কি।” তাহারাও বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহারাও নবধর্মে দীক্ষিত হইল। এইরূপে যখন বুদ্ধদেবের ৬০ জন শিষ্য হইল, তখন তিনি তাহা-দিগকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে গমন করিয়া পৃথকভাবে মোক্ষধর্ম প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। “হে শিষ্যগণ! তোমরা জগতের হুঃখে অমুকাপারিত হইয়া, বিশ্বমানবের

হিতের জন্ত, সুখের জন্ত, মোক্ষের জন্ত, এখনি যাত্রা কর। হই জন এক পথে যাইও না! যে ধর্ম আদিত্তে মহিমাম্বিত, মধ্যে মহিমাম্বিত, অন্তে মহিমাম্বিত সেই ধর্ম প্রচার কর—তাহার অক্ষরাংশ প্রচার কর—তাহার মর্মভাব প্রচার কর। অনাড়ম্বর সরল জীবনের কথা—সম্যক ও নির্মল জীবনের কথা—পবিত্র জীবনের কথা প্রচার কর। এমন লোক আছে যাহাদের চক্ষু পার্থিব ধূলিতে অন্ধীভূত হয় না, কিন্তু যদি তাহারা এই ধর্মের উপদেশ শ্রবণ না করে, তাহা হইলে তাহারা কখনই মুক্তিমুক্ত করিতে সমর্থ হইবে না; তাহারা এই ধর্ম গ্রহণ কবিত্তে” (৩৭)। আর তিনি স্বয়ং উরুবো অরণ্যে ফিরিয়া যাইবেন। সেখানে সহস্র-সংখ্যক বাণপ্রস্থধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ বাস কবে, কাশ্যপ নামে তিন ভ্রাতা তাহাদের অধিনায়ক। এই ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় জ্ঞানের জন্ত, পুণ্যের জন্ত ও তপস্যার জন্ত গর্জিত ছিল; তাহারা ঐকান্ত্য-মিশ্র দাক্ষিণ্য সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু যখন বুদ্ধদেব কতকগুলি অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উচ্চ পদ-মর্যাদা অবগত হইয়া শীত কালটা তাহাদের সহিত অতি-বাহিত করিতে তাঁহাকে অন্বয় করিল; তিনি সম্মত হইলেন। কেবল, কাশ্যপদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইল না; তখন বুদ্ধদেব, সেই ব্রাহ্মণের মন যে নীচ চিন্তায় বিকৃত হইতেছিল, তাহা তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন: “দেখ কাশ্যপ তুমি সিদ্ধপুরুষ নও, তুমি এখনও সিদ্ধির পথে প্রবেশ কর নাই, তুমি এখনও সে পথের কিছুই জান না।” কাশ্যপ পরাভূত হইল, তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল: “হে প্রভু যাহাতে আমি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা ব্রত গ্রহণ করিতে পারি, আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ কর।”

কিন্তু এ পর্যন্ত বুদ্ধদেব বেশীর ভাগ, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণদিগকেই নবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি পথ চলিতে চলিতে মগধরাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার আগমন সমাচার পাইয়া মগধরাজ্য বিধিসার মহাপ্রভুকে সঘর্দনা করিবার জন্ত অমুচরাদি সমভিব্যাহারে সবিভবে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধদেব ও কাশ্যপ পাশাপাশি উপবিষ্ট

ছিলেন, রাজা বুঝিতে পারিলেন না, উহাদের মধ্যে মহাপ্রভু কে ; কিন্তু কাশ্মপ বুদ্ধদেবের পদতলে পড়িয়া বলিয়া উঠিল, “ইনিই মহাপ্রভু, আমি ইহঁদের শিষ্য।” বিধিসার বিশ্বস্তান্ত হইয়া, বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন এবং বৌদ্ধসমাজভুক্ত হইলেন। পরে এই বিধিসাব বৌদ্ধধর্মের একজন পরম সহায় বলিয়া পবিচিত হন। অভিজ্ঞাতবর্গের অনেকেই রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এই রাজগৃহে, বুদ্ধদেব দুইটি ব্রাহ্মণ যুবককে স্বধর্মের দীক্ষিত করেন ; তাঁহাব শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে এই দুইজন কিছুকাল পরে প্রখ্যাত হইয়া উঠে। এই যুবকদ্বয়ের নাম, —সারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন। তখনকার দর্শন সম্প্রদায়ের যিনি অধিনায়ক—ইহঁাবা সেই সঙ্ঘের শিষ্য ছিলেন। অশ্বজিৎ নামক বুদ্ধের এক শিষ্যের সহিত, ঘনিষ্ঠ সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ এই যুবকদ্বয়ের সাক্ষাৎ হইল। অশ্বজিৎ সেই সময় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং তখনকার প্রথা অনুসারে ধর্মবিষয়কবাগ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। শিষ্টাচার-সম্পন্ন পবিত্রের সহিত বন্ধুভাবে অভিবাদন বিনিময়ের পর সারীপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন :—“কাহার নামে তুমি সংসার ত্যাগ করিয়াছ, এবং তুমি কোন্ ধর্মাবলম্বী ?” অশ্বজিৎ উত্তর করিলেন :—“মহাশ্রমণ সেই তথাগতের নামে সংসার ত্যাগ করিয়াছি এবং তাঁহারই ধর্ম আমি অবলম্বন করিয়াছি।”

—“আমাকে সেই ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেও।”

—“আমি নিজেই শিক্ষানবীস, আমি তোমাকে কি শিক্ষা দিব ? আমি তার সারমর্ম তোমার নিকট বলতে পারি।”

—“অল্পই হোক বেশীই হউক তাহাতে কি যায় আইসে ! আমি সেই ধর্মের সারমর্মই চাই, বচন চাইনে।” তখন অশ্বজিৎ উত্তরে এই বাক্যটি বলিলেন, যাঁহা বৌদ্ধধর্মের একটি মূল সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। “যে সকল পদার্থ কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সকল পদার্থের কারণটি কি এবং কিরূপে তাঁহাদের অন্ত হয়—তথাগত তাঁহারই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাই মহাশ্রমণের ধর্ম।” তদনন্তর, এই মন্ত্রণেব চরমগতির আলোচনাতেই যাহারা এতদিন ব্যাপ্ত ছিলেন, সেই দুই তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া

উঠিলেন :—“ইহা !” আমবা মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের উপায় পাইয়াছি।” উহারা তখন বুদ্ধদেবের পদতলে আসিয়া পতিত হইল। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার শিষ্য-বর্গের মধ্যে সর্বপ্রধান বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। সঙ্ঘ, স্বকীয় শিষ্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, এরূপ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন যে সেই ক্রোধের আবেশে, একটি শিরা ছিন্ন হইয়া তাঁহাব মৃত্যু হইল।

তদনন্তর, বুদ্ধদেব স্বীয় পবিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আর একবার কপিলবস্তুরে ঘাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। ৮ বৎসব হইল তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন—তিনি যখন চলিয়া আসেন তখন কপিলবস্তুরে নিদ্রিত ছিল, এক্ষণে এই সমগ্র নগর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত জাগ্রত হইল।

তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া রাজা শুদ্ধোদন, তাঁহার সমস্ত পুরুষ আত্মীয় সমভিব্যাহারে, পুত্র সিদ্ধার্থকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত নগর হইতে বহির্গত হইলেন। পার্শ্ববর্তী কোন এক অরণ্যে গুত্রের সহিত তাঁহাব সাক্ষাৎ হইল। কারণ, বৌদ্ধগণের নিয়মানুসারে, তাঁহার শিষ্য-দিগের জায় তিনিও কোন গৃহস্থের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। এই সাক্ষাৎকারেব ব্যাপাবটা বড়ই মন্থম্পর্শী—পিতার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় বুদ্ধদেবের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু পুত্রকে ভিক্ষুবসন পাবহিত ছিন্নশ্রম ছিন্নবেশ দেখিবেন ইহা শুদ্ধোদনের অসহ্য হইল। পরদিন প্রাতে বুদ্ধদেব ভিক্ষাপাত্রহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই কথা নগরে রাষ্ট্র হইল ; শুদ্ধোদন ইহা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ বুদ্ধের নিকট আসিলেন। “বৎস ! দর্শিত্রের জায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কেন আমার অবমাননা করিতেছ ?” বুদ্ধ উত্তর করিলেন :—“মহারাজ ! ইহাই আমার কুলধর্ম।”—“আমরা ক্ষত্রিয় রাজবংশ হইতে উৎপন্ন, আমাদের মধ্যে এপর্যন্ত কেহই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এতটা নীচতা স্বীকার করে নাই।” কিন্তু বুদ্ধ একটু হাসিয়া এইরূপ উত্তর করিলেন :—“আপনি রাজবংশোদ্ভব বলিয়া গর্ব করিতে পারেন, কিন্তু আমার পূর্বপুরুষ—অতীতকালের বুদ্ধগণ এবং তাঁহারাও আমার জায় ভিক্ষা

করিয়া বেড়াইতেন।” রাজা বিষমমনে পুত্রকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন। সেখানে বুদ্ধদেবের পত্নী যশোধরা বুদ্ধদেবের জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন হইতে বুদ্ধদেব গৃহ হইতে প্রস্থান করেন, সেই অবধি যশোধরা একাকিনী বিষাদে কাল যাপন করিতেছিলেন। - দুইজন শিষ্য সম্ভি-
ব্যাহারে বুদ্ধদেব (কেন না, কোন জীলোকের গৃহে, কোন ভিক্ষু, সংঘ-নিয়মামুসারে, একাকী ঘাইতে পারে না) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অবশ্য যশোধরার হৃদয়ের কোপ ও অভিমান সঞ্চিত হইয়াছিল,—বুদ্ধদেব কি উচ্চ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যে পক্ষিকে তিনি এত ভালবাসিতেন সেই প্রিয়তম পতি তাঁহার রূপলাবণ্যকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, শুধু এই কথা ভাবিয়াই তিনি যারপর নাই কষ্ট পাইতেছিলেন। কিন্তু পীতবসনপরিহিত সন্ন্যাস-বেশধারী মহাপুরুষ বুদ্ধকে দেখিবামাত্র, তিনি তাঁহার পদতলে গিয়া পড়িলেন এবং পতিব জাম্ম ধরিয়া, একটি কথাও উচ্চারণ না করিয়া নীরবে অঙ্গ অঙ্গ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধদেব তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া সান্দ্রনা কবিত্তে লাগিলেন; যশোধরা যে সকল পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তজ্জন্ত তিনি মুক্তিরাত্রের অধিকারিণী হইয়াছেন, এই বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎকার এইরূপে শেষ হইল। কিন্তু যশোধরা রমণী, তিনি যখন দেখিলেন, তাঁহার রূপলাবণ্য, তাঁহার অঙ্গবর্ষণ সকলই বৃথা হইল, তখন তিনি ভাবিলেন—তিনি যে কাজ পারিলেন না, হয়ত তাঁর পুত্রের দ্বারা সেই কাজ সুসিদ্ধ হইবে। তিনি আশা কবিয়াছিলেন, অপত্যস্নেহ বুদ্ধদেবকে গৃহে আবার আবদ্ধ করিতে পারিবে। এই মনে করিয়া, তিনি তাঁহার পুত্রকে স্নানব বেশভূষায় ভূষিত কবিয়া বুদ্ধেব নিকট প্রেরণ করিলেন। শিশু বলিল :—“পিতঃ! আমি ত একদিন রাজা হইয়া শাক্যবংশের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিব; অতএব উত্তরাধিকার স্বত্বে আমার যাহা প্রাপ্য আমাকে তাহা প্রদান করুন।” গৌতম উত্তর করিলেন—“তোমার যাহা প্রাপ্য তাহা নম্বর, হুংখ তাহার পবিণাম—; ওরূপ কোন বস্তু আমার দিবার নাই। আমি তোমাকে যাহা

দিতে পারি তাহা আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য। সে ঐশ্বর্য্য আমি বোধিজ্ঞানমের মূলে বসিয়া উপার্জন কবিয়াছি—তাহার ক্ষয় নাই।” তখন হইতে তাঁহার পুত্রকে আপনার নিকটে রাখিয়া সংঘের উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার পুত্র রাহুল একজন উৎসাহী ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইল। এই দৃষ্টান্তেব অনুসরণ করিয়া আরও অনেক লোক দীক্ষা গ্রহণ কবিল। বুদ্ধের পবিবারস্থ অনেক ব্যক্তি তাহাদের পদমর্যাদা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুর পীত বসন পরিধান করিল; ইহাদের নাম,—আনন্দ, উপলী, অমুরুদ্ধ। দেবদত্ত জুডাস ইষ্কারিয়টের অগ্রদূত বলিলেও হয়, জুডাস ইষ্কারিয়টের জায় দেবদত্ত স্বকীয় প্রভু বুদ্ধকে নিহত করিবার জন্ত এবং সংঘ হইতে তাঁহার কর্তৃত্ব ছিনাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু বুদ্ধদেবের অক্ষয় দয়া ও সাধু সংকল্পেব নিকট পরাস্ত হইয়া তাহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। এইরূপে শাক্যমুনি ৪৫ বৎসর ধরিয়া গ্রামে গ্রামে, প্রদেশে প্রদেশে, দৃষ্টান্ত কথার দ্বারা, ধর্মোপদেশের দ্বারা—ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, লোকদিগকে নবধর্মের দীক্ষিত করিয়াছিলেন। “মহা পরিনির্বাণস্থিতে” তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। জরাক্রান্ত হইয়া তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন দিন দিন তাঁহার বলক্ষয় হইতেছে; তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে বলিলেন :—“দেখ আনন্দ, আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমি বুদ্ধ হইয়াছি।” আনন্দ অঙ্গবর্ষণ করিল এবং শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আরও কিছুকাল থাকিবার জন্ত তাঁহাকে অনুরণ কবিল। বুদ্ধদেব বলিলেন :—“আনন্দ, তোমাকে আমি কি উপদেশ দিই নাই যে, আমরা যাহাদিগকে ভালবাসি তাহাদের সহিত একসময় বিচ্ছেদ হইবে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে—ইহাই জগতের নিয়ম? সংযোগোৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যস্বাবী—অতএব নানুষ মরিবে না—সে তথাগতই হউক না, যেই হউক না—ইহা কি কখন সম্ভব? কেহই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। স্তন, আমি সত্য বলিতেছি, তিন মাসের মধ্যে, তথাগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করিবে। অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যে সত্য আমি অবগত হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, তাহা সন্মারূপে তোমরা গ্রহণ কর। দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে তোমাদের জীবনকে

এই ধর্মের ভাবে অনুপ্রাণিত কব, এই ধর্মে নিমগ্ন হইয়া, আমাব স্থলাভিষিক্ত হইয়া তোমরা ইহাকে সর্বত্র ব্যাপ্ত কর—যেন এই বিশুদ্ধ ধর্ম স্থায়ী হয়—বহুকাল সংরক্ষিত হয়। যে এই বিশুদ্ধতাব পথ অনুসরণ করিবে সে নিশ্চিতই ভবসিন্ধু পাব হইয়া সেই পবন স্থানে উপনীত হইবে যেখানে সকল দুঃখের অবসান হয় (৩৮)।”

তাঁহার জীবনের শেষ দশায়, তাঁহার নির্দেশিত পথ অধ্যবসায় সহকায়ে অনুসরণ কবিবার নিমিত্ত তাঁহার শিষ্য-দিগকে ক্রমাগত বলিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, সংশয় ও তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইবে বুঝিতে পাবিয়া, তাঁহার শিষ্য-দিগকে বয়ানগবে একত্র কবিয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন :—“ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগের নিকট হইতে চলিয়া গেলে, বৌদ্ধ সমাজের প্রাচীনেবা, ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা এইরূপ বলিবে : আমি এই কথা কিংবা ঐ কথা বুঝিব নিজে মুখ হইতে শুনিয়াছি ; সাক্ষাৎ বুদ্ধের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাই আমাদের গুরুব উপদিষ্ট সত্য, ইহাই আমাদের গুরুব মত, গুরুব সিদ্ধান্ত। এই সব কথা, বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাসও কবিবে না, কিংবা অবজ্ঞা সহকারে অগ্রাহ্যও কবিবে না। প্রত্যেক কথা তোমরা কোন প্রকার পূর্বসংস্কারেব বশবর্তী না হইয়া মনোযোগ সহকায়ে শ্রবণ করিবে এবং আমার উপদিষ্ট বৌদ্ধধর্মের মুখ্য লক্ষণাদি সহিত, সংঘের নিয়মাবলীর সহিত মিল করিয়া দেখিবে। এইরূপ তুলনা কবিয়া—যদি অমুক প্রাচীনের কথা, অমুক ভিক্ষুব কথা আমার উপদিষ্ট ধর্মের সহিত, সংঘের নিয়মের সহিত মিল না হয় তবে তাহা অগ্রাহ্য কবিবে ; এবং তাহার বিপরীত হইলে গ্রহণ করিবে। এই আমার উপদেশ (৩৯)।” তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুসীনারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দুর্বলতার বৃদ্ধি হইল, দাক্ষণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন, অবশেষে পথের ধারে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম কবিত্তে বাধ্য হইলেন। তৃষ্ণায় কাতব হইয়া আনন্দেব নিকট ঐকটু জল চাহিলেন। আনন্দ উত্তর করিল, যে স্বল্পতোয় নদীতে একটু জল আছে, সার্থবাহরা সেই নদীর উপর দিয়া চলাচল কঁবার সেই নদীর জল কর্দমাক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বুদ্ধদেব পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা কবার,

আনন্দ কমণ্ডলু ভরিয়া জল আনিল, এবং সেই জল অনাবিল ও স্বচ্ছ দেখিয়া বিম্বিত হইল। এই অদ্ভুত ঘটনার পর, যে সার্থবাহরা নদী পার হইয়াছিল তাহাদেব অধিস্বামী পুঙ্কসা, বুদ্ধদেব আসিয়াছেন জানিতে পাবিয়া, তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম কবিয়া, বহুমূল্য কিংখাব পবিচ্ছদ উপহাব দিল। শাক্যমুনি উহার একখানি বস্ত্র লইয়া পরিধান কবিলেন ; কিন্তু পবিবামাত্র উহা স্নান ও জৌলস-বিহীন বলিয়া মনে হইল।

আনন্দ বিশ্বয়াভিভূত হইয়া বলিয়া উঠিল : “প্রভো, আপনাব মুখ একপ ডান্ডব, এমন একটা প্রভা আপনাব দেহ হইতে নিঃসৃত হইতেছে, যে উহার নিকট আপনাব বহুমূল্য বস্ত্রখানি অতীব স্নান ও অমুজ্জল বলিয়া মনে হইতেছে।” বুদ্ধ উত্তর করিলেন :—“আনন্দ, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য। এই পার্থিব জীবন-পথে বুদ্ধ হইবার রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রথমবার, সেই রাত্রে যখন বুদ্ধ পবন জ্ঞানলাভ কবে ; দ্বিতীয়বার বাজিকালে যখন বুদ্ধ পবিনির্বাণে প্রবেশ করিবে। আব আনন্দ আজি তৃতীয় গ্রহব বাজিতে, বুদ্ধ চিবশাস্তিব মধ্যে প্রবেশ কবিবে।” বস্ত্রতই শাক্যমুনির অন্তিম কাল আসন্ন। বুদ্ধদেব শিষ্যমণ্ডলী সমভিব্যাহাবে, কায়ক্লেশে কুসীনারার অনতিদূরস্থ শালবনেরেব অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌছিয়াই তিনি দুইটি যমজ-তরুর মাঝখানে শুইয়া পড়িলেন। গাছ দুটি তৎক্ষণাৎ ফুলে ভরিয়া গেল ; এবং সেই সকল ফুল আসন্নমৃত্যু বুদ্ধদেবের উপর অশ্রুচ্ছলে ঝরিয়া পড়িল ; প্রকৃতিদেবী স্বয়ং যেন ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান কবিলেন। রাত্রিতে স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রুত হইল। তখন বুদ্ধদেব বলিলেন ;—“দেখ, কি চমৎকার দৃশ্য ! তথাগতেব সম্মানার্থ স্বর্গ মর্ত্য বেরিষি করিতেছে। কিন্তু একপ সম্মান তথাগতেব সমুচিত নহে। আমার শিষ্যদিগের মধ্যে যাহারা চিন্তের মধ্যে সতত অবস্থিত কবিবে, আমাব উপদেশ ষথায়থরূপে পালন কবিয়া সাধুভাবে জীবন যাপন কবিবে, কেবল তাহাদিগের দ্বারাই আমি যথোচিতরূপে সম্মানিত হইব (৪০)।” যতই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, শাক্য-মুনির শরীর ততই ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। রৌকণ্ড-মান শিষ্যমণ্ডলীব মধ্যে, তাঁহার আত্মা সতত প্রশান্ত ছিল।

তিনি তাহাদিগকে বলিলেন ; “বন্ধুগণ, আমার মরণ আসন্ন বলিয়া তোমরা ব্যাকুল হইও না, এরূপ মনে করিও না যে, গুরুর মুখ রুদ্ধ হইয়াছে, তিনি নির্বাক হইয়াছেন, আমাদের আর কেহ নেতা নাই। আমি তোমাদের নিকট যে ধর্ম ঘোষণা করিয়াছি, এবং নিষ্কলঙ্ক জীবন সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছি—আমার অবর্তমানে উহারাই তোমাদের নেতা হইবে।”

গভীর ও নিস্তব্ধ রাত্রি ; কেবল শিষ্যদিগের ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে সেই নিস্তব্ধতা ফুটু হঠতেছে ; এবং সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শাক্যসংহের কণ্ঠনিঃসৃত আহ্বান-বাক্য তিনবার প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল ; “হে ভিক্ষুগণ ! বুদ্ধ সম্বন্ধে, ধর্ম ও সংঘ সম্বন্ধে যদি তোমাদের কোন সংশয় থাকে, আমাকে বল, আমি তাহার নিরাকরণ করিব।” কেহই উত্তর করিল না। তথাগত কায়ক্লেশ শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, শিষ্যদিগকে আশীর্বাদ করিলেন, এবং মুর্মুযু কণ্ঠস্বরে এই কথা বলিলেন :—“প্রিয় শিষ্যগণ ! এখন তবে আমি শাস্তিতে মরিতে পারিব। আমি তোমাদের বাহা বলিয়াছি মর্যাদাই মনে রাখিবে ; জ্ঞাত পদার্থ মাত্রই নশ্বর। প্রযত্ন সহকারে পুণ্য সঞ্চয় কর এবং এইরূপে মোক্ষে উপনীত হও।” ইহাই তাঁহার শেষবাক্য। স্থানে নিমগ্ন হইয়া তিনি অচিরান্তে সিদ্ধপুরুষত্বলভ স্নগভীর সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শিষ্য আনন্দ তাঁহার অস্তিম নিঃশ্বাসের স্পর্শ লাভ করিবার নিমিত্ত নিকটে আসিল। তখন বুদ্ধদেব পরিনির্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন—যে অবস্থা হইতে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না—আর কখনই ফিরিয়া আসিতে হয় না।

ইহাই সেই মহাপুরুষের জীবনকাহিনী, ভক্তবৃন্দ বাঁহাকে তথাগত, সিদ্ধার্থ, ও বুদ্ধনামে অভিহিত করিয়া থাকে ; বাঁহার স্বর্ণমূর্তিতে, পিঙ্গল-মূর্তিতে, ধোদিত-কাষ্ঠমূর্তিতে প্রাচ্যপ্রাচ্যে ও অতিপ্রাচ্যপ্রাচ্যে দেবালয় ও মন্দির সকল সমাচ্ছন্ন ;—সেই বুদ্ধ, বাঁহার মুখে মধুর স্মিত-হাস্য চির-বিরাজমান, যিনি পবিত্র পদ্মাসনে ধ্যানের ভঙ্গীতে অর্ধ-নিমীলিত নয়নে উপবিষ্ট হইয়া, সহস্র সহস্র বৎসর হইতে, ৪০ কোটি লোকের পূজা গ্রহণ করিতেছেন ;—বাহারা প্রতিদিন তাঁহার চরণে ভক্তিপূর্ণ

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে এবং মধুর স্নগন্ধি ধূপ প্রজ্জ্বলিত করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর ।

ইবনে বতুতার ভারত ভ্রমণ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

১। ভাকর। (১) লাহিরী হইতে ভাকরগমন কালে আলাওল হক আমার পথের সামগ্রীর সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই সহরের মধ্যে সিদ্ধু নদের একটি শাখা প্রবাহিত হইতেছে। ইহার বিষয় পরে বর্ণনা করা হইবে। এই নদীর তীরে একটি প্রকাণ্ড পাংশুশালা রহিয়াছে। প্রবাসিগণ এই স্থানে সমাগত হইলে যথারীতি তাঁহাদিগকে সম্মানিত করা হইয়া থাকে। কসলু খাঁ এই অতিথিনিবাসের স্থাপ-
স্নিত। যথাস্থানে কসলু খাঁয়ের পবিচয় প্রদত্ত হইবে। আমার পরিচিত ইমাম আবছল্লা হানফি ও সামসুদ্দিন মহাম্মদ সীরাঞ্জীর সহিত এই সহরে সাক্ষাৎলাভ হইল। ইমাম আবছল্লা আবু হানিফা সহরের কাজীর পদে নিযুক্ত আছেন। এই সময় সামসুদ্দিনের বয়স ১২০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

২। আওচাহ। (২) কিছুকাল ভাকরে অবস্থান করার পর এই স্থানে আগমন করি। সহরটি মন্দ নয়। বাজার-
শুল্ক পরিপাটির সহিত সাজান রহিয়াছে। সিদ্ধনদ এই জনপদটির পাদদেশ বিধৌত করিয়া চলিয়াছে। সৈয়দ

(১) অধুনাতন বাঁহাকে শকর বলা যায়, সম্ভবতঃ তাহাকেই ভাকর নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই স্থানে মির মহম্মদ ভকরির সমাধি রহিয়াছে। বাঁহাকে খাজা খেজেরের খানকা বলা যায় সম্ভবতঃ ইহাই কসলু খাঁয়ের অতিথি নিবাস ছিল। আর বাঁহাকে সাধা বিলাহ বলা হয় এইটি হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন মন্দির বলিয়া বোধ হয়। এখনও হিন্দুগণ মন্দিরে গমন করতঃ পূজাদি করিয়া থাকেন। এ সময় শকর একটি বৃহৎ বন্দর। প্রায় ত্রিশ সহস্র লোকের বাস। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই সহর ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অধীনে আইসে।

(২) এই সহরটি বর্তমান ভাওয়ালপুর রাজ্যের নিকটস্থ পঞ্চনদ নদীর তীরে এবং মুলতান হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্বকালে পঞ্চনদ এই সহরের নিকটে সিদ্ধুর সহিত মিলিত হইত। বর্তমান সময়ে পঞ্চনদের পাঁচটি—নদী ইহা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে মটনকোটের নিকট যাইয়া মিলিত হইয়াছে। General Cunningham বলেন এই সহর সম্রাট সেকেন্দর স্থাপন করেন। মাসিরুদ্দিন কাবাচার সময়ে এই সহর সিদ্ধু প্রদেশের রাজধানী ছিল।

জালালউদ্দীন কাজী এখানকার শাসন কর্তা। তিনি একজন সাহসিক ও দয়ালু পুরুষ। তাঁহার সহিত পরিচয় হইলে আমি তাঁহার নিকটেই থাকিতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। যে সময় আমি দিল্লীতে ছিলাম সে সময়ও কয়েকবার আমাব সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সময় দিল্লীর সম্রাট দৌলতাবাদে (১) অবস্থান করিতেছিলেন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎমানসে জালাল দৌলতাবাদে গমন করেন। আমিও যাইতে প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু জালাল আমার গমনে বাধা দিয়া তথার তাঁহার কর্মচারীদিগকে বলিলেন যে ইহার খরচপত্রের বাহা আবশ্যক হয় তৎক্ষণাৎ প্রদান করিবে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমি প্রায় পাঁচ সহস্র টাকা অতি অল্প দিবসের মধ্যে ব্যয় করিয়াছিলাম। জালাল প্রত্যাগমন করিলে কর্মচারিগণ এই কথা তাঁহার কর্ণগোচর করায় তিনি আমার প্রতি বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই সহরে জালালউদ্দীন হযরত উবি (২) নামক একজন সাধুপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে একখানা খেরকা (প্রাচীন জামা) দিয়াছিলেন। এক সময়ে দহ্মাগণ কর্তৃক আমার অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্যের সহিত ঐ খেরকাটি অপহৃত হয়।

• ৩। মুলতান। (৩) ইতিপূর্বে আমার বোড়া ও অস্ত্রাস্ত্র-দ্রব্যাদি মুলতানে প্রেরণ করিয়া আমি অস্ত্রাস্ত্র-স্থান পরিভ্রমণ

(১) দৌলতাবাদ বা দেওগিরি। অতি প্রাচীন সহর। মহাম্মদ সা তোগলক দিল্লীরাজধানী এই সহরে আনিয়ন করেন। এখানকার দুর্গটি বেধিবার জিনিষ; প্রায় ১২০ ফিট উচ্চ।

(২) এই স্থানে সৈয়দ জালাল বোখারী ও মকদুম জাহানিয়া জাহাগত প্রভৃতি সাধুপুরুষগণের সমাধি অতি জীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বতুতার আগমন সময়ে মকদুম জাহানিয়া জীবিত ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নামই সৈয়দ জালাল বোখারি। বতুতা জুলবশতঃ জাহানিয়া জাহাগতকে সৈয়দ জালালুদ্দিন হযরত উবি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন মকদুম জাহানিয়া জাহাগতের সমাধি কনোজ নগরে রহিয়াছে।

(৩) মুলতান অতি প্রাচীন সহর। সম্রাট সেকেন্দরের সময় এই সহর মালি নামক এক জাতির রাজধানী ছিল। কিন্তু General Cunningham বলেন এই সহরে অতি প্রাচীনকাল হইতে খৃষ্ট দেবতার মন্দির আছে বলিয়া বিখ্যাত। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে আসি হিউন (Hiouen thsang) নামক বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিন্দুস্থানে আগমন করেন। সে সময় খৃষ্টদেবতার মন্দির বর্তমান ছিল। এই সময়ে মুলতান হুয়া পাঁচ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চাচনামা হইতে জানা যায় ৭১৪ খৃষ্টাব্দে মহাম্মদ কাসেম এই সহর অধিকার করেন। এই সময় বিদ্রাস নদী সহরের উত্তরপূর্বদিকে এবং রাবি দুর্গ ও সহরের মধ্যে প্রবাহিত ছিল।

করতঃ মুলতানাভিমুখে গমন করিলাম। পথিমধ্যে আমার বোড়া, চাকর ও অন্যান্য মাল পাইলাম। তখনও তাহার মুলতান পহুঁচিতে পারে নাই। পথিমধ্যে একটি ক্ষুদ্র নদী পাওয়া গেল। এই নদীতীর হইতে প্রায় দশ কোশ দূরে মুলতান অবস্থিত। নদীটী অত্যন্ত গভীর সেইজন্য নৌকা ভিন্ন পার হওয়া দুর্লভ। বাদশার তরফ হইতে নৌকার রীতিমত বন্দোবস্ত আছে। এই নদী পার হইবার পূর্বে প্রত্যেক প্রবাসীর দ্রব্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হয়। মালের মাণ্ডল স্বরূপ প্রত্যেক মালের সিকি অংশ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমার হিন্দুস্থানে আগমনের দুই বৎসর পবে বাদশা এই কর উঠাইয়া দেন। হিন্দুস্থান

৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বালাজরী এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়া বলেন “সিন্ধুবাণী হিন্দু-বাজিগণ এখানে আগমন করতঃ দাড়ি ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া মন্দির প্রবেশ করেন।” ৯২০ খৃষ্টাব্দের আবুজিন ও মহদি এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। ৯৫০ খৃষ্টাব্দের আসতখরী (Istakhri) লিখিয়াছেন “অন্ত কোন হিন্দু রাজা এই সহর অধিকার করিতে সাহসী হন না, পাছে মন্দিরের সম্মান নষ্ট হয়। তাঁহার সময় মন্দিরটী বাজারের চক ছিল। ৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ইবনে হাওকাল বলেন “মুস্তি মনুষ্য প্রকৃতির, একটি চবুতার উপর স্থাপিত। চকুতে বহুমূল্যের দুইটি অন্তর বসান রহিয়াছে। ইহার সর্বাপেক্ষ রক্তবর্ণের। কি দ্রব্যে প্রস্তুত তাহা অজ্ঞাত।” হাওকালের বর্ণনার কিছু দিবস পূত্র কারামত এই সহর অধিকার করতঃ মন্দির ধ্বংস করিয়া তৎস্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। যে সময় আবু রাইহান এদেশে আগমন করেন, সে সময় মন্দিরটী ছিল না বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখা যায়; কিন্তু ১১৩০ খৃষ্টাব্দের আওরঙ্গী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ে রাবি নদী সহরের নিকটে প্রবাহিত হইত।—১১৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনসময়ে “মেসিও-খাভি-নও” নামক জনৈক করাসী এদেশে আগমন করেন। তিনিও ইবনে হাওকালের মতের অনেক পোষকতা করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রবাদ আছে যে—এই মন্দির আওরঙ্গজেব কর্তৃক ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া হয়। General Cunningham বলেন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে দুর্গের সন্নিকটে ইহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তৈমুরের সময় রাবি কেলার উত্তরদিকে এবং ইহার একটি শাখা উত্তরের মধ্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত ছিল। বুলাদ পুরির মন্দির বাহা, এখন কেলার মধ্যে অবস্থিত, ইহার সহিত খৃষ্টামন্দিরের কোন সংশ্লিষ্ট নাই। সহরের পাঁচ মাইল দূরে যে খৃষ্টকর্তৃক মন্দির আছে সম্ভবতঃ এইটী খৃষ্টা-মন্দির হইতে পারে। এই সহর মধ্যে শাহ রুকনউদ্দিন জালালের সমাধি একটি দেখিবার জিনিষ। ইহার উচ্চতা ১০০ ফিট। কবরটী অত্যুচ্চ স্থানের উপর রহিয়াছে বলিয়া প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূর হইতে দেখা যায়। কথিত আছে মুলতান পেয়াসউদ্দিন তোগলক ঐ কবর নিজের জন্ত প্রস্তুত করাইয়াছিলেন কিন্তু তৎপুত্র মহাম্মদ সাহ তোগলক ঐ কবরমধ্যে রুকনউদ্দিনকে সমাধিত করেন। এই সহরের লোকসংখ্যা প্রায় আশি হাজার। বতুতা দশ কোশ পবে সম্ভবতঃ রাবি নদী পার হইয়াছিলেন। যদি তিনি চিনাব, বিলাম ও রাবি তিনটী নদী পার হইতেন তাহা হইলে ছোট নদী বলিতেন না।

গমনেচ্ছায় বহু লোক এই নদীর তীরে উপস্থিত রহিয়াছেন। আমার সঙ্গে কোনরূপ মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিল না বটে কিন্তু বাহা ছিল তাহা দেখিয়া একজন বড় লোক বলিয়া বোধ হইতেছিল। যখন আমার দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিবে সে সময় আমাকে লক্ষ্য পড়িতে হইবে বলিয়া চিন্তিত হইতে হইল। বাহা হউক খোদাতালা শীঘ্রই সে চিন্তা দূর করিলেন। মুলতানের হাকিম কুতবল মালেক আমার আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া একজন সিপাহী প্রেরণ করেন। কেহ যেন আমার মালপত্র পরীক্ষা না করে সে তাহার জন্য বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্বে নদী পার হইয়া সেই নদীতীরে রাজিযাপনের বন্দোবস্ত করিলাম। পরদিবস প্রাতঃকালে বাদশার আধবার নবিস ও ডাকের সরদার দেহকান সমরকন্দ আমাকে সঙ্গে করিয়া মুলতানাভিমুখে লইয়া চলিলেন। আমি মুলতানে পহুঁছিয়া প্রথম কোতবল মালেকের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি বিছানা হইতে উঠিয়া আমার অভ্যর্থনা করিলেন এবং আপন পার্শ্বে বসিবার আস্তা দিলেন। সেই সময় আমি তাঁহার সম্মুখে উপচোকন স্বরূপ একটা গোলাম একটা ঘোড়া কিসমিস ও বাদাম উপস্থিত করিলাম। বাদাম কিসমিস এদেশে জন্মে না খোরাসান হইতে আনা হইয়া থাকে। কোতবল মালেক একটা চবুতারার উপর কাক-কার্য্যখচিত সুন্দর মসনদের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে সহরের কাজী, সিপাহসালার, খতিব ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটা বিজৃত মরদানে সৈন্তগণ তীর, ধনুক, ঘোড়া প্রভৃতি যুদ্ধসামগ্রী লইয়া আপন আপন যুদ্ধকোশল দেখাইতেছিল। কোতবল মালেক প্রত্যেক সৈনের যুদ্ধকোশল দেখিয়া তাহাদের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি করিতেছিলেন। তৎপর তিনি আমাকে সেখ রুকন দ্বিন কোরেসীর নিকট অবস্থান জন্য স্থান নির্দিষ্ট করিয়া যাইতে অনুমতি দিলে আমি তথা হইতে গমন করতঃ উক্ত সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলাম। রুকনউদ্দিন কোরেসী একজন সম্ভ্রান্ত খোরাসানবাসী, বাদশার দরবারে থাকিব জন্য এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ছায় আরও বহু সম্ভ্রান্ত লোক ঐ উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন।

ইহাদের মধ্যে খোদাওয়ান্দজাদা কেয়ামদ্দিন (১) বোরহান উদ্দিন, এমাদ উদ্দীন, জিয়া উদ্দিন, মোবারক নামক অনেক সমরকন্দের জমিদার, প্রভৃতি লোক গুলিই প্রধান। ইহাদের সঙ্গে বজুবাকব ও চাকর প্রভৃতি আবও বহু লোক ছিল। আমার আগমনের পর দিল্লী হইতে সম্রাট খোদাওয়ান্দজাদাকে অভ্যর্থনার সহিত দিল্লী গমন জন্য খেলাত সহ বসনজী নামক জনৈক হাজব (চোবদার) এবং মহাম্মদ হারদি নামক জনৈক কোতয়ালকে প্রেরণ করেন। এতৎ সঙ্গে সম্রাটজননী মকছুমিয়া জাহান (২) তাঁহার পরিবারদিগের জন্য পৃথক খেলাতসহ আরও কতকগুলি লোক প্রেরণ করেন। তাহারা মুলতানে আগমন করার পর খোদাওয়ান্দজাদার দিল্লী গমনের দিন স্থির করা হয়। তাঁহার সঙ্গে আমাদেরও গমনের হুকুম হয়। দিল্লী গমনের পূর্বে দিবসে জনৈক কস্মচারী একখানি ফারমে আমাদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর লওয়ার জন্য উপস্থিত হইলে আমরা সকলে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলাম। অনেকে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সম্রাটের আদেশ আছে “যদি কোন বিদেশী এদেশে আগমন করতঃ বসবাস করিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দিল্লী অভিমুখে যাইতে দেওয়া হয় না, (৩)।” আমরা বসবাস করিতে স্বীকৃত হওয়ার স্বাক্ষর লওয়া হইল। আমরা দিল্লী গমন জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। মুলতান হইতে দিল্লী ৪০ দিবসের পথ।

৪। দস্তবখান। (৪) যখন আমরা দিল্লী অভিমুখে গমন কবিত্তে লাগিলাম, তখন আমাদের পথের আহারের রীতিমত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক নির্দিষ্ট স্থানে

(১) কেহেস্তা লিখিয়াছেন “ঐ সময় বোর রাজবংশধরগণকে খোদাওয়ান্দজাদা এবং আকাসির রাজবংশধরগণকে মখদুমজাদা বলা হইত।”

(২) সম্রাট জননীকে সে সময়ে মকছুমিয়াজাহান বলা হইত।

(৩) ইহাতে অনুমান হয় বিদেশীদিগকে উচ্চপদস্থ কার্যে নিযুক্ত করা কেবল যে বাদশার উদ্দেশ্য তাহা নহে বরং যাহাতে তাঁহার সপরিবার এদেশে বসবাস করতঃ ইসলাম ধর্ম বিস্তার করেন ইহাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। এই জন্য খোদাওয়ান্দজাদা ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র, সেখ মুসা প্রভৃতি রাজবংশধরগণ সিওয়ান প্রদেশের জাজিরির সহর হইতে সপরিবারে এদেশে আগমন করেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে রোহটাক ও মিরাতের কাজীর পদ প্রদান করতঃ তথায় বসবাস করিতে আজ্ঞা দেন।

(৪) আহারের সময় যে কাগড় বহাইয়া তাহার উপর আহারীয় সামগ্রী রাখিয়া আহার করা হয় তাহাকে দস্তবখান বলে।

আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছিল। খোদাওয়ান্দজাদার সহিত একত্রে বসিয়া সকলকে আহার করিতে হইত। মুলতান হইতে এক মনজেল গমনের পর যে প্রকার আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রথমে একখানি দস্তরখান বিছাইয়া তাহার চতুর্পার্শ্বে আমাদিগকে বসিতে অনুমতি করা হয়। আমরা বসিলে প্রত্যেককে বোপা ও কাচ নির্মিত গেলাসে মিছরি ও গোলাবের সরবৎ পান করিতে দেওয়া হয়। তৎপরে এক একখানি বাসনে ৫১৬খানি করিয়া পাতলা চাপাতি কুটী, ছাগমাংস ভাজা, পারাঠা, হালুয়া খসতি (ইহা আটা চিনি ও স্নাত দিয়া প্রস্তুত) ৪৫ খণ্ড সমছা (ইহা আমি পূর্বে কখন খাই নাই) গোলাও কোরমা প্রভৃতি দেওয়ার শেষে হাজব “বিস্মিল্লাহ” বলিয়া সকলকে আহার করিতে অনুমতি দিলেন। আহারশেষে পান ও জুপারি দিয়া সকলকে নির্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। আমরা একে একে বিশ্রামাগাবে গমন করিলাম। বিশ্রামান্তে আবুহর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম।

৫। আবুহর। (১) মুলতান হইতে গমন করিয়া এই সহরে উপনীত হইলাম। সহরটা ছোট বটে কিন্তু অতি সুন্দর। এই সহরের অধিকাংশ স্থানে কুল বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। ফলও অপরিপাক্ত রহিয়াছে। ফলগুলি দেখিতে মাদু ফলের জায়। আমাদের দেশে যে সকল কুল জন্মে, ইহা তাহা অপেক্ষা বৃহৎ ও খাইতে সুস্বাদু।

৬। হিন্দুস্থানের ফল।

(ক) জামুন (জাম) এই ফল দেখিতে জামুন ফলের জায় কিন্তু রঙটা সামান্য কাল।

(খ) কাঁটাল। এই ফল দুই প্রকারের হয়, যে ফল

মূলে জন্মে তাহাকে “বরকী” বলে ইহা খাইতে সুস্বাদু। বৃক্ষোপরি যে ফল জন্মে তাহাকে “চুকি” বলে।

(গ) কসেরহ (কেশুর)। এই সকল পুষ্করিণীতে জন্মে। যখন পুষ্করিণীর জল শুষ্ক হইয়া যায় সেই সময় মৃত্তিকা খনন করতঃ ঐ ফল উদ্ধোলন করিয়া থাকে।

(ঘ) মহুয়া। এই ফলের বৃক্ষগুলি বৃহৎ বৃহৎ, পাতা-গুলি আখরোটের পাতার জায় কিন্তু দীর্ঘ লাল ও হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত। ফলগুলি আলুবোখারার জায় হইয়া থাকে। এই ফলের মুখে কিসমিসের জায় অন্য একটা দানা (১) থাকে। ইহাব আশ্রাদ আঙ্গুর ফলের জায়। অধিক খাইলে মাথা ঘুরে। এই বৃক্ষ বৎসরে দুইবার ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। ইহার বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া প্রদীপে জ্বালান হইয়া থাকে।

(ঙ) আনাব। আমাদের দেশের জায় হিন্দুস্থানে আনার জন্মিয়া থাকে। এদেশে আনার অর্থাৎ দড়িম বৃক্ষ হইতে বৎসরে দুইবার ফল পাওয়া যায়। জন্মিবে দেবত অল মহলে (মালদ্বীপ) আনার বৃক্ষ প্রায় বার মাসই ফলোৎপাদন করিয়া থাকে।

(চ) রক্তরাহ (কমলালেবু) (২)। এই ফল আমি আগ্রের সহিত খাইতাম।

(ছ) আম। (৩) এই ফল হিন্দুস্থানের সকল ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আম পাকিলে হরিদ্রাবর্ণের হয়। ঝড়বৃষ্টিতে কাঁচা ফল পড়িয়া গেলে তাহার আচার (৪) প্রস্তুত করে। আমাদের দেশে যে প্রকারে লেবুর ও লঙ্কার আচার প্রস্তুত করে হিন্দুস্থানবাসীও সেই প্রকারে আচার প্রস্তুত করে।

(১) বতুতা মহয়ার ফল এবং ফুল নির্দেশ করিতে পারেন নাই। তিনি যে দানাকে কিসমিসের জায় বলিয়াছেন সেইটা মহয়ার ফুল। ঐ ফল শুষ্ক হইয়া ফলের মুখে লাগিয়া থাকে। মহয়ার ফুলে এক প্রকার মারক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(২) কমলালেবুর অনেক নাম আছে যথা :—সদতরাহ, নারঙ্গ ও তরঙ্গ, নারঙ্গী, করনাহ, কাওলা, গুল গুল প্রভৃতি।

(৩) কবির আমির খসরু আম ও আচারের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যথা—

“নগজে কুনমা নগজে কুন বোস্তান
নগজে তেরিন মে’ওয়ে হিন্দুহান”

(৪) আচার সম্বন্ধে—“লোকমা না রওয়ার জেরে আগার আচার না ইয়াবী।”

বতুতার আগমনের নয় বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১২৫ হিজরীতে কবিরের মৃত্যু হয়।

(১) বতুতা এই সহরটা মুলতান ও পাকপটনের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথবা কিরোজপুর জেলার কামিলকার নিকটবর্তী পাকপটনের ৬০ মাইল পূর্বে আবুহার নামক এক জনপদ রহিয়াছে। বতুতা যে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আবুহরের নিকটই তেলঙী নামক স্থানে রাজপুত রাজা রাণামল অবস্থান করিতেন। এই রাজার কন্যাকে সালাব রজত (কিরোজ শাহের পিতা বা মহানন্দ ভৌপলকের পিতৃব্য) বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পর্বে কিরোজ শাহের প্রয়াস হয়। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস “তারিখ কিরোজ শাহী”তে উল্লেখ আছে।

৭। আবিবকহর। (১) আমরা আরব ও অজমবাসী ২২ জন অশ্বারোহী বেলা দুই প্রহরের সময় আবুহর হইতে গমন করতঃ সন্ধ্যাকালে একটা ময়দানে উপনীত হইলাম। আমাদের অস্ত্রাস্ত্র সজ্জিগণ পূর্বেই গমন করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে পর্কত রহিয়াছে। এই সকল পর্কতোপরি দস্যুগণ অবস্থান করিয়া থাকে। আমরা যে সময়ে এই ময়দানে উপস্থিত হইলাম সেই সময় অনেকগুলি দস্যু আসিয়া আক্রমণ করিল। আমরা সকলে জুইপৃষ্ঠ ও সাহসিক ছিলাম। তাহারা সম্মুখে না আসিয়া দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কয়েকটা তীর আমার শরীরে ও আমার অশ্ব-শরীরে লাগিয়াছিল। তীরগুলি মজবুত ছিলনা বলিয়া অধিক আহত হই নাই। একজন সঙ্গী ঘোড়া তীরে আহত হইয়া মরিতেছে দেখিয়া তাহাকে জবহে করিয়া দিলাম। আমাদের সঙ্গে একজন তুর্কী লোক ছিলেন। তিনি ঐ ঘোড়ার কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই দস্যুদলের সহিত আমাদের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হয়। ইহাতে আমরা সকলে সামান্য সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া-ছিলাম। আমি ঐ দস্যুদলের ১২ জনকে নিহত করিয়া-ছিলাম। এই বিপদে পড়িয়া আমাদের আবিবকহর পহঁছিতে রাত্রি ত্রিপ্রহর লাগিয়াছিল। এই সহরে দুই দিবস অবস্থানের পর অজমখানাভিমুখে গমন করিলাম।

৮। অজমখান (পাকপটন) (২) অজমখান একটা ক্ষুদ্র সহর। হিন্দুস্থানের বাদসা সেখ ফরিদ উদ্দিনের শিষ্য ছিলেন, তিনি গুরুর উপভোগের জন্ত এই সহর গুরুকে প্রদান করিয়া ছিলেন।

(১) পাকপটন হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে ও জেলা হুলতানের পুরাতন সড়কের ধারে মোড়ে দোহাগুর নিকটে আবুবকর দাকাকী নামক জনক মহাশ্বার সমাধি রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই স্থানই আবিবকর হইবে। এখানে চৈত্র মাসে একটা মেলা হইয়া থাকে, প্রায় দশ বার হাজার লোকের সমাগম হয়। কিন্তু বতুতা এই মহাশ্বার সমাধি সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, সেই জন্ত আমাদের সন্দেহ রহিয়া গেল। আবুবকর দাকাকী একজন যোগিশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। দুঃখের বিষয় যে তাঁহার সমাধি কোথায় আছে তাহার স্থান আজ পর্য্যন্ত কেহই নির্দেশ করেন নাই।

(২) পাকপটনের প্রাচীন নাম অজমখান। এই স্থানে বাবা ফরিদ-উদ্দিন সফরগঞ্জের সমাধি রহিয়াছে। ফরিদ এই স্থানকে পটন নামে অভিহিত করিতেন বলিয়া সম্রাট আকবর এই স্থানকে পাকপটন বলিতেন। অধুনা এই সহর শতদ্রু হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

একদা বুঝাহুদ্দিন ইসকন্দরী আমাকে বলিয়াছিলেন যে “অজমখানে তোমার সহিত সেখ ফরিদউদ্দিনের * সাক্ষাৎ হইবে তাঁহাকে আমার অভিবাদন জানাইবে।” ঈশ্বরানুগ্রহে এই স্থানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সেখ সদাসর্বদা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সেই জন্ত একপ্রকার লোকসহবাস ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলেই হয়। যদি কাহারও বজ্রাঘ্র দৈবাৎ তাঁহার বস্ত্রে স্পৃষ্ট হইত তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ নিজেই ধৌত করিয়া কেলিতেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিলাম এবং সেখ বুরহান উদ্দিনের অভিবাদন জ্ঞাত করিলাম। সেখ স্তনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্তর দিলেন যে তিনি অস্ত্র কাহাকে অভিবাদন দিতে বলিয়াছেন। অনন্তর তথা হইতে গমন করিয়া তাঁহার দুই পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ইহার উত্তরে বিধান ও জ্ঞানী লোক। জ্যেষ্ঠের নাম মা-আ-জমিন এবং কনিষ্ঠের নাম আলমউদ্দিন। জ্যেষ্ঠ মা-আ-জমিন পিতার মৃত্যুর পর পিতৃস্থানে সমাসীন হন। ইহার পিতামহ সেখ ফরিদউদ্দিন সফরগঞ্জের † সমাধি জিয়ারত করিলাম। এই নগর হইতে যাত্রাকালে আলমউদ্দিন বলিলেন আমার পরম গুরু পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাও। সেই সময় তাঁহার পিতা বাটীর একটা উচ্চ ছাদের উপর সমাসীন ছিলেন। তাঁহার পরিধানে শ্বেতবস্ত্র ও

প্রথমে এই সহরের পাদদেশ দিয়া শতদ্রু নদী প্রবাহিত হইত। বাত্রিগণ মূলতান হইতে দিল্লী আগমনকালে এই স্থানে নদী পার হইতেন। এতদে পাকপটন জেলা মণ্ডগমারীর অধীনস্থ একটা মহকুমা। এতোক বৎসর মহরম মাসে বাবা ফরিদের সমাধির নিকট একটা বড় মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রায় ৩০০৭০ হাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। সহরের লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। আইন আকবরীতে ইহাকে কেবল “পটন” ও ফেরেস্তা “পটন বাবা ফরিদ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

* যে সময়ে বতুতা এই সহরে আগমন করেন সেই সময়ে বাবা ফরিদউদ্দিন সফরগঞ্জের পৌত্র সেখ আলাউদ্দিন মওজ দেহিয়ারী পিতামহের স্থানে সমাসীন ছিলেন। বতুতা যে দুইজন পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা আলাউদ্দিনের পুত্র। সেখ আলাউদ্দিন হুলতান মহাম্মদ তোপলকের গুরু ছিলেন। ৭৩৪ হিজরায় আলাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে মহাম্মদ তোপলক মালেক কবুলাই নামক জনক কর্ণচারীর উপর আলাউদ্দিনের সমাধি নির্ধারণের ভার দেন। বতুতা ভ্রমবশত সেখ আলাউদ্দিনের নামের পরিবর্তে সেখ ফরিদউদ্দিনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

† বাবা সেখ ফরিদউদ্দিন সফরগঞ্জ ৮৩৪ হিজরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৭০ হিজরাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মন্তকোপরি একটা বৃহৎ পাগড়ী, ঐ পাগড়ীর একাংশ ছাদের নিম্নে ঝুলিতেছিল। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি আশীর্বাদ করতঃ আমার জন্ত মিছবি উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাহা গ্রহণ করতঃ নগরাভ্যন্তরভিত্তিতে গমন করিলাম।

২। সতীদাহ। * তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করতঃ নগরাভ্যন্তরে গমন করিয়া দেখিতে পাইলাম কতকগুলি লোক দলবান্ধিয়া গমন করিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে আমার সঙ্গীগণকেও দেখিলাম। তাহাদিগকে এক্রূপ দল বান্ধিয়া গমনের কাৰণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম একজন হিন্দু জ্ঞী স্বামীর মৃতদেহের সহিত দগ্ধ হইল। জ্ঞীলোকটী স্বামীর মৃতদেহের সহিত জড়িত হইয়া অগ্নিমধ্যে দগ্ধ হইয়াছিল। ইহারা তাহা দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন।

আমি আরও একসময় একজন হিন্দু জ্ঞীলোককে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম ঐ জ্ঞীলোকটির স্বামী মরিয়া গিয়াছে, সে তাহার স্বামীর মৃতদেহের সহিত দগ্ধ হইবে। যে স্থানে চিতা প্রস্তুত হইয়াছে অশ্বপৃষ্ঠে তথায় গমন করিতেছে। আবরোহী† সহরে থাকা কালে আমি স্বচক্ষে যে সতীদাহ দেখিয়াছি তাহার বর্ণনা করিতেছি। এই সহরের অধি-

* আবুল কজল লিখিয়াছেন হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে জ্ঞীর স্বামী মরিয়া যার তাহার উচিত আলোদের সহিত স্বামীসহ দগ্ধ হওয়া। কিন্তু সাধারণে তাহাকে ঐ কার্য হইতে বিরত রাখিবে। বিধবাপণ বৈধব্য-বস্থায় জীবিত থাকি অপেক্ষা স্বামীর সহিত দগ্ধ হওয়া মঙ্গল বিবেচনা করেন। আরও লিখিয়াছেন সতীদাহ হওয়ার পাঁচটা কারণ আছে যথা—১ম। অধিক ভাবনা উপস্থিত হইলে আত্মীয়গণ লইয়া গিয়া দাহ করিয়া ফেলে। ২য়। ভালবাসার নিমিত্ত খেচ্ছায় দগ্ধ হয়। ৩য়। লজ্জাবশত দগ্ধ হয়। ৪র্থ। সামাজিক রীতি অনুসারে। ৫ম। স্বামীর আত্মীয়গণ জোর পূর্বক দাহ করিয়া ফেলেন। ষষ্ঠীর কারণ ব্যতীত অজ্ঞানরূপে দাহ করিতে হইলে বাবসার হুকুম লইতে হইত।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লর্ডবেন্টল এই প্রথা রহিত করেন।

† সিন্ধু প্রদেশে রোচহী জেলার অধীনস্থ “ওবাওর” নামক যে একটা মহকুমা রহিয়াছে সম্ভবতঃ বতুতা ঐ স্থানকে আবরোহী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে এই সহর ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করা হয়। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত একটা মসজিদ আজও বর্তমান রহিয়াছে। সহরের লোকসংখ্যা প্রায় তিনসহস্র। আইন আকবরিতে সরকার মূলতামে “আবাওরা” নামক একটা স্থানের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইহাও হইলে হইতে পারে।

কাংশ লোক হিন্দু অধিবাসী। এখানকার কাজী সামান্য সম্প্রদায়ের একজন মুসলমান। হিন্দু অধিবাসিগণ সর্বদা কাজীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। সেই জন্ত বাদশার কতকগুলি সৈন্য তথায় অবস্থান করিত। এক দিবস হিন্দুদের সহিত যোঁরতর যুদ্ধারম্ভ হয়। অনেক হিন্দু মারা যায়। তাহাদের মধ্যে তিন জন লোককে তিনটা জ্ঞী আপন আপন স্বামীর সহিত দগ্ধ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই সংবাদ বাদশার নিকটে প্রেরণ করা হয়। প্রায় এক মাস গতে বাদশার হুকুম পঁহছিলে তাহার দগ্ধ হইবার তিন দিবস পূর্বে নানা প্রকাব আমোদ প্রমোদ ও নানা প্রকার সুখাশ্রয় আহার করিতে লাগিল। অজ্ঞাত হিন্দু জ্ঞীলোকগণ আসিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে লাগিল। চতুর্থ দিবসে নানা প্রকার বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া তিনজনে পৃথক পৃথক তিনটা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ বাম হস্তে একটা নারিকেল এবং অপর হস্তে একটা আরসি গ্রহণ করতঃ দৃষ্টচিন্তে বার বার মুখ দর্শন করিতে করিতে চিতাভিত্তিতে গমন করিতে লাগিল। তাহাদের আত্মীয়গণ অশ্ববলগা ধারণ করতঃ অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। অগ্র পশ্চাতে ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাজিতেছিল। অজ্ঞাত হিন্দুগণ তাহাদের নিকটে গমন করিয়া আপন মৃত আত্মীয়কে তাহাদের অভিবাদন জানাইবার জন্ত অনুরোধ করিতেছিল। জ্ঞীলোকগণ “আচ্ছা” বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিতেছিল। ইহাদের সঙ্গে বাদসার সিপাহীগণও ছিল। দাহক্রিয়া দেখিবার জন্ত আমরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। অবশেষে তিন ক্রোশ চলার পর একটা নিবিড় অন্ধকার বিশিষ্ট অরণ্যমধ্যে সকলে প্রবেশ করিলাম। অরণ্য-মধ্যে চারিটা মন্দির। তৎপার্শ্বে অন্ধকার ও ভূর্গন্ধময় জলে পরিপূর্ণ একটা কূপ রহিয়াছে। পৃথিবী মধ্যে কূপটি যে নরক তাহাতে সন্দেহ নাই। কূপের নিকটে একটা গর্ভ মধ্যে চিতা প্রস্তুত রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অগ্নিতে সর্বপ তৈল দেওয়া হইতেছে। অগ্নি আরও অধিক ধূ-ধু করিয়া জ্বলিতেছে। চারিজন লোক একটা কাঁথার চারিটা কোণ ধারণ করতঃ চিতাটী ঢাকিয়া রাখিয়াছে পাছে অগ্নি দেখিয়া জ্ঞীলোকেরা ভয় পায়। সেই সময় ঐ তিন জন

জীলোক মধ্যে একজন আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাঁথাটী কাড়িয়া লইয়া বলিতে লাগিল “আমরা জানি না কি যে উহার মধ্যে অগ্নি জলিতেছে? তবে কেন অনর্থক ঢাকিয়া রাখিয়াছ।?”

অবশেষে তিন জন জীলোক অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ দেহ হইতে একে একে সমস্ত গহনাগুলি খুলিয়া ফেলিয়া একখানি মোটা কাপড় পরিধান করিয়া কূপ মধ্যে দ্বান করিতে লাগিল। দ্বান শেষ হইয়া গেলে একে একে চিত্তার নিকটবর্তী হইয়া অগ্নিকে অভিবাদন করতঃ কুণ্ড-মধ্যে ঝম্প প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে প্রত্যেকে কুণ্ডমধ্যে ঝম্প দিল। ঢাক ঢোল দ্বিগুণ রবে বাজিতে লাগিল। দর্শকগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কাহারও মুখে কথাটি পর্দা নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে কার্য শেষ হইয়া গেল। তাহাদের আত্মীয়গণ বড় বড় কাষ্ঠখণ্ড ও তৈল অনবরত প্রদান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমি অজ্ঞান হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িতেছিলাম এমন সময় আমার সঙ্গী বুকিতে পারিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলেন এবং জল দ্বারা মুখাদি ধৌত করিয়া দেন। অতঃপর আমরা তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলাম। হিন্দুজাতি এই প্রকারে আপন দেহ গঙ্গামধ্যে ও ডুবাইয়া দেয়। গঙ্গানদী ইহাদের পরম তীর্থস্থান। তাহাদের বিশ্বাস স্বর্গের সহিত এই নদীর যোগ আছে। যদি কেহ গঙ্গামধ্যে ডুবিলে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পূর্বেই সকলকে বলিয়া রাখে “আমি সাংসারিক কোন প্রকার কষ্টে পড়িয়া ডুবিতেছি তাহা নহে বরং গোস্বামীর (ঈশ্বরের) সন্তোষসাধনার্থে ডুবিতেছি।” সেই ব্যক্তি ডুবিয়া মরিয়া গেলে তাহার আত্মীয়গণ মৃতদেহ উঠাইয়া বাহ করিয়া ফেলে।

১০। সুরসতী (সরসাহ) *। অজ্ঞান হইতে

* পুরাতন ঐতিহাসিকগণ “সরসাহকে” সুরসতী নামে উল্লেখ করিতেন। আবুল ফজল সরসাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সুরসতী সরসতী (সারস) নদীর তটে রহিয়াছে বলিয়া ইহাকে সুরসতী বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন সারস নামে এক রাজা এখানে বাস করিতেন সেই অস্ত্র ইহাকে সুরসতী নামে অভিহিত করিয়া থাকে কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে মেজর থারসপী ইহার নিকটে আর একটি সহর স্থাপন করেন, ইহাকেও ঐ নামে অভিহিত করা হয়। অধুনা ইহার লোক সংখ্যা ১৭ সহস্রের অধিক। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের দ্বিত্তিকে পুরাতন সুরসতী ধ্বংস হইয়া যায়। নূতন সহরের

সুরসতী সহরে গমন করিলাম। সহরটী অতি বৃহৎ। এখানে ধাতু প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। চাউলও অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত। সামসদ্দিন বসুনজী প্রমুখাৎ শুনিলাম এখানকার চাউল দিল্লীতে অতি মহার্ঘ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

১১। হানসী *। সুরসতী হইতে গমন করিয়া হানসীতে পহঁছিলাম। সহরটী অতি সুন্দর। প্রবাদ আছে একজন হিন্দু রাজা এই সহর স্থাপন করিয়াছিলেন। কাজী কামালউদ্দিন ও তাহার ভ্রাতাশ্বয় (কতলু খাঁ ও সামসদ্দিন) এই সহরের অধিবাসী ছিলেন। কতলু খাঁ বাদশার শিক্ষক ছিলেন। সামসদ্দিন মক্কা গমন করিয়া তথায় বাস করেন এবং মক্কাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

১২। মসুদাবাদ ও পালম। † দুই দিবস চলার পর মসুদাবাদে পহঁছিলাম। এই সহর হইতে দিল্লী ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বাদশা মালেক হোসেনকে হানসী ও মসুদাবাদ জায়গীর প্রদান করিয়াছেন। মসুদাবাদে

উত্তরপূর্ব কোণে পুরাতন সহরের ধ্বংসাবশেষ আঁকু দেখা যায়। ধার্মা নদীর একটা শাখা ইহার পার্শ্বদিয়া প্রবাহিত হইতেছিল কিন্তু এখন ঐ শাখা বালুকাপূর্ণ হওয়ার বশত হইয়া গিয়াছে।

বড়তীর সমরে এখানে ধাতু প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। এখনও প্রচুর পরিমাণে ধাতু জন্মে বটে কিন্তু চাউল ২০ ভাল হয় না। পূর্বে এই সহরে সোবোরার অবস্থান করিতেন। ফিরোজসাহ হোসার সহর স্থাপন করিলে সোবোরার ঐ সহর পরিত্যাগ করিয়া হোসারে অবস্থান করিতেন।

* এই সহর হিসার জেলার অধীনস্থ একটি মহকুমা। লোক সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। কথিত আছে অনঙ্গপাল এই সহরের স্থাপনকর্তা। এখানকার কেল্লাটি পৃথোরারের তৈয়ারী। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের দ্বিত্তিকে সহরটী ধ্বংস হইয়া যায়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জর্জ টমাস পুনঃস্থাপন এবং কেল্লাটির নঃ নির্মাণ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এই সহর ইংরাজ আধিকারভুক্ত হয়। হুলতান মহম্মদ গজনী, হুলতান মহম্মদ গজনী ও সাহাবুদ্দিন গোরির সময় কেল্লাটি দৃঢ় ছিল। আইন আকবরীতে এই কেল্লার উল্লেখ আছে।

† আকবর বাদশার সময়ও এই সহর বর্তমান ছিল। আইন আকবরীতে উল্লেখ আছে যে এখানে একটি পুরাতন দুর্গও ছিল। হানসী হইতে মসুদাবাদ ৬০ মাইল দূরবর্তী। এখন বোধ হইতেছে বড়তা ও তাঁহার সঙ্গিগণ প্রতিদিন ৩০ মাইল পথ গমন করিতেন। মসুদাবাদ, দিল্লী ও সুরসতী পথে নাই। মালেক হোসেন নামক যে ব্যক্তি ধোদাওয়াল জাদার অভিযানার্থে গমন করিয়াছিলেন, মসুদাবাদ ও হানসী তাঁহার জায়গীর ছিল বলিয়া তিনি ঐ পথে তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন। “সামস সিরাজ” ফিরোজসাহের সিন্ধু হইতে দিল্লী আগমনের যে পথ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সাধারণতঃ রোহটাক, মহম ও হানসী মধ্য দিয়া যে সড়ক ছিল।

• পালম। এই গ্রামটি এখনও দিল্লীর নিকটে রহিয়াছে।

পঁছিয়া গুনিতে পাইলাম বাদশা কনোজে গমন করিয়াছেন। দিল্লী হইতে কনোজ দশ মনজেল দূরে অবস্থিত। দিল্লী হইতে বাদশাব মাতা মথুরা জাহান ও মন্ত্রী খাজে জাহান আহাম্মদ আমাদের অভ্যর্থনার্থে সেথ বোসতানী, সেরিফ মাজেদানী, জহীবউদ্দিন জনজানী প্রভৃতি অনেক লোককে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের মস্জদাবাদে পঁছিয়া সংবাদ ডাকযোগে বাদশার নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তাঁহার উত্তর না আসা পর্যন্ত ৩ দিবস তথায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কনোজ হইতে সংবাদ পঁছিয়া আমাদের দিল্লীঅভিমুখে গমন করিবার আজ্ঞা দেওয়া হয়। মস্জদাবাদ হইতে গমন করিয়া পালম নামক একটা গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইলাম। বাদশা তাঁহার সহচর নাসিকদিনকে এই গ্রামটা জায়গীর প্রদান করিয়াছেন।

মহাম্মদ হাকিমজল হোসেন।

গোরা ।

৪০

বরদাসুন্দরী তাঁহার ব্রাহ্মিকাবন্ধুদিগকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহাদের ছাত্তের উপবেই সভা হইত। হরিমোহিনী তাঁহার স্বাভাবিক গ্রাম্য সরলতার সহিত মেয়েদের আদর অভ্যর্থনা করিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু ইহা বা যে তাঁহাকে অবজ্ঞা কবে তাহা তাঁহার কাছে গোপন রহিল না। এমন কি, হিন্দুদের সামাজিক আচার ব্যবহাব লইয়া তাঁহার সমক্ষেই বরদাসুন্দরী তীব্র সমালোচনা উত্থাপিত করিতেন এবং অনেক রমণী হরিমোহিনীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সেই সমালোচনার যোগ দিতেন।

সুচরিতা তাহার মাসীর কাছে থাকিয়া এই সমস্ত আক্রমণ নীরবে সহ্য করিত। কেবল, সেও যে তাহার মাসীর দলে, ইহাই সে যেন গায়ে পড়িয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত। বেদিন আহাবের আয়োজন থাকিত সেদিন সুচরিতাকে সকলে খাইতে ডাকিলে সে বলিত—“না, আমি খাইনে।”

“সে কি ! তুমি বুঝি আমাদের সঙ্গে বসে থাকে না !”

“না।”

বরদাসুন্দরী বলিতেন, “আজকাল সুচরিতা যে মন্ত

হিঁছ হয়ে উঠেচেন তা বুঝি জান না। উনি যে আমাদের ছোঁয়া খান না।”

“সুচরিতাও হিঁছ হয়ে উঠলো ! কালে কালে কতই যে দেখতে হবে তাই ভাবি।”

হরিমোহিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিতেন, “রাধারাণী, মা, যাও মা। তুমি ধৈর্যে যাও মা।”

দলের লোকের কাছে যে সুচরিতা তাঁহার জন্ত এমন করিয়া খোঁটা খাইতেছে ইহা তাঁহার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুচরিতা অটল হইয়া থাকিত। একদিন কোনো ব্রাহ্মমেয়ে কোতূহল বশত হরিমোহিনীর ঘরের মধ্যে জুতা লইয়া প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সুচরিতা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“ও ঘরে যেয়ো না।”

“কেন ?”

“ও ঘরে ঠাকুর আছে।”

“ঠাকুর আছে ! তুমি বুঝি রোজ ঠাকুর পূজা কর।”

হরিমোহিনী বলিলেন—“হাঁ, মা, পূজা করি বই কি !”

“ঠাকুরকে তোমার ভক্তি হয় ?”

“পোড়া কপাল আগার। ভক্তি আর কই হল ? ভক্তি হলে ত বেঁচেই যেতুম।”

সেদিন ললিতা উপস্থিত ছিল। সে ঝুঁক লাগ করিয়া প্রশ্ণকারিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি যার উপাসনা কর তাঁকে ভক্তি কর ?”

“বাঃ ভক্তি করিনে ত কি।”

ললিতা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, “ভক্তি ত করই না, আর, ভক্তি যে কব না, সেটা তোমার জানাও নেই।”

সুচরিতা বাহাতে আচার ব্যবহাবে তাহার দল হইতে পৃথক না হয় সেজন্ত হরিমোহিনী অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

ইতিপূর্বে হাবান বাবুতে বরদাসুন্দরীতে ভিতবে ভিতবে একটা বিবোধের ভাবই ছিল। বর্তমান ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে খুব মিল হইল। বরদাসুন্দরী কহিলেন, যিনি যাই বলুন না কেন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে বিগুহ্ন রাখিবার জন্ত যদি কাহারো দৃষ্টি থাকে ত সে পালু বাবুর। হারান বাবুও, ব্রাহ্মপরিবারকে সর্বপ্রকারে নিষ্কলঙ্ক

রাখিবার প্রতি বরদাস্থন্নরীর একান্ত বেদনাপূর্ণ সচেতনতাকে ব্রাহ্মগৃহিণী মাত্রেয়ই পক্ষে একটি স্মৃষ্টীকৃত বলিয়া সকলের কাছে প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই প্রশংসার মধ্যে পরেশ বাবুর প্রতি বিশেষ একটু খোঁচা ছিল।

হারান বাবু একদিন পরেশ বাবু সম্মুখেই স্মৃতিরত্নকে কহিলেন, “শুনলুম না কি আজকাল তুমি ঠাকুরের প্রসাদ খেতে আরম্ভ করেচ ?”

স্মৃতিরত্নার মুখ লাল হইয়া উঠিল কিন্তু যেন সে কথাটা শুনিতেনই পাইল না এমনভাবে টেবিলের উপরকার দোয়াতদানিতে কলমশুলা গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। পরেশ বাবু একবার করুণনেত্রে স্মৃতিরত্নার মুখের দিকে চাহিয়া হারান বাবুকে কহিলেন, “পান্নবাবু, আমরা যা কিছু খাই সবই ত ঠাকুরের প্রসাদ।”

হারান বাবু কহিলেন, “কিন্তু স্মৃতিরতা যে আমাদের ঠাকুরকে পরিত্যাগ করবার উদ্ভোগ করচেন।”

পবেশ বাবু কহিলেন, “তাও যদি সম্ভব হয় তবে তা নিয়ে উৎপাত করলে কি তার কোনো প্রতিকার হবে ?”

হারান বাবু কহিলেন, “স্রোতে যে লোক ভেসে যাচ্ছে তাকে কি ডাঙার তোলবার চেষ্টাও করতে হবে না ?”

পরেশ বাবু কহিলেন—“সকলে মিলে তার মাথার উপর ঢেলা ছুঁড়ে মারাকেই ডাঙার তোলবার চেষ্টা বলা যায় না। পান্নবাবু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি এতটুকু বেশা থেকেই স্মৃতিরত্নাকে দেখে আসছি। ও যদি জ্বলেই পড়ত তাহলে আমি আপনাদের সকলের আগেই জানুতে পারতুম এবং আমি উদাসীন থাকতুম না।”

হারান বাবু কহিলেন—“স্মৃতিরতা ত এখানেই রয়েছেন। আপনি শুকেই জিজ্ঞাসা করুন না। শুনতে পাই উনি সকলের ছোঁয়া খান না। সে কথা কি মিথ্যা ?”

স্মৃতিরতা দোয়াতদানের প্রতি অনাবশ্যক মনোযোগ দূর করিয়া কহিল, “বাবা জানেন আমি সকলের ছোঁয়া খাইনে। উনি যদি আমার এই আচরণ সহ্য করে থাকেন তাহলেই হল। আপনাদের যদি ভাল না লাগে আপনারা যত খুসি আমার নিন্দা করুন কিন্তু বাবাকে বিরক্ত করচেন কেন ? উনি আপনাদের কত ক্ষমা করে চলেন, তা আপনারা জানেন ? একি তারই প্রতিকল ?”

হারান বাবু আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—“স্মৃতিরতাও আজকাল কথা কহিতে শিখিয়াছে।”

পরেশ বাবু শাস্তিপ্রিয় লোক ; তিনি নিজের বা পরের সম্বন্ধে অধিক আলোচনা ভালো বাসেন না। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে তিনি কোনো কাজে কোনো প্রধান পদ গ্রহণ করেন নাই ; নিজেকে কাহারো লক্ষ্যগোচর না করিয়া নিভৃত জীবন যাপন করিয়াছেন। হারান বাবু পবেশের এই ভাবকেই উৎসাহহীনতা ও ঔদাসীন্ময় বলিয়া গণ্য করিতেন, এমন কি, পরেশ বাবুকে তিনি ইহা লইয়া ভৎসনাও করিয়াছেন। ইহার উত্তরে পবেশ বাবু বলিয়াছিলেন, “ঈশ্বর, সচল এবং অচল এই দুই শ্রেণীর পদার্থই সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি নিতান্তই অচল। আমার মত লোকের দ্বারা যে কাজ পাওয়া সম্ভব ঈশ্বর তাহা আদায় করিয়া লইবেন। বাহা সম্ভব নহে তাহার জন্ত চঞ্চল হইয়া কোনো লাভ নাই। আমার বয়স যথেষ্ট হইয়াছে ; আমার কি শক্তি আছে আর কি নাই তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এখন আমাকে ঠেলাঠেলি করিয়া কোনো ফল পাওয়া যাইবে না।

হারান বাবুর ধারণা ছিল তিনি অসাড় হৃদয়েও উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারেন ; জড়চিত্তকে কর্তব্যের পথে ঠেলিয়া দেওয়া এবং জ্বলিতজীবনকে অনুতাপে বিগলিত করা একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ; তাঁহার অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং একাগ্র শক্ত ইচ্ছাকে কেহই অধিকদিন প্রতিরোধ করিতে পারে না এইরূপ তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার সমাজের লোকের ব্যক্তিগত চরিত্রে যে সকল ভাল পরিবর্তন ঘটয়াছে তিনি নিজেকেই কোনো না কোনো প্রকারে তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছেন। তাঁহার অলক্ষ্য প্রভাবও যে ভিতরে ভিতরে কাজ করে ইহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত স্মৃতিরত্নাকে যখন তাঁহার সম্মুখে কেহ বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছে তিনি এমনভাবে ধারণী করিয়াছেন যেন সে প্রশংসা সম্পূর্ণই তাঁহার। তিনি উপদেশ, দৃষ্টান্ত এবং সমাজের দ্বারা স্মৃতিরত্নার চরিত্রকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন যে এই স্মৃতিরত্নার জীবনের দ্বারাই লোক-সমাজে তাঁহার আশ্চর্য প্রভাব প্রমাণিত হইবে এইরূপ তাঁহার আশা ছিল।

সেই সূচরিতাব শোচনীয় পতনে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহার গর্ষ কিছুমাত্র হ্রাস হইল না তিনি সমস্ত দোষ চাপাইলেন পরেশ বাবুর স্বন্ধে । পরেশ বাবুকে লোকে বরাবর প্রশংসা করিয়া আসিয়াছে কিন্তু হারান বাবু কখনো তাহাতে যোগ দেন নাই ; ইহাতেও তাঁহার কতদূর প্রাজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এইবার সকলে বুঝিতে পারিবে এইরূপ তিনি আশা করিতেছেন ।

হারান বাবু মত লোক আর সকলি সহ্য করিতে পারেন কিন্তু যাহাদিগকে বিশেষরূপে হিতপথে চালাইতে চেষ্টা করেন তাহা যদি নিজের বুদ্ধি অনুসারে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন কবে তবে সে অপরাধ তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না । সহজে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ; যতই দেখেন তাঁহার উপদেশে কল হইতেছে না ততই তাঁহার জেদ বাড়িয়া যাইতে থাকে ; তিনি ফিরিয়া ফিরিয়া বারম্বার আক্রমণ করিতে থাকেন । কল যেমন দম না ফুরাইলে থামিতে পারে না তিনিও তেমনি কোনোমতেই নিজে সন্মত করিতে পারেন না ; বিমুখ কর্ণের কাছে এক কথা সহস্রবার আবৃত্তি করিয়াও হার মানিতে চাহেন না ।

ইহাতে সূচরিতা বড় কষ্ট পাইতে লাগিল,—নিজের জন্ত নহে, পরেশ বাবুর জন্ত । পরেশ বাবু যে ব্রাহ্মসমাজের সকলের সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছেন এই অশান্তি নিবারণ করা যাইবে কি উপায়ে ? অপর পক্ষে সূচরিতার মাসিও প্রতিদিন বুঝিতে পারিতেছেন যে, তিনি একান্ত নম্র হইয়া নিজেকে যতই আড়ালে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন ততই এই পবিত্রের পক্ষে উপদ্রব স্বরূপ হইয়া উঠিতেছেন । এজন্য তাহার মাসীর অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ সূচরিতাকে প্রত্যহ দৃষ্ট করিতে লাগিল । এই সঙ্কট হইতে উদ্ধারের যে পথ কোথায় তাহা সূচরিতা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না ।

এদিকে সূচরিতাব শীঘ্র বিবাহ দিয়া ফেলিবার জন্ত বরদাসুন্দরী পরেশ বাবুকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । তিনি কহিলেন “সূচরিতার দায়িত্ব আর আমাদের বহন করা চলে না, সে এখন নিজের মতে চলতে বস্তু কবেচে । তার বিবাহের যদি দেরি থাকে তাহা

হলে মেয়েদের নিয়ে আমি অন্য কোথাও যাব—সূচরিতার অন্তত দৃষ্টান্ত মেয়েদের পক্ষে বড়ই অনিষ্টের কারণ হচে । দেখো এব জন্ত পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবেই । ললিতা আগতে এরকম ছিল না ; এখন ও যে আপন ইচ্ছামত যা খুসি একটা কাণ্ড কবে বসে কাকেও মানে না তাব মূলে কে ? সেদিন যে ব্যাপারটা বাধিয়ে বসল, যার জন্ত আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি ; তুমি কি মনে কর তার মধ্যে সূচরিতার কোনো হাত ছিল না ? তুমি নিজের মেয়েদের চেয়ে সূচরিতাকে বরাবর বেশি ভালবাস তাতে আমি কোনোদিন কোনো কথা বলিনি কিন্তু আর চলে না সে আমি স্পষ্টই বলে রাখছি ।”

সূচরিতার জন্ত নহে কিন্তু পারিবারিক অশান্তির জন্ত পরেশ বাবু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন । বরদাসুন্দরী যে উপলক্ষ্যটি পাইয়া বসিয়াছেন ইহা লইয়া তিনি যে হলস্থল কাণ্ড বাধাইয়া বসিবেন এবং যতই দেখিবেন আন্দোলনে কোনো ফল হইতেছে না ততই দুর্ভাব হইয়া উঠিতে থাকিবেন ইহাতে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না । যদি সূচরিতার বিবাহ সম্ভব সম্ভবপর হয় তবে বর্তমান অবস্থায় সূচরিতার পক্ষেও তাহা শান্তিজনক হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই । তিনি বরদাসুন্দরীকে বলিলেন, “পাছ বাবু যদি সূচরিতাকে সম্মত করতে পারেন তাহলে আমি বিবাহ সম্বন্ধে কোনো আপত্তি করব না ।”

বরদাসুন্দরী কহিলেন—“আবাব কতবার করে সম্মত করতে হবে ? তুমি ত অবাক কবলে ! এত সাধাসাধিই বা কেন ? পাছ বাবুর মত পাত্র উনি পাবেন কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করি । তুমি রাগ কর আব যাই কর সত্যি কথা বলতে কি, সূচরিতা পাছ বাবুর যোগ্য মেয়ে নয় ।”

পরেশ বাবু কহিলেন, “পাছ বাবুর প্রতি সূচরিতার মনের ভাব যে কি তা আমি স্পষ্ট করে বুঝতে পারিনি । অতএব তারা নিজেদের মধ্যে যতক্ষণ কথাটা পবিষ্কার করে না নেবে ততক্ষণ আমি এবিষয়ে কোনো প্রকারে হস্তক্ষেপ করতে পারব না ।”

বরদাসুন্দরী কহিলেন, “বুঝতে পারিনি ! এতদিন পরে স্বীকার করলে ! ঐ মেয়েটিকে বোকা বড় সহজ নয় ! শু বাইরে এক রকম ভিতরে এক রকম ।”

বরদাহুন্দরী হারান বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ।

সেদিন কাগজে ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান দুর্গতির আলোচনা ছিল । তাহার মধ্যে পরেশ বাবুর পরিবারের প্রতি এমন ভাবে লক্ষ্য করা ছিল যে, কোনো নাম না থাক। সবেশে আক্রমণের বিষয় যে কে তাহা সকলের কাছেই বেশ স্পষ্ট হইয়াছিল ; এবং লেখক যে কে তাহাও লেখার ভঙ্গীতে অনুমান করা কঠিন হয় নাই । কাগজখানায় কোনোমতে চোখ বুলাইয়াই সূচরিতা তাহা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতেছিল । ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কাগজের অংশগুলিকে ঘেন পরমাণুতে পরিণত করিবার জন্য তাহার রোখ চড়িয়া যাইতেছিল ।

এমন সময় হারান বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া সূচরিতার পাশে একটা চৌকি টানিয়া বসিলেন । সূচরিতা একবার মুখ তুলিয়াও চাহিল না, সে যেমন কাগজ ছিঁড়িতেছিল তেমনি ছিঁড়িতেই লাগিল ।

হারানবাবু কহিলেন, “সূচরিতা, আজ একটা গুরুতর কথা আছে । আমার কথায় একটু মন দিতে হবে ।”

সূচরিতা কাগজ ছিঁড়িতেই লাগিল । নখে ছেঁড়া যখন অসম্ভব হইল তখন ধলে হইতে কাঁচি বাহির করিয়া কাঁচিটা দিয়া কাটিতে লাগিল । ঠিক এই মুহূর্তেই ললিতা ঘরে প্রবেশ করিল ।

হারান বাবু কহিলেন, “ললিতা, সূচরিতার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে ।”

ললিতা ঘব হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সূচরিতা তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল । ললিতা কহিল, “তোমার সঙ্গে পান্ন বাবুর যে কথা আছে !” সূচরিতা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া ললিতার আঁচল চাপিয়াই রহিল—তখন ললিতা সূচরিতার আসনের এক পাশে বসিয়া পড়িল ।

হারান বাবু কোনো বাধাতেই দমিবার পাত্র নহেন । তিনি আর ভূমিকা মাত্র না করিয়া একেবারে কথাটা পাড়িয়া বসিলেন । কহিলেন, “আমাদের বিবাহে আর বিলম্ব হওয়া আমি উচিত মনে করিনে । পরেশ বাবুকে জানিয়েছিলাম ; তিনি বলেন, তোমার সম্মতি পেলেই আর কোনো বাধা থাকবে না । আমি স্থির করেছি, আগামী রবিবারের পরের রবিবারেই—”

সূচরিতা কথা শেষ করিতে না দিয়াই কহিল, “না ।”

সূচরিতার মুখে এই অভ্যস্ত সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট এবং উদ্ধত “না” শুনিয়া হারান বাবু থমকিয়া গেলেন । সূচরিতাকে তিনি অভ্যস্ত বাধ্য বলিয়া জানিতেন । সে যে একমাত্র “না” বাণের দ্বারা তাঁহার প্রস্তাবটাকে এক মুহূর্তে অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিবে ইহা তিনি মনেও করেন নাই । তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন—“না ! না মানে কি ? তুমি আরো ঘেরি করতে চাও ?”

সূচরিতা আবার কহিল, “না ।”

হারান বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “তবে ?”

সূচরিতা মাথা নত করিয়া কহিল, “বিবাহে আমার মত নেই ।”

হারান বাবু হতবুদ্ধির ভ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “মত নেই ? তার মানে ?”

ললিতা ঠোকর দিয়া কহিল, “পান্ন বাবু, আপনি আজ বাংলা ভাষা ভুলে গেলেন না কি ?”

হারান বাবু কঠোর দৃষ্টি দ্বারা ললিতাকে আঘাত করিয়া কহিলেন, “বরঞ্চ মাতৃভাষা ভুলে গেছি একথা স্বীকার করা সহজ কিন্তু যে মানুষের কথায় বরাবর শ্রদ্ধা করে এসেছি তাকে ভুল বুঝেছি একথা স্বীকার করা সহজ নয় ।”

ললিতা কহিল, “মানুষকে বুঝতে সময় লাগে, আপনার সম্বন্ধে হয় ত সেকথা খাটে ।”

হারান বাবু কহিলেন, “প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমার কথার বা মতের বা ব্যবহারের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি—আমি আমাকে ভুল বোঝবার কোনো উপলক্ষ্য কাউকে দিইনি একথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি—সূচরিতাই বলুন আমি ঠিক বলছি কি না !”

ললিতা আবার একটা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল—সূচরিতা তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল—“আপনি ঠিক বলছেন ! আপনাকে আমি কোনো দোষ দিতে চাইনে !”

হারান বাবু কহিলেন, “বোধ যদি না দেবে তবে আমার প্রতি অন্তায়ই বা করবে কেন ?”

সূচরিতা দৃঢ়স্বরে কহিল, “যদি একে অন্তায় বলেন তবে আমি অন্তায়ই করব—কিন্তু—”

বাহির হইতে ডাক আসিল, “দিদি, ঘরে আছেন ?”

সুচবিতা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—
“আম্বন, বিনয় বাবু, আম্বন!”

“ভুল করচেন দিদি, বিনয় বাবু আসেননি, আমি বিনয়
মাত্র, আমাকে সমাদর করে লজ্জা দেবেন না”—বলিয়া
বিনয় ঘবে প্রবেশ করিয়াই হারান বাবুকে দেখিতে পাইল।
হারান বাবু মুখের অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া কহিল—
“অনেক দিন আসিনি বলে রাগ করেচেন বুঝি।”

হারান বাবু পরিহাসে যোগ দিবার চেষ্টা করিয়া
কহিলেন, “রাগ করবারই কথা বটে! কিন্তু আজ আপনি
একটু অসময়ে এসেচেন—সুচরিতার সঙ্গে আমার একটা
বিশেষ কথা হচ্ছিল।”

বিনয় শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল—“ঐ দেখুন, আমি
কখন এলে যে অসময়ে আসা হয় না তা আমি আজ পর্য্যন্ত
বুঝতেই পারলুম না। এই জন্যই আসতে সাহসই হয় না।”
বলিয়া বিনয় বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

সুচবিতা কহিল “বিনয় বাবু, যাবেন না। আমাদের
যা কথা ছিল শেষ হয়ে গেছে। আপনি বসুন।”

বিনয় বুঝিতে পারিল সে আসাতে সুচরিতা একটা
বিশেষ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। খুসি হইয়া একটা
চৌকিতে বসিয়া পড়িল এবং কহিল “আমাকে প্রশ্রয় দিলে
আমি কিছুতেই সামলাতে পারিনে। আমাকে বসতে
বললে আমি বসবই এই রকম আমার স্বভাব। অতএব,
দিদির প্রতি নিবেদন এই যে, এসব কথা যেন বুঝে সুঝে
বলেন, নইলে বিপদে পড়বেন।”

হারান বাবু কোনো কথা না বলিয়া আসন্ন ঝড়ের মত
স্তম্ভ হইয়া রহিলেন। তিনি নীচবে প্রকাশ করিলেন,
আচ্ছা বেশ, আমি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম—আনার
যা কথা আছে তাহা শেষ পর্য্যন্ত বলিয়া তবে আমি উঠিব।

ঘরের বাহির হইতে বিনয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই ললিতার
বুকের ভিতরকার সমস্ত রক্ত যেন চমক খাইয়া উঠিয়াছিল।
সে বহুকষ্টে আপনার স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা
করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই পারিল না। বিনয় যখন ঘরে
প্রবেশ কবিল ললিতা বেশ সহজে তাহাদের পরিচিত বন্ধুর
মত তাহাকে কোনো কথা বলিতে পারিল না। কোন্
দিকে চাহিবে, নিজের হাতখানা লইয়া কি করিবে সে যেন

একটা ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িল। একবার উঠিয়া
যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সুচরিতা কোনমতেই তাহাব
কাপড় ছাড়িল না।

বিনয়ও যাহা কিছু কথাবার্তা সমস্ত সুচরিতাব সঙ্গেই
চালাইল—ললিতার নিকট কোনো কথা ফাঁদা তাহার মত
বাকপটু লোকের কাছেও আজ শব্দ হইয়া উঠিল। এই
জন্যই সে যেন ডবল জোরে সুচরিতার সঙ্গে আলাপ করিতে
লাগিল—কোথাও কোনো ফাঁক পড়িতে দিল না।

কিন্তু হারান বাবুর কাছে ললিতা ও বিনয়ের এই
নূতন সঙ্কোচ অগোচর রহিল না। যে ললিতা তাঁহার
সম্বন্ধে আজকাল এমন প্রথম ভাবে প্রগল্ভা হইয়া উঠি-
য়াছে সে আজ বিনয়ের কাছে এমন সঙ্কুচিত ইহা দেখিয়া
তিনি মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজেব
বাহিরের লোকের সহিত কন্যাদের অবোধ পরিচয়ের অব-
কাশ দিয়া পরেশ বাবু যে নিজের পরিবাবকে কিরূপ
কদাচারের মধ্যে লইয়া যাইতেছেন তাহা মনে করিয়া
পরেশ বাবুর প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরো বাড়িয়া উঠিল এবং
পরেশ বাবুকে যেন একদিন এজন্য বিশেষ ভুলোপ করিতে
হয় এই কামনা তাঁহার মনের মধ্যে অভিশাপের মত
জাগিতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ এই ভাবে চলিলে পর স্পষ্টই বুঝা গেল
হারান বাবু উঠিবেন না। তখন সুচরিতা বিনয়কে কহিল,
“মাসীর সঙ্গে অনেক দিন আপনার দেখা হয়নি। তিনি
আপনার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন। একবার তাঁর
সঙ্গে দেখা করতে পারেন না?”

বিনয় চৌকি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—“মাসির
কথা আমার মনে ছিল না এমন অপবাদ আমাকে দেবেন না।”

সুচরিতা যখন বিনয়কে তাহার মাসির কাছে লইয়া
গেল তখন ললিতা উঠিয়া কহিল, “পায় বাবু, আমার সঙ্গে
আপনার বোধ হয় বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই।”

হারানবাবু কহিলেন “না। তোমার বোধ হয় অন্যত্র
বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি যেতে পুর।”

ললিতা কথাটার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল। সে তৎক্ষণাৎ
উদ্ধত ভাবে মাথা তুলিয়া ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করিয়া দিয়া
কহিল—“বিনয় বাবু আজ অনেক দিন পরে এসেচেন, তাঁর

সঙ্গে গল্প করতে যাচ্ছি। ততক্ষণ আপনি নিজের লেখা যদি পড়তে চান তাহলে—না, ঐ যা, সে কাগজখানা দিদি দেখুটি কুটিকুটি কবে ফেলেচেন। পবেষ লেখা যদি সহ্য করতে পাবেন তাহলে এইগুলি দেখতে পাবেন।”

বলিয়া কোণেব টেবিল হইতে সম্বন্ধরক্ষিত গোবার রচনাগুলি আনিয়া হারান বাবু সম্মুখে রাখিয়া দ্রুতপদে ঘব হইতে বাহির হইয়া গেল।

হরিমোহিনী বিনয়কে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ অমুভব করিলেন। কেবল যে এই প্রিয়দর্শন যুবকের প্রতি স্নেহ-বশত তাহা নহে। এবাড়িতে বাহিরের লোক যে কেহ হরিমোহিনীর কাছে আসিয়াছে সকলেই তাঁহাকে যেন কোন্ এক ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মত দেখিয়াছে। তাহার কলিকাতাব লোক, প্রায় সকলেই ইংবেজি ও বাংলা লেখা-পড়ায় তাঁহাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তাহাদের দ্ববন্ধ ও অবজ্ঞার আঘাতে তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলেন। বিনয়কে তিনি আশ্রয়েব মত অমুভব করিলেন। বিনয়ও কলিকাতার লোক, হরিমোহিনী শুনিয়াছেন লেখাপড়াতেও সে বড় কম নয়, অথচ এই বিনয় তাঁহাকে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা কবে না; তাঁহাকে আপন লোকেব মত দেখে ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মান একটা নির্ভর পাইল। বিশেষ করিয়া এই জন্তই অল্প ঈরিচয়েই বিনয় তাঁহার নিকট আত্মীয়ের স্থান লাভ করিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল বিনয় তাঁহাব বর্ষের মত হইয়া অস্ত্র লোকেব ঔদ্ধত্য হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে। এবাড়িতে তিনি অত্যন্ত বেশি প্রকাশ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন—বিনয় যেন তাঁহার আবরণের মত হইয়া তাঁহাকে আড়াল কবিয়া রাখিবে।

হরিমোহিনীর কাছে বিনয় যাওয়ার অল্পক্ষণ পবেই ললিতা সেখানে কখনই সহজে বাইতনা—কিন্তু আজ হাবান বাবু স্তম্ভ বিজ্ঞপের আঘাতে সে সমস্ত সঙ্কোচ ছিন্ন করিয়া যেন জোর করিয়া উপরের ঘরে গেল। শুধু গেল তাহা নহে, গিয়াই বিনয়ের সঙ্গে অজস্র কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের মন্তব্য খুব জমিয়া উঠিল; এমন কি, মাঝে মাঝে তাহাদের হাসির শব্দ নীচেব ঘরে একাকী-আসীন হারান বাবুর “কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া” বুদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বেশিক্ষণ একলা থাকিতে পারি-

লেন না, বরদাসুন্দরীব সঙ্গে আলাপ করিয়া মনের আক্ষেপ নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বরদাসুন্দরী শুনিলেন যে সূচবিত্তা হাবান বাবুর সঙ্গে বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন কবিয়াছে। শুনিয়া তাঁহার পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইল। তিনি কহিলেন, “পান্ন বাবু, আপনি ভাল-মানুষি করলে চলবে না! ও যখন বাববার সম্মতি প্রকাশ কবেচে এবং ব্রাহ্মসমাজস্বদ্ধ সকলেই যখন এই বিয়ের জন্ত অপেক্ষা কবে আছে তখন ও আজ মাথা নাড়ল বলেই যে সমস্ত উল্টে যাবে এ কখনই হতে দেওয়া চলবে না। আপনার দাবি আপনি কিছুতেই ছাড়বেন না বলে বাণ্টি, দেখি ও কি করতে পাবে।”

এ সম্বন্ধে হাবান বাবুকে উৎসাহ দেওয়া বাহ্যিক—তিনি তখন কাঠেব মত শক্ত হইয়া বসিয়া মাথা তুলিয়া মনে মনে বলিতেছিলেন, “অন্ প্রিসিপ্ল্” এ দাবি ছাড়া চলিবে না—আমার পক্ষে সূচরিতাকে ত্যাগ করা বেশি কথা নয় কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মাথা হেঁট করিয়া দিতে পারিব না।—

বিনয় হরিমোহিনীর সহিত আত্মীয়তাকে পাকা করিয়া লইবাবু অভিপ্রায়ে আহাবের আবদাব করিয়া বসিয়াছিল। হরিমোহিনী তৎক্ষণাত্ বাস্ত হইয়া একটা ছোট থালায় কিছু ভিজানো ছোলা, ছানা, মাখন, একটু চিনি, একটা কলা, এবং কাসার বাটিতে কিছু দুধ আনিয়া সম্বন্ধে বিনয়ের সম্মুখে ধবিয়া দিয়াছেন। বিনয় হাসিয়া কহিল, অসময়ে ক্ষুধা জ্ঞানাইয়া মাসিকে বিপদে ফেলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমিই ঠকিলাম—এই বলিয়া খুব আড়ম্বর করিয়া বিনয় আহাবে বসিয়াছে এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনয় তাহার থালায় উপরে যথাসম্ভব নত হইয়া নমস্কারের চেষ্টা করিয়া কহিল—“অনেকক্ষণ নীচে ছিলুম; আপনার সঙ্গে দেখা হল না।” বরদাসুন্দরী তাহার কোনো উত্তর না করিয়া সূচরিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “এই যে ইনি এখানে! আমি যা ঠাউরেছিলাম তাই। সভা বসেচে! আমোদ করচেন! এদিকে বেচারী হারান বাবু সন্ধ্যা থেকে গুঁর জন্তে অপেক্ষা কবে বসে রয়েচেন, যেন তিনি গুঁর বাগানের মালী! ছেলেবেলা থেকে গুঁদের মানুষ করলুম—কুই বাপু, এতদিন ত গুঁদের এরকম

ব্যবহার কখনো দেখিনি। কে জানে আজকাল এসব শিক্ষা কোথা থেকে পাচ্ছে! আমাদের পরিবারে যা কখনো ঘটে পাবত না আজকাল তাই আবস্ত হচ্ছে—সমাজের লোকের কাছে যে আমাদের মুখ দেখাবাব জোরাইল না! এতদিন ধরে এত কবে যা শেখানো গেল সে সমস্তই দুদিনে বিসর্জন দিলে! এ কি সব কাণ্ড!”

হরিমোহিনী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সূচরিতাকে কহিলেন, “নীচে কেউ বসে আছেন আমি ত জান্তেম না! বড় অত্যাচার হয়ে গেছে ত! মা, যাও তুমি শীঘ্র যাও! আমি অপরাধ কবে ফেলিচি!”

অপরাধ যে হরিমোহিনীর লেশমাত্র নহে ইহাই বলিবার জন্য ললিতা মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল। সূচরিতা গোপনে সবনে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল এবং কোনো প্রতিবাদমাত্র না করিয়া নীচে চলিয়া গেল।

পূর্বেই বলিয়াছি বিনয় বরদাসুন্দরীর স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। বিনয় যে তাঁহাদের পরিবারের প্রভাবে পড়িয়া ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবে এ সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। বিনয়কে তিনি যেন নিজের হাতে গড়িয়া তুলিতেছেন বলিয়া একটা বিশেষ গর্ব অনুভব করিতেছিলেন; সে গর্ব তিনি তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে কারো কারো কাছে প্রকাশও করিয়াছিলেন। সেই বিনয়কে আজ শত্রুপক্ষের শিবিরে মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার মনের মধ্যে যেন একটা দাহ উপস্থিত হইল এবং নিজের কল্পা ললিতাকে বিনয়ের পুনঃপতনের সহায়কাৰী দেখিয়া তাঁহার চিত্তজালা যে আবো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল সে কথা বলা বাহুল্য। তিনি রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, “ললিতা, এখানে কি তোমার কোনো কাজ আছে?”

ললিতা কহিল—“হাঁ, বিনয় বাবু এসেছেন তাই—”

বরদাসুন্দরী কহিলেন, “বিনয় বাবু যাব কাছে এসেছেন তিনি ঠিক আতিথ্য করবেন, তুমি এখন নীচে এস, কাজ আছে!”

ললিতা স্থির কবিল, হারান বাবু নিশ্চয়ই বিনয় ও তাহার দুইজনের নাম লইয়া মাকে এমন কিছু বলিয়াছেন—হা বলিবার অধিকার তাঁহার নাই। এই অনুমান

কবিতা তাহার মন অত্যন্ত শক্ত হইয়া উঠিল। সে অনাবশ্যক প্রগলভতার সহিত কহিল, “বিনয় বাবু অনেক দিন পবে এসেছেন ঠিক সঙ্গে একটু গল্প করে নিয়ে তার পরে আমি যাচ্ছি।”

বরদাসুন্দরী ললিতার কথার স্বরে বুঝিলেন জোর খাটিবে না। হরিমোহিনীর সম্মুখেই পাছে তাঁহার পরাভব প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে তিনি আব কিছু না বলিয়া এবং বিনয়কে কোনো প্রকার সম্ভাষণ না করিয়া চলিয়া গেলেন।

ললিতা বিনয়ের সঙ্গে গল্প করিবার উৎসাহ তাহার মার কাছে প্রকাশ করিল বটে কিন্তু বরদাসুন্দরী চলিয়া গেলে সে উৎসাহের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিনজনেই কেমন এক প্রকার কুণ্ঠিত হইয়া রহিল এবং অল্পক্ষণপরেই ললিতা উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দবজা বন্ধ করিয়া দিল।

এ বাড়িতে হরিমোহিনীর যে কিরূপ অবস্থা ঘটয়াছে তাহা বিনয় স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। কথা পাড়িয়া ক্রমশঃ হরিমোহিনীর পূর্ব ইতিহাস সমস্তই সে শুনিয়া লইল। সকল কথার শেষে হরিমোহিনী কহিলেন, “বাবা, আমার মত অনাথার পক্ষে সংসার ঠিক স্থান নয়। কোনো তীর্থে গিয়ে দেবসেবায় মন দিতে পারলেই আমার পক্ষে ভাল হত। আমার অল্প যে কট টাকা বাকি রয়েছে—তাতে আমার কিছুদিন চলে যেত, তার পরেও যদি বেঁচে থাকতুম ত পবের বাড়িতে রেখে খেয়েও আমার কোনোমতে দিন কেটে যেত। কাশীতে দেখে এলুম, এমন ত কত লোকের বেশ চলে যাচ্ছে! কিন্তু আমি পাপিষ্ঠা বলে সে কোনো মতেই পরে উঠলুম না। একলা থাকলেই আমার সমস্ত হৃৎকথ কথ্য আমাকে যেন ঘিরে বসে, ঠাকুর দেবতা কাউকে আমার কাছে আসতে দেয় না। ভয় হয় পাছে পাগল হয়ে যাই। যে মানুষ ভুবে মরচে তার পক্ষে ভেলা যেমন, সাধারণী আর সতীশ আমার পক্ষে তেমনই হয়ে উঠেছে,—ওদের ছাড়বার কথা মনে করতে গেলেই দেখি আমার প্রশ্ন ইপিয়ে ওঠে। তাই আমার দিন রাত্রি ভয় হয় ওদের ছাড়তেই হবে—নইলে সব খুইয়ে আবার এই কদিনের মধ্যেই ওদের এত ভাল বাসতে গেলুম কি জন্য? বাবা, তোমার কাছে

বলতে আমার লজ্জা নেই, এদের ছুটিকে পাওয়ার পর থেকে ঠাকুরের পূজা আমি মনের সঙ্গে করতে পেরেছি—এরা যদি যায় তবে আমার ঠাকুর তখন কঠিন পাথর হয়ে যাবে !”

এই বলিয়া বন্ধাঙ্কলে হরিশোহিনী ছই চক্ষু মুছিলেন ।

সুচরিতা নীচের ঘরে আসিয়া হারান বাবু সম্মুখে দাঁড়াইল—কহিল “আপনার কি কথা আছে বলুন ।

হারান বাবু কহিল—“বোস ।”

সুচরিতা বসিল না, স্থির দাঁড়াইয়া রহিল ।

হারান বাবু কহিলেন, “সুচরিতা, তুমি আমার প্রতি অন্যায় করচ ।”

সুচরিতা কহিল “আপনিও আমার প্রতি অন্যায় করছেন ।”

হারান বাবু কহিলেন, “কেন, আমি তোমাকে যা কথা দিয়েছি এখনো তা—”

সুচরিতা মাঝখানে বাধা দিয়া কহিল—“ন্যায় অন্যায় কি শুধু কেবল কথার ? সেই কথার উপর জোর দিয়ে আপনি কাঙ্ক্ষিত আমার প্রতি অত্যাচার করতে চান ? একটা সত্য কি সহস্র মিথ্যার চেয়ে বড় নয় ? আমি যদি একশো বার ভুল করে থাকি তবে কি আপনি জোর করে আমায় সেই ভুলকেই অগ্রগণ্য করবেন ? আশ্র আমার যখন সেই ভুল ভেঙেছে তখন আমি আমার আগেকার কোনো কথাকে স্বীকার করব না—করলে আমার অন্যায় হবে !”

সুচরিতার যে এমন পরিবর্তন কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে তাহা হারান বাবু কোনো মতেই বুঝিতে পারিলেন না । তাহার স্বাভাবিক স্তব্ধতা ও নম্রতা আজ এমন করিয়া ভাঙিয়া গেছে ইহা যে তাঁহারই দ্বারা ঘটতে পারে তাহা অল্পমান করিবার শক্তি ও বিনয় তাঁহার ছিল না । সুচরিতার নূতন সঙ্গীগুলির প্রতি মনে মনে দোষারোপ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কি ভুল করেছিলে ?”

সুচরিতা কহিল—“সে কথা কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন ? পূর্বে মত ছিল এখন আমার মত নেই এই কি যথেষ্ট নয় ?”

হারান বাবু কহিলেন—“ব্রাহ্মসমাজের কাছে যে আমাদের জবাবদিহি আছে ! সমাজের লোকের কাছে তুমিই বা কি বলবে আমিই বা কি বলব ?”

সুচরিতা কহিল “আমি কোনো কথাই বলব না । আপনি যদি বলতে ইচ্ছা করেন তবে বলবেন, সুচরিতার বয়স অল্প, ওর বুদ্ধি নেই, ওর মতি অস্থির । যেমন ইচ্ছা তেমনি বলবেন ! কিন্তু এ সম্বন্ধে এই আমাদের শেষ কথা হয়ে গেল !”

হারান বাবু কহিলেন, “শেষ কথা হতেই পারে না । পরেশ বাবু যদি—”

বলিতে বলিতেই পরেশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; কহিলেন, “কি পাশু বাবু, আমার কথা কি বলছেন ?”

সুচরিতা তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া যািতেছিল । হারান বাবু ডাকিয়া কহিলেন, “সুচরিতা ঘেয়োনা, পরেশ বাবু কাঙ্ক্ষিত কথাটা হয়ে থাক ।”

সুচরিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল । হারান বাবু কহিলেন, “পরেশ বাবু, এত দিন পরে আজ সুচরিতা বলছেন বিবাহে তাঁর মত নেই ! এত বড় গুরুত্ব বিষয় নিয়ে কি এত দিন তাঁর খেলা করা উচিত ছিল ? এই যে কর্তব্য উপসর্গটা ঘটল এজ্ঞে কি আপনাকেও দায়ী হতে হবে না ?”

পরেশ বাবু সুচরিতার মাথায় হাত বুলাইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, “মা তোমার এখানে থাকবার দরকার নেই, তুমি যাও !”

এই সামান্য কথাটুকু শুনিবামাত্র এক মুহূর্তে অশ্রুজলে সুচরিতার দুই চোখ ভাসিয়া গেল এবং সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল ।

পরেশ বাবু কহিল, “সুচরিতা যে নিজের মন ভাল কবে না বুঝেই বিবাহে সম্মতি দিয়েছিল এই সন্দেহ অনেক দিন থেকে আমার মনে উদয় হওয়াতেই সমাজের লোকের সাম্মুখে আপনাদের সম্বন্ধ পাকা করার বিষয়ে আমি আপনার অনুরোধ পাশন করতে পারিনি ।”

হারান বাবু কহিলেন, “সুচরিতা তখন নিজের মন ঠিক বুঝেই সম্মতি দিয়েছিল, এখনই না বুঝে অসম্মতি দিচ্ছে এ রকম সন্দেহ আপনার মনে উদয় হচ্ছে না ?”

পরেণ বাবু কহিলেন, “হুটোই হতে পারে কিন্তু এ রকম সন্দেশের স্থলে ত বিবাহ হতে পারে না।”

হারান বাবু কহিলেন, “আপনি সূচরিতাকে সং-
পরাশর দেবেন না ?”

পরেণ বাবু কহিলেন, “আপনি নিশ্চয় জানেন সূচরিতাকে আমি কখনো সাধ্যমতে অসং পরামর্শ দিতে পারি নে।”

হারান বাবু কহিলেন, “তাই যদি হত, তা’হলে সূচরিতার এ রকম পরিণাম কখনই ঘটতে পারত না। আপনার পরিবারে আজ কাল যে সব ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে এ যে সমস্তই আপনার অববেচনাব ফল এ কথা আমি আপনাকে মুখের সামনেই বলি।”

পরেণ বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “এ ত আপনি ঠিক কথাই বলছেন,—আমার পরিবারের সমস্ত ফলাফলের দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে ?”

হারান বাবু কহিলেন, “এজন্তে আপনাকে অমূল্যতাপ করতে হবে—সে আমি বলে রাখি।”

পরেণ বাবু কহিলেন, “অমূল্যতাপ ত ঈশ্বরের দয়া। অপরাধকেই ভয় করি, পান্ন বাবু, অমূল্যতাপকে নয়।”

সূচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়া পরেণ বাবুব হাত ধরিয়া কহিল, “বাবা, তোমার উপাসনার সময় হয়েছে।”

পরেণ বাবু কহিলেন, “পান্ন বাবু, তবে কি একটু বসবেন ?”

হারান বাবু কহিলেন, “না। বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

আগে আত্মশাসন পরে রাজ্য- শাসন ।

বরিশাল, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৫।

ঐশ্রীচরণকমলেশু—

বর্তমান মাসে “প্রবাসী”তে আপনার প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আপনি যে আমার অক্লিষ্টকর রচনা উপলব্ধ করিয়া এমন একটা উপদেশ ও শিক্ষাপ্রদ পবন্ধ “প্রবাসী”তে প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহাতে আমি

যেমন অত্যন্ত প্লাবিত বোধ করিতেছি, “প্রবাসী” পাঠক-গণও তেমনি নিরতিশয় উপকৃত হইয়াছেন। আমার বন্ধুগণ উহা পড়িয়া মোহিত হইয়াছেন।

আপনার প্রবন্ধটি মনোযোগ পূর্বক বারংবার পড়িয়া আমার মনে কয়েকটা প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। কিন্তু আমি সেগুলি পত্রিকায় উপস্থিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি—কারণ, আপনি ব্রাহ্মসমাজের পুঙ্জনীয়, ঋষিকল্প আচার্য্য, আর আমি উহার একজন নগণ্য সভ্য। সুতরাং আমার প্রশ্নগুলি এই পত্র সাহায্যে জানাইতেছি। আপনি যদি এগুলির উত্তর স্বরূপ একটা প্রবন্ধ “প্রবাসী”তে প্রকাশ করেন, তবে আমার, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও, পরম উপকার হইবে। অমূল্য গ্রন্থ করিয়া আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, এই প্রার্থনা।

১। “যতোধর্মন্ততোজয়ঃ”, এই কথাটি বোধ হয় কুরুপাণ্ডবদিগের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সেকালে ধর্ম বলিতে বাহা বুঝাইত, এখনও কি আমরা তাই বুঝি ?

২। বিভিন্নদেশে, বিভিন্নযুগে, ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাধীন ও পরাধীন দেশের ধর্ম এক নয়। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যে সনাতন ধর্মের জয় হইবে বলিয়া আপনি বিশ্বাস করেন, তাহার সংজ্ঞা ও আকার কি ?

৩। ইয়ুরোপীয় সভ্যতা মানবী সভ্যতা ; ভারতেই মানবী সভ্যতার উদ্ভব হইবে—বা হইয়াছে, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু ঐ মানবী সভ্যতা কিপ্রকারে জয়যুক্ত হইবে ? ভারতবর্ষ আত্মশাসন-ক্ষমতা লাভ না করিলে কি উহা জয়লাভ করিতে পারিবে ?

৪। মানবী সভ্যতার ভাবী জয় যদি ভারতবর্ষের আত্মশাসন-ক্ষমতা লাভের উপর নির্ভর করে, তবে সেই ক্ষমতা লাভের পায় কি কি ?

৫। * * * * *

৬। এযাবৎ কোনও দেশের স্বাধীনতালাভচেষ্টাতেই বিশুদ্ধ ধর্মের জয় দেখিতে পাই না। ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে আন্দোলনতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, সুরল ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ তাহা হইতে দূরে থাকিবেন, না যতদিন সম্ভব যোগ বন্ধ করিয়া বাকী কার্যের ভার অপরের হস্তে হস্ত করিবেন ?

৭। ওয়াশিংটন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ধর্মপরায়ণ বীর-পুরুষদিগের দৃষ্টান্তে সময়োচিত ধর্মের সময়োচিত অর্থই দেখিয়া-শিখিবার বিষয় ইহা বলা বাহুল্য।—ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এ কথার অর্থ কি ?

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে আপনি যে সকল মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তগুলি অদ্বন্দ্বোচে মানিয়া লইতে পারিতেছি বলিয়াই এই কয়েকটা প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলাম। পত্রে বা পত্রিকায় সহজতর পাইলে যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহীত হইব।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রশ্ন গ্রহণ করুন।

প্রণত—

শ্রীরজনীকান্ত গুহ,

(ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ),

বরিশাল।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর।

বিহিত নামক সম্ভাষণ পূর্বক নমস্কার এবং নিবেদন—

আপনি যাহা যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন মোটের উপরে তাহার একটা সহজতর যাহা আমার মনে উপস্থিত হইতেছে তাহাই আমি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

ধর্ম কি ? যাহা ধরিয়া থাকিবাব বস্তু তাহাবই শাস্তিক সংজ্ঞা ধর্ম। ইংরাজি ভাষায় যিনি principleকে ধরিয়া থাকেন তিনি man of principle।—তুমি কোন ধর্মাবলম্বী ? না I hold অর্থাৎ ধবি অমুক religion। ধু ধর্ম, কু ধর্ম। ধর্ম করিবার বস্তু ; ধর্ম ধরিবার বস্তু বা অবলম্বন করিবার বস্তু। এই গেল ধর্মের শাস্তিক অর্থ। ধর্ম যে মহুঘোষ সর্ব্বথা অবলম্বনীয় এ বিষয়ে সাধারণত—পূর্বাকালেও যেমন বর্তমান যুগেও তেমনি—মহুঘুজ্ঞাতির মধ্যে মতভেদ নাই। সকলেই বলে সত্য জানিবাব বস্তু এবং অন্বেষণ করিবার বস্তু ; সকলেই বলে ধর্ম অবলম্বন করিবার বস্তু এবং সাধন করিবার বস্তু। কেহই বলে না যে, অসত্য জানিবাব বস্তু বা অন্বেষণ করিবার বস্তু ; কেহই বলে না যে, অধর্ম অবলম্বন করিবার বস্তু বা সাধন করিবার বস্তু। আসল ধরিতে গেলে ধর্মও এক, সত্যও এক। কিন্তু মহুঘোষ অপূর্ণতা বশতঃ সত্যের নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ

ঘটিয়া দাঁড়াইয়াছে ; ধর্মেরও তাই। কোনো সত্য জ্যোতিষী সত্য, কোনো সত্য রাসায়নিক সত্য, কোনো সত্য জ্যামিতিক সত্য, কোনো সত্য আধ্যাত্মিক সত্য, কোনো সত্য গোটা সত্য, কোনো সত্য আধা সত্য ; সত্যের মধ্যে এইরূপ জ্ঞাতিগত প্রভেদ এবং মাত্রাঘটিত তারতম্য ঘটিয়া দাঁড়াইয়াছে। তেমনি আবার কোনো ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, কোনো ধর্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম, কোনো ধর্ম বৈশ্য ধর্ম, কোনো ধর্ম সনাতন ধর্ম, কোনো ধর্ম সাময়িক ধর্ম—ধর্মের মধ্যে এইরূপ জ্ঞাতিগত এবং গুণগত প্রভেদ ঘটিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পাঁবা কিছুই কঠিন নহে যে, কি রাসায়নিক সত্য, কি জ্যামিতিক সত্য, কি ভৌতিক সত্য, কি আধ্যাত্মিক সত্য—সকল সত্য একই সত্য ; তেমনি, কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, কি ক্ষত্রিয় ধর্ম, কি বৈশ্য ধর্ম—সকল ধর্ম একই ধর্ম। একদিকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন নানা সত্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জানিবাব এবং অন্বেষণ করিবার বস্তু, আর একদিকে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন নানা সত্যের সঙ্গে এক যে সত্য নিববচ্ছিন্ন লাগিয়া আছে, সেই এক সত্য সকলেরই জানিবাব এবং অন্বেষণ করিবার বস্তু ; তর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন নানা ধর্ম যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের অবলম্বন করিবাব এবং সাধন করিবার বস্তু, তেমনি, ভিন্ন ভিন্ন নানা ধর্মের সঙ্গে এক যে ধর্ম নিববচ্ছিন্ন লাগিয়া আছে, সেই এক ধর্ম সকলেরই অবলম্বন করিবার এবং সাধন করিবার বস্তু। এক সত্যকে ছাড়িয়া অপর কোনো সত্য হইতেই পারে না ; তেমনি এক ধর্মকে ছাড়িয়া অপর কোনো ধর্ম হইতেই পারে না। নিউটন আপেলের পতনে এবং গ্রহাদির পরিলম্বে একই মাধ্যাকর্ষণের কার্যকারিতা দেখিয়াছিলেন। এক সত্যের সম্মান পাইতে হইলে জ্ঞানব এই প্রকারই সমদর্শিতা আবশ্যিক। তেমনি এক ধর্মের পথ ধরিয়া চলিতে হইলে হৃদয়ের সমব্যাখিতা আবশ্যিক—পরের সুখ দুঃখকে আপনাব সুখ দুঃখ করিয়া লওয়া আবশ্যিক। জ্ঞান এবং ধর্ম গোড়ায় একই বস্তু। হৃদয় দিয়া পরকে আপনাব মতো করিয়া জ্ঞান ধর্মের গোড়া'র কথা। ধর্মের এই গোড়ার কথাটা ছাড়িয়া কোনো ধর্ম হইতেই পারে না। কাহাকেও যদি আমরা দেখি যে, তিনি দেশের লোকের সুখ দুঃখকে আপনাব সুখ দুঃখ করিয়া লইয়া

দেশ-রক্ষার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, ইনি ক্ষত্রিয়ধর্ম সাক্ষাৎ মূর্তিমান। পক্ষান্তরে যদি আমরা দেখি যে, পরের ধন আত্মসাৎ করিবার জন্য পাকাতেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, ইহারা মরিবার জন্য বিষ বৃক্ষ বোপণ করিতেছে। যেরূপ যুদ্ধ শুধুই কেবল হত্যাকাণ্ড সেরূপ হিংসাপ্রধান যুদ্ধ ঘোরতর অধর্ম। আত্মীয় স্বজন এবং স্বদেশকে শত্রু-হস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্য শুববীবেরা যেরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ন, সেইরূপ যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ। ধর্মকে ছাড়িয়া ধর্মযুদ্ধ হইতেই পাবে না। ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ধর্মের পরিগঠিত হওয়া আবশ্যক। বাহিবেব রিপুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অন্তরের রিপুগণের উপরে অন্ততঃ ধানিকটা দ্বা পৰ্য্যন্ত জয়লাভ করা আবশ্যক। আপানীবা বাহিরের ভল্লুকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহাদের আপনা আপনির মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য কি পর্যাঙ্ক না ভাগ স্বীকার করিয়াছিল! অন্তরের রিপুগণের উপবে জয়লাভ করিবার পূর্বে তাহারা যদি রাগের মাথায় ভল্লুকদিগের প্রতি দাঁতমুখ খিঁচাইত, তাহা হইলে তাহারা ধনে প্রাণে মারা যাইত। “গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি” এরূপ কথা আপানী শাস্ত্রে লেখে না। “ধর্ম চাহি না—শুধু কেবল জয় চাই” এরূপ স্বার্থাভিসন্ধি কখনই চরম সিদ্ধিতে উপনীত হইতে পারে না—যেহেতু চরম উপরে আছেন।

আপনি বলিতেছেন—“এ যাবৎকাল কোনো দেশের স্বাধীনতালাভচেষ্টাতেই বিশুদ্ধ ধর্মের জয় দেখিতে পাই না।” আপনি হয় তো ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই বিশুদ্ধ ধর্ম বলিতেছেন। আর, ক্ষত্রিয়ধর্ম রক্তপাতদূষিত বলিয়া তাহাকে অবিশুদ্ধের কোটার নিক্ষেপ করিতেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ধর্মার্থের কষ্টপাথর হস্তপদ নহে—ধর্মার্থের কষ্টপাথর মন। বিশুদ্ধ মনে যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ধর্ম* অমুষ্ঠান করে—সে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ধর্মেরই অমুষ্ঠান করে; যেমন অজ্ঞান

করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অবিশুদ্ধ মনে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অমুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তির ধর্ম ধর্মই নহে। তবে যদি আপনি বলেন যে, আমাদের দেশের এরূপ দুর্গতি কেন? তাহার উত্তর এই যে, জাতীয় দুর্গতি জাতীয় পাপের ফল। রোম দেশের অধঃপতন—বাবিলোন দেশের অধঃপতন—আমাদের দেশের অধঃপতন—এবং আর আর কোন্ দেশের ললাটে কিরূপ দাক্ষণ অধঃপতন লেখা আছে তাহা কে বলিতে পাবে—সবই পাপের ফল। স্পেনের inquisition স্পেন জাতির অধঃপতনের গোড়ার কথা। St. Bartholomew উৎসবে Huguenot হত্যা করাসীস দেশীয় রাজ্যবিপ্লবের গোড়ার কথা। বৌদ্ধদিগের প্রতি মাত্রাতীত নির্ভূষাচরণ আমাদের দেশের অধঃপতনের গোড়ার কথা। Inquisitionএর প্রবল প্রতাপে রাজ্যের অন্তরের স্বাধীনতার বিনাশের পর হইতেই যেমন স্পেনের priestcraft দেশের লক্ষ্মীশ্রীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, বৌদ্ধ বিনাশের পর হইতে আমাদের দেশেও তেমনি অপ-ব্রাহ্মণেরা আপনাদের কু-অভিসন্ধি রীতিমত পাকাইয়া তুলিতে জো পাইলেন। ব্রাহ্মণেরা যখনই নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে ধর্মোপদেশের পরিবর্তে পাদোদক প্রদান করিয়া আপনাদের পদমর্যাদার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই পাপকলুষিত যজ্ঞোপবীতের রজ্জু গলায় দিয়া ব্রাহ্মণ্যদেব প্রাণত্যাগ করিলেন, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। বৌদ্ধধর্মের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অন্তরের স্বাধীনতা বিনাশ প্রাপ্ত হইল; তার সাক্ষী বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে ভাস্করাচার্য্য, চরক, সুশ্রুত, পতঞ্জলি প্রভৃতি বড় বড় লোক ধাহারা জন্মিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্মের বিনাশের পর তাহাদের জ্ঞায় স্বাধীনচিত্ত প্রতিভাশালী লোকের প্রাজুর্ভাব রহিত হইয়া যাওয়াতে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের উন্নতির পথে জন্মের মতো কাঁটা পড়িয়া গেল। আমাদের দেশে যখন লোকের অন্তরের স্বাধীনতা এইরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইল, তখন বাহিরের স্বাধীনতা বিনাশ পাইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। আমাদের দেশের এই যে দাক্ষণ ছর্ষিপাক—এ ছর্ষিপাকের খণ্ডন হইবে কিসে? আমাদের দেশের আপাদ-মস্তক এই যে জড়তাব্যাবধিতে আক্রান্ত হইয়াছে—এ

* এ কথা বলা বাহুল্য যে শুণ্ডহত্যা বা আক্রান্ত ব্যক্তিকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে না দিয়া হত্যা কোনও কালে ক্ষত্রিয় ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয় নাই এবং বর্তমান ভারত প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধর্মামুষ্ঠানেরও উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে—সম্পাদক।

রোগের ঔষধ কি? জাতীয় পাপের ঔষধ জাতীয় অমুতাপ এবং জাতীয় ধর্মের অমুঠান। একদিকে যেমন আমরা আমাদের দেশের পূর্বতন পাপের ফলভোগ করিতেছি, আর একদিকে তেমনি আমাদের দেশের পূর্বতন তপস্যা এবং স্মৃতির ফল লোকসমাজে তলে তলে কার্য্য করিতেছে। এখনো যদি আমরা বেদ উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্র সকলের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের সেই অন্তর্নিগূঢ় পুণ্যফল জাগাইয়া তুলি, আর তাহারই উপরে জাতীয় ঐক্যের গোড়াপত্তন করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের সে চেষ্টা কখনই বিফল হইবে না। আমাদের জানা উচিত যে, অস্তরের স্বাধীনতাই বাহিরের স্বাধীনতার সোপান; তেমনি অস্তরের পরাধীনতাই বাহিরের পরাধীনতার সোপান। আমরা যদি ঔদ্ধত্যের সভা না করিয়া অমুতাপের সভা করি; আর, জাতীয় ভ্রাতারা মিলিয়া অমুতপ্তচিত্তে ঈশ্বরের নিকটে আমাদের মর্ম্মবেদনা জানাই তাহা হইলেও অকূল পাথারে আমরা কতকটা কূল কিনারা পাই; কিন্তু আমরা বলিতে শিখিয়াছি—“ধর্ম্ম চাহি না, ঈশ্বর চাহি না।” ইহাতে আর আমাদের কত ভাল হইবে?

স্বাধীনতা কাহাকে বলে এবং ধর্ম্ম কাহাকে বলে, এটা যদি আমরা স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাইব যে দুয়ের মধ্যে মূল্যেই প্রভেদ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মের মধ্যে একটা মনঃকল্পিত ব্যবধানের প্রাচীর দাঁড় করাইয়া লোকে যখন স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া নাচিয়া উঠে—সে স্বাধীনতা সোপার হরিণ, তাহাকে বিশ্বাস নাই। তাহা ফরাসী বিপ্লবকারীদের “Equality Fraternity Liberty” বই আর কিছুই নহে। ভারত = রামচন্দ্র; ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা = সীতাদেবী; দানবী স্বাধীনতা = মায়ামৃগ। ঐ মায়ামৃগটা সীতাদেবীকে রাবণের হস্তে সমর্পণ করিবার পন্থায় ফিরিতেছে অহোরাত্র। আমাদের দেশের সভাপতিরাও তেমনি। তাঁহারা দেশস্বত্ব লোককে মায়াবিনী সভ্যতার দীক্ষিত করিবার জন্য মহা মহা সভা আহ্বান করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলেন যে “আমরা অযোধ্যাপুরীকে সোপার লঙ্কাপুরী করিতে চাই—এ বিষয়ে কর্ত্তারা আমাদের সাহায্য প্রদান করুন;

যদি সাহায্য প্রদান না করেন তবে আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিব।” বিরুদ্ধাচরণের কথা শুনিয়া লঙ্কেশ্বর মনে মনে হাসিতেছেন। তিনি বেস্ জানেন যে, “এদের না আছে ঐক্যজালিক ব্রহ্মাস্ত্র না আছে তিরস্করী মন্ত্রবিদ্যা, না আছে কিছু; এরা কপাধারী ঘোড়া বিষধর—গর্জ্জনকারী শরতের মেঘ। তবে এরা যদি সত্য সত্যই অযোধ্যাপুরীকে লঙ্কাপুরী করিয়া গড়িয়া তোলে, আমাদের তাহাতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই; কেননা অযোধ্যাপুরী লঙ্কাপুবী হইলে তাহা আমাদেরই পুরী হইবে।” ফল কথা এই যে আমরা দানবী সভ্যতার উপরে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার গোড়া পত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছি। মনে কর যেন তাহাতে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। মনে কব যেন দানবী সভ্যতা আমাদের স্বক্কে ভাষ-লাঘব করিয়া সাতসমুদ্র পারে প্রস্থান করিল। তাহা হইলে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা দাঁড়াইবে কিসের উপরে? আমাদের স্বদেশীয় মানবী সভ্যতার উপরেতো দাঁড়াইবে?

শুদ্ধ হয়। দেশীয় ভাষায় জ্ঞান-রত্ন ভক্তি-মুখ্য সাধনসম্পাদ প্রভৃতি যত কিছু সার পদার্থ এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বহুদে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, স্বদেশের সেই মহামূল্য পৈতৃক মূল ধন আমরা অনেককাল যাবৎ ধোয়াইয়া বসিয়া আছি! তবে কি ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ব্যতিরেকে এক্ষণে আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই? দানবী সভ্যতা ছাড়া কি আর সভ্যতা নাই? প্রকৃত সভ্যতা বলিয়া কি একটা পদার্থ নাই? আমার ক্রব বিশ্বাস এই যে, আমাদের দেশের অন্তরে অন্তরে—হাড়ে হাড়ে বলিলেও হয়—প্রকৃত সত্যের ভাব, প্রকৃত ধর্ম্মের ভাব, প্রকৃত মঙ্গলের ভাব জাগিতেছে; যদিচ বাহিরে বাহিরে ঠিক তাহার বিপরীত। আমার মন তাই বলে যে, সেই অন্তর্নিগূঢ় অধ্যাত্মশক্তিকে বৈধ্য বীধ্য পরহিতৈষিতা দ্বারা সত্য প্রভৃতির অমুঠান দ্বারা জাগাইয়া তুলিয়া তাহারই উপরে জাতীয় ঐক্যের গোড়া পত্তন সর্ব্বথা বিধেয়; কেননা, অধ্যাত্ম শক্তির একটা ঈশ্বরদত্ত বল আছে—সে বলের সাম্নে ঐপয় কোনো বলই মাথা উচা করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। শক্তিশেলের বেদনায় লম্বন যখন মুমূর্ষুদশাপন্ন তখন হুম্মান-বীর গল্পাঘন পর্কত হইতে যেমনতর একটা

বিশাল্যকরণী মহৌষধি আনিয়া তাহার গুণে লক্ষণকে
ষমধার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, সেইরূপ একটা প্রবল-
পরাক্রম মহৌষধি আমাদের জন্ত আবশ্যক হইয়াছে ; নচেৎ
আমাদের যেমন বিষম সাম্প্রতিক ব্যাধি তাহাতে সামান্য
গোচের টোটকা টুটকিতে ফল দর্শিবে না, ইহা বুঝিতেই
পারা যাইতেছে। সে ঔষধ সত্য ধর্ম (শ্রীতলা পূজা, মনসা
পূজা নহে) সত্য স্বাধীনতা (স্বেচ্ছাচারিতা নহে) সত্য
বৈর্য বীর্য (চপলমতিভুলভ মৌখিক বীর্য প্রকাশ নহে) ;
সত্য চাই—অকৃত্রিম সত্য চাই—খাঁটি সত্য চাই।

কায়মনোবাক্যের একতা চাই ; হৃদয়ে
হৃদয়ে—মর্মে মর্মে—যোগ চাই ; তবেই
ঔষধের গুণ ধরিবে দেখিতে দেখিতে ; নচেৎ
মাথা খুঁড়িলেও কিছুই হইবে না। সত্যের
এনি গুণ যে, “স্বল্পমপ্যস্তা ধর্মস্য ত্রায়তে
মহতো ভয়াৎ।”

আপনার অম্লরক্ত
শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাগজ ।

কাগজ আমাদের আধুনিক সভ্যতার একটা প্রধান উপাদান
স্বরূপ ; এবং আপনি আবার শুনিয়া আশ্চর্য্যাম্বিত হইবেন
যে ইহা আমাদের সভ্যতার একটা অন্তরায়। ইহা আমা-
দের সুন্দর পৃথিবীকে বৃক্ষশূন্য করিবার ভয় দেখাইতেছে।
পৃথিবী বৃক্ষশূন্য হইলে সমস্ত স্রোতস্বতী শুকাইতে আরম্ভ
করিবে ; পৃথিবী বৃষ্টিশূন্য হইবে এবং ইহা একটা মরুভূমিতে
পরিণত হইবে।

আপনি বলিতে পারেন যে পৃথিবীর এই অবস্থায় পরিণত
হওয়া পর্য্যন্ত আপনি বাঁচিবেন না, সমস্ত পৃথিবী এত অব-
স্থায় পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত আপনি নাও বাঁচিতে পারেন।
কিন্তু এখন একটা দেশের বিষয় আলোচনা করা যাক। তাহা
হইলে আপনার এই ভ্রম বিদূরিত হইবে। মার্কিন দেশের
কাগজের কলগুলি রোজ যে পরিমাণ বৃক্ষ চর্ষণ করিতেছে
যদি ক্রমাঘরে কএক দিন এই পরিমাণে করিতে থাকে তাহা

হইলে আপনি আপনার জীবদশায়ই এই দেশকে জঙ্গল-
শূন্য দেখিয়া যাইতে পারিবেন।

আপনার এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে এই দেশের জঙ্গল-
বিভাগের বড় কর্তার মন্তব্য শ্রবণ করিলেই আপনার সে
সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। তিনি বলিয়াছেন—“আমাদের এখন
কেবল মাত্র দুই হাজার বিলিয়ন ফুট (two thousand
billion feet), পাঁছ অবশিষ্ট আছে। যে পরিমাণে এককাল
এই গাছ ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে, এখনও যদি সে পরিমাণে
ব্যয়িত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই অবশিষ্ট কাঠ গুলিতে
২০ বৎসর মাত্র চলিতে পারে। নিউ ইয়র্কের (New York)
জঙ্গল এবং মৎস্য বিভাগের কমিসনার (Commissioner)
মিঃ হুইপ্পল (Whipple) আরও কি বলিয়াছেন শ্রবণ
করুন। তিনি বলিয়াছেন “আধুনিক সময়ে নিউ ইয়র্ক (New
York) সহরে ৪১ বিলিয়ন ফুট কাঠ অবশিষ্ট আছে এবং
প্রতি বৎসর ১২ বিলিয়ন ফুট করিয়া ব্যয়িত হইতেছে।”
এবং তিনি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন “যদি আরও কএক
বৎসর কোন প্রকার পরিবর্তন না হইয়া এই প্রকারে কাঠ
ব্যয়িত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই কাঠ ২২ বৎসর
মধ্যে নিঃশেষ হইবে।” এবং এত কাঠ কি প্রকারে ব্যয়
হইতেছে তাঁহাকে এই প্রশ্ন করায় তিনি উত্তরে বলিয়াছেন
“এক মাত্র ধবরের কাগজের জন্তই প্রতিবৎসর” দুই বিলিয়ন
ফুট কাঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।”

মার্কিন দেশের কৃষি বিভাগীয় রিপোর্টে প্রকাশ প্রতি
বৎসর পাঁচশত ছাব্বিস মাইল ব্যাপী কাঠ এক মাত্র কাগজ
প্রস্তুতের জন্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; এদেশীয় প্রকাশকেরা
প্রতি বৎসর ৩,৫০০,০০০ কর্ড (cord) এর ও অধিক কাঠ
ব্যয় করিয়া থাকে।

গত বৎসর একমাত্র নিউ ইয়র্কের (New York)
ওয়ার্ল্ড (world) নামক পত্রিকার জন্ত ৭৭৩:৮৭৫ পাউণ্ড
শাদা কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এক মাত্র রবিবারের সংস্করণের জন্ত দৈনিক ধবরের
কাগজের এক সপ্তাহে ব্যবহৃত কাগজের শতকরা ৩০ ভাগ
করিয়া লাগে, অবশিষ্ট ৭০ ভাগ সপ্তাহের অন্ত্যস্ত বারের জন্ত
ব্যয়িত হয়।

• কাগজের যৌগিক পদার্থ ৮০ ভাগ কাঠ এবং ২০ ভাগ

অল্প পদার্থ যাহা পরে বলা হইবে। ইহা হইতেই ঐ বিভাগীয় বহুদশী লোকগণ স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে এই কাগজের একমাত্র রবিবারের সংস্করণের জন্ম ২২.৭ একর জমির কাঠ লাগিয়া থাকে, সপ্তাহের অন্ত্যান্তদিনের জন্ম ১১.৫ একর জমির কাঠ লাগে। এখানে রবিবারের সংস্করণের ১৫৬টা পত্রিকা বিস্তারিত।

গত নবেম্বর মাসে যুক্ত রাজ্যের Census Bureau যে বুলেটিন (Bulletin) প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল। “১৯০৫ সনে যুক্তরাজ্যে মোট যত কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে তন্মধ্যে নয় হাজার টন (ton) কেবল মাত্র সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রের জন্ম ব্যয় হইয়াছে। ইহা ঐ সনের মোট প্রস্তুত কাগজের এক তৃতীয়াংশ। এই সমস্ত কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য ১৫০০০ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং নয় কোটি সাতাশ লক্ষ দুই হাজার আট শত পনের টাকা বেতন দিতে হইয়াছে। এই সমস্ত কাগজের কল ১০ দশ লক্ষ তিন শত কর্ড (cord) কাঠ ব্যবহার করিয়াছে, যাহা এক হাজার একর জমির উদ্ভূত পদার্থ। ইহার কতকাংশ কানাডা হইতেও আমদানি হইয়াছে। ইহা হইতেই দেখা যায় যে একমাত্র যুক্তরাজ্যে এক মিলিয়ন সাত শত ষাট হাজার ফুট কাঠ প্রতিবৎসর সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রে পরিণত হইতেছে।” এই বুলেটিনে আরো প্রকাশ ১৯০৫ সালে মোট সাতাত্তর কোটি বিশলক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয় শত ষোল টাকা মূল্যের কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সংবাদ পত্রের কাগজ দশ কোটি আটাত্তর লক্ষ এক চল্লিশ হাজার চারি শত ছাপান্ন টাকার; পুস্তকের কাগজ এগার কোটি তেত্রিশ লক্ষ উনআশি হাজার তিন শত বাবটি টাকার; উৎকৃষ্ট কাগজ ছয় কোটি চুয়ান্ন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শত ছিয়ানব্বই টাকার; দোকানের জিনিষ পত্রাদি বাধিবার কাগজ নয় কোটি বাইশ লক্ষ সাতান্ন হাজার আট শত অষ্টাশি টাকার; বোর্ড বা পাটা পাঁচ কোটি চৌদ্দ লক্ষ আট হাজার ছয় শত সাতান্ন টাকার।”

কেবল একমাত্র নিউইয়র্ক সহরের সংবাদপত্রগুলির জন্মই সমস্ত যুক্তরাজ্যের প্রস্তুত কাগজের এক অষ্টমাংশ

ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই সকল সংবাদপত্রের সংখ্যা এতই অধিক যে যদি এক দিনের প্রকাশিত সংবাদপত্র পাঁচ ফুট প্রশস্ত টুকরা করিয়া বিস্তৃত করা যায়, তাহা হইলে ইহা নিউইয়র্ক হইতে তিন হাজার মাইল দূরবর্তী সেনফ্রানসিসকো পৌঁছিতে পারিত। এক সপ্তাহের কাগজ বিস্তৃত করিলে বিষুবরেখা দিয়া সমস্ত পৃথিবীকে বেষ্টিত করিতে পারে। দশ সপ্তাহে ইহা চন্দ্রমণ্ডলে পৌঁছিতে পারে। এবং যদি এক বৎসরের সংবাদ পত্র পাঁচ ইঞ্চি টুকরা করিয়া বিস্তৃত করা যায় তবে বোম্ব হয় ইহা দ্বারা সূর্যমণ্ডলের সহিত পৃথিবীর সংযোগ করা যাইতে পারে।

ইহা বলাই বাহুল্য যে এই সমস্ত কাগজ কলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কল এমন সুন্দর ভাবে প্রস্তুত যে এই বৃহত্তর কলের এক প্রান্ত দিয়া কাঠ প্রদান করিলেই অপর প্রান্ত দিয়া ইহা ছাপিবার উপযোগী কাগজ হইয়া বাহির হয়। এই বৃহত্তর কলের একটা বৃক্ষকে কাগজে পরিণত করিতে ১০।১২ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে, বিশেষ দক্ষতার সহিত চালাইতে পারিলে ইহাপেক্ষাও অল্প সময়ে করিতে পারা যায়।

একটা জীবন্ত গাছকে কত সস্তর সংবাদ পত্রে পরিণত করা যাইতে পারে, এ বিষয় নিম্না সম্প্রতি জার্মান দেশের (Germany) এসেনথাল (Essenthal) সহরে একটা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার সম্পূর্ণ বিবরণ এইঃ— একটা কলের নিকটস্থ তিনটা বৃক্ষকে সাতটা পর্য্যন্ত মিনিটের সময় কাটা হইয়াছিল, এবং তৎক্ষণাৎই বৃক্ষত্রয়কে বৃহত্তর কলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, এবং প্রথম কাগজের রোল ঠিক নয়টা চৌত্রিশ মিনিটের সময় প্রেসে যাইবার উপযুক্ত হইয়া বাহির হইয়াছিল, এবং তৎক্ষণাৎই কাগজগুলিকে একখানা অটোমোবাইলে (automobile) করিয়া নিকটস্থ সংবাদপত্র আফিসে পাঠান হইয়াছিল, এবং দশ ঘটিকার সময়ই সে সংবাদ পত্র রাস্তায় বিক্রয় হইতে থাকে। এই বৃক্ষত্রয়কে খবরের কাগজে পরিণত করিতে ঠিক দুই ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমিত হইবে যে কত সস্তর একটা কলে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কাগজের কলে প্রথমে কাঠগুলিকে ক্রাত দ্বারা চিরিয়া ফেলে এবং পিষিয়া ছাতুর জায় করে। এই পেষণ কার্য কোন প্রকার ছুরি কিম্বা ক্রাত দ্বারা হয় না, অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন জাঁতা দ্বারা হইয়া থাকে। এই জাঁতা এত ক্ষমতাপন্ন যে ইহাতে পাঁচ শত কিম্বা ছয় শত বোড়ার ক্ষমতা থাকে। এই সকল কল এমন কোশলে প্রস্তুত যে এই ছাতুগুলি আপনিই জল মিশ্রিত হইয়া কর্দমাকারে পরিণত হয়। এই কর্দমাকার কাঠ হইতে আঁশ নিষ্কৃত করিবার জন্য উহাকে ফুটন্ত গন্ধক দ্রাবকে দেওয়া হইয়া থাকে। উহাকে কিঞ্চিৎকাল এই দ্রাবক মধ্যে রাখিয়া, জল দ্বারা ধুইয়া ফেলা হয়।

অবশেষে কর্দমাকার পদার্থকে মৃৎ কাগজে পরিণত করিবার জন্য অল্প পরিমাণ কর্দম, কাগজে কালী বিস্তৃত না হইবার জন্য অল্প পরিমাণ রজন (resin) ও সাদা করিবার জন্য কিছু নীল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। ইহা এখন দেখিতে পায়সের মত সাদা হইল। এই পায়সকে অধিক মিশ্রিত ও কাগজাকারে বিস্তৃত করিবার জন্য, ইহার উপর দিয়া জল প্রবাহিত করা হইয়া থাকে। জল ঠিক একটি প্রশস্ত ফিতার আকার ধারণ করিয়া একটি তারের জালের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়; এবং ঐ পদার্থগুলি জালের দুই পার্শ্ব দিয়া পড়িয়া না যাইবার জন্য, ঐ জালের দুই পার্শ্ব রবারের ফিতা দ্বারা আটকান থাকে। ইহা এখন ঠিক কাগজের জায় বিস্তৃত হইল।

ঐ জলগুলি জালের ছিদ্র মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে পড়িয়া যায় এবং কাগজগুলি শুকাইতে থাকে। তারপর এই গুলিকে একটি রোলারের (roller) ভিতর প্রবেশ করান হয় এবং রোলারের চাপদ্বারা ইহার জল বাহির করিয়া দেয়। তদনন্তর এইগুলিকে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিবার জন্য একটি গরম সিলিন্ডারের (cylinder) ভিতর দিয়া পরিচালিত করা হইয়া থাকে। অবশেষে এই কাগজগুলিকে মৃৎ করিবার জন্য ধারাবাহিকরূপে ঠাণ্ডা লোহার রোলারের মধ্য দিয়া পরিচালিত করা হইয়া থাকে। এখন ইহা ছাপাইবার উপযোগী কাগজে পরিণত হইল। এই গুলিকে অতি পরিপাটীরূপে রোল করিয়া, ফরমাইন্স অনুযায়ী আকারে পরিণত করা হয়।

খুব ভাল বোলিং মেশিনে এক মিনিটে পাঁচশত ফুট করিয়া কাগজ গুটাইতে পারে। যুক্ত রাজ্যের রামফোর্ড ফলস্ (Rumford Ealls) নামক স্থানে একটা কলে চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার আঁশ (৮০) মাইল করিয়া কাগজ বাহির করিয়া থাকে। প্রতি মাইল কাগজ গুজনে অর্ধ টন (ton) করিয়া। পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে যে প্রতি দিনে যুক্ত রাজ্যের সমস্ত কলগুলিতে চারি হাজার টন করিয়া কাগজ উৎপন্ন করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত একমাত্র নিউইয়র্ক সহরের পত্রিকাগুলির জন্যই পাঁচ শত টন করিয়া ব্যয়িত হয়।

যুক্তরাজ্যে অত্যন্ত অধিক কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন বিষয়ে এদেশে কাগজ প্রস্তুত শিল্পই সর্ব-প্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৯০৫ সনের সেন্সাস রিপোর্টে প্রকাশ যে উক্ত বৎসর এই রাজ্যে ছাব্বিশ হাজার চারি শত বাইশটি ছাপাখানা ছিল এবং এই সকল ছাপাখানার এক শত বোল কোটা সম্ভব লক্ষ সাতার হাজার দুই শত পাঁচ টাকা মূলধন খাটিত এবং প্রতি বৎসর দেড় শত কোটা ছত্রিশ লক্ষ পচাশি হাজার নয় শত অষ্টাশি টাকা মূল্যের পুস্তকাদি বাহির হইত। ইহার এক তৃতীয় ভাগ ছাপাখানা কেবলমাত্র পুস্তক এবং বিজ্ঞাপনাদি ছাপার জন্য ব্যাপৃত ছিল এবং এক বর্ষভাগ কেবলমাত্র মাসিক পত্র এবং সংবাদ পত্রাদি ছাপিবার জন্যই ব্যাপৃত থাকিত। অবশিষ্ট অন্যান্য কার্য করিত। এখন বোধ হয় ছাপাখানার সংখ্যা এবং পত্রিকার সংখ্যা পূর্বে হইতে কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে।

গত ১৯০৫ সনে যুক্তরাজ্যে মোট একহাজার বত্রিশ কোটা একাল্ল লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার এক শত অষ্টাশিখানা সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রিকা ছাপা হইয়াছিল। দৈনিক সংবাদ পত্রের রবিবারিক সংস্করণ প্রতি রবিবার এক কোটা পনের লক্ষ উনচল্লিশ হাজার একশতখানা করিয়া হইয়াছিল, এবং অন্যান্য দিনের কাগজ প্রতিদিন দু'কোটা দশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার এক শত ত্রিশখানা করিয়া হইয়াছিল। এবং মাসিক পত্রিকা প্রতি মাসে ছয় কোটা তেতাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার এক শত পঞ্চাশখানা করিয়া হইয়াছিল, এবং সাপ্তাহিক প্রতি সপ্তাহে দুই কোটা

সাতাত্তর লক্ষ বত্রিশ বাজার সাঁইত্রিশখানা করিয়া হইয়াছিল ।

নিউইয়র্ক স্টেটসক্রিটাত্ত (New York Staats Zeitung) নামক পত্রের সম্পাদক এবং প্রকাশক মিঃ হারম্যান রিডার (Hermann ridder) গত অক্টোবর মাসে জাতীয় পৌর-সম্মিলনীতে (National Civic Federation) বলিয়াছেন যে, এস্থানের সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রগুলি প্রতি মাসে কেবলমাত্র কাগজের জন্তই সত্তের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে । কেবলমাত্র একটা কাগজ প্রস্তুতের কারখানাতেই প্রতি বৎসর ছয় কোটি ছত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচ শত টাকার ব্যবসা হইয়া থাকে, পনের হাজার লোক খাটে, এবং উহা ২৫৯৭ বর্গ মাইল কাঠের জমির অধিকারী ।

সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রের পরই এস্থানের ট্রাম গাড়ির কোম্পানি এবং টেলিফোন কোম্পানি (telephone Co.) অধিক মাত্রায় কাগজ ব্যয় করিয়া থাকে । একমাত্র ট্রাম কোম্পানির পরিবর্তনের (transfer) জন্তই প্রতি বৎসর তিন কোটি টুকরা কাগজ ব্যবহার হইয়া থাকে, যাহার জন্ত মোটামুটি তিন শত তা কাগজ ছাপাইবার প্রয়োজন হয় । টেলিফোন কোম্পানির কেবল মাত্র নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া ও সিকাগোর জন্ত চৌদ্দ লক্ষ খানা গ্রাহক তালিকার আবশ্যক হয়, যাহার জন্ত দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড কাগজের আবশ্যক হইয়া থাকে ।

পূর্বে এই সমস্ত কাগজ পুরাতন কাপড়ে প্রস্তুত হইত । সেই সময়ে কাগজের মূল্যও অধিক ছিল, এখনো অনেক ভাল কাগজ পুরাতন কাপড় দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

যুক্তরাজ্যে কাঠ দ্বারা কাগজ প্রস্তুতের প্রথা প্রথমে ১৮৬৭ গালে মাসাচুসেট্ (Massachusset) প্রদেশের ষ্টক-ব্রিজ্ (Stock Bridge) সহরের মিঃ আলবার্টো প্যগেন-স্টেবার (Alberto Pagensteber) দ্বারা প্রবর্তিত হয় । সে সময়ে কেবলমাত্র বাঁতা দ্বারা কাঠ পেষণ করিয়াই কাগজ প্রস্তুত করা হইত । সেই জন্ত তখন এই উপায়ে উৎকৃষ্ট কাগজ পাওয়া যাইত না । এখন পেষিত কাঠ গুলিকে ফুটন্ত গন্ধক দ্রাবকের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া

উত্তমরূপে আঁশ নিমুক্ত করা হয়, সেই জন্তই এখন উত্তম কাগজ পাওয়া যাইতেছে ।

সমস্ত কাঠই কাগজ হয় না । এখন এখানে সমস্ত কাঠ দ্বারাই কাগজ প্রস্তুতের পরীক্ষা চলিতেছে । অনেক ফলও পাওয়া গিয়াছে । বোধ হয় শীঘ্রই কৃতকার্যতা লাভ হইবে ।

খৃষ্ট জন্মবার এক বৎসর পূর্বে চীন পণ্ডিত ত্রিযুত জায় লুন (Ts'ai lun) দ্বারা চীন দেশে প্রথমে কাগজ আবিষ্কৃত হয় । এই চীন পণ্ডিত অনেক গবেষণার পর রেশম দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন । অবশেষে তিনি ধানের খড় এবং পুরাতন কাপড় দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন ।

ইজিপ্সিয়ানরা (Egyptians) রশ (Rush) নামক ঘাস দ্বারা প্রস্তুত কাগজে লিখিত । সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দ (Samarcand) সহরে চীনবাসীদের প্রাণালীতে কাগজ প্রস্তুতের জন্ত এক কারখানা খোলা হইয়াছিল ।

৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা নগরের আরব পণ্ডিত যোজেফ্ আমরু (Joseph Amru) স্বাধীন ভাবে কাগজ প্রস্তুত করেন । শিক্ষিত আরবগণ শীঘ্রই ইহার ব্যবহার আরম্ভ করে । আমরুর কাগজ প্রথমে তুলা দ্বারা প্রস্তুত হইত । অবশেষে তুলার পরিবর্তে পাট ব্যবহার হইত । এই আরবীয় কাগজ একাদশ শতাব্দিতে মুরদের (Moor) দ্বারা স্পেইনে যায়, এবং স্পেইন হইতে ফ্রান্সে যায় এবং এই প্রকারে সমস্ত ইউরোপে যাইতে আরম্ভ করে ।

এখনো ইউরোপীয় অনেক দেশে হস্ত পরিচালিত প্রথাই কাগজ প্রস্তুত হইতেছে । যুক্তরাজ্যের মাসাচুসেট্ (Massachusset) প্রদেশের অ্যাডাম (Adum) নামক স্থানে একমাত্র একটা কলে এখনও এদেশে হস্ত পরিচালিত প্রথাই কাগজ প্রস্তুত হইতেছে । এই হস্ত প্রস্তুত কাগজ অত্যন্ত শক্ত ও সুন্দর এবং অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় । হস্ত পরিচালিত প্রথাই পাঁচ জনা লোক এক দিনে তিন রিমের অধিক কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে না ।

যে সমস্ত হস্তপ্রস্তুত কাগজ এ রাজ্যে ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই জাপান হইতে আমদানি হয় । কিঞ্চিৎ পরিমাণ ফ্রান্স ও ইটালী হইতেও আমদানি হয় । আধুনিক সময়ে ইম্পিরিয়াল জাপানিজ্ ভেলাম (Imperial Japanese

Vellum) নামক হস্ত প্রস্তুত কাগজই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। ইহার এক রিম্ (৫০০ পাঁচ শত তা) চারি শত বারাস্তর টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। প্রকৃত ইম্পিবিয়াল জাপানিঙ্ক ভেলাম (Imperial Japanese Vellum) কাগজের পরীক্ষা অতি সহজেই করা যায়। যদি ইহা প্রকৃত উক্ত কাগজ হয়, অত্যন্ত মৃদু থাকে সত্ত্বেও, কোন প্রদীপের শিখার বিপরীত দিকে ধবিলে, পশমী কাপড়ের জায় দেখাইবে। অন্য উপায়েও এ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একটুকরা ঐ কাগজ জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে যদি বিস্তৃত থাকে তাহা হইলে ইহা প্রকৃত, আর যদি কোঁকড়া হইয়া যায় তবেই জানা যায় ইহা নকল।

অনেক সময় কাগজে জলছাপা দেওয়া যায়। কাগজ ভিজা থাকিতে থাকিতে ইম্পাতের ছাঁচ দ্বারা (Steel die) এই ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে।

নষ্ট কাগজ আবার কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ফেলা যায় না।

এই যুক্তরাজ্যে এক ব্যক্তি কাগজ দ্বারা রাঁধিবার কড়া ডেক্টি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। তিনি এই সমস্ত পদার্থ কাগজের উপর তাঁহার আবিষ্কৃত অদাহ্য এনামেলের প্রলেপ দান দ্বারাই করিতেছেন।

রসায়নের গুণে কাগজ দ্বারা কি না হইতেছে? ইহা দ্বারা গাড়ির চাকা, অদাহ্য ছাত (ceiling), কৃত্রিম বস্ত্র, ঘরের মেঝে, জলের বাগ্‌তি, জানালার জাল, খড়খড়ি, ফিল্টার, স্নাতা, পোষাকের লাইনিং (dress-lining) প্রভৃতি আরোও অনেক পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে।

পুরাতন কাগজের কালী উঠাইতে পারিলে কাগজের মূল্য অনেক হ্রাস হইবে, সেই জন্যই খবরের কাগজ ও পুস্তকের মূল্য অনেক কমিবে। যে পণ্ডিত ইহা করিতে সমর্থ হইবেন তিনি সাধারণের অত্যন্ত ধন্যবাদী হইবেন। ছাপার কালিতে তিসির তৈল এবং রজন থাকার দরুণ কোন রাসায়নিক পদার্থই এ পর্যন্ত ইহা উঠাইয়া ফেলিতে সমর্থ হয় নাই।

কালিফনিয়া।

শ্রীনিরুপমচন্দ্র শুধ ঠাকুরতা।

আভিজাত্য।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আভিজাত্যের উপর অল্প বা অধিক পরিমাণে লোকের শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন দেশে আভিজাত্য সম্পন্ন ব্যক্তির ভূমির অক্ষুণ্ণ স্বত্বাধিকারী হইয়া আছেন, এমন কি সূচ্যগ্র ভূমিও অনভিজাতদিগের অধিকৃত নহে। তাহারা কেবল কর প্রদান পূর্বক কর্ষণাদি করিতে অথবা করাইতে পাবে। ভূমি সম্পর্কিত কথা বাদ দিলেও দেখিতে পাই যে, সমাজেও অভিজাতদিগের অনেক বিষয়ে অপ্রতিহত প্রভুত্ব রহিয়াছে। তাঁহারা দক্ষিণা পাইলেই অনভিজাতকে ইচ্ছা পূর্বক আভিজাত্যের সম্মানে অলঙ্কৃত করিতে পারেন। কাহার সাধ্য যে, তাঁহাদিগকে প্রসন্ন না করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আভিজাত্যশূন্য ব্যক্তিদ্বিগকে যৎপরোনাস্তি অপদস্থও করিতে সমর্থ আছেন। অন্যান্য সাধারণ কার্যে তাঁহাদের সহিত অনভিজাত মনীষিবর্গ যোগদান করিতে পারিলেও এক ভোজ্যাধারে ভোজন প্রভৃতি সামান্যলক ব্যবহারে তাহাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এইরূপ নিদর্শনও পাওয়া যায় যে, আভিজাত্যশূন্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষও নিম্নপদস্থ অভিজাত রাজপুরুষের সহিত এক ভোজ্যাধারে ভোজন করিতে অধিকারী হইবেন না। এরূপ নিয়মে না হউক, কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই কোন না কোন প্রকারে অভিজাত-দিগের গৌরব অনভিজাত অপেক্ষা অধিক রহিয়াছে। একজাতি হইতে অপর জাতির আভিজাত্য অন্তরূপ হইতে পারে, পরন্তু এমন জাতি বিরল আছে, যাহাকে আভিজাত্য সংস্কার অধিকৃত করে নাই। এই ত গেল মর্ত্যালোকের কথা—আবার স্বর্গেও আভিজাত্যের রাজপথ পরিষ্কৃত রহিয়াছে; সেখানেও এক দেবতা অন্য দেবতার সমকক্ষতা করিতে পারেন না। যখন স্বর্গ মর্ত্যালোকবাসীরই মনঃ-কল্পিত, তখন সেইখানেও যে তাহাদের আভিজাত্যভাব প্রবেশ করিবে ইহাতে বৈচিত্র্য কি আছে?

পুরাকালে সরস্বতী দেবীর লোলারঙ্গভূমি একমাত্র অভিজাতদিগের জন্ম ও রসনা ছিল, এই জন্য অনভিজাত-বৃন্দ যদিচ্ছাক্রমে তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেন।

এইক্ষেণে বিজ্ঞান ব্যাপ্তি জনসাধারণের মধ্যে হইতে চলিল, স্নতরাং বর্তমান অনভিজাতেরা আর বড় অভিজাতদিগের নৈক্সে সম্বন্ধ নহেন। তাঁহারা বৃত্তিতে পারিয়াছেন যে, বিজ্ঞা, ধন প্রভৃতি মানবীয় অভ্যাসকারী যে সকল জিনিষ আছে, তাহাতে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। এইগুলি একমাত্র অভিজাতদিগের স্বাধিকৃত হইতে পারে না। এই কারণে পৃথিবীতে আভিজাত্য ও অনাভিজাত্য লইয়া একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে; ভগবান্ই নিশ্চয়রূপে বলিতে পারেন কোনপক্ষ বিজয়লক্ষী লাভ করিবে। তবে সম্ভাবনা এই যে, সংখ্যা, উৎসাহ ও কার্যপটুতার গুরুত্ব বা আধিক্যে অনভিজাতেরাই এই সংগ্রামে বিজয়ী হইবেন। অধিকন্তু সংগ্রামকালে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষই শাস্তিস্থ উপভোগ করিতে পারেন না, উভয়কেই বিজয়াশাপ্রণোদিত হইয়া রণসম্ভার সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাই আজ পৃথিবীর কোথাও শান্তিদেবীকে বিরাজমানা দেখিতে পাওয়া যায় না; সর্বত্রই যেন অশান্তির তপ্ত প্রস্রবণ বহিতেছে। পূর্বে যাহারা যে অভিজাত বিশেষের আচ্ছাবহ ভৃত্য বা উচ্চিষ্ট ভোজনেও আপনাকে ধন্ত মনে করিত, তাহারা আব এক্ষণে তাঁহাদিগকে আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াও মানিতে চাহে না। এই ত গেল অনভিজাতের কথা।

আবার অনেক অভিজাত মহোদয় বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য বা “ভট্টেন নীবার ইবাবশিষ্ট” উক্তির লক্ষ্য হইয়াও আমার বুদ্ধ প্রপিতামহ অথবা তাঁহার বুদ্ধ প্রপিতামহ পণ্ডিত এবং সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া ‘ডম্-ম্-ম্’ করিতে ছাড়েন না। এই উভয় গুণধরদিগের ক্রুতিনৈপুণ্যে সমাজে একটা অস্তিনব বিশৃঙ্খল ভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

আভিজাত্যকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ধর্ম্মের আভিজাত্য, দ্বিতীয় বিজ্ঞান আভিজাত্য, তৃতীয় ভূমির আভিজাত্য ও চতুর্থ ধনের আভিজাত্য। প্রথম ও দ্বিতীয় আভিজাত্যের মূলে অন্তায় বা অধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় না, পরন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ আভিজাত্যের ভিত্তি তন্ন তন্ন করিয়া অমুসন্ধান করিলে অস্তায় এবং অধর্ম্ম ছাড়া বড় কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যাইবে কি প্রকারে? পরমেশ্বর জমিব সৃষ্টি করিয়াছেন জীব যাত্রের অথবা মানব মাত্রের জন্য, তাহাতে বলদৃষ্ট হইয়া অন্তের

উপভোগ্য অংশ স্বায়ত্ত করিয়া লওয়া ডাকাতিরই নামান্তর মাত্র। পক্ষান্তরে কতকগুলো লোক ধনী হইয়াছে আর কোটী কোটী নবনারী দারিদ্র্যের তীব্র নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতেছে, ইহার অর্থ কি ইহা নহে যে উহাদের প্রাপ্য অংশ ছলে বলে কৌশলে ধনিমহোদয়েরা আত্মসাৎ করিয়াছেন? ধনরাশি যদি কোবাগারে তাঁহাদের শ্রীমঙ্গ হইতে আপনা আপনি ঝর ঝর করিয়া পড়িত, তবে বলিতে পারিতাম যে, ঐগুলি একমাত্র তাঁহাদের প্রাপ্য। একজন ধনকুবের হইলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র লোকের স্বল্পে ছরারোহ অকিঞ্চনতা আসিয়া চাপিল। আমাদের বোধ হয় রাজত্ব ও ধনাগমের এইরূপ করাল দৃষ্ট দেখিয়া বা অমুভব করিয়া ভারতের প্রাচীন ঋষিবৃন্দ নিখিল আভিজাত্যের মধ্যে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান আভিজাত্যকে সর্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন। এইক্ষেণেও ভারত হইতে ঐপ্রকার ভাব নির্মূল হয় নাই; আজ ও অকিঞ্চন মহাপুরুষকে রাজ্যেশ্বর পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন, আজও শাকারভোজী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহারাজেরও অভ্যর্থনায় বঞ্চিত নহেন; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, দিন দিন যেক্রমে প্রতীচ্যভাবের প্রসার হইতে চলিল, ইহাতে অদূর ভবিষ্যতেই উহা অদৃষ্ট হইতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীতে তৃতীয় ও চতুর্থ আভিজাত্যের অধিক গৌরব—এই দুই আভিজাত্যের মধ্যে একটাও ইহাদের আছে, তাঁহাদিগকে বক্ষু ক্ষীত করিয়া চলিতে দেখা যায়। কেবল ইহা হইতেই যদি গুণধরেরা তৃপ্তিলাভ করিতেন তবে তত অনর্থপাতের আশঙ্কা হইত না। কিন্তু তাহারা অনভিজাতদিগের উন্নতিকে চক্ষুর শূল মনে করেন; প্রভুরা চাহেন যে, অনভিজাতেরা প্রমজীবী বা ক্রমক শ্রেণীতে পরিণত থাকিয়া তাঁহাদের আচ্ছাবহ ভৃত্য বা অধমর্ণ পদই অলঙ্কৃত করুক। এই শ্রেণীর মহাপুরুষদিগের ধারণা যে, স্বল্প সম্ভোগ ও শাস্তি প্রভৃতি সদৃশ কেবল অভিজাতদিগের জন্য নিয়মিত হইয়াছে। আহা প্রভুরা কি অপরূপ ধারণা করিয়া বসিয়াছেন! জিজ্ঞাসা করি, অনভিজাতেরা কি লোষ্ট্র বা উপলব্ধের ভ্রায় স্বল্প সম্ভোগের শ্রুতিতে বঞ্চিত রহিয়াছে? তাহারা বিজ্ঞা বুদ্ধি ও জ্ঞানীতি প্রভৃতিতে কি অভিজাতদিগের প্রতিযোগিতা করিতেছে না? অনভি-

জাতেরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করুক, আর তোমরা তাহাদের পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যাদি কেহ রাজসিংহাসন সুশোভিত কর, কেহ বিলাসনন্দনবনের পুরন্দর হও—এই অদ্ভুতনীতির সুমাদর তোমাদের নিকট হইতে পারে; পরন্তু কোন উদারচেতা মনীষীই ইহা অমুমোদন করিতে পারেন না।

পাঠক বুঝিতে পারিলেন যে যাহারা রাজ্য ও ধনের আভিজাত্য লইয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া থাকেন, তাহারা পৃথিবীতে দারিদ্র্য প্রসারিত হইবার মূলে রহিয়াছেন। পৃথিবীতে যত ধন ও জমি আছে ঐগুলি যদি সমভাগে জনসাধারণে বিভক্ত হয় তবে দারিদ্র্যই দূরিত হইয়া যায়। বিচারচক্ষু খুলিয়া দেখিলে ভূস্বামী ও ধনীদিগকে আমরা লৌকিক চক্ষে যেরূপ দেখিতে পাই তাহা বিপরীতভাবে ঘটিয়া থাকে। বোধ হয়, যেন তাহারা অনভিজাতদিগের বক্ষে ছুরিকা প্রহার করিতেছেন। রাজ্য ও ধনের অভিজাতেরা সকল বিষয়ে অত্যাধিকারী না হইলেও যে, অনভিজাতদিগের অভ্যুদয়ক্ষেত্রে পঙ্গপাল স্বরূপ, এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। জমি ও ধন যদি একশ্রেণীর লোকের স্বাধিকৃত রহিল, তবে যে অসম্প্রদায় শ্রেণীর লোকে দৈন্য ও দুঃখে কাল হরণ করিবে, এইরূপ হইবারই কথা। তাহার কারণ এই যে এই দুইয়ের উপর লৌকিক জুখ নির্ভর করিতেছে। পক্ষান্তরে দীন ও দুঃখীর বিদ্যা ও সভ্যতা প্রভৃতি সঙ্গুল আসিতে পারে না। আসিবে কিরূপে? তাহারা সর্বদাই আত্মীয়ের পোষণ চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, এমন কি উদর পূর্ণ করিয়া আহারও প্রাপ্ত হয় না। এমিকে ভূস্বামী ও ধনবানেরা তাহাদের প্রাপ্য অর্থ আত্মসাৎ করিয়া অজস্র উহার অপব্যবহারে নিযুক্ত আছেন। ভ্রমেও তাহাদের ঐরূপ শোচনীয় দশার প্রতি প্রভুদের দৃষ্টি পড়ে না। ইহা কেবল নিজের আত্মীয়বর্গের অথবা সমশ্রেণীর চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা অসমশ্রেণীর প্রতি যদি কদাচিৎ দয়াও কবিতোছেন মানিয়া লওয়া যায়, তথাপি নগ্নপদ অকোমলাঙ্গ কৃষিক ও শ্রমজীবীর প্রতি ভালবানার যে স্বপ্নও দেখেন, তাহা কোন প্রকারে স্বীকার করিতে পারা যায় না। পরন্তু বিবেক উপদেশ করে যে, যাহাদিগকে তাহারা ঘৃণা করিতেছেন, তাহাদের উপরেই প্রভুদের জীবনরক্ষার ভার রহিয়াছে।

কৃষক যদি শস্ত্র উৎপাদন না কবে এবং শ্রমজীবী যদি দ্রব্য-সম্ভার বহন প্রভৃতি ব্যাপারে বিরত হয়, তবে অবিলম্বেই তাহাদিগকে এই সাধেব লীলাভূমি হইতে অন্তর্ধান করিতে হইবে। স্বর্ণমুদ্রা চর্ষণ পূর্বক যে, কেহ কখন জীবনধারণ করিয়াছে ইহা শুনিতে পাওয়া যায় কৈ? যে কৃষক ও তদীয় পত্নী বালক বালিকার সহিত দুঃসহ শীতাতপ সহন পূর্বক মানবীয় জীবন রক্ষার মূল বস্তু উৎপন্ন করে, এই পাপ পৃথিবীতে তাহারা অনাহাবে মরিয়া যায়। সংক্রামক ব্যাধিও ঐ হতভাগ্যদিগকেই আক্রমণ কবে। প্লেগে যত লোক মৃত্যুর কবলে পতিত হয় তাহাদের মধ্যে ধনী সংখ্যা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। সদাশয় ভূস্বামী ও ধনিবৃন্দ যদি বিবেকের নির্জ্ঞান কুটীরে বসিয়া ভাবেন যে তাহাদের ঐ ভূমি ও ধন কোথা হইতে অধিকৃত হইল, তবে অবশ্যই তাহারা এইরূপ দেববাণী শুনিতে পাইবেন যে, “হে ভূস্বামিন ও ধনিবৃন্দ ঐ ‘ভূমি ও ধন সাধারণের; ঐগুলি তোমাদের বা তদীয় পিতৃপুরুষদিগের নহে। তোমরা, যদি পাপ হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে অবিলম্বে সাধারণের হিতার্থ ঐগুলিকে উৎসর্গ করিয়া দাও। নতুবা অদূর ভবিষ্যতেই শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের অভিসম্পাতে তোমাদিগকে দগ্ধ হইতে হইবে।”

অবশ্যই রাজ্য ও ধনের অভিজাতদিগের মধ্যে সদাশয়ও রহিয়াছেন, পরন্তু ঐ সদাশয়দিগকে সদাশয়তা গুণের জ্ঞান সম্মান করা উচিত হইলেও কদাপি অভিজাত বলিয়া জনসাধারণ তাহাদিগের অভিনন্দন করিতে পারে না। না, পারিবেন কি প্রকারে? এইরূপ আভিজাত্য প্রবর্তনের কাহিনী শুনিবা মাত্রই নীতিপরায়ণ সম্ভদয় ব্যক্তি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, অভিজাতবংশের রীতিনীতি ভালই হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করি দুইটা মিষ্ট কথা অথবা কায়দার সহিত ভদ্রলোকের সমক্ষে উপবেশন আদি করাই কি ইহার অর্থ? যদি এইরূপই হয়, তবে ঐ ভাল হওয়ার জ্ঞান আভিজাত্যকে সম্মান না দিয়া ভদ্রলোকদিগের সহবাসকেই উহা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। ধরাধামে এমন অভিজাতও বিরল নহে, যাহাকে একটা মনুষ্যাকৃতি অভিনব বলিবদি মাত্র বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। যদি আভিজাত্যের ঐরূপ মহিমাই

হইত, তবে কি আমরা এইরূপ দৃষ্ট দেখিতে পাইতাম। উক্ত অভিজাতবংশের প্রবর্তক যে, প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন লুপ্তনকাবী ছিলেন, সত্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

এই পর্য্যন্ত রাজ্য ও ধনসংক্রান্ত অভিজাত্যের আলোচনা করা গেল। এই ক্ষেত্রে ধর্ম ও বিত্তাব অভিজাত্য বিষয়ে গুণাগুণের অনুসন্ধান করা যাউক। পিতা-মাতার ধর্মভাব যদি নিয়তরূপে সম্মানে সংক্রমিত হইত, তবে বিত্তা ও ধর্মের অভিজাত্য এই ময়জগতে অতি আদরের জিনিষ হইয়া পড়িত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেক স্থলে ইহার বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ইহার উদাহরণ স্থল। অধিকন্তু রাজ্য ও ধনের অভিজাত্য যেরূপ অনভিজাতদিগের রুধির শোষণ না করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, তদ্রূপ এই অভিজাত্য নহে। বরং ইহা দ্বারা অনেক বিষয়ে সমাজের উপকার সংসাধিত হয়। যতপি পুরাকালের পৌরোহিত্যও এরূপ করাল দৃষ্ট দেখাইয়াছে, তথাপি বর্তমান সময়ে উহা তিরোহিতপ্রায়। এক্ষণে আর কোন সভ্যসমাজে প্রকাশ্যভাবে পুরোহিতের যথেষ্টাচার দৃষ্টিগোচর হয় না। স্রবণাতীত কাল হইতে আধ্যাত্মমতে যে, সম্যাসী-দিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি চলিয়া আসিতেছে, তাহাও দৈনন্দিন সংস্কারচর্চায় অনুসরণ করিতেছে। প্রতীচা শিকার প্রভাব বাহাদের উপর অক্ষুণ্ণ আছে তাঁহারা বড় সাধু সম্যাসীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। বাহারা স্বয়ং অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত লোকের ভাবে বঞ্চিত, তাহারাই তদীয় সেবায় আপনাদিগকে ধস্ত মনে করিয়া থাকে। ফলতঃ বর্তমান সময়ে এইরূপ অনেক সাধু সম্যাসী আছেন, বাহাদের মধ্যে অভিজাত্য ভিন্ন অল্প কোন বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিরও অভিমান করিয়া থাকেন। অনেকে আবার স্বয়ং সিদ্ধিব অভিমান না করিয়াও গুরুকে অথবা গুরুর গুরুকে সিদ্ধের সর্দার বলিয়া ঘোষণা করেন। সত্যের অনুরোধে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এইরূপ সাধু সম্যাসীরা ভারতবাসীর গণগ্রহে ভিন্ন আর কিছুই নহেন। অবশ্যই সদাশয় মনীষী সম্যাসীরা পৃথিবীর কল্যাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি নিরক্ষর ভোগাবণ্ড অর্থাৎ ভবঘুরে

দিগেরও গুণ গাইতে হইবে? ভারতে এই জাতীয়তার অকণোদয় সময়ে সাধু সম্যাসীরা যদি দেশের কল্যাণে ব্রতী হইতেন, তবে এক মহান কার্য সংসাধিত হইতে পারে। বঙ্গভূমির অনেক ভট্টাচার্য্য মহোদয়েরা স্বদেশের হিতসাধন করিতেছেন শুনিয়া স্তম্ভী হওয়া গেল। ভারতে যে জাতীয়তাব অনুর উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে ভট্টাচার্য্যদিগেরত কথাই নাই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে ভক্তিবারি সেচন পূর্বক ঐ অক্ষুব বাহাতে মহাবৃক্ষে পরিণত হয় তাহা করিতে হইবে। আবহমানকাল হইতেই আধ্যাত্মিকের সদাশয় সম্যাসী এবং ব্রাহ্মগণ জনসাধারণকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া আসিতেছেন। আশা করি বর্তমান সময়েও তাঁহারা এইরূপ করিবেন।

রাজ্য ও ধনের অভিজাত্য প্রবর্তক যেরূপ অস্ত্রের প্রাপ্য অংশ আত্মসাত্ করিয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ ধর্ম ও বিত্তার অভিজাত্য প্রবর্তক নহেন। এই অভিজাত্যের মূল অতীব পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক; কিন্তু পশ্চাত্ ইহাও ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় অভিজাত্যের মূল শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক, পশ্চাত্তরে তৃতীয় ও চতুর্থ অভিজাত্যের মূলদেশের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিলেও অস্ত্রায় এবং নৃশংসতার মাত্রা অধিক হইতে ও অধিকতম দেখিতে পাওয়া যায়; তখন অভিজাত্যের প্রবর্তক লইয়া যে অভিজাত্যেরা গৌরব করিয়া থাকেন, তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় অভিজাত্যশালী ব্যক্তিদিগের পক্ষেই উচিত। তৃতীয় ও চতুর্থ অভিজাত্যের লোকদিগের পক্ষে বরং উহা স্রবণ করিয়া অধোবদন হওয়াই বিধেয়। দেখিতে পাই অনেকেরই তাহাদের পূর্ব পুরুষ রাজকীয় উচ্চ কর্মচারী বা বীরপুরুষ ছিলেন বলিয়া অভিমানের বর্ষণ আরম্ভ করেন; পরন্তু অন্নবেতনের কর্মচারী হইয়া তাঁহারা কিরূপে রাশীকৃত অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা কি প্রভুরা কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? পশ্চাত্তরে বীরস্বের গৌরব ঠিক বল্য হাঁহিতে পারিত, যদি ঐ বীরপুরুষ স্বয়ং জমির অষ্টী করিয়া লইতেন। আর অস্ত্রের জিনিষ কাড়িয়া লওয়াও যদি সম্মানের কারণ হয়, তবে দস্যুদিগকে কেন আমরা সম্মান করি না? বৈষম্য ত কেবল লোকসংখ্যাতেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ দস্যুর দল ছোট আর এই প্রকার বীরের দল বড়।

পাঠক অনুধাবন করুন এই শ্রেণীর লোকেরাই জনসাধারণের উন্নতি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, স্বার্থের দাস হইয়া ইহারা ই স্বকীয় ভ্রাতৃগণের শোণিত পান করিতেছেন। পরন্তু ইহা নিশ্চিত যে কোন শ্রেণীর প্রভুত্ব চিরদিন সমভাবে চলিতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে যে ইহাদের আধিপত্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে, তাহার পূর্বসূচনা আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণেও যদি তাঁহারা সাবধান হন, অর্থাৎ উদারতা প্রদর্শন পূর্বক সাধারণের হিতকর কার্যে ধনের উৎসর্গ করেন, তবে বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

অতীত মেশের অপেক্ষা ভারতের অভিজাত্যপ্রথা উৎকৃষ্ট হইলেও যে, সাধারণের উন্নতির পরিপন্থী এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভূমি ও ধনের ত্রায় ধর্ম এবং বিজ্ঞা যে বংশবিশেষেরই একচেটিয়া থাকিবে ইহাতে কি কোন যুক্তি আছে? বিশ্বরূপ শ্রীভগবানের রাজ্যে সকল বিষয়েই মানব মাত্রের তুল্য অধিকার; যিনি ইহার সঙ্কেচ করিতে যাইবেন, তাঁহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং অভিজাত্যের অভিমানকে এই যুগে বটপত্রে ভাসাইয়া ফেলাই যুক্তি সম্মত। বিশেষ বিবেচ্য এই যে, যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে যদি অভিজাতবৃন্দ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া অনভিজাতদিগের সহিত সাম্যমূলক ব্যবহার করেন, তবে তদীয় মহত্বই প্রকাশ পাইবে। আর যদি দলননীতির অনুসরণ পূর্বক অনভিজাতদিগের ক্রোধের শোষণে ব্রতী থাকেন, তবে তাঁহারা অচিরেই অব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হইবেন। বস্তুতঃ এই মরজগতে ঘটনা মাত্রেরই আদি ও অন্ত অব্যক্ত, কেবল মধ্য অবস্থাই অভিব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বয়ের কারণ এই যে, এইরূপ সমস্তাতেও অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি ত্রায় পথে চলিতে চাহেন না, তাঁহারা স্বার্থের মোহনবেশে মেষিয়া একবারে উহা ভুলিয়া যান। এমন কি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন! আমরা অনভিজাতদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আলোচ্য বিষয়ের উপসংহারে আবার বলিতেছি অনভিজাতদিগকে তাঁহারা প্রাণের ভালবাসা অর্পণ করুন, অবিলম্বে সকল জঞ্জাল বুচিয়া যাইবে, পৃথিবীতে শান্তির হিল্লোল বহিতে থাকিবে।

‘নাভঃপশ্য বিদ্বতে অমনায়।’

পরিব্রাজক

অম্বুপসহর।

অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা ।

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য ।

গত ১১ই নভেম্বর পঞ্জাবের শ্মশান-চিতায় প্রবাসী বাঙ্গালী মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের শবদেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। মন্মথনাথ পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র গ্রায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং পিতার জ্ঞানপ্রিয়তা, অমায়িকতা, পরোপকারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বহুগুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মন্মথনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই বয়সে তিনি যেরূপ ধ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মন্মথনাথের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মন্মথনাথ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। এই কলেজ হইতে তিনি বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে গেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সংস্কৃত কলেজের উপাধি পরীক্ষায় “বিশ্ভারদ” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বিভাগীয় পরিত্যাগের পর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত কাল মধ্যে আপনার কার্যদক্ষতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার কার্য লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা ই তাঁহার কার্যদক্ষতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং, কলিকাতা, নাগপুর—নানাস্থানে কার্য করিবার পর মন্মথনাথ পঞ্জাবের একাউন্টেন্ট জেনারেল পদ লাভ করেন ও লাহোরে যাইয়া ওরা নভেম্বর কার্যভার গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য ইতঃপূর্বে আর কোন ভারতবাসী এই পদ লাভ করেন নাই। পরদিন তিনি অনুস্থ হইয়া পড়েন, এবং আট দিনে পীড়া সাংঘাতিক হইয়া তাঁহার জীবন নষ্ট করে। ইংরাজাধিকৃত ভারতে মন্মথনাথ প্রথম ভারতবাসী একাউন্টেন্ট-জেনারেল।

কিন্তু মন্মথনাথের গৌরব বিস্তার বা উচ্চ রাজকর্মচারীর পদে নহে; পরন্তু সরল ও সবল মনুষ্যত্বের বিকাশে। তাঁহার মত সরল ও অমায়িক লোক হ্রদভ। তিনি লোকের

উপকার করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। তিনি প্রবাসে যখন যেখানে যাইতেন তখন সেইখানে তাঁহার গৃহ বান্ধালীদিগের মিলনমন্দিরে পরিণত হইত। তিনি যৎকালে মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে উত্তর-কালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে প্রসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায় যাইতে ইচ্ছুক, কিন্তু পাথ্যেয়সম্বলশূন্য। মন্থনাথ উদ্যোগী হইয়া সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার আমেরিকা-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সেই সভায় নরেন্দ্রনাথের ব্যয় নির্বাহার্থে দুই সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

রেজুনে অবস্থানকালে মন্থনাথ প্রত্যহ ষ্টীমার ঘাটে বেড়াইতে যাইতেন, জাহাজ হইতে কোন বান্ধালী নামিলে সাদরে তাঁহাকে আপনার গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন। মৌলবী আব্দুল জব্বার ব্যতীত আর কোন প্রবাসী বান্ধালীর এরূপ স্বজ্ঞাতপ্ৰীতির কথা আমরা জানি না। কত অভিমাত্রী, গৃহত্যাগী বালক তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অ্যাডভোকেট হইয়াছে। আর তিনি যে কতজনকে চাকরী করিয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

তিনি যখন নাগপুরে ডেপুটি কন্ট্রোলার তখন নাগপুরে প্লেগের প্রবল প্রকোপ, প্রতিদিন শত শত লোক এই বিষব্যাধির অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারাইতেছে। ধন-ধানগণ সহর পরিত্যাগ করিতেছে। সকলেই ভীত। মন্থনাথ দরিদ্রদিগের হৃৎ-হৃদশায় ব্যথিত হইলেন। তিনি আপনার গৃহপ্রান্তে তাহু খাটাইয়া নিরাশ্রয় প্লেগপীড়িত রোগীর চিকিৎসার ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন; সময় সময় স্বয়ং রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এমন অসাধারণ সহায়ত্ব ও দয়া সচরাচর দেখা যায় না। নাগপুরবাসীরা মন্থনাথের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে “ধর্মরাজ” বলিত।

আশ্রিত, অমুগত ও অধস্তন কর্মচারী—সকলকেই মন্থনাথ আপনার মনে করিতেন। তিনি আফিসের কেরানীদিগের সহিত বন্ধুভাবে আলাপ করিতেন বলিয়া তাঁহার কোন পদগর্ভগর্ভিত বন্ধু একবার তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। মন্থনাথ হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—উহারা কি আমার সমকক্ষ নহে? যতক্ষণ আগিসের কাছে থাকি,

ততক্ষণ উহারা আমার অধীন সত্য; কিন্তু তাহার পর আমরা সকলেই সমান। মন্থনাথ যখন নাগপুরে তখন উপরওয়ালার যুরোপীয়কে সামান্য দোষে কেরানীদিগকে অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত করিতে দেখিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। যুরোপীয় কর্মচারী বলেন, অর্থদণ্ড ব্যতীত কেরানীরা ক্রটিসংশোধনে সচেষ্ট হইবে না। শুনিয়া মন্থনাথ বলেন, একবার জরিমানা রদ করিয়া—কেবল সতর্ক করিয়া দিলেই তিনি বুঝিবেন—জরিমানা অনাবশ্যক, কেবল দরিদ্রের পীড়ন। তাঁহার কথায় যুরোপীয় কর্মচারী সেবার জরিমানা রদ করিলেন; ফলে দেখিলেন ও বুঝিলেন, জরিমানা অনাবশ্যক। একটি ব্রাহ্মণ যুবক পাচকরূপে বহুদিন মন্থনাথের সেবা করিয়াছিল। তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক জানিয়া এবং বিবাহ ব্যয় নির্বাহে অসমর্থ জানিয়া মন্থনাথ স্বয়ং সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং বিবাহের পর সজ্জীক তাহাকে এক দিনের জন্য আপনার গৃহে আনিয়া তাহার ব্যবহার জন্ত আগলার শয়নকক্ষ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যে দুর্ভিক্ষ সহায়ত্বের পুত প্রবাহে সকল প্রভেদ ভাসিয়া যায়, মন্থনাথের ক্ষমতা সেই সহায়ত্ব নিত্যপ্রবাহিত ছিল। মন্থনাথ যখন নাগপুর ত্যাগ করেন তখন তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদানের উদ্যোগ হয়। মন্থনাথ চেষ্টা করিয়া তাঁহার গুণগুণদিগকে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত করেন। কিন্তু যখন এই অভিনন্দন পত্র প্রদানের উদ্যোগ হয় তখনই তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্মচারী তাঁহার উপরওয়ালাদিগকে সে কথা জানাইয়া লিখেন যে, মন্থনাথ বাবু নিয়মবিগর্হিত কার্য করিতেছেন। উপরওয়ালার যুরোপীয় কর্মচারী মন্থনাথকে স্নেহ করিতেন, তিনি অভিযোগকারীর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহার ব্যবহারের কথা মন্থনাথকে জানান। বলা বাহুল্য—মন্থনাথ তাহাকে কোন রূপ শাস্তিদান করেন নাই। পরন্তু অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাঁহার নিরস্ত পুত্রকে একটি চাকরী জোগাড় করিয়া দেন।

মন্থনাথ বিভাষুয়াগী ছিলেন, এবং নিজ ব্যয়ে স্বগ্রামস্থ বিভাষুয়াগী গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

নানা গুণে মন্থনাথ লোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ-অর্জন

করিয়ছিলেন । তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার
স্মৃতি রক্ষার্থ কলিকাতার আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে
একটি গৃহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন । তাঁহাদিগের এই
সাধু চেষ্টা সফল হইলে দুঃখী মরিতের যথেষ্ট উপকার হইবে
এবং মন্মথনাথের স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত কার্য্যই হইবে ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ।

কেদার রায় ।

বাকাল কেদার রায় ;—

ঘোষিল উচ্চ বজ্র কণ্ঠে

“নাহি মানি বাদশায় ।”

বৃদ্ধ মন্ত্রী মানিয়া বিশ্বাস,

হস্তযুগল ঘোড় করি কয়,

“বৃদ্ধ করিবে বাদশায় সনে ।

পারিবে আঁটিতে তায় ?”

“মরিব, তবু স্বাধীন মরিব,”

কহিল কেদার রায় ।

কেদার মহাবীর,

বসেছে উচ্চ সিংহাসনে,

সৌম্য, শাস্ত, ধীর ;—

দূত আসিয়া নিবেদিল খেয়ে,

পঞ্চশত-রণতরী নিয়ে,

মানসিংহ-প্রেরিত মন্দা

ধিরেছে পদ্মাতীর ;

“সাজ-সাজ,” শুধু কহিল ডাকিয়া

বাকাল কেদার বীর ।

পদ্মা তরঙ্গিনী,

নাচিল রঙ্গে বীর কল্লোলে

ভীষণ রঙ্গিনী !

শ্রীপুরের ভীম দুর্গপ্রাচীরে,

আছাড়ি আছাড়ি পড়িছে অধীবে

ব্যগ্র স্বপ্নে জানাইছে যেন—

“আমি আছি সজ্জিনো !”

নাচিল পদ্মা রঙ্গে ভঙ্গে

ভাসিল রণ-তরঙ্গী ।

গর্জি উঠে কামান,—

ঝলকিয়া উঠে আশ্বনের শিখা

হানিয়া মৃত্যুবাণ !

গুড়ুম-গুড়ুম-বুম-বুম-বুম,

আবারি পদ্মা, কামানের ধুম,

বিশাল বিজয় পতাকার মত

ছাইয়া কেলে বিমান ।

ঝলকে ঝলকে আদেশি মরণ

গর্জি উঠে কামান !

ভীষণ গোলায় ঘায়,—

খণ্ড খণ্ড মোগল তরঙ্গী,

একে একে ডুবে যায় !

পঞ্চ শতক তরী এসেছিল,

একটীও ফিরি যাইতে নারিল,

ছিন্ন ভিন্ন সকল সৈন্ত,

মরিল মন্দা রায় ;

একটীও লোক না ফিরি যাইল

ভীষণ গোলায় ঘায় !

বিশাল পদ্মা বুকে,—

মৃদু সমীরণ গুন গুন করি

গান গেয়ে যায় সুখে—

বিক্রমপুরের বীর ডাকি কয়

“কোন জনে আর বাকালীর ভয়

কোমর বাঁধিয়া—হৃদয় বাঁধিয়া,

দাঁড়াইলে বুকু ঠুকে !”

অতল সলিল গভীর কল্লোলে

বিশাল পদ্মাবুকে ।

(বাঁহারা মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধের
বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা Elliot's History
of India—Vol VI দেখুন ।)

ঢাকা ।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী ।

আলো।

সমালোচনা।

(From "Light" by F. W. Bourdillon.)

নিশা চাহে অগণ্য নয়নে,
দিনেব শুধুই এক আঁধি ;—
তবু, সেই একেরি বিহনে
অন্ধকাবে বিশ্ব ফেলে ঢাকি' !

শত চোখে চেয়ে দেখে মন,
একই লোচন হৃদয়ের ;
তবু, অন্ধ হ'লে সে নয়ন,
নিবে যায় জ্যোতি জীবনের !
শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

আহ্বান।

তুমি নাহি-দার তার কেহ নাহি আর—
দিনমণি অন্ত গেলে সকলি আঁধার।
নিবারে আলোক এবে দিবা হ'ল শেষ,
খেলা ফেলি' ছুটে আসি' খুঁজি সারাদেশ,
কোথা তুমি, কোথা তুমি, কোথা মা জননি—
আঁধারের শুরু-ভারা, নয়নের মণি !
যত দাও ওগো ! শিশু মুখে নাহি রুচে
দিব্য রাজভোগ,—তা'র সর্বজালা ঘুচে
মাতা যবে হাতে করে' মুখে দেয় তুলে ;—
আজি দাঁড়াইয়া চির বিরহের কূলে
ডাকি গো তোমায়, দেখা দাও, দেখা দাও,
মানসের চিত্রলেখা বাস্তবে ফুটাত,
ঘুচাও এ অন্তরাল,—ওগো একবার
অন্তরের ধন এস অন্তরে আমার !

শ্রীস্বধীশ্রীনাথ ঠাকুর।

তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত—শ্রীসখারাম গণেশ দেউরার প্রণীত। ডবল ক্রাউন বোড়শাংশিত ২১০+৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৮শ আনা মাত্র। জ্ঞানে শুণ্ডে তেজবিতার যে পুরুষ বেশের সকলের প্রশংসাপত্র তাঁহারই রাজমোহ অভিব্যঙ্গের আমূল বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তিলকের যে বক্তৃতার তাঁহার বিরাট মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহারও বঙ্গানুবাদ ইহাতে আছে। গ্রন্থারম্ভে সংক্ষেপে তিলকের জীবনী ও চরিত্র বিবৃত হইয়াছে। তিলকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পরিষ্কার হাকটোন চিত্র ইহাতে আছে। পুস্তকের আকারানুপাতে মূল্য সামান্য করিয়া সর্বশ্রেণীর পাঠকেরই আয়ত্তগম্য করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

আর্য্যনারী—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস শুক্ল, এম.এ. ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন বোড়শাংশিত ১৭৮ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বন্ধের বাঁধ। মূল্য ১ টাকা। দেশী এস্টিক কাগজে পরিপাট্যরূপে মুদ্রিত। ইহাতে ২০ জন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আর্য্য রমণীর চরিত্র বিবৃত হইয়াছে। চরিত্রগুলি শুধু উপাখ্যানরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতোক চরিত্রের বিশেষত্ব, মাধুর্য্য বা শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া বুঝানো হয় নাই। ইহাতে অল্পশিক্ষিত পাঠিকাদের একটু অহুবিধা হইবে, এবং আমাদের দেশের পাঠিকারা অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত—কোনো চরিত্রের উপাখ্যান পাঠ করিয়া তাহার বিশেষত্ব বাহিয়া বুঝার মত চিন্তাশক্তির উদ্বেগ তাহাদের প্রায়ই হয় না। বাহাই হউক এখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। কস্তা ভগিনীদিগকে উপহার দিবার উপযুক্ত।

ঠাকুর দাদার স্মৃতি বা বাঙ্গালার গীতকথা—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। দুপার রয়াল বোড়শাংশিত ৩৩৬ পৃষ্ঠা। ইহাতে ৫৯ খানি ছোট বড় শোভিত ছবি ও ১৭ খানি হাকটোন ছবি আছে। এতদ্ব্যতীত তিনখানি ছবি তিন রঙে ছাপা। বড় বড় অক্ষরে মুদ্রণাদি পরিষ্কার। বাঁধানো পরিপাটী। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। ইহাতে পূর্ব-বঙ্গ-প্রচলিত পল্লীকাহিনী সকল সংগৃহীত হইয়াছে। কাহিনীগুলি গম্ভীর পঞ্চ সঙ্গীতময়। দক্ষিণা বাবু এই সমস্ত লুপ্ত রত্ন উদ্ধারে ব্রতী হইয়া বঙ্গভাষাকে খাঁটি দেশী সম্পদে সৌভাগ্যবিত্ত করিতেছেন। দক্ষিণা বাবুর বিশেষ কৃতিত্ব পল্লী কথকের ভাষাকে অবিকৃত রাখিতে পারায়। এই পুস্তকখানি আবালবৃদ্ধবনিতার পরম উপভোগ্য। ইহাতে পাঁচটি কাহিনী আছে।

ক্ষেত্রনাথ গ্রন্থাবলী (প্রথমভাগ)—শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন মণ্ডল প্রণীত। ইহাতে 'আদর্শ-সাধনা-গার্হস্থ্য-দুটীভাই', 'রাজকুমারী' ও 'রুকমারী' নামক দুটি নাটক ও একটি প্রহসন বা ব্যঙ্গ-নাট্য আছে। রয়াল চতুর্থাংশিত ১০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১ টাকা। গ্রন্থারম্ভে প্রকাশকের নিবেদনটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

“প্রকাশকের নিবেদন।

“দেশের ও মানব জাতির মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্যে শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথের অন্ততমরী লেখনী হইতে বিবিধ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে। বশ, অর্থ, লোকরঞ্জন প্রভৃতি চরিতার্থ, তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; স্বার্থসাধন তাঁহার কামনা নহে; বিজ্ঞাপ্রকাশ তাঁহার চেষ্টা নহে; হতব্রাহ্মণ তৎপ্রণীত অননুত্কৃত সরল পুস্তকগুলি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল।

“নানা জাতীয় কাব্য-কুহসের সৌন্দর্য্য-সৌরভ-বিকাশে বঙ্গীয় কাব্য কাল্পন শোভিত ও আমোদিত হইলে, ইহার স্বভাব শ্রী আরও বর্জিত

হইবে; দর্শকের জ্ঞান-দৃষ্টির মধ্যে পতিত হইলে, দেশের অনেক কলায় সাধিত হইবে; এই বিবেচনার সঙ্গর বন্ধুগণের অসুবোধে, লেখকের নিভৃত-রক্ষিত, শুণ্ড-প্রতিপালিত কাব্য-কুহম-লতিকা নিচর একটি একটি করিয়া তুলিয়া লইয়া অসম্পূর্ণ অভাবপূর্ণ বঙ্গোদ্ভানে প্রোথিত করিতে অগ্রসর হইলাম। গুণগ্রাহী পাঠক কর্তৃক যত্নে লালিত পালিত হইলে কৃতার্থ হইবে ?”

প্রকাশক গ্রন্থকারের কোন আশ্রয় হইবেন, নামদাদৃশ্বে অনুমান করিতেছি। তিনি ত গ্রন্থকারকে স্বর্ণে তুলিয়াছেন, আমাদের বিচারে তাঁহার স্থান কোথাও দেখা যাক—হল ও ভাবের নমুনা যেখান সেখান হইতে তুলিয়া দিলাম—

“বৃদ্ধ তুমি ;

চাধার সম্মান বটে,

কিন্তু কহিতেছি অতি সার কথা ।

বুঝিতেছি

কুলদ্বার পুত্র হতে

মান বর্ষ বশ হানি হইবে আমার ।”

ইত্যাদিরূপ সর্বত্রই। কি নিয়মে যে কোনো পুস্তি হুৎ ও কোনো পুস্তি দীর্ঘ, দীর্ঘতর হইল তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। স্বকমারীর মধ্যে রচিত কথা না বলাই ভালো। এমন অপদার্থ রচনা কি না ছাপাইলেই নব ? ছাপাইয়া আবার সমালোচনার সধ কেন ? সকলের সময় কি গ্রন্থকারের মত হলভ ? গ্রন্থকারের অমৃতময়ী (?) লেখনী দ্বিতীয় ভাগ প্রণয়ণে বিরত হইলে “দেশেব ও মানবজাতির মঙ্গল সাধন” হইবে। এরূপ রচনা প্রকাশে “বশ, অর্থ, লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি চরিতার্থ” ত হইবেই না, অধিকন্তু বহু কটু কাটব্য পরিপাক করিতে হইবে। গ্রন্থকারের কি এমন কেহ বন্ধু নাই যিনি সত্বদেশে দ্বারা তাহাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারেন ? আজ আমার মুদ্রারাক্ষস নাম সার্বক হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের উচ্ছ্রষ্ট এমন কর্দম কর্মভোগ আমরা ভাগ্যে কমই জোটে। রাক্ষসের মত তাহাকেও কবলিত করিতে হইল। কি দুর্দৈব ।

Two Lectures of Srijut Aravinda Ghose, B.A., (Cantab)—Published by G. P. Murdeshwar, B.A., Price 9 pies. ইহাতে Advice to National College Students and the Present Situation সম্বন্ধে দুটি বক্তৃতা আছে। প্রত্যেক বাক্যে অরবিন্দ বাবুর মনোবৃত্তি, ভেদ, ধর্মপ্রাণতা স্পষ্ট পাইয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই মনোবৃত্তির আত্মপ্রকাশ, অকৃতোত্তরতা প্রভৃতি পাঠককে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। পুস্তকের ছাপা কাগজ কর্দম।

বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক—শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। বঙ্গভাষার পরলোকগত বাবুতর সাহিত্যসেবকগণের বর্ণামুজ্জ্বল সচিত্র চরিত্রাভিধান। ২ম হইতে ১১ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বিদ্যাপতি পর্যন্ত আছে। ইহাতে বহু অশ্রুতপূর্বনাম লেখকের পরিচয় আছে। শিবরতন বাবু বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসারে যে দুই এ পর্যন্ত অননুষ্ঠিত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যে বাংলা ভাষার মহদুপকার সাধন করিতেছে তাৎক্ষণিক সন্দেহ নাই। দেশের সমগ্র হৃদী সমাজ এই পুস্তকের প্রশংসা করিতেছেন। এক্ষণে পাঠক সাধারণ এই পুস্তকের গুণানুযায়ী আদর করিলে গ্রন্থকারকে উৎসাহিত ও বঙ্গভাষার উপকার করিবেন। এই খণ্ডে পাঁচজন সাহিত্য সেবকের চিত্র সম্মিলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কবি দ্বন্দ্বরতন শুণ্ডের চিত্র প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। শুণ্ড কবির চিত্র এ পর্যন্ত কখন কোথাও প্রকাশিত হয় নাই এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও নিতান্ত দুর্লভ। শিবরতন বাবু সেই

দুর্লভ চিত্র প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এরূপ ঘটনা যুরোপে হইলে এক দিনে হাজার হাজার বই বিক্রয় হইয়া যাইত, বঙ্গীয় পাঠক সেসকল গুণগ্রাহী কবে হইবে ?

মুকুট—শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ডবল ক্রাউন ২৪ পেজি ৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১০ আনা মাত্র। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। বহুকাল পূর্বে ‘বালক’ নামক অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রে রবিবাবুর ‘মুকুট’ নামক যে ক্ষুদ্র উপন্যাস বাহির হইয়াছিল তাহাকেই বোলপূব ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদেব অভিনয়ের উপযোগী করিয়া নাট্যকারে পরিণত করা হইয়াছে। নাটকের উপাখ্যানটি অতি মনোরম ও করণ। জাত্রেহের একটি পবিত্র চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। চরিত্রগুলি জীবন্ত। যুবরাজের সরল, ব্রাহ্মণ ও কবির ভাব; ইন্দু-কুমারের ক্ষান্তেজ ও নীচতার প্রতি উপেক্ষা; যুবরাজ ও রাজপুত্রের ক্রুরতা; ইহা ধীর মনোবৃত্তি; এই অল্প পরিমলের মধ্যেও স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাঙ্গ ও করণ রস পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া আছে। পুস্তকখানিতে প্রীতির নাই—জাত্রেহের অভিনয়ের উপযোগী। রবিবাবু তাঁহার বিভ্রালয়ের জাত্রেহের আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় করিবার জন্য বালকদের অভিনয়ের উপযোগী নাটক মধ্যে মধ্যে বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিয়া তাহাকে সম্প্রদায়ী করিতেছেন। এইরূপ বালিকাদের অভিনয়োপযোগী দুই একখানা নাট্যকার নিতান্ত অভাব আছে। আশা করি সে অভাব বহুদিন অপরূপ থাকিবে না।

স্মারের পুতুল ও শকুন্তলা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এই দুইখানি সর্বজন প্রিয়, শিশুদের পরম আদৃত, আদিম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ বহুদিন অপ্রাপ্য ছিল। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস এই দুইখানি পুস্তকের নতুন সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। শকুন্তলা ভালো এষ্টিক কাগজে প্রচাররূপে মুদ্রিত, তাহাতে ছয়খানি নব চিত্রিত কলাসম্মত চিত্রের হাফটোন প্রতিক্রিয়া আছে। স্মারের পুতুলে আছে তিন খানি। অবনীন্দ্র বাবু সর্বপ্রথম শিশুদের সাহিত্য রচনার কৃতকার্য ও বশবাহন। অবনীন্দ্র বাবু শব্দচিত্রে অদ্বিতীয়, প্রতিমূর্ত্তিবিহীন; তাঁহার বর্ণনায় মনের মধ্যে বর্ণিত দৃশ্যগুলি ছবির মত বর্ণে সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠে। “নেত্রকোলা টিয়েপাশী আকাশ সবুজ করে কোন দেশে উড়ে গেল” প্রভৃতি বর্ণনা একদিকে কবিত্বময়, অপরদিকে চিত্রকলাকুশলের উপযুক্ত। এই পুস্তক দুখানি বহুকাল পরে আবার শিশুদের আনন্দ বর্ধন করিবে।

বনকুল—শ্রীমতী প্রতিভাকুমারী দেবী প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীনরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকখানি বিক্রয়ের জন্য নহে, হুতরাং মূল্য নির্দিষ্ট হয় নাই। এখানি কবিতা পুস্তক। একটি বারো তের বৎসরের বালিকার লেখা। পুস্তকের কবিতাগুলি বেশ শ্রাঙ্গল, মধুর ও সংভাব পূর্ণ হইয়াছে। কোনো কোনো কবিতায় পূর্বতন কবিগণের ভাবের ছায়া পড়িয়াছে, শব্দমাত্রিক ছন্দগুলির স্থানে স্থানে পতিভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু এসকল ত্রুটি বালিকার অনিবার্য, হুতরাং মার্জনীয়। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বাস্তবিকই প্রীত হইয়াছি। বালিকা কবি সাধন করিলে ও চর্চা রাখিলে কালে কাব্যসাহিত্যে আপনাদের পথ করিয়া যশোলাভ করিবেন আশা করি। বঙ্গ প্রীতিকার এইসব অমৃতময় কল বিরোধীধর্মকে সচেতন করিবে। বালিকার স্বদেশমমতা, ভগবৎপ্রীতি অশ্রুর মধ্যে আনন্দের সন্ধান, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সমপ্রাণতা আমাদের বিমুগ্ধ করিয়াছে। বালিকাকে আমরা আশীর্বাদ ও অভিনন্দন করিতেছি। পুস্তকের ছাপা পরিষ্কার ও নির্মূল, দিব্য নয়নরঞ্জন হইয়াছে।

শকুন্তলা—স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক বিবৃত শকুন্তলা উপাখ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছে। এই পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব গ্রন্থকারের নাই। এখন ইহা যে কেহ ছাপিতে পারে। এই গ্রন্থোপে

শতাব্দীর বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে। আমাদের সমালোচ্য সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক প্রণেতা শ্রীশিবরতন মিত্র ও অধ্যাপক শ্রীতারাশ্রম ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে বিজ্ঞানসাগর বিবৃত মূল উপাখ্যান ত আছেই, তন্নির বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, টীকা, পরিশিষ্ট প্রভৃতি আছে। বহু শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ, প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল্যের পরিচয় প্রভৃতির অধিকতর উপযোগী করিয়াছে। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী রবিবর্মা ও মুরলীর প্রভৃতির ৮ খানি ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুখানি দুইরঙে ছাপা, ছবি হলের হইয়াছে। পুস্তকের প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ১০ আনা মাত্র। পুস্তকটিকে কাগজে পরিষ্কার ছাপা।

হস্তলিপি লিখন প্রণালী—শ্রীশিবরতন মিত্র প্রণীত। ডবলক্রাউন অষ্টাংশিত ৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১০ আনা মাত্র। এই পুস্তক নানাবিধ রঙের কালিতে অতি পরিপাটীরূপে মুদ্রিত। কাগজ পুরু ও মন্থ। পুস্তকখানির বাহ্যদৃশ্য ভাল। ইহাতে কিতোর গার্টেন পদ্ধতির অনুরূপ অভিন্নব প্রণালীতে শিশুদিগকে লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ককথিতে শিখাইবার প্রয়াস আছে। এই এক পুস্তকে বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত ও হস্তলিপি বিবরণ শিক্ষা আছে। প্রায় ৩৫০ টি ব্লক দ্বারা অঙ্কর রচনা-শেখানো হইয়াছে। টানা হস্তাক্ষরের আকর্ষণরূপে মহাশয় রাজা রামমোহন রায় ও রবি বাবুর হস্তাক্ষর দ্বারা এই পুস্তকখানি মণ্ডিত। শিশুদিগের উপযোগী এইরূপ পুস্তক বাংলায় এই বোধ হয় প্রথম। পুস্তক প্রাপ্তি স্থান—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

মুদ্রা-রাক্স।

চিত্রপরিচয়।

মথুরার রাজা কংস এরূপ অত্যাচারী ছিলেন, যে প্রজাদের পক্ষে তাঁহার অত্যাচার সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তখন প্রজাদের সাহসের জন্মই যেন কংসবধ সম্বন্ধে দৈববাণীর কথা রাজার সম্মুখে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দৈববাণীর উপপত্তিও বিষয়জনক।

কংস নিজ বন্ধু ও অমাত্য বাহুবল এবং নিজ ভগিনী দেবকীকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি এই জন্ত নিজ ভগিনী দেবকীর সহিত বাহুবলবের বিবাহ দিলেন, এবং বিবাহের পর এক রথে করিয়া, নিজেই সারথি হইয়া, তাঁহাদিগকে বাহুবলের গৃহে লইয়া যাইবার জন্ত রথ চালাইয়া দিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে এই আকাশবাণী শ্রুত হইল, “রে অত্যাচারী দুর্ভাগ্য রাজা, এই দম্পতির অষ্টম সন্তান একটি বালক হইবে। সেই বালক বার বৎসর বয়সে নিজ হস্তে তোর প্রাণ বধ করিবে।” ইহা শুনিয়া বাহুবল দেবকীর প্রতি কংসের প্রীতি বোর বিষয়ে পরিণত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বোড়ার মুখ ফিরাইয়া আবার মথুরায় রথ লইয়া গেলেন, এবং সেখানে বাহুবল ও দেবকীকে কাবাগারে নিষ্কোপ করিলেন। উদ্বেগ এই ছিল যে তাঁহাদের প্রত্যেক সন্তানকে কংস জন্মের পরই বধ করিবেন।

এইরূপ বার বার সাত বার সাতটি শিশু জন্মিল। কেবল বলরাম ছাড়া, আর সব শিশুই কংসের নিষ্ঠুর হস্তে প্রাণ হারাইল। বলরামকে গোপনে কাবাগার হইতে সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল, এবং কংসকে বলা হইয়াছিল যে শিশুটি জন্মিবাব পরেই মারা গিয়াছে।

এখন দৈববাণী সফল হইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবকী ও বাহুবল উৎসুক হৃদয়ে তাঁহাদের অষ্টম সন্তানের জন্মের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, যে সন্তান ষাটশব্দ বয়সে দেশের সমুদয় লোককে অত্যাচারী কংসের নিষ্ঠুর উপদ্রব হইতে মুক্তি দিবে।

আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। মেঘে বাতাসে যেন যুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। যমুনার জল বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন নিশিতে দ্বিপ্রহরে কৃষ্ণের জন্ম হইল। মায়ের প্রাণ সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। কিন্তু হায়! সে আনন্দ স্থায়ী হইল না। নর-পিশাচ কংস এখনই আসিয়া যে এই শিশুকে বধ করিবে।

কাবাগারে যেন কাহার স্বর শ্রুত হইতে লাগিল। প্রথমে “কৃষ্ণের জনকজননী ভাবিয়াছিলেন, এ বৃষ্টি ঝড় বৃষ্টির শব্দ। কিন্তু কাণপাতিয়া শুনিয়া তাঁহারা এই কথা স্পষ্ট কর্ণগোচর করিলেন; “উঠ! শিশুটিকে কোলে লইয়া, গোকুলে গোপরাজ নন্দের গৃহে তাহাকে রাখিয়া আইস, এবং তাঁহার গৃহে যে বালিকাটি জন্মিয়াছে, তাহাকে এখানে লইয়া আইস।”

কথাগুলি শুনিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার জন্ত বাহুবল হাত বাড়াইয়াছেন,—এই মুহূর্ত্তটি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়াছেন। মাতৃহৃদয়ের সংগ্রাম, মাতৃ-হৃদয়ের আকুল ভাষা, দেবকীর চক্ষুতে স্ফুটিত হইয়া ছবি-খানিকে করুণরসে প্রাণিত করিয়াছে। শিশু নিশ্চিন্তমনে মাতৃকোড়ে শয়ান।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় অনেক বৎসর গত হইল—

“কত কাল পরে,

বল ভারত রে,”

ইত্যাদি, স্মরণশীল স্বদেশপ্রেমোন্মেষ গান রচনা করেন। এই গানের কয়েকটি পংক্তি, যথা—

“নিজ বাসভূমে পরবাসী হ’লে

পর দাসত্বতে সমুদায় দিলে।

পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন স্বখে,

বহ লোহবিনির্মিত হার বুকে।

পর ভাবণ আসন আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তবু আপন রে।
পর দীপশিখা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।”

গত কয়েক মাস প্রবাসীর মলাটে ছাপা হইতেছিল। অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা কেন ছাপা হইত? সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তর এই যে “প্রবাসী” নামটির অর্থ বুঝান আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে “sojourners and exiles in the land of our birth।” “প্রবাসী” শব্দ দ্বাৰাও এইরূপ ভাব সূচিত হয়।

অনেকে বলিবেন, কেন আমরা ত নিজের দেশেই রহিয়াছি; তবে “প্রবাসী” নামের সার্থকতা কি?

কাজেই স্বগৃহবাসী ও প্রবাসীতে প্রভেদ কি, বুঝা দুরকার। আমি যখন নিজের গৃহে নিজের পরিবারের মধ্যে থাকি, তখন আমি তাহার আয় ব্যয়ের ব্যবস্থা করি, ভৃত্যাদি নিয়োগের বন্দোবস্ত নিজে করি, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থা নিজে করি, বাড়ী মেরামত, তাহার স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা, প্রয়োজন মত ২১টা কামরা বাড়ান কমান, ইত্যাদি সমস্তই, আবশ্যক হইলে বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের পরামর্শ লইয়া, করিয়া থাকি। কিন্তু যখন প্রবাসে পরের বাড়ীতে থাকি, তখন আমার এরূপ কিছু করিবার অধিকার থাকে না। আমরা স্বদেশে বাস করি বটে, কিন্তু দেশের কোন ব্যবস্থা আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা সাপেক্ষ নহে। আয় ব্যয়ের বন্দোবস্তও আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সুতরাং আমরা স্বদেশে থাকিয়াও প্রবাসী।

যত দিন দেশের আইন প্রণয়নে, রাজ-কর্মচারী নিয়োগে এবং আয় ব্যয়ের বন্দোবস্তে আমাদের, অন্ততঃ কোন কোন বিষয়ে, সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব না জন্মিবে, তত দিন “প্রবাসী” নামের সার্থকতা ঘুচিকেনা।

এই কর্তৃত্ব লাভেরই অস্ত্র নাম রাজনৈতিক অধিকার লাভ। এই রাজনৈতিক অধিকারলাভ সম্বন্ধে আমাদের দেশে দুইদল লোকের দুরকম মত দেখা যায়। একদল চান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকিয়া ইংলণ্ডের মত বা ব্রিটিশ উপ-নিবেশগুলির মত স্বায়ত্ত-শাসন-কর্মতা, আর একদল চান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। এই দুইদলে অনেক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এই ঝগড়া না হইলে ভাল হইত, এবং এখনও ঝগড়াটা মিটিয়া থেলে ভাল হয়। কারণ, আমরা উভয় প্রকার “স্বরাজ্য” হইতেই বহুদূরে, এবং “স্বগাস্ত্রের” দল ছাড়িয়া দিলে, সকল ভারত-বর্ষীয় রাজনীতিজ্ঞই আইনসম্মত উপায়ে রাজনৈতিক

অধিকারলাভের চেষ্টার পক্ষপাতী। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতীদেরও কার্যতঃ শেষ অস্ত্র passive resistance, এবং মধ্যপন্থী দলের অন্ততম নেতা শ্রীযুক্ত গোখলেও বলিয়াছেন যে passive resistance তাঁহাদেরও দলের মতে বৈধ আন্দোলনের চরম উপায়। বাহা হউক, ঝগড়া মিটাইব বলিয়া চেষ্টা কবিলে সম্ভবতঃ ক্ষীণ মিটিবে না। পরে অবস্থাচক্রের পেয়ে দুই দল মিশিয়া এক হইতে পারে।

মধ্যপন্থী হওয়ার আজকাল অনেক সুবিধা আছে। একদিন ছিল যখন কংগ্রেসে যোগ দিলেই মাছুষ অ-রাজভক্ত হইয়া যাইত। এবাব কিন্তু যাহারা মাস্তাজ কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন, তাঁদের আর মা’র নাই! এমন দিন ছিল যখন ষ্ঠেতচন্দ্র উচ্চরাজপদ হইতে গৃহীতাবসর কটন সাহেবও বাচঞা করিয়াও কর্ত্তনের সঙ্গে দেখা করিবার অমুমতি পান নাই। এবার কিন্তু মাস্তাজ কংগ্রেসের অনেক ‘কাল’ প্রতিনিধিও তথাকার লাট সাহেবের প্রাসাদে বাচঞা না করিয়াও তাঁহার প্রসাধ লাভ করিয়াছেন। এ বড় সহজ কথা নয়।

কিন্তু ইহাও বলি যে সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ও ত একজন প্রধান মধ্যপন্থী ছিলেন। তাঁহার নির্দাসনটা হইল কেন? অবশ্য তাঁহার স্পর্শদোষ ঘটাইয়াছিল বটে; তিনি অরবিন্দ ঘোষের মেসো মহাশয়, তাঁহার নির্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করিতেছিলেন। শুনা যায় সেকালে ভ্রাণের জন্তই অনেক সুব্রাহ্মণ পিরালি হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা স্পর্শদোষ মানেন না; সুতরাং কৃষ্ণবাবু অরবিন্দ ঘোষের মেসো বলিয়া তিনি কখনই মধ্যপন্থিতার অধিকার হইতে চ্যুত হইতে পারেন না। স্বদেশী বয়কটও ত আরও অনেক মধ্যপন্থী করিয়াছেন, কৃষ্ণবাবু না হয় স্বাভাবিক শুভভক্তি প্রযুক্ত খুব বেশী করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশী বয়কটের বিরুদ্ধেও ত ‘এপর্যন্ত কোন লিখিত আইন হয় নাই। তবে তাঁহার অপরাধটা হইল কি? তাঁহাকে যাহারা জানেন, তাঁহার এরূপ স্বদেশবাসীদের মধ্যে এমন গাধা এবং পাপিষ্ঠ কেহই নাই যে, তাঁহার ডাকাইতি বা নরহত্যার সঙ্গে সংশ্রব আছে বলিয়া রাজপুরুষদের সন্দেহের অস্তিত্ব অমুমান করিয়া, তাহার উভয় দিতে বাইবে, বা এরূপ অবজ্ঞের সন্দেহ থাকিলে তাহার প্রতিবাদ করিবে। তবে তাঁহার অপরাধটা হইল কি? সেকালে, শুনিয়াছি, ধর্ম্মস্ত তত্ত্ব গুহাতে নিহিত বলিয়া বিবেচিত হইত; আজ কাল রাজনীতির তত্ত্ব নিহিত গুহায়াং;—পার্লমেন্টের সভ্যরূপ যে মেবাং, তাঁহারাও ন জানন্তি, ত আমরা ত মানবাং, কেমন করিয়া জানিব কি অপরাধে বিনা বিচারে নির্দাসন হয়?

যাহা হউক, প্রসঙ্গতঃ অনেক দূব আসিয়া পড়িয়াছি ; নির্ধাসনের কথা পরে বলিব। এখন রাজনৈতিক অধিকাংশের কথাটী বলি। অনেক মধ্যপন্থী মনে করেন যে তাঁহারা ইংরাজকে খুসি করিয়া কিছু রাজনৈতিক অধিকার বংশিস্ পাইবেন। এইজন্য তাঁহারা নিজের চরমপন্থী ভাইদেব ত্যজ্যভাই করিয়া গঙ্গামান করিয়া মাথা মুড়াইতেও প্রস্তুত। ইংরাজেরাও ইহাতে ভারি খুসি। ভাল, রাজনীতি ত একটা খেলা ; দেখা যাক্ কে জেতে !

কিন্তু একটা বড় মজা দেখা যাইতেছে। ইংলিশমান প্রভৃতি ইংরাজ-চরমপন্থীদের মুখপাত্র ভারতীয় মধ্যপন্থীদের উপরও সম্বন্ধ নন। তাঁহারা তিনটা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—(১) সম্পূর্ণ অধীনতা, (২) ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা, (৩) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ;—অর্থাৎ একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, উপবেশন বা বঁকা হইয়া দাঁড়ান, এবং সম্পূর্ণ সোজা হইয়া ঘাড় উচু করিয়া দাঁড়ান। ইংলিশমানের দলের লোকেরা আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত চান ; উপবেশন বা বঁকা হইয়া দাঁড়ান চান না,—কি জানি যদি আমাদের হঠাৎ একেবারে খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। তাহী তাঁহারা কংগ্রেসের লক্ষ্য যে ঔপনিবেশিক স্বরাজ, তাহা পছন্দ করেন না, ওটাকে সম্পূর্ণ স্বরাজের পথের একটা সরাই বা পাছশালা মনে করেন। যে মল্লীর উপর "এক শ্রেণীর মধ্যপন্থীদের এত অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি, তিনি সম্পূর্ণ স্বরাজপ্রাসাদীদিগকে বলেন "our enemies" এবং মধ্যপন্থীদিগকে লক্ষ্যকে বলেন—"crying for the moon," অর্থাৎ বামনের বা পাগলের বা শিশুর চাঁদের জন্ত ক্রন্দন। সুতরাং দাঁড়াইতেছে এই যে মল্লীর মত লোকেরও মতে আমাদের দেশের একদল লোক ইংলণ্ডের শত্রু, আর একদল পাগল। আমাদের উভয়সঙ্ঘট—শত্রু বা পাগল কোন্ নামটা পছন্দ করিব, তাহা স্থির করা নিতান্ত সহজ নয়। মল্লী যে হঠাৎ বক্তৃতার স্রোতে এই সব কথা এক বাব বলিয়া ফেলিয়াছেন তাহা নয়, পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। এই সেদিনও ভারত-শাসন-প্রণালী-সংস্কার বিষয়ক বক্তৃতাতেও সেই কথাই প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার অবশিষ্ট জীবনকাল যদি কুড়িগুণ লম্বা হইত, তাহা হইলেও তিনি ভারতে পার্লামেন্ট প্রবর্তনের কল্পনা করিতে পাবিতেন না। তাঁহার বয়স এখন ৭০। বিলাতের লোকের ৯০ বৎসর বাঁচা কিছু বিচিত্র নহে। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে তিনি ২০×২০=৪০০ চারি শত বৎসর পরেও ভারতবাসীদিগকে নিজেদের পার্লামেন্টে দেশশাসনের ক্ষমতা দিতে রাজী নন। যাহা হউক, আমরা কাহারও কথায়, অজ্ঞান সত্যজ্ঞানির মত উন্নত, সুখী ও শক্তিশালী হইবার জন্য আমাদের বৈধ এবং ধর্মসঙ্গত চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে পারি না। আমরা

মানুষ, অজ্ঞ মানুষের মত আমাদেরও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে। তাহা দীর্ঘরদন্ত। দীর্ঘরেব অজুলি নির্দেশে আমরা রাজনৈতিক অধিকারলাভ চেষ্টার কণ্টকাকীর্ণ কিন্তু বৈধ ও ধর্মসঙ্গত পথে চলিব। এমন কোন প্রকার সাহস, বীরত্ব, বা আত্মোৎসর্গের কাজ নাই, যাহা আমাদের দেশের লোকে করে নাই, বা করিতে পারে না। সুতরাং আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তবে পথটা ভাল করিয়া চিনিয়া লটরা দৃঢ়পদে তাহাতেই চলা উচিত, এবং সেই পথ ধর্মসঙ্গত হওয়া চাই। ভারতে এখন ক্ষত্রিয়যুদ্ধের স্থান নাই। কিন্তু বৈশ্বযুদ্ধের অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার যথেষ্ট স্থান আছে, এবং জানে, চরিত্রে, ধর্মে উন্নত হইবাব যে প্রতিযোগিতা তাহা কখনও অসাময়িক হইবার নয়। এই উভয় প্রকার প্রতিযোগিতা আমাদের অবলম্বনীয় পন্থা। ভবিষ্যতে দেশ প্রস্তুত হইলে এবং প্রয়োজন হইলে passive resistanceও একটি বৈধ উপায়।

এ সকল ভবিষ্যতের কথা। বর্তমানে মল্লী সাহেব যে শাসনসংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের লাভালাভ কি? তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে আমাদের কিছু লাভ আছে বৈ কি? কিন্তু লর্ড সভায় শত্রুতার উহা কার্য্যে পরিণত না হইতেও পারে। আর যদি শীঘ্র পার্লামেন্টে ভঙ্গ হইয়া পুনর্নির্বাচনে উদারনৈতিকদের জিত না হয়, তাহা হইলে ত প্রস্তাব পার্লামেন্টে উপস্থিতই হইবে না। কিন্তু প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলেও খুব বৈশী লাভ নাই। কারণ, জাতীয় উন্নতি অবনতি যে সকল রাজবিধি উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর কবে, সে সমস্তই বড় লাটের সভায় হয়। সেখানে প্রজাদের প্রতিনিধিরা সংখ্যার কম থাকিবেন। সাম্রাজ্যিক বা প্রাদেশিক আর ব্যয় সম্বন্ধে আমাদের প্রতিনিধিরা কেবল মস্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন, শিক্ষা, বা স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, ইত্যাদির জন্য আমরা এক পয়সাও রাজকোষের খরচ বাড়াইতে পারিব না। অর্থাৎ সর্ব্বই তোমার, চাবিকাঠিটি আমার। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সভ্যের সংখ্যা সরকারী সভ্যের সংখ্যার চেয়ে বেশী হইবে বটে, কিন্তু বে-সরকারী সভ্য সকলেই প্রজার প্রতিনিধি বা প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন না। তন্মধ্যে ইংরাজ থাকিবেন, গবর্ণমেন্টের মনোনীত লোক থাকিবেন। সুতরাং বে-সরকারী সমুদয় সভ্যই কোন আইন প্রণয়নের বেলায় যে প্রজাপক্ষে থাকিবেন, এরূপ সম্ভাবনা কম। আর তাহা হইলেও, বে-সরকারী সভ্যদের মতে কোন আইন পাশ হইলেও, তাহা ছোট লাট ও বড় লাটের রদ করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

প্রস্তাবের মধ্যে আছে যে মিউনিসিপালিটি, ডিস্ট্রিক্ট

বোর্ড প্রভৃতিকে অনেক স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। তাহা হইলে একটা খুব লাভ বটে। এক একটা গ্রামকে স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিক্রম করিবার প্রস্তাব আছে। তাহা হইলে, আমরা নিস্বার্থ স্বদেশপ্রেমমূলক চেষ্টা দ্বারা গ্রামগুলিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলে, খুব লাভ হইবে বটে।

প্রস্তাবের মধ্যে একটা বড় অনিষ্টকর কথা আছে। তাহা শ্রেণী অনুসারে প্রতিনিধি নির্বাচন; অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, জীবিকা আদি অনুসারে নির্বাচন। ইংলণ্ডে স্কটলণ্ডে বা আয়ারলণ্ডে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট, শ্রমজীবী ও মূলধনী, চাষা ও কারিগর, এইরূপ শ্রেণী ভাগ করিয়া পার্লামেন্টে প্রতিনিধি নির্বাচনের কোন বন্দোবস্ত নাই। আমরা যতদূর জানি কোন সভ্য দেশেই এরূপ ব্যবস্থা নাই। অথচ বিলাতে যে ধর্মবিদ্বেষ, শ্রেণীগতবিদ্বেষ ও তজ্জন্ত অশান্তি নাই, তাহা নহে। একরূপ শ্রেণীবিভাগ দ্বারা জাতিগঠনের অন্তরায়কে হারী করা হয়। সুতরাং আমরা ইহার বিরোধী। কিন্তু এখন মুসলমানদিগকে স্বার্থপর লোকে শিখাইয়াছে যে তাহাদের সঙ্গে হিন্দুদের এত রাজনৈতিক পার্থক্য যে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি না পাইলে তাহাদের চলে না। যাহাই হউক, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিবা নিস্বার্থভাবে কাজ করিলেই কিছুদিনের অভিজ্ঞতাতেই বুঝিতে পারিবেন যে সকল ভারতবাসীরই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এক। আর সকল শ্রেণীর লোকই কিছু রাজনৈতিক অধিকার পাইলে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও অশিক্ষিত সর্বজাতীয় গরিবলোকদের সঙ্গে মিশিতে এবং তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্ত চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবেন। ইহাও কম লাভ নয়।

বাঙ্গলাদেশকে আবার অখণ্ড না করিলে প্রস্তাবিতশাসন-প্রণালীতেও আমাদের কোন লাভ হইবে না। এখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল। বঙ্গবিহার ছোটনাগপুর উড়িষ্যা ও আসাম এই সকল প্রদেশবাসী হিন্দু বাঙ্গালীই শিক্ষা, রাজ-নৈতিক যোগ্যতা ও নৈতিক সাহসে অগ্রসর। কিন্তু পশ্চিম-বাঙ্গলার ৭টি বিভাগের মধ্যে হিন্দু বাঙ্গালী কেবল ২টির প্রতিনিধিত্ব পাইবেন, পূর্ববঙ্গেও হিন্দু বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালী অপেক্ষা সংখ্যায় কম। রাজনৈতিক কাজের জন্ত যোগ্যতম বাহারা তাহাদের এই দশা হইলে লাভ কোথায়? ভিন্ন কোন প্রদেশের উপর আমরা প্রভুত্ব করিতে চাই না। গবর্ণমেন্ট বিহার উড়িষ্যাদিকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমরা সব বাঙ্গালী একত্র থাকিয়া আমাদের কষ্টার্জিত শিক্ষা ও রাজনৈতিক যোগ্যতার ফলভোগ করিতে চাই। আমরা এরূপ দেশ-বিভাগের বিরোধী বন্ধারা যোগ্যতমেরা তাহাদের জ্ঞান অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। এইরূপে প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রদেশবিভাগ করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের

থাকিবে, ততদিন আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের কোন মূল্য থাকিবে না।

তাহাব পৰ, এখন কর্তৃনের শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষা ক্রমেই অল্প হইতে অল্পতর লোকে পাইবে। এই শিক্ষানীতি পরিবর্তিত না হইলে আমবা দেশের ছোট বড় কাজের জন্ত যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত নেতা কোথায় পাইব?

দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার না হইলে প্রজা-কুল রাজনৈতিক অধিকারের সুব্যবহার করিবে কেমন করিয়া? সভ্যদেশ মাজেই প্রাথমিক শিক্ষা সকল ছেলেমেয়ে বিনামূল্যে পায়। আমাদের দেশেই উন্টা রীতি।

তাহার পর, এই যে বিনা বিচারে দেশের সর্বজনপূজ্য মহোপকারী লোকদের নির্বাসন, এই যে স্বদেশবান্ধবসমিতি প্রভৃতি দেশের উপকারকার্যে নিযুক্ত সভাগুলিকে বিনা বিচারে বে-আইনী সভা বলিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া, এরূপ অদ্ভুত আইন প্রচলিত থাকিলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিরূপে সম্ভব, দেশহিতকর কার্যই বা কিরূপে সম্ভব, এবং রাজ-নৈতিক কোনও অধিকারেরই বা মূল্য কি?

হইতে পারে যে নির্বাসিত ব্যক্তিরা দোষী, হইতে পারে যে সভাগুলি বে-আইনী কার্য্য কবিতেনি। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? লাট সাহেব ত পবম্পরাক্রমে শেষে বুদ্ধিমান ধার্মিক গুপ্তচর বা গোয়েন্দাদের কথার উপর নির্ভর করিয়াই ভদ্রলোকদের নাম দাগী করেন। বোর পাপিষ্ঠ নরহস্তার বিচার আছে। আর অশ্বিনীকুমার দত্ত ও কৃষ্ণ-কুমার মিত্রের জায় দেশহিতব্রত, ধার্মিক, পবিত্রচেতা, আত্মোৎসৃষ্ট লোকদের বিচার নাই? দেশে কী অস্তবিত্তোহ হইতেছিল, কী সর্বত্রব্যাপী অশান্তি আশুপ্তন জনিতেনিছিল যে হঠাৎ এরূপ করা দরকার হইল?

আমরা ত জানিতাম অশ্বিনী বাবু ও কৃষ্ণ বাবু অনেক সাহসী লোকের উদ্যোগগামিতাকে দমনে রাখিতেছিলেন ও রাখিয়াছিলেন। ইহার স্বদেশী প্রচার ও বিদেশীপন্যবর্জন শিক্ষা দিতেছিলেন বটে; কিন্তু তাহা বে-আইনী কাজ নহে। বিদেশী বণিকদের চাঁৎকারে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্বদেশীর নেতাদিগকে নির্বাসিত করিয়া-ছেন, একথা পথে ঘাটে হাটে বাজারে লোকে বলিতেছে বটে; কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে এরূপ কথা বিশ্বাস করা উচিত নয়। সুতরাং আবার জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের অপরাধ কি?

স্বদেশবান্ধবসমিতি প্রভৃতিরও অপরাধ আমরা জানি না। আমরা জানি, তাঁহারা স্বদেশীর প্রচলন ও বিদেশী পণ্যের বর্জন, ছর্ভিক্ষক্লিষ্টকে সাহায্যদান, সাগিসীর দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যাচার নিবারণ ও তাহাদের কষ্ট দূরীকরণ, প্রভৃতি সংকার্য্য করিতেছিলেন।

অধিকন্তু তাঁহারা ব্যায়াম লাগিলেখা প্রভৃতির দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য শক্তি ও সাহস লাভ করিতেছিলেন। এই সমস্তই ভালা এবং আইনসঙ্গত কাজ। সার হার্ভী আডামসন বলেন যে “এই সব সমিতি বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিল, যদিও ইহাদের দশ পনের হাজার সভ্যের মধ্যে সম্ভবত অধিকাংশই নেতাদের গৃহ অভিসন্ধি জানিত না।” তাহা না কি ডাকাইতি ও নরহত্যাও কবিত। কিন্তু আমরা বলি তাহাদের মধ্যে সকলে দূরে থাকুক, যদি এক হাজার লোক,—হাজার দূরে থাকুক, এক শত লোকও যদি বাস্তবিক এই সকল কুকাণ্ড করিত, তাহা হইলে, পুলিশের বৈরুপ কার্যক্ষমতা, তাহাতে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইত, তাহা নিবারণ করা বর্তমান পুলিশ কর্মচাবাদের সাধ্যাতীত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। কয়েকটা ডাকাইতি হইয়াছে বটে; তাহারও, পুলিশের কণাবিশ্বাস করিতে গেলে, সবগুলিই একই ক্ষুদ্র দলের কার্য। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দোষী প্রমাণ হইলেও তজ্জন্ত দেশের শিরোমণিদের দ্বারা চালিত প্রত্যেক সমিতিতে বে-আইনী বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। গোঁবা সৈন্তদলেও ত কেহ কেহ চোর ও হস্তা বলিয়া প্রমাণিত হয়। তাহাতে সমস্ত দলের সাজা হয় না। ডাকাতেরা ডাকাতি করিবার সময় কোন্ সমিতিব সভ্য ছিল, তাহা প্রমাণ করা চাই। তাহারা যে সমিতির নেতাদের জ্ঞাতসারে ডাকাতি করিতেছিল, তাহা প্রমাণ করা চাই। ডাকাতি করা সমিতির একটা উদ্দেশ্য তাহা প্রমাণ করা চাই। ডাকাতিলাব্ধ টাকা সমিতি লইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ চাই। নরহত্যা সম্বন্ধেও এই সব কথা খাটে। এক্ষণ প্রমাণ না হইলে, গবর্ণমেন্ট স্বীয় প্রভূত শক্তির বলে সমিতিগুলির উচ্ছেদ সাধন করিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণকে ইহা বিশ্বাস করাইতে পারিলেন না যে ভদ্রলোকের হাজার হাজার ছেলে দেশ-হিতৈষিতার মুখোন্ পরিয়া অশ্রুতপূর্ব শুণ্ডামি সহকারে ডাকাইতি ও নরহত্যায় ব্যাপ্ত ছিল। যদি অম্বিনীকুমার

দত্তকে প্রকারান্তরে বদমায়েসের সর্দার বলা হয়, তাহা হইলে চিন্তাহীন লোকদের ডাকাইতিকে নির্দোষ মনে করিতে বেশী সময় লাগিবে কি? ইহাতে মহা অনিষ্ট হইবে।

আর বাদ্যালীর ছেলের যদি সৈনিকগুণ না থাকে, তবে ভয় কিসেব? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সরকারী সৈনিক বা সরকারী ভলান্টিয়ার করিয়া লইলেই আপদ চুকিয়া যায়।

মোটের উপর আমরা এই বুঝি যে দেশের কাজ হওয়া চাই। স্বদেশীর প্রচলন ও বিদেশী পণ্যের বর্জন, শিক্ষা বিস্তার, সালিসী বিচার, শারীরিক স্বাস্থ্য, বল ও সাহস লাভ, তীর্থযাত্রী প্রভৃতি বিপন্ন ও উৎপীড়িত লোকদের সাহায্য দান, হৃতিক্ষ নিবারণ, ইত্যাদি সমস্তই আইনসঙ্গত এবং ধর্মসঙ্গত কাজ। এ সকলের বিরুদ্ধে কোন আইন নাই, হইতে পারে না, এবং হইলেও সকল লোককে তজ্জপ আইন মানান অসম্ভব। স্বদেশবাসী ভাই ভগিনীগণ, বিধাতা আমাদের নেতা, তপস্তা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, ব্রতপালন আমাদের চিরাভ্যন্ত কর্ম। তবে কেন আমরা নিরাশ হইব? আমরা এ পর্যন্ত আইন মানিয়া চলিতেছি, ভবিষ্যতেও, বিবেকবিরুদ্ধ এবং ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে, আইন মানিব। কোনকালেই পরের অনিষ্ট চেষ্টারূপ অধর্ম করিব না। কিন্তু কোনও কারণে দেশের মঙ্গল সাধনেও বিরত থাকিব না।

সুনিতে পাই আজকাল নাকি কেহ কেহ বলিতেছেন যে বিদেশীপণ্যবর্জন হইতেই রাজনৈতিক হত্যা, বোমা নিক্ষেপ আদির উৎপত্তি। বেশ কথা! খৃষ্টীয় ধর্মের নামেও ত অনেক তথাকথিত ধৃষ্টান অনেক লোককে গুড়াইয়া এবং অন্তপ্রকাণ্ডে নিষ্ঠুরভাবে মারিয়া ফেলিয়াছে। তজ্জন্ত কি বাস্তবিক খৃষ্ট কিম্বা তাঁহার উপদেশাবলী দ্বারা? বিদেশী-পণ্য বর্জনের অবশুস্তাবী পরিণতি বোমা নিক্ষেপে, ইহা বাতুলের কথা। ইহার আর কি জবাব দিব?

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

৮ম ভাগ ।

ফাল্গুন. ১৩১৫ ।

১১শ সংখ্যা ।

গোরা ।

৪১

একই সময়ে নিজের অন্তরের সঙ্গে, আবার নিজের বাহিরের সঙ্গে সূচরিতার যে সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহাকে ভীত করিয়া তুলিয়াছে। গোবাব প্রতি তাহার যে মনের ভাব এতদিন তাহার অলক্ষ্যে বল পাইয়া উঠিতেছিল এবং গোবাব জেলে যাওয়ার পর হইতে যাহা তাহার নিজের কাছে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট এবং হৃদ্যবান রূপে দেখা দিয়াছে তাহা লইয়া সে যে কি করিবে, তাহার পরিণাম যে কি তাহা সে কিছুই ভাবিয়া পায় না, সে কথা কাহাকেও বলিতেও পারে না, নিজের কাছে নিজে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। এই নিগূঢ় বেদনাটাকে লইয়া সে গোপনে বসিয়া নিজের সঙ্গে যে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবে তাহাব সে নিভৃত অবকাশটুকুও নাই—হারানবাব তাহার ঘাবের কাছে তাহাদের সমস্ত সমাজকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছেন; এমন কি, ছাপার কাগজের ঢাকেও কাঠি পড়িবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহার উপরেও তাহাব মাসীর সমস্তা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে অতি সল্প তাহার একটা কোনো মীমাংসা না করিলে

একদিনও আব চলে না। সূচরিতা বুঝিয়াছে এবাব তাহার জীবনের একটা সঙ্কীর্ণ আসিয়াছে, চিবপবিচিত পথে চিবান্তান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে চলিবার দিন আব নাই।

এই তাহাব সঙ্কটেব সময় তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল পবেশবাবু। তাঁহার কাছে সে পরামর্শ চাহে নাই, উপদেশ চাহে নাই; অনেক কথা ছিল যাহা পরেশবাবুর সম্মুখে সে উপস্থিত করিতে পাবিত না এবং এমন অনেক কথা ছিল যাহা লজ্জাকব হীনতাবশতই পবেশবাবুর কাছে প্রকাশের অযোগ্য। কেবল পবেশবাবুর জীবন, পরেশবাবুর সঙ্গমাত্র তাহাকে যেন নিঃশব্দে কোন্ পিতৃক্রোড়ে কোন্ মাতৃবক্ষে আকর্ষণ করিয়া লইত।

এখন শীতের দিনে সন্ধ্যার সময়ে পরেশবাবু বাগানে যাইতেন না। বাড়ির পশ্চিমদিকের একটা ছোট ঘরে মুক্তচাবের সম্মুখে একখানি আসন পাতিয়া তিনি উপাসনায় বসিতেন; তাহার শুক্লকেশমণ্ডিত শাস্ত্রমুখের উপরে সূর্যাস্তের আভা আসিয়া পড়িত। সেই সময়ে সূচরিতা নিঃশব্দপদে চুপ করিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিত। নিজের অশান্ত ব্যথিত চিত্তটিকে সে যেন পরেশের উপাসনার গভীরতার মাঝখানে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। আজকাল উপাসনাস্তে, প্রায়ই পরেশ দেখিতে পাইতেন তাহার এই

কল্পাটি এই ছাত্রীটি শুদ্ধ হইয়া তাঁহার কাছে বসিয়া আছে ; তখন তিনি একটি অনির্কচনীয় আধ্যাত্মিক মাধুর্যের দ্বারা এই বালিকাটিকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া নিঃশব্দে ইহাকে আশীর্বাদ করিতেন।

ভূমার সহিত মিলনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিল বালিয়া যাহা শ্রেয়তম এবং সত্যতম পরেশের চিন্তা সর্বদাই তাহার অভিযুক্ত ছিল। এই জন্ত সংসার কোনোমতেই তাঁহার কাছে অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিতে পারিত না। এইরূপে নিজের মধ্যে তিনি একটি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন বালিয়াই মত বা আচরণ লইয়া তিনি অন্তের প্রতি কোন প্রকার জবরদস্তি করিতে পারিতেন না। মঙ্গলের প্রতি নির্ভর এবং সংসারের প্রতি ধৈর্য্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। ইহা তাঁহার এত অধিক পরিমাণে ছিল যে সাম্প্রদায়িক লোকের কাছে তিনি নিম্নিত হইতেন, কিন্তু নিন্দাকে তিনি এমন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন যে হয়ত তাহা তাঁহাকে আঘাত করিত কিন্তু তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া থাকিত না। তিনি মনের মধ্যে এই কথাটাই কেবলি থাকিয়া থাকিয়া আবৃত্তি করিতেন আমি আর কাহারও হাত হইতে কিছুই লইব না আমি তাঁহার হাত হইতেই সমস্ত লইব।

পরেশের জীবনের এই গভীর নিস্তব্ধ শান্তির স্পর্শলাভ করিবার জন্তই আজকাল সূচরিতা নানা উপলক্ষ্যেই তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অনভিজ্ঞ বালিকাবয়সে তাহার বিরুদ্ধ হৃদয় এবং বিরুদ্ধ সংসার যখন তাহাকে একেবারে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে তখন সে বারবার কেবল মনে করিয়াছে বাবার পা দুখানা মাথায় চাপিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণের জন্ত যদি মাটিতে পড়িয়া থাকিতে পারি তবে আমার মন শান্তিতে ভবিয়া উঠে।

এইরূপে সূচরিতা মনে ভাবিয়াছিল সে মনের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া অবিচলিত ধৈর্যের সহিত সমস্ত আঘাতকে ঠেকাইয়া রাখিবে অবশেষে সমস্ত প্রতিকূলতা আপনি পরাস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিল না তাহাকে অপরিচিত পথে বাহির হইতে হইল।

বরদাসুন্দরী যখন দেখিলেন রাগ করিয়া ভবংসনা করিয়া সূচরিতাকে টলানো সম্ভব নহে এবং পরেশকেও

সহায়রূপে পাইবার কোনো আশা নাই তখন হরিমোহিনীর প্রতি তাঁহার ক্রোধ অত্যন্ত হৃদ্যন্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার গৃহের মধ্যে হরিমোহিনীর অস্তিত্ব তাঁহাকে উঠিতে বসিতে যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

সেদিন তাঁহার পিতার মৃত্যুদিনের বার্ষিক উপাসনা উপলক্ষ্যে তিনি বিনয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উপাসনা সম্ভাব সময় হইবে, তৎপূর্বেই তিনি সভাগৃহ সাজাইয়া রাখিতেছিলেন; সূচরিতা এবং অন্ত মেয়েরাও তাঁহার সহায়তা করিতেছিল।

এমন সময় তাঁহার চোখে পড়িল বিনয় পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে হরিমোহিনীর নিকট যাইতেছে। মন যখন ভারাক্রান্ত থাকে তখন ক্ষুদ্র ঘটনাও বড় হইয়া উঠে। বিনয়ের এই উপরের ঘবে যাওয়া একমুহূর্তে তাঁহার কাছে এমন অসহ্য হইয়া উঠিল যে তিনি ঘর সাজানো ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ হরিমোহিনীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বিনয় মাহুরে বসিয়া আত্মীয়ের জায় বিশ্রুদ্ধভাবে হরিমোহিনীর সহিত কথা কহিতেছে।

বরদাসুন্দরী বালিয়া উঠিলেন, দেখ তুমি আমাদের এখানে যতদিন খুসি থাক আমি তোমাকে আদর যত্ন করেই রাখব। কিন্তু আমি বলছি তোমাব ঐ ঠাকুরকে এখানে রাখা চলবে না।

হরিমোহিনী চিরকাল পাড়াগাঁয়েই থাকিতেন। ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল যে তাহারা খৃষ্টানেরই শাখা বিশেষ। জ্ঞতরাং তাহাদেরই সংস্রব সম্বন্ধে বিচার করিবার বিষয় আছে কিন্তু তাহাবাও যে তাঁহার সম্বন্ধে সন্মোচ অসম্ভব করিতে পারে ইহা তিনি এই কয়েকদিনে ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছিলেন। কি করা কর্তব্য ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময়ে আজ বরদাসুন্দরীর মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে আর চিন্তা কবিবার সময় নাই যাহা হয় একটা কিছু স্থির করিতে হইবে। প্রথমে ভাবিলেন কলিকাতার একটা কোথাও বাসা লইয়া থাকিবেন তাহা হইলে মাঝে মাঝে সূচরিতা ও সতীশকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তাঁহার যে অল্প সম্মল, তাহাতে কলিকাতার খরচ চলিবে না।

বরদাসুন্দরী অকস্মাৎ বড়ের মত আসিয়া যখন লিয়া

গেলেন তখন বিনয় মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরিমোহিনী বলিয়া উঠিলেন—
“আমি তীর্থে যাব তোমরা কেউ আমাকে পৌছে দিয়ে আস্তে পারবে বাবা ?”

বিনয় কহিল—“খুব পারব । কিন্তু তার আয়োজন করতে ত ছ চার দিন দেয় হবে ততদিন চল মাসি তুমি আমার মার কাছে গিয়ে থাকবে ।”

হরিমোহিনী কহিলেন “বাবা, আমার ভার বিষম ভার । বিধাতা আমাব কপালের উপর কি বোঝা চাপিয়েচেন জানিনে, আমাকে কেউ বহিতে পারে না । আমার শ্বশুর বাড়িতেও যখন আমার ভার সহ্য না তখন আমার বোঝা উচিত ছিল ! কিন্তু বড় অবুর মন বাবা—বুক যে খালি হয়ে গেছে সেইটে ভাববার ক্ষেত্রে কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমার পোড়া ভাগ্যও যে সঙ্গে সঙ্গে চলচে । আর থাক বাবা, আর কারো বাড়িতে গিয়ে কাজ নেই—যিনি বিশ্বের বোঝা বন তাঁর পাদপদ্মে এবার আমি আশ্রয় গ্রহণ করুব—আর আমি পারিনে ।”—বলিয়া বারবার করিয়া হুই চক্ষু মুছিতে লাগিলেন ।

বিনয় কহিল—“সে বললে হবে না মাসি । আমার মার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা করলে চলবে না । যিনি নিজের জীবনের সমস্ত ভার ভগবানকে সমর্পণ করতে পেরেচেন তিনি অন্যের ভার বহিতে ক্লেশ বোধ করেন না । যেমন আমার মা—আর যেমন এখানে দেখলেন পরেশবাবু । সে আমি শুনব না—একবার আমার তীর্থে তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসব তার পরে তোমার তীর্থ আমি দেখতে যাব ।”

হরিমোহিনী কহিলেন, “তাঁদের তা হলে ত একবার ধবর দিয়ে—”

বিনয় কহিল—“আমরা গেলেই মা ধবর পাবেন—সেইটেই হবে পাকা ধবর ।”

হরিমোহিনী কহিলেন—“তা হলে কাল সকালে”—

বিনয় কহিল, “দরকার কি ! আজ রাত্রেই গেলে হবে ।”

সন্ধ্যার সময় সুরচিতা আসিয়া কহিল, “বিনয় বাবু,

মা আপনাকে ডাক্তে পাঠালেন । উপাসনার সময় হয়েছে ।”

বিনয় কহিল “মাসীর সঙ্গে কথা আছে, আজ আমি যেতে পারব না ।”

আসল কথা, আজ বিনয় বরদাহন্দরীর উপাসনার নিমন্ত্রণ কোনোমতে স্বীকার করিতে পারিল না । তাহার মনে হইল সমস্তই বিড়ম্বনা ।

হরিমোহিনী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল, “বাবা বিনয়, যাও তুমি । আমার সঙ্গে কথাবার্তা সে পরে হবে । তোমাদের কালকর্ম্ম আগে হয়ে যাক তার পরে তুমি এসো ।”

সুরচিতা কহিল, “আপনি এলে কিন্তু ভাল হয় ।”

বিনয় বুঝিল সে সভাক্ষেত্রে না গেলে এই পরিবাবে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে তাহাকে কিছু পরিমাণে আরো অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে । এইজন্য সে উপাসনাস্থলে গেল কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ ফল লাভ হইল না ।

উপাসনার পর আহাঁর ছিল—বিনয় কহিল “আজ আমার ক্ষুধা নেই ।”

বরদাহন্দরী কহিলেন—“ক্ষুধার অপরাধ নেই । আপনি ত উপরেই খাওয়া সেরে এসেছেন ।”

বিনয় হাসিয়া কহিল, “হাঁ, লোভী লোকের এই রকম দশাই ঘটে । উপস্থিতির প্রলোভনে ভবিষ্যৎ খুইয়ে বসে ।” এই বলিয়া বিনয় প্রস্থানের উদ্যোগ করিল ।

বরদাহন্দরী স্মিতাসা করিলেন, “উপরে যাচ্ছেন বুঝি ?”

বিনয় সংক্ষেপে কেবল “হাঁ” বলিয়া বাহির হইয়া গেল ; ঘরের কাছে সুরচিতা ছিল তাহাকে মুহূর্ত্তের কহিল, “দ্বিদি একবার মাসীর কাছে যাবেন বিশেষ কথা আছে ।”

ললিতা আতিথ্যে নিযুক্ত ছিল । একসময় সে হারান বাবুর কাছে আসিতেই তিনি অকারণে বলিয়া উঠিলেন, “বিনয় বাবু ত এখানে নেই তিনি উপরে গিয়েছেন ।”

শুনিয়াই ললিতা সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া অসঙ্কোচে কহিল, “জানি । তিনি আমার সঙ্গে না দেখা করে যাবেন না । আমার এখানকার কাজ সারা হলেই আমি উপরে যাব এখন ।”

ললিতাকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত করিতে না পারিয়া হারানের

অন্তরুদ্ধ দাহ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিনয় সূচরিতাকে হঠাৎ কি একটা বলিয়া গেল এবং সূচবিতা অনতিকাল পরেই তাহার অনুসরণ করিল ইহাও হারান বাবুর লক্ষ্য এড়াইতে পারে নাই। তিনি আজ সূচরিতার সহিত আলাপের উপলক্ষ্য সন্ধান করিয়া বাবুয়ার অকৃতার্থ হইয়াছেন—তাই একবার সূচরিতা তাঁহার সুস্পষ্ট আহ্বান এমন করিয়া এড়াইয়া গেছে যে সভাস্থ লোকের কাছে হারান বাবু নিজেকে অপদস্থ জ্ঞান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মন সুস্থ ছিল না।

সূচরিতা উপরে গিয়া দেখিল হরিমোহিনী তাঁহার জিনিষপত্র শুধাইয়া এমনভাবে বসিয়া আছেন যেন এখনি কোথায় যাইবেন। সূচবিতা জিজ্ঞাসা করিল—“মাসি এ কি ?”

হরিমোহিনী তাহার কোনো উত্তর দিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কহিলেন, “সতীশ কোথায় আছে তাকে একবার ডেকে দাও মা !”

সূচবিতা বিনয়ের মুখের দিকে চাহিতেই বিনয় কহিল—“এবাড়িতে মাসি থাকলে সকলেবি অসুবিধে হয় তাই আমি শুঁকে মাঝে নিয়ে যাচ্ছি।”

হরিমোহিনী কহিলেন, “সেখানে থেকে আমি তীর্থে যাব মনে কষেচি। আমার মত লোকের কাবো বাড়িতে এরতম করে থাকা ভাল হয় না। চিরদিন লোকে আমাকে এমন কবে সহ্যই বা কবে কেন ?”

সূচরিতা নিজেই একথা কয়েক দিন হইতে ভাবিতেছিল। এবাড়িতে বাস কবা যে তাহাব মাসির পক্ষে অপমান তাহা-সে অনুভব করিয়াছিল স্ততরাং সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। চুপ করিয়া তাঁহাব কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। বাড়ি হইয়াছে, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। কলিকাতার হেমস্তের অশুষ্ক আকাশে তারাগুলি বাম্পাচ্ছন্ন। কাহাদেব চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল তাহা সেই অন্ধকারে দেখা গেল না।

সি ডি হইতেই সতীশের উচ্চকণ্ঠে মাসিমা-ধ্বনি শুন্য গেল। “কি বাবা, এস বাবা” বলিয়া হরিমোহিনী তড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। সূচবিতা কহিল, “মাসিমা, আজ রাত্রে কোথাও যাওয়া হতেই পারে না, কাল সকালে

সমস্ত ঠিক করা যাবে। বাবাকে ভাল করে না বলে তুমি কি কবে যেতে পারবে বল ! সে যে বড় অন্ডায় হবে।”

বিনয় বরদামুন্দরী কর্তৃক হরিমোহিনীর অপমানে উত্তেজিত হইয়া একথা ভাবে নাই। সে স্থির করিয়াছিল এক বাড়িও মাসীর এবাড়িতে থাকা উচিত হইবে না—এবং আশ্রয়ের অভাবেই যে হরিমোহিনী সমস্ত সহ্য করিয়া এবাড়িতে রহিয়াছেন বরদামুন্দরীর সেই ধারণা দূর করিবার জন্য বিনয় হরিমোহিনীকে এখান হইতে লইয়া যাইতে লেশমাত্র বিলম্ব করিতে চাহিতেছিল না। সূচরিতার কথা শুনিয়া বিনয়ের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, এবাড়িতে বরদামুন্দরীর সঙ্গেই যে হরিমোহিনীর একমাত্র এবং সর্বপ্রধান সূক্ষ্ম তাহা নহে। যে ব্যক্তি অপমান করিয়াছে তাহাকেই বড় কবিতা দেখিতে হইবে আর যে লোক উদারভাবে আশ্রয়ের মত আশ্রয় দিয়াছে তাহাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে এ ত ঠিক নহে।

বিনয় বলিয়া উঠিল, “সে ঠিক কথা। পরেশ বাবুকে না জানিয়ে কোনোমতেই যাওয়া যায় না।”

সতীশ আসিয়াই কহিল, “মাসিমা, জান রাশিয়ানরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসচে ? ভাবি মজা হবে !”

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি কাব দলে ?”

সতীশ কহিল—“আমি রাশিয়ানের দলে।”

বিনয় কহিল—“তাহলে রাশিয়ানের আর ভাবনা নেই।”

এইরূপে সতীশ মাসীমার সভা তমাইয়া তুলিতেই সূচরিতা আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া নীচে চলয়া গেল।

সূচরিতা জানিত শুইতে যাইবার পূর্বে পবেশ বাবু তাঁহার কোনো একটি প্রিয় বই খানিকটা করিয়া পড়িতেন। কতদিন সেইরূপ সময়ে সূচরিতা তাঁহাব কাছে আসিয়া বসিয়াছে এবং সূচরিতার অনুবোধে পরেশ বাবু তাহাকেও পড়িয়া শুনাইয়াছেন।

আজও তাঁহাব নির্জন ঘরে পরেশ বাবু আলোটি জ্বালাইয়া এমার্সনের গ্রন্থ পড়িতেছিলেন। সূচবিতা ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে চোঁকি টানিয়া লইয়া বসিল। পরেশ বাবু বইখানি রাখিয়া একবার তাহার মুখের দিকে

চাহিলেন। সূচরিতার সঙ্কল্প ভঙ্গ হইল—সে সংসারের কোনো কথাই তুলিতে পারিল না। কহিল, “বাবা, আমাকে পড়ে শোনাও।”

পবেশ বাবু তাহাকে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা বাজিয়া গেলে পড়া শেষ হইল। তখনো সূচরিতা নিদ্রার পূর্বে পবেশ বাবুর মনে কোনোপ্রকার ক্ষোভ পাছে জন্মে এইজন্ত কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া বাইতেছিল।

পবেশ বাবু তাহাকে স্নেহস্বরে ডাকিলেন—“রাধে।”

সে তখনি ফিরিয়া আসিল। পরেশ বাবু কহিলেন—“তুমি তোমার মাসিৰ কথা আমাকে বলতে এসেছিলে?”

পবেশ বাবু তাহার মনেব কথা বৃত্তিতে পারিয়াছেন জানিয়া সূচরিতা বিস্মিত হইয়া কহিল, “হাঁ বাবা, কিন্তু আজ থাক্ কাল সকালে কথা হবে।”

পরেশ বাবু কহিলেন—“বোস।”

সূচরিতা বসিলে তিনি কহিলেন—“তোমার মাসির এখানে কষ্ট হচ্ছে সে কথা আমি চিন্তা কবেছি। তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ লাভগ্যর মার সংস্কারে যে এত বেশি আঘাত দেবে তা আমি আগে ঠিক জানতে পারিনি। যখন দেখছি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে তখন এবাড়িতে তোমার মাসিকে রাখলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন।”

সূচরিতা কহিল—“আমার মাসি এখান থেকে যাবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছেন।”

পরেশ বাবু কহিলেন, “আমি জানতুম যে তিনি যাবেন। তোমরা দুজনেই তাঁর একমাত্র আশ্রয়—তোমরা তাঁকে এমন অনাথার মত বিদায় দিতে পারবে না সেও আমি জানি। তাই আমি একদিন এসম্বন্ধে ভাবছিলাম।”

তাহার মাসি কি সঙ্কটে পড়িয়াছেন পরেশ বাবু যে তাহা বুঝিয়াছেন ও তাহা লইয়া ভাবিতেছেন একথা সূচরিতা একেবারেই অনুমান কবে নাই। পাছে তিনি জানিতে পারিয়া বেদনা বোধ করেন এই ভয়ে সে এতদিন অত্যন্ত সাবধানে চলিতেছিল—আজ পবেশ বাবুর কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল এবং তাহাব চোখের পাতা হুলহুল করিয়া আসিল।

পরেশ বাবু কহিলেন—“তোমার মাসিৰ জন্যে আমি একটি বাড়ি ঠিক করে রেখেছি।”

সূচরিতা কহিল—“কিন্তু তিনি ত”—

পরেশ বাবু। ভাড়া দিতে পারবেন না! ভাড়া তিনি কেন দেবেন? তুমি ভাড়া দেবে।

সূচরিতা অবাক্ হইয়া পবেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পবেশ বাবু হাসিয়া কহিলেন, “তোমারই বাড়িতে থাকতে দিয়ো, ভাড়া দিতে হবে না।”

শুনিয়া সূচরিতা আবার বিস্মিত হইল। পবেশ বাবু কহিলেন, “কলকাতায় তোমাদের ছোটো বাড়ি আছে জান না! একটি তোমার একটি সতীশের। যত্ন সময়ে তোমার বাবা আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যান। আমি তাই খাটিয়ে বাড়িয়ে তুলে কলকাতায় ছোটো বাড়ি কিনেছি। এত দিন তার ভাড়া পাচ্ছিলুম, তাও জম্ছিল। তোমার বাড়ির ভাড়াটে অল্প দিন হল উঠে গেছে—সেখানে তোমার মাসির থাকবার কোনো অসুবিধা হবে না।”

সূচরিতা কহিল, “সেখানে তিনি কি একলা থাকতে পারবেন?”

পরেশ বাবু কহিলেন, “তোমরা তাঁর আপনার লোক থাকতে তাঁকে একলা থাকতে হবে কেন?”

সূচরিতা কহিল, “সেই কথাই জোমাকে বলবার জন্যে আজ এসেছিলাম। মাসি চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন, আমি ভাবছিলাম আমি একলা কি কবে তাঁকে যেতে দেব। তাই তোমার উপদেশ নেব বলে এসেছি। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।”

পরেশ বাবু কহিলেন, “আমাদের বাসার গায়েই এই যে গলি, এই গলির ছোটো তিনটে বাড়ি পরেই তোমার বাড়ি—ঐ বাবান্দায় দাঁড়ালে সে বাড়ি দেখা যায়। সেখানে তোমরা থাকলে নিতান্ত অবশ্বিত অবস্থায় থাকতে হবে না। আমি তোমাদের দেখতে সন্তুষ্ট পারব।”

সূচরিতার বুকের উপর হঠাতে একটা মস্ত পাথর নামিয়া গেল। “বাবাকে ছাড়িয়া কোন কথিয়া যাইব” এই চিন্তার সে কোনো অবধি পাঠিতেছিল না। কিন্তু যাইতেই হইবে ইহাও তাহাব কাছে নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সুচরিতা আবেগে পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া চুপ করিয়া পরেশ বাবুর কাছে বসিয়া রহিল। পরেশ বাবুও স্তব্ধ হইয়া নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে নিহিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচরিতা তাঁহার শিষ্যা, তাঁহার কন্যা, তাঁহার স্নহদ। সে তাঁহার জীবনের এমন কি, তাঁহার জৈরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। যে দিন সে নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার উপাসনার সহিত যোগ দিত—সে দিন তাঁহার উপাসনা যেন বিশেষ পূর্ণতা লাভ করিত। প্রতি দিন সুচরিতার জীবনকে মঙ্গলপূর্ণ স্নেহের দ্বারা গড়িতে গড়িতে তিনি নিজের জীবনকেও একটি বিশেষ পরিণতি দান করিতেছিলেন। সুচরিতা যেমন ভক্তি যেমন একান্ত নম্রতার সহিত তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এমন করিয়া আর কেহ তাঁহার কাছে আসে নাই;—ফল যেমন করিয়া আকাশের দিকে তাকায় সে তেমনি কবিতা তাঁহার দিকে তাঁহার সমস্ত প্রকৃতিক উদ্ভূত এবং উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। এমন একাগ্রভাবে কেহ কাছে আসিলে মানুষের দান করিবার শক্তি আপনি বড়িয়া যায়—অন্তঃকরণ জলভারনত্র মেঘের মত পরিপূর্ণতাব দ্বারা নত হইয়া পড়ে। নিজের বাহ্য কিছু নত্যা যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা কোনো অমুকুল চিন্তের নিকট প্রতিদিন দান করিবার সুযোগের মত এমন শুভ-যোগ মানুষের কাছে আর কিছু হইতেই পারে না; সেই দুর্লভ সুযোগ সুচরিতা পরেশকে দিয়াছিল। একান্ত সুচরিতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীর হইয়াছিল। আজ সেই সুচরিতার সঙ্গে তাঁহার বাহ্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে;—ফলকে নিজের জীবন-রসে পরিপক্ক করিয়া তুলিয়া তাহাকে নিজের নিকট হইতে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। একান্ত তিনি মনের মধ্যে যে বেদনা অনুভব করিতেছিলেন সেই নিগূঢ় বেদনাটিকে তিনি অন্তর্ধামীর নিকট নিবেদন করিয়া দিতেছিলেন। সুচরিতার পাথের সঞ্চয় হইয়াছে এখন নিজের শক্তিতে প্রশস্ত পথে সুখে ক্রমে আশ্বাত প্রতিঘাতে নূতন অভিজ্ঞতা লাভের দিকে যে তাহার আহ্বান আসিয়াছে তাহার আয়োজন কিছু দিন হইতেই পরেশ লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, বৎসে যাত্রা কর—তোমার চির-

জীবন যে কেবল আমার বুদ্ধি এবং আমার আশ্রয়ের দ্বারাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব এমন কখনই হইতে পারিবে না—ঈশ্বর আমার নিকট হইতে তোমাকে মুক্ত কবিতা বিচিত্রের ভিতর দিয়া তোমাকে চব্বিশ পরিণামে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান—তাঁহার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হউক। এই বলিয়া আশ্রয় স্নেহপালিত সুচরিতাকে তিনি মনে মধ্যে নিজের দিক হইতে ঈশ্বরের দিকে পবিত্র উৎসর্গ সামগ্রীর মত তুলিয়া ধরিতেছিলেন। পরেশ ববদাহুন্দরী। প্রতি রাগ কবেন নাই, নিজের সংসারের প্রতি মনো কোনো প্রকার বিবোধ অনুভব করিতে প্রশ্রয় দেন নাই; তিনি জানিতেন সঙ্গীর্ণ উপকূলের মাঝখানে নূতন বর্ষের জলরাশি হঠাৎ আসিয়া পড়িলে অত্যন্ত একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়—তাহার একমাত্র প্রতিকার তাহাকে প্রশস্ত ক্ষেত্রে মুক্ত করিয়া দেওয়া। তিনি জানিতেন অল্প দিনের মধ্যে সুচরিতাকে আশ্রয় করিয়া এই ছোট পবিবারটির মধ্যে যে সকল অপ্রত্যাশিত সমাবেশ ঘটয়াছে তাহা এখানকার বাঁধা সংস্কারকে পীড়িত করিতেছে, তাহাকে এখানে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না কবিতা মুক্তিদান করিলে তবেই স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য ঘটয়া সমস্ত শাস্ত হইতে পারিবে। ইহা জানিয়া, যাহাতে সহজে সেই শাস্তি ও সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে নীরবে তাহাবই আয়োজন করিতেছিলেন।

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ঘড়িতে এগাবোটা বাজিয়া গেল। তখন পবেশবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুচরিতাব হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়িবারান্দার ছাদে লইয়া গেলেন। সন্ধ্যাকালের বাষ্প কাটিয়া গিয়া তখন নির্মল অন্ধকারের মধ্যে তাবাতুলি দীপ্তি পাইতেছিল। সুচরিতাকে পাশে লইয়া পরেশ সেই নিস্তব্ধবাজে প্রার্থনা করিলেন—সংসারের সমস্ত অসত্য কাটিয়া পরিপূর্ণ সত্য আমাদের জীবনের মাঝখানে নির্মল মুর্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুন।

৪২

পরদিন প্রাতে হরিমোহিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া পরেশকে প্রণাম করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া সরিয়া গিয়া কহিলেন “করেন কি?”

হরিমোহিনী অশ্রুনেত্র কহিলেন, “আঁপনার ঋণ আমি কোন্সে জন্মে শোধ করতে পারব না। আমার মত এত

দড় নিকুপারের আপনি উপায় করে দিয়েচেন এ আপনি ভিন্ন আর কেউ করতে পারত না। ইচ্ছে করলেও আমার ভাল কেউ করতে পারে না এ আমি দেবেচি—তোমার উপর ভগবানের খুব অনুগ্রহ আছে তাই তুমি আমার মত লোকের উপরেও অনুগ্রহ করতে পেরেচ।”

পরেশ বাবু অত্যন্ত সচ্ছিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, “আমি বিশেষ কিছুই করিনি—এ সমস্ত রাধারাণী—”

হরিমোহিনী বাধা দিয়া কহিলেন “জানি জানি—কিন্তু রাধারাণীই যে তোমার—ও যা করে সে যে তোমারি করা। ওর যখন মা গেল, ওর বাপও রইলনা তখন ভেবেছিলুম মেয়েটা বড় দুর্ভাগিনী—কিন্তু ওর হৃৎকের কপালকে ভগবান যে এমন দয়াকর করে তুলবেন তা কেমন করে জানব বল। দেখ, ঘুরে ফিরে শেষে আজ তোমার দেখা যখন পেরেছি তখন বেশ বুঝতে পেরেছি ভগবান আমাদেরও দয়া করেচেন।”

“মাসী, মা এসেচেন তোমাকে নেবার জন্তে” বলিয়া বিনয় আসিয়া উপস্থিত হইল। স্মৃতিতা উঠিয়া পড়িয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, “কোথায় তিনি?”

বিনয় কহিল “নীচে থাপনার মার কাছে বসে আছেন।”

স্মৃতিতা তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল।

পরেশবাবু হরিমোহিনীকে কহিলেন “আমি আপনার বাড়িতে জিনিষপত্র সমস্ত গুছিয়ে দিয়ে আসিগে।”

পরেশবাবু চলিয়া গেলে বিস্মিত বিনয় কহিল—“মাসি, তোমার বাড়ির কথা ত জানতুম না।”

হরিমোহিনী কহিলেন “আমিও যে জানতুম না বাবা। জানতেন কেবল পরেশবাবু। আমাদের রাধারাণীর বাড়ি।”

বিনয় সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কহিল, “ভেবেছিলুম পৃথিবীতে বিনয় একজন কাবো একটা কোনো কাজে লাগবে। তাও ফসকে গেল। এ পর্যন্ত মায়ের ত কিছুই করতে পারিনি, যা করার সে তিনিই আমার করেন—মাসীরও কিছু করতে পারব না তাঁর কাছ থেকেই আদায় করব। আমার ঐ নেবারই কপাল দেবাব নয়।”

কিছুক্ষণ পরে ললিতা ও স্মৃতিতার সঙ্গে আনন্দময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিমোহিনী অগ্রসর হইয়া গিয়া কহিলেন—“ভগবান যখন দয়া করেন তখন আর

ক্লপণতা করেন না—দ্বিদি, তোমাকেও আজ পেলুম।” বলিয়া হাতে ধরিয়া তাঁহাকে আনিয়া বাছরের পরে বসাইলেন।

হরিমোহিনী কহিলেন, “দ্বিদি তোমার কথা ছাড়া বিনয়ের মুখে আর কোনো কথা নেই।”

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন—“ছেলে বেলা থেকেই ওর ঐরোগ, যে কথা ধরে সে কথা শীঘ্র ছাড়ে না। শীঘ্র মাসির পালাও শুরু হবে।”

বিনয় কহিল—“তা হবে, সে আমি আগে থাকতেই বলে রাখছি। আমার অনেক বয়সের মাসী, নিজে সংগ্রহ করেছি, এতদিন যে বঞ্চিত ছিলুম নানা রকম করে সেটা পুষিয়ে নিতে হবে।”

আনন্দময়ী ললিতার দিকে চাহিয়া সহাস্তে কহিলেন—“আমাদের বিনয় ওর যা অভাব তা সংগ্রহ করতেও জানে আর সংগ্রহ করে প্রাণ মনে তার আদর করতেও জানে। তোমাদের ও যে কি চোখে দেখেচে সে আমিই জানি—যা কখনো ভাবতে পারত না তারই যেন হঠাৎ সাক্ষাৎ পেয়েছে। তোমাদের সঙ্গে ওদের জানাশোনা হওয়াতে আমি যে কত খুসি হয়েছি সে আর কিবলব মা! তোমাদের এই ঘরে যে এমন করে বিনয়ের মন বসেছে তাতে ওর ভারি উপকার হয়েছে।—সে কথা ও খুব বোঝে আর স্বীকার করতেও ছাড়ে না।”

ললিতা একটা কিছু উত্তর করিবার চেষ্টা করিয়াও কথা খুঁজিয়া পাইল না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। স্মৃতিতা ললিতার বিপদ দেখিয়া কহিল—“সকল মানুষের ভিতরকার ভালটি বিনয়বাবু দেখতে পান, এই জন্যই সকল মানুষের ঘেঁটুকু ভাল সেইটুকুই ওর স্নেহে আসে। সে অনেকটা ওঁর গুণ।”

বিনয় কহিল—“মা, তুমি বিনয়কে যতবড় আলোচনার বিষয় বলে ঠিক করে রেখেচ সংসারে তার ততবড় গৌরব নেই। একখাটা তোমাকে বোঝাব মনে করি নিতান্ত অহঙ্কারবশতই পারিনি। কিন্তু আবু চলে না। মা আর নয়, বিনয়ের কথা আজ এই পর্যন্ত।”

এমন সময় সতীশ তাহার অচিরজাত কুকুরশাবকটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া লাক্ষাইতে লাক্ষাইতে আসিয়া উপস্থিত

হইল। হরিমোহিনী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—
“বাবা সতীশ, লক্ষ্মী বাপ আমার ও কুকুরটাকে নিয়ে
যাও বাবা।”

সতীশ কহিল “ও কিছু কববে না মাসী। ও তোমার
ঘরে যাবে না। তুমি একে একটু আদর কর, ও কিছু
বল্বে না।”

হরিমোহিনী সুবিয়া গিয়া কহিলেন, “না, বাবা, না,
ওকে নিয়ে যাও।”

তখন আনন্দময়ী কুকুবল্লভ সতীশকে নিজের কাছে
টানিয়া লইলেন। কুকুবকে কোলের উপর লইয়া সতীশকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি সতীশ, না? আমাদের বিনয়ের
বন্ধু?”

বিনয়ের বন্ধু বলিয়া নিজের পরিচয়কে সতীশ কিছুই
অসঙ্গত মনে করিত না। সুতরাং সে অসঙ্কোচে বলিল—
“হ্যাঁ।” বলিয়া আনন্দময়ীর মুখেব দিকে চাহিয়া বহিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, “আমি যে বিনয়ের মা হই।”

কুকুবশাবক আনন্দময়ীর হাতের বালা চর্কণেব চেষ্টা
করিয়া আত্মবিনোদনে প্রবৃত্ত হইল। সুচরিতা কহিল,
“বন্ধুত্বের মাকে প্রণাম কর।”

সতীশ লজ্জিতভাবে কোনোমতে প্রণামটা সাবিসা
লইল।

এমন সময় বরদাসুন্দরী উপবে আসিয়া হরিমোহিনীর
দিকে দৃকপাতমাত্র না করিয়া আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা
কবিলেন—“আপনি কি আমাদের এখানে কিছু
খাবেন?”

আনন্দময়ী কহিলেন “খাওয়া হৌওয়া নিয়ে আমি কিছু
বাছ বিচার করিনে। কিন্তু আজকের থাক—গোরা ফিরে
আসুক তার পরে খাব।”

আনন্দময়ী গোরা অসাক্ষাতে গোবার অপ্রিয় কোনো
আচরণ করিতে পাবিলেন না।

বরদাসুন্দরী বিনয়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন “এই
যে বিনয় বাবু এখানে; আমি বলি আপনি আসেন নি
বুঝি?”

বিনয় তৎক্ষণাৎ বলিল, “আমি যে এসেছি সে বুঝি
আপনাকে না জানিয়ে যাব ভেবেচেন?”

বরদাসুন্দরী কহিলেন, “কাল ত নিমন্ত্রণের খাওয়া
ফাঁকি দিয়েচেন আজ না হয় বিনা নিমন্ত্রণের খাওয়া
খাবেন।”

বিনয় কহিল—“সেইটেতেই আমার লোভ বেশি।
মাইনেব চেয়ে উপরি পাওনাটান বড়।”

হরিমোহিনী মনে মনে বিস্মিত হইলেন। বিনয়
এবাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে—আনন্দময়ীও বাছ-বিচার
কবেন না। ইহাতে তাঁহার মন প্রসন্ন হইল না।

বরদাসুন্দরী চলিয়া গেলে হরিমোহিনী সসঙ্কোচে
জিজ্ঞাসা করিলেন—“দিদি, তোমার স্বামী কি—”

আনন্দময়ী কহিলেন—“আমাব স্বামী খুব হিন্দু।”

হরিমোহিনী অবাক হইয়া রহিলেন। আনন্দময়ী তাঁহার
মনের ভাব বুঝিতে পাবিয়া কহিলেন—“বোন, যতদিন
সমাজ আমাব সকলেব চেয়ে বড় ছিল ততদিন সমাজকেই
মেনে চলতুম কিন্তু একদিন ভগবান আমাব ঘরে হঠাৎ
এমন করে দেখা দিলেন যে আমাকে আব সমাজ মান্তে
দিলেন না। তিনি নিজে এসে আমাব জাত কেড়ে নিয়েচেন
তখন আমি আর কাকে ভয় করি।”

হরিমোহিনী এ কৈফিয়তের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া
কহিলেন—“তোমাব স্বামী?”

আনন্দময়ী কহিলেন “আমাব স্বামী বাগ করেন।”

হরিমোহিনী। “ছেলেরা?”

আনন্দময়ী। ছেলেবাও খুঁস নয়। কিন্তু তাদের খুঁস
করেই কি বাচব? বোন, আমাব একথা কাউকে বোঝাবার
নয়—যিনি সব জানেন তিনিই বুঝবেন।

বলিয়া আনন্দময়ী হাত জোড় করিয়া প্রণাম
করিলেন।

হরিমোহিনী ভাবিলেন হয় ত কোনো মিশনারির মেয়ে
আসিয়া আনন্দময়ীকে খুঁটানি ভজাইয়া গেছে। তাঁহার
মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা সঙ্কোচ উপস্থিত হইল।

আমেরিকার গ্রামে উন্নতির পরাকাষ্ঠা ।

ভারতবর্ষে জাতীয় শিল্পোন্নতির জন্য বিবট চেষ্টা জাগ্রত হইয়াছে। ভারতের সকল অবস্থার, সম্প্রদায়ের ও প্রদেশের জনসাধারণ পুৰাতন শিল্পের উদ্ধাব ও নূতন কারিগরীর প্রবর্তন করিতে যত্নবান হইয়াছে। এ দেশের লোকের কর্মপ্রবর্তনার ও চিন্তার বিষয় হইয়াছে এই কার্শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। বর্তমান সময়ে বাণিজ্য ও শিল্প প্রচেষ্টা সমগ্র জাতির মনকে এমন ভাবে আধিকার কবিয়াছে যে মানবজীবনের উপযোগী অপব্যবহার বিষয় একেবারে প্রচ্ছন্ন ও বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে।

যখন প্রাচ্যভূমে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য দেশবাসিগণ সম্মিলিত চেষ্টায় প্রতীচ্যের আনন্দে শিল্পসাধনার আয়োজন করে, তখন একবার চিন্তা কবিয়া দেখা উচিত যে প্রতীচ্য দেশের এই রীতি প্রাচ্য দেশে নিরবচ্ছিন্ন স্রবৎপ্রবাহ হইবে কিনা। কল কারখানা দোকান পাটের প্রবর্তনে গ্রামগুলি উপেক্ষিত পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে রেহালাগিত সন্তানগুলিকে সহরের সর্বগ্রাসী কবলে সমর্পণ করিতে থাকে। ইহাতে সমগ্র মানবসমাজ একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া এক এক জন অর্থশালী ব্যক্তির অধীন হইয়া পড়ে। মজুরদের অবস্থা সুখকর হয় না, আনন্দজনক ত নহেই। গ্রামের পারিবারিক বন্ধন শিথিল ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। নিঃসম্পর্ক হাজাব হাজাব নরনারী সঙ্গীর্ণ স্থানের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হয়, সমাজের শাসন হইতে দূরে থাকিয়া তাহাদের নীতি, চরিত্র ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচ্যভূমের ছোট ছোট কারখানার কারিকরগণ স্বীয় পবিবারের পুণ্যছায়ায় থাকিয়া কাজ কবিতো পাবে, আপনাব ঘবকল্লাও দেখিতে পাবে। বড় বড় কারখানার মালিকগণ অর্থসঞ্চয়ের লোভে মজুরদের মজুরী যথাসম্ভব অল্পই দেয়, তাহাতে তাহারা সহরের কদম্ব অংশে থাকিতে বাধ্য হয়। মাতলামি ও আল্পসঙ্গিক পাপ সকল শিল্পোন্নতির সহচর হইয়া উঠে, অবশেষে দারিদ্র্য ও দুর্নীতি সামাজিক সমস্তা হইয়া দাঁড়ায়। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইলেই স্বার্থপরতা আসে।

অল্প অল্প করণের বশবর্তী হইয়া প্রতীচ্যের ব্যবসায় পদ্ধতি প্রাচ্যদেশে আমদানি করিলে এই সমস্ত দোষও অনিবার্য হইয়া উঠিবে।

বাহারা প্রতীচ্য দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের গতি বিচক্ষণতার সহিত পর্যবেক্ষণ কবিয়াছেন তাহারা জানেন যে তৎসম্পর্কায়িত দোষ সমূহ দূরীকরণের জন্যও কি প্রগাঢ় ও প্রবল চেষ্টা আবশ্য হইয়াছে। যুরোপ ও আমেরিকার কেন্দ্রীভূত ধনশালিত্বের বিপক্ষে সামাজিক সাম্যনীতি (Socialism) দণ্ডায়মান হইয়াছে; সহবে বিলাসের বিপক্ষে সর্বল জীবনযাত্রা প্রণালীর পক্ষপাতী দল উদ্ভূত হইয়াছে; সাংসাবিকতার বিপক্ষে আধ্যাত্মিকতা প্রবল হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী যেমন সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রসিদ্ধ, বর্তমান শতাব্দীর টানটা যেন আধ্যাত্মিকতার দিকেই প্রধান হইয়া উঠিতেছে। এখন সমগ্র পৃথিবী যেন নাগব-দোলায় উঠা নামা কবিতোছে। প্রতীচ্য এত দিন সাংসারিকতার কোঁকে মস্ত হইয়া ফিরিতেছিল এখন আধ্যাত্মিকতার আশ্বাদ পাইয়া সেই দিকে ফিরিতেছে; আব প্রাচ্য এত-কাল অধ্যাত্ম চিন্তায় স্তব্ধ হইয়াছিল, এইবার সাংসাবিকতা ও অর্থ সঞ্চয়ের জন্য খেপিয়া উঠিয়াছে। মানুষ যে কখনো সাংসারিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সামঞ্জস্য রাখিয়া যথার্থ সভ্যতা লাভ করিতে পারিবে তাহা ভবিষ্যদ্বাণীরও অজ্ঞেয়।

বাহারা তলাইয়া চিন্তা করেন, তাহারা বুঝিতেছেন যে গ্রাম সকলই সমাজশবীরের হৃদয় এবং বাণিজ্য কেন্দ্র-সকল তাহাব উপশিয়ার প্রান্ত মাত্র। লোহিত শোণিত হৃদয় হইতে বাহির হইয়া ধমনীর সাহায্যে শবীরের বিভিন্ন অংশে নীত হয়। সেই সংক্রমণ শেষে রক্ত দূষিত হইয়া কালো হইয়া যায় এবং সেই কালো রক্ত উপশিরা বাহিয়া হৃদয়ে ফিবিয়া আসে ও পরিষ্কৃত হয় এবং সেই রক্তপ্রবাহ সমগ্র শরীরকে সুস্থ বাখে। তেমনি বলিষ্ঠ কর্মঠ সুস্থ নবনারী কাঁচা বয়সে গ্রাম ছাড়িয়া কলকারখানায় খাটিতে যায়। সহবে জীবন যাপন করিয়া যখন দেহ ধিয়, চিন্তা অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার তখন পুনরায় নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধাবের জন্য গ্রামে ফিরিয়া আসে।

সন্ময়েব লক্ষণ যেরূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাহাতে প্রকাণ্ড কারখানা ভবিষ্যতে খুব অল্পই নির্মিত হইবে।

আজ কাল বড় বড় সহর ভাঙিয়া ছোট ছোট দশ-পনবটা বিভাগ করা হইতেছে এবং এক একটা বিভাগ দশ বিঘ মাইল দূরে দূরে রাখা হইতেছে, আব এই সকল বিভাগ বৈজ্ঞানিক পথে সংযুক্ত করা হইতেছে, সেই পথে আলো, জল, ফুটপাথ, পরিমার্জন, প্রভৃতির ব্যয়স্থা আধুনিক দস্তব মতই থাকিতেছে।

প্রাচীণ ভূখণ্ডে এই রীতিতে সহর সকল গ্রাম্যস্ত্রী ধারণ করিতেছে এবং গ্রাম সকলও সহবে ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। মানুষ মস্ত হইয়া ব্যবসায় কেন্দ্রে ছুটিয়া গিয়া বিশ্ব প্রকৃতির কল্পনা সমস্ত উন্টাপাটা করিয়া দেয়। পল্লী পরমেশ্বরের নিদ্রাণ। সহর মানুষের তৈয়ারি। দশ মাইল কেন্দ্রের মধ্যে লক্ষ লোকের ভিড় জমাইয়া তোলা বস্তুতই দেবনির্মিতব্য ব্যতিক্রম ঘটানো। স্বাস্থ্যতত্ত্ব যত অধিক অনুশীলিত হইতেছে এবং বৈজ্ঞানিক নরনারী সহবে জীবনের অপকরিতা যতই উপলব্ধি করিতেছেন, ততই সকলের মনে সহরগুলিকে পল্লীতে পরিণত কবিবাব আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। যে লোক কিছুদিন আগে চুধকাঁকিট লোহের মত সহরের ভিড়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল সেই এখন সহবে বঃ ধুমধসব তাম্বকাব ও পুতি-গন্ধময় বাতাসকে গ্রাম্যপরিজ্ঞতার লইয়া বাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণেই সহরব মাঝে মাঝে উদ্যান রচিত হইতেছে, ছায়ানীড়ল তরুবাণি বাজপথে সারি দিতেছে।

ঠিক সমান পরিবর্তন পল্লী অঞ্চলেও ঘটতেছে। গ্রাম সকলেও বৈজ্ঞানিক আলোক, টেলিফো, সিমেন্টমার্জা পথ, পাকা রাস্তা, জলের কল, ঢাক্য নর্দমা প্রভৃতি সহবের উন্নতি ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতেছে।

আমেরিকার মার্কিন প্রদেশে পশ্চিম ইলিনয় একটি সমৃদ্ধ প্রদেশ। সেই প্রদেশের ছোট পল্লী কেমব্রিজ, গ্রামের সহরে ভাব পাওয়ার একটি উদাহরণ। ইহা কোনো শিল্পকেন্দ্রও নহে, পুরাতন সহরও নহে। যে স্থানে এই সহর প্রতিষ্ঠিত, ষষ্ঠ বৎসর পূর্বে সেই স্থান জনহীন, বৃক্ষহীন, পথহীন ঘাসের জঙ্গল ছিল। কেমব্রিজ বড় সহর নহে। ১৯০৮ সালে ইহার জনসংখ্যা মাত্র ১৪০০ চৌদ্দশত ছিল। ইহার আয়তন এক বর্গ মাইল মাত্র। কিন্তু কেমব্রিজ

আধুনিক প্রণালীতে অত্যন্ত উন্নত পল্লীগ্রাম; বর্তমান কালের ভাবশ্রোতের একটি চমৎকাব দৃষ্টান্ত।

কেমব্রিজ বৈজ্ঞাত আলোক, টেলিফো ও সিমেন্টমার্জা পথ আছে। সেখানে কলে ষষ্ঠে পরিমাণ পরিষ্কার স্বাস্থ্যজনক জল সরবরাহ করা হয়—এবং এই জলের কল থাকিতে আগুন লাগার ভয় কম হইয়াছে, দমকলে জল উচু বাড়ীর চেয়েও উচুতে ছিটানো যায়। আজকাল গভীর আর্টিসিয়ান (Artesian) কুপ খনন কবিয়া সহরের কলে জল জোগানো হয়। এই সকল কুপ খননের পূর্বে রাস্তাব চৌমাথায় নির্মিত চৌবাচ্চা হইতে জল লওয়া হইত। বৃষ্টির জল সহরের বাড়ীর ছাদ হইতে সংগ্রহ করিয়া এই সব চৌবাচ্চায় জমা করা হইত, এবং ঘরে আগুন লাগিলে সহবের পুরুষগণ, দরকাব হইলে জ্বীলোকেরাও, পম্প দিয়া সেই জল ছিটাইয়া আগুন নিভাইত। এখন দমকলের সাহায্যে বড় বড় আগুনও সহজে নিভানো যায়। কলের জল গভীর আর্টিসিয়ান কুপ হইতে তোলা হয়। ভারতেও এইরূপ কুপের প্রচলন হওয়া উচিত। ডাক্তার জায়গায় যেখানে সাধারণ কুপে জল বারোমাস থাকে না, অথবা যে সকল স্থানে কুপের জল স্বাস্থ্যকর হয় না সেই সকল জায়গায় আর্টিসিয়ান কুপ করাইলে স্বাস্থ্যকর জল বারোমাস পাওয়া বাইতে পারে। ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতির আক্রমণে অকালমৃত্যুর ভয়ও অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে।

কেমব্রিজ সহবে অগ্নিনিরূপক সমিতি (fire brigade), একটি উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানশ্র ও একটি আদালত আছে। এখন সেখানে ষ্টিম রেলপথ আছে। অল্পদিনেই বৈজ্ঞাত ট্রেন নিকটস্থ সহর সকলের সহিত ইহাকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করিয়া দিবে। ডাকঘর হইতে প্রত্যহ চারবার চিঠি বিলি হয় এবং বৎসরে পনব হাজার টাকার ডাক টিকিট বিক্রয় হয়। ডাকের বাস্তব রাখার করস্বরূপ বৎসরে বারো হাজার টাকা আদায় হয়। ডাকঘরে একজন পোষ্টমাষ্টার, একজন সহকারী, একজন কেরানী ও পাঁচজন হরকরা কাজ করে। প্রত্যেক হরকরাকে ২৭ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিতে হয়। তাহার সপ্তাহে একদিন পাড়াগাঁয়ের চায়ফের ডাক বিলি করে, এবং তাহাদের চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসে এবং

টিকিট প্রভৃতি পোষ্টাপিস সংক্রান্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া আসে। চাষার গভর্নমেন্টের এই ব্যবস্থায় বিশেষ উপকৃত ও প্রীত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদিগকে কিছু দিতে হয় না। তাহারা শুধু একটা জলবারক (water poof) শক্ত বাস্তব জোগাড় করিয়া রাখে। তাহাতেই হরকরা চিঠিপত্র দিয়া যায়। এই গ্রামা ধরবাতি চিঠিবিলির ব্যবস্থা করিতে যুক্ত প্রদেশের শাসকসম্প্রদায়কে ১৯০৬ সাল হইতে এযাবৎ ২৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসরে ইহার জন্য সরকারের ১০ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে এবং সে খরচ ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেমব্রিজ ডাকঘরে দুজন ক্রীতদাস আছে।

এই সহরে একটা সাধারণ পাঠাগার আছে তাহার পুস্তক সংখ্যা কয়েক হাজার হইবে। সঙ্গীতসমাজ আছে। দুইটি চিত্রশালা আছে—সেখানে আড়াই আনা পয়সা দিয়া শত শত হস্ত লম্বা চলন্ত ছবি দেখিতে ও একটি সচিত্র গান শুনিতে পাওয়া যায়। কেমব্রিজে একটি নাট্যশালাও আছে—পৃষ্ঠটক নাট্যসম্প্রদায় সপ্তাহে একদিন বা বেশি, সেখানে অভিনয় করে। ইহা ছাড়া সহরের সঙ্গীত সম্প্রদায় সকল মাঝে মাঝে সহরের চারটি গির্জায় একতানবাচ্চ করে। আর একটি গির্জা আছে সেখানে ইংলণ্ডের ধর্মমতানুসারে উপাসনা হয়—কিন্তু সব সময়ে এই গির্জার কাজ হয় না। একটি রমণী শ্রীমতী ইমোজিন এটন একটি বাগ্‌দলের কর্তা। কেমব্রিজে মাদকতার জন্য মণ্ড বিক্রয় নিষিদ্ধ বলিয়া সেখানে মদের দোকান নাই। সেখানে চারটি সরাই, চারটি পানশালা, যেখানে লোকে সোডা, লেমনেড পান করে, কুলপি ববক ও মিঠাই খায়, এবং দুইটি ভোজনাগার আছে। একটা রুটির দোকান, একটা কলে কাপড় ধোলাইয়ের কারখানা, তিনটি নরসুন্দরের দোকান, একটা জুতার দোকান, তিনটা ভূষিমালের আড়ত, তিনটা জামার দোকান, দুইটা দেয়ালে চিত্রকাগজের দোকান, চারিটা কাঁসারির দোকান, দুইটা মাংসের বাজার, তিনটা মুদ্রিখানা, তিনটা ধনাগার বা ব্যাঙ্ক, এবং ছয়জন আইন ব্যবসায়ী সারা বৎসর ধরিয়া খুব জোরে কারবার করে। সহবে সাতজন ডাক্তার আছে—তন্মধ্যে দুইজন নারী ;

দুইজন দস্তচিকিৎসক ; একজন পশুচিকিৎসক। দুজন পুস্তক দরজি ও ছয়জন জীলোকের দরজি পোষাক করিতে ব্যতিব্যস্ত থাকে। একটা দরজির শিক্ষাশালা আছে সেখানে মেয়েদের সেলাই শেখানো হয়। দুজন জলের কল প্রভৃতির নল স্থাপক, তিনজন কামায়, তিনজন বাড়ীর ঠিকাদার, দশজন চিত্রকব এবং ত্রিশজন ছুতার সহরে থাকা সত্ত্বেও লোকে নূতন বাড়ী তৈয়ার করিতে বা পুরাতন বাড়ী মেরামত করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। দুটি ভাড়াটে আস্তাবল ও একটা মোটরগাড়ীর আড্ডা থাকিতে লোকের কাজে গত্যাত বা সন্দের ভ্রমণে খুব সুবিধা আছে। দুটি হাতিয়ারের দোকান চতুঃপার্শ্বের চাষাদের চাষবাসের হাতিয়ার জোগায়। তিনখানি সাপ্তাহিক খবরের কাগজ বাহির হয়, আর তাহাদের ছাপা খানায় খুচরা কাজও হইয়া থাকে। একজন দক্ষ ফটোগ্রাফ ওয়ালার দোকান সহরবাসীদিগের দ্বারা বেশ ভালো রূপেই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়ে নয়নরঞ্জক ফুলের কেয়ারি আছে, এখন একটি সাধারণভোগ্য উদ্ভান রচনার কল্পনা চলিতেছে।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে সব ছবি ছাপা হইল তাহা দেখিলেই কেমব্রিজের মত ক্ষুদ্র আয়তনের ভারতীয় গ্রামের দুরবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে। ভারতের বহু সহর হয় ত বহু প্রাচীন, শত শত বৎসর পূর্বে তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে ; কিন্তু অধিবাসিগণ এমন হীনভাবে থাকে যে তাহাদের নিজেদের বা পারিপার্শ্বিকের উন্নতি করিবার ইচ্ছা বা সাধ্য থাকার লক্ষণ মোটেই প্রকাশ পায় না। যে ভারতীয় গ্রামে চোদ্দশতজন মাত্র অধিবাসী সেখানে থানকয়েক ঘনপুঞ্জীকৃত কুঁড়েঘর ও কাঁচা ইট পাথরের গোটাকত বাড়ী ছাড়া আর কিছু থাকে না। সেখানে থান পাঁচ ছয় ক্ষুদ্র নোংবা, পুবাণো রকমের দোকান একসঙ্গে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যই বিক্রয় করে, রকমারি জিনিষের বিভিন্ন দোকান প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। সহরের মানুষগুণাও কেমন নিজীব রকমের। তাহারা দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি, হুর্জিকের সাক্ষী। তাহাদের পক্ষে জীবনযাত্রা ক্লেশকর, রসমাধুর্যহীন ! তাহারা মেটেদেয়ালের খোঁড়োঘরে বাস করে, একই ঘরে রান্না খাওয়া শোওয়া

বসা প্রভৃতি ঘরকন্নার সব কাজই চলে। সেই ঘরের পাশেই হয়ত গোয়ালঘর, তাহারই পাশে সাবের জন্ত গোবর পচিয়া বিষম দুর্গন্ধ প্রচার করিতেছে। স্ত্রীপুরুষেব পরিচ্ছদ নাই বলিলেও হয়। বাঙালী অপেক্ষা অন্ত দেশীয়া স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ কতকটা ভালো।

ভারতের কৃষকেরা হাজার বৎসর পূর্বে প্রচলিত চাষের পদ্ধতি এখনও অবলম্বন করিয়া আছে। তাহার লাঙল সেই আদিম কালেরই—ধীর মন্থর বলদে টানিয়া যতক্ষণ যতদূর যাহা করিতে পারে। কৃষক জলের জন্ত আকাশের দিকেই তাকাইয়া অপেক্ষা করে, কদাচিত্ কখনো সেচন করিয়া ক্ষেত্রে জল দেয়—কিন্তু সেই সেচন প্রণালীও এই বৈজ্ঞানিক যুগে ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। শিল্প বা কারুকরী কশেও ভারতীয় কারিগরেরা এইরূপ। বাপ পিতামহের অনুসৃত পন্থা তাহারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে চাহে না।

এই পাশ্চাত্য গ্রাম কেমব্রিজে উন্নতির চরম পরিণতির বীজ প্রকটভাবে রহিয়াছে। এই সহরের মধ্যে ও চতুঃপার্শ্বে সর্বত্রই পরিবর্তন চলিতেছে, এবং সেই পরিবর্তন উন্নতির দিকেই। লোকেরা যেন উন্নতি-পাগল। তাহারা পরিশ্রম-লঘুকর ও আরামপ্রদ সর্ববিধ সাধন আপনাদের গৃহস্থালীর মধ্যে চায়—যাহাতে তাহারা উন্নতিশীলতার দাবী করিতে পারে। কেমব্রিজের অধিবাসীর গোশালা বা অশ্বশালা ভারতের অনেক আফিস আদালতের ঘরের চেয়েও ভালো। সেখানকার গোশালা অশ্বশালা বিদ্যুতালোকে উজ্জ্বলিত, এবং সেই দিবালোকসদৃশ আলোক জলিয়া হৃদ্য দোহন সম্পন্ন হয়।

বিদ্যালয় গন্ধিরটি সেখানকার গর্কের সামগ্র্য। একটি জগকালো বাড়ী, ১২৭ ফুট লম্বা, ৭৬ ফুট চোড়া। উঁচু পোতার উপর হুতলা। ইহা ইট প্রস্তরে গ্রথিত, ছাদ ফ্লেটপাথরের, ভিতরটায় ওককাঠের অন্তর দেওয়া। তাপ দিয়া বাড়ীকে গরম করা, হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য-রক্ষার আয়োজন প্রভৃতি হাল নিয়মামুযায়ী সকল ব্যবস্থাই আছে। পোতার নীচে নর্দমার জলে রোগবীজাণুধ্বংস করিবার ব্যবস্থাস্বর, চুল্লীঘর, চারিটা টাটকা তাজা বাতাস ও তাপের ঘর, গৃহস্থালীবিজ্ঞান ও হাতে কাজ শিখানোর

ঘর, দুইট খেলাঘর ও একটা কুস্তির আখড়ার বড় ঘর আছে।

দোতালার ছয়টি পাঠাগার, একটা খাবার ঘর, একটা শিক্ষকদের বিশ্রামকক্ষ, এবং একটা ৭০ ফুট লম্বা ও ১৭ ফুট চোড়া বারান্দা আছে। তেতলায় বিদ্যালয়ের সভা গৃহ, আবৃত্তি গৃহ, পর্যবেক্ষকের কার্যালয়, ভাণ্ডার-প্রভৃতি আছে। সকল ঘরের সঙ্গেই জামা কাপড় রাখা পৃথক কামরা আছে। তা ছাড়া পুস্তকালয় ও বড় বড় বারান্দা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যালয়ের বস্ত্রশালায় আধুনিকতম সকল উপকরণই আছে। বিজ্ঞানের বস্তুভাণ্ডারে পাখীর চমৎকার সংগ্রহ আছে। এগুলি একজন জনহিতৈষী নাগরিকের দান। সব ঘরেই প্রায় বিদ্যুতের আলোক আছে—সর্বত্রই মোট ১৬০টা বৈদ্যুতবাল্ব আছে। সব ঘরেই ঘড়ী আছে। এই সকল ঘড়ী বৈদ্যুতবলে চলে এবং আপনাআপনি বিদ্যালয়ের কার্যের অনুযায়ী সময় নির্দেশ-করিয়া যুগপৎ বাজে।

প্রত্যেক ঘরের পাশেই সেহেতুখানা ও প্রত্যেক তালার পানীয়জলের কল আছে।

সকল জানালাতে খড়্‌খড়ি আছে, তাহা স্প্রিংয়ের সাহায্যে খুটানো যায়। ছাত্রদের ডেস্ক ছাড়া আর সব আসবাবই ওককাঠের। সকল ঘরই ছবিদ্বারা ভূষিত। সকল ঘরেই বই রাখা তাক আছে। ঘর থেকে বাবান্দার ঘাইবার দরজায় কাচের কপাট আছে।

খাবার ঘরও যথোপযুক্তরূপে সজ্জিত এবং তাহাতে একটি অগ্নিকুণ্ড আছে। শিক্ষকদের বিশ্রামাগারে ১৮০ টাকা মূল্যের বেতবোনা আসবাব আছে—সেগুলি শিক্ষকেরা নিজের পরসায় কিনিয়াছেন; এবং ২১০ টাকা দামের কম্বল, পর্দা, প্রায়না, ও প্রসাধন উপাদান কেমব্রিজের সদাশয় বণিকগণ দান করিয়াছেন।

স্কুল ঘরের পশ্চাতে একটা বড় এক জাতীয় তালগাছ বেদীর উপরে আছে, এটি একজন নাগরিকের দান। এই তালগাছটির বেড় ১০ ফুট; ৫ ফুট বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা বিদ্যালয়টিকে দুর্লভ সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে।

১১৭ জন বালক ও ১৩৮ জন বালিকা এখানে বিদ্যার্থী। ১০ জন শিক্ষক লেখাপড়া শেখান, একজন চিত্রাঙ্কন ও

একজন সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে সপ্তাহে একদিন সঙ্গীত ও মাসে একদিন চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইলিনয়তে শিক্ষা সকলেই পাইতে বাধ্য। সেই বাধ্য-করা আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলি পাঠযোগ্য—

প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অধীনস্থ ৭ হইতে ১৬ বৎসরের বালকবালিকাকে শিক্ষা পাইবার জন্য কোনো না কোনো বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বাধ্য, এবং সেই বালকবালিকাবা সমগ্র শিক্ষাকালে (বৎসবে ১১০ দিনের কম নহে) বিদ্যালয়ে যোগদান করিবে।

কিন্তু যে সকল বালকবালিকাদিগকে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী শিক্ষা দেন তাহাদের ও যাহারা ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়সে কোনো দরকারী আইনসম্মত কাজে ব্যাপ্ত থাকিতে বাধ্য হয় তাহাদের প্রতি এই আইন প্রযুক্ত্য নহে।

যাহাবা এই নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহাদের ১৫ হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

এই জরিমানানীতি টাকা সেই বালকের বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হইবে।

বালকের বয়স ভাঁড়াইলে ৯ হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

হুই চাবিঙ্কন কর্তৃচাবী এই সকল নিয়ম স্বাধীন পালিত হইতেছে কি না দেখিবেন। তাহারা স্কুলপালানো ছেলের দরিদ্রা শিক্ষকের জিন্মা করিয়া দিবে।

বিদ্যালয়ের অতি সন্নিকটেই সহরের প্রধান সংবাদপত্র ক্রনিকেলের আপিস। ইহা সাপ্তাহিক এবং ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া চলিতেছে। দুটি ছাপাব কল গ্যাসোলিন এঞ্জিনে চালিত হয়। সেই আপিসে কাটাই কল ও অক্ষরবিজ্ঞানের কাজও চলে। ইহাব স্বত্বাধিকারী একজন আন্সচেষ্টার-কৃত্তী পুরুষ, অথচ তাহার বয়স ত্রিশের কোঠায়। তিনি যে কখন কোনো বিদ্যালয়ে পড়িয়াছেন ইহা তাহার মনে নাই এবং তাহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া সকল জিনিষ উপার্জন করিতে হইয়াছে। তিনি স্বয়ং এই কাগজ সম্পাদন ও পর্য্যবেক্ষণ করেন, কাগজের জন্য বাহার্য্যে বিজ্ঞাপনগুলি কম্পোজ করেন এবং অন্তান্ত

কাজের অক্ষরবিজ্ঞানেরও তত্ত্বাবধান করেন। এই কাগজ ৮ পৃষ্ঠা। ভিত্তবেব চার পৃষ্ঠা এই আপিসে ছাপা হয় না, তাহা ছাপা কিনিয়া লওয়া হয়। একটি খবর-জোগানদার সমিতি খবরের জোগান দেয়। এই সমিতির কার্যালয় সব নগবেই আছে এবং ইহাদের নিকট সাহায্য লইয়া মফস্বল সত্বের বহু কাগজ পরিচালিত হয়। ইহা আমাদের পক্ষে এক অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার।

মার্কিন দেশের যে কাগজের কাটতি যত অধিক তাহাতে বিজ্ঞাপন দিবার খরচও তেমনি বেশি। এইজন্য খবর জোগানদারদের দর খুব বেশি। ইহাতে মফস্বলের কাগজওয়ালাদের খুব সুবিধা। তাহারা সাদা কাগজের দামেই খবর ছাপা কাগজ পায়।

খবর জোগানদারদের বিরাট কাবাব। তাহারা দেশ বিদেশের খবর যোগায়। এসব দেশের সকল খবরই রাষ্ট্র-সম্পর্কীয়, এজন্য বিভিন্ন দলের কাগজের জন্য খবর-জোগানদারেরা বিভিন্ন রকমের কাগজ ছাপে। যে সংবাদ পত্র যে দলের গোড়া তাহার জন্য তাহার মতের অনুকূল সংবাদ পাঠানো হয়। খবর ছাড়া বাজার ও টাকার দর, চাবী, পশুপালক, দর্জি প্রভৃতিরও জ্ঞাতব্য বহু তথ্য তাহারা জোগায়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রমশ প্রকাশ্য বড় গল্প, একটা স্বসম্পূর্ণ ছোট গল্প, কিছু চুটকি রস ও ছেলের জন্য খাঁধাও থাকে। মাঝে মাঝে সচিত্র ভ্রমণকাহিনীও বাহির হয়।

কেমব্রিজের লোকেরা সন্ধ্যা বেলায় আড়াই আনার মেলায় ঘণ্টা খানেক যাপন করে। সচল ছবিগুলি আকর্ষক—তাহাতে এমন কিছু থাকে না যে কাহাবো কচিতে আঘাত লাগে। দৃশ্যগুলি প্রায়ই হাস্যকর। কখনো কখনো করুণ দৃশ্য দারীও দর্শকদের ভাবোদ্বেক করানো হয়। এই সমস্ত ছবি শুধুই আনন্দ নয় অনেক সময় শিক্ষাও দেয়। জুলাই মাসের ৪ঠা মার্কিন দেশ ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়। সেই দিনে এ বৎসব স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধাভিনয় দেখানো হইয়াছিল, চিত্র দর্শনের পর দর্শকেরা দেশপ্রাণতা ও সাম্যভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কেমব্রিজের উন্নতি বিষয়ে অনেক কিছু বলা যাইতে পারে, তবে বাক্য অপেক্ষা এই প্রবন্ধ সংলগ্ন চিত্রাবল

অধিক ব্যস্ত করিতে পারিবে। এই প্রবন্ধের লেখক যে বাড়ীতে তিন সপ্তাহ ধরিয়া আছেন তাহার একটা বর্ণনা দিলে ভাড়াটে বাড়ীরও একটা ধারণা হইবে। ইহা ইটের পোতাৰ উপর কাঠের ছতলা বাড়ী, বৈঠকখানার দেয়াল বড় বড় চিত্রভূষিত; তাহাব করেকখানি গৃহকর্ত্রীব স্বহস্ত অঙ্কিত। এক কোণে স্তম্ভর পিয়ানো। মেঝে শক্ত কাঠের, খুব পালিশ করা, কিয়দংশ সূদৃশ্য গালচেতে ঢাকা। অপর কোণে রমণীর লিখিবাব ডেস্ক। কতকগুলি দোলনা চেয়ার ও কেদারা ঘবখানিকে আরামের মূর্তি দান করিয়াছে। বৈঠকখানার পাশে বসিবাব ঘর। একখানি গদিআটা কোচ, ছএক খানি আরাম কেদারা, ওক কাঠের টেবিল, বই ও সাময়িক পত্র ভরা তাক ও আলমারি ঘরটিকে আরাম ও সুখকর করিয়াছে। মেঝেটি গালিচায় ঢাকা, বসিবাব ঘর হইতে খাবাব ঘব, রান্নাঘর ও বজকা-পারে যাওয়া যায়। রান্নাঘরে গ্যাসজ্বালা উনন আছে। তিন প্রকার জিনিষ একসঙ্গে রান্না করা যায়। কুটি, পিটে প্রভৃতি সৈকিবার জন্ত তুন্দুরও আছে। উননের কাছেই একটা সিন্দুক আছে, তাহাতে তরি তবকারি, মসলা পাতি, কাঁটা চামচে ছুরি প্রভৃতির নানা খোপ আছে। সেই সিন্দুকের হড়পি টানা দেয়াল আছে, তাহাতে ময়দা ঠাসা, প্রভৃতি কাজ হয়। এই এক সিন্দুকে রন্ধনের সকল উপকরণই থাকে, রাঁধুনিকে এঘর সেঘর ছুটাছুটি করিতে হয় না।

রন্ধকাগারে একটা কাপড় ধোয়া কল আছে, তাহা জলের তোড়ে চলে। এই কলের সঙ্গে একটা কাপড় নিংড়োবার কল আছে, তাহাতে পাতলা মোটা সকল কাপড়ই বেশ নিংড়ানো হয়। এই সব কল হাত দিয়াও চালানো যায়। সেই ঘরেই-ধোবার গামলা, নীলের গামলা আছে। তাহাতে এক নল দিয়া জল আনা যায় ও আর এক নল দিয়া তাহা হইতে জল বাহির করিয়া দেওয়া যায়। জলবহন প্রভৃতির হাঙ্গাম নাই। এই সব কলে কাপড় কাচা এত সহজ যে সহবের সকল পরিবারই প্রায় আপ-নারাই কাপড় ধুইয়া লয়। এই ঘরে ইজির টেবিল থাকে। এক ঘরেই সকল আরোজন সম্পূর্ণ থাকতে কাহারো কাজ করিতে ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইতে হয় না। খোপাঘুবের তাকটি সর্বাপেক্ষা ভালো। তাহাতে কাপড়ের দাগ উঠাইবার

মসলা থাকে। পটাশ, লবণ ও তরল এমোনিয়া দিয়া একরূপ দাগ উঠাইবার মসলা তৈয়ারি হয়। এক বোতল এমোনিয়া সামান্য কাপড়ের দাগ উঠাইবার জন্য থাকে। পণ্ডর পিত্ত দিয়া রঙিন কাপড়ের রং বাঁচানো হয়। কাপড়ের মহিবা বা চিতি উঠাইবার জন্য চুণের ক্লোবাইড ব্যবহৃত হয়, ফল বা চা প্রভৃতির দাগ অক্সালিক এসিড দিয়া তোলা হয়, নেবুর ছুন লোহার দাগ দূর করে।

শয়ন কক্ষ, সেহেতখানা, সেলাই ঘর দ্বিতলে। প্রত্যেক শয়নকক্ষে হাত ধুইবার গামলা ও জলের ব্যবস্থা আছে। খাট সব লোহার—তাহাতে স্প্রিং ও পালকের গদি আছে। স্নানাগারে গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল আছে। জলের পাইপের নীচে গ্যাস জ্বালিয়া যে কোনো সময়ে তৎক্ষণাৎ গরম জলে স্নান হইতে পারে।

সেলাইকল পায়ে বা বিদ্যুতে চলে। সে ঘরে একটা বড় টেবিলও আছে—তাহাব উপর পোষাকের কাট ছাঁট করা হয়।

সস্ত নিহাল সিংহ।

[এই প্রবন্ধের লেখক একজন আমেরিকাপ্রবাসী পঞ্জাবী। মূল প্রবন্ধ ইংরাজীতে লিখিত। আমরা তাহাব অনুবাদ করিয়া দিলাম। আমাদের দেশেও জমী, জল ও বাতাস আছে। ভগবান আমাদিগকেও সকল শক্তি দিয়া মামুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন। অথচ আমাদের এত দুর্দশা কেন, তাহা পাঠক পাঠিকাপণ গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।]

ফল রক্ষণ ।

পৃথিবীর নানা দেশে যত প্রকারের ফল জন্মে, অমুসজ্জন করিলে বোধ হয় এক ভারতবর্ষেই প্রায় তার সকল প্রকারের নমুনা পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া নামক প্রদেশও ফলের জন্ত বিখ্যাত হইয়াছে। এদেশবাসীরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক ফলেরই নানা রকম শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া উৎপাদন করাইতেছে। কিন্তু অগতের মধ্যে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া সমস্ত সভ্য জাতির নিকট পরিচিত সেই 'আম' এখানে এখনও জন্মাইতে পারিতেছে না। অনেক চেষ্টা হইতেছে সত্য, কিন্তু এখনও জল বায়ুকে আমের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই। ইহার কৃষি সম্বন্ধে দিন দিন যেক্রম উন্নতি করিতেছে

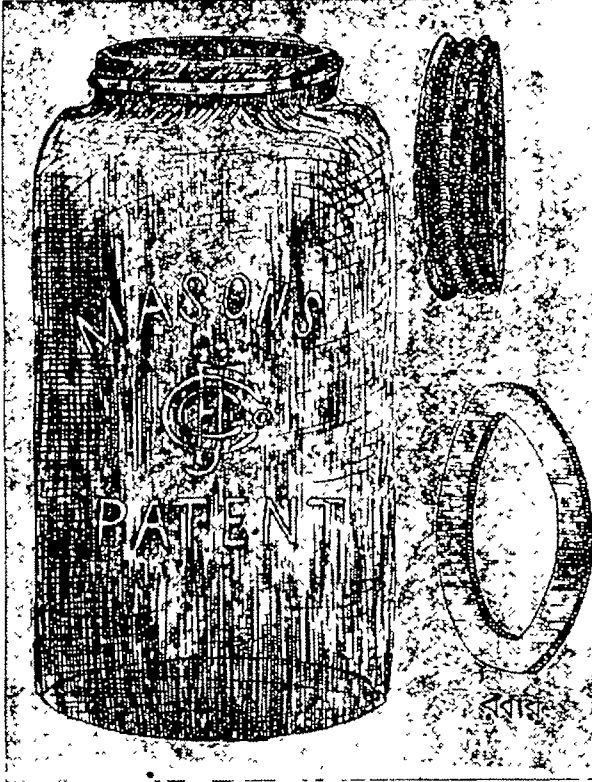
কে জানে যে আর দশ বৎসর পরে আমও এখানে জন্মাইতে পারিবে না ! এদেশের যাহারা আম দেখিয়াছে তাহাদের ত কথাই নাই ; যাহারা দেখে নাই—শতকরা নিরানব্বই জনই না দেখার দলে—তাহারাও আমার শুণে—অনেকেই শুনিয়া—এত মুগ্ধ যে আমার কথা যখনই তাহাদের সঙ্গে হইয়াছে তখনই লক্ষ্য করিয়াছি যে যদি এখানে আম দেখাইবার একটি প্রদর্শনী খোলা হয় তবে অনেকেই এক ডলাব (৩ টাকা) দিয়া টিকিট কিনিয়া যাইতে রাজী আছে । যে ফলের উপর ইহাদের এত আগ্রহ তাহা যে ইহারা না জন্মাইয়া ছাড়িবে তাহা মনে হয় না ।

আম বলিতে গেলে ভারতেরই একমাত্র একচেটিয়া সম্পত্তি, যদিও অস্ফাট কোন কোন স্থানে জন্মে বটে কিন্তু তাহা অতি অল্প পরিমাণে এবং শুণে ভাবতীয় আমার তুলনায় অত্যন্ত নিকৃষ্ট । আমাদের দেশ হইতে যদি আম কোন রূপে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠান যায় তবে যে প্রচুর লাভবান হওয়া যায় তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই । একথা নিশ্চয় যে আমকে স্বাভাবিক অবস্থায় কখনও ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠান সহজ নয়, অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া যদিও কোন রূপে পাঠান যাইতে পারে বটে কিন্তু ব্যবসার পক্ষে সে কথা উত্থাপন করাই বিড়ম্বনা মাত্র । একমাত্র এবং উৎকৃষ্টতম উপায় এই যে আমকে টিনে ভরিয়া প্রিজার্ভ অর্থাৎ রক্ষা করিয়া পাঠান যাইতে পারে এবং তাহাতে ব্যয়ও কম এবং প্রচুর লাভবান হওয়া যায় । আমাদের দেশের লোক প্রিজার্ভ অর্থাৎ রক্ষিত ফলের ধার ধারে না বটে—অবশ্যই যদি কার্তিক অগ্রহারণ মাসে টাটকা আমের মত স্বাদগন্ধযুক্ত আম পায় তবে ধার ধারে কিনা দেখা যায়—কিন্তু এদেশের লোকের যেন টাটকা ছেড়ে প্রিজার্ভ ফলের দিকেই বেশী ঝোঁক । চল্লিশ বৎসর পূর্বে এখানে একটিও ক্যানারী অর্থাৎ ফল রক্ষার কারখানা (cannary) ছিলনা বলিলেই চলে কিন্তু আজ শুধু এই ইউনাইটেড ষ্টেটের মধ্যেই বিশ হাজার নানা প্রকারের ক্যানারী আছে এবং চল্লিশ লক্ষের উপর লোক এই সব ক্যানারীতে কাজ করিয়া নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করিতেছে । ফলের ক্যানারীতে ইহারা কর্ম-চাৰীদিগকে প্রত্যহ গড়ে দুই ডলার অর্থাৎ ৬ টাকা

করিয়া বেতন দিয়াও ইহারা গড়ে শতকরা আশি টাকা লাভ করিতেছে । আর আমাদের দেশে দৈনিক মজুরী ১০/০ আনা হইতে ৮০ আনাই যথেষ্ট । আর ক্যানারী যদি ফলের বাগানের নিকট খোলা যায়—যেমন মুবসিদাবাদ, পূর্ণিয়া, মালদহ ইত্যাদি স্থানে—তবে ফলের মূল্যও খুব সম্ভা হইবে । আমি যে ক্যানারীতে কাজ করিতাম (এখানে ফলের ক্যানারী ছয়-মাস খোলা থাকে । অল্প ছয় মাস এখানে বিশেষ কোন ফল জন্মে না । তাই ও ছয় মাস ইহারা ক্যানিংএব কাজ বন্ধ রাখে এবং ফলের টিন ইত্যাদি নানা স্থানে পাঠাইতে বাস্তব থাকে ।), তাহার সুপারিন্টেন্ডেন্টের সহিত আম সম্বন্ধে আমার প্রায়ই কথা হইত । একদিন তিনি বলিলেন যে “আমি আশ্চর্য হইতেছি যে তোমাদের দেশে যখন এত আম জন্মে এবং মজুর এত সম্ভা তখন এতদিন তোমরা কেন আম প্রিজার্ভ করিবার ক্যানারী খোল নাই ! আমার ত মনে হয় যে আজ ভাবতবর্ষে গিয়া যদি শুধু আম প্রিজার্ভ করিবার জন্তই অন্যান্য দুই শত ক্যানারীও খোল তবে ইউরোপ ত দুবেব কথা এক আমেরিকার বাজারেই যোগান দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবে না, এদেশে আমার এত কাটতি হইবে । অবশ্যই যদি আমাদের দেশে আম জন্মিত তবে তোমরা আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতে কিনা সন্দেহ । কেন না আমেরিকায় কোন জিনিষ পাঠাইতে হইলেই তোমাদিগকে ডিউটি (মাণ্ডল) দিতে হইবে । আমাদের সে ব্যয় নাই । তা যখন নয়, আম যখন ভারতবর্ষ ছাড়া ক্যান করিবার মত প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীর অন্ত কোথাও জন্মেনা, তখন তোমাদের আর প্রতিযোগী কে হইবে ? ও ব্যবসায় তোমাদেরই একচেটিয়া, ইহাতে যে তোমরা প্রচুর লাভ কবিত্তে পারিবে তাহাতে একটুকুও সন্দেহ করিবার কিছু নাই ।”

ক্যানিংএর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী গভর্নমেন্ট এই মধ্যে ১২০০০ হাজার ক্রান্ত পুঙ্কার ঘোষণা করেন যে, ‘যে নৌ-সৈন্যদের (marines) খাদ্য প্রিজার্ভ (Preserve) অর্থাৎ রক্ষা করিবার উৎকৃষ্ট উপায় বাহির কবিত্তে পারিবে তাহাকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে ।’ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এপার্ট



গলায় রবার দেওয়া ফল রক্ষার বোতল ।

(Appert) নামক একব্যক্তি (চাটনিওয়াল) প্রথম উপায় আবিষ্কার করে। সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে ‘জগতে যত জিনিষ পচিয়া নষ্ট হয় তাহার একমাত্র কারণ এই যে জিনিষের মধ্যে ফার্মেন্ট (Ferment) নামক এক প্রকার ক্ষুদ্রতম কীটগু, যাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না—প্রবেশ করিয়া জিনিষকে পচাইয়া ফেলে; যদি কোন উপায়ে উক্ত কীটগুদিগকে উত্তাপ দিয়া বিনষ্ট করতঃ জিনিষগুলিকে বায়ুশূন্য স্থানে রাখা যায় তবে আর জিনিষ পচিয়া নষ্ট হইতে পারে না।’ সে তাহার এই নির্দ্ধারণ কার্য্যতঃ প্রমাণ কবাইয়া দেখাইয়া ফরাসী গভর্ণমেন্ট হইতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে উক্ত পুরস্কার পায়, এবং উক্ত সালেই ফরাসী গভর্ণমেন্টের সাহায্যে ও অল্পমোদনে এক পুস্তক প্রকাশ করে। আজকাল ক্যানিংএর প্রশালী এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে এই পুস্তক আজকাল আর ইতিহাসের সাক্ষ্য দেওয়া ভিন্ন অল্প কোন বিশেষ কাজে

আসে না। এপার্ট (Appert) কাচের বোতলে ভরিয়া প্রিজার্ভ করা ই একমাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করে কিন্তু ঐ সালেই (১৮১০ খৃষ্টাব্দে) ইংলণ্ডে পিটার ডুরান্ট (Peter Durant) নামক অল্প এক ব্যক্তি প্রোচলিন্ এবং টিনের ডিবায়ে ভরিয়া প্রিজার্ভিংএব আবিষ্কার করে। তাহাতে ব্যবসায়ের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে টমাস কেনসেট (Thomas Kensett) নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ড হইতে উক্ত প্রিজার্ভিং কার্য্য শিক্ষা করিয়া নিউইয়র্কে বাস করিবার জন্ত চলিয়া আসে এবং নিউইয়র্কেই উক্ত ব্যবসায় নিবু নিবু ভাবে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চালায়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্যানিং ব্যবসায়ের ক্রমে বিস্তৃতি ঘটে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেবল মাছ মাংসই ক্যান করা হইত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম কল ও শাক্ সর্ব্বজী তরকারী (Vegetable) ক্যান কবা আবিস্কৃত হয়। আজ ক্যানিং ব্যবসায় আমেরিকার মধ্যে এক প্রধানতম ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ ‘সুধু ইউনাইটেড ষ্টেটের মধ্যেই নানা প্রকারের ২০০০০ বিশ হাজার ক্যানারী এবং চল্লিশ লক্ষ লোক

সুধু ক্যানারীতে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

ক্যানিংএর মূলতত্ত্ব (Principle)

‘জগতে যত জিনিষই দেখা যায় পচিয়া নষ্ট হয় তাহার একমাত্র কারণ যে তাহাতে ফার্মেন্ট (Ferment) নামক এক প্রকার কীটগু, যাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না, প্রবেশ করিয়া উক্ত জিনিষকে পচাইয়া ফেলে। যদি কোন প্রকারে উত্তাপ দিয়া উক্ত কীটগু-গুলিকে বিনষ্ট করতঃ জিনিষগুলিকে কোন বায়ুশূন্যস্থানে রাখা যায় তবে তাহা আর পচিয়া নষ্ট হইতে পারেনা।’ ছদ্ম, মাছ, মাংস, ফল তরকারি (vegetable) ইত্যাদি সমস্ত ক্যানিংএর মূলতত্ত্বই এই।

টিনের ডিবায়ে বা কাচের বোতলে ভরিয়া

ফল রক্ষণ (Fruit Canning)

ফল প্রিজার্ভিং বা ফল রক্ষণ প্রধানতঃ তিন প্রকারে করা হয়। ১। ফলকে শুষ্ক করিয়া (Drying) ২। ফলকে

বোতল বা টিনে ভরিয়া (Canning)। ৩। জ্যাম ও জেলী (Jam and Jelly) আকারে বোতলে বা টিনে ভরিয়া। আমার এ প্রবন্ধে আমি শুধু ক্যানিংএর (ফলকে বোতলে বা টিনে ভরিয়া প্রিজার্ভিংএর) আলোচনা করিব। আশা আছে আমার পরবর্তী প্রবন্ধে যথাক্রমে শুষ্ক করিয়া ফল বক্ষণ (Drying) এবং জ্যাম জেলী প্রস্তুত প্রণালীর আলোচনা করিব। অন্ত দুই প্রণালী হইতে ক্যানিংএর বিশেষত্ব এই যে ইহাতে বহুকাল পরেও ফলের স্বাদ, গন্ধ, রং এবং আকৃতি (taste, flavor, color, and shape) প্রায় টাটকা ফলের মতই থাকে। যে সমস্ত ফল সিদ্ধ করিলে তাহার স্বাদ, গন্ধ বা রংএর বিশেষ পরিবর্তন হয় না কেবল সেই সমস্ত ফলই ক্যানিংএর উপযোগী। অবশ্যই অতিরিক্ত সিদ্ধ করিলে সমস্ত ফলেরই স্বাদ গন্ধ, ও রং আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, তজ্জন্তই যাহাতে অতিবিক্ত সিদ্ধ না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

যাহারা ব্যবসার জন্ত ফল প্রিজার্ভ করিতে চান তাহাদের পক্ষে টিনের ডিবাই উপযোগী। কেননা বোতলের দাম বেশি এবং তাহা নানাস্থানে পাঠাইতে অনেক ভ্রমিয়া বাইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাহা ঘরে শুধু নিজেদের জন্ত ফল প্রিজার্ভ করিতে চান তাহাদের পক্ষে বোতলই সুবিধা কেননা বাড়ীতে টিনের মুখে ঝালা দেওয়া ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত অসুবিধা জনক। বোতলের দাম বেশি বটে কিন্তু একবারে ২০২৫ টা বোতল কিনিয়া রাখিলে প্রতি বৎসরই রবার বদলাইয়া তাহাতেই ফল প্রিজার্ভ করা যায়। অবশ্যই যাহাতে বোতল না ভাঙ্গে তজ্জন্ত সতর্ক হইতে হইবে।

টিনের ডিবায় ভরিয়া ব্যবসার জন্ত ফল রক্ষণ (Canning)

প্রথমত ফলের খোসা ছাড়াইতে হইবে। পবে তাহাকে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে বেশ করিয়া ধুইতে হইবে। ফল যদি বড় হয় তবে তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত কবাই সুবিধা এবং ভিতরস্থ আঠি (Pit) ফেলে দিলেই ভাল হয়। কেননা সিদ্ধ করিলে আঠি হইতে কোন তিক্ত রস বাহির হইয়া ফলের স্বাদ নষ্ট করিয়া দিতে পারে। আমার যতদূর মনে হয় দেশে থাকিতে যখন আম সিদ্ধ খেয়েছি তখন যেন

আঠির নিকটের অংশটা কিছু তিক্তই মনে হইত। অবশ্য আমার তাহা ভাল করিয়া মনে হইতেছেন। যাহা হউক তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই চলিবে। সাধারণ কথায়, আঠিটা ফেলে দিলেই ভাল হয়, বিশেষতঃ অত বড় ফল টিনে ভরাও অসুবিধা। পরে তাহাকে কাঁচা, পাকা ইত্যাদি টিনের ডিবার ভিতর ভরিতে হইবে এবং তাহাতে চিনির সিরাস (Syrup) প্রায় টিনের মুখ পর্যন্ত ভরিয়া ভরিতে হইবে। চিনির সিবাব (Syrupএর) পরিবর্তে যদি শুধু জলও ভরা যায় তাহাতে ফল প্রিজার্ভ করার কোন হানি করিবে না কিন্তু তাহাতে ফলের স্বাদ ভাল হইবে না। তাই চিনির সিরাস ব্যবহার করা হয়। কতটা জলের সহিত কত পরিমাণ চিনি দিয়া সিরাস (Syrup) প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা নিজ নিজ স্বাদের উপর নির্ভর করে। যাহাতে ফলের স্বাদ ভাল হয় সেই পরিমাণ চিনি দেওয়াই উচিত। অতিরিক্ত চিনি দিলে অতিরিক্ত মিষ্ট হইয়া ফলের স্বাভাবিক স্বাদকে নষ্ট করিবে। দুই তিনবার পরীক্ষা করিয়া চিনির পরিমাণ ঠিক করিয়া লইলেই হইবে। পূর্বে বলিয়াছি চিনির সিরাস (Syrup) ফল রক্ষণের কিছুই সহায়তা বা ন করেনা, শুধু স্বাদের জন্ত উহা দিতে হয়। এ পর্যন্ত টিনের মুখ খোলাই আছে। ফল ভরা ও চিনির সিরাস দেওয়া হইয়া গেলে পব টিনের মুখে একটি ঢাকনি দিয়া তাহাকে ঝালা দিয়া বদ্ধ করিতে হইবে। উক্ত ঢাকনির মধ্য স্থানে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র—যেমন একটি মোটা সূচি প্রবেশ করিতে পারে, এই পরিমাণ রাখিতে হইবে। পরে টিনগুলিকে ফুটন্ত জলের ট্যাঙ্কে উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র উপরের দিকে রাখিয়া ডুবাইতে হইবে। টিনের উপরস্থ ছিদ্র অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিধায় বাহিরের জল ভিতরে বা ভিতরের সিরাস বাহিরে আসিতে পারিবেনা। একপ ভাবে ৪৫ মিনিট কি বড় টিন হইলে ৭৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখিলেই টিনের ভিতরস্থ বায়ু উত্তাপ পাইয়া উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। পরে টিন গুলিকে ফুটন্ত জল হইতে উঠাইয়া তখন তখনই ঝালা দিয়া উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র বদ্ধ করিতে হইবে। সাধারণ লোক মনে করিতে পারেন যে যখন ফুটন্ত জল হইতে টিন গুলিকে উঠান হইবে তখনই ত ঐ ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বায়ু পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিতে



সিদ্ধ করিবাব আগে বোতলে ফল রাখা।

পারিবে! কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন যে টিনগুলি তখনও অত্যন্ত গরম থাকিবে এবং টিনের মধ্যস্থ শূন্য স্থান সমস্তই জলীয় বাষ্পে (vapor) পূর্ণ থাকিবে। তাই বায়ু আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অবশ্য যদি টিন গরম থাকিতে থাকিতেই উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করা না হয় তবেই বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিবেই। তজ্জন্তই যাহাতে টিন গরম থাকিতে থাকিতে উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করা হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করা হইয়া গেলে পর পুনরায় টিনগুলিকে ফুটন্ত জলের ট্যাঙ্কে ডুবাইয়া ভিতরস্থ ফলকে সিদ্ধ করিতে হইবে। এই যে পুনরায় ফুটন্ত জলের ট্যাঙ্কে ডুবান ইহা কেবল ফলের সঙ্গে যে কীটাণু, যাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, সেগুলিকে মারিয়া ফেলিবার জন্ত। কত উত্তাপে (Temperature) কত সময় সিদ্ধ করিলে ফলের কীটাণু মারা যায় তাহাই

সমস্যা। কেন না এক এক প্রকার ফলে এক এক প্রকার কীটাণু, সে সমস্তই ব্যাক্টেরিওলজীব (Bacteriology) কথা, সে সমস্ত আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে মোটের উপর এই বলা যায় যে ২৫ হইতে ৩০ মিনিট সময় ফুটন্ত জলের (100° ডিগ্রী (100°C)) উত্তাপে ফল সিদ্ধ করিলে প্রায় সমস্ত ফলেরই কীটাণু মারা যায়। এই সিদ্ধ করা অনেকটা আবাব ফলের অবস্থার উপর নির্ভর কবে, যেমন কাঁচা ফল পাকা ফল অপেক্ষা বেশি সময় এবং অতি পাকা ফল আরও কম সময় সিদ্ধ করিতে হয় নতুবা ফলের আকৃতি, রং, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, ফলকে যে শ্রেণীবিভাগ করিয়া টিনে ভরিতে হয় তাহার প্রধান কারণই এই যে এক এক রকম ফলের এক এক রকম সময়ের দরকার হইবে। কাঁচা পাকা ফল যদি একত্র এক টিনের ভিতর ভরা যায়

তবে কাঁচাটা দম্বর মত সিদ্ধ হইতে হইতে পাকাটা হয় ত একেবারে গলিয়াই যাইবে। তাই ফলের শ্রেণীবিভাগের বিশেষ দরকার। ফুটন্ত জলে ২৫ হইতে ৩০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া যদি দেখা যায় যে ফলের আকৃতি, রং, স্বাদ ও গন্ধের পরিবর্তন ঘটয়াছে তবে ইহা অপেক্ষা কম সময় সিদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি দেখা যায় যে ২৫ কি ৩০ মিনিট উত্তাপে ফলের রং, আকার স্বাদ গন্ধের কোন পরিবর্তন হয় নাই, বরং পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে (অনেক ফল সিদ্ধ করিলে তাহার স্বাদ গন্ধ ও রং ভাল হয়) তবে না হয় উহা অপেক্ষা আবণ্ড বেশি সময় সিদ্ধ করা যায়। এ সমস্তই পৰীক্ষার উপর নির্ভর করে। এদেশে যদি আম জন্মিত তবে না হয় পৰীক্ষা করিয়া আমিই সময় বলিয়া দিতে পারিতাম যে ‘আম কতক্ষণ কত উত্তাপে সিদ্ধ করিতে হইবে’। কিন্তু এদেশে তাহার আব আশা নাই, তাই আমাদের দেশস্থ যদি কেহ পরীক্ষা করিয়া

দেখেন তবেই বুঝিতে পারিবেন। এখানে পীচ নামক ফল সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৩০ মিনিট সিদ্ধ করা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি এই সময়ের পরিমাণ অনেকটা ফলের অবস্থাব উপর নির্ভর করে; যেমন কাঁচা ফলের একটু বেশী সময়ের দরকার, অতি পাকা হইলে আরও কম সময়ের দরকার। কাঁচাখানার লোকেরা ব্যবসার জন্য ফল প্রিজার্ভ করে তাই ইহাদিগকে সব রকমই করিতে হয় অবশ্যই বিক্রীর সময় ইহারা ভিন্ন ভিন্ন রকমের ফল ভিন্ন ভিন্ন দরে বিক্রয় করে। তাই ক্রেতাকে, ভিতরের ফল না দেখিতে পাইলেও, ঠিকিতে হয় না। এইরূপ ফুটন্ত জলে নির্দিষ্ট সময় সিদ্ধ করা হইয়া গেলে পর ফলের টিনগুলি ফুটন্ত জলের ট্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়াই তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা জলের ট্যাঙ্কে ডুবাইতে হইবে, কেন না টিনগুলিকে তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা করিয়া না ফেলিলে উত্তাপে যে সিদ্ধ কার্য টিনের ভিতরে চলিতেছে তাহা অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলিবে এবং অতিবিক্ত সিদ্ধ হইয়া ফলের স্বাদ গন্ধ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এরূপ ভাবে ৫৭ মিনিট ঠাণ্ডা জলের ট্যাঙ্কে টিনগুলি ডুবাইয়া রাখিলেই তাহা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। পরে উহাদিগকে ট্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া, যে দিকের মুখ ঝালা, দিয়া লাগান হইয়াছে সেই দিকটা নীচে দিয়া দাঁড় করাইয়া সাজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে যখন টিনের গায়ে লেবেল লাগান হইবে তখন বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দেখিতে হইবে যে কোন স্থান দিয়া ভিতরস্থ সিরি (Syrup) এক আঁচুও চুয়াইয়া পড়িয়াছে কিনা। যে টিনে একটু সন্দেহ হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা পুনরায় প্রিজার্ভ করিবার জন্য পৃথক করিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত বাতিল টিনগুলির মুখ কাটিয়া ফলগুলি বাহির করতঃ পুনরায় পূর্বোক্ত নিয়মে প্রিজার্ভ করিতে হইবে, এ সমস্ত টিনের ফলের অতিরিক্ত সিদ্ধ না হইয়া আর উপায় নাই। ঐ সমস্ত ফল পাই (Pie) নামক পিষ্টকের জন্য ব্যবহৃত হয়। লেবেল লাগান হইয়া গেলে পর উহাদিগকে কাঠের বাক্সে—প্রতি বাক্সে দুই ডজন অর্থাৎ ২৪টা করিয়া ভরিয়া নানা স্থানে চালান দিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

নিম্নলিখিতরূপে ক্যানারীর কার্যকে সংক্ষেপে ভাগ করা যাইতে পারে।

- ১। ফলের খোসা ছাড়ান ও আঁচি কেদান (Peeling)
- ২। শ্রেণী বিভাগ করা (Sorting)
- ৩। টিনের ভিতর ভরা (Canning or filling)
- ৪। সিরি দেওয়া (Syruping)
- ৬। ঢাকনি লাগান (Capping)
- ৫। বাতাস বাহির করিবার জন্য ফুটন্ত জলের ট্যাঙ্কে ডুবান (Airtighting)



ফল রক্ষার “লাইটনিং” বোতল। ১নং।

- ৭। ক্ষুদ্র ছিদ্র বন্ধ করা (Soldering)
 - ৮। সিদ্ধ করা (Cooking)
 - ৯। ঠাণ্ডা জলের ট্যাঙ্কে ডুবান (Cooling)
 - ১০। ঝালা-দেওয়া মুখ নীচের দিকে দিবে দাঁড় করাইয়া রাখা।
 - ১১। লেবেল লাগান। (Labeling)
 - ১২। কাঠের বাক্সে বন্ধ করা। (Casing)
- আমাদের দেশে যাহারা ক্যানারী খুলিতে চান তাঁহাদের ক্যানারীর সঙ্গে একটি টিনের ডিবা প্রস্তুত করিবার

কারখানা (Can factory) ও খোলা দরকার, কেন না আমাদের দেশে টিনের ডিবা বাঁজাবে বেশী কিনিতে পাওয়া যায় না। যাহা যায় তাহারও অভ্যস্ত দাম বেশি। তাই ক্যানারীর সঙ্গে সঙ্গে একটি টিনের ডিবা প্রস্তুত করিবার কারখানার নেহাৎ দরকার। আমি পরবর্তী প্রবন্ধে টিনের ডিবা প্রস্তুত করিবার কারখানা ও ক্যানারীর ৩৪ রকমের (বড়, ছোট, মাঝারি) ৩৪টি মোটামোটি এস্টিমেট (Estimate) বা আনুমানিক ব্যয়ের ফর্দ পাঠাইব।

ক্যানিংএর উপযোগী ফল।

অতি কাঁচা, অতি পাকা, দাগিলাগা, কি পচা ফল ক্যানিংএর সম্পূর্ণ অসুপযোগী। টিন বা বোতলের মধ্যে এমন কোন গুণ্ড গুণ নাই যাহা মন্দ জিনিষকে ভাল করিতে পারে। ভাল জিনিষকে ভাল রাখাই ক্যানিংএর কাজ। ফলে যখন রং ধরিয়াছে এমন অবস্থায় গাছ হইতে পাড়িয়া টাটকা টাটকা সেই দিনই ক্যান (Can) করা দরকার। ব্যবসার পক্ষে অনেক সময় ওরূপ হইয়া উঠে না সত্য কিন্তু যাহাতে সেরূপ রন্ধোবস্ত করা যায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। মাঝে যে আমেরিকায় এ ব্যবসায় কিছু মন্দা ধরিয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ যে তখন লোকে যা তা ফল যাহা পাইত তাহাই ক্যান (Can) করিত। কিন্তু আজকাল ইহারা সে বিষয়ে খুব সতর্ক। যাহারা বাড়ীতে নিজেদের স্বস্ত ফল প্রিজার্ভ করিতে চান তাহারা অনায়াসেই গাছ হইতে টাটকা ভাল ফল পাড়িয়া প্রিজার্ভ করিতে পারেন। অবশ্য যাহারা সহরে থাকেন তাঁদের পক্ষে সব সময় টাটকা ফল পাওয়া মুশ্কিল, সম্পূর্ণ টাটকা না হউক যাহাতে ফলের মধ্যে পূর্বোক্ত দোষগুলি না থাকে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

বাড়ীতে বোতলে ভরিয়া ফল রক্ষণ।

পূর্বেই বলিয়াছি যে বাড়ীতে টিনের ডিবায় ভরিয়া ফল রক্ষণ বড়ই অসুবিধাজনক। কেননা ঝালা দিয়া ঢাকনি লাগান ইত্যাদি কাজ বাড়ীতে বড় হইয়া উঠিবে না। বোতলই বাড়ীর পক্ষে অভ্যস্ত সুবিধাজনক। এই বোতলে ফল রক্ষা দুই প্রকারে হইতে পারে। এক টিনের মতই বোতলে ফল ভরিয়া ফুটন্ত জলের কেটলিতে ডুবাইয়া

ফল সিদ্ধ করা, অল্প নিয়ম, ভিন্ন পাত্রে ফল সিদ্ধ করিয়া বোতলে ভরিয়া ভরা। ভিন্ন পাত্রে ফল সিদ্ধ করিয়া বোতলে ভরাই অভ্যস্ত সুবিধাজনক। আমেরিকার প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে যে ফল রক্ষা করা হয় তাহার অধিকাংশই শেখোক্ত নিয়মে। আমাদের দেশস্থ রান্নাকার্যে সুনিপুণ ভগিনীগণ ও জননীগণ যে একাধা অবাধে করিতে পারিবেন তাহাতে একটুকুও সন্দেহ নাই। নূতন রান্না শিক্ষাকারিণীর মত প্রথম প্রথম একটু ভয় বা অসুবিধা হইতে পারে বটে কিন্তু দুই একবার কবিতা অভ্যস্ত হইয়া গেলেই দেখিবেন যে ভাত রান্না করা আর আম প্রিজার্ভ করা উভয়েই সমান বিদ্যা বুদ্ধির দরকার।

প্রথমতঃ ভাল ভাল ফল বেছে নিয়ে তাহার খোসা ছাড়াইতে হইবে। পবে তাহার আঠি ফেলে দিতে হইবে, (যদি আম হয় তবে দুই দিকের পিঠি প্রায় আঁটি ঘেসাইয়া কাটিয়া লইয়া বাকি অংশটা তখনই ছেলে পিলে-দিগকে দিয়ে দিলেই ভাগ হয়) পরে তাহাকে বেশ পবিত্র জলে ধুইতে হইবে। ধোয়া হ'য়ে গেলে সিদ্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত বেশ পবিত্র ঠাণ্ডা জলেই ফল গুলিকে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে কেননা তাহাতে ফলের রং নষ্ট হইবে না। পরে একটি পাত্রে (এনামেলেব ষ্ট্রু-প্যান হইলেই ভাল হয়) তিন পেয়লা জলের সহিত দুই পেয়লা চিনি একরূপ পরিমাণে—অবশ্যই যাহারা একটু বেশি মিষ্টি ভাল বাসেন তাহারা চিনির পরিমাণ বাড়াইলেই চলিতে পারিবে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই হইবে,—মিশ্রিত করিয়া উনানে বসাইয়া দিতে হইবে। যখনই জল ফুটিয়া উঠিবে তখনই ফল যাহা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখা হইয়াছে উহার মধ্যে দিতে হইবে পরে ঢাকনি দিয়া পাত্রের মুখটি ঢেকে দিয়া ১৫ কি ২০ মিনিট পর্যন্ত সিদ্ধ করিতে হইবে, পরে ফল বেশ সিদ্ধ হয়ে গেলে পর পাত্রটি উনানের উপর থাকিতে থাকিতেই উহা হইতে কিছু ফুটন্ত সির (Syrup) প্রথমতঃ বোতলে ভরিয়া পরে একটি চামুচা বা হাতা দিয়া ফলগুলি ভরিতে হইবে পরে উত্তপ্ত সির—যাহা তখন পাত্রে বাকি আছে, তাহা বোতলের সম্পূর্ণ মুখ পর্যন্ত ভরিয়া রবায়ের সহিত ১নং বোতল হইলে ঢাকনি ও ২নং বোতল হইলে জু বেশ করিয়া আঁটি লাগাইতে হইবে। পরে একটি ভিজা

গামছা (গরম জলে ভিজান) দিয়া বোতলের গলা ইত্যাদি বেশ করিয়া পুছিয়া তাহাকে উপুড় করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে ভিতর হইতে কিছু সিরি বোতলের মুখ দিয়া বাহিরে আসিতেছে তবে জানিবেন পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে কেননা বোতলের মুখে ফাঁক আছে। আর যদি দেখা যায় যে কিছু সিরি বাহির হইতেছে না তবে অন্তত দুই বৎসর অন্ত নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে যে ফল কিছুতেই নষ্ট হইবে না। বোতল উপুড় করিয়া রাখিলে যদি দেখা যায় সিরি বাহিরে আসিতেছে তবে তখনই মুখ থুলিয়া ভিতরের সিরি ও ফল গরম থাকিতে থাকিতেই, অন্ত কিছু গরম সিরি, যাহা যে পাত্রে ফল সিদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে অবশিষ্ট আছে—বোতলে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া পুনরায় মুখ বেশ শক্ত কবিয়া লাগাইতে হইবে। এবং পুনরায় উপুড় কবিয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।

যদি উদ্ভৃষ্ট সিরি (Syrup) ঠাণ্ডা বোতলে ভরা যায় তবে বোতল ভাঙ্গিয়া যাইবারই পোনে যোল আনা সম্ভব। তাই বোতলে সিরি ও ফল ভরিবার পূর্বে বোতলকে বেশ করিয়া গরম করিয়া লইতে হইবে। একটি গামলা বা কড়াইয়ের মধ্যে জল গরম করিয়া তাহাতে বোতলটি ডুবাইয়া রাখিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে একটি ছুরি বা চামচ দিয়া বোতলটিকে গড়াইয়া গড়াইয়া এপিট ওপিট করিতে হইবে তাহাতে গরম সমানভাবে বোতলের সকল স্থানে লাগিতে পারিবে। এক স্থানে বেশি গরম ও অন্য স্থানে কম গরম লাগিলে বোতল ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বোতলের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঢাকনি ও রবারও গরম করিতে হইবে। এরূপভাবে বোতল গরম করাতে দুই কাজই হইবে ; বোতলের মধ্যে যদি কোন পোকা ইত্যাদি (germ) থাকে তাহা মারা যাইবে এবং বোতল ভাঙ্গিবার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। যখন ফল সিদ্ধ কার্য সম্পন্ন করিয়া তাহাকে বোতলে ভরিবার উপযোগী করা হইবে তখনই বোতল গরম জল হইতে উঠাইয়া তাড়াতাড়ি বোতল গরম থাকিতে থাকিতেই পূর্কোক্ত নিম্নে সিরি ও ফল ভরিতে হইবে। পরে রবার ও ঢাকনি গরম জল হইতে উঠাইয়া লাগাইতে হইবে। খোলা জানালার ন

দরজার নিকট যেখানে বায়ু চলাচল করিতেছে এরূপ স্থানে বোতলে ফল ভরা কার্য না করাই ভাল। কেননা হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া বোতল ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। বোতলকে ভাঙ্গিবার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে যাহাতে সিরি ও বোতল প্রায় সমান গরম হয়,



ফল রক্ষার "ইকনমি" বোতল। ৩নং।

তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। একটি গামছা গরম জলে ভিজাইয়া এবং চাপিয়া তাহা হইতে জল ফেলিয়া দিয়া তিন চার ভাঁজ করতঃ একটি কাঁঠেব পিঁড়া বা চোকির উপর পাতিয়া তাহার উপর বোতলটি বসাইয়া ফল ভরা কার্য করিলেই ভাল হয়। ফল ভরা ও মুখ লাগান ইত্যাদি কার্য হ'য়ে গেলে পর বোতলটি ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে এক স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখা দরকার। পরে বোতল ঠাণ্ডা হ'লে পর একটি মেটে (Brown) রঙের কাগজ দিয়া বোতলটিকে জড়াইয়া যেখানে আলো যেতে না পারে এমন স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। টিনে ভরিয়া ফল প্রিজার্ব কবিলে যেখানে সেখানে রাখা যায় কিন্তু বোতলে টিন হইতে সে বিষয়ে

অম্লবিধা। আমেরিকার প্রত্যেক বাড়ীতেই মাটির নীচে ঘর (Cellar) আছে, সেখানে তাহারা এ সমস্ত ফলের বোতল রাখে। কেহবা উপরেই সিঁড়ির নীচে একটি ক্ষুদ্র ঘর করিয়া যাহাতে সেখানে আলো প্রবেশ করিতে না পারে একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া সেখানেই এ সমস্ত বোতল রাখে। এই যে বোতলের উপর ব্রোউ (Brown) রঙের কাগজ জড়ান এ কেবল আলো যাহাতে বোতলে না লাগিতে পারে তজ্জন্ত। আমাদের দেশে ইচ্ছা করিলেই প্রত্যেক বাড়ীতেই একরূপ একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরের বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যায়।

এখানে যে যে রকমের বোতল ব্যবহার করা হয় তাহার তিন রকমের তিনটি চিত্র দেওয়া গেল। ইহাব মধ্যে-১নং ও ৩নং অর্থাৎ Lightning ও Economy নামক বোতলই বেশি ব্যবহার করা হয়। Economy বোতলে (৩নং) আলাদা রবারের দরকার হয় না উহার ঢাকনিতেই একরূপ সিমেন্ট লাগান আছে তাহাতেই রবারের কাজ করে। আমাদের দেশে একরূপ কোন বোতল পাওয়া যাইবে কি না বলিতে পারি না, বাজারে অনুসন্ধান করিলে যদি না পাওয়া যায় তবে কাহার কতটা বোতলের দরকার তাহা যদি ঢাকার সবজ্জ্ঞ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট লিখিয়া পাঠান তবে আমরা সেই পরিমাণ বোতল এখান হইতে পাঠাইতে চেষ্টা করিতে পারি। আমার নিকট চিঠি লিখিতে খরচ ৯/১০ পয়সা। তাই আমার নিকট চিঠি না লিখিয়া ঢাকার সবজ্জ্ঞ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাস মহাশয়কে লিখিলেই তিনি আমাদেরকে জানাইতে পারিবেন, তাঁর ছেলে ও আমি এক বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ি। তিনি প্রায়ই এখানে চিঠি লেখেন। তাই তাঁকে লিখিলেই তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদেরকে জানাইবেন।

আমি সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত অধ্যাপক শেলটন (Professor Shelton) ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিসবেন নগরে (Brisbane) যে এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা উক্তসালে আগষ্ট মাসে ১০নং বুলেটিন (Bulletin) এ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

“As to the sort of fruit suitable for canning, he (Prof. Shelton) might say that any

that did not change in the process of cooking could be canned. Oranges, of course would not do, because they became bitter when boiled. He had had a long experience of canning, and among Australian fruits, there were many excellently suited for the process. Mangoes, for instance, were excellent, and he might just say here that they were capable of about as many manipulations in cooking as any fruit he had ever seen. In fact, if he were going to plant an orchard along the coast he should have five or six mangoe-trees to every one of any other sort.”

(Bulletin No 10) Report of Agriculture Conferences, August 1891 (Page 57, Brisbane, Queensland.)

আমার সময় খুব কম। তাই অনেক স্থানে হয়ত খুব পবিদ্ধাব কবিতা লিখিতে পাবি নাই। যদি ফল রক্ষা সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে উৎসুক হ'ন এবং এ প্রবন্ধে তাহা পবিদ্ধার বুঝিতে না পাবেন তবে অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাকে লিখিলে আমরা যথাসাধ্য সংবাদ দিতে চেষ্টা করিব।*

অনাথ বন্ধু সরকার।

Stanford University,
California, U. S. A.

নবযুগের উৎসব।†

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করিতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কি, আমরা যে কি কর্তৃ, তার পরিণাম কি, তাব তাৎপর্য কি সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

মাগক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধেই সে চব্বম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে

* এ প্রবন্ধে ক্যানারীর (cannary) কার্য যে বার বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে পরবর্তী প্রবন্ধে তাহার প্রত্যেক বিভাগের চিত্র সহ কার্যপ্রণালী আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। ইতি লেখক।

† (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক মাঘোৎসবে পঠিত।)

জানেনা সে ঘরের চেয়ে অনেক বড়—সে জানেনা, মানব-জীবনে সকলের চেয়ে বড় সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই ।

সে মানুষ স্ত্রতবাং সে সমস্ত মানবের । সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র ; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্যন্ত তার মজাগত যোগ ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ, একথা শিশু অনেকদিন পর্যন্ত একেবারেই জানেনা । তবু একথা একদিন তাকে জানতেই হবে যে ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্তে পালন করচে না—সে মানবসমাজের জন্তেই বেড়ে উঠে ।

আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের উজ্জ্বল এই ১১ই মাসের উৎসব করে আসছি । আমরা কি করছি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে ; আর বিলম্ব করলে চলবে না ।

আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব-ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব । ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সৎসংস্কার ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঙ্কীর্ণ মলিনতা ধোত করে নেবেন ; মহোৎসব-ক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত উৎস আছে তারি জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনের সজোজাত শিশুর মত প্রকৃত হয়ে উঠবেন ।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় ধ্বংস হবেন কিন্তু এই টুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারিনে । আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড় ; এমন কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও একে ছোট করা হবে ।

আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানব-সমাজের উৎসব । একথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না কলতে পারি তাহলে চিন্তের সঙ্কোচ দূর হবে না ; তাহলে এই উৎসবের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবেনা ; আমরা ঠিক জেনে যাবনা কিসের যজ্ঞ আমরা আহুত হয়েছি ।

আমাদের উৎসবকে ব্রাহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলবনা এই সঙ্কল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি ; যিনি সত্যমুখী তার আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখুব ; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ ; এর ক্ষুদ্রতা নেই ।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন

“শুশ্রূষা বিধে অমৃতমুখী পূজা আবে দিব্যধামানি ততঃ—

বেদাহমেতং পুণ্যং মহাত্ম্যং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরমাত্মং”

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোন—আমি জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি ।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখতে পারেনা । মহাত্ম্য পুণ্যং মহান পুরুষকে মহৎ সত্যকে ধাবা পেয়েছেন তাঁরা আর ত দরজা বন্ধ করে থাকতে পারেন না ; এক মুহূর্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্ব-লোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান ; নিত্যকাল তাঁদের কর্তৃক আশ্রয় করে আপন মহাবাগী ঘোষণা করেন ; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন ; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন, সে মুখই হোক আর পণ্ডিতই হোক সে রাজচক্রবর্তী হোক আর দীন দরিদ্রই হোক, অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন ।

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্তা এসে পৌঁচেছিল, সে দিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জানুতেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

“বস্তু সর্বাণি ভূতানি আশ্রয়ন্তে বাহুপত্ৰি,

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগপসত ।”

যিনি সর্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না ।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—“তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি”—যিনি সর্বব্যাপী তাঁকে সর্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন ।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে-ছিলেন ; জলস্থল আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন ; উজ্জ্বলপূর্ণময় দেখেছিলেন—সেদিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর

কাছে উদ্ভাটিত হয়ে গিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন “বেদাহং”, আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি ।

সেইদিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতযজ্ঞে সর্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর স্রষ্টা ছিল না, গহঙ্কার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ কবেছিলেন। সে দিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সঙ্কুচিত হয়নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জ্ঞানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারিদিক হতে বন্ধ হতে লাগল—নির্কীর্ণিত প্রতীপের মত ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল শ্রোতস্বিনী যখন মরে আসতে থাকে তখন যেমন দেখতে দেখতে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোট ছোট জলাশয়ে বিভক্ত কবে;—যে ধারা দূরদূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশ-দেশান্তরে সম্পদ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসঙ্গীতের তানপূবার মত পর্কতশিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত নিরন্তর ব্রাজতে থাকত—সেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্ৰী করে তোলে সেই খণ্ডতান্ত্রিক আপন পূর্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিস্মৃত্যে আব যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই রকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভাবতবর্ষের সম্বন্ধেব পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল।—তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা? রুদ্ধ জল যেমন কেবলি ভয় পায় অন্নমাত্র অশুচিতায় পাছে তাকে কলুষিত করে, এইজন্তে সে যেমন স্থান-পানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারিদিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ রুদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলি কলুষের আশঙ্কার বাহিরের বৃহৎ সংশ্রবকে সর্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্তে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্যালোক এবং বাতাসকে পর্যন্ত তিরস্কৃত করেছেন,—কেবলি বিভাগ, কেবলি

বাধা;—বিশ্বের লোক শুক্ল কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অব্যবহিত মন্দির কোথায়—সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

“যথাপঃ প্রবতাস্তি যথা মাসাঃ জরজরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিপৌধাত আয়ন্ত সর্বভূতঃ স্বাহাঃ—

“জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসবের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন স্বাহা।” কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম, জ্ঞান, সমাজ তাদেব সিংহদ্বার বন্ধ কবে বসে আছে—কেবল অশুঃপূরেব যাতায়াতের জন্তে খিড়কির দরজার ব্যবহার চলচে মাত্র।

সত্যসম্পদের দাবিদ্রা না ঘটলে এমন চূর্ণগতি কখনই হয় না। যে বলতে পেবেছে “বেদাহং” আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তাকে বলতেই হবে “শৃণু বিশ্ব অমৃতস্ত পুত্রাঃ।”

এই রকম দৈন্ত্রে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ কবে যখন ঘুমচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখীর কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসঙ্গীতেব সুর এসে পৌঁছিল—যে সুরে লোকলোকান্তর, যুগযুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে সুরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সূর্য্য তাঁরা একই আত্মীয়তার আনন্দে বদ্ধ হইয়াছে—সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বলে “বেদাহমেতং”—আমি এঁকে জেনেছি! কাকে জেনেছি? “আদিত্য বর্ণং”—জ্যোতির্ময়কে জেনেছি—যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ময়? কই তাঁকে ত আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখেচিনে।—না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখিনি—তাঁকে দেখছি তমসঃ পরতাং—তোমাদেব সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ কবে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েচ, সে যে অন্ধকার—নিখিল মানব সেখানে থেকে দ্বিগে দ্বিগে যায়, সূর্য্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না—

সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্ণের স্থানে অভ্যস্ত আচার ; সেখানে ধারে একজন ভয়ঙ্কর ‘না’ বসে আছে, সে বলচে, না, না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও । সে বলচে কান বন্ধ কর, পাছে মন্ত্র কানে যায়, সবে বস পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলোনা পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে ! এত “না” দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছি—কিন্তু বেদাহমেতং—আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের—যাঁকে জানলে আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না—যাঁকে জানলে, নিম্ন দেশ যেমন জল-সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাস-সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে—তাঁকেই জেনেছি ।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জন করে উঠল—দূর কর দূর কর, এ’কে বের করে দাও—এ’ত আমার ঘরের সামগ্রী নয় ! এ’ত আমার নিয়মকে মানবে না !

না, এ তোমারি ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয় । কিন্তু পারবে না—আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেলতে পারবে না—তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে । প্রভাত এসেছে ।

প্রভাত এসেছে—আমাদের উৎসব এই কথা বলচে ! আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিন্তাগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্ছে এ যে সেই সূর্য্য প্রভাতের উৎসব !

বহু যুগ পূর্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল, “একমেবাদ্বিতীয়ং ।” অদ্বিতীয় এক ! পৃথিবীর এই পূর্ব্বদিক্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন ! একমেবাদ্বিতীয়ং ! অদ্বিতীয় এক !

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে, যে, “এক সূর্য্য উদয় হচ্ছেন, এবার ছোট

ছোট অসংখ্য প্রদীপ নেবাও”—এই মন্ত্র কোনো একঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো, তুমি জাগ্রত হও—শৃঙ্খল বিধে—হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো—পূর্ব্বগগনের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং—আমি জানতে পারি—তমসঃপরস্তাৎ—অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জানতে পারি—নিশাবসানের আকাশ উদয়ানুধঃ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জানতে পারে তেমনি করে ।

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ ।”

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিন্তে যে প্রভাত আসচে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল । তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের সংগ্রাম ; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহ সিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজ্য—সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীররুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের একসভার বসাবার জন্তে আয়োজন হয়ে গেছে । মানব সভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারম্বার মন্ত্র জপ করিতেছিলেন—এক ! এক ! এক ! তিনি বলছিলেন—ইহ চেৎ অবৈদীৎ অথ সত্যমস্মি—এই এককেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়—ন চেৎ ইহ অবৈদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি । এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাজ্ঞর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান একের উপলব্ধি অভাবে—যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌরল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে—যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে প্রচার করিতে—যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্তে !

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার ছদ্মদিনের মধ্যে কোথায় এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র—একমেবাদ্বিতীয়ং—ঐধা-

বিহীন সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠল তখন এ কথা নিশ্চয় জানতে হবে—সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগূঢ় আগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে—এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে !

আমাদের দেশে আজ বিরাট মানবের আগমন হয়েছে । এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নীচু করে রয়েছি—আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে । তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন । সকল মানুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজহুল্লভ অর্থ আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে, নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না । আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে ! এইখানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন, “একমেবাদ্বিতীয়ং ।” বলে গিয়েছেন মনে রাখিস্, সকল বৈচিত্রের মধ্যে মনে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক ! সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক !

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর ত আমাদের নিজা নেই দেখেছি । “এক” আমাদের স্পর্শ করেছেন, আর আমরা স্থস্থির থাকতে পারিনি ! আজ আমরা ঘর ছেড়ে, দল ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে বিশ্ব-পথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি । এ পথের পাথের আছে বলে জানতুম না—এখন দেখছি অভাব নেই । ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিত্যস্ত বিচ্ছিন্ন সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই “এক”কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে । এক আয়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছিল !

তার পর থেকে আনাগোনা ত চলেইচে ; একে একে দূত আসচে । এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্ছে যা পূর্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আব্বান করবে, যা একের আলোকে অন্যতর পুত্রগণকে অন্যতর পরিচয়ে মিলিত করবে । রামমোহন রায়েব আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি

চিরন্তনের অভিযুগে চলেছে । আমরা কোনো একটি আয়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মত ক্ষীত হয়ে উঠেছে । আমরা অনুভব করছি, সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্মের সঙ্গে ধর্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগরসঙ্গমে গুণান্বিত করতে পাবে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব । সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতবে আরম্ভ হয়ে গেছে ; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনি খুলবে এমনি আমাদের মনে হচ্ছে । কেন না, কিছুকাল পূর্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে ! আর ঐ যে দেখছি বাতায়নে এক একজন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছেন ! তাঁদের মুখ দেখে চেনা যাচ্ছে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয় ; পৃথিবীতে কালে কালে যে সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য, বিশ্বামিত্র, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের বলে চিনেছেন ; তাঁরা মৃতবাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর ফুলে বাস করেন না ! তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য অম্লকরণ নয়, গতি অম্লবৃত্তি নয় ; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্য-সঙ্গীতকে এখনি বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুলবেন । সেই মহা সঙ্গীতের মূল ধূয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন—“একমেবাদ্বিতীয়ং ।” সকল বিচিত্র তানকেই এই ধূয়াতেই বাবদ্বার ফিরিয়ে আনতে হবে—একমেবাদ্বিতীয়ং ।

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার যো নেই ! এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—ব্রহ্মের আলোকে সকলের সামনে প্রকাশিত হতে হবে—বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে । সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন । কোন্ পরিচয় আমাদের ? আমাদের পরিচয় এই যে আমরা তারা যারা বলে না যে ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত, আমরা তারা যারা বলে, “একোবশী সর্বভূতাস্তবাত্মা” সেই এক প্রভুই সর্বভূতের

অন্তরাত্মা, আমরা তারা যারা বলে না যে বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্তে আবদ্ধ হয়ে আছে, আমরা বলি “হৃদা মনীষা মনসাতিক্লৃপ্তঃ” হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায় ; আমরা তারা যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলিবে আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ এবং বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দশান্তি, সর্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না ; আমরা তারা যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক, এক, অদ্বিতীয় এক ! তবে আমরা আর স্থানীয় ধর্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকিব কেমন করে ! আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখতে হবে ! এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করছে।

সেই মহাদিন এসেছে অথচ এখনো সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে যে সত্য বিরাজ করছে সে ত এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিঁদুলে দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে ঢাবি বদ্ধ করে বসে আছি ; যাকে বলব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের ! না ! আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিনি, আমরা যে কিসের জন্ত এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আসছি তা ভাল করে বুঝতে পারিনি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। “এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ” এই যে মহান্ আত্মা এই যে বিশ্বকর্মা দেবতা যিনি সর্বদা জগতের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্তমান যুগে জগতে ধর্মসম্বন্ধ জ্ঞানসম্বন্ধের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন ; আমরা তাই বলছি ধন্ত, ধন্ত, আমরা ধন্ত !—এই আশ্চর্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাথোৎসবে জাগ্রত করছি। এই মহৎসত্যে আজ আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে—বিবাতার এই মহতী

কুপার যে গন্তীর দারিদ্র্য তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।—বুদ্ধিকে প্রশস্ত কর, হৃদয়কে প্রসারিত কর, নিজেকে দরিদ্র বলে ভ্রেনোনা, হর্ষল বলে মেনোনা—তপস্তায় প্রবৃত্ত হও, হুঃখকে বরণ কর, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে ভোগ করবার জন্তে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্মকে যন্ত্রবৎ কোনোনা—সত্যকে সকলের উর্দ্ধে স্বীকার কর এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ কর।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট বিশ্বকর্মা, তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম রচনা করচ, হে মহান্ আত্মা, তা এখনো আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। তোমার ভগবৎশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে কোন্ খানে স্পর্শ করেছে, কোথায় তোমার সৃষ্টিশীলা চলছে তা এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, জগৎ সংসারে আমাদের গৌরবান্বিত ভাগ্য যে কোন্ দিগন্তরাগে আমাদের জন্তে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুঝতে পারচিনে বলে আমাদের চোঁটা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে আমাদের দৈন্ত-বুদ্ধি ঘুচ্চেনা, আমাদের সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠছেনা, আমাদের হুঃখ এবং ত্যাগ মহৎ লাভ করছে না, সমস্তই ছোট হয়ে পড়ছে ; স্বার্থ, আরাম, অভিযাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড় কিছুকেই চোখের সামনে দেখতে পাচ্চিনে, একথা বলবার বল পাচ্চিনে যে সমস্ত সংসার যদি আমার বিকল্প হয় তবু তুমি আমার পক্ষে আছ, কেননা, তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্ছে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে। হে পরমাত্মন, এই আশ্র-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে, এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার কর, উদ্ধার কর, আমাদের সচেতন কর ; তোমার যে অস্তিত্বপ্রাপ্তিকে আমরা বহন করছি তার মহৎ উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহ-দ্বার উদঘাটন করবার জন্তে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কি তা বেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিম্বৃত হয়ে না বসে থাকি ! জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানাদেশে নানাকালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাস্ত বিধানকে আমরা মাথায় পেতে নিই—ভয় দূর হোক, অশ্রদ্ধা দূর হোক, অইন্সার দূর হোক, তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই,

সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিবৃত, এবং এক মজল সঙ্কল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয় জেনে সর্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়-হাতে তোমার সেই নিগূঢ় সঙ্কল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বন্ধ নয়, কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারে না, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না, এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহা সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সঙ্কল্পকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্মিলিত করে দিবে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে বেরই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্রাবল্য হয়ে যাক, জয় বলতে থাক্ আনন্দ পরমানন্দ, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক্—

শৃগ্ল বিধে অব্যত পুত্রা আ য়ে দিব্যধামানি তহুঃ।
বেদাহমেভং পুরুষং মহাত্মনু আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরতাং।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

পেন্সিলভেনিয়া-প্রবাসীর পত্র।

১০ই অক্টোবর সাউথামটন থেকে জাহাজে চড়েছিলাম। জাহাজে উঠবার আগে একবার ডাক্তারের একজামিন অর্থাৎ স্বাস্থ্যপত্রীকা হয়। দেখলাম এক জায়গায় ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে, আর এক একজন করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তিনি শুধু চোখের পাতাটা উল্টে দেখেন। বস, একজামিন হয়ে গেল। এ জাহাজটা গোলকুণ্ডার চেয়ে অনেক বড়, প্রায় ১১০০০ টন। ক্যাবিনের রা কামরার অন্ত নেই। বেদিকে বাওয়া যায় সেদিকেই ক্যাবিন। এসব ক্যাবিনে রাতদিনই ইলেকট্রিক্ লাইট জ্বলছে। প্রথম দিন এসে তো ক্যাবিন খুঁজে কিছুতেই পাই না। শেষে অনেক চেষ্টা করে তো ক্যাবিন পাওয়া গেল। ব্যাগগুলো রেখে একবার উপরে গেলাম। জাহাজ ছেড়ে দিবে খানিক দূর এসেছে এমন সময় আমার ক্যাবিনে এসে বেশি পোর্ট হোল খোলা পেয়ে দিব্যি একটা চেউ ঘরের ভিতর চুকে বিছানা বাগিশ জিনিসপত্র সব ভিজিয়ে ঘরের মেঝেতে বেশ খেলা করে বেড়াচ্ছে। ক্যাবিন-

বয়কে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে একটা চেউ ভিতরে অনধিকার প্রবেশ করে এই কাণ্ড করে রেখেছেন। যা হোক আবার সমস্ত বিছানা বাগিশ বদলে দিল। ২৩শে রাত্রি ৮।১৪ মিনিটের গাড়িতে চড়ে ২৪শে বেলা ১১টার সময় এখানে এসে পৌঁছিয়েছি। রাত্তার “বেলফস্টে” একবার বদলাতে হয়েছিল।—প্রথম ৩।৪ দিন সমুদ্র এত ভয়ানক ছিল যে-চেউ আপার ডেক ছাড়িয়ে উঠেছিল। ক্যাবিন থেকে বাইরে বার হবার সাধ্য কারো ছিল না। ১৫ই সমুদ্র শান্ত হয়, আমিও সেদিন প্রথম ডেকে যেতে পারি। জাহাজে কেবল আমি একমাত্র কালা আদমী তাই আমি গেলেই সাহেব মেমগুলো হাঁ করে দেখত। যা হোক সেখানে একটা আমেরিকান ইহুদীর সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছিল, আমেরিকার নেমে তার দ্বারা কিছু উপকার পাওয়া গেছে। ১৬ই অক্টোবর জাহাজে বসে আমিও রাধি-উৎসব নিজে নিজে করলাম। সে দিন রাত্রি কোন জিনিস খাই নাই শুধু আপেল আর বাদাম খেয়ে কাটিয়েছি। মাসখানেক পরে সেদিন রানও করি। ১৭ই আমাদের “ফিল্যাডেলফিয়া” জাহাজ প্রায় রাত্রি ১০টার সময় নিউ ইয়র্ক পৌছায়। সেদিন সকাল থেকে এত কুয়াসা হয়েছিল যে চারিদিকের কিছুই দেখা যায় নাই। আগে থাকতেই আমার ভাবনা হয়েছিল যে এই অজানা সহরে কোথায় গিয়ে উঠব, তার উপর এই কুয়াসা, আর রাত্রি ১০টার সময় জাহাজ জেটিতে লাগল। নিউ ইয়র্কে কারো ঠিকানা জানতাম না বলে আগে চিঠি দেওয়া হয়নি। প্রথমে জাহাজে উঠবার আগেই ত একবার সেই জন্মকাল থেকে কুষ্টি লিখে দিতে হয়েছে। আবার নামবার সময় যত কিছু খবর আছে সব লিখে দিয়েও রক্ষা নাই, আবার ট্রাঙ্ক খুলে একজামিন করে তবে ছেড়েছে। তবে এটা ইংরাজ বাবু দেয়ও করেছে; তাঁদের লাগমুখ দেখে ছেড়ে কথা করনি। এক এক সাহেব তো চটেই লাগ। যাক্, নামবার পর সেই ইহুদী তার এক বন্ধকে ৪০th Street এ নামিয়ে দিতে বললে, সেও ৪২nd St. যাবে। আমাকে লগুনে একজন আম্রাজে নিউ ইয়র্কের ইণ্ডিয়া হাউসের ঠিকানা দিয়েছিল। ৪০th St. এ নেমে বেশি সেখানে ১১৪২ পার্ক এ্যাভিনিউর চিহ্নও নেই; আর যে আমার সঙ্গে ছিল সেও

তার বাড়ী খুঁজে পায় না। সে 'সাউথ আফ্রিকা' থেকে ৫ বছর পরে বাড়ী ফিরছে। একটা বাড়িতে গিয়ে প্রথমে খাঁকা খাকি আরম্ভ করলে, খানিক পরে সে বাড়ীর লোক বেরিয়ে এসে বলল যে সে বাড়ীতে অল্প লোক থাকে। শুনে তো বুড়োর চক্ষু স্থির। তার পর রাত্তার রাত্তার দুজনেই হায়রান হয়ে প্রায় একঘণ্টা পরে সে হঠাৎ তার এক চেনা লোক দেখতে পেয়ে তবে তার বাড়ী খুঁজে পায়। আমাকেও তার বাড়ী নিয়ে গেল কিন্তু আমি দেখলাম যে আমাকে রাতে জায়গা দিতে হলে তাদের অসুবিধা হবে। তাই রাতে সেখানে থাকতে রাজী হলাম না। তারা প্রথমে আমাকে থাকতে অনেক করে বলল কিন্তু যখন দেখল যে আমি থাকতে রাজী নই তখন বুড়ো তার ছেলেকে আমার সঙ্গে ইণ্ডিয়া হাউস খুঁজে-বার করতে পাঠাল। ছেলেটি পার্ক এ্যাভিনিউ জানত তাই ১১৪২ নম্বর খুঁজে নিতে বেশী কষ্ট হল না। রাত সাড়ে এগারটার পর গিয়ে ইণ্ডিয়া হাউসে হাজির হলাম। এখানে এখন ৪ জন বোর্ডার আছেন। তার মধ্যে ৩ জন বাদামী আর একজন সিংহলী। আজ বেলা সাড়ে ১১টার সময় এখানে এসে পৌঁছিয়েছি; আজ শনিবার বলে ভর্তি হওয়া হলো না। বোধ হয় সোমবারের আগে ভর্তি হওয়া হইবে না। আমেরিকার মধ্যে সব চেয়ে ভাল ইউনিভারসিটি বোর্ষ্টনে, কিন্তু সেখানকার ফি ২৫০ ডলার বলে সেখানে যাওয়া হলো না। ওখানে থাকতে ভেবেছিলাম যে কেম্‌স্ সাহেবের স্কলারশিপ্‌ মানে যেখানে খুসী ভর্তি হতে পারব; কিন্তু নিউ ইয়র্কে এসে শুনলাম যে সে সব কিছু নয়; কয়েকটা ইউনিভারসিটি হিন্দু ছাত্রদের বেতনের টাকা ছেড়ে দেবে বলেছে তার জোরেই কেম্‌স্ ছেলেদের স্ক্রি স্কলারশিপ্‌ দেবেন বলেছিলেন।

যা হোক, সে সব ইউনিভারসিটি ফি ছেড়ে দেবে বলেছে

তার মধ্যে দেখলাম এটাই সব চেয়ে ভাল তাই এখানে চলে এলাম। ব্রুকলিন (Brooklyn) এর প্র্যাট্‌ ইন্সটিটিউসনে যদিও যাব ঠিক করেছিলাম কিন্তু সেখানে প্রথমতঃ কোন ডিগ্রি দেয় না তার ওপর সেটা তত ভাল ইন্সটিটিউসন্ নয়। এখন এই কলেজে আমি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স (Chemical Engineering Course) নিছি। প্রথম

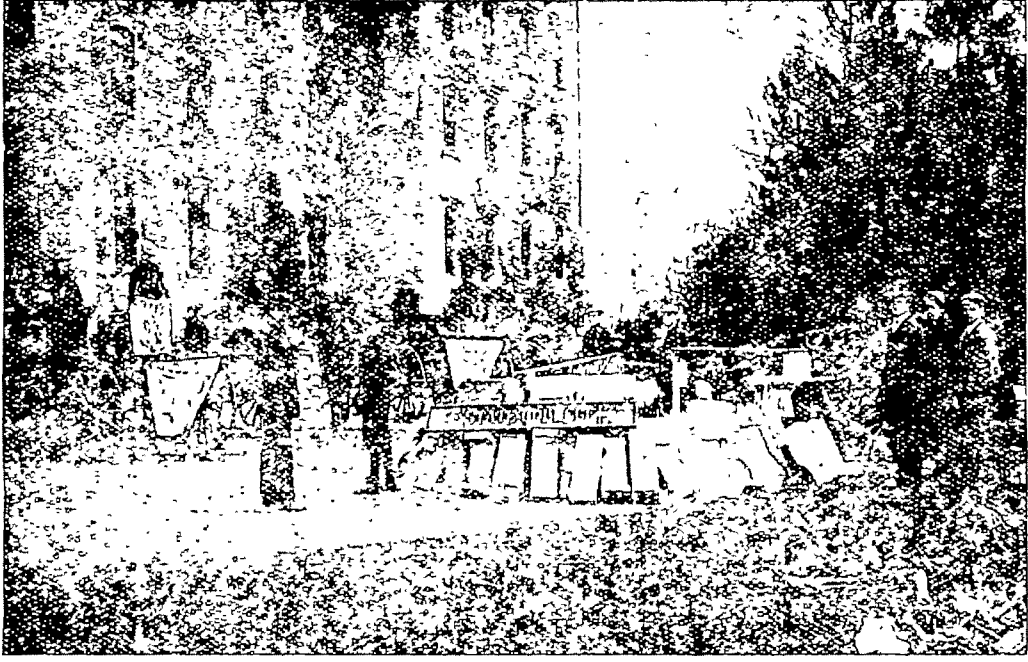
ছই বছর সব জায়গাতেই প্রায় এক পড়া হয়। শেষের ছই বছর স্পেশেল কোর্স নিয়ে শেষ করলে B. Sc. ডিগ্রী পাওয়া যায়। আমি ভেবেছি প্রথম ছই বৎসর এখানে পড়ে এখানকার প্রফেসরদের সুপারিসে যদি বোর্ষ্টন technical and free scholarship যোগাড় করতে পারি তবে শেষদিকটা সেখানে পড়তে পারব। সেখানে special student হয়ে ভর্তি হতে পারলে এক বছরেই কোর্স শেষ করা যেতে পারে। এখানকার জলবায়ু খুব ভাল। কলেজ সমুদ্রের জল থেকে ১০০০ ফিট উচু পাহাড়ের উপর। আমাদের দেশের দার্জিলিং এর মত পাহাড়ে জায়গা। মাসে মাসে যে সব বাঁধা খরচ আছে তা দিলাম— ১ম term :—১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৯শে জানুয়ারী— Incidentals—\$ 18, Gymnasium fee—\$ 5, Room Rent—\$ 27, Library fee \$ 1.50 cents, Damage Deposit—\$ 5.50 cents, Key deposit—50 cents, Laboratory charges—\$ 15; মোট \$ 67. ২য় term :—২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা জুলাই—মোট \$ 62। ছই term এ এক বছর হয়। খাওয়া খরচ মাসে \$ 12 এ একটু খারাপ এবং মাসে \$ 15 এ ভাল। তা ছাড়া খুচরা বোধ হয় ৪৫ ডলার লাগবে।—\$ 100 tuition fee ছিল কিন্তু আমাকে দিতে হবে না। এক \$ বা ডলার ৩। এখানে ভর্তি হবার সময় Boarding এবং lodging fee, incidental fee, library, laboratory ইত্যাদি ধরে সব শুদ্ধ এক term এর জন্য ৬৭ ডলার দিতে হবে। এখন থেকে হিন্দু ছাত্র হইলেই তাকে ত্রী নেওয়া হবে। এই পেন্সিলভেনিয়া ষ্টেট কলেজ এখানে নাকি খুব সস্তা বলে বিখ্যাত। এত কম খরচে নাকি অল্প কলেজে থাকা যায় না।

এখানকার ৬টা খুব ভোর জানতে হবে। ৭৮০টা থেকে সকালের খাওয়া আরম্ভ হয়। খাবার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই কেউ বা হোটেলে খায় আর কেউ বা আমি যেখানে খাই (Mc. Allister hall) সেখানে খায়। এই Mc. Allister hall এ সব চেয়ে সস্তার খাওয়া দেয়। অল্প অল্প হোটেলে মাসে ১৫ ডলার নেয়, কিন্তু এখানে ১২



ডলার। তবে খাওয়াও তজ্জপ। একটু সুবিধা এই যে তিনবারই এক গেলাস করে ছুধ দেয়। Breakfast এর পর ৮টা থেকে ৮:১৫ মিনিট পর্যন্ত chapel. ৮:২০ মিনিট থেকে ক্লাশ আরম্ভ হয়। যদি অস্ত্র-অস্ত্র department এ প্রায়ই মাঝে মাঝে এক এক period খালি থাকে কিন্তু আমার department এ সব চেয়ে বেশী খাটুনি। তার উপর আমি আবার দেবীতে এসেছি বলে workshop এ অতিরিক্ত সময় খাটিতে হয়। আমার প্রায় সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা ক্লাশ। মাঝে ১২:২০ থেকে ১:৩০ পর্যন্ত ছুটি (dinner) থাকে তার পর প্রায়ই ৪টা পর্যন্ত ক্লাশ থাকে। তার পর মিলিটারি ড্রিল সকলকেই করতে হয়। সাত্রে ৬টার সময় খাবার আগে যে টুকু সময় পাই একটু বেড়িয়ে আসি। তার পর পড়তে বসতে হয় প্রায় ১২।১২।০ টা পর্যন্ত। কেবল শনিবার বেলা ১:৩০র পর আর ক্লাশ থাকে না। রবিবার ছুটি থাকে। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ঢের বেশী খাটতে হয়। এখানকার কলেজে প্রত্যেককে ক্লাশে পড়া করে নিয়ে যেতে হয়। প্রত্যেককেই পড়া দিতে হয়। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ কেমন ভাবে আছি। এই কলেজ সহরের মধ্যে

নয় বলে চারদিকে খুব নির্জন আর পাহাড়ে ভরা। সহরের কোন বিলাস কিছা আমোদ এখানে নেই কিন্তু আমেরিকান ছেলেরা এর মধ্যেই নিজেদের মধ্যে নানা আমোদ করে। এদের নানা আমোদ প্রমোদ আছে। তার মধ্যে যে ছুটি আমি এসে দেখেছি তার ছবি পাঠালাম। ১মটা যে দিন এখানে প্রথম আসি (২৪শে) সে দিন হয়েছিল। এটা হচ্ছে কলেজের annual cider scrap। এক পিপে ড্রাক্সারস মাঝ খানে রাখে আর ছধারে Freshmen (1st year) আর Sophomore (2nd year) গোল হয়ে দাঁড়িয়ে College yell কয়েকবার চেষ্টায়। এই কলেজ yell (চীৎকার) আবার মজার, না আছে তার মাথা, না আছে মুণ্ড। আমাদের Freshmen yell কি জান? 'রারা রারা, রারা রেলভ; পেন্সি ষ্টেট্ নাইনটিন্ টুয়েলভ্।' Sophomore yell বিন্দা লাক্সা, বুমালাক্সা, বিংবাং বেঙ্ক পেন্সিলভেনিয়া ষ্টেট নাইনটিন্ ইলভেন, ইত্যাদি। যখন ৬৬ শো ছেলে মিলে এক সঙ্গে এই বিটকেল ডাক ছাড়ে তখন যেন কাণের পোকা বার হবার বো হয়। যা হোক চীৎকার হয়ে গেলে একটা বন্দুকের আওয়াজ হয় আর অমনি দুই দল এগিয়ে সেই পিপে অধিকার করবার চেষ্টা করে। 'সেই



হুড়োহুড়িতে কত যে হাত পা ভাদ্দে তার ঠিকানা নাই। যে ক্লাস হারে তাহাদের ভারি অপমান। বিশেষতঃ যদি freshman হারে তবে অমনি Sophomore রা নূতন নূতন আইন তৈরী করবে যে ফ্রেশম্যান পকেটে হাত দিয়ে চলতে পাবে না, তারা বাসের উপর দিয়ে চলতে পাবে না, ইত্যাদি যত রাজ্যের খামখেয়ালি নিয়ম আছে সব তৈরী করবে। যে ছবিটা দিলাম (৬২২ পৃঃ দেখ) সেটা সেই পিপে অধিকারের চেষ্টা হচ্ছে, কয়েকজন Sophomore পিপের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে আর তার চারিদিকে ঠেলাঠেলি ঘুবোঘুবি চলেছে। এবারে প্রায় ৩৪টা জখম হয়েছিল। এবার freshmanরা হেরেছে।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে Hallow e'en day. এটা ৩১শে অক্টোবর হয়। এদিন আমাদের দেশে যেমন লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে ছেলেরা চুরি করে বেড়ায় তেমনি এরাও সমস্তরাত ধরে যত mischief করে রাখে। অধ্যাপকদের ঘরে গিয়ে শূরোর মুরগী ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে আসে। যত রাজ্যের বাদরামি আছে সব করবে। ৩১শে প্রায় রাত ১টা পর্যন্ত বাইরে ছেলেরদের গোলমাল শুনেছি। এলা ভোর বেলা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি আমাদের

ঘরের সামনের এক গাছে পাইখানা থেকে সব toilet paper নিয়ে গিয়ে টাঙ্গিয়েছে, আর main-এর দরজার সামনে যত রাজ্যের ভান্ডাগাড়ী ইঞ্জিন ইট পাটকেল পাথর ইত্যাদি এনে সব রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে (উপরের ছবি দেখ)। Station থেকে signboard এনে এক জায়গায় কতকগুলো পাথর জড় করে তার মাঝখানে এক শূরোর ছেড়ে দিয়ে তার পাশে সেই সাইন বোর্ড লাগিয়েছে। একটা ঘরগুচ্ছ মুরগী তুলে এনে রেখেছে আর খড় দিয়ে Democratic, Republican আর Socialist-partyর তিন পুতুল তৈরী করেছে। একবার নীচে দেখতে গিয়ে-ছিলাম, মধ্যে কে বেন একটা ফটো তুলেছে; এই ফটোটিতে দেখলাম আমি রয়েছি তাই ৫ সেন্ট দিয়ে কিনে পাঠালাম। সেদিন কলেজের ফটোগ্রাফারের কাছে একটা ছবি তোলা হল। তার একখানাও পাঠালাম।

গত ২০শে নভেম্বর এখানে পেন্সিলভেনিয়া day ছিল (কলেজের জন্মদিন) সেদিন Pennsylvaniaর গভর্নর এসেছিল। সমস্ত দিন ধরে নানা আয়োজ হয়েছে।

এখানকার বোর্ডিং-এর নিয়ম এই যে ঘরের আসবাবের মধ্যে খাট টেবিল আর চেয়ার দেয় তা ছাড়া বাকী সব

নিজেকে কিনতে হয়। একটা মাথার বাগিশের দামই প্রায় ৫ টাকা, তাও আবার সকলের চেয়ে কম দর। এখানকার সমস্ত জিনিষের দামই প্রায় চার গুণ।

এত দেরীতে এসেছি যে প্রথমে regular student করে নিতে চায় নাই কিন্তু শেষে chemistry departmentএর Dean recommend করতে তবে regular student করে নিয়েছে। এখানে এর আগে কোন ভারতীয় ছাত্র আসে নাই। এদের ধারণা যে ভারতীয়রা ইংরাজী জানে না কিন্তু আমার ইংরাজী শুনে তো অবাক। বলে যে 'How could you learn the English language? We didn't know that Indians could speak English so well!' যা হোক, আমার ইংরাজী শুনেই যে রকম থুসী, ভাল ইংরাজী শুনে না জানি কি করে। এখানটা একটা গ্রামের মত, সমস্ত গ্রাম জড়িয়ে এই State College। এক একটা বাড়িতে এক এক department। এই উপত্যকাটাতে (Mittany valley) সব শুদ্ধ প্রায় ১০ হাজার লোক থাকে, তার মধ্যে প্রায় সকলেই এই ইউনিভারসিটির কোন না কোন কাজ করে। এই কলেজের চারদিকেই পাহাড় ঘেরা। চারিদিকের দৃশ্য খুব সুন্দর। আমেরিকার প্রায় সব ইউনিভারসিটিতেই ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। আমাদের German classএ প্রায় ৫৬ জন মেয়ে পড়ে। তবে তারা প্রায়ই art course আর domestic science নেয়। আমাদের সবশুদ্ধ ৪ বছরের কোর্স। প্রথম বৎসরকে বলে Freshman year দ্বিতীয় Sophomore year তার পর Junior year সব শেষ Senior year। এখানে প্রত্যেক departmentএ প্রথম দ্বিতীয় termএ প্রায় general education দেওয়া হয়। আমার Industrial Chemistry subject বলে German compulsory. শেষের দুই বছর যে subjectএ specialise করবার দরকার সেই subject পড়ায় আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রেই রকম factoryতে tour করতে হয়। আমাদের দুই বছর Chemical Factoryতে tour করতে হবে।

শ্রীপ্রমোদ দাস।

বঙ্গসাহিত্যে-বিজ্ঞান।*

ওরে বাছা! মাতৃ-কোবে রক্তসের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
শ্রীমধুসূদন।

"Ours is a noble language.....He who uses a French word where an English word would do just as well is guilty of high treason against his mother-tongue."—Southey ("The Doctor").

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় যখন আপনাদের প্রতিনিধি স্বরূপ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন তখন আমি যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কে অভিভূত হইলাম। প্রথমতঃ মনে হইল নাম বা ঠিকানা ভুলিয়া হয়ত তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছেন। আমি সাহিত্যসেবা করি নাই। বলিতে লজ্জা হয়, মাতৃ-ভাষায় দুইটি কথা সংযোগ করিতে হইলে আমার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ যে আসনে সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথকে আপনারা একবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে আসন গ্রহণ করা আমার পক্ষে গৃষ্টতা, বাতুলতা মাত্র। তার পর আমি এক প্রকার চিরকুণ। দূর প্রদেশে আসিয়া কোন প্রকার প্রমসাধ্য কাজ করা আমার শক্তি ও সামর্থ্যের অতীত। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া আমি এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু শশধর বাবু যখন পরদিন সাহিত্যপরিষদের দুই প্রধান স্তম্ভস্বরূপ শ্রদ্ধাঙ্গান শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে করিয়া পুনরায় এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণদেহ মশককে বৃত্ত করিবার জন্য জাল বিস্তার করিলেন, তখন পরাক্রান্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম। আমি এক-প্রকার বলিভাবে আপনাদের সমক্ষে আনীত। এই শুক্লভার আমার স্বর্দ্ধে চাপাইয়া আপনারা কতদূর সফলতা লাভ করিবেন জানি না, তবে "কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেশু কদাচন" এই শাস্ত্রোক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া আজ সম্মিলনের কার্য আরম্ভ করিতেছি।

* রাজসাহীতে সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৮ই মার্চ সভাপতি বিজ্ঞানার্চ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের বক্তৃতা।

স্থানীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে বঙ্গসাহিত্যে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রসার হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক ।

জাতীয় সাহিত্য জাতির মানসিক অবস্থার পরিচায়ক ও পরিমাপক । যে কোন দেশের কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাহিত্য নিবিষ্টভাবে পর্যালোচনা করিলে সে দেশের তৎকালীন লৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় । কাব্য, সাহিত্য জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির শাস্ত্রিক বিকাশ মাত্র । যেমন চিত্রকর নীরব ভাষায় চিত্রিত বিষয়ে কেমন এক প্রকার সজীবতা প্রদান করেন যদ্বারা আলোক্যবিশেষের মনোগত ভাব অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় তেমনি সাহিত্য-চিত্রে জাতীয় চরিত্র মুখরিত হয় । বাঙ্গলা সাহিত্যের সূচনা হইতেই তাহাতে ধর্মপ্রবণতা পবিত্রীকৃত হয় । মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া বামপ্রসাদের শ্রীমাসংগীত ও ভারত-চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত কেবল এই একই সুর । এষ্ট ভাবে চরম বিকাশ হইয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যে । প্রেমের জয়, নামে কচি, যে সাহিত্যের মূলমন্ত্র, সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদন শ্রোতে দেখিতে পাই সেই এক ভাব—ধর্মপ্রবণতা । এষ্ট বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসাদেই আমরা আজ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বীণা-নিরুণ শুনিয়া মাতৃ-ভাষাকে ও স্বদেশকে গৌরবান্বিত মনে করি । চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন আমরা তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধেও সেই উক্তি প্রয়োগ করিব । ইহার আদ্যোপান্ত “নিকষিত হেম” ।

এই ধর্মসাহিত্যের শ্রোত মাণিকচাঁদের সময় অর্থাৎ ষষ্ঠ একাদশ শতাব্দী হইতে প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গলা ভাষার উৎপাদন, পুষ্টিসাধন ও কলেবরবৃদ্ধি করিয়াছে । সেই শ্রোত আজও প্রবাহিত হইতেছে । এমন কি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গুরুস্থানীয় (inspirer) জয়দেবের সময় হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর সময় পর্য্যন্ত—এই সাতশত বৎসর—একই প্রসঙ্গ চলিতেছে । গীতগোবিন্দে যে তরঙ্গ আলোড়িত, ‘বাই উমাদিনী’তেও তাহারই সংঘাত দেখি । এমন কি ইসলামধর্মাবলম্বী গ্রন্থকাবেয়াও এই সংক্রামকতা এড়াইতে পারেন নাই । পদাবলী সাহিত্যের ভণিতায়

৭৪৭৫ জন মুসলমান কবিবণ নাম পাওয়া যায় । গত কয় বৎসর বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই ধর্মবিষয়ক ।- (পরিশিষ্ট দেখ)

বাঙ্গলা সাহিত্যে কোন সময়ে গদ্যের প্রথম আবির্ভাব হয় তাহার আলোচনা করিবার আমাদের সময় নাই । তবে মোটামুটি ইহা ধরা যাইতে পারে যে গদ্য সাহিত্যের বয়স শতবর্ষ মাত্র । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন সময় হইতে বঙ্গসাহিত্য নবযুগে পদার্পণ করিয়াছে । কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ, রাজীব-শোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রাম রাম বসু, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই যুগের প্রবর্তক । বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস সবিস্তারে বিবৃত করিয়া, নিম্নলিখিত কথা কয়টা বলিয়া তাঁহার সারবান গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন :—

“ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে নূতন চিন্তার শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি, নূতন আকাজক্ষার সঙ্গে সমস্ত জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে । সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে । বাঙ্গলা এখন বাঙ্গলা ভাষাকে মাত্র করিতে শিখিতেছে, এ বড় শুভ লক্ষণ । ক্রীড়াশীল শিশু যেমন সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে পড়ার উর্ধ্বাশিরি অক্ষুণ্ণ ধরি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপ্ত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদূরবর্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা করনা করিয়া বিস্মিত ও আত্ম-হইয়াছি । অর্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যে রূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কুরিত না হয় ?”

আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী । রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিভা-সাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভাপ্রভাবে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে । এমন কি বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যকে অনেকে বিভাসাগরীয় যুগের সাহিত্য এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু বিভাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গলা সাহিত্যের শব্দবিভাস বর্তমান হইতে অনেকটা বিভিন্ন । তাঁহার বেতাল পঞ্চবিংশতি সংস্কৃত সমাসবদ্ধপদে পরিপূর্ণ । একপংক্তি রচনার মধ্যে ৩৪টি দুক্লহ সমাসবদ্ধপদের অস্তিত্ব বর্তমান পাঠকদিগের নিকট কিরূপ স্মরণীয় হইবে তাহা সকলেই জানেন । কিন্তু বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের মৈশবে ইহাই রীতি ছিল । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের

পাঠ্যপুস্তক “প্রবোধচঞ্জিকা” তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। “কোকিলকলাপবাচল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছী-করাত্যচ্ছনির্করাস্তঃকণাচ্ছয় হইয়া আসিতেছে” ইহাই তখনকার আদর্শ ভাষা ছিল। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র “আলালের ঘরের দুলালে”র মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপকেরা যিকে “আজ্য” বলিতেন, কদাচ “বৃত্তে” নামিতেন। ষইকে “লাজ”, চিনিকে “শর্করা” ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া ভাষার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতেছিলেন। যাহাহউক নূতন বক্তায় সে ঢেউ চলিয়া গেল। বসন্তের অতৃপ্ত কোকিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে যেমন একদিকে বিরহের উচ্ছ্বাসগীতিকা গাহিতে লাগিল, আবার ‘আনন্দমঠে’ স্বদেশপ্রেমিকতার ভৈরবনিনাদ, অপরদিকে সংঘম, আত্মনিবৃত্তি, যোগ, অমূল্যলন, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে ‘বঙ্গদর্শন’ বঙ্গদেশে নূতন যুগ আনয়ন করিল। সেই অলোকসামান্য প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া আজ বাঙ্গলা সাহিত্য সমগ্র ভারতসাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভাবারি সিক্তন করিয়া উর্বরতা সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত, শ্রীমধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের কাব্যংশ কনকান্তরণে সাজাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু এসমস্ত সঙ্ঘেও আজ আমাদের সম্মুখে একটি ভীষণ বিপদ উপস্থিত। আমাদের সাহিত্যের আংশিক উন্নতি হইয়াছে বটে, সাহিত্যের উপভাস ও কাব্যংশের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে ইহাও সত্য বটে, কিন্তু একটি মাত্র কারণে ভাষার সর্বোচ্চ উন্নতি হইতে পারিতেছে না। শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যে অঙ্গের চালনা হয় সেই অঙ্গ দৃঢ় ও সবল হইতে থাকে, আবার যে অঙ্গের চালনা হয়না তাহা ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া পরে একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আমাদের সাহিত্যে বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের একান্তই অভাব।

প্রাচীন ভাষতে সত্যের ও নূতন ভাষের অমুসন্ধানে অল্প ঋষিরা ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু মধ্যযুগে এ সমস্ত লুপ্ত হইল। চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত যিনি যত বিজ্ঞান পারদর্শিতা লাভ করিতেন, তিনি শিক্ষিত সমাজে তত জ্ঞানবান বলিয়া

আদৃত হইতেন। বাংলায়নের ‘কামত্ব’ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় ধাতুবাদ (Chemistry and Metallurgy) ঐ সকল কলার মধ্যে পরিগণিত হইত। চরকে বনৌষধি চিনিয়া ও বাহিয়া লইবার জন্ত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানভেদে প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সূক্ষ্মতে শব্দব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থিবিজ্ঞা শিথিবীর ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অষ্টাদ আয়ুর্বেদেব মধ্যে শল্যতন্ত্র (Surgery) একটি প্রধান অঙ্গ। সূক্ষ্মতে যে ক্ষারপাকবিধি বর্ণিত আছে তাহা নব্য রসায়ন শাস্ত্রের এক অধ্যায় বলিয়া অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু হায়, যে ভারতের পূর্বকালীন ঋষিগণ জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বর্তমান জগতেরও আদর্শ, যাহাদের কাব্য ও দর্শন আজও সভ্য জগতের সাহিত্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, যে সামগান একদিন ভারতের বন-ভবনে উচ্চারিত ও গীত হইয়া ভারতে ধর্ম্মের যুগ আনয়ন করিয়াছিল, যে তটশালিনী গঙ্গাযমুনা আবহমান-কাল হইতে কুলকুলু নিনাদে বহিয়া, বক্ষে প্রাচীন ইতিহাস ধারণ করিয়া আজও হিন্দুস্থান পবিত্র কবিতা সার্ববসঙ্গে বাহিতেছে, সেই ভারতের, সেই পুণ্যদেশ আখ্যাবর্তের জ্ঞানরবি, দুর্ভাগ্য বংশধর আমাদের দোষে, অন্তর্মিত হইল। সত্যই কবি গাহিয়াছেন :—

“অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ..

তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।”

অমুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইল, ঐশ্বর্য সংগ্রহের জন্ত উদ্ভিদ পরিচয়ের ভার বেদিয়া জ্ঞাতির উপর সমর্পিত হইল। অল্প চালনার দুঃসাধ্য ভার নরসুন্দরের উপর স্তম্ভ হইল। যাহা হউক, অতীতের আলোচনা ও অমুশোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আর প্রয়োজন নাই। এখন সময় আসিয়াছে।

গত কয় বৎসর বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তগুলিই পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণীভুক্ত। ছুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠ্যপুস্তক। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের বর্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হইয়া ইউরোপধ্বংস ও আসিয়ার পূর্বপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০।৭০ বৎসর পূর্বেও বাঙ্গলা সাহিত্যের এ প্রকার

তুর্গতি হয় নাই। বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা”য় পদার্থবিজ্ঞা বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল “বিবিধার্থ সংগ্রহে” ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিজ্ঞা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের অস্বিমল্লভ্য হইয়া থাকিবে। বাঙ্গলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের বাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে তজ্জন্ত এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিবৎসী থাকিব। ইহাদের কিছু পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড হার্ডিঞ্জের আত্মকুল্যো Encyclopaedia Bengalensis অথবা “বিভাকল্পকল্প” আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষশ্রান্তিবিৎ ও নানা ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনাব্যক্তার স্থায়ী প্রচলিত সাহিত্যের (Classics) মধ্যে গণ্য হইবে না তথাপি তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অভিনব পথ-প্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্ত হইবেন। কিন্তু ইহাদের পূর্বেও বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারী-গণকে বর্তমান বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অতুক্তি হয় না; তাঁহারা ইবার বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, কিম্বা ‘ধুটানী বাঙ্গলা’ বলিয়া তাঁহাদের কৃত কার্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক, জ্ঞানের ও সত্যের তুল্যদণ্ড হস্তে করিয়া বাহার যে সম্মান প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন।

১৮২৫ খৃঃ অঃ উইলিয়ম ইয়েটস্ প্রথমে ‘পদার্থ বিদ্যা সার’ বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থ বিদ্যা ভিন্ন মৎস্ত, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্ত্যস্ত জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন “কিম্বা বিদ্যাসাব” নামক রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর জীবেন্দ্রী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃঃ

শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ ‘সমাচার-দর্শন’ নামে সর্ব প্রথম বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারা ইবার ‘দিগদর্শন’ নামক নানাতত্ত্ববিষয়িনী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২১ খৃঃ “বিজ্ঞান, অল্পবাদ সমিতি” (Society for translating European Sciences) নামে একটা সমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসর উইলসন্ এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সমিতির চেষ্টায় ‘বিজ্ঞান সেবধি’ নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ অঃ Vernacular Literary Society নামে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও যাহাতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেধুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন গবর্নেন্ট মাসিক ১৫০ টাকা দিয়া ইহার আত্মকুল্য করিতেন। এই সভার উদ্যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র “বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রকাশ করেন। মহামতি হজ্জন প্রোট্ট এই সমিতির স্থাপনিকাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম এই :—

“বাঙ্গলার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসারিত করা কর্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল বৃথপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠালিঙ্গার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত তুলা বুদ্ধি করিতে হইবে; নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অল্পকুল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। নীতিপ্রভৃতি উপদেশমূলক গ্রন্থ প্রচারও অতি প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের বশেষ উন্নতি হইবে। এই সকল প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিতে এই কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।” (বিষকোষ)

বিজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। ১৭ খানি পুস্তক প্রকাশের পর সমিতি

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে গল্প ও আনন্দজনক পুস্তকই এদেশের পাঠকসাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা এই তিনস্থানে তিনটি নন্দ্যাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থ-বিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞা, জ্যামিতি, ভূগোল, প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গলা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুল সমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা-ঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গলা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারেও যে বাঙ্গলা ভাষায় অনেকটা উন্নতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক-কাল ধরিয়া বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না। বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাটুতি আছে তাহা Text Book Committee নির্বাচিত তালিকাভুক্ত, স্তত্রাং পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার সোপান-স্বরূপ। একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃ-করণের ক্ষমতা যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে তদ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক চান না থাকিলে কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২০টি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয় সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-অধ্যাপন ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ-সম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেননা ইংরাজিতে একই কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন

পাশই যেখানকার ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বাৰা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান কিম্বা যে কোনও প্রকার ছুরুহ ও অধ্যবসায়-মূলক কার্যের সাফল্য সম্পাদনের আশা নিতান্তই সূদূর-পর্যন্ত। বস্তুতঃ একজামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হাত্তোদ্দীপক উন্নততা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায়গ্রহণ,—শিক্ষিতের এরূপ অবস্থা প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জানী ও শুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে ক্ষীণ হই, অপরূপ দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চার কাল আরম্ভ হয়। কারণ যে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, তাহারা একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র-মন্ডনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, স্তত্রাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাভর্জন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পঞ্জিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জ্বড়ায়। এক বৎসর হয়ত উদ্ভিদ বিজ্ঞান ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে এম, এ, পাশ হইলেন। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্বাণপ্রাপ্ত হইল; সে সমুদায় যুবকগণকে ২১ বৎসর পর আর বিজ্ঞানমন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পিপাসাশূন্য জ্ঞানালোচনার এইত পরিণাম! জাপানের জ্ঞান-তৃষ্ণা আর আমাদের যুবকগণের জ্ঞান-তৃষ্ণা এই দুই তুলনা করিলে অবাক হইতে হয়। প্রায় চারি বৎসর হইল আমি লণ্ডন নগরে একটা জাপান রসায়নবিৎসর সহিত পরিচিত হই। তিনি অনেক কষ্টকল্প সহ করিয়া দুঃসহ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া লণ্ডনের কোন রাসায়নাগারে মৌলিক গবেষণায় নিবৃত্ত ছিলেন। তাঁহার অসামান্য দৃঢ়তার গুণে, “মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পতন” এই জাতীয় চরিত্রের প্রভাবে, (সম্ভবই) তিনটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করিয়া

তিনি বৈজ্ঞানিক ভগতে অক্ষয় কীর্তি আহরণ করিয়াছেন। সম্ভ্রতি সম্ভ্রবনীতে কোন বাঙ্গালীবৃক আপানে পদার্পণ করিয়াই বাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—

“আপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা বেকপ, অত্র কোন জ্ঞাতির সেকপ আছে কি না সনেহ। কি ছোট, কি বড়, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিধান, কি বৃথ, সকলেই নূতন বিষয় জ্ঞানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিবা থাকে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জাহাজ হইতে আপানে পদার্পণ করিবার পূর্বে যে আভাস পাইয়াছিলার তাহাতেই মনে করিয়াছিলার একপ জ্ঞাতির উন্নতি অবশ্যস্বাবী। * * * * *

চাকরাণীগুলি পর্য্যন্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোজ রাখে আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাহা জানেন না।”

বস্তুতঃ একটু তলাইয়া দেখিলে অন্যান্যানেই বৃদ্ধিতে পারা যায় যে এই সংগ্রাম—দুঃখ দারিদ্র্য অতিক্রম করিয়া জ্ঞানানুধাবনের প্রবৃত্তি, দুইটি মহীয়সী আসক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট। এই দুইটি প্রবৃত্তির কোনটি প্রথম এবং কোনটি দ্বিতীয় ইহা নির্দ্ধারণ করা দুঃখ। জ্ঞানস্পৃহা প্রবৃত্তিষয়ের একটি, জাতীয়জীবন প্রতিষ্ঠা অপরিচা। এই দুইটির সমন্বয়েতেই আপান আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানের সংগ্রামে অটুট। ‘আমি উপলক্ষ্যমাত্র, দেশের ও মানব সমাজের কল্যাণ আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বদেশ আমার জগতের ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করুক’ এই বাণী আপয়ুবকহৃদয়ের ধমনীতে ভাড়িৎপ্রবাহ সঞ্চার করিয়াছে। এই ভাব জাতীয় জীবনে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। বাঙ্গালার যুবক! সমগ্র ভারতের যুবক! তোমাদের হৃদয়তন্ত্রী কি এ সম্ভ্রীতে বাজিয়া উঠে না? তোমাদের কি জগতের জ্ঞানকোষে অর্পণ করিবার কিছুই নাই? তোমরা কি চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে?

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক।

ফরাসীবিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল তাহা বাকল (Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লালাপ্ত, বাকো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকট প্রচাব করিতে লাগিলেন তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রম্য চরিত্র ও ধর্ম্মের পর্ণকুম্বিরে হলস্থল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্বে বিজ্ঞান সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত

হইত তাহা শুনিবাব জন্ত দুই চারিজন বিশেষজ্ঞ মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন বার্তা শুনিবার জন্ত সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন তাঁহাবাই পদমর্যাদা তুলিয়া লোকচার শুনিবার জন্ত নগণ্য লোকেব সহিত ঘেসাঘেসি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্ভ্রতি এক ধূয়া উঠিয়াছে যে বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্ভানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রাস্তরে ও ভগ্নস্থপে, নদী ও সরোবরে, তরুকেটরে ও গিরিগহবরে, অনন্ত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান-পিপাসুর যে কত প্রকার অমুসন্দের বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাঙ্গলার দরেল, বাংলার পাগিয়া, বাঙ্গলার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাঙ্গলার মশা, বাঙ্গলার সাপ, বাঙ্গলার মাছ, বাঙ্গলার কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের সোদাগর, বেগ, বাবলা ও জেওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদেরিগকে শিখিতে হইবে? বনে, জঙ্গলে ও উপবনে যে সকল তরু, লতা ও গুল্ম জন্মে তাহার গ্রাম্য নাম ও পরিচয় পাইতে হইলে শতাধিক বর্ষের লিখিত রক্তবর্ণের (Roxburgh) “ফ্লোরা ইণ্ডিকা” (Flora Indica) এখনও আমাদেরিগকে উদ্ঘাটন করিতে হয়। ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি, এসবের ভিতবে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না?

রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদবিজ্ঞা এবং ভূতত্ত্ববিজ্ঞার মৌলিক গবেষণা যে বিরাট যন্ত্রাগারের অভাবে কতক দূর চলিতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ছুরি, কাঁচি, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০ টাকার অধিক মূল্য লাগে না; কিন্তু গোড়াইতেই গলদ, জ্ঞানের গুণ্য পিপাসা কোথায়?

এদেশেব প্রকৃতিবিজ্ঞার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতিবিজ্ঞার্থী যুবকের কথা শুনুন। বিজ্ঞাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্ত জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকাব নিবিড় স্থাপদসঙ্কুল অবগণ্য প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। বৈজ্ঞানিক তথ্য-সমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার নিদ্রা ভুলিয়া কার্য্য করিতে থাকেন, ভোগলানসা তখন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন, উদ্ভিদ-নিচর আহরণের জন্ত হুকার (Sir Joseph Hooker) ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে কত বিপদ আলিঙ্গন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে হয় নাই। সেজন্ত তখন হিমাচলাবোহণ এখনকার মত সুগম ছিল না। তুবারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্ত কত অর্থব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশের কি অমর্য্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা। যখন ন্যান্সেন (Nansen) ফিরিয়া আসিলেন সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্ত ব্যাকুল।

অন্তঃপর আমাদের আলোচ্য বিষয় বাঙ্গলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য,—ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ও ইহার ভাবী উন্নতি বিধানের উপায়-নির্দেশ। তিনটি দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এবিষয়ে আমাদের সহায়তা করিবে। কারণ ইতিহাসে সদৃশ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। যাহা জ্ঞানীভিতে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা রুশিয়াদেশে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা জাপানেও সম্ভবিত সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা বাঙ্গলাদেশেও সম্ভবপর হইবে। এই তিন দেশই অল্প সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দেড়শত বৎসর পূর্বে জার্মান সাহিত্যের কি দুর্গতি ছিল! সত্য বটে, মার্টিন লুথার মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহার আদর ও চর্চা বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানগণ্য ল্যাটিন ও গ্রীকই অধীত হইত এবং রাজসভায় ফরাসী ভাষা চলিত ছিল। এমন কি ফ্রেডরিক

দি গ্রেট মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তিনি ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া বলটোরের সমক্ষে আবৃত্তি করিতেন এবং তাঁহার নিকট একটু বাহবা পাইলে নিজকে ধন্ত মনে করিতেন।

কিন্তু ফ্রেডরিকেব মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই Schiller, Goethe, Kant, Hegel প্রভৃতি একদিকে, আবার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Liebig, Wohler প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অপব দিকে জার্মান ভাষাকে মহাশক্তি-শালিনী করিয়া তুলিলেন। ৫০ বৎসর পূর্বে রুশিয়ার যে কি হুববস্থা ছিল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মহামতি বাকুল ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় এই দেশকে সূসভ্য আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনার্য্য জাতিব ভাষা আজ আদর্শস্থানীয়। যে ভাষা কবচভূকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টলষ্টয়ের গ্রায় ঔপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাতেই বিখ্যাত রুশ রসায়নশাস্ত্রবিৎ মেন্ডেলীফ (Mendeleef) স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদিগকে রুশ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

অধিক কি, এসিয়া খণ্ডেই ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। ৩০ বৎসর পূর্বে জাপান কি ছিল আর আজ কি হইয়াছে তাহা বলা নিস্প্রয়োজন। যে সমুদায় স্বদেশপ্রেমিক বর্ত্তমান জাপান গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা উৎসাহী, আশাহল যুবকবৃন্দকে প্রতীচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তৎতৎ দেশীয় পণ্ডিতদিগকে জাপানে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত আনয়ন করেন। বলা বাহুল্য, যদিও উক্ত পণ্ডিতগণ স্ব স্ব ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা প্রদান করিতেন, তথাপি শীঘ্রই সে সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জাপান নিজের ভাষার আদর বুঝিল; বুঝিল বৈদেশিক ভাষাতে শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না, বুঝিল মাতৃভাষার সৌষ্ঠবসাধন অবশ্যকর্তব্য।

ফল কথা এই যে আমরা যত দিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন, গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব ততদিন আমাদের ভাষার

এই দারিদ্র্য ঘটিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি এক প্রকার মৃতপ্রায় হইয়া বহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয়বস্তব হাবাহিয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন অথচ পূর্ক-পুরুষগণের ঐশ্বর্যের দোহাই দিয়া গর্কে ক্ষীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেখি বলেন যে দ্বাদশ খৃঃ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপখণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়; প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন, ভাস্কবাচার্য ভারতগগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে আমরা নব্যস্বৃতি ও নব্যজ্ঞানের দোহাই দিয়া বাঙ্গালীমস্তিস্কের প্রথবতার প্লাবিত করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে যে সময়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য মহাশয় মল্লু, যাক্সবন্দ্য, পরাশর প্রভৃতি মন্বন ও আলোড়ন কবিতা নবমবর্ষীয়া বিধবা নির্জলা উপবাস না কবিলে তাহাব পিতৃ ও মাতৃ কুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন কর পুরুষ নিবরণ্যামী হইবে, ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাবর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহো-পাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া টৌলের ছাত্রদিগেব আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্বিদবৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশপলী গতে নৈশ্বত কোণে বায়স কা কা রব কবিলে সে দিন কিপ্রকারে যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় পূর্কক কাকচরিত্র রচনা করিতে-ছিলেন, যে সময়ে এদেশেব অধ্যাপকবৃন্দ “তাল পড়িয়া চিপ করে কি চিপ কবিতা পড়ে” ইত্যাকাব তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলেভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তিভ্রমেব আশঙ্কা উৎপাদন কবিতেছিলেন, সেই সময়ে ইয়োরোপখণ্ডে গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বিগণ উদীয়মান হইয়া প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্কক জ্ঞানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন। তাই বলি, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিষ্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, বিধাতাব কৃপায় হাওয়া ফিরিয়াছে; মরা গাঙে সত্য সত্যই বাণ ডাকিয়াছে। আজ বাঙ্গালী জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত। যে দিন বাজা রামমোহন রায় গঙ্গালীর ধরে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনই

ভারতের সমৃদ্ধিসোপান বলিয়া নির্দেশ করিলেন সেই দিনই বুঝি বিধাতা ভারতের প্রতি পুনরায় শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল জাতি পুরাতন আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই গোঁড়া, বাঁহারা প্রাচীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আশ্রয়লাভ হন, বাঁহারা বর্তমান জগতের জীবন্ততাব জাতীয় জীবনে সংবেশিত করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বর্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি এই সমস্ত জাতি নূতনের প্রবল সংঘর্ষণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই যে বর্তমান ইয়োরোপের শিক্ষা অত্যন্তকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু আমরা ইহা যেন না ভুলি যে বর্তমান অবস্থায় ইয়োরোপ আমা-দিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আমার স্বতঃই মনে হয় আমাদের এই অযোগ্যতার কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহেতুক আসক্তি এবং অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিবেচ ও তাচ্ছিল্যের ভাব। এখানে অবশ্য স্বীকার্য যে আমাদের পূর্কপুরুষগণের আচারপদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্তমান সভ্যজাতিগণের আচার-পদ্ধতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সে সন্মুদায়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মুঢ়তার লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের পরিবর্তনে অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে—যেমন বাহু জগতে, তেমনই মানসিক রাজ্যে। এখানে প্রশ্নটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা কর্তব্য। আমি আশঙ্কিত হইতেছি পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি সঞ্চার করিয়া ফেলি; কিন্তু যদি স্বাধীন চিন্তা মানবমাত্রেরই পৈত্রিক সম্পত্তি হয় তাহা হইলে আমাদের বলিতেই হইবে যে পরকীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা আমাদের অনুকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরই আমার মতে ভাবী ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাপান ত্রিশ বর্ষ পূর্কে ঘোর তমসচ্ছন্ন ছিল, জগতে বাঁহার অস্তিত্ব (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল, সেই জাপান

পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া আদ্য কি এক অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া আসিবার পূর্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে !

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম, পার্থিব জগতেও ততোধিক। নূতনব ছাড়া পুৰাতনের সংস্কার করিতেই হইবে, নচেৎ ভয় হয়, ভারতভাগ্যবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অন্তর্মিত হইবে।

দেশের চর্গতি ও হুবহু অবস্থা বিষয় এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাঝেই আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে যতদিন একদিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে কোটি কোটি নরনারী অজ্ঞান অন্ধকাবে নিমগ্ন থাকিবে ততদিন আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসব হইবার আশা খুব কম। যাহারা ইংরাজী ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিখিতেছেন তাঁহারা অগাধ জলরাশির মধ্যে শিশিরবিন্দু হইয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। মহামতি বাকল ইংলণ্ড ও জার্মান দেশের শিক্ষাবিস্তার তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে জার্মানদেশে সর্ববিদ্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে জার্মানদেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক “পণ্ডিতী” ভাষা ব্রহ্মী কবিয়াছেন যে তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ “গণ্ডীব” মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতর স্তরে অমুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহা ফল এই হইয়াছে যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে একরূপ একটা অনতিক্রম্য প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিষয়ক সাধাবণের বোধগম্য অনেক সবল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও মূলমর্মে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের দেশে অত্যধিক প্রবল। আরও একটা কথা, আমরা এতক্ষণ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ও নীয়েট অস্ত্রদলের কথা বলিলাম। ইহার মাঝামাঝি একদল পড়িয়া রহিলেন। অর্থাৎ যাহারা কেবলমাত্র সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যানে ব্রতী। ইহারা কলাপ ও পাণিনি; কালিদাস, মাঘ ও ভাববী; জটিল শ্রায় শাস্ত্র,

এতদ্বিধ বেদ, বেদান্ত ও দর্শন লইয়াই ব্যস্ত। মোটামুটি বলিতে গেলে তাঁহারা ১৫০০ হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্বের ভাবতে বাস করেন। ইহাদিগকে আমরা অবশ্য আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণনা করিতে কুণ্ঠিত হই; কিন্তু আবার ইহাবাই সমাজে “পণ্ডিত” উপাধিধারী এবং ইহাদের আধিপত্য জনসাধারণের উপর ব্রিটিশশাসন অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ও কঠোর। এই শ্রেণীকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না।

কেহ কেহ বলিবেন যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণী লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গবর্ণমেন্ট হইতে “উপাধি” প্রদানের যে পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহার “আত্ম” “মধ্য” ও “উপাধি” এই তিন বিভাগে কেবল বঙ্গদেশে প্রতিবৎসব অনূন ৪৫০০ পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়া থাকেন। সমগ্র টোলের ছাত্র সংখ্যা ইহাপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে এমত সহস্র সহস্র ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণের হাতে পৌছিতে বাহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের পক্ষে কদাচ সম্ভব নয়। অবশ্য যাহারা বিজ্ঞান চর্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়া মৌলিকতত্ত্ব নির্ণয় ও গবেষণায় সূক্ষ্মতা ব্যাপ্ত থাকিবেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইংরাজী কেন জার্মান ও ফরাসী ভাষায় বচিত গ্রন্থাবলীও পাঠ কবিত্তে বাধ্য হন।

আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে যাহারা “শিক্ষিত” বলিয়া অভিহিত তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূল তাৎপর্যাগুলি জানা নিত্য প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি মাঝেবই বিজ্ঞানশাস্ত্রসম্বন্ধীয় সাধারণ বিষয়গুলি মোটামুটি জানা বিশেষ আবশ্যক।

এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব। জাপানিরা জার্মানি ও রুশিয়ার শ্রায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃভাষায় প্রচার কবিত্তে সক্ষম হন নাই। তাহারা মধ্য পথ অবলম্বন কবিয়াছেন অর্থাৎ মৌলিক গবেষণা সমূহ ইংরাজি ও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতত্ত্ব প্রচার হইতে পারে তজ্জন্ত মাতৃভাষা

অবলম্বন করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় জ্ঞানিগণের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রায় একই; সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে একই পরিভাষা হইলে যে কতদূর সুবিধা হয় তাহা নির্ণয় করা যায় না। আপানিরা এই সুবিধা টুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন; আমাদেরও তাহাই অবলম্বনীয়, কেননা, উক্ত জ্ঞানির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার বিশেষ সোসাদৃশ্য বর্তমান।

ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্বজন করা সাহিত্য-সম্মিলনের একটি প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আহ্লাদের বিষয়, কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্যপরিষৎ এই বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী ও শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ তজ্জন্ত পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় সাময়িক পত্রিকায় যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন তাহাতেও এ বিষয়ে সহায়তা হইতেছে। নাগরী-প্রচারিণী সভা ভূগোল, খগোল, অর্থনীতি, পদার্থবিজ্ঞা, রসায়নবিজ্ঞা প্রভৃতি ষটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন। পরলোকগত জগদ্বাণ স্বামী তেলেঙ্গ ভাষার রসায়নশাস্ত্র বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন ও তাহাতে সংস্কৃতমূলক অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি Vernacular Text Book Committee বাঙ্গলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংকলন করিয়াছেন এবং আশা করা যায় সাহিত্য সম্মিলনও এই অধিবেশনে একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি (Committee of Experts) নিয়োজিত করিয়া কি ভাবে পরিভাষা গৃহীত হইবে তাহার নিষ্পত্তির উপায় বিধান করিবেন।

বর্তমান-সাহিত্য সম্মিলনের অস্থগীতাগণ বাংলা সাহিত্যকে সাধারণ সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া শেখোক্ত বিভাগের কার্যক্ষেত্র British Association for the Advancement of Learning and Scienceএব আদর্শে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা সদৃশ্য বলিয়া বোধ হয়। মানবতত্ত্ব (Anthropology), পুৰাতত্ত্ব, ইতিহাস, লোকতত্ত্ব (Ethnology), ভূগোল, পদার্থ-বিজ্ঞা, রসায়ন-

বিজ্ঞা, উদ্ভিদ-বিজ্ঞা, ভূ-বিজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়া যাহাতে তৎ তৎ বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হয় তজ্জন্ত আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। আশা করি এই অধিবেশনে রাজসাহী বিভাগের লোকতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি সারবান প্রবন্ধ পাঠিত হইয়া ইহার সূচনা হইবে। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে রাজসাহীর কয়েকজন কৃতবিদ্য সন্তান পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে নূতন পথ দেখাইয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। বাঙ্গালী যে স্বাধীনভাবে চিন্তা কবিতা ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম, সিরাজদ্দৌলাপ্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয় তাহাব সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। আমার বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতুনাথ সরকার ইয়োরোপ ও ভারত-বর্ষের নানাস্থান হইতে বহু ছল্লত পারসী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সকল মন্বন করিয়া রত্নাবলী আহরণ করিতেছেন। তিনি যে সমুদায় বিবরণ লিখিতেছেন তাহা পাঠ করিতে করিতে আমি অনেক সময়ে আশ্চর্যবিস্মৃতি লাভ করিয়াছি এবং নিজকে কল্পনায় অনেক সময়ে ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সমকালীন বলিয়া মনে করিয়াছি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ মহৎকাৰ্য্যে ব্যাপ্ত থাকেন এবং মোগলরাজ্যের বিশাল ইতিহাস লিখিয়া মাতৃভাষায় সৌষ্ঠব সাধন কবেন, দেশের নিকট ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। আমাদের সম্মিলনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় “মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ” প্রভৃতি শীর্ষক যে সকল প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন তদ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি অভাব মোচন হইবার সূচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্নাল বহু-পরিশ্রমে মুসলমান বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মহত্বপূর্ণ সাধন করিয়াছেন।

আজ আমরা নূতন জাতীয় জীবনের প্রাসাদের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান। পাঁচ বৎসর পূর্বে যে দেশে ‘জাতীয় জীবন’ ইত্যাদি আশা ও উৎসাহেব কথা অলীক ও কবিকল্পনা-প্রসূত উদ্ভাসিত বলিয়া বিবেচিত হইত, যে দেশ স্বদেশপ্রেম বলিয়া

কথা বহু শতাব্দী যাবৎ বিস্তৃত ছিল, যে দেশ মাতৃভাষা ভুলিয়া এতদিন বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ণ ভাব আসিয়া মৃত প্রাণে কি এক অমৃত বাসি সিঞ্জন করিয়া সঞ্জীবিত করিল। যে যুবকগণের কাষ্ঠহাসি দর্শনে পূর্বে আশঙ্কার উদ্রেক হইত, যে দেশের প্রৌঢ়গণের মিতব্যয়িতা আত্মপ্রবঞ্চনামূলক বলিলে অত্যাক্তি হইত না, আজ কি এক অপূর্ণ ঈশ্বরপ্রেরিতভাবে অমুপ্রাণিত হইয়া সেই যুবক সবসবদনে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি লোকসেবার, জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বহুকষ্টসম্বিত অর্থ নিয়োগ করিল। ইহা কি আশার কথা নহে—ইহা ভাবিলেও কি প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না? ছই বৎসর পূর্বে যে বাঙ্গালী যুবক পিতামাতার মেহকোড় ত্যাগ করিয়া অথবা নবপবিত্রতা ভাষাকে ছাড়িয়া বৈদেশিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্ত দূরদেশে যাইতে কুণ্ঠিত হইত, আজ জানি না কি এক অদৃষ্টপূর্ব, অচিন্ত্যপূর্ব ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া জন্মভূমিকে গোববারিত কবিত্তে সেই যুবক বিদেশযাত্রা করিল। তাই বলিতেছিলাম আজ আমবা জাতীয় জীবনের সোপানে দণ্ডায়মান—আজ নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনার দিন।

বাঙ্গলায় এমন দীনহীন কাদাল হতভাগ্য কে আছ ভাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আস্থানে আহত হইয়া মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার আবতিব জন্ত নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলি! তুমি তোমাব বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমাব অজ্জিতবিদ্যা লইয়া—সকলে সন্মবেত হও।

আজ আমরা যুগসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ আমাদের দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে, স্বর্গ হইতে পিতৃপুত্র আমাদের কার্যাবলী লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমবা জাতীয় জীবনের এমন একস্তরে দণ্ডায়মান যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ, একটা অনন্ত অমবস্তুর অপরটি অনন্ত অকীর্তির, মধ্যপথে আর কিছুই নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আর্যসে মজিয়া ভবিষ্যৎ প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদের বিদ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে,

ভাবতাকান্তের উদীয়মান রবি উষার উন্মেষেই, হায়, আবার অন্তমিত হইবে।

কিন্তু আজ আশার দিন, আজ উদ্দীপনার যুগ। বাঙ্গলা এ আহ্বান উপেক্ষা করে নাই—সতীশচন্দ্র ও রাধাকুমুদের জ্ঞান বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী যুবক, সুরবোধচন্দ্র, ব্রজেন-কিশোর, সূর্য্যকান্ত, মনীন্দ্রচন্দ্র, তাবকনাথ, যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি ধনাঢ্যগণ যে দেশের জাতীয় শিক্ষার জন্ত বহুপরিচর ও মুক্তহস্ত, সে দেশ নিশ্চয়ই উঠিবে—সে দেশের ভাষা ও বিজ্ঞান কখনই উপেক্ষিত থাকিবে না। বাহাতে অধীতবিশ্ব, বিজ্ঞানবিদ ছাত্রগণ বৃত্তিলাভ করিয়া অন্নচিন্তা হইতে মুক্তিলাভ কবিত্তে পারে ও অনন্তমানে বিজ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গলা দেশের সেবার মনপ্রাণ নিয়োগ কবিত্তে পারে এমন উপায় নির্ধারণ করুন। সৌভাগ্যক্রমে এখন কৃতবিশ্ব ও নিষ্ঠাবান ছাত্রের অভাব নাই। তাহারা বিশাসবিভ্রমের প্রত্যাপ্তি নহে। বাহাতে তাহাদের সাংসারিক অভাব মোচন হয় ও তাহারা একান্ত মনে বিজ্ঞান সেবার ব্রতী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস। এই উৎসের পরিপূষ্টি সাধনের জন্ত আবার ভারতে শিক্ষা জ্ঞানচর্চা প্রবর্তিত হউক।

পরিশিষ্ট।

ইং ১৯০১—১৯০৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গলা পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ।

বিষয়	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭
জীবনী	২৫	১৮	১৯	২২	১৫	১৫	২০
ইতিহাস	২০	৪১	১৮	৪২	২৭	২৬	৩১
ভাষা ও ব্যাকরণ	২১২	২১৮	১৭৭	১৫১	১১১	১০১	৬৪
দর্শন ও নীতিবিজ্ঞান	১২	৪	৩	৩	১	৩	৩
Arts	১১	২৫	১৪	১৯	১১৬	৩০	২২
নাটক	৬২	৬৭	৪৭	৬৩	৬২	৭৪	৩৯
উপজ্ঞাস	৮৪	১১০	১০২	৮৫	৯১	১১০	১২৩
পদ্য	১২০	১২০	৮৭	৮৪	৭৫	৯৩	৫৫
ধর্ম	৩৪৮	৪০০	৩০১	২৮৯	২২৩	২৯৪	২৩৩
চিকিৎসা	৫০	৬৮	৪১	৬০	৬০	৭৩	৬১
আইন	১৬	২৭	১৬	১৫	১৩	৭	১১
রাজনীতি	...	...	...	১	...	...	...
বিজ্ঞান	৩২	২৩	১৯	১৩	১৭	১৩	১০
বিজ্ঞান (গণিত বিভাগ)	৪২	৬২	৪৫	৪৪	২৫	১৮	৩৩
ভ্রমণ	১	১	৪	৪	৩	৩	...
বিবিধ	৫১১	৫৭৭	৪৬৩	৫৭৪	৬৪৫	৬৪৭	৪৮৪
মোট	১৫৩৬	১৭৬১	১৩৫৬	১৪৬৯	১৩৮৪	১৫০৭	১১৮৯

ইং ১৯০১—১৯০৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তকের
শ্রেণীবিভাগ।

বিষয়	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭
জীবনী	১	...	...	...	...	...	...
ইতিহাস	...	১	...	৬	২	১	...
উপস্থাপন	১৭	১৭	১১	১৪	৪	৬	...
ধর্ম	১৯	১৭	১১	১৯	৯	৬	৭
ভাষা ও ব্যাকরণ	...	...	...	১	...	...	...
বিবিধ	২৭	১৬	৬	১২	১	৬	১
মোট	৬৪	৬০	২৭	৪৯	১৬	১৭	৮

৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শ্রেষ্ঠ-কর্ম্মা, নিকৃষ্ট-কর্ম্মা সকলেব অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ প্রকাশমান এই চৈতন্যময় আত্মাকে অন্তবে বাগিবে স্বীকার করিবে সেই মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ বা ভারতবাসী অন্তরে বাহিরে মুক্তি লাভের দ্বারা জ্ঞানে ধন্য, ভাবে ধন্য, কর্ম্মে ধন্য হ'য়ে আপনাকে বা মনুষ্যজাতিকে বা জগতকে পরম কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

বৌদ্ধযুগ ও ভাস্করাচার্য্য।

বিগত মাঘ মাসের “প্রবাসীতে” শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একস্থলে দেখিলাম, তিনি লিখিয়াছেন,—

“বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অন্তরের স্বাধীনতা বিনাশ প্রাপ্ত হইল; তার সাক্ষী বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যাসকালে ভাস্করাচার্য্য, চরক, অশ্বত্থ, পতঞ্জলি প্রভৃতি বড় বড় লোক বাহারা জন্মিয়াছিলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিনাশের পর তাঁহাদের জ্ঞান স্বাধীন-চিন্তা প্রতিভাশালী লোকের প্রাহুর্ভাব রহিত হইয়া যাওয়াতে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের উন্নতির পথে জন্মের মত কাটা পড়িয়া গেল। আমাদের দেশে যখন অন্তরের স্বাধীনতা এইরূপ বিনাশ পাইল, তখন বাহিরের স্বাধীনতা বিনাশ পাইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না।”

আমার হৃর্ভাগ্যক্রমে বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনা করিবার সুযোগ আমি কখনই প্রাপ্ত হই নাই। এই কারণে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই এবং সেই জন্তই বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশের সহিত ভারতীয় পরাধীনতার কি সম্পর্ক তাহা অবধারণ করিতে আমি অসমর্থ হইতেছি। যে সকল ঐতিহাসিকের রচনা আমার নেত্র-পথবর্ত্তী হইয়াছে সেই সকল ঐতিহাসিক হৃর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের পরাধীনতার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশের সংশ্লিষ্ট প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করেন নাই। কাজেই শ্রদ্ধাম্পদ দ্বিজেন্দ্র বাবুর ঐ কথাটি আমার নিকট নিতান্ত নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে এবং সেই জন্তই আমি এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে উত্থাপ্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। দ্বিজেন্দ্র বাবু স্বভাবসিদ্ধ উদারতা-গুণে আমার অপরাধ মাফ করিয়া তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যটি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার ক্রেশ স্বীকার

ভারতের সার কথা।

জগৎবাসী মনুষ্যমাত্রই জ্ঞানেন, ভারতবর্ষ, আত্মাব্যতীত আব কিছুকে কখনো সত্য ব'লে স্বীকার কবে নাই। এই এক-সত্য বা আত্মাই ভারতবর্ষের মর্ম্ম, এই এক-সত্য বা আত্মাতে নিষ্ঠাটি ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, এবং এই এক-সত্য বা আত্মার প্রতিষ্ঠাই ভারতবর্ষের কর্ম্ম। আত্মার পূজা ব্যতীত, আত্মাকে স্বীকার ক'রা ব্যতীত, আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা ব্যতীত যোগৈশ্বর্য্যের লীলাভূমি, অদ্বিতীয় সত্যের প্রকাশক্ষেত্র, আত্মার প্রতিষ্ঠাস্থান, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। যে মুহূর্ত্তে সমস্ত ভারতবাসী একত্র সমবেত হ'য়ে, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, কৃষ, স্বস্থ, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, রাজা, প্রজা,

করিলে আমি অত্যন্ত অমুগ্ধীত হইব—“প্রবাসীর” পাঠ-
কেরাও উপকৃত হইবেন।

আমাদিগের দেশে ধর্মসাহিত্য ও দর্শন-শাস্ত্রাদি বিষয়ে
যাঁহারা গ্রন্থরচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের
বংশপরিচয় ও আবির্ভাব কালাদির নির্ণয় করা নিতান্তই
কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কালিদাসের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত
অধুনাতন কালের প্রসিদ্ধ কবিগণ প্রকৃত পরিচয় জানিবার
কোন উপায় নাই। যে রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এ দেশে
এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহা যে কালিদাসেরই রচিত
তাঁহার কোন নিদর্শন গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিত নাই। সেকালের
সাম্প্রতিকপ্রকৃতি গ্রন্থকারেরা স্বরচিতগ্রন্থে আপনাদিগের
নামও সকল সময়ে সংযুক্ত করিতে সর্বোচ্চ বোধ করিতেন।
এরূপ অবস্থায় চরক, সুশ্রুত, প্রভৃতি গ্রন্থ কোন সময়ে,
কাহার উৎসাহে, কিরূপ অবস্থায় রচিত হইয়াছে তাহা
নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। ঐ সকল গ্রন্থ এদেশে
ঋষি প্রণীত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। “ঋষি প্রণীত” বলিলে
বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তীকালে প্রণীত—ইহাই
সাধারণতঃ সকলে বুঝিয়া থাকেন। পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের
আবির্ভাবকাল বৈরূপ বহুপরিমাণে নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত
হইয়াছে, চরক ও সুশ্রুতের সময় সেরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে
কি? তাঁহারা যে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে আবির্ভূত
হইয়াছিলেন এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে? (১)

ভাস্করাচার্য্যকে দ্বিজেন্দ্র বাবু কোন প্রমাণের বলে
“বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে” আবির্ভূত বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভাস্করাচার্য্য
স্বরচিত সিদ্ধান্ত শিরোমণির শেষে লিখিয়াছেন—

রন-গুণ-পূর্ণ-মহী (১৩০৬) সম শকনুপ সময়েভবনু মনোংপতিঃ।

রনগুণ (৩৬) বর্ষণ ময়া সিদ্ধান্তশিরোমণী রচিতঃ ॥ ৫৮

গোলেপ্রসাদাচার্য্যে।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশের জ্যোতিষী সম্প্রদায় আপনাদিগের
পরিচয়মান বিষয়ে বিশেষ কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেন না।
তাই আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই আবির্ভাবকাল
অন্যাসনে নির্ণয় করিতে পারি। জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য্য

(১) ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় চরকগ্রন্থিতার রচনাকাল
খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।
তাঁহার মতে বুদ্ধদেব চরকের প্রায় সাময়িক।

উদ্ধৃত শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ১৩০৬ শকাব্দে (১১১৪ খ্রীঃ)
তাঁহার জন্ম ও ৩৬ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে (১১৫০ খ্রীঃ) সিদ্ধান্ত-
শিরোমণি গ্রন্থ রচিত হয়। তিনি মহারাষ্ট্র দেশে জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীধর আচার্য্য
তদ্রত্য বাদবংশীয় মহারাজ জৈত্র পালের (১১৯১—১২১০
খ্রীঃ) সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন (মহা-
মহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রি-প্রকাশিত সিদ্ধান্ত শিরোমণির
ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। যিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে
প্রাভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে
আবির্ভূত বলিয়া নির্দেশ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত?

ভাস্করাচার্য্যের “করণ কুতূহল” নামক গ্রন্থের প্রারম্ভাংশে
নির্দেশস্থলে ১৩৭৫ শকাব্দের (১১৮৩ খ্রীঃ) উল্লেখ দৃষ্ট
হয়। ইহার পর কতদিন ভাস্করাচার্য্য জীবিত ছিলেন
তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ইতিহাসে দেখিতে
পাই ১১৯১ খ্রীঃ (অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্যের করণকুতূহলের
রচনা আরম্ভ হইবার ৮ বৎসর পরে) মহম্মদ ঘোরীর সহিত
হিন্দু নরপতিদিগের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে। সুতরাং ভাস্করা-
চার্য্যের দেহোপরম ও মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ প্রায়
সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়।

এখন দেখা যাউক, যে মহারাষ্ট্র দেশে ভাস্করাচার্য্য
জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মহারাষ্ট্র দেশে বৌদ্ধধর্মের
প্রভাব কোন সময়ে কিরূপ ছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন,
মহাবংশ ও দীপবংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে,
মহারাজ অশোকের সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে বৌদ্ধধর্ম
প্রচারের জন্য বহুসংখ্যক বৌদ্ধাচার্য্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।
এই উল্লেখ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে খ্রীঃ পূঃ ৩য়
শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্র দেশে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম
প্রচারের চেষ্টা হয় বলিতে হইবে। এই চেষ্টার ফলে
তথায় ব্রাহ্মণ প্রাধান্ত মূলক হিন্দুধর্মের কতদূর প্রতিপত্তি
লোপ পাইয়াছিল তাহা দেখা যাউক। ডাঃ রামকৃষ্ণগোপাল
ভাণ্ডারকার মহাশয় “দক্ষিণাপথের প্রাচীন ইতিহাস”
(Early History of the Deccan) নামক গ্রন্থের
অষ্টম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—

Brahmanism also flourished side by side with
Buddhism. In the inscription at Nasik in which

Ushavadata dedicates the cave monastery excavated at his expense for the use of the itinerant "priests of the four quarters," he speaks, as we have seen, of his many charities to Brahmins. The same notion as regards these matters prevailed then as now. Ushavadata fed a hundred thousand Brahmins as the Maharaj Sindia did about thirty years ago. It was considered highly meritorious to get Brahmins married at one's expense then as now. Gotamiputra also, in the same inscription which records a benefaction in favour of the Buddhists, is spoken of as the only protector of Brahmins and as having like Ushavadata put them in the way of increasing their race. Kings and princes then appear to have patronized the followers of both the religions and in none of the inscriptions is there an indication of an open hostility between them.

উপরি উদ্ধৃত অংশে—যে উষবদাতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথম পাড়ে ও গৌতমী-পুত্র ঐ শতাব্দীর ২য় পাড়ে মহারাষ্ট্র দেশে শাসনব্যপ্ত পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ-প্রাধিক্তমূলক হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের অপেক্ষা কোন অংশে হীনপ্রভ ছিল না। বর্তমান সময়ের ছায়ামুখও ব্রাহ্মণকে ভোজন ও দক্ষিণা দান করা পরম পুণ্য-কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রকৃত শত্রুতার কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর অবস্থা সন্দেহে ডাক্তার ভাণ্ডারকার এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষ ভাগে—মহারাষ্ট্র দেশে চালুক্যবংশীয় নরপতিদিগের প্রাধিক্ত ছিল। বিগত মাঘ মাসের প্রবাসীর ৫৪৪ পৃষ্ঠায় পুরাতত্ত্ববিদ ভিন্সেন্ট স্মিথ মহোদয়ের যে মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তদনুসারে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর ভারতে গুপ্ত বংশীয় নরপতিদিগের প্রাভাব কালে ব্রাহ্মণ-প্রাধিক্তমূলক হিন্দুধর্মের অভ্যুদয় ও বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ হয়। মহারাষ্ট্রে ও চালুক্য বংশের রাজত্ব কালে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে ছিল। ডাক্তার ভাণ্ডারকার ঐ সময়ের অবস্থাবর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

No inscription has yet come to light showing any close relations between the Buddhists and the Chalukya princes. But that the religion did prevail, and

that there were many Buddhist temples and monasteries, is shown by the account given by Hwan Thsang. Still there is little question that it was in a condition of decline. With the decline of Buddhism came the revival of Brahmanism and especially of the sacrificial religion. The prevalence of the religion of Buddha had brought sacrifices into discredit; but we now see them rising into importance. Pulakesi I is mentioned in all the inscriptions in which his name occurs as having performed a great many sacrifices and even the Asvamedha. I have elsewhere remarked that the names of most of the famous Brahmanical writers on sacrificial rites have the title of Svamin attached to them; and that it was in use at a certain period, and was given only to those conversant with the sacrificial lore. The period of the early Chalukyas appears to be that period..... The ritual of the sacrifices must during the previous centuries have become confused, and it was the great object of these writers to settle it by the interpretation of the word of the old Rishis. And the Puranic side of Brahmanism also received a great development during this period. The Chalukyas like their predecessors in previous times, were tolerant towards all religions.

এখানেও দেখিতেছি বৌদ্ধধর্মের উপর কোন প্রকার অত্যাচার না করিয়া চালুক্য রাজগণ পৌরাণিক ও বৈদিক ধর্মের উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন এবং "পৃথীরাঙ্কের আমলে অশ্বমেধের অলীক আড়ম্বর, মৃত্যু-শয্যা হইতে গাত্রোধান" করে নাই—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভেই উহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। বহু সংখ্যক যাগযজ্ঞের বিশেষত: অশ্বমেধের অনুষ্ঠানকারী পুণ্যকেশী খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম যে এই সময়ে অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল তাহা ডাক্তার ভাণ্ডারকার মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন।

চালুক্য বংশের পর—রাষ্ট্রকূট বংশের আবির্ভাব হয়। এই রাজবংশ ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করেন। ইহাদিগের শাসন-সময়ে পৌরাণিক ধর্মের প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।—

Under them the worship of the Puranic Gods rose into much greater importance than before. The days when Kings and Princes got temples and monasteries cut out of the solid rock for the use of the followers of Gotama Buddha had gone by, never to return.

Instead of them we have during this period temples excavated or constructed on a more magnificent scale and dedicated to the worship of Siva and Vishnu. Several of the grants of this Rashtrakuta princes praise their bounty and mention their having constructed temples.

ইহার পর হইতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্ত-মূলক হিন্দুধর্মের ক্রমাৎ-কর্ষ ঘটিতে থাকে। এবং তাহারই শেষ অবস্থায় ভাস্করাচার্যের জ্ঞায় মনীষীর জন্ম হয়। উল্লিখিত বৃত্তান্ত হইতে দৃষ্ট হইবে যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেও মহারাষ্ট্রদেশে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্ত-মূলক হিন্দুধর্মের প্রতিপত্তি বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। সেকালের রাজারা বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি সমধিক পক্ষপাত বা বিরাগ প্রকাশ করিতেন না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ঐ সময় হইতে ভাস্করাচার্যের সময় পর্যন্ত প্রায় ৭ শত বৎসর কাল হিন্দুধর্মের প্রবলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে ভবভূতির জ্ঞায় মহাকবি হইতে আরম্ভ করিয়া ভাস্করাচার্যের জ্ঞায় জ্যোতির্বিদ পর্যন্ত নানা শ্রেণীর স্বাধীনচিত্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ঐ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বরাহ-মিহিরের জন্ম যে দেশেই হইয়া থাকুক তিনি পূর্বোক্ত নবীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাচুর্য-কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আদ্যভট্ট খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন ও পৌরাণিক ধর্মের অভ্যুদয় আবর্ত হইবার শতাধিক বর্ষ পরে) পৃথিবীর মৈনন্দিন গতির আবিষ্কার করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। কালিদাস যদি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও নব ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয়-কালে আবির্ভূত বলিয়া নির্দেশ কবিতো পারি। বাণভট্ট, সুবল্লভ, দণ্ডী প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ লেখক এই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয়-কালেই জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ বর্তমান কালের ও মধ্যযুগের মধ্বাচার্যের নিকট অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অতি অল্প লোকেই অশ্রুত প্রকাশ করিবেন। শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ মহারাষ্ট্রদেশে প্রচারিত না হইলে ছত্রপতি মুহাম্মদ শিবাজীর চেষ্টা সফল হইত কিনা সন্দেহ। সেই শঙ্করাচার্য নব ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয় আশ্রয়

হইবার প্রায় ৪ শত বৎসর পরে প্রাচুর্য হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় বৌদ্ধধর্মের অবনতির সহিত ভারতবাসীর স্বাধীনপ্রতিভা-অবনতি-কল্পনা কতদূর সুসঙ্গত? বিশেষতঃ ভাস্করাচার্যের জ্ঞায় ব্যক্তির অভ্যুদয়কে বৌদ্ধপ্রভাবের ফল বলিয়া বর্ণনা করা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ? আশাকরি প্রতাপসিংহ বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবিষয়ে আমার সংশয় নিবৃত্তি করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীসধারাম গণেশ দেউসর।

কবির নবীনচন্দ্র সেন।

বঙ্গসাহিত্যের আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সাহিত্যগগন অন্ধকার করিয়া অনন্তে বিলীন হইয়াছে। সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে নবীনচন্দ্র আর নাই।

সে আশ্র ৩৫ বৎসরের কথা। তখন বাঙ্গালাসাহিত্যের রেনািসাঁসের (Renaissance) অর্থাৎ পুনর্জন্মের সময়। বঙ্গসাহিত্যের কার্লাইল রাজনারায়ণ বসু ইহাকে বঙ্গিমের কাল বলিয়াছেন। তখন বাঙ্গালীর চক্ষে এক অদ্ভুত বিশ্ব জন্মাইয়া ও যেন কোন নূতন বিশ্বের বিচিত্র সংবাদ লইয়া বাঙ্গালীর মুমূর্ষু প্রাণে এক নূতন আশার সংবাদ বহন করিয়া বঙ্গদর্শন আবির্ভূত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদর্শনের মহারথীরা একে একে উজ্জ্বল জ্যোতি-বিমণ্ডিত গ্রহরাজির মত ফুটিয়া উঠিয়াছেন। একে বঙ্গদর্শনের অদ্ভুতকর্মী সম্পাদকই স্বয়ং মহারথী—এক। এক সহস্র—রবীন্দ্রনাথের কথায় “আর্ন্ত বঙ্গভাষা” যখন যেখানে ডাকিয়াছে, তখন সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার সহকারীরাও নবরূপ বুদ্ধিকুশলী—বিধি-বিড়ম্বিত এ হতভাগ্য দেশে কেন, কোন স্বাধীন প্রতীচ্য সাহিত্যের কোনো গোববময় যুগেও এরূপ অদ্ভুতকর্মী সাহিত্যরথীদের একত্রে একাধারে সমাবেশ বিরল। প্রাচ্য-শাস্ত্রকোবিদ ডাক্তার রামদাস সেন, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রীক ও হিন্দু প্রণেতা প্রফুল্ল বাবু, কবির হেমচন্দ্র, পদ্মিনী কাব্যের রচয়িতা রঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদকের অগ্রজ, যাহাব সহস্র মর্মস্পর্শী বর্ণনা ও ভাষা বাঙ্গালার রচনায় আদর্শ হইয়া রহিয়াছে সেই কলাকুশলী সজীব বাবু,

অক্ষয় বাবু, যিনি “গ্রাবু” লিখিয়া সম্প্রতি বিখ্যাত হইয়াছিলেন, উদ্ভাস্ত প্রেম রচয়িতা চন্দ্রশেখর, “শক্তি-কানন” রচয়িতা ও বঙ্গদর্শনের সহকারীসম্পাদক শ্রীশ বাবু, ইত্যাদি কত রথীরই আর নাম করিব—তখনকার বঙ্গসাহিত্যের রথীদের অভ্যুদয়ের তুলনায় হেমচন্দ্রের কথার বলিলে বলিতে হয় “পর্যন্তেব চূড়া যেন সহসা প্রকাশ !” তখন উদীয়মান বঙ্গসাহিত্যের সেই মহারথীদের বচনা বন্ধ করিয়া সেই প্রতীচ্য ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা-প্রাবিত বঙ্গীয় যুবকের অনেক বৈঠকখানা গৃহেব আন্দোলন শ্রোত সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে অল্পে অল্পে পরিবর্তন করিতেছিল—

হুর্গেশনন্দিনী তখন কিছুদিন আগেই প্রকাশ হইয়া বঙ্গীয় উপন্যাস জগতে এক বিশ্বয়কর যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। চন্দ্রশেখর সেই বৎসরেই বঙ্গদর্শনে বাহির হইতেছে। সেই সময় আস্তনে ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে, গ্রন্থকাবের নাম নাই, কলিকাতা পার্শ্বব বস্ত্রে মুদ্রিত ‘অবকাশবঞ্জিনী’ নামধেয় একখানি ক্ষুদ্র গীতিকাব্য বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের হস্তে সমালোচনাব জন্ত পৌছিল।

বলা বাহুল্য, কবি ইতিপূর্বেই বঙ্কিমের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রতিভার বিকাশে ভাবী কালে যাহারা বঙ্গীয় সাহিত্যে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের গুণগ্রহণে বঙ্গদর্শন তখনই উদ্যমান ছিল না। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমী সার্টফিকেট যাহারা পাইলেন তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে সেদিন হইতেই যশস্বী হইলেন—এ অনন্তজলন্ত সৌভাগ্য ও ক্ষমতা আর কোনো বঙ্গীয় মাসিক পত্রের ভাগ্যে ঘটে নাই। শুনা আছে যে “এডিনবরা রিভিউ” যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সম্পাদক জেফ্রি, মেকলে, লকহার্ট, সিডনি স্মিথ, নিউম্যান প্রভৃতি রচনাবসিকদের (Stylist) লেখার গুণে তদানীন্তন লেখকেরা নিজ নিজ ক্ষমতামুসারে পুরস্কার বা তিরস্কার লাভ করিতেন—উক্ত রিভিউয়ের সম্পাদক ও লেখকেরাই যেন তদানীন্তন ইংরাজী সাহিত্যের রাজস্বও পরিচালনা করিতেন। অতিমাত্র লোকপ্রিয় গ্রন্থও “এডিনবরা” লেখকদের সম্মার্জনীর পর একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে এরূপও দেখা গিয়াছে—ষাটশ সংস্করণ অতীত মণ্ট্‌গমারির (জেমস্ নহে রবার্ট) “Satan” কাব্য তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সব সময়ে যে রিভিউয়ের

কশাঘাত উপযুক্ত স্থলে প্রযুক্ত হইত তাহা নহে ; অভিজ্ঞ পাঠকেরা Keatsএর Hyperionএর কথা স্মরণ রাখিবেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের কীর্তিউদ্ভাসিত লগাটে এরূপ ছবপনের কলঙ্ককালিমা কখনও কেহই অর্পণ করিতে পারে নাই।

সে যাহা হউক, নবীনচন্দ্রের অবকাশবঞ্জিনী ১২৮০ সাল অর্থাৎ ২য় বৎসবেব বঙ্গদর্শনে বৈশাখ সংখ্যায় সমালোচিত হয়। উক্ত অমুকুল সমালোচনায় কবি একেবারে সাধারণ্যে পরিচিত হইলেন। সে অবধি বঙ্গদর্শনেও “শ্রীন—” স্বাক্ষর বিশিষ্ট কবিতার রচনা নৈপুণ্যে বঙ্গীয় পাঠকেরা বিশ্বয়চমকিত হইতেন। তাহার পর বর্ষে পলাশীর যুদ্ধ সমালোচিত হইয়া নবীনচন্দ্রকে বঙ্গ-সাহিত্যের অতি উচ্চস্থানে স্থাপন করিয়াছিল।

তাহার পর তাহার পরবর্তী রচনাগুলি এ ত্রিশ বৎসরে তাহার যৌবনে অর্জিত যশঃ ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছে মাত্র।

বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্থান কোথায় ? বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে তিনি কোন্ কোন্ অমূল্য রত্নরাজি প্রদান করিয়াছেন, উহার কি কি গুণে অমূল্য তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার এস্থান ও সময় নহে। ভবিষ্যৎদৃষ্টিয়েরা তাহার যথাযথ বিচার করিবেন—এরূপ বিচার করিতে আমরা সম্যক কৃতকার্য হইব না। মহাকবির প্রতিভা অপ্রলিহ গগনচুম্বী শৈলশিখরের তুল্য। উদ্ভূতশৃঙ্গবিহারী চমরী ও মৃগযুগ্মেব অমুসরণকারী কিরাতেরা শৃঙ্গের উচ্চতা নিরূপণে সমর্থ, কিন্তু গিরির তলভাগে যাহারা, মেঘম্পর্শী শিখরদেশের অভ্রমণ্ডিত রহস্তকুহেলিকা, তাহার অন্তর্যমান রবিসমুদ্রের ঐক্সজালিক বর্ণচ্ছটা, তাহার উবার মুকুটজ্যোতিঃ ও প্রান্তলীন বর্ণরাগের প্রতি প্রলুপ্ত প্রশংসমান নেত্রে চাহিয়া থাকেন মাত্র, সেই দুবারোহ শৈলরাজির মহিমা নিরূপণে তাঁহার সম্পূর্ণ অসমর্থ। কবির সমকালবর্তী আমাদের অনেকটা সেই দশা। তথাপি একেত্রে অক্ষম হইলেও তাঁহার অমর কার্যেব একটা সন্মিলিত আভাস দেওয়া আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(অবকাশবঞ্জিনী তাহার প্রথম ও শেষ গীতিকাব্য। বিভাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির রচনা হইতে

রবীন্দ্রনাথের সুমধুর গীতিকাব্যের মনোমোহন বঙ্গ-সাহিত্যগগন পরিপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনার স্থলে গীতিকাব্যের কথাই ব্যাখ্যায় বলিয়াছিলেন যে গীতের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও যদি সেই এক উদ্দেশ্য হয় তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিণতি তাই গীতিকাব্য। বিজ্ঞাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সকলেই গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ সমশ্রেণীর বচনায় নবীনচন্দ্রের বিশেষত্ব কোথায়? সংক্ষেপে বলিতে গেলে বোধ হয় নবীনচন্দ্রের গীতিকাব্যে বিশেষত্ব তাঁহার ভাষার সবল পৌরুষতায়, তাঁহার শব্দচাতুর্য্যে এবং উক্ত শব্দের প্রয়োগ পটুতায়। রবীন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়ে তুলনা করিলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত স্থানে বলিয়াছিলেন যে অবকাশরঞ্জিনীর কবি শব্দচাতুর্য্য ও ছন্দোমাদুর্য্য বিস্ময়কর। আশ্চর্য্যজনক উক্তিমাত্র-বিশিষ্ট অব্যক্তব্য কথা, বাহ্য গীতিকাব্যের আশ্রয়, তাহাতেও নবীনচন্দ্রের কম পটুতা নাই। কোনো পক্ষের অগ্রিয় তুলনা করা এস্থলে আদৌ সমুচিত নহে। তবে বলিলে অত্যয় হয় না যে বর্তমান গীতিকাব্য সাহিত্যে ছন্দোমাদুর্য্য ও গীতিকাব্যোপযোগী শব্দ চয়নে রবীন্দ্রনাথ যে বিস্ময়কর পটুতা দেখাইয়াছেন তাহা ভারতচন্দ্র ব্যতীত বাঙ্গালার আর কোনো কবিই সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই, নবীনচন্দ্রও নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষা কোমল, পৌরুষভাববর্জিত, (তাঁহার বর্তমান স্বদেশী সঙ্গীত বলিতেছি না) যেন কোমলকায় লতার ভায় লতাইয়া পড়িতেছে। নবীনচন্দ্রের আর গীতিকবিতা নাই—তাঁহার ইহা পূর্ব্বের রচনা হইলেও যে সকল মোহিনীসৃষ্টিগুণে বা যে সব অপূর্ণ রসের সফল অবতারণার কবির কাব্যকে উচ্চ আসন প্রদান করা যায় সে সব গুণ অবকাশরঞ্জিনীতে নাই, অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একথা বলিয়াছিলেন।

“পলাশীর যুদ্ধের” ভাষা আরও সুস্পষ্ট, সুব্যক্ত, ও সবল—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় “জালাময়ী অগ্নিতুল্যা।” উহা বারবণের অগ্ন্যুদগারের মতই তীব্র ও উগ্র। কবি যেন একাব্যে আপনাকে যথার্থ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এরূপ সবল ভাষা ও বর্ণনা ভদ্রী হেমচন্দ্র ব্যতীত অল্প কোনো

বঙ্গ কবির কাব্যে পাওয়া হুঙ্কর। এই আশ্রয় গিরির অগ্নি-শ্রাবের সঙ্গে করুণামন্দাকিনীর পূত ধারা বহিয়া চলিয়াছে। বহুবৎসর পূর্ব্ব পলাশীর যুদ্ধ পড়িয়াছি—কিন্তু এখনও তাহা বর্ষিত “ব্রিটিশের রণবাহু” কানে লাগিয়া আছে। বস্তুতঃ, সংগ্রামে সংগ্রামস্থল ও বিজয়ীর জয়গান নবীনচন্দ্রের মত এমন অদ্ভুত পটুতার সহিত বাঙ্গালীর কাব্যে আর কেহও শুনাইতে পারেন নাই—বর্ণনাত্মক ভীষণ সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি কে সম্যক কল্পনা করিতে পারিয়াছে?—সেখানে অবশ্যস্বাভাবিক উৎকল সেনার দ্বর্ষিত উল্লাস ধনি শুনিব, না সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে সৈনিকের বিরহকাতর অন্তঃকরণের ব্যথা—“প্রিয়ে কেরোলাইনার” উদ্ভিষ্ট মনো-চ্ছ্বাসের কথাগুলি শুনিব, না সেনাপতির প্রণয়িনী ‘মেক্সিকানের’ উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত অশ্রুর মুক্তাবিস্মুর প্রতি লক্ষ্য করিব, না নির্জন কারাগারে পতিত্বতা নবাবপত্নীর ‘কেন চুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল’—এ হৃদয়-দ্রাবী গীতিতে গলিয়া যাইব? পলাশীযুদ্ধের কবি বিস্ময়কর কৌশলসহকারে এই দুই রসের একত্রে অপূর্ণ সমাবেশ করিয়াছেন। বীরের হৃদয়ের বহিরাবরণ কেবল কঠিন, তাঁহার চর্মবস্ত্রাদিত হৃদয় কিন্তু করুণ ভাবরসে কোমল; কবি একথা ভুলেন নাই।

রঙ্গমতী, পলাশীর ও রৈবতকের, এ দুই রচনার সঙ্কীর্ণ—এ কাব্যের প্রতিছব্দে কবি যেন আভাস দিতেছেন যে তিনি বিষয়াস্তরে ও স্থানান্তরে ব্যাপ্ত থাকিবেন—To-morrow to fresh fields and pastures new—কৃষ্ণের জীবন ও কাব্য ভবিষ্যতে যে তাঁহার সঙ্গীতের বিষয় হইবে—এ গ্রন্থে তাহার পূর্ণ আভাস আছে। তাহা ছাড়া, গ্রন্থের অনেক স্থলের বর্ণনা ও শব্দচিত্র মনে লাগিয়া থাকে। এ গ্রন্থও বহুপূর্ব্ব পড়িয়াছি—অনেকবার পড়িয়াছি—সকল কথা এস্থলে সমালোচনার দরকার নাই—তবে জুমিয়া বালার গীতি ‘যে দেশে রয়েছে তুমি’ ইত্যাদি এখনও ভুলিতে পারি নাই। সে সুন্দর গীতটী বঙ্গ সাহিত্যে অপারূপ অনমুল্যবস্তু হইয়া আছে। কবি যে উদ্দেশ্য পলাশীর যুদ্ধে প্রতীয়মান—পর জীবনে কবি যেন সে ক্ষেত্রেই পরিত্যাগ করিলেন—অনেকে এ পরিবর্তন অথবা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন—অনেকে

আবার মনে করেন—যে পরবর্তী কাব্যে যেন কবির অবনতি হইয়াছে তাঁহার মানসিক তত্ত্বচ্ছেদ হইয়াছে কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় এরূপ আশঙ্কা কোন কারণ নাই। পলাশীক্ষেত্রে যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মবিদ্বেষ ভারতের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে—কবি তাঁহার দূরদৃষ্টিতে অতীতের ভারতীয় সমস্ত ঐতিহাসিক রণক্ষেত্র খুঁজিয়া দেখিলেন—সেই একই লোককাহিনী সেই ভ্রাতৃদ্রোহ সেই গৃহবিবাদ, সেই বিশ্বাসঘাতকতা। ইহাতে একটা মীবজ্ঞাঙ্কর ও একটা জরজর কেবল ধরা পড়ে নাই। তাহার পর সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে আর কোন মহাপুরুষ এই “ক্ষত ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবতকে” এক মহা ধর্মবাহ্যে স্থাপন করিতে প্রয়াস পাউয়াছিলেন কিনা। তাঁহার মানস চিত্রপটে কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উজ্জল মূর্তিই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই বরণ্য মূর্তিকে সম্মুখে রাখিয়া কবি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং যে জাতীয়ভাব পলাশীর যুদ্ধে বিকশিত, সেই ভাবের ধারাবাহিকতা কুরুক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিস্রবিত বলিয়াই বোধ হয়।

তবে এই সমগ্রশ্রেণী চারি খানি কাব্যের সমালোচনা যোগ্যতর ব্যক্তি করিয়াছেন—যিনি মাননীয় শ্রীযুক্ত হীবেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা পাঠ করিয়াছেন তাঁহার আব এ সম্বন্ধে কোনো কথা অধিক জ্ঞাতব্য নাই। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ও এসময়ে কবি সকল কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা, বিশেষতঃ দোষের আলোচনা, আদৌ সমীচীন হইবেনা। বিবেচনায় আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁহার কাব্যের এরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি। প্রবন্ধান্তরে ও সমগ্রান্তরে তাঁহার জীবন ও কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে সেই অসাধারণ মহাকবি কোন্ গুণে অসাধারণ ছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে অজ্ঞাত মহাজনের জ্ঞায় তিনি বিশেষ কোন্ রত্নদান করিয়া গেলেন সে সম্বন্ধে আভাস না দিলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের সে বিশেষ দান কি?—আমাদের ক্ষুদ্র বোধে সেটা এই—তিনি অপূর্ণ প্রতিভাবলে কবিজনোচিত হৃদয় ভবিষ্যদ্বাণীর

গুণে ভারতের ভবিষ্য ইতিহাসের এক আভাস দিয়া গিয়াছেন। কোন্ পথে কি ভাবে চালিত হইলে ভারতের পূর্ব জ্ঞানগরিমা, পূর্ব ঐশ্বর্য বীৰ্য, পূর্ব শক্তিসিদ্ধি ফিরিয়া আসিবে—এক কথায় কোন্ পথে চালিত হইলে আবার ভারত ‘মহাভারতে’ মহাধর্মসাম্রাজ্যে পরিণত হইবে, কবি তাঁহার চিত্রিত কুরুক্ষেত্রের সে পথের পূর্ণ ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা বোধ করি ইহাই তাঁহার বিশেষ দান। বঙ্গীয় সাহিত্যের অমুরাগী অনেক বিজ্ঞ পাঠকদেরও নিকট কবির শেষোক্ত কাব্যের বৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস সমাদৃত হইতে দেখি নাই। পূর্বে বলিয়াছি তাঁহা এতলে কবির মানসিক তত্ত্বচ্ছেদের আশঙ্কা করেন। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে আশঙ্কা কতদূর অমুক। বস্তুতঃ তাঁহা যেখানে কবির প্রতিভার গৌরবের হানি দেখিতে পান সেখানেই তাঁহার প্রতিভার সার্থকতা। কয়েক বৎসর পূর্বে নব্যভারত সম্পাদক মহাশয় ও হীবেন্দ্র বাবু মধ্য কুরুক্ষেত্রের মৌলিককল্পনা লইয়া অনেক বাকবিতণ্ডা হইয়াছিল। এতলে সে তর্কের পুনরবতারণা নিম্নরোজন। এতলে সে আলোচনা কবি না—তবে উভয়ের কল্পনায় যে এক ফল—সেই ফল, সেই উদ্দেশ্য, এই মহাভাবত পুনঃসংস্থাপনকর্তা কৃষ্ণের অবতার-বাদ সংস্থাপন। কুরুক্ষেত্রের ১ম সর্গে ব্যাসের মুখে এ উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ব্যাস সংশয়ী শিষ্যকে ভারত ও ধর্মোতিহাসের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বুঝাইতেছেন :—

“—কর দমন।

সর্বত্র ধর্মের গ্রানি অধর্ম প্রবল,—
সাধুদেব হাহাকার, দুঃস্থত দুর্জন
বধিতেছে নিরস্তর পাপ হলাহল।
অধর্মের অভ্যুত্থান, এই পাপভার
করিতে মোচন, বৎস! করিতে প্রচার
মহারাজ্য ধর্মবাহ্য, করিতে প্রচার
ভাবতে মহাভারত; কুরু অবতার।
অপূর্ণ জীবনলীলা! কংসের নিধন,
উগ্রসেনে রাজ্যদান, আত্মনির্ভরসন,
নিবারিতে রক্ত শ্রোত সমুদ্রের পার।

সেই জয়াসম্বন্ধে, অদ্বৈত কৌশল,—
 কারায়ুক্তি, রাজমেষ বস্ত্র নিবারণ ;
 রাজহুয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রবল
 বিনা যুদ্ধে কি কৌশলে হইল স্থাপিত !
 সর্বত্র নির্লিপ্ত কৃষ্ণ, সর্বত্র নিকাম,
 সর্বত্রই দয়াদর্শ আদর্শ মহান্।”

নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ ভারতবর্ষকে—

বাধি ধর্ম নীতিপাশে
 মিলাইব অনায়াসে
 জননীর খণ্ড দেহ ; করিয়া চালিত
 জ্ঞানাসুশে, ভেদ জ্ঞান করিব রহিত।
 শিখাব একত্ব ধর্ম,—
 এক জাতি, এক ধর্ম,
 এক্রূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,
 সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ।”

এইরূপ এক বিশাল মহাত্মার, এক বিরাট ধর্ম-
 সাম্রাজ্য গঠিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন—ইহাব ফল কুরুক্ষেত্র,
 ইহার ফল ‘ভূতলে অতুল’ ধর্মশাস্ত্র গীতা, ইহার ফল
 ব্রাহ্মণ্যের আবহমানকাল প্রতিষ্ঠিত একদেশিতা বিনাশ,
 ইহার ফল আৰ্য্য অনাৰ্য্যের যুগান্তর ব্যাপী সংঘর্ষের ধ্বংস ও
 ইহার চব্বম অমৃতময় ফল কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ অকৌহিলী
 সেনার ভস্মরূপ হইতে এক মহা ধর্মসাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান।

(নবীনচন্দ্র এই বিশাল চিত্রফলকে মহর্ষি ব্যাসের
 পুতপদাঙ্ক অমুসরণ করিয়া, যে সব বিশাল চরিত্র চিত্রিত
 করিয়াছেন, তাহাও ঐরূপ বিশাল, বিরাট, উচ্চ—‘যেন
 স্পর্শে দিনমণি।’ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, অশ্বত্থা, শৈলজা, অভিমুখ্য,
 উত্তরা, অক্রূৎকার,—প্রত্যেকটি উজ্জল স্পষ্ট, সুব্যক্ত,
 প্রত্যেকটি নিজের স্বাতন্ত্র্যে পূর্ণ অভিব্যক্ত। বিশেষতঃ
 শ্রীকৃষ্ণার্জুন, সেই নরনারায়ণের বিশালোজ্জল চিত্রপট
 যেন চিত্রফলক ছাপাইয়া উঠিয়াছে, বর্ণ এতই উজ্জল !
 নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ স্বজাতিপ্ৰীতি ও দেশকালের সঙ্গীর্ণ
 গভী ছাড়াইয়া বিশ্বসংসারকে এক ধর্মসাম্রাজ্যে গড়িতে
 চাহিয়াছেন, সে সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণ শূত্র, আৰ্য্য অনাৰ্য্য, নীচ
 উচ্চের কোনো ভেদাভেদ নাই—জাতি ও দেশের সঙ্গীর্ণতা
 এক মহান্ সার্বজনীন সার্বভৌমিক ভাবে বিলীন হইয়া

গিয়াছে। তাই রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের মুখে কবি বলাইয়াছেন
 যে—

“কলাফল নারায়ণ পদে সমর্পিয়া
 এই কর্তব্যের স্রোতে যাইব ভাসিয়া।
 এক ধর্ম, এক জাতি,
 এক রাজ্য, এক নীতি,
 সকলের এক ভিত্তি সর্বভূতহিত ;
 সাধনা নিকাম ধর্ম,
 লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,
 একমেবাদ্বিতীয়ম্ !—কবিব নিশ্চিত
 ওই ধর্মরাজ্য মহাত্মার স্থাপিত।”

দেখুন হেমচন্দ্র বাহার “একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে” ইত্যাদি
 বাক্যে আভাস দিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র পুর্বাণেতিহাস সিদ্ধ
 মন্বন করিয়া যে অমূল্য কৌশলনিধি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,
 নবীনচন্দ্রের অমৃতময়ী লেখনী সে কল্পনাকে অপূর্ব জ্যোতি-
 বিমণ্ডিত কবিয়া বঙ্গীয় পাঠকের নেত্রসমীপে উপস্থিত
 করিয়াছেন। ইহাই কবির শ্রেষ্ঠ—ইহাই কবির বিশেষ
 দান—একপ ভবিষ্যৎদীর্ঘেবা বিচার করুন—নবীনচন্দ্রের
 স্থান কোথায় ? কত উচ্চ !

ইদীনীন্তন কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি আর বঙ্গসাহিত্যের
 সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখেন নাই—শাস্ত্রসমাহিতচিত্তে
 জীবনের শান্তিময় পরিসমাপ্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া-
 ছিলেন। নিজ প্রিয় গ্রামে—প্রিয়তম পরিবারবর্গে পরি-
 বেষ্টিত হইয়া তিনি জীবনলীলা শেষ করিবেন ইহা তাঁহার
 অনেক দিনের আশা ছিল। তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত
 আত্মজীবনচরিতে তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে এই
 ছঃখময় জীবনমরুতে বাণ্যে ষ্ট্রাহাদের হারাইয়াছিলেন,
 সেই জনকজননীর সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষার জন্ত তিনি
 সতৃষ্ণ নয়নপাত করিয়া আছেন। কে আশা করিয়াছিল
 যে তাঁহার সে প্রাণেব আকাঙ্ক্ষা ভগবান এত শীঘ্রই
 পূর্ণ করিবেন ! কে জানিত যে এত শীঘ্রই আমরা তাঁহাকে
 হারাইব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মধু বীণা বর্ণনে ও
 নাম কীর্তনে, একবার হেলায় শ্রদ্ধায় যে নাম গ্রহণ করিলে
 ঋষি বলিয়াছিলেন যে আমরা এ দ্বন্দ্বের স্রবসাগর উত্তীর্ণ
 হইতে পারি—‘সকলদপি পরিশীতং হেলায় শ্রদ্ধয়াবা’—সেই

শ্রীহরির লীলা বর্ণনা করিয়া নিজের জীবন ভক্তিময় করিবেন,
এটা তাঁর শেষ জীবনের ঐকান্তিক আশা ছিল। তিনি
সে কার্যে কতদূর সক্ষম হইয়াছেন ভবিষ্যৎদৃষ্টিয়েরা তাহার
বিচার করুন। কিন্তু এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে
পারে যে তিনি আমাদের হুঃখিনী বঙ্গভাষাকে যে অমূল্য
রত্নহারে ভূষিতা করিয়া গিয়াছেন—সে রত্নে সমৃদ্ধা বঙ্গ-
ভাষা সগর্বে বিদেশীকে আপনার বত্নপেটিকা উন্মোচন
করিয়া দেখাইতে পারিবেন, ও যত দিন বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গ-
ভাষা ও বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকিবে তত দিন নবীনচন্দ্রের
নাম সূবর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে ও কবি নবীনচন্দ্র “যশঃ-
স্বর্গে অন্নান ববমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমর-
গণেব সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।”

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

উপেক্ষিত।

প্রভাতে সাক্ষায়ে পায়ে ধূলিকণাহীন
বহুদিন সাধনার পূজা উপচার
লইয়া আসিহু যবে দেবতার পদে,
ব্যাকুল বাসনাভরে দিতে উপহার,
দেখিহু সহসা হ'ল মন্দিরের দ্বার
রুদ্ধ, হায়! চাপি খাস-দাঁড়ানু কাতরে।
উপহাসি তীব্রস্বরে যেন বার বার
রুদ্ধদ্বার শব্দধ্বনি ধ্বনিল গম্ভীরে।
উপেক্ষিত মত আমি রহিহু বাহিরে
নীরব নিরাশাখানি সাথে লয়ে মম।
গভীর স্তব্ধতাবাশি শিরের উপরে
জাগিয়া রহিল স্থির অভিষাপসম।
শুনিহু অর্চনাবাগী মন্দির অধীর
উঠিছে মন্দির মাঝে ভক্তপ্রাণ হ'তে।
আমাব প্রার্থনা বার্থ হুবাশার মত
কাদি উঠে প্রতিহত রুদ্ধ দ্বার পথে।
দেখিহু আবতি দীপে উজ্জ্বল মন্দির,
আমার পূজার সেখা নাহি শুধু স্থান।

আশীষ বচন শত ধ্বনিছে গম্ভীর
নীরব বেদনা খানি শুধু পেহু দান।
প্রভাত-আলোক-হাসি ক্রমে গেল নিবে,
সন্ধ্যার ছায়াটি নামি এলো ধীরে ধীরে ;—
নিরর্থ তপস্ত্যামত মন্দির বাহিবে,
আমার অর্চনা খানি র'ল শুধু প'ড়ে।

লজ্জাবতী বসু।

চিত্রপরিচয়।

গত ডিসেম্বর মাসেব শেষ সপ্তাহে মাদ্রাজে ভারতবর্ষীয়
সমাজসংস্কার সভার যে অধিবেশন হয়, মাননীয় বিচারপতি
শ্রীযুক্ত শঙ্কবন্ নায়াব তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন।
তাঁহার মূর্তি বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইল।

নয়জন নির্বাসিত বাঙ্গালীর মধ্যে কয়েকজনের ছবি
আমরা ইতিপূর্বে দিয়াছি। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত
মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার ছবি দিলাম।

ওস্তাদ রামমূর্ত্তি।

আজকাল সকলের মুখেই রামমূর্ত্তি ওস্তাদের নাম ফিরি-
তেছে। রামমূর্ত্তি অশেষ বলশালী পুরুষ। তিনি বহু
প্রদেশে আপনার বলের পরিচয় দিয়া সংপ্রতি বাংলা দেশে
আসিয়াছেন। নিজে আমরা তাঁহার পরিচয় সঞ্চলন করিয়া
দিলাম।

ইহাব পূরা নাম শ্রীযুক্ত রামমূর্ত্তি নাইডু। ইহার
পিতার নাম মৃত নারায়ণ স্বামী নাইডু রায় বাহাদুর।
ইনি বিজয়নগরপ্রদেশের পুলিশ ইন্সপেকটর ছিলেন। রাম-
মূর্ত্তির যখন মাত্র দুই বৎসর বয়স তখন তাঁহার মাতার
মৃত্যু হয়। ৩৪ বৎসর হইল-তাঁহার পিতারও ৪৫ বৎসর
বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। এই হিসাবে ওস্তাদ রামমূর্ত্তির বয়স
বেশি নয়। তাঁহাকে দেখিলে ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক
বোধ হয় না। ইহাবা মাদ্রাজ প্রদেশের অধিবাসী।

বাল্যকালে রামমূর্ত্তি রোগা ছিলেন। পাঁচ বৎসব
বয়সে তাঁর হাঁপানি রোগ হয়। চুরট ব্যবহাব করিয়া
সে রোগ সারিয়া গিয়াছে। সেই সময় তিনি প্রাথমিক

পাঠশালার পড়িতেন। তৎপরে উচ্চ বিভাগে প্রবেশ করেন। সেই শৈশবে ভীম, হুম্মান প্রভৃতি পৌরাণিক বীরগণের কাহিনী শুনিয়া তাঁহার বললাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। দশ বৎসর বয়সে স্কুলের ব্যায়ামের আখড়ায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি সকল রকম খেলায় যোগ দিতেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর গোলাম ও অপরাপর পালোয়ানের খ্যাতি তাঁহাকে অধিকতর উত্তেজিত করে। তদনন্তর ব্যায়ামের প্রকার ও সময় বাড়িতে থাকে। দুই বৎসর জ্ঞাণ্ডোর ডায়েল কসরতে কোনো ফল না পাইয়া তাতা ত্যাগ করেন এবং সতর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জিম্জামাটিক করেন। তখন বিদেশী রীতি ছাড়িয়া ঘেণী ব্যায়াম ডন, বৈঠক প্রভৃতি অবলম্বন করেন। এই সময়ে তিনি এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়া কিঞ্চিৎ ইংরাজি ও সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সূক্ষ্মত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই সত্য আবিষ্কার করেন যে বলাধান ও শরীর পুষ্টির একমাত্র উপায় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ, মনোবোগ দিয়া এমন কোনো ব্যায়াম করা আবশ্যক যাহাতে সর্কশরীরের পেশী সুগঠিত হইয়া উঠে। পেটেব পেশী পুষ্ট করিতে প্রাণায়াম করিতে হয়।

জ্ঞাণ্ডোর ব্যায়ামরীতি ঠিক এইরূপ। জ্ঞাণ্ডোর ডায়েল কসরতকারীকে সর্কদা আপন কর্মের দিকে সচেতন রাখে, ব্যায়াম অভ্যাসকৃত হইয়া পড়ে না। পেটের পেশী গঠনের জন্য শুটয়া উঠিয়া বসার যে কসরত তাহা যোগেরই একটি অঙ্গ, আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। জ্ঞাণ্ডোর বলসাধনের মূলমন্ত্রও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। এই নিয়মে রামমূর্তি যে কেন সফলতা ও সম্ভাব লাভ করেন নাই বলা যায় না।

ওস্তাদ রামমূর্তি প্রত্যহ ভোর তিনটা হইতে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ব্যায়াম করেন, তাহার মধ্যে বারো মাইল পথ না ধামিয়া না জিরাইয়া দৌড়ানো প্রধান। আজ কাল খেলা দেখানো ছাড়া আর অন্য সময়ে ব্যায়াম করেন না।

স্যাণ্ডো এদেশে আসার পর তাঁহার মনে কসরত দেখাইয়া অর্থোপার্জনের ইচ্ছা হয়। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহার সম্মুখে রামমূর্তি প্রথম আপনার বলের পরিচয় দেন। তদবধি ভারতের বিভিন্ন

এদেশে ঘুরিয়া আপনার শক্তিলীলা দেখাইতেছেন। সমগ্র ভারতভ্রমণ শেষ করিয়া ওস্তাদজীর বিলাত যাইবারও বাসনা আছে।

মধ্যাহ্নে একটার সময় একপোয়া চালের ভাত ও তৃপযুক্ত ডাল তরকারী ইহার প্রধান আহার, মাছমাংসে ইহার রুচি নাই। খাওয়ার সময় অল্প ঘি খান, দুধ খান না। প্রাতে নয়টা বসন্ত সময় 'ঠাণ্ডাই' সরবত পান কবেন। এই সরবত তৈয়ারার প্রক্রিয়া এইরূপ—বাদাম, মোরী, গোল-মরিচ, ছুটি ছোটএলাচ, সর্ক মোট একসের সারাবাত জলে ভিজানো থাকে। প্রভাতে হাঁকিয়া পিশিয়া চিনির সহিত সরবত হয়। এই সরবত পানের আধঘণ্টা পরে খানিকটা মাপন আহার হয়। বৈকাল চারটার সময় আবার ঠাণ্ডাই সরবত, এক পোয়া গৃহপ্রস্তুত রাবড়ি এবং ঘিচিনিমধু মিশ্রিত পানীয় গরম করিয়া পান করেন। ঘি ও মধু মিশ্রিত হইলে বিষ হয়, বৈদ্যক শাস্ত্রের মত। মধু গরম করিলেও বিষ হয়। এই বিবিধ বিষ হজম করা বিষম ক্ষমতাবান পাকস্থলীর কাজ সম্ভব নাই।

ওস্তাদজীর বক্ষস্থলের বেড় সাধারণত ৪৮ ইঞ্চি; বিস্তারিত অবস্থায় ৫৭ ইঞ্চি। খাড়াই ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। ওজন ২১ মণ।

ইনি আপনার বলের পরিচয় নিত্য শত শত লোকের সম্মুখে দিতেছেন। মাথা ও পা দুইটি কাঠের উপর রাখিয়া সমস্ত শরীরটা শক্তের উপর লম্বা করিয়া একটা পুনের মত শয়ন করেন। সেইরূপ অবস্থায় বকের উপর পাথর চাপাইয়া দুইজন পলোয়ান দুইটা লোহার প্রকাণ্ড হাতুড়ি মারিয়া সেই পাথর চুরমার করিয়া দেয়। ওস্তাদজী মাটিতে উপুড় হইয়া শুইলে ছয়জন পলোয়ানে একখানা ওকাণ্ড পাথর গড়াইয়া আনিয়া কষ্টে কষ্টে তাঁহার পিঠের উপর চাপাইয়া দেয় এবং সেই পাথরের উপর আরো তিনখানা বড় বড় পাথরের টালি রাখিয়া হাতুড়ির আঘাতে একে একে তিনখানা টালিই ভাঙা হয়। তার পর সব লোক সরিয়া গেলে প্রকাণ্ড পাথরখানা ওস্তাদজী পিঠ হইতে আপনিই ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেন। ওস্তাদজী চিত হইয়া শয়ন করেন। চুখানা গোরুর গাড়ী লোকে পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার বকের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, একটা ঢাকা বকের

উপর দিয়া আর একখানা উরুর উপর দিয়া যায়। সর্কীপেক্ষা বলের পরিচয় ঘাড়ের জোরে মোটা লোহার শিকল হেঁড়া এবং ১২ ফোড়ার জোরের চলন্ত মোটর গাড়ী পিছন হইতে টানয়া তাহার গতিবেগ বোধ করিয়া ধামান। ইনি স্যাণ্ডোকে বল পরীক্ষায় আহ্বান করিয়াছিলেন, তাণ্ডো কিন্তু সে আহ্বান গ্রহণ করেন নাই।

গুস্তাভ রামমূর্ত্তি সমগ্র ভারতবাসীর দুর্বল অখ্যাতি দূর করিয়াছেন। বাঙালীর 'ভেতো' অপবাদও মোচন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন তাত খাওয়াই দুর্বলতার কারণ নহে। মনের বলই প্রধান বল। গুস্তাভ রামমূর্ত্তি শীঘ্রই তাঁহার ব্যায়ামরীতির এক পুস্তক ইংরাজিতে লিখিয়া প্রকাশ করিবেন। পরে ভারতীয় সর্কভাষায় তাহার অনুবাদ হইবে।

আমরা সর্কাস্ত্রকরণে গুস্তাভ রামমূর্ত্তিকে অভিনন্দন করিতেছি। তাঁহার বিজয় ভারতেরই বিজয়।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

গণেশ ও বেদব্যাস।

মুখপত্ররূপে যে রতিন চিত্রখানি সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা উদীয়মান চিত্রশিল্পী ঐযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানি হৃদয় চিত্রের প্রতিলিপি। মৌলিক চিত্রখানি দেখিবামাত্রই হাইকোর্টের জজ ঐযুক্ত উদয়চন্দ্র মহাশয় স্বদেশে বাইবার জন্ত প্রস্তুত হন। তিনি অমুগ্ধ করিয়া সেই চিত্রের যে কটোপ্রাক লইতে দিয়াছিলেন তাহারই সাহায্যে ঐযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় এই হৃদয় রতিন প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। মূল চিত্র সমুখে না থাকাতোও চিত্রপ্রতিলিপি অতি হৃদয় ও প্রায় মূলমুগ্ধ হইয়াছে। কেবল বেদব্যাসের কাগড়ের রং গৈরিক না হইয়া প্রায় লাল হইয়া গিয়াছে।

এই চিত্রের ইতিহাস হিন্দুসাধারণের অপরিস্রব। তথাপি সংক্ষেপে ইহা বিবৃত হইতেছে। ব্যাসদেব যখন মহাভারত রচনা করিতে সজ্জ করিলেন তখন একজন যোগ্য লেখক আর জোটে না। অবশেষে অনেক তাবির। চিন্তিয়া গণেশকে ধরিলেন। গণেশ বুদ্ধির অস্বাভাব, কোপিত : সেবতা—গণেশ : চার হাত চালাইলো লিখিবেন ভালো। গণেশও রাজি হইলেন, এই সর্ত্তে, যে তিনি লিখিতে লিখিতে থামিবেন না, অপেক্ষা করিবেন না—ব্যাস বলিবেন অনঙ্গল, তিনিও লিখিবেন হরদম। ইহার পাটী ব্যাস আবার সর্ভ করিলেন, ভালো, তোমার আমার জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না, কিন্তু তোমাকে প্রত্যেক প্রাকের অর্থ বুঝিয়া লিখিতে হইবে। তথাস্ত, গণেশ স্বীকৃত হইলেন। লেখা আরম্ভ হইয়াছে। গণেশ দুই হাতে কাগজ ও অপর দুই হাতে কলম ধরিয়া কলের মত দ্রুত লিখিতেছেন। তখনকারকালে শোষণ কাগজ ছিল না, চূড়ের পুটুলি দিয়া কালী শুক করা হইত। গণেশ শুড়ে চূড়ের পুটুলি ধরিয়া লেখা কাগজের কালী শুখিতেছেন আর

হুমিতে রাখিতেছেন। গণেশের বাহন ইঁদুর। সেও নিশ্চিন্ত নাই, সে, বাহাতে লিখত পাতাগুলি উড়িয়া না যায় ততক্ষণ, কাগজ-চাপার কাজ করিতেছে। গণেশের চার হাত, শুড় কড়ি, কাগজ চাপাও সম্মান, তাহাকে তুলিয়া বসাইতে হয় না, সে আপনাই তড়াক করিয়া লেখা কাগজে লাকাইয়া বসে। ব্যাসদেব ত অস্থির, গণেশের লেখার জন্ত ব্যাক্রম্য জোপান্ন দিতে পারেন না, তখন তান কুটিলতা অবলম্বন করিয়া মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য শ্লোক রচনা করিতে লাগিলেন, সেই ব্যাসকুটের অর্থ ভাবতে গণেশের বেটু হাবলধ হইতে লাগিল, সেই অবসরে ব্যাসদেব অনেকখানি রচনা করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সমগ্র মহাভারত রচিত ও লিখিত হইয়াছিল।

চিত্রের আশ্রিত গণেশের মুখপ্রত্যেক বুদ্ধি, মনোযোগ, তেজস্বিতা ও আনন্দ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দুই পাশ কান খাড়া করিয়া ব্যাসের প্রতিটি কথা ধারবার ব্যস্ততা ও হৃদয় অঙ্কিত হইয়াছে। মানবের প্রাণের মুখে মানবোচিত ভাবের অরোপ ও প্রকাশ অতি কঠিন। মনোবিশিষ্ট হইতে সম্যক কৃতকাব্য হইয়া আশ্রিত ক্ষমতার হৃদয় পারচয় প্রদান।

ব্যাসদেব পাণ্ডবের অক্ষকৌড়ার উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছেন। তাহার মুখে একটা শাস্ত্র ধ্যানতত্ত্বভাব বড় চমৎকার ফুটয়াছে। হৃদয় মুগ্ধের মতএছাড়া সেই শাস্ত্র একে উজ্জ্বল করিয়াছে। ব্যাসদেব হাত দিয়া অক্ষপালপাতিন রচনা করিতেছেন ইহা শ্রদ্ধার পারকল্পনা। কিন্তু আমরা হাতের উল্লিতে গভীরতর সৌন্দর্য্য দেখিতেছি—হৃদয়ের গভীর ভাবপ্রবাহ হলে কবিত্ব প্রকাশ পাইতেছে, তাহারই প্রকাশ পূজক যবি অনুভব করিতেছেন।

চিত্রের পারিপাশ্বিক্যও যথেষ্ট ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে। বটকরূপে বসিয়া ভারতের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য-হাতহাস প্রদর্শিত হইতেছে। তাহার রচয়িতা শ্রদ্ধা, লেখক দেবতা, হান তপোবন। প্রাচীন ভারতে উচ্চ চিন্তার সহিত সরল জীবনযাত্রা প্রণালীর এক পাবক সংমিশ্রণ ইহার মধ্যে দেখা যাইতেছে। বটক তাহার অসংখ্য শাখা মূল লইয়া তপোবনের জটিল গহনতা, পাবকতা ও শান্তগতলভ্যাবের ব্যঙ্গনা প্রকাশ করিতেছে। ব্যাস কাব্যর কুশাসন ও কমণ্ডলু ত্যাগের নিদর্শন। এই ত্যাগ পুণ্যমালা বিস্তারিত, সমগ্র ভারত কতক সংপৃক্ত, পবিত্র মহান।

গণেশ অর্দ্ধ পশু, অর্দ্ধ নর ও উভয়ের সংমিশ্রণে দেবভাবে হিন্দুশাস্ত্রে পরিকল্পিত। ইহা বোধ হয় পশু হইতে নরসমাজ পর্যন্ত সকলের ঘনিষ্ঠ যোগ ও দেবতার সহিত আশ্রয়তা দেখাইবার জন্তই পরিকল্পিত হইয়া থাকিবে।

গণেশের স্তম্ভ মস্তক পবিত্রতা, বুদ্ধির নির্মলতা, প্রসন্নতা প্রভৃতির পরিব্যঞ্জক। ভারতে বর্ণচিত্রের প্রত্যেকটিরই অর্থ ছিল।

এই চিত্রখানি ভারতীয় চিত্রকলারীতি অনুসারে অঙ্কিত। ইহা ধ্যানধারণার চিত্র, দুরোগীয় কলার মত, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।

ঐচাঁকরুপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনুষ্য সৃষ্টি।

মানুষ যে হঠাৎ একদিন তাহার হস্তপদ ও জ্ঞানবুদ্ধি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। যে দিন বিধাতার অনন্ত শক্তির এক ক্ষুদ্রকণা জড়ে প্রবিষ্ট হইয়া নির্জীব প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই

মনুষ্যসৃষ্টির আরম্ভ। কত বৎসর পূর্বে এই প্রকারে জীবের অঙ্গুর উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা স্থির করা কঠিন বটে, কিন্তু পৃথিবীর শৈশব জীবনেরই কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে প্রাথমিক জীবের স্বেচ্ছা-সঞ্চলনে বে ধরাবক্ষ কৃষ্ণ হইয়াছিল তাহা অনিশ্চিত। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদগণ এই প্রাথমিক জীবকেই মনুষ্যের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং সেই জড়বৎ জীব কোন ধারায় ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া বৃক্ষলতা পশুপক্ষী এবং নরবানর ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাথমিক জীবের সৃষ্টিকে- মনুষ্য-সৃষ্টির প্রারম্ভ বলা অসঙ্গত নয়।

জীবের রক্ষণ নির্দেশ করিতে গেলে বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন, বাহিরের নানা প্রাকৃতিক শক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজেদের ঠিক রাখাই জীবের প্রধান ধর্ম। তাপ, আলোক, বায়ু চাপ, এবং ভূমধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নানা প্রবল প্রাকৃতিক শক্তি পদার্থের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়। গোড়ার খবর লইলে বলিতে হয় ইহারাই নানা আকারে কাজ করিয়া পৃথিবীকে গড়িয়া তুলিয়াছে। সমস্ত সৃষ্ট জীবটির উপর যখন এই সকল প্রাকৃতিক শক্তি প্রবলভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন টিকিয়া থাকিবার জন্য যে জীবাত্মরূপিক বহু চেষ্টা করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু সেই জড়যুগে আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র জীবগুলির হাতে কোন অস্ত্র দিয়া নিজের পথ নিজে কাটিয়া লইবার পরামর্শ দিয়াছিল তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই। এই সময়ের সন্ধি-বিগ্রহের ইতিহাস চিরদিনই আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিবে।

দেশের প্রাচীন ইতিহাস যখন লোপ পাইয়া যায়, চতুর ঐতিহাসিক পণ্ডিত অম্পষ্ট শিলালিপি এবং জীর্ণ মন্দিরের স্থাপত্যনৈপুণ্য পরীক্ষা করিয়া ইতিহাসহীন যুগের অনেক তথ্যের উদ্ধার করিয়া থাকেন। জীবতত্ত্ববিদগণও এই উপায়ে তমসীচ্ছন্ন জড়যুগের এক ইতিহাস দাঁড় করাইয়াছেন। তখনকার প্রাকৃতিক অবস্থার কথা মনে রাখিয়া এবং ভূপ্রাণিক শিলাময় জীবকঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া ইহা-

দিগকে জীবের পুরাতত্ত্ব লিপিতে হইয়াছে। আধুনিক মানুষ প্রাকৃতিক উপদ্রবকে কৃত্রিম উপায়ে দমন করিয়া চারিদিকটাকে তাহার জীবনের এত অল্পকূল করিয়া রাখিয়াছে যে, এখন একবার মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারিলে জীবনটা শেষ পর্যন্ত বেশ সহজেই কাটিয়া যায়। ইতর জীবগণ জীবনরক্ষার এই সুবিধাটুকু হইতে বঞ্চিত। তাই ইহাদিগের বিরুদ্ধ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতেই জীবনের অনেকটা সময় ব্যয়িত হইয়া যায়। প্রাথমিক জীবগণ আধুনিক ইতর জীবের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট ছিল, সুতরাং ইহাদিগকেও যে, বাহিবেব শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন রক্ষা কবিতে হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। এই অবস্থায় অল্পকূল শক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিষ্ঠুর প্রতিকূল শক্তির সহিত সংগ্রাম করা ব্যতীত আর উপায় থাকে না। প্রাথমিক জীবের জীবনের অনেক সময় এই প্রকার সংগ্রামেই কাটিয়া গিয়াছিল। তারপরও শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার নাই দেখিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষার কোন স্থায়ী উপায় উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা করিতে হইয়াছিল। প্রবল শত্রুপক্ষের বাণবর্ষণে যখন ঘোড়ার ধমু ভগ্ন হইয়া যায় এবং আত্মরক্ষার চেষ্টায় তুলীর শূল হইয়া পড়ে, তখন নিজের দেহ প্রাণ অক্ষত রাখিবার জন্য তাহাকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। পার্শ্বচব শরীররক্ষকের স্বন্ধে যে কঠিন বর্ম সঙ্কটকালের জন্য বাধা হইয়াছিল, তাহার প্রতি তখন ঘোড়ার বরষ দৃষ্টি পড়ে। সেই কঠিন বর্মে আচ্ছাদিত হইয়া দাঁড়াইলে বিপক্ষের বাণ বর্মে ঠেকিয়া শতধা হইয়া পড়িয়া যায়। প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির নিষ্ঠুরতাব হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য জীবকে ঠিক পূর্বোক্ত প্রকারেই সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বর্ম প্রস্তুত ছিল না, নিজের শরীরকে রূপান্তরিত কবিয়া ইহার বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ হইতে ত্রাণ পাইত। এক কোষময় প্রাথমিক জীব দ্বিধা খণ্ডিত হইতে হইতে যে অসংখ্য সম্ভাবনাসম্পত্তি উৎপন্ন করিত তাহাদের মধ্যে সকল-গুলিই মূলজীবের হাতে না জন্মিয়া নানাকারণে বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মিত। এই বিকলতা মহাভারতের বীর কর্ণের সহজ কবচের স্থায় কার্য্য করিলে প্রাকৃতিক উপদ্রব তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না। জীবন সংগ্রামে জয়যুক্ত

হইয়া যে সকল জীব নানায়ুগে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে মহাবীৰ্য্য কর্ণের জ্ঞান সহজ কবচধারী হইয়া জন্মিতে হইয়াছিল।

জীবের এই ক্রম পবিবর্তন পৃথিবীর কেবল শৈশব-জীবনেরই ঘটনা নয়, বাহিরের প্রাকৃতিক শক্তি যেমন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে, জীবও সেইপ্রকার নানা আকার পবিগ্রহ কবিতা জাতির পর জাতি সৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়াছে। বর্তমান যুগেও এই পরিবর্তনের ধারার বিরাম নাই। ইহার অন্ত কোথায়, এবং কোন্ দিক্ লক্ষ্য করিয়াই বা ইহা চলিয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত।

ইচ্ছাশক্তির সঞ্চার হওয়ার পর শক্তকবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জীবকে প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় নাই। এই স্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তির ইন্দ্রিতেই মনুষ্য প্রভৃতি উন্নত প্রাণী কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবন কবিতা এখন সহস্র প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতেছে। প্রাচীন জীবের এই ইচ্ছাশক্তির লেশ মাত্র ছিল না। বাহিরের উদ্ভাব প্রকৃতির চালনায় শব্দের মেঘের জ্ঞান তাহাকে নানা আকার পরিগ্রহ করিতে করিতে লক্ষ্যহীন অবস্থার চলিতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা ঘটনা বৈচিত্র্যে কুপথ অবলম্বন কবিতাছিল মৃত্যুর গ্রাস হইতে তাহারা রক্ষা পায় নাই। ভাগ্যক্রমে যাহারা সুপথের পথিক হইয়াছিল, কেবল তাহারাই ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। আধুনিক মানবজাতি সেই আদিম জীবের কোন এক সুপথগামী বংশধর হইতেই জন্মিয়াছে। যে পথ অবলম্বন কবিতা ক্ষুদ্রবৎ অপকৃষ্ট জীব শেষে মানবের জ্ঞান উন্নত প্রাণীতে পরিণত হইয়াছে, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই কিঞ্চিৎ আভাস দিব মাত্র।

আদিম জীবের উৎপত্তির পর তাহার বংশধরগণ দুইটি পৃথকজাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন যুগের আকাশ এখনকার মত পরিষ্কার ছিল না। তখন এতদকার তুলনায় আকাশে অঙ্গারক বাষ্প অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকিত। একজাতি কেবল অঙ্গারক বাষ্প দেহস্থ করিয়া শরীরে উপাধি করিত, এবং অপরটি অক্সিজেন বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিত। অঙ্গারক বাষ্পে অঙ্গার ও

অক্সিজেন যুক্তাবস্থায় থাকে। উভয়ই জীবদেহ গঠনের খুব উপযোগী হইলেও, যুক্ত অক্সিজেন জীবকে যেমন কৰ্ম্ম-কুশল করে অঙ্গারক বাষ্প সেপ্রকার করে না। অঙ্গারক বাষ্পগ্রাহী জীবের এইখানেই উন্নতির পথ বোধ হইয়া পড়িয়াছিল। অক্সিজেনগ্রাহী জীব যখন উন্নতির পথে চলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের অঙ্গার-বায়ুভোজী সহোদরগণ ঠিক একস্থানে দাঁড়াইয়া কিপ্রকারে বহু অঙ্গারক বাষ্প দেহস্থ করিতে হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিল।

অক্সিজেনভূক্ত জীব বহুকাল একই আকারে থাকিতে পারে নাই। বহিঃপ্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া ইহা বা সমেকদণ্ড ও অমেকদণ্ড (Vertebrate and invertebrate) এই দুই বৃহৎ জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক যুগে এই দুই জাতির মধ্যে অমেকদণ্ড জীব পৃথিবীতে খুব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। মাকড়সা মধু-মক্ষিকা ও পিপীলিকা প্রভৃতি জীব তাহাদের বংশধর। ইহারা বহিঃপ্রকৃতির সহিত নিজেদের মিলাইয়া যেমন অনায়াসে চলান্ধেরা করে অপর কোন জীবই সেপ্রকার পারে না। সমাজবদ্ধনেব কৌশলে ইহারা সমগ্র ইতর জীবের শীর্ষস্থানীয়। এই সকল আলোচনা কবিলে বলিতে হয়, যে, যে সমেকদণ্ড জাতি হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এককালে উন্নতির পথে অমেকদণ্ডজাতির অনেক নীচে ছিল। ভূতত্ত্ববিদগণও আজকাল এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতেছেন।

অমেকদণ্ডজাতি প্রথমে ভ্রমগতিতে উন্নতির দিকে চলিয়া শেষে তাহাদের সমেকদণ্ড ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারে নাই। মেকদণ্ডের অভাবে দেহের চৰ্ম্মকে ইহারা ইঞ্জিনিয়ারের প্রধান অবলম্বন করিয়া তুলিয়া একটা মহাভুল করিয়াছিল, এবং এই ভুলই তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতিপথের কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্থলচৰ্ম্ম দ্বারা সর্বদা আবৃত থাকায় আকারে বৃহত্তর হইবার চেষ্টা করিতে হইলে, ইহাদিগকে সেই অল্পবর্ণকে বিদীর্ণ করিতে হইত। অতাপি কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছ প্রভৃতি অমেকদণ্ড জীব এইপ্রকারে চৰ্ম্মবিদীর্ণ করিয়াই বাড়িয়া থাকে। সমেকদণ্ড জীবের দেহস্থ অস্থি যে কাজ করে,

অমেরুদণ্ড প্রাণিগণ তাহাদের দেহের কঠিন আবরণদ্বারা ঠিক সেই কাজ করাইয়া লয়। দেহের প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয় ও পেশীগুলি ঐ আবরণেই আবদ্ধ থাকে। কাজেই চর্মত্যাগ করার পর নূতন চর্ম বাহির হওয়া না পর্যন্ত ইহাদিগকে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। বৎসরে দুই তিনবার করিয়া যদি মানুষকে দেহের অস্থি ত্যাগ করিতে হইত, এবং নূতন অস্থিগুলিকে অঙ্কুরিত ও কার্যোপযোগী করিবার জন্য যদি তাহাকে দুই তিন মাস শয্যাশায়ী থাকিতে হইত, তাহা হইলে মানুষ কখনই এত উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। অমেরুদণ্ড জীব দৈহিক উন্নতির জন্য চর্মত্যাগে অভ্যস্ত হইয়া, ঠিক পূর্বোক্ত কারণে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কিছুদিন জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিয়া ইহারা যে একটু অভিজ্ঞতা লাভ করিত, নুগ্ধচর্ম হইয়া পড়িলে অনভ্যাসে তাহার প্রায় সকলি নষ্ট হইয়া বাইত।—শ্রীজগদানন্দ রায়।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

জুসেড ও জেহাদ—বিখ্যাত খ্রিস্টীয় প্রচারক খ্রীস্টীয় মহম্মদ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড ফ্রাউন অষ্টাংশিত ১৭৮-১১ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। জেরুজালেম খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর খ্রীষ্টানদের মতাদর্শ। এই ভূখণ্ড মুসলমান রাজ্যের অন্তর্গত। ইহাকে খ্রীষ্টান অধিকারে আনিবার জন্য মধ্যযুগে যুগে যুগে সমরাস্ত্রাধান হয় তাহার নাম জুসেড। এই ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য হইয়া খ্রীষ্টানগণ নির্দোষী মুসলমানদিগকে বহু-প্রকারে উৎপীড়িত ও উত্থাপন করেন। ইহাতে উদ্বেজিত হইয়া মুসলমানগণ প্রতিশোধমানসে যে সমরাস্ত্রাধান করেন তাহার নাম জেহাদ। সমালোচ্য পুস্তকে এই সকল ঘটনার চিত্তাকর্ষক ইতিহাস ও কাহিনী সংগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে। ইতিহাসটির পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া স্মিত হইবেন। হিন্দু মুসলমানের সমবেতযুদ্ধে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে—ইহা আমাদের একজাতীয়দের আনন্দময় পরিচয়। পুস্তকের ভাষা ভাল।

হরিবরভের মেহ—শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত। সান্তাল কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফ্রাউন অষ্টাংশিত ২২৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা মলাট। ছাপা কাগজ ভালো। মূল্যের উল্লেখ নাই। পুস্তকের প্রারম্ভে গ্রন্থকারের একখানি চিত্র সন্নিবেশিত আছে। ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। ব্রাহ্মসমাজের কথাই ইহার প্রধান উপজীব্য, এসজন্যে হিন্দুসমাজের কথাও আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকার যথেষ্ট সাবধানতার সহিত সাম্প্রদায়িকতার বাহিরে ঝাঁড়াইয়া উন্নয়ন সমাজের যৌবন অঙ্গ অঙ্গ দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানির মধ্যে সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক বিশেষত্ব যে প্রকৃষ্টভাবে সীমাসিদ্ধ বা পরিষ্কৃত হইয়া

উঠিয়াছে তাহা নহে; ইহাতে সমাজের অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে। বলাই ইহাকে সামাজিক উপন্যাস বলাই যৌক্তিক করিতে হয়। উপন্যাসের হিসাবেও এখানি খুব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হয় নাই; ইহার মধ্যে বর্ণিত প্রায় সকল চরিত্র অপরিপুষ্ট, কেহই আপনাদের ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র ও পরিষ্কার হইয়া উঠে নাই। আখ্যানবস্তুর নিত্য অকিঞ্চিৎকর, উদ্দেশ্যহীন এবং একঘেয়ে। কিন্তু জনবান গ্রন্থকারের ঘটনার সুন্দর পর্যবেক্ষণ শক্তি, কার্যের ক্রমপর্যায় নির্ণয়, রসিকতা ও সমান ক্ষমির শব্দপ্রয়োগ-ক্ষমতা একটি সরল লিখনশৈলীতে প্রকাশ হইয়া বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে শিক্ষিতা দ্বার আদর্শ আর্ঘ্যোচিত সারল্য, বলিষ্ঠতা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতার মহীয়ান হইয়াছে। ঐহারা সমর কাটাইবার জন্য উপন্যাস পড়েন, তাহারা এই পুস্তক পড়িলে স্মিত হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। পরিশেষে স্বস্ত্য, ধর্ম-প্রচারকের চরিত্র এমন সাংসারিকতার কৃকবর্ণে অঙ্কিত না করিলেই ভালো হইত।

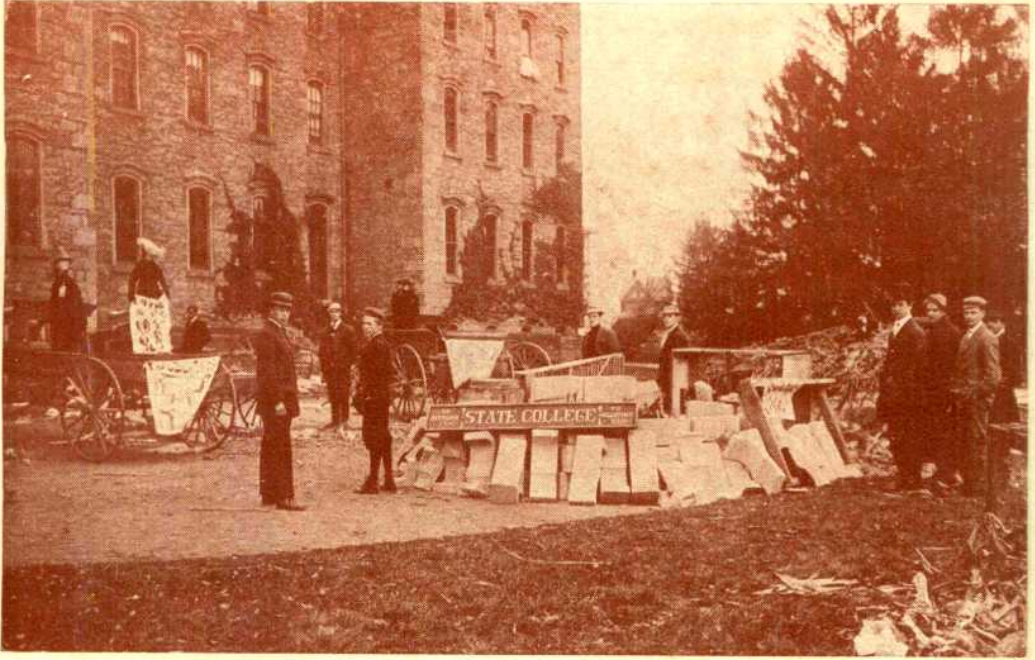
রাজন্যায়ণ বহুর আশ্রয়—তৎকর্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে কুস্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফ্রাউন অষ্টাংশিত ২১২+৮ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট দেশী এষ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা। বহু মহাশয়ের বিভিন্ন বয়সের, বৈদ্যনাথের বাড়ীর ও তাৎকালিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের ১৬ খানি ছাকটোন ছবি এই পুস্তকখানিতে আছে—ভদ্রাধ্যক্ষ রাজা রামমোহন রাবের ছবি তিন রঙে ছাপা অতি সুন্দর। পুস্তকের মূল্য কাগজের মলাট মাত্র ১/৮ এবং সুন্দর বাঁধানো মলাট ১/৮০ মাত্র। ২১০/৩১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে প্রবাসী কাগ্যালয়ে পাওয়া যায়। পুস্তকের আকার ও চিত্রাদির অল্পপাতে মূল্য খুব সুলভ হইয়াছে। এই পুস্তকে বহু মহাশয়ের নির্ভর্য তেজস্বিতা, সবেল মনুষ্যত্ব, শুভানুষ্ঠানে আগ্রহ, অস্ত্র-অসহিত্য প্রভৃতি সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিলে বহু মহাশয়ের কর্মজীবনের সর্ববিষয়াদিমুখতা ও ধর্মজীবনের প্রগাঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তৎকালের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গ ইংরেজী শিক্ষার প্রারম্ভে শিক্ষিত সম্ভ্রমের রীতি নীতি ও চাপ্তকর সাহেবদার, ব্রাহ্মসমাজের জন্ম ও প্রসার, গাহিতা ও রাষ্ট্রনীতি কিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যাইবে। ইহা উপন্যাসের মত কৌতুহলোদ্দীপক ও স্বপ্নপাঠ্য হইয়াছে। আশ্রয়দিতে এমন অকপটভাবে নিজের দোষগুণ বর্ণনা খুব অল্প লোকই করিতে পারেন। বঙ্গের সহস্র সহস্র লোক বৈদ্যনাথে রাজনারায়ণ বাবুকে দর্শন ও তাহার সহিত বাক্যালাপ করা পুণ্য ও আনন্দের কার্য মনে করিতেন। তাহারা এই ভূমানন্দরূপে নিমগ্ন হস্ত-নিপুণ চিত্রবোবনসম্পন্ন বুদ্ধের পুনর্বার সাক্ষাৎ পাইয়া স্মিত হইবেন।

শান্তিনিকেতন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ফ্রাউন ২৪ পেন্সি ৬২ পৃষ্ঠা। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র-পুস্তিকার রবিবারের কয়েকটি ধর্মোপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে। চলিত ভাষায় ঘরের কথার ধর্মতত্ত্বের জটিল বিষয়ও সরল সরল করিয়া বলা হইয়াছে। ইহাতে রবিবারের পরিণত প্রতিভার চিন্তাশীলতা চমৎকার ফুটিয়াছে। শান্তিপান্থ, ধর্মজিজ্ঞাসু, চিন্তাশীল বা মুমূক্ষু ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া স্মিত হইবেন ও উপকারবোধ করিবেন। কবির ব্রাহ্মনামর্শে ধর্মতত্ত্বগুলিও যেমন কাব্যে কেমনতরভাবে তুলিয়া উঠিয়াছে তাহা না পড়িলে বুঝানো কঠিন হইবে। পুস্তকের ছাপা কাগজও সুন্দর। পকেটপর্যায় হিসাবে আকারটিও উপযোগী। কাস্তিক প্রেসে মুদ্রিত।

মূল্য-রাস্কস।

৬১, ৬২নং বোম্বার স্ট্রীট, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

“পেন্সিলভেনিয়া-প্রবাসীর পত্র” শীর্ষক প্রবন্ধের দুইটি চিত্র।





কবি নবীনচন্দ্র সেন ।



বলী রামমূর্ত্তি নায়ক ।



শ্রীমদেবপ্রভু ঙ্গ ঠাকুরতা ।



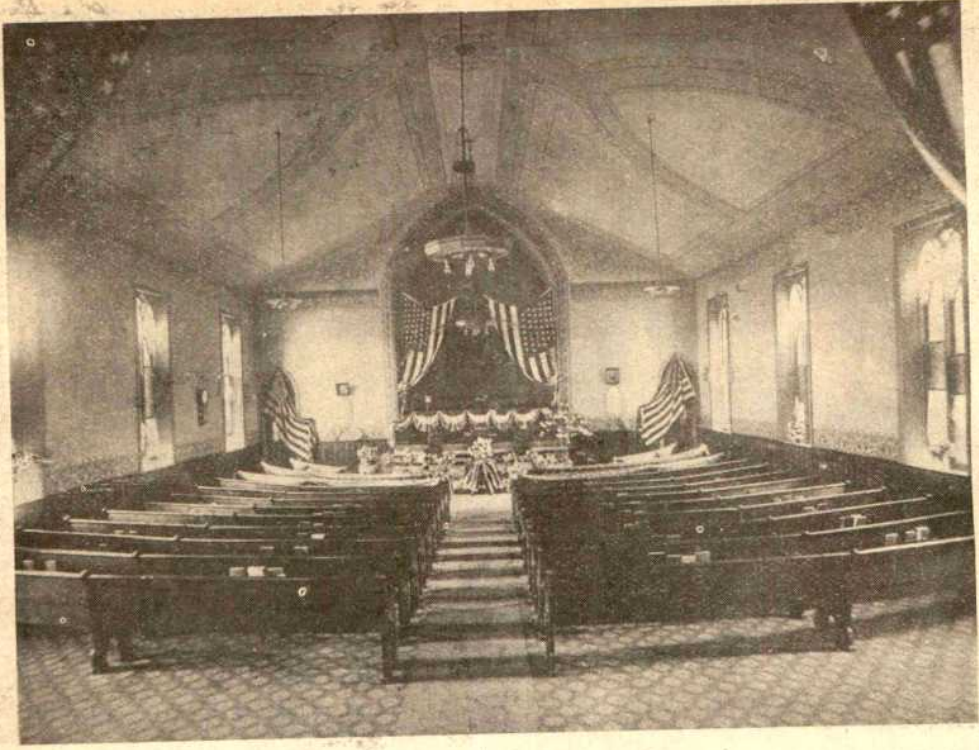
বিচারপতি শঙ্করন নায়াৰ ।



কেম্‌ব্রিজে মিঃ জনসনের ঔষধের দোকান।



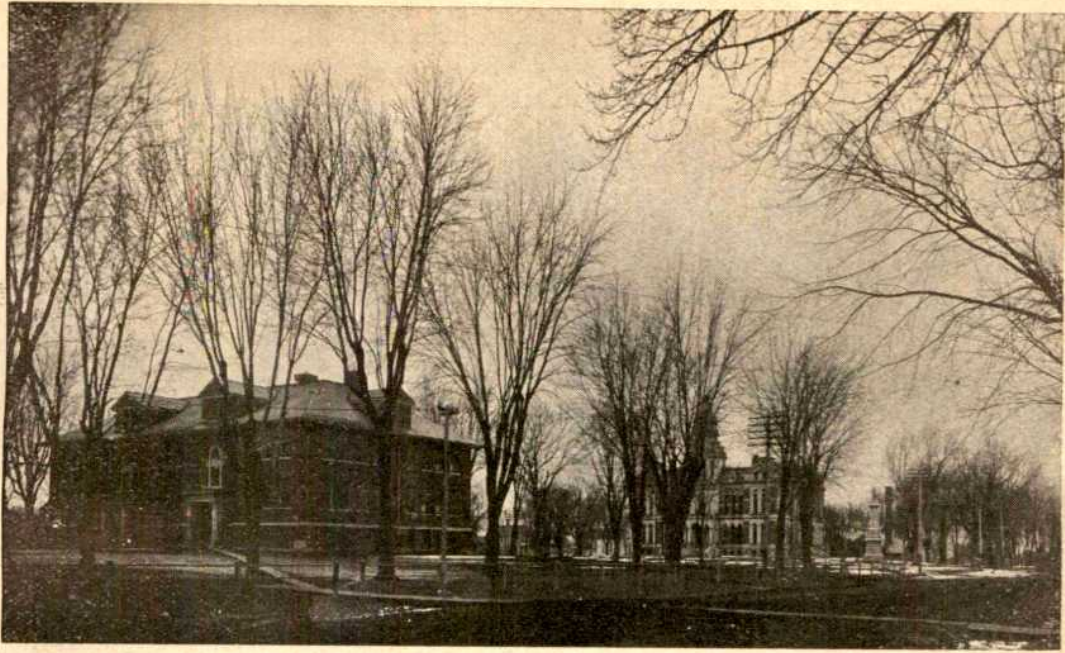
কেম্‌ব্রিজে হাণ্ট, জনসন ও টেলারের মুদ্রির দোকান।



কেম্‌ব্রিজের একটি গির্জার অভ্যন্তর।



প্রবন্ধ লেখক কেম্‌ব্রিজের মিঃ স্টল্যাংগের এই বাড়িতে থাকেন।



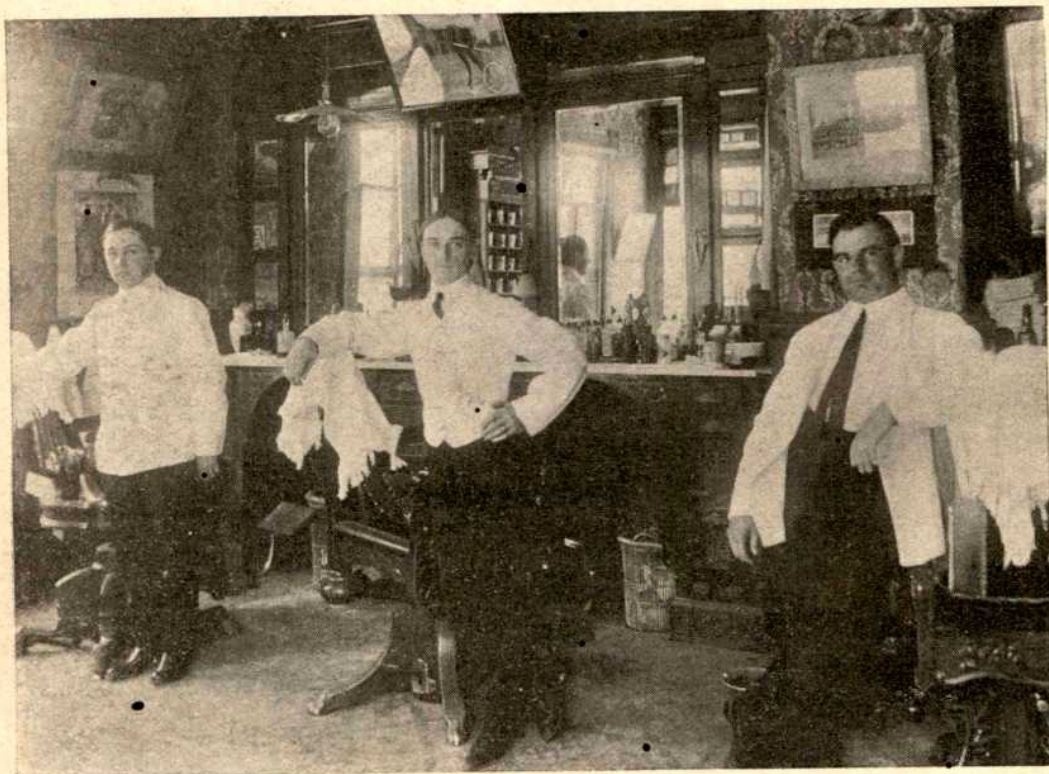
কেমব্রিজ গ্রামের বিদ্যালয় ও আদালত ।



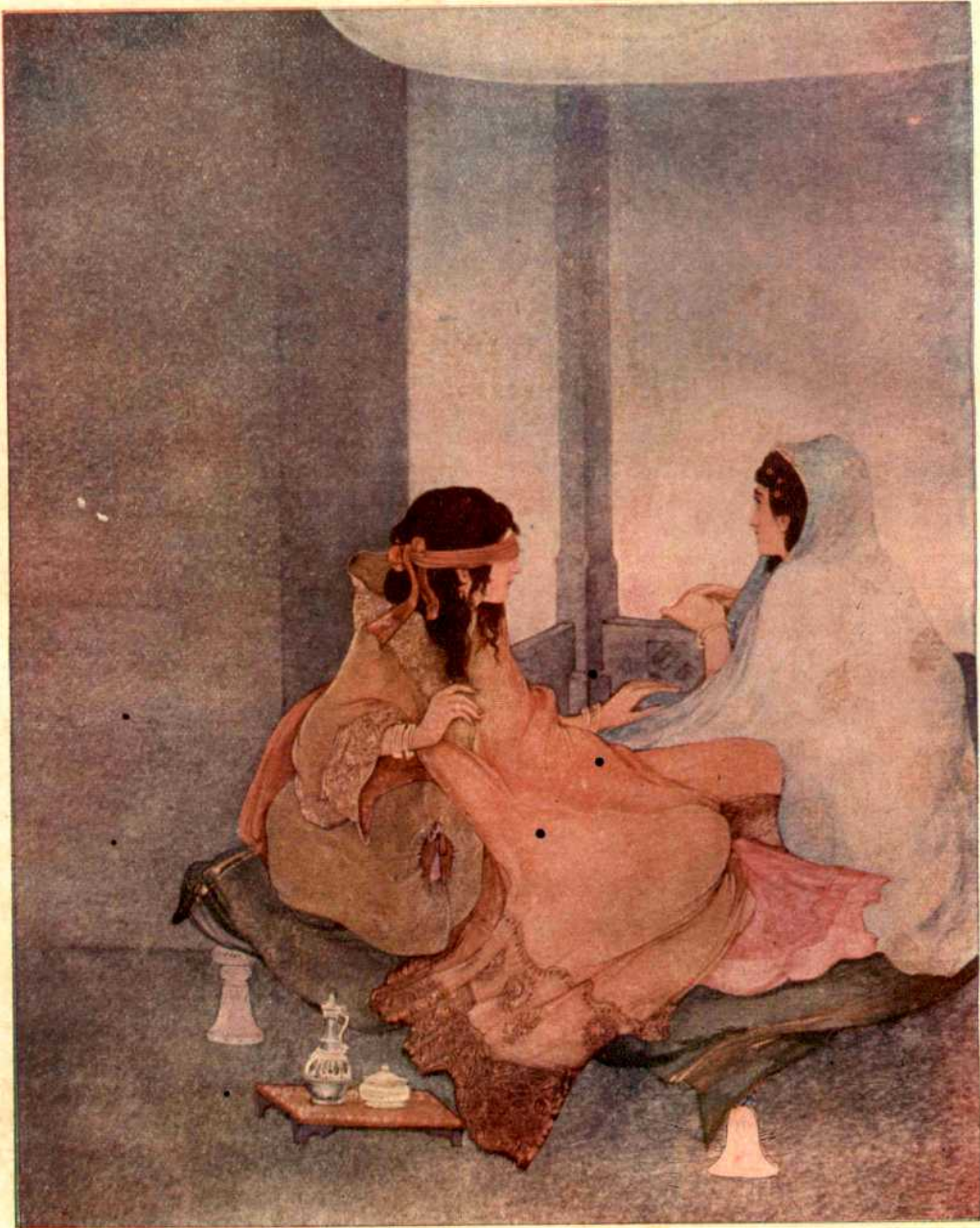
কেমব্রিজ গ্রাম্য পাঠশালার রাসায়নিক পরীক্ষাগার ।
ভারতের অধিকাংশ স্কুলেই এ রূপ যন্ত্রাগার নাই ।



কেমব্রিজ ক্রনিকল্ সংবাদপত্রের ছাপাখানা। সর্বদক্ষিণেব লোকটি সম্পাদক, কার্যাব্যক্ষ,
প্রধান কম্পোজিটর এবং কলের কারিগর।



কেমব্রিজের একটি নাপিতের দোকান।



গান্ধারী ।

শ্রীমদলান বসু কর্তৃক অঙ্কিত ।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ।”

৮ম ভাগ ।

চৈত্র, ১৩১৫ ।

১২ সংখ্যা ।

গোরা ।

৪৩

পবেশ বাবু বাসার কাছেই সর্কদা তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বাস করিতে পাঠবে এই কথা শুনিয়া সূচবিভা অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার নূতন বাড়ির গৃহসম্ভা সমাপ্ত এবং সেখানে উঠিয়া যাইবার সময় নিকটবর্তী হইল তখন সূচবিভার বৃকের ভিতর যেন টানিয়া ধরিতে লাগিল। কাছে থাকা না থাকা লইয়া কথা নয় কিন্তু জীবনের সঙ্গে জীবনের যে সর্কাদীন যোগ ছিল তাহাতে এতদিন পরে একটা বিচ্ছেদ ঘটবার কাল আসিয়াছে ইহা আজ সূচবিভার কাছে যেন তাহাব এক অংশের মৃত্যুর মত বোধ হইতে লাগিল। এই পরিবাবের মধ্যে সূচবিভার যেটুকু স্থান ছিল, তাহাব যে কিছু কাজ ছিল, প্রত্যেক চাকরটির সঙ্গেও তাহার যে সম্বন্ধ ছিল সমস্তই সূচবিভার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল।

সূচবিভার যে নিজের কিছু সঙ্গতি আছে এবং সেই সঙ্গতির ভাবে আজ সে অনায়াসেই স্বাধীন হইবার উপক্রম করিতেছে এই সংবাদে বরদাসুন্দরী বাববার কবিতা প্রকাশ করিলেন যে, ইহাতে ভালই হইল, এতদিন

এত সাবধানে যে দায়িত্বভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু মনে মনে সূচবিভার প্রতি তাঁহার যেন একটা অভিমানের ভাব জন্মিল; সূচবিভা যে তাঁহাদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আজ নিজের সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে এ যেন তাহাব একটা অপরাধ। তাঁহারা ছাড়া সূচবিভার অল্প কোনো গতি নাই ইহাই মনে করিয়া অনেক সময় সূচবিভাকে তিনি আপন পবিবারের একটা আপদ বলিয়া নিজের প্রতি ককণা অনুভব করিয়াছেন কিন্তু সেই সূচবিভার ভাব যখন লাঘব হইবার সংবাদ হঠাৎ পাইলেন তখন ত মনের মধ্যে কিছুমাত্র প্রসন্নতা অনুভব করিলেন না। তাঁহাদের আশ্রয় সূচবিভার গন্ধে অভ্যাসিত নহে ইহাই জানিয়া সে যে গরু অনুভব করিতে পারে, তাঁহাদের আশ্রয় স্বীকারে বাধ্য না হইতে পারে এই কথা মনে করিয়া তিনি আগে হইতেই তাহাকে অপরাধী করিতে লাগিলেন। একদিন বিশেষভাবে তাহাব প্রতি দৃষ্টি রাখা করিয়া চলিলেন। পূর্বে তাহাকে ঘরের কাজকর্মে যেন করিয়া ডাকিতেন এখন তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া গায়ে পড়িয়া তাহাকে অস্বাভাবিক সঙ্গম দেখাইতে লাগিলেন। বিদ্যায় পূর্বে সূচবিভা

ব্যথিত চিত্তে বেশি করিয়াই বরদাস্তবীর গৃহকাৰ্য্যে যোগ দিতে চেষ্টা করিতেছিল, নানা উপলক্ষ্যে তাঁহার কাছে কাছে ফিরিতেছিল, কিন্তু বরদাস্তবীর যেন পাছে তার অসম্মান ঘটে এইরূপ ভাব দেখাইয়া তাহাকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতেছিলেন। এককাল যাহাকে মা বলিয়া যাহার কাছে সূচরিতা মানুষ হইয়াছে আজ বিদায় লইবার সময়েও তিনি যে তাহার প্রতি চিত্তকে প্রতিকূল করিয়া রাখিলেন এই বেদনাই সূচরিতাকে সব চেয়ে বেশি করিয়া ব্যথিতে লাগিল।

লাবণ্য ললিতা লীলা সূচরিতার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত উৎসাহ করিয়া তাহার নূতন বাড়ির ঘর সাজাইতে গেল কিন্তু সেই উৎসাহের ভিতরেও অব্যক্ত বেদনার অশ্রুজল প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল।

এতদিন পর্য্যন্ত সূচরিতা নানা ছুতা করিয়া পরেশ বাবুর কত কি ছোটখাট কাজ করিয়া আসিয়াছে। হয় ত ফুলদানিতে ফুল সাজাইয়াছে, টেবিলের উপর বই গুছাইয়াছে, নিজের হাতে বিছানা মোড়ের দিয়াছে, ঘানের সময় প্রত্যহ তাঁহাকে খবর দিয়া অন্ন করাইয়া দিয়াছে— এই সমস্ত অভ্যস্ত কাজের কোনো গুরুত্বই প্রতিদিন কোনো পক্ষ অনুভব করে না। কিন্তু এ সকল অনাবশ্যক কাজও যখন বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হয় তখন এই সকল ছোটখাট সেবা, যাহা একজনে না করিলে অন্যাসে আর একজনে করিতে পাবে, যাহা না করিলেও কাহাবো বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না, এই গুলিই দুই পক্ষের চিত্তকে মথিত করিতে থাকে। সূচরিতা আজ কাল যখন পরেশের ঘরের কোনো সামান্য কাজ করিতে আসে তখন সেই কাজটা পবেশের কাছে মস্ত হইয়া দেখা দেয় ও তাঁহার বক্ষের মধ্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস জমা হইয়া উঠে। এবং এই কাজ আজ বাদে কাল অস্ত্রের হাতে সম্পন্ন হইতে থাকিবে এই কথা মনে করিয়া সূচরিতার চোখ ছলছল করিয়া আসে।

যেদিন মধ্যাহ্নে আহাৰ করিয়া সূচরিতাদের নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাইবার কথা সেদিন প্রাতঃকালে পরেশ বাবু তাহার নিভৃত ঘরটিতে উপাসনা করিতে আসিয়া দেখিলেন, তাহার আসনের সম্মুখদেশে ফুল দিয়া সাজাইয়া

ঘরের একপ্রান্তে সূচরিতা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। লাবণ্যলীলাও উপাসনাস্থলে আজ আসিবে এইরূপ তাহারা পরামর্শ করিয়াছিল কিন্তু ললিতা তাহাদিগকে নিবেদন করিয়া আসিতে দেয় নাই। ললিতা জানিত, পরেশ বাবুর নির্জন উপাসনায় যোগ দিয়া সূচরিতা যেন বিশেষভাবে তাঁহার আনন্দের অংশ ও আশীর্বাদ লাভ করিত—আজ প্রাতঃকালে সেই আশীর্বাদ সঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য সূচরিতার যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাহাই অনুভব করিয়া ললিতা অন্তকার উপাসনার নির্জনতা ভঙ্গ করিতে দেয় নাই।

উপাসনা শেষ হইয়া গেলে যখন সূচরিতার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল তখন পরেশ বাবু কহিলেন, “মা, পিছন দিকে ফিরে তাকিয়ো না, সম্মুখের পথে অগ্রসর হয়ে যাও—মনে সঙ্কোচ বেধো না। যাই ঘটুক, যাই তোমার সম্মুখে উপস্থিত হোক, তার থেকে সম্পূর্ণ নিজেব শক্তিতে ভালোকে গ্রহণ করবে এই পণ করে আনন্দের সঙ্গে বেরিয়ে পড়। ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে তাঁকেই নিজের একমাত্র সহায় কর—তাহলে ভুল জটিল ক্রতির মধ্যে দিয়েও লাভের পথে চলতে পারবে—আর যদি নিজেকে আধাআধি ভাগ কর, কতক ঈশ্বরে কতক অন্যত্রে, তাহলেই সমস্ত কঠিন হয়ে উঠবে। ঈশ্বর এই করুন আমাদের ক্ষুদ্র আশ্রয় তোমাব পক্ষে আর যেন প্রয়োজন না হয়।”

উপাসনার পরে উভয়ে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বসিবার ঘরে হাবান বাবু অপেক্ষা করিয়া আছেন। সূচরিতা আজ কাহাবও বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহভাব মনে রাখিবে না পণ করিয়া হারান বাবুকে নম্রভাবে নমস্কার করিল। হারান বাবু তৎক্ষণাৎ চৌকির উপরে নিজেকে শক্ত করিয়া তুলিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে কহিলেন— “সূচরিতা, এতদিন তুমি যে সত্যকে আশ্রয় করে ছিলে আজ তার থেকে পিছিয়ে পড়তে যাচ্ছ, আজ আমাদের শোকের দিন।”

সূচরিতা কোনো উত্তর করিল না—কিন্তু যে রাগিণী তাহার মনেব মধ্যে আজ শাস্তির সঙ্গে করুণা মিশাইয়া সঙ্গীতে জমিয়া উঠিতেছিল তাহাতে একটা বেহর আসিয়া পড়িল।

পরেশ বাবু কহিলেন—“অন্তর্যামী জানেন কে এগছে, কে পিছছে, বাইরে থেকে বিচার করে আমরা বুঝা উদ্বিগ্ন হই।”

হারান বাবু কহিলেন—তাহলে আপনি কি বলতে চান আপনার মনে কোনো আশঙ্কা নেই ? আর আপনার অহুতাপেরও কোনো কারণ ঘটেনি ?

পরেশ বাবু কহিলেন—পাছ বাবু, কাল্পনিক আশঙ্কাকে আমি মনে স্থান দিইনে এবং অহুতাপের কারণ ঘটাই কি না তা তখন বুঝব যখন অহুতাপ জন্মাবে।

হারান বাবু কহিলেন—“এই যে আপনার কল্পা ললিতা একলা বিনয় বাবুর সঙ্গে স্টীমারে করে চলে এলেন এটাও কি কাল্পনিক ?”

সুচরিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। পরেশ বাবু কহিলেন—পাছ বাবু, আপনার মন যে কোনো কাবণে হোক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এই জন্তে এখন এসম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলাপ করলে আপনার প্রতি অজ্ঞার করা হবে।

হারান বাবু মাথা তুলিয়া বলিলেন—আমি উত্তেজনার বেগে কোনো কথা বলি—আমি যা বলি সে সম্বন্ধে আমার দায়িত্ববোধ যথেষ্ট আছে ; সে জন্তে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনাকে যা বলছি সে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলচিনে, আমি ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে বলচি—না বলা অজ্ঞার বণেই বলচি। আপনি যদি অন্ধ হয়ে না থাকতেন তা হলে, ঐ যে বিনয় বাবুর সঙ্গে ললিতা একলা চলে এল এই একটি ঘটনা থেকেই আপনি বুঝতে পারতেন আপনার এই পবিবার ব্রাহ্মসমাজের নোঙর ছিঁড়ে ভেসে চলে যাবার উপক্রম করচে। এতে যে শুধু আপনাবই অহুতাপের কারণ ঘটবে তা নয় এতে ব্রাহ্মসমাজেরও অগৌরবের কথা আছে।”

পরেশ বাবু কহিলেন “নিশ্চয় করতে গেলে বাইরে থেকে করা যায় কিন্তু বিচার করতে গেলে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। কেবল ঘটনা থেকে মানুষকে দোষী করবেন না।”

হারান বাবু কহিলেন—“ঘটনা শুধু শুধু ঘটেনা, তাকে আপনারা ভিতরের থেকেই ঘটিয়ে তুলেছেন। আপনি

এমন সব লোককে পরিবাবের মধ্যে আত্মীয়ভাবে টানছেন যারা আপনার পরিবারকে আপনার আত্মীয় সমাজ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়। দুবেই ত নিয়ে গেল সে কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ?”

পরেশ বাবু একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—“আপনার সঙ্গে আমার দেখবার প্রণালী মেলে না।”

হারান বাবু কহিলেন—“আপনাব না মিলতে পারে। কিন্তু আমি সুচরিতাকেই সাক্ষী মানছি উনিই সত্য করে বলুন দেখি, ললিতার সঙ্গে বিনয়ের যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, সে কি শুধু বাইরের সম্বন্ধ ? তাদের অন্তরকে কোনো-খানেই স্পর্শ করে নি ?—না সুচরিতা চলে গেলে হবে না—একধার উত্তর দিতে হবে। এ গুরুতর কথা।”

সুচরিতা কঠোর হইয়া কহিল—যতই গুরুতর হোক একধার আপনার কোনো অধিকার নেই।

হারান বাবু কহিলেন—“অধিকার না থাকলে আমি যে শুধু চুপ করে থাকতুম তা নয়, চিন্তাও করতুম না। সমাজকে তোমরা গ্রাহ্য না করতে পার কিন্তু যতদিন সমাজে আছে ততদিন সমাজ তোমাদের বিচার করতে বাধ্য।”

ললিতা বড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—“সমাজ যদি আপনাকেই বিচারক পদে নিযুক্ত করে থাকেন তবে এ সমাজ থেকে নির্বাসনই আমাদের পক্ষে শ্রেয়।”

হারান বাবু চৌকি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন “ললিতা, তুমি এসেছ আমি খুশি হয়েছি। তোমার সম্বন্ধে যা নালিশ তা তোমার সামনেই বিচার হওয়া উচিত।”

ক্রোধে সুচরিতার মুখ চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে কহিল—“হারান বাবু, আপনার ঘরে গিয়ে আপনার বিচার-শালা আহ্বান করুন। গৃহস্থের ঘরের মধ্যে চড়ে তাদের অপমান করবেন আপনার এ অধিকার আমরা কোনো মতেই মানব না। আর ভাই ললিতা।”

ললিতা এক পা নড়িল না—কহিল—“না দিদি, আমি পালাব না। পাছ বাবুর যা কিছু বলবার আছে সব আমি শুনে যেতে চাই। বলুন, কি বলবেন, বলুন।”

হারান বাবু ধমকিয়া গেলেন। পরেশ বাবু কহিলেন—“মা, ললিতা, আজ সুচরিতা আমাদের বাড়ি থেকে যাবে—আজ সকালে আমি কোনো রকম অশান্তি ঘটতে দিতে

পারব না। হারান বাবু, আমাদের যতই অপরাধ থাকুক তবু আজকের মত আমাদের মাপ করতে হবে।”

হারান চূপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। সূচরিতা যতই তাঁহাকে বর্জন করিতেছিল সূচরিতাকে ধরিয়া রাখিবার জেদ ততই তাঁহার বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাঁহার জীব বিশ্বাস ছিল অসামান্য নৈতিক জোরের দ্বারা তিনি নিশ্চয়ই জিতবেন। এখনো তিনি যে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু মাসীর সঙ্গে সূচরিতা অস্ত্র বাড়িতে গেলে সেখানে তাঁহার শক্তি প্রতিহত হইতে থাকিবে এই আশঙ্কায় তাঁহার মন ক্ষুব্ধ ছিল। এই ক্ষুব্ধ আত্ম তাঁহার ব্রহ্মান্ডগুলিকে শান দিয়া আনিয়াছিলেন। “কোনোমতে আজ সকালবেলাকার মধ্যেই খুব কড়া রকম করিয়া বোঝাপড়া করিয়া লইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। আজ সমস্ত সন্ধ্যা তিনি দূর করিয়াই আসিয়াছিলেন—কিন্তু অপর পক্ষেও যে এমন করিয়া সন্ধ্যাচ দূর করিতে পারে, ললিতা সূচরিতাও যে হঠাৎ তৃণ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দাঁড়াইবে তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার নৈতিক অস্ত্রবাণ যখন তিনি মহাতেজে নিক্ষেপ করিতে থাকিবেন অপর পক্ষের মাথা একেবারে হেঁট হইয়া যাইবে। ঠিক তেমনটি হইল না—অবসরও চলিয়া গেল। কিন্তু হারান বাবু হার মানিবেন না। তিনি মনে মনে কহিলেন, সত্যের জয় হইবেই অর্থাৎ হারান বাবুর জয় হইবেই। কিন্তু জয় ত শুধু শুধু হয় না। লড়াই করিতে হইবে। হারান বাবু কোমর বাঁধিয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

সূচরিতা কহিল—“মাসি, আজ আমি সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খাব—তুমি কিছু মনে করলে চলবে না।”

হরিমোহিনী চূপ করিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন সূচরিতা সম্পূর্ণই তাঁহার হইয়াছে—বিশেষতঃ নিজের সম্পত্তির জোরে স্বাধীন হইয়া সে স্বতন্ত্র ধর করিতে চলিয়াছে এখন হরিমোহিনীকে আর কোনো সন্ধ্যাচ কবিত্তে হইবে না—যোলো আনা নিজের মত করিয়া চলিতে পারিবেন। তাই, আজ যখন সূচরিতা গুচিলা বিসর্জন করিয়া আবার সকলের সঙ্গে একত্রে অন্ন গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিল তখন তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি চূপ করিয়া রহিলেন।

সূচরিতা তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিল—“আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি এ’তে ঠাকুর খুসি হবেন। সেই আমার অন্তর্যামী ঠাকুর আমাকে সকলের সঙ্গে আজ এক সঙ্গে খেতে বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা না মানলে তিনি রাগ করবেন। তাঁর রাগকে আমি তোমার রাগের চেয়ে ভয় করি।”

যতদিন হরিমোহিনী ববদাসুন্দরীর কাছে অপমানিত হইতেছিলেন ততদিন সূচরিতা তাঁহার অপমানের অংশ লইবার জন্য তাঁহাব আচার গ্রহণ করিয়াছিল এবং আজ সেই অপমান হইতে যখন নিষ্কৃতিব দিন উপস্থিত হইল তখন সূচরিতা যে আচার সম্বন্ধে স্বাধীন হইতে দ্বিধা বোধ করিবে না, হরিমোহিনী তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। হরিমোহিনী সূচরিতাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়া লন নাই, বোঝাও তাঁহার পক্ষে শক্ত ছিল।

হরিমোহিনী সূচরিতাকে স্পষ্ট করিয়া নিষেধ করিলেন না কিন্তু মনে মনে রাগ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—মা গো, মানুষের ইহাতে যে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না! ব্রাহ্মণের ঘরে ত জন্ম বটে!

খানিকক্ষণ চূপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—“একটা কথা বলি বাছা, যা কর তা কর তোমাদের ঐ বেহারাটার হাতে জল খেয়ো না।”

সূচরিতা কহিল—“কেন মাসি, ঐ রামদীন বেহারাই ত তার নিজের গোরু দুইয়ে তোমাকে ছুঁ দিবে যায়।

হরিমোহিনী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, “অবাক করলি! ছুঁ আর জল এক হল!”

সূচরিতা হাসিয়া কহিল—“আচ্ছা মাসি, রামদীনের হোঁয়া জল আজ আমি খাবনা। কিন্তু সতীশকে যদি তুমি বারণ কর তবে সে ঠিক তার উল্টো কাজটি করবে।”

হরিমোহিনী কহিলেন—“সতীশের কথা আলাদা।”

হরিমোহিনী জানিতেন পুরুষমানুষের সম্বন্ধে নিয়ম সংঘমের ক্রটি মাপ করিতেই হয়।

হারান বাবু রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

আজ প্রায় পনেরো দিন হইয়া গিয়াছে ললিতা ষ্ট্রিমারে

করিয়া বিনয়ের সঙ্গে আসিয়াছে । কথাটা ছুই এক জনের কানে গিয়াছে এবং অল্পে অল্পে ব্যাপ্ত হইবাবও চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু সম্প্রতি ছুই দিনের মধ্যেই এই সংবাদ শুকনা খড়ে আশুন লাগার মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে ।

ব্রাহ্মপরিবারের “ধর্ম্মনৈতিক জীবনে”র প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই প্রকারের কদাচারকে যে দমন করা কর্তব্য হারান বাবু তাহা অনেককেই বুঝাইরাছেন । এসব কথা বুঝাইতেও বেশি কষ্ট পাইতে হয় না । যখন আমরা “সত্যের অমুরোধে” “কর্তব্যের অমুরোধে” পরের স্বলন লইয়া ঘৃণা প্রকাশ ও দণ্ডবিধান করিতে উত্তত হই তখন সত্যের ও কর্তব্যের অমুরোধ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হয় না । এই জন্ত ব্রাহ্মসমাজে হারান বাবু যখন “অপ্রিয়” সত্য ঘোষণা ও “কঠোর” কর্তব্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন এত বড় অপ্রিয়তা ও কঠোরতার ভয়ে তাঁহার সঙ্গে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে অধিকাংশ লোক পরাংমুখ হইল না । ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী লোকেরা গাড়ি পাকি ভাড়া করিয়াও পরস্পরের বাড়ি গিয়া বলিয়া আসিলেন, আজকাল যখন এমন সকল ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন “ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ।” এই সঙ্গে, সূচরিতা যে হিন্দু হইয়াছে, এবং হিন্দুমাসীর ঘরে আশ্রয় লইয়া যাগযজ্ঞ তপস্বী ও ঠাকুর সেবা লইয়া দিন যাপন করিতেছে একথাও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল ।

অনেক দিন হইতে ললিতার মনে একটা লড়াই চলিতেছিল । সে প্রতিরাত্রে শুইতে যাইবার আগে বলিতেছিল কখনই আমি হাব মানিবনা এবং প্রতিদিন ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় বসিয়া বলিয়াছে কোনো মতেই আমি হার মানিব না । এই যে বিনয়ের চিন্তা তাহার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে—বিনয় নীচের ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছে জানিতে পারিলে তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্ত উতলা হইয়া উঠিতেছে, বিনয় ছুই দিন তাহাদের বাড়িতে না আসিলে অবরুদ্ধ অভিমানে তাহার মন নিপীড়িত হইতেছে, মাঝে মাঝে সতীশকে নানা উপলক্ষ্যে বিনয়ের বাসায় যাইবার জন্ত উৎসাহিত করিতেছে এবং সতীশ ফিরিয়া আসিলে, বিনয় কি করিতেছিল বিনয়ের সঙ্গে কি কথা হইল তাহা

আদ্যোপান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে ইহা ললিতার পক্ষে যতই অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে ততই পরাভবের ম্মানিতে তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে । বিনয় ও গোয়ার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বাধা দেন নাই বলিয়া এক একবার পরেশ বাবুর প্রতি তাহার রাগও হইত । কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে লড়াই করিবে, মরিবে তবু হারিবে না, এই তাহার পণ ছিল । জীবন যে কেমন করিয়া কাটাইবে সে সম্বন্ধে নানা প্রকার কল্পনা তাহার মনের মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল । যুরোপের লোক-হিতৈষিণী রমণীদের জীবনচরিতে যে সকল কীর্ষিকাহিনী সে পাঠ করিয়াছিল সেইগুলি তাহার নিজের পক্ষে সাধ্য ও সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতে লাগিল ।

একদিন সে পরেশ বাবুকে গিয়া কহিল, “বাবা, আমি কি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে শেখাবার ভার নিতে পাবিনে ?”

পরেশ বাবু তাঁহার মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ক্ষুধাতুর হৃদয়ের বেদনায় তাহার সকল কণ্ঠ হইটি চক্ষু যেন কাঙাল হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে । তিনি স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন “কেন পারবে না মা ? কিন্তু তেমন মেয়ে-ইস্কুল কোথায় ?”

যে সময়ের কথা হইতেছে তখন মেয়ে-ইস্কুল বেশি ছিল না, সামান্য পাঠশালা ছিল এবং ভদ্র ঘরের মেয়েরা শিক্ষ-প্রদাতার কাছে তখন অগ্রসর হন নাই । ললিতা ব্যাকুল হইয়া কহিল, “ইস্কুল নেই বাবা ?”

পরেশ বাবু কহিলেন, “কই, দেখিনে ত !”

ললিতা কহিল, “আচ্ছা, বাবা, মেয়ে-ইস্কুল কি একটা করা যায় না ?”

পরেশ বাবু কহিলেন, “অনেক খরচের কথা, এবং অনেক লোকের সহায়তা চাই ।”

ললিতা আনিত সংকল্পেব সংকল্প জাগাইয়া তোলাই কঠিন কিন্তু তাহা সাধন করিবার পথেও যে এত বাধা তাহা সে পূর্বে ভাবে নাই । কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া বসিয়া থাকিয়া সে আশ্বে আশ্বে উঠিয়া চলিয়া গেল । তাহার এই প্রিয়তমা কস্তাটির হৃদয়ের ব্যথা কোন্‌খানে পরেশ বাবু তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন । বিনয়ের সম্বন্ধে হারান বাবু সে দিন যে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন তাহাও

তাঁহার মনে পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি অবিবেচনার কাজ করিয়াছি? তাঁহার অস্ত্র কোনো মেয়ে হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না—কিন্তু ললিতাব জীবন যে ললিতার পক্ষে অত্যন্ত সত্য পদার্থ; সে তা আধাআধি কিছুই জানে না; সুখ দুঃখ তাহার পক্ষে কিছু-সত্য-কিছু-কাঁকি নহে!

ললিতা প্রতিদিন নিজের জীবনের মধ্যে ব্যর্থ বিচার বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে কেমন করিয়া? সে যে সম্মুখে কোথাও একটা প্রতিষ্ঠা, একটা মঙ্গল পরিণাম দেখিতে পাইতেছে না। এমনভাবে নিরুপায় ভাসিয়া চলিয়া যাওয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে।

সেইদিনই মধ্যাহ্নে ললিতা সূচরিতাব বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে গৃহসজ্জা বিশেষ কিছুই নাই। মেঝের উপর একটি ঘব জোড়া সতরঞ্চ, তাহাবই একদিকে সূচরিতার বিছানা পাতা ও অস্ত্র দিকে হরিমোহিনীর বিছানা। হরিমোহিনী খাটে শোন না বলিয়া সূচবিভাও তাঁহার সঙ্গে এক ঘরে নীচে বিছানা করিয়া শুইতেছে। দেয়ালে পরেশ বাবুর একখানি ছবি টাঙানো। পাশের একটি ছোটো ঘবে সতীশের খাট পড়িয়াছে এবং একধায়ে একটি ছোটো টেবিলের উপর দোয়াত কলম খাতা বই প্লেট বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো রহিয়াছে। সতীশ ইঁসুলে গিয়াছে। বাড়ি নিস্তব্ধ।

আহারান্তে হরিমোহিনী তাঁহার মাদুরের উপর শুইয়া নিজের উপক্রম করিতেছেন, এবং সূচরিতা পিঠে মুক্তচুল মেলিয়া দিয়া সতরঞ্চ বসিয়া কোলের উপর বালিশ লইয়া একমনে কি পড়িতেছে। সম্মুখে আবার কয়খানা বই পড়িয়া আছে।

ললিতাকে হঠাৎ ঘবে ঢুকিতে দেখিয়া সূচরিতা যেন লজ্জিত হইয়া প্রথমটা বই বন্ধ করিল, পরক্ষণে লজ্জার দ্বারাই লজ্জাকে দমন করিয়া বই যেমন ছিল তেমনিই রাখিল। এই বইগুলি গোরার রচনাবলী।

হরিমোহিনী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—“এস, এস, মা ললিতা এস! তোমাদের বাড়ি ছেড়ে সূচরিতার মনের মধ্যে কেমন করচে সে আমি জানি। গুর মন খারাপ হলেই ঐ বইগুলো নিয়ে পড়তে বসে। এখন আমি

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম তোমরা কেউ এলে ভাল হয়—অমনি তুমি এসে পড়েছ—অনেকদিন বাঁচবে মা!”

ললিতার মনে যে কথাটা ছিল, সূচরিতার কাছে বসিয়া সে একেবারেই তাহা আরম্ভ করিয়া দিল। সে কহিল—“সুচিদিদি, আমাদের পাড়ার মেয়েদের জন্তে যদি একটা ইঁসুল করা যায় তাহলে কেমন হয়?”

হরিমোহিনী অবাক হইয়া কহিলেন—“শোনো একবার কথা! তোমরা স্কুল করবে কি!”

সূচরিতা কহিল—“কেমন কবে করা যাবে বল? কে আমাদের সাহায্য করবে? বাবাকে বলেছি কি?”

ললিতা কহিল—“আমরা দুজনে ত পড়াতে পারব। হয়ত বড়দিদিও রাজি হবে।”

সূচরিতা কহিল—“শুধু পড়ানো নিয়েত কথা নয়। কি রকম করে ইঁসুলের কাজ চালাতে হবে তার সব নিয়ম বেঁধে দেওয়া চাই, বাড়ি ঠিক করতে হবে, ছাত্রী সংগ্রহ করতে হবে, খরচ জোগাতে হবে। আমরা দুজন মেয়েমানুষ এর কি করতে পারি!”

ললিতা কহিল—“দিদি, ওকথা বললে চলবে না। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই কি নিজের মনখানাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছাড় খেতে থাকব? পৃথিবীর কোনো ক্রাজেই লাগুব না?”

ললিতার কথাটার মধ্যে যে বেদনা ছিল সূচরিতার বুকের মধ্যে গিয়া তাহা বাজিয়া উঠিল। সে কোনো উত্তর না করিয়া ভাবিতে লাগিল।

ললিতা কহিল—“পাড়ার ত অনেক মেয়ে আছে। আমরা যদি তাদের অমনি পড়াতে চাই বাপ মা বা ত খুসি হবে। তাদের যে ক’জনকে পাই তোমার এই বাড়িতে এনে পড়ালেই হবে। এতে খরচ কিসের?”

এই ব্যাধিতে রাজ্যের অপরিচিত ঘরের মেয়ে জড় করিয়া পড়াইবার প্রস্তাবে হরিমোহিনী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি নিরিবিলি পূজা অর্চনা লইয়া শুদ্ধ শুচি হইয়া থাকিতে চান তাহার ব্যাঘাতের সম্ভাবনার আপত্তি করিতে লাগিলেন।

সূচরিতা কহিল, “মাসি তোমার ভয় নেই, যদি ছাত্রী জোটে তাদের নিয়ে আমাদের নীচের তলার ঘরেই কাজ

চালাতে পারব, তোনার উপরের ঘরে আমরা উৎপাত করতে আসব না। তা ভাই ললিতা, যদি ছাত্রী পাওয়া যায়, তাহলে আমি রাজি আছি।”

ললিতা কহিল—“আচ্ছা দেখাই যাকনা।”

হরিমোহিনী বারবার কহিতে লাগিলেন, “মা স্কল বিষয়েই তোমরা ঋণান্নেব মত হলে চলবে কেন? গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ইস্কুল পড়ায় এত বাপেব বয়সে শুনিনি।”

পরেশ বাবুর ছাত্তের উপর হইতে আশপাশের বাড়ির ছাতে মেয়েদের মধ্যে আলাপ পরিচয় চলিত। এই পরিচয়ের একটা মন্ত কটক ছিল, পাশের বাড়ির মেয়েরা এবাড়ির মেয়েদের এত বয়সে এখনো বিবাহ হইল না বলিয়া প্রায়ই প্রশ্ন এবং বিস্ময় প্রকাশ করিত। ললিতা এই কারণে এই ছাত্তের আলাপে পারংপক্ষে যোগ দিত না।

এই ছাতে তে বন্ধুত্ব বিস্তারে লাভলাভই ছিল স্কলের চেয়ে উৎসাহী। অস্ত্র বাড়ির সাংসারিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাহাব কৌতুহলের সীমা ছিল না। তাহার প্রতিবেশীদের দৈনিক জীবন যাত্রার প্রধান ও অপ্রধান অনেক বিষয়ই দূর হইতে বায়ুযোগে তাহাব নিকট আলোচিত হইত। চিরুণী হস্তে কেশসংস্কার করিতে করিতে মুক্ত আকাশ তলে প্রায়ই তাহার গপরাহুসভা জমিত।

ললিতা তাহার সংকল্পিত মেয়ে ইস্কুলের ছাত্রীসংগ্রহের ভার লাভণ্যের উপর অর্পণ করিল। লাভণ্য ছাতে ছাতে যখন এই প্রস্তাব ঘোষণা করিয়া দিল তখন অনেক মেয়েই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ললিতা খুসি হইয়া সূচরিতার বাড়ির একতলার ঘর ঝাঁড় দিয়া ধুইয়া সাজাইয়া প্রস্তুত করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাব শুলভব শূন্যই রহিয়া গেল। বাড়ির কর্তারা তাঁদের মেয়েদের ভুলাইয়া পড়াইবার ছলে ব্রাহ্ম-বাড়িতে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। এমন কি, এই উপলক্ষ্যেই যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন পরেশ বাবুর মেয়েদের সঙ্গে তাঁহাদের মেয়েদের আলাপ চলে তখন তাহাতে বাধা দেওয়াই তাঁহারা কর্তব্য বোধ করিলেন। তাঁহাদের মেয়েদের ছাতে ওঠা বন্ধ হইবার জো হইল এবং ব্রাহ্মপ্রতিবেশীর মেয়ে দর সাধু সংকল্পেব প্রতি তাঁহাবা সাধুভাবে প্রয়োগ

করিলেন না। বেচাৰা লাভণ্য যথাসময়ে চিরুণী হাতে ছাতে উঠিয়া দেখে পার্শ্ববর্তী ছাত্তগুলিতে নবীনাদের পরিবর্তে প্রবীণাদের সমাগম হইতেছে এবং তাঁহাদের এক-জনের নিকট হইতেও সে সাদর সম্ভাষণ লাভ কবিল না।

ললিতা ইহাতেও ক্ষান্ত হইল না। সে কহিল অনেক গরীব ব্রাহ্মমেয়ের বেখুন ইস্কুলে গিয়া পড়া হুসাধ্য, তাহাদের পড়াইবার ভার লইলে উপকার হইতে পারিবে।

এইরূপ ছাত্রী সন্ধান সে নিজেও লাগিল সূর্য্যরকেও লাগাইয়া দিল।

সেকালে পরেশ বাবুর মেয়েদের পড়াশুনার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। এমন কি, সে খ্যাতি সত্যকেও অনেক দূবে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এই জন্ত ইহাবা মেয়েদের বিনা বেতনে পড়াইবার ভাব লইবেন শুনিয়া অনেক পিতামাতাই খুসি হইয়া উঠিলেন।

প্রথমে পাঁচ ছয়টি মেয়ে লইয়া দুই চাব দিনেই তাহাব ইস্কুল বসিয়া গেল। পরেশ বাবুর সঙ্গে এই ইস্কুলেব কথা আলোচনা করিয়া ইহাব নিয়ম বাধিয়া ইহার আয়োজন করিয়া সে নিজেকে একমুহূর্ত্ত সময় দিল না। এমন কি, বৎসরের শেষে পরীক্ষা হইয়া গেলে মেয়েদের কিরূপ প্রাইজ দিতে হইবে তাহা লইয়া লাভণ্যব সঙ্গে ললিতাব রীতিমত তর্ক বাধিয়া গেল—ললিতা যে বইগুলাব কথা বলে লাভণ্যব তাহা পছন্দ হয় না, আবার লাভণ্যব সঙ্গে ললিতাব পছন্দরও মিল হয় না। পরীক্ষা কে কে কবিবে তাহা লইয়াও একটু তর্ক হইয়া গেল। লাভণ্য মোটের উপরে যদিও হাবান বাবুকে দেখিতে পাবিত না কিন্তু তাঁহাব পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে সে অভিভূত ছিল। হারান বাবু তাহাদের বিদ্যালয়ের পরীক্ষা অথবা শিক্ষা অথবা কোনো একটা কাজে নিযুক্ত থাকিলে সেটা যে বিশেষ গোববের বিষয় হইবে এ বিষয়ে তাহাব সন্দেহ মাত্র ছিল না। কিন্তু ললিতা কথাটাকে একেবারেই উড়াইয়া দিল—হারান বাবুর সঙ্গে তাহাদের এ বিদ্যালয়ের কোনো প্রকার সম্বন্ধই থাকিতে পাবেনা।

দুই তিন দিনেব মধ্যেই তাহার ছাত্রীর দল কমিতে কমিতে ক্লাশ শূন্য হইয়া গেল। ললিতা তাহার নির্জ্ঞন ক্লাসে বসিয়া পদশব্দ শুনিবামাত্র ছাত্রী সম্ভাবনায় সচকিত

হইয়া উঠে কিন্তু কেহই আসে না। এমনি করিয়া জুই প্রহর যখন হইয়া গেল তখন সে বুকিল একটা কিছু গোল হইয়াছে।

নিকটে যে ছাত্রীটি ছিল ললিতা তাহার বাড়িতে গেল। ছাত্রী কঁাদো-কঁাদো হইয়া কহিল—“মা আমাকে যেতে দিচ্ছে না।” মা কহিলেন, অসুবিধা হয়। অসুবিধাটা যে কি তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। ললিতা অভিমানিনী মেয়ে; সে অল্প পক্ষে অনিচ্ছার লেশমাত্র লক্ষণ দেখিলে জেদ করিতে বা কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেই না। সে কহিল, যদি অসুবিধা হয় তা হলে কাজ কি।

ললিতা ইহার পরে যে বাড়িতে গেল সেখানে স্পষ্ট কথাই শুনিতে পাইল। তাহার কহিল, সূচরিতা আজ-কাল হিন্দু হইয়াছে, সে জ্ঞাত মানে, তাহার বাড়িতে ঠাকুর পূজা হয়, ইত্যাদি।

ললিতা কহিল সে জন্ত যদি আপত্তি থাকে তবে না হয় আমাদের বাড়িতেই ইস্কুল বসিবে।

কিন্তু ইহাতেও আপত্তি বঞ্জন হইল না, আরো একটা কিছু বাকি আছে। ললিতা অল্প বাড়িতে না গিয়া সূধীরকে ডাকাইয়া পাঠাইল। জিজ্ঞাসা করিল, “সূধীর, কি হয়েছে সত্যি করে বল ত?”

সূধীর কহিল—“পান্থ বাবু তোমাদের এই ইস্কুলেব বিবন্ধে উঠে-পড়ে লেগেছেন।”

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, দিদির বাড়িতে ঠাকুর পূজা হয় বলে?”

সূধীর কহিল—“শুধু তাই নয়।”

ললিতা অধীর হইয়া কহিল—“আর কি, বলই না।”

সূধীর কহিল—“সে অনেক কথা।”

ললিতা কহিল—“আমারো অপরাধ আছে বুঝি।”

সূধীর চুপ-করিয়া রহিল। ললিতা মুখ লাল করিয়া বলিল—“এ আমার সেই ঈশ্বার যাত্রার শাস্তি! যদি অবিবেচনার কাজ কবেই থাকি তবে ভাল কাজ করে প্রায়শ্চিত্ত করার পথ আমাদের সমাজে একবারেই বন্ধ বুঝি! আমার পক্ষে সমস্ত শুভকর্মে এ সমাজে নিষিদ্ধ! আমার এবং আমাদের সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির এই প্রাণালী তোমরা ঠিক করেছ!”

সূধীর কথাটাকে একটু নবম করিবার জন্ত কহিল—“ঠিক সে জন্তে নয়। বিনয় বাবুর পাছে ক্রমে এই বিভ্রান্তির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন শুধু সেই ভয় করেন।”

ললিতা একেবারে আশ্চর্য হইয়া কহিল, “সে ভয়, না, সে ভাগ্য! যোগ্যতায় বিনয় বাবু সঙ্গে তুলনা হয় এমন লোক শুঁদেব মধ্যে ক’জন আছে!”

সূধীর ললিতার রাগ দেখিয়া সঙ্কচিত হইয়া কহিল, “সে ত ঠিক কথা! কিন্তু বিনয় বাবু ত—”

ললিতা। ব্রাহ্মসমাজের লোক নন! সেই জন্তে ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁকে দণ্ড দেবেন! এমন সমাজের জন্তে আমি গৌরব বোধ করিনে!

ছাত্রীদের সম্পূর্ণ তিরোধান দেখিয়া সূচরিতা, ব্যাপার থানা কি এবং কাহার দ্বারা ঘটতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া-ছিল। সে এসময়ে কোনো কথাটি না কহিয়া উপরের ঘরে সতীশকে তাহার আসন্ন পবিত্রতার জন্ত প্রস্তুত করিতেছিল।

সূধীরের সঙ্গে কথা কহিয়া ললিতা সূচরিতার কাছে গেল, কহিল—“শুনেছ?”

সূচরিতা একটু হাসিয়া কহিল, “শুনি নি, কিন্তু সব বুঝিছি।”

ললিতা কহিল, “এ সব কি সহ্য করতে হবে?”

সূচরিতা ললিতার হাত ধরিয়া কহিল, “সহ্য করার ত অপমান নেই। বাবা কেমন কবে সব সহ্য করেন দেখেছি ত?”

ললিতা কহিল, “কিন্তু সূচি দিদি, আমার অনেক সময় মনে হয় সহ্য করার দ্বারা অন্তরকে বেন স্বীকার ক’বে নেওয়া হয়! অন্তরকে সহ্য না কবাই হচ্চে তার প্রতি উচিত ব্যবহার।”

সূচরিতা কহিল, “তুই কি কবতে চাস তাই বল!”

ললিতা কহিল, “তা আমি কিছু ভাবিনি—আমি কি কবতে পারি তাও জানিনে—কিন্তু একটা কিছু করতেই হবে। আমাদের মত মেয়ে মানুষের সঙ্গে এমন নীচ ভাবে বাবা লেগেছে তাহা নিজেদের যত বড়লোক মনে করুক তাবা কাপুরুষ। কিন্তু তাদের কাছে আমি কোনো মতেই হার মানব না—কোনো মতেই না। এতে তারা

যা করতে পারে করুক।” বলিয়া ললিতা মাটিতে পদাঘাত করিল।

সুচরিতা কোনো উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে ললিতার হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, “ললিতা, তাই, একবার বাবার সঙ্গে কথা করে দেখ।”

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “আমি এখন তাঁর কাছেই যাচ্ছি।”

ললিতা তাহাদের বাড়ির দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল নতশিবে বিনয় বাহিব হইয়া আসিতেছে। ললিতাকে দেখিয়া বিনয় যুহুস্তের অন্তঃকরণে ধমকিয়া দাঁড়াইল—ললিতার সঙ্গে হই একটা কথা কহিয়া লইবে কি না সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটা বিতর্ক উপস্থিত হইল—কিন্তু আত্ম-সম্বরণ করিয়া ললিতার মুখের দিকে না চাহিয়া তাহাকে নমস্কার করিল ও মাথা হেঁট কবিরাই চলিয়া গেল।

ললিতাকে যেন অগ্নিতপ্ত শেলে বিদ্ধ করিল। সে দ্রুতপদে বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই একেবারে তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মা তখন টেবিলের উপর একটা লম্বা সৰু খাতা খুলিয়া হিসাবে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ললিতার মুখ দেখিয়াই বরদাসুন্দরী মনে শঙ্কা গলিলেন। তাড়াতাড়ি হিসাবের খাতাটির মধ্যে একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যাইবার প্রয়াস পাইলেন—যেন একটা কি অঙ্ক আছে যাহা এখনি মিলাইতে না পারিলে তাঁহার সংসার একেবারে ছাবখার হইয়া যাইবে।

ললিতা চৌকি টানিয়া টেবিলের কাছে বসিল। তবু বরদাসুন্দরী মুখ তুলিলেন না। ললিতা কহিল—“মা”!

বরদাসুন্দরী কহিলেন, “রোস্ বাছা, আমি এই—” বলিয়া খাতাটির প্রতি নিতান্ত ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

ললিতা কহিল, “আমি বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। একটা কথা জানতে চাই। বিনয় বাবু ঐসে—ছিলেন?”

বরদাসুন্দরী খাতা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন “হ্যাঁ”।

ললিতা। তাঁর সঙ্গে তোমার কি কথা হল?

সে অনেক কথা।

ললিতা। আমার সম্বন্ধে কথা হয়েছে কি না?

বরদাসুন্দরী পলায়নের পছন্দ না দেখিয়া কলম ফেলিয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, “তা বাছা হয়েছিল! দেখ্‌লুম যে ক্রমেই বাড়াবাড়ি হয়ে পড়চে—সমাজের লোকে চারদিকেই নিন্দে করচে তাই সাবধান করে দিতে হল।”

ললিতা ললিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাহার মাথা ঝাঁকি করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা কি বিনয় বাবুকে এখানে আসতে নিষেধ করেছেন?”

বরদাসুন্দরী কহিলেন, “তিনি বুঝি এসব কথা ভাবেন? যদি ভাবতেন তাহলে গোড়াতেই এসমস্ত হতে পারত না!”

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, “পাছ বাবু আমাদের এখানে আসতে পারবেন?”

বরদাসুন্দরী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “কেন একবার! পাছ বাবু আসবেন না কেন?”

ললিতা। বিনয় বাবুই বা আসবেন না কেন?

বরদাসুন্দরী পুনরায় খাতা টানিয়া লইয়া কহিলেন, “ললিতা, তোর সঙ্গে আমি পারিনে বাপু! যা এখন আমাকে জ্বালাসনে—আমার অনেক কাজ আছে।”

ললিতা ছপুর বেলায় সুচরিতার বাড়িতে ইস্কুল করিতে যায় এই অবকাশে বিনয়কে ডাকাইয়া আনিয়া বরদাসুন্দরী তাঁহার যাহা বক্তব্য বলিয়াছিলেন। মমে করিয়াছিলেন, ললিতা টেবণে পাইবে না। হঠাৎ চক্রান্ত এমন করিয়া ধরা পড়িল দেখিয়া তিনি বিপদবোধ করিলেন। বুঝিলেন, পরিণামে ইহার শাস্তি নাই এবং সহজে ইহার নিষ্পত্তি হইবে না। নিজের কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীর উপর তাঁহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল। এই অবোধ লোকটিকে লইয়া ঘরকন্না করা দ্বীলোকের পক্ষে কি বিড়ম্বনা!

ললিতা ক্ষমভরা প্রলয় ঝড় বহন করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নীচের ঘরে বসিয়া পরেশ বাবু চিঠি লিখিতেছিলেন, সেখানে গিয়াই একেবারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, বিনয় বাবু কি আমাদের সঙ্গে মেশবার যোগ্য নন?”

প্রশ্ন শুনিয়াই পরেশ বাবু অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার পরিবার লইয়া সম্প্রতি তাঁহাদের সমাজে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহা পরেশ বাবুর অপোচর ছিল না। ইহা লইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট চিন্তা করিতেও

হইতেছে। বিনয়ের প্রতি ললিতার মনের ভাব সম্বন্ধে যদি তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত না হইত তবে তিনি বাহিরের কথায় কিছুমাত্র কান দিতেন না। কিন্তু যদি বিনয়ের প্রতি ললিতার অনুভাব জন্মিয়া থাকে তবে সে স্থলে তাঁহার কর্তব্য কি সে প্রশ্ন তিনি বরাবর নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা লওয়ার পর তাঁহার পরিবারে আবার এই একটা সম্বন্ধের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্ত একদিকে একটা ভয় এবং কষ্ট তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করিতেছে অল্প-দিকে তাঁহার সমস্ত চিন্তাশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বলিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের সময় যেমন একমাত্র জীৱনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, সত্যকেই সূখ সম্পত্তি সমাজ-সকলের উর্দ্ধে স্বীকার করিয়া জীবন চিরদিনের মত ধস্ত হইয়াছে এখনো যদি সেইরূপ পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয় তবে তাঁহার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া উত্তীর্ণ হইব।

ললিতার প্রশ্নের উত্তরে পরেশ বাবু কহিলেন—“বিনয়কে আমি ত খুব ভাল বলেই জানি। তাঁর বিজ্ঞাবুদ্ধিও যেমন, চরিত্রও তেমনি।”

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতা কহিল—“গৌর বাবুর না এর মধ্যে ছুদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। স্মৃতিদিক্কে নিয়ে তাঁর ওখানে আজ একবার যাব?”

পরেশ বাবু ক্ষণকালের জন্ত উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি নিশ্চয় জানিতেন বর্তমান আলোচনার সময় এইরূপ যাতায়াতে তাঁহাদের নিন্দা আরো প্রশ্রয় পাইবে। কিন্তু তাঁহার মন বলিয়া উঠিল, যতক্ষণ ইহা অন্যায় নহে ততক্ষণ আমি নিষেধ করিতে পারিব না। কহিলেন “আচ্ছা যাও! আমার কাজ আছে, নইলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতুম!”

বুদ্ধ সমাজ-সংস্কারক,

না মুক্তি-প্রচারক ?

(জি-দে জার্কোর ফরাসী হইতে)

এখন যদি আমরা বুদ্ধ-জীবনের সমস্ত উপাখ্যান-ভাগকে শুধু কবিকল্পনা বলিয়া নির্দ্বারক করি, তবে বুদ্ধজীবনের কোন অংশটিকে ঐতিহাসিক বলা যাইতে পারে? প্রাচীন

কালের মহাকাব্য মাত্রই সৌর-উপাখ্যান—জ্ঞান পণ্ডিত-দিগের একটি নব্য সম্প্রদায় এইরূপ যে একটি মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, এস্থলে সে সম্বন্ধে আমবা কোন তর্ক উপাধন করিব না। Senart তাঁহার বুদ্ধ-উপাখ্যান নামক প্রবন্ধে, বুদ্ধজীবনের উপাখ্যানকে সৌর-উপাখ্যান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বুদ্ধের জননী মায়াদেবী—সন্তান প্রসব করিবার পরেই বাহার মৃত্যু হয়—তিনি সেই প্রাভাতিক বাস্প বাহা সূর্য্য-কিরণের দ্বারা অপসারিত হইয়া থাকে; বুদ্ধ—বিনি মায়াদেবীর কুক্ষি হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন, তিনি সেই সূর্য্য বাহা তিমির-রাশির মধ্য হইতে বাহির হইয়া থাকে। বুদ্ধ—বিনি বোধি-বৃক্ষতলে বসিয়া পাপ-পুরুষ মারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তিনি সেই সৌর বীষ বাহার চারিদিকে শৃঙ্খলমুক্ত ঝটিকা ছুটিয়া বেড়ায়;—আর বোধিবৃক্ষ কি?—না, মেঘরূপ বৃক্ষ। বুদ্ধের যে “ধর্মচক্র” প্রবর্তিত করিয়া-ছিলেন, তাহা কি?—না সেই সূর্য্য বাহার অগ্নিময় চক্র আকাশে বিদ্যুর্গিত হইয়া থাকে। যে নগরে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই কপিলবস্ত্র কি?—না, বায়ুমণ্ডলের একটি নগর। এই মতটিতে একটু গুণপনা মাত্র প্রকাশ পাইতে পারে; তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। Oldenberg, তাঁহার বুদ্ধসম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে, এই ফরাসী পণ্ডিতের মতটি তন্ন তন্ন রূপে আলোচনা করিয়া, তাঁহার সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। নিজের আদর্শ অনুসারে অন্তর্কে বিচার করা, নিজের ধারণা, নিজের আচার ব্যবহার, নিজের রীতি-নীতি অন্তরে আরোপ করা—এইরূপ একটা গর্হিত প্রবণতা আমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আমরা ভাবি না, যে যুগ আমাদের যুগ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন সেই যুগের কথা বিচার করিতে হইলে, সেই যুগে অঙ্গনাকে লইয়া যাইতে হয়।

আমাদের মধ্যে যদি জীবন-চরিত্র লিখিবার একটি বাস্তব থাকে—যে বাস্তবের জোরে, আমাদের প্রখ্যাত লোকদিগের জীবনের ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র ঘটনা সকলও আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকি,—তাঁহা বলিয়া, ঐরূপ বাস্তব যে পুরাকালের সভ্য জাতিদিগের মধ্যেও থাকিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে। বস্তুত তাহা বিপবীতই দেখা

যায়। এই কারণেই পুরাকালের প্রসিদ্ধ লোকদিগের—
বিশেষত ধর্ম প্রবর্তকদিগের—যাহাকে প্রকৃত জীবন-চরিত
বলে—সে রূপ কোন জীবন-চরিত প্রাপ্ত হওয়া যায় না।
জরথুষ্ট্রা, কংফুচু, মুসা, বুদ্ধ—তাহাদের শৈশবে কি
করিতে পারিতেন না পারিতেন, তাহাতে প্রাচীনদিগের
কিছুই আসিয়া যাইত না; তাহাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থাই
প্রাচীনদিগের নিকট গৌরবের জিনিস বলিয়া মনে হইত।
কাজের দ্বারাই মানুষের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়। কাজের
ভাল মন্দ আলোচনা করিয়াই কার্যকর্তাকে বিচার
করিতে হয়। ধর্মপ্রবর্তকদিগের সম্বন্ধে এই একটা
বিশেষত্ব দেখা যায় যে তাহাদের শৈশব ও যৌবনের ঘটনা-
সমূহ প্রায়ই তমসাচ্ছন্ন। মিসর দেশ হইতে প্রস্থান করিবার
সময় মুসার বয়স ৮০ বৎসর ছিল এবং তিনি হেলিয়োপো-
লিসের পুরোহিত ছিলেন—এই দুইটি তথ্য ভিন্ন Exodus
গ্রন্থ হইতে আর কিছুই জানা যায় না। জরথুষ্ট্রা সম্বন্ধেও
এই একই রূপ নীরবতা। বুদ্ধ যিনি ৪০ বৎসর বয়সে ধর্ম
প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহম্মদ যিনি ঐ একই
বয়সে প্রবক্তার কার্য আরম্ভ করেন—ইহাদের সম্বন্ধেও
এই একই কথা। Evangeles গ্রন্থেও খৃষ্টের শৈশবের
কথা কিছুই নাট; ৩০ বৎসর বয়সক্রমে কালে খৃষ্টের প্রচার
কার্য আরম্ভ হয়। অতএব, বুদ্ধ কিরূপ ছিলেন জ্ঞানিতে
হইলে, বুদ্ধের প্রচার ও উপদেশ সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ আছে,
সেই সব গ্রন্থের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হয়। তাহার
যে রূপ অসাধারণ বুদ্ধি ছিল, তিনি যে রূপ গভীর-প্রকৃতি
ও চিন্তাশীল ছিলেন, তাহাতে ভারতের তদানীন্তন সামাজিক
অবস্থা দেখিয়া সমাজ-সংস্কারের কথা যে তাহার মনে
উদয় হয় নাই, ইহা কখনই সম্ভব নহে। তিনি যে রূপ
গভীর তত্ত্বাত্মশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান
ও পাণ্ডিত্যে তখনকার পণ্ডিত দিগকে ছাড়াইয়া উঠিবারই
কথা। কাজেও দেখা যায়, তিনি ধর্মসংক্রান্ত ও
দর্শনসংক্রান্ত বাগবিতণ্ডায় নিমগ্ন প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু
তাহা সত্ত্বেও, কোন চিন্তাশীল দার্শনিককে বৌদ্ধধর্ম
কিছুই শিক্ষা দিতে পারে নাই; তাহার কারণ, কোন
ধর্মই কোন উচ্চ দর্শনতত্ত্বের উচ্চতম অংশের ব্যাখ্যা
করে না; পরন্তু নিম্নতম অংশেই ব্যাখ্যা করিয়া

থাকে; কেন না, ধর্মের উপদেশ সেই জনসাধারণের
উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হয় যাহারা নির্বোধ ও চিন্তা করিতে
অসমর্থ। তাই ধর্মব্যবস্থাপক মাত্রই স্বকীয় জ্ঞান ও
বীজমন্ত্র হইতে এরূপ একটা বীজমন্ত্র বাহির করিতে চেষ্টা
করেন যাহা সর্বসাধারণের প্রতিই প্রযুক্ত; এবং এই
অর্থেই তাহাদিগকে তাহাদের মতবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া
বিবেচনা করা উচিত।

শাক্যমুনির চরিত্রগত বিশেষ লক্ষণ কি?—না, দয়া।
বিশ্বমানবের দুঃখকষ্টে অল্পকম্পাশিত হইয়া তিনি চিন্তাশীল
দার্শনিকের উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিলেন; নিম্নবর্ণের লোক-
দিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহার হৃদয় বিগলিত
হইয়াছিল; তাহাদের ঐহিক জীবনে কেবলই শ্রম, শ্রান্তি,
রোগ, দুঃখক্লেশ এবং পারত্রিক জীবনে অসুখী দুঃখময়
জন্মপরিপারার কথা চিন্তা করিয়া, এই রাজকুমার,—যিনি
জাত্যাংশে ক্ষত্রিয় ও জ্ঞান্যাংশে ব্রাহ্মণ,—সকলের জন্য মুক্তির
একটি বীজমন্ত্র আবিষ্কার করিতে অভিলাষী হইলেন।
রাজপরিচ্ছদের পরিবর্তে ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া, তিনি
পৃথিবীর সমস্ত অধিকার-চ্যুত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করি-
লেন; ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের জন্য মঠ নির্মাণ করিলেন;
উহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ব্রতী করিলেন; এইরূপে, এক
আঘাতেই বর্ণভেদের লৌকিক প্রাচীর ভগ্ন করিলেন;
এবং তাহার চিন্তাপ্রবাহকে নিম্নলিখিত স্তরের আকারে
পরিণত করিলেন:—“আমার এই ধর্ম সকলের পক্ষেই
হিতজনক; এবং যাহা সকলের পক্ষে হিতজনক সে
ধর্মটি কি? সে এমন একটি ধর্ম যাহা অবলম্বন করিয়া,
‘দুরাগত’ প্রভৃতির জায় অতি দীনহীন ভিক্ষুকও আপনা-
দিগকে ধর্মশীল করিয়া তুলিয়াছে।” যে যুগের এই কথা-
গুলি, সেই যুগে যদি আপনাকে লইয়া যাও, এবং মহু-
সংহিতা, বর্ণভেদের যে দুর্ভিক্ষ প্রাচীর উঠাইয়াছে তাহা বাদ
বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে এই কথাগুলির
মধ্যে কতটা মহত্ব আছে।

কতকগুলি পণ্ডিতের মত অনুসরণ করিয়া, বুদ্ধকে
সমাজ-সংস্কাররূপে দাঁড় করিতে যাওয়া একটা ভারী ভুল।
স্বাষ্ট্রনীতি আসলে গোপ-শ্রেণীর নীতির মধ্যে ধর্মব্য,
কেননা, উহা বিশ্বমানবের কিয়দংশের স্বার্থ লইয়াই ব্যাপ্ত;

অতএব, বুদ্ধকে রাষ্ট্রনৈতিকরূপে দাঁড় করাইতে গেলে তাঁহাকে ছোট করা হয়। তাঁহার উর্দ্ধ দৃষ্টি অন্তর ছিল; এই পৃথিবীর হুঃখ কষ্ট হইতে মানুষকে উদ্ধার করা, সুখ ও হুঃখকে, দৈন্য ও সমৃদ্ধিকে সমানরূপে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে মানুষের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয় সেইরূপ ধ্যানে নিমগ্ন হইতে উপদেশ দেওয়া, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া, প্রতিবাসীর প্রতি দয়ালুক্ষিপ্য প্রকাশ করিয়া, মানুষ আপনাত্মাকে উন্নত কবিত্তে পারে, এবং এইরূপে মৃত্যুকালে সেই বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যাহাতে করিয়া তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না, এবং সে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া, সংসারচক্র অতিক্রম করিয়া, নিত্য শান্তি লাভ করে। মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য ইহাই বুদ্ধের উপদেশ। বুদ্ধ যে সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না তাহার প্রমাণ—বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অবিরোধে পাশাপাশি একত্র বাস করিত; লোকসংখ্যা ও আচার ব্যবহারে বিভিন্ন হইলেও, তিব্বৎ, চীন, ব্রহ্মদেশ হইতে সিংহল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হইয়াছিল; কেবল পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে, অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় ১২০০ বৎসর পরে,—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উৎপাদনে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে তিরোহিত হয়। তা'ছাড়া, বুদ্ধ যে সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, তাহার আর এক প্রমাণ,—যেখানে আজিও বৌদ্ধধর্ম রহিয়াছে—সেই সিংহলে ক্রিয়বর্ণ রহিত হয় নাই (৪১)। অতএব, জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া তাঁহার ধর্মপ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, পরন্তু তাঁহার উপদেশের কলে কার্য্যতঃ জাতিভেদ উঠিয়া যায়। তিনি পৌরোহিত্যপন্থ সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন ও মঠের ভিক্ষুদের জন্য চিরব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন;—এই কারণেই ব্রাহ্মণ-বর্ণ রহিত হইয়া যায়। কেন না, ব্রাহ্মণেরা অপর বর্ণকে আশনাগের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিত না; পাছে ভিন্ন বর্ণের লোক তাহাদের মধ্যে মিশিয়া যায় এই জন্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকেই বিবাহ করিত, অপর বর্ণের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

কিরূপ চিন্তাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম ব্যবস্থা সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যদিও ইহা খুব

নিশ্চিতরূপে এখন বলা বড়ই কঠিন, কিন্তু তাঁহার জীবন-চরিত ও তাঁহার উপদেশাদি হইতে এই সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। শাক্যমুনি শৈশব হইতেই ধ্যান-প্রবণ ছিলেন; তাঁহার বয়স-সুগত ও তাহার উচ্চপদ-সুগত আমোদ-প্রমোদে তিনি কখন যোগ দিতেন না। অস্তুর্দৃষ্টি ও আত্মচিন্তার আবির্ভাব হইলে, মানুষ ব্যাহবিসয়ে আর সুখ পায় না, সংসার তাহার নিকট আর রমণীয় বলিয়া মনে হয় না। শাক্যমুনি শীঘ্রই সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন; তাঁহার যেরূপ সুকুমার হৃদয়, তাঁহার যেরূপ প্রথম বুদ্ধি, তাহাতে তিনি রাজদরবারের অসার ও কলুষিত জীবন-প্রণালী গ্রহণ করিতে পারিলেন না এবং যদিও তিনি এমন একটি সুপত্নী পাইয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেবতার ছায় পূজা করিত, বাহা হইতে তিনি একটি পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন—তবু তিনি জ্ঞী, পুত্র, রাজত্ব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তাপসব্রত অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে গৌতম, শুধু নিজের মুক্তি চিন্তা করিতে-ছিলেন, শুধু পরম সত্যের অন্বেষণ করিতেছিলেন। ইহার জন্য তিনি সকল প্রকার ক্রেশস্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। যে সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা ভারত তখন পরিব্যাপ্ত ছিল, সেই সন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং স্তম্ভতদ্বালোচনার সঙ্গে সঙ্গে, যার-পর-নাই কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে সত্যের অন্বেষণ করিতেছিলেন তাহা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, তপশ্চরণে তাঁহার শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল; তখন তিনি একাকী একটা অরণ্যে গিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে সেই ধ্যানেই তিনি হুঃখের মূল কারণ ও হুঃখ নিবারণের উপায় আবিষ্কার করিলেন। যে জ্ঞানের জন্য তাঁহার একটা জলন্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, অবশেষে সেই জ্ঞান তিনি লাভ করিলেন। কিন্তু সেই জ্ঞান লাভ করিয়া এখন তিনি কি করিবেন? এই সময়ে হয়ত প্রচারের কথা তাঁহার মনে আসিয়াছিল, কিন্তু যখন ভাবিলেন এই প্রচারকাণ্ড কি বিশাল ব্যাপার, তখন ভীত হইয়া সে সমস্ত আবার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বলিলেন,—“যাহারা এখানকার সংসার-আবর্তেই ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই

সব মানুষের পক্ষে কার্যকাৰণতত্ত্ব, লয়তত্ত্ব, বিয়োগতত্ত্ব তৃষ্ণা ও বাসনার ক্ষয়, নির্মাণ—এই সমস্ত বিষয় মনে ধারণা করা বড়ই কঠিন। অনেক কষ্টকর সংগ্রামের পর যাহা আমি লাভ করিবাছি, তাহা জগতের নিকটপ্রকাশ করায় কি ফল ? যাহাব মন রাগ ও দ্বেষে পূর্ণ, সত্য তাহাব নিকট চিবকানই প্রচ্ছন্ন থাকে।” এই সময়ে গৌতম, ধর্মপ্রচাবেব সঙ্কল্প পবিত্র্যাগ করিতে প্রায় উত্তত হইয়াছিলেন, তিনি বিজন বনে শান্তভাবে তাপসের জীবন যাপন কবিনেন এবং শান্তচিত্তে নির্মাণ-প্রাপ্তিব জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন, এইরূপ স্থিতি কবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ এই স্বার্থপর ও কাপুরুষোচিত সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি যে সত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা জগতের নিকট প্রচার করিতে হইবে; যে সকল হতভাগ্য লোক, দুঃখকষ্টেব মধ্যে জীবন যাপন কবিত্তেছে, যাহাদের জীবনে সুখের আশামাত্র নাই, তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। অবশেষে তাঁহার ধর্ম তিনি প্রচাৰ কবিনেন বলিয়া স্থির সঙ্কল্প হইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন:—“নিত্যধামের দাব সকলের প্রতিই উদ্ঘাটিত হউক, যাহাদের কাণ আছে তাহারা এই কথা শুনুক ও গুনিয়া বিশ্বাস ককক।” শাক্যসিংহ অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যনগরী বারানসীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এই থানেই তিনি তাঁহার প্রথম উপদেশ বিবৃত করিলেন,—সেই উপদেশের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের মুখ্য তত্ত্বগুলি সন্নিবিষ্ট আছে; এবং এই থানেই ৪০ বৎসর ধবিয়া তিনি তাঁহার ধর্ম প্রচার কবেন। তিনি তাঁহার উপদেশের মধ্যে ঈশ্বরেরও উল্লেখ করিলেন না, জগতেরও উল্লেখ করিলেন না; বৌদ্ধধর্মের যাহা একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়, সেই মুক্তি ও মুক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধেই উপদেশ দিলেন। এই থানেই বুদ্ধের মনোগত চিন্তা ও হৃদয়ের তীব্র অনুভবশীলতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। মানুষ দুঃখভোগ করিতেছে, কিন্তু মানুষের দুঃখভোগ করা উচিত নহে। মানুষ অজ্ঞ হউক বা জ্ঞানী হউক, জগতের উৎপত্তি ও পরিণাম জাহুক বা নাই জাহুক, এই জগৎ সসীম কি অসীম, মৃত্যুব পরেও সাধুপুরুষের অস্তিত্ব থাকে কি থাকে না—এসম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান থাকুক বা

না নাই থাকুক তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। এসমস্ত বিষয়ের উপব মানুষেব শান্তি ও পরমতত্ত্বেব জ্ঞান নির্ভর কবে না, অতএব এ সমস্ত নিরর্থক। কিন্তু দুঃখ, দুঃখের মূল কাৰণ, দুঃখ নিবারণ ও দুঃখ নিবারণের উপায়,—এই চাৰিটি মুখ্যতত্ত্ব মানুষেব জ্ঞান নিতান্তই আবশ্যক। যদি বুদ্ধ ঈশ্বরের কোন উল্লেখ করিয়া না থাকেন তবে তাহা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত নহে (যাহা Barthelemy—Saint-Hilaire-এর বিশ্বাস) পরন্তু তাঁহার মূল লক্ষ্য যে মুক্তি তাহাব সহিত উহাব কোন সংশ্রব নাই বলিয়াই উল্লেখ কবেন নাই।

তাঁহাড়া, যে সকল বচনে ঈশ্বরেব উল্লেখ আছে সেই সকল বচন সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাহাব প্রমাণ—তিনি একস্থলে বলিয়াছেন:—“যে গৃহে সন্তানেরা পিতামাতাকে ভক্তি কবে, সেই গৃহে ব্রহ্ম বাস কবেন।” “অভিধর্ম-কোষ” গ্রন্থের একস্থলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি বচন আছে, যাহা পাঠ করিলে এবিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না:—“জীবেরা ঈশ্বরের দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই, আত্মাব দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই, পঞ্চভূতের দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই।” এখানে এই বিষয়ের আলোচনা আর অধিক করিব না—যে অধ্যায়ে বৌদ্ধ মতবাদ সমূহের ব্যাখ্যা কবিব, সেই থানে আবার এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। এখন আমি শুধু এইটুকু দেখাইব যে, তাঁহার সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎযুগের দার্শনিক পণ্ডিত-দিগের অবজ্ঞাব পাত্র হইবার আশঙ্কাসত্ত্বেও, বুদ্ধদেব, ইতর সাধারণের—অর্থাৎ অজ্ঞ, হৃদলচিহ্ন ও দরিদ্রদিগের মুক্তির জন্ত বহুপরিকর হইয়াছিলেন। সে সময়ে ভাবতে যে সকল দর্শনতত্ত্ব বিদ্যমান ছিল, তাহাদের অপেক্ষা উচ্চতর না হউক, তাহাদের সমান কোন এক দর্শনতত্ত্ব তিনি স্থাপন করিলেও করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া, স্বশ্রেণীর লোকের নিন্দার ভাজন হইয়াও তিনি তাঁহার ধর্মকে শুধু নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিলেন, সকলকেই তৎপ্রহণের অধিকারী করিলেন এবং যে সকল বিষয়ের মীমাংসা করা অতীব দুঃস্বপ্ন, যে সকল সমস্তার সহিত আধ্যাত্মিক মুক্তির কোন সংশ্রব নাই, সে সমস্ত এক পাশে সরাইয়া রাখিলেন;—চিত্রপটের আলোক-

ভাগে না আনিয়া ছায়া-ভাগে রাখিয়া দিলেন। খুঁটও কি ঐরূপ ধরণে কাজ করেন নাই? খুঁটধর্মের মধ্যে যে কতকগুলি ছুঁটের রহস্য আছে, তাহা শুধু ভক্তদিগের জীবনে ব্যবহার করিবার জন্যই রহিয়াছে, তাহা চিন্তা-আলোচনার বিষয় নহে।

যাই হোক, বুদ্ধদেব যে করুণ-হৃদয় ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন, “আমার এই মুক্তির ধর্ম সকলেরই জন্য”, এবং বিশ্বমানবের হুঃখ নিবারণের জন্য, তিনি একটি উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন; মনকে সমাহিত করিয়া, যোগে নিমগ্ন হইয়া, মন্ত্রাদি আবৃত্তি করিয়া, সংসারের হুঃখ সমূহকে অতিক্রম করিতে হইবে;—ইহাই তাঁহার উপদেশ।

যোগসাধন অপেক্ষা হুঃখ নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় আর কি হইতে পারে?

অবস্ত, শাক্যমুনি,—বুদ্ধিমান, সুপণ্ডিত অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে কোনরূপ অনিচ্ছা কিংবা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু সেইরূপ সমান ভাবে, তিনি দরিদ্র অজ্ঞ ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকেও সাদরে গ্রহণ করিতেন। অনেকগুলি বচনের দ্বারা আমাদের এই কথা সপ্রমাণ হয়; এবং এই কারণেই, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্তঃসন্ন্যাসীরা তাঁহার বিদ্বেষী ছিল।

পূর্ণ নামক এক ব্যক্তির কাহিনী মৃষ্টান্ত-স্বরূপ এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কোন বণিকের ঔরসজাত দাসীপুত্র পূর্ণ, দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয় করে। তাহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহাকে বিবাহ করিতে চাও? কিন্তু পূর্ণ উত্তর করিল:—“আমি ইন্দ্রিয় হুঃখের অভিলাষী নই। আপনার অনুমতি পাইলে, আমি ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিব।” তাহার ভ্রাতা যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়া বলিল;—“কি! যখন আমরা দরিদ্র ছিলাম তখন ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিবার কথা তোমার মনে আসে নাই; আর এখন আমরা ধনশালী হইয়াছি—এখন তুমি কি না ধর্মব্রত গ্রহণ করিবে?” অতএব ইহা হইতে সপ্রমাণ হয়, যাহারা দীন দরিদ্র নিরুপায় তাহারাও বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিতে

পারিত। তাই ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে যখন-তখন উপহাস করিত। কোন অজ্ঞাত-শিশু সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময় তিনি তাঁহার মনোভাব এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন:—“যখন গৌতম বলিয়াছিলেন, ঐ গর্ভস্থ শিশু আমার ধর্মই অবলম্বন করিবে, তখন তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। যখন তোমার পুত্রের অশন বসনের কোন উপায় থাকিবে না, তখন সে নিশ্চয়ই ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিবার জন্য, শ্রমণ গৌতমের নিকট আসিবে।” (৪৪)

একজন দুর্দশাগ্রস্ত দ্যুতকার, সংসারে বিরাগী হইয়া, ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলে—“তখন আমি উন্নত মস্তকে রাজপথে চলিব।” আবার, কোশল-রাজের ভ্রাতা কাল নামক একটি যুবাণুরুষ, কোশলরাজের আদেশক্রমে ছিন্নাঙ্গ হওয়ায়, বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ যখন তাহার ক্ষত সারাইয়া দেন তখন সে বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করে। গত শতাব্দীতে একজন ভিক্ষু, Rhodia জাতির নিকট বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার সিংহলরাজ যখন তাহাকে অপমানিত করেন, তখন সে এইরূপ উত্তর করে; “ধর্ম সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হওয়া উচিত।”

আমার মতে প্রচার কার্যটাই বুদ্ধদেবের উদার লোক-হিতৈষণার একটা জলন্ত প্রমাণ।

তাঁহার পূর্বে, প্রচার বলিয়া কোন পদ্ধতি কোন ধর্মের মধ্যেই ছিল না; সকল ধর্মেরই নিকট উহা অজ্ঞাত ছিল। পুরাকালে দীক্ষিত ব্যক্তিরাই ধর্মমতগুলি জ্ঞানিতে পারিত, সাধারণ লোকের নিকট উহার আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। আবার ভারতবর্ষে, পুরোহিত-জাতি ব্রাহ্মণেরাই ঐ সকল গুরু ধর্মমতের একমাত্র রক্ষক ছিল, এবং একমাত্র উহারাই শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিতে পারিত।

শাক্যমুনির আগমনে সমস্তই পরিবর্তিত হইল; বিশেষাধিকারসম্পন্ন বর্ণেরা যে সকল সত্যকে অতি সাবধানে—নিজের হাতে রাখিয়া দিয়াছিল, শাক্যমুনি সেই সমস্ত সত্য প্রচার করিয়া সর্বসাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত করিলেন।

ইহা হইতেই, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে খুব একটা সাধাসিধা ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। এই সাধাসিধা ভাব,—এই ‘সরলতা’—উহাদের সাহিত্যের মধ্যেও পরিগল্ফিত হয়।

যাহাতে নির্বোধ লোকেরাও অনায়াসে বুঝিতে পারে এই জন্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে বুদ্ধি প্রদর্শন করিতে হইলে, অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি কবিতা তাহা বিবৃত কবা হইত। আমি বৌদ্ধধর্মের আনিম মতগুলির কথা বলিতেছি। পরে, অল্প সকল ধর্মের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের মতগুলিও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রজ্ঞা-পাবমিতাব দ্বারা গ্রন্থগুলি দর্শনগ্রন্থ বহি আর কিছুই নহে,—তাহাতে বৌদ্ধধর্মের মূলভাবটি নষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধ-সাহিত্য, সাহিত্যের হিসাবে যে খুব উচ্চদরের নহে—মধ্যম শ্রেণীর সাহিত্য,—এই সরলতাই তাহার মূল কারণ।

সংস্কারের দ্বারা, সত্যের দ্বারা যাহাতে সমস্ত জগৎ উপকৃত হয়, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উপকৃত হয়, এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রচার-পদ্ধতি প্রবর্তিত করেন। এবং তাহার ধর্ম প্রচার কবিবার জন্ত তিনি তাহার কতকগুলি শিষ্যকে প্রচারক-পদে বরণ কবিতাছিলেন—তাহারাই দেশ বিদেশে ধর্ম প্রচার কবিতা বেড়াইত।

কলত, বৌদ্ধ ভিক্ষু গুধু নিজে কঠোর তপশ্চরণ কবিতা, নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিতাই সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করিতেন না, পরন্তু কঠোর পরীক্ষার মধ্যে থাকিয়া যাহাতে তাহার শুভচেষ্টার ফলভাগী অল্প লোকেও হইতে পারে—এইরূপ সিদ্ধিলাভই তিনি আকাঙ্ক্ষা করিতেন।

বৌদ্ধধর্ম যে এত শীঘ্র দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রচার-পদ্ধতিই তাহার নিগূঢ় কারণ। বুদ্ধদেব শাস্তিময় প্রচারকার্যের দ্বারাই তাহার ধর্ম চতুর্দিকে প্রসারিত করিয়াছিলেন; তাহার দিগ্বিজয়ের মধ্যে একটুও রক্তের দাগ দেখা যায় না।

তাই আমরা দেখিতে পাই, যাহারা ভিক্ষুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পার না, তাহাদের উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—“যাহারা রক্তপাত করিয়াছে—তাহারা ভিক্ষু হইতে পারিবে না।”

‘পাতিমোক্ষ’ সংহিটার, মহাপাণী, ঋণগ্রস্ত ও সৈনিক-পুরুষদিগকে ভিক্ষুশ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে (৪৫)। শাক্যমুনির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা বোধ হয় যথেষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে:—তিনি মানুষকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ও ধর্মোচরণের শিক্ষা দিয়া, মানুষকে

মুক্তিদান করিবার জন্তই ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাই, দার্শনিকের আসন ত্যাগ করিয়া তিনি ধর্ম প্রচারক হইয়া দাঁড়াইলেন; এবং যে সত্য তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা ৪০ বৎসর ধরিয়া জনসমাজে প্রচার করেন।

অবদান-শতক হইতে একটা বাক্য আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহার সত্যতা “সংযুক্ত-নিকায়” নামক পালী ভাষার বৃহৎ সঙ্কলন-গ্রন্থে, ও ধর্মপদের পালী-ভাষ্যেও সমর্থিত হইয়াছে। উহা হইতে বুদ্ধের দয়া ও জ্ঞানের পরিচয় এবং ভাবতীর্থ আর্থাদিগের কোমল স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়; ইহা যুদ্ধসম্বন্ধে স্নেহময়ের উক্তি।

কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ ও মগধ-রাজ অজাত শত্রু—এই উভয়ের মধ্যে শত্রুতা ছিল। প্রসেনজিৎ যুদ্ধে তিনবার পরাজিত হইয়া, তাহার পর তিনি অজাতশত্রুকে পরাজিত কবিতা বন্দী করেন। অজাতশত্রুকে বুদ্ধের নিকট আনিয়া প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে এই কথাগুলি বলেন:—“আর্য্য। এই অজাতশত্রু অনেকদিন হইতে আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতেছেন, আমি কিন্তু ইহার কোন অনিষ্ট করি নাই। বিনা কারণে ইনি আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আমি ইহার প্রাণ বধ করিতে চাহি না,—আমাব মিত্রের পুত্র বলিয়া ইহাকে আমি ছাড়িয়া দিব।” বুদ্ধ উত্তর করিলেন:—“হাঁ, উহাকে ছাড়িয়া দেও।” তাহার পর ভগবান এই কথাগুলি বলিলেন:—“বিজয় হইতে শত্রুতা উৎপন্ন হয়, বিজিত হুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। যে ব্যক্তি শাস্তিপ্রিয়, সে জয় পরাজয় পরিত্যাগ কবিতা কল্যাণপথে বিচরণ করে।”

“সংযুক্ত নিকায়” এই বিষয়টি আবও স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে।

“তখন ভগবান্ এই বিষয় অবগত হইয়া, এই গাথাগুলি আবৃত্তি করিলেন:—কোন বিশেষ কাবশে উত্তেজিত হইয়া মানুষ মানুষকে কষ্ট দেয়, কোন ব্যক্তি অন্যের নিকট হইতে কষ্ট পাইলে, সে আবার অন্যকে কষ্ট দেয়। যতক্ষণ না দুর্বিপাক উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ না পাপের ফল পাকিয়া উঠে, ততক্ষণ মানুষ মোহে মুগ্ধ থাকে, দুর্বিপাক উপস্থিত হইলে মুঢ় ব্যক্তির কষ্ট পায়। হত্যাকারী

মাত্রই পরিণামে অল্প হত্যাকারীর বধ্য হয় ; বিজেতা মাত্রই পরিশেষে অল্প বিজেতার দ্বারা বিজিত হয় ; যে গালি দেয় সে আবার অন্তের নিকট হইতে গালি খায় ; যে অন্তের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে আবার অন্তলোকের ক্রোধের পাত্র হয়” (৪৬) জলপাট-উদ্যানে খুঁট যে কথা বলিয়াছিলেন, ইহা কি তাহারই ভাষান্তর-বাক্য নহে ?—“যে কেহ অসির দ্বারা আঘাত করিবে, সে অসির আঘাতেই মরিবে।”

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

পাট বা নালিতা ।

প্রথমাধ্যায়—পাটগাছের বর্ণনা ও জাতি এবং বংশভেদ ।

১। পাট ও শস্ত্র সংগ্রাম ।

‘পাট’ শব্দে ~~ব্যবহৃত~~ ভাবে পণ্য অসম্ভব নানাপ্রকার ছোট ছোট গাছকে বুঝায়—যথা মেঠা পাট, সন পাট, কোঠা পাট ইত্যাদি। সুধু ‘পাট’ বলিলে আমাদের দেশে কোঠা পাট বা নালিতাকেই বুঝায়। এই পাটই ‘জুট’ নামে পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত হইয়াছে। ডাক্তার রক্সবার নামক বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিলাতে নমুনা স্বরূপ কিছু পাট পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময়ে কর্তৃকে কোম্পানি-বাহাদুরের একটি বৃহৎ দড়ির কাবখানা ছিল, এবং তথায় পাটকে ‘জোট’ বলিত। রস্মববা সেই কারখানায়ই প্রথম পাটের ব্যবহার দর্শন কবেন, এবং তথা হইতে ‘জুট’ নাম দিয়া বিলাতে তাহার নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। সেই অবধি আমাদের পাট বা নালিতা পাশ্চাত্য জগতে ‘জুট’ নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আমাদের দেশে পাট বা নালিতার চাস বড় একটা ছিল না। কিন্তু সেই সন হইতেই পাটের বাণিজ্য আরম্ভ হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। তখন আমাদের দেশে কাপাসই প্রধান আঁসশস্ত্র ছিল। কিন্তু পাটের চাসের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কাপাসের চাস কমিতে আরম্ভ করিল—এবং পাট তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। তাহাতেও পাটের চাসের বৃদ্ধি বন্ধ হইল না। পাট এখন ধানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়াছে। উভয়ের মধ্যে মহা সংগ্রাম উপস্থিত। কে বলিবে এই

কুরুক্ষেত্রে আমাদের ধাত্তশস্ত্র ধাত্তেরই জয়লাভ হইবে কি বিদেশীর প্রয়োজনীয় আঁস শস্ত্র পাটেরই জয় হইবে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের পাট খাইয়া জীবন ধারণ করিতে শিথিতে হইবে।

পাট বা নালিতা জিনিসটা আমাদের নূতন নয়। পুরাকাল হইতে থাকের জন্ত আমরা নালিতা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দড়িদড় এবং ছালার জন্ত আমরা পাটের আঁসও কিছু কিছু ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। জানা যায় শাকরূপে এই নালিতা গ্রীকদের মধ্যে এবং ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী অপরাপর দেশেও ব্যবহৃত হইত। চীন দেশেও পাট বহুকাল অবধি প্রচলিত। অধুনা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পাট চাসের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু আশাব্যবসায় ফল পাওয়া যাইতেছে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার মিশরদেশে (Egypt)ও পাটচাসের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে এবং তথায় কৃতকার্য হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সেই সকল দেশে যদি পাটের চাষে বিশেষ সুবিধা হয় তবে পাটের বাজারে বাঙ্গলাদেশের বর্তমান একাধিপত্য আর থাকিবে না। তখন ব্রোধ হয় পাটের চাষাদের পুনর্মুখিক হইয়া ধাত্ত কি অল্প কোন ধাত্ত-শস্ত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। স্বাহাউক বর্তমানে পাট আমাদের প্রধান শস্ত্র এবং বাঙ্গালীমাত্রেয়ই তাহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা কর্তব্য। তাই আমরা পাটগাছের বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছি।

২। পাট গাছের বর্ণনা ।

নালিতার গাছ বর্ষজীবী (annual) অর্থাৎ একই বৎসরে বা পক্ষে ইহার গাছ জন্মিয়া পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া এবং ভবিষ্যৎ বংশ বিস্তারের জন্ত বীজ উৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়। ইহার কাণ্ড সরল, ৪ হাত হইতে ৮ হাত পর্যন্ত লম্বা। ইহার পত্র সরল, এবং প্রত্যেক প্রথমটি প্রত্যেক তৃতীয়টির উপরে অবস্থিত (alternate), পত্রের আকার কিঞ্চিৎ লম্বাগোলা (oblong), পত্রের কিনারা করাতের দাঁতের মত কাঁচিকাটা (serrate) এবং উভয় পার্শ্বের শেষ খণ্ডের অগ্রভাগে এক একটি ছোট বেষের মত দৃষ্ট হয়। ইহার পুষ্পকাণ্ড (peduncle)

ছোট।- ফুল ছোট, এবং হরিদ্রাবর্ণ। ফুলের বহিরাবরণ (calyx) কোন জাতির সংলগ্ন ৪টি অংশ (sepal) যুক্ত, কোন জাতির পৃথক ৪টি অংশ (sepal) যুক্ত। পুষ্পের পাপড়ি-চক্র (corolla) ৫টি পাপড়ি (petal) যুক্ত। পুষ্পাঙ্গুলি নিকট সন্নিবেশিত। পরাগ কেশর (stamens) অনেক। গর্ভকোষ দুইটি হইতে দুইটি পর্য্যন্ত প্রকোষ্ঠ যুক্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে অনেকগুলি করিয়া বীজ। গর্ভকেশর ক্ষুদ্র। কোন কোন জাতীয় নালিতার ফল লম্বা সরু নলের মত, আর কোন জাতির ফল গোলা। উদ্ভিদ জগতে নালিতা রুদ্ভাকাদির সহিত একজাতিভুক্ত (natural order Tiliaceae)। নালিতা (corchorus) সেই জাতিরই একটি বর্ষজীবী শাখা (genus)। এই শাখার আবার নানা প্রাশাখা (species) আছে, এবং তাহাদের সকলেরই বকুলের ভিতরের অংশ (liber) হইতে পাট বাহির করা যায়। এই সকল প্রাশাখা মধ্যে দুইটিই মাত্র আমাদের কৃষির অন্তর্গত। একটি ঘিয়া বা মিঠা নালিতা (corchorus olitorius) যাঁহা কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে পাটের জন্ত এবং শাক খাওয়ার জন্ত প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়। এবং অপরটি তিক্ত নালিতা (corchorus capsularis)। তাহা পূর্ববঙ্গে শাকের জন্ত এবং প্রচুর পরিমাণে পাটের জন্ত চাষ হয়। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে এই উভয় জাতিই ২৩টি বস্ত্র বা জলজ নালিতা (corchorus) জাতীয় (যথা বস্ত্র তিতাপাট C. Acutangulus, বেহারের জঙ্গলিপাট C. Trilocularis, এবং বিল নালিতা C. Fascicularis) গাছ হইতে অস্ত্রোস্ত্র-সংযোগ (Cross-fertilization) এবং চাষ দ্বারা উন্নীত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। দেশকাল এবং অবস্থা ভেদে আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্তন করিবার নালিতার বৈশিষ্ট্য আশ্চর্য্য শক্তি দৃষ্ট হয় উদ্ভিদজগতে সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। এই কারণে বৈজ্ঞানিকদিগের অনুমান নিতান্ত অসম্ভব মনে হয় না। পাটপাতা শুকাইয়া রাখিয়া সেই শুষ্ক পত্র ভিজান জল, আমাশয় রোগের একটি ভাল ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়।

৩। ঘিয়া বা মিঠা নালিতা ।

(Corchorus olitorius)

ঘিয়া বা মিঠা নালিতা বর্ষাকালে কলিকাতা অঞ্চলে অনেক স্থানে চাষ হয়। ইহার গাছ ৩৪ হাত লম্বা হয়। গাছের গায়ে ক্ষুদ্র রৌদ্রা থাকে না, কিন্তু পত্রের বোটার (Petiole) শেষার্দ্ধ এবং পত্রশিরাগুলি (Veins) কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রৌদ্রাযুক্ত। পত্র সরল লম্বা গোলা, তিতা পাট অপেক্ষা গোলাই বেশি, লম্বা কম। পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হইয়া থাকে। পত্রের কিনারাতে করাতে দাঁতের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। পুষ্প-কাণ্ডে (Peduncle) ২১টি মাত্র ফুল জন্মে। পুষ্প ক্ষুদ্র হরিদ্রাবর্ণ। পুষ্পের বহিরাবরণে (Calyx) পাঁচটি পৃথক অংশ (sepal)। ফল প্রায় নলাকার লম্বা ঈষৎকুর। ফলের অগ্রভাগ সরু (beaked)। ফলের গায়ে লম্বা লম্বা ১০টি কবিত্তা গভীর রেখা। ফলের ভিতর পাঁচটি পরদা দ্বারা পাঁচটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে অনেকগুলি করিয়া বীজ থাকে। বীজগুলিও পরদাদ্বারা পরস্পর বিভক্ত। বীজ সবুজবর্ণ, প্রায় ত্রিকোণ। পত্রের আশ্বাদন মিষ্ট না হইলেও তেমন তিক্ত নয়। এছাড়া ইহার চাষা গাছের পাতা শাকের জন্ত কলিকাতার বিশেষ প্রচলিত।

৪। তিতা নালিতা (C. capsularis)

তিতাপাট পূর্ববঙ্গের বর্ষাকালীন প্রধান ফসল। ইহার গাছ ৫৭ হাত লম্বা হয়। পত্র সরল লম্বা-গোলা কিন্তু মিঠা পাট অপেক্ষা লম্বায় বেশি, এবং গোলা কম। পত্রের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, এবং কিনারা করাতে দাঁতের মত কাটা, এবং তাহার নিম্নতমভাগে কেশর জায় অংশ। মোটামুটি তিতাপাটের গাছও দেখিতে মিঠা পাটের গাছেরই মত। তবে ইহার পুষ্প কাণ্ডে (Peduncle) অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক ফুল থাকে। ফুলের বহিরাবরণে (calyx) পরস্পর সংযুক্ত পাঁচটি অংশ (sepals)। পুষ্পাঙ্গুলি মিঠাপাট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। এবং হরিদ্রাবর্ণ হইলেও কিঞ্চিৎ সাদা। পাপড়ি পাঁচটি। ইহার ফল গোলা, অগ্রভাগ যেন কাটা। ফলের উপরিভাগ অসমান কর্কশ এবং রেখাযুক্ত। ফলের ভিতরে পাঁচটি বীজকোষ পরদা দ্বারা বিভক্ত। প্রত্যেক বীজকোষে অপেক্ষাকৃত

অল্প সংখ্যক বীজ পরদা দ্বারা অবিভক্ত। বীজকোষ পাঁচটির মাকে মাকে আরও পাঁচটি বীজ শূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ। তিতাপাটের বীজও মিঠাপাটেরই স্তায় ত্রিকোণ—কিন্তু ইহার বর্ণ লাল। এই লাল বর্ণ দৃষ্টেই তিতাপাটের বীজ সবুজ বর্ণ মিঠাপাটের বীজ হইতে বাছিয়া লওয়া যায়। আবার পত্রের তিস্ত আবাদন দ্বারা তিতাপাটের অতি ক্ষুদ্র চারাগাছ ও মিঠাপাটের চারাগাছ হইতে সহজেই বাছিয়া লওয়া যায়।

মিঠাপাট এবং তিতাপাট এই উভয়ই আমাদের কৃষির অন্তর্গত। আমাদের কৃষিবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই উভয় জাতীয় নালিতা গাছের তুলনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহারও সারমর্ম এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। তিতাপাটের মূল শিকড় (Taproot) অপেক্ষাকৃত কম সরল। তাহার প্রধান শাখা শিকড় সকল মাটির উপরিভাগে অবস্থিত। এই কারণে এই জাতীয় গাছ অল্প পরিপ্রমের টানিয়া উৎপাটিত করিতে পারা যায়। মিঠাপাটের মূল শিকড় অনেক বেশি লম্বা এবং প্রধান শাখা শিকড়গুলি মাটির অপেক্ষাকৃত অধিক নিম্নে অবস্থিত। এক্ষণে মিঠাপাট টানিয়া সহজে উৎপাটিত করা যায় না। তিতাপাটের কাণ্ড অপেক্ষাকৃত কম সরল এবং প্র-কাণ্ড অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক ও অধিক লম্বা। মিঠাপাটের কাণ্ড খুব সরল, প্র-কাণ্ডের সংখ্যা কম এবং দৈর্ঘ্যে ছোট। তিতাপাটের পত্রাঙ্গ (stipules) পৃথক, ও ঘনসন্নিবিষ্ট, মিঠাপাটের পত্রাঙ্গ (stipules) অল্প সংখ্যক ও সংযুক্ত। তিতাপাটের নিম্নের পত্রগুলি সহজে ঝরিয়া পড়ে না, কিন্তু মিঠাপাটের নীচের পাতাগুলি অতি সহজেই ঝরিয়া পড়ে। তিতাপাটের ফুল মিঠাপাটের ফুল অপেক্ষা ছোট। ফল তিতাপাটের গোলা এবং মিঠাপাটের লম্বা। বীজ তিতাপাটের লাল এবং মিঠাপাটের সবুজ। আবাদন তিতাপাটের খুব তিস্ত এবং মিঠাপাটের অতি সামান্য রকম তিস্ত।

৫। নালিতার বংশভেদ (Races)।

মিঠাপাট এবং তিতাপাট উভয়ই নানা প্রকার দৃষ্ট হয়। অনেক মনে করেন যে এই সকল প্রকার ভেদকে উপশাখা

(variety) নাম দেওয়া যায় না। কারণ তাহাদের প্রকার ভেদের (type) স্থায়িত্ব দৃষ্ট হয় না। উভয় বিধ পাটেরই পৃথক বংশভেদ জনিত (race) বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার পাটের যে সকল বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা মোটামুটি এই—(ক) একই সময়ে বপন করিলেও কতকগুলি বংশীয় পাট অতি অল্প সময়েই বর্ধিত হইয়া পুষ্প ধারণ করে; আর কতকগুলির পুষ্প ধারণ করিতে বিলম্ব হয়। (খ) একই প্রকার চাষ করিলেও, পূর্ণ বিকাশ লাভ হইলে, কতকগুলি অত্যন্ত সতেজ এবং দীর্ঘ কাণ্ড যুক্ত, আর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নেজ এবং কম দীর্ঘ হয়। (গ) কাণ্ডের (stem) পত্রাঙ্গের (Petiole) রংএর মধ্যে বংশানুসারে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কতকগুলির বর্ণ সবুজ এবং কতকগুলির লাল। মোটামুটি দেখা যায় যে যে সকল পাট পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে অধিক সময় নেয়, সেই সকলই অধিক পরিমাণে পণ্য পাটের আঁস (Jute-fibre) উৎপন্ন করে। ইহাও দৃষ্ট হয় যে গাছগুলি পুষ্ট হইলে পণ্য পাটও ভাল হয়। মিঠাপাটের বংশভেদ অপেক্ষাকৃত অল্প। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। (১) তোষ—ইহা পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জেই বিশেষ প্রচলিত; দেশী লাল পাট নামে ইহা হুগলি জেলায়, এবং হালবিলাতী নামে ত্রিপুরা জেলাতে প্রচলিত। ইহার কাণ্ড লাল রং। পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমীতে ইহার চাষ হয়। ক্ষেত্রে জল জমিলে তোষ জাতীয় গাছ যতই বড় হউক না কেন, ভাল হয় না। বেলে মাটিতে এই পাট অত্যন্ত পাট অপেক্ষা ভাল হয়। তোষগাছের কাণ্ডের নিম্নভাগে শিকড় গুলি বাহির হয় না। ইহার আঁস (fibre) শক্ত এবং ওজনে অধিক। কিন্তু এই পাটের বাজার দর তিতাপাট অপেক্ষা কম। (২) বাঙ্গি পাট—ইহা ঢাকা অঞ্চলে এবং (৩) সাতনটা ইহা ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচলিত। ইহাদের উভয়েরই কাণ্ড সবুজ বর্ণ। এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ইহারা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। (৪) দেওনাগা—ইহা ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত, কাণ্ডের বর্ণ সবুজ এবং ইহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে অত্যন্ত অধিক সময় লাগে। তিতাপাটের বংশভেদ (Races) মিঠাপাট অপেক্ষা

অনেক অধিক, তন্মধ্যে এই কয়টা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—

(১) দেশওয়াল পাট (C. Cap. Variety Ramosus) ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। ইহার কাণ্ড ৪।৫ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়, কিন্তু অধিক জল পাইলে ইহার কাণ্ডের নিম্নদেশে লোমের মত শিকড় গুলু দৃষ্ট হয়। তবে ইহার বৃদ্ধি এত তাড়াতাড়ি হয় যে যদিও অত্যন্ত জাতীয় নালিতার সঙ্গেই চৈত্র বৈশাখ মাসে (April, May) বপন করা যায়—শ্রাবণ মাস (June and July) মধ্যেই ইহার বিকাশ পূর্ণ হইয়া কাটিবার যোগ্য হয়। এক্ষণে ইহাকে আউসি পাটও বলে। ইহার দোষ এই যে শাখা প্রশাখা কিছু বেশী বাহির হয়, এবং প্রধান কাণ্ডও তত সরল হয় না। (২) বোম্বাই বা বাওয়া পাট (C. Cap. Variety Erectum) ইহাও ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুরে বিশেষ প্রচলিত। ইহার শাখা প্রশাখা অত্যন্ত কম হয়, এবং ফলও কম হয়। ইহার কাণ্ড ৬ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। গোড়ায় অধিক জল থাকিলে, ইহারও কাণ্ডের নিম্নভাগে অসংখ্য শিকড় গুলু দৃষ্ট হয়। এই পাটের আস অত্যন্ত পাট অপেক্ষা ভাল। এই পাটের বিকাশে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে বপন করিলেও ইহা আশ্বিন মাস পর্যন্ত কাটিবার যোগ্য হয়। বর্ষার জলে প্রাবিত না হয়, এইরূপ স্থানেই এই পাটের চাষ হয়। (৩) বরপাট বা তল্লাপাট (C. Cap. Variety Longum)—ইহার কাণ্ডের বর্ণ সবুজ। পূর্ববঙ্গে মেঘনার উভয় পার্শ্ব চর সমূহে এবং অত্যন্ত যে যে স্থান বর্ষার জলে প্রাবিত হয়, সেখানেই এই পাটের চাষ হয়। ইহার কাণ্ড ৭।৮ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। অল্প কোন শ্রেণীর পাট এত লম্বা হয় না। নিতান্ত চারাগাছ ভিন্ন বর্ষার জলে কিম্বা জমিতে জল দাঁড়াইলে এই পাটের কোন ক্ষতি হয় না, ইহার কাণ্ডের নিম্নভাগে শিকড় গুলু হয় না। (৪) আলতা পাট বা বিজ্ঞানন্দর—(C. Cap. Variety Rubra) ইহা রঙ্গপুর অঞ্চলেই বিশেষ প্রচলিত। ইহার কাণ্ড লাল বর্ণ। ইহার আসও কিঞ্চিৎ লাল আচ্ছাদিত। এই জন্ত বাজারে এই পাটের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম।

যে সকল স্থানে বর্ষার জল না উঠে এবং জমিতে জল না

দাঁড়ায় সে সকল স্থানে মিঠাপাট (C. Olitorius) এবং যে সকল স্থানে বর্ষার জল উঠে এবং জমিতে জল দাঁড়ায়, সে সকল স্থানে তিতাপাট (C. Capsularis) ভাল জন্মায়। মোটামুটি দেখা যায় পূর্ববঙ্গে, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের চরে, ও পার্শ্ববর্তী বিল সমূহে তিতাপাট (C. Capsularis) অধিক প্রচলিত। আবার পশ্চিম-বঙ্গে, কলিকাতা অঞ্চলে এবং হুগলি বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে মিঠাপাটই (C. Olitorius) অধিক প্রচলিত। ধাত্তের মত পাটেরও আউসি এবং আমনি এই দুই শ্রেণী আছে। মিঠা এবং তিতা উভয় পাটেরই এই দুই শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এবং যদিও সকল পাটই চৈত্র বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করা যায়, কয়েক জাতীয় পাট শ্রাবণ মাসের মধ্যেই (July and August) পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া কাটিবার যোগ্য হয়। ইহাদিগকে আউসি পাট বলে। আবার কয়েক জাতীয় পাট আশ্বিন মাসে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া কাটিবার যোগ্য হয়। ইহাদিগকে আমনি পাট বলে। ইহাও দেখা যায় যে যে সকল দেশে জল কম হয়, যথা উত্তর বঙ্গে, সে সকল দেশে পাট অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পণ্য পাট তত ভাল হয় না, এবং পরিমাণেও কম হয়। আবার যে সকল দেশে প্রচুর জল হয়, যথা পূর্ববঙ্গে, সেই সকল দেশে পাট পূর্ণ বিকাশ পাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে, এবং পণ্য পাট অধিক মূল্যবান এবং পরিমাণেও অধিক হয়।

দ্বিতীয়াধ্যায়—পাটের জল বায়ু ও চাষ।

৬। পাটের মাটি ও জল বায়ু।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে (অর্থাৎ যে সকল স্থানে উত্তাপ ৬০°ফ হইতে ১০০°ফ) উষ্ণ বায়ুতে এবং সিন্ত পলি ভূমিতে (alluvium) যে কোনরূপ মাটিতেই হউক অতি উত্তম রূপে নালিতার চাষ হইতে পারে। এই জন্তই বিষুব রেখার উত্তরে ২৩ ডিগ্রি (কর্কট ক্রান্তি) ও দক্ষিণে ২৩ ডিগ্রি (মকর ক্রান্তি) এই স্থান মধ্যে নদীর চরে এবং বিল এবং বিলেব পার্শ্ববর্তী জমিতে পাটের ভাল চাষ হয়। অধিকাংশ

জাতীয় পাট গাছ চারা অবস্থা অতিক্রম করিলে অর্ধ জল-ময় থাকিলেই ভাল ফসল পাওয়া যায়। এই সকল কারণে পূর্ববঙ্গ এবং আসামের মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের চর ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম্য বিল সমূহে সর্বাধিক ভাল পাট হয়। যে সকল জমি বর্ষাকালে জলময় হয় না, সে সকল জমির জন্ম মিঠাপাট বিশেষ উপযোগী। সিরাজ গঞ্জে দেখা যায়, এই জাতীয় পাট বর্ষাকালে অর্ধ শুষ্ক জমি এবং বাস্তব জমিতে বর্ধিত হইতেছে; কিন্তু তিতাপাট ৭৪ এবং বংশভেদে ৫৮ ফুট জলময় থাকিলেও অতি সতেজে বর্ধিত হয়। এবং নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ভৈরব প্রভৃতি স্থানে অনেক সময় দেখা যায় কৃষকেরা ডুব দিয়া ডুব দিয়া পাট কাটিতেছে। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে যদিও সিল্প উচ্চ বায়ু এবং আর্দ্র পলি ভূমি পাটের বিশেষ উপযোগী—তথাপি পাট গাছ ছোট চারা বসায় থাকা কালীন যদি অত্যন্ত বর্ষা হইয়া জমিতে জল দাঁড়ায় তবে সকল জাতীয় পাট গাছই মরিয়া যায়। উপযুক্ত পরিমাণ জল পাইলে সকল মাটিতেই ভাল পাট হয় বটে, তথাপি সাধারণ ভাবে একথা বলা যায় যে দোয়াস (Loam) এবং আটাল (clay-loam) মাটিতে যে পাট হয়, তাহার আস অতি উৎকৃষ্ট, এবং বেলে মাটিতে (sandy loam) যে পাট হয় তাহার আস নিকট। তবে আসের গুণের উপর মূল্যের তারতম্য যতদিন উপযুক্ত মত না হয়—ততদিন কৃষকগণ পণ্য পাটের পরিমাণের উপরই দৃষ্টি রাখিবে। জল বায়ু যদি ঠিক থাকে তবে, মাটি বেলে কি আটাল, উৎপন্ন পণ্য পাটের পরিমাণ সম্বন্ধে বেশী কিছু আসে যায় না। তবে আটাল মাটির চাষে, বেলে এবং দোয়াস মাটি অপেক্ষা ধরত অধিক পড়ে।

৭। পাটের চাষ।

পাটের চাষের অন্তর্যন্ত সম্ভব গভীর চাষ করিয়া মাটি চূর্ণ করিয়া ধুলার মত করিতে হয়। অল্প ধরতে চুক্তি করিয়া হল চালনা করাইলে পাটের উপযুক্ত চাষ হওয়া সম্ভব নয়। পুরোহিত যেমন চারি আনার চণ্ডীও জানে, এক আনার চণ্ডীও জানে—কৃষকও তেমনি আট আনার হল চালনাও জানে বার আনার হল চালনাও জানে।

নিজের হাল গরু দ্বারা নিজে লাঙ্গল করিলে যে রূপ ইচ্ছাম গভীর করিয়া চাষ করা যায়; চুক্তির হাল গরু দ্বারা এমন কি অসম্ভব কম বেতনের চাকর দ্বারাও সেইরূপ হইবে না। অসম্ভব চাকর লাঙ্গলের কটি এমন করিয়া ধরিবে যে ফাল ভাসিয়া ভাসিয়া জমির ২০ ইঞ্চি মাত্র খুঁড়িয়া চলিয়া যাইবে। তাহাতে গরুর বা মানুষের কিছুই পরিশ্রম হইবে না। আবার সম্ভব প্রভুর হিঠেবী চাকর লাঙ্গলের কটি এমন করিয়া ধরিবে যে আমাদের এই ক্ষীণজীবী গরুতেই ফাল ৩৭ ইঞ্চি পর্যন্ত গভীর মাটি খুঁড়িয়া যাইবে, কিন্তু একরূপ করিলে গরু এবং মানুষ উভয়েরই পরিশ্রম হইবে। পাটের চাষ উপযুক্ত মত গভীর হওয়া চাই। এজন্য অতি যত্নের সহিত এক লাঙ্গলের ধনিত গর্তের উপর দিয়া তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটা লাঙ্গল চালাইয়া জমি ১০।১২ ইঞ্চি গভীর করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। নিজের ভাল চাকর ভিন্ন এইরূপ পরিশ্রম কেহ করিবে না। চুক্তির চাকর ২০ ইঞ্চির বেশি গভীর করিয়া বড় চাষ করে না। সাধারণতঃ খেতের ধান বা অন্ত-শস্ত্র উঠিয়া গেলেই পাটের চাষ আরম্ভ হয়। যে সকল নীচা জমী কার্তিক অস্ত্রাণ মাসেও না শুকায়, তাহাতে কলাই সরিয়া প্রভৃতি রবি শস্তের সুবিধা হয় না। এরূপ নীচা জমিতে আমন ধান উঠিয়া গেলেই পৌষ মাসে অথবা জমি শুকাইবা মাত্র, অর্থাৎ অত্যন্ত শুকাইয়া শক্ত হইবার পূর্বেই প্রথম চাষ দিতে হয়। চাষ দিতে বিলম্ব করিলে, মাটি অত্যন্ত শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায়। এবং চাষ করিতে অধিকতর পরিশ্রম ও সময় লাগে। আটাল মাটির জমি হইলে, তাহা অতিরিক্ত শুকাইলে এত শক্ত হইয়া যায় যে তাহার উপযুক্ত কর্ষণে ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যদি অনিবার্য কারণ বশতঃ জমি অতিরিক্ত শুকাইয়া শক্ত হইয়া পড়ে তবে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া প্রথম বৃষ্টি হইলে, অথবা জল সিক্কনের বিশেষ সুবিধা থাকিলে জল সেচন বা “বুর” দিয়া (flooding) মাটি যখনই একটু শুষ্ক অর্ধচ নরম থাকে তখনই চাষ দিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ দোকুলি জমিতে কলাই সরিয়া প্রভৃতি রবি শস্ত হয়। এরূপ জমিতে মাঝ কি কানুন মাসে রবি শস্ত উঠিয়া গেলেই প্রথম চাষ দিতে হয়—এইদলেও মাটি শুকাইয়া

শক্ত হইয়া গেলে জলের স্রবীধা থাকিলে “বুব” দিয়া অথবা যেই প্রথম বুট্টি হইয়া মাটি কিঞ্চিৎ শুষ্ক অথচ নরম হইবে তখনই প্রথম চাষ দিতে হইবে। অন্ততঃ চৈত্র মাসেব মধ্যে প্রথম চাষ দিতেই হইবে। প্রথম চাষের অন্ততঃ ১০।১৫ দিন পর বুট্টির দিন দেখিয়া জমিতে ভাল, পচা গোবর সার ছড়াইয়া দিতে হয়, এবং বুট্টির জলটা কিঞ্চিৎ শুকাইলে দ্বিতীয় চাষ দিয়া মই দিতে হয়।

কৃষকের সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, একটা চাষ দিয়া, দ্বিতীয় চাষ দিবার পূর্বে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়া আবশ্যিক। যেন অক্সিজেন বায়ু (Oxygen) সূর্য্যরশ্মি এবং মাটিস্থিত বীজাণু (Bacteria) মাটির স্তরে স্তরে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত করিয়া তাহাতে উদ্ভিদের সহজপাচ্য খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সঞ্চয় করিতে পারে। দ্বিতীয় চাষ ফাল্গুন কি চৈত্রের মাঝামাঝি শেষ হওয়া উচিত। তৎপবে ৭ হইতে ১৫ দিন অথবা যতদূর সম্ভব কাক রাখিয়া জমি অল্পসারে যে কয়টা চাষ প্রয়োজন তাহা দিতে হইবে; এবং প্রথম চাষের পর প্রত্যেক চাষের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার মৈ দিতে হইবে। যদি মাটিতে ঢেলা বাধে, তবে দ্বিতীয় চাষের পরই যুগ্মে পিটিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যিক। শেষ চাষ দিয়া বিদে বা আচড়া দ্বারা আবর্জনা একত্র করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। অথবা তাহা গর্তে পুতিয়া ফাঁস প্রস্তুত করিয়া জমিতে ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। অন্ততঃ আবর্জনা পুড়াইয়া সেই ছাই জমিতে ছিটাইয়া দেওয়া সঙ্গত। পাটের হাল দেওয়া সম্বন্ধে সর্বদা মনে রাখা কর্তব্য যে ফাল যেন মাটির খুব ভিতরে প্রবেশ করে। এক ফুট পর্য্যন্ত ভিতরে গেলেই খুব ভাল হয়। তবে কৃষকের হুর্কল গরু দ্বারা তাহা চলে না। এজন্য এক লাজলের খনিজ গর্তের ভিতরে অল্প লাজল ঢালিয়া চাষ যত গভীর করা যায়, তাহাই করিতে হইবে। চাষ গভীর, মাটি আগাছা ও ঢেলাশূন্য থলির দ্বারা চূর্ণীকৃত—এই সকলই পাটের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিলাতের পূর্বকালেব একজন বড় কৃষকের (Jethro Tull) একটা কথা আমাদের গরীব কৃষকের সর্বদা মনে রাখা বিশেষ কর্তব্য। তিনি তাঁহার জমিতে কখনও কোন সার ব্যবহার করিতেন না, এবং

বলিতেন “চাষই ফাঁস” (Tillage is manure)। আমাদের গরীব কৃষক অপরিমিত স্রব দিয়া টাকা ধার করিয়া, সার ক্রয় করিবে আশা করা যায় না। চাষ ভাল করিয়া করিলে বিনা সারেও ভাল শস্য পাওয়া যায়। চাষ শেষ হইলে পরে মৈ দিয়া জমি সমান করিয়া বীজ ছিটাইয়া (বীজের সঙ্গে ছাই ও শুষ্ক মাটি মাখিয়া লইলে, সমানভাবে ছিটাইবার সুবিধা হয়) সমানভাবে একবার লম্বালম্বি আর একবার পাশাপাশি ফেলিতে হয়। বীজ ফেলিয়া একবার আচড়া দিয়া ঢাকিয়া দিয়া মৈ দিয়া সমান করিবে ও মাটিটা চাপিয়া দিবে। বিধা প্রতি সোয়া সের হিসাবে বীজ ফেলাই ভাল। বেশী ফেলিলে গাছ হুর্কল এবং পণ্যপাট নরম হয়। কম ফেলিলে গাছে ডাল পালা বেশী হয় এবং তাহাতে পণ্যপাট ধারাপ হয়। চৈত্র বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসই বীজ ফেলিবার সময়।

যে দেশে যখন বর্ষা আরম্ভ হয় তখনই বীজ ফেলিতে হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসামে চৈত্র বৈশাখ এবং পশ্চিমবঙ্গে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেই পাট বুনিবার সময়। বীজ ভাল হইলে গাছ ভাল হয়, এজন্য প্রত্যেক কৃষক আপনার ক্ষেত্রের সর্বোৎকৃষ্ট পরিপক্ক গাছ বাছিয়া বীজের জন্য যত্নের সহিত রক্ষা করিবে। অনেকে বলেন যে যে ক্ষেত্রের বীজ সেই ক্ষেত্রে না বুনিয়া অন্য ক্ষেত্রে বুনিলে অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। এজন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামের কৃষকেরা যদি আপনাদের সর্বোৎকৃষ্ট গাছের বীজ পরস্পরের সহিত বিনিময় করেন, তবে পাট গাছের আরো উন্নতি হইবে এরূপ আশা অনেকে করেন। “ফলেন পরিচায়তে”। তবে এইরূপ বিনিময়ে প্রবঞ্চনারও আশঙ্কা আছে। বীজ বুনিবার ৫।৭ দিনের মধ্যেই চারা বাহির হয়।

৮। পাট গাছের যত্ন।

বেলে এবং দোয়াস মাটিতে চারা সহজেই বাহির হইয়া বর্ধিত হয়, কিন্তু আটাল মাটির উপরে অনেক সময় এমন শক্ত সরের মত বাধিয়া যায়, যে চারা বাহির হইয়াও বর্ধিত হইতে পারে না। এরূপ স্থানে চারা গাছের শিকড় মাটিতে ভাল করিয়া ধরিলে পর—অল্পমান বুনিবার ৮।১০ দিন পরে একবার আচড়া বা বিদে দ্বারা মাটির

উপরের সরটা ভাঙ্গিয়া দিবে। প্রাণিগণের মত গাছের ও শ্বাস প্রশ্বাস আছে এবং বাতাস বন্ধ হইলে যেমন প্রাণীর শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়, গাছ—বিশেষতঃ চারা গাছের শিকড়ের বাতাস বন্ধ হইলে মরিয়া যায়। বুদ্ধিমান কৃষক এজন্যই সময় মত নিড়াইয়া এবং আচড়া চালাইয়া এইরূপ সর ভাঙ্গিয়া গাছের শিকড়ে বাতাস প্রবেশের সুবিধা করিয়া দিবে। পাট গাছ ৮৯ আঙ্গুল উচা হইলে আর একবার আচড়া বা বিদে চালাইয়া গাছ পাতলা করিয়া দিবে। সে সঙ্গেই গাছের চারিদিকের মাটি ও কতক ঢিলা করা হইবে এবং আগাছাও উঠান হইবে। বাহা অপূর্ণ থাকে তাহা হাতে গাছ উপড়াইয়া, নিড়াইয়া এবং আগাছা উঠাইয়া দিবে। মোটামুটি দেখিবে যেমন প্রত্যেক গাছের চারিদিকে ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫ হইতে ৮ আঙ্গুল পরিমাণ স্থান পালি থাকে। গাছ ১ হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলে আর আচড়া চালাইবে না। তখন হাতে নিড়াইয়া আগাছা তুলিবে এবং মাটি ঢিলা করিয়া দিবে। গাছ দুই কি আড়াই হাত উচ্চ হইলে শেষ নিড়ানি ও বাছাই দিবে। অতঃপর পাট গাছের আর কোন বিশেষ যত্নের আবশ্যক করে না।

৯। পাটের শত্রু ।

অনাবৃষ্টি পাটের প্রধান শত্রু। পাট বুনিবার পর যদি অনেক দিন বৃষ্টি না হয় তবে পাট গাছের জোর অত্যন্ত কম হইয়া পড়ে, এবং ফসল পরিমাণে অত্যন্ত কম হয়। তাহার বাজার দরও কম হয়। অতি বৃষ্টিতে সময় ভেদে পাটের অনিষ্ট করিতে পারে। পাট গাছ যখন ছোট চারা অবস্থায় থাকে তখন যদি অত্যন্ত বৃষ্টি হয় তবে অনেক সময় গাছগুলি জল জমাতে গোড়া পচিয়া মরিয়া যায়—অথবা চারাগাছ জলে ডুবিয়া গিয়া শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। অতি বৃষ্টিতে মিঠা পাট জাতীয় গাছের অধিকতর অনিষ্টের আশঙ্কা। তিতা পাট জাতীয় গাছ চারা অবস্থা অতিক্রম করিলে পর যত বেশী জল পায় ততই জোলের সহিত বর্ধিত হইতে থাকে।

অনাবৃষ্টি অতি বৃষ্টির পর সকল শত্রুরই প্রধান শত্রু নানা প্রকার ছাতাধরা রোগ (Fungoid disease) এবং

নানাজাতীয় পোকা। কিন্তু পাট সম্বন্ধে এ সকল শত্রু বড় বেশী অনিষ্ট করে না। তবে দুই প্রকারের পোকা সময় সময় বিশেষতঃ জলের অভাবে গাছগুলি দুর্বল হইলে নালিতা গাছকে আক্রমণ করিতে দেখা যায়। তাহার একটা প্রজাপতি বা আইসযুক্ত পক্ষবিশিষ্ট (Lepidoptera) জাতীয় এক শ্রেণীর (Arctiidae) অন্তর্গত। বাঙ্গালা কোন নামকরণ ঠিক হয় নাই। (ইংরাজি নাম Spilosoma)। এই পোকা পাট গাছ যখন কচি থাকে তখন তাহার পাতার ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম ফুটিয়া তাহা হইতে একপ্রকার শুয়া পোকা (Larva) নির্গত হয়।

সেই সকল শুয়া পোকা পাট গাছের কচি কচি পাতা-গুলি খাইয়া বর্ধিত হয় এবং শেষে শুটি বা কোষ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিদ্রিত (Pupate) অবস্থায় থাকে এবং কিছুদিন অস্ত্রে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত প্রজাপতি (Imago) হইয়া বাহির হইয়া উড়িয়া যায়। এই পোকাই কুমি (Larva) অবস্থায় পাট গাছের পাতা খাইয়া ফেলে। এবং তাহাতে সেই পাটের গাছ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। ও অনেক গাছ মরিয়া যায়। যে সকল আক্রান্ত গাছ বাঁচিয়া থাকে তাহা হইতেও ভাল ফসল উৎপন্ন হয় না। এই সকল কুমি (Gaterpillar) দেখিতে সাধা এবং গারে কিছু কিছু লোম থাকতে শুয়া পোকা নাম দেওয়া যায়। বিনা ব্যয়ে শুধু গার খাটিয়া এই পোকাক প্রতিকার করিতে হইলে পোকাগুলি হাতে ধরিয়া ধরিয়া একত্র করিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়াই ভাল। তদ্বির যে জমিতে এই শুয়া পোকাক উপদ্রব হয় তাহাতে বিধা প্রতি ১০১২টা মুরগী ছাড়িয়া দিলে অল্প সময় মধ্যেই পাট ক্ষেত এই শুয়া পোকাক উপদ্রব হইতে মুক্ত হইবে। আমরা শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া উপকার পাইয়াছি। পাটের চারা অধিকাংশই মুসলমান। তাহাদের পক্ষে এই পোকাক এবং এই জাতীয় অন্যান্য পোকাক হস্ত হইতে মুক্তিশাল্য করিবার এ অতি সহজ উপায়। এ সকল উপায় বাহ্যিক অবলম্বনে অশক্ত তাহাদের পক্ষে কেরাসিন তেলের জল—দুই ছটাক কেরাসিনে একসের জল হিসাবে ঝাকরাইয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া অথবা—তামাক পাতার

জল অর্থাৎ একছটাক তামাক পাতা একসের জলে ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া তাহাতে সমান পরিমাণ চূণের জল মিশাইয়া প্রত্যেক গাছের গায়ে বাগানে জল দিবার ঝাঁক দ্বারা বা ছিটাইয়া দেওয়া ভিন্ন অল্প ব্যয়সাধ্য প্রতিকারের অন্য উপায় দেখিতেছি না। যাহারা পরের পয়সা খরচ করেন অথবা নিজের পয়সা খরচ করিতেও কুণ্ঠিত নন তাহারা রীতিমত কেরাসিনের ঘি (Kerosine emulsion) প্রস্তুত করিয়া এবং এক্রেয়ার বেপরাইজার (Eclair vaporiser) ১৫১২০ টাকা দামে ক্রয় করিয়া তদ্বারা প্রয়োগ করিতে পারেন। নিম্নলিখিত প্রণালীতে কেরাসিনের ঘি (Kerosine emulsion) প্রস্তুত করিতে হয়। এক পোয়া সাবান পাঁচ সের জলে মিশাইয়া ফেল এবং আঙুনে সিদ্ধ করিয়া খুব গরম অবস্থাতে দশ সের কেরাসিন তেলে ঢালিয়া দিয়া পিচকারী দিয়া দশ মিনিট কাল তাহা খুব আলোড়ন করিয়া দেও। যখন দেখিবে ভাল করিয়া মিশিয়া গলা যিব মত হইয়াছে, তখন ঠাণ্ডা হইতে দেও। দেখিবে তখন বেশ গাঢ় হইয়াছে। ইহারই নাম কেরাসিনের ঘি (Kerosine emulsion)। ব্যবহার করিবার সময় এই ঘি একভাগ লইয়া তাহাতে নয় ভাগ জল যোগ করিয়া পিচকারী দ্বারা খুব ভাল করিয়া মিশাইয়া গাছের উপরে প্রয়োগ কর। পার ত এক্রেয়ার বেপরাইজার (Eclair vaporiser) দ্বারা প্রয়োগ করিবে। আর তাহা না থাকিলে, বাগানে জল দিবার ঝাঁক দ্বারা ঝারের মত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এক্রেয়ার বেপরাইজার খরিদ করিতে ১৫১২০ টাকা লাগে। আবার তাহা একটু মাত্র খারাপ বা বিকল হইলেই একেবারে অব্যবহার্য হইয়া যাইবে। পাড়াগায়ে ইহার কোন মেরামত হইবে না। এরূপ অবস্থায় আমরা কৃষককে ইহা কিনিবার পরামর্শ দিতে পারি না।

আর এক রকমের পোকা আছে তাহাতেও পাটের খুব অনিষ্ট হয়। তাহা কঠিন পাখা বিশিষ্ট জাতীয় (Coleoptera) পোকাকার এক শাখার (Curca lionidae) অন্তর্গত। ইহা দেখিতে কাল এবং অতি ক্ষুদ্র কতকটা আমাদের পুরাতন চাউলের পোকাকার মত। এই পোকা দাঁত দিয়া (mandibles) পাট গাছের গাইটের (nodes)

বাকল কাটিয়া সেই ছিদের মধ্যে একটা একটা করিয়া ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটিয়া ছোট কুমি (larva) জন্মে, এবং তাহা গাছ খাইতে খাইতে বর্দ্ধিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত অবস্থায় (pupa) কিছুকাল থাকিয়া পবে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত পোকা (Imago) হইয়া বাহির হইয়া আবার গাছ খাইতে আরম্ভ করে, এবং শেষে ডিম পাড়িয়া বংশ বিস্তার করে। এই পোকাকার আক্রমণে পাট গাছ মরে না বটে; কিন্তু পাট মাঝে মাঝে কাটিয়া যায় এবং স্থানে স্থানে ময়লা দাগ পড়ে। আঁশ খারাপ এবং কম হয়, এবং তাহার দরও কম হয়। এই পোকাকার প্রতিকার করা কঠিন। কারণ ইহা অধিকাংশ কাল গাছেব ভিতরে থাকে এবং পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে এক গাছ হইতে নিকটে অন্য গাছে উড়িয়া যায়।

কেরাসিনের ঘি (Kerosine emulsion) বা তামাক পাতার জল ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু আশামূলক ফলের সম্ভাবনা কম। একটা কথা কৃষকের মনে রাখা কর্তব্য—যেমন মানুষের বোগাদি দুর্বল গরীবদিগকেই বেশী আক্রমণ করে, তেমনি পোকাগুলিও দুর্বল গাছগুলিকেই আক্রমণ করে। গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হইলে তাহাতে এক প্রকার তিক্ত কটু রস জন্মে যাহা পোকাকার পক্ষে অখাদ্য এবং কষ্টদায়ক। এজন্ত সর্বদা (১) উপযুক্ত ফাঁস ব্যবহার করিয়া (২) কিম্বা নিড়াইয়া বা বিদে (আচড়া) ঢালাইয়া গাছের শিকড়ে হাওয়া প্রবেশের সুবিধা করিয়া (৩) আগাছা উঠাইয়া গাছেব খাড়ের অপচয় বন্ধ করিয়া এবং (৪) জলাভাব হইলে জলের বন্দোবস্ত করিয়া গাছকে সতেজে রক্ষা করিতে পারিলে গাছের কোন প্রকার পোকাকার আক্রমণের ভয় থাকে না।

পাটের সম্বন্ধে ছাতা ধরা রোগের (Fungoid disease) কথা বড় শোনা যায় না। তবে একটা রোগের কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক। পাটের গাছ চারা থাকা কালীন এমন কি এক হাত দেড় হাত লম্বা হওয়া পর্যন্ত ২৪ দিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়া জল নু দাঁড়াইয়াও যদি জমি অত্যন্ত ভিজা (বা সৈতসেতে) হইয়া যায়—তখন দেখা যায় যে স্থানে স্থানে গাছগুলি চলিয়া পড়ে এবং মরিয়া যায়। মানুষকে সাপে কাটিলে যেদুপ হঠাৎ চলিয়া পড়ে,

গাছেরও প্রায় সেইরূপ অবস্থা হয়। ইহাও একপ্রকার ছাতা ধরা রোগ (Pythium de Baryanum)। ভিজা মাটিতে কচি কচি শালগম প্রভৃতি চারাও এই রোগে অনেক সময় মরিয়া যায়। ঠিক গাছের গোড়াতে এই রোগ প্রথম আক্রমণ করে। ক্রমে সমস্ত গাছের শরীরে বিস্তৃত হয়। অপুত্রীকর্ণের সাহায্যে এই বোগ বেশ প্রত্যক্ষ করা যায় এবং বৈজ্ঞানিকেরা এই রোগ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার এ স্থলে উল্লেখ করা গেল না। চারা অত্যন্ত ঘন করিয়া বুনিলে এবং সেই সঙ্গে জমি খুব ভিজা হইলে রোগের আশঙ্কা বেশী। এই রোগের চিকিৎসা অতি সহজ এবং বিনা ব্যয়েই করা যায়। যে সকল গাছ ঢলিয়া পড়িয়াছে সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ উৎপাটিত করিয়া অনেক দূরে নিক্ষেপ করিবে। তারপর জমির ~~প্ৰপালীগুলি~~ (Drain) কোঁদাল দিয়া ভাল করিয়া খুলিয়া দিবে। এবং জলপ্রপালীর সংখ্যা ও এই পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবে যেন অল্পকাল মধ্যে জমিটা শুকাইয়া, বিদে বা আঁচড়া দিবার যোগ্য হয়। এবং বিলম্ব না করিয়া বিদে দিতে পারিলে দিবে। কিসা হাতে নিড়াইয়া বাছাই দিবে। অন্তত আক্রান্ত গাছের চতুঃপার্শ্ব গাছগুলি হাতে নিড়াইয়া বাছাই দিবে। গাছের গোড়ায় এবং দ্বিকড়ে বাতাস প্রবেশ করিতে পারিলে, এবং মাটি কিস্কিৎ শুকাইলেই এই রোগ নিবারণ হয়। সাধারণ কৃষকেরা এই রোগকে “হাজা” বা “পেকচিপা” লাগা বলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজ্ঞান দত্ত।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন ।

কালচক্রের পরিবর্তনে বাঙ্গালীর অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। যে বাঙ্গালীর বাহুবল-কাহিনী, যে বাঙ্গালীর বীরত্ব-গাথা যুগ যুগান্তর ধরিয়া ইতিহাসের পত্রে পত্রে জলন্ত ভাষায় কীর্তিত হইয়া আসিয়াছে, অরপাতীত কাল হইতে যে বাঙ্গালীর গৌরব-গরিমা দ্বিগুণে বিস্তৃত

রংপুরস্থ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন (১৩ই আষাঢ়, ১৩১৫ সাল) উপলক্ষে লিখিত ।

হইয়া পড়িয়াছে, সেই বাঙ্গালী—বঙ্গ-জননীর প্রিয় সন্তান বাঙ্গালী আজ হুর্দল কাপুরুষ বলিয়া নিমিত। বাঙ্গালার যে সকল স্বাধীন নরপতির অঙ্কে প্রতাপে শত্রুকুল সর্দা-সর্কদা সশঙ্কিত থাকিত, যে শূরবংশীয়, পালবংশীয় ও সেন-বংশীয় নরপতিগণের বীরত্ব-গৌরব-পরিচয় দেশের নানা স্থানে অস্তাপিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, যে বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, কংসনারায়ণ, কেদার রায় প্রভৃতি ভূঁইয়গণের অতুল প্রতাপে জল স্থল প্রকম্পিত হইত; বেশিদিনের কথা নহে,—যে যুদ্ধ-বিশারদ মোহনলাল, মেনাহাতী, জানকীরাম প্রভৃতি সেনাপতিগণের দুর্দ্বন্দ্ববীর্য্যনীতি সমগ্র দেশকে বিস্তারিত করিয়া রাখিত, হয় সেই বাঙ্গালী-দেশের সেই বাঙ্গালী বংশেরই আজ কি শোচনীয় পরিণাম!

আজ পাশ্চাত্য দেশাগত নবীন স্বৈতজাতির বীরত্ব ও মহত্ব প্রাচ্য দেশ মুখরিত। ভারতবর্ষ তাহাদের বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া তাহারা স্বাধা প্রকাশ করিতেছে। ইংরেজ ইতিহাস-লেখকগণ জগতের সমক্ষে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন যে,—পঞ্চনদের পুণ্য-ক্ষেত্রে, পলাসীর আশ্র-কাননে—সর্বত্রই বাঙ্গালী, ভারতবাসী, ইংরেজদের বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে পরাজয় ও বশতা স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি সত্য? ভারতবর্ষ কি সত্য সত্যই ইংরেজদের বিজয়লব্ধ সম্পত্তি? ভারতবর্ষ কি সত্য সত্যই ইংরেজদের বাহুবলে বিজিত, না ভারতবাসী নিজে-রাই আপনাদিগকে ইংরেজের অধীনে আনয়ন করিয়াছে? তাহারা নিজেরাই কি ইংরেজের হস্তে দেশের শাসনভার অর্পণ করে নাই? ভারতবর্ষ আপনিই কি আপনাকে জয় করে নাই?

আমরা বহুদিন ইংরেজদিগের লিখিত ঐবস্ত্রকার অসত্য অলীক ইতিহাস পাঠ করিয়া সত্য সত্যই আপনাদিগকে মনুষ্যতর শ্রেণীব মধ্যে গণনা করিয়া আসিতেছিলাম, পাশ্চাত্য অন্ধ-শিক্ষার মোহে আপনাকে ভুলিয়া, আপনার প্রাচীন ইতিহাস ভুলিয়া, বিদেশীয় ভাবে দেশীয় হৃদয় গঠিত করিয়া আসিয়াছি এবং স্বার্থপরতার কঠিন নিগড়ে সকলে শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছি। যে শিক্ষার আয়োজনিত ও জাতীয় উন্নতি সাধন হইয়া থাকে, ভারতবাসীর ভাগ্যে সে শিক্ষা-লাভ বহুদিন ঘটে নাই। কিন্তু বিধাতার কৃপায় দেশের

মধ্যে স্রবাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে—দেশবাসীর প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। 'যে পাশ্চাত্য অন্ধশিক্ষা-মোহে অভিভূত হইয়া আমরা স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভুলিয়া নিজের স্বার্থসাধনের লক্ষ্যেষণ করিয়া আসিতেছিলাম, এক্ষণে সেই প্রবৃত্তি পরিবর্তিত—সেই অন্ধ-মোহ দূরীভূত হইতে চলিয়াছে।

আমাদের পূর্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, সর্বপ্রাণে জাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রাচীন ইতিহাস শাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতিবন্ধনের মূলই জাতীয় সাহিত্য। যে জাতির মধ্যে জাতীয় সাহিত্য জনসাধারণের যত উপযোগী হইবে, ততই উহা জাতীয় ভাবে অল্পপ্রাণিত হইবে এবং এক জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়েই একজাতীয়তার ভাব জন্মিত ও পরিবর্তিত হইতে থাকিবে। এক বিজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন,—‘সমগ্র জাতির মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্য রচনা করিলে সাহিত্যের সাহায্যে বড় বৃহৎ, বড় মহৎ, বড় সুন্দর, বড় পবিত্র কার্য কবিত্তে পারা যায়। সাহিত্য বড় সামান্য সামগ্রী নহে, বড় সহজ সামগ্রীও নহে। সুপ্রণালীতে রচিত হইলে, উহা জাতি গড়িবার কার্যে যেমন সহায়তা কবে, কুপ্রণালীতে রচিত হইলে, জাতি ভাঙ্গিবার পক্ষে তেমনই কার্যকর হয়, জাতি গঠনের তেমনই প্রতিবন্ধকতা করে। গঠনের গুণে সাহিত্য যেমন সুন্দর, যেমন অমৃতময় ফল প্রসব করে, গঠনের দোষে তেমনই কদর্য, তেমন বিষময় ফল প্রদান করে। যে সাহিত্যের ফল কদর্য ও বিষময়, যে সাহিত্য জাতি ভাঙ্গে বা জাতি গড়িতে দেয় না, তাহা জাতীয় সাহিত্যও নহে, প্রকৃত সাহিত্যও নহে।’

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া যে ভাষা ব্যবহার করে, যে ভাষার স্বীয় হর্ষ বিবাদ, যতনা আনন্দ, সুখ দুঃখ জ্ঞাপন করে—তাহা তাহার মাতৃভাষা। এই সাহিত্য ও জাতীয় সাহিত্য এক জিনিষ নহে। অবশ্য মাতৃভাষার শেষ পরিণতি জাতীয় সাহিত্যে,—চর্চায় সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের নিকটবর্তী হইয়া থাকে। মাতৃভাষার শিক্ষক রক্ষক যেমন শিশু বয়সে মাতৃগণ, জাতীয় সাহিত্যের রক্ষকও তেমন দেশের জনসাধারণ। দেশের সর্ব শ্রেণীর সর্বজাতীয় লোকের সাহচর্য ব্যতীত, অক্লান্ত অধ্যবসায় ব্যতীত জাতীয় সাহিত্য গঠিত

ও উন্নত হইতে পারে না। এ কার্য স্বদেশের কার্য—স্বদেশবাসী প্রত্যেক নবনাভীব কার্য; হর্য্য অট্টালিকাবাসী মহাবাণিজ্যবাজ রাজচক্রবর্তী হইতে দীন কুটুবাসী নিবন নিবশ্রয় ভিক্ষা-সঞ্চল ভিখারী—সকলকেই ইহার সেবার মন প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে।

এক্ষণে আমি প্রাচীন সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পবিচয় প্রদান করতঃ অন্ধকার আলোচ্য বিষয়ের অর্থাৎ উত্তর বঙ্গীয় এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী-গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আমাদের বর্তমান জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য—বাঙ্গলা। কিন্তু চির দিনই বাঙ্গলা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কত দিন হইতে বাঙ্গলা ভাষার স্বরূপাত হইয়াছে, কতদিন হইতে বাঙ্গলা বাঙ্গালীর লিখিত ভাষারূপে গণ্য হইয়াছে, তাহা এখনো নির্ণীত হয় নাই। তৎসম্বন্ধে নানা জনের নানা মত প্রচলিত আছে, তাহার আলোচনা এক্ষণে নিম্নয়োজন। বৈদিক ভাষাই আর্য্যজাতির আদি ভাষা ছিল, পরে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন হয়। সমাজ-বিপ্লব ধর্ম-বিপ্লব ও রাষ্ট্র বিপ্লব প্রভৃতি সমস্ত বিপ্লবই ভারত-বর্ষের বৃক্কের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল বিপ্লবে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেমন পরিবর্তিত হয়, দেশের ভাষাও সেই সঙ্গে প্রকৃত পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষা বহুকাল এদেশে প্রভু বিস্তার করিলেও অকস্মাৎ বৌদ্ধ-বিপ্লবে তাহার আসন বিকম্পিত হইয়া উঠে, দেশের মধ্যে এক নব ভাষা মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হয়। এই ভাষার নাম—পালী; বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরা এই ভাষার সাহায্যেই তাহাদের ধর্মগ্রন্থ, নীতিগ্রন্থ, ব্যবহারশাস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার্য গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিল। ইহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের কথা। এই সময় হইতে সংস্কৃত ভাষা নিশ্চয় হইতে আবস্ত হয়। তৎপর বৌদ্ধধর্মের অবসানে ও ব্রাহ্মণধর্মের পুনরুত্থানে পুনরায় সংস্কৃত ভাষার চর্চা আবির্ভূত হয়, কিন্তু পূর্ববৎ নবাগত ভাষাটী সাহায্যে দেশে যে প্রাকৃত ভাষার স্তব সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল না। এই প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মিশ্রণে গোড়ীয় ভাষার সৃষ্টি। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর

প্রাকৃতবাক্যরণ মধ্যে গোড়ীর ভাবার আসন প্রদত্ত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই যে গোড়ীর বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এবং বৌদ্ধযুগে যে তাহার বিস্তার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহাও দেখান যাইতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, সামাজিক বিপ্লবে ভাষা বিপ্লবও উপস্থিত হয়। এদেশের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের কলহ ও ধর্মপ্রভাব সংস্থাপন প্রচেষ্টা হইতেই প্রধানতঃ বঙ্গসাহিত্যের বিস্তার ও পরিপুষ্ট সাধিত হইয়াছে। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, মোসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্মের ও ধর্মাবলম্বীর প্রভাবই বঙ্গসাহিত্যগঠনের পক্ষে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। নিম্নে সংক্ষেপে তথ্যের বর্ণন কবিতেছি; কিন্তু গল্প-সাহিত্য সম্বন্ধেই অধুনা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

খ্রীষ্টচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে তৎশিষ্য-গণের ভক্তিপ্রবণতায় আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য পরিপুষ্টী লাভ করিতে আরম্ভ কবে। তৎপূর্বে এদেশবাসী নরনারী বোগীপাল, মহীপাল, গোপীপাল প্রভৃতির গীত আনন্দের সহিত আলাপ করিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজ-গণের রাজত্বকালে এই গীতের জন্ম হয় এবং এক্ষণে প্রাচীন বিরাট সাহিত্যের ক্ষীণ আভাস প্রদর্শন করিতেছে মাত্র। বর্তমানকালে দেশমধ্য হইতে এই সকল গান এক রকম বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, কেবল রংপুর ও দিনাজপুরের বোগীজাতিবা কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে। নিম্নে এই সকল গানের স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতেই সত্য মহোদয়গণ দেশের তাৎকালিক অবস্থারও কথঞ্চিৎ পবিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

মাণিকচাঁদ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে এ দেশের কোনো অংশে রাজত্ব করিতেন। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র পিতার পরিচয় প্রদান স্থলে এই মাত্র লিখিয়াছেন,—

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।

তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥

পরবর্তী অংশপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পাটীকা নামক নগরে রাজার রাজধানী ছিল এবং তাহার পত্নীর নাম—ময়নামতী।

মাণিকচাঁদের গান যথা,—

ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।

সেই বাঙ্গাল আসিয়া মূলকত কৈল কড়ী॥

আছিল দেড় বুড়ি খাজানা লৈল পোনার গুণ।

লাঙ্গল বেচার জোঙ্গাল বেচার আরো বেচার ফাল।

খাজনার তাপেতে বেচার জুধের ছাওআয়াল॥

রাড়ী কাঙ্গাল জুধির বড় জুফ হইল।

ধানে ধানে তালুক সব ছন হইয়া গেল॥

ছোট রায়ত উঠে বলে বড় রায়ত ভাই।

প্রধানের বরাবর সবে চল যাই॥

কি আচ্ছ বলে প্রধান সকল।

যেত রায়ত পরামর্শ করিয়া প্রধানের বাড়ী

বৈলেটলে গেল॥

দিনাজপুর ও রংপুরের বোগীজাতি মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান গাওনা করে কিন্তু তাহারাও সমগ্র গীতের উদ্ধার সাধন করিতে পারে নাই। উত্তর-বঙ্গের কোনো সভ্য এবিষয়ে যত্নবান হইলে আমাদের প্রাচীন ও প্রথম অবস্থার সাহিত্যের উদ্ধার সাধন হইতে পারে। এই সকল গীত ও খনা এবং ডাকের বচন প্রভৃতিই বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথমকালের রচনা বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণের ধারণা। কিন্তু পক্ষান্তরে অনেকের ধারণা যে, ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যের আদিম রচনা নহে,—আদিমের নিকটবর্তী মাত্র। ইহারো পূর্বকালে বাঙ্গলা ভাষা রচিত হইয়াছে।

একাল পর্য্যন্ত যে সমুদয় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্ত পুরাণ’, চণ্ডীবাসের ‘চৈতন্য-রূপ প্রাপ্তি’, রূপ গোবামৌব ‘কারিকা’, কৃষ্ণদাস গোস্বামীর ‘রাগময়ীকণা’ এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্বোক্ত গ্রন্থ সাহায্যেই আমরা বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

‘শূন্ত পুরাণ’ বৌদ্ধ প্রভাব কালের পণ্ডগন্তময় গ্রন্থ। ইহার অধিকাংশই পদ্ম, সামান্ত্র ‘অংশ মাত্র গদ্য। ‘ঐতিহাসিক অমুসন্ধানে সপ্রমাণ হইয়াছে এই পুস্তকখানি প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্বে বিরচিত হইয়াছে।’ এতৎ পূর্বে কোনো বাঙ্গালী লেখক গদ্য লিখিবার প্রয়াস

পাইয়াছিলেন কিনা অবগত হওয়া যায় না। শূন্ত পুরাণের গল্প রচনার নমুনা,—

“হে জ্ঞানসম্মত হে বিজ্ঞানসম্মত তুমি সংখ্য হইএ চিরাই।

তুমি জলে স্থান করেন শ্রীধর্ম গোসাঞি। অভিসেক জলে স্থান মনখির কৈসের পাবন সহিতের পাবন সচল অচল সৃষ্টি সৃজিলেন গোসাঞি ডকত বৎসল।”

বৌদ্ধ প্রভাবকালে রচিত শূন্তপুরাণে গল্প সাহিত্যের অবতারণা হইলেও সে কালের অপব কোনো লেখকের গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরবর্তী বৈষ্ণব যুগেই গদ্য সাহিত্যের প্রচলন আরম্ভ হয়।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস গল্প রচনা কবিতা গিয়াছেন,— তাঁহাদের কণ্ঠে ‘গল্প পঞ্চময় গীত’ ধ্বনিত হইত। (১) সুতরাং ‘চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি’ দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচিত কি না, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। এই সকল আদিম গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা কথা উল্লেখ যোগ্য বিবেচনা করি। মাতৃ-ক্লেড়-শায়িত শিশু যেমন অতি কষ্টে আধ আধ ভাষায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করে, ‘চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি’ প্রভৃতি সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালী বিষয়ক পুস্তক-গুলিতেও তেমনি অতি কষ্টে রহিয়া রহিয়া আলোচ্য তথ্য পরিব্যক্ত হইয়াছে। সত্য মহোদয়গণ তাহার একটু পরিচয় গ্রহণ করুন,—

“জিহ্ন রজকিনী তিহ্ন বাগ মই। রাগআত্মা শ্রীমতীর অঙ্গ এক হন। জিহ্ন চৈতন্যরূপ তিহ্ন চণ্ডীদাস। কার দেহ। শ্রীমতীর অন্তরঙ্গ দেহ। রজকিনী কার দেহ। চণ্ডীদাসের অন্তবঙ্গ দেহ।” ইত্যাদি

রূপ গোস্বামীর ‘কারিকা’ হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি;—“অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গুণ নির্ণয়। শব্দ গুণ, গন্ধ গুণ, রূপ গুণ, রসগুণ, স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধিকাতেও বসে।”

‘মুরসিদের বার মাস’ নামক একখানি প্রাচীন অমুদ্রিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার স্থানে স্থানে গদ্য-রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তকখানি মোসলমান গ্রন্থকারের, সুতরাং তাহা হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন;—

“জীবের জন্ম কিসে। * * * গঠন

(১) পদকল্পতরু—পঞ্চদশ শাখা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে। স্থিতি পঞ্চভূত আর বেদমায়াশক্তি ? হৃত (?)। পিতাব চাইর ৪ মাতার চাইর ৪ (এইভাবে ২৫ তত্ত্বের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তারপর—) ১ অপগুণ গৌরবর্ণ জিহ্বাতে স্থিতি। তার প্রতিক্রিয়া পঞ্চগুণ * * মর্জাঞ্চ মল মুত্রঞ্চ পঞ্চমং অপপঞ্চ ইতি ৫।” আশ্চর্যের বিষয়, সেকালের মোসলমান লেখকও সংস্কৃতের আলোচনা করিতেন।

অতঃপর ‘ব্রজ কারিকা’ নামক একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থের আলোচনা করিতেছি। ইহার পদ ছত্র প্রভৃতি কিছু দীর্ঘ,—বেন শিশুর মুখের আড়ষ্টভাব ক্রমেই সারিয়া আসিতেছে। গ্রন্থের ভাষা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইলেও আলোচনার যোগ্য। যথা—

“শ্রীপঞ্চমী তিন দিবস থাকিতে শ্রীমতী বাপের ঘবে জ্ঞান। মাঘ ফাল্গুন চৈত্র মাস পর্যন্ত দোহাভাষা পূর্ণ হয়, যাবৎ তাবৎ বৃকভানুপুরে থাকেন। তথা থাকিয়া নিত্য খেলেন পাশা।” ইত্যাদি

পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ মোসলমান-শাসন-আমলে বচিত হইলেও, তাহাতে একটাও অ-সংস্কৃত বা বৈদেশিক শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহজিয়াগণই বাঙ্গলা গল্পের প্রথম স্রষ্টা। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে এই গদ্য রচনার নমুনা পাওয়া গিয়াছে। সহজিয়া সম্প্রদায়ের রোপিত বীজ হইতেই বর্তমান কালের এই মহান মহাকীর্তির উৎপত্তি। প্রথম কালের এই গ্রন্থ সমূহে ভাবার লালিত্য, বাক্যের সম্পূর্ণতা না থাকিলেও গ্রন্থকারের মনোভাব ব্যক্তির কোনো প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়া প্রমাণ হয় না। এইরূপে সহজিয়াগণ গদ্য সাহিত্যের যে ভিত্তি সৃষ্ট করিতে আরম্ভ করেন, তাহার আংশিক পরিণতি সহস্র বৎসর পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ‘বেদাদিত্ত্ব নির্ণয়’ প্রভৃতি গ্রন্থে আমবা দেখিতে পাই। ‘বেদাদিত্ত্ব নির্ণয়’ গ্রন্থখানি জনৈক বৈষ্ণব পণ্ডিত কর্তৃক রচিত। গ্রন্থকার সুদীর্ঘ বাক্যাবলী দ্বারা দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতির বিবিধ তথ্য আলোচনা করিয়াছেন। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির কঠোর বিষয়ও যে বাঙ্গলা গদ্য ভাষায় আলোচিত হইতে পারে, তাহার প্রথম নিদর্শন এই গ্রন্থে পাইয়া কোন্ ব্যক্তি না প্রস্তুত হইবেন?

গ্রন্থখানি প্রকাশের একান্ত উপযোগী, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহা হইতে ন্যূনা উদ্ধৃত করিতে না পারিয়া চুঃখিত হইলাম। এই গ্রন্থের ভাষা অতি সবল। ‘বৃন্দাবন লীলা’, ‘শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা’ প্রভৃতি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচিত কতিপয় গ্রন্থও এইরূপ সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যাকরণের নিয়ম মানিত হয় নাই; সম্ভবতঃ তৎকালে কোনো বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল না। না থাকিলেও পশ্চিমসাহিত্যে এরূপ বহুল প্রয়োগ-ব্যভিচার দৃষ্টগোচর হয় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এতদ্রূপে ইংবেঙ্গ-প্রভাব প্রবর্তিত হয়। ইংবেঙ্গগণ শাসনকার্যের সৌকার্যার্থে ও দেশীয়গণের মধ্যে খৃষ্টধর্মপ্রচারের অভিপ্রায়ে বাঙ্গলা ভাষায় উন্নতি ও পুষ্টিসাধনে মনোনিবেশ করেন। এই সময় হইতে ~~নবিশ~~ শতাব্দীর প্রাবল্য পর্যন্ত গদ্য সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া, বর্তমান কালে সাহিত্যোন্নতির জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য তাহার আলোচনা করিতে সচেষ্ট হইব। সপ্তদশ শতাব্দীর আরো বহুতর সহজিয়া গ্রন্থে গদ্য সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসমুদয়ের আলোচনা একদিনের একটা প্রবন্ধে করা ছুড়; কাষেই সে বাসনা পরিত্যক্ত হইল।

পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে মার্সম্যান, কেরী, কষ্টার প্রভৃতি ইয়ুবোপীয়গণ দেশীয় গদ্য সাহিত্য প্রচারের প্রভূত চেষ্টা করিলেও পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও তাদৃশ কোনো উন্নতি করিতে পাবেন নাই। তাই রেভারেণ্ড লং সাহেব আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ঈষ্ট ইন্ডিয়া-বাসী ইংরেজফিরঙ্গীগণের দেশীয় ভাষা শিক্ষাকারার বিশেষ সুবিধা থাকিলেও তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হন নাই। (১) তাঁহাদের ভাষাকে সাধাবণতঃ ‘বৃষ্টানী ভাষা’ নামে অভিহিত করা হইত। এতৎসঙ্গেও আমবা যখন দেখিতে পাই যে, কতিপয়

বিদেশীয় ব্যক্তি আমাদের জাতীয় নবীন সাহিত্যপ্রচারের নিমিত্ত এরূপ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তখন স্বতই আমাদের মন কৃতজ্ঞতা রসে আপ্ত হইয়া উঠে। মিশনারীগণের নাম এই ভাবে বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। মিঃ হালহেড ইয়ুবোপীয়দের মধ্যে সর্ব প্রথম বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং ১৭৭৮ অব্দে একখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ১৮০০ অব্দে কলিকাতায় ‘ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ’ স্থাপিত হয়। কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন। রামনাথ ত্রায়বাচস্পতি, রামরাম বসু, কালী-প্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত, শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার, পবে বিজ্ঞাসাগর, মদনমোহন প্রভৃতি সকলেই ফোর্ট উইলিয়মে নিযুক্ত থাকিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এই সময়ের অধিকাংশ গ্রন্থই সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দ যোজনা দ্বারা উৎকট। কাষেই এই সকল গ্রন্থ দ্বাৰা সাধাবণের তাদৃশ উপকার দর্শায় নাই। আমরা এখানে এই সময়ের কতিপয় গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিলাম।

বেণ্টো সাহেবের ‘প্রবোত্তরমালা’ ১৭৬৫ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইংরেজশাসন আরম্ভের ইহাই সর্ব প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তৎপর রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ‘হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী’ গ্রন্থই তাঁহার সর্ব-প্রথম রচনা। রামমোহনের পিতা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া নাকি পুস্ত্রের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অতঃপর রামমোহন বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার পর আমরা কেরী সাহেবের গ্রন্থ দেখিতে পাই। তদীয় গ্রন্থে তৎকালীন দেশীয় সমাজের যে জীবন্ত চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন সম্বন্ধে কবিত্তে পারিলাম না।

ছোট্টা রমণী স্বরকল্পার কথা বলিতেছে।—

“প্রথমা।—তোদের বৌ কেমন রাঁধিতে বাড়িতে পারে ?

• দ্বিতীয়া।—হাঁ বুন সেই বই আর কে রাঁধে ? মেয়েরা

(১) “East Indians, though children of the soil, and so favourably situated in many cases for gaining a good knowledge of the native language, have done scarcely anything in Bengali composition. Russia can boast that her Milton, Poushkin is a Mulatta of Negro origin, but Bengal has never had either East Indians or Portuguese who were good vernacular writers.”—Rev. Long.

কেহ এখানে নাই। আপনি কাচা বাচা নিয়া নড়িতে পারি না। সকল কাষি বড় বউ করে। ছোট বোড়া বড় হিঙ্গলদাণ্ডা অঙ্গ লাড়ে না আর সদাই তার বকড়া। কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন কানা হাঁড়ি পানে চাহিয়া বড় বৌটা আঁত ভাল। এ সংসারে কাষ কাম করে আর ছেল্যা পিগ্যা খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমাদের সেবা স্নহ করে। তাহার জন্ত আমাদের কোন ব্যামোহ নাই।”

১৮১২ অব্দে ত্রিপুরামিশন প্রেস হইতে “ইতিহাস-মালা” নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; তাহা হইতে একটি দেশীয় সমাজ চিত্র সভ্য মহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিলাম।

“এক কৃষক লাজল চসিতে গিয়া কোন খালে, গোটা চব্বিশেক মৎস্ত ধরিয়া গৃহে আনিয়া আপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া আপনি পুনর্বার চসিতে গেল। তাহার গৃহিণী সে মৎস্ত কয়টা পাক করিয়া মনে বিবেচনা করিল যে মৎস্ত পাক করিলাম কিন্তু কি প্রকার হইয়াছে চাখিয়া দেখি। ইহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ঝোল লইয়া খাইয়া দেখিল যে ঝোল স্নহ হইয়াছে। পরে পুনর্বার মনে ভাবিল মৎস্ত কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিয়া দেখি ইহা ভাবিয়া একটি মৎস্ত খাইল। পুনর্বার চিন্তা করিল ওটি কিরূপ হইয়াছে তাহাও চাখিতে হয় ভাবিয়া সেটাও খাইল। এইরূপ খাইতে খাইতে একটি মাত্র অবশিষ্ট রাখিল। পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটা আইলে তাহার গৃহিণী সেই মৎস্তটী আর অন্ন তাহাকে দিলে কৃষক কহিল যে, এ কি? চব্বিশটি মৎস্ত আনিয়াছি আর কি হইল? তখন তাহার স্ত্রী মৎস্তের হিসাব দিল :—

“মাছু আনিলা ছয়-গণ্ডা

চিলে নিল দুই গণ্ডা

বাকী রইল ঝোল।

তাহা মুতে আটটা জলে পলাইল।

তবে থাকিল আট।

দুইটায় কিনিলাম দুই আট কাট।

তবে থাকিল ছয়।

প্রতিবাসীকে চারিটা দিতে হয়।

তবে থাকিল দুই।

‘তাব একটা চাখিয়া দেখিলাম দুই।

তবে থাকিল এক।

অই পাতপানে চাহিয়ে দেখ।

এখন হইস্ যদি মান্‌সের পো

তবে কাঁটা খান খাইয়া মাছুখান খো।

আমি বেই মেরে।

তেঁই হিসাব দিলাম করে।”

বিদেশীয়দিগের এই সরল সমাজ-চিত্রের সহিত আমাদের দেশীয় পাণ্ডিত্যভিম্বানী সংস্কৃতজ্ঞদিগের রচনা একবার তুলনা করিয়া দেখুন। ‘গোলক শর্ম্মার ‘হিতোপদেশ’, যতাজয় বিজ্ঞানস্বারেব ‘পুস্তক-পরীক্ষা’ ও ‘প্রবোধ-চন্দ্রিকা,’ রামরাম বসুর ‘প্রতাপসিঁহা-চরিত্র’, চণ্ডী-চরণ মুন্সীর ‘তোতার ইতিহাস’, তারিণীচরণ মিত্রের ‘ঈশপের গল্প’, রামমোহন রায়ের ‘বেদান্তসূত্র ভাষ্যানুবাদ’ প্রভৃতি এবং অপরাপর গ্রন্থকারগণের রচিত ‘মনোরঞ্জন ইতিহাস’, ‘নীতিকথা’, শঙ্করাচার্য্যকৃত ‘আনন্দলহরী’ ও ইলিয়ড্ কাব্যের গভ্জানুবাদ, রাজা রাধাকান্ত দেবের জী-শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ, আত্ম-তত্ত্বকৌমুদী, কলিরাজার যাত্রা প্রভৃতি এই সময় পর পর প্রকাশিত হয়। তৎপর মদন-মোহন তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তা, বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হিতকর-প্রভাকর, বোধেন্দু-বিকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা প্রথমতঃ পূর্বোক্ত ‘খুষ্টানীভাষা’ ও ‘পণ্ডিত ভাবার’ ব্যবধান দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

বিদেশীয় সিভিলিয়ানদের পাঠ্য ‘প্রবোধ চন্দ্রিকা’র মুখবন্ধ;—“অকারাদি ককারাক্তা ক্ররমালা যদ্যপি পঞ্চাশৎ সংখ্যক। কিম্বা একপঞ্চাশৎ কিম্বা সপ্তপঞ্চাশৎ সংখ্যা পরিমিতা হউক তথাপি এতাবদ্যাজ কতিপয় বর্ণাবলী বিজ্ঞাস বিশেষ বশতঃ বৈদিক-লৌকিক-সংস্কৃত-প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানাদেশীয় কল্লম্ব জাতীয় ভাষা বিশেষ বশতঃ, অনেক প্রকার ভাষা বৈচিত্র্য শাস্ত্রতো লোকতঃ প্রসিদ্ধ আছে।” আর না, ইহাই যথেষ্ট। ছাত্রের পক্ষে এই ভাষা আরম্ভ করা কিরূপ হৃদয় তাহা

আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। আমার মনে হয়, বৈদেশিক সিভিলিয়ান সাহেবদিগকে এইরূপ ‘কটমট’ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত বলিয়াই তাঁহারা দেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। এই তো গেল, বৈদেশিকগণের শিক্ষা পুস্তক; এখন একবার আমাদের দেশীয় বালকগণের শিক্ষাগ্রন্থের ভাষার নমুনা দেখুন। নিম্নে প্রাচীন শিশুবোধক গ্রন্থ হইতে স্বামীর নিকট জ্বর লিখিত একখানি পত্রের আদর্শ উদ্ধৃত করিলাম;—

“ঐহিক পারত্রিক ভবাবর্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর

মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপদ্মবাপ্রশ্ন

প্রদানেযু—

শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদ ~~স্ববোধক~~ স্মরণমাত্র অত্র শুভদ্বিদেশ্য। পরং মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কালযাপন করিতেছেন যেকালে এ দাসীর কালরূপ লয়ে পাদক্ষেপ করিয়াছেন সেকাল হরণ করিয়া দ্বিতীয় কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব পরকালের কালরূপকে কিছুকাল সাধনা করা দুই কালের সুধকর বিবেচনা করিবেন। * * * অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার স্তায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীচরণগুণে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন মিত।”

বর্তমানকালের স্বামী পত্নীর নিকট হইতে এবস্ত্রকার পত্র পাইলে যে কি করেন, তাহা বলা যায় না। প্রাচীনকালে অতিরিক্ত পণ্ডিত দর্শনবিদ্যার আশায় ভাষাকে নিতান্ত দুর্বোধ্য করিবার প্রথা যেমন প্রচলিত ছিল, সেইরূপ প্রাচীন প্রথা, আচার ব্যবহার প্রভৃতিও ‘মধ্বাভাবে শুড়ং দত্যাৎ’ এর স্তায় ঠায়ঠারেই মানিত হইত। পূর্বোক্ত পত্রখানিতে স্বামীর নাম করিতে হয় না বলিয়া, জী তাহাকে ‘প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য’ নামে অভিহিত করিয়াছেন, যেন পৃথিবীতে আর কোনো মধ্যম ভট্টাচার্য্য থাকিতে পারে না।

একাল পর্যন্ত আমরা যতগুলি বাঙ্গলা গদ্য পুস্তকের উল্লেখ করিলাম, তাহার একখানিতেও দাঁড়ি, কমা প্রভৃতি ছেদ ব্যবহৃত হয় নাই। সহজিয়া সম্প্রদায়ের কোন কোন পুস্তকে দাঁড়ির স্থলে : বিসর্গ বা ॥ ডবল দাঁড়ি ব্যবহৃত

হইয়াছে, কোন কোন পুস্তকে কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই। বিভাসাগর মহাশয়ের আমল হইতেই বাঙ্গলা গ্রন্থে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলেন প্রভৃতি ছেদও পূর্ণ ছেদের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন অভিপ্রায়ে সরকারী শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য সভা’ সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে সরকার হইতে বঙ্গসাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে আর একবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল সত্য। বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদের নিমিত্ত ‘বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি’ অধ্যাপক উইলসনের সভাপতিত্বে ১৮২৮ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমিতি হইতে ‘বিজ্ঞান সেবধি’ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহাতে ভারতীয় ভূগোল, যন্ত্রবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই উদ্যম সভাই অধিক দিন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। অতঃপর সরকার তরফ হইতে কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা প্রভৃতি নগরে নব্বাাল স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুলে বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। শ্রীরামপুরের মিশনারী বিভাগেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে ছাত্রগণকে বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। এই বিভাগেই পাঠ্য স্বরূপ পদার্থ-বিজ্ঞানসার, উদ্ভিজ্জ বিজ্ঞান, ক্রিমিয়া-বিজ্ঞানসার, পদার্থ জ্ঞান-মালা এবং চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কতিপয় বিজ্ঞানগ্রন্থ অনূদিত ও প্রচারিত হয়। রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে ‘ক্রিমিয়া বিজ্ঞানসার’ই বঙ্গভাষার প্রথম গ্রন্থ; ইহা মিঃ যোহন ম্যাক সাহেবের Principles of Chemistry নামক গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদ হইলেও এই সময় হইতেই প্রমাণ হইতে থাকে যে, যন্ত্র ও পরিশ্রম করিলে বাঙ্গলা ভাষায় ইউরোপীয় যাবতীয় বিজ্ঞানেরই আলোচনা করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্ম সভা ও ব্রাহ্মগণ কর্তৃকও বঙ্গভাষায় কম গৌরবান্বিত হয় নাই। তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গসাহিত্যের যুগেষ্ঠ উন্নতি সাধন করিয়াছে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কতিপয় সিভিলিয়ান ও দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সাহায্যে কলিকাতায় Vernacular Literary Society

নামে এক সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয় । ৬ রাঙ্কেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় কিয়দ্বিবস এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন । সমিতির দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল । ইহার সভাগণকে মাসিক চাঁদা দিতে হইত এবং সম্পাদক মিত্র মহাশয় মাসিক ৮০৭ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইতেন । সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল,—ইয়ুবোপীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ ও তাহা দেশমধ্যে প্রচার । সমিতি ছই বৎসবে সতের খানি গ্রন্থ প্রকাশিত ও অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় কবিস্বার ব্যবস্থা করে । সমিতির একতম সভাপতি মিঃ প্র্যাট্ বঙ্গসাহিত্যের আলোচনার নিযুক্ত থাকার সময়ে, সাহিত্যের উন্নতির জন্য সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন । তিনি সমিতির বার্ষিক বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন যে, বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে অধিক মূল্যে গ্রন্থ বিক্রীত হইতে পারে না । গল্পের পুস্তক ও অন্যান্য আমোদজনক পুস্তকই দেশীয়গণের অধিকতর প্রিয় ও অধিক পরিমাণে বিক্রয় হয় । কিন্তু অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এই ভাবের গ্রন্থাদি রচনা করা অত্যন্ত দুষ্কর । প্র্যাট্ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, বর্তমান-কালেও সে অবস্থা বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই । এই সমিতি হইতে স্ত্রী ফেরিওয়াল পুস্তক বিক্রয়ার্থে পল্লীগ্রামে প্রেরিত হইত । এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন । ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এইভাবেই বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি সাধিত হয় । এই সময় পর্য্যন্ত বেশমধ্যে সাময়িক পত্রাদির প্রচলন ছিল না । ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই ‘সমাচার দর্পণ’, ‘সংবাদ-কোমুদী’, ‘চন্দ্রিকা’ প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদির প্রচার আবদ্ধ হয় ।

অতঃপরে “বিভাগবীর যুগের” আরম্ভ । এই যুগেই বঙ্গসাহিত্য উন্নতির উচ্চতম সোপানে আবোহণের সূত্রপাত হয় । আমরা শ্রীহৃত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত একযোগে বলিতে পারি,—“ভাগীবথী যেমন হিমালয়েব দূর গভীর কন্দব হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে স্বকীয় সঙ্কীর্ণভাব পবিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ বিশাল আকার ধারণ করেন এবং বহুজনপদ অতিক্রম করিয়া অবশেষে শতুমুখে সাগর চুম্বনে কৃতার্থ হন, বাঙ্গলা গল্প সাহিত্যও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবশ্রোতে

উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ প্রাচীন পণ্ডিতবর্গের পাণ্ডিত্যপ্রবাহে এবং তৎপরে যুতাজ্বর ও বামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় স্বকীয় সঙ্কীর্ণতা পবিত্যাগ করিয়াছে এবং বহু অবস্থা অতিক্রম করিয়া, বহুবিধ বিষয়ে বিভক্ত হইয়া শেষে বিভাগ-সাগর সঙ্গম লাভে কৃতার্থ হইয়াছে । ভাগীবথী সাগর-সঙ্গমস্থল যেরূপ মহাতীর্থ স্বরূপ, উহা যেমন সহস্র সহস্র তীর্থ যাত্রীর পবিত্রতাসাধক ও পুণ্যপ্রবর্দ্ধক, বাঙ্গলা গল্প-বচনার বিভাগসাগর সঙ্গমও সাহিত্যিকগণের পক্ষে তাদৃশ মহাতীর্থ স্বরূপ । যে রচনা এক সময়ে উৎকট, দুর্বোদ, বিশৃঙ্খল ও পূর্ণাপব বস সম্বন্ধবর্জিত ছিল, বিভাগসাগর সংস্পর্শে তাহা স্থূললিত, সুধপাঠ্য ও সুসংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে এবং জগৎ সন্ক্ষে আপনাব অনন্ত গুণগৌরব ও মহিমার পরিচয় দিতেছে । বিভাগসাগরের রচনার বাঙ্গলা গল্প ললিত-মধুব শব্দাবলীর বিস্তার ভূমিতে পরিণত হইয়াছে ।” বিভাগসাগরীয় যুগেই বঙ্গ গল্পসাহিত্য প্রভূত শক্তিশালী হইয়া উঠে । এক দিকে বিভাগসাগর মহাশয় যেমন অক্লান্ত পরিশ্রমে নানা ভাবাব জ্ঞান আহরণ করিয়া নানা স্থূললিত পদে ও শব্দে ভাষাব পুষ্টি সাধনে রত হন, অপর দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব যথোপাধ্যায়, বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনাথায়ণ তর্করত্ন, এবং পবে দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে “টেকচাঁদ ঠাকুর”, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মারা গল্প সাহিত্যের ইতিহাসে মহা গৌরবান্বিত ও মহিমাম্বিত স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন । সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহারা চিবকাল আঁয় ও পূজা প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে হইতেই, সাধাবণতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বঙ্গদেশে সমাজবিপ্লবের ছায়া এক বর্ণাবর্ধ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয় । বিদেশীয় সভ্যতার আলোক-বশিতে বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত ও সঙ্গে সঙ্গে কুরীতি-স্রোত-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে । পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বিদেশীয় রীতিনীতির অনুকরণে, বিদেশীয় পানাহারে অনুবর্ত্ত হইয়া উঠেন । আবার সেই সঙ্গে তাঁহাদের চিন্তে দেশেব এই পবাদীন অবস্থাও জাগ্রত হইয়া স্বদেশহিতকল্পে তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল ।

যে মাইকেল মধুসূদন দেবীর আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় রমণীয় কঠলয় হইয়াছিলেন, তিনিও অবশেষে জাতীয় ভাবে উদ্ধুদ্ধ হইয়া উঠিয়া গাহিতে আরম্ভ করেন,—

“হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন,

তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,

পরধন লোভে মত্ত করিহু ভ্রমণ

পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুঞ্জে আচরি।”

মাইকেলের এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া চিরকাল আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে আসন প্রাপ্ত হইবে। এই সময় হইতেই বঙ্গভাষা শতমুখী গঙ্গা-প্রবাহের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নানা দিগেশের অভ্যন্তর-বিদ্যা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। পূর্বোক্ত সাহিত্য-রশ্মিগণের প্রত্যেকেরই উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিবার অবসর আমার নাই, পরন্তু বর্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস সংকলনের সময়ও উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গলা পদ্ম সাহিত্য যেমন সহস্র বৎসর পূর্ব হইতেই উন্নতির পরিচয় দিয়া আসিতেছিল, গঙ্গা সাহিত্য সেরূপ পারে নাই। উনবংশ শতাব্দীর প্রাবল্য হইতেই গঙ্গা সাহিত্যের উন্নতি সূচিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দেশমধ্যে যে প্রবাহ প্রবর্তিত হয়; তাহাতেই বাঙ্গালী বাঙ্গলাকে চিনিতে চেষ্টা কবে, তাহাতেই বাঙ্গালী নিজেদের শোচনীয় অবস্থা জয়যম্ম করিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য মার্গে নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। তিনিই সাহিত্য মধ্যে নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, অভিনব কল্পনার প্রবর্তন করিয়া বঙ্গবাসীকে আনন্দবসে আগ্রহ করিয়া তোলেন। কেনা জানে, সেকালে তাহার ‘বঙ্গদর্শন’ পাঠের নিমিত্ত সকলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে মাসের দিন গণনা করিতেন। শেখাবস্থায় তিনি ধর্ম-তত্ত্বাশোচনায় প্রবৃত্ত হন। আমি বহুপূর্বে একবার বলিয়াছিলাম যে, সেই দেবদত্ত অসাধারণ প্রতিভা-সম্বিত মস্তিষ্ক বেদিন ধর্মতত্ত্বের স্তর বিস্তারিত হইয়াছিল, সেই দিনই বঙ্গোপদ্রাস-লক্ষী আগুনার অঙ্কলকোণে উচ্ছৃঙ্খল নয়নবারি সংবরণ করিয়াছিল। তাহার কণ্ঠের সেই অক্ষুট রোরন, ধ্বনি ঘাষণিক ঢকার সজোর আক্ষালন বশতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের

কর্ণপটিকে অগ্রসর হইবার অবসর পায় নাই। আমরা ধর্মতত্ত্বের কাঙ্গাল ছিলাম না, আমাদের দেশ, আমাদের সাহিত্য, আমাদের জাতীয়তা ধর্মপটে সমাচ্ছাদিত;— তাহারই তত্ত্ব আমরা জগতের মধ্যে বরণীয় জ্ঞতি। আমরা আবাব নূতন কবিতা ধর্মতত্ত্বের জন্ত কাঙ্গাল সাজিব কেন? যাহারা সমগ্র জগতের ধর্মপিপাসার বারি সঞ্চয় করিতে পারে, তাহাদিগকে গণ্যপূর্ণ জলের জন্ত লাগানিত হইলে শোভা পাইবে কেন? যাহা ছিল না, বঙ্কিম না জন্মাইলে যাহা আমাদের ভাগ্যে কোন দিন ঘটিত না, যাহার জন্ত আমাদের ভাষা আবার বিদ্বজ্জন সমাজের আশীর্বাদে নবভাবে বিভূষিত হইয়া তাহার সূতজননীর কীর্তিবন্ধা করিতে পারিত; একদিন বঙ্গভাষা প্রসূতি যে অতুলনীর গোরব গর্বে স্মৃতি হইয়া আপনার কোলের সম্ভান ‘শকুন্তলা’কে সর্বভাবার সৌন্দর্য্যধার কবিতা তুলিয়াছিল;—তাহারই জন্ত আমরা কাঙ্গাল সাজিয়া-ছিলাম। দাবিত্র্য ঘুচিয়া আসিয়াছিল, চব্বিশে মূপূব পাইয়াছিলাম, কটিতটে কঙ্কা পাইয়াছিলাম, বুঝিবা কণ্ঠের হারও মিলিয়াছিল কিন্তু শিবোপরি সেই বিজয় ক্রি়াট কোথায়? এখন আর আমাদের ভাষা নিরাভরণ নহে— মুকুটহীন। ধর্মতত্ত্বের শ্রোত অসময়ে প্রবাহিত না হইলে সে শিবোদ্ভূষণ বঙ্কিম দিতে পারিতেন। বঙ্কিম বাচিয়া থাকিতেই সে আশা মরিয়া গিয়াছে।

বঙ্কিমের নামের সহিত আমাদের বাঙ্গলা উপজাতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের মহিমাম্বিত প্রতিভা কিরণে বাঙ্গলা উপজাতির জন্ম। বঙ্কিমের কৃষ্ণকেশ শুভ্র হইতে না হইতেই, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার যৌবন ফুটাইয়া আসিয়াছিল। কোনো দেশের কোনো ভাষার কোনো জ্বরের এরূপ অপূর্ব ক্ষিপ্র উন্নতি এবং পরক্ষণে এরূপ শোচনীয় অবনতি সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে উন্নতির রশ্মি এতই উজ্জ্বল যে, সূদূর ইংরাজি সাহিত্য-সাম্রাজ্যও মুগ্ধনয়নে চকিতচিত্তে তাহার পানে চাহিয়া-ছিলেন,—সে আভরণ এমনই মূল্যবান যে, তিনি আপনার ভূষণ বিনিময়ে কেতাকে তাহা ধারণ করিবার লোভ সন্ধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু হায়! সে আভরণ অদ্ব্যভরণ, শির আভরণ নহে। আমাদের একোন্ম যিনি দূর করিতে

পারিতেন, তিনি করেন নাই। ভবিষ্যতে কেহ পারিবেন কি না, সে আলোচনা এখন শোভন হয় না।

গল্প সাহিত্যে যেকপভাবে নানা অবস্থা নানা সংকীর্ণতা পবিহার করতঃ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে আপনাদের গোচরীভূত করিয়াছি। কিন্তু আমাব সময়ের অল্পতায় এবং অবসরভাব হেতু পূর্ণ-সফল-কাম হইতে পারিয়াছি বলিয়া আমার নিজেবই ধারণা হয় না। একপভাবে অসম্পূর্ণ ও অক্ষরচনা একপ পণ্ডিত সম্মিলনীতে উপস্থিত করা নিতান্তই ষ্ট্রুতাব পবিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ অস্থবোধ উপেক্ষা করিয়া একাধা হইতে পশ্চাৎপদ হওয়াও আমি তুল্যরূপে ষ্ট্রুতাব বলিয়া মনে করি।

সাহিত্যের অপব শাখা—পদ্য; উহা মাণিকচাঁদের, গোপীচাঁদের গানের মধ্যদিয়া জন্মলাভ করিয়া, ডাক ও ধনার বচনের মধ্য দিয়া পুষ্টিলাভ করতঃ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব লেখকগণের রূপায় উন্নতির সোপানে আরোহণ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিনব প্রেম-ভবন্ধু নদীয়া যখন 'ডুবু ডুবু'; তখন নানা দিগদেশ হইতে নানা জাতীয় ভক্ত আসিয়া তাহার প্রেম-মনাকিনী-শ্রোতে নিমজ্জিত হয়। এই সময় একেশ্বরবাদী মোসলমানগণও বৈষ্ণব ধর্মের মহিমাচ্ছটার অকুণ্ট হইয়া বৈষ্ণববাসের রসিক হইয়া উঠে এবং স্থললিতপদে গৌর গুণগান কীর্তনে মনোনিবেশ করে। এইভাবে নানা দিক হইতে ধর্ম-সম্প্রদায়ের নানা উদ্ভেজনা লইয়া বঙ্গসাহিত্য সাগর-সঙ্গমে মিলিত হয়।

এখন কথা এই—বঙ্গ সাহিত্য বর্তমান সময়ে যে অবস্থায় সমানীত, তাহাই কি তাহাব পূর্ণাবস্থা, না আব কোন বিষয়ে কোনো ভাবে তাহাব উন্নতির উপায় অন্বেষিত হইতে পারে। এই সন্ধে বর্তমান সাহিত্য সম্মিলনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাও আমবা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু সর্ব প্রথমেই একটা কথা বলিয়া রাখি যে, এবিষয়ে সকলে সহস্র একমত হইতে পারেন না; নানা জনের নানামত অন্তঃস্থাবী। অনেকের অনেক বকম প্রস্তাব উপাধিত করিবেন জানি। আমি যাহা বলিব, তাহা যে অভ্রান্তরূপে পরিগ্রহীত হইবে, সেকপ আশা আমার নাই। তবে আপনারা সকলে আমার কথাগুলি

প্রণিধান করিবেন, যুক্তি তর্কেব দ্বাৰা তাহার বৈধ অবৈধতা প্রতিপাদন করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

বাঙ্গালী পবাবীন—ইংবেজবাজেব অধীনে বাস করিতেছে। ইংরেজি আজ রাজভাষা; বাঙ্গলার্থা, ব্যবসায় বাণিজ্যেব কার্য, শিক্ষা কার্য সমস্তই আজ ইংবেজি ভাষা সাগাযে নির্বাহিত হইতেছে। বাঙ্গালীব দেশে বাঙ্গালীর ভাষা প্রচলনেব যে কোনরূপ সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা আমাদের কর্তাদের বিবেচনায় আইসে না। সময়ের শ্রোতে দেশবাসীও নীয়মান, সকলেই স্ব স্ব পুত্র পৌত্রাদিকে ইংবেজি শিক্ষার নিমিত্ত ইংরেজি স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছেন। সকল বালকই যে এইভাবে বিদ্বান হইয়া আসিতেছেন, তাহা নহে। সর্বোচ্চ পবীক্ষায় অতি সামান্য মাত্র বাঙ্গালী উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যাক্ সে কথা। এখন কথা এই যে—পবাবীন জাতি হইলেই কি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞেতার ভাষা গ্রহণ করিতে হয়? জগতের ইতিহাসে একরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি পাওয়া যায় বলিয়া আমার জ্ঞান নাই। বিশ্ববিজয়ী রোম যখন কাল-চক্রের পরিবর্তনে বর্জবদিগেব হস্তে স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়, তখন সে কোন্ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল? প্রাচীন গ্রাস্তুরস্বেব বাহুবলে পরাজিত হইয়া কি স্বীয় জাতীয় ভাষা বিসর্জন দিয়াছিল? তাবপর জর্জর, স্যাক্সন্ প্রভৃতি অনেক জাতিবই এক সময় ভাষা বিপর্যায় সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কেহই তো মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাষা—বিজ্ঞেতার ভাষা গ্রহণ কবে নাই। যাহারা তদ্রূপ করিয়াছে, তাহাবা সম্ভবত মরিয়া গিয়াছে তাহাদের অস্তিত্বটুকুও অনন্তগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। তবে কি বাঙ্গালী, তুমিও নিজেব অস্তিত্বটুকু—সত্তাটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছা কর? না, ব্রতধাবণ পূর্বক মাতৃভাষার সেবায় মন প্রাণ সমর্পণ করিবে? আজ যে আমবা নানা দেশেব বাঙ্গালী এথায় সমবেত হইয়াছি, কি উদ্দেশ্যে? আজ আমাদের জাতীয় সাহিত্য—বাঙ্গলা ভাষা দীনা নহে, আভরণ বিহীন নহে, পরন্তু ইহা বিপুল সম্পৎসারে গৌরবান্বিত। তবে এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য কি? আমি বলি প্রথমতঃ বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা দানের নিমিত্ত বাঙ্গলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। বিজ্ঞান, দর্শন,

ইতিহাস, শিল্প, প্রভৃতি যে যে শাখার উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পুস্তকের অভাব আছে তাহা পূরণ করিতে হইবে। যেদিন দেখিব বাঙ্গলাব জেলায় জেলায়, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে ইংবেজি বিদ্যালয়ের পাশ্বে বড় বড় বঙ্গ বিদ্যালয় দণ্ডায়মান হইয়া দেশের অগণ্য সন্তানকে জাতীয় ভাষা শিক্ষা দিতেছে, জাতীয় ভাষার সাহায্যে দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান বিতরিত হইতেছে, সেইদিন জানিব বুঝিব আমাদের জাতীয় সাহিত্য পূর্ণ সফলতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

আজ দেশের মধ্য দিয়া এক নূতন বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে বাতাস উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছামত বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলে উপহাসসম্পদ হইতে হইবে। আজ দেশের সমবেত শক্তি—সমস্ত নরনারী মাতৃ-পূজার অভিযানে মাতৃ মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। আমরা সাহিত্যসেবী বলিয়া কি পশ্চাৎপদ হইয়া রহিব? না, আমাদেরকেও সাহিত্যের ভিতর দিয়া মাতৃসেবা করিতে হইবে। দেশধর্মই এক রকম সকল ধর্মের সার। দেশের সেবাকে ধর্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা মাতৃ ভূমির অর্চনা করিতে পারি, তবেই আমাদের সকল সাধনা, সকল ব্রত উদ্ভাপিত হইবে। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর উন্নতি বিধান করিতে গেলে যে, অসংখ্য জীবের উপকার সাধন করা হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ভগবানের সৃষ্টজীবের উপকার করিলে, ভগবানেরই সেবা অর্চনা করা হয়, ভগবানের প্রসাদলাভ করা যায়। আমাদের দেশের নারীজাতি ধর্মের জন্ত কত স্বার্থত্যাগ, কত ব্রত কত উপবাস, কত দান কত ধ্যান করিয়া থাকেন, কতই না উপচিকীর্ষাপরতন্ত্রতার পরিচয় দেন, এ বিষয়ে সমগ্র ভারতের নারী সমাজ একমত। দেশের যেখানে যাইবে সেইখানেই মঠ বাট, মন্দির পাছশালা প্রভৃতি নিত্য ভোগের কত উপাদান দেখিতে পাইবে। কিন্তু দেশের হিতের জন্ত কে কবে লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছে? ধর্মের জন্ত যতটা এক-প্রাণতা আমরা দেখাইয়া থাকি, দেশের মঙ্গলের জন্য যদি ঐরূপ দেখাইতে পারি, তবে দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হয়।

আমাদের দেশের নারীজাতিই সমাজের শিরোভূষণ, তাহাদের হস্তে মহান কর্তব্যভার সম্যক। শিশু শিক্ষার

প্রথম ভার জননীর হস্তেই জন্ম থাকে। সেই নারীজাতিকে দেশধর্মের, মহনীয় বুরাইয়া দিলে দেশের প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা। ঐরূপ করিতে পারিলে স্বদেশ-প্রেম, একপ্রাণতা, স্বার্থশূন্যতা অগণিত দৃষ্টান্ত আমরা বঙ্গের ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব। অপরাপর ব্যক্তির পক্ষে এই কার্য সম্পন্ন করিবার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে কিন্তু সাহিত্য-সেবী আমরা,—আমাদেরকে সাহিত্যের ভিতর দিয়াই এ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এই ভাবে পূর্ণমনস্ক হইতে পারিলে, আমাদের জাতীয় সাহিত্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠাপন্ন এবং সর্বজনীন সহায়ভূতি লাভে সক্ষম হইবে।

ঐরূপ অল্পাধীন অল্প সময়ে বা অল্প আয়োজনে সুসাধ্য নহে, স্বীকার করি এবং তজ্জন্মই এই উত্তর-বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে আমি আজ নিম্ন লিখিত তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত করিতেছি। আমি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিব, তাহা সকল স্থানের সকল সাহিত্যিকের প্রতি প্রযোজ্য হইলেও উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীর প্রতিই বিশেষ ভাবে প্রয়োজ্য বলিয়া মনে করিবেন। উত্তর বঙ্গে যখন লোকবল, ধনবল প্রভৃতি তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন নহে, তখন উত্তর বঙ্গবাসীদিগকে অল্প আয়ত্তেই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং সর্বপ্রথম আমাদেরকে সাহিত্যের এই তিনটি শাখায় সেবার নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য। ইহাতে সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উত্তরবঙ্গের অজ্ঞাত শাখায় হস্তক্ষেপ করিব। পূর্কোক্ত তিনটি শাখা,—(১) সাহিত্য শাখা, (২) ইতিহাস শাখা এবং (৩) বিজ্ঞান শাখা। এই তিন শাখায় কি কি বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত, তাহা একে একে নিয়ে বিবৃত হইল। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন বাহাতে লক্ষ্যলব্ধ উদ্ধার স্থায় বিপথে পরিচালিত না হয়, তৎপক্ষে আমাদের সকলেরই চেষ্টা হওয়া কর্তব্য। রংপুর্বাসী বন্ধুরা এই প্রথম সম্মিলন যে ভাবে চালাইবেন, ভবিষ্যতে সম্মিলন সেই ভাবেই চালিত হইবার আশা করা যায়। আবশ্যেই ইহা বাহাতে লক্ষ্যলব্ধ না হয়—বিপথগামী না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত।

(১) সাহিত্য শাখা।

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের

আলোচনা এবং বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের চেষ্টা এই বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন কবি ও লেখক-দিগের জীবনী সংকলন এবং প্রাচীন গ্রন্থাদির আবিষ্কার, বিবরণ সংকলন, সমালোচনা ও প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস প্রচার করিতে হইবে। আমাদের দেশের প্রতি গ্রামে প্রতি পল্লীতে কতশত কবি অজ্ঞাতে লোকলোচনের অন্তরালে লুপ্তগিত আছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সকল সাহিত্যসেবীত আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের আদ্বৈত লেখক। প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাদের স্থান অতি উচ্চ।

বাঙ্গলাভাষায় বাঙ্গলা ব্যাকরণ নামে প্রায় আড়াই শত ব্যাকরণ পুস্তক বর্তমান ছিল সত্য, কিন্তু তাহার একখানিও প্রকৃত বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, হালহেড সাহেবের ব্যাকরণই এই শ্রেণীর ব্যাকরণের মধ্যে প্রথম রচিত ও প্রকাশিত হয়। তৎপর যথাক্রমে কেরী সাহেবের ব্যাকরণ, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের ‘বাঙ্গলা ব্যাকরণ’, রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ‘বর্ণমালা ও ব্যাকরণ’, হটন সাহেবের ও কীথ সাহেবের ব্যাকরণ, শ্রীমাচরণের ‘ইংরেজি বাঙ্গলা ব্যাকরণ’ প্রকাশিত হয়। বাঙ্গলা ভাষার শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ, তদ্ধিত প্রত্যয় প্রভৃতি সংস্কৃতের সম্পূর্ণ অনুরূপ না হইলেও এই সকল ব্যাকরণে এতদূত্বের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য প্রদর্শিত হয় নাই। পরবর্তী বৈয়াকরণগণও পূর্বোক্তের পদানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং এসকল ব্যাকরণ বাঙ্গলা ব্যাকরণ নামের প্রকৃত উপযোগী নহে। বাঙ্গলা ব্যাকরণে বাঙ্গলা শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার, শব্দের ইতিহাস, ভাষার গঠন বৈচিত্র্য প্রদর্শন এবং বাঙ্গলার সহিত হিন্দী, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি ভাষার সম্বন্ধ নির্ণয় ও তুলনায় সমালোচনা প্রয়োজনীয়।

ব্যাকরণের ছাড়া বাঙ্গলা শব্দের অর্থ পৰিষ্কারক অনেকগুলি অভিধানও বর্তমান আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান উভয়েরই সর্বপ্রথম প্রণেতা ইয়ুরোপীয় জাতি। কষ্টার নামক এক সিভিলিয়ান সর্বপ্রথম এক বাঙ্গলা অভিধান

১৭২৯ অব্দে প্রকাশিত করেন; ইহাতে ১৮০০ অব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপর যথাক্রমে মিলার সাহেবের অভিধান, ঠাকুরের বাঙ্গলা ইংরেজি অভিধান, পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিন্ধু অভিধান, কেরী সাহেবের অভিধান, পিয়ার্সন সাহেবের, মোঁগুস সাহেবের, লাবাণ্ডয়ার সাহেবের, ইটন সাহেবের, মটন সাহেবের, মার্সম্যান সাহেবের ও রবিন্সন্ সাহেবের অভিধান এবং বাঙ্গালী রচিত ‘বাঙ্গলা কোষ গ্রন্থ’, ‘ধাতুশব্দজ’, ‘শব্দ কল্প ললিতা’ প্রভৃতি সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। এই সকল অভিধান দ্বাৰা বঙ্গসাহিত্যের বর্ধিত শক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও, প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

উত্তরবঙ্গীয় সম্মিলন দ্বাৰা উত্তরবঙ্গের শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। তৎপর এ অঞ্চলের গ্রাম্য গল্প, প্রবচন, প্রবাদ, উপকথা, গ্রাম্য গান, গাথা সংগ্রহ ও তাহার ইতিহাস বিশ্লেষণ এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী সমাধে প্রচলিত বারব্রত কথা, রূপকথা, nursery tales ও rhymes প্রভৃতির আলোচনা অবশ্য করণীয়। দুই একজন লেখকের দৃষ্টি ইতিমধ্যেই এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশে তত্তৎ দেশবাসী সাহিত্যিকের যত্ন এ বিষয়ে প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) ইতিহাস শাখা।

বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস সংকলন এই শাখার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ইতিহাস দুই শ্রেণীর হইবে,—সামাজিক ও রাজনৈতিক। সামাজিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক ইতিহাসাপেক্ষা কম নহে। কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষও বাঙ্গলা সম্বন্ধীয় প্রায় কুড়িখানি পুস্তক রচিত হয়। ইহার আধিকাংশই স্বাধীনমত প্রকাশের ও অভ্রান্ত সত্য প্রচারের ঐকান্তিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮০২ খৃঃ অব্দে ‘ঐতিহাসিক ব্যাকরণ’ নামে একখানি বাঙ্গলার ইতিহাস রবিন্সন সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার প্রণেতা মিঃ কেরী। ঐতিহাসিক আলোচনার নিমিত্ত তৎকালে এক সম্মিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ষাটশটি দেশীয় সত্য ছিলেন। সেই সম্মতির উত্তোগেই ‘ঐতিহাসিক ব্যাকরণ’ প্রকাশিত হয় কিন্তু ইহার একরূপ অদ্বৈত হইল কেন, তাহা ঠিক বলা কঠিন।

আলোচ্য ইতিহাস-শাখা প্রত্যেক জেলার বা গ্রামের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ; প্রাচীন মুদ্রা, খোদিত লিপি, প্রাচীন চূর্ণ অট্টালিকা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ চিত্র ও তাহার বিবরণ সংকলন; ঐতিহাসিক কিস্তদস্তীর উদ্ধার ও সমালোচনা ও ইতিহাসের সহিত তাহার সমন্বয়সাধন এবং ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ তীর্থাদির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করিবে।

ভূগোল, খগোল, মানবজাতিবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি আপাততঃ এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। দেশের সামাজিক আচার ব্যবহার, পর্ব-উৎসবাদির আলোচনা এবং হাড়ি ডোম, বাগদি বাউরী, রাজবংশী প্রভৃতি অনাথ্য জাতি সমূহের সমাজতত্ত্ব ও আর্থ্য জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক বিচার করা বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত দেশের বিবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত এবং বিভিন্ন জাতির কুলগ্রন্থাদির আলোচনা এই শাখারই উদ্দেশ্য রূপে গণ্য হওয়া উচিত।

আর একটি কার্য্য আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের কৃষিশিল্প বাণিজ্যের একখানি সর্বোচ্চ সুন্দর ইতিবৃত্তের আবশ্যকতা অনেক দিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছে কিন্তু কাহাকেও এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে শ্রুতি নাই। উত্তর বঙ্গের প্রতি জেলায় প্রতি নগরের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উন্নত অল্পমত, জীবিত, অর্দ্ধমৃত, মৃত—সর্ববিধ কৃষি শিল্পের একখানি ইতিহাস প্রস্তুত হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে কি উপায়ে মৃত শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে, কি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কার্য্য করিলে জীবিত শিল্পাদির অধিকতর উন্নতি হইতে পারে তৎসমুদয়ের বিস্তৃত আলোচনা থাকিবে এবং কোন্ স্থানে কোন্ শিল্পের, কোন্ বাণিজ্যের বা কোন্ কৃষি কার্য্যের প্রচলন অধিক তাহারও আভাস প্রদত্ত হইবে। পরিশেষে দেশের শিল্প বাণিজ্যের পূর্বতন গৌরব কাহিনী ও অবনতির কারণ পরম্পরা সংযোজিত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

(৩) বিজ্ঞান শাখা।

যেদ্রুপ সময় আসিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞানের প্রভূত আলোচনা ব্যতীত আমরা সংসার ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইতে

পারিব না। আমাদের প্রত্যেক কার্য্য—কৃষি শিল্প বাণিজ্যের প্রত্যেক কার্য্য বৈজ্ঞানিক মতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির বলে সম্পন্ন করিতে হইবে; নতুবা বৈদেশিক এবং প্রতিভা ও বিজ্ঞান বলে বলীয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে আমাদের শিল্প বাণিজ্যের অধোগতি অবশ্যস্বাভাবী। কতদিন আমরা কেবল বৈদেশিক পদার্থের প্রতি বিতৃষ্ণা অগ্ন্যইরা দেশের জনসাধারণকে নিরস্ত রাখিব? অল্প সময়ে অধিক দ্রব্য উৎপাদন এবং সুলভে তাহার প্রচলন করিতে না পারিলে দেশের উন্নতির আশা সুদূরপর্য্যন্ত। দেশের সকল লোকেই যে ‘বয়কট’ নীতি অবলম্বনে সুলভ মূল্যের বৈদেশিক সামগ্রী পরিহার করতঃ দেশীয় দ্রব্য উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিবে তাহার আশা করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং আমাদের বিজ্ঞানালোচনা সর্ব প্রথম কর্তব্য রূপে পরিগণিত হওয়া কর্তব্য। দেশের নানা স্থানে যে সমুদয় সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত আছে বা ভবিষ্যতে হইবে, তাহাদের দৃষ্টি এবিষয়ে পতিত হওয়া প্রার্থনীয়। আমাদের রাজসাহীর সাহিত্য সভার পরিষদের শাখা) ইহাই বিশেষত্ব। রাজসাহী শাখা-পরিষদ যাবতীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনাই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে স্থির করিয়াছে। কৃষিশিল্পের উন্নতি করিতে হইলে রসায়ন শাস্ত্রের এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির আলোচনার প্রাধান্য থাকা কর্তব্য। তৎসহ জীব বিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনাও থাকিবে। বঙ্গ দেশের কতিপয় স্থানে রাসায়নিক কর্ম্মাগার স্থাপিত হইয়াছে বটে এবং তাহা হইতে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু এরূপ সীমাবদ্ধ স্থানে এ ছত্র কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারেনা। দেশের অভাব যেমন গুরুতর, দেশের শিল্পালয় বা যন্ত্রালয়ও তদ্রূপ প্রচুর থাকা প্রয়োজনীয়। এইরূপ কারখানা যত অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল হইতে থাকিবে। পূর্বোক্ত তিন শাখারই প্রাচীন দ্রব্যাদি ও অভিনব যন্ত্র সামগ্রী প্রভৃতি সন্নিধানের সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দ্বী শিক্ষা বিষয়ে ছই একটি কথা বলিয়া আমি আমার প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে আমাদের জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় ধর্ম্মে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর

ভক্তি প্রবণতায়—বাহিত্যের গুণ কীর্তন হইতেই বাঙ্গলা সাহিত্য জন্ম লাভ করিয়াছে। ইহা কখনো কৰ্মক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ কবিত্তে পাবে নাই। এক্ষণে সাহিত্যকে কৰ্মে প্রবেশ করাইতে হইবে; সাহিত্যের দ্বারা বাহাতে দেশের স্থায়ী কাব্য হইতে পারে—জনসাধারণের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে তৎপক্ষে আমাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে।

জনৈক ইংরেজ লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, গার্হস্থ-জীবন ও নারীজাতির সামাজিক অবস্থা হইতেই সকল দেশের সভ্যতার পরিমাপ হইয়া থাকে। শিশুগণ শৈশবকালে স্বগ্রহে জননীৰ নিকট যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই জাতীয় উন্নতির প্রধান উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। নারীজাতির জীবন ও চিন্তাপ্রণালী উন্নত না হইলে কোন জাতিই প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না। জননীই সন্তান-হৃদয়ে যথাকালে মহত্ত্বের বীজ রোপণ করিয়া থাকেন।

প্রাচীন ভারতের নারীজাতির অবস্থা উন্নত থাকিলেও বর্তমানকালে নারীজাতির অবস্থা দেখিয়া আমাদিগকে হতাশ হইতে হয়। জীবের যেমন দেহ আছে, সমাজেরও তেমন দেহ অনুমান করিয়া লওয়া যায়। জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত বিকাশের অভাবে যেমন দেহের সর্বাঙ্গীন পুষ্টি হয় না বা তাহার কার্যকারিতা উপলব্ধি হয় না; সমাজদেহেরও তজ্জন কোনো অঙ্গ দুর্বল ও অপটু হইলে জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। নারীজাতি সমাজদেহের অঙ্গ স্বরূপ পরিগণিত। এই অঙ্গ দুর্বল বা দুর্বল হইলে সমাজদেহ কখনই পূর্ণ বিকাশিত হইতে পারিবে না। আজ সমগ্র ভারতবাসী উন্নতির পথে প্রধাবিত সত্য কিন্তু তাহারা সমাজের অপরাধের প্রতি আস্থাবান নহেন; তাহারা ভুলিয়া যান—‘কল্যাণ্যেবং পালনীয় শিক্ষনীয়াতীতয়তঃ’, আর ভুলিয়া যান যে রমণীগণ সুশিক্ষা প্রভাবে দৃঢ়ব্রত হইলে অতি দুর্লভ কৰ্মও সাধ্যায়ত্ত হইয়া উঠে। তাহাদের সৰ্বদা মনে রাখা উচিত,—

‘না জাগিলে সব ভারত-ললনা,

এ ভাবত আর জাগে না জাগে না।’

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ষষ্ঠপূৰ্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কার্কেজের সহিত রোমের জীবন-মরণ

সংগ্রামের সময় রমণীগণেব বঙ্গাশঙ্কাবেব ব্যয় হ্রাস কবিবার উদ্দেশ্যে রোমে এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। বোমক মহিলাবৃন্দ স্বদেশ-প্ৰীতিতে পুরুষগণ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, তাহারা অক্ষুণ্ণ চিন্তে এই রাজ-বিধি পালন কবিত্তে থাকেন। গ্রীস দেশান্তর্গত আর্গস নামক স্থানেব এক ক্ষুদ্র অধিপতি বিপক্ষেব সহিত এক যুদ্ধে স্বাধিকাবভুক্ত এক ক্ষুদ্র গ্রাম হাবাইলে, অধিবাসিনী মহিলাবা প্রতিজ্ঞা কবেন যে, যতদিন না সেই গ্রামের পুন-রুদ্ধাব হইবে ততদিন তাহারা অগন্ধাব পরিধান করিবেন না বা কোনো প্রকাব বিলাসে লিপ্ত হইবেন না। জাপানেব মহিলাবা এতই উন্নতির সোপানে আবোহণ করিয়া ছিলেন যে, যখন বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রথম প্রবর্তিত হয় তখন ঐ ধর্মের মূলতত্ত্বানুসন্ধানভার দিনজন নারীগণ প্রতি হস্ত হয়; তাহারা ভারতবর্ষে আগমন কবিয়া বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্ত সংকলন করেন। প্রকৃত শিক্ষিতা হইলে রমণীগণ কিঞ্চপ কার্যক্ষম ও স্বদেশ-প্রেমিক হন, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত ইতিহাস হইতে প্রদর্শন করা বাইতে পাবে। সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষা বাহাতে প্রসারলাভ করে, রমণীবৃন্দের বাহাতে স্বাভ্যোন্নতি হয়, সভ্যতার স্রোতকে তাহারা বাহাতে বেগশালী করিতে পারেন তাহার উপায় অবলম্বন করা আশু কর্তব্য। আজ এই জাতীয় অভ্যুত্থানের দিনে দেশের বিভিন্ন জাতিসমূহ যখন একই আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টিত হইতেছে, তখন আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য—যে জাতিগঠনের ভার আমাদের উপর নহে, নারীগণের হস্তেই সম্যস্ত।

সম্মিলন প্রতি বৎসব একস্থানে না হইয়া এক একবার উত্তরবঙ্গের এক একস্থানে হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ করি। ইহাতে বিভিন্ন স্থানের সাহিত্য আমাদের পরিচয় স্থাপিত হইবে। এই সম্মিলনে যে সকল প্রবন্ধ পাঠিত হইবে এবং প্রদর্শনীতে যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে তাহাতে যে জেলায় সম্মিলন বসিতেছে সেই জেলার বিশেষত্ব থাকা আবশ্যক। সম্মিলন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিবার ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ও বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্ক্ষার বিস্তার পরিচয় দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়।

আমাদের এই সম্মিলন যাহাতে কেবল প্রবন্ধপাঠে এবং জল্পনায় কল্পনায় পর্যাবসিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যাহারা কেবল প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দ্বারা আপনাকে দেশের মধ্যে পরিচিত করিবার জন্য লালায়িত তাহাদের আক্রমণ হইতেও সম্মিলনের রক্ষার উপায়বিধান করিতে হইবে। ইহাতে এক দলের অযথা আক্রোশের আশঙ্কা করিলে চলিবে না। তৎপর সম্মিলনে যাহাতে কোনো একটা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, একটা কোনো কাণের সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তী সম্মিলনে যাহাতে জবাবদেহী করিবার সংস্থান থাকে তাহার আয়োজন এখন হইতেই করিতে হইবে। এইরূপ কোন কাণ যদি আপনারা সম্পূর্ণ করিতে পারেন, বা কতকটা সূত্রপাত করিয়াও দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে সম্মিলন সার্থক হইবে; তাহা হইলে সম্মিলন দ্বারা প্রকৃত দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে এবং সম্মিলনও ক্রমে ক্রমে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। আমি আর অধিক কিছু বলিব না, সভ্যগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা করিতেছি। আজ আমরা যে মহানুভবের সভাপতিত্বে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, তিনি প্রকৃষ্টতর, কথায় আমাপেক্ষা দক্ষতার সহিত আমাদের বর্তমান কর্তব্যের বিষয়ে আপনাদিগকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাকে সাধুবাদ দিয়া আমি উপবিষ্ট হইলাম।

শ্রীব্রজমুন্দের সান্নাধ্য।

মনুষ্য সৃষ্টি।

(কান্টনের প্রবাসীর অনুবৃত্তি)

অমরদণ্ডজাতির মধ্যে কতকগুলি জীব চর্মভ্যাগের পূর্বোক্ত অনুবিধাটা বুঝিয়া উন্নতির আশায় চর্মভ্যাগ হইতে বিরত হইয়াছিল। কিন্তু এই স্ববুদ্ধিও তাহাদের ভবিষ্যৎ পথ নিষ্কটক করিতে পারে নাই। এক নূতন বিঘ্ন আসিয়া উন্নতির পথ *রোধ* করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চর্মভ্যাগ অভ্যাস পরিহার করায়, ইহাদের সকলকেই অগ্নায়ু ও ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট হইয়া জন্মিতে হইত, এবং যাহারা ক্ষোর করিয়া দেহের আয়তন বৃদ্ধির চেষ্টা করিত তাহাদের ক্ষুদ্র

জীবনটা পুনঃ পুনঃ দেহের পরিবর্তন করিতেই কাটিয়া যাইত।

আধুনিক বেসমকীট এবং নানা জাতীয় পতঙ্গগুলিই পূর্বোক্ত জীবের বংশধর। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ উন্নতির পথ নির্বাচনে যে ভ্রম করিয়াছিল, তাহারি ফলে অদ্যাপি ইহারা ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট ও অগ্নায়ু হইয়া জন্মিতেছে, এবং জীবনের অধিকাংশ সময়ই দেহপরিবর্তন করিয়া কাটাইতেছে। বলা বাহুল্য এই প্রকার ক্ষুদ্র জাতি কখনই বুদ্ধিমান হইয়া উঠিতে পারে না। বুদ্ধির জন্ম বৃহৎ মস্তিষ্কের প্রয়োজন। ক্ষুদ্রদেহে সে প্রকার মস্তিষ্কের স্থান নাই। পিপীলিকার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের শক্তি বৃহৎ মানবমস্তিষ্কের তুলনায় হীন নয় বলিয়া একটা কথা আছে। একথাটা যে সম্পূর্ণ নিরর্থক তাহা নানা পরীক্ষায় প্রাপ্তপন্ন হইয়া গেছে।

বংশানুক্রমে বহুকাল একই কার্য্য অবিচ্ছেদ্য করিতে থাকিলে, কাজের ভিতরকার খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিবার শক্তি সেই বংশের একটা বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়ায়। নানা জাতীয় জীবের বিশেষ বিশেষ বুদ্ধি, জ্ঞান ঠিক এই প্রকারেই ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া শেষে সেগুলি জাতিগত সম্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে জীবকে তাহার ক্ষুদ্রজীবনে দুই তিনবার দেহপরিবর্তন করিতে হয়, সে কখনই অবিচ্ছেদ্যে কোন একটা কার্য্য করিবার অবসর পাইতে পারে না। কাজেই ইহাতে তাহার বুদ্ধিও সৃষ্টি পাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। পরিবর্তনশীল দেহ লইয়া পতঙ্গজাতিকে ঠিক এই কারণেই অল্পবুদ্ধি হইয়া থাকিতে হইয়াছে। বেসমের কীট যখন স্ত্রোপোকাকার আকারে থাকে, তখন তাহাকে প্রবল বৃক্ষপত্র আহার করিয়াই জীবনধারণ করিতে হয়। এই অবস্থায় ইহারা নানাজাতের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সুস্থ পত্র উদরস্থ করিবার কৌশল শিখিয়া ফেলে। কিন্তু সেই পোকাগুলিই যখন সুদীর্ঘ নিদ্রার পর গুটি কাটিয়া প্রজাপতির আকারে বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের পূর্বের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কোন কাজেই লাগে না। এই অবস্থায় তাহা-দিগকে সম্পূর্ণ নূতন শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া নূতন উপায়ে আহাার সংগ্রহের জন্য শিক্ষানবিসি করিতে হয়। কাজেই পূর্বাপর জীবনের কোন অভ্যাসই

তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিকে উন্নত করিতে পারে না।

পূর্বোক্ত বিবরণগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অমেরুদণ্ড জীব প্রথমে তাহার স্নায়ুগুণ্ড ভ্রাতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া শেষে নিজেই পিছনে পড়িয়াছিল; আন্দোলন ও আশ্রয়ার্থে যে কয়েকটি উপায় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাব কোনটিই উহাদিগকে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর করে নাই। যে সকল প্রাণী কোমলদেহে কঠিন মেরুদণ্ডকে পোষণ করিতে আবশ্য করিয়াছিল, শেষে কেবল তাহারাই জয়ী হইয়া পড়িয়াছিল।

স্নায়ুদণ্ড জীব বহুকাল জলচর প্রাণীর আকারে সমুদ্রে বিচরণ করিয়াছিল, এবং পর্বতীয়গণে ইহাদের কতকগুলি স্থলচর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জীবন্তবৈদগ্ধ্য এই পরিবর্তনের নানা প্রকার কাবণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে চক্ষুর আকর্ষণকে বাহ্যিক প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহাদের কথা যথার্থ বলিয়া মনে হয়। ইহারা বলেন, অতিপ্রাচীনকালে যখন চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটে ছিল, তখন তাহার প্রবল টানে সমুদ্রজলে অত্যন্ত অধিক জোয়ার ভাঁটা হইত। এই জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জলচর জীব স্থলে উঠিত, ভাঁটার জলের সঙ্গে তাহাদের সকলগুলি সমুদ্রে পড়িত না। এই প্রকার কতকগুলি জীবকে প্রতিদিনই দুইবার করিয়া স্থলবাসী হইতে হইত। হঠাৎ প্রতিকূল অবস্থায় আসিয়া পড়িলে, প্রতিকূলকে অল্পকাল করিয়া লওয়াই জীবের জীবন। কাজেই সাধারণ জলচর জীব যে শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে জলের ভিতরকার অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকিত তাহার পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছিল। জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে স্থলে আসিয়া পড়িলে তাহা দ্বারা বায়ু অক্সিজেন সংগ্রহ করা যাইত না। এই প্রয়োজনই জলচরের ফুলকো (Gill) অঙ্গ করিয়া রাখিয়া নূতন শ্বাসযন্ত্র ফুসুসের (Lungs) উৎপত্তি করিয়াছিল।

স্নায়ুদণ্ড জলচর জীব পূর্বোক্ত প্রকারে স্থলচর জীবের পরিণত হইয়া ক্রমোন্নতির পথ ধরিতে পারিয়াছিল কি না, এখন আলোচনা করা যাউক। জলচর জীব পবিত্র করিতে গেলেই প্রথমেই তাহাব মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতা আমাদের

চোখে পড়ে। এই অসম্পূর্ণতার কাবণ নির্দেশ করা কঠিন নয়। যে জাতি আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিস হাতের গোড়ায় পাইয়া এক্ষেত্রে জীবন অতিবাহন করে, তাহাব মস্তিষ্কের বিকাশ কোনক্রমেই সম্ভবপন নয়। সর্বদাই প্রায় সমোচ্চ জলে বিচরণ করিয়া জলচরগণ জীবনকে খুবই এক্ষেত্রে কবিয়া তুলিয়াছিল। শীতাতপ ঝড়বৃষ্টিব অত্যাচাব হইতে বক্ষা পাইবার জন্য ইহাদিগকে মোটেই বুদ্ধি পরিচালনা করিতে হইত না, এবং আহাৰ্য্যও প্রচুর পরিমাণে হাতের গোড়ায় সঞ্চিত থাকিত। কাজেই জলকে স্থায়ী আবাসস্থান রূপে নির্বাচন করাই ইহাদের সর্বনাশের মূল কাবণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের যে সকল বংশধর হঠাৎ স্থলচর হইয়া পড়িয়াছিল, উন্নতি কেবল তাহাদের নিকট স্থলভ হইয়া আসিয়াছিল।

স্থলচর হইয়া জীবগণ বহুদিন একভাবে চলিতে পারে নাই। শীঘ্রই আব এক সমুদ্রকাল উপস্থিত হইয়াছিল। স্থলচরগণ অবস্থা বিশেষে পড়িয়া পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী এই দুই পৃথক জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই জাতীয় পরিগ্রহের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে, বস্ত্র-সঞ্চালন পদ্ধতি ও শ্বাসযন্ত্রের ক্রমিক পরিবর্তন অল্পসঙ্কীর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। সাধারণ স্থলচরদিগের মধ্যে যাহাদের হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুসুসের আয়তনও প্রসাৰিত হইয়াছিল, তাহাবা আর পূর্বের প্রকৃতি রক্ষা করিয়া থাকিতে পারে নাই। বৃহৎ ফুসুসের সাহায্যে পবিত্র হইয়া বিশুদ্ধ বস্ত্র সর্বদাই তাহাদের ধমনীতে চলিত। তা'ছাড়া দেহাভ্যন্তরে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের যোগে প্রবলভাবে বাসায়নিক কার্য শুরু হওয়ায় পূর্বপুরুষদিগের তুলনায় তাহাদের শরীরের তাপও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছিল। এই প্রকারে নবশক্তিবৃদ্ধ হইয়া নূতন জীবগণ অঙ্গস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে নাই। সেই সময়ে সমগ্র ভূভাগ জলচর জীব হইতে উৎপন্ন মহাকায় সৰীসৃপ (Reptiles) দ্বারা আকীর্ণ ছিল। ইহাদের সহোদরগণ যখন নূতন শক্তি এবং উন্নত প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিল, তখন নূতন পুরুষতানে বোব সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। নূতন জীব প্রচুর অক্সিজেন দেহস্থ করিয়া যে শক্তির সঞ্চয় করিত,

তাহাই উহাদিগকে মহাকায় সরীসৃপদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিত। ক্ষিপ্ৰতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতিযোগিতায় পুরাতন নূতনকে পরাভব করিতে পারিত না। ইহা ছাড়া এই সময়ে নূতন জাতিতে আব যে একটি শুভ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা পুরাতনকে আরো পশ্চাতে বাধিয়াছিল। পুরাতন জীবগণ বংশবিস্তারের জন্ত অণ্ড প্রসব করিত, তাহাদেরি সন্তানদিগের শবীবে যখন উষ্ণ শোণিতধারা বহিতে লাগিল, তখন এই সৌভাগ্যবান বংশধরগণ অণ্ড প্রসব অভ্যাস ত্যাগ করিয়া জীবন্ত শাবক প্রসব করিতে আরম্ভ করিল। এই ব্যাপারটি নূতন জীবগুলিকে মনুষ্যত্বের দিকে এত অধিক অগ্রসর করিয়াছিল যে, মূল জীবের মনুষ্যত্বলাভের আশায় এখানেই জলাঞ্জলি দিয়াছিল।

নূতন জীব শিশুসন্তানগুলিকে প্রসব করিয়া প্রথম প্রথম বড়ই গোলযোগে পড়িত। শাবকগুলিকে শত্রুব কবল হইতে রক্ষা করা তাহাদের জীবনের একটা প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইত। জীবতত্ত্ববিদগণ বলেন, সন্তানরক্ষার এই চেষ্টাই জীবগণকে উন্নতির পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। অনেক সময় দেখা যায়, কোন বিশেষ উন্নতিব জন্ত যখন সকল অবস্থাই অনুকূল, তখন প্রকৃতি সেই উন্নতিপথ রোধ করিবার জন্ত মোহিনী বেশে আসিয়া জীবকে বিপথগামী করিয়া দেয়। নিঃসহায় শাবকগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্ত যখন জীবগণ ব্যস্ত, তখন কাহাবো উদরের নিম্নে চর্মপুট নির্মাণ করিয়া বা কাহাবো লাঙ্গলে শাবক বুলাইয়া বাধিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্বয়ং প্রকৃতি জীবগণের চিন্তা দূর করিতে আবিস্ত করিয়াছিলেন। কান্দার প্রভৃতি জীব প্রকৃতির এই অস্বাচিত দান গ্রহণ করিয়া চিন্তার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। অপর জীবগণ মোহিনী প্রকৃতির মায়ার ধরা দেয় নাই। ইহারা নৈসর্গিক উপায় ত্যাগ করিয়া, স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে শাবক রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্ত চেষ্টা আত্মস্ত কবিয়াছিল।

শাবকদিগকে স্তন্যদান করিলেই পিতামাতার কর্তব্য শেষ হয় না। শিক্ষা-প্রদানেরও প্রয়োজন। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বংশধরদিগকে জানাইবার যে একটুও

আবশ্যক আছে, ইহার পূর্বে কোন জীবই তাহা ভাল করিয়া অনুভব করে নাই। নিঃসহায় শিশুসন্তান প্রসব করিতে আবিস্ত করিয়া অবধি জীবগণ এই ব্যাপারটির প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে আরম্ভ কবিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এই জ্ঞান এবং পূর্বোক্ত স্বাধীন চিন্তার চেষ্টা স্তন্যপায়ীদিগকে মনুষ্যত্বের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর করিয়াছিল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে জাতি বা যে ব্যক্তি জীবনের সমগ্র আবশ্যকীয় সামগ্রী সর্বদাই সম্মুখে প্রস্তুত দেখিতে পায়, তাহাব ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা অতি অল্পই থাকে। পক্ষিজাতি ও স্তন্যপায়ীগণ একই মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিল, এবং উষ্ণ শোণিত-ধারায় উভয়েবই দেহ শক্তিশালী হইত। সুতরাং এই অবস্থায় উভয়েবই উন্নতি অবশ্যস্বাবী বলিয়া মনে হইবারই কথা। কিন্তু পক্ষিজাতি উন্নতির পথ ধরিতে পারে নাই। পূর্বোক্ত বিঘ্নটি আসিয়া পথ বোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা অতি অল্পকাল মধ্যে শবীবের অনেক উন্নতি করিয়াছিল। অত্যাপি ইহাদের উন্নতদেহের নিকট শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যকেও পরাভব মানিতে হয়। কিন্তু শবীব রক্ষার জন্ত যাহা কিছু আবশ্যক তাহাব সকল সম্মুখে প্রস্তুত পাইয়া তাহারা বুদ্ধিচালনার কোন ক্ষম্যগই পায় নাই। ইহাই মনুষ্যত্বের সোপানে উঠিবার পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছিল। দৈহিক পূর্ণতার সহিত কোন প্রকারে যদি বুদ্ধিব পূর্ণতা আসিয়া যোগ দিত, তাহা হইলে পক্ষিজাতি যে কি আশ্চর্য্য জীবের পরিণত হইত তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

যাহা হউক সুপথগামী স্তন্যপায়ীগণ ইহার পর কোন পথ অবলম্বন করিয়া মনুষ্যত্বের দিকে আরো অগ্রসর হইয়াছিল, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। এই পথ আবিষ্কারের জন্ত আধুনিক জীবতত্ত্ববিদগণকে বহু গবেষণা করিতে হইয়াছিল। গবেষণাকারীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই এখন একবাক্যে বলিতেছেন, মহাকায় সরীসৃপ দ্বারা আচ্ছন্ন পৃথিবীতে ক্ষুদ্রকায় স্তন্যপায়ী জীবের আ'বর্তন হইলে, ঐ সকল বৃহৎজীবের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত স্তন্যপায়ীদিগকে নিবাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। সে সময় বৃহৎ বৃক্ষের অভাব ছিল

না। জীবতত্ত্ববিদগণ বলেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে অধিকাংশ স্তম্ভপায়ী জীবট আধুনিক অপোসাম (Opossum) প্রকৃতি প্রাণীর আকার ধারণ করিয়া বৃক্ষচব্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূ-তত্ত্ববিদগণও এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতেছেন। অতি প্রাচীন শিল্পকালে যে সকল জীবের চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলিকেই বৃক্ষচব্ব বলিয়া মনে হয়।

বৃক্ষচর প্রাণীকে দেহ পরীক্ষা করিলে, গাছ আঁকড়াইয়া ধরিবার ক্ষমতা তাহাতে কেবল দুইটিমাত্র সুব্যবস্থা দেখা যায়। কতকগুলি প্রাণী তাহাদের দীর্ঘ নখ দিয়া শাখা-প্রশাখা আঁকড়াইয়া বৃক্ষবাস করে। অপর কতকগুলি তাহাদের অঙ্গুলিগুলিকে দীর্ঘ করিয়া ডাল ধরিবার সুবিধা করিয়া লয়। কোন্ প্রাকৃতিক অবস্থায় পড়িয়া সাধারণ স্তম্ভপায়ী জীব ক্রমে দীর্ঘনখী বা দীর্ঘাঙ্গুলি প্রাণীতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা এখন স্থির করিবার উপায় নাই। তবে সাধারণ স্তম্ভপায়ী প্রাণী হইতেই যে উক্ত দুই শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিত, এবং প্রতিযোগিতার নথি-গণকে পরাস্ত করিয়া অঙ্গুলিযুক্ত বৃক্ষচরগণই যে, মনুষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাও স্থির।

নখীদিগের নখই উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল। নখ দ্বারা ভাল করিয়া বৃক্ষশাখা আঁকড়াইয়া ধরা বড়ই কষ্টকর। দেহ পুষ্ট হইলে এই কার্য একেবারে অসম্ভবই হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বৃহৎ অঙ্গুলিযুক্ত প্রাণী যতই পুষ্টাবয়ব হউক না কেন, অঙ্গুলি দ্বারা শাখা ধরিয়া সে অনায়াসে বৃক্ষে বিচরণ করিতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, নখের এই অনুপযোগিতাই বৃক্ষচারী নথিগণকে ক্ষুদ্রাবয়ব করিয়া রাখিয়াছিল। অপবনিকে দীর্ঘ অঙ্গুলিযুক্ত প্রাণিগণ ক্রমে দেহের সর্বাঙ্গ পুষ্ট করিয়া উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যে সকল মানসিক শক্তি মনুষ্যকে ইতরপ্রাণী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলির আলোচনা করিতে গেলে গণনাশক্তির কথা সর্বাগ্রে আমাদের মনে পড়িয়া যায়। পাঁচটি জিনিসের সহিত আর পাঁচটি জিনিস যোগ করিলে, এই নূতন জিনিস গুলি যে পূর্বের দ্বিগুণ হইয়া পড়িল, তাহা ধারণা করিবার শক্তি কেবল মনুষ্যজাতিরই নিজস্ব। এই জ্ঞানের উন্মেষ তৎকালেই ডাঙাধ ওয়াগেন্স ও

ডারউইন প্রভৃতি মহা পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। দুই একটি নব্য পণ্ডিত এই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বলিতেছেন, পুষ্টি স্তম্ভপায়িগণ যখন শাখা হইয়া বৃক্ষে বিচরণ করিতেছিল, সম্ভবতঃ সেট সময়েই ইহাদেব মস্তিষ্কে গণনা-শক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। শাখা পাণিগণ যখন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লাফাইয়া পড়িত, তখন তাহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া দৃষ্টে একটা নির্ভুল হিসাব মনে স্থির রাখিতে হইত। এই হিসাবের ভুলে হয়তো প্রথমে অনেক প্রাণীকে ভূপতিত হইয়া জীবন বিসর্জন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু শেষে তাহারা আর সে প্রকার ভুল করিত না। ইহা ছাড়া হস্ত পদের পেশীগুলিকে কত সঙ্কুচিত করিলে এক লক্ষ কতদূর পৌছা যায় শাখা স্তম্ভপায়ীদিগকে তাহাবও একটা হিসাব করিতে হইত। শেষে হয়তো এই হিসাবগুলি তাহারা যত্নবৎ করিত, কিন্তু তথাপি পূর্বোক্ত ব্যাপারগুলিই যে স্তম্ভপায়ীদিগের গণিত জ্ঞানের উন্মেষ করাইয়া দিয়াছিল তাহা আর অস্বীকার করা যায় না।

যখন কোন প্রাণী একটি বিশেষ শক্তি হইতে বঞ্চিত হয়, প্রায়ই অপব আব একটি শক্তি সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র শক্তি সমষ্টিকে পূর্ণ রাখে। ইহা একটা পরীক্ষিত প্রাকৃতিক নিয়ম। অন্ধের শ্রবণ ও স্পর্শশক্তির তীক্ষ্ণতা এবং বধিবার দৃষ্টিশক্তির প্রাথমিক চিরপ্রসিদ্ধ। এই প্রাকৃতিক নিয়মটিকে মনে রাখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যখন মানবের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ স্তম্ভপায়ীর আকারে বৃক্ষে বিচরণ করিতেছিল, তখন সেই সকল প্রাণীতে আরো কতকগুলি মনুষ্যসুলভ শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। অনেক ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের দৃষ্টি ও শ্রাবশক্তি অত্যন্ত অল্প। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, মানবের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ যখন শাখীর আকারে ছিল, তখন ধরাতলবিহাবী প্রাণীদিগের ভায় তাহাদের শ্রাব বা দৃষ্টিশক্তির চালনা করিতে হইত না। কাজেই ব্যবহারের অভাবে এগুলি ক্রমে অক্ষম হইয়া গিয়া অপর শক্তির উন্নতি করিতে আবৃত্ত করিয়াছিল। এই অক্ষমতা বৃক্ষচর প্রাণীকে মনুষ্যের দিকে যে কত অগ্রসর করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শ্রাব-

শক্তির তীক্ষ্ণতা হারাইয়া ইহারা যখন কুকুরের মত গন্ধ গ্রহণ করিয়া আহার্য অমুসন্ধানাদি কবিত্তে পাবিত না, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাবে দূরস্থ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা যখন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন আত্মরক্ষার অস্ত্র উপায় না থাকায় বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর ছিল না। এই পরিবর্তনই ইহাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

ইহার পর পূর্বোক্ত প্রাণীদ্বিগের মধ্যে বুদ্ধি পরিচালনার কৌশল লইয়াই প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৃক্ষবিহারী প্রাণী হইতে যখন হস্তপদাদিযুক্ত মনুষ্যাকৃতি জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন উহাদ্বিগকে পশুপক্ষী বধ করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হইত। বলা বাহুল্য এই কার্য্য তাহাদের বুদ্ধিবিকাশের খুবই সাহায্য করিত। সমস্ত বৎসর ধরিয়া কোন স্থলেই হাতের গোড়ায় শিকার পাওয়া যায় না। কাজেই বুদ্ধিমান শিকারীকে ভবিষ্যতের চিন্তা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। যাহারা এই চিন্তায় অনভ্যস্ত ছিল ক্ষুৎপিপাসা ও অনাহারে তাহাদের সকলকে সবংশে মৃত্যুমুখে পড়িতে হইত। এই প্রকাবে কেবল একটিমাত্র উন্নতবুদ্ধি নরাকৃতি জাতি পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল। ইহাকেই আধুনিক মানবজাতির পিতামহ বলা যাইতে পারে। এই অসম্পূর্ণ মানবই ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া আধুনিক মনুষ্য-জাতির সৃষ্টি করিয়াছে।

মনুষ্যসৃষ্টির ঠিক পূর্বেরকার ব্যাপারগুলি আলোচনা করিলে মনে হয়, অসম্পূর্ণ মানব কতকগুলি প্রাকৃতিক দানকে অব্যবহারে কার্য্যের অমুপযোগী করিয়া নিজের উন্নতি খুব দ্রুত করিয়া তুলিয়াছিল। এই স্বেচ্ছাকৃত নিঃসহায়তা মানুষকে ধেরিয়া না দাঁড়াইলে, সেই মানুষ কখনই এতদিনে এখনকার মানুষে পরিণত হইতে পারিত না। সেই নিঃসহায়তাই মানুষকে গৃহবস্ত্র ও অস্ত্রাদি নির্মাণের কৌশল শিখাইয়াছে। মানুষ যদি পক্ষীর দ্বায় প্রকৃতিদত্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত রাখিত, এবং তাহাদের দ্বায় পক্ষবিশিষ্ট হইয়া যথেষ্ট গমনাগমন করিয়া সহজে আহার্য্য সংস্থান করিতে পারিত, তবে আজ আমরা মনুষ্যজাতিতে আধুনিক সভ্যতার

শেষমাত্র দেখিতাম না, এবং উড়িবার কল আবিষ্কারের অল্প দেশের বড় বড় পণ্ডিতদিগকে চিন্তাকুল দেখিতাম না। প্রকৃতির বৈরিতাই পশুশ্রেণী মনুষ্যশ্রেণীর আরোপ করিয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায় ।

স্বয়ংবহ যন্ত্র ।*

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় কর্তৃক লিখিত ।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে এই যে প্রবন্ধ উপস্থিত করিতেছি, তাহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। ভূমণ্ডলে নূতন না কি কিছুই নাই। থাক বা নাই থাক, আমরা পুৰাতনের দিকে তাকাইয়া সুখী হই, কখনও বা কদাচিত্ কুরুও হই। কিন্তু একথা নিশ্চিত, পুৰাতনের সহিত নূতনের যোগ ঘটাইতে না পারিলে নূতন দ্বারা জাতীয় দেহের পুষ্টি হয় না।

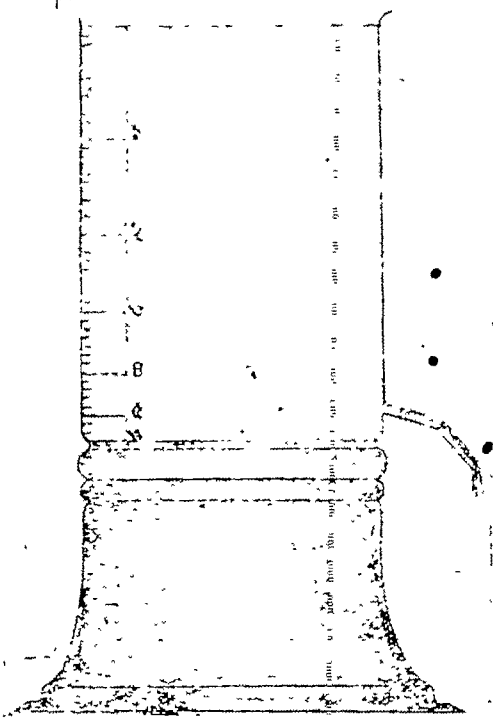
কালের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। প্রাচীনেরা দিনে সূর্য্য এবং রাত্রে তাবা দেখিয়া সেই এক-টানা স্রোতের বিভাগ করিতেন। কিন্তু দিবা ও রাত্রি ছোট ছোট নয়, পূৰ্ণাহ্নপূৰ্ণাহ্নও ছোট নয়। দিবাভাগে উচ্চ বৃক্ষের ছায়া, ষষ্টিব ছায়া, এমন কি আমাদের দেহের ছায়া পরিমাণ করিয়া স্থূলতঃ কাল অবধাবণ করার বিচিত্র কিছু নাই। বোধ হয় ইহা হইতে দণ্ড অর্থে কাল-বিভাগ-বিশেষ হইয়াছে।

কিন্তু ছায়াও সূর্য্য-সাপেক্ষ। এই হেতু তাম্রী বা ঘটীর প্রচলন হইয়াছিল। তাম্রনির্মিত ঘটের নির্মার্ধ লইয়া ঘটী যন্ত্র হইত। ইহাব আকার মাথার খুলীর তুল্য। এই হেতু কোন কোন সিদ্ধান্তে ইহাকে কপাল-যন্ত্রও বলা হইয়াছে। ঘটের অধোভাগে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকিত। স্বচ্ছ জলে ভাসাইয়া দিলে ঘট ছি দিয়া জল প্রবেশ করিত এবং কিয়ৎ কাল পরে ডুবিয়া যাইত। অহোরাত্র্যে—জ্যোতিষে নাক্ষত্র অহোরাত্র্যে—ঘটি বাব ডুবিতে পারে, এইরূপ প্রমাণের ঘটী নির্মিত হইত। যে সময়ে ঘটী একবার ডুবিত, সে সময়ের নাম ঐ ঘটী বা ঘটিকা। ঘটী হইতে বাংগলা ঘড়ী

* রাজশাহীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সম্মিলনে পাঠ হইয়াছিল।

শব্দ। ঘটাতে ঘাট পল পরিমিত জল ধরিতে পারিত। ৬০ পলে এক ঘটিকা। বাংলা তেলের পলাতে সেই পল শব্দ বহিয়াছে। ঋগ্বেদাংগ জ্যোতিষে ঘটাব পরিবর্তে প্রস্থ সংজ্ঞা আছে। বিষ্ণু পুরাণেও প্রস্থ সংজ্ঞা আছে। জল তৈলাদিব মান পাত্রের নাম প্রস্থ ছিল। অতএব কত প্রাচীন কাল হইতে যে এদেশে ঘটা যন্ত্রের ব্যবহার আছে, তাহা বলিতে পাবা যায় না।

কিন্তু যে যন্ত্র দ্বারা কালজ্ঞানার্থ লোক বসাইয়া রাখা আবশ্যক, তাহা কদাপি সকলের ব্যবহারযোগ্য হইতে পাবে না। এই হেতু লল্লাদি জ্যোতিষী স্বেচ্ছামত ঘটা



১ম চিত্র। নাড়িকাযন্ত্র।

নির্মাণের উপদেশ করিয়াছেন। এক অহোবাত্রের ঘটা কতবার ডুবিল তাহা জানিয়া ত্রৈমাসিক দ্বারা সেই ঘটা কাল পাওয়া যায়। ব্রহ্ম গুপ্ত (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী) অন্য প্রকার ঘটা যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইষ্ট-প্রমাণ নলকের (সমপরিবর্তুল পাত্রের) মূলে ছিদ্র করিয়া জল পূর্ণ করিবে। এক এক ঘটা কুণ্ডলে জলশ্রাব হেতু জলের উচ্চতা যত যত কমিয়া যাইবে, নলকের গাএ সেখানে

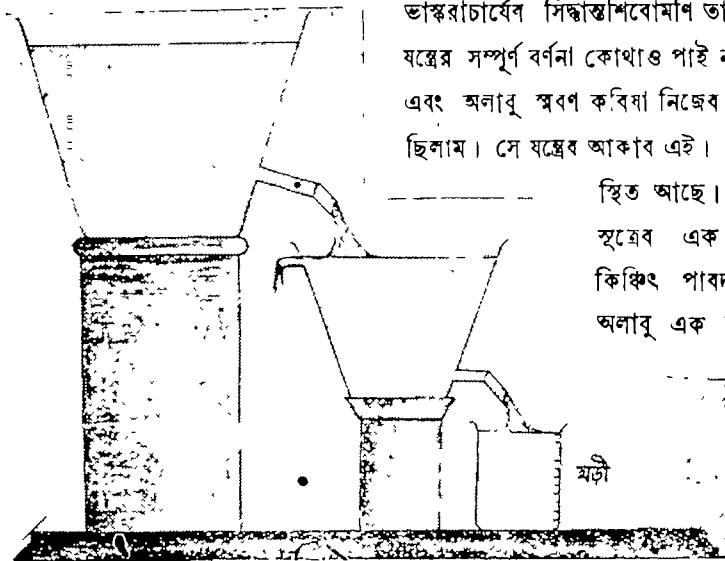
সেখানে অংক দিলে অনায়াসে কাল জ্ঞান হইতে পারিবে। ১ম চিত্র দেখুন। ঘটা যন্ত্রের প্রত্যেক নিমজ্জন না দেখিলে সময় জানা যায় না, নাড়িকা যন্ত্রে সে অসুবিধা নাই। বোধ হয় এই নাড়িকা যন্ত্র নাম হইতে দণ্ড বা ঘটার নামান্তর নাড়ী বা নাড়িকা হইয়াছে।

শুধু এদেশে নয়, প্রাচীন মিশরে ও বেবিলোনিয়াতে এবং তথা হইতে গ্রীসে এবং যুরোপের অন্যান্য দেশে জল-শ্রাব দেখিয়া সময় জ্ঞান হইত। শুধু প্রাচীন কালই বা কেন, খ্রীষ্টের ১৬শ শতাব্দীতে দেনমার্ক দেশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌ তায়কো-ব্রাহি তাঁহার বেধ-শালায় জল-ঘড়ী দ্বারা কাল পরিমাপ করিতেন। চীনেও এখনও করে, এবং আমাদের দেশ হইতে তাঁরী এখনও তিরোহিত হয় নাই।

কিন্তু আমাদের তাম্রী ও যুবোপের জল-ঘড়ীর মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। এদেশে তাম্রীতে জল প্রবেশ দেখিয়া, যুবোপে পাত্র হইতে জল নিঃসরণ দেখিয়া কালজ্ঞান হইত। পাত্র হইতে ছিদ্র পথে জল নিঃসৃত হইতে থাকিলে সম-কালে সম পরিমিত জল বহির্গত হয় না। কারণ পাত্রে জলের উচ্চতা যত কনিতে থাকে, জল-শ্রাব-বেগ তত কমে। এই হেতু জলপাত্র সর্বদা জলপূর্ণ রাখিতে হইত। ২য় চিত্র দেখুন।

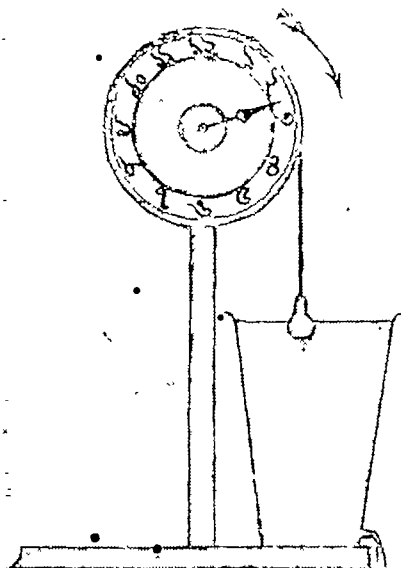
আরও প্রভেদ আছে। গ্রীকদিগের গণনায় দিবা অর্থে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্তকাল, এবং এই কালের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগের নাম ঘণ্টা ছিল। সূর্যোদয় গ্রীষ্মকালে তাহা-দিগের ঘণ্টা দীর্ঘ এবং শীতকালে হ্রস্ব হইত। এজন্য অসমান ঘণ্টা জ্ঞাপক জল-ঘড়ী নির্মাণ করা সহজ ছিল না। আমাদের সে অসুবিধা ছিল না; জ্যোতিষে অপরিবর্তনীয় নাক্ষত্র অহোরাত্র, লৌকিক ব্যবহারে সাবন অহোরাত্র সমান ভাগ করিলেই চলিত। সূর্য্যোদয় হইতে ছোট-বড় ঘটা আবশ্যক হইত না।

পূর্বকালে নাড়িকা যন্ত্রের জল-শ্রাব দ্বারা বহুবিধ যন্ত্র চালিত হইত। লল্লা (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী), ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রভৃতি প্রাচীন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদগণ এই প্রকার যন্ত্র নানাধিক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, সেদিনকার মহামহোপাধ্যায় ৮ চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত মহাশয়ও এইরূপ



২য় চিত্র। জলঘড়ী।

যন্ত্র রচনা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। যে যন্ত্র আপনি ভ্রমণ করিতে থাকে, যাহা কোন মানুষ চালায় না, সে যন্ত্রকে প্রাচীনেরা স্বয়ংবহ বলিতেন। একদিন সামন্ত মহাশয়কে স্বয়ংবহ নির্মাণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি লল



৩য় চিত্র। স্বয়ংবহ ঘটীচক্র।

ও ব্রহ্ম গুপ্ত কখনও দেখেন নাই; স্বর্ঘ্য সিদ্ধান্ত ও

ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিবোমণি তাহাঁর সম্বল ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, এই যন্ত্রের সম্পূর্ণ বর্ণনা কোথাও পাই নাই, প্রাচীন সিদ্ধান্ত-লিখিত সূত্র-জল-পাবদ এবং অলাবু স্বরণ কবিয়া নিজেব অনুভব দ্বারা এক স্বয়ংবহ নির্মাণ কবিয়া-ছিলাম। সে যন্ত্রের আকাব এই। ৩য় চিত্র দেখুন। একটি চক্র দুই আধাবে

স্থিত আছে। চক্রের নোমিতে এক সূত্র বেষ্টিত আছে। সূত্রের এক অগ্র চক্রে বদ্ধ; অন্য অগ্র হইতে কিঞ্চিৎ পাবদযুক্ত এক অলাবু লম্বিত আছে। এই অলাবু এক বৃহৎ জলকুণ্ডের জলে ভাসিতেছে। কুণ্ড হইতে জলশ্রাব হইলে অলাবু নিম্নগামী হয়, তখন সূত্র বদ্ধ চক্রটি অগ্নে অগ্নে ঘুরিতে থাকে।

বলা বাহুল্য, তাহাঁর উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয়ে আশ্চর্য হইয়াছিলাম। আব বুঝিয়াছিলাম, আমাদের চিত্তা-প্রণালী অধুনা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

কারণ যদিও অবিকল এইরূপ যন্ত্র ব্রহ্মগুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাব একটি অর্থাৎ হইতে বস্তু জ্ঞান হওয়া দুর্লভ।*

কোন প্রকারে একটা গতি পাইলে তদ্বারা পুস্তলিকাব নুত্যেব তুল্য অন্য বস্তুব গতি সম্পাদন কবিত্তে পাবা যায়। আমাদের পূর্বাচার্যগণ নাড়িকা যন্ত্র সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্র চক্রও ঘুঝাইতেন। আজিকালি বিজ্ঞানগণে বিলাতী 'ওরোরী' যন্ত্র ঘেরূপ, সেকালে গোলা যন্ত্র সেরূপ ছিল। জলশ্রাব দ্বারা তাহা ঘূর্ণিত হইত। স্মৃতবাং প্রচুর শিল্পনৈপুণ্য আবশ্যক হইত। ইহা দ্বারা লগ্নাদি কালজ্ঞানও হইত।

লগ্ন এবং ব্রহ্ম গুপ্ত কাল জ্ঞাপক বহুবিধ যন্ত্রেব উল্লেখ করিয়াছেন। একটি এইরূপ। ৪র্থ চিত্র দেখুন। এক

* এমন দুর্লভ যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ও ব্রহ্মগুপ্তের টীকার অর্থান্তর ঘটাইয়াছেন। দ্বিবেদী মহাশয় মনে করিয়াছেন, জলশ্রাবের আঘাতে চক্রটি ভ্রমণ করিবে। বস্তুতঃ জলশ্রাব-হেতু অলাবু নামিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে চক্রটি ভ্রমণ করে। ব্রহ্মগুপ্তের শ্লোকটি এই,—

কীলু স্তোপরিগামিনি তৎপর্যয় সূত্রে কুতমলাবু।

প্রাগ্ বয়লকে প্রক্ষিপ্য নাড়িকা শ্রবতি পানীয়ে।

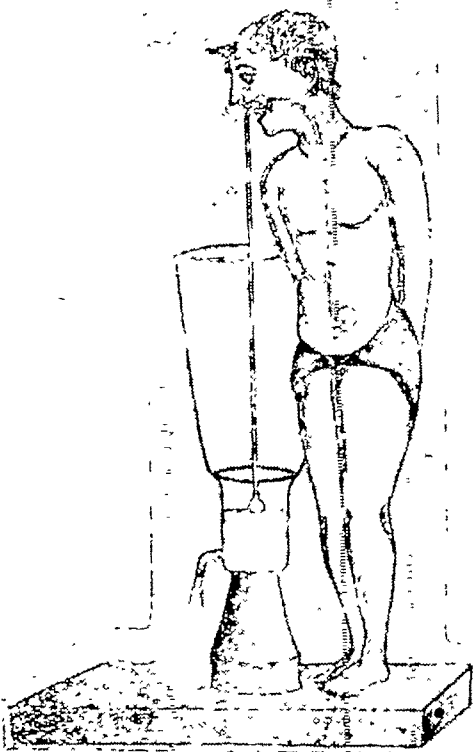
লগ্ন স্পষ্ট। ঘড়ী।

জল কুণ্ডে ঋষিহ্মে ঘটিকা কালান্বিতে জলক্রত্যা।

পোলে বেষ্টন সূত্রাগ্রবদ্ধতুং কিপেং সরস্

শ্রবতি চ যথাবৎস্ত স্তম্বাতধালাবু গচ্ছমানমথঃ

ভ্রমন্তি পোলকমস্তো মুক্তা নাড়িকা যাতাঃ ॥



৪র্থ চিত্র। স্বয়ংবহ নরযন্ত্র।

মহুয্যমূর্তির মধ্যভাগে মুখপর্ধ্যন্ত এক ছিদ্র আছে। তাহার উদরে অতি দীর্ঘ কিন্তু অত্যল্পপরিসর বজ্রখণ্ড আছে। মহুয্যের মুখ মধ্যে স্থাপিত এক কৌলক-নলের (মস্তক খন্ড দণ্ডের উপরে স্থিত নলের বা আধুনিক কপিকলের ঢাকার) উপর দিয়া বস্ত্রের এক অগ্র বহির্গত হইয়াছে। এই অগ্রে আবশ্যক পরিমিত পারদযুক্ত এক অলাবু বদ্ধ আছে। অলাবুটি এক কুণ্ডের জলে ভাসিতেছে। কুণ্ড হইতে জল যেমন নির্গত হইবে, মহুয্যের মুখ হইতে বজ্রও তেমন বহির্গত হইবে। বস্ত্রের যত অঙ্গুলী বাহিরে আসিলে এক এক দণ্ড সময় হইত, তত অঙ্গুলী দূরে দূরে যন্ত্রে গুটিকা বদ্ধ থাকিত। দুই দণ্ড গত হইলে দুইটি গুটিকা, তিন দণ্ড গত হইলে তিনটি গুটিকা, এই ক্রমে গুটিকা বহির্গত হইত। কত দণ্ড সময় গত, তাহা গুটিকার সংখ্যা দেখিয়া সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিত।

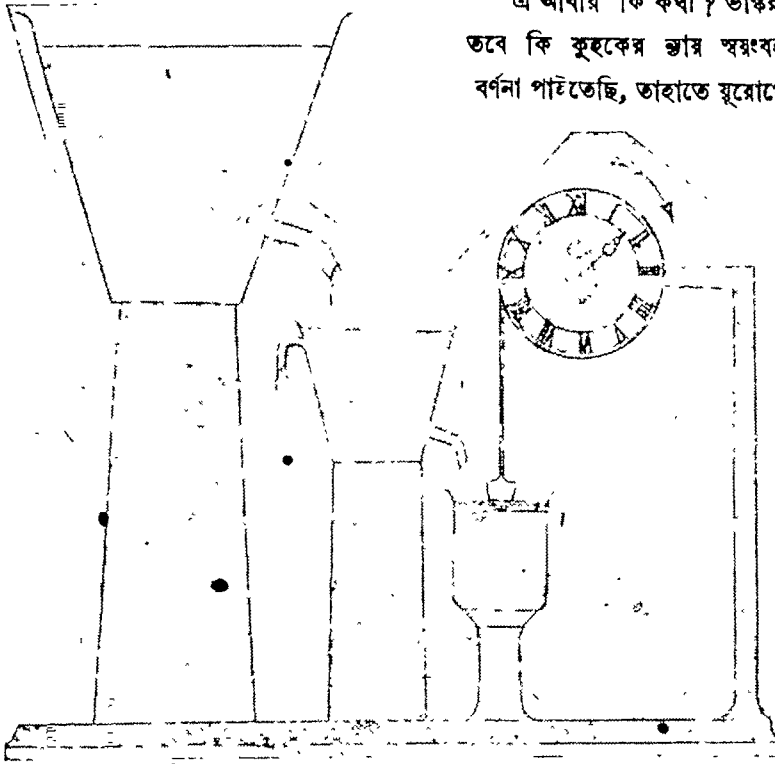
এইরূপ কোন যন্ত্রে এক নরমূর্তি নিকটস্থ অস্ত্র নরমূর্তির মুখে জল নিক্ষেপ করিত, কোন যন্ত্রে বর মুখ দিয়া বধুর

মুখে গুটিকা প্রক্ষেপ করিত, কোন যন্ত্রে দুই মল যুদ্ধ করিত, কোন যন্ত্রে ময়ূব সর্প গিলিত, কোন যন্ত্রে কাঠি নিক্ষিপ্ত হইয়া পটহে কিংবা ঘণ্টায় শব্দ করিত, ইত্যাদি। এই সকল কৌতুকজনক যন্ত্রেব উদ্দেশ্য কালজ্ঞাপন। আজি কালি যেমন বিলাতী ঘড়ীতে নরনাবীর মূর্তিব অল্প বিশেষ চালিত করিয়া শিল্পী গ্রাম্য জনকে বিস্মিত কবে, সেকালের জল ঘড়ীতে তেমন করিত। পটহবাণ্ড কিংবা ঘণ্টাবাণ্ডেব সহিত আজিকালির বিলাতী ঘড়ীর ঘণ্টাবাণ্ড তুলনা করা যাইতে পারে।

কথিত আছে পূর্বকালে—খ্রীষ্টজন্মের নাকি পূর্বে—আলেকজান্দ্রিয়া নগরে কেমন জ্যোতিষী কুণ্ডে জলস্রাব কবাটয়া ঘণ্টাঙ্কিত চক্র চালাইতেন। এম চিত্র দেখুন। খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপল নগরে এক ‘চমৎকার পিত্তল ১টা হইতে ১২টা বাজাইত’ খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীতে সম্রাট শার্লমেনকে পাবস্তাধিপতি এক জল-ঘড়ী উপহার দিয়াছিলেন। তাহাতে ১২ঘণ্টা জানাইতে ১২টা দ্বার ছিল। এক এক ঘণ্টার এক এক দ্বার খুলিত, এবং যত ঘণ্টা সময় তত গুটিকা বহির্গত হইয়া এক পটহেব উপরে পড়িত।

মাহুযের স্বভাব চিবদিন সর্বত্র একই প্রকার আছে।

শিল্পীর মন এক বিষয়ে আবদ্ধ থাকে না। যিনি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তিনি অন্ত্র যন্ত্র নির্মাণে ধাবিত হন। সেকালের আর্ঘগণ পারদ জল তৈল সাহায্যে চক্র ভ্রমণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এরূপ স্বয়ংবহ যন্ত্রের উল্লেখ ললে (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) প্রথম পাই। তারপর ব্রহ্মশুপ্তে, তাবপর ভাস্কবাচার্যে (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) সেই যন্ত্রই ভিন্নাকারে পাই। ভাস্করের বর্ণনা অনুবাদ করিতেছি। ‘গ্রন্থি কৌলশূত্র লঘু কাঠময় [পল্ল বলেন খ্রীপদী অর্থাৎ গামাব কাঠেব] এক চক্র ভ্রম-যন্ত্রে [কুন্দন-যন্ত্রে] সিদ্ধ করিবে। উহার নেমিতে সমগ্রমাণ, সমছিদ্রযুক্ত, সমগুরু অর যোজনা করিবে। এই সকল অর নদীর আবর্তের ন্যায় একই দিকে কিঞ্চিৎ বক্র হইবে। অরের অর্দ্ধাংশ পারদ পূর্ণ করিয়া অব্যব ছিদ্রমুখ বদ্ধ করিবে। এইরূপ চক্র দুই আধারে স্থিত হইলে স্বয়ং ভ্রমণ করিবে। কারণ যন্ত্রের একদিকে পারদ অর-মূলে এবং অন্ত্রদিকে অর-অগ্রে



৫ম চিত্র। স্বয়ংবহ জলঘড়ী।

ধাবিত হইবে। শেষোক্ত দিকের পারদের আকর্ষণে চক্র স্বয়ং ভ্রমণ করিবে।’

৬ষ্ঠ চিত্রে ঐরূপ চক্র প্রদর্শিত হইল। কিন্তু ব্যাপারটা কি? ইহা কি আধুনিক বিজ্ঞানে নিদ্রিত সদাবহ যন্ত্র? কিংবা আরও কিছু ছিল, যাহা গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে? এরূপ যন্ত্রদ্বারা লব্ধ ভগ্নোৎপন্ন ভ্রমণের কথা বলিয়াছেন। স্বয়ংবহ যন্ত্রের রহস্য পাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কার (বর্তমান) স্বয়ংসিদ্ধান্ত রহস্য গুপ্ত রাখিতে শিল্পকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। শিল্পকৌশল প্রকাশে যিনি এত শঙ্কিত, অবশ্য তিনি কোন কথা বলিতে পারেন না। একজ্ঞ তিনি পারদ জল তৈলাদির প্রয়োগ ‘চর্লভ’ বলিয়া সারিয়াছেন। তাঁহার চাকার রজনাপ (খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী) বলেন, ‘স্বয়ংবহ যন্ত্র অসাধারণ, মনুষ্যের অসাধ্য; এই হেতু উহা চর্লভ; অত্যাধা প্রতিগৃহে প্রচুর স্বয়ংবহ থাকিত। সমুদ্রের অস্ত্র প্রান্তবাসী ফিরঙ্গেরা স্বয়ংবহ বিজ্ঞান সম্যক অভ্যস্ত। ইহা কুহক বিজ্ঞান অন্তর্গত।’

এ আবার কি কথা? ভাস্করাচার্যও কুহকবিজ্ঞান উল্লেখ করিয়াছেন তবে কি কুহকের জ্ঞান স্বয়ংবহও গুপ্ত রহিয়া গিয়াছে? কিন্তু যে বর্ণনা পাঠিতেছি, তাহাতে যুরোপের সদাবহ আবর্তচক্র মনে আসিতেছে।

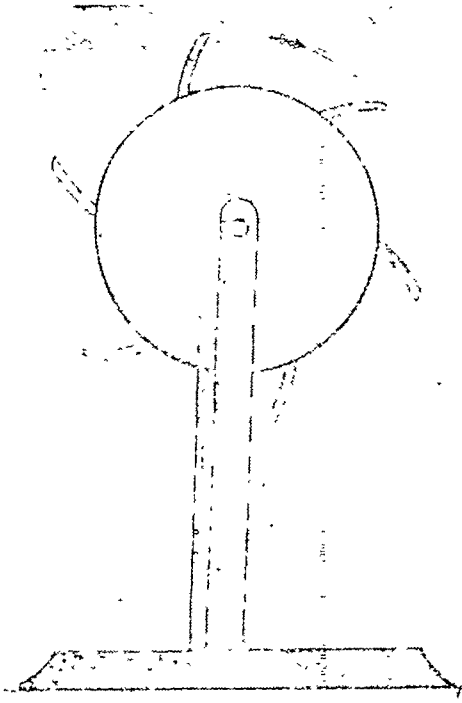
এই চক্রের আকার ৭ম চিত্রে প্রদর্শিত হইল। আবর্তকার অর-সমূহের অন্তর্কর্ত্তী গুলিকার ভায়ে চক্রের ভ্রমণ কল্পিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এইরূপে চক্রভ্রমণ অসাধ্য।

ভাস্কর অস্ত্র দুই প্রকার স্বয়ংবহ বর্ণনা করিয়াছেন। এই দুইটি ব্রহ্ম গুপ্তে নাই। একটি এইরূপ। ৮ম চিত্র দেখুন। ‘ভ্রম-যন্ত্র দ্বারা চক্রের নৈমিত্তে দুই অংশের পর্ভীর এবং দুই অংশের বিস্তৃত একটি স্থবির বা নালী করিয়া চক্রটি দুই আধারে স্থাপন করিবে। নালীর উপরে তালপাতা মম দিয়া জুড়িবে। পরে তালপাতার কোন

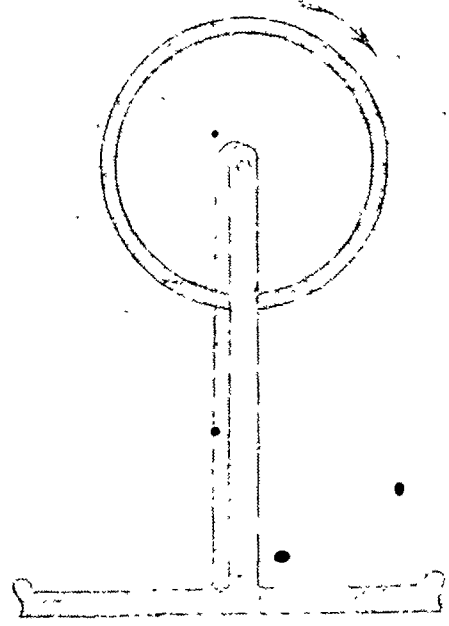
স্থানে ছিদ্র করিয়া নালী মধ্যে পারদ ঢালিবে যেন নালীর অধোভাগ পূর্ণ হয়। পুনর্বার এক পার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া জল প্রবেশ করাইবে যেন অস্ত্র পার্শ্বে জল যায় না। অনন্তর ছিদ্র বন্ধ করিবে। এখন জলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চক্র স্বয়ং ভ্রমণ করিতে থাকিবে। পারদ দ্রব পদার্থ বটে, কিন্তু গুরু। এই হেতু উহাকে জল অস্ত্র পার্শ্বে সরাইতে পারিবে না।’

ইহার অর্থ কি এই যে, পারদ অধোভাগেই থাকিবে; জল পারদ ঠেলিতে থাকিবে, এবং তাহাতেই চক্র ঘুরিতে থাকিবে? যদি এই অর্থই ঠিক হয়, তাহা হইলে এখানে কাল্পনিক সদাবহের স্থান দৃষ্টান্ত পাঠিতেছি।

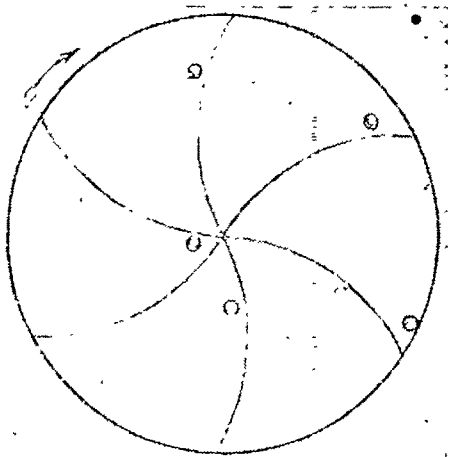
ইহার সহিত এই খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের এক সদাবহ যন্ত্র তুলনা করুন। ৯ম চিত্রে এক কুণ্ডে পারদ, এবং কুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে এক নলে জল আছে। পারদ-কুণ্ডের উপরে এক চাকা, এবং তিতরে আর এক চাকা আছে। ঐ দুই চাকাকে বেষ্টন করিয়া এক স্থত্র আছে।



৬ষ্ঠ চিত্র । স্বয়ংবহ ।



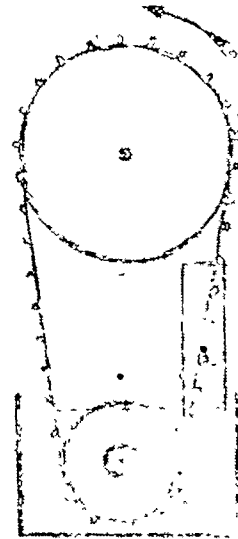
৮ম চিত্র । স্বয়ংবহ ?



৭ম চিত্র । আবর্তচক্র ।

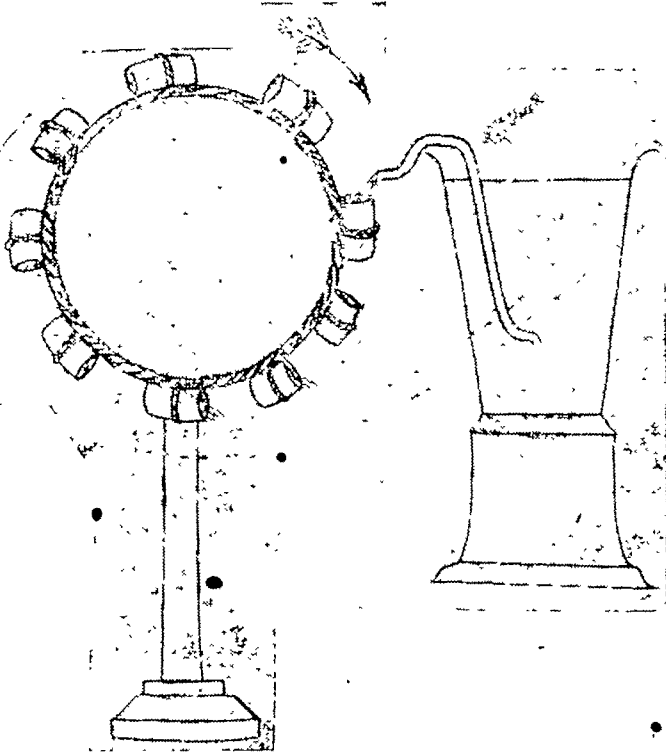
স্থ্রে কতকগুলি লবু (যেমন নোলাব) বর্তুল বন্ধ আছে ।
বর্তুলগুলি জলে ভাসিয়া উঠিতে থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে চাকা
হুইটও ঘুরিতে থাকিবে ।

ভাস্করাচার্যের -তৃতীয় স্বয়ংবহ এইকণী । ১০ম চিত্র
দেখুন । 'এক চক্রের নৈমিত্তে ঘটা বন্ধ আছে । কুপাদি



৯ম চিত্র । স্বয়ংবহ ।

হইতে জলোত্তোলনের ঘটচক্রবৎ এই চক্রকে হুই আধারে
ধারণ করিবে । তাত্রাদি ধাতু নির্মিত অক্ষুশাকার এক
নল দিয়া কুণ্ডের জল ঘটামুখে পড়িবে । তখন চক্রটি



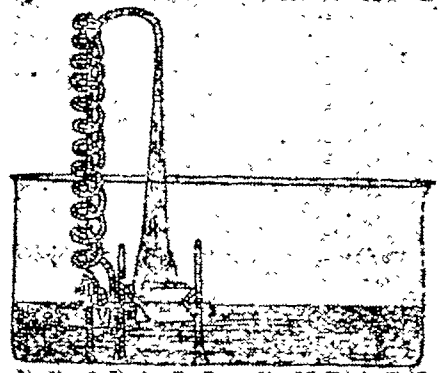
১০ম চিত্র। স্বয়ংবহ।

পূর্ণ ঘটা ঘারা আকৃষ্ট হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। চক্র হইতে চ্যুত জল চক্রেব অধঃস্থিত প্রণালী দিয়া যদি কুণ্ডে গমন করে, তাহা হইলে কুণ্ডে পুনর্বার জল প্রক্ষেপ আবশ্যক হইবে না।

এখানে ভাস্কর প্রথমার্শ ঠিক বলিয়াছেন, বক্রাকার অঙ্গুশ যন্ত্র বা “কুকুটনাড়ী” যন্ত্রের (ইংরেজী সাইফন) প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। ছিন্ন-কমল কমালনী-নল লইয়া কুকুট নাড়ীর দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন এই কুকুট নাড়ী শিল্পীদিগের এবং হরমেখলীদিগের নিকট প্রসিদ্ধ আছে। হরমেখলী কাহারো, তাহা এখন অজ্ঞাত। যাহা হউক, “চক্রচ্যুতং তদ্রূপং কুণ্ডে যাতি প্রণালিকল্পা” বলিয়া নীচের জল উপরে উঠিবার সম্ভাবনা করিয়াছেন। আজিকালিও যে ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত স্বরূপে পাওয়া যায় না, এমন নহে। এক কলনার, এক জলচক্রে আর্কিমিডেস ইক্ষুরূপ যন্ত্র চালিত করিতেছে। উর্দ্ধগত জল জলচক্রে পড়িয়া জলচক্রে ঘূর্ণিত করিতেছে। ১১শ চিত্র দেখুন।

ভাস্করচার্য স্বয়ংবহ যন্ত্রকে ক্রৌড়নকতুলা মনে কবিতেন। এই হেতু লঙ্কের ও ব্রহ্মপুত্রের স্বয়ংবহকে গ্রাম্য বলিয়া নিন্দা কবিয়াছেন। কারণ তাহা সাপেক্ষ, অর্থাৎ জল ফুটাইয়া গেলে জল প্রক্ষেপেব প্রয়োজন হয়। যে যন্ত্রে চতুর্ভুজকাকরী যুক্তি থাকে, তাহা ভাস্করের মতে গ্রাম্য নহে।* বাস্তবিক তিনি প্রথমধীসম্পন্ন ছিলেন; বোধ হয় এই হেতু স্বয়ংবহ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিবার তাঁহার যৈর্য ছিল না।

দেখা গেল, প্রাচীনেরা স্বয়ংবহ অর্থে এমন যন্ত্র বুঝিতেন যাহা চালিত করিতে মানুষ আবশ্যক হয় না, এবং যাহা একবার চালিত হইলে সতত চলিতে থাকে। অর্থাৎ স্বয়ংবহ হইতে সদাবহে গিয়া পড়িয়াছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান ঘোষণা কবিতেছে, সদা গতি অসম্ভব। বলিতেছে, জড় সৃষ্টি করিতে পারা যায়



১১শ চিত্র। স্বয়ংবহ।

না, তেজনি শক্তিও পারা যায় না। যে যন্ত্রে শক্তি যত

* যথ্য
বদধোরন নলং তৎ সাপেক্ষতঃ স্বয়ংবহং গ্রাম্যম্।
চতুর্ভুজকাকরী যুক্তির্ভ্রমং নহি গ্রাম্যম্।
এবং বহুধা যন্ত্রং স্বয়ংবহং কুহকবিদ্যায়া ভবতি।
নেবং পৌলিন্দিতয়া পূর্বোক্তান্নান্নাপ্যুক্তম্।

থাকে, তাহা ততই থাকে, তাহার ভ্রাস বৃদ্ধি হয় না।
 সূর্যকালে লোকে মনে করিত, (শুধু এদেশে নয়
 য়োপদেশে), যে কাঠ লোহা পিতলের ঢাকা ও দণ্ডের
 যোগাযোগ ঘটনা দ্বারা প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়া কাজ
 করাইয়া লইতে পাবা যায়। প্রকৃতির রহস্ত প্রকৃতি
 গোপন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা নিত্য দেখিতেছি,
 নদী বহিতেছে, বাতাস খেলিতেছে, গাছের ফল পড়িতেছে,
 আকাশে মেঘ বেড়াইতেছে। কই, কালের ত বিরাম
 নাই! আকর্ষণ বিকর্ষণ, সংকোচন প্রসারণ, সংসক্তি ও
 অসংসক্তি এবং সমুদয় আণবিক ক্রিয়া গুপ্তবলের বাহ্যবিকাশ।
 কোন কোন ক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে। চলুক, আধুনিক
 বিজ্ঞান—আধুনিক বলিতেছি, কারণ শক্তি যে সৃষ্ট হইতে
 পারে না, এ তত্ত্ব অধিক দিন জানা যায় নাই,—আধুনিক
 বিজ্ঞান স্পষ্টভাষায় বলিতেছে, যে শক্তিই কাজ করুক এবং
 যতক্ষণই করুক, বিরামই তাহার পবিণায়। এমন যে
 স্নাকৌশল সম্পন্ন আমাদের দেহ, যাহা নিজের জীর্ণ সংস্কার
 নিজেই করে, ইহাবও কর্ম্মেব বিরাম ঘটে। অথচ মানব-
 বচিত যন্ত্রেব বিবাম ঘটিবে না—এরূপ সন্দেহ উদয় হয়
 নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের দেশে, য়োপদেশ ও আমেরিকায়
 সদাবহ যন্ত্র আবিষ্কার-প্রলোভনে অদ্যাপি বহু ব্যক্তি
 প্রতারিত হইতেছে।

বর্তমান বিজ্ঞানের মানদণ্ডে য়োরোপের প্রাচীন জ্ঞান
 পরিমাণ করা ভায়সংগত নহে, আমাদের দেশের প্রাচীন
 জ্ঞান পরিমাণ করাও নহে। আশ্চর্য্যেব কথা কোন কোন
 পাশ্চাত্য গণিত সূর্য্য সিদ্ধান্তে স্বয়ংবহ নাম পাইয়াই উৎফুল্ল
 চিত্তে প্রাচীন আর্ঘ্যগণের জ্ঞান গণিমায় প্রতি উপহাস বাণ
 নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে দেখা গিয়াছে, সকল
 স্বয়ংবহ এক তত্ত্বে নির্মিত হয় নাই, পরন্তু জলচক্র নির্মাণ
 দ্বারা গতি সম্পাদন হেতু প্রাচীনদিগকে প্রশংসা করিতে
 হয়। বিলাতী ক্লক-ঘড়ীকে স্বয়ংবহ মনে করা ঘেঁরুপ,
 আমাদের সিদ্ধান্তের ভ্রমণশীল যন্ত্রকেও স্বয়ংবহ মনে করা
 সেরূপ। গুরু দ্রব্যের নিয়ম গতি দ্বারা চক্র ভ্রমণ কবানই
 বাবতীয় স্বয়ংবহ বস্তুর মূলভাব। খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে
 হাইগেন্স নামক গণিত দোলক প্রয়োগ করিয়া ক্লক
 ঘড়ীকে প্রকৃত কালমান যন্ত্র করিয়াছেন। আমাদের

আর্ঘ্যগণ দোলকশূন্য ক্লক-ঘড়ীর আবিষ্কার্তা বলিলে দোষ
 হয় না। কে জানে, এদেশ হইতে বিদেশে ক্লক-ঘড়ীর
 মূল-সূত্র যায় নাই?*

স্কোভের বিষয় এই যে, দেড় হাজার বৎসর পূর্বে যে
 জ্ঞান যে প্রয়োগকুশলতা এদেশে প্রচুর ছিল, ক্রমশঃ তাহার
 বিকাশ হয় নাই। পরন্তু বর্তমানকালে তাহার লোপ
 ঘটয়াছে। জলপ্রবাহে শক্তি যে লুক্কায়িত আছে, তাহা
 প্রাচীনেরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা আধুনিক
 পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াও প্রয়োগকুশল শিল্পী
 হইতে পাবি নাই। আমাদের স্মৃজনা নদীবহলা বংগভূমির
 ধান্ত জলাভাবে শুকাইয়া যায়, আমরা হা-অন্ন-স্বরে ক্রন্দন
 কবি। আমরা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি, বায়ু বহে। কিন্তু
 যে শক্তি বহমান পবনে সঞ্চিত থাকে, তাহা দ্বাবা কার্য্য
 সিদ্ধির পন্থা দেখি না। সূর্য্য আমাদের দ্বায় অ-পাত্রেয়
 দেশে এত তাপ বিতরণ না করিলে ভাল করিতেন, আমরা
 মুক্ত হস্তের দান ভোগ করিতে জানি না। রামায়ণের
 কবি ইন্দ্র বরুণ পবন তপনকে রাবণের দাসত্বে নিযুক্ত
 করিয়াছিলেন; আমরা দেখিয়াও দেখি না, কবিকল্পনা সফল
 হইয়াছে।

বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা কি ?

[রাজসাহীর “বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে” “বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা
 কি ?” নামক যে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলাম তাহা প্রবাসীতে প্রকাশ
 করার জন্য পাঠাইলাম। ইতিপূর্বে অল্প কোন পত্রিকায় প্রকাশার্থে
 গঠন হয় নাই। যদি অল্প কোন পত্রিকায় প্রকাশ হয়, তাহা আমার
 অমুমোদিত নহে।—আঃ মঃ ২১।]

কয়েক বৎসর যাবৎ, বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা
 কি,—এই প্রশ্ন লইয়া নানারূপ আন্দোলন আলোচনা
 চলিতেছে। এই প্রশ্ন উপযুক্তরূপে মীমাংসিত হওয়াব
 উপর বঙ্গীয় মুসলমানদিগের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ অস্বাধিক

“He [Waltherus] is also the first astronomer
 who used clocks moved by weights for the purpose of
 measuring time. These pieces of mechanism were
 introduced originally from Eastern countries”—Grant's
 History of Physical Astronomy. Page 442.

পরিমাণে নির্ভর করে বলিয়াই এই সভায় বর্তমান প্রবন্ধটি পেশ করা গেল।

এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার পূর্বেই একটা অতি গুরুতর কথা আমাদের কাছে স্মরণ রাখিতে হইবে। “হইত” এবং “আছে” এই দুইটা কথায় অনেক প্রভেদ। “যদি আমি নবাব হইতাম তবে কি ভাল হইত” একথা আলোচনা করিয়া সম্মত নষ্ট করা নিতান্ত মূর্থতা মাত্র। “আমি কি আছি” ইহাই আমাদের কাছে দেখিতে হইবে। বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা কি হইলে ভাল হইত কিম্বা কি হওয়া উচিত এ বিষয় আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; তাহাদের মাতৃভাষা কি, আমরা কেবল তাহাই দেখিব।

এই খণ্ডেই হয়ত অনেক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লোকের সহিত এ নবীন লেখকের মতভেদ হইবে। “যাহা করা উচিত তাহা করিতেই হইবে” এ উপদেশ অতি মূল্যবান হইলেও বর্তমান স্থলে তাহার প্রয়োগ হইতে পারে না। ভাষার স্বভাব হইতে উৎপত্তি এবং স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ইহার গঠন ও পরিবর্তন হইয়া থাকে; ইহা একপ্রকার মনুষ্যাক্রমতাব বহির্ভূত।*

অনেকেই বলিয়া থাকেন বঙ্গীয় মুসলমানদিগের পক্ষে উর্দু মাতৃভাষা হইলে ভাল হইত; তাহা হইলে ভারত-বর্ষের অস্ত্রান্ত্র প্রদেশের মুসলমানদিগের সহিত তাহাদের একতাবন্ধন অধিকতর দৃঢ় হইত। আমি বলি আরবী হইলে আরও ভাল হইত; কারণ তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদিগের সহিত তাহাদের একতাবন্ধনে গ্রথিত হইবার সুবিধা হইত।

অনেকে আবার উর্দুকেই বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাহাদের অজ্ঞানতাই এই যে বঙ্গীয় মুসলমানগণ যে ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাতে অনেক আরবী ও পারসী শব্দ দেখা যায় সুতরাং উহাকে বাঙ্গলা বলা যায় না। বরং উর্দু ভাষার সঙ্গে উহা একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা-যাইতে

* “Language is a natural organism possessed of a separate existence and as little subject to the will of the individual as the power of changing its song to the will of the nightingale.”—Schleicher.

পারে। তাহাদের এই অজ্ঞানতাই মানিয়া লইলে ইংরাজী ভাষাকেও আমরা ইংরাজী বলিতে পারি না, কারণ তাহাতে অনেক লাতিন ও গ্রীক শব্দ আছে; এবং স্পেনিশ ভাষাকে আরবী ভাষার একটি শাখা বলিতে হইবে, কারণ উহাতে অনেক আরবী শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক কেবল শব্দের ঐক্য দেখাইয়া এক ভাষাকে অপর ভাষার সঙ্গে সংযোগ করা যায় না, উভয় ভাষার ব্যাকরণের মিল দেখাইতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষার ব্যাকরণের ও উর্দু ভাষার ব্যাকরণের সাদৃশ্য না দেখান যাইতে পারে সে পর্য্যন্ত উর্দু ভাষাকে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে না।*

কেহ কেহ আবার ঝগড়া ফসাদে না যাইয়া একটা মাকামাফি রকমের বন্দোবস্ত করিতে চাহেন। তাহারা বর্তমান বাঙ্গলা ভাষাকে মুসলমানদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন; মুসলমানী বাঙ্গলা বলিয়া তাহারা একটি আলাহিদা বাঙ্গলা ভাষা তৈয়ার করিতে ইচ্ছুক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভাষা কাহারও ইচ্ছা-পূর্বক তৈয়ার করিতে হয় না; উহা মনুষ্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া থাকে।† যদি বঙ্গীয় মুসলমানগণ বাঙ্গলা ভাষার উপর তাহাদের যে অধিকার পূর্ব হইতেই রহিয়াছে তাহা চিনিয়া উঠিতে পারেন তাহা হইলে এই বর্তমান বাঙ্গলা ভাষাকেই তাহাদের মুসলমানী বাঙ্গলা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ছাথের বিষয় মুসলমানদের একটা জাতিগত ঘোষ হইয়া পড়িয়াছে এই যে তাহাদের যাহা আছে তাহারা তাহা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহেন অথচ যাহা গ্রহণ করিবার তাহাদের কোন দাবী দাওয়া নাই তাহা লইবার সত্ত্ব তাহারা ব্যগ্র।

“Unless the grammar agrees, no amount of similarity between the roots of two languages could warrant us in comparing them together.”—Sayce.

+ “Language, in fact, is a social creation; we may term it if we like, a human invention, but we must remember that it is no deliberate invention of an individual genius, but the unconscious invention of a whole community.”—Sayce.

“A society never met together to make a language”—*The Same.*

বাঙ্গলা ভাষা নিজে বলিতেছে যে “আমি তোমাদের” তবুও বঙ্গীয় মুসলমানগণ বলিবেন যে এ বাঙ্গলা ভাষা আমাদের নহে। যে ভাষার মাল, মাতা, দৌলত, আসবাব মুসলমানের প্রদত্ত সে ভাষা মুসলমানের নহে, তবে কাহার? যে ভাষার কাগজ, কলম, দোয়াত পর্যন্ত মুসলমানের দেওয়া সে ভাষা মুসলমানের নহে তবে কাহার? যে ভাষার আইন, আদালত, মুসেক্কা, সেরেস্তাদার, নকলনবীশ, আমিন, উকীল, মোক্তার সমস্তই মুসলমানের দাবী সমর্থন করিতেছে সে ভাষা মুসলমানের নহে তবে কাহার? যে ভাষার রক্তবেরঙ্গের লোক হরেক রকমের কাজ করবারে বাঙ্গলা ভাষা একদিন অজ্ঞাতভাবে মুসলমানের হাতে তৈয়ারী হইয়াছিল বলিয়া গাওয়া দিতেছে সে ভাষা মুসলমানের নহে তবে কাহার? এত সাক্ষী সাবুদ সঙ্কেও অনেক নাছোড়বান্দা বাঙ্গালী মুসলমান মাথা নাড়িয়া বলিবেন যে এ বাঙ্গলা ভাষা আমাদের নহে !!!

যদি বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গলা ভাষাকে পায় না তেলিয়া নিয়মিতরূপে তাহার চর্চা করিত তবে আমার বিশ্বাস আরও অনেক মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় আয়গা পাইত। বর্তমান সময় যে ছই একজন মুসলমান বাঙ্গলা ভাষা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহার আবার বাঙ্গলা ভাষায় অভিজ্ঞতা দেখানের জন্ত এতদূর ব্যস্ত যে অতি ছুন্ন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিবেন অথচ যে ছই একটা মুসলমানী শব্দ পূর্ষ হইতেই বাঙ্গলা ভাষায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহার কাছ দিয়াও যেযিবেন না। স্মরণ্য মুসলমান সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে এ পর্যন্ত কোন নূতন মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় দাখিল হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিতে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদেরই যেন সময় কিছু জেয়াদা বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ নিজের জিনিস নিজে গ্রহণ না করাতে তামাদি মাঝে বাঙ্গলা ভাষায় উপর মুসলমানদের স্বত্ব রহিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। হয়ত এক শতাব্দীর পর এ সমস্ত শব্দ যে মুসলমানী তাহার কোন প্রমাণ থাকিবে না। আমার মনে পড়ে এক সময় আমার একজন হিন্দু বন্ধু ‘আসালতন’ এই শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা কোন মুসল-

মানের নিকট হইতে এইরূপ শুনিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন, যথা :—

“আসালতন”—আশালতা হইতে, যেহেতু আশাকে লোকে চিরকালই পোষণ করিয়া থাকে কখনই ছাড়িতে পারে না সেই হেতু ‘আসালতন’ অর্থ চিরকালের জন্ত।

এই উৎপত্তি ব্যাখ্যা হিন্দু বন্ধুব স্বকপোল কল্পিত কি তাঁহার মুসলমান শিক্ষক হইতে গৃহীত বলিতে পারি না তবে মুসলমানগণ এরূপ খামখেয়ালির ঘোরে পড়িয়া থাকিলে কালে যে প্রায় সকল মুসলমানী শব্দেরই এই ধরনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা শুনিতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ ধরিতে গেলে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি মুসলমানদের হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গ হিন্দু রাজত্বের সময় বিদ্বান ও উচ্চপন্থ ব্যক্তিগণ সংস্কৃত ভাষারই চর্চা করিতেন, বাঙ্গলা ভাষার বড় ধার ধারিতেন না। মুসলমানদের আমলে সংস্কৃতের চর্চা অনেক কমিয়া যায় এবং বাঙ্গলা ভাষা অস্বাধিক পরিমাণে বাদসাহী সুনজরে পতিত হয়।* সেই সময় হইতেই বাঙ্গলা ভাষায় নানা মুসলমানী শব্দ ঢুকিয়া উহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে।

ইংলণ্ড নরমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইলে ইংলণ্ডের ভাষার বেক্রপ পরিবর্তন ঘটয়াছিল মুসলমানগণ বঙ্গ অধিকার করিলে পর বঙ্গীয় ভাষারও কতকটা সেইরূপ পরিবর্তন ঘটয়াছিল। পুরাতন “এংগ্লো সেক্সন” নরমানদের হাতে পড়িয়া বেক্রপ বর্তমান ইংরাজী ভাষায় পরিণত হইয়াছে সেইরূপ পুরাতন “সান্থুভাষা” মুসলমানদের হাতে পড়িয়া বর্তমান বাঙ্গলা ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। নরমান অধিকারের পর বেক্রপ ইংলণ্ডের ভাষায় bilingualism অথবা দ্বিভাষাত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল বঙ্গীয় ভাষায়ও যে মুসলমান অধিকারের পর সেইরূপ ঘটয়াছিল তাহার প্রমাণ আজকালও পাওয়া যায়; যথা :—

কাগজপত্র	খালখন্দক	সীমাসরহর্দ
ধনদৌলত	কাণ্ডকারখানা	হাটবাজার
চাষ আবাদ	খরিশ বিক্রী	ঝড় তুফান

ইত্যাদি।

* হসেনশাহ ও গরাজল বা ইহার উচ্চল দরাজ।

কিন্তু নরমানদের ইংলণ্ড বিজয়ে ও মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ে অনেক ফরাক। নরমান ও সেক্সন জাতিতে ও ধর্মে একই ছিল; তাহাদের কেবল ভাষা বিভিন্ন ছিল। হিন্দু মুসলমানের ধর্ম জাতি ও ভাষা সকলই বিভিন্ন ছিল। সুতরাং কয়েক শতাব্দীর পর ইংলণ্ডে নরমান ও সেক্সনের মধ্যে কোন প্রভেদই রহিল না, কিন্তু বহু শতাব্দীর পর বঙ্গে এখনও হিন্দু মুসলমানের সেরূপ অবস্থা ঘটে নাই। অন্ততঃ ধর্মে এখনও তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বঙ্গে হিন্দু মুসলমানের অবস্থারও অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে এবং সেই অল্পসারে বাঙ্গলা ভাষারও যে কিছু তারতম্য না হইয়াছে এরূপ নহে। “সহরের চকমিলান দালান ইমারৎ” ছাড়িয়া এখন মুসলমানগণ “দেহাতের গয়রাবাদী জমী” সমূহ দখল করিয়াছে। “জবরদস্ত জমীদারের আসা সোটা” এখন “গরিব রাইয়তের আসানডি” হইয়া পড়িয়াছে। “কাজীসাহেব” এখন আর “মিয়াদ” দেন না তিনি “কাবিন” “রেজিষ্টারী” করিয়াই খালাস। তাঁহার সেই অর্দ্ধগজ লম্বা “তাজ” এখন ক্ষুদ্র “টুপী”র আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্বে “সহরে” থাকিতে আরবী ভাষা হইতে গৃহীত “চক” বাজার বুকাইত এখন “দেহাতে” আসিয়া তাহার অর্থ হইল ক্ষেত। এখন মুসলমানেরা আর “টাকা” লইয়া “খাজানা তহসীল” করে না বরং “রুপিয়া” দিয়া “দেয় কর শোধ” করিয়া থাকে। মুসলমানগণকে উচ্চ “মসনদে” বসিয়া এখন আর “বাদসাহী খেয়ালে” ঝিমাইতে হয় না “জিরাতির মসুম বেমসুম” ঠাওরাইতেই এখন “হয়রান পেরেগান লবেজান।”

মোটের উপর দেখিতে গেলে তিন প্রেণীর মুসলমান তিন ভাষা লইয়া বাঙ্গলা দেশে আসিয়াছিলেন; রাজা আসিয়াছিলেন পারস্য ভাষা লইয়া, সৈন্তগণ আসিয়াছিলেন তুর্কী ভাষা লইয়া এবং ধর্ম প্রচারকগণ আসিয়াছিলেন আরবী ভাষা লইয়া। সুতরাং এই তিন ভাষারই প্রচুর মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমানগণ যোদ্ধাবেশে প্রথম বাঙ্গলা দেশে প্রবেশ করেন সুতরাং অনেক যুদ্ধ সম্বন্ধীয় মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়; যথা ভীর, কামান, তোপ, ব্রেকাব, জীন, লাগাম, নিসান, নাকাড়া, বন্দুক, বারুদ,

ইত্যাদি। কালক্রমে মুসলমানগণ বাঙ্গলা দেশের রাজা হইলেন এবং রাজকীয় কার্য সম্বন্ধীয় অনেক মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় স্থান পাইল; বর্তমান সময় আফিস আদালতের ব্যবহৃত শতকরা নিবানবই শব্দই মুসলমানী। “হাকিম” হইতে “পেয়াদা” “উকীল” হইতে “মওয়াফেল” “ফরিয়াদি” হইতে “কয়েদী” সমস্তই যে মুসলমানের হাতে গড়া ইহা সকলেই জানেন সুতরাং তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন সুতরাং বর্তমান সময় ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রচুর মুসলমানী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। আমদানী, রপ্তানী, মাণ্ডল, তেজারতী, পেশা, জমা খরচ, হাওলাত বরাত ইত্যাদি সমস্তই মুসলমানী। এইরূপ রাজকার্য ও বাণিজ্য উপলক্ষে মুসলমানগণ বাঙ্গলা দেশে বসবাস করা হেতু গৃহের অনেক জিনিসপত্রও মুসলমানী হইয়া পড়িল; যথা জিনিস, মাল, আসবাব, কুরসি, মেজ, চামচ, তক্তপোষ, পাপোষ, বালিশ, ফরস, চাদির, হুকা, পরদা, আতরদান, গোলাবপাশ, ইত্যাদি।

এ সব ত গেল জবোয়র নাম; ক্রমে অনেক মুসলমানী ভাবব্যঞ্জক শব্দও বাঙ্গলা ভাষায় চুকিতে আরম্ভ করিল। এই সমস্ত ভাবব্যঞ্জক শব্দের মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধ সম্বন্ধীয়; যথা হাজামা, ফসাদ, জোর, জুলুম, জবরদস্তি, করিয়াদ, ইত্যাদি। কতকগুলি মনুষ্য প্রকৃতি সম্বন্ধীয়; যথা মেজাজ, গোসা, জেদ, তবিরত, ইত্যাদি এবং কতকগুলি আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধীয় যথা খুসী, তামাসা, মজা, শিকার, ইত্যাদি। এ সমস্ত বিশেষ্য ছাড়া অনেক মুসলমানী বিশেষণও বাঙ্গলা ভাষায় দেখা যায়, যেমন গরিব, বেচারী, বেহায়া, বেমাণুম, বজ্জাত, বদ, খারাপ, গোলাবী, দরকারী ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত আরবী ভাষা হইতে গৃহীত “ওরালা” ও পারস্য ভাষা হইতে গৃহীত “মস্ত,” এই উভয়ের সংযোগে এ প্রকার কর্তৃবাচক শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় গঠিত হইয়া থাকে যথা শ্রীমস্ত, ভাগ্যমস্ত, আক্কেলমস্ত, দানেশমস্ত, তামাকওয়া টিকাওয়ালা, কিকিওয়ালা, ইত্যাদি। আবার পারস্য ভাষা “খোর” নান শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গলা ভাষা গুলির ভাণ্ডার বাড়িয়া দিয়াছে; যেমন, গাজাখোর, নেশা-খোর, তামাকখোর, সরাবখোর, হারামখোর, ইত্যাদি।

মোটের উপর বিশেষ্য ও বিশেষণ পর্য্যন্তই বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমান প্রভাব পৌছিতে সক্ষম হইয়াছে। কোন মুসলমানী সর্বনাম কি ক্রিয়া বাঙ্গলা ভাষায় দেখা যায় না ; দ্বি দেখা যাইত তবে বাঙ্গলা ভাষা আর বর্তমান বাঙ্গলা ভাষা থাকিত না। উর্দু ব সঙ্গে ও বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে এই খানেই বে মিল দেখা যায়।* আরবী ও পারসী বিশেষ্যের সঙ্গে বাঙ্গলা সহযোগী ক্রিয়া “করা” যোগ করিয়া এক প্রকার মুসলমানী ক্রিয়া গঠন করা হয় বটে কিন্তু হাকে ঠিক খাটি মুসলমানী ক্রিয়া বলা যায় না।

উদাহরণ স্থলে উপরে যে সমস্ত মুসলমানী শব্দের গালিকা দেওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রায় সমস্তই লিখিত বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত দেখা যায়। সকলেই স্বীকার রিবেন যে ঐ সমস্ত শব্দ ছাড়া আরও অনেক মুসলমানি শব্দ বঙ্গীয় মুসলমানগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বটতলার সব মুসলমানী পুখী আছে এবং বাহা অর্দ্ধ শিক্ষিত লম্বানদের অতি আদরের বস্তু, ঐ সকল পুখিব মধ্যেও রূপ অনেক আরবী ও পারসী ভাষার শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, বাহা এখনও বাঙ্গলা ভাষার সর্বত্র গৃহীত হয় নাই। সকল শব্দের মানি অনেক সময় বাঙ্গালী মুসলমানগণই লরূপ বৃথিতে পাবেন না, হিন্দুগণত দূরের কথা। যেমন ববালা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহাত্মা হোসেন (রাঃ আঃ) তনয়া বৈ সখিনার সঙ্গে তদীয় ভ্রাতৃপুত্র মহাবীর কাসিমের বিবাহ পন্ন হওয়া মাত্রই যখন কাসিম যুদ্ধ ক্ষেত্রভিমুখে অগ্রসর হইতেন তখন কোন পুথিগোথক বিবি সখিনার মুখে হইতেন :—

“আগে যদি জানতাম কাসিম তুমি জঙ্গের পেয়ারা, +

“না দিতাম বিয়া এজিন না পরিতাম সেয়ারা।”

* বাঙ্গলা, উর্দু, পারসী ও সংস্কৃত সকলই এক মূল ভাষা হইতে হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের সর্বনাম গুলি প্রায়ই এক ধরণের, উর্দু ভাষার সর্বনাম গুলিতে পারস্ত ভাষার সর্বনাম গুলির ছায়া স্পষ্ট।

+ জঙ্গ—লড়াই যুদ্ধ

পেয়ারা—প্রিয়

এজিন—অসুখ

সেয়ারা—মাথার অলঙ্কার বিশেষ

এই দুই পংক্তিতে ‘জঙ্গ,’ ‘পেয়ারা,’* ‘এজিন’ ও ‘সেয়ারা’ এই চারিটাই মুসলমানী শব্দ। ‘জঙ্গ’ এক ‘পেয়ারা,’ হিন্দু মুসলমান সকলেই হয়ত বুঝিবেন ; ‘এজিন’ শব্দটী মুসলমানগণ বুঝিলেও হিন্দুগণ বুঝিবেন না ; এবং ‘সেয়ারা’ শব্দটীর সঠিক অর্থ অনেক মুসলমানও ভালরূপ বুঝিবেন কি না সন্দেহ। এই সব পুথিতে শতকরা প্রায় পঞ্চাশটীই মুসলমানি শব্দ ; কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের ভাষাকে উর্দু বলা যাইতে পারেনা। কারণ যে সকল মুসলমানি শব্দ ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহাদের সকলেই বিশেষ্য কি বিশেষণ, সর্বনাম কি ক্রিয়া নাই বলিলেও চলে ; সুতরাং ইহাদের ভাষাব্যাকরণের সঙ্গে উর্দু ভাষার ব্যাকরণের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই নাই।† অতএব আরবী ও পারসী শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন কেবল এই অল্পহাতে বঙ্গীয় মুসলমানগণ উর্দু ভাষাকে তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

বাঙ্গলা ভাষায় অনেক মুসলমানী শব্দ একরূপ অবিকৃত ভাবে স্থান পাইয়াছে যে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যাম্বিত হইতে হয়। সুদূর আরব দেশের মক্কা হইতে উথিত তামাসা, খেয়াল, ফুত, ফেরার, ইত্যাদি শব্দ সমূহের বঙ্গীয় প্রতিধ্বনি অতি শুদ্ধ ও সঠিক।‡ আরব দেশের ‘আতরের’ ও পারস্ত দেশের ‘গোলাবের’ সুগন্ধ নগ্নীয় ‘আতরে’ ও গোলাবে প্রায় অটুট রহিয়াছে। আরবী ‘বন্দুক’ ও তুর্কী ‘তোপ’ বাঙ্গলার আসিয়া একেবারে বেকল হইয়া পড়ে নাই। অথচ এমন অনেক মুসলমানী শব্দও দেখিতে পাওয়া যায় যাহা বাঙ্গলা দেশের জল পানিতে একেবারে খাস বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছে, যেমন :—

* সংস্কৃত ও পারসী উভয়ই আর্ধ্যভাষা, সুতরাং পারসী ও সংস্কৃত শব্দ সমূহের মধ্যে যথেষ্ট আত্মীয়তা রহিয়াছে। ‘পেয়ারা’ শব্দটী সংস্কৃত ‘প্রিয়’ হইতে আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন কিন্তু পারসী ‘পেয়ারা’ হইতে উহার উৎপত্তি হওয়াব সম্ভাবনা কিছু বেশী বলিয়া বোধ হয়।

† উর্দু ও বাঙ্গলা উভয়েই আর্ধ্যভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিন্তু মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষার ও উর্দু ভাষার মধ্যে একরূপ কোন মিল নাই বাহাতে উর্দু ভাষাকে তাহাদের literary ভাষা বলা যাইতে পারে।

বে আরাম = ব্যারাম = ব্যাম

বাহির = বাইর = বের

সেপাহী = সিপাহী — সিপাই

কেতাব (?) = খাতা

খানা (?) = খাতা*

ইত্যাদি ।

আবার অনেক মুসলমানি শব্দ বাঙ্গলা দেশে পদার্পণ করিয়া নূতন মানি হাসিল করিয়াছে। “খালি” এই শব্দ আরবী ভাষায় “শূন্য” (empty) বুঝায়, বাঙ্গলায় আসিয়া তাহার অল্প একটা অর্থ হইয়াছে “কেবল”; যেমন “তুমি খালি বাঙ্গলার মী করিতে পার”। “জব্বত” এই শব্দ আরবীতে কেবল “ধরা” বুঝায়। বাঙ্গলায় আসিয়া উহার আর একটা অর্থ হইয়াছে “নাকাল করা”; যেমন তাহাকে ভারি “জব্বত” করিয়াছি। “বাহার” এই শব্দ পারস্য ভাষায় “বসন্তকাল” বুঝায়, বাঙ্গলায় আসিয়া উহার অর্থ হইয়াছে “সৌন্দর্য্য”। “বহর” এই শব্দ আরবীতে সমুদ্র বুঝায়, বাঙ্গলায় আসিয়া উহার অর্থ হইয়াছে “বহুসংখ্যক নৌকার সমষ্টি”।

মুসলমানগণ হিন্দুর অস্পৃশ্য হইলেও খাঁটি মুসলমানী শব্দগুলির আলিঙ্গনাবদ্ধ হইতে সংস্কৃত শব্দসমূহকে বড় নারাজ দেখা যায় না। পারস্য শব্দ “সহর” প্রায়ই সংস্কৃত শব্দ “অঞ্চলের” অঞ্চল ধরিয়া থাকে; এই দুইয়ের সংযোগেই “সহরাঞ্চল” শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত “অন” মুসলমানী “আদায়ের” গায়ে পড়িয়া উহাকে “অনারায়” করিয়া ফেলিয়াছে। পারস্য “জোর” সংস্কৃত “স”কে আলিঙ্গন করিয়া “সজোরে” পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত “স্ন” আরবী “নজর”কে বুকে লইয়া “স্ননজর” করিয়াছে। এতৎসঙ্গেও উহাদের সংস্কৃতত্ব এখনও বহাল, বজায় ও অটুট রহিয়াছে!!!

বঙ্গ ভাষার বর্তমান অবস্থায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই একটা অবশ্য কর্তব্য কর্ম হইয়া পড়িয়াছে এই যে বাহাতে বঙ্গ ভাষার একপাশা প্রকৃত অভিধান প্রণয়ন করা হয় তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। যে সকল বাঙ্গলা অভিধান বর্তমান সময় দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বঙ্গ ভাষার ব্যবহৃত সমুদ্র শব্দগুলি স্থান পাইয়াছে

কিনা তথ্যের ঘোর সন্দেহ আছে; সকল শব্দের আব উৎপত্তি ব্যাখ্যাও সঠিকরূপে দেওয়া হয় নাই। বিবে শব্দ মাত্রকেই সার্বজনীন “বাবনিক” আখ্যা দিয়াই অতি অভিমানপ্রণেতা ক্রান্ত রহিয়াছেন; উহা আরবী পারস্য, তুর্কী কি ইংরেজী তাহার কোন উল্লেখ ও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই সম্ভার গত অধিবেশ এ বিষয় কিছু আলোচনা করা হইয়াছিল কিন্তু কার্য্য কতদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে সর্বসাধারণ তথ্যের বিবে অবগত নহেন।

বঙ্গীয় মুসলমানগণের বর্তমান হৃদশা এত নিরন্তর পৌছিয়াছে যে তদ্রূপ তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ বঙ্গভাষায় যে সব শব্দ দান করিয়াছিলেন তাহাদিগকেও কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। মুসলমানী শব্দগুলি যেন বঙ্গ ভাষায় চং সাজাইবার কতকগুলি উপকরণ হইয়া পড়িয়া যখনই একটু বিক্রম কোতুকের প্রয়োজন তখনই মুসলমান শব্দ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়। যখনই হাতের কোর ছুটাইতে চাহেন তখনই বঙ্গীয় লেখকগণের মন মুসলমানী শব্দের উপর পতিত হয়। নবীন বঙ্গীয় লে “কলয়ের” স্থানে “লেখনী” ধারণ করিবেন, “কাগজ” লইয়া “তুলট” দিয়া কোনরূপে কাজ চালাইতে “দেওয়ানের” স্থানে হয়ত “মস্তাধার” নামক একটা দুঃসংস্কৃত জিনিসের আমদানী করিবেন কিন্তু যেই একটু প্রয়োজন অমনই মুসলমানী শব্দ না হইলেই “কাকার” স্থানে যখনই “চাচার” ব্যবহার হয় তখনই লেখক ও পাঠক উভয়েরই বদনমণ্ডলে হাসির দীপক রেখা প্রকটিত হয়, অথচ ভাষাতত্ত্ববিদগণের মতামত ‘কাকা’ পুরাতন কুরুশ guttural দ্বারা গঠিত এবং ‘চ’ উক্ত শব্দেরই একটু মার্জিত ও নব্য সভ্য আ মাত্র।।* .

গোয়ার ছেলের হাতের জিনিসকে ধারাপ বলিলে যেমন উহা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া কাঁদিতে থাকে, মুসলমানগণও তেমনি বঙ্গভাষায় মুসলমানী শব্দ সাধু রূপ নিগ্রহ দখিলা এ বাঙ্গলা ভাষা তাঁহাদের নহে ব

* “.....gutturals usually an important class sounds in savage idioms.”—Sayce.

রা লইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াও না যে বঙ্গভাষার মুসলমানী শব্দেব এ নিগ্রহেব অপেক্ষা তাঁহারাষ্ট অধিকতর দায়ী। কয়জন লখকেব মুসলমানী বাঙ্গলা শব্দেব উৎপত্তি ত বাৎপত্তি আছে ? এ বিষয় শিক্ষিত বঙ্গীয় ব সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।* হিন্দুলেখকগণ মানী শব্দ সমূহের প্রকৃত তথ্য নিরূপণে অসমর্থ নক সময় হাতেব কাঁছের, ঘরের কোণে ব্যবহৃত ছাড়া পবিশ্রমোপার্জিত ছরহ সংস্কৃত শব্দ তে বাধ্য হন। সুতরাং অজ্ঞার হঠকারিতা পূর্বক বাঙ্গলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া মনে ক শিক্ষিত মুসলমানের তাহার যথোচিত দাস্ত কর্তব্য।

মাতৃভাষার অনিশ্চয়তাই বঙ্গীয় মুসলমানদের পশ্চাৎপদ হওয়ার অন্যতম কারণ। মাতৃভাষা ভাবে আসীন না হইলে অজ্ঞ কোন ভাষা পায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব নূতন শিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে একথাটা যের কঠপক্ষগণও স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্ব- নূতন নিয়মাসুযায়ী মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে তে মুসলমান ছাত্রগণ বিষম সমস্যা পতিত।

বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রগণ ত উর্দুকে মাতৃভাষা বি ফরিতে সাহসই পায় না, অধিকন্তু বাঙ্গলা স- ত চর্চা না থাকার দরুন বাঙ্গলা ভাষায়ও হই মুসলমানগণের সমকক্ষ হইতে তাহারা বল কবিত্তে পাবে না। এদিকে মাতৃভাষা াল, অতদিকে পারসীসহিত আরবী শিক্ষা হওয়াতে মুসলমান ছাত্রগণের প্রতি জুলুমের ছে। পারসীসহিত আরবী শিক্ষা করা

গঠিত

দেখি দীনেশচন্দ্র সেনের যদি একজন মুসলমান সাহায্য- ব হয়ত তিনি বঙ্গভাষার মুসলমান প্রভাব আরও রিতে পারিতেন। মাণিকচাঁদের গানে প্রাপ্ত আসা ক- কইতর (পায়রা) আউল (সিকুপুয়) শব্দগুলি ১ যে কোন শিক্ষিত মুসলমান তাঁহাকে অনায়াসে পারিতেন। তাহা হইলে মাণিকচাঁদের সময় নিরূপণে ত্রত হইতে হইত না।

পূর্বই বাঙ্গলীয়, কিন্তু তাই বলিয়া যে সব ছেলে আববী ভাষার বিন্দুমাত্রও অবগত নহে তাহারা কি প্রকারে- মাত্র ছুই বৎসবেব মধ্যে আববী সাহিত্য ও ব্যাকরণ কবায়ত্ত করিবে বাঙ্গলিকই তাহা ভাবিবার বিষয়। যে সব ছেলে নূতন নিয়মাসুযায়ী এণ্ট্রেন্স পাশ করিবে তাহাদের পক্ষে এত কষ্টকর নাও হইতে পারে। সুতরাং ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় আরও ছুই বৎসব পর ও বি, এ, পরীক্ষায় আরও চাবি বৎসর পর নূতন নিয়মাসুযায়ী আরবী ও পারসী শিক্ষার বন্দোবস্ত কবিলে হয়ত মুসলমান ছেলেদিগের একটু হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ হইত।

এই মাতৃভাষার অনিশ্চয়তার দরুনই আবার মুসলমান ছেলেরা প্রতিযোগিতায় তাহাদের হিন্দুসহপাঠীদের সমকক্ষ হইতে অনেক সময় অক্ষম হইয়া পড়ে। যে স্থানে হিন্দু ছাত্রগণকে তিন ভাষা শিক্ষা করিতে হয় সে স্থানে বেচার মুসলমান ছাত্রগণকে পঞ্চ ভাষা শিক্ষা না করিলে চলে না। এই Penta Lingua বা পঞ্চ ভাষার গোলে পড়িয়াই যে অনেক মেধাবী মুসলমান ছাত্রকে অতি অল্প সময়েব মধ্যেই শিক্ষা ক্ষেত্র হইতে বিদায় হইতে হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমান ছাত্রগণকে বাড়ীব কাজ কারবার চালানোর অজ্ঞ কিছু বাঙ্গলা শিখিতে হয়, ধর্ম- কথ্যের অজ্ঞ কিছু আরবী না শিখিলেও নহ, সহজে পরীক্ষা পাসকরার অজ্ঞই হউক কি মুসলমানদের গৌরব পরিচায়ক ভাষা বলিয়াই হউক কিছু পারসী শিক্ষা না করিলেও চলেনা, আবার স্কুলের মৌলবী সাহেব বাঙ্গলা ভাষাকে “নফরৎ” করিয়া উর্দুতে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহার খাতিরে কিছু উর্দু ভাষার অভিজ্ঞতার দরকার ; সকলের উপর রাজভাষা ইংরেজীত আছেই। এই পঞ্চ ভাষার মারামারিতে মুসলমান ছাত্রগণ কোনটাই ভাল করিয়া শিখিবার অবসর পায় না।

যদি বাঙ্গলা ভাষাকে মাতৃভাষা ঠিক করিয়া মুসলমান ছাত্রগণ কেবল বাঙ্গলা, আরবী ও ইংবেজী শিক্ষা করে তাহা হইলে বোধ হয় সবদিক বজায় থাকিত পাবে। যাহারা ভয় কবেন যে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিলে মুসলমান ছাত্রগণ অতি দরকারী ধর্ম বিষয়ক শব্দগুলিও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিবেনা তাহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই যদি

বর্তমান সময়ের মত তোতা পাখীর ভায় আরবী না পড়াইয়া নিয়মিত মতে অর্থ সহ আরবী পড়ান যায় তাহা হইলে মুসলমান ছাত্রগণও শুদ্ধ ভাবে ধর্মশব্দগুলি উচ্চারণ করিতে পারিবেনই অধিকন্তু তাহাব মানিও বুঝিবে। বাহারা বলেন যে পারসী ভাষার মত সুসঙ্গীত ও মুসলমানদের গৌরব পরিচায়ক ভাষাকে একেবারে ত্যাগ করা উচিত নহে, তাঁহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই যে আরবী ভাষা জানা থাকিলে পারসী ভাষা শিক্ষা নিজে নিজেও কবা যায় কিন্তু পাবসীভাষাভিজ্ঞ কেহই সহজে আরবী ভাষা শিখিতে পারিবেন না। বাহারা বলেন যে উর্দু জানা না থাকিলে ভদ্র সমাজে ও অস্ত্রান্ত প্রদেশের মুসলমানদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় সুবিধা হয় না তাঁহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই যে ভাবতের সকল প্রদেশেরই শিক্ষিত ও ভদ্র মুসলমানদের সঙ্গে ইংবাজী ভাষাতে আলাপ চলিতে পারে; অপর দিকে আববী জানা থাকিলে প্রয়োজন মত যে উর্দু ভাষায় দুই চারিটা কথা না বলা যায় এরূপ নহে।

সুতরাং বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রগণকে সর্ব প্রথম কিছু বাঙ্গলা শিখাইয়া বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে আরবী ও ইংরেজী শিক্ষা দিলে সময়ও অল্প লাগিবে এবং আমাব বিশ্বাস শিক্ষাও ভাল হইবে। এ কথাগুলি চিন্তাশীল মুসলমানগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?

আবজল ময়ীদ খাঁ,

[রাজশাহী কলেজের আরবী অধ্যাপক]।

• আনন্দ ।

সকল বস্তুরই দুইটা দিক আছে—একটা ভিতর, একটা বাহির। ভিতরের বস্তু বলিলে যাহা খাঁটি, যাহা আসল তাহাই বুঝায়, যেমন ভাষায় আমরা বলিয়া থাকি—অত বাজে কথা রাখিয়া দাও, ভিতরের কথাটা কি বল না,—অর্থাৎ, যাহা আসল, যাহা মূলকথা তাহাই বল।

কি জড় কি চৈতন্তময় সকল পদার্থের মধ্যেই যিনি যতটা এই ভিতরকার বস্তু সহিত পবিচিত, তিনি ততটা সত্য বথার্থ উপলব্ধি করেন। ভৌতিকজগতে যিনি

এই ভিতরকার বস্তু সহিত সম্যক পরিচিতি আমবা বৈজ্ঞানিক বলি, অধ্যাত্মজগতে যিনি এই বস্তুটিকে সম্যক তলাইয়া দেখেন তাঁহাকে আমরা তত্ত্ববিৎ বলিয়া থাকি।

কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটি জগৎ আছে। জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাকে প্রেমের যাইতে পারে। এইখানে একটি ভিতরকার একটি ভিতরকার বস্তুকে শুধু জানিয়া, উহা সম্যক পবিচিত হইয়া ক্ষান্ত নহে—স্বেচ্ছায় নিকট আপনাকে ধরা দেয়, বধুপায়ে মন্দির আপনাকে একেবারে আটকাইয়া ফেলে। এইখান বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের সহিত প্রেমিকের তফাৎ।

জ্ঞান এবং প্রেম দু'য়েবই ভিতরকার বস্তু—ইহা কাববার, কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রেম বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভিতরকার সমস্ত সকে ফিরিয়া আসে, প্রেম কিন্তু প্রিয়বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করি আর ফিরিয়া আসিতে চায় না, সেইখানেই রহিয়াবে, স্বেচ্ছায় আপনাকে দান করিয়াই প্রেমের স্বভাব চবিতার্থতা। জানে আমরা সত্য অর্জন করি, প্রেম ছিলে আপনাকে বর্জন করিয়া প্রিয় বস্তুকে লাঞ্ছনা করি। সুনিপুণ চিকিৎসক জ্ঞানকোশলে রোগের মূল চিহ্ন করিয়া, ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া যান, কিন্তু আপনাকে অহোবাত্র সেবা শুশ্রূষায় সেই রোগকে আরোগ্যের আনিতে একমাত্র প্রেমই সক্ষম।

প্রেমের নিকট নিজ স্বার্থ হৃৎখেব পরিমাপ, উদাসী নিকাশ, ক্ষতিলাভ গণনা কিছুই নাট। প্রেম প্রবাসী—পৃথিবীর অন্তান্ত যাবতীয় বস্তুবই একটা বাজার ঘাই জাই। কিন্তু প্রেমের বস্তু বিনিময়ের বস্তু নহে, অমূল্য। স্ত্রী—পৃথিবীতে এত ধনবস্ত্র ঐশ্বর্য থাকিতেও প্রেমের সকলের কাহারও সহিত প্রিয় বস্তুকে উপমের দৃষ্টিতে বলিয়া জ্ঞান কবেন না, প্রিয় বস্তুর সহিত অবিচার না পাতিয়াই প্রেমিকের একমাত্র স্বর্থ, আনন্দ।

দৃষ্টান্ত হইয়া এই কথাটিকে পবিশ্রুত করা যাইতে নতির রঘুবংশে আছে—লক্ষণ যখন সীতাকে গর্তীবস্থা করিয়া রাখিয়া রামচন্দ্রের নিদারুণ আত্মা প্রবণ করাইলেন, তখন

মানা কথার পর সীতা রামচন্দ্রের উদ্দেশে
ন,—

সাহং তপঃ সূর্যানিবিষ্টদৃষ্টিঃ

উজ্জ্বলং প্রসূতে শরিতুং বতিয়ে ।

ভূয়ো যথা মে তননাস্তরেহপি

অমব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ ॥

বর পর আমি সূর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া
দগ্ধতাপ নিযুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিব, যাহাতে
ও পুনঃ আমি যেন তোমাকেই ভর্তারূপে পাই—
বিন বিচ্ছেদ না হয় ।

৩. রামচন্দ্রের প্রতি সীতার এই উক্তি কেবলমাত্র কবি-
কল্পনা নহে। ইহা সীতার বথার্থ প্রাণের কথা। পতি-
বিচ্ছেদ সীতা সহস্র দুঃখতাপের মধ্যে নিষ্কিন্ত হইলেও পতি
দেখা দাপি বিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করেন না, কেন না,
স্বর্গীয় প্রাণ ।

৪. চন্দ্রকে পতিরূপে লাভ করিয়া সীতা জীবনে যে
দুঃখ ক্লেশ লাঞ্ছনা নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন
সেই ভোগও অবিস্মৃত নাই। এক্ষণে, সকল হর্ভাগ্যের
সমাপ্তি—রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও সীতা
ও পুনরায় সেই রামচন্দ্রকেই পতিরূপে পাইবার
কোশল করিতেছেন,—শুধু আকাঙ্ক্ষা নহে, তত্ত্বজ্ঞ
তপশ্চরণেও উদ্যুক্তা। ইহা অপেক্ষা প্রেমের
স্বার্থপরতা ও আত্মত্যাগের মহত্তর দৃষ্টান্ত আর কি
পাওয়া যায় ।

৫. পতি ভগবানকেও ভক্ত ঠিক এইরূপ ভাবেই দর্শন
করেন। ভগবানকে পাইবার জন্য ভক্ত হৃদয়ের বোঝার
মাথায় তুলিয়া লইতে প্রস্তুত, কিন্তু জীবন-
কালমাত্র বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কেন ?
৬. ইহারও সেই একমাত্র কারণ,—ভগবান যে
আপন অপেক্ষা প্রিয়, প্রিয় হইতেও প্রিয়, সর্বাপেক্ষা
প্রিয়। জীবনের একমাত্র আনন্দ আরামস্থল ।

৭. এই আশ্রয়দান হইতে আনন্দ স্বতঃই উদ্ভূত
আনন্দ পাইব বলিয়া প্রেম নহে, প্রেমের অবশ্যস্বার্থ
আনন্দ। বীজ ধরণীগর্ভে আপনাকে দান করে,
কাথা হইতে রসধারা উচ্ছসিত হইয়া, অভিযুক্ত

করিয়া, কুল কুল ফলে তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া
তোলে ।

সকল আনন্দ অপেক্ষা পরমাত্মার সহিত সংযোগ-
জনিত আনন্দকে আমাদের শাস্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান
করিয়াছেন। ইহাব সহিত পৃথিবীর আর কিছুই তুলনা
হয় না।—

সকলো বৈ সঃ । রসং হৃদয়ান্ন লব্ধ্বা মন্যৌ ভবতি ॥

সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ, তৃপ্তিহেতু। সেই রসস্বরূপ
পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন ।

এই পরব্রহ্মকে লাভ করা বা পাওয়ার একটু বিশেষ
অর্থ আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রেমের আমরা আপনাকে
দান করিয়া প্রিয়বস্তুকে লাভ করি। পৃথিবীর অজ্ঞান
যাবতীয় বস্তুকে আমরা লাভ করিলাম বলিয়া মনে করি
যখন উচ্ছাদিতকালে কাঁজে ধাটাইয়া স্বীয় প্রয়োজন সাধন
করিতে পারি,—উচ্ছাদিতকালে আপন হইতে পৃথকভাবে
গ্রহণ করি, কিছুই দান করি না। পরব্রহ্মকে লাভ করা
বা পাওয়ার অর্থ—আপনাকে বিয়ে কেসা, খেচ্ছায় স্বাধীনতা
স্বীকার করা, আত্মসমর্পণ অহঙ্কারকে নষ্ট করা। প্রেমের
লাভ এবং আনন্দ এই দানে, এই আত্মদানে, এই স্বাধীনতা-
দানে। সংসারে প্রিয়তমকে লাভ করিয়া মানবের যে তৃপ্তি,
যে আনন্দ, ভগবানে সেই আনন্দের পূর্ণতা, পরিসমাপ্তি ।

শাস্ত্রে ভগবানকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে।
এই অতীন্দ্রিয় পদার্থকে প্রেম যে কি চক্ষে দেখে তাহা
সেই জানে। দেখিবার বস্তু নহে, ছুঁইবার বস্তু নহে,
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিবার বস্তু নহে,—তবুও জানিয়া
আনন্দ, তাবিয়া আনন্দ, ডাকিয়া আনন্দ,—জ্ঞানে আনন্দ,
ব্যানে আনন্দ, নামে আনন্দ। প্রেমের মত এরূপ স্পৃষ্ট-
ছাড়া ধর্ম জগতে আর কিছুই নাই। শিশুর নিকট
জননীর অঞ্চলটুকু ছায়া প্রেমিকের নিকট পরমাত্মার
স্পৃষ্ট কণাটুকু, অণুপরমাণুটুকু পর্যন্তও গন্ধে ভরা আনন্দ
পরিপূর্ণ ।

আনন্দই ব্রহ্ম।—

কোহে বা ভাঙ্যৎ কঃ প্রাণ্যাং বদেষ আকাশ আনন্দো ন ভাঙ্যৎ ॥
ঐহিকোহনন্দময়তি ॥

কেবা শরীর চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত,

যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন।
তিনিই লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

কত না ভাবে এই আনন্দময়ের সহিত সম্বন্ধ পাতিবার
মানবেব চেষ্টা। পিতা, মাতা, সখা, পতি,—কত না
বিচিত্র মধুব সম্বন্ধে মানব তাঁহাকে চিবকাল সম্ভাষণ করিয়া
আসিতেছে। স্বর্গ্য কিবণে মেঘের বর্ণ বৈচিত্র্যের স্তায়
অস্তবে তাঁহার প্রকাশে কত না ভাবেব লীলাচঞ্চল্য,
উদয়ান্ত পরিবর্তন।—সমীর্ণস্পর্শে শিশিবিন্দুব স্তায় তাঁহার
স্বর্ণেও অস্তবে কত না রসের স্পন্দন।—এইজন্ত বৈষ্ণব
শাস্ত্রে শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য, মধুব রসেব সমাবেশ;
এইজন্ত বাইবেলে ভগবানের সহিত মানবেব সম্বন্ধ নির্ণয়ে
গরু দৃষ্টান্ত উপমা উপদেশে, পিতাপুত্র, জননীশিশু, পতি-
পত্নী, বববধূ, সখা প্রভৃতি কত না ভাবেব অবতারণা;
এইজন্ত গীতার “যে যে ভাবেই আমার শরণাপন্ন হউক না
কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই আশ্রয় দিয়া থাকি।”—
শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি। হাফেজ, নানক,—সর্বত্রই এই
ভাবপ্রকাশ, এই সম্বন্ধ স্থাপনের বৈচিত্র্য। কিন্তু তথাপি,
এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও চিবস্থায়ী একটি আনন্দস্বরূপ নিরন্তর
ধনিত হইতেছে।

ভাব বৈচিত্র্যের মধ্যেও আনন্দ আছে, কিন্তু যেখানে ভাব
প্রতিহত সেখানে আনন্দ কোনমতেই তিষ্ঠিতে পারেনা।
অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিই সকল আনন্দের মূল। মুক্ত আকাশ,
মুক্ত বাতাসের স্তায় যেখানে ভাবেব ধারা সহজে স্বচ্ছন্দে
প্রবাহিত সেইখানেই আনন্দ। প্রিয়তম ও প্রেমিক, মাঝে
কোন অন্তরাল নাই, ব্যবধান নাই, অস্ত কোন চিন্তার
ব্যাবাহত নাই,—কেবল যেখানে ভাবের অপ্রতিহত প্রবাহ
যেখানে ভগ্নতা, সেইখানেই আনন্দ। ইহাই যোগের
আনন্দ, মুক্তির আনন্দ। ইহারই জন্ত রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ
করিয়া বৃদ্ধদেব পথের ভিখারী; ইহারই জন্ত প্রেমের
অবতার শ্রীচৈতন্যদেব গৃহত্যাগী সম্যাসী; ইহারই জন্ত শিশু-
হৃদয় ভক্ত রামকৃষ্ণ বাহুজ্ঞানশূন্য উদাসী;—ইহারই জন্ত
সারা ত্রিভুবন পাশল।

সুখ এবং আনন্দ দুই বিভিন্ন বস্তু। সুখের মধ্যে আনন্দ
না থাকিতে পারে, আবার সুখের মধ্যেও আনন্দ থাকিতে
পারে। সমুদ্র যেমন সমস্ত নদনদীর সম্মিলন, আনন্দও

তেমনি সমস্ত সুখসুখের মিলন-পরিধি। সমস্ত
সমস্ত সলিলধারাকে বক্ষে টানিয়া আপনার
করিয়া লয়, আনন্দও তেমনি সমস্ত সুখসুখকে
টানিয়া মধুময় করিয়া তোলে। আনন্দের সীমা
পৌছিলে সুখও আনন্দময়, সুখও আনন্দময়,—সুখও
সুখও আনন্দ নাই, সুখও আনন্দ নাই। যে
শুভকর ফুল ফুলফলে সজীবিত হইয়া উঠে, যে রসে শুক-
স্তন পীষ্মধারার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যে রসে শুক মরুভূমি
কোমল রসাল হয়, সেই রসই আনন্দ।

আনন্দ রস পবিত্রতার রস। অস্তবে প্রবেশ করিয়া,
মিশিয়া, যতক্ষণ না এই পবিত্র রসকে আশ্বাদন কবিতে,
প্রাণে অনুভব করিতে পাঁবা যায়, ততক্ষণ আনন্দ লাভ
হুইত। এই পবিত্র রসকে গ্রহণ করি বলিয়াই সাহিত্য
সঙ্গীত শিল্পকলা প্রভৃতির পুণ্য পবিচয়ে আমরা
অসীম আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হই। এই রস
অন্তরে গ্রহণ কবিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঋষি
ওয়ার্ডসওয়ার্থ গিরিকন্দরে, নির্ববে, ফুলে ফলে, তরুপত্র
নির্জনে বনে প্রকৃতির সর্বত্রই এক মহান আনন্দ
উপলব্ধি করিয়া পবমানন্দ উপভোগ করিয়া
এবং সাহিত্যে উহাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এ
সেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা এবং সুখ ও আনন্দের প্রকৃতি
বৈষম্য।

যেমন প্রকৃতিতে তেমনি ব্যাপ্তিতেও সুখ
আনন্দে বহু প্রভেদ। সুখ ক্ষুদ্রাতন কুপেব,
সঙ্গীর্ণ, সীমাবদ্ধ; আনন্দ অসীম সমুদ্রের স্তায় মুক্ত,
বিস্তীর্ণ। মানবের মন স্বভাবতই পূর্ণতার প্রস
যাহা পায় তাহাকে সম্পূর্ণরূপেই পাইতে চায়। এই
উপনিষদে—যোবৈ ভূমা তৎ সুখং, নামে সুখম
ভূমতেই সুখ, স্বল্প পদার্থে সুখ নাই—এই কথা
হইয়াছে। এখানে সুখ অর্থে আনন্দ। সংসারের
প্রাণ ভরে না, আশ মিটে না,—মন তৃপ্তি পা
স্থিতি লাভ করে না,—সে আরও চায়, কিন্তু কি
ভাল করিয়া নির্দেশ করিয়া বলিতে পারে না,—
নেতি,—ইহা নহ, ইহা নয়, বলিয়া একে একে সমস্ত
পরিত্যাগ করিতে থাকে,—অবশেষে যতক্ষণ না সেই

গিয়া পৌছে, ততক্ষণ তাহার ব্যাকুলতার আর
কেন না ।

জনর ! আনন্দ কোথায় ! আনন্দের ব্যাবাহার জানিয়া
লগ্নে ধূলিবৎ পরিত্যাগ করিয়া মহাপুরুষেরা অন্তঃপথে
করিয়াছেন, সেই অসার অনিত্য তুচ্ছের মধ্যে তুমি
খুঁজিতেছ !—বাহ্য চাকচিক্যময় মায়ার পুতুলকে
শন করিয়া তুমি জননীর উৎসর্গের অপার আনন্দ
করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ ! কাঠের কঠিন চুখিকাটি
য়া তুমি মাতৃস্তন্য স্তম্বারসের অমৃত আশ্বাদন উপভোগ
র ইচ্ছা করিতেছ ! হায়, ভ্রান্ত ! আনন্দ উহার
কোথায় ! আনন্দ উহার মধ্যে নাই, উহার মধ্যে
—বাসনার বিটপী এই বিচিত্র বস্তুধার কেবল একমাত্র
গন্ধরাজ চিরকাল চির শোভায় সূটিয়া আছেন,—
নিকটে দূরে, অন্তরে বাহিরে,—গন্ধেত্তরা, প্রাণে
—তিনিই ত্রিগুণ, তিনিই শাস্তি,—তিনিই একমাত্র
—নন্দময় ব্রহ্ম ।

শ্রীস্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সিরাজ-সমাধি ।

খুসবাগ, মূর্শিদাবাদ ।

নিভৃত এ আশ্রুকুঞ্জে প'ড়ে আসে বেলা
ধীরে ধীরে ; পরিত্যেছে তিমির-মেখলা
শ্রামাদিনী বসুমতী সরমে হেলায়,
এ আশ্রকাননে আজি বেলা যায় যায় ।

বেলা যায় প্রতিদিন, কিন্তু আজিকার
সন্ধ্যা যেন সুনিবিড়, যেন অন্ধকার
আনিত্যেছে অগস্ত্যের পূর্বতীর হ'তে,
যে দিক ভা'নায় নিত্য আলোকের স্রোতে
এই বসুন্ধরা ; আজি এ আশ্র-কাননে
এ বিজনে কার কথা ভাবি আন মনে
কাহার স্বদীর্ঘ তীব্র শোক-কাহিনী
রাজিয়া উঠেছে মোর হৃদয় নিভৃত
—কি ? শুণ্ড প্রেম-অভিসারে

কবে কেহ এসেছিল, কেমনে তাহারে
করেছিল সম্ভাষণ দমিত অধর,
ঢেলেছিল বাক্যজ্বালা, আরো মিষ্টতর
মুহূ হাসি,—এ নহে গো হীন স্মৃতি তার ।

এই দীন কক্ষ আর এই অন্ধকার
সিংহাসন আজি তব, রাজত্ব তোমার
হে সিরাজ ! ভাবিয়াছি আঁহা যতবার
এই নিদারুণ কথা, গিয়াছে চুটিয়া
অজ্ঞাতে অশ্রুর বীধ । কাঁপিয়াছে হিরা
ভাবিয়াছি যতবার তব বরতন
ধূলিসুষ্টি আজি, তার অণু পরমাণু
মিশারে গিয়াছে আঁহা এই ভূমিতলে !
কতজন রচিয়াছে কল্পনার বলে
অপূর্ব কাহিনী কত তব নাম ল'য়ে
বীভৎস, ভীষণ । এই নিভৃত আলয়ে
এই সমাধির পাশে হৃদয় আমার
সে নিদ্রুক দলে আজি দিতেছে শিকার ।

ইতিহাস,—সে কি কারো বিবেচ্যগ্রন্থত
কল্পনা-কাহিনী, পিতৃমাতৃহীন স্মৃত
পরদত্ত পিণ্ড ল'য়ে করে অহঙ্কার ?
কে গিয়াছে কল্পনার হেন অধিকার
যায় মুখ চেয়ে আজি করে অপলাপ
নির্ভয়ে সে সত্যের সম্মান ? অভিলাপ
এক কথা, ইতিহাস তার কেহ নয়,—
সত্যের সমষ্টি সে যে, সত্য অভিনয় ।

আজ তবে এ নিভৃত বিজন সন্ধ্যায়
হে সিরাজ দেখা হোক তোমার আমার
সত্যের আলোকে ; সার্ব্ব এক শতাব্দীর
পরে যেন আজ তুমি দাঁড়াইয়া স্থির
এই দীন সমাধির সিংহাসন পরে ;
আর আমি, সসম্মখে শির নত ক'রে
আছি হেথা দাঁড়াইয়া ভ্রাতা দীনতম

একান্ত তোমারি। নহ তুমি নিরমম
অধম সিংহ, ইংরাজের মনোমত
কল্পনার ছবি; নহ পরস্রীনিরত *
পাষণে কঠিন নর, পাগ-অবতার।

লহ তবে হে সিরাজ লহ নমস্কার
এই দীন ভ্রাতা হ'তে; তোমার চরণে
ধিয়াছ যতনে স্থান যে নারী-রতনে
ঠাহারেও করি নমস্কার; প্রেমময়ী
মৃতিক বেগম আজ তুচ্ছ মৃত্যুঞ্জয়ী
তোমার চরণতলে। এ সুন্দর ছবি
কে দেখিবে?—ওই দূরে অন্তর্যামন রবি,
আর হেথা আশ্র-বনে সন্ধ্যার ছায়ার
এই নগরোপকণ্ঠে এই নিরালয়ে
কি অপূর্ণ শ্মশান-মিলন! চিরদিন,
তবে চিরদিন হেথা কোলাহলহীন
অবতরিত এই শূন্য উপবনে
ধাক' ধরণী-ধূলি-বাসর-শরনে।

কোথার প্রাসাদ আজি লক্ষ বস্তিকার
সুশোভিত? চাটুকার কথার কথার
কেশায়ে তুলিত হাসি অর্থলেশহীন,
কোথার সে হাসিরাশি, কোথা সেই দীন
পরভাগ্যজীবী নব? কোথা দাসদাসী
কর্মহীন ব'সে ব'সে করি' হাসাহাসি
কাটাত সময় ধারা, আভূষিতপ্রণত,
মুহমুহ হ'য়ে ধীরে জীবনের ত্রত
সাজ করে গেছে? কোথা নর্তকী গায়িকা
বিলোল চাহনি-ভরা, বার আধ্যাত্মিকা
বিশ্ব হ'তে মুছে গেছে।

অতীতের কথা

ধাক আজি। জেগে উঠে নিদারুণ ব্যথা

* ঐতিহাসিকগণ সিরাজকে এই সকল কলঙ্ক হইতে মুক্ত
করিয়াছেন। অসং শেঠের পরিবার সক্রান্ত ঘটনাও মূর্খিতাবাজে
মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত।

খুলিলে ও জীবনীর অন্তিম অধ্যায়।
আসিছে আঁধার রাত; নিদ্রাছে বিদায়
দিবালোক; জালি' দিয়া শিরবে তোমার
সুত্র দীপ, নির্মিত সে তুচ্ছ মৃত্তিকার,
প্রহরী গিয়াছে গৃহে। তবে আর আজ
কহিব না কথা; তুমি ঘুমাও সিরাজ।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোৎস্নার।

রোমাঞ্চ হ'তেছে মোর হেরি' আজি এ শান্ত মাদুরী
—যেন এক স্বপ্ন-বিশ্ব জুড়ি'
বিচ্ছুরিত—সুধাপ্রসূত, সুনির্গল, তরল আল্লাদ।
যেন শুধু এক মধু-স্বাদ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভরা! যেন এক বিবৃত কল্পনা
অতীত জন্মের! উদ্ভাদনা
যেন আজি মূর্তিমান—সুচ্ছ, এহি সম্পূর্ণ স্বরূপে।
যেন চাহি' অজ্ঞাত মধুপে
চরাচরে ফুটি' আছে একটি বিরাট শতদল—
সুখ-স্বপ্নে রচিত, উজ্জল!
আজি যেন আমি নাই! মনে হয়—যেন কি বন্ধার
উষ্টি'ছে এ অঙ্গে অনিবার
পরাম-প্রমত্ত করা! যেন আজি কোন-কিছু হার—
জানা কিবা বুঝা নাহি যায়!
যেন হেরিতেছি—ব্যাপ্ত সত্ত্বঃসহ সুখ-বেদনার
দীপ্ত এক মোন হাহাকার!
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

চিত্র-পরিচয়।

বর্তমান সংখ্যায় যে নানাবর্ণে চিত্রিত সুন্দর ছবিখানি
দিলাম, তাহার মূল চিত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত,
এখন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পত্তি। ধৃত
অম্বাঙ্ক ছিলেন। ঠাহার মহিষী গাঙ্গুলী

পক্ষে মঙ্গল, নতুবা হোটেলের বিল মাসের শেষে দেখিবেন যে প্রায় ডবল লম্বা ও ডবল চাকার অঙ্ক বৃকে ধারণ করিয়া চাকরাণীর হস্তস্থিত রৈকাবে চড়িয়া আপনার ঘরে হাজির। যখন চাকরাণীকে মোট চাকার অঙ্কেব কথা জিজ্ঞাসা করিবেন * তখন যখন সে তাহার সঙ্গিনীর সঙ্গে

* বিল, জাপানীতে লেখা থাকে।

পরামর্শ করিয়া (বিল লইয়া প্রায়ই দুজন চাকরাণী আসে) ১৪ ইয়েন এর স্থানে নিজ পো (২৫) নিজ রকু (২৬) ইয়েন ইকিবে, তখনই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ইওরসি (আচ্ছা বেশ) বলিয়া আরাম কেদারায় শুয়ে পড়িতে হইবে। তাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে মিতব্যয়ী হাত্রাগণ পূর্বেই যেন সে বিষয়ে সাবধান হন। বন্ধু বাড়ী এলে তাহাকে খাওয়ার ইহাই জাপানের রীতি। জাপানে স্বাবলম্বন চলে না, কোন কোন ছেলে প্রায় স্বাবলম্বী হয়ে জাপানে এসে, অনেক সময় অপরাপর ভারতী হাত্রাগণকে অনেক অহবিধায় কেলিযাছেন। সত্য বটে তাহাদের যদি মাসিক ৩০-৩৫ টাকাও আয় হইত তবে কাহারও দরজার তাহারিগণকে যেতে হ'ত না।

সত্যের খাতিরে বন্ধুর প্রতিবাদ গিলির কিছু আংশিক প্রতিবাদ করিলাম; অনুরোধ করিয়া আপনার সুবিধায় প্রবাসীতে যদি কিঞ্চিৎ স্থান দান করেন, আশা করি তাহাতে সত্য প্রচারিত হইবে।

বিনীত

শ্রীঅনাধবকু সরকার।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনাধবকু সরকার মহাশয় আপনার খবর সম্বন্ধে বাহা লিখিতেছেন উহার সত্যতা আমবা জাপানে অবস্থান করিয়া সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিয়াছি।

California University,
Berkeley, California,
U. S. A.

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ।
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র নাগ।
শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র দাস।
B. D. Pande.
শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ গুহ।
শ্রীরাইমোহন দত্ত।

ভারতে বৌদ্ধ প্রভাবের শক্তি।

প্রীতিভাজনেষু

প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউকর আমার লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন—সমস্তই ঠিক। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক রহস্য উহার দ্বারা যোগ্য ব্যক্তিগণের লেখনী হইতে সুসংস্কৃত হইয়া বাহির হইলে অনেকের অনেকপ্রকার ধন্দ মিটিয়া বাইতে পারে। উহার প্রদর্শিত ঐতিহাসিক বিবরণের বিবরণে আমার বোনো কথা বলিবার নাই। আমার বক্তব্য কথাটির প্রকৃত মর্ম্ম বাহা, তাহা অল্পের মধ্যে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইলে অনেকগুলি আনুমানিক বিষয় বাদ-মাদ দিয়া মোটের উপরে বলা ভিন্ন সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খকপে খুঁটাইয়া বলা আমা দ্বারা ঘটরা ওঠা অসম্ভব। বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভূতনের পবে যখন ব্রাহ্মণপ্রধান ক্রিষাকর্ম্ম আমাদের দেশে পুনর্ব্বার গা খাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তাহার ভিতরে ভিতরে কার্য করিয়াছিল ইহা অতিশয় স্পষ্ট। এমন কি—বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গোষ্ঠাস্বামী পণ্ডিতেরা ভাবে গতিকে সঙ্ক্ষে বৃদ্ধিতে পাবিয়াছিলেন যে, শঙ্করাচার্যের মত “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মেব তৎ।” তা ছাড়া, ভবভূতি প্রভৃতি কবিদিগের গ্রন্থেব পাতায় পাতায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব জানা দিতে ছাড়ে নাই। তা শুধু না—আমাদের দেশের অনেকানেক অবৈদিক রীতি পদ্ধতি

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দ্বারা ওতপ্রোত। বৌদ্ধের কোটায় নিক্ষেপ করিয়া বলিতে হইত যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতরে স্বাধীন উদ্ভাসদান বাহা আছে, তাহা আমাদের দেশের মধ্যমাবীর বিজ্ঞানদর্শন প্রবর্তক। অর্থাৎ আমি বলিতে চাই এই যে, বৌদ্ধধর্ম্মে প্রচ্ছন্ন ভাবেই হোক আর স্পষ্ট ভাবেই হোক কার্য না করি চিন্তাব স্রোত আমাদের দেশে প্রবর্তিত হইতে পারিত না। বিষয় এই যে, সে স্রোত জনসাধারণের ভোগে আসিতে না ত ভগীরথের অবতারেবা তাহাকে উটাপথে কিরাইয়া দিল। বৌদ্ধধর্ম্ম দশ। এবং ভাস্করাচার্য প্রভৃতির অভ্যুদয় দশার ম কালাংশটুকু দেউকর মহাশয়ের দ্বারা ইতিহাসবেত্তাদিগের নিঃ বলিয়া মনে হইবারই কথা; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখি বৌদ্ধ আমলেরই একপ্রকার পরিশিষ্ট বা লেজুড। ফুল হইবার পরে ফুলের গন্ধ কিছুকাল ধরিয়া টেকিয়া ছিল—বি অবলম্বনে তাহা কতকাল টেকিয়া থাকিতে পারে? আর আমাদের দেশের দৈবজ্ঞদিগের মধ্যে কেবা জানে ভাস্করাচার্য, জানে অর্ঘ্যভট্ট। সকলেই জানে পৃথিবী ত্রিকোণ, এবং। রাহুর নষ্টামি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব আপনাপনি যত টেকিয়াছিল—ছিল; কিন্তু সে প্রভাবের প্রতিরোধ করিয়া শূন্য পরিধান করিতে হইবে—স্বাধীন চিন্তাকে মাথা দেওয়া হইবে না, নীচের জাতিকে নীচে রাখিয়া রাখিতে হইবে জাতিকে বর্ণে ভুলিতে হইবে—নিম্ন শ্রেণীর শাস্ত্রকারদিগের যে একটা ভূতগত সংকল্প, এই দুর্দান্ত সংকল্পটাব কোপে আমাদের দেশে ভাস্করাচার্য প্রভৃতি প্রতিভাশালী পণ্ডিত সমস্ত উদ্যম অধ্যবসায় ডুগল হইয়া গেল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বতকাল জীবিত ছিল, ততকাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াও নি—কিন্তু তাহার পরে যখন জনসাধারণের মধ্যে তাহার নাঃ রহিল না, তখন আমাদের দেশের অন্তঃকরণদ্বারা পরাধীনতা এরূপ আর্তপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িল যে, এখনো পর্যন্ত আমাদের মতে ইটিবার বল পৌছিতেছে না। আমাদের মনের যখন এইরূপ তখন আমাদের দেশে যে পরাধীন হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠা

প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শান্তি—শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ডিমাই দ্বাদ ১৭ পৃষ্ঠা। মূল্য এক আনা। “সুত্র পদ্য-কাব্য”। গ্রন্থকারের একতাত্ত্বই শান্তি। বঙ্গের সমস্ত সন্তান একতাবদ্ধ হইলে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। এই সামান্য বক্তব্য ফেনাইয়া দী হইয়াছে। পদ্যে প্রবাহ আছে, স্থানে স্থানে কবিত্বও আছে, ভাবুকতা কুড়াপি নাই। গ্রন্থকার অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব করিতে বিশেষ আগ্রহাযিত।

জাপানী কামুসো—শ্রীমণিলাল পঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত। ই পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। রয়াল বেডশাংসিত ৮৫ মূল্য আট আনা পাত্র। কতকগুলি জাপানী উপকথার অবলম্বন করিয়া শিল্পের ভাবে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। রচনার মণিবাবু সর্বশেষ কৃতির দেখাইয়াছেন। ইহার বর্ণনার শব্দের বন্ধন ও লালিত্য, বর্ণিত প্রভৃতি বহু ভগ্ন এক অবনীল

আর কাহারো লেখাতে দেখি নাই। ইহা পাঠ করিয়া হাসিবে কীত হইবে, কিছু শিখিবে, চিন্তা করিবার মতও হইবে। আধুনিক অনেক শিশু পাঠ্য পুস্তক শুধু বাচ লতা ও লবতা হইয়া উঠিতেছে। আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার আয়োজন, ও উপকরণ খুব অল্প পুস্তকেই বেধা যায়। মশিলাল বাবু সেই তরক পথ ছাড়িয়া নতুন পথে দাঁড়াইয়াছেন ও তাঁহার প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। নবীন গ্রন্থকারের নিকট আমরা হৃদয়বতর আশা পুস্তক আশা করিতেছি। এই পুস্তক শিশুদের পিতামাতাকেও ভাবেব রস জাগাইবে। দশখানি হৃদয় হুমুত্রিত হাকটোন ত হইয়া পুস্তকখানি অবিকতার উপভোগ্য হইয়াছে। স্বদেশী লক্ষ্যে তাঁকে পরিকার ছাপা। মলাটের পরিকল্পনাটিও দৃষ্টিগ্রক।

মুদ্রিত।
প্রদে মুদ্রিত।
র গ্রন্থাবলী—শ্রীপাদীশঙ্কর দাস গুপ্ত প্রণীত। নব্যভাবত কার্ণী প্রকাশিত। “আমার গ্রন্থাবলী” বলিলে পাঠককে পূর্ণাঙ্গী বাবুর মধ্যে উচিত হইবে। “আমার গ্রন্থাবলী” মধ্যে আমরা প্যারী মলিপিত বইগুলি অন্তর্ভুক্ত করিতেছি; (১) বক্তার—নাইক জীবনবৃত্তান্ত। মূল্য চারি আনা। (২) মহারাণা প্রতাপ-সিংহের লেখা। মূল্য ছয় আনা। (৩) পার্গী—ব্রহ্মবাদিনী বৃত্তান্ত। মূল্য তিন আনা। (৪) ক্রবের উপাখ্যান। মূল্য ১। (৫) আর্ধ্য-বিধবা—বিধবা বর্মণীর আদর্শ, কর্তব্য, সংযম, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক। মূল্য তিন আনা। গ্রন্থগুলি মলিপিত গ্রন্থাবলী হইবার সর্বোৎকর্ষ উপযুক্ত। “আর্ধ্য-বিধবা” বিধবাদের উচিত। কিন্তু গ্রন্থগুলির বচনা সযত্নে কিছু বক্তব্য পৌরাণিক উপাখ্যানের সহিত ধীর কল্পনা শ্রীয়াই যে ভাব গ্রন্থগুলিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে নাই। কেবল উপাখ্যানটির বর্ণনা উপলক্ষে বর্ণিত শ্রেয়, শিক্ষা ও নীতি পাবিস্কৃত করিয়া দিলেই হৃদয় ও ইতি। গ্রন্থগুলির মূল্য ও সৌষ্ঠব মনোহর হয় নাই।

শ্রীপ্রবন্ধনা দেবী প্রণীত। ইতিবাচন পাবলিশিং হাউস হইতে। এই সর্বজন সমাদৃত কবিতা পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ আমাদের দেশে কবিতা পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াই আমাদের কাহুরঞ্জনের প্রকৃষ্ট পরিচয়। ছোট ছোট অনেকগুলি গানে একত্রিত হইয়াছে, তাই ইহার নাম রেণু। কিন্তু ভাবে-মাধুর্য্যে-সৌন্দর্য্যে স্বর্ণরেণুর মত উজ্জ্বল। ভাষা বক্তব্য বাহুল্যবর্জিত। ছন্দে প্রবাহ আছে। অল্প মধ্যে কোনো একটি ভাবকে সম্পূর্ণ ফুটাঁয়া তোলা বড় কঠিন। কর্মে গ্রন্থকর্তা সিদ্ধহস্ত ও অপ্রতিদ্বন্দী বলিতেও অত্যুক্তি নহে। ছাপা কাগজ বাঁধাও ভালো। কৃষ্ণলীনে প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১।

গ্যালেরিয়া—শ্রীরাজকৃষ্ণ মণ্ডল প্রণীত। ডিমাই প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা। ইহাতে গ্রন্থকারের নিজ অভিজ্ঞতার কারণ ও প্রতিকার যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাই বিবৃত। গ্রন্থকার চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ, নহেন। ইহাতে অভিজ্ঞতালব্ধ মৌলিক পিবন্ধ হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক ও বিশেষজ্ঞেরা ইহার ও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

ব—অর্থাৎ গোপ ও সলোপ জাতির ঐচ্ছিকের প্রমাণ ও তত্ত্ব। শ্রীগিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ও শ্রীবিজ্ঞানীকান্ত ঘোষ প্রণীত ও চাঁদপুর বৈজ্ঞানিক সন্থা সমিতি হইতে প্রকাশিত। ১ আনা। বেদ, পুরাণ, সাহিত্য, ইতিহাস ইহাতে প্রমাণ ও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে সলোপ বৈজ্ঞানিক।

হইয়াছে। ইহার আকৃতিতে অনাধ্য নহেন, শিক্ষার আর্থিক পাইলে সেই ইহার উন্নতি পথ কল্প্য কবিতা পারিবে না। দেশেব সকল কৃতিতর যে শুদ্ধ উন্নত হইবাব প্রচেষ্টা জাগিয়াছে। ইহা আশা প্রদ। সকলেই সামাজিক অধিকার যোগ্যতা বা বুদ্ধি দ্বারা লইতে পাবিলে শাস্ত্রের দোহাই আবিষ্কৃত হইবে না। আর যোগ্যতা যদি না লাভ হয়, শাস্ত্র কাহাকেও বড় করিতে পাবে না। যোগ্যতা লাভের একমাত্র উপায় শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষায় যোগ্যতা জোগায়, যোগ্যতা সামাজিক অধিকার আপনি আদায় হয়। জানে, চরিত্রে শুদ্ধ না হইলে শাস্ত্রের শুচিতার দোহাই নিরর্থক, পণ্ডিত। ইহাই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠার উপায় নির্ধারণ করা উচিত, কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নহে। আমবা জানিয়া আশাবিত হইয়াছি যে ঈহাদের চেষ্টায় এই পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উল্লিখিত সর্ববিধ উপায়ই অবলম্বন কবিয়াছেন।

বকিমচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। সিটিবুক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত ভাবভগবীর প্রন্থাবলী অর্ন্তগত অন্ততম গ্রন্থ। মূল্যপাণ্ড অষ্টাংশিত ১১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ আনা। ইহা বকিমচন্দ্রের জীবনী নহে—প্রতিভা ও মত বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণ কঠোর হইয়াছে। ভাষা কবিত্বময় ও হৃদয় প্রবাহী। কিন্তু এক পর্বাণের অন্তর্গত বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যে বচনান্তরী একা একত্রিত হইতেছে না। ইহাতে কবির বিশ্লেষণ এমন গুরুত্বাবে হইয়াছে যে এই পর্যায়ের অপরগ্রন্থ যে সকল বালকে বুঝিবে ইহা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত গুরুপাক হইবে। ইহা বহুস্তর উপভোগ্য, চিন্তাশীলের আলোচ্য হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় এই গ্রন্থাবলী বালকদিগের জন্যই রচিত হইতেছে।

শব্দশা—প্রণেতা শ্রীহেমেন্দ্র ঘোষ বি, এল। প্রকাশক শ্রীউমেশ-চন্দ্র গুহ খাসনবিস। ক্রাইন অষ্টাংশিত ৪৩৮+২+জ+১০০ পৃষ্ঠা। মূল্য, এক টাকা বারো আনা। এখানি কাব্য, বোধ হয় মহাকাব্য। অষ্টাদশ সর্গে বিরচিত। অষ্টাদশ সর্গ লিখিয়াও গ্রন্থকারের তৃপ্তি হয় নাই, এক প্রকাণ্ড পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে। তাহা চাড়া আরো বহুবিধ উপসর্গ ইহাতে আছে। সপ্তপৃষ্ঠাবাপী শুদ্ধিপত্রকেও আবার সংশোধন করিতে হইয়াছে। এতদ্বিত আপাতদৃষ্টিতে ছাপা কাগজ মন্দ নহে। সামান্য প্রেসে ছাপা। এই কর্মবহুলতার যুগে এত বড় দীর্ঘ কাব্য পড়িবার অবসর খুব অল্প লোকেবই ভাগ্যে ঘটে। এই গ্রন্থ বর্তমান যুগে গীতিকবিতার একাধিপত্য। মানবের ক্ষুদ্র মনস্তত্ত্ব গীতিকবিতার বিষয়; মহাকাব্যের বিষয় দীর্ঘ ঘটনাপন্থাপর। এই কাব্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে ভীষ্মদেবের শব্দশা উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, নানা ছন্দে সর্গগুলি বিরচিত। ভাবে ভাষায় ছন্দে বর্ণনার বিশেষত্ব নাই। বচনানে স্বরচিত শব্দ সুষ্পন্দারণ ও অপ্রচলিত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহাই হউক গ্রন্থকারের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

অনুবিজ্ঞান—শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত। শ্রীমুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত (২৮ এটনি বাগান লেন) কর্তৃক প্রকাশিত। ক্রাইন অষ্টাংশিত ৩৬২ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা। ইহাতে বেদান্ত মতে আত্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। একপ দার্শনিক গ্রন্থ বঙ্গলায় বিবল, অধিকন্তু গ্রন্থকার বেদান্তমতের সহিত যুরোপীয় দার্শনিক মত তুলনার সমালোচনা কবিয়াছেন। গ্রন্থকার সকল প্রচলিত মত নিরপেক্ষ হইয়া তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। এই স্বাধীনতা অবলম্বনে তাঁহার সহিত হয় ত অনেকের মতানৈক্য ঘটতে পাবে। কিন্তু তথাপি ইহা যে গভীরগতিক পথ হইতে স্বতন্ত্র এই গ্রন্থই ইহা দার্শনিক ছাত্রের নিকট সমাদৃত হইবে। গ্রন্থমধ্যে বহু জটিল তত্ত্ব সরলভাবে বীমাংসা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গ্রন্থের হুচী ও বিবরণী খুব উপাদেয় হইয়াছে।

ধর্মসমাজ ও বাণীচিন্তা—শ্রীযশমণী বেদান্ততীর্থ, এম, এ, বিবৃত।
প্ৰতি সপ্তাহ প্রকাশিত পুস্তকাবলীর অন্ততম পুস্তক। ডিমাই
বাদশাশাসিত ৭১ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন আনা। ইহাতে শাস্ত্রপ্রমাণ
সহযোগে ধর্ম, সমাজ ও বাণীচিন্তা কি এবং কিরূপ হওয়া উচিত।
তাহারই আলোচনা হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে বাণীচিন্তা,
কুসংস্কারবিরোধিতা, অভ্যন্তর আচার জ্ঞাপেক্ষা বুদ্ধিমূলক অমুষ্ঠানের
সংস্কৃতি প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে বহু দার্শনিক তত্ত্বের
সহিত হিন্দুর আভিভেদ, জীজ্ঞাসার অবস্থা, বিধবা ও কুলীনকন্ডার
অবস্থা, আরাধনা বাঈপাসনা, ইংরাজী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা
করিয়া গ্রন্থকার মনোবীর পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকার আপনাম
শিক্ষার সার্থকতা দেখাইয়াছেন। এই পুস্তক আমরা সকল হিন্দু
মনন্যরীকে ভাল করিয়া পাঠ করিতে অমুরোধ করি।

পরীক্ষা—শ্রীরাগচন্দ্র ভাগবতীরদ্বারা রচিত। মূল্য চারি আনা।
এখানি নাটক। আসামী প্রাদেশিক ভাষায় রচিত। আসামী বাংলায়ই
উপভাষা। ইংরাজ খীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহা বাংলা হইতে বহু
করিবার ব্যয়সা করিয়াছেন; আর অধিরাও এমনি নির্বোধ যে অমনি
আমরা নিজেরাই প্রাদেশিক ভাষাকে প্রাধান্য দিয়া standard বাংলা
ভাষা হইতে পৃথক হইয়া পড়িতেছি। ইহাতে বাদলা ভাষায়ও লোকসান,
নিজেরেরও সমুদ্র ক্ষতি, ইচ্ছা করিয়া বঞ্চিত হওয়া। Standard বাংলা
ভাষা হইতে চট্রগ্রাম নোয়াখালীর প্রাদেশিক ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।
যদি মনোনীত সেন প্রভৃতি কবিগণ প্রাদেশিক ভাষায় কাব্য রচনা
করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আজ করুণ চিনিত। আসামী
ভাষাও উচ্চারণ বৈষম্যে standard বাংলা হইতে পৃথক। এই
বৈষম্য ত্যাগ করিয়া সমগ্রতাই একতার প্রতি আসামবাসীদের আকর্ষণ
নাই, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। সমালোচ্য গ্রন্থে অর্জুনের সংঘ
পরীক্ষা বিবৃত হইয়াছে। অর্জুন জ্ঞানসাহায্যে ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন
জয় করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন ইহাই বক্তব্য। ইহাতে নাটকও কিছু
নাট। কিন্তু বহুস্থানে কবিত্বের পরিচয় আছে। আসামী ভাষা বাংলার
কতদূর অনুরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য দুই পংক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম—

“সখি; সংসারর

অনন্ত যৌবন, বিধে অনন্ত আনন্দ,
তারো আগে এমে অহঙ্কার।”

হিন্দী বাদলা বর্ণ শিক্ষা—শ্রীরাগচন্দ্র পোখামীদ্বারা সংকলিত ও
প্রকাশিত। দাপ্তরী প্রচারক এণ্ড কোম্পানি, বৃন্দাবনে পাওয়া যায়।

ডিমাই অষ্টাংশিত ১১ পৃষ্ঠা। মূল্য এক আনা। বাঙালীর
শিক্ষার উপযোগী পুস্তক। বাংলা শব্দ বা পদের হিন্দি অমুবাদ
উত্তর ভাষার রীতি দেখানো হইয়াছে।

সংস্কৃত প্রবেশিকা—গুরুকুল বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত
১০ আনা, ইহাতে সংস্কৃত শিক্ষার্থীর কয়েকটি প্রাথমিক পাঠ
এ দেশ প্রভৃতিও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, এ পুস্তক পাঠ
মিতান্ত্রই গুরুনির্ভর হইতে হয়।

বালকধানীতিমালা—গুরু ল বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত
পাঠ। পঞ্চম হইতে সংগৃহীত আখ্যান সমস্ত সংস্কৃতে বর্ণিত হই
গ্রন্থশেষে কঠিন বাক্যের শব্দার্থ হুটী দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যা
হইবার উপযোগী।

Harinabhi past and present—অমূল্যচরণ ভট্টা
অন্নবা প্রসাদ ঘোষ কর্তৃক বিবৃত। ক্রাউন অষ্টাংশিত ১৬
মূল্য দুই আনা। ইহাতে হরিনাভি গ্রামের পুরাতন ও বর্তমান
আলোচিত হইয়াছে।

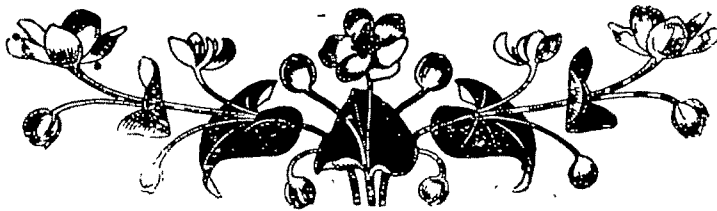
Essays and Letters, parts I and II—By
Banerji, published by S. C. Auddy & Co. ইহাতে
ও পত্র রচনার নমুনা, পদ্ধতি ও সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে।
উপযোগী। ছাপা পরিষ্কার। ইংরাজী ও বিবরণনির্বাক্ত ভাল।
দুইভাগের ছয় আনা ও আট আনা।

ভূতভূত কাণ্ড—শ্রীমদিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ছয়
দ্বিতীয় সংস্করণ। তিন মাসের মধ্যে যে পুস্তকের দ্বিতীয়
হইয়াছে তাহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। দ্বিতীয় সংস্করণে
ও পরিবর্তন হইয়াছে। ইহাতে সম্মোহনতত্ত্ব, পারলৌকিক
ইত্যাদির কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মূল্য-৮

ভ্রমসংশোধন।

পত কাল্কন মাসের “প্রবাসীতে” প্রকাশিত “বৌদ্ধবর্ণ ও ভাস্কর্য্যঃ
শীর্ষক প্রবন্ধে, ৬৩৬ পৃষ্ঠায় কয়েক স্থলেই লিপিকর প্রমাদবশে
শকাব্দের পরিবর্তে “১৩০৬ শকাব্দে” এবং “১৩৭৫ শকাব্দের পশ্চি
“১০৭৫ শকাব্দে” মুদ্রিত হইয়াছে।



৩১, ৬২নং বোঝার স্ট্রিট, কলকাতা প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।